বিংশ শতাব্দী

756.3
.005/41

পঞ্চম বর্ষ প্রথম খণ্ড

১ম সংখ্যা আষাঢ় ১৮৮২ হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৮৮২ পর্যন্ত

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	অ	
অলঙ্কার থেকে শিল্প (বিচিত্রা)	অশোক মুখোপাধ্যায়	
অমায়ুত অতিথি মিউকর (বিজ্ঞান)	সুব্যয়াচী বন্দ্যোপাধ্যায়	
অলিম্পিকের আদর্শ ইতিহাসের ভূমিকা (খেলাধূলা)	অজয় বসু	৩৪৫
অন্য এক নাম (উপন্যাস)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৫৬
অন্ধকারের ডায়েরী (গল্প)	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	৫১৭
অনুরূপ (গল্প)	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৫৮৭
অভিশলক (গল্প)	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	৬৩৭
অনন্তে দ্যাখিয়ে (বিশ্বসাহিত্য)	সরূপ আচার্য	৭৩৪
	আ	
আষাঢ়ের কথা	সম্পাদকীয়	১, ১২১, ২৪১, ৩৪৯
আদিবাতেঁ মৌয়াভিয়া (বিশ্বসাহিত্য)	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৬
আজব দুনিয়া (হাস্যকৌতুক)	শ্রীজ্ঞানপাপী	১১৩, ৮৪৩
আরোগ্য (কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	২২৫
আদিবাসী ও উপজাতিদের গান (সংগীত)	চিত্তরঞ্জন দেব	২৭৩
আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে শক্তি (প্রবন্ধ)	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৩৪০
আসামে (প্রবন্ধ)	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪১৭
আত্মা (চিত্র)	ব্যাধিকানন্দ রায়চৌধুরী	৪৯৯
আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ (প্রবন্ধ)	কপিল ভট্টাচার্য	৫০১
আসাঢ় (প্রবন্ধ)	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৬১১
আগস্ট, ১৯৬৯ (কবিতা)	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৬৩২
আলিপ (চিত্র)	অবনী ঘোষ	৬৩৬
আ উৎসবে নৃত্যগীত	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৬৭৪
আ রো (কবিতা)	শ্যামলী কুমার	৭৮৪
	ই	
ইয়োজিসম ও এজরা পাউণ্ড (প্রবন্ধ)	অনুকূল লস্ত	
ইন্দ্রিয়তত্ত্ব (কবিতা)	বিনয় চাকরা	
	উ	
উপন্যাসের কর্মকাণ্ড (সংলাপ)	শিশির চট্টোপাধ্যায়	
	ঋ	
ঋষিবেশের সমাধি (গল্প)	সুকুমার সেনগুপ্ত	৬৩৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	এ	
এ টাইম টু লীভ অ্যাণ্ড এ টাইম টু ডাই	উপগুপ্ত	৮১
একটি অনুভব (গল্প)	নীলাদ্রি চক্রবর্তী	১৪৫
একটি আধুনিক উপন্যাস (পুস্তক পরিচিতি)	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২৫
একদা বসন্তে (উপন্যাস)	বিমল কর	৬৫০
একটি স্বপ্নের জের (গল্প)	রমাপদ চৌধুরী	৭৭৮
একটি বিপ্লবের জন্ম (প্রবন্ধ)	আনন্দ দে	৭৮৫
একা (গল্প)	কার্তিক লাহিড়ী	৮৮৯
	ও	
ওভার ব্রীজ (চিত্র)	অবনী ঘোষ	৬৩১
ওল্ড বেইলী কোর্টে (ইতিকথা)	ভবঘুরে	৮৬৬
	ক	
কয়লার রং কালো (প্রবন্ধ)	হিমানীশ গোস্বামী	৩৩
কোন মৃত কবির প্রতি (কবিতা)	মণিভূষণ ভট্টাচার্য	৩৪২
কালস্য কুটিলা গতি (কবিতা)	অন্নদাশঙ্কর রায়	৩৯৪
কাকতালীয় (ছড়া)	দিওবারস	
কলোনীর বাজার (চিত্র)	দমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	
কংগ্রেস আন্দোলনে নরম ও গরম দল (রাজনীতি)	মুজফ্ফর আহ্মদ	৪৮৩
কয়েকটি পুরানো গির্জা (ইতিহাস)	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
	খ	
খেলাধুলো ও একালের বাঙ্গালী (খেলাধুলো)	অজয় বসু	১১৪
খবরাখবর (রঙ্গজগৎ)	কুমার গুপ্ত	১১৪
খাদ্য সমস্যা ও জনসংখ্যা (আর্থিক প্রসঙ্গ)	মন্মথসুন্দর	১৮০
	গ	
গল্পা (রঙ্গজগৎ)	মানিক সেন	৯৬৬
	ঘ	
ঘরে ফেরার পথ (গল্প)	শিলাদিত্য	২৮৯
	চ	
চায়ের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)	বীরেশ্বর বসু	১০২, ১৪৯, ২৪১, ৮২৮, ৮৮৫
চিত্তচকোর (গল্প)	সুবোধ ঘোষ	৭৯৬
চীনের গণকমিউন ও মার্কসবাদ (প্রবন্ধ)	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	৩৯৫
	ছ	
ছুঁচোর বিবর্তন (কার্টুন)		১৯
ছোট কথা (গল্প)	সন্তোষকুমার ঘোষ	৫৫৯
ছায়া নেই তার (কবিতা)	উৎপলকুমার গুপ্ত	৭৮৩
	জ	
জেনে রাখা ভাল (কার্টুন)	বুদবুদ	১৯
জ্বালানী তেলের জ্বালা (আর্থিক প্রসঙ্গ)	মন্মথসুন্দর	৩
জলের রেখা (কবিতা)	শ্যামসুন্দর দে	৭২৯
জাতিসংঘ ও তার ভবিষ্যৎ		

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ঝ	
ঝুমুরের গান (সংগীত)	চিত্তরঞ্জন দেব	
ঝিলিমিলি (গল্প)	মৈত্রেয়ী রায় চৌধুরী	
	ট	
টেলিফোন (নাটিকা)	শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী	
টুকরো খবর		
	ড	
ডেভিড লো ও তাঁর কার্টুন (শিল্প কথা)	কমল সরকার	
ডারউইন (প্রবন্ধ)	বন্ধুবন্ধু	
	ত	
তিনজন বাঙ্গালী বাল্য চিত্র-শিল্পী (শিল্প কথা)	কমল সরকার	
তাদের মর্যাদা দিও (কবিতা)	অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	
তুমি কেবল করে গান কর (কার্টুন)	কে, সরকার	
তুমি (কবিতা)	সিদ্ধেশ্বর সেন	
তুরীয়ান-তুর্গীয়ান-বলীয়ান (খেলাধুলা)	অজয় বসু	
তলস্তয় : জীবন ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)	পরিতোষ মুখোপাধ্যায়	
তুমিও শিবির (কবিতা)	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	
	থ	
থিয়েটারের ভাষা (প্রবন্ধ)	শেখর চট্টোপাধ্যায়	
	দ	
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাকস্‌মুলার (প্রবন্ধ)	শ্রীহিরেন্দ্রলাল নাথ	
দি ক্রশ এ্যাণ্ড দি এ্যারো (সংক্ষেপীকরণ)	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	
দুধের স্বাদ (গল্প)	অমরেন্দ্র ঘোষ	
দায়ভাগ (গল্প)	প্রবোধকুমার সান্যাল	
দুপদি (চিত্র)	সুনীল বাঈব	
দাবানল (উপন্যাস)	অবধূত	
দেয়াল, চাকনি, ঈশ্বর (কবিতা)	হরপ্রসাদ মিত্র	
দক্ষিণীদের রাজধানী-বিজয় (রম্য রচনা)	অমিয়া সেন	
দোসর (কবিতা)	কৃষ্ণ ধর	
	ধ	
ধা[illegible] (গল্প)	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	
	ন	
[illegible] ( )	মনীন্দ্র ঘটক	৪১
[illegible] (গল্প)	মনমোহন ঘোষ	৭৭
[illegible] (পুস্তক সমালোচনা)		১১০, ২০৭, ৩৪০, ৮২৩, ৯৪১
নদীকে (কবিতা)	মহীতোষ বিশ্বাস	১৪৪
নেপালের লোকগীতি (সংগীত)	বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯১
নবরত্ন (গল্প)	কালীনাথ দাস	২৬৫
নায়ক নায়িকা (গল্প)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৬১৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ন	
নাট্য-আন্দোলনের বিষয় বস্তু (রঙ্গজগৎ)	উৎপল দত্ত	৬৮৯
নবজাগরণের পথে কৃষ্ণ মহারেশ (প্রবন্ধ)	বাসব সরকার	৭৬৮
নারীর রূপ : ত্রিভুজ বিরোধ	প্রণয়কুমার কুণ্ডু	৭৭৮
নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণময়তায় (বিজ্ঞান)	অশোক মুখোপাধ্যায়	১৪১
নুলিয়া পাড়া (চিত্র)		৪৩৩
	প	
পাতায় রান্না ফার্ম (বিজ্ঞান)	সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়	২
পরস্পর (উপন্যাস)	বিমল কর	৪, ২০১
পেরুকাশ পল্লীর শেষ শিকার (শিকার)	কলাপী	৪৪
পশ্চিম জার্মান ধনকুবেরশ্রেণী (রাজনীতি)	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	৮৭
পাঠকের চোখে (মতামত)	.....	২২৮
পেয়াদার বাঘ (কার্টুন)	রেবতীভূষণ	৩৩৮
পত্র	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৮
পরিপার্শ্ব (কবিতা)	বিমল চন্দ্র ঘোষ	৩৯৪
প্রহসন (গল্প)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৪২৯
পরস্মৈপদী (গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	৪৮৪
পরমাণু (গল্প)	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৫৭৩
পা রাখার জায়গা	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৭১৮
প্রথম পত্র (গল্প)	সমীর মুখোপাধ্যায়	৭৮৪
প্রেম নিবারণ (গল্প)	দীপক সেন	১০৫
প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল (বিচিত্রা)	সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
প্রকৃতির রং আর মানুষের খাবার (বিচিত্রা)	নলিনীকান্ত চক্রবর্তী	১৩৭
	ফ	
ফলিত দর্শন (রস-রচনা)	সুবল রায়	২১৯
ফেরাই (উপন্যাস)	দেবেশ বসু	৪৪৪
ফেরারী (গল্প)	শক্তিপদ রাজগুরু	৭৩৭
	ব	
ব্যঙ্গ সাময়িক পাঠ (শিল্পকথা)	কমল সরকার	১
বিচিত্রা (রস-রচনা)	চন্দ্রগুপ্ত	১২৯
ব্যাজস্তুতি (কবিতা)	তুষার চট্টোপাধ্যায়	১৪৪
বাতায়ন (কবিতা)	অশোক মুখোপাধ্যায়	১৭৬
বিদেশী গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক (বিশ্ব সাহিত্য)	অমল হালদার	১৯৯
বাউল ও বাউলিয়া তত্ত্ব (প্রবন্ধ)	প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৪
বিবিধর (গল্প)	দুঃখেন্দু দত্ত	৩০৪
বেতার (কবিতা)	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩১
বুদ্ধ বুদ্ধ (কবিতা)	সোরাচাঁদ নন্দী	৩৩৭
বুড়ি (গল্প)	সুশীল সিংহ	৩৪৪
বিচিত্রা	চন্দ্রগুপ্ত	৩৫৫
বিড়াল তপস্বী (কার্টুন)	প্রাজ্ঞার সৌজন্যে	৩৮২
বৈঠকখানা ও সমাজ (রম্য রচনা)	বঙ্কিমপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩৮৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ব	
বিদ্রোহ (চিত্র)	রাধিকাবল্লভ রায়চৌধুরী	৪১১
বাদ্য যন্ত্র ও সংগীত (সংগীত)	অজয় সিংহ রায়	৪১৩
বুদ্ধি তৃষ্ণার শেষ নেই (গল্প)	অবধেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৬৯
বিজ্ঞান বিচিত্রা (সংকলন)		৮৩৩
বাঙালী ইংরাজী কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৪১
ব্যাধার এপারে (কবিতা)	কুণাল মিত্র	১২২
	ভ	
ভিন্নপথে কেদারবদরী (ভ্রমণ)	গণেশ লালওয়ানী	১৪, ২১৯, ৩২৬, ৮১৬, ১২০
ভানগ্যঘের মেঘোক্তি থেকে (কবিতা)	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	১৭৬
	ম	
মাটির রস্ রঙ্ (একাঙ্কিকা)	তৃপ্তি চৌধুরী	
মৃত্যুর চোখে জল (একাঙ্কিকা)	মনোজ মিত্র	
মডেল (গল্প)	বেচু প্রামাণিক	
মুসলমি : কূল নয় (কবিতা)	শ্যামল সেনগুপ্ত	
মেঘদূত সমস্যা (প্রবন্ধ)	সুকুমার সেন	
মুখাবরণ (গল্প)	আশা দেবী	
মামার বাড়ির দেশে (বিচিত্রা)	শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	
মানুষ নহিতো আমরা মেষ (রম্য রচনা)	নীলকণ্ঠ	
মেরুর রহস্য সন্ধানে (বিজ্ঞান)	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	
মহাযজ্ঞ মহান সোনার (খেলাধুলো)	অজয় বসু	
মূল্য বৃদ্ধিসমস্যা ও তার প্রতীকার (আর্থিক প্রসঙ্গ)	নন্দ মুখার্জ	
	য	
যে-কোন জননীর জন্মলগ্নে (কবিতা)	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	২২৫
যেন শুধু টাকারই খেলা (খেলাধুলো)	অজয় বসু	২৩২
যুদ্ধিষ্ঠিরের মুখ (কবিতা)	পবিত্র মুখোপাধ্যায়	৩৩২
যুক্তরাষ্ট্র না শান্তি (প্রবন্ধ)	শৈলপতি মুখোপাধ্যায়	৭৫৩
যে ভাবে (কবিতা)	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	৮২৬
	র	
[illegible]র যাত্রা (কবিতা)	গৌরী চৌধুরী	১৪৪
[illegible]লিকার বর্ণচরিত্র (প্রবন্ধ)	শ্যামসেবক চক্রবর্তী	১৯৮
রবী[illegible]ও নতুন সভ্যতা (প্রবন্ধ)	গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী	২৮৬
[illegible]সভার রোমাঞ্চকর (রম্যরচনা)	কুমারগুপ্ত	২৫৪, ৩৪৫, ৮৪৪
[illegible]ন বিদ্যা ও প্রাচীন ভারত (প্রবন্ধ)	হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪৩০
[illegible] সংগীতের রহস্যলোকে (সংগীত)	বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০৯
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	আলেকজান্দার শিক্‌মান	৮৫৪
রোদ্দুরের তাপ বিকেলের ছায়া (গল্প)	নীলমণি ধর	৯৩৫
রূপকাহিনীর সন্ধানে (কবিতা)	নির্মলেন্দু গৌতম	৩৪২
	ল	
লেনিন ও জনগণ (প্রবন্ধ)	আলেক্সি বেরেঝকিন	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	শ	
শিল্পবাণিজ্যের খতিয়ান ১৯৫৯-৬০ (আর্থিক প্রসঙ্গ)	মন্থ মুখর	
শ্রাবণী (উপন্যাস)	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	
শতবর্ষ পরে (রম্য রচনা)	ছদ্মবেশী	
শতাব্দীর সমবয়সী কবি (প্রবন্ধ)	সোমেশ্বরনাথ দত্ত	
শেষ ছবি (কবিতা)	রাম বসু	
শেষ ছবি (নক্সা)	শিও নিদ্ রাদিচ্ছিত	
	স	
সোল অব লিলিথ (অনুবাদ)	বেরী করেলী	২৪, ১৮৩, ২৭৪, ৭৪৯, ৯১৩
সাপের বিষ (বিজ্ঞান)	অবনীভূষণ ঘোষ	১৯৩
সায়েবের কুকুর (কার্টুন)	রেবতীভূষণ	৪০৪
সমুদ্র সৈকতে (চিত্র)	চিত্ত সরকার	৪৩৩
সুস্থ থাকে মন (কবিতা)	বিষ্ণু দে	৪৩৯
সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও ছবি (রঙ্গজগৎ)	কৌশিক	৬৯৪
সে : আমি (কবিতা)	শান্তশীল দাস	৭৮৩
স্বপ্নদেখা সেই লোক (কবিতা)	করুণানয় বসু	৭৮৩
সুপ্তিভঙ্গ (কবিতা)	মানিক মুখোপাধ্যায়	৭৮৯
সে পাখি ক্ষমা করেনি (কবিতা)	গোপালচন্দ্র ঘোষ	৮০৫
সহ-অবস্থানের নীতি (আলোচনা)	শৈলপতি মুখোপাধ্যায়	৮৯৭
সমস্যাসঙ্কুল কপো (প্রবন্ধ)	বাসব সরকার	৯৪৫
সাঁ জঁ পার্স (বিশ্ব সাহিত্য)	বিকাশ সরকার	৯৫৫
	হ	
হিজল কন্যা (ইতিহাস)	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	
হয়তো সবাই ভোলে (কবিতা)	বন্ধুবর দাশগুপ্ত	

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অ	
অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	আদবাতোঁ বোরাভিয়া (বিশ্বসাহিত্য)	
অজয় বসু	খেলাধুলা ও একালের বাঙালী (খেলাধুলা)	
অশোক মুখোপাধ্যায়	অলঙ্কার থেকে শিল্প (বিচিত্রা)	
অশোক মুখোপাধ্যায়	বাতায়ন (কবিতা)	
অমরেন্দ্র ঘোষ	দুধের স্বাদ (গল্প)	
অবনীভূষণ ঘোষ	সাপের বিষ (বিজ্ঞান)	
অমল হালদার	বিদেশী গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক (বিশ্ব সাহিত্য)	
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	যে কোন জননীর জন্মলগ্নে (কবিতা)	
অজয় বসু	যেন শুধু টাকারই খেলা (খেলাধুলা)	
অনুকূল দত্ত	ইমেজিনস্ ও এভারা পাউণ্ড (প্রবন্ধ)	
অজয় বসু	অলিম্পিকের আদর্শ ইতিহাসের ভূমিকা (খেলাধুলা)	
অন্নদাশঙ্কর রায়	কালসা কুটিলাগতি (কবিতা)	
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	তাদের মর্যাদা দিও (কবিতা)	
অজয় সিংহ রায়	বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসংগীত (সংগীত)	
অবধূত	দাবানল (উপন্যাস)	
অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই (গল্প)	
অবনী ঘোষ	আলাপ (চিত্র) ওভার ব্রীজ (চিত্র)	
শ্রীঅরূপ চক্রবর্তী	টেলিফোন (নাটিকা)	
অজয় বসু	মহাবল মহান গোলাম (খেলাধুলা)	
অজয় বসু	তুরীয়ান তুরগীয়ান বলীয়ান (খেলাধুলা)	
অমিয়া সেন	দক্ষিণীদের রাজধানী বিজয় (ভ্রমণ রচনা)	
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	যে ভাবে (কবিতা)	
অশোক মুখোপাধ্যায়	নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণময়তায় (বিজ্ঞান)	
	আ	
আলেক্সি মেরুইগিন	লেনিন ও জনগণ (প্রবন্ধ)	
আশাদেবী	মুখাবরণ (গল্প)	
আনন্দ দে	একটি বিপ্লবের জন্ম (প্রবন্ধ)	
আলেকজান্দার শিফম্যান	রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	
[illegible]	উ	
[illegible]	এ টাইম টু লীড অ্যাণ্ড এ টাইম টু ডাই	৮১
উৎপল দত্ত	নাট্য-আন্দোলনের বিষয়বস্তু (রঙ্গজগৎ)	৬৮৯
উৎপল কুমার বসু	ছায়া নেই তার (কবিতা)	৭৮৩
[illegible]	ক	
কমল সরকার	ব্যঙ্গ সাময়িক পাঞ্চ (শিল্প কথা)	৯
কলাপী	পেরকাশ পল্লানের শেষ শিকার (শিকার)	৫৫
কুমার গুপ্ত	খবরা খবর (রঙ্গ জগৎ)	১১৯
কমল সরকার	ডেভিড লো তার কার্টুন (শিল্পকথা)	১৭০
কুমার গুপ্ত	রঙ্গজগতের খবরাখবর (রঙ্গজগৎ)	২৩৫, ৩৪৬, ৮৪৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ক	
কাশীনাথ দাস	নবজন্ম (গল্প	২৬৫
কমল সরকার	তিনজন বাঙালী ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী (শিল্পকথা)	৪৩৪
কপিল ভট্টাচার্য	আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ (প্রবন্ধ)	৫০১
কে সরকার	তুমি কেমন করে গান কর (কার্টুন)	৫৬৮
কৌশিক	সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও ছবি (রঙ্গজগৎ)	৬৯৪
করুণাময় বসু	স্বপ্নদেখা সেই লোক (কবিতা)	৭৮৩
কার্তিক লাহিড়ী	একা (গল্প)	৮৮৯
কৃষ্ণ মিত্র	ব্যথার এপারে (কবিতা)	৯২২
কৃষ্ণ ধর	দোসর (কবিতা)	৯২২
	গ	
গণেশ লালওয়ানী	ভিন্নপথে কেদারবদরী (ভ্রমণ)	১৪, ২১৯, ৩২৬, ৮১৬, ৯২৩
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	শ্রাবণী (উপন্যাস)	৯৩, ১৩৯, ২৪২, ৭৩৭, ৮৪৭
গ্রীজ্ঞানপাণী	আজবদুনিয়া (হাস্যকৌতুক)	১১৩, ৮৪৩
গৌরী চৌধুরী	রাত্রির যাত্রা (কবিতা)	১৪৪
গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী	রবীন্দ্রনাথ ও নতুন সভ্যতা (প্রবন্ধ)	২৮৩
গৌরাচাঁদ নন্দী	বুদ্ধ বুদ্ধ (কবিতা)	৩৩২
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	অন্ধকারের ডায়েরী (গল্প)	৪১৭
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	অনুকল্প (গল্প)	৫৮৭
গোপালচন্দ্র ঘোষ	সে পাখি ক্ষমা করেনি (কবিতা)	৮০৫
	চ	
চিত্তরঞ্জন দেব	ঝুমুরের গান (সংগীত)	৬৩
চন্দ্রগুপ্ত	বিচিত্রা (রস-রচনা)	১১২, ৩৩৭
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	দি ক্রস এ্যাণ্ড দি এ্যারো (সংক্ষেপীকরণ)	১৬৩
চিত্তরঞ্জন দেব	আদীবাসী ও উপজাতিদের গান (সংগীত)	২৭৩
চিত্ত সরকার	সবুজ সৈকতে (চিত্র), মুলিয়া পাড়া (চিত্র)	৪৩৫
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	অগ্নিফলক (গল্প)	৬৩৭
	ছ	
ছন্দবেশী	শতবর্ষ পরে (রম্য-রচনা)	১০৮, ২১৪, ৭৪৪, ৯০৮
	ছুঁচোর বিবর্তন (কার্টুন)	১০৭
	জ	
	জাতিসংঘ ও তার ভবিষ্যৎ	৭৯৫
	ত	
তৃপ্তি চৌধুরী	মাটির রঙ সবুজ (একাঙ্কিকা)	৭১
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	পশ্চিম জার্মান ধনকুবের শ্রেণী (রাজনীতি)	৮৭
তুষার চট্টোপাধ্যায়	ব্যাকস্ফুতি (কবিতা)	১৪৪
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পত্র	৩৯৮
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	বেরুর রহস্য সন্ধানে (বিজ্ঞান)	৬০৭
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	চীনের গণ-কমিউন ও মার্কসবাদ (প্রবন্ধ)	৭৯৬

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব	
শ্রীবিজেন্দ্রলাল নাথ	দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্সমুলার (গল্প)	১২২
দীবেন গঙ্গোপাধ্যায়	বেতার (কবিতা)	৩৩২
দণ্ডবায়স	কাকাস্টক (ছড়া)	৪৪০
দীপক সেন	প্রেম নিবারণ (গল্প)	১০৫
	ধ	
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বৈঠকখানা ও সমাজ (গ্রন্থ-সমালোচনা)	৩৮১
	ন	
নীলাদ্রি চক্রবর্তী	একটি অনুভব (গল্প)	১৪৫
নচিকেতা ভরদ্বাজ	আলো ঘর (কবিতা)	২২৫
নির্মলেন্দু গৌতম	রূপ-কাহিনীর সন্ধানে (কবিতা)	৩৪২
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	প্রস্রবন (গল্প)	৪২৯
নীলকণ্ঠ	মানুষ নহিতো আমরা মেষ (গ্রন্থ সমালোচনা)	১০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	আগস্ট, ১৯৬০ (কবিতা)	৬৩২
নবরুণ আচার্য	অনরে দ্যমিয়ে (বিশ্ব সাহিত্য)	৭৩৪
নীলমণি ধর	রোদ্দুরের তাপ বিকেলের ছায়া (গল্প)	১০৫
নলিনীকান্ত চক্রবর্তী	প্রকৃতির রং আর মানুষের খাবার (বিচিত্রা)	১৬২
	নতুন বই (পুস্তক সমালোচনা) ১১০, ২০৭, ৩৪০, ৮২৩, ৯৪১	
	প	
প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়	বাউলগান ও বাউলিয়া তত্ত্ব (প্রবন্ধ)	২৪৩
পবিত্র মুখোপাধ্যায়	দেওয়ার মুখ (কবিতা)	৩৩২
প্রাভদার সৌজন্যে	বিড়াল তপস্বী (কার্টুন)	৩৩৯
প্রেমেন্দ্র মিত্র	অন্য এক নাম (উপন্যাস)	৩৪৬
প্রবোধকুমার সান্যাল	দাবদাহ (গল্প)	৪০৪
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	আনন্দ উৎসবে নৃত্যগীত	৬৭৪
পরিতোষ-মুখোপাধ্যায়	উপন্যাস : জীবন ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)	৮৪১
	পাঠকের চোখে (মতামত)	২২৮
প্রণবকুমার কুণ্ডু	নারীর রূপ : ত্রিভুজ বিরোধ	৭৭৮
	ব	
বিমল কর	পরস্পর (উপন্যাস)	৪, ২০১
বীরেশ্বর বসু	চায়ের সোডার কথা (প্রবন্ধ) ১০২, ১৪৯, ২৪১, ৮২৮, ৮৮৪	
বুল বুল	জেনে রাখা ভাল (কার্টুন)	১৩৭
বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	নেপালের লোকগীতি (সঙ্গীত)	১৯১
বেচু প্রামাণিক	মডেল (গল্প)	২০১
বিনয় হাজরা	ইচ্ছামৃত্যু (কবিতা)	৩৪২
বিমলচন্দ্র ঘোষ	পরিপার্শ্ব (কবিতা)	৩৯৪
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	আলাপে (প্রবন্ধ)	৪১৭
বিজু দে	সুখ-থাকে-বন (কবিতা)	৪৩৯
বিমল কর	একলা বসন্তে (উপন্যাস)	৬৪০
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	কয়েকটি পুরানো গির্জা (ইতিহাস)	৬৮৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব	
বাসব সরকার	নবজাগরণের পথে কুরুমহাদেশ (প্রবন্ধ)	৭৬৮
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্র-সংগীতের রহস্যলোকে (প্রবন্ধ)	৮০৯
বসুবন্ধু	ডারউইন (প্রবন্ধ)	৮৭৪
বাসব সরকার	সমস্যা সঙ্কুল কল্পো (প্রবন্ধ)	৯৯৫
বিকাশ সরকার	সাঁ ড়ি পার্স (বিশ্ব সাহিত্য)	১৫৫
	বিজ্ঞান-বিচিত্রা (সংকলন)	৮৩৩
	ভ	
ভবঘুরে	ওল্ড বেইলী কোর্টে (ইতিকথা)	
	ম	
মেরী করেলী	সোল অব লিলিথ (অনুবাদ)	
মণীন্দ্র ঘটক	নতুন মানুষ (গল্প)	
মন্থনবুধর	১৯৫৯-৬০ শিল্প বাণিজ্যের খতিয়ান (আর্থিক প্রসঙ্গ)	
মনমোহন ঘোষ	নেমন্তন্ন নয় (গল্প)	
মহীউদ্দীন কিবরিয়া	নদীকে (কবিতা)	
মনোজ মিত্র	বন্যার চোখে জল (একাঙ্কিকা)	
মন্থনবুধর	খাদ্য সমস্যা ও জনসংখ্যা (আর্থিক প্রসঙ্গ)	
মন্থনবুধর	তালানী তেলের জ্বালা (আর্থিক প্রসঙ্গ)	
মণিভূষণ ভট্টাচার্য	কোন মৃত কবির প্রতি (কবিতা)	
মুজফ্ফর আহমদ	কংগ্রেস আন্দোলনের নরম ও গরমদল (রাজনীতি)	
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	নায়ক নায়িকা (গল্প)	
মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী	ঝিলিমিলি (গল্প)	
মন্মথকৃষ্ণ রায়	একটি স্বপ্নের জের (গল্প)	
মফজল লাশকর	হয়তো সবাই ভোলে (কবিতা)	
মানিক মুখোপাধ্যায়	সুপ্তিভঙ্গ (কবিতা)	
মানিক সেন	গঙ্গা (রঙ্গ জগৎ)	
মন্থনবুধর	মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা ও তার প্রতিকার (আর্থিক প্রসঙ্গ)	
	র	
রেবতীভূষণ	পেধাদার মার (কার্টুন)	
রেবতীভূষণ	সায়েবের কুকুর (কার্টুন)	
রাধিকারঞ্জন রায়চৌধুরী	আহার (চিত্র)	
	বিশ্রাম (চিত্র)	
রাম বসু	শেষ ছবি (কবিতা)	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাঙ্গালীর ইংরাজী কাব্য-চর্চা প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	
	ল	
লিওনিদ্ রাদিশ্চভ	শেষ ছবি (কথা)	৮৬১
	শ	
শেখর চট্টোপাধ্যায়	থিয়েটারের ভাষা (প্রবন্ধ)	১১৭
শ্যামসেবক চক্রবর্তী	রবীন্দ্র তুলিকায় বর্ণ-চরিত্র (প্রবন্ধ)	১১৮
শ্যামল সেনগুপ্ত	মৃগনাভী : ফুল নয় (কবিতা)	২২৫
শিলাদিত্য	ঘরে ফেরার পথ (গল্প)	২৮৯
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে শক্তি (প্রবন্ধ)	৩৪০

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শ	
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	শারদাবাহিক (গল্প)	
শিবরাম চক্রবর্তী	পরস্মৈপদী (গল্প)	
শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়	একটি আধুনিক উপন্যাস (পুস্তক পরিচিতি)	
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	মামার বাড়ির দেশে (বিচিত্রা)	
শিশির চট্টোপাধ্যায়	উপন্যাসের কঙ্কালকাণ্ড (সংলাপ)	
শ্যামসুন্দর দে	জলের রেখা (কবিতা)	
শৈলপতি মুখোপাধ্যায়	যুদ্ধ না শান্তি (প্রবন্ধ)	
শক্তিপদ রাজগুরু	ফেরারী (গল্প)	
শান্তশীল দাস	সে : আমি (কবিতা)	৭৮৩
শ্যামলী কুমার	আমি ছুটবো (কবিতা)	৭৮৪
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	তুমিও নিবিড় (কবিতা)	৮১১
শৈলপতি মুখোপাধ্যায়	সহ-অবস্থানের নীতি (আলোচনা)	৮৯৭
	স	
সম্পাদকীয়	আমাদের কথা	১, ১২১, ২৪১, ৩৪৯
সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়	পাতার রাজা কার্ণ (বিজ্ঞান)	২
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	ভান গ্যাখের খেদোক্তি থেকে (কবিতা)	১৭৬
সৌমেন্দ্রনাথ দত্ত	শতাব্দীর সমবয়সী কবি (প্রবন্ধ)	২২৮
সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়	অনাহূত অতিথি মিউকর (বিজ্ঞান)	২৯৬
সুবল রায়	কলিত দর্শন (রস-রচনা)	২৯৯
সুবোধ দত্ত	বিবিঘর (গল্প)	৩০৪
সৈয়দ মুজতবা সিরাজ	হিজল কন্যা (ইতিহাস)	৪১৪
সুশীল সিংহ	বুড়ী (গল্প)	
সুবোধ ঘোষ	চিত্তচক্রোদ্ধ (গল্প)	
সমরেশ বসু	কেরাই (উপন্যাস)	
সুকুমার সেন	মেঘদূতের সমস্যা (প্রবন্ধ)	
সন্তোষকুমার ঘোষ	ছোটকথা (গল্প)	
সুনীল মাধব	দম্পতি (চিত্র)	
সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলোনীর বাজার (চিত্র)	
সুকুমার সেনগুপ্ত	কবিবৈদ্যের সমাধি (গল্প)	
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	পা রাখার জায়গা	
সতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রথম পত্র (গল্প	
সিদ্ধেশ্বর সেন	তুমি (কবিতা)	
সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল (বিচিত্রা)	
	হ	
হিমানীশ গোস্বামী	কয়লার বড় কালো (প্রবন্ধ)	৩৩
হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	কলানৈবিদ্যা ও প্রাচীন ভারত (প্রবন্ধ)	৫১৩
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	পরমায়ু (গল্প)	৫৭৩
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	আষাঢ় (প্রবন্ধ)	৬১৯
হরপ্রসাদ মিত্র	হোল, ঢাকনি, ঈশ্বর (কবিতা)	৬৩২

পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম আসে, তখন হইতেই সে তাহার চারিপার্শ্বের বৃত্তাবলী অঙ্কন করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাঠফলকের উপর মানুষ কর্তৃক খোদিত ছবি ও লেখার বহু নমুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রস্তরযুগে এই অসংস্কৃত সহজাত শিল্পটি স্পষ্ট এবং বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠে, যাহা হইতে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, মানুষ খোদাই-শিল্পকার্যে সেই সময়েই কতকটা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

সেই যুগে মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা তাহা বুঝা যায় না, এবং আজ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক যুগে মুদ্রণ-শিল্প যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছে তেমনি ইহা তীব্র প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হইয়াছে। এখন কাজ কেবল সুন্দর ও পরিপাটী হইলে চলিবে না, অধিকন্তু কাজ যথা সম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করাও চাই।

● নিখুঁত মুদ্রণ

● সুন্দর ডিজাইন

● সময় সময়বাহ

লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ

প্রিন্টার্স ও কার্ড-বোর্ড বক্স মেকার্স

১/১, গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩. :: ফোন ৫৪-১৮৬১

754.3
005/41

আষাঢ়
১৮৮২
পঞ্চম বর্ষ
১ম সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ১০ই আষাঢ় শেষরাত্রে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। গত এক বছরে বাংলা সংস্কৃতি জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সংঘটিত হয়ে গেল। প্রথমে শিশিরকুমার, পরে উপেন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, পরশুরাম এবং সর্বশেষে সুধীন্দ্রনাথ সেই তালিকাকে দীর্ঘতর করে গেলেন।

কবি হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বিরল পথের পথিক। বাংলা কাব্যের যে ধারাবাহিকতা, তাকে তিনি অনুসরণ করেন নি। বাংলা কাব্যের স্বধর্মের অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে দুরূহ ভাষার কঠিন আবরণে কাব্য সরস্বতীকে অবগুণ্ঠিতা করে রেখেছিলেন তিনি। সেই কারণে সুধীন্দ্রনাথ সুধী সমাজের শ্রদ্ধা যতখানি পেয়েছিলেন, জনপ্রিয়তা পাননি ততখানি। নিজস্ব স্বকীয়তায় তাঁর কাব্য-সৃষ্টি উজ্জ্বল। এক আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্যে তাঁর কবিতাগুলি আভিজাত্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের যুগের কবি হয়েও সুধীন্দ্রনাথের কাব্য রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত থেকেছে অবলীলায়, তুলনায় বিদেশী কবিদের প্রভাব তাঁর উপর সক্রিয় ছিল।

দুরূহ রচনারীতি, আবেগ বিবর্জিত মননশীলতা, নাগরিক বৈদগ্ধ্য, মার্জিত রুচি এবং পরিশীলিত প্রজ্ঞা ছিল সুধীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ এগার বছর এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। যে যুগে 'পরিচয়' পত্রিকা বাংলা সাহিত্য ও চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই যুগে তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

বাংলা সাহিত্যে সঞ্চয় ও সম্পদের পরিমান ক্রমেই কমে আসছে, ব্যয়ের হার বাড়ছে দ্রুতগতিতে। এই দুর্দিনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ও চলে গেলেন। এই বেদনা দুঃসহ বলে মনে হয়।

232574

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

পাতার রাজা ফার্ন

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি সাধারণ, অতি পরিচিত পাতার গাছ 'ফার্ন'।

তার তার একটা অতি-প্রাকৃত রূপ আছে, যে রূপে সচরাচর তাকে দেখা যায় কোন বিশেষ স্থানের প্রবেশ দ্বারে। হালকা অথচ প্রচুর খাঁজওয়ালা বহু পত্র বিস্তার করে ফার্ন গাছ দাঁড়িয়ে থাকে সাক্ষী-গোপালের মত ঠাণ্ডা আর চায়াভরা নিয়ে। তাকায়। শুধু সৌখীনলোকদের বাড়ীর প্রবেশদ্বারেই যে সে থাকে, তা নয় কারণ অনেক সময় তাকে ভাঙা পাঁচিলের পাশে অন্ধকারে অনেকখানি স্থান দখল করে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এর বাহার ঘালি পাতায়, বর্ণে বা পুষ্পে নয়। তাই তাকে কোন কাবাবসিকের পাতায় দেখা যায় না বা কোন সাঁওতালী মেয়ের খোঁপায় স্থান পেতে শোনা যায় না। এ হলো পাতার রাজা, যে রাজত্বে সবুজের কৌক-ডানি আর ফিরোজ ছাওয়ায় শির শির করে কেঁপে ওঠা আছে। কিন্তু বর্ণালীর ছটা বা সুগন্ধের কোন আবেদন নেই।

পাতার রাজা ফার্ন আজকের গাছ বা ভুঁইফোড় নয়। সেকেলে পৃথিবীর সেকেলের গাছ এটি। তার পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি আজও লিপিবদ্ধ হয়ে পাথরের ফসিল হয়ে বেঁচে আছে। বহু যুগ-যুগান্তের পুরনো পাথরের ওপর ফার্ন গাছের পাতার ছাপ আজও পাওয়া যায়। তাকে জানতে হলে কৌতূহলী মন নিয়ে তাকে দেখতে হবে, বিচিত্র ও তরঙ্গায়িত পত্রগুচ্ছের সম্ভারে আন্দোলিত এই ছোট্ট জীবনটিকে বুঝতে হবে। আমাদের যেমন জীবন আছে, তেমনি সেও জীবিত। আমাদের

১নং চিত্র

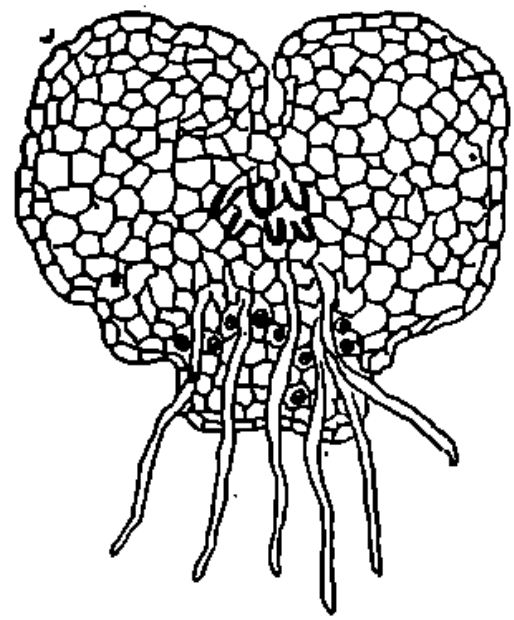

২নং চিত্র

জীবনের যেমন ধারা আছে, তেমনি রহস্যময় জীবনের প্রাণে সেও যাযাবরিক।

দেখুন অনেক সময় একই মানুষের দুটো জীবন থাকে। যেমন ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইড। ডক্টর জেকিলকে দেখলে মিস্টার হাইডকে ঠিক বোঝা যাবে না। তেমনি আবার মিস্টার হাইডকে দেখলে ডক্টর জেকিলকে বোঝা যাবে না। যদি বলি মিস্টার ফার্নের বেলাতেও তাঁর ঠিক এই দুটো রূপ আছে, তাহলে কি আপনি খানিকটা আশ্চর্য হবেন না? সত্যি কিন্তু তাই। এ দুটি রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে, যেমনটি আপনি তাকে দেখে থাকেন (১নং চিত্র) আর একটি হচ্ছে একটি ছোট্ট ১।৩ ইঞ্চির হৃদ্‌পিণ্ড আকারের শ্যাম-তালিক প্রথেলাস (Prothallus) (২নং চিত্র)। এটিও কিন্তু ফার্ন গাছ। কিন্তু একে আপনি স্বচ্ছন্দে পকেটে

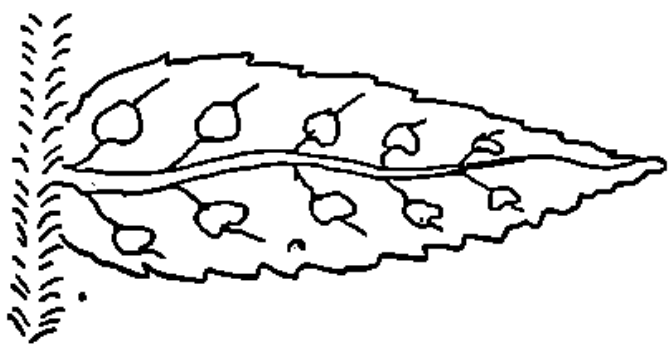

৩নং চিত্র

পুরে নিয়ে মা'র শিয়রে রেখে রাত্তিরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। কারণ এ আপনাকে পাতার কাপটা দিয়ে বিরক্ত করবে না।

এখন কথা হলো, এ কি করে সম্ভব? ঐ বড় পাতা-ওয়ালা সুশ্রী ফার্নগাছটি কিভাবে হঠাৎ এরকম গোঁফ কামানো কান্তিকে পর্যবেসিত হলো? তা যদি আপনাকে বুঝতে হয় তাহলে আপনাকে এর রহস্য কিছু কিছু জানতে হবে।

আপনি সাধারণতঃ যে রকম ফার্ন গাছ দেখে থাকেন, তার একটা পাতার নমুনা ৩নং চিত্রে দিলাম। বেশ আদর করে এই পাতার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আপনি যদি দয়া করে পাতাটির উল্টো পিঠটি একটু লক্ষ করেন, তাহলেই দেখতে পাবেন যে সেখানে পাতার

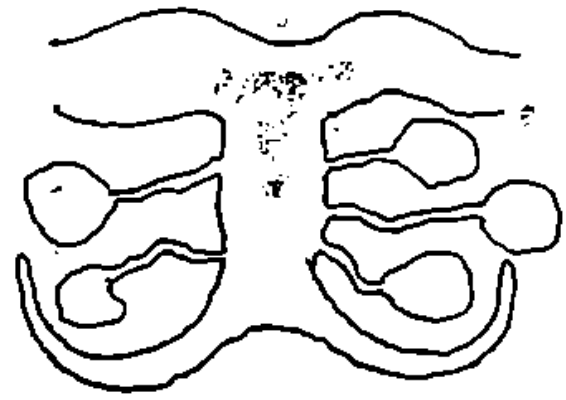

৪নং চিত্র

শিরার ওপর গোল গোল বাদামী রঙের কতকগুলি বুটি সাজান আছে। এই বুটিগুলির নাম হলো সোরাস (Sorus)। এই সোরাসগুলোর মধ্যেই ফার্নের আগামী ছোট প্রথেলিক জীবনের মালমশলা সব লুকোনো আছে।

এখন যদি এই রকম একটি সোরাসকে ঠিকমত কেটে আপনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন তার মধ্যে গোলপানা কতকগুলো জিনিস আছে (৫নং চিত্র দেখুন)। এগুলোর নাম হলো স্পোরাঞ্জিয়া (Sporangia)। স্পোরাঞ্জিয়াকে আপনি যদি আর বেশী বড় করে দেখেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে তার মধ্যে থেকে ছোট ছোট গোলদানার মত বেরিয়ে আছে। অবশ্য এর জন্যে আপনাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এই গোল গোল দানাগুলোর নাম হলো স্পোর (Spore)। এই স্পোরগুলো হলো একটি মাত্র কোষের তৈরী। প্রত্যেকটি স্পোরের দুটো করে চামড়া আছে। একটি থাকে বাইরে, আর একটি থাকে ভেতরে। বাইরেটির নাম হলো এক্সাইন (Exine)। এটি হলো

৫নং চিত্র

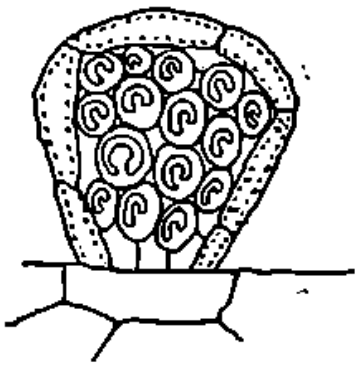

৬নং চিত্র

বেশ মোটা। ভেতরেরটি হলো পাতলা আর তার নাম হলো ইনটাইন (Intine)। এখন এই স্পোর বাবাজীই সুবিধেজনক অবস্থাতে পূর্বোক্ত ২নং চিত্রের প্রথেলাসের জন্ম দেয়। এখন বুঝেছেন, গোঁফ কামান কার্তিক এলো কি করে ?

এর পরে আবার অল্প ইতিহাস। আগেই বলেছি, স্পোরই ফার্ন প্রথেলাসের জন্ম দেয়। জন্ম নেবার পর এই প্রথেলাসের নীচের দিকে একক কোষের লম্বা লম্বা কতকগুলি শুঁড় গজায় (২নং চিত্র)। এই শুঁড়গুলো দিয়েই এই প্রথেলাস মাটিতে সংযোগ স্থাপন করে আর মাটি থেকে খনিজ খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করে। এই প্রথেলাসের ওপর থাকে দুই রকমের যৌন অঙ্গ। একটি পুরুষ অঙ্গ। এটির নাম এ্যানথেরিডিয়া (Antheredia) ৩নং চিত্র দেখুন। আর একটি নাম হলো আরচিগোনিয়া (Archegonia)। এটি হলো স্ত্রী অঙ্গ। প্রথেলাসের ওপর এরা দুজনে থাকে কাছাকাছি (২নং চিত্র দেখুন)।

এখন এই অ্যানথেরিডিয়ার মধ্যে থাকে যৌনকোষ। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে উৎপন্ন হয় এক একটি করে অ্যানথেরোজয়েড (Antherozoid) বা পুরুষ গেমিট। আর আরচিগোনিয়া হলো কুঁজোর মতন একটি জিনিস। ৭নং চিত্র দেখুন। এর মধ্য থেকে স্ত্রী ডিম্ব বা এগ সেল (Egg cell)। ক্রমে ক্রমে এই অঙ্গ বেড়ে উঠে পেকে গেলে এই আরচিগোনিয়ার মুখ খুলে যায় এবং তা দিয়ে পুরুষ অঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা অ্যানথেরোজয়েড ঢুকে যায়। একটা কথা এখানে বলে রাখি। পুরুষ অঙ্গ থেকে অনেকগুলো অ্যানথেরোজয়েড বেরিয়ে এলেও কিন্তু আরচিগোনিয়ার মুখে ঢুকবে একটিই। তারপর হয় এই অ্যানথেরোজয়েড আর ডিম্বকোষের যৌন মিলন। এর ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হলো, তার নাম হলো উসপোর (Oospore)। এই Oospore পুনরায় নিজের চতুর্দিকে একটি আবরণের সৃষ্টি করে নেয়। তারপর আরম্ভ হয় কোষগুলির উপর্যুপরি বিভাগ। এই বিভাগের ফলে সৃষ্টি হয় এমব্রিয়ো (Embryo)। এই এমব্রিয়োই আস্তে আস্তে বেড়ে গিয়ে যে ফার্নগাছটিকে আপনি সচরাচর দেখে থাকেন, তাকেই সৃষ্টি করে। এইভাবে পুনরায় আমরা ডক্টর জেকিল থেকে মিষ্টার হাইডে, ফার্ন প্রথেলাস থেকে সাধারণ ফার্নগাছে ফিরে আসি।

তাই বলছিলাম, যে এই দুই জীবন নিয়ে বেঁচে আছে ফার্ন, যুগ যুগ ধরে, মাটিতে আর অন্ধকারে, উদ্ভিদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে। তবু সে সুখী নয়। কারণ উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা তাকে পুষ্পময় উদ্ভিদের (Anjiosperms) স্থান দেননি বলে। উদ্ভিদের সমাজে ফার্ন হলো পতিত, একেবারে সিডিউল্ড কাষ্ট। প্রচুর শোভা আর প্রাণের অফুরন্ত স্পন্দন থেকেও সে হলো কিছুটা মূল্যহীন কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ শোভায় যে মনোহরণ করে, পুষ্পহীনতায় সে কখনো নিষ্প্রভ হয় না। যা একদিকে ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন তা অপরদিকে বিস্তারিত ও বিস্ময়। তাই বৃক্ষ সমাজের কঠোর অনুশাসনকে এড়িয়ে পাতার রাজা ফার্ন চিরদিনই মানুষের মন হরণ করবে।

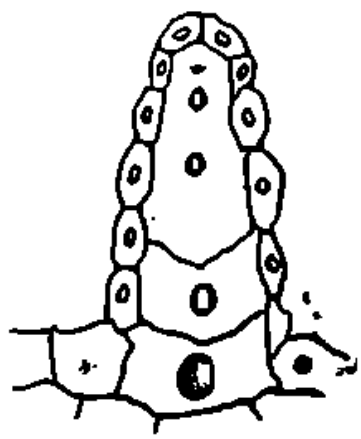

৭নং চিত্র

বিমল কর

পরস্পর

—এগারো—

গার্ডের হুইসল বাজল।

ভিড়ের মধ্যে পুষ্প বড়বাবুর গিন্নীর পাশে দাঁড়িয়েছিল; আধ মাথা ঘোমটা। রতন তখনও বাংকের ওপর এটাওটা ভালো করে গুছিয়ে দিচ্ছে। বড়বাবু খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বড়বাবুর দুই ছেলে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বসে আছে। এক পাশে অস্বস্তি এবং বিরক্ত মুখে গায়ত্রী বসে।

হুইসল-এর শব্দে বড়বাবু কামরার দিকে মুখ ফিরিয়ে পুষ্পকে বললেন, 'এবার তুমি নেমে পড় বউমা—'। পুষ্পকে নামতে বলে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

কামরার মধ্যে ব্যস্ত ভাবটা ছিল আগে থেকেই, এখন যেন আরও বেড়ে উঠল। বড়বাবুর গিন্নীও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ—তুমি নেমে পড় বউমা, গাড়ি ছেড়ে দেবে।'

পুষ্প কুঁজো হয়ে বড়বাবুর গিন্নীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ছেলে দুটোর কাঁধে হাত দিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করল, গায়ত্রীর হাত ধরল, 'নতুন জায়গায় গিয়ে একেবারে ভুলে যেও না ভাই, মাঝে মাঝে চিঠি দিও।' গায়ত্রী অস্বস্তির মুখে ঈষৎ হাসল, পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে হাতের রুমাল ঠোঁটের কাছে আনল, বলল, যেন রুমালে মুখ চেপেই বলল, 'তুমি দিয়ো আগে।' বলে' গায়ত্রী কেমন এক অপ্রসন্ন চোখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বড়বাবুর গিন্নীর পাশ কাটিয়ে সরে আসছিল পুষ্প, উনি পুষ্পর হাত ধরে কোলের কাছে টেনে নিলেন, চাপা অস্ফুট গলায় বললেন, 'একটু সাবধানে থেক বউমা, এখানে তোমার আপন বলতে কেউ নেই। বেশী রাগ টাগ করো না।' পুষ্পর চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে আবার স্নেহ-চুম্বন করলেন।

বড়বাবু থাক থাক করে উঠলেন, পুষ্প তবু প্রণামটা সেরে ফেলল। বড়বাবু আশীর্বাদ করলেন নীরবে। মৃদু গলায় বললেন, 'সাবধানে নামো।'

পুষ্প প্লাটফর্মে নেমে পড়ল। বিস্তর লোক চারপাশে। বড়বাবুকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে। পুষ্প বিব্রতবোধ করল। ঘোমটা আরও একটু টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল। কামরার জানালায় চোখ। বড়বাবুর দুই ছেলে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। গায়ত্রীর মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

এঞ্জিনের সিটি বাজল, গাড়ি নড়ল। নামেনি। পুষ্প একটু উদ্বিগ্ন।

গাড়ি ছেড়ে দিতে রতন তাড়াহুড়োয় বড়বাবুর গিন্নীকে প্রণাম সারল; ছেলেদুটোর মাথায় আদর করে টোকা মারল। গায়ত্রীর দিকে হাসল, হাসিটা বোকার মতন। বড়বাবুকে প্রণাম করার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আর প্রণাম করা গেল না। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রতন। ট্রেনের গতিতে ততক্ষণে জোর এসেছে। বড়বাবু ব্যস্ত মানুষ, উৎকণ্ঠা বোধ করছিল। 'তুমি নেমে পড় রতন। পালকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। বেশী গণ্ডগোল করে, আমায় জানিয়ো। কয়েকটা মাস এখন যাক—তারপর দেখি।...'

বড়বাবুর কথা শুনতে শুনতে খোলা দরজা দিয়ে রতন বাইরে এল, হ্যাণ্ডেলে হাত, পা দানিতে পা। প্লাটফর্ম শেষ হয়ে আসছে। স্টেশনের নাম লেখা মস্ত বোর্ডটা চোখের ওপর ভেসে উঠছে। রতন একটুর জন্যে কেমন দুর্বল বোধ করল নিজেকে। মনে হল, হাত ছাড়লে সে আর ঠিক মতন প্লাটফর্মে পা দিতে পারবে না। ছিটকে পড়বে, হয়ত বাতাসের টান তাকে লাইনের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে এই হ্যাণ্ডেল না-ছাড়া ভাল। রতন এই আশ্রয় হারাতে চায় না।...ট্রেন আরও জোর হয়ে গেল। প্লাটফর্মের কাঁকরগুলো এখন যেন স্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছে; চাকার শব্দ শুনতে পেল রতন এতক্ষণে, শব্দটা ক্রমশ ঘন ভারী হয়ে উঠছে। পা দানিতে পা দুটো শক্ত করল রতন। মনে পড়ল পুষ্প পেছনে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা হাত ছাড়ল রতন। পুষ্প বোধহয় ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে—ভাবতে ভাবতে রতন পা সরস করে অন্য হাতটা ছেড়ে দিল।

ঝোঁকের টানে বুঝি দু-চার পা পিছনে হেলতে হেলতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রতন, একেবারে স্টেশনের শেষ প্রান্তে। ট্রেনটা চলে গেল। জানালায় বড়বাবুর ছোট ছেলের মুখটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল, রতনের কানে চাকার শব্দ, চোখের সামনে সিগন্যালের পোষ্ট, পাশ কাটিয়ে বাকি কামরাগুলো তর তর করে চলে যাচ্ছে।

অনেকটা চলে গেল ট্রেন। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছ বরাবর। পাহাড়ের খাদের মতন দুপাশে মাটির ঢিবি কেবিনের ঘরটা মাঠকোঠা বাড়ির মতন টঙে দাঁড়িয়ে। বিকেলের রোদ কখন যেন প্রায় মরে এসে, এক মুঠো আলো কেবিনের কাচের জানলায় ফেলে রেখেছে।

শীতের দিনের রোদটুকু অন্যমনস্ক ভাবে দেখতে দেখতে রতন ট্রেনটার শাঁকোয় ওঠার শব্দ শুনতে পেল। শেষ বারের মতন দূরান্তে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলল রতন, দীর্ঘ ভারী নিশ্বাস। চোখে যে জল এসেছে, গলার কাছটা বাধায় টাটিয়ে উঠেছে এতক্ষণে অনুভব করতে পারল।

পুষ্প জলের ঠেলাগাড়ির কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে। প্লাটফর্মটা প্রায় ফাঁকা। যারা বিদায় দিতে এসেছিল—তারা চলে গেছে; দু-একজন বুঝি তখনও টি-স্টলটার বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে।

পুষ্পর কাছে এসে রতন দাঁড়াল, 'চলো।'

স্বামীর বুকের দিকে সামান্যক্ষণ চেয়ে থাকল পুষ্প। কথা বলল না। ওভারব্রিজের দিকে পা বাড়াল।

ডাউন প্লাটফর্মটায় বুঝি আর একদফা কাঁকর ছড়ানো হয়েছে। নতুন কাঁকরের লালচে রঙের ওপর আসন্ন গোধূলির আভা মাখানো। প্লাটফর্মটা আরও যেন লালচে দেখাচ্ছিল। পায়ের তলায় ছুড়ির শব্দটা কানে লাগছিল দু-জনেরই।

লাল ইটে ঘেরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটা পেরিয়ে এসে, পুষ্প মৃদু গলায় বলল, 'অমন করে গাড়ি থেকে কেউ নামে নাকি?'

রতন কথাটা শুনল, জবাব দিল না। মনে মনে তখনকার অবস্থাটা ভাবল, যখন সত্যিই তার ভয় করছিল নামতে, পায়ে জোর পাচ্ছিল না, দ্বিধায় পড়েছিল। তখন শেষ পর্যন্ত রতনের কি মনে হয়েছিল, কার কথা, কার কথা মনে হবার পর রতন আবার পায়ে-হাতে জোর পেল? পুষ্পকে সেই কথাটা শোনবার ইচ্ছে হল। কিন্তু এখন কি ভেবে কথাটা আর বলল না।

ওভারব্রিজের প্রথম সিঁড়িতে পা দিল পুষ্প। রতন একটু পিছনে, বিড়ি ধরাচ্ছে।

'কিছু বললেন উনি?' পুষ্প শুধলো।

রতন এবারও নীরব। মাথা নেড়ে জানাল, না কিছু না।

স্বামীর এই নির্বাক গম্ভীর হতাশ ব্যথিত ভঙ্গিটা পুষ্পর তেমন ভাল লাগছিল না। এত মুখ গোমড়া করার কি আছে? এমনত নয় যে তোমার বউ মরে গেছে, সেই দুঃখে একেবারে মুষড়ে পড়ছ! দুঃখ, কষ্ট? তা তেমন কষ্ট আমারও একটু হয়েছে। ওই যে যখন বড়বাবুর গিন্নীকে প্রণাম করে উঠলাম, তখন সত্যিই বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছিল। যখন গিন্নী হাত ধরে টেনে বললেন, 'সাবধানে থেকো বউমা, এখানে আপন জন বলতে কেউ থাকল না তোমাদের—' তখন বুড়ির কথা বড্ড আপন আপন মনে হয়েছিল, বুঝি কান্নাও আসছিল। কিন্তু সেই কষ্ট আমার একেবারে দিশেহারা করে দেবে কেন?

কেন? পুষ্প যেন এই প্রশ্ন চোখে নিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল এক পলক। ওভারব্রিজের সিঁড়ি উঠতে হচ্ছে নয়ত ভাল করে দেখত রতনের মুখ। কিসের এত দুঃখ তোমার?

সিঁড়ি শেষ করে কাঠের পুল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুষ্প বলল, 'তোমাদের মালগুদোমের সবাই এসেছিল না?'

'সবাই।'

'ওই লোকটা কে, পিপের মতন মোটা, কালো?'

'নতুন বড়বাবু।'

'ওই নাকি নতুন বড়বাবু।' পুষ্প সবিস্ময়ে স্বামীর

মুখের দিকে তাকাল। কি ভাবল, শেষে বলল, 'চেহারাটি দেখলে বাপু সত্যিই কলাই কলাই মনে হয়।'

রতন জবাব দিল না। আপ প্লাটফর্মে একটা গাড়ি আসছে। স্লো ট্রেন। ঘন্টি বাজছে।

ওভারব্রিজের নামার সিঁড়িটা মালগুদোমের গা বেয়ে নেমে গেছে। পুষ্প এতদিনে মালগুদোম চিনেছে। স্বামীর অফিসের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কোনখানে বস?'

'আমি বসি না।' রতন জবাব দিল, 'বসার চাকরি আমার নয়।'

স্বামীর জবাব পুষ্প গায়ে মাখল না। এটা মশাইয়ের রাগের জবাব, অভিমানের জবাব। ঠাট্টা করে পুষ্প হেসে বলল, 'তুমি কি ঘোড়া নাকি, সারাদিন দাঁড়িয়ে থাক?'

'ঘোড়ারও অধম, গাধা।' রতন যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করে বলল।

পুষ্প আবার স্বামীর মুখটা এক পলক দেখে নিল। মানুষটার মনমেজাজ আজ একেবারেই বিগড়ে গেছে। সরল কথা হাসিঠাট্টার কথাতেও নরম হচ্ছে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পুষ্প বলল, 'একটা পান খাওয়াবে, এখানে কোথায় নাকি ভাল পান খাও তুমি!'

'চলো।' গাড়ি-ঘোড়ার স্ট্যাণ্ডের দিকে ইশারা করে রতন বলল।

রতনের আচরণ পুষ্পর পছন্দ হচ্ছিল না। যা বলে পুষ্প তাতেই হুঁ হা মানুষটার; গা নেই কথায়। মনে মনে অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল পুষ্প তবু আজ তার ব্যবহারে এতটুকু অপ্রসন্নতাও প্রকাশ করছিল না। বরং স্বামীর মন ভোলাবার চেষ্টা করছিল যেন। সত্যিই কি আর পান খেতে ইচ্ছে করছিল? বাজারের পানটানে বড় একটা ভক্তি নেই পুষ্পর। নেহাত মানুষটাকে অন্যমনস্ক করা, যদি এতেই খুশী হয় একটু।

সিঁড়ির নীচে এসে রাস্তায় পা দিল দুজনে। এখানটায় ভিড়। নানান মানুষ। ট্রেন ধরতে যাত্রী আসছে। রিক্সাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে একেবারে টিকিটঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ডান দিকে সেই টিনের শেড দেওয়া মস্ত মুদাফিরখানা। প্রথমদিন, এখানে পা দিয়েই ওই মুসাফিরখানায় ঢুকেছিল পুষ্পর দৃষ্টি মাথায় করে। সেদিন পুষ্পর কাছে কোনো কিছুরই দেখার মতন করে চোখে পড়েনি। কেমন বেঠপ হয়েছিল।

পুষ্পর হঠাৎ ইচ্ছে হল ওই মুসাফিরখানার মধ্যে গিয়ে দু-দণ্ড দাঁড়াতে।

'ওটা কি রতন করেছে আবার?' পুষ্প মুসাফিরখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধলো।

'হাঁ।'

'কবে করল আবার?'

'পুজোর পর।'

পুজোর পর ষ্টেশনের দিকে আর আসা হয়ে ওঠে নি পুষ্পর। তার আগেও কি বরদর এসেছে? না। ওই রতনের সংগে বেড়াতে বেড়াতে বার দুই বোধহয়, সন্ধ্যের দিকে। মুসাফিরখানাটা চোখে পড়ছে, চলুদ আপসা আলো আর অন্ধকার মেখে পড়ে আছে কতান্ত দূরে। ওদিকটায় তাকালে প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। আগেও পড়েছে। কিন্তু কই পুষ্পর তেমন কোনো আগ্রহ ত হয় নি, যাই একবার দেখে আসি জায়গাটা।... আজ কেন যেন এই আগ্রহ অনুভব করছিল পুষ্প। মনে মনে বুঝি সেই বৃষ্টিভরা দিনটির স্মৃতি অস্পষ্ট ছবির মতন দেখছিল পুষ্প।

'যাবে নাকি ওদিকটায়—?' পুষ্প বলল। অনুরোধের ঈষৎ সরু গলায়।

'কোথায়?'

'ওই মুসাফিরখানাটায়—?' পুষ্পর গলা ছেলেমানুষের মতন শোনাল।

রতন পুষ্পর মুখের দিকে তাকাল। গত কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম রতন পরিপূর্ণ মনোযোগে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখল, স্ত্রীর কথার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করল।

'ওখানে কী—' অবাক হচ্ছিল রতন।

'কী আবার, একটু বেড়িয়ে যাই।' পুষ্প এলোমেলো করে বলল।

'বেড়াবার কিছু নেই ওখানে, যত ভীড় নোংরা ভিখিরি—' রতন বিরক্ত মুখে প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল। 'দাঁড়াও এখানে—পান নিয়ে আসি' পুষ্পকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে পান কিনে আনতে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে থাকল পুষ্প। রতনের সর্বাংগে এই উপেক্ষা অবহেলা তাকে অসন্তুষ্ট করল। বিরক্ত অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল পুষ্প। রাস্তা এবং দোকানের লোকগুলো অনেকেই তার দিকে চেয়ে আছে। নীল রঙের একটা মোটরগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে এক ছোকরা হাঁ করে গিলছে তাকে। রিক্সাওলাগুলো পাল্লিক ডাকাতে। স্টেশনে বুঝি গাড়িটা এসে গেল। একটা কুকুরছানা দাপাটি রাস্তায় খেলা করে বেড়াচ্ছে।

পানের দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকল পুষ্প। রতন দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পর কেন যেন মনে হল, সেই রতন আর নেই। মানুষটা বদলে যাচ্ছে দিন দিন। আগে যেমন সব কিছুতেই পুষ্প পুষ্প ছিল, পুষ্প ছাড়া মুহূর্ত কাটত না, পুষ্পর কিসে ভাল লাগা লাগবে, কিসে সুখ কি করলে বউ খুশী হবে, হাসবে, তার চিন্তায় মগ্ন থাকত, এখন আর সেসব ভাবে না। নিজের মতন

আছে, নিজের নৌকো নিজে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।...স্বামীর দূর-মূর্তির দিকে চেয়ে মনে মনে বিরক্তির সঙ্গে বলল পুষ্প: 'ভিড় নোংরা ভিখিরি...আজ ওপানেটা বড় নরক হল! কই সেদিন তো মনে হয় নি ওই ভিড় নোংরা ভিখিরির মধ্যে নতুন বউকে নিয়ে গিয়ে তুলছি!'

রতন পান নিয়ে ফিরছিল। পুষ্প একবার মনে হল, রতন এসে পড়ার আগে সে মুসাফিরখানার দিকে হাঁটতে শুরু করে। রতন দেখুক, পুষ্প প্রথম দিনের আশ্রয়স্থানটুকুকে আজও মনে রেখেছে, রতনের মতন অত অবজ্ঞা করতে শেখে নি।

পানের মোড়ক হাতে রতন এসেপড়ল। খালপাতার মোড়কের গায়ে খানিকটা চুন। গোটা চারেক পান এনেছে একসঙ্গে। পুষ্পর দিকে পানের মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ধরো।'

পান নিল পুষ্প। মুখে দিল না; হাতে রাখল।

রতন ট্যাক্সের দিকে মুখ করে রিকশা ডাকছিল। বাধা দিয়ে পুষ্প বলল, 'রিকশা কি হবে?'

'বাড়ি ফিরবে না?' রতন ঘাড় ঘুরিয়ে পুষ্পর দিকে তাকাল।

পুষ্পর বাড়ি ফেরার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না এখন। খানিকটা বেড়িয়ে ফিরলে বড় জোর সন্ধে উতরে যেতে পারে। তা যাক, এমন কিছুতে কাজ নেই বাড়িতে।... পুষ্প ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবল, অন্য সময় হলে রতন নিজেই বেড়াবার কথাটা তুলত। আজ তুলল না। মন মেজাজ খারাপ কি না বাবুর।

'রিকশা থাক, হেঁটেই চল—' পুষ্প ক্ষুব্ধ ভাবটা গোপন করল না।

'অনেকটা হাঁটতে হবে—' রতন বলল।

'হোক।'

'চল—!' রতন হাঁটতে শুরু করল।

পথের মধ্যেই শীতের বেলার আবছা আলো সরে গেল। দিকে অন্ধকারটা যেন পলকে পলকে ঘন হয়ে আসছিল। স্টেশনের রাস্তা হলেও এখন বেশ ফাঁকা। খালিয়াড়ির মতন উঁচু চিপিটা টানা চলেছে। ঝুনো লতা গাছ পাতায় ভরা। গাছের আড়াল পেয়ে অন্ধকারটা যেন আরও ঘিতিয়ে বসছিল। পাখিদের কলকণ্ঠে পূর্ণ চারপাশ।

বড় একটা কথা বলছিল না কেউ। হাতের মুঠোয় পানের মোড়াকটা তখনও রেখেছে পুষ্প। মাথার ঘোমটা বাতাসে সামান্য এলোমেলো।

অনেকটা চুপচাপ হেঁটে এসে রতন যেন পুরোনো একটা কথার খেই ধরে বলল, 'আমায় একজন হাত দেখে বলেছিল, এ-চাকরি তোমায় ছাড়তে হবে।'

পুষ্প শুনল কথাটা। কিছু বলল না। 'আরও বলেছিল দু চারটে কথা'—রতন খানিকটা চুপচাপ থেকে নিজের মনেই বলল। হাঁটতে হাঁটতে আরও ক'পা রাস্তা পেরুল, বলল, 'আমি এ-সব বাজে ব্যাপারে বিশ্বাস করতাম না কখনো। কিন্তু তার একটা কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।'

রতন হয়ত আশা করেছিল পুষ্প এবার কিছু একটা প্রশ্ন করবে। পুষ্পর প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করল রতন। পুষ্প নীরব। স্বামীর কথায় যেন তার মন নেই, কিংবা আগ্রহ।

রতন বিরক্তি বোধ করছিল। বলল, 'যার কথার একটা মিলে যায় তার কথার বাকি ক'টাও মিলবে।

পুষ্পর মুখে কথা এগোচ্ছিল। কথাটা খুশী করার মতন নয়। বলবে না বলবে না করেও শেষ পর্যন্ত ঝোঁকের বশেই বলল, 'অত মেলামিলির কথা বলে লাভ নেই। কোন কথা মিলেছে তা আমি জানি। সর্বনাশী একটা বউ জুটবে বলেছিল তোমার, তাই জুটেছে কপালে, এই ত!' পুষ্পর গলা কটু শোনাল।

রতন রাস্তার এদিক ওদিক তাকাল। কেউ নেই। নির্জন। দূরে কে একজন চলেছে। গাছের ছায়ায় পথটুকু বেশ অন্ধকার। পুষ্পর গা ঘেঁসে এল রতন। বলল, 'না, হাত দেখে সে-কথা বলে নি।'

পুষ্পর কাঁধের ওপর আলতো করে হাত রাখল রতন। বোধহয় আরও একটু ঘন হল। 'বলেছিল হঠাৎ আমার বিয়ে হয়ে যাবে।.....তা হঠাতই তো হল।'

স্বামীর স্পর্শ থেকে সামান্য সরে যেতে যেতে পুষ্প বলল, 'আর কি বলেছিল?'

'বললাম তো, এ-চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

গাছের ঘন ছায়া পেরিয়ে এল ওরা। চুপ চাপ। পুষ্প মাথার ঘোমটাটা ঠিক করে নিল। কোয়ার্টার গুলো এবার সামনে এসে পড়েছে। নালাটার কাছে মিউনিসিপালিটির বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে সিঁড়ি কাঁধে লোকটা এগিয়ে আসছে। 'এ-চাকরি যদি যায় যাক।' পুষ্প ধর ধর গলায় হঠাৎ বলল। দু মুহূর্ত থামল, যেন দম নিল, বলল, 'ওই এক বড়বাবু ছিল তোমার, সারাদিন সেই দেবতার নাম জপতে—আর এই এক ছোটলোকের চাকরি, সারাক্ষণ তার ঘ্যানঘ্যানানি। যাক তোমার চাকরি। পানের দোকান দিয়ে বসো। যদি না পারো তুমি ঘরে থেক, আমিই বসব।' পুষ্পর গলা চিকন হয়ে উঠেছিল প্রথমটায়। পরে ভারী রুদ্ধ হয়ে এল। রতন নির্বাক।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ব্যঙ্গ সাময়িক পাঞ্চ

কমল সরকার

পৃথিবীতে যে কয়টি পত্র-পত্রিকা শতাধিক বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে ব্রিটেনের ব্যঙ্গ পত্রিকা পাঞ্চ বা লণ্ডন চেরীভেরী অন্যতম। হাস্যরসকে উপজীব্য করে একশো উনিশ বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়ে পাঞ্চ সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। গুটিকয়েক শিল্পী ও লেখকের অমিত পরিশ্রম ও গবেষণায় বিশ্ব ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাসে পাঞ্চের আসন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কল্পনা ও বাস্তবের মননশীল একত্রীকরণ যে কত গভীর ভাবে প্রকাশের সহায়ক হতে পারে পাঞ্চ তা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার পটভূমিকায় প্রকাশ করে প্রমাণিত করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন এবং য়ুরোপের রাজনীতি ও সমাজনীতির ওপর যে কয়টি পত্র-পত্রিকা অপরিসীম প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল তার মধ্যে পাঞ্চ শুধু অন্যতম নয় অগ্রগণ্য। রাজনৈতিক মহলে পাঞ্চের মতামত এবং ব্যঙ্গচিত্র কোন কোন সময়ে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এমজীর আছে। এছাড়া ইংরেজ চরিত্রের নিখুঁত প্রতিফলন পাঞ্চের বৈশিষ্ট্য।

শতাধিক বছরের ইতিহাসে য়ুরোপ এবং বিশ্বের বহু স্মরণীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে পাঞ্চ। ত্রিকালজ্ঞ না হোক্ উনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান অতীত এবং বিংশ শতাব্দীর সুংনিক বর্তমানকে শতায়ু পাঞ্চ সহাস্যে নিরীক্ষণ করেছে। নিরীক্ষণ করেছে একাধিক রাষ্ট্রের উত্থান এবং পতন। নিরীক্ষণ করেছে একাধিক পররাক্রমশালী নরপতির জন্ম-মৃত্যু। উত্থান-পতন। এই নিরীক্ষণের প্রতিফলনও ঘটেছে তার দেহে। কোথাও করেছে সমর্থন কোথাও করেছে ব্যঙ্গ। কখনও সহানুভূতি কখনও বিদ্রূপ। কখনও লেখায় কখনও কার্টুনে। ভিক্টোরিয়ান যুগের পামারস্টোন, স্যার রবার্ট পিল, রাসেল, ডিসরেলী, গ্লাডস্টোন থেকে ম্যাকডোনা, চেম্বারলেন, চার্চিল, এটলী এবং ইডেনকে পাঞ্চ একে একে হপনবর ডাউনিং স্ট্রীটে ঢুকতে এবং বেরুতে দেখেছে। দেখে কোথাও হেসেছে অথবা হাসিয়েছে। হেসেছে ক্রিমিয়া দেখেছে যুদ্ধ। কোথাও সমর্থন কোথাও আপত্তি। ভারতের মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ কেও সন্তর্পণে প্রত্যাক্ষ করেছে পাঞ্চ। সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর ত্রস্ত পাঞ্চ এই বিভীষিকা বিনাশের বুদ্ধিও দিয়েছে। বিসমার্ক থেকে হিটলার। ইমানুয়েল থেকে মুসোলিনী, আর দ্বিতীয় নিকোলাস থেকে লেনিন। সকলকেই পাঞ্চ ধরে রেখেছে নিজের পৃষ্ঠায়। প্রথম মহাযুদ্ধের অষ্ট্রিয়া থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাগাসাকি আর হিরোসিমা, পার্লহারবার থেকে নুরেমবার্গ অথবা লীগ অব নেশনস থেকে উনো কেউই বাদ যায়নি। ভার্সাই থেকে ইয়ালটা

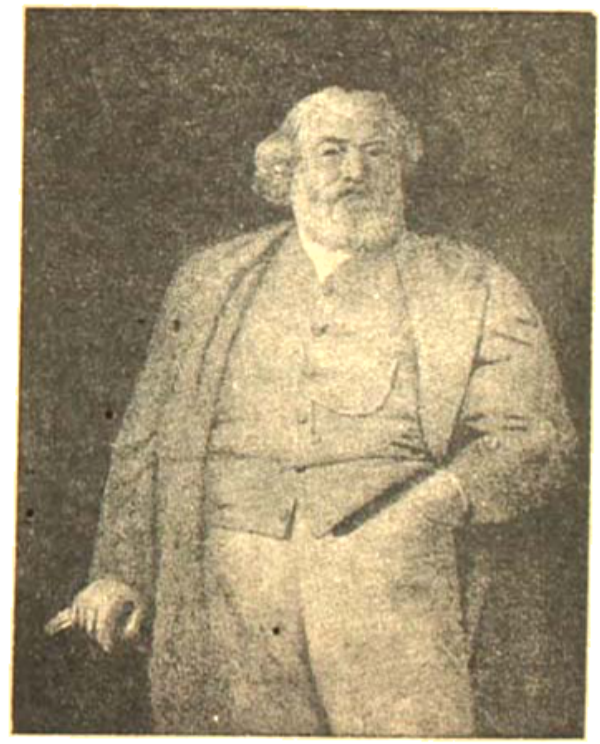

পাঞ্চের প্রথম সম্পাদক মার্কলেমন

৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত জন লিচের কার্টুন "দি মোমেনটাস কোশ্চেন"। কার্টুনে দুইজন ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট রেলওয়ে শেয়ার সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপরত।

বা সানফ্রান্সিসকো থেকে জেনেভা সকলেরই
কী পাঞ্চ। বাহুত না হলে আরও অনেক কিছু
বার আশা পাঞ্চের আছে।

পাঞ্চের গোড়াপত্তন এবং আবির্ভাবের সঠিক
ান্ত আজ গবেষণার বস্তু। একাধিক খ্যাতনামা
কোর পাঞ্চের ইতিহাস বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
রেছেন নচেৎ পাঞ্চের প্রথমাবস্থার ইতিহাস আজ
ান্ত থেকে যেত। কারণ, পাঞ্চের প্রথমদিকের
ান্ত লেখা এবং আঁকা লেখক অথবা শিল্পীর নাম
ড়া অথবা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।

পাঞ্চ যে সময়ে প্রকাশিত হয় সে সময়ে ভিক্টো-
য়া ওদেশের সম্রাজ্ঞী। তাঁর বয়স তখন বাইশ।
লবোর্ণ প্রধানমন্ত্রী। জনসাধারণের কাছে বাষ্পীয়পোত
নে বিস্ময়। সিপাহী বিদ্রোহ তখনও ঘটেনি।
র দুই হলো পাঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহের
। প্রয়াণ। মাত্র আট বছর আগে রাজা রামমোহন

যুবক। মাইকেল ষোল পার হয়ে সতেরয় পা দিয়েছেন।
বঙ্কিমচন্দ্র তখন তিনবছরের শিশু। ব্রাউনিং, ডিকেন্স,
থ্যাকারে তখনও ত্রিশে পৌঁছোননি। রবীন্দ্রনাথ,
বার্নার্ড শ, ওয়েল্স এবং এইচ. জি ওয়েলসের
জন্ম তখন কল্পনাতীত। এই পরিবেশে ১৮৪১ সালের
১৭ই জুলাই লণ্ডন থেকে পাঞ্চ আত্মপ্রকাশ করে।

দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হবার জন্য পাঞ্চ ব্যঙ্গ
সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে
সত্যি কিন্তু পাঞ্চের পরিকল্পনা তাদের নিজস্ব চিন্তা-
প্রসূত নয়। সম্পূর্ণ বিদেশী অনুপ্রেরণায় পাঞ্চের
আদর্শ অনুপ্রাণিত। পাঞ্চ প্রকাশের প্রায় দশবছর
আগে প্যারিসে এই জাতীয় পত্রিকার প্রচলন ছিল
এবং এই ফরাসী পত্রিকার অনুসরণে বিলেত থেকে
পাঞ্চ প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ সালে প্যারিস থেকে
চার্লস ফিলিপন নামে এক ভদ্রলোক "লা কারিকেচার"
নামে এক ব্যঙ্গপত্রিকার প্রকাশন শুরু করেন কিন্তু
বেশিদিন এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।
১৮৩২ সালে তিনি "লে চেরিভেরী" নামে অপর এক
ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী
দনরে দ্যামিয়ের এই "লে চেরীভেরীতে" কার্টুন আঁকি-
তেন। প্রকাশের স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চাঙ্গের কার্টুনের
জন্য লে চেরিভেরী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই
লে চেরীভেরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লণ্ডন থেকে
পাঞ্চ প্রকাশ করা হয়।

লণ্ডন চেরিভেরী বা পাঞ্চের আগে বৃটেনে ছোট-
খাটো কয়েক ব্যঙ্গ সাময়িকের প্রচলন ছিল। এদের মধ্যে
পাঞ্চ ইন লো, ফিগারো ইন লণ্ডন, পাঞ্চ ইন লণ্ডন,
পাঞ্চ ইন কেমব্রিজ সমধিক খ্যাত। কিন্তু পাঞ্চের মত
অন্য কোন পত্রিকা জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় নি।

এনগ্রেভার হেনরী ভিজেটলি এবং সাংবাদিক
হেনরী ম্যাহ্যুর উদ্যোগে পাঞ্চ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।
এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন ছাপাখানার সত্বাধিকারী
জোসেফ লাট, লেখক মার্কলেমন এবং ষ্টারলিং কয়েন।
পত্রিকার প্রকাশের সময় মার্কলেমন, ষ্টারলিং কয়েন
এবং হেনরী ম্যাহ্যু মুখ্য সম্পাদক হিসাবে পত্রিকা পরি-

অর্থাৎ শিল্প সম্পাদক মনোনীত হন। ব্যঙ্গচিত্রের দায়িত্ব ছিল জন লিচ্ এবং ডিকি ডয়েলের উপর লেখকদের মধ্যে সাহিত্যিক থ্যাকারে, ডাক্তার পসি-ত্যাস্লে এবং ডগলাস জেরল্ড।

ফক্স এনগ্রেভার হিসেবে ল্যাণ্ডসিয়ারএর খ্যাতি ছিল এবং প্রথমাবস্থায় লিচ এবং ডিকি ডয়েলের প্রায় সব কার্টুনই ল্যাণ্ডসিয়ার এনগ্রেভ করেন। সাহিত্যিক থ্যাকারে পাঞ্চে নিয়মিত লিখেছেন এবং সেই সঙ্গে কার্টুনও এঁকেছেন। থ্যাকারের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন এইখানেই হয়। থ্যাকারের বিখ্যাত সমাজ প্রহসন "স্নবস অব ইংল্যাণ্ড" প্রথম পাঞ্চেই প্রকাশিত হয়েছিল। কেবলমাত্র থ্যাকারেই নয় ব্রিটেনের একাধিক সাহিত্যিক এবং ঔপন্যাসিক পাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আজও আছেন। পাঞ্চকে কেন্দ্র করেই এঁদের সুনাম। উদাহরণ স্বরূপ পি, জি, ওডহাউসের নাম করা যেতে পারে।

পাঞ্চের প্রথম ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী জন লিচ সাধারণত কার্টুন দেখা যেতো। পাঞ্চে লিচের প্রায় ছয়শো কার্টুন ছাপা হয়। তাঁর মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লিচের অন্যতম সহকর্মী ডিকি ডয়েল অথবা রিচার্ড ডয়েল বিখ্যাত কার্টুনিস্ট জন ডয়েলের পুত্র। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে সমালোচনার জন্য পাঞ্চের সঙ্গে ডিকির সম্পর্ক দীর্ঘ হতে পারেনি। ডিকি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ১৮৫০ সালের ১৬ই নভেম্বরের সংখ্যায় পোপকে সমালোচনার জন্য ডিকি ২৭শে নভেম্বর, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পাঞ্চের চাকুরীতে ইস্তফা দেন। পাঞ্চের ষষ্ঠ প্রচ্ছদপটের কুকুর এবং সিংহের ছবি এই ডিকিরই আঁকা। আজও মাঝে মাঝে এই প্রচ্ছদ পাঞ্চে ব্যবহার করা হয়। ডিকি পদত্যাগের পর ব্রিটেনের তথা বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী স্যার জন টেনিয়েল পাঞ্চে যোগ দেন এবং দীর্ঘ একান্নবছর তিনি পাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পঞ্চাশ বছরে তিনি দু হাজারের উপর কার্টুন আঁকেন

১৮৫৭ খৃঃ প্রকাশিত টেনিয়েলের সিপাহী বিদ্রোহ বিরোধী কার্টুন "দি ব্রিটিশ লায়নস ভেনজেনস অন দি বেঙ্গল টাইগার"।

পাঞ্চ ডিনারে উপস্থিত উপ্তোক্তাদের ব্যঙ্গচিত্র। উপরে বাঁদিক থেকে মার্কেলেমন, জন লিচ, ডিকি ডয়েল, থ্যাকার, হোরেস ম্যান, পার্সিভাল লে এবং ডগলাস জেরল্ড।

র্মান রাজনীতির পটভূমিকায় জার্মান সাম্রাজ্যের
লির বিসমার্কের প্রতি সম্রাট উইলহেলম কাইজারের
বিদ্বেষকারীতার চিত্রায়ন "ড্রপিং দি পাইলট" টেনি-
লের অন্যতম বিখ্যাত কার্টুন। ভারতের সিপাহী
দ্রোহের পটভূমিকায় ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধকে
ি কটাক্ষ করেছেন ফলে তদানীন্তন ভারতীয় সমাজে
নিয়েলের প্রতি বিদ্বেষ দেখা দেয়। ১৮৭৭
ালের ২৭শে আগষ্ট "দি ব্রিটিশ লায়নস ডেনজেরস
; দি বেঙ্গল টাইগার" কার্টুনে টেনিয়েল ভারতীয়
বকে চরম আঘাত করেন। সাম্রাজ্যবাদের
ন্যতার জন্য ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টেনিয়েলকে "নাইট"
াধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাঁর নাম সুপারিশ
রেন স্বয়ং গ্লাডস্টোন।

পাঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে মার্কেলেমন, স্টারলিং
ন এবং হেনরী ম্যাহ যুগ্মভাবে পত্রিকা সম্পাদনা
রেন। এরপর মার্কেলেমন ১৮৫৭ থেকে তাঁর মৃত্যু
৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করেন।
র্কেলেমনের পরে একে একে শার্লি ব্রুকস, টম টেলর
ফিস্, ওয়েন সীম্যান, নক্স, কেনেথ বার্ড, ম্যালকম
রিজ পাঞ্চ সম্পাদনা করেছেন।

মার্কেলেমনের সম্পাদনাকালীন সপ্তাহে দুই একদিন
ক্ষ উপ্তোক্তামণ্ডলীর সকলে ডিনারে একত্র মিলিত
ন পত্রিকার নীতি-নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। এছাড়া
ন রাজনৈতিক বিষয়ে কার্টুন আঁকা হবে সে বিষয়ও

উপ্তোক্তাদের মধ্যে মার্কেলেমন, ইরেনকার ল্যাংডেলস, মাকপিস থ্যাকারে, হেনরী ম্যাহ, জনলিচ এবং রিচার্ড ডয়েল ডিনারে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। বিদগ্ধ সমাজে পাঞ্চের এই ডিনারের সুনাম ছিল। অনেক প্রতিভাবান এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিরা এই ডিনারে উপস্থিত থাকতেন। সাহিত্যিক মার্কটোয়েন এবং গ্যারিবল্ডীও মাঝে মাঝে পাঞ্চের ডিনারে অংশ গ্রহণ করতেন।

টেনিয়েলের পরে পাঞ্চের রাজনৈতিক কার্টুনিস্টদের মধ্যে ণ মরিয়ের, জর্জ বার্ণার্ড প্যাটরিজ র‍্যাভেন হিল, হ্যারি ফার্নিস এবং ফ্রাঙ্কেরেনলডস্ বিখ্যাত। এ যুগের পাঞ্চের প্রধান চিত্রশিল্পী ইলিংওয়ার্থ তাঁর প্রখর ব্যঙ্গ এবং অভিনব রুচির জন্য জগৎবিখ্যাত। বর্তমানে ইলিংওয়ার্থের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন নর্মান ম্যানসব্রিজ। রোনাল্ড সেরালও মাঝে মাঝে রাজনৈতিক কার্টুন এঁকে থাকেন। এঁরা উভয়েই ক্ষমতাশালী কার্টুনিস্ট।

রাজনৈতিক কার্টুন ছাড়াও সামাজিক কার্টুন পাঞ্চের অন্যতম আকর্ষণ। পাঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে সমস্ত কার্টুনিস্ট সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে চার্লস কেনী, লিনলে শ্যামবোর্ণ,

ডিকি ডয়েল অঙ্কিত পাঞ্চের ষষ্ঠ প্রচ্ছদ।

ফিল মে, জন অরো,
টেনর, আন্টন,
থেলওয়েল গলবী।

পাকের এই দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হবার মূলে পাকের স্বত্বাধিকারী মেসার্স ব্রাডবুরী এ্যাণ্ড এগনুর কৃতিত্বই সর্বাধিক। যদিও এর মধ্যে কয়েকবার কোম্পানির নাম বদল এবং দুই একজন অংশীদার অদল-বদল হয়েছেন তথাপি এঁরা পাকের প্রকাশ বন্ধ করেন নি। বর্তমান রাজনীতির পটভূমিকায় পাকের ভূমিকা প্রাচ্য বিরোধী। পশ্চিম অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিরোধী দেশগুলির সমর্থনই পাকের আদর্শ। এছাড়া পাকের নিগ্রো বিরোধী ভূমিকা অশ্বেতকায় দেশগুলির কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্বেতকায় দেশে প্রায়ই কালা আদমী অর্থাৎ নিগ্রোদের জীবন-যাপনকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গচিত্র আঁকার রীতি আজকাল ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে। এই দোষ থেকে পাক নিজেকে দূরে রাখতে পারে নি।

রাজনৈতিক কার্টুনের ক্ষেত্রে পাক বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে চলে। রাজনৈতিক কার্টুনে এঁরা অত্যন্ত গিরিয়াস। আলোচ্য ঘটনার ক্রটির দিকটা সব সময়েই এড়িয়ে যাওয়া হয়। এবিষয়ে শুধু পাকই নয় ব্রিটিশ কার্টুনে আজ এই ধারা স্থায়িত্ব লাভ করতে চলেছে। ব্যঙ্গ বা প্রহসনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন আধুনিক ব্রিটিশ কার্টুনের বিশেষত্ব। এখানে বলে রাখা ভালো যে পাকে কার্টুন বলতে রাজনৈতিক কার্টুনকেই বলা হয়। সামাজিক কার্টুনকে ড্রইং অথবা ক্যারিকেচার বলাই রীতি।

দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হবার জন্য পাক প্রবীণের পংক্তিতে আসীন। ব্রিটেনের শিক্ষিত সমাজে পাকের স্থান সকলের উর্ধ্বে। অনেকের ধারণা সুস্থ এবং মার্জিত রুচির জন্য পাক এই স্থায়িত্বলাভে সমর্থ হয়েছে। যদিও-হেতু পাকের দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল নয় সমাজ এবং রাজনীতির উপর পাকের প্রভাব অপরিসীম—একথা আগেই বলেছি এবং সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে—

"The Punch Editors not only write the Jokes but they help to make the laws of England."

ভিন্নপথে কেদার বদরী

গণেশ লালওয়ানী

[কেদারনাথের পথই সাধারণতঃ কেদার বদরী যাবার পথ, সেই পথেই যান যাত্রীরা। তবে আমরা সে পথে যাই নি। আমরা প্রথমেই উত্তরী হয়ে চলে গিয়েছিলাম যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরীর দিকে—সেখান হতে ফেরার পথেই তাই আমাদের কেদার বদরী করা। আমরা নীচে নেমে এসে যাইনি—যারা হেঁটে ওপর ওপর দিয়েই যে একটা পথ চলে গেছে বৃদ্ধ কেদার হয়ে ত্রিযুগী—সেই পথেই ফিরেছিলাম। এ পথে একটা চড়াই পড়ে পাঙরালীর চড়াই—কঠিন চড়াই। কঠিন চড়াই তা এইতেই বোঝা যাবে যে যাঁরা কেদারনাথের পথে ত্রিযুগী যান তাঁদের কাছে ত্রিযুগীই একটা শক্ত চড়াই। অথচ সেই ত্রিযুগীই আমাদের নেমে আসতে হয়েছিল মাসগু হতে প্রায় সাড়ে চার মাইল। মাসগু থেকে আরো অনেক উঁচুতে এই পাঙরালী। কেদারনাথের পথে কেদার ফল্গীর কথা অনেক লেখা হলেও পাঙরালীর পথে কেদার ফল্গীর কথা লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ পাঙরালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। তবে পথের দুরুহতার ভয়ই তা বোধহয় কমপাওয়ার লোককে আকর্ষণ করে। বর্তমান রচনায় পাঙরালীর পথে কেদার ফল্গীর বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি গঙ্গোত্তরী হতে যার আরম্ভ।

রবিদা, কেশব, সুধাংশু, নীলকান্ত ও বৈদ্যনাথ আমাদের পথের সঙ্গী। যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী এক সঙ্গেই করেছি আমরা। আর ব্রহ্ম—সে আমার পথের সঙ্গীই নয়, দোসর। এক সঙ্গেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম আমরা দু'জনে। তারা সব সাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ। আমাদের ছড়িদার। কপ্‌পুর কুলী। এছাড়া যাঁদের কথা আছে তাঁদের পরিচয় লেখাতেই পাওয়া যাবে।

আর একটা কথা এখানে বলে রাখি যে এই পথটা কেবল একটা ভৌগলিক পথ নয়—তাই পথের বর্ণনায় যাঁদের সঙ্গ করেছি তাঁদের কথাও না এসে পারে নি। তাঁরাও আমাদের কাছে পথের অঙ্গ হয়েই আছেন। —লেখক]

যে গঙ্গোত্তরী আসবার জন্য এত সাজ-সাজ সেই গঙ্গোত্তরী ছেড়েই চললুম আবার। সেই যে সকালে বেরুলাম, তারপর এক ছুটেই চলে এলাম ভৈরবঘাটী। ভৈরবঘাটীতে চা খাওয়া হল। তারপর জাহ্নবী সংগম পেরিয়ে এলাম জংলায়। জংলায় সেঁও-পাকোড়ী খেতে খেতে বলেন রবিদা, হরসিলে তো থাকা হবনি, হরিদ্বারে। আজ হরসিলেই থাকা যাবে, কি বলেন?

কি আর বলব! তবে দেখছি, কাজে লাগবে এবার ব্রহ্মর পারমিটটা। D. F. O.-র সঙ্গে আলাপ করে পারমিটটা ও নিয়ে রেখেছে এ পথের ফরেষ্ট-রেষ্ট হাউসগুলোর গঙ্গোত্তরীতেই। হরসিলেও বেশ ভালো রেষ্ট হাউস আছে।

রেষ্ট হাউসেই উঠি। তাই স্বাচ্ছন্দ্যের একটু চেহারা দেখি। কিন্তু সত্যি বলতে কি রেষ্ট হাউস কি ডাক-বাংলোয় উঠতে আমার একটুও ভালো লাগে না। মনে হয় কেমন যেন বিজাতীয়। ওর চাইতে ধর্মশালা কি চটি, হোক একটু ময়লা কি অপরিচ্ছন্ন, হয়ত একটু ঠাসাঠাসিই হয়, তবু মনে হয় যেন নিজের, অন্ততঃ এমন পর পর মনে হয় না।

ঘরের মধ্যে ফার্নিচারই কি আবার কম? চেয়ার টেবিল, খাট, গদিচা—সামনেই প্রকাণ্ড আয়না। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই আবার চমকে উঠি। এ কি হয়েছে! শুকিয়ে যে হয়ে গেছি আধখানা। আর দাড়ি হয়েছে। ব্রহ্ম কাল পরমহংস বলে যে ঠাট্টা করছিল, দেখছি তা নিতান্ত অকারণে নয়। বলে, তোমার জন্য কোন গুহা দেখি। একটা পছন্দ করে নাও, বসিয়ে যাই এবেলা। দাড়ি তারও হয়েছে। আর সকলেরও। তবে আমার মতো নয়।

কিন্তু আমি যে নিজেকেই নিজে চিনতে পারলুম না। হিমালয়ে কি মনের প্রকৃতির সঙ্গে দেহের আকৃতিও এমনি বদলে যায়?

বাসের এক সহযাত্রিণীর কথা মনে পড়ছে। এসেছিলেন বোধহয় দিল্লী হতে। মুখে রুজ ছিল, ঠোঁটে লিপষ্টিক। সাধারণ তীর্থযাত্রী নন—আলট্রা মডার্ণ, আধুনিক কায়দা-দুরস্ত। কিন্তু ওঁকেই দেখলুম আবার যমুনোত্তরী হতে ফেরবার পথে। ঠোঁটের রঙ উঠে গেছে, গালে নেই রুজ। কাপড় চোপড় সম্বন্ধেও সাধারণ তীর্থযাত্রীদের মতোই সমান অবহেলা, চলেছেন লাঠি নিয়ে যমুনোত্রী। তবু ভালো লাগল। ভালো লাগল তাঁর মুখে হিমালয়ের বন্য প্রকৃতির একটা রঙ লাগতে দেখে।

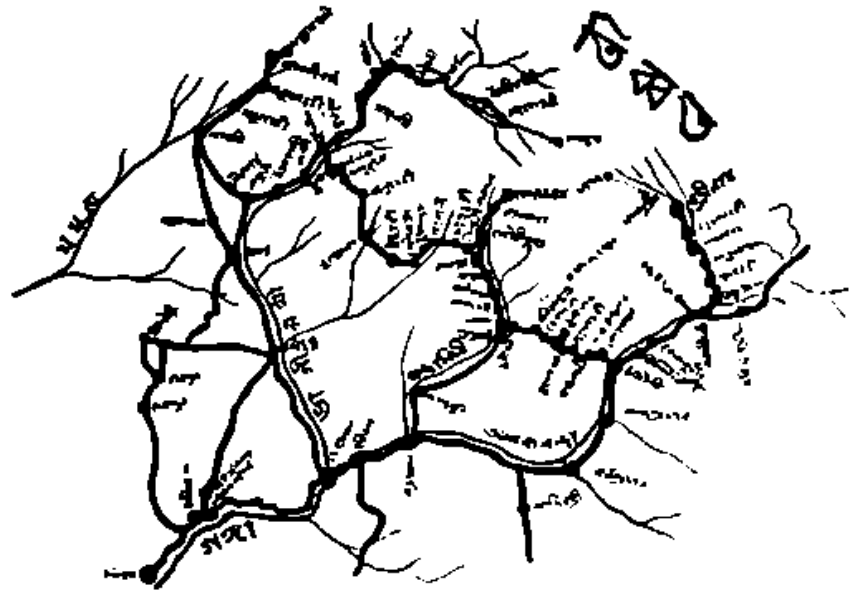

বারান্দায় ডেক চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসি। ঝমাঝম বৃষ্টি নেমেছে। কিন্তু ওরি মধ্যে দেখি, আমাদের কুলীরা ঝরণার জলের ধারে একটা চীড় গাছের তলায় বসে রুটি খাচ্ছে। মাথার ওপর গাছের পাতার সামান্য ঘা একটু আচ্ছাদন, অন্য আচ্ছাদন নেই। গায়ের তলা দিয়ে বৃষ্টির জলের ধারা ছুটে চলেছে, গায়েও কি আর জল পড়ছে না একটুও?

কিন্তু এত যে বৃষ্টি, বিকেলের দিকে সব ফরসা। চীড় গাছের পাতায় পাতায় আবার রোদ এসে পড়েছে। সেই রোদে ঝলমল করছে বৃষ্টির জলে সদ্য-ধোয়া পাতাগুলো। আকাশের রঙ যেমন আরো নীল, পাহাড়গুলো যেমন আরো পরিচ্ছন্ন, গাছের পাতাও দেখছি তেমনি আরো সবুজ।

এমন সোনালী বিকেলে কি আর ঘরে থাকা যায়? হরসিলেও নয়ই। তাই বেরিয়ে পড়ি। তবে কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছি। বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডাটা যেন একটু বেশী পড়েছে, ঝরণার জল আরো যেন বেশী কল কল করে ছুটে চলেছে।

কিন্তু সখ করে এখানে এতো ফলের গাছকে লাগালো? এ পথে তো আর ফল বেচিনি, এক আখরোট ছাড়া। কিন্তু এ যে,ডালিম, বেদানা, আপেল, পীচ্। ফল ধরে রয়েছে।

সুধাংশু বলেন, এ সমস্তই উইলসন্ সাহেবের কীর্তি। সৈন্যদল হতে পালিয়ে এসেছিলেন, তারপর ঘর বেঁধেছিলেন এখানে পাহাড়ীয়ালী মেয়ে বিয়ে করে। ভদ্রলোকের সখ ছিল গাছ-গাছালির। শুধু সখই নয়, চোখও ছিল। তা নইলে যেদিন এ পথ সুগম ছিল না সেদিন তাঁর নিভৃত নিলয়ের জন্যে হরসিলকেই তিনি বেছে নিলেন কি করে? আমার তো মনে হয়, তিনি শিল্পী ছিলেন।

মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা নালা পেরিয়ে এলাম লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে। সুধাংশুই পথ দেখিয়ে এনেছিলেন। যাত্রীশালার পাশ দিয়ে এলাম। ওপরে যাত্রী নীচে গাই আর মোষ।

মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু আমাদের দেখে একটি ছোট্ট ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে। তখন ভিতরে ঢুকে বিগ্রহ দেখি।

বেষ্ট হাউসের সামনেই পঞ্চায়েতী গ্রাম উদ্যোগের দোকান। গায়ে দেবার কাপড় বিক্রী হয় এখানে। এখানকার কাপড় দেখেছিলাম সেই ব্রহ্মচারীর গায়ে যিনি ব্রহ্মকে পেট্রোল ঢেলে নিতে বলেছিলেন ইরিনে। তা নইলে উঠতে পারবে কেন—সামনে যে ভৈরবঘাটীর চড়াই। পেট্রোল মানে চা। কিন্তু দোকান সেদিন সমস্তদিনই বন্ধ ছিল। তাই সে সব আর কিছু দেখা হয় না। কেনাও না।

আজ ওবেলা খেতে বেলা হয়েছিল। প্রায় চারটে। তাই রাত্রে আর কিছু রান্না হল না। কেবল সুজী। সুজী খেয়েই তাই চালাও কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম আমরা। কিন্তু ঘুম গেল রাত ন'টার খবর শুনতে বেষ্ট হাউসের অন্যদিকটায় যে পুলিশ অফিসার থাকেন তাঁর ওখানে।

হরসিলের পাশেই নেলাং; কাছেই তিব্বতের সীমানা। তিব্বত চীনাদের হাতে যাবার পর তাই এখানে আর্মড্ পুলিশ এসেছে। হরসিলেও ওদের বিরাট আড্ডা। এখান থেকে আগের আউটপোষ্টে লোক যা আবার ফিরে আসে কর্তব্য শেষ হলে। অফিসার লোকটিও বেশ। শুনি ব্রহ্মর মুখেই।

ব্রহ্ম খবর শুনতে গেলেও, আমরা আর কেউ যাই নি। ইচ্ছে করেই যাই নি। উত্তরকাশীতেও তাই যখন একখণ্ড খবরের কাগজ হাতে এসে পড়েছিল শুনো দেখিনি। যখন লোকালয় ছাড়িয়ে এতদূরেই এসে গেছি, যখন ওদিককার কোনো খবরই আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয় না, যখন পাহাড় বনের এই নির্জনতায় মনের প্রশান্তিকেই উপভোগ করছি তখন কি হবে ছাই আমাদের মর্ত্যের মাটির টুকরো টুকরো খবর জেনে—খবরও আবার কোথায় কে ধর্মঘট করেছে, কোথায় পুলিসে গুলীবর্ষণ। তার চাইতে এই বেশ আছি। ওসব শুনে মনের বিক্ষেপ ঘটতে দিতে চাইনে।

খবরের কাগজে যে মনের বিক্ষেপ ঘটায় সে ঠিক। তেমন তেমন খবর থাকলে তো কথাই নেই। তর্কাতর্কি হতে হতে হাতাহাতি, শেষে রক্তপাত। তা না হলেও, মনের উত্তেজনা কি কম হয়!—নন্দ তো তাই তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের খবরের কাগজ পড়তে নিষেধই করতেন। সে ছিল তাঁর অনুজ্ঞা। যখন মনে শান্তি পেতে চাই, আনতে চাই মনের স্থৈর্য, তখন ইচ্ছে করে কেন আবার চিত্ত-বিক্ষোভ ডেকে আনা।

পরদিন এলাম গাংনানী

একবেলা করে পথ হাঁটছি এখন। বিকেলে পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু যখন গাংনানী এলাম তখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে।

পথের মধ্যে বৃষ্টি নেমেছিল দুবার। একবার আশ্রয় নিয়েছিলাম পথের ধারের একটা উটকো ঘরে। আর একবার পাহাড়ের গায়েরই পথের দিকে ঝুঁকে থাকা একটা তেরছা পাথরের নীচে। পাশেই বোধহয় বন-মল্লিকার ঝোপ ফুটেছিল। তারি সুবাসে সব জায়গাটি ছাওয়া। বৃষ্টি ধরতে যখন বেরিয়ে আসি, তখন দেখি সেই গাছ আর তার ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল। কেশব একখানা ডাল ভেঙে নিয়ে এসে আমার হাতে দেয়।

গাংনানী ধর্মশালায় দেখা হয় একদল বাঙালী যাত্রীদের সংগে। দল মানে সংঘ-টংঘ নয়। আত্মীয়স্বজন নিয়ে এক পরিবারের। দেখি একবিঘে পান বেঁধে নিয়ে এসেছেন তাঁরা সংগে করে। হরিদ্বার হতে সমস্ত পথ পান খেতে খেতে যাবেন তাই।

বিকেলে ওঁদের সংগেই কথা হচ্ছে। ভদ্রলোকটি অসুস্থ। আমরা রয়েছি আর ওঁদের দলের দুজন। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী রয়েছেন। তিনিও গোমুখ হয়ে এসেছেন। গোমুখেরই কথা হচ্ছে। ভদ্রলোকেরও খুবই ইচ্ছে গোমুখ যাবার। কিন্তু ওঁর ইচ্ছের চাইতেও বোধহয় বেশী ইচ্ছে ওঁর স্ত্রীর। অন্ততঃ তাঁর কথায় তাই মনে হল। বললেন, আমাদের মধ্যে একজনও যদি যায় তবে শেফালি যাবেন।

শেফালিকে দেখেছি এখানে এসেই। খুব মোটা না হলেও পাতলা ছিপছিপেও নন তিনি। সুধাংশু তো একটু বিচলিতই হয়ে পড়েছিলেন, অবশ্য ওঁকে দেখে নয়, ওদের ঘরের দিক হতে যেরকম পোস্ত বাটার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল তাইতে। হবারই কথা। তাল নদ খাইয়ে ওঁরা সকলেই, অথচ এতদিন এপথে যা জুটেছে সেত কেবল আলুর সব্জী আর সব্জী। স্বাদ গন্ধবিহীন। কিন্তু ওঁরা যখন এদিককার এ কটি তৃষিত প্রাণীর কোনো খবরই নিলেন না তখন নীলকান্তকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওঁদের দুষতে লাগলেন সুধাংশু। চুঁচুড়ো চন্দননগরের লোকেদের মতো স্বার্থপর নাকি আর হয় না। ওঁদের মতো নীলকান্তের বাড়ীও ওদিকে কিনা তাই। কিন্তু আশ্চর্য হলাম কেশবকে নীলকান্তর পক্ষ নিতে দেখে। পরে জানা গেল কেশবের মাসীর বাড়ীও নাকি ওদিকেই! ব্রহ্ম বলে, এ যে দেখছি মামার চাইতে মাসীর দরদ বেশী। সুধাংশু আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, না হয় বলতেনই একবার। তাই বলেত সত্যি সত্যিই আর আমরা কিছু দেতে যাচ্ছিলাম না।

তা যাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওঁরা নাই জিজ্ঞাসা করুন, তাতে আমাদেরত আর ওঁদের চা খাইয়ে দিতে বাধে না। রবিদা চা দিতে বললেন তারাপদকে। বললেন, আমরা যদি মেয়ে থাকতে পারি, তবে আপনারাই বা পারবেন না কেন? তবে আমার ব্যক্তিগত মত যদি নিতে চান তো বলি, বাঙালী ঘরের মেয়েদের ওপথে না যাওয়াই ভালো।

সুধাংশু শুনে বলেন, কিন্তু যাবার আগ্রহ ওঁর স্ত্রীরইত বেশী।

রবিদা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কেশব

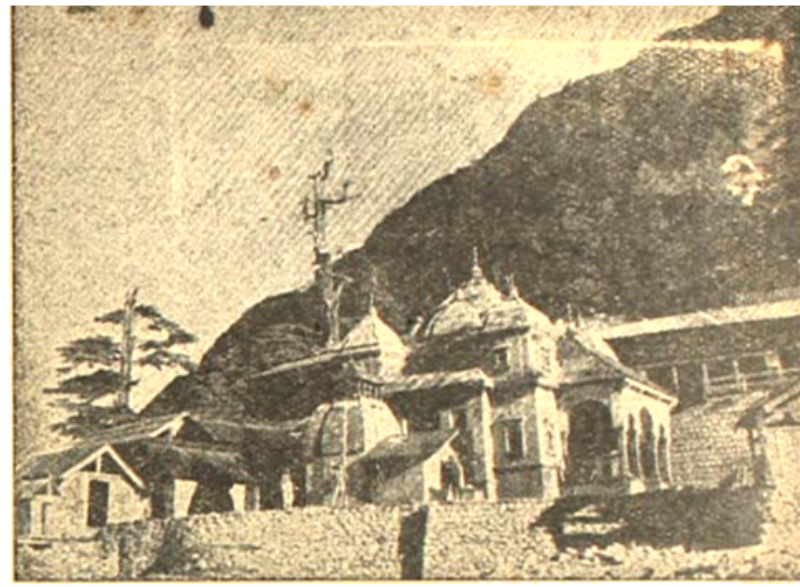

গঙ্গোত্রীর মন্দির

[illegible] কথা থেকে নিয়ে বলে উঠল, 'কেন পারবেন না যেতে, নিশ্চয় পারবেন।' পর্বত ময়দান। ওদিকে চড়াই উৎরাইও নেই তেমন কিছু। তবে হ্যাঁ, ওপথে গাড়ী-ফাড়ী চলবে না, চাই সালোয়ার কোর্তা। কারণ হাঁটিনি ত আমরা একটুও। তবে যখন চীড়বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখি এক লক্ষ ডন-বৈঠক দিয়ে উঠলাম।

কেশবের কথাই ওই ধরণের। তবে এক্ষেত্রে একটুও অতিরঞ্জিত নয়। কিন্তু গাংনানীতে বসে গংগানী সম্বন্ধে সে যা গল্প বললে তাতে আমার অবস্থা অনেকটা 'বিরিঞ্চিবাবা'র সভার মতো। ওয়ানক হাসি পাচ্ছে অথচ হাসতে পারছিনে। তখন মনে মনে কল্পনা করছি পাঞ্জাব মেল ডিরেল্ড হওয়া, ইঞ্জিনে ইঞ্জিনে ঠোকাঠুকি, ছচল্লিশের রায়ট—

কথা উঠেছিল অলৌকিক দেখা নিয়ে। সেই প্রসঙ্গেই বলল কেশব। বলল, বসে আছি গংগানীর গঙ্গাস্নান-কুণ্ডের ধারে। শরীরটাও তেমন ভাল নেই, তাই মন-টাও। ভাবছি, কাল কি আর পেরুতে পারব সিডোটের চড়াই। ভাবছি শেষে ফিরে যেতে না হয় মাঝপথ থেকে। এমন সময় দেখি হঠাৎ সামনের পাহাড় থেকে প্রায় এক ছুটেই নেমে এলো দুটী মেয়ে। বয়স বেশী নয়। বারো কি তেরো। মনে মনে ভাবি, ওদিকে আবার পাড়া কোথায়—না এখান থেকেই খেলতে খেলতে উঠে গিয়েছিল ওপরে। ওদেরই লক্ষ্য করছিলাম। এমন সময় ওরা কাছে এল। বলল, ফল খাবে, ফল। একরকমের বড় ফল দেখলাম ওদের কোঁচড়ে। ওই ফলই ওরা খেতে খেতে আসছিল। একবার ভাবলাম কি জানি কি ফল। তারপর ভাবি, ওরা যখন ও ফল খাচ্ছে, তখন আমাদের খেতেই বা আর বাধা কি?

ফল দিয়েও ওরা পালিয়ে গেল আর ঐ ফল খেতে খেতেই এলাম আমরা ধর্মশালায়। হঠাৎ ফলের কি নাম জানতে ইচ্ছে হওয়ায় ধর্মশালার চৌকিদারকে সে ফল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি, এ কি ফল?

চৌকিদারও ফল দেখে বোকার মতো চেয়ে থাকে। বলে, জানি না।

জানোনা মানে কি, এদিকেই যে হয়।

না বাবুজী। এ ফল কস্মিনকালেও এদিকে হয় না। হলে কি আমি জানতাম না।

সত্যিইত তাই। তখন মেয়ে দুটোর কথা বলি।

শুনেও সে যায়। বলে ঠিক দেখেছেন না ভুট।

ভুট! এইত ফল রয়েছে হাতে।

না বাবুজি আপনারা ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে। ঐ বয়সের কোনো মেয়েইত এখানে থাকে না—আর থাকলে কেনই বা যাবে ওরা ঐ পাহাড়ে চড়তে।

চৌকিদারের কথায় এবার আমাদেরই ধোঁকা লাগে। ভাবি এ কি রকম হল। তখন ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু বুঝতে পারি খানিক পরেই। শরীরে আর ক্লান্তি নেই, না মনে অবসাদ। সেই ভেড়ে পড়ার ভাব গেছে একেবারে কেটে, এখন আমরা ভিন্ন মানুষ। আমরা যেন নূতন জীবন লাভ করেছি।

আগন্তুকদের চোখ বিস্ফারিত। সুধাংশু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার কথাত আগেই বলেছি। কিন্তু সেই ভদ্রলোক হঠাৎ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠলেন এ পথে কিছুই আশ্চর্য নয় মশাই। কখন যে কে কিভাবে দেখা দেন, কৃপা করেন। কি বললেন যেন, গঙ্গাস্নান

কুণ্ড না ? তবে গঙ্গা যমুনাই হবেন। আপনারা ভাগ্যবান।

ভাগ্যবান নিশ্চয়ই। কিন্তু ওঁরা উঠে যেতেই হাসিতে লুটিয়ে পড়ি। কারণ সেদিন সেই গঙ্গাযমুন কুণ্ডের ধারে কেশবদের সঙ্গে ছিলাম আমিও। অথচ আমি আমার এই সাদা চোখে ওসবের কিছুই দেখিনি তবে ভাবি মানুষ কিভাবে যে অলৌকিক কাহিনী সৃষ্টি করে এই বুঝি তার নমুনা। অথচ এই অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আমাদের দুর্বলতারও অন্ত নেই। তা নইলে যেসব বইতে এই ধরণের কাহিনী লেখা হয়ে থাকে তা আমরা গোগ্রাসে গিলি কেন ?

পরদিন গাংনানী হতে এলাম আমরা ভাটয়াড়ী।

যাবার সময় যেমন সকলের সাধু-সঙ্কল্প ছিল যে ফেরবার পথে উষ্ণ জলের কুণ্ডে স্নান করা হবে, দেখলাম সে সঙ্কল্পের কথা যখন আজ গাংনানী হতে ফিরে চলেছি তখন কার মনে নেই। তবু সে কথা মনে করিয়ে দিতে সকলেই গেলেন একটুখানি ওপরে উঠে সেই জলের কুণ্ড দেখতে—ওখানেই আবার সত্যানন্দজীর সঙ্গে দেখা হল।

সত্যানন্দজীকে দেখে আশ্চর্য হই না। কারণ কাল গাংনানীর পথেই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলেছিলেন, ঋষিকুণ্ডে যাচ্ছি। ভালোই হল। আরো একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

ভাটয়াড়ীরই আর এক নাম ভাস্কর প্রয়াগ। যাবার সময় এখানে থাকা হয়নি, না স্নান। কুমালটী হতে সোজা চলে গিয়েছিলাম গাংনানী। তাই আজ এখানেই থেকে গেলাম। ভাস্কর প্রয়াগে স্নান করা হবে।

কাল থেকে আমাদের পথ পৃথক হয়ে যাবে। রবিদারা যাবেন মনেরী। তারপর উত্তরকাশী হয়ে হৃষিকেশ। সেখান হতে কলকাতা ফিরবেন। আর আমরা যাব ছুনার পথে বেলাক—তারপর ত্রিযুগী হয়ে কেদারনাথ।

তাই হিসেবের ব্যবস্থা হল। বিকেলের আলু ও পাপড় ভাজা হতে আরম্ভ করে রাত্রের পায়েস। কিন্তু পায়েস রান্না করতে সকলেই গলদঘর্ম। ধোঁয় কাঠের। একটু একটু আঁচ, তাও ভালো জ্বলে না। কাঠ পুড়ল, দেড় টাকার, প্রায় তিন সের দুধের ধাম আর রান্না হল রাত দশটায়। ব্রহ্ম আর নন্দীত না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ছিল, শেষ তাদের টেনে তুলে আনতে হল।

ভাটয়াড়ীর ধর্মশালাটীও বেশ বড়। আর বাজার। সন্ধ্যার দিকে গেলাম সুধাংশুদের সঙ্গে বাজার ঘুরে দেখে আসতে। বেরুবার মুখে শুনি কে যেন হার্টফেল করে মারা গেছে এখানে। সিঙ্গোটের চড়াই পথে একজন গেছিল। এই দ্বিতীয়।

একটা দোকানের পাশ দিয়ে ওপরে উঠি বাজারের পথ ধরতে। অন্ধকার পথ। মাঝে মাঝে অবশ্য হ্যাজাকের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় দেখি যাত্রীদের ভূতের মতো কালো ছায়া এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

একজন দোকানী চেয়ার এগিয়ে দেয় আমাদের দিকে। বলে কিছু না, এমনি বসতেও বাধা নেই। তা নেই। তাই বসিও। কাঠের চেয়ার। দেখি রেডিও রয়েছে ঘরে। AIR-এ হিন্দী গান হচ্ছে। এসব থেকেই বুঝতে পারছি লালজীর অবস্থা সচ্ছল। ওদিকে সুধাংশু গল্প জমিয়ে নিয়েছেন। বহুত হুকে আয়া, বহুত হুকে।

সকালে উঠে জিনিষপত্র সব পৃথক করে নেওয়া গেল। পৃথক আর কি, পৃথকই ছিল তবু যার যা নেবার যা দেবার। রবিদারা তাঁদের বাদাম কিসমিস আখরোট কাঁড়ু সব আমাদের দিয়ে দিলেন। বললেন, কি আর হবে। আমাদের পথও সব ফুরিয়ে গেল। আপনাদের কাজে লাগবে। সরষের তেলের যে ছোট্ট একটা টিন নিয়ে এসেছিলেন সেই টিনটাও বেঁধে দিলেন গামছায় করে। পৃথকভাবে বুলিয়ে নেবে কপ্‌পুর। তেলটা খাবার জন্য ততটা নয়, যতটা গায়ে মাখবার জন্যে। এপথে তেল গায়ে না মাখলে শরীরটা কেমন যেন চড় চড় করে।

জিনিষপত্র বাঁধা হলে রবিদা বলেন নীচের পথেই যাওয়া যাক। সকাল সকালই ত যাচ্ছি। এখন নিশ্চয় ওপরে কাজ আরম্ভ হয়নি যে পাথর গড়িয়ে আসবে।

বলি, সেই ভালো। ওপর দিয়ে যাওয়া মানেই ত সেই পাহাড় ডিঙোনো। কি দরকার ?

তাই নীচের পথ দিয়েই বেরিয়ে যাই। অবশ্য আমরা ছাড়া আর কেউই যায় না। যাওয়া মানেই খানিকটা ঘুঁকি নেওয়া। কেউ কেউত নিষেধও করল আমাদের। কিন্তু দেখলাম প্রায় সমস্ত পথটাই ভালো। যাত্রার কাছাকাছি এসে, ওপরে যেখানে পথ তৈরীর কাজ হচ্ছে সেখানেই যা ভাঙা চোরা। তবে গোমুখ

হয়ে যখন এসেছি তখন ওই ভাঙা চোরাকে কি আর ভয় পাই। কিন্তু ভয় পেলাম যখন ওপর হতে পাহাড়ের গা দিয়ে পাথর গড়িয়ে এলো। রবিদা বলেন, এখানে এক মিনিটও দাঁড়াবেন না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসুন দেখতে দেখতে আসুন।

দেখতে দেখতেই যাই। তবে সেই একটি পাথরই গড়াল যা আমাদের সামনে দিয়ে নীচে নেবে গেল। আর নয়। তারপর মাল্লায় এসে কেদারের পথ ধরি নীচের দিকে একটুখানি নেমে গিয়ে। রবিদারা সেই-পথ ধরেই এগিয়ে যান মনেরী।

সমান্তরাল পথ। যতদূর দেখা যায় ততদূর হাত নাড়তে নাড়তে যাই। শেষে আমাদের পথ বাঁক নেওয়ায় গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন আর তাঁদের দেখতে পাই না।

কেন জানি না, ওঁরা চলে যেতেই একটা বিচ্ছেদের বেদনার মতোই যেন অনুভব করি।

হাঁটতে হাঁটতেই ভাবি, কলকাতায় থাকলে কি এ কয়দিনের আলাপে এতটা ঘনিষ্ঠতা হতে পারত, না এতটা কাছে আসতে পারতাম। সেখানে মনের দেয়াল আছে—খোপ খোপ কুঠরী! প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাই সেখানে কাউকে চিনিনে। স্বার্থ ছাড়া কাউকে এতটুকু সময় দেইনে। মানুষে মানুষে সেখানে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ। কিন্তু এখানেত তা নয়। যতদূর দেখা যায় ততদূর অবারিত আকাশ আর পাহাড়। মনের তাই কোথাও সীমা নেই। সহজেই এখানে তাই সকলকে যেমন নিজের করে নিতে পারি নিজেকে সকলের।

•

মাল্লা হ'তে স্যালী তিন মাইল। পথও কিছু খারাপ নয়। তাই দেখতে দেখতেই চলে আসি ক্যালু। ক্যালু স্যালী হতে আরো তিন মাইল।

ক্যালুতেই প্রথম সেই ধরণের চটি দেখি যার তিন দিকে পাথরের দেয়াল, একদিক সম্পূর্ণ খোলা। ছাদে বাঁশের কঞ্চির ওপর ডাল ও লতাপাতা। এতদিন যা দেখেছি, যেখানে থেকেছি সবই কোঠাবাড়ী। কাঠের ছাদ, টিন দিয়ে ছাওয়া। গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরীর পথের ধর্মশালাগুলোও খুবই ভাল। দালান বাড়ী বললেই হয়। ঘরের দরজা জানালা সবই আছে। কিন্তু এখানে সে সবের বালাই নেই। আর কেমন জীর্ণ।

বোধহয় এগুলো আগের কালের চটির প্রতীক। এ পথে যাত্রীও বেশী যায় না তাই এদের দৈন্যদশা আজো ঘোচেনি। আর কোনো কালে ঘুচবে বলেও মনে হয় না। কারণ এতখানি পথ আসতে এক প্রফুল্লবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। ক্যালুতে এসে অবশ্য আরো কয়েকটি যাত্রী দেখলাম, তবে তাদের আঙুলে গোনা যায়। কেদার-বদরীর কথা বাদই দিচ্ছি, যাঁরা গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী যান, তাঁদের ক'জনাই বা আবার এপথে আসেন। কারণ একসঙ্গে চারধাম কেউ বড় বিশেষ একটা করেন না। প্রথমবারে কেদার-বদরী, দ্বিতীয়বারে গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী। তা নইলে সত্যিই শরীরের ওপর অত্যাচার হয়। তারপর অর্থ। দ্বিতীয়তঃ, যাঁরাও করেন তাঁদের অনেকেই আবার নীচে নেমে যান। আবার দেবপ্রয়াগ হয়ে কেদারের পথ ধরেন। তার কারণ এ পথে একটা চড়াই আছে পাঁওয়ালির চড়াই। সিঙ্গোটের চড়াইও যার কাছে কিছু নয়। তারাদত্তের মুখেই শুনেছি, শেষের টুকু চড়াই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

এই হামাগুড়ির ভয়েই পে হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ফিফটি আবার এ পথে আসেনি। লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ভৈরবঘাটিতে। প্রথম আলাপেই যে ভাবে গড় গড় করে নাম বলে বলল, আই, এ, আপার ডিভিসনাল ক্লার্ক, পে হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ফিফটি—তাতে একটু হাসিই পেয়েছিল। কিন্তু এ তার দোষ নয়। এগুলো দক্ষিণ ভারতের লোকেদের অনেকটা বাতিকের মতো। বাতিকই বা কি করে বলি, যখন বিনয়কে ওরা বিদ্যার-ভূষণ বলে মনে করে না, করে অলঙ্কার। তাই নামের সঙ্গে জুড়ে দিতেই হয় আই, এ-র মতো ম্যাট্রিক, কি বি-এ হনস-ইকন। তবে পের কথাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি—তবে ও হয়ত ভেবেছে পের কথা না বললে পাছে হয়ত তার সঙ্গে আমরা কথাই না বলি।

এমন অনেকেই আজকাল বলেন না—বিশেষ রাজ-

ধনীতে যাঁরা বসবাস করেন। শুধু বড়রাই নয়, ছোটদের মধ্যেও এই বিষ ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে। নূতন ধরনের বর্ণ-বৈষম্যকে যে আমরা গড়ে তুলছি সেদিকে কি আমাদের চোখ আছে!

উত্তরাখণ্ডের তীর্থপথের একটা বই দেখলাম পে ফার্স্ট্রেড এ্যাণ্ড ফিফটির হাতে। ম্যাপ দেখতে দেখতে ও আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে যদি কেদারনাথ যাই তবে কি ধরাসু হয়ে হৃষিকেশ গিয়ে দেবপ্রয়াগ আসবে না টিহরী হয়ে দেবপ্রয়াগ যাওয়া যাবে।

প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হই। বলি, অত ঘুরেই বা যাবে কেন যখন মাল্লা হতে কেদারনাথ যাবার একটা সংক্ষিপ্ত পথ রয়েছে। আমরাও তো যাচ্ছি সেই পথে। চলনা একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

কিন্তু ওই পাঁওয়ালী! বলে, পাঁওয়ালীর চড়াই কি আর ভাঙতে পারবে। তার চাইতে ঘুরেই যাই।

কি আর বলব! বলি, তাই যান, তাছাড়া ও-পথেও বসেই যেতে পারবে অনেকখানি। তবে হৃষিকেশ যেতে হবে না। টিহরী হতে বাস যায় দেবপ্রয়াগ।

ওর মুখেই শুনি পাঁওয়ালীর চড়াই কিনা কাবুলের লড়াই।

কাবুলের লড়াই লড়বার যাদের সাহস হয় না, তারা ওর মতো নীচে নেমে যায়। তাই বোধহয় এই পথের চটিগুলোর এই দৈন্যদশা। চটিরই না, ধর্মশালাগুলোরও। তার পরিচয় পেলাম ছুনায় গিয়ে।

ক্যালু হতে ছোট্ট একটি পুল পেরিয়ে মাইল তিনেক চড়াই ভেঙে তবে আসতে হয় ছুনায়। তারাদত্ত তো চড়াইয়ের কথা কিছুই বলে নি কিন্তু দেখলাম বেশ চড়াই। কিন্তু পুল পেরিয়েই যে দৃশ্য দেখলাম তা অভাবনীয়। ঘন নীল আকাশের গায়ে সাদা চকচকে বরফ ঢাকা পাহাড়ের এক টুকেরা। সূর্যের আলোয় রূপোর পাতের মতই ঝলমল করছে। কি পাহাড় জানিনে, আর বরফঢাকা পাহাড় যে এই নূতন দেখলাম তাও নয়। তবে এখানে এই পাহাড় দেখব আশা করি নি তাই বোধহয় এই বিস্ময়ের চমক।

বনের একটু আড়াল পড়ে বলে ছুনার চটিটাকে পথ চলতে চলতে ভালো দেখা যায় না। তবে অনুভবই জানিয়ে দেয় নীচের দিকে নেমে গেলেই চটি আছে। আমি তো ওই ভাবেই নীচে নেমে গিয়েছিলাম।

জায়গাটা কেমন যেন জলজলা। অনেকটা বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চলের মতো। ঝিরঝির করে গাছের পাতা দুলছে আর তারি সঙ্গে আলো-ছায়া। মৌমাছির গুনগুন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সব কেমন যেন নিঝুম। সব কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলাম ধর্মশালায়। বেলা আর কি যয়েছে, মাত্র দশটা। তবু চটিগুলো খাঁ খাঁ করছে, ধর্মশালাও তাই। লোক নেই বলেই হয়ত। বলতে কী আমিই প্রথম গেলাম ধর্মশালায় সেদিন। তারপর এলেন প্রভুদয়াল ও তাঁর স্ত্রী। বেলা বাড়তে আরো দু'জন সন্ন্যাসী। বিকেলের দিকে যখন আমরা বেরুচ্ছি তখন কিছু যাত্রী। বোধহয় ক্যালুতে যাদের আমরা দেখে এসেছিলাম তারাই।

ধর্মশালাতেও দেখছি ঘর বলে কিছু নেই। যা আছে সে চালা বারান্দা, মাঝে মাঝে কাঠারির বেড়া দিয়ে পৃথক করা। তবে এপারে-ওপারে সবই দেখা যায়। সামনে এবং বাঁ দিকেই যা থাকবার। ডানদিকে রান্নার উনুন, মাঝে চত্বর। ঢুকবার দরজার কাছেই চৌকিদারের আস্তানা।

বাঁ দিকেই বেড়ার এপারে চাটাই নিয়ে আমরা কম্বল পেতেছি। ওপারে প্রভুদয়ালরা। দেখি, প্রভুদয়ালরা শুধু স্বামী-স্ত্রীই নন, ওঁদের সঙ্গে রয়েছে ওঁর বৃদ্ধ বাবাও। তিনি বেড়ার ওপার হতে আমাদের দিকে যে দুজন সাধু এসে বসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন।

ছুনায় বড় জলের অভাব। ঝরণা অবশ্য একটা আছে, তবে ক্ষীণধারা। খাবার জল ধরতেই প্রাণান্ত। স্নান তো দূরের। তবু সেই ঝরণাতলায় গিয়ে দাঁড়াই। অল্প অল্প জল ধরে গায়ে দেই।

শুধু ছুনা বলেই নয়, এপথে জলের অভাবটা দেখেছি সর্বত্রই। পথ চলতে চলতেই দেখলাম কত অজস্র ঝরণা সব শুকিয়ে রয়েছে। বর্ষার সময় নিশ্চয়ই ও-সব জায়গা দিয়ে জলের ঢল নামে, কিন্তু এখন? যেখানেও বা জল পড়ছে সেও প্রায় পাথরের গায়েই শুষে যাবার

অপটুকুই সংগ্রহ করে খেতে হয়। তাইত দেখছি ছুটো পাথরের মাঝখানে গাছের একটা পাতা ছুকিয়ে দিয়ে সেই ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়া জল ধরবার চেষ্টা। না করেই বা কি করে? জল না খেয়ে তো এ পথে হাঁটা যায় না। আর সঙ্গে জলই বা নেওয়া যায় কত? বুক বুক সব চড়াই। পথের মধ্যেই সে জল নিঃশেষ হয়ে যায়। তাছাড়া সব যাত্রীই তো আর সঙ্গে জল নিতে পারে না!

কেদারনাথ গিরিশৃঙ্গ

জল ফুটিয়ে ওয়াটার-বটলে নেবার কথা বলে দিয়েছিলেন আমাদের সকলেই। মিনিট দশেক পরে খেও। জলে যে 'মাইক্রা'র কণা থাকে তাহলে তা বিতিয়ে যেতে পারবে। ওই 'মাইক্রা' থেকেই তো হয় হিল ডিসেন্ট্রি। কিন্তু গরম করা জল মুখে রুচে না, একরকম গন্ধ হয়। আর বিতোনো? যতক্ষণ ওয়াটার বটলের জল যাই ততক্ষণই যা বিতোনো। তারপর আর সে সময় কই। জল দেখলেই হল। কপ্‌পুরকে দেখছি ঝরণা দেখলেই মাল নামিয়ে, ঘর্মাক্ত দেহেই চোঁ-চোঁ করে জল টানে। ব্রহ্ম বলে, দেখেছ ওর কাণ্ডটা। অসুখে যদি না পড়ে যায়।

অথচ আমরাও কি খাচ্ছিনে? খাচ্ছি। কপ্‌পুরকে সে কথা বললে ও যা বলত আমরাও তাই বলতাম। বলতাম এখন ওনিয়ে মাথা ঘামিও না। ডিসেন্ট্রি যদি হবার হয়ত হবেই। আপাতত গলাটা তো একটু ভিজুক।

কিন্তু বিকেলে ব্রহ্ম বাচ্ছি বলে সেই যে বেরিয়ে গেল, অনেকখানি ছুটে এসেও তাকে আর দেখতে পাই না। ছুলীকে রওয়ানা করতেই যা একটু দেরী হয়েছিল। কিন্তু অন্য দিনও এমন হয় না। খানিক গিয়েই তাকে ধরে ফেলি। তবে কি শেষে ও পথ ভুল করল—কিন্তু তাই কি আর সম্ভব। এই তো একটি পথ—যে পথে এসেছে সে পথে আর সে ফিরে যাবে না। কিন্তু তাহলে কোথায় সে আরো জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যাই। জোরে জোরে নাম ধরে ডাকি, কিন্তু কোথা হতেও যদি কোনো সাড়া আসে। তারাদত্তও চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসে তবে সেদিন ধরতে পেরেছিলাম ব্রহ্মকে। দেখি সে হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে। বলি, আজ কি হল? আবার অমন ছুট কেন? তা ভাবিয়ে দিয়েছিলে আমাদের।

ব্রহ্ম আমার দিকে ঘুরে বলে, ছুটব না পেছনে যাব। তারপর তারাদত্তকে বুঝিয়ে বলে, সে জানতো শের। পেছনদে বপাংসে শের আয়া ঔর হম্ ভাগা।

বাঘই হোক আর শেরই হোক প্রথমটা বুঝতে পারি নি বস্তুটা কি! শেষে হো হো করে হেসে উঠি। শের বটে। প্রভুদয়ালের স্ত্রী মেয়েমানুষ হয়েও যে সকালে তাকে পেছনে ফেলে এসেছেন সেটা ওর বড় বেজেছে

ভাই ও ওমন মরিয়া হয়ে ছুটছে।

কিন্তু অত ছুটেও ব্রহ্ম শেষ রক্ষা করতে পারলে না। ম ঘন ঘন করে প্রায় আমাদের পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল।

কিন্তু এদিককার পথ যা দেখছি সে অপূর্ব। বড় গাছের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, ছোট ছোট গাছই বা কম! কত রকমের ফুল! একটি গাছ দেখলাম যেন হাজার সাপ ফণা তুলছে—এই ছোবলে দেবে। গোখরো সব মাথায় যেমন চিত্তির থাকে গাছের মাথায়ও তেমনি চিত্তির। তারি আবার কত রকম ভ্যারাইটী। পাতাবাহারই বা কত! এসব পাতাবাহারের কিছু দেখেছি কলকাতায়। কি অসম্ভব মূল্যেই না বিক্রী হয় সেখানে। কিন্তু এখানে সেসব হেলায়-ফেলায় ছড়ানো।

জল বেঁধে লতাপাতা কাটছিল পাহাড়ী মেয়েরা যখন ফিরে। আমি ভেবেছিলাম গাই-বাছুর কি মোষ, তা নয়, এইসব লতাপাতা বুড়িতে ভরে পিঠে করে

[illegible] যায় সেখানে গাছপালা নেই। গাই বাছুরের জন্যে ঘাস পাতাও দরকার সকলেরই, তাই চড়া দামে বিক্রী হয়ে যায়।

হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ি সার সার তুষারশৃঙ্গ দেখে। ব্রহ্মকে ডাক দিয়ে বলি, দেখ! দেখ! কি অপরূপ! দীর্ঘ সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে কি সুন্দরই না দেখায় আকাশের নীল ছোঁয়া সেই তুষার শ্রেণী। মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

এবেলা ইচ্ছে ছিল পাণ্ডয়ানায় যাবার। কিন্তু বেলাকে এসেই থেমে যাই। শেষের দিকে আকাশে যেমন মেঘ জমতে শুরু করেছিল, তাতে আর এগিয়ে যাবার সাহস হয় না। যদি বৃষ্টি নামে, যদি সন্ধ্যার আগে পৌঁছুতে না পারি পাণ্ডয়ানায়।

সুধাংশু ঠিকই বলেছিলেন, বেলাকে গিয়ে দেখবেন পাহাড়ের গায়ে চাষ মাঠ। মাঠও নয়, কাশ্মীরি গালিচা। বলেছিলেন, ইচ্ছে করে আপনাদের সঙ্গে আবার চলে যাই।

কাশ্মীরি গালিচাই বটে! ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটেছে—ছোট ছোট ফুল। সাদা, বেগুনী, হলদে, নীল আর

মানুষ এগুচ্ছে। সভ্যতা এগুচ্ছে।
সভ্যতার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে
বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ চাই-ই।

—: তার জন্য খোঁজ করুন :—
রেডিও টেক্‌নিকস্
এইচ্-এম-ভি ও কলোম্বিয়ার
অনুমোদিত প্রতিনিধি
৬৪ ঘ, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, কলি-৪
ফোন : ৪৫-৪৮৩১

সকল রকমের সুন্দর ও মজবুত
বই এবং লেজার বাঁধাইয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকৃষ্ণ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯০, শোভাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫।

কুসুমী ! কাশ্মীরের জাফ্রান-খেতই বা এর কাছে কোথায় লাগে ! এত উঁচুতে মাঠ আর ফুল।

বেলাকে হতেও দেখা যায় সেই তুষারশ্রেণী। শেষ সূর্যের আলো কেমন যেন রঙ বুলিয়ে দিয়েছে তুলির টানে। চটি হতে বেরিয়ে এসে তাই সেই দিকে চেয়ে থাকি।

পথের দুপাশে দু-সার চটি ও দোকান—মাঝখানে পথ। বাঁদিকের একটা দোকানে উঠেছি আমরা। এই ধরণের খোলা চটিতে এই আমাদের প্রথম রাত্রিবাস। আমাদের থাকতে দেখে প্রভুদয়ালরাও আবার থেকে যান। একই চটিতে উঠি আমরা। মাঝখানে একটু পথ রেখে পাশাপাশি কম্বল পাতি। মাথার দিকে একসার চুল্লী ওই চুল্লীতেই রান্না হবে।

শুয়ে শুয়ে চালের ফাঁক দিয়ে রাতের তারা দেখি আর আকাশ। খোলা অংশ দিয়েও দেখা যায়। সেই দিকেই মাথা করে শুয়ে আছি। ঘুম আর হয়নি। মেঘও গেছে কেটে। একটু শীত শীত করে যেন। একেবারে কোথায় দিকে আছি আমি। হঠাৎ একটা ধর ধর শব্দে চমকে উঠি। লণ্ঠনের আলোটা উঁচু করে ধরি। ওদিক হতে আশ্বাস দেয় দোকানী। ও কিছু নয়। ওদিকে আমার গাই মোষ আছে।

তবু ভালো। আমার পাশেই পড়েছিল একগাদা লতাপাতা। ভেবেছিলাম সাপটাপ। তা নয়। ভালো করে দেখতেই দেখতে পাই ওধারে গাই মোষ বাঁধা।

এই বেলাক।

অথচ এই বেলাক হতেই নাকি অমর সিং মেরেছিলেন এক সঙ্গে বারোটা কি তেরোটা বীজ ধানে ভালুক।

অমর সিং-এর কথা পরে বলব।

বেলাক হতে বেরিয়ে ব্রহ্ম বলে, আজ চলে যাব এ-বেলায় বুদ্ধকেদার—পাঙরানায় আর থামা নয়।

প্রভুদয়ালরাও তাই যাবেন বললেন। সেখানেই একেবারে বিশ্রাম নেবেন।

বেলাক হতে পাঙরানা পাঁচ মাইল। আর উৎরাই। তারপর অংলা চটি হয়ে ঝল্লায়। ঝল্লায় যখন এলাম তখন বেলা দশটা।

অংলা চটি নামেও যা কাজেও তাই। ঘোর জঙ্গল। মাঝে মাঝে তো এত ঘোর যে সূর্যের আলো এসে পড়ে কিনা সন্দেহ।

রোজকারমতো আজও এগিয়ে গিয়েছিলাম একা একা। আশেপাশে জন-মানুষের বসতি নেই, না কাছাকাছি কোনো যাত্রী। বনের মধ্যে তাই কেমন যেন একটু ভয় ভয়ই করে। এই নিবিড় পত্র-পল্লবের মধ্যে হতে হঠাৎ যদি একটা ভাল্লুকই বেরিয়ে আসে—একখানেত একটা বিট্-কেলে গন্ধ মতো এসে নাকে লাগছিল। কিন্তু ফেরে যাবার উপায়ে নেই। ওরা কত পেছনে আছে কে জানে ! আর কিই বা হবে ফেরে। তাই যেমন হাঁটছিলাম তেমনি হেঁটে এগিয়ে যাই। তারপর ঝল্লায় গিয়েই থামি।

ঝল্লার চটি পথ হতে একটু নীচে নেমে। কিন্তু যখন ঝল্লায় থাকছিনে তখন ঝল্লায় আর নেমে যাই না। একটা পাথরের ওপর উঠে বসি গাছের ছায়ায়।

পাথরের গা দিয়ে কিছুটি গাছ। বসবার সময়েই লক্ষ্য করেছি তবু কোন ফাঁকে যে একটুখানি লেগে গেল গায়ে। সেও আবার আমার ওপর দিয়ে। কিন্তু ওইতেই দেখি কেমন চিন চিন করতে লাগল জায়গাটা।

আসবার সময় বন-বিছুটি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন বিশ্বাদত্ত। আরো বলে দিয়েছিলেন, অচেনা গাছে যেন হাত না দিই কি অচেনা ফুলের গন্ধ না শুঁকি। অনেক সময়ই নাকি তা হয়ে যায় মারাত্মক। এক এক ফুলের তো এমন 'কড়া' বাস যে গন্ধ নাকে গেলে মাতাল হয়ে যেতে হয়—তারপর জ্ঞান ফিরে পেতে বিশ বাইশ ঘণ্টা।

[ক্রমশঃ

সোল অব লিলিথ

মেরী করেলী

॥ ১ ॥

লণ্ডনের একটি থিয়েটারের সমস্ত আসনগুলি ভরে গিয়েছিল। সারা রঙ্গালয় লোকে-লোকারণ্য!

সেটা বিখ্যাত 'হ্যামলেট' নাটকখানির নবপর্যায়ের অভিনয়ের প্রথম রজনী।

একজন দর্শক নিঃশব্দে এসে স্টলের দ্বিতীয় সারির একটি খালি চেয়ার দখল ক'রে বসে পড়ল। সেই মৃদু শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে, জন কতক দর্শক মুখ ফিরিয়ে আগন্তুককে দেখতে চাইল, কিন্তু আলো স্তিমিত থাকায়, আগন্তুককে, ভাল ক'রে দেখা গেল না।

ক্রমে সে অঙ্ক শেষ হওয়ায় যবনিকা পড়ল। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল, আর সেই সঙ্গে ঐকতানে বাদন আরম্ভ হ'ল

এইবার অনেকেই মুখ ফিরিয়ে, নবাগতের দিকে চাইলেন। নবাগত, সত্যিই দেখবার মত মানুষ। তাঁর গোঁফ, ভ্রূ, চোখের পাতা নিশ কালো, কিন্তু মাথার চুল-গুলি, সদ্যপড়া বরফের মতই মতই ধবধবে সাদা। গায়ের রঙ, সাদা না হলেও, মুখশ্রী অপূর্ব সুন্দর। আর স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে দেহটি তাঁর ঝলমল করছিল,—এক-বার তাঁর দিকে চোখ পড়লে, দৃষ্টি আর সহজে ফেরান যায় না।

দর্শকদের মধ্যে, এক আমেরিকান তরুণী, আলো জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই, একাগ্র দৃষ্টিতে এই আগন্তুকের দিকে চেয়েছিল। পাশ থেকে তার মা, চাপাগলায় মেয়েকে বার বার এরকম অসভ্যের মত চেয়ে থাকতে মানা কর-ছিলেন; কিন্তু যুবতী তা গ্রাহ্যই করছিল না। মনে হচ্ছিল, আগন্তুকের মুখ-চুম্বকে যেন তার চোখ দুটো আটকে গিয়েছিল। ফেরাবার শক্তিই নেই। এই সময় মুখ তুলে আগন্তুক একলহমার জন্যে, পূর্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চাইতেই, তার সেই একাগ্র দৃষ্টি, যেন রূঢ়-আঘাত পেয়ে, আগন্তুকের দিক থেকে ছিটকে, দূরে সরে গেল! ...বাপরে। কি ভীষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। মেয়েটি জীবনে কখনও এমন তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখেনি কোন চোখে। এক লহমার দৃষ্টিতেই তার সারা দেহ শিউরে উঠল।

তৎক্ষণে অভিনয় আবার আরম্ভ হ'য়েগেছে। আগন্তুক একমনে অভিনয় দেখছিল, এমন সময়, তার পেছনের সারির এক যুবক ঝুঁকে পড়ে আগন্তুকের গায়ে হাত রেখে, মৃদুস্বরে বললে—"একি? এলরামি, তুমি?—কি আশ্চর্য! তুমি এসেছ থিয়েটার দেখতে? এমন অসার জিনিসেও তা হ'লে তুমি কতকটা সময় নষ্ট কর? —আশ্চর্য ত'!"

সহাস্য মুখে উঠে আগন্তুক করমর্দন ক'রে, তেমনি চাপা স্বরে বললে—"হ্যামলেটকে কি ঠিক অসার বলা চলে ভগান?"

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি এম্পায়ারে নৃত্য-নাট্য দেখতেই যাচ্ছিলুম, কিন্তু ক্লাবে এক বন্ধু জোর করেই এই প্রথম-অভিনয়-রজনীর টিকিটখানা গছিয়ে দিলে। কাজেই..."

"কাজেই অদৃষ্টের হাতের পুতুলের মতই তুমিও মুড় মুড় ক'রে এখানে এলে। অদৃষ্ট, তোমাকে দিয়ে তার মৎলব হাসিল করতেই তিড়িয়ে এনেছে এখানে। চেয়ে, দেখ, সামনের ঐ চেয়ারে বসা মেয়েটিকে,—ভাল ক'রে চিনে রাখ ঐ হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী।" —বলে, এলরামি সেই আমেরিকান তরুণীটিকে দেখিয়ে দিলে ভগানকে। তারপর আবার বললে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ যে গোলাপী পোশাক পরা তরুণী, ওরই কথা বলছি তোমায়! তুমি হয়ত বলবে—ওর সঙ্গে তোমার পরিচয়ই নেই—তা বিয়ে! কিন্তু জেনে রাখো, আজই রাত্রে, পরিচয় পর্ব শেষ হবে। ক্রোড়পতি জেবেজ চেস্টারের একমাত্র সন্তান উনি। আর, একমাসের মধ্যেই তুমি ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে। তোমার আশা পূর্ণও হবে জেনো। তোমাদের বিয়ে হ'লে খাসা মানাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত দেনাও শোধ হয়ে যাবে।"

অতি বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে ভগান এতক্ষণ এলরামির কথা শুনছিল, এবার সে থামলে, বল্লে—"এ তোমার অতি বাড়াবাড়ি এলরামি। এই কি তোমার ভবিষ্যৎ-বাণী নাকি?"

"কিন্তু তুমি এর মধ্যে চলে যাচ্ছ যে?"

"হ্যাঁ আমি ইচ্ছে করেই চলে যাচ্ছি—যাতে আজ রাতে অন্তত, কুমারী চেস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার কোন সুযোগ না ঘটে। তা হ'লে, অন্তত:, আজকের জন্যেও প্রমাণ হবে, যে তোমার সব ভবিষ্যৎ-বাণীই সত্যি নয়,—কোন কোন ক্ষেত্রে তা মিথ্যেও হয়।"—বলে ভগান হেসে উঠল।

এলরামি সেকথার কোন জবাব দিলে না। দুজনে বারান্দায় এসে, নিজের নিজের, কোট আর টুপী নিতে গিয়ে দেখলে, জিম্মাদার সেখানে নেই। কাজেই বাধ্য হ'য়ে, দুজনকেই জিম্মাদারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

অল্পক্ষণ পরেই জিম্মাদারকে ফিরে আসতে দেখে এলরামি, ভগানকে বললে,—"ঐ যে মুরুব্বি ফিরে আসছেন! নাও, তাড়াতাড়ি কোট আর টুপী নিয়ে সরে পড়ি চল।—তা না হলে হয়ত অদৃষ্টের লিখন এড়াতে পারবে না।"—বলতে বলতে পেছন দিকে চেয়ে, এলরামির চোখ দুটো হঠাৎ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। তার সেই উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে, কোট পরতে পরতে ভগান বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়, আনন্দ-মুখর স্বরে পেছন থেকে কেউ বলে উঠল,—"এই যে ফ্রেডি ভগান! তোমাকেই আমি মনে মনে চাইছিলুম এতক্ষণ!"

ভগান বক্তার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলে, একজন যুবক, আর তার পেছনে দুজন ভদ্রমহিলা, জিম্মাদারের কাছ থেকে তাঁদের সজ্জিত টুপী আর জামা নিতে আসছেন। ভগান দেখলে, বক্তা তার খুড়তুতো ভাই লর্ড মেলবর্প, আর তাঁর সঙ্গিনীদের মধ্যে একজন কুমারী চেস্টার। অপর ভদ্রমহিলাকে তার পরিচিত বলে মনে হল না।

অগ্রসর হয়ে, ভগানকে বললেন,—"সমাসের বল নাচে যাবার জন্যে আমরা হ্যামলেটের জন-জমাট অভিনয় দেখতে দেখতে উঠে এলুম।...হাঁ, এঁদের সঙ্গে আগে তোমার পরিচয় করিয়ে দি,—এই ইনি মিসেস জেবেজ চেস্টার, আমেরিকার কোটীপতির ঘরণী, আর ইনি ওঁরই একমাত্র সন্তান—কুমারী ইডিনা চেস্টার।" তারপর মহিলাদের দিকে ফিরে, তিনি বললেন—"আর ইনি হচ্ছেন, সার ফ্রেডরিক ভগান, আমার আড়তুতো ভাই।"

ভগানের খুড়তুতো ভাই, লর্ড মেলবর্প, এইভাবে ভগানের সঙ্গে ভদ্র মহিলাদের পরিচয় করিয়ে দিলে, ভগান এই কথা ভেবে, এক মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, যে এলরামির ভবিষ্যৎবাণী তা হলে সত্যিসত্যিই ফলে গেল। পরক্ষণে আত্মসম্বরণ করে সে মহিলাদের সঙ্গে যথারীতি শিষ্টাচার বিনিময় করলে।

লর্ড মেলবর্পের কাছে, ভগান নানাভাবে উপকৃত ছিল। কাজেই তিনি যখন এইভাবে মহিলাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন, তখন সে সেজন্য বিন্দুমাত্রও অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারলে না। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর, পেছন ফিরে, এলরামিকে খুঁজতে গিয়ে ভগান, দেখে, ইতিমধ্যে তাকে কোন কথা না বলেই এলরামি কখন সেখান থেকে চলে গেছে।

তরুণী চেস্টার মৃদু হেসে ভগানকে প্রশ্ন করলে—"এইমাত্র যে লোকটি চলে গেলেন, কে তিনি? দেখলে তাঁকে বেশ ভয় করে—নয় কি?"

ভগান একটু ইতস্তত: করে বললে—"হ্যাঁ, ভদ্রলোক বেশ একটু অদ্ভুত ধরণের..."

বাধা দিয়ে লর্ড মেলবর্প বললেন—"কার কথা বলছ?—এলরামি বুঝি?...হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, আমরা যখন আসছিলুম, এলরামিই তখন তোমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বটে! কিন্তু এভাবে চুপচাপ সে সরে পড়ল কেন?...থাকলে ভারী খুশী হতুম।"

তরুণী চেস্টার বললে—"কিন্তু কে তিনি? তোমরা দুজনেই দেখছি বেশ মজার লোক। ভদ্রলোকের পরিচয় কি তা কেউই বলছ না। —কি নাম যেন?...এলরামি?

প্রাচ্য দেশের লোক নিশ্চয়ই ?"

লর্ড মেলথর্প বললেন—"হ্যাঁ, পাঁটি প্রাচ্য ;—আর এক অতি প্রাচীন প্রাচ্যবংশের বংশধর। যখন প্রথমে এখানে এলো,—কেনই যে এলো, তা কেউই জানে না, তা, তখন থেকে বোধহয়, মোটমাট দু-তিন বারের বেশী আমার সংসে দেখা হয়নি। সামাজিক সভায় কিন্তু অনেককেই ও বিভ্রান্ত আর মুগ্ধ করেছে দেখেছি। আমার স্ত্রীইত বলেন, লোকটি নাকি অপূর্ব! এলরামির তিনি প্রকাণ্ড গুণমুগ্ধ। সেই জন্যে, বাড়ীতে কোন কিছুর অনুষ্ঠান হলেই, এলরামিকে তিনি নেমন্তন্নের কার্ড পাঠান, কিন্তু এলরামি খুব কচিত-কখন আসে।"

তরুণী চেস্টার বললেন—"কিন্তু কি করেন তিনি ? —সংসার চালান কি করে ?"

"তা আমিও জানি না। আমার মনে হয় লোকটি যাদুকর।"

মিসেস চেস্টার ততক্ষণে আরাম করে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসেছিলেন। এইবার তিনি প্রশ্ন করলেন—"লোকের বাড়ী বাড়ী, ম্যাজিক-ট্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায় বোধহয় ?"

সহাস্যে লর্ড মেলথর্প বললেন—"না, না, সে রকম কিছুই সে করে না। কথাটা আমিই ঠিক করে বোঝাতে পারিনি আপনাদের। ও সাধারণ লোকের জীবনের অতীত আর ভবিষ্যৎকালের অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা বলে দিতে পারে।"

তরুণী চেস্টার সহাস্যে বললে—"ওঃ! হাত দেখেত ? আমিও হাত দেখে লোকের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের ফিরিস্তি দিতে পারি।"

সহাস্যে লর্ড মেলথর্প বললেন—"এলরামি কিন্তু লোকের হাত-টাত দেখে না—দেখে তার মুখ, দেহের গড়ন, আর তার চাল-চলন। এর জন্যে সে কারো কাছ থেকে কোন পয়সা কড়িও নেয় না। কিন্তু যা বলে, সবই সুন্দর মিলে যায় তার।"

ভগান এতক্ষণ কি যেন ভাবছিল। মেলথর্পের শেষ কথাটা কানে যেতে, যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে—"সত্যিই তাই। তাছাড়া দু-একটা ভবিষ্যৎ-বাণী তার অতি অদ্ভুত।"

কুমারী চেস্টার ভগানের দিক থেকে চোখ নাবিয়ে নিয়ে হাতের দস্তানার বোতাম আঁটতে আঁটতে বললে —"তোমাদের কথা শুনে ভারী লোভ হচ্ছে। আমার অদৃষ্টে কি আছে একবার জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারলে, ভারী খুশী হতাম। নিশ্চয়ই অনেক সুখ-দুর্দশা আছে বরাতে আমার!···ভদ্রলোকের চোখ দুটো কিন্তু বড় ভীষণ! সুন্দর চোখ, তাতে সন্দেহ নেই কিছু, কিন্তু কি অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাতে।

লর্ড মেলথর্প সহাস্য মুখে ভগানকে বললেন—"তা হলে ফ্রেডী, তুমি আমাদের সংগে নাচের মজলিসে যাচ্ছ ? আজ তুমি এত অন্যমনস্ক হয়েছ যে নাচের মজলিসে তোমার যাবার জন্যে আমি প্রথমেই যে অনুরোধ করেছিলুম, এখনও অবধি সে বিষয়ে হ্যাঁ কি না, কিছুই বলনি।"

লজ্জিতভাবে ভগান বললে—"তাই নাকি ? আমায় মাপ কর ভাই! সত্যিই আজ এলরামির অপার্থিব প্রভাবে মনটা আমার চঞ্চল হয়ে রয়েছে।"

ভগানের কথা শুনে লর্ড মেলথর্প হেসে উঠে বললেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।"

তারপর সকলে মোটরে উঠে বসলে গাড়ীখানি পূর্ণ-বেগে সোমার্সের নাচ ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল।

ইতিমধ্যে, ভগানের চিত্ত-চাঞ্চল্যের নায়ক, এলরামি বা এলরামি আরাবোস দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুতপদে বাড়ী ফিরছিল। তার তখন মনে হচ্ছিল, এইমাত্র যে ভবিষ্যৎ-বাণী করে সে ভগানকে বিস্ময়ে নির্বাক করে দিয়ে এলো —তা করা কত সহজ! দুদিন আগে লর্ড মেলথর্পের কাছেই সে শুনেছিল, নিউইয়র্কের কোটিপতি জেবেজ চেস্টারের একমাত্র মেয়ে, তরুণী চেস্টারের সংগে ভগানের বিয়ের ব্যবস্থা করে ভগানকে ঋণজাল থেকে মুক্ত করবার মতলব আঁটছে সে মনে মনে। তারপরই এলরামি তরুণীকে মেলথর্পের সামাজিক সভায় আসতে দেখলে—এক দৃষ্টিতেই সে তরুণীর রকম-সকম বুঝে নিলে। তাই আজ রাত্রে সে যখন তরুণী চেস্টারকে দেখলে, আর তার অল্পদূরেই মেলথর্প, এদিকে তার দুতিন সারি পেছনের আসনে ভগান বসে, তখন এ ভবিষ্যৎবাণী করা তার পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য হয়নি। শুধু, সামান্য মাত্র সন্দেহ ছিল, আজ রাত্রেই তরুণীর সংগে ভগানের

পরিচয় হওয়া নিয়ে, কিন্তু নিয়তি তার চোখের সামনেই সে সন্দেহ দূর করে দিয়েছেন।

হাইডপার্কের কাছে এসে এলরামি দাঁড়িয়ে পড়ে পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সময় দেখলে—রাত বারোটা। হঠাৎ এই সময়ে কেউ পেছন থেকে সজোরে তার ঘাড়ে আঘাত করে, হাত থেকে ঘড়িটা তার ছিনিয়ে নিলে। পরক্ষণেই চোর যাতনায় অব্যক্ত চীৎকার করে, স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে এলরামি একবার চোরটির আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে বললে—"একাজ কেন করলে মুকব্বি?"

লোকটা তখন তার প্রসারিত হাতের মুঠোর মধ্যে ঘড়িটা ধরে, থরথর করে কাঁপছিল। পালাবার তার তখন শক্তি ছিল না। তার মুঠো থেকে ঘড়িটা উদ্ধার করে, এলরামি সেটা নিজের পকেটে রেখে দিলে, তার পর বেশ ধীরেসুস্থে বললে—"এ ঘড়িটা নিয়ে মোটেই শান্তি পেতে না বন্ধু!"

ততক্ষণে চোরের প্রসারিত হাতখানা অসাড় হয়ে পাশে ঝুলে পড়েছে। দেখে অল্প হেসে এলরামি বললে "সামান্য বিদ্যুতের ধাক্কা লেগেছে তোমার, ওর জন্যে কিছু ভেবো না।" বলে এলরামি তার বাড়ী যাবার পথ ধরে চলে গেল।

ততক্ষণে চোর অনেকটা সুস্থ হয়েছিল। ঘুসি বাগিয়ে ছুটে সে এলরামির কাছে গিয়ে বললে—"তোমায় সাবাড় করে দিলেই ভাল হত।"

হেসে এলরামি দাঁড়িয়ে পড়লো। একবার চোরের দিকে চেয়ে বললে—"আর একবার না হয় চেষ্টা করেই দেখ না, আপশোস থাকে কেন মনে?"

এলরামির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই লোকটা কিন্তু এমনি ঘাবড়ে গেল যে, তার কোন কথা না বুঝেই, প্রাণ-পণে দৌড়ে সেখান থেকে ছুটে পালাল।

এলরামি আবার হেসে উঠল। মনে মনে বললে—"বোকা,—বোকা—সবাই একবার থেকে। আমি নিজেও তা থেকে বাদ পড়িনি। নিয়তি আমাকেও বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন,…কিন্তু আমি ছাড়বো না। নিয়তির গুহ্য রহস্য বার করতে না পারা অবধি আমার সোয়াস্তি নেই।… একবার যদি তা বের করতে পারি, তখন আমারই নির্দেশে নিয়তি চলবেন, তাঁর নির্দেশে আমি নয়।"

॥ ৩ ॥

বাড়ীর দোরগড়ায় পৌঁছে পকেট থেকে চাবি বার করে এলরামি বাড়ীর ভেতরে ঢুকে, ভেতর থেকে দোরে খিল বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলে। তারপর সোজা বারান্দায় গিয়ে উঠল। সেখানে, একটা মৃদুশক্তি লাল বিদ্যুতের আলো জ্বলছিল। সেই মৃদু আলোয় টুপী আর ওভারকোট খুলে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালার পর দেখা গেল, ঘরখানি অপ্রশস্ত, খান কতক সাধারণ চেয়ার, আর তার চেয়েও সাধারণ একটি টেবিল ছাড়া একখানি মাত্র উজ্জ্বল রেশমী গদিআঁটা দামী মেহগিনীর চেয়ার, টেবিলের কাছে রাখা আছে। সেইটিই একমাত্র মৌখিন জিনিস ঘরের মধ্যে।

কিছু দূরে পাশের ঘরে ঢোকবার দোর, কিন্তু তার ওপর উজ্জ্বল রেশমের মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা সেটি। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে আত্মরক্ষার উপযোগী কটা মামুলী অস্ত্রশস্ত্র সাজান, অপর দিকে বই ভর্তি একটা সাধারণ আলমারী, আর তার কাছেই চওড়া বেঞ্চির মত একটি সোফার তক্তপোস। টেবিলের ওপর একটি বড় গোলক, গোটাকতক জ্যামিতির উপযোগী যন্ত্রপাতি আর রাশিখানেক সদ্য আসা ডাকের চিঠি।

দামী মেহগিনী চেয়ারটায় বসে, এলরামি একবার চিঠিগুলো এক নজরে দেখে নিয়ে ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে অন্যমনস্ক ঘরে বললে—"থাক, পরে দেখলেই চলবে এসব।"

এইবার দুই করতলে মাথা রেখে, কি যেন সে ভাবতে লাগল। চোখে তখন তার যেন আগুনের ছটা বেরুচ্ছিল। এইভাবে প্রায় মিনিটখানেক কাটবার পরই পাশের ঘরের দোরের ওপরের পরদা সরিয়ে একটি রাত্রের ঘুমের পোশাক পরা অতি সুন্দর তরুণ এসে তার সামনে দাঁড়াল। মুখ তুলে শান্তস্বরে এলরামি বললে—"আমার ডাক শুনতে পেয়েছ কিরাজ?"

মুমিষ্ট মৃদুস্বরে, যেন স্বপ্নে কথা বলার মতই তরুণ উত্তর দিলে—"মেঘের রাশির ভেতর থেকে, তোমার জানা

চেনা মধুর স্বর ভেসে এসে আমার কানে পৌঁছল। তাইতো আমি তোমার কাছে উঠে এলুম, তাড়াতাড়ি।—বলে বুকের ওপর হাত দুখানি বন্ধ করে সে স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে এলরামির দিকে চেয়ে, স্থির হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। এলরামি তরুণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে টেবিলের ওপর রাখা, কল-বেলটায় একটা ঘা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকল—"ফিরাজ"।

সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতই, ফিরাজ দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এলরামির দিকে এগিয়ে এসে বললে—"দাদা?···তুমি কখন ফিরলে? অনেকক্ষণ অবধি আমি তোমার জন্যে জেগে বসেছিলুম, তারপর কখন যে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা আর আমার মনে নেই।···তুমি আমায় ডাকলে কি করে? রোজ যেমন করে জাগাও তেমনি করেই বোধহয়? তোমার ডাক আমায় ঠিক জাগিয়ে দিয়েছেত! হ্যাঁ, তোমার ডাক আমি মরে গেলেও শুনতে পাবো ঠিক!"—বলতে বলতে সে এলরামির হাত দুটি গভীর শ্রদ্ধাভরে চুম্বন করলো।

হাত দুটি ছেড়ে দিয়ে আবার বললে—"সারা সন্ধ্যাটা তুমি বাইরে রইলে। এদিকে বাড়ীটা এমন নিরালা লাগছিল আমার, যে কি বলব!"

এলরামি ফিরোজের সুন্দর কোঁকড়ান গাঢ় কাল রঙের চুলগুলোর মধ্যে আদর করে আঙুল চালাতে চালাতে বললে—"কেন ফিরাজ? তোমার বাঁশী, তোমার পিয়ানো আর তার সংগে তোমার মিঠে সুরের গান,—এসব সংগী তো ছিল তোমার, তবে নিঃসঙ্গ বোধ করছিলে কেন আজ? আমি হ্যামলেট নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম।"

"ছিঃ! কেন গেলে? অমন সুন্দর নাট্য-কাব্য, মানুষের বলবার দোষে, কি বিশ্রীই না হয়ে যায়। তারচেয়ে, হ্যামলেট ঘরে বসে পড়—ঘটনাগুলো মনে মনে ভেবে কল্পনায় তা ফুটিয়ে তোল, তখন দেখবে নাটকের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে উঠে মনকে তোমার ভরপুর করে দেবে। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও নাট্যশালায় গিয়ে কোন দিন হ্যামলেটের অভিনয় দেখবো না।"

মৃদু হেসে এলরামি বললে—"তুমি ঠিক কবির মত কথাই বলেছ ফিরাজ! যাক, আমায় কিছু খেতে দাও, বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমার।"

এলরামির কথা শুনে তাড়াতাড়ি ফিরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মিনিট কয়েকের মধ্যেই এলরামির খাবার এনে সস্নেহ শ্রদ্ধায় তার সামনে রাখলে। তারপর একটি সুদৃশ্য ইতালীয় বোতল থেকে একটি গ্লাসে মদ ঢেলে তার খাবারের পাশে রেখে দিলে।

এলরামি স্নেহভরে তাকে জিজ্ঞেস করলে—"তোমার খাওয়া হয়ে গেছে ফিরাজ?"

হ্যাঁ, আমি আজ জারোবার সংগেই খেয়ে নিয়েছি। আজ কিন্তু মেজাজটা তার ভাল দেখলুম না। চুপচাপ খাওয়া সেরে যাবার সময় তোমায় বোলতে বলে গেল "নতুন কিছু বলবার নেই।"

মৃদু হেসে এলরামি বললে—"এরকমও সে করে না?"

"কে জানে? সন্ধ্যে থেকে অনেকে তোমার সংগে দেখা করতে এসেছিল—সবাই নামের কার্ড রেখে গেছে। দু-একজন আবার আমায় জিজ্ঞেস করলে, আমি তোমার কে? আমি বললুম, আমি তোমার চাকর। কথাটা কিন্তু কেউই বিশ্বাস করলে না। তাদের মধ্যে নামজাদা বড়লোকও দু-চারজন ছিলো। কী সুন্দর তাদের গাড়ী-গুলো। কি তেজী দামী ঘোড়াগুলো তার! কার্ডগুলো দেখেছ তুমি?"

"না। দেখবো পরে, তাড়া কি?"

"হুঁঃ। তুমি তাদের আমলই দাও না এলরামি! তা আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি। তাঁদের মধ্যে কিন্তু কত আর্ল, কত ডিউক আছেন—তাঁরাও নিজেদের তুচ্ছ মনে করেন না?" বলে ফিরাজ বালক-সুলভ সরল দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে চাইল।

এলরামি দেখলে, কুড়ি বছর বয়সের ভাইটি তার তখনও যেন স্বপ্ন-রাজ্যেই বিচরণ করছে। মৃদু হেসে সে বললে, "থাকগে যাক তাদের কথা। জারোবা আর কিছু বলেনিত?"

"না। খালি বলে গেল—'সব ঠিক আছে'। রোজই ঐ এক কথা তার কাছ থেকে শুনি। কি যে তার মানে, তা কিন্তু মোটেই বুঝে উঠতে পারি না। এমন কি তার জিম্মের রাখা আছে যার 'ঠিক' বা 'বেঠিক' এর কথা রোজ সে বলে যায়? কতদিন এ কথা তোমায়

জিগেস করেছি, কিন্তু কোনদিনই তুমি তার জবাব দাওনি।"—বলে কণ্ঠটা অভিমান ভরা কৌতূহলের দৃষ্টিতে সে এলরামির দিকে চেয়ে রইল—এর বেশী আর কিছু সে এলরামিকে বলতে সাহস করলে না।

এলরামি কিন্তু দেখেও তা দেখলে না। ফিরাজের প্রশ্ন এড়িয়ে সে বললে—"ওকথা থাক। তারচেয়ে বরং তোমার নিজের কথা বল। আজ আর তুমি তোমার স্বপ্নরাজ্যে যাওনি?"

হ্যাঁ, আর যখন তুমি আমায় ডাকলে, তখনও সেই খানেই ছিলুম আমি। দেখছিলুম—আমার ঘর, আমার বাগান, তাতে কত যে সব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। পাশেই তার পাকা ধান ভরা মাঠ একটা। লোকেরা গান গাইতে গাইতে সেই মাঠে ধান কাটছে।"

চেষ্টা করে এলরামি আত্ম-সম্বরণ করলে। পিয়ানোর কাছে গিয়ে সস্নেহে ফিরাজের হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে কোমল স্বরে বললে—"তোমার বিশ্রান্তি—তোমার বিশ্বাস মনে তোমার অটল হয়ে থাক, আর তাই নিয়ে তুমি সুখে থাক ভাই। তুমি স্বপ্ন দেখতে থাকো, আর আমি প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকি। দেখছি আমার অদৃষ্টই মন্দ! হয়ত তোমার স্বপ্নই সত্যি—আর আমার সংগ্রহ করা প্রমাণগুলো মিথ্যে। কে বলবে তাই কিনা?"

বিস্ময় ভরে ফিরাজ এলরামির দিকে চেয়ে রইল। মনে সে ভাবতে লাগল—জ্ঞান যদি মানুষকে এমন করে দুঃখই শুধু দেয়, তবে সেরকম জ্ঞানলাভ করবার দরকার কি?" তার চেয়ে বাস্তবকে ছেড়ে মানস-কল্পনাকে নিয়ে খুশী মনে জীবন কাটানইত ভাল।

অতঃপর ফিরাজকে ঘুমুতে বলে এলরামি দোতলায় উঠে একটি রুদ্ধ দোরের কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে ঘরের অধিবাসিনী কালো রঙের একটি বুড়ি—বুড়ি হলেও তার শরীরে কিন্তু বেশ সামর্থের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। বিরক্ত স্বরে ধীরে ধীরে সে বললে—"ভেতরে এসো এলরামি।

এলরামি বুড়ির কথার কোন উত্তর দিলেও কোন ফল হত না, কারণ আরোবা বুড়ি ছিল একেবারে বদ্ধ কালা। ছোট বড় কোন কথাই সে কানে নিতো না।

ঘরের মধ্যে একটি ছোট টেবিল, তার পাশে একটি মাত্র চেয়ার তারপরই ঘরের এক দেওয়াল থেকে অপর দেওয়াল অবধি; একটি দামী ভেলভেটের পর্দা টাঙান ছিল। পর্দাখানিতে সোনালী জরির নক্সার কারুকার্য ঝলমল করছিল। ছোট টেবিলের ওপর একটি স্লেট আর পেন্সিল রাখা ছিল। চেয়ারে বসে এলরামি স্লেটে লিখলে—"আজ কোন পরিবর্তন হয়েছে?"

স্লেটের উপর ঝুঁকে পড়ে আরোবা লেখাটা পড়ে জবাব দিলে—"না, কিছু না।"

"সে নড়েছিল একবারও?"

"না, একটা আঙুলও নাড়ায়নি আজ।"

এলরামি আবার লিখলে—আমার ধারণা ছিল, তোমার জিম্মের থাকে রাখা হয়েছে, তাকে তুমি স্নেহ কর।"

আরোবা লেখাটা পড়ে উদ্ধত স্বরে বললে—"স্নেহ কাকে করব···একটা মড়া—একটা ছবিকে, কেউকোনদিন স্নেহ করতে পারে নাকি?"

আর কিছু না লিখে, এলরামি স্লেট আর পেন্সিল টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। চোখে চোখে আরোবাকে একটা ইঙ্গিত করতেই, দেওয়ালে ঝোলান একটা সিল্কের দড়ি টেনে, সে পর্দা কতকটা খুলে ভেতরে ঢোকবার পথ করে দিলে।

পর্দার পেছনে এবার যে দৃশ্য দেখা গেল, অতি ধনী রাজা-রাজড়ার শোবার ঘরেও তেমন অতি মহার্ঘ শয্যা-সম্ভার দেখা যায় না। অতি সূক্ষ্ম রেশমের মশারী ছাদ থেকে মেঝে অবধি নেমে এসেছিল। তাতে সূক্ষ্ম সোনালী সাচ্চা-জরির কারুকার্য, অতি নিপুণ হাতে করা হয়েছিল। সেই মশারীর ভেতর সোনার সেতের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক আলো গোলাপী কাঁচের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ আলো দিচ্ছিল।

অতি কোমল ও দামী রেশমের কাপড়ের বিছানার সাজ-সজ্জার ওপর অতিন রেশের রাজকন্যার মতন একটি তরুণী, হাতির দাঁতের কাজ করা একটি সুদৃশ্য মেহগিনী কাঠের খাটের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

তাকে দেখলে মনে হয়, কবির স্বপ্নের ছবি মূর্তি ধরে বিছানায় শুয়ে আছে যেন, এমনি অপরূপ তার সৌন্দর্য! গায়ে তার তুষার-শুভ্র উৎকৃষ্ট রেশমের ঢিলা পোশাক, মুখখানি সুন্দর বাদামী রঙের, গায়ের রং দুধের মত ধবধবে সাদা, তার নীচে নীল রং-এর শিরা অঙ্গুলিয়ার ভেতর দিয়ে আগুনের মত একটা রক্ত স্রোত একটানা বয়ে যাচ্ছিল। আর এই কারণেই তার শরীর থেকে যেন একটা অলৌকিক সৌন্দর্যের আভা বেরুচ্ছিল।

এলরামি সেই খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। পেছনে তার জারোবা দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক এই সময় তরুণীর দেহটা যেন ঈষৎ নড়ে উঠল। সুন্দর তার ঠোঁট দুটিতেও একটা যেন মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

জারোবা তার স্বাভাবিক কর্কশ স্বরে বললে,—"তোমার কাছে ও আসে। প্রতিদিন, ওর দেহ যেন বড় হচ্ছে—আর সেই সঙ্গে দিনের পর দিন, ওর রূপও যেন বেড়ে উঠছে। কিন্তু এলরামি, ও ছোল সূর্য আর তুমি রক্তের চাই; মনে থাকে যেন, রক্ত সূর্যের তাপে একদিন না একদিন গলে যাবেই! তুমি,—অতি জ্ঞানী এলরামি,—তুমিও প্রকৃতির কাছে একদিন হেরে যাবেই-যাবে। আমার একথা তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়ো না।"

ধীরে ধীরে একটা হাত বরফানের ভঙ্গিতে তুলে এলরামি মৃদু স্বরে বললে—"বেচারী জারোবা!—স্বামী-পুত্রহারা নিঃসঙ্গ আত্মা! বাইরের কোন শব্দই তোমার কানে যায় না, কিন্তু আমার ইচ্ছা-শক্তিতে তোমার আত্মা আজ আমার কথা শুনতে পাবে। আজ তোমার প্রাণে অতীত দিনের সুখের স্মৃতি ভেসে উঠবে—ফিরে আসবে তোমার হারান যৌবন—মুছে যাওয়া সৌন্দর্য! ভুলে যাওয়া প্রেমের স্বপ্ন। মিশরের নরম পাম-পাদপের তলায়, তাঁবুর ভেতরে, তোমার বুকে মাথা রেখে,—ঐ দেখ তোমার দুর্দান্ত স্বামী ঘুমিয়ে রয়েছে……

"কি অদ্ভুত কল্পনা! ঘুমিয়ে স্বর্গ বা নরকের স্বপ্ন দেখবে,—অথচ কোনটা যে সত্যি, তাই জানে না কেউ!"

ভাবতে ভাবতে এলরামি ফিরে এসে ঘুমন্ত তরুণীর খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ডাকল—"লিলিথ! লিলিথ!—কথা বল লিলিথ! আমি যে তোমার কথা শোনবার জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি!"

॥ ৫ ॥

এবার এলরামি তরুণীর একখানি হাত, নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, সামনে তাকের ওপরে রাখা ঘড়িটির দিকে চেয়ে, এক থেকে একশ অবধি গুণতে গুণতে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর, নাড়ী টেপা শেষ করে, তরুণীর দুই ভ্রূর মাঝখানটা, সেই হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করলে। সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর সারা দেহের মধ্য দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল। পরক্ষণেই, ভ্রূর মাঝখান থেকে হাতটা তুলে নিয়ে, এলরামি মৃদুস্বরে ডাকলে—"লিলিথ! —কোথায় তুমি লিলিথ?"

তরুণীর সুন্দর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। মৃদু গানের মত সুরে সে উত্তর দিলে—"এই যে আমি।"

"লিলিথ, আজ কি কি দেখে এলে, আমায় বল। জায়গাটা কোথায়?—কি দেখলে সেখানে?"

"সে একটা নতুন গ্রহ—মানুষ এখনও তার অস্তিত্বের কথা জানতে পারে নি। দুনিয়ার সেরা দুনিয়া সেটা,—কত বড় বড় তার সাগর—কত নদ-নদী এসে সেই সাগরে মিশেছে। সেই সমুদ্রের ওপর এক বিচিত্র সহর দেখলুম। সহরে প্রাসাদ, অট্টালিকাগুলো সব যেন ঝলমল করছে। সোনা, রূপো, হীরে, মুক্তার ছড়াছড়ি সেখানে। কি সুন্দর সব পতাকা উড়ছে, সেইসব প্রাসাদ অট্টালিকার মাথায় মাথায়! লোকেরা সব হেসে-খেলে-নেচে বেড়াচ্ছে। আকাশে সেখানে দুজন সূর্য, সর্বক্ষণ আলো আর তাপ দিচ্ছে। সুন্দর, সুখী অধিবাসীরা তার, যান ভরা ক্ষেত, চিরস্থায়ী জীবন, আর স্রষ্টার অসীম করুণার জন্যে, প্রাণ ভরে তাঁর গুণগান করছে……"

"চিরস্থায়ী জীবন তাদের?…আমাদের মতন মরে যায় না তারা কোন দিন?"

এলরামির কথায় লিলিথের মুখের ওপর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে সে বললে—"মৃত্যু বলে কিছু নেই—এখানেও না, সেখানেও না।…কতদিন এ কথা ত' তোমায় বলেছি, তবু কিন্তু কিছুতেই তা তুমি

বিশ্বাস করছ না।...অবিশ্বাস কর সেই, বার বার আমায় বল মৃত্যুকে খুঁজে বার কর! ...আমিও তোমায় আদেশে, চেষ্টার কসুর করিনি,...কিন্তু, আজ অবধি মৃত্যু বলে কোন কিছু আমি খুঁজে পাইনি।"—বলতে বলতে তরুণী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লিলিথ আবার বললে,—"...তোমায় দেখতে, আমার বড্ড ইচ্ছে করে। কিন্তু কিছুতেই আমি তোমায় দেখতে পাই না!...কেন জান? তোমার, আর আমার মাঝখানে মেঘের মত কি যেন কতকগুলো ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সেই গুলোই দেখতে দেয় না আমায়, কে আমাকে আদেশ দিচ্ছে—যে আদেশ আমি না মেনে পারি না?—কে?...কে তুমি?"

লিলিথের কথা শেষ হ'লে এলরামি দৃঢ়স্বরে তাকে আদেশ দিলে—"চুপ কর। আমার কথা, তোমায় আমি বলতে বলিনি।...তোমার নিজের কথাই শুধু আমায় বল।...তুমি বলছ, মৃত্যু বলে, জগতে কোন কিছু নেই। ...কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হয়?"

"সত্যি কথাই বলেছি আমি।—মৃত্যু বলে কোন কিছুই নেই।"

"এ পৃথিবীতেও না?"

"না। কোথাও-ই না।"

"স্বপ্ন কন্যা! তোমার আত্মার চোখ কোথায় গেল?"—বলে আর একটু রূঢ় স্বরে এলরামি তাকে আবার আদেশ দিল,—"যাও—আবার খোঁজ।—ভাল ক'রে খুঁজে দেখে এস।...মৃত্যু না থাকলে, প্রকৃতি কেন সর্বদা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তৈরী হ'য়ে রয়েছে?"

তুমি বড় নিষ্ঠুর।...যা সত্যি নয়, তাই কি তুমি আমায় দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও?...কিন্তু মিথ্যে কথা যে আমি কোন মতেই বলতে পারি না গো।...যাকে তোমরা মৃত্যু বল—সেটা শুধু একটা বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।...এই বিবর্তনের পর, আত্মা 'মৃগব্যাধ' তারার (Dog star) পরপারে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেয়—তাকেই তোমরা মৃত্যু মনে কর।"

"বিশ্রাম নেয়?...কতদিন?...কেন?"

"যখন আত্মার কর্তব্য দারা হ'য়ে যায়,—কর্মফল ভোগের শেষ হয় তখন তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে—তাই, সেই সময় তারা বিশ্রাম নিতে যা[illegible]...তাদের সেই বিশ্রামের মধ্যেই, একটা পরিবর্তন হয়,—সেই পরিবর্তন..."

"সেই পরিবর্তনেরই নাম মৃত্যু?—তাই না?"

"না, না, সেই পরিবর্তনের নাম 'জীবন'।...এই জীবনের স্পন্দনই সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।"—বলে তরুণী নীরব হ'ল। মাথার পাশ থেকে হাতটা টেনে এনে আবার বুকের চুনীর ওপর সে হাতখানা রাখল।

এলরামি তার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে, কতকটা যেন বিদ্রূপ ভরেই বললে—"এগুলো, তোমার স্বপ্নের অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয় লিলিথ!"

তরুণী লিলিথ এ কথার কোন উত্তর দিলে না।

এলরামি তার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে, আবার ডাকলে,—"লিলিথ!—লিলিথ!"

না, কোন সাড়াই লিলিথের কাছ থেকে এলো না। তার ঘুমন্ত মুখের সৌন্দর্য, আর মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকখানির ওঠা নামাই কেবল তখন তার জীবনের নজীর দিয়ে যাচ্ছিল।

এলরামি নিজের হাতের মুঠো থেকে তার হাতখানি মুক্ত করে, তবে বুকের ওপর রেখে দিলে।

চুপ করে বসে বসে, তার মনে হ'তে লাগল,—"লিলিথের আত্মা চলে গেছে, এখান থেকে।...কি দৃঢ় স্বরে বলে গেল সে আমায়, যে পৃথিবীতে 'মৃত্যু' বলে কিছু নেই!...কিন্তু এ অসম্ভব! বরং আমার মনে হয়, এখানে 'জীবন' বলেই কিছু নেই।...কিন্তু এর কোনটা সত্যি?...আচ্ছা, এই যে কথাগুলো, লিলিথের আত্মার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, এ গুলো সত্যিই কি তার বহুদর্শীতার বিবরণ?...আমার নিজের ইচ্ছাশক্তি ত' তার মধ্যে আমার নিজের কথা,—নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস সংক্রামিত ক'রে, এই কথাগুলো বলাচ্ছে না? ...কিন্তু না, তা কি ক'রে হবে? আমি নিজে, কোনদিন যা দেখিনি, মনে মনে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি, সে সব কথা,—যে বিষয়ে আমার কোন কিছুই জানা নেই, এমন অনেক কথাও তো লিলিথের কাছ থেকে জেনেছি!...তবে?...তবে?..."

এলরামি আবার লিলিথের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললে,—

"লিলিথ। তোমার জীবনের ওপর আমার যে প্রভুত্ব আছে—আমার যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তুমি বাঁধা পড়েছ, সেই প্রভুত্ব—সেই শক্তির নামেই, আবার আমি তোমায় আদেশ দিচ্ছি—তুমি দুঃখের মূল খুঁজে বার কর···কই? ···লিলিথ!···লিলিথ! এখানে এস—আমরি ডাকের সাড়া দাও আমার কাছে এসে নতুন আদেশ নিয়ে যাও!···"

এলরামির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিলিথের সারাদেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। মুখ থেকে তার হাসির আভাসটুকু অবধি মুছে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরুণী ক্ষীণস্বরে বললে—"এই যে আমি এসেছি।"

"তোমার কাছে আমি কি জানতে চাই শোন!—ভাল করে মন দিয়ে শুনে যাও আমার কথা। আমি জানতে চাই—মানুষ কষ্ট পায় কেন?—নিরপরাধ শিশু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরে কেন? সৎ লোকেরাই বা এত কষ্ট পায় কেন? আর অসৎ লোকেরাই বা কেন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে, পৃথিবীর সকল সুখ উপভোগ করতে পায়?···কেন লোকে নৈরাশ্যে পাগল হ'য়ে, শেষ অবধি আত্মহত্যা করে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি নিতে বাধ্য হয়?···এত দুঃখ কষ্টই বা সারা পৃথিবী ছেয়ে আছে কেন?···লোকে বলে এক মহান ঈশ্বর—করুণাময় মহা শক্তিই নাকি আমাদের স্রষ্টা। তাঁর করুণার তো একমাত্র নিদর্শন দেখতে পাই, আমাদের সাজা দেবার জন্যে, ভীষণ নরকের সৃষ্টিতে!—একে কি করুণা বলে?···খুঁজে বার কর, এই নরক কোথায়?—কি তার সীমার পরিধি? ···শয়তান কে?···কোথায়ই বা থাকে সে?···যাও শুদ্ধাত্মা আমার আদেশমত সব দেখে শুনে এসো, যাতে জগতের মধ্যে আমি প্রকাশ করতে পারি, এমন নিখুঁত, অভ্রান্ত প্রমাণ আমি পেতে চাই।···আমার কথা শুনেছ ত' সব? ···যাও এবার—"বলে এলরামি তার হাতদুটি ছেড়ে দিলে।

লিলিথ তখন দুই কর যুক্ত করে, হাত দুটি একবার ওপরে তুললে। পরক্ষণেই সেই হাত দুটি তার বুকের ওপর নেতিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহের সৌন্দর্য যেন মলিন হয়ে গেল। ঠোঁট দুটি একবার ঈষৎ নড়ে উঠল, কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন কথা বেরুল না।

এতক্ষণ এলরামি তাকে লক্ষ্য করছিল। এইবার ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে—"কিছু বলছ লিলিথ?"

"না···কিছু না।···এখনকার মত বিদায়···" ধীরে ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে কথাগুলি বলে তরুণী নীরব হল।

তার দিকে চেয়ে, এলরামি বুকপকেট থেকে একটা শিশি বার করলে। তার থেকে, অল্প খানিকটা ঝক্‌ঝকে, মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধের ওষুধ বার করে সিরিঞ্জে ভরে, লিলিথের একটা হাতের মোটা শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্ট করে দিলে। এর ক'মিনিট পরেই, লিলিথের দেহে, তার পূর্বের সৌন্দর্য ফুটে উঠল। সানন্দে বসে এলরামি তার ওষধির ক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল।

গত ছ'বছর ধরে শুধু এই ওষুধ দিয়েই সে লিলিথের মৃত দেহটাকে সজীব করে রেখেছে। এরই গুণে কিশোরী লিলিথের দেহ বেড়ে ওঠে, ক্রমে এখন তাকে তরুণী করে তুলেছে। কিন্তু আরও কতদিন এলরামি তাকে এই ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, দেহকে পূর্ণ যৌবন দিতে পারবে কিনা, তা সে নিজেই জানত না। ওষুধটা সে নিজেই আবিষ্কার করেছিল।

এই যে দেহের বিবর্তন,—এটা ত' বয়সেরই লক্ষণ? —আর, মানুষের বয়স বাড়ার শেষ কথা—মৃত্যু!··· নাঃ! এ মৃত্যুরহস্য প্রাণ-পণ করেও সে বের করবে··· তাতে যদি তার নিজের জীবন আহুতি দিতে হয়, তাও স্বীকার! এ রহস্য আবিষ্কারের কাছে মরণও তুচ্ছ!

হঠাৎ তার খেয়াল হল—"একি ভাবছি আমি?··· এই ওষুধ আবিষ্কারের পরও মরব আমি?···নাকি, লিলিথের আত্মাই সত্যি কথা বলেছে,—মরণ নেই? ···ওঃ! সেও ত' ভীষণ। জীবনভোর শুধু ভেবেই যাব? ···অপূর্ণ কামনার তাড়নায় দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে খেটে বেঁচে থাকতে হবে?···চিরকাল?"

হঠাৎ দেওয়ালে টাঙান বড় আয়নাটার মধ্যে নিজের পূর্ণ অবয়বের দিকে চেয়ে সে থমকে দাঁড়াল। নিজের দিকে চেয়ে বলে উঠল—"একি ভাবছ তুমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক? এই একটা,—একমাত্র মৃত্যুরহস্য জেনেই কি তোমার সব জানার শেষ হবে?—তুষ্ট হতে পারবে? না—কিছুতেই না! তারপর—তারপর করে হাজার রকম সন্ধান পেলেও তোমার তৃপ্তি হবে না! আরও··· আরও···আরও, জানতে চাইবে।" —ভাবতে ভাবতে বিদ্রূপের মৃদু হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। আয়নার কাছ থেকে সরে, বেরিয়ে এসে, দড়ি টেনে সে মখমলের পরদা দিয়ে লিলিথের শয্যাঘরটা ঢেকে দিলে। তারপর ছোট টেবিলে রাখা স্লেটে লিখলে;—

'আরোবা—দুদিন আমি এ ঘরে আসব না। এই সময় বক্তটা পাশের ঘরের মধ্যে দিনের আলো আসতে দিও। কোন কথা কইবে না। লিলিথকে ছোঁবে না।'

'এলরামি'

কাজ সেরে নিচের ঘরে গিয়ে এলরামি নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমবার উদ্‌যোগ করলে।*

[ক্রমশঃ

---

* অনুবাদ করেছেন হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

● হিমানীশ গোস্বামী

যুদ্ধক্ষেত্র বলে মনে হতে পারে।

ভাঙা মাঠ। ছেঁচে-চুঙে দুমড়ে একাকার। উঁচু নিচু মাঠ। বিবর্ণ ঘাস, বিবর্ণ গাছ। ক্যাকটাস্ গাছের নানা শাখা-প্রশাখা বংশ বৃদ্ধি করছে। কোনদিন এখানে হাইড্রোজেন বোমা পড়েছিল কি? নিদেন পক্ষে পরমাণু বোমার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ? দেখে তাই মনে হয় বটে।

তাছাড়া আওয়াজ তো আছেই।

বিস্ফোরণের আওয়াজ। এখানে ওখানে, দূরে কাছে। কামানের গোলা এসে পড়ছে নাকি? যুদ্ধ কার সঙ্গে হচ্ছে? শত্রুপক্ষ কোথায়? যুদ্ধ হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ হচ্ছে। রাণীগঞ্জ থেকে যুদ্ধের শুরু ধরিয়াতে গিয়ে শেষ। বিরাট ক্ষেত্র। এদিক ওদিক ভারতবর্ষে আরো যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু এমন বড় যুদ্ধ নয়। স্টালিনগ্রাদ যদি হয় রাণীগঞ্জ ধরিয়া, তাহলে আসাম, দার্জিলিং সিকিম, বোম্বাই উড়িষ্যার সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে ব্রহ্মদীমান্ত যুদ্ধের।

যুদ্ধ রোজই চলছে। যুদ্ধ চলছে প্রকৃতির সঙ্গে।

আমরা অবশ্য আতিশয্যভাবে প্রকৃতিকে বিব্রত করা নারাজ, কারণ কোনরকম যুদ্ধেই আমাদের উৎসাহ নেই। বেঁচে থাকার যুদ্ধেও আমাদের সাড়া সা রব নেই, হুঙ্কার নেই। মৃত্যু যখন হাত বাড়ায় তখ ডাক্তার না ডেকে পুরুত ডাকি, ওষুধ না খেয়ে মাদুলি পরি। সেই দেশে এমন যুদ্ধ আশ্চর্যই বটে।

প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ চলছে কয়লার ব্যাপারে। কয়লা না হলে কতকগুলি সরকারী বেসরকারী কারখা অচল হয়ে পড়বে। মাটির নীচে কয়লা জমা রয়েছে- কেন জমা রয়েছে, কবে থেকে জমা রয়েছে সে হিসেব সাহেব বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন। আমাদের দেশের কয়া খনিও আবিষ্কার করে সাহেব। আমরা মোটামুটি আবি ষ্কার না করতে পেরেই খুশি।

প্রায় দুশো বছর হয়ে গেল। ১৭৭৪ সালের ২১ আগষ্ট। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস আমাদের সাহেব বিধাতা জন সামনার নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক ওয়ারে হেষ্টিংসকে লিখছেন (তার সারমর্ম এই যে), মশাই

আমরা বীরভূম এবং পাথেট এ কয়লাখনি আবিষ্কার করেছি, যদি দয়া করে সেগুলি থেকে কয়লা তুলবার অনুমতি দেন তো বাঁচি।

কিন্তু কোন কারণে সে খনিতে কাজ হয়নি হয়ত তেমন প্রয়োজনও হয়নি কোনো। কয়লা জরুরী প্রয়োজন হল অবশ্য রেলপথ খোলার সময়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম কয়লাখনির পত্তন হয়—প্রকৃতির সঙ্গে কয়লা নিয়ে লড়াইএর সেই প্রথম শুরু আমাদের দেশে। সে লড়াই এখনো থামেনি, এবং সরকারী পরিকল্পনা হিসাবপত্রের জমাটাক বাজানো দেখে মনে হয় এ লড়াই রোজ বেড়েই চলবে—যদিও ১৯৩৫ সালের পর থেকে কয়লার সন্ধান অনেকখানি কমেছে। তার কারণ হিরোসিমার উপর পরমাণু বোমার আক্রমণে এটা বোঝা গেল মানুষ এমন একটি শক্তি প্রায় আয়ত্ত করেছে যার শক্তির কাছে কয়লা কিছুই নয়।

পরমাণুর শক্তিকে আমরা যতদিন ঠিক মত না নিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজে লাগাচ্ছি, ততদিন করিয়া বাণীগঞ্জই আমাদের ভরসা। এবং এ যুদ্ধও শেষ হবার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। ১৯১৮ সালের কথা ধরা যাক—আমরা খনি থেকে কয়লা তুলেছি তখন একশো পঞ্চাশ লক্ষ টন। চল্লিশ বছর পার হয়ে এলাম তারপর থেকে, এখন আমরা কয়লা তুলছি বছরে চারশো আশি লক্ষ টন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন হবে নশো লক্ষ টন বা নব্বুই মিলিয়ন টন। কয়লাখনির প্রধান অঞ্চলগুলিতে শুরু হয়ে গেছে কর্মচাঞ্চল্য। বর্তমানে সমস্ত কয়লাখনিতে শ্রমিকের সংখ্যা তিনলক্ষ সত্তর হাজারের কাছাকাছি একটি সংখ্যা। এর দ্বিগুণ সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎ, ঘরবাড়ী, রাস্তা, যানবাহন, হাসপাতাল, ডাক্তার ইত্যাদি ব্যাপারেও আরো অনেক লোকের প্রয়োজন হবে।

ধানবাদ অঞ্চলে সম্প্রতি সাতদিন ঘুরে এলাম। দেখলাম এই কর্মচঞ্চলতার চিহ্ন। বড় বড় লরি চলেছে, নতুন নতুন গাড়ী, কোনটা স্বদেশী, কোনটা বিদেশী। কোথাও চলেছে জিপ, তাতে কনসালটিং ইনজিনিয়ার, এনজিনিয়ার, সেলসম্যান ইত্যাদি সব বসে আছে। কোনটাতে সেকটি ল্যাম্প বিক্রেতা বসে আছে। কয়লার খনির মধ্যে অনেক জিনিস তো প্রয়োজন হয়—নানারকম এনজিনিয়ারিং জিনিসপত্র। ওয়ু মিলার-এর সার্ভিস এনজিনিয়ার বিশ্বনাথ-এর কল্যাণে একটি লিস্ট পেলাম, তারা কি কি জিনিস বিক্রী করে তার একটা ছাপানো লিফলেট। এর মধ্যে রয়েছে কোল কাটার, ড্রিলস এবং অ্যাকসেসরিস, কনভেয়রস, হলেজ গিয়ার্স অ্যাণ্ড ওয়াইণ্ডার্স, রোটারি পাম্পস, মাইনিং পাম্পস ইত্যাদি নানারকমের পাম্প। এছাড়া তালিকায় দেখলাম আর একটি ভাল জিনিস-এর নাম হল ডাস্টট্র্যাপ। কয়লার খনির মধ্যে কয়লার গুঁড়ো এবং ধূলোয় যখন নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় তখন এই যন্ত্রে ধূলোকে বন্দী করা যায়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের দেশে এই দেড়শো বছরেরও বেশী কয়লার খনি চলছে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কয়লাখনির যন্ত্রপাতির অতি সামান্য অংশ কেবল আমরা তৈরি করেছি। যেটুকু তৈরি করেছি সেগুলি অধিকাংশ কয়লার খনিই ব্যবহার করতে ইতস্তত করে। কয়লার খনিতে এতদিন এত লোকে কাজ করেছি আমরা, অথচ কোনরকম উৎসাহ দেখাইনি। আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি খনি থেকে তার কতখানিই বা আমরা আমাদের সাহিত্যে প্রকাশ করেছি। আমাদের বাঙলা ভাষার গৌরব যতই করি, বাংলাদেশকে অনেকখানি পাওয়া গেলেও এর অনেকখানিই বাকি রয়ে গেছে জানবার। আমাদের কুল আমরা চিনি না, কারণ আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নেই, আমাদের সমস্ত ফুলই নাম-না-জানা, আমাদের সমস্ত গাছই "কত রকমের বিভিন্ন গাছ।" প্রতিটি গাছের আলাদা অস্তিত্ব আমাদের জানা নেই। জানার আগ্রহও নেই, তাই আমাদের সাহিত্যের দুর্বলতা।

ইংরেজদের কিছু দোষ তো ছিলই—অনেকখানিই দোষ ছিল। তারা ভারতবাসীদের কোন কাজে (বিশেষত বৈজ্ঞানিক কাজে) উৎসাহ দেয়নি। তাই কয়লাখনিতে কোনরকম বৈজ্ঞানিক কাজ করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখন সে সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। আমরা ইংল্যাণ্ড থেকে অনেককিছু যন্ত্রপাতি কিনেছি, এবং সেগুলো খারাপ নয়, কিন্তু কতকগুলি যন্ত্র অতিরিক্ত রকমের ভাল বলে অনাবশ্যক বেশী দাম

যেতে হচ্ছে। আমাদের সরকারী কর্তারা জোর দেন ব্রিটিশ স্পেসিফিকেশনের উপর। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের কয়লাখনির অধিকাংশেই কম গভীর। যেখানে ইংল্যাণ্ডে তিন চার হাজার ফুট নিচুতে গিয়ে কাজ করা খুবই সাধারণ ঘটনা, আমাদের দেশের অধিকাংশ কয়লাখনিই হাজার ফুটের নীচে। অতএব এই অগভীর জায়গায় গভীর মাইনিং-এর যন্ত্রপাতি বিনা কারণেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের অবস্থা অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন চালু করলে বেশ কিছু টাকা বেঁচে যাবার সম্ভাবনা। দেশেই খনির যন্ত্রপাতি তৈরি করবার কারখানা তৈরি হবার পরে, এ সময়ে ব্রিটিশ স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে ভারতীয় অবস্থার কতখানি সম্পর্ক আছে তাও স্থির করে ফেললে ভাল হয়।

কয়লাখনির ম্যানেজার মৃণাল ভাদুড়ী কয়লা হাতে নিয়ে বলছেন : "এখানে কয়লার টন পোনের কুড়ি টাকা, কিন্তু কোলকাতায় গেলেই এর দাম হবে সত্তর টাকা।"

তাছাড়া যন্ত্রের ব্যবহারও আমাদের দেশে তুলনায় খুবই কম হয়। যদিও কোটি কোটি টাকার যন্ত্র কেনা হয়, কিন্তু কয়লা তাড়াতাড়ি কাটবার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার কম। সমস্ত ভারতবর্ষে বর্তমানে কয়লাখনির সংখ্যা আটশো পঁয়ত্রিশটি—খুব বেশি নয়, এমনকি ১৯৫১ সালের হিসেবের চাইতে মাত্র চারটে বেশী—কিন্তু কয়লা কাটবার যন্ত্র ব্যবহার ১৯৫১ সালের তুলনায় ৩৭৪টির থেকে ৪০৯টিতে দাঁড়ালেও এই সংখ্যা অপ্রতুল বলেই মনে হবে। খনি পিছু একটি কয়লা কাটবার যন্ত্রও নেই। সমস্ত কাজ এখনও সাবল এবং গাঁইতি দিয়েই হয়।

এর কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের কয়লাখনিগুলির আকার বড় নয়। মাসে দুকুড়ি হাজার টনের বেশি কয়লা উৎপাদন হয় মাত্র ২৮টি খনিতে। দুশো নটি খনি আছে যার উৎপাদন মাসিক একশো টনও নয়। যদি টন পিছু একটাকা লাভ থাকে মালিকের তাহলে এই সমস্ত কয়লাখনির মালিকেরা প্রায় না খেয়ে রয়েছে। তবে খুব ছোট খনিতে দশ টন পিছু দুতিন টাকাও হতে পারে—কিন্তু তাহলেও অবস্থা খুব ভাল বলে মনে হবে কি? একজন খনির মালিক মাসে তিনশো টা (সর্বোচ্চ) আয় করছে, এটি খুব আনন্দের সংবাদ না তবে এসব ক্ষেত্রে হিসেবটা সরকারী অতএব খানি দুন এই হিসেবের সংগে মিশিয়ে নিতে হবে, কা নানা মতলবে আসল উৎপাদনের হিসেব খনি মালিকে দিতে নারাজ। ইনকামট্যাক্সের ব্যাপার আছে, তাছা শেয়ার হোল্ডারদের ঠকানোর প্রশ্ন আছে। নইলে এ লাভ হচ্ছে না এমন খনি চালু রাখবার কোন অ খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতএব এরকম খনিতে কোনরকম যন্ত্র কেনাই স নয়। সাবল এবং গাঁইতি একমাত্র সম্বল। এর ফ মাইনগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়—খুব তাড়াতাড়ি যে সমস্ত কয় কাটা সম্ভব সাবল গাঁইতি দিয়ে সেগুলিই কাটা হয় তারপর প্রচুর কয়লা সমেত খনিটিকে বুঁজিয়ে দে হয় বা খনির ছাদ স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙে পড়ে খনির ভেতর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টন কয় থেকে যায়।

নানা কারণে ভারতবর্ষে ভাল কয়লাখনি নেই ব দিয়েছে। ভাল কয়লা যা আছে তা বছরে নয় মিলিয়ন টন হিসেবে যদি তোলা যায় তাহলে আ পঞ্চাশ বছর মাত্র চলবে। কিন্তু খারাপ কয়লার সম্ব

আমাদের প্রচুর রয়েছে। খারাপ ভাল মিলিয়ে যা আছে তা বছরে একশো মিলিয়ন টন হিসেবে চলবে ছশো বছর। কিন্তু ভাল কয়লা যদি বাজে কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে ভাল কয়লা থেকেও কোন লাভ হচ্ছে না। বাজে কাজ—যেমন রেলোয়ে বয়লারে প্রথম শ্রেণীর কয়লা বরাবর ব্যবহার হয়ে আসছে, অথচ প্রথম শ্রেণীর কয়লার সেখানে কোন প্রয়োজন নেই।

সেজন্য সরকার থেকে কয়লাখনিগুলি বিশেষ কাজের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে। যেমন কেবল প্রথম শ্রেণীর কয়লা লোহা গলানোর কাজের জন্য রিজার্ভ করে রাখা হবে। ব্যাপারটা খারাপ নয়, কিন্তু এতে খুব লাভ হচ্ছে না।

প্রথম শ্রেণীর খনিকেও কাগজে-কলমে দ্বিতীয় শ্রেণীর খনি পরিণত করা হচ্ছে। অর্থাৎ ভাল কয়লাকে খারাপ কয়লা হিসাবে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। তার কারণ ভাল কয়লা যত্রতত্র বিক্রী নিষেধ—মালিকদের তাতেও ক্ষতি হয়। এজন্য গভর্ণমেণ্ট ইনসপেক্টর নেই কি? তাঁরা কেমন করে প্রথম শ্রেণীর কয়লাখনিকে দ্বিতীয় শ্রেণী বলে সার্টিফিকেট দেন?

কেমন করে তাঁরা সার্টিফিকেট দেন? হয়ত খুব সহজলভ্য নয় তা। কিন্তু অসম্ভব নয়—বিশেষ করে তার কাছে, যার টাকা আছে অফুরন্ত।

দামোদর ঝরিয়া জিওলগোরায় দেখলাম টাকার খেলা। আগেই বলেছি, সমস্ত হিসেবই এখানে টাকায় হয়। মানুষের দাম? তাও টাকায় হয়। মানুষের কতখানি দাম এই ভারতবর্ষের কয়লাখনিতে?

ছোট মানুষের একটা হলেও অন্য সমস্ত বিষয়েই মানুষের অসাম্য। মানুষের দাম সবার একরকম নয়। কয়লাখনিতে একরকম লোকও কাজ করে না। নানা তাদের জাত—হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ তো আছেই। কিন্তু তা ছাড়া আরো শ্রেণী আছে। প্রধানত দু জাতের—যারা মাটির তলায় কাজ করে, আর যারা মাটির উপরে কাজ করে। এর হিসেব আছে—সে হিসেব প্রকাণ্ড। কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—১। জেনারেল লেবারার, ২। নালা ক্লিনার, ৩। রোড ক্লিনার, ৪। রোপ লিফটার, ৫। অয়লার, ৬। চেইনম্যান, ৭। ডোরম্যান, ৮। শট ফায়ারিয়ার, ৯। কাঠ মিস্ত্রী, ১০। সহকারী কাঠ মিস্ত্রী, ইট প্রস্তুতকারী, ১২। সহকারী ইট প্রস্তুতকারী, ১৩। দড়ির মিস্ত্রী, ১৪। ইঞ্জিন ড্রাইভার এবং আরো একুশটি বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ।

এতো গেল নিচের কাজ। মাটির উপরেও শ্রেণী-ভেদ কম নয়—যেমন ১। শ্রমিক, ২। কয়লা পরিষ্কারকারী, ৩। জংগল পরিষ্কারকারী, ৪। এ্যান্টি ম্যালেরিয়া শ্রমিক (আসাম কয়লাখনিতে) ইত্যাদি সব সমেত ত্রিশটি বিভিন্ন কাজ।

ত্রিশটি উপরে পঁয়ত্রিশটি নিচে, এই পঁয়ষট্টি রকমের লোক কাজ করছে কয়লাখনিতে। এরপর তো আছে ম্যানেজার, মালিক, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, কেরানী, টাইপ-বাবু, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।

শ্রমিকদের মূল্যের কথা বলছিলাম। এক একটি শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গেলে (মাইনে ৭০৲—৮০৲ মাসিক হলে) নিকট আত্মীয় ক্ষতিপূরণ পাবে দু হাজার চারশো টাকা। মাইনে কম হলে আরো কম। চিরকালের মত পঙ্গু এবং অচল হলে এই টাকাটির পরিমাণ একটু বাড়ে—হয় তিনহাজার তিনশো ষাট টাকা।

তবু তো কয়লাখনিতে মরলে সুখ আছে। বাইরে না খেয়ে মরলেও কেউ কিছুই দেয় না।

আরো হিসেব আছে—সে হিসেবে যেতে চাইনে। একটি আঙুল কেটে গেলে তার কত দাম, একটি কানের কত দাম, পায়ের দাম, নাকের দাম চোখের দামও মেপে ঠিক করা হয়েছে।

কিন্তু চালের দামের কোন মাপ নেই। এককালে সস্তায় র‍্যাশন দেওয়া হত শ্রমিকদের—এখন কোনরকম নিয়ন্ত্রণ নেই।

স্বাধীন দেশে নিয়ন্ত্রণ কথাটার হয়ত কোন অর্থ নেই।

একটি শ্রমিক বত্রিশ টাকা মণ চাল কিনে খায়। একটু বেশিই খায় তারা—এই একমাত্র চাল। মাছ মাংস কোথায় পাবে? কখনো সখনো তা জুটলে ভাগ্য মনে করে।

এই টাকার সবটাই সে খরচ করে না। তার দেশেও তাকে পাঠাতে হয়। সেখানেও রয়েছে চাকুরীহীন আত্মীয়ের দল। এখানে চালটা যদি নিয়ন্ত্রিত দরে কিনতে পারত তাহলেও হত। কিন্তু যে আশা নেই।

চিত্র। সম্পূর্ণ চিত্র নয়, আমার অভিজ্ঞতা কম। অনেক কথাই অজানা। কয়লা সম্বন্ধে আগ্রহ হয়েছিল বছর দশেক আগে। তখন এই ধানবাদ অঞ্চলেই ঘুরে বেরিয়েছি খনিতে খনিতে। দেখেছি তখনকার চিত্র। আজকের চিত্র দেখে মনে হল, বদলেছে, কিছুটা বদলেছে বৈকি। যেমন ধানবাদে যেরকম নোংরা-আবর্জনা আগে দেখেছিলাম এখন তার পরিমাণ বেড়েছে। যে পথ তখন মোটামুটি চলনসই ছিল, সেই পথে এখন নিত্য নৈমিত্তিক ট্রাফিক-জ্যাম। আর গাড়ি দুর্ঘটনা? তা তো আছেই, তা নইলে মোটর গাড়ি ব্যবহার করাই বা কেন? ধানবাদে কয়লাখনি সম্পর্কিত একটি ইংরিজি সাময়িক পত্রের নাম, দি কোলফিল্ড টাইমস্। এই সাময়িক পত্রে পাথরদি থেকে এস. কে, শর্মা লিখছেন। (প্রকাশ তারিখ ১৮ই মার্চ, ১৯৬০)

প্রায় সর্বত্রই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কুলিদের থাকতে হয়। ছোটরা তো সব সময় নোংরা ঘাঁটছে।

"আবার ধানবাদে গেলাম বেশ কিছুদিন পর—কিন্তু আশ্চর্য বলে ভাবছি এই কি সেই ধানবাদ? স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার পথে, রেলওয়ে সীমার দেয়ালের কাছে গাদা করে রাখা ময়লা-আবর্জনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে রয়েছে। এর কিছু পরেই রয়েছে নর্দমার পচা জলের গন্ধ, দেখে তো মনে হয় না কোনরকম কর্তৃপক্ষেরই এ ব্যাপারে কোন হুঁস আছে। রেলওয়ে ক্রসিংটির ফলে ট্রাফিক জ্যাম এক বিরাট সমস্যার এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার এদিক ওদিক গর্ত খোঁড়া হয়েছিল বিভিন্ন প্রয়োজনে, কিন্তু ঠিকমত ভরাট করা হয়নি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে চার্চ পর্যন্ত রাস্তা কেমন বিশৃঙ্খল।" ইত্যাদি··· বর্ণনাটা পড়ে যেন কোলকাতার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। শিবরাম চক্রবর্তী হয়ত বলতে পারতেন কোলকাতার থেকে কোল-কাটারদের শহর ধানবাদ আর কত ভাল চাই? কিন্তু এ সমস্যার অবিলম্বে সমাধান হওয়া প্রয়োজন—একদিনও দেরি করবার উপায় নেই সমাধান খুব কঠিন তাও নয়। কেবল কিছু ইচ্ছে থাকলেই হয়ে যায়। সেই ইচ্ছেটাই কর্তৃপক্ষের নেই। অন্তত ইচ্ছে আছে সেরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধানবাদ যদি এ ভাবে চলতে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় ক্ষতি হতে বাধ্য। আরো বেশিদিন গেলে রাস্তা আর চওড়া করবার উপায় থাকবে না, যেমন হয়েছে কোলকাতায়, যেমন হয়েছে বেনারসে। তবে কোলকাতা বেনারসের জন্য দায়ী আমরা নই, সেই যা সান্ত্বনা তখন কোনরকম আইন করেই যথেচ্ছভাবে বাড়ী করা ছোট রাস্তা রাখা বন্ধ করা হয়নি। ইংরেজ রাজত্বে লোকেরা স্বাধীনতা ভোগ করেছে যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি স্বাধীনতা একটু (অন্তত এ ব্যাপারে) বেশি মাত্রা লোকেরা পাচ্ছে। ভবিষ্যতকে পঙ্গু করবার জন্য এই অবাধ-স্বাধীনতার অবসান আজই ঘটানো উচিত কিন্তু ধর্মের কাহিনী শুনে কেউ চরিত্র পরিবর্তন করে না—অতএব প্রয়োজন কঠোর নিয়ন্ত্রণের। যদি কেউ বলে ডেমোক্রেসি যে মারা যায়, তখন তাকে বলতে হবে, তা যাক, কিন্তু রাস্তা তো হক!

রাস্তার জন্য ডেমোক্রেসির বিদায় নিতে হবে শুনে

অনেকেই খুশি হবেন। কিন্তু আর কোন উপায় আছে কি? যেখানে বিলম্বিত সার্টিফিকেটের বাজারে কোন ছোট-অফিসারের মস্তক দেহচ্যুত তো হয়ই না, সে কর্মচ্যুতও হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেখানে কাজ করবার প্রবৃত্তি কোথায়? আমাদের আফিং খাওয়া চরিত্রে, এবং আমরা আধ-মরা—যা খেলে আমরা হয়ত মরব, কিন্তু যা না খেলে আমরা বাঁচতেও পারব না। ধানবাদের কয়লা-খনিতে কেউ ডেমোক্রেসি চায় না। ডেমোক্রেসির ফলে এখানে কয়লার দাম বেশি (কেবল ধানবাদে নয় সব জায়গাতেই), কারণ কয়লাখনির উপর নিষেধাজ্ঞা দেবার প্রভূত ক্ষমতি নেই। যেমন:

1. Sampling & Grading of Coal (By Coal Board)
2. Boiler Inspection
3. Electrical Inspection
4. Mining Equipments Inspectors
5. Sanitory Inspectors
6. Labour Inspectors

Explosive Inspectors

এর যে-কোন প্রভুই একটি কয়লাখনি বন্ধ করবার হুকুম জারি করতে পারে। ফলে কোন কিছুর উন্নতি না করে, বিপজ্জনক অবস্থায় শ্রমিকদের কাজ করতে দিয়েও কয়লার খনি পার পেয়ে যেতে পারে—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যায়ও। কেমন করে? ইনস্পেক্টর এলেন—খনিতে দেখবার জন্য এলেন—কিন্তু দেখলেন না। একটি মোটা খাম তার পকেটে এল, "সব ঠিক আছে" বলে তিনি সার্টিফিকেট দিলেন। তারপর পঞ্চপালের মত ইনস্পেক্টর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আরো মোটা খামের আবির্ভাব ঘটল, এবং সকলেই খুশি হল। খনি বন্ধ করে দিলে কত ক্ষতি ভাবুন তো?

সাহেবদের খনির কথা একটু আলাদা। একটি ঘটনা শোনা গেল। মোটা খাম না পেয়ে এক খনির ইনস্পেক্টর লিখলেন, "এ খনির খারাপ।" ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে সে কোম্পানি নানা জায়গা থেকে এক্সপার্ট আনিয়ে প্রমাণ করলেন, খনির ঠিকই আছে—তবে খনির ইনস্পেক্টর বিগড়েছে। খনির ইনস্পেক্টরকে বাধ্য হয়ে "ঠিক আছে" বলে সার্টিফিকেট দিতে হল। মোটা খামের আশা ত্যাগ করেই।

খনির ভালই কি বা খারাপই হক—মোটা খাম দিতেই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

কেবল খনির সম্পর্কে বলা হয়ত ঠিক হল না—এতে অন্য ডিপার্টমেন্টকে কমিয়ে বলা হয়। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের লোকের সম্পর্কেই শুনলাম এই ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে নেই।

এ সবই আমার শোনা কথা। এত বেশি শুনেছি এত লোকের কাছ থেকে যে মনে হয়েছে রীতিমত ট্রাইবুনাল বসানো প্রয়োজন।

কয়লা খনির মালিকেরও ক্ষোভ যথেষ্ট রয়েছে—তারাও চায় মোটা খাম দিতে। দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে—কারণ এতে নাকি অন্নের উপর দিয়ে যায়।

আমি একটি খনির মালিককে বলেছিলাম, "আপনারা যত মালিক আছেন, সবাই যদি সংঘবদ্ধ হন তাহলে ওদের জব্দ করা যাবে।"

বলেই ভাবলাম, একি কথা বলছি? চিরকাল মালিকদের মুণ্ডপাত করে আসছি—তাদের জন্য শেষ পর্যন্ত আমার সহানুভূতি হচ্ছে? মালিকেরা চিরকালই ধড়িবাজ, চিরকালই ঘুঘু। তাদের ধ্বংসের জন্যই তো সমাজতন্ত্র চাই। আর আমি সেই মালিককে বলছি সংঘবদ্ধ হতে! মালিকেরা কি সংঘবদ্ধ নয়? মালিকেরা নিজেদের স্বার্থে সবাই সংঘবদ্ধ বলেই তো শুনেছি, পড়েছি—এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে দেখেওছি—কিন্তু আমি তাদের সংঘবদ্ধ হতে বলছি এটা আমার কাছেই কেমন হাস্যকর ঠেকল।

না: আমি বোধহয় গোল্লায় গেছি?

•

আসল কথা তা নয়—আসল কথাটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র ব্যাপারটা। আমি "ভারতীয়" সমাজতন্ত্রের কথা বলছি। একটি সমাজতান্ত্রিক উদাহরণ—দার্জিলিঙ হিমালয়ান রেলওয়ে যখন ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল, তখন লাভ হত, এখন ক্ষতি হয়—এর কারণ, এটি জাতীয়করণ করা হয়েছে। কোলকাতায় বাস যখন ব্যক্তিগত মালিকানায় চলত তখন তাতে বিরাট লাভ হত, এখন রাষ্ট্রের হাতে গিয়ে ক্ষতি হচ্ছে—বাসে

সরকারী চেষ্টায় যে সমস্ত সমাজতন্ত্র আমরা দেখছি তার চাইতে ব্যক্তিগত মালিকানা অনেক, অনেক ভাল।

আমার বক্তব্য হচ্ছে কয়লাখনিকে জাতীয়করণ করবার কোন প্রয়োজন নেই। জাতীয়করণ করলেই কয়লার দাম হবে বেড়গুণ। প্রতিটি কয়লার খনি ক্ষতিতে চলবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকারী কোনরকম নিয়ন্ত্রণই এখানে খাটানো উচিত নয়—কারণ, আসল উদ্দেশ্য এখানে নষ্ট। সবই

খানখাদের কাছে একটি কয়লাখনির কুড়ি দেখা যাচ্ছে। এই কুয়োগুলো অত্যন্তই বেশী—খুব বেশি দেখেও গণা যায় না।

আগের মত চলছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে আরো খারাপ অবস্থাই চলছে, কিন্তু মাঝ থেকে নানারকম ভাবে পয়সা খরচ হচ্ছে। এ পয়সা সরকারীই হক, বা মালিকের পকেট থেকেই আসুক, এর প্রাথমিক উৎস জনসাধারণ—এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকেই এর দাম দিতে হয়।

ইনস্পেক্টর না থাকলে দুর্ঘটনা হবে যে খনিতে?—এ একটা প্রশ্ন বটে। কিন্তু গণ্ডায় গণ্ডায় ইনস্পেক্টর থাকাতেও কি কম দুর্ঘটনা হয় নাকি ভারতবর্ষে? এই তো সেদিন চিনাকুড়িতে কতবড় দুর্ঘটনা হয়ে গেল। তা ছাড়া ভারতের সমস্ত কয়লার খনিতে সাপ্তাহিক প্রায় ষাটটি বড় আকের দুর্ঘটনা ঘটেছে। কয়লার খনি এবং লোকসংখ্যা প্রায় ঠিক থাকলেও দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সরকারী হিসেবে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত লোকের সংখ্যা:

১৯৫১	১,৯০১
১৯৫২	২,৬০০
১৯৫৩	২,১৮৭
১৯৫৪	২,১৯৪
১৯৫৫	২,৮৫০
১৯৫৬	২,৮০০
১৯৫৭	২,৭২০
১৯৫৮	২,৮৪১

এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত সংখ্যা ২,৫৮৭

দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে যখন—তখন এই সিদ্ধান্ত করা যায় নাকি যে যে-সমস্ত ইনস্পেক্টর আছেন তাঁরা ঠিক মত কাজ পরিচালনা করছেন না? জন সাধারণ এই দাবি করবে যে হয় এই সমস্ত পরিদর্শকদের রাখার ফলে সত্যিকারের উন্নতি হয়েছে তা প্রমাণ করা হক—অথবা এত খরচ করে এদের রাখবার কোন প্রয়োজন নেই স্বীকার করে নেওয়া হক।

ঠিক মত কিছু হচ্ছে না এই অভিযোগ যেখানে সেখানেই পেয়েছি। চা বাগানে, জুটমিলে সরকারী অফিসে, কয়লার খনিতে, ট্রেনে, বাসে, রেশনে দোকানে—কোথায় নয়?

আমরা কোথায় চলেছি?

কয়লার দামের কথাই ধরা যাক। কোলকাতা এক টন কয়লার দাম কত? পঁয়ষট্টি টাকা থেকে সত্তর টাকা। মালিকের লাভ-সমেত কয়লার খনিতে এক টনের দাম কুড়ি টাকা থেকে সাতাশ টাকা বাকী টাকাটা যায় রেল ভাড়ায়, গুদামঘর ভাড়ায় এবং ঠিকমত রেল-ওয়াগন না আসায়।

সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। যখন প্রয়োজন তখন ওয়াগন পাওয়া যায় না আবার যখন হয়ত প্রয়োজন নেই তখন গাদা গাদা ওয়াগন এসে হাজির।

মনে হয় কোনরকম পরিকল্পনাই নাই কোথাও কয়লা উৎপাদন কেন হচ্ছেনা সে সম্পর্কে ১৮ই মার্চ

১৯৩০ সালের দি কোলফিল্ড টাইমস্-এর সম্পাদকীয় :

"Despite all the studied tomtommings, carried out by the Railways from time to time, the fact remains, unfortunate as it might be, that railway transport has failed to keep pace with increased coal output, and 'inadequate transport' has hence impeded increased coal production."

শোনা যাচ্ছে রেল-কর্তৃপক্ষ ওয়াগনের সংখ্যা কমানোর কথাই চিন্তা করেছেন।

গত ছেড়শো বছর ধরে কয়লাখনিতে দুর্নীতি চলেছে, অব্যবস্থা চলেছে।

১৯৩৭ সালে এ-বিষয়ে ভাল করেই বলা হয়েছে—কিভাবে খনিগুলির অবস্থা খারাপ হয়েছে :

"The coal trade in India has been rather like a race in which profit has always come in first, with safety a poor second, sound methods an "also ran", and national welfare a "dead horse" entered perhaps, but never likely to start.....Neither the Govt. nor land-lords can escape responsibility for allowing this state of affairs to prevail for so long, but this does not alter the facts, nor still less will it justify further inaction on the part of all concerned."

অরাজকতা আঁকিয়ে বলেছে, এর হাত থেকে কোন মানুষের পরিত্রাণ নাই। আমি এমন কোন মানুষকে দেখলাম না যিনি মেশিনগানের কথা না ভাবছেন। "ইচ্ছে করে গুলি করে কতকগুলি লোককে শেষ করে দিই।" বললেন আমাকে একজন খনির ম্যানেজার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন কি হল?" ম্যানেজার বললেন, "আমরা রীতিমত পয়সা খরচ করে বিদ্যুৎ কিনি। ঠিক মত পয়সা দিই—কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই কথা নেই বার্তা নেই বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। আর তার মানেই প্রায় সমস্ত কাজ-কারবার গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।"

আমি বললাম, "আর কোন লোককে গুলি করতে ইচ্ছে হয় কি?"

ম্যানেজার বললেন, "সবাইকে। সবাইকে গুলি করার প্রয়োজন।"

এর পর আমি পালাক্রমে শুনে গেছি মালিকের কাছে যে কিছু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে গুলি করার প্রয়োজন, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী বলেছেন, শালা মালিকদের শেষ না করলে কিছু হবে না, গবর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন কর্মী ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন—সমস্তই অসহ্য লাগছে তাঁর, উঁচু-তলার জনকতক লোককে শেষ করলে কিছু উন্নতি হবার সম্ভাবনা, উঁচু-তলার লোককে জিজ্ঞেস করে জেনেছি তাঁরা ঠিকই আছেন কেবল নিচের লোকগুলি খুব আলস্যপ্রিয় হয়ে কিছু কাজ করতে চায় না, ফলে দেরি হয় নানা ব্যাপারে।

এইরকম অসুস্থ মনোভাব সর্বত্র অনুভব করে যখন ফিরে আসছি, আমার ম্যানেজার বন্ধু বললেন, "কয়লা সম্পর্কে কিরকম ইম্প্রেশন নিয়ে চললে বলো?

আমি বললাম,—"কালো।"

নতুন মানুষ

মণীন্দ্র ঘটক

সন্ধ্যার সময় মেঘে কালো হয়ে এসেছিল আকাশ। তারপর ঝমঝম্ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর আকাশ যেন পরিষ্কার হয়ে জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে—চাঁদ আর তারা, আর হাল্কা হাওয়ার একটা ধীরেজ ঝিরঝির স্রোত, আশ্চর্য লাগছিল তার, আশ্চর্য।

তখনই ব্যথাটা উঠল। শুধু ব্যথাই নয়, বিদ্যুতের মত একঝলক খুশির তীব্র আলোও খেলে গেল তার মনে।

বিকেল থেকেই ঝিন্‌ঝিন্ ব্যথা ছিল একটা। তত ভাবেনি তখন। এ সময় ওরকম হতে পারে। হয়েছেও দুএকদিন। তাই আর কিছু বলেনি কাউকে লজ্জায়।

কিন্তু এখন?

বাউই কোথায় কলা গাছের পাতা নড়ছে চিক্‌চিক্ করে। ঝাপড়া-কোপড়া পেয়ারা গাছটা রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়ে উঠানের ওপর। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে ঘরের চালা বেয়ে কটিক-মালার মত। দূরে কুকুরের ডাক, আশে পাশে দোকজনের গলা খাঁকারি, কথাবার্তা। সব যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

সারা দেহ আঁকড়ে ধরছে ব্যথাটা। জ্যোৎস্নায় স্বপ্ন হয়ে উঠছে বাইরেটা। ঘরের মধ্যে টিম্ টিম্ লণ্ঠনের আলোয় বাড়ীর লোকজনের নক্সপণে আনাগোনা, ফিস্ ফাস। মেঝের ওপর চট-কাঁথার বিছানায় সে শুতে পারছে না, বসতে পারছে না, উঠতে পারছে না। শরীরটা যেন দুমড়ে, মুচড়ে ভেঙে ফেলতে চাইছে ব্যথাটা। দাঁত মুখ খিঁচে সহ্য করতে চায়, পারে না সে।

পাশে বসে শান্তড়ি। শঙ্কাকুল কোমল কণ্ঠে ডাকে, বৌ!

মা—গলাটা কাঁপছে কাঁপতে মিলিয়ে যায় করুণ ব্যথায়। দুহাতে কাপড় ধরে শান্তড়ি কিছু আর বলতে পারে না।

পাই এসেছে। সব শুনে বলেছে, প্রথম বাচ্চা একটুতো কষ্ট হবেই।

একটু? কান্না-করুণ চোখ তার অসহায়। কি হবে কোথায়, কেমন? গলা কাঁপিয়ে চীৎকার

হে, কষ্ট তো হবেই বৌ।

কে কী হবে? পাড়ার লোকজন তারা? একটু সহ্য করে থাকা

কি করে সহ্য করবে সে। অসহ্য তো হয়েছে লজ্জায় মুখ ফোটেনি। কিন্তু আর পারে না। বুকচাপ কান্নায় ভেঙে পড়ে সে—ওমা, মাগো।

কী সব প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করছে পাই। কতক্ষণ সময় যেন দলা পাকিয়ে স্থির হয়ে আছে তার চারপাশে। নড়ছে না, চলছে না। তার শক্তায় মাথা কুটছে কে অসহ্য সেই ব্যথা-কোটা ভগবান, আর পারে না সে, পারে না সে।

জ্যোৎস্না আরো নিবিড় হয়েছে বাইরে। গভীর হয়েছে রাত। ঘুমে নিঃসাড় হয়ে গেছে চারদিক। তখনও ব্যথার দুর্দম সহস্র ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে তার শিরায় শিরায় নরাতে।

বারান্দায় শান্তড়ির উদ্বেগাকুল গলা শোনা যায়, ডাক্তার ডাকব। পাই কিছু করতে পারবে না।

চমকে ওঠে সে। ডাক্তার? ডাক্তার এসে কী করবে? সন্তানটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে নামাবে।

মা, না। সে হবে না—ডাক্তার নয় মা, প্রাণপণ চিৎকার করে বলে সে।

কিন্তু কে কান দেবে সে কথায়? কানের মাকড়ি দুটো খুলে নিয়ে গেল শাশুড়ি। অত রাতে টাকা যার দেবে কে খালি হাতে? টাকা ছাড়া দুমাইল দূরের শহর থেকে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসবে না কোনো ডাক্তার। কিন্তু সে লোকটা কী নিষ্ঠুর! একবারও দেখল না এসে, বুঝল না তার কষ্ট। এ রাতে ছুটল গয়না বন্ধক দিয়ে ডাক্তার ডাকতে! ডাক্তার এসে কী করবে তা কি সে জানে না? তার যে সর্বনাশ করবে। অনেক গল্প শুনেছে সে—ডাক্তার শুধু মাকে বাঁচায়। সন্তান বলি দিয়ে মা বাঁচে কি করে। সে যে আরো বাথা। সারা জীবন থাকবে সে ব্যথা। না, না—ডাক্তার এলেও সে কিছু করতে দেবে না, দেবে না।

একঝাঁক শেয়ালের আকস্মিক প্রহর ঘোষণায় আঁতকে ওঠে চারিদিক। দূরে দূরে হুয়াক্কা হুয়া। কী মর্মান্তিক ভয়ের শব্দ যেন। ভয়—ব্যথা ছাপিয়ে ভয়ে কাঁপে তার সর্বচেতনা।

নিষ্পলক চেয়ে আছে শাশুড়ি। সচেতন দৃষ্টিতে দাই লক্ষ্য করছে তার অবস্থা। জোরে শ্বাস ওঠে পড়ে। দুমড়ে পড়ে আছে বুক চেপে। তলপেটের কাছ থেকে ব্যথাটা যেন ফুলে ফুঁসে পাক খেতে খেতে আছড়ে পড়ছে তার উর্ধ্বাঙ্গে। অনড়, কঠিন, ভীষণ হয়ে তাকে পড়ে থাকতেই হবে—থাকতেই হবে। আরো, আরো—কতক্ষণ কে জানে। কে জানে সে কেমন, যে আসছে?

ভয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে যেন ঘরটা। মরা ছেলে হয়েছিল সরলার। প্রথম সন্তান—কী কষ্ট! একটা রক্ত মাখা নীল মাংস পিণ্ড—স্মৃতি মোচড় দিয়ে ওঠে তার মাথার মধ্যে। সরলার সেই মরা ছেলে সে দেখেছিল। তখন তত বোঝে নি। কিন্তু একমাথা কালো চুল, ফর্সা ধবধবে ট্যাবাটোবা সুন্দর ছেলে; হাসবে, কাঁদবে, আর বুকে চেপে ধরবে সে, এই তার স্বপ্ন, যেন মিলিয়ে যাচ্ছে কোথায় কোথায়। ঝিম ঝিম করছে মাথা। চোখে আলো যেন বালুকণার মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ে যাচ্ছে কোথায় অন্ধকারে—ভয়ংকর অন্ধকারে।

নিবিড় জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে নিশ্চুপ পৃথিবী: আগরবের মত সাড়াশব্দ সব যেন এই ঘরে—অজ পাড়াগাঁয়ের এক অলক্ষ্য-কোণে। বেদনা, আতঙ্ক, সংশয়ের এক অলৌকিক যন্ত্রণায় জেগে আছে ছোট্ট বাড়ীটা। আজ তার ঘুম নেই। সে যেন এক অচেতন অস্তিত্ব—একটি সুন্দর স্বপ্ন বার বার মাথা চাড়া দিচ্ছে—তার মধ্যে আবার বার বার ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে গভীর রাতের জাগরণ। ঘুমোনো যায় না, জেগে থাকাও চলে না, স্বপ্নও নয়—কোন এক অচেনা আগন্তুকের প্রতীক্ষায়—শুধুমাত্র মুমূর্ষু, অতন্দ্র, দুর্বোধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, আর কিছু নয়।

কে যে আসছে!

কে আসছে? ঝন ঝন করে কি যেন ভেঙে গুড়িয়ে গেল বুকের মধ্যে। ব্যথা, উঃ! কী ব্যথা! মা—আ—আ!!

ডাক্তার, দাই আর সেই যন্ত্রগুলো।...

সরলার ছেলে হয়েছিল—মরা ছেলে। এক পিণ্ড মাংস আর রক্ত আর সরলা। একটা জীবন্ত স্তূপ সরলা। পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যথার শ্বাস, কান্নার ফেনা সরলার সারা দেহ অবিরল কাঁপিয়ে নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল যেন তার চোখের ওপর। আর ডাক্তার, সেই যন্ত্র। ঝকমক চকমক চোখের ওপর ভাসে সব। টুং টাং শব্দ—মিষ্টি, অথচ শুনতে যে কী ভয়। বুক যেন ফেটে যেতে চায় দুঃখে। সরলার করুণ গোঙানিতে চারদিক স্তব্ধ হয়ে গেছিল সেদিন।

ক্রিং ক্রিং! সাইকেলের ঘণ্টা বাজে।

শাশুড়ি আর দাই চঞ্চল হয়ে ওঠে একটু। উন্মুখ ম্লান দৃষ্টি তাদের মুহূর্তে একটা সংকার সূত্র ধরে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাইরে কাদের গলা জাগে মৃদুমৃদু। এক জোড়া জুতোর আওয়াজ মচমচ করে উঠান পেরিয়ে দুয়ারে এসে থামে।

তারপর—তারপর কি? দেকি কেঁদে, চীৎকার করে আছড়ে মরবে?...ডাক্তারের হাতে সেই যন্ত্রটা না? সরলার মরা ছেলে টেনে এনেছিল যে যন্ত্র দিয়ে। আড়াল থেকে লুকিয়ে সব দেখেছিল সে। হ্যাঁ, সেই যন্ত্র—হুবহু সেই যন্ত্র।

আঃ মাগো!

আবার যেন শেয়ালগুলো ডাকছে। থমথম নিস্তব্ধ রাত্রি যেন জেগে উঠল চারধারে। সে সইতে পারছে

না কিছু। চোখের ওপর আলোটা জ্বলছে ধপ ধপ করে। হয়তো নিভে যাবে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে যাবে সব।

না, না, না! আতঙ্কে সর্বশরীর ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে —না, না, না।

বাইরে দুতিন গলার জটলা চলছে অনুচ্চে। ডাক্তার কি বলছে, দাই ব্যস্ত-ত্রস্ত। শাশুড়ি যেন হাত-পা ভাঙা, অসাড় একদিকে বসে। আর কেউ? না, আর কাউকে দেখা যায় না। এদিক ওদিক, দুয়ারের চৌকাট পেরিয়ে জ্যোৎস্না-চলা বারান্দায়—কোথাও কেউ নেই। আঃ লোকটা কি নিষ্ঠুর। মা, মাগো। ইচ্ছা যায়—কী ইচ্ছা হয় তার? আতঙ্কে চোখ দুটো গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বুজে আসে। ব্যথায় অসাড় হয়ে আসে দেহ। মনে পড়ে খালি সরলার কথা। ভীষণ দুঃস্বপ্নের মত। তবু যেন কেমন একটা ইচ্ছা ব্যাহত হয়ে বার বার ক্ষুব্ধ করে তাকে। আকুল করে তাকে। কী নিষ্ঠুর! একবার চোখের দেখাও কি দেখতে চায় না মানুষটা?

বাবা, মা, ডাক্তারবাবু—সবাইয়ের নাম ধরে চীৎকার করে কাঁদে সে। বুক ফেটে যায়। শরীরের শিরা উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে জড়িয়ে যায়। মা, মাগো! আর একজনের নাম বারবার তার মনে আসে, মুখে ফোটেনা। মুখে ফুটলে হয়তো কিছুটা শান্তি পেত সে। কিন্তু লজ্জা যে, দুঃখ যে, ক্ষোভ যে!

কী করছে ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু কী করছে? তাকে, কোল-আবদা করে ধরেছে দাই। যন্ত্রগুলো বাজছে। সে দেখতে পায়না, নড়তে পারেনা, কাতরায়। ধমকায় ডাক্তারবাবু। তার দেহটা যেন কিছুনা এমনি-ভাবে কী করছে ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু গো! আবার একটা মর্মান্তিক সাড়া ককিয়ে কাঁদে।

সরলার মরা ছেলেটা যেন মহত্রটা হয়ে পড়ে আছে তার চারদিকে—রক্তমাখা নীল, নরম মাংসপিণ্ড। আর ডাক্তারের যন্ত্রগুলো নড়ছে চড়ছে, ঝিলিক মারছে। তার সর্বশরীর হিম, নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ক্রমে। মা—আঁ, মাগো!

যেন কী, যেন বাজনার মত বাজছে কোথায়। না, বাজনা নয়, কারা যেন কথা বলছে। শুধু কথাও নয়, কলকণ্ঠ। না, কণ্ঠও নয়, কানের ভুল তার। কাঁদছে সরলা। না-কি সেই? বোঝা যায় না—কিছুই বোঝা যায় না। যেন অনেকগুলো আলো তার চোখের ওপর আসছে যাচ্ছে। একটাও স্থির নয়, একটা আলোও তাকে স্পষ্ট করে দেখতে দিচ্ছে না কিছু।

বৌ! শাশুড়ির গলা। কতদূর থেকে ভেসে আসছে! তবুও সে আঁকড়ে ধরতে যায় শাশুড়িকে—দু-হাতের নাগালে পেতে চায়। শাশুড়িকে? কী জানি, কিছুই বুঝতে পারেনা সে। কেঁদে ওঠে হু হু করে। লোকটা কী নিষ্ঠুর, একবারও কাছে এল না। মা, মাগো।

বৌ! চেয়ে ছাখো।

এ্যাঃ! চোখ মেলতে চায়, পারে না। ভয়। কারা যেন হাসছে না? না, শেয়াল ডাকছে, কুকুর হাঁকছে। কারা কথা বলছে দূরে দূরে—অনেক দূরে। চোখ দুটো টিপে ধরে আছে সরলা।

না, সে চোখ মেলবে। আর সে দেখতে পারেনা সরলাকে। তাকাতে পারে না সরলার রক্তাক্ত নীল মৃত ছেলেটার সহস্র পিণ্ডের দিকে। না, না, না!—সারা দেহের শক্তিতে দুহাত দিয়ে সরলাকে দূরে ঠেলে দিতে চায় সে। সরলার ছেলের পিণ্ডগুলো ছুঁড়ে ফেলতে চায় অন্ধকারে।

বৌ, শুনছ!

উঃ, মা—আ! নড়ে চড়ে কুঁকড়ে ওঠে দেহ। কী ব্যথা, কী ব্যথা! মা, মাগো!

এই যে ছাখো বৌ, কে।

কে? সে এল? সেই নিষ্ঠুর মানুষটা?

কে যেন ঠেলছে আস্তে আস্তে। কে?

ছাখো, ছাখো বৌ, চোখ মেল!

এ্যাঃ! চোখ দুটো ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে সরলা। চোখের ওপর একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। ধোঁয়ার গন্ধে দম আটকে আসে। চোখ জ্বালা করে তাকাতে। তবুও দেখতে হবে, কে? পাশে কে? চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না, কে?

ছাখো বৌ, কে?

কে? ধাপসা কাটে আস্তে আস্তে। কে? একটা

হাত উঠে এসে স্পর্শ করে। কে? নরম তুলতুলে একটা দেহ—ছোট্ট, অদ্ভুত, আনন্দময়। কে?

উত্তেজনায় প্রায় উঠে বসতে যায় শুইয়ে দেয় ফের।

প্রায় স্পষ্ট হয়ে আসে সব। স্মৃতিতে হঠাৎ জাগছে সেই বৃষ্টি, সেই ব্যথা, সেই জ্যোৎস্না ঝাপড়া-ঝোপড়া পেয়ারা গাছ—সেই স্বপ্নের দেশের মত বাইরের দৃশ্যগুলো। আর ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ, ডাক্তার এসেছিল মনে পড়ে। কী যেন করল ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে, মনে পড়ে।

তারপর? তারপর কী হয়েছে? কে এসেছে? সে কোথায়? মা, মাগো! বুকফাটা কান্না এসে গলায় আটকে যায়।

এইতো সে, এইতো! নরম, ছোট্ট, সুন্দর! কিন্তু সরলার মরা ছেলের মত নয়তো? না, গরম, ধুকধুক করছে।

দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কী ব্যথা—আনন্দের কী ব্যথা! বুক টনটন্ করে। মন যেন আকস্মিক উদ্যমে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কী করবে সে এখন? শাশুড়ি চেয়ে আছে, দাই নেকড়া গরম করে। অথচ ইচ্ছে হচ্ছে তার উঠে বসতে, বুকে চেপে ধরতে—নরম, তুলতুলে ছোট্ট, সুন্দর দেহটা। যে তার বুকের উষ্ণ-পাথারের মধ্যে ডুবে গিয়ে ধুকধুক করে আশ্চর্য একটি অস্তিত্বের নিঃস্বন তুলবে অবিরাম, অনবরত।

অনেকক্ষণ ধরে অপলক চেয়ে থাকে রক্তাভ ঘুমন্ত শিশুটির দিকে। খুব ঘুমোচ্ছে। জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। কেমন করে কাঁদে দেখতে বড় সাধ। কেমন তারো স্বর শুনতে উৎকর্ণ সে।

দাই বলে, ঘুমে মাই যাও বৌ। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েছে।

ইচ্ছা যে তারও। বুক টনটন করে। কিন্তু লজ্জা লাগে যে। এ পাশে দাই, ওপাশে শাশুড়ি। চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে সে। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে কেবলই ভাবে, কেবলই কী-সব ভাবে।

সেই ব্যথাটা নেই আর। সেই জ্যোৎস্না নেই। স্বপ্নের মত অস্পষ্ট—বাহির স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। পাখী-পাখালির সাড়া আসছে চারদিকে।

বড় ক্লান্তি—ভারমুক্ত মনে হয় তার আবার চোখ মেলে সে।

হারিকেনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। গনগন্ করছে কাঠের অগ্নিকুণ্ড। ধোঁয়া-গন্ধ ছেয়েছে সারা ঘর। কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে তার পাশেই শুয়ে পড়েছে দাই। দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমচ্ছে শাশুড়ি। এই তার সময়।

বুকে আঁকড়ে ধরে ছেলেকে। তার ছেলে—নরম, তুলতুলে, টুকটুকে তার ছেলে। সে আজ মা। এই ছেলে তাকে মা ডাকবে। নড়েচড়ে কাঁদে ছেলে। কী কান্না! মাই মুখে গোঁয়ায়। আশ্চর্য! চুকচুক করে টানে। কান্না থামে। তার ছেলে, সে আজ মা! সব ব্যথা কি করে যেন একটা অসীম সুখের স্মৃতিতে এসে আনন্দ হয়ে ওঠে। তৃপ্তি নেই তার। ছেলেকে চেপে ধরে বুকের মধ্যে।

দুরুদুরে একটা মৃদু হা
ঘরে বাইরে।

মা!

ছোট্ট একটা ডাক, তারপর গলা খাঁকারি। চমকে ওঠে সে। চেনা গলা, চেনা মানুষ। দেখে ফেলেনি তো? কাপড়-চোপড় টেনেটুনে ঠিকঠাক হয় ত্রস্তে। তারপর মাথা তুলে তাকায়। দরজায় দাঁড়িয়ে জড়সড় মানুষটা। উঃ, কী নিষ্ঠুর! অভিমানে চোখে জল আসে। কিন্তু [redacted]ও যে আছে, হাসিও যে আসে। কেমন একটা [redacted]-গর্বে সারা মুখ ছেয়ে যায় তার।

সে-মানুষও চেয়ে আছে। করুণ, উদ্বেগাকুল তার দৃষ্টি। দেখে কেমন লাগে। নিজের ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান সব উবে যায়। ইচ্ছা হয় কাছে টেনে এনে দেখায়, দ্যাখো, তোমার ছেলে।

কিন্তু লোকটা কি অদ্ভুত! একটুক্ষণ দাঁড়ায় না। সরে গেল।

রোদের আভাস দেখা যায় বাইরে। শাশুড়ি উঠে গেছে। দাই জেগে ছেলেটাকে কোলে করে সেঁক দিচ্ছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছু টের পায় নি।

মা-ছেলের গলা শুনা যাচ্ছে বাইরে। কান পেতে শোনে সে।

হরিবলা, ডাক্তারের কাছে যা।

হুঁ, যাবো।

বৌয়ের অবস্থা গিয়ে বলবি সব। বলবি ভাল আছে।

কিন্তু—

ওষোধ যা

তুই যা।

মোচড় দিয়ে ওঠে মন। এই সময়ও টাকার কথা ভাবছে লোকটা? এখন না হোক পরে তো দেওয়া যাবে। তা নিয়ে অমন মাথা ঘামানো কেন? লোকটার কি আনন্দ বলেও কোনো বোধ নেই? একটা নতুন মানুষ এল,—বাপ হল সে। সেই সাধ-স্বপ্নের সুখও কি একটু উছলে ওঠে না লোকটার মনে?

ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে বেলা করে এল হরিবলা। মা তখন ওবাড়ীর পুকুরে গেছে চানে। দাই গেছে বাড়ী। আতুড় ঘরে নবজাত শিশু বুকে করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে হরিবলার বৌ।

পা টিপে টিপে এসে আতুড় ঘরে ঢোকে হরিবলা। এই, এই বলে শীতুগলায় ডাকতে ডাকতে বৌয়ের গায়ে

জেগে ধরফর করে উঠে বসে সে।

ওঁয়া-জোর কান্নায় সাড়া দেয়।

বৌয়ের দিকে চেয়ে বলে হরিবলা, একটা হাত পড়াতে দিয়ে এলাম। কী কান্নারে বাবা! ছেলেকে বুঝিয়ে বলো, থামবে।

রহস্যময় মনে হয় লোকটাকে। কি এক খুশির আমেজে যেন ধরা-গলা। এমন আর কোনদিন দেখেনি সে। কেমন এক নূতন সুর গুন গুন করে মনের মধ্যে—ভাষা খোঁজে।

আর দাঁড়ায় না হরিবলা।

দায় ঘর থেকে

মা-ঠাকুমার মুখে শোনা

পড়ে যায় তার—

"আয় চাঁদ, আয় চাঁদ,
চাঁদের কপালে চাঁদ,
টিপ দিয়ে যা।"

কিন্তু এ ছড়া তো আজ গাওয়া যায় না ছেড়ে! কী লজ্জা, সবাই শুনবে—কেউ বুঝবে না।

বিশ্বসাহিত্য

আলবার্তো মোরাভিয়া

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর যুগের পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যে আলবার্তো মোরাভিয়া একটি বিস্ময়কর নাম। দ্রুতবেগে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন মোরাভিয়া। তিনি সাম্প্রতিক ইতালীয় কথাসাহিত্যের নেতা। মোরাভিয়া অবশ্য ১৯২৫ সাল থেকেই লিখছেন। তাঁর ইদানীং কালের জনপ্রিয়তার সূচনা সমরোত্তর কালের।

১৯০৭ সালের ২৮শে নভেম্বর রোমে তাঁর জন্ম। ভেনিস স্থপতির পুত্র মোরাভিয়া শৈশবে কেবল ইতালীয় নয়, তিনটি বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন—ফরাসি, ইংরেজি ও জার্মানি। ১৯২৫-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। এ সময় তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আসেন বিদেশী সংবাদদাতারূপে। তিনি তুরিন-এর La Stampa এবং Gazetta del Popolo পত্রিকা দুটির সংবাদদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের আগে মুসোলিনীর রাজত্বে তাঁর বইগুলি বাজেয়াপ্ত হয় এবং ছদ্মনামে লিখতে তিনি বাধ্য হন। জার্মান সেনা যখন ইতালি অধিকার করে তখন মোরাভিয়া পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে থাকেন। এখন তিনি রোমে বাস করেন। কাপ্রি দ্বীপেও তাঁর বাড়ি আছে। এ-যাবৎ তাঁর যে ক'টি উপন্যাস ও গল্পসংকলন ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে, তার তালিকা দিলাম—'The Woman of Rome', 'Conjugal Love', 'The Conformist', 'Two Adolescents', 'The Time of Indifference', 'The Fancy Dress Party', 'Bitter Honey Moon', 'A Guest at Noon', এবং 'Roman Tales'।

স্থপতি-পুত্র, তিনটি বিদেশী ভাষায় দক্ষ, বিদেশী সংবাদদাতা আলবার্তো মোরাভিয়ার রচনার প্রধান গুণ—সাবলীল ভাষা। তাঁর ভাষায় যে ধারবৎশক্তি আছে তা পাঠককে টেনে নিয়ে যায়, কোথাও থামতে দেয় না। ইংরেজি অনুবাদেও ভাষার এই সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দচারিতা বর্তমান। দ্বিতীয়ত, মোরাভিয়ার গল্প বলার ভঙ্গী খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং তত্ত্বের খাতিরে গল্পকে তিনি কোথাও বিসর্জন দেন নি। এই গল্পরস ও সাবলীল ভাষা পাঠককে অভিভূত ও মুগ্ধ করে এবং এজন্য মোরাভিয়ার নিন্দা না করে প্রশংসাই করা উচিত।

মোরাভিয়ার গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য রোমের জীবন। রোম নগরীর বাস্তব চিত্র তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। রোমের প্রখর সূর্যালোকিত প্রভাত, স্বপ্নময় সন্ধ্যা, বিলাস-উৎসবে মত্ত নৈশ জীবন, গ্রীষ্মদিনের তাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন—সবই মোরাভিয়ার বর্ণনাগুণে রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে-শব্দে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক।

টিবার নদীতীরে প্রতপ্ত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে রোম নগরীর বর্ণনা: It was two O' clock, the hottest time of the day, and the sky, threatening a scirocco, was as lived as a punched, bruised-eye. When I reached the bridge, I lent against the nail-studded iron parapet; it was Scorching. The Tiber, confined between quays at the bottom of great sloping walls, looked like an open sewer and had the same muddy colour.....I stood for a time looking at the Tiber, the small, yellow Tiber with a large full of bags of cement lying beside the quay'

that this little rivulet called itself a port, just like the ports of Genoa and Naples which are the rouged with Ships of all sizes. ('Hot weather jokes' "Roman Tales")। এই বর্ণনায় কোথাও আতিশয্য বা আড়ম্বর নেই। অথচ বাস্তবানুগ এই বর্ণনা প্রত্যুত মধ্যাহ্নে রোম বন্দরের ছবিটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

অথবা চন্দ্রালোকিত শর্বরীর বর্ণনা : It was assuredly a lonely spart, and the moon, as it rose behind us lit up the whole of the flat ground beneath us, thinly veiled in white mist with dark patches of scrub and mounds of silt here and there, and with the Tiber winding through it, loop after loop, looking like silver, ('The Perfect Crime', "Roman Tales")। এই আশ্চর্য পটভূমিতে একটি হত্যাকাণ্ডের ভূমিকা রচিত হয়েছে।

আলবার্তো মোরাভিয়া

কেবল প্রকৃতি বর্ণনায় নয়, মানব-চরিত্রের বর্ণনাতেও বাস্তবানুগতি ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, As for the woman, she was almost painfully thin, with a long, sharp face between two waves of loose hair and a narrow body in a tight green dress that made her look like a snake. But she had a full, red mouth, like a fruit, and beautiful eyes, black and shining like wet coal. ('The Fanatic', : "Roman Tales")।

আলবার্তো মোরাভিয়ার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লেগেছে এই বর্ণনায়। উপমা প্রয়োগে, চিত্রাঙ্কনে, পরিস্থিতি রচনায় বর্ণনা নৈপুণ্য এখানে স্বতই প্রকাশিত।

বলেছি, রোম নগরীর জীবনই মোরাভিয়ার প্রধান [illegible] করেছে। ঘৃণা, সন্দেহ, প্রেম, বিশ্বাসভঙ্গ, দাম্পত্য-কলহ, যৌবনের স্বপ্ন ও যৌবনা এদের জীবনকে আশ্রয় করে মোরাভিয়া লিখিয়েছেন। বাস্তবের অনুসরণ মোরাভিয়ার প্রধান লক্ষ্য, তাই সত্যপ্রকাশে তিনি নির্মম, অকুণ্ঠ, অলঙ্ক। যৌবনের যৌনা কেবল রোমান্টিক ব্যাকুলতায় প্রকাশ পায় না, যৌনজীবনের বিক্ষোভেও প্রকাশিত হয়, তা মোরাভিয়া জানেন বিলাসিনী রম্যা রোম নগরী কেবল শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান নয়, সেখানে জীবনের অপর দিকটিও বর্তমান। পণ্যা নারীর জীবনচিত্রণে সেই রূঢ় জীবনের উদ্‌ঘাটন বহু-প্রশংসিত বহু নিন্দিত 'The woman of Rome' উপন্যাস তাঁর পরিচয়স্থল। আবার দাম্পত্য জীবনের ভুল বোঝার বিয়োগান্ত কাহিনী প্রকাশেও মোরাভিয়া তৎপর। তার প্রমাণ Conjugal Love ও A Ghost at Noon উপন্যাসে। এরই মধ্য দিয়ে আমরা মোরাভিয়ার জীবন- দর্শনের পরিচয় পেতে পারি।

কিন্তু এই পরিচয় লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মোরাভিয়া সম্পর্কে জনশ্রুতিনির্ভর অস্পষ্ট ধারণা। কোনো কোনো সমালোচক এই অভিমত প্রচার করেছেন, যৌনজীবন চিত্রণে মোরাভিয়ার যে ঝোঁক, তাই তাঁর জনপ্রিয়তার মূল কারণ। মোরাভিয়ার সৎপাঠক স্বীকার করবেন এই অভিমত গ্রাহ্য নয়। বাস্তবের প্রতি, জীবনের প্রতি, সত্যের প্রতি মোরাভিয়ার আগ্রহ এবং সে কারণেই যৌনচিত্রের উপস্থিতি। 'রোমের পণ্যানারী' (The woman of Rome) উপন্যাসে মোরাভিয়া এক দেহব্যবসায়িনীর জীবনের সত্য আলেখ্য অংকন করেছেন। গরীব অনাথার মেয়ে চিত্রকরের 'মডেল' হয়ে অর্থোপার্জন করত ; ওই স্বল্প আয়ে জীবন চলে না। কীভাবে মায়ের প্ররোচনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রমোদসঙ্গিনী

হল, কীভাবে প্রথমবার ধর্ষিত হল, তারপর কীভাবে রীতিমত দেহপণ্য বিক্রয় শুরু করল, এবং এই ব্যবসায়ে বহু পুরুষের সংগে সাক্ষাৎ হল; এই ঘৃণ্য অধ্যেপার্জনে যে আনন্দ নেই, সুখ নেই, আছে কেবল অসীম বিরক্তি ও হতাশা এবং পণ্যা নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষের ফল হতাশা—এই উপলব্ধি—এই সবই মোরাভিয়া অকম্পিত লেখনীতে বর্ণনা করেছেন। কোথাও তিনি উদ্দেশ্যহীন লালসার চিত্রাঙ্কনে প্রলুব্ধ হন নি, কোথাও হিংসা ও কাম-প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দেন নি, সর্বত্র তিনি অবিচল থেকেছেন এবং এই দুর্ভাগিনী পণ্যানারীর জীবনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। এই উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা নয়, সত্যভাষণে ও চিত্রণে নির্মম বাস্তবের উপলব্ধি।

আবার 'Conjugal love' এবং 'A Ghost at Noon' নামক উপন্যাসদুটিতে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির অতি তীব্র মর্মান্তিক কাহিনী এবং তার বিয়োগান্ত পরিণতি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সহজ নয় আদিম মনোবৃত্তি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন হয়নি তাই দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষা, সংশয় সংসারের শান্তিকে বিঘ্নিত করে; সহিষ্ণুতা ও উদারতা বারবার জিঘাংসা ও হিংসার দ্বারা প্ররোচিত হয়। সভ্যতা এইভাবে নিয়তই পরীক্ষিত হচ্ছে—এই ধরণের একটি ইংগিত এখানে পাই। 'A Ghost at Noon' উপন্যাসে ইউলিসিস পেনিলোপের কাহিনী যেভাবে মোরাভিয়া উপস্থিত করেছেন, তাতে এই ইঙ্গিতটি উচ্চারিত হয়েছে।

মোরাভিয়ার গল্প-উপন্যাসের আরেকটি বিশেষত্ব—সমগ্র কাহিনী উত্তম পুরুষের জবানীতে বলা হয়েছে। এ নিয়ে আপত্তি হতে পারে একথা ভেবে যে নায়ক নায়িকারা যদি সমাজের উপর তলার বাসিন্দা হয়, তবে মোরাভিয়ার বলার ভঙ্গী তাদের মানিয়ে যাবে, কিন্তু নীচুতলার বাসিন্দার মুখে এই সংলাপ বেমানান হবে। মোরাভিয়া এই আপত্তির জবাব নিজেই দিয়েছেন 'The Woman of Rome' উপন্যাসের ভূমিকায়। অশিক্ষিতা পণ্যানারীর আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাসে হয় একেবারে বাস্তবানুগ নীচু তলার ব্যবহৃত কথ্যভাষা প্রয়োগ করতে হয়—যা আসলে অতি দীন শক্তিহীন ভাষা—যা জীবনের সকল অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে না; অথবা লেখকের নিজস্ব বাক-ভঙ্গীতে নায়িকাকে কথা বলাতে হয়। এই দুয়ের কোন পথটি গ্রহণীয়? মোরাভিয়া দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করেছেন এবং কারণস্বরূপ বলেছেন, সাহিত্যের ভাষা সর্বদাই দৈনন্দিন জীবনের কথ্যভাষা অপেক্ষা সত্যতর এবং মানবিক অনুভূতি প্রকাশের যোগ্যতর বাহন। মোরাভিয়া সাহিত্যের সত্যকে বড় করে তুলে ধরেছেন এবং বাস্তবের খাতিরে জীবনকে তথা জীবনের শিল্পরূপকে বিসর্জন দেন নি। সেইজন্যে মোরাভিয়াকে যৌনচিত্র আঁকিয়ে বলা ভুল। মোরাভিয়া শিল্পী, জীবনশিল্পী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্প্রতিক আমেরিকান সাহিত্য ইতালীর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে এবং একালের তরুণ ইতালীয় লেখকেরা প্রেরণা ও নির্দেশের জন্য আমেরিকান সাহিত্যের দ্বারস্থ হন, একথা স্বীকার করেও বলা যায়, জীবনের নীচুতলার গল্প লিখতে গিয়ে সাম্প্রতিক ইতালীয় লেখকেরা জীবনকেই গুরু বলে মেনেছেন। নয়া-বাস্তবতা (neo-Realism) আজ ইতালীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পে দেখা গেছে, তার মূলে আছে জীবননিষ্ঠা ও জীবনের প্রতি আনুগত্য, একথা অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক ইতালীয় সাহিত্যে মোরাভিয়া জীবননিষ্ঠা ও জীবনানুগত্যের শ্রেষ্ঠ ফল।

আরো একটি কারণে মোরাভিয়া আমাদের সপ্রশংস আলোচনা দাবি করেন। মোরাভিয়া জীবন-বিরোধী নন, তিনি জীবন-শিল্পী। একালের পাশ্চাত্য উপন্যাসে জীবন-বিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠেছে। নিরীশ্বরবাদ, অস্তিবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নৈরাত্মবাদ—এই সব জীবন-বিরোধী মতবাদ পাশ্চাত্য উপন্যাস-গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। ক্যাথলিক স্বর্গে আশ্রয় নিয়েছেন অনেকে, সেখানে মানুষের আদিম পাপ-চেতনা অতি প্রকট, এই চেতনা সুস্থ জীবনবোধের বিরোধী। সার্ত্র-এর উপন্যাসে, জোদেলের কাব্যে, ফ্রাঁসোআ মোরিআক-অঁদ্রে জিদ- অলবেয়ার কাম্যুর উপন্যাসে, নবোকভ্-গ্রাহাম গ্রীন্-ইভলীন ওয়াঘ্-এর উপন্যাসে হয় অস্তিবাদের নৈরাজ্যবোধ, নয় ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের পাপ-চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছে; এইসব চেতনা আর

গাই হোক জীবনধর্মী নয়, জীবন-বিরোধী চেতনা। মোরাভিয়া নৈরাজ্যবোধ, নৈরাত্মচেতনা বা ক্যাথলিক পাপ-চেতনার দ্বারা পরিচালিত হন নি। আর সে-কারণেই জীবনকে বাস্তবের আধারে সত্যরূপে দেখতে ও দেখাতে তাঁর বাধেনি।

মোরাভিয়া কেবল সমাজের উপরতলার বাসিন্দাদের জীবনালেখ্য আঁকেন নি, নীচুতলার সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ কম নয়। এর পরিচয় পাই তাঁর ছোট গল্পে। 'Racconti Romeni' অর্থাৎ 'Roman Tales' নামে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থে ট্যাক্সি-ড্রাইভার, মিস্ত্রী, দোকানদার, দোপাটী, চোর, বারবণিতা, হোটেল-বয়, হোটেলের গীটার-বাদক, লরী-চালক, দোকান-কর্মচারী, পানালয়-কর্মিণী, মোটর-কারখানার মালিক, হোটেল-মালিক, কসাই, ধাত্রী, গেঁয়ো চাষী রমণী প্রভৃতি সাধারণ নরনারীর দেখা পাই। এরা রোম নগরীর বিচিত্র কর্মময় জীবন-যাত্রার সহিক। স্নেহমতী মানুষের যৌবনের উদ্দামতা, প্রাণের চাঞ্চল্য ও জীবনানুরাগ এদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বর্তমান। রোমান্ গল্পগুলিতে এই সব বিচিত্র মানুষের মিছিল, বিচিত্র পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের প্রকাশ করে। কোনো মহৎ ও সুন্দরকে নয়, অসুন্দর ও বর্বরের মধ্যে মোরাভিয়া জীবনকেই পেতে চেয়েছেন। কী অনায়াস নৈপুণ্য স্বল্পায়োজনে মোরাভিয়া এই ক্ষুদ্রকায় গল্পগুলিকে গড়ে তুলেছেন, তা প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি বাক্য উপভোগ করতে করতে না পড়লে উপলব্ধি করা যাবে না।

গল্পের আলোচনা নয়, গল্পপাঠই উপভোগের শ্রেষ্ঠ পন্থা। এবিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই সে ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে এই জীবননিষ্ঠ শিল্পী সম্পর্কে সংক্ষেপিত আলোচনা শেষ করছি। সমাপ্তির আগে মোরাভিয়ার একটি গল্পের সারাংশ এখানে দিচ্ছি—এর থেকেই বোঝা যাবে মোরাভিয়া কী অনায়াস নৈপুণ্যে জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

গল্পটির নাম 'Rain in May', এটি Roman Tales সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, মোরাভিয়ার অন্যান্য কাহিনীর মতো এটিও উত্তম পুরুষে কথিত। গ্রীষ্মপ্রধান মে মাসের বর্ষাধারার গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি।

উত্তম পুরুষের জবানীতেই গল্পের সংক্ষিপ্ত সার এখানে দিলাম।

এই মে মাসের অঝোর বৃষ্টিধারায় মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন আমি গ্রাম থেকে রোমে এলাম। মন্টি মারিও—অঞ্চলের ঐ সরাইখানায় হঠাৎই এসে পড়েছিলাম। 'ওয়েটার' হিসেবে মালিক আন্তনিও তোচ্চি আমাকে চাকরি দিল খাকা-খাওয়ার বিনিময়ে, বেতন দেবে না। তাবলাম এক পরিবারে আশ্রয় মিলল, কিন্তু পরে দেখলাম তা তো আশ্রয় নয়, নরক। বাপ, মা ও মেয়ে—তিনজনে সরাইখানা চালায়। বাপ আন্তনিওর বিশাল দেহ, অযথা মেজাজ ও সাপের মত চোখ। মেয়ে ভাসির মেজাজ-ব্যবহার বাপের মতই, রূঢ়-ভাষিণী অভদ্র, কিন্তু সে রূপবতী, চলনে বলনে সে যেন প্রতি পলেই ঘোষণা করে—এ দুনিয়া আমারই। কেবল মা-ই এই তিনজনের মধ্যে শান্ত মেজাজের, মনে হয় আধ-পাগল।

সরাইখানার নামের খুব বাহার। একটি সাইন-বোর্ডে লেখা আছে—"অস্তারিয়া দেই কাসিয়াতোরি, মালিক আন্তনিও তোচ্চি।" পুরনো ভাঙা বাড়ীতে সরাইখানার বড় খাবার ঘর আর বাগানে গাছপালার মাঝে টেবিল পাতা। গরমকালটাই সবচেয়ে ভাল সময়। রোমের লোকেরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত, এখানে বাগানে বসে মদ ও খাবার খেত। সামনে রোমের সামগ্রিক দৃশ্যটি দেখা যায়। এটাই লোকে পছন্দ করত। খাটুনির অন্ত নেই। আমরা দু জন পুরুষে পরিবেশন করতাম এবং দু জন নারী রান্না করত, বাসন ধুত। একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতাম। কাজের চাপে অন্য কোনো বিষয়ে মন দেবার অবকাশ থাকত না।

শীতে বা বর্ষায় গোলমাল থাকত। তখন খরিদ্দার কম, অবসর বেশি। বাপ ও মেয়ে পরস্পরকে ঘৃণা করত বললে কম বলা হয়। তারা পরস্পরকে হত্যা করতে পারলে খুশী হত। বাপের অযথা মেজাজ, যে কোনো তুচ্ছ ব্যাপারে তার খুন চেপে যেত। বাগানে একটা মাচের রঙমঞ্চ তৈরী করতে এবং বাড়িটাকে

আধুনিক রেস্তোরাঁয় পরিণত করতে চাইত মেয়ে। এতে আয় বাড়বে। বাপ কিছুতেই তাতে রাজী হত না। এই নিয়ে তর্ক ও ঝগড়া। ঝগড়া করতে করতে আন্তনিও ডাসিকে ঠাস করে এক চড় মারত। মেয়ে উল্টে গাল দিত। বাপ চুলের মুঠি ধরে ঘুসি চালাত। মা দুজনকে ছাড়াবার একটা চেষ্টা করত, কিন্তু নিঃশব্দে হাসত। অসহ্য নারকীয় অবস্থা!

আমি অনেকদিন আগেই কাজ ছেড়ে চলে যেতাম। যেতে পারছিলাম না ডাসির জন্য। তাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। ডাসিও তা জানত। সে জানত যে আমি তার ফাঁদে পড়ে গেছি। তবে সে রক্তমাংসের স্বৈরিক ভালবাসাই বুঝত। যেদিন আমি প্রথম এখানে আসি সেই রাত্রেই সে আমার ঘরে এসেছিল এবং আমাকে ঘুম থেকে যৌন-সম্ভোগের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গোপন ছিল, বাইরে তার প্রকাশ ছিল না। ডাসি উদ্ধত স্বতন্ত্রচারিণী ছিল, তবে সে একনিষ্ঠা ছিল। এজন্যই আমি তার কাছে বাঁধা পড়ে গেছিলাম।

আমি লোকটা সহজে কোন কিছু করি না। চট করে ভালবাসার গলে যাই না বা হঠাৎ আমার মাথায় খুন চাপে না। আমি রেগে যেতাম যদি কেউ আমায় খোঁচাত ফলে আমার কর্সা মুখ লাল হয়ে যেত। ডাসি এটা বুঝতে পেরেছিল এবং সেজন্যই সে আমায় খোঁচাত। কিছুদিন বাদে বুঝলাম এর কারণ—সে আমাকে তার বাপের বিরুদ্ধে লড়াতে চাইত। সে প্রায়ই বলত—আমি একটা কাপুরুষ কেননা তার বাপের অত্যাচার মারধোর থেকে আমি তাকে রক্ষা করি না। বুড়ো আন্তনিও একদিন তার মেয়েকে মাটিতে ফেলে লাথি পর্যন্ত মেরেছিল। ডাসি চাইত, আমি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেই। সেজন্যই সে আমাকে তীব্র অপদার্থ বলত। আমি আর প্ররোচনা ঠেকাতে পারছিলাম না।

একদিন ডাসি বলল, সে আমি দুজনে মিলে যদি এখানে নোতুন করে আধুনিক ঢঙে একটা রেস্তোরাঁ খুলি, তা খুব সুন্দর হয়, আয়ও বাড়ে। সেদিন ডাসিকে খুব মিষ্টি ভদ্র স্নেহময়ী বলে আমার মনে হল। তারপর সে তার আসল মতলবটা খুলে বলল—যতদিন তার বাপ আছে, আমরা বিয়ে করি আর না করি কিছুই করতে পারব না। তাই সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই—বাপকে খুন করা দরকার। সে আমাকে ভাবনার অবকাশ দিল না, প্রথম রাতের মতো এই মতলব হঠাৎ আমার ওপর চাপিয়ে দিল।

পরদিন আমি তাকে বললাম, এটা ভুল হচ্ছে, এটা অন্যায়। ফলে সে আমার সংগে ঘনিষ্ঠতা করা বন্ধ করে দিল। আমি তখন ধীরে ধীরে বুড়ো আন্তনিওর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছি—তার জন্যই ডাসি আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আমি বুড়োকে আরো বেশী ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

আবার মে মাস এল। অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। কাজের চাপ কমল। বাপে মেয়েতে আবার ঝগড়া লাগল। একদিন তুমুল ঝগড়া। বাপ মেয়েকে ঠেসে চড় মারল। আমি আর থাকতে পারলাম না। বাপকে বাধা দিতে গেলাম। ভাবলাম এভাবেই ডাসিকে ফিরে পাব। বুড়োর সংগে আমার ঝগড়া বেঁধে গেল। রাগে দিশেহারা হয়ে এক পাত্র মদ বুড়োর মুখে ছুঁড়ে দিলাম। বুড়ো লাফ দিয়ে চীৎকার করে উঠল—তোকে আমি খুন করব। আমি সিঁড়ির ওপরে নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। জানালার বাইরে দেখি অঝোর ধারায় মে মাসের বৃষ্টি পড়ছে।

তখন আমি ডাসির মতলব কাজে পরিণত করার সম্মতি দিলাম—বুড়ো আন্তনিওকে হত্যা করব। ডাসিই পরিকল্পনা ঠিক করল। মাটির নীচে 'সেলার'—মদের ভাঁড়ার। রোজ সকালে বুড়ো আন্তনিও সেখান থেকে মদ নিয়ে আসে খরিদ্দারের জন্য। তখনো আমি দ্বিধাগ্রস্থ। ডাসি বলল—যখন বুড়ো সেলারে ঝুঁকে পড়ে মদের বাক্স থেকে মদ নেবে, ঠিক সেই সময় আগুন উস্কে দেবার লোহার রড দিয়ে বুড়োর মাথা কাটিয়ে ফেলবে। তাহলেই কার্যসিদ্ধি। ডাসি আমার সকল দ্বিধা, ভয় ফুৎকারে উড়িয়ে দিল। পুরুষকে লোভ দেখাতে ও নিজের পথে আনতে রূপবতী যৌবনবতী ডাসি সিদ্ধহস্তা।

অবশেষে সেই স্মরণীয় সকাল এল। সেই সকালেও

বৃষ্টি হচ্ছে। সব অন্ধকার। সূর্যালোক কোথাও নেই। আন্তনিও ও ডাসি 'সেলারে নেমে যাচ্ছে। ডাসি নেমে যাবার আগে আমাকে 'সব ঠিক আছে' এই ইংগিত করে গেল। তার মা তা দেখতে পেল। আমি যখন লোহার রডটি নিতে যাচ্ছি চুল্লির কাছ থেকে, তখন তাকিয়ে মায়ের মুখ দেখে বুঝলাম, বুড়ী সব বুঝে ফেলেছে, কিন্তু কিছু বলছে না। নীচের থেকে আন্তনিওর আহ্বান ভেসে আসে—ডাসি, ডাসি। সে বলল—যাচ্ছি—নেমে যাবার আগে তার অঙ্গভঙ্গীতে যৌবনের ঝড় তুলে আমাকে ইশারা করে গেল। আমি রড হাতে নীচে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভিজতে ভিজতে বাইরে থেকে এক গাড়োয়ান এল। এসেই বলল—'এখুনি এস, আমাকে একটু সাহায্য কর।' আমি সংগে সংগে সেই লোহার রড হাতে করেই তার সংগে সংগে বাইরে অন্ধোর বৃষ্টিধারায় রাস্তায় এলাম। তার পাথরে ভরা গাড়িটা কাদায় বসে গেছে, ঘোড়াটা টানতে পারছে না। আমি লোহার রডটা বাগানের দরজায় খুঁটির মাথায় রেখে গাড়ির চাকা কাদা থেকে উদ্ধারে তাকে সাহায্য করতে গেলাম। প্রবল বর্ষণ, প্রচুর কাদা। আমরা দুজনে কিছুতেই গাড়িটা ঠেলতে পারলাম না। সেই রুক্ষদর্শন পরুষভাষী গাড়োয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোড়াকে চাবুক মারতে লাগল। ঘোড়াটা কিছুতেই এগোতে পারে না। তখন ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান সেই লোহার চুঁচালো রডটি হাতে নিল। সে যে কেবল ঘোড়াটার ওপর চটেছে তা নয়; তার সমস্ত দুর্ভাগ্য জীবনের ওপরেই চটেছে। আমি ভাবলাম সে বুঝি ওটা দিয়ে ঘোড়াটাকেই খুন করে। বারণ করতে গেলাম, পারলাম না। ওটা নিয়ে আমিই তো বুড়োকে খুন করতে যাচ্ছিলাম। আমার মনে হল, আমার সমস্ত ক্রোধ যেন গাড়োয়ানে বর্তেছে। আমি বেঁচে গেলাম। হতভাগ্য ক্রুদ্ধ দারিদ্র বঞ্চিত গাড়োয়ান সেই লোহার রডটি ঘোড়ার মাথায় আঘাত করল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। যখন চোখ খুললাম দেখি ঘোড়াটা কাদায় পড়ে গেছে। তার রক্ত মিশে গেছে কাদায়, দুবার পা ছুঁড়ল, তারপর শেষ হয়ে গেল। তখন হত্যাকারী গাড়োয়ান নিরস্ত হল, রডটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম, সামনের দিকে সেই প্রবল বৃষ্টিতে হাঁটতে শুরু করলাম। বড় রাস্তায় পৌঁছে প্রথম যে রোমগামী ট্রাম পেলাম লাফ দিয়ে তাতে উঠলাম। তখন একবার পিছন ফিরে তাকালাম—অন্ধোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। শেষবারের মতো দূরে আবছা ভাবে সরাইখানা ও তার সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলাম।

লেনিন ও জনগণ

আলেক্সি রেকুইগিন

জনগণের জন্যে উৎসর্গিত-জীবন যাঁরা, লেনিন ছিলেন তাদেরই একজন। সংঘবদ্ধ জনতার মধ্যে যে কী বিপুল শক্তির উৎস রয়েছে তা লেনিনের মতো আর কেউ এতো ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন কিনা সন্দেহ। লেনিন সেটা সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর গোড়ার দিকে কঠিনতম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত জয়লাভ সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যেও আস্থা হারান নি।

১৯১৯ সালটি ছিল নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে এক দারুণ সংকটের কাল। চারিদিক থেকে শত্রুসেনা-বাহিনী এগিয়ে আসছে; জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত; শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে; ক্ষিদের জ্বালায় অসংখ্য লোক হন্যে আর বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে। এমন কি, পার্টিকর্মীদের মধ্যেও অনেকের মনেই সে সময়ে হতাশা দেখা দিতে থাকে। কিন্তু লেনিনের সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে।

সেই সময়ে লেনিন প্রতিদিন শ্রমিকদের মধ্যে কাটা-তেন; কাজের মধ্যে দিয়ে, প্রতিনিয়ত তাদের মনে এই আস্থা জাগিয়ে তুলতেন যে আর মাত্র কয়েকটা মাস কঠিন আর একনিষ্ঠ কাজ করে যেতে পারলেই জয়লাভ সুনিশ্চিত। এবং, শ্রমিকরা সত্যিই জয়লাভ করেছিল। ১৯২০ সালের গোড়াতেই তার সূচনা দেখা দিল। প্রতিবিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান দলগুলি সেই সময়েই উৎখাত হয়ে গেল। শহরগুলিতে সরবরাহের ব্যবস্থা অনেক উন্নত হল। কল-কারখানাগুলিতে মোটের ওপর সুষ্ঠুভাবে কাজ চালু হল। হতাশা আর নৈরাশ্যের ওপরে জয়ী হল ইচ্ছাশক্তি আর সংগঠন ক্ষমতা।

সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম কয়েক বছরে অন্যদিক থেকেও নানারকম বাধা-অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। কৃষকদের একাংশে—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত চাষীরা তখনও বিশ্বাস করত না যে সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত টিকবে—যদিও তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল এই গভর্নমেণ্টের পক্ষে। লেনিন তখন বারবার এই কথাটির ওপরে জোর দিতেন যে কৃষকদের এই মনোভাব বদলানো যেতে পারে একমাত্র এই কথাটি প্রমাণ করার মধ্যে দিয়ে যে এই গভর্নমেণ্টের হাতে কৃষকদের জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে দেবার মতো ক্ষমতা আছে।

শ্রমিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েও লেনিন কিন্তু সব সময়েই কৃষকদের ওপরে জোরজুলুম প্রয়োগের বিপদ সম্বন্ধে বারবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে এসেছেন। কৃষকদের আস্থা অর্জন করতে হবে সমাজ-তান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার সুফলগুলিকে প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের সামনে তুলে ধরে এবং শ্রমিক কৃষকের অর্থনৈতিক সম্পর্কের নতুন রূপটিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলে—এই ছিল লেনিনের শিক্ষা। গ্রামাঞ্চলে পার্টির ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে লেনিন যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তাতে তিনি মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে কাজ চালাবার এক বাস্তব পদ্ধতি নির্দেশ করে এই স্লোগান দিয়েছিলেন: "কখনও হুকুম দিতে যেও না।" গ্রামাঞ্চলে কাজ চালাবার এক নিয়ামক নীতি হয়ে দাঁড়ায় এই স্লোগানটি।

সেই সময়কার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে লেনিন অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তাতে তিনি মনে মনে খুবই কষ্ট অনুভব করতেন। গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে শ্রমিক-কৃষকরা যে কী অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট আর অভাব সহ্য করেছে তা দেখে আর কেউ লেনিনের মতো এতোটা মানসিক যন্ত্রণা পায়নি। ১৯২০-র হেমন্তকালের শেষের দিকে যে কৃষক প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এসে-ছিল, লেনিন তাদের সম্বন্ধে গভীর বেদনার সঙ্গে

বলেছিলেন, এদের পোশাক একেবারে ছেঁড়াখোঁড়া, হাতে সেলাই করা কাঁচা চামড়ার জুতোয় পা ঢাকা, তার ওপরে মোজার বদলে কম্বল জড়ানো। এই প্রচণ্ড শীতে এদের এই অবস্থা! প্রত্যেকের পা ভিজে, ঠাণ্ডায় নীল হয়ে এসেছে। স্বভাবতই, আমি সামরিক গুদাম থেকে এদের জুতো সরবরাহ করার জন্যে অর্ডার দিলাম। কিন্তু তাতে আর কতোটুকু সাহায্য করা হবে? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ চাষী-মজুর আজ এইরকম ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে চলাফেরা করছে। এদের সবাইকে রাষ্ট্রের খরচে জুতো সরবরাহ করা অসম্ভব।"

এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে জনগণের প্রতি লেনিনের যে গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সেটা কিন্তু মোটেই অন্তঃসারশূন্য ভাবালুতা নয়। এটা শুধুই সহানুভূতি মাত্র নয়। লেনিনের মানসজীবনের সংগে তাঁর কর্মজীবনকে মিলিয়ে দেখলেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা যাবে যে এই মনোভাবের পেছনে আছে এক সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সংগ্রামের আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ এবং এই অদমনীয় আস্থা যে যতোই কঠিন বাধা-অসুবিধা আসুক না কেন মেহনতী জনগণ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেই।

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের নানা সমস্যা, বহু জটিল প্রশ্ন নিয়ে সবসময়ে কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, লেনিন কখনও জনগণের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি, তাদের ছোট-বড়ো প্রয়োজন গুলির কথা কখনও ভুলে থাকেন নি। সোভিয়েত জনগণের খুব ছোটখাটো সাফল্যের খবরেও তিনি আন্তরিক উল্লাস বোধ করতেন। একদিন লেনিন এক অনাথ-আশ্রমের শিশুদের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। তারা লিখেছে, "প্রিয় ঠাকুরদা লেনিন, আমরা, যে কতো ভালো হয়ে উঠেছি, সে কথাই এই চিঠিতে আপনাকে জানাতে চাই। আমরা মন দিয়ে লেখাপড়া করছি। ইতিমধ্যেই আমরা লিখতে পারি, পড়তে পারি, অনেক কিছু হাতের কাজও করতে পারি। প্রত্যেকদিন সকালে আমরা ভালো করে মুখ ধুই, দাঁত মাজি। প্রত্যেকবার খেতে বসার আগে আমরা হাত ধুয়ে নিই।"

এই চিঠি পড়ে লেনিন বললেন, "এই স্বাধো তাহলে! আমরা কীভাবে সংস্কৃতিবান হয়ে উঠেছি! আমাদের শিশুরা পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের এরকম মনে করার কি কারণ থাকতে পারে যে আমাদের জয়লাভ হবে না?

জনসাধারণের সবচেয়ে আস্থা-ভাজন লোক ছিলেন লেনিন। তাদের ওপরে তাঁর প্রভাব ও কর্তৃত্বও ছিল অপরিসীম। লেনিন ছিলেন সেই জাতের নেতা যাঁরা জনগণের সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মসমীকরণ করেন, তাদের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেন। সেই জন্যই জনগণও নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে এঁদের স্থান দেয়, গভীর এক ভালবাসার আসনে এঁদের প্রতিষ্ঠিত করে। সোভিয়েত জনগণ, তথা সমস্ত বিশ্বের শ্রমিক সাধারণ, যে লেনিনকে কতোখানি ভালবাসত তার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ হচ্ছে—লেনিনের ওপরে কাপুরুষোচিত আক্রমণের খবরে তাদের মধ্যে জেগে ওঠা এক প্রচণ্ড ক্রোধ আর ঘৃণার মনোভাব। সেদিন প্রত্যেকেই যেন অনুভব করেছিল যে সে ব্যক্তিগত ভাবে আহত হয়ে শারীরিক যন্ত্রণা বোধ করছে। প্রত্যেকের চোখে জ্বলে উঠেছিল শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড ক্রোধের আগুন।

লেনিনের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে, তাঁর আহার আর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জনসাধারণ সভীর আগ্রহের সঙ্গে খোঁজখবর নিত। চাষীরা তাঁর জন্যে নিজেরা হাতে করে নিয়ে আসত রুটি, মাখন বস্তা ভরা ময়দা, নিজেদের বাগানের ফল, সবজি। মজুররা নিয়ে আসত জুতো, গরম জামা। একবার দেশে চিনির বড়ো, অভাব হয়েছিল। চাষীরা কি করে যেন খবর পেল—চিনির অভাবে লেনিন বিনা-চিনিতে চা খান। সঙ্গে সঙ্গে তারা অতিকষ্টে তিন বস্তা চিনি জোগাড় করে লেনিনের নামে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখল—লেনিন যেন কোনমতেই বিনা-চিনিতে চা না খান। বলা বাহুল্য জনসাধারণের এইসব স্নেহের দানকে লেনিন প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতেন, কিন্তু কখনও নিজের জন্যে ব্যবহার

করতেন না। সব সময়ে তিনি এইসব জিনিস পাঠিয়ে দিতেন কোন দুঃস্থ কমরেডের বাড়িতে কিংবা হাসপাতালে অথবা অনাথ আশ্রমে।

সাধারণ মানুষের উদ্দেশে লেনিন বক্তৃতা দিতেন সহজ সরল স্পষ্ট ভাষায়—গলার স্বর কখনও চড়াতেন না, ঘরোয়া ভাবে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করতেন এমন ভঙ্গিতে যেন যাদের বলছেন তারা সকলেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিচিত বন্ধু। এমন কি, পার্টি কংগ্রেসে অথবা পিপলস্ কমিশনারদের (মন্ত্রী) আলোচনা-বৈঠকেও তিনি এই ভাবেই তাঁর বক্তব্য বলতেন। সাধারণ মানুষ এই জন্যেই লেনিনের বক্তব্য খুব সহজেই বুঝত।

লেনিনের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে জিনিসপত্র, নিজস্ব ঘর আর আসবাব, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেখে তাঁর ব্যক্তিজীবনের যে-পরিচয় পাওয়া যেত, তা হল নিতান্তই সরল আর অনাড়ম্বর—বরং বেশ একটু দারিদ্র্যে ঘেঁসা—এক জীবন যাত্রা। বিপ্লবের পরবর্তী সেই দু'দিনের প্রথম কয়েক বছর লেনিন জনসাধারণেরই একজন হিসেবে তাদের সঙ্গে সমস্ত কষ্ট অসুবিধা আর অভাব-অনটন ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের চেয়ে সামান্যতম অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করতে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। কখনও কোন সভায় লেনিনকে দামী আর ভালো পোশাক পরে উপস্থিত হতে কেউ দেখেনি। সব সময়ে তাঁর গায়ে সেই পুরনো স্যুট, দুমড়ানো টুপি, জীর্ণ জুতো। শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্যে প্রায়ই তাঁর জালানির অভাব ঘটত—কিন্তু কেউ কাঠ পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে লেনিন তা পাঠিয়ে দিতেন কোন অসুস্থ সহকর্মীর ঘর গরম রাখার জন্যে। এমন কি, অনেক সময়ে খাদ্যদ্রব্যের অভাবও তাঁর ঘটত। কিন্তু লেনিন বলতেন : আমি জনসাধারণেরই একজন, তারা যেভাবে আছে আমিও সেইভাবেই থাকব, তাদের চেয়ে বেশি সুখসুবিধা ভোগ করার কোন অধিকার আমার নেই।

উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাটার কথা ধরা যাক : যে ঘরে বসে লেনিন সরকারী কাজকর্ম করতেন সেই ঘরে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যে তাঁর টেবিলের নীচে বড়ো এক টুকরো ফেল্টের পাত বিছিয়ে দেওয়া হয়। লেনিন এতে খুশিই হন কারণ টেবিলে বসে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে তাঁর পা দুটো এতো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত যে তিনি কাজ ছেড়ে উঠে খানিকক্ষণ পায়চারি করে নিতে বাধ্য হতেন এবং এর ফলে কিছুটা সময় নষ্ট হত। পরে দপ্তর-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ একজন মন্ত্রিপরিষদের (কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশারস্) নির্দেশে ওই ফেল্ট সরিয়ে সেখানে বিছিয়ে দেয় একটা শ্বেত ভল্লুকের চামড়া। লেনিন এতে অত্যন্ত বিরক্ত হন। মন্ত্রিপরিষদের কাছে তিনি কড়া ভাষায় বলেছিলেন যে দেশের এই দরিদ্র-দশাগ্রস্ত অবস্থায় এ ধরণের বিলাসবাহুল্য খুব অন্যায়।

ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর অনবদ্য ভাষায় লেনিনের যে-প্রতিকৃতি এঁকেছেন, তাতে তিনি বলেছেন,: "নিরহঙ্কার, নিরভিমান, উদয়াস্ত কেবল কাজ নিয়ে ব্যস্ত—কঠোর কঠিন জটিল কাজ।...চিরস্মরণীয় হবার মতো এমন লোক পৃথিবীতে ক'জন জন্মেছেন ?"

পেরকাশ পল্লানের শেষ শিকার

'কলাপী'

ডাক্তারিশাস্ত্রে এটা কোন রোগের পর্যায় ফেলে বে জানি না, তবে ছোটবেলা থেকে পেরকাশ পল্লানকে দেখে এসেছি এইভাবে। তার সারা শরীর দড়ির মত পাকানো আর শক্ত, হাত দুখানা অ্যামিডির একটি বিশেষ কোণের মত করে বাঁকানো। লোকটার বয়স কত দেখে অনুমান করা শক্ত।

ডাক্তারিশাস্ত্রে এভাবে হাত বেঁকে যাওয়াকে কি বলে জানিনা, তবে আমরা জানি, অর্থাৎ আমাদের ধারণা, শুধু আমাদের কেন, এ তল্লাটে সবারই ধারণা ছেলেবেলা থেকে বন্দুক ধরে ধরে পেরকাশের হাতটা অমন বেঁকে গেছে। হাতের রকমটা এই যে, দেখলে মনে হয় সব সময় যেন সে বন্দুক বাগিয়ে আছে, বন্দুকটা অদৃশ্য এই যা।

ধারণাটা অমূলক নয়। কারণ এ' অঞ্চলে শিকারী বলে নাম ডাক তার বহুদিন থেকেই আছে। কোথাও কোন অন্ত-জানোয়ারের উপদ্রব দেখা দিলেই ডাক পড়ে পেরকাশের। আর পেরকাশ নির্বিবাদে কাজটা সেরে আসে বিনা আয়াসে। পেরকাশের হাতে যে শিকার মরে তার একটা বিশেষ সুবিধা আছে, একটির বেশি গুলির অপেক্ষায় তাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না। তেমন বড় রকম কিছু হলে আলাদা কথা। মোট কথা পেরকাশের হাতের টিপ অব্যর্থ আর অমোঘ।

তিন কূলে কেউ নেই পেরকাশের। কাজেই পেরকাশের ঘরের বাঁধন বা বালাই বলতে কিছুই নেই। তাই বলে অজলে সময়ে অসময়ে ঘুরে বেড়ানোতে তার বাধাও নেই। সে যত দূরেই যাক্ বা যে বনেই যাক্ আমাদের গাঁয়ের মায়াটি সে ছাড়তে পারে নি। তাই সে কিছুকাল পরে পরে চলেও ঘুরে-ফিরে তার দেখা পাওয়া যায়।

আমাদের অঞ্চলটাকে আধা বুনো বলা যায় পূবের দিকে পাহাড়ী চড়াই আর পশ্চিমে উপকূলের ঢাল নেমে গেছে। এর মাঝেই চাষবাসের জমি। জমির ফলনে প্রাচুর্যের জন্যেই এ অঞ্চলের মানুষ এমন মাটি কামড়ে পড়ে আছে। শুধু চাষবাসের জমি ছাড়াও ছোটখাট বনবাদাড় এর আশেপাশে বেশ বন হয়েই আছে। এই বনবাদাড়ের আশ্রয়েই অরণ্যচারী জীবদের আনাগোনা। আর আনাগোনা বাড়ে ধান কাটার সময়। পুরানো চাষীরা বলে ধানের গন্ধে গন্ধে বাঘ আসে।

জানিনা ধানের গন্ধে কিনা, তবে বাঘ আসে তা ঠিক। বাঘ যেন আসে তখন শিকারীর ডাকও আসে। তাই পেরকাশ পল্লানেরও ডাক পড়ে যখন বাঘের দেখা মেলে গাঁয়ের আশেপাশে।

সেবার আশ্বিন মাসের শেষাশেষি পেরকাশ পল্লানে ডাক পড়ল। গাঁয়ের শেষ সীমায় পাহাড় ঘেঁসে এক পানের বরোজ। সেই বরোজে নাকি বাঘ ঢুকতে দেখেছে কে।

সারা গাঁয়ে সোরগোল পড়ে গেল। হাতের কা যা পারল নিয়ে ছুটল বরোজের দিকে।

বরোজটা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিরাট। সেই বরোজে ঢুকেছে বাঘ, তাকে খুঁজে পাওয়াই একটা সমস্যা।

পেরকাশ বরোজের কাছে পৌঁছবার আগেই গাঁয়ের তিন জোয়ান ঢুকে পড়লেন বরোজে। হাতে নিল তারা টাঙ্গী আর দা। বরোজের তলায় সাধারণত, বেশি আলো হতে পারে না। কারণ পানগাছের

গোড়ায় গোড়ায় পান-চাষীরা দস্তুর মত মেহনত চালে, কাজেই লোকের যখন যাতায়াত আছে তখন খুব ঘন ঝোপ হবার কথাও নয়।

তিন জোয়ান তো চুকল বরোজে। কথা হল বাঘের দেখা পাওয়া মাত্র তারা যেন জানান দেয়। আর বাইরে সব তৈরী হয়ে রইল লাঠি বল্লম নিয়ে। পেরকাশ তখন এসে পৌঁছায়নি সেখানে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টাও প্রায় কাবার হতে চলল। তবু কোন সাড়া-শব্দ নেই। কেমন সন্দেহ জাগল সকলের মনে। ভাল করে দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি?

এবার আরো পাঁচজন তৈরি হল বরোজে ঢোকার জন্য। আঁট-সাঁট মালকোঁচা মেরে কেউ লাঠি কেউ বল্লম নিয়ে এগুতে গেল বরোজের দিকে, এমন সময় পেছন থেকে আওয়াজ এল, 'হেই হোসিয়ার—'

সবাই তাইল পেছনে, ওদিকে আবার হাঁক দেয় কে? ফিরে দেখে পেরকাশ পল্লান এসে গেছে, একটা বন্দুকও এনেছে সঙ্গে করে। জোয়ান ক'জন থামল। সবার মুখেই একটা স্বস্তির ভাব, যাক এতক্ষণে আসল লোকটা এলো।

পেরকাশের কানে আগেই গেছে কথাটা—তিনজন বরোজ থেকে এখনো ফেরে নি। তাই নূতন করে ঢুকতে যাচ্ছিল যারা তাদের বাধা দিল সে।

তারপর তার প্রস্তুতি শুরু হল। যারা তৈরি হয়ে ছিল বরোজের মধ্যে ঢোকবার জন্যে, তাদের সে পাঠাল বরোজের চারপাশটা দেখে আসতে, আর কোথাও বেরুবার পথ আছে কিনা এই মুখটা ছাড়া।

তারা ঘুরে এসে খবর দিল, বেরুবার আর কোন পথ নেই।

এবার পেরকাশ পল্লানের তার সারা শরীরে কেমন অদ্ভুত এক শৌর্য ফুটিয়ে তুলল। সেই বাঁকা শরীরটা প্রায় ছিলা-কাটা ধনুকের মত দাঁড়াল। যেন এক আসন্ন যুদ্ধের সেনানায়ক সে।

বরোজের ভেতরে ঢোকার বেড়াটা সরান হল। এবার ধীরে ধীরে বন্দুক সামনে বাগিয়ে ধরে অব্যর্থ শিকারী পেরকাশ পল্লান বরোজের ভেতরে ঢুকল।

বরোজের মধ্যে পানের গাছগুলোতে কেমন এক মেটে রং ধরেছে। সেই রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে একটি বাঘ দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে বাপটি মেরে থাকতে পারে এ সন্দেহ তার হল। তাই সে প্রথম থেকেই খুব সন্তর্পণে এগুলো ভেতরের দিকে।

পানের গাছগুলো সার বেঁধে গাঁথা হয়। সেই সার বরাবর দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অবশ্য তেমন অভ্যস্ত চোখ না হলে তা সম্ভব নয়।

পেরকাশ পল্লান একটি একটি করে সার ঘরে ঘরে চারদিকে কড়া নজর রেখে এগুতে লাগল।

কিছুদূর যেয়ে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটি কালো রংএর ঢিবি। ঢিপটি আশেপাশের গাছপালার সঙ্গে মেলে না। তবে ওটি কিসের ঢিবি? আরেকটু নজর দিয়ে দেখল একটি মেটে হলদে রংএর লেজের ডগা সেটি। ক্রমে লেজের মালিকটিকে পেছন থেকে দেখে ফেলল পেরকাশ পল্লান। এবার তাকে ঘুরে সামনে যেয়ে দাঁড়াতে হবে, নয়ত অব্যর্থ গুলিকে তার মর্যাদা দেওয়া যাবে না। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালেই বাঘটা টের পেয়ে যাবে। কাজেই অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতে হল তাকে।

সে এবার খুঁজতে লাগল মানুষগুলোকে। যে তিনটিকে বাঘ ঘায়েল করল সে মানুষগুলোর লাস কোথায়?

খানিক খোঁজার পর সে দেখতে পেল একটি লাস আধখাওয়া অবস্থায় বাঘটার সামনেই রয়েছে। ব্যাপারটা দেখে পেরকাশ আর সামনে ঘুরে যাবার অপেক্ষা করল না, ঐ অবস্থাতেই পেছন থেকে তাক করে বন্দুক দাগল—'গুড়ুম'।

আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা প্রচণ্ড এক লাফে বরোজের বেড়ার ওপর যেয়ে পড়ল। তারপর বেড়া ডিঙ্গে বরোজের পেছনে একটা টিলার পাশ দিয়ে কেটে পড়ল বাঘটা।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে অনেকেই তখন বরোজের ভেতর ঢুকে পড়েছে। একটু যেয়েই ওরা দেখল বন্দুকের ওপর ভর দিয়ে সেই বৃদ্ধ শিকারী ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের চেহারা রাগে আর দুঃখে কেমন ধরিয়া

হয়ে উঠেছে। সারা গা তার তখনও কাঁপছে থর থর করে। অব্যর্থ শিকারী বলে সে এই অঞ্চলে বিখ্যাত, তার হাত থেকে বাঘটা কেটে পড়ল দেখে সে যেন অপমান সহ্য করতে পারছিল না, এমনি তার মনের অবস্থা।

তাকে এই অবস্থায় দেখে কেউ বিশেষ ঘাঁটাল না। যে তিনজন মারা গিয়েছিল তাদের আত্মীয়স্বজন আর গাঁয়ের লোকেরা মিলে লাসগুলোকে সরিয়ে ফেলতে গেল, এমন সময় পেরকাশ পল্লান আবার হুংকার ছাড়ল—"এই খবরদার!"

সবাই চমকে উঠে লাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখে পেরকাশ তাদের দিকে বন্দুক প্রায় বাগিয়ে ধরেছে। ঘাবড়ে গেল ওরা, ব্যাপার কি? পেরকাশ পল্লান পাগল হল নাকি?

"শালা শয়তান, আমার থেকে পালাবে?".....

পেরকাশের গালাগালি শুনে ওরা একটু আশ্বস্ত হল, যাক বাঘের ওপরই রাগ ঝাড়ছে তাহলে। কিন্তু আবার সেই লাসে হাত লাগিয়েছে অমনি পেরকাশ সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল,—"খবরদার।"

সত্যি সত্যি ভয় পেল ওরা। পাগলের হাতে বন্দুক থাকা বিপজ্জনক। কাজেই একটু একটু করে গাঁয়ের লোকজন পিছু হটে এল। এবার পেরকাশ একটু ধীর-ভাবেই বলে, "লাস উঠিয়ে নিওনা, ও ব্যাটা আবার আসবে। মাচা বাঁধ ঐ লাসের কাছে।"

তাহলে সত্যি পাগল হয়নি সে, বাঘ মারার নেশায় পাগল হয়েছে।

একদল চলে গেল বাঁশ দড়িদড়া আনতে, আরেকদল বরোজের সেই জায়গাটা একটু সাফ্ করে রাখতে লাগল।

এবার পেরকাশ পল্লান ক্ষোভে দুঃখে কেটে পড়ল।

"গাঁয়ের তিন-তিনটে জোয়ানকে ঘায়েল করে, ব্যাটা আমার হাত থেকে পালাল?.....

গাঁয়ে খবর পৌঁছে গেছে। কিন্তু বাঘ পালিয়েছে শুনে, যারা কাঁদছিল তারাও যেন কাঁদতে ভুলে গেল আজকে। অনেকের ঘরে রান্না-বাড়াই বন্ধ হয়ে গেছে ভয়ে, কারো কথা বলার মেজাজ নেই। বাঘ গুলি খেয়ে যখন পালিয়েছে তখন তো ব্যাপার বড় সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। অনেকে মনে মনে চটে গেল পেরকাশের ওপর, কিন্তু পেরকাশ বলেই কেউ মুখ ফুটে কিছু বলল না। অনেক বিপদ থেকে সে এর আগে গাঁকে রক্ষা করেছে।

কেউ বিশ্বাসই করতে চায়নি প্রথমে, কিন্তু বিশ্বাস করতে হল কথাটা শুনে, কারণ তার ব্যর্থতাই তার সামর্থহীনতার চরম সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

সন্ধ্যের মধ্যেই মাচা বাঁধা হয়ে গেল। সেই মাচায় পেরকাশ পল্লান দুজন গাঁয়ের লোককে নিয়ে উঠল সন্ধ্যের একটু পরেই।

পেরকাশের সরঞ্জামের মধ্যে রইল তার সেই দোনালা বন্দুক, কিছু টোটা, আর কড়া তামাকের সরঞ্জাম, আর ক'টা মশাল যা প্রয়োজন হলে জ্বালানো যাবে।

সন্ধ্যে রাত্রিটা প্রায় নিরুপদ্রবেই কাটল। মাঝে মাঝেই সঙ্গের মালসাভর্তি আগুন থেকে দু' দিয়ে টিকে ধরান হচ্ছে, আর তামাক সাজা হচ্ছে, যাতে ঘুম-টুম না পায়। বেশ কয়েক প্রহর রাত কেটে গেল। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে একজনার চোখে প্রায় ঘুমুনি এসেছে। সবে সে একটু আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলতে যেয়ে একটু শব্দ করে ফেলেছে অমনি পেরকাশ তার মুখটা বজ্র-মুঠিতে চেপে ধরল। সে তখন যায় আর কি।

মুঠি আলগা হতে তার চোখ পড়ল নীচে। তখন তার নজরে এল সেই ভাঙা বেড়ার ফাঁকে দুটি জলন্ত কয়লার টুকরো। সঙ্গে সঙ্গে সে মালসার ওপর একটা কলাপাতা চাপা দিয়ে আগুনের আভাটা কমিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ সেই জলন্ত কয়লার টুকরো দুটো আর নজরে পড়ল না, আবার সব নিঝুম নিথর। অল্প হাওয়ায় দু' একটা গাছের পাতা খসে পড়ার আওয়াজ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

বাঘের শয়তানির শেষ নেই। তিনজনই জাগতে প্রহর গুনছে, কখন কোন ফাঁক দিয়ে এসে ঢোকে তার ঠিক নেই। বাঘের শয়তানিও যেমন লোভও তেমন। তাই তারা নিশ্চিত হয়ে আছে—ও বাঘ লাসের কাছে আসবেই আসবে।

শেষপর্যন্ত আবার দেখা দিল সেই জলন্ত চোখ জোড়া। ঘুটঘুটি অন্ধকারের মধ্যে সব ডুবে গেছে, শুধু ভাসছে একজোড়া ভয়ঙ্কর চোখ। চোখ দুটি ক্রমে মাচার খুব কাছে চলে এল। পেরকাশ ততক্ষণে বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল রেখেছে টেপবার অপেক্ষায়।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

যার হাতের কাছে আগুনের মালসা ছিল তার কেমন অসাবধানতা লেগে মালসা উল্টে পড়ে গেল মাচা থেকে। পড়বি তো পড় একেবারে সেই বাঘের সামনে। বাঘ তখন বিকট আওয়াজ তুলে সেই ভাঙা বেড়াটার দিকে দিয়েছে লাফ। পেরকাশের বন্দুকও তখন সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল—'গুড়ুম'।

নিস্তব্ধ রাতের মধ্যে বাঘটা বেশ হড়মুড় করেই সেই টিলাটার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। বেশ স্পষ্ট শোনা গেল তার চলে যাওয়ার আওয়াজ।

পেরকাশ পল্লান এবার সত্যি সত্যি আতঙ্কিত হল একটা চিন্তায়। গতবার পেছন থেকে বাঘকে তাক করে কিছুই বিশেষ করতে পারে নি, কিন্তু এবার বাঘ যে একটা মোক্ষম গুলি খেয়েছে তা তার চলে যাবার ভঙ্গিতেই টের পাওয়া গেল। তাই এবার কেমন ভয় ধরে গেল সবার। এ বাঘ তো বেশ কয়েকজনকে ঘায়েল করবে বলে মনে হয়।

পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের লোক ভেঙে এল বয়োজ্যেষ্ঠ কাছে, কি হল জানতে। রাত্তিরে সবাই বন্দুকের আওয়াজ, বাঘের গর্জন সবই শুনেছে। সবার ধারণা, নিশ্চয় এক বিরাট বাঘ দেখা যাবে, কারণ পেরকাশ যেখানে শিকারের দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে অন্যরকম কিছু দেখা যায় নি। কিন্তু যেই শোনা গেল বাঘ পালিয়েছে গুলি খেয়ে তখন সবারই বাঘ দেখার উৎসাহ জল হয়ে গেল। কেউ আর বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করল না, যে যার গাঁয়ের দিকে, ঘরের দিকে চলে গেল এবং যেতে যেতে পেরকাশের প্রায় চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গেল।

"বাপু বুড়ো হয়েছো তো শিকারের সখ কেন, এখন ক্ষ্যান্ত দেও না……"

পেরকাশ পল্লানের কানে কথাগুলো পৌঁছতে সে যেন মরমে মরে গেল।

গাঁয়ে গাঁয়ে রাতের বেলায় মশাল জ্বালিয়ে হৈ হৈ করে পাহারা দেওয়া শুরু হয়ে গেল, কি জানি কোন্ ফাঁকে বাঘ এসে যায় এই ভয়। বাঘের রোখ বড় সাংঘাতিক, কাজেই কয়েকজনকে না নিয়ে সে শান্ত হচ্ছে না।

পেরকাশের মাথায় ক্রমে এক অদ্ভুত নেশা চাপল। সেই গুলিখাওয়া বাঘকে শেষ করতেই হবে তাকে।

বাঘ যে-পথে গেছে সে-পথে রক্তের দাগ ধরে গিয়েওছিল সে অনেকদূর। যেতে যেতে সে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, সে-বাঘ বেশ জবরকম ঘায়েল হয়েছে। বোধহয় একটা পা'ই তার জখম হয়ে গেছে, কারণ সেই বাঘটা যাবার পথে পা ঘেঁষটে যে চলছে তা বেশ বোঝা যায়।

দু' একজনে পেরকাশ পল্লানের কেমন দিশেহারা উন্মাদের মত চেহারা দেখে একটু সান্ত্বনার সুরে বলতে গিয়েছিল, অমন পাগল হয়ে গেলে চলবে কেন, সময় মত খাও দাও, তারপর একদিন না একদিন সে ব্যাটা আসবেই এখানে, তখন দেখা যাবে আবার।

কিন্তু কথাগুলো যেন ঘিয়ে ঘি ঢালা হল। পেরকাশের সেই আহার-নিদ্রাহরণকারী বাঘ-মারার চিন্তা আর গেল না। দিন নেই রাত নেই সে বনবাদাড়ে আর পাহাড় অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, যেন ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজেখুঁজে ফিরছে, এমনি তার মনের অবস্থা।

ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার প্রায় দিন দশ পরের কথা।

পেরকায় পল্লান প্রায় দিন দুই হল গাঁ ছেড়েছে এখনও খবর নেই। একদল কাঠুরেই প্রথমে খবর দিল পেরকাশের। খবর পেয়ে গাঁ থেকে প্রায় জনবিশেক লোক গেল তার খোঁজে।

কাঠুরেরা আগুন জ্বালিয়ে যেখানে রাত কাটাচ্ছিল তারই অনতিদূরে তারা শুনতে পেয়েছিল পেরকাশ পল্লানের গগনভেদী চিৎকার—'হেই হোসিয়ার'। তারই পাল্টা দিয়ে বাঘের ডাকও শুনেছিল তারা। কিন্তু ভরসা করে ঐ ঘন অন্ধকার বনে তারা কেউ এগোয় নি। তাছাড়া অস্ত্র বলতে প্রায় কিছুই ছিল না তাদের।

শেষপর্যন্ত বন্দুকের আওয়াজও নাকি ভেসে এসেছিল সেই নিথর অরণ্য থেকে। কিন্তু তারা সাহস করে কেউ এগোয় নি।

কাঠুরেদের কাছে এই খবর পেয়েই গাঁয়ের জোয়ানেরা গেল তার সন্ধানে।

পাহাড়টা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বা হয়ে চলে গেছে অনেকখানি। পূবের উপত্যকাকে সমুদ্রোপকূল থেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে এই শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়।

উপত্যকার বনজঙ্গল আরো বেশি ঘন আর বিপদ-সঙ্কুল। মানুষের আনাগোনা খুবই কম। বসতি বলতে কিছুই নেই। বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে শুঁড়ি পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। দিনের বেলাতেই যেতে ভয় ভয় করে। পেরকাশ পল্লান এই অঞ্চলে কোন্ সাহসে যে রাতের বেলা চলা ফেরা করে তা তাদের ধারণা করাই শক্ত। খুব সন্তর্পণে তারা এগুলো চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখে।

কাঠুরেদের আস্তানা ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর চলে এসে ওদের নজরে পড়ল, চারপাশের জংলার লতাজাল-গুলো ছিন্ন ভিন্ন। ছোট ছোট আগাছার ঝোপগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। বেশ বড় রকমের ঝাপটা-ঝাপটি হয়েছে বোঝা গেল।

আরো কিছুদূর এগুতেই একজন চেঁচিয়ে উঠল, একটা বন্দুক পাওয়া গেছে রে।

সবাই কাছে ঘেঁষে দেখে পেরকাশ পল্লানেরই বন্দুক বটে। তবে লোকটা কোথায় গেল? এই গভীর বনে বন্দুক ফেলে গেছে যে-শিকারী সে-শিকারীকে জীবিত দেখার ভরসা কারো রইল না। সবাই দুঃখ করতে লাগল, শেষ পর্যন্ত বাঘের হাতেই শেষ হল পল্লান!

এবার গাঁয়ের সেই বলটি ফিরবে ঠিক করল, কারণ খোঁজার আর কোন অর্থ হয় না। যে বাঘ পল্লানকে নিয়ে গেছে সে আর এ তল্লাটে থাকেনি তাকে। যেখানে বাঘের সাঁই অর্থাৎ বসবাসের জায়গা, সেই আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছে নিশ্চয়।

আশেপাশে বাঘের যা চিহ্ন পেল তাতে মনে হল বাঘটাও কম জখম হয়নি। হঠাৎ একজনার মাথায় কেমন একটা ভাবনা খেলে গেল, আরেকটু খুঁজে দেখলে হয়ত বাঘটাকে পাওয়া যেতে পারে। কারণ যেখানে-যেখানে বাঘের চিহ্ন ছড়ান সেখানে-সেখানে রক্তের ছড়াছড়িও খুব বেশি।

আরেকটু হৈ-হাই করে খোঁজা শুরু হয়ে গেল, কিন্তু পদে পদে ভয় রইল কোন আহত বাঘের খপ্পরে না পড়তে হয়। আরো একটু ভেতরে ঢুকে দেখা গেল বিরাট এক হাড়গোড় বাহুরের মত কেঁদো বাঘটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটা কচিকারী ঝোপের পাশে। তারই অদূরে পেরকাশ পল্লানের ছিন্ন-ভিন্ন নিথর দেহটাও রয়েছে। এই অবস্থাতেই দেখা গেল পেরকাশের হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রয়েছে একটা রক্তাক্ত ছা। খুশল সবাই শয়তানকে শেষ করতে পেরকাশ তার জান কবুল করে লড়েছে। নিজের শিকারী মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেও পেরকাশ পল্লানের শেষ-শিকারের শিকার হল সে নিজেই।

আর্থিক প্রসঙ্গ

১৯৫৯-৬০—শিল্প-বাণিজ্যের খতিয়ান

মন্ত্রমুখর

ভারত সরকারের শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি দ্রুততর হারে হয়েছে—১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায়। রপ্তানী বাণিজ্যে আয়-বৃদ্ধিটাও লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া, যন্ত্রশিল্পের বিস্তার এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিকল্পনায় হাত দেওয়াও হয়েছে বেশ। বিদেশী মুদ্রার এই সঙ্কটকালেও শিল্পবাণিজ্যের এই শ্রীবৃদ্ধি খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক ব্যাপারটা।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের প্রথম ১০ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে তার সূচক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৩—অর্থাৎ ১৯৫১-র তুলনায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ঐ সময়ের তুলনায় এ বছর ১০·৬ পয়েন্ট বেড়েছে। তার আগের বছর মাত্র ২ পয়েন্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু এই সূচক সংখ্যার আওতায় পড়েনি এমন বহু নতুন শিল্প আছে—যাদের শ্রীবৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য। এরা প্রায় সবাই ১৯৫১-র পর জন্মেছে—যেমন পেনিসিলিন শিল্প। তাছাড়া সূচক সংখ্যা তৈরির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে—সেন্সসের কয়েসাজিতে ঠিক ঠিক অবস্থাটা ধরা পড়ে না। যাই হোক, মোটামুটি হিসেবেই আমাদের চলবে।

দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত সময়ে মূলধন পর্যায়ের পণ্যের উৎপাদন যেমন বেড়েছে—তেমনি বেড়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ের পণ্যের উৎপাদন। মূলধন পর্যায়ের পণ্য বলতে বোঝাতে চাইছি মোটরগাড়ি, ডিজেল ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। অর্থাৎ যাদের অবলম্বন করে অন্য শিল্পপণ্য উৎপাদিত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিল্প-পণ্য বলতে বোঝাতে চাই লৌহ ও ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ম, সোডা অ্যাস, সুপারফসফেট, সিমেন্ট, কাগজ, বোর্ড প্রভৃতি। এবং অন্য শিল্পপণ্যের কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এই সমস্ত শিল্পপণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির চেহারা দুরকম—অনেকের উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পুরো উৎপাদন হতো না—তারা এবারে পুরো উৎপাদন করছে। আর অনেকের মোট উৎপাদন ক্ষমতাই বাড়ানো হয়েছে।

ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে বিবিধ ফললাভ হয়েছে। সেলাইয়ের কল, ইলেক্ট্রিক ফ্যান্, রেডিও সেট, সাইকেল প্রভৃতিতে যেমন প্রভূত উন্নতি হয়েছে—তেমনি চিনি, চা ও লবণ শিল্পে হয়েছে অবনতি।

মোটামুটি চিত্র যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এটুকু স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতীয় শিল্পজগতে বিরাট এক পরিবর্তন এসেছে এবং আরো আসছে। তার সামগ্রিক চেহারাই পাল্টে যাচ্ছে দ্রুততালে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতিই এই যুগান্তর এনেছে। সঙ্গে আছে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, স্থাপত্য ও পূর্তশিল্প এবং রাসায়নিক পণ্যশিল্প। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিমূল এদেরই ওপর রচিত হবে। যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতিও এবছর রেকর্ড সৃষ্টি করেছে—তার মধ্যে চিনির কল সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিই উল্লেখযোগ্য। ফলে মূলধন পর্যায়ের পণ্য আমদানী যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। হিসাবটা এইরকম :—

ইস্পাতের নল, রেল, বীম্ প্রভৃতি প্রায় ২৷৷০ লক্ষ টন; ডিজেল ইঞ্জিন ৩০ হাজারটি, বল বেয়ারিং ২০ লক্ষটি, মোটরগাড়ি ৩৪ হাজার, ইলেকট্রিক মোটর ৬ লক্ষ অশ্বশক্তি সম্পন্ন, পাওয়ার ট্রান্সফর্মার ১০ লক্ষ কিলো-ওয়াট শক্তিসম্পন্ন। এসব ছাড়া অ্যালুমিনিয়ম, তামা ও ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর উৎপাদন বেড়ে পৌঁছেছে যথাক্রমে ১৬ হাজার, ৭৷৷০ হাজার ও ৬০ হাজার টনের কাছাকাছি।

সরকারী প্রযোজনায় শিল্প সংস্থার অগ্রগতিও বেশ

পঞ্চাশীয়। ভূপালে নির্মীয়মান ভারী বিদ্যুৎশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাঁচীর ভারী যন্ত্রপাতির কারখানা দুটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এরা তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকারিতাকে প্রভূত সহায়তা করবে। বিদেশী আমদানী কমায় বৈদেশিক মুদ্রাও বাঁচবে এতে। প্রথম কারখানাতে ট্রান্সফার্মার থেকে 'এম্'র ইলেক্ট্রিক মোটর পর্যন্ত তৈরি হবে। শেষোক্ত কারখানাটিতে বৎসরে ৮০ হাজার টনের মতো যন্ত্রপাতি তৈরী হবে—যাতে করে অন্তত একটি ইস্পাত কারখানার ১ লক্ষ টনের মতো ইস্পাতের দরটাই এতে ব্যবহৃত হতে পারে। ছোটখাট পরিকল্পনার মধ্যে আছে খনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা ভারী পূর্তশিল্পের কারখানা, ভারী গ্রেট ও ভেসেলস্‌এর কারখানা এবং আরো ভারী ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির কারখানা। এসব ছাড়াও তৃতীয় প্লানের জন্যে থাকবে কয়েকটি সারের কারখানা, ওষুধপত্রের কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা এবং সিনেমা ও এয়ারে ফিল্ম তৈরির কারখানা। ঘড়ি তৈরির একটা কারখানার কথাও শোনা যাচ্ছে।

নতুন নতুন কারখানার পত্তন ছাড়াও বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হবে অনেক কারখানারই। সরকারী কারখানাগুলোর বিস্তার আরো বহু বেসরকারী শিল্পকে সাহায্য করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এটা সহজেই বোঝা যায়। সোজা কথায় বলতে গেলে যে আমাদের বর্তমান শিল্পজগৎ বহুমুখী এবং বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করছে—সামনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

এবারে বৈদেশিক বাণিজ্যের খবর নেওয়া যাক। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপারে যে নিম্নমুখী গতি দেখা গিয়েছিল—সেটা এবারে অন্তর্হিত হয়েছে এবং এব্যাপারে শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। এইপ্রান্তে মোট আয় দেখানো হয়েছে ৬২৬ কোটি টাকা। সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ও ফ্যান রপ্তানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো উল্লেখযোগ্য হল মিলজাত কাপড়, ট্যান করা চামড়া, হাড় এবং চামড়ার দ্রব্য। ১৯৫৯-এর আমদানীর পরিমাণ ৮৬৯ কোটি টাকার মত—১৯৫৮তে সেটা ছিল ৮৬৪ কোটি। বোঝা যাচ্ছে আমদানীর ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াকড়ির সুফল ফলেছে। সেইসঙ্গে রপ্তানী বাড়াবার জন্যে বিশেষ ঋণ দেওয়াতেও লাভ হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে কিংবা কড়াকড়ি হ্রাস করে রপ্তানী বাণিজ্যের সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিদেশী বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভ এবং কাঁচা মাল আমদানীর সুবিধেও করে দেওয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করেও বহির্বাণিজ্যের খুবই উন্নতি করা হয়েছে। একথা ঠিক যে কোনো দেশের আভ্যন্তরীন উন্নতির ছাপ তার বহির্বাণিজ্যের ওপর পড়বেই। তবে এর জন্যে চাই পরিমিতি জ্ঞান, নিষ্ঠা এবং সততা। বহির্বাণিজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের বাজারেও দেশের মাল বাড়ে বা কমে। স্থায়ী উন্নতি ওদিকে হলে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিও স্থিতিশীল হতে বাধ্য।

গত চৈত্র সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছিলাম, তার কিছুকিছু এই প্রসঙ্গেও বলতে হচ্ছে। (ঐ আলোচনা অনবধানতা বশতঃ একটি ভুল থেকে গিয়েছিল। "সুদ সমেত প্রাইজবণ্ডের মূল টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে—ওটা পড়তে হবে—"সুদ বাদে…"।) অনেক সম্প্রসারিত শিল্পের ওপর নতুন, আবগারী শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ার নিন্দা করেছিলাম। কারণ এর ফলে সেই সমস্ত শিল্পের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা উপস্থিত হচ্ছে। সাইকেল, ফ্যান প্রভৃতির ওপর প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ করবৃদ্ধি—নিশ্চয়ই বিদেশে প্রতিযোগিতার পক্ষে অন্তরায় হবে। একই কথা খাটে ইলেক্ট্রিক মোটর, মোটরগাড়ি, অ্যালুমিনিয়ম দ্রব্যাদির বেলাতেও। এই সমস্ত কর বাবদ আদায় হবে মাত্র ২৩॥ কোটি টাকা—অথচ মোট ঘাটতি ২১৭ কোটির তুলনায় এতো সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের তুল্য। ১৪৩॥ কোটি টাকা ঘাটতি তবু রয়েই যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের সহজ ও নিশ্চিত পথ পরিত্যাগ করে পানা-ডোবার ধার দিয়ে চলাটা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অর্থমন্ত্রী এই কথাটাই বুঝছেন না।

শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের রিপোর্টে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলোর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে যথোপযুক্ত পরিমাণে টাকা বাজার

সরকারগুলোর হাতে দেওয়া হয়েছে—তাদের পরিকল্পনা-গুলোর শতকরা ৯৬টিই বাস্তবে রূপায়িত করা হচ্ছে। আমরা অবশ্য তার ফল প্রত্যক্ষ করছি না বিশেষ কিছু।

রিপোর্টে কোম্পানী আইন পরিচালন বিভাগের কথাও বলা হয়েছে। ১৯৫৯-এর প্রথম দশ মাসে কোম্পানী আইন ভঙ্গের অপরাধে প্রায় হাজার আড়াই অভিযোগ দায়ের করা হয়—প্রায় সাড়ে ছ'শো কোম্পানীর বিরুদ্ধে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিশেষ শাখা এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। বেসরকারী কোম্পানীর পঞ্জীভুক্ত বা রেজিষ্ট্রেশন হয় ১২৮৪টির এবং তাদের অনুমোদিত মূলধন হল ১৫৯ কোটি টাকা। ১৯৫৮র তুলনায় সেটা সন্তোষজনক বলতে হবে—কেননা সে বৎসর নূতন কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৯৪৩ এবং মূলধন ছিল ১৫৬ কোটি টাকা। সরকারী কোম্পানী ১৯৫৯-এ চালু হয় ১৮টি (প্রথম ১১ মাসের হিসেবে)—এবং এই নিয়ে তাদের মোট সংখ্যা হল ১১৩টি। এদের মোট আদায়ী-কৃত মূলধনের পরিমাণ হল ৪৪০ কোটি।

এই হল গত বৎসরের আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সরকারী চিত্র। এর বাইরে খবর বিশেষ কিছু পাই না বলে অন্য কিছু বলাও সম্ভবপর নয়। জন-সাধারণ অবশ্য সঠিক বুঝতে পারছে না কতদূর উন্নতি হল—কারণ হাতে-হাতে ফললাভ তাদের কিছু হয় নি। তবু আমরা কৃষিপ্রধান দেশ থেকে ধীরে ধীরে শিল্প-প্রধান দেশে রূপান্তরিত হতে চলেছি—তাতে ভুল নেই। যদিও সে এখনো বহু দূরের পথ। আসলে জমির উপর অত্যধিক লোকসংখ্যার চাপ কমানোর বিশেষ প্রয়োজন। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি বস্তুতঃ সেই কাজটিই করছে। ভারতীয় অর্থনীতির সেটাই একটা বিশেষ দিক। ভবিষ্যতের পানে আশায় আশায় চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আমরা আর কী-ই বা করিতে পারি এখন!

সংগীত

ঝুমুর গান

চিত্তরঞ্জন দেব

বাংলায় ঝুমুর গান সাধারণতঃ গাওয়া হয় রাধাকৃষ্ণের মিলন যাত্রা উপলক্ষ্যে। তাই এর গানগুলিও প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা নিয়েই রচিত। কিন্তু পণ্ডিতগণের মতে ঝুমুরের উৎপত্তি হল সাঁওতালী গান থেকে। ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা জেলার আদিবাসীদের ভিতর মাদল ও বাঁশীর সঙ্গে এক প্রকারের গীত আছে তার নাম ঝুমুর। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে ছোট নাগপুর ও পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত আদিবাসী সমাজে এই ঝুমুর গান প্রচলিত। তবে সাঁওতাল জাতির একাংশের মধ্যেই এ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বলে মনে হতে পারে। তবে সাঁওতালী ঝুমুর গানগুলি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মানভূমের বাংলা ঝুমুর মোটেই সংক্ষিপ্ত তো নয়ই, বরং অনেক জায়গায় দীর্ঘ বলেও মনে হতে পারে। বীরভূমের ঝুমুর মানভূমের ঝুমুরেরই অনুরূপ। মানভূম আর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম বা পশ্চিম বর্ধমানে যে ঝুমুর প্রচলিত তার ভিতর পার্থক্য অতি সামান্যই।

সাঁওতালী ঝুমুর সাধারণতঃ গীত হয় মাদল এবং বাঁশী সহযোগে একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মানভূমের বাংলা ঝুমুরে, বীরভূম, বাঁকুড়ার মতই খোল, করতালও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় কীর্তনের সুরও বেশ পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাংলার ঝুমুর গান রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা নিয়ে রচিত হলেও যে কোন লৌকিক বিষয় নিয়েই ঝুমুর গান রচিত হতে পারে। তবে প্রেম-ভালবাসার বিষয়ই এর ভিতর প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। পণ্ডিতগণের মতে সাঁওতালী ঝুমুরের প্রেম ও ভালবাসার গীতই বাংলার সীমানায় প্রবেশ করে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে স্বর্গীয়তা লাভ করেছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে কোন লৌকিক বিষয় নিয়েই ঝুমুর গান রচিত হতে পারে, সুতরাং এর ভিতর শুধুমাত্র প্রেম ভালবাসার কথাই নয়, অনেক সময় সামাজিক, রাজনৈতিক খবরাখবরও পাওয়া যায়। ব্যঙ্গ গীতিও এর থেকে বাদ যায় না। অবশ্য এই ধরণের গান বেশীর ভাগই মানভূম অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

ঝুমুর গানকে আমরা মোটামুটিভাবে ভাদরিয়া, সিঁদুরিয়া ও অন্যান্য এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। তা ছাড়া কাজের সুবিধার জন্য আমরা আদিবাসীদের ঝুমুর ও সাঁওতালী ঝুমুরকে পৃথকভাবেও দেখাতে পারি। কিন্তু যে হেতু ঝুমুর লোককবিদেরই রচনা, এ গান যখন হয় তখন এক্ষেত্রেই সকলে বসে রস আহরণ করে সেই হেতু আমরা আর সে চেষ্টা না করে একত্রই উপস্থিত করছি। বাংলা ঝুমুর পদ-কর্তাদের ভিতর মানভূমের ভবপ্রীতানন্দ, গৌরাঙ্গী, রামচরণ ও ভরতের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এঁরা ছাড়াও অনামী পদকর্তাদের সংখ্যা যে কত তা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়।

মনে করা যাক শ্রীরাধিকা আজ অগুরু চন্দন দিয়ে সেজেছেন। সোনালী পালঙ্কের উপর রেশমী শাড়ী পরে গলায় দুলিয়ে কুসুম হার চোখে দিয়ে মায়া-অঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ দরশন আশায় বসে আছেন। এমন মেঘলা যামিনী শূন্য বিছানায় কেমন করেই বা তিনি রাত কাটাবেন?

আঁধারি তাদের রাতি, দেখিয়া তড়পে ছাতি
পতি নাহি পালঙ্কের উপর।
(সখীরে প্রাণ রহে মদনের শরে)।
একে তো অবলা বালা দোসরে যৌবন জ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য ঘরে।
(সখীরে প্রাণ রহে মদনের শরে)॥

শুন শুন সহচরী তো-দিগে বিনয় করি
বাঁচাও আসিয়া সে নাগরে
(সখীরে প্রাণ পরে মদনের শরে)।

ঠিক এই ধরণের গান আদিবাসীদের ভিতরও শোনা যায়। কোন যুবতীর প্রাণপতি সেই ভোরে মোরগ ডাকবার সাথে সাথেই টাঙ্গি ঘাড়ে নিয়ে পাতার তৈরী বিড়ি টানতে টানতে কাজে চলে গেছে। এখন অনেক বেলা হয়েছে, ভাত খাবার সময় হয়েছে এখনও সে ফিরে আসছে না, কে জানে কোথায় গেছে তার প্রাণ বঁধু :—

টাঙ্গিয়া স্কন্ধকায়ে লাগর যাছন্ গো।
বাইরলেন কুঁকড়ী (মোরগ) ডাকে
সোজা গেলেন কুলীর বাটে
চুটিয়া ফুঁকিয়া গো।
ভাত খাবার বেলা চল্যা
এখনো লাগর না আইল
কোন্ বাটে কেই যাছেন গো
মহুল বনে গো ;

মানভূমের পল্লীর মধ্যে বেদিয়া, মাঝি, মাহাতো, ভূঞা বেদব আদিবাসীদের বাস আছে উপরোক্ত গীতটি ঐ শ্রেণীর কুমার-কুমারীদের গাইতে শোনা যায়। এসব গান প্রেম-ভালবাসার গান বলেই পরিচিত। উপরোক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে দু' চারজন অবিবাহিত যুবক থাকে। মাথায় তারা বাবরী চুল রাখে। বাঁশী বাজায়। কিশোরীদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়। এদের বলে 'রসকা', 'রসিক' বা 'রসিয়া'। স্থানীয় লোকে রসিয়াদের সঙ্গে কিশোরীদের প্রেমপ্রীতি ঘনার চোখে দেখে থাকে। উপরোক্ত গীতটি যদি আর একটু সুসংস্কৃত হত তা হলেই বাংলায় এসে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধিকার স্বকীয়োক্তি বলে বর্ণনা করা খুব বেশী অসম্ভব কাজ হত না।

রাত্রির তৃতীয় যাম অতিক্রান্ত প্রায়। শ্রীরাধিকা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ 'দরশন বিনে'। জগৎ সংসার সবই তার কাছে নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে। বাইরের আকাশে বর্ষার মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে পূর্ণচন্দ্রের অকৃপণ জ্যোছনা। বন-প্রান্তর মুখর হয়ে উঠেছে সেই আলোর জোয়ারে। কুঞ্জে কুঞ্জে ডেকে উঠল কোকিল। কিন্তু সে কী শুধু শ্রীরাধার মনে ব্যথা জাগাবার জন্যই? এমন যে চাঁদনী রাত সবই কী বিফলে যাবে? প্রাণ বঁধু কি সত্যিই আর তার আসবে না :—

হের সহচরী যায় বিভাবরী
এলো না কপটের মূল রে।
কোকিল কুহরে, বিঁধিছে অন্তরে
মদনে বিরহ শূলরে।
এলোনা ত্রিভঙ্গ শ্যাম পরাণ আকুল রে।
সুমধুর স্বরে, ভ্রমর গুঞ্জরে
কুঞ্জে চুমি নব মুকুলরে।
সুধাকর কর অনল প্রখর
গরল ভেল তাম্বুল রে।
অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন
সাপিনী নিল দু'কুল রে।
কণ্টক সমান শয্যা অনুমান
দহিছে কুঞ্জ মঞ্জুল রে।
মরি যায় ভরে, সে মজিল পরে
পরপ্রেমে প্রেমাকুল।
ভবপ্রীতা গুণে মানস দর্পণে
হেরি সে রূপ অতুল।

শ্রীরাধিকার মনের অবস্থা যখন এই রকম, কুসুম শয্যা যাঁর কাছে কণ্টক শয্যা, কোকিলের ডাক কাকের ডাকের মতই কর্কশ রূঢ়, অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক দংশন সদৃশ, সখী ললিতা তখন সহজ সরলভাবে শ্রীরাধিকার মনের এই ভাবকে অবলম্বন করে বলতে থাকে :—

ঝিঙাফুলে শিলেক জাতি কুল গো
পিরীত হৈল শূল।
বর্ণ ছিল চাঁপার কলি
ভাইবে ভাইবে হলাম কালি
কালার এ পিরীতি আমার
ডুবাল দু' কুল।
(গো পিরীত হৈল শূল)।
একে আমার জীর্ণ তরী
তায় চাইপাছেন বংশী ধারী

মাঝখানে লাগিয়ে তরী
দুখানি দু' কূল
(গো পিরীত হৈল শূল)॥

এই ধরণের গান বীরভূমের ঝুমুরিয়াদের ভিতরও শোনা যায়:—

কালার গুণের কথা
বলবো চোরে কি তা,
বলবো কি বল শ্যামের ভারে
জলকে যাই ছল করে
যমুনার ওই তীরে
কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে
মনচোরা নামটি ধরে বেড়ায় ঘুরে—
আবার ও কদম তলায় চুপটি করে
বসে থাকে গোপিনীদের বসন হরে
কালো শশী বাজায় ব শী
সকল কাজে সকাল সাঁঝে
প্রাণ আমার হায় হয় উদাসী
মন বসে না আর ঘরে।

চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। রাত্রি অবসানের আর বড় বেশী বাকী নেই। এখনও সেই 'নিঠুর কালিয়া' দেখা দিল না—এ যাতনা কি প্রাণে সহ্য হয়? তারত এখন জীবন-মরণ সবই সমান। আর একটু পরেইত পূর্বাকাশে লোহিত-ভানুর উদয় হবে, মুখর হয়ে উঠবে বিশ্বচরাচর। নিষ্ফল হল শ্রীরাধিকার বাসরসজ্জা। মনের আক্ষেপে সহচরীদের উপর কঠোর আদেশ জারি করলেন যদি নিঠুর কালিয়া আর কখনও আমার কুঞ্জ-দ্বারে আসে তাহলে তাঁকে যেন দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়—

হেরলো সজনী ভেল প্রভাতী
শীতল সমীরে শিহরে অতি
ধেনু তরুপতি ডাকিছে বিহঙ্গ জাগিয়া।
সুন্দর সিন্দুর রাশিলো যেমন,
শ্যামাঙ্গী বসুধাসীমান্তে শোভন
অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়া॥
এখনও না এলো কালিয়া
লম্পট বর মালিয়া॥
সরোবরে যায় কুলবালাগণ,
নিশা জাগরণে অলস নয়ন
চকল চরণ ঘুম ঘোর যায় টলিয়া।
ভ্রমর নিকর মধুপান তরে.
নলিনী কানন অন্বেষণ করে
গুন্ গুন্ স্বরে মন প্রাণ লয় কাড়িয়া॥
অস্তাচলে যায় রজনী রঞ্জন
কুমুদিনী করে নীরবে রোদন
যায় আঁখিনীরে নিশির শিশির ভাসিয়া।
চকোর চকোরী বসি দুখে মনে
চক্রবাক সুখী পিয়ার মিলনে
পতি দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া॥
যাও সহচরী থাক যায় দেশে
যদি সে কপট আসে নিশা শেষে
বলিও সরোষে 'যাও হেথা হতে চলিয়া'।
যায় ভাল তবু থাকে কিছু মান,
নহে প্রতিশোধ করো অপমান
নহে সুবিষানে কহে ভব প্রীতা ভাবিয়া॥

এদিকেত রাই কমলিনীর এই অবস্থা। ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাটাও একটু ভাবুন। তিনি আজ রাধার কুঞ্জে আগমন কালে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে আটকা পড়েছেন, আজ আর তার নিস্তার নেই।

চন্দ্রাও কম যায় না। সেও বহুদিন আড়ি পেতে থেকে থেকে আজ নিজ বাহুপাশে বন্দী করেছে নিঠুর কালিয়াকে। কাজেই—তারপক্ষে বলা নিশ্চয়ই আর অসম্ভব নয়—

শ্যামকে রাখিব আদরে হে
হৃদয় মাঝারে॥ (ধু)
হেরি ও মুখচন্দ
লোকে বলে ভালোমন্দ
প্রাণনাথ বিনা আমি যাব কোথা বলরে।
(সখী) আমি যাব কোথা বলরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে হে। (ধু)
কালার এ পিরীতি জ্বালা
আমার প্রাণে দেয় জ্বালা
হৃদয়ের আলো কালারে আনিয়া দেরে।

(তোরা) কালারে আনিয়া দেরে।
(সখী) কালারে আনিয়া দেরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে (হে) (ধু)।

শ্রীকৃষ্ণ এবার বেজায় জব্দ হয়েছেন। চন্দ্রাবলীর কাছে অনুনয়-বিনয় করে কোন ফলই হল না। নিশি-যাপন তাঁকে করতেই হল চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। নিশাবসানে অতি ভক্ত গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীরাধিকার কুঞ্জ দ্বারে—

গত বিভাবরী নেহারি শ্রীহরি
পরিহরি নব কামিনী
আসি রাধা দ্বারে সভয়ে নেহারে—
কাছে বৃন্দা যার বাসিনী॥

শ্রীকৃষ্ণ একবার চারিদিক দেখে নিয়ে চুপি চুপি এগোতে চেষ্টা করলো রাধাকুঞ্জের দিকে। কিন্তু রাধা-সখী বৃন্দা তো কম পাত্রী নন। লোককবি ভবপ্রীতানন্দ এবার শুধু বাংলা কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা ও হিন্দির সংমিশ্রণে গীত রচনা করে শ্রীকৃষ্ণকে চোর বলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। পাঠকবর্গ এইবার একই সংগে দুটো জিনিস লক্ষ্য করুন। একটা হল লোককবিদের বদভ্যাস, অন্যদিকে যেহেতু হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলেও (মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত) ঝুমুর গানের প্রসার রয়েছে সেই হেতু কবি হিন্দী-ভাষীদের জন্যও কিছু কিছু ঝুমুর গান রচনা করেছেন। শোনা যায় ভবপ্রীতানন্দের প্রায় অধিকাংশ বাংলা ঝুমুর গানই হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে।

বৃন্দা ত শ্রীকৃষ্ণকে বলে বসলেন, কে বাবা এই শেষ রাত্রে সিঁদকাটি হাতে দিয়ে চুরির মতলবে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছ। তোমার মতলব ত বিশেষ ভাল বলে মনে হচ্ছে না। যাওনা বাবা যেখানে রাত কাটিয়ে ছিলে সেখানেই। তুমি বাপু খুব সুবিধার লোক নও কিন্তু—

কৌন্ হো তুম্ নেহি কুছ মালুম
ইধর কাঁহাসে আতো হো ?
যার সে মাল চোর সে মালা
আধ মুখড়া দেখলাতে হো।
হট্ যাও জী বংশীবালে
কাহাকে অন্দর আতে হো ?
কাহে লাঠি ক্যা সিধ কাঠি
হাতমে ক্যা দেখলাতে হো !
রাই রাজাকে ধন হরনেকে
চোরি মতলবলাতে হো
রাত কিয়া রং পরনারী সংগ
ভোর কিয়াপর আতে হো ;
পাহিরণ কালা বরণ ভি কালা
নয়ন ভাখ দেখলাতে হো।
রাত জাগরণ তাকে কারণ
লাল আঁখ চমকাতে হো,
রাতকা ডেরা যানা তোরা
বেহতর হুকুম বহলাতে হো !
ভবপ্রীতাচিত্ হরিপদ সে প্রীত
দুসরে সে কোঁ ভুলতে হো।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন আমি কেন চোর হতে যাব ? আমি খুব ভাল লোক গো। হাতে দেখছ এত মোহন বাঁশী আর এই যে কপালে সিঁদুরের দাগ দেখছ এ হল দেবী ভগবতীর পুজো করতে গিয়েছিলুম কিনা, তাইত সিঁদুরের দাগ লেগেছে, আর বুকে যে ক্ষত চিহ্ন দেখছ এ হল দেবী পূজোর জন্য পদ্ম ? ফুল তুলতে গিয়েছিলুম সেই পদ্মের কাঁটার ঘায়ে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আর নীল রঙের কাপড় পরেছি কেন এই কথা জিজ্ঞেস করছত ? তা দেখ, রাত্রে কাপড়ের রং বাপু ঠিক করে উঠতে পারিনি। সত্যিই তাই আমি চোরও নই বা বদমায়েসও নই, পক্ষান্তরে তোমার সখী শ্রীরাধিকারই একান্ত অনুগত ভক্ত—

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
চিনিলেন সহচরী• আমি রাধার প্রহরী
দ্বারে থাকি ঘরে আসি চাল
মোরে চোর•বল কি জঞ্জাল॥
সিঁদকাটি নয় রসনী করেতে মোহন বাঁশী
রাধা নামে সাধা সন্ধাকাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
করিতে দেবীর পূজন করি কমল চয়ন
(তাই) কাঁটাঘাগ হৃদয়ে বিশাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।

পূজে ছিলাম ভগবতী তাহার প্রসাদে যুতী
সিঁদুর কজ্জলে মাখা ভাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥
অভিসারে নীল বাস আঁধারে নহেকো প্রকাশ
(তাই) পথ ভুলে এমন বেহাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥
ভব শ্রীভানন্দ ভনে, বেলে হৃদি বৃন্দাবনে
তাই কাঁটাদোগ হৃদয়ে বিশাল ॥

কিন্তু তবী ভুলবার নয়। বৃন্দাদূতী যদিবা কোন-রকমে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল তার বাক-চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে কিন্তু শ্রীরাধার সেই ধনুকভাঙ্গা পণ, কালো বরন আর হেরবো নাগো।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। নিজের দোষ খালনের জন্ত অনেক কাহিনীরই অবতারণা করলেন, কিন্তু না শ্রীরাধা সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইলেন আর এদিকে ফিরেও তাকালেন না।

বেচারী শ্রীকৃষ্ণ! মনের দুঃখে ফিরে গিয়ে সখা সুবলের কাছে প্রকাশ করতে শুরু করলেন তার মন বেদনা—

ধঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়
(সখী) বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়।
দেইখ্যে'ছি তায় পথে ঘাটে জল আনিতে পুকুর ঘাটে
দেইখ্যে আমার হিয়া মাঝে
জল বরিষায়।
(সখী) ধঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায় ॥
হেরি ও মুখচন্দ লোকে বলে ভালোমন্দ
আমি বসি বরাতমন্দ
দেখাই যদি পাই।
(সখী) ধঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায় ॥

আর এদিকে? লোককবি কি শুধু শ্রীকৃষ্ণরই মনোবেদনা প্রকাশ করে ক্ষান্ত হবেন? শ্রীরাধা অভিমান করতে পারেন, তার প্রাণ-বঁধুর উপর কিন্তু তাই বলেত আর রাগ করতে পারেন না। রাগ আর অভিমান এক জিনিস নয়। তা নইলে এর পরদিনই যমুনার ঘাটে জল আনতে গিয়ে শ্রীরাধাকে বলতে শুনব কেন?

যাইতে যমুনার জলে শ্রীরাধা সখীরে বলে
তরুতলে কালিয়া দাঁড়ায় (গো)
একাকী সে যাব যমুনায়। (ধু)
দেখিলে যুবতী নারী শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আঁখি বারি রমণী ভুলায় (গো)
সেই ভ্রমর কালিয়া নারী কুলে জড়াইয়া
অধর চুসিয়া মধু খায় গো।
একাকী সে যাব যমুনায়। (ধু)

এই ধরণের একটি সাঁওতালী ও বাংলার সংমিশ্রণে রচিত বুমুর গানের সন্ধান পাওয়া যায়। পাহাড়ী মেয়ের দল চলেছে ঝরণায় জল আনতে। এ গানটিও একটু পরিশুদ্ধ করে নিলেই এদিকে শ্রীরাধিকার সখী-সহ জল আনতে যাওয়ার কথা বলে চালিয়ে দেওয়া খুব বেশী অসম্ভব হত না—

পাহাড় কেটো আসে জল
চল মাঝিয়ান জলকে চল
ঝরণা বহে ঝুরু ঝুরু রে—
ঝরণা বহে ঝুরু ঝুরু রে
মহুয়া গাছের ফুল ডগাতে
চাঁদ উঠেছে পাহাড় কেটো
তুলোছে ওই মাতাল মেয়ের
দেখো কাজল ভুরুরে।
মাতাল মেয়ের কাজল আঁকা ভুরু।
ধীরে ধীরে চলে মাঝিয়ান
মনে মনে খুঁজি তাহার পুঁতি
মাঝিন বলে মাঝিন বলে
আওয়ান, আওয়ান,
জংলা মেয়ের দলে
নাচের তালে তালে
নেশায় বিভোর হয়ে
চলে পড়ে রে
(তারা) চলে পড়ে, চলে পড়ে
চলে পড়েরে।

বাংলায় একটা চলিত প্রবাদ আছে 'বেধে চেনে সাপের ছাঁ'। শ্রীকৃষ্ণও কি বুঝতে পারেন নি যে শ্রীরাধাও ঠিক তাঁরই মত মনে মনে জ্বলে পুড়ে মরছেন। তাঁরও

অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে 'শ্রীকৃষ্ণ পরশন আশে'। হয়ত এ কারণেই তিনিও আড়ি পেতেছিলেন যমুনার ঘাটের কোন এক নিভৃত কোণে। ঝোপের আড়াল থেকে শ্রীরাধিকাকে দেখেই তার পক্ষে বলে ওঠা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়—

কত গরবে চলেরে ধনী
যখন শীতে সিনানে যায়,
মনে হয় বুকটা বিছায়েদি
ধনী পা দিয়ে যাক তায়।
মাথায় কলসী, কলসী কাঁকে
ঐ ঘুরো ঘুরো চাইতে থাকে
গান ভুলে যায় বলব কাকে
ঘটল বিষম দায়।

যাকে এক কথায় বলে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ। শ্রীরাধা বুঝেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সত্যই তাঁর বিহনে শোকাতুর—এদিকে তাঁর নিজের অবস্থাও তথৈবচ। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি আর কিইবা করতে পারেন? তাই হয়ত সখী ললিতার কাছে বলতে শুনি তার মনের বেদনা। লোককবি ভবপ্রীতানন্দ অতি সহজে এই অসহনীয় পরিবেশের সমাপ্তি ঘটিয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা পেলেন—

রাধা রাধা নাম ধরে বাঁশী ডাকে প্রেম ভরে
ফুল শরে হিয়া বিঁধিল মদন গো,
ফুল শরে হিয়া বিঁধিল মদন।
কি করিবে কুল লাজ পাই যদি রসরাজ
হৃদি মাঝে তারে ধরিব যতনে গো।
কহে রাধা উৎকণ্ঠিতা চল ত্বরা ও ললিতা
তব প্রীতাভাবে সে নীল রতনে গো।।

রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েই যে অধিকাংশ ঝুমুর বিশেষ করে বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের গানগুলি রচিত একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা ঝুমুর গানে এ ছাড়াও জনসাধারণের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কথা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক খবরাখবরও পাবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন (১৯৩৯—১৯৪৪ খৃঃ অঃ) সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে মানভূমের জনসাধারণও কম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। কাজেই যুদ্ধের হিড়িকে যখন নিত্য-প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই অভাব ঘটতে লাগল তখন মানভূমের লোককবির দলও ঝুমুর গানের সুরে শোনাতে শুরু করল তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী :—

সঘনে ছাড়ে নিঃশ্বাস ঘটিল কি সর্বনাশ
উপায় হারা হইল মমিন।
কেমনে কাটিবে এবার দিন (হে)।
(মনে মনে ভাবিছে মমিন)।
যদি বলে দিবসুতা দাম শুনে ধরে মাথা
হিসাব করিলে মূলে হীন (হে)।
টুপি, জুব্বি, জুতা, ছাতা সে সকল সেল কোথা
সুতার কটার বস্ত্র করিল সরকার।
ভরত বলে সে পাণ্ডবার কি থাকে চিরকাল (হে)।

শুধু কি সরকারী অব্যবস্থা? সুদখোর মহাজনের কৃপায় দেশের চাষীবাসী মানুষেরও দুর্দশার একশেষ। চালের অভাবে, ক্ষুধার তাড়নায় ধানের জন্য মহাজনের বাড়ি ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে পড়ে তারা:—

এ বৎসর ভাদ্র-আশ্বিনে, ঋণ না দেয় মহাজনে
হেন অকাল না দেখি নয়নে।
জীবন না যায় রে ধরা, টাকায় চাল পাঁচ সেরা
ঘুরে মরি চালের কারণে।
দিনে যদি চাল পাই, উপাস থাকি সন্ধ্যায়
ভয়ে নিদ্রা না আসে নয়নে।
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ, টাকায় তিন সের ধান
তবু ক্ষীণ অন্নের বিহনে।
কিন্তু যারা ধনবান, বিষম তাদের মন গুমান
দিবসে তারা দেখে নয়নে।
বেড়ি সুদে টাকা দিব, সুদে মূলে ধান লিব
যে দরে বিকাবে অগ্রহায়ণে।
মহাজনের বাসায়, যদি বা খাতক যায়
বসিতে না বলে কোন জনে।
তথাপি খাতকগণ, হয়ে দুঃখিত মন
বসে থাকে দিন বদনে।।

কি কারণে মোর ঘরে, আসিতেছে করে করে
ডাকাতি করিবে লয় মনে।
সারা দিন কেটে যায়, সবে নিরানন্দ কায়
ঘরে আসে বেলা অবসানে ॥

কোন রকমে কোনদিন এক বেলা, কোন দিন বা প্রায় উপোস দিয়ে, অতি কষ্টে দরিদ্র হৈমন্তিক ধানের মুখ দেখল কৃষাণকুল, কিন্তু এদিকে শুরু হল মড়ক। লোকে ঘাস্তাভাবে অধাদ্য খেয়ে রোগ বাধাল। ঘরে ঘরে উঠল কান্নার রোল। তারা গিয়ে আবার হাত পাতল মহাজনের কাছে। কোন কোন মহাজন 'আজ নয় কাল' বলে ঘোরাতে লাগল। কেউ কেউ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে ছিল, 'ওসব হবে না বাপু'। মানভূমের এই দুর্দশার দিনে লোক-কবি তাদের দুঃখের কাহিনী শোনাতে লাগল দেশবাসীর কাছে এই ঝুমুরের সুরেই গান বেঁধে :—

রবিশস্য সব হইল, তা' পরে বরষা কমিল (হে)
ধান্য মরে জলের বিহনে।
একে খণ নাহি পায়, লোকে করে হায় হায়
মারামারি হয় জলের কারণে ॥
(প্রাণ বাঁচিবে কেমনে)
দেবতা বৃষ্টি করিল, ধান্য সকল বাঁচিল (হে)
কিন্তু রোগ লেগে গেল ধানে।
না দেখি কোন উপায়, গাছি পুড়ে নেমে যায়
আনন্দ না আর আসে কারও মনে ॥
কেহ সাগসিঝা যায়, কেহ কেহ মত্ত যায় (হে)
রক্তহীন অন্নের বিহনে।
কদ ভাঁদলী অনাদি, মাড়ুয়া গড়া যুগবিরি
সকল ফুরাল উদর পূরণে ॥
কোন মহাজন কয়, কাল আসিবে এ সময় (হে)
পরদিন যায় ততক্ষণে (হে)
তথাপি না দেয় ধান, বরং করে অপমান
ধিক্ ধিক্ ধনহীন জনে ॥
পেট ভরিলে আনন্দ, না ভরিলে নিরানন্দ (হে)
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবনে।
মা পূজায়, সবে নিরানন্দ কায়
উৎসাহ না আসে আর কার মনে ॥
অন্ন বনে ধনী যারা, ভুলে যায় চিন্তামণি (হে)
কান্না হয় থাকিতে নয়নে।
সন তেরশ উনপঞ্চাশ সালে, এই কথা 'ভরত' বলে
নিজ দুঃখ জানায় পরিন্দ চরণে ॥

আমাদের পাঠকবর্গ উপরোক্ত গীতটি লক্ষ্য করলেই আমাদের পূর্ব বক্তব্য অতি পরিষ্কার বলে মনে হবে। অর্থাৎ ঝুমুর গান পশ্চিম বঙ্গে শুধু মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পর্বদিন উপলক্ষে গীত এবং তাঁর বিষয়েই রচিত হলেও ঝুমুরের ধনি মানভূমে কিন্তু তা' নয়। ঝুমুর গান এবং এর সুর হল সাঁওতালী বসতি একটি গানের সুর ও শ্রেণী মাত্র। কাজেই সে কোন দিন এমনকি কালীপুজোর দিনেও হতে বাধা নেই। আর তা ছাড়া এই সব গান শুধু অবসর বিনোদনের জন্যই সৃষ্ট নয়। এর ভিতর বাংলার সামাজিক ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। সত্য বলতে কি এই লোক-সংগীতের মধ্যেই তো লুকিয়ে রয়েছে বাঙলার খাঁটি ইতিহাস—যার উপর কারো হাত নেই। তেরশ উন পঞ্চাশ ও পঞ্চাশ সালে বাংলার মহা-দুর্ভিক্ষের কথা যাঁরা এখনও ভোলেননি তারা বিনা দ্বিধায় এ গীতটিকে অন্ততঃ তাঁদের ভবিষ্যত ইতিহাসের উপকরণ বলে ধরে নিতে পারেন।

আমরা পরিচ্ছেদের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি মানভূমে সিঁদুরিয়া ও ভাদারিয়া ঝুমুর ছাড়াও আধ্যাত্মিক ঝুমুরেরও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ অধ্যাত্মবাদের বনিয়াদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় সমাজ। তাই ভারতীয় নিরক্ষর লোককবির মুখেও অধ্যাত্মবাদের কথা শোনা যায়। ঝুমুর গায়করা বিশেষ করে মানভূমের ঝুমুর গায়করাও তাদের গানের মধ্যে অধ্যাত্মবাদ প্রচার করতে কসুর করেননি। তাই মানভূমের লোককবি অতি সহজেই বলতে সক্ষম হয়েছেন, পৃথিবীতে এসেছত' দুদিনের জন্য। একটু বুঝে সুঝে চলো, নইলে কালের পাকচক্রে নিস্তার পাবে না—

দহের মাছ না পড় ভাই ডাঙ্গালে
সাঁতার দিছ তবজলে।
যদি হবে ইচলা পুঁটি
খেতে হবে শুটি শুটি,
ঘুঁরাই ঘুঁরাই মারবে ঘুন-জালে (হে)
সাঁতার দিছ তব জলে।
যদি হবে রুই কাতলা
ঘুঁচাও মনের মাতলা
অনন্ত কই রাখ পদতলে,
সাঁতার দিছ তব জলে॥

শুধু কি ভাই? জীবন প্রদীপের তেল আর কত-টুকু? এত' দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। এখনও কি দুনিয়ার যা কিছু দেখবার তা' দেখতে পারলি না?

চিন্তাপথে আয়ু তৈল
ঝরি ঝরি শেষ হৈল
দেখবি মন ভবের খানি
চক্ষেতে ঢাকনি।

মানভূমে পূর্বোল্লিখিত কুমুর গান ছাড়াও কিছু কিছু ব্যঙ্গ গীতিরও সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মনে করা যাক যেন কোন লোক গেছে দোকানে। গিয়ে বলছে আমাকে এই সব জিনিস দাও, কিন্তু দাম দেব মাত্র নয় (দেবদ) পয়সা মাত্র:—

"অনেক জিনিস লিব, পয়সা পয়সা দাম দিব হে
হিসাবেতে নয় পয়সা লিবে পণি।
হয়ো তুমি সাবধান, শুন আগে দেওো কান,
অন্যমন না কর আপনি॥

কজগুঁদলী জনারী, মাড়ুয়া, মুগ, মুসুরী
রাহেড়, বুট, বাটলা, আর।
যাও গম, জারা, বিরি, রমা, কুরতী, খাসারী
একে একে দাও হে দোকানদার॥
নারিকেল সাঁচি তেল, লাল সাদা মাটি তেল
নিম তেলা কুসুম বরড়া।
লইব কুসুম তেল, ওজনে না কর তেল
লইব বাদাম রেড়ী আরা॥

* * *

অমর শঙ্খের পাতা পদ্ম কণ্ঠে চাই চিরতা
হাকিং আদি দাও হে দোকানী।
কতই বলিব আর, বাড়িয়ে যাবে বিস্তর
রহিত করি ভরত অজ্ঞানে॥

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আধুনিক যুবকগণ যে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী পরিত্যাগ করে স্ত্রীর কথায় ওঠা বসা করে, আত্মীয় পরিজন ছেড়ে আবাল্যের বাসভূমি পরিত্যাগ করে নিজের সুখের জন্য চলে যায় দূরে, মান-ভূমের লোককবির কণ্ঠে এই নব্য শিক্ষার প্রতিও বিদ্রূপ ধ্বনি শোনা যায়:—

শুন শুন বন্ধুগণ, মোর এই নিবেদন
কলিযুগের মাহিত্ম।
বিবি হন মাতা, পিতা তাহার না মানে কথা
মহামায়ার মায়ুম॥
ভাই বন্ধু পরিহরি, যায় তারা দেশ ছাড়ি
জন্মদাতা চিনেনা তখন।
যার উদরে জন্ম নিল, তখন তারে না চিনিল
নারীর কথায় চলেন॥

মাটির রঙ্ সবুজ

[একাঙ্কিকা]

তৃপ্তি চৌধুরী

শকুন্তলা ★ অনঙ্গ

[ঝম্ ঝম্ শব্দে নিবিড় রাতের স্তব্ধতাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মেল ট্রেনটা বেরিয়ে যায়। পাশের বাড়ী থেকে একটি সদ্যজাত শিশুর কান্না ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাপিয়ে আনন্দের মালিকধ্বনি : উলু-লু-লু···। পর পর পাঁচবার। একটি বেড়াল, লোম ওঠা উপোসী কাতর, বেরিয়ে আসে চিলে-কোঠার তেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। লাফ দিয়ে ডান-দিকের রেলিঙ্এ ওঠে। নীচে কুঁকে দেখে। তারপর নীচে নামবার সিঁড়ির অন্ধকারে গতি ফিরিয়ে নেয়। পুরনো জীর্ণ তেতলা বাড়ীর ছাত। ভাঁতা পড়া প্রায় ভাঙ্গা রেলিঙ্, অসমান খস্‌খসে মেঝে। বাঁদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। ডানদিকে চিলে কোঠা। টালির আচ্ছাদন। ছাতের আকার ইংরেজী উল্টো এল্ [⅂] অক্ষরের মত।

ছাতের আলিসায় কয়েকটি ফুলের টব অযত্নে অবহেলিত।। গাছের আগাগুলো দুমড়ানো ছেঁড়া। একটা টব মাটিতে উল্টানো।

তাপহারা শীতার্ত রাত। ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশের মাঝখানে। ছাতে উপুড় করা তার রূপোলী আলি। সিঁড়ির অন্ধকারে পায়ের শব্দ। ধপ্ করে এক-টুকরো আলো জ্বলে। সেই সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠ]

: সাবধানে পা ফেলো। সিঁড়ির রেলিঙ্ নেই।

দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি হাতে উঠে আসে অনঙ্গ চিলেকোঠার একমাত্র বাসিন্দা। এবং তাকে অনুসরণ করে বারবণিতা শকুন্তলা। হলুদ জ্যোৎস্না-মাখা ছাতে পা দিয়ে কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ফেলে অনঙ্গ।

এসো।

চাঁদের আলোয় দু'জনেই দুজনের দিকে তাকায়। শকুন্তলা শীর্ণাঙ্গী কালো। চোখের কোণে যন্ত্রণার কালি। কপালে কুটিল রেখা। ন্যাকাশে ঠোঁট। উঁচু চোয়াল। সিঁদিতে মোটা করে সিঁদুর। কপালে টিপ। পায়ে আলতা। যেন একটি লজ্জিতা গ্রাম্য-বধূ। অনঙ্গ জোয়ান। চওড়া বুক। ছোট লোভী চোখ। পুরু ঠোঁট। বিরাট নাক। এক নিমেষে দু'জন দু'জনকে দেখে। অনঙ্গ চিলে কোঠার সিঁড়িতে পা দেয়। দূরে আর একটি ট্রেনের মৃদু গতি। শকুন্তলা কেঁপে ওঠে। অনঙ্গ কপালে হাত রেখে দূরে রেলের দিকে তাকায়। গাড়ী চলে গেলে হেসে বৃষ্টি নামিয়ে আনে শকুন্তলার মুখে।

মালগাড়ী। মেল নয়।

শকুন্তলা সরে এসে রেলিঙ ধরে দাঁড়ায়। অনঙ্গ দরজা খুলে আলো জ্বালে। হলদে বৈদ্যুতিক আলোয় প্রকট হয়ে ওঠে ঘরের অভ্যন্তর ভাগ। বিছানা, বই এলোমেলো। টবের ফুলগাছ-গুলোর মতই কে যেন এই সংকীর্ণ ঘরটিকে তছ্‌নছ্ করে দিয়ে গেছে।

যাও ঘরে গিয়ে বোসো।

অনঙ্গ ঘরের পেছনে যায়। তারপর একটা বালতি নিয়ে আসে খালি। দেখে শকুন্তলা ঝুঁকে নীচের দিকে কি দেখছে।

এই···ওখান থেকে সরে এসো।

এত রাতে ওরাও জেগে আছে কেন?

: নতুন বৌ ছেলে হল। তুমি সরে এস। পরের বাড়ীর দিকে ওভাবে তাকাতে নেই।

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

জল নিয়ে আমি চৌবাচ্চা থেকে। মুখহাত ধুতে হবে তো।

(নেমে যায় অনঙ্গ নীচে। শকুন্তলা রেলিঙ্ ছেড়ে এগিয়ে আসে চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে। ছাত-টাকে দেখে এক নজর। টব, দুমড়ানো ফুলগাছ। ঘরের অবস্থাও পাগলা হাওয়ার দুষ্কর্মের মত। ভুরু কুঁচকে যায় শকুন্তলার। ঘরে না ঢুকে সিঁড়িতে বসে। জল নিয়ে অনঙ্গ উঠে আসে।

কে এসেছিল ?

কোথায় ?

এই ছাতে—

কেউ না।

না শকুন্তলা।

তোমার চোখ নেই। ফুলগাছগুলো দেখেছ কি দুমড়ে মুচড়ে রেখে গেছে ? ঘরটাও ছত্রখান—নিশ্চয়ই চোর এসেছিল।

তা হবে।

শিগ্‌গির দেখ কি কি নিয়েছে।

কিছুই নেয়নি। কিছু পায়নি তো তাই অমন রাগ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে।

না বাপু। ভাল করে দেখ তুমি। ঐ সুটকেশটার ডালা খোলা—

ওটায় কিছু নেই। একটি শিল্পীর স্বপ্ন ওখানে ঘুঁকছে কেবল।.....হ্যাঁ শকুন্তলা, চোরই এসেছিল। জিনিষ নিতে নয়—জীবন খুঁজতে।

কি খুঁজতে ?

যাও। বালতী নিয়ে ওদিকে যা মুখ হাত ধুয়ে এসো।

তুমি যাও আমি বসেছি। একটু বিশ্রাম করে নিই।

(অনঙ্গ জামা খোলে। পকেট থেকে বিড়ি, দেশলাই ও একটা ভাঁজ করা কাগজ খসে পড়ে। শকুন্তলা কুড়িয়ে নেয় সেগুলো। অনঙ্গ সেদিকে লক্ষ্য না করে জামাটা রেলিং-এ রেখে পেছনে চলে যায় বালতি নিয়ে।)

তোমার ছাতটা বেশ সুন্দর। কত বড়। অনেক ভাড়াটে থাকে এই বাড়ীটায় না ? ...তোমার কে কে আছে গো ? বউ, ছেলেমেয়ে ? তুমি এই ছোট্ট ঘরটায় থাক কেন ? এতবড় মানুষটা তুমি কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শোওনাকি গো ? ...নিশ্চয়ই চোর এসেছিল তোমার ঘরে। ইস্ কত বই তোমার। তুমি বুঝি খুব পড়াশুনো কর ? ...আচ্ছা ভাড়াটেরা লোক কেমন গো ? কাল সকালে ওরা যখন তোমার ঘরে আমায় দেখবে—না-না তোমায় আমি বিপদে ফেলব না-গো। রাত পোহাবার আগেই বেরিয়ে পড়ব কিন্তু দরজা খুলতে গেলে যদি শব্দ হয় ? দূর, ওদিকে যাবই না—আমরা।

তুমি আমায় আবার পাচিল টপ্‌কে পার করে দেবে, উঁ ? তোমার ঐ চওড়া পিটটায় লেপ্টে থাকবো আমি। ...আহা। কি সুন্দর ফুলগাছগুলো। দেখো টবটা একেবারে নষ্ট করে দিয়ে গেছে ? তুমি বুঝি চন্দ্রমল্লিকা ভালবাস ?

জলে ওঠে শকুন্তলার কোটরাগত চোখ।

তোমার মনের মানুষের খোঁপায় চন্দ্রমল্লিকা গুঁজে দাও ? উঃ কি কুৎসিত পুরুষ তুমি।

(টবের ধার থেকে সরে এসে হাতের বিড়ি, দেশলাই কাগজ ছুঁড়ে দেয় ঘরের ভেতর। দেশলাই, বিড়ি ঘরের কাছাকাছি গিয়ে পড়ে। কাগজটা ওর পায়ের কাছেই গড়ায়।)

তুমি শুধু কুৎসিতই নও। তুমি ঘৃণ্য, তুমি নোংরা—

কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে দলা পাকায়। দাঁতে কাটে।

কেন—কেন তুমি আমায় এখানে নিয়ে এসেছ ?

(অনঙ্গ আসে কাপড়ের খুটে মুখ মুছতে মুছতে।)

কাল সকালেই তোমার বাড়িতে তোমায় পৌঁছে দেব।

না আমি এখনই যাব। তোমায় আমি আর একটুও সহ্য করব না।

কোরো না। যাও মুখহাত ধুয়ে এসো।

কি ভেবেছ তুমি ? তোমার মতলবটা কি ?

কিছু না।

কিছু না ? ন্যাকা—আমায় কচি খুকি পেয়েছ ? দুটো ছাতের তলায় প্রেম জমে না গো বেশ্যার সঙ্গে।

বেশ জমাব না ? কথা দিলাম।

আহা আমার ভদ্রলোকরে। কাণা কড়িরও মুরোদ নেই যখন—পীরিত করে আমায় ঘরে তুলে এনেছ কেন ? যদ্দের আমার ছুটতো না ভাব ?

তুমি যদ্দের জোটাতে রেললাইনের ধারে গিছলে নাকি ?

(হাসে অনঙ্গ। আলতো করে হাত রাখে শকুন্তলার পিঠে)

যাও—আর রাগারাগি করে না। মুখে চোখে জল দিয়ে এসো—ভাল লাগবে। যাও।

(একরকম ঠেলে দেয় শকুন্তলাকে পেছনের দিকে। শকুন্তলা শান্ত হয়েই যায়। অনঙ্গ বিড়ি দেশলাই কুড়িয়ে পকেটে রাখে। চিরুনী বের করে চুল আঁচড়ায়।)

বেশী ডানদিকে যেও না—রেলিং ভাঙা। লাফ দেবার চেষ্টাও কোরো না। পাশের দোতালায় গিয়ে পড়বে। মরবে না। মড়া হয়ে বেঁচে থাকবে।

(বালতি নিয়ে ফিরে আসে শকুন্তলা। দেখে অনঙ্গ চন্দ্রমল্লিকার টবটায় হাত বোলাচ্ছে।)

এই, এটুকু জল আমার কিছু হবে না। নিয়ে এসো।

(বালতি হাতে তুলে নেয় অনঙ্গ।)

ক্লান্ত মানুষটা হাতের কাছে থাকতে ঐ মড়া টবটাকে আদর করছ।

মজা দেখ শকুন্তলা, চন্দ্রমল্লিকা গুঁজে দেবার খোঁপা আমার এই আটত্রিশ বছর বয়সেও খুঁজে পাইনি। অথচ চন্দ্রমল্লিকা ঠিক প্রতিদিন আমার তার ফুল গুঁজিয়ে গেছে। আজ নিজের হাতে গাছটিকে নষ্ট করেছি। অস্ত্র হাতের কাছে মস্তবড় এক খোঁপা—

এই তুমি আমার সংগে প্রেম করবেনা কথা দিয়েছ।

আবার কথা দিলাম।

(বালতি নিয়ে পা বাড়ায়।)

এই শোন—শোন।

জল তুলে আনবার দরকার নেই—যে বালতি তোমার? আমার এই মোষের শরীর ওতে ভিজবে না। চৌবাচ্চাটা দেখিয়ে দাও—

তুমি চান করবে নাকি?

হাঁ করি। একরাত্রির জন্য তোমার বাড়ীতে আমায় মনের মত করে থাকতে দাও। তোমার বৌয়ের মত।

কিন্তু আমি যে তোমায় কথা দিয়েছি তোমার সংগে প্রেম করব না।

নাই তো। বৌর সংগে কেউ প্রেম করে নাকি? তুমি কি গো?

(ঠোনা মারে অনঙ্গর গায়ে।)

মজবুত সুন্দর তোমার শরীর। বিয়ে করনি কেন?

দুটো হাতের তলা বৌ তো ঘেন্না করে।

করুক। আমি করব না। চলো চৌবাচ্চাটা দেখিয়ে দেবে। আমি চান করতে করতে তুমি চট্ করে কিছু খাবার কিনে আনবে।

কোত্থেকে? দোকানপাট সব বন্ধ না?

খেষ্টার দোকানে পাবে। ঝাঁপের কাছেই বুড়ো ঘুমোয়। ডাকলেই উঠে পড়বে।

বাকী দেবে না।

আমার এই নাকছাবিটা—

(আঁচল খুলে একটা ছোট্ট পদার্থ বের করে।)

নাও। এটা দেখিয়ে নিয়ে এসো। বলবে কাল এটা বিক্রি করে ওর দাম দেবে।

মনে হচ্ছে দামী পাথর।

হীরে।.....বয়েসকালে এক মাড়োয়ারীর ছেলে আমার প্রেমে পড়েছিল। মায়ের নাক থেকে চুরি করে এনে আমার অভিমান ভাঙিয়েছিল। খাঁটি হীরে।

নাকে না পরে আঁচলে রেখেছ কেন?

মরলে পরে কেউ যদি চুরি করে খুলে নিয়ে যায় নাক থেকে?...হেসোনা বাপু, হীরে আমি এই একটাই পেয়েছি।

পরতো দেখি।

পরব মানে? নাও—খাবার নিয়ে এসো। শুধু পেটে ভালবাসার কথা বেরুবে না ভাই।

আহা—পরই না। লক্ষ্মীটি—

(শকুন্তলা কথা শোনে। অনঙ্গ দেখে খুটিয়ে। তার পর ঘুরে সরে যায়।

তুমি বড় কুৎসিত শকুন্তলা।

(জ্বলে ওঠে শকুন্তলার চোখ।)

রেললাইনের ধারে আমাকে বুঝি খুব সুন্দর মনে হয়েছিল তোমার? আর তাই বুঝি চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই কুৎসিত ধুমসী মাগীটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে—হ্যাঁ আমি কুৎসিত। নইলে তোমার ঘরে আসি? কর না কত ঘেন্না করবে—কর—

আমি তোমায় ঘেন্না করি না।

নিশ্চয়ই কর। তুমি কেন আমায় বাঁচিয়েছ এখনও ঠের পাইনি ভাব?

তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে—তাই তোমায় বাঁচিয়েছি।

মিছে কথা বল না। তুমি ভেবেছিলে আমার মেয়ে বুঝি বসে আছে ঘরবার আশায়। তাই অমন কাণ্ড-জ্ঞানহীনের মত লাফিয়ে পড়েছিলে সাইনে—

না আমি তা ভাবিনি শকুন্তলা। তোমার মেয়েকে আমি ভাল করে চিনি।

হ্যাঁ—চেনোই তো? মেয়ে চন্দ্রমল্লিকা ভালবাসে—তুমি চন্দ্রমল্লিকার টব করেছ।

তোমার মেয়েকে কোনদিন আমি চন্দ্রমল্লিকা দিই নি। দিলে গাল বাড়িয়ে চড়টা খেতে না? ও মেয়ে শুধু চন্দ্রমল্লিকায় ভোলে না। চন্দ্রহারও চাই।

তোমার মেয়েকে ফুল দেবার কথা আমি কোনদিন ভাবিওনি শকুন্তলা। হ্যাঁ তোমার মেয়ে সুন্দর—নিশ্চয়ই সুন্দর—কিন্তু সে—তার মিষ্টি মুখ—আমার ঘুমের ঘোরেও কোনদিন ঐ মুখ চোখের পাতায় নেমে আসেনি। বড় বেশী সুন্দর তোমার মেয়ে শকুন্তলা। বড় ঠাণ্ডা—যেন একতাল মোম। ওকে গলাতে হলে বাড়তি উত্তাপ চাই। কালো, অনেক পোড়খাওয়া একটি জীবন। একটি অভিজ্ঞতা। যাকে আমি সৃষ্টি করবো—সে আমায় সৃষ্টি করবে।

তুমি পাগল।

(কুড়িয়ে নেয় আবার দলাপাকানো দাঁতে কাটা কাগজের টুকরোটা।

বোস জল নিয়ে আসি। এত রাতে আর চান করতে হবে না। শীতে জমে মারা পড়বে।

(চলে যায় নীচে। খুশীমনে শকুন্তলা কাগজটা আবার দাঁতে চাপে। ছেঁড়া টুকরো খোলে—মাটিতে ফেলে—আবার কাটে—আবার খোলে—চোখ দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। কপালের কুটিল রেখাগুলো জড়াজড়ি করে। মাটির টুকরোটা তুলে নিয়ে জোড়া দেয়। পড়ে। অনঙ্গ জল নিয়ে উঠে আসে। পায়ের শব্দ পেয়ে কাগজটা ব্লাউজের তলায় লুকিয়ে ফেলে শান্ত হয়ে পাইচারী করে। অনঙ্গ বালতি রেখে আসে পেছনে।

সাবান চেয়ো না। দিতে পারবো না।

অনঙ্গ।

বল।

তোমার নাম ধরেই ডাকব আমি। মনের দিক থেকেও কচি তো বটেই—বয়েসেও ছোট তুমি।

কি বলছিলে বল।

আত্মহত্যা তো মহাপাপ।

আমাদের শাস্ত্রে তাই লেখা আছে।

শাস্ত্র আমি জানি না, পথে আসতে আসতে তুমি আমায় বোঝাচ্ছিলে—

হ্যাঁ।

আমায়ই কি শুধু বলছিলে তুমি?

আর কাকে বলব? তুমিইতো মরতে গিয়েছিলে।

কেন গিয়েছিলাম?

কেন গিয়েছিলে?

তুমি কেন গিয়েছিলে?

আমি?

তুমি নিশ্চয়ই জানতে না শকুন্তলা বলে এক কুৎসিত বেন্দা আজ মরবে বলে ঠিক করেছে। জানতে?

কি করে জানব?

তবে? কেন তুমি অত রাত্রে ওখানে—

(আর একটা মেল ট্রেন যায়। শকুন্তলা অনঙ্গর হাত চেপে ধরে। ট্রেনের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। শকুন্তলা চোখ মেলে তাকায় অনঙ্গর দিকে।)

আমরা দুজনেই বেঁচে আছি অনঙ্গ।

হাসে শকুন্তলা। কোটরাগত চোখে স্নেহের আকুতি। অনঙ্গ তুমি গরীব—দুঃখ কোরো না। আমি তোমার কাছে কিছু চাইব না। যতদিন খুশী তুমি আমায় তোমার কাছে রাখতে চাও রেখো। তুমি ছেড়ে না গেলে আমি তোমায় ছাড়ব না।

কি বলছ পাগলের মত?

পাগলের মত নয়। বিশ্বাস কর। পেশাদারী কথা আমি বলছি না। আমি জানি তুমি গরীব। আমি তোমায় খাওয়াব। না-না যন্ত্রের ধরব না আর। এই নাকছাবিটা তুমি নাও। বিক্রী করে—

সত্যি তুমি একটা পাগল শকুন্তলা।

তুমি বোকা। তুমি একটা চাষা—তা হোক। তোমায় আমি সহ্য করব। তোমার মন বড় নরম। এসো, শুয়ে পড়িয়ে।

তুমি যাও।

তুমি শোবে না?

রাত আর বেশী নেই। এটুকু সময় পায়চারী করেই কাটিয়ে দোব।

কিন্তু একা বিছানায় রাত কাটাতে তো আমি পারিনা।

। শকুন্তলা।

আজ পর্যন্ত কোন রাত আমি একা বিছানায় কাটাইনি গো! মার কোল ছেড়ে ভাইবোনদের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। তারপর যখন আরো বড় হয়েছি শরীরের মধ্যে একটা নূতন স্বাদ টের পেয়েছি—বসন্তকে ভালোবেসেছি—বসন্ত আমাদের গাঁয়ের অর্জুন মণ্ডলের ছেলে। ঐ বয়েসেই কি তাগড়াই ছিল দেখতে। ওর কথা ভাবতে ভাবতে ছোটভাইকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছি। কি সুন্দর ছিল বসন্ত। ঠিক তোমার মত মজবুত বুক। তোমার মত লোভী চোখ। মোটা ঠোঁট। এতক্ষণে সে আমায় দুহাতে ছেনে পাগল করে তুলত। তোমার মত ভাঁড় নয় সে। তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। এত ভাল আর কাউকে বাসিনি। তোমায়ও না। ও: কেন সে আমায় বিয়ে করতে চাইল?

(ফুঁপিয়ে ওঠে শকুন্তলা)

বিয়ে করতে চেয়েছিল সে তোমায়?

হ্যাগো। কেন চাইল?

সে তোমায় ভালবাসে, তাই চেয়েছে। তুমিও তো ভালোবাসতে তাকে।

হ্যাঁ বাসতাম। আর তাইতো ওর কথা শুনে পালিয়ে এসেছি। ওকে সে শেষ করে দিতাম আমি। আজকের এই কুৎসিত দেহটাকে তুমি যেমন ঘেন্না করছ—সেও তো তেমনি করত।

কেন? তখন তো সেই একমাত্র মালিক থাকত তোমার এই দেহের।

থাকত না। অনেকগুলো খুদে খুদে শিশুও যে থাকত আমার এই দেহটাকে ঘিরে। মাকে আমি দেখেছি রোগা, বহুমেজাজী। বাবা ছিল ভীষণ গরীব। কিন্তু শরীরের খিদেটাও ছিল নবাবদের চাইতেও দরাজ। বাবাকে শান্ত করে মা বাকী সময়টুকু খুঁকত—আমাদের গাল দিত। আমরা এত গরীব ছিলাম যে বুক ঢাকবার জন্য একটা আস্ত জাকড়াও আমি পাইনি।...বসন্তও গরীব। আমি পালিয়ে এলাম। সেই যে মাড়োয়ারীর দুধে ছেলে? জগন্নাথ—তার হাত ধরে।...তুমিও গরীব। কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমি পালাব না গো! এসো ঘুমুবে।

। শকুন্তলা।

না গো না। তুমি ঘুমুবে। আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দোব।

(শকুন্তলা চিলেকোঠার সিঁড়িতে বসে। তার কোলে মাথা রাখে অনঙ্গ।)

বড় ভাল তুমি অনঙ্গ। বড় সুন্দর তোমার মন। একপাড়ায় থাকি আমরা। দু'জনই দুজনকে কত দেখেছি। এমন করে তুমি তো আমার চোখে পড়নি কখনো। আর পাঁচজনের মত আমিও তোমায় পাগল বলে জানতাম। কলতলায় জল নিতে এসে শুনতাম ওরা বলছে তোমার ছাতে চুল করে একটা কাকও বসে না। তুমি মানুষ নও। তুমি একা একা কথা বল।

হ্যাঁ—একা। বড় একা আমি শকুন্তলা। ভদ্রলোকেরা আমায় ঘেন্না করে। তোমাদের কাছে যাব—টাকা নেই। আর তুমি একা নও। এই তো আমি আছি।

হ্যাঁ তুমি আছ।

আজকের রাতটা আকাশটার মতই পরিষ্কার সুন্দর। অনঙ্গ, আমি মরতে গিয়েছিলাম। জীবনে কত স্বপ্ন দেখেছি। জ্ঞান হয়েই টাকার স্বপ্ন—গরীব না হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। বসন্তকে ভালবেসেছি। কিন্তু অস্বীকার করতে পারিনি জগন্নাথকে। জগন্নাথ আমায় ভালবেসেছে পাগলের মত। আমার দুহাত ভরে না চাইতেই টাকা দিয়েছে। তুমিকে দিয়েছে আমার কোল জুড়ে। কিন্তু আমি ওকে কিছুই দিইনি। রোজ ভোরের আলো ফোটার সংগে সংগে প্রতিজ্ঞা করেছি আজ ওকে ভালবাসব—ভালবাসব—ভালবাসব। অনঙ্গ, সে যন্ত্রণার দিনগুলো...আমি পারিনি। তুমি বড় হয়ে জানবে তার বাবাকে আমি ঘৃণা করি। ভয়ে তাই পালিয়ে এসেছি মেয়েকে নিয়ে

তারপর এহাত ওহাত বদল হয়ে পা দিয়েছি এই পাঁকের মধ্যে। তবু আমি চেষ্টা করেছি মেয়ের গায়ে যেন পাঁক না লাগে—এই ষোলটা বছর। উঃ ছলি—!

তুমি শান্ত হও শকুন্তলা।

একেবারে শান্ত হব বলেই তো গিয়েছিলাম জ্বালা জুড়াতে। আমার ঐ একরত্তি মেয়ে—আমার বুক আগলানো ধন—অনঙ্গ, ছলি আমায় বিশ্বাস করে না। ওর জন্য যে পাঁকের মধ্যে নয় একথা আমি পারিনি ওকে বিশ্বাস করাতে। আমারই ডেকে আনা যন্ত্রদেবের নিয়ে ও আমারই চোখের সামনে দরজায় খিল দেবে—ওকে আমি ক্ষমা করব না অনঙ্গ। মা হয়ে ওকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, একদিন এমনি যন্ত্রণা যেন ওকেও—নাঃ, না না—না—তুই সুখী হ। তোকে আমি সুখী দেখতে চেয়েছিলুমরে হতভাগী।

শকুন্তলা, লক্ষীটি কাঁদে না।

না কাঁদব না। আজকের রাতে অন্ততঃ চোখের জল আমি ফেলব না। তুমি আমায় বকছিলে যত দুঃখই জীবনে আসুক—বোকার মত আত্মহত্যা করা অন্যায়। ওগো, আমি যেন এমনি বোকা হয়েই থাকি গো। এমনি করে তোমার হাতে নতুন করে বাঁচি। তোমায় বাঁচাই।

ঠিক শকুন্তলা। আমরা দুজনেই দুজনকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু শকুন্তলা তুমি জান না আমি কত অপদার্থ। তুমি মরে গিয়েও বেঁচে থাকবে তোমার মেয়ে ছলির মধ্যে। আমি! কারও মধ্যে নয়।...সবার মধ্যে বেঁচে থাকব বলে ছবি আঁকতাম। আজ তাও নিঃশেষ করে দিয়েছি। আমি পারিনি—পারিনি এতটুকুও শিল্প সৃষ্টি করতে। ছবিগুলো দেখলেই মনে হবে তোমার একটা হাংলা পুরুষের শূন্য আর্তনাদ। উঃ.....।

কই দেখি ছবিগুলো।

: নষ্ট করে ফেলেছি।

: বেশ করেছ। আবার আঁকবে।

: ঠাট্টা করছ?

: না। অ্যাদ্দিন তুমি একা ছিলে। আজ তো আমরা দুজন।

: তুমি কি সুন্দর শকুন্তলা!

: চুপ! আর একটা স্বপ্নে আমায় আবার নতুন করে ডুবে যেতে দাও। কতবার স্বপ্ন দেখেছি—ব্যর্থতার জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। তবু আবার আমি স্বপ্ন দেখব অনঙ্গ। আমি লোভী। বেহায়ার মত আমি আবার বাঁচতে চাই ছলিকে ক্ষমা করতে চাই।

কেঁদো না শকুন্তলা।

একটু কাঁদিগো। তোমার কোলে চুপি চুপি

(শকুন্তলা অনঙ্গর কাঁধে মাথা রাখে। অনঙ্গ হাত বাড়িয়ে জামাটা টেনে নেয় রেলিঙ থেকে। বের করে বিড়ি দেশলাই। বিড়ি ধরায় ঠোঁটে চেপে। জলন্ত কাঠিটা নিবোতে যায়।

দাঁড়াও।

(ব্লাউজের তলা থেকে টুকরো কাগজগুলো বের করে আগুনে ধরে।)

কি ওটা?

আমার এই ছোট্ট মানুষটার বোকামি।

এ-এটা তুমি পেলে কোথায়?

লজ্জা কি? তুমিও মরতে চেয়েছিলে সবার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারলে না বলে। আমিও চেয়েছিলাম মেয়েকে ক্ষমা করতে পারবনা বলে। আমি ছলিকে ক্ষমা করেছি! তুমিও সবার মধ্যে বেঁচে থাকবে গো।

থাকব। নিশ্চয়ই থাকব। আমি আঁকব। তোমায় আঁকব।

আমায়? এই বোকা, এই বিশ্রী চেহারাটাকে আঁকবে কিগো?

না—আমি আমার এই সুন্দর শকুন্তলাকে আঁকব।

বেশ এঁকো। এখন ছাড়ো। ভোর হয়ে গেছে। সবাই জেগে পড়বে, আমি যাই।

চলো—

ভয় নেই গো। আর ওদিকে যাব না আমি। আমার ঘরে যাব। মেয়েকে এটা—এই নাক ছাবিটা দেব। এটা ওর বাবার। আর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করব।

চলো। আমিও তোমার ঘরে গিয়ে একটু বসব। তোমার ঘরটাকে ভালবাসব।

এসো।

(দু'জনে আবার নেমে যায় নীচের সিঁড়ি বেয়ে। ভোরের আলো মেখে ছুটি চড়ুই নেমে আসে চিলেকোঠার ঘুল-ঘুলিতে গড়া বাসা থেকে ছাতের কার্নিশে।

—য ব নি কা—

নেমন্তন্ন নয়...

মনোমোহন ঘোষ

মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে বিয়ে বাড়িকে উৎসব-সজ্জায় যতখানি সাজানো যায় সাজানো হয়েছে। সানাইও বাজছে। বর এসে গেছে। বৈঠকখানা আর পালটাকা উঠোন ছাপিয়ে রাস্তায় সারি সারি পেতে দেওয়া চেয়ার গুলিতেও অভ্যাগতদের ভিড়। কন্যাপক্ষ সকলকে যথারীতি আপ্যায়ন করছেন। এমন সময় হরিপদ এলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

তাঁকে দেখেই কন্যাকর্তা বনমালী বলে উঠলেন: "একী দাদা, একা যে! বৌদি? ছেলেমেয়েরা?"

হরিপদ বল্লেন: "আরে ভাই, তোমার বৌদির শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। আর ছেলেমেয়েদের তো পরীক্ষা চলছে, জানোই। তারা আসবে কী ক'রে?"

বনমালী বললেন: "তা, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা, তারা নয় না এলো। কিন্তু বৌদি না এলে চলে কখনো? আমার বাড়ি কতকাল বাদে এই কাজ, আর তিনিই বাদ? না না, সে হয় না। আমার বায়না করা ট্যাক্সি হাজির রয়েছে। আপনি একটু কষ্ট ক'রে একবার গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসুন। তিনি না এলে আমার উৎসবই কানা। আচ্ছা, আপনি নয় থাকুন; আমি দেখি অন্য কাকে পাঠাতে পারি। মোদ্দা, বৌদিকে আনাতেই হচ্ছে।"

বলেই বনমালী পাঠাবার মতো কারুর খোঁজে সেখান থেকে অন্যত্র যাবার উপক্রম করতেই হরিপদ আগিয়ে গিয়ে তাঁকে পাকড়াও করলেন: "অ-বনমালী, আরে শোনো শোনো; বলি শোনো।" তারপর বনমালীকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টায় বললেন: "আরে ভাই, তুমি মিছে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তাঁর আসার উপায় থাকলে কি আর সঙ্গে করে আনতুম না? সত্যিই তাঁর আসার উপায় নেই। উপায় থাকলে এখনিই আনতুম। গাড়ীর দরকার কিসের?"

বনমালী একটু সন্দিগ্ধভাবে বললেন: "উপায় নেই কেন তা তো বুঝছি না দাদা! আমার বাড়ি কাজ, অথচ বৌদি আসবেন না—এ কেমন কথা? সংসার নিয়ে নেহাত ব্যতিব্যস্ত তাই, নইলে তাঁর তো সকাল থেকেই আসবার কথা। সে নয় গেল, কিন্তু এবেলাও একবারটি আসতে পারলেন না তিনি, এ কেমন কথা?"

হরিপদ এতটা ঠিক আশা করেন নি। বনমালীর আগ্রহাতিশয্য দেখে মনে মনে এবার একটু বিব্রতই বোধ করলেন। মুখে কিন্তু মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন: "আরে উপায় থাকলে কি না এসে ছাড়তো সে, না পারতো? বেথার বিয়েয় আসবে, আমোদ-আহ্লাদ করবে, কতদিনের সাধ তার। কিন্তু ভাই সবই অদৃষ্ট। আজ ক'দিন ধ'রেই হাঁপের টানটা হচ্ছিল, আজই আবার হঠাৎ সেটা বড্ড বেড়ে গেল যে।"

এ ব্রহ্মাস্ত্রের পর বনমালীকে সত্যিই হাল ছেড়ে দিতে হোলো। একেবারে নিতে গিয়ে তিনি বললেন: "তাহলে অবশ্য কী আর করা যাবে! তা দাদা, আপনি একটু ওদিকে দেখুন—মানে, বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়নটা ঠিকমত হচ্ছে কি না একটু তদারক করুন। তারপর প্রথম ব্যাচেই তাহলে আপনি বসে পড়বেন। বৌদির অসুখ দেখে এসেছেন যখন, তখন

ব্যাচ্‌ হেপাজতে

: ডিটেকটার

রা এলো ওদের

আমি আবোল বাচ্ছাদের, আর দূরে বাড়ি যাদের

দের মেয়েছেলেদের নিয়ে একটা ব্যাচ আগেই

ছ দিয়েছিলুম। ভাগ্যি আর, হাঙ্গাম যতটা চুকিয়ে

। যায়, এই আর কি। ওদের হলেই

স্ত্রী সমেত কাঁহা ব্যাচ্‌ বসিয়ে দেবো। আপনিও

ই হেপাজতে নিয়ে বসে যাবেন সেই সঙ্গে; ও আর

টিস্ক করবেন

বলেই তিনি হনহন্ করে অন্যদিকে চলে গেলেন।

র্তা হিসেবে কর্তৃপক্ষের একজনমাত্র অভা-

ক নিয়ে স্বাস্থ্যকরের পক্ষে যথেষ্টের চেয়েও বেশ

মনোযোগ সময় বার করা হয়ে গেছে।

সম্পাদের অতি প্রত্ন

সুতরাং হরিপদবাবুকে নিয়ে

থাকলে আর দেরি হবে না হরিপদও

এগিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন, একটু বেশি

অন্যমনস্ক কাউকে দেখতে পাবার আশায়। পেয়েও

গেলেন পাঁচকড়িকে। ছেলেবেলার সহপাঠীদের মধ্যে

পাঁচকড়ির সঙ্গেই তাঁর এখনো প্রাণখোলা ঘনিষ্ঠতার

সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। উভয়েই পরস্পরকে 'তুই'

সম্বোধন করেন উভয়েরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি

অর্থাৎ কর্মকর্তা বনমালীর চেয়ে দুচার বছরের বড়ো।

বনমালী তাঁদের এক মৃত সহপাঠীর ছোট ভাই।

সেই সম্পর্কে দুজনকেই বনমালী দাদা বলেন এবং

খাতিরও করেন। তবে বনমালীর সঙ্গে আবার হরি-

পদর চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই পাঁচকড়ির।

পাঁচকড়িও তাঁকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো।

দুজনেই একটু একান্তে সরে আসার পর, বললে :

"এত দেরি করে এলি যে হরি? —নে, সিগারেট

কর্মকর্তা দামী সিগারেটের মুখকাটা টিনটা,

বাড়িয়ে দিলে পাঁচকড়ি।

সিগারেট ধরিয়ে হরিপদ বললে "বরযাত্রীদের

আপনার পছন্দমত সেরা কালি

রেনবো

ইঙ্ক

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

২/২ এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, : কলিকাতা-১

আদর-আপ্যায়ন ছেড়ে এদিকে পালিয়ে এলি; ওদিকে বনমালী যে আমাকেও বলে গেল, বরযাত্রীদের একটু খাতির-টাতির করতে।"

পাঁচকড়ি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে "আরে, সে কি আর তোর-আমার জন্যে আটকে থাকবে নাকি? তাঁদের আপ্যায়ন ছেলে-ছোকরার দল যথেষ্টই করছে।"

"কিন্তু সিগারেট যে তোর কাছে!"

"মানে? সিগারেট কি মোটে একটিন নাকি? ওদের কাছে আরও পাঁচ টিন রয়েছে। আমারটা থেকে যা গোটা পনেরো খরচ হয়েছে—ওই পর্যন্তই। বাকি-গুলো থেকে যায় তো থেকে থাক। ভালো সিগারেটের মুখ বড়ো দেখতে পাইনা আজকাল। বিড়িই তো ভরসা।"

হরিপদ মুচকি হেসে বললে: "বাদর!"

পাঁচকড়ি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে: "বাঁদর কিসের? কর্মবাড়িতে ও-রকম একটু আধটু হয় রে বাপু! আর, আমারই বা দোষটা কী? ছোকরারা আমার হাত থেকে বড় বেশি কেউ নিলে না। বোধহয় সঙ্গের বরপক্ষের কর্তাব্যক্তিদের সমীহ করেই। সেটা জান-তুম বলেই তো আগে থাকতে একটা টিন হাতিয়ে রেখেছিলুম। নইলে উৎসাহী ছোকরাদের জ্বালায় কি পরে আর পাবার জো থাকতো? থাকগে বাজে কথা। দান-টান দেখিছিস? না, তুই তো এই এলি। চল্‌না, বিয়ের জায়গায় যাওয়া যাক। এখুনি লগ্ন। বিয়েটা দেখিগে চল্ বরং।"

বিয়ের সভায় গিয়ে হরিপদর চোখ ঠিকরে পড়ার যোগাড়! বনমালী এত খরচপত্র করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে।

পাঁচকড়ি চুপি চুপি বললে: "কী রকম দেখছিস বল! চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা খরচ করছে বনমালী।"

হরিপদ বললে: "এমন কিছু বড়লোক বলে তো জানতুম না বনমালীকে। টাকার যোগাড় হোলো কোত্থেকে? প্রভিডেন্ট ফণ্ড থেকে ধার?"

পাঁচকড়ি বললে: "মাথা খারাপ? অত টাকা সেখান থেকে পায় কখনো? পেয়েছে অবশ্য কিছু তা থেকে। বাকি সবই ধার রে, ক্রেডিট! তা, সেও বনমালীর ভাগ্য বলতে হবে। নইলে ওর মতো লোক এত টাকার মাল ক্রেডিটে পায়?"

হরিপদ চিন্তিতভাবে বললে: সে পেলে। শুধতে তো হবে?"

পাঁচকড়ি ধমক দিলে: "সে বনমালী বুঝবে; তোর অত মাথা ব্যথা কিসের? যা দেখছিস চোখ বুঁজে দেখে যা।"

হরিপদ বললে: "চোখ বুঁজে?"

"ওই হোলো, নে! ওদিকে দেখছিস? আমার বৌকে চিনতে পারিস? ঘুঁটেকুড়ুনির অঙ্গে কী ঝিলিক্ খুলেছে স্যাপ্!"

"তাই তো রে! এযে চেনা যায়! একেবারে রাজেন্দ্রাণী! ব্যাপার কী? অ্যাঁ?"

বনমালী বললে: "কী বলবো ভাইরি, আমার হাতে পড়েছে। গয়না নেই, শাড়ী নেই। সেবার সাহুদের বাড়ী জড়োবুঁচো হয়ে খাদামাটা ওঁতের শাড়ী পরে গেছলো বলে ওকে ভালো করে পরিবেশনও করেনি। তাই তো এবার কোট ধরে বসেছিল 'শাড়ি-গয়না না হলে নেমন্তন্নই যাবো না।' বলি, তাও কখনো হয়? ঘুটলুম আগুর বাড়ী। তা ভাই, বড়-লোক হলেও মান রেখেছে সে। ছুতো-নাতা টাল-বাহানা করে হাঁকিয়ে দেয় নি। তার বৌয়েরই ওই সব শাড়ি-গয়না। আমার হাতে পড়েছে, তাই। নইলে শাড়ি-গয়নায় এখনো ওকে মন্দ মানায় না, কী বল্?"

তারপরই যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল এইভাবে বললে: "তা হাঁরে, তোর বৌকে নিয়ে এলি না যে? বলে নি নাকি?"

"বলেছিল।"

"তবে?"

"একই ব্যাপার। শাড়ি-গয়না নেই বলে।"

"মানে? যা—যাঃ! বাজে বকিস নি। বাবা, তোমার বৌ-এর শাড়ি-গয়না নেই? চালাকি হচ্ছে? সাড়ে চারশো টাকা মাইনে পাও, আমি জানি না মনে করেছো?"

"তাতে কুলোয়? ছেলেমেয়েদের লড়ার খরচ নেই? একটার বি-এস-সি, একটার বি-এ; দুজনেরই অনার্স

যে বই কেনার বহরটা খেয়াল আছে? তারপর ছোটোগুলোর ইস্কুল আর বাড়ির মাস্টারের মাইনে, বাড়িভাড়া। অসুখ-বিসুখেও খরচ আছে। গরীব আত্মীয়-স্বজনদের দায়ে-আপদে কিছু দিতেথুতেও হয়।"

"কিন্তু তোর বৌ-এর তো ছিল সব?"

"ছিল, কিন্তু শাড়ি কি আর চিরকাল থাকে? গয়নাগুলোও ক্ষয়ে যায় এবং এক-একটা দমকা ধাক্কায় এক একখানা বাঁধা পড়তে কিম্বা বিক্রি হতে সেই যে বেরিয়ে যায়, আর তাকে কিছুতেই রিগেন করা যায় না। বিশেষ এই তিরিশ টাকা মণ চাল আর একশো টাকা ভরি সোনার বাজারে। আবার মাইনেটাও গোড়া থেকেই কিছু সংসে চারশো টাকা ছিল না।"

"কিন্তু তোমার তো বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে চাইলেই পাওয়া যেত, একবারটি পরবার জন্যে। যা বড়লোক সব তারা।"

হরিপদ একটু মুচকি হেসে বললে: পাওয়া যেতো কি না জানিনা। তবে চাওয়া কিছুতে চলতো না।"

পাঁচকড়ি বললে: "কী জানি বাবা, তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝি না। কিরে পটলা? খাওয়া হয়ে গেল? আয়, বিয়ে হ্যাদ্। এইটি বড়ো ছেলে। বুড়ো বয়েসের বিয়ে তো আমার? হেঃ হেঃ! তারপর চুপি চুপি বললে: "ছেলেমেয়েগুলোকেও এনিচি। তা, অমনি তো আর নয়? দস্তুরমতো করকরে নটা টাকা খসিয়ে একখানা শাড়ি দিতে হয়েছে। বউ বলে, 'শুধু হাতে যাবো না। তা সে, বনমালীর মেয়ের জন্যে নটা টাকাই যায় যাক। তবে নগদ লাগেনি। যে-দোকান থেকে বনমালী ক্রেডিটে মাল নিলে, সেখান থেকেই অমনি ওর অ্যাকাউন্টেই নিয়ে নিলুম। স্পষ্টই বললুম ওকে, 'তোমার মেয়ের বিয়ের আমারও তো খুদ-কুঁড়ো কিছু পাওয়া চাই।' তা, ও টাকা আমি শোধ করে দেবো বনমালীকে। কী করি ভাই, পঁচাশি টাকা তো মোটে আয়। ভাগ্যে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু ছিল। হাত দিয়ে জল পড়ে পড়ুক, তবু ভাড়া তো লাগে না।"

হরিপদ অন্যমনস্কভাবে বললে: "কিন্তু বনমালী চোদ্দ হাজার টাকা শুধবে কী করে?"

"কে জানে! হয়ত ভেবেচে, লবডঙ্কা! একটা স্ট্রোক তো ইতিমধ্যে হয়েই গ্যাচে!"

"অ্যাঁ? সে কী? করোনারি থ্রোমবোসিস্?"

"ঠিক জানি না। তবে ব্লাড-প্রেসার আছে জানি।.....চেঁপি, আয় এদিকে। এইটি মেয়ে রে। ভাল করে খেইচিস্? এবারে ঠিক নেমন্তন্ন তো? না, ভাত? অ্যাঁ? বল! ভাত নয় তো?"

চেঁপি লজ্জায় বাপের কোলে মুখ লুকোলো।

হরিপদ জিগেস করলে: "নেমন্তন্ন না ভাত, মানে?"

পাঁচকড়ি বললে: "আর বোলো না। পাড়ায় একটা বাড়ি আছে, সেটা শুধু বিয়ের জন্যেই ভাড়া দেওয়া হয়। এই সেদিন, কারা বিয়ে দিতে এসেছে। আনা সেই শোনা নেই—ধেখে মেয়ের বামনা, নেমন্তন্ন খাবো। 'কাল নেমন্তন্ন খাওয়াবো' বলে অনেক বুঝিয়ে সে রাতে ঘুম পাড়ানো গেল। পরের দিন রবিবার ছিল। বাজার থেকে কলাপাতা কিনলুম, ঘুরি গেলাস কিনলুম। সকাল থেকে রান্নাঘরের দিকে ঘেঁসতে না দিয়ে একেবারে পাতা সাজিয়ে ছেলেমেয়েকে ডাকা হোল 'নেমন্তন্ন খাবি আয়।' মেয়ে হুড়হুড়িয়ে আগে এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়েচে—ছেলেটা তখনো পেছনে। সাজানো পাতের দিকে তাকিয়েই মেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে উঠলো: 'ওরে দাদা, নেমন্তন্ন নয়, নেমন্তন্ন নয়—ভাত!'—তা কী করি বল দিকি? পঁচাশি টাকা আয়ে লুচিটা আর ভাজতে পারিনি ভাই।—সেই নেমন্তন্ন এতদিন বাদে ও আজ খেলে কিনা, ভাই।"

[এরিখ মারিয়া রেমার্কের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। যুদ্ধ পটভূমিকায় লিখিত তাঁর কয়েকটি উপন্যাস জগৎ-বিখ্যাত। আঠারো বছর বয়সে গ্রাজুয়েট হওয়ার সংগে সংগে তিনি যুদ্ধ-আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন—সৈনিক হিসেবে। যুদ্ধ শেষ হোলো, হতভাগ্য জার্মান নাগরিক রেমার্ক ফিরে এলেন। কিন্তু সমাজ ও গৃহকে যা তিনি দেখে গিয়েছিলেন, তা আগের মত নেই, ভেঙে গিয়েছে বদলে গেছে। একালের যুদ্ধ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তার অধিকার বহুদূরদেশেও ব্যাপ্ত; একালের যুদ্ধ কালেও সীমিত নয়, যেদিন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তারপরেও যুদ্ধের রেশ চলতে থাকে; যতটা ভেঙেছে, যেমন করে ভেঙেছে, তা আর গড়ে তোলা যায় না। এই ভাঙা দেশের মধ্যে ফিরলেন রেমার্ক। জীবিকার জন্য ঘুরলেন নানা জায়গায়; একের পর এক হলেন স্কুলের শিক্ষক, নাট্য-সমালোচক ডিস্তি-প্রস্তরের সেল্‌সম্যান, রেসিং মোটরগাড়ীর ড্রাইভার ক্রীড়া পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি। অবসর সময়ে খুব ধীরগতিতে লিখলেন একটি বই; ১৯২৯এ প্রকাশিত হোলো 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট'। এই গ্রন্থ তাকে বিখ্যাত করল। বহুভাষায় অনূদিত হোলো, সাংঘাতিকও এর অনুবাদ আছে। এই সময় জার্মানীর শাসন-ক্ষমতা এস নাৎসীদের হাতে এবং রেমার্ক জার্মানী পরিত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। নাৎসীরা তাঁকে নানা প্রলোভনে দেশে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সব বই ও ফিল্ম নষ্ট করে ফেলল। ১৯২৯ খৃঃ রেমার্ক আমেরিকায় চলে যান। প্রথমে থাকেন হলিউডে, পরে নিউইয়র্ক, বর্তমানে তিনি আমেরিকার নাগরিক। সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর একটি বাড়ী আছে—সেখানে তিনি বছরে অন্তত একবার যান, 'স্কি' করতে।

তাঁর অন্যান্য বই 'দি কমরেডস', 'রোড ব্যাক', 'স্পার্ক অব্ লাইফ' ইত্যাদি। 'এ টাইম টু লাভ এ্যাণ্ড এ টাইম টু ডাই' তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস এবং অল্প সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এ উপন্যাসটিও যুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত। উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ নেই—তাই বাংলা-ভাষার পাঠকদের সংগে এর পরিচিতি ঘটাবার জন্য নিম্ন-লিখিত সংক্ষিপ্তসারটি প্রকাশ করা হোলো। সম্পাদক।]

সংক্ষেপীকরণ | উপগুপ্ত

এরিখ মারিয়া রেমার্ক রচিত উপন্যাস

এ টাইম্ টু লাভ্, অ্যাণ্ড এ টাইম্ টু ডাই

মৃত্যুর গন্ধ আলাদা—আলাদা জায়গায়। রাশিয়ার মৃত্যুর যা গন্ধ, আফ্রিকায় তা নয়। আফ্রিকায় অপ্রোথিত মৃতদেহের ওপর সূর্যের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত, রাশিয়ায় হয়তো তা নয়। ভিজে ভারী মৃত্যু কোথাও। কোথাও বা বালি রোদ আর বাতাসে শুষ্ক মৃত্যু। রাশিয়ার মৃত্যু তৈলাক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত।

যত আলাদাই হোক, তবু তারা মৃত্যু। নানা চেহারায় নানা গন্ধে, নানা রূপে। গভীরে তারা এক।

সেই মৃত্যু ঘিরে আছে ওদের। সব দিকে, সব সময়। মৃত্যুর ব্যাপ্ত তরঙ্গলীলার মধ্যে ওরা দ্বীপখণ্ড। শুধু এক দিকে একটু পথ আছে মনে হয়—পেছন দিকে। পিছিয়েছেও ওরা অনেক সময়। কিন্তু তখনও পুরো নিরাপদ মনে হয়নি নিজেদের। সেই মৃত্যু-বলয়িত দ্বীপ-খণ্ডই যেন। এর থেকে নিষ্কৃতি নেই।

নিষ্কৃতির জন্য দরখাস্ত করেছিল গ্রেবার। অনেক দরখাস্তের ভীড়। সবাইকে একসংগে ছাড়া যায় না। একের পর একের পালা আসে।

গ্রেবারও একদিন ছুটি পেল—অনেকের ঈর্ষার মধ্যে। তিন সপ্তাহের জন্য মৃত্যুর কাছ থেকে ছুটি।

সৈনিকবন্ধুরা বলল, 'বিদায়! আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে।'

গ্রেবার বুঝল কথাটার অর্থ, তবু বলল, ফিরে না আসা পর্যন্ত—মাত্র তিন সপ্তাহ।'

কেউ বলল তার মার সংগে দেখা করতে।

যাত্রা হোলো শুরু। মৃত্যুর তীর থেকে জীবনের তীরে। গ্রেবার যাবে তার বাড়ীতে। যেখানে কেটেছে

আর শৈশব, কৈশোর। সেই দেশ যে এত কাছে, তা আগে জানত না সে।

যাত্রাপথে মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়ানো। সৈনিকদের দ্রুত ব্যস্ত যাতায়াত। সাধারণ লোকদের ত্রস্ত আতঙ্কিত পলায়ন। সর্বত্র বিধ্বস্ত—সভ্যতা, সহর, গ্রাম।

গাড়ীতে অকারণ ঝগড়া হয়। আবার থেমেও যায়। হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে যেন থেমে যায়। সত্যি, এই মুহূর্তে এই সামান্য কিছু নিয়ে ঝগড়া করার কোন অর্থ হয় না—যে কোন মুহূর্তে শুধু একটা বোমা সবাইকে বিলুপ্ত করে দিয়ে অট্টহাস্য তোলবার জন্যে যেন ওৎ পেতে আছে। বোঝে সবাই সেটা। হঠাৎ বোঝে, আর থেমে যায়। কলহ অর্থহীন। তখন হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করে আর একজনের বাড়ীর খবর। হ্যাঁ ছেলেরা যুদ্ধে। বৃদ্ধ শিশু নারীরা সরে যাচ্ছে। একটি ছেলে মারা গেছে, খবর এসেছে।

না, কাঁদবার কিছু নেই। দেশের জন্যে? না, না তা বলছি না। তবে? কি জানি কি বলছি।

এমনি করে তবু এক সময় এসে পৌঁছনো গেল—সেই শহরে যেখানে গ্রেবার জন্মেছে, ছেলেবেলা থেকে যুদ্ধে যাবার আগে পর্যন্ত মানুষ হয়েছে।

কিন্তু কোথায় শহর। এ যে শহরের ধ্বংসস্তূপ, শহরের চেহারা পালটে গেছে। যেখানে রাস্তা ছিল না কস্মিনকালে, সেখানে, বাড়ী ভেঙে রাস্তা আপনা থেকে তৈরী হয়ে গেছে। আগের রাস্তা হয়তো ধ্বংস-স্তূপের তলায় চাপা পড়ে গেছে। শহরের ভূগোল চিহ্নিত থাকে রাস্তায়, বড় বড় বাড়ীতে, সিনেমাহলে, পথিপার্শ্বের বিজ্ঞাপনে, ট্রাম-বাসের রুটে। সে সবই এখন বেমালুম লোপাট। আছে কতগুলি ইঁট-কাঠ-লোহা-ধুলো, আর কতগুলো মানুষ। অক্ষত বাড়ীর সংখ্যা খুব কম, মানুষ-গুলো ঝড়ের ঝাপট খাওয়া।

গ্রেবার ছুটিতে এসেছিল দুদিন স্বস্তিতে থাকবে বলে। সব ভুলে যেতে চেয়েছিল সে। কামান, গোলা, বন্দুক, সৈন্য—আর সর্বোপরি মৃত্যু, যার ছায়া সদাদর্বদা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ওপর কালো মেঘের মত বিস্তৃত হয়ে থাকে। ভেবেছিল হাসবে, খেলবে, ফুর্তি করবে, ঘুমোবে। হ্যাঁ ঘুমোবে নিশ্চিন্তে; তাড়াতাড়ি ওঠার আদেশ নিয়ে নয়, অকস্মাৎ কাঁচা ঘুমে উঠে মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানোর কাহিনী ভুলে; সাইরেনের দুঃস্বপ্ন আর্তনাদ যে ঘুমের মধ্যে ক্রমাগত বেজে উঠবে চমকে দেয় সে ঘুম নয়। নিটোল ঘুম। আর বাড়ীর লোকজন, মা, বাবা—।

কিন্তু এ কি! কোথায় বাড়ী! যুদ্ধক্ষেত্র তার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে এ শহরে এসে পৌঁছেছে। ছাড়বে না তাকে। একালের যুদ্ধে সারা দুনিয়াই যুদ্ধক্ষেত্র। কথাটা শোনা ছিল। কিন্তু এমন করে বোঝা ছিল না গ্রেবারের।

শহরে এসে পৌঁছে দিশেহারা অবস্থায় কাটল কিছুক্ষণ। কোন পথে কতটা গেলে বাড়ি পাওয়া যাবে তার হদিশ মেলে না।

ইতিমধ্যে বাজল একবার সাইরেন। গোটাপাঁচ শত্রুপক্ষ বোমা ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। হুড়মুড় করে পড়ল কিছু বাড়ী, জ্বলল আগুন, ছুটি! ছুটি কোথায়?

একটা লোক চীৎকার করে উঠল, 'এই এদিকে এসো, এখানে অনেক লোক মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে।'

'কে কে চাপা পড়েছে?' উৎকণ্ঠিত গ্রেবার প্রশ্ন করল।

কেউ উত্তর দিল না। সেই শূন্যতায় আশ্চর্য বোকা ও অর্থহীন মনে হোলো কথাটা।

ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে একটা হাত কেঁপে কেঁপে নড়ছে। ও হাতটা তবু হাওয়ায় আছে। বাকীটা স্তূপের তলায়।

কাজে নেমে পড়ল গ্রেবার। ইঁট-কাঠ সরানো আর লোকগুলোকে জ্যান্ত বা মৃত উদ্ধার করা দরকার।

একটা লোককে টেনে তোলা হোলো। অসাড়।

গ্রেবার জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা বেঁচে আছে?'

'জানি না। দুমিনিট আগেও বেঁচে ছিল।'

লোকটার গায়ে ভগ্নস্তূপের মুখে হাত বোলাল গ্রেবার দাঁতের মধ্যে হাত ঢোকাল। একবার একটু দাঁতের চাপ লাগল হাতে। তারপর মৃদু কামড়টা আরো শিথিল হয়ে গেল। হাতটা সরাল গ্রেবার। হাতটাও সাড়া দিল না। ঐ হাতটা ধরেই বসে রইল সে খানিকক্ষণ।

শত্রুবিমান চলে যাবার পর আবার সে খুঁজতে লাগল তার বাড়ী ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ইঁট-কাঠের মধ্যে বাড়ীগুলোর স্বতন্ত্র চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তা কোথাও

বুঝে গেছে, কোথাও নতুন হয়েছে। চেনার উপায় নেই। 'উদ্ধার-কর্মী'রা উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে। তাদের কাছেই খোঁজ করে বাইশ নম্বর বাড়ীর জায়গাটা চেনা গেল।

'এইটাই বাইশ নম্বর বাড়ী?' জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'হ্যাঁ, ঐটাই বাইশ নম্বর বাড়ী ছিল।'

'শীগগির এসো। এখানে নিশ্চয়ই লোক চাপা পড়ে আছে। আমার বাবা মা—'

'চীৎকার করবেন না। আমাদের কাজ আছে।'

'আর এটা বুঝি কাজ নয়!'

'বাজে বকবেন না। যারা সদ্য চাপা পড়েছে বা আহত হয়েছে, তাদের কাজ আগে। আপনার বাড়ীতে সপ্তাহখানেক আগে 'রেড' হয়েছে। তখনি হয় উদ্ধার করা হয়েছে অথবা মারা গেছে।'

'মারা গেছে!'

'নাও যেতে পারে। বুড়ো-বুড়ীদের অনেককে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে।'

'কোথায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'জানি না। সরুন, সরুন, কাজ করতে দিন।'

সৈন্য-দপ্তরে, রিপোর্ট করল গ্রেবার তার উপস্থিতির। সেখানেই খোঁজ করল মৃত এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পর্কে। কিন্তু কোন লিষ্টই সম্পূর্ণ নয়।

'কেন সম্পূর্ণ নয়?' প্রশ্ন করল গ্রেবার।

'সম্ভব নয়! কোথায় কে মরছে, সব খবর পাওয়া মুস্কিল—এত অল্প সময়ে।'

'যারা বাইরে গেছে তাদের লিষ্ট—'

'তাদের লিষ্টও সম্পূর্ণ নয়। সবাই সরকারী সাহায্যে সরে যায় নি। অনেকে নিজেরাই গেছে। তাদের পুরো হিসেব জোগাড় করা যায় নি। কিন্তু জরুরী কাজ রয়েছে।

'অনুসন্ধান-অফিসে' লোক বড় হয়েছে অগণ্য। বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, বৌ, ভাই—সব নিখোঁজ। তাদের খোঁজ করতে এসেছে। লোকগুলোর মুখে যন্ত্রণা ও আতঙ্ক। নিখোঁজদের অতকরা একশো জনকেই যে আর কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না তা বুঝতে পারছে সবাই। আর হয়তো ভাবছে—নিখোঁজ হবার পালা তাদের বোধহয় সন্নিকট।

বাবা-মার নাম অফিসে লিখে রেখে এল গ্রেবার। খোঁজ পেলে জানাবে।

এক সৈনিক বন্ধুর কৃপায় থাকার একটা জায়গা মিলল। বাসযোগ্য জায়গা প্রায় নেই। সারা শহর উধাও।

একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা নেম-প্লেটে চোখ পড়ল গ্রেবারের: 'ডঃ ক্রুজে।

বেল টিপতে একটি মাঝ-বয়সী ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। 'কাকে চাই?'

'ডঃ ক্রুজে।'

'ডঃ ক্রুজে?'

'চিকিৎসার ব্যাপারে?'

'না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে।'

মহিলাটি সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, 'ক্রুজে এখানে থাকেন না।'

'নেম-প্লেট রয়েছে।'

'ওটার অনেক আগেই বিদায় হওয়া উচিৎ ছিল।'

'ডঃ ক্রুজের বাড়ীর কেউ থাকে?'

ওপাশের দরজা থেকে একটি বছর কুড়ির মেয়ে বাইরে সামান্য বেরোল। বলল 'কি দরকার।'

'একটা খবরের ব্যাপারে এসেছি।'

'এখানে বড় আলো বাইরে পড়ছে। ভেতরে আসুন।'

ভেতরে এসে মেয়েটি বলল, 'এ কি! আমি তোমাকে চিনি মনে হচ্ছে। তুমি এখানকার হাইস্কুলের ছাত্র ছিলে না?'

'হুঁ,' গ্রেবারও চিনল। এলিসাবেথ মেয়েটির নাম। ছোটবেলায় স্কুলে আসত বড় বড় চোখ ছিল, আর অজস্র চুল ছিল মেয়েটির। 'তোমার চারদিকে এত পাহারা যে মনে হয় তুমি একজন সেনাপতি।'

'আমি আসলে প্রায় বন্দিনী। তারপর কি মনে করে?'

এলিসাবেথ জোরালো একটি যুদ্ধ-সঙ্গত বাজিয়ে দিল রেকর্ডে।

গ্রেবার বলল, 'ওটা থামাও। আমি ওসব অনেক শুনেছি।'

'তোমার শোনার জন্য নয়। বাইরের মাঝবয়সী

ভদ্রমহিলা আমাদের কথা যাতে না শুনতে পায়, তাই—' তারপর হঠাৎ বলল, 'বল, বাবার কি হয়েছে?'

'তোমার বাবার! আমি কিছু জানি না তো।'

'তবে?'

'আমার বাবা-মার কোন খোঁজ নেই। ভেবেছিলাম উনি যদি কোন খোঁজ দিতে পারেন, তাই—। তোমার বাবার কি হয়েছে?'

তাঁকে কনসেনট্রেশন্ ক্যাম্পে নিয়ে গেছে।

হঠাৎ বেজে উঠল সাইরেন। চারদিকে চীৎকার শোনা গেল। বাইরে থেকে সেই মাঝ-বয়সী মেয়ে-লোকটি চীৎকার করে উঠল, 'আলো নেভাও।'

আলো নিভিয়ে দিল এলিসাবেথ।

'ও মেয়েলোকটা কে?'

'স্পাই।'

'তুমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওনা কেন?'

'না, আমি পালাব না।' সাইরেনের গলাকে ছাপিয়ে তার গলাটা তোলবার চেষ্টায় চীৎকার করে বলতে হোলো কথাটা।

গ্রেবার চীৎকার করে বলল, 'সৈনিক-রীতি বলে, যে যায়গা দখলে রাখা যাবে না, তা ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

এবার ক্রুদ্ধ চীৎকারে এলিসাবেথ বলল, 'তবে ছেড়ে চলে যাও।'

এলিসাবেথ একা ওকে ছেড়ে এগিয়ে গেল।

গ্রেবার ধরল ওকে। ও ছাড়িয়ে নিল সজোরে। গ্রেবার বলল, 'দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, এয়ার-রেড শেল্টারে।'

আতঙ্কিত কতগুলো মুহূর্ত শুধু বোমার আওয়াজ শুনল। তারপর সব স্থির, নিঃশব্দ।

বাইরে এল ওরা দুজন। এলিসাবেথ বলল, 'কবর-খানা! এর চেয়ে ওপরের ধ্বংসস্তূপ ভাল। তার ওপরে অন্তত আকাশ আছে।'

গ্রেবারের কয়েকদিন কাটল অনুসন্ধানে, দু'একজন ছুটি-পাওয়া সৈনিকের সঙ্গে মদ্যপানে, সাইরেন শুনে, এয়ার-রেড শেল্টারে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে হেঁটে।

মদ্যপানের সুখও সাধারণ লোক পায় না। খাদ্যের অবস্থাও খারাপ। গ্রেবার সে ব্যাপারে ভাগ্যবান। পরিচিত এক বন্ধু মিলিটারী অফিসার—তার দৌলতে খানা-পিনা জুটছে মন্দ না, সেই অফিসারটি ওর বাবা-মার খোঁজও করেছে, পায়নি কোন খোঁজ।

একটি ভাল ভদ্‌কা মদের বোতল পেয়ে গ্রেবার এল এলিসাবেথকে দিতে। তার নিজের মদের সরবরাহ ভাল। এলিসাবেথ নিশ্চয়ই ভাল মদ পায় না।

বাড়ীতে গিয়ে শুনল, এলিসাবেথ এখন নেই, আসবে সাতটায়।

গ্রেবার পার্কে একটা বেঞ্চে বসে রইল এক ঘণ্টা। এই একঘণ্টায় সে অধীর বোধ করতে লাগল এলিসাবেথের জন্য। আগে কিন্তু দেখা করবারও বিশেষ ইচ্ছে হয় নি। আশ্চর্য এই ঘণ্টা-টা।

এক ঘণ্টা পরে দেখা হোলো। দেখা হতে গ্রেবার খুশি হোলো। একা-একা ভাবটা যেন একটু কাটল।

সেদিন রাত্তে ওরা একটু বেড়াতে বের হোলো।

কিন্তু সবত্রই যেন যুদ্ধ। যুদ্ধের আবহাওয়া, যুদ্ধের পোশাক, যুদ্ধের অন্ধকার, যুদ্ধের আশংকা, যুদ্ধের গন্ধ। যুদ্ধের দানবটা যেন গ্রেবারের পিছু-পিছু এখানে এসে পৌঁছে গেছে। অথবা পৌঁছেছে সর্বত্র। - শুধু এখানে নয়।

যুদ্ধের কথাই চলছিল খোলা বাগানের নির্জন বার-এ বসে। হঠাৎ গ্রেবার বলল, 'একটু বিষয় বদলানো যাক। যুদ্ধের কথা এখন আর বলব না।'

এলিসাবেথ বলল, 'এখানে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলব না। শুধু চুপচাপ একটু বসে থাকি।'

'বেশ।' কিরকম ঘুম আসছিল তার। আশ্চর্য এক শান্ত ঘুম। গতকাল এমন শান্ত ঘুম আসেনি তার।

এই দিনটা থেকে ক্রমে ওরা বেশ সহজ হয়ে এল। মৃত্যু-পরিকীর্ণ জগতে ওরা যেন পরস্পরের মধ্যে একটু জীবন খুঁজে পেল। আর সেই জীবনকে আঁকড়ে ধরল ক্ষুধিত আগ্রহে। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ওরা পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করল। যেকোন মুহূর্ত যেখানে মৃত্যু হয়ে দেখা দিতে পারে, সেখানে এক মুহূর্ত জীবনের মূল্য অসীম।

গ্রেবার তার মিলিটারী পোশাকটা ছেড়ে সিভিল পোশাক পরতে লাগল। কয়েকদিন সে যুদ্ধকে ভুলে

থাকবে আর অফিসার মাত্রকেই সেলাম করবে না।

গ্রেবার তার শিক্ষক পলম্যানের সঙ্গে দেখা করে এল। বৃদ্ধ প্রথমে তাকে ভেবেছিলেন পুলিশের লোক, পরে চিনলেন।

হঠাৎ গ্রেবার জিজ্ঞেস করল, 'এ সবের মানে কি? এই যুদ্ধ, এই মৃত্যু, এই ধ্বংস।'

পলম্যান করুণভাবে হাসলেন। উত্তর নেই তাঁর।

গ্রেবার বলল, 'কি হবে গিয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মধ্যে?'

'তার মানেও মৃত্যু। ওরা বেড়াজালে আটকেছে মানুষকে।'

পলম্যানের তবু সান্ত্বনা, তিনি তাঁর বইগুলোকে বাঁচিয়ে সরিয়েছেন।

গ্রেবারের মনে হোলো, আশ্চর্য, কতদিন সে কোন বই পড়ে না।

বোমা পড়েই চলেছে। নিয়মিত। বোমা না পড়লেই এখন মনে হয় অনিয়ম ঘটল। যে বাড়ীগুলো মাথা তুলে ছিল, তারাও ক্রমাগত ভাঙছে।

এলিসাবেথের ঘরে এসেই কয়েকদিন থাকছিল গ্রেবার। কারণ ঐ মাঝবয়সী মহিলা স্পাই রাজনৈতিক কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছেন।

বাইরে বেরিয়ে ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও হাঁটতে এক রকমের ভাল লাগে গ্রেবারের। সে বেঁচে আছে—আশ্চর্য ঘটনা। এর বিস্ময় শেষ হতে চায় না।

এলিসাবেথ বলে, 'ঐদিকে কোথায় আগুন লেগেছে?'

'আগুন নয়, সূর্যাস্ত।'

হাসে এলিসাবেথ: 'সূর্যাস্তও হয় আজকাল? অমন আকাশ রাঙিয়ে? আকাশ লাল দেখলে যে এখন আমাদের ভয় হয়।

পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এলিসাবেথ বলে, 'এটা নিশ্চয়ই বসন্তকাল। ভায়োলেট ফুলের গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে—।'

কিন্তু দিন ফুরিয়ে আসছে গ্রেবারের ছুটির। আর কয়েকটা দিন মাত্র জীবন। তারপরই আবার মৃত্যুক্ষেত্র।

হঠাৎ গ্রেবার বলল, 'এলিসাবেথ, এস আমরা বিয়ে করি।'

কেঁদে ফেলল এলিসাবেথ: 'এই মৃত্যুপুরীতে!'

'হাঁ।, মৃত্যুর মধ্যে আমরাই তো জীবন। জীবনকে রুদ্ধ রাখলে তো মৃত্যুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।'

ভেঙে পড়ল এলিসাবেথ গ্রেবারের বাহুর মধ্যে। কান্নায়।

'কাঁদছ কেন?'

'বাবার সুবাদে আমাকে যেকোন দিন কনসেনট্রেশন্ ক্যাম্পে নিয়ে যেতে পারে।'

'তার আগেই করব আমি। আমার এখানকার মেয়াদও তো ফুরিয়ে এল।'

গ্রেবার পলম্যানের কাছে গিয়ে বলল, এখানে একটু জায়গা দিতে পারেন একজনকে দিনের জন্যে।'

'কে সে?'

'আমি যাকে বিয়ে করব তাকে। অবশ্য হয়তো দরকার নাও হতে পারে।'

'আচ্ছা। তোমার বিয়েতে আমি কি উপহার দিতে পারি। আচ্ছা, এই নাও একখানা বই—ছবির বই।'

গ্রেবার পলম্যানের বিশাল লাইব্রেরীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, 'আমি বুঝি না। এই বই, ছবি, কবিতা, এইসবের সংগে যুদ্ধটা কি করে একই সংগে আছে।'

পলম্যান হাসলেন। 'আছে দুটো জিনিসই পাশাপাশি—এই এ মুহূর্তের সত্য। আর যাঁরা এ বইয়ের লেখক তাঁরা এখন বেঁচে থাকলে হয়তো সবই থাকতেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।'

গ্রেবার বেরিয়ে পড়ল।

বিয়ের অনুমতি সহজেই পাওয়া গেল—সৈন্য বলে। গ্রেবার একটা ভাল পোশাক পরল, চুল ছাঁটল। ফুল কেনা যায়, সব ফুলের বাগানে সবজী করা হচ্ছে। তাও কয়েকগুচ্ছ লিলি যোগাড় করা গেল। কিন্তু সাক্ষী? রেজিষ্ট্রি অফিসে আর এক জোড়া বিয়ে করতে এসেছিল, তাদেরও সাক্ষী নেই। অতএব পারস্পরিক সাহায্যে বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর ওরা দুজনে শহরের বাইরে একটা আরণ্য

জায়গায় গেল—মধুচন্দ্রিমা। সেখানে শুয়ে অনেকক্ষণ কাটাল।

গ্রেবার বলল, 'যুদ্ধ থামলে আমরা একবার সুইজারল্যাণ্ড যাব। সুন্দর জায়গা। পলম্যানের এই বইটায় সুইজারল্যাণ্ডের অপরূপ ছবি।'

'সুইজারল্যাণ্ড! যেখানে এখনও রাতে আলো জ্বলে!'

না, ওখানে এখন আলো জ্বলে না। ওদের আলোয় বিমানবহর তাদের স্থান নির্দিষ্ট করতে সুবিধে পায়। তাই আমাদের সরকারের নির্দেশে—'

'ইউরোপে তাহলে রাতে একটাও আলো জ্বলে না।'

'না, তবে যুদ্ধের পর আমরা যখন যাব, তখনও এই দেশ এই ছবিগুলোর মত থাকবে, যা ইউরোপের অন্য কোন দেশেই থাকবে না। সব দেশে থাকবে ধ্বংসস্তূপ।'

সন্ধ্যেয় বাড়ী ফিরল ওরা। এলিসাবেথের বাড়ীতে।

পরদিন দুপুরে বিরাট বোমা-আক্রমণ ঘটল। সহরের বহু অংশ জ্বলতে লাগল। এই দিনটা এলিসাবেথের বাড়ী বাঁচল। কিন্তু কয়েকদিন পরে ওদের বাড়ীও হোলো ধূলিসাৎ।

আশ্রয় তখন রাস্তা. পলম্যানের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল গ্রেবার।

যাযাবরের নতুন জীবন চলতে লাগল। এর মধ্যে এলিসাবেথকে তার কারখানায় চাকরীতে যেতে হয়। আশংকা থাকে, হয়তো আর দেখা হবে না। কারখানার সংগে হয়তো সেও উড়ে যাবে।

বাধার অন্ত নেই। দুটি হৃদয়ের স্রোত বরাবর প্রতিহত হয়। আর বাধার ফলেই নিভৃত মুহূর্তগুলো নিবিড় হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন ওরা পার্কে সন্ধ্যার শুরে থাকে, তখনও একটা বিষণ্ণতার সুর বাজতে থাকে। দিন আর বেশী নেই। ছুটি শেষ হয়ে আসছে।

'তবু আশ্চর্য, আমরা বেঁচে আছি, বাঁচাটাই কি আশ্চর্যের আজ! তাই না!'

'তাই। কিন্তু আমি আজও বাঁচতে চাই। আরো বেশী করে, আরো বেশীদিন।' বলে এলিসাবেথ।

যাওয়ার আগে এলিসাবেথের জন্য একটা ঘর ঠিক করতে হোলো। ও একা থাকবে। ওর পক্ষে মাঠ-ঘাট নিরাপদ নয়।

'কাঁদছ কেন?' বলে গ্রেবার।

'ও কিছু নয়। দুঃখ নয়। বিশ্বাস কর আমি সুখী।'

কিন্তু এই কদিনে এত আমার জীবনের মধ্যে এসেছে আমি ধারণ করতে পারছি না। দশ বছরের এক নাগাড়ে একঘেয়ে জীবন—আর এই কদিনের জীবন; এই দেখতে ছোট জীবনটাই আসলে এত বড় যে মন উপছে পড়ছে। শোন, বোধহয় আমার বাচ্চা হবে।'

'বাচ্চা? কেন?'

'কেন নয়?'

'বাচ্চা! এই সময়! আমার ভাবা ছিল না। ভাবা নেই।'

'তোমায় আর ভাবতে হবেও না। আর আমি এখনও নিশ্চিন্ত নই।'

'ছেলে! সে বড় হবে—আবার আর একটা যুদ্ধের জন্যে?'

'তুমি কোনদিন বাচ্চা চাও না?'

'জানি না। ভাবিনি। শান্তির সময় হয়তো চাই। এত বিষাক্ত চারদিক—এর মধ্যে শিশু!'

'ঠিক ঐ জন্যেই তো—'

'কেন?'

'ওরা এর মধ্যে থেকে হয়তো উল্টোটা পাওয়ার চেষ্টা করবে। আর আমরা বলতে পারব ওদের আরো ভাল কিছু আছে যার সামান্য অংশ আমরা দেখেছি আগে।'

আবার পোশাক পালটে মিলিটারী পোশাক পরল গ্রেবার।

ট্রেণ যখন ছাড়ে. তখনও গ্রেবার দেখতে পায় ট্রেনের সংগে সংগে সমান্তরাল ভাবে এলিসাবেথ ছুটছে। তার পর একসময় ট্রেন ওকে ছাড়িয়ে চলে গেল।

আবার যুদ্ধক্ষেত্র। চিঠি আসে এলিসাবেথের। সে চিঠি থাকে সর্বদা গ্রেবারের পকেটে। সবসময় সেটা পড়তে হয় না। শুধু মাঝে মাঝে সে হাত দেয় পকেটটার ওপর।

এরপর এল সেইদিন। সে একটি রাশিয়ান বন্দুকের ঠিক মুখোমুখি পড়ে গেল। সে কালো নলটা স্পষ্ট দেখতে পেল একেবারে সামনে। হঠাৎ গ্রেবার অনেক কিছু বলতে চাইল—খুব দ্রুত, খুব উচ্চকণ্ঠে—।

গুলির আঘাত সে অনুভব করল না। অকস্মাৎ সে দেখল সামনে ঘাস আর ঘাস। আর একটা চারা গাছ। গাছের পাতা দুলে উঠল। একটা পাতা দুলে দুলে সমস্ত আকাশটাকে ঢেকে দিল।

গ্রেবারের চোখ বুঁজে গেল।

পশ্চিম জার্মান ধনকুবের শ্রেণী

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার বিশ্বরাজনীতির ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের সম্ভবত ১৯০৮ সালে 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার প্রতিনিধির সংগে কাইজার ২য় উইলহেল্মের সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে। সেই সাক্ষাৎকারে জার্মান সম্রাট উত্তেজিত স্বরে বলেন—

"ব্রিটিশ তোমরা মার্চ মাসের খরগোশের মতই পাগল, একেবারে পাগল!"

এবারে আসুন ১৯৫৯ সালে ম্যাকমিলানের মস্কো ঘুরে যাওয়ার ঠিক পরেই। এপ্রিল মাসে ক্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক সভায় চ্যান্সেলার আদেনাউয়ার মন্তব্য করেন :—

"ওঃ এই ব্রিটিশগুলো এখনো যদি না বোঝে যে ইউরোপকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত মুরোদ তাদের আজ নেই তাহলে আর কবে বুঝবে! ইউরোপের অবিসম্বাদী নেতা আজ জার্মানী আর ফ্রান্স।

এই উক্তির সপ্তাহ কয়েক পরেই আমেরিকার 'লুক' পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ কবি চ্যান্সেলারের সংগে দেখা করতে গিয়ে ঘরের টেবিলের উপর দেখেন আইসেনহাওয়ার ও ডালেসের ফটোর মাঝখানে মিঃ ম্যাকমিলানের একখানি ফটো রয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলারের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করলে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ছবিখানি তুলে নিয়ে দেরাজের মধ্যে রেখে দিয়ে আক্ষেপ করে বলেন—

"আর বলেন কেন, আমি নিজের হাতে না করলে একটি কাজও হবে না।"

১৯০৮ সালের কাইজার এবং ১৯৫৯ সালের চ্যান্সেলারের মধ্যে ব্রিটিশ আচরণের বিরুদ্ধে এই যে আক্রোশের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে এর কারণ কি? কারণ এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ জয়ের চেষ্টার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী একথা শুনে অনেকে আপত্তি করতে পারেন এই বলে যে আগে যা ছিল তা ছিল, আজ জার্মানী আর সাম্রাজ্যবাদী নেই, সেরকম কোন উদ্দেশ্যও তার নেই। এই যুক্তি যারা দেন তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না কারণ আমেরিকার কোনদিন ব্রিটিশ ভারতের মত পাশমহল ছিল না। এই দৃষ্টান্তদ্বারা রাশিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ পান এবং নিজেদের উক্তি প্রমাণ করার জন্যে একজনের কথা অন্যজনের মুখে লাগিয়ে দেন। যেমন ধরুন "বিংশ শতাব্দী" পত্রিকায় শ্রীবরুণ দত্তের প্রবন্ধের মুখের মত জবাব দিতে গিয়ে "চীন এক্সপার্ট শ্রীশৈলপতি মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিখ্যাত জার্মান রণনীতি বিশারদ ক্লজভিৎস-এর বিশ্ববিখ্যাত উক্তি মাও সে-তুং-এর নামে বেমালুম চালিয়ে দিয়েছেন। সেই উক্তিটি হচ্ছে—'War is a continuation of politics by the means' মনে হয় কি ক্লজভিৎস, কি মাও, কিছুই তিনি পড়েন নি। কিন্তু এতখানি সততার অভাব যাঁর মধ্যে তাঁর প্রবন্ধের অন্যান্য কথাও পাঠকরা নিশ্চয়ই যাচাই করে নেবেন। অন্তত গণতান্ত্রিক ও ন্যায় নীতির হয়ে ওকালতি করা এঁদের শোভা পায় না। এইসব গণতন্ত্র-দরদী ভদ্রমহোদয়েরা মার্কিন বা জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে দেখতে পান না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার হিম্মৎ অবশ্য তাঁদের নেই কারণ দেশের লোক ব্রিটিশ মার্কা সাম্রাজ্যবাদকে হাড়ে হাড়ে চেনে। আসলে সাম্রাজ্যবাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ছিটেফোঁটা কুড়িয়ে বাড়িয়ে এঁরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলেছেন, কারণ লেনিনের ভাষায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে রয়েছে এক অচ্ছেদ্য নাড়ীর টান। নিজের আধিপত্যের এলাকা বিস্তৃত করার চেষ্টা না করে ধনতন্ত্র বাঁচতে পারে না।" ভারতের নতুন স্বাধীন হওয়া পুঁজিপতিদের সেই এলাকা বিস্তারের অর্থাৎ বাজার দখলেরই চেষ্টা চলছিল তিব্বতে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জলের দরে তিব্বতী পশম কিনে সোনার

ধরে দেশে-বিদেশে বেচতেন। কিন্তু তিব্বতের মুক্তির পর পশমের দর সেখানে বেঁধে দিয়ে এই অস্ত্রটি ব্যবসা নির্মূল করা হয়েছে। তাই "তিব্বত হবদীদের" এত গাত্রদাহ। তাই দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী রকধার্মিকের সংগে গলা মিলিয়ে তাঁরা একদিকে তিব্বতের ধালাই লামার জন্যে হাহুতাশ করছেন, অন্যদিকে খাল কেটে জার্মান ও মার্কিন ধনিক কুমীরদের ঘরে ডেকে আনছেন আর তাদের ভারতপ্রেমের প্রশস্তি গাইছেন। কিন্তু এত দলাই-লামাই করেও ধালাই লামার লামালাদী আর জীইয়ে তোলা যাবে না।

পশ্চিম জার্মান সরকার সাম্রাজ্যবাদী কিনা সেটা এবার বিচার করে দেখতে হলে সাম্রাজ্যবাদের মূল বিশেষত্বগুলির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান ও মার্কিন কর্মপন্থার বিচার করা দরকার।

পররাজ্য দখল করে সেখানে নিজেদের শাসন কায়েম করা সাম্রাজ্যবাদীদের চরম লক্ষ্য নয়, চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। এ বিষয়ে এঙ্গেলস্ বলছেন—

"আক্রমণটা উপায় মাত্র, আসল লক্ষ্যটা হচ্ছে অর্থনৈতিক।"

সেই অর্থনৈতিক লক্ষ্যটি হচ্ছে পুঁজি জমা করা এবং মুনাফা সঞ্চয় করা।

এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের ভিত্তিতে লেনিন লিখেছেন—

"পুঁজিবাদের বাজার দখলের দুটি দিক আছে—দেশ-বিশেষের এলাকার মধ্যে পুঁজিবাদী কৃষি ও শিল্পের ক্রমবিকাশ অর্থাৎ নির্দিষ্ট এলাকার গভীরে পুঁজিবাদী শোষণের মূল উপমূলের বিস্তার এবং তারপর সেই দেশের বাইরে নতুন অঞ্চলে সম্প্রসারণ।" প্রথমটি পুঁজিবাদের গভীরতার দিক, দ্বিতীয়টি সম্প্রসারণের দিক অর্থাৎ উপনিবেশের বাজার দখলের দিক (সাম্রাজ্যবাদ) এবং দ্বিতীয় দিকটির প্রধান ধারক ও বাহক হচ্ছে ধনকুবের শিল্পপতি গোষ্ঠী। সেসিল রোডেসের কোম্পানীই দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়ায় ব্রিটিশ পল্টনের রামদার রাস্তা খুলে দিয়েছিল, মানেসমান—ক্রুপ প্রমুখ জার্মান ধনকুবেরের দলই মহাযুদ্ধের আগে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আফ্রিকা অভিযানের এবং হেটেন্ট জাতির উচ্ছেদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুতরাং সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে কোন দেশ দখল করা হোল কিনা হোল সেটা বড় কথা নয়। আসল কথাটা হচ্ছে অন্য দেশের বাজারে পুঁজি খাটিয়ে এবং মাল বেচে সেই দেশটিকে শোষণ করা হচ্ছে কিনা। যদি তাই হয় তাহলেই বলতে হবে সে ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী নীতির অস্তিত্ব রয়েছে।

পশ্চিম জার্মান সরকারের নীতিকে আমরা সেই দিক থেকে যাচাই করে নেব। আমরা দেখব অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশগুলিতে পশ্চিম জার্মানীর কার্যকলাপের চরিত্র কিরকম; তারপর দেখব অনুন্নত আফ্রিকা ও এশিয়াতেই বা সেই নীতির চেহারাটা কি ধরণের?

পৃথিবীতে যে দুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তার মূলে ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ দখলের লোভ। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে যুদ্ধে হারিয়ে তাদের উপনিবেশ দখল করে নেওয়ার জন্যই কাইজার ও হিটলার যুদ্ধে নামেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হার হবার পর জার্মান সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রে কতগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন কারণে সেগুলি নিহিত রয়েছে ইতিহাসের গতি রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ঐতিহাসিক চরিত্র কিরকম? মহাযুদ্ধের আগে বিশ্ব পুঁজিবাদের অসম অগ্রগতির দরুণই জোট পাকাতো বিভিন্ন যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। আজ যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আভ্যন্তরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও আর এক সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে। সে হচ্ছে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংগে যার ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চলেছে—মহাকাল তার পক্ষে। ওদিকে এদিনকার শৃংখলিত উপনিবেশগুলি আজ প্রচণ্ড মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে একের পর এক স্বাধীনতা জয় করে নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ব-বাজারের সীমা ক্রমশই সংকুচিত হয়ে আসছে, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের দেশে তাই দেখা দিচ্ছে মারাত্মক সংকট। ওদিকে সারা দুনিয়ায় উৎপাদিকা শক্তির সম্প্রসারণ আজ যে স্তরে উঠে গিয়েছে তাতে বিশ্ব অর্থনীতি আজ স্বাদেশিক গণ্ডী ভেঙে ফেলে বিশ্বমুখী হতে চাইছে। এর মানে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায় বিশ্ব অর্থনীতি আজ সমাজতন্ত্রমুখী থাকে

লেনিন বলেছেন—"পরিণত বয়স্ক পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলার" লক্ষণ। সারা দুনিয়ার মানুষ আজ আকৃষ্ট হচ্ছে সমাজতন্ত্রের দিকে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী বস্তুনিষ্ঠ অবস্থা আজ আর ভবিষ্যতের কথা নয়, বিশেষ করে মার্কিন ডলার-টনিক দিয়ে জীইয়ে রাখা ইউরোপের অতি পরিপক্ক পুঁজিবাদের পক্ষে তো বটেই। তাই সেখানে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদিকা সম্পর্কের দ্বন্দ্ব আজ এত সঙ্গীন। ইউরোপে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ আজ সরাসরি মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একটি দেশের সীমানার মধ্যে এই দুটি ব্যবস্থার চরম দ্বন্দ্বের উদাহরণ রয়েছে দ্বিখণ্ডিত জার্মানীর মধ্যে।

এই অবস্থায় ইউরোপের দেশে দেশে সামাজিক অন্তর্বিরোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠছে, শক্তিশালী হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি (বিশেষ করে ইতালী ও ফ্রান্সে)। এই দুটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর কোন উল্লেখযোগ্য অংশকে বুর্জোয়া শ্রেণী ব্রিটেন বা আমেরিকার মত ঘুস দিয়ে কিনে নিতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত চাষী, কারিগর, দোকান-কর্মচারী ক্যাসিবাদী চরম প্রতিক্রিয়া ও শ্রমিক-শ্রেণীর মাঝখানে পড়ে কোন দিকে যাবে ভাবছে দ্বিধা-গ্রস্ত মন নিয়ে। এই কারণে এই দুটি দেশে ইজ মার্কিন ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আজ ঘোর সংকটের ঘূর্ণীতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—পতন হচ্ছে একটির পর একটি মন্ত্রিসভার।

এই অবস্থায় ইউরোপীয় ধনিকগোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে আমেরিকাকে মাতব্বর করে নানারকম জোট পাকিয়েছে, সামরিক ও অর্থনৈতিক এইসব জোটের ইউরোপীয় অংশীদারদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা দেওয়া হয়েছে পশ্চিম জার্মানীকে। ফলে ইউরোপের ৬টি দেশের ধনকুবের গোষ্ঠী যে "সাধারণ বাজার" ঘোষণা করে তাতে পশ্চিম জার্মান পুঁজিপতি-দের হয়েছে পোয়াবারো। পশ্চিম জার্মানী বর্তমানে তার শিল্পোৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ রপ্তানী করছে প্রধানত পশ্চিম ইউরোপে। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইতালী আজ পশ্চিম জার্মানীর কাছে যথাক্রমে ২৩২ কোটি, ১২৬ কোটি এবং ৬০ কোটি ডলার ধারে। গত বছর পশ্চিম জার্মানীর সংরক্ষিত সোনা ও মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪০০ কোটি "ডয়চে মার্ক", যেক্ষেত্রে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ নেমে আসে মাত্র ৫০০ কোটি মুদ্রায়। আজ পশ্চিম ইউরোপে জার্মান ফেডারাল রিপাবলিক সব চেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালী যেক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ১৫, ১৮ ও ১৯ ভাগ দেশের অর্থনীতিতে লগ্নী করেছে, পশ্চিম জার্মানী করছে শতকরা ২৫ ভাগ।

মূলধন রপ্তানী করা, পশ্চিম জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বিস্তারের এক প্রধান হাতিয়ার। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর ২২০ কোটি মার্ক বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তারপর প্রতি বছর গড়ে ৫০ কোটি মার্ক করে বেড়ে আসছে। ক্রিনিক্স-রাইন্‌বোর ব্রাইসেন, মানেসমান, ক্রুপ ইত্যাদি একচ্ছত্র শিল্পপতিরাই এইসব মূলধনের মালিক। আজ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মান পুঁজিপতিরা বিদেশে ২০০০ কোটি মার্ক মূলধন রপ্তানী করেছেন, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি দেশে যে টাকা দিয়ে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আলজিরিয়ায় চালিয়ে এসেছে এক নৃশংস ঔপনিবেশিক যুদ্ধ। সম্প্রতি গোডসবের্গে এক আন্তঃ-পার্লামেন্টারী বৈঠকে জার্মান ও ফরাসী পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বন্‌-প্যারিস অক্ষের উদ্দেশ্য হচ্ছে "একই শত্রুর দুটি রূপের বিরুদ্ধে লড়াই করা—এল্‌ব, রাইন ও সীনে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আলজিরিয়ার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই।"

এই হচ্ছে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান ভূমিকা।

আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশ যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্য-বাদের অধীনে থাকার পর আজ স্বাধীনতা অর্জন করে নিচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীর কর্তারা সাধু সেজে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন এইসব দেশের জন্যে তাঁদের প্রাণ বরাবরই কাঁদত। আজ এদের স্বাধীনতা লাভে তাঁরা খুব খুশি এবং এদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করবার সুযোগ পেলে তাঁরা ধন্য হয়ে যান। জার্মান ধনকুবের গোষ্ঠী জানে যে ভারতবর্ষ, মিশর, আলজিরিয়া ইত্যাদি দেশের লোক ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে কত ঘৃণা করে। তাদের সেই মনোভাবের সুযোগ নিচ্ছে জার্মান

সাম্রাজ্যবাদ। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তল্পিবাহক স্বদেশী ধনিক গোষ্ঠী তাই আজ এই কথাটা সকলকে বোঝাতে চায় যে পশ্চিম জার্মান মূলধন ও যন্ত্রপাতি স্বদেশে আমদানী করায় কোন বিপদ নেই। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী আজ চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী ধারায় অনুন্নত দেশে চড়া দামে কলকব্জা ও শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করে জলের দরে সেখান থেকে কাঁচামাল কেনে। এইভাবে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে পশ্চিম জার্মান পুঁজিপতিরা লাভ করেন ৬৫ কোটি মার্ক। পশ্চিম জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অনুন্নত দেশগুলিকে শিকারে পরিণত করার চেষ্টার আসল চেহারা ফাঁস করে ব্রিটিশ পত্রিকা 'টাইম্‌স' মন্তব্য করেছে—

জার্মানদের বার্লিন থেকে বাগ্‌দাদ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের চিরকেলে স্বপ্নের ঘোড়া কাইজার বা হুহরারের কষাঘাতে এক পাও এগোতে পারেনি। আজ পশ্চিম জার্মানীর সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতির কি শান্তিপূর্ণ ধাক্কায় সেই ঘোড়া দিব্যি ছুটে চলেছে। পশ্চিম জার্মান ব্যবসায়ীরা হাউইজার কামান ও সমর পরিকল্পনা নিয়ে যে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি আজ কিন্তু 'ব্রিফকেস্' আর নীল নক্সা হাতিয়ার করে তাঁরা "প্রাচ্যবিজয়ের সাধনায় সেই সাফল্য লাভ করে চলেছেন।"

প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য দেখা যাক। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ে শতকরা ৮৮ ভাগ থেকে ১৯৯ ভাগ। যে ক্ষেত্রে ঐ রপ্তানীর পরিমাণ নেমে আসে ব্রিটেনের ক্ষেত্রে ৩৯৬ থেকে ২৮ ভাগে, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে শতকরা ১১·৭ থেকে ৭·১ ভাগে এবং ইতালীর ক্ষেত্রে ১০·১ থেকে ৯·৪ ভাগে। মধ্যপ্রাচ্যে মাল রপ্তানীর দিক থেকে পশ্চিম জার্মানীর জায়গা আজ আমেরিকার পরেই এবং ইরাণ, গ্রীস ও সীরিয়ায় সে আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। মিশরেও পশ্চিম জার্মান তৈল কোম্পানীর মূলধন খাটছে। এই সব দেশে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে জার্মান ধনিকরা ঋণ ও কারিগরী সাহায্যের অজুহাতে বেশ জেঁকে বসছেন। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী নামে যে জোট আছে তারই ধ্বজা উড়িয়ে পশ্চিম জার্মান ব্যাঙ্কারের দল ৮৫ কোটি মার্ক বরাদ্দ করেছে আফ্রিকায় ব্রিটিশ, ফরাসী, বেলজিয়ান, স্পেনীয় ও পোর্তুগীজ উপনিবেশগুলির আকরজ লোহা, শিসা, টিন ও তেলের ব্যবসা হাতিয়ে নেওয়ার জন্যে। এই মতলবেই পশ্চিম জার্মানী ফ্রান্সকে ১৫০ কোটি মার্ক "সাহায্য" দিয়েছে যে সাহায্য কাজে লাগানো হয়েছে আলজিরিয়ায় যুদ্ধে এবং সাহারায় ফ্রান্সের অ্যাটমবোমা ফাটাতে।

এবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আসা যাক।

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে পাত্রমিত্রসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সফর শেষ করে পশ্চিম জার্মানীর অর্থনীতি সচিব মিঃ এর্হার্ড দেশে ফিরে যাবার পর "হান্ডেলস্‌ব্লাৎ" পত্রিকা মন্তব্য করে—

"চীন না ভারতবর্ষ—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান অর্থনৈতিক ভূমিকা নেবে কে?...পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভারতকে সাহায্য করা দরকার কারণ সর্বোপরি এটা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রশ্ন।"

এই ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুসারে পশ্চিম জার্মানী ভারতবর্ষকে ১০০ কোটি মার্ক ঋণ দেয় যা ঐ বছরের (১৯৫৮) ভারতে জার্মান রপ্তানীর মোট মূল্যের সমান। এত টাকা পশ্চিম জার্মানী একসংগে আজ পর্যন্ত কোন অনুন্নত দেশকেই দেয়নি। আজ ভারতে ব্রিটিশ পণ্য আমদানী আর বাড়ছে না, মার্কিন পণ্য আমদানী কমে যাচ্ছে কিন্তু পশ্চিম জার্মান পণ্য আমদানী বাড়ছে।

ভারতের সংগে পশ্চিম জার্মানীর লেনদেনের চরিত্র কিরকম? ১৯৫৬ সালে ভারতে পশ্চিম জার্মান মাল রপ্তানীর পরিমাণ ছিল পশ্চিম জার্মানীতে ভারতীয় মাল রপ্তানীর মাত্র ৮ ভাগ, ১৯৫৭ সালে ৯ ভাগ এবং ১৯৫৮ মাত্র ১০ ভাগ। এইভাবে তিন বছরে পশ্চিম জার্মানীর কাছে ভারতের দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০ কোটি মার্ক। অর্থাৎ আমরা যে ঋণ পেলাম তার ওপর আরো আড়াই গুণ দেনা আমাদের বেড়ে গেল রাউরকেল্লার মত কারখানা তৈরি করতে গিয়ে।

ল্যাটিন আমেরিকাতেও এই একই ছবি আমরা দেখতে পাব।

পশ্চিম জার্মানী থেকে যে মূলধন আজ পর্যন্ত রপ্তানী করা হয়েছে তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মূলধনের পরিমাণ ব্যক্তিগত মূলধনের দশগুণ। সে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মূলধন

যার পিছনে রয়েছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ। "দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ", "উপদেশ" ইত্যাদি বাবদ জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আজ ২০০০ কোটি মার্ক বিদেশের বাজার সমূহে চারা ফেলে ৭০০ কোটির মত মুনাফার মাছ ডাঙায় তুলেছে।

এই মুনাফার টাকা এক মোটা অংক চলা হচ্ছে অস্ত্রসজ্জার পিছনে। কেন? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আদেনাউয়ের স্বয়ং—

"আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তবেই আমরা সোভিয়েতের সংগে কথা কইব।"

জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার শতকরা ৬৭% ভাগ আজ জার্মানীতেই তৈরী হচ্ছে মার রকেট পর্যন্ত। সেই অস্ত্রশিল্পের মালিক ১০টি ধনকুবের কোম্পানী—ক্রুপ, মানেসমান ইত্যাদি যারা একদিন হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে অস্ত্র যোগান দিয়েছিল। আজ উত্তর আতলান্তিক সামরিক জোটে একমাত্র পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে ১৯৫৭ সালের অস্ত্রোৎপাদনের 'কোটা' পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে।

ওদিকে চ্যান্সেলার আদেনাউয়ের বলেছেন—

"জার্মান রাষ্ট্র দুটি নয়, একটি।...আমাদের জোয়ান চাষীদের আমরা তাদের বর্তমান অবস্থাতেই রাখব যাতে সময় উপস্থিত হলেই তারা পুবদিকে বসতি বানাতে পারে।"

পশ্চিম জার্মান মন্ত্রী মিঃ সীবোহম্-এর মতে—

"জার্মানীর পূর্বাঞ্চল বলতে শুধু এল্‌ব আর ওদার নদী পর্যন্ত ধরলে চলবে না, বোহেমিয়া এবং অন্যান্য জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলও ধরতে হবে।"

পঃ জার্মান স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ শ্রোদার একথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে—

"পূর্ব জার্মানীর ও পূর্ব ইউরোপের কোটি কোটি মানুষ মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে।"

পঃ জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মসচিব হের হলষ্টাইন স্বপ্ন দেখেছেন—

"ইউরোপকে একতাবদ্ধ করার চরম লক্ষ্য হচ্ছে উরাল পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত অঞ্চল একতাবদ্ধ করা। এই কাজ করতে হলে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। ধাপগুলি হচ্ছে—"(১) পঃ জার্মানীর প্রথমে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সংগে হাত মেলানো। (২) জার্মানীর খণ্ডিত অবস্থার বিলোপ সাধন। (৩) মুক্ত পঃ ইউরোপের সাম্যবাদের কবলমুক্ত পূর্ব ইউরোপের সংগে মিলন। সেই মিলিত এলাকার বিস্তার হবে উরাল পর্যন্ত।"

এই জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের রাস্তা পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যেই কি জেনেভা সম্মেলন কি শীর্ষ সম্মেলন সর্বক্ষেত্রেই পঃ জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে কোন রকমের বোঝাপড়া ও আপোস আলোচনার বিরোধিতা করে এসেছে কমিউনিস্ট জুজুর জিগির তুলে। হের আদেনাউয়েরের স্বজাতীয় লেখক বিশ্ববিখ্যাত হাইনরিশম্যান্ এই জিগিরের আসল চেহারা প্রকাশ করে দিয়ে বলেছিলেন—

"যে কোন পাপকার্যের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে হলে, অন্যায়কে ন্যায় বলে জাহির করতে হলে বলশেভিক জুজুর মত এমন দোহাই আর নেই।"

পঃ জার্মান সমরদপ্তরের মুখপত্র "ভেহ্রভিসেন্‌শাফ্‌তিলুঙ্গে কুন্দশাউ" প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে—

"পুনরিকীকরণ হচ্ছে জার্মানদের আজ সবচেয়ে কঠিন সমস্যা কিন্তু একমাত্র লড়াইয়ের পথেই সেই সমস্যার মীমাংসা হতে পারে।

লড়াই করে পূর্ব জার্মানীকে "মুক্ত করার পর সেখানে কি করা হবে সে সম্পর্কেও প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে। হালে মিউনিক থেকে প্রকাশিত "আদেনাউয়ের পূর্বনীতি" নামে বইখানিতে "জার্মান ফেডারাল রিপাবলিক এবং সোভিয়েত অধিকৃত জার্মান এলাকার সামাজিক সাকল্য" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

"পুনরিকীকৃত জার্মানী যখন কিছুতে মজুর রাষ্ট্র হবে না তখন সোভিয়েত এলাকার অনেক কিছুই ফেলে সাজতে হবে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সম্পর্কে ইহুদী হলনকারী ও স্বস্তিকা মার্কা ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলোর পৃষ্ঠপোষক বন্ সরকারের আসল মতলব; জার্মানীর সংগে সন্ধি চুক্তি করতে তাঁদের এত আপত্তির আসল কারণ এবং আপোস আলোচনার রাস্তা বর্জন করে লড়াইয়ের যারা জার্মানীর একীকরণের পিছনে যে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধ বিরোধী ও জনজীবী জনগণবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা আত্মগোপন করে রয়েছে সেটি উপরের উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এই বিষয়েও শত্রুর মুখ

থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে পূব জার্মান রাষ্ট্র কিরাণ মজুর রাষ্ট্র।

প: জার্মান ধনকুবের গোষ্ঠীর অর্থনীতির মুখোস-পরা সাম্রাজ্যবাদী নীতি আজ সারা দুনিয়ার সামনে বিপদের ইঙ্গিত। জার্মানীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারাই সেই বিপদ কাটতে পারে। তাই শান্তিচুক্তির নাম শুনলেই হের আদেনাউয়ার কুকুরে কামড়ানো জলাতংক রোগীর মত চিৎকার জুড়ে দেন। এই মারাত্মক অবস্থার সঙ্গে চমৎকার একটি উপমা দিয়ে ফ্রান্সের রেইম সহরে মিঃ ক্রুশ্চভ বলেন—

"শান্তি মজবুত করবার জন্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু উচ্ছিষ্ট জীইয়ে রাখতে হবে, এই কথাটার মানে আমি কিছুতেই বুঝি না। কোন চাষীর গোলায় আগুন লাগলে আগুন নিভোনোর পর চাষী আগে ছাইয়ের গাদা ঘেঁটে কোন জলন্ত আংরা জলন্ত কয়লার টুকরো থাকলে সেগুলিতে ঠাণ্ডা জল ঢালে কারণ সে জানে যে সেগুলো থেকে কিনকি বার হয়ে হাওয়া পালটে আবার আগুন জ্বলে উঠতে পারে। যে পুরোনো আগুন নিভে যাবার পর জলন্ত কয়লাগুলোর কিনকির ওপর জল ঢালতে নারাজ, বুঝতে হবে সে আবার আগুন জ্বালাতে চায়।"

প: জার্মানীর আদেনাউয়ের রাষ্ট্র হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নির্বাপিত দাবানলের একটি স্ফুলিংগমান জলন্ত কয়লার সামিল যা থেকে আবার আগুন জ্বললে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা দুনিয়ায়।

—এগার—

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মালিশের নিয়ম মাফিক আধ ঘণ্টা শুতে হাজির হল ভবেশ।

বিজয়ব্রত প্রথমে ভবেশকে কষে ধমক দিলেন—অংশী ব্যাঙ্কে কাজ করে করে তুই একেবারে বুনো হয়েছিস যে, ভদ্রমহিলার সম্মান রেখে কথা বলতেও ভুলে গেলি!

ভবেশ হাসল। হাসির চেউ-এ তার চওড়া বুকখানা ঘনঘন ওঠাপড়া করল মিনিট দুই ধরে। তারপর সে খুব মিঠে গলায় বলল—তুমি কি আমার কথায় রাগ করেছ খুকী?

কথাগুলো শ্রাবণীর কানে উদারার ষড়জ থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সবগুলি পর্দা-ছোঁয়া সুরে পৌঁছলো—ঠিক কোন সুর সেটাই ভাবতে চেষ্টা করছিল শ্রাবণী। এমন সময়ে বিজয়ব্রত আর একটা ধমক দিলেন—নাঃ, তুই সব প্রেস্টিজ গুবলেট করবি দেখছি। বর্বর, শোনো, এই যাকে খুকী বলে তুমি বেমক্কা করছ ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী, বুঝলে?

শ্রাবণী লজ্জা পেল, বিজয়ব্রতের বচন-ভঙ্গীতে। ভ্রূ যুগলে ছাকামীর ছোঁয়া বাঁচিয়ে, শান্তভাবে ও বলল—এভাবে অপদস্থ করবেন জানলে কি আপনাকে অভ্যর্থনা করতে ডাকতাম?

—কেন ভাই অজের রায় কি তোমার মনোমত হয় নি?

—নিশ্চয়ই হয় নি। আপনার কথাগুলো বড় জোর আমার তরফের উকীলের স্টেটমেন্ট হতে পারে।

প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে ভবেশ বেশ অভিনিবেশ নিয়ে শ্রাবণীর কথাগুলো শুনছিল। সেই ভাবটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে বিজয়ব্রতকে সিগারেট দিতে দিতে বলল—তাহলে জজের রায় কেমন হলে তুমি খুশী হবে, নমুনা দিতে পারো?

শ্রাবণী আধ ঘণ্টা দু-চোখ তুলে ভবেশের দিকে তাকালো। চাহনীতে তামাশা ছিল, তাচ্ছিল্য তারচেয়ে কিছু কম নয়। বলল—আপনার মতো ছেলেমানুষের সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া করব এমন ছেলে মানুষ আমি নই।

—হুঁ, তা বটে! কি পড়ছ এম. এ? জ্যোগ্রাফি না বাংলা, না ফিলজফি?

'এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া হিষ্ট্রি' শুনে ভবেশ একটু ভাবিয়ে কি যেন ভাবল তারপর যেন অনেক দূর থেকে বলল—তারপর? তার পর কি করবে ওই মৃত-জ্ঞান নিয়ে? ওতে কোন অমৃতের স্বাদ পাও, বলতে পারো? না কি, একটা কিছু পড়তে হবে শুধু সেইজন্যেই পড়া!

তার কণ্ঠস্বরে আঘাত করবার উদ্যম ছিল না, যে নৈরাশ্যের একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস কথার রূপ ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে! অবাক হয়ে গেল শ্রাবণী! লোকটা—যাকে একটু আগে নেহাৎ চঞ্চল ছেলেমানুষ মনে হয়ে ছিল সে এই মুহূর্তে গভীর জিজ্ঞাসায় জটিল সমস্যায় প্রায় বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

একবার বিজয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে সেখানে যেন প্রশ্নের জবাব খুঁজল শ্রাবণী। ভবেশের মুখের ওপর চোখ রাখতে সাহস হচ্ছে না—কি জানি, যদি সে ওর এই হোলাষাওয়া অসহায় অবস্থাটা টের পেয়ে যায়!

তারপর কতকটা স্বগত ভাবেই বলল—লেখাপড়ার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান, আর জ্ঞান যে অফুরন্ত নিরবধি অনন্ত।

ইতিহাসের জ্ঞান মৃত আর ধনবিজ্ঞানের জ্ঞান অমৃত—এ আমি মানি না। তবে, আমি পরীক্ষায় পাশ করে কি করব না-করব সেটা এখনো ঠিক নেই—অবিশ্যি ইচ্ছে আছে গবেষণার কাজে হাত দেবো।

—গবেষণা! পুঁথিগতই বলো, মুক্তি বা গুহ্যগতই বলো, সবটাই প্রায় অনুমান। তোমাদের এই ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণা আর আবিষ্কার ব্যাপারটা বাপু মগজ মাহাত্ম্যের চরম সাহারা! অবিশ্যি আমার মতো বাইরের লোকের মুখে এসব শোভা পায় না। এখনি হয়তো বিজুদা বলবে—

—তা ত বলবেই, বিজুদা হচ্ছে আর্টালিস্ট যাই প্রফেশন। তোর অতো কথায় দরকার কি বাপু, জংলী আছিস, জংগলের কিস্‌সা বল্। এসে অবধি দেখচি ছেলেমানুষ পেয়ে শ্রাবণীর মাথায় খুব গাঁট্টা মারছিস! আরে বাবা গবেষণার বেলায় সব বিষয়েই ওরকম অনেক গোঁজামিল থেকে যায়—আমাদের এনসেন্ট হিষ্ট্রির বেলাতেই কি তোর মতো গায়ের জ্বালা? আচ্ছা তুই একটা কথা বলতো, তোদের সাহেব-প্রভুরা আমাদের দেশের কটা গাছ-গাছালির নাম জানতো? আচ্ছা ধরা গেল ওরা বিদেশী, কেমন করেই বা জানবে! তা ইয়ে, এদেশের লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে অনায়াসেই নামগুলো জেনে নিতে পারত। সেদিক দিয়ে না গিয়ে, খুশিমতো নিজের নাম জুড়ে দিয়ে বলল—এটা অমুক গাছ, অমুক সাহেবের আবিষ্কার! তার বেলায় বুঝি গোঁজামিল হল না?

ভবেশ হাসল—তুমি অজও নও উকিলও নও বিজুদা, নেহাৎ খাটোদরের মোক্তার! এতক্ষণ পরে তুমি নিজেই ভদ্রমহিলাকে ছেলেমানুষ বললে? আর একটা কথা, অন্যের গোঁজামিল দেখাতে পারলেই কি নিজের গোঁজামিলটা শুধরে যায়! তাছাড়া আমাদের দেশের গাছপালা সম্পর্কে বিদেশীদের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বড় সামান্য নয়! অবিশ্যি ইন্ জেনারেল শিক্ষা ব্যাপারটা খুবই ভালো, তবে আমাদের দেশের মেয়েদের বোধহয় ডাক্তারী কৃষিবিজ্ঞান বা ওই ধরণের কোনো কার্যকরী বিষয় নিয়েই লেখাপড়া করা বেশি প্রয়োজন। তাতে করে ভবিষ্যতে দেশেরও খানিকটা সুরাহা হতে পারে। আমার আসল অভিযোগ হচ্ছে, অগ্রপশ্চাৎ না-ভেবে বিষয় নির্বাচনের বিরুদ্ধে। সে যাক, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধারণা আমার—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

শ্রাবণী বলল—আপনার কথাগুলো দামী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, কোন্ জ্ঞানটা কার্যকরী, আর কি অকেজো তাও একদিক থেকে বিচার করে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। অবিশ্যি আমি নিজে অত্যন্ত সাধারণ স্তরের মেয়ে, আমার দ্বারা গবেষণা নাও হতে পারে—

—সেটা ত এখনো জানা যায় নি। ও নিয়ে মাতা-মাতি করে তোমার হলিডে মুডটা মাটি করার কোনো অর্থ হয় না। এসব হাঙ্গামার না নিয়ে গোড়াতেই যদি গান শুরু করে দিতে, তাহলে কি ভালোই না হত।

ভবেশের এ প্রস্তাবে বিজয়ব্রত ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন—বহুৎ আচ্ছা! বনমহোৎসবের গান একটা গাও না ভাই!

শ্রাবণী অবাক হয়ে তাকাল বিজয়ব্রতর দিকে।

ভবেশ হঠাৎ ছিটকে সরে গেল জানালার ধারে। বাইরের আকাশে কিছুটা একটা দরকারী খবর যেন লেখা আছে, এখনি সেটা জেনে নেওয়া তার জরুরী!

বিজয়ব্রত বললেন—কেন, এই যে বনের রাজার দরবারে আমরা এসেছি একে অভিনন্দিত করা যায় এমন গান কি তোমার জানা নেই?

—আছে। কিন্তু আপনার রাজা যেন নারাজ হয়েছেন।

বিজয়ের চোখের কোণে কপট জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি হতাশভাবে হাতের তালু উল্টে বললেন—অবিশ্যি বনের পাখি গান গায় মনের খুশিতে, তার পরজ নেই গাছপালারা কেউ শুনছে কি না! তাই না ভবেশ?

মুখ ঘুরিয়ে ভবেশ যখন চাইল তখন বিজয়ব্রত আর শ্রাবণী দুজনেই হকচকিয়ে গেল। একটু আগে যে মানুষটা তর্কে টগবগ করে ফুটছিল সে হঠাৎ এমন বিমর্ষ মৌনতায় আবিষ্ট হয়ে গেল কি করে—কেনই বা!

বিজয়ব্রত প্রশ্ন করেন—কি হয়েছে রে?

—কিছু না!

তারপর শ্রাবণীর মুখের ওপর বিদগ্ধ চোখ রেখে সে বলল—এক্সকিউজ মি ম্যাডাম! গান আমি খুব ভালো-বাসি, ইনক্যাক্ট গানের উপবাসে অনেকদিন কেটেছে। রিয়ল—গান আপনি!

এতক্ষণ ধরে যে সহজ ঘরোয়া পরিবেশ গড়ে উঠেছিল সেটা যেন এই মুহূর্তে ভেঙেচুরে খান্‌খান্ হয়ে গেল। ভবেশের কথা বলার ধরন আর কথাগুলো সবই যেন সাজ-গোছ করে হাজির হয়েছে। যে কথাটা শ্রাবণী প্রায় ভুলতে বসেছিল সেই কথাটা মনে পড়ে ও অস্বা-ভাবিক আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওর সামনের এই মানুষটা সত্যিই কনে-দেখার পরীক্ষা নিতে হাজির!···লজ্জায় একটা অসহায় অবশ অসহায় পৌঁছে শ্রাবণীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ও কতকটা মরীয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল—আপনারা গল্প করুন, আমি একটু ওঁদের খবর নিই।

জবাবের সুযোগ না দিয়ে শ্রাবণী বেরিয়ে গেল।

বিজয়ব্রত ইশারায় ভবেশকে বললেন—ডাকো, ডাকো!

বিরক্তিভিক্ত কণ্ঠে ভবেশ বলল—ডাকতে হয় তুমি ডাকো, কেন না দোষটা আসলে তোমার বিজুদা।

—কিন্তু তুই যে হোস্ট হতভাগা! তাছাড়া, আমার দোষটা কোথায়?

সিগারেট ধরাবার উদ্যোগ করতে করতে ভবেশ বলল—সে একটা করুণ কাহিনী। ওকে ডাকো, ওর সামনেই সব বলছি—

—কিন্তু আমার ডাকে আসবে না। কারণটা যা-ই হোক, আচরণটা খুব রুড করে ফেলেছি। ভাবি নি যে মেয়েটি এতখানি অভিমানী—।

ভবেশের কথার মাঝপথেই নিরুপমা আর পুলক এসে পড়লেন। নিরুপমা ঢুকেই বললেন—আপনারা ওপরে চলুন, মাসীমা ডাকছেন। শ্রাবণীটা আবার গেল কোথায়?

—দেখলে বিজুদা! কিরকম ঠোঁটকোলানো মেয়ে—

নিরুপমা প্রশ্ন করেন—কি হয়েছে?

বিজয়ব্রত বললেন—কিছু না।

ভবেশ মাথা নড়ল—কিছু না মানে? ইস্তর মতো ইয়ে—। চলো দেখি আবার তিনি কোথায় গিয়ে বসে রইলেন! এইজন্যেই আমি—থাক গে।

ভবেশ রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে।

বিজয়ব্রতর চোখে কৌতুক।

পুলক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার বললেন—ওই ত সামনের লনে শ্রাবণী গল্প করছে বেয়ারার সঙ্গে।

ভবেশ ধমকের সুরে বলে—তা একথাটা আপনি এতক্ষণ বলেন নি কেন?

বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে ভবেশ হাঁক দিল—এই, এই শ্রাবণী! শোনো,—

হাসিমাখা মুখখানা ওপরের দিকে তুলে শ্রাবণী সাড়া দিল—আমি? আমাকে কিছু বলছ!

—এস না একবার এখানে!

—যাচ্ছি।

ওপরের ঘরে খেতে বসেছে সবাই, এক মালিনী বাদে। উনি দেওয়া-থোয়া করছেন। বেয়ারা-বাবুর্চি দুলন্‌বাহাদুর আজ বেকার।

খেতে খেতে ভবেশ বলল—বিজুদা, তখন তোমার ওপর চটে গিয়েই, রাগ সামলাবার জন্যে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম।

নিরুপমা প্রশ্ন করেন—আপনি বুঝি খুব রাগী?

—না, ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কোনো রাগঝাল হয় না। তবে ন্যাকামী বস্তুটা দেখলে গা ঘিনঘিন করে। বিশেষ করে পুরুষমানুষের ন্যাকামী আরো অসহ্য।

শ্রাবণী কোনো কথা বলছে না। মায়ের সামনে ভবেশের সঙ্গে সহজভাবে আলাপ আলোচনায় যোগ দেওয়ার পরিপাম ওর জানতে বাকী নেই। তাই মাঝে মাঝে হাতগুটিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ভবেশের কথাগুলো গিলছিল ও।

বিজয়ব্রত বললেন—আমাকে তুই ন্যাকা বলতে চাস?

হ্যাঁ! তা বই কি! বনমহোৎসব কথাটা তোমার মুখ থেকে আশা করি নি। তুমি কি জানো না যে গত বিশ্বযুদ্ধে যতো মানুষ মরেছে গাছের মৃত্যু তার চেয়ে কম হয় নি। যারা এই যুদ্ধে লড়াই করতে যায় নি, তারা কাঠ সাপ্লাইয়ের ঠিকেদারী নিয়েছে, রাস্তা তৈরীর ঠিকেদারি নিয়েছে, বাড়িঘর তৈরীর ঠিকেদারি নিয়েছে—আর প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজের জন্যে এন্তার গাছপালা কেটে সাবাড় করেছে।···এইসব করে যাদের পকেটে দু-পয়সা ঢুকেছে তারাই আজ ঘটা করে বনমহোৎসব

করে। ক্রটস্! ভারতের বনসম্পদের কি দশা দাঁড়াচ্ছে সেকথা কজন চিন্তা করে? বছরে একদিন কি দুদিন গাছ লাগালে কি ছাই হবে শুনি! এক-একটা কারখানা বসছে, রাতারাতি ইমারৎ উঠছে আর বনজঙ্গল ক্ষৌত হচ্ছে। অবিশ্যি খাতায় কলমে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার গাছ পোঁতা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তিরিশ চল্লিশ বছরের গাছগুলো ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাটতে তোমাদের কতোটুকু সময় লাগে? গাছগুলো পুঁতে বড় হতে হতে কত সময় যাবে—সেটা হিসেব করে কাটা উচিত নয় কি? এইত আমাদের বনের ওপর দরদ। আমরা আবার বনমহোৎসব করি।

ভবেশ যেন গভীর আন্তরিক ব্যথার কথা বলছে, যা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে রীতিমত—তবু না-বলে থাকতে পারছে না।

মালিনী বললেন—তা যা বলেছ বাবা!

বিজয়ব্রত আবহাওয়া লঘু করবার জন্যই বোধহয় বললেন—তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, কোনদিন তুই সেই গাছ-পোঁতা বুড়ো বনে যাবি।

ভবেশ গম্ভীরভাবেই প্রশ্ন করে—সে কে?

শ্রাবণী বলল—বিভূতিভূষণের আরণ্যককে একটি চরিত্র আছে সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। যে অঞ্চলে যে জাতের গাছ নেই সেখানে সে নতুন গাছ পোঁতে। গাছ লাগানো তার নেশা। যাই বলুন, চমৎকার কল্পনা।

বিজয়ব্রতকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ভবেশ বলে—কল্পনা নয়। এ একেবারে সত্যি। এরকম মানুষ আমিও দেখেছি। তবে, তোমরা শহরেরা যে বনমহোৎসব করো, তোমরা কলেজ থেকে মেয়ে ধার করে একটা লোক দেখানো উৎসবের অভিনয় করে খবরের কাগজে ছাপো। তোমাদের মনে জেনুইন কোনো মূল্য নেই। যাদের কাছে আছে তারা কাঁদে-হাসে, গাছের সুখেদুঃখে তারা মরে বাঁচে। সেইসব ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল বলে, শহরে বনমহোৎসবের গান শোনার রুচিও চলে গিয়েছিল।

মালিনীর চোখে শ্রাবণীর চোখে পড়ল। মায়ের এ চাহনীর অর্থ শ্রাবণী বেশ বোঝে। বেহায়াপনার ওপর একচোট ঝড় আপাততঃ তোলা রইল।

ভবেশকে কি থামানো যায় না? সম্ভব হলে লোকটার মুখে হাতচাপা দিয়ে রুখে দিত শ্রাবণী।

অবশ্য সর্বনাশ যেটুকু হবার সেটা হয়ে গেছে, এখন আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই—মৃত্যুর পরে কি মানুষের আর কোনো অনুভূতি থাকে!

ওদিকে ভবেশ কিন্তু অসামান্য আবেগের টানে নিজের গল্পের মধ্যে উপস্থিত সবকটি মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

—বিজুলা বনমহোৎসবের কথা বলছ। এই অঞ্চলে বনদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল, সে খবর তোমরা রাখো? না রাখারই কথা, এদের কথা ত তোমাদের খবরের কাগজে ঠাঁই পায় না। বনদেবী জংগলে জংগলে হেসে-খেলে গান গেয়ে বেড়াত। যেমন তার গানের সুর, তেমনি কণ্ঠের কাজ! গরীব পাহাড়ীরা বন থেকে কাঠ চুরি করে, এটা ওদের এক্তিয়ারের মধ্যেই ধরতে পার। বন দেবীকে সামনে দেখলে কিন্তু কেউ গাছ কাটতো না। কেন, জানো? ছোটবেলাতে কাঠ চুরির দলে ওই বনদেবীও থাকত। একদিন জংগল থেকে ফিরে মেয়েটার তেমনি জ্বর; জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় মেয়েটা খুব চেঁচামেচি গালিগালাজ শুরু করল—পাহাড়ীদের ওপর নাকি বনদেবী খুব রুষ্ট হয়েছেন। তিনি অভিশাপ দেবেন যাতে এই পাহাড়ের লোকেরা হাহাকার করে মরে। অপরাধ? অপরাধ কি একটু-আধটু, মহাপাপ করেছে পাহাড়ীরা যৌবনবতী, গাছের হাত-পা সব কেটেকুটে ছরকট করেছে! বনের শুকনো ডাল-পালা কিংবা ছোটখাট দু-চারটে প্রশাখা নেওয়াটা বনের ছেলে-মেয়ের পক্ষে দোষের নয়, এইসব শুনে মেয়েটার মা-বাবা, পাড়াপড়শী সকলেরই ধারণা হয়ে গেল, এই মেয়েটিই বনদেবী। জ্বর গায়ে মেয়ে ছুটে চলে যাচ্ছিল। সাত-আটজনে মিলে ধরেও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। ভয়ে সবার মুখ এইটুকু হয়ে গেল। দেবীর রোষে, বলা ত যায় না—হয়তো বনকে বন সাফ হয়ে যেতে পারে। তখন এই দারুণ শীতের দেশে মানুষগুলো বাঁচবে কি করে? শেষে ওরা সেই মেয়ের হাতে-পায়ে ধরল, অপরাধ স্বীকার করল। বনদেবীকে ভালোভাবে পুজো দেবে সংকল্প নিল—আর কখনো পাহাড়ীরা কেউ

বড় গাছের ডালপালা কাটবে না একথাও বনদেবীর পা ছুঁয়ে শপথ নিল। তারপর মেয়ে শান্ত হল, আস্তে আস্তে তার গা থেকে জরও নেমে গেল।

পুলকদা বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন—তাহলে বলুন, আপনাদের ওরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অনেকখানি কাজ হাসিল করে দিল বনদেবী।

—তা খানিকটা করেছিল বই কি! যতদিন সে এ তল্লাটে ছিল ততদিন অন্ততঃ তার সামনে পাহাড়ীরা গাছপালা কাটতে সাহস করত না। অবিশ্যি ওদের উপায় বা কি, তাই লুকিয়ে-চুকিয়ে দরকারমতো কাটতো বই কি।

মালিনী দু-চার বার তরকারী-ভাত দেবেন কি না জিজ্ঞাসা করেছেন এবং ভবেশ নেহাৎ অন্যমনস্কভাবে সম্মতি জানিয়েছে এবং আরও অমনোযোগ সহকারে পাত পরিষ্কার করে সবকিছু খেয়ে নিয়েছে। পুলকের কথায় বাধা পেয়ে সে যেন হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল এবং মালিনীকে অনুযোগ করল—মাসিমা একি কাণ্ড! আপনি করেছেন কি, এত খেয়েছি যে হাঁসফাঁস করছি। শেষে অসুখ করলে খুব খারাপ হবে কিন্তু।

মালিনী ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন—আমি ত বাবা তোমায় জিগ্যেস না করে দিই নি। কার কি পেটের মাপ, প্রথম দিনে ত জানা যায় না—এর পর থেকে সাবধান হয়ে দেবো।

ভবেশ বলল—আপনি জানেন না মাসিমা, খাবার সময় আমি দিব্যি খেতে পারি, যতো দেবেন খেয়ে নেবো—কিন্তু সেটা আহারের মাপ নয়। আমার খাওয়ার আন্দাজ আছে আমার মায়ের—তিনি ভুলেও বেশি দেন্ না, চাইলেও নয়। কেন না, আমার অসাবধানের ফল ত ওঁকেই বেশি ভুগতে হয়।

বিজয়ব্রত বললেন—তা এখনে তোর আহার কে মাপে?

হেসে জবাব দিল ভবেশ—ওপরে যিনি আছেন তিনি! তিনি আমার এই বাহাদুরকে পাঠিয়েছেন, ওর রান্নার গুণে খাওয়া বেশি হবার উপায় নেই। অনেকদিন হয় কি খাওয়ার একঘণ্টা পরেই ক্ষিদে পায়, তখন বুঝি যে পেট ভরে খাওয়া হয় নি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিরুপমা ফোড়ন দিলেন—তা এই শখের বৈরাগ্য কেন, বিয়ে-থা করলেই ত পারেন।

হাসতে হাসতে ভবেশ বলল—কপাল, বুঝলেন দিদি, সবই হ'ল গিয়ে, সেই কথায় আছে না—অশ্ব মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। তা সে আপনি যা-ই করুন যদি ললাটে প্রজাপতির নেকন্ না থাকে—

বলতে বলতে সে একবার শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে নায় চাইল—না, কি বলো তাই তুমি।

প্রসঙ্গটা নিজের গায়ে এসে পড়ার জন্যে শ্রাবণী মোটামুটি তৈরীই ছিল, কেন না এতক্ষণের কথাবার্তা থেকে ও এটুকু বুঝেছে যে ভবেশের মনের বয়েসটা একদিকেই বেড়ে গেছে—সেটা জ্ঞানের দিক, সাংসারিক ব্যাপারে সে শিশু। তাই চট্ করে জবাবটা এড়িয়ে গেল প্রশ্নের ঢেউ তুলে। বলল—আচ্ছা, সেই বনদেবীকে দেখা যায় না? এখান থেকে খুব বেশিদূরে থাকে না কি?

গম্ভীর হয়ে গেল ভবেশ, বলল—হ্যাঁ, সে এখন অনেক অনেক দূরে থাকে। নগর সভ্যতার নটনে সে হয়তো বিস্তর নাকানী-চোবানী খাচ্ছে।

—কেন?

—আমার আগে যিনি ডি. এফ. ও. হয়ে এসেছিলেন, তিনিই ওই বনদেবীর সর্বনাশটা করলেন। হল কি, ওর ওই গান শুনে ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অবিশ্যি তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি ওর ভালোই করতে চেয়েছিলেন, আসলে কাল হল আমাদের শহরে জাঁকজমক। মিস্টার চাঙার উদ্যোগ আয়োজন করে বনদেবীকে কলকাতায় পাঠালেন—বনমহোৎসবের প্রথম বছরে। প্রথমে মেয়েটি রাজী হয় নি যেতে। ওর ভক্তই বলো প্রিয়পাত্রই বলো, মানে যার কথা ও শুনতো, তার তাতানীতে গেল। ছোকরাটির উদ্দেশ্য ছিল ফাঁকে শহর কলকাতার তামাশা লুটে আসার। ওরা গেল দুজনে কিন্তু ফিরল একজন। ছোকরা একা ফিরল, খবর দিল—বনদেবী কলকাতার তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। সেখানে বিধবা এক সিনিয়র অফিসারের নেকনজরে পড়ে, ক'দিন খুব সিনেমা—থিয়েটার দেখল তিনজনে। তারপর অফিসার ভদ্রলোক বনদেবীকে নিজের বাড়ির আয়াপদে বহাল

করলেন। একার সংসার, আয়াও যা গিন্নীও তাই। ছেলেটাকেও ভদ্রলোক একটা চাকরী দিতে চেয়ে ছিলেন, সে রাজী হয় নি—উল্টে খুন করবার জন্যে মতলব আঁটছিল। ব্যাপারটা আন্দাজ করে ভদ্রলোক পুলিশের ভয় দেখিয়ে কলকাতা-ছাড়া করেছেন—আর বনদেবীও মাত্র কয়েকদিনে একদম পাল্টে গেছে। এ থেকে আমি এই বুঝেছি যে, আমাদের উপকার স্পৃহা বা চাপানো শিক্ষা দিয়ে এদের বিশিষ্ট চরিত্রকে নষ্ট করা ছাড়া বেশি কিছু করতে পারব না।

বিজয়ব্রত মাথা নাড়লেন—এটা তোমার এ্যাকিউট এ্যাঙ্গুলার চিন্তা। শিক্ষা কখনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। তুমি যার গল্প এতক্ষণ ধরে করলে তাকে আমরা শিক্ষিত করার চেষ্টা করি নি, আর তার নিজস্ব বনিয়াদটা রীতিমত দুর্বল ছিল বলেই অতো অল্পে সে নিজেকে ডোবানোর হাত থেকে বাঁচতে পারে নি, ভাবেশ।

—তর্ক দিয়ে কল্পনাকে দাঁড় করানো যায় বিজুদা, কিন্তু সত্যকে মুছে ফেলা চলে না। আমার ত মনে হয় এই মেয়ে যেমন মনে মনে গাছপালার সঙ্গে মিলে-মিশে কাটাচ্ছিল ওকে তেমনি থাকতে দিলে এই অঘটনটা হত না। মিস্টার চাওয়ার যদি নিজের চরকা-তেই তেল দিতেন তাহলে আমাকেও এখানে এসে কাজের চাপে হিম্‌সিম্ খেতে হত না। তাঁর ছিল যতো সব এক্সট্রাঅর্ডিনারী ফিট্‌লেমো।

—আহা, তুমি যে কথাগুলো বলছ তারমধ্যে বিস্তর কল্পনা আর আদর্শবাদের ভেজাল রয়েছে। আমি রিয়্যাল ম্যানের কথা বলতে পারি। আগেই ধমক দিয়ে থামিয়ো না—

নিরুপমা বললেন—বিজুদা তোমাদের ডিস্‌কাশনটা অন্যত্র বসে চালালেই ভালো হয়। মাসিমার এখনো খাওয়া হয় নি।

—ইস্, স্যাখো দেখি কাণ্ড! মাসিমা ভেরি সরি, তুমি কেন আমাদের কান ধরে তুলে দাও নি, এটা তোমার ভারি অন্যায়।

মালিনী প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বললেন—পাগল ছেলের কথা শোনো। , উড়ে এসে জুড়ে বসেছি, বলা নেই কওয়া নেই এলাম, এসেই তোমার কান ধরি আর—

—থাক, থাক আর বলতে হবে না! চলো বিজুদা, এই শ্রাবণী ওঠো, নিরুদি তুমি চট্‌পট্ মাসি-মাকে খেতে দাও। আমি ভুলেই মেরে দিয়েছি যে আমি হোস্ট!

ওরা সবাই চলে গেল। কেবল শ্রাবণী রয়ে গেল ওর খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এখন এখান থেকে নড়া চলবে না। মা বেচারী একা একা কিছুই খাবো না। তা ছাড়া মনে মনে কৌতূহল, ভবেশকে উনি কি চোখে দেখেছেন সেটা পরোক্ষে পরখ করে দেখার।

মালিনী যেন নিজের মনেই বললেন—বেশ ছেলে!

কথাটার প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্য শ্রাবণীর দিকে তাকালেন।

শ্রাবণী নীরব।

উনি আবার- বললেন—এখানে ওরকম সঙের মতো হাঁ করে কি দেখচ। যাও না, ঝঁকের কই ঝাঁকে যাও। আমি ত ডাঙা, এখানে মুখে মাকু দিয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। এইরকম চড় খাওয়া যদি করে রাখলে কোনো ছেলে সাত জন্ম কাছে ঘেঁসবে না। শুনলে ত কেমন মিরুর মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিল, তোমাকে পছন্দ হয় নি।

আচমকা কথাটার আঘাতের চেয়ে বিস্ময়টা বড় হয়ে উঠেছিল, তাই শ্রাবণী কতকটা নিজের অজান্তেই বলল—কই, কখন আবার—!

গালে হাত রেখে মালিনী হাল ছেড়ে দেওয়া ভাবে বললেন—ওমা! আর কি করে মনের ভাব বোঝায় তা ত জানি নে! গায়ে পড়ে গান শোনাতে গেলি তা পাত্তাই দিল না। আবার বিজুকে একা ঘটকালির ভার দিয়ে ভরসা হল না, নিরু মাস্টারনীকে দোহারকীতে বহাল করলি, তা দিল ত ধোঁতা মুখ ভোঁতা করে!

লজ্জায়, আশঙ্কায় শ্রাবণী ত মাটিতে মিশে যাবার যোগাড়। রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলল—তোমার পায়ে পড়ি মা! যা বলবে বাড়িতে গিয়ে বলো। এঁরা যদি কেউ শোনেন এসব কথা তাহলে কি মনে করবেন।

মালিনী এমনিতেই দাঁতে দাঁতে চেপে কোনো রকমে কথাগুলো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে

ধীরে ধীরে ছাড়েন। তবু অন্তের উপস্থিতির কথাটা কানে যেতে একটু থমকে গেলেন। তারপর বললেন—ঢের হয়েছে, এখন আমার বাড়াভাতটা অখাদ্য করবার জন্যে কলাগাছের মাথা খেকো না।

এতদিনের পরিচয়ের পরেও এক এক সময়ে যাকে কেমন যেন হেঁয়ালি লাগে। গানের ব্যাপারটা ওঁকে শুনিয়ে যাওয়ার জন্যই এখনো নড়ে নি শ্রাবণী। চলে যাওয়ার বদলে আরো কাছে গিয়ে বলল—আমি নিজে গাইতে চাই নি, বিজুদা—

বলেই হেঁসেলের দিকে ওর নজর পড়ল। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ও বলল—ও মা! কিছুই যে নেই তোমার মা? আমরা রাক্ষসের মতো সব খেয়ে ফেলেছি?

—চুপ, চুপ! আমার জন্যে ত কিছু নয়, দুলন বাহাদুর বেচারীর কি হবে। তুই যা আমি চাড্ডি চালে ডালে ফুটিয়ে নিচ্ছি।

—ও এইবারে বুঝলাম, আমাকে তাড়াবার জন্যে অতো তোড়জোড় কেন।

—আঃ, খুকী চেঁচামেচি করিস নে! ওরা শুনলে কি ভাববে বলতো। আর আমারও খুব দোষ নেই—নিরু, বিজু সকলেরই ত যাওয়ার আন্দাজ আছে! কিন্তু কি বলব মা, বেশি বেশি করে রান্না করেও—! আসলে এখানকার জল হাওয়াটাই বোধহয় স্বাস্থ্যকর।

—হুঁ!

মেয়ের কাছে এভাবে ধরা পড়ে যাওয়াতে মালিনী যেন বাঁচলেন। নিজের মনে মনে যেটা ভয় হয়ে ঘুরছিল সেটা এখন ব্যক্ত হয়ে ওঁকে অনেকটা হাল্কা করে দিল। উনি বললেন—হ্যাঁ রে, ছেলেটা কেমন একটু পাগ্‌লাটে, তা হোক মনটা খুব সাদা—তাই না?

—বড্ড বেশি সাদা।

মুখের ডগায় এসেছিল, যেন শান্তিপুরের আড়ং ধোলাই। পরলে কেবল ধবধবা হয়ে যাওয়ার ভয় কিন্তু মালিনীর সামনে একথা বলার মতো দুঃসাহস ওর নেই।

মালিনী বললেন—তুই চলে যা নইলে নিরুও আসবে। তখন হেঁসেলের খবরটা জানাজানি হয়ে যাবে, আমি তাহলে আর মুখ দেখাতে পারব না!

—বেশ যাচ্ছি। কিন্তু এরপর আবার ও আমাকে বেহায়া গায়ে-পড়া বলতে ছাড়বে না।

—আমার যা মনে হবে তা বলব বই কি! এখনো অতো ধুবধুবু হই নি রে!

সিঁড়ির মুখে ভবেশের সঙ্গে দেখা হল, সে বলল—মাসিমার খাওয়ার কদ্দুর কি হল, দেখতে যাচ্ছিলাম।

শ্রাবণী বলল তাচ্ছিল্য ভরে—চলুন মশাই ঢের হয়েছে। নিজেই নাড়ুগোপাল, উনি আবার অন্যের দেখাশুনোর দায়িত্ব নিয়ে মাথাব্যথা করতে যাচ্ছেন।

—অল্ রাইট! ও. কে!

দুজনেই নীচে নামছিল। মাঝপথে ভবেশ বলল—তুমি এখনো রাগ করে রয়েছ? চলো এখুনি তোমার গানটা শুনে ফেলি।

—থাক ওষুধ-গেলা করে গান শুনে বস্তু করতে হবে না।

—ও হো! মোটেই তা নয়, বিজুদাকে কাছে পেলে আমার মনটা হঠাৎ আন্তু হয়ে ওঠে তাই যা ইচ্ছে তাই করি। বাট এমনিতে আমি খুব রেস্পন্সিবল্, সেন্সিবল্ অফিসার। হ্যাঁ! বিশ্বাস না হয় চলো আমার আপিসে।

—জুনিয়রদের সার্টিফিকেট নিয়ে যাকে একিসিয়েন্সি প্রমাণ করতে হয় তার মুরোদ বোঝা গেছে।

—থাক ওসব কথা। তুমি নাকি নিরুকে বেড়াতে আসো নি, আমাকে অপছন্দ করতে এসেছ, বিজুদার কাছে শুনলাম।

শ্রাবণী মনে মনে সংকুচিত হয়ে উঠলেও ভবেশকে সেটা টের পেতে না দেবার জন্যে ওর স্বভাবসিদ্ধ পথ ছেড়ে বলল—যদি তাই হয়, তাতে ক্ষতি কি!

—না। কথাটা শুনে অবধি অস্বস্তি হচ্ছে কি না। ভাবনা শুরু হয়ে গেছে বর-বর ডাকটা কিছুতেই আমার কায়দায় আসছে না।

—না এলে জোর করে কাজ কি!

—বেশ তাহলে গান গাইবে তো?

—গাইব, তবে তার আগে বিজুদার সেই বিখ্যাত ম্যানের কথাটা শুনতে চাই।

—বিজুদার রিয়্যালম্যান মানে? আমরা কি সব অবাস্তব? না, অমানুষ?

—না, ছেলেমানুষ!

ভবেশ এমন হৈ হৈ করে হেসে উঠল যে, একতলার ঘর থেকে বিজয়ব্রতরা সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের হতচকিত মুখগুলোর দিকে নজর পড়তে শ্রাবণী লজ্জায় মাথা হেঁট করল। কিন্তু ভবেশ যেন ওঁদের দেখে আরো চপল হয়ে উঠল, বলল—শুনছো বিজুদা এই ভদ্রমহিলা আমাকে ছেলেমানুষ বলে না-পসন্দ করেছেন। অন্য কোনো গ্রাউণ্ডে বাতিল করলে ত আপত্তি ছিল না। কিন্তু অপরিণত বয়সে বরখাস্ত করা যায়? তুমিই বলো বিজুদা!

ভবেশের কণ্ঠস্বরে সরলতা, সরসতা পর্যাপ্ত—এ উচ্ছ্বাসের মাদকতা যেন বড়ই বাহ্যিক। অকৃত্রিমতা যেমন শ্রাবণী পছন্দ করে তেমনি অপছন্দ করে অসংযত স্থূলতাকে।··· জানতে কার বাকী রইল, ওদের এই আলাপের সূত্রাভাস? এমন কি ওপর থেকে মালিনীর কানেও পৌঁছেছে। ভবেশের এই কাহিনীআমাকে ধমক দিলে বিপদ আরো বাড়তে পারে এই ভয়েই শ্রাবণী তাড়াতাড়ি বিজয়ব্রতর হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল—আসুন বিজুদা, সেই লোকটার কথাটা শেষ করুন তো!

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিজয়ব্রত। জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কিম্বা তন্ময়তা—ঠিক কোনটা প্রকাশ পাচ্ছে বিজয়ব্রতের চোখে শ্রাবণী তা বুঝল না। অথচ এমন একটা ভাব দেখাল যেন, ও সব বুঝেছে, সেই অনুধাবনের চাঞ্চল্যে ওর তারা উজ্জ্বল হল, ও বলল—আপনি এতো ভুলো! আরে সেই যে ভবেশবাবুর বনদেবী দিদিমাকে প্রতিবাদ করবার জন্য এক রিয়্যাল-ম্যানের কথা শুরু করলেন একটু আগে!

—ও! সেই পাঞ্জাবী ড্রাইভারের গল্প? কিন্তু সেটাত এ্যাক্টিডিসিস নয়। এমনি কথায় কথায় মনে পড়ে গেল লোকটার কথা। সেও অনেকদিন আগের ব্যাপার। আমার সে লোকটির সঙ্গে ভবেশের বনদেবীর গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই।

ভবেশ সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল—বনদেবীর ব্যাপারটা কিন্তু ফ্যাক্ট, গল্প নয়।

—আমারটাও ট্রু ফ্যাক্ট।

পুলক বললেন—তোমাদের এই ময়নাতদন্তের শুঁতোয় আসল রসটাই মাটি হতে বসেছে।

—ছোট একটি চরিত্রের বিচিত্র বিশ্বাস! বুঝলে—

বলে বিজয়ব্রত শ্রাবণীর মুখের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালেন—বছর বিশেক আগের ঘটনা। একটি লোক পাঞ্জাব থেকে কলকাতা শহরে এসে গাছতলায় ডেরা ফেলেছিল। কলকাতা শহরের থিয়েটার রোড তখন ফস্তরমতো সাহেবী এলাকা। সেই থিয়েটার রোডের কোনো বড়সাহেবের ড্রাইভারের গাঁয়ের ছেলে এই পাঞ্জাবী যুবক। দেশোয়ালীর দৌলতে সে ওই গাছতলায় থাকবার অধিকার পেয়েছিল আর দেশোয়ালী ড্রাইভারটি তাকে মোটর ড্রাইভিংও শেখালো। তারপর লাইসেন্সের দরখাস্ত করল। গোলমাল বাধলো ঠিকানা নিয়ে। লাইসেন্সের ঠিকানা চাই। সে বলল—'থিয়েটার রোড'। ডিপার্টমেণ্ট বলল—'কত নম্বর?' জবাব দিল—'গাছতলা—!' নম্বর নেই গাছতলার, পুলিশ হাতগুটিয়ে বলল—'ইয়াকি রেখে নম্বর বলো।' পাঞ্জাবী ছোকরা বেশ বিজ্ঞভাবে বলল—'ইয়াকির এর মধ্যে কিছু নেই: সত্যি আমি গাছতলায় থাকি। সেটাই আমার ঠিকানা। আর, অত বড় গাছ থিয়েটার রোডে নেই, সবচেয়ে বড় অশ্বত্থ গাছটা নেহাৎ অন্ধ ছাড়া সকলের নজরেই পড়তে বাধ্য। এর চেয়ে ভালো ঠিকানা দুনিয়ার কোথাও কেউ দিতে পারে না।

ডাচ্ছিল্যভরে একঝলক ধোঁয়া ছেড়ে ভবেশ যেন স্বগত-ভাবে বলল—মনসেন্স!

বিকেল হতেই খাবার কেরার তাড়া পড়ল! সামনে রাতের অন্ধকার, পাহাড়ী পথে যারা হরদম যাতায়াতে অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে গাড়ি চালানো খুব বিপদজনক। ভবেশ বার বার ওদের থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করল, মালিনীও খানিকটা নিমরাজি হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রাবণী বেঁকে বসল। আড়ালে মালিনীকে একঝাঁকে শুধু বলল—'মা, মা, এভাবে যদি আজ থাকো তো মান থাকবে না। ভবেশবাবু জেনে ফেলেছেন—' বাকীটুকু উচ্চারণ না করে মায়ের চোখে চোখ রেখে বুঝিয়ে দিল।

একটা দিন ত নয়, যেন একটা যুগ! না, যুগ বললে ঐতিহাসিক গুরুত্ব এঁটে দেওয়া হয়। শ্রাবণী কিছুতেই ভেবে পায় না আজকের এই দিনটিকে কোন্ নামে চিহ্নিত করা যায়। আচ্ছা, যদি এ দিনটিকে 'ভবেশ' বলা যায়? মন্দ নয়, এই মানুষটার একদিক এগিয়ে গিয়ে যেন একবিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করেছে আর একটা দিক একেবারে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে ধাবমান। সবটুকু জড়িয়ে মানুষটা দস্তুরমতো ভাবনার ব্যালে। কখনো মুগ্ধ করে, কখনো আবার বিতৃষ্ণ করে। আজ সারাটা দিন গল্পে, তর্কে, গানে বেঁচে থাকার স্বাদ বদলে দিয়েছে ভবেশ। কিন্তু মানুষটার একটা হস্তের চূড়া আকাশকে ছুঁড়ে কোথায় উঠে গেছে তার নাগাল শ্রাবণী পায় নি, হয়তো কোনোদিনই পাবে না। হ্যাঁ, দম্ভ বই কি। বিজয়দা সেটাকে 'সরলতা' বলে যতোই চাপা দিতে চেষ্টা করুন না কেন, শ্রাবণীর কোনো সংশয় নেই। নইলে ওইভাবে 'ননসেন্স' বলতে পারে কেউ! তবে হ্যাঁ, অসাধারণ একটা চরিত্র বই কি। না মানুষ, না প্রতীক। কি যে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শ্রাবণী।

বিদায়মুহূর্তে ভবেশ যখন ওকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল —তাহলে?

প্রশ্নের অর্থটা বুঝেও যেন বুঝল না শ্রাবণী, বলল— এবার আপনার পালা। সামারের ছুটি ফুরোবার আগে একদিন বেড়াতে আসুন আমাদের বাড়ী।

অধীরভাবে সে বলল—ওটা তো নাসিমার বক্তব্য! তুমি—তোমার—

এই প্রথম কথা তার থমকে গেছে।

শ্রাবণী হাসি চেপে বলল—আমার সব আগে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হওয়া দরকার। কেন না একটা স্কেলোশিপ যেমন করে হোক পেতেই হবে, নইলে চিরকাল তো মায়ের পুঁজি থাকবে না। ঘষে ভেঙে ভেঙে পড়ার খরচ চলবে! অথচ রিসার্চ আমাকে করতেই হবে। সে যাক্। আপনি কিন্তু আসছেন।

—দেখি।

—না, না। আসতেই হবে।

ওর চোখের তারায় যে অকৃত্রিম আগ্রহ ফুটে উঠেছে সেটা বুঝতে ভবেশের একটু ভুল হল না। সে ছেলেমানুষের মত জবাব দিল—কাল যাবো?

—বেশ!

—উঁহুঁ, কাল হবে না। দাঁড়াও দেখি ভেবে! কাল না, পরশু না, না তার পর দিনও নয়—

তার কানের পাশ থেকে বিজয়ব্রত হঠাৎ বললেন— দেন্ হোয়াই নট্ টুডে? চল্ আজই—!

—ধ্যাৎ! সব ব্যাপারে ইয়ার্কি নয় বিজুদা। বলে দিলাম। আচ্ছা, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি হাজির হচ্ছি শ্রাবণী, কেমন!

শ্রাবণী বলল—আচ্ছা!

সারাটা পথ শ্রাবণী ভাবল: ভবেশ একটি মানুষ, একটি প্রতীক। ভিস্তার ঝর্ ঝর্ গর্ গর্ গর্জন যেন বলছে: বিস্ময়, ভয়, প্রশংসা, বিশ্বাস, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, নগ্নতা, সবকিছুই অবান্তর। বাস্তব পৃথিবীটার সবটুকুই যেন স্বপ্ন। সুখে আর দুঃখে সে স্বপ্ন কখনো সুন্দর অথবা দুঃসহ। তা হোক, আসলে স্বপ্ন ছাড়া সত্য কিছুই নেই। নইলে, যে মুহূর্তে একটা মানুষের বিরুদ্ধে তোমার মনের দরজা তীব্র বিদ্বেষের প্রতিকূলতায় অবরুদ্ধ সেই মুহূর্তেই কি করে তাকেই তোমার এত ভালো লাগে!

রাতের অন্ধকার সামনের কালো পাহাড়টাকে আরো গাঢ় মসীবর্ণ করে তুলেছে, জমাট আঁধারের মাথায় আকাশও কি আলো নিভিয়ে মজা দেখছে, ওদের ভয় দেখাচ্ছে?

নিরুপমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মৃদু সুরের আভাস ফুটে উঠল। গাইছেন নিরুপমা, হ্যাঁ শ্রাবণী কান খাড়া করে শুনতে পায়, আরো স্পষ্টভাবে এবার সুরটা ধরতে পারে। ওর মন প্রশ্ন করে ওকে, রহস্যটা কোনখানে? তোমার মনে? না, ভবেশের মধ্যে!

এত গাঢ় অন্ধকারে বোধকরি নিজের কাছে থেকেও আপনাকে লুকিয়ে রাখা যায়। সেইজন্যই শ্রাবণীর পক্ষে নিরুপমার সংগে গলা মিলিয়ে গান গাওয়া সম্ভবপর হল। শুধু শ্রাবণীই নয়, সেই সুরের ছোঁয়া একে একে বিজয়ব্রত এবং মালিনীকেও আচ্ছন্ন, আবৃত করে। একদল মানুষ যেন মানবজাতির প্রতীক হয়ে ভিস্তার গর্জমান অহংকারকে দাবিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

পুলক হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিলেন।

বিজয়ব্রত প্রশ্ন করে—কি হল? থামলে যে!

—আমিও গাইব!

[ক্রমশঃ

চা এর গোড়ার কথা

বীরেশ্বর বসু

—চার—

চা পান যেমন আরাম-দায়ক তেমনি কর্মস্পৃহা উদ্দীপক এ-কথা সকলেই জানেন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার মধ্য দিয়ে চলতে হয় প্রতিদিন। দুঃখের মধ্যে সুখ আর কান্নার মধ্যে যদি হাসি না থাকতো তাহলে মানুষ হয়ত কোথাও হারিয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে যে সুখ আর কান্নার মধ্যে যে হাসি—এই সুখ ও হাসি মানুষকে খুঁজে বের করে নিতে হয়। যে খুঁজে বের করে না সে জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। এই উপভোগের অনেক দিক আছে। এর মধ্যে চা-পানও বিশেষ একটা দিক। প্রতি ঘরে চায়ের আসর বসে সকালে ও সন্ধ্যায়। এই সকাল ও সন্ধ্যার আসরের মধ্যে সন্ধ্যার আসরটাই বেশি জমে। সকালে সূর্য ওঠে খড়্গহস্তে। মানুষকে তাগিদ দেয় কাজে যাওয়ার। এই সঙ্গে উৎসাহ ও আশাও দেয়। মানুষ ছোটে আপন আপন কাজ করতে। তাই কাজের তাগিদে সকালের আসর ভাল জমে উঠতে পারে না। বিকেলে সূর্য হাত থেকে খড়্গ নামায়। মানুষ ক্লান্ত দেহে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। তখন সূর্য ছড়িয়ে দেয় তার হলুদ আলো। ঝির ঝিরে বাতাস বইতে থাক এই সঙ্গে। মানুষ এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে একটু হাসে। তারপর ট্রাম বাসের ভিড়ে জীবন যেন কোথায় হারিয়ে যায় আবার। তবু আমরা বেঁচে থাকে। শেষে বাড়িতে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে চায়ের আসরে বসা। আধো অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। ফুলের মধু-পানের মত ছুটে আসে ভ্রমরের দল। চায়ের কাপে মুখ দিতে না দিতেই সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে কথার ফুল ঝরতে থাকে। জীবনটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে একতাল হয়ে ওঠে। তাই একজন কবি এই নিয়ে একটা গান লিখেছিলেন।

"Now stir the fire, and close the shutters fast;
Let fall the curtain,
cohcel the sofa round;
and while the buffling
and loud hissingr on
Throws up an teamy
column, and the cups
That cheer, but not
inebriate, wait on each,
So let us welcome peaceful evening in."

এই গানের ভেতর দিয়েই আমরা জানতে পারি কি করে চা তৈরি করতে হয়।

এই চা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন যা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে পূর্বোক্ত কবি বা সাহিত্যিক ছাড়া নিম্নোক্ত নামগুলিও উল্লেখ যোগ্য :- Linschoten, Texeria, Jarric, Trigawet, Casper Banhin, Bontius, Olearius, Mondeslo, Moriset, Varenius and Tale. এঁরা প্রায় সকলেই সমরূপ কথাই বলেছেন তাই এঁদের লেখা কবিতা বা প্রবন্ধের কোন উদ্ধৃতি দিয়ে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা নাই। এতে শুধু একঘেয়েমির সুরটাই বেজে উঠবে। তবে Tate যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাঁর কিয়দংশ উদ্ধৃতি করছি।

"When in discourse of Natures mystic Powers
And no bleat themes we pass the well-spent
hours,
Whllest all arouud the Vlnues-sacred band
And listening Graces pleased attendante stand.
Thus our tea conservations we employ,
Quaffing, without the waste of time and wealth
The sovereign drink of pleasure and of health."

চায়ের গুণ, নির্গুণ নিয়ে অনেক কিছুই লিখেছি এর আগে। এবারে Dr. Sigmondর মতবাদ দিয়েই গুণ-নির্গুণ পর্ব শেষ করবো।

Dr. Sigmond বলেছেন :—

(ক) চা প্রীহার কাঠিন্য ও জড়তা দূর করে।

(খ) পাকস্থলী ও মূত্রনালী পরিষ্কার রাখে—পাথর হতে দেয় না যদি কিনা চা চিনির পরিবর্তে খাঁটি মধু দিয়ে তৈরি করে খাওয়া যায়।

(গ) চোখের জ্যোতি পরিষ্কার করে।

(ঘ) বায়ুজনিত সমস্ত রকম collick pain দূর করে।

এই সম্বন্ধে Byron তাঁর কবিতাতে একটা মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর একলাইন উদ্ধৃত করছি।

"That eye was in itself a soul"

বিভিন্ন প্রকারের চা আছে এ-কথা আগেই বলেছি। এখন এর মধ্যে Pekoe এবং Souchong নাম দুটো কোথা থেকে এলো তাই বলছি।

(i) Chinese Pai-hao থেকে Pekoe নামের উৎপত্তি। সাধারণতঃ Pai-hao অর্থে বোঝায় কচি পাতা ও কুঁড়ি। এই কচি পাতা ও কুঁড়ি থেকেই Pekoe তৈরি হয়, তাই চীনদেশীয় কেউ হয়ত এই নাম দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই নামে চলে আসছে। তবে কে যে কখন এই নামকরণ করেছেন তা কোন কেতাবে কোরানে উল্লেখ নেই।

(ii) Souchong নামটিও Chinese Seao-chung থেকে। Seao-chung মানে ছোট নরম শাখা ডাল। এই নরম শাখা ডালটা থাকে কুঁড়ি ও পাতার নিচে। Souchong তৈরী হয় সাধারণত এই শাখা ডাল দিয়ে। তারই ভাবার্থে এই নামকরণ হয়েছে।

'Discovery of Tea Plant In Assam' এ জানতে পারি এক সময়ে চায়ের এত সমাদর হয়েছিল যে ১৪ই জুলাই ১৮৪৭ সালে বিলেতে Socutys Room, টাউন হলে এক সাধারণ মিটিং হয়। The Hon. Sir Edward Ryon সভাপতিত্ব করেন। এই মিটিংএ সর্বসম্মতিক্রমে মিঃ ক্রস্‌কে আসামের চা আবিষ্কারক বলে একটা স্বর্ণপদক উপহার প্রদত্ত হয়। এতে ক্যাপ্টেন চার্লটন বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। এবং তিনিই যে আসামের চা আবিষ্কার করেছেন সে বিষয় কমিটিকে জানান। Dr Wallich ও এই দাবী পেশ করেন। ক্যাপ্টেন চার্লটন তাঁর বিবৃতিতে জানান যে ১৮৩০ সালের মে মাসে তিনি আসামে আসেন এবং বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে বিলেতে ফিরে যান। এবং এই সময়ে আসাম থাকাকালীন তিনি ছোট ছোট কটি চায়ের চারাগাছ Dr Jhon Tytlerকে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন যাতে তিনি ঐ চারাগাছ কটি হর্টিকালচারাল সোসাইটিকে উপহার দেন। তিনি আরো জানান যে ১২ই মার্চ ১৮৩২ সাল সোমবার সন্ধ্যায় ক্যালকাটা গভর্ণমেণ্ট গেজেটে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল। এছাড়া মিঃ ক্রস যাঁকে কিনা স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়েছে তিনি তাঁরই অর্থাৎ ক্যাপ্টেন চার্লটনেরই অধীনে কাজ করতেন।

প্রথমটায় কাশ্মীরবাসীগণ কিভাবে কেমন করে চা তৈরি ও পান করতো সেকথার উল্লেখ করা হয়নি আগে তাই এখানে সংক্ষিপ্তভাবে লিখছি। Raw tea (cha Tnech) একটি জলভরা তামার পাত্রে সিদ্ধ করা হতো। জলটা যখন টগবগ করে ফুটে উঠতো তখন ঐ জল ভরতি পাত্রের মধ্যে "ফুলি" নামক একজাতীয় লাল উদ্ভিজ্জ ক্ষার ছেড়ে দিত। এই 'ফুলি' পাওয়া যেত লাদাকের বল্ট জেলাতে। এই সংগে Bidian Katai (Chinese aniseed) এবং খানিকটা লবণ দিয়ে তবে পানীয় তৈরী হতো। এই সময়ে চীনেমাটির কাপ-প্লেটের সম্ভবত প্রচলন ছিল না তাই চা পান করা হতো পিতল অথবা তামার পাত্রে। আর এছাড়া পূর্বকালে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সমস্ত কাজে-কর্মেই তামার পাত্র ব্যবহার করতো। এবং এই তামার পাত্রকেই পবিত্র বলে মনে করা হতো তাই পুজো আচ্চা সমস্ত কাজেই তামার পাত্র ব্যবহার করা হতো। অবশ্য সমগ্র বাংলাদেশও এই ধারায় বাঁধা। এখনও পূজোপার্বণে তামার পাত্রই বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় যদিও আগের তুলনায় অনেকটা শিথিল হয়েছে। অবশ্য এর অন্য কোন কারণ আছে। আমার মনে হয় কারণ অন্য কিছু নয়, দিন যেমন এগিয়ে চলেছে মানুষও সেই সংগে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, অনেক নতুন নতুন জিনিসের আবিষ্কার ও সৃষ্টি করা হচ্ছে। রুচি বাড়ছে। অনেক রুচিকর মনোরম জিনিস তৈরি হচ্ছে। তারপর এই সমস্ত জিনিসের মূল্য হ্রে

কোন ধাতব দ্রব্যের চেয়ে অনেক কম অথচ দেখতে সুন্দর।

সমগ্র পৃথিবীময় যখন চায়ের প্রশস্তি এবং প্রচলন শুরু হয় তখন দিন দিন চায়ের চাষ-আবাদ বাড়তে থাকে। এতে চায়ের বীজের খুব অভাব অনুভূত হয় সর্বত্র। চা-বীজ আর মিলে না কোথাও। তখন কিছু কিছু বাগানে চা-বীজের চাষ শুরু হয়। এই চাষ হতো চা বাগানেরই একটা পরিত্যক্ত অংশে। এই অংশের পরিত্যক্ত গাছগুলি থেকে পাতি তোলা হত না। এতেও চা-বীজের চাহিদা মেটে না। তখন নানা জায়গায় চা-বীজের বাগান খোলা হয়। এই চাষ হয় ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। চা-বাগান থেকে বেশ কিছু দূরে জংগল পরিষ্কার করে। মালিক বা ম্যানেজারের ইচ্ছামত চারা চাগাছ এনে রোপন করা হয়। সাধারণত এই রোপণ যদি কাছাকাছি হয় তাহলে বীজ খুব কম পাওয়া যায় তাই রোপণ করা হয় বিশ ফুট ফাঁক দিয়ে।

এই বীজবাগানেও সারের প্রয়োজন। সার বলতে আগে শুধু গোবরই ব্যবহার করা হতো কিন্তু আজকাল নানাপ্রকার কেমিক্যাল মিক্শার তৈরী হওয়াতে গোবর এবং কেমিক্যাল দুইই ব্যবহৃত হয়। অনেক গবেষণা ও পরীক্ষার পর জানতে পারা যায় যে চারা গাছের পক্ষে পটাস ও ফসফরিক এসিড সারের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ চারা গাছের অনেক শত্রু আছে। তার জীবন-শক্তিও অনেক কম। তাই যে কোন সময়ে পোকা-মাকড়ে নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষ করে 'রেড স্পাইডার' চারাগাছের যম। এই পোকামাকড় বা লাল মুক্তো (Red spider)র হাত থেকে গাছকে রক্ষা করতে ফসফরিক এসিড দরকার। আর ঐ সংগে 'পটাস' গাছগুলোকে বেড়ে উঠতে শক্তি দেয়।

এই সার ছাড়া আরো অনেক কিছু কাজ করবার আছে বীজবাগানে। প্রথমে চারাগাছগুলি ছোট থাকার ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই চারাগাছগুলিকে বেরে অনেক জংলি লতাপাতা উঠে ওদের কোল সাপটা করে ধরে রুদ্ধশ্বাস করে দেয়। যে বায়ু জীবনকে ধারণ করে সেই বায়ু তাদের গায়ে লাগতে পারে না। এছাড়া মাটির সমস্ত রস টেনে নেয় এই আগাছা জংলি গাছে। ফলে গাছগুলির জীবনশক্তি নষ্ট হয় তাই এই আগাছা-কুগাছা জংগল পরিষ্কার করে দিতে হয়। তারপর এই চারাগাছগুলি বড় হওয়ার সংগে সংগে তাদের অনেক শিকড় ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের মাটিতে। এই সময়ে গাছের চারপাশ 'খালি' বা 'খুলনি' করে দিয়ে সার ছিটিয়ে দিতে হয়।

এসব ছাড়াও চা-গাছের মত ক্ষেত্র-বিশেষে বীজ গাছেরও কলমের প্রয়োজন হয়। অবশ্য সাধারণত বীজ-গাছে কলমের দরকার হয় না। তবে যদি গাছের কোন ডালপালা বা পাতাপুত্তিতে পোকা ধরে তাহলে সেই অংশটা কেটে ফেলে দিতে হবে। তা না করলে ঐ গাছেরই পোকামাকড় অন্য গাছে গিয়ে সমস্ত বাগানটা নষ্ট করে দেবে আর এই কাটা জায়গাটাতে 'Bitumen Paint' লাগিয়ে দিতে হয়।

চারাগাছে ফুল হয় জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। তারপর ফল হয়। এই ফল পরিপক্ক হতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। ফলের উপরটা কাঠবাদামের মত একটা শক্ত বহিরাবরণ বা খোল দিয়ে ঢাকা থাকে। একটা ফুল থেকে এক থেকে চারটে পর্যন্ত বীজ পাওয়া যায়। এই ফল যখন পোক্ত হয় বা পাকে তখন বহিরা-বরণ বা শেলটি গাঢ় সবুজ রঙের হয়। শেষে ফলটা গাছেই শুকিয়ে নারকেলের মত ঝুনো হয়ে চিমসে ধরে তারপর এক সময়ে মাটিতে ঝরে পড়ে। ফলটি আকারে একটা ছোট মার্বেলের মত এবং মার্বেলের মতই গোল।

এই ফল গাছ থেকেও তোলা যেতে পারে। কিন্তু গাছ থেকে তুলতে হলে রীতিমত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কারণ সব ফল এক সময়ে পাকে না এবং পেকেছে কিনা বিচার করাও সোজা নয়। আবার গাছের থেকে ঝরেপড়া বীজ সংগ্রহ করাতেও বিপদ আছে। কারণ বীজ মাটিতে বেশীক্ষণ থাকলে তা মাটির সৈত্যে নষ্ট হয়ে যায়। তাই বীজটি গাছ থেকে ঝরে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয়।

বীজ তোলা উচিত সাধারণত জানুয়ারী মাসে। তবে অনেকে অক্টোবর, নভেম্বরেও তুলে থাকেন। কিন্তু অক্টোবর নভেম্বরে তোলাতে বিপদ আছে। কারণ এই সময়ে তুললে বীজ বেশীদিন সুস্থভাবে রাখা যায়

না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে বীজের জীবনশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু জানুয়ারীতে তুললে সেই ভয় ততটা থাকে না। এই বীজ তিন চার মাস পর্যন্ত বেশ সুস্থ অবস্থায় রাখা যেতে পারে যদি কিনা তা মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা যায় এবং কোন মতে বৃষ্টির জল বা মাটির আর্দ্রতা না লাগে। অনেকে আবার মেঝেতে শুকনো কড়কড়ে বালি ছিটিয়ে তার মধ্যে কাঁঠালের বিচির মত রাখেন। এতে বীজ খুবই ভাল থাকে।

বীজ ভাল কি মন্দ পরীক্ষা করবারও পদ্ধতি আছে। একটা পাত্রে জল দিয়ে তার মধ্যে বীজগুলি ছেড়ে দিলে যেগুলি জলের উপর ভেসে ওঠে সেইগুলিকেই খারাপ বুঝতে হবে। তবে বীজ জলে দিয়ে বেশিক্ষণ রাখা ঠিক নয় কারণ জল বা ঠাণ্ডা লেগে অঙ্কুরিত হওয়ার ভয় আছে। তাই পরীক্ষা করা মাত্র বীজগুলি জল থেকে তুলে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়।

বীজ পরীক্ষা করার পর বাছাই ভাল বীজ অন্যত্র পাঠানো ও প্যাক করবারও বিশেষ নিয়ম আছে। বিশেষ করে বীজ যদি দূরে কোথাও পাঠাতে হয়। বীজ প্যাক করতে কাঠকয়লা বা বালির প্রয়োজন। এই 'চারকোল' বা বালিতে সামান্য মাত্র অর্থাৎ দশ থেকে বারো ভের পারসেন্ট সৈত্যের ভাগ থাকা চাই কিন্তু সৈত্যের ভাগ এর বেশি থাকলে বীজ শ্বাসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার 'চারকোল' বা বালি যদি অত্যন্ত শুষ্ক অর্থাৎ একেবারেই না হয় তাহলে বীজের মধ্যকার শাঁস শুকিয়ে যাবে। আর বীজ কখনও একগাদা 'চারকোল' বা বালির মধ্যে সাদা করে দিতে নেই। প্রথমটায় বাক্সের তলাতে এক খণ্ড মোটা বালি-কাগজ বিছিয়ে তার ওপর 'চারকোল' বা বালি ছিটিয়ে দিয়ে তার মধ্যে বীজ রাখতে হয়। বীজ রেখে আবার একখণ্ড মোটা বালি-কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তারপর আবার 'চারকোল' বা বালি বিছিয়ে বীজ সাজাতে হয় শেষে আবার আর একখণ্ড মোটা বালি-কাগজ দিয়ে ঢাকতে হয়। এমনি করে 'চারকোল' বা বালি তার ওপর বীজ শেষে কাগজে ঢেকে স্তরে স্তরে সাজাতে হয়।

কয়েকটি নতুন "সোভিয়েত দেশ" পুস্তিকা

কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনার পূর্ণতর সদ্ব্যবহার
(এন. এস. খ্রুশ্চফের রিপোর্ট)

২। **সোভিয়েত কলকারখানায় কর্ম-ব্যবস্থা** (প্রশ্নোত্তর)

৩। **শিশুদের লালন পালন** (চিকিৎসকের পরামর্শ)

৪। **আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ—নিরস্ত্রীকরণ**—এন. এস. খ্রুশ্চফ

৫। **আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি**
—এন. এস. খ্রুশ্চফ

সোভিয়েত অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা

:: অর্ডার দিবার ঠিকানা ::

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১/১ উড ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১৬

আগেই বলা হয়েছে চায়ের বীজ সামান্য কারণেই অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উত্তাপ বা আর্দ্রে নষ্ট হয়ে যায়। তাই চা বাগানের ম্যানেজারেরা বাগানে বীজ পৌঁছবার পূর্বেই রোপণের জন্য 'বেড' এবং নার্সারী তৈরী করে রাখেন। এবং বীজ-বাগানের ম্যানেজারও বীজ পাঠানোর সংগে সংগে ক্রেতাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেন যাতে রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়ে পড়ে না থাকে।

বীজ পৌঁছবার পরে আবার পরীক্ষা করা হয় বাগানে। কারণ বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ করার পরে যে পদ্ধতিতে বীজের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়, শেষে তা[illegible] পৌঁছবার পরে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল দেয় না। কারণ এর মধ্যে হয়ত বীজ আরো শুকিয়ে যায়। ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে শতকরা আশীভাগ বীজ জলে ভাসে। অথচ বীজগুলি ভাল। তাই বাগানের ম্যানেজারেরা অর্থাৎ ক্রেতারা জলে পরীক্ষা ছাড়াও অন্যভাবে বীজের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করে থাকেন। এই অন্য পদ্ধতি হচ্ছে—একশত বীজ নিয়ে তার খোসা বা 'শেল' ছাড়িয়ে শাঁস পরীক্ষা করা। শেষে তা থেকেই ভাল মন্দের অংক করা হয়। সাধারণত বীজ শতকরা আশী থেকে নব্বই ভাগে ভাল হওয়া দরকার। তা না হলেই বুঝতে হবে বীজ-বাগান থেকে পরিপক্ক বীজ তোলা হয়নি অথবা তাদেরই দোষে বীজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উত্তাপ বা আর্দ্র লেগে নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা প্যাকিং ও পাঠানোতে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি হয়েছে।

পরীক্ষান্তে বীজগুলি এনে 'বেডে' পুতে রাখতে হয়। প্রতিদিনই পরীক্ষা করতে হয় বীজগুলির 'শেল' ফেটে অঙ্কুর বের হয়েছে কিনা। যদি অঙ্কুর বের হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোকে তখনই নার্সারীতে নিয়ে রোপণ করতে হয়।

এই নার্সারির জন্য সাধারণত অনাবাদী পতিত জমিই শ্রেয় অর্থাৎ যে জমিতে বহুদিন চাষ আবাদ হয় নাই। অবশ্য এর কারণ এই নয় যে বহুদিনের অনাবাদী জমিতে চারা বেশী খাদ্য সংগ্রহ করবে। কারণ এই যে অনাবাদী জমি ভালভাবে কর্ষণ করলে তাতে Organic matter অর্থাৎ সরীর সংরক্ষণ পদার্থ বেশী পরিমাণ পাওয়া যায়। আর ভালভাবে কর্ষণের জন্যে ছোট চারা অতি সহজে এবং অবাধে তার শাখা শিকড়গুলি ছড়াতে পারে। এতে আরো একটা লাভ আছে। আবাদী জমি চারাগাছের অনাবৃষ্টিতে যত ক্ষতি হয় অনাবাদী জমিতে তা হয় না কারণ অনাবাদী জমি সাধারণত অনেক পাতাপুতি আবর্জনাতে ঢাকা থাকে। সেই কারণে এই জমির নীচের মাটিতে অনাবাদী জমির চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা থাকে আর এই পাতাপুতি আবর্জনাগুলো পচে পচে একপ্রকার সারও হয়। আর এছাড়া নার্সারী যদি জংগলের কাছাকাছি পাশেই তৈরী করা হয় তাহলে জংগলের গাছগুলোর ছায়া চারাগুলিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্যকরতাপ এবং শুষ্ক গরম বায়ুর হাত থেকে রক্ষা করে। অবশ্য নার্সারী জংগলের লাগোয়া হওয়াতে একটা মস্ত বড় বিপদও আছে। এই বিপদ হচ্ছে বন্য পশুপক্ষীর উপদ্রব। হয়ত কোনক্রমে যদি একপাল হাতী বা দু-একটি বাঘ কিম্বা কোন জানোয়ার নার্সারীর মধ্যে ঢোকে তাহলে তো সমস্ত চারাগুলিই একরাতে সাবাড় হয়ে যাবে। তাই অনেকে এইরকম জায়গায় নার্সারী তৈরী না করে জঙ্গল থেকে কিছুটা দূরে গোচারণ মাঠে তৈরী করেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে জঙ্গলের লাগোয়া জমির চেয়ে গোচারণ মাঠের জমি নার্সারীর পক্ষে নিকৃষ্ট। তবুও মন্দের ভাল। কারণ এও অনাবাদী জমি।

এছাড়া নার্সারীর জমি নির্বাচনে আর একটা বিশেষ দিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। এই জমিতে কাদার চেয়ে বালির ভাগ বেশি থাকলে ভাল। কারণ কাদার ভাগ বেশী থাকলে জমি অল্পদিনের অনাবৃষ্টিতে শক্ত হয়ে যায়। এই শক্ত মাটি তুলো তুলো করে কর্ষণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এইজন্য কাদা এবং বালির ভাগ সমপরিমাণ থাকলেই ভাল হয়। এতে দুই কূলই বজায় থাকে। কাদার ভাগ একেবারে না থাকলেও বিপদ আছে কারণ নার্সারী থেকে চারা বাগানে রোপন করার জন্য যখন তুলে নিতে হবে তখন বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন যে চারাটি যাতে ঢেলা সমেত তোলা হয় অথচ কোনও একটা শিকড় ক্ষত বা কেটে না যায়। এর মানেই হলি চারাটিকে সহজ ও সরলভাবে তুলতে সাহায্য করে আর কাদা গাছ ও তার শিকড়গুলিতে আঠার মত লেগে থাকে।

আমার বিশ্বাস চা-চাষ আবাদের ব্যাপারে জমি নির্বাচন একটা শক্ত কাজ। জমিতে পূর্ববর্তিত সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও দেখতে হবে যে জমিতে অতিরিক্ত মাত্রায় অম্লভাগ আছে কিনা। অম্লের ভাগ কম থাকলে গাছ সুস্থ ও ভাল হয় না। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে নার্সারী তৈরী করার সমস্ত খরচাটাই অপব্যয়ের খাতায় জমা করতে হয়। পরিশ্রম ও সময় নষ্টের কথা না হয় বাদই দিলাম। তাই নার্সারী তৈরী করার পূর্বে জমির মাটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি অম্লের ভাগ কম থাকে তাহলে সেটাকে বাড়িয়ে নিতে হবে। বাড়ানোর উপায়ও আছে। সে বিষয় স্থানান্তরে উল্লেখ করবো।

ছুঁচোর বিবর্তন

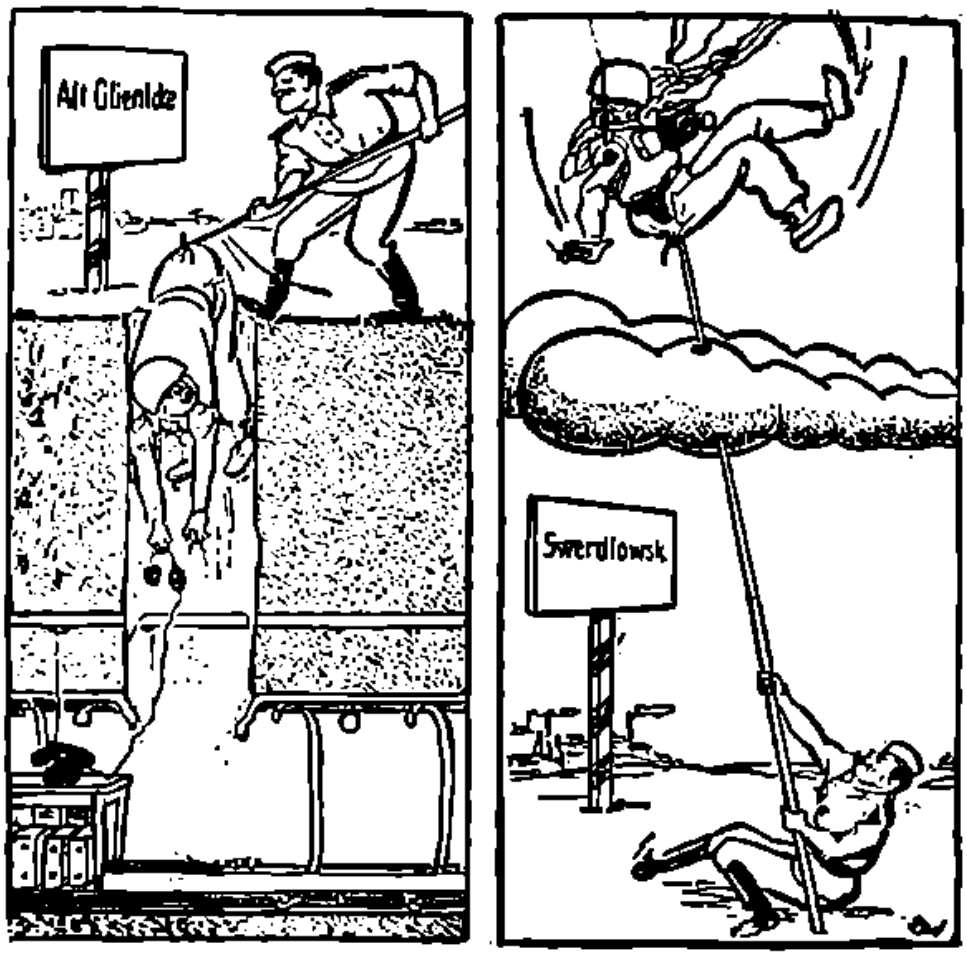

কালে কালে হলো কি ?
ছুঁচোই শেষে শকুন হলো
এতো বড় আশ্চর্য

১৯৫৬ সালে পূর্ব জার্মানীতে মাটির নীচে টেলিফোন পাতিয়া মার্কিনীরা গুপ্তচর বৃত্তি করিয়াছিল।
১৯৬০ সালে তাহারাই আবার বিমানের সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে গুপ্তচর বৃত্তি করে।

(কমসোমলস্কায়া প্রাভদা)

শতবর্ষ পরে

: ভূমিকা :

ছদ্মবেশী

★

জয় রবি ঠাকুরের জয়। এই কোরাস জয়ধ্বনিতে আকাশ ফেটে চৌচির; তার সঙ্গে আমার অর্ধাশন-ক্ষীণ কণ্ঠটি জুড়ে দিলাম।

প্রশ্ন হতে পারে—কেন?

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে মশাই। একশ বছর আগে একটি ভদ্রলোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমন কিছু মহৎ কর্ম নয়। জন্মায় সবাই। কোন্ লোকটা আর অ-জাত। তিনি ছুটো-চারটে কী ছাই-ভস্ম লিখেছিলেন। কলম, কালি, বাতিক ও প্রচুর অলস সময়; থাকলে তা যে কেউ করতে পারে। তাতে জয়ধ্বনি দেবার কিছু নেই। অন্য লোকে কেন দেয় তা বুঝি না আমি। আমি দিই তার কারণ আছে। রবি ঠাকুর আমায় একটি চাকরি দিয়েছেন। হ্যাঁ চাকরি।

রবি ঠাকুর অনেককে অনেক কিছু দিয়েছেন আপনারা শুনেছেন। অনেক পণ্যের প্রশস্তি—বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, অনেক অখাদ্য লেখককে সৌজন্যের খাতিরে খাদ্য বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। (সেই খাদ্যে যে পাঠকের অজীর্ণ দেখা দিতে পারে—এ কথা মনে রাখেন নি।) যাদের সৃষ্টিক্ষেত্র শুধুমাত্র সন্তানে আবদ্ধ তাদের সৃষ্টি-কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন সন্তানের নাম-করণ করে। যাকে আর কিছু না দিয়ে যেতে পেরেছেন, তাদের দিয়েছেন সঙ্গ-সুধা, যা লিখে বেচে অন্তত তারা আত্মগর্ব এবং আত্ম-অর্থ বৃদ্ধি করতে পারবে।

এত বড় সাধ ছিল না আমার, সাধ্যও ছিল না। তাই আমার কাম্য ছিল এক-গাছি মালার মত সুন্দর একখানি চাকরি। আবেদন করা ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি যখন দেহরক্ষা করেন, তখন পাণ্ডাদের ভীড় ঠেলে সেখানে পৌঁছোনো আমার সাধ্য ছিল না। কিন্তু তিনি সবই দেখতে পান। তিনি আমার করুণ মুখখানি দেখতে পেয়েছিলেন। অত্যন্ত করুণ, তিনি মারা যাচ্ছেন বলে নয়, আমায় চাকরি না করে দিয়ে যাচ্ছেন বলে। তিনি বুঝেছিলেন, চাকরির একটা বীজ মাটিতে পুঁতে রেখে দিয়েছিলেন। সেটা এতদিনে 'বিংশ শতাব্দীর' বাগানে ফলল।

'বিংশ শতাব্দী' আমায় নিযুক্ত করেছে একটি বিশেষ কাজে—রবি ঠাকুরের সেঞ্চুরী পেটানো উপলক্ষ্যে নানা যায়গায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তার ধারা বিবরণী, সুযোধ্য ভাষায় বললে রানিং কমেন্টারী, প্রচার করতে হবে। এতে আমায়ও সদা সর্বদা রানিং থাকতে হবে। জোড়াসাঁকো, বোলপুর, দিল্লী তো আছেই; তা ছাড়া প্রতি পাড়ায়, প্রতি ব্যক্তিতে রবি-প্রতিক্রিয়া কেমন ঘটেছে তাও জানতে হবে এবং আপনাদের জানাতে হবে।

আমি ছুটব। বিশ্বাস করুন। আমার কলমের কম জোর আমি চাকার বেশী জোরে পুষিয়ে দেবো। তবে আপনারাও আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। আপনারাও আপনাদের জানা খবর পাঠাতে পারেন ছদ্মবেশী, C/o বিংশ শতাব্দীর ঠিকানায়। শুধু লক্ষ্য রাখবেন, খবর যেন বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক হয়, সেটা যেন আগে কোথাও না ছাপা হয়ে থাকে—বস্তুত ছাপার অযোগ্য বিবেচনায় যে সংবাদ কোন কোন কাগজের অবশায়িনী হতে পারে নি, সেই সলজ্জ কুমারী-সংবাদকে আমরা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে দাঁড় করিয়ে দেব। এই মহৎ ব্রতে আপনারা আমার সহায় হোন। এবং আমার চাকরিটা টিঁকিয়ে রাখুন।

আমি যে রবীন্দ্র-সংবাদ আলোচনায় বিশেষ যোগ্য লোক একথা আমি নিজে মুখে বললেও সত্য। আমার (এবং একালের অনেকেরই) নিজমুখে বলা কথা সত্য খুব কম হয়, কিন্তু এটি সম্পর্কে সে সন্দেহ পোষণ করবেন না। বিশ্বাস না হয় যোগ্যতার কথা সামান্য বলি।

আমি রবি ঠাকুরের প্রতিস্পর্ধী লেখক হতে চাই না। (দু'একজন আমায় তা হতে বলেছে, কিন্তু আমি রাজি হই নি।) অতএব তাঁর বিরুদ্ধে অহেতুক উগ্র আমায় হতে হবে না। অন্যদিকে আমি তাঁর ঘুন পাই

নি, অতএব গুণগানে বাধ্য নই। অতএব নিরাসক্ত চিত্তে আমি দেখতে ও বলতে পারব।

আর একটা বড় সুবিধে আছে আমার। আমি রবি ঠাকুরের লেখা একটি ছত্রও পড়ি নি। অর্থাৎ আমার মন সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত। নিরাসক্ত মন আমার।

আর রবীন্দ্রনাথই যখন অপঠিত, তখন রবীন্দ্র-সমালোচক কুল যে অপঠিত থাকবেন তা বলা বাহুল্য। এটাও বিশেষ সুবিধের, আমার মন আগে থাকতে কারুর চিন্তায় চিন্তিত নয়। আমি নিরপেক্ষ।

অতদূর যাবারই বা দরকার কী। উনি যা যা সৃষ্টি করেছেন, সেই বিষয়গুলোই আমি চর্চা করি নি, পাছে মনের নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, গান, ছবি, নাচ—এ সব জিনিস আমি বিন্দুমাত্র ছুঁই নি। ছুঁলেই মনের নিরপেক্ষতা নষ্ট হতে পারে।

সুতরাং রবীন্দ্রালোচনার কাজে আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে বাংলা দেশে। তাই 'বিংশ শতাব্দী' আমায় ডেকেছে এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে আমি অগ্রসর হচ্ছি। প্রতি সংখ্যায় আমি রবির একটি করে রশ্মিপাত করব।

রবীন্দ্রনাথের ঔদার্য ও সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা আমার বারবার মনে হয়। তিনি বক্তার কণ্ঠের খোরাক যুগিয়ে গেছেন, গায়কের জন্য সুর রেখে গেছেন, নাচিয়ের জন্যে নাচ, পড়ুয়ার জন্য বই, অভিনেতার জন্য নাটক, আঁকিয়ের জন্য ছবি, কিন্তু সাংবাদিকের জন্যও তিনি কিছু রেখে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আমরা এ তাবৎ সচেতন ছিলাম না। আমার মত প্রতিভাবান রিপোর্টারের জন্য যে আবিষ্কার প্রতীক্ষা করছিল।

মৃত্যুর পরেও তিনি আমাদের কাছে আছেন, এমনভাবে আছেন যে তাঁকে ছেড়ে আমরা নেই, সুতরাং তাঁকে আবিষ্কার করা মানে আমাদের নিজেদেরই আবিষ্কার করা। সেই দুঃসাধ্য আবিষ্কারে কলম্বাসের মত আমি বেরোলাম। জানি সামনে পথ অকূল, নাবিকেরা ক্ষুব্ধ, তবু আমার যাত্রা অপ্রতিহত।

আমাদের মধ্যে যা কুঁড়ির মত সুপ্ত ছিল, তা তাঁকে অবলম্বন করে ফুটে উঠেছে, জেগে উঠেছে। আমাদের মুখে খই ফুটে উঠেছে, আমাদের তহবিলে নতুন প্রাণ জেগে উঠেছে। আমরা সার বুঝেছি, জীবনের। নেয়ে ছেড়ে কসল ছেড়ে আমরা সোনার তরীটাকে খুঁজছি। সে কী সুন্দর দৃশ্য! নেয়ে আর তার সোনার ধান কালায় আর জলে লুটোপুটি, লোকেরা সে-সব ছেড়ে সোনা-বাঁধানো নৌকাটাকে তোলপাড় করে খুঁজচে।

আর যারা অতটা পারল না, তারা দূর থেকে ঠাকুর-প্রণাম করল। হ্যাঁ, বলা হয় নি, ঐ গুণটি আমারও আছে। আমি ভারতবর্ষের লোক, ধর্ম আমার মজ্জায় মজ্জায়, ভক্তি আমার হাড়ে হাড়ে, অতএব হে গুরুদেব, তোমার প্রতিমার চরণে চারটিখানি ফুল-বেলপাতা ছড়িয়ে, ধূপ-ধুনোর গন্ধে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে, বদর বদর বলে সংস্কৃতির সমুদ্র-যাত্রায় বেরিয়ে পড়া যাক। তবে হ্যাঁ, বাণিজ্যে অলক্ষ্মী নয়, লক্ষ্মীই আমার কাম্য। ওটি না হলে আমার পেষন শরীর খারাপ করে। গুরুদেব, আমার শরীর যাতে না খারাপ হয়, তার জন্যে তুমি অন্তত গোটাকত খবর সৃষ্টি কর। সেটা তোমার খুব অসুবিধের নয়। তুমি নিজে একটা খবর, আর তোমায় যারা স্মরণ করবার জন্য মরণ-পণ করেছে, তারাই বা খবর কম কী!

নতুন বই

হনুমানুষ—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—কথাশিল্প। ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম ২·৫০।

সাম্প্রতিক বাংলা শিশুসাহিত্যে ভালো রচনার বড় অভাব। এমন রচনা হাতে গোনা যায় যা পড়তে পড়তে আমাদের মন ছেলেবেলার কল্পলোকে চলে যায়। কোথায় গেলেন শিশুসাহিত্যের সেই সব আশ্চর্য লেখকেরা যাদের লেখা পড়তে পড়তে মন আমাদের উধাও হয়ে যেত! কোথায় গেলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মৌমাছি? কোথায় গেল এঁদের সেইসব আশ্চর্য গল্প আর ছড়া, যা পড়তে গেলে চোখের ঘুম কেড়ে নেয়? কোথায় গেলেন 'আমার বাংলার' সুভাষ মুখোপাধ্যায়? কোথায় গেলেন 'বনফুল'? শুধুমাত্র পূজোসংখ্যা আর নববর্ষসংখ্যার জন্য ছোটদের লেখক হবেন এঁরা? যাঁরা ছোটদের সত্যিকারের চিনতে পারেন, যাঁদের কলমে সেই সব আশ্চর্য রচনার প্রকাশ তাঁদের হলো কি। শিশুসাহিত্যের আসরে তাঁরা পিছিয়ে কেন?

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হনুমানুষ' বর্তমান সমালোচককে অবাক করেছে। ইতিপূর্বে দু'একটি কিশোর উপন্যাসের অনুবাদ ছাড়া যেটি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা সেটি হলো 'ববির বন্ধু'। 'ববির বন্ধু' তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে। কারণ ইদানীংকালে শিশুসাহিত্যে এমন একটি সার্থক উপন্যাস আর দেখা যায় নি।

'সে যুগে বনের পশুপক্ষী যেমন ভালোবাসতো শকুন্তলা, তেমনি এ যুগে আমাদের মিনি। তবে মিনির ভালোবাসার ভাগ বসাতে ছিল আরো হরেক রকম প্রাণী। টিয়া, খরগোস, বাঁদর, বেড়াল, আর কুকুর ছিল চোদ্দটি। মিনির বয়েস বারো, দেশ ছেড়ে আছে বর্ধায়, সাইরেন শোনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। এমনি সময় একদিন শিকারে গিয়ে মিললো বুনো। তাকে ববিকে—পাঁচমাসের বাচ্চা, সদ্য মা হারিয়ে এমন হিংস্রে যে ভয়ঙ্কর। কারো মত নেই, তবু এই জীবটিকে মানুষ করবার ভার নিল মিনি। কী অপূর্ব কৌশলে এই ববি শেষ পর্যন্ত বশ মানলো, জনে জনে সবার ভালোবাসা আদায় করে নিল জোর করে—তারই কাহিনী 'ববির বন্ধু'।'

'হনুমানুষ' ববির বন্ধুর পরবর্তী রচনা। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল এ গ্রন্থে লেখিকা আরও বেশি নিপুণ হয়েছেন। 'মা বলেন বুজুনকে নাকি ভুল করে একটু দক্ষিণে হাওয়ার সুড়সুড়ি মিশিয়ে ফেলেছিলেন।'—প্রথম সুরুতেই কিশোরবয়স্ক পাঠকেরা কৌতূহলী। তারপর ক্রমে ক্রমে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে কি বিচিত্র ঘটনায় জালবোনা। পড়তে পড়তে কখনো যেমন হাসিতে উচ্ছ্বসিত হওয়া যায় তেমনি কান্না-করুন বোধ হয় পাঠকের। মধুর রসের সঙ্গে করুণ রসের এমন অপূর্ব মিলন বাংলা সাহিত্যে কদাচিৎ দেখা যায়। হনুমানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লেখিকা নৃতত্ত্বের কথা বলেছেন। এই কাহিনীর নায়ক বুজুন। মনে তার বিজ্ঞানী-কৌতূহল। তাই 'হনুমান' পুষে সে দিন কাটায় ভাবনা নিয়ে, কবে ছোটুর লেজ খসে পড়বে, গায়ের লোম ঝরবে। এবং একদিন তারই মত মানুষ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা সে শুনেছে কয়েক যুগ আগে হনুমান থেকেই নাকি মানুষ এসেছে। ডারউইন সাহেব নাকি এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। বুজুনও ডারউইন হতে চায়। বুজুনের কৌতূহল এবং ছোটুর বিস্ময় পাঠককে পাতার পর পাতা টেনে নিয়ে যাবে এবং একসময় শেষপাতাটা চোখে পড়বে পাঠকের। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার স্বচ্ছতা প্রশংসা পাবার মতো। তবে মাঝে মাঝে দুএকটি শব্দের ব্যবহার ছোটদের কাছে কঠিন মনে হয়।

সব মিলিয়ে 'হনুমানুষ' সাম্প্রতিক বাংলা শিশুসাহিত্যের একটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। শিল্পী খালেদ চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র অপূর্ব।

আকাশ নন্দিনী—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। প্রকাশক—শতাব্দী গ্রন্থভবন। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে লেখক স্বতঃ প্রতিষ্ঠ ও খ্যাতিমান। পুনঃ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন আকাশ নন্দিনী তাঁর নবতম উপন্যাস। পটভূমিকায় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের বিস্তৃতি না থাকলেও, বইখানিকে চিত্র-পরিসর রোমান্টিক উপন্যাস সংজ্ঞা দেওয়া চলে। ঘটনায় নাটকীয় সংঘাত নাই, ঘাত প্রতিঘাত নাই। পরিব্যাপ্তি নাই। আছে মূলতঃ তিনটি নরনারীর মনের কথা, যা উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকেই পাঠকের মনকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। স্নেহপরায়ণ দাদামণি আর যৌবনোন্মুখিনী কিশোরী-বুলা—অবাধ, নিঃসঙ্কোচ, স্বচ্ছ পাঠকের মনে ঠিক আকাশ নন্দিনীর মতই প্রতিফলিত হয়। ঝিলিমী গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ানো অনন্তমনা বুলার দেহে ধীরে ধীরে যৌবনের শতদল ফুটে ওঠে। দেহের সঙ্গে মনের ব্যবধান তার তখনো ঘোচে না। কিন্তু দাদামণির স্নেহে লাগে সোনালী রঙ। যৌবনমনির নারীচিত্ত মাঝে মাঝে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে পত্নীসুলভ সন্দিগ্ধতায়। রুদ্ধ অভিমান দাদামণির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। যৌবনমনিকে বুঝতে তাঁর দেরী লাগে না। কিন্তু নিজেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। স্নেহ ও অনুরাগ, প্রেম ও মমত্ববোধ চেতন আর অচেতন মনের লাটাই-এ পাক খেয়ে কেমন এলো-হয়ে যায়। মনের ঘুড়ি কাটে না। কিন্তু মাঝে মাঝে মাঞ্জা দেওয়া শক্ত সুতোর প্যাঁচ লাগে। মনোবিশ্লেষণের অকপটতায় লেখক যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সাবলীল এবং সুন্দর। চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ কুশলী শিল্পীর পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। খুঁটিনাটি ঘটনার ছিদ্র দিয়ে লেখক যেন মাঝে মাঝে চরিত্রগুলির মনের দরজা খুলে দিয়েছেন। নায়িকা বুলার চরিত্রের পরিণতি মনে আঘাত দেয়। তবুও মনে হয়, এইটাই স্বাভাবিক; নইলে বুলা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। বইখানি পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না ক'রে ছাড়া যায় না। প্রচ্ছদ-পটের সৌন্দর্য ও সমন্বয় পরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

—ভীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

চরকাশেম—অমরেন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৩·১০

বাংলা কথা-সাহিত্যে জেলেদের জীবন, বিশেষ-ভাবে মুসলমান সমাজের উপর লেখা খুব কমই হয়েছে। শরৎচন্দ্র শেষের দিকে মুসলমান গ্রাম্য-কৃষকের জীবনের উপর লিখেছেন মহেশ। এবং জেলেদের জীবনের উপর উল্লেখ-যোগ্য রচনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের—পদ্মানদীর মাঝি। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর' নাম। অমরেন্দ্র ঘোষের চরকাশেম কেবলমাত্র জেলেদের জীবনের উপরই লেখা নয়, তার পটভূমিকা ঘূর্ণি-কুটিল পদ্মা ও গ্রাম্য মুসলমান সমাজ। লেখক এত নিখুঁত-ভাবে এদের চরিত্র রূপায়িত করেছেন যে মনে হয় লেখকের এই সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। বাংলা কথা-সাহিত্যে লেখকের আর এক দিকনির্ণয়ের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

ভাঙনের স্রোতে পদ্মার দুই ধারে কত গ্রাম জনপদের জন্ম হয়, আবার কত গ্রাম জনপদ জলের [redacted] বিলীন হয়। এমনি এক জেগে ওঠা চরে [redacted] সমাজের অনাবৃত কাশেম। পত্তন করে নতুন উপ-নিবেশের। আর তারপর বিবাহ সূত্র থেকে ছিনিয়ে আনে তার আবাল্য ভালবাসার পাত্রী মুসলমানকে। জয় করে নেয় তাকে। অবচেতন মনের প্রচ্ছন্ন ভালবাসাকে মুখর করে আপন পৌরুষের জোরে। নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠে হিন্দু মুসলমানে মিলিত প্রচেষ্টা ও সৌহার্দ্যে। কিন্তু একদিন এই উপনিবেশের শান্তির ক্ষুদ্র নীড় মহা-যুদ্ধের দামামায় শান্তির সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ইঙ্গিত দিল নতুন-দুনিয়ার কুৎসিত অভীপ্সা। শক্ত হাতে হাল ধরেও রুখতে পারল না কাশেম ঝড়কে। ভেঙে পড়তে লাগল তার সমাজ, তার গড়ে তোলা উপনিবেশ। কিন্তু শেষে দুঃখ ও হতাশায় ভেঙে-পড়া কাশেমরা পিওন জীবনের মুখে শুনতে পায় নতুন আশার বাণী। আবার নতুন করে বাঁচার জন্যে তারা বুক বাঁধে।

কিন্তু উপন্যাসের কয়েকটি ত্রুটিও চোখে পড়ে। পিওন জীবনের আবির্ভাব ও তার অনেক সময় আপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। পাঠকের কাছে জোর করে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য উপস্থিত করার জন্যেই যেন জীবন-চরিত্রের উপস্থিতি। এবং মাঝে মাঝে কাশেম ও জুলমনের জীবন বর্ণনায় আরো একটু সংযম তাঁর মত প্রবীণ লেখকের কাছে আশা করেছিলাম। বাঙালী পাঠকরা যে চরকাশেমকে সমাদৃত করেছে, তার নিদর্শন বইটির তৃতীয় সংস্করণ। আশা করি এই সংস্করণটিও সমাদৃত হবে।

বি চি ত্রা

চন্দ্রগুপ্ত

★

শহর কোলকাতায় ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। কিন্তু তার উপযুক্ত ব্যবস্থা কটি ক্ষেত্রেই বা করা সম্ভব হয়? পশ্চিম আমেরিকার কোন এক শহরে পর পর অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ডাকাতি হওয়ায় সেখানে ব্যাঙ্কগুলিতে এক বিশেষ ধরণের প্রতিরোধক দেওয়াল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাঁচের এই দেওয়ালগুলির বিশেষত্ব হলো এগুলি বুলেটের গুলি আটকে দেয়। অর্থাৎ এই কাঁচের দেওয়াল ভেদ করে কোনক্রমেই বুলেট এগোতে পারে না।

• •

একটি বিদেশী সংবাদ:

বুডাপেস্টের এক হোটেল। মাঝরাতে সেখানে টেলিফোন বেজে উঠলো। এক ভদ্রমহিলা ছিলেন সে ঘরে। বিছানা থেকে জেগে টেলিফোন ধরলেন। ওপাশ থেকে এক অপরিচিত গলা বলছে, ধৈর্য ধর, তোমাকে তোলেনি সে। তারপর আর কিছু শোনা গেল না। কৌতূহলী হলেন ভদ্রমহিলা। দিন যায়। আবার হঠাৎ টেলিফোন—।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে?

টেলিফোনে আমার নাম বলতে পারবো না। তবে শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে। আর আমি যার কাছ থেকে যাবো তার নাম তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করো।

—ওপাশ থেকে আর কোন সাড়া নেই।

একদিন। সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের আবির্ভাব হলো হোটেলে। 'ফ্রান্জ নামে তুমি কাউকে চেন?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'ফ্রান্জ', চোখে জল এলো ভদ্রমহিলার। তাঁর হারানো স্বামীর কথাই বলছে যে লোকটি।

ভদ্রমহিলা স্বামীর কাছে চললেন।

অনেক বিপদ বাধা পেরিয়ে সত্যিই তিনি এসে পৌঁছলেন ফ্রান্জের আস্তানায়। কিন্তু ফ্রান্জ কিছু বলছেনা যে! তবে কি সে ভুলে গেছে তাকে। যে ভদ্রলোক তাঁকে সংগে করে এনেছেন এখানে, ফ্রান্জ তাকে ডেকে বললেন, তুমি এ কি করেছো বলতো। আমি তো আমার প্রথমা স্ত্রীকে আনতে বলিনি তো যাকে।.....

• •

যেখানে দাবীর প্রয়োজন সেখানেই ইউনিয়ন।

শোনা গেল পাঞ্জাবের এক উপমন্ত্রী নাকি উপমন্ত্রীদের ইউনিয়ন গড়ার পক্ষপাতী। তাঁদেরওতো অনেক অভিযোগ আছে। সেগুলি মেটাতে হলে ইউনিয়নের দরকার।

• •

"সেইত সখী মাটির কোলে
পড়তে শেষে হবেই ঢলে,
তাই বলি আয় হিম-অতলে তলিয়ে যাবার আগে—
ভোগ করে যাই প্রাণটা ছেলে,
বুক ভরে নিই তালবেসে
এ জীবনের যে কটাদিন সামনে আজও জাগে!
মাটির দেহ মাটির গেহে হবেই জেনো লীন,
ধূলোর বোঝা মিশবে ধূলোয় এসে;
সুর কি সুরা—গায়ক—আলোক—সবল শোভাহীন
অন্তহারা অসাড় শীতল দেশে!"

ইদানীংকালে যে ছবিটি রাশিয়ায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছে তা হলো 'গার্ল উইথ এ গীটার।'

জীবনকে মূর্ত করে সংগীতে, আনন্দে মোহিত করে উপভোগের কাহিনী 'গার্ল উইথ এ গীটার'।

বোরিস লাভিন ও ভ্লাদিমির পোলিয়াকোভ এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন।

আজব দুনিয়া

শ্রীজ্ঞানপাপী

ভারতের এক রাষ্ট্রপতি (রাজেন্দ্রপ্রসাদ) সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করিতেছেন। অন্য রাষ্ট্রপতি (রাধাকৃষ্ণণ বর্তমানে আর উপরাষ্ট্রপতি নহেন) দিল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। দেখা যাইতেছে, একজন রাষ্ট্রপতিতে আর ভারতরাষ্ট্রের পোষাইতেছে না। রাজেন্দ্র প্রসাদের রাশিয়া সফর সরকারী কাজ—রাষ্ট্রপতিরূপেই তিনি রাশিয়া সফর করিতেছেন। আবার একি বিপত্তি! তাহার বর্তমানেই আর একজন রাষ্ট্রপতি।

শ্রীজ্ঞানপাপী অবশ্য বলেন, এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। ভারত নিরপেক্ষ দেশ। রুষ ও মার্কিন শিবিরের মধ্যে কোন বৈষম্য সে রাখিতে চায় না। সুতরাং দুইজন রাষ্ট্রপতি থাকাই বিধেয়। প্রয়োজন হইলে একই সঙ্গে একজনকে রাশিয়ায় অন্যজনকে আমেরিকায় পাঠাইয়া নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যাইবে।

○

কিন্তু শুধু দুইজনই বা কেন? গোছায় গোছায় রাষ্ট্রপতি পঠাইলেই বা ক্ষতি কি? রাষ্ট্র তো আজ আর শিশু নয় যে তাহার মাত্র একটি পতি থাকিবে। সে এখন চতুর্দশ বর্ষীয়া কিশোরী। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপতির মত কয়েকজন রাষ্ট্রপতি থাকিলেই বা মন্দ কি? গাদায় গাদায় মন্ত্রী উপমন্ত্রী রহিয়াছেন আর মাত্র কয়েকজন রাষ্ট্রপতিতেই আপত্তি!

○

দিল্লীতে স্কুল ছাত্রদের বিনামূল্যে টিফিন দিবার ফলে গড়ে তাহাদের ওজন চার পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় এই ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা তাহা কর্পোরেশনের সভায় আলোচিত হইয়াছে। আলোচনান্তর সিদ্ধান্ত হইয়াছে কিরূপ খরচ যাইবে দিল্লীর শিশুরা ওজন বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য একদল পৌর-পিতাকে রাহা খরচ দিয়া দিল্লীতে পাঠান হইবে। তোফা ব্যবস্থা! জ্ঞানপাপী নিশ্চিন্ত যে দিল্লীর শিশুরা যখন চার পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে কলিকাতার পৌর-পিতারা ষোল পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি না করিয়া ফিরিবেন না।

○

কিন্তু ওজন বৃদ্ধির জন্য দিল্লী যাইবার কি প্রয়োজন ছিল। এই গরমে দিল্লী খুব আরামদায়ক স্থানও নয়। কাছেই রহিয়াছে শ্রীনগর, গুলমার্গ। মন্ত্রী উপমন্ত্রীরা যাহা পারেন, পৌর পিতাদের তাহা না পারিবার কারণ কি? শ্রীনেহরু আক্ষেপ করিয়াছেন, সারা গ্রীষ্মকালটা কাশ্মীরে সম্মেলন ডাকিবার ধুম পড়িয়া যায়। উদ্যোক্তারা তো বটেই তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনরাও আসিয়া কাশ্মীর সরকারের ঘাড়ে চাপিয়া বসেন। শ্রীনেহরু বৃথাই ক্ষেপিয়াছেন। ব্যাপারটা আর একটু ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে দুঃখের কারণ থাকিত না।

কাশ্মীরকে বলা হয় ভূস্বর্গ। এমন স্থানে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়। মন্ত্রী উপমন্ত্রীরা জানেন স্বর্গে যাওয়া অপেক্ষা ভূস্বর্গে যাওয়া অনেক সাশ্রয়ী। স্বর্গ তো দূরের কথা নরকেও তাহাদের স্থান হইবে কিনা এ সম্পর্কে তাঁহাদের নিজেদের মনেই সন্দেহ আছে। তাহা ছাড়া পারমিট কণ্ট্রোলের স্বর্গ ছাড়িয়া তাহারা যদি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মাত্র কয়েকদিনের জন্য ভূস্বর্গে যাইয়া প্রাণ শীতল করিতে চাহেন, তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়—মন্ত্রী উপমন্ত্রীরা ভাগ্যবান পুরুষ। ভগবান না পারুন ভগবানের পুত্র দরিদ্র জনসাধারণই না হয় এই বোঝাটুকু বহন করিল!

○

দীর্ঘ সম্মেলনের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করিয়াছে।

—মামা যখন একবার ক্ষেপিয়াছেন--

○

নাগা নেতা ফিঞ্জো বৃটেনে আছেন বলিয়া সরকার চুপ রহিয়াছেন।

চীনে থাকিলে সম্ভবতঃ নাগ নৃত্য করিতেন।

খেলাধূলা

খেলাধূলা ও একালের বাঙালী

অজয় বসু

খেলাধূলায় বাঙালী আজ সারা ভারতের পুরোভাগে নেই। এককভাবে কারাই বা আছেন? মনে উঁকি দিতে পারে সেই স্বল্প সংখ্যক স্বভাব জোয়ানেরা, পঞ্চনদে ঘেরা দেশের মাটীতে যাঁরা প্রতিপালিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরাও সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রধান নন। অ্যাথলেটিকে পুরোভাগে তাঁদের আসন দিয়েও শারীর চর্চার বিভাগ বিশেষে বাঙালীর শীর্ষস্থান আজ কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সুতরাং নিরঙ্কুশ নায়কত্বের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করা রীতিমতো সমস্যা।

কিন্তু বিতর্ক সাপেক্ষ সে আলোচনার অনুকূল প্রতিকূল যুক্তি উত্থাপনের সমস্যায় আজ আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। সমস্যা এড়াতে এবং তর্কের পাশ কাটাতে মেনে নিতে আপত্তি নেই যে ব্যাপক অর্থে বাঙালী ক্রীড়াবিদেরা আজ অন্তদের পুরোভাগে নেই। তবুও বাঙালীর সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরাশ হবার কারণ দেখি না। বাঙালী ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা নেই, যোগ্যতা নেই, এ অভিযোগ খাঁটি নয়। যা নেই তা হলো সেটা খেলাধূলা সম্পর্কে বাঙালীর শুধু পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার অভাবেই অতি নিপুন ও অসাধারণ দক্ষ বাঙালী ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা আজ আশঙ্কাজনক ভাবে সীমিত হয়ে পড়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বাঙালী যদি পিছিয়ে পড়ে থাকে তাহলে তার জন্যে দায়ী বাঙালীর চিন্তার দৈন্য। চিন্তার ক্ষেত্রেই আজ বিরাট শূন্যতা। সেই শূন্যতার পরিণামেই আজ বাংলার ক্রীড়াজগতে বাঙালীবোধের অভাব। এবং এই এক অভাবই বাঙালী ক্রীড়াবিদদের এগিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।

ভারতে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বাঙালীর সাফল্য স্মরণীয়, ঐতিহ্য, প্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত। পূর্বসূরীরা যে ঐতিহ্য গড়ে দিয়েছেন সেই ঐতিহ্যকে ধারণ ও বহন করার একালেও যোগ্য বাঙালীর সংখ্যা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এ দক্ষতা আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ রাখার, নিজেকে আবিষ্কার করার ও আত্মস্থ হওয়ার তাগিদ আঙ্গিগতভাবে বাঙালী উপলব্ধি করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। আমার বিশ্বাস বাঙালী বোধে বাঙালী অনুপ্রাণিত হতে পারলে আজকের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশেও ঘাঁটি বাংলাকে নিশ্চয়ই সারা ভারতের নেতার আসনে বসানো যাবে। কারণ খেলাধূলায় বাঙালীর দক্ষতা কিছুটা সহজাত। তবে এর জন্যে দরকার অকৃত্রিম আন্তরিকতা, ও নিঃস্বার্থ মনোভাব। প্রয়োজন সত্যিকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের।

'ভেতো বাঙালী' শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) একদা (১৯২১ সালে) বিশ্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীররূপে স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিজয়ে বাঙালীর সে কীর্তি কাহিনী হয়তো দূর অতীতের ঘটনা। কিন্তু মনোতোষ—মনোহরেরা বিস্মৃত দিনের দৃষ্টান্ত নন। তাঁদের পরেও বাঙালীর মনের দিগন্তে নতুন আশার আলো ছড়িয়ে রেখেছেন সাঁতারু আরতি সাহা (গুপ্তা), বিমল চন্দ্র, মিহির সেন ও ব্রজেন দাস। এঁদের পরিচয় দেশে বিদেশে অভিনন্দিত, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিতে প্রচারিত এঁদের সফল ভূমিকা। ওঁদের সমগোত্রীয় না হতে পারলেও আরও কজন বাঙালী তরুণ-তরুণী এগিয়ে যাবার সাধনায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছেন। তাঁদের দলে সুদেষ্ণা ব্যাডমিন্টনবিদেরা আছেন, কিশোরী সাঁতারুরা আছেন, আছেন লক্ষ্মীদ্বিদ, মল্লবীর ও ভারোত্তোলকেরা তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলে প্রতিষ্ঠিত নন, কিন্তু সর্বভারতীয় আসরের নির্ধারিত আসন তাঁদেরই দখলে। বাঙালীর সম্ভাবনায় অম্লান নজীর তাঁরাই। আরও আছেন। আছেন পঙ্কজ রায়, প্রদীপ ব্যানার্জি। সুতরাং বাঙালী ক্রীড়াবিদদের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরাশ হবো কেন?

হয়তো এসব দৃষ্টান্ত সবই বিক্ষিপ্ত। হয়তো সেকালের তুলনায় একালে লোকায়তনের সংখ্যা বাড়লেও সংখ্যানুপাতিক ক্রীড়ানিপুণতার সামগ্রিক মান আশানুরূপ উঁচুতে ওঠে নি। উঠতে পারেনি মূলতঃ আমাদেরই চিন্তার দৈন্যে। প্রচারধর্মী বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে প্রতিযোগিতা জয়ের দৃষ্টান্তের কৌলীন্য আছে, নেই শিক্ষণব্যবস্থার কদর। সাধনার ক্ষেত্রকে একপাশে সরিয়ে রেখে প্রতিযোগিতা জয়ের প্রয়াসে আড়ম্বর এসেছে। প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভের কাহিনীর রূপ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ফলাও, সেখানে ক্ষেত্রবিশেষে সামাজের মূল্যও অসামান্য। কাপ মেডেল সংগ্রহের নেশায় ক্রীড়াসংস্থাগুলি মত্ত। খেলোয়াড় তৈরী করার দিকে না ঝুঁকে তাঁরা সব ছুটছেন তৈরী খেলোয়াড়দের পেছনে। ফলে শিক্ষা ও সাধনায় ভাঁটা পড়েছে। সাধনাই যে উন্নয়নের একমাত্র পথ এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে অপরিণত খেলোয়াড়দের ওপর প্রভাবও খাটানো হচ্ছে না।

প্রচার যন্ত্রের কল্যাণে এ যুগে আরও একটি বিপদ উঁকি মেরেছে। সামান্য দক্ষতার সন্ধানেই যেন প্রচারযন্ত্র সক্রিয় হয়ে প্রশংসা ও অভিনন্দনের অকৃপণ ধারাবর্ষণ শুরু করে। কুঁড়ি ধরার আগেই যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের সন্ধান মিলেছে বলে উৎসব শুরু করে দেওয়া হয়। উচ্ছ্বাসের এই আতিশয্যে স্বল্প দক্ষ ক্রীড়াবিদদের আত্মস্থ হয়ে থাকাও কঠিন। তাই প্রচারকাজে সংযম বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভবতঃ প্রচারে সে সংযম আসবে যদি দক্ষ ও যোগ্য ক্রীড়াবিদদের বিক্ষিপ্ত আবির্ভাবের বিকল্পে তাঁদের বহুল আবির্ভাব ঘটে ক্রীড়াজগতে। কিন্তু কোন্ সূত্রে সে আবির্ভাব ঘটবে যদি না আবির্ভাবের ক্ষেত্রকে আগে থেকেই প্রস্তুত ও সহজ করে তোলা যায়?

এক-আধজন অসাধারণ, অসামান্যের আবির্ভাবে একটা জাতির পরিচয়ের পুরোপুরি রূপ প্রকাশ পায় না। জাতিগতভাবে বাঙালী খেলাধুলার সমস্ত বিভাগেই অনন্যসাধারণ দক্ষতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে অচিরে, একথা কল্পনা করা ভাবানুরেগের পরিচয় রাখা। বরং তার চেয়ে বাস্তবানুগ প্রত্যাশা হলো এই যে সাধারণভাবে বাঙালী খেলাধুলায় মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করে নিক এবং খেলাধুলায় সক্রিয় অংশ নিক দলে দলে। সমষ্টিগত উৎসাহের জোয়ারেই অসামান্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে ফসল ফলবে। এগিয়ে যাওয়া দেশের অনুসৃত রীতিই এই। সেখানে জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করেন, তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়; সেই ফাঁকে সমষ্টির ভীড়ে আবির্ভূত হন অসামান্য, অসাধারণেরা। প্রতিভা সহজাত। প্রতিভাবান গড়ে তোলার অপেক্ষা রাখে না, রাখে প্রতিভাত হওয়ার স্বাভাবিক সুযোগের। জনতার সক্রিয় উৎসাহে সেই সুযোগ এসে যায়; কিন্তু বাংলাদেশে সে উৎসাহ কোথায়? কোথায় বা সেই সুযোগ?

খেলাধুলার প্রচার বেড়েছে, প্রসারও। খেলোয়াড়দের সংখ্যাও আগের চেয়ে বেশি। কিন্তু দেশ নিয়ে একালে যে মাতামাতি চলেছে তার সঙ্গে খেলোয়াড়দের এই সংখ্যাও সুসমঞ্জস নয়। অর্থাৎ উৎসাহীর সংখ্যা অপরিমিত, সক্রিয় খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম। নগদ পয়সা ব্যয় করে খেলা দেখেন অনেকে কিন্তু খেলেন নামমাত্র ক'জনে। কোন্ খেলোয়াড় কবে কি করেছেন তার পরিসংখ্যান আউড়ে দিতে পারেন যাঁরা তাঁরা নিজেরা কিন্তু মাঠে নামায় কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত। হাততালি দিতে তারা রাজি, পেতে নয়। এই আচরণ মানসিক সুস্থতার শুভ লক্ষণ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই মনোভাবে বেশি করেই ভুগছে তারাই যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অপরিণত এবং সেইটিই হয়ের কথা।

অপ্রাপ্তবয়স্ক মহলে এই মনোভাব আপনা হতে গড়ে ওঠেনি, গড়ে দিয়েছেন প্রাপ্তবয়স্কেরা। অপরাধটি বয়স্ক সমাজের; এগিয়ে চলা যুগে দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠার কথা কিন্তু তবুও খেলার মাঠ থেকে ছেলেদের সরিয়ে রাখাটাই যেন এখনও অনেক অভিভাবকের পবিত্র কর্তব্য। হয়তো বিগত যুগের অনুপাতে অভিভাবকেরা কিছুটা যুগপোযোগী চিন্তাধারা অনুসরণ করছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতোটুকুই বা! ইট পাথর দিমেন্টে গড়া শিক্ষায়তনের আকাশছোঁয়া কাঠামোগুলির দিকে দৃষ্টি তোলালেই এক অসদ্ভক্তির নজীর ভেসে উঠবে। সেখানে মাঠ নেই,

নেই খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধেও। অথচ স্কুল ও কলেজেই গুণী, বিদগ্ধ, চিন্তানায়কদেরই সমাবেশ।

ছেলেরা প্রকৃতির স্বাভাবিক আনন্দে মাতে না। সহজাত প্রকৃতির টানে খেলার মাঠে ভীড় না জমিয়ে সিনেমা দেখে, রকে বসে গুলতানি পাকায় কেন? এর উত্তর যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি অপ্রিয়। তারা মাঠে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না সুযোগের অভাবে এবং বয়স্ক সমাজের কড়া শাসনের প্রভাবে। খেলাধুলার চর্চা বাধ্য যে কল্যাণপ্রসূ এ শিক্ষা তাদের কে দিয়েছে? সে শিক্ষায় বঞ্চিত ছেলেরা দলই বা উত্তরজীবনে খেলাধুলায় হাত পাকাবে কেন? দেহে মনে স্ফূর্তি আনার উপকরণ যে দেশের মাঠে সাজানো রয়েছে যে কিশোর অভিভাবক মারফৎ সে কথা বুঝলো না, জানলো না, যৌবনে সে কিসের টানে এবং কেনই বা যাবে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে?

বয়স্ক সমাজের আচরণে কিশোর তরুণদের প্রতি উপেক্ষার এই নজীর নতুন কোন দৃষ্টান্ত নয়। এ দৃষ্টান্ত পুরনো। তবু উপেক্ষার প্রভাব এড়িয়ে এককালে বাঙালী তরুণেরা নিজেদের অনুদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। ফুটবল, সাঁতার, মল্লক্রীড়া, জিমনাষ্টিক, নানান বিভাগে এই প্রামাণ্য নজীর রয়েছে। সেকালে বাঙালীর পক্ষে এইভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছিল প্রতিযোগিতার তীব্রতা তেমন ছিল না বলেই। একালে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে কিন্তু আমাদের মানসলোকে নতুন চিন্তার অনুরোধগম ঘটেনি। তাই প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। বাস্তবকে ঠেকিয়ে রাখার হাতিয়ার হাতে থাকে না বলেই অতীত স্মরণে আমরা আক্ষেপের কান্না জুড়ে দিই।

এই আক্ষেপের দাঁড়ি পড়তে পারে যদি আমরা আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাই, আত্মানুসন্ধান করে যদি বাঙালী বুঝতে পারে যে ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙালীর সমস্যা বাঙালী নিজেই। বাংলাদেশে বর্তমানে যেভাবে খেলাধুলা পরিচালিত হচ্ছে সেই আয়োজন সমগ্রভাবে বাঙালীর স্বার্থে নিয়োজিত কিনা, এই প্রশ্নের সদুত্তরেই বাঙালী ক্রীড়াবিদ্‌দের সমস্যার সত্যিকারের সমাধানের সন্ধান মিলবে। এবং সে-প্রশ্নের সন্ধানে ফেরার প্রয়োজনীয়তা আজ ঐতিহাসিকও। কারণ আঞ্চলিক উন্নয়নের ব্যবস্থাই সামাজিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে তুলতে পারে।

গণতান্ত্রিকযুগে স্বতন্ত্রভাবে একটি অঞ্চলের উন্নয়নে এতো কথা বলার অর্থ প্রাদেশিকতা বা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া নয়। কেননা তা একটি অঞ্চলের উন্নতিতে সমগ্র ভারতের উন্নয়নের সম্ভাবনা দৃঢ় মূল হয়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়েই ভারতের মূল কাঠামো। সেই কাঠামোর ইস্পাত শক্তি আসতে পারে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সামর্থ্য সঞ্চিত হয়। আঞ্চলিক উন্নয়নের জোগফল সমগ্রের কল্যাণে পাথেয় জুগিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আঞ্চলিক সাধনার প্রয়াস উপেক্ষণীয় নয়; সমর্থনীয়। অঞ্চল মূলের অংশবিশেষ। মূল ভারত অখণ্ড কিন্তু বিচিত্র বিভিন্ন অঞ্চলের দর্পণে তার রূপ পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিভাত।

থিয়েটারের ভাষা

শেখর চট্টোপাধ্যায়

থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজ বা মানুষের ব্যথাবেদনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে নাটকে লিখিত সংলাপই কি যথেষ্ট? প্রশ্নটা বিচার করবার সময় এসেছে আজ। চিত্রকলার যেমন আছে নিজস্ব ভাষা, সঙ্গীতের যেমন আছে নিজস্ব ভাষা—যে ভাষা বিশ্বজনীন—যে ভাষা স্থান-কালের অতীত—তেমনি থিয়েটারেরও কেন থাকবে না নিজস্ব একটা ভাষা, যা কোন বিশেষ ভৌগলিক সীমার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়—? Haydnএর Symphony শুনতে বা Rembrandtএর ছবি দেখতে যেমন দরকার হয় না অষ্ট্রিয়ান বা ডাচ্ ভাষা শিখবার তেমনি নাটকে কেন থাকবে না এমনি একটা সর্বজনবোধ্য ভাষা? এ প্রশ্ন আজ তুলছেন পৃথিবীর বড় বড় নাট্যবিদরা।

কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি তাতে মনে হয়—কথ্য সংলাপই নাটকের সবটুকু উক্তি নয়—আরও অনেক কথা প্রকাশ পায় নাটকের আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে। তাই নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে আঙ্গিক হচ্ছে থিয়েটারের ভাষা। চরিত্রের মুখে কথিত সংলাপের সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু থিয়েটারের আঙ্গিক সার্বজনীন। তাই মনে হয়, থিয়েটারের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'বাচিক' সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে একটা সার্বজনীন আঙ্গিককে মাধ্যম বেছে নেওয়া। অবশ্য একথা আলোচনা সাপেক্ষ।

'আঙ্গিকে'র সার্বজনীনতা প্রসঙ্গে তর্কের সম্ভাবনাও আছে; 'স্বদেশী-বিদেশী'র গোঁড়ামিও আছে নানা রকমের। যেমন আধুনিক মঞ্চের একটি কৃতী শিল্পীর অভিনয় দেখে এক ভদ্রলোক বললেন—"অভিনয়ের Styleটা বড় Western।" প্রশ্ন ওঠে অভিনেতা যদি তাঁর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অভিনীত চরিত্রটিকে দেশীয় type করে তুলতে পারেন—তাহলে অভিনয় কি করে Western হল? আমরা ভুলে যাই—আমাদের আজকের এই Box Stage কিছু আমাদের নিজস্ব নয়, এটাও ধার-করা —Western।

কেউ কেউ বলেন—Box Stage থাক, কিন্তু তার মধ্যেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে—অর্থাৎ Box Stageএ অভিনয় করতে হবে যাত্রার ঢং-এ।—আর একটি অনভিজ্ঞ উক্তি। Box Stage বা থিয়েটার যখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে অকপট Realismএর দিকে—তখন যাত্রার ঐ সুরে-অভিনয় বা কল্পিত চরিত্রে বিবেকের স্থান সেখানে কোথায়? অবশ্য বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে অনেক কিছু। Classic বা পৌরাণিক বা এ' জাতীয় অতি-প্রাকৃত নাটক হলে হয়ত একটা রফা করা যায় যাত্রা ও থিয়েটারের মাঝে। কিন্তু এসব নাটকের চল আজ নেই বললেই চলে—[illegible] সে অন্য প্রসঙ্গ। আজ আর 'উদার বীর'এর যুগ নেই—আজ সমষ্টির যুগ। তাই আজকের নাটকের বক্তব্য সমষ্টিগত, চরিত্রও সমষ্টির প্রতিনিধি।—কিন্তু কথা হচ্ছে আঙ্গিক আর বিষয়-বস্তু এদুটোকে আমরা থিয়েটারের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা করি না, দুটোকে দেখি আলাদা আলাদা করে—তাই গোল বাধে, আসলে ঐ দুটো যে অঙ্গাঙ্গীজড়িত সেটা ভুলে যাই—ছবিতে যেমন রঙ-রেখা আর Subject, সঙ্গীতে যেমন তাল, লয় আর সুর—। সবটা মিলে একটা—এই মেলাটা যোগফল নয়, আইসেনষ্টাইনের ভাষায় গুণফল। থিয়েটারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিতর্কও বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ। আশার কথা; কিন্তু অযৌক্তিক বা অনভিজ্ঞ আলোচনা বা সমালোচনা থিয়েটারের পক্ষে ক্ষতিকর।

মঞ্চে যান্ত্রিক কলা-কৌশলকে নিন্দা করা হয়; এটা নাকি নব্য-থিয়েটারে দেখা দিয়েছে একটা ব্যাধির মত। কেন—যন্ত্রের ব্যবহার কি ছিল না আমাদের 'কালকের থিয়েটারে'? 'কিন্নরী' নাটকে যখন "কিন্নরীর" দল মঞ্চ থেকে উড়ে যেতেন শূন্য-পথে—দর্শক মুগ্ধ-মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিত তা দেখে—তখন তো তাকে থিয়েটারই বলেছি আমরা?

অথচ আজ যখন মঞ্চে দেখি খনির শ্রমিক লিফটে

করে নেমে যাচ্ছে খনির নীচে, কিম্বা খনির খাদের নীচে জল ঢুকছে বুগ্‌বুগ্‌ করে—তখন আমরা চীৎকার করি—তখন আমরা চীৎকার করি—এ' নাটক নয়—যন্ত্রের ভেল্কী। আধুনিক শ্রমিক-জীবন নিয়ে যে নাটক, যে-নাটকের মানুষের পৃথিবীর গতি হচ্ছে একটা খনির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে-নাটকের চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রাণ দিতে হবে তার পরিবেশকে—সেই খনিকে। তবেই আমরা বুঝবো খনির শ্রমিকের দুঃখ, তবেই আমরা বুঝবো হাজার ফুট মাটির নীচে খনির মধ্যে একুশ দিন আটকে থাকার মৃত্যু-যন্ত্রণা। তাই—আনতে হয় ক্রেইন, লিফ্‌ট, খাদের নীচে জল-প্লাবন—এগুলোকে বাদ দিলে খনির শ্রমিক নিয়ে নাটক করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠবে এ নিয়ে নাটক হয় না; কিন্তু তাহলে তো কোন আলোচনাই আর হয় না। বিজ্ঞানের যুগে, শিল্প-বিপ্লবের যুগে যন্ত্রের প্রভাব সর্বত্র—সাহিত্য, চিত্র-কলায়, নাচে, গানে, পোষাকে, চলায়, চিন্তায়। মোটরে চেপে, বৈদ্যুতিক পাখার নীচে অথবা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসে এ-যুক্তি কি অবান্তর শোনাবে না?

এর পরে প্রশ্ন আসবে অভিনয় নেই। হয়ত সত্যি। শিশিরোত্তর যুগে বাংলার থিয়েটারে তথা অভিনয়ের জগতে এসেছে যন্ত্রজ্বর—ডেমাল আর মেকী নিয়ে বেসাতি চালাচ্ছে কালা-বাজারীরা—অভিনয় থাকবে কি করে? কিন্তু বিষয়-বস্তু হিসেবে যদি আমরা বাস্তবকে মেনে নিতে পারি—তবে সেই বিষয়-বস্তুর অনুগ পরিবেশ বা আঙ্গিককে আমরা মেনে নেব না কেন? ধরা যাক্ জাপানের কাবুকী থিয়েটারের কথা। কাবুকীতে Realism অচল—বাস্তবের ছায়াকেও তাঁরা এড়িয়ে চলেন মঞ্চে—সেখানে এই প্রশ্ন আসে না—সেখানে তাঁরা মঞ্চে illusion আনতে চেষ্টা করেন না, মঞ্চকে মঞ্চ বলেই দেখাতে চান—তাই অভিনয়-চলা-কালীন অভিনেতা সংলাপ বন্ধ করে হঠাৎ দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর আসল নাম—স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি অভিনয় করছেন। তাঁরা ভয় পান পাছে দর্শক তাঁদেরকে সত্যিকার চরিত্র বলে মনে করেন। তাই কাবুকী-মঞ্চে দৃশ্য-পরিবর্তন করতে পটক্ষেপণের প্রয়োজন হয়না—মঞ্চ-শিল্পীরা দর্শক-সমক্ষেই দৃশ্যপট পরিবর্তন করেন। তাই যখন বিখ্যাত কাবুকী অভিনেতা নাকা-মুরা কিচিএমন্'কে জিজ্ঞাসা করা হয়—"কাবুকীতে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় স্ত্রীলোক দিয়ে করান হয় না কেন?" স্তম্ভিত বিস্ময়ে তিনি জবাব দেন—"But that would be too real!"

তবু সেখানেও এসেছে Realismএর ছোঁয়াচ—যন্ত্র-যুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; এ ছোঁয়াচ এড়িয়ে কাবুকী কতদিন অপবিত্র থাকতে পারবে তা আজ চিন্তার কথা। কিন্তু একটা কথা ঠিক—থিয়েটার এগিয়ে চলবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বেশে—একদিন আসবে যখন সে খুঁজে পাবে সেই নিজস্ব ভাষা, যা ভূগোলের সীমাকে অতিক্রম করবে, হবে কালজয়ী; থিয়েটার বেঁচে থাকবে ততদিন যতদিন তার বক্তব্য মানুষকে দেবে চেতনা, দেবে এগিয়ে চলার প্রেরণা, দেবে দুঃখ-জয়ের আনন্দ।

রঙ্গ জগৎ

কুমারগুপ্ত

যে চিত্র আসছে :—

অভিনেত্রী প্রগতি ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় এম, এম প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্র "মধ্যরাতের তারা"র চিত্র-গ্রহণ পরিচালক পিণাকি মুখার্জির পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বহুদিন পরে বাংলা চিত্রে এক নিগৃহীতা নারীর ভূমিকায় প্রগতি ভট্টাচার্যকে দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, দীপক মুখোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু, রেণুকা রায়, মলিনা দেবী এবং আরও অনেকে, কাহিনী প্রতিভা বসুর একটি গল্প অবলম্বনে নেওয়া হয়েছে।

• • • •

এপেক্স ফিল্মসের প্রযোজনায় এবং সুদক্ষ পরিচালক অজয় করের পরিচালনায় সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের "তিন বহুরূপী"র চিত্র গ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানা গেল। এর মুখ্য চরিত্র দুটিতে আছেন উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়া চৌধুরী, অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন দীপক মুখার্জি, বনানী চৌধুরী, সুনন্দা দেবী এবং আরো অনেকে।

• • • •

প্রায় দু'বছর ধরে ইংলণ্ডের চিত্র নির্মাণ প্রণালী অধ্যয়ন করে অভিনেত্রী মঞ্জু দে দেশে ফিরে এসে তার চিত্র প্রযোজনার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর প্রথম চিত্রের চিত্রনাট্য লিখছেন সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং চিত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে "অন্তরাল"। অভিনয়ে মঞ্জু দের সঙ্গে থাকবেন ছবি বিশ্বাস, নির্মলকুমার, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল রায় প্রভৃতি।

• • • •

শ্রীগ্রন্থ নাথ বিশীর বহুচর্চিত "কেরী সাহেবের মুন্সী" উপন্যাসখানির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক বিকাশ রায়।

• • • •

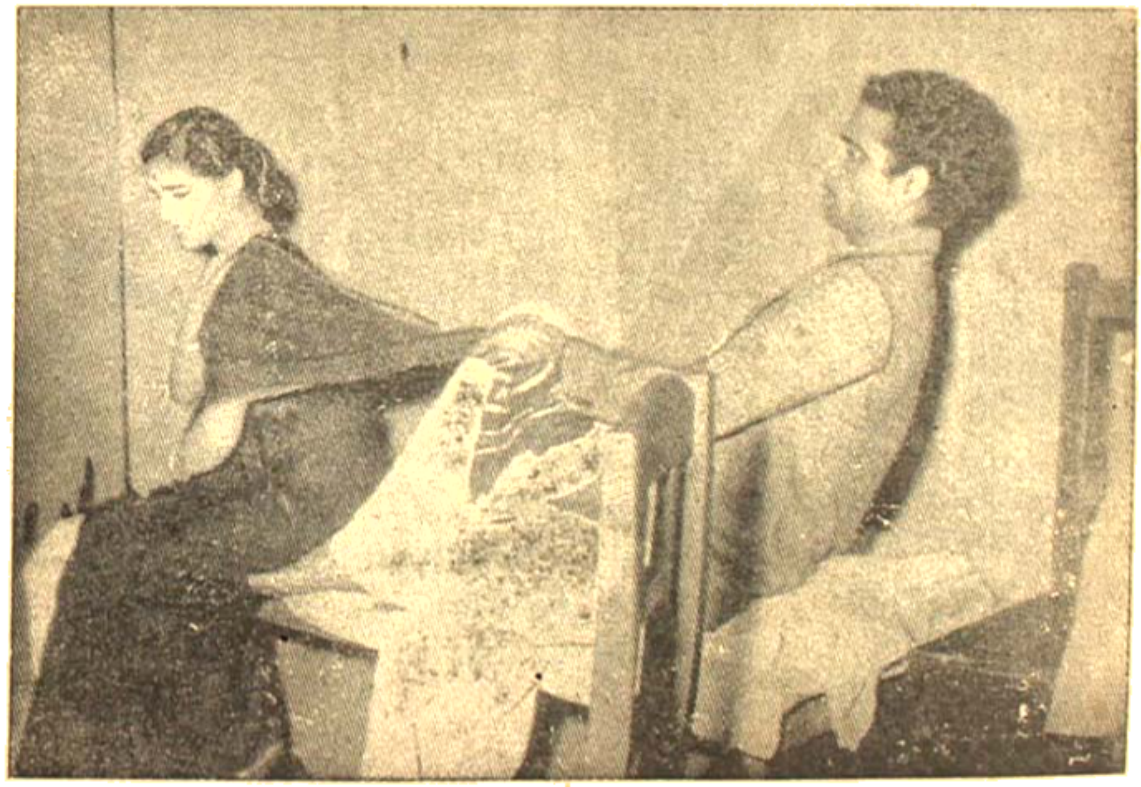

মিনার্ভা থিয়েটারে "চার দেয়াল" নাটকে একটি দৃশ্যে শেখর চট্টোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের অন্যতম উপন্যাস "আগুন" এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রখ্যাত পরিচালক অসিত সেন।

• • • •

প্রফুল্ল রায় রচিত "সোনা জল মিঠে মাটি" উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রবীন চিত্রপরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী।

• • •

ডাঃ সুরেশ রায়ের পরিচালনায় কালিকা চিত্রমের ছবি "মরুতৃষা"র কাজ শেষ হয়ে এসেছে। এর প্রধান অংশে অভিনয়ে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিত বরণ, ছবি বিশ্বাস, তপতী, রবীন মজুমদার, জহর রায়, মৌতিশ, পদ্মা, এবং আরও অনেকে। কালোবরণের সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা, আলপনা, সতীনাথ। নব নির্মিত কমলা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় চিত্রখানি শীঘ্রই মুক্তি পাবে বলে প্রকাশ।

এক মজরের সংবাদ :—

গত ২৪শে জুন থেকে বার্লিনে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে তাতে কাহিনী-চিত্র বিভাগে অন্যতম বিচারক হয়েছেন প্রখ্যাত প্রযোজক পরিচালক ও কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের সদস্য মিঃ সোহরাব মোদী, এবং সেন্সর বোর্ডের সভ্যা শ্রীমতী পূর্ণিমা ও, পাকবাস প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছেন। ভারতের পক্ষ থেকে এই আন্তর্জাতিক উৎসবে এবার চিত্র বিভাগে প্রতিযোগিতা করছে অসমীয়া চিত্র "পুবেরকণ" "হীরামোতী" (হিন্দি) ও "ক্ষুধিত পাষাণ (বাঙলা) এবং শুধু বিভাগে থাকবে ফিল্ম ডিভিসনের "কথা কলি"।

• • • •

এবারে ব্রিটিশ অভিনেতা স্যার লরেন্স অলিভার আমেরিকান টেলিভিশনে "এমি" পুরস্কার লাভ করেছেন। পুরস্কার দেওয়া হয়েছে "সমারসেট মম" এর "দি মুন এণ্ড সিক্স পেন্স" এ অভিনয়ের জন্য। টেলিভিশনে স্যার লরেন্সের এই প্রথম আবির্ভাব। সুইডিশ শিল্পী ইনগ্রিড বার্গম্যানও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে একটি "এমি" পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার তাকে দেওয়া হয়েছে "দি টার্ন অব দি স্ক্রু"তে অভিনয়ের জন্য। টেলিভিশনে শ্রীমতী বার্গম্যান-এরও এই প্রথম অবতরণ।

• • •

উমেশ মল্লিক লিখিত গল্প ও চিত্রনাট্যে এবং তারই প্রযোজনায় ইংরাজী ছবির নাম "দি ম্যান হু কুড নট ওয়াক" এই মাসেই লণ্ডনের বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

• • •

এবারে সত্যি সত্যিই মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে আমেরিকার লক্ষেভ ইং নামে জনৈক চিত্র প্রযোজক "দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী" চিত্র নির্মাণের আয়োজন করেছেন, এবিষয়ে ভারত সরকারেরও অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। নাম ভূমিকায় একজন ভারতীয় শিল্পীকে দেখা যাবে।

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রপতির সোবিয়েত সফর

ফিল্ম ডিভিসন রাষ্ট্রপতির সোবিয়েত রাশিয়া সফরের দৃশ্যগুলো সমস্ত দেশে দেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতা থেকে আলোকচিত্রশিল্পী শ্রী এ, এনা পরমেশকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাশিয়ায় পাঠান হয়েছে।

কুইবিশেভের অপেরা হাউসে "চিত্রাঙ্গদার ভিত্তিতে ব্যালে নৃত্য

সোবিয়েত সংবাদে প্রকাশ গত ১৯শে জুন সোবিয়েত ইউনিয়নের কুইবিশেভ অপেরা হাউসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার একটি ব্যালে নৃত্যের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। কবির দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সাহায্যে ব্যালেটি মঞ্চস্থ করা হয় এবং তারই জন্য উপদেষ্টা হিসাবে শ্রীমতী কৃপালনী দু'সপ্তাহ কাল কুইবিশেভে ছিলেন।

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY

শ্রাবণ
১৮৮৫
পঞ্চম বর্ষ
২য় সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

উনিশ'শ ছেচল্লিশ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনিবার্য ফলরূপে দেখা দিয়েছিল ভারত বিভাগ। উনিশ'শ ষাট সালে আসামের বর্বরতায় আবার কোন মহাদুর্ভাগ্যের সূচনা হল কে জানে! আসামের সাম্প্রতিক ঘটনায় একথা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে স্বাধীন ভারতবর্ষের কোন একটি জাতির স্বাধীন ভারতের যে কোন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার নেই।

'ভারতীয় মাত্রই একজাতি'—এই প্রকাণ্ড মিথ্যাটা দিনের পর দিন ইংরেজ আমলে আমাদের শোনানো হয়েছিল। বার বার প্রচারে একটা মিথ্যাও প্রায় সত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। বহু ভাষাভাষী জনসমষ্টিকে একজাতি বলে ভাববার মত একটা অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে প্রশ্রয় দেবার মনোভাব তাই অনেকের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। আসামের ঘটনায় যদি ভারতবাসী মাত্রেরই নিজ নিজ জাতিসত্তা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা জাগে তবে তাই হবে এই চরম অমঙ্গলের মধ্যে একমাত্র মঙ্গল। বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া অসমিয়া—আমরা সকলে এক নই, স্বতন্ত্র—এ ধারণা যত শীঘ্র আসে ততই মঙ্গল। সত্যকার স্বাতন্ত্রকে অস্বীকার করলেই ঐক্য আসে না বরং সংঘাত তীব্রতর হয় আর স্বাতন্ত্র মেনেও সৌহার্দ্র বজায় রাখা চলে।

ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই জাতি-ভিত্তিক। ইউরোপের জাতিগুলি তার ফলে দুর্বল হয়নি। যে যে ক্ষেত্রে বহু জাতিকে একত্রে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল সেখানে হানাহানি তীব্ররূপ ধারণ করেছিল—ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য।

বহু জাতির দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন : জাতিতে জাতিতে সদ্ভাব সেখানের ইতিহাস। সোভিয়েত ইউনিয়নে যা সম্ভব বর্তমান ভারতে তা নয়—একথা মনে রাখাই মঙ্গলজনক। ভারত সরকারের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যেই তার বীজ রয়েছে, এক জাতির দ্বারা আর এক জাতির নিপীড়নই তার রাজ্য-শাসনের মূলধন এবং সেই কারণে কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হতে পারলেও আসামে হবে না, তাও নিশ্চিত।

অপরের অনুগ্রহে কোন জাতি দাঁড়ায় না, বড় হওয়া তো দূরের কথা। বাস্তব ঘটনায় বাঙ্গালী জাতি যদি জেগে উঠতে না পারে তবে ভবিষ্যতে তার জন্য আক্ষেপ করারও কেউ থাকবে না। তাছাড়া বাঘকে তৃণভোজী হবার অনুরোধ না জানিয়ে তার স্বভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্‌সমুলার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

★

॥ এক ॥

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) রাজা রামমোহনের মত বাংলা দেশের আধুনিক মানুষ। তাঁর গতিশীল জীবনের বিচিত্র কর্মবৃত্তের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে নবযুগের শঙ্খধ্বনি। নবযুগের প্রথম উদ্গাতা রাজা রামমোহনের মনীষার ক্ষরদীপ্তি হয়ত তাঁর ছিল না। কিন্তু রামমোহনের অভিনব সমাজচিন্তার পথে অগ্রসর হয়ে তিনি যে অধমা কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন তা চিরদিনই তাঁকে বাঙালীর ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে।

বাল্যে সার্বরণ সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা এবং যৌবনে ব্যারিষ্টার কাউসন সাহেবের নিকট আইন-শিক্ষা ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট আধুনিক জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র। এ ছাড়া এ নবযুগের মানুষটির ছিল চমৎকার একটি সামাজিক মন, যে-মনের সহায়তায় ইংরাজ বণিকের নিকট-সম্পর্কে আসা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। এ বিদেশী বণিক সংস্পর্শ বণিক-বৃত্তিতে তাঁকে নিপুণ করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। প্রথমে নিমকের এজেন্ট গ্রাউডেন সাহেবের দেওয়ানী কাজে এবং পরবর্তীকালে স্ব-প্রতিষ্ঠিত 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানী' এবং 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় এ ব্যবসানৈপুণ্য দ্বারকানাথের পরম সহায়ক হয়েছিল। বিদেশী বণিকের মতই ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে অপরিমিত অর্থোপার্জন ছিল দ্বারকানাথের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সে আকাঙ্ক্ষায় তিনি চরম সফলতা লাভ করে তৎকালীন কলকাতার বিত্তবান সমাজের অগ্রণী হয়েছিলেন।

জীবনধর্মের দিক দিয়েও দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর গুরুর বন্ধু রাজা রামমোহনের মত রাজসিক। রাজার মতই ভোগ, বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তাকে কখনও অনভিপ্রেত বস্তু বলে মনে করেননি তিনি। শুধু এদেশে নয়, ইংলাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রবাসকালে তাঁর রাজোচিত ব্যবহার সে-দেশবাসীকে শুধু তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ করে তোলেনি, তাঁর স্বদেশের প্রতিও পাশ্চাত্ত মনে একটা প্রবল কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল। সে কৌতূহল সে-যুগে পাশ্চাত্তের সংগে প্রাচ্যের মিলনকে ত্বরান্বিত করেছে, এবং সে মিলনের ফলে বাংলাদেশে আধুনিক যুগ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

লক্ষ্মীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাঁর জীবন ছিল যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি জনকল্যাণমূলক কাজে অজস্র দাক্ষিণ্য-প্রদর্শনে কখনও দ্বিধা করেন নি তিনি। হিন্দু কলেজ, ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর সে দাক্ষিণ্যের স্বাক্ষর। এ ছাড়া দেশের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবার কার্যকরী পন্থা অবলম্বনে তিনি ছিলেন রাজা রামমোহনের দক্ষিণহস্ত। দেশীয় যুবকদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রচারে তিনি যে কত উৎসাহী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি নিজ ব্যয়ে দুটি ছাত্রকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে তাদের সেখানকার উচ্চতর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার খরচ নিজে বহন করেছেন। ইংরাজ সংস্পর্শে আগত নবযুগের বাঙালীর পক্ষে আধুনিকতার স্তরে উত্তীর্ণ হতে হলে যেমন ঐহিক সমৃদ্ধির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে আয়ত্ত করে নবতর শক্তিলাভ—এ সত্য উপলব্ধি করতে দেরী হয়নি সেদিন ধনকুবের দ্বারকানাথের।

দ্বারকানাথ ঐশ্বর্যবান ছিলেন, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। একটা অবারিত প্রসন্ন উদারতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজকীয় আড়ম্বরে বাস করা স্বভাব-গত ধর্ম হলেও স্বদেশের কল্যাণচিন্তা ছিল তাঁর মনে সদাজাগ্রত। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাজা রামমোহনের উপযুক্ত শিষ্য। বৈষয়িক উন্নতির জন্যে তাঁকে সর্বদা কর্মচঞ্চল থাকতে হত সন্দেহ নেই। অবশ্য বর্তমান যুগচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, দ্বারকানাথের

কোন কোন চিন্তা ও কাজকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হবে। কিন্তু দ্বারকানাথের বিশেষ মানসপ্রবণতা ও কর্মবিচারে এযুগের মানদণ্ড নিয়ে বসা বোধহয় সমীচীন নয়।

। দুই ।

একজন চিন্তাশীল লেখক লিখেছেন, ১৮৩০ থেকে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার জনজীবনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত এত উল্লেখযোগ্য স্থান আর কোন ভারতীয়ের ছিল না।

এ ষোল বৎসরের মধ্যে দ্বারকানাথের জীবনে দেখা যায় দুটি সুস্পষ্ট অধ্যায়—এক অধ্যায়ের পটভূমি স্বদেশ, আর এক অধ্যায়ের বিদেশ।

পরস্পরবিরোধী দুটি মনোভাব দ্বারকানাথের চিত্তের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে একদিকে তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের একজন প্রচণ্ড সমর্থক, আর একদিকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সদাসক্রিয়। দ্বারকানাথের জীবনী-পাঠক মাত্রই এ সংবাদ জানেন, তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা 'একঘরে' হয়েছিলেন। এ ঘটনা ঘটে দ্বারকানাথের বিলাত যাত্রা ও ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে একত্র ভোজন প্রসঙ্গে। এ কাহিনী বহু প্রচলিত হলেও সে যুগের 'ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত ও ১৮৪৩ সনের 'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' নামক বিখ্যাত পত্রিকার পুনর্মুদ্রিত খবরে জানা যায় যে, এ বিদেশ গমন বা বিদেশীর সঙ্গে একত্র পানাহার তাঁর 'একঘরে' হওয়ার প্রধান কারণ নয়, তার অন্যতম কারণ হল দ্বারকানাথ কর্তৃক ভারতে ব্রিটিশ অধিকারে অকুণ্ঠ সমর্থন। দ্বারকানাথের আত্মীয়েরা এতটা স্বদেশ প্রেমের অধিকারী ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' সন্দেহ প্রকাশ করলেও, একথা বোধ হয় অনুমান করা অহেতুক নয় যে, দ্বারকানাথের অন্ধ ব্রিটিশ অনুরক্তিকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা খুব প্রীতির চোখে দেখতে পারেন নি।

দ্বারকানাথের ব্রিটিশ ভক্তি অন্ধ ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু এ একচক্ষু দৃষ্টির প্রধান কারণ সে যুগের ব্রিটিশ-জাতির ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তাঁর নিরঙ্কুশ বিশ্বাস। দ্বারকানাথ একথা আন্তরিক বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় প্রজার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর লণ্ডনে কোর্ট অফ ডিরেক্টারদের যে সভা হয় সে সভার সভাপতির নিকট দ্বারকানাথের লিখিত পত্রে দ্বারকানাথের এরূপ আশাবাদী দৃষ্টিভংগী খুব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বাস্তবিকই সে যুগের ব্রিটিশদের সদাশয়তার প্রতি দ্বারকানাথের এ বিশ্বাসপরায়ণ দৃষ্টিভংগীকে একেবারে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা যারা অনুসরণ করেন তাঁরা একথা জানেন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সমাপ্তির পর হতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে খুব বড় রকমের কোন বিপ্লব দেখা দেয়নি। এ সময়টাকে কোন কোন ঐতিহাসিক ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসের age of peaceful progress বলে অভিহিত করেছেন। এ যুগেই ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে ভারতের উন্নতির জন্যে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ (যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Indian Policy) সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের উন্নতির সংগে ব্রিটিশ স্বার্থ জড়িত ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তা হলেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ভারতের প্রতি ব্রিটিশের এ অনুকূল মনোবৃত্তির ফলে সেযুগে ভারতীয় জনসাধারণের নানামুখী উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ভারত-বাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি ব্রিটিশ শাসনের সে অনুকূল মনোভাব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীযুদ্ধের পরে অনেকটা সন্দেহাত্মক দৃষ্টিতে পরিবর্তিত হয় ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সে সংবাদ জানেন।

দ্বারকানাথ ভারতেতিহাসের সে peaceful progress যুগের মানুষ। এজন্যই ব্রিটিশের সহায়তার প্রতি তাঁর বিশ্বাস এত পর্বতপ্রমাণ। তাঁর ভাবগুরু ও প্রিয়সুহৃদ্ রামমোহনের মতই তিনি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। পশ্চিম থেকে অনুকূল বাতাস বইছে, এখন জাতীয় জীবন নৌকায় পাল লাগাতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা। অবশ্য জাতীয় জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে দ্বারকানাথের ধারণা কতটা স্বচ্ছ ছিল তা প্রশ্নাতীত নয়।

রাজা রামমোহনের মতই তিনি বিশ্বাস করতেন সুশিক্ষিত ইংরাজেরা এদেশে বেশী সংখ্যায় বসবাস করলে এদেশের দ্রুত উন্নতি হবে। এছাড়া তিনি নিজে

বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয় জনস্বার্থ রক্ষিত হবে। এ বিশ্বাসকে কার্যে রূপান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং বহু ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির শেয়ার কিনতে। ৩৪০০ টাকা দিয়ে তিনি 'India Gazetee'-এর সত্ত্ব নিজেই কিনে ফেলেন এবং "Bengal chronicle"এর সঙ্গে পত্রিকাখানিকে যুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে 'India Gazetee' 'Bengal Harkarn'র সঙ্গে যুক্ত হয়। সে যুগে 'Joha Bull' নামক সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রখানি দেশবাসীর প্রতি বর্বরোচিত আক্রমণ করত। এ আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্যে দ্বারকানাথ 'বেঙ্গল হরকরার' অধিকাংশ শেয়ার নিজে কিনে সে পত্রিকাকে জনস্বার্থের কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টিত হলেন। বলাবাহুল্য নিজ অর্থব্যয় করে বিদেশী ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা প্রয়াস পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদের যুগে হাস্যকর বলে মনে হওয়া নিশ্চয়ই।

শুধুমাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে নয়, সে যুগের বিত্তশালী জমিদারদের সম্মিলিত সংস্থার মাধ্যমেও জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়েছিলেন দ্বারকানাথ। 'ল্যাণ্ডহোল্ডারস সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। এ 'ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ সোসাইটি' যে শুধুমাত্র সে যুগের বিত্তবানদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিল তা নয়, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে রামমোহনবন্ধু উইলিয়ম এডাম প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তৎকালীন ব্রিটিশ জাতির কৌতূহল উদ্রেক করবার জন্যেও সচেষ্ট হয়। এমন কথাও শোনা যায়, 'ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ সোসাইটি'র মাধ্যমে তিনি অনেক অর্থব্যয় করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে ভারতের অনুকূলে জনমত গঠন করবার জন্যে ইংরাজ এজেন্ট নিযুক্ত করে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই অনুষ্ঠিত 'ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ সোসাইটি'র সভার বিবরণ হতে জানা যায় যে রাজা রাধাকান্তদেবের প্রস্তাবে এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থনে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান বক্তা জর্জ টমসন উক্ত সোসাইটির পক্ষে সে দেশে ভারতকথা প্রচার করতে সম্মত হয়েছেন। জর্জ টমসনকে সেজন্য কোন অর্থ দেওয়া হয়েছিল একথা সোসাইটির কার্যবিবরণের ভেতর তার কোন উল্লেখ নেই। মানবতাবাদী জর্জ টমসন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগময় ভাষায় ও উদাত্তকণ্ঠে লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে ভারতপ্রসঙ্গ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ও ইংরাজ জনসাধারণের মনযোগ ভারতবর্ষের প্রতি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন। তারপরে দ্বারকানাথ যখন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন তখন তিনি মানবতাবাদী জর্জ টমসনের সঙ্গে নিজেই সংযোগ স্থাপন করেন এবং সে যুগের নব্য ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করবার জন্যে এই নিভীক মানবদরদী ইংরাজকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্তরে সাময়িকভাবে প্রবল উদ্দীপনা এনে দিলেও বাঙালী জনসাধারণের চিত্তে অবশ্য স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ বোধহয় জাতীয় আদর্শ লাভে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের আদর্শহীনতা, দেশব্যাপী যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব এবং পরবর্তী কয়েকটি যুগান্তরকারী রাজনৈতিক ঘটনা।

দেশের মধ্যে সুসভ্য ইংরাজ রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক, সে সম্পর্কে মনীষী বন্ধু রামমোহনের মত দ্বারকানাথের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পূজারী ইংরাজ অধিকারে বাঙালী তথা ভারতবাসীর নাগরিক স্বাধীনতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্যে রামমোহনের মতই তাঁর সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা ছিল সদাজাগ্রত। রামমোহনের মতই দ্বারকানাথ বিশ্বাস করতেন সভাসমিতির অনুষ্ঠানের সাহায্যে জনমত সৃষ্টি না হলে এ নাগরিক অধিকারলাভ কখনও সম্ভব হবে না। একথাও অবশ্যই তিনি ভাবতেন ইংরাজী শিক্ষার প্রসার না হলে স্বাধীকার সম্বন্ধে জাতীয় মন কখনও সচেতন হবে না। এ কারণেই দ্বারকানাথ হিন্দু কলেজের মাধ্যমে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে এত উৎসাহী ছিলেন। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পরে নাগরিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্যে যে সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী সচেষ্ট হন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি জনসভায় তিনি ভারতীয় প্রজার প্রতি সুবিচারের জন্য শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টে নয়, মফঃস্বল আদালতেও যাতে জুরী-প্রথা প্রবর্তিত হয় তার জন্যে দাবী জানান। সে বৎসরেই আর একটি জনসভায়

তিনি প্রেস আইন এবং জনসভা অনুষ্ঠানের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। অত্যাচারী মফঃস্বল পুলিশের হাত হতে প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে তিনি তৎকালীন পুলিশ-সংস্কার সমিতির (Police reform committee) নিকট যে সাক্ষ্য দেন তা দ্বারকানাথের নির্ভীকতা ও প্রজাদরদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মফঃস্বলের প্রজাদের প্রতি ও পুলিশী জুলুম নিবারণের জন্য তিনি সরকারকে সুশিক্ষিত দেশীয়, পূর্বভারতীয় বা য়ুরোপীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের পরামর্শ দেন। দ্বারকানাথ বলেন এ শ্রেণীর মফঃস্বল শাসকেরা হবেন সম্ভ্রান্তবংশজাত ও সংস্কারযুক্ত, যাতে তাঁরা বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত না হয়ে নিগৃহীত প্রজার প্রতি সুবিচার করতে পারেন। বলা-বাহুল্য দ্বারকানাথের এ পরামর্শ কিছু সংশোধনের পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। দ্বারকানাথের অন্যান্য চেষ্টায় শিক্ষিত ভারতীয়েরা সর্বপ্রথমে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ সরকারী কর্মে নিযুক্ত হন।

এছাড়া দ্বারকানাথ ভারত শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর আর একটা অধিকারের দাবী জানান যা রামমোহন পর্যন্ত চিন্তা করেন নি। তিনি তৎকালীন সরকারকে বলেন, ভারত শাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী হতে চজন করে প্রতিনিধি থাকা উচিত।

ইংরাজ বন্ধু আড়ম্বরপ্রিয় ও বিলাসী দ্বারকানাথ ঠাকুর সমকালীন অনগ্রসর দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নের জন্যে কতকটা সচেষ্ট ছিলেন তাঁর উক্ত রাজনৈতিক ও সমাজভাবনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ অসমা ধর্মনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতির জন্যে দ্বারকানাথের জীবনে দেশ বিদেশ হতে সম্মানও এসেছিল প্রচুর। কোন সময় সে সম্মান তিনি গ্রহণ করেছেন, আবার সে যুগে যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে পরম লোভনীয় সম্মান তিনি ত্যাগও করেছেন কখনও। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম তৎকালীন সরকার কর্তৃক অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ওয়েলসের Abergaveany Cymreigyddion societyর নবম বার্ষিক অধিবেশনে সম্মানীয় অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়েও তিনি তথায় যোগ দিতে পারেন নি; কিন্তু সে সমিতি তাঁর অনুপস্থিতিতেই একটা সুদৃশ্য কাগজে ওয়েলস্ অক্ষরে যে প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন তাতে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে—"Most Illustrious chieftain Dwarkanath" বলে।

॥ তিন ॥

ইংল্যাণ্ডে বাসকালে দ্বারকানাথের অভিজাত্যজ্ঞান আড়ম্বরপ্রিয়তা ও সামাজিক গুণ সে যুগের ইংরাজকে ভারতবাসীর প্রতি যে সশ্রদ্ধ করে তুলেছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। মহারাণীর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাঁর সম্মানের কথাও বহু আলোচিত। অতএব তাঁর দ্বিতীয়বার য়ুরোপ ভ্রমণের সময় ফরাসী দেশের অভিজাত ও বিদ্বজ্জন সংস্পর্শে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের যে দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেই বর্তমান প্রসঙ্গে ইতি টানব।

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর দলবলসহ প্যারিসে উপস্থিত হন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্যারিসে এসে দ্বারকানাথ সেখানকার সব চাইতে অভিজাত হোটেলের উৎকৃষ্ট 'সুটে' রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। এ সংবাদ শীঘ্রই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ল প্যারিসের অভিজাত মহলে, এবং তাঁরা এ ইতিহ্যান প্রিন্সের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের ভাগ্যে অভূতপূর্ব সম্মান এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তরফ থেকে। ফরাসী দেশের তদানীন্তন রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি নিমন্ত্রিত হলেন একটা জৌলুষপূর্ণ সান্ধ্য উৎসবে। রাজা তাঁর রাজসভার সমস্ত সভ্যসহ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হলেন এ সম্মানীয় বিদেশী অতিথির সম্বর্ধনা সভায়। উৎসব কক্ষটি সুসজ্জিত করা হল ভারতীয় বহুমূল্য শাল দিয়ে—যে শাল ছিল সেযুগের বিলাসিনী ফরাসী নারীর পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সভা ভঙ্গের পর সভাগৃহ ত্যাগ করার সময় বিস্মিত আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল প্রত্যেক বিলাসপ্রিয়া ফরাসী মহিলা যখন দ্বারকানাথ নিজের হাতে একখানা করে শাল তাদের কাঁধে রেখে দিয়ে সস্মিত মুখে তাদের বিদায় দিলেন।

শুধু যে বিলাসপ্রিয় ফরাসী নরনারী দ্বারকানাথের সংগে পরিচয়লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা নয়, প্যারিসে অধ্যয়নরত একজন প্রাচ্য ভাষাবিদ পাশ্চাত্য

পণ্ডিতও চকল হয়ে উঠেছিলেন এ বহুকথিত অভিজাত ভারতীয়ের সংগে পরিচিত হবার অভিপ্রায়ে। ইনি হলেন সুবিখ্যাত জার্মান মনীষী ম্যাকসমূলার। প্যারিসের 'কলেজ ডিফ্রান্সে' তখন তিনি বিখ্যাত ফরাসী মনীষী বার্নফের কাছে সংস্কৃত পড়ছিলেন। দ্বারকানাথ বার্নফের কাছেই নিজের পরিচয়পত্র নিয়ে আসেন, এবং এ মনীষীর মধ্যস্থতায় দ্বারকাথের সংগে ম্যাক্সমূলারেরও পরিচয় হয়। ম্যাক্সমূলার তাঁর বিখ্যাত 'Auld laug syne' secon f series (My Indian Friends) ১৮৯৯ নামক গ্রন্থে দ্বারকানাথ সম্পর্কে যে স্মৃতিকথা লিখে গেছেন, তার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এখানে সংকলিত হল :

দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না একথা সত্য, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সংগে তিনি অপরিচিতও ছিলেন না। প্রথম আমি তাঁকে দেখি Institute de Freaceএ যখন মঃ বার্নফ তাঁকে নিজের সম্পাদিত ভাগবৎপুরাণের একখানি চমৎকার খণ্ড উপহার দেন। সে পুরাণের পৃষ্ঠাগুলি একধারে ছিল মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি আর একধারে তাদের ফরাসী অনুবাদ। এ সম্ভ্রান্ত ভারতীয় যখন তাঁর সুন্দর বাদামী রঙের আঙুলটি ফরাসী অনুবাদের উপর রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, "আহা আমি যদি ওগুলি পড়তে পারতাম"—তখন আমি বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। নিজের দেশের প্রাচীন ভাষার সংগে সম্পূর্ণ পরিচয়ের অভাবের জন্যে যেখানে তাঁর আন্তরিক ব্যাকুলতা স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে বিদেশী ফরাসী ভাষা আর একটু ভাল করে জানবার জন্যে তাঁর উৎকণ্ঠা কৌতুকজনক সন্দেহ কি ?

দ্বারকানাথ পুরাতত্ত্ববিদ ছিলেন না, নিজের দেশের ধর্মতত্ত্ব বা শাস্ত্রগ্রন্থের নিবিষ্ট পাঠকও তিনি ছিলেন না। কিন্তু বার্নফ সাহেব যখন তাঁকে একথা জানালেন যে আমি প্যারীতে বসে পাশ্চাত্য দেশে প্রাপ্ত বেদের বিভিন্ন সংস্করণগুলি কপি করে এবং সেগুলির পাঠ মিলিয়ে নূতন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হয়েছি, তখন তিনি আমার সম্পর্কে প্রবল কৌতূহলী হয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করতে শুরু করলেন, এবং আমি তাঁর সংগে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় রীতিসম্পর্কীয় আলোচনায় অনেক সকাল ব্যয় করতে লাগলাম। আমি আশ্চর্য হলাম সংগীতের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরক্তি দেখে। ইতিমধ্যেই ইতালীয় ও ফরাসী সংগীতের প্রতি তাঁর মনে একটা রুচিবোধের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় তিনি আমাকে তাঁর পিয়ানো সংগীতের সংগী হতে আহ্বান করতেন। আমি শীঘ্রই আবিষ্কার করলাম দ্বারকানাথ শুধু সুকণ্ঠ নন, তাঁর সংগীতশিক্ষাও মোটামুটি বেশ ভালই হয়েছে। এভাবে ক্রমে ক্রমে আমরা বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লাম। একদিন সকালে তাঁর ইতালীয় সংগীতপ্রিয়তার যথেষ্ট প্রশংসা করে আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম আমার নিকট একটি খাঁটি ভারতীয় সংগীত গাইতে। তিনি ভারতীয় সংগীতের নামে যা গাইলেন আসলে তা হল কোন বিশিষ্ট ভংগী বা কাঠামোহীন ফরাসী সংগীত। এ অবশ্য আমি চাইনি। তখন আমি তাঁর নিকট জানতে চাইলাম অকৃত্রিম ভারতীয় সংগীত বলতে যা বোঝায় সে সংগীত তাঁর জানা আছে কিনা। একটু হেসে তিনি আমাকে বললেন, "তুমি তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না।" বারবার অনুরোধ করবার পর তিনি তাঁর পিয়ানোতে কয়েকটি গদ্ বাজিয়ে তার পর বাজনার সংগে গাইতে শুরু করলেন। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তাঁর গান শুনে আমি যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সে সংগীতের সুর ছন্দ বা সামঞ্জস্য কোথায় আমি তা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাঁকে আমার এই বিভ্রান্তির কথা জানাতে তিনি একটু মাথা নেড়ে বললেন : "তোমরা সবই সমান, যখনই তোমরা অভিনব কিছু দেখ এবং সে অভিনব বস্তু তোমাদের পছন্দমাফিক না হয় তখনই তোমরা তা ত্যাগ কর। যখন আমি প্রথমে ইতালীয় সংগীত শুনি তা প্রথমে আমার সংগীত বলেই মনে হয়নি। কিন্তু ভাল না লাগা (তোমরা যাকে বল না বোঝা) পর্যন্ত আমি যে সংগীতের চর্চা করেছি। সকল বিষয় সম্বন্ধেই এ কথাটা সমানভাবে খাটে। তোমরা বল আমাদের ধর্ম, ধর্মই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। য়ুরোপ যা সৃষ্টি করে তা বুঝতে বা তার মর্মগ্রহণ করতে আমরা সব সময় সচেষ্ট। তাই বলে তোমরা মনেও করোনা ভারতবর্ষ যা সৃষ্টি করেছে তাকে আমরা ঘৃণা করি। আমরা যেমন তোমাদের সংগীতকে বোঝবার

চেষ্টা করি তেমনি তোমরাও যদি আমাদের সংগীত-জগতে প্রবেশ কর তাহলে দেখবে আমাদের সংগীতেরও তোমাদের সংগীতের মত সুর, ছন্দ এবং সামঞ্জস্য সবই আছে। আর তোমরা যদি আমাদের কাব্য, ধর্ম বা দর্শন ভাল করে পড় তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে, তোমরা যাদের ধর্মবিশ্বাসহীন বা ভুলভ্রান্তিকারী বলে অভিহিত কর বাস্তবিকই তা আমরা নই। বরং এসমস্ত ভারত-বিদ্যার সহায়তায় তুর্জ্ঞেয় ভগবান সম্পর্কে তোমরা যতখানি জান তার থেকে অনেক বেশী গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে।" বাস্তবিকই আমারও ধারণা দ্বারকানাথ মিথ্যা কিছু বলেন নি।

সংগীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে দ্বারকানাথ শুধু যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, উত্তেজিতও হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে শান্ত করবার জন্যে আমি বললাম—"একথা আমি ভাল করেই জানি যে ভারতবর্ষের নিজস্ব একটা সংগীতবিজ্ঞান ছিল এবং সে বিজ্ঞান গণিতশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের উপর লিখিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করবার সুযোগ আমার হয়েছিল কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই তার মাথামুণ্ড আমি কিছুই বুঝিনি। এইচ এইচ উইলসন বহু বৎসর ভারতবর্ষে বাস করায় এবং নিজেই একজন সংগীতজ্ঞ হওয়ায় আমি এ সম্পর্কে একবার তাঁর সংগে আলোচনা করি। তিনি কিন্তু আমাকে ভারতীয় সংগীত চর্চায় মোটেই উৎসাহ দেননি। তিনি আমাকে বলেন, ভারতবর্ষে থাকতে একজন সংগীতশিক্ষকের কাছে তিনি গিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতবিজ্ঞানের সংগে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। উইলসনের অভিপ্রায়ে তিনি তাঁকে ভারতীয় সংগীত শিক্ষা দিতে রাজী হন। তবে শর্ত থাকে যে সপ্তাহে অন্তত দুবার কি তিনবার উইলসন তাঁর কাছে যাবেন। তার ছমাস অতিক্রান্ত হলে তিনি উইলসনকে জানাতে পারবেন যে তিনি ভারতীয় সংগীত শিক্ষার জন্য অধিকারী বা উপযুক্ত কিনা। উপযুক্ত বিবেচিত হলে উইলসন অন্তত: পাঁচ বসৎরের জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও সংগীত আয়ত্ত করতে পারবে এমন আশা পোষণ করেন। কর্মব্যস্ত একজন ভারতীয় সিভিলিয়ানের পক্ষে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সংগীতসাধনায় ব্যয় করা একপ্রকার অসম্ভব। উইলসন তখন টাঁকশালের কর্তা এবং আরো কতগুলি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার ছিল তাঁর উপর। অতএব তাঁকে একজন সংগীত শিক্ষকের নিকট অন্ততঃপক্ষে শিক্ষানবিশী করার ধারণা বাদ দিতে হল।" এ কাহিনী শুনে দ্বারকানাথ খুবই কৌতুক অনুভব করলেন। সংগে সংগে এমন মন্তব্যও তিনি প্রকাশ করলেন, ভারতীয় সংগীতের খুঁটিনাটির সংগে পরিচিত হতে হলে পাঁচ বছরের সময় খুবই কম। ফলে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কীয় সংগীত রত্নাকর এবং ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের সংগে ঘনিষ্ট পরিচয় লাভের সমস্ত আশা আমাকেও ত্যাগ করতে হল যদিও ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারে ও শ্রেণীর বই আমার যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেক করেছিল।

...আমার নতুন বন্ধু দ্বারকানাথ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বস্তুতঃপক্ষে তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক মানুষ। ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। দেশে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি হেসে বলেছিলেন,—'কক্‌খনো না। এতদিন পর্যন্ত আমি দেশের বহু ব্রাহ্মণকে খাইয়েছি, এতেই তো যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করা হচ্ছে।...

দেশীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর ধারণা অত্যন্ত নীচু ছিল একথা সত্য কিন্তু যাঁদের তিনি 'কালো কোট পরা ইংরাজ ব্রাহ্মণ' বলতেন তাঁদের প্রতিও তিনি সদয় ছিলেন না। ইংরেজদের সব কিছুকে ভাল বললেও ইংরাজ সমাজের খুঁত আবিষ্কার করে তিনি একটা তুষ্ট আনন্দ অনুভব করতেন। সব চাইতে আমোদ পেতেন তিনি ইংরাজ পাদ্রীদের ত্রুটি বের করে। রাজনীতি ও ধর্মসম্পর্কীয় কতগুলি ইংরাজী পত্রিকা তিনি রীতিমত পাঠ করতেন। নিম্ন বা উচ্চপদস্থ কোন ধর্মযাজক সম্বন্ধে সে সমস্ত পত্রিকায় তিনি যখনই কোন প্রতিকূল মন্তব্য পেতেন তখনই তা তিনি সযত্নে একটি মোট বইয়ে টুকে নিতেন। ইংরাজ ধর্মযাজক সম্পর্কীয় কুৎসার সে এক অদ্ভুত সংকলন। এ সমস্ত সংগ্রহ তাঁর কি কাজে লাগবে আমি অবশ্য ভেবে পাইনি। তাঁর অধিতুল্য পুত্র আদি-ব্রহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিপক্ষদের প্রতি এ ধরণের অস্ত্র নিক্ষেপ

ব্যবহার করতেন না। কিন্তু সে ছোট নোট বইখানি নিয়ে দ্বারকানাথের গর্বের সীমা ছিল না। ভারতীয় ও খ্রীষ্ট ধর্মের তুলনা মূলক উৎকর্ষ সম্পর্কে যখনই কোন প্রশ্ন তাঁর সামনে উপস্থিত হত তখনই তিনি সে নোট বইখানি বের করে সে সমস্যার সহজ সমাধান করে দিতেন !···

···ইংল্যাণ্ডে বাসকালে দ্বারকানাথ ভারতের মহান ধর্মসংস্কারক রামমোহনের স্মৃতির প্রতি একটি পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করেন। ব্রিষ্টলের সমাধিক্ষেত্রে রাজার চিতা-ভস্মের উপর তিনি একটি স্মৃতিফলক তৈরী করান। এ দায়িত্ব সম্পন্ন করবার সময় তিনি অবশ্য স্বপ্নেও ভাবেননি, তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মত বিদেশ বিভূঁইয়ে শিগগীর তাঁরও মৃত্যু হবে।

ভারতবর্ষে বেদ-অধ্যয়নের জন্যে যে নতুন আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল তার মূলেও দ্বারকানাথের প্রচেষ্টা ছিল বলেই আমার বিশ্বাস। এটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগে, যে দেশে বেদকে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আকার গ্রন্থ বলে মনে করা হয়, এবং ইংল্যাণ্ডের নিউ টেষ্টামেণ্ট থেকেও দৈব-প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ হিসাবে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়, সে ধর্ম-গ্রন্থকে মুদ্রনের ব্যবস্থা না করে স্বল্প সংখ্যক পুরোহিত শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এ পুরোহিত শ্রেণীর কাছে বেদের পাণ্ডুলিপি বেশী ছিল না, তাঁরা শুধু বেদের শ্লোকগুলি মুখস্ত করে রাখতেন। এ বেদচর্চা ভারতীয়দের মধ্যে যে কতটা অনাদৃত হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন স্বর্গগত জন স্যুইয়েরের পুরস্কারের লোভেও কোন হিন্দু বেদজ্ঞ পণ্ডিত বেদসম্পাদনার জন্য এগিয়ে আসেন নি।

এ অবস্থায় দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন দেখলেন যে প্যারিস, বার্লিন ও অন্যান্য স্থানের রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বেদের সব থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ—শুক্লযজুর্বেদের তুলনামূলক পাঠবিচার করে আমি যখন সে মহান ধর্মগ্রন্থের সম্পাদনায় নীরবে ব্যাপৃত আছি, তখন তিনি প্রবল আগ্রহ নিয়ে এ সংবাদ কলকাতায় তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের নিকট লিখে পাঠান। ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরক্তি ও ধর্মসংস্কারের প্রতি প্রবল আসক্তির ফলে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে চারজন তরুণ ছাত্রকে কাশী পাঠান সে পুণ্যতীর্থের চারজন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে বেদ অধ্যয়নের জন্য।···দেবেন্দ্রনাথের একখানা চিঠি থেকে জানা যায় যে এ দুটো ঘটনা একই সংগে ঘটে যায়, তার মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই তরুণ পণ্ডিতদের মধ্যে একজনও দেবেন্দ্র-নাথ নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে কোন স্বাধীন বৈদিক গবেষণার পরিচয় দিতে পারেন নি।···"

এই স্মৃতি-চিত্রণে ম্যাকসমূলার নিজের বেদসম্পাদন বিষয়ে আরো কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন যা দ্বারকানাথ প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে এমনি একজন আশ্চর্য মানুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর। যে সংস্কারমুক্তি মানবিক কৌতূহল; ঐতিহ্যপ্রীতি ও সমসাময়িক ভাব ও বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধিতে সমান আগ্রহ সে যুগের বাঙালীকে আধুনিকতার তোরণপ্রান্তে উপস্থিত করেছিল, দ্বারকানাথ সে নবযুগের প্রতিভূ। মননশীলতার দিক দিয়ে না হোক, অন্ততঃ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাচ্যের সংগে পাশ্চাত্যের মিলনে বাঙলা দেশ তথা ভারতবর্ষে যে নতুন সংস্কৃতির দিগন্তরেখা দেখা দিয়েছিল, সে অস্পষ্ট আলোকরেখাকে সুস্পষ্ট করে তোলেন দ্বারকানাথ তাঁর কর্ম ও ভোগচঞ্চল জীবনের জীবনের বলিষ্ঠ 'গ্রহণ নীতি'র মধ্য দিয়ে। বিচারবিহীন সে পাশ্চাত্ত জীবনাদর্শ 'গ্রহণ-নীতি' যে সর্বাংশে অভ্রান্ত ছিল সেকথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় সে অন্ধ পাশ্চাত্য অনুরক্তি পরবর্তী চিন্তাশীল বাঙালী মণীষীদের অন্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং এ সে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার (actions and reaction) এবং চিন্তা সমন্বয়ের (Interaction) ফলেই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণবন্ত বাঙালী সংস্কৃতির।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিচিত্র জীবন সে যুগের প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত মিলনের ইতিহাসের একটি মূল্যবান পৃষ্ঠা।

—বার—

সোসাইটির চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওরওর করে মহাবেগে একটা বেড়াল ব্যস্তভাবে নীচের তলায় নেমে গেল। সেদিকে তাকিয়ে শ্রাবণী না হেসে পারল না। শ্রীহর্ষর মাথা ডিঙিয়ে যতটা দেখা যায় দেখল—তারপর বেড়ালটা যে কোথায় উধাও হল, একতলায় নেমে চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক খুঁজেও তার পাত্তা করতে না পেরে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে শ্রাবণী বলল—নাঃ।

চমকে উঠল শ্রীহর্ষ—ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাবামাত্র শ্রাবণী বুঝল, শ্রীহর্ষ যেন গভীর চিন্তা-সমুদ্রের তলা থেকে আচমকা উঠে এসেছে, না, আসে নি, শ্রাবণীর 'নাঃ' কথাটাই ডুবুরি হয়ে তাকে টেনে তুলেছে। সে বলল—এ্যাঁ! তুমি কি বলতে চাও অশোক বৌদ্ধ ছিলেন না?

শ্রাবণী কোনো কথা বলবার আগেই শ্রীহর্ষ ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে নিজের তরফের যুক্তিগুলো 'এক, দুই, তিন, করে বলে শেষ করবার আগে একটু থামল, কেন না ততক্ষণে ওরা পার্ক স্ট্রীটের ওপর এসে পড়েছে। এক নজরে চৌরঙ্গী ডিঙিয়ে ওপারের আকাশটা দেখে সে বলল—তবে হ্যাঁ, অশোক উদার চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন তাই তাঁর আমলে শ্রমণেরাও যেমন আদর পেতেন, ব্রাহ্মণেরাও তার সমান আদর পেয়ে থাকতেন।

শ্রাবণী বলল—বেশ, তিনি যদি বৌদ্ধই হবেন তাহলে তাঁর লিপিতে 'দেবানাম প্রিয়' থাকতে গেল কেন? দেবতা, স্বর্গ এসব কথা অশোকেরই লিপিতে পাওয়া যাচ্ছে তো! অবিশ্যি একটি কথা ঠিক যে, অশোক একজন বিরাট মানুষ ছিলেন—তিনি একজন উদার চরিত্রের রাজা মাত্র ছিলেন না। অনেক বড় বড় পণ্ডিত তাঁকে পুরোপুরি বৌদ্ধ বানিয়ে ছেড়ে ছেন বটে। তবে আমার নিজের ত মনে হয় যে, এক-একজন মানুষ এমন চোখ নিয়ে জন্মান যে তাঁর কাছে সব ধর্মের যেটুকু ভালো সেইটুকু ছেঁকে-ছেনে নিতে পারেন তিনি। নইলে তাখো জীবনে ব্যর্থতা কোনো বড় ধাক্কা খেয়ে অথবা শূন্যতাবোধের তাড়নায় মানুষ সন্ন্যাসী হয়, গৃহত্যাগী হয়, কিন্তু জীবনে সার্থকতা খোঁজার মধ্যে মানুষকে উত্তরণ করে তোলার স্বাভাবিক সেখানে অশোক দুঃখ পেলেন, বেদনার্ত মনে হিংসের পথ ছাড়লেন—

শ্রীহর্ষ ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল—অ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন।

হাসল শ্রাবণী। ওর হাসিতে স্নেহের আলো একটু বেশি, বলল—একটা গৃহীত মতকে বিশ্বাস নিগৃহীত হতে দেখলে তুমি যেরকম বিরক্ত হচ্ছ আজক তাতে আমার ভয় হয়, হর্ষ তুমি খুব তাড়াতাড়িই ব কলার হিসেবে নাম কিনে ফেলবে। সেখানে আমার ক কি জানো, কোনো একটা বক্তব্য বা সিদ্ধান্তকে পুরো পুরি স্বীকার করে নেবার আগে তার ফাঁক-ফোঁকিগু ঘষেমেজে বাজিয়ে নিতে আপত্তি কি!

পেট্রল পাম্পের মাথার ওপর যে ঘড়িটা সবাইকে সময় দেখবার সুযোগ দেয় সেই ঘড়ির দিকে তাকি শ্রাবণী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। শ্রীহর্ষর সেদিকে লক্ষ্য নে সে বলল—ওঃ, আজ অনেক লেখাপড়া করা হয়েছে এবার চলো ওই ময়দানের খোলা হাওয়া পালে লাগাই

কিন্তু একটি কথা মনে রেখো 'শ্রমণী' (এর মধ্যে একদিন শ্রীহর্ষ দুঃসাহসে ভর করে শ্রাবণীর কাছে একটি চুম্বন চেয়ে বিফল হয়েছিল। তারপর থেকে সে আর ওকে শ্রাবণী বলে ডাকে না, বলে 'শ্রমণী')। ডক্টর 'ক'-এর কাছে তোমার এই থিসিস্ একেবারে অ—চ—ল! তুমি যদি লেখো যে অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং প্রসারে সহায়তা করলেও নিজে দীক্ষা নেন নি, তাহলে তোমার মতো—

—অ—ধ—ম আর নাস্তি, এইত। এবং তার ফলে আমার খাতার মার্ক দুঃখ হয়ে যাবে। তা জানি। কিন্তু হর্ষ, আমরা কি কেবলই পরীক্ষায় ভালো ভাবে পাস করার জন্যেই এত খেটে মরছি? জীবনের সব চেয়ে সুন্দর যে বয়স সেটা কি কেবলই ডিগ্রি কেনার দায়ে বিক্রি করতে বসেছি। না কি সত্যিকার জ্ঞান-উপার্জন করাই আমাদের লক্ষ্য।

—তোমার ওসব পাগলামী ছাড়ো। জ্ঞানটা মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে ডিগ্রির দাম আরো বেশি। আমার এই ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে একটা ধ্রুবজ্ঞান হয়েছে, তা হল এই যে, আমাদের অধ্যাপক এবং পরীক্ষকেরা যে-যেমন মত পোষণ করেন সেই মতকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন না করলে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার কোনো আশা নেই। অতএব, যদি লেখাপড়া করতে করতে তোমার স্বতন্ত্র কোনো উপলব্ধি ঘটে থাকে তাহলে আপাততঃ সেটা ধামাচাপা দিয়ে রাখো, পরে পস্তাতে যখন ডক্টরেট-এর জন্যে তৈরি হবে তখন—। মোটকথা নবম-পত্রটিকে প্রথম-পত্র হিসেবে ধরে নিয়ে চলতে হবে!

পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গী রোডের বিকেল বড় সুন্দর লাগে শ্রাবণীর। এখানে সবকিছুর মধ্যেই কেমন চমৎকার ছিমছাম ছবিছবি ছন্দ। আকাশখানা সামনের দিকে বড় বড় গাছের মাথার ওপর বিরাট আর মিশ্র রঙের মেঘে বিচিত্র। ট্রাম-বাসগুলো বেশ গর্বিত ক্ষিপ্র গতিতে যাচ্ছে। আর কতোরকমের মোটরকার। সোসাইটির সেই বেড়ালটার ব্যস্ততার সংগে এই গতিবেগের যেন বড় বেশি মিল। অবাক হয়েছিল শ্রাবণী এই পরিবেশে বেড়ালটাকে দেখে। যেখানে ভারতবর্ষের বড় বড় মনীষী জ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন হয়ে কাটিয়ে গেছেন, যান, যেখানে এই দেশের ইতিহাসের দুষ্প্রাপ্য বস্তুরাজি সমাহৃত, সেখানে সেই প্রি-হিস্টরির আমল থেকে শুরু করে সিপাহী-বিদ্রোহের যুগ পর্যন্ত কালের ওপর গবেষণা আপাত-মস্তক বোঝাই সেখানে বেড়ালটা অকল্পনীয়। না, তাই বা কেন, শ্রীহর্ষ একটি বেড়াল। কথাটা মনে হতেই, আরো মনে মনে শ্রাবণী বলল নিজেকে, ছি ছি। সেই মুহূর্তে ঘড়িটার দিকে আবার চোখ পড়ল ওর—আবার সেই একই মুহূর্তে ওর দিকে শ্রীহর্ষ ছাড়া আরও একজনের চোখ পড়ল (অবিশ্যি সেটা শ্রাবণীর দেখতে পাওয়ার কথা নয়। চলন্তি দোতলা-বাসে বসে বসেই সেই চোখ জোড়া ওর দিকে নজর রেখে রেখে দেখে গেল।) ব্যস্তভাবে শ্রাবণী বলল—আচ্ছা, তাহলে চলি হর্ষ!

কথাটা বলবার সময় যেন নিজেকে শোনাবার জন্যে একটু বড় গলায় জোর করে বলল। যেমনটি আশা করেছিল তেমনি ভাবেই শ্রীহর্ষ ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল—চলি মানে! বলো, চলো ভাই মাঠে যাই।

—না, না, বড্ড দেরি হয়ে যাবে। মাঠের বকুনী তো জানো।

দীর্ঘনিশ্বাসটা গোপন করার চেষ্টা করে (যাতে এই গোপনতার চেষ্টাটা শ্রাবণী টের পায় এমনভাবে) শ্রীহর্ষ বলল—যাদের মা আছেন তাদের কি ভাগ্য! আমার ত লোভ হয় শ্রমণী ওইরকম বকুনী মাঝে মাঝে খেতে! তা আজ না হয় তুমি আমার এ্যাকাউন্টে বকুনীটা খেয়ো, একটু বেশি দেরি করলে পরিমাণে বেশিই পাবে তাহলে উদ্বৃত্তটা আমি পরে চেয়ে নেবো, কেমন?

—না, আজ আর হয় না হর্ষ! মাঠে বেড়ানোর মতলব আছে আগে যদি বলতে তাহলে সকাল সকাল উঠে পড়া যেত। না হয় আর্নোলটা অন্যদিন—। এখন—

—অন্যদিনে ত আর আমার জন্মদিনটা পাবো না। জানো, বাড়িতে বৌদির ওই হিসেব করে জন্মদিনের পুজো থেকে শুরু করে পুঁটিনাটি পর্ব করা এতে আমি কোনো রস পাই নে। একটা বাঁধা ছক আছে, প্রত্যেকের জন্মদিনে সেই ছক মাফিক সবকিছু হওয়া চাই—তার এতটুকু ইদিক-উদিক হওয়া চলবে না। আমি তো বলি ওসবের কোনো দরকার নেই। যার জন্মদিন তার ইচ্ছেকে মুক্তি পেতে দাও—

শ্রাবণী কোনো কথা বলল না, ছোট্ট একটি 'হুঁ'তে নিজের সমর্থন জানিয়ে হাল ছেড়ে দিল। জন্মদিনের উৎসব সম্পর্কে ওর নিজের কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছার দায় নেই। ও জানে এই দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে হাজারো প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু ঘটছে। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, যদি কেউ নিজের পৃথিবীতে আসার মুহূর্তকে স্মরণ করে তৃপ্তি পায় তাহলে তাকে অবমাননা করা আদৌ সংগত নয়। এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের সংসে পরিচয় ঘটল যে মুহূর্তে সেই মুহূর্ত না হোক সেই জীবনটা তো মূল্যবান। জীবনের মহিমাকে শ্রাবণী অবশ্যই স্বীকার করে—সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনার উপলব্ধিতে মানুষ যে বিচিত্র পরিণতির পথে চলেছে সেই মানুষকে শ্রাবণী মর্যাদা অবশ্যই দিতে উদ্‌গ্রীব। আর শ্রীহর্ষ তো মাত্র একজন মানুষ নয় শ্রাবণীর চোখে, শ্রীহর্ষ ওর অন্তরঙ্গ!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুর বজায় রাখতে পারল না শ্রাবণী। গড়ের মাঠে সন্ধ্যার গোধূলি মুহূর্ত যখন ওর মনে মহানন্দার মাধুর্যের স্মরণাভাষ এনে দিয়ে ওকে মুক, মুগ্ধ করে তুলেছে সেইক্ষণে শ্রীহর্ষ কতকগুলো ছেলেমানুষী নরম নরম কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ধ্যানভঙ্গ করতে তৎপর। 'তোমাকে এত ভালো লাগে কেন বল তো! ইচ্ছে করছে তোমায় আজই ধরে নিয়ে যাই আমাদের বাড়িতে।' 'আচ্ছা আজত আমার জন্ম-দিন। তুমি কিছু উপহার দেবে না?' অবশেষে নাচার শ্রাবণী বলল—'দিতে তো চাই। কিন্তু কি দিই বলো! আগে জানলে—' বাধা দিয়ে শ্রীহর্ষ বলল—'এখনো পারো। ইচ্ছে করলেই পারো।'

রোদ পড়ে গেছে। সন্ধ্যা ভালো হয়ে নামে নি। তবে মনে হচ্ছে দুজনের মাঝখানে হাল্কা (প্রায় অদৃশ্য) একটা পর্দা দুজনের দৃষ্টির মাঝে ব্যবধান রচনা করেছে। শ্রাবণী বলল—পারি? পারি তো নিশ্চয় দেবো। পারি অথচ দেবো না এমন কৃপণ আমাকে ভাবতে পারলে তুমি!

এই ঘাসের মখমলে বসে, হু-হু হাওয়ার আদরে, না-ঘুম, না-জাগা আবেশের নেশার মতো ঘোর আছে। শ্রাবণী সেই আচ্ছন্নতার মায়ায় শিথিলবুদ্ধি, তাই শ্রীহর্ষর কথার ধরণটা ধরতে পারে না। কিন্তু সে যখন বলল—'সেই উপহার। যা দিলে আর তোমায় প্রমণী বলতে হবে না।'

—না, না, হর্ষ! এ তুমি কি বলছ।

—জানি তুমি কৃপণ নও, তুমি ধন্য। নিজেও ভোগ করবে না, অন্যের ভাগ্যেও প্রাণ ধরে দিতে পারবে না একটি কণিকা অমৃত।

—চলো ওঠা যাক।

—আমার উপহার?

—না, সে আমি পারব না শ্রীহর্ষ। তবে—

বলে শ্রাবণী থেমে গেল। শ্রীহর্ষ বলল—তবে কি? বলো! আমার জন্মলগ্নে দুই গ্রহের দৃষ্টি ছিল, তাই জীবনে আমার সব থেকেও কিছুই থাকবে না, আমি জানি। পাবো না, কিছুই পাবার ভাগ্য আমার নয়।

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রাবণী প্রায় অস্ফুটস্বরে বলল—পাওয়ার আশায় বসে থাকলে কি পাওয়া যায়।

—তাহলে? অবাক চোখে শ্রীহর্ষ তাকালো। মাথা নামিয়ে শ্রাবণী কি যেন দেখছে। ওর বুকের ভেতরে কি যেন একটা উত্তাল ঝড় বইছে। চাপা গলায় ও বলল—যেতে হবে হর্ষ! ফিরে যেতে হবে।

—হ্যাঁ! যেতে হবে। কিন্তু—কিন্তু তুমি কি প্রমণীই থাকবে? শ্রাবণী—

—জানি না, জানি না। পারব না। নিজে হাতে তুলে দিতে বলো না হর্ষ।

মুহূর্তের অমৃত চিহ্ন দুনিয়ার আর কোথাও কোনো পরিবর্তন এনে দিতে পারল না। একটা জ্বালা, একটা অবসাদ, একটা পরাভবের বেদনায় শ্রাবণীর মনটা হতবুদ্ধি। চুপচাপ। দ্বিতীয় চুম্বনের উদ্যোগ করল শ্রীহর্ষ। ভেবেছিল বাধা পাবে। কিন্তু পেল না। পেল একটা তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠের আকুতি—। ঠোঁটের প্রতি রক্তকণিকায় আগ্রহের উৎসারণ। এক, দুই, তিন! তৃতীয় চুম্বনের সংগে সংগে কান্নায় ভেঙে পড়ল শ্রাবণী।

পর মুহূর্তে শ্রীহর্ষকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সরিয়ে ও বলল—সর্বনাশ কর না হর্ষ।

—কোথায় সর্বনাশ? কার!

—তোমার নিজের, আমারো! এভাবে ইতিহাস পড়ার নামে, প্রেমের ইতিহাস বানিয়ে বসলে আখেরে আফশোষ ছাড়া আর কিছু পাবে না।

—আর তো কিছুই চাই নে।

—তুমি না চাও আমি চাই। আমি চাই নে যে তুমি সাধারণ হও, আমি সাধারণ হই। অথচ সেই সাধারণ হওয়ার মতো কাজই তো তুমি আমি করলাম শ্রীহর্ষ!

—না, সাধারণ হওয়ার মতো কোনো কাজ তুমি করো নি। আমার জন্মদিনের নতুন জন্ম হলো আজ শ্রাবণী—।

উঠে দাঁড়িয়ে শ্রাবণী আস্তে আস্তে বলল—নিজেকে ঠকাতে চেষ্টা কর না। তবে এই চুক্তি রইল, একটা জীবনে যেমন মানুষ মাত্র একবারই জন্মায়, আজকের ঘটনারও তেমনি পুনর্জন্ম যেন আমরা ঘটতে না দিই।

—বেশ।

—কথা দিচ্ছ তো?

—দিলাম।

মাঠের পথে চলতে চলতে ফুটবল খেলে ফেরা কয়েকটি ছেলে ওদের দুজনের উদ্দেশ্যে কিছু সময়োচিত মন্তব্য করল।

মা বললেন—বিজয়ের চিঠি এসেছে।

দেরি করে ফেরার জন্যে তিনি মেয়েকে আজ আদৌ বকলেন না। বোধহয় শ্রাবণীর মুখখানা শুকনো দেখে ধরে নিয়েছেন যে, লাইব্রেরীতে এই সন্ধ্যে পর্যন্ত পড়াশুনা করে শ্রাবণী যেমন শ্রান্ত তেমনি ক্ষুধার্ত। তাই তাড়াতাড়ি ওর জন্য জলখাবার এনে বললেন—থাক এখন চিঠিখানা পরে দেখলেও চলবে, এখন চিড়েভাজা কটা মুখে দিয়ে উদ্ধার করো।

মনে মনে শ্রাবণী গুটিয়ে সঙ্কোচে এইটুকু হয়ে গেল। ছি, ছি, মা কি ভুলই করছেন। মেয়ের মুখ যে কেন শুকনো সেটা মায়ের পক্ষে কল্পনা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। ছি, ছি, শ্রাবণী শেষে মালিনীকে এইভাবে ঠকাতে শুরু করল! সারা জীবনের সবটুকু স্বপ্ন আর আশাকে সংহত করে যাকে মানুষের মতো মানুষ গড়ে তোলার ব্রতে মালিনী নিয়ত মগ্ন সেই শ্রাবণী আজ এ কী করল! মায়ের সামনে বসে মুখ নীচু করে খেতে খেতে শ্রাবণী এইসব ভাবছিল আর মরমে নিজের মৃত্যুর কামনা করছিল।

মালিনী আবার ভুল করলেন, বললেন—গান-টান সব তো শিকেয় তুলেছ। নাও, একটু জিরিয়ে আজ একটু গান শোনাও তো দেখি!

এই পরিণাম যদি শ্রাবণীর হয় তাহলে ওর সঙ্গে কমলার তফাৎটা কোথায়! হস্টেল-জীবনে কমলাকে যে মনেমনে ঘৃণা করেছিল শ্রাবণী। মায়ের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস ওর নেই। কি জানি তিনি যদি ধরে ফেলেন। গানের প্রস্তাব শুনে ও আরো অনেক বেশি লজ্জা পেল। মা! মায়ের মন একেই বলে।

ও বলল—আজকের নোটগুলো কেয়ার করতে হবে মা।

—হবে তো হবে। তা বলে কি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরতে হবে নাকি? সকালে শুরু হয়েছে পড়া, কলেজে পড়া, লাইব্রেরীতে পড়া আবার বাড়িতেও পড়া! বাপের জন্মে কি আর কাউকে এম-এ পড়তে দেখি নি খুকী! বলি একটু নিজের দিকে তাকা! অতো বেশি পড়া-পড়া করলে মাথায় আর কিছু ঢুকবে না। তা ছাড়া, এর পর তো তোমায় পরের দোরে পাঠাতে হবে! তোমার মায়ের এমন টাকার জোর নেই যে তার প্যালা দিয়ে তরে যাবে। ওই যেটুকু রূপগুণের ছিরিছাঁদ আছে তাই পুঁজি মা! পড়ার মাতনে ছিরিটুকু খোয়ালে পরে পস্তাবে, চল্, ছাদে চল্—মাকেও ডাকি।

চোখ ফেটে বুঝি কান্নার বন্যা নামবে! ওর ওপর কতো আস্থায় নির্ভর করে এই মানুষটি নিশ্চিন্ত। আর ও—?

কান্নাকে ঢাকতে গিয়ে হেসে ফেলল শ্রাবণী, বলল—তখন তানপুরাটা তো আনতে দিলে না, বললে ওটা থাকলে পড়ার ক্ষতি হবে। আর আজ—

—তোমাদের সঙ্গে তর্কে পারব না মা। আমার ঘাট হয়েছে গান শুনতে চেয়ে।

—রাগ করছ কেন মা! আমি কি গাইব না বলেছি?

দিদিমা বোধকরি কাছাকাছিই ছিলেন। এতক্ষণ সেটা টের পাওয়া যায় নি। তিনি দরজার ওপার থেকে গলা বাড়িয়ে (বোঝা গেল যে ওঁর জপ-তপ বাকী আছে, তাই শ্লেচ্ছতার ছোঁয়াচ এড়াবার জন্য এ ঘরে শুদ্ধদেহকে ঢুকতে দেবেন না) বললেন—গান গেয়ে ছুটি করার আগে বিজনবাবুর পত্তরখানা পড়লে হত

না! সেই পাত্তরের কথা কিছু লিখেছে কি না দ্যাখো না!

লেখাপড়া বা গান-বাজনার চেয়ে মেয়েদের জীবনে বিবাহ এবং ঘরসংসার অনেক বড়, দিদিমা সত্যিই বিশ্বাস করেন। মেয়ের ভাগ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি মুখ বুজে থাকলেও এক-এক সময় মনোভাব চাপা দিতে পারেন না। বিকেল থেকে বার-দুয়েক উচ্চকণ্ঠে স্বগতোক্তি করেছেন—'বিজনবাবু কি লিখলেন কে জানে।' পত্তর তা আবার থামে। আজকালকার সব কেশান হয়েছে দ্যাখো, আরে বাপু সাতপাকের স্ত্রীকেও বড় কেউ সে আমলে থাম দিত না—পোস্টকার্ড কি দোষ করেছে কে জানে।' 'মালু, খামখানা খুলে পড়তে পারে ত স্বচ্ছন্দে। তা নয়—'

পড়ল শ্রাবণী। বিজয়দার চিঠিখানা আসছে আনমুড় থেকে। তার চিঠিতে গোয়ামুক্তির জন্য সত্যাগ্রহীদের বিস্তৃত বিবরণ। পোর্তুগীজদের অত্যাচারের ওপর বিজয়-দার খবরদার-বাণী। চিঠিখানা পড়তে পড়তে শ্রাবণীর মনে হল, মানুষ কি বিচিত্র! মানুষের জন্যে মানুষের এই যে সহানুভূতি—যার তাড়নায় দেশের কোন দূর প্রান্তর থেকে ছুটে যাচ্ছে বিদেশী শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। আর তার তুলনায়, সেই একই মানুষের দেহধারণ করে শ্রাবণী কিভাবে কেবায় নেবে যাবার পথে ধেয়ে চলেছে!

গোটা চিঠিখানা পড়ে শোনালো শ্রাবণী। দিদিমা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—আ কপাল। কাব্যি, না স্বদেশী! পাত্তরের কথা কমনে গেল?

'পুনশ্চ' অংশটার দিকে চোখ পড়তে শ্রাবণী বলল—এই যে! লিখছেন, ভবেশের ইচ্ছে এই শ্রাবণেই বিয়েটা হয়। আমি এখান থেকে কিছুই করতে পারছি না। ওকে লিখে দিয়েছি, নিজেই যোগাযোগ করুক। তবে, আমি বলি কি, পরীক্ষার পর হলে সব দিক বজায় থাকে। আমার দিল্লীর ঠিকানায় জানিয়ো কি সিদ্ধান্ত করলে—

বিজয়দার চিঠিখানা যেন অন্য পৃথিবী থেকে এসে পড়েছে এই গলিটার ছোটঘরে। শ্রাবণীর মনটা আরো ছোট হয়ে যায়। আজ গোধূলি-বেলায় অপরিণাম-দর্শনের দুর্বলতায় অত বড় গড়েরমাঠখানার সবটুকু হাওয়া নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। আর এখানে, এখন, এই ঘরখানার ছোট্ট এই চিঠিখানা যেন হাজারখানা গড়েরমাঠের সমস্ত হাওয়াকে ঝড়ের বেগে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছে। তখনো দম বন্ধ হয়ে এসেছিল, এখনো শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু দুটো অবস্থায় কতো তফাৎ। দলে দলে সত্যাগ্রহীরা চলেছে, পুণা-বেলগাঁও ছাড়িয়ে গোয়াতে পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। বাংলাদেশ থেকে ত্রিদিব চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল সত্যাগ্রহী জুলাই-এর দশ তারিখে সীমানা লংঘন করে বন্দী হয়েছেন। ত্রিদিববাবু জ্বর গায়েই যাত্রা করেছিলেন, কারও নিষেধ শোনেন নি!...কেন? মানুষের স্বাধীনতার জন্য দাবি জানাবার কর্তব্য তাঁকে—তাঁকে এবং তাঁর মতো বিবেকবান আরো অনেককে ওই ধরনের ঝুঁকি নিতে বাধ্য করে। বিবেকের দরবারে নীতির নির্দেশনামা এই বিচিত্র বাধ্যবাধকতার রাজ্যটা সীমাবদ্ধ। মনের পরিধি বড় না হলে এই রাজ্যের খবর পাওয়া যায় না, পেলেও তাৎপর্যের মর্মটুকু স্পর্শ করা যায় না। মায়ের হুকুমে গান গাইবার সময় এইসব কথাই শ্রাবণীকে বিচলিত করে তোলে। যেন সমগ্র অন্তর উৎসারিত করে ঢেলে দিল:

...যেথা আজ শুভ শঙ্খ
যেথা নাই ছায়া ভয়,
হয়ত তোদের নয়ন-জলে ভরবে ফুলে ফলে!
জীবনের সন্ধি-পথে,
খুঁজে পথ যবে নিতে;
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবে না বলে!...

দিদিমার চোখ ছলছলিয়ে এসেছে, উনি বললেন—এ. পি. সেনের গলাও খুব সুন্দর রে। ওঁর গলায় এ গান শুনেছি। আহা অমন মানুষ আজকাল আর দেখি নে। তা নাতনীর আমার বড় কষ্ট। আচ্ছা ভাই তাড়াতাড়িই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সে শালারও আর তর সইছে না, তোরও সেই দশা—। আহা বয়েস ত হয়েছে। আমার এ বয়েস ত ভরা সংসার। হবে হবে, এ শাঁওন আর বেরথা পাশ বালিশ আঁকড়ে কাটাতে হবে না রে—

মালিনী ধমক দিলেন—আঃ, মা তুমি মুখে একটু লাগাম লাগাও!

—থাম তুই! জানিস, উনি বলতেন, কর্মক্ষেত্র রহিত হলে সব বাসনা মুখের কথায় ছুটে বেরোয়—

বাইরের পথে কি একটা গোলমালের শব্দ পেয়ে শ্রাবণী ব্যস্তভাবে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে নীচের পথের যে অংশটা দেখা যায় সেটা বাড়ি থেকে একটু দূরে। কিন্তু গোলমালটা একেবারে দরজার সামনে বলেই মনে হচ্ছে।

একতলার মধুদার গলাও আছে তার মধ্যে। একটু কান খাড়া করে শোনে শ্রাবণী। কে যেন জড়ানো গলায় বলছে—ওসব আমি জানি না, সামনের মাস থেকে সবার ভাড়া দশ টাকা করে বেড়ে গেল—আর দোতলার ওই যে হেলেন অফ ট্রয়—হ্যাঁ, হেলেনদের বাড়বে পনের টাকা—হ্যাঁ, শাফ কথা যাওয়া।

মধুদা ইতিমধ্যে চটে গেছেন, ওঁর গলার ঝাঁঝেই সেটা প্রকট—মদ খেয়ে মাতলামো করতে এসেছেন ছোটবাবু! নেহাৎ আপনি বাড়িওলা তাই এখনো গায়ে হাত তুলি নি। কিন্তু আর বেচাল বরদাস্ত করব না। ভালোয় ভালোয় চলে যান—

ছোটবাবু? বাড়িওলা! হ্যাঁ সেই রকমই তো মনে হচ্ছে! আশ্চর্য, এমনিতে মাসে একবার-দুবার এবাড়িতে ভদ্রলোক আসেন। কই কখনো ও কথাবার্তায় ছোটবাবু অভদ্রতা দেখান নি! ওই, আবার কি বলছে—যাবো যাবো! তবে তার আগে আমার কথাটা পাকাপোক্ত করে তবে যাবো। বেচাল তো কিছু করি নি ব্রাদার! বেচাল কিছু করি নি। দয়া করে পথটা ছাড়ো, আমি ওপরে যাবো।

—না, আপনি এ অবস্থায় বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারবেন নেরে পত্তা উড়িয়ে দেবো। খবরদার—

—বাবা, এযাকি রাখো বাওয়া! মাইরি অনেক খর্চা করে নেশা করে মেজাজে বল এনিছি। বুঝলে মধু বাবু রীতিমত খর্চা হয়ে গ্যাচে। কেন? না, শালা চোখে ওই হেলেনকে দেখলে এই শালা ছোটবাবু কেঁচো হয়ে যায়। বার বার চেষ্টা করেও ভাড়া বাড়াবার কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসেও পিছলে জিভের নীচে পালায়। তোমার কাছে লুকোবো না মধুবাবু! ইউ আর মাই ব্রাদার। নইলে—

মালিনী উঠে এসে শ্রাবণীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

দিদিমা প্রশ্ন করেন—কি হলো আবার? ও লীলাবতী —কি হলো, বল্ সে!

শ্রাবণী কোনো জবাব দেয় না।

মালিনী বললেন—মাতাল!

দিদিমা কান্নার সুরে বলেন—ওমা আমার কি হবে। নীচের দরজা বন্ধ আছে ত! মুখপোড়া আবার ঘরে ঢুকে না ইয়ে করে!

দিদিমা আপন মনে বকেই চললেন।

ওদিকে দরজার সামনে এতক্ষণে হয়তো হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে। মধুদার গলার স্বর সপ্তমে চড়েছে। যা-তা ভাষায় ছোটবাবুকে গালাগালি করছেন। ছোটবাবুর কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে খাদে নেমে গেছে, যেন তানপুরার বাঁধা-সুরকে কান টিলে করে নামিয়ে দিয়েছে। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে ছোটবাবু এখনো দোতলায় ওঠবার জন্য অনুনয়-বিনয় করছেন।

মধুবাবুর হাঁকডাকে পানওয়ালা মাস্তাদা দোকান ফেলে ছুটে এসেছে, এপাশ-ওপাশের বাড়ি থেকে আরো লোকজন এসে জমেছে। চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। কেউ বলল 'পুলিশে দাও'—কেউ বিজ্ঞভাবে রায় দিল—'দাওয়াই লাগাও। কথায় বলে মারের আগে ভূত পালায়' —'লাগাও লাগাও—'

মধুদার গলার জোর আরো বেড়েছে—শুনুন মশাই! এইত এঁদো বাড়ি। দশ বছরের মধ্যে চুণের পোঁচড়া দেওয়াতে পারি নি। বললেই বলে, 'আমি ভাঁড়াটেকে আদায় করে খালাস। মেরামতের জন্যে বাড়িওলাকে বলো।' ভাড়া নেবার বেলায় উনি কর্তা, আর মেরামতের কথা বলতে হবে ওঁর দাদাকে। চালাকি! দেবো দুই ঝাপড়।

মাস্তাদা বললেন—উঁহুঁ এখানে নয়। শালাকে বড় রাস্তায় নিয়ে চলো। সেখানে চাঁদা করে আচ্ছা ধোলাই দাও—নে—নে—আর—

কি এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শ্রাবণীর কান মাথা গরম হয়ে ওঠে। নিমেষে ঘর থেকে তরতর করে

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। মহুবাবুর বৌ, আরও সবাই দালানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের ঠেলে সরিয়ে শ্রাবণী একেবারে মহুবাবুর পাশে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলল—কি হয়েছে মহুদা।

—আঃ আপনি আবার এর মধ্যে কেন। সরে যান, ভেতরে যান।

—যাবো বই কি। কিন্তু আপনারা এতগুলি মানুষ এঁর পিছনে কেন লেগেছেন বলুন তো!

এতক্ষণ যারা ঘোঁট পাকাচ্ছিল তারা সবাই স্তব্ধ।

কেবল মহুবাবু বললেন—লোকটা মাতাল ওকে নিয়ে—

বাধা দিল শ্রাবণী—মাতাল? তার মানে ত অসুস্থ। তা আপনারা অথবা ওঁকে নিয়ে এরকমভাবে টানা-হেঁচড়া না করে একখানা রিকশা ডেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই ত পারেন।

ছোটবাবুও এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার নড়ে চড়ে এগিয়ে এসে একেবারে শ্রাবণীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন—ক্ষমা করো দেবী! আমি সিলটি। আমার অন্যায় হয়েছে। আমি একটা কীট। আমি কীট নইলে বড়দাদাকে মায়ের ভয় দেখিয়ে এই বাড়ির ভোগদখল আদায় করি! বাট মাই এন্ডার ব্রাদার গড, ইয়েস দি গড, মি সেটান্, ইউ নিমফ্, ইউ মাদার মেরী!

হেসে ফেলল শ্রাবণী, বলল—হয়েছে! এখন দয়া করে এখান থেকে বিদেয় হোন, নইলে এঁরা—

—জানি, আই নো! ক্ষমা চাইছি। টু ইউ অল্।

মাস্তাদা ধমক দিল—ওঠো গো মশাই। আর লেকচার ঝাড়তে হবে না। নেহাৎ দিদিমণি বারণ করলেন তাই বেঁচে গেলে। নইলে হুঁ!

ওপর থেকে মালিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—খুকী! খুকী, ওপরে এসো।

এর আগেও তিনি দু-একবার ডেকেছেন, শ্রাবণী শুনতে পায় নি।

শ্রাবণী সাড়া দিল—যাই মা।

ও যখন দালান দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছে তখন ছকুর বৌদি ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ধন্যি তোমার বুকের পাটা। এখানে দাঁড়িয়ে আমি ত ভাই ভয়ে ঠকঠক করে কেঁপেই সারা।

এতক্ষণ শ্রাবণীর মনে কোনো বিকার ছিল না। কিন্তু দোতলায় উঠে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। মালিনীর চোখেমুখে এমন বিশ্রী ঘৃণার ভাব এর আগে কখনো দেখেছে বলে ওর মনে পড়ে না। মালিনী শুধু বললেন—চান না করে যেন বিছানাপত্র ছুঁয়ো না।

দিদিমা বললেন—তুই শেষে মজুমদার বাড়ির নাম ডোবালি?

মালিনী মন্তব্য করলেন—হবে না! নটেবাড়ির চৌধুরীদের রক্ত যে ওর গায়ে রয়েছে। ওদের কাছে মদ হল কারণ বারি, ওরা রক্তিতা রাখত আর বলতো তাদের জলপাত্র! রক্তের সবরকম অরগুণ-বরগুণ আস্তে আস্তে ছুটে বেরুবে।

এতক্ষণ মুখ বুজে শ্রাবণী সব কথা হজম করছিল। কিন্তু এইক্ষণে ওর মনে হল মালিনী পরোক্ষে আজকের গোধূলির ঘটনাকে কটাক্ষ করছেন। যেটা বর্তমানে শ্রাবণীর কাছে দুর্ঘটনার মতো, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠেছে—যা থেকে শ্রাবণী নিজেকে অনেক দূরে, যতটা সম্ভব ঊর্ধ্বে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছে, মালিনী যেন জোর করে ওকে সেই নিদারুণ নিয়ে নামিয়ে দিচ্ছেন। তাই আর সইতে না পেরে ও বলল—ও লোকটা মদ খেলেও, বেয়াদপী করে নি। আর যারা মদ খায় নি, যাদের ভোরা সুস্থ বলে মনে করো, তারা যে বেয়াদপী শুরু করেছিল সেটা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না।

মালিনী চোখ কপালে তুলে বললেন—অ! মদ খেয়ে তিনি খুব ভালো কাজ করেছেন!

—না, না, আমি ত তা বলি নি মা! যে লোকটা মাতাল, তার কাছ থেকে ত সুস্থ মানুষের মতো আচরণ আশা করা ঠিক নয়। আমি এখানে দাঁড়িয়ে ত শুনেছি, লোকটা খারাপ কথা মুখে উচ্চারণ করে নি, কিন্তু মহুদা থেকে শুরু করে সবাই এত জঘন্য কথাবার্তা বলছিলেন যে সেটা বন্ধ করা দরকার মনে হল। আসলে ভেবে ছাখো মা, আমি গিয়ে না পড়লে এই হাঙ্গামা আরো কতদূর গড়াতো তার ঠিক কি! একটা কেলেঙ্কারী ত—

দিদিমা বললেন—হয়েছে, তুমি খুব বাহাদুর! কেলে-

[illegible]—নইলে আর এক দফা ঝড় উঠবে, কথার বাঁশ উড়বে! প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে অবসাদে হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে। এখনি এখানেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

ঘুম কিন্তু এল না। খুঁটে-খুঁটে বিকেল থেকে শুরু করে সবগুলো ঘটনার ছবি বার বার এল। প্রবীণার মনে হচ্ছে ওরা সবাই মরে না গেলেও মেসের বিকারে ভুগছে: ও নিজে, উৎপল, মালিনী, দিদিমা, মধুবাবু মাস্তানরা—সবাই, সবাই। কখনো বা হাসি পেল, কখনো বা কান্না—তবে কান্নার ভাগটাই বেশি, গভীর দুঃখ আর হতাশার বেদনা কান্না,যে-কান্নার জলীয় অংশটা বাষ্প হয়ে সামনের রাত্রির অন্ধকারে মিশে গিয়েছে।

[illegible] যখন ঘুম আসি-আসি করছে তখন, কান্না থেকে ওর বিনিদ্র [illegible] ঘা দিয়ে বলল—এভাবে চলবে না। কান্না নয়, কান্নায় ভেঙে পড়া নয়—উঠে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে চলতে হবে।' ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে প্রা [illegible] সেই অবিশ্রেয় স্বপ্ন দেখল।

[ক্রমশঃ

[illegible]
[illegible]
[illegible]

জেনে রাখা ভাল

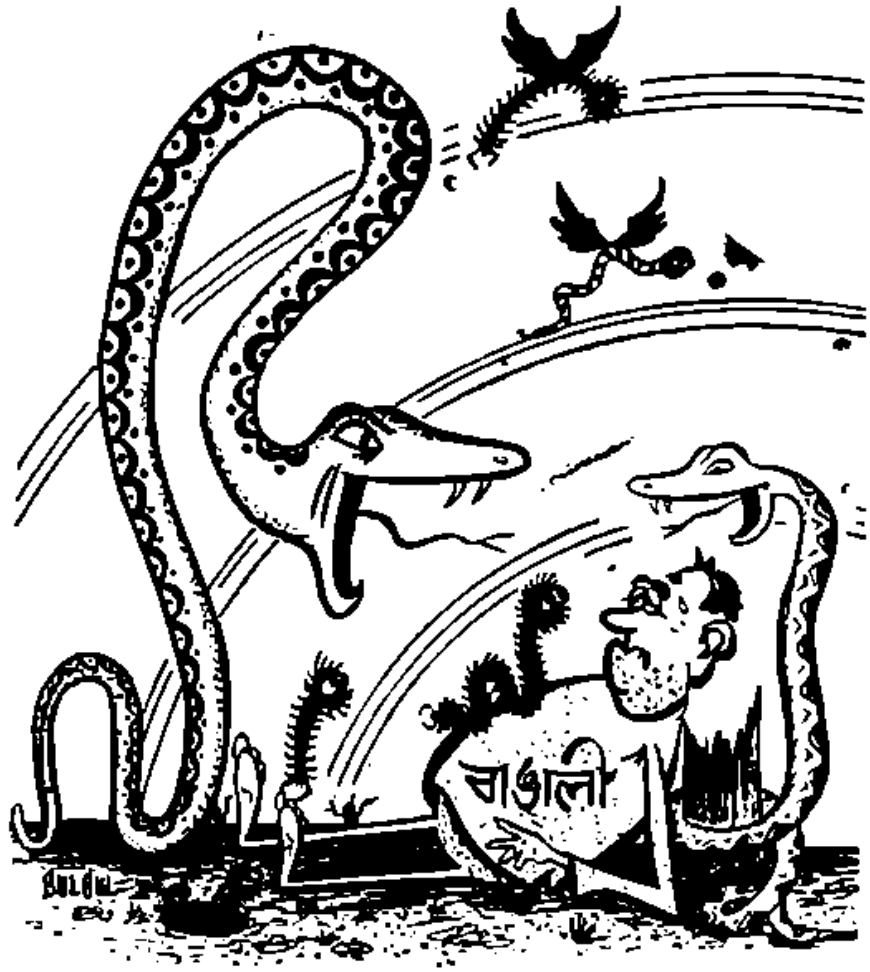

আজকের বাঙালী

শিল্পী : বুলবুল

অলঙ্কার থেকে শিল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

★

প্রকৃতিমাতার ভাণ্ডারে কত সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে কৃপণের মত, তা আজও আমাদের পুরোপুরি জানা হয়ে ওঠেনি। সভ্যতার উন্মেষ থেকে মানুষের প্রতি মুহূর্তের ইতিহাস হল উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ রচনার জন্য তার ধারাবাহিক সংগ্রামের কাহিনী। আজকের এই বিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধির সিংহদ্বারে এসে পৌঁছোবার আগে মানুষের পথ-পরিক্রমা চলেছে দু'হাজার বছর নয়, তারও অনেক কাল আগে থেকে। প্রকৃতির বুক থেকে সে দস্যুর মত লুণ্ঠন করে এনেছে সঞ্চিত সম্পদরাশি। তারপর তা নিয়োগ করেছে আপন প্রয়োজনে। সে প্রয়োজন বহুধা-বিভক্ত। প্রথমতঃ নিছক টিকে থাকার সহজাত আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয়তঃ জীবনের মান উন্নততর করার প্রয়াস, আর তৃতীয়তঃ এই দুইয়ের বাইরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক তাগিদ। তা হল সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতা। কিন্তু মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে থমকে থাকেনি। একই পদার্থের বিভিন্নমুখী সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেছে তার প্রতিভার স্পর্শে। ফলে কোন বিশেষ বস্তুর প্রয়োগক্ষেত্রই শুধু প্রসারিত হয়নি, ক্ষেত্রান্তরও ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহারিক মূল্যও পাল্টেছে অনেক। হয়তো প্রাচীনকালে যে পদার্থ প্রায় অপ্রয়োজনীয়রূপে গণ্য ছিল, অথবা অলঙ্কার ভিন্ন যার ব্যবহার কল্পনা করা যেতনা, সেই পদার্থই এখন আমাদের অশেষ উপকারে আসছে। এমনি একটি বস্তু হল হীরক এবং অলঙ্কারের গণ্ডী থেকে তার শিল্পদ্রব্যের মহিমায় উত্তরণের কাহিনীই এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে হীরক প্রস্তুতের জন্য কিছুকাল আগে দাক্ষিণাত্যে একটি শিল্পকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে, ঘটনাটি ভারতের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সংযোজন। সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে অভিনব তো বটেই, বিশ্বগতভাবে চিন্তা করলেও খুব অবহেলার-যোগ্য নয়। বর্তমানে দাবা পৃথিবীতে এমনি কারখানার সংখ্যা মাত্র আটটি। ভারত সঙ্গত ভাবেই নবম কেন্দ্রটির স্থাপয়িতা বলে গর্ব অনুভব করতে পারে।

অনেকে ভাববেন দেশের বর্তমান অর্থকৃচ্ছতার পট-ভূমিতে এই পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখলেই বা কি ক্ষতি হত! বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেও বলে দেওয়া যায়, প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় প্রস্তাবকর্তা হীরকের অলঙ্কার-মূল্যের কথাই শুধু মনে রেখেছেন। তাই একটি বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের পেছনে অর্থব্যয় নিতান্ত বাহুল্য বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু অলঙ্কার ভিন্ন আরও কত বিষয়ে যে আজকাল হীরক ব্যবহৃত হয়, তা জানতে পারলে তাঁরাও বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। সব থেকে বড় কথা, আমাদের বর্তমান চাহিদা বার্ষিক আনুমানিক সাড়ে বারো টন ও কৃত্রিম হীরক আমদানীর সুফল পথ বেয়ে যে পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা বিদেশী শিল্পপতিদের জঠরে গিয়ে প্রবেশ করে, তা বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান তো হবেই, উপরন্তু দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে হীরককাটার যে কুটীরশিল্প এতদিন অবধি ধিকিধিকি করে বেঁচে ছিল, এবার তা সরকারী পৃষ্ঠপোষণের মাধ্যমে নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

যে সব বৈশিষ্ট্য রত্নের মহার্ঘতা সূচিত করে, তারা হল দুষ্প্রাপ্যতা, মনোহারীত্ব এবং নিষ্কলঙ্কতা। হীরক এই সব কটি গুণের অধিকারী। তবে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কাঠিন্য। এখন পর্যন্ত আমরা যত পদার্থের সন্ধান পেয়েছি, হীরক তার মধ্যে কঠিনতম। কাঠিন্যের ক্রমপর্যায় নির্দেশ করে বিজ্ঞানে 'মোর স্কেল অফ হার্ডনেস' বলে যে শ্রেণীবিভাগটি বহুল প্রচলিত, তাতে ট্যালকের স্থান সর্বনিম্নে এবং হীরকের স্থান সর্বোচ্চে।

অজানা ছিল না। এর প্রাচীন গ্রীক নাম adamas (the Invincible) কথাটি থেকেই adamon, diamont এবং diamond নামের বিকাশ। হীরকের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'বজ্র'ও এর কাঠিন্যের পরিচায়ক।

বিজ্ঞানে 'কাঠিন্য' এবং 'অভঙ্গুরতা' পৃথক অর্থ বহন করে। কোন বস্তু 'ক' অপর বস্তু 'খ' অপেক্ষা কঠিন বললে এই বোঝান হয়ে থাকে যে, 'ক' 'খ'এর ওপর আঁচড় কেলতে সক্ষম। কাঁচ লোহা থেকে কঠিন ঠিক এ কারণেই। কিন্তু 'ক' 'খ' অপেক্ষা অভঙ্গুর হবে যদি 'ক'কে ভেঙে বিচূর্ণ করতে 'খ' অপেক্ষা বেশী শক্তির প্রয়োজন হয়। সে হিসেবে কাঁচ লোহা অপেক্ষা বেশী কঠিন হলেও, লোহা কাঁচ অপেক্ষা বেশী অভঙ্গুর।

প্রাচীনকালে কাঠিন্য এবং অভঙ্গুরতা—এই দুই শব্দ সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হত। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) সে হিসেবেই লিখেছেন, হীরক এমনই কঠিন পদার্থ যে, তাকে কোনমতেই ভাঙা যায় না। কোন 'অ্যানভিলে'এর ওপর এক খণ্ড হীরক রেখে তাকে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করা হোকনা কেন, সেটা ভাঙবার আগে হাতুড়ী এবং 'অ্যানভিল' চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। অনেক গ্রন্থকার বাওয়ার (Bauer) লিখেছেন, 'সেকালে অনেক হীরকসন্ধানী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অগণিত প্রস্তরখণ্ড হাতে করে সমুদ্রের অপরাবেলায় করে চলত'। শুধু তাই নয়, এই ভিত্তিহীন সংস্কারের সহায়তায় রত্নব্যবসায়ীগণ অজ্ঞ এবং নিরক্ষর হীরক সন্ধানীদের ঠকাবার এক চমৎকার সুযোগ পেয়েছিল। হাতুড়ী দিয়ে আঘাতের পর যেই কোন হীরকখণ্ড ভেঙে যেত, অমনি সেটা হীরক নয় বলে তারা রায় দিয়ে বসত। তারপর তার অধিকারী হতাশ হয়ে ফিরে গেলে বিনা মূল্যে তারা হীরকের সেই টুকরোগুলো আত্মসাৎ করে নিত। হীরক সম্বন্ধে একরা পোষিত আর একটি কৌতুকজনক বিশ্বাসের কথা শোনা যায়। কি কারণে কে জানে, একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোন হীরকখণ্ডের মধ্যে যদি একবিন্দু মৌমাছির রক্ত থাকে তাহলে তা অবিলম্বে বিস্ফোরিত হতে বাধ্য।

সেকালের হীরক খনি
পাল্লা : ভারত

পৃথিবীর কোন কোন দেশে এমন ধারণা ছিল যে হীরক অভঙ্গুর হলেও ছাগ-কাটা ছাগলের টাট্‌কা এবং উষ্ণ রক্তে ডুবিয়ে নিলে তা আর অভঙ্গুর থাকবে না। চীন দেশের লোকের আবার বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। তাদের মতে লৌহ-হাতুড়ীর আঘাতে হীরক ভাঙতে পারা যাবে না সত্যি, কিন্তু ভেড়ার শিংএর আঘাতে তা অনায়াসে ভেঙে যাবে।

সেকালে হীরকের ওপর নানা অলৌকিক গুণাবলীর আরোপিত হত। লোকে বিশ্বাস করত, হীরক তার অধিকারীকে ব্যাধি, বিষক্রিয়া, মিথ্যে প্রলোভন এবং বিপজ্জনক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। হীরকের আর এক নাম হচ্ছে 'রিলক্টোন অফ রিকনসিলিয়েশন'। কারণ মনে করা হত এই দুষ্প্রাপ্য বস্তু যার আয়ত্তে থাকে সে কখনও অকারণে উত্তেজিত হয়ে বিবেচনাশক্তি হারিয়ে বসে না, স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারে এবং অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়েও ওঠে না। আর স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে সুখী দাম্পত্যজীবন রচনায় হীরক প্রভাব বিস্তার করতে পারে—এমনি বিশ্বাসও অনেক অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল। হীরককে ভিত্তি করে আরও কত কুসংস্কার যে জন্ম নিয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই

ধনন ক্ষমতা আরোপ করতেও দ্বিধা করত না! ব্রমবার্গের অনেক রাজকন্যার কাছে নাকি উত্তরাধিকার ত্র প্রাপ্ত একটি রত্ন ছিল, যা কখনও কখনও হীরক শিল্পের জন্ম দিত।

কৃত্রিম হীরককে হীরকাগ্র যন্ত্রে কেটে সঠিক আকৃতি দেওয়া হচ্ছে

হীরকের যথার্থ স্বরূপ : এইসব অন্ধ-সংস্কার ধীরে ধীরে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে অপসারিত হয়েছে। আজ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, হীরকের সংগে কোনরকম অলৌকিক ত্বই জড়িত নেই। তাছাড়া কঠিনতম হলেও হীরক ন্দুর নয় মোটেই। সর্বাংকৃষ্ট হীরককেও উপযুক্তভাবে ঘাত করলে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায়।

প্রাচীনকালে হীরক নিষ্কর বলে বিবেচিত হত, ধা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে রেনটাইন বাস্তব পরীক্ষা দ্বারা এই ভ্রান্তি নিরসন রন। তিনি দেখালেন, এই মনিজ পদার্থটি অধিক াপে এবং ঘনীভূত সূর্যকিরণে দাহ্য। অতঃপর ভেন্তি ৮১৬ খৃঃ) এবং ফোসে (১৮৭০ খৃঃ) প্রমানিত করেন রক কেবল দাহ্যই নয়, উপরন্তু এর দহনফল একমাত্র র্বনডাই অক্সাইড গ্যাস। এই থেকে জানা গেল, রকের উৎপাদন বিশুদ্ধ অঙ্গারক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবিষ্কারটি বিস্ময়কর এবং চমকপ্রদ। কৃষ্ণ কয়লার অঙ্গার আর বিশ্বের উজ্জ্বলতম রত্ন হীরক যে একই ার্থের রূপভেদ, তা প্রথমে বিশ্বাস করতে সত্যি বাধ ধ ঠেকে। কিন্তু বিশ্বাস না করেও গত্যন্তর নেই। বর্ণবাস্যারের পরীক্ষা এই সত্য যাচাই করেছে।

অঙ্গারকের হীরকে রূপান্তর প্রক্রিয়ার স্বরূপও মোটা- ; উদ্ঘাটিত হয়েছে। ল্যাভয়সিয়রের মতে ভূগর্ভের ুল তাপ, চাপ এবং অন্যান্য সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে ড় অঙ্গারও বেদাসিত হয়ে জন্ম দেয় হীরকের। ন্তু লিবিগ (Liebig) এর মতে কার্বন এবং হাইড্রোজেন- — জাতীয় তরল পদার্থের ক্রমিক বিশ্লেষণই এই বস্তুর প্রাণ বলে মনে হয়।

আগ্নেয়গিরীর অগ্নুৎপাতকালে ভূগর্ভস্থ হীরক অনেক সময় বাইরে বেরিয়ে আসে। এ কারণেই দেখা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বহু হীরকক্ষেত্র লুপ্ত আগ্নেয়গিরীর আশা-মুখের কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত।

হীরকের জন্ম-ইতিহাস অনুসন্ধান করেই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হন নি। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হ্যাডনাম্বা রসায়নবিদ ম্যাসন গবেষণাগারে অঙ্গারকের কৃত্রিম রূপান্তরও ঘটিয়েছেন। চিনি থেকে নিষ্কাসিত বিশুদ্ধ অঙ্গারককে তিনি চার হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত গলিত লৌহের সংগে মিশ্রিত করেন। তরল লৌহ কিছুটা অঙ্গারক শুষে নেয়। তারপর সেই মিশ্রণকে অকস্মাৎ তরল সীসের নিচে নামিয়ে শীতল করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে অত্যধিক তাপ এবং চাপের সৃষ্টি হয়, তার ফলে লৌহধার। শোষিত অঙ্গারকের কিয়দংশ বেদাসিত হয়ে স্বচ্ছ উজ্জ্বল-বর্ণের হীরকের জন্ম দেয়।

হীরকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর দ্যুতি (লাশচার) এবং অনুপ্রভা (ফস্ফরেসেন্স)। প্রকৃতিজ অবস্থায় এর বর্ণ অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। কিন্তু ওপরের অস্বচ্ছ আবরণ উন্মোচিত করলেই উজ্জ্বল দীপ্তির আবির্ভাব হয়। একমাত্র হীরককে সূর্যকিরণ বা রঞ্জন-রশ্মির প্রভাবে কিছুক্ষণ রাখবার পর অন্ধকারে নিয়ে গেলে তা অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা এক ধরণের আলো বিচ্ছুরণ করে। এরই নাম হীরকের অনুপ্রভা। কিন্তু উপরোক্ত উভয় গুণই প্রাকৃতিক হীরকে অনুপস্থিত। উপযুক্তভাবে কাটবার পরই কেবল তারা আত্মপ্রকাশ করে। 'সেজন্য মধ্যযুগ-

অপরূপ সৌন্দর্যের নিদর্শন একটি হীরক অলঙ্কার

পরম হীরক তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। হীরক কাটার কৌশল আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই তার যথার্থ সৌন্দর্যের সংগে মানুষের পরিচয় ঘটে।

কিন্তু হীরকের যে কল্যাণকারী রূপ রয়েছে তার আত্মপ্রকাশ অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে। আজ আর সুন্দরী নারীর অঙ্গাভরণ রূপে তার শোভাবর্ধনই হীরকের একমাত্র কাজ নয়, মানুষের সেবায়ও তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যার ডেভিড ব্রুস্টার ভবিষ্যৎবাণী করে লিখেছিলেন, 'অতুলনীয় দীপ্তি এবং আলঙ্কারিক মূল্যে ভূষিত হলেও শুধু শিল্পে ব্যবহার-যোগ্যতার দিক থেকেই হীরক খনিজরাজ্যের শীর্ষে অবস্থান করত।' কথাটা যে পুরোপুরি অতিরঞ্জন ছিল না, তা আজ দিবালোকের মতই সুপরিস্ফুট। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে যে হীরক প্রস্তুত হয়, তার শতকরা আশীভাগই ব্যবহৃত হয় শিল্পে। একটুকরো হীরক কত বিস্ময়কর বস্তুর অন্তর্ধানে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, যুদ্ধকালীন সংকটের সময় বৃটেন থেকে জার্মানীতে শিক্ষিত পায়রার সাহায্যে হীরকের চোরাই রপ্তানী চলত। হীরকের এই শিল্প-গুরুত্ব উপলব্ধির জন্যই গত কয়েক বৎসর যাবত অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল হীরকের বিভিন্ন গুণাবলী। যন্ত্রশিল্পে হীরকের প্রয়োগ যাতে আরও ব্যাপক এবং সার্থক করে তোলা যায়, তার জন্য হীরকের উত্তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব, দ্বিতি-স্থাপকতা (এলাসটিসিটি), অভ্যন্তর গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞানের সংকলন এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

সৌন্দর্যের নিদর্শন আর একটি হীরক অলঙ্কার

শিল্পকার্যে তিন শ্রেণীর হীরক ব্যবহৃত হয়ে থাকে যথা:

(ক) বোর্ট

(খ) কার্বোনেডো

(গ) ব্যালাস

উৎকৃষ্ট অথবা 'কাট্ট ওয়াটার' হীরক বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ। এদেরই রত্ন হিসেবে যোগ্য বিবেচনা করা হয়। তবে সব হীরকই বর্ণহীন নয়। নীল, পীত, সবুজ এবং রক্তবর্ণের 'অক-কালার' হীরকও রয়েছে। শিল্পে ব্যবহার করা হয় সেই সব হীরককে, রত্ন হিসেবে যাদের চাহিদা নেই। বোর্ট অস্বচ্ছ এবং ধূসরবর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ। রত্নহীরক প্রস্তুতকালে উপজাত পদার্থ হিসেবে এদের পাওয়া যায়। কার্বোনেডো ঘনকৃষ্ণ এবং অত্যন্ত কঠিন দেখতে অনেকটা কাঠকয়লার মত দচ্ছিদ্র। কার্বোনেডো প্রাপ্তিস্থান একমাত্র ব্রাজিলের অন্তর্গত বাহিয়া। ব্যালাস হীরক অনেকটা পিণ্ডাকৃতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রাজিল উভয় স্থানেই সুলভ। একথা বলাই বাহুল্য যে রত্নহীরকের তুলনায় বোর্ট, কার্বোনেডো এবং ব্যালাসের মূল্য অনেকগুণে কম।

সৌন্দর্যের নিদর্শন হীরকখণ্ড

হীরকের অজস্র শিল্পপ্রয়োগের মধ্যে একটি প্রাচীন এবং রোমে অতি প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত ছিল তা হল রত্নালঙ্কারে নক্সাকাটার কাজে ব্যবহার। এর অবশ্য শুধু রত্নালঙ্কারেই নয়, প্রস্তর, তাম্রফলক এবং প্লাস্টি খোদাইয়ের কাজেও হীরক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই খনিজ পদার্থটির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভবতঃ ঘর্ষক (অ্যাব্রেসিভ) রূপে। মূল্যবান যন্ত্রপাতি মসৃণকরণে হীরক একটি বিশিষ্ট উপকরণ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

ভূত্বকের নীচে কঠিন শিলাগর্ভে যেসব খনিজ পদার্থ যুগযুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে, তা খুঁজে বার করবার

জন্য ওপরের শীলাস্তর বিদীর্ণ করতে হয়। এই কাজ করা হয়ে থাকে 'ডায়মণ্ড-ড্রিলে'র সাহায্যে। ডায়মণ্ড ড্রিলের দ্বারা এই উদ্দেশ্যে যেসব কূপ খনন করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কূপ খনন করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং গভীরত্বে সেটি ছিল প্রায় দুই মাইল।

শুধু ধাতুবিশারদেই নয়, বস্তুবিদদের কাজেও হীরক কম সহায়তা করে না। ধাম পালিশের কাজে অথবা ধামের গায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ছিদ্র করবার জন্য, নির্মানকার্যের উপযোগী স্থান নির্বাচনে এবং কঠিন শিলার বুকে অট্টালিকা কিংবা বাঁধের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ডায়মণ্ড-ড্রিল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের সঠিক আকৃতি দেবার জন্যেও হীরক প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কারিগরী প্রয়োজনে (যেমন ইলেকট্রিক বাল্ব প্রস্তুত) অতি সূক্ষ্ম ধাতব তারের প্রয়োজন হয়। এই সব তার নির্মাণে বর্তমানে হীরকযুক্ত ছাঁচ ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঘড়ি এবং ক্রোনোমিটারের মধ্যকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যন্ত্রাংশগুলির (বিয়ারিং) ভিত্তি ক্ষয়-প্রতিরোধক পদার্থে নির্মিত হওয়া আবশ্যক। দেখা গেছে হীরকই এর সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল বুরো অফ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ নামক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি ঘোষণা করেছেন, পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারণে হীরক বর্তমানে প্রচলিত 'গাইগার মুল্যার কাউন্টার' (Geiger Muller Counter)-এর স্থান সার্থকভাবেই গ্রহণ করতে পারে। 'গাইগার মুল্যার কাউন্টার' অপেক্ষা হীরকনির্মিত যন্ত্র শুধু দীর্ঘস্থায়ীই হবে না, আকৃতির দিক থেকেও হবে ক্ষুদ্রতর। এদের অনায়াসেই সার্জারীতে ব্যবহার করা চলবে এবং আণবিক গবেষণায় নিযুক্ত কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তাও এর ফলে অনেক বেশী বৃদ্ধি পাবে।

উড়োজাহাজের বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য হীরকের সাহায্যগ্রহণ অপরিহার্য। এছাড়া বিলিয়ার্ড-বল, সেরামিক, ভালকানাইট মাউথ-পিস প্রভৃতির সঠিক আকৃতিও দেওয়া হয়ে থাকে 'ডায়মণ্ড টুলে'র দ্বারা।

বিভিন্ন কঠিন পদার্থকে প্রয়োজনমত কাটার কাজ সহজ করে দিয়েছে হীরকনির্মিত যন্ত্র। মাইক্রোস্কোপের জন্য মিলার পাতলা চাদর, বেতারযন্ত্রের জন্য কোয়ার্টজ প্লেট, কাঁচ—এমন কি স্বয়ং হীরক কাটার কাজও হয়ে থাকে হীরকচূর্ণগ্রথিত ঘূর্ণায়মান করাতের সাহায্যে।

মিনির মতে হীরকের উৎস হচ্ছে কোন অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত একটি গভীর দুরারোহ্য উপত্যকা। সেখানকার আদিবাসীরা সেই উপত্যকাটির মধ্যে গলিত মাংসের টুকরো নিক্ষেপ করে। হীরকখণ্ডগুলো প্রায়ই সেগুলোর সংগে লেগে যায়। ঈগল পাখীরা আহারের জন্য মাংসখণ্ডগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায় পাহাড়ের ওপর। হীরকসন্ধানীগণ ঈগলপাখীর বাসা থেকে রত্নগুলো সংগ্রহ করে আনে।

হীরকের উৎস সম্বন্ধে কেন যে এমন উদ্ভট উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল, তা বলা সম্ভব নয়। তবে যথার্থ উৎস সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই হয়তো এই রহস্যময় কাহিনীর জন্ম দিয়ে থাকবে।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হীরকের প্রধান প্রাপ্তিস্থান ছিল। ক্রমে ক্রমে ব্রাজিল, অষ্ট্রেলিয়া এবং সবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এখন কেবল আফ্রিকাই পৃথিবীর মোট প্রয়োজনীয় হীরকের শতকরা নব্বুইভাগ অংশ সরবরাহ করে। এইসব দেশ ছাড়াও বৃটিশ গায়না, আলাস্কা, ইউরাল—প্রভৃতি স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে হীরক পাওয়া গেছে। আমেরিকার অ্যারিজোনার অন্তর্গত একটি উল্কা-গর্ভের (মিটিওর ক্র্যাটার) মধ্যেও সামান্য পরিমাণ হীরকের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।

হীরকের উৎস আগ্নেয়শিলা। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বারলাইট প্রস্তরের মধ্যে হীরকের স্ফটিক প্রোথিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ নদীবাহিত উপলস্তূপের মধ্যে হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়। রত্নধর-শিলা প্রাকৃতিক কারণে পরিবর্তিত এবং নুড়ীকৃত হয়। তখন হীরক পৃথক হয়ে নদীস্রোতে নীত হয় এবং তীরস্থ উপল এবং বালুকার মধ্যে স্থান লাভ করে।

শিল্পে অন্যতম উপকরণ হিসেবে প্রয়োগ সুরু হবার পর থেকে হীরকের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। উন-

বিংশ শতকের প্রথমভাগে বার্ষিক পনেরো থেকে চল্লিশ লক্ষ ডলার মূল্যের হীরক উৎপাদিত হত। যুদ্ধকালীন মন্দার ঠিক আগে বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্যমান সাত থেকে আট কোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছোয়। ওজনের হিসেবে তখনকার বার্ষিক উৎপাদন ছিল আনুমানিক সত্তর লক্ষ ক্যারাট (১ ক্যারাট=·২০০ গ্রাম)। অর্থাৎ এক বৎসরের সমস্ত হীরককে গালিয়ে যদি একটি বস্তুপিণ্ডে ঢালাই করা সম্ভব হত, তাহলে আড়াই ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি ঘনক প্রস্তুত হতে পারত। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পকার্যের জন্য বার্ষিক পড়ে তিন কোটি পাউণ্ড মূল্যের হীরকের চাহিদা আছে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বকালের প্রকৃতিজ হীরকোৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮ কোটি ক্যারাট (৬৩৮ টন)। এর মধ্যে ২২ কোটি ক্যারট (৪৮০ টন) ব্যয় হয়েছে শিল্পকার্যে। অবশিষ্টাংশের মধ্যে কাটাকুটির পর সাড়ে ছয় কোটি ক্যারাট রত্নরূপে সঞ্চিত হয়ে আছে বলে মনে হয়। এই হীরক পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ভারত এবং বেলজিয়াম কঙ্গো থেকে।

যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সংগে সংগে হীরকের প্রয়োজন দিনদিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু অন্যান্য খনিজ সম্পদের মত এর প্রাকৃতিক সঞ্চয়ও শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। এই শূন্যতা পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম হীরকের উৎপাদন। এই বিষয়ে বর্তমানে সুইজ্যারল্যাণ্ডের স্থান সকলের পুরোভাগে। একমাত্র সেইখানেই পৃথিবীর বর্তমান আটটি কৃত্রিম হীরক প্রস্তুতের কারখানার মধ্যে পাঁচটি অবস্থিত। অপর তিনটি রয়েছে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

আগেই বলা হয়েছে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিল হীরকের প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র। কথিত আছে নবম শতাব্দীতেই এখানে হীরক কাটা এবং পালিশের কাজ প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে হীরক কাটার কৌশল প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইউরোপেরই প্রাপ্য। তবে মোগলসম্রাট আকবরের সময়কাল পর্যন্ত যে ভারত হীরকশিল্পে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র 'পান্না' হীরকোৎপাদন কেন্দ্র থেকেই তখন বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা রাজস্ব সম্রাটের কোষাগারে আসত। ভারতে কৃষ্ণানদীতীরস্থ কর্নুল এবং কোলারে মহানদীতীরস্থ সম্বলপুর এবং পান্নার পেন্নার নদীতীরস্থ কাদাপ্পায়, বেলারীতে এবং পালামৌ জেলার সঙ্খ এবং কোয়েল নদীর বেলাভূমিতে হীরক পাওয়া যেত। ঐসব অঞ্চল থেকে যেসব হীরক পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটির নাম হল কোহিনুর (১৮৬ ক্যারাট), ওরলফ (১৯৩ ক্যারাট), পিট (৭১০ ক্যারাট), গ্রেট মোগল (২০০ ক্যারাট) প্রভৃতি।

পিট নামক হীরকটি সঠিক আকৃতিতে কাটবার পর ওজনে দাঁড়িয়েছে ১৩৬·৭ ক্যারাট এবং এর বর্তমান মূল্য ৪৮০,০০০ পাউণ্ড বলে অনুমিত হয়।

ব্রাজিল এবং ট্রান্সভালের খনি আবিষ্কৃত হবার পর ভারতের হীরকশিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ভারত এ ব্যাপারে পিছিয়ে পড়তে থাকে। আজকাল ভারতে হীরকের কাজ হয়না বললেই চলে। যে সব পরিবার হীরকশিল্পকে বংশগত পেশা বলে নিয়েছিল, তারা অনেকেই অন্য ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আশা করা যায় নির্মিয়মান হীরক কারখানাটি এইসব লুপ্তপ্রায় শিল্পীদের পুনর্জীবনের সুযোগ এনে দেবে। কৃত্রিম হীরক প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব ভারতবর্ষের নেই। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে যদি দক্ষতার সংগে হীরক প্রস্তুত করা যায়, তাহলে শুধু দেশের চাহিদাই নয়, বিদেশের চাহিদা মেটানোর কর্তব্যও ভারতবর্ষ খানিকটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারবে।

নদীকে | মহীতোষ বিশ্বাস

কখন পাষাণ-মৌন হৃদয়ের স্তব্ধ সেই হিমবাহ গ'লে
নদী হয়। কূলে কূলে কল্লোলিত ঢেউ কৌতূহলে
উধাও সমুদ্র-মন
সারাদিন মিঠে সুরে বেজে চলে
নিরিবিলি জলের কাঁকন।

পাল তুলে সে নদীতে নৌকা বেয়ে বেয়ে
মনে হয় আমি এক নিরুদ্দেশ নেয়ে
চলে গেছি অন্য ঘাটে। সেখানে অনেক ফুল,
মধুগন্ধা আমের মুকুল,
আকাঙ্ক্ষা-সুনীল সাধে তন্দ্রালস নদীর দু'কূল।
সেখানে ভিড়িয়ে নাও কখনও বা মনে হয় যদি
ছুঁয়েছি তোমার মন; হে স্তব্ধ হিমগলা নদী
শুনেছি তোমার সব ভাষাহীন মৌন মুখরতা,
আমার আবেগ-তপ্ত স্পর্শ পেয়ে তুমি
পেলে সমুদ্র-সমতা।

বহতা স্রোতের থেকে
পুনরায় বরফের নদী হ'তে হ'তে
একটি স্মৃতির দুঃখে অন্যমন হবে নাকি
আগামী শরতে।

ব্যাজস্তুতি | ভূষার চট্টোপাধ্যায়

জটায় বেঁধেছি স্রোত ত্রিনয়ন শিব
প্রয়োজনে নীলকণ্ঠ সমুদ্র মন্থনে
কৈলাসে উৎসের সূত্র পর্বত শ্রীমন
অভিকর্ষে চিরন্তন সমুদ্র মনন
হৃদয়ে বালির বাধা তাই সুগ্রীব
সহায়ক রামেশ্বরে সাগর বন্ধনে।

বিকেলের ম্লান আলো এতো ভালো লাগেনিত আগে
সাগর সংগমে শ্লথ খুলে যায় নীবি
উপগত নদী তাথে সমুদ্র পৃথিবী
মিলনের থেকে বেশি সুখ বুঝি আছে পূর্বরাগে।

ভাঙনে কার্পণ্য নেই নির্মাণেও নির্ভীক কাণ্ডন
কোন গুণ নেই শুধু কপালে আগুন॥

রাত্রির যাত্রা | গৌরী চৌধুরী

সবুজ আশার ইঙ্গিতে ভরা ধানের ক্ষেত—
অপরাহ্নের কবোষ্ণ রোদে কি সঙ্কেত।
শ্রান্ত চিলের ডানায় নীড়ের আমন্ত্রণ
ঝুমকো বটের জলছবি কাঁপে সারাক্ষণ।

বসে বসে কত স্বপ্নপটের তন্তু বুনি
সাহারার যত পথ হারাদের ডাক যে শুনি।
আমার মনের সূর্যবিধুর রক্তমেঘে
বিসুভিয়াসের অগ্নিরঙীন স্বপ্ন জাগে।

কৃষ্ণসায়রে সায়াহ্ন নামে, সাঁঝ ঘনায়
রক্ত যে নাচে কাস্পিয়ানের ঢেউ-দোলায়।
অদেখা সূর্য পৃথিবীর বুকে রঙ্ ঝরায়,
নীড়ে ফিরে যেতে সহসা কি ভেবে
সোয়ালো পাখী কি পথ হারায়?

হিন্দুকুশের হিমেল শিখরে কালো আঁধার
ঘুমপাড়ানিয়া কুহেলি চাদরে ঢাকে তুষার।
আঁধারে আঁধারে দিশাহারা দিক্‌চক্রবাল—
অমাবস্যার রিক্ত আকাশ মেঘমাতাল।

চাঁদহারা রাতে ফেনিল সাগর ঢেউ-অধীর
নীল জলে তার দীর্ঘনিশাস ঝাউ-বীথির।
মৌনশয়নে নামহারা ধূলি গণে প্রহর—
ঘাসরক্তান্ত ধূসর পৃথিবী ঘুমনিথর।

নীলাদ্রি চক্রবর্তী

কালুয়া

বয়স ঠিক যেন চিত্রগুপ্তের বডিগার্ড।

দেখতে লোকটা এতই কুৎসিত। এমন চেহারা বুঝি এর কেউ দেখেনি। কোথাও না। কখন না!

লম্বা টিঙটিঙে নয় মোটেই। বরং বেঁটে যেন বেশ কিছুটা। রঙটা ঘ স খ সে কা লো। ভোবড়ানো দুটো গাল। তারপর চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠে গেছে একেবারে আ কা লে র দিকে। শকুনের মতো লম্বা চেপ্টা নাক। কুঁচের মত লাল আর ফুলে ফুলে এক জোড়া চোখ। ওরমুজের বীজের মত ক্ষয়ে যাওয়া ছোপড়াধরা তিনটে দাঁতওয়ালা দুপাটি লাল মাড়ি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল বাবড়ি বাঁধা। আর গায়ের চামড়া যেন একটু ঢিলে ঢিলে হয়েছে। তা হোক।

কিন্তু দেখে এটুকু অন্তত আজও বোঝা যায় একদিন লোকটার দেহে শক্তির অভাব ছিল না। সাহসের খাঁকতি ছিল না ওর চিতল বুকের পাটায়ে। আজ যদিও তার অনেকটাই উধাও হয়েছে তবু সবটা এখনও যায়নি একেবারে। ঠিক যেন প্রদীপ নিভবার আগের মুহূর্তটির মত ওর বলশালী দেহটা এখনও শক্তি আর সাহসের প্রাচুর্যে দপদপ করে জ্বলে উঠতে চাইছে। হয়তো সেই উজ্জ্বলতাটুকু নিয়ে জ্বলবে আরো কিছুদিন। তারপর একদিন হয়ত আচমকা নিভেও যাবে দপ করে। কেননা ভেতরে ভেতরে ও বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে আজকাল। পাকা বাঁশে ঘুন ধরেছে।

অদ্ভুত লোকটা। ওকে চেনে সবাই। খেলার মাঠে আইতিন, বেল্লাইন, ভুলো, নেকড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ও। কখন আনি কার হাঁ ছুড়ে যায় অথবা কেটে যায় কিছুই ঠি নেই। কিন্তু ঠিক আ লোকটা। ভুলোটা আ ডিমে তিড়িয়ে ছোবল ধরা দাঁতওয়ালা দুপা লাল মাড়ি বের ক বলবে—স্যার ব্যাবা একটুন স্টেরেস করে দি তারপর খেলোয়াড়দে সেবু দিতে চলে যায় সব কাজেই আছে ও।

আছে খেলার মাঠে হাসপাতালে, মিউনিসি প্যাল অফিসের কাছে সরকারী ঘোষণার চো দিতে, সতীঘাটা শ্মশানে সব কাজেই কালুয়াকে চাই। মাসের মধ্যে একবার বাড়ী যায়। শহর থেকে আট মাইল দূরে বাড়ী। হাসপাতালের মাইনের সবটা দিয়ে আসে, মুনিয়াকে। আট বছরের বাচ্চাটাকে দেখে আসে থাকে একদিন। একদিনের বেশী ছুটি পায়না মুনিয়া সব জেনেও আপত্তি তোলে : এ্যাদ্দিন যা এল্যা। দুদিন থেক্যা যাও।

কালুয়ার লাল মাড়ি দুটো হেসে ওঠে : থাকার বি কপায় আছে রে বৌ। আমার কি সি কপাল রে ! দুদের কাছে থেক্যা হাড় কটা জুড়াব। বাবুরা মলেও ডাকবে, বেঁচে থাকলেও ডাকবে। এই শর্মা না থাকলে চলেনা বাবুদের।

কথাটা সত্যি বলেছে কালুয়া। ওকে না হলে চলেনা কারো। আট বছরের তেলচিটে কাঁথায় মুনিয়ার বুক জুড়ে শুয়ে হাড় জুড়াবার সময় তার কোথায়। সিভিল সার্জেন একদিন বই দুদিন ছুটি দেয় না। শালা ঘটালের বাচ্চা শয়তানের হাড্ডি—অন্তত কালুয়া তাই

বলে! বলে অবশ্য মনে মনেই।

পান্তা ভাতে নুনগুড়ো আর তেল মাখতে মাখতে বলে: হ্যারে বউ আমাকে ছেড়ে তু থাকতে পারিস লয়?

—হ্যাঁ। লজ্জায় চুপসে যায় মুনিয়া। আস্তে আস্তে বলে, সি কি তুই জানিস না?

—জানিরে বউ। জানি। কিন্তু চাকুরী তো ছাড়তে লারি।

—সবার মরদ কেমন ঘরেই থাকে। তু কেবল বাউলের পারা হেথায় হোথায় ঘুরে বেড়াস।

—তুর মরদের মত চাকুরী কার মরদের কটা আছেরে বউ! কথাটা শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুনিয়ার মুখটা। খুসি হবার মতই কথাটা বুঝি!

মরদ তার হাসপাতালে কাজ করে। বড়সাহেব, ছোটসাহেব, উকিলবাবু সবাই চেনে তাকে। ইস্কুল কলেজের ছাত্ররা সাহেব বাবুদের মেমবিবিরা সবাই চেনে তার সোয়ামীকে। কালুয়া কি যে-সে লোক! এ পাড়ায় যেসব পটকা মরদগুলোর মধ্যে ও একটা ভ্যাস্ত মানুষই বটে। একটা ডারিক্কি মানুষ। সবার সংগে তার খাতির। দহরম মহরম। সবাই কত ভালবাসে। আপদে বিপদে ডাক পাঠায়। নাম করলেই মনে পড়বে: পেলার মাঠ, সতীঘাটা শ্মশান, হাসপাতাল। সরকারী ঢোলের ঢিম্ ঢিম শব্দ। মনে পড়বে সেই রুক্ষসিত্ত চেহারা কালুয়া ডোম। মুনিয়ার মরদ। পোঁটলা হাতে উঠে দাঁড়ায় ও। ভিজে গ্যাতস্যাতে গলায় বলে—যাচ্ছিরে বউ! কানাইয়া কই?

—কি জানি, উ পাড়াতে আছে।

চলে আসছিল কালুয়া। আস্তে আস্তে মুনিয়া ডাকলো শোন? ফিরে দাঁড়াল কালুয়া: কি বলছিস?

একটু থেমে মুনিয়া বলে: আমার একটো শিশি আলতা আনিস্।

হাসলো কালুয়া বুঝি। হেসেই বল্লে, হ্যাঁরে বউ মরা ভালে কি ফুল ফোটে কখনো?

তারপর রাঙামাটির পথ ধরে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। ঠিক দশটাতে হাজির হতে হবে নইলে মাইনা কাটা যাবে। আসছে মাসে মুনিয়াকে পুরো টাকাটা দিতে পারবে না।

ঠিক সময়েই হাজিরা দিয়েছিল ও।

সারাদিনের হরেক রকম কাজের পর সন্ধ্যায় মাতাল-শালায় এলো কালুয়া। তালপাতার চাটাইএর উপর বসে পড়ে ধপ করে। শালপাতার ঠোঙা খুলে বের করে আলুর চপ, বেগুনি, পেঁয়াজি মদের সংগে চাই। বেশ লাগে মদের সংগে। লাল ছুপাটি মাড়ি দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। বাখর মাখা ভাজা চালের পচুই মদের সংগে বেশ লাগে বাদি তেলেভাজা। মেশা জমে কানে গোঁজা বিড়িটাকে ধরিয়ে টান দেয় চৌ চৌ করে। তারপর ওখানে তালপাতার চাটাইএ শুয়ে কাটিয়ে দেয় রাতটা। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায় কোনদিন। ডাক পড়েছে ওর। শ্মশানে যেতে হবে। মড়া মরেছে।

উঠে পরে কালুয়া। কদিন একেবারে মড়া আসেনি শ্মশানে। ওর রোজগার একরকম বন্ধ ছিল। এমন হলে চলবে কি করে। হাসপাতালে কতই বা পায়। ত্রিশটাকা মাসে। তাও সিভিল সার্জেন ফাইন কাটে ফন্দিফিকির করে। বেটা শকুনের বাচ্চা আস্ত কসাই। মাইনে কাটবে ঠিকই! তাতে কি করে চলবে কালুয়ার।

না চললেও তাতেই চালিয়ে নিতে হয়, মাইনের সবটা গিয়ে আসে মুনিয়াকে। মড়া পুড়িয়ে, ঢোল দিয়ে যা পায় তাতেই চালিয়ে নেয় নিজের খরচটা। মড়াই তার অন্ন। যত মরে ততই ভাল। মড়া পিছু সাড়ে তিন টাকা পাবে সে। একেবারে বাঁধা রেট।

ঝিলের ওপর কাঠ সাজিয়ে পেট্রোল ঢেলে দেয়। তারপরে বলে—হেন বাবু চাপিয়ে আগুন জ্বেলে।

মড়া পোড়ে। কালুয়া গাঁজার কলকে বের করে আর ওই সংগেই বের করে কাগজে মোড়া গাঁজার পাতা। হাতের চেটোতে টিপে তৈরী করে কলকেতে সেজে আগুন চাপায় ঝিল থেকে এনে। জোরে জোরে টান দেয় গোটাকতক। শ্মশানের বুকে চিতার আগুন জ্বলতে থাকে। নৈশ স্তব্ধতার বুকে আগুনের কেমন একটা হিস হিস শব্দ হয়। আর দগ্ধ শবের বুক থেকে ছিটকে আসা আগুনের শিখা সাপের মত কালুয়ার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। বড় অদ্ভুত দেখায় কালুয়াকে নিঃশব্দ শ্মশানে লোকটাকে যেন কোন এক প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের অস্তিত্বের জ্যান্ত মানুষ বলে মনে হয়।

মড়া নিয়ে যারা আসে তারাও যেন কেমন ভয় পায় ওর মূর্তি দেখে। জ্যান্ত মানুষের গায়ের রক্ত কালুয়াকে দেখে যেন থমকে যেতে চায়। তারা ভয় পাওয়া চাপা চাপা গলায় শুধোয় : কতক্ষণ লাগবে কালুয়া ?

—এই ধরেন বাবু তিনঘণ্টার মধ্যে শেষ কোরে দিবু। দৈত্যের মত হাঁ করে জবাব দেয় কালুয়া।

—বলকি, মোটে তিন ঘন্টা ?

—হ্যাঁ বাবু। উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে ও। বলে—কত মড়া জেবনে পুড়ালাম কত দেখলাম, জানলাম। উত্তরপাড়ার বড়বাবু দখিন পাড়ার মেজবাবু পছিপাড়ার উকীলবাবু আমাদের গেরামের ধনদাবাবুকে তো আমি নিজে পুড়ালাম। হা! তা বাবু ছিলেন বটে ধনদাবাবু। সাড়ে চবি ছিল। লাউ ঘাউ করা পুড়া গেল! বিচিত্র ভংগীতে হেঁসে উঠল ওর লাল মাড়ি দুটো।

মিথ্যে বলেনি কালুয়া। জীবনে অনেক মড়া পুড়িয়েছে ও। এই বয়সে কত হাকিম উকিল মুচি মুদ্দোফরাস। ছেলে ষোয়ান বুড়ো পাগল পোয়াতি সূতিকা কলেরা। অনেক। অনেক রকমের। অনেক জাতের। অনেক রোগের। সব বয়সের। পঞ্চাশটা বছর তার কেটে গেল ঐ মড়া পুড়িয়েই। হয়তো কাটবে অনেকদিন। অনেক বছর। হয়ত বা সারাটা জীবনই!

ওতে ওর বিরক্তি নাই। ডাকলেই ও আসবে। তা সে রাতদুপুর হোক, কিংবা দিনদুপুর হোক। বর্ষা শীত জল ঝড় দরকার হলেই ওকে পাওয়া যাবে। আসবে, ঝিল সাজাবে। পেট্রল ঢেলে দেবে। আর মড়া পুড়তে থাকলে বসবে গাঁজার কলকে নিয়ে। গোটা কয় টান দিয়ে শরীরটাকে উত্তপ্ত করে নেবে। আচ্ছন্ন করে নিতে চাইবে ওর মানবিক চেতনাকে।

ওটা না হলে পারে না। কেমন যেন করে ওঠে শরীরটা।

যখন এ লাইনে প্রথম আসে তখন কেমন ভয় ভয় করতো। ধক ধক করতো বুকটা। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। অভ্যাস হয়ে গেলে এখন আর ভয় করে না। মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে মনটাই বুঝি শক্ত মতন হয়ে গেছে। আজ আর দুধের বাচ্চাকে চিতায় চাপাতে একটুও কষ্ট হয় না। বুকে বাজেনা একটুও। হয়ত.....

হয়ত কেন, সত্যিই মড়া পোড়াতে আজ আর একটুও কষ্ট হয়না ওর। একটু দ্বিধা সংশয় মন কেমন-করা ভাব, না এসব কিছুই হয় না। শ্মশানের পোড়া কাঠের মত তার নিশ্চেতন হৃদপিণ্ডটায় আজ আর কোন অনুভূতিই দাগ ফেলতে পারে না। নির্বিকার নির্বিরোধ মুখে মৃতদেহে আগুন ধরায় সে। ছাই করে দেয় পুড়িয়ে। তার মনের স্নেহ মমতার কোঠায় বুঝি এমনি করেই আগুন দিয়ে দিয়ে তাকেও যেন নিঃশেষে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে কালুয়া। এখন ভস্মশেষের ছাইয়ের মত একটা বিস্তৃ বিবর্ণ হৃদপিণ্ড নিয়ে কাজ করে চলেছে ও।

তারপর সব শেষ হয়ে গেলে নিবু নিবু ঝিলে কালুয়া জল ঢেলে দিল। সামনে তাল বটগাছগুলোর দিকে চেয়ে মৃতদেহের একটা কুড়ি ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : তোদের দেনা শোধ।

বট-তালের গাছে গাছে চকিতে যেন ঝড় তুলে দিয়ে এক আকাশ শকুন এল নেমে। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল মজ্জার আর ভূতের মত বিচিত্র ভঙ্গীতে হেসে উঠল কালুয়ার তরমুজ বীজের মত ক্ষয়ে যাওয়া ছোপধরা তিনটে দাঁতওয়ালা দুপাটি লাল মাড়ি : খা—খা—খা—।

নগদ তিনটাকা আটআনা গুনে নিয়ে কাপড়ের খুঁটে জড়িয়ে বাঁধল। তারপর হন হন করে হাঁটতে সুরু করল। একেবারে সোজা চলে এল মদের দোকানে। শালপাতার মোড়ক খুলে বের করল চপ বেগুনি ভাজা। মাটির ওপর রেখে ডাক দিল মালিককে। একজোড়া লালসা মাখানো সলিল চোখে তাকাল একবার ভাঁটির দিকে, আর একবার ওই তেলেভাজাগুলোর দিকে। তারপর আস্তে একটা ঢোঁক গিলল। চপ বেগুনি ভাজা। ও দিয়ে খেনো খেতে বেশ ভালই লাগে বাঘর মাখানো ভাজা চালের পচুই মদ। ভটকা। বাসি তেলে-ভাজা দিয়ে ভটকা খেতে কালুয়ার সত্যিই ভাল লাগে। কালুয়া খায়। খায় পেট ভরে। তারপরে কানের পাতা থেকে একটা আধপোড়া বিড়ি বের করে। ধরিয়ে গোটাকতক টান দিল চৌ চৌ করে। এবং টানতে টানতেই মাতালশালার তালপাতার চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

ভোর হলেই আবার চলে আসে হাসপাতালে।

কখনও দেখা যায় পথে পথে দেওয়ালে দেওয়ালে কোন অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সিটিয়ে বেড়াতে। ডান হাতে একটা মই বাঁ হাতে একটা টিনের কৌটায় আঠা। হয়ত আবার কোনদিন দেখা যায় বেলার খবর কিংবা মিউনিসিপ্যালিটির কোন ঘোষণা নিয়ে শহরটাকে সচকিত করে বেড়াতে। সেই টিম টিম শব্দ। সেই ক্যাস্ ক্যাস্ গলা: এ্যাংঘারা সর্ব্বসাধারণকে অগবত (অবগত) করান হইতেছে যে কেউ রাস্তা মুংরা ফেললে বেআইনি হইবে। টিম্ টিম্ টিম্ করতে করতে শব্দটা কোন এক গলির ভিতরে হারিয়ে যায়। কখন যা হারিয়ে যাওয়ার আগেই, হয়ত ঠিক এমনি সময়েই ওর ডাক পড়ে যায়। শশ্মানে যেতে হবে। মড়া এসেছে। বেশ হয়েছে। ভাল হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। সাড়ে তিন টাকার একটা মধুর খুসি ওর কুঁচের মত লাল ফুলে ফুলে চোখ দুটোতে নেচে ওঠে। খুসির উজ্জলতা নিটোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভাঁজ পড়া গত যৌবন মুখের খাঁজে খাঁজে। সত্তর বছরের পুরানো এবং জীর্ণ সেই মুখটা যেন হেসে ওঠে। মনে মনে বলে, এইত চাই। এ না হলেই বা চলবে কেমন করে কালুয়ার। মড়াইত কালুয়ার বেঁচে থাকা। সব কিছু।

দা আর কোদালী হাতে শশ্মানে এলো ও। কাঠগুলো দিয়ে সাজলো খিলটাকে। তারপর পেট্রল দিল ঢেলে। আকাশের নীলে তখন সূর্য ডোবা রঙের আলপনা। রিজার্ভারের লাল জল ডুবিয়ে দিয়েছে সন্তীষাটা শশ্মানের পড়ান চালুটা। সবুজ চালুটায় লাল জল ছুঁয়ে রেখেছে সন্তীর মমতায়। শশ্মানটা উঠে এসেছে উপরের দিকে রিজার্ভারের লাল জলে সূর্য ডোবা গোধূলি আকাশটা সন্তীর স্তব্ধতায় বিশ্রাম নিচ্ছে যখন, কালুয়া তখন চিতা সাজিয়ে সেই আদিম এবং অকৃত্রিম কথাগুলো বলে গেল: স্থান বাবু এবার চাপিয়ে আগুন দিয়ে।

—তুমিই দাও কালুয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ বাচ্চা ছেলে, খুব পারবে। নেহাৎ বাচ্চা।

এতক্ষণ কালুয়া লক্ষ্যই করেনি। দামী শাড়ীতে ঢাকা আছে মড়াটা। কালুয়া কাছে এল। ফুলে ফুলে চোখ দিয়ে দেখল শাড়ীটাকে। হ্যাঁ সত্যিই দামী শাড়ীটা। এটা পেলে মুনিয়া খুসিই হবে। একশিশি আলতা চেয়েছে মুনিয়া। এমন দামী শাড়ীটা পেলে সত্যিই ও' অবাক হয়ে যাবে। আর অবাক হয়ে যেতে যেতে কালুয়ার ওপরে খুসি না হয়ে ও' পারবে না। কারণ এত দামী কাপড় মুনিয়া জীবনেও পরেনি। আর এটা পরলে ওকে মানাবেও ভাল। কি জানি ওকে কালুয়ার বৌ মুনিয়া বলে চিনতে ভুল হয়ে যাবে হয়ত। কিম্বা···

আস্তে আস্তে হাত বাড়াল কালুয়া। কাপড়টা ধরে টান দিতেই চমকে উঠল ও'। ভীষণভাবে চমকে উঠল। ইস্! নেহাৎ বাচ্চা। আট কি ন' বছর হবে। দুধের রং এখনও সারা দেহে। কচি কোমল মুখে নব-কিশলয়ের পেলবতা। চোখে এখনও দুষ্টুমির আভা। সারা দেহের ভাঁজে ভাঁজে এখনও চঞ্চলতার আভাস। যেন মরেনি। এক টুকরো আনন্দঘন জীবনের গায়ে দাগ বসায়নি মৃত্যুটা। এইমাত্র যেন খেলা শেষ করে বিশ্রাম নিতে শুয়েছে ছেলেটি। বোঁজা চোখ দুটোতে বিশ্রামের সেই আদুলতা। সেই জেগে থাকার মিষ্টি চপলতা। কালুয়ার ছেলেটি যখন মাঠ-ঘাট ঘুরে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মুনিয়ার কোল ঘেঁসে, তখন, ওকে ঠিক এমনি দেখায়। এমনি ক্লান্ত এমনি দুষ্টু। এক ঝলক ঘুমন্ত হাসির মত এমনি মমতা নরম।

হঠাৎ কি যেন হয় কালুয়ার। চীৎকার করে ওঠে ও, না না, ই-আমি লারব। ই-আমি পোড়াতে লারব।—

—কেন, কি হল কালুয়া?

—হুজুর ক্ষেমা করবেন। অপরাধ লিবেন না। ই-ছেল্যার গায়ে আগুন দিতে লারব আমি। ই আমার কানাইয়ার মোতন! আরত আমার কানাইয়া!! ই আমার কানাইয়া হুজুর!!!

এবং হঠাৎ এক ঘূর্ণি বাতাস উঠল শশ্মানের বুকে। আর সেই মড়াপোড়াতে এসে ফেলে দিয়ে যাওয়া বিছানা-বালিশের তুলো উড়তে লাগল। বাতাসের ঘূর্ণিপাকে উঠতে লাগল। ভরে গেল সন্তীষাটা শশ্মানের আকাশ। কালুয়ার রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখটাও। এক আকাশ তুলো।

তারপর একসময় অসাড় দুটো ক্লান্ত পায়ে কালুয়া এগিয়ে গেলো তার গ্রামের দিকে। অসময়ে। একান্ত অসময়েই। কি জানি তার শশ্মানের মত নির্মম পাথর-বুকে আজ বুঝি হঠাৎ একটা ব্যথা-ছায়া নেমেছে হয়ত।

চা এর গোড়ার কথা

বীরেশ্বর বসু

—পাঁচ—

নার্সারীকে চা শ্রমিক এবং কর্মচারীরা পালং বাড়ি বলে। চা কেন্দ্রে কোথাও পালংবাড়ি কথা উল্লেখ হলেই সাধারণতঃ সেটাকে বুঝতে হবে চা নার্সারী, পালং শাক বা ক্ষেত নয়।

এই পালংবাড়ি সম্বন্ধে অনেক কিছুই আগে বলা হয়েছে তবু আরো অনেক আছে প্রয়োজন।

আগেই বলেছি—পালংবাড়িতে বীজ রোপন করার পূর্বে বহু কিছু ছোটখাটো করণীয় আছে। ছোটখাটো কথাটা বলার অর্থ এই যে একজন সাধারণ লোকের কাছে তা একান্ত অবাঞ্ছিত, অবহেলিত বলে মনে হবে কিন্তু একজন চাষ-আবাদ অভিজ্ঞলোকের বিশেষ দরকারী এবং মারাত্মক। সাধারণতঃ পালংবাড়ি তৈরি করতে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বাড়িটিকে সমস্ত রকম অংগল লতাপাতা আগাছা-কুগাছা থেকে মুক্ত করতে হবে। এইজন্য সমস্ত বনজংগল কেটে পরিষ্কার করে এক রাউণ্ড 'ডিপ হো' বা কোদালী মারতে হয় এবং ঐ সংগে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে কোন গাছের গোড়া শিকড় বা মরা কিংবা পোকাধরা কাঠ থেকে না যায়। এতে মাটির তলদেশ হালকা হয় এবং তার সমস্ত বিষাক্ত হাওয়া বেরিয়ে যায় আর ঐ সংগে নতুন নির্মল আলো বাতাস প্রবেশ করে মাটিকে নতুন জীবনীশক্তি দান করে। এই জমি পরিষ্কার ও গভীর কোদালী দিতে হয় বসন্তকালে। এরপর জমিটিতে 'গ্রিন ক্রপ' অর্থাৎ অড়হর, ধনচে অথবা যেসব মেডোআলা ছিটিয়ে দিতে হয়। এই গাছগুলি বর্ষার জল পেতেই যাই যাই করে আকাশমুখী বেড়ে ওঠে। এর পাতা ও নরম ডালে জমি সারালো হয়। আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ঐ গাছগুলো কেটে মাটিতে কেলে সংগে সংগে এক রাউণ্ড 'লাইট হো' অর্থাৎ হালকা গাড়ুয়া দিতে হয় যাতে এর পাতাপুষ্টি ডাল-পালাগুলো মাটি ও বৃষ্টির জলে পচে সার হয়। তারপর যতদিন পর্যন্ত বীজ রোপাই না হয় ততদিন জমিটিকে সমস্তরকম ঘাস জংগল আগাছা থেকে মুক্ত রাখতে হয়।

বীজরোপণ করতে হয় সাধারণ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। বীজ রোপন করারও পদ্ধতি আছে। জমির এখানে-সেখানে ছড়িয়ে বা ছিটিয়ে রাখলে হবে না। তৈরি জমিতে 'বেড' তৈরি করে সেই বেডগুলিকে বীজ রোপন করতে হয়। এই বেড্ ছয় ফুট থেকে আট ফুট চওড়া হওয়া চাই। দুইটি বেডের মাঝখানের যে ব্যবধান তার মধ্যে জল নিকাশনের নালির প্রয়োজন। এই নালিগুলি সাধারণতঃ এক ফুট চওড়া আর প্রয়োজন-বোধে এক ফুট থেকে দুই ফুট গভীর করতে হয়।

বীজ রোপণের সময় আর একটা দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। অনেকে অনেক সময়ে খরচ বাঁচাতে গিয়ে মাত্র চার পাঁচ ফুট ব্যবধানে বীজ রোপন করে মারাত্মক ভুল করে বসেন। এই ভুল অনেক সময়ে সংশোধন করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ বীজ থেকে চারা হলে বাগানে রোপন করার সময় তাকে চারপাশের মাটি সমেত তুলতে হয়। এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে কোন শিকড় কাটা না যায়। কিন্তু এত কাছাকাছি রোপাই করলে চারপাশের মাটি সমেত চারাটিকে তুলে আনা শক্ত কারণ দুই গাছের শিকড় ছড়িয়ে এ ওর সংগে লেগে থাকতে পারে। ফলে শিকড় কাটা যাওয়ারও বেশ আনা ভয়। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। চারা গাছগুলির বয়স ছ-মাস হতেই যদি তুলে নিয়ে বাগানে রোপাই করা হয়

তাহলে এই ভয় হতটা থাকে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন অনিবার্য কারণ বশত তা সম্ভব হয় না বিশেষ করে রিপ্লানটেসনের ক্ষেত্রে কারণ অনেক সময়ে দেখা গেছে যে ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত পুরনো গাছ তুলে ফেলে জমি তৈরি করা সম্ভব হয় নি। আমার বিশ্বাস এই সমস্ত দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুই বীজের ব্যবধান আট ফুট থেকে দশ কি এগারো ফুট রাখাই ভাল। কারণ আট নয় ফুট ব্যবধান রাখলে এক বছর বয়সের চারাও অনায়াসে নির্ভুল রোপন করা যেতে পারে। অনেকে দুই বছর বয়সের চারাও রোপাই করে থাকেন। এক্ষেত্রে বীজের ব্যবধান কমপক্ষে দশ এগারো ফুট হওয়া দরকার।

গভীর গর্ত করে বীজ রোপণ করা উচিত নয়। একটা বাঁশের অথবা অন্য কিছুর কাঠি দিয়ে মাটি আধ ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত করে বীজ রোপণ করাই সংগত। তবে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন যাতে বীজটা ঠিক মত বসে এবং গর্ত আধ ইঞ্চির চেয়ে বেশী না হয়। সব চাইতে ভাল হয় যদি বীজ বেডের ওপর রেখে জংগল থেকে আলগা মাটি নিয়ে এসে তার ওপর দেওয়া যায় তবে এই কাজে মজুর খরচা অনেক বেশি। জংগলের এই আলগা মাটিতে সার আছে আর সারেলা মাটি শীঘ্র দলা বাঁধে না কিন্তু সারবিহীন মাটি সামান্য জল বা রোদ পেলেই শক্ত হয়ে যায়। আর একটা কথা—বীজ রোপণ দুইভাবে হতে পারে। ত্রিকোণ ও চৌকোণ। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে ত্রিকোণ রোপণই শ্রেয় কারণ এতে খরচ অনেক কম। এবং জমিও কম লাগে। ত্রিকোণ রোপাইএ চৌকোণ রোপাই-এর চেয়ে প্রায় বারো চোদ্দটা বীজ বেশী রোপণ করা যায়।

বীজ রোপণের পর বীজের সারগুলি খড় দিয়ে এক পরিমাণ উঁচু করে বিছিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ এতে একাধারে বৃষ্টির কোপ থেকে বীজকে রক্ষা করে আবার ঐ সংগে রোদের তাপে মাটির শৈত্য বিলোপ হয় না। যেই চারাগুলি মাথা উঁচিয়ে ওঠে সংগে সংগে খড়গুলো সরিয়ে দিতে হয়।

এছাড়া আজকাল অনেকে বেডের ওপরে চার পাঁচ ফুট উঁচু করে আর একটা ছাউনি দেয়। এই ছাউনি প্রবল বারিপাত বা প্রখর সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করে। তবে এই ছাউনি তৈরি করার সময়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে ঝড় বা বৃষ্টিতে সেটা ভেঙে না যায়। কারণ ভেঙে বা উড়ে গিয়ে যদি চারাগাছের ওপর পড়ে তাহলে চারা নষ্ট হয়ে যাবে।

পালংবাড়ির জমিতে জলীয় ভাগ বেশী থাকা প্রয়োজন। এইজন্য গ্রীষ্মকালে জলের বিশেষ দরকার। এই সময়ে বৃষ্টি বড় একটা হয় না তাই ঝাঁঝরি দিয়ে সমভাবে জল পৌঁছাতে হয়। এছাড়া শীত বা বসন্তে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে গাছে পোকামাকড় ধরার আশংকা থাকে না।

এখানে বলে রাখা উচিত যে পালংবাড়ির চারা গাছের ভয়ংকর শত্রু হচ্ছে পোকামাকড়। এই পোকা-মাকড়ও এক রকমের নয়। এর জাতি এবং প্রকার ভেদ আছে। এর মধ্যে Cricket, E lworm (Hetro-dera marioni), Black Aphis (Ceylonia theacola) এবং Red spider বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই জাতীয় পোকামাকড়ের মধ্যে Cricket সাধারণত গাছের গোড়ার নিকটে মাটিতে গর্ত করে থাকে। এই পোকাগুলো চারাগাছগুলির নরম শিকড় কেটে দিয়ে বিশেষ ক্ষতি করে। এই পোকার জন্ম মাটিতেই হয়। এর হাত থেকে কতকটা রক্ষা পাওয়া যায় যদি পালং বাড়ি তৈরি করবার কয়েক মাস পূর্বে জমিতে গোবর মল বা সবুজ সার বেশ ভাল করে কয়েকবার কোদালী মারা হয় এবং ঐ সময়ে জমিটাকে সমস্তরকম জংলি লতাপাতা আগাছা থেকে মুক্ত রাখা যায়। গোবর জল ব্যবহার করতেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ কাঁচা গোবর অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এথেকে আরো অনেক পোকামাকড়ের জন্ম হয়। তাই এই গোবর জমা করে উত্তমরূপে শুকিয়ে খড়খড়ে করে নিয়ে ব্যবহার করাই যুক্তিসংগত। অনেকে তাজা গোবরও ব্যবহার করে থাকে কিন্তু তা পালংবাড়ি তৈরি করার অনেক আগে নির্দিষ্ট জমির ওপর ছিটিয়ে দেয়। রোদে সেগুলো শুকিয়ে যায় তারপর কাড়া যায়ে। তবে এই পদ্ধতি বিশেষ যুক্তিসংগত নয়। কারণ এতে অনেক ক্ষেত্রে গোবরের অপব্যবহার হয়। গরুবাছুর পশুপক্ষী ও লোক চলাচলের ফলে ঐগুলো আসল জমি থেকে অন্যত্র সরে

যায়। আর এছাড়া আরো একটা মারাত্মক দিক আছে এর। যদি হঠাৎ কোন বৃষ্টি হয় তাহলে সেগুলো ধুয়ে জলের সঙ্গে অন্য কোথাও চলে যাবে শুধু এ নয়, আধো শুকনো গোবর জল পেয়ে থাক্ থাক্ করে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে জন্ম নেবে অনেক প্রকার পোকামাকড়।

এই সব প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও ক্রিকেটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এই সময়ে পোকাগুলি ধরে মেরে ফেলে দিতে হয়। ধরা খুব সোজা নয়। কারণ শব্দ অথবা কোন কাঠিকুটির শব্দ পেলেই তারা আরো মাটির নীচে চলে যায়। এইজন্য বাগানের ম্যানেজার কতকগুলো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েকে এই কাজে নিযুক্ত করে। তারা একটা টিনে কিছু পরিমাণ ঘন লুব্রিকেটিং তেল আর জল সঙ্গে নিয়ে যায়। ক্রিকেটের গর্ত খুঁড়ে বার করে সেখানকার মাটিটা সরিয়ে গর্তটা পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা তেল ঢেলে দেয় তারপর সমস্ত গর্ত ভর্তি করে দেয় জলে। ফলে পোকাগুলোর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসায় বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন ছেলেমেয়েরা হুড়োহুড়ি করে পোকা-গুলো ধরে তাদের বাঁশের চোঙার মধ্যে পুরে রাখে যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে। এতে তাদের অপার আনন্দ। কারণ প্রতি পোকা পিছু তারা দু' একটা পয়সা পায় ম্যানেজারের কাছ থেকে। এই সামান্য পয়সা ক'টির মূল্য তাদের কাছে রাঙ্গার ধনের সামিল। অনেকে আগে থেকেই কোন কিছু পরিকল্পনা তৈরি করে রাখে মনে মনে। মুখটা সরস হয়, অলক্ষে জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'টো ভিজিয়ে নেয়। অথবা হাত দুটো সুড়সুড় করে। শেষে একখানা শুকনো নীরস জিলিপি অথবা একটা জুলোরি কিংবা বেগুনির স্বাদে সমস্ত দেহে মনে একটা অপূর্ব স্পন্দন দেখা দেয়। কেউ অনেক দিনের সাধ মিটায় একটা লাটিম অথবা মার্বেল কিনে। লাটিম ঘুরতে থাকে ভোঁ ভোঁ করে ঐ সঙ্গে ওদের মনটাও ঘোরে, নাচে। মার্বেল ছোটে সঙ্গে সঙ্গে ওরাও অন্য রাস্তা ছোটে।

Eelworm (He terodera Marioni) ও বিশেষ ক্ষতিকারক। এই পোকা অনেক সময়ে সমস্ত গাছ-বাড়িটি উজাড় করে দেয়। এসওয়ার্মের প্রতিরোধ করা একান্তই অসম্ভব। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আক্রান্ত চারাটিকে তুলে ফেলিয়ে দেওয়া। এই পোকা চারা গাছের শিকড়ে ধরে। সাধারণতঃ বর্ষা শেষেই এর আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকা অতি ক্ষুদ্র। খালি চোখে একে দেখা যায় না। পোকাগুলো এক ইঞ্চির ছাব্বিশ সাতাশ ভাগের একটা অংশের পরিমাণ লম্বা। একে দেখতে হলে আতসী কাচ ব্যবহারের প্রয়োজন। আক্রান্ত গাছটিকে মাটি খুঁড়ে শিকড় সমেত তুললে দেখতে পাওয়া যায় শিকড়ে অনেক জায়গা ফুলো ফুলো। এখানেই ওদের বাস। এর কোন ওষুধ নেই। তবে দেখা গেছে পালংবাড়ির বেড্ তৈরি করার পূর্বে যদি জমিতে খড় বা জঙ্গল জালিয়ে নেওয়া হয় তা হলে তেমন একটা মারাত্মক আক্রমণের ভয় থাকে না।

Black aphis (coyloria theae cola) পূর্বোক্ত দুই প্রকার পোকার মত মারাত্মক নয় এবং এর প্রতিরোধ করবার উপায়ও আছে। এই পোকা ধরলে গাছের পাতাগুলি কুঁকড়ে যায়। এই সময়ে খুব অল্প পরিমাণ গন্ধক ছিটিয়ে বা জলে গোলা করে দিলে পোকা মরে।

পালংবাড়ির আর এক শত্রু হচ্ছে Red-spider বা লাল মুতো পোকা। এই পোকা হলে গাছের পাতা ও ডালগুলোতে কেমন একটা লালচে দাগ পড়ে। হাতে করলে বোঝা যায় পাতাগুলো আগের মত মসৃণ নেই আর ভারীও হয়েছে ওজনে। এই পোকার আক্রমণ হয় দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টিতে। তাই এর আক্রমণ সাধা-রণতঃ দেখতে পাওয়া যায় মার্চ এপ্রিলে। আবার মে থেকে ঘন বৃষ্টি শুরু হলে অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আপনা থেকেই পোকাগুলো অপসৃত হয়ে গেছে। অবশ্য এই রোগেও গন্ধক উপকারী।

এছাড়া আরো অনেক প্রকার পোকা আছে। Brown Grey Copper and blister blights. এতেও Sulpher Sclution বা গন্ধক ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

এই সমস্ত পোকামাকড় সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলবার ও জানবার আছে। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা

সম্ভবপর নয়। তবে কাজ চলার মত একটা মোটা-মুটি অভিজ্ঞতার জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আরো কিছু বলে এই পোকা মাকড় সম্বন্ধে পর্ব শেষ করবো।

১৯০০ সাল পর্যন্ত এই পোকা মাকড় নিয়ে তেমন কোন মাথা ঘামাঘামি হয় নাই। আর হলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এর ফলে যখন অনেক বাগান এক রকম নষ্ট হয়ে যায় তখন ১৯০১ সালে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে এদিকে। এই সময় থেকে সমস্ত দেশের সরকারই কৃষি-কার্যের উন্নতিকল্পে উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরা অনেক বৈজ্ঞানিক ও কৃষিবিদকে পোকা-মাকড় সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করার জন্য নিযুক্ত করেন।

১৯০১ সালে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন গভর্ণমেণ্টের নিকট হতে গ্রাণ্ট নিয়ে একজন বিজ্ঞানবিদ নিযুক্ত করেন। এর পর আস্তে আস্তে এখন তো ভারতে, সিংহলে এবং জাভাতে অনেক বিজ্ঞানবিদ এই পোকা মাকড়ের প্রতি-ষেধক উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। শেষে ১৯০৮ সালে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনের Chief Scientific Officer এ যাবৎকাল (অর্থাৎ ১৯০১ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত) যে কাজ করেছেন তার একটা বিবরণী দেন। এই বিবরণী "Empire Journal of Experimental Agriculture" এ ছাপা হয়। বিবরণীর মূল নাম "The application of Science to modern Tea Culture। এতে তিনি Pests and diseases সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। "In no part of tea culture has Scientific investigation had a greater effect than in the recognition and control of pests and bliglts. Before Scientific investigation came to tea, little or nothing was known concerning Insect parts exept that they were doing damage."

তিনি এখানে আরো বলেছেন যে এই দীর্ঘ সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছরের পর্যালোচনার ফলে যে সমস্ত প্রতি-ষেধক আবিষ্কার করা হয়েছে এতে Root diseaes এ গাছের যে পরিমান মৃত্যু হার ছিল তা কমে গিয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় দাঁড়িয়েছে।

তিনি আরো বলেন—পাতার রোগ যথাযথ পরিমাণে নিয়মিত গন্ধক বা গন্ধক গোলা জলে ছিটিয়ে অথবা একটা হালকা কলম দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পোকা যদি কলম করা জায়গাটির গোড়াতে লাগে তা হলে একে রোধ করা খুবই শক্ত। এই ক্ষেত্রে ভারী কলম (Heavy Pruning) একান্ত ভাবে প্রয়োজন। তবে সমস্ত সময়েই মনে রাখা দরকার যে গাছের বয়স এবং শক্তি অনুযায়ী গন্ধক জলের পরিমাণ বা মাত্রা ঠিক করতে হবে। গাছ দুর্বল হলে তাতে যদি মাত্রা বেশি দেওয়া হয় তা হলে হিতে বিপরীত হবে। এই মাত্রা নিরূপণে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এখানে পুঁথি-পত্তরের ধারাবাহিক নিয়মের ব্যতিক্রম হবেই।

আজকাল অনেক কোম্পানী অনেক রকম রেডিমেড্ লাইম-সালফর সলিউসন' তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে থাকেন এই রেডিমেড্ সালফর-সলিউসনের প্রত্যেকের একটা স্কেল আছে। একে বলা হয় Baume scale। এতে এক থেকে ১৭০ Gravity (ঘনত্ব) পর্যন্ত Baume র Degree ঠিক করা আছে। এই সুযোগ-সুবিধা পাওয়াতে আজকাল আর বাগানে কেউ গন্ধক-জল তৈরি করেন না। সকলেই প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত Gravityর Sulpher solution কিনে ব্যবহার করেন।

এর মধ্যে অনেক পোকা-মাকড়ের আবির্ভাবের একটা সঠিক কাল বা সময় আছে। আবার স্বাভাবিক ধারাতেই সরে পড়ে। ডিমগুলি রয়ে যায় গাছের কোন বাকল, শুঁড়ি বা পুরনো পাতাতে। শেষে আবার সময় বা কাল এলেই তারা ডিম থেকে ফুটে বেরিয়ে আসে। এই সমস্ত পোকা মাকড়ের ভেতর Red spider বা লাল মুতো বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ-কথা আগেই উল্লেখ করেছি। Mosquito blight সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

অনেকে এই সমস্ত পোকার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এদের আবির্ভাব বা সম্ভাবনার আগেই গাছগুলি কলম করার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালেই গন্ধক ছিটিয়ে দেয়। এতে যে ভাল ফল পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনেকে গন্ধক জলের চেয়েও গুঁড়ো

গন্ধক ব্যবহার করে থাকেন। এই গুঁড়ো ব্যবহারেরও একটা পদ্ধতি বা নিয়ম আছে বিশেষ করে পালংবাড়ির ক্ষেত্রে। টুকরো মলমল কাপড়ের মধ্যে গন্ধক নিয়ে কাপড়টা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গাছের সর্বাঙ্গে দিতে হয়। এই কাজ খুব সকালে করা দরকার, রোদ ওঠার আগেই। কারণ রোদ উঠলেই পাতার শিশির শুকিয়ে পাতাটা খড় খড়ে হয়ে যায়। এতে গন্ধকটা একটু বাতাস হলেই অন্যত্র উড়ে যায় তাই শিশির থাকতে ভিজে পাতায় দিলে তা আঠার মত লেগে থাকে। এই সময়ে আর একটা দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। আকাশ মেঘলা থাকলে এ কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। কারণ বৃষ্টি পেলেই সে-সব ধুয়ে-মুছে যাবে। এই ক্ষেত্রে তিন চার দিন, কম পক্ষে দুই দিন বৃষ্টি না হলেই ভাল।

আর এক জাতীয় মশা বা পোকা আছে যা চা গাছের বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটা শত্রু। একে বলা হয় "Tea mosquito Bug (Helopeltio tocivora) এই পোকার উপদ্রব সাধারণত ডুয়ার্স তেরাই সুর্মাভ্যালি অঞ্চলের বাগানগুলিতেই বেশি দৃষ্ট হয়। জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মশা বা পোকা তিন চার বছরের মধ্যে দার্জিলিং এবং তেরাই অঞ্চলের কতকগুলি বাগান সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দেয়। এই সম্বন্ধে Mr. E. A. Andrews. Entomologist to the Indian Tea Association এক সময়ে বলেছেন—"This Insect is thrust Into the plant tissues with its long axis perpendicular to the surface and is completely embedded. By being thus embedded in the plant tissues the eggs are completely protected from the action of Insecticides or ovicides. এতেই স্পষ্টত বোঝা যায় যে এ রোগের বীজাণু ভিতরে। সুতরাং বাইরের insecticides-এ কোনই সুফল পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানবিদ এবং কৃষিবিদদের অনেক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে উপযুক্ত চাষ-আবাদের অভাবেই এই পোকার উৎপত্তি। এ বিষয়ে অনেক কিছু বলবার আছে। পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলো।

মৃত্যুর চোখে জল

[একাঙ্কিকা]

মনোজ মিত্র

★

[সিঁড়ির মুখে এ ঘরখানায় কেউ নজর দেয় না। দেয়ালের চুনবালি ঝরছে, কালিঝুলিতে অপরিচ্ছন্ন। মাঝখানে ও কোণাকুণি ডানদিকে দুটো পুরোনো জীর্ণ দরজা। ডানদিকের দরজার পেছনে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। বাঁদিকে চেপে কপাট-ভাঙা জানালা। এমন অবহেলার ছাপ থাকলে কি হবে, এই ঘরের ওপর দিয়েই বাড়ীতে ঢুকতে-বেরুতে হয়। ঘরটি রবির বাইবছরের কন্যা পড়ুটে পিতা বঙ্কিমের। জানালার নিচে ভাঙা তক্তপোষ, ঠিক তার পাশে বহুকেলে পুরোনো মিটসেফ আর একটা টুল। আসবাব বলতে এই। একটা শাড়ির ছেঁড়া পাড় টাঙিয়ে কতুয়া ঝুলোনো। অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্তরের সংগে দেখা যায় মিটসেফের ভেতরে ও ওপরে একরাশ ওষুধের শিশি-বোতল, মোড়ক, পেটেন্ট ওষুধের প্যাকেট, তালপাতার পাখা ও আরো অনেককিছু। একপাশে একটা জলের কুঁজো। তক্তপোষের নীচে একটা ভাঙা সুটকেস, একটা কুড়ির মধ্যে আরো কিছু শিশি বোতল, সামনের দিকে একজোড়া বেঢপ জুতো পড়ে আছে।]

[পর্দা উঠলে দেখা গেল বঙ্কিম তক্তপোষে বসে দৃষ্টিহীন চোখে একটা ওষুধের শিশির লেবেল পড়ছে। কিছুবাদে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে খোঁজে। তার পর হতাশ হয়ে চাদর গায়ে শুয়ে পড়ে। একটু বাদে কথা বলতে বলতে ডাক্তার সেনের প্রবেশ। চিন্তিত শম্ভু পেছনে।]

সেন। না, না ভয়ের কোন কারণ নেই। একটুতেই অতো ভেঙে পড়লে চলে? বাচ্চা ছেলে, ওর ভেতরের অস্বস্তির কথা তোমরা কিছুই বুঝতে পারছো না। তাই সবকিছুই এমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। [হঠাৎ সচেতন হয়ে] কই?

শম্ভু। আপনি এখানে এলেন বৌদির ঘরে।

সেন। ওহোঃ তাইতো। এই দেখ, তোমাদের বাড়ীতে আগে যা দু-একবার এসেছি, এই ঘরেই এসেছি কিনা। অন্যমনস্কভাবে আজো তাই দাঁড়িয়ে পড়েছি।...তা শম্ভু, তোমার বাবা এখন আছেন কেমন? এই সন্ধ্যেবেলায় এমন বেশ চুপচাপ ঘুমুচ্ছেন দেখেছি।

শম্ভু। ওঁর আর চুপ করে ঘুমোনো। ঘরটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন না, আপনার গোটা ডিসপেন-সারিটা ঘর যেন খাবে। ঘুমুচ্ছেন, তাও দেখুন মুঠোয় ওষুধের শিশি।

সেন। [একটু হেসে] তাইতো দেখছি! তা কি আর করবে বলো? একটি দুটি দিনতো নয়। দীর্ঘ পনেরোটা বছর ভুগছেন। বয়েসও এখন কম হোল না। এমন ঐ ঐভাবে যে কটা দিন যায়...হ্যাঁ চলো...

শম্ভু। চলুন।

[শম্ভু ও সেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়]

বঙ্কিম। [হঠাৎ জেগে] কে? কে যাও? রবি ফিরলে নাকি? ওরে পদো...রবির মা...ও রবির মা...

[বিরক্ত মুখে নীহার সিঁড়ি দিয়ে নামে]

নীহার। ডাকাডাকি করে তো বাড়ী মাথায় তুলেছো! গলায় জোরও আছে বাপু।...কি, ডাকছো কেন বলো?

বঙ্কিম। না ডাকলে তো একবার এপথে হাঁটতে-কাশতেও আসো না। [চাদরের তলা থেকে শিশিটা বার করে] দেখ দেখি, কি ওষুধ এটা।

নীহার। রাতদিন তোমার ঘরে বসে ওষুধ দেখি আমি! খেয়ে দেখ কী ওষুধ। পেটের না তোমার হার্টের।

বঙ্কিম। বেশ বলো যাহোক। হোক শেষে একটা মালিশের ওষুধ। খেয়ে মরি আমি!

নীহার। তা মরো যদি তুমি ঐ ওষুধ ওষুধ করেই মরবে। সময়ে অসময়ে অতো ভক্তি করে মানুষ যে দেবদেবীর প্রসাদও খায় না!

বঙ্কিম। এমনো বলো তুমি।

নীহার। বলি বড় সাধে!

বঙ্কিম। মরার জন্যে আমি ওষুধ খাই নাকি?

নীহার। এখনো বাঁচার ইচ্ছে আছে তোমার?

বঙ্কিম। হ্যাঁ, বাঁচার ইচ্ছে! সে ইচ্ছে থাকলে কবে এতদিন দুকৌটা মালিশের ওষুধ জিবে ঠেকিয়ে তোমাদের হাত থেকে বাঁচতাম! দিনরাত ঐ বাঁচা নিয়ে আমায় খোটা দেওয়া!···নাও, দেখ দেখি, কী ওষুধ একটা···

নীহার। [ওষুধটা দেখে] নাও, বুকের মালিশ।

বঙ্কিম। হ্যাঁ, মালিশ না আরো কিছু!···কই, কাচের গেলাশটা কই? আমার পাশে সব গুছিয়ে রাখ। ছটার ঘণ্টা সেই কখন বেজে গেছে, শিশির সেবেলটা পড়ে দেওয়ার আর সময় হোল না কারুর!

নীহার। দু-দশটা মিনিট এপাশ-ওপাশ হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না তোমার। আর ঘন্টা হোক, পনের বছর ধরে নিক্তিমাপা সময়ে কেউ তোমায় ওষুধ খাওয়াতে পারবে না।···চোখের মাথা খেয়েছে? সুখ-অসুখ নেই আর মানুষের!

বঙ্কিম। (নিজেকে সামলে) আমি তোমার কথা বলছি না। কিন্তু বাড়ীতে তো আরো প্রাণী আছে।

নীহার। তাদের তো আমার মত কপাল পোড়েনি···সব সময় তোমায় কোলে নিয়ে বসে থাকবে!

বঙ্কিম। হ্যাঁ—। তুমি তো কতো একেবারে আমার সেবা করছো! সকাল থেকে কতক্ষণ এঘরে এসেছো তুমি···

নীহার। লজ্জাসরম বেচে খাইনি আমি।

বঙ্কিম। আমি সেই দুপুরবেলা তেষ্টায় মরতে মরতে কুঁজোটার পাশে যাই···গিয়ে দেখি পাশে গেলাস নেই। গেলাশ ঐ ওপাশে টুলের ওপর। বলো ঐ গেলাশ এনে জল খাওয়ার সামর্থ এখন আর আছে আমার? আছে···

নীহার। না কোন সামর্থ নেই তোমার! আছে কেবল গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবার সামর্থ!···তোমার জ্বালায় যে মুখ দেখবার উপায় নেই আমার!··· দুপুরে থেকে কচি ছেলেটা যে জ্বরে বেহুঁশ···সে খবর রাখো?

বঙ্কিম। (নিস্পৃহস্বরে) আবার জ্বর হোল কার?

নীহার। সেবেলায় তুমি অজয়, আজ পাঁচদিন যে রবির ছেলেটার জ্বর ছাড়ছে না, সে খবর রাখো? ছেলেমানুষ বৌটাকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করেছো। তা নয়, ওরা মরুক-বাঁচুক সে আমার দেখার দরকার নেই···আমি কেবল ওদের কাছে ঠিক সময়ে সেবা চাই···পথ্য চাই··· ওষুধ চাই···

বঙ্কিম। হ্যাঁ, চাইলেই যেন পাচ্ছি আমি! রোগে রোগে খুন হয়ে গেলাম! আজ কদিন বুকে সেই যন্ত্রণাটা আবার উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে···তা চেয়ে দেখ, কটা ওষুধ আছে···

নীহার। আরো ওষুধ চাই তোমার?

বঙ্কিম। রবিকে শম্ভুকে বলে বলে মুখ তেতো হয়ে গেল আমার। সেই কবে ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করে দিয়ে গেছে। তারপর তো আর একবার এনে দেখাতে হয়! রুগ্ন শরীরে কখন কি হয়!

নীহার। ঐ রোগ রোগ করে পাগল হয়ে গেছ তুমি!

বঙ্কিম। আর তুমি! তোমাকে যে কাল থেকে বলছি, সকালে একটু মুখে দিই, এমন একটা দ্রব্য ঘরে নেই···ওপর থেকে একটু হরলিক্স্ এনে দাও···তা কানে তুলেছো কথাটা?

নীহার। চুপ করো।

বঙ্কিম। আমি তো চুপ করবো!···পরশু বলে গেল এই বড় একটা হরলিক্স্এর বোতল এসেছে খোকার জন্যে!

নীহার। না, খোকার জন্যে আসবে না, আসবে তোমার জন্যে! তাদের কুলে বাতি দেবে তুমি! (নিজের মনে) সে সব গেছে, জ্ঞানবুদ্ধি লজ্জাসরম সে সব আর নেই··· [প্রস্থানোদ্যত]

বঙ্কিম। ওকি, আবার যাচ্ছ কোথায়?

নীহার। কি বলবে বলো। ডাক্তারবাবু এসেছেন, আমি এখানে বসতে পারবো না।

বঙ্কিম। (চঞ্চল হয়ে) কি? ডাক্তার এসেছে? কখন, কোথায় ডাক্তার? আচ্ছা আমায় একবার ডাকনি কেন?

নীহার। ডাকলে কি করতে?

বঙ্কিম। বেশ বলো যাহোক। ডাক্তারের কাছে কি একটা দরকার নাকি আমার?

নীহার। উঃ তুমি মানুষ না। ছেলেটাকে নিয়ে বাছারা আমার নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে···এরমধ্যে তোমার আবার উঠিয়ে উঠলো।

বঙ্কিম। এমনো বলো তুমি! ডাক্তার বাড়ীর ওপর, আমায় একবার না দেখে···

নীহার। তুমি থামবে? ছেলে-বৌ শুনলে কি মনে করবে?

বঙ্কিম। কেন, আমার রোগটা রোগ না?

নীহার। রোগ রোগ কোর না, এমনিতেই মরার বয়েস হয়েছে তোমার। [প্রস্থানোদ্যত]

বঙ্কিম। যাচ্ছ কোথায়?

নীহার। তোমায় নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

বঙ্কিম। তোমার দেখি সব আলাদা! রোগীর কাছে থাকে না আবার কোন মানুষটা?

নীহার। সখ দেখিও না। কচি ছেলেটা জ্বরে বেহুঁশ···

বঙ্কিম। [রাগত স্বরে] তুমি কি ওখানে যাচ্ছ?

নীহার। যাচ্ছি।

বঙ্কিম। শোন···

নীহার। (সরে আসে) কি বলবে বলো।

বঙ্কিম। কিছু বলবে না তো? (ক্ষুব্ধ স্বরে) তুমি তো সব কথাতেই···

[দরজায় অফিস ফেরত রবি। হাতে আঙুরের ঠোঙা নীহার পিছিয়ে আসে]

রবি। মা, তুমি যে এখানে? খোকা কেমন?

নীহার। সেন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে শম্ভু।

রবি। তবে তো একই রকম। তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে···

বঙ্কিম। রবি, অফিস থেকে ফিরলে?

রবি। হ্যাঁ।

নীহার। [রেগে] ফিরলো, কেন?

বঙ্কিম। না, বলছিলাম কি ছেলেপিলের ওরকম মাঝে মাঝে গা গরম হয়। ও নিয়ে অতো ভাবতে গেলে চলে না। একবার আমার এই নির্দেশপত্রটা পড়ে দিও তো···বাড়ীতে একটা লোক নেই যে পড়ে! ক চামচ করে কখন কখন দেতে হবে। আচ্ছা দেখ দেখি, কোন কোন ভিটামিন···

নীহার। আঃ। জামাকাপড়টা ছাড়তে দাও ওকে। তুই যা বাবা, ওপরে বৌমা একা···

রবি। (বঙ্কিম কে) দে ক' চামচ সব, খান।

বঙ্কিম। হ্যাঁ যে ক' চামচ। বেশ বলো যা হোক। জেনো, ওষুধ সব বিষ। একটু বেশি মাত্রা হলে···

রবি। বিষ হলে খাবেন না।

নীহার। পারিসনে, ধরে বেঁধে একশিশি একদিন পালের মধ্যে উপুড় করে দিতে পারিসনে?

রবি। যাচ্ছ যাও ওসব। তুমি এই আঙুর কটা শিগগির-শিগগির একটু গরম জলে ধোও দেখি···

বঙ্কিম। আবার আঙুর আনলে কেন? এখনকার আঙুর সব টক। ডাক্তার আমাকেই তাই···

রবি। ধুয়ে রস করে ওপরে নিয়ে এসো। আমি চললাম। [রবির প্রস্থান]

নীহার। (একটু চুপ করে থেকে) কই, কই, তোমার গেলাস? জল-জল করে তো পাগল করে তুলেছো।

বঙ্কিম। জল আবার চেয়েছি কখন?

নীহার। না চাইলেই দিচ্ছি আমি! দুপুর থেকেই তো···

বঙ্কিম। খালিপেটে জল-পড়া ভাল না।

নীহার। (সন্দিগ্ধ স্বরে) কী?

বঙ্কিম। লেবুও তো নেই। থাক গে···দাও দুটো আঙুরই না হয়·····

[বঙ্কিম হাত বাড়ায়। নীহার দিতে যায়। দ্রুত পদোর প্রবেশ]

পদো। উঁ-হু-হু। একটা ফল কম পড়লে চলবে না। যেখানকার আঙুর সেখানে যাবে। ডাক্তারবাবু বললেন, খোকা ও খেতে পারবে না। ঠিক। কই শিগ্‌গির দিন।

নীহার। অসুখে বিসুখে টাকার নয়ছয়। যা কেবতই না হয় দিয়ে আয়।

বঙ্কিম। ওরে পদো, গেলাসটা খুঁজে একগেলাস জল ভরে দেতো···

পদো। কী যে বলেন, তার বদিশ নেই। ঐ পয়সা কেবত নিয়ে এখুনি মুসুম্বি লেবু কিনে আনতে হবে। কই, আঙুরগুলো দিন, আর একবার ওপরে যান বৌদিমণি ডাকছেন।

[পদোর হাতে আঙুর দিয়ে নীহার বেরিয়ে যেতে চায়]

বঙ্কিম। তাড়াতাড়ি এসো যেন।

নীহার। কেন? কোন রাজকার্যে?

বঙ্কিম। না, ঐ ঠিক সাতটার সময় আবার হাটের ওষুধ খেতে হবে তো…

নীহার। ঐ ওষুধের শিশিগুলো মুখে গুঁজে শুয়ে থাক তুমি। [নীহারের প্রস্থান]

পদো। টাইম মেপে ওষুধ খেতে পারেন, কথা বলতে পারেন না?

বঙ্কিম। (চিৎকার করে) তুই থাম।

[সিঁড়ি দিয়ে কথা বলতে বলতে সেন ও শম্ভু নামছে]

শম্ভু। কী? আবার চেঁচামেচি কিসের?…কি হয়েছে রে পদো?

বঙ্কিম। তোরা কেন এ হতভাগাটাকে বেঁচেছিস রে শম্ভু? আমার কোন উপকার হবার নয় এর দ্বারা!

শম্ভু। আঃ। এসময়ও তুমি চিৎকার করে বাড়ী কাটাবে? রোগ-শোকও মানবে না তুমি?

বঙ্কিম। রোগ-শোক মানার মতো লোক আছে নাকি এ বাড়ীতে? এই লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরটাকে…

শম্ভু। ওকে বোক না। অসময়ে তোমার চেয়ে বেশি উপকার হচ্ছে ওকে দিয়ে। (পদোকে) যা তুই…

[পদোর বাড়ীর বাইরে প্রস্থান]

হ্যাঁ, কি বলছিলেন ডাক্তারবাবু?

বঙ্কিম। (চমকে) কে? ডাক্তার নাকি গো?

শম্ভু। হ্যাঁ। কী হবে কী?

বঙ্কিম। তুমি একবার এদিক দিয়ে একটু ঘুরে যেও তো ডাক্তার। দুপুর থেকে বুকের সেই যন্ত্রণাটা…

শম্ভু। কী? কী আরম্ভ করলে তুমি?

বঙ্কিম। না, ঠিক আগের মতো নয়, বুঝেছ ডাক্তার, সে রকম নয়। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন বুকের দুপাশে একটা ধাক্কা…

শম্ভু। চুপ করো।

বঙ্কিম। (এবার শম্ভুকে) চুপ করবো কি রে? ডাক্তার বাড়ীর ওপর আমি চুপ করে থাকবো?

শম্ভু। (অপেক্ষাকৃত জোরে) হ্যাঁ থাকবে।

বঙ্কিম। বেশ। (একটু চুপ করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে) তা অন্ততঃ এইটা পড়ে দিক ডাক্তার। ওষুধটা যে কোন মাত্রায় খেতে হবে, তাই বলে দেবার লোক হোল না।

শম্ভু। লোক না হয় যেও না। তাই বলে আলাতন করতে পারবে না। চুপ করে বসে থাক।

[বঙ্কিম বিড় বিড় করতে করতে চুপ করে]

সেন। এ সময় কখনো মাথা গরম করলে চলে?

শম্ভু। এখন কেমন ডাক্তারবাবু?

সেন। এখুনি একটা ওষুধ কিনে আনতে হবে আধ ঘন্টার মধ্যেই…

শম্ভু। কোন আশা নেই?

সেন। উঁহু। নার্ভাস হয়ে পড়ো না।

প্রথম সন্তানে। ওদের মুখের দিকে চেয়ে

শম্ভু। কী করি বলুন দেখি

সেন। টাকা দিয়ে এখুনি কাউকে পাঠিয়ে দাও ওষুধটা আনতে। যাও দেরি কোর না।

[শম্ভু সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়—

হঠাৎ বঙ্কিম স্বপ্নোত্থিতের মতো]

বঙ্কিম। পদো, ও পদো। ওরে কে আছিস, পদোকে একবার ডেকে দিস্ তো…

শম্ভু। [ঘুরে, রেগে] কেন, কী হবে?

বঙ্কিম। [নির্বিকারভাবে] আমার বুকের মালিসটা একেবারে ফুরিয়ে গেছে

শম্ভু। আর একশোটা ওষুধ নতুন করে কেনা হবে না তোমার জন্যে। যা আছে ঐ দিয়ে যে ক'দিন পারো বেঁচে থাকো।

[শম্ভুর প্রস্থান]

বঙ্কিম। বেশ বলিস যাহোক। ওরে কতকগুলো খালি শিশি গুঁকে যদি বেঁচে থাকা যেতো, তবে আর ডাক্তার-বদ্যিকে ডাকতো না লোকে

[শম্ভু চলে গেছে দেখে]

[জোরে] তার মানে তোরা চাস আমি যেন আর না বাঁচি। আর বেঁচে কাজও নেই আমার! কে, ডাক্তার?

সেন। [কাছে এসে] মিছিমিছি আপনি চীৎকার করছেন। বাড়ীর ভেতর একটা life and deathএর struggle চলছে…

বঙ্কিম। আর আমার বুঝি মৃত্যু ঘটতে পারে না?

সেন। সে কথা নয়। আপনি বুড়ো মানুষ, ওদিকে একটা শিশু। রবিবাবুর প্রথম সন্তান। আপনার পুত্রবধূর কথা একবার ভাবুন।

বঙ্কিম। রোগীমাত্রই শিশু। আমার দিকে কে তাকাচ্ছে?

সেন। আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না।

বঙ্কিম। বোঝাতে হবে না। আমি বুঝতে চাই না।... তুমি একবার আমার বুকটা দেখ দেখি...আমি যেন...

সেন। বাপ-মার সংগে সংগে ছেলেটির জন্যে আমারো দুশ্চিন্তা কম নয়। রবিবাবুর কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো বলুন তো?

বঙ্কিম। বেশ বলো যাহোক। আমি তো আজ তিন মাস ধরে রবি ও শম্ভুকে বলছি, তোমাকে একবার 'কল্' দেওয়ার জন্যে। কমপক্ষে পনেরো দিন অন্তর আমার মতো একটা রোগীকে পরীক্ষা করা উচিত।

[রবির প্রবেশ]

রবি। এই যে সেন, তুমি এখানে?

সেন। হ্যাঁ। ওষুধটা আনা হয়েছে কি? ওটা না আসা পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই ভাই...

বঙ্কিম। [অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে] করারই যখন কিছু নেই...তুমি যখন বলছই ডাক্তার...তখন আমায় একবার দেখে নিলে পারতে

রবি। [চাপা বিরক্তিতে] এই সিঁড়ির মুখ থেকে আপনাকে সরাতে হবে। কাকপক্ষীর পা বাড়ানোর উপায় নেই এই বারান্দায়!

[ওষুধ নিয়ে পদোর প্রবেশ]

পদো। এই যে ডাক্তারবাবু, ওষুধ এনেছি।

সেন। এনেছো? কই দাও। চলো রবি।

রবি। তুমি যাও। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।

সেন। ভেঙ্গে পড়ো না ভাই।

(কথা বলতে বলতে ওরা যায়)

সেন। এত বাড়াবাড়ি, অথচ আগে আমায় একটা খবর দিলে না?

রবি। প্রথমে অতো বুঝতে পারিনি ··· তাছাড়া না-না ঝামেলায় একেবারে ··· (উভয়ের প্রস্থান)

বঙ্কিম। (ক্লান্ত স্বরে) কোন দোকান থেকে আনলি রে ওষুধ?

পদো। ওঃ সে কি এখানে?

এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম।

বঙ্কিম। এতো তাড়াতাড়ি ছুটতে পারিস তুই?

পদো। ধোকার অসুখ। আজ আমি হাতীর মত হাঁটবো!

বঙ্কিম। যা, কলতলা থেকে আমার পিকদানিটা নিয়ে আয় শিগ্‌গির।

পদো। দয়ামায়া বলতে শরীরে নেই আপনার। বল্লাম, এতোটা পথ হেঁটে এলাম, একটু আরাম বিশ্রাম দরকার হয় না? (শম্ভুর প্রবেশ)

শম্ভু। এই পদো, আবার যেতে হবে যে!

পদো। তাতে কি হয়েছে? বলুন ছোটদা, কোথায় যেতে হবে?

শম্ভু। যেতে হবে ঘোষের বাজারে।

পদো। সেতো যাচ্ছি। কী আনতে হবে বলুন।

শম্ভু। কী আনতে হবে? এই ভাখ, ভুলে গেলা আবার। আয়, আয় ওপরে আয়।

পদো। চলুন।

বঙ্কিম। সেই ঘোষের বাজারেই যাচ্ছিস যখন পদো···

শম্ভু। নাঃ। বিরক্ত করে মারলে দেখছি। তোমার চিৎকারের জ্বালায় কি কিছু মনে রাখবার উপায় আছে? কেউ একটি কথাও বলবে না তুমি।

বঙ্কিম। বেশ বলিস যাহোক। কথা বলবো না কি রে? ওষুধ পথ্য দরকার হলেও বলবো না?

শম্ভু। না। বলবে না।

বঙ্কিম। কিন্তু বুঝে ভাখ শম্ভু। ওষুধপত্তর কেনায় এমন হেলাফেলা করলে রোগ যে আরো বেড়ে যাবে। মানে, তখন তোদেরি আবার···

শম্ভু। কিছু হবে না। কিছু হবে না আমাদের।

বঙ্কিম। বেশ বলিস যাহোক।

শম্ভু। ঠিকই বলছি।

বঙ্কিম। কি বলছিস তুই?

শম্ভু। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। একটি কথাও যেন আর কানে না যায় আমাদের। চল পদো।

পদো। এত করে বল্লেও তো মানুষ বোকে···

শম্ভু। তুই থাম!

পদো। চলুন।

[শম্ভু ও পদোর প্রস্থান]

বঙ্কিম। (আপন মনে) এখন কিছু খেয়াল করবি না। না করিস, করিস নে। এবার আবার হার্টের এ্যাটাক হলে···এই শরীরে··· (অপেক্ষাকৃত জোরে) একেবারে মরণাপন্ন না হলে তো তোদের টনক নড়বে না। শেষে ছোট পদো···ছোট শম্ভু···আন ওষুধ···আন হরলিক্স্।

[বাইরে যাওয়ার মুখে পদো]

পদো। খোকা হরলিক্স্ পাবে না।

বঙ্কিম। আমি খোকার কথা বলছি না।

পদো। নিজের কথা বলছেন? তা বলুন।

[পদোর প্রস্থান]

বঙ্কিম। পদো···এই পদো···ওরে শুনে যা। (জানালায় একজনকে দেখা যায়) কে যাও? একবার শুনে যেও তো! (লোকটি ওপরে চলে যায়) রবির মা, বলি ও রবির মা, তোমরা কে আছো···আমার এই জানালাটা বন্ধ করে দিও তো... কে রে জানালায় কে?

[জানালার পাশে রবির স্ত্রী কণিকা। একটা জলের গ্লাস দু-হাতে ধরে]

কণিকা। আমি।

বঙ্কিম। কে? বৌমা?

কণিকা। (ভেতরে ঢুকে) হ্যাঁ।

বঙ্কিম। তোমার হাতে ওটা কি?

কণিকা। জল।

বঙ্কিম। (সাগ্রহে) জল?

কণিকা। ডাক্তারবাবুর হাত ধোয়ার জল।...খোকা এখন একটু ভাল।

বঙ্কিম। তবে ডাক্তার বাবুকে একটু ডেকে দিও তো...

কণিকা। আজ সারারাত উনি খোকার ঘরে থাকবেন বলেছেন। এখনো ভয় কাটেনি।

বঙ্কিম। মিনিট দুয়েকের জন্যে।

কণিকা। সব সময় থাকবেন। বাচ্চা ছেলেমেয়ের ভেতরে কখন কি হয় আমরা সব বুঝতে পারি না।

বঙ্কিম। তবে এই কাগজটা নিয়ে যাও। শোন, একটু আড়ালে এটা পড়িয়ে এনো। রবি শম্ভু যেন জানতে না পারে।

কণিকা। আমার দুহাতে জোড়া।

বঙ্কিম। তা ওটা নামিয়ে রেখে নিয়ে যাও। আমায় যে এখুনি ওষুধ খেতে হবে। ...আচ্ছা কটা বেজেছে বৌমা?

কণিকা। প্রায় সাতটা বাজলো।

বঙ্কিম। আহা, 'প্রায়' বললে তো চলে না।

ঠিক সময়টিতে না খেলে ফল হবে

ঠিক কটা বেজেছে?

কণিকা। (বিরক্ত স্বরে) চোখের সামনে তো ঘড়ি নেই।

বঙ্কিম। তাতো বুঝতে পারছি। আমার ঘরের ঘড়িটা তখন তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে গেলে। তা যাক... সাতটা বাজলো বোধহয়?

কণিকা। বল্লাম তো, বলতে পারবো না।

বঙ্কিম। তোমায় আর বলতে হবে না। ওষুধ খাওয়ার সময় হলে আমি ঠিক বুঝতে পারি সাতটা বেজেছে। [বঙ্কিম ধীরে ধীরে মিটসেফের কাছে যায় ও ওষুধ খোঁজে] তুমি আমার ওষুধ-খাওয়া গেলাসটা নিয়ে এসো···

কণিকা। খোকার ঘর থেকে সেটা ভেঙে গেছে।

বঙ্কিম। [ঘুরে] কি? [কাঁপতে কাঁপতে এসে তক্তপোষে বসে] ভেঙে গেছে? নাঃ, তোমরা আমার একটা জিনিস একটু নজর দিয়ে রাখতে পারো না। ওষুধের মাপে দাগ কাটা ছিল ঐ গেলাসের গায়ে। আমি এখন কি করি বলো দেখি···· করে ভাবছো কি?

কণিকা। [চমকে] এ্যাঁ? কিছু না।

বঙ্কিম। তা কিছু একটা ভাবো। সাতটা বাজলো প্রায়। এখন কি দাঁড়িয়ে থাকবার সময়?

কণিকা। এমনো বাড়ী! কোনখানে দুদণ্ড তিষ্ঠোবার উপায় নেই।

বঙ্কিম। আহা, এখন কি দাঁড়াবার সময়? জীবন-মৃত্যুর সমস্যা! তোমরা তো সব খেলা খেলা ভাবো···

কণিকা। আমি ঠিক জানি এ বাড়ীতে খো

বঙ্কিম। খোকার কথা কে বলেছে?

[শম্ভু আসছে। বঙ্কিম চুপ করলো]

শম্ভু। বৌদি, ও বৌদি, একটু জল আনতে গিয়ে···কি? এখানে কি করছ?

বঙ্কিম। কে? শম্ভু নাকি রে?

শম্ভু। হ্যাঁ। আচ্ছা বৌদি, ডাক্তারবাবুতো বললই শুনলে, ওর কোন কারণ নেই। জ্বর এখন ছাড়ার মুখে। তবে কেন তুমি মন খারাপ করে নীচে এসে দাঁড়িয়েছে?

কণিকা। না, মন খারাপ করলাম কই? আমি তো জল নিয়ে যাচ্ছিলাম।

শম্ভু। [বঙ্কিমকে] তবে তুমি আটকে রেখেছ? আচ্ছা কি বলে তুমি এসময়···

বঙ্কিম। তোরা সবাই খোকার কাছে রয়েছিস, আমা তো একজন লোক চাই।

শম্ভু। তাই জলজ্যান্ত ওকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছ! না, নেহাতই তুমি ছেলেমানুষ বৌদি।

কণিকা। আমি কি করবো বলো? উনি যদি একটু বিবেচনা না করেন।

শম্ভু। উনি করবেন বিবেচনা? তবেই হয়েছে! যাও, শিগগির জল নিয়ে যাও। হ্যাঁ শোন, নোতুন যে হরলিক্সটা আছে, ওটা আর ভেঙোনা। খোকা হরলিক্স্ খাবে না।

কণিকা। আচ্ছা।

[কণিকার প্রস্থান। শম্ভু মিটসেফের দিকে এগিয়ে যায়।]

বঙ্কিম। বৌমা, ও বৌমা।

শম্ভু। আবার ডাকছ কেন?

বঙ্কিম। আমার ঘরের আলো···

শম্ভু। এখনো সন্ধ্যে হয়নি। এর মধ্যে আলো না হলে থাকতে পারছো না?

বঙ্কিম। আরতো বেশি দেরি নেই সন্ধ্যের।

শম্ভু। না থাক্। এখন আলো পাওয়া যাবে না।

বঙ্কিম। কেন রে?

শম্ভু। অতো কৈফিয়ৎ দেওয়ার সময় নেই। ডাক্তারবাবুর ওখানে তিনটে আলো লাগছে।

[শম্ভু দ্রুত মিটসেফের ভেতর কি খোঁজে

বঙ্কিম। [শঙ্কিত] কী খুঁজছিস তুই?

শম্ভু। দূর! যতো ছাইভস্মে মিটসেফটা ভরাট।

বঙ্কিম। ওতে তোদের কিছু নেই।

শম্ভু। আছে কি না আছে আমি দেখছি।···পদো পদো

[পদোর প্রবেশ]

পদো। এইতো ছোটদা।

শম্ভু। নে ফেলে দেতো এগুলো।

বঙ্কিম। ওরে না, না। ওর মধ্যে কোথায় কি আছে! আমায় কি মারবি তোরা? ওরে পদো, একটা আলো জেলে দে···

পদো। আলো কি পড়বো?

বঙ্কিম। ওরে, তোর কি চাই বলনা।

শম্ভু। একটা ওষুধ বাটা খলনুড়ি ছিল না!

বঙ্কিম। আছে, কিন্তু সেতো দেওয়া যাবে না।

শম্ভু। দেওয়া যাবে না কি?

বঙ্কিম। হ্যাঁ, দেওয়া যাবে না।

শম্ভু। কি বক্ বক্ করছো! কোথায় রেখেছো?

[রবির প্রবেশ]

রবি। কিরে শম্ভু, পেলি?

পদো। উনি তা লুকিয়ে রেখেছেন।

শম্ভু। কোথায় রেখেছ দাও।

বঙ্কিম। রবি, এই ভাখ। আরেকটু বাদে যে হজমি বড়ি বেটে খেতে হবে···বড়ি না খেলে আবার···

রবি। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? শিগগির দিন।

পদো। এই যে দাদাবাবু, পেয়েছি।

শম্ভু। যা, শিগগির নিয়ে যা।

[খলনুড়ি নিয়ে পদোর প্রস্থান]

বঙ্কিম। ওরে পদো···রবির মা···

রবি। চিৎকার করছেন কেন?

বঙ্কিম। ওরে, আমার ঘরের আলো?

শম্ভু। আলো নেই।

বঙ্কিম। অন্ধকার হয়ে আসছে।

শম্ভু। আসুক।

বঙ্কিম। আমি অন্ধকারে থাকবো?

শম্ভু। থাকবে।

[দ্রুত পদোর প্রবেশ]

পদো। দাদাবাবু, শিগগির আসুন···খোকন···

রবি। খোকন? খোকন কি?

পদো। খোকন কেমন করছে।

শম্ভু। চলু দেখি···

রবি। খোকন কেমন করছে···?

[বলতে বলতে শম্ভু ও রবির প্রস্থান]

বঙ্কিম। (বুক চেপে) পদো···

পদো। কী? কী বলছেন কী? সারাক্ষণ পদো পদো! দাদাবাবুরা ডাকেন বলে, আপনি কি জেদ করে ডাকেন?

বঙ্কিম। (খুব কষ্টের সংগে) একবার এদিকে আ

পদো। বাড়ীর আপদবিপদও বোঝেন না?

বঙ্কিম। একবার বুকে হাত রাখ···

পদো। কেন, খোকার মতো আপনারো বুকে কাশি জমেছে নাকি?

বঙ্কিম। একবার রবিকে ডাক···

পদো। বড়বাবুর কি মাথার ঠিক আছে?

বঙ্কিম। তবে শম্ভুকে ডাক···

পদো। কেন অনর্থক চেঁচাচ্ছেন?

বঙ্কিম। (সামলে) ওরে পদো, আমি কি যাবো রে? হরলিক্সটাও ভাঙা হবে না।

আপনি দেখছি ছেলেপিলেরও অধম হলেন। খোকার তো অতো খাই খাই নেই। দু-ঠোঁটের ফাঁকে যা দিচ্ছে···তাই গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। ডাবের জল···বার্লির জল···লেবুর রস···মুসুম্বির রস···

বঙ্কিম। ওরে, পাখাটা এগিয়ে দে।

[কণিকার দ্রুত প্রবেশ]

কণিকা। পাখাটা কই?

বঙ্কিম। ঐ যে পাখা। দাও দেখি বৌমা একটু বাতাস। বুকের ভেতরটা

কণিকা। (পাখা নিয়ে) পদো, শিগগির এসো ওপরে

বঙ্কিম। ওকি, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

কণিকা। এক কথার আর কতবার জবাব দোবো?

বঙ্কিম। কিন্তু পাখাটা?

কণিকা। আমাদের পাখাটা ছেড়ে গেছে।

বঙ্কিম। কিন্তু আমি?

রবি। (নেপথ্যে) কই? পাখা আনতে গিয়ে কি হোল তোমার?

[কণিকার প্রস্থান]

বঙ্কিম। পদো, ওরে পদো ডাক। শিগগির ডাক।

পদো। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

বঙ্কিম। ওরে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে··· দম আটকে আসছে···

পদো। ওসব আপনার চালাকি।

বঙ্কিম। ওরে নারে। তুই বুঝতে পারছিস না।

পদো। খুব, খুউব পারছি। পনেরো বছর ধরে দেখছি, আর বুঝতে পারবো না? যতো না রোগ, তার বেশী রোগ আপনার···

বঙ্কিম। ওরে, এতোর ছিঁচকে জ্বরকাশি না। কোন উপসর্গ নেই অথচ যে কোন মুহূর্তে আমার দম নিঃশ্বাস আটকে আসে) একটু জলের হাত রাখ বুকে।

[রবির প্রবেশ]

রবি। পদো, এই পদো, শিগগির জলের কুঁজোটা নিয়ে আয়···

বঙ্কিম। কুঁজো?

পদো। হ্যাঁ।

[কুঁজো নিয়ে পদো চলে যায়]

বঙ্কিম। ওটা নিসনে···নিসনে রবি···

রবি। আপনি একটু চুপ করুন দেখি। আপনার জন্যে যে আরো অশান্তি।

বঙ্কিম। আমার জল?

রবি। জলটাই বড় হোল? খোকা যে বাঁচেনা আর।

শম্ভু। (নেপথ্যে) ওদো শিগগির এসো।

[রবির প্রস্থান]

বঙ্কিম। রবি...রবি...

[ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো]

সাতটা...সাতটা বাজলো...ওষুধ...আমার ওষুধ··· রবির মা ও রবির মা, আমার বুকের ভেতরটা··· আমায় একটু ধরো···রবির মা, আমার একটা আলো নেই···

[বঙ্কিম উঠে দাঁড়ায়। ধরজোর নীহার। মুখের ওপর লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরেছে]

নীহার। এইতো আলো।

বঙ্কিম। কে? রবির মা?

নীহার। হুঁ।

বঙ্কিম। আমার ওষুধ। বুকে বড় চাপ লাগছে। আমি কথা বলতে পারছি না। ওকি, তুমি অমন করছ কেন!

নীহার। কী?

বঙ্কিম। কিছু বলছো না কেন?

নীহার। কই তোমার ওষুধ?

বঙ্কিম। ঐ মিটসেফের ওপর। (নীহার মিটসেফের দিকে এগিয়ে যায়) দেখো, সব ওষুধ ছড়ানো কিন্তু।

নীহার। থাকুক।

[নীহার একটা শিশি তুলে নেয়]

বঙ্কিম। ওকি, ওটা কি ওষুধ?

নীহার। বুকের ওষুধ।

বঙ্কিম। না।

নীহার। হুঁ খাও। (নীহার বঙ্কিমের দিকে এগোয়)

বঙ্কিম। না খাবো না।

নীহার। তোমায় খেতে হবে।

বঙ্কিম। (ভয়ে) রবির মা, রবির মা—

নীহার। নাও ধরো।

বঙ্কিম।

[নীহার জোর করে বঙ্কিমের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়। বঙ্কিম অস্ফুট আর্তনাদ করে তক্তাপোষে ঢলে পড়ে। মুহূর্ত নীরব। বাড়ীর মধ্যে তীক্ষ্ণ কান্নার রোল উঠলো।]

নীহার। (শীতল গলায়) রবির ছেলেটা মারা গেল। শুনেছো, রবির ছেলেটা মারা গেল—

বঙ্কিম। হুঁ।— (বঙ্কিম উঠে বসে)

নীহার। তবে কাঁদো—।

বঙ্কিম। রবির মা!

নীহার। কাঁদো শিগগির।

বঙ্কিম। রবির মা!

নীহার। কই কাঁদো।

বঙ্কিম। রবির মা, ওষুধ খেয়েও আমার বুকের চাপ কমেনি। আমার কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে।

নীহার। তবু কাঁদো।

বঙ্কিম। আমি পারবো না।

নীহার। পারবে। কেঁদে তুমি জানিয়ে দাও ওদের, আমরা দুজনে এ ঘরে এখনো বেঁচে আছি।

[চুনবালিহারা ঘরটির ভেতর বৃদ্ধ বঙ্কিম কাঁদবার অক্লান্ত চেষ্টা করছে। দৃশ্যের সমস্ত আলোক নিষ্প্রভ হয়ে ততক্ষণে কম্পমান হ্যারিকেন শিখার ওপর গিয়ে সংহত হোল।]*

—য ব নি কা—

* থিয়েটার সেন্টারের একাংক প্রতিযোগিতায় এই নাটকটি এবার প্রথম হয়েছে।

সংক্ষেপীকরণ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

আলবার্ট মালজের
দি ক্রশ এ্যাণ্ড দি এ্যারো

[লেখক পরিচিতি—খ্যাতনামা প্রগতিশীল আমেরিকান গ্রন্থকার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—The Cross and the Arrow, The Underground Stream, The Way Things Are (গল্পগ্রন্থ)। নাৎসী জার্মান যুদ্ধের পট-ভূমিকায় রচিত যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস হিসাবে The Cross and The Arrow সবিশেষ পরিচিত।]

'এই পৃথিবীতে এমন অনেক ভুল করা হয়েছে, আজ যা একটা শিশুও করতে পারে কিনা, এ বিশ্বাস কেউ করতে পারবে না। চিরকালের যে সত্য পথ, সেই পথে যাবার প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে মানুষ কত না আঁকাবাঁকা বিকৃত অপরিসর অন্ধ গলিপথ বেছে নিয়েছে। আর কতবার না, মানুষ দিকভ্রষ্ট হয়ে দিনের আলোয় দুর্ভেদ্য অংগলে প্রবেশ করেছে, নিজেদের পরস্পরের চোখে অন্ধকার কুয়াশা ছুঁড়ে দিয়েছে, মরীচিকায় মুগ্ধ হয়ে অতলস্পর্শী গহ্বরের কিনারায় গিয়ে পৌঁছেছে, তারপর আতঙ্কে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করেছে, বেরোবার পথ কোথায়, কোথায় সেই পথ ?'—নিকোলাই গোগল।

আগষ্ট বিয়াল্লিশের একটি রাত। জার্মানীর একটি গ্রাম। মাথার ওপর ব্রিটিশ বিমান ভীমরুলের মত গুনগুন করতে করতে এগিয়ে যাবে হয়ত এখনই। সকলের নিদ্রাহীন চোখে তারই অপেক্ষা। ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে এক খামারে কে যেন শুকনো তুলীকৃত ঘাসগুলো তীরের মত দাগিয়ে জ্বালিয়ে ছিল, কেউ তা জানল কি জানল না। কিন্তু সামান্য এই ঘটনার সংগে অনেকগুলো নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত ইতিহাস জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাসের এক ক্ষুব্ধ প্রশ্ন, বেরোবার পথ কোথায়, কোথায় সেই পথ ?

কৃষিপ্রধান একটি জার্মান গ্রাম। কোথা থেকে রাতো-রাতি এল এক কারখানা, শোনা গেল উঠে এসেছে ড্যুসেলডর্ফ থেকে। বোমার হাত থেকে বাঁচাতে এই ব্যবস্থা। ভয় পায় গ্রামের মানুষরা, শান্তির নীড় তাদের ব্রিটিশ বিমানের পাল্লায় টলমল করে ওঠে বুঝি। কিন্তু আকাশ থেকে এখানে যে একটা কারখানা আছে তা যাতে না বুঝতে পারা যায় তার পাকা ব্যবস্থা। শুধু রাত্রে বিমানের পরিচিত শব্দগুলোর অস্তি আর ব্লাকআউট মানার কঠিন নির্দেশ ছাড়া, তাদের অন্যান্য জীবনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হল না। যদিও তরুণী মেয়েরা এল এস গার্ডদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত মানুষের মত অস্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থায় পড়েছে, তবু ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে গ্রামের লোকেরা অসন্তুষ্ট হত না কারখানাটার ওপর। কিন্তু জার্মান সন্তান জার্মান নাগরিক উইলী ওয়েগলার, সে কেন এমন কাণ্ড করে বসল সেদিন। ব্রিটিশ বিমানগুলো কি দেখে গেল ওর এই আগুন জ্বালার নির্দেশ ?

তীর জ্বলে ওঠার সংগে সংগে ভেসে এল নারী-কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ, আর কারখানার কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে পাহারারত গার্ডের আগ্নেয়াস্ত্রে জ্বলে উঠল আগুন। কিন্তু তার আগেই কি উইলী ওয়েগলারের কাজ শেষ হয়েছে ?

না, মুক্তি নেই উইলী ওয়েগলারের কারখানার লেবর-ফ্রন্ট লীডার জুলিয়াস বাউমারের হাত থেকে। ডাক্তার জোডারের কাছে অপারেশন হয়েছে উইলীর। ওলপেটে মারাত্মক জখম হয়েছে। গুলী অনেকদূর পেটের ভেতর ঢুকে গেছে।

জুলিয়াস বাউমার এত সব কিছু শুনতে চায় না, তার শুধু মাত্র একটা কথা, 'লোকটার সংগে আমি

কথা কইতে চাই'

জোডার ঘাড় নাড়ে, 'উঁহু একটা হপ্তা ধরে ওয়েগলারের সংগে কথা বলা চলবে না, লেবার-ফ্রন্ট লীডার বাউমারেরও নয়!'

জুলিয়ার বাউমার রাগে ফেটে পড়ে, 'ওর ভাল হওয়া নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই; শুধু একবার ওর মুখের কথা শোনবার অপেক্ষা, শয়তানের মাথাটা ওর ধড় থেকে আলাদা হতে চলেছে।'

—'তাই নাকি, কিন্তু ওয়েগলার করলেটা কি, লোকটাকে কালকেইত তোমরা ওয়ার সার্ভিস ক্রস দিলে!' জোডার জিজ্ঞাসা করে।

তীরের আগুন জলেছে, এরপর কি বোমাবর্ষণ? ব্রিটিশ বিমান যদি না দেখে থাকে তাহলে হয়ত এবারের মত বাঁচা যাবে, কিন্তু শত্রু যদি হয় ওয়েগলার, তবে তাকে শেষ করতেই হবে। তাই বাউমারের এই ব্যাকুলতা ওকে কথা বলাতেই হবে ডাক্তার। বাউমারকে প্রতারণা করেছে যে লোকটা, তার বাউমারের প্রতিশোধের হাত থেকে রেহাই নেই।

ঘটনা ঘটেছে একটা, কারখানা নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্যে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কে দায়ী এ ঘটনার পেছন—সবকিছুর তদন্তে আসে গেষ্টাপো কমিশার কেহর। বাউমার পছন্দ করে না লোকটিকে কিন্তু উইলী ওয়েগলারকে অনুগত শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করে যে ভুল সে করেছে, সে ভুল সংশোধনও তাকেই করতে হবে। কিন্তু ভুল সংশোধনের আগেই যদি রাইনল্যাণ্ডেরমত বোমাবর্ষণে ভেঙে পড়ে তার সগর্বে পরিচালিত এই কারখানাটা? তাহলে পার্টির বিবেচনায় পড়ে বাউমারের সমস্ত মর্যাদা চুরমার হয়ে যাবে।

বাউমার কেহরকে বলে ঘটনার কথা, বন্দী পোলদের কথা যারা এ কারখানায় পারিশ্রমিক-হিসাবে কাজ করছে। বলে কিছু কিছু শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসিস্ট ভূতের মত ধ্যানধারনার আভাস সে পেয়েছে। অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ অবশ্য এর আগে বড় কিছু ঘটে নি। মাঝে মাঝে কারখানার যন্ত্রপাতি বিকল হওয়া ছাড়া।

কথা ওঠে কারখানার পাশে খামারের বিধবা মালিক বার্থে লিনজের সম্বন্ধে। ওরই খামারের ঘাস আলিয়েছে উইলী ওয়েগলার। ওয়েগলারের সংগে ওর বিয়ের ঠিকঠাক। সেদিন রাত্রে যে নারীর কাতর আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল, তা হল বার্থে লিনজের।

কথা বলাতে হবে উইলী ওয়েগলারকে। কিন্তু শুধু বাউমারের আদেশেই ওয়েগলারের চিকিৎসায় মগ্ন হয়ে পড়েনি জোডার। তার মনে খালি প্রশ্ন উঠেছে কে এ, কি ও? উইলী ওয়েগলারের সংগে সেদিনের জার্মানী কি উঠে এল আবার, যেদিন জোডারের জীবনের নাৎসী শাসনে অশান্তি নেমে এসেছিল। একমাত্র কন্যা এলী সহ্য করতে পারে নি নাজী অনুগত স্বামীর ভীরুতাকে। নাজীদের সাহায্যে সন্তান কেড়ে নিতে চেয়েছিল ওর স্বামী নরবার্ট; এলী নিজের হাতে শিশুসন্তানকে হত্যা করেছে স্থির চিত্তে, তবু নাজী অফিসারের হাতে সন্তানকে তুলে দেয় নি। জোডার চিন্তিত হয়েছে মেয়ের লাঞ্ছনার কথা ভেবে। পুরোন ধর্মযাজকের বদলে নতুন ধর্মযাজক ক্রিসকের কথা মনে পড়ে জোডারের। তরুণ ক্ষীণদৃষ্টি সেই যুবক ধর্মযাজক যখন ধর্মকে পার্টির ক্ষমতার বাইরে রাখার কথা বলল প্রার্থনা সমাবেশে, অস্বীকার করল পার্টির প্রতাপকে, তখন রাত্রের অন্ধকারে সেই তরুণ ধর্মযাজককেই রেলরোড ষ্টেশনে নাজী ব্রাউন-শার্টদলকে কুকুরের মত টেনে নিয়ে যেতে দেখেছে ডাঃ জোডার। তারপরইত এলী ক্ষেপে গেল। সন্তানকে মেরে এলী আত্মহত্যা করল। বউ গারট্রুডও মারা গেল; জোডার এরপর থেকে নাজীদের ঘৃণা করেছে। জোডার তাই স্বপ্ন দেখে একটা মড়কের, যে মড়কে উজাড় হয়ে যাবে গোটা জার্মান জাতটা। অবশ্য সেও মরবে তারপর, কারণ সেও ত জার্মান!

উইলী ওয়েগলার কি সেই জার্মান, যে জার্মানকে অন্তত বাউমারের নিষ্ঠুর আক্রমণের কাছে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ক্রিসকের সংগে জোডারের এই কারাগারেতেই দেখা হয়েছে, বন্দীশিবির ঘুরে ক্রিসক এসেছে এখানে। ক্রিসকের সংগে দেখা করে এ ব্যাপারটার সমাধান না করা পর্যন্ত বাউমারকে ঠেকিয়ে রাখতে হবেই।

বার্থে লিনজের ডাক পড়েছে কমিশার কেহরের কাছে। ফরাসী থেকে মার জন্যে আনা টান টান সোয়েটার পরা উদ্ধত যৌবনা বার্থে লিনজকে দেখে খুশী হয় কেহর,

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন কিছু জানতে পারে না। উইলীর বউ ব্রিটিশ বোমাবর্ষণে মারা গেছে, তার ছেলে রিচার্ড নরওয়েতে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে, ছেলের বউ স্বামীর বীরত্বের স্বীকৃতির জন্যে পেয়েছে স্বামীর মৃত্যুর পর ক্রস উপহার। এমন কিছু সন্দেহজনক কথা-বার্তাও উইলী বলত না, যাতে বোঝা যায় যে পার্টির ওপর বিরূপ। বিপত্নীক ওয়েগলার আর বিধবা বার্থে লিনজে শুধু একটা খামারের স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের বিয়ের শুধু দেরী হচ্ছিল বার্থে লিনজের ছেলে রুডীর সম্মতির জন্যে। কেহরের প্রশ্নে বার্থে লিনজে বলে তাদের খামারে কাজ করবার জন্য যে যুদ্ধবন্দী পোল কাজ করত, নাকি তার সম্বন্ধে বার্থে লিনজেকে বলেছিল, 'আমরা দুজনেই পোলের জন্যে অপরাধী।' একথার অর্থ বার্থে লিনজে বোঝেনি।

ডাক পড়ল প্যাষ্টর ফ্রিসকের। তবে কি জানাজানি হয়েগেছে উইলী ওয়েগলারের সংগে দেখা হয়েছে ফ্রিসকের। উইলী ওয়েগলারই তাকে বনের পথে আবিষ্কার করেছে রক্ত হাতে। পাহাড়ের পাথরে পাথরে পার্টিবিরোধী স্লোগান লিখেছে ফ্রিসকই। কারখানার কোরম্যান বেডনারিক তার কাছে এসে জানাল, 'মেশিন বন্ধ কর, তোমাকে পার্টি অফিসে দরকার।' তবে কি সব ধরা পড়ে গেল?

শুধু কমিশারের অফিসে ফ্রিসকেই ডেকে আনা হয় নি। ফ্রিসকের মত অপেক্ষা করছে হোইসলার, এগার্ট, পেলজ, রাফকে আর উইলার। এদের মধ্যে পেলজই সবচেয়ে ছোট, বয়স মাত্র একুশ। পেলজের কাঁধের পাশে একটা হাত নেই, ফ্রান্সের যুদ্ধে ওর এই পঙ্গুত্ববরণ। ছেলেটার মন ভিক্ততায় ভরা, কিন্তু কাকে ও দোষ দেবে জানে না। ফ্রিসক ভাবে ওর নাজী-সারে ভর্তি মাথায় চাপা পড়ে আছে একটা ক্রোধ, একটা প্রশ্ন, সে প্রশ্নের উত্তরের ওপর ওর ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

ওদের সংগে এই ব্যাপারেটার পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করে ফ্রিসক। এস এস গার্ড রুমেল বার্থে লিনজের খামারের পোলকে নিয়ে অপেক্ষা করার ঘরে ঢোকে। লোকটির বুকে 'পি' লেখা। একটা লাঞ্ছিত মন্তব্যের রূপ নিয়ে পোল বসে থাকে ভেতরে ডাকের জন্যে। সংগীদের পোলকে বিদ্রূপের কথা মনে করে যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে ফ্রিসক ভাবে, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি পোল তুমি যেন জার্মান ভাষা বুঝতে না পার। তার নেই জার্মানদের শেষ বিচারের দিনে আমিও তোমার মত সাক্ষী দেব পোল, আমারও পিঠে জার্মান চাবুকের ক্ষত-চিহ্ন লেগে রয়েছে...'

রাউম'গুকে ফিরিয়ে দিয়েছে ডাঃ জোডার। সকাল আটটার আগে উইলীর জ্ঞান ফিরবে না। উইলী অচৈতন্যের রাজত্ব থেকে ধীরে ধীরে চেতনার রাজ্যে ফিরে আসছে। ধীরে ধীরে মনে পড়ছে সব কিছু: এখনও রাত; ব্রিটিশ বোমারু বিমান আসুক, হে ভগবান। বার্থে লিনজের কথা মনে পড়ে। ঘৃণা করতে পারে না ওকে, যদিও বার্থে বাধা দিয়েছে ওকে ওর কাজে। পেটের ধকধক যন্ত্রণা আর অসহ্য পিপাসার মাঝে মনে পড়ে পুরোন দিনের কথা। শীত দিয়েই তো পরম অবহেলায় উইলী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। বন্ধু কার্ল ওর ভাই নাম দিয়েছিল, 'উইলী দি হুইইলার'। বন্ধু আর বন্ধুপত্নী ইরমাকে উইলী আর উইলীর বউ ক্যাথে ভালবাসত, কিন্তু উইলী ওদের সাদামাঠা জীবনে বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর রাজনীতিকে টেনে আনা পছন্দ করত না। কিন্তু উইলীর জীবনে কি ঘটে গেল আজ? কার্ল কি ঠিকই বলেছিল, শান্তি আর ঘুঁষ যাই বল না কেন, তুমি যদি শ্রমিক হও সব সময় তোমার ভাগ্যে এই বুলেটই জুটবে। আজ রাত্রে তাই ঠোঁট দুটো জোর করে চেপে ধরে নিঃশব্দে কাঁদে উইলী অতীতের কথা ভেবে।

...বার্থে লিনজের খামারের পোল-বন্দী কার্ল-হিট্জ কিকেন বিরোনস্কির কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করতে পারল না গেষ্টাপো কমিশার কেহর। প্যাষ্টর ফ্রিসকের পালা এল। ফ্রিসক বলল ওয়েগলার যা করেছে, আমি হলে তাকে গুলী করে মারতাম। কিন্তু ফ্রিসকের আজ মনে যে আনন্দের ঢেউ উঠেছে, তার কথা কেউ জানবে না। শীতের অন্ধকার রাত্রে নাজীদের হাতে পশুর মত ব্যবহার পেয়ে, মানুষের ওপর অনাস্থা হয়েছিল প্যাষ্টর ফ্রিসকের, সেই অনাস্থার বদলে মানুষের ওপর আস্থা এসে দিল আ

উইলীর ওয়েগলার নামে চালাই কারখানার এক শ্রমিক। মানুষ চিনতে ভুল হয় নি হিট্‌লরের।

মানুষ চিনতে বার্থেলিনজেরও ভুল হয়নি। কিন্তু দুর্বোধ্য এ উইলীকে ত ও চায়নি। ও কেন এমন কাজ করল, কেন আগুন জ্বালতে গেলো ঘাসে। কমিশার কেহলের কাছে দেশপ্রেমিকার প্রশংসা পেয়েছে বার্থে-লিনজে, কিন্তু বার্থেলিনজে কি ভাবতে পারে ওপর থেকে নীচে নেমে আসা একটা ধারালো অস্ত্রে তার প্রিয়তম উইলির মাথাটা গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। ঐ মুখে কতবার বার্থে অনুরাগ-চুম্বন এঁকেছে। বার্থে-লিনজে উইলির কাজের বিরুদ্ধে তদন্তের সময় যাই বলুক, বাসায় ফিরে এসে ও কাঁদে। এতদিন পরে বাসায় ও' সত্যিই একা।

...ওয়েগলার হাসপাতালে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে কেন ও এমন কাজ করল। শরীরের যন্ত্রণার সঙ্গে মনের এ-যন্ত্রণাটা ওকে অস্থির করে তুলেছে। মনে পড়ে হিটলার পূর্ব জার্মানীর কথা। বেশ ত ছিল ও। কিন্তু সব যেন কেমন পালটে গেল। ফ্যুরেরারকে মেনে চলতে হবে আমাদের, ইহুদীরা আমাদের শত্রু, কমিউ-নিষ্টরা শত্রু, সমস্ত কিছু কথা উইলি শোনে আর ভাবে। ছেলে রিচার্ড, রিচার্ডের বউ মেরিয়ানে সবাই যেন এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু উইলি ভাবে কার্লকে ওরা কেন মেরে ফেলল বন্দী শিবিরে। কার্লও ত' উইলির মত যুদ্ধে গিয়েছিল, কার্ল ত এক-জন জার্মান বীর সৈন্য, তবে? মনের এই দ্বন্দ্ব থেকেই কি তার স্বতন্ত্র এক নীতি তৈরী হয়ে ছিল, তাই কি উইলি ওয়েগলার শাস্তি চেয়েছিল সবসময়। তাই কি আজ হাসপাতালের এই খাটিয়ায় জার্মান প্রহরীর বন্দুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে উইলি ওয়েগলার।

...যুদ্ধ বুঝি কারখানা-সুপারিন্টেন্ডেন্ট এডমণ্ড কোহল-বার্গও চায় না, নিশ্চয় বাউমারও চায় না। ডুয়েসেল-ডর্ফে বোমাবর্ষণের অভিজ্ঞতা দুজনেরই আছে। বাউমার বুঝেছে উইলির এই কাজে অঘটন ঘটে যেতে পারে, তা আজ উৎপাদন বন্ধ রেখে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজ আগে নিতে হবে। কোহলবার্গ ভাবে আজকের রাতটা কারখানার বাইরে থাকা যায় না।

...ডুয়েসেলডর্কে বোমাবর্ষণে ক্যাথে যখন মারা গেল, তখন উইলি অভিসম্পাত দিয়েছিল আকাশের দিকে হাত তুলে ব্রিটিশ বিমানদের কিন্তু সেই নিশাচর-গুলোকে আজ সে আমন্ত্রণ করবার জন্যে এই কাজ করেছে। ক্যাথে তার ছিল সর্বস্ব, ক্যাথে ফ্যুরেরারের জার্মানীর কেউ ছিল না, ছিল উইলির প্রিয়তমা। বিরোধ বেধেছে ছেলে রিচার্ড, আর রিচার্ড মারা যাবার পর তার বউ মেরিয়ানের সঙ্গে, কিন্তু ক্যাথের মধ্যে উইলি নিজের শান্তিপ্রিয় মনটাকেই খুঁজে পেয়েছে। তাই ক্যাথেকে ভুলতেই ডুয়েসেলডর্ফ থেকে এই কার-খানায় এসে, এমন একটা শক্ত কাজের ভার ও নিল, যে-কাজের সময় সমস্ত শক্তি গুড়োগুড়ো হয়ে যায়, চিন্তা করবার কোন সময়ই থাকে না। কাজ আর কাজ, কাজের মধ্যেই ভুলতে চেয়েছে উইলি সব কিছু। আর মদ!

...রবিবার ছুটির দিন। কারখানার হোইসলার প্রমুখ সবাই কারখানার বাইরে যায় গ্রামে প্রমোদ সন্ধানে, উইলি যায় শুধু কারখানায় মদ গিলতে। আগে থেকে কেউ বলে দিতে পারে না ভাগ্যের কোন খেলায় একজন পুরুষ ও নারী পরস্পর ভালবাসবে। ঘটনাটা ঘটল আশ্চর্যভাবে।

মদ খেয়ে ফিরছিল উইলি। বৃষ্টি এল। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে উইলি পথে বার্থেলিনজের খামারে ঢুকে পড়ল। তেড়ে এল বার্থের দানিয়েল কুকুর। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে মারতে হল কুকুরটাকে। পরদিন কুকুরের আততায়ী লোকটাকে গোটা রাত ভারই ঘরের মেঝেয় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে দেখে ভয় পেল বার্থে। নেশা কেটে গেছে উইলির, সামনে তার ক্রুদ্ধা বার্থেলিনজে। কুকুরটার দাম দিতে হবে আঠার মার্ক। উইলিকে।

আঠার মার্কের ঋণ শুধতে উইলি আবার এল বার্থের খামারে। বার্থের স্বামীর অ্যাকর্ডিয়ান বাজাল উইলি। একটা আকর্ষণের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল দুজনে। কিন্তু নিবিড়তম মুহূর্তে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ক্যাথের স্মৃতি। বার্থে বিরক্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়; পরে উইলির সমস্ত কথা শুনে সান্ত্বনা দেয়। যুদ্ধের অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে চায় উইলি ওয়েগলার, বার্থের খামারে নতুন করে

জীবন সুরু করতে চায়। তাই বার্থেকে তাগাদা দেয় উইলি, 'এস আমরা বিয়ে করি'। কিন্তু বার্থের সতের বছরের ছেলে রুডীর সম্মতি না পেলে বার্থে রাজী হয় কি করে? ছুটি নিয়ে ত রুডী আসছেই, তখন কেন উইলি নিজে কথা কয়ে নিক না!

এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে রুডী এল। বার্থে ছেলের আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল; রুডী খুশি হলেই তবেই ত রুডীর খামারে উইলিকে নিয়ে তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন সফল হবে। রুডী এনেছে মা'র জন্যে কত উপহার গোলাপী রঙের রাত্রিবাস, গরমের আটসাট সোয়েটার, সুগন্ধির শিশি। রুডীকে মন্দ লাগেনি উইলিরও। কিন্তু সেই রুডী যখন ছুটি শেষ হলে চলে যাবার পরে শোনাল উইলিকে এই সব দামী দামী উপহার কোন ফ্রেঞ্চী মেয়ের ওপর হ'না দেওয়ার পর অপহরণ করে এনেছে ও, তখন রাগে দিশাহারা হয়ে পড়ল উইলি। রাস্তার পাথর কুড়িয়ে ইচ্ছে হয়েছিল জার্মান এই সতের বছরের ছেলেটার মাথাটা দু' টুকরো করে দেয় ও'। এরাই তার জার্মানী, এদের নিয়ে গর্ব করতে হবে উইলিকে।

খামারে বার্থে যখন উইলির জন্যে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল, তখন পরিবর্তন ঘটে গেছে উইলির মনে। রুডীর এই খামারে সে সুখের সংসার গড়তে পারবে না। উইলি বলে, 'আমার কথা শোন বার্থে। আমি ডাঃ গোয়েবলস নই। কিন্তু যেটা অন্যায়, যেটা লজ্জার, যেটা অপরাধ সেটা আমি জানি। যখন কোন যুবা তার মায়ের কাছে তারই ধর্ষিতা কোন মেয়ের পোশাক এনে দেয়, তখন বুঝতে পারি মানুষের মনুষ্যত্বটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। এই অন্যায় জীবনের মাঝে আমি বাঁচতে পারব না।'

বার্থে ভয় পায় খামার ছাড়তে, মিথ্যে করে বলে উইলির সন্তান তার পেটে। উইলির ক্রোধ সে শান্ত করে গোলাপী রাত্রিবাসটা পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু লুকিয়ে রাখে গরম সোয়েটার আর সুগন্ধি শিশিটা।

...কিন্তু খামারে উইলী থাকবে কি শেষ পর্যন্ত? বোধহয়, কারখানার ভার পোলদের ওপর ছেড়ে দিয়ে, সবাইকে সৈন্য হিসাবে নাম লেখানোর আহ্বান জানান হবে। এ বিপদের পূর্বাভাস কারখানার শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছে। পোলরা একদিন চাবুক আর বন্দুকের শাসনের তলায় কারখানার কাজের পরীক্ষাও দিয়ে গেল। নতুন করে যন্ত্রণা আরম্ভ হল উইলীর নিজের সহযোগী শিক্ষানবিশী পোলকে দেখে। কিন্তু হায়, উইলী যে একজন স্বতন্ত্র জার্মান, একথা পোলকে জানাবার উপায় নেই। খামারে এসে উইলী দেখল কুকুরের চেয়েও কম দামে মাত্র সতের মার্কে; বার্থে একজন পোল কিনে এনেছে তার খামারে কাজ করবার জন্যে। উইলীর পোলকে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ রাখতে চায় না বার্থে, বিরোধ বেধে ওঠে দু জনের মধ্যে। উইলী খামার থেকে বেরিয়ে পড়ে। বার্থে নিজের ক্রীতদাস পোল গোলাঘরে বন্দী। সেখান থেকে পোলকে মুক্ত করে উইলী অপরাধী মনটা শান্ত করতে চায়। ষ্টিকেন বিরোনস্কি ভয় পায়, ফিরিয়ে দেয় উইলী ওয়েগলারকে। উইলী ভেবে পায় না', এই অবস্থা থেকে কি করে ও মুক্তি পাবে?

...ডাঃ জোডার রাত্রির শিফট থেকে ফেরার পথে নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসন করতে ফ্রিসককে পাকড়াও করেছিল, জোডারের একমাত্র স্বপ্ন জার্মান ধ্বংস হোক, একজন জার্মানকেও ও বাঁচাতে চায় না, কিন্তু ফ্রিসক ডাঃ জোডারকে বোঝায় কারখানার লেবর ফ্রন্ট লীডার বাউমারই জার্মানী নয়, জার্মানী এই ওয়েগলারই। এ জার্মানকে সাহায্য না করা মনুষ্যত্বের পক্ষে অপরাধ তাই কিছুতেই বাউমারের কবলে উইলীকে ঠেলে দিলে চলবে না। উইলীকে ওরা সার্ভিস ক্রস দিয়েছে, সে শুধু উইলীকে ওরা নির্বোধ অমন্তাবনে ভেবেছিল বলে; ওরা ভেবেছিল কারখানার শ্রমিকদের যুদ্ধের মনোভাব এই ভাবেই চিঁকিয়ে রাখবে। কিন্তু উইলীই ওদের সে আশা চুরমার করে দিয়েছে। তাই বাঁচার জন্যে ওরা এখন টেক ঘুঁড়ছে, কিন্তু তাতে করে সত্যিই কি বাঁচা যাবে?

বাউমারের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে জোডার তাই ষ্টিকনিন দিচ্ছি বলে জল ইনজেকসান দেয় উইলীকে। ডাঃ জোডার ফ্রিসক আসতে হাসতে হাসতে কথাটা বলে। তারপর কেঁদে ফেলে...'প্যাষ্টর আমার মেয়েকে

। সাহায্য করিনি। শাস্তি নেই আমার, শাস্তি নেই।' শাস্তি নেই কারোর, না জেডারের, না প্যাট্রিকের, না ধনপতালের ধাউটার শুয়ে থাকা অর্ধ উন্মাদ ওয়েগলারের। টিউলারের জীবনীতে এদের কোনো নেই।

ট্রেক খোঁড়া হচ্ছে পুরোদমে। সবাই ওয়েগলারের কথা নিয়ে আলোচনা করছে গোপনে। টিকেন ডেকিকেই এই মানসিকভারসাম্যহীন কয়েদীদের অপরাধী শাস্তি দেবার জন্যে ওদের সামনে দিয়েই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। প্যাট্রিক ক্রিসক চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিয়ে পালায় ও।

গভর্নর কমিশনার ফেয়ারের হুকুমে বার্থে লিনক্লে ছ চালপাতালে উইলীর সঙ্গে দেখা করতে। জানার যা পারেনি, তা যদি পারে বার্থে লিনক্লে। দেখে কি না হয়, নিষ্পাপ অর্ধ অচেতন উইলীর লিনক্লকে দেখে কত বাক্যালাপে উত্তেজিত হয়ে ও পারে।

বার্থের কান্না শোনে উইলী কিন্তু বার্থের গায়ে যে কতটা আনা সেই দোষেটা দোষেটারটা বার্থে নিয়ে করে বলেছিল পুড়িয়ে ফেলেছে। তীব্র বিরাগে ভরে ওঠে উইলীর মেয়েটার সঙ্গে হয়ত তার জীবন জড়িয়ে যেত, যদি না সেদিন রাত্রে বন্দী পোলাকে নিয়ে বিরোধ লাগত ওদের দু-জনের।

সেদিন রাত্রে অদ্ভুত দুর্বোধ্যের মত উইলী বার্থের কাছে এল। বাউনার তাকে ওয়ার সার্ভিস ক্রস দিয়ে চায় সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে সৈন্য হিসাবে নাম লিখিয়ে অন্যদের প্রেরণা দিক, কিন্তু তা সে করবে না। এতদিন ধরে যা কিছু অপরাধ জমা হয়েছে, তার জন্যে একটা কিছু তাকে করতে হবে। এ ছাড়া তার শান্তি নেই। অনেক বছর আগে একদিন পার্কের বেঞ্চিতে বসে নিজের দুর্বলতার জন্য নিজের সঙ্গে তর্ক করেছিল; আর সেই দ্বিধার অবসরে একটি আয়া তার খাটুনি কমাবার জন্যে একটি নির্দোষ শিশুকে গ্যাস দিয়ে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ উইলীর ওপর শিশুটির দাবী ছিল, যে উইলী তার মাকে ব্যাপারটা বলে দিয়ে শিশুটিকে রক্ষা করবে। সেদিনের কাপুরুষতার লজ্জা

মানুষ এগুচ্ছে সভ্যতা এগুচ্ছে।
সভ্যতার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে
রেডারের সঙ্গে যোগাযোগ চাই-ই।

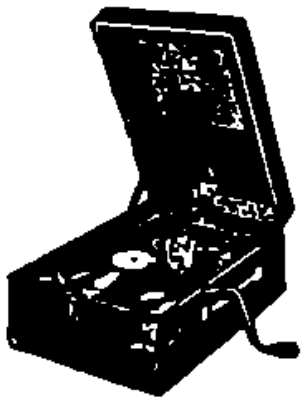

—: তার জন্য খোঁজ করুন :—
রেডিও টেক্‌নিকস্
এইচ্‌-এম-ভি ও কলোম্বিয়ার
অনুমোদিত প্রতিনিধি
৬৪এ, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, কলি-৫
ফোন : ৫৫-৪৮৩১

সকল রকমের সুন্দর ও মজবুত
বই এবং লেজার বাঁধাইয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকৃষ্ণ বুক বাঁইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০, শোভাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫।

ভুলতে পারেনি ওর মন। এখন তাকে সেই লজ্জার ঋণ শুধতে হবে। ওর ছেলে রিচার্ড, ক্যাথে আর কার্লের স্মৃতি, যে ফরাসী মেয়েকে ও কোনদিন দেখেনি তার প্রতিচ্ছবি, পোলের চোখে ক্ষমাহীন ঘৃণা সব কিছু গুছিয়ে নিজের লজ্জার প্রশ্নটাই ওকে অস্থির করে তুলেছে, তাই এই কাজটা ওকে করতেই হবে। না বার্থে, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই। সেদিন যখন তোমার খামারের কাটালাদে কেরোসিন তেল ঢেলে আমি জ্বালিয়েছিলাম তখনকার তোমার ভয়ের ব্যাপারটা আমি বুঝি, কিন্তু এই সোয়েটার ?

…চঞ্চল ফ্রিসক কোরম্যানের কাছে প্রস্রাববাবার যাবার ছুটি নিয়ে পালিয়ে আসে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সবারের অলক্ষ্যে ছোট ছোট কাগজে সে লেখে 'উইলী ওয়েগলারই ব্রিটিশদের আগুন জেলে সংকেত করেছে, পোল নয়। প্রমাণ ওয়েগলার গুলী খেয়ে হাসপাতালে রয়েছে। হিটলার আমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, ওয়েগলারের পথ অনুসরণ কর।'

পেলজের হাতে পড়ে ফ্রিসকের কাগজ। ফ্রিসককে সন্দেহ করে পেলজ। স্বেচ্ছা-সৈন্যদের সম্বর্ধনার জন্যে যে মিটিং হবে, সেখানে না গিয়ে ফ্রিসক পাঁচ-ছ মিনিট ব্যারাক বাড়িতে কি করছিল ? উইনারকে কথাটা বলে পেলজ। কিন্তু পেলজ জানত না আর একটি অশান্ত মন ফ্রিসকের মত নাজীদের ধ্বংসকামনায় তাকেই অনুসরণ করছে। ফ্রিসককে হাতে নাতে ধরতে চায় পেলজ, অনুসরণ করে পেলজ ফ্রিসককে কিন্তু তার আগে সবারের অলক্ষ্যে দুটো হাত শুদ্ধ করে দেয় পেলজকে। সে দুটো হাত উইনারের।

সভা শুরু হল। কিন্তু বাইরের আর্তনাদের সংগে সংগে বিশৃঙ্খলা নেমে এল গোটা কারখানার মধ্যস্থানে। ওদিকে হাসপাতালের খাটিয়ায় শুয়ে উদগ্র ব্যাকুলতায় উইলী শুনে যাচ্ছে এক দুই তিন…আসুক ওরা আসুক, ভগবান।

ট্রেকে দেখা হয় এপার্টের সংগে। এপার্ট আর উইনার জানল তাদের মত আরও একটা মানুষ আছে এ শয়তানের কারখানায়, সে হল প্যাটের ফ্রিসক।

বাউমারক্রোধে ভয়ে ছটফট করে নিজের অফিসে বসে। এত করেও বাঁচান গেল না বুঝি কারখানা ? এর প্রতিশোধ তারা নেবে আজ নয় কাল।

আর উইলীর সংখ্যা গোনবার দরকার নেই, দরকার নেই তুকার বিরুদ্ধে লড়াই করবার বা ব্যাণ্ডেজটা সরিয়ে দিয়ে নিজের জীবন শেষ করে দেবার। বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলোর গোলাবৃষ্টির আওয়াজ উইলী শুনতে পাচ্ছে। সব জানা হয়ে গেছে ওর। ও জানে ওর সেই তীরের সংকেত দেখা গেছে। ও জানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও সামান্য যা এই কাজটুকু করেছে, তার দাম আছে এখন, দাম পরে থাকবেও ধীরে ধীরে তাই ওর হাতটা পেটের ব্যাণ্ডেজটার দিকে এগিয়ে যায়।

পৃথিবীটা দু'টুকরো হয়ে গেল, হাসপাতালটা বুঝি ভূমিকম্পে দুলে উঠল। বাইরে বিরাট ঝড় চলেছে, টুকরো টুকরো হয়ে বাড়ী জ্বলছে, বন জ্বলছে কারখানা জ্বলছে, পৃথিবীর মাটি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

উইলীর অন্তর শেষ একটা কথা শুধু বলল, 'এখনই'। ওর সে কথার উত্তর ছিল শুদ্ধ এক হৃদস্পন্দন। গভীর প্রশান্তি নেমে আসে ওর অন্তরাত্মায়। উইলী ঘুমিয়ে পড়ল চিরতরে।

ডেভিড লো ও তাঁর কার্টুন

কমল সরকার

ীবিতকালীন সাংবাদি-
াকে কেন্দ্র করে যে
জন ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী
র্জাতিক খ্যাতিলাভ
ছেন তাঁদের মধ্যে
ভন আলেকজান্ডার
দল লো শীর্ষস্থানীয়।
। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ইনি শুধু লো নামে পরিচিত।
যদিও লো গত অর্ধশতাব্দী ধরে কার্টুন আঁকছেন
াপি তাঁর খ্যাতি এ শতাব্দীর ত্রিশ শতক থেকে
শ শতকের মধ্যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে।
ঁ কার্টুনের দুই শতাব্দীর ইতিহাসে একমাত্র পাঞ্চ
কোর স্যার জন টেনিয়েল ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির
। লোর কর্মক্ষমতার তুলনা করা চলে না। যুগপৎ
ল রাজনীতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ব্যঙ্গবোধ লোর
গ অন্য কোন শিল্পীর মধ্যে এত ব্যাপকভাবে একীভূত
ত দেখা যায় নি। তুলির স্বল্প রেখায় যে কোন
ত্র বা বস্তুর বলিষ্ঠতম প্রকাশ ডেভিড লো'কে
র্টুনের ইতিহাসে চিরকাল অমর করে রাখবে এ বিষয়ে
মতের অবকাশ তো নেই
এমন কি সবদিক থেকে
চারের মানদণ্ড হিসেবে
র কার্টুনই যে চূড়ান্ত হবে
করে একথা নিঃসন্দেহে
া যায়।

ব্রিটেনের সাংবাদিকতার
ঙ্গ জড়িত থাকা সত্ত্বেও
ার কার্টুনের জনপ্রিয়তা
ক্তরাজ্যের বাইরেও বিশেষ
সিদ্ধিলাভ করেছে। একা-
ক দেশে বিভিন্ন পত্র-
ত্রিকায় প্রকাশিত লোর
র্টুনের সংখ্যা নির্ণয়
ধ্যাতীত। পঁয়ত্রিশটি দেশে
লোর কার্টুন ছাপা হয়েছে।
কার্টুনের ইতিহাসে ব্যক্তি
হিসেবে জনপ্রিয়তার এই
দৃষ্টান্ত অদৃষ্টপূর্ব। এক্ষেত্রে
তিনি বিশ্বনাগরিক।

রাষ্ট্রের বা সরকারের
কর্ণধার না হয়েও তিনি
পরোক্ষে কূটনৈতিক সঙ্কটে জাতীয় সরকারকে নূতন
পথের সন্ধান দিয়েছেন কার্টুনের সাহায্যে। নিজের
আদর্শকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাধারাকে
প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লো পাঠকশ্রেণীর বিরাগভাজন
হয়েছেন এ দৃষ্টান্তও আছে। রাজনীতির ছকে বাঁধা
বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জল্পনা-কল্পনা যখন ব্যর্থতায়
পর্যবসিত হতে চলেছে তখন লোর কার্টুন রাজনীতির
ভেদ বুদ্ধিকে কটাক্ষ করে বিশ্বমৈত্রীর পথ নির্দেশ করেছে।

ব্রিটিশ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও লো ভারতের পরাধীনতার
মুক্তিসংগ্রামকে কোন কোন ক্ষেত্রে সহানুভূতির সঙ্গে
বিচার করেছেন। ব্রিটেনের কার্টুনের ইতিহাসে অনেক
খ্যাতনামা কার্টুনিস্ট ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে প্রকাশ্যে
হীনভাবে আক্রমণ করেছেন
এ দৃষ্টান্ত প্রচুর। ১৮৫৭
সালের ২২শে আগষ্ট
সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থ-
তাকে কটাক্ষ করে পাঞ্চে
স্যার জন টেনিয়েলের
The British Lion's
Vengence on the Bengal
tiger কার্টুন টেনিয়েলের
মত প্রতিভাকেও ভারতীয়
জনসাধারণের কাছে ঘৃণার
পাত্রে পরিণত করেছে।
গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১)
যোগদানের সময় মহাত্মাকে
ব্যঙ্গ করে "ডেলী এক্সপ্রেসে"
ট্রকের কার্টুন ভারতীয়

অষ্টমবর্ষে ডেভিড লো

এবং আয়ারল্যাণ্ডে ব্রিটিশ দমননীতির প্রতিবাদে লোর বিখ্যাত কার্টুন "Progress to Liberty—Amiltsar style" ভারত এবং আয়ারল্যাণ্ডে ব্রিটিশ দমননীতির প্রতিও প্রতিবাদ।

যদিও লো এখন ব্রিটিশ নাগরিক কিন্তু লোর জন্মভূমি নিউজিল্যাণ্ড। লো পরিবারের আদি নিবাস ছিল স্কটল্যাণ্ডে। লোর পিতামহ ছিলেন নৌবহরের ইঞ্জিনীয়ার এবং তাঁরই অভিপ্রায়ে ১৮৬০ সালে লো পরিবার নিউজিল্যাণ্ডে বসবাস শুরু করেন। ডেভিড লোর মা আভিতে আইরিশ এবং এবং তাঁদের পরিবারও প্রায় ১৮৫০ সাল থেকে নিউজিল্যাণ্ডবাসী। ১৮৯১ সালে নিউজিল্যাণ্ডের ডানডিনে লোর জন্ম হয়। ডেভিড পিতার তৃতীয় সন্তান। লো পরিবারের কুকুলে কেউ শিল্পী ছিলেন না। শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্যারিকেচার দেখে ছেলেবেলায় তিনি কার্টুনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রাইষ্টচার্চ শহরে লোর লেখাপড়া শুরু হয় কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর আকর্ষণ ছিল না বললেই চর্চার কোন নিভৃতস্থান খুঁজে না পেয়ে পিয়ানোর বড় কাঠের বাক্সটাকেই করে নিয়েছিলেন নিজের ছুটিও স্কুলের পেন্সিল এবং খাতাই ছিল শিল্পচর্চার প্রধান উপকরণ।

বাল্যকালের চেষ্টা কৈশোরেও অব্যাহত থাকে এবং আরও ব্যাপকভাবে অগ্রসর হয়। পুরোনো বইএর দোকান থেকে নিয়মিত পাঞ্চ কিনে তার অনুসরণে কার্টুন অনুশীলন করতেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছবি পাঠানো তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। এর ফলে ১৯০৮ সালে মাত্র এগারো বছর বয়সে "বিগ বাজেট" নামে অর্ধপেনী মূল্যের এক পত্রিকায় বালক ডেভিডের প্রথম একটি কার্টুন ছাপা হয়। কার্টুন প্রকাশের ফলে লো দ্বিগুণ উৎসাহে চিত্র-চর্চায় নিমগ্ন হন এবং ঐ বয়সেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও পেয়েছেন। পুরস্কৃত ছবিগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অর্থাগমের উৎসাহ ক্রমশঃ ক্রাইষ্টচার্চের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক "স্পেকটেটর

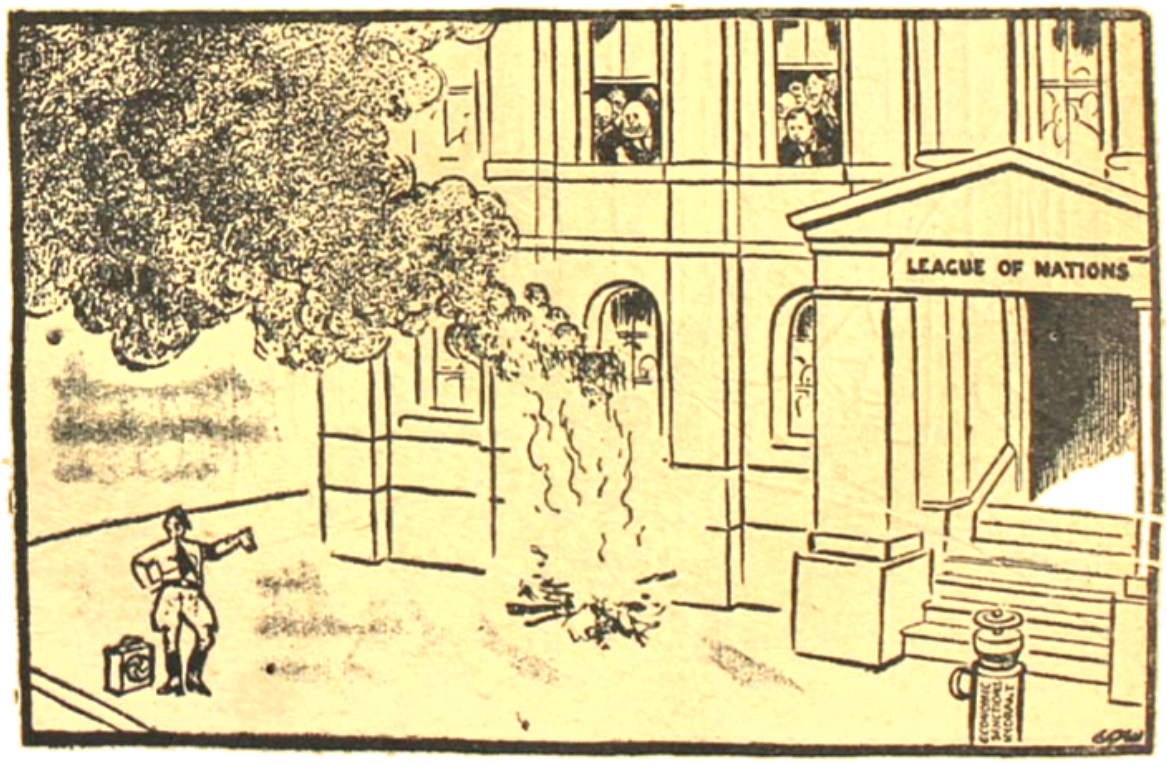

লীগ অব নেশনসে অস্ত্রসংযোগরত হিটলার। এই কার্টুনটির জন্য জার্মানীতে লোর কার্টুন নিষিদ্ধ হয়।

...ার কার্টুন পরিবেশনের কাল লো'র সুনাম ক্রমশ
...লিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং ...সে কার্টুনিষ্ট
...রে ফিরলেও ...বুলেটিন" পত্রিকাতে
...দান করেন ...কে পরপর লো
...টিনে কার্টুন আঁকেন। বুলেটিনে কার্টুন আঁকার
...তাঁর কার্টুন ব্রিটিশ সংবাদপত্র পরিচালকমণ্ডলীর
...আকর্ষণ করে এবং ব্রিটেনের অন্যতম বিখ্যাত সংবাদ-
..."ডেলীমেল" লো'কে চাকুরী গ্রহণের জন্য আহ্বান
...য়। ডেলীমেলে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৯
...ব্রিটেন আসেন

ডেলীমেলে যোগদানের পরে ডেভিড লো বিশেষভাবে
...সাহ হয়ে পড়েন পত্রিকার কর্তৃপক্ষের আচরণে।
...পক্ষের নির্দেশে তাঁকে ডেলীমেলের অন্যতম সাপ্তা
...ক "ষ্টারে" কার্টুন আঁকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
...ময়ে লো লণ্ডনের অন্যান্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকাতেও
...কিছু কার্টুন পরিবেশন করেন এদের মধ্যে
...র অন্যতম

ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ডে" যোগদান করেন। এই "ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ড" মারফৎ লো বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বছর তিনি "ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ডের" সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ডে কার্টুনিষ্ট হিসেবে তাঁর দক্ষতা এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী লর্ড বীভারব্রুক লো কে পত্রিকার নীতির বিরোধী কার্টুন আঁকবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সম্পাদকীয় কার্টুনিষ্ট হিসেবে এ বিষয়ে লো একমাত্র ব্যতিক্রম। ষ্টাণ্ডার্ডের চব্বিশ বছরের জীবনে ব্রিটেনের রাজনীতিতে সরকারী বা বিরোধী দলের এমন কোন নেতা ছিলেন না যে লো'র তুলিকে ভয় করেছেন। স্যার উইনষ্টনের মত রাজনীতিকও লো'র কার্টুন প্রসংগে তাঁর Thoughts and Adventure গ্রন্থে বলেছেন— Green-eyed young, Antipodean radical...particularly mischievous...Low's pencil is not only not servile."

ফ্যাসীবাদের অন্যতম বিরোধী হিসেবে লো'র খ্যাতি

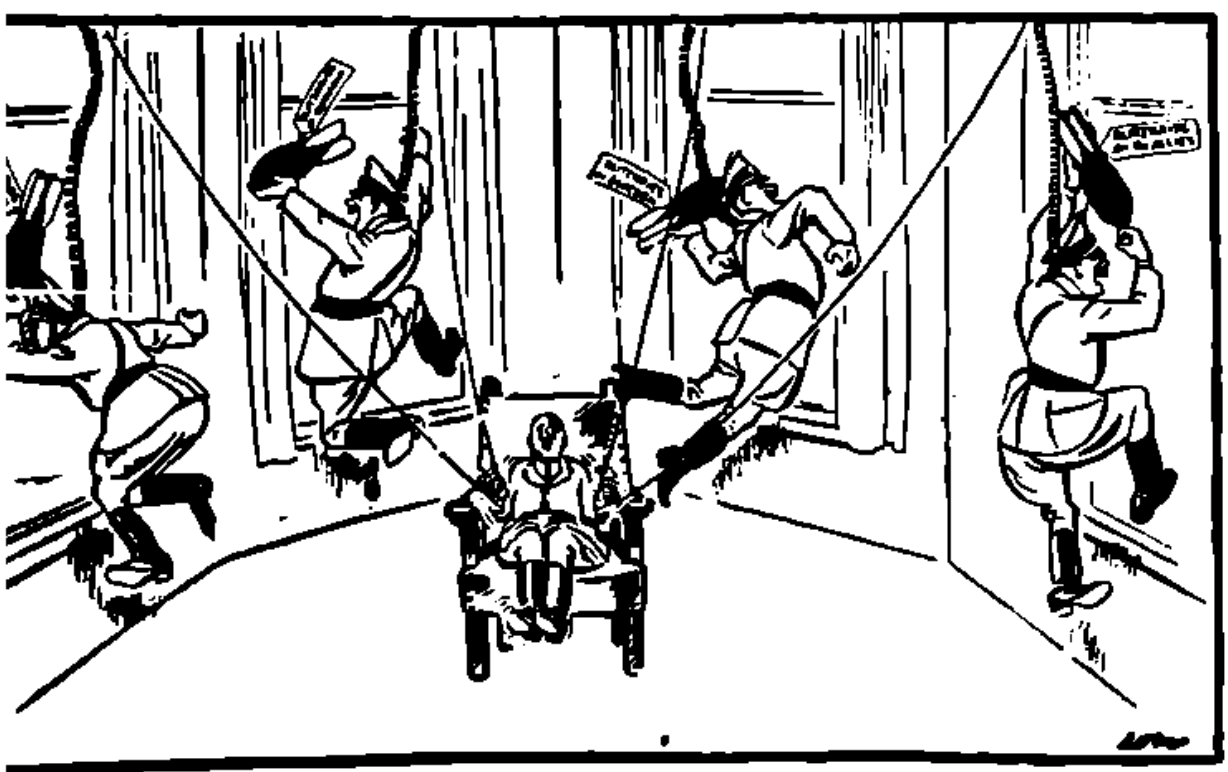

পরাজয়ের ভয়ে ভীত হিটলারের বাহিরের রূপ War of Nerves কার্টুনে নিপুণভাবে চিত্রায়িত করেন লো।

সমর্থনে। হিটলার বা মুসোলিনীর রাজনৈতিক লালসার চিত্রায়ণ তিনি বিভিন্ন কার্টুনেতে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন যে তাঁকে কোন কোন সময়ে স্তালিন বা চার্চিলের চেয়েও ফ্যাসীবাদের অধিকতর বিরোধী বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় অঙ্কিত I did it to insure your destiny কার্টুন

রাজনীতিক না হয়েও বিভিন্নক্ষেত্রে রাজনীতির উপর তাঁর কার্টুনের প্রভাব আশ্চর্যভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লো এত তীব্রভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের আক্রমণ করেছেন যে সেই আক্রমণ শেষে দুই রাষ্ট্রের মনকষাকষির অন্যতম মূল্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের উদাহরণস্বরূপ হিটলারের নাম উল্লেখযোগ্য এবং এর জন্যে হিটলারের বিদ্বেষ থেকে লো রেহাই পান নি। একদা যে হিটলারের ত্রাসে সমগ্র য়ুরোপ কেঁপে উঠেছিল সেই হিটলারও লোর তুলিকে ভয় করতেন। হিটলারকে তীব্রভাবে আক্রমণের জন্য লোর কার্টুন ১৯৩৬ সালে সমগ্র জার্মানীতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য লোর কার্টুনের বিরুদ্ধে হিটলারের উষ্মা এর কয়েক বছর আগেই প্রকাশ পেয়েছিল।

নির্বাচনে হিটলার সবেমাত্র হিণ্ডেনবুর্গকে পরাস্ত করে চ্যান্সেলার হয়েছেন (১৯৩৩) এবং প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর সর্বময় কর্তা হয়ে বসেছেন। দেশী-বিদেশী কমিউনিস্ট, সোশালিস্ট এবং ইহুদীদের ওপর হিটলারের আক্রমণ শুরু হয়েছে। লো এহিসব ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন আঁকলেন, ফলে হিটলার বিরক্ত হয়ে একদিন প্রকাশ্যে তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজদূতের কাছে লোর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বসলেন। পরোক্ষে লো কে নিবৃত্ত করার কিঞ্চিৎ উপদেশও দিলেন হিটলার। ব্রিটিশ রাজদূত অবিলম্বে হিটলারের মন্তব্যের ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছে দিলেন পরিণামে ব্রিটেনের তৎকালীন বৈদেশিক সেক্রেটারী কে ডেকে সাম্রাজ্যের এ ধরনের আক্রমনাত্মক ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কণ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু লো অবিলম্বে বৈদেশিক সেক্রেটারীকে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলেন এই ঘটনার শেষ এখানেই নয়। এরপর লো "অস্ত্রসংবরণ চুক্তিকে কেন্দ্র করে হিটলারকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ" "বাইবল ভস্মীভূত করার অপরাধে (রাইখস্টাগ), ১৯৩৩ হোয়ারোল করে বসলেন তাঁর এক কার্টুনে। ভার্সাই চুক্তির সমস্ত সর্তগুলিকে উপেক্ষা করে হিটলার এর আগেই অস্ত্রসংবরণের উদ্যোগকে বিদ্রূপ করেছেন এবং কিছুকাল পরে লীগ অব নেশনসের অপ্রয়োজনীয়তাকে উল্লেখ করে লীগের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেন হিটলারের এই আচরণের বিরুদ্ধে লো আঁকলেন "I worked at the Reichstag—why not here?' কার্টুনে দেখান হয়েছে যে হিটলার জেনেভায় লীগের

লিনি' পলাটিক্স' এবং মাইন্ড ওয়াশিং কার্টুনটি নিউ ইয়র্কে ১৯৩৩ সালের ১৮ই অক্টোবর প্রকাশিত

এই কার্টুন প্রকাশের বছর খানেক পরে হিটলার ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯ সালে লোর কার্টুন জার্মানীতে নিষিদ্ধ হয়। ১৯ সালের ১৮ই অক্টোবরের "It worked at the ch-ug v not here?" কার্টুনের জন্যই এই ব্যবস্থা

শুধু জার্মানীই নয়, ১৯২৮ সালে ইটালীতেও লোর কার্টুন নিষিদ্ধ করা হয় মুসোলিনীকে ব্যঙ্গ করার অপরাধে। ১৯৩৫ সালে ইটালীর আবিসিনীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পটভূমিকায় "The girls he left behind" নামকে কেন্দ্র করে ইটালীতে লোর কার্টুন নিষিদ্ধ হয়।

রাজনৈতিক কার্টুন ছাড়াও "কর্ণেল ব্লিম্প" নামে সামরিক ইংরেজ-চরিত্র সৃষ্টির জন্য লো যথেষ্ট দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবীণকে কেন্দ্র করে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিকে লো দীর্ঘকাল ব্যঙ্গ করেছেন। কর্ণেল ব্লিম্পকে কখনো কখনো ব্যক্তি বলে ভ্রম হয়। বস্তুতপক্ষে কর্ণেল ব্লিম্প সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। কর্ণেল ব্লিম্পের রসিকতা এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে তাকে নিয়ে একসময়ে কমন্সেও আলোচনা হয় এবং সে আলোচনায় পথিক সাহেব, হোরেস বেলিসা, স্যার ইনসকেপ এবং স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পার্লামেন্টের এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে লো ক্রিপসকে কটাক্ষ করেছেন "The end of colonel Blimp" কার্টুনে (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)। ইভনিং ষ্টান্ডার্ড থেকে পদত্যাগের ফলে কর্ণেল ব্লিম্প বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪০ সালে ফ্লিট ষ্ট্রীটকে কম্পিত করে দীর্ঘ তেইশ বছর পর লো ইভনিং ষ্টান্ডার্ড থেকে লেবার দল সমর্থক "ডেলী হেরাল্ডে" যোগ দেন ডেলী হেরাল্ডে তিন বছর থাকার পর লো পুনরায় উদারনৈতিক সংবাদপত্র "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে" যোগদান করেন এবং আজও "গার্ডিয়ানে" কার্টুন আঁকছেন।

দীর্ঘকাল ধরে কার্টুন আঁকার পথিকৃৎ অভিজ্ঞতা

লোর অন্যতম বিখ্যাত কার্টুন Ordered and Decoration

সত্ত্বেও. একটি কার্টুন আঁকতে লোর দীর্ঘ সময় লাগে। কার্টুন পিছু লো নূন্যপক্ষে আটঘণ্টা সময় নিয়ে থাকেন।

ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি লোর সংগে উপযাচক হয়ে আলাপ করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড লোর কার্টুনের একজন অনুরাগী ছিলেন। লোর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তিনি উপযাচক হয়ে লো-কে তাঁর অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান এক চিঠিতে। ১৯৩৮ সালের ১২ই নভেম্বর ফ্রয়েড প্রথম এই চিঠি লিখে লোর সংগে পরিচিত হয়েছিলেন।

A Jewish refugee from vienna, a very old man personally unknown to you, cannot resist the impulse to tell you how much he aJmires your glorious art and your inexorable, unfailing criticism. একমাত্র ফ্রয়েডই নয় বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির সংগে লোর সান্নিধ্যলাভ ঘটে তাঁর কার্টুনকে কেন্দ্র করে। এঁদের মধ্যে চেম্বারলেন, রুজভেল্ট, মহাত্মা গান্ধী, বার্ণার্ড শ, নেহরু, এইচ জি, ওয়েলস, মম, লাম্বি ওডহাউস, সিসিল বি ডি মিলোর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট লোর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং লোর একটি মূল কার্টুন তিনি সংগ্রহ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি লোর শ্রদ্ধা অপরিসীম। রাউণ্ড-টেবিল বৈঠককালীন যখন গান্ধীজী কমন্সের সর্বদলীয় এম-পিদের সভায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন তখন লো মহাত্মাকে প্রথম দেখেন। এরপর একাধিকবার তিনি গান্ধীজীর সংগে মিলিত হয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। গান্ধীজী ছাড়াও নেহরুর অন্তরঙ্গ গুণমুগ্ধ লো। লো তাঁর আত্মচরিতে নেহরু প্রসংগে বলেছেন—"Nehru, whom I met a little latter (গান্ধীজীর সংগে পরিচিত হবার কিছু পরে), impressed me strongly, too, but in a different way. An Indian Cripps, blend of idealism and practically, far more political talent than Gandhi, but less inner sunshine."

কিছুকাল আগে কর্নেল ব্লিম্পের মত "ওয়ার্ল্ড সিটিজেন নামে এক নিরীহ ভালো মানুষের কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেন লো। বিশ্বনাগরিকের চরিত্রের সাহায্যে সত্যি কারের ভালো মানুষ যে এযুগে অচল লো সেইকথাই প্রতিপন্ন করেছেন বিভিন্ন ক্যারিকেচারে তথাকথিত প্রগতি আধুনিক মনুষ্য সমাজকে কতটা হৃদয়হীন করেছে তার জলন্ত প্রমাণ এই ওয়ার্ল্ড সিটিজেন।

শক্তির বলে বলীয়ান মানুষ আজ মানুষের উপর আস্থা রাখে না। মানুষের স্বভাবের কারণ মানুষ। কিন্তু এই সত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষের উপর এই আস্থা হারায় নি সবার উপরে মানুষ এই সত্যই এই বৃদ্ধের জীবন দর্শনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং তাঁরই বিচিত্র চিত্রায়ন আজও করে চলেছেন।

ভান গ্যখের খেদোক্তি থেকে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন আছে। জমকা । নয় বলে চো'খের আড়'লে
রয়ে গেছে। মন আছে উঁচুনিচু সিঁড়ি সন্তর্পণে
বেয়ে নামো। অন্ধকার বুঝি ! হোক ! কঠিন চাতালে
পাতো ঋজু ! দেহ দৃঢ়। আ কের সুদীর্ঘ খননে
এখানে পৌঁছাবে হাসি, পৃথিবীর সহজ আধারে।

কিন্তু থা'ক ! ভেবে দেখো ! কটি প্রাণ অরণ্য-সংসারে
জীবন আঁকড়ে ধরি ! পুরাণ-বর্ণিত কৃকলাশ,
অন্ধকার বিভীষিকা ! বেঁচে থাকা ভীষণ বিলাস
নয় কী। আবার স্বপ্ন ! মর্মান্তিক, অসহ্য কৌতুক !
কী করে সামাল দিই ! এরি মধ্যে খুঁজি স্বস্তিসুখ !

প্রেম ও সংসার চা'ই। চাই কটি সন্তান, প্রেয়সী
মনের মতন। নেই কোনো খাদ। সহজ চাওয়ায়
সায় দেবে সকলেই। বাধা নেই। নেই তীক্ষ্ণ অসি
ঝন্‌ঝন্। তবু দেখো, পেলে নাকো। শূন্য হাওয়ায়
কথা ডুবে গেল সহজেই। যেই কোন্‌খানে ! তল
কোথা বল ! দেখো, কত অনায়াসে লুপ্ত হোল স্মৃতি!
মানে প্রেম—ভালোবাসা, নরম গলায় যাকে বল !
বিপ্রলব্ধ ! শূন্য। দিন কাবারে পাত—এই রীতি !

না-পেলে ওসব। ক্ষতি কী বা ! ভেবেদেখো, সামুদ্রিক
স্বপ্নে তুমি সুবিশাল। কেউ জানেনাকো। ঢেউফেনা
তুমি বোঝো। রক্তমাংস বৃথা। তুমি জানো, হে নাবিক
তোমার ও-চোখ দেখে অদৃশ্য-ইঙ্গিত। ভাঙবে না
যে-ভাস্কর্য কুঁদে তোলো ঝড়ে জলে প্রখর সন্তাপে।
একে একে সব গেল প্রেয়সী ও প্রেম। দেখো, কাঁপে
তোমার গভীর স্পর্শে বিস্ফারিত গূঢ় সম্ভাবনা !

স্বপ্ন আছে ! জমকালো নয় বলে কেউ বুঝল না !

বাতায়ন

অশোক মুখোপাধ্যায়

তারপর দিন নেভে, জ্বলে অন্ধকার,
বিস্মৃতির মত এক প্রাগৈতিহাসিক
মায়াবী নির্মোকে ঢাকা ঘরের দেয়ালে
টিকটিকি লাল চোখে চেয়ে বসে থাকে ;
আর এক বুকচাপা গুমোটের পাখি
কি অসহ বেদনায় মাথা কুটে মরে।

তখন মোমের আলো জ্বেলে আমি সেই
অন্ধকারের জলে ভীরু ক'টি ঢেউ
তুলে দিই : আধো ছায়া আলোর কুহকে
খুলে বসি গ্রন্থ কোন : প্রজ্ঞার নীলে
খুঁজে পাই অপরূপ মুক্তির আকাশ।

আমার এ ছোট ঘরে কোন ঘুলঘুলি
নেই, তবু দুঃখ নেই, শুধু আছে যেন
মনের নিভৃতে এক থাকে বাতায়ন।

দুধের স্বাদ

অমরেন্দ্র ঘোষ

ভাদ্রের একটা গুমোট বিকেল। অফিস থেকে বেরুবামাত্র মনে হবে কে যেন একটা ধোঁয়াটে ময়লা পেয়ালা দিয়ে চেপে ধরেছে। ছিঃ কাঁহুনে বৃষ্টি। কখনো আছে কখনো নেই। পথঘাট চটচটে। জুতোয়, মাথায়, ছাতায় চারদিক অন্ধকার। দিব্যি খাবি খাচ্ছে আর কিলবিল করছে মেয়ে-পুরুষ। কেউ কেরানী, কেউ বয়, কেউ বা পিয়ন। বাড়ি ফেরবার ঝামেলা এবার। এবার শাড়ি ব্লাউজ পায়জামা ছেঁড়া, কিংবা মানুষের ছঁকে আটকাবার পালা। নিত্য এক ঝুটিং। তবু ধরতে হবে ট্রাম-বাস। হাতল কামড়ে ঝুলে, নয়ত বাঁড়-চাপটা হয়ে পৌঁছুতেই হবে গন্তব্যে। দু-চার জন ফ্লিপ করে হাসপাতালে। একান্ত দৌভাগ্য যার, সে লাসকাটা ঘরে।

বিভূতি ভাবছে। একেবারে চরম হয়ে ভাবছে। একটা কেন্নো তার মর্মে পিল পিল করে চলেছে অজস্র সরু সরু পায়। শুধু তাকে তুলনা করা চলে কোনো এক বিগত যৌবনার সংগে। যদি ভুল করেও কোনো এক রাত্তিরে গায় হতে পড়েছে—ব্যস।

বিভূতি তেমনি খিঁচিয়ে রয়েছে আজ কদিন। এখন গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে এই বিচিত্র মানুষগুলোর অড়াআড়ি হুড়োহুড়ি। ভ্যাপসা গরমে সে ঘামছে আর চোখ মেলে দেখছে ঠেলাঠেলি। একটু আগে পৌঁছবার জন্য কি মোরামি! এখন দশটায় হাজিরা নয়, পাঁচটায় ছুটি। তবু কতদূর স্বার্থপর হতে পারে এই শিক্ষিত ধোপ-দোরস্ত মানুষগুলো! তিনখানা ট্রাম চলে গেল। দুখানা বাস। তবু ঐ বুড়ো ভদ্রলোক একটু আয়গা পেলেন না ভিতরে গলার। পরের গাড়িতে আসুন, পরের গাড়িতে। ভদ্রলোক ভিজছেন, ঘামছেন, শুকাচ্ছেন আবার ছুটলেন হন্যে হয়ে। এবারও সেই মুখোসপরা মানবভাবোধের অনুরোধ, আপনি পারবেন না উঠতে, পরে আসুন।

এ প্রবাহের শেষ কোথা বিভূতি ভাবে, এদের সংগ থেকে পিছলে লাসকাটা টেবিলে চড়া পরম সৌভাগ্যের বিষয় নয় কি?

দশটা পাঁচটার আসা-যাওয়া গেল আদি এবং সমাধি পর্ব। মধ্যপর্বও কম কটু নয়। এই পাঁচ বছরে একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেছে জিভ। কোয়াসিয়া, কুইনাইন আর কত তেতো! কটু এই আটঘণ্টার ডিউটি। তার চাইতেও দুর্জয় কাইল সামলাও, মোট ধাও, করস্পণ্ডেন্স রাখো পৃথিবীর সংগে, আবার উঠে উঠে কানমলা খেয়ে এসো মেজে সুপার মিনতির। এ কি করেছেন? চায়না'র চিঠি জাপানের খামে ভরেছেন! আপনাকে নিয়ে আর পারলাম না?

বিভূতি জ্বলে ওঠে। সে এম, কম, আর মিনতি আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। আজ বীরভোগ্যা বসুন্ধরার যুগ থাকলে বিভূতি বুঝিয়ে দিত এই তমিস্রধন্বা মহিলাকে, খোসগল্প করতে করতে কে ভরেছে চায়নার চিঠি জাপানের খামে! শয়তানেরও ভুল আছে, কিন্তু বিভূতির ভুল নেই। তবে তার পাশের টেবিলের মিস শর্মা তাকে মাঝে মাঝে ঘোল খাইয়ে ছাড়ে।

বড় যে মনযোগ? এবার ডাবল ইনক্রিমেন্ট নিশ্চয় পাচ্ছেন মিষ্টার রয়।

বিভূতির কথা বলার অবকাশ নেই, একটা ছুতসই

বাক্য খুঁজছে এ প্রতিষ্ঠানের সততা ও অভিজ্ঞতা প্রমাণের জন্য।

নিশ্চয় লেডি সুপার রেকমেণ্ড করে পাঠিয়েছেন আপনার নাম, কি বলেন ?

বিভূতি ইশারায় চুপ করতে বলে মিস শর্মাকে।

কিন্তু সে চুপ করবে কেন ? যদিও সে অবাঙালী তবুও নিচুতে না হয় আছে। তবু মেয়ে সুপারের তুলনায় তন্বী চারুদর্শনা তো বটে। মাইনে কম বলে তার একটু অসুবিধা আছে, কিন্তু বয়েস কমের গর্বটা তো সে পুরোপুরিই ভোগ করছে।

কিসের নোট দিচ্ছেন ? প্রেমের না প্রমোশনের ?

একটু নীচু গলায় বললেও কোনোদিন তো এমন মন্তব্য করে না মিস শর্মা। বিভূতি আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

আজ ছটার শোতে সিনেমায় যাবেন ?

কোথায় ?

ইন্দ্রপুরীতে।

যাবো কখানা টিকিট করব ?

মাত্র দুখানা। কাউণ্টারের কাছে থাকবেন, আমি মিনিট পাঁচেক আগে গিয়ে হাজির হবো। একটু ফ্রেস হয়ে যেতে যা দেরী। মনে থাকবে তো, না লেডি সুপারের চেম্বারেই ছটা বাজিয়ে দেবেন ?

বলেন কি মনে থাকবে না! ম্যাট্রিকে কিছু জলপানি পেয়েছিলাম।

ছটা, ছটা পাঁচ, দশ, পনর, কুড়ি কিন্তু মিস শর্মার দেখা নেই। অথচ কত কৈফিয়ৎ দিয়ে যে আসতে হয়েছে লেডি সুপারের কাছে। পাঁচটার পর বাড়তি সময়টা যেন কাঠ্য ঘাসীতে দাঁড়িয়েছে গেছে আরতির।

আচ্ছা শর্মার কাজকর্মে কি আপনি খুশি মিষ্টার রয়।

আমার খুশি অখুশিতে কিবা এসে যায় বলুন।

না, না তা নয়, তবে কিনা, আচ্ছা আজ একটি তাড়াতাড়ি যেতে চাইছেন যান। কিন্তু···

কিন্তুর মত কাজ কিছু তো টেবিলে জমা নেই।

তবু অফিস সংক্রান্ত কিছু আলাপ আলোচনা করা যেত এই সময়। সিনেমায় যাবেন নাকি ?

বিভূতি কাঁপা গলায় জবাব দিয়েছে না। কিছু অনুমান করলেন নাকি আরতি ?

অথচ শর্মার দেখা নেই—সাড়ে ছয়।

ট্রামে বাড়িতে সারারাত ছারপোকায় কামড়েছে, তারপর সারাদিন অফিসের চেয়ারে। এইতো মধ্য পথ। এর চেয়ে করোনারীর তদন্তের বিষয় হওয়া ঢের সৌভাগ্যের নয় কি ? ছুরি করাতে আর ক পোঁচ দেবে !

শর্মার বদলে শর্মিষ্ঠা এসেছে। তার সংগে আর ঘনিষ্ঠ হতে চায় না বিভূতি। মোট কথা সে মুক্তি চায় এ দংশন থেকে। আজই তো পরমক্ষণ। কতদিন উন্মুক্ত নীলাকাশ দেখেনি, দেখেনি আদিগন্ত ধানের ঢেউ আম বাবলা তেঁতুল এবং কলমি ফুল।

আজ সে মাইনে পেয়েছে, পকেট বোঝাই। বাড়ি ফিরলে লুটপাট করে নেবে সরলা, মুদি ট্রাম কয়লা শুধু ইস্কুল।

বিভূতি বাড়ির দিকে না ফিরে উল্টাদিকের বাস ধরলে। নামলে এসে মাছির মত মানুষ যেখানে গিয়ে চলে—দশটা পাঁচটার আদি এবং সমাধি পরের একটা ঘাঁটি।

ঘটাং করে একখানা টিকিট, কয়েক মিনিট বাদেই উদ্দাম হুইসেল।

আপাতত বেশীদূর যাবে না বিভূতি। মাইল ত্রিশেক দূরে এক বন্ধুর বাড়ি। একবার মাত্র গিয়েছিল সেই কবে আর অবকাশ হয়নি। অথচ বারবার অনুরোধ এসেছে। সেখানে গিয়ে দুদিন হাঁপ ছেড়ে তারপর যেখানে খুশি।

ধোঁয়াটে পেয়ালাটা এখন যেন ভেঙে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে। দেখা যাচ্ছে নীল সমুদ্রে সাদা বকের সার ডানা ঝাপটাচ্ছে একটানা মন্থর গতিতে। কখনো আরামে ডুব সাঁতার। রেল লাইনের ধারে ধারে ঝিকঝিকে মানুষ নেই, শুধু সবুজ আর সবুজ। সন্ধ্যার ভিজা আলোতে যে কী চমৎকার দেখাচ্ছে।

ঝির ঝির করে এক পশলা ইলশেগুঁড়ি ঝরে গেল। বিভূতির ভিজতে ইচ্ছে করছে, সে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

মশাই কি করছেন !

আবার সেই ধোপা খাওয়ান চশমা আঁটা মানুষ। বিভূতি বিরক্ত হয়ে হাত সরিয়ে নিল। লেডি সুপার

নেই, কিন্তু তার সতর্ক প্রহরার প্রতিবিম্বখানা এ পর্যন্ত যেন বিভূতিকে ধাওয়া করে এসেছে। খানিক সে মনমরা হয়ে থেকে আবার কখন যেন ডুবে যায় সবুজে-নীলে। বেশ লাগে লাইনের ধারে ধারে জলে-মাটি-পাঁক জংলি ঝোপে শালিক। ঐ একটি দেহাতি মেয়ে ছিপ গুটিয়ে নিল। শর্মা-শর্মিষ্ঠা হলে অন্ধকারেও শিকার খুঁজত। বঁড়শির ক্ষত কত যে আছে ওর নাকেমুখে! নিতান্ত ঈশ্বর সহায় নইলে ওর চোখ জোড়াতে যায়েল হত এতদিনে। বেশ লাগছে পুকুর ডোবা জলকাদা—মাছি নেই ঝিনঝিনে।

মাত্র ত্রিশ মাইল পথ। কতক্ষণ আর লাগল গন্তব্যে পৌঁছুতে। সবে অন্ধকারের ঘোর হয়েছে, ঝিঁঝিঁরা শাঁক বাজিয়ে অভ্যর্থনা জানাল বিভূতিকে। কোলাব্যাঙ টেনে টেনে বললে আসুন বাবু আসুন। বিদ্যুতের ঝিকি-মিকিতে দেখা গেল ষ্টেশনের পাশে সবের মত মাটিতে ভাঙ্গুরে ধানের কচি কচি গোছা।

ছোট ষ্টেশন। একটি মাত্র সহযাত্রী নামল। কাঁধে ঝোলা; হাতের একতারাটার মতই চেহারা। মেঘমতের সংগে ডিং ডিংয়ে পেটটি সার।

কোথায় যাবা বাবু মশাই?

যাওই, সহদেব মুখুজ্জের বাড়ি।

আমারও বাড়ি মুখুজ্জেদের বাড়ির পুব টেরে।

তবে তোমার সংগেই যাবো, অনেকদিন আগে একবার এসেছিলাম। কত দূর?

বেশি নয়—ঐ তো হোতা। ঝটপট এসো, আবার ঝেঁকে আসবে জল। মুখুজ্জে কি হন?

বন্ধু।

জানিয়ে আসোনি? দেখছি ছাতাও নেই। জল এলে কি করবে? এখানে তো রাস্তার ধারে গাড়ি-বারান্দাও নেই।

ভিজে ভিজে যাবো।

খাতে সইলে হয়।

লোকটা নিতান্তই অকবি। বিভূতি বিরক্ত হয়ে পথ চলে। সে ক্যানের ছাওয়ার অনেক শুকিয়েছে, এখন না হয় ভিজলে খানিক খোলা আকাশের তলে এসে। সর্দি হলে এই চড়া মেজাজ হয়ত একটু নামতে পারে মিনতি শর্মা শর্মিষ্ঠা এ্যান্ড কোংয়ের ব্যবহারে ও একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

ভাদ্রের সচল কালো মেঘ। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এলো। একেবারে যাবা যাবা জল। একতারা মাথার মাথালটা দিল টেনে। বিভূতির কড়া ধাত নরম হতে লাগল।

একটু পা চালিয়ে এসো।

এবার মানুষ নয় জল-কাদায় কামড়ে কামড়ে ধরছে সৌখিন চপ্পল। বিভূতি জুতো খুলল। ঝপাং করে প্রায় সের আড়াই ওজনের একটা ব্যাঙ এসে পড়ল সুমুখে। বিভূতি লাফিয়ে উঠল। দূরে একটা সকরুণ একটানা আর্তনাদ!

একটু হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলো—লতায় শিকার গিলছে।

বিভূতি জানত লতা মানে সাপ। এবং বিষধর হওয়াই এ ওস্তাদের বৈশিষ্ট্য। হাত পা সিরসির করলেও নিরুপায় বিভূতি ধনুর চাকার মত একতারার পিছন পিছন চলল। আর কতদূর?

বেশি নয়। ঐ তো হোতা···বৃষ্টিটা জমে কষে আসছে।

একটা অংগল ঝরঝর করে উঠল। সাপ, সাপ।

না বাবু, শেয়াল। একটা বুঝি মরা খাবলাচ্ছে।

এটা কি তবে শ্মশান?

একটু চিন্তা করে একতারা বলে, ইচ্ছা হলে বলতে পারো। জর বন্ধে লতার কামড় তো লেগেই আছে। আমার বংশই তো ছ'ড়া হল ম্যালেরিয়ায়।

এখন কি করা হয়?

জর না থাকলে ভিক্ষে। গায় মেলে না সহরে যাই।

পথের পাশে আবার একটা মুমূর্ষু গোঙানি, শিকারের শেষ আকুতি। বিভূতি ছিটকে এসে জড়িয়ে ধরল একতারাকে। অফিস আওয়ারে লম্বা কুইডোরে লেডি সুপার হলেও সে বুঝি ইতস্তত করত না এ সিচুয়েশনে। শর্মা শর্মিষ্ঠা তো তুচ্ছ।

প্যাক করে ছিটকে উঠল খানিক কাদা জল। মুখ মুছে আর বন্ধুর সংগে দেখা করার ইচ্ছা রইল না বিভূতির। সে ছাড়া পেয়ে একটু এগিয়ে একতারা সংবাদ যোগাড় করলে যে আজ সাতদিন মুখুজ্যেরা অন্যত্রাসন ত্যাগ করেছে। তিনখানা ঘর আর ধানের গোলা খুঁড়ে নাকি সাত কলসী কাল কেউটের বাচ্চা পাওয়া গেছে খাড়ি চারটা নাকি এখনো ধরা পড়েনি। বেদেরা বলে গেছে, খুব হুঁশিয়ার কিন্তুক।

বিষ, বিষ একেবারে পরিপূর্ণ বিষের বাথান।

পরদিন সোয়া এগারটা নাগাদ অফিসে পৌঁছল বিভূতি।

শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি?

বড্ড টায়ার্ড।

চা খাবেন?

না। পানসে তেতো ঝাঁঝাল অনেক চা খেয়েছি ট্রেনে। নলিনকে একটু ক্যান্টিনে পাঠাবেন।

দুধ খাবেন, গরম দুধ? তা তো সংগেই রয়েছে—দেবো?

শর্মিষ্ঠা ফ্ল্যাক্সের মুখটা খুলল।

বিভূতি কঠোর স্বরে বলল, 'না'।

আর্থিক প্রসঙ্গ

খাদ্য সমস্যা ও জনসংখ্যা

মন্ত্রমুখর

আর্থিক প্রসঙ্গে বিশ্বের সর্বত্রই গবেষণা ও আলোচনার অন্যতম বিষয় হল খাদ্যসমস্যা ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। রাষ্ট্রসংঘও এ ব্যাপারে কম মাথা ঘামায় না। তাদের F.A.O. অর্থাৎ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা চুপ করে বসে নেই। গত ১লা জুলাই থেকে সেই সংস্থার উদ্যোগে এক পঞ্চবার্ষিকী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে দুনিয়া থেকে ক্ষুধাকে নির্বাসিত করা যাবে—তা সে ক্ষুধা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ, যাই হোক না কেন।

F.A.O.-এর মুখ্য পরিচালক শ্রীবিনয়রঞ্জন সেইদিনকার ভাষণে সমস্ত রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা ও ঐকান্তিকতা প্রার্থনা করেছেন। শ্রীসেন তাঁর ভাষণে এই ব্যাপারে অর্থনৈতিক, শিল্পজাগতিক এবং সামাজিক—সব দিক দিয়ে অগ্রসর হতে আবেদন জানিয়েছেন—যাতে করে উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়—বিশেষ করে কম উন্নত দেশগুলোর একাজ সম্ভব করা নিশ্চয়ই যায়।

এই আন্দোলনের খবরে অনেক দেশই বিশেষ উৎসাহিত বোধ করবে—এটাই স্বাভাবিক—বিশেষ করে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অধিকাংশই হয় অনশনে কিম্বা অর্ধাশনে দিন কাটায়। ভারতও নিঃসন্দেহে এই দলে পড়বে। বিশেষ করে—যখন তার খাদ্যতালিকার মান পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাই ভারত বিনা দ্বিধায় এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক। আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত তার খাদ্যোৎপাদন ব্যাপারে অনেক অগ্রসর হবে—এমন কি খাদ্যের ব্যাপারে নাকি সে স্বাবলম্বী হবেই হবে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের বর্তমান পরিমাণ হল ৭৩·৫০ মিলিয়ন টন (১৯৫৮-৫৯) আর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে আমাদের উৎপাদন দাঁড়াবে ১০০ থেকে ১০৫ মিলিয়ন টনে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে আমাদের নির্ধারিত উৎপাদন ছিল ৮০·৪ মিলিয়ন টন—অথচ শেষ পর্যন্ত ৭৫ মিলিয়ন টনের বেশী যবে বলে মনে হচ্ছে না। খাদ্যোৎপাদনের অবস্থার খুব বেশী উন্নতি আমরা এ পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। ১৯৫০ এর পর মাত্র ২৮ শতাংশ উন্নতি লক্ষিত হয় এ ব্যাপারে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও সরকারী ব্যর্থতার কথা স্বাভাবিক কারণেই এসে যায়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথায় পরে আসছি। এক আমেরিকার কাছ থেকেই এই সেদিনকার চুক্তিমতে ৬০০ কোটি টাকার গম আর চাল আমদানী করছি আগামী চার বছরে। এহেন দেশ যদি স্বপ্ন দেখে খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হবার—তাহলে সেটা বিস্ময়কর বৈকি। কিন্তু শ্রী সেনের কথা মনে রাখলে আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। তাঁর মতে প্রকৃতির রোষ খুব কম ক্ষেত্রেই অন্নাভাবের কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা এবং অক্ষমতাই এর মূলে। কথাটা খাঁটি সত্য। এই ভারতবর্ষেই আমরা দেখছি কর্তৃপক্ষ ক্রমাগতভাবে রোষ দিয়ে চলেছেন প্রকৃতিকে—বন্যা বা অনাবৃষ্টিও তার মধ্যে। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে পরিচিত খাতে চিন্তা করার কুঅভ্যাস। সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা বা গবেষণার স্পৃহা একেবারেই নেই। সেখানে আছে নিশ্চিন্ত আরাম-প্রীতি ও গতানুগতিকতা। এর ক্ষতিকর পরিণতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

আমাদের দুরবস্থা সরকারী পরিসংখ্যান বিভাগের মধ্যে থেকে ততটা বোঝা যাবে না। যায় তখন, যখন আপনি আমি রাস্তায় ঘুঁকতে দেখি শত শত ভিখারীকে। আমরা যে কত ব্যর্থ—তার জন্যে এর চেয়ে বড় সাক্ষী

আর পাওয়া যাবে না।

এর জন্যে দায়ী করা হয় জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে। সমাজের অপেক্ষাকৃত নীচুতলার অধিবাসীদের নাকি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধি করা। সরকার পক্ষ ছাড়াও বহু ওপরতলার বাসিন্দাদের এই অভিযোগ নীচুতলার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। দেশের সব দুঃখদারিদ্র্য এবং কষ্টের মূলে নাকি তারা। লক্ষ্যণীয় যে এই ধারণা ম্যালথাসের নীতির খুব কাছাকাছি। ম্যালথাসের মতে মড়ক, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্ঘটনাই জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করে—অর্থাৎ খাদ্য ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যেকার সমতা রক্ষা করে। অবশ্য ভারতের সরকারী বিচারে পুরাপুরি ম্যালথাস নীতি স্বীকৃত না হলেও—তার কতকটা প্রভাব আছে বলেই মনে হয়। অপরিকল্পিত ভাবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়—দুটো কারণই স্বচ্ছন্দে দেখানো যায়—বিশেষ করে যখন দুই তরফ থেকেই কোনো প্রতিবাদের সম্ভাবনা নেই।

ফলে জনসাধারণের মনে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে—সত্যিই তো ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের মতো এতবড় দুই শত্রুর সংগে লড়াইতে আমরা কি করে জিতবো? বিশেষ করে লোকসংখ্যা যখন এই হারে বেড়ে যাচ্ছে! দারিদ্র্যের দর্শন আসলে যে দর্শনেরই দারিদ্র্য, একথা কে তাদের বোঝাবে?

জনসংখ্যা কী হারে বাড়ছে সেকথা বলি এবার। ১৯২১-এর পর ১৯৩১-এর সেন্সাস রিপোর্ট বলে যে ঐ বৃদ্ধির হার ছিল ১১%—১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে ওটা দাঁড়ায় ১৩·১ %। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬·৬ কোটি—এই হারে বাড়লে সেটা ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াবে প্রায় ৪২ কোটি। সরকার এদিকে নজর দিয়েছেন এবং এজন্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁরা এ বাবদ প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘও এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে। পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামে ও শহরে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে।

যাই হোক, এসব সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়—এবং সেই প্রশ্নটাই বিরাট—"সত্যিই কি দেশে জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যা রয়েছে?" F.A.O.প্রধান বয়েডের ভাষণে সেই মূল কথাটার জবাব মেলে। তিনি বলেছেন কেন্দ্রীয় মূল সমস্যাটা জনসংখ্যাধিক্যের নয়, কম উৎপাদনের। সম্পূর্ণ সচেষ্ট হলে মানুষের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান মোটেই কঠিন নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য প্রাণী যতটা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, মানুষ ঠিক ততটা নয়। কারণ তার আছে হাতিয়ার নির্মাণের ক্ষমতা, আছে বুদ্ধি আর কৌশল, আছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। অন্যান্য প্রাণী স্বাভাবিক ভাবে মরে—যখন সেটা ঘটে কোনো ক্ষেত্রে—এবং তার সংখ্যা প্রকৃতিরই প্রয়োজনমত কমে যায়। কিন্তু মানুষ তা হতে দেবে কেন? তার বুদ্ধি, তার দক্ষতা—তাকে এ সমস্যাকে অতিক্রম করতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

দুর্ভিক্ষ, মড়ক—এ সমস্তর আবির্ভাব হয় মানুষের বুদ্ধির দোষে, তার অক্ষমতার ফলে। একথা সত্য নয়, যে এসব হয় প্রকৃতির নিয়মে—খাদ্যের সংগে জনসংখ্যার সমতা বজায় রাখতে। বিশেষ করে আজকের দিনে—বিজ্ঞানের ও যন্ত্রশিল্পের এই আশ্চর্য উন্নতির যুগে—মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে যখন দ্রুতপায়ে প্রকৃতিকে জয় করতে এগিয়ে আসছে—তখন ওসব বিশ্বাস একেবারেই বাজে। যুগের বাণী তাই তো প্রতিধ্বনিত হয় শুনতে পাই মনীষী কালিন ক্লার্কের মুখে—পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা, তার দশগুণ লোককে স্থান দিতে পারা যাবে যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায়। এর চেয়ে বড়ো আশার কথা আর কে শুনিয়েছে?

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম ভারতে জনসংখ্যাধিক্য ঘটেছে। কিন্তু তার মান হিসেবে কোনটা ধরবো? জনসংখ্যার আয়তন কিংবা জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার, অথবা জনবসতির ঘনত্ব—কোনোটাই কাজের নয়। মাপ চান? আসুন নেদারল্যাণ্ডসে। সেখানে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল ১·১ কোটি—আর আয়তন হল দেশটার ১২,৮০০ বর্গমাইল—লোকবসতির ঘনত্ব হল ৮৬৯ জন প্রতি বর্গ মাইলে। ভারতের লোকসংখ্যা ঐ বৎসর ছিল ৩৯·৭ কোটি—আয়তন ১২,২১,৮০০ বর্গমাইল—লোকবসতির ঘনত্ব মাত্র ৩২৫ জন। আপনি কি নেদারল্যাণ্ডসকে

জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা-পীড়িত বলবেন—যখন আপনি জানেন যে তার জীবনযাত্রার মান ঢের বেশী উন্নত আমাদের চাইতে? আরো ধরুন পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের কথা। জাপানে জনবসতির ঘনত্ব ৬৪৪ এবং পশ্চিম জার্মানীতে ৫৬৬। অথচ পশ্চিম জার্মানী প্রায় সওয়া কোটি উদ্বাস্তুকে স্থান দিয়েছে গত ১৫ বছর এবং তা সত্ত্বেও সেখানে শ্রমিকের অভাব! আর সেখানকার জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আর জাপান কতো অসুবিধার মধ্যেও প্রতি একরে আমাদের চাইতে বেশী ফসল উৎপন্ন করে—তা কারো অজানা নয়।

এ থেকে এই প্রমাণিত হল যে, ভারতের জীবনযাত্রার মান এত নীচু—তার কারণ তার বিপুল জনসংখ্যা নয়। তার কারণ, প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনত্ব তার খুব বেশী সেটাও নয়। আসল কারণ হল তার উৎপাদন পদ্ধতি খুবই সেকেলে ও অবৈজ্ঞানিক, সরকারী প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ অযোগ্য ও প্রমাদপূর্ণ।

কেউ কেউ মনে করেন যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব খুব অসমান—তাই বিভিন্ন প্রদেশের লোক চালাচালি করে অবস্থা সব প্রদেশেই সমতাসম্পন্ন করা যায়। একথা তাঁরা ভুলে যান যে বর্তমানে মাথিক উৎকর্ষ ঢের বাড়ানো যায়—কম লোকেই বেশী লোকের উপযুক্ত ফসল ফলাতে পারে। দ্রুতগামী যানবাহনের অসুবিধে এখন আর নেই—সহজেই প্রদেশান্তরে সেটা পাঠানো চলে। এ সত্ত্বেও লোকচালচালির কী দরকার? বিশেষ করে বর্তমানে যা প্রাদেশিকতার হাওয়া বইছে—এ প্রস্তাব করা বিশেষ দুঃসাহসের কথা।

এবারে আসা যাক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রসঙ্গে। এটাও একটা নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। দেখা যায় যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোয় এই বৃদ্ধির হার বর্তমানে ভারতে যে হার চলেছে তার চেয়ে বেশী। দশ বছর পূর্বেও ভারতে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল ১·৪% প্রতি বছরে। বর্তমানে সেটা প্রায় ২%এ দাঁড়িয়েছে। তুলনা করে দেখা যায় যে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আমাদের এই হারের নীচে আছে—সেখানে ঐ হার হল ১·৮%। অবশ্য মনে রাখতে হবে আমেরিকা সেই দেশ যেখানে খাদ্যোৎপাদন এত বেশী যে প্রতি বছর ২।০ কোটি একর জমি পতিত রাখতেই হয়। সেখানে লোকসংখ্যা বাড়লে নেতারা খুশীই হন—কেননা তাতে শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারেও খুব আশার সঞ্চার হয়। ভারতের অবস্থানই বা সেরকম হবে না কেন?

FAO-প্রধান যা বলেছেন সেটাই হল মূল কথা। আসলে রোগ হল শিল্প এবং কৃষি—দুই ক্ষেত্রেই কম উৎপাদন। তার সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে অযোগ্য বণ্টন ব্যবস্থা। এর পেছনে কাজ করেছে স্বার্থপরতা ও লোভ। মানুষের ভূমিকাটাই হল বড়—প্রকৃতির নয়। সরকারকে তাই মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে—তার হাতে উপযুক্ত হাতিয়ার দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে। তবে উৎপাদন বাড়বে। নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি করতে হবে—তেমন কাজতো কতই আছে। রাস্তা, রেলপথ, ব্রিজ, গৃহ প্রভৃতি নির্মাণ, পশুপালন, কৃষি, বনরক্ষণ, মৎস্যচাষ ইত্যাদি অনেক, অনেক কাজ। প্রচুর লোকের দরকার এসবে। আবার তারাই তো বর্ধিত পণ্য ভোগ করবে—ফলে উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। এই ভাবেই চক্রের আবর্তন হতে থাকবে—দ্রুত থেকে দ্রুততর হারে। ফলে বাড়বে জীবনযাত্রার মান—বাড়বে জাতীয় আয়—বাড়বে সঞ্চয়। সেই সঞ্চিত অর্থ আরো উন্নত ভবিষ্যতের জন্যে বিনিয়োগ করা যাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করাটা পথ নয়—শুধু বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা চাই সব ব্যাপারে। তা না হলে লোকসংখ্যা হ্রাসের ফলে সৃষ্ট যে অসুবিধে সেটা আরো তীব্র হবে।

আমাদের লক্ষ্য তাহলে হোক, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, উন্নতধরণের বীজ, সার ও জলসেচের ব্যবস্থা করা—যাতে খাদ্যোৎপাদন বাড়ে এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী বন্ধ হয়। এতে বিদেশী মুদ্রাও বাঁচবে প্রচুর, বর্তমানে যার খুবই দরকার। তবে সর্বাগ্রে দরকার সততা ও পরিশ্রমের—সেই মূল্য দিতে কি সত্যিই আমরা পারবো?

সোল অব লিলিথ

মেরী করেলী

[৬]

"সু-প্রভাত! আপনিই মিঃ এলরামি আরানোজ?"

"হ্যাঁ। আর আপনি নিশ্চয়ই রেভারেণ্ড ফ্র্যান্সিস এনস্ট্রে? বসুন। এইবার বলুন, আমার কাছে আপনি কি জন্যে এসেছেন?...খুঁজে আমার বার করলেনই বা কি করে?"

মৃদু হেসে, রেভারেণ্ড বললেন—"সেটা যেন কতকটা আকস্মিক ভাবেই হয়েছে। সেদিন লেডী মেলথর্পের সংগে তাঁর বাড়িতে বসেই আমার বিত্রাটের কথার আলোচনা হচ্ছিল। তাঁকে বলেছিলুম, এ অবস্থায় কি করা উচিত, কিছুতেই তা স্থির করে উঠতে পারছি না। তাতেই তিনি বললেন, আমার সন্দেহের নিরসন, আপনিই নাকি একমাত্র লোক, যিনি নির্ভুল ভাবে করে দিতে পারেন। তাই...হেঁ হেঁ..."

"না, না। একথা ঠিক নয়। আমার নিজের সন্দেহের নিরসনই আমি করে উঠতে পারছি না, তা অন্যের করব কি করে?"

বিস্মিতভাবে এলরামির মুখের দিকে চেয়ে রেভারেণ্ড বললেন—"কি মুস্কিল! অথচ তিনি বললেন, বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিতে আপনি নিশ্চয়ই এর সমাধান করে দিতে পারবেন!..."

"না, না। মানুষের চপলতার ভাল-মন্দর কারণ আমি কিছুই জানি না।—মানুষের জীবন-মৃত্যুর রহস্যও আমার জানা নেই। মরণের পর কিছু আছে কিনা এই নিয়েই আমি গবেষণা করছি—কিন্তু, এখনও সে বিষয়ে আমি মোটেই নিশ্চিত হতে পারিনি।"

"কিন্তু কিছু মনে করবেন না। আপনার কথা শুনে আপনার শ্রোতাদের মনে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ধারণা জন্মায়...যেমন মনে করুন, লেডী মেলথর্পের কথা..."

বাধা দিয়ে এলরামি বললে—"আমার কথা শুনে লেডী মেলথর্প যেমন খুশী মনে করতে পারেন। তার জন্যে আমি কেমন করে করব?"

"কিন্তু তাঁর ধারণা, আপনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ—বর্তমান, স্পষ্ট দেখতে পান! অর্থাৎ এক কথায় আপনি ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তি!..."

এলরামি কিছুক্ষণ রেভারেণ্ডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে—"আমি আপনার জীবনের অতীত ঘটনাগুলো বলে দিতে পারি, আর বর্তমানও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর এই দুটো থেকে যোগবাদ করে ভবিষ্যৎটা বলতে হয়। কাজেই এইভাবে গণনার ফল যে সব সময়েই নির্ভুল হবে, তা কেমন করে বলব?...অবশ্য খালি ভবিষ্যতের বেলাই এইরকম ভুল হতে পারে। অতীত আর বর্তমান নির্ভুলই বলা যায়, কারণ যে পদ্ধতিতে আমি অতীত আর বর্তমান বিচার করি, তাতে কোনরকম ভুলই আসতে পারে না।—প্রাচীন মিশরের পুরুৎরা এই পদ্ধতিতেই গণনা করতেন কাজেই পদ্ধতিটা বহুদিনের। আজ অবধি এ পদ্ধতিতে গণনার কোন ভুল কেউ দেখতে পাননি।... কি বলেন? আপনার অতীত আর বর্তমান শুনতে চান?"

এলরামির কথা শুনে রেভারেণ্ড মনে মনে ভাবলেন—ইনি ত আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। জীবনে কোনদিন আমরা পরস্পরকে দেখিই নি, কাজেই আমার অতীত আর বর্তমানের কোন কিছুই এঁর জানা থাকা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় ভদ্রলোকের বিদ্যের দৌড়টা পরখ করে দেখতে দোষ কি? কথাগুলো ভেবে নিয়ে প্রকাশ্যে বললেন—"বেশত! তাই বলুন না?"

এলরামি নিজের বাঁ হাতখানা টেবিলের ওপর চিৎ করে রেখে বললে—"আপনার বাঁ হাতের চেটোটা আমার এই হাতখানার ওপর বেশ করে চেপে ধরে থাকুন।...হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে হাতকড়ির মত ক্লিপ দিয়ে

রেখে দিচ্ছি।··· এটা করবার উদ্দেশ্য—হঠাৎ আপনার হাতটা, আমার হাত থেকে সরে না যায়, আর আপনার হাতের চাপও, একবার কম একবার বেশী না হয়।··· এইবার আমার হাতের অবস্থানটা লক্ষ্য করুন। দেখুন, আমার বাঁ হাতের আঙুল গুলো, আপনার কব্জির ভেতরের নাড়ীগুলোকে স্পর্শ করছে···আর আপনার নাড়ী আর শিরগুলোর সংগে আপনার অন্তঃকরণের আর মগজের যোগ রয়েছে। কাজেই আপনার মগজের বিভিন্ন অনুকোষের মধ্যে অতীতের যে স্মৃতি লুকিয়ে আছে, ঠিক ফটোর নেগেটিভের মত, সেগুলো আমার মগজের মধ্যে ছবি ফুটিয়ে তুলবে।···আচ্ছা, এইবার আমি বলতে আরম্ভ করছি শুনুন···" বলে এলরামির চোখ বুজল।

অল্পক্ষণ পরেই সে বলতে লাগল—

"একটি রমণীর মূর্তি দেখছি···সুন্দরী, চোখের তারা উজ্জ্বল কালো, চুলের রঙ বাদামী ···স্বেচ্ছাচারিণী··· অবাবস্থিত চিত্ত ···তার কথাতেই আপনার মন-প্রাণ পূর্ণ রয়েছে···তিনি কিন্তু আপনার স্ত্রী নন।···এক বড়লোক প্রতিবেশীর স্ত্রী তিনি।···ঘরে আপনার স্ত্রী···আর আটটি ছেলেমেয়ে তাদের কথাই আপনি ভাবছেন, অষ্টপ্রহর ···তাকে নিয়েই আপনার যতকিছু ভবিষ্যৎ কল্পনা···"

কয়েক মুহূর্ত এলরামি নীরব হয়ে রইল। রেভারেণ্ড মনে মনে শিউরে উঠে, চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

এলরামি আবার বলতে লাগল—

"দাঁড়ান, দাঁড়ান···হ্যাঁ, এইবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি··· এই রমণীর জন্যেই আপনি যাজকের পদ ত্যাগ করতে চাইছেন···পরকাল মানার ভয়ে নয়। পরকালে বিশ্বাস আপনার কোনদিনই ছিল না—আজও নেই···হ্যাঁ, আপনার ইচ্ছেটা আমি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি···ঐ পরকালে বিশ্বাস নেই, এই গুজর দেখিয়ে আপনি যাজকের পদে ইস্তফা দিতে চাচ্ছেন···তারপর এই রূপা স্ত্রী, আর অসহায় ছেলে-মেয়েদের ফেলে রেখে, ঐ রমণীর সংগে আপনি দেশত্যাগ করবার মতলব করেছেন··· পরকীয়া প্রেমে আপনি হাবুডুবু খাচ্ছেন··"

মহা ক্রোধভরে, বন্ধ হাত ছাড়বার চেষ্টা করতে করতে রেভারেণ্ড বললেন—"থামুন মশায়—থামুন! তাহা মিথ্যেকথায় একেবারে বাগ ডাকিয়ে দিয়েছেন যে···"

চোখ খুলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রেভারেণ্ডের দিকে চেয়ে এলরামি বললে—"কি বললেন?—মিথ্যে কথা?···আমি মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছি?···আপনার সারাজীবন এই মিথ্যের ছলনায় ভর্তি, কাজেই প্রকৃতি আর শাস্ত্রের মধ্যেও যে আপনি তারই প্রতিবিম্ব দেখবেন, এ ত অতি স্বাভাবিক কথা! আপনি মনে করেন, অজ্ঞেয় প্রকৃতির সংগে মিথ্যাচার করে চমকীর জোরে তা ঢেকে রাখবেন! —তাই কখনও হয় নাকি? সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে ঠকান আপনার—শুধু আপনার কেন, যে কোন লোকের পক্ষেই তা অসম্ভব। মনে রাখবেন, তিনি আপনার গির্জের পোষমানা ভগবান নন।—দুর্বার শক্তিশালী অজ্ঞের সর্বজ্ঞ তিনি!"—বলতে বলতে এলরামি হাতের বাঁধন খুলে দিলে।

রেভারেণ্ডের হাতটা বাঁধন-মুক্ত হতেই, সভয়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখুনি তিনি সরে পড়তে চাইছিলেন, কিন্তু এলরামি না-বলা পর্যন্ত চলে যেতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না। এলরামির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখবার পর, চোখ তুলে আর তার দিকে চাইবারও সাহস ছিল না রেভারেণ্ডের।

তাঁর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে এলরামি রেভারেণ্ডকে প্রশ্ন করলে—"আপনার সম্বন্ধে যা বলেছি আমি, তার প্রতিবর্ণ নির্ভেজাল সত্যি হওয়া সত্ত্বেও, আমায় মিথ্যা-বাদী বলার মানে কি? নিজের মতলব—নিজের পাপাচার গোপন রাখাই যখন আপনার উদ্দেশ্য, তখন মিছি মিছি আমার সময় নষ্ট করতে এখানে কেন এসেছেন? আপনার মগজ যে আলোকচিত্র, আপনার ধমনীর মধ্য দিয়ে আমার মনের পরদায় ফুটিয়ে তুলেছিল তা কি নির্জলা সত্যি নয়?···বলুন, জীবনে অন্ততঃ এক-বারও সত্যিকে সত্যি বলে স্বীকার করুন।"

অস্ফুট স্বরে রেভারেণ্ড বললেন—"না, না,···মিথ্যে··· সবটাই মিথ্যে—"

বিরক্ত কণ্ঠে এলরামি বললে—"বেশ, তাই আমি মেনে নিলুম। এবার আপনি আপনার বিশপের কাছে গিয়ে—'আপনার পরলোকে বিশ্বাস নেই'—এই গুজর দেখিয়ে পদত্যাগ করুন গে। পরলোকের অস্তিত্ব মানলে মতলব আপনার মাটি হয়ে যাবে। কাজেই আমি

এমন কোন পরামর্শ আপনাকে দেব না, যাতে আপনার মনে পরলোকের অস্তিত্বে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। হ্যাঁ, আপনার পরত্যাগ বিলপ মেনে নেবেন।···তারপর?··· তারপর আপনার চরম মতলব—প্রতিবেশীর সুন্দরী, অর্থশালী স্ত্রীকে নিয়ে পালানটা, অনেকদিন অবধি আপনাকে লোকের কাছে স্মরণীয় করে রাখবে।···সে খ্যাতি যে কেমন হবে তা নিশ্চয়ই মনে মনে বেশ বুঝতে পারছেন?···হ্যাঁ, ঠিক তাই!···এমনি করেই মানুষ নিয়মিত জালে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলে, যে ভবিষ্যতে কোনদিন তা থেকে ছাড়া পাবার আর কোন উপায়ই থাকে না।···এমনি করে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা পড়া মানুষকে শেষ-অবধি নিয়তি গলা টিপে মেরে ফেলে।···কি দুরদৃষ্ট আপনার যে, আমার মত লোকের কাছে আপনি নিয়তির রহস্য জানতে এসেছিলেন।"

"না, না। আমি তা মনে করি না। আর কেউ হলে হয়ত আপনা ভবিষ্যৎবাণী শুনে খুবই অপমান বোধ করতো, আমি কিন্তু

শ্লেষ ভরে এলরামি বললে—"কিন্তু আপনি এমনই দয়ালু—আর উদার, যে আমার কিছুই অপরাধ নেননি, —এই না?···চমৎকার!"—বলে টেবিলের ওপর রাখা ছোট কলিং বেলটি বাজিয়ে দিলে।

ঘণ্টার শব্দ শুনে রেভারেণ্ড ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন —"আশাকরি আমার সম্বন্ধে সব কথাই আপনি গোপন রাখবেন, মিঃ এলরামি?"

"কি গোপন রাখব?···আমি আপনার কথা বেশ বুঝতে পারলুম না? তবে আপনার জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে এইমাত্র আপনাকে যা বলেছি, তাই যদি হয় তবে আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনি আমার ঘরের বাইরে যাবার পর আপনাকে আর আপনার জীবনকাহিনীকে আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে দেব জানবেন।"

ততক্ষণে ফিরাজ এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। সংকেতে এলরামি তাকে বললে, রেভারেণ্ডকে পথ দেখিয়ে বিদেয় করে দিয়ে আসতে।

ম্লান হাসে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রেভারেণ্ড বললেন—"আচ্ছা চলি।···খুব আনন্দে সময়টা কাটল···মিঃ···মিঃ এলরামি!··· আপনার গণনায় যদিও সত্যের লেশমাত্রও ছিল না···

তীব্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে এলরামি বললে— "থামুন—থামুন!···মিথ্যের বিষবাষ্পে, ঘরের হাওয়া অবধি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে···আর বাজে কথা না বাড়িয়ে আপনি যান দিকি এখান থেকে।"

লগুড়াহত কুকুরের মতই রেভারেণ্ড ফিরাজের সংগে তাড়াতাড়ি এলরামির ঘরের বাইরে এসে যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

ফিরাজ সদর-দোর বন্ধ করে চলে গেলে রেভারেণ্ড ঈষৎ ইতস্ততঃ করে পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সময় দেখে নিলেন। তারপর একটি চলন্ত ভাড়াটে গাড়ী দাঁড় করিয়ে তার মধ্যে উঠে বসে চালককে একটি হোটেলের নাম বলে গাড়ী চালাবার নির্দেশ দিলেন।

তিনি হোটেলে পৌঁছতেই একটি সুন্দরী রমণী অসন্তুষ্ট মুখে তাঁর দিকে চেয়ে এগিয়ে কাছে এসে বললেন— "এত দেরী?—কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি আমি—সময় আর হয় না তোমার!"

॥ ৭ ॥

সেইদিন দুপুরে এলরামি নিজের বাড়ীতে খেতে বসে ছিল। একটার পর একটা করে ডিসের পর ডিস ফিরাজ ঠিক বাবুর্চির মতই তাকে এগিয়ে দিচ্ছিল। এলরামির বাড়ীতে গৃহস্থালীর সব কাজই ফিরাজ করত। আর কোন চাকর-বাকর ছিল না তাদের। বুড়ী জায়োবা ওপরের ঘরের অধিবাসীকেই দেখা-শোনা করত শুধু,— সংসারের কোন কিছু সে করত না।

সেদিন রেভারেণ্ডের ঘটনায় এলরামির মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল না। ঘরে সেদিন তার মনই টেঁকছিল না, খেতে খেতে সে ফিরাজকে বললে—"আজ আর আমার জন্যে রাত জেগে বসে থেকো না ফিরাজ। খেয়ে উঠেই আমি সমুদ্রতীরে ইলফ্রাকোম্বে যাচ্ছি— রাতে ফিরব না।"

"ইলফ্রাকোম্বে?···সেই পাগলকে দেখতে তুমি অত দূরে যাবে আজ?"

"পাগল তাকে বলছ কেন?—সে নিরীহ বেচারা

চুম্বক শক্তিবাহ ফটিকের চাকার ওপর গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র-রাশির যে প্রতিবিম্ব পড়ে—যে আলোর রেখে চিত্র-বিচিত্র ছবি এঁকে দেয়,—নিজেদের গতি পথ দেখায়, তারই মানে বার করবার জন্যে প্রাণপাত করছে। এতে পাগলামিটা কি আছে?... আর তাই যদি হয় তবে এই যে তোমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি অপর কোন গ্রহের জীব, যার নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত তোমার ধ্যান-দৃষ্টির সামনে, স্পষ্ট সত্যি হয়ে ফুটে ওঠে, এমনকি সেখানের অধিবাসীদের কথাবার্তা নাচগান অবধি, তুমি শুনে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়, বা শুনচ মনে করে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাব—সেওত এক হিসেবে নিছক পাগলামি।

হাঁ। কিন্তু আমি যা দেখি বা শুনি তা আমি আমার মনের মধ্যেই রেখে দিই, অপর কারো কাছে সেসব কথা কোনদিন বলতে যাই না ত?"

"সেওত সেসব প্রতিবিম্বের মানে কি তাবলে কাউকে বাস্ত করে না?...না ফিরাজ, তার নতুন ধরণের ধ্যান-র জন্যে তাকে তোমার পাগল বলা মোটেই উচিত নয়। ...হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তার এই আবিষ্কার বসে প্রমাণ হবে! আর জগতের কত রকমের তা থেকে উন্নতি হবে তা কে বলতে পারে?...আচ্ছা আমি চলি। আর দেরী করলে হয়ত ট্রেন ধরতে পারব না।" —বলে এলবামি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ফিরাজ বললে—"তোমার ট্রেনের এখনও দেরী আছে ...আচ্ছা, আরোবাকে কিছু বলতে হবে কি?"

"না। তাকে যা বলবার বলে এসেছি।"

"আচ্ছা দাদা, তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর?... তা যদি না হয়, তবে আরোবা আর তোমার চলি দেওয়া ওপরের ঘরের সম্বন্ধে কোনো কথাই আমায় জানতে দাও না কেন? আমি জানলে ক্ষতিটা কি?

বিরক্ত মুখ ফিরাজের দিকে চেয়ে এলবামি বললে—"ছিঃ! ফিরাজ আবার তোমার মনে সেই অস্থির কৌতূহল মাথা তুলে উঠেছে।...আমিত মনে করেছিলুম এতদিনে ও রোগটা তোমার হয়ত সেরেই গেছে।"

"না, না এলবামি—এটা আমার একটা অহেতুক কৌতূহল নয়...কি বলে বোঝাব তোমায়?...অর্থাৎ অন্য একটা...নাঃ। কিছুতেই আমি তোমায় বোঝাতে পারছি না,...আমার কথা শুনে তুমি হয়ত হেসেই উঠবে। ...কিন্তু তবুও-

প্রায় রুদ্ধ স্বরে এলবামি বললে—"কি বলতে চাও বলইনা শুনি?"

"মাঝে মাঝে আমার কানে একটা যেন স্বর ভেসে আসে—মনে হয়।...আমার ধারণা ওপরের যে চাবি দেওয়া ঘরটায় কেবল আরোবাই ঢুকতে পায়,...সেখান থেকে যেন একটা করুণ প্রার্থনা ভেসে আসছে। মনে হয়,... মনে হয় কে যেন মুক্তি চাইছে শান্তি চাইছে!... ঘরটা অবশ্য আমি কচিত কখনও শুনি...কিন্তু যখনই শুনি, তখনই আমার প্রাণের মধ্যে একটা অদ্ভুত যাতনা হতে থাকে।...আর সে কষ্টটা আমায় অনেকক্ষণ অবধি ব্যাকুল করতে থাকে।...তুমিত বল ওপরের ঘরে তুমি কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছ।...কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারি না, তোমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঘর থেকে তুমি এরকম কাতর প্রার্থনার সৃষ্টি কর কি করে? ঐ দেখ আবার তুমি আমার কথা শুনে রেগে গেলে!..." বলে ফিরাজ তার বড় বড় চোখের অভিমান ভরা দৃষ্টিতে এলবামির দিকে চেয়ে, তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেল।

"রেগে গেলুম?...না ফিরাজ। তোমার খেয়ালীমনের গল্প শুনে, কোনদিন কি আমি রাগ করেছি?...না। আমার মনে হয় তোমার এ স্বর শোনাটাও তোমার অন্য গ্রহের অধিবাসীদের গান শোনার মতই তোমার একটা কল্পনা বা একটা খেয়ালই শুধু। আমি ওপরের ঘরে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করি তার কথা জেনে তুমি কোন তৃপ্তিই পাবে না কোনদিন। কিন্তু আমার পক্ষে পরীক্ষাটা এতই দরকারী যে যদি আমি সে পরীক্ষায় সফল হতে না পারি তাহলে আমি আর এ-আমি থাকব না।—আর লোকের কাছেও আমি অতি বড় বোকা—অতি মূর্খ হয়ে যাব! যাক্ ও নিয়ে মিথ্যে তুমি মন খারাপ কর না। আচ্ছা, এবার চলি আমি স্বপ্নবিলাসী! আমি আমার গবেষণাতে যা না সুখ পাই, তুমি তোমার স্বপ্ন থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী সুখ,—মনের শান্তি পেয়ে থাক একথা তুমি ভুলো না। —ইচ্ছে করে—হঠকারিতার বশে বা কৌতূহলের পুতুল হয়ে—নিজের দুঃখ তুমি নিজে ডেকে এনো না ফিরাজ।"

—বলে এলরামি তাড়াতাড়ি টেবিলে চলে গেল।

কিরাজ তার পেছনে পেছনে গিয়ে দরজা ঘোরে হুড়কো বন্ধ করে এল। ফিরে এসে এলরামির বড় গদি আঁটা চেয়ারটায় বসে পড়ে, ঘরের চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে।

কিরাজ চেয়ে দেখলে, টেবিলের ওপর প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় হাতে লেখা একটা পুঁথি পড়ে রয়েছে। সেটা অন্যমনস্কভাবে কাছে টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা জায়গায় নজর পড়তেই, আর পাতা না উল্টে সেইখানটা পড়তে লাগল—

"—সেইজন্যেই প্রাণস্পর্শী কল্পনা আর ধারণার প্রতিবিম্ব —প্রেম, হিংসা, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিশোধ লইবার দুর্জয় স্পৃহা, একব্যক্তি সহজেই অন্যের মস্তিষ্ক কোষে সঞ্চার করিতে পারে। প্রেরণার শক্তি ও সহজতার উপরই ইহার সাফল্য নির্ভর করে। পরীক্ষককে এজন্য আপনার দৃষ্টিশক্তির অনুশীলন করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হয়। তাহার পর সেই তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে। যে কোন ব্যক্তির ওপর আপনার ইচ্ছা শক্তি চালনা করিতে পারে। সাধারণতঃ এজন্য সর্বপ্রথম পরীক্ষক ছাত্রের অপবগা নাড়ী (Optic Nerve) কে সুপ্ত করিয়া ফেলিবে। এই সুপ্ত করিবার দুইটি উপায় আছে— (এক)—ছাত্রকে কোন চুম্বক শক্তি সম্পন্ন উজ্জ্বল বস্তুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে বলিয়া নিজে এক দুই করিয়া ধীরে ধীরে দুইশত অবধি গণনা করিবে। আর (দুই) প্রবল ইচ্ছা-শক্তির সহায়তায় পরীক্ষক আপন চক্ষু দুইটিকে চুম্বক-শক্তিতে পূর্ণ করিয়া ছাত্রকে সেই দীপ্তিপূর্ণ চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে বলিবে। এই উভয় পদ্ধতিতেই ছাত্রের অপবহা নাড়ীর মধ্যে রক্তস্রোত স্তব্ধ হইয়া যাইবে। ফলে তাহার মস্তিষ্ক কোষে তখন আর পারিপার্শ্বিক কোন কিছুরই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবে না;—কেবল সে সেই পরীক্ষকের নির্দেশ বা প্রেরণাই বুঝিতে পারিবে।—কেবল পরীক্ষকের ইঙ্গিত প্রতিচ্ছবিই তাহার মস্তিষ্কের কোষে প্রতিবিম্বিত হইবে। এই অবস্থায় সম্ভব অসম্ভব সমস্ত কিছুই সেই ছাত্রকে বিশ্বাস করাইতে পারিবে এবং পরীক্ষকের এই শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রের উপর বলবৎ থাকিবে, ততক্ষণ অবধি সেই ছাত্র ক্রীতদাসের ন্যায় নির্বিচারে পরীক্ষকের আদেশ পালন করিবে। পরীক্ষকের নিজের যদি আলোক ও বায়ুতরংগের নিয়মগুলির সুষ্ঠু জ্ঞান থাকে তাহা হইলে সে তাহার এই প্রভাব ছাত্রের উপর বহুকাল অবধি অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে পারিবে —"

কিরাজ পুঁথিখানির এই অংশ দু-তিন বার ভাল করে পড়ে, পুঁথির বক্তব্যটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে তখন সে পুঁথিখানি বন্ধ করে টেবিলের যেখান থেকে নিয়েছিল, ঠিক সেইখানেই রেখে দিলে।

পুঁথিখানি তার ভাবনার যথেষ্ট খোরাকই জুগিয়ে দিয়েছিল। কিরাজ বসে ভাবতে লাগল—"দাদা আমায় স্বপ্ন-বিলাসী বলে।...তবে কি আমার গ্রহান্তরে জন্মভূমির স্বপ্ন,—সেখানের অপূর্ব সুন্দর গান,... এসব কি দাদার মনের ইচ্ছাশক্তিই আমার প্রাণে জাগিয়ে তোলে? দাদা কি আমায়, তার চুম্বক শক্তিতে বশ করে, এই সব ছবি-টবি দেখাচ্ছে আমায়?...মন কিন্তু আমার একথায় সায় দিতে চাইছে না। বরং আমার ত মনে হয়, দাদাই আমার আত্মার শ্রবণশক্তি অপূর্ব ভাবে তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে।...তা না হলে যখন আমি গাঢ় ঘুমে ডুবে, অচেতন হয়ে থাকি, তখন দাদা, মাত্র মনে মনে আমায় ডাকলেই, তা আমি শুনতে পাই কি করে?...আর দাদাই নিশ্চয় আমার আত্মার দৃষ্টিশক্তিও তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে—যার জন্যে আমি কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাই, যা সাধারণ লোকে কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না!...তবে?...তবে? ...আমি কি এইভাবে এলরামির দ্বারা উপকৃতই হইনি?...হাঁ, এ কথা আমায় স্বীকার করতেই হবে,

এলরামি সত্যিই আমার যথেষ্ট উপকার করেছে। ...এ আমি কোন দিনই বলতে পারব না। ...কিন্তু, সময়ে সময়ে, আমি যেন কেমন একটা শূন্যতা বোধ করি,...কি যেন একটা কিছু, যার আমি কোন মতেই ঠিক করে নাম দিতে পারিনা,—সেটা যেন হারিয়ে গেছে, মনে হয়!"—এই রকম নানা ভাবনা ভাবতে ভাবতে কিরাজ, দু-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে রইল। এই ভাবনার মধ্যেই কেমন

যেন একটা অ—জানা ভয়, মনের মধ্যে তার মাথা তুলে উঠতে চাইছিল।

হঠাৎ কারো হাতের স্পর্শ, পিঠের ওপর অনুভব করে, সে চমকে উঠে সোজা হয়ে বসতেই দেখতে পেলে, বৃদ্ধা জারোবা ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে, তার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে! এ দৃশ্য দেখে, ফিরোজের মন থেকে ভয় দূর হয়ে গেল। জারোবার মৃদু হাসির উত্তরে সেও মৃদু হেসে উঠল। জারোবা কেন হাসছে, তার দিকে চেয়ে, আর কেনই বা, সে নিজে হেসে যে তার সে হাসির জবাব দিলে, এ প্রশ্ন তার মনেই উঠল না একবারও!

"এলরামি কোথায়?—চলে গেছে কি?"

মাথা নেড়ে ইসারায় ফিরোজ তার প্রশ্নের উত্তর দিলে। সাধারণতঃ সে জারোবার সঙ্গে দু-উপায়ে কথা কইত, প্রথম, ইসারা; দ্বিতীয়, জারোবার হাতের চেটোয় নিজের আঙুল দিয়ে লিখে।

"কোথায় গেছে সে?"

আবার নীরব ইসারায় ফিরোজ তার কথার উত্তর দিলে। সে কথা শুনে, জারোবা কতকটা যেন নিজের মনেই বলে উঠল,—"আজ রাতে, তা হলে আর, সে ফিরছে না!"—বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, জারোবা আরাম করে বসে পড়ল। তারপর হাঁটুর ওপর হাত দুটো রেখে, দুলতে দুলতে, সে কি যেন ভাবতে লাগল। অল্পক্ষণ এই ভাবে ভেবে কতকটা নিজের মনেই সে বিজ বিজ করে বলে উঠল,—"লোকটা হয় স্বয়ং দেবতা, আর নয়ত আস্ত শয়তান!···কিম্বা হয়ত দুই-ই সে!"

সামনে বসে ফিরোজ যে তাকে দেখছে বা তার কথা শুনছে একথা তখন যেন সে ভুলেই গেছল। ভুলে ভুলে সে বলে যেতে লাগল,—"একদিন সে আমার মরণের মুখের গ্রাস থেকে টেনে বার করে, বাঁচিয়ে তুলেছিল,—সে কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।..... তার অদ্ভুত শক্তিতে, কাল আমি স্বপ্নের মধ্যে আমার হারানো যৌবন ফিরে পেয়েছিলুম কত গান গাইলুম আমার কালো চুলে কত যত্নে বিনুনী করে, মতি-মুক্তা দিয়ে তা সাজালুম—যখনি আগে যৌবন কালে, যেমন যেমনটি আমি করতুম,—অবিকল তাই,—!... হ্যাঁ, তখন আমার সত্যিই মনে হচ্ছিল, আমার হারান যৌবন আবার বুঝি আমি ফিরে পেয়েছি!... শুধুই কি তাই?...আমার হারান মনের মানুষটিও আমার কাছে ফিরে এসেছিল..কত সোহাগ কত আদরই না, সে করলে আমায়! এলরামির শক্তিতেই এসব সম্ভব হ'য়েছিল...তারই দয়ায়, ফিরে পেয়েছিলুম, আমার হারান রূপ,.. আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনের মানুষটিকে,···"

বলতে বলতে হঠাৎ ফিরোজের দিকে তার নজর পড়ল। দেখলে বিস্ময় ভরে সে তার কথাগুলো শুনছে—ঠিক যেন গেলার মতন ক'রে। দেখে বুড়ি খলখল্ ক'রে হেসে উঠে বললে,—"কিগো ছেলে, তুমি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনে, মনে মনে হাসছ, এই ভেবে যে এই তোবড়ান মুখ,—ঝুলে পড়া চামড়া, কোনদিন নাকি সুন্দর ছিল!—তাই নয় কি!"

ফিরোজ চেয়ার ছেড়ে উঠে, জারোবার সামনে, মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে, ধীরে ধীরে বুড়ির একখানা হাত তুলে নিয়ে সস্নেহে তার ওপর একটি চুমো খেলে। ফিরোজের ঠোঁটের স্পর্শে, জারোবার সারা দেহ, আবেশে কেঁপে কেঁপে উঠল। দুচোখে তার অশ্রুর ধারা নামল। সস্নেহে ফিরোজের মাথার ওপর ডান হাতখানি রেখে, কোমল মৃদু স্বরে বললে,—"ছেলেমানুষ। হ্যাঁ, আমার কাছে কচি ছেলে বইকি! তবু কিন্তু যৌবনের জোয়ার তোমায় মাতিয়ে তুলেছে! না, না, ফিরোজ, আমি ভুল করেছি,—তোমার মতন ছেলে সে আমার মতন বুড়িকে ঘেন্না করবে না, তা আমি ভুলেই গেছলুম। কিছু মনে করো না ফিরোজ? বড্ড নরম তোমার মন,—মেয়েদের মতই তা স্নেহ ভালবাসায় ভরা!"

"বুড়ি কি বললে? মেয়েদের মতই কোমল আমার মন?"—জারোবার ঐ কথাটা কানে যেতেই ফিরোজ উঠে পড়ে উত্তেজনায় থরথর অস্থির পদে পায়চারি

করে বেড়াতে লাগল।

জারোবা তখন ভাইনীর মতই, তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কতক্ষণ দেখে দেখে সে বললে—"ফিরাজ তুমি অদৃষ্টের.—নিয়তির ক্রীতদাস হয়ে রয়েছ। ঘুনিয়েই তোমার দিন কেটে যাচ্ছে। ওঠো! জাগো! তোমারও যে পৌরুষ আছে তা জানিয়ে দাও। জীবনের সেরা সুখ, প্রেম আজো তুমি তার সন্ধান পাও নি! কি দুর্ভাগা তোমার!"

বিরক্তিভরা চোখে, বক্তাকে একবার দেখে নিয়ে ফিরাজ একটা স্লেটে পেন্সিল দিয়ে লিখলে—"এসব কি বাজে বকছ তুমি?—নিশ্চয়ই কোন রোগ ধরেছে তোমার, তাই এমন যা-তা বকে যাচ্ছো। প্রেম যে কি তা আমি জানি। আর জীবন বলতে কি বোঝায়, তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু, আমি জানি,—আমার জীবনের সুখ,—শ্রেষ্ঠ প্রেম, এ পৃথিবীতে পাব না, পাব অন্য গ্রহে গিয়ে।"

স্লেটের লেখাগুলো পড়ে জারোবার মুখ-চোখে স্পষ্ট রাগের লক্ষণ ফুটে উঠল। জোরে জোরে লেখা-গুলোর ওপর হাত ঘসে ঘসে সেগুলোকে পুঁছে ফেললে। তারপর স্লেটখানা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে, ফিরাজের দিকে চেয়ে বললে—"বোকা···আহম্মক কোথাকার!··· অন্য গ্রহে পাবে প্রেম?—ঘরের বাড়ী গিয়ে পাবে··· তোমার জীবন—তোমার প্রেম, নিছক স্বপ্ন। অন্যের চোখে তুমি দেখ,—অন্যের মগজে তুমি ভাব। আর এক জনের ইচ্ছাশক্তি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমায়!··· যেন তুমি জড়!···যন্ত্র মাত্র তুমি!···কিন্তু না। সারা জীবন, তোমায় আমি এ ভাবে প্রতারিত হ'তে দেবে না,—কিছুতেই না।···আমিই তোমায় মানুষ ক'রে তুলবো, দেখো!"—বলে সভয়ে জারোবা একবার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে!—দোরের দিকেও চেয়ে দেখলে, একবার। মনে তার ভয় হচ্ছিল—এখুনি হয়ত দোর খুলে এলরামি ঘরে ঢুকে তার মনের কথা শুনে ফেলবে। তখনই তার মনে পড়ে গেল, এলরামি এতক্ষণ ট্রেনে চড়ে যাচ্ছে···।

নিজের নিরাপত্তার কথাটা মনে হতেই সে নিজের ত্রস্ত ভাবটা সামলে নিয়ে, ফিরাজকে আবার বোললে,—"শোন আজ রাত্রে—সারা শহর যখন ঘুমিয়ে থাকবে,—চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, তখন ওপরে আমার কাছে এসো।···আমি তোমায়, জগতের এক সেরা আশ্চর্য জিনিস দেখাব!···দেখবে, এসো, তোমারই মতন স্বপ্ন দেবতার আর একটি বলির পশু!"—বলে আবার একবার জারোবা সভয়ে ঘরের চারিদিকটা দেখে নিলে। আবার নতুন করে সাহস জাগল তার মনের মধ্যে। ফিরাজকে শেষ কথা জানিয়ে দিলে—"মনে থাকবে ত?···হাঁ, ঠিক,—নিশ্চয় এসো কিন্তু!"

ইসারায় ফিরাজ বললে—তা না হয় গেলুম,—কিন্তু যাব কোথায় বল ত?"

জারোবা আঙুল হেলিয়ে বললে—"ঐ ওপরের ঘরে —সে ঘরে দোরে চাবি বন্ধ করে, দিন রাত আমি ভেতরে থাকি। সেই খানেই আছে এলরামির সবচেয়ে বড় গুপ্ত রহস্য! আজ আমি তা, তোমার কাছে ফাঁস করে দেব।"

এলরামির মানা করা ঘরে ঢুকতে হবে ভেবে, ফিরাজের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল দেখে, জারোবা তাকে আবার বললে—"জান, এলরামি তোমায় ওঘরে যেতে মানা করেছে" তোমাকেও, তোমায় কোন কথা জানাতে মানা আছে! কিন্তু সারা জীবন, কেন আমরা তার এই অন্যায় হুকুম মেনে চলবো?···কারো ত কেনা চাকর নই আমরা?···কি হল? তোমার বুঝি সাহসে কুলুচ্ছে না, তার সে হুকুম অমান্য করতে?···বেশ, তা হলে আর আমার বলবার কি থাকতে পারে?—তুমি নিজে যেমন ভাল বুঝবে তাই কোর।—আমি কিন্তু আজ তোমায় একটা মহা সুযোগ দিতে চাইছিলুম।— আমি পুরুষ মানুষ হলে কিছুতেই এমন সারা-জীবন ধরে স্বপ্ন-দেবতার বলির পশু হয়ে পড়ে থাকতুম না!"—বলে রাগে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

জারোবা বেরিয়ে গেল, ফিরাজ এলরামির বড় চেয়ার খানায় ক্লান্তভাবে আবার বসে পড়ল। মনে মনে সে ভাবতে লাগল—এলরামি তার সহোদর বড় ভাই।— তার মত স্নেহ-ভালবাসা ফিরাজ আর কারো কাছেই পায় নি। মা-বাবা তার কেমন ছিলেন—আর কবেই বা

ছিলেন, তারপর কবেই বা তাঁরা মারা গেছেন—ফিরাজ সেসব কথা মনে করতেই পারে না। একা এলরামিই তার মা-বাপ-বড়ভাই, এ তিনের অভাবই তার জ্ঞান হবার পর থেকে চিরদিনই মিটিয়ে এসেছে। আজও কোন দুঃখ বা অভাবকে সে ফিরাজের কাছেও আসতে দেয় না।—মনে পড়ে, ছেলে-বেলায় বহুদিন ধরে সে এলরামির সংগে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কাজেই এলরামির জীবনকাহিনী ফিরাজের কাছে একটা বইয়ের খোলা পাতার মতই সরল—প্রাঞ্জল! শেষবার ভ্রমণের সময় সিরিয়ার মরুর ভেতর দিয়ে তারা যখন দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছিল, সেই সময় একদল ক্ষুধাতুর বিপন্ন আরব ভবঘুরেদের সংগে তাদের দেখা হয়। সেই দলের মধ্যে প্রায় মরা অবস্থায় এক বুড়ি আর একটি মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন হারা মৃতপ্রায় কিশোরী মেয়ে লিলিথের সংগে তাদের দেখা হয়। কি জানি কেন এলরামি অতি দ্রুততা দেখিয়ে এই দুটি মরণ পথের যাত্রীর চিকিৎসার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। এর আগে পরের জন্য এতটা করতে ফিরাজ কখনও দেখে নি এলরামিকে,—তারপর এলরামির অদ্ভুত চিকিৎসার ফলে দুই-একদিনের মধ্যেই সেই প্রায় মরে যাওয়া বুড়ি বেঁচে উঠল। শুধু তাই নয়, আরও তিন চার দিনের মধ্যে বুড়ির স্বাস্থ্য এমন ফিরে গেল যে, তাকে দেখে কারো মনে করবার যো ছিল না যে, চার-পাঁচ দিন আগে এই স্বাস্থ্যবতী বুড়িই মরার মত হয়ে পড়েছিল—আর তার সাথী আরবেরা তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করছিল!—সেই বুড়িই এই আবোবা। এলরামি কিন্তু বার বছর বয়সের কিশোরী লিলিথকে বাঁচাতে পারলে না। এলরামির কোলে শুয়েই বেচারী মারা পড়ল!

মনে পড়ল ফিরাজের—যেদিন লিলিথ মারা গেল সেদিন হঠাৎ এলরামি অতি তাড়াতাড়ি কখানা হাতে লেখা পুঁথি সাইপ্রাসের এক মঠে পৌঁছে দেবার জন্যে একা ফিরাজকে সেই মরুভূমি থেকে আলেকজেন্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এলরামি তাকে বলে দিয়েছিল সে যেন সেই মঠেই থাকে, যতদিন না এলরামি একটা বাসের আস্তানা ঠিক করে তাকে ফিরে আসতে চিঠি লিখে পাঠায়। কারণ বুঝিয়ে ছিল তাকে এলরামি যে এই পুঁথিগুলো নাকি অমূল্য আর বড় জরুরী। অথচ এদিকে এই বিপন্ন আরবদলকে সাহায্য করবার জন্য এলরামিকে তখনও কদিন সেই মরুর মাঝেই থেকে যেতে হবে, তাই ফিরাজকে দিয়ে সে পুঁথিগুলো মঠে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বিনা বিধাতেই ফিরাজ সেদিন তাদের আদেশ পালন করেছিল। তারপর এলরামি তাকে লণ্ডনের এই বাসার ঠিকানা দিয়ে ফিরে আসতে চিঠি দিয়ে ছিল। সেই চিঠি পেয়ে এখানে আসার পর থেকে তারা লণ্ডনের এই বাসাতেই বরাবর বাস করছিল।

এ বাসায় ফিরে এসে বুড়ি আবোবাকে দেখে ফিরাজ বিস্মিত হয়েছিল। আর সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছিল এই দেখে যে বুড়ি সংসারের কোন কাজই করে না, শুধু খাবার সময় ওপরের ঘর থেকে নেবে এসে নিজের খাবারটি তৈরী করে খেয়ে যায়। আর বাকী সময়টা ওপরের ঘরে ঘোর বন্ধ করে বসে থাকে! লক্ষ্য করে দেখেছে ফিরাজ যে, বুড়ি যখন রান্না-খাওয়ার জন্যে নীচের নেবে আসে তখন তার ঘরের দোরটা একটা দামী তালা দিয়ে চাবি বন্ধ করা থাকে। কাজেই সে ঘরটা কেমন বা কি আছে সে ঘরে, ফিরাজ তার কোন কথাই জানত না। এলরামিও তাকে কোনদিন কিছু বলেনি।

সাইপ্রাস থেকে ফিরে এসে, ফিরাজ এলরামিকে অনেকবার জিগেস করেছে, সিরিয়ার মরু থেকে সে চলে যাবার পর কি কি ঘটেছিল? কিন্তু প্রতিবারেই এলরামি তার এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে—কোন জবাবই দেয়নি তাকে। তারপর ফিরাজ লক্ষ্য করল, যতদিন যেতে লাগল ততই যেন সে এলরামির আরও বেশী ন্যাওটো—আরও বেশী বাধা হয়ে উঠতে লাগল। এরকম কিন্তু একটা যে হচ্ছে বা কেন যে এরকম হচ্ছে তা ফিরাজ কোনদিনই ভেবে দেখেনি। এলরামির আকর্ষণ-শক্তি বরাবরই প্রবল আর সেই শক্তি আরও বাড়াবার জন্যে এলরামি নিত্য সাধনা করত। বহুদূর থেকে এলরামি মানুষকে তার ইচ্ছামত কাজ করাতে পারত। মিশরে এরকম শক্তি অনেকেরই আছে এজন্য এ নিয়ে ফিরাজ কোনদিন মাথা ঘামাতো না। তার বদলে কবিতা, গান, নব নব গল্পের চর্চা—যা তার প্রকৃতিতে স্বতইস্ফূর্ত হত, তাই নিয়েই সে নিজের রচিত মধুর স্বর্গে দিন কাটাতো। মাঝে মাঝে শুধু ওপর তলায় আবোবার ঘরখানায় কি আছে, তা জানবার জন্যে মনের মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠতো। বরাবরই ফিরাজ লক্ষ্য করে এসেছে যে এই ঘর সম্বন্ধে তার কোনরকম কৌতূহলকেই এলরামি কোনদিন আমল দিত না।—বরং যেগেই উঠত। তার এই অহেতুক কৌতূহল দেখে শেষে এলরামি তাকে একদিন বলেছিল —"অহেতুক কৌতূহলের মোহে পড়ে নিজে কেন নিজের জীবনে দুঃখ টেনে আনতে চাও ফিরাজ?"

আজ আবোবা তাকে ডেকে গেছে। বলে গেছে ওপরতলার রহস্য, তাকে দেখাবে আজ। এই থেকেই ফিরাজের মনে আজ এইসব ভাবনা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভেবে কিন্তু সে স্থির করতে পারছিল না, কি তার করা উচিৎ। ভাবের বিশ্বাসের অমর্যাদা করে কি তার সেখানে যাওয়া উচিৎ হবে?—না হবে না?

[ক্রমশঃ

সংগীত

নেপালের লোকগীতি

বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নেপালের মত এত মেলা বোধ হয় অন্য কোন দেশে হয় না। বারোমাসে তের পার্বণের মত মেলার পর মেলা নেপালীদের মিশুক প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে যায়। তাই নেপালীরা তাদের মাতৃভূমিকে 'মেলা সমৃদ্ধ নগরী' বলে ডাকে। মেলাগুলি সাধারণতঃ দুই নদীর সংগমস্থলে বসে। দূর দূরান্ত হতে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতা আসে মেলায় যোগ দিতে।

মেলাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এদের সাংস্কৃতিক দিক। নানান সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের লোকেরা এখানে একত্রে আসে, একে অপরের স্থানীয় আচার-বিচার, ব্যবহার, লোকগীতি ইত্যাদি শোনে। আর এতে করে তারা বিভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন কলাকৌশল সমন্বিত লোক-নৃত্য আর লোকগীতি শিখতে পারে। তারপর দুই একদিনের মধ্যে মেলা শেষ হয়ে যায়। তখন তারা নিজের নিজের গ্রামে ফিরে নতুন নতুন নাচগানে করে সকলের সঙ্গে নতুন আনন্দ লাভ করতে পারে।

নেপালীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে, এদের নাম হল গুরুং। সাধারণতঃ মেষপালনই এদের জীবিকা। এই গুরুংরা খুব নাচের ভক্ত। এদের গ্রামে একজন করে মোড়ল থাকে। মোড়লদের কুটির অন্যান্য গ্রামবাসীর কুটিরের চেয়ে আকারে বড় আর দেখতেও ভাল হয়। এই মোড়লদের বাড়ীতে একটা করে নাচঘর থাকে। এই নাচঘরের নাম তাদের ভাষায় 'রোরি-ঘর।' সাধারণতঃ ফসলকাটা শেষ হবার পর ওরা এই রোরি-ঘরে একত্র জমায়েত হয়, তারপর সকলে মিলে সুন্দর মনোরম ভঙ্গিমায় নাচ পরিবেশন করে। এই নাচকে 'সড়-টি' বলে। ফসল যখন বেশী পরিমাণে কাটা হয় তখন এই সমস্ত নাচঘরের আনন্দোৎসব বেশ কিছুদিন উত্তেজনার সঞ্চার করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এইসব রোরি-ঘরে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীদেরই প্রবেশাধিকার থাকে। নাচ আর গানের মধ্যে দিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের ভাবীজীবনের সাথীকে বেছে নেবার সুযোগ পায়।

নেপালের পশ্চিম অংশে প্রধানতঃ চারধরনের লোকগীতি প্রচলিত আছে। 'লাহ্যা-করি' আর 'চক্-পারে'। গানগুলোর উচ্চারণের ভঙ্গিমা আর সুরে একটা বিশেষত্ব আছে। সময় সময় যুবক-যুবতীদের মধ্যে একটা গানের লড়াই বেধে যায়। প্রথমে কোন একজন যুবক গান ধরে। গান শেষ হলে একজন যুবতী উঠে গানের মাধ্যমেই তার উত্তর দেয়।

যুবতী যদি লড়াইয়ে হেরে যায় তাহলে যুবককে গলায় তাকে মালা দিতে হয়। কিন্তু কোনক্রমে যুবক যদি পরাজিত হয় তখন অন্য যুবক তার সঙ্গে লড়াই-এর সুযোগ পায়। যে ভাগ্যবান এই লড়াই-এ জিততে পারে সে সেইদিনের নায়ক হয়ে খুব সম্মান পায়। আর বিয়ের সময় সেই তরুণীর কাছ হতে উপহার পায়।

লোক-গীতিগুলো কতকগুলো ক্রমশঃ সেগুলো দেওয়া গেল।

'করাওরে' গীত—নেপালী ভাষায় 'করাওরে' কথার মানে হল রোগা আর পাতলা। এই গানগুলো আকারে খুব ছোট। মাত্র চার লাইনে শেষ। এর প্রধান বিষয় হল প্রেম।

'সরাই' গীত-এ গানগুলোর বিষয়বস্তু হল এক একটা গল্প। এগুলো আকারে দীর্ঘ, অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হয়।

'হাল-সি-রী' গীত দুর্গা পুজোর সময় এ গানগুলো গাওয়া হয়। দুর্গা দেবীর রোমান্টিক অভিধানের কথাই এ গানের বর্ণনার বিষয়।

'ভৈলো' অথবা 'দেওসী' গীত—দেওয়ালীর সময়ের গান হল এটা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে দেওয়ালীর সময় এই গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী অর্থ সংগ্রহ করে।

'জুবারী' গীত—'কম্বাওরে'র মত এ গানগুলোও চার লাইনের। বিশেষ কোন উৎসব বা মেলা উপলক্ষে প্রশ্নের ভঙ্গীতে এ গান গাওয়া হয়। সাধারণতঃ যুবক-যুবতীরাই এ গানে অংশ নেয়। যুবতীরা প্রথমে গানের সুরে সুরে কতকগুলো প্রশ্ন করে। যুবকরা তার গানের মধ্যে দিয়েই উত্তর দেয়।

'সাঙ্গিনা' গীত 'টি-জে' উৎসবের সময় সাধারণতঃ মেয়েরা একত্রে এ গান করে। 'টি-জে' উৎসব পূজোর আগে হয়। গ্রামের মেয়েরা হয় কোন মন্দিরের চত্বরে কিংবা কোন বটগাছের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে এই গান গায়। গান গাইতে গাইতে কয়েকজন গোলের মধ্যে আসে আর কয়েকজন বাইরে চলে যায়। যারা ভেতরে থাকে তারা নাচ আরম্ভ করে আর বাইরে যারা থাকে তারা গান গায়। এইসব গানে সুখী সাংসারিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার ছবি পাওয়া যায়। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে একটা বিশেষ সংস্কার আছে—যারা এই নাচগানে ভাগ নেয় তারা নাকি খোঁড়া হয়ে যায়।

'বাজুন' গীত—রামায়ণ মহাভারতের বীর নায়কদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীই হল এই গানগুলোর বিষয়।

'বা-তে-লা' গীত নেপালে বিয়ের সময় সাধারণতঃ গ্রামের সমস্ত পুরুষেরা বউ আনবার জন্য বরের সঙ্গে যায়। মেয়েরা ঘরে থাকে। এই সময় গ্রামের সমস্ত মেয়েরা একত্র হয়ে এক উৎসব আরম্ভ করে। এর নাম হল 'বাতেলা'। সারারাত ধরে চলে এ উৎসব। কতকটা নাটক অভিনয়ের মত ব্যাপার এটা। মেয়েরা পুরুষের বেশ পরে অভিনয় করে। বিদ্রূপাত্মক বিষয়বস্তু সাধারণতঃ নাটকের উপাদান হয়। পুরুষদের কিন্তু এ অভিনয় দেখা নিষেধ।

'বারমাসে' গীত—কোন কারণবশতঃ স্বামীসঙ্গহীন হয়ে থাকতে হয় যাদের—এমনি মেয়েরা সব একত্র হয়ে এই গান গায়। নেপালের যে অঞ্চল হতে বেশীরভাগ পুরুষ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে যায় সেই সেই অঞ্চলেই প্রধানতঃ এই গানের প্রচলন বেশী। এই সব সৈনিকের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের কোন সংবাদ পায় না। দুঃখ বেদনায় তাদের হৃদয় ভরে উঠে, অভাগিনী বধূদের প্রিয় মিলনের অভাবজনিত দুঃখের কাঁদন 'বারমাসে' গীত নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে।

'আষাঢ়ে' গীত—সাধারণতঃ কৃষকরা আষাঢ় মাসে এই গানগুলো গায়। বর্ষার বন্দনা আর আবাহনই এর বিষয়।

'সাওনে' গীত—এ গানের সময় হ'ল শ্রাবণ মাসে। নববিবাহিত কৃষক-দম্পতি এই সময় সকলকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। শাশুড়ীর কাছ থেকে বাপের বাড়ী যাবার জন্য যাদের আকুলতা তাঁরা এ গান করেন; আবার বাপের বাড়ীতে থেকে যাঁরা আনন্দ উপভোগ করছেন তাঁরাও এ গান করেন।

'চৈতে' গীত—বসন্ত ঋতুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বড় সুন্দর গান এগুলো। বছরের প্রথমে এ গান গাওয়া হয়। গানের মধ্যে দিয়ে নতুন বছরকে আবাহন জানানো হয়।

সাপের বিষ

অবনীভূষণ ঘোষ

★

সাপের বিষ সাধারণ মানুষের কাছে এক অদ্ভুত জিনিস। সামান্য একটু জিনিস—কিন্তু তাতেই মানুষের প্রাণ নষ্ট করে দিতে পারে! এ হেন জিনিসের নামে মানুষ যে ভীত হয়ে পড়বে, এ তো খুব স্বাভাবিক। কেবল সাধারণ লোকের কাছে অদ্ভুত নয়, বৈজ্ঞানিকদের কাছেও সাপের বিষ আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে! সাপের বিষের সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা আজও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব না হলেও সাপের বিষের উপাদান সম্বন্ধে তাঁরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছেন!

সাপের বিষ দেখতে কেমন? সদ্য বের করা সাপের বিষ পরিষ্কার তরল পদার্থ। সব সাপের বিষের রঙ এক রকম নয়। তবে সাধারণের বলা চলে, সাপের বিষের রঙ ঈষৎ হলদে রঙের—কতকটা সরষের তেলের মত। ঘনীভূত সল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের উপর অথবা শূন্যে বেল-জারের (Bell jar) নীচে শুষ্ক করলে সাপের বিষ তার জলীয় উপাদানের শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ হারায়—এবং অল্প হলদে রঙের দানা বাঁধা পিণ্ডে পরিণত হয়। এই পিণ্ড কতকটা তৈলশুটিকের মত দেখতে হয়। শুষ্ক বিষ অনির্দিষ্ট কাল ধরে তার বিষত্ব বজায় রাখে। জলে শুষ্ক বিষ শীঘ্রই গলে যায়। পিণ্ডাকার শুষ্ক বিষ সহজে গুঁড়ো করাও যায়। ৭৩০ সেন্টিগ্রেড তাপে আধ ঘণ্টা ধরে ফণাধারী সাপের বিষ যদি উত্তপ্ত করা হয়, তাহলে তার বিষত্ব সামান্য হারায়। ঐরূপ ক্ষেত্রে বোড়া সাপের বিষ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তার বিষত্ব হারায়।

সাপের বিষের তরলত্বারও তারতম্য আছে। একদিকে জল, অপর দিকে ডিমের সাদা অংশ—এই দুয়ের ঘনত্বের মধ্যে বিভিন্ন সাপের বিষের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় সাপের বিষে অল্প অ্যাসিড হয়। কিন্তু উদ্বায়ী অ্যাসিড দূরীভূত হওয়ার ফলে এ বিষ শীঘ্রই ক্ষারীয় (alkaline) হয়ে ওঠে।

সাধারণ লোকের অনেকের ধারণা আছে, সাপের বিষ বুঝি নীল রঙের। এ ভুল ধারণা হওয়ার অবশ্য কারণ আছে। বিষধর সাপ কাউকে কামড়ালে দষ্ট স্থানের আশে-পাশে ত্বকের তলায় রক্ত জমে কখনও কখনও নীলাভ (বা সবজেটে বা বেগুনে) দেখায়। এই নীলাভ রঙের কারণ ঠিক ধরতে না পেরে তারা মনে করে, সাপের বিষ বুঝি নীল—তাই এই নীলাভ রঙ।

এখন প্রশ্ন হল, সাপের বিষ তার মুখে এল কেমন করে? আমাদের মুখে লালাগ্রন্থি আছে। লালাগ্রন্থিগুলি থেকে লালা বেরিয়ে খাদ্য গ্রহণে ও হজমব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে। সাপের মুখে এই লালা পরিণত হয় তার বিষে। আর আমাদের মুখের লালাগ্রন্থিগুলির যেটি সবচেয়ে বড়, সেটিরই অনুরূপ হল সাপের বিষ-গ্রন্থি। সাপের বিষ জমা হয় তার এই বিষ-গ্রন্থিতেই। আমাদের মুখের লালা খাদ্য গ্রহণ ও হজম ব্যাপারেই সাহায্য করে। সাপের মুখের বিষ এই কাজটি তো করেই—পরন্তু শিকারকে হত্যা করে সাপের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও সাহায্য করে। শত্রুকে হত্যা করে সাপের প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারেও সাহায্য করে তার বিষ।

সব সাপের লালাতেই কম বেশী বিষ-পদার্থ থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ সাপের লালাতে এই বিষপদার্থ থাকে খুব কম। এত কম যে বিশেষ কিছু আসে যায় না। তাই এ সাপগুলিকে আমরা বিষহীন বা নির্বিষ সাপ বলেই ধরে নিয়ে থাকি। যে-সব সাপের বিষ-পদার্থ তার মুখের বিষগ্রন্থিগুলিতে জমা হয়, তাদেরকেই আমরা বিষধর বা বিষাক্ত সাপ বলি। বিষধর সাপের বিষ-দাঁতও থাকে। বিষহীন সাপের সুস্পষ্ট বিষ-গ্রন্থি ও বিষ-দাঁত থাকে না।

সাপের বিষ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে জেনে

বাধা দরকার। সাপের বিষ কারও দেহের রক্তের সংগে না মেশা পর্যন্ত তার ক্ষতি করতে পারে না। রক্তের সংগে মিশলেই তবে তার বিষত্ব প্রকাশ পায়। সাপের বিষ কেউ হাতে করে নিলেও তার কোন ক্ষতি হয় না। এমন কি সাপের বিষ খেলেও মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় না। কোন জিনিস খেলেই তা রক্তের সংগে মেশে না। তা হজম হয়ে রক্তের সংগে মেশে। সাপের বিষ হজম হয়ে রক্তের সংগে মেশবার আগে তার বিষত্ব নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য কারও দাঁতে, গলায় বা পেটে ঘা থাকলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে সাপের বিষ তার রক্তের সংগে মিশে যেতে পারে। সাপের বিষ খেয়ে অনেকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের ভান করেন। সাপের বিষ খাওয়ার মধ্যে অলৌকিক যে কিছু নেই তা নিশ্চয়ই এখন আমরা বেশ বুঝতে পারি।

সাপের মুখে বিষ, অথচ তার কিছু হয় না। কেন হয় না, তাও বোধ হয় বোঝার পক্ষে আমাদের অসুবিধে নেই। মুখে বিষ থাকলেও তা তো আর তার দেহের রক্তের সংগে মিশছে না। অপরপক্ষে কোন বিষধর সাপ অপর কোন বিষধর বা বিষহীন সাপকে যদি ছোবল দেয়, তবে দষ্ট সাপটির মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। এমন কি কোন বিষধর সাপ আকস্মিকভাবে নিজের দেহেও বিষদাঁতের আঘাত করে বসলে তারও মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে সাপের দেহের রক্তে সোজাসুজি তার বিষ মিশেছে কিনা, অবশ্য এখানে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, সাপের বিষ সম্পর্কে কি বিষধর কি বিষহীন—সব সাপের রক্তে কিছুটা অনাক্রম্য (immune) ক্ষমতা আছে।

সাপের মুখে বিষ এল কেমন করে, এ সম্পর্কে ভারী একটা মজার কথা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যাবতীয় বিষাক্ত গ্যাস নাকি বিষধর সাপের মুখে এসে জমা হয়। বিষাক্ত গ্যাস থেকে পৃথিবীর অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্যেই নাকি সৃষ্টিকর্তার এ কৌশল! সাপের মুখে বিষাক্ত গ্যাস জমে তার বিষে পরিণত হয়! বলা বোধহয় বাহুল্য যে, একথার মধ্যে কোন সত্য নেই। আর একটা কথা চলতি আছে। যারা খুব বেশী আফিম খায় তাদের নাকি সাপের বিষে কিছু হয় না। মারাত্মক বিষধর সাপে কামড়ালেও তাদের দেহে নাকি বিষক্রিয়া দেখা যায় না। একথার মধ্যেও কোন সত্য নেই।

সাপের বিষ বিশ্লেষণ করে যেসব বিষ উপাদান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে প্রধানগুলির ক্রিয়া এরূপ: (১) কয়েকটি বিষ উপাদান বিভিন্ন নার্ভ কেন্দ্রে ক্রিয়া করে দেহের অবশকতা এনে দেয়—বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশী বিকল করে দেয়; (২) কয়েকটি বিষ উপাদান লোহিত রক্তকণিকা এবং রক্তবাহের কোষ প্রাচীর নষ্ট করে দেয়; (৩) কয়েকটি বিষ উপাদান রক্তজমন ঘটায়।

মোটামুটিভাবে প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন সাপের বিষ দুই ধরণের বলা যায়: (ক) যার ক্রিয়া প্রধানত নার্ভের উপর এবং (খ) যার ক্রিয়া প্রধানতঃ রক্তের উপর। কণাধারী সাপ (গোখরো, কেউটে, শঙ্খচূড়) কয়েত সাপ (কালাচ শাঁখামুটি) ও সামুদ্রিক সাপের বিষের ক্রিয়া প্রধানতঃ নার্ভের ওপর, আর বোড়া সাপের (চন্দ্রবোড়া বঙ্করাত) বিষের ক্রিয়া প্রধানতঃ রক্তের উপর।

সাপের বিষের প্রতিক্রিয়ার কথা বললাম। এখন বিভিন্ন সাপের বিষ গ্রন্থিতে কি পরিমাণ বিষ থাকে কারও কারও মনে সে কৌতূহল জাগতে পারে। গড়পড়তা শঙ্খচূড়ের বিষ গ্রন্থিতে ৬০ মিলিগ্রাম, গোখরো কেউটের বিষ গ্রন্থিতে ৩১৭ মিলিগ্রাম এবং চন্দ্রবোড়ার বিষ-গ্রন্থিতে ১০৮ মিলিগ্রাম পরিমাণ বিষ থাকে।

এক ছোবলে কতটা পরিমাণ বিষ সাপ মানুষের দেহে ঢোকায়? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এক ছোবল গোখরো-কেউটে সাপ সাধারণতঃ ২১১ মিলিগ্রাম বিষ ঢালে। এও পরীক্ষা করে দেখা গেছে একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে গোখরা কেউটের ১৫ মিলিগ্রাম বিষই যথেষ্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটানোর অল্পতম মারাত্মক মাত্রার ১৪ গুণ পরিমাণ বিষ গোখরো-কেউটে সাপ এক ছোবলে মানুষের দেহে ঢালতে পারে। এ কথাই আর একভাবে বলা চলে, এক ছোবলে গোখরো-কেউটে সাপ যে পরিমাণ বিষ মানুষের দেহে ঢালতে পারে তা ১৪ জন মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। এক ছোবলে কালাচ সাপ সাধারণতঃ ৫ মিলিগ্রাম বিষ ঢালে। একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে কালাচের ১ মিলিগ্রাম বিষই যথেষ্ট। এক ছোবলে চন্দ্রবোড়া সাপ সাধারণতঃ ৭২ মিলিগ্রাম বিষ ঢালে। একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে চন্দ্রবোড়ার ৪২ মিলিগ্রাম বিষই যথেষ্ট। গোখরো-কেউটে এবং কালাচ শাঁখামুটি জাতীয় সাপের কামড়ে ২০ মিনিট থেকে ৩০ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণতঃ মানুষের মৃত্যু ঘটে; আর চন্দ্রবোড়া বঙ্করাত জাতীয় সাপের কামড়ে ২ দিন থেকে ৪ দিনের মধ্যে সাধারণতঃ মানুষের মৃত্যু ঘটে। অবশ্য মানুষের এই মৃত্যু মাত্র কয়েক মিনিট—এমন কি তৎক্ষণাৎ ঘটতে পারে যদি সাপের বিষ তার শিরাতে প্রবেশ করে।

বিশ্বসাহিত্যে

বিদেশী গোয়েন্দা-ঔপন্যাসিক

অমল হালদার

○

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, গোয়েন্দা-কাহিনীর কথা সমালোচকরা উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ গোয়েন্দা-কাহিনীকে সাধারণভাবে সাহিত্যের মর্যাদা দিতে এখনো সমালোচকরা কুণ্ঠিত। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে কেউ সেই দেশের গোয়েন্দা-কাহিনীর ক্রমবিকাশের বিবরণ কিম্বা এই শ্রেণীর প্রধান-প্রধান বইগুলির আলোচনা পাবে না। অবশ্য পো বা কোনান ডয়েলের মতো দু' একজন গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক সমালোচকদের নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে গোয়েন্দা-কাহিনী এখনো সাহিত্যের আসরে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে রয়েছে।

যে কোন দেশের পাব্লিক লাইব্রেরীর পরিসংখ্যান প্রমাণ করবে যে গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তা অন্য যে কোন শ্রেণীর পুস্তক অপেক্ষা বেশী। কথা-সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ হল পাঠকের আনন্দ দেবার ক্ষমতা। আনন্দ পরিবেশনের ক্ষমতা গোয়েন্দা কাহিনীর যত আছে অন্য উপন্যাসের তত নেই। আর আনন্দ শুধু যে অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকরাই পান তা নয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ধার্শনিক-সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক নেতারাও চিত্ত-বিনোদনের জন্য অবসর সময়ে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়েন। যাঁরা পড়েন তাঁদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। পাঠকদের ওপর গোয়েন্দা-কাহিনীর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করে সমারসেট মম বলেছেন যে, ভবিষ্যতের সমালোচকরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা সাহিত্য আলোচনা করবার সময় হয়ত তথাকথিত 'সিরিয়াস' উপন্যাস উপেক্ষা করে গোয়েন্দা-কাহিনীর কথাই বিশেষ করে উল্লেখ করবেন।

ইংরেজীতে ডিটেক্‌টিভ কাহিনী, রহস্য কাহিনী এবং অপরাধমূলক বা ক্রাইম-কাহিনী নামে তিন শ্রেণীর জনপ্রিয় কাহিনী আছে। বাংলা প্রতি শব্দের এদের পার্থক্য বোঝা যায় না। গোয়েন্দা কাহিনী—হল, a tale in which the primary interest lies in the methodical discovery by rational means, of the exact circumstances of a mysterious event or series of events.

রহস্য-কাহিনীর সঙ্গে গোয়েন্দা-কাহিনীর খানিকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু উভয়ে এক নয়। রহস্য-কাহিনীতে হয়ত দেখা যাবে অকস্মাৎ একটি ঘরের তালা খুলে গেল। কেমন করে খুলল সে সম্বন্ধে কোনো কারণ বা যুক্তি নেই। আলিবাবার গুহার মুখ খোলবার মতো অযৌক্তিক ঘটনার পরিবেশন করা হয় রহস্য-কাহিনীতে। যে সব রহস্য গল্পের যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ভেদ হয় তাদের ডিটেকটিভ গল্পের সগোত্র বলা যেতে পারে।

ক্রাইম বা অপরাধমূলক কাহিনী মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই প্রচলিত। চাতুর্যের সঙ্গে অপরাধ অনুষ্ঠানের কৃতিত্বই নায়কের প্রতি পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। নায়ক আইন লঙ্ঘন করে অপরাধ করলেও তাকে দুরাত্মা বলে মনে হবে না। রবিনসন ক্রুশোর প্রতি পাঠকের মনে যেরূপ সহানুভূতি জাগ্রত হয় নায়কের প্রতি সেরূপ সহানুভূতি জাগ্রত করা অপরাধমূলক কাহিনীকারেরও উদ্দেশ্য।

গোয়েন্দা-কাহিনীতে অপরাধী নায়কের মর্যাদা পায় না। সেখানে গোয়েন্দাই নায়ক। এবং পাঠকের সহানুভূতি ন্যায় ও আইনের দিকে নিয়ে যাওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। গোয়েন্দা-কাহিনীতে ক্রাইম যে

ইয়েলো কেস্' শার্লক হোমস ক্রাইম-এর সন্ধের ভুল করেছিল। এই ভুল ভাঙবার ইতিহাসই : প্রতিপাদ্য বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপ আমেরিকার গোয়েন্দা কাহিনী পড়া নিষ্ফলীর । আমাদের দেশে এখনো অনেক পরিবারে কটিও উপন্যাস পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনী রণতঃ ন্যায়ের জয় এবং চক্রান্তকারীর পরাজয় য়ে থাকে। আর যে অভিযোগই গোয়েন্দা কাহিনীর ক থাক না কেন, নীতিভ্রষ্টতার অভিযোগ উঠতে না।

ডিটেকটিভ উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ কি?

াস যখন প্রথম লেখা শুরু খন রোমান্স ও ঐতিহাসিক ছিল কাহিনীর প্রধান ন। কাহিনীর বিন্যাসে যুক্তি সব সময়ে থাকত না; বাস্তব জীবনের কঠোরতা পাঠকের ঐ ধরণের কাহিনীর বিশ্রাম খুঁজে পেত, র কল্পনা ক্রিয়াশীল হত। সাহিত্য বাস্তবনিষ্ঠ ও াদী হবার সঙ্গে সঙ্গে টিক উপন্যাসের আকর্ষণ : শিথিল হল। ফটিন বাঁধা কে জীবনে ঘরে বসে মনের নার খোরাক পাওয়া যেত একমাত্র ডিটেকটিভ উপন্যাস থেকে।

অ্যাগা থা ক্রিস্টি

াধুনিক ডিটেকটিভ উপন্যাসে অবিশ্বাস্য কিছু না। গল্পের ঘটনাবলী বাস্তব জীবনে ঘেষতে । খুবই স্বাভাবিক। একটি সম্ভাব্য অপরাধের রহস্য করবার জন্য পাঠকের মন উৎসুক হয়ে ওঠে। ৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারলেই লেখকের রচনা । পাঠক নিজেকে গোয়েন্দা নায়কের সমকক্ষ রে। কাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে তার ও সেও এ রহস্য ভেদ করতে পারত। কারণ কোনো অলৌকিক বা যুক্তিহীন উপায়ের সাহায্য সে গ্রহণ করে না। কেউ কেউ বলেন, আর্কিমেদিস পৃথিবীর একজন প্রাচীনতম গোয়েন্দা। সাইরাকিউসের রাজা মুকুট তৈরী করতে কর্মকারকে সোনা দিয়েছেন। মুকুট তৈরীতে রাজার সন্দেহ হল যে, কর্মকার হয়ত কিছু পরিমাণ সোনা চুরি করে খাদ মিশিয়েছে বেশী পরিমাণে। কি পরিমাণে সোনা চুরি গেছে তার হিসাব বের করবার জন্য রাজা তার বন্ধু আর্কিমেদিসকে অনুরোধ করেন। আর্কিমেদিস্ নানাভাবে অনুসন্ধান করে কিছুই হদিশ পেলেন না। একদিন স্নান করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন জলের টবে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা জল উপচে পড়ে গেল। এই দেখে অকস্মাৎ তাঁর মনে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বের মূল সূত্র জেগে উঠল। তিনি এরই সাহায্যে সোনা-চুরি রহস্য সমাধান করেছিলেন। গোয়েন্দা কাহিনীর বীজ সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই নানা উপন্যাসে পাওয়া যায়। পরবর্তী শতকে শেলীর শ্বশুর উইলিয়াম গডউনের 'ক্যালেব উইলিয়ামস' এবং বুলওয়ার লিটনের পেলহাম ও মেসেস র‍্যাডক্লিফের উপন্যাসে গোয়েন্দা-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফরাসী সাহিত্যে বালজাক, হুমা প্রভৃতি কয়েকজন লেখক ডিটেকটিভ কাহিনীর প্রবর্তন করেন। যদিও এখনকার মতো ডিটেকটিভ গল্প তখনও ছিল না। ফরাসী লেখকরা ইংরেজী সাহিত্যের গোয়েন্দা কাহিনী থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এডগার অ্যালেন পো-র গোয়েন্দা গল্পগুলি বর্তমান ডিটেকটিভ উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। গোয়েন্দা কাহিনীর ইতিহাসে তিনি নবযুগের প্রবর্তক। তাঁর প্রভাব আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডেই নিবদ্ধ ছিল না। বোদলেয়ার ফরাসী

ভাষায় পো-র গল্পগুলি অনুবাদ করেছিলেন এবং ফরাসী গোয়েন্দা সাহিত্যে তাঁর রচনার গভীর প্রভাব পড়েছিল। এর পরে গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা শার্লক হোমসের আবির্ভাব। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল শার্লক হোমসকে সৃষ্টি করে ইংরেজী সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট শার্লক হোমস পরিচিত। শার্লক হোমসের জনপ্রিয়তা বুঝা যায় এই থেকে যে লণ্ডনে শার্লক হোমস সমিতি নামে একটি সংস্থা রয়েছে। এই সমিতি ও বি-বি-সি'র উদ্যোগে ১৯৪৪ সালের ৮ই জানুয়ারী শার্লক হোমসের শতবার্ষিকী উৎসব হয়েছে।

কোনান ডয়েল সহজে শার্লক হোমসকে সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। ১৮৮৫ সালে এম, ডি উপাধি লাভ করে তিনি ডাক্তারী করতে বসলেন। নতুন ডাক্তারের প্র্যাকটিস নেই, অনন্ত অবসর। কোনান ডয়েল লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি যে সব প্রকাশকের কাছে পাঠানো হল, তারা সবাই ছাপাতে অস্বীকার করল। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি—'এ ষ্টাডি ইন স্কারলেট'ও বহু প্রকাশক প্রত্যাখান করায় কোনান-ডয়েল যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন এক প্রকাশক পঁচিশ পাউণ্ড দিয়ে কপি-রাইট কিনতে রাজী হল। এই প্রকাশকের পরামর্শদাতার স্ত্রী ছিলেন লেখিকা। দৈবক্রমে এই ভদ্রমহিলা কোনান ডয়েলের পাণ্ডুলিপি দেখতে পেয়েছিলেন। গল্প তাঁর ভাল লাগায় তিনি স্বামীকে অনুমোদন করবার জন্য বলেছিলেন। এই মহিলার আগ্রহেই পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়েছিল। এবারও প্রত্যাখান হলে কোনান ডয়েল হয়ত আর কলম না ধরে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে উঠতেন এবং আমরা শার্লক হোমসকে পেতাম না। চার্লস ডিকেন্স, উইলকি কলিন্স, জি, চেষ্টারটন, ষ্ট্যানলি গার্ডনার, জর্জ সিমেন, প্রভৃতি বহু লেখক ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনা করেছেন। কয়েকজন লেখিকা গোয়েন্দা কাহিনী রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ডরোথি সেয়ার্স ও আগাথা ক্রিষ্টির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী ক্রিষ্টি প্রায় ষাটখানি গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন এবং তার গুণমুগ্ধ পাঠক পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যাবে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি মার্ডার অব রোজার অ্যাকরয়েড'।

য়ুরোপের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক 'জর্জ সিমেন'। তার 'ইনসপেক্টর মাইগ্রেট' শার্লক হোমসের মতোই পাঠকচিত্ত অধিকার করেছে। গোয়েন্দা কাহিনী তাঁর হাতে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। 'আঁদ্রেজিদ সিমন'কে সমকালীন ফ্রান্সের অন্যতম শক্তি-শালী ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইতিহাস ও অর্থনীতির উপর বই লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন কোল্ হম্পতি। তাঁরা যে গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছেন আজ হয়ত তা অনেকের জানা নেই। পূর্বে বলেছি বর্তমানে ডিটেকটিভ উপন্যাসের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অথচ জনচিত্তে প্রভাবের গভীরতা বিচার করলে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে এরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সম্প্রতি A. E. March রচিত The Development of the Detective Novel প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা ডিটেকটিভ উপন্যাস সম্বন্ধে আগ্রহশীল শুধু তাঁরা নন, পাঠকের রুচি-বিবর্তনের ধারা নিয়ে যারা আলোচনা করতে উৎসুক তাঁরাও পড়ে উপকৃত হবেন।

রবীন্দ্র তুলিকায় বর্ণ-চরিত্র

শ্যামাসেবক চক্রবর্তী

★

যাঁরা সত্যই মহৎ লেখক তাঁদের ভেতর একটা গুণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত এবং বাহুত সাধারণ রচনাগুলিও তাঁদের বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে, তাঁদের জীবন-দর্শন এবং বাণীর সন্ধান তাদের ভেতর পাওয়া যায়। দৃষ্টি-শক্তি হারানোর পর মহাকবি মিল্টন যে চোদ্দ পংক্তির ছোট্ট সনেটটি রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর জীবন-বেদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি "স্বর্গচ্যুতি"তেও তা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। প্রিয়তম বন্ধু কীটসের অকাল এবং শোচনীয় মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে শেলী যে ছোট কাব্যটি রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রোষ, সমস্ত নিপীড়িত মানবের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি সম্যকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের নিজেদের যুগে দেখতে পাই যে দার্শনিকপ্রবর বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ছোট অথচ অসামান্য নিবন্ধ—একটি স্বাধীন মানবের পূজা (A Free Man's Worship)—যেভাবে তাঁর জীবনদর্শনটিকে বুঝতে সাহায্য করে, তাঁর অতুলনীয় কিন্তু দুরূহতর রচনাগুলোর প্রচুর সময় এবং বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ অধ্যয়ন বোধ হয় ততটা করে না। মনীষী-শ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ক্ষুদ্রায়তন এবং বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত পুস্তিকা "কল্কি"তে নিজের মতামত যেরূপ সংক্ষেপে অথচ গভীরতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন সেরকম তাঁর দুটি বৃহত্তর এবং সুবিখ্যাত গ্রন্থে—The Hindu View of life এবং An Idealist View of Life-এ—হয়ত করেন নি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও এই কথা খাটে। আধুনিক যুগের অন্যতম জনক হিসাবে, বর্তমান যুগের মহানদের মধ্যেও মহত্তর হিসাবে, তাঁর অত্যন্ত সাধারণ চিঠিটি বা কোনো স্বাক্ষর-সংগ্রহকারীর-পুস্তিকায় খুব তাড়াতাড়িতে লেখা দুটি পংক্তিও তাঁর সুমহান প্রতিভার ছাপ বহন করেছে। স্বাক্ষর সংগ্রহের বই থেকে এলো-মেলো ভাবে তুলে নেওয়া নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটি পংক্তি এই কথার সত্যতা প্রমাণ করছে :

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

কে অস্বীকার করতে পারে যে মাত্র দুটি চরণের এই সামান্য রচনাটির ভেতর এমন একটি গভীর তত্ত্ব রয়েছে যা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে মানব-জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্ট-তাপ থেকে, অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে, অনেক হতাশা আর ক্ষোভ থেকে মুক্তি পাওয়া যেত?

"কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্রকায় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রচনা। সকলেই জানেন যে ভারত মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডব জননী কুন্তী এবং তাঁর পরিত্যক্ত সন্তান মহাবীর কর্ণের একটি কাল্পনিক কথোপকথনকে ভিত্তি করে এই কাব্যটি কবি রচনা করেছিলেন। প্রত্যাসন্ন মহারণে নিজ সন্তানদের মৃত্যু ভয়ে ভীতা হয়ে কুন্তী কর্ণকে কুরুপক্ষ পরিত্যাগ করে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করতে এসেছিলেন। সমস্ত অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হতে দেখে তিনি কর্ণকে রাজ্য লোভে লুব্ধ করার চেষ্টাও করে-ছিলেন। কিন্তু উপরোধ বা প্রলোভন কোনো কিছুতেই এই মহৎ চরিত্র মহাবীর তাঁর বিপন্ন বন্ধুকে পরিত্যাগ করতে রাজি হন নি।

মহাবীর কর্ণের চরিত্র যুগে যুগে বহু ব্যক্তিকেই আকৃষ্ট

করেছে। কোনো কোনো পণ্ডিত এমন কথাও বলে থাকেন যে মহর্ষি বেদব্যাসেরও এই মহাবীর সম্বন্ধে একটি গোপন শ্রদ্ধা ছিল এবং সমাজ পূজিত বীরপুংগব অর্জুনকে তাঁর মহাকাব্যের নায়ক করা ছাড়া যদিও তার উপায় ছিল না তবুও তাঁর প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ছিল বিদ্রোহী, অনমনীয় কর্ণের প্রতি, যেমন ছিল মিল্টনের "প্যারাডাইস লস্ট" কাব্যের স্বর্গলেশহীন, আত্মমর্যাদাশীল প্রতি নায়ক শয়তানের প্রতি।

সে যা হোক, এটা কিন্তু সত্য কথা যে বাঙালী লেখকেরা বরাবরই কর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করে এসেছেন। বাংলা সাহিত্যে কর্ণের উদ্দেশ্যে এমন কবিতা ও নাটক লেখা হয়েছে যাতে কর্ণের চরিত্র অর্জুনকে প্রায় নিষ্প্রভ করেছে এবং অর্জুনকে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণচক্রী ও চতুর কৃষ্ণেরও একটি আশ্রয়-রক্ষিত জীব হিসেবে। কর্ণের প্রতি বাঙালী সাহিত্যিকদের এই পক্ষপাতের কারণ খুঁজে বার করা খুব কঠিন নয়। যে চণ্ডীদাস উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" তাঁর সময় থেকেই বাংলা সাহিত্য তার অন্তরে মানবতাবাদের (humanism এর) একটি গভীর এবং প্রবল স্রোত বহন করেছে। নানা কারণে যদিও সে স্রোত বর্তমানে বহুলাংশে ক্ষীণ হয়ে এসেছে তাহলেও রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত মানবতাবাদের এই ধারা প্রবল বেগে বয়েছে। বরং বলা উচিত যে বাঙালীর মানবতাবাদ রবীন্দ্রনাথের হাতেই তার চরম ও উজ্জ্বলতম প্রকাশ লাভ করেছে। সুতরাং এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে বাঙালী সাহিত্যিকেরা মহাভারতের সেই মহাপুরুষের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছেন যিনি কুল এবং ঐশ্বর্যের গৌরবকে তুচ্ছ করে সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন।

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মাদায়ত্তং হি পৌরুষম্॥"
[আমি সূত বা সূত পুত্র যাই হই না কেন, আমার জন্মের উপর আমার কোনো হাত নেই, কারণ আমার জন্ম দৈবাধীন কুলে—কিন্তু পুরুষকার আমার আয়ত্তাধীন।]

সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে কর্ণ ই বোধহয় প্রথম মানবতাবাদী প্রথম ডেমোক্র্যাট। এমনকি হোমারের ইলিয়াড বা ওডিসিতেও আমরা এমন একটিও চরিত্র পাই না যাকে কর্ণচরিত্রের গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা, বন্ধুবাৎসল্য, আত্মত্যাগ এবং সকলের উপরে, মানুষের সংগে মানুষের সমান অধিকারের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাসের সংগে তুলনা করা যেতে পারে।

মেঘনাদ যেমন মাইকেলকে তেমনি কর্ণের এই অনন্যসাধারণ গুণ গুলিই বোধহয় রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিয়েদিয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখতে। কিন্তু, আর সব বিষয়েই যেমন, তেমনি কর্ণচরিত্রের কল্পনায় এবং চিত্রনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীদের অতিক্রম করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ অন্যান্য বাঙালী সাহিত্যিকদের কর্ণের তুলনায় মহত্তর উদারতর। এমনকি তিনি মহাভারতের কর্ণ—যাঁর প্রতি মহাভারতের খুব সামান্যই সুবিচার করা হয়েছে—তাঁর চেয়েও মহত্তর। আদর্শ হিসেবে কর্ণ রবীন্দ্রনাথের চরিত্র এবং কর্মধারাকে কতটা প্রভাবিত করেছিলেন তা অবশ্য গবেষণা সাপেক্ষ, তবে নিজের শেষ জীবনের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে প্রায় কর্ণের পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। মানুষের প্রতি মানুষের ভেদভাব এবং বিদ্বেষে মথিতচিত্ত এই ব্রাহ্মণ সন্তান, বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম এবং অভিজাত পরিবারের এই বংশধর আর্তস্বরে ঘোষণা করেছেন :

"কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।"

এইবার মূল কবিতাটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যা একথা সর্বজনবিদিত ছিল যে কর্ণ কদাপি প্রতিজ্ঞাভংগ করতেন না এবং কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ করতেন না। কুন্তীও একথা জানতেন, তাই প্রারম্ভেই তিনি কর্ণের কাছে প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে কর্ণ তাঁকে বিমুখ করবেন না। এর উত্তরে কর্ণ যা বলেছিলেন তা একমাত্র তিনিই বলতে পারতেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি বললেন :

"আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।"

বলাই বাহুল্য এই দুটো জিনিসই—পৌরুষ এবং ধর্ম-

রবীন্দ্রনাথ মানুষের পক্ষে সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু বলে মনে করতেন।

তারপর কুন্তীর কাকুতিতে এবং অশ্রুবিসর্জনে বিচলিত হয়ে কর্ণ তাঁর সঙ্গে যেতে সম্মত হয়ে যখন জানতে চাইলেন যে মা তাঁকে জন্মক্ষণে পরিত্যাগ করে ছিলেন তিনিই এখন তাঁকে ফিরিয়ে নিতে কেন চাইছেন তখন কুন্তী যে উত্তর দিয়েছিলেন সেটা খুব সুবিবেচনাপূর্ণ হয়নি। কুন্তী বললেন যে রাজপুত্র হয়ে সূতপুত্র বলে পরিচিত হবার যে অসম্মান তার থেকে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যেই তিনি কর্ণকে পাণ্ডবদের ভেতর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। এক মানবতাবাদী বীরের কাছে এর চেয়ে অসম্মানজনক কথা আর কী হতে পারে। তাই কর্ণ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন :

"মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব—
ইর্ষা নাহি করি কারে।"

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পিত বীর এমন একটি প্রলোভনকে তুচ্ছ করলেন যা খুব কম মানব সন্তানেই পারে এবং অনেকে—ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার উচ্চাসনে যারা অধিষ্ঠিত—এই গৌরব (যাকে আমরা কুলগৌরব বলে থাকি) লাভ করার জন্যে লালায়িত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বংশ গৌরবের প্রতি কর্ণের কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই দেখে কুন্তী তাঁকে সাম্রাজ্যের লোভ দেখাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বর্ণনা করলেন :

"দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রণে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র। তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে পাণ্ডবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্য মাঝে রত্ন সিংহাসনে।"

যদিও পৃথিবীতে এমন লোক আছেন যাঁর বংশ গৌরবকে বিশেষ মর্যাদা দেন না কিন্তু এমন লোক প্রায় নেই যিনি সমানভাবেই এমন জীবনকে তুচ্ছ মনে করেন যা তাকে শক্তির উচ্চাসনে বসাবে, ঐশ্বর্যের গরিমে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বড়ই কঠিন ধাতুতে গড়া। কুন্তীর এই প্রস্তাবকে তুচ্ছ ব্যঙ্গহাস্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বললেন :

"সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহ পাশ
তাহারে দিতেছে মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস।"

তারপর আপন গৌরব এবং ধর্মে অবিচল কর্ণ ধিক্কার দিয়ে বললেন :

"সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি কাছে বন্ধু আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে যাই যদি রাজ সিংহাসনে—
তবে ধিক মোরে।"

কুন্তীর কাছ থেকে কর্ণের শেষ 'বিদায়ের বাণী' তাঁকে মরলোকের শ্রেষ্ঠতম এবং নির্লোভতম পুরুষের গৌরবদান করেছে। কৌরবদের পরাজয় এবং পাণ্ডবদের বিজয় সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি জানেন যে ধর্ম পাণ্ডবদের দিকেই এবং সেই জন্যেই তাঁরা জয়লাভ করবেন এবং কৌরবরা ধ্বংস হবে। তবুও ডুবন্ত নৌকো ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ইঁদুরের মত, তিনি তাঁর ভাগ্যহত বন্ধুদের পরিত্যাগ করবেন এমন কাপুরুষ বা স্বার্থপর তিনি নন। তাই মাতা কুন্তীর কাছে তিনি শেষ প্রার্থনা জানালেন :

"যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে করো না আহ্বান
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশার দলে।"

এত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কর্ণকে অতিমানব হিসেবে কল্পনা করেন নি—যে অতিমানব অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, নিজের সম্বন্ধে সংশয়লেশহীন। কর্ণ অতিমানব নন, তিনি কেবল মানব শ্রেষ্ঠ, তিনি নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন, নিজের সফলতা সম্বন্ধে অনিশ্চিত। কাব্যের শেষে তাই তিনি কুন্তীর কাছে আশীর্বাণী ভিক্ষা করে বলেছেন :

"শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অরি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই॥"

মাত্র আট পৃষ্ঠাব্যাপী এই ক্ষুদ্রায়তন কাব্যটি বিদগ্ধ পাঠকের কাছে প্রেরণার উৎস স্বরূপ। যে কর্ণ চরিত্র কবি কল্পনা করেছেন সে মহাপুরুষ আমাদের সকলেরই প্রতীক—আমাদের শক্তি এবং দুর্বলতার, আমাদের আত্মত্যাগ এবং মহত্ত্বের, আমাদের বীরত্ব এবং আদর্শবাদের। কর্ণ ভারতীয় সাহিত্যের প্রমিথিউস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে তাঁর চরিত্র এমন এক মহান মানবতার ভাস্কর হয়েছে যাঁর তুলনা প্রাচ্য বা প্রতীচ্যে কোথায়ও মেলে না। কর্ণের ভেতর রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের পরম আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন।

মডেল

বেচু চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন খুব উঠে-পড়ে লাগল ধীমান, তারপর কে ব কি মি য়ে গেল। অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি ক র তে করতে বলল, 'নাঃ, কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না এ-দেশে।'

আমি হাসি ছাড়া কোন প্রত্যুত্তর দিলাম না।

ধীমান বলল, 'হাসছো যে! এ যা জায়গা এখানে কাউকে মডেল হতে বললে ভাবে বুঝি সর্বনাশ হয়ে যাবে। শেষ চেষ্টা হিসেবে অঞ্জলিকে পর্যন্ত রাজি করালুম, বেশ কয়েকটা সিটিং দিল অঞ্জলি, তারপর আর রাজি হল না। কত করে বোঝালুম, 'আখো দুদিন পরে তো তোমার সঙ্গে আমার বিয়েই হবে, তখন তোমার সব-কিছুই তো আমি জানতে পারব, এখন এত লজ্জা নাই বা করলে। তবু রাজি হল না, উল্টে অভদ্র ইতর ছোটলোক বলে চলে গেল।'

আমি বললাম, 'ন্যুড নাই-বা আঁকলে ধীমান।'

ধীমান বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'না অরূপ, ন্যুড আমি আঁকবই।'

জেদী ছেলে ধীমান, যা সে ধরে তা সে করেই। কিন্তু এ-এরকম একটা অস্বস্তিকর বিষয় নিয়ে কি করে ছবি আঁকবে আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। পাড়ার মেয়েদের কাছে নানা সূত্রে সে এগিয়েছিল কিন্তু পুরো ন্যুডের মডেল হওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কেউই রাজি হয়নি। ব্যর্থ হতে হতে শেষ চেষ্টা হিসেবে সে যে অঞ্জলির কাছেও আবেদন করবে তা কিন্তু আমি ভাবিনি, এখন শুনছি সেই অঞ্জলিও তাকে অভদ্র ইতর ছোটলোক বলে চলে গেছে।

বাস্তবিক ধীমান মডেল খুঁজছে বহুদিন থেকে। একখানি ন্যুড আঁকবে সে। মোটামুটি ভাল আঁকে ধীমান, বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় এ-সব সমস্যা ওর দেখা দেয়নি, সাঁওতাল মেয়েদের নিয়ে অসংখ্য মডেল করেছে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পাঠ সমাপ্ত করে চন্দননগরে নিজেদের বাড়িতে ফিরে মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেছে। বাড়িটা তেমন উদারনৈতিক নয়, পাড়াটা তো খুব খুলেই আছে। রুজি-রোজগারের জন্যে তাকে অবশ্য ফাইন-আর্টস ছেড়ে কোলকাতায় একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে নিতে হয়েছে কমার্শিয়াল আর্টিসের চাকরি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, চাকরি-জীবনের বাইরে, তার ধরাবরকার ইচ্ছা একটি নিখুঁত ন্যুড রচনা করা। কিন্তু এই সাধটুকু তার কিছুতেই মিটছে না। পাড়ার কোন মেয়েই এগিয়ে এল না।

ওর দুঃখটা আমি বুঝি না এমন নয় কিন্তু পাড়ার গৃহস্থঘরের মেয়েদের বে-আব্রু মডেল হওয়ার অসুবিধে-টাও তুচ্ছ নয়। ওদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে লজ্জা, ভয়, সংস্কার। বদনামের ভয় তো আছে সবার ওপরে। কিন্তু ধীমানকে সেকথা বোঝাবে কে? মাঝে মাঝে তাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ধীমান। ওকে আমি চিনি, ওর চরিত্রকেও জানি। শিল্পী মেজাজের অধিকারী বলে একটু যা খামখেয়ালী নইলে বেশ সংযত চরিত্র, বেশ নির্বিকার আর নিরাসক্ত প্রকৃতির ছেলে সে, অন্ততঃ নারীঘটিত ব্যাপারে ওকে বরাবর উদাসীন থাকতে দেখেছি। কিন্তু সবাই তো তা নয়!

শেষে রতন একটা প্রস্তাব দিল। রতন হল ওই পাড়ারই ছেলে, নিছক কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট। কোন উচ্চ স্বপ্ন নেই বরং যেটুকু শিখেছে সেইটুকু নিয়েই তার গর্ব। ধীমানকে সে একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তার কাছে আসে, আড্ডা মারে, গল্প করে। এক্তার সিগারেট ফোঁকে আর বকবক করে। দুজনে একসঙ্গে কোলকাতায়

যায় আবার ফিরেও আসে একই সঙ্গে। সে বলল, 'ধীমানদা, আপনাকে আমি মডেল জোগাড় করে দোব। এ-সব ভদ্দর পাড়ার কম্ম নয়—একটু বেপাড়ায় যেতে আপত্তি আছে?'

ধীমান বলল, 'কিছুমাত্র না। শুধু অলিগলিগুলো চিনিয়ে দিও।'

তারপর একদিন শুনলাম ওরা দুজনে গেছে শেওড়াফুলি। ট্রেনে করে বাড়ি ফিরে আসতে আসতে রতন নাকি প্রায়ই লক্ষ্য করেছে বিকেলের ঝিম আলোয় কতকগুলি ভাল ফিগার মেয়ে পরিপাটি সেজে শেওড়াফুলি ষ্টেশনের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে খদ্দেরের আশায়। তাদের মধ্যে কাউকে ধীমানের মডেল হিসাবে পাওয়া যায় কিনা তাই দেখবার জন্য দুজনে রওনা হয়ে গেছে। উপর্যুপরি কয়েকটি রবিবার বাড়ীতে পেলাম না ধীমানকে। তারপর একদিন রাস্তায় রতনের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস কোরলাম তাকে, 'রতন, ধীমানকে রেখে এলে কোথায়?'

রতন বলল, ধীমানদা তারকেশ্বরে ন্যুডের মডেল পেয়েছে, সেখানে ছবি আঁকছে।'

বললাম, 'শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর? ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপার এমন কিছু নয়।' রতন বলল, 'প্রথমদিন শেওড়াফুলি গিয়ে বাচ-বিচার করে যদি বা একটি মেয়েকে চোখে লাগল, ধীমানদা দিলেন সব গড়বড় করে। সোজাসুজি তাকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'তোমাকে মডেল হতে হবে। কত নেবে?' সে যত বলে 'মেডেল-ফেডেল অত বুঝি না, আমাদের যা রেট তাই দিও'—ধীমানদা ততই তাকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। শেষকালে মেয়েটি ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'কী একশোবার মেডেল-মেডেল করছেন, কাপ করতে হয় মেডেল করতে হয় অন্য জায়গায় যান, এখানে ও-সব হবে না।' চলেই আসছিলেন ধীমানদা কিন্তু পাশ থেকে একটি মেয়ে বলে বসল, 'আপনারা যা চাইছেন এখানে তা পাবেন না, তারকেশ্বরে যান, বন্দস্থান, অনেক ভাল ভাল মেয়ে পাবেন।' সেদিনটা ফিরে এসে পরের রবিবার আমরা চলে যাই তারকেশ্বর।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তুমি ফিরে এলে কেন?'

রতন একটু অস্বস্তির সংগে বলল, 'আমার ভাল লাগল না।'

ধীমানের দর্শন পেলুম মাস দুই পরে। ঘরে ঢুকে দেখি একটা চেয়ারে বসে সে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রয়েছে একটা ন্যুড ছবির দিকে। ওর ঘরে এ ছবিটা আগে কোনদিন দেখিনি। বুঝলাম এইটাই ও এঁকে এনেছে। কিন্তু চোখ দুটি অসম্পূর্ণ। বললাম, 'এ কি চোখ আঁকোনি কেন?'

ধীমান আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কেমন হয়েছে বলো তো ছবিটা?'

বললাম, 'ভাল।

ভাল হত।'

ধীমান একটু হাসল, বলল, 'আচ্ছা অরূপ, তুমি কি কোনদিন চোখ খুলে দেখেছো আমরা কোন্ সমাজে এবং কিভাবে বাস করছি?'

একটু থেমে বললাম, 'হঠাৎ এরকম চোবালো প্রশ্ন কেন?'

ধীমান বলল, 'ওই চোখহীন ন্যুড ছবিটার পানে তাকিয়ে গতকাল থেকে আমি শুধু এই কথাটাই ভাবছি। মেয়েটিকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না অরূপ।'

'কি রকম?'

ধীমান সামান্য চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি তো তারকেশ্বর গেছ। বেশ্যাপল্লীটাকে জানো। গলির পর গলি, ভস্ত গলি। ষ্টেশান থেকে নেমে যে কেউ সেই গলিতে ঢুকলে সংগে সংগে বুঝতে পারবে এ গলিটা দেহোপজীবিনীদের গলি। দুপাশে সাজগোজ করা বেশ্যাদের ভিড়। রতন ও আমি মুখ আর ফিগার বাচতে বাচতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। শেওড়াফুলির মেয়েটি ঠিক কথাই বলেছিল, বাস্তবিক অনেক সুন্দরী মেয়ের ভিড় এখানে। কিন্তু আমার মডেলের জন্যে আমি যা খুঁজছিলাম তা শুধু সুন্দর মুখ নয় সুন্দর ফিগারও। বিকেলের রহস্যময় আলোয় দূর থেকে যার মুখ মনে হচ্ছিল সুন্দর, কাছে গিয়ে দেখি ফিগারটা তত সুন্দর নয়; আবার ফিগারটা যদিবা ভাল লাগছিল মুখটা পছন্দ হচ্ছিল না। এইরকম বাচবিচার করতে করতে কখন যে ওদের এলাকা ছাড়িয়ে একটু দূরে চলে এসেছি

বুঝতে পারি নি, হঠাৎ দেখি একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। তাকে দেখেই মনে হল এতক্ষণ ধরে যাকে খুঁজছি এ হল সেই মেয়ে, আমি এগিয়ে গেলাম তার কাছে।'

বললাম, 'তারপর?'

'মেয়েটি আমাকে দেখে চমকে গেল, জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?' বললাম, 'চাই তোমাকে। আমার ছবির মডেল হতে হবে তোমাকে, কত নেবে?' কের সেই শেওড়াফুলির পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে দেখে রতন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সামনে, আমাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে সে কথাবার্তা বলতে লাগল মেয়েটির সংগে, দরাদরি করতে লাগল। আবিষ্কারের আনন্দে অন্ধ হয়ে না থাকলে মেয়েটির সুশ্রী মুখের রেখায় রেখায় যে বিচিত্র দ্বিধাদ্বন্দ্বের আলোছায়া খেলা করে যাচ্ছিল সেটুকু নিশ্চয় আমার নজরে পড়ত। রতন প্রতিবার সিটিংএ পাঁচ টাকা করে দেবে ওর সংগে কথাবার্তা ঠিক করে ফেলল। একবার মনে হল বড্ড কম টাকায় রফা করল রতন কিন্তু দেখলাম মেয়েটি তাইতেই রাজি হয়ে গেল।

ভাঙা দোতলা বাড়ি। উপর নিচে অনেকগুলি খুপরি। ভাড়াটে লোকজনই বেশির ভাগ, দেয়ালে চুনকাম নেই, পলেস্তারা খসেছে, কেমন যেন হা-করা দারিদ্র্য। তখন বিকেল হয়ে গেছে, মিমিয়ে পড়েছে আলো। এমনিতেই এ গলিতে আলো কম, তারপরও সন্ধ্যে হয়ে আসায় ভিতরটা অন্ধকার ঠেকছিল আরো। মেয়েটি আমাদের নিয়ে গিয়ে বসাল উপরের একটি ছোট আর বুকচাপা ঘরে। আমাদের দেখে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল একটি লোক। মেয়েটি বলল, 'বসুন আপনারা, আমি আলো নিয়ে আসি।' বলে সেও বেরিয়ে গেল লোকটির পিছন পিছন। রতন একটা সিগারেট ধরাল, বলল, 'বোধহয় পুরনো খদ্দের, চলবে কিছুক্ষণ খিস্তিবাজি।' কিন্তু খিস্তিবাজি তেমন কিছু শুনলাম না, শুধু দু-একবার চাপা না-ইয়া ছাড়া। মেয়েটি এল খানিক পরে হ্যারিকেন হাতে করে। ঘরের কুশ্রীতা তাতে বেড়ে গেল আরো। রতনের অস্বস্তি দেখে মনে হল তার গাটা যেন ঘিনঘিন করছে। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটি শাড়িখানা বদলেছে দেখলাম, চুলেতে চিরুনী ঠেকিয়েছে আর মুখেতে সস্তা পাউডার। এইটুকুতেই তার মুখশ্রী সোলতাই হয়েছে অনেকখানি, রোগা পাতলা ফিগারখানা ঘিরে এমন একটা রহস্যের আলোছায়া যে আমি তার দিকে মুগ্ধ হয়েই তাকিয়েছিলাম। কিন্তু বেলা একেবারে গড়িয়ে যাওয়ায় সেদিন কোন কাজ করা সম্ভব ছিল না। ওকে আমরা কি ভাবে পেতে চাই সেটা বুঝিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম সেদিনকার মতো। মেয়েটির মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, 'এ কি উঠছেন যে! আমার এতখানি সময় তাহলে মিছিমিছি নষ্ট করলেন কেন?'

বললাম, 'আমার কাজ রাত্রিবেলা হয় না। আগামী রবিবার দুপুর বেলা আসব।' বলে একখানা পাঁচটাকার নোট দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

পরের রবিবার সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে চলে গেলাম তারকেশ্বর। মাথার মধ্যে মেয়েটির ফিগারখানা ঘুরছিল। আঁকতেই হবে ওকে। আমরা গিয়ে পৌঁছুতেই মেয়েটি আমাদের নিয়ে গেল সেই ঘরে। নিস্তব্ধ দুপুর। চেঁচামেচি হৈচৈ নেই, শুধু একটা বাচ্চা ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছিল পাশের ঘর থেকে। সেই লোকটিও নেই, মেয়েটি একা। সংগে নিয়ে গিয়েছিলাম আঁকার সরঞ্জাম, সেগুলো খুলে তৈরি হয়ে বললাম। গতবার মেয়েটিকে বলে গিয়েছিলাম কিভাবে তাকে আমরা পেতে চাই, তৈরি হতে হতে আবার তাকে সেকথা বললাম। কিন্তু দেখি মেয়েটি নড়ছে না, চুপ করে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। আবার বললাম তবু মেয়েটি নড়ল না। বললাম, 'এবার বুঝি মিছিমিছি সময় নষ্ট হচ্ছে না? আমাদের সময়ের বুঝি দাম নেই?'

রতন একটা সিগারেট ধরাল, বলল, 'আশ্চর্য! তবু অমন সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে? যাও ওই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো গে। তারপর আমরা বলছি তুমি কি কি করবে।'

মেয়েটি তবু নড়ে না।

রতন এবার রেগে গিয়ে বলল, 'লজ্জার বহর দেখে তো মনে হয় বড়ঘরে মা গোঁসাই! করো তো বেশ্যাগিরি অত লজ্জা কিসের?'

মেয়েটি যেন থরথর করে কেঁপে উঠল, চোখ মুখ

দিয়ে ঠিকরে বেরুল আগুনের শিখা। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। তারপরই ফ্যাকাসে আর বিবর্ণ হয়ে গিয়ে ভীরু ভীরু চোখে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে পা পা করে এগিয়ে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। মনে হল গলগল করে ঘেমে উঠছে সে, শাড়ির প্রান্ত দিয়ে কেবলই মুখ মুছতে লাগল। ওদের ছলাকলা অনেক। সুতরাং বললাম, 'নাও শুয়ে পড়ো। হাঁটুটা মুড়ে আধশোয়া ভংগিতে আমাদের দিকে মুখ করো।' মেয়েটি তাই করল। বললাম, 'এবার বুকের জামা-কাপড় খুলে বাঁ হাতটা রাখো বালিসের নিচে আর ডান হাতটা তলপেটের ওপর।' যন্ত্রচালিতের মতো ধীরে ধীরে মেয়েটি করল তাই। পিছন দিকে ফটাস করে একটা আওয়াজ হল, রতন একটা সিগারেট ধরাল। আমি আঁকতে লাগলাম।...

তার পরের রবিবার গিয়ে বসতে-না-বসতেই নির্মলা পূর্বদিনের ভংগি নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল, কোন কথা বলতে হল না। শুধু বলল, 'আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন। দেখুন ঠিক হয়েছে?' দেখলাম ভংগিটা যথাযথই হয়েছে শুধু তলপেটের ওপর হাত রাখাটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি উঠে গিয়ে হাতটা ঠিক করে বসিয়ে বললাম, 'যাঃ ঠিক হয়েছে।' আঁকার সরঞ্জাম ঠিক করতে লাগলাম আমি, আর নির্মলা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর চোখ দুটো ভারি সুন্দর। যেমন টানাটানা তেমনি বড় বড়। ভেবেছিলাম ওকে আরো একটু করুণ হতে বলে ওর চোখ দুটো আজ আঁকব কিন্তু মনে হল ওর চোখ দুটোর মধ্যে যেন একটা চাপা উত্তিগ্নতা ও অস্থিরতা লুকিয়ে রয়েছে। সেইজন্যে আমি হাত দিলাম বাকি কাজটায়। গতবার যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু শেষ করতে বেশি সময় লাগল না; গলা বুক পার হয়ে নাভি পর্যন্ত এনে আমাকে থামতে হল, কেননা নাভি পর্যন্তই আবরণ মুক্ত ছিল, নিচের দিকটা ঢাকা।

বলতে হল, 'নির্মলা, এবার বাকি কাপড়টাও খুলতে হবে যে।'

যেন চমকে গেল নির্মলা, সত্রাসে বলল, না না না না।'

রতন ছিল এতক্ষণ চুপ করে, সে বলল, 'না-না মানে? প্রথম দিনই তো তোমাকে বুঝিয়ে বলা হয়েছিল আমরা তোমাকে কিভাবে আঁকব?'

নির্মলা বলল, 'না না ও আমি পারব না। মরে গেলেও পারব না।'

রতন হয়ত রাগের মাথায় একটা কিছু করে বসত কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘর থেকে শোনা গেল সেই বাচ্চা ছেলেটির বিশ্রী করুণ কান্না। প্রথম দিন থেকেই এই কান্নাটা আমরা শুনছি। এমন বিশ্রী আর করুণ কান্না যে মানুষের ছেলের কান্না বলেই মনে হয় না। নির্মলা তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়টা সামলে চলে গেল ঘর থেকে।

রতন বলল, 'দাঁড়ান আসুক একবার, ওর সব ধাষ্টামো বার করে দিচ্ছি।'

নির্মলা এল অনেক পরে। বাচ্চা ছেলেটির কান্না সে কিছুতেই থামাতে পারছিল না, তাকে অনেকক্ষণ বুকে করে ভোলাবার চেষ্টা করল। তারপর একটু যখন থামল তখন শুনলাম সেই লোকটির গলা, কিছুক্ষণ দুজনে কি একটা পরামর্শ করল। তার মধ্যে একবার কি দুবার শুনলাম 'ডাক্তার'-কথাটি। নির্মলা ঘরে ঢুকে আমার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে সটান এগিয়ে এল কাছে, বলল, 'আপনার টাকাটা যদি একটু আগে দেন তো বড় ভাল হয়।'

আমি একখানা পাঁচটাকার নোট বার করে দিলাম।

রতন বলল, 'আসবে তো? নাকি চলে যাব আমরা?'

নির্মলা বলল, 'না না, টাকাটা দিয়ে আমি এখুনি আসছি। যা বলবেন তাই করব।'

দেখলাম টাকাটা নিয়ে সেই লোকটি তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। ও-ঘর থেকে শোনা যেতে লাগল বাচ্চা ছেলেটির নির্জীব কান্না। রতন ডাকল, 'কই এসো। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

বাইরে শুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্মলা, ডাক শুনে ভিতরে এসে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিছুই বলতে হল না তাকে। কাঁপা-হাতে প্রাণহীন যন্ত্রের মতো সে একটু একটু করে নিজের দেহ থেকে খুলে

ফেলল সমস্ত আবরণ। পাথরের মতো স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে শুধু বলল, 'কিভাবে শোব বলুন? হয়েছে?'

ফটাস করে দেশলাইয়ের একটা শব্দ, রতন একটা সিগারেট ধরাল।

পরিপূর্ণ নগ্ন নারীমূর্তি। আমার এতদিনকার হ্যাড আঁকার সজীব মডেল। ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে চোখ বুলিয়ে আমি বললাম, 'না নির্মলা, হয়নি। পা দুটো আরেকটু ছড়িয়ে দাও, কোমরটা ঈষৎ টান করো, বুকটা সামান্য ঠেলে দাও—অর্থাৎ এমন করে শুয়ে থাকো যেন বুক তলপেট আর উরুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে।'

নির্মলা বার-দুই চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। হয় পা ঠিক তো কোমর কুঁচকে যায় আবার কোমর ঠিক করে তো বুক বেশি ঠেলে ওঠে। আমি যা চাইছি তা ও' পারছে না দেখে বললাম, 'দাঁড়াও, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' বলে উঠে গিয়ে ওর পা একটু টেনে কোমরটা টান করে শরীরের ভংগিটা এমন করে স্থাপন করে দিলাম যাতে আমি যা চাইছি তা ও' হতে পারে। আমি যখন তার শরীরটা ঠিকঠাক করছি তখন লক্ষ্যই করিনি রতন কী ঘন-ঘন সিগারেট টেনেছে আর অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে ঘরময়। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি হল রতন?'

রতন মুহূর্তমাত্র আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি হাসলাম একটু। রতন আসেনি আর তারপর।

চোখের সামনে আমার হ্যাড আঁকার মডেল—আঁরি মাতিস, পিকাসো, লোত্রেক, গঁগ্যা আরো কতজনের হ্যাড আমি দেখেছি আর মনে মনে কল্পনা করেছি আমিও একদিন এমন হ্যাড আঁকব যার দিকে লোকে চেয়ে থাকবে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে। ভাঁজে ভাঁজে ওর শরীরের অংগে প্রত্যংগে পড়ে রয়েছে অনন্ত ছন্দে, আমি রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলছি তাকে। বাকি ছিল শুধু চোখ। চোখ দুটিকে আমি এমনভাবে আঁকতে চেয়েছিলাম যার মধ্যে ফুটে বেরুবে অমর্ত যৌবন-বেদনা, যার মধ্যে থাকবে স্বর্গ ও মর্তের চিরন্তন ব্যথার দৃষ্টি আর সমগ্র-ভাবে যাতে ধরা পড়বে নগ্ন ও নগ্ন এক বিশ্বনারী। ওর আড়ষ্ট কুণ্ঠিত চোখ দুটিকে তাই ব্যাপতুর করে তুলতে বলেছিলাম বারবার কিন্তু পারছিল না নির্মলা। পাশের ঘর থেকে ছেলেটি হঠাৎ ককিয়ে উঠল আর সংগে সংগে লক্ষ্য করলাম নির্মলার দৃষ্টি হয়ে উঠেছে সেই তন্ময়তার করুণ যা আমি এতক্ষণ ধরে চাইছিলাম। চিৎকার করে বললাম, 'নির্মলা, ধরে রাখো ধরে রাখো ওই ভাবটা তোমার চোখে···কিছুক্ষণ, কয়েক মুহূর্ত!' কিন্তু আমার চিৎকারের সংগে সংগেই ওঘর থেকে ভেসে এল আর একটি চিৎকার: 'নির্মলা, নির্মলা, শিগগির এসে'—'

সেই লোকটির ব্যাকুল কণ্ঠস্বর।

নির্মলা ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

আমি তাকে দুহাতে চেপে ধরে বললাম, 'না না, কখনো না, তুমি এখন কখনো যেতে পাবে না।'

নির্মলা বলল, 'আমার ছেলে মরে যাচ্ছে, ছেড়ে দিন বলছি—' গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে নির্মলা আমাকে ঠেলে ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সংগে সংগে আমিও ছুটলাম তার পিছন পিছন। পাশের ঘরের মেঝেতে একটা ছোট্ট ছেলে শুয়েছিল নিথর হয়ে, তার সামনে ডাক্তার, পাশে সেই লোকটি। নির্মলাকে দেখে বেদনাহত কণ্ঠে সেই লোকটি বলে উঠল, 'বাঁচল না নির্মলা, আমাদের খোকা বাঁচল না—'

নির্মলা আছাড় খেয়ে পড়ল ছেলেটির বিছানা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'আমার কোন হাত ছিল না মা, আমি এসে কিছুই করতে পারি নি।' বৃদ্ধ ডাক্তার যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'আমাকে একেবারে শেষ সময়ে ডেকে আনল বিনয়। যদি কিছু আগে আসতে পারতুম।'

বিনয়বাবু দাঁড়িয়েছিলেন নতমস্তকে, বললেন, 'কী করব ডাক্তারবাবু। আমি নিজে বেকার, হাতে একটি পয়সা নেই, কী করে যে আমাদের সংসার চলে!'

ডাক্তারবাবু ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বললেন, 'দুঃখিত, খুবই দুঃখিত বিনয়।' তারপর দেখতে পেলেন আমাকে, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?'

আমার হয়ে উত্তর দিলেন বিনয়বাবু, বললেন, 'উনি

একজন আর্টিষ্ট, আমার স্ত্রীকে মডেল করে ছবি আঁকেন। পার সিটিং পাঁচটাকা করে পান আমার স্ত্রী।'

ডাক্তারবাবু নিজের মনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন।

আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

বিনয়বাবু বললেন, 'আজ আপনার কোন কাজ হল না ধীমানবাবু। আমার স্ত্রী আর কোনদিন মডেল হতে চাইবেন কিনা জানি না কিন্তু আপনার টাকাটা ফেরৎ দেবার চেষ্টা করব বিশ্বাস করুন।'

আমি বললাম, 'না না সে কি। আমি বরং পরে আসবখন।'

পরে আমি আরো তিনটে রবিবার গিয়েছি, অরূপ। কিন্তু নির্মলা দেবী আর কিছুতেই মডেল হতে চাননি। অনাহারে এই দম্পতিটি কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন তা আমি দেখে এসেছি শেষ রবিবারটিতে, দুজনেই যেমন শীর্ণ তেমনি রুক্ষ হয়ে গেছেন, কিন্তু মডেল হওয়ার ব্যাপারে নির্মলা দেবী কিছুতেই রাজি হননি। ব্যর্থ হয়ে, ছবিটা যাতে শেষ করতে পারি, তারজন্যে এই একটি মাস কত জায়গায় ঘুরলাম কত ভাড়াটে মেয়ের কাছেই গেলাম কিন্তু নির্মলা দেবীর চোখের সেই দৃষ্টি কারো কাছ থেকেই না পেয়ে ঠিক করেছিলাম এই রবিবারে নির্মলা দেবীর কাছে আবার যাব এবং যেমন করে হোক তাঁকে রাজি করাবই। কিন্তু গতকাল এক খানি মনিঅর্ডার এসে সব ওলোট-পালট করে দিয়ে গেল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের মনিঅর্ডার ?'

ধীমান বলল, 'সেই টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়েছেন বিনয়বাবু। শুধু ফেরৎ পাঠাননি, কুপনে লিখে জানিয়েছেন একটি সংবাদ : ধীমানবাবু, এবার আপনি আসতে পারেন। নির্মলাকে অনেক বুঝিয়ে ওর দেহটাকে মূলধন করে ব্যবসায় নামিয়েছি। এবার আপনি এলে ফেরৎ যাবেন না, ওকে নিয়ে যেমন খুশি মডেল করতে পারবেন।'

চুপ করল ধীমান, জিজ্ঞেস করলাম, 'যাবি নাকি ?'

ধীমান ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল, বলল, 'জীবনে একটা ছবি নাইবা আঁকা হল। যাব না।'

কয়েকটি নতুন "সোভিয়েত দেশ" পুস্তিকা

কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনার পূর্ণতর সদ্ব্যবহার
(এন. এস. খ্রুশ্চফের রিপোর্ট)

২। সোভিয়েত কলকারখানায় কর্ম-ব্যবস্থা (প্রশ্নোত্তর)

৩। শিশুদের লালন পালন (চিকিৎসকের পরামর্শ)

৪। আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ—নিরস্ত্রীকরণ—এন. এস. খ্রুশ্চফ

৫। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি
—এন. এস. খ্রুশ্চফ

সোভিয়েত অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা

:: অর্ডার দিবার ঠিকানা ::

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১/১ উড ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১৬

নতুন বই

প্রাক্তন—বরেন বসু। প্রকাশক—সাধারণ পাবলিশার্স। ৭, ওয়েস্ট রো, কলিকাতা-১৭। দাম—সাড়ে চার টাকা।

উপন্যাসটির রচয়িতা বরেন বসু ইতিপূর্বে তাঁর অপর একটি গ্রন্থের জন্য খ্যাতিমান হয়েছেন। পৃথিবীর অনেকগুলি দেশের পাঠকেরা বরেন বসুর 'রংরুটে'র সঙ্গে পরিচিত।

সৈনিক জীবন নিয়ে রচিত বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। যুদ্ধ এবং সেনাবাহিনী নিয়ে পৃথিবীর সাহিত্যে অনেক মহৎ উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অভিজ্ঞতার অভাবহেতু এই জাতীয় প্রচেষ্টা স্বভাবতই এগোয়নি। বরেন বসুর বর্তমান উপন্যাসটি প্রাক্তন সৈনিকদের জীবন-সমস্যার কাহিনী।

প্রয়োজনের তাগিদে যাদের বেছে নিতে হলো সৈনিক জীবন তারাই একদিন ফিরে এলো পরিচিত মানুষদের কাছে প্রাক্তন সৈনিক হয়ে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, শহর কোলকাতা তাদের কাছে দাঁড়াল নূতন ভূমিকায়। দেখা দিল অজস্র সমস্যা। সামান্য কিছু অর্থ এবং প্রচুর দুশ্চিন্তা নিয়ে বার বার তারা বেসামাল হয়ে পড়লো সংসার সমুদ্রে।

যুদ্ধ-পরবর্তীকালীন বাংলার সামাজিক বিবর্তনের চিত্র রচনায় লেখক অন্তরঙ্গ হয়েছেন। বিকাশ, সনত, অতীশ, নীরোদ, মায়া, কমলা, সুধাংশিনী, ধীরেনবাবু প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে অনেক পরিচিত মুখকে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে মাঝে মাঝে উপন্যাসের গতি বড় মন্থর মনে হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিতে একটি ব্যথার সুর করুণ হয়ে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ পাঠক এই ব্যথার সুরে একাত্মীভূত হবেন, বিশ্বাস রাখা যায়।

চেনা-অচেনা—মায়া বসু। প্রকাশক—সাহিত্য সদন। এ-১২৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২। দাম : তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা ছোট গল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তরুণ গল্প লেখকেরাও যথেষ্ট বহুশীল হয়েছেন। তাই সাম্প্রতিক কালে বাংলা ছোট গল্পের অগ্রগতি গর্ব করার মতো। মায়া বসুর গল্প গ্রন্থ 'চেনা-অচেনা' হাতে পেয়ে বিশেষ আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু তিনি বর্তমান সমালোচকের আশা পূরণ করেন নি। 'চেনা-অচেনা'র বেশির ভাগ গল্পই স্কেচ-ধর্মী। বিভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র-রূপের মানুষগুলিকে লেখিকা 'চেনা-অচেনা'র মাঝে জড়ো করেছেন। ভূমিকা থেকে জানা যায়—'সবগুলো গল্পই ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ এর মধ্যে লেখা। সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশও আমার ১৯৫৮ থেকে।' এবং বোধ হয় 'চেনা-অচেনা'ই লেখিকার প্রথম গল্প-গ্রন্থ। 'পলি ব্যানার্জী', 'আশ্রয়', 'পুতুলওয়ালী', 'বিচিত্র এক মন', 'চেনা-অচেনা', 'উত্তরঙ্গ', 'পুজোর শাড়ী', 'কলঙ্কের বোঝা' 'পাত্রগ্রন্থী', 'স্মৃতি ছবি', 'জীবন তৃষ্ণা', 'অতিথি', 'হাওয়া', 'বিচ্ছু', 'স্পেশাল ওয়ার্ড', ও 'একটি দুপুর' এই ষোলটি গল্পের সংকলন 'চেনা-অচেনা'। কোন কোন গল্পে লেখিকা অনেক নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যে জীবন-বোধের গভীরতা বর্তমান বাংলা ছোট গল্পগুলির প্রাণ 'চেনা-অচেনা'য় তার বড় অভাব।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শক্তি সম্পন্ন মহিলা-লেখিকার সংখ্যা হাতে গোনা যায়। রাণীচন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবীর পর মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, সুলেখা সান্যালের নাম মনে আসে। কিন্তু তারপর? মায়া বসুর রচনা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আধুনিক রীতিতে ছোট গল্প প্রকাশের কৌশল তাঁর এখনো সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসেনি। তাঁর আগামী গ্রন্থ এ ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠলে অনেক আকর্ষণীয় হবে আশা করা যায়। শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের আঁকা প্রচ্ছদটি অভিনব

—শ্যামাপ্রসাদ সরকার।

ক'টি কবিতা ও একলব্য—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। দাম—দুই টাকা।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 'ক'টি কবিতা ও একলব্য' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই সংযত-বাক মননশীল কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কবিতা পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। আঙ্গিক, ভাষালুতা বা বাচন-ভঙ্গির মধ্যেই মঙ্গলাচরণ সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর ব্যাপ্তি সামগ্রিক ভাবে রসোত্তীর্ণতার মধ্যে। তিনি তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছেন জীবনের গভীরে এবং কবি-মানসের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আন্দোলনে ও জীবন-যন্ত্রণায়। তাই দেখি তিনি লিখেছেন :—

"যেখানে কলে জল, মরা পিচের
খাড়িতে জীবনের কোটাল
যেখানে জীবন আলোর বেগে জলসা
যেখানে জীবন
মোর মিছিল যেখানে বে-ঠিকানা
তোমার বয়ঃদান পথে-ফেরানো মুখ :
আমার ভালবাসার মুখ।"

(কলকাতা—কলকাতা)

কবি আশাবাদী। যুগ-বিবর্তন ও মানব জীবনের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস :

"ঘুমোয় রে ঘুম নতুন ভোরের ভরসায়!
ঘরে পিদিম নিবু-নিবু, ঘুম ঘুম,
দুখিনী মা-র শিবরাত্রির সলতে
ঘুমোয় খোকা নতুন ভোরের ভরসা!"

(মা গাইছে)

তাঁর যন্ত্রণাবোধের রয়েছে সর্বজনীনতা আর এই যন্ত্রণাবোধই রসোত্তীর্ণতার অন্যতম উৎস।

"ক্ষুদিরামের মা আমার—
কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা॥"

(জননী যন্ত্রণা)

একলব্য একটি কাব্য নাটিকা। তিনি এই প্রাচীন কাহিনীতে এনেছেন জীবনের এক মূল্যবোধ, দ্রোণ ও একলব্যের চরিত্রের নব-রূপায়ণ ও যন্ত্রণার অবসানে আশার সংকেত।

এই সংযতবাক জীবননিষ্ঠ কবির সব কয়টি কবিতাই পরিচ্ছন্ন ও সুস্থতার পরিচায়ক।

মে দিনের কবিতা—শ্যামসুন্দর দে ও গোপাল ঘোষ সম্পাদিত। পরিবেশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ। দাম—২৫ নঃ পঃ।

মে দিবস কেবল মাত্র একটি খণ্ড ঘটনা নয়। তার আবেদন বিশ্বজনীন ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। বাংলা দেশের বিভিন্ন কবি এই মে দিনের তাৎপর্যটি তাঁদের নিজস্ব মনন ও বৈশিষ্ট্য রূপ দিয়েছেন কবিতায়।

এই ছোট্ট কবিতা-সংকলনটি বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, বীরেন্দ্র সরকার ও শ্যামসুন্দর দে প্রভৃতি প্রবীন ও নবীন কবিদের কবিতা সংকলন। সংকলনটি আরো পূর্ণাঙ্গ হবার অবকাশ আছে। আশা করি এত অল্প মূল্যের সংকলনটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

হাঁটা এ জীবনে : লেখক—অ. কু চ. প্রকাশক শ্রী হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি বুক ডিপো, স্টেশন রোড, সোদপুর, ২৪ পরগনা দাম ১৲

ছদ্ম নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকার জন্য কবির পরিচয় পেলাম না। কিন্তু কবি-মননের পরিচয় পেয়েছি কবিতার সংকলনটিতে। কবি বইটি উৎসর্গ করেছেন পোড়া অদৃষ্টকে এবং উৎসর্গ থেকে শুরু করে কবিতার সংকলনটিতে বিদ্রূপতা, ব্যাজ, শ্লেষ ও অতিবাস্তবতাই প্রধান উপজীব্য। অতিবাস্তবতার প্রভাবে কয়েকটি কবিতার মেজাজ ও কাব্য-সুষমা ক্ষুণ্ন হয়েছে। 'বুক কিপার' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রাণার কবিতার প্রভাবে অতি মাত্রায় প্রভাবিত। ত্রুটিগুলি ছাড়া সহজ ও সরল ভাবে কবির ভাব প্রকাশের প্রয়াসকে স্বাগত জানাই।

কবিতার বইয়ে ছাপা, বানান ও বাঁধাইয়ের দিকে আরো একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার।

বিমল কর

পরস্পর

—বার—

কদিন ধরেই মাঘের শীত ভীষণ হয়ে উঠেছিল। এমন করে শীতটা পড়বে এ বছর কেউ ভাবেনি। পৌষের শেষের দিকে বরং কেমন ছাড়া ছাড়া দুর্বল শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল, যেন শীত যায় বসন্ত আসে-আসে। গাছের পাতা ঝরছিল, রোদের রঙ এত পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল ছিল যে কখনও কখনও আকাশের দিকে মুখ তুলে পুষ্প ভাবত এবার বুঝি শীত কেটে গেল। পুষ্পদের নতুন লেপ তৈরি করান তখনও হয়নি। রতনের আদ্যিকালের তুলো ওঠা-ওঠা লেপটাই নানান কারিকুরী করে, ছেঁড়া শাড়ীর ওয়াড় পরিয়ে কাজ চালান গোছের করে নিয়েছিল পুষ্প। তার শীত বেশী, লেপটা ছোট তবু পুষ্প নতুন লেপের ভাবনাটা পরের বছরের জন্যে তুলে রেখেছিল। কিন্তু এই মাঘের মাঝামাঝিতে এসে শীতটা যেন পুষ্পকে অতিষ্ঠ করে তুলল। সকালে জলে হাত দেওয়া যায় না এত ঠাণ্ডা, রোদের তাপ গায়ে লাগার মতন গাঢ় হতে অনেকটা বেলা হয়ে যায়; সারাটা দুপুর মাঘের কনকনানি উত্তুরে হাওয়া বয়, বিকেলে রোদ সরতে না সরতেই চারপাশে ধোঁয়াশা-কুয়াশায় মিলে কেমন একটা ঘোলাটে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তারপর যত অন্ধকার বাড়ে কুয়াশা ঘন হয়ে যেন বাতাসে চাপ চাপ হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এত হিম আর কুয়াশার আড়াল থেকে আকাশের তারা ক্ষীণ চাঁদটাও ভাল করে দেখা যায় না।

এমন দিনে এক সন্ধ্যেয় রতন যে খবরটা নিয়ে এল তাতে পুষ্পর মনে হচ্ছিল, এই ভীষণ মাঘের শীত আর সহজে স্বল্পকালের মধ্যেই কেটে যাওয়ার নয়। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মতন তার আয়ু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

'লোকটা তোমায় সত্যিই এই কথা বলল?' পুষ্প লণ্ঠনের আলো আরও উজ্জ্বল করে দিতে দিতে বলল। যেন নিভ্যকার মত যতটুকু আলোয় এই ঘর, এই ঘরের খাটটা টেবিলটা দেখা যায়, যে আলোয় এতদিন স্বামীকে সুস্পষ্টভাবে দেখেছে—আজ আর সেই আলোয় ভাল করে কিছুই দেখতে পারছে না পুষ্প।

রতন কোন কথা বলল না। গায়ের জামাটা না খুলেই বিছানার ওপর রিক্ত নিঃস্ব মানুষের মতন বসে পড়ল। তার সমস্ত মুখে হতাশা এবং ক্ষোভ যেন ব্যাধির রেখার মতন ফুটে রয়েছে। স্বামীর চোখের তলায় এতখানি কালিমা দুপুরেও পুষ্প দেখেনি; দুটি গালের শুষ্কতা দেখে মনে হচ্ছিল, মানুষটা যেন কতকাল ঘুমোয়নি, চোখের দৃষ্টিতে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার শূন্যতা। রতনের বুক ওঠানামা করছিল না; পুষ্প অন্তত লক্ষ্য করেও স্বাভাবিক মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটুকুও স্বামীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল না। যদি না মাঝে মাঝে থেমে থেমে রতন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত, কিংবা অব্যবস্থিত চিত্ত মানুষের মতন নিজের চুল মুঠোয় ধরে না টানত—তবে পুষ্প আজ—এখন—নিশ্চয় ভয় পেয়ে যেত। হয়ত মনে করত রতনের জ্ঞান নেই সাড় নেই।

পুষ্প অধীর অধৈর্য উদ্বেগে বিমূঢ় হলেও তেমন ভয় পায়নি। পুষ্পর সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে আসছিল, বুক কাঁপছিল, দৃষ্টি আরও তীব্র উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। রতনের কাছে আরও একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল পুষ্প, অপলকে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকল তারপর আচমকা কেঁদে ফেলল।

রতন স্ত্রীকে কাঁদতে দেখছিল। কান্নার উচ্ছ্বাসে পুষ্পর গলার স্বর যে খাদারোহের শব্দ উঠছিল রতন শুনতে পাচ্ছিল। পুষ্পর ঠোঁট গাল চোখ নাক কান্নার তীব্রতায় কিংবা আবেগে যতটুকু বিকৃত বিসদৃশ হয়ে উঠছিল রতন অন্যমনস্ক চোখে তাও দেখছিল।

এক সময় পুষ্প স্বগত ফোপান কান্নার কাঠিন্য থেকে মুক্তি পেয়ে সোচ্ছ্বাসে গলার কষ্টকর শব্দ তুলে কেঁদে ফেলল। রতন স্ত্রীর এই অসহায় তরল কান্নার মধ্যে যেন কোথায় একটু সুগভীর সুখ পেল। না সুখ নয়, হয়ত সুগভীর

সহানুভূতি, হয়ত চরম দুঃখের দিনে পরম সান্ত্বনা। রতনের বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ক্রন্দনশ্রান্ত স্ত্রীর এই প্রত্যক্ষ সরল সহানুভূতি পেয়ে অসহায় কান্নায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। অথচ রতন কাঁদতে পারছিল না।

রতন গায়ের জামাটা আস্তে আস্তে ক্লান্ত ভঙ্গীতে খুলতে লাগল। পুষ্প কান্নার উচ্ছ্বাস সামান্য সামলে নিয়েছে। ধোলা জামাটা হাতে করে রতন উঠল, শিথিল পায়ে ঘরের কোণে আলনায় রেখে ফিরে এল। আলোর কাছে দাঁড়িয়ে রতন মালকোচা মারা ধুতিটার গিঁট খুলছিল; ওর গায়ে গেঞ্জির ওপর মোটা সোয়েটার। পুষ্প ততক্ষণে আচমকা আঘাতের প্রথম উত্তেজনাটুকু কাটিয়ে ওঠেছে। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল নাক টানল। রতন হাত বাড়িয়ে লুঙিটা টেনে নিচ্ছিল, পুষ্প বলল, 'এই কোয়ার্টার ছাড়বার কথা তোমাকে আগেই বলেছিল?'

রতন অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল।

'তুমি আমায় বলনি কেন?' পুষ্প স্বামীর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল।

'কি আর লাভ হত বলে—' রতন ম্লান মৃদুগলায় বলল।

পুষ্প কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'লাভই হত তোমার লোকসান নয়।'

রতন স্ত্রীর কথা বিন্দুমাত্র মূল্য দিল না। অনাগ্রহে একবার শুধু পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে ছাড়া কাপড়টা গোছাতে লাগল।

'তুমি ভেবেছিলে কোয়ার্টার ছাড়ার কথা শুনলে আমি মরে যাব?' পুষ্প চোখের জলের শেষ রেখাটুকুও যেন আঁচল দিয়ে মুছে নিল।

'অবশ্য—' রতন নিস্পৃহ সুরে বলল। 'অবশ্য তোমায় বলে কি লাভ হত। তাছাড়া আমিও ত ঠিক এতটা জানতে পারিনি—'

'ঠিক বেঠিক জানি না', পুষ্প বলল, 'তুমি আগে বললেত আমি জলে পড়তুম না।'

স্ত্রীর কথায় রতন অবাক। পুষ্প কি বলছে। দুমুহূর্ত আগে যে মানুষ অগাধ জলে পড়ার মতন ভাব করে উঠেছিল দু-মুহূর্ত পরে হঠাৎ তার এত দুঃসাহস কিংবা প্রত্যয় কোথা থেকে আসে। রতন চুপ করে থাকল, ধুতিটা রেখে হাতমুখ ধুতে বাইরে চলে যাচ্ছিল।

'আমার কাছে কথা লুকিয়ে তুমি ভাল কাজ করনি', পুষ্প অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বেদনার্ত গলায় বলল। 'আমায় আগে বললে আজ তোমায় এই অপমান সইতে হত না।'

রতন চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল; আধখানা ঘাড় ঘুরিয়ে স্ত্রীকে সে দেখতে পাচ্ছিল না, তবু সেই ভঙ্গির মধ্যে স্ত্রীর প্রতিটি কথা শোনার এবং মুখটি দেখার লক্ষ্য করার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। পুষ্পর গলার স্বরে যে অযৌক্তিক এমন কি অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল রতন তা অনুভব করতে পারছিল। কি করে কোন আশ্বাসে সাহসে পুষ্প যে একথা বলে কে জানে। নিরুত্তরে রতন হাতমুখ ধুতে বাইরে চলে গেল।

পুষ্প অল্পক্ষণ ঘরে প্রায় নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ঘরের কোন কিছুই ঠিকমত লক্ষ্য করছিল না। যেন পুষ্পর দুটি চোখ আর শরীরটা এই ঘরের স্থূল সামান্য কিছু বস্তুর মধ্যে পড়ে আছে, কিন্তু না মন না চিন্তা।

কলতলায় রতনের হাত পা ধোয়ার জলের শব্দ, বাইরে একটা আহত কুকুরের আকস্মিক চিৎকার, মণ্ডলদের বাড়িতে কচি ছেলেটার গলচেরা কান্নায় বুঝিবা পুষ্পর তন্ময়তা কেটে গেল। বার কয়েক পলক ফেলে পুষ্প দীর্ঘ একটা নিশ্বাস বুক থেকে নামিয়ে একটু বুঝি হালকা হল। লণ্ঠনের উজ্জ্বল দিকের দিকে স্বাভাবিক ভাবেই চোখ পড়ল পুষ্পর। বাতিটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, হয়ত এই তাপে চিমনির কাচটা ফেটে যাবে।

চোখে জল ছিল না, তবু আঁচলে মুখ মুছে নিল পুষ্প। লণ্ঠনটা উঠিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল, রতনের জন্যে চা আর চিঁড়েভাজা নিয়ে আসতে।

ঘর প্রায় অন্ধকার। নড়বড়ে টেবিলটার ওপর এক বিঘতের সেই মিটমিটে লণ্ঠনটা জ্বলছে।

মেঝেটা বড় কনকনে। টেবিলের কাছে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া পলকা চেয়ারটার ওপর রতন বসে। চায়ের কাপে মুখ দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এক মুঠো চিঁড়ে নিয়েছিল প্রথমটায় তারপর আর খেতে ভাল লাগেনি। পুষ্প স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। হাতে চায়ের গ্লাস।

"প্রথম মাসে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে কমাল, পরের মাসে বাসনা ধরল আরও পাঁচ না কমালে রাখতে পারবে না—এখন আবার কোয়ার্টার থেকে তাড়াতে চাইছে।

লোকটার সবই শয়তানি।' পুষ্প চিন্তিত উদ্বিগ্ন স্বরে বলল। এখন আর তাকে অতটা বিহ্বল মনে হচ্ছিল না।

রতন উদাস হতাশ চোখে অনেকক্ষণ দরজার দিকে চেয়ে থাকল, অলস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা বিড়ি ধরাল। বলল, 'আসলে মতলবটাতে আমাকে তাড়ান।'

'কেন?' পুষ্প শুধলো, 'তুমি তার গোলায় কি এমন আগুন দিয়েছ?' 'কেন টেনর কথাই ওঠে না। এসব অনেক চুরি জুচ্চোচুরির ব্যাপার আছে। রেলের মাল গুদোম চোর জোচ্চোরদের আড়ৎ। এখানে নামাতে মাল উঠাতে ডেলিভারি দিতে বুক করতে পয়সার খেলা—সে তোমার দু চার আনা থেকে তেমন হলে দু দশ কেন দু একশ টাকা পকেটে আসে।' রতন আক্ষেপ এবং গ্লানির মুখে বলছিল। একটু থেমে বিড়িতে টান দিয়ে আবার বলল, 'আর আমার ত শিবকে তুষ্ট করার চাকরি। বড় বাবুর ঘরোয়া জমিদারি এই হাওড়িং; এতে অনেক চুরি জুচ্চোরির ব্যাপার আছে, লোকে নিজের শালা ভায়েকেই বসিয়ে রাখতে চায়।'

পুষ্প আজ কিছু নতুন করে কথাটা শুনল না; স্বামীর মুখে বহুবার শুনেছে। রতন বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করে তাকে অনেক কিছু বুঝিয়েছে। কাজেই এখন আর পুষ্পর রতনের কথার সবটুকু অর্থ বুঝতে কষ্ট হল না। ও বিষয়ে যেন আর ভাববার কিছু নেই। পুষ্প বলল, 'তুমি কেনই ওই বদমাস লোকটার হাতে পায়ে ধরে বলতে গিয়েছিলে?'

'সব কথা শেষে ত কিছু বলতে যাইনি।' রতন বলল।

'কোন কিছুই তোমার বলা উচিত ছিল না। যখন জানোই লোকটা পাজির পা ঝাড়া, তখন তার কাছে তোমার কি দরকার ছিল বলার—বউ সংসার নিয়ে এখন আমি কোথায় যাব!'

'না বলে উপায় কি! এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিলে এখন আমায় বাজার টাজারের দিকে খোলার ঘর ভাড়া করতে হলে বার পনের টাকা গুনতে হবে, একেই ত শালা আসতে না আসতেই দু মাসে পাঁচ পাঁচ দশটা টাকা কমিয়ে দিয়েছে, তার ওপর দুচার টাকা যা উপরি হত আগে এখন তারও উপায় নেই, চিলের চোখ সব সময় চেয়ে আছে।'

'তা হোক তবু সে তোমার সংসার বউ নিয়ে অপমান করবে কেন?' পুষ্পর গলায় ঝাঁঝ এবং জ্বালা ফুটে উঠল। স্বামীর চোখে চোখ রেখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল, বলল, 'লোকটার গালে তুমি ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিলে না কেন?'

রতন নীরব। চায়ের তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে নিয়ে যাওয়া বিড়িটা আবার ধরিয়ে নিল। পাল বাবুর কথাটা তার আবার মনে পড়ল। লোকটা ইতর পশু ছোটলোক। চেহারাটাও যেমন মেথর চামারের মতন—কথাবার্তাও তেমনি। স্বভাব চরিত্রই বা কি! রতন মনে মনে যেন নিজেকে উপহাসভরে শুধালো, আর সংগে সংগে ঘৃণায় সমস্ত মন তিক্ত করে বলল, 'চোর মাতাল, মেয়েমানুষের অত্যাসটত্যেসও আছে।'...আজকের বিকেলের ঘটনাটা মনে পড়ায় রতন এখন ভাবল, পুষ্প ঠিকই বলেছে, লোকটাকে রীতিমত মারা উচিত ছিল। এত বড় বুকের পাটা তার কি করে হয়, রতনকে অনায়াসে বলতে পারে, রেলের কোয়ার্টার কি তোমার শ্বশুর যৌতুক দিয়েছিল! বিয়ে করার আগে ত বাপু আমায় জিজ্ঞেস করনি, আজে কটি সোমত্ত বউ নিয়ে কোথায় উঠব আজেবাজে জায়গায়।'

কথাটা ভাবতে বসে রতনের যেন এখন আরও গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছিল। তখন, বড়বাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথাগুলো যখন শুনেছিল, কেমন যেন গূঢ় বিমূঢ় অবস্থায় ছিল, এই জ্বালা অপমান ঠিক এখনকার মতন অনুভব করেনি। বরং এত বেশি অসহায় বিহ্বল বোধ করছিল যে তখন অপমান গায়ে না মেখে বড়বাবুর কাছে যেন সে ভিক্ষুকের মতন মিনতি করে বলছিল, রেল কোয়ার্টার থেকে তাড়িয়ে দিলে আমায় বউ নিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।...ছি ছি—রতন গ্লানি এবং লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। সেই শালা সুয়োরের বাচ্চাটাকে কেন আমি গলার টুঁটি টিপে ধরে মাল গুদোমের সেডের চুনের গাদায় পুঁতে দিলাম না।

'এই কোয়ার্টার তুমি ছেড়ে দাও।' পুষ্প হঠাৎ বলল। চায়ের গ্লাসটা টেবিলে রাখল। মেঝের কনকনানি পুষ্পর পা অসাড় করে তুলছিল। বিছানায় এসে পুষ্প বসল।

শ তা ব্দী র স দ্য - প্র কা শি ত ব ই

সজনীকান্ত দাসের

রবীন্দ্রনাথ
জীবন ও সাহিত্য

॥ ৬·০০ ॥

বিষয়-সূচী :

ভূমিকা : ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ : কর্মী রবীন্দ্রনাথ : 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী' রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র জীবনের নূতন উপকরণ : প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি : রবির পূর্ব উদয় : রবিরশ্মি : রবীন্দ্রনাথের মন : রবীন্দ্র-রূপকনাট্য : রবীন্দ্র কাব্য ও কবিতার গোড়ার কথা : রবীন্দ্র কাব্য : শব্দ-চয়ন : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—যোগাযোগ : রবীন্দ্রনাথের ছন্দ : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কাব্যধর্ম : রবীন্দ্রনাথের বাণী : রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী :

বইখানি যে কোন রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য

অন্যান্য অপরিহার্য বই :

শিবনারায়ণ রায়ের

নায়কের মৃত্যু ॥ ৪·৫০ ॥

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ॥ ৬·০০ ॥

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

আকাশ নন্দিনী ॥ ৩·৫০ ॥

গ্র্যাণ্ড হোটেল ॥ ৬·০০ ॥

রাত্রির বয়স ॥ ৩·৫০ ॥

সুশীলকুমার ঘোষের

গ্রহ-সারথি ॥ ৬·০০ ॥

রমেশচন্দ্র সেনের

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ॥ ২·৫০ ॥

ঃ শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন (প্রাক্তন গ্রন্থ-ভবন) ঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-৪৯২১

রতন স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকল, তার চোখ বলছিল, তারপর···তারপর কোয়ার্টার ছেড়ে—?

স্বামীর চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন স্পষ্ট সরল ভাষে ফুটে উঠেছিল পুষ্প তা বুঝতে পারল। বলল, 'খোলার চালের ঘরেই আমরা যাব।'

অল্পক্ষণ আর কোন কথা নয়। দুজনেই ভাবনায় ডুবে থাকল। রতন বলল, 'গেলাম না হয় বস্তিটস্তিতে তারপর—'

'তারপর কি—?'

'দশ পনের টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে বাকি যা থাকবে তাতে দুজনের পেট চলবে কি করে?'

'ভগবান যেমন করে চালাবেন।' পুষ্প চরম উদাস সুরে জবাব দিল।

'ভগবান তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকায় চালিয়ে দেন না।'

পুষ্প জানে ভগবানের চালাবার ক্ষমতা কতটুকু। তার কাছে অবিদিত নয়, সংসারে চাল না থাকলে ভগবান ভাতের হাঁড়ি ভরে দেন না। তবু তিনি কিছু দেন। ঠিক যে কি করে দেন, পুষ্প জানে না। চাল ডাল কয়লা নুন তেল নিশ্চয় দোরগোড়ায় নামিয়ে দেবার জন্যে তিনি আসেন না, কিন্তু কোথাও যেন তাঁর উপস্থিতি আছে। কোথায়? হয়ত···হয়ত আশায় ভরসায়, চেষ্টায় উদ্যমে। বিদ্যুতের চমক যেমন অনেকখানি আকাশ এক লহমায় অতিক্রম করে—পুষ্প দু-এক পলকের মধ্যে তার সমস্ত জীবন যেন একবার অতিক্রম করল। বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ বেচে, ঠোঙা তৈরি করে, তেলেভাজার দোকান চালিয়ে, খোলাঘরের মতন মুদির দোকান দিয়ে যার জীবন কেটেছে তার আজ এত ভেঙে পড়ার কি আছে!

'কষ্টের জন্যে আমি ভাবি না।' পুষ্প বলল। বলে অনুভব করতে পারল, কথাটার মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা ভাব রয়েছে। সে ঠিক যা বোঝাতে চাইছে, তেমন কষ্ট সহ্য করার কল্পনা এখনই তাকে হতাশ করছে। মনএ যে মুষড়ে পড়ছে—পুষ্প স্পষ্ট বুঝতে পারল।

রতন অনেকক্ষণ আর কিছু বলল না। আবার একটা বিড়ি ধরাল। বাইরে শীতটা ভারী ঘন হয়ে

উঠেছে, ঘরের মধ্যেও সব যেন ঠাণ্ডা কন কন করছিল। রতন একটু কেঁপে উঠল। তার শীত কম, তবু শীত শীত করছিল এখন।

'বিছানায় এসে বসো না।' পুষ্প স্বামীর শীতার্ত ভাব লক্ষ্য করে বলল।

এত অন্তরঙ্গ আপন একান্ত সুরে কথাটা বলল পুষ্প যে রতন স্ত্রীর সঙ্গে তার আর একটি গভীর সম্পর্ক অনুভব করতে পারছিল। সব কথা যেমন কথা নয় তেমনি কখনও কখনও কোন একজনের বিশেষ একটী কথা কাথারও অধিক। রতনের মনে হল নিজের অঙ্গের মতন, নিজের হৃদয়ের মতন পুষ্প যেন তার অন্তরের হৃদয়ের। কখনও কখনও পুষ্পর কথায় ব্যবহারে আচরণে রতন এমনিই গভীরতম অন্তরঙ্গতা অনুভব করে। তখন মনে হয় যেন রতনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্ত্রীর মমতা সমবেদনার সহানুভূতির আশ্রয় অবলম্বন করে পরিতৃপ্ত ও ধন্য হয়ে উঠেছে।

রতন চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানায় গিয়ে বসল। আধখানা শরীর ভেঙে প্রায় শুয়ে পড়ল।

সামান্যক্ষণ নীরবে কাটল। রতন ছাদের দিকে অন্ধকারে চেয়ে থাকল, পুষ্প দরজার দিকে। এক সময় একই সঙ্গে দুজনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। দুজনেই পরস্পরের দীর্ঘনিশ্বাস শোনাল। পুষ্প বিছানার পায়ের কাছ থেকে লেপের পাট খুলে রতনের পায়ের ওপর কোমর পর্যন্ত বিছিয়ে দিল। স্বামীর কপালে একটুক্ষণ নিজের করতলের তাপ এবং উষ্ণতার স্পর্শ রেখে পুষ্প আস্তে আস্তে রতনের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ঠিক কতটা সময় এইভাবে কেটেছিল কারও খেয়াল নেই। হঠাৎ মৃদু পরিষ্কার গলায় পুষ্প বলল, 'এই চাকরি তোমার থাকবে না। মাইনে কমিয়েছে, ঘর কেড়ে নিল, এবার চাকরিটাও নেবে। আমি বলি কি এ ছোটলোকের চাকরি যখন থাকবেই না—আর থাকলেও সে রোজগারে আমাদের সংসার চলবে না, তখন তোমার এত কষ্ট গালাগাল অপমান সয়ে লাভ কি!' পুষ্প কথাটা এখানেই শেষ করল যদিও বোঝা যাচ্ছিল তার কথার শেষ এখানে নয়।

রতন স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে অপলকে চেয়ে থাকল একটুক্ষণ, বলল, 'উপায়—'

পুষ্প বলবে কি বলবে না করে একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'আজ এখনি তোমায় আমি উপায়ের কথা কেমন করে বলব। তবে উপায় একটা হবেই। এ চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।'

রতন কেমন ক্রমশই অভিভূত হয়ে পড়ছিল। স্ত্রীর হাত আস্তে করে টেনে প্রথমে খানিকক্ষণ নিজের কপালের ওপর রাখল, তারপর বুকের ওপর—ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে রেখে বলল, 'সত্যি, ঠিক বলেছ এ চাকরি ছোটলোকের। মান নেই সম্মান নেই। নিজের ওপর মানুষ কিছুটা আস্থা রাখে, কুলির সর্দারি করতে করতে আমি একেবারে অমানুষ হয়ে গেছি।'

পুষ্প কখন যেন স্বামীর মুখের ওপর বুকের দিকে নুয়ে এসেছিল। রতনের কথা শুনতে শুনতে আরও একটু নুয়ে পড়ল। 'আমি সারাজীবন কষ্ট সয়েছি, আরও না হয় কিছুকাল সইব।'

'আমিও ত তোমারই মতন বেড়াল কুকুরের মতন মানুষ হয়েছি।'

'তবে অত ভয় পাচ্ছ কেন?...আমরা দুবেলা দুমুঠো অন্নের যোগাড় হয়ে যাবে।'

'যাবে—?' রতন স্ত্রীর চোখে যেন গভীর কোন সমর্থন খুঁজছিল।

পুষ্প স্বামীর দৃষ্টি অনুভব করতে করতে কখন যেন উদ্বেল হয়ে উঠল। চোখে জল এসে পড়েছিল তার। কে জানে সেই জল লুকোতে নাকি স্বামীর বুকে তার সমগ্র সত্তা রেখে প্রতিজ্ঞা করতে পুষ্প স্বামীর বুকে মাথা রাখল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না, শেষে তার বিগলিত জড়িত স্বর শোনা গেল, 'যাবে। এক কালে ঠোঙা তৈরি করে বেচেছি তেলেভাজার দোকান দিয়েছি তবুও মরিনি। আর আজ তুমি আমার পাশে রয়েছ। আমি মরব না।'

রতন তার হৃদপিণ্ডের শব্দের মধ্যে যেন পুষ্পর এই আশ্চর্য কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পারছিল। স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে রতন চোখ বুজল এবং দেখল তারা—সে আর পুষ্প এই ভীষণ শীত এবং অন্ধকারে পাশাপাশি হাতে হাত ধরে কোথায় যেন হেঁটে চলেছে। রতন সেই গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখতে পারছিল না শুধু অনুভব করছিল তার পাশে পুষ্প রয়েছে এবং তারা দুজনেই নির্ভয়।

— স মা প্ত —

শতবর্ষ পরে

: বাইশে শ্রাবণ :

ছদ্মবেশী

★

বাইশে শ্রাবণ দিয়ে সুরু করি, পঁচিশে বৈশাখে শেষ করব।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গসুধা যাঁরা পান করেছিলেন তাঁরা ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী। জন্মসূত্রে বা কোন যোগসূত্রে তাঁরা রবি-সান্নিধ্যে এসে পড়েছিলেন—এ তাঁদের অর্জিত অধিকার নয়। কিন্তু তাঁদের ছিল কত দরাজ—তাঁরা সেই রবি-সঙ্গ-সুধা শুধু নিজেরা পান করেন নি, বিশ্বহিতে পুস্তক-আধারে সে-সুধা আমার-আপনার জন্যে পরিবেশন করছেন। এঁদের সাহায্য ছাড়া আমরা সে-সুধার স্পর্শ পেতাম না। এঁরা হাতে ধরে না নিয়ে গেলে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের সামনে আমরা কল্পনায়ও পৌঁছতে পারতাম না। এঁরা এক একজন মহৎ পাণ্ডা। পাণ্ডার দক্ষিণাও সামান্য—একটি গ্রন্থের মূল্য। এঁরা পাণ্ডার মতই ভগবান ও ভক্তের সেতু। ভক্ত যত চেষ্টাই করুক, এঁরা প্রসন্ন না হলে দেবতার পরস্পর্শ ঘটবে না। আর ভগবানের অবস্থাও তথৈবচ। তিনি তো বিগত অতীত—তাঁর মহিমা এঁরা জনসমাজে প্রচার না করলে পৌঁছবে কি করে? অতএব এঁরা রবি ঠাকুরকেও অনুগ্রহ করছেন।

রবি-সান্নিধ্যের জনগণ কম ছিল না। তাঁরা সবাই লিখেছেন, লিখছেন, লিখবেন। না লিখে ছাড়বেন না। কারণ তাঁর কথাটুকুই তো আসল। রবি ঠাকুর তো সবাইকে ছেড়ে তাঁর সাহিত্যকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর কান ধরে টেনে ছিলেন সেই কথাটুকু বলবার জন্য।

তাতে রবি-সঙ্গীদের নিজেদের মধ্যে মতান্তরও ঘটছে। কারণ সবাই বলছে—আমি আসল, আমার কাছে খাঁটি মাল। কেমন, পাণ্ডাদের সঙ্গে মিলছে কিনা। আমরা যারা রবিকররঞ্জিত, তারা পড়েছি বুঝিলে। কাকে মানি!

একজন লেখিকা বেশ কিছুদিন আগে একখানি মনোরম রবীন্দ্র-স্মৃতি-গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর বইয়ের আদর হয়েছিল—হওয়া অযৌক্তিকও নয়। সুধীজনে অন্তত তাই বলে। আমি সামান্য লোক আমার মত থাক। যাই হোক, এই লেখিকা এবারের একটি রবীন্দ্র সংখ্যায় আপত্তি তুলেছেন—এতদিন বাদে রবীন্দ্র-স্মৃতি লেখা হচ্ছে কেন! এতদিন বাদে কি কিছু মনে থাকবার কথা? লেখিকা স্বয়ং রবি-বাক্য কাগজে টুকে রেখেছিলেন। তাছাড়া প্রকাশও করেছেন আগে। এখন যাঁরা লিখছেন তাঁদের নোট নেই, দাম্পত্য-পত্র আছে। অতএব লেখিকার উক্তি যুক্তিসঙ্গত। অনেকে বলছেন, লেখিকা বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে বিরূপ হয়েছেন। একথা ভাববার কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ তাঁর বই বাজারে বেরিয়ে কয়েকটি সংস্করণ করে ফেলেছে। সুতরাং এখন যেই আসুক তাকে অনেক পেছন থেকে সুরু করতে হবে।

এই লেখিকা আপত্তি করেছেন কোন একটি রবীন্দ্র-স্মৃতি-গ্রন্থ সম্পর্কে এই বলে—রবীন্দ্রনাথ চীৎকার করে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথ খিলখিল করে হেসে উঠলেন, এ জাতীয় উক্তি রবীন্দ্রনাথকে বিকৃত করছে। রবীন্দ্রনাথ খিলখিল করে হাসতেন না—রেকর্ড করা নেই। আর রবীন্দ্রনাথ চীৎকার করবেন—সর্বনাশ, কবি-ঋষি-গায়ক রবি ঠাকুর চীৎকার করতেই পারতেন না। চেষ্টা করলে বা ইচ্ছে করলেও পারতেন না, যা তিনি মুখ দিয়ে বার করতেন তাই সুর হয়ে বেরোত।

এই লেখিকার লেখার চমৎকার একটি খবর পাওয়া গেল: 'মনস্তত্ত্বের যে ঘোরপ্যাঁচে পড়ে এই অসাধ্যসাধন প্রচেষ্টা হয়, তারই চূড়ান্ত পরিণতি বেশ কিছুদিন একটি মাসিক পত্রিকায় পড়েছিলাম, সেখানে লেখক মিডিয়ামের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। বিদেহী রবীন্দ্রনাথ মিডিয়ামের মুখে তাঁর সঙ্গে রঙ্গরহস্য তো করেছেনই এমন কি কবিতা ডিক্টেট করেছেন—সে কবিতাও ছাপা হয়েছে এবং লেখকের ধারণা ওই কবিতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ লিখতে পারে না।'

—(শনিবারের চিঠি; রবীন্দ্র সংখ্যা)

এই প্ল্যানচেটকারীর ওপর লেখিকা যে কেন খামাখা রাগ করছেন বুঝতে পারলুম না। স্বয়ং কবি বলে গেছেন :

'ভারতে ছিল না কভু হেন প্রথা পেয়ালের
কবি পরে ছিল তার নিজ মেমরিয়ালের।'

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী তো প্ল্যানচেট-কারীরা অক্ষরে অক্ষরে মেনেছে। তারা সভা করেনি, মাইক বসায় নি, প্রশ্রয় দেয় নি কোন পেয়ালের প্রথাকে, স্বয়ং কবিকেই ডেকে এনেছে তাঁর মেমরিয়ালের জন্য। আর কবি যদি শরীরী হয়ে না দেখা দিতে পারেন, তবে অশরীরীতে আপত্তি কি?

অন্য কথায় আসা যাক। 'বাইশে শ্রাবণ' নামে সম্প্রতি কোলকাতায় দুটো বই বেরিয়েছে। একটি ছবি অর্থাৎ ফিল্ম্, আর একটি গ্রন্থ। আমি রবির কর সংগ্রহে ব্যাপৃত শুনে আমার এক বন্ধু আমাকে এই দুটিই দেখতে বলল। তার ধারণা ছিল দুটিই রবীন্দ্র-বিষয়ক। আমি ছবি দেখে ও বই পড়ে দেখি—হরি হরি। ছবিটা একটা ক্যাবলা মাস্টারের দাম্পত্য-কথা। আর বইটা একজন ভদ্রমহিলার ও তাঁর স্বামীর দাম্পত্য-পত্র-সংকলন।

অনেকে ছবির নামকরণ নিয়ে আপত্তি করেছেন। কারণ ওটা নাকি রবি ঠাকুরের মৃত্যু-দিবস, এবং একজন তরুণ বামপন্থী পরিচালকের থেকে এটা প্রত্যাশিত নয়।

আমি কিন্তু এই উক্তির মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই নি। ক্যালেণ্ডারে আরো ৩৬৪টি দিন আছে ঠিকই কিন্তু এই 'বাইশে শ্রাবণ' তারিখটা যে নায়ক-নায়িকার জীবনের একটি বিশেষ দিন। পরিচালক তার কী করতে পারেন? নায়ক-নায়িকার তারিখটা বদলানো কি ডিরেক্টরের কর্ম? স্বয়ং বিধাতা বলে হয়তো পারতেন। যেমন রবি ঠাকুরের মৃত্যুদিন বাইশে শ্রাবণ। এটা রবি ঠাকুর নিজেই ইচ্ছে করলে আজ বদলাতে পারেন? আমি হলফ করে বলতে পারি যে আজ স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেও তা পাল্টাতে পারেন না। নায়ক-নায়িকার জীবন সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজকাল পঁচিশে বৈশাখ তারিখে বিয়ের একটা হিড়িক পড়ে গেছে। যদি ঐ তারিখে উদ্বাহিত কেউ 'পঁচিশে বৈশাখ' নামে তার নৌ-র গল্পো লেখে তাহলে কেউ কি তাতে আপত্তি করতে পারে? পঁচিশে বৈশাখ বা বাইশে শ্রাবণ কোন তারিখেই তো রবিঠাকুরের রেজিষ্ট্রি-করা কপিরাইট নেই। আর রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বছরেই ছবিটির মুক্তি পাওয়ায় পরিচালকের কী দায়িত্ব? রবি ঠাকুরের অত আপত্তি থাকলে তিনি এক বছর আগে বা পরে জন্মালেই পারতেন। তাতে পরিচালকের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। তাছাড়া, ছবি তৈরী করা পরিচালকের কাজ। তিনি ছবিটি তৈরী করে ছেড়ে দিয়েছেন। মুক্তিদানের দায়িত্ব ডিষ্ট্রিবিউটারের। সুতরাং পরিচালক নির্দোষ, নিষ্পাপ।

গ্রন্থটি কিন্তু ঠিক এমন নয়। তাতে রবি ঠাকুরের নাম আছে অনেকবার—তাঁর শেষ জীবনের কয়েকটি দিনের অন্তরঙ্গ চিত্র আছে। এই শাঁসটুকুতে বইটি সত্যই মূল্যবান। এই শাঁসে পঞ্চাশ পাতা, কি বড় জোর সত্তর-পঁচাত্তর পাতা হতে পারে। কিন্তু বইটার পাতার সংখ্যা দুশো বায়ান্ন মাত্র। অতএব শাঁসের চারদিকে প্রচুর ছোবড়া। আমি সরল মানুষ। এইটুকু মাত্র ভেবেছিলুম। আমার একজন বিদগ্ধ-সমালোচক-বন্ধু বললেন, 'তারা তুমি ভুল বুঝেছ। ওটি রবি-স্মৃতি-গ্রন্থ নয়। ওটি লেখিকার বংশ-পরিচয়ের পটভূমিকায় আত্মকথা, এবং সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু ওঁর কাছে এসে পড়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। বইটিতে নিজে বাদে দ্বিতীয় বৃহৎ চরিত্র হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং রবি ঠাকুরকে ভাগ কম দেওয়া হয় নি। তোমরা রবি ঠাকুরের নামে কেমন যেন খাই-খাই করে ওঠো। রবি ঠাকুর দেখলেই 'আরো দাও আরো দ'ও' রব তোলো। কিন্তু এখানে তো রবি ঠাকুরের স্থান সংকীর্ণ হবেই। কারণ এটা রবীন্দ্র-গ্রন্থ নয়, আত্মকথা। বরং লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্ব আরো বেশী দিলে আসল কথা অর্থাৎ আত্মকথা পানিকটা চাপা পড়তে বাধ্য ছিল।'

এই কথা শোনার পর থেকে আমি কেমন হকচকিয়ে গেছি। সমালোচক বন্ধুটি এত বড় পণ্ডিত যে ওঁর মুখে মুখে চোপা করার মত চোপা আমার নেই, তাই কেমন একটা ধন্দে পড়ে আছি।

বন্ধু সেটা বুঝে বললেন, 'আচ্ছা আমি প্রমাণ করি। একে একে বলি। গোড়াতেই লেখিকার বাবার নাম—ঠিক কিনা?'

আমি। তা খুব স্বাভাবিক। ওঁর বাবা একজন অত্যন্ত বিখ্যাত লোক। তাছাড়া উৎসর্গ-পৃষ্ঠা যে কোন লেখকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

বন্ধু। লেখিকা উৎসর্গ-লিখনে স্বহস্তাক্ষর ব্লক করে ছেপেছেন। রবীন্দ্রস্মৃতি-গ্রন্থই যদি হবে বইটা তবে লেখিকার হস্তাক্ষর পাঠককে দেখিয়ে লাভ কি! তাঁর সু-অক্ষরের যতটুকু সুবিধা সে তো কম্পোজিটার পেয়েই গেছে।

আমি। রবীন্দ্রহস্তাক্ষরও তো আছে।

বন্ধু। হ্যাঁ। একটি লেখিকার পিতার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা। আর একটি ঐ কবিতা প্রসঙ্গে লেখিকাকে লিখিত পত্র।

আমি। রবীন্দ্র রচিত বলেই এগুলি মূল্যবান।

বন্ধু। নিঃসন্দেহে। কিন্তু এখানে লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে দেখান নি। পিতৃগৌরবের স্বপক্ষে রবিঠাকুরের সার্টিফিকেট উপস্থিত করেছেন। পাছে কেউ সন্দেহ করেন তাই রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি।

আমি। অত্যন্ত হীন উক্তি।

বন্ধু। কেউই হীন নয়। আমিও নই। লেখিকাও নন। তুমি শুধু এইটুকু মনে রাখো যে এটা একটা আত্ম-কাহিনী। তার ভূমিকাংশে পিতার পরিচয় থাকা কিছু অন্যায় নয়।'

আমি। অন্য কি বলার আছে বল।

বন্ধু। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষর বাঁদিকে এবং স্বহস্তাক্ষর ডানদিকের পাতায় পাশাপাশি সাজানো আছে দেখেছ।

আমি। ওটা প্রকাশকের ব্যাপার।

বন্ধু। প্রকাশক লেখিকা স্বয়ং। প্রেস-সাইন বিশ্লেষণ কর।

আমি। এহো বাহ্য, আগে কহ আর।

বন্ধু। আচ্ছা, ছবিগুলো দেখেছো।

আমি। হ্যাঁ।

বন্ধু। কটা ছবি আছে বইতে?

আমি। তিনটি।

বন্ধু। লেখিকার বাড়ীর ছবি আছে একটা। তাতে বোধ হয় কবি নেই, লেখিকা আছেন।

আমি। রবীন্দ্র-স্মৃতি-পূত গৃহ।

বন্ধু। 'ট্যুরিনের চকোলেট ফ্যাক্টরীতে'—এই ছবিতেও কবি নেই, লেখিকা আছেন।

আমি। ও ফ্যাক্টরীতে কবি একবার গিয়েছিলেন। এবং তাঁকে তখন চকোলেটের বাক্সো দেওয়া হয়। তার উল্লেখ গ্রন্থে আছে।

বন্ধু। বাকী চারটি ছবিতে বিভিন্ন ভংগীতে লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথ।

আমি। একটি পূর্বপৃষ্ঠা ও একটি অর্ধপৃষ্ঠা ছবি শুধু কবির।

বন্ধু। ঠিক। দুটোরই নিচে লেখিকার বাড়ীর নাম ও সাল অঙ্কিত।

আমি। তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। আর একখানি কবির ছবি আছে—অবনীন্দ্রনাথের আঁকা।

বন্ধু। হ্যাঁ। লেখিকার বাড়ীর শোভা ও গৌরব।

আমি। এহ বাহ্য, আগে কহো আর।

বন্ধু। আচ্ছা এবার আত্মীয়-বন্ধুদের পরিচয়। আত্ম-কাহিনীতে এটা খুবই দরকার। আর লেখিকা অত্যন্ত দয়াবতী তাঁর আত্মজন কাউকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। কোনরকমে একবার নামটা উল্লেখ করেছেন—সারা বইটাই চিঠি বলে তা উল্লেখ করা সহজ হয়েছে—এবং সংগে সংগে ফুটনোটে তাদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

আমি। উদাহরণ চাই।

বন্ধু। স্যার নীলরতন সরকার লেখিকার স্বামীর মেজমামা সেই সূত্রে লেখিকার মেজমামা। ফুটনোটে নেই এ তথ্য?

আমি। আছে। কিন্তু তিনি ডাক্তার। রবীন্দ্রনাথের রোগ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল।

বন্ধু। ফুটনোট আরো লক্ষ্য করুন। স্যার নীলরতনের তিন কন্যার পরিচয় আছে—নলিনী (লেখিকার 'বেবিদি'), অরুন্ধতী লেখিকার 'আকুদি', কমলা (লেখিকার 'টুনি')। আছে?

আমি। হ্যাঁ, আছে।

বন্ধু। ঐ তিন কন্যার স্বামীদের পরিচয় আছে—ঐ সংগেই।

আমি। আছে।

বন্ধু। লেখিকার দেবরের পরিচয় আছে?

আমি। আছে।

বন্ধু। লেখিকার মার তো বিস্তৃত আখ্যানই আছে।

আমি। হ্যাঁ।

বন্ধু। এছাড়া আছেন 'লতা'।

আমি। লতা কে?

বন্ধু। ফুটনোট দেখ। কি দেখছ? রেণুকা রায়। পশ্চিম-বঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়। স্বামীর পরিচয়ও দেওয়া আছে ঐ সঙ্গেই। কিন্তু এ নামটা থাক ভাই। রবীন্দ্রনাথের পাশে রেণুকা রায়ের নাম এলে আমার কেমন রজনীগন্ধার গন্ধের পাশে চুরুটের গন্ধের কথা মনে হয়।

আমি। তাহলে থাক।

বন্ধু। শান্তিনিকেতনে বাসকারী একজন কন্ট্রাকটারের পরিচয়ও আছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগের অনেক কাজ করেন।

আমি। এ প্রসঙ্গ থাক।

বন্ধু। আর একটা নাম বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। বাইরের মধ্যে এক জায়গায় মৈত্রেয়ী দেবীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এ বই রবীন্দ্রস্মৃতি-গ্রন্থ হলে মৈত্রেয়ী দেবীর পরিচয় দেওয়া হোতো এইরকম একটি লাইনে —'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের লেখিকা। কিন্তু এ কথাটির একেবারেই উল্লেখ নেই। আছে, তিনি বিখ্যাত দার্শনিকের কন্যা এবং সিনকোনা বাগানের একজন কর্মচারীর স্ত্রী। পারিবারিক গ্রন্থে এ ধরণের পারিবারিক পরিচয়ই স্বাভাবিক।

আমি। এহ বাহ্য আগে কহো আর।

বন্ধু। লেখিকাদের একটি বাড়ী আছে শিরিডিতে। নিশ্চয়ই তার বৃত্তান্ত পেয়েছ বইতে।

আমি। হ্যাঁ।

বন্ধু। সেবারের বর্ষায় শিরিডির গাছ লাগাবার জন্য লেখিকার কি উৎকণ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের অসুখ— সেইজন্য যেতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু বর্ষা তো আর বসে থাকবে না। রবিঠাকুর থাকলেও থাকতে পারে। সত্যি কী রক্ত-প্রাণা শকুন্তলা-সমা মহীয়সী নারী! এঁর আত্মকথা হাজার বার লেখা উচিৎ।

আমি। এহ বাহ্য আগে কহো আর।

বন্ধু। কবি যে লেখিকাদের মধ্যে লেখিকাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, এ কথাটা নানাভাবে প্রমাণ করেছেন। কবি তাঁকে ছেড়ে থাকতেই পারেন না। তাহলে বোঝো এ নারী কত বড়! স্বয়ং রবিঠাকুরের যাকে ছাড়া চলে না। এঁর আত্মকথা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

আমি। এহ বাহ্য আগে কহো আর।

বন্ধু। লেখিকা অত্যন্ত পতিভক্তিপরায়ণা। তাঁর আত্মকথায় পতি-পরিচয় খুব ভালভাবে দিয়েছেন। স্বামী বিখ্যাত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক। ব্যস্ত লোক। কোলকাতায় দুদণ্ড বসতে পান না। বম্বে দিল্লী করে বেড়াতে হয় তাঁকে। লেখিকা এ হেন স্বামীকে প্রতিদিন চিঠি লিখবেন এ আর আশ্চর্য কথা কি?

আমি। প্রতিদিন চিঠি লিখতেন একথা আছে নাকি বইতে?

বন্ধু। ৩৮ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনটি দ্রষ্টব্য। তুমি আশ্চর্য হচ্ছো কেন? চিঠি যে তিনি যথেষ্ট লিখতে প্রেরণা অনুভব করেন তার সাক্ষী তো বইখানা স্বয়ং। হাস্পাতা-পত্রের মাধ্যমেই তো লেখিকা তাঁর আত্মকথা লিখেছেন। 'দুঃখ হচ্ছে যে তুমি শুনতে পেলে না। যদি থাকতে সত্যি খুশী হতে।' ইত্যাদি নিবেদনও রয়েছে, ঐ পাতাতেই। আচ্ছা, এ গ্রন্থের প্রথম চরিত্র লেখিকা, দ্বিতীয় চরিত্র কে?

আমি। কেন, রবীন্দ্রনাথ।

বন্ধু। এ ভ্রান্ত ধারণা তোমার হোলো কেন?

আমি। বারে, বইয়ের নাম 'বাইশে শ্রাবণ' তারপরে গিয়ে—

বন্ধু। রাখো কথা রাখ। দ্বিতীয় চরিত্র স্বামী।

আমি। মানব না।

বন্ধু। অন্তত স্বামীর স্থান যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে গৌণ নয় এটুকু অন্তত মানতে হবেই।

আমি। কেন?

বন্ধু। পত্র-মাধ্যমের এক সূত্র লেখিকার হাতে আর এক সূত্র স্বামীর হাতে। দ্বিতীয়ত, লেখিকার একদিকে স্বামী, অন্যদিকে কবি, স্বভাবতই, স্বামীর দিকে ওজন বেশী। কিন্তু লেখিকার অন্তর্দ্বন্দ্বটা লক্ষ্য কর। কী দুর্দ্বর্ষ নাটকীয় দ্বন্দ্ব। কবি ও স্বামী, শান্তিনিকেতন ও কোলকাতা। জোড়াসাঁকো ও বরানগর। দুজনের

একই সময় অসুখ। লেখিকা তাঁর আত্মকথায় এই অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপুণ চিত্র এঁকেছেন।

আমি। এহো হয়, আগে কহো আর।

বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের শেষ সময় লেখিকা কাছে থাকতে পারেন নি বলে প্রচুর দুঃখ পেয়েছেন এবং প্রচুরতর লিখেছেন সে বিষয়ে। যদি এটা রবীন্দ্রস্মৃতি-গ্রন্থ হোতো তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষ মুহূর্তে যতটুকু দেখেছেন তাই বলতেন। এটা আত্মকথা বলে লেখিকা নিজের ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনা ও তিক্ততা (কোন অনির্দেশ্য টেলিফোন-কারকের প্রতি যেন !) বেশী করে লিখেছেন আত্মকথায় নিজের কথাই তো থাকবে রবীন্দ্র-পুণ্যকথা যারা শুনতে চায় তাদের কাছে এর মূল্য কি—কে দেখতে পেল না তাতে রবিভক্তদের কি ? অনেকেই দেখতে পায়নি। রবিভক্তদের জন্য এ গ্রন্থ নয়, লেখিকার লেখার যারা ভক্ত তারা সানন্দে লেখিকার ঐ মুহূর্তের বেদনার বিস্তৃত বর্ণনা যাতে পড়তে পারে সেইজন্যই কবির মৃত্যু তেমন বড় ঘটনা নয়, লেখিকা শেষ সময় দেখতে পাননি এটাই বড় ঘটনা। মরলে ক্ষতি ছিল না, শেষ সময় দেখাটা হলেই হতো।

আমি। এহো হয়, আগে কহো আর।

বন্ধু। মৃত্যুর পর কবিকে স্নাত ও সজ্জিত করা হচ্ছিল। হঠাৎ একদল ছোটলোক দরজা ঠেলে ঢুকে এসেছিল। কী লজ্জাকর ব্যাপার। কী পাপ। কবি তো লেখিকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সুতরাং আত্মচরিত্রে তিনি ছোটলোকদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদি রবীন্দ্র-গ্রন্থ হোতো এটি, তবে লেখা যেত—রবিকে বাংলাদেশের মানুষ কী ভালবাসে তা জোড়া-সাঁকোর জনসমুদ্রের দিকে তাকালে বোঝা যায়। তাদের উৎকণ্ঠা, তাদের শোক উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ওরা জানে না ঘরের মধ্যের খবর। ওরা একবার শেষবারের মত—হয়তো এই একবার—তাদের প্রিয় কবিকে দেখতে চায়। তবু ঐ বিপুল জনতা শান্তই ছিল। থমথমে মুখে তারা দাঁড়িয়ে ছিল—অনেকক্ষণ ধরে। পা টনটন করবার কথা। কিন্তু সেকথা তাদের কারুর মনে ছিল না। সেই আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা নিয়ে লোকগুলো বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। আর যেই বেরোক ঐ ভেতর থেকে তাকেই ছেঁকে ধরে জিজ্ঞেস করছিল। এই কোলকাতা সহর, এত বড় ডাক্তার, তবু বাঁচানো গেল না ? খুব কষ্ট পেয়েছিলেন ? নানা প্রশ্ন তাদের মনে। সেই উৎকণ্ঠার একটা অতি ক্ষুদ্র ঢেউ একবার, মাত্র একবার, তীরকে উলঙ্ঘন করে দরজার উপর এসে পড়েছিল। মাত্র একবার। তাছাড়া তারা অসীম ধৈর্যে সীমাহীন শোককে অন্তর্লীন রেখেছিল। লেখিকা তাদের দেখতে পান নি, দেখতে চান নি। যদি দেখতেন তবে এদের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তিনি একবার উপলব্ধি করতেন, যদি দেখতেন, তবে জানতেন যে এরাও কবিকে শেষ মুহূর্তে—হয়তো বা কোন মুহূর্তেই দেখতে পায় নি। ওদের দুঃখ দেখলে তিনি নিজের সৌভাগ্যে হতবাক হয়ে যেতেন।

আমি। আগে কহো—

বন্ধু। আর আমার কিছু বলবার নেই। শুধু একটা প্রশ্ন…

আমি। কী প্রশ্ন ?

বন্ধু। লেখিকা দুঃখ করেছেন, কবির ইচ্ছে ছিল তাঁর শেষকৃত্য হয় শান্তিনিকেতনে, এবং তাঁর শেষকৃত্য যেন প্রশান্তির মধ্যে হয়। এ ইচ্ছাটা পূরণ হয়নি কবির। স্নান ও সজ্জার ভার অন্য কারো ওপর দিয়ে তিনি বাইরে এসে ঐ রাস্তায় দাঁড়ানো ছোটলোক-গুলোকে কবির শেষ ইচ্ছাটা জানালেন না কেন ? সেটা শুনলে, ছোটলোকদের অনেকে কবিকে মাথায় করে হাঁটা পথে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। কেন তিনি একবার বললেন না ? নিমতলার বিজ্ঞি নোংরা যায়গায় রবি-স্মৃতিসৌধ দেখে যদি কেউ লেখিকার জবানবন্দী থেকেই তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তখন—

আমি। মহীয়সী নারী ছাড়া কেউ তাঁর আত্মকথায় আত্মদোষের এত অকপট স্বীকৃতি লিখতে পারে না।

বন্ধু। তা বটে। আর একটা অনুরোধ।

আমি। কাকে ?

বন্ধু। লেখিকাকে। ছোটলোকগুলো 'বিশ্বকবির জয়' বলে চীৎকার করেছিল। ভুল করেছিল। শিক্ষাহীন লোকগুলো যাদের শোকে সংযম নেই, তারা অন্যায় করেছিল। কিন্তু সত্যি ওরা কবিকে ভালবাসে। কবিকে ওরা সবটা হয়তো বোঝে না। কিন্তু কবিকে ওরা অসম্মান করতে চায় নি। ওটা ওদের শোকেরই এক রকমের প্রকাশ। খুব শোভন প্রকাশ নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু ওরা বোঝেনি সেই মুহূর্তে যে এটা অশোভন। সুতরাং লেখিকা যদি পারেন যেন নিজগুণে ওদের ক্ষমা করেন।

আমি। শুধু এইটুকু থাকলেই একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর আত্মচরিত হোতো।

বন্ধু। তাহলে ইঃ উঃ বিঃ ?

আমি। সে আবার কি ?

বন্ধু। ইহাই উপন্যাসের বিষয়। অর্থাৎ আত্মকথা প্রমাণিত হোলো।

আমি। না—মানে—ইয়ে—হ্যাঁ—না—তা—

বন্ধু। তোতলা হয়ে যাচ্ছিস কেন ?

আমি। ভাগো। আমি এখন রিপোর্ট লিখব।

ভিন্নপথে কেদার বদরী

গণেশ লালওয়ানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভালো লাগছে ঝির ঝিরে হাওয়াটা। আকাশ ভরা রোদ তাই বোধহয়। সামনেই নদী, ওদিক হতেই বাতাস যেন উঠে আসছে।

ঝল্লা হতে বৃদ্ধকেদার পাঁচ মাইল। কিন্তু প্রখর রোদে সেই পাঁচ মাইল পথ হাঁটতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। নদী পেরিয়ে তেমন আর বন নেই। পাহাড়গুলো তাই অনেকটাই রুক্ষ। চীড়গাছ অবশ্য আছে কিন্তু বিরল। আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে থাকায়, পথের ওপর তেমন তাদের ছায়াও এসে পড়ে না। পথ চলতে তাই বেশ কষ্ট হয়, যেমনটা যমুনাচটির পথে হয়েছিল অনেকটা সেইরকম।

ওদিকে জলের যেমন অভাব দেখেছিলাম, বৃদ্ধকেদারে তেমনি দেখছি আবার জলের প্রাচুর্য। দু-দুটো নদী রয়েছে এখানে আর জলের সোতা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একটা নালাও কাটা হয়েছে—সেই নালা দিয়ে জল চলেছে কুলুকুলু করে। সোতায় জলে জলচাকী ঘুরছে। এক আধখানা নয়, কম করেও বিশ পঁচিশটা। আর মেয়েরা হাঁটুজলে নেমে কাপড় কাচছে—কে জানে কত কাপড়! সারাদিনইত দেখলাম যে কাপড় কাঁচার বিরাম নেই।

এদিকের মধ্যে এই বৃদ্ধ কেদারই যা একটু সহর। নদীর ওপারেও দেখছি আবার পাকাবাড়ী। শুনি ওটা নাকি চামারপল্লী! তাই যদি হয় তবে তাদের অবস্থা যে সাধারণ গাঢ়োয়ালীদের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছল তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কপ্‌পুর এলো আজ অনেক দেরীতে। ওর আর দোষ কী! যা দীর্ঘপথ। তারাদত্ত অবশ্য এসে এসেই রান্না তুলে দিয়েছে দোকান হতে বাসনপত্র আর চাল ডাল নিয়ে। পাণ্ডার ছোট্ট ছেলেটিকে দইয়ের কথা বলায় কোথা থেকে দই এনে দিয়েছে একটা কাঠের পাত্রে করে। তাই কপ্‌পুর আসবার আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে নেই। তারপর সে এলে কাপড় চোপড় নিয়ে সংগমে যাই স্নান করতে। মন্দাকিনী ও বাল গঙ্গার সংগম। সেই ছেলেটির দাদা এসে সংগমে আমাদের পূজো করান। তারপর তিনিই আমাদের নিয়ে যান বৃদ্ধকেদারের মন্দিরে।

কেদারনাথের মতোই এখানেও পর্বতখণ্ড তবে অমন ত্রিকোণ নয়, গোলাকৃতি—অনেকটা গিরিগোবর্দ্ধনের মতো। আর সেই পাহাড়ের গায়ে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মূর্তি খোদা। ঘরের ভিতর ঘুপসি অন্ধকার। আলো জ্বালিয়ে পূজারী দেখায় সবকিছু। এই আলো জ্বালবার জন্য তাঁর বিশেষ কিছু প্রাপ্য আছে। কিন্তু যখন দেখতে এসেছি, তখন না দেখতে যাওয়া যায় না। পাণ্ডা বলেন, কেদারনাথের এই আদি পীঠস্থান, আগে এখানেই কেদারনাথের পূজো হত। কেদারে পূজো হতে আরম্ভ হয়েছে অনেক পরে।

পূজো চলে মন্দির হতে বেরিয়ে সেই ছেলেটিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই এদিক ওদিক। এক ফাঁকে ওদের বাড়ীটাও দেখে নেই। বেশ পাকাবাড়ী আর অনেককালের। একটা ছোট্ট মেয়ে কোথা থেকে বেরিয়ে আসে। বলে সুঁচ সুতো দাও। তাইত! মন্দিরে আসবার সময়ত সে-সব সংগে আনিনি। তাই ওকে চটিতে যেতে বলি। চটিতে যেয়ে দেখি ও একাই নয়, এসে গেছে একটা দলকে দল। সবাই সুঁচ-সুতো নেয়, আর পাই পয়সা। পাণ্ডার ছেলেটি হাসে। বলে কি করবে অত সুঁচ-সুতো নিয়ে? সবার কাছেইত এত এত জমে গেছে। সকলের কাছেইত এরা নেয়।

প্রভুদয়ালের সংগে শেষ দেখা হয়েছিল ঝল্লায় নদী পেরুবার সময়। তারপর আর দেখিনি। বোধহয় স্নানাহারের জন্যেই ওঁরা ওখানে থেকে গিয়েছিলেন। এখানে কোথায় উঠেছেন জানি না। তবে বিকেলে দেখলাম ওঁকে নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে। একা একাই যাচ্ছিলেন।

পরদিন সকালে পুরানো পথ দিয়ে এলাম বীরাপাল।

নূতন পথও হয়েছে। নূতন পথ সহজ হয়, তবু কি দুঃখে যে যাই পুরানো পথ দিয়ে। তারাদত্ত বলে ঘুর কম হবে।

তা হয়ত হয়। তবে আমাদের নয়। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ঘুর যা কম হয় তা পুষিয়ে যায়। একজন গাড়োয়ালীকে দেখলাম, কোটপ্যাণ্ট পরা, কেমন তরতর করে উঠে গেলেন ওপরে।

প্রভুদয়ালরা নূতন পথ দিয়েই এসেছিলেন বীণাখাল। ওখানেই ওঁদের সংগে দেখা হল। তারপর তাঁরা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁদের আবার ধরে নিলাম কালাদি চটিতে গিয়ে। কালাদি হতে ভৈঁরো সবটাই প্রায় চড়াই। সেই চড়াই একসংগেই উঠলাম আমরা। তারপর যখন পাহাড়ের মাথায় উঠে আসি তখন দেখি বিরাট ফাঁকা। কাছাকাছি কোথাও গাছপালা নেই। কেবল মাঠ আর মাঠ। পাহাড়ের একেবারে চূড়োয় ভৈঁরো বা ভৈরবের মন্দির। সেই মন্দিরের খানিকটা নীচে দোকান ও চটি।

ভৈঁরো চটিতেও দেখছি বেশ জলের অভাব। বীণাখালেও ছিল বোধহয়। ছিলোই বলছি। কারণ সেখানে পাইপে করে জল আনা হয়েছে, বসানো হয়েছে জলের কল। কিন্তু এখানে সুতার মতো ঝরণার ক্ষীণধারা। সেই জল ধরা হচ্ছে একটা ট্যাঙ্কে। সেই ট্যাঙ্কের জল বালতিতে তুলে নিয়ে মানুষ স্নান করে, কাপড় কাচে, আর ঝরণার জল একটু ওপর হতে ধরে নিয়ে রান্নাবান্না।

প্রভুদয়ালরা উঠেছেন ভিন্ন চটিতে। কিন্তু জল নিতে যাবার ঐটি পথ। জল নিতে এসে প্রভুদয়াল জিজ্ঞাসা করেন, যাচ্ছেনত ওবেলা?

বলি নিশ্চয়ই।

তিনটা বাজতে না বাজতে আবার বেরোই। কাজের মধ্যে ত এখানে ওই এক কাজ। চটিতে গিয়ে সমস্ত কিছু খোল, আবার তাদের কুড়িয়ে-বাড়িয়ে থলিতে ভর্তি করো। তারপর আবার খোল। বারবার খুলতে মেলতে আর কুলীর পিঠে রগড়াতে রগড়াতে সেসবে আর কিছু দম নেই। মোমবাতি ছিল, সাবান, সে সমস্ত ভেঙেছে, তাল পাকিয়েছে। পাঁপড় চুরচুর। যে দু-একটা বাসন ছিল, তাদের কানা দুমড়েছে। কোনটা বেভাঙতে বসেছে। কিন্তু কাকে কি বলব।

ওবেলা কোপারে এসেই থাকবার কথা ছিল।

কিন্তু ভোঁট হয়ে যখন কোপারে এলাম তখন দেখি খুব তাড়াতাড়িই চলে এলাম যেন আমরা। তাই কোপারে আর থাকি না। প্রভুদয়ালরা আসতে আবার এগিয়ে যাই। কপ্‌পুরের জন্য ভাবনা নেই। ও আমাদের এখানে না দেখলে এগিয়ে যাবে, তবু দোকানীকে বলেও যাই আমাদের কুলী এলে তাকে এগিয়ে যেতে বলতে।

কোপার পর্বত চীড়বনের মধ্যে দিয়ে এসেছিলাম। পথ বেশ ভালো। কিন্তু পরের পথটা দেখলাম আরো ভালো। আরো ভাল লাগছে বোধহয় এইজন্যে যে এখানে চারদিক যেমন খোলা আর পাহাড়ের মাথায় মাথায় সমতল পথ। আশে পাশে দু-একটি বাড়ী উঠছে। বোধহয় সরকারী ডাকবাংলো। থাকবার মতোই জায়গা।

পুরানো একটা মন্দিরকে ডানদিকে রেখে অনেকখানি এগিয়ে গেছি কিন্তু কোথায় সেই, গঙ্গাচটি যার কথা কোপারে আমরা শুনে এসেছিলাম। জানি না কোপারে আমরা থাকিনি বলে কি দোকানী এভাবে প্রতিশোধ নিলে। কিন্তু গঙ্গাচটি না পাই ত সেই একেবারে ধুত্তু। সন্ধ্যার আলো-আঁধারীতে আমরা পৌঁছুতে পারলেও কপ্‌পুর কি আসতে পারবে এতটা পথ। অবশ্য ধুত্তু যেতে পারলেই ভালো ছিল কারণ সেখান হতেই পাঁওয়ালীর চড়াই। একটানা এগারো মাইল। তাহলে সকাল সকালই বেরুনো যেত—

শুনেছিলাম একমাইলের মধ্যেই গঙ্গাচটি কিন্তু তিন মাইল হেঁটেও যখন তার কোনো সন্ধান পাইনা তখন একটু হতাশ হই বৈকি! তারপর নীচের দিকে বসতি দেখে খবর নিতে নীচে নামি। কিন্তু কিসের উৎসবে সকলেই যেন মত্ত তাই সঠিক খবর পাইনা। অগত্যা সামনের দিকেই এগুতে থাকি।

শেষে চার মাইলের মাথায় পাওয়া গেল সেই গঙ্গা চটি। একটিমাত্র দোকান। দোকানের পাশে জলের ঝরণা। ঝরণার ওপারে আর একটা চালাঘর।

জায়গা এমনিতেই সংকীর্ণ। তারপর কিছু কিছু লোকজন আগে হতেই এসে আছে। তাই থাকবার

[illegible] আমরা সেই। কিন্তু দোকানের লালাজী আমাদের দিলেন। বললেন, এরি মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।

দিলেনও। ওঁর দোকান হতে জন দুই তিন বাবাজীদের তুলে পাঠিয়ে দিলেন চালাঘরে। তারপর বাকী যাঁরা রইলেন, তাঁদের ঠেলে দিলেন ভেতরের বেয়ালের দিকে। তারপর যেখানে তাঁর চুল্লী জ্বলছিল ঠিক তার পাশে জায়গা করে দিলেন আমাদের। প্রভুদয়ালের স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন বলেই এই ব্যবস্থা হ'ল। নইলে বোধহয় কোনো কিছুই হ'ত না।

লালাজী মিলিটারী কেরৎ। গায়ে মিলিটারী কোর্ত্তা। মেজাজও তাই। তাই তাঁর ব্যবস্থায় কেউই উচ্চবাচ্য করল না।

কিন্তু রাত্রির ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখি লালাজীর কাছে ঘী নেই। নেই ত নেই। কিন্তু কথাটা প্রভুদয়ালের স্ত্রীর কানে যেতেই তিনি ঘীয়ের বাটি এগিয়ে দিলেন। নেব না বলাতেও শুনলেন না। তারপর যখন খেতে বসেছি তখন পুদিনার চাটনি।

ভাটোয়ারীর পথে কোথায় পুদিনা দেখলেন প্রভুদয়াল। তুলি সেখান হ'তে তুলে নিয়ে এসেছেন। আর ক্যাদু হতে ঘী। বেশ সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। বললেন ওখানে ঘোড়াও পাওয়া যায় অপরিমিত। মনে মনে ভাবি সংসারী কিনা তাই। আমরা ত ওসব কিছু আনিনি।

লালাজী দোকানের লাগোয়া ঘরেই স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস করেন। রাত নটায় উনুন নিবিয়ে তিনি ঘরে ঢুকে খিল দিলেন। আর আমরা ক'টি প্রাণী সেই একদিক খোলা দোকান ঘরে রাত্রের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। এখানের ঝরণার জলের তোড় আছে। তাই তার কল কল শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

আজ পাঁওয়ালীর চড়াই। তাই সকাল সকাল উঠেই পথে বেরোই।

সেই শীতশীত সকালে প্রভুদয়ালরা সেখানে সেই ঝরণার জলেই স্নান করে নিলেন। ভালোই করলেন। কারণ তারপর আমরা আর কোথাও জল পাইনি। [illegible]

পাণ্ডোয়ালী ছেলেমেয়েরা

বিশ্রামের অবসর। তারপর যখন পাঁওয়ালী গিয়ে পৌঁছুই তখন বেলা তিনটে। এবং পৌঁছুবার পর পরই মুষলধারে বৃষ্টি। তাই সেদিন আর স্নানই হল না।

ধুন্ত পর্যন্ত পথ বেশ ভালো। তাই স্বচ্ছন্দেই এলাম। তারপর নদী পেরিয়ে ধুন্তুর বাজারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম যে পাহাড়ের গা দিয়ে আমাদের উঠতে হবে। বেশ ছোট খাট সহর এই ধুন্তু। অনেকটা বুদ্ধ কেদারের মতো। হাসপাতাল ইত্যাদিও রয়েছে।

আজ ঘন ঘন বদরী বিশালের নাম নিচ্ছে তারাদত্ত আর গরুড় ভগবানের। ব্রহ্ম বলে, কই কাল গরুড় ভগবানের প্রসাদ করনি ত। সত্যি তো কি অন্ত মনে থাকে। তাছাড়া লালাজীর কাছে কি আবার পাওয়া যেত প্রসাদী এলাচ দানা!

কিন্তু উঠতে গিয়েই দেখি প্রভুদয়ালরা এগিয়ে গেলেন যেন। মনে মনে ভাবি, আজো কি ওঁরা এগিয়ে থাকবেন। পায়ের গতিটা তাই দ্রুত করি। শেষে দেখি একটা বাঁকের মুখে ওঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দাঁড়াতেই হবে। না দাঁড়িয়ে ত উপায় নেই। এই চড়াই পথে দম রাখা খুব সহজ নয়। বুক ফেটে যেতে চায় আর পা দুটো ক্লান্তিতে আপনিই ভেঙে পড়ে।

একটানা একটা পাহাড় উঠে এলাম। পথ ঘুরে গেল আর একটা পাহাড়ের গা দিয়ে। মাঝে একটা কাঠের পুল। ওরি পাশে ছোট একটা চটি। সোকজন সব ওরে বসে। ঐটুকু উঠে আসতেই [illegible]

হতে দেখতে পাচ্ছি ধুস্তুর অধিত্যকা। কিন্তু এই মাত্র যে ধুস্তুকে পেছনে ফেলে এলাম, এই কি সেই ধুস্তু? ঘরবাড়ীত দেখছিনে। দেখছি যেন রেল ইয়ার্ডে পড়ে থাকা ক'টা কাঠের প্যাকিং বাক্স।"

এ পাঁওয়ালীর চড়াই। তবে পাঁওয়ালির চটির আগে যে চড়াই পড়ে ঠিক সে ধরণের নয়। পাঁওয়ালীর সেই বিকট চড়াই দেখলাম দোকান্দা পেরিয়ে, যেখানে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় আমাদের উঠতে হয়েছিল। মনে হয়েছিল ওখানে উঠলে আকাশটাকে যেন হাতে ছুঁতে পারব। তবে হামাগুড়ি দিয়ে আর আমাদের উঠতে হয়নি। নূতন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পথ কাটা হয়েছে। পথ দীর্ঘ হয়েছে তবে খানিকটা সহজও। আগের পথটাও দেখলাম। কী ভয়ঙ্কর খাড়া! হাত ও পায়ের ব্যবহার করা ছাড়া ওপথে সত্যি ওঠা দুষ্কর।

পথ ঘুরে ঘুরে উঠছে ওপরে। ক্রমশঃই ওপরে। আরো ওপরে। দম আর রাখতে পারছিনে। নিঃশ্বাসের কথা আগেই বলেছি। মুখ দিয়েও বাতাস টানছি—পা দুটো মাতালের মতো টলছে, হাতেও কি আবার লাঠি আছে ঠিক মতো।

জল খাচ্ছি অনবরত। কিন্তু খেলে কি হবে জিব শুকিয়ে উঠছে, ঠোঁটও।

তারপর একসংগেই এলাম আমরা গৌমওয়ায়।

এবেলা গৌমওয়ায় এসে থাকব এইরকম কথা ছিল। তারপর এখানেই খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে যাব পাঁওয়ালীর দিকে। কিন্তু ভয় খাইয়ে দেয় দোকানী। বলে পাঁওয়ালীর আজ অনেক লোক এগিয়ে গেছে—সেবে রাত্রে থাকবার মতো জায়গা পান কিনা সন্দেহ। শুনে প্রভুদয়াল বলে ওঠেন: তাহলে এখানে থাকা ঠিক হবে না। চলুন চলে যাই একেবারে পাঁওয়ালী।

কি আর বলব। কিন্তু পাঁওয়ালী এবেলা যাই বা না যাই এখান থেকে যে আমাদের আরো এগিয়ে থাকা উচিত সেটা বুঝতে পারি। গৌমওয়ায় আসতেই যদি এই তাহলে গৌমওয়া হতে পাঁওয়ালীর দীর্ঘপথ বিকেলের জন্য রাখা উচিত নয় কিছুতেই। তাই দোকান্দা খাওয়া ঠিক করেই লাঠিখানা তুলে নেই। দোকান্দা হতেই পাঁওয়ালীর সেই শক্ত চড়াই।

দোকানীর চাটাইতে বসেই দুধ খেয়েছিলাম। চা খেয়েছি এর আগেও একবার। মাইল, দুই মাইল পরে পরে দুধ ও চা পাচ্ছি তাই হাঁটতে পারছি। তা না হলে বোধহয় হাঁটতেই পারতাম না। কখনো কখনো খাচ্ছি আবার দুধ ও চা মিশিয়ে।

যেতে যেতে দেখছি পাহাড়তলায় কে যেন কাঁদতে বসেছে। এক অন্ধবুড়ো মেয়ে বলছে কেন যে এপথে মরতে এলাম। কে একজনত শুয়েই গেছে পথের ওপর মড়ার মতো। কিন্তু ওসব কিছু দেখি না। দেখবার কিছু নেই—সকলেরি একদশা।

চটিটার নাম প্যাউ চটি।

প্রভুদয়ালের স্ত্রী এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, আর না। তাই আমাদেরও থামতে হল।

জলের এখানে শুধু অভাবই নয়, একেবারে দুর্ভিক্ষ। উঁচুতে বলেই কিনা জানি না, জলের ঝরণা দেখছি না এখানে একটাও। শুনি জল আনতে হয় মাইল চারেক নীচে হতে।

এসে এসেই সেই জল মুখে দিয়েছি। না দিয়েও উপায় ছিল না। ওয়াটার বটল খালি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু মুখে দিতেই মনে হল কি বিস্বাদ সেই জল! বোধহয় বর্ষার জল। পাতা পচে কটু গন্ধ হয়েছে। মনে মনে ভাবি, সাধেই কি আর প্যাউচটি। পাশেই প্যাউর ঘর। কালী কমলীওয়ালার পক্ষ হতেই জলের ব্যবস্থা। তবে একগ্লাস করে জনপ্রতি, তার বেশী নয়। সেখান হতেও নিলাম একগ্লাস জল। ঠিক তেমনি বিস্বাদ। শুধু পটাস ফেলে তাকে রক্তের মতো লাল করে রেখেছে।

হায়রে! আটার চাইতে দুর্মূল্য এখানে জল! তাইত দেখি একজন সন্ন্যাসীকে আটা পেয়ে যেতে কিন্তু কে দেবে তাকে জল? কিন্তু জল নইলে সেই আটা সে মাখে কি করে? দোকানী তাকে জল দেবে না কারণ আটা ও সে তার কাছে কেনে নি। আর প্যাউ? সেও দেবে না কারণ একগ্লাস জল সে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে এখানে এসে এসেই।

এখানেই এবেলার খাওয়া হল। খাওয়ালেন আমাদের

আমি ও তারাদত্ত। আগে গিয়ে জায়গার ব্যবস্থা দেখতে হবে। ওঁরা সকলে বিশ্রাম নিয়ে তবে আসবেন।

চড়াইয়ের পর চড়াই—শুধুই চড়াই। রোদ উঠেছে। বেলা মধ্যাহ্ন। কিন্তু রোদের জন্য তত কষ্ট হচ্ছে না—বোধহয় অনেক উঁচুতে বলেই। কষ্ট চড়াই পথে ওঠার। তবে এদিকের পথটা বনময়। ঘুরে ঘুরে তাই উঠতে থাকি। তারপর যখন দোকান্দায় আসি তখন দেখি ফুলের সমারোহ। বেলাকের পর এত ফুল আর দেখিনি। কি ফুল জানিনে তবে খুব ছোট নয় আর সমস্তই বসন্তের রঙের। মনে হয় যেন কোন দেবাঙ্গনার পীত উত্তরীয়প্রান্ত এখানে লুকিয়ে পড়েছে আলগোছে।

কিন্তু ওকি আর এমন! আশ্চর্য হবার তখনো অনেক বাকী। দোকান্দা পেরিয়ে এলে যেমন আকাশ ও পাহাড়ের ছোঁয়াছুঁই দেখি তাতে ভাষা হারিয়ে ফেলি।

পথের দুপাশে এবার চোখে পড়ে নানারঙের ফুল—নীল, লাল, বেগুনি—এক এক রঙেরই আবার কতরকম 'সেডস্'। জানিনে এত ফুল এখানে কেন ফোটে। ফোটে আর ঝরে যায়। কে দেখে এই ফুল! যারা এই পথ দিয়ে যায় তারাই কি হাই সবাই দেখে? মন্দিরের দেবতা তাদের আকর্ষণ করে, পথের সৌন্দর্য তাদের মন ভোলায় না।

হাত দিয়ে স্পর্শ না করে পারি না কিন্তু তুলে নিতে কেমন মায়া হয়। আশ্চর্য কোমল সুন্দর!

সামনেই এক আকাশচুম্বী পাহাড়—বিন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে নীলাম্বরের সুদূর বিস্তারকে। ভয়াবহ না হলেও মনে সম্ভ্রম জাগায়। মনে মনে ভাবি ওই পাহাড়ে যদি উঠতে পারতাম।

শুনে তারাদত্ত বলে, পারবে। ওরি ওপারে পাঁওয়ালী। ওই পাহাড়ের শিখরেই আমাদের উঠতে হবে।

না আর ক্লান্তি শ্রান্তি নেই। এক মুহূর্তেই যেন সেসব ঝরে খসে গেল। তখন মনে হল এপথে না এলে কি যে হারাতাম, তা বোধহয় কোনোদিনই জানতে পারতাম না।

পথের একটা বাঁক ঘুরতেই এসে পড়ি এক তৃণ-

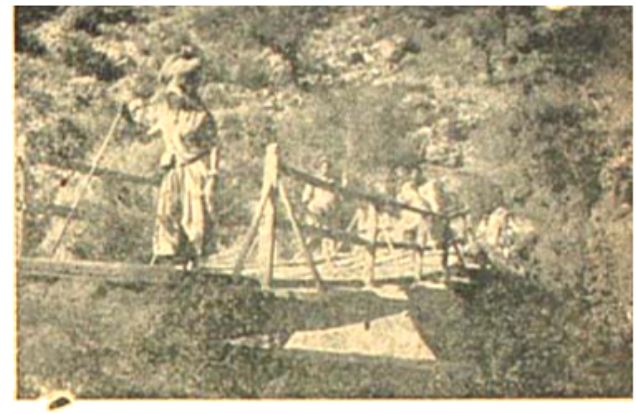

হেঁটের পুল

প্রান্তরে—ঢালু এবং খাঁজ খাঁজ—যতদূর চোখ যায়। বড় গাছ আর নেই এখানে সেসব নীচে রয়ে গেছে, অনেক নীচে। এত ওপরে বড় গাছ বোধহয় হয় না। আর সেই পর্বতশৃঙ্গ তাকে তখনো দেখছি তেমনি সমান উঁচু, আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমুন্নত। শুধু আমরা এসে গেছি আর এক দিক দিয়ে। ওই শৃঙ্গে আমাদের উঠতে হবে।

বছরের বেশীর ভাগ সময়ই এ সমস্ত থাকে বরফে আচ্ছন্ন। তাই গাছপালা আর হয় না। যখন বরফ গলে তখন বেরিয়ে আসে তৃণাঙ্কুর। আর সেই তৃণাঙ্কুরের লোভে লোভে তখন আসে বকরীওয়ালারা ছাগল নিয়ে চরাতে। শুনি এমন জায়গা নেই, যেখানে এদের গতিবিধি নেই। ছাগলের পেছনে পেছনে এরা সব চলে যায় হিমালয়ের দুরধিগম্য অঞ্চলগুলিতেও, উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর চূড়ায় চূড়ায়। ওদের কখনো পদস্খলন হয় না।

সেই শৃঙ্গটিতে এবার উঠতে আরম্ভ করেছি। উঠছি—উঁচুতে আরো উঁচুতে, আরো অনেক উঁচুতে। তারপর একসময় চূড়ায় উঠে আসি।

একটুখানি সমতল জায়গা। ওধারটা নীচু। মনে হল, মরদেহ নিয়ে যে স্বর্গে একদিন গিয়েছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির আমি যেন সেই স্বর্গ রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে অবারিত হয়ে গেল এক অনির্বাণ শুভ্রতা—পুঞ্জ পুঞ্জ তুষাররাশি সূর্যকরোজ্জ্বল—আদিগন্তবিস্তৃত। সেই তুষার ছোঁয়া একখণ্ড মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখলাম ছড়িয়ে পড়েছে

এক অনির্বচনীয় দ্যুতি—সেই দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে শূন্যলোক।

তারাদত্ত দেখিয়ে দিতে লাগল কোনদিকে কেদার কোনদিকে বদরী, কোন দিকে যমুনোত্তরী, কোন দিকে গঙ্গোত্তরী। আর ওই যে সামনে পাহাড় দেখছ ওরি ঠিক নীচে ত্রিযুগী।

কিন্তু কিছু দেখলাম কিনা জানিনা। কারণ সেই পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্রতায় সমস্ত কিছুকেই আমার এক মনে হল। মনে হল, কালিদাস যে হিমালয়কে পৃথিবীর মানদণ্ড বলেছিলেন তাতে একবর্ণ ভুল নেই। এই সেই পৃথিবীর মানদণ্ড—দেবতাত্মা হিমালয়। সেই দেবতাত্মা হিমালয়কে সেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রণাম না জানিয়ে পারি নি।

পাঁওয়ালীর চটি কিন্তু অনেকখানি নীচে নেমে। শুনে নিরাশ হই। কারণ সেখান হতে এ সবের কিছুই দেখা যাবে না।

আর একবার দেখেছিলাম এই শুভ্রতা তুঙ্গনাথের শিখরে উঠে। তবে সেখান হতে দেখা সেই তুষারশ্রেণী এত নিকটে নয়। এত উজ্জ্বল নয়। তবু দেখে কেমন যেন মনে হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেব নিশ্চলক যেন ধ্যান-মগ্ন, আর যেখানে পৃথিবীর শ্যামশ্রীমূর্চ্ছিত সেখানে যেন দেখলাম পত্রাভরণা নগাধিরাজ দুহিতা পার্বতীকে ঈশানের পদাবলুণ্ঠিতা। কিন্তু সে দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখতে পারিনি। এক নীল কুয়াশা তখন তখনি উঠে এলো নীচে হতে। তারপর সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিল।

ধর্মশালায় আর ঘর খালি নেই। বারান্দাতেই খানিকটা যায়গা আছে সেখানেই থাকতে হবে।

তবু ভালো যে বারান্দা পওয়া গেল। বারান্দা হলেও একেবারে খোলা নয়। কাঠের জানালা আছে। বন্ধ করা যায়। রাত্রে তাই শীতার্ত বাতাসে আমাদের আর হি হি করে কাঁপতে হবে না।

ব্রহ্ম ও প্রভুদয়ালরা এলেন আমাদের আসবার আরো ঘণ্টাখানেক পরে।

আলো ঘর | নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমার ও আলোঘরে তাহলে জ্বালিয়ে রেখো
একটি আলোর উৎস—এই ঢেউয়ে—উন্মাদ সমুদ্রের পর।
এ আকাশে আর এক আলোর আকাশ
বহমান করে রেখো, তা না হলে এখানে যে বৃষ্টি ব্যথা ঝড়।
উদ্দাম ঢেউয়ের রোলে—হাল ভেঙে পাল ছিঁড়ে
এখানে আসবে যারা
তাদের আতিথ্য দিও—ক্লান্ত চোখে এক মুঠো স্বপ্নের বিভাস
ছড়িয়ে জড়িয়ে দিও। আদিগন্তঅন্ধকারে—
দিগভ্রষ্ট যারা—আহা অস্তমিত সমস্ত বিশ্বাস,
নোঙর হারিয়ে গেছে—মৌন মুখে দাঁড়ালে এখানে
ডেকে নিও প্রশ্নহীন প্রণত সম্মানে।

এ সমুদ্রে নোনা ঢেউ দিনরাত উথাল-পাথাল। অন্ধকার
আলোছায়া—মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের চেহারা
রিমঝিম আদিগন্ত ; হৃদয়ের গোল ঘরে তবে
একটি অতন্দ্র আলো-জেলে রেখো—চারিদিকে ভয়ের প্রচার
স্তব্ধ করে। কে কখন দিগভ্রষ্ট হয়! একটিই উজ্জ্বল পাহারা
আমাদের আছে এই আদিগন্ত জলের উৎসবে।
দিনেও ভীষণ ভয়—কখন আকাশ ঢেকে যাবে
কঠিন নির্মম মেঘে,—বৃষ্টি নামবে,—রৌদ্র মুছে যাবে,
ঝড় উঠবে—ভীষ্ম ঝড়। তখনো তোমার আলোঘর
হয়তো দেখাবে পথ— দেখাতেও পারে।

তুমি তো জানো না কে যে খুঁজে পাবে অন্তিম আশ্রয়
তোমার আলোর তীর্থে। কয়েকটি নির্জন প্রহর,
একটি রাতের মত, অথবা দূরস্থ দিনে তোমার ও শান্তির উৎসারে
থেকে গিয়ে হয়তো বা পাড়ি দেবে—ভুলে গিয়ে পরিচিত ভয়
নতুন উজ্জ্বল ভোরে—সোনা ঢালা দিগন্তের দিকে
স্বপ্নে উধাও এক স্মিত ঢেউ—নম্রচল—আকাশের নীচে।

কয়েক মুহূর্ত শুধু। তারপর পাল তোলা মগ্ন তরীটিকে
ফেনার পাখির মত দেখা যাবে চলে গেল! শুধু আসে পিছে
অতল মগ্ন নীল—আমাদের আদিগন্ত ঢেউয়ের ভূগোলে
অতএব কেউ যদি অন্ধকারে পথ খোঁজে,—আলোর আঁচলে
তুমি তাকে ডেকে নিও।
তোমার আলোর স্বাদে অন্ধকার সমুদ্রের পাড়
যদি সে খুঁজেই পায়—খুঁজে পাক জীবনের আর কোনো মানে।
একদিন তো সকলেই চলে যাবে অতীন্দ্রিয় নক্ষত্রের গানে॥

মৃগনাভী ঃ ফুল নয় | শ্যামল সেনগুপ্ত

আমি যদি খুঁজে পাই
মৃগনাভী-ফুল নয়—
মৃত্তিকার এতটুকু বাস।
যে মাটি অহল্যা নয়,
আষাঢ়ের ঋতুমতী দেহ
যার বুকে নবশ্যামে অঘ্রানের প্রাণ কেঁপে সারা
যে মাটিকে ভালবেসে
পৃথিবীর ভালবাসা পাই।

সে মাটি আমায় যদি দেয়,—
সোনা নয়, রূপো নয়,
তৃণের লাবণ্য আর শ্রাবণের স্নেহ,
আমি তবে খুশী হই ;
আমি তবে খুঁজে পাই,
মৃগনাভী ফুল নয়—
মৃত্তিকার বাস।

যে-কোনো জননীর জন্মলগ্নে | অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

কি বিচিত্র বাঁচায়েছ তব বৃক্ষটিরে
অঙ্গে যায় সমীরণ কুহকী মালিনী,
নবীনা রজনী তার চন্দ্রকলা ধীরে
উন্মোল শরীরে আনে চিত্রল দামিনী।
বেগে ধায় নিকুঞ্জের প্রিয় পত্রবালা
প্রবাহিনী অভিসারে। কম্পিত একাকী
সে শুধু জাগিয়া রহে স্খলিত ছবালা ;
বকুল বনানী তলে উড়িছে জোনাকি।
অভিভূত রাত্রি যায়, যায় বিভাবরী
প্রভাতে যমুনাকূলে বাঁধিবে কবরী।
হেমন্ত মন্থর যবে বাড়িবে চরণে
প্রান্তরে চলিবে প্রেম ফুটিবারে একা,
সন্ধ্যাকালে তারা গণি গাগরী ভরণে
রহিবে সে, যৌবনের জন্মিবার রেখা।

শতাব্দীর সমবয়সী কবি

সৌম্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"কান পেতে শুনি
যেখানে দিগন্তরে
পুরাতন বাঁধ ভাঙে
বিস্রোত বানে ;
দেখি ঝঞ্ঝার
আয়োজন অম্বরে ;
আমিও আহুত বুঝি যুদ্ধিস্থানে।
অনুমতি দাও আরো কিছুকাল থাকি
বিশাল বিশ্বে বিস্ফারি দুই আঁখি ;
ডেকো না, মরণ, এখনই সন্নিধানে।"

(—সুধীন্দ্রনাথ)

তবু 'অসময়ে আহ্বান' এলো। এবং দুঃখের কথা, শতাব্দী তার এই সমবয়সী কবিবন্ধুটিকে চল্লিশ বছর পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এত গেল শুধু ঘটনার একদিক। কে জানে, অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে হয়ত সুধীন দত্তই দৌড়ের পাল্লায় জয়ী হলেন। শতাব্দীকে হয়ত তিনিই পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছেন। এবং তা যে কত যুগ, সে হিসেব আজই ঠিক আমরা কষে উঠতে পারব না। পারবে হয়ত শতাব্দী শেষের সহৃদয় পাঠকসমাজ।

অথচ স্বভাববিনয়ী কবি কোনোদিনই তাঁর কাব্যকে এদিক দিয়ে বিচার করে দেখেন নি। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন—

"আমার মৃত্যুর দিনে
কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি
সাধিলাম কি সুকৃতি
তবো যার প্রসাদে অমর ?
মেনে নিও মুক্তকণ্ঠে,
নেই মোর পাপের অবধি
সারা ইতিহাস খুঁজে
মিলিবে না হেন স্বার্থপর।"

একটু আশ্চর্য হতে হয় কবিতাটি পড়ে। এই নির্লজ্জ আত্মরতির যুগে এ ধরণের সবিনয় আত্মস্বীকৃতি শুধু বিরল নয়, অবশ্যই অনুকরণযোগ্য। এ থেকেই বুঝতে কষ্ট হয় না তাঁর আত্মস্থ প্রত্যয়ের গভীরতা। কেন না উপলব্ধির অতলান্তে যিনি রত্নাকর, উপরে তরঙ্গের আস্ফালনে তাঁর অস্তিত্বের বিঘোষণা অর্থহীন। হয়ত অপ্রয়োজনীয়। তাই সুধীন দত্তে ঐ আশ্চর্য বৈষ্ণবীয় বিনয়। এ সত্ত্বেও সমাজের প্রতি নীতিধর্মের প্রতি অপরিসীম অবহেলায় তার কবিতাবলীর মধ্যে শুদ্ধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা উচ্চারিত হয়েছে বারবার। উদ্বেলিত হয়েছে 'আভিজাত্যিক সুমিতি'র সঙ্গেও এক 'বলশালী পৌরুষের সফেন উচ্ছ্বাস।' যা বাঙলার কাব্যচিত্তায় দুর্লভ। কেন না কবিতা এখানে 'কোমলকান্ত পদাবলী'। তার দেহে মনে এখানে মাখানো থাকে মৃদুমন্দগমনা নারীর কমনীয়তা ও লাবণ্য। এর সুরে তাই খোলকরতাল বাজলেও তূরীভেরী বাজে না। অথচ সুধীন্দ্রনাথ এই মিঠে বাংলা কবিতার ছন্দেই এক ধ্রুপদী সুর যোজনা করলেন। দিলেন এক আশ্চর্য উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি-গৌরব। তাই তাঁর কবিতার প্রতিটি কথাকে কেন্দ্র করে এক একটি ভাবের পরিমণ্ডল বহুদূর পর্যন্ত বিকীর্ণ হয়। পরিমূর্ত হয়ে ওঠে একটি নিটোল ও মনোরম অর্থ সংহতি। যা জানের, এমন একটি ব্যাপ্তি, ব্যক্তিত্বের এমন একটি সমগ্রতার দ্বারা মাণ্ডিত ও পরিশীলিত যে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সুধীন্দ্রনাথের মতে কবির প্রতিপাদ্য হল 'নর্ম, কর্ম ও মর্মের একীভাব।' তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'কায়মনোবাক্যের ত্রৈবর্গ্যব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠ কবিতার উৎপাদন অসম্ভব।' কেন না এই শিল্পসৃষ্টি উদ্বুদ্ধ চৈতন্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তার প্রত্যেক অঙ্গ সজীব ও অপরিহার্য, প্রত্যেক অলঙ্কার বহু পরীক্ষার ফল। তাই কাব্যচর্চার অঙ্গে বুদ্ধি-বিদ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা-সংযম এসবের ওপরই বেশী নির্ভর করেছেন তিনি। এবং সংশয়ী ছিলেন 'প্রেরণা-নামক এক অলৌকিক শক্তি'র অস্তিত্বে। বস্তুতঃ সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন 'আত্মপ্রকাশের অনিবার্য তাগিদে' নয়, প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিবৃত্তির সুসঙ্গত চর্চা হিসেবে। তাই তাঁর কাব্যের

অনুচ্চারিত একান্তই স্পর্শসহ, হয়ত বা নিবিড়ভাবেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। এর মধ্যে কবিত্ব যতখানি, কারিগরি তার চেয়ে ঢের বেশী। বুদ্ধদেববাবুর ভাষায়, সুধীন্দ্রনাথ হলেন সেই সজীব ও সক্রিয় কবিগোষ্ঠীর অন্যতম, "যাঁদের ঝোঁক বলশালী উচ্চারণের দিকে, কঠিন উজ্জ্বলতার দিকে, মিতব্যয়ী শব্দপ্রয়োগের দিকে। এঁদের ছন্দেও তাই কানে-কানে-টানা ধনুকের ছিলার মতো টান, কোনোখানে একটু ঢিলে হবার জো নেই। মাথা খাটিয়ে এঁরা কবিতা লেখেন, এবং সেই শ্রম ধরা পড়লে লজ্জিত হন না। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম, তথ্যবহ ও শাস্ত্রজ্ঞানসাপেক্ষ এবং সর্বোপরি নানা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে ও পরিভাষায় আকীর্ণ করতে এঁরা কুণ্ঠিত নন; রচনা বিন্যাসের অসমনস্কতারই কোনো প্রশ্রয় নেই এঁদের কাছে।"

তবু চলিত অর্থেই সুধীন্দ্রনাথ কবি। সৎ ও মহৎ কবি। ঐতিহ্যাশ্রিত মননশীলতার অধিকারী হয়েও তিনি নব নব আবিষ্কৃতির দিশারী। অগ্রজের অটল বিশ্বাসকে আত্মীকরণ করেও তাঁর কাব্যে এ যুগের সংশয় ও যন্ত্রণা নির্বৃতভাবে প্রতিবিম্বিত। রবীন্দ্রবলয়ী কবি হয়েও তাই এলিয়টীয় মেজাজটি ধরে নিতে তাঁর দেরী হয় নি। অথচ আধুনিক কবিরা যে অর্থে দুর্বোধ্য ঠিক সে অর্থে দুর্বোধ্য নন সুধীন্দ্রনাথ। তাঁর মন তাত্ত্বিকের, তাত্ত্বিকের, গন্ধের ন্যায় সম্ভূত ধরণটা তিনি কবিতায় আরোপ করেছেন। একন্ত আপাত-দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য (বা অপ্রচলিত) শব্দার্থ এবং এ্যালুউশনের (ভাবকল্প) খোলস খসিয়ে ফেলতে পারলে তাঁর কবিতা বোঝা খুবই সহজ। দর্শনের যুক্তির মত বা জ্যামিতির প্রস্তাবের মতোই তাঁর কবিতা অনুসরণ করা যায়। সুতরাং পাঠকের দিক থেকেও কিছুটা পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যে দুরূহতার জন্য পাঠকের আলস্যে, তার জন্যে কবির উপর দোষারোপ অন্যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত বাদ দিলেও কলার অন্যান্য বিভাগে প্রবেশাধিকার যে আগ্রহ, অভিনিবেশ ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে, কবি যদি তার বিভাগ থেকে সেই পরিমানের শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায়, তাহলে তার দাবী নিশ্চয়ই সংগত।" কিন্তু এ যুগের পাঠক হয়ত ঠিক অতটা প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে নি। তাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের পরিচয় ও অতীতবিলাস প্রক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়, তাই 'দুর্বোধ্য' বলে অন্যায়ভাবে

ব্যাখ্যাত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছে এতদিন।

সাধারণভাবে যদিও কাব্যে এসবের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে সুন্দরের সীমান নিয়ে। আর হয়ত বা মহাকালই তার একমাত্র বিচারক তবু একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তাঁর ভাষা-নির্মানের কলাকৌশল, তাঁর জমাট ও জমকালো গঠন ভঙ্গী আমাদের এই অতিসিধিল অস্তিত্বের রচনার ক্ষেত্রে সত্যই মূল্যবান। এছাড়াও "কাব্য কেবল তখনই অমর-পদ বাচ্য, যখন তার সন্ধান প্রত্যহ ছাড়িয়ে পৌঁছায় প্রতিদিনে।"—আধুনিক কাব্যে প্রায় দুর্লভ এই উত্তরণ 'ভবিষ্যতের ভারাতুর' কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্য ভাবনার একটি সুস্পষ্ট সুলক্ষণ। তা তাঁর কবিতা সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এ যে তিনি 'সামাজ্যের সোহাগ খরিদ করে চিরন্তনী অভাব মেটাতে' চান নি। চান নি সস্তা ও সহজ জনপ্রিয়তা। বরং অযোগভিত্তির দাপে নেমে পাঠকে পাশে না দাঁড়িয়ে পাঠককেই তিনি নিজে যে লেখকের স্তরে উঠে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তুলে ধরার জন্য।

আর এখানেই সুধীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনন্যতা তাঁর অমরত্বের প্রতিশ্রুতি।

"মহার্ণবের সামসঙ্গীত
হয়তো বা শুনি শঙ্খের মাধ্যমে।"

পাঠকের চোখে বিংশ শতাব্দী

['বিংশ শতাব্দী'র সমালোচনা করে পাঠকেরা বহু চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু সব চিঠি স্থানের অভাবে ছাপা সম্ভব হোল না। কয়েকখানি চিঠির অংশ বিশেষ ছাপা হোল। পরবর্তী সংখ্যায় আরো কয়েকটি চিঠি ছাপা হবে।

সম্পাদক 'বিংশ শতাব্দী']

বাজারে আজকাল পত্রিকার অভাব নেই—কিন্তু তার মধ্যে ক'খানা আদর্শ স্থানীয়? ন্যায্যবিচার বলতে গেলে বাজারে না কাটলেও অধিকাংশই কাটছে পোকায়। তাই 'বিংশ শতাব্দী' এই পোকায় কাটা পত্রিকায় না পরিণত হয়—এই আশায় স্বীয় মতামত পাঠালুম। জানিনা এতে কিছু আপনাদের উপকার করতে পারব কিনা। কিন্তু সবার আগে বলব আপনাদের পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করতে।

গত বছর শারদীয়া সংখ্যা রচনা নির্বাচনে আপনারাও অযোগ্যতা, পক্ষপাতিত্ব ও কুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় আপনারা লেখকটিকে হাত ছাড়া করার ভয়েই লেখাটা ছাপিয়েছেন।

বই যাতে ভাল বিক্রি হয়—তার জন্য চাই সুন্দর রুচিপূর্ণ মলাট, ঝরঝরে ছাপান, কতগুলো সুন্দর সুদৃশ্য চিত্র। শুধু ভাল লেখা হলেই ত চলে না? তাই চাই আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিষ। অথচ গত শারদীয়া সংখ্যার মলাট অন্য যে কোন সংখ্যার মলাটের চেয়েও তুচ্ছ-হেয়। রুচির পরিচয় একদম পাইনি। একটা মাত্র ছবি—তাও অস্পষ্ট ভাল নয়।

রবীন্দ্র-সংখ্যাটি খুব ভাল সংখ্যা। এ সংখ্যা ছাত্র শিক্ষক ও অন্যান্য যে কোন ব্যক্তির অপকার না করে বরং উপকার করবে। এ রকম একটা সংখ্যার প্রয়োজন ছিল। নাটা সংখ্যার নাটক বিষয়ক প্রবন্ধগুলি শিক্ষনীয় কিন্তু নাটকগুলিকে খুব একটা উচ্চ শ্রেণীর নাটক বলা চলে না।

কবিতাগুলো এক জায়গায় জড়ো না করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিন। গল্প কবিতার সংখ্যা যদি পারেন কমিয়ে নানা প্রকার ছন্দের কবিতা দিন। বিংশ-শতাব্দীর ১ম খণ্ডের বর্ণসূচি বা বর্ণক্রমিক লেখক সূচী অগ্রহায়ণ মাসে এবং ২য় খণ্ডের সূচী জ্যৈষ্ঠ মাসেই দেবেন। এতে সাধারণের খুব সুবিধাই হবে। সূচীপত্রের বেলায় আপনাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি-মত্তারযে পরিচয় দিচ্ছেন তার তারিফ না করে পাচ্ছি না।

ভবদীয়—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তি (১৭৮)
৯৩।৩১০বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

'বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ সাহিত্যে জগতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। চারি বৎসর পূর্বে যখন 'বিংশ-শতাব্দী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে আট আনা দামের এই সাহিত্যে পত্রিকাটির পরমায়ু সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু আজ সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করিয়া পঞ্চম বর্ষে যে নবতম ঘোষণা আপনারা করিয়াছেন সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই—ইতি

শ্রীসুনীলকুমার দে
৫এ, শৈলেন্দ্র হালদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-২৬।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষের তুলনায় উৎকর্ষতায় পর-বর্তী সংখ্যাগুলি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারে নি। এর কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে কাগজের দুর্মূল্য। কিন্তু লেখায় কিছু উন্নত ধরণের না থাকার কারণ ত বোঝা গেল না।

এই চার বছর শারদীয় সংখ্যার মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যা বাদে আরগুলি মোটেই আকর্ষণীয় হয়নি। পত্রিকার মূল্য ও পৃষ্ঠা বৃদ্ধির এই নতুন পরিকল্পনা ঠিক ভালভাবে নিতে পারি নি।

ভবদীয়—
শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য
২০।৫ শীল লেন
কলিকাতা-১৫

'বিংশ শতাব্দী' আমাদের এই অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। আমার বন্ধু বান্ধব ও অনেক শিক্ষক মহাশয় আমার নিকট হইতে বিংশ শতাব্দী লইয়া নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন। দুঃখের সঙ্গে জানাই যে আমি নিজেই এই পত্রিকা পড়িতে পাই অনেক দেরীতে। আমাদের এখানে অনেক দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আসে। কিন্তু 'বিংশ শতাব্দী'ই স্থানীয় সকলের মনে একটা দাগ কাটিয়াছে। 'বিংশ শতাব্দী'কে আবার আপনারা নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আমরা খুবই আনন্দ পাইলাম। আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক হউক, ইহাই আমাদের আনন্দ।

পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যার অনুপাতে আপনারা যে মূল্য ধার্য করিয়াছেন আশা করি প্রত্যেক পাঠকই ইহাতে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন—কেননা এত কম দামে এমন পত্রিকা পাওয়া দুর্লভ।

সেখ আখতার হোসেন
এনায়েতপুর, মালদহ
সভ্য নং—৩০৩

বিংশ শতাব্দীতে যে সকল গল্প প্রকাশিত হয় তাদের অধিকাংশেরই কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। গদ্য কবিতার ক্ষেত্রেও তাই বলা যায়। দয়া করিয়া 'গদ্য কবিতা' বিভাগটি অবিলম্বে তুলিয়া দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ আমার ধারণা এই পত্রিকাতে নতুন লেখকদের মোটেই সুবিধা দেওয়া হয় না। কাজেই একটা নতুনদের বিভাগ খোলা উচিত।

মনতোষ সরকার
২২।২, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৫

বিংশ শতাব্দী উচ্চস্তরের পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম। নাট্যসংখ্যার মধ্যে দু-একটি দুর্বোধ্য হয়েছে। বাঁধাই ও কাগজ ভাল হওয়া প্রয়োজন তাই মূল্যবৃদ্ধি ৩২ নয়া পয়সা করা চলতে পারে। বিনীত—

শংকরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভিলাই ষ্টীল প্ল্যান্ট
কোয়ার্টার নং ২৬।৩বি, সেক্টার-৪
জেলা—দুর্গ, মধ্যপ্রদেশ।

ইদানীং রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য-সংখ্যা বার করার একটা হিড়িক পড়ে গেছে কিন্তু সত্যিকার সাহিত্য সংখ্যা হয় কটি। কিছু সংখ্যক পত্রিকা এই সময়ে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে সরল পাঠককে ভ্রান্ত করেন নানা রকম চটকদার কথায়—বলেন যে তাদের পত্রিকা হবে এক কথায় অপূর্ব। হায়, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে তাদের সংখ্যাগুলি হয়েছে বিজ্ঞাপন সংখ্যা, সাহিত্য সংখ্যা নয়।

কিন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে বৈশাখের বিংশ-শতাব্দী প্রকৃতই সাহিত্য সংখ্যা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তার অপরূপ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন বাংলার লেখকেরা। প্রতিটী রচনাই সুনির্বাচিত হয়েছে, সুলিখিত ও পাঠ্য

রবীন্দ্র মিত্র, —দিল্লী

গত একবছর ধরে আমি বিংশ শতাব্দীর নিয়মিত পাঠক। একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এটি একটি উৎকৃষ্ট মাসিক। এত অল্পদামে এত সুন্দর মাসিক পত্রিকা আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ। প্রতি বছর একটি করে সাহিত্যসংখ্যা এবং একটি করে নাট্যসংখ্যা প্রকাশ করা উচিত।

শ্রীবিজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (৮৪৩)
৩৪, নেতাজী সুভাষ এভিনিউ
শ্রীরামপুর, হুগলী।

'নাট্যসংখ্যা' প্রকাশকে আমরা অভিনন্দিত করছি। কারণ অনেকদিন পর নাটক পড়ার সুযোগ পেলাম। পত্রিকার কাগজ একটু ভাল দেবার চেষ্টা করবেন। কারণ বৎসরান্তে একত্রে বাঁধিয়ে থাকি। অংগসজ্জা আরও উন্নত করুন। 'জীবনী' অধ্যায়ে যেন মামুলী ধরণের জীবনী প্রকাশিত না হয়। অজানা ব্যক্তিকে জানবার সুযোগ যেন পাই। প্রাচীন লেখকদের লেখা ছাড়াও নবীনদের লেখা প্রত্যেক সংখ্যায় আশা করি। কিন্তু নতুনদের লেখা ছাপাতে গিয়ে পত্রিকাকে শিক্ষানবীশী করে তুলবেন না।

নির্মলেন্দু রায়
২৫।১, মিল রোড, ব্লক-৪
চাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১

ধারাবাহিক উপন্যাস তিনটি, অনুবাদ উপন্যাস একটি, গল্প তিনটি, বিজ্ঞান, সিনেমা ও রঙ্গজগৎ, দেশেবিদেশে, খেলাধূলা, ভ্রমণ কাহিনী, বিচিত্রা, আজব দুনিয়া এইগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। হাতে আঁকা ছবিগুলি আরো ভাল হওয়া দরকার। পত্রিকার মূল্য ও পৃষ্ঠাবৃদ্ধির এই নূতন পরিকল্পনা আমি পছন্দ করি, যদি উপরোক্ত বিষয়গুলি যোগ হয়।

তরুণকুমার দাশগুপ্ত
১০।৪, সেন্ট্রাল পার্ক,
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

গত বছরের শারদীয়া সংখ্যার আকার ও ঘনত্ব দেখে ভালই মনে হয়েছিল কিন্তু ভিতরের গল্প ও উপন্যাসগুলো যতখানি উচ্চস্তরের হবে বলে মনে হয়েছিল ঠিক ততখানি হয়নি। রবীন্দ্রসংখ্যা ও নাট্যসংখ্যা বেশ ভালো লেগেছে।

শ্রীরামচন্দ্র দাস
গ্রাহক সংখ্যা-৮৮৩ বালুরঘাট।

পত্রিকার বিষয় নির্বাচনে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই—কৃতবিদ্য ব্যক্তির মতই তাহা হইতেছে। গত শারদীয়া সংখ্যা খুবই ভাল হইয়াছে। শুচিতায় ও বিষয়-নির্বাচনে প্রথম শ্রেণীর! বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে সাহিত্য শব্দের ভিতর যে সহিত (স-হিত) থাকা আছে গল্পাদিতে যাহাতে আবর্জনা না থাকিয়া যথার্থ দেশ ও সমাজহিতকর ব্যবস্থার উপদেশ নিহিত থাকে তাহাই একান্ত কাম্য। —ইতি।

কে, বি, রায়চৌধুরী
বড়িশা, কলিকাতা-৮।

রবীন্দ্রসংখ্যা ভাল হয়েছে, তবে প্রচুর ছাপা ভুল, নাট্যসংখ্যা ভালই। প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রসার হোক। পত্রিকার মূল্য ও পৃষ্ঠাবৃদ্ধির এই নূতন পরিকল্পনা পছন্দ করলাম কিন্তু দাম বাড়ানো ঠিক হচ্ছে না। ম্যানেজম্যান্ট মোটেই সুবিধার নয়। 'বিংশ শতাব্দী'র বাঁধাই খুব আলগা। একটুতেই খুলে যায়, অনেক পাতা হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে যত্ন নেবেন। ইতি—

মিসেস ছবি দে
২এ, নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৫।

বিংশ শতাব্দীতে নতুনদের লেখা ছাপানো দরকার। স্বাস্থ্য বিভাগ ও একটি চিঠিপত্র বিভাগ খুললে ভাল হয়। পত্রিকার মূল্য ও পৃষ্ঠাবৃদ্ধির এই নূতন পরিকল্পনা পছন্দ করি না। ইতি—

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫৬)
C/o ই, এস, ই, অফিস
নেপাল হাউস, পোঃ ডিনো, রাঁচি।

নারীজগৎ সম্বন্ধেও একটা বিভাগ রাখা প্রয়োজন। দেশ এবং বিদেশের সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য। নারীদের সংগে থাকবে শিশু সম্বন্ধেও সংবাদ। নিবেদক—

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার দে
৯৯, বি, রোড, টেলকো,
পোষ্ট জামসেদপুর, সিংভূম।

বিংশ শতাব্দী পত্রিকা আমাকে যে পরিমাণ আনন্দ দেয় তা যে আর কোন বই পড়েই পাইনা তা বলতে দ্বিধা নেই। এতদিন যদিও কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুপস্থিতি মনকে ক্ষুণ্ণ করতো এবার থেকে তাও মিটবে বলে আশাকরি। যদি একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ খোলেন তাহলে যারপর নাই খুশী হব। একই রকমের লেখা না দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের লেখায় সমৃদ্ধ করা দরকার। পত্রিকার মূল্য ও পৃষ্ঠাবৃদ্ধিতে আমি খুব খুশি।

বিনীত—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখার্জি
C/o শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জি
শালতোড় কলিয়ারী
পোঃ ডিসেরগড়, বর্ধমান।

বিংশ শতাব্দীর শারদীয়া সংখ্যা আমার এ পর্যন্ত ভালই লেগেছে। বিংশ শতাব্দীর আগামী শারদীয়া সংখ্যায়ও তরুণ কবিদের কবিতাগুচ্ছ থাকুক। এই আমার প্রত্যাশা। নাট্যসংখ্যা খুব ভাল লাগেনি। বিংশ শতাব্দীতে কবিতা প্রকাশের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সিনেমার পত্রিকা বাজারে অসংখ্য, তাই ও সম্বন্ধে লেখা না ছাপাই শ্রেয়। নমস্কারান্তে—

প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়
১৬৫বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪।

শারদীয়

বিংশ শতাব্দী

এবারে শারদীয় সংখ্যায় থাকবে তিনজন বরেণ্য ঔপন্যাসিকের তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি খ্যাতনামা প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ, গল্প লেখকদের গল্প ও কবিদের কবিতা থাকবে। চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির মূল্য হবে মাত্র তিন টাকা। পত্রিকা মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে। বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী সংখ্যা বিংশ শতাব্দী, দেশ, স্বাধীনতা ও যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হবে। এজেন্টদের এখনই অর্ডার জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

'বিংশ শতাব্দী'র (বড় আকারের ১২০ পৃষ্ঠার) প্রতি সংখ্যার দাম বার আনা। বার্ষিক চাঁদা নয় টাকা।

আসামের দুর্যোগ ও সাম্প্রতিক ডাক গোলযোগের জন্য গ্রাহকদের যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হোল। শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্বে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা কিন্তু মাত্র ছয় টাকায় এক বছরের গ্রাহক হতে পারবেন। শারদীয় ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

বিংশ শতাব্দী

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন ঃ ৫৫-৪৪২৫

খেলাধূলা

যেন শুধু টাকারই খেলা

অজয় বসু

বিংশ শতাব্দীর খেলাধূলা যেন শুধু—টাকারই খেলা। অর্থের প্রভাব যেমন জড়িয়ে আছে পেশাদারী ক্রীড়ানুষ্ঠানের কাঠামোয় তেমনি ছড়িয়ে আছে অপেশাদারী খেলাধূলার ভিত্তিমূলে। প্রত্যক্ষ প্রমান রোম। প্রচারধর্মী যুগে টাকা ছড়িয়ে সাংগঠনিক সুনাম অর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন সেই শহরের বাসিন্দারা, নামে এবং কাজের দায়িত্ব যাঁরা আসন্ন অলিম্পিক ক্রীড়ার ব্যবস্থাপক।

আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার সপ্তদশ অনুষ্ঠানের আসর বিছানো হবে ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর রোমে। তারই প্রস্তুতি পর্বে রোমান সংগঠকেরা অপরিমিত টাকা ছড়িয়ে, প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প-স্থাপত্য কলার সংমিশ্রণে নানারকম নয়নাভিরাম দ্রষ্টব্য সাজিয়ে রোমে যেন রাজসূয় যজ্ঞভূমি রচনা করে রেখেছেন। তাঁদের চেষ্টা রোমের নতুন সজ্জার চটকে বিদেশীদের তাক্ লাগিয়ে দেওয়া।

বিশ্বাস হয়, সংগঠকদের সে পরিকল্পনা সার্থক হবে। কারণ প্রাচীন ও রেনেসাঁ যুগের শিল্প ও স্থাপত্য কলার যেটুকু ভগ্নাবশেষ রোমে এখনও পড়ে রয়েছে, বিদেশীদের অবাক করে তুলতে তাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাতেও রোমান সংগঠকদের মন ভরেনি। তাই সেদিনের দৃশ্যপটে এদিনের তুলির টান পড়েছে; অতীতের জীর্ণ চিহ্নের পাশে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প ও স্থাপত্যকলার অসংখ্য অবিনিশ্র নিদর্শন। একালের এই শিল্পকীর্তির পরিচয় বহন করেছে মূলতঃ অলিম্পিক ক্রীড়া কেন্দ্র নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণের সূত্রগুলিই।

সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়া উপলক্ষ্যে রোমে হবে আঠারো রকমের খেলাধূলা বিভাগীয় অনুষ্ঠান। তার জন্যে দরকার অন্যূন পনেরটি ক্রীড়াভূমি। টাইবার নদীকে মাঝখানে রেখে শহরের দ্বিধাবিভক্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সব ক্রীড়াভূমি, শুধু মাত্র নৌবাইচ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান কেন্দ্র ছাড়া। নদীর এক পারে কোরো ইটালিতে যে অবস্থা একদা মনীষী, বাগ্মী ও দেশনায়ক সমাগমে মুখরিত হতো; অপর পারে রোম-অষ্ট্রিয়া ও আপ্পিয়ান সড়কের অন্তর্বর্তী সেন্টপল্‌স-গির্জা সংলগ্ন ভূমি, রোম ইউনিভার্সাল সীমানা রূপে যা চিহ্নিত। ইতালীয় ফোরাম এবং প্রদর্শনী সীমানা, দুটি অঞ্চলেই স্থাপন করা হয়েছে এযুগের সর্বাধুনিক ক্রীড়াকেন্দ্রগুলিকে।

বেশীর ভাগ ক্রীড়াভূমিই নবনির্মিত, অবশিষ্টগুলি পুনঃ সংস্কারের পর নতুন প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী, ইতালীয় ফোরামে অবস্থিত অলিম্পিক স্টেডিয়ামটিই মূল ক্রীড়ানুষ্ঠানকেন্দ্র। সেখানে সপ্তদশ ক্রীড়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও সমাপ্তির, অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার এবং আরও কয়েকটি বিভাগীয় খেলের চূড়ান্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। অলিম্পিক স্টেডিয়াম অবশ্য নতুন সৃষ্টি নয়। ১৯৩৩ সালে ওই বিশালকায় ক্রীড়াভূমির উদ্বোধন ঘটেছিল কিন্তু সপ্তদশ অলিম্পিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে সংগঠকেরা অন্তর্বর্তীকালে স্টেডিয়ামটির রূপান্তর ঘটিয়েছেন সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে। তাঁদের দাবী, রূপান্তরিত ষ্টেডিয়াম অধুনা বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়াভূমির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ভূখণ্ডের ওপর পড়ে তোলা ওই ষ্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে রানিং ট্র্যাক্, জাম্পিং পিট, ফুটবল ও হকিখেলের মাঠ আছে। আর আছে দেড় হাজার ক্রীড়াবিদের একত্রে সাজ পোশাক বদলের ঘর, শতাধিক স্নানাগার, শতাধিক টেলিফোন কক্ষ, দুটি হাসপাতাল, ত্রিশটি পানশালা, দুটি ডাকঘর, ডেস্ক সমন্বিত সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিশন ভাষ্যকারদের ব্যবহার্য ৪৭২টি আসন। লক্ষাধিক দর্শক আসনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এরই মধ্যে। এলাহী ব্যাপার নিশ্চয়ই। বড়সড় ষ্টেডিয়াম বর্জিত বাংলাদেশের মানুষের কাছে অলিম্পিও ষ্টেডিয়ামের ওই লম্বা ফিরিস্তি যেন রীতিমতো অস্বস্তিদায়ক।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু গঠন সৌকর্যে আরও নয়নাভিরাম। ইতালীয় শিল্পানুরাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ষ্টেডিয়াম। কারণ ক্রীড়াঙ্গনের আভ্যন্তরীণ বৃত্ত ঘিরে অসংখ্য শ্বেতমর্মর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অভিনব অংগসজ্জায় সমৃদ্ধ এই ষ্টেডিয়ামের নাম 'ষ্টেডিও ডিমার্মি' বা মার্বেল ষ্টেডিয়াম। ফুটবল, হকি, অ্যাথলেটিকস্ ছাড়া, প্রয়োজন দেখা দিলে মার্বেল ষ্টেডিয়াম সংলগ্ন সুইমিং পুলে ওয়াটার পোলো খেলার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। তবে সপ্তদশ অলিম্পিকের সূচীভুক্ত ওয়াটার পোলো এবং সন্তরণ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এখানে হবে না, হবে নব-নির্মিত স্বতন্ত্র দুটি জলাশয়ে। একটি জলাধার সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত, রেখাচিত্র শোভিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত, অপরটি উন্মুক্ত। আচ্ছাদিত সুইমিং পুলে দর্শকআসনের সংখ্যা কম, উন্মুক্ত ক্রীড়াঙ্গন কুড়ি হাজার দর্শক-আসনে ঘেরা।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী-ভূমিতেও একটি ষ্টেডিয়াম, নাম 'ফ্লমিনি ষ্টেডিয়াম'। ইতালীয় স্থপতি পিয়ের লুইগি নার্ভির গড়া এই ডিম্বাকৃতি মনোরম ক্রীড়াভূমিতে কিঞ্চিদধিক অর্ধলক্ষ দর্শক-আসন আছে। এইখানে অনুষ্ঠিত হবে নার্ভি যে একালের শ্রেষ্ঠ স্থপতি, ফ্লমিনি ষ্টেডিয়াম তার অন্যতম নিদর্শন কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠতর শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি প্রদর্শনী সীমানায় 'পালাজেত্তো দেলা স্পোর্ট' বা স্পোর্টস প্যালেস নির্মাণে। একটি নয়, দুটি 'প্রাসাদ'। বৃত্তাকারে নির্মিত এই প্রাসাদগুলি গম্বুজবিশিষ্ট, তার একটিতে শীততাপ ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। নার্ভি কংক্রিটের যাদুকরস্থপে প্রখ্যাত কিন্তু স্পোর্টস-প্যালেস নির্মাণে তিনি কংক্রিট ছাড়া, কাচ ও এ্যালুমিনিয়ামের অকৃপণ ব্যবহার ঘটিয়েছেন। একটি প্রাসাদে নির্মাণেই ব্যয় কোটী লীরা খরচ পড়েছে এবং সময় লেগেছে আড়াই বছর। একটি প্রাসাদে হবে ভারোত্তোলন এবং অপরটিতে বাস্কেটবল ও মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান।

অলিম্পিক, ফ্লমিনি, মার্বেল ষ্টেডিয়াম, স্পোর্টস প্যালেস বা নার্ভারের দুটি পুল, কুড়ি হাজার দর্শক আসন সমন্বিত সাইক্লিং ভেলোড্রম, সব কিছুই আনকোরা নতুন অথবা সাম্প্রতিককালের সৃষ্টি। অবশিষ্ট ক্রীড়াঙ্গনগুলি ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বলেই সেগুলির আয়োজন হয়তো আরও বেশি, প্রাচীন ও রেনেসাঁ যুগে

অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম : রোম

শিল্পকর্মের যেসব অংশবিশেষকে অলিম্পিকের প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো পিয়াজ্জো ডি সিয়েন্না, কারাকালা স্নানাগার, ব্যাসিলিকা ম্যাকসেনটিয়াস, কনস্টেনটাইন আর্চ, পিজালো দেল্ ক্যাম্পিউগলিও ইত্যাদি।

পিয়াজ্জো ডি সিয়েন্নায় হবে অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতা, ইতালীয় ফোরামের বৃহত্তম ভগ্নাবশেষ ব্যাসিলিকা ম্যাকসেনটিয়াসে হবে মল্লক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ভগ্নস্তম্ভগুলির মধ্যে রিং প্যারালাল বার স্থাপন করে কারাকালা স্নানাগারে বিছানো হবে জিমনাষ্টিকের আসর। কারাকালা স্নানাগারের নির্মাণকাল ২১৫ খৃষ্টাব্দ। আরও প্রসিদ্ধ শিল্পকীর্তি মাইকেল এঞ্জেলোর পিজালো দেল ক্যাম্পিউগলিউর সোপান শ্রেণীর সামনে সুরু হবে ম্যারাথন দৌড় এবং দৌড়বীরেরা ইতালীয় ফোরাম, আপ্পিয়ান সড়ক, কারাকালা স্নানাগার ঘুরে দীর্ঘ ছাব্বিশ মাইল ৩১৫ গজ দৌড় পথ শেষ করবেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ রোমান কলিসিয়ামের ছায়ায় অবস্থিত কনস্টেনটাইন আর্চে এসে থেমে।

শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে কিছু দূরে আলবানো হ্রদে হবে নৌবাইচ প্রতিযোগিতা, এই অঞ্চলটিও ঐতিহাসিক স্মৃতি-জড়িত যদিও আজ প্রাচীন রোমান স্থাপত্য কলার অতি সামান্য অবশিষ্টই সেখানে পড়ে আছে। আলবানো হ্রদ ক্যাস্ত্যালউলিকী হ্রদ নামেও ইতালীতে পরিচিত কারণ দূর অতীতে বীর গ্যানেডলফি এই তীর শৈলাবাস নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু সেসব চিহ্নই আজ পুরানো ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু দাঁড়িয়ে আছে আলবানো অঞ্চলে সেকালের একমাত্র নিদর্শন, ডেরোশোমিটার দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গ। যেটি নির্মিত হয়েছিল আনুমানিক ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে।

রোমে নবনির্মিত অথবা স্বয়ংসংস্কৃত ও সম্প্রসারিত অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণগুলির এই হলো মোটামুটি পরিচয়। এছাড়া একেবারে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে অলিম্পিক গ্রাম। গ্রাম মানে তিন হাজার ঘোড়ার, মিটার পরিমিত জমি হতে পাকা ও আধুনিক বসতি। কমপক্ষে আটহাজার প্রতিনিধির বসবাসের উপযোগী চারহাজার কক্ষ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদপুষ্ট আরামদায়ক। হোটেল, সেলুন, ডাকঘর, হাসপাতাল, টেলিফোন ভবন, অনুশীলনে ব্যবহারযোগ্য প্রশস্ত ক্রীড়াভূমির ছড়াছড়ি এই অলিম্পিকের পরে গ্রামখানি ইতালী নাগরিকদের স্থায়ী আবাসে রূপান্তরিত হবে।

নতুন নতুন ক্রীড়াঙ্গণ ও অলিম্পিক 'গ্রাম' নির্মাণে, পুরানো ক্রীড়াভূমি ও রাস্তাঘাট সংস্কার ও সম্প্রসারণে; অতিথিদের আদর আপ্যায়নে এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় ইতালীয় সরকারের সহযোগিতায় রোম অলিম্পিক সংগঠকদের কতো টাকা ব্যয় করতে হবে জানেন? কমপক্ষে তিনকোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড! চমকে উঠবেন না। এই টাকার অঙ্কই রোম অলিম্পিকের সাংগঠনিক সাফল্যের মূল্যায়নের নিরিখ নাকি ইতালীর জাতীয় মর্যাদাও এই সাংগঠনিক আয়োজনে যাচাই হয়ে যাবে। বলেই বা অলিম্পিক ক্রীড়া আদর্শগতভাবে নিছকই এক অপেশাদারী অনুষ্ঠান। কিন্তু সে অনুষ্ঠান এই শতাব্দীর আয়োজন বলেই শতাব্দীর চাহিদা তাকে মেটাবে হবে। শতাব্দীর চাহিদা ও আড়ম্বরের চাকচিক্য ও প্রচারের বর্ণাঢ্য সমারোহকে ঘিরে। আধিক মূলধনেরও এতো প্রয়োজন সেই কারণে। তাই বলছিলাম যে বিংশ শতাব্দীর খেলা যেন টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা! অবশ্য ঐশ্বর্য আছে যার একমাত্র সেই পারে এমন খেলা দেখতে। অন্যেরা নয়।

রঙ্গ জগৎ

কুমারগুপ্ত

কিশোরকুমারের নিজস্ব প্রযোজনায় দ্বিতীয় চিত্রটির নাম "পাগলাবাবু"। পরিচালক কমল মজুমদার এই চিত্রটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন এবং প্রধান দুটি চরিত্রে দেখা যাবে কিশোরকুমার এবং মালা সিংহকে। দুটি মুখ্য পার্শ্বচরিত্রে আছে অনুপকুমার এবং সুখেন।

• • • •

বাদল পিকচার্সের "সাথীহারা" চিত্রের কাজ পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে। প্রধান ভূমিকা দুটিতে আছেন বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী উত্তমকুমার এবং মালা সিন্‌হা। এর কাহিনী লিখেছেন ফণী মজুমদার এবং অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন কাজরী গুহ, তরুণকুমার, জহর রায়, প্রীতি মজুমদার এবং আরও অনেকে।

• • •

পরিচালক তপন সিংহ তার পরবর্তী চিত্রের নাম জানিয়েছেন সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঝিন্দের বন্দী"।

• •

কেমিরা ফিল্মসের চিত্র "শহরের ইতিকথা"র কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বিশু দাশগুপ্তের পরিচালনায়। এ চিত্রেরও নায়ক নায়িকার ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার, মালা সিন্‌হা।

• • •

পরিচালক ডাক্তার সুরেশ রায় এবার মহালক্ষ্মী চিত্রের পতাকা তলে "ছেলেধরা" চিত্রের কাজ আরম্ভ করবেন।

• • • •

দেবকী বসু পরিচালিত এবং বহু প্রশংসিত ছবি "রঙ্গদীপ" এর সত্ত্ব নবগঠিত উদয়ন প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের হাতে এসেছে। চিত্রখানির আবার মুক্তির আয়োজন করা হচ্ছে।

বাংলার রঙ্গমঞ্চে

ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সুসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ রচিত "শ্রেয়সী" উপন্যাসের নাট্যরূপ দিচ্ছেন বলে শোনা গেল। এ নাটকের প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং বসন্ত চৌধুরী।

• • •

বিশ্বরূপার পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারের প্রথম উদ্বোধন হয়েছে "ডাউন ট্রেণ" নাটকটি নিয়ে, নাটকটি লিখেছেন সলিল সেন এবং নাটকে যারা যোগদান করেছেন তাদের মধ্যে আছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে এবং আরও অনেকে।

এক নজরে সংবাদ—

"শাশ্বতীর সংগীত ইন্দোর ঘরোয়ানা" নামে দু রীলের যে গীতিচিত্রখানি আশীষ মুখোপাধ্যায় তুলেছেন, তার বাঙলা সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে ক্রয় করে নিয়েছেন। আশীষ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে ওস্তাদ আলাউদ্দীনকে কেন্দ্র করে একটি প্রামাণ্য চিত্র তুলছেন।

ফিল্ম ইনষ্টিটিউট

সরকারী উদ্যোগে পুণায় যে ফিল্ম ইনষ্টিটিউট গঠিত হচ্ছে, বর্তমানে সরকার তার নিয়মকানুন প্রণয়ন করার ব্যাপারে নাকি ব্যস্ত, এখানে ফিল্মশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং শিক্ষার পর উত্তীর্ণ ছাত্রদের ডিপ্লোমা দেওয়া হবে, এরই জন্য পুণায় বিখ্যাত প্রভাত ফিল্ম ষ্টুডিওটি কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয় করেছেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের উৎসব—

বার্লিনে অনুষ্ঠিত দশম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এবার স্প্যানিস ছবি "লা লাজারিলো অ টর্মস" শীর্ষস্থান অধিকার করে "গোল্ডেন বেয়ার" পুরস্কার লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ফ্রেডারিক মার্চ (চলিউডের চিত্র "ইনহেরিট দি উইণ্ড"এ অভিনয়ের জন্য) এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে জুলিয়েত সেবেরিস (জার্মান ছবি "ফিরমেসে" অভিনয়ের জন্য) "সিলভার বিয়ার" পেয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের মর্যাদা পেয়েছেন ফ্রান্সের লুকব্রাদার করাসী চিত্র "আবু দে গুকল"এর পরিচালনার জন্য।

বার্লিনের উৎসব শেষ হতে না হতেই কারলভি ভেরীর উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। সেখানে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত "হীরামোতি" ভারতের পক্ষ থেকে পাঠান হয়েছে।

আগষ্টের শেষ সপ্তাহে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব আরম্ভ হচ্ছে। সেখানে তিনখানি বাঙলা চিত্র ভারতের পক্ষ থেকে পাঠান হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে পাঠান হয়েছে তপন সিংহের "ক্ষুধিত পাষাণ", কেন্দ্রিভ্যাল কমিটি আরও যে দুখানি চিত্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার একটি হল অগ্রগামী পরিচালিত "হেডমাষ্টার" অপরটি মৃণাল সেন পরিচালিত "বাইশে শ্রাবণ"। আবার ঠিক এই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এডিনবার্গের চলচ্চিত্র উৎসব। পৃথিবীর সকল দেশ থেকে প্রায় তিনশখানি চিত্র এ উৎসবে যোগদান করছে। ভারতবর্ষ থেকে পাঠান হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার"। এ বছরের শেষদিকে দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ের মন্টি-ভিডিওতে একটি চলচ্চিত্র উৎসব হবে বলে জানা গেল। সেখানে ভারতের পক্ষ থেকে চিত্র যাবে কি, আর ফিল্মসের "ধূল কা ফুল"।

ট্রাপ ফর এ পলিটারিম্যান

ট্রাপ ফর এ পলিটারি ম্যান—রবার্ট থমাসের সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রসস্থ উপন্যাস। রবার্ট থমাস নিজে একজন সুঅভিনেতা ও লেখক। প্রথম প্রকাশিত তাঁর এই উপন্যাসটি পশ্চিমের বাজারে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সম্প্রতি আলফ্রেড হিচকক এই রহস্য কাহিনী-মূলক উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জন্য টোয়েনটিএথ সেঞ্চুরি ফক্স-এর সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। পার্বত্য বিশ্রামাগার থেকে কোন এক মহিলার রহস্যজনক নিরুদ্দেশকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী পল্লবায়িত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, অনতিকালের মধ্যেই ফরাসী অথবা সুইস আল্পসে এ ছবির স্যুটিং আরম্ভ হবে।

আমদানি-রপ্তানি

চেকোস্লোভাক্ ও ভারত সরকারের মধ্যে ফিল্ম আমদানি ও রপ্তানির হিসাব মন্দ নয়। গত দশ বছরে ভারত ৩২৫টি চেকোস্লোভাক্ ফিল্ম আমদানি করেছে। ভারতের বহু ছবিও সে দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রামাণ্য দলিল মূলক ছবি, বিজ্ঞান বিষয়ক ছবি ইত্যাদি ভারতে এতকাল প্রদর্শিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে চেকোস্লোভাক্ কাহিনীমূলক ছবিরও ভারতে বেশ চাহিদা দেখা যাচ্ছে। নিজেও অব লাভ ছবিটি সিংহল, পাকিস্থান, সিঙ্গাপুর ও হংকংএ প্রদর্শিত হয়েছে সম্প্রতি। ছবিটিকে হিন্দীতে অনুবাদ করা হচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রামাণ্য দলিলমূলক চিত্র

ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভস্-এর এক সংবাদে প্রকাশ যে অসমিয়া ছবি, আসান অদেস সার্ভে, ও দি ষ্টোরি অব ভিসবয়—এই প্রামাণ্য দলিলমূলক ছবি দুটি জাতির মূল্যবান সম্পদরূপে জাতীয় চলচ্চিত্র সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত হবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ও ইতিহাসের দিক হতে ব্রিটিশ ফিল্মসংস্থার এ প্রয়াস বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

রায় চলচ্চিত্র উৎসব

কিছুদিন আগে বোম্বাইএ "রায়" চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছটি ছবি এ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত "দেবী" এ উৎসবের প্রথমে প্রদর্শিত হয়। বোম্বাই দর্শকমহলে ছবি কটি গতানুগতিক ধারার মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন আনে। শ্রীরায় কর্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য চিন্তাধারাই তাঁর চলচ্চিত্রের একমাত্র বিষয়বস্তু—এ অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন যে, না তাঁর এরূপ কোন গোঁড়ামি নেই। আধুনিক শহর-সভ্যতাকেও তিনি অত্যন্ত নিপুণরূপে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তিনি সম্ভবতঃ ইংরেজি ফিল্মের কাজে হাত দিতে পারেন, তবে বর্তমান হিন্দী চিত্র পরিচালনা তাঁর পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

সিনেমা শিল্পে আত্মনির্ভরতা

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারত প্রগতির পথে। এতকাল সিনেমা শিল্পে ব্যবহৃত ফটোগ্রাফিক কাগজের ক্ষেত্রে একান্তভাবে

বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে বরোদার নিউ ইণ্ডিয়া কিল্ম ইনস্ট্রুমেন্টস ও জার্মানীর প্রখ্যাত ফটো সরঞ্জাম নির্মাতা আগফা কোম্পানির মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতে ফটোগ্রাফিক দ্রব্যাদির কারখানা নির্মিত হচ্ছে। এই নতুন প্রয়াসের ফলে ভারতীয় বৈদেশিক মুদ্রা বেশ বাঁচবে বলে আশা করা যায়।

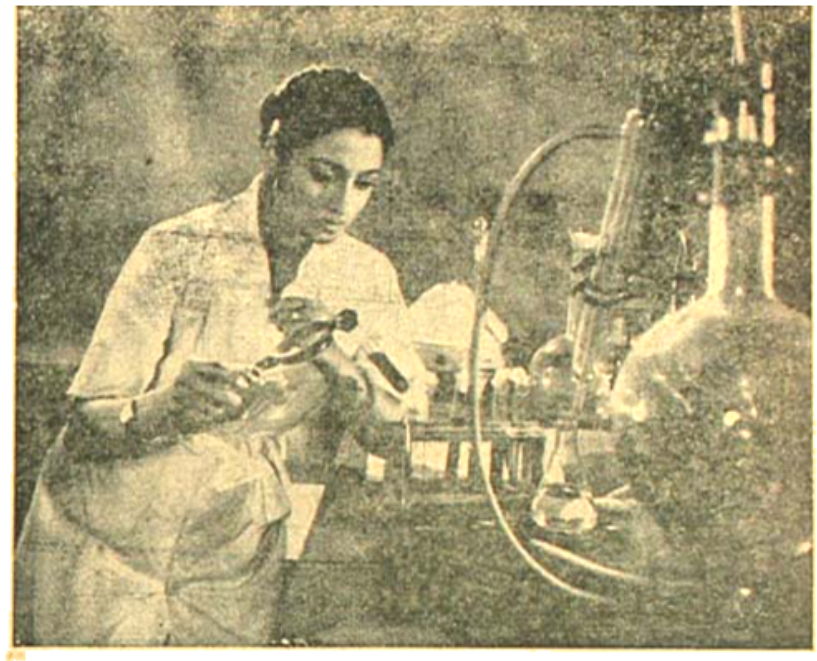

'হাসপাতাল' চিত্রে সুচিত্রা সেন

তামিল নাটক

গতমাসে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পালা-পর্বের মধ্যে কলকাতার এনেচার ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক অভিনীত তিনটি তামিল নাটকের অভিনয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তামিল নাটক কটি যথাক্রমে—ইনব লাল, প্রেসিডেন্ট পঞ্চকম্‌ ও ইথু ভজকু।

টুকরো খবর—

এল. বি, কিল্ম ইন্টারন্যাশনালের নবতম প্রচেষ্টা—"নগর সংকীর্তন"এর কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। এই কাহিনীটি বিমল মিত্রের রচনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। শোভা সেন, ক্ষমা দেবী, গীতা দে ও তপতী ঘোষ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বলে জানা গেল। লিটল থিয়েটার গ্রুপের রবি ঘোষ অন্যতম প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন। পরিচালক প্রমোদ দাহিড়ী নিজেই এ চিত্রের পরিচালনা করবেন।

• • • •

মুক্তি ইন্টারন্যাশনালের "বিয়ের খাতা"র কাজ সমাপ্ত প্রায়। নির্মল দের পরিচালনায় এ ছবিটি দর্শক মনে হাসির খোরাক জোগাবে বলে আশা করা যায়। এ ছবিতে অহর গাঙ্গুলির অভিনয় অন্যতম আকর্ষণ।

• • • •

১৯৫৯ সালের U. N. Year Book সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্যমূলক মূল্যবান গ্রন্থখানিতে পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের স্থান, বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা ব্যতীত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংযোজিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর চলচ্চিত্র সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি খবর এই বইটীর আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছে। U. N.এর হিসাব মত দেখা যায় যে কাহিনী মূলক চলচ্চিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রতিবৎসর ভারতে এ ধরণের ছবি প্রকাশিত হয় ২৯৫টি, জাপানে ৩৬০টি ও আমেরিকায় ২৮৮টি কিন্তু দর্শকের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রুশিয়া প্রথম—৩. বিলিয়ান; আমেরিকায় ২.২ বিলিয়ান, ভারতে ১. বিলিয়ান ও জাপানে ১.১ বিলিয়ান।

• • • •

বিগত কয়েকমাস আগে প্রদেশ প্রমদপুর সিনেমা শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণের জন্য এক কমিটি গঠন করেন। গত মে মাসে শেষার্দ্ধে এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করবে এই কমিটি সিনেমা কর্মীদের বর্তমান বেতন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখেন যে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বেতন নামমাত্র। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে সিনেমা কর্মীর সর্বনিম্ন বেতন হবে ৬০ টাকা আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিনেমাগৃহে ৭৭ টাকা।

তাঁরা এই রিপোর্টে প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক এমনকি ষ্টুডিও-কর্মীদেরও বেতনের সর্বনিম্ন মান নির্ধারণ করে দেন। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই চিত্রশিল্পে জড়িত বর্তমান কর্মীর সংখ্যা দশ হাজারেরও কিছু বেশী।

• • •

সম্প্রতিকালে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্বর হত্যাকাণ্ড সভ্যমানুষের কলঙ্কস্বরূপ। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ঘৃণিত বর্ণ-বৈষম্য নীতি ও তার প্রয়োগ। এই হত্যাকাণ্ডের বাস্তবছবি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবার জন্য লণ্ডনের এক কমিটি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের উপর প্রামাণ্য দলিলমূলক ছবি তোলার সিদ্ধান্ত করেছেন। এই কমিটির অনুরোধ-ক্রমে কলিকাতায় নিউ এম্পায়ার চিত্রগৃহে বহুরূপী কর্তৃক "চার অধ্যায়" অভিনীত হয়। এই আয়োজনের পেছনে ছিলেন কলিকাতায় বিশপ, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি ও ভারত পাকিস্থানের বহু নাগরিক। অভিনয়ে অর্জিত সমস্ত অর্থই লণ্ডনে প্রেরিত হয়। শোনা যায় সাধারণ মানুষের স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তাই এ ছবি প্রামাণ্য দলিলরূপে বিশ্ববাসীকে ভবিষ্যতে সভ্য মানুষের বর্বরোচিত আচরণের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে।

• • • •

সুদীর্ঘ বার বছর পর সেন্ট লুইসনের স্যাস চেম্বারে কার্ল চোসম্যানের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকেই আমেরিকায় মৃত্যুদণ্ডের সার্থকতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠে। সম্প্রতি U.N. এর অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু ক্যাপিটাল প্যানিসম্যাণ্টের যথার্থতা বিচার। স্যাস চেম্বারে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চোসম্যান তাঁর জীবনের বাস্তব চিত্ররূপায়নের অনুমতি দিয়ে যান। এই চলচ্চিত্রের মূখ্য বিষয়বস্তু হবে চোসম্যানের পূর্ণজীবন ও মৃত্যুদণ্ডের সার্থকতা নিরূপণ। চোসম্যানের রচিত বহুল প্রচারিত চারখানি বই এই চলচ্চিত্রের উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করবে। চোসম্যানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন স্বয়ং পরিচালক মারলন ব্রাণ্ডো।

•

বোম্বাই এর সংবাদে প্রকাশ, যে সোরাব মোদীর পরিচালনায় ও নির্দেশনায় তাঁর আগামী ছবি "মেরা ঘর মেরা বেচারে"র কাজ বেশ সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে। এ ছবির স্যুটিং এর জন্য দলবল সহ তিনি সম্প্রতি অন্ধ্রে গেছেন। দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ বাঁধ নাগার্জুন সাগরের পটভূমিকায় স্যুটিং হয়েছে। হায়দ্রাবাদের মনোরম কিছু কিছু দৃশ্যও এ ছবির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাহিনীর সংলাপ রচনা করেছেন নবাগত লেখক হাফিজ ওমর খৈয়াম সাহারণ পুরী। সুলোচনা, কবিতা ও কুমারী নাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সোরাব মোদী স্বয়ং অন্যতম প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন বলে জানা গেছে।

•

সিনেমা দর্শকদের মধ্যে জনি ওয়াকারকে চেনেন না এমন খুব কম লোকই আছেন। অন্যতম সেরা কমেডিয়ান-রূপে ভারত-পাকিস্থানের সবার কাছেই তিনি পরিচিত। তবে এতদিন দর্শকরা তাঁকে যে ভূমিকায় দেখে এসেছেন, এবারে তার বেশ কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটবে। তাঁর পরবর্তী ছবি "মডার্ন গার্ল"। আর স্বয়ং তিনি মডার্ন গার্লের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। বিপরীত চরিত্রে স্মৃতি বিশ্বাসকে দেখা যাবে।

• • • •

কানে চলচ্চিত্র উৎসব শেষে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। পুরস্কারের তালিকায় এবারে ইটালি, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রুশিয়ার নাম দেখা যাচ্ছে। এ উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে ইটালির 'La Dolce Vita' (The Sweet Life)। ফরাসী ছবি 'The Smile' (La Sourire) সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রায়তন চলচ্চিত্ররূপে সম্বর্ধিত হয়েছে। 'La Dolce Vita' বহু আকাঙ্ক্ষিত Palme d' or পুরস্কার লাভ করেছে। আন্তন চেখভ্ রুশ সাহিত্যের অমর লেখক। তাঁর রচিত ছোট গল্প 'A woman with a Little Dog' পুরস্কৃত হয়েছে। Ballad of the Soldier' সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্ররূপে পুরস্কৃত হয়েছে। এ উৎসবে আগত বেলজিয়াম ও আমেরিকান্ বিচারকগণ সোভিয়েত রুশিয়ার চলচ্চিত্রগুলির অপার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিদেশে ছবি আমদানির ক্ষেত্রে ভারতীয় মুদ্রা বাঁচান বর্তমান সরকারের নীতি। আর তারই ফলে, ভারত সরকার সম্প্রতি এক নির্দেশ জারী করেছেন যে ভারতে আগত সর্বপ্রকার বিদেশী ছবিকে প্রতি ফুটের জন্য ৬ নয়া পয়সা হারে শুল্ক দিতে হবে। কিছুকাল আগেও এই কর ছিল ৫০ নয়া পয়সা। এরূপ ব্যবস্থার ফলে পরিবেশকগণের আপাততঃ অসুবিধা হলেও, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই নতুন পরিবর্তন বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছে।

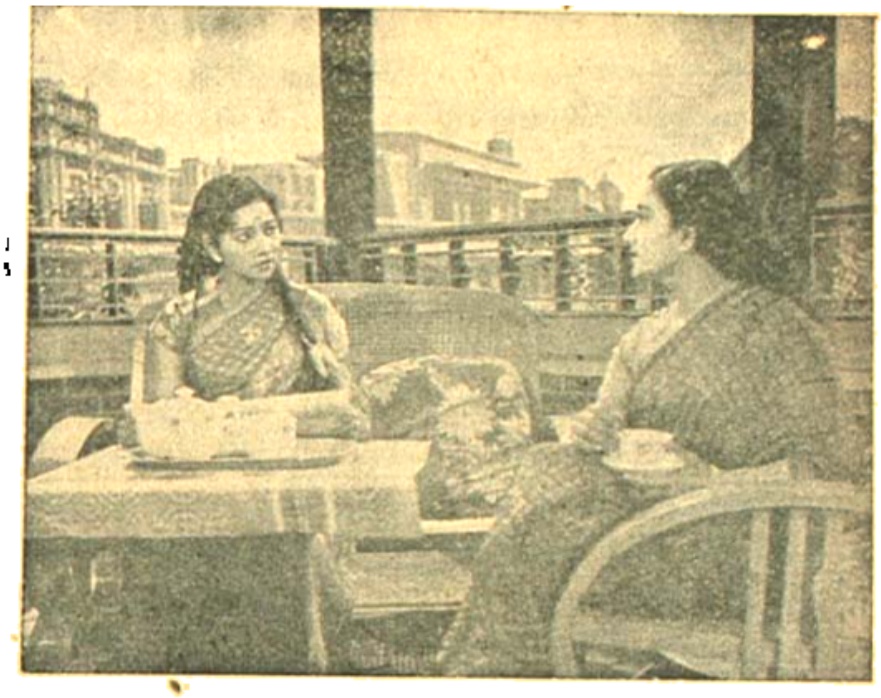

'মরুতৃষা' চিত্রের একটি দৃশ্যে তপতী ঘোষ ও সবিতা বসু

• • • •

রাজকাপুরের আগামী ছবি 'ইস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়' এর কাজ সম্পূর্ণ প্রায়। পশ্চিমের দেশগুলিতে এই ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের কাজও সমাপ্ত প্রায়। এই ছবির ইংরাজী নাম 'The Gun and the Ganges' ছবিটির ফটোগ্রাফী ও নির্দেশনার কাজ করেছেন যথাক্রমে—তরু দত্ত ও রাজু কর্মকার।

• • • •

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, মেসার্স রসিদ ব্রিদার্স, সাহী-জল-আমিনের রচিত বাংলা কাহিনী 'বিষ-কন্যা'র চিত্র রূপায়ণের কাজে হাত দিয়েছেন। ভারতীয় টেকনিসিয়ানগণ শীঘ্রই এক কাজের জন্য ঢাকা রওনা হচ্ছেন। উদয়ন চৌধুরী মেগাফোনের কর্মভার গ্রহণ করেছেন আর অঘগ্রহণ ক্যামেরা, ও সম্পাদনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে মণি বোস, মুরারী ঘোষ ও নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য। স্থানীয় শিল্পিগণ এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন বলে জানা গেল।

• • • •

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে, আগামী বার্লিন, কার্লোভি ভারী ও কানের উৎসবের জন্য ছবি নির্বাচিত হয়ে গেছে। কৃষিত পাষাণ, দেবী ও অনামিকা ছবি পূর্বোক্ত ঐ উৎসব গুলিতে অংশ-গ্রহণ করবে।

• • •

একই ছবিতে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। জনপ্রিয় অভিনেতা দেবানন্দ নব কেতনের পরবর্তী ছবিতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে প্রকাশ। মালা সিনহা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

• • • •

সুধাকণ্ঠী লতা মুঙ্গেশকার, সলিল চৌধুরী, কবি শৈলেন্দ্র, ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্ত ও নির্দেশক সুবোধ রায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সঙ্গীত গোষ্ঠী অল্পকাল হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংস্থা 'Our Unit Private Ltd. নামে পরিচিত।

• • • •

জাতির চরিত্র গঠনে চলচ্চিত্রের প্রভাব অসমান্য। ভাল বা মন্দ—এ দু' ধরণের কাজেই চলচ্চিত্রের দ্বারা সাধিত হতে পারে। যে দেশ চলচ্চিত্র সম্পর্কে যত সজাগ, সে দেশ ততো শীঘ্র তার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করতে পারে। পশ্চিমের দেশগুলিতে এ বিষয়ে কিছটা

যেন শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষও এ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। সম্প্রতি ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করেছেন। তার কারণও আছে; ব্রিটিশ ও ফরাসী ফিল্ম বিদেশে তাদের সুনাম নষ্ট করছিল। সম্প্রতি ব্রিটিশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভাপতি রূপে নির্বাচিত হয়েছেন লর্ড মরিস। তিনি চলচ্চিত্রের মান সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে একমাত্র গঠনমূলক ফিল্মই এখন থেকে মুক্তি পাবে। ফরাসী তথ্য সচিব মিঃ টেরিনহার ফিল্ম সেন্সরশিপ সম্পর্কে তাঁর অভিমত শীঘ্রই মন্ত্রি পরিষদে পেশ করবেন। এতকাল চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ সুযোগের যে অপব্যবহার করেছেন, তার ফলস্বরূপই এই দুই দেশে এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হচ্ছে।

* * * *

ক্যানে চলচ্চিত্র উৎসবে বিমল রায়ের "সুজাতা" বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। বর্ণবৈষম্য এর উপর রচিত এ কাহিনী পশ্চিমীদের মনে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগায় নি বলে জানা গেছে। ইউরোপ অঞ্চলে জাতিগত ভেদাভেদ বিশেষ প্রবল নয়, কাজেই, সুজাতার আবেদনও এ অঞ্চলে দর্শক মনে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযে গ্য যে ভারত সরকারের প্রামাণ্য দলিল-মূলক ছবি "শ্রীনগর" এ উৎসবে উপহারের পাত্র হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ যে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য "আনাড়ী" নির্বাচিত হয়েছে।

লোকসভার কয়েকজন সদস্য এ নিয়ে প্রশ্নাদি উত্থাপন করেছেন। শ্রীকেশকার তাদের সকলকে 'শ্রীনগর' দেখবার আমন্ত্রন জানিয়েছেন। দেখা যাক, ভারতীয় অভিমত শ্রীনগর সম্পর্কে কি রায় দেয়।

* * * *

সম্প্রতি ইউ, পি, সি'র চেয়ারম্যান শ্রীদেশমুখ বোম্বাই-এ এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে যুবকগণের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও যথাযথ আচরণ গঠনে চলচ্চিত্রের প্রভাব প্রভূত। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম সোসাইটি গঠন ছাত্রদের আনন্দ বর্ধন ও মান উন্নয়নে সাহায্যকারী হইতে পারে।

* * * *

সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বের অন্যতম চিন্তানায়ক লেনিন, গল্পকাহিনী ও পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কর্ম-চঞ্চল লেনিনকে দেখবার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই ভাগ্যে ঘটেছে। কিছুকাল আগে কলিকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসে "সোভিয়েত প্রেস ডে" অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সম্পাদক সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ আনন্দ অনুষ্ঠান ছাড়া সেখানে সেদিনকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল মহান লেনিনের কর্মবহুল জীবনের কতকাংশের পূর্ণ সবাক্ ছবি। এই প্রামাণ্য দলিল-মূলক ছবি পুরাতন হলেও আগামী দিনেও এর প্রভাব ম্লান হবে না। ১৯১৮—২২—সোভিয়েত রুশিয়ার সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে লেনিনের ভূমিকা এই ছবির অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। কলিকাতাস্থ সোভিয়েত কন্সাল-জেনারেল শ্রীচেরসকভ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

UNIVERSITY

ভাদ্র
১৮৮২
পঞ্চম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীরও জীবনাবসান হল। গত উপেন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, পরশুরাম, সুধীন্দ্রনাথ এবং সব শেষে ইন্দিরা ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের যোগ ক্রমেই ছিন্ন হয়ে আসছে। দেবীর বিয়োগ সেই বেদনাকে আরো তীব্রতর করে গেল।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সাহচর্যের মধ্যে যাঁর সাহিত্যিক দীক্ষা, বীরবলের সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁর প্রতিষ্ঠা, সেই ইন্দিরা দেবী বাংলা সাহিত্যে আর কোন দিনও করবেন না।

বাংলা সাহিত্যের মহৎ অতীত মহত্তর ভবিষ্যত রচনা করতে চলেছে,—এই ভরসা যখন দুর্বল ঠিক সেই দুর্দিনেই ইন্দিরা দেবী চলে গেলেন। বাংলা সাহিত্যে সঞ্চয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ দ্রুত গতিতে বাড়ছে, এটাই আশঙ্কার কথা। একান্ত পরিণত বয়সে ইন্দিরা দেবীর মৃত্যুও তাই সহজ মনে মেনে নেওয়া কঠিন।

বাংলা দেশের বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকরূপে সরকারী বেসরকারী অনেক সম্মানই তিনি পেয়েছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন, তাঁর কৃতিত্বের দীর্ঘ খতিয়ান আমাদের শোককে লঘু করবে।

ইন্দিরা দেবীর মৃত্যুতে আমরা গভীর ব্যথা অনুভব করছি।

—তের—

কানাকানি থেকে মুখে-মুখে কথাটা ছড়ালো ক্লাসময়। জানাজানি হয়ে গেল। বিশ্বি সেজন্যে শ্রাবণী কিন্তি বোধ করলেও দুমাত্র অপ্রতিভতা ফুটতে দেয় নি আপন আচার-চরণে। বলেছে, বেশত বরের সম্বন্ধ এসেছে তাতে এমন মহাভারত অশুদ্ধ য়েছে? তবে ঠিক কাউকে লনি, ভেবেছে যে যদি কেউ এ নিয়ে কিছু তে আসে তখন এই ছের একটা জবাব দেবে। ন্তু ওরা শরতের মেঘের তা কথাটা এধারে-ওধারে ড়িয়ে পড়তে দিচ্ছে তবু শ্রাবণীর সংগে এ নিয়ে একটি ও বলেনি।

ইলা বলল মিনতিকে—তোমার ত তবু আশা আছে ই, হাজার হোক এক শহরের মেয়ে, তার বাসরে গাইতে রবে। কিন্তু চিত্রা আমি—

চিত্রা হাত নেড়ে জোর গলায় প্রতিবাদ করে—না , তোরা যেমন তাবিস ও তেমন মেয়ে নয়। বিয়েটা ই কলকাতা থেকে হয় তবে কি আর ক্লাসের মেয়েদের বলে পাঠাবে!

আরতি হাসল—তোমাদের যত আজব কথা, পরীক্ষা ষে গেলে কে যে কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই!

মিনতি ফোড়ন দিল—আরে বাবা, জনীতা বলেছে । লিখনং পঠনং বিবাহেরই কারণং। আগেত বিয়ে াক, তারপর দেখা যাবে পরীক্ষার কথা ভেবে। হুঁ, কে বলে বিয়ের ফুল—যখন ফোটবার তখন ফটাফট টে যাবে। তোরা এসবের কি বুঝিস!

প্রফেসর চৌধুরীর ক্লাস, তিনি যে কখন ঢুকে পড়েছেন, মেয়েরা এই রসঘন আলোচনায় ডুবে থাকায় টেরও পায়নি। তিনি চেয়ার টেনে বসলেন, সেই শব্দে ওরা চমকে থমকে থেমে গেল। না, ঠিক থামল না, চুপি-চুপি যতটা পারল চোখের ইশারায়, মৃদু ঠোঁটের ফিসফিসে অধোচ্চারণে আলাপ চালালো—মুখ্যতঃ মিনতি আর আরতি ছাড়া। আর সকলেই লেকচার কপো করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ক্লাস শেষ হতে মিনতি এসে শ্রাবণীকে ধরল—বর কি কাজ করে রে?

—বর? তার মানে!

—মানে-টানে রাখ, এখন জবাব দে!

—ও। আগে বিয়ে হোক, তবেত বর—

—নে, ওই হল। কি নাম?

—ভবেশ।

—তা বেশ। চল্ কমনরুমে গিয়ে বসি। এ পিরিয়ডে ক্লাস না করলেও চলবে।

—না ভাই, আমার চলবে না।

—থাম্। কাল বাদে পরশু বিয়ে, শেষে পরীক্ষাই দিবি কিনা তার ঠিক নেই! যা বলছি শোন। তার ফোটো আছে তোর কাছে—

—কেন?

—দেখতাম।

শ্রাবণী হাসি চেপে জবাব দিল—থাকলে দেখতাম। তবে বয়স অল্প, দেখতেও ভালো।

—তাই নাকি, খুব ছেলেমানুষ! আমার আবার একটু বয়েস না হলে ছেলেদের ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না।

শ্রাবণীর সামনেই শ্রীহর্ষ ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় একটু হাসির রেখাও তার মুখে দেখতে পেল না, নিজের হাসির রেশটুকু মুছে ফেলে মুখখানা স্বাভাবিক করে মিনতির কথার যেই জবাব দিতে যাবে—তেমন ছেলেমানুষকে আমিও আমল দিই নে।

ভ্রু নাচিয়ে মিনতি বলল—তবে যে বড় আজকাল সাহেবপাড়ায় ঘাচ্ছিস ঘোড়াকে নিয়ে!

শ্রীহর্ষ এমনিতে গম্ভীর বলে অনেকে তার নাম horse দিয়েছে, এবং কেউ কেউ তারই বাংলা তর্জমা করে ঘোড়া নামে অভিহিত করে।

শ্রাবণী একটু চুপ করে কি যেন ভাবল, তারপর বলল—আমিও সোসাইটিতে যাই, ও যায়—দুজনে এক সঙ্গে পড়তে যাওয়াটা কি—

—না ভাই, তুমি ত জানো না। এর মধ্যেই ওই ইয়েরা বলাবলি শুরু করে দিয়েছে। আমি অবিশ্যি এসবের ভেতরে অসঙ্গত কিছু দেখি নে। তাছাড়া তোকে ত আমি জানি। ভালো ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করলে আখের গোছানো সহজ হয়। তবে ভাই তোমার Horseএর ভাবগতিক কেমন কেমন লাগে। মনে ত হয় যে, তোর ওপর টানটা অন্যরকম।

—ধ্যাৎ, তোমার যতোসব কল্পনা! ছেলেমেয়ের সম্পর্ক বুঝি একটাই হয়!

মিনতি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় প্রফেসর ক্লাসে ঢুকলেন। আপাতত আলোচনাটা মুলতুবি রেখে বেরিয়ে গেল মিনতি।

এই পিরিয়ডটা এমনিতেই ওর তেমন ভালো লাগে না, তার ওপর শ্রীহর্ষ ওইভাবে বিরস মুখে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াতে আরো খারাপ করে দিয়েছে মেজাজটা। অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মনটা এখন ওর গড়েরমাঠের একটি নিবিড় ভিজে-মধুর সন্ধ্যায় নিবিষ্ট। আরো কতো কথা—শিলিগুড়ির ওয়েটিং রুমের মিষ্টি সকাল, শ্রীহর্ষর ঘুমজড়ানো দুটি চোখের ভারি-ভারি পদ্মে যেন বিশ্বের ভাবং আবেশ সেদিন ভর করেছিল। ...শ্রীহর্ষর জন্মদিনের স্মারক উপহার ঘড়ির বন্ধু-জগতের বিন্দুমাত্র জায়গা দখল করে নেই, তবু তার চিহ্ন শ্রাবণীর বুকের তলায় কি এক দুঃসহ রিক্ততার তীব্র আলোড়ন তুলেছে। কতোবার মুছতে চেষ্টা করল কিন্তু কই পারল না ত! বুঝি এই অনুভূতির হাত থেকে কোনদিনই শ্রাবণী মুক্তি পাবে না। অথচ শ্রাবণী নিজে হাতে তুলে দেয়নি—শ্রীহর্ষ ওকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। সেদিক দিয়ে সত্যিই শ্রাবণীর দাবির কতোটুকু?

এই সিদ্ধান্ত দিল দু-মিনিটের শান্তি। কিন্তু দু মিনিট ত আর অন্তহীন নয়। আবার মনে হল একেবারে অনিচ্ছে থাকলে শ্রীহর্ষ কিছুতেই জোর করে কিছু নিতে পারত না। কই, প্রথম দিনে ত পারে নি। তবে সেদিনেই বা...! না, নিজেকে সাফাই দিয়ে ঠকানো যাবে না।

যাই হোক, বিয়ের কথাটা যখন রটতে শুরু করেছে তখন এটা শ্রীহর্ষর কাছে বলে রাখাই ভালো।

কিন্তু কি বলবে! কি করে বলবে? শ্রীহর্ষ কি মনে করবে! বড়জোর ভাববে যে, শ্রাবণী সেই মেয়ে যে প্রেমে উদার আর বিয়ের বেলায় বিদেশী। যদি শ্রীহর্ষ ওকে অন্য কোনো মেয়ের মতো মনে করে—মনে করে কমলার মতো শ্রাবণীরও কোনো নীতির বালাই নেই। যদি সে আর কিছু নাও মনে করে, এমনি যদি হাসে পায়, তাহলে—?

যতো গোলমাল এই বিজয়দার পা
রাগ হচ্ছে বিজয়দার ওপর।

পিরিয়ড ওভার হতে শ্রাবণীর উৎসুক দুটি চোখ ক্লাসরুমটা কয়েক বার ঘুরে ফিরে হতাশ ভাবে প্রফেসরের খালি চেয়ারটায় এসে থামল।

তাঁর মানে শ্রীহর্ষ ক্লাস করে নি।

কোথায় গেল?

ছেলেদের কমনরুমে হাট বসেছে তা ছাড়া শ্রীহর্ষকে সেখানে খোঁজার কোনো অর্থ হয় না। থাকলে সে লাইব্রেরীতেই রয়েছে। করিডরে দেখা হল মিনতি সেনের সঙ্গে। পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেও যাওয়া সহজ নয়। মিনতি ডাকল—এ্যাই কোথায় যাচ্ছিস?

—লাইব্রেরীতে।

—যাও, কিন্তু—

মিনতির বাক্য শোনার মতো ধৈর্য শ্রাবণীর নেই।

কিন্তু লাইব্রেরীতে শ্রীহর্ষকে পাওয়া গেল না। ফিরতে গিয়ে আবার কি মনে ক'রে বসে পড়ল শ্রাবনী। মিনতি সেন এখনো পাহারা দিচ্ছে, এখনই ফিরে গেলে ঘেরা শুরু করবে। এই এক আশ্চর্য স্বভাবের মেয়ে। মাসাড়ে পরীক্ষার আগে চুপ করে চলেছে, অথচ নিয়মিত ইউনিভার্সিটিতে আসা চাই। ফ্লার্ট!

বই-পত্র সামনে ছড়িয়ে শ্রাবনী নিজের কথাই ভাবছিল।

'আচ্ছা, ও নিজেও যদি মিনতি সেনের মতো হয়ে দাঁড়ায়! হয়তো, কে জানে হয়তে মিনতিও একদিন শ্রাবনীরই মতো শান্ত মেয়ে ছিল। 'হয়তো অনুরাগের আবেগ নিজেকে উজাড় করে দিয়ে, তারপর

না, না, এ ভাবে আবোল-তাবোল চিন্তা করলে জীবনে শক্ত মাটিতে দাঁড়ানো যাবে না। হঠাৎ নিজেকে ধমক দিল শ্রাবনী—কি এমন হয়েছে! একটা ছেলে একটি মেয়েকে চুমো খেয়েছে—খেয়েছে তাই কি হয়েছে! এই সামান্য একটু তিলকে তুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখলে—দেখা-পড়া মাথায় উঠবে। আর, শ্রীহর্ষ ওর বন্ধু। বন্ধুই যদি সে হয়, তাহলে তার সঙ্গে এমন সম্পর্ক হওয়া চাই যেটা কোনো দিনই কোনো কারণেই ম্লান হবে না।

ওর পিছনে কে যেন এসে দাঁড়াল।

কে?

—ও, তুমি! এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

—কমনরুমে একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম। ক্লাসে যাচ্ছিলাম মিনতিদি বলল তুমি আমাকে খুঁজছ।

শ্রাবনী বিব্রত ভাবে বলল—না, ঠিক খুঁজি নি।

—ও! তা ক্লাস করছ না যে!

—মাথাটা বড্ড ধরেছে।

কৈফিয়ৎটা এমন অনায়াসে এসে গেল যে শ্রাবনীর নিজের কানেও খারাপ বা অস্বাভাবিক ঠেকল না।

শ্রীহর্ষ বলল—মাথা ধরার দাওয়াই এখানে মেলে না। চলো একটু খোলা হাওয়াতে।

—যাবো?

প্রশ্নটার মধ্যে ঔৎসুক্যের মাত্রা এত বেশি যে শ্রীহর্ষ না হেসে পারল না।

পথে বেরিয়েও দু'জনের মধ্যে কথার কোনো বিনিময় ঘটল না। এসপ্ল্যানেডের ট্রামে উঠল ওরা। ট্রাম বদল করে সোজা এসে নামল থিয়েটার রোডের মোড়ে। শ্রাবনী এবার প্রশ্ন করে—কোথায় যাচ্ছি?

—এই একটু মিরিবিলি ছায়াঘেরা হাওয়া হাওয়া জায়গায় বসা যাবে চলো। তোমার সঙ্গে দু'টো কথা বলা দরকার। তা ভাবছি, সেকথা শুনলে মাথাধরা না বেড়ে যায়।

গম্ভীর হয়ে শ্রাবনী বলল—কথা আমারও ছিল। কিন্তু এভাবে ক্লাস-ফাঁকি দিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো—

—এটা ত নিয়ম নয়। তা ছাড়া মাথার এ অবস্থায় কি লেখাপড়া মগজে ঢুকত।

হেসে ফেলল শ্রাবনী। তারপর বলল—আচ্ছা এখানে একটু বসা যাক। ফেরার পথে কিন্তু—

ওর কথা শেষ হতে দিল না, শ্রীহর্ষ বাধা দিয়ে বলল—দোহাই আজ আর এসিয়াটিক সোসাইটিতে যেতে চেয়ো না। যদি রোজ পড়ো, তাহলে একদিন বাদ দিলে তেমন ক্ষতি হয় না—!

—না আমি বলছিলাম যে শিবু আর বনানীকে একবার দেখে গেলে হতো। ওরা কতো ক'রে বলে—

—বেশ তাই হবে।

একটা গাছতলায় কতকগুলি হিন্দুস্থানী ছাতুর দোকানে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। এ পাশে ওপাশে আরও কিছু লোক শুয়ে আছে ছায়াতে হাত-পা ছড়িয়ে। একখানা ঠেলা গাড়ি আর একটা গাছের সঙ্গে গেরো-বেঁধে কাপড় শুকোচ্ছে। হাওয়ার ঝাপটে কাপড় খানা নানা রকমের শব্দ করছে। সবুজ ঘাসের মখমলে চোখ দুটো যেন আরামে গা ঢেলে দিল আহা, —!

শ্রীহর্ষ কতকটা কিসফিসে সুরে বলল—যা শুনছি তা কি সত্যি?

একবার তার মুখের দিকে চেয়ে শ্রাবনী জবাব দিল—তোমার কি মনে হয়।

—সত্যি হতেও পারে! জানো—। প্রথমে শুনে খুব রাগ হলো।

—সে ত দেখতেই পেলাম।

—ভাবলাম—

ব'লে ধমকে শ্রীহর্ষ কি যেন ভাবছিল, একটা শুকনো

পাতা বেঞ্চের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে, ধীরে ধীরে আবার শুরু করল—থাক গে, যা ভেবেছি সেটা ছেলে মানুষী, তা আর শুনতে চেয়ো না।

তার কথার ভঙ্গী থেকে শ্রাবনীর মনে হ'ল যেন সে চাইছে যে শ্রাবণীর শুনতে ইচ্ছা হোক। অতএব শ্রাবনী বলল—কি? শুনিই না।

—নেহাতই শুনবে! আচ্ছা বেশ, কিন্তু তার আগে শুনেই ভুলে যাবে কথা দাও।

—না এটা বললে মিথ্যেই কথা দেওয়া হবে, রাখা যাবে না। আচ্ছা হর্ষ তুমি কি বিশ্বাস করো যে মানুষের মনে-রাখা না-রাখার মালিকানা তার নিজের হাতে?

—থাক, বাদ দাও ওসব। এখন বলো তো বিয়ের খবরটা কতটা খাঁটি?

—আমার সিঁথিতে কি সে রকম কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে হর্ষ।

—হেঁয়ালি কখনো-কখানো প্রাণঘাতী হয় শ্রাবনী।

—আরে বাবা, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি। আজ না হয় দুদিন বাদে আমাকে আমার মা পার করবেনই। এক জায়গায় কথা উঠেছে।

—কই সে কথা ত আমাকে বলো নি।

—বলবার মতো অবস্থা হলে ঠিকই বলব।

—তোমার বিয়েতে আমি নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যাবো এটা যদি আগে কল্পনা করতে পারতাম! থাক গে, সবই ভুল—

—কি হ'ল। কোথায় আবার কি ভুল করলে!

কথাটা আলতো ভাবে লঘু ভাবে বলল শ্রাবনী ইচ্ছে করেই।

—তুমি কি কিছুই বোঝ না?

—শোনো হর্ষ আজ একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো। আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে, প্রথম যেদিন বন্ধুত্বের সংকল্প হল সেদিন তুমি নিজেই বলেছিলে যে আমাদের এ বন্ধুত্ব নভেলের মতো দুই আর দুয়ে চার-এর মতো হবে না।

—তখন ভেবেছিলাম যা তা-ই বলেছিলাম। আর এখনো যা মনে হচ্ছে তা-ই জানাচ্ছি। এর মধ্যে ভায়োলেশন অব কন্ট্রাক্ট কিছু হল নাকি।

—তা ত হচ্ছেই।

—আচ্ছা শ্রাবণী তোমার কি মনে হয় যে মানুষ এই রকম ঈশ্বরের হিসেব চুক্তি মেনে চলতে পারে।

—না পারলেই বা চলবে কি করে!

—তা হলে আর একটু ভরসা দাও তো বলি—

—বলবার জন্যে ভরসার কোন দিন তোয়াক্কা করেছ না কি!

—না, ভরসা চাই আর একটু বেশি। মানে—

—মানে যাই হোক শোনাও—

—একটা বিয়ে করাই তোমার সিদ্ধান্ত, না কি যার সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে তারই সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা?

—শোনো এসব ছেলেমানুষী রেখে, এসো না মন দিয়ে এম-এ পরীক্ষাটা চুকোই!

—মন? মন কি আর দুটো আছে যে, একটা মনকে এদিকে রেখে অন্যটা দিয়ে পড়ীক্ষার পড়া সারবো!

শ্রীহর্ষর মুখের অবস্থাটা দেখতে ইচ্ছা করলেও সাহসে কুলোচ্ছে না—পাছে শ্রাবণীর মনটা দুয়ে পড়ে! কিন্তু চোখের দেখাটাই যে দেখার সবটুকু নয় তা শ্রাবণী জানে না। সে দিকে না তাকালেও ওর মন আশ্চর্য কোন রাসায়নিক কার্যকারণ সম্বন্ধ-বশতঃই হয়তো ভিজে গেল। ও বলল—সে ভদ্রলোককে আমি এক দিনই মাত্র দেখেছি। অসাধারণ পণ্ডিত, আর বিচিত্র একটি চরিত্র। ভালো চাকরীও করেন। সব দিক দিয়ে খতিয়ে দেখলে পছন্দ হওয়ার মতো মানুষ। ব্যস, এইটুকুই বলতে পারি। আর হ্যাঁ, এও বলা যেতে পারে, এখানে বিয়েতে অমত করা মানে বোকামী।

—তাহলে ত মিটেই গেছে।

—না, কিছুই মেটেনি। আমি এখন ও নিয়ে মাথা একটুও ঘামাচ্ছি নে। পরে যখন অবসর পাবো তখন—

—শোনো শ্রাবণী বলি-দেওয়ার প্রথাটা জবাই-এর চেয়ে এক দিক দিয়ে ভালো।

—দোহাই তুমি জবাই করো না।

—আচ্ছা হর্ষ তুমি কি মনে করো যে তোমাকে তেমন কোন ভরসা দিয়েছি, না কি চেয়েছি! একটা বোঝাপড়া থাকা দরকার, সেটা এই যে, বিয়ের পারঘাটার

পৌঁছবার জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের নৌকো যাত্রা করেছি। কেন যে তোমার মাথায় এই পোকাটা ঢুকল!

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে শ্রীহর্ষ বলল—কয়দিনের কথাটা—

শ্রাবণী বিচলিত সুরে কথা কেড়ে নিয়ে বলল—নিতান্ত তুমি এ কথা তুলবে। তারও জবাব আছে, 'এই ক্ষণকাল হোক সেই চিরকাল।' জীবনটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিতে না পারলে এই গড়ের মাঠে কি জন্যে আসো? অত ছোট করে নিজেকে বেঁধে রাখলে কোন দিন বিরাটত্বের নাগাল পাবে না হর্ষ! আমি কেবল সেদিনের ওই ব্যাপারটার কথাই বলছি নে—

—আমার বড় হয়েও কাজ নেই, ভালো হতেও সাধ নেই—যদি জীবনের স্বাদটুকুই ঘুচে যায় তবে বেঁচে থা রে গরজই বা এত কিসের!

—তোমার মত বুদ্ধিমান মানুষ না হর্ষ!

—মানুষই কথার খাতিরে কি মনের ভাবটা চলে? তোমার লক্ষ্য যেমন আকাশ, আমার তেমনি জল-মাটি ফুল-ফল।

হেসে ফেলল শ্রাবণী, বলল—অবুঝ শুকর মতো আকাশে ঝুলে থাকার স্বপ্ন দেখিনে। তবে আকাশ আমাকে আকর্ষণ করে—তা বলে কি মাটিকে অস্বীকার করতে পারা যায়!

—আমার একটিই আকাশ, সে হচ্ছ তুমি! আগেও ছিলে, পরেও থাকবে।

—এসব পাগলামী রেখে চলো ওঠা যাক।

—বিরক্ত হচ্ছো?

—না তা নয়! কথার ফুলঝুরি ছড়ালে পরে তার জন্যে ভুগতে হয়। মুখে যাই বলিনে কেন, আমিও ত মানুষ!

—মানুষ যদি ত মানুষের মতোই চলো না কেন!

—আমার ত তাই ইচ্ছে। কিন্তু তোমরা শুধু মেয়েমানুষের মতো দেখতে চাও, আমার তাতেই আপত্তি।

—ও, তাই বলো। আচ্ছা তাহলে মানুষের সংজ্ঞাটা তোমার কাছে কি ধরণের সেটা বুঝিয়ে দাও—

—খুব সহজ। এর আগেও কতো দিন বলেছি—মুখে স্পষ্ট না বললেও আমার চলাফেরা আচরণের মধ্যে দিয়ে সেটাই প্রকাশ করতে চাই। অর্থাৎ আমি মেয়ে হয়েছি, প্রকৃতির আইনকে অস্বীকার না করেও ব্যক্তির বিকাশ করার জন্যে আমার মনে আর চিন্তাকে—

—দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি হঠাৎমতো দার্শনিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছ। এসব কি তোমার নিজের উপলব্ধির কথা? না কি অঙ্কের চাপানো কোনো তত্ত্বের গাঁজলা?

—আবার একটা ভুল হল। আমার এ বয়সটা যাঁর ইচ্ছের বড় হয়েছে তাঁর সঙ্গেও সব সময় মতে আমার মেলেনি, তবু সেই মানুষটার আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আমাকে অনেকখানি গড়ে তুলেছে। তার সবটুকু হয়তো নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারেনি, তাই কিছুটা গাঁজলা বলতে পারো, তবে ষোলআনা নিশ্চয়ই নয়।

—তারপর বলো। কথার স্রোত বড় সাংঘাতিক বস্তু, তবে কোনো জায়গায় যে আমি কোনো কথাই বলিনে তাই তোমাকে কাছে পেলে যা ইচ্ছে তাই বলি। রাগ করো না—

—না, রাগ-অনুরাগ কোনটাই এত অল্পে আমার হয় না। যা বলছিলাম, আজ বিয়ের ভাবনাটা আমার কাছে আদৌ বড় নয়। আজ কেন, হয়তো কোনদিনই তেমন বড় হয়ে উঠবে না। আমি কি চাই জানো?

—কি, বলো?

—শুনে হাসতে পাবে না।

—না, না, হাসব কেন!

—আমি অনেক বড় হতে চাই। আমি কেবল ধানজমি হয়ে ফসল ফলিয়ে জীবনকে ভুরিয়ে দিতে চাইনে। আমার মনে বাগানের বড় শখ। আমি নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে চাই, নিজের মতো করে।

শ্রীহর্ষ অনাবশ্যক ভাবে গা-ঘেঁষে এসে বসে বলল—তোমার এই চাওয়াটুকুই আমি চেয়ে আসছি। আমাকে আপন করে তোমার কাজে লাগাও, ব্যস—

আরও কিছু কথা শ্রাবণীর ঠোঁটের ডগায় এসেছিল কিন্তু শ্রীহর্ষর সান্নিধ্যটা নজরে পড়তে মনেমনে ও শিউরে উঠল। এমনি করেই হয়তো বয়সের জোয়ারের টান ওদের আবার কোনো দৈহিক চুক্তির দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এই ভেবে ও বলল—বড্ড বেঠা পাচ্ছে। অনেক বকবক করেছি!

—চলো কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়ে—

—না বাবা, আজে পরচে আমি নেই। এ—

—আমিত রয়েছি।

শ্রীহর্ষর কণ্ঠস্বরে প্রাণময়তা।

শ্রাবণী বলল—আমি পয়সাকে তফাৎ দেখিনে, সে তোমারও যা আমারও তাই। এ পাড়ার বেস্টুরেন্টগুলো তাকাত।

—আজত মাত্তর একটা দিন। কাল থেকে আবার সিরিয়াস স্টাডি। মাও চলো।

শ্রাবণীর আপত্তি টিকল না।

ওরা দুজনে একটা এয়ারকণ্ডিশন্ করা রেস্তোরাঁয় এল। বিকেল এখনো পুরোপুরি জমেনি, তাই পরিষ্কারের ভিড়ও বিশেষ নেই।

এরকম রেস্তোরাঁয় শ্রাবণী খুব কমই এসেছে। হ্যাঁ একবারই এসেছে, শিবু আর বনানীর আবদারে রাখতে। সেদিন অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। মায়ের কাছে সে বাবদে বকুনীও কম খায়নি শ্রাবণী। আজ ঢুকেই ওর মনে হচ্ছে ভাই-বোনকে নিয়ে এলে বেশ হত। কিন্তু আজ টাকাও নেই। অতএব আরও খারাপ লাগছে। শ্রীহর্ষ ওদিকে মেনুকার্ড নিয়ে ছমড়ি খেয়ে পড়েছে। সেদিকে নজর পড়েও শ্রাবণী সঙ্কুচিতভাবে বলল—স্রেফ চা! চা ছাড়া কিছু চলবে না।

—বাঃ! তাই হয় নাকি? আইসক্রীম খাও, ডেন্টার সময় চা কি খাবে!

—বা-রে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে চায়ের মতো শীতল পানীয় আর কিছু হয় নাকি?

—তা হোক! নজরটা অমন ছোটো করছ কেন। আজ আমার কাছে টু পাইস হাজ! স্কলারশিপের টাকা—

—তাই বলে ফুটফড়াই করতে হবে নাকি! আমি স্রেফ চা! চাওতো আইসক্রীম খেতে পারো তুমি।

—না, সেম কর মি।

ওরা দুজনে এখন বেশ সহজ হয়ে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল।

শ্রাবণীর মনে হচ্ছে যেন বড় পিয়ানোটার এক কোণে ঘাড় করানো বুড়ো পুতুলটা পাগড়ী হেলিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

শ্রীহর্ষর চোখেমুখে খুশির আমেজ।

চায়ের সরঞ্জামে টেবিলখানা ভর্তি হয়ে গেল।

শ্রাবণী জলের গ্লাসটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—যদি এইরকম ঠাণ্ডা জল সবসময় পেতাম তাহলে শুধু জল খেয়েই কাটিয়ে দিতাম।

হঠাৎ ওর পিছন থেকে খুব চেনা গলায় কে বলল—ইস্ বৃষ্টির জলে আমি ভিজে একসা হয়ে গেলাম।

প্রথমে শ্রীহর্ষর দিকে তাকাল শ্রাবণী, তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল। পরক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—কি অবাক কাণ্ড! আপনি—আরে বসুন, বসুন। এই অনীতা বস না! কি ভাগ্যি আমার, এখানে এসেছিলাম তাইত আপনার দেখা পেলাম।

বিজয়ব্রত একগাল হেসে বসে পড়লেন। অনীতা প্রথমে দাঁড়িয়েই রইল, তারপর বিজয়ব্রতের হাবভাব দেখে বসল।

শ্রাবণী বলল—হর্ষর সঙ্গে আপনার আলাপ নেই?

বিজয় বললেন—নেই বলেই ত মনে হচ্ছে।

শ্রীহর্ষ একটু বাঁকা হাসি হেসে মাথা নাড়ল—আপনার মনে না থাকারই কথা। সেবার অনীতা পরিচয় করিয়ে দিল কফিহাউসে।

—ও, হ্যাঁ। আপনি একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, মনে পড়ছে বটে। ভেরি গুড।

পরক্ষণে তিনি সিগারেট ধরালেন, শ্রীহর্ষকেও দিতে গেলেন, সে 'ধন্যবাদ' বলে প্রত্যাখ্যান করল।

বিজয় হাসলেন—ও আপনার চারমিনারে আপত্তি বুঝি!

—না, মিনাস, ক্যাপ্সুল, কোনো কিছুতেই আমি হ্যাবিট নই।

অনীতা মুখ বুজে বসে আছে, মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে।

বিজয়ব্রত শুরু করেছেন ভ্রমণের গল্প। এর মধ্যে কালিমপং থেকে সে মাসি খান-চারেক চিঠি লিখেছে, দিল্লীতে ফিরে তিনি সেগুলি পেয়েছেন।

শ্রাবণী বলল—সেখানে কি দেখে এলেন বলুন।

—আরে ভাই সেখানে গেলে কি আর আজ এখানে দেখতে পেতে আমাকে! আমরা সেদিন বাড়ির দরজার

সামনে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যতটুকু দেখতে পাই তাইই তেকুর তুলে খবরের কাগজের পাতা বোঝাই করি।

—তবু।

—সেকথা পরে হবে। এখনো দিন তিনেক মেয়াদ রয়েছে। পরশু এসেই তোমার কথা ভেবেছি—

—থাক থাক! আমি অতো বোকা নই বিজয়দা। দুদিনে সময় করতে পারলেন না। ভাগ্যে হর্ষ এখানে টেনে আনল—

—বিশ্বাস করতে না চাও উপায় নেই। কেন না মনের ভেতরটাতে খুলে দেখাবার কৌশল শিখিনি। জরুরী কথা আছে, মাসিমাকে বলো যাবো। হ্যাঁ ভালো কথা ভবেশকে চিঠি দিয়েছ?

—বা-রে, আমি কেন চিঠি দেবো! তবে না হয়তো লিখে থাকবেন সে কিছুদিন সবুর করতে হবে।

—অনুমান করছি সেইরকম কিছু ঘটেছে! নইলে শ্রীমান এরকম উদ্ভ্রান্ত হয়ে একই কথার ওপর জোর দেবে কেন!

—কি কথা?

—অবিলম্বে এই পত্রকে টেলি মনে করিয়া উদ্বাহ-বন্ধনের দ্রুত বন্দোবস্ত করহ! আমি এতখানির জন্যে তৈরী ছিলাম না। যে ছেলে বিয়ের নামে তেড়ে মারতে আসতো সে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। এই অরক্ষণীয়াকে ঠেকিয়ে রাখা খুব মুস্কিল।

—অথচ উনি নিজেই ত আমাকে বললেন ব্যস্ত হবার কিছু নেই। অবসর হলে—

—থামো! অবসর সে ঘোড়ায় চড়ে তেড়ে আসবে তা কে জানতো!

অনীতা আর শ্রীহর্ষ দুজনেই নাচার বেচারার মতো মুখ বুজে বসে আছে। ওরই মধ্যে অনীতা একবার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে মুখের পরিপাট্য ওধরে নিয়েছে। কব্জি ঘড়িটা বিজয়ব্রতর চোখের সামনে এগিয়ে এনে বলল মরীয়া হয়ে—এরপর আর কখন যাবেন!

—রাখো, ঘড়ি আমারও আছে।

পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—সিনেমার টিকিট কাটা আছে ভাই। যাবো, কালই সকালে, বলে রেখো মাসিমাকে।

অনীতা আর বিজয়ব্রত যেন শ্রীহর্ষের নিবিড় ছন্দের তাল কেটে দিয়ে গেছে। চায়ের পালা চুকিয়ে এখন উঠে পড়তে পারলেই যেন শ্রাবণী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এই বেচারী শ্রীহর্ষকে যদি বা সহজ অবস্থায় আনা গিয়ে ছিল, তা যেন সইল না ওদের।

শ্রীহর্ষ মন্তব্য করল—ভদ্রলোকের পেশা ও শুনেছি সাংবাদিকতা। কিন্তু উনি সব সময়ই অনীতাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন। দেখলে মনেও হয় না যে দুনিয়াতে কোনো দায়িত্বের বালাই আছে ওঁর।

—তোমার ওই রকম কথা। এই ত শিলিগুড়িতে যখন গিয়েছিলেন, যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কাটাতেন ততক্ষণ বেশ জমিয়ে রাখতেন—আবার ভাখো সেই মানুষটা দিনের পর দিন বেপাত্তা! হয়তো আসামের সীমান্তে ঘুরছেন, কিম্বা পাকিস্তানেও যেতে পারেন। আমার খুব পছন্দ হয়—

—তো তো হবেই। তোমার বিয়ের ঘটকগিরি করছেন যে—

—যা-ই বলো, তাতে আমার গায়ে চিড় খাবে না। তবে হ্যাঁ, অনীতাকে কেমন লতা-সতা লাগে। বিজয়দাকে কেবলই আগলে রাখতে চায়। শুধু বিজয়দাই বা কেন, ওর ওরকম দাদা আরো আছে—।

রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে গা দিয়ে অনীতা চোখ ঘুরিয়ে বলল—এবার নিজে চোখে দেখলেন ত! আপনার শ্রাবণী কি রকম উড়ছে।

—কই, দিব্যি বসে বসে চা খাচ্ছে ত!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওকেই ওড়া বলে। আমি কতো দিন বাসে করে যেতে যেতে ওদের এ পাড়ায় ঘুরতে দেখেছি! আর আপনি ওর বিয়ের জন্যে এমন ব্যস্ত হয়েছেন—। ধানোধা একজন ভদ্রলোককে জেনে শুনে সারা জীবন অশান্তিতে ফেলার কোনো মানে হয়।

—অশান্তি!

কথা শেষ হবার আগেই একখানা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামালেন বিজয়ব্রত—এই ট্যাক্সি।

গাড়িতে গুছিয়ে বসে বললেন—শোনো অনু! তেমন যদি কোনো গোলমেলে কিছু থাকতো ত শ্রাবণী নিজেই আমাকে বারণ করত। ও মেয়ে অন্তর্জাতের—

বিজয়ব্রতর কোলের ওপর একটা কিল মেরে অনীতা অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে বলে—জ্ঞান তুলে খুব যে কথা বলা হচ্ছে! অমন ঢল-ঢল চোখের চাউনি থাকলে আমিও জ্ঞানে উঠতে পারতাম বিজুদা। তুমি কথায় কথায় অমন ঠেস দিয়ে কথা বললে বড় কষ্ট পাই। না হয় তোমাকে আমি মরেছি তাই বলে এমন ঘা দিয়ে কেনো কথা বলো।

বিজয়ব্রত ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—আমি কি তাই বলেছি! ও মেয়েটা তোমারই মতো সরল, তবে ওর দীপ্তি অসাধারণ—

—দীপ্তি ওর যতোই থাক তুমি এ বিষয়ে মাথা দিতে পাবে না! চোখের ওপর সবাই দেখছে শ্রীহর্ষকে ও মাছাচ্ছে! এরপর বড় লোকের বৌ হয়ে ও দিব্যি দেশ-সাইডে চলে যাবে আর শ্রীহর্ষর মতো হীরের টুকরো ছেলে ব্যর্থ-প্রেমিক হয়ে মরবে। লাইকটাই নষ্ট। তা ছাড়া তুমি ত বলতে পারো না জোর করে, যে, ওই মেয়েকে নিয়ে ভবেশবাবু সুখী হবেন। না, না, আমার গা ছুয়ে তুমি প্রমিস করো বিজুদা, আমার বড্ড ভয় করে —শেষ তোমাকে ডুববেন ভবেশ বাবু!

—অনু এটা তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এসব বাদ দিয়ে তুমি নিজের কথাটা একটু ভাবো বেশি। এই ভাবে যে আমার সঙ্গে সবকিছু করছ, এরপর হোয়াট উইল বি ইওর রিএ্যাক্শন?

—আমি, আমি, আমি। আমার যা ইচ্ছে তাই করবো। তোমার যদি এতই খারাপ লাগে তাহলে গাড়ি থামাও নেমে যাচ্ছি—

—আহা রাগ করছো কেন অনু। একটা কথা কি জানো, যদি কোন দিন জানা-জানি হয় তখন সবাই আমাকেই দায়ী করবে। অবিশ্যি আই ডোণ্ট মাইণ্ড! কিন্তু তোমার জীবনটা সবে শুরু হচ্ছে। আমি আর তোমার চিরকালের পেরাম্বুলেটর হয়ে থাকতে পারব না—তোমার দিদি আছেন, সংসারের শতেক ঝামেলা রয়েছে, আই উইল বি লস্ট টু ইউ। সেও আমরা না জানি তা নয়!

বিরক্তিতে অনীতার ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হল, হাত নেড়ে বলল—জানি, জানি, জানি। আমি জানি। তুমি জানো, সবাই জানে। কিন্তু জানলেই বা উপায় কি। আমি পারিনে—না পারলে কি করব! ওঃ, আমার চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেলে বেশ হতো।

—কি হতো!

—তোমাকে দেখতে পেতাম না। না দেখলে ত আর এই ভাবে মাথা খারাপ হয়ে যেত না।

বিজয়ব্রত চোক গিলে বললেন—হুঁ! বাঁচানো যাবে না দেখছি!

চিমটি কেটে অনীতা ধমকের সুরে ফোড়ন দেয়—আচ্ছা! আমাকে বাঁচাবার জন্যেই উনি ভেবে সারা! প্লিজ তুমি শ্রীহর্ষকে বাঁচাও আর তার আগে ভবেশকে।

একদা অনীতা ভবেশকে বিয়ে করবার জন্য রীতিমত ঝুঁকে পড়ে ছিল কিন্তু ভবেশ নাকচ করে দিয়েছে। বোধ করি সেই জন্যেই শ্রাবণীকে ভবেশের পছন্দ হওয়াটা অনীতার আদৌ পছন্দ নয়।

পরদিন সকালে শ্রাবণী বার বার জানালায় এসে দাঁড়াল। যদি বিজয়ব্রত আসেন এই আশায়। এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল: বিজয়কে আসতে দেখলে নীচে নেমে গিয়ে ওপরে আনবে, আর সেই সময়টুকুর মধ্যে ছোট্ট একটি কথা বলে দেবে—কাল যে সাহেব পাড়াতে বেড়োনোর শ্রীহর্ষর সঙ্গে চা খাচ্ছিল শ্রাবণী এই ঘটনার কথা যেন উল্লেখ না করেন। এই লুকোচুরির জন্যে নিজেকে অন্যের কাছে ছোটো করতে ওর খারাপ লাগে—অথচ অন্য ভাবে ত অশান্তি এড়ানো যাবে না!

অবিশ্যি যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে মায়ের কাছে ও বলেছে —বন্ধুটার কদিন জ্বর হয়েছে। হস্টেলে থাকে ত— 'দেখতে গিয়েছিলাম। বেশ ভুগছে মেয়েটা। অবিশ্যি ওরা খুব যত্ন করে, তবু অসুখবিসুখের সময় আপন কেউ কাছে না থাকলে এতো অসহায় মনে হয়! সেই যখন পি.জি হস্টেলে আমার জ্বর হয়েছিল তখন বালিশে মুখ গুঁজে বুড়ো মেয়ে এই আমি কি কান্নাই কেঁদেছি।'

সব শুনে মালিনী বলেছেন—তা ওকে এখানে নিয়ে এলেই পারিস। যে কটা দিন শরীর না সারে, এখানে

থাকুক না। আজই নয় ওরা পর হয়ে গেছে, নইলে আপন বোনঝি ত। কতো আপন হবার কথা!

এই প্রসঙ্গেই বিজয়ব্রতের সঙ্গে দেখা হওয়াটা ছুড়ে দিয়েছে শ্রাবণী। হ্যাঁ পথে দেখা হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু তার জায়গায় রেস্তোরাঁর পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে একা-একা বসে সময় কাটানোটা ত বরদাস্ত করা যায় না।

লুকোচুরি করলে নিজের চোখেও ছোটো হয়ে যেতে হয়। এ যেন নিরন্তর অবনমনের বোঝা! না, ভালো লাগে না। যা হবার তা হয়ে গেছে। এই ধরণের গা ভাসিয়ে চলার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকে হুঁশিয়ার হতে হবে। আচ্ছা, বিজয়দা কি মনে করলেন? খারাপ কিছু ধরে নেননি তো! আর যদি নিয়েই থাকেন তাহলেই বা শ্রাবণী কি করতে পারে। ছি, ছি, এই কি পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের সিরিয়াস স্টাডি!

কই এখনো ত এলেন না বিজয়দা!

না বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মোটেই ও উতলা নয়। ও শুধু অবশ্যম্ভাবী অঘটনকে সামলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। যা হয়ে গেছে তার চারা নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে না হয় সাবধানই হবে। আর সাবধান হতে চায় বলেই ত বর্তমানকে এ ভাবে বাঁচানোর প্রয়াস।

বেলা হল।

বিজয়ব্রতের জন্য উদ্বিগ্ন মন নিয়ে শ্রাবণী কলেজে বেরুলো। পথেও একটুখানি দাঁড়ালো কিন্তু বিজয়ব্রত এলেন না তখনো।

সারাটা দিন দুশ্চিন্তায় কাটল ওর। ক্লাসের পর সোজা বাড়ি চলে এল, শ্রীহর্ষ বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছিল, ও কাটিয়ে দিল কাজের অছিলায়। বনানীকে দেখতে যাওয়ার কথাও বলল, শ্রীহর্ষ, ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারল না। কেন না ইতিমধ্যে বিজয়ব্রত হাজির হয়ে কেলেঙ্কারী পাকিয়ে রেখে গিয়ে থাকেন ত সেটার ধকল পোহাতে হবে। আর যদি না এসে থাকেন তাহলে এখনো 'সিচুয়েশন' রক্ষার সুযোগ পাওয়ার আশা রয়েছে।

উন্মনা শ্রাবণীকে ট্রামে করে গলির মোড় পর্যন্ত শ্রীহর্ষ পৌঁছে দিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ

—ছয়—

চা এর গোড়ার কথা

বীরেশ্বর বসু

চা নার্সারী সম্বন্ধে পূর্ব সংখ্যায় কিছু বলেছি কিন্তু আরো কিছু বলবার রয়ে গেছে তা স্থানান্তরে বলবো। নার্সারীতে তো বরাবর চা গাছ থাকে না এবং একে অন্যত্র রোপণ করতে হয় একথা আগেই বলেছি। অন্যত্র যেখানে এই চারাগাছ রোপণ করা হয় তাকেই নানাভাষায় নানাপ্রকার বলা হয়। যেমন বাংলাতে আমরা বলি চা বাগান, হিন্দীতে অথবা নেপালীতে ফিয়া বাগিচা কিম্বা চিয়া কামান এবং ইংরাজীতে টি গার্ডেন অথবা টি ষ্টেট। এখন এই চা বাগান বা টি গার্ডেনের জমি কিভাবে তৈরী করতে হয় সেই কথা বলবো।

বাগানের জমি তৈরী করার বেলাতেও নার্সারির অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই জমিও উচ্চমরূপে পরিষ্কার ও চারাগাছ রোপণ করা হতো সেকথা আজকার এই বৈজ্ঞানিক যুগে একটা প্রহসন মাত্র। আগের দিনে সাধারণত জমির সমস্ত ঘাস লতা পাতা কেটে বা তুলে ফেলে পোড়ানো হতো। 'এলিফ্যান্ট গ্রাস' নামক এক জাতীয় ঘাস চায়ের দেশে প্রায়ই দেখা যায়। এই ঘাস আমাদের দেশের শন খড় জাতীয় গাছের মত দেখতে। পাতাগুলো শনখড়ের মতই খসখসে তবে আরো মোটা, চওড়া ও লম্বা। এই ঘাস শিকড় সমেত তুলে কিনারে রেখে দেওয়া হতো। চারাগাছ-গুলোকে সূর্যের উত্তাপের হাত থেকে রক্ষা ও জমিটাকে আর্দ্র রাখার জন্য। একথা আগেই বলেছি যে বীজ রোপণের সময় সাধারণত নভেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত। এই সময়ে বৃষ্টি বড় একটা হয় না। তারপর এই জমিতে চার পাঁচ ফুট অন্তর সরু দুফুট আড়াই ফুট লম্বা এক একটা বাঁশের কাঠি পোতা হয়। আর প্রতি কাঠির গোড়াতে এক একটি চায়ের বীজ রোপণ করা হতো। এই কাঠি দেওয়ার কারণ অন্য কিছুই নয়, একে ধরে চারাগাছটা বাড়তে থাকে। কিন্তু এই প্রকার রোপণে দেখা গেছে যে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ বীজ অঙ্কুরিত হতো না। তবে এইরকম রোপণেও অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকম সফল পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সুফলের মূলে জমি তৈরির কোন কৃতিত্ব ছিল না। এইসমস্ত ক্ষেত্রে গেছে ঐ জমির উর্বরতার শক্তি এমনিতেই বেশি ছিল এবং উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি পেয়েছিল। জমি তৈরীর এ প্রথা ছিল শুধু পতিত জমির বেলাতেই, যেখানে কেবলমাত্র ঘাস লতাগুল্মই জন্মাতো। কিন্তু বনজঙ্গল বা ফরেষ্টের জমি যেখানে বড় বড় গাছ থাকে সেখানকার বেলাতে অন্য উপায় অবলম্বন করা হতো। এখন এই ফরেষ্টের জমি কি করে চা চাষের উপযোগী করা হতো তাই বলছি। ফরেষ্টের এই জমি সাধারণত তৈরী করা হতো বর্ষা অন্তে। এই সময়ে জমির বড় বড় গাছগুলির বড় বড় ডালগুলি কেটে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো। কিছুকাল বাদে ঐ গাছগুলি কাটা হতো কিছু গাছের মূল শিকড় বা গোড়াটা মাটিতেই রয়ে যেত। আবার আগুন লাগানো হতো। তারপর জমিটাতে খুব উত্তমরূপ কোদালী মেরে সমস্ত ছোট ছোট শিকড়-গুলোকে বেছে ফেলে দিয়ে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বীজ রোপাই হতো। কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বনের কুফল অচিরেই দেখতে পাওয়া যায়। গাছের শিকড় বা গুঁড়ির কাছে যে সমস্ত চাগাছ তা ক্রমান্বয়ে সবই মরে যাচ্ছে। পরে দেখা গেল গাছে পোকা ধরেছে এবং এই পোকার উৎপত্তি হচ্ছে ঐ শিকড় বা গুঁড়ি থেকে।

এইজন্য আজকাল সমস্ত জমিটা ভালভাবে পরিষ্কার করে গাছগুলো শিকড় বা গুঁড়ি সমেত তুলে ফেলে

দেওয়া হয়। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে বাগানের মাঝে মাঝে দু চারটে নিরোগ সবুজ গাছ থাকা একপক্ষে ভাল। কারণ এই গাছগুলো ছোট চারাগাছগুলোকে ছায়া দেয়। এছাড়া রৌদ্রের মধ্যে যারা বাগানে কাজ করে তাদেরও কাজ করতে সুবিধা হয়। হাওয়া আর ছায়া দুইই পায়। তবে এর মধ্যে কয়েক প্রকার গাছ আছে যা কখনও বাগানের মধ্যে অথবা আশপাশে রাখা উচিত নয়। যথা—শাল, চিলউনি, বাবলা, কদম ইত্যাদি। জমি পরিষ্কার এবং শিকড় বা গুঁড়ি তুলে ফেলার পর হেক্টর পরিমাণ গভীর কোদালী মেরে মাটি খুঁড়ে ওলটপালট করে আলগা করে দিতে হয়। এর মধ্যে যেসমস্ত ছোট ছোট শিকড় গুঁড়ি বা পাথর থাকে সেগুলোকে এক জায়গায় জমা করে মজুর দিয়ে রাস্তায় বা দূরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়। তবে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বাগানের কর্তৃপক্ষেরা ঐ পাথরগুলো অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজে লাগান। রাস্তা, নালা কিম্বা বাঁধ অথবা হয়তো কি ঘরবাড়ি তৈরী করার কাজে লাগান। বিশেষত যে সমস্ত বাগান ঠিক পাহাড়ী উঁচু নীচু জায়গায় সেসব ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই ঐ পাথরগুলো দিয়ে বাগানের চাউনারি লাইনে একটা বাঁধের মত কিছু তৈরী করেন যাতে উপর থেকে মাটি ধসে বাগানে গাছের গোড়ায় না পড়ে বা নালা বন্ধ না হয়ে যায়।

১৯২৯—৩০ সালে যখন চায়ের বাজারে কাটল ধরে তখন গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করে নতুন বাগান খোলা বন্ধ করে দেন। অবশ্য এর মধ্যে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে দু-চারটে বাগান খোলার অনুমতি দিয়েছেন সত্য। এই নতুন আইনে গভর্ণমেণ্ট রিপ্ল্যাটেসনের অনুমতি প্রদান করেন। তবে এই অনুমতি শুধু ৩১শে মার্চ ১৮৩১ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত গাছযেকে পাতি তোলা হয়েছে সেখানকার পক্ষেই প্রযোজ্য।

রিপ্ল্যাটিংএর প্রশ্ন ওঠে যখন গাছের উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। নিম্নলিখিত কারণে গাছের উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়।

(১) গাছ বয় পুরনো হলে।

(২) তাদেরূপ চাষআবাদ না হওয়ায়, জমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হলে অথবা পোকামাকড় ধরে গাছের মৃত্যু ঘটলে।

(৩) উপরোক্ত কারণ ছাড়া যদি কোন খারাপ জাতের বীজের গাছ হয়। কারণ এই জাতের গাছে উপযুক্ত পরিমাণ পাতি পাওয়া যায় না। তাই এই ক্ষেত্রে ঐ গাছ তুলে অন্য ভাল জাতের গাছ রোপণ করা।

একথা সকলেই জানেন যে মানুষের জীবনধারণে যেমন অনেক প্রকার খাদ্য, ওষুধ প্রভৃতি অনেক কিছুর প্রয়োজন তেমনি সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের পক্ষেও দরকার। মানুষের যেমন জলের প্রয়োজন উদ্ভিদেরও তেমন দরকার। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে যেমন ক্ষতি করে, গাছের বেলাতেও ঠিক তাই। এইজন্য বাগানের জমি তৈরী করার সংগে সংগে অর্থাৎ গাছ রোপণের পূর্বেই জল নিকাশের মূল নালাগুলিও তৈরী করতে হয়। আগেই বলেছি—গাছের গোড়ায় বেশিক্ষণ জল জমা থাকা বিশেষ ক্ষতিকর আবার মাটিটা শুকিয়ে একেবারে খড়খড়ে হয়ে যাওয়াও ভাল নয় তাই নালা বা ড্রেনের বিশেষ প্রয়োজন। এই নালার সাহায্যে অতিরিক্ত জলটা বাগান থেকে বেরিয়ে যায় অথচ এই নালার তলাটা জলে ভিজে থাকার দরুণ মাটির সেই রসটা গাছের শিকড় টেনে নিতে পারে। এইজন্য নালা বা ড্রেন তৈরির সময়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে অতিরিক্ত জলটা কোথাও না দাঁড়িয়ে যথাস্থানে নেমে যায়। আগেরদিনে অনেকেরই ধারণা ছিল জমি বা মাটি একটা 'ফিল্টার' বিশেষ। তাই তারা নালাগুলি এমনভাবে তৈরী করতেন যাতে নালার সমস্ত জলটা বাগানের জমির ওপর দিয়ে বয়ে যেত। তারা জানতেন এইরূপ করলে জলের মধ্যে যে সমস্ত মূল্যবান খাদ্য থাকে সেগুলি গাছ আহরণ করে নেবে। কিন্তু জমির কি পরিমাণ জল টেনে নেওয়ার সামর্থ আছে সে বিচার করেন নি তারা। ফলে মাটির প্রয়োজন অতিরিক্ত জলটা জমির উপরে জমা থেকে যেত। এতে গাছের খুব ক্ষতি হতো।

বৃষ্টির জলে যে গাছের একপ্রকার মূল্যবান খাদ্য থাকে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এতে নাইট্রোজেন আছে। ইংলণ্ডে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাতে নাকি বছরে একর প্রতি তিন থেকে পাঁচ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আছে, আমেরিকাতে বছরের বারিপাত হয় সাধারণত

চল্লিশ বিয়াল্লিশ ইঞ্চি। তাহলে এই হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাই আসাম, ডুয়ার্স, তেরাই, দার্জিলিং প্রভৃতি বারিপাত যখন একশো থেকে একশো সত্তর পঁচাত্তর ইঞ্চি তখন এখানকার জমিতে কমপক্ষে পনর থেকে ছাব্বিশ সাতাশ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পায়। প্রকৃতপক্ষে যদি সমস্ত নাইট্রোজেন জমিটাতে পায় তাহলে জমির উর্বরাশক্তি নিশ্চয়ই বাড়বে। তবে এখানে আর এক সমস্যা হচ্ছে যে সমস্ত জমি ও গাছের গোড়া দিয়ে চলতে দিলে গাছের গোড়ার মাটি ধুয়ে তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজন চলে যায়। এখানে বিশেষ নজর রাখা দরকার যাতে জমির জল নিকাশের সঙ্গে বেশি পরিমাণ মাটি না যায়। অবশ্য সমতলক্ষেত্রে এই ভয় ততটা নেই। তবে ড্রেনের কিনারা ভেঙে বা ধসে যাওয়া দুই ধারের মাটিতে কোনরূপ কোদালী না দেওয়াই শ্রেয়। আর ড্রেনের ধারে দিয়ে যদি সবুজ সার অর্থাৎ বোলা মেডালোয়া অথবা অড়হর কিম্বা ধইঞ্চা রোপণ করা হয় তাহলে ড্রেনের দুধারের মাটি ধসে বা ভেঙে পড়ার ভয় অনেকটা কমে যায়।

ড্রেনের সংখ্যা এবং মাপ নির্ভর করে জমির মাটির ওপর। যে জমিতে বালির ভাগ বেশি সেখানে সাধারণত ড্রেন সংখ্যা কম করতে হয় কারণ বালি মাটির চেয়ে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে জল টানতে পারে। এই জন্য এই সমস্ত বেলে জমিতে ড্রেন সংখ্যা বেশি করলে অল্প বৃষ্টির সময়ে জমিটা জল শূন্য অথবা শুকিয়ে যাবে। তাই এই রকম জমিতে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন থেকে আশি পঁচাশি ফুট ব্যবধানে ড্রেন তৈরি করা উচিত। অথবা যে সমস্ত জমিতে মাটির ভাগ বেশি সেখানে বিশ পঁচিশ ফুট থেকে চল্লিশ ফুটের মধ্যে ড্রেন করা দরকার কারণ এই জমি বেলে জমির মত জল টানতে পারে না। এই ড্রেনগুলির গভীরতা সাধারণত আঠারো ইঞ্চি থেকে চব্বিশ ইঞ্চি হওয়া দরকার। তবে স্মরণ রাখা উচিত যে যেন ড্রেনগুলি এই পরিমাণে অনেক বড় ও গভীর হওয়া প্রয়োজন। কারণ ছোট ড্রেনগুলির সমস্ত জলই গিয়ে পড়বে ঐ বড় ড্রেনগুলিতে এবং সমস্ত জলটা টেনে নিয়ে যাবে অন্যত্র।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বোগা মেডালোয়া, অড়হর বা ধইঞ্চা মালার দুই পাশ দিয়ে রোপন করলে মাটি ধসে পড়ে ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কম তেমনি বর্ষাকালে বেশি বারিপাতের ফলে যে জলটা জমা হয় তার কিয়দংশ ঐ গাছগুলো টেনে নেয় এতে চা গাছের গোড়া ভিজে থাকে এবং গাছ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য আহরণ করতে পারে। কিন্তু বর্ষা অন্তে যখন জলের অভাব হয় তখন এই সবুজসার আতীয় গাছগুলো অত্যধিক পরিমাণে মাটির রস টেনে নেয় যার ফলে চা গাছগুলো উপযুক্ত খাদ্য আহরণ করতে পারে না এবং আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য এই সময়ে এই সবুজসার গাছগুলির ডাল পালা কেটে ন্যাংটা করে দিতে হয় যাতে মাটির রস বেশি পরিমাণ টানতে না পারে। এই কারণে এ সময়ে জমির সমস্ত অগাছা, ঝুগাছা, সতাপাতাও তুলে ফেলে দেওয়া দরকার।

সমতল জমির ড্রেন তৈরি করা বড় শক্ত। এক না একটু উঁচু নিচু থাকবেই জমির। এই সামান্য সূক্ষ্ম উঁচু নিচু মানুষের চোখে বড় একটা ধরা পড়ে না এই ক্ষেত্রে এক রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রের নাম "ডাম্পি লেভেল"। তবে এই যন্ত্র ব্যবহারে যেমন সময় লাগে এবং দক্ষতার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে আর এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এর নাম "ক্লিনোমেটার"। এই যন্ত্র ব্যবহারে তেমন কিছু দক্ষতার প্রয়োজন নেই, সাধারণ বুদ্ধির যে কোন লোক নির্ভুল ব্যবহার করতে পারে। এই "ক্লিনোমেটার" যন্ত্র আবিষ্কার করেন বল্ড সাহেব। এ-ছাড়া আজকাল ড্রেনের গভীরতা করবার জন্যও "গেজ রেড" ব্যবহৃত হয়। এই ড্রেন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে যেখানটায় মূল ড্রেন বেঁকে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে, এটা স্বাভাবিক যে ঐ সমস্ত জায়গায় জলের তোড় বা স্রোত বেশি হবে যার ফলে নালা ধসে বা ভেঙে পড়তে পারে তাই এই সব ক্ষেত্রে এই বাঁক জায়গাগুলিতে ইঁটের পাকা গাঁথুনি দিয়ে ড্রেনের দুদিকে ধার বেঁধে দেওয়া কর্তব্য।

ড্রেনের সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দিয়েছি এ বারে চাষের কথা বলবো। ড্রেনের মত চাষ (Cultivation works) একটি বিশেষ প্রয়োজন

জিনিস। আমাদের দেশে ধান পাট বা ইবিশস্য এ শুধু বছরের একটি মাত্র ফসল কিন্তু চা কেবল মাত্র বছরের ফসল নয়। চা গাছের আয়ু অনেক বেশি। সাধারণ কথায় বলতে গেলে মানুষের চেয়েও এর জীবন দীর্ঘ। একটা গাছ রোপন করলে তা কমপক্ষে সত্তর আশী বছর পর্যন্ত বেশ সুস্থ ও সবল থাকে যদি চা আবাদ ঠিক মত করা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে গাছের আয়ু যখন দীর্ঘ তখন এর অসুখ বিসুখও যে বেশি তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। আগেই বলেছি চা গাছ শুধু মাত্র বছরে একবার ফসল দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয় না, প্রতি বছরে কম বেশি প্রায় নয় মাস ফসল দেয়। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই গাছ যখন এত দীর্ঘ দিন ধরে ফসল দেয় তখন তার দেহের মনের ক্ষয়ও হয় সেই পরিমাণে। দেহের ও মনের এই ক্ষয় পরিপূরণের জন্য ঐ সঙ্গে সম পরিমাণ চাষ আবাদ করে তার জীবনী বা উৎপাদক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এবং এই কাজ চালাতে হবে গাছের জীবিতকাল অর্থাৎ সত্তর আশী বছর। ফল বা কফি গাছের আয়ুও কম নয় তা সত্বে এই সমস্ত গাছের চাষ আবাদের চেয়ে চা গাছের চাষ আবাদে অনেক বেশি শক্ত ও সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ এই ফল বা কফি শুধু বছরের একটি মাসের ফসল দেয়।

যে কোন প্রাণী জগতেরই জীবন ধারণে খাদ্যের প্রয়োজন। উদ্ভিদ জগতের পক্ষেও সেই কথা। এ-কথা সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরই জানা আছে। তাই এখন যে কোন উদ্ভিদ বা চা গাছকে জীবন ধারণ করতে হলে কি কি খাদ্যের প্রয়োজন এবং গাছ সেই সমস্ত খাদ্য কি ভাবে আহরণ করে সেই কথা বলছি। কোন উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য হিসাবে Gases. Oxygen and Carbon dioxide (Carbonic acid gas) এবং লবণ বা ক্ষার জাতীয় আহার অর্থাৎ Intrates, Phosphates and Sulphates of Potast, Soda, lime, iron প্রভৃতির প্রয়োজন। এই প্রথমোক্ত গ্যাস জাতীয় খাদ্য আহরণ করে গাছের পাতা আর লবণ বা ক্ষার জাতীয় খাদ্য আহরণ গাছের শিকড়। মোট কথা একটা গাছকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে Carbon, Oxygen. nitrogen ও hydrogen বিশেষ প্রয়োজন। গাছ Carbon সংগ্রহ করে বায়ু থেকে আর nitrogen মাটি থেকে।

এই চাষ বা Cultivative এর উদ্দেশ্য জমিতে যে সমস্ত অগাছা, কুগাছা, লতাপাতা বা গাছ জন্মে যা গাছের পক্ষে ক্ষতি কর সে গুলো শিকড় সমেত তুলে ফেলে দেওয়া। কারণ এ-কথা আগেই বলা হয়েছে যে এই সমস্ত গাছ বা লতাপাতা থাকলে মাটির থেকে যে খাদ্য চা গাছ আহরণ করে তার কিয়দংশ তারা নিয়ে নেয়।

এ ছাড়া অনাবাদী জমিতে এক প্রকার দৈহিক গঠন মূলক-বস্তু বা খাদ্য আছে থাকে ইংরাজিতে Organic matter বলে। অনাবাদী জমি বছরের পর বছর চাষ আবাদ না হওয়ার ফলে এর উপরি ভাগে নানাপ্রকার পাতাছুড়ি পড়ে সেগুলো পচে গলে একটা স্তর পড়ে। এই স্তরের মধ্যেই ঐ বস্তুটি থাকে যা প্রাকৃতিক ভাবে গাছের উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই Organic matter র মধ্যে আছে Nitrogen, Carbon, Oxygen ও hydrogen, Nitrogen সাধারণতঃ মাটির সঙ্গে একটা কঠিন পদার্থের মত থাকে যা জলে গলে না তাই চাষ করে অর্থাৎ কোদালী মেরে সেটাকে ভেঙে দিতে হয়।

ডেন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আগেই বলেছি যে মাটি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাই গভীর কোদালী মেরে আগাছা কুগাছাগুলির মূলচ্ছেদ না করে মাটির উপরি ভাগ চেঁচে দেওয়ার ব্যবস্থাগুলির করাই যুক্তিসঙ্গত। এই কাজের জন্য আজকাল এক প্রকার কোদালী তৈরি হয়েছে, একে ইংরাজিতে "চিলিং হো" বলে। এই বলে বলছি না যে গভীর কোদালী বা "ডিপ হোইং" একদম মারতে হবে না। আগের দিকে তো প্রতি বছরেই "ডিপ হো" করা হতো। কিন্তু বর্তমানে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতি বৎসর "ডিপ হো" দিলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না, তাই আজকালকার বাগান কর্তৃপক্ষেরা তিন চার বছর পর পর এই কাজ করান। এতে গাছের শিকড় কেটে যায় এবং পূর্বাহ্নেই বলা হয়েছে যে শিকড় কেটে গেলে গাছ কম জোরি হয়ে পড়ে। কাটা শিকড় মাটি থেকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত

কারণে আজকাল সকলেই "লাইট হো" বা হালকা কোদালী দেন।

'ডিপ হো' বা গভীর কোদালী দেওয়ার একটা সময় আছে। এই কাজ প্রয়োজন হলে ডিসেম্বর ও জানুয়ারীর মধ্যে করাই উচিত। কারণ মাটি বেশি শক্ত হলে গাছের শিকড় কেটে যাওয়ার ভয় আনা ভয়। এই জন্য মাটিটা খুব শক্তও নয় আবার তেমন নরমও নয় এই মত সময়ে এই কাজ করা ভাল। কারণ এতে মাটিতে যে Organic matter থাকে সেই সমস্ত শক্ত ঢলাগুলো ভাঙতে সুবিধা হয়। এই কারণে শীতকালে গাছ কলম করার পর এই করা উচিত।

Cultivation বা চাষ বলতে শুধু মাত্র "ডিপ লাইট, ও চিল হো" বা ট্রেন নয় এ ছাড়া আরো অনেক প্রকার কাজ আছে। এর মধ্যে আর এক রকম Cultivation আছে যাকে আলিইং বা ফরকিং বলে। বাগানের চলতি কথায় একে খুরনি বলা হয়। এই কাজটি ও বিশেষ দরকারি। কারণ "ডিপ লাইট বা চিল হো" এ দুই ধরণের গাছের মধ্যেকার অংশের আগছা কুসাছা মারা যেতে পারে কিন্তু গাছের একেবারে শিকড় ঘেষে যে লতাপাতা বা আগাছার জন্ম হয় সেগুলি নষ্ট করা যায় না। এই 'আলি বা খুরনিতে' সেগুলো মারা যায়। এতে গাছের গোড়ার চারপাশ বেশ পরিষ্কার হয়। গাছের গোড়ার মরা বা পোকা ধরা ডাল পালাগুলি কেটে ফেলাতে পোকা মাকড়ও নষ্ট হয়। তবে এই কাজ বছরে শুধু একবার মাত্র করতে হয়। শীতকালে কলমকরার সঙ্গে সঙ্গে। এই কাজ সাধারণত "ডিপ, লাইট বা চিলহো'র চেয়েতে হালকা তাই মেয়েরা বা অল্প বয়স্ক বালকেরাই এই কাজ করে, "ডিপ, লাইট বা চিলহো" পুরুষের কাজ।

এতক্ষণ যে সমস্ত কাজের কথা বলা হলা এসবই শীতের কাজ। বর্ষার সময়ও এই জাতীয় কিছু করণীয় আছে। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে বর্ষাকালে আগাছা-কুগাছা ও লতাপাতার জন্ম শীতের চেয়েতে অনেক বেশী! এবং একথাও আগেই বলেছি এই সমস্ত আগাছা-কুগাছা বা লতাগুল্মের গাছে চা গাছের অনিষ্ট করে। তাই এই সময়েও এই সমস্ত আগাছা তুলে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই গাছগুলিকে সাধারণতঃ চা শ্রমিকেরা 'সেরু, ধেরিয়া, ভুনিয়া, মুরিকা, কারা বা দোতসারা' বলে। এগুলির সবগুলোই একেকম লতা-জাতীয়। বর্ষার সময়ে পাতি তোলা হয়। এই সময়ে মেয়েপুরুষ সকলকেই পাতি তুলতে হয় তখন এই কাজের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক লোক নিযুক্ত করা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না তাই কিছু লোক খাটিয়ে সেগুলিকে মাঝে মাঝে খুরনি করে দিতে হয়। এই খুরনিতে কেবলমাত্র যে গাছটাই রক্ষা পেল তা নয় কারণ এগুলি থাকলে যারা পাতি তোলে তাদেরও অসুবিধা। শুধু অসুবিধা বলেও বাদ দেওয়া যায় না। এই লতাপাতার সংগে লজ্জাবতী লতা বা আরো অন্য কোন প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ অথবা তাদের ছোট বড়ের মত ধারালো লম্বা পাতা শ্রমিকদের গা হাত পা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। এই কারণে খুরনি করা হয় একপ্রকার কাস্তে দিয়ে।

বাউল গান ও বাউলিয়া তত্ত্ব

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

★

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের ভারতবর্ষে সমাজ জাতি—সংস্কারমুক্ত সাধকপুরুষদের একটি শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিশেষ শ্রেণীটির অস্তিত্বের প্রমাণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থগুলিতে মেলে। এঁদের কোনকালে ছিল না কোন নির্দিষ্ট সমাজ, জাতি, বা সম্প্রদায়। এঁরা ছিলেন সহজ মানুষ। এঁদের ধর্মও সহজ মানব-সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যটিকে যিনি সম্যক্-ভাবে উপলব্ধি করে আপনি 'বাউল' (বাতু-ল) বা 'বায়ুগ্রস্ত' অর্থাৎ ন্যাপা বা পাগল হয়ে সংস্কারমুক্ত পথে এসে দাঁড়াতে পারবেন তিনিই হবেন সত্যিকারের সাধক বা বাউলিয়া। তার জন্যে কোথাও কোন আমন্ত্রণ নেই। নেই কোন সম্বর্ধনা। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ অনুরাগ প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল ও স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি যাঁর হৃদয়ে পুষ্পের মত বিকশিত, তিনিই বাউলিয়া। শাস্ত্র বা লোকাচারমুক্ত এবং মানবধর্মসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান-যুক্ত যেকোন ব্যক্তিই বাউলিয়া।

বাউলিয়াদের বেশভূষায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় রকম ভাবেরই সম্মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। মাথায় লম্বা কেশ-রক্ষণ এই সম্প্রদায়টির একটি বৈশিষ্ট্য। দেহে তাঁরা জোড়াতালি দেওয়া আপাদবিস্তৃত নানা রঙে রঞ্জিত জামা পরেন। ঝুলি, লাঠি ও কিস্তী (ধরিয়াই নারকেলের মালার ভিক্ষাপাত্র) নিয়ে বাউলিয়ারা দেহ-তত্ত্বের গান গাইতে বের হন। যে আদর করে ডাকে, তার কাছেই অনায়াসে তাঁরা গান করেন। গান করার সময়ে পায়ে তাঁরা নূপুর বাঁধেন। ডান হাতে একতারা আর বাঁ হাতে বাজান কোমরের সংগে বাঁধা ছোট ডুগি। এ ছাড়া দোতারা, সারিন্দা, খমক, খোল, কর-তাল প্রভৃতি যন্ত্রও তাঁরা গানের সংগে ব্যবহার করেন। নেচে নেচে মনের আনন্দে তাঁরা গান করেন। নৃত্য-সম্বলিত এই গান খুব স্বাভাবিকভাবে যেকোন মানুষের চিত্ত জয় করে। তাঁদের নাচেরও একটি বিশেষ ধরনের ংগ বা পদ্ধতি আছে। চে ও গানের সংগে মনের আনন্দে তাঁরা নানা রকমের সুদৃশ্য অংগভংগীও করে থাকেন। তাঁদের গানের বাণী আপাতদৃষ্টিতে খুবই সহজ মনে হয়। কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত ভাব এত গভীর যে, তা যেকোন চিন্তাশীল শ্রোতাকে রসে নিমজ্জিত করে। চমৎকার এই সংগীতে বাংলাদেশের নিজস্ব ধারাটির পরিচয় মেলে। কারণ এই মুক্তমনা সাধকসম্প্রদায়টিকে ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশেই দেখতে পাওয়া যায়। বাউলিয়ারা প্রধানতঃ বাঙালী। বাউল গান বাংলার একেবারে নিজস্ব গান।

অধ্যাত্মসাধনার পথই বাউলিয়াদের পথ। রস আর ভাবের আতিশয্যই সমর্থ বাউলিয়ার জীবনের গতি সূচনা করে।

সত্যকে বিচার কর, বিশ্লেষণ কর, হৃদয়ের ঘনীভূত রসকে নিংড়ে তা ব্যক্ত করে আনন্দ সৃষ্টি কর। সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমই জীবন। সেই জীবন-সাধনাই সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বাউলিয়ারা এই সহজ সাধনপদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই মানেন না।

তাঁদের মতে, সাধককে স্বাধীন ও মুক্ত হতে হবে। তারা বাহ্য পূজার্চনা বা শাস্ত্রবিধির অতীত হবে। মূল কথা, বাইরের দেহকে বিসর্জন দিয়ে অন্তর-দেহকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। অর্থাৎ প্রতি মানুষের মধ্যে যে অন্তরদেবতা বিরাজ করছেন, তিনি জাগতিক সব ধর্মকে ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর মধ্যেই সর্ব গুণ ও সর্ব ভাবের সমন্বয়। তাঁর সাধনাই চরম ও পরম সাধনা। অথর্ববেদের একস্থানে মানবধর্মের এই চরম কথাটি আমরা পাই :

"গৃহং কৃত্বা মর্ত্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্।"

(অথর্ব ১১. ১০ ১৮)

এই মানবদেহ একটি বিচিত্র মন্দির। এই মন্দিরটি

রচিত হলে দেবতা তাতে আশ্রয় করে রইলেন।

এই মন্দিরটিকে চেনা করাই সাধনা। মন্দিরের সংস্কার-সাধন হলেই দেবতার আবির্ভাবে আর কোন বাধা থাকে না।

মানবদেহ সম্বন্ধে বাউলিয়াদের বর্ণনার সংগে অথর্ব-বেদের অন্তর্গত অনেকস্থানের বর্ণনার অনেক সংগতি পাওয়া যায়।

উক্ত বেদের একস্থানে উক্ত হয়েছে :

"যত্রামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেতি সমাহিতে।"

এই মানবের মধ্যেই অমৃত ও মৃত্যু সমাহিত। এই অপূর্ব তত্ত্ববিকাশই সমগ্র বাউলিয়া সাম্প্রদায়ের ধ্যানে ধারণায় কর্মে জ্ঞানে ও সাধনায় আমরা দেখতে পাই।

সাধক বাউলিয়া লালনশশীর একটি পদ মানুষের স্তুতিতে মুখর। লালনশশীর পদবী ছিল মিত্র। ভনিতায় তিনি তাঁর পদবী ব্যবহার করেছেন :

"মানুষের কথা তোরা বল গো বল
শুনলে যার কথা যায় গো ব্যথা,
তাপিত হয় প্রাণ শীতল॥

তার কথা অমৃত সমান শুনতে শুনতে
জন্মে ক্রমে অজ্ঞানে জ্ঞান,
তার কথা শুনলে নয়ন জলে
ভেসে যায় গো বক্ষস্থল॥

• • •

মিত্র বলে কি বলিব আর,
সকলই অসার কেবল মানুষচরণ সার,
আমার মানুষ গতি, মানুষ পতি,
মানুষ আমার বুদ্ধিবল॥"

ঋক্‌বেদের মধ্যেও আমরা দেখি এই মহান মানুষের মত এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে যে পুরুষকে 'পরমপুরুষ' বলা হয়েছে। যে পুরুষই একমাত্র প্রেমের পাত্র। যে পুরুষ স্বয়ং যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ দিয়েই যজ্ঞ সম্পন্ন হয় :

"যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ॥" (ঋঃ ১০-৯০-১৬)

সাধক চণ্ডীদাসও বলেছেন :

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

বাউলিয়াদের এই সহজ মতটি অনাদিকালের মূলে তাঁরা দাবী করেন। সে দাবী যে অযৌক্তিক, তা বলা যায় না।

ধর্মতত্ত্ব

মানুষের মধ্যে দিব্য চেতনাময় একটি মন আছে। সেই মনের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ এবং চঞ্চল মনকে স্থির করার যে সহজ সাধনা, সেই সাধনাই বাউলিয়া-ধর্মের মূলতত্ত্ব। দেহের মধ্যে আত্মময়কে পাওয়াই নির্বাণ। বাউলিয়াদের এই নির্বাণই কাম্য।

এই আত্মময়ের আদি নেই, অন্ত নেই। ইনি অনাদি-কালের একটি কুসুম। যুগ যুগ ধরে ইনি ফুটে চলেছেন। বাউলিয়া বিশ্ব ভূঁইমালীর একটি পদে সেকথা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

"হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।"

মানবচিত্ত এই কমলটিকে পাওয়ার জন্যে সারা পৃথিবীময় খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সে জানে না যে, সে কমলটি তারই হৃদয়ের নিভৃত কাননে অমৃত-সৌরভ বিস্তার করে প্রস্ফুটিত হয়েছে কত যুগ আগে থেকে।

অথর্ববেদেও অমৃতের পুষ্পের বিষয়ে অনুরূপ একটি উক্তি রয়েছে :

"অমৃতস্য পুষ্পম্।" (অথর্ব ৬-৯৫-২)

ধর্মসাধনার তিনটি প্রধান প্রধান পথ। কর্ম জ্ঞান ও প্রেম। কর্ম বাহ্য বা গৌণ পথ। জ্ঞান মধ্য বা মুখ্যতর পথ। কিন্তু প্রেমই মুখ্যতম ও অন্তরংগতম পথ। কর্ম ও জ্ঞানের পথে শাস্ত্র বা লোকাচারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু প্রেমের পথে কোন বন্ধন বা বিধিনিষেধ নেই। সবই একাকার।

প্রেমধর্মের ছায়াপাত আমরা যাগযজ্ঞ-বহুল বেদশাস্ত্রের মধ্যেও যে না দেখি এমন নয়।

ঋগ্‌বেদই প্রাচীনতম শাস্ত্র। সেখানেও উক্ত হয়েছে যে, প্রেমের চেতনাই সত্যিকারের আত্ম-জাগরণ বা জ্ঞান। শাশ্বত জ্ঞানের বাণী বিশ্বাকাশে নানারূপে উদ্ভাসিত। কেউ তা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না।

"উত ত্বঃ পশ্যান্ ন দদর্শ বাচম্।
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্॥"

(ঋ ১০-৭১-৪)

শাশ্বত এই বাণীকে দেখার ও শোনার যোগ্যতার

অন্তে উপযুক্ত সাধনা বা প্রেমসঞ্চারের প্রয়োজন। তাছাড়া কোনমতেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্বময় বিরাজমান এই বাক্‌ই গায়ত্রীর 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'। এই বাক্‌ই জগৎসবিতার বরণীয় সর্গ। সাধকের অন্তরের সংগে এই মুক্তিমন্ত্রের নিত্যযোগ। এই বাক্‌ই জ্ঞান-মার্গের সারবস্তু।

বাউলিয়ারা এই তত্ত্বকথাটিকে আরও সহজ করে বলেছেন :

যা আছে ভাণ্ডে
তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে।"

সর্বতীর্থের গূঢ় সাধনা এই দেহের মধ্যেই। বাউলিয়ারা তাই দেহতত্ত্বকে সর্বস্বময় আধার করে মনের সাগরে সাঁতার কেটে কেটে রস আস্বাদন করেন।

"কারে বলব কে করবে বা প্রত্যয়,
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিরানন্দময়।"

দেহ-সাধনার একটি উচ্চ-ভাবসমৃদ্ধ রচনার ভনিতায় বাউলিরা বলেছেন :

"গোঁসাই গুরুপদে বলে,
ডুবে যাক্ মন সিন্ধুজলে,
কিন্তু সে জলে পরশ হলে গুরুদোষ ডুবাবি তরা।"

মনকে সিন্ধুজলে ডুবিয়ে দাও, কিন্তু দেখো সে জলে মনকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। নিরাসক্তি বা বৈরাগ্য সাধনার গোড়ার কথা। এই পদটিতে কেমন সুন্দরভাবে নিরাসক্তির মাধ্যমে বাউলিয়ার রসোপভোগের ধারাটি ব্যক্ত হয়েছে!

বাউলিয়াদের এই নিরাসক্তি ভাবের সংগে সহজিয়া-ভাবের খুব ঘনিষ্ঠ ঐক্য বিদ্যমান।

শাস্ত্রের সংগে বাউলিয়াদের বিরোধ এইখানে যে, তাঁরা স্বর্গসুখ চান না। চান তাঁরা শুধু মুক্তির পরমানন্দ। তাঁদের মতে, স্বর্গের অমৃতের চেয়ে মর্তেই এই প্রেমরস মহত্তর। তাই এই প্রেমরসের মোহে বা আকর্ষণে, এমন কি, স্বর্গের দেবতারাও মর্তে মানুষ হয়ে এসে জন্মাতে চান:

"প্রেম আমার পরশমণি
তারে ছুঁইলে যে কাঁচা হয়রে সোনা।
তাই গোলক চায় যে ভূলোক হতে
মানুষ হৈতে চায় যে দেবা।"

এই প্রেম যখন বিশ্বব্যাপী বিশ্বতিলাভ করে তখন সাধক আর ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকে না। সাধক তখন ঈশ্বরের মতই প্রেমময় হয়ে ওঠেন।

মতবাদের প্রাচীনত্ব

বাউলিয়া সম্প্রদায় বা বাউলিয়া মতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

বেদই প্রাচ্যের একমাত্র শাস্ত্রবক্তা ধর্মবাণী। সেই বেদে বাউলিয়া মতবাদের প্রত্যক্ষ উল্লেখ কোথাও থাকবার কথা নয়। তবে পরোক্ষ সংগতি অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়।

বেদে প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানের আড়ম্বরই সর্বত্র। বেদপন্থী অর্থাৎ আর্যগণ বললেন, সকাম যাগযজ্ঞ কর, প্রার্থনাদর দেবতাদের উপাসনা কর, স্বর্গলাভ হবে।

কিন্তু আর্যেতর বেদবিরোধীগণ বললেন, যাগ-যজ্ঞ নিষ্ফল। স্বর্গকামনা বিড়ম্বনা। মানবের মধ্যেই সব সত্য সব ধর্মাধর্ম নিহিত। সুতরাং মানবকে বাদ দিয়ে অন্য কোথায় ধর্মের সন্ধান করবে? বিশ্বের সার সত্য মানব-সত্য।

এইখানে প্রাচীন ধর্ম-সাধনার এই স্তরেই যেন আদিম বাউলিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায়।

"তোমার পথ চাইকাছে মন্দির মসজেদে"।

বাউলিয়ার এই হৃদয়স্পর্শী বাণীটি যেন সেই আদিম কালের সাধকদের কণ্ঠেই উৎপত্তি লাভ করেছিল।

বৌদ্ধসম্প্রদায় বেদবিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন। তাঁরা শূন্যবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে, সব মিথ্যে, এমন কি জগতও মিথ্যে। মহাশূন্যতা লাভই নির্বাণ বা মোক্ষ। কিন্তু বাউলিয়াদের মতে আর সবকিছু মিথ্যে হলেও জগত বা মানুষ মিথ্যে নয়। মোটের ওপর, বেদবিরোধিতার মধ্যবর্তী কোন স্তরে যে বাউলিয়া মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল, এর সঠিক কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও কয়েকটি অনুমান করা হয়ত খুব অসংগত হবে না।

তাছাড়া 'কায়াযোগ'ই বাউলিয়াদের পরমতত্ত্ব! বাউলিয়ারা বরাবর কায়াকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ জাগতিক অন্যান্য সবকিছুর মত কায়াকেও অস্বীকার করেছেন।

বৌদ্ধদের মতে শূন্যের সংগে শূন্য মিললে সহজ ধাম উদিত হয়:

"সুনে সুন মিলিআ জবে
সঅল ধাম উইআ তবে।" (চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ৬৭,৪৪)

সহজ ও নিষ্কলঙ্ক প্রেমকেও বৌদ্ধসাধকেরা 'শূন্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

তবু বেদকে অস্বীকৃতির মধ্যে এই দুই সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার মধ্যে অনেক সংগতি দেখা যায়। কায়াকে অস্বীকার করার উপলক্ষ্যে কায়ার অসারত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা বৌদ্ধগণ করেছেন:

"কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল।" ইত্যাদি

মানবদেহ একটি বৃক্ষ। তার পাঁচটি ডাল। অর্থাৎ পাঁচটি ইন্দ্রিয় ইত্যাদি···

তারপর এই ইন্দ্রিয়াদি দমন করার কথা তারা বলেছেন। বাউলিয়ারাও রিপু বা ইন্দ্রিয় দমনের কথা এমনি করেই বলেছেন:

"গাঁট কাটা ছয় বেটা বড় বোম্বেটে।
ওদের লজ্জা নাই মেরাদ খেটে।
তারা মিষ্ট কথায় আসে ভোলায়
পরেতে ভাই সব লুটে।"

ক্ষিতিবাবুর একটি গানেও আমরা ইন্দ্রিয়াদির কথা এমনি হেঁয়ালী ভাষায় দেখতে পাই:

"সংসারে বাঁকা পথে দিনে রেতে
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা।
দেখ আবার ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে
নেহরে কেড়ে সব সাধনা।।"

এখানে ছয়টি 'চোর' বা 'বোম্বেটে' ছয়টি রিপুকে বলা হয়েছে।

আসলে, দেহতত্ত্বের সমর্থন ও লোকাচার-বেদাচারের অস্বীকৃতির মধ্যে অনুরাগতত্ত্বই বাউলিয়াদের নির্বাণের মাধ্যমিক শক্তি।

এই প্রসংগে বৈষ্ণব সহজিয়াসম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাউলিয়াদের এই অনুরাগতত্ত্ব বৈষ্ণব-সাধনার মধ্যেও আমরা দেখি। বৈষ্ণবসাধনায় নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীরাধিকা। চৈতন্য মতে গুরু শ্রীকৃষ্ণ, শিক্ষা শ্রীরাধিকা। চৈতন্যমত ভক্তিপন্থী। সুতরাং কিয়দংশে তা শাস্ত্রভারমুক্তও বটে। চৈতন্য মতে নাম মন্ত্রভব প্রেম ও রস এই পাঁচটি আশ্রয়। তার মধ্যে প্রেম ও রসই প্রধান। এই প্রেম ও রসই বাউলিয়া-সম্প্রদায়ের সাধনমার্গের প্রধান দুটি উপাদান। এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণেই আনন্দ, বাউলিয়া মতে যে আনন্দের অর্থ নির্বাণ।

অপরপক্ষে মহাপ্রভু ও তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকে নিজেদের বাউল বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবগণ বাউলিয়াদের জানতেন, এবং বাউলিয়াভবের সংগে নিজেদের সংগতিও মানতেন। এই দুই ধর্মের ঐক্যপূর্ণ ভাবধারার ছায়াপাত পরবর্তীকালের বাউলগানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সেই বাউলগানগুলোকে 'বৈষ্ণব বাউল' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি সুন্দর রচনা উদ্ধৃত করছি। গানটি বৈষ্ণবভাবপ্রধান কিন্তু বাউলসুরে বীরভূমের অনেক বাউলিয়াগণ কর্তৃক সচারচর গীত হয়ে থাকে।

"গৌরচাঁদের হাসপাতাল ভাই নদিয়াপুরে।
তবে আর কেন ভাই যাওনা পাস
কলি-ম্যালেরিয়ার জ্বরে?
কখনও এমন ছিল না,
দেখে জীবের এ যন্ত্রণা
খুললেন দাতব্য এক ডাক্তারখানা
দীনহীনের তরে।।
নিতাইবাবু সিভিল-সার্জন, অদ্বৈত হন আর পঞ্চানন,
ওরে নেটিভ চিনিবাস আর শ্রীনিবাস, হরিদাস
তার কম্পাউণ্ডারে।।
নিতাইবাবুর সুযশ ভাল, ধর্মাই-মাধাই রোগী ছিল,
তাদের বৈষম্য-জ্বর ছেড়ে গেল একটি মিক্‌চারে।।"

আর একটি উচ্চভাবসমৃদ্ধ পদ। কোন এক চৈতন্যভক্ত কর্তৃক রচিত।

স্বরূপের নিরূপণ বিনে গৌর পাবিনে।
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ
জানবে কি আর জ্ঞানহীনে।"

গ্রাম্য কবির কি অভূতপূর্ব রচনা! ভাষার মাধুর্য ও ভাবের মাদকতায় আপ্লুত পংক্তিগুলি।

কত সহজ কথা কত মিষ্টি করে কবি বলেছেন:

"তুই ঘর না জেনে খুঁজিস দুয়ার
কি ঠিকানা পাবি রে তার?
সাত মহলে সে ঘর আঁটা,
চৌকিদার তায় আছে হটা,
রসরাজ তায় বিরাজ করে
তারে চিনবে কি ছয় অধীনে?" ইত্যাদি

জ্ঞানবৃদ্ধ রসজ্ঞজন কবি মনের প্রেম-নিংড়ান তত্ত্বকথা এমন করে যিনি বলতে পারেন, তিনি 'ক্ষ্যাপা' বা 'বাউলিয়া' ছাড়া আর কি হতে পারেন? সংসারের মাঝে থেকে তিনি বৈরাগী, কোটি মানুষের মাঝে তিনি মহামানব, কোটি জীবনের বেদনাধার তিনি মহাসুত্রধার।

হৃদয়ধর্মে যে মহাসত্য নিহিত, তা আপনার গুণে আপনিই ব্যক্ত। প্রেম ও অনুরাগের পথে সেই সত্যকে অনুসন্ধান ও আবৃত্তি করার মধ্যে যে সাধনা, তাই সত্যসাধনা। শাস্ত্রসম্মত আচার-বিচার ও কঠোর নিয়ম-কানুনের সসীম গণ্ডীর মধ্যে মুক্তপুরুষ বাউলিয়া কখনও ধর্মসাধনা করতে পারবে না। তাই তাঁরা শাস্ত্রকে বলেন কৃত্রিম ও নিরস। তাই বলে তাঁরা যে মোটেই শাস্ত্রিধর্মাশ্রিত সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন নি, তার প্রধান প্রমাণ তাঁদের অভিনব ও অপূর্ব ভাবপ্রকাশ।

॥ সম্প্রদায় ॥

ইতিপূর্বে বলেছি, প্রেমানন্দে পাগল হয়ে মুক্তির পথে যিনি এসে দাঁড়াবেন, তিনিই বাউলিয়া। সেই বাউলিয়াদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতির সংমিশ্রণই দেখতে পাওয়া যায়। বাউলিয়ামতের প্রায় সব সাধকই নিরক্ষর ও হীনবংশজাত। অথচ তাঁদের ভাবৈশ্বর্য অতুলনীয়।

এই নিরক্ষর ও হীনবীর্য সাধকের দল সমাজের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও বস্তুতঃ সমাজের বাইরেই তাঁদের স্থান। তাঁদের কথা কখনও কোন পণ্ডিতজনের রচিত সাহিত্যে প্রকাশ পেতে পারে নি।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের সংগীতের ভাবৈশ্বর্যে ও ভাষার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের কথা তাঁর বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে কুষ্টিয়ার একটি বাউলিয়াসম্প্রদায়ের সংগে পরিচয় লাভ করেন।

সেইসব বাউলিয়াদের অপূর্ব রচনাভংগী ও হৃদয়াকর্ষক সুরের মাধুর্যে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসব বাউলিয়াদের মধ্যে লালনফকীর ও কিকিরচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য।

লালন বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু কিকিরচাঁদ (অপর নাম কাঙাল হরিনাথ, পদবী মজুমদার) ছিলেন সিদ্ধসাধক। তিনি কিছু লেখাপড়া জানতেন।

কিকিরচাঁদ বস্তুতঃ লালনের শিষ্য ছিলেন। লালনের গানের রচনা এত উচ্চাংগের ছিল যে, অনেকে মনে করেন যে, তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

বাউলিয়াদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন:

"এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নেই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।"

রবীন্দ্রনাথ আরও অনেকস্থানে এই নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর বাউলিয়াদের সৃষ্টির গভীরতা ও সাবলীল প্রকাশ-ভংগিমার অতুলনীয়তা সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন।

সাধারণতঃ বাউলিয়ারা ফকীর হলেও অনেকে গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করেন। তবে তাঁদের গৃহীজীবন সাধারণ পর্যায়ের নয়। তার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা। বাউলিয়ারা জলে ডুববেন, কিন্তু জল ছোঁবেন না। তারা গৃহী হবেন, কিন্তু সংসারী হবেন না।

কিকিরচাঁদ গৃহী ছিলেন। কিন্তু লালন গৃহী ছিলেন না। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কোন হিন্দুকুলে, কিন্তু প্রতিপালিত ও দীক্ষিত হন মুসলমান ফকীর সিরাজ সাঁইয়ের বাড়ীতে। কথায় কথায় মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি চমৎকার গান রচনা করতে পারতেন। কেউ কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর তিনি তৎক্ষণাৎ গান রচনা করে বাণী ও সুরের মারফৎ দিতেন। অবশ্য বাউলিয়াদের রীতিই তাই। গানের মাধ্যমে হেঁয়ালী

করে তাঁরা সব কথার উত্তর দেন।

কিকিরচাঁদের শিষ্যেরা পুরোপুরি বাউলিয়া না হলেও বিশেষ কৃতী ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্র, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বা জলধর সেনের নাম তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লালনের অন্যতম শিষ্যের নাম গগন। গগনের একটি গান খুবই জনপ্রিয় :

আমার মনের মানুষ যরে,
আমি কোথায় পাব তারে!" ইত্যাদি

লালনের রচনা এসব গানের তুলনায় আরও কত উচ্চ ও সূক্ষ্ম রসাত্মক। একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি :

"আমার বাড়ীর কাছে আশিনগর,
তাহাতে এক পড়শী বসত্ করে,
একদিনও না দেখিলাম তারে।
বলব কি আর পড়শীর কথা,
ও তার হস্তপদ অঙ্গ মাথা নাইরে,
সে রূপে থাকে শূন্যের উপরে,
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
আবার সে আর লালন একই স্থানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥"

আনন্দধাম বাউলিয়া বিরহের কথা বলেছেন। কিন্তু এ বিরহে সাধকের আনন্দের পরিসীমা নেই, পরিসমাপ্তি নেই। সনাতন শাশ্বত এই বিরহ যুগে যুগে ভক্তহৃদয়ে রসসঞ্চার করেছে ও করবে নানা রূপে, নানা গন্ধে, নানা ছন্দে।

বাউলিয়া আরও সহজ করে বলেছেন :

"মনরে আমার আপন খবর
আপন তো আর হয় না।
আপনারে চিনলে পরে
যায় অচেনারে চেনা॥
নিকট থেকে দূরে দেখায়,
যেন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
চাকা দিল্লী হাত্ড়ে ফিরি
কোলের ঘোর তো যায় না॥
আত্মরূপে কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তার ঠিকানা।
আমার বেদ-বেদান্ত পড়বে যত যেড়বে ততই লটনা॥
আপন আপন কে করে মন,
সে জানে তার চরণ শরণ নে না,
লালন বলে মনের ঘোরে
চোখ থাকিতে কানা॥"

যত বেদ-বেদান্ত পড়বে, ততই সাধনার পথ আত্মময়কে পাওয়ার পথ সমস্যাপূর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠবে। মাথার চুলের আড়ালে যেমন বিরাটকায় স্বচ্ছন্দে ঢাকা পড়ে, তেমনি চোখ থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টির আড়ালে তিনি ঢাকা পড়ে রয়েছেন। আপনাকে চিনলে, আপন অন্তরের মধ্যেকার প্রস্ফুটিত কমলটিকে দেখতে পেলেই সব দেখা সব জানার শেষ হবে, সব সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটবে।

প্রায় বছর আঠের আগেকার কথা। মনে পড়ে সনাতন বাউলিয়ার কথা। খুলনার অন্তর্গত ভৈরব নদীর তীরে গ্রামবাসীদের বসতি থেকে দূরে জংগলাকীর্ণ একটি পোড়ো ভিটের ছোট্ট একখানা কুঁড়েঘর বেঁধে সনাতন ও তার স্ত্রী বাস করত। স্বামী-স্ত্রীর নিরিবিলি জীবনে ছিল সংহতির প্রকাশ। গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে গেয়ে কিছু চাল, ও তরকারি সংগ্রহ করে তারা জীবনধারণ করত।

লক্ষ্য করেছি, ধর্মনিরপেক্ষ অধ্যাত্মবাদের সাধনাই ছিল সনাতনের জীবনের আদর্শ। অতি নিরক্ষর ছিল সে। এমন কি, কোন বাংলা বই সে বোধকরি ভাল করে পড়তেও পারত না। কিন্তু তার কথাবার্তা থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যেত যে জীবন সম্বন্ধে তার নিজস্ব ও স্বাধীন একটি চিন্তাধারা ছিল।

ভিক্ষে করে অন্নসংগ্রহ করে দৈনন্দিন জীবনযাপন করার মধ্যে সনাতন নিয়মিত আর একটি কাজ করত। প্রতি সন্ধ্যায় সে তার মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে তার প্রিয় একতারাটি বাজিয়ে গান গাইত। বাউল গান ছাড়া অন্য গানও সে গাইত। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গান বা "ওরে মন গুরুপাখীরে" বলে একটি চমৎকার গান গাইত। তার নিজস্ব কয়েকটি গানের রচনা খুব উঁচুস্তরের না হলেও উচ্চ-ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তার কয়েকটি গান আমি মুখে মুখে শিখেও নিয়েছিলাম। তার সব ক'টি কথা এখন মনেও নেই। তার একটি গান দোপার গাধাকে নিয়ে অনেকটা রূপক ধরনের কথা নিলিয়ে চমৎকারভাবে রচিত। সে-গানটি তাকে কতদিন যে গ্রামের হাটের মাঝখানে নেচে নেচে গাইতে দেখেছি, তার হিসেব নেই।

সনাতনের স্ত্রী সাধারণতঃ তার গানের ধুয়ো ধরত। সে খুব ভাল গাইতে পারত না। সে নাচতও না। তবে সে খঞ্জনী বাজাত। সনাতনের স্ত্রী বোধকরি বয়সে সনাতনের চেয়ে কিছু বড়ই ছিল। মহিলাটি বহুভাষিনী। বেশ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। গায়ের রং তার ময়লা। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। সাদা থান পরত সে।

সনাতনেরা ছিল জাতে তাঁতী। কিন্তু সনাতনের বাবা তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে খেয়ার নৌকো বাইত। সনাতনের বাবার নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণ। তার রচিত কয়েকটি গানও সনাতন মাঝে মাঝে গাইত।

বছরের কোন কোন বিশেষ সময়ে সনাতন চলে যেত দক্ষিণেশ্বরের কোথায় যেন। সেখানে প্রতি বছর পৌষ মাসে ওদের বাউলিয়াদের কি যেন একটা আড্ডাও জমত। থাকত সেখানে দিন-পনের-ষোল। তারপর ফিরে আসত। সহজ মানুষ সনাতনকে আমি ভুলি নি।

আর মনে পড়ে অঘোরচন্দ্রকে। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত: আজ্ঞে বাবু, অঘোরচন্দর। অঘোরকে যখন দেখেছি, তখন সে রীতিমত বৃদ্ধ। মামাবাড়ীতে গরমের ছুটি কিংবা পুজোর ছুটিতে কখনও কখনও যেতাম। মামাবাড়ীর গ্রামেই ছিল অঘোরের বাস। তার বাড়ীতে ছেলেদের যাওয়ার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার কয়েকটি লিচু-জামরুলের গাছ ছিল। আমরা বিশেষতঃ তার অবর্তমানে সেই সুস্বাদু ফলগুলির সদ্ব্যবহার করতাম।

গ্রামের সীমান্তে, গ্রামের প্রায় বাইরেই অঘোরের বাড়ী ছিল। তার কোন পরিবার ছিল না। একলা মানুষটি বিরাট বনাবৃত দীঘিটার পাড়ে নিতান্ত জীর্ণ একখানি কুঁড়েঘরে বাস করত। গ্রামবাসীরা তার গান ও নাচ উপভোগ করে করে বোধকরি হয়রান হয়ে উঠেছিল। তাই সে ভিক্ষের বেরত ভিন্‌গাঁয়ে। নিজের গ্রামে তার ব্যক্তিগত মর্যাদাও বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। গ্রামের ছেলেরা তাকে 'অঘোর-পাগলা' বলে ডাকত। তাকে অকারণে বিরক্ত বা জ্বালাতন করতেও তারা ছাড়ত না। তাই বলে অঘোরকে কোনদিন সেজন্য তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে দেখিনি।

প্রায় প্রতিদিনই সকালে সে বেরিয়ে যেত, আর ভিক্ষে শেষ করে ফিরত সন্ধ্যে বেলায়। যেদিন তার ঝাড়িতে দুটো বাড়তি চাল থাকত, সেদিন সে আর বেরুত না। তার উঠোনের বেগুনগাছ কিংবা পাতিলেবুর গাছটার গোড়ায় একটু জল ঢালত, আর গুন্ গুন্ করে গান গাইত।

অঘোরের নির্জন বাড়ীটিকে আমার মনে হত অনেকটা যেন সংস্কৃত নাটকে বর্ণিত তপোবনের মত। খুব ভাল লাগত তার আস্তানাটিকে। তাই অন্য ছেলেদের এড়িয়ে লিচু-জামরুল খাওয়ার প্রলোভন সংবরণ করে কিছুক্ষণের জন্যে কখনও যেতাম বৃদ্ধ মানুষটির নির্জন সংগ লাভ করবার জন্যে। অনুরোধে পড়ে অঘোর আমাকে তার প্রিয় কয়েকটি গান ঘুরেফিরে রোজই প্রায় শোনাত। তার মধ্যে তার মুখে বহুশ্রুত একটি গান আজও আমার মনে দাগ কেটে রয়েছে:

"ও মন নানান্ পথে ঘুরবি
তবু একটি পথকে চিনবি না।
নানান্ কথা বলবি
তবু একটি কথা বলবি না।।
ও তোর মনের মধ্যে আর এক মন,
চোখ মেলে দেখ আর এক জন,
চেয়ে আছে তোর পানে ওই
তুই কি চোখে দেখবি না।
ও মন একটি পথকে চিনবি না।"

—ইত্যাদি

একথা আমার মনে হয় নি যে, অঘোরের গানের ভাষা খুব উচ্চাঙ্গের। কিন্তু তার ভাবের কথাকে কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। গান গাইবার সময় বৃদ্ধের ভাবৈশ্বর্য দেখে কতবার যে মুগ্ধ হয়েছি, তা বলতে পারি নে। অঘোর তার দাওয়ায় বসে কতদিন বিকেলবেলায় আমায় গান শুনিয়েছে। শেষ বয়সে গলার স্বর তার

বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। তার গানের সব কথা বা তার অর্থ সব সময় বোঝাও যেত না। তবু খুবই ভাল লাগত তার বারবার করে গাওয়া একই গান, তার জীবনধারণের রমনীয় ছবি, তার বিনীত ও বৈরাগ্যবিদগ্ধ কথাবার্তা। মানুষটির ইহসংসারে কোন বন্ধনই ছিল না। বন্ধনহীনের সন্ন্যাসেমনটিকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম গ্রামের মধ্যে পরম দারিদ্র্য অবহেলিত নগণ্য অঘোরচন্দ্রের মধ্যে।

হঠাৎ একবার শীতকালে মামাবাড়ীতে গিয়ে শুনলাম, কিছুদিন হল, অঘোরচন্দ্র মারা গেছে। কেউ বলল, জ্বর-বিকারে মারা গেছে, কেউ-বা বলল, শীতের চোটে মারা গেছে। সত্যিই সে-বছর শীত পড়েছিল খুব বেশী। বৃদ্ধের কাঁথা-মাদুর বোধহয় পর্যাপ্ত পরিমানে ছিল না, থাকবার কথাও নয়। বার্ধক্যজনিত গায়ে রক্ত-মাংসের উত্তাপও ছিল না।

সেই শীতের মাঝে হঠাৎ একদিন নাকি খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই ঝড়বৃষ্টিতে তার জীর্ণ কুঁড়েখানাও ভেংগে পড়েছে।

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অঘোর-পাগলার সব স্মৃতি গ্রামের বুক থেকে। কিন্তু আমার মনে অঘোরচন্দ্রর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে তার নাম বলার ভংগীটা—আজ্ঞে বাবু, অঘোরচন্দর!

বাউলিয়ারা গুরু মানেন। গুরুকে তারা পান নানা স্থানে। যিনি তাঁদের জ্ঞানের আলো দিতে পারেন, তিনিই তাঁদের গুরু। অনেক সময় নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও এমন কাজ করে ফেলে যাতে তাদেরও তাঁরা গুরু বলে অভিহিত করে থাকেন, বাউলিয়া নিজেই বলেছেন :

"গুরু বলে কারে প্রণাম করিব মন ?
তোর অধিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন।"

বাউলিয়ারা নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুদের মধ্যে কে খাঁটি বাউলিয়া, আর কে অবাউলিয়া, এ বিচারের ধার ধারেন না।

এই প্রসংগে কোন এক বাউল-সাধু অপূর্ব একটি গান রচনা করেছিলেন :

"ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার ভ্রমরা,
নিকষে বসিয়ে কমল আ মরি মরি।"

বাউল-তত্ত্ব অন্তরের সত্য-স্বীকৃতির ভাব। এর মধ্যে তর্ককারের মত কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে প্রমাণ করবার কি প্রয়োজন, কে খাঁটি ভক্ত, আর কে-বা মেকি? বাউলিয়াদের ধর্মের এ একটা মস্ত বড় দিক যা পৃথিবীর অনেক বড় বড় ধর্মমতের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। ভক্তকে যাচাই করবার স্পৃহা পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

হেঁয়ালী স্বভাব

বাউলিয়ারা বড্ড হেঁয়ালী ধরণের রসিকজন। তাঁদের যা-কিছু প্রশ্ন করা যায়, তার জবাবটি তাঁরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এমন রসগ্রাহী করে দেবেন যে, উপযুক্ত জবাব পেয়ে প্রশ্নকর্তার আনন্দের আর সীমা থাকবে না। বাউলিয়ারা নিজেদের সম্বন্ধে বলেন :

"আমরা পাখির জাত
আমরা হেঁটে চলার ভাত জানি না,
আমাদের উড়ে চলার ধাত।" ইত্যাদি

বাউলিয়াদের কতকগুলি গানই আছে, যেগুলি 'উল্টা-বাউল' বলে পরিচিত। উল্টা বাউলের মধ্যে কতকগুলি রূপক-বাউলের পর্যায়ে পড়ে। এই জাতীয় বাউলগানগুলির সাধারণ কথার মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত। কখনও কথাগুলো এমন ওলোট্-পালোট্ভাবে সাজান থাকে যে তার অর্থ বের করা সুকঠিন। এমন কি, অনেক বাউলিয়া গানের গুণিতার বা অন্য কোথাও বলেই দেন যে, ভক্ত ছাড়া সাধারণ মানুষ তার গানের অর্থ বের করতে পারবে না।

হরিপদ গোঁসাইয়ের একটি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের গানের কয়েকটি পদ এই প্রসংগে উদ্ধৃত করছি :

"দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হল পূর্ণিমার দিন অমাবস্যা তের দণ্ডের অন্ধকার॥
শুধিমামা মরে গেছে বুকে নিয়ে শূল,
বামুনপাড়া কষ্ট পেল বয়ে মাথার চুল,
কামরূপেতে কাকা মল, কাশীধামে হাহাকার॥
ময়রা মামীর কোলের স্বামী মরে গিয়েছে,
তিন জনের গর্ভে একটি ছেলে হয়েছে,

আবার রাজবাড়ীতে টাট্টুঘোড়ার শিং উঠেছে
দুইখান তার ॥
গোঁসাই হরি বলছেন ডেকে শোন পদ নমুনার,
এই তিন কথার অর্থ বোঝে সাধ্য আছে কার ?
অর্থ যে বুঝেছে সেই মরেছে মিটেছে মনের আঁধার ॥"

এটি একটি আদর্শ উল্টা-বাউল। সত্যিই এই পদগুলির সঠিক অর্থ বের করা এক দুরূহ ব্যাপার। বাউলিয়া বেশ খানিকটা রহস্যপ্রকাশ করেছেন তাঁর ভনিতার পদে।

এসব গানের যথাযথ অর্থ বাউলিয়ারা বলতেও চান না। আমি কয়েকজন বাউলিয়াকে এ বিষয়ে অনুরোধও করেছিলাম। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। তাঁরা বলেন, এ তাঁদের গুপ্ত সাধনার কথা। রচয়িতার প্রত্যক্ষ শিষ্যসম্প্রদায় ছাড়া এর অর্থ আর কারো জানবার কথা নয়।

আর একটি উল্টা বাউলের নমুনা :

"নতুন এক চীন সহরে,
দেখি, বন্ধ্যা নারীর পুত্র মরে।" —ইত্যাদি

গোপালচাঁদ বাউলিয়ার একটি রূপক-বাউলের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"শুনতে পাই নিধারাতে নিত্যমানুষ
নিদানের কাণ্ডারী।
অতি সূক্ষ্মাকার রূপ নিরাকার
নির্গুণ সে নির্বিকারী ॥"
আর একটি মজার কথা
তিনজনার মাইক্যে মাথা
কে তাদের মাতাপিতা বসতি কোথা ?
সেই তিনটি তীর্থ বলে
তিন ধারায় তিনজন চলে,
তার কোন্ ধারাতে স্নান করিলে
পার হওয়া যায় ভবঘারি ॥
বোবায় কয়, কালায় শোনে,
অন্ধে কি তার স্পর্শ জানে,
পঙ্গু আবার তীর্থ ভ্রমণে
আশা করে মনে,
গোঁসাই গোপালচাঁদের খেলা
না বুঝিলে ঘটবে জ্বালা…" ইত্যাদি

॥ উপসংহার ॥

এই বাউলিয়াসম্প্রদায়টিকে আজও আমরা মনুষ্য-সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে দেখি। হামেসাই দেখতে পাওয়া যায়, সেই চিরন্তন জীর্ণ ও বিচিত্র পোশাক পরিধানে, একতারা কিংবা দোতারা হাতে, পথের মাঝখানে রসিকমনা শ্রোতা-পরিবেষ্টিত হয়ে নৃত্যসহকারে হয়ত কোন বাউলিয়া গান করছে মনের আনন্দে। মাথার ওপরে নীলাকাশ। পায়ের নীচে বসুন্ধরার কাঁচা মাটির স্পর্শ। মুক্ত মন। স্বাধীন জীবন। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের নিদর্শন পুত্তলিকা।

বীরভূমের বিখ্যাত বাউলিয়া নবীনদাস ও তাঁর পুত্র পূর্ণ দাসের নৃত্য ও গান আজকাল বাংলা দেশের অনেক সুধীজনই উপভোগ করছেন। অন্যান্য অনেক বাউলিয়াকেও আজকাল পল্লীগ্রাম ছেড়ে শহরে এসে জনসাধারণের সংগে লোকালয়ের মধ্যে বসবাস করতে দেখা যায়। যদিও সাধারণ জনতা থেকে এঁদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এঁরা নিজেরাই বজায় রেখে চলেন, একথা তাঁদের দেখলেই বোঝা যায়।

নবজন্ম

কমলীনাথ দাস

আঁতুর ঘর থেকে যখন কান্নাটা সুহৃদার কানে এল তখন লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেল। মনে হল শিসে গলা কানে কেউ ঢেলে দিল। একটা কান্নার তীক্ষ্ণ চীৎকারে দুটো কান তার জ্বলে গেল।

আস্তে আস্তে কান্নাটা দম নিয়ে বাড়তে লাগল।

...আঁ-আঁ-আঁ-আঁ...

—গরম জল।

দশ বছরের বিপদভঞ্জন তাড়াতাড়ি এসে বলল—

—বড়দি! গরম জলটা দে! গরম হয়েছে তো? তাড়াতাড়ি ঢেলে দে।

ষ্টোভের শব্দ সুহৃদার কানে ঢুকছিল না। সদ্যজাত শিশুর থমকে থমকে শকুনের মত কান্না কানে বাজছিল। বাড়ির জমাট হট্টোগোল সব মিলিয়ে ষ্টোভের পাশে হাটুতে মুখ দিয়ে বসে থাকা সুহৃদার মনে জ্বলছিল ঘৃণার আগুন। কান দুটো অতিরিক্ত গরম হয়েছে! মাথার মধ্যে বেসামাল রক্তের বেআইনী ছুটাছুটি অনুভব করল সুহৃদা। কানের দুপাশের শিরাগুলো ধপ ধপ করে নড়েচড়ে উঠল।

—এই দিদি!

আস্তে ধাক্কা দিল বিপদ।

আঁতুর ঘরের কান্নাটা তখন সারা বাড়ির বাতাসে ছড়িয়ে গেছে। ঘরে ভর্তি হয়ে গেছে কান্না।

—যাঃ! আমি যাবার মত দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? কি হয়েছে তোর? গরম জল তাড়াতাড়ি ঢেলে দে। এই বড়দি!

বিপদ চিৎকার করে ডাকল।

সুহৃদা মুখ তুলল। ভাল করে তাকাতে পারছিল না বিপদের দিকে। সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। আঙুলের ডগায় ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। নাক দিয়ে ক্রান্ত পশুর মত নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে। রাগে ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর জ্বলছে।

শাড়ীতে শক্ত করে হাতটা মুছে নিল। ষ্টোভ বন্ধ করে দিল। গ্যাসগুলো বেরিয়ে আবার শব্দ হল। গরম জলের বাটি নামাল। পাতিল ধুঁয়ো মুখে এসে লাগল।

ভাল করে চাল! ফেলে দিচ্ছিস যে? দেখতে পাচ্ছিস না? কান্নাটা তীরের মত কানে এসে লাগছে। বিপদ চলে গেলে দুহাতে কান চেপে ধরল। হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে কান বন্ধ করল।

—না শব্দটা কানের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে। কানের মধ্যে বিশ্রী আওয়াজ ভাল লাগছে না! ভাল লাগছে না।

নিজের মনে সুহৃদা চিৎকার করে উঠল। কান দুটো ছেড়ে দিল সুহৃদা।

—বড়দি! পাঁচ বছরের ললিতের গলায় ঘরে ফিরে আনন্দ।

—বড়দি! ভাই হয়েছে! তালি দিয়ে উঠল ললিত।

—আপদ! যা পালা। নিজের আগুনে জ্বলছি আবার জ্বালাতে এলি কেন?

সুহৃদা নেড়ী কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠল।

ছেঁড়া জামা। মাথার চুলগুলোর কোন শ্রী নেই। নাক দিয়ে বারমাস সর্দি নামে। ললিতের দিকে চেয়ে করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

—না বেচারার দোষ কি? ওতো আমার মত ভাবতে পারছে না। ললিত যদি নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেত। তাহলে...তাহলে এখনই মহানন্দার জলে ডুবে মরত।

—সব জীবগুলো নষ্ট হল। ডাইরোন সব গোল্লায় নামবে। ভালমন্দ খাওয়া জুটেনা দুবেলা। জামাকাপড়ের কোন শ্রী নেই। ছেঁড়া ঘাটা। বাবা-মার তাও চোখ ফুটল না। ছিঃ! ছিঃ!..এদের ভবিষ্যত অন্ধকার। কি করে খাবে বড় হয়ে? রাস্তায় রাস্তায় লাথ জুতা খাবে। জেলে যাবে। একজন ভ..।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল সুছন্দা।

বুকটা অন্যদিনের চেয়ে আজ ঘন ঘন উঠানামা করছে। সারা শরীর কাঁপছে। কপাল বেয়ে ঘাম। সমস্ত শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে।

—না! আঁধার চাই! এ আলো অসহ্য। আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। মার লজ্জা হচ্ছে না ঐ আঁতুর ঘরে শুয়ে? ছিঃ! ছিঃ! লোকে কি বলবে? চমকে উঠল সুছন্দা।

ধাই ডাকছে।

—বড়দি! আলনার পাশে ছেঁড়া শাড়ি আর ছোট কাঁথা আছে দাও তাড়াতাড়ি। মাটিতে দুই হাতের ভরদিয়ে উঠল সুছন্দা। পাথরের মত ভারি মনে হল সমস্ত শরীর। রক্তমাংসগুলো সব পাথর হয়ে গেছে নাকি? সামনের পৃথিবী মাতালের মত টলে উঠল।

—মিষ্টি খাওয়াতে হবে। চার বোনের পর ভাই। কতকষ্টে পোওয়াতী খালাস করলাম। কালো কালো দাঁতগুলো বের করে লক্ষীধাই হাসতে লাগল।

—এ বয়সে পোয়াতি খালাস করা বড্ড কষ্ট। এই পাকাচুলের লক্ষীধাই ছাড়া গতি নেই দিদি।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুছন্দা দেখল ধাইকে। শুনলে তার কথা।

—মিষ্টি না ছাই! রেগে উঠল সুছন্দা।

—লজ্জা ঘোল না লক্ষীর। আমার কাছে মিষ্টি খাবে। হুঁ! যেন আমার ছেলে হয়েছে! আমি বড় মেয়ে। আমার মার বুড়ি বয়সে ছেলে হলত আমার কি? আমাকে বিদ্রূপ করছে লক্ষী। হ্যাঁ আমাকে বিদ্রূপ করছে। আমার বিয়ে হলে আমি দু-তিন ছেলের মা হতাম। সংসার করতাম। অনেক বয়স হল, স্বামীর স্বাদ পেলাম না। ছোট্ট ঘর। ছোট্ট জীবন।

খড়মের শব্দটা আস্তে আস্তে এই ঘরে আসছে। আস্তে আস্তে আওয়াজ আঁতুর ঘরের দিক থেকে সামনে এসে থামল।

—ছন্দা! বড্ড আদর করে ডাকলেন সুরেশ্বরবাবু অচেনা মেয়েকে। তোর ভাই হয়েছে। রং তোর মত ফর্সা। চুলগুলো..আঃ! ঠিক কার্তিকের মত। মাথায় যেন কিলবিল করছে সব কালো কালো সাপ। লম্বা নাক। যা দেখে আয়। আমি অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখলাম। আহাঃ! ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। তুই মুখ ভার করে কেন আছিস মা? যা! দেখে আয়।

—তুমি ওখানে ছিলে? বলল সুছন্দা আর মনে মনে বলল, চাঁদের আলো দেখছিলে? আকাশের চাঁদ কি মরে গেছে!

একটু লজ্জা পেয়ে হাসলেন সুরেশ্বর বাবু।

হঠাৎ সুরেশ্বর বাবুর তাল কেটে গেল।

—যাব...না। না। বাজার যাব পয়সা কোথায়? আনা-আটেক পয়সা ধার দেনা? দুটো ডিম কিনে আনব। ডিমের ঝোল আর ভাত আরামে খাওয়া যাবে। ডিম অনেকদিন...।

—একটা নয়া পয়সা নেই। মাইনে পেয়ে সবত তোমার হাতে দিলাম। স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে স্কুল করতে হবে। একটা ভাল শাড়ী নেই। ললিতের জামা নেই। বনমানুষের মত চুল হয়েছে। তুমি...বাপ হয়ে এগুলো দেখতে পাওনা? চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ?

—সব দোষ আমার? শালা সব আনোয়ারের দল! আমি কি করব?

রেগে উঠলেন সুরেশ্বরবাবু।

—যা মুখে আসে বললেই হল। টাকা নিয়নাও বসে বসে তোমার রূপ দেখব। ম্যাট্রিক পাশ করালাম কি জন্যে? শোকেশে সাজিয়ে রাখব। মানিক, হারামজাদা ক্রিমিনাল। বৌএর আঁচল ধরে পালাল।

চোখ মুছতে মুছতে সুছন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আঁধার পাতলা আঁধারে নামছে।

পাতলা আঁধার মাখা সিঁড়ি বেয়ে সুছন্দা ছাদে এসে দাঁড়াল। ছড়িয়ে থাকা আঁধারকে দুহাত দিয়ে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে সুছন্দা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। একটানা অনেকক্ষণ কাঁদল সুছন্দা। তারপরে আস্তে আস্তে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে তাকাল। অদ্ভুত এক অনুভূতি সারা শরীরে বিদ্যুতের মত ঝিলিক মারল।

সুছন্দা ভাবল। আশ্চর্য! সুছন্দা ভাবতে পারল।

—কোটি কোটি মাইল দূরের তারাগুলো কত সুন্দর। ভয় নেই। লজ্জা নেই। শূন্য আকাশে নিজের আগুনে নিজে জ্বলছে। জ্বলা শেষ হলে মাটির দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যাবে। উঃ। আমি যদি কোটি কোটি মাইল দূর থেকে পড়ে মরতাম। ভাল হত। সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হতে পরিত্রাণ পেতাম। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতাম।

অনেক উঁচু আকাশ থেকে মাথা নামাল সুছন্দা। কাঁধটা যেন ব্যথা হয়ে গেল।

দূরে দূরে রাস্তার লাইট পোষ্টে আলো জ্বলছে। আলোগুলোর রঙ লালচে।

সুছন্দা বসল ছাদে। আঁধার চারিধারে শুধু আঁধার।

—আমি যদি হারিয়ে যাই এই আঁধার স্রোতে, ভাল হয়। কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না। যেমন বর্ষার স্রোতে হারিয়ে যাওয়া গামছা কেউ পায় না, আমি হারিয়ে যেতে চাই আঁধারে। আমার লজ্জা ঢাকার আবরণ, তুমি, আঁধার। যত লজ্জা আমার! লজ্জা হলনা বাবার। লজ্জা হলনা আঁতুড় ঘরে শুয়ে মার? মার চুল সব সাদা পাটের মত। বুড়ো হয়ে গেছে। বুড়ো হলে যা হয়—গায়ের চামড়া ঝুলে গেছে। চোয়াল ভেঙে গেছে। চোখ দুটো রক্ত-শূন্য, ঘোলাটে। ভাল খেতে পায়না, আমরা কেউ ভাল খেতে পাই না।

নিজের পরিত্যক্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল সুছন্দা নিজে। আঁধার ঘন হয়ে এল। সুছন্দা আরও গভীরে নামল। একপা একপা করে নামতে লাগল।

—আমাদের বাড়ী একটা চিড়িয়াখানা। আমরা সব জানোয়ার। ঐ সদ্যজাত শিশু থেকে জানোয়ার। জন্তুর সাথে তফাৎ কোথায়? দেহের আকার যদি প্রাগৈতিহাসিক কালের মত ফিরে পেতাম তাহলে সব আমার জন্য। ভাত নেই, কাপড় নেই, জামা নেই, রুটি নেই, সব গোল্লায় নামছে। নিচুর টানে সব তলিয়ে যাচ্ছে। দাদাটা একটা স্বার্থপর পশু। বিয়ে করে হারামজাদা বৌ নিয়ে কেটে পড়ল। দাদার বৌ অমলা ছুঁড়ি বড্ড চালাক। একটি ছেলে একটি মেয়ে হবার পর অপারেশন করিয়ে ওদিকের পাট মিটিয়ে দিল। মার একটু ভয় হলনা, যদি মারা যেত? মরলে ভাল হত। মরল না কেন? কেন? কেন?

মধুটা বদমাস, গুণ্ডা। বটতলার ছেলেদের সাথে মিশে গোল্লায় গেল। মকদুমপুরের ফ্রকপরা মেয়েদের পেছনে পেছনে কুকুরের মত ঘেড়ায়। তিনের সাথে জড়িয়ে চিঠি ছুঁড়ে দেয়। একবার মার খেল। চোখটা নষ্ট হতে হতে বাঁচল। তবুও ভয় নেই, লজ্জা নেই।

মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরোয়। রাতে বাড়ি ফিরলে চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে থাকে।

ছিঃ, ছিঃ। বালিশের তলায় উলঙ্গ সব মেয়েদের ছবি। গায়ে গায়ে জড়িয়ে ছবি। আমার নিজেরই খুব লজ্জা হল তাকাতে, লজ্জা হচ্ছিল। বারকয়েক তাকিয়ে ঘৃণায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললাম।

আমি মধুকে বকে দিয়েছিলাম।

আমি বলেছিলাম—

ছিঃ, ছিঃ, তুই এত নীচে নেমে গেলি? তোর একটু লজ্জা হোল না। তোর চেয়ে আমার লজ্জা বেশী হচ্ছে। নিজের উপর ঘৃণা জন্মালোনা? বংশের মুখে-মুখে কালি দিলি। ওরে তোর উপর আমাদের কত আশা ছিল, কত বিশ্বাস ছিল। এখন তুই বাড়ির বড় ছেলে। তোর বড় হবার কত পথ খোলা। জীবনে দাঁড়াবার সুযোগ তুই করে নিতে পারতিস। তা না করে তুই রাস্তায় রাস্তায় ষাঁড়া করে বেড়াচ্ছিস? ষাঁড়া খাচ্ছিস, টি বি হবে রে...মরবি।

কান পেতে মধু সুছন্দার কথা শুনছিল।

—বল থামলি কেন? তুইত আজকাল বাড়ির গার্জেন। একটা চান্স এখন পেয়েছিস বলেন। গোল্লায় গেছি, ডুবে গেছি। মন্দ লাগছেনা শুনতে। এ চান্স

রি জীবনে পারি না। বলে নে, বলে নে প্রাণ খুলে।

—তোর বিছানার চাদরটা দাবান দেবার জন্য তুলে ঐসব উলঙ্গ নোংরা ছবি দেখলাম। সব ছিঁড়ে ফেললাম। মানুষ হয়ে ওসব তুই এত অধঃপাতে নামলি? তুই না মানুষ, হিউম্যান?

মানুষ, হিউম্যান?

বিস্ময়ে মধু চাইল দিদির দিকে। বিদ্রূপ করে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

—সে আবার কিরকম জীব?

—মধু! সুছন্দার মেয়েলি কণ্ঠস্বরে শাসনের কঠোর সুর। সুছন্দা রাগে কাঁপতে লাগল।

—দেখ ওসব মেজাজ তোর বোকা ছাত্রীদের দেখাবি। হা-করে গিলবে। আমিতো বাপু গোল্লার জীব। আমাকে আবার শাসন কেন?

—লজ্জা করে না মুখে মুখে তর্ক করতে? জানোয়ার!

—জানোয়ারের পেট থেকে কি মানুষ বেরোবে? নাটকীয় ভংগীতে মধু হাসতে লাগল।

—এটা বাড়ি, হাঃ...হাঃ! চিড়িয়াখানা, বুঝলি?

চোখ দুটো ঘুরিয়ে মধু তাকাল সুছন্দার পানে।

—ওখানে সব পশু। মানে অ্যানিমেল। ওরা ঘাস-পাতা খায়, মারামারি করে। এ বাড়িতে আমরাও সব পশু। এভাবে মানুষ বাস করে? ঘরে আলো নেই, বাতাস নেই। আলো আর বাতাসের স্বাদ পেয়েছিস? বলত কিরকম স্বাদ।

—অনেকেই এরকম বাড়িতে বাস করে। কই অনেকে তো তোর মত গোল্লায় যায়নি। ইচ্ছে করে গোল্লায় নামলে কে কি করবে?

—বললাম ত ওসব বক্তৃতায় আমার আর টনক নড়ছে না। পেটে দুবেলা ভাত পড়ে না। রেশনের চালের লাল কাঁকর মেশানো ভাত খেয়ে বাঁচতে হবেনা। দোকানের দিকে চেয়ে চোখে জল নামে। কত ভাল ভাল জামা-কাপড় সাজানো। টাকার অভাবে আমাদের গায়ে উঠল না। যাদের টাকা আছে তারা মৌমাছির মত ভিড় করে থাকে দোকানে। এসব দেখে হৃদয় শুকিয়ে গেছে। হৃদয়, মন বলে কিছু আর নাই। আজ শুধু জ্বলছে! জ্বলছে!

—কার উপর রাগ করে নামলিরে নীচে? উঠে আয় তুই যদি একটু ভাল হস তাতেই আমার আনন্দ মধু। যা আছি তাই ভালরে। সুছন্দার স্বরে কান্নার নিস্তেজ বিলাপ।

—না। তীব্র প্রতিবাদ করে মধু। তার কণ্ঠস্বরে আগ্নেয়গিরির জ্বালা। অভিমান আর বিক্ষোভ। বিশ্বাস-হীনতার সুস্পষ্ট লক্ষণ।

—না, যা আছি ভাল নেই। তোদের সান্ত্বনা নিয়ে তোরা থাক। নাইনে ফেল করলাম। বাবা পড়া বন্ধ করে দিল! যা মুখে এল বাবা তাই বলে গাল দিল, অপমান করল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। সান্ত্বনা কেউ দিল না। একবার যদি চান্স পেতাম তাহলে চেষ্টা করতাম। মানুষ হবার বাসনা আমারও ছিল। সব নষ্ট হয়ে গেল। আমার স্বপ্নের পৃথিবী জলেপুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

—বাবা কি করবে বল?

—করার ছিল। আজ নেই। আজ আর নেই। সেদিনের মধুও আজ নেই। সেদিনের মধু আজকের মধু আকাশ পাতাল তফাৎ। সেদিনের মধু মারা গেছে। মধুর গলার স্বরে অনুতাপের ছোঁয়া।

—এইত বুঝতে শিখেছিস। উঠে আয়। কান্না ছেড়ে শুকনো ডাঙায় আয়। সুছন্দার কথায় আনন্দের সুর।

—না, আর হবে না। কান্নার জীব শুকনোয় মারা যায়। কান্নার স্বাদ মন্দ কি?

সেদিনের ছবি মধু তুলে আনল।

—ছুটে গেলাম সুজিতের কাছে, নিয়ে গেল আড্ডায়। চারিধারে তাস খেলা চলছে। বিড়ির ধোঁয়ায় ছোট্ট ঘরটা বিশ্রী লাগছিল। পালিয়ে আসতে পারলাম না। পায়ে আমার শক্তি ছিল না, সুজিৎ চা এগিয়ে দিল। চায়ের সাথে রঙিন কি মিশালে। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ভালই লাগছিল। আমি চা খেলাম, আবার নিলাম। বড্ড ভাল লাগল খেতে। আস্তে আস্তে শরীর অবশ হয়ে এল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল, চোখ দুটো জড়িয়ে এল, সবকিছু যেন হারিয়ে গেল। ভুলে গেলাম বাবার রাগ। বাড়ি, সব সব। অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। রাস্তায় কয়েকবার বমি করেছিলাম। বিছানায় পড়ামাত্র

মড়ার মত ঘুমিয়ে গেলাম। আমি হারিয়ে গেলাম। মধুর চোখ দুটিতে কান্নার জল চিক্ চিক্ করছে।

হাত দিয়ে বারকয়েক চোখ মুছল, নাক মুছল। নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানল।

বারকয়েক কেশে নিল মধু।

তবুও গলার স্বরে কান্নার অবদমিত প্রকাশ। পরেরদিন সকালে তাড়াতাড়ি স্নান করলাম। স্নানের পর খিদে জ্বলতে লাগল পেটে।

কিছু নেই। মা বলল।

—বড্ড খিদে পেয়েছে।

—আমি কি করব। এতবড় গাধা ছেলে সকাল বেলা খাব খাব। বুড়ো বাপের ঘাড়ে চেপে, লজ্জা করে না বসতে।

—কয়টা মুড়ি দাও, পেট জ্বলে গেল।

—তোর জন্যে মুড়ি লাকাচ্ছে। ললিত, বিপদ ওরাওত না খেয়ে আছে।

—তবে পয়সা দাও।

স্নেহাগুনে জ্বলে উঠল মা। মা তার মনের আগুন সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাকে মারল।

—আমি রোজগার করছি? যা বাপের কাছে। বাপের কাছে যেতে পার না? কে আমি এ সংসারের? দাসী বাঁদিরও ত কথা লোকে শোনে। আমি দাসী বাঁদির চেয়েও অধম। রাতদিন গাধার মত খাটি। রাবণের চাঁজে। খাটতে খাটতে জীবনটা গেল। চল্লিশ বছর তোর বাবার ঘর করছি, একটা ভাল শাড়ি দিয়েছে? হাতে তুলে একটা টাকা দিয়েছে? মরণও হয় না, পোড়া কপাল আমার।

—আমি দৌড়ে গেলাম সুজিৎ এর কাছে। সুজিৎ ছিল না। বিড়ির দোকানে গেলাম না। পেটে তখন আমার রাক্ষস-খিদে। ছুটে গেলাম আড্ডায়। অজয়ের কাছে দু'আনা ধার নিলাম—ঝালমুড়ি কিনলাম রাস্তার কলে জল খেলাম। আস্তে আস্তে আবার আড্ডায় গেলাম। অজয়এর পাশে বসলাম। বসে বসে খেলা দেখলাম। মজার খেলা।

এক আনায় চার আনা। চার আনায় এক টাকা।

আমিও অজয় হলাম, মাছ কিনে আনতাম, মুড়ি, মাঝে মাঝে সন্দেশ।

—কোথায় পাচ্ছিস রোজ রোজ পয়সা? পকেট মারছিস নাকি? বাবা মাছের মুড়া চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞাসা করল।

—কাজ করছি।

—কাজ? কি কাজ? সুরেশ্বর বাবুর গলায় বিস্মিত বিস্ময়।

—এক আনায় চার আনা। চার আনায় এক টাকা।

—দুর্যা! গ্যামলিং! চিৎকার করতে গিয়ে দম যেন বন্ধ হয়ে গেল।

সুরেশ্বর বাবু চমকে উঠলেন। যেন ভূত দেখেছেন দিন দুপুরে। হাত থেকে মাছের মুড়া পরে গেল। নিজের ছেলের দিকে আর তাকাতে পারলেন না। রাগে কাঁপতে লাগলেন।

আমি তাড়াতাড়ি ভাতের থালা থেকে উঠে পড়লাম। কুয়োর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম।

বাবা তখন মেজাজে চিৎকার করে চলেছেন—

—শালা ওটা একটা জানোয়ার। ইতর। বংশের কুলাঙ্গার। বেড়িয়ে যা।

হাত ধুয়ে মধু ঘরে এল। বাবার পকেট থেকে বিড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল।

সুছন্দা অনেক কষ্টে মধুকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়ে আনল। ভাইয়ের হাত ধরে ছাদে নিয়ে এল।

—আমার কথা শোন মধু। লক্ষ্মী ভাই আমার। মিনতি মাখানো স্বর সুছন্দার।

—না কোন কথা আমি শুনব না। বাবার ওসব কথা আমি গ্রাহ্য করি না। দে একটা টাকা। কাল সকালে তোকে দশ টাকা দেব। এক টাকা নিয়ে বসব আর উঠব দশ দিয়ে। তোর শাড়ী কেনার টাকা হয়ে যাবে। দে। ছেঁড়া শাড়ী নতুন হবে। দে····।

—আমার কথা শোন। ওপথ তুই আর মাড়াস না। তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। আমি পড়াব। সব খরচ আমি দেব। তুই মানুষ হ মধু।

—আবার লেকচার। থামা তোর বুলি। যা বলছি শোন, দে একটা টাকা।

—তোর সব কীর্তি বাবাকে বলে দেব। সুছন্দা

ঝাঁঝালো গলায় বলল।

কয়লার কুণ্ডোলী পাকানো ধোঁয়া মা করে জ্বলে উঠল।

—বলিস ! ভয় করি ? কে তোকে আমার বিছানা ছুঁতে বলেছিল ? ভাতের উপর চরম উগরে পড়ছিল। বাকে ফটো আছে আমার আছে। গোল্লায় গেছি আমি, কার কি ? তোর কি ? আমার জন্ত তোর মাথা ব্যাথা কেন ? কে দেখতে বলেছিল ফটোগুলো ? কে তোকে লজ্জা পেতে বলেছিল ? ওসব চালাকি। বিয়ে হলে তুই একগণ্ডা ছেলের মা হতিস। সংসার করতিস আদ্ধির। নিজের কথা ভাব। কি মধু আছে এই ছোট্ট বাড়িতে ? কত মেয়ে পালিয়ে গেল। বিয়ে করল। কুমারের দিদি, ভানু, বেণা আর সব ছেলের মা। তুই বসে বসে বুড়ি হলি।

—চুপ কর মা। যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছিস। লজ্জার মাথা খেয়ে আছিস।

—দে কথা বলতে দে।

আর কোন কথা ধৈর্য ধরে শুনবার মত সুছন্দার মানসিক অবস্থা ছিল না মধু যেন আজ সুছন্দার চোখের সামনে এক নতুন পৃথিবী তুলে ধরল। সুছন্দা অস্বীকার করতে পারে না মধুর তিক্ত কথাগুলো। সুছন্দা জানত এ তার অভিজ্ঞতার কথা। তবুও সুছন্দার সামাজিক মন তীব্র অস্বীকার করে উঠল। ভাতের মুখ থেকে তার নারী-জীবনের করুণ কাহিনী সে শুনতে চায় না। তীব্র প্রতিবাদ করে উঠে সুছন্দা।

—না—না। তুই পালা। কোন কথা শুনতে চাই না। তোর মুখ দেখতে চাই না। সুছন্দা আজ মধুর সামনে দু'হাতের পাতলা পাতলা আঙুলগুলো দিয়ে মুখ ঢাকল।

—তোদের এ মুখ আর আমি দেখবো না। আজ আমাকে বলতে দে। না বলতে পারলে পাগল হয়ে যাব।

মধু দু'হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো শক্ত করে টেনে ধরল। চোখ দুটো কুঁচকে উঠল। সারা মুখে অসংখ্য অত্যাচারের ছাপ তীব্র হয়ে জেগে উঠল। চোখের পাতায় ধারে ধারে অনিদ্রার প্রলেপ।

ময়লা সার্ট, হাত দুটো খুলে নেমেছে। বোতাম নেই, খালি বুক। বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখতে পেল সুছন্দা। সুছন্দা দেখতে পেল মধু মরার জন্ত ছটপট করছে। আগুনের তীব্র আলোর নেশায় পতঙ্গ ধেয়ে চলেছে। হাত বাড়িয়ে টানবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে সুছন্দা।

—দাউ দাউ করে বুক জ্বলছে বড়দি। ঘৃণায় ! হিংসায় ! উঃ ! কী তীব্র জ্বালা। সাপের বিষের চেয়েও তীব্র। জ্বলে জ্বলে কাঠ কয়লা হয় বড়দি। আর আমি ···দুয়ারী হলাম। চোর হলাম। বাপের নাম ডুবালাম পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল।

—আঃ !

মধু আস্তে আস্তে বিড়ি টান মেরে বলল—

—ভেবেছিলাম সুজিৎ, অজয়রা ভাল আছে। না ! গোল্লায় আরও জ্বালা। গোল্লায় নেমে ওরা বাঁচল না সুজিৎ না, অজয় না, আমিও না। এখানেও বাঁচবার কোন প্রশ্ন নেই। সুজিৎ সর্দারের বেটির সাথে উধাও ! বেটি পালিয়ে যাবার পর সর্দারও চটিপট্টি গুটিয়ে ছিল। সর্দার দেশে ভাগল। অজয়ের হল টি, বি। ওর মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল।

—পাড়ার তোর জন্ত টেঁকা দায় হল। আমাদের লোকে কত ঘৃণা করে ! বিদ্রূপ করে ! মাথা তুলে ওদের কথার প্রতিবাদ করতে পারি না। সুছন্দা আঁচল তুলে চোখে ধরল। এখন যেন কাঁদতেও লজ্জা পাচ্ছে সুছন্দা। পাতলা জল চোখের কোণে কোণে ভাসছিল।

ঘন ঘন চোখের পাতা মুছল।

কট কট করে জ্বলছিল চোখ। দু'টি চোখে জ্বালা আর যন্ত্রণা।

আবছা দৃষ্টিতে তাকাল মধুকে।

মধু যেন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। তবুও মধুর স্বর স্পষ্ট। মধু যেন সব কথা চিৎকার করে সারা পৃথিবীতে বলতে চাইছে।

সুছন্দা নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। ত্রিশ বছরের রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী দেহ।

বার কয়েক নাক ঝাড়ল।

তারপর আস্তে আস্তে গালের ময়লা তুলতে লাগল।

চোখের জল জমে অনেক ময়লা তৈরী হয়েছিল।

মধুর গলার স্বরে অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

প্রদীপের অন্তিম শিখা।

নিভিয়ে অন্ধকার হবার আগে শেষ শক্তি দিয়ে নাড়া দিল।

—পাড়া আবার টেনে আনলি কেন? পাড়ায় সব মহাপুরুষের বাস নাকি? সব ব্যাটাকে জানতে মধু রায়ের বাকি নেই। আমি জুয়ারী। আর মদন বাবু? সভা বাবু···ওরা সাধু। শালারা ডুবে ডুবে জল খায়। আর ঐ দোতলা বাড়ির বেবেন ঘোষ ডাক্তার এক নম্বরের শয়তান। রাতের বেলা—শালার যত রোগীর ভিড় বাড়ির ভেতর। পুলিসকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে। আর তোদের চন্দ্রনাথ দা মাটির মানুষ। সাধু! মাছ ভাজা উল্টে খেতে জানে না। ওগু শালা এক নম্বরের। মিশনে একবার করে গেলেই সব পাপ ধুয়ে মুছে মহানন্দার জলে মিশে গেল।

সুছন্দা আজ যেন এক আশ্চর্য পৃথিবীর স্বাদ পাচ্ছিল। ত্রিশ বছর ধরে এ স্বাদ সে পায়নি। সতের বছরের মধু যেন এ স্বাদের সঙ্গে পরিচিত। যারা তরকারির মত স্বাদ অম্বল, ঝাল দিয়ে বলতে পারে মধু। সমাজের এক একটি অংশ থেকে কি খুলছে মধু।

মদন ব্যানার্জি! সভ্য বাবু!

মধু আজ যেন এদের টানতে টানতে সুছন্দার কাছে আনল। মুখোশ তুলে ফেলল মধু।

শিউরে উঠল সুছন্দা।

—টাকা থাকলে ওসব চরিত্রের অলঙ্কার, আর রিটায়ার্ড কেরানী সুরেশের যাদের ছেলের চরিত্র নিয়ে টানাটানি। পুতুল যখন ডাইভারের সঙ্গে পালিয়ে যে তখন তোরা সাবিত্রি মাসি, কমলা বৌদিরা কোথায় ছিল? পুতুলের বেলায় সাতখুন মাপ। পুতুলের বাবার হাজার হাজার টাকা।

মালদহ কলেজ থেকে

ফেরল সুছন্দা।

কালো, বেঁটে, চোখ দুটো খুঁদে খুঁদে।

সেই পুতুল প্রেমে পড়ল সুরেশের।

তারপর পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল।

মানুষ এগুচ্ছে। সভ্যতা এগুচ্ছে।
সভ্যতার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে
বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ চাই-ই।

—: তার জন্য খোঁজ করুন :—
রেডিও টেক্‌নিকস্
এইচ্-এম-ভি ও কলোম্বিয়ার
অনুমোদিত প্রতিনিধি
৬৪এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
ফোন: ৫৫-৪৮৩১

রামকৃষ্ণ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯০, শোভাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫।

ফিরে এল, কোলে তখন বাচ্চা।

পুতুল এক ছেলের মা।

পুতুলের বাপ বলাই বিয়ে করল না মাধুরীকে। বিয়ে করল মোক্তারের মেয়ে জ্যোৎস্নাকে। মাধুরী জানত বলাই তাকেই বৌ করবে। তাও হল না।

তাই নিয়ে মাধুরীর বাপা হাবুর সাথে হল ঝগড়া। মারামারি।

—মৃন্ময়, ও ব্যাটা এক নম্বরের বদমাইস। কর্ণা কলেজে যেন আমি কত দিন হাতে হাতে তোদের মৃন্ময় বাবুর চিঠি দিয়েছি। কতদিন চিঠি খুলে খুলে পড়তাম। কি জন্ত এক দিন কর্ণাকে নিয়ে কলকাতা ভাগল। কুকুর বেড়ালেও আজ কর্ণার দিকে তাকাতে লজ্জা পায়। কর্ণা ঘোষ আজ মরা। মরা দেহ নিয়ে চিতায় উঠবার দিন গুনছে।

সেদিনও ছাদে অনেক আঁধার।

সুছন্দা শুনছিল নতুন মহাভারত। সমস্ত ছবি ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। চন্দ্রনাথ, রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর। অশোক কন্ট্রাকটারের মেয়ে পুতুল। জজ কোর্টের মুহুরী সতীশ সাহার মেয়ে মাধুরী। বলাই এর দুয়ারী ভাই দীনেশ।

—মীরা দেব বেশ্যার চেয়েও অধম। পেটের দায়ে বেশ্যারা দেহ বিক্রি করে। আর মীরা কি বলব! এক হাতে যোগেনকে নাচালে অন্য হাতে বিভূতিকে। রাতারাতি বাড়ি হাঁকাল। বিভূতি শালা শুধু মিছেমিছি টাকা ঢালল বেশ্যার পায়ে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ছাদে সুছন্দা নিজে।

মধু নেই। মধু বহরমপুর জেলে।

মধু জেলে। মীরা দেব মারা গেল।

শ্যামল ডাক্তার বলেছিল মীরার অসুখ ভাল হবে না।

আস্তে আস্তে মাথার চুল উঠতে লাগল। সিঁথির জায়গায় দগ্‌দগে ঘা। গালের চামড়া উঠতে লাগল। সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ। চোখের নীচে কালোর ছায়া।

আঁতুর ঘরে কান্নাটা মায়ের কোলের গরমেও কেঁদে চলেছে।

ঘুরন্ত গ্রহের উপর কান্নাটি ঘুরছে।

সুরেশ্বর বাবুর ছাদে তখন অনেক আঁধার। চারিধারে আঁধার।

কোটি কোটি বছরের গ্রহটিও কেঁদে কেঁদে ঘুরছে।

সুছন্দার ন' নম্বর ভাইটির কান্না হঠাৎ সুছন্দার বড্ড ভাল লাগল।

কোন ক্লান্তি নেই। কোন অবসাদ নেই শরীরে।

ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা ধীর স্থির হয়ে উঠল। হঠাৎ সুছন্দার মনে হল—

—আমিও ত্রিশ বছর আগে মাটিতে পড়ে এমনি করে কেঁদেছিলাম। হাঁ ঠিক এই সুরে আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ।

সুছন্দা আস্তে আস্তে নামল। চুপি চুপি আঁতুর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আঁতুর ঘরের বাচ্চাটি মিটমিট করে সুছন্দার দিকে চাইল।

সুছন্দা হাসল। হাত নেড়ে ন' নম্বর ভাইটিকে ইশারা করল।

সুরেশ্বর বাবুর ত্রিশ বছরের মেয়ের এক জোড়া চোখ তখন এক দিনের শিশুর দিকে চেয়ে আছে। দুটি চোখ হাসছে।

হাসতে হাসতে সুছন্দা আঁতুর ঘরের অনেক ভেতরে ঢুকল।

পৃথিবীর আঁতুর ঘরে সুছন্দার আবার জন্ম হল।

সংগীত

আদিবাসী ও উপজাতিদের গান

চিত্তরঞ্জন দেব

শারদীয়া পূজা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উছলে উঠতে থাকে বাঙালী-হৃদয়ে। কিন্তু মানভূমের আদিবাসীদের ভিতর শারদীয়া পূজার চাইতে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতের উৎসবেই আনন্দের বান ডাকে। তাই জোছনা ঝলকানো শারদ পূর্ণিমা নিশিথে ডুংরির ধারে বসে যায় এদের উৎসব। মাহাতো, কুর্মী ও আদিবাসীরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে মাদল বাঁশী নাচের মধ্যে দিয়ে তাদের মনের কথা প্রকাশ করবার চেষ্টা করে। এই যে নাচের কথা বললাম এরই নাম হল ডাঁইড় নাচ বা দাঁড় নাচ। এর সঙ্গে এদেরই রচিত যে গান গাওয়া হয়ে থাকে তার ভাষা হল 'খট্টা'। মাদলের বাজনা আর বাঁশীর সুরে সুরে মিলিয়ে তারা গাইতে থাকে :—

কতক্ষণে ফুটই হরদোই রে ঝিঙাফুল,
কতক্ষণে ফুটই লাল শালুকের ফুল
ভিনিসরে ফুটই হরদোই রে ঝিঙাফুল,
(ওরা) শাশুড়ী ননদে পাতাইয়া গেঁদাফুল।
(ও মরি হায়রে হায়)

মানভূমের আদিবাসীরা নিরক্ষর বটে। কিন্তু দেখুন কী অপূর্ব তাদের রসবোধ। লোককবি বলছে, আমার হৃদয় মুকুল ফুটবে কতক্ষণে ও ঝিঙাফুল। কতক্ষণেই বা ফুটবে লাল শালুকের ফুল? কবি পরক্ষণেই বলছে, ভোরের সময়েই ফুটবে হৃদয় মুকুল। ওরা আজ আনন্দে এতটা আত্মহারা হয়ে গেছে যে শাশুড়ী ননদেই গেঁদাফুল (সেই পাতান) পাতান।

সাঁওতালী

আদিবাসী সমাজের ভিতর সব চাইতে প্রাধান্য লাভ করেছে প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক ও প্রেম ভালবাসার গীতগুলি। এর মধ্যে এদের প্রেম ভালবাসার গানগুলি বা সমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি কিন্তু দেশে চলিত এইসব গান ছাড়াও নিছক আদিবাসীদের গান বলে যেগুলি পরিচিত সে সম্পর্কেই আপাততঃ কিছু বলছি। আদিবাসীদের এইসব গান বেশীর ভাগই প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক।

প্রকৃতির দুলাল দুলালী সাঁওতাল যুবক-যুবতী। তাই তাদের রীতি ও গানের অঙ্গ কথার চাইতে প্রকৃতির কথাই থাকে বেশী। বনানীর শ্যামছায়া, পর্বত ও উপত্যকার মনোরম দৃশ্য, ঝর্ণার প্রাণ মাতান হাসিই এদের নিত্য সহচর। সভ্যজগতের বাসিন্দাদের মত সোনা-দানা এরা ব্যবহার করে না—তার জন্য এদের কোন দুঃখ নেই। খোঁপায় পরে ফুলের মালা, কানে গোঁজে ফুলের ঝুমকো, কপালে দেয় কাঁচ পোকার টিপ। কারও বা গলায় থাকে দু'এক ছড়া রাঙা পাথরের মালা—এই পর্যন্ত। এতেই এরা মহাখুশী। নিত্য নূতনের সাজসজ্জার ধার ধারেনা। সভ্য জগতের চেয়ে তাই এদের গানে প্রকৃতির বর্ণনা মেলে অকৃত্রিমভাবে। সামান্য নাতাল ফুল দেখে সাঁওতাল যুবতীর যে আনন্দ, সভ্য জগতের কোন সুন্দরী তরুণী রত্নখচিত কোন অলঙ্কার দেখেও এতটা খুশী হয় কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিতর সাঁওতালগীতি যেকোন আঞ্চলিক লোকগীতিকেই হার মানিয়ে দিয়েছে :—

বুকরে নাতাল বাহা
দলপ্ দলপ্ নাতাল বাহা
বাহা লেকাতে হইঞ্ ভিতিক গিয়া
হরিঞ্ চিপ রেহ ছুতদ কচ্ রেহ
বাহা লেকারে হইঞ্ বাহাই গিয়াই।

পাহাড়ের উপর নাতাল ফুল দুলছে, হাওয়ায় নাচছে, যে করেই হোক আমি ও' ফুল তুলে আনব। যদিও আমি তত সুন্দরী নই, তবু আমি সেগুলি আমার খোঁপায় পরব। আমার খোঁপার দু'ধারে দুলতে থাকবে নাতাল ফুল।

কিংবা :—

নদীয়াকা ধারে ধারে আমাকার বাগান রঘু
ফুলাকার বাগান,
ফুলাকার বাগান রঘু বাতাসে মারল
আমাকার বাগান রঘু দূরে মারল।

রঘু নামক কোন যুবককে বলছে কোন সুন্দরী, নদীর ধারে রয়েছে আমাদের ফুলের বাগান। ফুলের উপর বাতাস খেলে বেড়ায়, সেখানে এসে খেলা করতে থাকে যত সব দূর পরীর দল।

মানভূমে শাল-মহুয়ার ঘেরা বনের মাঝে সাঁওতাল নর-নারী আনন্দের আতিশয্যে বসন্ত উৎসবে মিলিত হয়। এই উৎসবে ঘেরিয়া, মাহাতো, ভূঞা প্রভৃতিরাও যোগ দেয়। সেই সময় মাদলের সঙ্গে তারা গাইতে থাকে :—

ধা তিন্ তা ধা তিন্ তা
ধা তিন্ তাতাক্ ধা তিন তা
তাতাক্ ধাতিন্ ধাতিন্ তা
তাকতা ধাতিন্ ধাতিন্ তা।

একে ঠিক গান বলা চলে না। বরং বলা উচিত মাদলের বোল।

এই রকম মাদলের মত বাঁশীর সঙ্গেও গান চলে। তবে একটু ব্যতিক্রম আছে, বাঁশী বাজায় সাঁওতাল যুবক আর একত্রে হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকে সাঁওতাল যুবতীর দল। সাঁওতাল যুবক তার বাঁশীতে সুর তোলে :—

তুরু রুরু তুরু রুরু
তুতুর তুআ তু—
তুতুর তুআ তুতুর তুআ
তুতুর তুআ তু।

একেও গান না বলে বলা উচিত বাঁশীর বোল।

বন্দনা গান

মেদিনীপুরে লোধা নামে যে উপজাতির বাস আছে হিন্দু সমাজের সঙ্গে সংমিশ্রনের ফলে তাদের ভাষা আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাংলা ভাষারই অংশরূপে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু তাদের ভিতর এখনও তাদের আদিম সমাজের কতকগুলি পূজা-পরব ও অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের ভিতর ভূত-প্রেত বা অপদেবতার উপর অসীম বিশ্বাস। তা ছাড়া তাদের মৃত পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যেও তাদের উৎসব করতে দেখা যায়। শীতলা, ডাকিনী, যুগিনী প্রভৃতি এ সমাজের অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। ভয় থেকেই যখন ভক্তির উৎপত্তি, সেই হেতু এরাও তাদের সংসারের অমঙ্গল দূর করবার জন্য পুরোহিত ঠাকুরের মারফৎই তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়, হে মা তুমি প্রসন্ন হও, আমাদের উপর কু-দৃষ্টি দিও না, আমরা তোমায় ভোগ দেব। এই বলে "চাড়ল" নামক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তারা সমস্বরে গাইতে থাকে :—

বন্দনা বন্দনা মুই মা—
বন্দনা বন্দনা মুই মা।
প্রথমে বন্দনা করি, প্রথমে বন্দনা করি
জয় মা শীতলা,
বন্দনা বন্দনা মুই মা—।
তারপরে বন্দনা করি শীতলা-যুগিনী,
তারপরে বন্দনা করি বসন্ত কুঁয়ারী,
তারপরে বন্দনা করি মিলমিলা বুড়ী,
তারপরে বন্দনা করি ওলাউঠা বুড়ী,
তারপরে বন্দনা করি ছাঁদন বাঁদন,
তারপরে বন্দনা করি বুড়ারে বড়াস,
তারপরে বন্দনা করি বেড়াজাল কক্কা,
দক্ষিণেতে বন্দি আমি জয় জগন্নাথ,
পশ্চিমেতে বন্দি আমি জয় মা মঙ্গলা,
ষোলঘড়ী ষোলবেশ গলায় মুণ্ডমালা,
উত্তরেতে বন্দি আমি জয় কালিঘাটা,
পূরবেতে বন্দি আমি জয় সূর্য-চন্দ্র,
ভদ্রেশ্বরে বন্দি আমি জয় মা ভদ্রানী,
নারায়ণ গড়ে বন্দি আমি জয় মা ব্রাহ্মণী।
বন্দনা বন্দনা মুই মা— ॥

সোল অব লিলিথ

মেরী করেলী

॥ ১ ॥

ইলস্রাকোম্বের সমুদ্র-উপকূলে মাত্র একখানিই পাকাবাড়ী ছিল। সম্প্রতি তার ওপর একটি মস্তবড় পাকা গম্বুজ তৈরী করা হয়েছে। বর্তমান মালিক বাড়ীটার 'ভূতের বাড়ী' বলে বদনাম থাকায় আগেকার মালিকের কাছ থেকে, প্রায় নামমাত্র মূল্যে কিনেছেন। তারপর বর্তমান মালিকই তৈরী করিয়েছেন এই অতিকায় গম্বুজটী।

সমুদ্রের দিকে গম্বুজটীতে একটি বড় জানালা কোটান ছিল। এ গম্বুজের সবটুকু পরিকল্পনাই বর্তমান মালিকের নিজের খেয়াল-খুশী মত করে গড়া হয়েছিল।

সেদিন রাত্রে সমুদ্রের ওপর প্রবল অশান্ত বাতাস মাতামাতি করে বেড়াচ্ছিল; তার ফলে পর্বত-প্রমাণ ঢেউগুলি সাগর তটের ওপর বিকট শব্দে আছাড় খেয়ে পড়ে ফিরে ফিরে আসছিল। আকাশে কিন্তু বিশেষ মেঘ ছিল না। চাঁদ না থাকায় হাজার হাজার তারা কালো মেঘের আচ্ছাদন ভেদ করে, আকাশের গায়ে মণিমুক্তার মতন ঝিকমিক্ করছিল। আর গম্বুজের বড় খোলা জানলাটার ভেতরে রাখা একটা লণ্ঠনের ক্ষীণ বাতির আলো হাওয়ার দাপটে কেঁপে কেঁপে প্রায় নিভু নিভু হয়ে যাচ্ছিল।

বাড়ীর বর্তমান মালিক ডাক্তার ক্রেমলিন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন। যাকিছু সওদা, তাঁর একমাত্র জার্মান ভৃত্য-বাবুর্চি কার্লই করত। কাজেই তার ক্রেমলিনকে গাঁয়ের কেউই কোনদিন দেখেও নি, চিনতও না। সে বাড়ির কড়া নেড়ে মাসে-ছমাসে একমাত্র এলরামিই সেখানে দেখা করতে আসত।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন রাত প্রায় দশটার সময় এলরামি এসে বাড়ীর দোরের কড়া নাড়ল। প্রায় সংগে সংগেই দোর খুলে দিয়ে কার্ল বললে—"এই যে হুজুর এসে গেছেন! ডাক্তার সাহেব আজ সারাদিনের মধ্যে একবারও গম্বুজ ঘর থেকে বাইরে আসেন নি—কাজেই সারাদিনের মধ্যে একবিন্দু জলও তাঁর পেটে পড়েনি। এ রকম নিরম্বু উপোস করে থাকলে, আর কদিনই বা তিনি বেঁচে থাকবেন, তাওত বুঝি না!"

এলরামি সিঁড়ি দিয়ে ওপর তোলায় উঠে গম্বুজের উদ্দেশ্যে গেল। গম্বুজ-ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে, বন্ধ দোরে সে করাঘাত করল।

ঘরের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা গোঙানী শব্দ আসছিল। এই দোরগোড়ায় দাঁড়াতে সেই শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়েই এলরামির কানে আসতে লাগল। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে সে জোরে করাঘাত করল—এবার একটু জোরে জোরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বয়ং ক্রেমলিন দোরের একটা ছোট খুপরী খুলে কে ডাকে দেখবার জন্যে বাতি হাতে তাঁর বার্ধক্য-জীর্ণ অতিক্লান্ত মুখখানি বার করতেই সামনে এলরামিকে দেখে সোল্লাসে বলে উঠলেন—"আরে এলরামিয়ো—তুমি এসে গেছ তাহলে?—এস, এস ভেতরে এসো।"—বলে দোরটা এবার পুরো খুলে দিলেন।

এলরামি গম্বুজ-ঘরে ঢুকলো।

ক্রেমলিন বাতিটা তুলে ধরে এলরামির আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন—"সত্যি! কি সুন্দর তোমার স্বাস্থ্য!—দেখলে সত্যিই হিংসে হয়।...অথচ, বয়েসে তুমি আমার চেয়ে কত বড়।...আমি কিন্তু বুড়ো হয়ে পড়েছি—বেশ বুঝতে পারছি জীবনে ভাঁটার স্রোত খরতর বেগে বইতে আরম্ভ করেছে!...তোমার মত স্বাস্থ্য যদি আমিও পেতুম!...ভগবান জানেন, জীবনের অনেক কাজই আমার এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে!"—কথাগুলো বলতে বলতে ক্রেমলিন যেন মহা খেদে ভেঙে পড়তে চাইলেন!

দরদী সুরে এলরামি বললে—"অতিশ্রমে তুমি ক্লান্ত ক্রেমলিন! আজ রাত্রে তোমায় আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব।...সেইজন্যেই আমার প্রতিশ্রুতি মত আমি এসেছি

...দেখাই যাক্, কতটা কি করতে পারি।...আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর ক্রেমলিন আমি কথা দিচ্ছি তোমায়—সময়ের অভাবে তোমার কাজকে অসম্পূর্ণ রেখে মরতে হবে না তোমায়। কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করে তারপরও কিছুদিন নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম করবার সময় পাবে...যথেষ্ট কুরসুৎ পাবে...আমি তোমায় পরমায়ু বাড়িয়ে দেব।"

বুড়ো ডাঃ ক্রেমলিন অনেকটা হতাশা ভরেই সোফার ওপর বসে পড়ে, হাতের তেলোয় মাথা রেখে, এলরামির অবিশ্বাস্য কথাগুলো শুনতে লাগলেন।

এলরামি বলে উঠল—"কি আশ্চর্য ক্রেমলিন! কত দুঃসাধ্য বিষয়, তুমি প্রমাণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস কর আর আমি যা সত্যি বলে প্রমাণ করেছি সেটাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?...এই দেখ তোমার জন্যে আমি একটা নতুন রকমের ওষুধ এনেছি। একে অমৃতও বলতে পার এক হিসেবে। তার কারণ, এটা তোমার বয়েসকে বিশ বছর বা তারও বেশী কমিয়ে দেবে আর তা মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই!"—বলতে বলতে এলরামি তার ভেতরের পকেট থেকে, একটা ওষুধ ভরা শিশি বের করে ক্রেমলিনকে দেখালে, আর হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিলে তার দিকে!

সাগ্রহে শিশিটা ধরে ক্রেমলিন বললেন—"সত্যিই তুমি বিশ্বাস কর যে, এ ওষুধের এমন শক্তি আছে?"

"বিশ্বাস কি বলছ?—আজ দু-বছর ধরে কেবল এই ওষুধেরই জোরে আমি একজন মরা মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

"তুমি বলছ, মৃত্যু আমায় ধরতে পারবে না?...তার মানে, আমি আমার আবিষ্কার পূর্ণ করবার সময় পাব?...হা ভগবান! সত্যিই কি এত কুরসুৎ পাব আমি?...

"হ্যাঁ, সত্যিই তুমি সে কুরসুৎ পাবে ক্রেমলিন—এ বিষয় আমি তোমায় সম্পূর্ণ ভরসা দিচ্ছি। তবে, সেই সঙ্গে দৈব দুর্ঘটনার কথাটাও মনে রাখতে হবে—ভুললে চলবে না।"

"দৈব দুর্ঘটনা?...কিন্তু আমরা যদি নির্ধারিত সময়ে আমাকে দেহ থেকে মুক্ত হতে না দিই, তবে ভগবান কি স্বয়ংই সেই দৈব দুর্ঘটনার সৃষ্টি করে আমাকে মুক্তি দেবেন না?"

"ভগবান!...সত্যিই ভগবান বলে কেউ আছেন ...যদি সত্যিই ভগবান বলে কেউ থাকেন, তাহলেও আমার মনে হয়, এমন কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না। দৈব দুর্ঘটনা ঘটে, মানুষের নিজের বুদ্ধির দোষে এক শুঁয়েমীর জন্যে। আর অসাবধান থাকার জন্যে। আমিত এতে ভগবানের হাত, কোথাও দেখতে পাই না। আর তাছাড়া, এমন নীচ কাজ করবার মতি ভগবানেরই বা হবে কেন?"

গম্বুজের মধ্যে ছোট একটী চতুষ্কোণ ঘরের মধ্যে বসে দুই বন্ধুর এতক্ষণ আলাপ চলছিল। ঘরখানি এতই ছোট যে একটী অতি ছোট টেবিলের দুপাশে দুখানি ছোট ছোট সোফাতেই সমস্ত ঘরখানা জোড়া হয়ে গেছল, অন্য কোন আসবাব রাখবার আর সেখানে জায়গাই ছিল না। দেওয়ালে দেওয়ালে, গ্রাফকাগজে আঁকা সোজা-বাঁকা নানান রকমের লাইনটানা ম্যাপে ম্যাপে ভরা ছিল। সেইসব লাইনের মানে যে কি তা একা ক্রেমলিনই জানতেন।

এখন তিনি নানা দুর্ভাবনা ভাবতে ভাবতে, মাঝে মাঝে অতি আগ্রহ, আর ঔৎসুক্য ভরা চোখে সেই ম্যাপগুলি দেখছিলেন। সারাক্ষণ সেই একঘেয়ে গোঙানী শব্দটা হয়েই চলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন একটা অতি বড় চাকা ঘুরে একটানা সেই আওয়াজটার সৃষ্টি করছিল।

আর চুপ করে থাকতে না পেরেই যেন এলরামি ক্রেমলিনকে জিগেস করলে—"চাকাটা তাহলে এখনও সামনে ঘুরে যাচ্ছে—কি বল?"

এলরামির এই হঠাৎ প্রশ্নে প্রায় চমকে উঠে ক্রেমলিন বললে—হ্যাঁ, এখনও চাকা তেমনি ভাবেই ঘুরছে—সমান গতিতে ঘুরে সমান ঐক্যতানের সৃষ্টি করছে। শুনতে পাচ্ছ না, ঠিক যেন পৃথিবীর আহ্নিকগতির সুর? —পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য গান!

"কাজ করবার উপযোগী রাতটা আজকের, সারা আকাশ আয়নার মত ঝকমক্ করছে! চল—চল, তোমায় না দেখিয়ে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।...দেখবে এসো, আমার 'অদৃষ্টচক্রের' সৌন্দর্য!...আগে অবশ্য তুমি দেখেছ এটা, কিন্তু আজ দেখলে আবার তার নতুন রূপ দেখতে পাবে। তার ওপর নতুন আলোর রেখা, কি

সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে, তা দেখে তুমি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে!···আঃ, এলরামি, বন্ধু আমার! তুমি যদি আমার সমস্যার সমাধান করতে পারতে, তবে অতিশীঘ্রই তোমার জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যেত। আমার সমস্যার সমাধান করতে পারলে, জানতে পারতে জীবনের পরপারে কি আছে, আর কি নেই। তখন তোমার এই জীবন বাড়াবার ওষুধ তোমার কাছেও তুচ্ছ মনে হ'ত।..."

বাধা দিয়ে এলরামি বললে,—"সত্যি বটে!—তবে তার নির্ভুল প্রমাণ পেলে তবে ত'!"

"প্রমাণ পাবে।—নিশ্চয়ই পাবে।...প্রমাণ কোরে, তবে আমি মরব দেখো!···প্রকৃতির কাছ থেকে—দরকার হ'লে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে, এ সত্য আমি ছিনিয়ে নেবো।"—কথা বলতে বলতে উত্তেজনার আতিশয্যে ক্রেমলিন ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপে উঠলেন। পরক্ষণেই, মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে, তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। মৃদু হেসে বন্ধু এলরামিকে বললেন,—"এস, যাই চল।"

এইবার ডাক্তারের সংগে এলরামি এসে গম্বুজের মাঝখানের বড় উঁচু ঘরটার মধ্যে ঢুকলো। সমস্ত ঘরটা টাট্‌কা তাজা হাওয়ায় ভরপুর। ক্রেমলিনের জীবনের অদ্ভুত আবিষ্কার আর সাধনার আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ভরা ঘরের মধ্যে ঢুকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে, দুজনেই একমুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এমনি সব অদ্ভুত যন্ত্রপাতিতে ঘরটা ভরা ছিল যে দেখলেই মনে হ'ত, জগতে আর কেউ কোনদিন বুঝি এমন অদ্ভুত যন্ত্রের কল্পনা মনের মধ্যেও জাগাতে পারেনি!

॥ ১০ ॥

এলরামি সেই ঘরের মধ্যে সভ্রম-ভরা বিস্ময় দৃষ্টিতে যেটিকে দেখছিল, সেটি একটি স্ফটিকের মত কোন উজ্জ্বল পদার্থে প্রস্তুত চক্র—ঘরের ছাদ থেকে প্রায় মেঝে অবধি তার পরিধি দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সেটি গম্বুজের ছাদ থেকে লম্বমান, একটি সূচাগ্র দৌহদণ্ডের সূচ-মুখের ওপর, আলগা ভাবে আটকে থাকে, নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে, ঘূর্ণ্যমান অবস্থায়, ক্রমাগত ঘুরছে।

সেই উজ্জ্বল স্ফটিকে চাকাখানা সুসঘৃত সমুজ্জ্বল আলোর রেখার ঝিকিমিকিতে ভরা। আর সেই সোজা বাঁকা, গোল-অর্দ্ধগোল রেখাগুলো, ছেলেদের খেলার দূরবীনের মতই মুহুর্মুহু ভিন্ন ভিন্ন রংএর আলোর ফুলঝুরি কাটছিল। সেই সংগে সেই বিরাট চাকাখানি সুসঘৃত সুরে—সমগতিতে একটানা ঘুরে চলেছিল। ক্রেমলিনের বাড়ীতে ঢোকার পর থেকে যে একঘেয়ে গোঙানী শব্দ এলরামি শুনে আসছিল, এই স্ফটিক চক্রটিই তার স্রষ্টা!

ক্রেমলিন এলরামির কথা ভুলে গিয়ে জানালার ধারে রাখা একটি ছোট বেঞ্চির ওপর বসে পড়লেন। যেন তিনি রোজকার মত তখনও একাই আছেন ঘরে, এই ভাবে বিভোর হ'য়ে চাকাখানার দিকে দেখতে দেখতে নিজের মনে বলতে লাগলেন,—"কি ক'রে আমি এর অর্থ সমন্বয় করব? রশ্মি-বাণীর সংকেত-লিপির অনুবাদ করব কেমন ক'রে? আমার মগজের নরসিংহী কি এর সমাধানের কোন হদিসই দেবে না আমায়?—আমারই মনের ধাঁধা বাঁধিয়ে দিয়ে যাবে আমাকে?...পারব না এর মানে বার করতে?···ঐ—ঐ—ঐ দেখ, গতির সুরের পরিবর্তন হ'য়ে গেল, সংগে সংগে রেখার প্রতিবিম্বেরও রদবদল হ'য়ে গেল···কিন্তু কেন?—কি এর মানে?"

এই সময় এলরামি ডাক্তারের পাশে দাঁড়াতেই ডাক্তারের সম্বিৎ ফিরে এলো। তাড়াতাড়ি বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি—যেন একটু কুণ্ঠিতও হলেন নিজের এ বিস্মরণের জন্যে।

এলরামির দিকে চেয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললেন,—"চেয়ে দেখো, এই যে চক্রের বিরামহীন গতি—এর মূলে রয়েছে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভার-সাম্য। সমস্ত ঘরটা বিগড়ে না গেলে—অর্থাৎ, এই ভার-সাম্য কক্ষচ্যুত না হ'লে, কোনদিন চাকার এ অবিরাম গতি থামবে না। ঠিক এই ভাবে, এই একই কারণে আমাদের পৃথিবীও বিরামহীন আহ্নিক গতিতে ঘুরছে—এই ভার-সাম্যের বিঘ্ন ঘটালেই, পৃথিবীও আমার এই চাকাখানার মত, মহাশূন্যের মধ্যে ছিটকে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে।···বল, আমার এই যুক্তি কি নির্ভুল নয়?"

"হ্যাঁ—সম্পূর্ণ নির্ভুল।"

"হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি, যে শুধু এই চাকার পরি-

কল্পনাটাই তোমার বিরাট আবিষ্কার। তা'বলে এই অবিরাম গতির তুমি আবিষ্কারক, একথা কিছুতেই বলতে পার না। পৃথিবীর এই অবিরাম গতি—কি ক'রে,—কেন হচ্ছে, আর কেই-বা সেই গতিবেগের জোগান দিচ্ছে, এসব আজও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।"

"কিন্তু এই এত বড় চাকাখানার ভার-সাম্য বজায় রেখেছে, একটিমাত্র বিন্দু—একটিমাত্র যোগকীলক ..।"

"এই যোগকীলক বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও?"

"এই যোগকীলকই হ'ল জগৎ-কেন্দ্র—সেখানে ভগবান বসে আছেন।"

"জগৎ-কেন্দ্র!"—বলতে বলতে এলরামির চোখ দুটো যেন দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সে বলতে লাগল,—"মনে কর, তর্কের খাতিরেই কথাটা আমি বলছি,—এই যে তুমি জগৎকেন্দ্র কল্পনা করছো, এটা যদি আর একটা কেন্দ্রিক-জগতের বাইরের খোলসটাই মাত্র হয়,—আবার সেটাও যদি আর একটা কেন্দ্রিক-জগতের বাইরের আবরণমাত্র হয়, এই ভাবে পরে পরে যদি আরও কেন্দ্রিক-জগৎ থাকে তবে তোমার এই যোগকীলক বা 'পিভট্‌ পয়েন্ট'টা থাচ্ছে কোথায় বলত?"

সভয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত দুটো তুলে ধরে ক্রেমলিন বললেন,—"কি ভীষণ অন্যায় কল্পনা তোমার? ...চুপকর!"

এই সময় চাকাটার ওপর একটা জায়গায় একগুচ্ছ কিরণ রেখা ঝক্‌মক্‌ করে ফুলঝুরি কাটছিল। ক্রেমলিন সেইটা এলরামিকে দেখিয়ে বললেন,—"দেখ, দেখ, কি অদ্ভুত ফুলঝুরির সৃষ্টি হচ্ছে এখানে! কিন্তু ঘড়ি ধরে দেখলে দেখতে পাবে দু' মিনিট পরে আর এর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। আবার এ দৃশ্য দেখবার জন্য হয় ত' এক বছর—দু' বছর—এক যুগও প্রতীক্ষায় থাকতে হ'তে পারে। এ রশ্মিগুচ্ছ কোন তারা থেকে আসছে, আর কেনই বা এগুলো অন্য সমস্ত আলোর রেখার চেয়ে উজ্জ্বলতর, তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।... ঐ...ঐ...ঐ দেখ!...যাঃ মিলিয়ে গেল। আমাদের চোখের ওপর থেকেই মিলিয়ে গেল আলোর ফুলঝুরি!..."

অল্পক্ষণ নীরব থেকে ক্রেমলিন আবার বললেন,—"চাকাটা আমি খাড়া করেছি আজ বারো বছর হ'ল। এই বারো বছরে এই আলোর ফুলঝুরি আমি মাত্র চারবার দেখেছি। প্রতিবারেই আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, খুঁজে বার করতে, কোন তারার এ আতসবাজী,—কিন্তু না, কোন মতেই আমি এর কিছুমাত্রও হদিস বার করতে পারিনি।"—বলে ক্রেমলিন আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সহানুভূতি-ভরা চোখে তাঁর একখানি হাতের ওপর নিজের হাত রেখে, এলরামি মৃদুস্বরে বললে,—"চল ক্রেমলিন, এবার একটু বিশ্রাম করবে। রাতের পর রাত জেগে, এই ঘরে বসে তুমি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছ। আজ একটু ঘুমিয়ে নিয়ে, ভবিষ্যৎ দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয় ক'রে নাও। এই শিশিতে যা আছে, তা আমি শুধু তোমার জন্যেই তৈরী ক'রে এনেছি। আমার অনুরোধ, এই ওষুধটা খেয়ে আজ রাতের মত তুমি ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে উঠে দেখবে যে তুমি একেবারে নতুন মানুষ হ'য়ে গেছ।"

একটা গভীর অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে এলরামির দিকে চেয়ে ক্রেমলিন বললেন,—"বুঝেছি!...তুমি আমায় বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও, তারপর আমার এতদিনের, এত কষ্টের আবিষ্কার 'তারা-রহস্য'র সব গৌরব,—সব যশ, নিজে নিতে চাও! হাতে তোমার ঐ শিশিতে যা রয়েছে, তা বিষ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব তীব্র বিষ ওটা!"

ক্রেমলিনের অন্যায় সন্দেহে ব্যথিত হ'লেও, করুণা-মাখা স্বরে এলরামি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে,—"মনের ভুলে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে ডাক্তার। ...এটাকে তুমি বিষ মনে করছ? এই দেখ, আমি নিজে এর খানিকটা খাচ্ছি।"—বলে এলরামি শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা নিজের মুখে ঢেলে ক্রেমলিনকে দেখিয়ে দিতে চাইলে, সে ওষুধটা—ওষুধই, বিষ নয়?

স্খলিত পদে ক্রেমলিন উঠে জানলার ধারের বেঞ্চের ওপর বসে পড়লেন। তারপর ম্লান হাসি হেসে বললেন,—"দেখছ ত'?—মন আমার কি রকম ভীরু হ'য়ে পড়েছে?... কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না!"

॥ ১১ ॥

পরের দিন প্রভাত, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ গায়ে মেখে হাসিমুখে আত্মপ্রকাশ করলে। সমুদ্রও তখন, হ্রদের মত

স্থির—শান্ত।

ক্রেমলিনের চাকর কার্ল, সারা রাত্রি গাঢ় ঘুমের মধ্যে থেকে বেশ বাহাল তবিয়তেই জেগে উঠল সকালে। মনে পড়ল তার, এলরামি বলেছিল ডাক্তার আজ সুস্থ শরীরে নেবে আসবেন। এতে তার কোন সন্দেহই ছিল না, কারণ প্রতিবারই সে লক্ষ্য ক'রেছে, এলরামি এখানে আসার পরদিন ডাক্তার বেশ বাহাল তবিয়তেই থাকেন।

হঠাৎ সহর্ষ কণ্ঠে কেউ তাকে ডেকে বললে,—"কার্ল, তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা কর···আমার বন্ধু আবার সকালের ট্রেনেই চলে যেতে চাইছেন।"

চকিতে মুখ ফেরাতেই যাঁর ওপর কার্লের নজর পড়ল, তাঁকে দেখে অতি বিস্ময়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া, আর কিছুই তার মধ্যে কুলোয় না।···এই যে বার্ধক্যের গ্লানিহীন, সহর্ষ বৃদ্ধ, তাকে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করতে বলছেন, ইনিই কি সেই অতিবৃদ্ধ, সন্ত দিট্‌সিটে মেজাজের অদন্তুষ্ট-স্বভাব ডাক্তার ক্রেমলিন?···কি তাজ্জব!···কি অসম্ভব কাণ্ড এ?···

পেছনেই তাঁর এলরামি দাঁড়িয়ে ছিল। কার্ল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই, চোখ ইসারায় তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বললে,—"হ্যাঁ কার্ল, যতটা সম্ভব হাত চালিয়ে কাজ সেরে ফেল। তোমার মনিব-মশায়, কাল সারা রাত ঘুমিয়ে আজ বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন।—রাতে উপোসের জন্যে ওঁর খিদেও পেয়েছে খুব! তা ছাড়া কাল রাতেইত তোমায় বলে গেছলুম আমি, সকালে ভাল ক'রে প্রাতঃরাশ তৈরী রাখতে।"

"আজ্ঞে···য্যাজ্ঞে···" বলে আমতা আমতা করতে করতে, কার্ল সভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে কিন্তু দিশেহারা হ'য়েই কার্ল হাত চালিয়ে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

ততক্ষণে ডাঃ ক্রেমলিন তাঁর বন্ধু এলরামিকে সংগে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, ক্রমে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন। দু'জনেই নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ ক্রেমলিন মুখ ফিরিয়ে, তাঁর বন্ধুর হাত দুটি গভীর শ্রদ্ধাভরে নিজের হাতের মধ্যে ধরে ব্যাকুল ভাবে বললেন,—"সত্যি এলরামি, আজ তুমি আমার কাছে ভগবানের সমতুল। আজ আমি যেন আবার নতুন ক'রে বেঁচে উঠেছি।"

সহসা ক্রেমলিন মন স্থির ক'রে ফেললেন। একবার গভীর মমতা ভরে স্ফটিকের ঘূর্ণায়মান চাকাখানার দিকে দেখে নিয়ে এলরামির দেওয়া শিশিটার ছিপি খুলে, এক নিঃশ্বাসে সবটুকু সেরে ফেললেন। ওষুধটা খাওয়ার সংগে সংগে বুড়ো ডাক্তার একটা অস্বাভাবিক শব্দ ক'রে বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠে টলতে টলতে, মেঝের ওপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। এলরামি তাঁকে যত্ন ক'রে তুলে বেঞ্চের ওপর শুইয়ে দিয়ে মাথার নীচে বালিশ গুঁজে দিলে। তখন ডাক্তার মড়ার মতই নিঃসাড়ে পড়ে রইলেন—শ্বাস-প্রশ্বাস কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক ঘুমন্ত মানুষের মতই বইতে লাগল।

আচ্ছা, একটা কথা আমায় বল ত? আমার মনের পরিবর্তনের সংগে সংগে, আমার বাইরের চেহারাটারও কি কোন পরিবর্তন হয়েছে নাকি!··· সত্যিই কি আমায় আগের চেয়ে কম বয়সী দেখাচ্ছে এলরামি?

মৃদু হেসে, এলরামি বললে—"কার্ল বেচারার গভীর বিস্ময় ভরা মুখখানা দেখেও কি তা তুমি বুঝতে পার নি বন্ধু? ···তোমার চেহারার এই পরিবর্তন দেখে, বেচারা খুবই ভয় পেয়েছিল···সংগে সংগে সে সভয়ে আমার দিকে চেয়েও হয়ত ভাবছিল, আমায় ভগবান মনে করবে, না শয়তান ভাববে?

গভীর ঔৎসুক্যভরে ক্রেমলিন জিগেস করলেন,—"কিন্তু এ পরিবর্তন,—এ উন্নয়, কি স্থায়ী হবে?··· কতদিন থাকবে এসব, তুমি বলতে চাও?"

"নিশ্চয় স্থায়ী হবে।—সেটা কিন্তু মনে রেখো, সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, আমার দেওয়া নির্দেশগুলো ঠিক করে মেনে চলার ওপর। আমার এই 'অমৃত' বা 'জীবন-সুধা' আর এক শিশি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি,—প্রতি তৃতীয় দিনে, তার থেকে দশ ফোঁটা করে খাবে তুমি। ইচ্ছে করলে, মুখে না খেয়ে ঐ দশ ফোঁটা তুমি শরীরে ইন্‌জেকট্‌ করেও দিতে পার। এই নিয়ম ঠিক মত মেনে চললে একমাত্র দুর্ঘটনা ছাড়া মৃত্যু তোমার কাছেও ঘেঁসতে পারবে না জেনো। আমি

একথা তোমায় বড় গলা করেই বলে যাচ্ছি ডাক্তার।

ভয় ও বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে ডাক্তার এলরামির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কতক্ষণ পরে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি বললেন,—"আচ্ছা, একটা কথা জিগেস করছি···রাগ কর না বন্ধু! এই যে এমন সুপুরুষ সুন্দর চেহারা তোমার,—এ দেখে আজ অবধি কোন মেয়েই কি তোমার প্রেমে পড়ে নি?—কিম্বা তুমিও কাউকে ভালবাস নি?"

হো-হো করে সশব্দে এলরামি হেসে উঠল। বললে,—"মেয়ে মানুষের প্রেমে পড়ব আমি?···এমন দুরাদৃষ্ট যেন কোনদিন না হয় আমার!···না, না, বন্ধু! মেয়ে মানুষের চুলে হাত বুলনোর চেয়ে, পাখীর গায়ে হাত বুলিয়ে আমি বেশী আরাম পাই। রমণীর মুখে চুমো খাওয়ার চেয়ে আমি ফুটন্ত গোলাপে চুমো খেয়ে বেশী খুসী হই।"

"তার মানে, প্রেমকে তুমি আমল দিতে চাও না?"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়েই এলরামি খেতে লাগল।

তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে কার্ল তখন ক্রেমলিনের খাওয়া লক্ষ্য করছিল। যেরকম পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে সেদিন তার মনিব খেয়ে যাচ্ছিলেন, এভাবে আহার্যের সদ্ব্যবহার করতে বোধহয় কোনদিন সে দেখেনি!

॥ ১২ ॥

যথা সময়ে বাড়ী পৌঁছে এলরামি পকেট থেকে চাবি বার করে সদর দোর খুলে বাড়ী ঢুকলো। দোরটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, হলঘরের কাছে এসে সে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ! কই, আজ ফিরাজের গান বাজনা কিছুই ত শোনা যাচ্ছে না?···ব্যাপার কি? ঘুমুচ্ছে নাকি সে?

এরপরেই তার পাঠাগার। ঘরের দোরটা সামান্য খোলা রয়েছে দেখে, এলরামি সেটাকে আর একটু ঠেলে দিলে। এইবার সে দেখতে পেলে ঘরের ভেতর তার বড় চেয়ারটায় বসে রয়েছে ফিরাজ। পরণে তার জমকালো মিশরীয় পোশাক। সোনার কোমর-বন্ধটা থেকে ঝুলছে একটা সোনার কারুকার্য করা খাপের মধ্যে ভরা সোনার বাঁটওয়ালা একখানা মিশরীয় ছোরা। আর তার চেয়েও বিস্মিত হল এলরামি, এই দেখে যে ফিরাজ তারই একখানা মোটা হাতে লেখা পুঁথি খুলে একমনে তাই পড়ছে!

ফিরাজের হাতে তার পুঁথিখানা দেখে এলরামি রাগে জ্বলে উঠল। সশব্দে দোরটা খুলে দিয়ে ঘরে ঢুকে সে তীব্র স্বরে ডাকলে—"ফিরাজ!"

ফিরাজ একবার আড়ামোড়া খেয়ে হাতের পুঁথি-খানা মুড়ে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। জিগেস করলে স্নেহ ভরে—"তোমার পাগল বন্ধুটি আছে কেমন?...আর তুমিও যে প্রায় তারই মত আর একটা পাগল, একথা তাকে বলনি নিশ্চয়?···"

কথা শুনতে শুনতে রাগে এলরামির চোখ দুটো ধপ্‌ধপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। তবুও সংযত স্বরে এলরামি বললে,—"বোলছ কি তুমি?·· এসব কথার মানে কি?"

এতক্ষণ অবধি যে নিদারুণ চেষ্টায় ফিরাজ নিজেকে শান্ত সংযত রেখেছিল, এবার আর তা রাখা সম্ভব হ'ল না। রুঢ় স্বরে সরোষে সে বলে উঠল,—"ও! মানে বুঝতে পারছ না বুঝি?···সত্যিই জানতে চাও মানে? শোন তবে বলি,—আমি আর তোমার ক্রীতদাস হ'য়ে,—তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, স্বপ্নাতুর অবস্থায়, তোমার খেলার পুতুল হ'য়ে থাকতে চাই না। এরপর আর কোন দিন যদি তুমি, আমার ওপর তোমার ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব চালাতে আস, তবে জেনে রেখো, আমি আমার ইচ্ছাশক্তিতে তা প্রতিহত করে দেবো। আমি তোমার মতনই স্বাধীন,—এটা আমার অসহ্য। কোন অধিকারে আমার সে স্বাধীনতা ব্যাহত করে রেখেছ তুমি?···আর তা ছাড়া, আর একটা কথাও তোমার কাছ থেকে আমি চেপে রাখতে চাই না। জেনে রাখো যে, আমি তোমার গোপন-রহস্য জেনেছি।···ওপর তলার ঘরে লুকিয়ে রাখা তরুণীকে আমি দেখেছি।"

এলরামির বড় বড় কালো চোখ দুটো স্নেহ ভরে ঝক্-মক্ ক'রে উঠল।

"ব্যাপার কি?···একেবারে ছোরায় হাত যে?··· তুমি কি ষ্টেজে দাঁড়িয়ে থিয়েটার করছ নাকি? যাক্, সে কথা। তুমি বলছ, তরুণীকে তুমি দেখেছ। বেশ, ···এইবার বল, কে সে তরুণী?"

বিস্ময় ভরা চোখে এলরামির দিকে চেয়ে ফিরাজ বলল,—"কে সে তরুণী ?···আশ্চর্য প্রশ্ন তোমার! যার দেহকে ঘুমে অচেতন ক'রে রেখে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্দী ক'রে লুকিয়ে রেখেছ;—যার জীবনের যা-কিছু সত্য-সুন্দর, তা তার অমতে,—অজ্ঞাতে, তোমার চুম্বক-শক্তির বলে,—ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, হারিয়ে রেখেছ,—তাকে ছাড়া ওপরের ঘরে আর কাকেই বা দেখব ?"

শ্লেষভরে এলরামি বললে,—"তোমার মতে তা হ'লে সে একটি যাদু-মুগ্ধ ঘুমন্ত রাজ-কন্যা, আর তুমি তার উদ্ধারকারী বীর রাজপুত্র!—কেমন, এই ত' ?···বেশ ত' সে ঘুমিয়ে আছে বলেই যদি তোমার ধারণা, তুমি এই সুযোগে তাকে একবার জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে দেখলে না কেন ?"

"সে চেষ্টা করে দেখতে, তাকে জাগাতে চেষ্টা করিনি ? ···আহা! তার সেই সুন্দর চোখের পাতা দুটি খুলে,—সে চোখে জাগরণের আলো ফুটিয়ে তুলতে,···তার একটা হাত আমার দু হাতের মধ্যে রেখে, নিজের শরীরের উষ্ণতা দিয়ে, তাকে তাতিয়ে তুলেছি,···তার সেই অপরূপ সুন্দর ঠোঁট দুটি চুমুতে···"

এইবার এলরামির ধৈর্যের বাঁধও যেন ভেঙে গেল—আর্তনাদের মত বীভৎস চিৎকার করে এলরামি বাধা দিয়ে বললে—"নিশ্চয়ই এ দুঃসাহস তোমার হয়নি ? তোমার ঠোঁটের স্পর্শে নিশ্চয়ই তাকে কলুষিত করনি ?... বল ?··· বল ফিরাজ ?"

এলরামির আর্তনাদের শব্দে, ফিরাজের ধমনীর ভেতর দিয়ে যেন তুষার স্রোত বয়ে গেল। সভয়ে সে এলরামির কাছ থেকে দু-পা পেছিয়ে এলো। বিহ্বল হ'য়ে দেখলে, এলরামি যেন তার অতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভস্ম ক'রে ফেলতে আসছে! এই দৃশ্যে ফিরাজের এতক্ষণের সব সাহস,—সব সংকল্প যেন এক নিমেষে নিভে গেল। মহাতেজোদীপ্ত বিদ্যুতের মত এলরামির তীব্র চুম্বক-শক্তি, ফিরাজকে যেন মহাভয়ে অভিভূত করে দিলে এক মুহূর্তে। ভীত,—স্খলিত কণ্ঠে, থেমে থেমে, ফিরাজ জবাব দিলে—"মা।···আমি কোন কিছু ক্ষতিই করিনি তার···আরোবা সর্বক্ষণই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল,···সব জানে,···সবই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে···।"

দারুণ ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে এলরামি বললে,—"আরোবা ?···বিশ্রী কোন দানব, যদি স্বর্গের দেবীকে তার চোখের ওপর কলুষিত করে, তাও সে শান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখবে।···বরং খুশী হ'য়ে হাসবেও সে তাতে। ···তার ধারণা, এই ভাবে কলুষিত, এমনি ক'রে ধর্ষিতা হবার জন্যেই মেয়েদের জন্ম! অবোধ বালক!···তুমি মনে করলে, বিংশ শতাব্দীর নতুন যিশুখৃষ্টই বা তুমি; সে মরাকে গিয়ে বলবে—'ওঠো—জাগো!'—আর অমনি আজ ছ বছর আগে যে মরে গেছে, সে তোমার আদেশে তোমার কৃপায় উঠে বসে চোখ খুলবে ?—কি বল, তাই না ?···চমৎকার!"

বিহ্বল দৃষ্টিতে এলরামির মুখের দিকে চেয়ে ফিরাজ বলে উঠল—"কি বলছ তুমি ?···মরা ? তরুণীর মৃত দেহ ওটা ?···এযে অসম্ভব কথা!···যাকে দেখেছি আমি, সে জীবন্ত। তোমার আমার মতই স্বাভাবিক ভাবে সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছে যে ?···"

"হা···হা, তা আমিও জানি, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়,—কৃত্রিম।···শুধু আমার ইচ্ছা-শক্তির বলেই, তা সম্ভব হ'য়েছে জেনো। আসলে সে মরাই।—ওটা একটা মৃতদেহ মাত্র। আসলিক নিয়মে, আজ ছ বছর আগে, সিরিয়ার মরুভূমিতে ওর মৃত্যু ঘটেছে।"

এরপর বিহ্বল ফিরাজের মুখে বলবার কোন কথাই জোগাল না।

"তরুণী মৃতা ?···"

মুহ্যমান অবস্থায় ফিরাজ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মুখে আর তার কোন কথা জোগাল না। মন যেন তার ভেবে ঠিক করতে পারল না, এর পর সে কি বলবে ?··· কি তার বলা উচিৎ ?

এলরামি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, ফিরাজের দিকে চেয়ে, লিলিথ যে মরা, এই কথা শুনে তার মনের গতি লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ মুখ তুলতেই ফিরাজ এলরামির এই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা দেখে, সভয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—"না, না, আর আমি এ সহ্য করব না,···আমার মনের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর তোমার শাসন কোন দিনই আমি মানব না। আমি

পুঁথি দেখেছি, সব পড়েছি।... জানতে পেরেছি, কি ক'রে তুমি আমার ওপর তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছ... কিন্তু..."

একটা অব্যক্ত ক্রোধের হুঙ্কার ছেড়ে, এসরামি বার দুয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বললে,—"বাজে বোক না;—শোন ফিরা এখন আমি একটুও ইচ্ছাশক্তি তোমার ওপর প্রয়োগ করিনি। আর তা ছাড়া কথা দিচ্ছি তোমায়, এরপর যখন তোমার ওপর আমি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রব, তার আগে দেকথা তোমায় জানিয়ে দেব।...তা জানিবার পর, ইচ্ছে হয় ত', ...শক্তিতে কুলোয় ত' তখন তার প্রতিরোধ করবার চেষ্টা ক'রে দেখো।"

"এইমাত্র তুমি যে সব কথা বললে, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, যে আমায় তুমি দুষ্ট, পাপাচারী মনে কর। মনে কর, মানুষ খুন করার চেয়েও খারাপ কাজ যেন আমি করছি।...কি গভীর অজ্ঞতায় অন্ধ হ'য়ে যে তুমি আমার ওপর এরকম দুর্নাম দিচ্ছ, তা আমি বুঝি বলেই, তোমার এ পাগলামী ক্ষমা করলুম জেনো। আজ আমায় এমন কতকগুলো ঘটনার কথা তোমার কাছে প্রকাশ করতে হবে, যা আমি তোমায় বলে তোমার মনকে সুখের,—সৌন্দর্যের,—সুখ-স্বপ্নের পুলকিত রাজ-প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করতে চাইনি।"—বলতে বলতে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এসরামি ফিরাজের সামনে একটা চেয়ারে ক্লান্ত ভাবে বসে পড়ল।

"শোন ফিরাজ!—আমাদের বাবা আর মা যখন মারা যান, তখন তুমি নিতান্তই শিশু!—কাজেই জানতেও পারলে না, জগতের কি অমূল্য সম্পদ তুমি হারালে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর ওষধি শাস্ত্রে বাবার যে কত নাম-ডাক ছিল, তাও তুমি জান না। যৌবনেই তাঁর মৃত্যু হয়।...আর তার অল্পদিন পরেই মাও মারা যান।... আমি তখন প্রায় প্রাপ্ত-বয়স্ক যুবক,—উনিশ বা কুড়ি বছর তখন আমার বয়েস। আর সেই যুবকের জিম্মাতেই এসে পড়লে অতি শিশু তুমি।...বাবার পুঁথিগুলি আমার হাতে এসে পড়ায় তা পড়ে মনে আমার এমন উদ্দীপনা,—এমন গভীর বিশ্বাস এসে পড়ল, যে আমি নিশ্চয় বুঝতে পারলুম, সেই পুঁথিগুলির উপদেশ আর নির্দেশ মত পরীক্ষা করতে পারলে, অচিরেই আমি সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অনেক ওপরে, আমার আসন পাততে পারব।

পুঁথিগুলো যতই আমি গভীর আগ্রহে আর সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনুশীলন করতে লাগলুম, ততই আমার মনে গভীর বিশ্বাস হতে লাগল, যে দুনিয়ার লোকে যা মানুষের অসাধ্য বলে মনে করে, আর চেষ্টাতেই, তা আমি অনায়াসেই ক'রে ফেলতে পারব।...শুধু তাই নয়, বেশ বুঝতে পারলুম, সেই পুঁথির নির্দেশ মত নতুন নতুন আবিষ্কার করে নিজেকে সাধারণ মানুষের স্তরের অনেক ওপরে তুলতে পারব।...অসাধারণ শাস্ত্রের কটা কঠিন, জটিল, পরীক্ষায় আমার পূর্ণ সাফল্য হওয়ায়, আমি খুঁজতে লাগলুম এমন একজন লোককে, যার ওপর আমি নির্বিবাদে পরীক্ষা চালাতে পারি।—আর সর্বদা যাকে চোখের ওপর রাখতে পারি।—দেখতে পারি,—বুঝতে পারি, পরীক্ষায় ফল আমার কি দাঁড়াচ্ছে।... তখন নজর পড়লো, তোমার ওপর। আমার মনের মত আর কাউকে না পেয়ে, শেষ অবধি আমি তোমার ওপরই আমার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করলাম।...তখন তুমি শিশু। আর ছোট বাচ্চাবাচ্চা সাধারণ ছেলেদের মত ছিলে, আর দুষ্টু-বুদ্ধিতে ওরা তোমার মন, স্বভাব খুব বেশী চঞ্চল।...পানের দিকে তোমার একটুও ঝোঁক ছিল না তখন।—লেখাপড়ার দিকেও তাই।...ঝোঁক ছিল তোমার—ঘোড়ায় চড়ার দিকে, বন্দুক নিয়ে শিকার করার দিকে, আর ঘন্টার পর ঘন্টা মাছের মত জলে থেকে সাঁতার কাটার দিকে। আর ছিল নিজের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে চাষাড়ে ইয়ারকী দেওয়া, আর সঙ্গীরা তাতে বিরক্ত হ'লে বা রাগ করলে সেজন্য তাদের সঙ্গে মার-পিট করা।—সবই অবশ্য স্বাভাবিক, কিন্তু এগুলোর কোনটার জন্যেই কিছুমাত্রও বুদ্ধির দরকার হয় না। তখন তোমার অপ্রকাশ বুদ্ধি আর আমার খোঁজ করে আবিষ্কার করাই হ'ল আমার প্রথম সংকল্প।

"আমার তীব্র ইচ্ছাশক্তি ধীরে ধীরে তোমার স্বাভাবিক দুষ্ট প্রকৃতির পরিবর্তন করলে।...ধীরে ধীরে আমি তোমায় কবি আর গায়ক করে তুললুম।" লেখা পড়াতেও এবার বেশ আগ্রহ দেখা গেল তোমার।...এরপর দিন

দিনই তোমার বুদ্ধি খুলতে লাগল, জ্ঞান বাড়তে লাগল, আর সবচেয়ে বড় কথা, মন তোমার আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতে লাগল তাতে। এইভাবে তোমার অপ্রকাশ মন আর বুদ্ধিকে ফুটিয়ে তোলার পর—আমার মনের মতন করে গড়ে তোলার পর আমার মনে ইচ্ছে জাগল অতঃপর তোমার আত্মা নিয়ে কাজ করতে। আত্মা প্রতি মানুষের মধ্যে কেশবক্ষ প্রজাপতির মত জ্ঞানা ওটুরে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। আমি তাকে সেই কোশ মুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলুম।...এইবার কিন্তু তোর এক দুর্জয় শক্তি আমার সে কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যাহত করলে। প্রতিহত হলুম আমি।

দীর্ঘকাল ধরে তোমায় মহাবিষ্টের ঘেরে ঘিরেছি—অথচ তোমার আত্মা তেহ থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তির স্বর্গীয় আনন্দের মধ্যে মগ্ন সুখে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে যে আনন্দ, যে স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন মানুষ তোমন দিন পায়নি, আর পাবেও না। কিন্তু হলে কি হবে, ওই স্বাধীন অবস্থায় যা যা তুমি দেখে বেড়ালে সেসব কথা তোমার কাছ থেকে আমি জানতে পারি নি। হয়ত তার একটা কারণ এই হতে পারে যে তোমার আত্মা ফেরে উঠে আর সেসব কথা মনে রাখতে পারছো না। শুধু যে অপূর্ব সুরে তুমি মাঝে মাঝে গান গাও সেই সুর আর তোমার নিজভূমি বলে যে প্রদেশ কথা তুমি বল মাত্র সেই দুটি কথা আমি তোমার কাছ থেকে তোমার আত্মার আভাস পেয়েছি।

শুনতে শুনতে নীরব কিরাজের মুখের ওপর দিয়ে এক অপূর্ব ভাবের আবেশ খেলে গেল, ঠোঁট দুটি তার বিভক্ত হল কিন্তু মুখে সে কোন কথাই বলতে পারল না।

এলরামি খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল—এই সব দেখে আমার মনে সন্দেহ জাগল, যে পরকাল পরলোক ভগবান ইত্যাদিকে তোমার আত্মার কাছ থেকে কোনদিন আমি পাইনি আমরা কোন ধরর করে করতে পারব না—আমাকেই এ চেয়ে আমার যাহোক বুঝলুম। আধ্যাত্মিক জ্ঞান তোমার আত্মার প্রেরণা আমার কোন প্রভাব সেইজন্য তোমার মনের উপর বিস্তার আমার চক্ষে সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে তখনও তা আছে আর মনে মনে আমি সাধ্য চাইছি, এ কর্তৃত্ব যেন চিরদিন বজায় থাকে। আমার এ আগ্রহের কারণ, আমার বিশ্বাস কোনদিন যদি তুমি এ কর্তৃত্ব ঝেড়ে ফেলতে পার তবে সেই সঙ্গে তো এসব কার এই প্রতিভার দীপ্তিও ম্লান হয়ে যাবে।

এতক্ষণ অবধি কিরাজ নীরবেই এলরামির কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল, কিন্তু এইখানে সে যেন পাথরের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, অস্থির ভাবে বললে—এ আমি সহ্য করতে পারছি না।...না, না, এলরামি এ আমি সইব না কিছুতেই সইতে পারব না।

কিরাজের ব্যাকুলতা দেখে এলরামি তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর একটি হাত রাখতেই চমকে উঠে কিরাজ পেছিয়ে গেল দুপা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলরামি ফিরে নিজের চেয়ারে এসে বসে বললে—আমার হাত ছোঁয়াতে তুমি এ কেন শিউরে উঠলে কিরাজ? কিন্তু এতদিন অবধি আমার এই হাতেই তোমার ইষ্টের পর ইষ্ট করে এসেছে...অতি সুকঠোর অনিচ্ছুক কোনদিন সে করেনি...বেশ তবে তাই হোক। শুধু দুঃখের কথায় আমায় তুমি প্রথমেই আজ অবধি আমি তোমার ভালর জন্যে যা কিছু করেছি সব নোটন করে তোমার স্বাভাবিক স্বাধীনতা তোমায় আমি ফেরৎ দেব। আবার তখন প্রকৃতির দেওয়া তোমার স্বরূপ, স্বভাব দিবই ফিরে পাবে।...কিন্তু তার জন্যেও ও তোমারই কারো কাছে—অর্থাৎ তোমার যিনি স্রষ্টা সেই ভগবানের কাছে ঋণী হয়ে থাকতে হবে।

কোনকথা না বলে নতমস্তকে কিরাজ ভাবতে লাগল।

এলরামি আবার বললে—আমি তোমার এমন কি ক্ষতি করেছি কিরাজ, যার জন্যে আজ তুমি এতটা বিরূপ হয়ে উঠেছ আমার ওপর? আমি যতদূর জানি তাতে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, ঘণ্টা কতক আগে তুমি একটা ভয়ের দৃশ্য মূর্ত দেখে এসেছ,—এই তোমার বিরাগের হেতু?

আমার সব কথা এখন বলা হয়নি...

ব্যস্ত হয়ে উপযুক্ত আকার সন্ধান করতে লাগলুম—মন আমার স্বভাবে যেন অতিরিক্ত হয়ে উঠেছিল...বহুদিন

পথে এই প্রস্তাবিত আত্মার খোঁজ পেলুম। সাহস আর ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করলে একদিন না একদিন সাফল্য লাভ হবেই হবে। ...আমার বেলাও ঠিক তাই হল।... সিরিয়ার মরুর ভেতর দিয়ে যাবার সময় আমাদের সংগে একদল ক্লান্ত পান্থ-জল-সহায়-হীন আরব ভবঘুরেদের দেখা হয়, সেকথা তোমার মনে আছে বোধহয় ?"

"হ্যাঁ, সেকথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

"বেশ।...তাদের তাঁবুতে দুটি রুগী ছিল, সেকথাও বোধহয় তোমার মনে আছে?—একজন বয়স্কা বিধবা, নাম জারোবাকে, আর একটি মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন-হারা বারো বছরের কিশোরী নাম তার লিলিথ। জ্বর আর অনাহারে দুজনেই মরণাপন্ন হয়ে উঠেছিল। আমি তাদের চিকিৎসার ভার নিজের হাতে নিলুম—বিধবা জারোবাকে চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে তুললুম। সেরে উঠে সে হাপুসনয়নে কাঁদতে কাঁদতে আমার পা-জড়িয়ে ধরে প্রাচ্যসুলভ কৃতজ্ঞতায় আমরণ আমার ক্রীতদাসীর মত থেকে, আমার কাজেই জীবনপাত করবে বলে স্বেচ্ছায়ই আমার কাছে রয়ে গেল। পৃথিবীতে তার আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও না থাকায় তার একটা আশ্রয়েরও দরকার হয়ে পড়েছিল, ভেবে-চিন্তে শেষ অবধি আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে আমার কাছেই তাকে রেখে-দিলুম।...আজ অবধি সে তার কথার খেলাপ করেনি—আমার সব আদেশই সে নীরবে মেনে নিয়েছে।...আজই প্রথম তার মতিভ্রম ঘটেছে দেখছি।...

"যাক্, তারপর কিশোরী লিলিথের কথা বলি!... শুনলুম চেহারা তার প্রথম থেকেই রোগা-পাতলা ছিল তার ওপর দীর্ঘদিনের অনাহার আর অর্ধাহার আর তার ওপর মরু জ্বর—এই সবগুলো মিলে তাকে এমন করে জীবনের শেষপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছিল যে, আমার সর্ব-প্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ অবধি সে মরেই গেল। ...শুনছ ত যে লিলিথ সেই মরুর মধ্যেই মারা গেল?... বাঁচাতে পারলুম না তাকে কোন মতেই..."

ধীরে ধীরে এলরামির কথার প্রতিধ্বনি করে ফিরাজ বলে উঠল—"লিলিথ সেই মরুর মধ্যেই মারা গেল!"

"হ্যাঁ, সে যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেললে তখন সে আমার কোলে শুয়ে রয়েছে...আমার হাতে ধরা তার ছোট মাথাটা! হঠাৎ এই সময় আমার মনের মধ্যে একটা দুঃসাহসভরা মতলব জেগে উঠলো...মনে হল এই কিশোরীর যদি আত্মাবল কিছু থাকে তবে সেই আত্মাকে আমি এই দেহ থেকে মুক্ত হতে দেব না... অন্তত আমার প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এর আত্মাকে দেহের সংগে যোগসূত্র ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে দেব না। চকিতে মতলব মত কাজ সুরু করলুম।... তখনও তার দেহ থেকে উষ্ণতা চলে যায়নি, তার দেহ তার মাংসপেশী স্বাভাবিক অবস্থাতেই রয়েছে। ধরিত্র হাতে আমারই আবিষ্কার করা একটা নতুন রকমের তরল-সার সিরিঞ্জ দিয়ে তার দেহের রক্তের সংগে খানিকটা মিশিয়ে দিলুম।... রুগীর কাছ থেকে উঠে বাইরে এসে তার সংগী আরবদের বললুম, অনেক চেষ্টা করেও মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলুম না। শেষ অবধি সে মরেই গেল! বললুম তাদের আর অনর্থক সেখানে বসে থাকবার দরকার নেই—মরার কবর দেবার ব্যবস্থা আমিই করে দেব।...এক নিঃসঙ্গ মেয়েকে সেই মরুর মাঝে কবর দেবার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে খুসীমনেই তারা নিজেদের গন্তব্য পথে গেল।—পড়ে রইল মৃতা লিলিথের দেহটা আমার জিম্মায়!...আর রইলো জারোবা।

তোমার মনে আছে, লিলিথ যেদিন মারা গেল সেইদিনই আমি তোমায় একখানা চিঠি আর খান কতক পুঁথি দিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপের ধর্মসংঘের মঠাধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তুমি বিনা দ্বিধায় আমার সে আদেশ পালন করলে। স্বেচ্ছায় আমার সব কাজ করবার জন্যে একা জারোবাই তখন আমার কাছে রইল।... দু-একদিন পরে আমার মতলবের কিছুটা জারোবাকে আমি খুলে বলেছিলুম।...মরণের চোয়াল থেকে তাকে টেনে এনে বাঁচানতে সে তখন আমায় ভগবান বলেই মেনে নিয়েছিল।...তাছাড়া খাঁটি প্রাচ্যের লোক সে; কাজেই সহজেই মেনে নিলে সে, যে সত্যিকারের জ্ঞানী গুণী লোকেরা অনেককিছু অসম্ভব আর অন্যায় কাজ করতে পারে তাতে তাদের কোন দোষ হয় না, বা ধর্মেও বাধে না তাতে।...এই জন্যেই অল্প চেষ্টাতেই বুঝিয়ে তাকে আমার মতে আনতে পারলুম।...

এই অবস্থায় জীবন্মৃতা লিলিথের দেহটা নিয়ে আমার

সেই মরুর মাঝে আরও তিন চার দিন কাটাতে হল। মন তখন আমার সন্দেহ দোলায় দুলছে—হবে?…না হবে না?…পারবো?…না পারব না?…

"কিন্তু দু-একদিন যেতেই দেখতে পেলুম মরে যাওয়া সত্ত্বেও দেহটা যেন জ্যান্ত দেহের মতনই অবিকৃত রয়েছে। …ক্রমে যখন বুঝলুম, আমার পরীক্ষা সফল হবার সম্ভবনাই বেশী তখন তাঁবু উঠিয়ে আলেকজেন্দ্রিয়া হয়ে ইংলণ্ডে আসবার ব্যবস্থা করলুম।

"পথে কৌতূহলী দর্শকদের কাছে পরিচয় দিলুম লিলিথ মূর্চ্ছা রোগাক্রান্তা রোগিনী আমার আর আরোবা তার সেবাকারিনী নার্স। কাজেই এরপর আর পথে কোথাও কোন বিপদ-বিভ্রাট ঘটেনি। আগে থেকে লণ্ডনকেই আমার ঘাঁটি করবার সংকল্প করেছিলুম মনে মনে। তার কারণ, লণ্ডনের এই জনারণ্যের মধ্যে আমি আমার ব্যাপার মধ্যে কি করি না করি তা নিয়ে, কারোরই মাথা ঘামাবার ফুরসুৎ হবে না, তা আমি ভাল করেই বুঝেছিলুম। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েছেও তাই। আজ ছ-বছর ধরে ওপরের ঘরে যে একটা মৃতদেহ রেখে দিনের পর দিন পরীক্ষা চালাচ্ছি, কাক-পক্ষীতেও তা জানা দূরের কথা সন্দেহ অবধি করতে পারেনি কেউ।…

"এখানে পরীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে লিলিথের মৃতদেহ ওপরের ঘরে আরোবার জিম্মায় রেখে দিয়ে দোরে চাবি বন্ধ করে রাখবার আদেশ দিয়ে তারপর তোমায় সাইপ্রাস থেকে ফিরে আসতে চিঠি লিখি।…

"এখন সব কথাই শুনলে তুমি আর পার্থিব কোষে লিলিথের চেহারাও দেখেছ। এছাড়া কিন্তু আর একজন লিলিথ আছে—সে ঐ কোষের আত্মা। তাকে চোখে দেখা যায় না বটে কিন্তু তবুও সত্যিসত্যিই তার অস্তিত্ব আছে।…সেই আত্মা ঐ পার্থিব দেহের সঙ্গে কোন অজ্ঞাত বাঁধনে বাঁধা আছে।…আমার ইচ্ছাশক্তি আর আমার ওষধির শক্তিতে সে আত্মা আজও দেহের বাঁধন কেটে চলে যেতে পারেনি।…সেই আত্মাকে দিয়েই আমি পরলোকের নানা তথ্যের সন্ধান করছি।… আমার পরীক্ষা সেই আত্মাকে নিয়েই—ঐ মরা দেহটা নিয়ে নয়।"

ভয় ও বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে এলরামির দিকে চেয়ে কিরাজ বললে—"যা তুমি বললে এলরামি তা অতি অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য—কিন্তু তোমার শক্তি ও আমি নিজেই জানি, কাজেই তোমার সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি।…কিন্তু এলরামি লিলিথকে… তার ঐ দেহটাকে মরা মনে করে তুমি কি ভুল করছ না?…তুমিইত বললে ইনজেকসন্ করে তার ধমনীতে ওষুধ ঢুকিয়ে দিয়ে মরুভূমিতে তুমি তাকে মরতে যাওনি।…তাহলে ওকে মড়া কেন বলছ?…আমি তোমার এ কথাটার মানে বুঝতে পারছি না।"

"যে শুধু ঘুমিয়েই থাকে জাগে না কোনদিন তাকে জ্যান্তই বা বলি কি করে?"

"চেষ্টা করলে হয় ত' তা পারি।…কিন্তু সত্যিকারের জাগা ও যদি জাগে, তারপরই—হয় ত' পরক্ষণেই,—ওর যে মৃত্যু হবে তা থেকে আমি হয় ত' আর ওকে এরকম জীবন্মৃত করেও ধরে রাখতে পারব না, এইটেই আমায় সেরকম চেষ্টা করা থেকে বিরত করে রেখেছে।… এই জন্যেই আরোবার এই নির্বোধ প্ররোচনা—আর তার ফলে, তোমার লিলিথের ঘরে যাওয়া, তাকে জাগাবার চেষ্টা করার কথা শুনে আমি অন্যটা বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলুম। কারণ, কোন কারণ বশতঃ লিলিথকে হারালে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।…অবশ্য একথা তুমি জান না বা জানতেও না আগে…আর সৌভাগ্যক্রমে লিলিথও জেগে ওঠেনি তোমার ডাকে। কাজেই এবারের মত আমি তোমার এ অপরাধ ক্ষমা করলুম কিরাজ!"

"আমার চেষ্টায় লিলিথ জাগেনি বটে, কিন্তু মুখে তার একটা হাসির রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল।…আচ্ছা এলরামি, একটা কথা আমি এখনও বুঝতে পারছি না; —ও মৃত্যুর সময় কিশোরী ছিল, বয়েস ছিল তার বারো বছর। কিন্তু আজ সে আঠারো বছরের শরীর পেল কি ক'রে?"

"আমার মনে হয়, আমার ওষুধ, আর কৃত্রিম জীবনী শক্তিতে তা সম্ভব করেছে।…যেমন কাঁচের ঘরের নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় অসময়ের ফুল ফোটান সম্ভব হয়, আমার মনে হয়, এও প্রায় সেই রকমেরই একটা কিছু!"

"তা হলেই—স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যাই বল না কেন, একটা কোন রকম জীবনী শক্তি, তার দেহের মধ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে ত'?—কাজেই, তাকে মড়া না বলে, জ্যান্ত বলাই উচিত নয় কি?…আর…আর, ইচ্ছে করলেই ত' তুমি তাকে জাগিয়ে তুলে সত্যিকারের জ্যান্ত ক'রে দিতে পার।…তার জীবনের আনন্দ, প্রেম, সবই জেগে উঠবে, যদি তার এ অবচেতন অবস্থা তুমি কাটিয়ে দাও…।"

একটা হুংকারের মত আওয়াজ করে, এলরামি বললে "চুপ কর দিকি!…আরোবার মতন তুমিও পাগলামী আরম্ভ করলে যে!…আমার কথা বিশ্বাস কর কিরাজ— লিলিথ তোমার কাছে, মড়া ছাড়া আর কিছুই নয়।… আর তুমি তাকে যে চোখে দেখছ,…যা মনে করছ তাকে সেভাবে ধরলে আমার কাছেও সে মড়াই শুধু।"

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ ও নতুন সভ্যতা

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

সমাজের [illegible] সাহিত্যে [illegible] মনুষ্য সমাজে [illegible] উন্নীত হয়েছে, বোঝা যায়, তার সাহিত্য থেকে। সমাজে নিহিত হয়ে আছে অর্থনৈতিক কাঠামোর নিয়মকানুন দিয়ে। তারই ওপর গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের বনিয়াদ। এ সত্য যে দেখতে পায় না, সে একচোখো কবি বা সাহিত্যিক।

সমাজে মানুষের যখন দীনতায় জীবন বিশীর্ণ হয়, প্রতিভাবলে সার্থক সাহিত্য রচনাও হয়, তবু যদি যন্ত্রচালনার আর প্রাণের প্রকৃত কারণ বৈজ্ঞানিক বিচারে ধরতে না পারা যায়, তবে সে সাহিত্য যত মহত্তোত্তীর্ণই [illegible] কেন, সেটাকে দোষে বাধা। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই দোষ থেকে মুক্ত করেছিলেন নিজের বহুত্র বয়সে। যখন তিনি প্রাচীর নীরন্ধ্রে, বিশ্বের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর সুখের [illegible] নেই, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি নিজের বহুর উপর বলে ভেবে এসেছেন, সে সভ্যতা প্রকৃত সভ্যতা নয়—তাই বিশ্বাসে ভুল হয়েছে।

সকল বন্ধনের গণ্ডী ভাঙা, বিশ্বদর্শনকে এত রঙ্গময় [illegible] কোরে নতুন [illegible] শক্তি একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। [illegible] বহু রবীন্দ্রভিমানীর দল মনে করেন তাঁর সৃষ্টির এই দিকটাই সম্পূর্ণ সত্য হয়ে। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না যে সৃষ্টির প্রেরণা আসে জীবনদর্শন থেকে, জীবনবোধ থেকে। তাই কবির যত কবিতাই তাঁরা অমঙ্গলসূচক বলুন না কেন, রবীন্দ্রদর্শন সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অপরিপূর্ণ এবং অতিরিক্ত [illegible] থাকবেই থাকবে।

সত্যদ্রষ্টা কবি বা সাহিত্যিক সমাজের, দেশের ক্রমবিকাশের সত্যকে যত বেশী উপলব্ধি করেন, তাঁর সৃষ্টি হতে থাকে গার্থকতর। সত্যের অন্বেষণের সাথেই কবি সাহিত্যিকের সম্বন্ধ অন্যকোন কাল্পনিক [illegible] নয়। সৎ এবং সুন্দরের আকর্ষণেই সভ্যতার অগ্রগতি। সেই সৎ ও সুন্দরের [illegible] সাহিত্যিক সমাজকে নির্দেশ দিয়ে চলেন, কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন, সার্থক নতুন সমাজ গঠনে, অন্যায়, অপরাধ, অবিচার আর অত্যাচার থেকে মুক্ত প্রকৃত আদর্শ সমাজ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এছাড়া ক্ষণিক আনন্দ বিতরণের জন্যে সমাজে কবি-সাহিত্যিকের প্রয়োজন থাকলেও তাঁরা মহাকবি বা মহৎশিল্পীর পর্যায়ভুক্ত নন।

একটা [illegible] ব্যাপার [illegible] নিয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রদর্শনের এই চরম সার্থকতার অধ্যায়টিকে বাদ দিয়ে চোখ বুজে নানা ভঙ্গী কোরে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি কোরে যাওয়া। কথায় কথায় ভাববেগে রবীন্দ্রনাথের কোটেশান উচ্চারণ করা।

এটা আসে অজ্ঞতা ও অক্ষমতা থেকে। যেমন অজ্ঞতা আগুন আবিষ্কারকে একদিন ভগবান বোলে ভাবতে বাধ্য কোরে পূজো আদায় কোরতো—এ ঠিক সেই অজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণতার এই অধ্যায়টির নিয়ে আলোচনা কোরতে তাঁরা ভয় পান। [illegible] একটি সুন্দর কন্যা। কলটি যেমন পাখলো, কিসের সঙ্গে কী মিলালো, কে সে কি কোরে, কোন উপায়ে গাছের কাঠ-মাটি-পাতা-ডাল যন্ত্রে যোচড়ি গোড়ায় দিয়ে এত মধু এনে দিলে—এ বুঝতে হলে, বিচারজ্ঞানের দরকার হয়—তাই অধিকাংশ রবীন্দ্রভিমানীর দল এ বিচারের ধারে কাছে ঘেঁষেন না। তাঁরা বলেন—[illegible] কলের বাঁশীতে [illegible] পাখীর মাটি-অস্থি-ভিতর [illegible] কেন? পাখা হল, ডিম হল, ব্যস—তারই জায়গায় [illegible] প্রকৃত সত্যদ্রষ্টার মতন তাঁরা [illegible] নির্ণয়ই [illegible] পারেননা। তিনি যে মানুষের মাটির [illegible] খুঁজবার [illegible]।

সমাজের পরিপূর্ণতা আর সবপ্রকারি বন্ধনা থেকে মানুষের মুক্তি, সুন্দরের সাধনা আর চিরকল্যাণের প্রতিষ্ঠা

—তারই বাণীবাহক—কবি। রবীন্দ্রনাথ এই বাণীই শুনিয়েছেন সারা বিশ্বকে তাঁর মধুর ছন্দে।

কবির এই বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করল (তাঁর নিজের কথাতেই) "পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান দেখানে, সেইখানে..."

কবির পূর্বপুরুষেরা "জমিদারী ব্যবসা" কোরতেন বলে কবি তারপর থেকে লক্ষ্মীছাড়া কোরতেন। তিনি নিজেই বলছেন, "জমিদারীর ওপর কোনদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিষটার ওপর অনেককাল থেকেই আমার মনে ধিক্কার ছিল। এবার সেটা একেবারে পাকা হয়ে গেল। বেশির কথা কিছু ভেবেই এসেছি, এবার রাশিয়ার তার চেহারা দেখে এলুম।"

তখনকার দিনে রবীন্দ্র-জিমদারীর দল হয়ত আঁতকে উঠবেন —একিরে বাপু—রবীন্দ্র কাব্যে আবার রাশিয়া-কাশিয়া কি? কাব্য-সাহিত্য—এসব শিল্পকলায় আবার রাশিয়া কেন?

কাব্য ও সাহিত্যে রাশিয়া আসছে এই জন্যে যে কাব্য ও সাহিত্য মানুষ নিয়ে—সমাজ নিয়ে আর কারবার। আর রাশিয়াই পৃথিবীর প্রথম ভূখণ্ড যেখানে মানুষের সমাজে ঘৃণ্য অপমানে অত্যাচারে অবিচারের দুঃখগুলোকে চিরকালের জন্যে চূর্ণ কোরে মানুষকে পথ দেখিয়েছে। যা দেখে মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর তীর্থস্থান"।

রবীন্দ্রনাথের 'বহু' মানব, 'নিম্নের' অপমানিত মানব শ্রেণী তাঁকে একথাটা মানিয়েছে। এই শ্রেণীর মনোভাব, তাঁদের মনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভক্তের দল। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক মূল্যায়নে তাঁরা বঞ্চণাত্মকে অস্বীকার করেছেন।

যন্ত্রই হচ্ছে নব সভ্যতার ভিত্তি।

১৯২২ সালে কবি লেখেন 'মুক্তধারা' নাটক। তাতে তিনি পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার বীভৎসরূপ এঁকেছেন। বিচলিত কবি যুবরাজ অভিজিৎকে যন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত কোরবার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে দেখিয়েছেন। কিন্তু এইখানেই থমকে দাঁড়ালে চলবে না। আমরা দেখতে পাই রাশিয়া থেকে ফিরে এসে যন্ত্রসভ্যতা সম্বন্ধে কবির মনোভাব আমূল পরিবর্তিত হোলো। বললেন—পশ্চিম মহাদেশের কলকাতাতে দুর্ভিক্ষ জীর্ণ ভিড় মেরে আসছে। কিন্তু এজন্যে শক্তিসম্পদকে আর দোষ দেব না। দোষ দেব মানুষের রিপুকে। কেছুংগাছ তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই মেলার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়ার এই বিষ দাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, সেই সংগে যন্ত্রকে শুধু টান মারেনি, ঠিক উল্টো—যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুলভ কোরে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুরিয়ে দিচ্ছে"।

মানুষ আর সমাজ নিয়েই কাব্য আর সাহিত্য। সে সমাজে কবি বর্ণিত বিধাতা বর্তমান তার কোথায় জীবন? জীবনের গানই কালের ইতিহাসে সার্থক সাহিত্য বোলে স্বীকৃত। মানবতার মুক্তি আনন্দময় জীবনের মধ্যেই। মৃত্যুর পরপারে মুক্তির সরাইখানা যাঁরা কল্পনা করেন, কবিতা বা সাহিত্য হয়ত বা তাঁদের সুখপাঠ্য হতে পারে কিন্তু সভ্যতার কটকের ভেতর প্রবেশের ছাড়পত্র সে পায় না। রবীন্দ্রদর্শনে তাই আমরা দেখি লাঞ্ছনা অপমান-মুক্ত নতুন সভ্যতার বলিষ্ঠ আহ্বান। রবীন্দ্রনাথ তাই চিরকালের সর্ব দেশের মানুষের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ধনবাদী সমাজ পরিকল্পনার কথা এখানে তুলব না। কিন্তু কবির কথাতেই বলব, তারই অভিশাপে আজ মানুষের যত যন্ত্রণা। এই ধনবাদী পাশ্চাত্য কানা সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে চরম ধিক্কার দিয়েছেন। বলেছেন, এই পেটুক সভ্যতার স্বাস্থ্যগত সমাধান হবে কি করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে কি চিরকালই উৎসর্গ কোরে মরতে হবে? সভ্যতার এই ভিত্তি বদল না হলে মানুষকে অকথ্য অবমাননা আর লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। তিনি বললেন, সে প্রয়াস এই পৃথিবীতে একমাত্র দেখলুম রাশিয়ায়। মনে হয়েছিল, নরমাংস-ভোজী রাষ্ট্রতন্ত্রের কচির পরিবর্তন যদি ওরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব। মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আশান্বিত হয়েছি। প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপর রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা কোরেছে—কিন্তু এ বিপ্লব, মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অসভ্য রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব, এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়া মানুষ

সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় দুঃস্বপ্নের ভুলে
সাধনায় বাস্ত,—যেটাকে বলে লোভ।

এই বাণী কবি উচ্চারণ করেছিলেন কখন? যখন তাঁর ওপারের ডাক আসন্ন। তাঁর মধ্যে তখন তারুণ্যের অথবা যৌবনের অস্থিরতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবু, নবযুগের, নতুন সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকে তিনি এমনি কোরেই দ্বিধাহীন চিত্তে স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ, সত্যিকারের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হোলে, জীবন পাপমুক্ত না হোলে কাব্য-সাহিত্য কিসের কাজে লাগবে? কবি এ কথা একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করেছেন। যে খ্যাতি তাঁকে পশ্চিমী সভ্যতা দিয়েছিল, সেই সভ্যতাকে তিনি নিষ্ঠুর অসভ্যতা বোলে প্রকাশ কোরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সত্যদ্রষ্টা মানব কল্যাণে সত্য করনে কারো মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াননি। এত বড় নির্ভীক পুরুষ ভারতের সাহিত্যে দ্বিতীয়জন খুঁজে পাওয়া যায় না। সুন্দরের কবি রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের ধনবাদী সভ্যতার পচা কাঠামো দেখে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কোরলেন, মানবের যত অকল্যাণের মূলে ঐ ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরতে তিনি আহ্বান জানালেন। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সত্যসুন্দরের প্রতিষ্ঠা কোরতে, কলঙ্ক থেকে মানুষের সমাজকে চিরতরে মুক্ত কোরে নবসভ্যতার বোধন কোরতে তিনি মন্ত্র দিলেন।

একথা ভাবতে কেমন লাগে, সুন্দরের কবির কণ্ঠে বিপ্লবের আহ্বান? হ্যাঁ, তাই। সর্বগ্রাসী আগুনের মধ্যে দিয়ে যুগসঞ্চিত পাপকে ভস্ম কোরে চিরকল্যানকে আহ্বান জানাবার পথ নির্দেশ দিলেন তিনি।
বললেন,

জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসী।

আবার বললেন,

প্রতাপের ভোজে আপনাকে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ,
নরমাংসাসী করিতেছে কাড়াকাড়ি
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানা ছেঁড়া তারি, দিকে দিকে যায় বেপে
রক্তপঙ্ক ধরার অঙ্গ লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
এক দিন, শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।

বিপ্লবকে কবি সর্বনাশের ধ্বংসলীলা বলে স্বীকার করেন নি। দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, সেই পুরাতন যুগ সঞ্চিত পচা ধনবাদী সভ্যতার অবশ্য অভিশাপ, পাপ হিংসা লোভ অবমাননাকে আগুন আর ভস্মে গ্রাস করে ফেলুক। তারপর বিপুল বীর্যে চিরসুন্দরের প্রতিষ্ঠা সফল হোক। সার্থক হোক নতুন সভ্যতা। ঠিক সেই একই কথা Bernad Shaw বলেছেন, ধনবাদী পচা সভ্যতার রক্ষকদের উদ্দেশ্য,—If you dare to protect it with violence, it will be overthrown by violence.

কিন্তু ভারতে কোন মনীষী, কোন মহাপুরুষ উনো-আশী বৎসর বয়েসে মানবের নবসভ্যতার আগমনী সঙ্গীত এমন বিপ্লবের সুরে, স্থির নিশ্চয় প্রত্যয়ের সাথে কণ্ঠভরে গেয়ে যাননি।

শিলাদিত্য

ঘরে ফেরার পথ

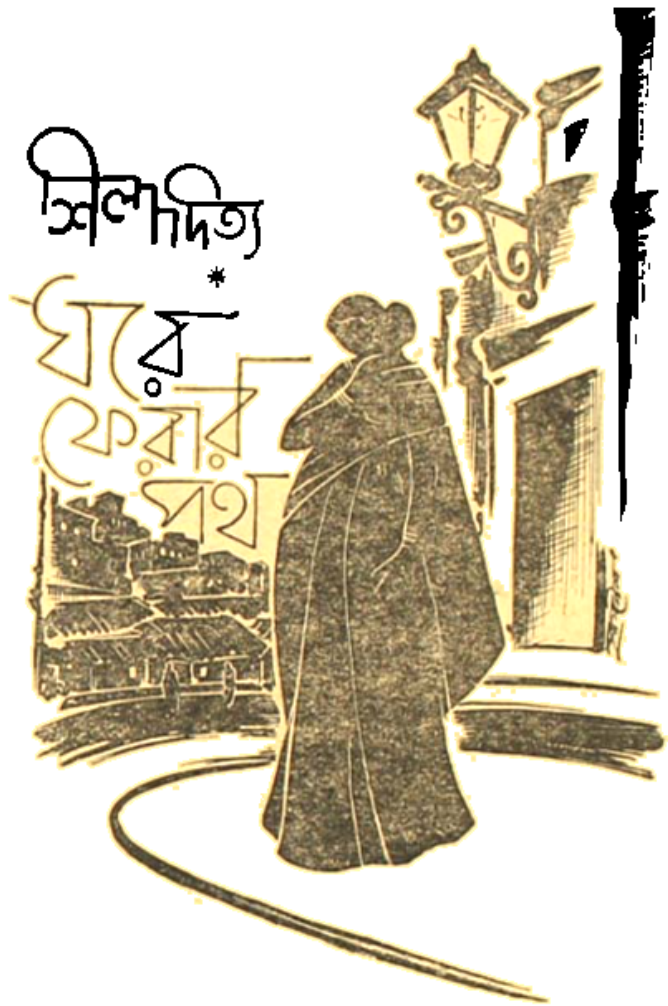

আয়নাটা তিন হাত হলেই যেন তৃপ্তি পেত নিভাননী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চুলের খাঁজ থেকে আলতার রংটি পর্যন্ত। পেছিয়ে গেলে এক রকম দেখাতো, কাছে এলে আর এক রকম। না, অনেকটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলেই যেন ভাল হ'ত। অনেক কিছু অবাঞ্ছিত নজরে আসত না, দূরত্বটাই যে সৌন্দর্যের পরিপূরক। তা নয় হাত বাড়িয়ে কতটুকু আর দেখা যায়? গলাটা নিচের পক্ষে বুক অব্দি। তারপর চার কাঠের ফ্রেমে সব বাঁধা। ভীষণ বিরক্ত লাগছে নিভাননীর। এ যেন মনের মত হয়েও মন না পাওয়া। কিংবা প্রতিবিম্ব-দর্পী হয়েও জলটা অস্থির, চঞ্চল এমনি। তা হোক্, জীবনের অনেক বাসনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেমন উড়ে যেতে দিতে হয়েছে তেমনি করে মনটা মানাতে চাইল নিভাননী। মুখের কাছাকাছি আয়না ধরে খাঁজে খাঁজে স্নো ঘষতে লাগল। চুলের ফাঁকে ভ্রূর অলিতে-গলিতে লেগে থাকা সাদা প্রলেপটাকে চামড়ায় মিলিয়ে দিয়ে মসৃণ করল। তারপর পাউডারের কৌটাটা খুললো সে। এবার হাল্কা একটু প্রলেপ। হ্যাঁ, রত্না এমনি করেই বিকেলে প্রসাধন করত। এই স্নো পাউডার সেই ফেলে গেছে। ঠিক ফেলে গেছে নয়, ইচ্ছা করেই নিয়ে যায়নি। মনে পড়ছে নিভাননীর। বাক্স বিছানা গোটানোর সময় এই স্নো আর পাউডারের কৌটটা এগিয়ে দিয়েছিল সে, বাক্সর চাবি দিলে যে বৌমা, এগুলো চুকবে না?

—না মা। হেসেছিল রত্না। বলেছিল, ওতে আর বিশেষ কিছুই নেই। আর আপনার ছেলে নতুন কিনে এনেছে ওগুলো থাক।

—কিন্তু এখানে ফেলে তো নষ্ট হবে মা, নিভাননী বলছিল, কে আর মাখবে

—কেন আপনি দুষ্টুমি ভরা চোখে চেয়েছিল রত্না। বাবা তো আ আপনাকে কিনে দেন না ভীষণ অন্যায় কিন্তু দাঁড়ান যাবার সম বা বা কে খুব বু বে দিয়ে যাব।

হাসি পেল নিভাননীর পাউডারের রেশমি রেশা রেণু মুখে ছড়াতে ছড়াতে আয়নার দিকে চেয়ে হাসল। রত্নাটা ভীষণ বাজিল। যে কটা দিন কাছে থা নিভাননীকে অস্থির করে তোলে।

—মা, এই জরি পাড় শাড়িটা পরুন না একবার তার সঙ্গে নাইলনের এই ব্লাউজটা।

—দ্যুত্, মেয়ে। আমার কি ওসব পরার বয়স আছে

—বয়স নেই? ওমা বলেন কি! আচ্ছা, আ দিকি মুখে খানিকটা স্নো ঘষে দি, একটু পাউডার অ একটান কাজল চোখে। তারপর দেখবেন বাবা যাবা ঠাকুদা এলেও চিনতে পারবে না আপনাকে মনে হবে পনের বছরের—হি হি হি।

—বৌমা। গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেল হয়েছে নিভাননীকে। বিরক্ত হতে গিয়ে আরও কিন্তু না, কোন আরক্তিম রং এই বয়েসে চামড় গলিঘুঁজি পেরিয়ে সদরে এসে পৌঁছতে পারে না ত

যোগ্যতা। নইলে মেয়েটা জন্ম তো এই মুহূর্তে সমস্ত রক্তটা তার মুখে মাখিয়ে আরো রঙিন করে দিত লজ্জার রংটাকে। কিন্তু এই একটু সাদা প্রলেপ, রেশমী রেণুর পাউডার, লিপষ্টিকের হাল্কা ছোঁয়া, চোখের নীচু পর্দার উপর কাজলের সরু রেখা পনের বছর না হোক্ আর চল্‌তি বয়েসের অনেক নীচে তাকে নামিয়ে এনেছে। শুধু কয়েকটা সাদা চুলের অবাধ্যতা, মুখের কয়েকটা চামড়া অবাঞ্ছিত ওঠা নামা যদি সরিয়ে ফেলা যেত? তাহলে রত্না আর নিভাননী দুটি সমবয়সী মেয়ে। কবী, চন্দনা যেমন। চামেলী, সন্ধ্যা যেমন। অলকা আর রঞ্জনা যেমন। না, না অলকা রঞ্জনা নয়। নিভাননী নিজের মুখটাকে আয়নায় দেখলো। তাদের এই মফঃস্বল শহরের টিনবাজারের ঘর গেরস্থালি সমস্ত মুখের ছবি তার মুখে। ওদের দুবার লজ্জার ঘৃণার আর ঐ দুটি মেয়ের প্রতি অশালীন রসিকতা···ঘোষ বাবুর বউ বলেন, আর বলবেন না দিদি, ছি ছি কি কাণ্ডটাই না চলছে। সন্ধ্যে হলেই মুখে রং মেখে রাস্তায় দাঁড়ায়। তারপর সারারাত লোক জুটিয়ে সেকি হল্লোড়। কি জানি বাপু। দিনে দিনে সবই প্যাটার্ণ হচ্ছে। ঘোষ বাবুর বউ গলার স্বরটা অকারণে সংযত করেন, বুঝলেন দিদি, আপনার কাছে বলছি কি ঐ দুটোর মাও এই ব্যবসাই তো করতো। আর আকছার এমন কত জনাই তো করছে। তা বাপু ঘরে সয়ে ঘেপে চুপে সব চল তো। কিন্তু এ দুটো যেন হাঁকডাক করে জানির করছে। ছি ছি।

বাস্তবিক ছি ছি। নিভাননীর মনটা বলে উঠল। কার সঙ্গে তুলনা করে বসেছিল সে নিজেকে। আয়নাটায় নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে নিজেই যেন চোখ বাঁচাল সে। অলকা, রঞ্জনা নয়। সে যে সতীসাধ্বী। হ্যাঁ, এই তো সিঁথিতে সিঁদুর এখনও জ্বল্‌জ্বল করছে। হরকান্ত এই তো সন্ধ্যের খানিক পর দাবা খেলে ফিরবে। তাকে খেতে দেবে সে পরিপাটি করে। মনের সবটুকু শ্রদ্ধাভক্তি আর ভালবাসা মিলিয়ে। হরকান্তকে সে ভালবাসে। লজ্জা লাগছে নিভাননীর। স্বামীকে কেউ না ভালবাসে নাকি! অপরিসর আয়নাটার দিকে চেয়ে মনে পড়ে গেল নিভাননীর অনেক দিন আগের একটা কথা। বাস্তবিক অনেক দিন। সেদিনটায় এমনি করে সো, পাউডার না ঘসেও মুখে একটা আলগা আভা ছিল। চুলের রং-এ কালোর ভেজাল ছিল, আর মুখের কোন জায়গায় অবাঞ্ছিত ওঠা নামা ছিল না। হরকান্তর বুক পিঠ ছমড়ে যায়নি। নাকের ডগায় মোটা পাওলা কাচের চশমাটি ঝুলোতে হয়নি। সেই একদিন হরকান্ত বলেছিল, আমার উপর তোমার ভীষণ রাগ হয় না?

—কেন?

—তোমার কোন সাধ মেটাতে পারি না। একখানা গয়না তো দূরের কথা গায়ে মাখা একটা সাবান কিনে দেবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই আমার।

—তাতে কি হয়েছে?

তাতেই তো সব। পাড়ার মেয়েদের দেখে তোমার কষ্টটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু কি করব বল কোন উপায় পাচ্ছি না। ভীষণ ভুল বুঝেছি তোমাকে বিয়ে করে। আমি বিয়ে না করলে নিশ্চয়ই ভাল ঘরে তোমার বিয়ে হতো—

—ছিঃ। কি যা তা বলছ? আমার কিছুর দরকার নেই। নোয়া-সিঁদুর থাকলেই আমার যথেষ্ট।

কিন্তু এই মুহূর্তে নিভাননীর মনে হচ্ছে, না, নোয়া সিঁদুর যথেষ্ট হলেও, একান্ত কাম্য হলেও আরও কয়েকটা কামনা তার মনের ভণ্ডারে ছিল। কিন্তু সেগুলো পূর্ণ হয়নি। বয়সের তফাৎ তা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিয়েছিল। হরকান্তর আয়ু মানের সমান্তরাল রেখায় কখনও সমান চলেনি। বরং ডিসপ্রপি হয়েছে দিনের পর দিন। দুটি জীবন তিনটি। তিনটি করে চারটি। তারই মাঝখানে কামনাগুলো রুদ্ধ হয়ে কেটেছে। অথৈ জলে মিশে গেছে। তবু আশাগুলো কোন মানে নেই। তাই নিভাননী সেই ভেঙে যাওয়া রুদ্ধগুলোর উপর আবার রঙ্গ ফলিয়েছে। আকাশের রং নকল, ঘরের বর্ণালীরঞ্জন।

আকাশের আলো থাকলেও এই মুহূর্তগুলোর কোলটা আগেই অন্ধকার হয়। তার চাইতে আগে হয় নিভাননীর ঘরের ভেতরটা। মনটা ভয় ভয় করে ওঠে। আয়নায় নিজের মুখের ছায়াটা স্পষ্ট পড়ে না। তা না পড়ুক। প্রসাধন শেষ করে নিভাননীর। এবার একটা শাড়ি

পরতে হবে। আর কয়েকটা গয়না। হ্যাঁ, সেই রঙিন বুষ দুগুলো। আজ তার হাতের নাগালে। আপনি ডে যায় না, হাত দিয়ে ছুঁলেও না, নাড়াচাড়া করলেও না,। হাসল নিভাননী। অথচ এরই জন্যে সেই ছোটবেলা থেকে বাসনার সমুদ্র সেঁচে তোলে।

'ওরে আমার ছোট্ট পাখি ময়না, লক্ষ মাণিক ছড়িয়ে তোরে গড়িয়ে দেব গয়না।' সুরটা গুণ গুণ করে উঠল নিভাননীর গলায়। তার মা-ও এই গান গেয়ে ঘুম ঘুম আসতে আসতে জিগ্যেস করত চার বছরের নিভাননী, কি গয়না মা?

—টিকলি। মা বলতেন।

—তিকলি আর তায়রা? হাতে চুরি, কানে দুল?

—হ্যাঁ, সব-ব্। খুনোও তো লক্ষ্মী সোনা।

—আর সাড়ি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। লালটুকটুকে সাড়ি দেবো। বর এসে নিয়ে যাবে। সোনার পাখী, হীরের পন্নামোতির মালা।

মনে পড়লে হাসি পায়। সত্যি, ছোটদিনের অনেক কথায় হাসি আছে, য�ৌবনেও। আর কি আশ্চর্য হাসির কথায় হাসির কথা মনে পড়ে যায়। দুঃখের কথায় দুঃখ। বন্ধুদের বিয়েতে কার শ্বশুর বাড়ী থেকে কি গয়না দিয়েছে তার হিসেব মুখে মুখে রাখত নিভাননী। শুধু তাই নয় নিজের মনের সঙ্গে মিশিয়ে অন্য একটা ভাবনাও ভাবত। অথচ—। দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিভাননী। হরকান্ত সত্যি তার স্বপ্নী-দিনের কোন সাধ পূর্ণ করতে পারেনি। তাই আজ ছেলে শেখরের চাকরীর বন্ধন টাকা হাতে পেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে শাড়ি কিনেছে সে। আর না, গয়না গড়ায়নি, বন্ধক রেখেছে। পড়াপড়শীদের সাহায্যের অন্ধকারে। এই বিকেলের অন্ধ আলোর গলিতে নিভাননীর অপূর্ণ সাধটা প্রাণ পেয়ে উঠেছে। রঙ্গার ছেলে যাওয়া প্রসাধনের সামগ্রীগুলো তাকে প্রলোভিত করেছে। বাক্সবন্দী গয়নাগুলো, রঙিন শাড়ীর জেল্লা-গুলো। আর তাকে উতলা করেছে একলা ঘরের এই নিশ্চিন্ত অবসর। আয়নাটার ঝকঝকে ইসারাময় প্রলোভন। মনটার মাতলামির কাছে শরীরের বিরসতাটা তুচ্ছ হয়ে গেছে। হরকান্ত দাবা খেলে ফিরতে এখন অনেক দেরী। এই একলা অবসরটুকুতে নিভাননী নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সাধ মিটিয়ে। আর ভাবলে আয়নাটা কেন তিন হাত হল না!

আয়নার চোখ আছে বটে কিন্তু সে চোখের তলায় মন নেই। তাই বিস্তৃততায়, বিস্ময়ে ঝিকিমিকি করে ওঠে না আয়নার চোখ। রেখায় রেখায় কথা ফোটে না। নিষ্পলকের বিনোহনে স্থির হয়ে থাকে না। আর একটা ইচ্ছে নিভাননীর মনের প্রান্তে ঢেউ তোলে। যদি এমনি করে সেজে কোন চোখের তলায় মনের সামনে দাঁড়ান যেতো। যেমন করে দাঁড়ায় এই টিনবাজারের উঠতি যৌবনা মেয়ের দল। স্কুল যাওয়ার পথে। উৎসব অনুষ্ঠান-রজনীতে। পানবাজনার আসরে। আর যেমন করে প্রত্যেকদিন রাস্তার আলোগুলোর সামনে দাঁড়ায় অলকা, রঙ্গনা। এইখানে এসেই প্রতিহত হয় নিভাননী। প্রায় প্রত্যেক দিন নিজেকে অশুচি মনে হয়। কেমন জ্বালা জ্বালা করে ওঠে মনের ভেতরটা। ত্বরিতে সাড়ী গয়না খুলে ফেলে। ঘটি ঘটি জলে ধো, পাউডারের প্রলেপ আর গন্ধ উঠিয়ে দিতে চায় সে। ঠিক সেই সময় এসে পৌঁছয় হরকান্ত বলে, ওকি হচ্ছে, মুখ ধুচ্ছো কেন?

—এ্যাঁ? সচকিত হয় নিভাননী।

—হঠাৎ মুখ ধুচ্ছ কেন? তোমার খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

—আহিখ্যেত দেখো। তোমার আগে খাব কি! ইচ্ছে হল তাই ধুচ্ছি। তার জন্যে কৈফিয়ৎ লাগবে নাকি?

—না, না, কি যে বল। হরকান্ত হাসে। খেতে দাও।

কিন্তু মনটা? হ্যাঁ, এবার মনের তলায় চোখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিভাননী। কৈফিয়ৎ তলব করে। কেন এই বয়েস পেরিয়ে প্রজাপতি-পানা করবার কি দরকার? অলকা রঙ্গনার মত তার হতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? ছি ছি। নিজের মনের চোখটাকে ধমকায় নিভাননী। অমন করে দেখছো কেন? ওসব কথা ভাবলেও যে পাপ। জানে, আমি স্বামীকে কত ভালবাসি। বাইরের পুরুষের মুখগুলো কেমন পাঁচের তা দেখিনি। জীবনে কখন বিচারিণী হওয়ার কল্পনাও করিনি। ছোট থেকে সেজে থাকার ইচ্ছে ছিল সে সাধ মেটেনি।

আজ সেই সাধ মিটাচ্ছি। আজ সেই সাধ মিটেছে। অপরাধ কোথায়?

—বুঝলে, শেখরের আসছে মাস থেকে শ'খানেক টাকা বেতন আরো বাড়বে। হবকান্তের কথায় সজাগ হল নিভাননী। কমান হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিলে।

—এবার তাই ভাবছি ঘরটা বড় করে করব। আর লাইটের ওয়েরিং করিয়ে নেব। কীমার ভীষণ কষ্ট হয় এখানের এই ছোট ঘরে থাকতে। শহরের মেয়ে লাইট ছাড়া কখন থাকেনি। হ্যারিকেনে অন্ধকার দেখে।

—হুঁ। নিভাননী পাশ ফিরে শোয়। মুখের চামড়ায় এখনো মিষ্টি গন্ধটা লেগে আছে তার। কি বিরক্তিকর।

—তাছাড়া শুনছি শেখর নাকি এই শহরেই বদলির চেষ্টা করছে।

—তাই নাকি, নিভাননী পূর্ণ সচেতন হল।

—পরেশ উকিল বলছিল।

—কি? উঠে বসল নিভাননী উৎসাহে।

—বলছিল, শেখর তো মুনশেফ হয়ে এখানেই আসছে। ঘরটরগুলো তৈরী করান। বাড়ী থাকতে মিছিমিছি কেন কোয়ার্টারে থাকবে।

—ঠিকই তো। কাজ আরম্ভ করিয়ে দাও। শুধু বাড়ী হলেই তো হবে না, তেমনি আসবাব চাই। কথা বলেই চুপ করে গেল নিভাননী। তিন হাত আয়নার একটি ছবি হঠাৎ অকারণেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কথাটা মিথ্যে নয় শেখরের চিঠিতে জানা গেল। হবকান্ত সাম্যাল লেগে পড়ল বাড়ী তৈরী করাতে। নতুন নতুন আসবাব এলো। বাইরের আকাশ অন্ধকার হলেও, বার লাইটের উজ্জ্বলতায় ঘরের ভেতরটা দিন হয়ে রইল। আর তিনহাত আয়নাটা একজনকে অন্তজন দেখিয়ে বারবার ভুল করিয়ে দিতে লাগল নিভাননীকে। নিজেকে প্রসাধনমণ্ডিত করার উদগ্র বাসনাটাকে সন্ধ্যে হলেই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না তার। রংএ রংএ সাজিয়ে তোলার মোহটা কিছুতেই ছাড়া যায় না। প্রতিদিন সন্ধ্যের নিরিবিলিতে নিভাননী অপরূপ হল। নিজেকে নিজে দেখেও সাধ মিটল না। তাই একদিন অপরের চোখে দেখার বাসনাটা প্রবলতর হল। সমস্ত ভুলিয়ে দিল তাকে। বাইরের লাইটপোষ্টের সেই মোহমুহ আলো দিনের পর দিন নিভাননীকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে। চলতি পথিকের চোখের নীচে মনের ছবি দেখিয়ে। টুকরো কলির গান শুনিয়ে। রহস্যময় জগতের ইসারায় রোমাঞ্চিত করে।

পাড়ার মেয়ে-পুরুষেরা বিস্মিত হয়ে অলকা-রঞ্জনার আর একটি সাথীকে খুঁজে হায়রান হল। ঘোষবাবুর বউ দ্বিপ্রহরের অবসরে বললেন, আর দিদি বলবেন না। উনি বলছিলেন আপনাদের বাড়ির কাছাকাছি আর একজন এসেছে। রাস্তার আলোর সামনে দাঁড়িয়ে রঙ করে। ছি ছি দিদি কি সর্বনাশ, পাড়াটা জাহান্নমে গেল। ভাবছি উঠে যাব এপাড়া থেকে। আপনার ছেলেতো মুনশেফ হয়ে আসছে এই শহরেই। তাকে বলে সর্বনাশীদের উচ্ছেদ করবার ব্যবস্থা করবেন দিদি। নইলে.....

টিনবাজারের এই উপগলিটিতে দিন নেই রাত্রি আছে। ঘোষগিন্নী চলে যাওয়া শব্দহীন আর রংহীন দ্বিপ্রহরে বসে থেকে নিভাননীর মনে হল, বাস্তবিক তাই। তাদের হাল তৈরী বাড়িটাই যেন এএলাকায় আভিজাত্যের জন্ম দিয়েছে। নইলে কোন শতাব্দীতে কয়েকটা ইটের পাঁজর ঘর উঠেছিল। যাদের গায়ে মসৃনতার সৌন্দর্য লাগেনি। আর যাদের অন্তরে নিভাননীর মর্যাদা পাওয়া কেউ বাস করেনি। সেইকটি ঘর সম্বল ছিল টিনবাজারের আর ছিল কয়েকটি সমাজচ্যুত লাইটপোষ্ট। যাদের উঁচু মাথার আলো প্রায়দিন জ্বলত না। তবু এখানে রাত ছিল। সারাদিনের বাগর জাগান মজুর দল ফিরে আসত এই টিনবাজারের কোলের ভেতর। জাত যাই হোক না কেন টিনবাজারের রাতের প্রান্তরে বাঁশিতে মাদলে তারা শীওতাল, হিংস্রতায় তারা আফ্রিদি, আর নেশায় তারা যেন শীতার্তহেশীয়। সত্যিই টিনবাজারে দিন নেই রাত আছে। নিভাননী সবটা না জানুক, ঘোষগিন্নী খানিকটার খোঁজ-খবর রাখুক তবু টিনবাজার নিজে নিজে জানে তার বুকের রাতে অনেক অলকারঞ্জনা আছে। যারা সারাদিনের গোলামি সহরে

দিয়ে রাতের নিশ্চিন্তায় নিজের বেসাতি বিছিয়ে বসে। কাতারে কাতারে লোক ডাকে। বিকিকিনি চলে। জাতপাওয়া লাইটগুলো সব রাতে জ্বলেই না ভাল করে। কারণ, জন্মের আগে অন্ধকার, মৃত্যুর পর অন্ধকার আর উপভোগের তীব্রতা অন্ধকারেই মধুর। নিভাননীও তাই আলোর নীচের অন্ধকারটুকু বেছে নিয়ে সন্ধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং দুপুরের—ঘোরসিনী চলে যাওয়া নির্জনতায় বসে লজ্জায় ঘৃণায় যেন মরে যেতে চায় নিভাননী। কেন সূর্য সারাদিন দারোয়াত আকাশে থাকে না।

শেখর এস মাসখানেক পর। সস্ত্রীক উঠল কোর্টের কাছে মুনসেফের জন্যে নির্দিষ্ট বাসাটায়। হরকান্তবাবু হন্তদন্ত হয়ে এলেন, কি ব্যাপার এখানে উঠলি যে? হ্যাঁ বৌমা এখানে কেন? আমি যে তোমাদের জন্যে পরশুর সব তৈরী করে রাখলাম।

হাসল শেখর। বললে, তাতে কি আছে বাবা এইতো এক জায়গায় থাকলাম। তাছাড়া, কোর্টের কাছাকাছি না থাকলে অসুবিধা অনেক।

—তা বটে, তা বটে। আসবাব আর অভিজাত্যের রূপটা চোখ ঝলমলিয়ে দিয়েছে হরকান্তবাবুর। এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখেন। তবু তোর মা অপেক্ষা করে বসে আছে।

—চলুন মার সংগে দেখা করে আসি। শেখর উঠলো। আজ অফিস করবো না। তুমিও চল সংগে। বিকেলের দিকে ফিরে গোছগাছ করবে।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। তোর মাকে বুঝিয়ে আসবি। এস বৌমা।

কিন্তু শেখর এ বাড়ীতে থাকবে না শুনে বিন্দুমাত্র দুঃখ হল না নিভাননীর। কেমন যেন একটা স্বস্তি আর প্রসন্নতা তাঁর মনের সমস্তটায় বিছিয়ে পড়ল। তবু নিভাননী কৃত্রিম হতে চাইলেন, তাই বয় ঘরের ছেলে ঘরের কাছে থেকেও দূরে থাকবি?

—কি আশ্চর্য, শেখর মৃদু হাসল, বলছিতো প্রত্যেক দিন তোমার কাছে আসব। দূরে থাকা হল?

—না বাপু, আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। নিভাননীর মুখটায় বেদনার রং কিছুতেই পরিপূর্ণ ফুটছে না, তুমিও কি তাই বল বৌমা?

—আপনি অমন হচ্ছেন কেন মা? একই শহরেই তো রইলুম। কতটুকু আর দূর? যখন ভাববেন সংগে সংগেই পাবেন। তাছাড়া প্রায়ই তো আসব।

—তা বটে। নিভাননীর দীর্ঘশ্বাসটা এতক্ষণে যেন পূর্ণতা পেল।

আর পূর্ণতার দিকপ্রাবিত করেও নিভাননীর ইচ্ছেটা বেদোয়ারী ঘোড়া হয়ে গেল। সেই কোনদিন জ্বলা, কোনদিন না জ্বলা লাইটপোষ্টটার বায়না বেড়েই উঠতে লাগল। সন্ধ্যে, রাত্রি, গভীর রাত্রি। নিভাননী বয়সে না হোক মনে আর প্রযত্ন দেহসজ্জায় নবযৌবনা নটিনী। যার জ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গ আন্দোলিত, যার মৃদু হাস্যে সব লাস্যময়। আর টিনবাজারের উপপল্লিটার জীবনের রাতারাতি বয়েসের হিসাবে বাতিল হওয়া অনেক অলঙ্কার রঞ্জনার দীর্ঘশ্বাস নিভাননীর চারপাশে নিষ্ফল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সংগ দিতে লাগল, মহমুহ্য করল।

আসব বলেও অনেকদিন আসা হয়ে ওঠে নাই শেখর আর বত্নার। মাঝে মাঝে যাওয়ার কথাটা তীব্রভাবে মনে হয়। কিন্তু ঘন্টাখানেকের কাজ সব তুলিয়ে দেয়। নয়তো বত্নার কোন বায়না তাকে অক্রমণ করে। তাই প্রায় প্রতিজ্ঞা করে বসল শেখর, ওসব শুনছি না। আসার পর দিন তিন চার গিয়েছিলাম। তারপর থেকে এই প্রায় একমাস শুধু বাবাই এসেছেন। আমাদের আর সময়ই হয়ে ওঠে না।

—আমার না তোমার? বত্না ঘুরে বসে বলে।

—তোমার জন্যেই তো। সকাল-বিকেল আমাকে মাকে ঘড়ি দিয়ে খাটাচ্ছ। তুমি না যাও, আজ আমি যাবই।

—যাবনা বলেছি আমি! কি জানি বাপু মা কি মনে করছেন তার ঠিক নেই। চল।

বৈকালের শহর যেন যৌবনোদ্ভিন্না অনূঢ়া মেয়ে। সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া। ঝরঝরে সাবান মো মাখা। দুএকটি তারা আর হাজার লাইটের টিপ আর আভরণ পরা। মুখে তার প্রসন্নতা, চোখে তার আলোকচ্ছটা। মনে তার গানের গুঞ্জন, লাবণ্যে মোহঞ্জন। শেখর বত্না পাশাপাশি হেঁটেই যাচ্ছিল। কিন্তু ফলটা ফুলটা কিনতে কিনতে বোঝা বাড়ল। শেখর বললে আর হেঁটে যাওয়া

—কিন্তু

—ট্যাক্সিতে বসেই আমার মনে

—লক্ষ

—হ্যাঁ বাপু যদি আপনি ছোট ছোট আর এ ঘরে দশ দিন দশ দিন পর তাও আবার ট্যাক্সিতে।

—তা বটে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে বন্ধু বলল, ট্যাক্সিতে তো বেশ। কি বললে। পৃথিবীটা মনটাই যেন ছোট হয়ে গেছে বাপু এযুগে। সেই সত্যযুগের কাহিনীতে। শকুন্তলা যাবে শ্বশুরবাড়ী জন্মে কতদিন ধরে মনে মনে কত আশা-আওয়ার ভিতে কত ঘটা। আবার ভাল উদাহরণ দেবদূত। সে কালিদাস কবি জন্মালে যক্ষের মনটাকে মেঘদূতে চিঠি দিয়ে দিতেন তারপর কিছু দেখতে না হই উর্ধ্বদিকের অন্দিন। হি হি হি। তখন বন্ধু অখণ্ড তেজময় বিয়ার দেখে বলল, তুমি

—কেন?

— তা নয়লে এত স্তুতিগীত যুক্তি আর উক্তি।

—আর তুমি ঈশ্বরগুপ্ত।

—কেন?

—অনুপ্রাসের জন্যে।

দুজনে হেসে উঠল। বৈকালের শহর বাসিন্দে। তাই এই একটি হাসির উচ্ছলতা অনেক হাসির সঙ্গে লুটোপুটি খেতে মিশে গেল। হেসে খুন হল। আর ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন হাসির জন্ম দিল। তারি ছোঁয়া বন্ধু মুখের উপর লাগিয়েই বলল, বিয়ের সময় ট্যাক্সিতে করে এসেছিলাম। কিন্তু ভীষণ বিরক্ত লাগছিল। আর তুমি মৌজসে সিগারেট ফুঁকছিলে। কিযে রাগ হচ্ছিল কি বলব। তারপর থেকে পুজো দিতে কি বেড়াতে যার সঙ্গে যতবার গেছি হেঁটে নয় রিক্সায়।

বরবাড়ী ছাড়া ছাড়া হয়ে এল। অর্থাৎ শহর শেষ। এবার শহরতলী। খানিকটা পড়ো জমি। যত ময়লা

আপনার পছন্দমত সেরা কালি

রেনবো ইঙ্ক

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
২/২ এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, • কলিকাতা-১

আর মৃত জন্তুদের ফেলে দেওয়ার জায়গা এটা। তারি গা ঘেঁষাঘেঁষি একটা কবরখানা। অনেকগুলো স্মৃতিফলক এখনো ক্ষতবিক্ষত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা খিন আর রটনাছের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। ছলকি চলনে শেখর আর রত্নার গায়ে আর খানিকটা গিয়েই টিনবাজারের সীমান্ত। তারই একটি উপগলির শেষপ্রান্তে শেখরের বাবা থাকেন। কথাটা হঠাৎ মনে হতে রত্না বলল, আচ্ছা মা বাবাকে আমাদের ওখানে নিয়ে গেলে হয় না?

—উঁ?

—তাহলেই হয়। প্রত্যেকদিন এমন ছুটোছুটি অর্থহীন। এ বদ্ধটা বরং ছাড়া দিয়ে যাও।

—হুঁ। শেখর আনমনা হয়ে গেছে। টিনবাজারের এই পরিবেশ, লাল মাটির সংগে তার দীর্ঘদিনের নিবিড় যোগ ছিল। কিন্তু আজকে যেন মনে হচ্ছে সে নিজ ঘরে পরবাসী। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় যাওয়া-আসা করতে হচ্ছে। অথচ একদা যখন সে ঘুনসেক ছিল না, তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, আর এই রত্না ছিলনা, তখন তার আর একজন ছিল। যে এই টিনবাজারের বহুগলির ভেতর কোকিলের স্বর শুনিয়েছিল। রঙে রঙে আকাশ রাঙিয়ে ছিল। বসন্তের মত্ততাকে ভঙ্গ করে এই টিনবাজারকে শেখরের কাছে ছবি করে দিয়েছিল। সেই মেয়েটির কথা অকারণেই মনে পড়ে গেল শেখরের। একটা দীর্ঘশ্বাস তার, আর শেখরের মধ্যেখানে এখন বিকেলের রেখনার্ত আকাশকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নইলে বলা যায় না, ঘরে ফেরার এই মুহূর্তে রত্নার বদলে রত্নাই হয়তো শেখরের পা থেকে জুতা খুলে করতো। কিন্তু রত্না? সেইকালের কচি নিষ্পাপ মুখটিতে তার মায়ের পদস্খলনের উত্তরাধিকারের কাহিনী ছিল বলে কিরতে হয়েছিল কি শেখরকে? কিম্বা রত্নাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল? শেখর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আর রাস্তার দিকে চেয়ে থাকল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জ্বাত-খাওয়া লাইটগুলো জ্বলার আগেই। এই মুহূর্তে তারা জ্বলল যখন তখন টিনবাজারের জীবন সুরু হয়ে গেছে অলকারঞ্জনাদের নিয়ে।

শেখরের পাশে বসে রত্না তখনও বকে চলেছে, বাবা: গুরুতো নয় যেন পর্বত। এত উঁচু এত নীচু। কী করে এখানে তুমি কাটিয়েছ? আমি হলে তো পারতাম না। সত্যি কথা বলতে কি এখন আয়গাটা ভীষণ খারাপ। খারাপ মেয়েছেলেরা এ পাড়ায় থাকে। আমার মোটেই ভাল লাগেনা বাপু। সেই জন্যেই বলছি বাবা-মাকে নিয়ে চল বরং ওখানে।

একটা লাইটপোষ্ট থেকে আর একটা শুধু আবছা। ঘোলাটে। অন্ধকার। ধোঁয়া। যেন সকালে বিকেলে উনানে জ্বালান ধোঁয়াগুলো উড়ে যাওয়ার পথ পায়নি। দিনের পর দিন এখানে জমা হয়েই চলেছে। আর সেই ধোঁয়াঅন্ধকারে কেউ শিস দিলে, কেউ গান গাইলে কিংবা কোন নারীকণ্ঠের হাসিতে কারো মন সুরা-মাতাল হল। শেখর উৎসুক হয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকল। কি জানি তার মায়ের ব্যবসার অংশীদার রঞ্জনা যদি হয়ে থাকে। তাহলে দেখা হলেও হতে পারে। দু একজনকে আবছা অন্ধকারে পড়ছিলও। হয়তো রঞ্জনাই। পেছিয়ে চলে এল শেখর। দেখা হয়েও দেখতে পাওয়া গেল না। আড় চোখে লক্ষ্য করছিল রত্না। আর একটা লাইটপোষ্টের সামনে অমনি আবছায়া একটি মূর্তি স্পষ্ট হচ্ছে। শেখর ঝুঁকতে চাইল। হাতটা ধরে টানলো রত্না, ছি, জোরেই বলল সে, কি দেখছো অমন করে। যতসব নষ্ট মেয়েমানুষের আড্ডা এখানটায়। এই রিক্সাওয়ালা তাড়াতাড়ি চল না। ছি ছি, সন্ধ্যে রাতে থাকতেই কি কেলেঙ্কারী।

রিক্সাটা দ্রুত এগিয়ে গেল।

কিন্তু লাইটপোষ্টের নীচে দাঁড়ান মূর্তিটা প্রথমে স্থানু হয়ে গেল। তারপর ছটফট করতে লাগল। তার শেষে বেতাল হয়ে আত-থেকো লাইটপোষ্টটার হীমশীতল গায়ে ধাক্কা খেল। মাথায় ঠোক্কা লেগে অস্ফুট আর্তনাদ করে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। আর সেই অস্পষ্ট আলোয় একঝলক তাজা রক্ত তার চুলের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে সিঁদুর বং সিঁথি তৈরী করে দিলে। এই মুহূর্তে টিনবাজারের রাতের কচি বয়স যৌবনাভীমুখী।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

অনাহূত অতিথি "মিউকর"

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

সে আবার কেমন ছ্যাঁচড়া লোক মশাই? চাইনা, অথচ এসে হাজির, জানিনা অথচ দাঁত বার করে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠিক তেমনি এক অতিথি হচ্ছেন আমাদের 'মিউকর', এক প্রকারের খুব খুদে পরভৃতিক গাছ, যাকে প্রায়ই বারাপ হয়ে যাওয়া রুটির ওপর, তরকারীর ওপর, অনেক সময় গোবরের ওপর দেখা যায়। বিশেষ করে বর্ষাকালে। নয় কি? আপনি না জানুন কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি বর্ষাকালে অফিস যাওয়ার আগে মুখধানাকে হাঁড়ির মতন করে আপনি আপনার পাঁউরুটিটাকে পরিষ্কার করতে করতে এই ধরণের গজিয়ে ওঠা ছাতাকে শাপশাপান্ত করছেন। আপনি হয়ত জানেন না যে আজ যাকে আঙুলের এক ঝাপটায় মুহূর্তের মধ্যে আপনি নিশ্চিহ্ন করে দিলেন, তারও একটা আলাদা জীবন আছে। আর তার সংগে আছে সামিকটা রহস্য। কিন্তু সে রহস্য বোঝবার আগ্রহ আপনার মধ্যে কই? প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে, কোনদিন কি এক মুহূর্তের জন্যেও এর কথা ভেবে দেখেছেন? তবে আমি জানি, নিশ্চিন্ত অপরাহ্নে আপনি যখন কোন খোলা মাঠে বসে আপনার অবসর সময়ে বসে বাদাম ভাজা ছাড়াচ্ছেন আর খাচ্ছেন, তখন আপনার পাশেই পড়ে থাকা কিছু গোবরের ওপরে গজিয়ে ওঠা এই ছাতা আপনার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তবে আসুন, কিছুক্ষণ সময় আমরা এর জন্যে চিন্তা করি, অন্তত জানতে চেষ্টা করি, আজ যাকে আমরা অত্যন্ত ঘৃণাভরে উপেক্ষা করছি, তার এই নিঃসঙ্গ তুচ্ছ জীবনের বৈচিত্র্য কোথায়।

জেনে রাখুন, এই ধরণের পরভৃতিক গাছ কিন্তু নিজে নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। আর পারে না বলেই একে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যে সমস্ত জিনিষে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, বিশেষ করে স্টার্চ বা চিনি, এ জন্যায় ঠিক তারই ওপরে। এ গাছ এত ছোট যে একে জানতে হলে আপনাকে রীতিমত অনুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হবে।

অনুবীক্ষণের সতর্ক দৃষ্টির নীচে এই গাছের চেহারা ১নং চিত্রের মতন আপনি দেখতে পাবেন। এর তলার দিকে রয়েছে ছড়ানো সুতোর মতন জিনিষ। এই সুতোগুলোই চতুর্দিকে ছড়িয়ে এই ছাতার আপাত আকার সৃষ্টি করে। এই সুতোগুলোরই নাম হলো হাইফা (Hyphae)। এই হাইফাগুলোর অবিন্যি

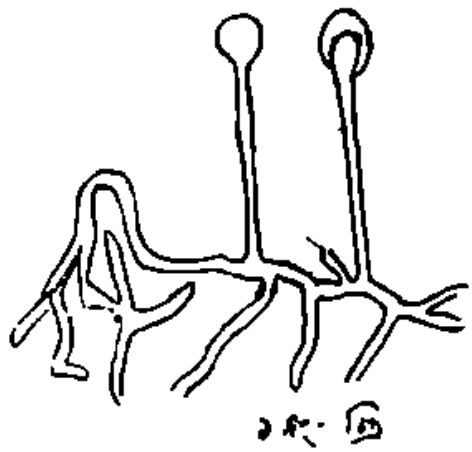

১নং চিত্র

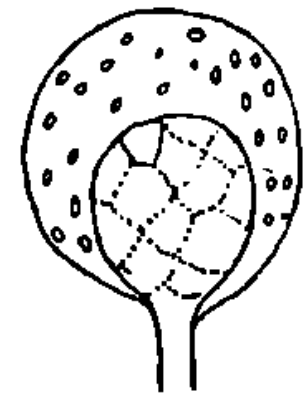

২নং চিত্র

নিজেদের কিছু খাদ্য সঞ্চয় থাকে। তা হলো প্রাইকোজেন আর কিছু তেলের দানা। এই হাইফাগুলোই পাউরুটির ওপর ছড়িয়ে তার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করবার জন্য ঢুকে পড়ে। তাহলেই দেখুন 'মিউকর' খালি ভাড়াটেই নয়, একেবারে বাড়ীওয়ালার ট্যাঁক ধরে টানাটানি করা ভাড়াটে।

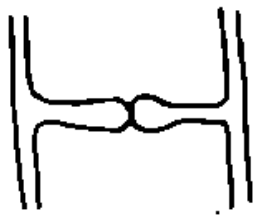

৩নং চিত্র

প্রশ্ন হলো সে এই রাবনের গুষ্টি বাড়ে কি করে? কি করে এদের বংশবিস্তার হয় এবং কীভাবে এরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে? জেনে রাখুন, এর বংশ-বিস্তার হয় দুইভাবে। একটি হলো যৌনভাবে, অপরটি হলো অযৌনভাবে।

(১) প্রথমতঃ অযৌনভাবে যখন এদের বংশবিস্তার হয়, এই ছড়ানো সুতোগুলোকে (Mycelium) লম্বা লম্বা কতকগুলো ডাঁটার মতন জিনিস ওপরে উঠে পড়ে। এই ডাঁটাগুলো কিছু কিছু বেড়ে উঠবার পর এদের মাথাগুলো ফুলে ওঠে ১নং চিত্রের রূপ নেয়। এই রকম একটা ফুলে ওঠা ডাঁটার ছবি দিলাম ২নং চিত্রে। এই ফুলে ওঠা বলের মতন জিনিষের মধ্যে তলা থেকে ঠেলে ওঠা একটা ডোমের মতন জিনিষ আছে। এর নাম হলো কলুমেলা (Columella)। এই কলুমেলার মধ্যে কিছু হয় না। কিন্তু কলুমেলা ছাড়া বলের অপর অংশটুকুর মধ্যে গোল গোল দানার মতন থাকে। এদের রঙ কালো। এই দানাগুলোরই নাম হলো স্পোর (Spore)। স্পোরের আধারের নাম হলো স্পোরাঞ্জিয়াম বা গনিডেঞ্জিয়াম (Gonidangium)। তা ছাড়া যে ডাঁটাটির ওপরে এই কলুমেলা বা স্পোরের আধারটি থাকে, তার নাম হলো স্পোরাঞ্জিয়াফোর বা গনিডেঞ্জিয়াফোর (Sporangisphore বা Gonidangi spore)। এখন

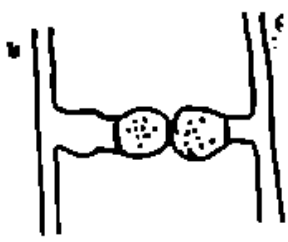

৪নং চিত্র

হয় কি জানেন এই স্পোরাঞ্জিয়াফোর বাইরের দেয়ালটি গলে গলে যায় আর তার ফলে ভেতরের এই স্পোরগুলো বাইরে পড়ে বেরিয়ে। ঠিক পূর্বের মতনই সুবিধেজনক স্থানে, মানে তেমনি এক বাড়ীওয়ালা পেলেই প্যাঁক করে তার ঘাড়ের ওপর বসে পড়ে এই স্পোরগুলিই সৃষ্টি করে ১নং চিত্রের মাইসেলিয়াম বা সেই সুতোগুলোকে।

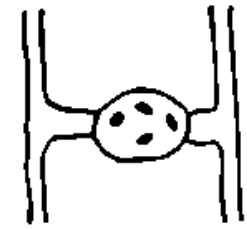

৫নং চিত্র

(২) দ্বিতীয়তঃ মিউকর তার বংশবিস্তার করে যৌনভাবে (Sexually)। এর জন্যে দরকার হয় দুই প্রকারের যৌনচেতনা সম্পন্ন মাইসেলিয়াম বা মিউকরের সুতোর। এর মধ্যে একজন হচ্ছে "+" আর একজন হচ্ছেন "−"!

এখন যৌনকার্য সম্পাদন করার জন্যে, এই দুই রকমের দুইটি সুতো তারা পাশাপাশি এসে ঘনিষ্ঠভাবে ৩নং চিত্র দেখুন। তারপর এই দুটো সুতো থেকে দুটি শাখা ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। এদের মাথাগুলো একটু কোলা কোলা গোছের হয়। এখন এই মাথা দুইটি পরস্পরকে স্পর্শ করে বড় হতে থাকে (৪নং চিত্র)। এই মাথা দুটো মাইসেলিয়াম থেকে একটি কোষ প্রাচীর দ্বারা আলাদা হয়ে যায় এবং তাদের নাম এখন হবে প্রোগেমিটেঞ্জিয়া। এই প্রোগেমিটাঞ্জিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু তালগোল পাকিয়ে "গেমিটে" (Gamete) পর্যবেসিত হবে। তা হলেই দেখুন, দুই দিককার দুইটি শাখার মধ্যে অনেক গেমিট থাকে। এখন হলো মিলনের পালা। এর জন্যে সর্বপ্রথম দরকার দুইটি গেমিটেঞ্জিয়ামের মধ্যকার দেয়ালের অপসারণ। তা হওয়া মাত্রেই দুইদিকের গেমিটের মধ্যে হয় যৌনমিলন। এই যৌন-মিলনের ফলে

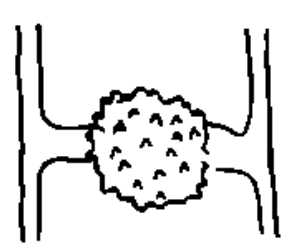

৬নং চিত্র

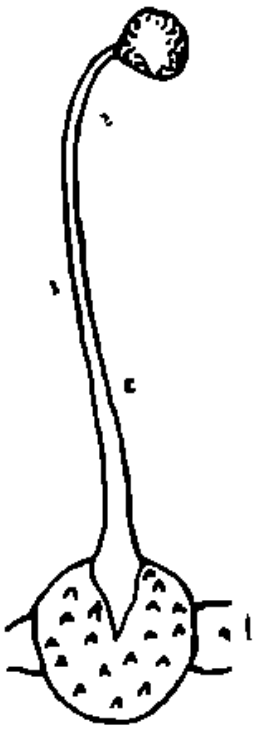

৭ নং চিত্র

সম্ভানটি উৎপন্ন ও র জাইগোট বা জাইগোস্পোর (Zygo-spore)। এবং চিত্র দেখুন তারপর এই জাইগোট ক্রমশ বেড়ে উঠে ৬নং চিত্রের রূপ নেয়। এবং গাছের আবরণ বাইরের দিকে খুব পুরু এবং দেখতে অনেকটা কাঁটাওয়ালা বলের মতন। কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর জাগরণ আসে। জাগরণের সময় এর বাইরের কাঁটাওয়ালা আবরণটি যায় কেটে এবং ভেতরকার আবরণটি একটি ছোট্ট টিউবের আকারে বেরিয়ে আসে। ক্রমক্রমে এই ছোট্ট টিউবটিই বেড়ে ওঠে (৭ নং চিত্র দেখুন) আর তার মাথাটা পুনরায় ফুলে ওঠে। ঠিক বলের মতন। এইটিই হলো স্পোরের আধার বা স্পোরাঞ্জিয়াম। আর তার মধ্যে তৈরী হবে স্পোর। তবে একটা কথা, একটি স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে ঠিক এক জাতীয় স্পোরই তৈরী হবে। হয় "+" আর না হয় " " দুই জাতীয় স্পোর একটি স্পোরের আধারের মধ্যে হবে না। তারপর কিছুদিন পরে হবে স্পোরের জাগরণ আর তাথেকে বেরিয়ে আসবে নতুন মিউকরের মুতো বা মাইসেলিয়াম।

তাই দেখুন, তুচ্ছ আর নগণ্য বলে যাকে আমরা উপেক্ষা করি তারই মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকবার কত রকম কলাকৌশল। বিধাতা যেন প্রত্যেকটি অংশ সন্নিবেশিত করেছেন, নিজের নিপুণ হাতে। প্রত্যেকটির পেছনেই একটি করে রহস্য, যা উদ্ঘাটিত হলে আপনার মন অফুরন্ত আনন্দে ভরে উঠবে। আপনি যেমন নিজের সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে দিব্যি বাস করছেন, তেমনি তারও সংসারে মিউকর ঠিক আপনারই মত বেঁচে রয়েছে। তাই বলছিলাম, ছোট জিনিসকে আমরা যেন কখনও উপেক্ষা না করি।

শতাব্দীর সদ্য প্রকাশিত বই

সজনীকান্ত দাসের

রবীন্দ্রনাথ
জীবন ও সাহিত্য

॥ ৬·০০ ॥

বিষয়-সূচী :

ভূমিকা : ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ : কর্মী রবীন্দ্রনাথ : 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী' রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র জীবনের নূতন উপকরণ : প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি : রবির পূর্ব উদয় : রবিরশ্মি : রবীন্দ্রনাথের মন : রবীন্দ্র-রূপকনাট্য : রবীন্দ্র কাব্য ও কবিতার গোড়ার কথা : রবীন্দ্র কাব্য : শব্দ-চয়ন : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—যোগাযোগ : রবীন্দ্রনাথের ছন্দ : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কালানুক্রম : রবীন্দ্রনাথের বাণী : রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী :

বইখানি যে কোন রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য

অন্যান্য অপরিহার্য বই :

শিবনারায়ণ রায়ের
নায়কের মৃত্যু ॥ ৪·৫০ ॥

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ॥ ৬·০০ ॥

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
আকাশ নন্দিনী ॥ ৩·৫০ ॥
গ্র্যাণ্ড হোটেল ॥ ৬·০০ ॥
রাত্রির বয়স ॥ ৩·৫০ ॥

সুশীলকুমার ঘোষের
গ্রহ-সারথি ॥ ৬·০০ ॥

রমেশচন্দ্র সেনের
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ॥ ২·৫০ ॥

ঃ শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন (প্রাক্তন গ্রন্থ-ভবন) ঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৪-৪৯২১

ফলিত দর্শন

সুবল রায়

মহামুনি চার্বাকের বলী রেখাঙ্কিত প্রশস্ত ললাট সঙ্কুচিত হইল। সলিল তরঙ্গদল কুঞ্চিত করিয়া তিনি কয়েক পল স্তব্ধ বিস্ময়ে অর্কের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সেই মার্তণ্ডতেজসদৃশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অর্ক ক্ষুব্ধাতি-ক্ষুব্ধ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। চার্বাক জলদনির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন—"বৎস অর্ক।"

অর্কের শুষ্ক কণ্ঠ হইতে বাঙনিষ্পত্তি হইল না। ঘড় ঘড় করিয়া শব্দ হইল মাত্র।

—"সম্প্রতি তোমার মধ্যে ভগবৎপ্রীতির বিশেষ আধিক্য দেখিতেছি। আমি চার্বাক তোমায় পুনরায় বলিতেছি—ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। ভণ্ড তপস্বীগণের সংস্পর্শে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতেছে। সাবধান!

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পনঃ কিং করিষ্যতি॥

তুমি যদি নির্বুদ্ধি হও কিরূপে আমি তোমাকে জ্ঞানদান করিব?

তাঁহার কঠোর কণ্ঠস্বর প্রখর দৃষ্টি ক্রমশঃ কোমল হইয়া আসিল। কহিলেন—"বৎস! পুনরায় অবধান কর—যাহা কিছু তোমার নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে তাহাই সত্য। ঈশ্বর কি তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পার? ঈশ্বর মিথ্যা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই।"

অর্ক বলিলেন—"কিন্তু গুরুদেব—"

"—বৎস, তর্ক করিও না। যাহা কহিতেছি তাহা ধ্রুব সত্য। বিস্মিত হইও না—মহামুনি চার্বাকের সহিত আলোচনা করিতেছ।"

সহসা অজস্রের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে গুরুশিষ্যের আলোচনা বিঘ্নিত হইল। অর্ক বলিলেন—"গুরুদেব আমি ইহাকে সবিশেষ জানি। অস্তিকপির জনৈককে আশ্রমে আসি এই অজস্রকেই দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ ইহাকে ইহার প্রভুহস্তে সমর্পণ করাই বিধেয়। মুনিবরের মুখের অর্গল নাই। কি হইলে পিতামহ। উহাকে চতুর্দশ পুরুষে উদ্ধার করিয়া আনেন।

চার্বাক হাসিয়া বলিলেন—"তুমি চার্বাকশিষ্যে উপযুক্ত বল নাই। এসো দেখি সবশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আজ ইহাকে উত্তমরূপে যুক্তিসহায় সহযোগে খণ্ডন করে উত্তর জাতির মাংস ভক্ষণের সমর্থন করিবে। উহা অতি মুখরোচক। অতি কষ্টে তিনি বহির্গতপ্রায় লালার সংবরণ করিলেন।

অর্ক বলিলেন—"প্রভো! আশ্রমে মৃতভাব ঘটিয়াছে

"—মহর্ষি জাবালির নিকট হইতে এককুম্ভ ঘৃত ধার করিয়া আন।"

"—প্রভু পূর্বঋণ পরিশোধ না করিলে আর কে ঋণ দিবেন না। কল্য ঋণ চাওয়াতে মহর্ষি দুর্বাসা কোপপ্রযুক্ত হইয়া আমাকে লগুড় হস্তে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। মহর্ষি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এখন হরিণের ন্যায় দৌড়িতে পারেন।

চার্বাক বিমর্ষ হইয়া কহিলেন—"তবে ইঙ্গুদি তৈলে কর্ম সম্পন্ন কর। সম্প্রতি বড়ই ক্ষুধাদ্রেক হইয়াছে আশ্রমের দক্ষিণস্থ বাতাপীখ্যাত আম্রবৃক্ষ হইতে কয়েকশত ন্যাগ্রোধ আনয়ন কর।

শিষ্য সত্বর প্রচুর ফলাফল সংগ্রহ করতঃ উভয় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্ক বলিলেন—"প্রভো আমাকে আমার প্রাপ্য অংশ পূর্বেই দান করুন মহর্ষে—"

চার্বাক অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সে হাস্যে আশ্রম প্রকম্পিত হইল। আশ্রমপালিত পশুগণ চমকিয়া উঠিল। পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া বলিলেন—সাধু, সাধু অর্ক চার্বাক-শিষ্যের উপযুক্ত বলিয়াছ।

অচিরেই দুইটি আম্রবৃক্ষের উপর গুরুশিষ্য মুণ্ড গুঁজড়িয়া পড়িলেন। চার্বাক নিজ অংশ নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া অর্ককে বলিলেন—বৎস, অধিক আম্রভক্ষণ করিও না, বিস্ফোটক হইতে পারে। মুখ-গহ্বরে অতর্কিতে এক সবীজ চূতফল প্রবেশ করায় তাঁহার মুখনিসৃত শেষ বাক্যগুলি বিকৃত হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চার্বাক হাসিয়া বলিলেন—বৎস, তুমি বোধহয় তোমার নবলব্ধ ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতেছ—বুড়াটা পঞ্চত্ব পাইলে অবশিষ্ট ফলগুলি খাইতে পারি। কিন্তু তাহা হইবে না। কারণ ভগবান—

অর্ধপথেই তিনি পিতঃ পিতঃ রবে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। একটি আঁটি ও একটি সুপ্রাচীন দন্ত একই কালে মুখগহ্বর ত্যাগ করিয়া বেগে ধাবিত হইল। গণ্ডে হস্তক্ষেপ করতঃ তিনি শনৈঃ শনৈঃ রক্ত-নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অর্ক কহিলেন, ভগবানের অসীম দয়া। কিন্তু প্রভু, একটি প্রশ্ন নিবেদন করি। আপনার পিতৃদেব তো বহুদিন গত হয়েছেন। আপনি তাঁহাকে সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষও করিতেছেন না। তবে কিজন্য আপনি তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেন।

চার্বাক অর্ককে দৃষ্টিবিদ্ধ করিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—জ্যেষ্ঠতাতপনা করিও না। স্মরণ রাখিও যে তুমি—থুঃ, থুঃ—

পাঠক এ কাহিনী পড়িয়া তোমার কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বলি না। কারণ ইহা দুর্ঘটনা মাত্র। কারণ ইহার পরও চার্বাকমুনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

ইমেজিসম্ ও এজরা পাউণ্ড

অনুকূল দত্ত

আমেরিকান সাহিত্যে যখন ক্লাসোলিজম আর রিয়ালিজমের মতন্থম ক্রমশঃ অন্তস্তেজক অথনীভূত আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হয়ে উঠছে, উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কাব্যের সিম্বলিজম্-এর নিষ্টিক অনুভূতি যখন সমসাময়িক আমেরিকান কবিতায় পুরোনো আর একঘেঁয়েমির ট্রাম্পেট বাজনাতে ম্রিয়মান, সে-সময় 'পোয়েটিক রেনাসাঁ' নাম দিয়ে সমসাময়িক আমেরিকান কবিতায় বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবের সূচনাকার হিসাবে আধুনিকতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিরোধরূপে রোমান্টিসিজমের দুর্বোধ্যতাকে সরিয়ে এক নোতুন টেকনিকে কবিতাকে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টায় এজরা পাউণ্ড সর্বজনবিদিত। ইমেজিসমের প্রচারক এই তরুণ ইমেজিষ্ট আমেরিকান কাব্যাকাশে এক নোতুন আংগিকের আর সতেজ মতবাদের প্রবর্তন করেন। দুর্বোধ্য ভাবসম্পৃক্ত তথাকথিত রোমান্টিসিজমের উৎপাটন করে ইনটেলেকচুয়ালিজমের ধার ঘেঁসা ভাবধারায় একটা বাস্তব ও স্বাধীন চিন্তার মিশ্রণে যে অনুভূতির তিনি সৃষ্টি করেন আধুনিক কবিতার সুস্থ উৎকর্ষতা বর্তমানে তার ওপরই নিরূপিত হয়।

কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এজরা পাউণ্ড বলেন, 'Poetry is nothing but higher grade of mathematics.' তাঁর এই নোতুন মতবাদ অথবা কবিতার প্রতি তাঁর এই নোতুন মনোভঙ্গী তিনি অর্জন করেছিলেন লণ্ডনে সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল স্থায়ী অবস্থানকালীন অবস্থায় দার্শনিক বন্ধু ও গুরু টি. ই. হ্যুলমের কাছ থেকে। সুইনবর্নের রোমান্টিকতায় যেমন নোতুন ধরনের 'Pure art' ইংরেজী সাহিত্যে প্রাক-আধুনিক যুগের গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তেমনি পেনসেলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তরুণ যুবকের 'ভাষা আন্দোলনের' যে নোতুন উৎসাহ অনুরিত হয়েছিলো তাঁর মনে তাই পরবর্তীযুগে সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ উদ্দীপনাময় ইতিহাসের সৃষ্টি করে।

পাউণ্ডের ওপর হাল্‌মের প্রভাব ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপর কোলরিজের মতো; কোলরিজের প্রগাঢ় দার্শনিক অনুভূতিকে কিছুদিনের জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছিলেন, এই প্রভাব কিছুদিনের মতো তাঁর উপর টনিকের কাজ করেছিলো কিন্তু পরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর নিজস্ব দার্শনিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ান; পাউণ্ডের ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিলো।

দার্শনিক হাল্‌মে ইমেজিসমের প্রকৃত ব্যাখ্যা তাঁর বিখ্যাত কথায় প্রকাশ করেছেন 'cheerful, dry and sophisticated' নাম দিয়ে এবং পরবর্তীযুগে পাউণ্ড আরও পরিপূর্ণভাবে এর বিশ্লেষণ করেন এইভাবে—'the point of Imagism is that it does not use images as ornaments. The image is itself the speech; এবং যখন poetry is no more no less than a mosaic of words, so great exactness is required for each one তখনই কল্পনার এরূপ প্রতিফলন ও সে সম্বন্ধে অনুভূতি প্রবল মননশীলতার মধ্যে এতদূর স্বাভাবিক বাস্তবতা ও সঠিকতা আসা সম্ভব। কল্পনার সংগে বাস্তবতার এই সামুজ্য বা অনুভূতির ছাপ ও বাক্যের মধ্যে এই সঠিক নৈকট্য যত দৃঢ়তর হবে, ইমেজিসমের আদর্শও ততবেশী স্পষ্টতর হবে। ইমেজিষ্ট আন্দোলনের এই প্রথমযুগে তাই পাউণ্ড ও এ দলের কবিরা তাদের কাব্যের মধ্যে এ তত্ত্বের প্রয়োগ আরম্ভ করেন ব্যাপকরূপে। —কোন নারীকে দেখে পাউণ্ড তিরিশ লাইনের এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন, পরের বছর সেই একই অনুভূতি ও বক্তব্য নিয়ে আর একটি নারীকে নিয়ে লেখেন পনেরো লাইনের এক কবিতা। পরের বছর সেই অনুভূতি ও বক্তব্যকে ঘনীভূত করেন মাত্র ছলাইনে—

The apparition of these faces in the crowd
Petals on wet, black bough.

শব্দের এরূপ 'disillation' তারা শিখেছিলেন প্রতীক

বাদ ও প্রাচ্যদেশীয় চীনা ও জাপানী কবিতাগুলি থেকে।

আমেরিকা ও ইউরোপের ইংরেজী কাব্যাকাশে তখন বহু জ্যোতিষ্কের আলোক-বিকীরণ : সে বিকীরিত আলো আটলান্টিকের নীলজল পেরিয়ে তখন এদেশের ও দেশের মাটিতে ঠিকরচ্ছে। ইংরেজী ভাষা তখন আমেরিকান ও ইংরেজী কবিগোষ্ঠিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে; সেই উদ্দীপনাময় যুগে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে তাঁরা তখন এক লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন একযোগে, নোতুন কিছু প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তাৎকালিক কোন সমালোচক-এর মুখে শুনি : Since the imagist movement American poetry has been to a striking extent an international (or non-national) affair, its leaders also among the leader of European poetry. To attempt to isolate their 'American' traits is to misunderstand their acheivement.

আর এই নোতুন কিছু প্রবর্তনের স্রষ্টিকার হলেন পাউণ্ড। এলিয়টের মতো সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অনেকেই যে পাউণ্ডের অসামান্য প্রতিভাকে মেনে নিয়েছিলেন তাঁর লণ্ডনে অবস্থান-কালীন সময় সে সম্বন্ধে বিতর্কের বিন্দুমাত্র আশংকা নেই, He has enabled a few others persons including myself এলিয়ট বলেন to improve their verse sense, so that he has improved poetry through other man as well as through himself. I can not think of any one writting verse of our generation and the next whose verse (if any good) has not been improved by the study of Pound's.

শুধু এলিয়ট কেন, সমসাময়িক ইংরেজী কাব্যের বিরাট পটচিত্রে তখন প্রশস্তির নৈবেদ্যের অর্ঘ্য চলেছে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক আর সমালোচকের। হুইটম্যান থেকে রবার্ট ফ্রস্ট পর্যন্ত যে আমেরিকান কবিতা, ইংলণ্ডে তার কতটুকু সমাদর হয়েছে? ইউরোপের কথাতো বাদই দিলাম। কিন্তু পাউণ্ডের এই আধুনিক কবিতা আন্দোলনের পর সমগ্র ইংরেজ আমেরিকান কবি সমতুলাতা ও সম্মিলনের স্রোতে একযোগে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাই এখন কোন বিখ্যাত ইংরেজ কবিকে বলতে শুনি : I have in recent years cursed Mr. Pound often enough for I am never sure that I can call my verse my own. Just when I am most pleased with myself. I find that I have caught up some echo from a verse of Mr. Pound's.

যাঁর কাছে কবিতার ডেফিনেশন 'an stere direct free from emotional slither', তিনি যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী, বায়রন কোলরিজ থেকে ব্রায়ান্টের বর্ণনা কল্পনা অথবা দুর্বোধ্য ও অসংস্কৃত সৌন্দর্য ও ভাব বহুল অনুভূতির বাইরে এক নোতুনতর কাব্যসৃষ্টির কল্পনা করবেন তাতে আর সন্দেহ কি? এলিয়ট আর্চিবল্ড ম্যাকলইস, হার্ট ক্রেন ও আরও প্রখ্যাত কবিকে ধন্যবাদ যে তাঁরা তাঁদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ওপরেও পাউণ্ডের প্রভাবকে মেনে নিয়েছিলেন।

রাজনীতিতে রয়ালিষ্ট, ধর্মে এ্যাংলো ক্যাথলিক ও সাহিত্যে ক্লাসিসিষ্ট এলিয়ট ১৯১৭ সালে তাঁর Prufrock and other observation বেরুবার সংগে সংগেই তিনি যে পাউণ্ড প্রভাবিত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না এবং তিনি নিজেও তা স্বীকার করেন। ১৯১৪ সালে প্যারীতে হোসিংওয়ের In our time নামে যে বই বেরোয় তাতে সম্পূর্ণ প্রভাব ছিলো পাউণ্ডের আর গার্টরুড ষ্টাইনের।

লং কেলো পরিবারের সংগে নিকট সংযুক্ত আইভাহোর এই যুবক কখন যে সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের লক্ষ্যবস্তু দাঁড়িয়েছিলেন তা তিনি নিজেই বোধহয় জানতেন না। সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের পথরেখা সম্পূর্ণ বদলাতে চেয়েছিলেন তিনি—প্রশস্তি অর্জন করতে তিনি বোধহয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামেননি; তিনি ছিলেন সব সময় active in every changing poetic speculation, experiment and propaganda.

১৯০৮ সালে প্রবাসে অবস্থানকালীন ভেনিসে তাঁর কবিতার বই A lumo spento এবং ১৯০৯ সালে লণ্ডনে Personae প্রকাশিত হবার পরই তিনি ফার্নিক হালমের সংগে পরিচিত হন এবং ইমেজিষ্ট আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত হন। ১৯১৪ সালে ইমেজিষ্ট থিয়োরীর ব্যাখ্যা করে তাঁর বই বেরোয় 'Des imagistes' নাম দিয়ে এবং সে বছরই তিনি Vorticistদের মুখপত্র ব্লাষ্টের

সম্পাদক হন। হ্যারিয়েট মনরো চিকাগো থেকে কবিতার বই (A magazine of verse) বার করতেন— ১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পাউণ্ড ছিলেন তার প্রবাসী প্রতিনিধি। তিনি মিস মনরোকে নিজের লেখার সঙ্গে হিল্‌ডা ডুলিটল (H. D.) এলিয়ট আর তাছাড়া তৎকলীন যুগে বিখ্যাত কবি লরেন্স, টেগোর, ইয়েট্‌স্, অরেসএর কবিতাও পাঠাতেন।

১৯২৮ সালে এলিয়ট পাউণ্ডের যে 'সিলেকটেড পোয়েমস' বার করেন তার মুখবন্ধে তিনি অনেক প্রশস্তির পর লিখেছিলেন : Pounds 'erudition' has been both exaggerated and irrevalently underestimated : for it has been judged chiefly by scholars who did not understand poetry and by poets who had little scholarship. বস্তুত এলিয়ট যে পাউণ্ডের লেখার সমালোচকদের প্রতি উপযুক্ত মন্তব্য আরোপ করেছিলেন তা বোঝা অতি সহজ নাহলে একটা পেডানিটক উৎকর্ষতার মাধ্যমে গড়া পাউণ্ডের কলমই চলতো না; একথা অতি সত্য ও সুধীজনবিদিত এবং আশ্চর্য এইখানে যে 'স্কলারশিপ' 'পোয়েটিক ফ্যাকাল্‌টি' এই দুটি জিনিসের সমন্বয় হওয়ার জন্যে তাৎকালিক য়ুরো-আমেরিকার খুব বেশী সমালোচক পাউণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন নি।

কিন্তু একটা ইউটোপিয়ান মনোবৃত্তি নিয়ে চলার দরুণ পাউণ্ডের জীবন-দর্শন বোধহয় কোনদিনই বাঁধা পথে চলতে পারেনি। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতার অভাব ছিল না, বিশ্লেষণী মেধার অভাব ছিল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্যের দৃঢ়তাও তাঁর সংকল্পের মধ্যে ছিলো না। তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অস্থির অসুস্থ মন বারে বারে তাঁর উদ্দেশ্যকে ভেঙে দিয়েছে। মনের এই অস্থিরতাকে বয়ে নিয়ে স্বভাবতঃই কোন কিছু বড় কাজ করা যায় না, পাউণ্ডের দ্বারাও তা হয়নি। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন, age of reason আর realism-এর যুগে তিনি নোতুন পদ্ধিকৃৎ আধুনিক কাব্যদর্শনের কিন্তু যে তত্ত্ব তিনি একদিন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন তাকেই তিনি আবার বিসর্জন দিলেন। কোন সমালোচকের ভাষায় But it was characteristic of Pound to grow impatient of a prolonged stay within any 'movement' however amusing its diversions may have been.

তাই ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে সমসাময়িক ইংরেজী কাব্যকলাবিদদের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির যে বিশেষ অনুভূতি গড়ে উঠেছিলো, কিউবিষ্ট দৃষ্টিকোণের প্রিজমে বিস্তীর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে তাই-ই যন্ত্রীয় যুগে মনের জটিলতা ও আধুনিক উৎপাদনশীল শিল্পমুখীন সভ্যতাকে প্রতিফলিত করলো পোষ্ট-ইমপ্রেশনিষ্ট তত্ত্ববাদ, ভোর্টিসিজমে—পাউণ্ডের আন্দোলন-পিপাসু মন এবার সেদিকে ঝুঁকে পড়লো। এই নিয়ে ইমেজিসমের প্রচণ্ড সমর্থকদিগের অন্যতম মহিলা কবি এমি লাওয়েলের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ হয়। আটলান্টিকের ওপারে ব্রুকলিনের সেডেলেনস থেকে মিস্ লাওয়েল ইমেজিষ্ট আন্দোলনের প্রতি মুগ্ধ হয়ে লণ্ডনে প্রথম পাউণ্ড আর তাঁর সংগঠনীর সংস্পর্শে আসেন এবং আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত তিনিই বোধহয় এই আন্দোলন বা প্রচার ও সংস্কৃতি সম্মেলনের একমাত্র সভ্যা ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ইমেজিষ্ট এবং ইমেজিষ্ট দৃষ্টি-ভংগীর প্রচারক ও সমর্থক। এমি লাওয়েলের ইমেজিষ্ট অনুভূতির প্রবল সাফল্যমণ্ডিত স্ফুরণ তাঁর কাব্য Sword Blade and Poppy Seeds-এ অথবা শুধু এই কাব্যে কেন মিস লাওয়েলের প্রত্যেক কাব্যেই কঠিন বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যানুভূতির বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার প্রতিফলন হয়েছে। কিন্তু এর পরে ইমেজিসমের যুথ থেকে প্রধান সেনানী পাউণ্ড যখন অন্তর্ধান হলেন তার কিছুকাল পরে (তিনি কিছুকাল ইমেজিষ্ট-গোষ্ঠী নেত্রী ছিলেন এবং এ-সময় ইমেজিসমের নাম হয়েছিল তাঁর নামানুসারে Amygism) মিস লাওয়েলও এই আন্দোলনের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে 'পলিফোনিক' গদ্যের সৃষ্টিকার হলেন। তাঁর ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের এই নোতুন আংগিক সৃষ্টির সাফল্য মণ্ডিত ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে তার লেখায় Man, Women and Ghosts-এ যা সমালোচকের ভাষায় 'best in its protrayal of colours and sounds- Physical perception rather than the reaction of inner experience. এই অদ্ভুত 'পলিফোনিক' গদ্যসৃষ্টির কৈফিয়ৎ হিসাবে লাওয়েল জন গোল্ড ফ্লেচারকে লিখেছিলেন : Polyphonic means

many voiced and the form is so called because it makes use of the voices of the poetry namely meter, vers libre, assonace, alliteration, rhyme and return.

মিস লাউয়েল খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন পাউণ্ডের এই পরিবর্তনে। তার এই নোতুন দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পেয়ে তিনি পাউণ্ডের বহু বন্ধু-বান্ধবের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এ বিষয়ে। তাতে অঙ্কিত ছিল পাউণ্ডের প্রতি তার ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান আর ক্রোধ, কিন্তু theory-logged পাউণ্ড তার নোতুন আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান নি। আন্দোলন ছিল তার প্রাণ, যেই সে বিপ্লব শেষ হয়ে যেত তিনি আবার এক নোতুন বিদ্রোহির স্বরূপপর হতেন, কেননা কর্ম চঞ্চলতাকেই তিনি বোধহয় জীবনের সজীবতা বলে ধরে নিয়েছিলেন। সমসাময়িক সমালোচকেরা তাঁকে 'seemed to sink himself in an intellectual sargasso sea, to be more archeologist than the artist বলে অভিহিত করতেন সেইজন্যেই।

বস্তুত তার প্রতিভার ও পাণ্ডিত্যের অভাব ছিলো না; কিন্তু তার প্রতিভাকে তিনি তাঁর আন্দোলন পরিচালনার মধ্যেই নিয়োজিত করেছিলেন, কিন্তু সে আন্দোলন সংখ্যায় একটিই নয়, বহু আন্দোলনের বহু দৃষ্টিভংগীর ও বিদ্রোহির জটিল গোলকধাঁধায় তিনি তাঁর কর্মপ্রতিভাকেও জটিলতর করে ফেলেছিলেন; আর তাতে করে ফল হয়েছিলো a lassitude of the creative faculties, an impoverishment of emotion ধ্রুপদের অনুকরণে যে একশ ক্যান্টো তিনি রচনা করা স্থির করেছিলেন তা তিনি শেষ করতে পারেননি কিন্তু যতগুলি তিনি সৃষ্টি করে গেছেন সমস্তকিছু বিতর্কের ঊর্ধ্বে সেগুলির বিশেষ এক ঐতিহাসিক মূল্য সাহিত্য জগতে স্বীকৃত হবে। তাঁর ক্যান্টো পড়লে সত্যিই প্রথমে মনে হবে 'mere madness and rhetoric, a vain exhibition of force and passion without beauty.' কিন্তু যতই পড়া যায় এবং গভীরভাবে পড়া যায়, প্রবল অনুভূতি নিয়ে, কাব্যের অন্তর্দেশে ততই পৌঁছান যায় আর তখনই বলা সম্ভব 'these curious meter seem to have a law and order of their own.' পাউণ্ডের ক্যান্টোর মধ্যে যে কাব্যানুভূতি, যে রসোত্তীর্ণ ভাব-ব্যঞ্জনা, যে দুর্বোধ্য উদ্ধৃতি, যে বিস্ময়ের সৃষ্টিকারী বর্ণনা, যে কৌতুক যে উপকথা, যে বিশ্বিতপ্রায় ঐতিহাসিক কাহিনী, যে নিজস্ব মত ও মনোভংগী ছড়িয়ে আছে তা বহু ভাষায় অভিজ্ঞ, অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ কাব্য-পাঠকের বোধগম্যের অতীত। তাঁর কবিতাকে বারবার পড়তে হবে ইতিহাস, অর্থনীতি রাজনীতি, ভাষাতত্ত্বের বই নিয়ে আর বারবার সেসব বইয়ের পাতার পর পাতায় চোখ বুলোতে হবে কঠিন অধ্যবসায়ে তাঁর কবিতার একটি লাইনে গুটিকয়েক দুরূহ অন্তর্গত অর্থের জন্য—এতো কবিতা পড়া নয়, এ যেন কোন কঠিন সংস্কৃত ন্যায় বা স্মৃতিশাস্ত্রের ভয়াবহ গ্রন্থ, টীকা টিপ্পনীর সাহায্য ছাড়া এর একটা শব্দে হস্তক্ষেপ অসম্ভব। কোন সমালোচক তাঁর নিদারুণ অতিজ্ঞতার সত্যি কথাই বলেছেন: It juxtaposes the jargon of the modern world with di-rupted quotations and vast even violent scholasticism.

এহেন 'জটাটিক' কবিতার উপর অনেকেরই খুব বেশী শ্রদ্ধা হবে না সে তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। এডওয়ার্ড কিৎস গেরাল্ড ক্যান্টো সম্বন্ধে বলেছেন: About the poems there hangs a di-mal mist of unresolved confusion. Through that mist we can see fact but fact historically stated, enlivened in no way by either a creative or a critical process. পাউণ্ডীয় দৃষ্টিভংগী দিয়ে না দেখলে সে কবিতার প্রত্যেকটি ছত্র confusion এরই সৃষ্টি করে। উত্তর রবীন্দ্র বাংলা কাব্য নামক প্রবন্ধে বিদেশী কবিদের নিয়ে আলোচনা প্রসংগে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন: এজরা পাউণ্ডের আগেকার রচনাগুলো বাস্তবিকই কবিতা—তাঁর আধুনিক ক্যান্টোজ মহাকাব্যের অর্থ ও ইংগিত বুঝবার ক্ষমতা আমাদের তো দূরের কথা স্বয়ং ইয়েট্‌সের কপালেও ঘটে ওঠেনি, এলিয়টও বুঝেছেন?'

এটা খুবই দুঃখের কথা যে অতবড় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির সম্বন্ধে হতাশ হবার সুযোগ তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। একটা অদ্ভুত উদাসীনতা, অথবা গোঁয়ার্তুমী একটা দুর্বল বিশৃঙ্খলাকে জীবনে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যার জন্যে ভবিষ্যতে তাঁর চূড়ান্ত অনিষ্ট হয়েছিলো। ১৯৪১ সালে তাঁর বিশিষ্ট কবিবন্ধু চার্লস্ আলডিংটন লিখেছিলেন: Join Eliot's carreer in England has been exactly the reverse of Ezra's. Ezra stated out in a time of peace and prosperity with everything in his favour and muffed his chances of becoming literary dictator of London to which he undoubted by aspired by his own conceit, folly and bad manners. Eliot started in the enormous confusion of war and post-war England, handicapped in every way. Yet by merit, fact, prudence and pestinacity he succeeded in doing what no other American has ever done—imposing his personality, taste and even many of his opinions on literay England.

বিবিঘর

সুখেন্দু দত্ত

হিলটন সাহেব আর মীনা মেমের কাহিনী এখনও এ অঞ্চলের কেউ কেউ মনে করে রেখেছে।

ভাগীরথীর তীরে আজও শোভাবর্দ্ধন করে দাঁড়িয়ে আছে কানপুর সহর, কিন্তু সে ভাগীরথী আর নেই। কলস্রোতা ভাগীরথীর জল-লহরীতে একদা যখন উজানের ঢেউ এসে লাগত, সেই ঢেউয়ের উপর হাঁসের মত সুন্দর লীলায়িত ভঙ্গিতে ভেসে বেড়াত কত শত পাল তোলা নৌকা। পশ্চিম আকাশের লাল রং ছড়িয়ে পড়ত নদীর ঘোলাটে জলের লক্ষ লক্ষ ছোট ঢেউয়ের উপর আর কুলু কুলু শব্দে ছোট ছোট ঢেউগুলো নেচে নেচে চলে পড়ত নৌকার তলায়। নদীর বুক থেকে কখনও হয় তো ভেসে আসত মধুর সঙ্গীত ও বাদ্যের বোল—কোন ধনাঢ্যের প্রমোদ-তরণী চলেছে। বিশ দাঁড়ীর উল্লাসে নৌকা তরতর করে এগিয়ে যেত, আর দাঁড়ের অবিরত আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত নদীর জল। অক্ষম আক্রোশে ঢেউগুলো শুধু আছড়ে পড়ে পড়ে প্রতিবাদ জানাত। নদীর অপরূপ তরঙ্গ ভঙ্গিমা কখনও হয় তো কোলাহল মুখর কানপুর সহরের পদতলে নেচে বেড়াত, কখনও নিস্তরঙ্গ ভাবে নগরের ছায়া বুকে করে বয়ে যেত। প্রভাত-সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি পড়ে ভাগীরথী বয়ে যেত যেন গলিত রক্ত ধারা। দলে দলে পুরুষ ও নারী তখন ভক্তি-ভরে জাহ্নবীর পুণ্য সলিলে স্নান করত।

ভাগীরথীর সেই অতীতেরই সাক্ষ্য বহন করে কানপুর সহরের একান্তে আজও নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিবিঘর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ অফিসার হিলটন সাহেব একদা মীনা মেমের জন্য তৈরী করিয়েছিল এই বিবিঘর। মীনা অবশ্য 'মেম' নয়, সহরেরই এক হিন্দুর মেয়ে ছিল সে। কিন্তু তার ছিল অসামান্য রূপ। মীনার বড় বড় চোখ, কাল চুলের ঢেউ আর সুন্দর মুখের গড়ন হিলটনের স্বজাতি অনেক সুন্দরী মেম সাহেবকেও মানিয়ে-ছিল। সাহেব পিছে হেঁটে গেলে যতক্ষণ দৃষ্টি চোখে তাকিয়ে থাকতে হয় এমনি ছিল মীনার রূপ আর সেই রূপে মুগ্ধ হয়েছিল হিলটন, তারই জন্য তৈরী করিয়েছিল এই বিবিঘর। আশেপাশের মানুষ সকলেই তাদের সম্মান করত। বলত, হিলটন সাহেব আর মীনা মেম। হিলটনকে তারা যেমন সম্ভ্রম করত, মীনা মেমকেও তেমনি খাতির করে চলত।

ইংরেজ বণিক কোম্পানী ভারতের মাটিতে একদা যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল, তার রক্তাক্ত মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেই বিষবৃক্ষের ফল যখন ফলল, হিলটন সাহেব আর মীনা মেম কিন্তু তখন আর নেই। ভাগীরথীর তীরে তাদের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু নিষ্প্রাণ বিবিঘর। বিদ্রোহের সেই আগুন দেখতে দেখতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সহরের মত কানপুরেও প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। কোম্পানীর ধনাগারে লুণ্ঠন করল। কারাগারের ফটক খুলে দিয়ে কয়েদীদের খালাস করে দিল। তারপর ধনাগারের লুণ্ঠিত পাঁচ লক্ষ টাকা নানা সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে তারা তাঁকে তাদের অধিনায়কত্বে বরণ করল।

নানা সাহেবও পেশবা বংশের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবার এই হল সুযোগ। পৈতৃক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত এই মহারাষ্ট্র-বীর তীব্র অসন্তোষের জ্বালা বুকে নিয়ে বিঠুর-প্রাসাদে বসে এতকাল এই ভবিষ্যতের আশায়ই দিন গুনছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ভারতব্যাপী বিদ্রোহের যে জাল সেদিন বিস্তৃত হয়েছিল, তার পিছনে যার বুদ্ধি প্রতিভা ইংরেজের অলক্ষ্যে সক্রিয় ছিল তিনি ছিলেন স্বয়ং ধুন্দুপন্থ নানা। বিঠুরে বসেই ভারতব্যাপী বিদ্রোহের

যে পরিকল্পনা নানা সাহেব রচনা করেছিলেন, তা ছিল ঘড়ির কাঁটার মতই নিখুঁত নির্ভুল।

সহরের প্রায় সমস্ত ইংরেজই বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে প্রাণ দিল। শুধু নারী ও শিশুদের নানা সাহেবের প্রধান শিবির, সবেদা কুঠিতে বন্দী করে রাখা হল। কানপুরে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটল। বিঠুর-প্রাসাদে বসে সম্রাট বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করলেন নানা সাহেব, নিজেকে মহীশূরের পেশবা বলে ঘোষণা করলেন। নতুন পেশবার রাজ্যাভিষেকে তোপধ্বনিও করা হল।

এমনি করেই মহারাষ্ট্রের সাহ্যাদ্রি পর্বতের সানুদেশে চিরস্থায়ী উপত্যকার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান পেশবার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, যে সিংহাসনে বসে পরাক্রান্ত মারাঠারাও একদা শাসনদণ্ড ধারণ করে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন, সিন্ধুনদের পবিত্র সলিল-স্পর্শে পূত যে সিংহাসনের জন্য ইতিহাসের বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধ!

ভারতে আসবার প্রাক্কালে লণ্ডনের ভোজ-সভায় শঙ্কিত-হৃদয় বড়লাট লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেছিলেন, 'ভারতবর্ষের আকাশ এখন নির্মল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে এক হাত পরিমাণ একটা মেঘের উদয় হতে পারে।' তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর এক বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের আকাশের প্রান্তে সেই ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল এবং দেখতে দেখতে তা গোটা ভারতবর্ষের আকাশ ছেয়ে ফেলল!

কিন্তু ইতিহাসের চাকা আবর্তিত হতে দেরী হল না। কোম্পানীর শাসনের সেই সংকটকালে রণকুশল একাধিক ইংরেজ সেনাপতি একে একে ভারতের রণাঙ্গনে এসে পদার্পণ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে পারস্যযুদ্ধ-বিজয়ী জেনারেল হ্যাভলক ও বহু অভিজ্ঞ রণনায়ক মেজর রেনডের ইংরেজ বাহিনী কাশী ও এলাহাবাদে নিষ্ঠুর হাতে শাসন করে অবশেষে কানপুর সহরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। চোখে তাদের জিঘাংসা, ওষ্ঠের কঠিন ভঙ্গীতে প্রতিহিংসা। কানপুরের নৃশংস কাহিনী তাদের কানে পৌঁছেছে, ইংরেজ হত্যার নির্মম প্রতিশোধ তারা নেবে।

অতএব আসার পথে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য যাকে পেল তাকেই গাছের ডালে ফাঁসীতে লটকে দিতে লাগল। তাদের যাত্রাপথের দু'ধারে গাছের ডালে অসংখ্য মৃতদেহ ঝুলতে লাগল, গ্রামগুলো হয়ে উঠল জনশূন্য। পরিত্যক্ত নির্জন কুটীরে যারা আত্মগোপন করে ছিল, কুটীর-শুদ্ধ তাদের পুড়িয়ে মারা হল। সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে চলল বেপরোয়া নির্মম বেত্রাঘাত। এক কথায়, ইংরেজের প্রতিহিংসা সংহার মূর্তি ধারণ করল!

বিঠুর-প্রাসাদে বসে নানা সাহেব শুনলেন ইংরেজ সৈন্যের এই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। আর এও শুনলেন, সেনাপতি হ্যাভলক সসৈন্যে কানপুরের দিকেই আসছেন। সবেদা কুঠিতে বহু ইংরেজ নরনারী ও শিশু বন্দী। বোঝা গেল বিশেষ করে তাদের উদ্ধারের জন্যই হ্যাভলকের বাহিনীর এই অভিযান।

ইংরেজ সৈন্যকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিদ্রোহী সিপাহীদের তৈরী হবার নির্দেশ দিলেন নানা সাহেব। বন্দী ইংরেজদেরও সবেদা কুঠি থেকে বিবিঘরে স্থানান্তরিত করার হুকুম দেওয়া হল।

হিলটন সাহেব আর মীনা মেমের সেই বিবিঘর।

বিবিঘরের সেই স্বল্প পরিসরের মধ্যে দু' শ'র বেশি বন্দী ইংরেজ নরনারী ও শিশুকে বন্দী করে রাখা হল। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে বদ্ধ বিবিঘরের মধ্যে বন্দী ইংরেজ নরনারী ও শিশুদের দুরবস্থার একশেষ হল। গরমে অবসন্নতায় ও নিদারুণ দুশ্চিন্তায় জীবনের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছল তারা। কিন্তু সেই প্রাণান্তক অবরুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যেই বন্দী ইংরেজ নরনারী সহরের অনরব শুনল, কানপুর উদ্ধারের জন্য জেনারেল হ্যাভলক নাকি ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে কানপুরের দিকেই এগিয়ে আসছেন!

হতোদ্যম ইংরেজ নরনারী এই সংবাদে উল্লসিত হয়ে উঠল। কারণ তারা জানত, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগে রণদক্ষতায় হেনরী হ্যাভলক প্রায় অতুলনীয়। এই রণকুশল সেনাপতির আবির্ভাবে আবার তারা জীবনের আশায় দিন গুনতে লাগল।

এদিকে কানপুরের দিকে এগিয়ে আসার পথে ইংরেজ সৈন্যেরও কষ্টের আর অবধি রইল না। তাদের মাথার উপর সূর্য-কিরণের প্রখর আগুন, রৌদ্রের ভীষণ উত্তাপ।

দীর্ঘকাল তারা সূর্য-কিরণের সেই প্রখর আগুন মাথায় নিয়ে পথ চলল। কিন্তু তারপর তারা আবার দেখল এক নতুন দৃশ্য। জুন মাসের সেই দারুণ গরমের মধ্যেই এবার আবার শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। তবু সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যেও পথ করে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। কিন্তু দেখতে দেখতে জলে তাদের পথ ডুবে গেল, তাদের দু'পাশে যত দূর দৃষ্টি গেল দেখা গেল শুধু জল আর জল। জলে কোথাও বুট শুদ্ধ তাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল! সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ইংরেজ সৈন্যের চোখে যেমন নতুন, রহস্যময় ভারতবর্ষের পথঘাটও তাদের তেমনি অচেনা। কোথাও তাদের সামনে পড়তে লাগল নিবিড় বন, কোথাও তাদের কানে এল বন্য জন্তুর হিংস্র ডাক। পদে পদে তাদের যাত্রা বিপর্যস্ত হতে লাগল।

নানা সাহেবের বাসভবন সবেদা কুঠির অদূরেই বিবিঘর। বন্দী ইংরেজ নরনারী রোজই দেখতে পায়, প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারের দু'দিকে সজ্জিত দু'টো কামান। নানা সাহেবের একদল নিজস্ব সৈন্য উন্মুক্ত সঙ্গীন সমেত বন্দুক হাতে নিয়ে সেই প্রবেশদ্বার রক্ষা করে। রাত্রিবেলা উজ্জ্বল আলোকমালায় ঝলমল করে ওঠে সেই প্রাসাদ, দরজায় দরজায় জ্বলে ওঠে রক্তরাঙা মশাল। বিবিঘরের যে অলিন্দে দাঁড়িয়ে মীনা মেম অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকত ভাগীরথীর জলের উপর সূর্যাস্তের রঙীন ছায়া আর তার অপরূপ তরঙ্গ ভঙ্গিমার দিকে, সেই অলিন্দে বসেই যাঁতা ঘুরিয়ে মটরডা পিষতে পিষতে হতভাগ্য ইংরেজ বন্দী ও বন্দীনীরা সেই উজ্জ্বল রাজ-প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলত ও নিজেদের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা স্মরণ করত।

কিন্তু তারপর একদিন আশ্বস্ত হয়ে তারা দেখল, আলোকমালায় সজ্জিত উৎসব-মুখর বিঠুররাজের প্রাসাদেও চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে ফটকের প্রহরীরা। জেনারেল হ্যাভলক নাকি সসৈন্যে কানপুরের দিকেই আসছেন।

জনরব তাহলে সত্য!

নানাসাহেবের নির্দেশে সেনাপতি জওলাপ্রসাদ এবার এগিয়ে গিয়ে ফতেপুরে ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করলেন। জলকাদা ভেঙে ইংরেজ সৈন্য তখন ক্লান্ত, তাদের পায়ের তলাও ক্ষত-বিক্ষত। বিশ্রামের আশায় ফতেপুরে এসে তারা দেখল, তাদের সামনে সিপাহীরা যুদ্ধসাজে সজ্জিত।

ক্লান্ত ইংরেজ সৈন্যকে বিশ্রামের অবকাশ থেকে বঞ্চিত করে জওলাপ্রসাদ রণভেরী বাজালেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের ক্ষিপ্রকারিতা দূর পাল্লার এনফিল্ড রাইফেল ও দুর্জয় কামান সিপাহীদের পর্যুদস্ত করে দিল। কামানের সুগভীর গর্জনে হ্যাভলকের বাহিনীর বিজয়বার্তা ঘোষিত হল। যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজের প্রতিহিংসায় ফতেপুরে আগুন জ্বলল। তোপের মুখে সহরের বড় বড় অট্টালিকা ধ্বসে পড়ল, উড়ে গেল মসজিদের মিনার আর মন্দিরের ধবল চূড়া! চারদিকে ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ ও কোলাহলের মধ্যে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহে ফতেপুরকে জনশূন্য শ্মশানে পরিণত করে দেওয়া হল! নারী ও শিশুদের কাতর কান্নায় পৈশাচিক উল্লাসে অট্টহাসি করে উঠলেন জেনারেল হ্যাভলক। প্রতিশোধের এই প্রথম অধ্যায়!

কানপুরে বসেই নানাসাহেব শুনলেন ফতেপুরের এই দুঃসংবাদ। ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি। রণনিপুণ যোদ্ধা বালারাও এবার ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। কিন্তু সাহস ও পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেও ইংরেজ সৈন্যের উন্নত ধরনের কামান ও বন্দুকের অগ্নিবর্ষণে তিনিও পর্যুদস্ত হয়ে গেলেন।

এদিকে বিবিঘরে উদ্বিগ্ন ইংরেজ নরনারী অসীম আগ্রহে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধের ফলাফলের প্রতীক্ষা করছে। দূরাগত কামানের গম্ভীর নিনাদে ক্ষণে ক্ষণে তাদের মনে যুগপৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষা, হর্ষ ও বিষাদের ছায়াপাত হচ্ছে। তারপর তারা যখন শুনল যে, আহত বালারাও ও পরাজিত ছত্রভঙ্গ সিপাহীরা কানপুরে ফিরে এসেছে, তখন তাদের আনন্দের আর অবধি রইল না।

কিন্তু তারা জানত না তাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের তখনও অনেক বাকী ছিল!

দু-দুটো যুদ্ধে জয়লাভ করে সেনাপতি হ্যাভলক সত্য-সত্যই কানপুরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন! জয়ধ্বনী ইংরেজ সৈন্যের দুন্দুভি-নিনাদ নানাসাহেবকে বিচলিত করে। পেশবার ভবনের অভ্যন্তরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এবার জরুরী গোপন পরামর্শ সভা বসল। সভায় উপস্থিত

নানাসাহেবের বিশ্বস্ত অনুচর তাঁতিয়াতোপি, আজিমউল্লা খাঁ, মৌলভি লিয়াকৎ। আলোচনার পর স্থির হল, ইংরেজ সৈন্যের এগিয়ে আসার পথেই আবার স্বয়ং নানাসাহেবের নেতৃত্বে তাদের বাধা দেওয়া হবে।

'কিন্তু বিবিঘরের বন্দীদের কী ব্যবস্থা করা যায়?' আলোচনার মধ্যেই নানাসাহেব একসময় প্রশ্ন করলেন।

'চরম ব্যবস্থা।' আজিমউল্লা সোজাসুজি জবাব দিলেন।

সভার মধ্যে এবার মতবিরোধ দেখা দিল। তাঁতিয়া তোপিও আজিমউল্লার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'বন্দীদের হত্যা করে আপদ মিটিয়ে দেওয়াই যুক্তিসংগত।'

কঠিন ভ্রূকুটি করে মৌলভি লিয়াকৎ খাঁ বললেন, 'বিশেষ করে, এই ইংরেজ বন্দীদের উদ্ধার করার জন্যই যখন ইংরেজ সৈন্য আসছে!'

দেখা গেল, বন্দীদের হত্যা করার দিকেই সভার মত। নানাসাহেব তবু ইতস্তত করতে লাগলেন। 'কিন্তু এতগুলো নারী ও শিশুকে হত্যা! তার ফলে দিবা, 'তাতে লাভ কি?' অস্থিরচিত্তে আসন ত্যাগ করে তিনি পদচারণা করতে লাগলেন।

'কি লাভ!' তাঁতিয়া তোপির দুচোখ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, 'ফতেপুরের কথা একবার মনে করে দেখুন।'

'আপনি আদেশ করুন নানাসাহেব!' বললেন মৌলভি লিয়াকৎ।

'শত্রুর ক্ষেত্রে কোন দয়া নেই!' আজিমউল্লার কণ্ঠস্বর এবার দৃঢ় হয়ে উঠল, 'কানপুরের ঘটনার সাক্ষী দেবার জন্য একজন ইংরাজকেও আমরা জীবিত রাখব না।

নানাসাহেব আর একবার ইতস্তত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসহায়ভাবে আজিমউল্লার ইচ্ছার সামনেই নতি স্বীকার করলেন। বিষণ্ণভাবে আদেশ দান করলেন তিনি।

নানাসাহেবের প্রধান অনুচর এই আজিমউল্লার একটু পূর্ব ইতিহাসও আছে। নিতান্ত গরীবের ঘরে জন্মলাভ করে এবং অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও একদা ইংরেজের গৃহে সামান্য বাবুর্চি আজিমউল্লা খাঁ পরবর্তীকালে নিজের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার বলে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠার শিখরে আরোহন করেন ও কালক্রমে সিপাহীযুদ্ধের প্রধান নায়কের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা এখন কি সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। কানপুর বিজয়ের পর নানাসাহেব পেশবা বলে নিজেকে ঘোষণা করলেও, পেশবার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কিন্তু এই আজিমউল্লারই হাতে। স্বয়ং নানাসাহেবেরও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা ছিল না।

নিভৃত আলোচনার পর একটা ঝাঁকড়া লেবুগাছের তলায় নানাসাহেবের প্রকাণ্ড দরবার বসল। সন্ধ্যা তখন এগিয়ে আসছে, গঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে আসছে মৃদু মিষ্টি বাতাস, গাছের পাতাগুলো সেই বাতাসে শির-শির করে কাঁপছে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়ে ঝলমল করছে নানাসাহেবের মাথায় বহুমূল্য স্বর্ণখচিত পাগড়ী। তাঁর দুপাশে আসন গ্রহণ করেছেন, জওলাপ্রসাদ, তাঁতিয়া তোপি, আজিমউল্লা ও বালারাও। বিবিঘরে বন্দী ইংরেজ নরনারীর মধ্যে যে পাঁচজন পুরুষ ছিল, প্রহরী সিপাহীরা তাদের দরবারে নিয়ে এল।

ফতেপুরে ইংরেজ সৈন্য আমার নিরীহ প্রজাদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করেছে তোমাদের উপর আমি তার প্রতিশোধ নিলাম! দরবারে নানাসাহেব গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

মুহূর্তে অপেক্ষমান সিপাহীদের বন্দুক গর্জন করে উঠল। একটিও লক্ষ্য না করে পাঁচজন ইংরেজের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল!

বিবিঘরে আটক ইংরেজ বন্দীদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছতে দেরী হল না। ইংরেজ সৈন্য তখন কানপুরের দিকেই এগিয়ে আসছে, মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তারা। কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ-বিষাদ উপস্থিত হল। এই দুঃসংবাদে কান্নার রোল উঠল তাদের মধ্যে, চোখের সামনে আবার মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে শুরু করল তারা।

সিপাহীদের উপর এরপর হুকুম হল, বিবিঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে গুলি করে বন্দিনী ইংরেজ নারী ও শিশুদের হত্যা করতে হবে।

কিন্তু সিপাহীরা যখন শুনল, রুদ্ধগৃহে অসহায় নারী ও শিশুদের উপর তাদের গুলিবর্ষণ করতে হবে, তখন তারা বেঁকে দাঁড়াল। মাতৃভূমির স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধা তারা, নারী ও শিশুদের ওপর গুলিবর্ষণ করবার জন্য অস্ত্রধারণ করেনি।

প্রমাদগুনে আজিমউল্লা তাদের অনেক বোঝালেন, অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। হত্যাকারী প্রত্যেক সিপাহীকে একটা করে সোনার বালা গড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিলেন। কিন্তু সিপাহীরা টলল না। হতাশ হয়ে আজিমউল্লা শেষ পর্যন্ত ভয় দেখালেন, সিপাহীরা তাঁদের আদেশ পালন না করলে তাঁরা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব ত্যাগ করবেন।

সিপাহীরা তবু ইতস্তত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জানালার ফাঁক দিয়ে বিবি ঘরের ভেতরের দিকের ছাদ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে আদেশ পালন করল তারা। তাতে ঘরের মধ্যে আতঙ্কগ্রস্ত ছুটাছুটি শুরু হলেও একজনও মারা পড়ল না।

নিরুপায় আজিমউল্লা অগত্যা সহর থেকে কয়েকজন মুসলমান কসাইকে নিয়ে এলেন। বলা যায় না, সিপাহীদের বেশী পীড়াপীড়ি করতে গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে!

বড় বড় ছোরা হাতে নিয়ে সেই ভীষণ দর্শন কসাইরা বিবিঘরের দরজার সামনে দেখা দিতেই ইংরেজ নারী ও শিশুদের হৃদয়বিদারণ ক্রন্দনধ্বনিতে সিপাহীরা কানে আঙুল দিল। কিন্তু নিষ্ঠুর কসাইরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না। হিলটন সাহেব আর মীনা মেমের সাধের বিবিঘরকে তারা নারী ও শিশুদের বধ্যভূমিতে পরিণত করল, রক্তে লাল হয়ে গেল বিবিঘরের মেঝে!

গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে সেনাপতি হ্যাভলক তখন এই নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্যই সসৈন্যে দ্রুত কানপুরের দিকে এগিয়ে আসছেন! বিবিঘরে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, ইংরেজ সৈন্য তার কোন খবরই জানতে পারল না।

তাদের পথ তখন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তপ্ত হয়ে উঠেছে চারদিক। খরতাপে গ্রামের পর গ্রাম পুড়ছে ঝলসে যাচ্ছে আকাশ। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে ইংরেজ সৈন্য আর তপ্ত ধূলার স্পর্শে তাদের পায়ের বুট পর্যন্ত গরম হয়ে উঠছে। পথশ্রমে তারা অবসন্ন, পিপাসায় তাদের কণ্ঠ শুষ্ক। সূর্যের প্রখর জ্বালায় জ্বলছে তাদের সর্বাঙ্গ, তবু তারা থামতে পারে না।

নানাসাহেব স্বয়ং এবার ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করতে অগ্রসর হলেন। ঘন ঘন গম্ভীর নির্ঘোষে সিপাহী দের নিয়ে এবার এমনই কৌশলের সংগে সৈন্য সমাবেশ করে ব্যূহ রচনা করলেন নানাসাহেব যে, বহুদর্শী সেনাপতি হ্যাভলক পর্যন্ত তাঁর রণনৈপুণ্যে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও দুঃসংকল্প ইংরেজ সৈন্যের এনফিল্ড রাইফেলের দূর পাল্লার গুলি ও কামানের ঘন ঘন অব্যর্থ গোলায় নানাসাহেবের ক্ষিপ্র ও রণকুশল সৈন্যরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তাদের কামানের সঙ্গীন গর্জনে কানপুরের নগরসৌধ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। অবস্থা বুঝে কয়েকজন মাত্র বিশ্বাসী সৈন্য সংগে নিয়ে নানাসাহেব সেই যে ঘোড়া ছুটিয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন, সিপাহী বিদ্রোহের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আর তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি!

বিজয় উল্লাসে রণবাদ্যধ্বনি করে কামানের গোলায় আহত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন সিপাহীদের দেহ নির্মমভাবে বুটে মাড়িয়ে ইংরেজ সৈন্য সদর্পে কানপুরে প্রবেশ করল। কিন্তু শুভ্রকেশ বৃদ্ধ সেনাপতি হ্যাভলকের বিশ্রামের অবসর ছিল না। কানপুরে ইংরেজের বিজয় পতাকা উড়ল, কিন্তু তখনও লক্ষ্ণৌ বিপদাপন্ন, আগ্রা অবরুদ্ধ, দিল্লী বিদ্রোহীদের হাতে। অতএব সহকর্মী কর্নেল নীলের হাতে কানপুরের সেনাপত্য অর্পন করে তিনি আবার সসৈন্যে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন।

বহু যুদ্ধে বীরযোদ্ধা কর্নেল জেমস জর্জ নীল! নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতায় নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সেনাপতি হ্যাভলকেরই সুযোগ্য অনুচর। মাত্র সতের বছর বয়সে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি যখন ভারতের মাটিতে পদার্পন করলেন, তখন তাঁর বয়স সাতচল্লিশ বছর। ত্রিশ বছরের এই দীর্ঘ সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলেন নীল এবং বিদ্রোহ দমনের নামে উত্তর ভারতের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের আগুনে পুড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে ও বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে অপরিসীম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে অচিরেই কোম্পানীর সামরিক বিভাগে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে ফেললেন।

কানপুরের সেনাপত্য লাভের পরই বিবিঘরের সেই

রক্তাক্ত ঘটনার বিবরণ নীলের কর্ণগোচর হল। ইংরেজ নারী ও শিশুদের সেই নিষ্ঠুর হত্যার কাহিনী শুনতে শুনতে সেনাপতি নীলের মুখ কালো হয়ে উঠল, প্রত্যেকটি কথাই যেন আগুনে তাঁতানো টকটকে লোহার শিকের মত তাঁর হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বিঁধতে লাগল, স্নায়ুগুলোকে ঝলসে পুড়িয়ে দিতে লাগল। তারপর বিবিঘরে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য তিনি দেখলেন, তাতে বেদনায় তাঁর সমস্ত অন্তর ভরে গেল।

কয়েকদিন আগেকার ঘটনা, তবু ঘরগুলো তখনও রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এক একটা ঘরে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত কালো রক্তের কাদা। কোথাও হয়তো তখনও পড়ে আছে কোন হতভাগা ইংরেজ নারীর মাথার একগুচ্ছ সোনালী চুল, কোথাও বা তার পরিধেয় বস্ত্রের একটু ছেঁড়া টুকরো, কোথাও বা রক্তমাখা একটা জুতা। ইতস্তত ছড়ান শিশুদের কয়েকটা কাঠের খেলনা ও এককোণে একটা রক্তমাখা সুমবুনি সেনাপতি নীলকে যেন ইংরেজ সৈন্যের অযোগ্যতা ও অপদার্থতার জন্য উপহাস করে উঠল।

শোকে, দুঃখে ও ক্রোধে সেনাপতি নীল অভিভূত হয়ে পড়লেন। ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে দুহাত ছুঁড়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ।'

ইংরেজ সৈন্যও রীতিমত ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রতিহিংসা চাই! ইংরেজ নারী ও শিশু হত্যার নিষ্ঠুর, কঠিন প্রতিহিংসা।

পরদিনই সহর থেকে কয়েকজনকে ইংরেজ সৈন্য বিবি-ঘরের হত্যাকাণ্ডের জন্য গ্রেপ্তার করল। অবশ্য তারাই যে বিবিঘরের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক তার কোন প্রমান নেই। শুধু অনুমান ও সন্দেহ। কিন্তু ইংরেজের আইন কর্ণেল নীলের সহায়, এক্ষেত্রে শুধু সন্দেহই যথেষ্ট। অপরাধীদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার অপেক্ষা শুধু এখন। তাছাড়া শত্রুর পক্ষেতো কোন আইন নেই।

কিন্তু না, শুধু ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিলেই নীলের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার নয়। শাস্তিদানের এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন নীল এবং প্রতিহিংসা তৃপ্তির—সেই অভিনব পরিকল্পনা আবিষ্কারের আনন্দে অট্টহাসি করে উঠলেন। নীল জানতেন, ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের কাছে তাঁর উদ্ভাবিত এই শাস্তির মূল্য কতখানি।

নীলের নির্দেশে প্রথম অভিযুক্ত পদাতিক পল্টনের এক ব্রাহ্মণ সুবাদারকে বিবিঘরে নিয়ে আসা হল। ইংরেজ নারী ও শিশুদের রক্তে বিবিঘর তখনও রঞ্জিত। সুবাদারকে আদেশ করা হল, সেই ঘরের এক হাত মেঝে লেহন করে তারপর ঝাড়ুদারের ঝাড়ু হাতে নিয়ে তা দুইয়ে দিতে।

আদেশ শুনে মৃত্যু ভয়ে ভীত সুবাদারের চোখও ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল। সোজা দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানাল সে।

মুষ্টিগত শিকারের মুখের দিকে তাকিয়ে তার এই স্পর্ধায় সেনাপতি নীলের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল শুধু। তাঁর ইঙ্গিতে দৈত্যের মত একজন ইংরেজ সৈন্য এবার সুবাদারের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা লকলকে চাবুক!

কর্ণেল নীল আঙুল তুলে হুকুম দিলেন, 'এক।'

সংগে সংগে ইংরেজ সৈন্যের হাতের চাবুক বাতাসে দ্রুত একটা পাক দিয়ে সপাং করে গিয়ে পড়ল সুবাদারের পিঠে। খানিকটা চামড়া কেটে বসে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুবাদার।

'দুই!' আবার হুকুম দিলেন নীল।

পর মুহূর্তেই সাপের মত হিসিয়ে উঠে চাবুকটা বিদ্যুৎবেগে গিয়ে পড়ল সুবাদারের উপর। রক্ত ফেটে বেড়িয়ে পড়ল এবার, আর আহত জানোয়ারের আর্তনাদের মত একটা গোঙানি শোনা গেল শুধু!

তিন। চার। পাঁচ। চাবুকের সংখ্যা যত বাড়ছে গোঙানির শব্দও তত কমে আসছে। কয়েক ঘা চাবুকের পরই রক্তে ভেসে গেল সুবাদারের দেহ। দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতাও তাঁর আর নেই। মাটিতে পড়ে কাতরাতে শুরু করল সুবাদার।

'...পনের।'

দু'হাতে চাবুকটা এবার চেপে ধরল সুবাদার। ক্ষীণকণ্ঠে শোনা গেল তার গোঙানি, 'না-না-না!'

ইংরেজ সৈনিকের হাতের চাবুক থামল। দু'দিক থেকে দু'জন ইংরেজ সৈন্য এসে এবার সোজা করে

ধরল সুবাদারকে। এখনও হুকুম না মানলে আরও চাবুক পড়বে!

রক্তাক্ত বিপর্যস্ত মূর্তি সুবাদার এবার টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে মেঝের রক্ত লেহন করতে শুরু করল। চাবুকের নিষ্ঠুর আঘাতে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু তার চেয়েও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তার অন্তর। বিধর্মী ম্লেচ্ছদের রক্ত লেহন করছে সে, ধর্ম নষ্ট হয়েছে তার। এই ধর্ম তার কাছে জীবনের চেয়েও মূল্যবান, এই ধর্ম রক্ষার জন্যই তারা জীবন পণ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিদ্রোহী হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ সুবাদারের দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। আদেশ মত এক হাত মেঝে লেহন করল সে, তারপর কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করল। কিন্তু তবু সে নিষ্কৃতি লাভ করল না। নীলের প্রতিহিংসা শুধু এতেই চরিতার্থ হবার নয়।

ফাঁসীকাঠ সামনেই তৈরী ছিল। যথারীতি যথাবেশ পরান হল এবার সুবাদারকে। তারপর জোর করে তাকে বয়ে নিয়ে এসে সেই ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তারপর তার প্রাণহীন দেহটা পুঁতে দেওয়া হল মাটিতে।

তারপর নিয়ে আসা হল দ্বিতীয় অভিযুক্তকে। সহরের এক মুসলমান কসাই। যথারীতি তাকেও মেঝের রক্ত চাটবার হুকুম দেওয়া হল। ব্রাহ্মণ সুবাদারের মত সেও প্রথমে আদেশ পালন করতে অস্বীকার করল।

আবার হাসলেন কর্ণেল নীল। ভীমকায় ইংরেজের হাতের চাবুক আবার হিংস্র ভাবে শিস দিয়ে উঠল, সপাং, সপাং!

দেখতে দেখতে হতভাগা মুসলমান কসাইয়ের পিঠে চাবুকের লম্বা লম্বা দাগ বসে রক্ত ফুটে উঠল। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, বীভৎস আর্তনাদ করে উঠল। তারপর দু'হাতে চাবুকটা চেপে ধরে সেও গোঙানি দিয়ে উঠল, 'না-না-না।'

বেত্রাঘাতে জর্জর দেহ নিয়ে নিরুপায় সেই কসাইও তারপর কাঁপতে কাঁপতে মেঝের রক্ত লেহন করতে আরম্ভ করল। পরিতৃপ্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে উৎকট আনন্দে এবার অট্টহাসি করে উঠলেন নীল, 'হা-হা-হা'। এইখানেই মাত্র কয়েক দিন আগে তাদের স্বজাতীয়দের নিষ্ঠুর নির্মমতার মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে, এইখানেই তাদের অসহায় নারী ও শিশুদের রক্তপাত হয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাস, তাদের হত্যাকারীদেরই আজ সেই রক্ত লেহন করছে!

পর পর কয়েকজন অভিযুক্তকেই সেই ব্রাহ্মণ সুবাদারের মত নির্যাতন ভোগ করে তারই মত মৃত্যুকে বরণ করতে হল।

হত্যাকাণ্ড সমাধা করে সেনাপতি নীল একবার তাকালেন বিবিঘরের সামনের কুয়োটার দিকে। এই-খানেই বিবিঘরে নিহত ইংরেজ নারী ও শিশুদের দেহ নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এতদিনে সেই হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হল। পরিতৃপ্ত জিঘাংসার আনন্দে সেনাপতি নীল আর একবার অট্টহাসি করে উঠলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই বাতাসে এক বিশ্রী দুর্গন্ধ ভেসে আসতেই নীলের দৃষ্টি আবার গিয়ে পড়ল ঐ কুয়োটারই দিকে। মুহূর্তে আবার ক্রোধে জ্বলে উঠল তাঁর সমস্ত অন্তর। না, মাত্র কয়েকজন অভিযুক্তকে হত্যা করে নয়, প্রতিটি ভারতীয়কে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে পারলে তবেই এই হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

নীলের নির্দেশে ইংরেজ সৈন্য এরপর কানপুরে যে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, ইতিহাসে তার বিস্তৃত কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, সেদিনের ইতিহাস যাঁরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজ। বেশির ভাগই আবার ইংরেজ রাজ-পুরুষ। বিদ্রোহী সিপাহীদের নৃশংসতার কাহিনী বর্ণনায় তাদের ইতিহাস যতটা সরব, বিদ্রোহ-দমনের নামে ইংরেজের নির্মম ও নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনায় তাঁরা আবার ততখানিই নীরব।

কিন্তু ইতিহাস নীরব হলেও সেদিনের সেই নৃশংসতার মূক সাক্ষী হয়ে বিবিঘর আজও দাঁড়িয়ে আছে। এখনও ভাগীরথীর জলে তার ছায়া কাঁপে। এখনও দলে দলে পুরুষ ও নারী ভক্তিভরে সেই নদীতে স্নান করে। জাহ্নবীর পুণ্য সলিলে দাঁড়িয়ে কেউ হয় তো তারা উদাত্ত কণ্ঠে গঙ্গা স্তব পাঠ করে, কেউ হয় তো সূর্যের বন্দনা ও মালা জপ করে, আবার কেউ তীরে ধ্যানস্থ হয়ে পূজা করে। এখনও তারা মাঝে মাঝে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ঐ বিবিঘর!'

আর্থিক প্রসঙ্গ

জ্বালানী তেলের জ্বালা

মন্ত্রমুখর

বর্তমান দুনিয়ায় তেলের প্রয়োজনীয়তা কী এবং কতখানি, সে কথা আজকাল বলে দিতে হবে না। তেল তো কত রকমেরই কিন্তু আমাদের তেল হল খনিজ তেল অর্থাৎ পেট্রোলিয়ম্। কয়লা বা লৌহের ব্যাপারে আমরা স্বাবলম্বী হলেও তেলের ব্যাপারে তা নই। এইটাই হল সমস্যা। এই সমস্যা যাতে দূর হয় তার জন্যে চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি নেই। চাহিদার পরিমাণ কী বিশাল সেটা দেখুন। আমাদের বর্তমানে তেলের চাহিদা হল প্রায় ১ কোটি টন—সেক্ষেত্রে উৎপাদন মাত্র ৬ লক্ষ টন। তাদের ৯ ভাগই আমদানীর ওপর নির্ভরশীল। আর এই আমদানীর জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা কত দিতে হয় শুনলেও চোখ কপালে উঠবে—৮০ কোটি টাকা। বিদেশী মুদ্রার অভাব এদেশে হবে না কেন?

কিন্তু তবু চেষ্টা তো করতেই হবে উদ্ধার পাবার। অন্ততপক্ষে যতটা পারা যায় এই বাবদ খরচ কমানোর। সরকার তাই ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বসালেন "তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন"। এঁরা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন নতুন নতুন তেলের খনির সন্ধানে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কমিশনকে পার্লামেন্টের আইন দিয়ে বিশিষ্ট রূপ দেওয়া হয়। এঁদের হাতে তেলের ব্যাপারে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল। এঁদের প্রচেষ্টায় তোলা তেলের বেচা-কেনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

সরকারের প্রথম দুই পরিকল্পনায় তেলের ব্যাপারে তেমন জোর দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় (পঞ্চবার্ষিকী) পরিকল্পনায় ঐ ব্যাপারে বরাদ্দ করা ছিল ৩০ কোটি টাকা মাত্র। আর তৃতীয় পরিকল্পনায় সেখানে বরাদ্দ করা হচ্ছে ৩০০ কোটি টাকা। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সরকার এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করছেন।

আজকের দিনে—এই আণবিক যুগেও—তেলের ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের এদেশেই বৎসরে শতকরা ৭ ভাগ করে বাড়ছে। তাহলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ—অর্থাৎ ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে দেখা যাবে যে তেলের চাহিদা কোটি ৪০ লক্ষ টনে পৌঁছে গেছে! প্রশ্ন হচ্ছে, তখনও কি বলতে পারবো যে আমরা তেলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হচ্ছি?

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ এর সদুত্তর আমাদের ভূগর্ভের অনাবিষ্কৃত তেলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করছে। কতদূর আমরা সফলকাম হবো—তা ভবিষ্যতেই বলতে পারে। যাই হোক মোট ৪ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই তেল অনুসন্ধান কার্য চলেছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নাহরকাটিয়া ও মোরান অঞ্চলেই আশার আলো বেশী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই অঞ্চলে যে ৪৩টি কূয়ো খোঁড়া হয়েছিল—তার ৪০টি থেকেই তেল পাওয়া যাবে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এখান থেকেই প্রায় ২০ লক্ষ টন তেল পাওয়া যাবে। কিন্তু বাকীটার কী হবে?

প্রথমেই ধরা যাক তৈল অনুসন্ধান কার্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আজকের দিনে বিজ্ঞান খুবই সহায়তা করছে অজানাকে জানতে। কিন্তু সে এখনও এমন সার্থকতম পর্যায়ে পৌঁছয়নি যে মাটির ওপর থেকে ম্যাগনিটোমিটার বা অন্য কোনও যন্ত্র দিয়ে নিশ্চিত করে বলতে পারবে—যে এখানে তেল আছেই। তাই এ ব্যাপারে অনেকটাতে আন্দাজ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়। ঠিক এই কারণেই তেলের অনুসন্ধান কার্য ব্যাপক ও বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে করাটাই সংগত। তা না হলে কোনও একটা অঞ্চলে প্রভূত অর্থ ও সময় লাগিয়ে তেল খোঁজার পর—

সেখানে ব্যর্থ হলে—সমগ্র দেশের পক্ষেই চরম ক্ষতি। এ যেন সেই এক খুড়িতে সবগুলো ডিম রাখার ব্যাপার। তেল অনুসন্ধানকার্যে যে কী পরিমাণ নৈপুণ্য, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, এবং ধৈর্যের প্রয়োজন তা খুব কম লোকেই জানে। তার ওপর আছে বিপদের আশঙ্কা এবং অদৃষ্ট।

তেলের ব্যাপারে আমাদের দেশ পিছিয়ে থাকার পেছনে যেসব কারণ আছে তার মধ্যে একটি হল উপযুক্ত সংখ্যক তৈল-বিশেষজ্ঞের অভাব। কমপক্ষে খুব উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞদের দরকার আমাদের দেশে ২৫।৩০ জন। তা ছাড়া, অপেক্ষাকৃত নীচু ধাপের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন তো অনেক। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী অনুযায়ী কিছুসংখ্যক ছাত্রকে বিদেশে শিক্ষা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সে তো প্রয়োজনের তুলনায় ঢের কম। তাই এখনো আমরা বিদেশী এক্সপার্টদের ওপরই নির্ভরশীল। রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী প্রভৃতি দেশের সহায়তাই প্রধান। এ না হলে আমাদের এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না এই ব্যাপারে।

পরবর্তী সমস্যা হল বিপুল অর্থের ও সরঞ্জামের। এত টাকা লগ্নী করার ক্ষমতা বেসরকারী ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রায় অসম্ভব। সরকারী ক্ষেত্রেও বেশ কঠিন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আমাদের লক্ষ্য ১৪০ লক্ষ টন তেল তোলার জন্যে লগ্নী করার প্রয়োজন প্রায় ৮০০ থেকে ১০০ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে ৩০০ কোটি টাকা তো নিঃসন্দেহে অপরিমিত। এই কারণেই সরকার বিদেশী তেল কোম্পানীগুলোকেও ডেকেছেন এ কাজে। এছাড়া আর উপায় ছিল না। তারাও সরকারের সংগে সহযোগিতা করে তেল-অনুসন্ধান ও উৎপাদন—দুইই করবে। এ কাজের সর্তাবলী নির্ধারিত হচ্ছে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সরকারী শিল্পনীতি দ্বারা।

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যাপারেও আমরা খুব পিছিয়ে আছি। গভীর কূপ খননের উপযোগী যন্ত্র মাত্র ছটি আছে ভারতে। তার মধ্যে দুটি দিয়েছেন রুশিয়া সরকার। রাশিয়া আরো দুটো সরবরাহ করবে। এগুলোর যথার্থ ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। জ্বালামুখী, ক্যাম্বে, হোসিয়ারপুর, আঁকলেশ্বর ও শিবসাগর প্রভৃতি অঞ্চলে সত্যিই আশা অনুসন্ধানের কার্য চলেছে।

আর একটা বিষয় ভাববার আছে। মোটরগাড়ীর পেট্রোল, ডিজেল তেল, বিমানের গ্যাসোলিন, কেরোসিন ও শিল্পকার্যে ব্যবহৃত তেলের উৎপাদনের মধ্যেকার একটা ক্ষমতা স্থাপন দরকার। এর অভাবে বর্তমানে কেরোসিন ও ডিজেল তেলের ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারী ক্ষেত্রে নব-স্থাপিত তৈল শোধনাগার দুটি এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। গৌহাটি ও বারাউনী—একটি আসামে এবং অপরটি বিহারে—এই শোধনাগার দুটি স্থাপিত হল। বাংলার দাবী অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ছিল—কিন্তু আসামী উদ্যমতার কাছে সরকার পরাজিত। বিহারের দাবী একরকমও নেই—তবু তাকে দিতে হবে—। সেসব কথা আজ পুরনো হয়ে গেছে।

আসামে নাহারকাটিয়া অঞ্চলে যে-তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে—তার উৎপাদন যোগ হলে আমাদের উৎপাদন যে ৩০ লক্ষে পৌঁছবে, একথা আগেই বলেছি। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সংগে নবগঠিত কোম্পানীটির যে-চুক্তি হয়েছে—তাতে সরকারের মূলধন থাকছে এক-তৃতীয়াংশ। বাকীশেষের অংশ হল দুই-তৃতীয়াংশ এবং কোম্পানীটির নাম হল "অয়েল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড"। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে আমাদের দেশে উৎপন্ন তেলের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫০ লক্ষ টন—আগামী বছরে সেটা ৬ লাখ টনে পৌঁছবে। যাই-হোক, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও আমাদের তেলের ঘাটতি ১ কোটি ১০ লক্ষ টন মিটবে কিসে সে প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনো পাই নি।

তবে একটা ব্যাপারে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। সেটা হল বিদেশ থেকে অপরিশ্রুত তেল আনিয়ে এখানে শোধন করে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত মাত্র একটি শোধন-কেন্দ্র ছিল ডিগবয়ে আসামে ওয়েল কোম্পানীর। তাদের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ টন বছরে। এখন আরো তিনটে শোধনাগার হয়েছে। পৃথিবী বিখ্যাত তিনটি কোম্পানীকে একটি করে মূলধন দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল

কোম্পানীর (ট্রোয়েডে), দ্বিতীয়টি বার্মা-তেলের (ওটি ও ট্রোয়েডে), আর তৃতীয়টি ক্যালটেক্সের (বিশাখাপত্তনমে)। উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১৬ লক্ষ, ২০ লক্ষ ও ১৮ লক্ষ টন। সুতরাং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে সংশোধিত তেলের পরিমাণ ৪ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর এর ফলে বিদেশী মুদ্রা বাঁচছে বছরে ৮০ কোটি টাকার মত। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলবার আছে। রাশিয়া অপরিস্রুত তেল সরবরাহ করতে রাজী আছে—কিন্তু এই বিদেশী কোম্পানীগুলি সে তেল কিনতে রাজী নয়। রাশিয়ার তেলের দাম বেশ কম—এই দরিদ্র দেশের তাতে বেশ কিছু সাশ্রয় হতো ঐ তেল কিনলে। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান কোম্পানীকে সে প্রস্তাবে রাজী করানো যাচ্ছে না—তাদের পুঁজিবাদী সুধার যে অন্ত নেই। কিউবার কাস্ত্রোর মত শক্তিশালী ও মনোবল সম্পন্ন আমাদের সরকার হলে এঁদের জারিজুরি খাটতো না। থাক ওসব কথা।

তেলের অনুসন্ধান কার্য এখনো চলছে—চালাতেও হবে চিরকাল। কারণ তেলের কুয়োগুলো চিরস্থায়ী নয়—তাদের মধ্যেকার তেলের পরিমাণও সীমিত। সুতরাং নতুন খনির সন্ধান করতেই হবে। কিন্তু এক একটা সাধারণ আকারের কুয়ো খনন করতে খরচের কথা ভাবলে আঁৎকে উঠতে হয়—৩০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা! তার সবগুলো তো দূরের কথা—অনেকগুলোতেই কিছু পাওয়া যায় না! তবু চালিয়ে যেতেই হবে এই ব্যয়বহুল অভিযান। দরকার—দরকার—দরকারের শেষ নেই। আসাম অয়েল কোম্পানী, "ষ্ট্যানভ্যাক" এবং সরকারী তেল ও গ্যাস কমিশনের প্রচেষ্টায় ভারতের বহু স্থানে এই অনুসন্ধান কার্য চলেছে। ভূতাত্ত্বিক পরিসংস্থান ও জরিপ তো শেষ হয়েই গেছে প্রায়। পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু, রাজস্থান, কচ্ছ, গুজরাট, অন্ধ্র, আসাম ও কেরালা সহ পশ্চিমবঙ্গ এই জরিপের এলাকায় পড়েছে। কুয়ো খোঁড়া হয়েছে হোসিয়ারপুর, জ্বালামুখী, ভাদসার ও লুনেজে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলায় ইন্দো-ষ্ট্যানভ্যাক এই খনন কার্য করেছিল। সেটা ব্যর্থ হয়েছে। জ্বালামুখী ও হোসিয়ারপুরেও সেই দশা। ক্যাম্বে ও লুনেজে আশা আছে একথা বলেছি। জ্বালানী গ্যাস পাওয়া গেছে বরোদার কাছে ভাদসারে ও সুরাটের কাছে। এখনো যে সব অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য হয়নি তার মধ্যে অন্ধ্র, কেরালা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আছে। পশ্চিম বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলটাও অনেকে আশাপ্রদ বলে মনে করেন।

অদৃষ্ট কথাটা যদি কেউ না মানেন—তাঁকে এই তেলের ক্ষেত্রে মানতেই হবে। প্রচুর পরিশ্রম, বিপুল অর্থ ব্যয় এবং তার চেয়ে বিরাট আশা—শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে আনন্দের পরিমাণটা ভেবে দেখুন—যদি তেল সত্যিই পাওয়া যায়—সেই তেল আর তেল নয়—লক্ষ লক্ষ টাকা! পাতালের যথের ধন মানুষের মুঠোয়। রাতারাতি পত্তন সমৃদ্ধ নগরের। সেই সোনার-স্বপনই দেখছি আমরা— কবে বড়লোক হবো, তা নয়, কবে স্বাবলম্বী হবো আমরা তেলের ব্যাপারে—জ্বালানী তেলের। এও কি কম জ্বালা?

হিজল কন্যা

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

এত ভাল লাগল ওকে।

ভরসন্ধের পাতলা আলোয় ওর শাড়ীর টানটানা লাল রেখাগুলো দুঃসহভাবে জ্বলে উঠল তখন। বড় বড় চোখে এক সহজ হিংসার তীব্র রঙ্। ভেজা বাতাসের টানে শিথিল খোঁপার আশে পাশে ছেঁড়া-খোঁড়া চুলগুলো এক পাল সাপের মত দুলতে লাগল। আর বাঁধের নীচে ফুল-কিনারা নেই অনিবার জলের এই আলো ঝিলিমিলির গভীরে এক বোবা আর্তনাদকে কত সত্য মনে হল তখন।

কোমরে আঁচল জড়াল বসে থেকেই। অমনি দু হাতের কখানা চুড়িতে আবার ওর বাবার বাঁধানো সদ্য-শোনা অসমাপ্ত গানের দু কলি বেজে উঠল। আর মনে হল বাঁধের তাল-গাছের পাতায় এদেশের এক দল নিশাচর বদ্ভতা থেকে সদ্য উঠে এসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন আলো জেলে দিই।

কখন রাত্রি এসে আমাকে কালো করে দিয়েছে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আড়ামোড়া দিয়ে শরীরের প্রন্থিগুলোকে সতেজ করে নিলাম। সেই বিকেল থেকে ঠায় বসে থেকে কী অস্পষ্ট বেদনা পায়ে কোমরে পিঠে।

কিন্তু শোনা, আর অযথা কল্পনার ভীড়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছাড়া আর কি করার আছে আমার। এই আশ্চর্য দেশ, আশ্চর্য নর-নারীদের মেলা, তাদের বদ্ভতা, প্রেম, জিঘাংসা আর নিঃসহায় অশ্রুপাতের কাহিনী এখন বড় নড়িয়ে দিয়েছে বুঝি আর দুবরকে, কাল সকালে নিশ্চয় তা আর থাকবে না। এক মোহের স্বপ্নের মত, গোঁজামিল দেওয়া কোন অসংলগ্ন কবিতার মত ভেবে [illegible]

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। দেশলাইটা অযথা বাজাতে লাগলাম হাতে ধরে। ততক্ষণে কাঁচ ভাঙ্গ হেরিকেন জেলে সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

—ঘুমোর যোগার শেষ বুঝি? বিড়ি খান তো দিতে পারি।

বললাম, খাবনা এখন কোন প্রতিজ্ঞা করিনি। তবে—

—তবে এনে দিই। উঠোনে আলো নামিয়ে রেখে ও অন্ধকারেই ঘরে ঢুকলো। গোটাকয় আবছা স্বরে গালমন্দ শুনতে পেলাম। খানিক পরে বেরিয়ে এ হাসিমুখে।

বলল, অবেই ভাল গো আপনার, একটা ছিল মাত্তর নেন, খেয়ে দেখুন।

হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে আঙুলে ছোঁয়া। দুর্ব চেতার মত শরীরে আমার কী অচেনা আমেজ চেউ মত উঠে চুল অবধি গিয়ে দুরন্ত বাতাসে মিশে গে তৎক্ষণাৎ। থতমত করে বললাম, উনি তো এলেন না!

বলল, আসবে এখুনি। এত দেরী তো করে ন কোন কাজে বুঝি আটকে গেছে।

বলে আবার হাসি।—কেমন লাগছে গো আপনা অভ্যেস নাই, আহা! তা বাপু, কুটুম-বাড়ী আস গেলে ওসব কিছু বেশী আনতে হয় কিন্তু। বাপম

যেখানে যায়, চাঁকো আর তামাকের পুঁটলীটা নিতে ভোলে না। আর ভুললে সেই বার ফোর্ড থেকে ফিরে এসে আমাকে বকুনি! পারিনে বাপু, ওসব নেশা কেন যে করে মানুষে?

আপন মনে কথার দলে এলিয়ে পড়ে ও। আমি বিড়ি টানি চুপচাপ। বার বার সেই গানের কলি ছুটো কানে এসে বাজছে,—

নদীতে জোয়ার দেখে আতংকে ঘর বাঁধলে না।

তাঁতীর কাদা পেছল্ বড় বোঝার কাঁদন বুঝলে না॥

ঘরের পেছনে খাল। সেখানে ডোঙ্গা বেয়ে কারা সব দল বেঁধে চলেছে। কার বাঁশীর সুর এলোমেলো বাতাসে টলে টলে পড়ছে বিস্তীর্ণ মাঠের অতল জলের উপর। ঝাঁকড়া গাছের মাথায় জোনাকীর ঝাঁক। দীঘল তাল গাছের সার এ দেশের জোয়ানদের মতই পাহারায় দাঁড়িয়ে। তার নীচে রাঙা গেরুয়া জলের তোড়ে ঝুরঝুর মাটি খসে পড়া। আর মাঝে মাঝে পাঁচার চাঁৎকার।

হাসে,—ভয় পেলেন নাকি? প্যাচা; পেত্নী নয়।

অমনি বাইরে শোনা যায়,—দূর, দূর, যাঃ, শালার আপদ! শালার যতসব কুলক্ষণ!

এখানে চাপা গলায় শুনি।—এতক্ষণে এল। বা বেরিয়েছে সেই বেলা দশটায়।

বাইরে কথা ফুরোয় না।—শালার আপদ ডাকছেরে সোয়াষ্টি, এক কুলো ছাই ছড়িয়ে দেতো আগ্‌নেতে! বান-বন্যায় একে তো ভটস্থ, আবার তাতেও স্বস্তি নাই। থুঃ, থুঃ, শালার আপদ, যাঃ।

বাইরে থুথু ফেলার আওয়াজ। এখানে চাপা গলায় কথা,—দেখলেন মজা? এত মানে ওসব! বলে, সাত সঙ্কে পেচা ডাকলে বড় কুলক্ষণ!

কিসকিসিয়ে হাসে ও। আমিও।

বাড়ী ঢোকে বুড়ো। হেঁ হেঁ করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে।—এট্টু দেরী হয়ে গেল, বাপধন, সেই কাশী গিছলাম কিনা!

মেয়ে চোখ তোলে কপালে, ওমা! কাশী? কেনে? যদি কোন বাঁধ ভেঙে আটক পড়ে যেতে?

বুড়োর হাসি থামে না।—আরে না, না, অত ভয় কিছু নয়! কিন্তু গিছলাম একটো কাজের লেগে গো!

কী কাজ মেয়ে জিনিষ পত্তরগুলো হাত থেকে নামিয়ে নেয়।

কতুয়ার পকেট থেকে সাবধানে একটা মোড়ক বার করে বুড়ো। তারপর হেরিকেনের আলো যেখানে বেশী উজ্জ্বল সেখানে বাড়িয়ে ধরে হেসে বলে,—এট্টু চাহা আনলাম বাপধনের জন্তে।

বলি,—কি সর্বনাশ, চা আনবার জন্তে এই দুর্যোগে শহরে গেছিলেন?

ততক্ষণে বালতি ভরা জল এগিয়ে দিয়েছে মেয়ে। বুড়ো পা ধোয়। বলে,—কুটুমের জন্তে বাড়ীতে এটা ওটা হলে বাড়ীর লোকেরা কি চাপে না বাপধন? ছেঁ···হেঁ···হেঁ···।

কাটা কাটা ফ্যাকাসে পায়ের পাতায় রাঙা পাহাড়-ধোওয়া জল কলকলিয়ে বেয়োচ্ছে। কেমন অবাক লাগল, এই রাঙাপানা ঘোলা জল কোথায় কতদূর—অনেক অনেক দূরের ছোটনাগপুর পাহাড়ের গেরুয়া মাটি মেশানো জল, এখানে এই হিজল দেশের এক গাঁইয়ে বুড়োর পায়ে লুটোচ্ছে।

—আরে যাঃ! ওদিকে লাফিয়ে উঠেছে বুড়ো।

মেয়ে শুধোল,—কিছু ফেলে এসেছ বুঝি! আচ্ছা লোকটা বটে তুমি!

বুড়ো একগাল হেসে উঠল,—না, না! দুধ, দুধ নাই যে!

মেয়ে গম্ভীর হয়ে যায় হঠাৎ। বলে,—এত বেতে দুধ কোথায় মিলবে গো?

তবু যোগাড় হয় শেষমেশ। প্রকাণ্ড এক বাটি চা একেবারে ঠোঁটের কাছে পৌঁছে যায়। হাত বাড়াতে গিয়ে শুনি বারণ,—উঁহু হুঁ, অত সস্তা না বাপু, কাঁসার বাটী, তেতে আগুন। দেখছেন না, কাপড় দিয়ে ধরে আছি।

এতক্ষণে চোখে পড়ে, শাড়ীর আঁচলে পাত্রটা জড়ানো। তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে সন্তর্পণে ওর হাত থেকে ওটা নিলাম। চুমুক দিয়ে দেখি, চা ঠাণ্ডা; কিন্তু কিনারায় ঠোঁট ছোঁয়ানো যায় না! বারান্দায় বাপ-মেয়ের অবস্থাও তাই। ক্রমাগত ফুঁ দিচ্ছে দু জনে। আর চুমুকের দীর্ঘ দীর্ঘ বায়বিক চুক্‌কার।

—ইস, এই আবার মানুষে খায়? জিভ পুড়ে গেছে একেবারে, তরকারী খেতে ঝাল লাগবে তো!—বলতে বলতে কটাক্ষ হানে আমার প্রতি।—আচ্ছা, ফুটুস, মোছলমানের হাতে খেলে জাত যাবে না আপনার? বুড়োও যেন সচকিত এতক্ষণে।—তাই তো বটেরে সোহাগী, বাপধনকে জিগ্যাসা করা হয়নি যে। এঃ, বড় ভুল হয়ে গেল হয় তো!

সোহাগীর চোখে কৌতুক।—কী ফুটুস, জাত যাবে নাকি গো? দেখো বাপু, পরে কিন্তু নিন্দে কর না।

শান্তকণ্ঠে চোখ বুজে বলে ফেলি,—আমি রাঁধতে জানিনে, সোহাগী! আর তাই বিদেশে গেলে জাতটা সিকেয় তুলে রেখে আসি।

—তা বটে বাপু, জাত আগে না জেবন আগে?—অনেক কথা গজগজ করে বেরুচ্ছে ওর মুখ দিয়ে। বুড়ো বুঝি খুশী হয়ে গেছে কথাটা শুনে। আঁকিয়ে বসেছে তামাক সেজে।

আমি উঠোনে বসে চুপচাপ সিগারেট টানছি। বুড়ো বুদ্ধি করে নিয়ে এসেছিল কাশী থেকে। তাই মেয়ের চোখে টলটলিয়ে উঠেছে বাপের তারিফ, ঠাহর করা যায় সহজেই। আর খানিক বাদে বিশাল ভাঁট-গাছটার ডালপালার উপর. মেঘমাখানো চাঁদের মুখ। আবছা হলুদ আলো সবখানে। মড়ার খুলির হাসির মত এক উদাসীন কাঠিন্য।

হঠাৎ শিউরে উঠি তিনজন। একটু দূরে কোন বাড়ী থেকে মেয়েলী গলায় দীর্ঘ আর্তনাদ মূর্ছিত চরাচরকে চাবুক মেরে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে একটা বিরাট কিছু জলে পড়লো। ধুম্বি।

প্রায় কামান গর্জনের মত মনে হয় সেই বিবর্ণ রাত্রির পটভূমিতে। চমকে উঠি, কি ব্যাপার?

—বুঝি ঘর পড়ল কার।—আশ্চর্য নির্লিপ্ত কণ্ঠে মেয়ে জানায়।

বুড়ো কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। উদ্দাম বাতাসে কিছু শোনা যায় না। তারপর আমাদের অন্ধকারে রেখেই হেরিকেন হাতে বেরিয়ে যায়।

ছোট্ট পাঁচিলে বুক দিয়ে দাঁড়িয়ে ভীক্ষ চোখে চেয়ে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম, কোন নিষ্ঠুর সংবাদের জন্য। হিজল দেশের দীর্ঘ কাহিনীর, প্রেম আর রক্ত আর অশ্রুর লাল নীল ধূসর ঐকতানে আরো এক তুচ্ছ বিষাদের টান অনুভব করার জন্য। হঠাৎ মনে হল, একটু আগে শোনা ঐ মেয়েলী আর্তনাদের রেশ ধরে অলক্ষ্যে যেখানে পৌঁছে গেছি, সেখানে হিজল গাছের ছায়ায় চুল এলিয়ে বসে এখনো কতজনে বিবি হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে—সোয়ামীর নাস্তা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে যে মেয়ে হঠাৎ আসা রাঙা জলের তোড়ে হারিয়ে গেছিল সন তেরশ তেষট্টি সালের বন্যায়। মনে হল এখুনি ডাকি সোহাগীকে, বলি, শোন, শোন ঐ যে···

এরপর ছট্ ছট্ পাঁচনে গরু ঠেঙানি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না সেই হিজল গাছটারই কাছাকাছি কোথাও? সোয়ামী হারু চাষাও যে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছিল। দুটি নরনারী কেউ কাউকে খুঁজে পাচ্ছে এখনো! শোন, এখনো লাউল বেয়ে চলেছে সেই জোয়ান চাষা হিমলের অতল জলের নীচে·····

আর কতজন বিবি নাস্তা হাতে হিজল তলায় বসে কাঁদছে···আর কাঁদছেই এক টানা।

এক সঙ্গে অনেক মেয়ের কান্না শোনা যায়। কয়েকটা হেরিকেনের আলো, তাল গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো চোঙার বৈঠার ছপ্ ছপ্ শব্দ। খানিক সজীবতা এতক্ষণ পরে। বুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে আসে।—আহা, হা, নতুন পোয়াতী গো, মাত্তর সাতদিন হল পেসব করেছে। সন্তান শুদ্ধ দেয়াল চাপা পড়েছে। ছেলেকে দুধ দিতে ঘরে ঢুকেছিল।

সোহাগী শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করে, সেই মেয়েটা গো, যার কথা বলছিলাম। হাতে কোলে ছেলে, সোয়ামী মল পরত।

বাঁশীর সুর সেই সঙ্গে থেকে একটানা শুনছি। বিরক্ত হয়ে বলি, কে বাঁশী বাজায় এত?

এইবার হাসে সোহাগী,—নামু পাড়ার কাজু। ও অমনি ছেলে। বারণ করবে সাধ্যি কার? হিজলে রক্ত গায়ে। ইয়া লম্বা চওড়া শরীর, ঝুঁত চুল মাথায়। আলকাপের গানের সখ কত! বেশী বললে, ফজলু মারা করবে।···হিঃ···হিঃ···হিঃ···! হেসেই ওর চোখ সজল।

শুধালাম—সে আবার কি ?

—ও পাড়ার ফতলু গো, মজ্জিদের মোল্লা। বলে, নামাজের সময় বাজাস না, বাঁশী শুনলে চল্লিশ বছরের বন্দেগী নষ্ট। সেই বলা, অমনি বচসা।···

—শেষমেশ মোল্লার মাথাই কাটিয়ে দিলে।

এত হাসছে মেয়েটা। বাপ তামাক টানছে চুপচাপ। বাইরে অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ বাতাসে দুলে দুলে ভেসে আসছে।

—তা ঐ ভাল বাপু হিজল দেশের যুগ্যি বটে। ডাকপুরুষের বচন,—

হিজল জাগে ঘর করি,
বান বন্যাকে ভয় করি ?

—একী বান, এর চেয়ে কত সেচও বান গিয়েছে,—না বাপজী ? বুড়ো কি বলে বিড়বিড় করে। হয়তো বারবার শোনা সেই একই গল্প। সেই একই কথার বুহুনি, একই গান, একঘেয়ে সুর

পাহাড়ে ধোওয়া লাল জলের রঙ নেবে শরীরে ? নদীর স্রোতের মত প্রাবল্য তরঙ্গের মত উল্লাস আর দহের মতন নিস্তল গভীরতা ? চেয়ে দেখ হিজল দেশের পুরুষের শরীরে, মনে, চোখে কি আছে ! রূপ আর শক্তি। শৌর্য আর উদ্দাম প্রেম। তার বলিষ্ঠ দীঘল বাহু অন্ধকারে ঘাটে জল নিতে আসা নিটোলতনু যুবতীকে টেনে নিয়ে ডাঙায় বসিয়ে পাড়িয়ে দেয় দূর হিজলবনের দুর্গম পৃথিবীতে—কত বছর ধরে ফুটে থাকা জাগুলা শালুক পদ্মের ভাঁড় ঠেলে কোন শরবনের কিনারায় ঘন ঘাসের বুকে ছুঁড়ে ফেলে প্রেমের আদিম মন্ত্র উচ্চারণ করে ওঠে। জাতকুলের তোয়াক্কা নেই, লজ্জা ভয় দ্বিধা নেই, বুক দুলিয়ে সেই মেয়ে আর পুরুষ আবার ভেড়ে এসে বসন্তীর কিনারায় আদিম বন্য প্রণয়ের দুর্নিবার জয়যাত্রার শেষে কালের তিলক পরে।

আর এ মেয়ে হিজল দেশেই জন্মায়। রূপে বন্যা, চোখে বন্যা, বুকে বন্যা। অগ্নিবর্ণ বন্যা। ছোটনাগপুর পাহাড়ের রাঙামাটীর রঙ তার সব কিছুতে। বাপ আর মেয়ে কলবলিয়ে বলে যায় এই কথাই। বলে যে মেয়ের রঙ নেই, রূপ নেই বলে লাজে মরে আক্কা, একবার এই হিজলবিলের ভোড়ে নেয়ে যাও এই ঘারকা নদীর বুকে নেমে। এ মাটীর ধুলো মেখে যাও তোমার রোগা গায়ে-গতরে, কোটরগত চোখে, শীর্ণ নিথিল বুকে। পাবে এই প্রমত্ত জীবনের বিচিত্র বর ; রঙ আর রূপ আর যৌবন। আর এক আপাপবিদ্ধ দুরন্ত বুভুক্ষা—

—প্রেমের রক্তের অক্ষয় অন্তে চিরকালের শ্রেষ্ঠতম সঞ্চয়ের মত।

এমন রাতের স্বপ্ন দেখে না কেউ। বাহাত্তুরে বুড়ো আর তার যুবতী মেয়ে ; আর চারপাশে দুরন্ত ঘারকা নদীর দুর্বার বন্যাস্রোত। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাঁধের বুকে বুকে ছোট ছোট জনপদ, হাজার অজগরের কুণ্ডলী-ভাঙা পড়ে থাকা খাপদ শিশুর মত। এ মাটী দেবে অনেক, নেবেও অনেক। এর উর্বরতা অনেক বছরের সঞ্চয়। পলির পাহাড় জমে ওঠা বুকে অপ্রমেয় শস্যরাশি এইসব নরনারীদের মতই সাহস, সতেজ, সুঠাম। তারপর বন্যা আসে। দুর্ধর্ষ জলস্রোত এদের সাজানো চরাচরকে নিষ্ঠুর পদাঘাতে ভেঙে চুরে তছনছ করে চলে যায়। হিজলের মাটীতে কাদায় মুখ রেখে ডাগর ধানের চারা লাসের মত পচে থসে পড়ে থাকে। জমিদখলতীর অনেক খুন...রক্ত আর কান্না—ব্যর্থ হয়ে যায় তখন।

তবু ঘর বাঁধে। নোতুন করে সংসার সাজায়। সেই বাঁশী আর লাঠি। হিজলের জংগলে জংগলে মহিষের পিঠে চড়ে জোয়ান ছেলেদের ঘুরে বেড়ানো, মেয়েদের শাকতোলা, মাছধরা জলে-কাদায় খালে-বিলে লুটোপুটি কোন কিছুতেই ছেদ পড়ে না। সেই একই গান, একই সুর। শাঁখালার বিলে পদ্মর ফুল ফুরোয় না। শালুক হেলঞ্চ কলমীর দামে নেচে বেড়ায় জলচর পাখীরা শরবনের নীচে পলিমলিন ঘাসের ভীড়ে সন্তর্পণে পথ চলে কাল-নাগিনীর দল, আরো দূরে পুবদিকের জংগলে বুনো শুয়ার গা ঘসে বেড়ায় ধূসর হিজলগাছে।

আবার কামান গর্জনী চমকে উঠি যেতে যেতে। মুহূর্তের জন্য ক্ষুরধার লকামজানো মাছের আস্বাদ ভুলে যাই। সোহাগী তেড়েমেড়ে বলে ওঠে—আবার ভেষ্টি সন এল না কি রে বাপু ? এত ঘর পড়ছে কেনে ?

বুড়ো এঁটো হাতেই উঠে দাঁড়াল। তুই লক্ষটা জ্বালতো মা, ঘরের পেছনটা দেখে আসি।

বাজে করে মেয়ে, উঁহু, খাওয়া ফেলে উঠতে হবে না। আর পানি এতক্ষণ দেয়ালে ঠেকে থাকেতো ভালোই হবে। আঁচল চাপা দাসি ওর। তাহলে তিনজনেই একেবারে হি ..হি...হি...

প্রদীপ জেলে রেখে হেরিকেন হাতে বেরিয়ে গেল সোহাগী।

বললাম—বিষ্টিতো সকাল থেকে বন্ধ। বান বাড়ছে নাকি, ওস্তাদ?

চেকুর তুলে বুড়োর জবাব—খু—উ—ব। ক্রমে ক্রমে বাড়ছে।

তা কারণটা কি জানেন? ওই যে কি বলে সব... ক্যানল না কী, ওটার পানি ছাড়ছে কিনা?

রঙ বেরঙের ফড়িং এসে ভিড় জমিয়েছে কাছে। এটা মারতে ওটা এসে ভাতে পড়ে। দুজনে নাকাল হচ্ছি শুধু। এতক্ষণ মেয়েটা পাখার বাতাসে সব তাড়াচ্ছিল বসে।

—কেন যে ভাত রোচেনা মুখে। বলতে বলতে শেষ গ্রাস মুখে তুলল বুড়ো। দাড়ির ভেতর কখন থেকে একটা ফড়িং সেঁধিয়ে গেছে, আঙুল দিয়ে খুঁজতে লাগলো। বেশ দেখা যায় ওর তোবড়ানো গালে কোঁচকানো চামড়ার উপর কিসের একটা লাবণ্য চকচক করছে। সোহাগীকে কথাটা বললেই অমনি জবাব দেবে হিজলে রঙ। কথায় কথায় এই বিশেষণ ওর। কিন্তু ঐ লাবণ্যটা কিসের আমি যেন জানি। ওর বুড়ো হাড়ের ভেতর এক দুর্বার শক্তি এখনো ওৎ পেতে সাপের মত কোন শিকারের প্রতীক্ষায়, তাই আমার ভাবতে ইচ্ছা করে।

সকালে বলছিল বুড়ো, আমাকে এ দেশের লোক ওস্তাদ বলে কেনে জানেন? গান বাঁধি বলে নয়; অস্ত্র যেহু আছে। বলে খানিক ঠোঁট চেপে মাথা নেড়েছিল দুপাশে। যেন কী একটা গভীর রহস্যের কাহিনী শুনতে ওৎ পেতেছিলাম তৎক্ষণাৎ। এখনো আমার লাঠির জন্য সুখ্যাতি আছে।

তা—সেটা জানেন অবশ্যি কাশীর রাজামশায়রা আর হিজলের মরহুম মুনিশ যত আছেন—তেনারা।

বড় বেমানান। লাঠিয়ালের হাতে একতারা। লাঠি আর বীণা। চমক ভাঙে ওর কথায়—তা মশাই বুঝলেন কিনা, হিজলের মাটি যেন কেমনধারা। শুকোলে পা দাও দিকি, কেটে ছড়ে একাকার। হিজলে ছুতো দেখেছেন? তালগাছের বগড়ায় তৈরী। খালি পায়ে শুকনো মাটিতে পা দেয় সাধ্যি কার? আর যেমনি পানির ছিট লাগলো অমনি গলে একাকার। সেই তো... যত ভয়গো মশাই।

আড়চোখে দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখি। না, কাটল ধরেনি কোথাও।

বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, মেয়েটাকে নিয়ে পারিনে বাছা, এখনো কি করছে দেখদিকিনি। ও সোহাগী!

বাইরে থেকে মেয়ের গলা শোনা গেল—এঘরে পানি উঠলে বেল্লাও নৈরাকার হয়ে যাবে না? কিন্তু...মজা দেখবে এস।...

—কীরে? বাইরে বেরোয় বুড়ো। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে—ছি...ছি...সর্বনাশ, ফেলে দে, ফেলে দে মাগী! কাণ্ডটা দেখদিকিনি বাপু..সর্বনাশ। কোনক্রমে ছুঁয়ে দিলে কি হবে চিন্তা নাই যে হতভাগী?

আমার সারা শরীরে বিদ্যুত। চুল খাড়া। আতঙ্কে স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। মেয়েটা কি একটা সাপের মাথা মুঠো দিয়ে চেপে ধরে আছে, বার বার ঝাঁকি দিচ্ছে, তাই ওটা ওর হাতে জড়াতে পারছে না। আর—হাতে হেরিকেনটা তেমনি জ্বলছে বাতাসের বেগে দপদপিয়ে। বুড়ো হেরিকেন কেড়ে নেয় তৎক্ষণাৎ। সন্তর্পনে মাটিতে খুঠোটা রেখে একটা ছোট্ট লাঠি টেনে নেয় সোহাগী। তারপর মুঠো খুলেই সাপটার মাথা চেপে ধরে লাঠিটাতে।

—কী সাপ পরখ করতো বাপজী? দেয়াল বেয়ে উঠছিল। যেমনি দেখা, অমনি ধরে ফেললাম।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো বুড়ো।—ছোঁরটোয় নিতো?

—ছোবে, না আর কী! ছোঁবার জো আছে। পড়েছ বাবা আজরাইল কালের হাতে।

আমরা দুজনে পরখ করি সযত্নে সাবধানে। ক্রুদ্ধ সাপটা এতক্ষণে নিজের রূপ ধরে। কেউটের বাচ্চা ছোট্ট ফণায় সুন্দর এক আলপনা আঁকা। গলায় লাঠিটা চেপে আছে, তাই বারবার দুপাশে ঘাড় ফিরিয়ে শূন্যে ছোবল মারছে ভীষণ আক্রোশে। তিরস্কার করতে সাধ হল। বললাম, ছিঃ, সোহাগী, তোমার জ্ঞানের ওর নেই এতটুকু,

—আজ নতুন দেখছেন কিনা, আশ্চর্য লাগছে। ভাবছেন বুঝি বেদেনী মেয়ে ছাড়া এমনটি কে পারে, তাই না গো? সোহাগী অমনি বসে থেকেই জবাব দেয়।—অমন কত কাল-সাপের মাথাকে দাঁত থেকে টেনে বের করেছি। তখনতো কত ছোট আমি। মনে আছে বাপজী, সেই আমলবাঁধের বাঁশে পাকুড়তলায় ছাগল চরাতে গিয়ে দেখি লম্বা কি মোটা একটা সাপ বাঁধের ফাটলে ঢুকছে...অমনি

ধমকে উঠলো বুড়ো, খাম বাপু! আর বড়াই করিসনে! ও হচ্ছে তোমার মনাই, সাক্ষাৎ কাল—মালে কুল মউত (মৃত্যুর দেবতা)..... ওর কাছে বড়াই বুজরুকী চলে!

একটা লক্ষ কিছু দাও তো। ধরিসের মাথাটা ছেঁচে দিই। সোহাগী বলে। কিন্তু পুসলে দু পয়সা ওষুধার হয় বেশ।

বুড়ো হাউমাউ করে ওঠে—দুত্তেরি বাপু, এই চারি দিকে বিপদ আর তোর কি ছেলেমানুষী! তারপর বেঁটে মত একটা লাঠি নিয়ে আসে।

সোহাগী রুচি মেয়ের মত ঠোঁট উলটিয়ে বলে, নাহয় থাক, পুষবো এটাকে। হাঁড়ি আনো একটা।

হঠাৎ বুড়োর চোখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ঘুমন্ত হিংস্র পুরুষত্ব প্রখর হয়ে উঠেছে, তারই তীব্র জ্বালা। প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করে বসে সাপটার মাথায়। শবব্যবচ্ছেদ করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহাগী। এতক্ষণে যেন ভয় পেয়েছে খুব। আমার কাছ ঘেঁসে আসে। আমাকেও কী আতঙ্ক ভর করছে তখন। মেয়েটাকেও যা কয় খেয়ে নাকি? মরা সাপটাকে লাঠিতে তুলে পাঁচিলের বাইরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বুড়ো। নিশ্চয়ে হুঁকো সাজতে থাকে। পিঠে সোহাগীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস অনুভব করি। পরক্ষণেই আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে ও।

আকাশে কখন মেঘ। পশ্চিমে হাঁকরাচ্ছে। দীর্ঘ বিদ্যুতের রেখা বারবার। মাথার উপর চাঁদ লুকিয়ে গেছে কখন। হঠাৎ বাতাস বোবা! বাঁধের উপর ঘরগুলোর আশেপাশে কীটপতঙ্গের কলরব তখন স্পষ্টতর। আর সহজেই কানে আসে ডোঙা নৌকায় সবল বৈঠার ছপছপ শব্দ। আলো, প্রায় নগ্ন মানুষের দীর্ঘদেহ আর কে কাকে ডাকার আওয়াজ। কানে বাজে থেকে থেকে রুদ্র পৌরুষ হুঙ্কার। চাষাড়ে উচ্চারণে প্রমত্ত শব্দপুঞ্জ। সোহাগীর গলা শুনি—ডাকলম, হাঁক। বাজ হাঁকছে, বাক্কা। কিছু বৈষ্ণবিহৎ চাইলেই বলবে, হিজলে হাঁক।

তারপরই ভুম ভুম দামামার বাজনা। পশ্চিম দক্ষিণ কোণ থেকে বাঁধের বাঁকের মুখে। সেই সঙ্গে অনেক নারী-পুরুষের চেঁচামেচি। বুড়োর হাতের হুঁকো টলে পড়ে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর এক গর্জন। কানে খিল ধরে যায় আমার। এই শিথিল কণ্ঠের স্বর এত প্রখরতম হয় ভাবতে পারিনি। বুড়ো হাঁকরায় যেই ঘুনিয়রা হো—ও—ও—

সেই হাঁকের শেষপ্রান্ত 'ওঃ' দিয়ে ডুবে যায় ভারী বাতাসের নীচে। আর্তনাদ বলে মনে হয়। বুড়ো কাতরাচ্ছে যেন।

—ওঃ, পাহাড় সমান ধানরে, হায়, হায়..

এইবার বাতাস আসে শনশনিয়ে। ছেঁড়াখোঁড়া আওয়াজ দামামার। ঘোষকের কথা কানে আসে—আসেনা। সোহাগী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে, সায়েবের ঘের ভেঙেছে গো। আর রক্ষে নাই কারুর।

ভয় পেয়ে বলি, এখানেও জল উঠবে তো তবে!

খিল খিল হাসি ওর মুখে। আঙুলের ইশারায় উঠোনের প্রান্তে ঝাঁকড়া চুলো তাওড়াগাছটা দেখায়—ভয় কি, ঘুলার কিস্তী (নৌকো) তো আছেই। আর, মলেই বা কে কার?

ঠাট্টায় কান পাতি না। বলি ভারী সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে দেশটার।

আবার হাসি।—চিরকাল হয়ে আসছে। ভয় কি আপনার, মলে কাঁদার লোক তো নাই!

হেসে চোখ রাখি চোখে।—তোমার আ

চাপা গলায় বলে, আছে বৈকি।

—কে? আমিও স্বর মেলাই।

অমনি চুপ। তারপর ইশারায় বাপকে দেখায়। কেমন প্রচ্ছন্ন বেদনা পাই যেন। আবার বাইরে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু অমনি ঝিপঝিপ বৃষ্টি।

হাওয়ায় উঠতে হল। সোহাগী উঠোন থেকে সরে এল না। আলো যতটুকু, তাতেই দেখা যায় বেশ ওর চুলগুলো ভিজে ভারী হয়ে গালে জড়িয়ে যাচ্ছে বারবার। তীব্রভাবে কষুসা রঙের উপর কালো রেখার আন্দোলন।

অধর দাঁতে চেপে আছে। ঝকঝকিয়ে আলো উঠছে সেখানে। সরু নাকের একপাশে নাকছবি চুঁইয়ে জল পড়ছে বিন্দুবিন্দু। তাঁতের রঙীন শাড়ী অংগে জড়িয়ে গেছে, তাই অংগ রূপময় এক আবেশের মত। যেন এক অসহায় কাপুরুষের মত বসে বসে দেখা আমার; থাকে ঐ সীমায় পৌঁছোতে একটি জন্মান্তর ঘুরতে হবে।

কিন্তু বুড়োর সাড়া পাই। সস্বিৎ ভাঙে।—আচ্ছা সন্ধানেলে সময়ে এলেন বাপধন। এখন জীবন রক্ষে হয় কিসে গো! ভোঙাটাও দড়ি ছিঁড়ে কোথায় ভেসে গেল।

সোহাগী সরে আসে উঠোন থেকে। বলে, কুটুমের দুঃখু দেখতে এলে কিছু ভাগও তো নিতে হয়। হিজল দেশের কুটুম হওয়া অত সহজ নয়।

কিন্তু বলতে পারিনে যে এ আমার সখের আসা। হিজলের বান দেখতে আর তেরটি সালের সেই মহাপ্রলয়ে ডাঙাদেশে আমার বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া একটি বন্য যুবতী মেয়েকে দেখতেই এসেছি। সুযোগ পেলে যাব বলে কথা দেওয়াটার ভেতর আর কিছু কি ছিল না? ওস্তাদ বুড়ো বারবার বলে এসেছিল, পাচক্রোশ আবার পর বাপধন? নাইবা থাকল সুপথ, গাড়ীঘোড়ার বন্দোবস্ত, হাঁটতে হাঁটতে যাবেন সরীষের বাড়ী।

আর এই বাঙাপানা ডাগর মেয়ের প্রতিশ্রুতি ভুলতে পারিনি হয়তো।

—গেলে আসতে মন চাইবে না। নাহয় বিয়ে করে থেকেই যাবেন হিজলদেশে। হিজলে মেয়েতে মন না ভরলে আর কোন হতভাগী আছে বেহাতে মন ভরাবার? অবিশ্যি উপকারের ধার শোধ করার মত অবস্থা নয়, কিন্তু আমাদের মন কেমন, তার পরিচয়তো পেলেন না এখন!

তাই যেন আসার অবলম্বন। হিজলদেশের মেয়ে কী অদ্ভুত রোমান্সের ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল কথাটা তিনবছর ধরে। অথচ আজ সকালে সব সংশয় পুঁচ মায়ালোক মাকড়সার সুতোর মত ওর একটা কথার উদাম-ঝড়ে ছিঁড়ে উড়ে গিয়েছে কোথায়। ও বলছিল ছড়ার কথায়—হিজলে মেয়ের মন আর পদ্মপাতার পানি বুঝে চলবেন জানী॥ এ হচ্ছে ঘাঁটি ডাকপুরুষের বচন। বানের পানি ঢুকে পুকুরের পানি বের করে নিয়ে যাবেগো।

দাওয়ায় বাবুই চড়ির পাটে আমার শয্যা। ঘুমের কথা ভাবতে পারিনে।

বুড়ো বলল, শুয়ে পড়ুন বাপধন। আমরা বাপ-বেটিতে পাহারায় রইলাম। আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে কত কষ্ট দিলাম!

বললাম—না থাক। ঘুম আসবে না শুলেও। একটা রাত্তির জাগতে কি কষ্ট!

অমনি প্রতিবাদ!—উহু, কোনও ওজর নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমান। তেমন কিছু হলে জাগিয়ে দেব। আহা-হা, ভদ্দরলোকের ছেলে। বেজাতের বাড়ী এসে কী দুরাবস্থা দেখ দিকিনি!

কিন্তু ভারী ক্লান্ত আমি। সাঁ গড়াতে ইচ্ছে করে। চারপাশে প্রলয়ের উল্লাস, ঘুমতো আসার কথা নয়। বৃষ্টির জোর বেড়েছে। বেড়েছে বাতাসের বেগ। আকাশ থেকে মাটি অবধি কালো রঙের একখানা মোটা বৃষ্টিধারার নকসা বোনা চলেছে অবিশ্রাম। চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম। বাড়ী ফেরার পথতো নেই এখন। যে মিটোল গড়নের হলুদমাটির বাঁধের উপর উল্লাসে পথ কেটে এসেছি, সবগুলোই তার ভেঙে গেছে এতক্ষণ। বহরমপুর থেকে সাঁইথিয়া গামী পাকা সড়কে রনগ্রামের স্রীজের কিনারায় পুবদিকে মোড় নিয়ে বাঁধের উপর যেখানে আমার হিজলযাত্রা-পথের সুরু, সেখানে হয়তো কুল্ল জলতরঙ্গ বাজছে, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্তের হল মেচে চলেছে উন্মাদের মত। সেই সুন্দর সাঁইসাদা স্কুলে তরা কাঁটা-গাছের উপর এতক্ষণ গাঢ় হলুদজলের প্রলেপ। সকালে দেখে আসা প্রজাপতিগুলো এখনো হয়তো তাদের খুঁজে খুঁজে উড়ছে চক্রাকারে।

চোখ খুলতে হয়। বাইরে কার হুঙ্কার—ওস্তাদ আছেন ঘরে, ও ওস্তাদ! বৃষ্টি না মেনে ছুটে বেরোয় বুড়ো।—কে ডাকে হে?

বাইরে ঘর। শাখালার ঘর টলমল। বহুত লোক জমায়েত হচ্ছে গো!

ওটা ভাঙ্ কানাবৌর মিসে বড়ই সর্বনাশে করবে কিন্তুক। দিয়ে যাচ্ছি।

নিঃশ্বাসে মিলিয়ে বলে সোহাগী—সেই তেরশ তেষট্টি সাল আবার। চৈত্যায় ওস্তাদ, ডোঙা লাগাও যাব আমি।

খাটিয়ার নীচে থেকে কোদালটা টেনে বের করতে গেলে বাধা দেয় মেয়ে—তোমাকে যেতে হবে না আর। না, না—যা হয় হোক। তুমি না গেলেও যা হবে গেলেও তাই।

হাঁকডায় বুড়ো, কেনে? কি বললি?

হাত ধরে মেয়ে: পায়ে পড়ি বাপজী, যেওনা, কথা শোন।

—যাব না? সোহাগী হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলবি। হাজার হাজার হিজলে মরদ যেখানে বুক দিতে যাবে আমি যাব না রে হারামজাদী! ওরে আমার নাম হাঁসিল স্যাক, আমি যাব না?

থরথরিয়ে কাঁপি এই বস্তু উচ্চারণের প্রান্তে। হিজলের ঘুমন্ত পুরুষত্ব ঘুম ভেঙে আড়মোড়া দিয়ে উঠে বসেছে অনুভব করি। মাথায় ছেঁড়া লুঙি জড়ায় ওস্তাদ। ওজনে ভারী, বেগে তীব্র,- ধারে তীক্ষ্ণ কথাগুলো রাঙা পলিমাটি দিয়ে বানানো দেয়ালে এসে আঘাত করে। —যখন হিজলে অবৈ সমুদ্দুর সেই আদিকালে এই হাসিল স্যাক তার দলবল নিয়ে পেরথম বাঁধের পত্তন করে। দেখাদেখি রাজা জমিদারের টনক নড়ল। উনারাও যোগ দিলে আমাদের সংগে। লাঠির জোরে হিজলে জমি ভোগ করছি, চষছি, ফসল তুলছি এতকাল! কত বান, কত মরদ দেখে এলাম জীবনভোর! অমন তেরষ্টি সনেও হরিনি, আর এতো ছার।

পাগড়ী বাঁধা মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা শেষ হয়ে যায়। কোদাল ছিনিয়ে নিয়ে বলে—দেতো আমার লাটিখান, কী জানি ওপর ওয়ালা যদি বাঁধ কেটে দেয়, তবে রাজা কাসাদ লাগলে খালিহাতে মার খেতে হবে। শালা চোরের দল!

এবার দ্বিধা নেই। নিঃশব্দে হাতে লাঠি পৌঁছে যায়। বুড়ো বেরিয়ে যায় লাঠি আর কোদাল হাতে। মেয়ে দরজার চৌকাঠ ধরে পাথর। সবিস্ময়ে দেখি ওর চোখ জল টলমল।

বলি, তুমি কাঁদছ সোহাগী?

ছুটে ঘরে ঢোকে। ঘর অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। ঘরে কোন শব্দ নেই। বাইরে ডোঙা চলে যাওয়ার দ্রুততাল ছপছপ শব্দ। একসংগে অনেকগুলো।

মুহূর্তে অনুভব করলাম আমার স্নায়ুতরঙ্গে কী একটা কীট ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর মনের ভেজা আকাশে একটু সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে মারার নিশ্চিন্ত সুযোগ। শুয়ে শুয়েই ডাকবার জন্ত তৈরী হয়ে নিলাম। অমনি ভেতর থেকে মিষ্টি আওয়াজ, কুটুম!

সাড়া দিই গলা কেড়ে কি হল?

মিষ্টি স্বর।—ভারী আশ্চযি কাণ্ড চলছে কুটুম। কেন যে এমন হয়।

বুঝতে না পেরে বলি, কী?

শান্ত নিরুদ্বেগ জবাব।—এখন দেয়াল চাপা পড়ে মরণ মরার সাক্ষী থাকে একজন। তাহলে সে এসে খুঁজে না পেয়ে কেলেঙ্কারী করবে না কোনদিন।

রুদ্ধশ্বাসে শুধাই, সে কে?

—একটা মানুষ। জেলখানায় পচছে একটা খুনী মানুষ।

মাতালের মত বলছে মেয়েটা। কেমন সুন্দর আবেগ দিয়ে বলছে হিজলের মেয়ে তার 'মোনের' কথা। এটা জানতাম না। সেবার ওর কাছে বা বুড়োর কাছে ওর এ ধরণের কোন সংবাদ নিই নি। সেবার মত সাহসই হয়তো ছিল না। আর কি প্রয়োজন ছিল, এই অবগতিটার জন্ত সেই বিপদসঙ্কুল দুদিনে? পলকে সব অনুমান করে নিই। বলি, কত বছর?

—মোটমাট সাত বছর। তার মধ্যে চারবছর হবে আশ্বিন এলে, আর তিন বাকী। তা এখনো অনেকদিন। শুনতে শুনতে এই কথাগুলোর সংগে ওর নিঃশ্বাসের তীব্রতা অনুভব করার জন্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রাখি। বুঝতে পারিনে কিছুই। শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়াটা ছাড়ি সশব্দে।

ভেতরে ও কি করছে জানতে পেলে সুখী হতাম যেন। কিছু বলতে হবে ভেবে বলি—ভাত খেয়েছ তুমি।

অলস গলায় জবাব দেয়, যাইনি, খাব।

আলোর রঙ বাড়িয়ে দিলাম। খাট থেকে নেমে দরজার সমুখে দাঁড়িয়ে বললাম—ওঠ, খেয়ে নাও।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানা থেকে। অসংলগ্ন আবরণ সযত্নে করতে করতে বলল—হেই মা, কেনে? জোর করে খাওয়ালে জাত যাবে না আমার?

স্পষ্ট দেখছি ও এতক্ষণ কাঁদছিল। চোখ জুলোজুলো, গালে চুড়ির দাগ। হাতের চুড়ির উপর গাল রেখে সে এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিল। বললাম—এত দুঃখ কিসের সোহাগী, হিজলে মেয়ে...

কথা কেড়ে নিয়ে দুলে দুলে হাসে ও, হি...হি...হি হিজলে মেয়ে...হি হি...হি! আপনিকেও হিজলে ভূতে ধরল। খাচ্ছি বাপু ভাত। সকাল রাত্তির আছে।

বললাম—না, রাত্তির বেশী নেই। তিনটে বাজছে আর বড় জোর ঘণ্টা দুই।

—রেখে দাও মশাই ঘড়ি, আমাদের চোখ বড় না আপনার ঘড়ি বড়? ঘড়ি মানুষের তৈরী, আর এ চোখ খোদার। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সোহাগী। সরে আসি দরজা থেকে। আর তৎক্ষণাৎ নজরে পড়ে খাটিয়ার নীচে নীচু দাওয়ার প্রান্তে জলের হাসিমুখ। উধাও জলে থৈ থৈ।

সোহাগী বেরিয়ে এল ঝটপট।—ওমা, তাইতো!

ওর চোখেমুখে চাঞ্চল্য।—দু সতীনে মিলেছে, এবার রক্ষে কার! কিন্তু বাপজীটা কি যেন হয়ে যেয়েছে একেবারে, অথর্বর ধাড়ী। দেখদিকি এখন কি করি।

দুহাত কচলায় আর ঘন ঘন চোখের পাতা বোজে আর খোলে।

—কুটুম, বুঝছেন তো কাণ্ডটা। এবার রাতপোষাকটা খুলুন তো দেখি। হিজলে মরদ হতে হবে গো।

অনাস্বাদিত এক আতংক এসে আমার সংগে কুস্তি বাধিয়ে বসেছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করি, তারপর জামা খুলে ফেলি। কাপড়টা হাঁটু অবদি তুলে কাছা এঁটে দিই শক্ত করে।

অমনি এগিয়ে আসে।—উঁহু-হু মশায় অমন করে লয়। দেখেননি বুঝি এদেশের কাপড় পরা? এই এমনি করে। আর জামাটা মাথায় বাঁধুন। যেমন দেশ, তেমন বেশ নইলে চলে না।

বাধা দেবার আগেই ও আমার কাপড়খানা এমন করে তুলে দিয়েছে প্রায় উলঙ্গ হয়ে যাই আর কি।

বললাম—এইবার ঠিক হয়েছে। বল কী করতে হবে?

—কী আর করবেন। জিনিষপত্তর কিছু যা আছে। চাট্টি ধান, তালাই কাঁথা পেরস্থালীর সম্বল। দাঁড়ান বাইরে একবার দেখি, কোনখানে যাওয়া যায়। বলতে বলতে উঠোনের জলে নেমে গেল। হাঁটু ছাড়িয়ে উঠেছে জল। বৃষ্টির ধারা চলেছে তেমনি একটানা ঝিমঝিমিয়ে। কিন্তু মানুষের কোলাহল আরো তীব্র হয়ে উঠেছে, ক্রমশঃ বেশ শোনা যায়। ছাগলের তীব্র চীৎকার, মুরগীর করুণ আর্তনাদ ঘটনাকে আরো ভয়াবহ করে তুলছে। আর সেইসংগে এক সুকঠিন সত্যের মুখোমুখী হয়ে গেছি দুজনে। এবার আমাদের সরে যেতে হবে এখান থেকে—এই ক্রুদ্ধ জলরাশির নাগালের বাইরে একটুকরো নিরাপদ মাটির উল্লাসে।

কিন্তু তার আগে আরেকবার পেছন ফিরে ঘরের ভেতরটা দেখতে সাধ হল। অন্য কিছু না, সেই চায়ের পুরিয়াটাই যেন এখন দেখতে ইচ্ছে আমার। আর তখন সোহাগী ছুটে এসে আমাকে টানছে।—দেখে কি হবে কুটুম, চলে এস। ওর পায়ের লাথিতে জলন্ত হেরিকেনটা উঠোনের জলে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে চকিতে একবার দেখতে পেলাম ভেতরে দেয়ালে ঝোলানো ওর বাবার একতাড়াটা আর একটা বিরাট হাসুয়া।

আমার হাত ধরে আছে সোহাগী। সন্তর্পণে এক গলা জল পার হচ্ছি। তীব্রতম স্রোতে স্বল্প পরিসর খালটা পার হতে কত যুগ যেন কেটে যাবে। তবু হাত তো ধরে আছে একজন। মেয়ে হলেও সে হিজল কন্যা। বুকে তার দুরন্ত সাহস, হাতের আঙুলে অপরিমিত শক্তির স্পর্শ। আমার পুরুষত্ব লজ্জা পেল না। মুখ লুকোল না ঘৃণায়। সমস্ত সজাগ ইন্দ্রিয়ে প্রতি মুহূর্তে ছাপ পড়ছে এক উজ্জ্বল অনুভূতির—হিজল কন্যা আমার হাত ধরে আছে।

বাঁধের ওজন এটা। তাই এত স্রোত। শেষ রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকারে চারপাশে তাকিয়ে স্বস্তি আসে। আকাশে চাঁদের দিকে চাইতে পারিনে, চাঁদ মেঘে হারানো। ভয় হয়, এক নিঃসীম সমুদ্রে অন্তহীন নিরুদ্দেশে চলেছি

বুকি। সেখানে ঘর বাঁধার কথা
অজানিত পিপাসায় দুটির আবেশ।

চারপাশে চেয়ে স্বস্তি পাই। হাঁ, নিরন্ত চরাচরেই আছি। খাল পেরুলেই আশ্রয়। আশ্রয় আর এই মাঝী। হঠাৎ পেছন ফেরে ও। আমার দৃষ্টিকে পাশ কাটিয়ে দেখে নেয় ওদের লাজানো গেরস্থালীর এলোমেলো, ছেয়ে যাওয়া ঘরের চাল। চাপা গলায় বলে, বুড়ো লোকটা কোথায় থাকল কি জানি। হয়তো বাঙ্গা খেয়ে খুব খারাপ হয়ে গেল কে জানে। বারণ শুনলে না। আবার চুপ। কিন্তু কথা আসে না আমার। আমি নির্বাক।

আবার বলে ও, ফুটুস।

জবাব দিই না। শুনি।—কেন যন্তে এসেছিলে গো।

বলতে পারতাম, এই নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্যে তোমাকে এমনি নিবিড় করে পেতে। বললাম না। গলায় আটকে যায় কথা। কথা বলতে বুঝি কেঁদে ফেলবো, তাই ভয়। তাই চুপ।

মিটিমিটি মুখপোড়া, ফুটুস!

চোখে চোখ পড়ে। কিন্তু কিছু বলে না ও ঠোঁট কড়ে উঠেই চুপ। কিন্তু এই স্রোতাকীর্ণ খালটা পার হতে একটা জীবন বুঝি শেষ হয়ে যাবে। তা যাক্, বিমল বন্যা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। খেরুয়া জলের নীচে আমার মুঠির ভিজে-জমে-যাওয়া নিজীব হাত বাঁকিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে এক টুকরো মাটির কাছাকাছি।

আর কয়েকটি পদক্ষেপ মাত্র। তারপর পতিত জাঙ্গা একটা। শরবন কাঁটাঝোপ আর ছিন্নভিন্ন ভাঁট, বিষাক্ত জেলা গাছের জঙ্গল। সাপুকের খোলের মত গড়ন আয়নাটার। অর্ধসিক্ত আবরণটুকু নিঙড়ে ঠিকঠাক করে নেয় সোহাগী। ব্লাউজ-বিহীন বুকের ঐশ্বর্য ভুলে শাড়ীর স্বচ্ছতায় অবাক হয়ে চেয়ে আছে। খোঁপাটা খুলে দিতেই ঘনকালো কোঁচকানো চুল পিঠে উপ্‌চে পড়ে একটা প্রগল্‌ভ উল্লাসের মত। আঁচলটা ঝড়ির মত পাকিয়ে জল ঝেড়ে নেয় পেছন ফেরে। তখন চোখ ফেরাই অন্যখানে। চাইতে পারিনে বুকের দিকে। ঐ কবিতার চেয়ে এখন নির্মম সত্য চারপাশের চরাচরে উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাসে, আর্তনাদে বাতাসে।

বৃষ্টি বন্ধ। পাতলা আলো পুব দিগন্তে।

সোহাগী বলে উঠে, —তারপর, ফুটুস?

বলি, তারপর আর কী! জলে ডুবে মরার ভয় তো নেই। উপায় একটা হয়েই যাবে।

সোহাগী বলে, ডাঙাদেশের নৌকো তো আসছে না এবার? সবাই পায়নি বুঝি। এলে তোমার জেবনটা তো বাঁচতো গো!

দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলি, আসবেই। সারা জেলায় এতক্ষণ সংবাদ পৌঁছে গেছে। কিন্তু নৌকো এলে তুমি বুঝি যাবে না?

কোন কথা নেই। নিরাবরণ নগ্ন বুক আমার দৃষ্টির পেছনে রেখে বাতাসে আঁচল মেলে কাপড় শুকোচ্ছে। রনগ্রামের ব্রীজের কাছে বাঁধের গায়ে যেমনটি দেখে এসেছি, যেমনি কাঁটা ফুলের মেলা। সাদা ফুলে গাছগুলো ভরে আছে। এগিয়ে যেতেই সোহাগীর বারণ,—বন সোলাপ। কিন্তু যাবেন না ওদিকে, পোকামাকড়ের আড্ডা এখন।

হঠাৎ নিউরে উঠি। সারে সারে ফুটে জোঁকের দল কিলবিলিয়ে তাড়া করেছে। ঘাসের পাতা থেকে পাতায় লেজে ভর দিয়ে এগোচ্ছে বাঁকের পর বাঁক। গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে। পা ফুলে প্রায় মাচের মতন আর কী! হেসে ওঠে মেয়েটা।

বলে, চলুন, ঐ গাছটায় ওঠা যাক।

সেই ভাল। তাড়াতাড়ি পা ফেলে একটা ধূসর হিজল গাছে উঠে বসি দুজনে। গত বন্যায় প্রায় উপ্‌ড়ে দিয়েছে গাছটাকে। হেলে আছে এক পাশে। উপরের ডালে ঝুলে পা নাচায় সোহাগী। একটু নীচে আমি। কথা বলতে ইচ্ছা করে না। যেদিকে চোখ, সেদিকে শুধু জল; ডেকে যাওয়া ঘরের চাল—তাতে মানুষ, পশু-পাখী। আর ভাগ্যবানদের ডোঙা আর ছোট ছোট নৌকো। কিন্তু দূরে দূরে। ভাবলাম, ডাকি ওদের কাউকে। কিন্তু ডাক শোনা যাবে না হয়তো। গেলেও আমাদের মত আরো কত গাছের ডালে ডালে কাতরাচ্ছে বসে। তাদের চেয়ে অসহায় আমরা নই। বয়সে

ভরপুর যৌবন—দুটি যুবক যুবতী। নিপুণ ভঙ্গ করার সাহস আর শক্তি থাকতো সহজ কথা। আর কেন যে ভাবলাম, দুটি যুবক যুবতীর এই নিভৃত আশ্রয়কে মন্দ বলে মেনে নেবে লোকে। কেন যে মনে হল, এই প্রোষিত-ভর্তৃকা দ্বিজন কন্যার স্বামী ফিরে এলে এই কথাটাই হয়তো রটবে বেশী করে। আর কেন যে কামনা আমার এই অপালবিদ্ধা মেয়েকে কেউ কোন দিন কলঙ্কিনী না বলুক অন্ত মেজাজের দুর্গন্ধ মাখানো কোন অশ্লীল কাহিনী বানিয়ে। আর এতক্ষণে, মুহূর্তের জন্ত এক বিস্মৃত চেতনার সাড়া পেয়ে গেলাম, আমি হিন্দু, ও মুসলমান। সোহাগীও বুঝি তাই ভেবেছিল। ও তো কাউকে ডাকল না বাঁচাবার জন্তে!

নাকছাবিটা খুঁটতে খুঁটতে বলল,—কুটুম?

জবাব দিই,—বল।

—একটা কথা মনে আসছে। ম্লান হাসি ওর কথার সঙ্গে।

—কী?

—আরেক বানে বিন্দে সোহাগিনী এমনি একটা গাছে উঠে বসেছিল। বয়সবে সোহাগী মেয়ে। গাছেই পেসব। সাতদিন গাছেই রইল। শাঁখারীর বিলের কোলে একেবারে। কে জানে ওখানে মেয়েটা যেয়ে আটকেছে।

রুদ্ধশ্বাসে শুধাই,—তারপর?

—তারপর আর কী! সাতদিন পরে নায় নজরে পড়েছিল। তখন বান নেমে গেয়েছে। ভাল শকুনের হেঁড়াহেঁড়ি মড়া নিয়ে। মাথা নীচু করে বলছে ও।

বিরক্ত হয়ে যাই। ক্ষুব্ধ আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠি, তবু কেন যে এরা ঘর বেঁধেছে এদেশে!

চোখ তুলে তাকায়। বলে, সে তুমি বুঝবে না কুটুম। বুঝতে লেখাপড়া জানা লোক যখন, যদি আসতে শুদিনে। লাঠি, সড়কী আর বাঁশী, মাথায় গামছা বাঁধা হিজলে মরদ···নিশ্বাস ফেলে আরো বলে যায়। কান পাতি না। এ সব অনেক শুনেছি। হিজলের দুর্গম যৌবনের অবাধ আনন্দ, অবারিত কামনার নির্ভয় নিঃসংকোচ লীলাবিলাস, অনেক টের পেয়েছি এদে। আমিও বহু আবেগকে সংহতির অনুকূল পরিবেশ এ মাটিতে নেই জেনেছি। অথচ সেই উন্মুক্ত আদিমতার বর্বরতার অরণ্যে বেরতেও তো পেলাম নিষ্পাপ স্বাভাবিকতার শুচিশুভ্র ফুলটাকে। এ নেয়ে তো বলবেই, এমন ফুল হিজল দেশের ঘরের উঠোনে পথে ঘাটে ঘরে বিথরে ফুটে আছে। নীচে বিষাক্ত কাঁটা, এই সব বন-গোলাপের মতই।

কিন্তু পুব আকাশে সূর্য। সদ্যস্নাত নিরাবরণ সূর্য। কালকের মতই। এত মিষ্টি রোদ, এত উত্তেজক। প্রতি রোমকূপে শিহরণ। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আঃ, কী মিষ্টি, কী মিষ্টি!

আড়াল করা পাতাভরা ডালটাকে ভেঙ্গে ফেলে দিই। অনাবৃত নগ্ন দেহে সূর্যের আলোর মদির উষ্ণতা। যার যার আড়ামোড়া দিই, হাত পা ঝিঁঝি ধরিয়ে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি। বলি,—বড় মিষ্টি রোদ!

হঠাৎ হাত বাড়ায় সোহাগী। আমার কপালে তার হাত; আঙুলে আলতার ছটা। বলে,—কুটুম, তোমার জ্বর?

চমকে উঠি,—এঁ্যা!

কপালে বুকে সেই রাঙা হাতের চাপ।—সর্বনাশ, পানিতে ভেজা অভ্যেস নাই, জ্বর এসেছে কুটুম। ইস্ চোখ দুটো কী লাল হয়েছে তোমার! উঠে এস, এখানে উঠে এসতো! হাত ধরে টেনে নিজের কাছে তোলে আমাকে। মোটা ডালটায় জোর করে শুইয়ে দেয়। তারপর যা ভাবতে পারিনে, তার ঘর ভাবতে, তার নিটোল ভাঙতে আমার মাথা। কপালে মিষ্টি রোদের মত উত্তাপ আর রক্তাভ হাতের আঙুলের। চোখ বুজি আরামে। এ কেমন অপরিচিত জগত একটা। তবু ভয় কী, দ্বিজন কন্যা বিথরে। যদি জানি, সোহাগ!

দাড়া তো আসবেই,—এই যে আছি কুটুম, ভয় কী!

দ্বিজন কন্যা বিথরে পাহারায়। মৃত্যু এখানে পৌঁছাতে পারে না।

ভিন্নপথে কেদারবদরী

গণেশ লালওয়ানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাঁওয়ালি হতে মাগণ্ড দশ মাইল। মাঝে আর কোনো চটি নেই। যা আছে সে চ'-পকৌড়ির দোকান। ঠিক থাকবার মতো নয় কোনোটি। তাই পাঁওয়ালি হতে বেরিয়ে সবাই চলে যায় মাগণ্ড। সেখানেই স্নানাহার করে। আমাদের ইচ্ছা কিন্তু মাগণ্ডতে থাকবার নয়, একেবারে ত্রিযুগীতে চলে যাবার। ত্রিযুগী মাগণ্ড হতে চার মাইল উৎরাই।

দোকানে বসে চা খেয়ে নিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম, হঠাৎ আলাপ হয়ে যায় এক বাঙালী ছেলের সংগে। হঠাৎই। কারণ সে যে বাঙালী তা বুঝতেই পারিনি আমি। ব্রহ্ম যে কি করে বুঝল, তা সেই জানে। বাঙালীয়ানার কোন ছাপ নেই তার আকৃতিতে, না কথায়। তারপর ভাঙা ভাঙা বাংলায় সে যা বলল তার পনের আনাই হিন্দী। উচ্চারণও।

তার মুখেই শুনি বাড়ী থেকে যখন সে পালিয়েছিল তখন তার বয়স খুব বেশী নয়। তারপর নানা সাধু-সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে এইভাবেই সে ভেসে বেড়িয়েছে। দেখি আজো সেই ভেসে বেড়ানোর শেষ হয়নি। কোনো দিন হবে কিনা তাও জানি না। কিন্তু ভাবি এই জীবনে কি পেয়েছে সে?

একেবারে পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে আমাদের পথ—সেই পথ দিয়ে হাঁটছি আমরা। দুদিকে তাই বিরাট ফাঁকা। আর পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে নেমে গেছে দুদিকে। এখানে নেই তেমন গাছপালা, বা বিরাট বিরাট মহীরুহ। কাল যেমন তৃণাঙ্কুর দেখেছিলাম তেমনি তৃণাঙ্কুর। দূরের পাহাড় দূরে তাই হু হু করে বাতাস আসে ভীষণ ঠাণ্ডা আর দুরন্ত। মাঝে মাঝেই জল পড়ছে। আবার পর মুহূর্তেই রোদ উঠছে। মেঘে মেঘে আলোছায়ার লুকোচুরি। কাদের ছেলে আবার কেঁদে ওঠে কাণ্ডীতে। কাণ্ডীওয়ালা কাণ্ডী নামিয়ে কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছে না। কম্বল জড়িয়ে দিচ্ছে তার চারদিকে আরো ঘন করে। কিন্তু দিলে কি হবে?

এমনি সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে যমুনোত্রীর পথে এক-জনাকে, ব্রহ্ম বলেছিল কেন নিয়ে এসেছ এদের এখানে কষ্ট দিতে। কি বোঝে ওরা, কি-ই বা মনে থাকবে ওদের?

শুনে বোধহয় রাগই করে লোকটি। বলে, কষ্ট? বল ভাগ্য। ওদের ভাগ্যে ছিল, তাই আসতে পারল, ওরা ধন্য হল।

তাই সেকথা বলবার সাহস নেই। তবু এগিয়ে যেতে যেতে যাদের দেখি বলি, ওগো কাদের ছেলে রয়েছে কাণ্ডীতে। সে যে কেঁদে খুন হল। গিয়ে দেখোগে।

পাহাড়ের মাথার ওপরের পথ প্রায় শেষ হয়ে গেল। আবার এলো বন, এলো জংগল। মাগণ্ড আর দূরে নেই শুনি। কিন্তু কি রাডোডেনড্রনই না ফুটে আছে এখানে। তবে যমুনোত্তরীর পথে যেমন লাল দেখেছিলাম তেমন লাল নয়, গোলাপী।

আবার পাই ফুলের সমারোহ। নীলফুল লাল ফুল। কত রঙ কত বৈচিত্র্য। নীল ফুল অনেকটা জটা ফুলের মতো। সাদা ফুলও আবার কত। এক এক জায়গায় মনে হয় পাহাড়ের গায়ে পড়ে রয়েছে একরাশ রংবেরংচি।

মাগণ্ডর পথে বরফ পাওয়া যায় শুনেছিলাম—এবার চোখেও দেখি। দুপাশে পাহাড়ের গায়ে তুষারপাত হয়েছে। তারপর খানিকটা এগিয়ে যেতেই একেবারে পথের ওপর। সেই নরম তুষার পা পা করে মাড়িয়ে যাই। পায়ে পায়ে সাদা তুষার ময়লা হয়ে ওঠে।

বৃষ্টি হয়েই পথটা পেছল হয়ে গেছে। পা টিপে টিপে তাই নামতে হচ্ছে। একেবারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথটা। আর পা হড়কালে দেখতে হবে না। তাই অত সন্তর্পণে নামা। আধ ফার্লঙও নয় কিন্তু ওরি মধ্যে ঘাম ঝরিয়ে দিলে। তারপর আবার সমতল পথ।

বেলা এগারোটার কাছাকাছি আসি মাগণ্ড। কিন্তু সেখানে থাকি না। প্রায় সাথে সাথেই নেমে যাই ত্রিযুগীর দিকে। পথ হতেই দেখি প্রভুদয়াল বাসনপত্র নিয়ে চলেছেন রান্না ঘরের দিকে। তাহলে ওঁরা এবেলা এখানেই রয়ে গেলেন দেখছি।

হু হু করে নামছি। ওপর হতে বল গড়িয়ে দিলে যেমন নামে অনেকটা সেইরকম। কেবল লাঠিখানা মাটি ছুঁইয়ে যাচ্ছি মাত্র যাতে ধপাং করে পড়ে না যাই। হাঁটুর ব্যাথাটা আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। উৎরাইতেই আমার যত কষ্ট।

জায়গাটাও আবার ভারী জল-জলা। কেমন যেন স্যাঁৎসেঁতে। মাছি না কি গায়ের কাছে বিন বিন করছে। দাঁড়াতে তাই কোথাও সাহস হয় না। আর দাঁড়াবই বা কি করে? প্রায় একছুটেই তাই চার মাইল পথ আমরা নেমে এলাম।

বোধহয় একটার কাছাকাছি আমরা ত্রিযুগীর মাটি স্পর্শ করলাম। দূরে দেখলাম একটা গ্রাম, বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। ঘরবাড়ী, ঘন লোকালয় ও বসতি। এক ধরণের পাখী দেখি আজ নূতন। পায়রার মতো কিন্তু লেজ কি ভয়ানক লম্বা। 'হিমালয়ান পিজিয়ন' নয়ত।

আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে দেখি যে পথ এসেছে নীচে হতে ত্রিযুগীনারায়ণ। ব্রহ্মকে বলি গজোত্তরীর পথ এবারে আমাদের শেষ হল—এবার ভগবান বদরিকানাথের সদর দরবারে এসে গেলাম আমরা।

ত্রিযুগীতে ঢুকবার মুখে কেমন যেন এক নৈঃশব্দকে অনুভব করলাম। জানিনা এ নৈঃশব্দ সকলেই অনুভব করেন কিনা। কোথাও কোনো শব্দ নেই নয়, শব্দ রয়েছে কিন্তু আমি যেন সমস্ত শব্দের ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ত্রিযুগীতে পথের দুধারে দীর্ঘ দীর্ঘ যে বেতমঞ্জরীর আলোদণ্ডগুচ্ছ দেখি সেও আবার অপূর্ব। ফুলত নয়, ফুলের ফুলঝুরি। মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হয়ে তারা যেন আমাদের অভ্যর্থনা করে নিল।

মন্দিরে যাবার পথের ওপরেরই এক পাণ্ডার আবাসে উঠি আমরা। মন্দির খুব দূরে নয়, আর বাজারের মধ্যেই। সেইখানে বসে তাই সবকিছু দেখা যায়।

তারপর মন্দিরে গিয়ে স্নান করি সরস্বতী ও গঙ্গার ধারা দিয়ে যে চারটি কুণ্ড হয়েছে তার একটি কুণ্ডে নেমে। কুণ্ডটির নাম রুদ্রকুণ্ড। পাশে বসে রুদ্রকুণ্ডে স্নান, বিষ্ণুকুণ্ডে মার্জন। ব্রহ্মকুণ্ডে আচমন আর সরস্বতী-কুণ্ডে তর্পণ। কিন্তু স্নান করে উঠতে না উঠতেই ভোগ রাগের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বেলা তখন দুটো।

চারটের আগে মন্দির আর খুলবে না। তাই ভাবি সেই পেটেদেয়েই আসব মন্দিরে। কিন্তু ব্রহ্ম ছবি নিতে আরম্ভ করেছে মন্দিরের, তাই মন্দিরের সামনের সিঁড়িতে এসে বসি।

পাণ্ডাদেরই একটি ছেলে দরজার ডানদিকের একটা মূর্তি দেখিয়ে সবাইকে বলছে হরপার্বতী হরপার্বতী জল দাও এখানে, পয়সা দাও। কিন্তু একি হরপার্বতী, এযে নারায়ণের অনন্ত-শয়ন। হায় ভগবান!

মন্দিরে আসি আবার বিকেলে। নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। নারায়ণ সাক্ষী করে শিবপার্বতীর বিবাহ হয়েছিল এইখানে। দেখি সেই নারায়ণ মূর্তি ও তাঁর পাশে লক্ষ্মী ও ভূদেবীকে। আর দেখি সেই অগ্নি যে অগ্নি তখন সপ্তপদীর জন্য প্রজ্বলিত করা হয়েছিল, সেই অগ্নি আজও জ্বলছে অনির্বাণ। তিন যুগ হতে অগ্নি জ্বলে আসছে এখানে তাই ত্রিযুগী। সেই হোমাগ্নিতে যাত্রীরা কাঠ কিনে ফেলে দিচ্ছে, আর হবন করছে। চিড়বিড় করে কাঠ পুড়ছে। আমরাও কাঠ কিনে সেই আগুনে আর হবন করি। তারপর সেই পাথরে বাঁধানো হোমকুণ্ড হতে ছাই তুলে কপালে আর বুকে মাখি, কিন্তু কাপড়ে করে কাপড়ে বেঁধে নেই—সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

সেরাত্রি ত্রিযুগীতেই ছিলাম—পরদিন বেরুলাম আবার সেখান হতে।

দেবপ্রয়াগের পথে যাঁরা যান ত্রিযুগীনারায়ণ তাঁদের চড়াই এবং সেও কেদারনাথের পথ হতে খানিকটা সরে গিয়ে। কিন্তু আমরা ওপরের পথ দিয়ে এসেছিলাম বলে—কাল যেমন পেয়েছিলাম উৎরাই, আজ আবার পেলাম তেমনি উৎরাই। মাইল দুই নেমে এলাম তাই শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরে। পথের ধারেই ছোট্ট তাঁর মন্দির। ভেতরে কাল পাথরের ছোট্ট

একটা আঁজাবেসা টুকরো টুকরো কাপড়ে ঢাকা মূর্তি। শুনি এই শাকম্ভরী দেবীর আর এক নাম মনসা।

পূজারী বলেন, সে অনেককালের কথা যখন মুনি-ঋষিরা এখানে তপস্যা করতেন। তারপর যখন তাঁরা রক্তবীজের অত্যাচারে অস্থির হলেন তখন এই শাকম্ভরী দেবীর শরণাপন্ন হলেন। দেবী এইখানে প্রকট হয়ে তখন রক্তবীজকে বধ করেন। দেবী সেই হতে এখানেই আছেন। এঁকে চীর দাও।

ঠিক বুঝতে পারি না কেন তাঁকে চীর দেব। জিজ্ঞাসা করতে বলেন, সে অন্য কথা। ঐ যে নীচে সংগম রয়েছে, সোম ও মন্দাকিনীর সংগম, সেখানে স্নান করতে এসে দুর্বাসার কৌপীন ভেসে গেল। দ্রৌপদীও এসেছিলেন তখন সেই সংগমে স্নান করতে। তিনি তাড়াতাড়ি আঁচল ছিঁড়ে তাঁকে চীর দিলেন। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টান দিল তখন তাঁর কাপড় যে অফুরন্ত হয়ে গেল সেত সেই চীরের জন্য।

পথ দিয়ে নামতে আর স্বস্তি পাচ্ছি না। ডাণ্ডী আর ঘোড়া। পদে পদে এমনি যদি থামতে হয় তাহলে পথ চলাই দুষ্কর। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। আর মানুষের ভীড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে মনে যে পথ পেছনে ফেলে এলাম তার সংগে এর তুলনা করি। ওপথ অনেক বেশী শান্ত ছিল অনেক বেশী নির্জন।

আরো খানিক নেমে আসতেই তারাদত্ত বাঁদিকের পথ দেখায়। বলে ডানদিকের পথ গেছে রামপুরে। যারা নীচে থেকে ত্রিযুগী আসে তারা ওইপথে আসে তারপর এই পথ হয়ে নেমে যায় সোনপ্রয়াগের দিকে। সোনপ্রয়াগ হতে চলে গেছে সোজা কেদারের পথ।

সেই পথ দিয়েই নীচে নামি। নামতে নামতে কোথায় যে এসেছি কে জানে। সেই কাল থেকেই নামছি। নামা মানেই আবার ওঠা।

অনেকখানি এসে শুনতে পাই জলের প্রবল গর্জন। ব্রহ্ম বলে তাহলে এসে গেছি সোনপ্রয়াগ কি বল? সোম ও মন্দাকিনীর এই সংগম।

পুল পেরিয়ে পারে আসি। গৌরীকুণ্ডের পথ আবার খাড়া চড়াই। তারাদত্ত বলে এখন কেবল চড়াই আর চড়াই। সেই কেদারনাথ পর্যন্ত।

তা হোক। চড়াইকে আর ভয় করিনা। তার ওপর ব্রহ্ম বলে রেখেছে আজই যাব আমরা কেদারনাথ। এবেলা গৌরীকুণ্ড নয় একেবারে রামবাড়া। তাই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলি।

মাইলখানেকও আসিনি। বাঁদিকে ছোট একটা পাথরের গাঁথনির ঘরে দেখি মুণ্ডকাটা গণেশ। তেল সিঁদুরে একাকার।

গণেশ মুণ্ড হারিয়ে ছিলেন জন্ম নিয়েই শনির দৃষ্টিতে। নবজাতকের মুখ দেখতে এসেছিলেন শনি। তখন হুলুস্থুল কাণ্ড। শেষে কেটে আনা হল শ্বেতহস্তীর মুণ্ড। সে উত্তরদিকে মাথা করে শুয়েছিল। সেই মুণ্ডই জুড়ে দেওয়া হল গণেশের মাথায়, তাই গণেশ হস্তীমুণ্ড। ছেলেবেলায় তাইত মা কখনো উত্তরদিকে মাথা করে শুতে দিতেন না। বলতেন শুতে নেই। শেষে কি হতে কি হয়। সবকিছুরই এখন আবার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না দিলে চলে না। তাই বড় হয়ে যখন ওকথা উড়িয়ে দিতে গেছি তখন শুনি তা নয়, তা নয়। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণে 'ম্যাগনেটিক ফিল্ডস' রয়েছেত। উত্তর দক্ষিণে সর্বদাই কারেন্ট চলে—যেজন্য কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে মুখ করে থাকে।

সে যা হোক্। গণেশত মুণ্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু এ কোন গণেশ? পূজারী বলেন, সে বুঝি জাননা। শিব-পার্বতী ঘরে ছিলেন গণেশ হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েন। দেখে পার্বতী লজ্জা পান। রাগে ছেলের মাথা নেন। তবে মা হয়েত সত্যিকার ছেলের মাথা নিতে পারেন না। তাই মাটির গণেশের। এই সেই গণেশ।

মুণ্ডকাটা গণেশ হতে গৌরীকুণ্ড তিন মাইল। বেলা নয়টায় এসে পৌঁছাই আমরা গৌরীকুণ্ডে।

গৌরীকুণ্ডেত থাকছিনে এবেলা, কেবল স্নান। তাই কুণ্ডের কাছের এক দোকানের রোয়াকে বসে জামা কাপড় ছাড়ি।

গৌরীকুণ্ডেত উষ্ণ জলের কুণ্ডের কথাই শুনেছিলাম কিন্তু দেখি শীতল জলের কুণ্ডও আবার রয়েছে এখানে একটা। তারাদত্ত বলে, অমৃত কুণ্ড। আগে এইটাতেই নাকি নামতে হয়। নামিও। জল কেমন মরচে ধরা, হলদেটে, গন্ধটাও তেমনি। তারপর সেখান হতে ভিজে

কাপড়ে গিয়ে উষ্ণ কুণ্ডের জলে নামি। জল একটু সইয়ে সইয়ে নামতে হয়। বড় সমান জল।

শীতের দেশে উষ্ণ জলের কুণ্ডে নেমে থাকতে লাগে। প্রথমটাই যা একটু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে। কিন্তু যেখানে পেতলের গোমুখ হতে জল পড়ছে কুণ্ডটিতে, তার নীচে দাঁড়ায় কার সাধ্য। তবুও হুট পুট করে যাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। গোমুখের মতটা কাছে থেকে স্নান করা যায়।

কুণ্ড থেকে স্নান করে উঠে কাপড় নিঙড়োতে যাই। বলে, এখানে কাপড় নিঙড়ানো চলবে না, যাও মন্দাকিনীতে। ভারি মজা ব্যবস্থা নয়, শীতল জলের কুণ্ডে নেয়ে এসে নাম এই উষ্ণ কুণ্ডে। তারপর যাও আবার মন্দাকিনীতে। মানে এখানের সবখানের সব জলই ছুঁইয়ে নেয়ে এরা। তাই যাই মন্দাকিনীতে কাপড় নিয়ে। স্বর্গের নদী মন্দাকিনী। গৌরীকুণ্ড গ্রামের মধ্যে দিয়েই চলেছেন তিনি একেবারে পাহাড়ের গা বেয়ে। কূল টুল তাই কিছুই নেই। দূর হতেই শোনা যায় মন্দাকিনীর হুঙ্কার। কাছে আসতেই মনে হয় এই বুঝি সবনাশ ঘটল এই বুঝি সব ভাসল জলে, কাপড় কেচে তুলি তাই কোনমতে। তারপর মন্দিরে যাই।

গৌরীকুণ্ড গৌরীর জন্মভূমি, শুধু তাই নয় গৌরী যৌবন প্রাপ্তও হন আবার এইখানে।

গৌরীকুণ্ডে চা খেয়ে নিয়েই আবার তখন তখনি বেরিয়ে পড়ি। ভিজে কাপড় আলাদা করে বেঁধে নেই কপ্‌পুরের পীঠে। রামবাড়ায় শুকিয়ে নিলেই হবে।

গৌরীকুণ্ডের পর এক মাইলেরও ওপর চড়াই। রোদ উঠেছে এখন, আর বেশ কড়া। তাই হাঁটতে কষ্ট। পথের দুদিকে কিছু কিছু গাছপালা আছে অবশ্য, তবে তাদের ছায়া পথের ওপর এসে পড়ে না। তাই যখন চীরপটিয়া ভৈরবে এলাম তখন ঘামে নেয়ে উঠেছি। পিপাসায় কণ্ঠ এবং তালু সব শুকিয়ে উঠেছে।

চীরপটিয়া ভৈরব এখানকার ক্ষেত্রপাল। পূজো করে বস্ত্র দিলে তবে নেমে কেরার দেদি গাছের ডালে ডালে কাপড়ের টুকরো ঝোলানো। যেমন দেখেছিলাম জানকীবাই চটি হতে যমুনোত্রীর পথে ভৈরব মন্দিরে।

কয়েকটি নতুন "সোভিয়েত দেশ" পুস্তিকা

১। কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনার পূর্ণতর সদ্ব্যবহার
(এন. এস. খ্রুশ্চফের রিপোর্ট)

২। সোভিয়েত কলকারখানায় কর্ম-ব্যবস্থা (প্রশ্নোত্তর)

৩। শিশুদের লালন পালন (চিকিৎসকের পরামর্শ)

৪। আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ—নিরস্ত্রীকরণ—এন. এস. খ্রুশ্চফ

৫। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি
—এন. এস. খ্রুশ্চফ

সোভিয়েত অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা

:: অর্ডার দিবার ঠিকানা ::

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১/১ উড ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১৬

মন্দিরের বোয়াকের একটুখানি ছায়ায় উঠে বসি। জল চাই পূজোরীর কাছে, আগে জল খাই, তবে পূজো। পূজোরী জল দেয় খাঁজলায় ঢেলে।

জল খেয়ে ভৈরবকে পূজো দেই। কাপড় দেই।

চনচনে রোদ। এই রোদে কেই বা আর হাঁটে—এক আমাদের মত যাদের মাথা খারাপ হতে যায়নি। তাই পথ এখন বেশ ফাঁকা। দু একজন দোকানী লোক ছাড়া আর কেউ নেই। সামনে থেকেও আসছে কেদার ফেরত দু' একজনই লোক আসছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে যাচ্ছে জয় কঠিন কেদার কি, জয় কেদারনাথ কি।

পথের একটা বাঁক ঘুরতেই সামনেই দেখতে পাই তুষারাবৃত এক পাহাড়। ব্রহ্ম আমায় দেখিয়ে বলে, ওইটিই বোধহয় কেদার শৃঙ্গ।

তাই বোধহয়। এখন বাঁকে বাঁকেই দেখছি তাকে।

রামবাড়া আর মাইল দুই।

এ পথে মাইল পোষ্ট রয়েছে। তাই হিসেবের ভুল হবার উপায় নেই।

হাঁটতে হাঁটতে ছায়াময় পথও পাই খানিকটা। আর জলের ঝর্ণা। একটা সীঁথির কাছে সামনের পাহাড়ের গা দিয়ে দেখলাম নামছে এক জলধারা। একেবারে পাহাড়ের গা দিয়ে তাই নামছে কি নামছে না বোঝা যায় না। মনে হয় কালো পাহাড়ের গায়ে ঝুলে রয়েছে একখানা সাদা সুতো।

রামবাড়া চটির বোধহয় কাছে এসে আবার দেখলাম এক 'সাওয়ার বাথ'। ওপরের পাথর হতে পথের ওপর শতধারায় জল পড়ছে। ইচ্ছে করছিল দাঁড়িয়ে যাই ওর নীচে, স্নান হয়ে যাবে। কিন্তু স্নান আর হয় না। সঙ্গে অন্য কাপড় নেই। তাছাড়া চটিতে গিয়ে এত দূর আবার ফিরে আসতে পারব না।

রামবাড়ায় যখন এসে পৌঁছুই তখন বেলা বারটা। রান্না হতে ও খাওয়াদাওয়া সারতে ছুটো। একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হয় না। এখানে আসবার পর থেকেই আকাশে যেমন মেঘ জমতে সুরু করেছে তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। যদি বৃষ্টি নেমে যায়, আর বেরুতে পারব না। অনেক যাত্রীও আবার ফিরে গেল আমাদের আসবার পর পরই। সবাই বলছে শক্ত চড়াই। গৌরীকুণ্ড হতেই চড়াই বটে তবে শেষের চার মাইল নাকি খুবই কঠিন।

কিন্তু সত্যি বলতে কি চড়াই যত না কঠিন, এরা ভয় দেখায় তার দশগুণ। যাত্রীদের কথা বলছিনে, কি যাঁরা কেদার হয়ে এলেন। এই ঘোড়া ও ডাণ্ডী ওয়ালারা। ওরা যাত্রীদের ভয় দেখায়। এত দূর ত যেমন তেমন এসেছ, এর পর আর যেতে পারবে না। শেষে কি পথের মধ্যে পড়ে থাকবে। তাই ঘোড়া করো, ডাণ্ডী করো—যদি যাতায়াতের না করো ত শুধু যাবারই করো। যাত্রীরাও একটু ভয় পায়। তখন ঘোড়া করে কি ডাণ্ডী।

যতক্ষণ বাঁধা ছাঁদা হয় ততক্ষণ বাইরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের কাণ্ড দেখি। ডাণ্ডী ও ঘোড়া-ওয়ালাদের এখানে কি ভীড়!

রামবাড়ার চটিটাও বেশ বড়। আর হবে না কেন, কেদারের পথে এই শেষ চটি। এর পরেই তুষার-তীর্থ কেদারনাথ।

তারাদত্ত বেরিয়ে আসতেই জয় কেদার কি বলে সামনের দিকে পা বাড়াই।

ডানদিকে মন্দাকিনীর খদ। ওরই বাঁ পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ উঠে গেছে ওপরের দিকে। অগণিত যাত্রী চলেছে—পাঞ্জাবী, বাঙালী, মারাঠী, গুজরাটি, রাজস্থানী মেয়ে পুরুষ শিশু যুবা বৃদ্ধ। কত রকমের কাপড় কত রকম কাপড় পরবার ভঙ্গী। মনে হয় যেন সমস্ত ভারতবর্ষই তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছে। এদের ভাষা ভিন্ন, ভিন্ন এদের আচার ব্যবহার। এমন কি সুখ দুঃখও। কিন্তু দেখছি একখানে তারা এক। সেখানে তাদের ধর্ম। এই ধর্মই তাদের ধরে রেখেছে—

খানিকটা ওপরে আসতেই শুনতে পাই মন্দাকিনীর গর্জন। তারপর দেখতে পাই কিভাবে লাফাতে লাফাতে তীব্র আবেগে মন্দাকিনীর জলধারা মর্ত্যের দিকে ছুটে চলেছে।

কঠিন কেদার, দুর্গম কেদার, আরোহণের স্বপ্ন কেদার—সেই কেদার আর দূরে নেই, তখনকার মনের অবস্থা বলে-বোঝাই এমন ভাষা কই আমার? বুঝতে পারি একটা অনাস্বাদিত আনন্দ আমার সমস্ত সত্তাকে উদ্বেল

করে তুলেছে! আমি যেন ধরে রাখতে পারছিনে নিজেকে—আমি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

বোধহয় সেই চাকলোই সেই কঠিন চড়াই পথও তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলাম। পেরিয়ে গেলাম একে একে সকলকেই। এমন কি যারা রামবাড়ায় আসতে পথে বেরিয়েছিল তাদেরকেও। তারাও আমায় দেখে হতচকিত। হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সত্যিই সেদিন আমার নিজের ওপর নিজের কোন অধিকার ছিল না। তাই ভালো করে দেখিওনি কিছু। শুধু মনে আছে একটার পর একটা মাইল পোষ্ট পেরিয়ে গেলাম। দম নেবার জন্যও সেদিন এক মুহূর্ত কোথাও দাঁড়াইনি।

মাইল তিনেক চড়াই ভেঙে এলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। এরা চার মাইল চড়াই বলে কেন জানি না। ওই তিন মাইলই যা চড়াই। শেষের এক মাইল চড়াই নয়। সমতল পথ। ট্র্যাণ্ড রোডে যেমন পাথর দিয়ে বাঁধির করা অনেকটা সেই রকম।

পেছনে ফেলে এসেছি দেবদর্শনী, কেদারনাথের জয় ঘোষণা করে যে তূর্য-নিনাদ করছিল সেই তূর্য-নিনাদ-কারীকে। কিন্তু কি দেখছি? দেখছি তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের রমণীয় সেই মন্দির। কিন্তু তার চাইতেও রমণীয় তুষারাবৃত ত্রিকোণ এক গিরিশৃঙ্গ। না, না, গিরিশৃঙ্গ ত নয়—স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তেমনি রজত গিরিনিভ ও তেমনি চারুচন্দ্রাবতংস।

সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছিলাম সেই অশিবকে।

কাঠের বোঝা নিয়ে যায় কাঠুরে। ঝাড়ু দিয়ে যায় ঝাড়ুদার। এটুকু পথের কি ভার নেয় এরা। এখানে কেবলই পাথর আর পাথর। আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ঘাসের চাপড়া। ডানদিকে মন্দাকিনীর খাদ। দুটো পাহাড়ের বাহু গিয়ে মিলেছে কেদারনাথের পেছনে।

মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে যাই ওপারে যেখানে মন্দাকিনী ও দুগ্ধগঙ্গার সংগম। জলের সে কি আবর্ত! প্রবল গর্জন করতে করতে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে দুগ্ধগঙ্গা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন মন্দাকিনীর বুকে। যেন দুই বোনে গলাগলি। খানিকটা নেমে গিয়ে একেবারে মন্দাকিনীর ধারে গিয়ে বসি।

ব্রস্ত এলে পাণ্ডা পান্নালালের আশ্রয়ে গিয়ে উঠি। তারপর সন্ধ্যার পর মন্দিরে যাই। হিমাচ্ছন্ন পাহাড়ের গায়ে সেই পথ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানে ভগবান কেদারনাথের মন্দির। মন্দিরের পেছনে আর পথ নেই। ওখান হতেই স্বর্গারোহণী। স্বর্গ ও মর্ত্যের এই এক সীমা। কেদারনাথের যে সৌন্দর্য আমার তো মনে হয় সে এই কারণেই।

রাত্রের অন্ধকারে আজ আর কিছু ভাল করে দেখা হয় না। শুধু দেখি মন্দিরের সামনে প্রস্তর বেদীকার ওপর মন্দিরের দিকে মুখ করে বসা বিরাটকায় এক নন্দীশ্বর। দরজার মুখে গণপতি। ভেতরে ভগবান কেদারনাথ। ছাদের আলোয় আলোকিত। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যারতি দেখি তারপর ঘরে ফিরে আসি।

রাত নটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। পান্নালাল বলে গেলেন, তাড়াহুড়ো করে সকালে উঠবার দরকার নেই। মন্দির খুলবে আটটায়। রোদ না উঠলে এখানে আর কেই বা ওঠে!

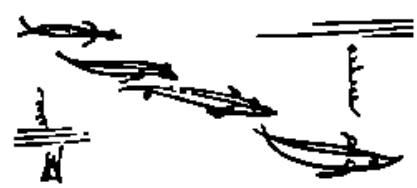

যন্ত্রণার মুখ | পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সমস্ত মুখেই তার চিত্রিত এ-যুগের যন্ত্রণা।
অথবা প্রতীক বুঝি বিধ্বস্ত এ নগর আত্মার।
যত দৃশ্য গড়ে, হেসে, অনায়াসে ভাঙে পুনর্বার,
স্থির শান্তি শূন্য-কুম্ভ।
নাভিদেশে নৃত্য করে উষ্ণ রক্তকণা।

"হৃদয়ে বাঁচবার সাধ বিলাসিতা? হে দুঃখ আমার!
প্রেম, তুমি পরাজিত নিষ্পিষ্ট বিকৃত পদতলে।
কে আর জননী হবে যদি তৃষ্ণা মেটে সুকৌশলে?
স্বেচ্ছায় আশ্রিত হবো নগ্ন-বুকে বারবণিতার।

তিনটি বুদ্‌বুদ হয়ে মিশে যাবে মদের গেলাসে
তিনটি শূন্যতা।—আমি পান করে ত্রিকালজ্ঞ জানো।
ছায়াহীন বৃক্ষ, পরিচয়-হীন আমার সন্তান ও
মাতৃজঠরেই পুনঃ ফিরে যাবে। রমণী বিলাসে

অন্ধকার গড়ে হবে, মুছে যাবো বিন্দুর মতন"—
বলে সে হাসলো।—মুখে সুগভীর যন্ত্রণা তখন।

বেতার | দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

পাখির আনন্দ ছিলো একদিন হৃদয়ের নীড়ে
আকাশের স্বপ্ন আর সমুদ্রের নীল
জানি এ জীবনে আর আসিবে না ফিরে,
এ মন পাবে না ফিরে সে কুমারী-মনের নিখিল

আর কোনদিন।—সে আশ্চর্য রামধনু-মন,
আকাশ-সম্ভবা সেই স্বয়ম্ভু হৃদয়,
বিশ্ব-লেহী বিস্ময়ের সেই স্বপ্ন-কণা
আজ ক্লান্ত, নতমুখ, নিরুত্তাপ, নিরাবেগময়।

হিসাবের চক্রব্যূহে অবরুদ্ধ অভিমন্যু-কাল :
সমুদ্র-হৃদয় নিঃস্ব 'ল্যাগুণ' এর জল,
সে অতল অভ্রনীল উদার বিস্তার
অনন্তের ছন্দহারা অগভীর, স্থবির পঙ্গল।

আকাশ-বঞ্চিত পাখি : ডানা ঝাড়ে সীমিত ইথারে :
আনন্দের নাভিশ্বাস সংগীতের যান্ত্রিক বিকারে।

বুদ্‌বুদ | গোরাচাঁদ নন্দী

প্রাণপ্রস্থে বনং ব্রজেৎ
পড়তে গিয়ে দেখি কোথায় বন?
চারিদিকেই ইট-কাঠ, পাথরের জঞ্জাল
সোনা-রূপো লোহার বেড়াজাল।

ইচ্ছে হয়,
যদি এক চাপড়ে সব গুঁড়িয়ে
ধূলিসাৎ করে দিতে পারতাম।
তাহলে খানিক মাটি পাওয়া যেতো
যেখানে মানুষের ভালোবাসা শেকড় নিয়ে
স্বস্তিতে ডালপালা মেলতে পারতো।

এরা বলে নতুন মানুষ তৈরি করবে :
ভয় হয়,
এরা ভুলে যাবেনাতো
মাথার সামনে চোখ দুটো বসাতে,
গলায় গান দিতে, বুকে স্বপ্ন দিতে
যাতে সে অবাধে আকাশের দিকে
হাত দুখানা তুলে ধরতে পারে
লোহা আর কংক্রিটের চাপে
তার শ্বাসরোধ হয় না
চোখ ধাঁধানো শহরের মধ্যে
সে হারিয়ে যায় না
তার প্রাণের স্পন্দনের গানও
অগীতি থাকে না।

বুড়ি

সুশীল সিংহ

কোন কোন মানুষের জীবনে কখনও কখনও বিনা ভূমিকায় অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। জিখারিণী নাকি রাজরাণী হয়। কয়লা কুড়ুনির কপাল ফেরে। আমাদের বুড়ির কপালও বুঝি ফিরল।

আমার ঘরের সামনে একটা বটগাছ আছে। গত সাত বছরে আমার চোখের সামনে দেখতে দেখতে গাছটি বিস্তারিত হল। তার ডালে ডালে কাক, শালিখ, চড়ুই বাসা বাঁধল। সবুজ, পুরু পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট লাল ফলে ছেয়ে গেল গাছটা।

তিন বছর হল এই গাছতলায় বাসা বেঁধেছে এক বুড়ি। বাঁশের বাখারিতে খড় ছেয়ে তার ঘরের দেওয়াল করেছে। গোল পাতার ছাউনিতে ছাদ ছাওয়া। ঘরটি সে নিজেই বাড়া করেছে।

সারাদিন বুড়ি বাড়ি থাকে না। রেলের লাইন থেকে কয়লা কুড়িয়ে ফেরে। রেলের লাইন এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। সেখানে সে সারাদিনে এক বস্তা কি দেড় বস্তা এঞ্জিন-পরিত্যক্ত কয়লা সংগ্রহ করে। দিনের শেষে বিক্রি করে ফেরে।

বলা বাহুল্য, বুড়ি খুবই গরীব। বয়স তার ষাট পেরিয়েছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। হাত-পাগুলি শীর্ণ। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। দিনের শেষে বাড়ী এসে অন্ধকার থাকতে রাঁধার আগে ও কিছু কুটো, সরু সরু শুকনো ডাল কিছু এক জায়গায় করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে রান্না সারে করে। তারপর ঘুমোয়। আবার জাগে ভোর না হতেই। এই ভাবে তার বাঁধা নিত্যকর্ম আছে। তার কিছুটা আমি দেখেছি। কিছুটা না।

এ হেন বুড়ির কপাল যদি সত্যিই ফেরে তাহলে ধরে নিতে হবে শ্রাবণের মেঘভারানত আকাশ এবার বিশেষ ভাবে তারই জন্য বৃষ্টি নিয়ে এসেছে।

ব্যাপারটা বলি।

এবার শ্রাবণের শেষে আকাশ উপুড় করে বৃষ্টি নামল। গতকাল রাত্রি থেকে সুরু হয়েছিল। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও অবিরাম ধারাপাতে ঝমঝম্ বাজনা বাজছে, বিছানার শুয়ে শিরশির্ করছে গা।

বেশ লাগল।

বাইরে এসে দাঁড়াতে দেখি বুড়ি আমার দরজার সামনে ভেজা কাপড়ে চুপ করে বসে আছে। একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, ও ছেলে, তোমার কাছে একটা ভিক্ষে আছে বাবা। এই বলে হাত জোড় করল।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়। বৃষ্টিতে কয়লাকুড়ুনি বুড়ির ঘরখানা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। সেখানাকে ধরে রাখার জন্য আমার ঘরের সামনে কদিন থেকে পড়ে থাকা চারটি ছোট ছোট বাঁশ বিনা অনুমতিতে নিয়ে গেছে, আর সেগুলিকে তার চার দেয়ালে ঠেস দিয়েছে।

বাঁশগুলি আমার নয়। আমাদের স্কুলের ছেলেরা গত সরস্বতী পুজোর পর ফেলে রেখে গিয়েছিল এখানে। সে কথা হয়ত ওদের মনেও নেই। বুড়ি নিয়েছে বেশ করেছে।

বুড়ি এক গাল হাসল।

বললাম, আজ কাজে গেলে না?

—এই যাবো বাবা। তোমার বলে দাঁড়িয়েছিনু।

সারা রাত বৃষ্টি গেছে এই বৃদ্ধার ওপর দিয়ে। চোখ সাদা। গলার কণ্ঠা, হাতের কব্জী, কনুইর হাড়গুলো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে। হাতের পায়ের চামড়া গেছে আরো কুঁচকে। ভেজা ছুটি বস্তা নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে হাঁটতে হাঁটতে বুড়ি চলে গেল।

এই বৃষ্টিতে পাখিরাও আজ গাছ ছেড়ে যায়নি। বুড়ি চলে গেল। হোক কয়লা কুড়ুনি, মানুষ তো। মানুষ যে কোথায় কেমন ভাবে বাঁচে এমনি এক একটা দৃশ্য

তা মনে পড়ে যায়। এগুলো নিতান্তই অলস ভাবনা। এতে মনও বিষণ্ণ হয়।

আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল।

ষ্টেসনটা বড় নয়। খুব ছোটও নয়। মেল, এক্সপ্রেস দু' চারটে দাঁড়ায়। তবে সব গাড়ীকেই যেতে হয় এই পথ দিয়ে। তা ছাড়া রেলওয়ের একটা বড় লোকো শেড্ থাকায় এ জায়গায় এঞ্জিনের ঘন ঘন আনাগোনা।

ষ্টেসন থেকে এক মাইল পশ্চিমে বুড়ি কয়লা কুড়োতে বসল আপন মনে। এখানে দুটি, ওখানে চারটি এই ভাবে ছড়িয়ে আছে। একবার বসা, ওঠা। এই ভাবে সারা দিন। কেবল সে একলাই নয়, আরো কজন আছে।

পূবে পশ্চিমে লম্বা লাইন চলে গেছে। কোথাও কোথাও একটার গা থেকে বার হয়ে গেছে আর একটা। মাথা উঁচু সিগন্যাল। সিগন্যালের সংকেত বুড়িও এখন বুঝতে পারে।

আকাশে মেঘ। বৃষ্টির বেগ একটু কমেছে বটে, কিন্তু ইলশে-গুঁড়ি ঝিরঝির করে ঝরছেই। লাইনের মাঝে কাঠের পাটা, পাথর সব ভিজে গেছে। ছায়ার মত একটা পাতলা, ঝিকে অন্ধকার চারদিকে।

বুড়ির হাত দুটো থেমে গেল। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারল না। কোনদিন সে এমন দেখেনি। সে যেখানে কয়লা তুলছিল ঠিক সেখান থেকে হাত বিশেক জমি একটা খাদের মত খালি হয়ে গেছে। ওপরে লাইন যেমনকার তেমনি আছে, নীচে মাটি নেই। মাটি আছে অনেক নীচে যা ঠাকুর, এ যে ধ্বস্ নেমেছে।

বাংলা দেশের এই পশ্চিম প্রান্তে নানা কয়লা খনিতে ধ্বস্ নামে। সেগুলোও বুড়ি দু' চারটে শুনে থাকবে। কিন্তু রেল লাইনের তলে যে এমন হতে পারে তা সে কোনদিন শোনেনি। বুড়ি আপন মনে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বস্তা রেখে উঠে কেবিন ঘরে গিয়ে মানুষ-জন ডেকে আনল। কি হয়েছে বুঝিয়ে বলতে পারল না। শুধু বলল, কি জানি বাবা! মনটা আমার 'কু' গাইছে, তোমরা এসো, দেখোসে।

দু'ঘন্টার মধ্যে সে জায়গাটা ছেয়ে গেল, এনজীনিয়ার কুলি আর গবেষকে। মাটির বিভিন্ন স্তরে কোন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলে এভাবে আকস্মিক খাদের সৃষ্টি হতে পারে তারই একটা বুদ্ধি-গ্রাহ্য রিপোর্ট তৈরি করা দরকার।

কিন্তু বুড়িকে ধন্যবাদ। শুধুতো কতকগুলো মানুষের প্রাণ নয় অজস্র ক্ষতি বাঁচিয়েছে এই বুড়ি।

বুড়িকে জিজ্ঞাসা করা হল,—তোমার নাম কি?

পাশে একজন খাতা কলম নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে চেয়ে বুড়ি কোনমতে আপনার নাম বলল।

—তোমার স্বামীর নাম কি?

বুড়ি এবার বলল, হেই বাবা ক্ষ্যামা দাও, আমি আর কয়লা কুড়োবোনি বাবারা।

একজন পদস্থ ব্যক্তি একটু হেসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

বুড়ি বুঝল না। বলল, সি কথার আবার মানে কি বাবা?

সকলে জানতে চাইল, বুড়ি তুমি থাকো কোথায়?

বুড়ি বলল, ওই যে গো বাবুরা, পুব ধারে সেই 'ম্যাষ্টর' ছেলেটি থাকে না, আমি থাকি তারই সুমুকে। বট গাছের তলে।

বৃষ্টির জন্যে আজ স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। বিকেলে দেখলাম আমার বাড়ীরসামনে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীর পাদানিতে হাতের পাতা রেখে তারপর পিছল মাটিতে পা রেখে গাড়ী থেকে নামল—কি আশ্চর্য, আমাদের বুড়ি।

একরাশ জল ছিটিয়ে গাড়ীটা চলে গেল।

আমায় দেখে বুড়ি একগাল হাসল। থেমে বলল, আর বোলোনা ছেলে, আজ—

গল্পটা সুরু করার আগে বুড়ি তার বস্তা নামাল মাটিতে। একটি বস্তা একেবারে খালি আর একটিতে সিকি বস্তা কয়লা আছে কি নেই।

বুড়ি তার কোমরে হাত দিয়ে জীর্ণ মলিন, সিক্ত, নোংরা বস্ত্রের চার-পাঁচটি ভাঁজ থেকে একটি নোট বার করে বলল, এই দেখো ওরা আমায় পাঁচটে টেকা দিয়েছে।

একমাস কেটে গেল এরপর।

কিন্তু আগেই বলেছি আমাদের বুড়ির কপাল বুঝি

ফিরল। আশ্বিনের পয়লা খবর এলো কলকাতা থেকে যে রেলের বড় সাহেব বুড়িকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অনুমান হয় ফাইল-পত্রের সেতু বেয়ে বেয়ে বুড়ির কথাটাও অবশেষে তাঁর কাছে গেছে। তাই এই ডাক।

বুড়িতো ভেবেই অস্থির। কাল সকালেই তাকে যেতে হবে। তাকে অবশ্য কিছুই করতে হবে না। আজ গাড়ী করে এসে রেলের লোকেরা জানিয়ে গেছে যে কাল সকালেও তারা গাড়ী নিয়ে আসবে বুড়িকে নিয়ে যাবে। একেবারে এখানে ট্রেণে তুলে দেবে, ওখানে নামিয়ে নেবে, পৌঁছে দেবে সাহেবের কাছে। তার কোন ভাবনা নেই।

বুড়ি ভেবেছিল ব্যাপারটা সব চুকে গেছে। একমাস পরে আবার যে এমনভাবে সে ঘটনার জের টানা হবে তা সে একবারও আশা করেনি। তার মনটা তাই দ্বিধাগ্রস্থ। কিছুটা অবিশ্বাসও রয়েছে।

বোধহয় তাই আজ সন্ধ্যে থেকে বুড়ি আমার ঘরের চৌকাটে এসে বসেছে। আমি সামান্য শিক্ষকতা করি। দুবেলা স্বপাক আহার করি। আজ যেন আমার জন্য বুড়ির স্নেহ উথলে উঠেছে। সে বেশ নিঃসংকোচে বক বক করছে আমার সংগে।

তাকে বুঝিয়ে দিলাম, বুড়ি তোমার ভাগ্য ফিরেছে। রেলের বড় সাহেব তোমায় কিছু দিতে চাইবে। কি নেবে আজ সারারাত ধরে ভাবো গে।

আশ্বিনের ধোয়া-মোছা আকাশ অজস্র নক্ষত্রের সমারোহে পরিপূর্ণ। জানালার অদূরে বটগাছের তলায় গোলপাতার ছাউনি দেওয়া বুড়ির ঘরখানা দেখতে পাচ্ছি। তালপালার ফাঁক দিয়ে দিয়ে চাঁদের আলো এখানে-ওখানে এসে পড়েছে। বুড়ির কথা ভেবে আজ আমিই যখন ঘুমোতে পারছি না—তখন একটা আনন্দের যন্ত্রণায় ওর সারারাত নিশ্চয় জেগেই কাটবে। কি চাইবে বুড়িটা?

আমি হলে কি চাইতাম? কিছু টাকা চাইতাম—এই ধরো হাজার দশ। না। হয়তো ওরই মধ্যে একটা ভাল কাজ চাইতাম। এমন কিছু চাইতাম যাতে জীবনটা নিরুপদ্রবে স্বচ্ছলতার সংগে চলে। সে জিনিসটা কি?

এমনিই হয়। যে পাওনার নির্দিষ্ট কোন চেহারা নেই মনে মনে তার বহর কেবল বেড়েই চলে। লোভের টানে দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ীই কেবল স্ফীতকায় হয়।

কি সব ভাবছি ভেবে আমার হাসি পেল।

বুড়িও নিশ্চয়ই হিসেব করছে। ও আজ সারারাত্রি হিসেব করবে।

পরদিন সকালে রেলের গাড়ী এসে বুড়িকে নিয়ে গেল।

সাতদিন কেটে গেল। আজ আসে কাল আসে ভাবি। বুড়ির দেখা নেই। পুজোর ছুটি এসে গেল। আমি সামান্য জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করে ট্রেন ধরলাম। বুড়ি ফিরল না।

ছুটি ফুরোল। ফিরে এলাম। বটগাছের তলে বুড়ির ঘরখানি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম তার এক কোণে কয়েকটি কুকুরছানা কুঁই কুঁই করছে। বুড়ি ফেরেনি।

হতে পারে হয়তো বুড়ি মারা গেছে। কিম্বা না, তা নয়। ও নিশ্চয়ই বাকী জীবনের জন্য কোথাও একটা ঘর আর মাসে মাসে কিছু মাসোহারা চেয়ে নিয়েছে। সেটাই সম্ভব।

শেষের ধারণাটা বেশ মনে ধরায় খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম; দিন চলতে লাগল।

কিন্তু নিরাশ করল বুড়িটা। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি বটগাছের তলে সরু সরু ডালপালা আর শুকনো পাতায় আগুন দিয়ে রান্না বসিয়েছে বুড়ি।

—'তিথতো' করে এলাম বাবা।

—তীর্থ?

—হ্যাঁ। সাহেবের ঘরে আমায় নিয়ে গেল। সাহেব বললে, বস।

আমি বসনু, তোমার মত বড় মানুষের সামনে আমি কি বসতে পারি?

সাহেব বললে, কি তোমায় চাই বল—

বসনু, 'তিথতো' করতে চাই বাবা—

কবে যেতে চাও?

বসনু, যখন পাঠাবে। আজ বলতো আজই—

সাহেব বললে, তাই হবে। সংগে একটা লোক দিলে

তার হাতে আমার শুদ্ধে তিনশো টাকাও দিলে। তিনটে মাস শুধু ঠাকুর-দেবতার ঠাঁইয়ে ঘুরছি।

এই বলে বুড়ি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে ফুক্ ফুক্ করে কেঁদে ফেলল।

চোখ মুছে বুড়ি তার ঘরে গিয়ে একটু প্রসাদ নিয়ে এসে আমায় দিয়ে বলল, এই নাও ছেলে। এটুকুন মুখে দাও।

ছাত্রাবস্থায় স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইএ ভারতবর্ষের কথা অনেক পড়েছি। ছেলেদের পড়াতে হয়। আমার দেশকে কোনদিন এভাবে প্রত্যক্ষ করিনি।

বহুদিনের বাসি, সস্তা মিষ্টির টুকরোটা মুখে ফেলে দিলাম।

পরদিন সকালে উঠে কয়লাকুড়ুনি বুড়ি তাকে দুটি বস্তা নিয়ে আবার কয়লা কুড়োতে গেল।

বলার তা হয়তো এখানেই বলা হয়ে গেছে। কিন্তু আরো কথা না বলে আমি থামতে পারছি না।

দিনের পর দিন গেল। চৈত্রের শেষে এল বৈশাখ। বৈশাখের গোড়াতেই সূর্য যখন ধপ্ ধপ্ করে জ্বলছে, মাটি ফেটে ফেটে মাটিতে অজস্র ফাটল সৃষ্টি করছে, বাতাস যখন রক্তচক্ষু মত্ত মহিষের মত আগুনের হল্কা ছুঁড়ে দিচ্ছে—তেমনি এক দুপুরে আর কয়লা কুড়োতে না পেরে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ী এলো বুড়ি। এসে দুবার বমি করল। মরে গেল তারপর।

একদিন এই বুড়ির মধ্যে আমি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষকে দেখেছিলাম। সেটিতো মাত্র একটি দিক। যে দিকটা দেখার বাকি ছিল তা দেখলাম আজ। দেখলাম মিউনিসিপ্যালটির চারটি ধাঙরে একটি মাত্র শব বাঁশে বুড়িকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। ওরা সেটাকে কাঁধে তুলে নিল, যেন একটা পথের জন্তুকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিচিত্রা

চন্দ্রগুপ্ত

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপন মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গনে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীনা খোঁজে তোমার
অঙ্গুলি পরশ ;
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায়—আতুর অন্ধকার
অন্তঃসুধারস ॥

অনিতা স্ট্রেবার্গকে দেখে এমনি অনেক কথাই কি মনে হয়েছিল পরিচালক রজার ভাদিমের ?

তারপর অনেক সোনালী সন্ধ্যায় তাকে আপন করে পেয়েছেন রজার। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ঘোষণা অবাক হবার মতো। পরিচালক ভাদিম ঘোষণা করেছেন তিনি অনিতার সংগে বিবাহ-বিচ্ছেদ চান!

একটি ভারতীয় খবর।

নৃত্যপটিয়সী জনৈকা ভারতীয় অভিনেত্রীর প্রতি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের নায়ক শ্রীনাসের অনুরক্ত হয়েছেন বলে যে কাহিনী আপনারা জেনেছেন তা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন বৈজয়ন্তীমালা।

আমি স্বপ্ন দেখছি। এ আমার জীবনে স্বপ্ন এ আমার মননের স্বপ্ন। রূপালী পর্দায় কখনো কান্নায় কখনো হাসিতে ফুল উঠছে আমার মুখ। আমি শিল্পী ;...

কফির কাপ এগিয়ে দিতে দিতে এমনি অনেক স্বপ্ন দেখেছেন আইরিন। শিল্পী হবার বাসনা, শিল্পী হবার স্বপ্ন। তারপর হোটেলের কলকোলাহলে হারিয়ে গেছে স্বপ্ন। হারিয়ে গেছে স্মৃতি। পরিচারিকা আইরিনের ইচ্ছাসুখ মুক্তি পায়। রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে একটি মুখ। মুখটি আইরিনের।

বিশ্বআলোচিত লেখক নবোকভের 'ললিতা' নিয়ে আন্দোলন আজ সারা পৃথিবীতে। নির্জন দ্বীপেও তা শব্দময়। মিউজীয়ামে 'ললিতা' সম্প্রতি আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার পাঠকদের মুখে মুখে ফিরছে 'ললিতা'র গল্পকাহিনী!

লণ্ডনের বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী রোনাল্ড আর্মস্ট্রং জোনস্ সম্প্রতি তাঁর তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করেছেন। শ্রীজোনসের বর্তমান বয়স ষাট। শ্রীমতির একত্রিশ। একটি অভিনব মিলন, সন্দেহ নেই! ইংলণ্ডে আর্মস্ট্রংদেরই অসুবিধাকার।

পেয়াদার মার

বিভিন্ন অফিসে অধিসংখ্যক হাটাইয়ের ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহী হইয়াছেন

শিল্পী ঃ রেবতীভূষণ

বিড়াল তপস্বী

কঙ্গোকে সাম্রাজ্যবাদীরা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। —সংবাদ

নতুন বই

সমুদ্র ধ্রুপদী—গিরিশংকর, দাম—দেড় টাকা।

কাব্যে কতটুকু নাটকীয়তা সংযোজিত হলে শিল্প হিসাবে সেটা কাব্য-নাট্যের আখ্যা লাভ করতে পারে সে সম্বন্ধে স্বভাবতই মতভেদের অবকাশ থেকে যায়। বিপরীতে নাটকে কাব্যের রসসংযোগের অনুপাত সম্পর্কে অংকপাতও একটি প্রশ্নের অপর পিঠ। কূটতর্কের বা কাব্য-বিচারের পণ্ডিতমূলভ দুরূহতার মধ্যে না গিয়েও এতটুকু বোধহয় নিঃসংশয়ে বলতে পারা যায়, সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যশিল্প নব নব পরীক্ষায় ব্রতী, মূলতঃ অপেশাদারদের নিঃস্বার্থ ও শিল্পজনোচিত প্রকাশের দুঃসাহসিক তাগিদে। ফলশ্রুতি, বাস্তবজীবনাশ্রয়ী নাটক একাংকিকা এবং কাব্যনাট্য।

বংগ রঙ্গমঞ্চের ছকবাঁধা পেশাদারী অভিনয় এবং নাটকের ভড়ংয়ের উপরে প্রাথমিক আঘাত হানে সম্ভবত গণনাট্যসংঘের বলিষ্ঠ প্রয়োজন। জীবনাশ্রয়ী বাস্তব নাটক রচনার সূচনাও তখন থেকেই। তারপর দিন গড়িয়েছে। কলাকৌশল, আঙ্গিক, প্রয়োগবিদ্যার নব-নব পরীক্ষা চলছে। সাথে সাথে বাংলার বহু অবহেলিত নাট্যশালার একটি দুটি করে নূতন নূতন নাটকের আবির্ভাব ঘটেছে। এরই স্বাভাবিক পরিণতির পথে দেখতে পাই একাংকিকা এবং সর্বশেষে কাব্যনাট্য।

আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীগিরিশংকরের দুটি কাব্যনাট্যের সমষ্টি-ফল। একটি 'শর্বরী-মানস-সবিতা' এবং অন্যটি 'সাইরেন'। লেখক একাধারে নাট্যকার এবং অভিনেতা। সুতরাং এই কাব্যনাট্য রচনার প্রচেষ্টায় স্বভাবতই আশাকরা যায়, তিনি মঞ্চপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার মূলধন সবিশেষ কাজে লাগিয়েছেন। একথা লেখক উল্লেখ করেছেন যে 'সাইরেন' অভিনীত হয়ে দর্শক সমাজে অভিনন্দিত হয়েছে।

নাটক-দৃশ্য এবং শ্রাব্য দুইই। কাব্য অতীতে মূলতঃ শ্রাব্যই ছিল। শ্রাব্য কাব্যকে দৃশ্যে রূপান্তরিত করতে যে নাটকীয়তা সঞ্চার করা প্রয়োজন সেটুকু ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই কাব্যনাট্য পাওয়া যায়। গিরিশংকর 'সাইরেন' কাব্যনাট্যে এই গুণ সঞ্চার করতে পেরেছেন। নাট্যকার দৃষ্টিভংগী সমাজ সচেতন, কিন্তু যান্ত্রিক নয়। তিনি মূলতঃ জীবনাশ্রয়ী, সমস্ত দুঃখ এবং মৃত্যুর উপরেও জীবন তার পতাকা সবল মুষ্টিতে ধরে আছে, এই প্রত্যয় তাঁর কাব্যনাট্যটির মূল সুর। 'হে মানুষ, তোমার সর্বাঙ্গের ক্ষতচিহ্ন মৃত্যুবিজয় ঘোষণা করছে। সাইরেনের কবি একথা গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করে। এবং এইখানেই নাট্যকার যান্ত্রিকতা ছাড়িয়ে শিল্পসৃষ্টির স্বার্থকতার পদক্ষেপ করেন। সাইরেনের চরিত্রগুলি কিছু আটপৌরে। বাবুরাম, খুড়ো, ললিতা এরা জীবনের কাছে মার খেয়েছে তবু বাঁচার আগ্রহ যায়নি এদের। কবি জীবনের অর্থসন্ধানী আর রাজনদার মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কাব্যনাট্যটিতে ফলতঃ আংশিকভাবে প্রতীকাভাসের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও পুরো প্রতীক নাট্য হয়ে ওঠেনি।

'শর্বরী মানস সবিতা' মূলতঃ জীবনাশ্রয়ী প্রেমের উপলব্ধি এবং তার বৈচিত্র্যময় সন্ধানের ইঙ্গিত বহুল নাটক। তিনটি চরিত্র এবং তাদের ছায়াকণ্ঠ এর চরিত্র। ফলে আঙ্গিকের দিক থেকে অনেকখানি অভিনবত্বের সঞ্চার করে। এবং কাব্যগুণেও এই রচনাটি অধিকতর সমৃদ্ধ। কিন্তু নাট্যরসের তিলক এর কপালে কতটা পড়বে, সে সম্বন্ধে অবশ্য কিঞ্চিৎ সংশয় থেকে গেছে। সে তুলনায় সাইরেনেই কাব্যরস এবং নাট্যরসের গূঢ় মিলন ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস। যদিও এটি কোথাও কোথাও অতিনাটকীয়তা দোষে আক্রান্ত।

শেষ কথা, কাব্যনাট্য বাংলা সাহিত্যের আসরে নবীন আগন্তুক। এই বিশেষ বস্তুটি নিয়ে পরীক্ষা কেউ কেউ সুরু করেছেন ইতিমধ্যেই। গিরিশংকরই যে বলিষ্ঠ মন নিয়ে এই পরীক্ষার রাজ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন এজন্য তিনি স্বতঃই ধন্যবাদার্হ।

—বীরেন্দ্র নিয়োগী

জী ব ন স্রো ত—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ৬, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—২·৫০

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্য আন্দোলনে বিচিত্র মানসিকতার নাটক দিয়ে যিনি নাট্যজগতকে সতত রসদ যুগিয়ে চলেছেন সেই জীবনধর্মী নাট্যকার দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিকতম নাটক 'জীবনস্রোত'। 'জীবনস্রোতে'র পটভূমিকা সম্পর্কে ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, 'আমাদের দেশে আজ দুটো জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ সংঘাত। অধ্যাত্মবাদ নির্ভর ভাববাদ ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ আজ মুখোমুখি। ধারণিত ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু আমাদের জীবন বিবর্তিত হচ্ছে এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই। রাষ্ট্র বা সমাজজীবনেই নয়, ব্যক্তি জীবনেও তার প্রভাব। তাকে কেন্দ্র করেই আজ বহু আবর্তের সৃষ্টি। জীবনবৃত্তেরও অন্ত নেই। তেমন একটি বৃত্তই জীবনস্রোতের পটভূমি।' বস্তুত এই নাটকে 'অধ্যাত্মবাদ নির্ভর ভাববাদ' ও 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের' সংঘাত কুশলী পাঠককে চিন্তান্বিত করবে। তরুণ অধ্যাপক জীতেন্দ্র, বন্ধু তাপস আশ্রমের অধ্যক্ষ তেজসানন্দ শিষ্য অঘোরানন্দ, আশ্রমকন্যা গীতা, অবসরপ্রাপ্ত জজ রায়বাহাদুর, জিতেনের মা হেমাঙ্গিনী, তাপসের স্ত্রী যুথিকা ও মার্কিন মহিলা এলিজা প্রভৃতি চরিত্রগুলির নিজস্ব মতবাদের সংঘাত নাট্যকার অপূর্ব কৌশলে উপস্থাপন করেছেন। 'cross current of thought' জীবনস্রোতে নাটকের মূল।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ-চিত্রন সুন্দর।

পিকনিক—খ্যারাজ, বিচিত্রা। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮০ নয়া পয়সা।

'যেসব ছোট ছোট ছেলেরা সবে তেরোয় পা বাড়িয়েছে কল্পলোকের পক্ষিরাজ ডানা মুইয়ে যাদের সামনে নেমে ডুলে পা ছুঁড়ে লাফালাফি দাপাদাপি করে বলছে—চলে এস জোয়ান! কে আমার পিঠে সওয়ার হবে' তাদেরই অভিনয়ের মত করে লেখা খ্যারাজের 'পিকনিক'। তিনটি দৃশ্যে এই নাটকের সমাপ্তি। সংলাপ কোথাও আড়ষ্ট নয়। অত্যন্ত সহজ। ফলে কিশোরদের অভিনয়ের পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে। প্রচ্ছদটি আরও সুন্দর হলে ভালো হতো। —শ্যামাপ্রসাদ সরকার

সল্‌ভেন্সী ইন্ ইণ্ডিয়া—অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—নাগার্জুন প্রেস। পৃষ্ঠা—১৫০। মূল্য—১০৲।

ভারতবর্ষের দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল এবং চিন্তা মূলক গ্রন্থ। লেখক অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্যন্ত দাসত্ব প্রথার বিভিন্ন স্তর বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায় সমাপ্ত। প্রতিটি অধ্যায় লেখকের পাণ্ডিত্যের এবং গবেষণার বিশেষ নিদর্শন। ইংরাজ রাজত্বে ভারতের দাসত্বের দুর্ভোগ এবং অত্যাচার সম্বন্ধে তথ্য বহুল ঘটনা এবং অত্যাচারের নিদর্শন দিয়েছেন। এই পুস্তকটি সুধী সমাজকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিবে। পুস্তকের বিষয়বস্তু ব্যতীত লেখকের ইংরেজী ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বাঁধাই ভাল, তবে পুস্তকটিতে কিছু কিছু প্রুফ দেখার ভুল আছে। যাহা এই ধরণের গ্রন্থে থাকা অনুচিত।

রূপকাহিনীর সঙ্গমে | নির্মলেন্দু গৌতম

রূপকথা শোনবার সময় কী আছে ?
রূপসী রাজার-কন্যা কবে
কোন্‌দিন কোন্ এক কুমারের কাছে
জীবন কাঠির জন্য কেনা হয়ে যায়।

কারণ আমরা আজ বড় হয়ে গেছি !

ছোটবেলাকার বুড়ো ঠাকুর্দা বারান্দার একপাশে বসে
যেমন বয়সের ভারে ঝুঁকে থাকতেন।
যদিও সে স্মৃতি মৌমাছি
উড়ে গেছে কোন্‌দিন, চেতনাকে জানায় নি কিছু !

আজ যেন পুরাতন পৃথিবীতে আধো অন্ধকারে
কবে ছেলেবেলা শোনা কবেকার কত রূপকথা
চেনা চেনা মনে হয়। তাই চুপিসারে
সাধ যায় সেইখানে ফিরে যাই, রূপকাহিনীর
সঙ্গে না হয় মন নির্জন আলাপে
লিপ্ত হয়ে থাক। দূরে বুড়ো ঠাকুর্দাদা
ঝুঁকে থাক নিরিবিলি কালের উত্তাপে !

রূপকাহিনীর সেই সাগর সংগমে,
কবে ছেলেবেলা শোনা কবেকার কত রূপকথা
মনে হয় জীবনের ছায়াচ্ছন্ন শান্ত কথকতা।

ইচ্ছামৃত্যু | বিনয় মজুমদার

নিদ্রার নির্জনে ভাবো, প্রহরীরা সতর্ক ছিল না,
সমস্ত ঐশ্বর্য তার অসঙ্কোচে রয়েছে প্রণত :
ঘুমের অথই নীলে দুঃসাহসী ডুবুরির আশা
করায়ত্ত ছিল : প্রতীক্ষা-প্রার্থনে তারা ছিল নিবেদিত।

এতকাছে ছিল নাকি ! তা হলে কি ঘুমের প্রাণীরা
অনর্থক ঔৎসুক্যে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করে ?
একটি অমৃত স্বাদ অধিকারে এতই অরুচি ?

লাজুক চোখের পাতা, শরশয্যা রাতে কেঁদে মরে।

কোন মৃত কবির প্রতি | মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সময় ফুরিয়ে এলে পরিণত বিষণ্ণ বিরাম।
কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নে বিচলিত শিল্পের সংসার,
সহিষ্ণু বৃত্তের কেন্দ্রে দৃশ্যপুঞ্জ নয়নাভিরাম
সূর্যাস্তে সহস্র কণ্ঠে জ্বলে ওঠে দিনের অঙ্গার।

অগুতটে ফিরে গেছে ক্লান্ত উপনিষদের পাখি,
অসংলগ্ন কাহিনীরা অর্থবহ আলোর আড়ালে,
সে নদীর উৎস পথে তুমি ছিলে নির্বিঘ্ন একাকী :
রূপালি স্রোতের ঢেউ গল্প হয় সন্ধ্যায় সকালে।
রৌদ্রের আতিথ্য থেকে পার হয়ে শ্রাবণের সেতু,
কালান্তরে ফিরে যাবে মৃত্যুহীন মাস বর্ষ ঋতু।

কখনো প্রতীকে কিংবা প্রতীতির সমগ্র নিষ্ঠায়
প্রগলভ ঝর্ণার স্রোতে ঢেলে দাও রেখা, রঙ, ছবি,—
প্রেম শোক বিচ্ছেদের অন্তরঙ্গ প্রতিটি পৃষ্ঠায়
সৃষ্টির সমাধি-লগ্নে কেঁদে ওঠে লৌকিক পৃথিবী।

দৃষ্টির তিমিরে ছিল নয়নের নীলকান্ত মণি
বিচ্ছুরিত আলো আর ছায়ারঙ্গে কেঁদেছে যৌবন
ধ্যানমগ্ন দুই চোখে গোধূলির হীরকের খনি
স্মৃতির নির্জন কক্ষে শুয়ে আছ সুন্দর, শোভন।

অন্ধকারে তুমি একা দ্রুতগামী রাত্রির পশ্চাতে,
সব আলো নিভে গেলে মৃত্যুর বাহুতে বাঁধো রাখী
আকাঙ্ক্ষার মৃতদেহ দৃশ্যময় সমুদ্রের স্রোতে
তোমাকে হারিয়ে একা অন্ধকার করে ডাকাডাকি।

খেলাধূলা

অলিম্পিকের আদর্শ ইতিহাসের শিক্ষা

অজয় বসু

গ্রীষ্মাবসানে প্রথম শুক্লপক্ষের পুণ্য লগ্নে আজ অলিম্পিয়া প্রান্তরে জাতীয় উৎসবের আমেজ। বিচিত্র রংয়ের ম্যাথখানে সেখানে আয়োজিত চতুর্বার্ষিকী ক্রীড়ানুষ্ঠান।

দেবলোক অলিমপিয়া প্রান্তরে দেবরাজ জেউসের অধিষ্ঠান। আকাশ-ছোঁয়া ষাট ফুট উঁচু দেবালয়ের অভ্যন্তরে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণে মোড়া চল্লিশ ফুট দীর্ঘ বিগ্রহ যেন বিশ্বের বিস্ময়! এই বিগ্রহই অলিমপিয়ার প্রেরণার উৎস, শিলীভূত প্রাণশক্তি। এলিসের পিসা শহরের উপকণ্ঠে উত্তরে দূর বিস্তৃত পর্বতমালা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্রোতস্বিনী আল্‌ফিয়াস ও ক্লাডিয়ামের ত্রিমুখী ধারা, পূর্বপ্রান্তে শুচিশুভ্র ক্রীড়াঙ্গন, একালে পরিচিত যা স্টেডিয়াম নামে। এই আবেষ্টনীর ফাঁকে বিস্তৃত, প্রশস্ত, মসৃণ অলিমপিয়া প্রান্তর।

বনস্পতির ছায়া-শীতল প্রান্তরে রয়েছে আরও কত কি! অনুশীলনকেন্দ্র ও ধাবন চক্র। রয়েছে পবিত্র অলিভকুঞ্জ, মহাবলী হারকিউলিসের জয়কীর্তির স্বাক্ষরে যা নাকি প্রতিষ্ঠিত। মর্মর সৌধরাজি রয়েছে। আর রয়েছে অলিমপিক ক্রীড়ার বিজয়ীদের প্রধান প্রতিমূর্তি-শোভিত গ্রীসের জাতীয় সংগ্রহশালা। বার্তাবাহী চারণেরা মৈত্রী ও শান্তির অমৃত-বাণী উচ্চারণ করে সৌভ্রাত্য প্রসারের আহ্বান জানিয়ে এসেছেন আগেই। সে ডাকে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত নয় কেউই। অলিমপিয়া প্রান্তরে আজ তাই হাজারো মানুষের মেলা; মন্দির প্রাঙ্গনে নওজোয়ানদের জমায়েত।

প্রান্তরস্থিত ক্রীড়া-অনুশীলনকেন্দ্রে তরুণেরা এসেছে দশ মাস আগে। দশ মাসে শিক্ষক, পরীক্ষক ও পর্যবেক্ষকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে সামনে রেখে তারা প্রস্তুত হয়েছে। সমিষ্ঠ শিক্ষা; নিরলস অনুশীলনে তারা অর্জন করে নিয়েছে ক্রীড়া-দক্ষতা, দৈহিক শক্তি ও মানসিক ঔদার্য। আজ পরীক্ষা অলিমপিক ক্রীড়ার আয়োজনে। সে আয়োজনে জয়লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করাই লক্ষ্য তাদের। জাতীয় উৎসবের এই পুণ্য লগ্নে আজ শান্তি বিরাজিত সমগ্র গ্রীকভূমিতে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অন্তে অন্তত আরও তিনমাস নিরবচ্ছিন্ন শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এক অলিখিত, অলঙ্ঘনীয় নির্দেশে।

অনুষ্ঠান উদ্বোধনের শুভ মুহূর্ত এসে পড়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার সমাপ্তি সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে আজ। তরুণেরা অনুশীলন কেন্দ্র ছেড়ে এসে দাঁড়ালো দেবরাজের বিগ্রহের সামনে। সেখানে সুস্থ ও সৎ পথে বিচরণের অঙ্গীকার করা হলো, শপথ বাক্য হলো পূর্বপুরুষদের বিদেহী আত্মার তৃপ্তি বিধানে প্রাণপাত করার। আর হলো প্রার্থনায়, উপাসনায় দেবাশীষ ভিক্ষা মাগা। শুরু সে প্রার্থনা, কণ্ঠ মূক তবু যেন অলিম্পিয়ার প্রান্তরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো এই এক সুর 'সাক্ষী তুমি অন্তর্যামী! দেখো যেন পদস্খলন না ঘটে। ব্রাত্য বলে ধিক্কৃত না হই কোনো কালে!'

ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণের মর্যাদামণ্ডিত। আবেগের স্পর্শে যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি মর্মস্পর্শী। এই আবেগে, প্রেরণায় নববলে বলিয়ান হয়ে তরুণেরা স্টেডিয়ামে এসে শুরু করলো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সুস্থ ক্রীড়া, প্রীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপেশাদারদের সামর্থ ও দক্ষতা যাচাইয়ের আয়োজন। তবু তা যেন রুদ্ধশ্বাস নাটক। ছল নেই আছে বলের প্রকাশ। ভণ্ডামী নেই, নেই দুর্নীতিও, আছে নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মহান প্রয়াস। সমানে সমানে দ্বন্দ্ব, যোগ্যে যোগ্যে যোঝা; বাতিয়ার মাত্র নিপুনতা ও বিচক্ষণতা।

সুস্থ, শোভন নগরটি উপভোগ্য যেমন, শিক্ষনীয়ও তেমনি। যে তরুণেরা সফল হলো তাদের অঙ্গে রাতারাতি জাতীয় বীরের অমল মর্যাদা চিরতরে নির্দিষ্ট হয়ে রইলো। যারা বিফল হলো তারা নতুন করে শিখলো

আরও প্রস্তুত হয়ে ওঠার তাগিদ। বিজয়ী পেলো বটে মহত্তর মর্যাদা কিন্তু বিজিতের ভূমিকা গৌরবান্বিত হলো শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করায়। জয়-পরাজয় সবই তুচ্ছ। সবাই জানে 'অলিম্পিক ক্রীড়ায় জয়লাভ নহে, অংশ গ্রহণই বড় কথা। জীবনেও বড় কথা বিজয়লাভ নহে—সংগ্রাম। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য সততার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা।'

মূল আসরে বিজয়ীরা পুরস্কার পেলো মাত্র অলিভ পাতার শেরপা ও পবিত্র তালপত্র, বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের বিচারে যার মূল্য কতোটুকুই বা! তবে প্রান্তরস্থিত জাতীয় সংগ্রহশালায় স্থাপিত রইলো তাদের মর্মর মূর্তি। আর স্বগ্রামে ফিরে তারা আপ্যায়িত হলো রাজসিক সম্বর্ধনায়। নগর প্রাচীর ছিদ্র করে অলিম্পিকের বীর বিজয়ীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত রাখা হয়েছিল। স্বস্থানে নগরের কেন্দ্রস্থলেও স্থাপিত হলো তার মর্মর মূর্তি। আদরে আপ্যায়নে, প্রশংসায় স্তুতিবাচনে বীর-পূজা করে অন্তরের অনুরাগ উজাড় করে দিলো স্বগ্রাম পড়শীরা। অলিম্পিকে শ্রেষ্ঠের মর্যাদা অর্জন করে বীর বিজয়ী তার নিজের, প্রতিবেশীদের, স্বগ্রামের গৌরব ও গৌরব বাড়িয়েছেন। তাই এই কৃতজ্ঞতা।

এক অলিম্পিয়াডের (চতুর্বার্ষিক কাল) ঘটনাবলীর আপাততঃ এই অঙ্কেই পটক্ষেপ। তবে অন্তিম নয়। বর্ষ ফিরে চার ঋতু চক্রের আবর্তে এই মুহূর্তটি এসে পড়লে আবার অলিম্পিয়া প্রান্তরে নতুন করে পট উত্তোলিত হবে। সেদিন ফিরে ফিরে আসবে। আসর সাজবে আবার। শাশ্বত শুভ চেতনা ও নতুন আশার প্রতিশ্রুতিতে আবার আলোকিত হয়ে উঠবে জন্মভূমি অলিম্পিয়া। সে লগ্ন যথারীতি ফিরে ফিরে এসেওছিল। এসে এক অবিনশ্বর কাহিনীর সৃষ্টি করে গিয়েছে। সে কাহিনী পুরানো দিনের। খৃষ্টের জন্ম লগ্নের চেয়েও প্রাচীন। কাহিনীর মূলে কিছুটা কিংবদন্তী ও কিছুটা ইতিহাসানুগ ঘটনা।

গ্রীস তখন শতধাবিভক্ত। মত ও পথের আড়াআড়িতে, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শক্তিমান গ্রীকদের হাতে উদ্যত আয়ুধ। এমনি এক বিপর্যয়ের মুহূর্তে অলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে পরস্পরের সঙ্গে মিলিতে, মিশতে ও প্রীতি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠতে কে যেন জানিয়েছিল উদাত্ত আহ্বান। দেহ-সুন্দরের উপাসক ক্রীড়ানুরাগী গ্রীকেরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে খেলতে গিয়ে যুদ্ধ ভুলেছিল। অলিম্পিক-বর্ষে তাই শান্ত, সংযত সমগ্র হেলাস (প্রাচীন গ্রীস) রূপান্তরিত হয়ে উঠতো এক গোষ্ঠী, এক জাতি ও এক প্রাণে।

প্রাচীন গ্রীসে প্রথম পর্বে অলিম্পিক ক্রীড়ার যে অনুষ্ঠান হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক বিস্মরণে তার ধারা অবলুপ্ত। ইতিহাসে পাওয়া যায় খৃষ্ট-জন্মের ৭৭৬ বছর আগের কাল থেকে ৩৯২ (মতান্তরে ৩৯৪) খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অলিম্পিকের চতুর্বার্ষিকী ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিবরণ।

তারপর রোমানদের আমলে সম্রাট প্রথম থিওডি-য়াসের আজ্ঞায় এই অনুষ্ঠানের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। রোম সাম্রাজ্যের জীবন-মধ্যাহ্নে অলিম্পিক অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়েছিল কেন? এর উত্তরেও ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় শিক্ষা রয়ে গিয়েছে। যে শিক্ষা একালেও অনুধাবন যোগ্য।

রোমানদের আমলেও যে গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়েছে তার কারণ আয়োজনের বাহ্যিক চেহারায় আড়ম্বরপ্রিয় রোমানরা আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র বাহ্যিক আকর্ষণ ছাড়া অলিম্পিক ক্রীড়ার আর কোন আবেদন গিয়ে পৌঁছতে পারেনি রোমানদের অন্তরে। অলিম্পিক আদর্শের মূল সুরটিকে উপলব্ধি করতে পারেনি তারা। ফলে রোমানদের চিন্তার শূন্যতায় অলিম্পিক অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। গ্রীকদের দেখাদেখি অলিম্পিক নিয়ে মেতে ওঠার ও ক্রীড়াভূমিতে জয়লাভ করার সাধ জেগেছিল রোমানদের। কিন্তু তাদের প্রস্তুতি ছিল না। না দেহের না মনের। প্রস্তুতির দৈন্যেই তারা অলিম্পিক আদর্শের একনিষ্ঠ সাধক শাসিত গ্রীকদের কাছে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হোতো। সে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে রোমানরা প্রথমে ছল, কৌশল ও রাষ্ট্রনীতির আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তাতেও অভীষ্টসাধন হয় না দেখে বলবেঁধে তারা একদিন অলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে বিদ্বেষ ও বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ রোপণ করে রাখলো। আর সেই হলাহলেই একদিন গ্রীকদের ভাগ্য পুড়লো, ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হলো যাতকের

শানিত অস্ত্র-মুখে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জিত হলো। রাজা থিওডিয়াসের শাসনকালের দশম বর্ষের কাহিনী এটি। বিষ বীজের মূলোচ্ছেদ না করে তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢেকে বললেন, বাদবিসম্বাদের মূল এই অলিম্পিক অনুষ্ঠান, অতএব এটিকে বন্ধ রাখা হোক। তাই হোলো। শিরোধার্য রাজাজ্ঞায় অলিম্পিয়ার শূন্য প্রান্তরে নেমে এলো শ্মশান-শর্বরী।

কিন্তু সে কালরজনী অতিক্রান্ত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সাময়িক যতি পড়লেও অলিম্পিকের আদর্শ রইলো অক্ষয়, অম্লান হয়ে। তারই প্রমাণ একাল। ইতিহাসের ছায়া-পথে সেদিনের রোম-সাম্রাজ্য কোথায় হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু উত্তরকালের দৃষ্টিপথে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে অলিম্পিকের ঐতিহ্যের আদর্শ। ঐতিহ্য স্মরণে, আদর্শ অনুসরণে উত্তরকাল তাই দেড় হাজার বছর আগে নির্বাপিত অলিম্পিয়ার পূতাগ্নিশিখাকে পুরানো মর্যাদায় আবার নতুন আশায় প্রজ্বলিত করেছে। ফরাসী চিন্তানায়ক ব্যারন পিয়ের ডি কুবারটেন অলিম্পিক আন্দোলনের উত্তর ইতিহাসে পূজ্যপাদ চরিত্র। নতুন যুগে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার বাস্তব প্রবর্তক তিনি, বিগত অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনে তাঁর ভূমিকা সফল ও সার্থক।

যে প্রয়োজনবোধে প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল, দেড়হাজার বছর পরেও আধুনিক দুনিয়ায় তার মূল্য কমেনি, বরং বেড়েছে। স্বার্থের সংগে স্বার্থের সংঘাত, মতের সংগে মতের, মানুষে মানুষে ভিন্নতা, আজও অব্যাহত। সেকালের অনুপাতে একালে এই ব্যবধান আরও বিস্তৃত, দেশ-দেশান্তরের গণ্ডী উপচে সারা বিশ্বে ছড়ানো। একালে এই অলিম্পিক আন্দোলনের নেতাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে কাজের ও পথের জটিলতা বেড়ে উঠার সংগে সংগেই। এই জটিলতা টেনে এনেছে অনেক সমস্যা। তবু সে সমস্যা দেশবিদেশের সুস্থ প্রতিনিধিদের এগিয়ে চলার পথ রুদ্ধ করে দিতে পারেনি। সমস্যার ঊর্ধ্বে আদর্শের জয় এইখানেই। আজ অলিম্পিক আসর মানে কিন্তু আসলে তা সর্বজনীন ক্রীড়াভূমি অথবা সর্বজনীন মিলনকেন্দ্র। আজ সে আসরে উপস্থিত থেকে মহা মিলনে অংশ নিতে আপত্তি নেই ৮৬টি দেশের। কুণ্ঠা নেই পরস্পর মিলতে আমেরিকা উরালিয়ায়। যেটুকু কুণ্ঠা আজ আছে চীনের ও ফরমোজার। বিশ্বাস হয়, অলিম্পিকের মহান আদর্শের দুর্বার বন্যায় সে কুণ্ঠাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন।

আশাবাদী মানুষ আমরা। ব্যারন কুবারটেনের উত্তর সাধকদের আচরণে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলো কতোটুকু তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে সময় কাটানো আমাদের সাজে না। রক্তক্ষয়ী মহাসমরে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার দু-দুটি অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। তবুও নিরাশ হবো না। কিসের আফসোস? যা পেয়েছি তাই কি অসামান্য নয়? যা পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অলিম্পিকের আসর সম্ভাবনাময় হয়ে আছে তাও কি যথেষ্ট নয়? পরাক্রমশালী রাষ্ট্রনায়কেরা যা দিতে পারেন নি, রাজনৈতিক চিন্তা যে বৈভব হাতে আসেনি, শীর্ষসম্মেলন যে সম্পদ উপহার দিতে পারেনি মানবগোষ্ঠীকে, পরম-বাঞ্ছিত সেই মৈত্রীর অঙ্গীকারই তো অনুষ্ঠিত একালের অলিম্পিক আসরে। মিলনের মন্ত্র সম্পর্কে, খ্যাতি প্রতিষ্ঠার শপথে সে আসর ধন্য ও পুণ্য। পুণ্যভূমির এই রূপ মহান এবং সে রূপ চর্চায় সাধনা মানুষের বৃহত্তর জীবন-বোধেরই পরিচায়ক। আশা এই এতো বড় সম্পদ হাতছাড়া করার কাঙালপনা থেকে যুক্তিবাদী মানুষ চিরদিনই মুক্ত থাকতে পারবে।

সেকালে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও ছিল প্রাচীন গ্রীসের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত। গ্রীকেরা শুদ্ধক্রীড়ায় দেহ গঠন করছে, আদর্শের জয়ধ্বনি তুলে অর্জন করছে মানসিক বৈভব। যুদ্ধ করেছে তবু অলিম্পিক বর্মে হাতে রাখি বেঁধেছে তারা পরস্পরের। রাক্তের মূল্য ধরে দিতে গিয়েও তাদের পদস্খলন ঘটেনি। মহৎ হওয়ায় মানুষের যে মহত্তর ধর্ম আছে তাকে তারা অস্বীকার করতে চায়নি, উপেক্ষাও করেনি। তাদের সাধারণ দৃষ্টান্ত কবি, শিল্পী, দার্শনিককে চিন্তার উপকরণ জুগিয়েছে। কালজয়ী কবি পিণ্ডার, সিমনিডেস, ইউরিপিডেসের কাব্যগাথায়, কিডিয়াস, প্রাক্সিটেলেসের ভাস্কর্যে সেই কবিকর্ম ও শিল্পকর্মের নিদর্শন। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় ও জীর্ণ উপলখণ্ডে সে দৃষ্টান্তের স্বাক্ষরই প্রাচীন জীবনবোধের নিশানা। সে নিশানা যুগ-যুগান্তের প্রেরণার উৎসমুখ। সেই প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক উত্তরকাল, প্রাচীন জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটুক এ যুগের জীবনধারায়। শান্তি আসুক, মানুষ মানুষ হয়ে উঠুক। অতীতকে ফিরে পেতে লজ্জা নেই কারণ সে অতীত মহান, সমৃদ্ধ। তাকে ফিরে পেতে হলে অলিম্পিক আন্দোলনকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এবং সে আন্দোলন বাঁচলে একালেরও অনাগত কালের দুনিয়াও বেঁচে যাবে।

রঙ্গ জগৎ

কুমারগুপ্ত

প্রস্তুতির পথে—

সুরকার ও সংগীতশিল্পী শ্রী শ্যামল মিত্র সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের "অন্তর্গৃহ" উপন্যাসটিকে চিত্রে রূপ দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন এবং নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার নির্বাচিত হয়েছেন।

• • • •

সুবীর হাজরার পরিচালনায় সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের "সকলি গরলি ভেল" উপন্যাসটির চিত্ররূপের কাজ এগিয়ে চলেছে। অবশ্য চিত্ররূপের নাম দেওয়া হয়েছে 'শিলালিপি'। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে আছেন বসন্ত চৌধুরী, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী এবং রত্না।

এক নজরের সংবাদ

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের "উল্কা" ও "মায়ামৃগ" নাটক দু'খানির হিন্দী চিত্রস্বত্ব কিনেছেন যথাক্রমে অশোককুমার ও এ-ভি-এম প্রোডাকসন্স।

• • • •

বনফুল বৈরাগীর "এক মুঠো আকাশ"-এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন ছায়ালোক প্রাঃ লিমিটেড। পরিচালনায় থাকবেন শ্রীতরুণ রায়।

• •

একটি তামিল চিত্রে অভিনয়ের জন্যে অশোককুমার তামিল ভাষা শিখতে সুরু করেছেন।

আলি আকবর খানের গৃহে
চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গীতজ্ঞ

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত শোনার আগ্রহে এবং আলোচনার উদ্দেশ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ডাঃ জোসেফ পেলেনিচেক, মিঃ আলেকজাণ্ডার স্লোয়েক, মিঃ সাসাভোস্কী মত কিছুদিন পূর্বে সুরস্রষ্টা আলি আকবরের গৃহে এসেছিলেন, এই সম্মানিত অতিথিদের জন্য ঘরোয়া পরিবেশে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, খান সাহেবের সুরোদ বাজনায় অতিথিরা বিমোহিত হয়ে পড়েন এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁরা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রশংসা করেন। ডাঃ জোসেফ শ্রী আলি আকবর খানকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন।

শান্তি-আন্দোলনের অক্লান্ত যোদ্ধা ও সঙ্গীত-শিল্পী পল রোবসনের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৯ই এপ্রিল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে লিটল থিয়েটার গ্রুপের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, "অঙ্গার" নাটক অভিনয়ের পূর্বে পল রোবসনের রেকর্ড বাজিয়ে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

অভিনেত্রী সম্মানিত

দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী জানকী সম্প্রতি মুক্তি-প্রাপ্ত কানাড়া ছবি মহিষাসুর মর্দিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ নায়িকারূপে বোম্বাইস্থিত কানাড়া সংঘ কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়েছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে বর্তমানে তিনি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার কাজে ব্যস্ত।

পুরস্কার ঘোষণা

যুবরাজ সেলিম ও আনারকলির প্রণয় কাহিনী ভারত ইতিহাসের এক বিস্তৃত অধ্যায়। সম্রাট আকবরকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বহু বিচিত্র কাহিনী সমাবেশে সমৃদ্ধ। সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত মোগলে আজম চিত্র সেলিম ও আনারকলির প্রণয় কাহিনী কেন্দ্র পল্লবায়িত হয়েছে। আনারকলির অন্তর্ধান আজও ইতিহাসের রহস্য স্বরূপ। মোগলে আজমে দেখানো হয়েছে যে আনারকলিকে জীবন্ত কবরস্থ করার পরও গুপ্ত গুহার মধ্য দিয়ে আকবরের চেষ্টায় সে মুক্তি লাভ করে। এই বিতর্কিত অংশ নিয়ে বর্তমানে সমালোচক-মহলে বহু প্রশ্ন উঠেছে। পরিচালক আসিফ-এর মতে তিনি বিন্দু মাত্র ইতিহাস বিচ্যুত হননি। নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদে প্রকাশ যে এই দাবী যদি ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হয় তিনি তাহলে একলক্ষ টাকা পুরস্কার

দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। চলচ্চিত্রে এ ধরণের আলোচনা নিঃসন্দেহে শুভ সঙ্কেতের সূচনা করে।

গঙ্গা যমুনা

দুই ভাইয়ের কাহিনী গঙ্গা যমুনা। সুঅভিনেতা দিলীপ কুমার এ ছবির পরিচালক। দিলীপ ও বৈজয়ন্তীমালার মিলিত অভিনয় এই চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ। প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক নৌসাদ এর সঙ্গীত-সমৃদ্ধ রঙিন ছবি গঙ্গা যমুনা কিছুকালের মধ্যেই ভারতের সর্বত্র মুক্তিলাভ করবে।

মৃণাল সেনের কৃতিত্ব

বাইশে শ্রাবণ ও নীল আকাশের নীচে—মৃণাল সেনের এই ছবি দুটি বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে। নবীন পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে একথাও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে তরুণ পরিচালকদের পক্ষেও জটিল ও রুচিশীল চলচ্চিত্র অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব।

চিত্র নিকেতনের প্রথম চলচ্চিত্র প্রয়াস 'এমনো দিন আসতে পারে'র কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে বেশ সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে। এ ছবির কাহিনী রচয়িতা শ্রীগৌর দী। বিশ্বজিত ও রঞ্জনা প্রধান ভূমিকায়, ছবি বিশ্বাস, বিপিনগুপ্ত, চন্দ্রাবতী, অহর রায় ও তুলসী অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন। গৌরী-প্রসন্ন মজুমদারের সঙ্গীতগুলিতে হেমন্তকুমার ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সুরারোপ করেছেন।

মধুমিতা প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'উঁচু পাহাড় নীচু জমি'র স্যুটিং এর কাজ সুরু হয়ে গেছে। কোন এক অধ্যাপকের আদর্শ জীবন যাত্রাকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী রচিত হয়েছে। পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্রীঅতিজিত।

হালিউডের সংবাদে প্রকাশ যে পাশ্চাত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী ক্যারল লিনলে The Hot Eye of Heaven ছবির চাঞ্চল্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে পরিচালক-দ্বয় ইউজিন ফ্রাঙ্ক ও এডওয়ার্ড লুই এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। রক হাডসন্, কার ডগলাস ও তরুণি ম্যাকিন অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। মিস্ লিনলের অন্যান্য সুঅভিনীত ছবি যথাক্রমে Blue Denim এবং Hound Dog Man।

এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসব

এ বছরের এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসব গত ২১ আগষ্ট থেকে সুরু হয়েছে। এই উৎসবে প্রায় পঁয়ত্রিশটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছে। তাদের প্রেরিত চিত্রের সংখ্যা প্রায় দুশোকুড়ি। কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী এই আন্তর্জাতিক চতুর্দশ এডিনবরা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলা পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' ও দুটি প্রখ্যাত দলিলমূলক ছবি—তাজমহল ও কথাকলি এই উৎসবে ভারতের তরফ থেকে প্রদর্শিত হবে বলে জানা গেছে। বর্তমান পাক-সরকারের অগ্রগতি ও সাফল্য সম্পর্কিত চিত্র Naikiran প্রদর্শিত হবে সেখানে। পাশ্চাত্যের বারটি দেশের ছবি এ উৎসবের আনন্দ বৃদ্ধি করবে। এই দেশগুলির মধ্যে সুইডেন, ইটালি, ও রাশিয়ার অংশ গ্রহণ বিশেষ উল্লেখ্য।

আমির বেগ সাইকেল এর একটি দৃশ্য

এক সেয়ানা কঁস নাটকের একটি দৃশ্য

শ কি লা খা হু সঙ্গীত জগতে কাওয়ালী গায়িকারূপে জনপ্রিয়া। কোবরা গার্ল চিত্রে তিনি সঙ্গীতে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল। তাঁর এই নবতম প্রচেষ্টায় প্রেম খিতাল এর ভূমিকা উল্লেখ্য। চিত্র সংস্থা পরিচালিত এই ছবির রেখা নিশিকে নায়িকারূপে দেখা যাবে।

হিন্দী ছবিতে উত্তমকুমার

বাংলা ছবি, তাদের ঘর এর হিন্দী চিত্ররূপায়ণ আসন্নপ্রায়। জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার এই সর্ব প্রথম হিন্দী ছবিতে অংশগ্রহণ করছেন। বিপরীত চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন বোম্বাই-খ্যাত অভিনেত্রী—নিম্মী। নির্দেশক মঙ্গল চক্রবর্তী এই ছবির কাজের জন্য বোম্বাই রওনা হয়ে গেছেন। চিত্রগুপ্তের সঙ্গীত রচনায় এ চিত্র সমৃদ্ধ হবে বলে প্রকাশ।

ভারতীয় চিত্রে অরণ্য জীবন

অরণ্য পটভূমিকায় মানুষ ও হিংস্র প্রাণীর জীবন্ত চিত্র ভারতীয় চলচ্চিত্রে নেই বললেই চলে। সম্প্রতি জানা গেল, যে পরিচালক সাধনলাল জৈনের পরিচালনায় এরূপ একটি ছবি পূর্ব আফ্রিকার অরণ্য পরিবেশে গৃহীত হবে। রঙীন ছবি Love on the true top এর প্রধান চরিত্রে রাজেন্দ্র কুমার ও নিম্মী রূপ দিচ্ছেন। দার-এস-সালাম, যোহানা ও নাইরোবি-র অরণ্য জীবন যাত্রা একে ঘেরে রোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনবে।

ফেস্টিনার নবপ্রয়াসে প্রেরিত চিত্র Fin de Fie-ror কমলে অত্যন্ত আগ্রহের সৃষ্টি করবে বলে বিশ্বাস। ভিন্ন দেশগুলির মধ্যে এরূপ সাংস্কৃতিক বিনিময় রাজনৈতিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করবে আশা করা যায়।

রাহাজানি সমস্যা সমাধানে চলচ্চিত্র

অশিক্ষিত চম্বলের ডাকাত কাহিনী আজও ভারতবাসীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। দুর্ধর্ষ ডাকাতি দমনে ভারতে আজও বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে অন্যতম এক প্রশ্ন। জনপ্রিয় শিল্পী সুনীল দত্ত অল্প কিছুকাল পূর্বে নির্দেশক মনি ভট্টাচার্য সহ ভূপালে যান। 'বাগী কি দুনিয়া' চিত্রের তথ্য সংগ্রহের কাজে মধ্যপ্রদেশের বহু স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেন। এই ব্যাপারে পুলিশ অধিকর্তাদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেন। জীবন্ত বিভীষিকা দস্যু গাথার ও পুতলীর কিছু কিছু কাহিনীও তিনি সংগ্রহ করেন। ভারত সরকারের কোরী পুবার্ট মন্ত্রী শ্রীলীক্ষিতের সঙ্গে তাঁরা এ ব্যাপারে আলোচনা করেন।

বিদ্রোহ

শিল্পী : রাধিকারঞ্জন রায়চৌধুরী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আশ্বিন
১৮৮২
পঞ্চম বর্ষ
শারদীয় সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতিতে শরৎকাল এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। বর্ষার তিমির অবগুণ্ঠন সরাইয়া শরৎ তাহার অরুণ আলোর অঞ্জলি যেদিন আকাশে বাতাসে বিস্তার করিয়া দেয়, সেই দিনই বাঙালী মন উৎসবের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া উঠে—শারদোৎসবে। ইহা তাহার প্রাণের উৎসব। কিন্তু এই শারদোৎসব বাঙালীর কাছে শুধু দেবার্চনা, শুধু প্রাণ-বন্যায় চঞ্চল হইয়া ভাসিয়া বেড়ান নয়, ইহা তাহার নিকট সাহিত্যের শারদোৎসবও বটে। সাহিত্যের এই শারদোৎসবে বাংলাদেশের সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও পাঠকগণ যে ভাবে যোগদান করেন ভারতের অপরাপর প্রদেশে তাহার তুলনা নাই। বাঙালী মানসিকতার ইহা এক বিশেষ দিক।

'সহিত' কথাটি হইতেই 'সাহিত্য' কথাটির উৎপত্তি। জীবনের সহিত সাহিত্যের সংযোগও অস্বীকার্য। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' বা 'সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য' এই ধরণের কথাগুলিও তাই স্বতঃই অর্থহীন। জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানব জীবনকে উন্নত, বিস্তৃত করিয়া তাহাকে বড় রূপে বাড়াইয়া তুলিবার আগ্রহ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে যুগে যুগে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শুধু ব্যক্তি মানবের জীবনে নয় সমগ্র জাতি এমন কি সমগ্র মানব সমাজের চরম দুঃসময়ের ও সঙ্কটের মধ্যেও সাহিত্য মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জয়গান করিয়াছে। বাল্মিকী হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কোথাও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সাহিত্য অপরিমেয় শক্তির অধিকারী। ইহা দুর্গত মানবাত্মার সঙ্গীত। এই সঙ্গীতকে স্তব্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের কবি সাহিত্যিকদের দিকে তাকাইলে এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। অবস্থা যত সঙ্গীন, যত জটিল হইয়াছে, বিপদ ও দুঃখের ঝটিকা জাতিকে যত বেশি গ্রাস করিয়াছে ততই ইহারা অনাগত ভবিষ্যতের আহ্বান করিয়াছেন। রুশো, ভলটেয়ার, গোর্কি, ভেরকরস, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অগ্নি লেখনী লইয়া জাতির পাশে দাঁড়াইয়াছেন।

'বিংশ শতাব্দী', সাহিত্যের এই অপরিমেয় শক্তিতে বিশ্বাস করে। 'বিংশ শতাব্দী' প্রত্যক্ষ করিয়াছে মানচিত্রের মসী পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু বাঙালী জাতিকে বিভক্ত করা যায় নাই। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ—নজরুলের চিরন্তন সৃষ্টি মানচিত্রের মসী পরিবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশি সত্য তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

গত এক যুগে বাঙালী জীবনের ঘটনা স্রোত বোধ হয় শতবর্ষের ঘটনাপূর্ণ। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ভ্রাতৃহত্যা, দেশ বণ্টন, আসাম ও পূর্ববঙ্গ হইতে নিরবচ্ছিন্ন উদ্বাস্তু স্রোত, দুর্বহ মূল্যবৃদ্ধি—তবু বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় নাই। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়াইয়াও সে আজও উৎসবকে অভ্যর্থনা জানাইতেছে—সাহিত্যের শারদোৎসব।

'বিংশ শতাব্দী' বিশ্বাস করে আজিকার দুর্যোগের রাতগুলি যখন অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে তখনও সাহিত্যের 'ঘুঁই ফুল'গুলি অম্লান থাকিবে। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে কনিষ্ঠ হইয়াও শত ত্রুটি বিচ্যুতি, শত অক্ষমতা সত্ত্বেও সাহিত্যের এই শারদোৎসবে 'বিংশ শতাব্দী' আসর হইতে চায়। অক্ষমতার অজুহাতে এই উৎসব হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে সে নারাজ। বাঙালীর এই জাতীয় উৎসবে 'বিংশ শতাব্দী'ও তাই তাহার বর্ষাসাথ নিবেদন করিতেছে।

আধুনিক হিন্দীসাহিত্যে শক্তি

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র তাঁহার 'নীলদেবী' নামক নাটকে চণ্ডীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভারতীয় নারী-জাতিকে সেই শক্তির আদর্শ গ্রহণ করিবার উৎসাহ দিয়াছেন।

উনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদের কবি বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী-বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে 'দুর্গা-স্তুতি'১ নামক কবিতাটি তিনি শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'দেবাপরাধক্ষমাপন স্তোত্রে'র ছায়া অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা হইল 'শারদীয় পূজা'। এই কবিতায় শরতের বর্ণনার মধ্য দিয়া কবি শারদীয়া দেবীর আবির্ভাবকে যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন হিন্দী অন্য কোনও কবিতায় এরূপ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না। শারদীয়া দেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে কবি শরৎ-প্রকৃতির যেমন উপযুক্ত বর্ণনা দিয়াছেন, তেমনই শারদীয়া পূজাকে অবলম্বন করিয়া ভারতবাসীর মনের আশা-উৎসাহ উৎসব-আনন্দের রূপ দিয়াছেন। কবি 'আগবানী' কবিতায় মধ্যে মায়ের যে আগমনী গাহিয়াছেন তাহাতে দেখি দেবীর এ আগমন কৈলাস হইতে 'ভারত-ভবনে'—'ভারত-ভবনহিঁ' ধরণ দিবারে আসে।' মা যখন বৎসরান্তে একবার আসিলেন তখন—

বহু তেরি সন্তান দেব, তোহি ধাবতী।
'মা, মা' করতী মা তেরে, ঢিগ আবতী ॥

তবে পিতা হিমাচলের গিরিপুরে কন্যারূপিণী পার্বতীর আবির্ভাবের বর্ণনাও দেখিতে পাই অন্য কবিতায়—

আজ মধুর ধুন বজত সৈল-পতি ভবন বধাই।
নাচত গাবত বহ কিন্নরি সুর তাল মিলাই।
বহবিধ ফুলে ফুল পবন সৌরভ কৈলাসত।
বিকসে কমল তড়াগন মহঁ সোভা সরসাবত।
গিরিপুরবাসিনকো আনন্দ কহো নহীঁ জাই।
আজ হিমাচলকে মহলন এক কন্যা আই ॥২

বাঙালী রামদুলাল দে'র 'শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি' গানটি একটি প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত। এই সংগীতে যেমন দেখিতে পাই—

আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ওমা, চিতা-ভস্ম চারিভিতে,
রেখেছি মা আশিস্ যদি ॥

বালমুকুন্দ গুপ্তের 'আবহ মাস্থ' কবিতাটির মধ্যেও বার বার এই আকুল আহ্বান দেখিতে পাই, 'মেরে হিয়-মসান মহঁ মা, করহ নিবাস', 'হিয়-মাসন মহঁ মা, ঠাঁব বনায়', 'যহ হিয় মেরে নিসি দিন মা ঘোর মসান। পীতত হৈ মা মহঁ দিন রৈন এক সমান।'

বালমুকুন্দ গুপ্তের মাতৃভক্তির সহিত দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের মিশ্রণের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।৩ এ বিষয়েও এই যুগের বাঙালী কবি-মনের সহিত তাঁহার কবি-মনের মিল লক্ষ্য করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীচণ্ডীকে প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু বাঙলা মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি; এখানে কবিগণ কিছু কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেও কোন কবিই মূলকে একেবারে ঢালিয়া সাজান নাই। আধুনিক যুগে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের কিছু কিছু সচিত্র অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; এই অনুবাদে কেহ কেহ কিছু কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেও মূলকে এখানেও ঢালিয়া সাজান হয় নাই। অর্থাৎ মোটের উপরে অনুরূপিণী চণ্ডিকা বা পার্বতী উমাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যে কোনও স্বতন্ত্র কাব্য রচিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে আধুনিক কালে এইরূপ কয়েকখানি কাব্য রচিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করিতে পারি আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মৈথলীশরণ গুপ্তের 'শক্তি'৪

কাব্য। মূল চণ্ডী পড়িয়া কবির একটি জিনিস মনে গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল, তাহা হইল চণ্ডিকার মধ্যে 'সৌম্যাতিসৌম্য' আবার অতীব ভয়ংকরী রূপের অপূর্ব সমাবেশ। কবি একদিকে যেমন দেখিলেন, 'হিমালয় কৃতাশ্রয়া' দেবীকে 'পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্'—অপর দিকে দেখিলেন সেই দেবীই দর্পভরে বলিতেছেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥

কবিও তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেবীর একাধারে সৌম্য-ভীষণ রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

কৈসা সুন্দর কৈসা ভীষণ থা দেবী কা রূপ।
ইধর অমৃত কী চারু চন্দ্রিকা উধর প্রলয় কী ধূপ।৫

অন্যত্র দেখি—

মন মেঁ মৃদুতা কর মেঁ দৃঢ়তা তেরী রহে সদৈব
রোষ সময় পর কিন্তু তোষ কী ধারা বহে সদৈব।৬

কাব্যখানি ছোট কাব্য। ইহাতে স্বর্গলোকে অসুরের উৎপাত-অত্যাচার ও দেবী-কর্তৃক অসুরনিধন সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কবির সময়ে ভারতবর্ষে যে অনভিপ্রেত পররাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার-অবিচার চলিতেছিল তাহারই বেদনা-বিক্ষোভ কবির মনোভূমিতে ঘনীভূত ছিল; দেবভূমিতে অসুরের অত্যাচার এবং দেবভূমির স্বাধীনতা-হরণ বর্ণনার ভিতরে আমরা তাহারই আভাস পাই। এক্ষেত্রে শক্তির উদ্বোধনের মধ্যে যে সঙ্ঘশক্তি উদ্বোধনের কথা রহিয়াছে তাহার ব্যঞ্জনা স্থানে স্থানে লক্ষণীয়। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের নিকটে তাঁহাদের দুর্দশার কাহিনী শুনিয়া বিষ্ণু বলিয়াছিলেন—'সঙ্ঘ-শক্তি হী কলি-দৈত্যোঁ কা মেটেগী আতঙ্ক।' কাব্যের শেষেও দেখিতে পাই—

পুরদেবী সে কহা ইন্দ্র নে, "ভদ্রে, অব ভয় ছোড়,
হম সব কী একত্র শক্তি মে দিয়া দৈত্যবল তোড়।"

কবি কাব্যারম্ভে দেবীমহিমা বর্ণনা করিলেও বিংশ যুগে শক্তির যে নূতন ধারণা তাহা তাঁহার কাব্যমধ্যে ব্যক্তিত হইয়াছে।

বিশেষ স্থান ও কালের সহিত চণ্ডীর অনুষঙ্গ কাহিনীকে কতখানি মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটি কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই মেবারের চৈঁসরোড়গড়স্থিত সাহিত্যরঞ্জন কুঁবর বিশ্বতসিংহ-বিরচিত 'মহিষাসুর বধ' কাব্যে। কাব্যখানি পড়িলে বেশ বোঝা যায়, এখানে ভূমি হইল ভারতবর্ষ—বিশেষ করিয়া রাজস্থান, সময় উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী, দেবতাগণ হইলেন কর্তব্যবিমুখ শৌর্যবিমুখ বিলাস-ব্যসনে মগ্ন দেশবাসিগণ, অসুর হইল বিদেশী শাসকবর্গ যাঁহারা এদেশের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। একটি গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনা দিয়া কাব্যের আরম্ভ; সেই গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে অসুর-অত্যাচারের প্রচণ্ডতা। অসুরগণ কেন প্রলুব্ধ হইয়া ছিল এবং সাহস করিয়াছিল আমাদের এই স্বর্গোপম দেশকে আক্রমণ এবং অধিকার করিতে? কবি বলিতেছেন—এ দৈত্য কুটিল-নীতিজ্ঞ; জাতির দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই সে আস্তে আস্তে তাহার বেড়াজাল বিস্তার করিয়াছে।—

জান গয়ে সব ভেদ হমারে দৈত্য কুটিল নীতিজ্ঞ।
কৈসী ফুট দেখকর হমমেঁ আয়ে হৈঁ বন বিজ্ঞ।
পতন যহাঁ পর হোতা নিশ্চয় জহাঁ ঘোর হৈ বৈর।
পড়া ফুট কে চক্র-জাল মেঁ হৈ যহ প্যারা দেশ।৮

কিন্তু এখন শুধু বসিয়া কাঁদিয়া পশ্চাৎ-তাপ করিয়া কিছু লাভ হইবে না; সমর-ভূমিতে শত্রুকে পুড়িয়া ছারখার করিতে হইবে। বসুধাকে বীরগণ ভুজবিক্রমেই ভোগ করিয়া থাকেন; বসিয়া কাঁদিলে রাজ্য মেলে না, শুধু শত্রু হাসে—

পর অব যহাঁ রোম-পছতানা হৈ নিতান্ত নিস্সার।
সমর অগ্নি মেঁ করনা সত্বর শত্রুবর্গ কো ক্ষার॥
করতে সদা বীর বসুধা কা ভুজ-বিক্রম সে ভোগ।
রাজ নহীঁ মিলতা রোনে সে, হঁসতে হৈঁ রিপু লোগ॥৯

কিন্তু দেশের রাজা ইন্দ্র তখন কি করিতেছেন? রাজ্যের কথা তখন তাঁহার ভাবিবারও অবকাশ নাই, তিনি রাজকার্য ছাড়িয়া নন্দনবনে গিয়াছেন—সেখানে যে বড় জৌলস। গ্রীষ্মাতপ দূর করিবার জন্য মহানন্দে তিনি শচীসহ তখন জলযন্ত্র-বেষ্টিত ভবনে আরাম করিতেছেন। সেখানে নর্তকীদের নৃত্য-নিরীক্ষণ করা ব্যতীত অন্য কাজের যে আর ফুরসুৎ নাই! যে রাজ্যের এই অবস্থা সে রাজ্যের দিন দিন হ্রাস-পতন ও অবলুপ্তি ভাবী।

কিন্তু করেঁ ক্যা, পথ ন দীখতা ছোড় রাজ কা কাজ
নন্দনবন কো শক্র সিধারে রহী রাখে হৈঁ ব্রাজ ।
গ্রীষ্মাতপ হরনে কো সুরপতি শচী-সংগ আনন্দ।
জল-ঘারোঁ সে ঘিরে তখন মেঁ করতে হৈঁ আনন্দ ।

নির্ভরিয়োঁ কে মৃদা-নিরীক্ষণ সে উনকো অবকাশ।
নহীঁ তনিক ভী মিলতা, ইসসে হুআ রাজা কা হ্রাস ।
'বহ আমোদ-প্রমোদ জহাঁ পর বহুতা হৈ সবিশেষ ।
বনা দেশ কো নীচ প্রমাদী করতা হৈ নিঃশেষ ।১০

ইহার পরে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমরা নন্দন-কাননে শচীসঙ্গে ও মরুতগণ সঙ্গে ইন্দ্রের বিলাস-ব্যসনের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না যে ইহা রাজস্থানের ঋদ্ধিমান সামন্ত-রাজাগণের বিলাস-ব্যসনেরই একটি নিখুঁত বর্ণনা। অবশ্য কিছু পরে ইন্দ্রের চৈতন্য হইল—তিনি দেবতাদের দুর্দশাও ভাল করিয়া বুঝিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুর্দশার কারণও ভাল করিয়া বুঝিলেন। সে কারণ হইল প্রেমের একান্ত অভাব; হৃদয়-সিন্ধুর প্রেমবারি শুকাইয়া গিয়া সেখানে জ্বলিতেছে শুধু ঈর্ষানল। ফলে দেব সমাজে কোথাও নাই ঐক্য, ঐক্য ব্যতীত কি করিয়া হইবে কার্যসিদ্ধি—কি করিয়া জগতে হইবে কীর্তিলাভ?

প্রেমবারি সব হৃদয়-সিন্ধুকা হয়া তিরোহিত।
ঈর্ষানল হো প্রবল দিখা হৈ তুম কো ভস্মিত ।
ইস কারণ একত্ব নহীঁ ক্যা তুম করতে হো।
ফুট-ফুটে মেঁ ফঁসে বিবশ হো কর মরতে হো ।

কার্য সিদ্ধ একত্ব বিনা হৈ ক্যা হো সকতা।
ঐক্য-বিনা হৈ কৌন কীর্তি জগ মেঁ হো সকতা ।১১

তৃতীয় সর্গে দেখিতে পাই, শচী নিজে যথার্থ রাজপুত-বীরাঙ্গনার রূপ ধারণ করিলেন, দেশের জন্য দশের জন্য সংগ্রামে ইন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

মম হৃদয়-প্রেম নদ বহতা হৈ,
কর্তব্য কিন্তু যহ কহতা হৈ—
সংগ্রাম করো নৃপকর্ম যহী,
দুখ হরো প্রজা কা ধর্ম যহী ।১২

মহিষাসুর পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল—সুরা-নারী লইয়া তাহার সকল প্রমত্ততার বর্ণনা দেখিতে পাই কাব্যের পঞ্চম সর্গে। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত সুরগণ ঐক্যবোধে জাগ্রত হইলেন—তখন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন শক্তিরূপিণী দেবী—মহিষাসুরের বিনাশ হইল।

'চণ্ডী-সপ্তশতী'তে বর্ণিত চণ্ড-মুণ্ড-বধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া একেবারে হালে রচিত (সং ২০১৩) 'চামুণ্ডা-প্রাকট্য' অথবা 'চণ্ড-মুণ্ড-মথন' নামে ছোট একখানি কাব্য দেখিতে পাই।১৩ অম্বরপুরের নিকটবর্তী অম্বরে প্রতিষ্ঠিতা দেবী অম্বরেশ্বরী অম্বিকার মহিমা-ব্যাপন উদ্দেশ্যে কাব্যখানি লিখিত। কাব্যখানি চণ্ড-মুণ্ড-বিমর্দিনী চামুণ্ডা-সম্বন্ধে একাত্রটি গীতের সমষ্টি।

'ভারতীনন্দন' রামানন্দ তিবারী শাস্ত্রী-রচিত হিন্দীতে একেবারে হালের আর-একখানি বড় কাব্য দেখিতে পাই 'পার্বতী' নামে।১৪ কাব্যখানি ২৩শ সর্গে সম্পূর্ণ। মূল বিষয়বস্তু 'কুমারসম্ভব'-বর্ণিত পার্বতী কাহিনী; কিন্তু সেই কাহিনীর সূত্রসার অবলম্বন করিয়া কাব্য যতটা সম্ভব তাঁহার স্বাধীন কবিকল্পনার বিস্তার করিয়াছেন। পৌরাণিক শক্তিকে কবি যতটা সম্ভব আধুনিক কবিদৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভাবদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায় যেখানে গ্রন্থারম্ভে 'মঙ্গলাচরণের'র পরে 'অর্চনা'য় কবি আদিশক্তি শৈলকুমারী সম্বন্ধে বলিতেছেন—

জিন কী মহিমা সে শিব বন কর জীবন কা শব জাগা,
জিন কী করুণা সে সত্তা প্রেয় সৃজন কা মাঁগা;
জিন কী প্রীতি উদার চেতনা বন জীবন মেঁ ছাঈ,
জিন কী কৃপা অপার প্রকৃতি মেঁ কৃতি-গৌরব বন আঈ;

'যাঁহার মহিমায় জীবনের সব শিব হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার করুণায় সৃজনের সত্তা ও প্রেয় মাগিতেছি; যাঁহার প্রীতি উদার চেতনা হইয়া জীবনে ছাইয়া গিয়াছে, যাঁহার কৃপা অপার প্রকৃতিতে কৃতি-গৌরব হইয়া আসিয়াছে।'

কবি শক্তিকে এক দিকে যেমন বিশ্ব-সৃষ্টির সব-কিছুর ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য দিকে আবার বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রকাশ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন নারীর মধ্য দিয়া—নারীর সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম-আকর্ষণের ভিতরে।

কাব্যের প্রথম সর্গে হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা। এই বর্ণনায় যেমন 'কুমারসম্ভবে'র বর্ণনার বহু বিস্তারও রহিয়াছে—আবার কেদার-বদ্রি—তাহার বিস্তৃত পথের বর্ণন—নেপাল প্রভৃতি বর্ণনও বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় সর্গে হিমাচল-কুমারীর বর্ণনায় 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনার নানারূপ লৌকিক বিস্তারও যেমন দেখিতে পাই, তেমনই দেবি পার্বতী যখন রাজকন্যা তখন রাজসভায় গিরিরাজ হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রীতি ও শাসনের সঙ্গে সংযুক্ত নীতিরূপে প্রসন্না ও অভীতা মূর্তিতে উপবিষ্টা।১৫ কাব্যের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা কবি-কল্পনা-বিস্তার সত্ত্বেও মোটামুটি 'কুমারসম্ভব'কে অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। 'কুমারসম্ভবে'র পঞ্চম সর্গের শেষ দুইটি শ্লোককে কবি এই ভাবে একটি পদে রূপ দিয়াছেন—

পথ মেঁ শিবন অচল বাধা সে আকুল শৈবলিনী সী,
স্থিতি-গতি কে অনমংজস মেঁ বহ রহী সরিত নলিনী সী,
কহা শম্ভু নে স্নেহভাবসে, "প্রিয়ে! আজ সে তেরা,
প্রেম ঔর তপ-ক্রীত দাস হৈঁ তন, মন জীবন তেরা।১৬

পরিণয়ের পরে নব-দম্পতি মহাদেব-উমা কৈলাসে চলিয়া আসিলে এই নব-দম্পতীকে লইয়া কবি নর-নারী-জীবনাদর্শ—বিশেষ করিয়া স্বামি-স্ত্রী-জীবনাদর্শের অনেক কথা বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মধুর হাস্য করিবারপরে বিবাহের তাৎপর্যটি কবি নানাভাবে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে দাম্পত্য জীবনের লৌকিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই কবি আদিশক্তি-রূপিণী উমার অলৌকিক মহিমা উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন—

বৈঠে যে শংকর কুটীর মেঁ ধ্যান লগায়ে,
দেখ রহী থী উমা, পলক মেঁ সপনে ছায়ে;
চঞ্চল তকলী ঘূম রহী থাসৌ কী গতি সী,
বিরচ রহী থী সূত্র সৃষ্টি কা বিশ্ব নিয়তি-সী।১৭

ধ্যান ধরিয়া কুটীরে শঙ্কর বসিয়া আছেন, দেখিতেছিলেন উমা—পলকে ভরা স্বপ্নের ছায়া; কুটীরবাসিনী উমা বসিয়া বসিয়া কি করিতেছিলেন? তিনি তকলী কাটিতেছিলেন; কিন্তু সে তকলীতে কোন্ সূত্র কাটা হইতেছিল? বিশ্ব-নিয়তির মত কেবল সৃষ্টির সূত্র বিরচনা করা হইতেছিল।

কাব্যে কুমার-জন্মের পর কুমার-দীক্ষা, দেবোদ্বোধন, তারক-বধ, অসুর-অভিষেক প্রভৃতি এবং আরও বহু সর্গ দেখিতে পাই। ইহা 'কুমার-সম্ভবে'র ঘটনার সহিত পুরাপুরি হইতে বিভক্ত। গ্রন্থশেষে 'আরতী'তে প্রার্থনা দেখি—

বনে উমা-সী পুণ্যবতী প্রতি প্রকৃতি-কুমারী,
নর হো শংকর তুল্য তেজ-তপ সংযম-ধারী,
শক্তি ঔর শিব কী গোদী মেঁ বীর কুমার পলেঁ।

আধুনিক প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণের উপরেও শক্তিবাদের প্রভাব বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামায়নী'র মধ্যে বহু স্থানে দেখিতে পাই পরিপূর্ণ নারীত্বের ভিতরে তিনি 'ভগবতী' বা 'সর্বমঙ্গলা'র রূপ বর্ণন করিতে চাহিয়াছেন।১৮ 'নিরালা' কবির (সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী) উপরে শক্তির প্রভাব আরও স্পষ্ট। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ও অন্যান্য শক্তি-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই সব অনুবাদে মূলের ভাব বেশ রক্ষিত হইয়াছে।—

দুঃখভার ইস ভব কে ঈশ্বর,
জিনকে মন্দির কা দ্বার
জলতী হৈ চিতাএঁ মেঁ হৈ
প্রেত-পিশাচোঁ কা আগার;
সন্ধ্যা ঘোর সংগ্রাম ছেড়না
উন্কী পূজা কে উপচার,
বীর! উসমে কভী ন. আয়ে
অসুর পরাজয় সৌ-সৌ বার।
চুর চুর হো স্বার্থ, সাধ সব
মান, হৃদয় হো মহাশ্মশান,
নাচে উস পর শ্যামা, ধন রণ
মেঁ লে কর নিজ ভীম কৃপাণ।

'নিরালা'র 'আবাহন' কবিতাটিও অনুরূপ—

এক বার বস ঔর নাচ তু শ্যামা!
সামান সভী তৈয়ার,
কিতনে হী হৈঁ অসুর, চাহিয়ে
কিতনে তুঝকো হার?
কর মেখলা মুণ্ড-মালাওঁ সে বন ঘন-অভিরামা—
এক বার বস ঔর নাচ তু শ্যামা।

সমরেশ বসুর উপন্যাস

রাণীর বাজার

রাণীর বাজারের নামে নেই ইতিহাসে বা ভৌগলিক বিবরণে। তবু কালের রাখালের বাঁশীতে সে নাম বাজে আর বাজে। কোন একটি পুরুষ বা নারীকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী গড়ে ওঠেনি। একটি জনপদ, একটি আধাগ্রাম আধাসহর এ কাহিনীর নায়ক। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমরেশ বসু আর নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। রাণীবাজার তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস। বিচিত্র অভিজ্ঞতার আশ্চর্য অভিব্যক্তি হিসাবে 'রাণীর বাজার' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উৎকৃষ্ট আর্টিস্টিক ডিমাই কাগজে ছাপা। পূর্ণেন্দু পত্রীর সুন্দর প্রচ্ছদ।

দাম : তিন টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

চোরাবালি

ভাগ্য দেবতা এক হাতে কেড়ে নিয়ে আবার ভরে দিয়েছিল তার দুহাত। যে মেয়ে অদৃষ্টের চক্রে একদিন ম্যাসাজ ক্লিনিকের জীবনে নেমে এসেছিল অদৃষ্টের আবর্তনে সেই আবার স্বামী সংসার সব ফিরে পেল। কিন্তু অতীত তার পিছু ছাড়ল না। যা ছিল গোপন তা আবার ব্যক্ত হলো। হৃদয়হীন সমাজ, বিভ্রান্ত স্বামী আর সাজানো সংসারের সমানে দাঁড়িয়ে চিরদিন তাকে বলে যেতে হলো—"বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, আমায় বিশ্বাস করো।" তবু প্রশ্ন থেকে যায় নিষ্ঠুর সমাজ আজ তাকে কোন স্থান দেবে? তরুণী লেখক এই উপন্যাসে সে প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। দাম : দুই টাকা

শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী

মহামরণ

স্ত্রী নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তান কামনা করেন। স্বামীর একান্ত কামনা স্ত্রীর জীবন। কার দাবি বড়? 'মহামরণ' এনেছে মহাজীবনের ইঙ্গিত।

দাম : আড়াই টাকা

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী : ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন : ৫৫-৩৪২৫

নিরালা কবি একশত আটটি নীলোৎপলের দ্বারা রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উপাখ্যানটিকে নিজের মতন করিয়া রূপ দিয়া 'রাম কী শক্তিপূজা' কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতাটি একটি দীর্ঘ কবিতা। কৃত্তিবাস হইতেই বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও কবি ইহার মধ্যে নবীন সরসতার সৃষ্টি করিয়াছেন। একশত আটটি পদ্ম দিয়া দুর্গাদেবীকে পূজা করিতে গিয়া রামচন্দ্র যখন শেষ অঞ্জলির সময়ে একটি ফুল কম দেখিতে পাইলেন তাহার পরের বর্ণনা এইরূপ—

বুদ্ধিকে দুর্গ পহুঁচা বিদ্যুৎ-গতি হতচেতন
রাম মেঁ জগী স্মৃতি হুএ সজগ পা ভাব প্রমন।
"যহ হৈ উপায়" কহ উঠে রাম জোঁ মজ্জিত ঘন—
কহতী থী মাতা মুঝে সদা রাজীব নয়ন!
দো নীল কমল হৈঁ শেষ অভী, যহ পুরশ্চরণ
পূরা করতা হুঁ দে কর মাতঃ এক নয়ন।"
কহ কর দেখা তূণীর ব্রহ্মশর রহা ঝলক,
লে লিয়া হস্ত লক লক করতা বহ মহাফলক;
লে অস্ত্র বাম কর, দক্ষিণ কর দক্ষিণ লোচন
লে অর্পিত করণে কো উদ্যত হো গয়ে সুমন
জিস ক্ষণ বঁধ গয়া বেধনে কা দৃগ দৃঢ় নিশ্চয়
কাঁপা ব্রহ্মাণ্ড, হুআ দেবী কা ত্বরিৎ উদয়:—
"সাধু, সাধু, সাধক-ধীর, ধর্ম-ধন-ধন্য রাম!"
কহ লিয়া ভগবতী নে রাঘব কা হস্ত থাম।
দেখা রাম নে, সামনে শ্রীদুর্গা ভাস্বর
বামপদ অসুর-স্কন্ধ পর, রহা দক্ষিণ হরি পর ॥১৯

নিরালার অনেক গীতিতে মা, জননী, অরুণা প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।২০ নিরালা কবির জন্ম অবশ্য বাঙলাদেশে (মেদিনীপুরের মহিষাদলে) তাঁহার যৌবনের শিক্ষাও বাঙলাদেশে, সুতরাং তাঁহার উপরে শাক্ত প্রভাব অতি স্বাভাবিক-ভাবেই থাকিবার কথা।

হিন্দী আধুনিক কাব্যের মধ্যে কবি 'অনূপ'-কৃত 'শর্বাণী' কাব্যখানি শক্তি-অবলম্বনে রচিত একখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্য।২১ আটচরণযুক্ত ১০১টি স্তবকে কাব্যখানি সমাপ্ত। হয়ত 'দেবী-সপ্তশতী'র কথাই কবির মনে ছিল। কাব্যখানির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই সমগ্র ১০১টি পদই এক 'ঘনাক্ষরী' ছন্দে

লিখিত। কাব্যমধ্যে কবি দেবীর সম্বন্ধে প্রচলিত মধুর মূর্তিরও মনোভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবীর বিশ্বসৌন্দর্যময়ী রূপও বর্ণনা করিয়াছেন, আবার পৌরাণিক বিদ্যাধিকা, সর্বশক্তিরূপিণী অসুরনাশিনী রূপও বর্ণনা করিয়াছেন, তান্ত্রিক নাদরূপিণী, মাতৃকারূপিণী, ষট্‌চক্র-বাসিনী রূপও বর্ণনা করিয়াছেন; আবার এই সকল বর্ণনা সত্ত্বেও কবির মূল বিশ্বাস ছিল যে, এই দেবীই হইলেন পরমতত্ত্ব—তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্ম, কর্মবাদিগণের কর্মরূপা, শাক্তের পরমেশ্বরী, ন্যায়বাদিগণের বিশ্বকারিণী, সাংখ্য-জ্ঞানীর দিব্য পুরুষ-স্বরূপ, শৈবের শিব, সৌরের সবিতা, কবির কবিতা।

তূ হী ব্রহ্ম-বাদিয়োঁ কী ব্রহ্ম-নাম ধারিণী হৈ
তূ হী কর্ম-বাদিয়োঁ কো কর্ম রূপ ভাতী হৈ।
তূ হী শাক্ত জন কী প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরী হৈ
ন্যায়-বাদিয়োঁ কো বিশ্বকারিণী লখাতী হৈ।
সাংখ্য-জ্ঞানিয়োঁ কো দিব্য পুরুষ-স্বরূপ তূ হী
শৈব মানয়োঁ কো বিশ্ব-সদৃশ দিখাতী হৈ
সৌর-প্রাণীয়োঁ কা সবিতা তূ অতি পাবন হৈ
তূ হী কবিয়োঁ কো কবিতা যো তুষ্টি আতী হৈ ॥২২

কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে একশত স্তবকে দেবীর স্তুতি করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে আশিটি স্তবকে শুধু মায়ের চরণের বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দীতে এইরূপ দীর্ঘ চরণবর্ণনা আর নাই; শুধু আর-একখানি মাত্র গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে; পণ্ডিত রামচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ 'চারুচন্দ্রিকা'য়[২৩]। ২৩।২৬টি স্তবকে চরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এত দীর্ঘ বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্তি ও প্রপত্তির সহিত অলক্ত ও পাদলাক্ষার কথা বার বার স্মরণ হয়। একশত তিনটি স্তবকে দেবীর 'দৃষ্টিপাতে'র বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনার ভিতরে কবিত্বের প্রকাশ বহু স্থানে আছে, কিন্তু বর্ণনার আতিশয্যে মনকে খানিকটা ক্লান্ত করে। একশত স্তবকে কবি দেবীর চক্রের (অস্ত্র) বর্ণনা করিয়াছেন, একশত এক স্তবকে করিয়াছেন দেবীর রূপাদের বর্ণনা। একশত ষোল স্তবকে কবি মহিষাসুর-বধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সর্গে কবি বীররসের সুযোগেই মন অধিক নিয়োগ করিয়াছেন, সামান্য শৃঙ্গার-রস ও হাস্য-রসের অবতারণার দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক যুগের দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের কবি বচন দেবীকে আবার সর্বভূতে প্রচণ্ড ক্ষুধারূপেই সংস্থিতা দেখিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ-কবিতার সঙ্কলন 'সোপান' কাব্যগ্রন্থে 'বংগাল-কা কাল' নামক কবিতায় দেখি—

ভুখ নহী দুর্বল, নির্বল হৈ,
ভুখ সবল হৈ
ভুখ প্রবল হৈ,
ভুখ অটল হৈ,
ভুখ কালিকা হৈ, কালী হৈ,
যা কালী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

১। গুপ্ত নিবন্ধাবলী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ২। দুর্গা-স্তবন, ঐ। ৩। এই গ্রন্থের ৩২১-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৪। সাহিত্য-সদন, চিরগাঁও (ঝাসী) হইতে ১৯৪৮ সংবতে প্রকাশিত। ৫। পৃষ্ঠা ১৫। ৬। পৃষ্ঠা ২৮। ৭। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ, ১৯৩২। ৮। ১।২৪। ৯। ১।২৫। ১০। মহিষাসুর বধ, ১।২৬-২৭। ১১। ঐ, ২।৪৫-৪৬। ১২। ঐ, ৩।১৪। ১৩। জয়পুর হইতে 'গোপালকরণ' কর্তৃক প্রকাশিত। ১৪। নয়াপুর, কোটা (রাজস্থান), ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫। রাজসভা মেঁ বৈঠ পিতা কে দক্ষিণ পার্শ্ব পুনীতা। প্রীতি ঔর শাসন সে সংযুত নীতি প্রসঙ্গ অভীতা। ১৬। সপ্তম সর্গ। ১৭। ত্রয়োদশ সর্গ। ১৮। হে সর্বমঙ্গলে তুম মহতী। সব কা দুঃখ আপনে পর সহতী॥ কল্যাণময়ী বাণী কহতী। তুম ক্ষমা নিলয় মেঁ রহতী॥ ১৯। 'অপরা' কবিতাগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। ২০। দলিত জনে পর করো করুণা দীনতা পর উতর আএ প্রভু. তুমহারী শক্তি অরুণা। ২১। শ্রীবিশ্বনাথ মিশ্র, এম.এ সাহিত্যাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। ২২। সর্বাণী, স্তুতি, ৭১। ২৩। ভারত-জীবন প্রেস, কাশী।

অন্য এক নাম

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ডোমজুড়ির দিকে যেতে চড়াই ভাঙতে হয় খানিকটা।

সাইকেল রিক্‌শওয়ালা কিছুক্ষণ প্যাডলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে চালায়। তারপর নেমে পড়ে হাতে ধরে টেনে নিয়ে যায় নতুন মেয়েদের স্কুল পর্যন্ত। তার বকবকানিও সুরু হয় সেই সঙ্গে।

দেখছি ত বাবু কি রকম পাড়াই। মাজা ভাঙে যায় চালাতে চালাতে। কত জোয়ান দেখলম বটে। এক মাস দু'মাস চালাই ভাগি যায়।

তুমি কত কাল চালাচ্ছ? অবনীকে শুধু কথায় পিঠে কথা বলতেই জিজ্ঞাসা করতে হয়।

আমি? রিক্‌শওয়ালা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, অনেক বছর ধরি চালাতে আছি বাবু। ওই বাজারের কাছে যিবার অশথ গাছে বাজ পড়ল সেই তখন আড্ডি বাবু ঐ সাইকেল রিক্‌শ একটা আনালেক। তা আনালে হবেক কি? চালাবে কে বটে? আড্ডি বাবু একদিন আমায় ডাকি রিশ্‌ক দেখায়ে বললেক, কি রে রঘু মনে লাগে? তা বললাম মনে ত লাগে বাবু কিন্তুক চালাতে ছাতি ফাটি যাবেক। উ আমি লারব। আমার ঐ হাত টানা রিশ্‌কই ভালো। কত বুঝাই শুঝাই আড্ডি বাবু শেষ তক্ রাজি করালেক। তারপর কত রিশ্‌ক হল বাবু। কিন্তুক সেই তখন হতি চালায়ে আসছে খালি এই রঘু।

চড়াই শেষ হয়েছে। মেয়েদের স্কুলটা পার হয়ে রাস্তা খানিকটা সমতল। তারপর আবার ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে।

ঢালু রাস্তায় বিনা চেষ্টায় গড়িয়ে যেতে যেতে রঘু আবার বকতে সুরু করে,—আমি ত হাতটানা রিশ্‌কা চালাতাম বাবু, তার আগে ছিল গরুর গাড়ি। তখন কুথা ছিল ই ইস্কুল আর উ বাজারের বাইস্‌কোপ। খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। ইখান থেকে মুংরাহাটা রাতের বেলা কেউ যেত নাই লুটে পুটে নিবার ডরে।

তুমি কি গরুর গাড়িও চালিয়েছ নাকি?—অবনী এবার কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করে।

না বাবু, আমি যখন এলাম তখন টানা রিশ্‌কা চালু হইছে। একটা দুটা গরুর গাড়ি ইস্টিসানে থাকে। কেউ চাপতে চায় না। কে যাবে টিকির টিকির করি গরুর গাড়িতে! ওই লছমণ সাউর দুকান তখন পাকা দালান হয় নাই বাবু। বাজারে সব তখন খাপরার ঘর।

অবনী মনে মনে একটু হাসে। হাঁ খাপরার ঘর-ই বটে, কিন্তু সেই খাপরার ঘরের বাজারই যখন ছিল না তখনকার কথা রঘু জানে না। গরুর গাড়ির দিনের লোক হ'লে অবনীকে বোধ হয় চিনতে পারত। কিন্তু সত্যিই পারত কি?

চেনা লোক স্টেশনে নেমে অবধি কাউকে দেখে নি, দেখবার কথাও নয়। কিন্তু চেনা হলেও তাকে এই বেশে এই চেহারায় কেউ চিনত বলে আশা করে না।

শশধর অবশ্য চিনবে চোখে যদি তার ছানি না পড়ে থাকে। চিনেও না চেনার ভাণ করে কি না সেইটেই ভাববার, দেখবার।

এখানে রাস্তাটা ফাঁকা। দুধারে এখানে শুধু শাল পিয়ালের জঙ্গল। মাঝে মাঝে এক একটা গাছে নম্বরি-টিনের চাকতি আঁটা দেখেই নতুন কালের ঢোঁয়া বোঝা যায়। এখন বাসও চলে বটে এ রাস্তায়। দিনে দুবার সেই হাজিগঞ্জ থেকে আসে যায়।

হাজিগঞ্জেই শশধরের সঙ্গে শেষ দেখা। হাজিগঞ্জের ভেতরে নয় বাইরে রথতলার মাঠের কাছে।

দিনে নয় ঘোর অন্ধকার-রাত্রে। তার হাতে ব্যাগটা দেবার সময় শশধরের হাতটা কিরকম কাঁপছিল আজো মনে আছে। মনে আছে কি হিম ঠাণ্ডা সে হাত, যেন মড়ার। শশধর ব্যাগটা দিয়ে সেই বরফের মত হাতে তার কব্জিটা চেপে ধরে কি বলতে চেয়েছিল। কৃতজ্ঞতাই জানাতে চেয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু মুখ দিয়ে তার কথা বার হয় নি। গলাটা জমে গেছল যেন ঠাণ্ডায়!

অবনী অবশ্য তার কৃতজ্ঞতা জানাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে নি! ব্যাগটা নিয়ে সে একবার ফিরেও না তাকিয়ে হন হন করে সামনে চলে গিয়েছিল।

শশধর আজ হঠাৎ দেখলে চমকে উঠবে নিশ্চয়। কিন্তু ভয় পাবে কি অবনীর এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে? অবনীর এই ফিরে আসা সে ত কল্পনা করতেই পারে না। অবনীর আর ফেরবারই কথা নয়!

কিন্তু তাতে ভয়েরই বা শশধরের কি আছে আর? আজ অবনী ফিরে এসে বেঁকে দাঁড়িয়েও কি ক্ষতি করতে পারে শশধরের! কমপক্ষে বিশ বছর পার হয়ে গেছে। সে দিনের স্মৃতি এই দুপাশের অরণ্যের জীর্ণ পাতার মত কবে ঝরে গেছে মানুষের মন থেকে।

অবনী যদি সেই বিলুপ্ত ইতিহাস খুঁড়ে বার করতে চায় ত ক্ষতি ত শুধু তার নিজেরই।

তাছাড়া তার কথা বিশ্বাসই বা করবে কে? এত বছরের ব্যবধানে মিথ্যা রটনাও অকাট্য সত্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু অবনী সে বিস্মৃত কাহিনী নতুন করে খুঁড়ে বার করবেই বা কেন? সে ত শশধরের শত্রুতা করবার জন্য আসে নি। কেন তবে এসেছে শশধরের মনে সে প্রশ্ন অবশ্য জাগতে পারে। তার নিজের মনেও সে প্রশ্ন কি নেই!

রঘুকে আবার রিকশ থেকে নেমে হ্যাণ্ডেল ধরে টেনে নিয়ে যেতে হয়। দূরের মাতঙ্গী নদীর নালার মত একটা শাখা আছে। এখানে তার ওপর একটা বাঁধানো পোল হয়েছে। সেই পোল পার হয়েই বেশ চড়াই।

এখানে ডান দিকের জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত কাটা। একটা বড় কাঠের সাইন বোর্ডও পোঁতা হয়েছে।

সেটা পড়বার দরকার হয় না। তার আগে রঘুই জানিয়ে দেয়—এখানে কারখানা বসবেক বাবু। জবর কারখানা। কাগজ তৈরী হবেক। দেওয়ান বাবুরা বনাইতে আছে।

দেওয়ান বাবুরা মানে ত শশধর। কিন্তু দেওয়ান বাড়ির প্রতিনিধি একা শশধরই ত ছিল। দেওয়ান বাবুরা আবার কোথা থেকে এল?

রঘুকে জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তি হয় না। করাও বৃথা।

শশধরের অনেক স্বপ্নই তাহলে সফল হতে চলেছে। ডোমজুড়ি প্রায় আদিম অরণ্য থেকে বেরিয়ে আধুনিক যুগের নাগাল ধরেছে।

যে স্টেশনে কৃপা করে দুটো প্যাসেঞ্জার দুবার শুধু দিনে রাত্রে দাঁড়াত বিরল যাত্রীদের গাড়ীর কামরার সব কটা পাদানি বেয়ে মুড়ি ফেলা প্ল্যাটফর্মে নামবার সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ করতো, সেখানে এখন ওভারব্রীজ জোড়া তিন তিনটে উঁচু প্ল্যাটফর্ম। লাইনের সাইডিংএ সার সার মালগাড়ির খালাস-বোঝাই চলছে। হাজিগঞ্জ পর্যন্ত পিচ ঢালা রাস্তা; সেই রাস্তায় লাইট পোস্ট বসতে সুরু হয়েছে। বিজলী বাতির দেরী নেই। লক্ষ্মণ সাউর নিঃসঙ্গ দোকানের চালা ঘরটা এখন চূড়ায় হনুমানজীর মূর্তি বসান রাস্তার দু'পারে ছোটবড় অসুচরে ঘেরা তেতালা দালান কোঠা। একটা মোটা বাজার গড়ে উঠে হাজিগঞ্জের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। বাজার ছাড়লেই সিনেমা হল। তার বাইরে বসানো লাউড স্পীকার বিকেল না হতেই ছায়াছবির গানের কর্কশ বিকৃতিতে সমস্ত অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

খাস ডোমজুড়ির পথে যেতে এখনো এ জায়গায় সাবেকী অরণ্যরূপ কিছুটা দেখা যায়। কিন্তু সেখানেও নতুন কালের পদক্ষেপ সুরু হয়েছে।

এই রাখো।—অবনী হঠাৎ রঘুকে থামিয়ে রিকশ থেকে নেমে পড়ে।

কি হল বাবু, রঘু অবাক,—আর ত দশ মিনিটে পৌঁছাই দিব।

না, দরকার নেই।—অবনী ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বলে,—আমি এটুকু হেঁটেই যাবো।

পুরো ভাড়া পেলেও এরকম বেয়াড়া শখের মানে না বুঝতে না পেরে রঘু তার সরলতায় আপত্তি না করে পারে না,—রাস্তা ইখান হতে দূর আছে বাবু!

তা জানি। আমি এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাব। —অবনী যেন রঘুর কাছেই কুণ্ঠিত। রঘু কিন্তু বাধা দেয়।

উ জঙ্গলের রাস্তা বন হই গেছে বাবু। উধারে কাঁটা তার ঘিরাই দিছে।

ঠিক আছে আমি তারের বেড়া ডিঙ্গিয়েই যাব।

অবনী আর কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে রাস্তার ওপারে চলে যায়।

এখানে কিছুদূর পর্যন্ত যাবার কোন অসুবিধা নেই। দুএকটা বড় বড় শাল পিয়াল বাদ দিয়ে বাকি জঙ্গল সাফ করে ফেলা হয়েছে।

এক এক জায়গায় জমিতে দাগও কাটা হয়েছে কারখানা বাড়ির প্লান ধরে বোধ হয়।

পেছনের দিকে জঙ্গল এখনো কাটা চলছে। অবনীর হঠাৎ মনে হয় যে শিরিষ গাছটা আর বোধ হয় দেখতে পাবে না।

শশধরের নির্দেশ যদি জঙ্গল কাটার পেছনে থাকে তাহলে সে গাছটা সে বোধহয় রাখবে না।

হয়ত অনেক আগেই সে কাটা হয়ে গেছে। অবনী একটু পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। শশধরের সঙ্গে দেখা করার চেয়ে শিরিষ গাছটা দেখবার আগ্রহই তার বেশী এখন!

গাছটা এ শাল পিয়ালের জঙ্গলে থাকাই একটু বিচিত্র।

সেই কথাই শশধরকে একদিন বলেছিল মনে আছে। শশধর তার সেই স্বাভাবিক মাতব্বরী ভঙ্গিতে বলেছিল,—জঙ্গলে কি আছে না আছে সব কি জেনে ফেলেছ?

শশধরের কথার ধরণে সব সময় একটা বিদ্রূপের সুর একটু মেশানো থাকত। সেটা অবশ্য অগ্রাহ্য করা যায়, অবনী বুঝত। শহুরে অবনীর কাছে জঙ্গলের শশধর যে হার মানে না তাই বোঝাবার দুর্বলতা।

হার মানবার তার অবশ্য কিছু ছিল না। তাছাড়া অবনী তার সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করেনি কোথাও। পাল্লার ব্যবসায় যা হয়েছিল ও হতে পারত তাও অবনীর ইচ্ছাকৃত নয়।

কিন্তু শশধর সব বিষয়ে যেন এক ধাপ উঁচুতে থাকতে চাইত।

ওই শিরিষের প্রায় মগডালে মানিকজোড় মারাটাও সেই জন্যে। চড়ুয়ায় নয়, মেরেছিল পয়েন্ট দুশ পঁচাত্তরের বন্দুকে শুধু বাহাদুরী দেখাতে। অবনী বলেছিল, অন্যায় করলে।

কি?—শশধর ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল,— তোমাদের মত ছররাগুলি না ছেড়ে?

না,—অবনী হেসেছিল,—তোমার হাতের তাগ আছে সবাই জানে। কিন্তু মানিকজোড় মারতে নেই বলে।

কেন, মানুষের মত ওদের নভেলী প্রেম বলে?—শশধরের মুখে অবজ্ঞা ভরে কৌতুক ফুটে উঠেছিল।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল,—তোমার বাথা পাবার কিছু নেই। যেটাকে মেরেছি সেটা একাই বোধহয় মানিক! জোড় জোটেনি বা ছেড়ে গেছে। নইলে এতক্ষণে আরেকটা এসে ন্যাকা-কান্নায় কান ঝালাপালা করে দিত।

অবনী আর কিছু বলে নি। শশধরকে তখুনই সে ভালো করে চিনে ফেলেছে। দেখেছে যে শুধু

বাহাদুরীর জন্যেই—মনের কথা উল্টো করে বলতে তার আপত্তি নেই।

জঙ্গল তখন এখানে আরো অনেক গভীর। তার ভেতর দিয়ে মানিকজোড়টার পা বেঁধে বন্দুকের নলে ঝুলিয়ে যেতে যেতে শশধর এক জায়গায় ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

একটা কাঁটা লেগে পাঞ্জাবীটা আটকে যাওয়ায় অবনী সেটা তখন ছাড়াচ্ছে।

শহুরে পোষাকটা ছাড়তে হবে বুঝেছ!—বেশ গম্ভীর ভাবেই বলছিল শশধর—শুধু পোষাক নয়, শহুরে মনটাও। এখানে লুটোন ঢলঢলে জামা কি মন কিছুই চলবে না।

শশধরের সব কথার ওই-টেই ছিল একরকম ধুয়ো। অন্ততঃ প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত।

যে প্রসঙ্গই হোক ঘুরে ফিরে একবার শহুরে বলে অবনীকে খোঁচা দেবেই।

অবনী গোড়ার দিকে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে সত্যি কিন্তু তারপর কৌতুক অনুভব করেছে।

শিরিষ গাছটা কিন্তু শুধু মানিকজোড় মারার জন্যেই মনের মধ্যে আজো শিকড় গেঁথে নেই।

আরো অনেক কিছু তার সঙ্গে জড়ানো, কিছু যা কোন দিন বুঝি ভোলবার নয়।

জায়গাটার কাছাকাছি এখন এসে পড়েছে। শিরিষ গাছটা নেই এই আশঙ্কাই করেছিল অবনী, কিন্তু যা দেখল তা অন্ততঃ সে কল্পনাও করে নি।

শিরিষ গাছটা ঠিকই আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আর যা আছে তাই প্রায় অবিশ্বাস্য।

শিরিষের গুঁড়িটার চারিধারে সিমেণ্ট দিয়ে সযত্নে বাঁধানো গোল চওড়া একটা বেদী। বেদীটা ঘিরেও নিচের অনেকখানি জায়গা রঙ-বেরঙের নুড়ি ফেলে সাজানো। তার চতুর্দিকে ছোট ছোট থামের ভেতর দিয়ে লোহার শিকল চালিয়ে বেড়া দেওয়া।

বেড়া জায়গাটার সামনে শ্বেতশুভ্র মার্বেল পাথরের একটা ছোট খাট স্মৃতিস্তম্ভই বলা যায়।

অন্য কোন কিছু নয়, একটা তারিখ শুধু তার মধ্যে কালো অক্ষরে খোদাই করা।

তারিখটা অবনী পড়ে। তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

এ স্মৃতিস্তম্ভ শশধরের পক্ষেই স্থাপনা করা সম্ভব।

নিজের মনটা অবনী বুঝি একটু বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে। একটা আলোড়ন সেখানে সত্যিই উঠেছে এই এত কালের কালি পড়ে বুজে আসা হৃদয়ের ধারাতেও। কিন্তু সেটা বেদনার না জ্বালার, বিদ্বেষ না কৌতুকের স্পষ্ট করে বোঝা যায় না।

হয়ত সব কিছুই তার মধ্যে মেশানো।

কবে শশধর এ সব কীর্তি করেছে?

বেদী ও স্মৃতিস্তম্ভের চেহারা দেখে মনে হয় খুব বেশী দিন নয়। অন্ততঃ জায়গাটা যে অবহেলায় ফেলে রাখা হয় না তা সব কিছুর পরিচ্ছন্নতা দেখেই বোঝা যায়।

দূরে একটা গাছপড়ার সঙ্গে অবনীর চমক ভাঙে।

বড় একটা পিয়াশালের গুঁড়ি কেটে এখন দাঁড়ি বেঁধে টেনে মাটিতে ফেলা হ'ল।

কুলি ও কাঠুরেরা হৈচৈ করছে।

আর থাকা চলে না, তবু অবনীকে যেন জোর করে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে হয় এই জায়গাটার অদৃশ্য বন্ধন থেকে।

স্মৃতিস্তম্ভের তারিখটায় ভুল নেই।

এ তারিখ শশধরের মনেও যে ওভাবে গাঁথা হয়ে যেতে পারে তা অবশ্য তখন বুঝতে পারে নি। কিন্তু পারা কি উচিত ছিল না?

কাঠুরেরা যেখানে মাটিতে ফেলা গাছটার ডালপালা কাটছে তার বেশ একটু দূর দিয়ে বনের পথে যেতে যেতে অবনী সেই কথাই ভাবে।

সেদিন রাত্রেই শশধরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভাণ্ডারীর কুঞ্জে। ভাণ্ডারীদা নিজেই তার এ আস্তানাকে বলত 'কুঞ্জ'। দেখা হওয়াটা একটু আশাতীত, কারণ ভাণ্ডারীর সঙ্গে রেষা-রেষির চাপা আগুনটা তখনও ফুটে না বেরুলেও শশধর তার ছায়া সাধ করে তখন থেকেই মাড়ায় না! সেই শশধরের নিজে থেকে, আর কোথাও নয়—ভাণ্ডারীর রাতের আস্তানায় আসা একটু আশ্চর্য বই কি!

খবরটা পেয়েছিল ভেতরে ঢোকবার আগেই।

দুপাশে সিসল্ ঝোপ বসানো সঙ্কীর্ণ পথে টর্চ ফেলে যেতে যেতে নালার সাঁকোটা পেরোবার সময় চমকে উঠেছিল একটু।

তারপরই বোস্টমদি বলে চিনতে পেরেছিল।

তোমার অপিক্ষেতেই দাঁড়িয়ে আছি।—চাপা গলায় বলেছিল বোস্টমদি।

কেন কি হ'ল কি।—হেসে বলেছিল অবনী,—ভাণ্ডারীদা আজও তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি!

না, না শোনো।—চুপি চুপি কথা বলার ধরণেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বোস্টমদি বলেছিল,—ওই ডোমজুড়ির বড়বাবু হঠাৎ এসেছে। কি যে হবে ভেবে আমার বুক কাঁপছে। কর্তার মেজাজ ত জানো রাত যত বাড়বে তত খামখেয়ালী ও। তারপর একটা কুরুক্ষেত্তর হ'তে কতক্ষণ। তুমি যদি একটু বুঝিয়ে শুকিয়ে বড় বাবুকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পারো!

ভেতরে ভেতরে বেশ একটু উদ্বিগ্ন হলেও অবনী ভরসা দিয়ে বলেছিল, কিছু ভাবনা নেই বোস্টমদি। ভাণ্ডারীদা অতিথের মান রাখতে জানে, আর শশধর ডোরাকাটার ডেরায় ঢুকে অন্ততঃ তাকে ঘাঁটাবে না!

মুখে সাহস দিলেও অবনী বেশ একটু ভয়ে ভয়েই ভেতরের উঠানে ঢুকেছিল।

গ্রীষ্মকাল। হ্যাসক্ বাতিটা পেছনের দাওয়ার চালের বাঁশে ঝুলিয়ে ভাণ্ডারীদা উঠোনেই আসর পেতেছে।

অবনীকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে মোষটা ধরার ভঙ্গিতে বিশাল দেহ নিয়ে ঘুরে ঘুরে দুবার নেচে গেয়ে উঠেছিল,—এসো এসো বঁধু এসো। আধ আঁচরে বোসো।

ভাবভঙ্গি ও গলার স্বরে বোঝা গেলে ভাণ্ডারীর ইতিমধ্যে বেশ কয়েক পাত্র হয়ে গেছে।

নাচ থামিয়ে হাসি হাসি মুখে ভাণ্ডারী বলেছিল,—কে এসেছে দেখেছ চৌধুরী! খোদ দেয়ান ঠাকুর আবার দোনলা বন্দুক লই আসছে। কিছু ট্যারা-বাঁকা বলেছ কি দিবে গুড়ুম গুড়ুম করি বন্দুক ফুটাই!

ভাণ্ডারী বকতে শুরু করেছিল নিজের মনেই। শেষের কথাগুলোয় স্থানীয় টান। কিন্তু বিরূপ বলবার উপায় নেই! ভাণ্ডারীর এ মার্কামারা কথা বলবার মিশেল ধরণ সকলের জানা।

শশধরের হাতের বন্দুকটা উঠোনে ঢুকেই অবনীর নজরে পড়েছিল। তবু এখন যেন প্রথম লক্ষ্য করবার ভাণ করে বলেছিল—আরে তাইত এমন সময় বন্দুক হাতে বেরিয়েছ যে বড়!

চাঁপাগাছিতে চিতাটা আবার একটা গরু মেরেছে। মাচানে বসতে যাচ্ছি। যাবার পথে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে যেতে এলাম। রাত্রে এই ভাণ্ডারী-দার কুঞ্জে ছাড়া তোমায় পাওয়া যায় না জানি ত।

শশধর নিতান্ত সহজ গলাতেই কথাগুলো বলেছিল।

হ্যাসাক্ বাতিটা তার পেছনে। অন্ধকারে মুখের চেহারাটা তাই দেখা যায় নি।

ভাণ্ডারীদা নিজে উঠোনের মাটিতে মাদুর পেতে তার মৌতাতের সরঞ্জাম সাজিয়ে শশধরকে একটা ভাঙা মোড়া দিয়েছে বসতে। ভাঙা মোড়াটা তাচ্ছিল্যের নিদর্শন নয়। এ আস্তানায় ওটি ছাড়া উচ্চাসন নেই।

সেই উচ্চাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শশধর আবার বলেছিল—চলি ভাণ্ডারীদা। তোমার নেশা আশা করি চটিয়ে দিইনি।

আরে আমার নেশা কি অত সহজে চটে তোমার ওই দোনলা ত ছার কামান ফুটাই যাও না কেনে!

হাতের গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে ভাণ্ডারীদা আবার বলেছিল,—কিন্তু চিতা বাঘ মারতে যাচ্ছ। আমার এই যাদুর জল এক আজলা গলায় যদি ঢেলে যেতে! আপন হাতে চোলাই করছি হঁ। ই প্যাটে গেলে চিতাবাঘকে লাগত যেমন শিয়ালটা। ডরে হাত কাঁপত নাই।

ভাণ্ডারীদার কথায় শঙ্কিত হয়েছিল অবনী।

কিন্তু এ কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন উপহাস অনুমান করা যেত শশধর তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি।

হেসেই বরং জবাব দিয়েছিল,—ডান হাত কাঁপলে বাঁ হাতটাত আছে। তোমার ভাবনা নেই কিছু। ও চিতাবাঘের পরমায়ু ফুরিয়েছে। তোমায় বরং কাল চামড়াটা দিয়ে যাবো। আসন করে বসলে তোমার আপন হাতের চোলাইও ঝাঁঝালো হবে আরো।

ভাণ্ডারীদাকে উত্তরের অবসর না দিয়ে শশধর অবনীর কাঁধটা ধরে বাইরে নিয়ে গেছল। গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সাঁকোটার ওপর।

উঠোন থেকে বেরুবার সময় বোষ্টমদির কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অবনী লক্ষ্য করেছিল কিন্তু সাঁকোর ওপর শশধরের সঙ্গে দাঁড়াবার সময় বেশ একটু বিচলিত বোধ করেছিল নিজেকে।

কি বলবে শশধর! কি জানে সে!. কতটুকু?

অস্বস্তিটা আবার আরো বেড়েছিল শশধর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকায়।

শশধর নিজের গরজে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নেহাৎ তুচ্ছ কারণে ভাণ্ডারীর কুঞ্জে এসে অপেক্ষা করেনি এতক্ষণ। সেই কারণটা অবনী যা ভাবতে পারে তা ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব?

দূরের জঙ্গলে এক পাল শেয়াল ডেকে উঠেছিল।

শশধর যেন এই জন্যেই এতক্ষণ চুপ করেছিল। শেয়ালের ঐকতান শেষ হতে সে যা বলেছিল অবনী তাতে কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেছল প্রথমে।

শশধর বলেছিল,—আজ রাতটা তোমায় ডোম-জুড়িতেই থাকতে হবে বুঝেছ। আমি মাচানে বসতে যাচ্ছি। মঙ্গলা বাড়িতে একা।

কিন্তু,—অস্ফুট স্বর অবনীর মুখ দিয়ে বেরুবার আগেই শশধর বলেছিল,—ভরত থাকলে তোমায় কষ্ট দিতাম না। সে আজ দুপুরেই একটা জরুরী কাজে সদরে গেল। তখনও এ চিতার খবরটা ত পাই নি।

অনেক কথাই অবনীর মনে হয়েছিল। বনের চিতার খবরটা কি এত জরুরী যে ঘরের পাহারা অন্যের ওপর ছেড়ে তাকে মারতে যেতে হয়? তা ছাড়া পাহারা দেবার লোকের কি অভাব আছে শশধরের! আর মঙ্গলারও কি পাহারা দরকার হয়?

কিছুই সে অবশ্য বলে নি নিজের বিমূঢ়তাতেই।

শশধরই আবার বলেছিল,—দেওয়ান কুঠিতে এক রাত থাকলে তোমার শয্যাকণ্টক হবে না হে! তোমার ছাগল মুরগীর খোঁয়াড়ের সুগন্ধ শুধু পাবে না।

আপত্তি করাটাও ইঙ্গিতময় হতে পারে ভয়ে অবনী আর কিছু না বলে মৌন সম্মতি জানিয়েছিল।

এ কুঞ্জে তাহলে আর বেশী রাত কোরো না।—বলে শশধর বেশ দ্রুতপদেই চলে গিয়েছিল তারপর।

অবনীর চলা আর ভাবনা এক সঙ্গে থামে।

সামনে কাঁটা তারের বেড়া। এই বেড়ার কথাই রঘু বলেছিল। এদিকে বেড়া দেওয়াটা একটু অদ্ভুত লাগে বটে। কারখানার সীমানা নির্ধারণের জন্যেই দেওয়া হয়েছে অবশ্য। রাস্তার দিকে সীমা নির্দেশের ত আর দরকার নেই।

কিন্তু শশধরের কি এখন বেড়া দিয়ে নিজের সীমানা ঠিক রাখতে হয়! হতে পারে। যুগ পাল্টাবার সঙ্গে কত কিছুই হয়ত বদলেছে।

পাকা রাস্তায় অনেক বেশী ঘুর হয় বলেই বনের ভেতর দিয়ে এই সোজা পথটা অবশ্য নেয় নি। পথটার অন্য টানও আছে।

পাকা না হোক বড় রাস্তাটা তখনও ছিল। ডোমজুড়ির দেওয়ান বাড়ি যেতে তবু এই বনের পথই বরাবর ধরেছে।

কিন্তু এখন কাঁটা তারের বেড়াটা তপার না হলে নয়। রঘুর সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও বেড়াটা এমন উঁচু ও মজবুত আর কাঁটাতারগুলো এমন ঘন হবে ভাবে নি।

বেড়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে গলে যাবার মত ফাঁক খোঁজে অবনী।

দরকার হলে এখনও অবশ্য গাছের ডাল লাগিয়ে এ বেড়া টপকে যাবার ক্ষমতা অবনী রাখে। হ্যাঁ বয়সের তুলনায় সে যথেষ্ট শক্তসমর্থই আছে। বয়ে যাওয়া সময় তার ওপর বিশেষ দাগ রেখে যেতে পারে নি। নেহাৎ কাছে এসে দাড়ি চুলের পাক আর মুখের কিঞ্চিৎ কাঠিন্যের রেখা না দেখতে পেলে বয়সটা তার চলায় ফেরায় অন্ততঃ ধরা পড়ে না।

কোন এক আরক যেন তাকে জীর্ণ হতে দেয় নি এতদিন। সে আরক কি তার হৃদয় থেকে চোয়ানো ?

বেড়া টপকাবার দরকার হয় না। জঙ্গলে চরা কটা ছাগলই তাকে রাস্তা চিনিয়ে দেয়।

তারের বেড়া পেরিয়ে ছাগল কটা এধারেই চরছে।

কাছে গিয়ে তারের বেড়ার ফাঁকটা দেখা যায়। রাখালরাই বোধ হয় নিজেদের সুবিধের জন্যে ওপর নিচের তার টেনে বেঁধে গলে যাবার রাস্তা করেছে।

বেড়াটা গলে যাবার পর আর বেশী দূর নয়। মাঝে শুধু নালাটা পার হতে হয়।

নালাটা প্রায় এখন শুকনো। ঝির ঝির করে একটা ক্ষীণ ধারা শুধু মাতঙ্গীর দিকে বইছে।

এই নালার পথ দিয়েই মাতঙ্গীর দিকে একদিন গেছল। সঙ্গে ছিল মঙ্গলা।

মঙ্গলা !

ভাবতে অবাক লাগে। মঙ্গলাকে তখন চিনতইনা !

না ভুল হ'ল। চিনত ঠিকই, কিন্তু মঙ্গলা বলে নয়, শশধরের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কল্পনাও না করে।

কল্পনা করবে-ই বা কি করে ?

শশধরের সঙ্গে তখন ভালোই পরিচয় হয়েছে। এ জঙ্গল-মহলের প্রায় একচ্ছত্র মালিক শশধরদের দেওয়ান কুঠিতেও গেছে অনেক বার। নামে দেওয়ান কুঠি হলেও ছিরি ছাদ হীন ইট কাঠ পাথর মাটির খামখেয়ালী তৈরী জংলী রুচির নমুনা স্বরূপ আধা দুর্গ গোছের নতুন পুরোন ভাঙা ও আস্ত ঘর দালানের জটলা দেখে বিস্ময়ের চেয়ে কৌতুকই অনুভব করছে বেশী, কিন্তু মঙ্গলা বলে কারুর কোন অস্তিত্বের আভাসও কখনো পায় নি।

মঙ্গলাকে প্রথম এই অরণ্যপথেই দেখেছিল।

ভালো করে লক্ষ্যও বুঝি প্রথমটা করে নি।

এ তল্লাট তখন প্রায় আদিম বন। তপ্তায় এক-বার জিরাখালার হাটের দিন দু পাঁচজন আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ মাতঙ্গীর ওপার থেকে বনের ভেতর দিয়ে এই সোজা পথটা ধরে। তাও দল বেঁধে। আর এ বনে কখনো সখনো আসে শশধরের নিজের হুকুম দেওয়া কাঠুরেরা। শুধু হুকুমের পরোয়া করে না লোধা-রা। তারা শিকার করতেই আসে। সজারুটা খরগোসটা মেরে নিয়ে যায় আঠা-কাটি দিয়ে বগেড়ি ধরে, আবার সুযোগ সুবিধে হলে ছোট ছোট বাড়ন্ত শাল কি লম্বি বাঁশ কেটে নিয়ে যায়।

দূর থেকে দেখে লোধাদের মেয়েই ভেবেছিল প্রথম। সেইটে ভাবাই স্বাভাবিক। কারণ আদি-বাসী যুবতী মেয়েরা একা এ বনে পারতপক্ষে আসবে না। কিন্তু তারপরই মনে হয়েছিল লোধা মেয়ে-দের চেহারা পোষাক কিছুর সঙ্গেই মিল নেই। পোশাকটা বরং আদিবাসীদেরই মত। কিন্তু রংটা এক

নজর দেখাতেই বেশ আলাদা বোঝা গেছল। ওরকম তামাটে ফর্সা আদিবাসীদের ভেতর দেখা যায় না।

ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। লোধাই হোক আদিবাসীই হোক জঙ্গলের পথে অচেনা একা মেয়ে সম্বন্ধে অতিরিক্ত কৌতূহল শোভনতার প্রশ্ন বাদ দিয়েই ঠিক নিরাপদ নয়। তা ছাড়া অবনীর মনটাও অন্য ভাবে তৈরী। নীতিবাগিশ কি ঋষ্যশৃঙ্গ না হ'লেও এ জঙ্গলের রাজ্যে নীতি কি রুচির বালাই বিসর্জন দেবার লোভেই সে আসে নি।

মাঝখানে কটা লম্বা বাঁশের ঝাড় পড়ায় চলার পথে মেয়েটা আড়ালে পড়েছিল।

বাঁশ ঝাড়টা ছাড়িয়ে যাবার সময় পেছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়াতে হয়েছিল চমকে। চমকে শুধু নয়, বেশ একটু হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

এ কুঁকড়াবাবু। উদিকে যাইবেন নাই। বন বরা বেরোইছে।

লোধা কি আদিবাসী মেয়ে অচেনা পুরুষকে যদি বা বিপদের মুখে সাবধান করতে পারে সাহস করে, কিন্তু স্থানীয় টান সত্ত্বেও এ বাংলা তাদের মুখে ত বার হয় না।

তা ছাড়া ওরকম অদ্ভুত প্রায় উপহাসের সম্বোধন তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

অবনী ফিরে তাকিয়েছিল একটু অপ্রসন্ন মুখেই।

মেয়েটি তখন বাঁশবনটার অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

চেহারা পোষাক দেহের যৌবনোদ্ধত বাঁধুনি লক্ষ্য করবার মত। বিশেষ করে লক্ষ্য করবার, তার দৃষ্টি। তাতে সঙ্কোচ বিস্ময় যেমন নেই তেমনি নেই কৌতুকেরও কোন স্পষ্ট আভাস। আদিবাসীদেরই ধরণে যে শাড়াটা পরা তার দৈর্ঘ্য তুলনায় একটু বেশী, সেরকম মোটা তাঁতের খোকড়ও নয়। সেই সঙ্গে গায়ে একটা ঝুলা, হাতে দুটি কঙ্কন ও কানের দুটি ফুল ছাড়া শরীরে আর কোন অলঙ্কার নেই। অলঙ্কার গুলিও আদিবাসীদের ধরণের নয়।

এসব খুঁটিনাটি সেদিন সেই মুহূর্তেই হয়ত লক্ষ্য করে নি। পরে যা চোখে পড়েছে সেই সবই হয়ত সেই মুহূর্তের স্মৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু লক্ষ্য যা করেছিল তা মেয়েটির চেহারা পোষাক চলন এবং সব কিছু জড়িয়ে বিশেষ ভাবে তার দৃষ্টিতে অনায়াস আভিজাত্যের একটি স্বাচ্ছন্দ্য। পরণে যার ওই পোষাক কথায় যার অমন বাঁকা টান প্রায় জংলী তেমন একটি মেয়ে এই আভিজাত্যের অকৃত্রিম ভঙ্গি কোথায় পেল ভেবে বিস্মিত হয়েছিল তখনই। কৌতূহলটাও তখন আমল না দেবার মত ক্ষীণ নিস্তেজ আর নেই।

মেয়েটি সামনে আসার পর তার হাতের লম্বা লাঠি বলে যা মনে হয়েছিল সেটা সড়কি বলে বোঝা গেছে।

সেদিকে তাকিয়ে অবনী ঈষৎ কঠিন স্বরে হলেও একটু দ্বিধা করেই বলেছিল,—বন বরা বেরিয়েছে ত তুমি এখানে কেন? তোমার ভয় নেই?

দ্বিধাটা অন্য কিছুর জন্যে নয়, তুমি বলে সম্বোধন করতে। তুমি বলে এ মেয়েটিকে প্রথম সম্ভাষণ জানাতে যেন কোথায় বেধেছিল, কিন্তু আপনিই বা বলা যায় কি করে?

মেয়েটি এইবার একটু হেসেছিল। তারপর চকিতে একবার নিজের হাতের সড়কিটার দিকে চেয়ে কি না চেয়ে বলেছিল,—ভয় থাকবে নাই কেনে! তবে বন বরা জঙ্গল আর শহরের মানুষের ফারাক বুঝে যে!

ফারাক বুঝলে শহরের মানুষকে ঘাঁটাবে না! —অবনী নিজের পরিহাস করবার ধরণে নিজেই খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ অচেনা একটা জংলী মেয়ের সঙ্গে নির্জন বনের মধ্যে এভাবে

আলাপ করাই কেমন যেন আজগুবি। মেয়েটির কথার জন্যে অপেক্ষা না করেই সে তারপর সোজাসুজি কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করেছিল,—আমায় তুমি চেন ?

মেয়েটির চোখে এবার একটু স্নিগ্ধ কৌতুকের আভাস। হ্যাঁ, না কিছুই কিন্তু সে বলে নি।

অবনীই একটু কঠিন স্বরে আবার বলেছিল—কুঁকড়া বাবু বলে কোনো ভদ্রলোককে কেউ ডাকে!

নামটা জানি না যে!—মেয়েটি হেসে উঠে বলেছিল।

কিন্তু কুঁকড়া বাবু নাম কোথায় পেলে তাহলে ? গলার স্বরটা যতদূর সম্ভব কড়া রাখবার চেষ্টা করেছিল অবনী।

ই দেখো,—মেয়েটির মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুক মেশানো, আপনে ত কুঁকড়া পালেন—হাঁস কুঁকড়া পেরু বকরী। আমি জানি না!

তুমি জানো ?—অবনী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল তারপর,—তুমি থাকো কোথায় ? কোন গাঁয়ে ঘর ?

মেয়েটি কোনো উত্তর দেয় নি। শুধু অদ্ভুত রহস্য-কৌতুকে মেশানো দৃষ্টিতে অবনীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল।

না, খিল খিল করে চপল-উচ্ছ্বসিত হাসি হাসে নি। ছুটেও যায় নি চঞ্চল দ্রুতপদে।

প্রায় নিঃশব্দেই হাসতে হাসতে ধীর মন্থর গতিতে দূর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছল, একবার কি দুবার ফিরে চেয়ে। কিন্তু হঠাৎ এক ঝাঁক উড়ন্ত টিয়ার সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনিতে মনে হয়েছিল সমস্ত বনভূমিই যেন প্রচণ্ড কৌতুক চাপতে না পেরে ব্যঙ্গহাস্যে ফেটে পড়ছে।

বন-বরার ভয় থাক বা না থাক মুংরা হাটায় অবনী সে দিন আর যায় নি। মেয়েটি যে দিকে অদৃশ্য হয়েছিল সেই দিকেই বনের মধ্যে কিছুক্ষণ উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

মেয়েটিকে খুঁজে বার করবার কোন আশা নিয়ে নয়!

কল্পনাকে একটু রাশ ছেড়ে দিলে সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত অলীক দিবাস্বপ্ন বলে ভাবতে পারত। রক্ত-মাংসের কোন নারী নয় রহস্যময়ী অরণ্য-প্রকৃতিই যেন তার সঙ্গে একটু কৌতুক করবার জন্যে এভাবে মূর্ত হয়ে তাকে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু মন তার রঙ-ছুট না হলেও কল্পনাকে ও রকম প্রশ্রয় দেবার উৎসাহ তখনও ছিল না।

কৌতূহল হয়েছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তাতে দিশাহারা বিহ্বল হয় নি। মনের আগ্রহ মনেই চেপে রেখে-ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। কারুর সঙ্গে এই ঘটনা নিয়ে আলাপও করে নি।

কেমন করে একটা বিশ্বাস তার হয়েছিল যে এই রহস্য-সাক্ষাৎ ওইখানেই শেষ হবে না। মেয়েটিকে এই অরণ্যেই একদিন আবার দেখতে পাবে। পেয়েছিলও তাই।

নালার পাড়টা বেয়ে উঠে কিছুদূর যাবার পরই দেওয়ান কুঠি চোখে পড়ে। আগে থাকতে খানিকটা অনুমান না করে রাখলে অবাক হবারই কথা। কিন্তু এতখানি না হলেও অবনী এই ধরণের পরিবর্তনই কতকটা আশা করেছিল।

অরণ্যের মাঝখানে জংলা মাটি পাথরের আধা দুর্গস্তূপ নয়, বলতে গেলে আধুনিক জমকালো ছোট খাট প্রাসাদ। চারিদিকে বিরাট সাজানো বাগানের মাঝখানে কোন আলাদীনের প্রদীপের কল্যাণে এনে বসানো হয়েছে।

ঢুকতেই বিরাট তোরণের সামনে দাঁড়ালে এ

অঞ্চলের সাধারণ মানুষের নিশ্চয় বিস্ময় সম্ভ্রমে মাথা হেঁট হয়।

তোরণের সামনে যথাযথ সাজ পোষাক পরা শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক নিয়ে। তবে নেহাৎ শোভা হিসেবে। কোন প্রশ্নও করে না। বাধাও দেয় না। অবনীকে অন্ততঃ নয়।

বাঁ দিকের লম্বা বারান্দা ঘেরা একতলা বাড়ীটার চেহারা দেখেই কাছাড়ি-বাড়ী বলে বুঝে অবনী সেখানেই আগে যায়।

বেলা প্রায় দুপুর হতে চলেছে। মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের জন্যই বোধহয় লোকজন বিশেষ সেখানে নেই। পর পর তিনটি কামরার শেষেরটিতে জিজ্ঞাসা করবার একজন লোক অবনীর নজরে পড়ে।

কামরার দরজার ধারে ইংরাজীতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার লেখা একটা পেতলের ফলক আঁটা।

ভেতরে একটা টেবলের ধারে সার্ট-প্যাণ্ট পরা একজন অল্পবয়সী যুবক একলাই কাজ করছে।

অবনীর পায়ের শব্দে সে মুখ তুলে তাকায়।

একটু আসতে পারি ?—অবনী বিনীতভাবে অনুমতি চায়।

নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! অবনীর চেহারা পোষাক না কি দেখে বলা যায় না, সহকারী ম্যানেজার সহাস্যেই তাকে ভেতরে এসে বসতে বলে।

অবনী সামনের চেয়ারটায় বসবার পর ইংরাজি সৌজন্যেরই যেন বাংলা তর্জমা করে সহকারী বলে,—আপনার কি করতে পারি বলুন।

অবনী একটু দ্বিধা করে। সরাসরি আসল কথাটা জানাতে যেন তার বাধে।

একটু সময় নিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে বলে—দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমার দরকার আপনাদের খোদ কর্তার সঙ্গে।

ও ভাণ্ডারী সাহেবের সঙ্গে —সহকারী অবনীকে প্রায় চমকে দিয়ে জানায়—কিন্তু তিনি ত এখানে নেই। দুদিন বাদে ফিরবেন।

অবনীর বিস্মিত অবস্থাটাই লক্ষ্য করে সহকারী সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে আবার—আচ্ছা আপনার ব্যাপারটা কি খুব জরুরী ?

জরুরী ! বিস্ময় কাটিয়ে উঠে আপনা থেকেই অবনীর মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে—হাঁ জরুরী নিশ্চয়ই। তবে কুড়ি বছরের ওপরে যখন কেটে গেছে তখন আর কটা দিন বোধ হয় অপেক্ষা করা যায়।

কুড়ি বছর আপনি অপেক্ষা করেছেন ? সহকারীর মুখে অবনীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে একটু সংশয় প্রকাশ পায়—কোথা থেকে আসছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

সহকারীকে আর একটু হতভম্ব করবার লোভ যেন সম্বরণ করা যায় না।

অবনী হেসে বলে—আসছি তা বেশ একটু দূর থেকে ! সাগর ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে বলতে পারেন।

একটু থেমে সহকারী ম্যানেজারের সন্দিগ্ধ বিমূঢ়তাটা উপভোগ করে অবনী আবার জিজ্ঞাসা করে—ভাণ্ডারী সাহেবই তাহলে আপনাদের খোদ কর্তা এখন ?

আজ্ঞে হাঁ—তিনিই সব। তবে কুড়ি বছর বাদে বিদেশ থেকে আসছেন যখন সে কথা আর কি করে জানবেন।

শেষ কথাগুলোয় হয়ত এতক্ষণের বিভ্রমের শোধ হিসাবে একটু বিদ্রূপের সুর আছে, কিন্তু সেটা ধর্তব্য নয়।

আচ্ছা নমস্কার ! বলে অবনী উঠে পড়ে।

সেই তোরণ পেরিয়ে বড় রাস্তায় যেতে যেতে মনে হয়—ভালোই হয়েছে সরাসরি প্রশ্ন না করে।

ব্যস্ত হবার তার কি আছে ? হাতে তার অঢেল

সময়। শশধরের খোঁজ সোজাসুজি নেবার এখন আর আগ্রহই নেই। তাহলে শশধরের কাছে পৌঁছতে কতক্ষণ। তার আগে অচেনা বাইরের লোক হিসেবে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পরিবর্তনের ঢেউয়ে ভাসা এই অরণ্য-ভূমির সঙ্গে পরিচয়টাই নিবিড় হোক না কেন?

বড় রাস্তায় এসে সেই রঘুরই দেখা পায়।

আর দু'চারটে সাইকেল রিকশ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কিন্তু একবার সওয়ারী করে রঘুর একটা অলিখিত দাবী জন্মে গেছে তার ওপর।

আসেন সাধু বাবা।

রঘু সবার আগে রিকশটা কাছে এনে দাঁড় করায়।

রঘুর সম্বোধনে মনে মনে হাসে অবনী। পোশাক তার সাধুর নয়, সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী, রঘুর সমীহটা সুতরাং তার লম্বা কাঁচা-পাকা চুল আর দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রুর দরুণ। অ্যাস্তিসট্যাণ্ট ম্যানেজারের প্রথম খাতিরটার কারণও বোধ হয় ছিল তাই।

বিনা প্রতিবাদেই এ সম্বোধন মেনে নিয়ে অবনী রিকশয় চেপে বসে।

গড়ানে রাস্তায় সাইকেল ছেড়ে দিয়ে রঘু জিজ্ঞাসা করে, ইস্টিশানে লই যাবো ত?

না বাজারে চল। এখানে ভালো হোটেল আছে?

ভালো মন্দ আমরা কি জানব সাধু বাবা। তবে দাসবাবুর হোটেলেই সবায় যায় বটে। তা আপনে দেওয়ান কুঠির অতিথিশালায় রইলেন না কেনে। কতো বড়ো বড়ো লোক সাহেব সুবারা আসি থাকে।

না, আমি বাজারের কাছাকাছি থাকতে চাই। তুমি দাসবাবুর হোটেলে চল।

যা বলেছেন আজ্ঞে। উই ভালো—রঘু সায় দিয়ে মন্তব্য করে,—উ বড় মানুষের ঠাঁই থাকার অনেক ঝামেলা।

দাসবাবুর হোটেল পর্যন্ত পৌঁছতে রঘুর অনেক এ রকম মন্তব্য শুনতে হয়। সেই সঙ্গে নানান স্থানীয় সংবাদ ও কাহিনী।

অবনী এক সময়ে ফাঁক পেয়ে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করে—ভাণ্ডারী সাহেবকে চেনো?

রঘু সবিস্ময়ে জানায়—উয়ারে কে না চিনে সাধু বাবা? তিনি দিল্লীতে যাই নাম করলে এক ডাকে চিনবে। এই ডোমজুড়ি হতে মুংরাহাটা তামাম মুলুক হাঁক পাড়লে সাড়া দিবেক।

অবনী আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। মনের মধ্যে একটা খেই শুধু যেন হাতড়ায়। অস্থির হবার প্রয়োজন নেই। সব খেই আপনা থেকেই ক্রমশ ধরা দেবে।

দাসবাবুর হোটেলেই অবনী উঠেছে।

হোটেল অতি নিম্নস্তরের। সাধারণতঃ হাটে কেনা বেচার ব্যবসায়ীরা আর ওষুধ-পত্র ইত্যাদির কোম্পানীর দালালরাই দুচার দিনের জন্যে উঠে চলে যায়।

কিন্তু হোটেল যেমনই হোক তার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার দরকার শুধু একটা আস্তানার। হোটেলে সে থাকেই বা কতক্ষণ। দুবেলার স্নানাহার আর রাত্রের শোয়াটুকু। বাকি সময় ঘুরে বেড়ায়।

না, কেউ তাকে এখানে চেনে না।

লছমন সাউর আড়তে গেছল দুদিন আগে। লছমন বুড়ো হয়েছে, এক মাথা সাদা চুল নিয়ে ভুঁড়ি বার করে সে দোকানের বাইরের বারান্দায় খাটিয়ায় বসে তামাক টানে আর কাশে। আড়ৎ চালায় তার ছেলে।

লছমন তাকে চেনে নি। সাধুবাবা বলেও অবশ্য সম্বোধন করে নি। শুধু কৌতূহলী হয়ে একবার তাকিয়েছিল।

দোকানে আসার অজুহাত হিসেবে নোটের ভাঙানি চেয়েছিল অবনী।

লছমন সাউ ভ্রূকুঞ্চিত করে, বলেছিল—বড়ি আফশোষ। রেজগী আমাদেরই মিলে না।

শুধু আর একটু কথা বাড়িয়ে পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ করবার জন্যেই অবনী বলেছিল—সে কি! আপনার এত কালের এত বড় দোকান। দশ টাকার ভাঙানি হবে না।

লছমন সাউ গলে নি। কোন দিনই গলত না। তেমনি ভ্রূকুঞ্চিত করেই কাশতে কাশতে বলেছিল। বাট্টা দিবেন। দো আনা বাট্টা।

তাই দেব —অবনী রাজী হয়েছিল।

লছমন সাউ এবার ভেতরের গদিতে তার ছেলেকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—যান উখানে।

ভেতরের গদি থেকে নোট ভাঙিয়ে ফিরে এসেও অবনী আবার লছমনের খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

সুক্রিয়া সাউজি। আজকাল বুঝি আর নিজে গদীতে বসেন না!

গায়ে পড়ে আলাপটা সাউজির খুব পছন্দ নয়, তবু খদ্দেরকে খাতির করার মজ্জাগত সংস্কারে জবাব না দিয়ে পারে নি।

আরে গদি ত আছে উসবকে নিয়ে।—সাউজি হাত বাড়িয়ে গদিতে বসা ছেলেকে ও নেপথ্যের আরো কতজনকে বলা যায় না দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল,—এখোনভি পয়সার পিছে ছুটবো তবো ভগোয়ানের নাম লিব কখন?

সাউজির ঈশ্বর-চিন্তা সার করার নমুনা কিছু আগেই পাওয়া গেছে সন্দেহ নেই। অবনী তাই সায় দিয়ে বলেছিল,—তা ত ঠিকই। যে বয়সের যা। ইহকালের কাজ যা করবার সবই ত করেছেন, এখন পরকালের কথা ভাবতে হবে বই কি! তা এ আড়ৎ ত আপনার কম দিনের নয়!

কেতো দিন জানেন?—এবার সাউজি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল,—জঙ্গল ছিলো, খালি জঙ্গল। ই দুকান ছিল খাপরার ঘর। উখান হোতে রাত্রে শের কি আওয়াজ শুনিয়েছি। কুথা ছিল হেথোন উ বনার্জি বাবু। বড়া দুকানওয়ালা বনেছে আজ!

বোঝা গেছল সাউজির ঈশ্বর-চিন্তায় বনার্জি বাবুর দোকানটাই এখন প্রধান বিঘ্ন। ব্যানার্জি ব্রাদার্সের দোকানটা ইতিমধ্যে অবনী দেখেছে। সাজানো-গোছানো হাল ফ্যাশানের আড়ৎ। সাউজির সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে। ব্যানার্জি বাবুর প্রসঙ্গটা আর ছড়াতে না দেবার জন্যে অবনী গভীর বিস্ময় দেখিয়ে সাউজিকে তুষ্ট করে বলেছিল—আপনার আড়ৎ ওই অত দিনের! ডোম-জুড়ি ত তাহলে আপনারই হাতে গড়া বলতে হবে! আচ্ছা আপনার জানা-শোনা তখনকার মানুষ-জন কেউ আছে নাকি আজো!

সাউজি ভুরু কুঁচকে অবনীর দিকে চেয়েছিল। পরীক্ষার বুঝি চরম মুহূর্ত।

কিন্তু বোঝা গেছল সাউজি তাকে লক্ষ্য করবার জন্যে ভ্রূকুঞ্চিত করেনি, করেছিল অভ্যাসে কিংবা ফালতু প্রশ্নের জবাব দিতে হওয়ার বিরক্তিতে।

বলেছিল,—কে থাকবে! উও ডোমজুড়িই আর নাই। যে আছে সে ভি মরিয়ে আছে।

অবনীর প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে। সে তাই আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল।

যে আছে সেও মরেই আছে।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই সিসলের সারি দেওয়া পথটা দিয়ে সেদিন বিকেলে যাচ্ছিল।

সিসলের সারি ঠিকই আছে বরং আরো ঘন দুর্ভেদ্য হয়েছে। লম্বা করাতের মত কাঁটা দেওয়া পাতা-গুলো পথের ওপরই ছড়িয়ে আছে কোথাও কোথাও। পথ বলতেই কিছু আর নেই। আগাছার জঙ্গলে সব দিয়েছে ঢেকে। দুধারের সিসলগুলিই শুধু নিশানা।

এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাঁ এই এখানেই ছিল সাঁকোটা নালার ওপর। ওধারে খানিকটা মাটির স্তূপ। ভাণ্ডারীদার কুঞ্জের শেষ সমাধি বলা যায়।

এ দিকটায় এখনো নতুন কালের ছোঁয়া পৌঁছোয়নি। অযত্নে অবহেলায় ভাণ্ডারীদার কুঞ্জের বাগানই জঙ্গল হয়ে উঠেছে।

জায়গাটা টিলার মত একটু উঁচু। এখানে দাঁড়িয়ে দূরে মাতঙ্গী নদীর খানিকটা ধারা আর তার ওপারের বালির চর দেখা যায়। দেখা যায় তার ওপারে দূর দিগন্তের পাহাড় শ্রেণী। তার কোল পর্যন্ত শালের জঙ্গল ছড়িয়ে আছে। সব যেন এই বিরাট শালবনের প্রাচীর। ও পাহাড়ের নামটা যে ভীমের বেড় তা ভাণ্ডারীর কাছেই শুনেছিল।

শালের জঙ্গল এখন বোধ হয় আর মালিকানার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে নেই। বড় গাছ সব কাটা হয়ে গেছে। নতুন চারা উঠছে প্রায় এক মাপে। এখান থেকে যেন সবুজ গালচে পাতা বলে মনে হয়।

ভাণ্ডারীদা একদিন এখান থেকেই ওদিকের পাহাড় জঙ্গলের দিকে চেয়ে বলেছিল—ওই জঙ্গলে একদিন কাঠও কেটেছি জানো।

ভাণ্ডারীদা আর কিছু বলে নি। অবনীও জিজ্ঞাসা করে নি, কারণ ভাণ্ডারীদার সঙ্গে তখন যেটুকু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাতেই সে বুঝেছে, নিজে থেকে বলতে না চাইলে কোন কথা তার কাছ থেকে বার করবার নয়।

ভাণ্ডারীদার এই জঙ্গলের কাজের কথা অবনী অন্য দু চার জনের মুখেও তখন শুনেছে। শুনেছে আরো অনেক কিছু। সত্যমিথ্যা তার যাচাই করবার কোন উপায় নেই। ভাণ্ডারীদার আগের জীবন সত্যিই বেশ খানিকটা রহস্যে ঢাকা।

ভাণ্ডারীদা মেজাজ-মর্জি ভালো থাকলে কখনো সখনো দু একটা কথা বলে ফেলে। তাতে রহস্য বাড়ে বই কমে না, তার আসল ইতিহাস কেউই সঠিক জানে না। শশধরও জানত না।

ভাণ্ডারীদা এ অঞ্চলে যখন এসেছে শশধর তখন শিশুই বলতে হবে।

ভীমের বেড় পাহাড়ের ওপারে চৌগড়ের কোন রাজার সনদের জোরে এক সাহেব কোম্পানী তখন এ অঞ্চলের হর্তা-কর্তা। ক্ষেত-খামার মাঠ-ঘাট পাহাড় জঙ্গল নদী সবই তারা গ্রাস করে বসে আছে। তারাই জমিদারী চালায়, জঙ্গল জমা দেয়, খুশি মত সব কিছুতেই হাতে মাথা কাটে।

তাদেরই কোন ঠিকাদারের তাঁবেতে ভাণ্ডারীদা ওই জঙ্গলে কাঠ-কাটার কাজ নিয়েছিল প্রথম। কিন্তু তারপর কিছুদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলে সাহেব কোম্পানীর এক সাহেবকে ওই জঙ্গলে নিকেশ করে দিয়েই নাকি সে ভীমের বেড় পাহাড়ে কয়েক বছর লুকিয়ে বেড়িয়েছে।

কথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। ভাণ্ডারীদার শরীরে অসুরের মত শক্তির প্রমাণ সে পেয়েছে, দেখেছে, প্রৌঢ় বয়সেও ভাণ্ডারীদার ভেতর বন্য একটা দুরন্ত প্রাণী কি ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

সাহেব কোম্পানীর প্রতাপ যখন অস্তমিত ভাণ্ডারী তখনই আবার ফিরেছিল।

তখন ডোমজুড়ির দেওয়ান বাড়ি চৌগড়ের সনদ ভুয়ো বলে প্রমাণ করবার জন্যে মামলা লড়ছে সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে। চৌগড়ের রাজবংশই তখন গেছে লুপ্ত হয়ে। সে দিক থেকে দু পক্ষের কেউই কোন সমর্থন কি প্রতিবাদ পায় নি।

মামলা গড়াতে গড়াতে বিলেতের প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এদিকে ভীমের বেড়ের জঙ্গল তখন প্রায় বেওয়ারিশ। মালিকের ঠিক নেই তাই যার যেমন সাহস আর সুবিধে সে জঙ্গল কাজে লাগায়।

ভাণ্ডারীর সাহসের অভাব ছিল না। সুবিধে

সে নিজেই করে নিতে জানে।

ওই জঙ্গলেই ভাণ্ডারী এসে আড্ডা গেড়ে ছিল।

কেউ বলে ওখানে যত রাজ্যের খুনে খুনে বদমাস জুটিয়ে ডাকাতি করত। দেওয়ান কুঠির সে যুগের সব চেয়ে বড় ডাকাতি সেই করেছিল অনেকে রটায়।

কেউ বলে না খুনে বদমাসদের জড়ো করে সর্দারী করলেও ভাণ্ডারী ও সব কিছু করে নি, তবে বেওয়ারিশ জঙ্গলের গাছ বেপরোয়া কেটে চালান দিয়ে পয়সা করেছে।

তাকে সায়েস্তা করবার কেউ তখন নেই।

দেখা-শোনার অভাবে ও জঙ্গল তখন গহন দুর্ভেদ্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কে যাবে সেখানে প্রাণের মায়া ছেড়ে। গেলে হয় বাঘ ভালুক সাপ কি ভাণ্ডারীর অনুচরদের হাতে প্রাণটা রেখে আসা ছাড়া উপায় নেই।

ইতিমধ্যে শশধর দেশে ফিরছে তার বাবার মৃত্যুর পর। দেওয়ান বাড়ির সেই একমাত্র ছেলে যে জঙ্গল-মহল থেকে বেরিয়ে শহরে গেছল লেখা পড়া শিখতে।

লেখাপড়া যাই শিখুক শশধর দেওয়ান বাড়ির ধারা থেকে একটু আলাদা হয়েই ফিরেছে। কিন্তু সত্যই আলাদা কি।

সাহেব কোম্পানী তখন বিলেতের শেষ আদালতে হেরে গিয়ে পাণ্ডাড়ি গুটোচ্ছে। শশধর সমস্ত মুল্লুকের রাশ নিচ্ছে নিজের হাতে।

ভাণ্ডারী গহন বনের মাঝখানে তার দুর্গম আস্তানায় আরো অনেকদিন বেপরোয়া ভাবে স্বাধীন হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু কেন বলা যায় না শশধরের মালিকানা সে মেনে নিয়েছিল তখনি। নিজে থেকে উপযাচক হয়ে লিখিত-পড়িত ভাবে ও জঙ্গল জমা নিয়েছিল দেওয়ান বাড়ি থেকে।

গোল বেধেছিল তারপর। ভাণ্ডারী ও জঙ্গলের ইজারা ছেড়ে দিয়েছিল কিছুদিন বাদে। শশধরের সঙ্গে একটা চাপা বিরোধের বীজ সেই সময়ে বোধহয় অঙ্কুরিত হয়েছিল।

সে অঙ্কুর খুব স্পষ্ট ছিল না কারুর কাছে। দিন দিন এমন কিছু বেড়েও ওঠে নি। কিন্তু অবনী সেটা অনুভব করেছিল প্রথম থেকেই।

প্রথম ভাণ্ডারীদার সঙ্গে তার পরিচয়ও অবশ্য বিরোধের মধ্য দিয়ে।

তার মুনিষ গোবর্ধন এসে একদিন কেঁদে নালিশ জানিয়েছিল—দেখেন বাবু আমাকে কি রকম মারছে, আর কুঁকড়াটা কাড়ি রাখছে।

মারটা এমন কিছু নয়, মাটিতে আছড়ে পড়ার কটা দাগ গায়ে কাপড়ে, কিন্তু মোরগটা কেড়ে রাখাটা গুরুতর ব্যাপার।

অবনী তাই রেগে জিজ্ঞাসা করেছিল,—কে? কে মোরগটা কেড়ে রেখেছে?

ওই—ভাণ্ডারী বাবু! কুঁকড়াটা কুঞ্জের মধ্যি যায় নাই বাবু! আমি বাহার হতেই ধরে ফেলাইছি। তবু জুলুম করি কাড়ি রাখিলেক। আমি টানি রাখতে গেলাম ত আমায় বেধড়ক মারি দিলেক।

ভাণ্ডারী বাবু নামটা তখন অচেনা।

কুঞ্জটা বুঝতে পেরেছিল। তার জমির কিছু দূরেই শালের খুঁটির বেড়া দেওয়া একটা বিস্তীর্ণ বাগান, তার মাঝখানে ঝকঝকে তকতকে নিকোনো পোঁছোন একটি খোড়ো দোচালা স্টেশনের দিকে যাবার পথে নজরে পড়েছে। কোঁটা তিলক রসকলিকাটা মাঝ বয়সী হলেও আঁট-সাঁট গড়নের একটি স্নিগ্ধ শান্ত চেহারার স্ত্রীলোককে মাঝে মাঝে ওই পথে আসতে যেতে দেখেছে। কখনো কখনো রাত্রে সন্দেহজনক চড়া গলা ওদিক থেকে ভেসে এলেও খোল করতালের আওয়াজ আর নাম গানের সুরও কানে এসেছে অনেক দিন। তাই কুঞ্জ বলতে ওই জায়গাটিকে বুঝতে কষ্ট হয় নি। কুঞ্জ মানেই বৈষ্ণব হোক আর বৈষ্ণবদের

এলাকায় মোরগের অনধিকার প্রবেশ যতই দোষের হোক, মেরে ধরে সে মোরগ কেড়ে রাখা ত বৈষ্ণব বিনয়ের সঙ্গে মেলে না। বৈষ্ণবের কুঞ্জে পরম বৈষ্ণব এই ভাণ্ডারী বাবুটি কে তাহলে!

তাই দেখতেই গোবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে একরকম আস্তিন গুটিয়েই গিয়েছিল। সিসলের সার বসানো পথে সাঁকোটা পার হতেই দেখা পেয়েছিল ভাণ্ডারীর। গোবর্ধন যে সেইখান থেকেই সরে পড়েছিল প্রথমটা অবনী টেরই পায় নি।

জলহস্তীর মত বিরাট শরীর নিয়ে ভাণ্ডারী তখন উঠোনে বসেই মোরগটার পালক ছাড়াচ্ছে। সদ্য ঝুঁটি বেরুনো বাচ্চা মোরগের কাটা মাথাটা পড়ে আছে সামনে।

অবনীকে ঢুকতে দেখে জালার মত মুখে মিট মিট করে হাসতে হাসতে ভাণ্ডারী বলেছিল,—বাঃ—খাসা চিজ্ বনাইছ ত কলকাতাই বাবু। ইমন কুঁকড়া ত ইতল্লাটে দেখি নাই। যা রান্না আজ রাঁধব!

অবনীর সমস্ত শরীর রাগে তখন জ্বলছে। মুখ দিয়ে তার কথার বদলে যেন আগুনের হল্কা বেরিয়েছিল,—কার হুকুমে আপনি আমার মোরগ ধরেছেন, কোন সাহসে সেটা কেটেছেন!

এই দেখো।—ভাণ্ডারীর মুখে সেই হাসি,—ইমন মাল পেলে কেউ ছাড়ি দেয়! আবার ইচ্ছা-সুখে যখন আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে। ও ধরা দিতেই এসেছে গো।

শেষ কথা গুলো কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠেছিল ভাণ্ডারী।

এই মিশেল ভাষা আর তার সঙ্গে গানের কলি মেশানো বিদ্রূপে সমস্ত শরীরের রক্ত অবনীর মাথায় গিয়ে উঠেছে তখন। ওই জলহস্তীটার মত মাংসের পাহাড় না হলেও সেও কিছু তালপাতার সিপাই নয়, শরীরের চর্চা ভালোভাবেই করেছে। জংলী এই জুলুম-বাজটার ভয়ে ল্যাজগুটিয়ে পালাবে না।

চারিধার কাঁপিয়ে বজ্রস্বরে অবনী গর্জন করে উঠেছিল—কি ভেবেছেন আপনি! এটা কি মগের মুল্লুক? বুনো ওলের বাবা তেঁতুল আছে সে কথাটা বুঝি এখনো জানেন না!

সেই বীভৎসী বৈষ্ণবীটি সেই সময়েই ঘর থেকে দাওয়ায় কম্পিত পদে এসে দাঁড়িয়েছিল মনে আছে। তখন ভেবেছিল তার চীৎকারেই ভয় পেয়ে বুঝি বেরিয়ে এসেছে। ভয় যে তার চীৎকারের জন্যে নয় তা জেনেছে পরে ভালো করে আলাপ হলে।

বোস্টমদি যা ভয় করেছিল ব্যাপারটা কিন্তু সেদিক দিয়ে যায় নি।

ওই বজ্র গর্জনেও নির্বিকার ভাবে হেসে ভাণ্ডারী বলেছিল,—শুনছিস্ বোস্টুমী, একটা কুঁকড়ার লাগি কলকাতাই বাবু গুস্সা হইছে!

তারপর অবনীর দিকে ফিরে—গলায় কোন ঝাঁঝ না দিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল,—ইকুঁকড়া পালছ কেনে শুনি? বলি চোখের মুখের জন্যে ত নয় হে। ব্যবসা করবার জন্যে ত। তা ব্যবসাই করো। কত দাম তোমার এ মোরগের বলো। দিয়ে দিচ্ছি।

ঝগড়ার ঠিক এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত না থাকলেও অবনী কঠিন স্বরে বলেছিল,—ও বেচবার মোরগ নয়।

বলো কি! বেচবার নয়? তবে কি তুমার ধম্ম-মোরগ বটে! উ যেমন ধম্মের ষাঁড় হয়!—ভাণ্ডারী একাই উচ্চৈঃস্বরে নিজের রসিকতায় হেসেছিল খানিকক্ষণ।

কেমন যেন নিজেকে অপ্রস্তুত মনে হয়েছিল অবনীর। তবু কড়া গলায় বলেছিল,—মোরগ আমার যাই হোক, বেচাকেনার কথা এখানে আসছে কোথা থেকে? জোর করে ধরে কেটে ফেলে তারপর দাম দিতে চাওয়াটা কিরকম বেচা কেনা?

হাঁ এটা অন্যায় হয়েছে বটে। দাম দিয়ে কিনে তারপর কাটা উচিত ছিল। কিন্তু ক পসন্ হই গেল যে। তাই ত লোভ সামলাতে লারলাম। তা তুমি জরিমানা ধরি লও না কেনে,—ই কুঁকড়ার দাম লিয়ে লও আর ইখানে ই বেলা দুটি খায়েও যাও।

অবনীর ভেতরটা তখনও জ্বলছে, কিন্তু ঝগড়ার কারণটা ভিজে সলতের মত যেন নেতিয়ে গেছে, দপ করে তাতে আর আগুন ধরানো যায় না।

তার ক্ষণিক দ্বিধাটা যেন উপভোগ করেই ভাণ্ডারী আবার বলেছিল,—কই কত দাম বলো তাহলে!

দুটাকা!—অবনী দামটা বাড়িয়েই গায়ের জ্বালা প্রকাশ করেছিল। মোরগটা বাইরে থেকে আমদানী করা লেগহর্ণের বাচ্চা বটে, কিন্তু তখনকার দিনে তারও দাম অত নয়।

দুটাকা! ই ত জলের দর হে। দে বোষ্টুমী কলকাতাই বাবুকে দু টাকা দি দাম চুকাই দে।—ব্যাপারটার যেন অতি সন্তোষজনক নিষ্পত্তি করে ভাণ্ডারী ছুরি দিয়ে নিপুণ ভাবে মোরগটা কাটায় মন দিয়েছিল এবার।

অবনীর মুখ থেকে দামের কথাটা খসতে না খসতেই বোষ্টমদি ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল ব্যস্ত হয়ে। দুটো টাকা এনে অবনীর হাতে গুঁজে দিয়ে যে রকম কাতর ভাবে সে তাকিয়েছিল তাতে সে দৃষ্টির মানে বুঝতে অবনীর দেরী হয় নি। অবনী যেন আর ভাণ্ডারীকে না ঘাঁটিয়ে দামটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় এই তার চোখের নীরব মিনতি।

অবনী সে মিনতি রেখেছিল। সাঁকোটা পার হবার পথে পেছন থেকে শুনেছিল ভাণ্ডারীর ডাক!

চানটান করি এসো কিন্তুক কলকাতাই বাবু। জরিমানাটা লই যায়ো।

স্পষ্ট পরিহাসের সুর কিন্তু সে ডাকে প্রকাশ পায় নি।

অবনী জরিমানা আদায় হিসেবে ভাণ্ডারীর রান্না খেতে অবশ্য আসে নি। ভাণ্ডারীর সঙ্গে বিরোধটাও ওই প্রথম সংঘর্ষে চুকে যায় নি।

কিছুকাল বাদেই সেই গাছ কাটার ব্যাপারটা ঘটে। দুদিন আগেই প্রচণ্ড একটা ঝড় হয়েছে ও অঞ্চলে। তখনো অবনী নিজের জমির চারিদিকে বেড়া দিতে পারে নি। তার জমির এক দিকের সীমানার কাছে একটা বড় পিয়াল গাছ ঝড়ে উপড়ে গিয়ে তার মাথাটা সীমানা ছাড়িয়ে পড়েছিল। তাও কোন রাস্তা-ঘাটের ওপর পড়েনি, পড়েছিল প্রায় বেওয়ারিশ কার না কার ছাগল গরু চরবার একটা বাঁকা ডাঙায়।

সেদিন বিকেলে স্টেশনের পোস্টাফিস থেকে চিঠি ও কাগজপত্রের খোঁজ করে ফেরার পথে দেখে দুজন কাঠুরে পরমানন্দে সে গাছ কাটছে। মাথার দিকের ডালপালা কেটে সাবাড় করে ইতিমধ্যেই সরানো হয়ে গেছে, কুড়ুল চলছে এখন গুঁড়ির দিকে।

ব্যাপারটা বে-আইনি বুঝে কাঠুরেদের মনে কিঞ্চিৎ ভয় ডর সঙ্কোচ বোধ হয় ছিল। অবনীকে দেখে তারা কুড়ুল চালানো বন্ধ করেছে।

এ গাছ কাটছিস যে বড়! কে বলেছে কাটতে?

অবনীর গলার স্বর আর মুখের চেহারায় কাঠুরেরা রীতিমত ভড়কে গেছে তখন।

ভয়ে ভয়ে তারা জানালে, ভাণ্ডারী বাবু হুকুম দিছেন আজ্ঞে!

ভাণ্ডারী বাবু হুকুম দিয়েছেন। কোথায় তিনি।

ওই কুঞ্জে আছেন আজ্ঞে!

অবনী কাঠুরেদের আর একটা কথা বলে নি। সোজা গিয়েছে ভাণ্ডারীর কুঞ্জে।

সাঁকোটা পেরিয়ে হাল্কা বাঁকারির ফটকটা যে ভাবে সবেগে ঠেলে ঢুকেছে তাতে সেটা ভেঙেই গেছে বোধ হয়।

পালা ভলো স্যাজয়ে রাখাচ্ছে।

শুনুন।—অবনী যেন হুকুম করছে।

ফিরে দাঁড়িয়েছে ভাণ্ডারী। আজ কিন্তু মুখের চেহারা আলাদা। সে মিটমিটে হাসি নেই। জালার মত মুখে লালচে চোখ দুটোতে যেন তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা মাখানো।

এই চুরিই তাহলে আসল ব্যবসা! স্টেশনের কাছের আড়ংটা ত শুনলাম আপনার। সেখানে শালের রোলার পাহাড় এমনি করেই জমিয়েছেন।—অবনী গলায় ঘৃণার বিষ ঢেলে দিয়ে বলেছে।

হ্যাঁ তাই জমিয়েছি, ত করবে কি!—ভাণ্ডারী তাকে যেন তৃণজ্ঞান করে বলেছে,—তোমার মত চেংড়া কলকাতিয়া বহুৎ দেখছি। হিম্মৎ থাকে ত' কাড়ি লই যাও। নয় ওই কুঁকড়া দুহাও যাই।

অবনী আর সহ্য করতে পারে নি। ভাণ্ডারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি মেরেছে।

ঘুঁসিটা মাথাতে নয়, যেন কোন পাহাড়ে লেগেছে। ভাণ্ডারী নড়ে নি বুঝি এক চুলও কিন্তু কেমন যেন হতভম্ব হয়ে তাকিয়েছে অবনীর দিকে।

অবনী রাগে তখন উন্মাদ। সে আবার ঘুঁসি চালিয়েছে

সে ঘুঁসি ভাণ্ডারীর গায়ে পৌঁছোয়নি। মাঝ পথেই হাতটা ধরে দুমড়ে শোলার পুতুলের মত তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ভাণ্ডারী

তারপর যা করেছে তা অবিশ্বাস্য।

অবনী মাটি ছেড়ে ওঠবার আগেই তাকে ছুটে গিয়ে ধরে তুলে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখে চীৎকার করেছে,—দেখি যা বোস্টুমী দেখি যা। কলকাতিয়া বাবুর তেজ দেখি যা। আমার সাথে লড়বার আসছে।

বোস্টমদিকে ডাকবার দরকার ছিল না। দাওয়ার

তবে বন বরা জঙ্গল আর শহরের মানুষের কায়দা বুঝে যে।

একটা খুঁটি ধরে সে তখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কি করি বল ত ই-জোয়ানটারে লই! দিব এক চেলা কাঠ দিয়া মাথা ফুটাই।

ভাণ্ডারীর গলার স্বরে কিংবা জড়িয়ে রাখার ধরণে আর রাগ-আক্রোশের বাষ্পও কিন্তু না পেয়ে অবনী অবাক হয়েছে।

নিজেই আলিঙ্গন মুক্ত করে অবনীকে দু-কাঁধ ধরে একটু দূরে সরিয়ে ভাণ্ডারী বলেছে তারপর,—হাঁ কল-কাতা থেক্যা সাচ্চা মরদ আসিছে বটে ই জঙ্গলে! যা—লই যা সব কাঠ, আর আমাকেও ঘা কতক দেই যা। সব তাহলে শোধ-বোধ।

সেই শোধই বোধই হয়ে গেছে তারপর থেকে।

শশধরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু সে বন্ধুত্ব যেন মাঝখানের কোন অদৃশ্য দেওয়ালের ওপর দিয়ে হাত ধরা। প্রীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতাও ছিল।

ভাণ্ডারীর জীবনে যত দোষ গ্লানি রহস্যই থাক। যত আদিম বন্যই হোক তার আসল প্রকৃতি, অবনীর সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে অনিশ্চিত কোন সংশয়ের মেঘ কোথাও ছিল না। তার বিরাট দরাজ বুক অবনীর জন্যে যেখানে প্রয়োজন ভাণ্ডারী যে পেতে দিতে পারে তা অবনী জানত। এই রুক্ষ বলিষ্ঠ স্নেহের অকৃত্রিমতাও হয়ত ভাণ্ডারীর আদিম বন্যতারই একটা পরিচয়।

নিজে নিজেই অবনীর অভিভাবকের পদটা সে কবে কে জানে নিয়ে নিয়েছিল। অভিভাবক কিন্তু শাসক নয়।

খেয়াল হলে তার নিজস্ব ধরণে অবনীকে দু-একটা গূঢ় ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করত।

একদিন ওই কুঞ্জে বসে মৌতাত করতে করতেই বলেছিল, আফশোষ এই, তোকে মদ ধরাতে পারলাম না।

সেটা কি আফশোষের ব্যাপার,—হেসে বলেছিল অবনী।

হাঁ, আফশোষই না শুধু, ডরও লাগে।

ডর আবার কিসের!

ইয়ার চেয়ে বদ নেশা না ধরি ফেলাস্! ভাণ্ডারী মুচকে মুচকে হেসে বললেও গলার স্বর তার কেমন ভারী লেগেছিল!

বদ নেশা আবার কি?—অবনী হাল্কা সুরেই জিজ্ঞাসা করেছিল।

যা নাই তা চুঁড়বার নেশা। ভাণ্ডারী মাটির গেলাসে চোলাই মহুয়া ঢালতে ঢালতে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, ই মহুয়া ঢালতে ঢালতে ফুরাই যায়। ফুরাই গেলেও আবার দিলে নেশা হয়, আবার ছুটি ভি যায়। কিন্তু যা নাই তা মিলেও না কখনো, নেশাও আর ছুটে না।

বোষ্টমদির দিকে চেয়ে হেসে অবনী জিজ্ঞাসা করেছিল, বুঝলে কিছু বোষ্টম দি?

না ভাই উর কথা এমনেই বুঝি না, ত' নেশা করলি বুঝব।

না উ বুঝবেক নাই।—ভাণ্ডারী বিরক্তির ভাণ করে বলেছিল,—মাইয়া মানুষ এ সব বুঝবার লাগি পয়দা হয় নাই। ওদের মনটা কি রকম জানিস্। খাঁচার মত। যা ধরি না রাখা যায় তার দাম উয়ারা জানে না। আকাশের পাখী শুধু দেখি উয়াদের সুখ নেই।

অসংলগ্ন সব কথা অবশ্য তারই ভেতর দু-একটা কথা ঝিলিক দিয়ে স্পষ্ট কিছু যেন ইঙ্গিত করে।

কথায় কথায় বলেছিল,—যা নেই তা সবাইকেই খুঁজতে হয়। আমিও খুঁজেছি একদিন। উ ফাঁকির কারবার ধরি ফেলাইছি তারপর। দেবতার দয়া আর মেয়াছেল্যার মন, উয়ার লাগি কাঙালী হবি কেনে? থাকে যদি এমতেই পাবি। না থাকে ত গরজ কিসের।

পিয়াস লাগে ত' আপন ইন্দারা পুঁড়ি লে, নয়, বছর ভরি বয় ইমন নদীতে যা। উ বানের জলের ভরসা করিস না। পিয়াস মিটবে না শুধু ভাসাই লই যাবে।

অবনী একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভাণ্ডারীর দিকে তাকিয়েছিল। এ সব কথার পেছনে আসল বক্তব্য কিছু আছে কি? ভাণ্ডারীদা কি-ই বা জানে কতটুকু? ঠিক বুঝতে পারে নি।

বুঝুক না বুঝুক ভাণ্ডারীদার কুঞ্জে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নিয়মিতভাবে আসার একটা আকর্ষণ এই ধরণের এলো মেলো অদ্ভুত সব কথা।

তার জানা শোনা বই পড়া জগতের সঙ্গে যার কোন মিল নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরোণো স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে সময়ের খেয়াল ছিল না অবনীর।

ভীমের বেড়ের ওপরে সূর্য ডুবে যাবার পর ছঁস হয়েছে। বাজারের দিকেই তার পর ফিরেছিল।

অন্ধকারে পথ চিনতে কষ্ট হোক দিক্ ভ্রম হবার কারণ নেই। সিনেমা হলের লাউডস্পীকারের গান এত দূর পর্যন্তও নিস্তব্ধতাকে কলুষিত করছে।

বাজারে গিয়ে সেই দিনই ব্যানার্জি বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। গিয়েছিল ছুঁচ সুতো কেনবার ছল করে।

কর্মচারী আছে কিন্তু ব্যানার্জি নিজেই দোকানে বসে বিকেল থেকে।

ফিটফাট হাওয়াই শার্ট প্যান্ট পরা ব্যানার্জি হেসে আপ্যায়িত করে বলেছিল,—আজ ত আর পাবেন না!

অবনী একটু বিস্ময়ের ভান করে বলেছিল, নেই বুঝি।

না থাকবে না কেন? কন্তু রাত হয়ে গেছে কি না!

ব্যানার্জি ব্যবসা জানে। সামান্য ছুঁচ সুতোর খদ্দেরকেও হাত ছাড়া করতে চায় না। তা ছাড়া অবনীর অচেনা মুখের একটা দাম আছে।

অবনী যেন হঠাৎ বুঝতে পেরে বলেছিল,— ও! রাতে ও জিনিষ বিক্রী করতে নেই বুঝি! কিন্তু আপনার এরকম হাল ফ্যাশানের দোকান! আপনারা এ যুগের ছেলে।

এ যুগ ও যুগে শুধু এইটুকুই তফাৎ বুঝেছেন, ব্যানার্জি নিজের পোষাকটা দেখিয়ে বলেছিল। তার পর নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল,—আপনি এখানে নতুন না? আছেন কোথায়?

অবনী প্রথম প্রশ্নটা এড়াবার সুযোগ পেয়ে যে হোটেলে আছে তার নাম বলেছিল।

ব্যানার্জি নাক সিঁটকে বলেছিল,—ওই হোটেলে! ওটা কি হোটেল নাকি!

বলেই আবার সামলেছিল,—তবে ভালো হোটেল আর পাচ্ছেন কোথায়! সেই জন্যেই বলছিলাম, শুধু বাইরের খোলসই বদলানো দেখছেন নইলে এখনো ভেতরে সেই জঙ্গল।

আপনার দোকান ত অনেক দিনের!—অবনী আলাপটা চালু রাখবার চেষ্টা করেছিল। ফলও হয়েছিল তাতে।

হ্যাঁ, তা এই সাত বছর হয়ে গেল। আসুন না, ভেতরে বসুন না একটু!—ব্যানার্জি নিজের আলাপী স্বভাবের গুণে আর নতুন মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহলে খাতির দেখিয়েছিল এবার।

ভেতরে বসবার ভালো ব্যবস্থাই আছে। বোঝা যায় এ জায়গার কেওকেটারা এখানে আসর জমায়।

কথায় কথায় অবনীকে এ জায়গায় হঠাৎ আসার একটা উদ্দেশ্য জানাতে হয়েছিল। শুনেছে জায়গাটার স্বাস্থ্য ভালো তাই শেষ বয়সের একটা ডেরা বাঁধতে চায়।

ব্যানার্জি আরো উৎসাহিত হয়েছিল। জানা গেছল শুধু দোকানদারী নয় এখানকার জমি জায়গা

বেচা কেনার কারবারও সে করে।

জংলী জায়গার সব দোষ হঠাৎ উবে গেছল। পরিণত বয়সে অবসর নিয়ে থাকবার মত এমন স্বর্গ নাকি কোথাও নেই। যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি অন্য সমস্ত সুবিধে। এমন কি সিনেমা দেখতে চাইলে তাও আছে! এরকম একটা হল নাকি এ তল্লাটে নেই।

ক্রমশঃ জানা গেছে সিনেমা হলেও ব্যানার্জির কিছু অংশ ও স্বার্থ আছে।

ব্যানার্জির হাতে যে সব জায়গা আছে সে গুলির বিষয়ে অবনী বেশ কিছুটা উৎসাহ দেখিয়েছিল।

তারপর যেন বিশেষ কোন কৌতূহল না দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা এখানে দেওয়ান বাড়ি দেওয়ান বাড়ি শুনি। দেওয়ান বাড়ি বলতে কি বোঝায়!

ব্যানার্জি হেসেছিল,—বোঝায় অনেক কিছু, তবে দেওয়ানও নয়, বাড়িও না। দেওয়ান বাড়ি নয়, লোকে বলে দেওয়ান কুঠি। আছেন যখন একদিন দেখে আসবেন। ছোটখাট প্রাসাদ বললেই হয়। তবে এখন সেটা অবশ্য কলেজ হয়েছে।

কলেজ হয়েছে—অবনীর বিস্ময়টা এবার সত্যকার। সেদিন দেওয়ান কুঠি দেখেও এ ব্যাপারটা অনুমান করতে পারে নি।

হাঁ কলেজ হয়েছে ত আমার এ দোকান সুরু করবার আগেই। আর দেওয়ান নামটা কোথা থেকে এল আমার অন্ততঃ জানা নেই। দেওয়ান থাকতে গেলে রাজা গজা ত কেউ না কেউ থাকে, এখানে সে বালাই নেই। মাথা ছাড়াই মাথা ব্যথা। অথচ দেওয়ান যে কে তাও জানি না।

ব্যানার্জিও তা হলে কিছু জানে না! সাত বছর আগে এসেও শশধরের নাম সে শুনেছে কি না সন্দেহ।

সে নাম কি মুছে গেছে এরি মধ্যে! বেশী স্পষ্ট করে খোঁজ নিতে মন চায় না। স্মৃতির স্ফটিক-পুরী হঠাৎ কোনো রূঢ় আঘাতে ভেঙে যেতে পারে এই যেন এখন তার ভয়।

সে নাম কারুর মনে থাকুক বা না থাকুক যারা লাউডস্পীকারে সিনেমার গান বাজায়, নিয়ন বাতি দিয়ে হাল ফ্যাশানের দোকান সাজায় তাদের কাছে অন্ততঃ ও নাম পৌঁছোয় নি। সে নামের দামও নেই তাদের কাছে।

একটু বসে থাকতে থাকতে এ আসরের নিয়মিত অনিয়মিত সভ্যেরা এসেছিল একে একে। কেউবা দুদণ্ড দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছে, দু-একজন কৌতূহলী হয়েছে অবনীকে দেখে। ব্যানার্জিই প্রথম আবিষ্কারের দাবীতে পরিচয় দেবার ভার নিয়েছে। অবনীর দেওয়া নামটাই জানিয়ে বলেছে,—ইনি রাজীব মল্লিক, ডোম-জুড়িতে জমি জায়গা দেখতে এসেছেন বাড়ি ঘর করে থাকবার জন্যে।

ভালো কথা! খুব ভালো। কেউ বলেছে।

কেউ কোন কৌতূহলই প্রকাশ করে নি। ব্যানার্জির দোকানে অমন নতুন মুখের আমদানি খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয় বোঝা গেছে।

অবনী রাজীব মল্লিক হয়ে তাদের আলাপ শুনেছে।

হিন্দী দিল্লীর রাজনীতি, শহরের সিনেমার গল্প, কারবারী আলাপ কখনো বা স্থানীয় রসাল কেচ্ছা।

…ওহে অভয় যে আবার ডুব মেরেছে। দু মাস হয়ে গেল আর পাত্তা নেই। বৌ ছেলেমেয়ে গুলোর হাড়ির হাল হয়েছে।

হাঁ দর্জির দোকানেও ত তালা বন্ধ। আড্ডি বাবু বলেছে এই মাসটা দেখে তালা ভেঙে ঘর দখল করবে। দশ মাসের ভাড়া বাকি।

ওই ঘরই দখল করবে। পাবে কি আর। সেলাই এর কলটা পর্যন্ত বিক্রি করে গেছে যাবার আগে।

সেই ছুঁড়িটাকে নিয়েই কোথাও নতুন ডেরা

বেঁধেছে। ওঃ, কি বিচ্ছেদরীই সাবান কোম্পানী পাঠিয়েছিল। সাবানের গুণ গাইতে এসে মানুষটাকে একেবারে ধোবিরপাট দিয়ে আছড়ে নিয়ে গেল। অভয় আর ফিরবে না দেখো!

ফিরবে! ফিরবে! একেবারে পুরো ধোলাই হয়ে ফিরবে আবার। তখন ইহকাল পরকাল সব সাফ্।

তুমি খুব বেঁচে গেছ ব্যানার্জি! তোমার ওপরই নজরটা বেশী ছিল। সকাল বিকেল যে রকম উঠে পড়ে লেগেছিল ভেবেছিলাম তোমার ছাড়া কাপড় কেচে-ই না সাবানের গুণ বোঝাতে চায়।

আমায় ধোলাই দেওয়া ও সাবানওয়ালীর কম্মো নয় হে। অমন অনেক বিবি হার মেনেছে……

সেই চিরকেলে রসাল পরচর্চা! ক্ষুধা ও মোহের জটপাকানো দুর্বল করুণ জীবনের গ্লানি নিয়ে হাস্য পরিহাস।

কিন্তু তবু সব কেমন যেন বিবর্ণ মনে হয়েছিল অবনীর, যেমন কাহিনী তেমনি তার আলোচনা সবই যেন প্রাণহীন নিস্তেজ।

ডোমজুড়ির আদিম অরণ্য কেটে শুধু নোংরা টিনের চালের বাজারই বসল কি!

হোটেলে ফিরে গিয়ে নিজের তক্তপোষে বসে অনেকক্ষণ ধরে অবনী সেদিন একটা বাঁধানো খাতা খুলে পড়েছিল হারিকেনের আলোয়। ঘরে আর একটা তক্তপোষ আছে, অন্য বোর্ডারের জন্যে। কিন্তু অবনী উপরি ভাড়া দিয়ে এক মাসের জন্যে ঘরটা নিজস্ব করে নিয়েছে।

হোটেলটা বাজারেরই ধারে। দিনের বেলা হট্টগোল আছে, কিন্তু রাত্রে একেবারে নিস্তব্ধ। এখানে বাজার এখনো হাটের স্বভাব ভুলতে পারে নি। হাট-বারে অর্থাৎ বুধ শনিতেই জোয়ার আসে। অন্য দিন ভাঁটার টান।

অবনী নিরুপদ্রবেই পড়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত, লিখেছিলও কিছু।

হোটেলের ঠাকুর একবার ডেকে গেছল,—খেতে আসুন বাবু! অবনী খাবারটা ঘরে এনে চাপা দিয়ে রাখতে বলেছিল।

কি পড়ায় এত তন্ময় অবনী! হাতে লেখা একটা খাতা। পাতাগুলো দেখলে বোঝা যায় অনেক পুরানো দিনের কাগজ, বিবর্ণ মলিন হয়ে এসেছে। লেখাও পুরোনো তবে তার নতুন কাটাকুটি আছে। দীর্ঘ কুড়ি বছরের কাটাকুটি আর নতুন লেখা। মানুষ অনেক কিছু নিয়ে বাঁচে। সে যার নিজের নিজের মত দেওয়াল তুলে প্রাণের গোপন নিজস্ব দুর্গ আমরা রচনা করবার চেষ্টা করি, আমাদের আসল জীবন সেই দুর্গের আড়ালে। অবনী বেঁচে আছে বুঝি এই খাতাটির বাঁধানো দুটি মলাটের মধ্যে। এই মলাট দুটির আড়ালে থেকেই কুড়ি বছরের নিরুদ্দিষ্ট জীবন সে অনায়াসে কাটিয়ে এসেছে। তার মনের নিভৃত স্মৃতির গর্ভগৃহে বাইরের কিছু তাকে স্পর্শ করতেই পারে নি।

এই খাতার লেখাগুলো মনে মনে মিলিয়ে সেদিনের স্বাদ দুবার করে পাবার লোভেই কি এতকাল বাদে পরম দুঃসাহসে সে এখানে এসেছিল?

হয়ত তাই। হয়ত তার চেয়ে বেশী কিছু!

এসে হতাশ ঠিক বুঝি হয় নি। কোনো ছবি যে মিলবে না তা সে জেনেই এসেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আঘাত পেয়েছে বই কি একটু! শুধু এই নোংরা টিনের চালের বাজার আর লরী বাসের তেল-কালি ধোঁয়া ধুলোর গন্ধ মাখানো রাস্তা, আর সিনেমা হলের কর্কশ লাউডস্পীকারের কর্ণ-পীড়ায় নয়, পেয়েছে এমন কিছুতে যা ভালো করে ধরতেও তার সময় লাগে।

রাস্তা বাজার সিনেমা হল ব্যানার্জির দোকান, প্রত্যক্ষ বর্তমান।

এই বর্তমানকে দেখবার শোনবার জানবার অনেক কিছু আছে।

ব্যানার্জির দোকানই সব চেয়ে সুবিধের জায়গা। সেখানে হরেক রকম মনিহারী জিনিষের সঙ্গে ডোমডুড়ির নতুন মানুষের নমুনাও পাওয়া যায়।

অবনী সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে। ছুতো করে আর যেতে হয় না। তার জন্যে একটা আসন প্রায় বরাদ্দ হয়ে গেছে।

অনেকে সেখানে আসে। চা মিষ্টির দোকানের বেরা, কাপড়ের দোকানের জগবন্ধু, নতুন নার্শারীর পাল মশাই। আড়ত বাবু পর্যন্ত মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যান কাগজের কারখানার কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে তারই জাঁপে। আড়ত বাবু বড় কিছু দাঁও মারবার তালে আছে নিশ্চয়।

নতুন লোকও আসে।

সেদিন একজন এসেছিলেন। ব্যানার্জির কিরকম আত্মীয় হন। মালয়ের গল্প করেছেন, সেখানেই অনেককাল কাটিয়েছেন রবারের বাগানে।

অবনী উঠে যাচ্ছিল। ব্যানার্জিই তাকে যেতে দেয় নি। বলেছে, আরে বসুন না! কুয়োর ব্যাঙ আমরা, দেশ বিদেশের কথা তবু কানে শুনেও সুখ। তা সত্যি। মজার মজার সব ঘটনা বলে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আসর জমিয়ে রেখেছেন। নানা জনে নানা প্রশ্ন করেছে। অবনী শুনেছে নীরবে। একবার কি একটু চাঞ্চল্য প্রায় দেখিয়ে ফেলেছিল?

কেউ অন্ততঃ লক্ষ্য করে নি। ভদ্রলোক তখন তাঁর মালয়ের বিদ্যে জাহির করে 'পানতুন' শোনাচ্ছেন।

…কেরেঙ্গা দি দালাম বুলো
সেরাহি বেরিসি আয়ের মাওয়ার
সাম্পাই হাসরাৎ দি-দালাম
বুবো
তুয়ান সা-ওরাং জাদি
পেনাওয়ার…

মালয়ী কবিতার কলির মানে করে বলেছেন,—বাঁশের ফোকরে লাল পোকা! আতর দানে গোলাবী আতর!

আমার মনে কামনার আগুন। শুধু। তোমার মধ্যেই প্রেয়সী তার শান্তি।

কি বলতে গিয়ে অবনী নিজেকে সংবরণ করেছে কে জানে: কবিতার অদ্ভুত ভাষা উচ্চারণ না মানে কি তার কানে লেগেছে!

শেষ পর্যন্ত বলে নি সে কিছুই।

আজ কিন্তু আপনি বড় চুপ চাপ রাজীব বাবু!—ব্যানার্জিই লক্ষ্য করেছে।

শোনার কথা ত চুপচাপই শুনতে হয়।—হেসে বলেছে অবনী।

মালয় ফেরৎ ভদ্রলোক অবনীর দিকে খুশি হয়ে চেয়েছেন।

একটা বই লিখতে পারি মশাই জানেন! পাঁচটি বছর মালয় একেবারে চষে বেড়িয়েছি বলতে পারেন। পয়সা সত্যিই সেখানে উড়ছে। কুলি খালাসী হয়ে গিয়ে টাকার কুমীর হয়েছে এমন কত লোককে দেখেছি।

তাহলে সে দেশ ছেড়ে এলেন কেন মশাই?—কাপড়ের দোকানের জগবন্ধু আফশোষের সঙ্গে বলেছে।

কি করব বলুন, হতভাগারা যে নতুন আইন চালাল। হয় ও দেশেই ভিটে মাটি পাকা করতে হবে, নয় পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হবে। পয়সা কড়ি আর আনা চলবে না। সময় থাকতে তাই সরে পড়লাম। আমার মত কতজনকে সরে পড়তেও দেখলাম।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প চলেছিল। খোলামকুচির মত পয়সা সেখানে ছড়ানো সে দেশে যাবার উপায় থাক বা না থাক তার গল্প রূপকথার মত মনোরম।

বাজার দিয়ে হোটেলে ফেরবার সময় নার্শারীর পাল মশাই কিছু দূর পর্যন্ত সঙ্গে গেছেন। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে নির্জন রাস্তা প্রায় অন্ধকার। শুধু বেরার মিষ্টির দোকানে এখনো ভিয়েনের উনুন জ্বলছে। কাল সকালের মিষ্টি তৈরী হবে। মাঝ রাত্রের লরীওয়ালারা এসে চা চাইবে।

পাল মশাই যেতে যেতে মামুলি আক্ষেপ করে বলেছেন,—কিছু হ'ল না মশাই, কিছু হল না! ছেলেবেলা থেকে সখ ছিল দুনিয়াটা ঘুরে দেখব। তার বদলে মাটি কুপিয়েই জীবন গেল।

তাই বা মন্দ কি! যেখানেই কোপান মাটি সব জায়গাতেই এক!—হেসে বলেছিল অবনী।

না মশাই না।—পাল মশাই প্রতিবাদ করেছেন, এই গাছের গোলাম হয়ে থেকে হ'ল কি! ভদ্রলোক কি রকম দেখুন ত! টাকাকে টাকা কামিয়েছেন আবার চোখ কান ও খোলা রেখেছেন। দেশটা যেন মুখস্থ। কত কিছু দেখেছেন।

অবনী আর কিছু বলে নি। রেল লাইনটা পার হবার আগেই পাল মশাই বাঁ দিকে বেঁকে তাঁর নার্শারির পথ ধরেছেন।

অবনী লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে দাসবাবুর হোটেলের দিকে পা বাড়িয়েছে।

পাল মশাই-এর মত সে রাত্রের আসরটা তাকেও একটু ঝাঁকনি দিয়েছে হয়ত।

হ্যাঁ ভদ্রলোক জানেন অনেক কিছু, বলেনও ভালো। তবে কুলি খালাসী হয়ে গিয়ে যারা টাকার কুমীর হয় নি কিংবা নতুন আইনের ভয়েই পুঁজি-পাটা নিয়ে পালায় নি তাদেরই শুধু চেনেন না।

হোটেলে গিয়ে সেরাত্রেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই বাঁধানো খাতাটা খুলে বসে থাকে অবনী। পড়েও না সব সময়।

উত্তরের খুপরি জানালা দিয়ে বাজারের সীমানার বড় বড় শাল গাছের মাথাগুলো ঝাপসা কালির পোঁচের মত দেখা যায়। তার ফাঁকে ফুটি তারা মাঝে মাঝে হাওয়ায় দোলানো পাতা সরে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে ও তারাদের একটির নাম জানে। মৃগশিরা। ওইটেই পূব দিক।

মনটা আকাশ বেয়েই চলে যায় বোধহয়।

একটা শব্দ যেন মনের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন তোলে।

সায়াঙ্! সায়াঙ্! এই শব্দটা করেছিল প্রথম শোনবার পর।

সায়াঙ্ মানে ভালোবাসা, আবার সায়াঙ্ মানে দেওয়া। আশ্চর্য শব্দ!

শব্দটা কেন মনে পড়ছে কে জানে! মনে ত আর বেশী কিছু বড় একটা পড়ে না! কুড়ি বছরের অনেক কথাই ত মনে পড়তে পারত!

খালাসী হয়েই একজন সদাগরী জাহাজে লুকিয়ে দেশ ছেড়ে গেছল। তখন পৃথিবী এত বেশী অগ্রসর হয় নি। সীমানা ছিল, বেড়া ছিল কিন্তু এমন নির্মম দুর্লঙ্ঘ্য নয়। ঘুরেছিল দুনিয়ার অনেক ঘাটে ঘাটে। তার পর যেখানে গিয়ে উঠেছিল সেখানেই জীবনের বেশীর ভাগটা কাটিয়েছে। কাটিয়েছে কাটাতে হয় বলে। খোলামকুচির মত পয়সা কুড়োবার চেষ্টা করে নি, মুখস্থও করতে চায় নি সেখানকার সব কিছু। যা দেখেছে শুনেছে, মনের বন্ধ কবাট ঠেলে তা ভেতরে জায়গা পায় নি। বন্ধ কবাট বুঝি একটা পুরোনো খাতার দুটো মলাট। তারই মধ্যে তার জীবন স্মৃতির আরকে ডুবিয়ে রাখা। বাইরের সব কিছু তাই অবান্তর। তা নিয়ে গল্প বলে সে আসর জমাতে

পারে না। শুধু দু একটা সুর ভেসে আসে। আজ এখন যেমন আসছে,—

নিয়াওয়া মেনাংগিস্ দি-পিন্তু কাবর
হেনদাক্ পুলাং ক-দলম দুনিয়া।

হাঁ,—কবরখানার দরজায় কাঁদছে আত্মা। আকুল হয়ে সে চায় আবার কায়া নিতে।

ব্যানার্জির দোকানে রোজ রোজ যাওয়া যায় না।

হাঁফিয়ে ওঠে মন। তখন আছে সেই সব নির্জনতা যেখানে যুগবদলের নোংরা হাত এখনও তেমন পৌঁছোয় নি।

যে নালাটা মাতঙ্গীতে গিয়ে পড়েছে তা দিয়ে যেতে যেতে মানুষজনের দেখা এখনও পাওয়া যায় না।

এ নালার এ চেহারা হয়ত থাকবে না। কোপ-ঝাড় কেটে ছেঁটে পাড় বেঁধে সভ্য হবে। সভ্য আর বাধ্য। কাগজের কারখানার নোংরা ময়লা জল বয়ে নিয়ে যাবে নির্বিবাদে মাতঙ্গীতে।

এখনও কিন্তু তার আগের চেহারাই আছে। বরং আরেকটু জংলা।

ঝির-ঝিরে জলের ধারা। নুড়ি মেশানো বালির বিছানা। পাড়ের গাছ হেলে পড়ে কোথাও বা দুর্ভেদ্য বাধা।

মঙ্গলাকে এমনি একটা পথ আটকানো পাড় থেকে ভেঙে পড়া শাল গাছের কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

অবনী এসে পৌঁছেছিল একটু পরে।

মঙ্গলা তখন পাড় বেয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পাড়টা এখানে বেশী খাড়া। মাটি পাথর ও আলগা। তার ওপর মঙ্গলার একটা হাত জোড়া শাড়ীটার জন্যে।

মঙ্গলা পাড়ের ছোট খাট গাছের চারা ধরে প্রায় কিনার পর্যন্ত উঠে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিল।

ওঠবার সময় অবনী বাধা দেয় নি কিন্তু এখন নিজের সচেতন ইচ্ছা ছাড়াই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল।

মঙ্গলার পড়ার বেগ সামলাতে গিয়ে তাকেও নালার মধ্যে বসে পড়তে হয়েছে। মঙ্গলার দেহটা তারই ওপর। মাথাটা বুকের কাছে।

মঙ্গলা প্রথম হেসে উঠেছিল।

সমস্ত বনভূমি চকিত করা তার সেই আশ্চর্য হাসি, এপর্যন্ত যা কোনদিন শোনে নি।

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে অবনীর বুক থেকে মাথাটা তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

দাঁড়িয়ে উঠেছিল অবনীও। মনে সেই মুহূর্তে যা এসেছিল মুখে তা বলে নি।

তার বদলে হাতের শাড়ীটা দেখিয়ে বলেছিল,—ওটা ত নোংরা হয়ে গেল!

হাঁ, শাড়ীটার লালচে-ই ধরা পড়ি গেলাম।—গলার স্বর না হোক মঙ্গলার মুখ তখন গম্ভীর।

ধরা পড়লেও ভয় নেই কিছু, তুমি যেতে পারো। তোমার পিছু পিছু আর যাব না। তোমার ঘর কোথায় জানতে আর চাই না।

মঙ্গলা একটু বিস্মিত হয়েই অবনীর দিকে চেয়েছিল। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলেছিল,—না, আর লুকাছাপা চলবে নাই। আমার ঘর আপনাকে আজ দেখাই দিব। চলেন।

মঙ্গলা পিছন ফিরে নালার ভিতর দিয়েই খানিকটা হেঁটে সুবিধা মত একটা ঢালু জায়গা দিয়ে ওপরে উঠেছিল। অবনীও উঠে এসেছিল তার পেছনে।

অবনী অবশ্য না এলেও পারত। মঙ্গলা পিছু ফিরে একবারও চায় নি। নিঃশব্দে পেছন থেকে অন্য দিকে চলে যাবার কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু অবনী তা পারে নি। অদম্য কৌতূহল আর সব বিচারকে ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু সেদিন এ কৌতূহল শেষ পর্যন্ত জয় করেছিল।

এই কৌতূহলের জন্যেই যদিও মাতঙ্গীর নালার পথে ওই অনুসরণ আর তার পরের ওই ঘটনা। ব্যাপারটা তার কাছে অবশ্য অপ্রত্যাশিত।

মঙ্গলার সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হওয়াটাও যেমন।

প্রথম সাক্ষাতের পর এই বনের ভেতর দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করেছে। ঘুরেও বেড়িয়েছে এদিক ওদিক।

একদিন ভাণ্ডারীর সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গিয়েছিল ওই ভাবেই।

ভাণ্ডারীর যে অরণ্যের মধ্যে একটা সহজাত স্বাচ্ছন্দ্য আছে সেই দিনই ভালো করে বুঝেছিল। অত বড় বিরাট একটা দেহ নিয়ে ভাণ্ডারী যে শ্বাপদের মত অমন নিঃশব্দে চলা ফেরা করতে পারে ভাবতে পারে নি।

এদিক ওদিক ঘুরে ওই শিরিষ গাছটার তলাতেই একটু বসেছিল। একটা কাঠ ঠোকরার আওয়াজ কোথা থেকে আসছে।

চমকে উঠেছিল, পাশে হঠাৎ ভাণ্ডারীকে সশব্দে বসে পড়তে দেখে। ওই বসে পড়ার আগে কোথা দিয়ে কখন সে এসেছে টেরও পায় নি।

চমকাই দিছি কেমন!—ভাণ্ডারী বসে পড়ে হেসে বলেছিল,—জঙ্গলে পিছন বাগেও একটা চোখ রাখতে হয় জানিস। তবে দুটা চোখই যার ছুটি লিছে সে আর করবেক কি!

ভাণ্ডারীর কথার সূক্ষ্ম মানে কিছু ধরবার চেষ্টা করে নি। হয়ত সেরকম কোনো মানে ছিলও না।

অবনী হেসে শুধু জিজ্ঞাসা করছে, তুমি কোথা থেকে এলে? এ দিকে তোমাকে ত কখনো দেখি না।

চ্যা দিশা ভুলি না গেলে ইদিকে কেউ আসে না বটে! ভাণ্ডারী এবার গম্ভীর হবার ভাণ করে বলেছিল,—কিন্তু আমি ত এলাম তুমাকে তালাস করতে! তোমার ঘর যাই শুনলাম তোমার মুনিষের কাছে যে মুংরাহাটা গেছে। শুধালাম, বে বারে মুংরাহাটা যায় কেনে রে? তা তুমার মুনিষ বললেক, বাবু ইখন রোজ যায় দুপর বেলায় মুংরাহাটা!

অবনী কথাটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বলেছিল,—তা আমাকে হঠাৎ তোমার কি দরকার হোলো। বলে ফেলো। মুংরাহাটা আমার না গেলেও চলবে।

তবে চল আমার সাথে আজ ভীমের বেড়। দুটা টাটু রাখছি। সাঁঝের আগে পঁউছাই যাব।

তারপর?—অবনী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, রাত্রে ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ফিরব কি করে?

সে তুকে ভাবতে হবেক নাই! ভাণ্ডারী সাথে থাকলে জানিস যমও ছুঁতে লারবে। দুনিয়ায় কেউ যা জানে না আজ তোকে তাই দেখাই দিব চল।

তাই সত্যিই দেখিয়েছিল ভাণ্ডারী। বিস্মিত হবারই ব্যাপার। তবে তার আগে আরেকটা ছোটখাট বিস্ময়ও ছিল।

ভাণ্ডারী সেদিন প্রথম নিয়ে গেছল তার কুঞ্জে নয়, রেল স্টেশনের ওপারে তার নিজের বাড়িতে।

এই বাড়িটাই অবনীর কাছে অপ্রত্যাশিত। ভাণ্ডারীর যে বাড়ি ঘর সংসার আছে আর পাঁচজনের মত এই কথাটাই সে জানত না। শোনেও নি কারুর কাছে। আর বলবে-ই বা কে? ডোমজুড়িতে তখন আলাপ করবার মত মানুষই বা কটা!

স্টেশনের ওপারটা তখনও একেবারে নির্জন। ভাণ্ডারীর বিরাট বাগান ঘেরা প্রকাণ্ড টিনের মাটকোঠাটাই সেখানে একমাত্র বসতি। স্টেশনে যেতে আসতে সে বাড়িটা চোখে পড়েছে অনেকবার কিন্তু সেটা ভাণ্ডারীর বলে ভাবতে পারে নি।

ভাণ্ডারী এই প্রথম দিন ছাড়া কখনো সে বাড়িতে ডাকেও নি। তোলেও নি ঘর সংসারের কথা। কুঞ্জে

আর এই বাড়িতে তার যেন দুটো আলাদা জীবন। কোন সম্পর্ক দু-এর মধ্যেই নেই।

বাড়িটা মাটি কোঠা হলেও ভাণ্ডারীর সচ্ছল প্রাচুর্যের ছাপ তার সর্বত্র।

টাট্টু দুটো বাইরের উঠোনে বড় বড় মরাই দুটোর পাশে বাঁধা ছিল। ও ধারে ঝকঝকে তকতকে গোয়াল, এ পাশে প্রকাণ্ড খড়ের গাদা। প্রকাণ্ড বাঁধানো ইঁদারা থেকে লাঠা দিয়ে জল তুলে তরকারীর ক্ষেতের কাটা নালায় ঢালছে একজন মুনিষ।

কটি ছেলে মেয়ে টাট্টু ঘোড়া দুটোর আকর্ষণে সেখানে জড় হয়েছে।

সমস্ত ছবিটা অবনীর মনে এখনো যেন ছাপা হয়ে আছে। তখনই হয়ে গিয়েছিল। হওয়াটা অবশ্য আশ্চর্য। পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য প্রাচুর্যের পরিচয় ছাড়া কোন বিশেষত্ব সেখানে ছিল না। তবু তা যে মনে গেঁথে গেছে তার কারণ বোধহয় এই যে ভাণ্ডারীর চরিত্রের সঙ্গে এ ছবি সাধারণ বিচারে মেলানো যায় না।

ভাণ্ডারীর এ বাড়িতে যাওয়া সেই প্রথম ও শেষ। ভাণ্ডারী বাড়ির কারুর সঙ্গে তার পরিচয়ও করিয়ে দেয় নি সেদিন। বাইরের উঠোন থেকেই চাকরের হাতে রাস্তার রসদ আর একটা বন্দুক নিয়ে জীনের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়ায় চেপে অবনীকে নিয়ে রওনা হয়েছে।

অরণ্য তখন দুর্গম। কিন্তু ভাণ্ডারীর সমস্ত অন্দি সন্ধি যেন নখ দর্পণে।

পৌঁছেছিল তাই সন্ধ্যা হবার কিছু আগেই।

পৌঁছে সত্যি বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

ভীমের বেড়ের মাঝখানে এরকম একটা কিছু দেখবার জন্যে ভাণ্ডারী তাকে নিয়ে এসেছে কল্পনা করতে পারে নি।

ভীমের বেড় এলো মেলো খাক খাক পাহাড়ের সার। জঙ্গল শেষ হবার পর এমনি দু খাক পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ পাথুরে উঁচু নীচু রাস্তায় ভাণ্ডারী যেখানে গিয়ে টাট্টু থামিয়েছিল সেটাকে একটা মনোরম কুদে উপত্যকা বলা যায়। চারিদিকেই জংলা পাহাড় উঠে গেছে। মাঝখানের খোদলের মত জায়গায় দুদিকের দুটি পাহাড়ি ঝর্ণা এসে একটা ছোট্ট কুণ্ডে জমা হয়ে এক ধারের সুড়ঙ্গ প্রায় একটা পথ দিয়ে উপছে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বর্ষা শেষ হয়েছে কিছু দিন মাত্র আগে। কুণ্ডটা তাই প্রায় কানায় কানায় ভরা। সন্ধ্যার আকাশের রঙীন ছায়া নিয়ে অপরূপ কোন মণিরত্নের মত জ্বলছে।

কিন্তু সেই কুণ্ড কি চারিপাশের জংলা পাহাড়ের শোভা দেখাতে ভাণ্ডারী তাকে আনে নি।

এই প্রায় অনাবিষ্কৃত উপত্যকার একটি পাহাড়ে গোপন একটি গুহাবাস-ই আসল বিস্ময়ের বস্তু। ঢোকবার মুখটা তার সঙ্কীর্ণ কিন্তু ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে বেশ সুবিশাল একটি মন্দিরের ভেতরকার আকার নিয়েছে।

ভেতরে ঢুকেই বোঝা গেছে এ গুহাবাস অব্যবহৃত নয়। ভাণ্ডারীর কাছে তারপর এ গুহার ইতিহাসও জেনেছে কিছু কিছু।

ভীমের বেড় পাহাড়ে দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের সময় এই গুহাই ছিল ভাণ্ডারীর ঠিকানা।

চিনা না থাকলে পল্টন লই আসিও তালাস পাবে নাই বুঝেছিস! ভাণ্ডারী বলেছে সগর্বে।—ইখানে নাই কি? জল আছে গাছের ফল আছে হাতের তাগ থাকলে তীর ধনুকেও শিকার আছে।

সেদিন ও গুহায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য তারপর জানিয়েছিল ভাণ্ডারী। রাত্রে ওই কুণ্ডে জল খেতে আসে নানান জানোয়ার। ভাল্লুকও আসে কখনো কখনো। সেই ভাল্লুকের চামড়ার লোভেই এখানে আসা।

উদ্দেশ্যটা হয়ত তাই। তার জন্যে অবনীকে সঙ্গে নিয়ে আসাও হয়ত তার প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাসের পরিচয়। কিন্তু তবু অবনীর মনে একটু খট্‌কা কোথায় লেগেছিল। ভাণ্ডারীর চরিত্রের অনেক বিপরীত দিক আছে অবশ্য। তবু এই গোপন গুহাবাসেই তার বুঝি সত্যকার চরিত্র লক্ষণ ধরা পড়ে।

যে ভাণ্ডারী এত ঘনিষ্ঠতাতেও নিজের জীবনের পর্দার আড়ালে কদাচিৎ একটু উঁকি দেবার সুযোগ দিয়েছে মাত্র সে হঠাৎ নিজে থেকে তার এই গোপনতম রহস্য অবনীর কাছে মেলে ধরল কেন ?

শুধুই কি খেয়াল !

অবনী ঠিক বুঝতে পারে নি।

নিয়তি এই জায়গাটির সঙ্গে তার জীবনের কোন জট্ পাকিয়ে তুলছে তা'ত নয়-ই।

আশ্বিনের শেষ। পাহাড়ে উপত্যকায় কিন্তু রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা।

টাট্টু দুটোকে একটা সুবিধে মত জায়গায় বেঁধে রেখে কম্বল মুড়ি দিয়ে অবনী একটা পাহাড়ী তাকের ওপর ভাণ্ডারীর সঙ্গে বসে সারা রাত কাটিয়েছে।

ভাণ্ডারীর কম্বল দরকার হয় না। জঙ্গলের পোকা মাকড়ের দৌরাত্ম্যেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু রাত জাগা তাদের বৃথা-ই হয়েছে। কোনো ভাল্লুককে সেদিন জলের তৃষ্ণা জাগিয়ে নিয়তি ডাকেনি বোধহয়।

দুটো সম্বর একবার অতি সন্তর্পণে এসেছিল। জলে মুখ দেবার আগে তাদের শঙ্কিত দ্বিধার আর অন্ত নেই। হঠাৎ সশব্দে জল খাওয়া শেষ না করেই তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়েছিল।

কারণটা বোঝা গেছল অনেক পরে।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী অষ্টমী হবে। অনেক রাত্রে একদিকের পাহাড়ের মাথা থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন ঘোলাটে চাঁদের আলো পড়ে জায়গটা যেন আরো অস্পষ্ট করে তুলেছিল।

অবনীর অনভ্যস্ত চোখ যখন টের পেয়েছে, ভাণ্ডারীর নজর নিশ্চয় তাহলে এড়ায় নি।

কিন্তু ভাণ্ডারী কিছুই করে নি। বন্দুকটা একটু তুলেও ধরেনি একবার।

অবনী কিস্ ফিস করেও কিছু বলতে সাহস করে নি। রুদ্ধ নিশ্বাসে শুধু দেখেছে একটা গাঢ় ছায়া যেন আবছা গাছ পালা পাথুরে ঢিবিগুলোর ওপর দিয়ে কে নিঃশব্দ বুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কুণ্ডের কালিমায় মিশিয়ে দিয়েছে। একবার শুধু দুটো জ্বলন্ত মণির চকিত ঝিলিক ও দেখেছে।

টাট্টু ঘোড়া দুটো একটু অস্থির হয়ে নড়ে চড়ে ওঠার শব্দ করতেই সেই ঝিলিক। তারপর চক্ষের নিমেষে সে ছায়া পাহাড়ের অন্য পারে অদৃশ্য হয়ে গেছে কালো বিদ্যুতের মত।

অবনী একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছিল এবার,—কি করলে ভাণ্ডারীদা ! ওটা'ত কালো চিতা !

হ্যাঁ।—ভাণ্ডারী অবিচলিত ভাবে বলেছিল,—জঙ্গলের সাক্ষাৎ শয়তান ! কিন্তু শয়তানকে খামোকা মারি ফালালে বনের বাহার থাকবে কুথা ! শয়তান মারতে মন চায়'ত মার যাই তুদের শহরে !

অবনী কিছু বলে নি। এ সব শোনবার কথা, জবাব দেবার নয়।

ভাণ্ডারীই আবার বলছিল,—ওই ডোরা কাটা বাঘ হ'ল বনের বাদশা বুঝেছিস। দুষমণ বটে কিন্তু ছ্যাঁচড়া না, হাঁক ডাক ছেড়ে জুলুম করে। কিন্তু উকেও সার্কাসের খাঁচায় আগুনের চাকার ফাঁদ ডিঙাই খেল দেখাতে হয়। আর ওই ভালু, উ হ'ল জঙ্গলের গাঁইয়া পালোয়ান। ভাঁড়ও বটে। ফাঁক পেলে লোটে তেমন হাঁক শুনলে ছোটে। উর ও নাকে দড়ি দিয়া মানুষ যেমন খুশি নাচায়। খালি এই

চিতা, মারো, ধরো, খাঁচায় পুরি রাখো, খেল দেখাবে নাই। না চিতা আমি সহজে মারি না। উ বনের মান রাখে। চিতা মারবার মানুষ ওই তুদের দেওয়ান বাড়ির জোয়ান!

শেষ রাতটা গুহার মধ্যে ঘুমিয়েছিল।

পরের দিন গুহার মুখে পাথরের চাঁই গুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে ভাণ্ডারী বুঝি আসল কথাটা বলেছিল। বলেছিল অবশ্য নেহাৎ তাচ্ছিল্য ভরে, কথাটার কোন দাম নেই এমনি ভাবে!

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন নিয়ে সৃষ্টি জানিস ত। হিম্মৎ যার আছে সে মানুষকেও এই তিন ভুবন খুঁজি লিতে কি বানাতে হয়। শুধু স্বর্গ, মর্ত্য না একবারে ডুব মারি থাকবার পাতাল। মরি গেলে আমার এ পাতালের কেউ তালাস পেত নাই। তাই তুকে শুধু দেখাই দিলাম!

তার পরের দিনই মুংরাহাটা যাবার পথে দ্বিতীয় বার দেখা। ওই শিরিষ গাছটারই তলায়।

লুকিয়ে নয় বেশ সোজাসুজি ভাবেই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে!

হাটে চলিছেন?

গায়ে পড়ে ডেকে না কথা বললে দেখতে পেয়েও অবনীকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হ'ত।

এখন সে দাঁড়ায়। বলে,—না। হাটে না!

হাট বাদে উখানে আছে কি!

একি শুধু কথা বলবারই ছুতো! তা হোক অবনী খাঁটি জবাবই দেয়,—সরকারী পোল্ট্রি সেণ্টার আছে!

মানেটা বুঝিয়েও দেয় তারপর,—হাঁস মুরগীর সরকারী ঘাঁটি। ওখান থেকে মুরগীর ডুই-দাওয়াই আনতে হয়।

হাঁ।—মেয়েটির চোখ দেখে মনে হয় ভেতরের হাসিটা সে যেন চাপছে,—তা হাটে যাবেন নাই?

যেতেও পারি একবার। যদিও দরকার নেই।

হঠাৎ মেয়েটি হাতের মধ্যে ভাঁজ করা একটা কাগজ সামনে খুলে ধরে অবনীকে দেয়।

অবনী কাগজটা দেখে অবাক। কোন কাগজের একটা বিজ্ঞাপনের পাতা। একটি নক্সা আঁকা শাড়ি পরা মেয়ের ছবি তাতে বড় করে আঁকা।

মেয়েটি আঁচলের খুঁটে বাঁধা একটা দশ টাকার নোট খুলে অবনীর দিকে এগিয়ে দেয় এবার।

উ শাড়ি আমার তরে একটা খরিদ করি আনতে হবেক।

অবনী বিমূঢ় স্তম্ভিত। মেয়েটি, কাটা কাগজের বিজ্ঞাপন, তার অনুরোধ, এই টাকা দেওয়া সবাই যেন অলীক অসম্ভব ব্যাপার। বাস্তবতার সঙ্গে কিছুই খাপ খায় না কোন মতেই।

এই চেহারা পোষাকের একটি মেয়ে এই বনের মধ্যে কাগজ থেকে কাটা বিজ্ঞাপন দেখিয়ে দাম দিয়ে তার জন্যে শাড়ি কিনে আনতে অনুরোধ করছে, এ'ত অবিশ্বাস্য!

নিজের অগোচরে তার বাস্তব ও কল্পনার জগৎ কোন দুর্জ্ঞেয় মানসিক ব্যাধিতে কি মিশে যাচ্ছে আজকাল! এরকম রোগের কথা সে যেন কোথায় শুনেছে বা পড়েছে।

কিন্তু কল্পনার জগৎ যে নয় বিজ্ঞাপনের কাগজ হাতের নোটটা ও তা দিতে গিয়ে সামান্য একটু স্পর্শই তা বুঝিয়ে দেয়।

অবনী টাকাটা হাতে নেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু কঠিন হয়ে বলে, তোমার শাড়ি হাটে তুমি নিজে কিনতে পারো না!

পারলে আপনাকে সাধব কেনে?—মেয়েটির চোখে সেই ঈষৎ কৌতুকরঞ্জিত মোহময় দৃষ্টি,—আমার হাটে যেতে মানা।

কার মানা?

ঈষের বেড এলোমেলো থাক থাক শাড়ের স্তূপ

মানা আমার নিজেরই ধরেন কেনে! মেয়েটির চোখ মুখে চাপা হাসির কুঞ্চন।

না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। অবনী কঠিন থাকবার চেষ্টা করে বলে,—আমার সঙ্গে কি তামাসা করছ! তোমার শাড়ি আমাকেই বা কিনতে দিচ্ছ কেন? আর লোক নেই?

আছে, কিন্তু তারা চিনা লোক।

চেনা লোক শাড়ি কিনলে দোষ কি! তারা কি শাড়ি কিনতে পারে না!

মিছা কথা বাড়াই হবে কি?—মেয়েটি হেসে বলে,—আপনার মন না চায় কিনবেন না। আমি সাধি একবার দেখলাম।

কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকেই বা সাধছ কেন?—অবনীর স্বর অধৈর্য ও বিমূঢ়তা মেশানো।

আপনে ই পথে হামেশা মুংরা হাটা আসা যাই করেন যে!

এমন ভাবে মেয়েটি কথাটা বলে যেন এ যুক্তির আর খণ্ডন নেই।

কি ভেবে বলা যায় না, কিংবা ভালো করে কিছু ভাবতে না পেরেই অবনী এবার অনুরোধটা মেনে নেয়।

জিজ্ঞাসা করে,—এ শাড়ি তোমার পৌঁছে দেব কোথায়?

কুথা আবার! ইখানে এই গাছতলাতে আমি রইব বিকাল বেলায়।

প্রশ্ন আরো অনেকগুলো মনে এলেও অবনী তখনকার মত চুপ করে টাকা নিয়ে চলে যায়।

ঠিক বিজ্ঞাপনের শাড়ি হাটে না পাওয়া গেলেও কাছাকাছি নিজের পছন্দ মত একটা শাড়ি কিনে এই পথেই ফেরে।

মেয়েটি গাছের তলায় নেই।

খুব অবাক অবনী বুঝি হয় না। তবু গাছটার

নিচে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে।

মেয়েটির সবই অদ্ভুত। কিন্তু শাড়ি যদি সে না নেবে তা হলে তাকে দিয়ে কেনানো কেন?

এ শাড়ি এখন নিজের আস্তানাতেই সে বা নিয়ে যাবে কি বলে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এদিক ওদিক খুঁজে অবনী অগত্যা তার আস্তানার দিকে চলতে সুরু করে।

খানিকটা গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়!

শাড়ীটো দিবার মন নাই বুঝি?

পেছন থেকে মেয়েটি এগিয়ে আসে।

অবনী ভুরু কুঁচকে বলে,—তোমার না শিরিষ গাছটার তলায় থাকবার কথা।

তা'ত ছিল বটে! দেঁর হই গেল যে আসতে। মেয়েটি হাসে,—তাইত ছুটি ছুটি আসতেছি।

কোথা থেকে?—অবনীর সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

জবাব না দিয়ে মেয়েটি শাড়ীর জন্যে হাত বাড়িয়ে বলে,—আপনার পসন্ তো ভালো মনে লয়!

শাড়ীটা অবনী কিন্তু দেয় না। একটু হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে,—এ শাড়ীর দস্তরি চাই।

দস্তরি! দস্তরি কেনে?

বাঃ এত কষ্ট করে এতখানি হেঁটে বাজায় ঘেঁটে কিনে আনলাম তার দস্তরি নেবো না। তোমার ঘর কোথায় আজ দেখতে হবে এই আমার দস্তরি!

ঘর দেখাতে লই গেলে আমার মরদ বলবে কি!

তোমার মরদ আছে?—অবনী বিদ্রূপও করে।

কেনে আমি কি কানী না কুঁজী যে আমার মরদ জুটবে নাই!—মেয়েটির মুখে দুষ্টুমির হাসি।

ঘরে মরদ থাকলে পরকে দিয়ে শাড়ী কেনাও কি বলে?—অবনীর স্বর এবার সত্যিই অপ্রসন্ন,—বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরতেই বা সে দেয় কেন।

উ ত বাঁধি রাখতেই চায়। তাই ত আমি জিদ করি পলাই পলাই আসি।

অবনী বিস্মিত দৃষ্টিতেই মেয়েটিকে লক্ষ্য করে। এ কথাগুলো ঠিক মিথ্যা পরিহাসের মত শোনাচ্ছে না।

সে জানতে পারে না?—নিজের জেরা করবার ধরনে নিজেই সে অবাক হয়। এ অধিকার নেওয়া সম্বন্ধে সঙ্কোচ তার গলায় প্রকাশও পায় একটু।

মেয়েটিকে কিন্তু তাতে ক্ষুব্ধ মনে হয় না। হেসে বলে,—কখনও পারে কখনও পারে না!

পারলে তখন!

মেয়েটি প্রথমটা জবাব না দিয়ে অবনীর হাত থেকে নিজেই শাড়ীটা টেনে নেয়, তারপর মুখের অদ্ভুত ভাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলে,—পারলে করবেক কি! আমি গাই না বকরী! ধরি আনি বাঁধি রাখা মানব কেনে? উই মাতঙ্গীকে ইন্দারায় ভরি রাখা যায়?

এ সব তোমার ঝুট কথা! অবনী হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে,—কে তোমার মরদ আমি দেখতে চাই। মিছি মিছি আমায় নিয়ে এ তামাসার মানে জানতে চাই। চলো।

হাইরে আবদার! একটো শাড়ী কিনি আনি আমার ও মাথা কিনি রাখতে চায়!

মেয়েটি হঠাৎ শাড়ী নিয়ে মাতঙ্গীর নালাটার দিকে ছুট্ দেয়।

লজ্জাই পেয়েছিল অবনী সেদিন। সুস্থ সবল জোয়ান ছেলে হয়েও বনের হরিণীর মতই বিদ্যুৎগতি ওই মেয়েটির নাগালই ধরতে পারে নি। মাতঙ্গীর নালায় হেলে পড়া গাছটায় সে আটকে না পড়া পর্যন্ত।

অত্যন্ত বিশ্রীও লেগেছিল তার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কারের বিরুদ্ধে একটা অচেনা বনের মেয়ের পেছনে এমন ভাবে ছোটা, কিন্তু নিজেকে সংবরণ করতে পারে নি সেই সময়টুকুর উত্তেজনায়।

আত্মসংবরণ করেছিল শেষে, মেয়েটি যখন তাকে নিজের ঘর দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মাতঙ্গীর নালার পার বেয়ে উঠেছে।

খানিকদূর তার পিছু পিছু গিয়ে অবনী দাঁড়িয়ে পড়েছিল এক জায়গায়। বেশ দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে বলেছিল,—থাক, তোমার ঘর দেখাতে হবে না।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়েছিল নীরবে। তার চোখের দৃষ্টিতে উপহাস না নিষ্কৃতির, বিস্ময়ের না বেদনার আভাস অবনী বিশ্লেষণ করবারও চেষ্টা করে নি।

শুধু মুখ ফিরিয়ে চলে আসবার আগে আবার বলেছিল,—তুমি নির্ভাবনায় থেকো। মুরাহাটা এ জঙ্গলের রাস্তায় আর আমি যাব না।

অবনী নিজের শপথ হয়ত সত্যিই রাখতে পারত।

কিন্তু জীবনের সুতোয় দুর্বোধ জট পাকানই যার কৌতুক সেই নিয়তিই তা হতে দেয় নি।

পরের দিন বিকালে শশধর অপ্রত্যাশিত ভাবে নিজেই তার আস্তানায় এসে হাজির।

শশধর তার আস্তানায় কখনো আসে না এমন নয় কিন্তু সাধারণতঃ খবর দিয়ে তার দেওয়ান কুঠিতেই ডেকে পাঠায়। কদাচিৎ এলেও আসে সকালে স্টেশনে কোন নিজস্ব দরকার থাকলে যাবার পথে।

অবনী গোবর্ধনকে দিয়ে মুরগীদের একটা নতুন পোঁয়াড়ের জাল লাগাচ্ছিল।

শশধর এসে দাঁড়তে একটু অবাক হয়ে বললে,—কি সৌভাগ্য। এমন অসময়ে?

অসময়ে অজান্তে এসেই ত মানুষকে দেখতে হয়!—শশধরের সেই ভাবলেশহীন মুখের অকারণে ঈষৎ বেঁধানো কথা।

আমি কি সব সময়ে সাবধানে সেজে থাকি যে অসময়ে অন্য চেহারা দেখাবে!—অবনী হাসল।

কোনটা আসল চেহারা সবাই নিজেই কি জানে! তোমার অন্ততঃ—আসল চেহারা বাইরের কেউ জানে না!—অবনীও আবার হেসে বললে,—খেয়ে যাবে আজ রাত্রে? দুটো ভালো মুরগী কাটাই তাহলে।

ও পোষা জিনিষ রোজই ত খাচ্ছ আর খাওয়াচ্ছ। অরুচি ধরে না!

ধরলেও করছি কি! বুনো জিনিষ পাচ্ছি কোথায়!

আজ পাবে। সেই জন্যেই আজ তোমাকে খবর দিতে এসেছি। রাত্রে আজ দেওয়ান কুঠিতেই খাবে।

কথাটা বলেই যে ভাবে শশধর চলে গেছল তাতে অবাক একটু হলেও শশধরের ধরণ ধারণ কিছুটা জেনে খুব বেশী তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

শশধরের এ দিনের ব্যবহার কথাবার্তার পেছনে কোন সূক্ষ্ম গূঢ় মানে যে থাকতে পারে—তা কেমন করে আর ভাববে!

মানেটা বুঝেছিল সেই রাত্রে দেওয়ান কুঠিতে খেতে বসে।

শশধর বন্য জিনিষেরই ব্যবস্থা করেছে।

একটা চিঙ্কল হরিণের মাংসই সেদিন প্রধান ভোজ্য।

শশধরের দেওয়ান কুঠি জঙ্গলের সেকেলে আধা দুর্গ স্তূপ হোক তখনই খাবার ঘরে তার টেবিলপাতা।

এ টেবিলে আগেও শশধরের সঙ্গে খাবার সৌভাগ্য অবনীর হয়েছে। বেশীর ভাগই টেবিলে বসেছে শুধু তারা দুজন। কখনো শশধরের এক হিসেবে দূর সম্পর্কের আত্মীয় ও ফাই-ফরমাজ খাটবার সরকার ভরত তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

শশধরের সেদিকে ছুৎমার্গ একেবারে নেই। ভরতকে দরকার হলে জুতোর ঠোক্কর দিলেও তাকে এক টেবিলে নিয়ে খেতেও সে দ্বিধা-হীন।

এ দিন টেবিলের বসবার আয়োজন দেখে গোড়াতেই অবনীর একটু আশ্চর্য লেগেছে।

(৭০২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র

পরম প্রীতিভাজনেষু,

গৌরহরবাবু, তোমার 'বিংশ শতাব্দী'তে
পুরনো সংখ্যা দিয়ে বলেও দিখতে পারছি না দুই কথা বারবার
ব্লাডপ্রেসারের পড়ে লিখেছি। অসুস্থতার কথা তুমি জানতে এবং দেখেও গিয়েছ।
এর উপর গত ২০ শে আগস্ট থেকে ইউরিমিয়ার আক্রান্ত হয়ে
একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে আছি। এ অবস্থায় সুচিন্তিত লেখা
সম্ভব হচ্ছে না দুই কথায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি। আশা করি
তুমি এবং বিংশ শতাব্দীর পাঠকবর্গ আমার এই অনিচ্ছাকৃত
অনুপস্থিতির কথা বুঝে কিছু মনে করবে না এবং বিংশ শতাব্দীর গ্রাহক
বর্গও কোন একটি সংখ্যা অগ্রহণ করবেন না।

ইতি
শুভার্থী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগৌরহর প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক - বিংশ শতাব্দী

বৈঠকখানা ও সমাজ

দূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দেশের আবহাওয়া, জমির গঠন, কাঠ কাঠরা প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ী, ঘর, মসজিদ ইমারতের সম্পর্ক খুব নিবিড়। সম্প্রতি আজকালকার মহা-ভূগোল বৃত্তান্তে অনেক কথা লেখা হচ্ছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাসেও সম্বন্ধটি খুব পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায়। বাংলা দেশে বৃষ্টি বেশী হয়, আরব দেশে বৃষ্টির বালাই নেই, ভারবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রৌদ্র প্রখর, আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর উত্তরাংশে কুজ্ঝটিকার উৎপাত, সূর্যের মুখ দেখাই যায় না—অতএব ভিন্ন স্থলে বাড়ী ঘর ভিন্ন উদ্দেশ্যে, ভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খাল, বিল, হ্রদের ধারে বাড়ী এক রকম, পাহাড়ের গায়ে বাড়ী অন্য রকম। এঁটেল মাটি কিম্বা পাথরের ওপর পাকাপোক্ত ইমারৎ তোলা সহজ, পলিমাটির ওপর একতলার বেশী উঁচু বাড়ী তোলা শক্ত। যে দেশে ভূমিকম্প হয়, সেখানে বাড়ী ঘর চুনকো হবে, যে দেশে ঠাণ্ডা কি গরম হাওয়া জোরে বয়, সে দেশে দোর-জানলা একটু কম হবে। যে দেশে বাঁশ পাওয়া যায় সে দেশের স্থাপত্যের রেখা সরল হয় না। পাথরে জায়গায় স্থাপত্যের রেখা সাধারণতঃ সরল হয়। আবার পাথরের আঁশের ওপরও স্থাপত্যের রূপ নির্ভর করে। এ সব কথা সকলেই জানেন।

বাড়ীঘর মোটামুটি দু' রকমের বাড়ী বুঝি। এক ইমারৎ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি; অন্যটি বাড়ী, গৃহ। দুইই সম্মিলনের স্থান—প্রথমটি সাধারণের, দ্বিতীয়টি একটি বংশের, কি গোষ্ঠীর নিবাস-স্থল। সম্মিলন ও নিবাসের মধ্যে যা পার্থক্য, ইমারতের সঙ্গে গৃহের তাই পার্থক্য। তবুও মিল রয়েছে অনেকখানি। অন্দর-প্রাসাদ, ফতেপুর সিক্রী চিতোর-স্তম্ভের সঙ্গে জাতির অনেক আশা, ভরসা, স্মৃতি, ভয়-ভাবনা জড়িত রয়েছে। আবার যে গৃহে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ হয় নি, সে গৃহ গৃহই নয়, মেসের বাড়ী হস্তে সংস্কার জোরাল, সে দেশ ঘরেও জয়-পতাকা।

আমার বক্তব্য গৃহের একটি ঘর মাত্র। সমাজতত্ত্বে সাধনার একটি প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার রীতি আছে। আমি সেই সনাতন প্রথাটি লিখ্‌ছি। আমার মনে হয় যে, সমগ্র সভ্যতার মাপকাঠি এই বৈঠকখানা সাজানো, তার আকার-প্রকার এবং অন্তঃপুর থেকে দূরত্বের ওপর নির্ভর করেছে আমাদের মনের সংস্কার বদলাচ্ছে—সেই পরিবর্তনের ফলে ও সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানার চেহারাও বদলাচ্ছে। এই দুটি পরিবর্তনের সম্বন্ধটি ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য। আমার অভিজ্ঞতা স্বল্প। যাঁর অভিজ্ঞতা তিনি আমার মূল সিদ্ধান্তটি সমর্থন করবেন।

আমি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক—সেইজন্য নিজের সম্প্রদায়ের কথাই প্রথমে লিখ্‌ছি। কোলকাতা সহরে ভদ্রলোকের বৈঠকখানা নেই বোলেই চলে। যাঁদের পুরাণো বসত বাড়ী আছে, তাঁদের অবশ্য বৈঠকখানাও আছে। বৈঠকখানাওয়ালা বাড়ীর ভাড়া খুব কম গৃহস্থই যোগাতে পারে। সেইজন্য বরাবর লক্ষ্য কোরেছি যে বাসোড়ে-বাড়ীর ছেলেদের আড্ডা হয় চাওর দোকানে—না হয় গড়ের মাঠে। বসত বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে বাসোড়ে বাড়ীর ছেলেরা আলাপ জমাতে ভারী ব্যগ্র হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বসত বাড়ীর কর্তারা ভারী কড়া, পয়সা-কড়ি ও ঘরচের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। সেইজন্য তাঁদের ছেলে-পুলেরাও বহির্মুখী হয়ে পড়েছে বৈঠকে আড্ডা বসে—সেখানে বয়স্কেরই প্রতিপত্তি। যদি তাঁরা বড় কেরাণি হন,

হলে তাঁদের তাস-পাশা কিম্বা খোশগল্পের মজলিসে এক শালা-বাবু, মা বাবু কি 'উঁহো' ছাড়া অন্য দুরকের গতিবিধি নিষেধ। যদি কর্তারা উকীল, ডাক্তার, ব্যবসাদার, বন্ধুজী হন, তা হলে সেখানে মক্কেল, রোগী, প্রোকার না হয় কীর্তন গাই-এর ভিড় হয়। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাব, বিশেষতঃ বৈষ্ণবভাবের উদ্রেক হলেও, পিতার পসারে লোভ থাকলেও, ছেলে-ছোকরারা সন্ধ্যাবেলাতে গড়ের মাঠে নির্মল বায়ু সেবন, চাদের দোকানে প্রোফেসারের বিদ্যাবুদ্ধি ও তরুণ সাহিত্য আপেক্ষিক ও তুলনামূলক বিচার কোরতে এটুক নির্মল আনন্দ উপভোগ কোরতে ভালবাসে। একে প্রকৃতির আপ্তান বলা যেতে পারে। বেটি ব্লাইথ, মে মারে ও দেশী চিত্র তারকাদের আলোচনা কিন্তু পিতৃবন্ধুর সঙ্গে চলতে পারে না—এ বিষয়ে মতের পার্থক্য থাকতে পারে। বৃদ্ধেরা মোটেই সহিষ্ণু হতে পারেন না।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের বৈঠকখানা ছাদ, সিঁড়ির ধারের কিম্বা শোবার ঘরের জানলা। এই স্থান থেকেই অন্য বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পরস্পরের সঙ্গে সখীত্ব স্থাপন, গোলাপ কি বেয়ান পাতান, সুখদুঃখের কথা, পুত্র সন্তানের তারিখ, ননদের কাহিনী প্রভৃতি আন্তরিক কথাবার্তা এই ঘুলঘুলি কিম্বা ছাদের ধারে, বেলফুলের টবের পাশ থেকেই সুরু হয়, বোধ হয় শেষও হয়। গহনার প্যাটার্ণ স্থির হয় এইখান থেকেই—বাড়ীর বৌমার রূপগুণ স্থির হয় এইখান থেকেই। তরুণ সাহিত্যের যে অংশ মোদার বাড়ীতে না পুষ্ট হয়, সেটুকুর জন্মস্থান ও অধিষ্ঠান এইখানে। এইখানেই নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ হয়, এইখানেই খুসখুসে কাসি কাসতে কাসতে তরুণী সন্ধ্যাবেলায় আসেন, অন্য বাড়ীর ছাদে অমনি কাসির সুরেই সুর মিলিয়ে গ্যাসের ম্যাজিক মাউথ্‌পীস্ হাতে নিয়ে তরুণ আসেন হাওয়া খেতে। সঙ্গে সুরেশ, নরেশ, প্রদীপ, প্রফুল, দীপকের দল আসে সাহিত্যালোচনা কোরতে। বেঁধে গেল সুতো। এতএব একবারে চাদের দোকান—চপ, কাটলেট, পচা সরবৎ—তার ফলে সহরে মহামারী ও উচ্চ মৃত্যুহারের জন্য, অন্য ধারে তরুণ-সাহিত্যের প্রভাবে সমাজ-বন্ধনে শৈথিল্যের জন্য দায়ী বৈঠকখানার অভাব।

এই অভাবের ফল ব্যক্তিগত জীবনেও লক্ষ্য কোরেছি। গোড়াতে কিন্তু একটি সুফলের কথা না বলা অন্যায়। বৈঠকখানা না থাকায় অন্য বন্ধু বন্ধুনী (না বান্ধবী? আসতে পারে না বোলে গৃহে শান্তি থাকে—অবচ পরকীয়া প্রেমের নভেলও বিক্রী হয়। কিন্তু কুফলের ওজন বেশী। স্ত্রীজাতিকে সদাসর্বদা নিজ মূর্তিতে দেখলে, মণীন্দ্রলালের নভেল পড়া থাকলেও, তাঁদের ওপর ভক্তি অটলা রাখা শক্ত হয়। স্ত্রীজাতি নিতান্তই আদর ও যত্নের বস্তু। অনাবৃত ও অযত্নে রক্ষিত দেহলতার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সে জ্ঞানের উন্মেষ অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাহায্যে অসম্ভব। স্ত্রীজাতিকে কোন দোষ দিচ্ছি না—দোষ আমাদের, সমাজের, অবস্থার, প্রকৃতির, বয়সের—বাকী সকলের, শুধু তাঁদের নয়। আজকাল অবশ্য কোন কোন শিল্পী আমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা কোরছেন। সকলে কিন্তু তাঁদের মডেলের মতন চিরযৌবনা নন—কিম্বা সকলে কিছু বেণারসী সাড়ী পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন না। সকলের স্নানের ঘরই নেই। মোদ্দা কথা এই যে, বৈঠকখানা স্নানের ঘর এবং রান্না ঘর থেকে দূরে থাকলে স্ত্রীজাতির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, আমাদের সৌন্দর্য-জ্ঞান ও সেই সঙ্গে আর্টের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা সবই অক্ষুণ্ণ থাকে। চিত্রবিদ্যা ও সাহিত্য এখানেই স্থাপত্যের ওপর নির্ভর করে।

বৈঠকখানা না থাকার আর একটি দোষ দেখাচ্ছি। একান্নবর্তী পরিবার—কোলকাতার ভাড়াটে কিম্বা পৈতৃক বসত বাটিতে তিল রাখবার জায়গা নেই—ছোট্ট বৈঠকখানাতে পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজন শুতে বাধ্য হন। একজন কর্তা আফিস থেকে এসে সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকলেন। একটি প্রকাণ্ড মশারির ভেতর তিনটি ছেলেমেয়ে—একটির ঘুংরি কাসি, অন্যটির দাঁত উঠ্‌ছে, তৃতীয়টির হাতে ধারাপাত, গৃহিণী অঙ্গমূলে ছট্‌ফট্ কোরছেন—কোণে হাতকটি ও সকালের শিঙ্গী মাছের ঝোল ঢাকা রয়েছে—নলের মুখে গামছা, গাড়ু ও ডাবর ঢাকা। কর্তা খেতে

হেতে আফিসে লোক কমাবার কথা বোলছেন। স্ত্রী হতভাগিনী নিবাস পরিত্যাগ কোরে পাশ ফিরলেন। গল্প শেষ হল, কর্তার ঠিক ঘুমটি আসছে এমন সময় গিন্নী আরম্ভ কোরলেন—ছোট জায়ের বাপের বাড়ীর কি এসে তাঁকে কি অপমানটাই না কোরে গিয়েছে—তার বিষয় বিদায়ে বর্ণনা। হিন্দু জাতির সনাতন একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বিষবৃক্ষ রোপিত হল। বঙ্কিমবাবুর যুগে প্রথা ছিল অন্য—দেশ ছিল লোকের পাড়াগাঁয়ে, তাই আত্মীয় স্বজন সব বৈঠকখানাতেই গল্পগুজোব কোরতেন। রাত একটার আগে কর্তারা ঘরে যেতেন না। সব স্ত্রীরাই যে তার আগে ঘুমিয়ে পড়তেন বলছি না—কোন স্ত্রীই যে স্বামীকে আপমানের বৃত্তান্ত শোনাতে জেগে থাকতেন না তাও বলছি না। তবুও এ কথা ঠিক যে স্বামী-স্ত্রীর আলাপের সুবিধা ও সময় তখন অল্প ছিল—বৈঠকখানার জন্য। এখন সুবিধা ও সময় বেশী—সেই বৈঠকখানার অভাবের জন্য। স্বামী-স্ত্রীর সর্বক্ষণ আলাপ পরিচয়ে সুফল কুফল দুই আছে। একটি কুফল এই—প্রেম ও অভিমানের অশ্রুতে বিষবৃক্ষ যত শীঘ্র বেড়ে ওঠে অন্য আর কিছুতে বাড়ে না। বৈঠকখানা থাকলে অন্ততঃ অপেক্ষা কোরে কোরে মেয়েদের চোখে ঘুম নামত। সনাতন অনুষ্ঠান বজায় রাখবার জন্য মেয়েদের চোখে তাড়াতাড়ি ঘুম আনান উচিত। তা না হলে হিন্দু-জাতির অধঃপতন হবে। ব্রাহ্মণ-সভা থেকে পয়সা দিয়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী বৈঠকখানা কোরে দেওয়া উচিত। দোক্তার বদলে আফিমের কথাও বলা যেতে পারে—কিন্তু এই ব্যবস্থায় আমার আপত্তি আছে। সকলেরই থাকা উচিত।

পূর্বে পল্লীগ্রামে গৃহস্থের গৃহ ছিল," সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানাও ছিল। এখনও আছে। রোয়াক, বারাণ্ডা, দাওয়াতে সকাল সন্ধ্যায় আড্ডা বসে। নীচু জাতের যেমন বটতলা, উঁচু জাতের তেমনি রোয়াক, বারাণ্ডা। আজকাল শিবতলা, চণ্ডীতলায় লোক বসে না—দরকারও নেই। তার বদলে লাইব্রেরী ও সঙ্ঘের ফলের আখড়া-ঘর হয়েছে। পল্লী-সমাজের মোটা মোটা সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ হয় এইখানে। কিন্তু লাইব্রেরী কি আখড়াঘর-সমালোচনা যাই হোক না কেন, সে সমালোচনার কোন মূল্যই থাকে না, যদি না চক্রবর্তী মশাইএর বৈঠকখানার চায়ের মজলিসের সিদ্ধান্ত তার পিছনে থাকে।

সহরে বড়লোকের বাড়ীতে বৈঠকখানা আছে—একটি ও আছেই—পয়সা অনুসারে আবার দুটি তিনটি। অন্দরমহল থেকে স্ত্রীজাতির ক্ষীণ স্বর, ছেলে-মেয়েকে দুধ খাওয়ানর মৃদু তাড়না, ঝি'র কোলাহল, বাসন-মাজার শব্দ, রান্নাঘরের ধোঁয়া সেখানে আসে না। বড়লোকের মধ্যে যাঁরা উচ্চশিক্ষিত ও সাহেবী ভাবাপন্ন, তাঁদের Drawing-room থাকে। এখানে স্ত্রীদের অবাধ গতি-বিধি—অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলায় যখন ও সেখানে শরৎবাবু সরোজিনী চরিত্রাঙ্কনের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরে-ছিলেন। এই ঘরের মধ্যিখানে পিয়ানো রাখা হয় ভাল ছিটের কাপড় মুড়ে। যখন মোড়ক খোলা হয়, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে সুরে ও বেসুরে দেশী ও বিদেশী গান গাওয়া হয়। দেশী গান বোলতে রবিবাবু, অতুলপ্রসাদের না হয় কাজী নজরুলের গান, আর বিদেশী গান বোলতে বিশ বছর পূর্বের পরিচিত ও সুপ্রচলিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-সঙ্গীত। অনেকের মতে দেশী বিলাতীর, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সাধন এই উপায়েই প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হবে। এই পূর্ব-পশ্চিমের পুণ্য মিলনক্ষেত্রে নন্দলাল ও মার্কাস ষ্টোনের পাশাপাশি ছবির তলায় বিলেতী সুট পরা নব্য-সিভিলিয়ান তরুণ কুমার মারাঠী সাড়ী পরিহিতা কুমারী ইলা মীলার গ্রীবা, গহনার সঙ্গে প্রেমে পড়েন। যে যাই বলুন না কেন—বর্তমান যুগের ধর্ম অনুসারে সব বাড়ী থেকেই বৈঠকখানা উঠে গিয়েছে। ধর্ম যেকালে মেয়েদের জন্য তৈরী হয় ও রক্ষা পায়, তখন বৈঠকখানার রূপ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলিত হবার কিম্বা দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। শুধু এইটুকু দেখলেই চলবে যে শিক্ষিতা মহিলার হাতে পড়ে Drawing-room-এর রূপ সুন্দর হচ্ছে কি না। সৌন্দর্যের মাপকাঠি কি জানি না—সেইজন্য গোটা কয়েক অন্য অভিজ্ঞতা লিখে পরিবর্তনের ইংগিত জানাচ্ছি।

মেয়েরা এতদিনে পুরুষদের বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত কোরতে পেরেছেন। ফলে মেয়েদের গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয়েছে, সঙ্গ-জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, সমালোচনায়

স্বাধীনতা এসেছে, পুরুষদের অত্যাচারের বিপক্ষে তাঁরা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে শিখছেন। মানুষ অর্থাৎ পুরুষে কতদিন আর নীরব থাকতে পারে? পয়সাওয়ালা লোকে সব club-এ যাচ্ছেন। ক্লাবের সভ্য হওয়া যে কত ভাল জিনিস তা বোলে শেষ করা যায় না। প্রথমতঃ—এর জন্য গৃহে শান্তি থাকে—বেশী মদ না খেলে ও বেশী ব্রিজ খেলে বাজী না হারলেই হল। দ্বিতীয়তঃ আমাদের un-clubbable বোলে একটা বদনাম আছে সাহেবদের কাছে—সে বদনাম সহজেই দূর করা যায়। তৃতীয়তঃ—ক্লাবে সাহেব মেম এবং বন্ধুর উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় লাভ হয়—এতে মনের উন্নতি নয়, পৃথিবীতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা স্থাপনের উপায় পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ—রুশিয়া, তুর্কী ও নিজেদের গভর্ণমেণ্টের অনেক গূঢ় কথা শুনে অনেকে অর্থাৎ যিনি ও যাঁরা ক্লাবের সভ্য নন, তাঁদেরকে বলা যায়। এই ব্যস্ততার যুগে কিছু সব-বিষয়ে বই পড়ে মত ঠিক করা যায় না—অনেকটা অন্ধ বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভর কোরতেই হয়। ক্লাবে প্রত্যেক বিষয়েরই বিশেষজ্ঞকে পাওয়া যায়। আমি আইনষ্টাইনের নতুন তত্ত্ব এই ক্লাবেই শুনেছি ও বুঝেছি একজন দালালের কাছে। পঞ্চমতঃ—এই ক্লাবের জন্যই একটি ক্লাব-সাহিত্য গড়ে উঠছে। 'চারইয়ারী কথা' থেকে চার হাজার ইয়ারকীর জন্ম হয়েছে সকলেই জানেন। অনেক গল্প 'যদু, পেগ লেয়াও' বোলেই সুরু করা হয়। যাঁদের পেগে আপত্তি থাকে তাঁরা তামাক আনতে হুকুম দেন। কিন্তু তাদাকে আজকাল আর গল্প জমে না। পরশুরাম ও কেদারবাবু জমাতে চেষ্টা কোরছেন চা তামাক দিয়ে—কিন্তু তাঁরা সাহিত্যের losing battle লড়াই কোরছেন। বৈঠকখানা আজকাল ভাঙা লাটের সামিল। এ হাটে ব্যবসা চলে না। আমার একান্ত অনুরোধ যেন সাবাই কোন সভ্য ক্লাবে অতি শীঘ্র ভর্তি হয়ে পড়েন। 'রায় বাহাদুরের গৃহিণী' ও 'বেহ্মন ঠাকরুণ' আমার মন্তব্য সমর্থন কোরবেন শপথ কোরতে পারি।

চারুকলার সঙ্গে বৈঠকখানার সম্বন্ধ পূর্বে ইংগিত কোরেছি। সেই সম্বন্ধটিই বিশদভাবে প্রকাশ করছি। আমার বিশ্বাস, কোলকাতা সহরে বৈঠকখানাওয়ালা বাড়ী পাওয়া দুর্লভ বোলে রিয়েটারী সঙ্গীত, কন্সার্ট বাজনা, গ্রামোফোন ও বেতার সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়েছে। সহরের ভাড়াটে বাড়ীর নীচের তলার ঘর ছোট, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। সেখানে গাইয়ে-বাজিয়েদের আসতে বলা যায় না। সেখানে বীণা, তানপুরা, পাখোয়াজ রাখা যায় না। জোর রাখা যায়—হারমোনিয়ম ও তবলা কিম্বা এস্রাজ। এ সব যন্ত্রগুলি ছোট, ওপরের ঘরেও রাখা যায়। শ্রান্ত কেরাণী অবসর পেলে কোলে তুলে নিতে পারেন এবং বাড়ীর বিবাহ-যোগ্যা মেয়েও 'অন্ধকারের অন্তরেতে' কিম্বা 'কে বিদেশী' গেয়ে পাড়াকে সঙ্গীতসুধায় ডুবিয়ে দিতে পারেন।

বড় লোকের বাড়ীর কথা বিভিন্ন হতে বাধ্য। সেখানে বৈঠকখানার বদলে Drawing-room আছে। অতএব সঙ্গীতের রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হবেই হবে। খুব বড় লোকের বাড়ীতে পিয়ানো থাকে, মাঝামাঝি বড় লোকের বাড়ীতে থাকে জাপানী অর্গান ও এস্রাজ। এই সব যন্ত্রের ঘেরা টোপ, বোসে বাজাবার আসন এবং আশপাশের স্থান-গুলি মনোরম ভাবে সজ্জিত থাকে। পিয়ানোর মাথায় বেটহফেনের মর্মর মূর্তিও দেখেছি। তানপুরাও থাকে না তা নয়। তবে তানপুরা দেখতে তত সুশ্রী নয়, আওয়াজ-টাও বেড়ালের মতন, বাঁধতে তার ছিঁড়ে যায় বোলে ঘেরা-টোপের মধ্যেই থাকে। পিয়ানো সারাতে ভারী বাজাবা; সেইজন্য ডোয়াকিনের আদর সর্বত্র। অল্প বয়সী মেয়েদের এস্রাজ বাজাতে বোসলে ভারী সুন্দর দেখায়, বাঁ হাতের হীরের আংটি জল জল ক'রে ওঠে, এস্রাজের সুরটাও করুণ ও নাকী। বাঙ্গালী মেয়েদের প্রাণের কথা (শুধু বাঙ্গালী কেন? সমগ্র বাংলা জাতির মর্মবাণী) এস্রাজে যেমন আত্মপ্রকাশ করে অমন আর কিছুতে হয় না। মৃদুস্বরে, ঈষৎ নাকী সুরে, আধ আধ ভাষায় যে বেদনা কবিতায় রূপায়িত হয়, সেই কবিতাই Drawing-room-এ গাওয়া সম্ভব। পয়সাওয়ালা লোক ও বিলেত-ফেরতের গায়ণা যে অতুলপ্রসাদ ও রবিবাবুর গান গাইতে কোমলকণ্ঠি হওয়া চাই, সে কণ্ঠে মুক্তার শেলী ঝোলা চাই। চেহারা ভাল হওয়া চাই অবশ্য, কিন্তু ওটা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না—বিলেত ঘুরে এলেও মেলে না।

গ্রামের অভিজাত বাড়ীর বৈঠকখানায় এখনও সুরবাহার, তানপুরা, পাখোয়াজ দেখতে পাওয়া যায়। এসব বাড়ীর ছোট ছেলে সাধারণতঃ ব্যবহার করেন হাতির দাঁত বসান ছোট্ট হারমোনিয়ম, চাবি টিপলেই scale বদলান যায় আবার। কিন্তু বাইরে থেকে ওস্তাদ এসে যন্ত্রগুলো সাফ করা হয়। বৈঠকখানা হয় খুব দূরে—সেখান থেকে পাখোয়াজ ও ধ্রুপদ গানের বিকট আওয়াজ অন্দর মহল প্রবেশ করে না বোলে গ্রামের বৈঠকখানার গানের আওয়াজ খুব চড়া ও গম্ভীর হওয়া সম্ভব হয়। সর্বত্র ধনীরা আর্টের পরিপোষক। তবে পরিপোষণের মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ভর করে ঘর বাড়ীর ওপর। গ্রামের সঙ্গীতজ্ঞ জমীদার সম্প্রদায় চড়া ও জোর গলা ভালবাসেন—তাইতেই তাঁরা অভ্যস্ত হয়েছেন। কি কোরে তাঁরা মৃদু গলায় নাকী সুরের Drawing room music পছন্দ কোরবেন? Drawing-room-এ পূর্বোক্ত কারণে অতুলপ্রসাদ ও রবিবাবুর, বিশেষতঃ রবিবাবুর গান গাওয়া হয়। সেইজন্য দেশের সঙ্গীতজ্ঞ জমীদার সম্প্রদায় রবিবাবুর গান ভালবাসেন না। যদি জমীদারের দলকে কোলকাতায় ছোট ভাড়াটে বাড়ী কিম্বা বালিগঞ্জের সাহেবপাড়ায় থাকতে হত, তা হলে রবিবাবুর গানই রামপ্রসাদী, নিধুবাবুর টপ্পা ও রজনী সেনের গানের চেয়ে ভাল লাগত। এতএব সঙ্গীতে মত পার্থক্যের কারণ সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় কোন গূঢ় তত্ত্ব নয়—কারণ বৈঠকখানার রূপ ও অন্দরমহল থেকে দূরত্ব।

এই দূরত্বের ওপর সাজ-সরঞ্জামের ও খেলাধূলার রুচি নির্ভর করে। বৈঠকখানা পরিষ্কার করে চাকর-বাকরে, Drawing-room পরিষ্কার করেন বাড়ী মেয়েরা। প্রথমটি সাজান হয় পুরুষের রুচিতে, দ্বিতীয়টি সাজান হয় মেয়েদের রুচিতে। একটু তফাৎ হতে বাধ্য। মেয়েরা দামী গহনা ভালবাসেন, সেই জন্য Drawing-room-এর ঐ একটু ঝাবিড়ী ধরনের। পুরুষরা ভালবাসেন খোলা জায়গা, সেইজন্য বৈঠকখানাতে বেশী জঞ্জাল থাকে না। ময়লা থাকে দু'জায়গাতেই—মেয়েরা কিন্তু রোজ ম্যাটিং তুলে ঝাঁট দিতে পারেন না, দেয়ালটোপ খুলে ঝাড়-পোঁছ কোরতে পারেন না, আর বৈঠকখানা পুরাতন ভৃত্যের হাতে ন্যস্ত থাকে বোলে চাদর ও তাকিয়ার গেলাপ ময়লাই থেকে যায়—কোণে তামাকের গুল বেড়েই চলে। বৈঠকখানায় খেলা হয় তাস, সতরঞ্চ, Drawing-room-এ খেলা হয় Bridge। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। আমি সমাজ তত্ত্ববিদের কাছে—বিশেষতঃ Environmentalist-দের কাছে সামাজিক পরিবর্তনের একটি অসম্পূর্ণ কাহিনী বিবৃত করেছি। আশা করি, কোন অধ্যাপক আরো নতুন তথ্য সংগ্রহ কোরে সভ্যতার সঙ্গে বৈঠকখানা ও অন্দরমহলের সম্বন্ধে লম্বা থিসিস্ লিখবেন—তবেই আমি ধন্য হব। সম্বন্ধের সূত্রটুকু আমি ধরিয়ে দিলাম। সূত্রটি হচ্ছে স্ত্রীলোকের হাতে। অর্থাৎ স্ত্রীজাতির শিক্ষা, সাধনা ও সুবিধার ওপর সভ্যতার ভাগ্য নির্ভর কোরছে। আজ-কালের মেয়েরা নিজেদের জন্য কিছু টাকা এবং একটি ঝিরিঝিরি ঘর চাচ্ছেন। তাঁদের চাওয়াটা খুবই ন্যায্য মনে হয়। প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে মাসে মাসে হাত খরচ দেওয়া—তার হিসেব না নেওয়া এবং একটি আলাদা ঘর দেওয়া। কোলকাতা সহরে আলাদা ঘর পাওয়া দুষ্কর। এ সব কথা লিখতে সাহস হয় না আমাদের দেশে। অমনি এক এ'র দল মেয়েদের বাপের কাছে এমন পণ চেয়ে বোসবে যার সুদে স্ত্রীর হাত খরচ দেওয়া চলে, নিজের হাত খরচও চলে এবং বৈঠকখানা কিম্বা boudoir-ওয়ালা বাড়ী ভাড়াও দেওয়া যায়। তা ছাড়া সাজাবার খরচ ও বিলেত যাওয়ার খরচও আছে। সেই জন্য সমস্যাটুকু উল্লেখ কোরেই অতি সন্তর্পনে প্রবন্ধ শেষ কোরলাম।

কলসী কুটিলা গতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

মোচ্ছব
আহা মোচ্ছব
দেব মোচ্ছব আমি সত্যি
যদি পাকিস্থানের
দ্বার খুলে দেন
আয়ুব চক্রবর্ত্তী।
যদি ফিরে যায়
আহা ফিরে যায়
ঘরে ফিরে যায় উদবাস্তু।
ওহো তেরো বৎসর
আগে ছিল যথা
পুনরবার তথাস্তু।
ওঁ তথাস্তু।
ওঁ তথাস্তু।

("লোকাঘাটের জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক লিখিতেছেন—ইহা ছাড়া এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, অনেক লোক যে-কোনপ্রকারে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক আসামে প্রচার করিতেছে, আয়ুব খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন, পাকিস্তানের গেট খোলা হইয়াছে। আসাম হইতে বাঙালী আসিলেই তাহাদের আশ্রয় দেওয়া হইবে, খাদ্য দেওয়া হইবে।"

দৈনিক বসুমতী, ৬ই ভাদ্র ১৩৬৭)

পরিপার্শ্ব

বিমলচন্দ্র ঘোষ

উৎস মুখে নদী আর ফেরে না উর্বর উজ্জীবন
সতেজ হিরণ্যগর্ভ পলিতে অনন্ত সম্ভাবনা
কূলে কূলে রেখে যায়। সমষ্টি চেতন ব্যষ্টিমন
আলোয় ফসলে আনে ইতিহাসে প্রদীপ্ত ভাবনা।

দেশ-কাল-পরিপার্শ্ব সম্পৃক্ত মেধায় অনুক্ষণ
সমস্যার প্রতিভাসে উজ্জ্বল চৈতন্যে বীজবোনা
সাফল্যের কর্মভূমি কালোত্তীর্ণ আনে রূপায়ণ ;
অবিষ্ণু আত্মার রূপকল্পলোকে আমরা যাবো না।

আমরা যাবো না কূটচাতুর্যের আত্মঘাতী পথে
ঐশী কুয়াশায় ঘেরা নির্বোধের ব্যক্তিত্ব বিলাস
চেতনাকে অন্ধ করে বিপ্লব-বিরোধী মনোরথে
সমস্যা এড়াতে চায় পলায়নী প্রজ্ঞার অধ্যাস।

বস্তুনিষ্ঠ পথে তাই আমাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার
কালধর্মী পরিবেশে কালজয়ী কাব্যের ঝঙ্কার।

চিত্তচকোর

সুবোধ ঘোষ

মধুপুর থেকে চিঠি লিখেছে মীরা।—সেজদা, আমার এই চিঠি খুব মন দিয়ে পড়বে। যা লিখছি, সেটা খুব ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করবে। কারণ, আমি যা লিখছি, সেটা আমিও খুব ভাল করে বুঝে দেখেছি। বুঝেছি; এই একটা ভাল সুযোগ। এ সুযোগ যদি তুচ্ছ কর সেজদা, তবে খুবই ভুল করা হবে।

—জি, বি, কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নামে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর নামটা শুনেছো নিশ্চয়! এরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বড় বড় ব্রীজ তৈরী করবার কনট্রাক্ট নিয়ে থাকে। খবরের কাগজে সম্বলপুরের মস্ত বড় রেলওয়ে ব্রিজের ছবিটা দেখেছো নিশ্চয়! সেই ব্রীজ এই জি, বি, কনস্ট্রাকশনই তৈরী করেছে। তোমাদের টাউন থেকে সে নাইল দূরে লালকি নদীর উপরে যে নতুন ব্রিজ তৈরী হচ্ছে সেটাও এই জি, বি, কনস্ট্রাকশন শুনেছি ঐ ব্রীজ তৈরী করতে কোটি টাকা খরচ হবে। আমাদের মধুপুরের কাছেও ছোট ছোট কয়েকটা ব্রীজ তৈরী করছে ওরা, কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—ডি, পি, সি'র ইনস্পেকটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সৌরভ সরকার এখন মধুপুরেই আছে। কিন্তু আর বেশী দিন থাকবে না। বোধ হয় এক মাসের মধ্যেই চলে যাবে। এবার তার কাজ হলো তোমাদের ওদিকের লালকি নদীর ব্রিজের কাজের ইনস্পেকশন। বোধ হয় মাস তিন তোমাদেরই টাউনে থাকবে। তারপর আবার সম্বলপুরের দিকে চলে যাবে।

—সৌরভ সরকার ওরই এক মাসির ছেলে। তিন বছর মাসগোতে আর দু'বছর হাঙ্গেরিতে ছিল সৌরভ সরকার। ব্রিজ তৈরীর ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্পেশালে স্টাডি করে আর ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরেছে; আর এই বয়সেই জি, বি, সি'র মত বিখ্যাত কোম্পানীর ইনস্পেকটিং ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। মাইনে দেড় হাজার। বয়স অবশ্য ত্রিশের কম নয়; কিন্তু পঁয়ত্রিশের বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু তোমার অণিমার বয়সও যে ত্রিশের কাছে এসে ঠেকেছে।

—সৌরভ এখনও বিয়ে করেনি। কিন্তু কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারা যায়, বিয়ে করতে চায়। কাজেই বুঝতে পারছো তো, এখন তোমার আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। চেষ্টা করতে হবে। আমার খুব বিশ্বাস, একটু চেষ্টা করলেই সৌরভের সংগে অণিমার বিয়ে হয়ে যাবে।

—মেয়েকে বিয়ে পাশ করিয়েও তিন বছর ধরে শুধু ভাবছো অথচ কিছুই করতে পারছো না। কলকাতায় গিয়ে যদি কিছুদিন থাকতে পারতে, তবে কোন ভাল ছেলের খোঁজ হয় তো পেতে; কিন্তু সৌরভের মত ছেলের খোঁজ পেতে না। কলকাতার মত কমলিটিশনের জায়গায় ওরকমের ছেলে ধরবার সাধ্যিও তোমার নেই। অণিমার চেয়ে অনেক শিক্ষিতা আর অনেক সুন্দরী মেয়ে সেখানে থই-থই করছে।

—কাজেই, এই একটা সুযোগ। তুমি তোমার লেকেলে মতিগতি এখন একটু চাপা দিয়ে রাখ। যে কালে যেমন নিয়ম, সেই নিয়ম মেনেই চলতে হয়। তা না হলে ঠকতে হয়। অণিমার সংগে সৌরভের একটু আলাপ করিয়ে দেবে। সৌরভকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করবে। অণিমার চেহারাটা তো সুন্দর আছেই। আমার মনে হয়, সৌরভের কোন আপত্তি হবে না। ভগবানের ইচ্ছায় সৌরভের সংগে অণিমার বিয়েটা হয়েই যাবে বলে মনে হয়।

—আর একটা কথা। এটাও একটা সুযোগ। সৌরভের সংগে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ। টাউনের ভেতরে কিংবা বাইরে সৌরভের জন্যে একটা বাড়ি ঠিক করে রাখবে। মাস দুই-তিন থাকবে সৌরভ। ভাড়া তিনশো হোক বা চারশো হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সৌরভের ইচ্ছা, বাড়িটা যেন [illegible] হয়, একটা লন আর ফুলবাগান থাকে। চাকর-টাকরের ব্যবস্থা করতে হবে না। শুধু একটা মালী ঠিক করে রাখবে। সৌরভের কুক, বেয়ারা, চাপরাসী আর চাকর এখান থেকেই সৌরভের সংগে যাবে।

—চিঠিটা বউদিকেও ভাল করে পড়ে শুনিয়ে দিও। বউদি যেন আর এমন আশা না করেন যে, আজকালকার দিনে এমনিতেই ভাল পাত্র পাওয়া যাবে। মেয়েকে কারও সংগে মিশতে দেওয়া চলবে না, এরকম ধারণা যেন মন থেকে বিদায় করে দেন। ভয় পেয়ে তুকু-পুকু করলে চলবে না। সৌরভ যদি অণিমাকে সংগে নিয়ে একটু বেড়াতে চায়, তবু আপত্তি করবে না। এর মধ্যে অশোভন কিছু নেই।

নিবারণবাবু চিঠিটা মন দিয়ে পড়েই শোনালেন, আর আপনার মা সুহাসিনীও মন দিয়ে শুনলেন।

নিবারণবাবু বলেন—তুমি কি বল?

সুহাসিনী বলেন—আমি তো বলি, ভাল কথাই লিখেছে মীরা।

অণিমাও মধুপুরের মীরা পিসির একটা চিঠি পেয়েছে।

—তোমার বাবাকে লিখেছি, কিন্তু তোমাকেও লিখতে হচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছেয় সৌরভের মত ছেলের সংগে যদি তোমার বিয়ে হয়, তবে জানবে সেটা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর একটা সৌভাগ্য। কাজেই তোমাকেই একটু সাহস করতে হবে। মনে করো না, তোমাকে আমি বেহায়া হতে বলছি। ভদ্রলোকের ছেলের সংগে যেভাবে মিশতে হয়, সেভাবেই মিশবে। আজে বাজে কথা যেমন বলবে না, তেমনই আবার একেবারে বুড়ো ঠানদিদের মত ঠাণ্ডা কথা বলবে না। তুমি নিজেই সৌরভকে চা খেতে নেমন্তন্ন করবে। সৌরভ ফুল ভালবাসে। রোজ সকালে কিংবা সন্ধ্যায় তোমাদের বাগানের ফুল তোড়া করে বেঁধে সৌরভকে পাঠিয়ে দেবে। সৌরভ যদি কোন দিন বেড়াতে ডাকে, তবে নিশ্চয় যাবে। আমি গত বছর বহরমপুর থেকে যে বালুচর শাড়িটা পাঠিয়ে ছিলাম, সেটা মাঝে মাঝে পরবে। ওরকম কুঁজোটি হয়ে আর ভীতু-ভীতু চোখ করে

হাটবে না। সৌরভ যদি গান শুনতে চায় তবে শুনিয়ে দিও। মনে রেখ, তোমার ভাগ্য তোমার হাতে। ভগবানের ইচ্ছায় ভালই হবে বলে মনে হচ্ছে।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন—মীরা তোকেও একটা চিঠি দিয়েছে বোধহয় ?

অণিমা—হ্যাঁ।

সুহাসিনী—কি লিখেছে ?

অণিমা গম্ভীর হয়ে বলে—একগাদা ছাই পাঁশ লিখেছে।

সুহাসিনী—না, ছাই-পাঁশ নয়। যা লিখেছে ঠিকই লিখেছে। তোমার ভালর জন্যেই লিখেছে।

অণিমা গম্ভীর মুখটাকে আরও গম্ভীর করে নিয়ে বলে—আশ্চর্য।

সুহাসিনী—কিসের আশ্চর্য ?

অণিমা—তুমিও দেখছি একেবারে নতুন কথা বলছো।

সুহাসিনী—একালের যেমন নিয়ম, সেটা মানতেই হয়; তাছাড়া সৌরভের মত ছেলেকে পাওয়া আমাদের মত অবস্থার মানুষেরও যে একটা সৌভাগ্য।

হেসে ফেলে অণিমা—সৌভাগ্যটা বলে হয়।

সুহাসিনী—হবে না কেন ? সৌরভ যদি পছন্দ করে···।

অণিমা—কেন পছন্দ করবে ?

সুহাসিনী—সেই কথাই তো লিখেছে মীরা।

পারিস না কেন ?

অণিমা আবার গম্ভীর হয়ে যায়—বুঝতে পারছি না।

সুহাসিনীর মুখটাও যেন একটু করুণ হয়ে যায়। মীরার ইচ্ছা উপদেশ আর পরামর্শের কথাগুলিকে খুশি হয়ে মেনে নিতে সুহাসিনীরও মনের কোথায় যেন বাধছে। খুবই সুখের কথা হতো, যদি সৌরভ নিজেই এসে একবার অণিমাকে দেখতো আর পছন্দ করে ফেলতো। একটা অচেনা মানুষের চোখে পছন্দ ধরাবার জন্য মেয়েটা নিজেই দৌড়াদৌড়ি করবে, কালের নিয়ম হলেও ভাবতে ভাল লাগছে না।

তবে একথাও ঠিক, সৌরভের মত ছেলে নিবারণ বাবুর মত অবস্থার মানুষের আশার কাছে দুর্লভ উপহার। এককালে অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন সে অবস্থা আর নেই। শুধু মস্ত বড় এই বাড়িটা আছে; আর একটা গাদাগুচ্ছি আছে। মালার বাজারও আর সেরকম নয়। বছর দুই হলো গাড়িটাকে বেচে দিতে হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ করবার সামর্থ্য অবশ্য আছে; কিন্তু পাঁচ-সাত হাজারের খরচে যেসব ছেলে পাওয়া যায়, আর এ পর্যন্ত যেসব ছেলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তাদের একজনও গুণে ও সৌরবে সৌরভের ছায়ার কাছাকাছি দাঁড়াবারও যোগ্য নয়। তাই মীরার চিঠির পরামর্শটা মেনে নিতেই ইচ্ছে করছে।

[দুই]

সৌরভের জন্য বেশ ভাল একটা বাড়ি ঠিক করে ফেলতে দেরি করেননি নিবারণবাবু। টাউন থেকে সামান্য দূরে হিল কানারি যাবার রাস্তার উপরেই ইউকালিপটাসে ঘেরা একটি বাড়ি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন আছে। লনের দু'পাশে ফুলপাতের ঝিড় নিয়ে ছুটো ফোয়ার আছে। ফটকের থামের গায়ে আইভিলতা আর সারি সারি টবেতে গাজিপুরী গোলাপ। মালী বৃন্দাবন বাগান থেকে সব শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।

সৌরভ সরকারও এসে
চাপরাসি, বেয়ারা আর চাকর।

সৌরভ যেদিন এল সেদিন স্টেশনেই উপস্থিত ছিলেন নিবারণ বাবু। ট্রেণ থেকে নেমে সৌরভই নিবারণ বাবুর হাসিভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—আপনিই বোধহয় নিবারণবাবু !

—হ্যাঁ।

—বাড়িটা কোন্ দিকে ?

—এই যে মালী বৃন্দাবনও এসেছে। বৃন্দাবনই তোমাদের নিয়ে যাবে।

ছুটো ট্যাক্সি সৌরভ সরকারের সব জিনিসপত্র আর চাকরবাকরদের তুলে নিয়ে চলে গেল। আগে আগে একটা ট্যাক্সিতে চলে গেল সৌরভ সরকার আর মালী বৃন্দাবন।

সন্ধ্যা হবার একটু আগেই অণিমাকে সঙ্গে নিয়ে হিল রোডের বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ান নিবারণবাবু; তখন বাড়ির বারান্দায় একটি চেয়ারের উপর খোলা বই

পড়ছিল সৌরভের সরকারে। সত্যিই বড় চমৎকার চেহারা। পঁয়ত্রিশ বছর নয়, এ চেহারার বয়স [illegible] বেশি হতেই পারে না। সাদা ভিনের ট্রাউজার আর সাদা টুইলের সার্ট পরে; আর সাদা চামড়ার স্লিপার পায়ে দিয়ে চেয়ারের উপর বসে আছে একটি চমৎকার পরিচ্ছন্ন আর স্নিগ্ধ চেহারা। নিবারণবাবুর চোখ দুটোও যেন একটা স্নেহাক্ত আগ্রহে চঞ্চল হয়ে চিকচিক করতে থাকে।

অনিমাও বালুচর শাড়ি পরেছে। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়ে এই সামান্য আধমাইলের ছায়াময় রাস্তাটা হাঁটতেও যেন বারবার হোঁচট খেয়েছে। ভয়ানক অপ্রসন্ন দুটো চোখ বারবার যেন ভ্রূকুটি করে কুঁচকে গিয়েছে। দুঃসহ একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস বুকের ভিতরে একটা যন্ত্রণা ছড়িয়েছে। ছি-ছি; সৌরভ সরকার হলোই বা এতটা মস্ত গৌরব আর মস্ত সৌভাগ্য; কিন্তু অনিমার ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণটা যে এ ভাবে একটা কাঙাল লোভের মত এগিয়ে যেতে চাইছে না। একটুও ভাল লাগছে না।

নিবারণবাবু আর অনিমাকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সৌরভ। নিবারণবাবু হাসেন—আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসিনি। অনিমা কি বলবে তাই শুনে নাও।

—কে? সৌরভ যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে।

নিবারণবাবু বলেন—এই তো অনিমা, আমার মেয়ে।

অনিমা হাসে—বিরক্ত বোধ করলেও আপত্তি করতে পারবেন না। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে চা খাবেন।

সৌরভের বিস্ময়ের চোখ দুটো এবার যেন মুগ্ধ হয়ে হেসে ওঠে।—বিরক্ত বোধ করবো কেন? কখ্খনো না। আচ্ছা···নিশ্চয় যাব।

চলে যান নিবারণবাবু আর অনিমা। যে পথে দুঃসহ অস্বস্তির হোঁচট খেয়ে খেয়ে অনিমার প্রাণটা কোনমতে হেঁটে এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু অনিমার সেই অস্বস্তির ভার যেন লজ্জা পেয়ে এই রাস্তারই ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চোখের সেই অপ্রসন্ন ভ্রূকুটিই বা কোথায় গেল? বালুচর শাড়িটাকেও আর কাঙাল লোভের সাজ বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, শাড়িটাকে কি একাই হিলরোডের বাড়িতে গিয়ে তারই সঙ্গে বেড়াতে

[তিন]

হিল রোডের বাড়িতে ভুল পাঠাতে ভুল করেনি অনিমা। যাকে দেখবার জন্য মনটা সব সময় উৎসুক হয়ে থাকে, সেও হিলরোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে গালাকুটির মালিক নিবারণবাবুর টাউনের বাড়িতে আরও দুদিন চা খেয়ে চলে গিয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে যান নিবারণবাবু, আর বেশ খুশিই হয়েছেন সুহাসিনী, মুখচোরা মেয়ে অনিমা তিনদিনের চেনা সৌরভের সঙ্গে এক-এক সময় যেন মনে-মুখে কথা বলতে থাকে। সেই ভীতু-ভীতু অনিমা নয়, যেন একটা ব্যস্ত হাসির প্রতিমা ঘরের বাইরের বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা চলেছে যেন ছটফট করতে থাকে। আজ সারাদিনও আগেকার চেয়ে বেশি সময় পার হয়ে যায়, তবু অনিমার শাড়ি আর সাজ যেন অনিমার চোখের পছন্দ হয়ে উঠতে পারে না। এরই মধ্যে একদিন নিজেই চোখে দেখতে পেয়েছেন সুহাসিনী, চলে যাবার সময় ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সৌরভ যেন খুব আস্তে খুব ব্যাকুলতার একটা কথা বললো; তা না হলে কথাটা বলতে গিয়ে সৌরভের মুখটা ওরকম লাজুক হয়ে যাবে কেন? অনিমাও যেন চমকে উঠেছে। তার পরেই মাথা হেঁট করেছে। তারপরেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ করেছে। মেয়েটার সারা মুখটাও যে লালচে হয়ে উঠেছে।

না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারেননি সুহাসিনী—সৌরভ কিছু বলে গেল নাকি?

অনিমা—হ্যাঁ।

—কি বললে?

—আজ সন্ধ্যেবেলা সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলছে।

—যা তবে।

—যাব।

সন্ধ্যা হবার আগেই বের হয়ে যায় অনিমা। আজ

নেয় হতে হবে, যা চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বাকি নেই অনিমার, শুধু আজকের তাকে এই আহ্বান নয়, চিরকালের জন্য। মীরা সিনিমা যেন মিছিমিছি একটা ভয় দেখিয়েছিলেন; যেন একটা তপস্যার জন্য অনিমাকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। কিছু নয়; মুখ খুলে বোঝার মত স্পষ্ট করে একটা কথাও বলতে হয়নি। স্নিগ্ধ হাসির মানুষটার নিবেদনে চোখ দুটো বার বার পিপাসিতের মত অনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কত স্পষ্ট করে সবই বুঝিয়ে দিয়েছে, অনিমার আশার মনটাকে ধন্য করে দিয়েছে।

হিলরোডেরই উপর একটা দেবদারুর ছায়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই অভ্যর্থনা, সেই সাদা ফিনের ট্রাউজার আর টুইলের শার্ট। পায়ে সাদা চামড়ার শু। চোখ দুটো কালো নয়, কেমন যেন নীলাভ আর নিবিড়। এক এক সময় মনে হয়, সে চোখে যেন নীল আকাশের ছায়া হাসছে।

অনিমা হাসে—মনে হচ্ছে, কিছু সন্দেহ করে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

—কিসের সন্দেহ?

—মনে করেছিলেন বোধ হয়, আমি আসবোই না।

—তা একবার মনে হয়েছিল ঠিকই।

—কেন?

—এখানে এসে এই তিনদিনের মধ্যেই এত বড় একটা উপহার পেয়ে যাব, এটা যে বিশ্বাস করতে সাহসই হয়নি, অনিমা। কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে আমার মত মানুষের একটা অনুরোধের কথা শুনে···।

—ওকথা বলো না।

—কেন?

—তোমার মত মানুষ আমাকে ডাকতে পারে, একথা যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে সাহস পাই নি।

হিলরোড ধরে আনেকদূর এগিয়ে যায় অনিমা আর অনিমার ভালবাসার চৌরঙ্গ। রোডটা যেখানে খুব বেশি নিরিবিলি, সেখানে দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতেও ভুলে যায় না। মাঝে মাঝে অনিমার গলার উজ্জ্বল হাসির শব্দ শুনে সড়কের পাশের ঝরোয়ার গাছের শালিক ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যায়।

হিলরোড ধরে ফেরবার পথটাও আবছায়ায় ঢাকা পড়ে যেন কল্পলোকের একটা দুরন্তের পথ হয়ে যায়। সত্যিই তো, কোনদিন কল্পনাতেও অনুভব করতে পারেনি অনিমা, মনের মত সঙ্গীর হাত ধরে পথ চলতে প্রাণটা এমন বিহ্বল হয়ে যায়।

—চল তোমাকে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি অনিমা।

অনিমা হাসে—এখনই পৌঁছে দেবে?

—ইচ্ছে তো করে না; কিন্তু আজ আর উপায় নেই।

—কেন?

—এখনই একবার স্টেশনে যাব।

—কেন?

—সাহেব আসবেন খোঁজ নিয়ে।

—কোথাকার সাহেব?

—ইন্ডিনিয়ার সরকার সাহেব।

—সরকার সাহেব কে?

—সৌম্যেন সরকার। তোমার মধুপুরের পিসিমাদেরই তো কি-রকমের যেন আত্মীয় হন।

অনিমার বুকের ভিতর থেকে দুঃসহ একটা আর্তনাদ যেন গুমরে ওঠে।—কি বললে? কি? কি বললে তুমি।

—কি বলেছি?

—তুমি কে? তাই বল।

—আমি হলাম আমি।

—কে তুমি? চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে অনিমা।

—আমি তো সরকার সাহেবের স্টেনোটাইপিস্ট ক্লার্ক।

—তোমার নাম কি?

—তাও জানো না?

—না।

—এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।

—যতই আশ্চর্যের কথা হোক্, বল, বলে ফেল, তাড়াতাড়ি বলে দাও।

—আমি বিনয় দত্ত।

—তুমি তাহলে সরকার সাহেব আসবার আগেই···।

—হ্যাঁ, সে তো আগেই আসে; তারপর সাহেব। ···কিন্তু··· আমি যে ব্যাপারটা এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অনিমা।

—কি বুঝেছ ?

—তুমি ভুল করে আমাকেই সরকার সাহেব মনে করে ...আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি অণিমা। তুমি সব ভুলে যাও। তোমার বাবাকে বলো তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

হিলরোডের সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অণিমা যেন অদৃষ্টের একটা বিদ্রূপের করুণ ভাষার আক্ষেপ শুনছে। স্টেনো-টাইপিস্ট বিনয় দত্তের গলার স্বর যেন আবার ভয় পেয়ে ছটফটিয়ে ওঠে,—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সরকার সাহেব এলেই তাঁর কাছ থেকে যে-ভাবেই হোক্ ছুটি আদায় করে আমি দু'দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব।

অণিমা বলে—আপনি এখন যান। শিগগির চলে যান।

স্টেশনের দিকে চলে যায় বিনয়; আর অণিমা তার শালুচরের শাড়ির আঁচলটাকে দাঁতে চেপে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায়।

[চার]

সকাল বেলা একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে থাকে অণিমা। মধুপুরের মীরা পিসিমা লিখেছেন চিঠিটা। খামের চিঠি নয়, একটা পোস্টকার্ড। অণিমার কাছে নয়, নিবারণবাবুর কাছেই এই চিঠি দিয়েছেন মীরা।—সৌরভ কলকাতা গিয়েছে। বোধ হয় দিন সাত পরেই তোমাদের ওখানে পৌঁছে যাবে। সৌরভের স্টেনো ক্লার্ক বিনয়কে বলে দিও, যেন স্টেশনে উপস্থিত থাকে।

সুহাসিনী বলেন—কার চিঠি পড়ে এত হাসছিস ?

অণিমা—মীরা পিসিমার চিঠি।

—কি লিখেছে মীরা ?

—লিখেছেন, সৌরভ সরকার এখন কলকাতায় আছেন।

—তার মানে ?

—তার মানে সৌরভ সরকার এখনো এখানে আসেননি।

—কি বলছিস পাগলের মত ?

—পাগলের মত নয়; পাগল হয়েই বলছি।

নিবারণবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন। আর অণিমার মুখটার দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকেন।—কি হলো ?

অণিমা—সৌরভ সরকারের স্টেনো তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

—কে বিনয় দত্ত ?

—ঐ যে, যাকে সৌরভ সরকার বলে মনে করা হয়েছে, যাকে তিন দিন নেমন্তন্ন করে চা খাওয়ানো হলো।

নিবারণবাবু আর সুহাসিনী, যেন আর্তনাদ করবারও শক্তি হারিয়েছেন। যেন একটা হিংস্র কৌতুকের আক্রমণে আহত দুটো অসহায় অদৃষ্ট; মাথা হেঁট করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুহাসিনী আর নিবারণবাবু।

নিবারণবাবুর চোখ দুটো ভিজে গিয়ে আরও করুণ হয়ে ওঠে; আর সুহাসিনীর চোখ দুটো জলে ভেসে যায়।

কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অণিমা—আমাকে এখনই একবার বের হতে হচ্ছে।

নিবারণবাবু আর সুহাসিনী, দু'জনেই মুখ তুলে তাকান। সত্যিই যে বেশ সুন্দর করে সেজেছে অণিমা। সত্যিই বাইরে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাবে ? ওরকম অদ্ভুত ভাবে হাসছেই বা কেন ?

সুহাসিনী—কোথায় যাবি ?

অণিমা—যার কাছে জোর করে পাঠাতে চেয়েছিল, তার কাছে।

—তার মানে ?

—দেখে আসি, সৌরভ সরকার এসেছেন কিনা। বোধ হয় এসেছেন।

—না, এখনই যেয়ে কাজ নেই।

—এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

—মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করে যত আবোল তাবোল কথা বলে ফেলবে।

—কিছুতে ভুল হবে না, কোন আবোল-তাবোল কথা বলবো না। মীরা পিসিমা যা বলে দিয়েছেন, ঠিক তাই বলবো।

সুহাসিনী আর নিবারণবাবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপলক চোখ তুলে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন কালের নিয়মের আর একটা বিস্ময়কে

দেখছেন। নিয়মটা সত্যিই যে একটা প্রজাপতি। এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছে, এতক্ষণ কোথায় ছিল আর কোন্ বনের ফুলের পরাগ পাখায় মেখেছিল। অণিমার হাসিটাও যেন একটা নতুন ব্যস্ততা। কালকের সন্ধ্যা-বেলার হাসিটাকে আর সেই হাসির মনটাকেও বোধ হয় তুচ্ছ অকেজো ধূলোর মত একেবারে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে অণিমা।

সুহাসিনী আর নিবারণবাবুর চোখে একটা আতঙ্কও যেন থমকে রয়েছে। মেয়েটার ভাগ্যটা নতুন আশা নিয়ে আবার একটা নতুন বিদ্রূপের কাছে যাচ্ছে না তো?

অণিমা বলে—তোমরা খুবই ভাবছো বলে মনে হচ্ছে।

সুহাসিনী—নিশ্চিন্তি হতে পারছি না।

অণিমা—কেন?

সুহাসিনী—সত্যি করে বল্, সৌরভেরই সংগে দেখা করতে যাচ্ছিস তো?

অণিমা হাসে—সত্যি সত্যি সত্যি।

নিবারণবাবু কোন কথা না বলে আবার ঘরের ভেতরে চলে যান। সুহাসিনী বলেন—সৌরভকে কি বলবি?

অণিমা—যা বলা উচিত, যা বলে দিয়েছেন মীরা পিসি, তাই বলবো। চা খেতে নেমন্তন্ন করবো।

সুহাসিনী যেন কুণ্ঠিত ভাবে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন,—আর তবে।

[পাঁচ]

লনের ঘাসের উপরে বেতের চেয়ারে বসে আছেন সৌরভ সরকার। বেশ দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ; বেশ হাসি-হাসি মুখ। গলা থেকে খুলে নেওয়া টাইটাকে কাঁধের উপর ফেলে রেখেছেন। দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে এক মনে খবর-কাগজ পড়ছেন।

ফটকের থামের গায়ে আইভিলতা দুলছে। একবার থমকে দাঁড়ায় অণিমা। যেন একটা মূর্চ্ছার ঘোর হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে; তাই হঠাৎ চমকে উঠেছে অণিমা। কেন? কিসের ভয়? কোথায়? কার কাছে হেরে এসেছে অণিমার উদ্‌ভ্রান্ত ইচ্ছাটা? সত্যিই কি সৌরভ সরকারেরই কাছে কোন আশা নিয়ে আর অন্য এক লোভের অভিসারের মাঝিকা হয়ে এখানে এসেছে, অণিমা? কিংবা, সৌরভ সরকারের সংগে দেখা করবার ছুতো করে আর কাউকে দেখতে এসেছে?

না, চলে যায়নি। ঐ যে, এখনও ঐ বারান্দার উপরে একটা টেবিলের কাছে বসে আছে সেই ক্ষমা-চাওয়া আর আতঙ্কিত আত্মাটা; হাতের পাশে এক গাদা কাগজের ফাইল। ছোট টাইপরাইটার মেসিনটাকে প্রায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে আর মাথা নুঁইয়ে ব্যস্ত ভাবে টাইপ করছে। ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্, শব্দ করে বাজছে টাইপ-রাইটার। যেন বিনয় দত্ত নামে নিতান্ত একটা কাজের মানুষের পাঞ্জরা শব্দ করে বাজছে। ঐ মানুষ আর কালকের সেই মানুষ নয়।

মুখ তুলে একবার তাকিয়েছে বিনয় দত্ত; কিন্তু চোখের ঐ শান্ত উদাস ভাবটা দেখে মনে হয়, অণিমাকে জীবনে কোন দিন দেখেনি বিনয় দত্ত। অণিমার চোখে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।

—আসুন! ডাক দিয়েছে সৌরভ সরকার। চমকে ওঠে অণিমার আনমনা কৌতূহলের চোখ দুটো। বুঝতেই পারেনি অণিমা, বারান্দার ঘড়ির তাকাতে তাকাতে কখন সৌরভ সরকারের এত কাছে চলে এসেছে অণিমার চাহনিটা।

এইবার যেন অণিমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে একটা প্রশ্ন চিৎকার করে ওঠে, কেন এসেছো? সৌরভ সরকার তো বেশ হেসে হেসে আর বেশ ভদ্রতা-ভদ্র ভঙ্গীতে ডাক দিয়েছে। কিন্তু অণিমার অন্তরাত্মা তবে এমন অপ্রস্তুত হয়ে যায় কেন?

এমন আহ্বান শুনতে পাবে বলে বোধ হয় কল্পনা করতে পারেনি অণিমা। যেন বাবা মা আর মীরা পিসিমাকে একটা বাজে স্বপ্নের ভুল ধরিয়ে দেবার জেদ নিয়ে এখানে এসেছে অণিমা। যেন একটা পরীক্ষাকে একটু পরীক্ষা করে চলে যেতে হবে। সৌরভ সরকারকে একবার চা খেতে নেমন্তন্ন করতে হবে। তার পর বাবা আর মা দেখতেই পাবেন, আর মীরা পিসিও চিঠি পেয়ে জানতে পারবেন, সৌরভ সরকার নিবারণবাবুর বাড়ির চায়ের নেমন্তন্ন শুনে মনে মনে হেসেছে; যেতে ভুলেও গিয়েছে; ষেড় হাজার টাকা মাইনের মানুষ এক ধেড়ে গোছের গালা মার্চেন্ট নিবারণবাবুর মেয়েকে একটু করুণার চক্ষেও দেখবার সময় পায়নি।

ঠিকই, অণিমার মুখের সেই ব্যস্ততার ভাবটাকে ঠিক বুঝতে পারেননি নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। সৌরভ সরকারের মত সৌরভকে তপস্যা করানোর যে নিবারণবাবুর মত মানুষের মেয়ের কোন লাভ হবে না, এই সহজ সরল সত্যটাকে পৃথিবীকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই অণিমা যেন দুঃসাহস করে একটা ভুয়া অভিসারে এখানে এসেছে।

সৌরভ হাসে।—বসুন আপনি। আপনাকে আপনার পরিচয় আর বলতে হবে না আমি জানি কে আপনি। মীরা বউদি আপনাদের কথা আমাকে আগেই বলে রেখেছেন।

হাসতে চেষ্টা করে অণিমা; কিন্তু হাসিটা যেন একটা এলোমেলো করুণ হাসি। সে করুণ হাসি আরও এলোমেলো হয়ে যায়; যখন সৌরভ সরকারের চোখ দুটো বেশ নিবিড় হয়ে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সৌরভ বলে—আপনি এসেছেন, খুবই ভাল লাগছে।

ভুলেই গিয়েছে অণিমা; তাই প্রাণপণে স্মরণ করতে চেষ্টা করে; যেন বলবার ছিল? কি-যেন বলবার জন্যে এখানে এসেছে অণিমা? কি-যেন লিখেছিলেন মীরা বিবিমা!

সৌরভ সরকারই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে খুশির স্বরে হাসতে থাকে।—চলুন, আপনাকে বাবা আর মা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।

অণিমা বলে—বাবা আর মা দু'জনেই বলে দিয়েছেন···।

—কি?

—আপনি আজ আমাদের বাড়িতে চা খাবেন।

—তবে আর দেরি করি কেন?

কাঁধের
পকেটে পুরে
—চলুন।

ফটকের থামের গায়ে জড়ানো আইভিলতায়ে যেন ঝড়ো হাওয়ার টান লেগেছে। পাতাগুলি যেন ছিঁড়ে পড়বে কিংবা উড়ে যেতে চায়। ভয়ানক দুলছে, ভয়ানক কাঁপছে। মনে হয় অণিমার, যেন সৌরভ সরকারের উচ্ছল খুশির বাতাসটাই ঝড় হয়ে উঠেছে। ফটকটা পার হবার সময় সৌরভ সরকার যেন নিজেরই মনের খুশির আবেগে বলে ওঠে।—ভালই হলো; তিন চারটে দিন তেমন কোন কাজও নেই। খুব কুঁড়েমি করে নেওয়া যাবে; নয়তো আপনাদের বাড়ির চায়ের আসরে বসে···অবশ্য আপনি যদি বলেন, তবেই যাব।

—কি বললেন?

—আপনি যদি বলেন, তবে যাব।

—যাবেন বইকি। হোকই যাবেন।

—হোকই সম্ভব হবে না অণিমা। আমার স্টেনো ক্লার্ক বিনয় ছুটি নিয়ে আজই সন্ধ্যার ট্রেণে চলে যাচ্ছে। তাই, তিন-চারটে দিন, তার মানে নতুন ক্লার্ক না আসা পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিতে পারা যাবে।···কি হলো?

রাস্তার পাশের একটা গাছের গায়ে হাত দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অণিমা। যেন মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল, টলে উঠছিল পা দুটো; আর চোখে কিছু দেখতেও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বিবশ শরীরটাকে সামলাবার জন্য গাছের গায়ে হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে অণিমা।

আস্তে বলে—না, কিছু নয়।

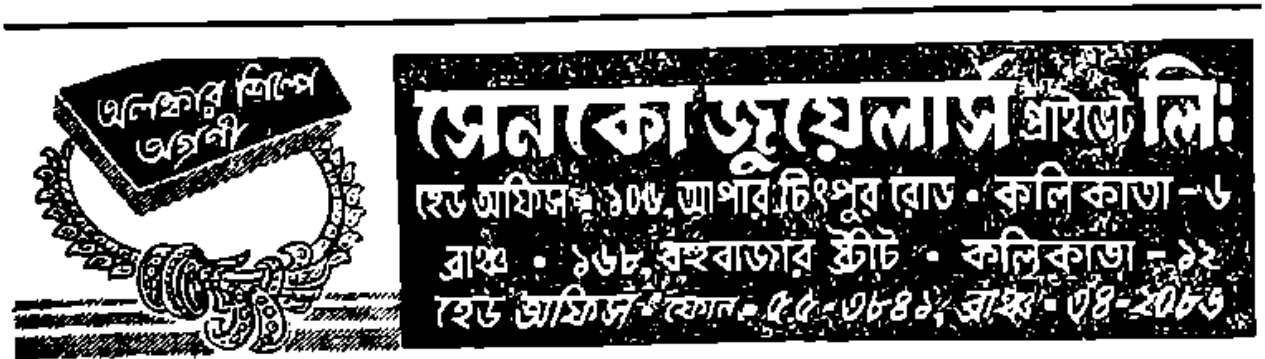

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকায় অনিমা; যেন পিছন থেকে কেউ অনিমার বাসুচর শাড়ির আঁচলটাকে ধরে হাঁচকা টান দিয়েছে। দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দার উপরে একেবারে শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিনয়ভূষণ। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। যেন সত্যিকারের একটা সুহৃদের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে।

[ছয়]

সুহাসিনী বলেন—সৌরভ যা বলে গেল, তাতে তো এই ধারণাই করতে হয় যে, সৌরভের আপত্তি নেই।

নিবারণবাবু—আমার ধারণাও তাই। আর কত স্পষ্ট করে বলবে?

আস্তে আস্তে নয়; বেশ জোরে, যেন কাউকে শোনাবার জন্যই কথাগুলি বলছেন নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। ঘরের ভিতরে বসে অনিমাও শুনতে পায়। শুনেও অনিমার চোখে-মুখে কোন কৌতূহল চঞ্চল হয়ে ওঠে না। কারণ অনিমাতেও যে তাই ধারণা।

চা খেয়ে আর অনেকক্ষণ বসে নিবারণবাবু আর সুহাসিনীর সঙ্গে অনেক গল্প করেছে সৌরভ। যাবার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর বেশ স্নিগ্ধস্বরে অনিমাকে যে কথাটা বলেছে সৌরভ, সেকথা সুহাসিনী আর নিবারণবাবু ঘরের ভিতরে বসেই শুনতে পেয়েছেন।

—মীরা বউদি আমাকে একটা কথা বলছিলেন, অনিমা।...কিন্তু থাক্, আজ আর বলতে চাই না। এত তাড়াতাড়ি বলে ফেলা বোধহয় উচিত নয়।

চলে যায় সৌরভ। আর অনিমা সেই যে ছটফটিয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতরে বসেছে, তারপর এতক্ষণের মধ্যে একবারও বাইরে আসেনি, একটা কথাও বলেনি।

ইণ্ডিয়ান্স
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা
৩৪৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা
ফোন-নং ২৩৩৩ • টেলিগ্রাম-"SONIVAS"

কিন্তু চমকে ওঠেন নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। ঘর থেকে বের হয়েছে অনিমা; আ কি আশ্চর্য, যেন বাইরে যাবার জন্যই সেজেছে। আজই এই সন্ধ্যায় আবার কোথায় যাবার জন্যে মেয়ের মন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো? এ কি? কাঁদে কেন মেয়েটা?

—কি হলো? চেঁচিয়ে ওঠেন সুহাসিনী।

—আমি যাচ্ছি।

—কোথায়?

—স্টেশনে।

—স্টেশনে কেন?

—বিনয় বোধহয় সন্ধ্যার ট্রেনেই চলে যাবে।

—চলে যাক্ না বিনয়।

—যাবে কেন?

—বিনয়ের ইচ্ছা বিনয় চলে যাবে। বিনয়ের কাছে তোর কিসের কাজ?

—কাজ আছে বইকি। তা না হলে যাব কেন?

—কি কাজ?

—ডেকে নিয়ে আসি।

—কেন?

—যাবার আগে এ বাড়ির চা খেয়ে যাক্।

—বিনয় আবার এখানে এসে চা খাবে কেন?

—তোমাদের মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে হবে বলে।

—কে বললে?

—আমি বলছি।

নিবারণবাবুর মুখের দিকে তাকান সুহাসিনী। তার পর দুজনেই একসঙ্গে অনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চাইছে অনিমা? আজকের সকাল বেলার হাসিটাই মিথ্যে; আর এই সন্ধ্যার কান্নাটাই তাহলে সত্যি?

নিবারণবাবু বলেন—আমার আর কিছু বলবার নেই।

সুহাসিনী বলেন—আমি ভাবছি, মীরাকে আমি তবে বোঝাবো কি বলে?

হেসে ফেলে অনিমা—একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে ভগবানের ইচ্ছেয় যা হবার ছিল, তাই হলো।

সায়েবের কুকুর

দায়ভাগ

প্রবোধকুমার সান্যাল

ব্যাপারটা সামান্যই। প্রতিদিনের এবং প্রায় প্রতি পরিবারের প্রাত্যহিক ঘটনারই একটি অঙ্গবিশেষ। এ নিয়ে কেউ মুখ ফিরিয়ে হয়ত একবার তাকায়, আর নয়ত কেউ এটা মনেও রাখে না।

গণপতি নিজেও বোধহয় ভ্রূক্ষেপ করেননি। দলিলপত্র নিয়ে মক্কেলদের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ভিতর মহলে, মিলুর মা বাজার-হাট এনে বোধ করি ঠাকুরকে রান্না-বান্নার ফর্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এবার বাইরের দিকে ভিখারী মেয়েটার এক মেয়ে কবানি শুনে হঠাৎ সে বেরিয়ে এসে ঝাঁঝিয়ে উঠল, ভিখিরির মরণ! তখন যে বলে গেলুম হাত জোড়া,—অন্য বাড়ি দেখো? ঘ্যান ঘ্যান করছিস সেই থেকে কেন লা? জোয়ান মেয়ে ত দেখছি, গতর খাটিয়ে খেতে পারিসনে? ভিক্ষের ভাত বড় সস্তা, কেমন? যাও, বেরোও বাড়ি থেকে।

মেয়েটা এরই মধ্যে কাঁকালের বাচ্চাটাকে নামিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছিল। মিলুর মা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দুজন মক্কেল ভদ্রলোককে বেরিয়ে আসতে দেখে আবার ভিতরে গেল। বাবুর মেজাজ নিয়ে ভয় ছিল।

একে একে মক্কেলরা বিদায় নেবার পর এক সময় গণপতিবাবু বেরিয়ে এলেন। উগ্র এবং উত্তেজিত কণ্ঠে ভিখারী তাড়ানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গণপতিবাবু এর ব্যতিক্রম নন্। বরং এ সম্পর্কে তিনি অধিকতর গরমপন্থী। আশ্চর্য, কলকাতায় প্রতিদিন যেন ওদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ওদেরকে দল বেঁধে ঘুরতে দেখলেই ওঁর মাথায় খুন চাপে। তাঁর এই হিংস্রতা কার ওপর বলা কঠিন। ওরা যখন আসে, পাড়ার পর পাড়া ছেয়ে ফেলে, তখন ওদেরকে দেখলে ভয় করে। মেয়ে আর শিশুর দলই বেশি। পরণে ময়লা কানি, অনাবৃত বুক, কাঁকালে বাচ্চা, হাতে টিনের কৌটো, মাথায় বা কারো ছোটখাট পুঁটলি। ওদেরকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে শুধু যে দুর্ভাবনা আসে তাই নয়, ভবিষ্যৎকালের দিকে মুখ ফেরালে ভয়ও করে। গণপতির মন বিদ্বেষ ও ঘৃণায় ভরে ওঠে।

মক্কেলরা এখন আর কেউ নেই। এবার গণপতিবাবু দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলেন, তোমাদের ওষুধ কি জান?

একখানা চ্যালাকাঠ, বুঝেছ? যাও, ওঠো বলছি ওখান থেকে? বলি, শুনতে পাচ্ছ? পরের ঘর থেকে লুটপাট করতে এসেছ,—কেন, সত্তর খাটতে পার না? দেশের চারদিকে এত কাজ, এত লোক মজুরি খাটছে,—কাজ খুঁজে পাওনা কেন?

মেয়েছেলেটা বোধ হয় কাঁদছিল। এবার ক্ষীণকণ্ঠে বলল, দুদিন কিছু খাইনি বাবা—বাচ্চাটা নেতিয়ে পড়েছে—

খামো!—গণপতিবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, রাগো বুলি আর গেয়োনা। ওঠো ওখান থেকে। আপিস-ইস্কুলের সময় দরজায় অযাত্রা বসল! যাও, বেরোও বলছি? দরকারের সময় একটা ঝি খুঁজে পাওয়া যায় না আজকাল! বলি, ও মিলু মা, কোথা গেলে? তাড়াও ত ছুঁড়িটাকে দরজা থেকে?

গণপতিবাবু বিরক্ত হয়ে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে নিজেই ভিতরে চলে গেলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনে কোন আপোস-রফা নেই। তাঁর দৃষ্টি অতি স্পষ্ট, তাঁর সিদ্ধান্ত অতিশয় বৈপ্লবিক, নির্মমতাটা সুতীক্ষ্ণ। অর্থনীতির দিক থেকে এরা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় জনতা, এদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তাঁর কাম্য।

কিন্তু এই অপরিহার্য প্রাত্যহিক ঘটনা ভুলতে তাঁর দুই মিনিটও সময় লাগে না। ভিতরে গিয়ে দলিলের গোছাটা একত্র করে তিনি তাঁর পোর্টফোলিওতে তুললেন। চাবিটি ঘুরিয়ে তিনি টেবিলের টানা বন্ধ করলেন। অন্যান্য চিঠি ও কাগজপত্র গুছিয়ে রাখলেন। টেলিফোনের ডায়ল্ ঘুরিয়ে কার সঙ্গে কি যেন কথা বললেন কতক্ষণ।

রাজমিস্ত্রিরা পিছন দরজায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিল। গণপতিবাবু তাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন তখনকার মতো। ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনি কোর্টে যাবার আয়োজন করছিলেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ গুছিয়ে দেবার লোক ছিল না কাছাকাছি। গণপতিবাবু নিজেই আলমারি খুলে তাঁর দরকার মতো সাজ-গাছ করে নিলেন। ওরই মধ্যে ছুঁচ-সুতো বার করে জামাটার বোতাম সেলাই করতে বসলেন। চাকরটাকে দিয়ে আজকাল কিছু হবার যো নেই। নিবিয়ে আর ছুটলে কেউ কাজ করতে চায় না আজকাল।

বাইরে কে যেন কড়া নাড়ছিল। গণপতিবাবু নিজেই এসে দরজা খুললেন। বললেন, এই যে নিখিলবাবু, আপনার জন্যেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছিলাম। টাকাকড়ি এনেছেন?

সবিনয়ে নিখিলবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, এনেছি বৈকি। সেইজন্যেই ত এলুম। ভাবলুম যা পারি আজ কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে যাই। আপনার টাকার দরকার বৈ কি।

ভস করে চটে উঠলেন গণপতিবাবু,—শুনুন, কিন্তু আপনার এ কথার মানে কি? কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কেন বলছেন? সব টাকাই ত আজ দেবার কথা আপনার!

আজ্ঞে হ্যাঁ, একলোবার। দশটার মধ্যে শোধ করব,—এই কথাই ত ছিল!—নিখিলবাবু বললেন, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই দুশো বাইশ টাকা হল, আটটি আর জুটল না, চাটুয্যে মশাই।

উত্তেজনায় গণপতিবাবুর কণ্ঠে কিছু সংযম এল। তিনি রগচটা, সেজন্য তাঁর কিছুমাত্র লজ্জা নেই। বললেন, দেখুন নিখিলবাবু, এক মাঘে শীত পালায় না। এসব আমার হকের টাকা, পাওনা টাকা। সেদিন কোর্টে হিসেবের সময় আমার মুহুরির মাইনে পাঁচ টাকা আপনার ছেড়ে দিয়েছি। আজ তাগ্ বুঝে আবার আটটি টাকা উড়িয়ে দিচ্ছেন। মনে রাখবেন অধিকে ঘোষের সেই মামলায় আপনার মেজ ছেলেটি আসামী! ও মামলায় আর কেউ নাক গলবে না।

ইঙ্গিতটি বুঝে নিতে নিখিলবাবুর এক পলকও সময় লাগল না, তিনি সন্তর্পণে-সঙ্কোচে পকেট থেকে পুনরায় আটটি টাকা বার করে সামনে রেখে বললেন, বাজার করতে বেরিয়েছিলুম!—যাকগে, আপনার টাকাটা সম্পূর্ণ শোধ করেই যাই। আসছে মঙ্গলবার তাহলে দশটায় সময় আমি কোর্টে থাকব আপনার মুহুরির খানে।

নিখিলবাবু উঠে বেরিয়ে যাবার সময় নমস্কার জানিয়ে গেলেন।

গণপতিবাবু শুধু মুখের একটা আওয়াজ করলেন মাত্র। অর্থাৎ লোকটা ঠকাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল

না। অতঃপর তিনি বিশেষ যত্নসহকারে দুইশত ত্রিশ টাকা গুণে নিলেন। নিজে তিনি জানেন, তাঁর নাম ডাকও যেমন প্রচুর উপার্জনও তেমন কম নয়।

বস্তাটা মালেলা তাঁর অনেক। সবগুলি মেরে হস্তদন্ত হয়ে তিনি স্নান করতে গেলেন। স্নান সেরে যখন খেতে বসলেন তখন দেখতে দেখতে বৃষ্টি এল। কিন্তু সময় কম। কোনমতে নাকে মুখে গুঁজে তিনি যখন হাত মুখ ধুয়ে পোশাক চড়াচ্ছিলেন তখন দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন মিলুর মা।

আঃ তাড়াতাড়ির সময় তোমার আবার কি নতুন ফরমাস? বলো, তুমি,—আর সময় নেই।

মিলুর মা সবিনয়ে বলল, বাবা, আজ রবিবার, আপনার ছুটি!

অ্যাঁ?—গণপতিবাবু ঘনঘিয়ে গেলেন,—রবিবার! তাইত, আগে আমাকে বলনি কেন? বলি, ঘণ্টাখানেক আগে থেকে ত কথাটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারতে? যত সব—

বাকি শব্দটি শেষ না ক'রেই তিনি জামাটা রাগের মাথায় খুলে ছুঁড়ে ফেললেন একদিকে। পরে বললেন, ওই শোনো গে, আবার কোন্ ভিখির কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিল দরজায়। আর আমি পারিনে। রবিবার না হলেই ভাল হত। তোমরা ত কেউ কোনও কাজের নও। ঠাকুর-চাকর-ঝি-ড্রাইভার,—সবই ফক্কিকারী। দেখছি সারাদিন ব'সে ব'সে আমাকেই ভিখিরি তাড়াতে হবে। বীরু হারামজাদা কোথায় গেল? এ সব কাজ-গুলো করে কে? ওকে ডেকেই বলো না গলাধাক্কা দিয়ে ভিখিরি তাড়াতে?

বাইরে থেকে খোনা গলায় আবার ভিখারীর গলার স্বর শোনা গেল।

বৃষ্টি তখন মুষলধারায় আরম্ভ হয়েছে।

জামাকাপড় ছেড়ে তিনি বোধ করি এবার নিজেই গিয়ে গলাধাক্কা দেবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু দরজা থেকে বেরিয়ে দেখলেন, সেই জোয়ান মেয়েটাই তার বাচ্চাটাকে নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রয়েছে। এত বৃষ্টিতে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। উলঙ্গ বাচ্চাটা অকাতরে বৃষ্টিতে ভিজছে। মেয়েটা যায়নি, চোখের জল নিয়ে একগুঁয়ে হয়ে বসেছিল। অসীম ধৈর্য নিয়ে সে স্থির হয়ে রয়েছে।

মেয়েটা বোধ করি দুদিন ধরে উপবাসী ছিল ব'লেই গণপতি বাবুর পেটের ভিতরকার ভালভাতগুলো হঠাৎ একবারটি যেন ঘুলিয়ে উঠল। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, তোমাকে যে তখন দশবার বললুম চলে যেতে। এ তোমার কেমন ধারা আক্কেল, বাছা? মাথে-ঝিয়ে বসে ঝড় বৃষ্টিতে ভিজছ,—এদব গেরস্থকে জব্দ করা বৈত' আর কিছু নয়। রেশনের যুগে ভিক্ষে দিচ্ছে কে তোমাদের? চা'লের দাম কত তা জান কি? যাই, মিলুর মা কোথা গেলে? ওই নাও, শোনো, মেয়েছেলেটা কি বলে! দেখো দেখি সমানে বৃষ্টিতে ভিজছে! বাচ্চাটা যে ভিজে ভিজে মরবে। যা হয় করোগে—

বিরক্ত হয়ে গণপতিবাবু ভিতরে চলে গেলেন, এবং ভিতর থেকেই গলা উঁচিয়ে বললেন, সাধে কি বলি খুন চাপে আমার মাথায়। না খেয়ে মরতে বসেছে চোখের ওপর। ভাত দেলুম, না ছাই দেলুম। ঝমঝম করছে বৃষ্টি.....

মিলুর মা ফিরে এসে বলল, বাবা, আপনি ওকে খেতে দেবেন, কথা দিয়েছেন?

আমি! —গণপতিবাবু অবাক,—কে বললে আমি খেতে দেবো? এই ঠাকুর, যাও ত, গর্দান্ ধাক্কিয়ে উদকো নিকাল্ দেও। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই যাচ্ছি, —মিলুর মা, বঁটিখানা বার ক'রে দাও ত?

দেবরায় তাঁর গল্পটা ওই ভাবেই ফেঁদে বসেছিল।—

রামগড় ছাড়িয়ে চস রোড পেরিয়ে চিতেরপুরের প্রান্তরের ভিতর যে পথটি এঁকে বেঁকে ভেরানদীর ধারে এসে মিলেছে, তারই ওপারে পাহাড়তলী আর বনভূমির ধারে ওদের তাঁবু পড়েছিল। সামনেই 'রাজরোপ্পার' মন্দির, ভিতরে আছেন দেবী ছিন্নমস্তা। মন্দিরের পিছন পাশে জনশূন্য একটা খোলামেলা ধর্মশালা। নিকটে ঘুরে জনবসতি কোথাও নেই। মন্দিরের সিঁড়ির নীচে দিয়ে ভেরানদী গিয়ে পড়েছে দামোদর নদে। এই অঞ্চলেই দামোদরের উৎপত্তি। প্রাকৃতিক শোভায় জায়গাটি সুন্দর।

কয়েকটি তাঁবু পড়েছিল পাশাপাশি। দেবরায়ের দলবল এবং কুলিকামিন সবাই মিলে এই জনমানবহীন নদী-সঙ্গমের প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চলটিকে মুখর করে রেখেছিল।

সন্ধ্যার পর থেকে এ অঞ্চল নিরাপদ নয়, এবং মাঝ রাত্রের নিঝুম গহন বনলোকে প্রায়ই হিংস্র জন্তুর ঘোর বিদ্বেষে ও ঘৃণায় জ্বলতে থাকে কিন্তু ডি-ডি-সির কাজকর্ম ওতে বাধা পায়নি।

দেবরায়ের তিনটি তাঁবু পড়েছিল মন্দিরের ঠিক সামনে খোলা জায়গায়। রামোদরের জরীপের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এবার তাঁবু উঠবে। নদীর ওপারে গাড়িগুলোকে পাহারা দেবার জন্যও দুটি তাঁবু ফেলা আছে। রসদের গাড়ি আসে রামগড় থেকে। মালপত্রাদি এপারে বয়ে আনতে হয়।—

ও সময়টা বোধ হয় রাসপূর্ণিমার কাছাকাছি ছিল। সেই কারণে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই পাহাড়তলীর বনভূমি এবং নদীসঙ্গমের বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তরে প্রকৃতি জ্যোৎস্নায় একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। ওই জ্যোৎস্নায় শুধু জড়ানো থাকে রামোদরের শব্দ, বনবিহঙ্গের কচিৎ কাতরোক্তি, আর নূতন শীতের বাতাসের একটা রুক্ষ ধূসর মর্মরানি! চন্দ্র নিবিড়তর হচ্ছিল ধীরে ধীরে রাজযোগ্যার বনে বনান্তরে। সামনে আগুন জ্বলছে, রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে।

তরুণ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সেন বললেন, নাঃ সন্ধ্যেটাই আজ মাটি। দাদা, দুদিন ধরে আপনাকে তাতিয়ে তুলছি একটা নিটোল প্রণয় কাহিনী ঝাড়বেন ব'লে—আর আপনি বয়লেন কিনা এক ছুঁদে উকীলের গল্প, তার সঙ্গে আনলেন এক ভিখিরি মেয়ে! রসের ছোঁওয়া বিন্দুমাত্র নেই কোথাও।

হুইস্কির গ্লাসটি মুখ থেকে নামিয়ে দেবরায় একটু হাসল মাত্র। পরে একটি সিগারেট ধরিয়ে বলল, এও এক প্রণয় কাহিনী হে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে বোঝাপড়া ঘটেছে,—সেখানেই প্রণয়। আপিসের কেরাণী যখন বড়বাবুর স্নেহলাভ করে,—তখন তাকে প্রণয় বলতে বাধবে কেন, অনিল?

ওভারসিয়ার মিঃ ভার্গব বললেন, সাচ্চি বাৎ। মানিয়ে চাই নহি মানিয়ে।

কয়েকটি বাদাম মুখে তুলে দেবরায় বলল, গণপতি বাবু ক্ষুব্ধ হয়ে ছুটলেন বটে কিন্তু ঠিক বাঁটি নিয়ে মেয়েটাকে কাটতে ছুটলেন না। বরং বাইরে এসে সেই ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে মেঘের থেকে বজ্রাঘাতের ডাক শুনে থমকিয়ে গেলেন। সেই দানবীয় ঘোরলার আওয়াজে সুখী মানুষের পাঁজর কেঁপে ওঠে বৈকি। কিন্তু আশ্চর্য, ওই আওয়াজে মেয়েটার ঈষৎ মাত্রও চাঞ্চল্য দেখা গেলনা। বাচ্চাটা কেবল তার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে বৃষ্টিতে স্নান করছিল। মেয়েটার সর্বাঙ্গে জল ঝরছে, কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সহজ স্বাভাবিক দুটো চোখ তুলে সেই জোয়ান মেয়ে-ছেলেটা শুধু দুটি অন্নের আশায় বসেছিল। সে ভিক্ষে চায়না, খেতে চায়।

ওর চাহনির মধ্যে নিরুপায় কাঙ্গালপনা অপেক্ষা ইচ্ছার কাঠিন্য খুঁজে পাওয়া গেল। গণপতি বাবু একটু দ্বিতিয়ে বললেন, নাও কি করবে কর। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা আর দিই বা কেমন করে? তা বেশ, তোমার ইচ্ছেটাই তা প্রবল হল। মেয়ে মানুষের জিদ বড্ড বেশি। ফ্যাল-ফেলে চোখে তাকালে কে না এক মুঠো দেয় বলো? বলি, ওঠো এবার, বৃষ্টিতে যে সাপের মুখ ছিঁড়ে পড়ছে। ওপাশ দিয়ে যাও, সিঁড়ির তলায় গিয়ে বসো। মিলুর মা, কোথা গেলে? যা একমুঠো খেতে চায় ওকে দাও গে। একজনের ভাত দিলে আর রক্ষে নেই, চারদিক থেকে পঙ্গপালের মতন ভিখিরিরা ছুটে আসবে। বৃষ্টি থামুক, খেয়ে দেয়ে তুমি হাঁটা দাও, বাছা। আর এপথ মাড়িয়োনা।

গণপতিবাবু বিরক্ত হয়ে ভিতরে গেলেন।

কথাটা ওখানেই শেষ হল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই গণপতিবাবু আবার উপর থেকে নেমে এলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, ঠাকুর তোমার বিবেচনাটাই বা কিরকম?

বিহারী পাচক রান্না ফেলে উঠে এল। বলল, কেন বাবু?

আবার কেন জিজ্ঞেস করছ? বলিহারি বুদ্ধি তোমাদের। আরে ওর সংগে রয়েছে টিনের কৌটো,—ওটাতে কি ভাত খাওয়া যায়? তুমি নিজে কৌটোয় ভাত খেতে পার?

মিলুর মা পাশ থেকে বলল, ওরা আঁচলে ভাত নিয়ে যায়, বাবা। পেটটা ভরলেই ওরা খুশী।

আঁচলে!—গণপতি একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আঁচলই বা কোথায়? আছে কতটুকু? শোন বলি মিলুর মা, উৎপাতকে যখন ভেতরে ডেকে আনাই হয়েছে তখন তার স্থায়ী বিচারই কর। এ বাড়িতে বসে আঁচলে পেতে ভাত আর নাই খেল! মাটির সরাটরা আছে?

ঠাকুর বলল, ওসব কিছু নেই বাবু ঘরে। ওরা ত' রাস্তায় বসেও খায়!

এটা রাস্তানয় ঠাকুর। আচ্ছা দাঁড়াও আমি দেখি—

গণপতিবাবু দ্রুতপদে উপরে উঠে গেলেন, এবং তাঁর বিলাস-বৈভব পরিপূর্ণ শয়নকক্ষে ঢুকে ফুলের জগটার তলা থেকে সেই পিতলের চিত্রিত রেকাবখানা নিয়ে আবার নেমে এলেন। পরে বললেন, এখানা দিচ্ছি, তবে মেজে ঘষে দিয়ে যেতে বলো।

তিনি চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির নীচে ফিরে থমকিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন বাচ্চাটাকে পাশে নিয়ে মেয়েটা সেই সিক্ত নোংরা এক টুকরো কাপড় কোনমতে টেনেটুনে জড়িয়ে বসে আছে। উপরদিকে অধিকাংশ দেহ একেবারেই অনাবৃত। সেদিকে চোখ রাখা যায় না।

ছুঁদে উকীলের মনোজগতে সেই মুহূর্তে যে ভাববিপ্লব ঘটে গেল, তার ইতিহাস পৃথিবীর কোনও মহাকাব্যে লেখা নেই। কিন্তু সেই ইতিহাসের মূল সূত্র ধরে দিতে পারতেন গণপতির পরলোকগতা জননী—শুদ্ধপান করে তিনি মানুষ হয়েছিলেন!

সর্দারজী শুধু বলে উঠলেন, সাবাস রাম সাব!

দেবরায় বলল, গণপতি হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের স্নানের গামছাখানা এনে ওদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, বাচ্চাটাকে আগে মোছাও দেখি, বাছা? ওটা যে কের ঘরে গেল! নিজের পেট চলে না, আবার বাচ্চা কাঁধে নিয়ে ঘুরছ?

মেয়েটা এতক্ষণ পরে কথা বলল—কোথা রেখে আসব?

কেন, তোমাদের ঘরদোর কি মাথা গোঁজার জায়গা কোথাও নেই?

না। ভেঙে গেছে সব। আকাল চারদিকে যে!

গণপতি এবার চেঁচিয়ে বললেন, মিলুর মা, কোথায় গেলে?

কলতলার ওদিক থেকে জবাব এল, ঠাকুরের জন্যে কখানা বাসন মেজে দিচ্ছি বাবা—

এমন সময় তাঁর চাকর ধীরু এসে দাঁড়াল। গণপতি তার প্রতি আক্রোশটা এর মধ্যে ভুলেই গিয়েছিলেন। এবার যেন অকূলে কূল পেয়ে বললেন, গরম দুধ নিয়ে আয়ত রান্নাঘর থেকে?

আপনার দুধ থেকে আনব কি?

চোপ রও!—গণপতি এবার চিৎকার করে উঠলেন—দুধে কি নাম লেখা আছে? যা বলছি তাই কর্—বাচ্চাটা না পেয়ে মেতিয়ে পড়ছে দেখছিসনে? যা নিয়ে আয়—উল্লুক!

ধীরু রান্নাঘর থেকে বাটি করে দুধ নিয়ে এল, এবং আর কোনও কথা না বাড়িয়ে মেয়েটার হাতের কাছে বাটিটা এগিয়ে দিল। ক্ষুধার্ত শিশু বনজন্তুর মতো দুধের উপর হামলিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাবার আগে গণপতি প্রশ্ন করলেন, তোমরা কোনদিকের লোক, বাছা?

জহরনগরের ওদিকে।—মেয়েটা জবাব দিল।

নামধাম আছে কিছু?

কুণ্ঠার সংগে মেয়েটা বলল, আমাকে দাসী বলে ডাকে।

তোমার মরদ কোথায়?

মরদ নেই গো।—পরিষ্কার কণ্ঠে মেয়েটা জবাব দিল।

চটে উঠলেন গণপতি। এ আবার কোন্ গাঁজাখুরি কথা! মরদ নেইত বাচ্চা পেলে কোথায়?

এ আমার নয়।

তবে কার?—উদগ্রীব হয়ে উঠলেন ছুঁদে উকীল।

দাসী আর কোনও জবাব দিলনা। গণপতি এবার নিজের কৌতূহলের জন্য একটু লজ্জাই পেলেন। কিন্তু ভিখারী-কাঙালীর জগতে কোথাও যে আবার প্রাণ সমস্যা থাকতে পারে, এটি অনুধাবন করার মতো সময় তিনি নিলেন না।

মরুকগে—বলে তিনি উপরে উঠে গেলেন। কি চাকররা নীচের তলায় রইল, ছুঁড়িটাকে দুটো খাইয়ে যা হোক করে একসময় বিদায় করবে। এর বেশি আর

মাথা ঘামানো চলে না।

তামাকের নলটা মুখে দিয়ে এবার তিনি হাঁটে-ভুঁয়ে একটু গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অস্বস্তি ছিল ওই বিছানাটায়। বিছানাটা তাঁর পিঠের তলা থেকে যেন ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল। সেই প্রতিবাদের ভাষা নেই, কিন্তু অনুভূতি আছে। তিনি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বিবেচনার পরিচয় দেননি।

নলটা ছেড়ে তিনি উঠলেন। তারপর আলমারিটি খুলে একখানা ফর্সা ধুতি বার করে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন। ক্ষুধার জ্বালায় মেয়েটার লজ্জা ও সম্ভ্রম-বোধের চেতনাটা অসাড় হয়ে গেছে, কিন্তু ধনবান গণপতি নিজেই যেন তারজন্য অপমান বোধ করেছিলেন। ধুতিখানা নিয়ে মেয়েটার সামনে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, এখানা তুমি পরে নিয়ো বাছা। তোমার সামনে এসে দাঁড়ালে মানুষের মাথা হেঁট হয়। বলি, ওকে তাড়াতাড়ি ছুটি খেতে দাওনা গো, মিলুর মা। খেয়ে দেয়ে পথ দেখুক। এসব নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাতে পারিনে বাপু।

গণপতি আবার উপরে উঠে গেলেন।

রাজরোপ্পার পাহাড়তলীর নির্জন প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চলে ঘন চন্দ্রালোক যেন মায়াকানন রচনা করেছিল। ছিন্নমস্তার মন্দির বেলাবেলি বন্ধ করে পুরোহিত ওপারের কোন্ গ্রামের দিকে চলে গেছে। সামনে আগুন জ্বালিয়ে মাংস ইত্যাদি রান্না হচ্ছিল। ওদিকের তাঁবুতে কেউ কেউ মাঝরাত্রে শিকার-সন্ধানে বেরোবার আয়োজন করছে। রাত মন্দ হয়নি।

গেলাসে একবারটি চুমুক দিয়ে দেবরায় বলল, হ্যাঁ, মাথা ঘামাতে তাঁকে বল বৈকি। লোকটা বোধ হয় নিউরটিক্, কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারব না। অস্বস্তি ঢুকেছিল গণপতির মনে। গণপতি যে ফাঁদ বারবার এড়াতে চাইছেন, সেই ফাঁদেই তিনি নিরুপায়ভাবে পা দিচ্ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নি, সন্তানের জনক তিনি হননি। কিন্তু গায়ের জোরে জায়গা দখল করে অনেকেই তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে। মোটর ড্রাইভার ও তার বেকার ভাই, তাঁর এক ভাগ্নে, পিসতুতো বোনের এক বিধবা মেয়ে আসে যায়, মৃত বড় ভাইয়ের ছোট শ্যালকটি, তাঁর মুহুরি বুড়ো বাপ—এছাড়া বাড়ির ঝি-চাকর ঠাকুরেরা। সংসার তাঁর ছোট নয়। বয়স তাঁর পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের দিকে এগোচ্ছে।

বিছানার নতুন চাদরখানা ফস করে তুলে নিয়ে আবার তিনি নেমে এলেন। বললেন ওই যাঃ বাছা, আসলেই ভুল। তুমি না হয় ধুতিখানা পরলে, কিন্তু বাচ্চাটার গতি কি হবে? এই নাও চাদরখানা নিয়ে যাও—মেয়েটাকে জড়িয়ে রেখো।

লুব্ধহস্তে চাদরখানা টেনে নিয়ে দাসী কাছে রাখল। সেদিকে তাকিয়ে মিলুর মা একটু বিরক্তই হল। হীরু এদিকে ছিল না, মেয়েটার নিরাবরণ অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও পুরুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মেয়েটা লজ্জা-শরম-সঙ্কোচের ধারই ধারে না।

গণপতি গলা বাড়িয়ে বললেন, কই মিলুর মা, ধুতিখানা যে দিলুম, মেয়েটা ত পরল না?

একটু আড়াল থেকে মিলুর মা বলল, তাহলে শুনুন, বাবা—মেয়েটা মেহাৎ সোজা নয়। ওর ব্যবসাই ওই। এখন বলছে, ধুতিখানা গিয়ে বাজারে বেচলে দুপয়সা পাব, ওতে পেট চলবে কদিন!—আপনাকে বলছি বাবা, বাচ্চাটাকে ও তাড়া করে এনেছে! ওটাকে সঙ্গে নিয়ে কাঁদে আর ভিক্ষে করে। ছুঁড়ি বড্ড ডাঁয়না বাবা। কাপড়জামা দিলেও ওরা পরবে না, ওই ওদের কাজ। অমন করে সঙ হয়ে না ঘুরলে ভিক্ষে পাবে কেন? এসব মস্ত লাভের ব্যবসা, বাবা।

গণপতিবাবু সেখান থেকে সরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে একটা চাপা গণ্ডগোল শোনা গেল। গলা উঁচিয়ে মিলুর মা বলল, সাবান! আমর, সাবান আবার কে তোমাকে দিচ্ছে? চান করতে হয় রাস্তার কলে যা। পেরস্থ ঘরে পাত পাড়তে পারছিস এই না খুব? সাবান! দাসীর সব রাণী হবার! মরণ আর কি, দুটো ভাত ফেলে দিচ্ছি, কুকুর-বেড়ালের মতন খেয়ে যা। বলি, কি জাত তোর লা?

দাসী বলল, ডিমিরির আবার জাত!

জাত নয়ত কি? ভাত গিলে এঁটো পেড়ে বাসন মেজে দিয়ে যাস। আমি কৈবর্তর মেয়ে, গোঁড়া হিন্দু,

তা জানিস? বামুন কায়েতের সংগে আমার পাত পড়ে। তোর মতন ব্যবসাবাজি করিনে।—

মিলুর মার কর্কশ কণ্ঠ অহেতুক বিদ্বেষে যখন গরগর করছিল সেইসময় গণপতিবাবু ধীরুকে ডেকে তাঁর নিজের একখানা নতুন সাবান বের করে দিয়ে বললেন, মিলুর মাকে থামতে বলগে। সাবান হল সভ্যতার চিহ্ন। দাসীর দোষ কোথায়? বাথরুমে মাথার তেল আছে, ওকে দিগে যা। মিলুর মার যদি এতই রাগ তবে ঝিয়ের কাজটা ওকে দিক্‌না কেন?

তামাকের নলটা মুখে দিয়ে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। ধীরু সাবানখানা নিয়ে নিচে নেমে গেল। মিলুর মা একেবারে চুপ।

দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্নের দিকে এল। দায়ভাগ আইনের বইখানা নিয়ে কয়েকঘণ্টা গণপতির কেটেই গেল দেখা যাচ্ছে। বইটি এক সময় সরিয়ে রেখে তিনি উঠে বসলেন। নিচের তলাটা শান্ত। দাসী অবশ্যই এতক্ষণে চলে গেছে। গত কয়েক ঘণ্টায় ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গেছেন মনে হচ্ছে। ধীরু বোধ করি এবার চায়ের ব্যবস্থার কাজে লেগেছে। তিনি অতঃপর গা ঝাড়া দিয়ে বাইরে এলেন। কোনো কোনো মক্কেল বিকেলের দিকে হয়ত আসতে পারে।

এমন সময় ঘোমটা দিয়ে মিলুর মা গুটি গুটি উপরে উঠে এল। সবিনয়ে বলল, আমার বোনপোর চিঠি এসেছে বাবা, তার বড্ড অসুখ—আমার ওই একটিই বোনপো—

সে কি!—গণপতিবাবু ব্যস্ত হলেন—তাহলে তোমাকে ত এক্ষুণি চলে যেতে হয়। ট্রেণ পাবে ত?

দাঁড়াও, দাঁড়াও—ভারি দুঃসংবাদ ত! তাইত টাকাও তোমার কিছু চাই বৈকি। তাহলে বেরিয়ে পড় তাড়াতাড়ি—

গণপতি ঘরে ঢুকলেন এবং মিনিট দুই পরে এসে কিছু টাকা মিলুর মার হাতে দিলেন। মিলুর মা কি যেন ভেবে কতক্ষণ সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় যেন কিছু বলতে চাইল। তারপর একসময় দূরের থেকে গণপতিকে প্রণাম জানিয়ে নিচে নেমে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে নিচে নেমে এসে গণপতিবাবু সহসা জানতে পারলেন, বোনপোটি হল মিলুর মার নতুন আবিষ্কার। ভিখারিনীর সামনে দাঁড়িয়ে কৈবর্ত্তর মেয়ে হয়ে মিলুর মা অপমানে বরদাস্ত করতে পারেনি। সেইজন্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে চলে গেছে। খবরটি গণপতির কানে তুলে দিয়ে পাঁচক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। নিচের তলায় অসন্তোষের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

সিঁড়ির তলার দিকে তাকিয়ে সহসা গণপতি থমকিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আরে, দাসী এখনও চলে যায়নি?

দাসী জায়গা পেয়েছিল। এবার সে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, কেমন করে যাব? মেয়েটার বড্ড অসুখ!

দাসীর দিকে তাকিয়ে ক্ষণকালের জন্য গণপতি অবাক হলেন। সে দাসী নয়! ওবেলার ভরা বর্ষার সেই সপসপে নোংরা কাঙালিনী নয়, এ দাসী প্রখর শরতের রৌদ্রের আভায় উজ্জ্বল। দাসীকে ভাল করে ওবেলায় দেখা হয়নি, এখন দেখা গেল তার বড় বড় নিরুপায় চোখের কালো দুটো তারা। মাথায় একরাশি চুল। বাঙলার নরম পলিমাটির মতো গায়ের রং। স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে গ্রামের একটি যুবতী। বয়স আন্দাজ বছর পঁচিশেক হবে। ধুতিখানা ওকে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

তাহলে তুমি যাওনি, কেমন? আর কেমন করেই বা যাবে বাচ্চাটার অসুখ নিয়ে?—গণপতিবাবু যেন একটু সন্তোষ প্রকাশ করেই বললেন, দাঁড়াও আমি ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। না না, সেকি কথা! বাচ্চাকে যে বাঁচায়, সেই তার মা। পরে আমি শুনব তোমার কাহিনী, বুঝলে দাসী? ওরে ধীরু, ছোট বৈঠকখানার ঘরটা খুলে দেত? তুমি বাছা ঐ ঘরখানায় এখনকার মতন থাকো গে—মেয়েটার অসুখ আগে সারুক তখন যেয়ো।—হ্যাঁ, ভাল কথা, বাসন-টাসন তুমি মাজতে পারবে? ঠিকে ঝিদের আজকাল বড্ড চাঁকার! দশ টাকার কাজে পঁচিশ টাকা হাঁকে। তাছাড়া বাবুদের পাশে বসিয়ে তাদের চা খাওয়াও, সকাল-বিকেল জল খাবার দাও, সংগে করে সিনেমায় চলো, দাদাদের সংগে ঠাট্টা তামাসার সুযোগ দাও!—এইসব অনেক হাঙ্গাম। মাজা-ঘসার কাজকর্ম কি তুমি পারবে বাছা?

দাসী বলল, আমি সব কাজ জানি। আমি ত গেরস্থই ছিলুম।

গণপতি বললেন, বেশ ত তাহলে আরেকবার চেষ্টা হও? মেয়েকে তুলে নিয়ে এসো সিঁড়ির তলা থেকে। ওই ঘরটায় থাকো।

সেদিন থেকে বিছানা ও তক্তাপোসসহ দাসী একখানা ঘর পেয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় সেই ঘরে ইলেকট্রিক জ্বলে উঠল।

গণপতিবাবু বেরিয়ে গেলেন তাঁর গাড়িতে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সঙ্গে নিয়ে এলেন ডাক্তার, এবং কিছু কাপড়-চোপড়। খানচারেক ভাল শাড়ি এবং দেড় বছরের মেয়েটার জন্ম জামা ইত্যাদি আনতে ভোলেন নি।

যাবার সময় ডাক্তার বলে গেলেন, ভয় পাবার কিছু নেই।

অনিল সেন বলল, গণপতিবাবুর উদ্দেশ্য কি, দাদা?

দেবরায় এবার একটি সিগারেট ধরালো। তারপর গোটাদুই কাসু বাধান মুখে দিয়ে বলল, উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়নি! মনস্তত্ত্বের গহন জটিলতার মধ্যে হয় ত কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে, আমি কিন্তু তার কোনও খবর জানিনে।

লোকটার কালচারে বাধল না?

দেবরায় বলল, কালচারের সহস্রবিধ ব্যাখ্যা থাকতে পারে।

কিন্তু রুচিবোধ?—অনিল প্রশ্ন তুলল।

সে বস্তু ত' অবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ রুচি বদলায়, সেইজন্যই সে প্রগতিবাদী। বস্তুজগৎ রুচি বদলায় না!—সে যাই হোক, দাসীর কিন্তু মাসিক মাইনের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। গণপতিবাবু বিনামূল্যে কারো কাছে পরিশ্রম আদায় করতে রাজি নন।

সেন এবার অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। বলল, আপনার কি মনে হচ্ছে না এবার আসল গল্পের আরম্ভ।

আমি জানিনে—দেবরায় একটু গুছিয়ে বসে বলল, আমি কেবল ঘটনার কথা বলতে পারি যেটি আমার চোখের সামনে ঘটেছে। ভিখারী মেয়ে ভদ্রঘরে এসে জায়গা পেয়ে গেল।

মিঃ ভার্গব বললেন, সম্ভবত গল্পটা এই. একজন ঝানু অর্থপিশাচ উকীল দয়ার অবতার হয়েছিলেন একটি স্বাস্থ্যবতী গ্রাম্য যুবতীর সংস্পর্শে এসে। ব্যাখ্যাটা খুব স্বাস্থ্যকর নয়।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে দেবরায় পুনরায় বলল, জীবনকে বিচার করার পথ খুব সহজ নয়, ভার্গব,—আমি শুধু ঘটনার কথা জানি। কারণ, আমি ছিলুম তাঁর অতি নিকট প্রতিবেশী। বোধ হয় আমিই ওই পাড়ার একমাত্র ব্যক্তি—যে, গণপতিবাবুর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেনি।

শত্রুতা! কেন?

দেবরায় হাসল। বলল, চল্‌তি সমাজের মন নতুনের ধাক্কায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তোমরা ত' জানো, সামাজিক সংযম, সহনশীলতা এবং নিরাসক্ত বিচারবুদ্ধি—এরা আমাদের দেশে বড় কম? পথের ভিখিরি শোবার ঘরে উঠবে, কেউ বরদাস্ত করেনি।

শ্রোতারা দেবরায়ের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ওরফে পাচক-ঠাকুর এ বাড়ির কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল। তার চাকরি গেলে চলবে, কিন্তু জাতিধর্ম না বাঁচলে চলবে না। তার পাওনা টাকাকড়ি নিয়ে চলে যাবার পর গণপতি জানতে পারলেন, লোকটা গত এক সপ্তাহকাল অবধি এ বাড়িতে অন্নজল স্পর্শও করেনি। তাঁর নিজের মোটর ড্রাইভার শ্রীমান্ পঞ্চাননের বিবাহ-প্রস্তাব চলছিল। হঠাৎ একদিন ছোকরার কানে কে যেন প্রবেশ করিয়ে দিল, গণপতি উকিলের গাড়ি চালানোটা লাভজনক বটে, কিন্তু তাঁর গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরে থাকলে তোমার সামাজিক বিবাহের কোনও আশা থাকবে না। সুতরাং শ্রীমান্ পঞ্চানন একদিন সন্ধ্যায় গাড়িটি গ্যারাজে ঢুকিয়ে রেখে সেই যে অদৃশ্য হল, আর তার দেখা পাওয়া গেল না। তার বেকার ভাইটি একদিন রাস্তায় বাবুকে ডেকে বলে গেল, বলে দিয়ো তোমার বাবুকে, আমার দাদা মাইনে-টাইনে আর চায় না,—এ বাড়ির ভাত আমরা খেয়েছি অনেক। ও টাকা তার প্রায়শ্চিত্তের জন্ম রইল। বলো তোমার বাবুকে, বুড়ো বয়সে মতিচ্ছন্ন কেউ সইবে না!

পাড়ার লোকরা—বিশেষ করে মেয়েছেলেরা যখন

এখান-ওখান থেকে গণপতির নামে অশ্রাব্য এবং অশ্লীল চিঠি পাঠাচ্ছে, সেই সময় একদিন হঠাৎ বীরু এসে গণপতিবাবুর পায়ের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ল।—বাবু, বাবু—আমাকে আপনি মাপ করুন। অনেক ভাত খেয়েছি আপনার, এবার ছুটি দিন্ আমাকে। এরা আমাকে থাকতে দিচ্ছে না, বাবু—খুন করবার ভয় দেখাচ্ছে! ঘরে আমার মা বোন আছে, বউ ছেলেমেয়ে আছে—। আমাকে রেহাই দিন্ বাবু।

গণপতি তার কান্না দেখে একটু হাসলেন। তারপর পা দুখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট দুই পরে যখন বেরিয়ে এলেন, হাতে তাঁর কতকগুলি টাকা। বললেন, চাকরির অভাব তোর হবে না জানি। তবু মাস দুয়েকের মতন মাইনে তুই নিয়ে যা।—আচ্ছা, তা হলে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়, বীরু,—আর ফেরি করিসনে!

টাকা নিয়ে মাথা হেঁট করে বীরু চলে গেল।

সেন সাহেব বলল, বাড়িতে তাহলে আর কে রইল?

দেবরায় বলল, ঘরে নাও আর কেউই বিশেষ রইল না। তবে ওই দাসীও আর দাসী হয়ে থাকল না। চারদিক থেকে একদল বিষাক্ত সাপ যখন ছোবল মেরে গণপতিকে ক্ষতবিক্ষত করছে, সেই সময় একদিন বিশেষভাবে সমাদর জানিয়ে তিনি দাসীকে ডাকলেন। বললেন, দাসী নামটি অনেকদিন থেকেই আমার কানে ভাল ঠেকছে না। এখন থেকে আমি যদি তোমাকে দেবদাসী বলে ডাকি, তাহলে তোমার আপত্তি আছে কি?

না না, তা কেন থাকবে? আপনি যা খুশি বলে ডাকবেন।

গণপতি বললেন, শোন দেবদাসী, নীচের তলায় তুমি থাকো, তোমার ভারি অসুবিধে—আমি জানি। তোমার ওই নতুন চটি-জোড়াটা পায়ে দিয়ে চলাফেরা করো,—নৈলে ঠাণ্ডা লাগবে!

দেবদাসী একবার থমকিয়ে সেখানে দাঁড়াল, তারপর বলল, আপনার যখন ইচ্ছে, আমি তাই করব!

মিঃ ভার্গব তাকালেন অনিস সেনের দিকে, এবং ওপাশ থেকে হাজরা মশাই ও শর্মাজি বলে উঠলেন; অবিশ্যি!

দেবরায় হাসল। বলল, ঘটনা অনেক সময় কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায় বৈকি। গণপতি সেদিন নিঃসঙ্কোচে বলে ফেললেন, আমার কি মনে হয়, জান দেবদাসী,—গতজন্মে তুমি বড় ঘরের বউ ছিলে! রাঙাপাড় তসরের শাড়ি পরে মোটা মোটা সোনার বালা হাতে দিয়ে তুমি যখন গঙ্গাস্নান সেরে উঠে আসতে,—তোমাকে দেখে পথের মানুষ সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াত। তবে কি জান দেবদাসী, এসব কথা তোমার মাথায় নাও ঢুকতে পারে!

গণপতির পিসতুতো বোনের বিধবা মেয়েটি সেদিন মাদোহারা আদায় করতে এসে একেবারে অবাক। মামার-বাড়ির যিনি বর্তমান কর্ত্রী, তাঁর চেহারা ও যৌবনের সম্পদ এ বাড়ির নিচের তলাটাকে যেন সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। পরণে সুন্দর একখানি জরিপার ধনেখালির শাড়ি, নিটোল দুখানি হাতে সোনার বালা, মাথায় একরাশি সুগন্ধ কালো চুল, পায়ে জরি বাঁধানো চটি এবং দুই উদার চক্ষুতে শান্ত সহাস্য দৃষ্টি।

দেবদাসী বলল, আপনি ওপরে যান্—।

মামার এ কি কাণ্ড! মেয়েটি সোজা উপরে গিয়ে সভয়ে মামার কাছে প্রশ্ন তুলল।—মামা, আপনার কি ইচ্ছে, এই বাড়িতে ওঁরা কেউ না আসি? আপনি কি সকলকে ত্যাগ করতে চান?

দায়ভাগ আইনের বইখানা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে মামা একবার তাকালেন ভাগ্নির দিকে। বললেন, ও, লাবণ্য এসেছে দেখছি। হ্যাঁ, কি বলছে?

মামার চাহনি দেখেই ভাগ্নি জুড়িয়ে গিয়েছিল। এবার শান্তকণ্ঠে বলল, নিচে উনি কে চিনতে পারলুম না।

তাহলে নিচে গিয়ে ভাল করে চেনোগে?

সে আমার দরকার নেই, মামা!

ভাল! তবে যেটি দরকার সেইটিই আগে নিয়ে যাও?—এই বলে উঠে গণপতি আলমারি থেকে তিরিশটি টাকা বার করে তাঁর ভাগ্নির হাতে দিলেন, এবং পুনরায় বললেন, তোমার যদি এখানে আসার অসুবিধে হয়, আমাকে জানিয়ো—মাসে মাসে টাকা আমি পাঠিয়ে দেবো।

তাঁর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ছিল। লাবণ্য আর কিছু

বলল না, টাকাটা আঁচলে বেঁধে সে নেমে গেল। বেশ, এ অপমানের শোধ একদিন নেবেই নেবে।

মাস আষ্টেক পরে দেখা যাচ্ছে, কোতলপুর সুসজ্জিত বড় ঘরখানায় দেবদাসী তার আড়াই বছরের মেয়েটাকে নিয়ে জাহগা পেয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে তার মেহগনির পালঙ্ক এবং দরজায় ঝালর দেওয়া রেশমি পর্দা দুলছে।

ঘরের বাইরে সামনেই ছোটখাট একটি লাউঞ্জে এক প্রবীণ বয়স্ক অধ্যাপক প্রায় প্রত্যহই ঘণ্টা দুই ধরে দেবদাসীকে পড়িয়ে যান। তিনি মাসিক বেতন পান ছশো টাকা। এরই মধ্যে দেবদাসী বাংলা ভাষা ও রচনা শিখেছে ভাল। ইংরেজি থার্ড রীডারও প্রায় শেষ হয়ে এলো। অঙ্কে তার মাথা পরিষ্কার। বাচ্চা মেয়েটা সুন্দর মাইলোনের ঘাগরা পরে মাদ্রাজী আয়ার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যায়। জনৈক মুসলমান যুবক গণপতির ড্রাইভার নিযুক্ত হয়েছে। তবে পুরনো গাড়িখানা এখন নেই, এখানা নতুন মডেলের। প্রতি প্রভাতে গণপতি সন্ত্রীক যান, এবং একেবারে পূজা আহ্নিক সেরেই বাড়ি ফেরেন। সম্প্রতি এ বাড়িতে কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ কর্মী নিযুক্ত হয়েছে,—তারা কিটফাট পোশাক পরা লোক। তবে তারা হল খিদ্‌মৎগার, চাকর, ঠাকুর এবং বাজার সরকার। তাদের মাইনেপত্র শ্রীমতী দেবদাসী নিজের হাতে করেই দেন; এসব নিয়ে গণপতিবাবু আজকাল আর মাথা ঘামান না।

হঠাৎ অনিল সেন বলে বসল, ট্রয়বুদ্ধে দুটি জাতি প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল। মূল কারণটা কি ছিল যেন?

কথাটা শুনে দেবরায় একটু হাসল। কিন্তু জবাব দিলেন প্রবীন বয়স্ক সুরসিক মিঃ হাজরা। বললেন, মূল কারণটা বোধ হয় ছিল একটা মেয়ের নিটোল স্বাস্থ্যশ্রী!

সবাই উচ্চরোলে হেসে উঠল।

• • • •

সমগ্র রাজমোহনার উপরে নূতন হেমন্তকালের শুক্লপক্ষ যেন একটি অপ্সরালোক সৃষ্টি করেছিল। সেই দিগন্তব্যাপী নীরবতার মধ্যে শুধু শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল ভেরানদী আর দামোদর সঙ্গমের মৃদু মর্মরধ্বনি।

দেবরায়ের মদালস দুই চক্ষু আবিল দৃষ্টিতে শুক্ললোকের স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল দেবরায়। এবার একটু সচকিত হয়ে সে বলল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বাচ্চার বয়স যখন প্রায় চার বছর, এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল। একদিন হঠাৎ একটি লোক খালি পায়ে হাফ সার্ট গায়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে এসে দাঁড়াল। হাটবাজারের ফড়ের মতো লোকটার চেহারা—যেন একটু বিশেষ অপরিচ্ছন্ন। চোখ দুটো শুঁয়োপোকের মতো লাল।

গণপতিবাবুর নূতন দারোয়ান প্রথমটা লোকটিকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি; কিন্তু গণপতিবাবু নিজে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন লোকটি বলল, আমি দাসীকে দেখতে এসেছি বাবু, সে আমারই মেয়েছেলে। আমার নাম শিবু। দাসীকে বললেই চিনবে। আমরা এক গাঁয়েরই লোক।

গণপতি ডাকলেন ভেতরে এসো।

শিবু ভিতরে এসে দাঁড়াতেই অন্তরিক থেকে দেবদাসী এসে বৈঠকখানায় ঢুকল। দাসীকে দেখে শিবু স্তম্ভিত। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকাল। তার গলা শুকিয়ে উঠেছিল। পরে বলল, এ যে হেলকি রে বাবা!—তবে যে আমাকে সবাই বললে, তোমার মেয়েছেলেটা উকীল বাবুর বাড়িতে বাসন মাজে! কিন্তু এ আবার কি!

দেবদাসী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল!—

গণপতি বললেন, তুমি কি দাসীকে বিয়ে করেছিলে?

কী যে বলেন বাবু—শিবু বলল, বিয়ে করতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি! বিয়ে করব পয়সা কই? ওসব বড়মানুষি কথা। মেয়েমানুষটাকে ঘরে আনলুম,—এসেই ভাত ফুটোতে বসল। সেই ত ঘরকন্না!

বাচ্চাটা কার?

আমারই বাবু। মেয়েটাকে গছিয়ে গিয়েছিলুম দাসীর ঘাড়ে। পাঁচটা মন্দলোকের পাল্লায় পড়ে আমি ফেলে গিয়েছিলুম কিনা।

গণপতিবাবু বললেন, তুমি ছিলে কোথা এতদিন?

শিবু সোৎসাহে বলল, সেই কথাই ত বলছি বাবু। মেয়েছেলে ঘরে রাখলে ত ভাত কাপড় দিতে হয়!

ছাড়া আগের মেয়েমানুষটা আমার ঘরে রেখে গেল একটা বাচ্চা! এখন এদের খাওয়াই কেমন করে? ক্ষেতখামারে কাজ নেই কোথাও! ধান পাইনে দেনার দায়ে। দোষ নেবেন না বাবু, সত্যিই বলি। ওই তোমার বাকইপুরের একটা চুরি-ডাকাতির কেসে ধরা পড়েছিলুম। দুটো লোক কাটা পড়েছিল, তবে সাক্ষী-সাবুদ ছিল না। আমাকে ঠেলেছে তিন বছর।

গণপতি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রঘু মোড়লের খুনের মামলার কথা বলছ শিবু?

ইয়া, ঠিক ধরেছেন, বাবু। তবে ত সবই জানেন! আপনি তবে আমাদের ঘরের লোক!—শিবু এবার অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে বলল, তাহলে অনুমতি করুন বাবু—দাসীকে নিয়ে রওনা হই? অনেক দিন মেয়েমানুষ ছাড়া আছি ত!

গণপতি শান্তকণ্ঠে বললেন, বেশ ত এসেছ এতদিন পরে, খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে যেয়ো?

দাসী বসে বলল, আমি আর যাব না, এখানেই থাকব।

ফস করে শিবু ধৈর্য হারাল। উত্তেজিত হয়ে বলল, বটে, এখানেই থাকবি! যাবিনে মানে? চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাব!

গণপতি থামিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, ওটা এখন থাক্, শিবু। আমার সামনে এসব আর কেন! বেশ ত, মাথা ঠাণ্ডা করে আগে একটু বিশ্রাম নাও। এতদিন পরে দেখা, দুটো কথা বলো!

আমি যাব না—বলে দেবদাসী ভিতরে চলে গেল।

মেয়েটার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও লীলায়িত ভঙ্গীর দিকে একবারটি তাকিয়ে শিবুর মাথাটা যেন ঘুরে গেল। হঠাৎ সে হাসিমুখে বলল, দেখলেন উকীলবাবু, মেয়েমানুষ সুখের গন্ধ পেলে আর ছাড়তে চায় না। কিন্তু বাবু, দোহাই, আইন কানুন দেখিয়ে আমার মেয়েছেলেকে যেন কেড়ে নেবেন না—!

হা হা হা করে প্রবীণ গণপতি হেসে উঠলেন। বললেন, পাগলের মতন এসব কি বলছ তে?—তিনি আবার শান্ত হাসি হাসলেন।

হ্যাঁ বাবু, ঠিকই কই। ওর জন্যেই আমার জেল খাটা! ওর পেট ভরাতে গিয়েই ত এই খুন খারাপি, ডাকাতির মামলা।—শিবু বিজ্ঞের মতো বলল, যদি নেন ত ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে নিন্—ওটাকে নিয়ে যত ঝঞ্ঝাট।

গণপতিবাবু শিবুকে বোঝাতে বসলেন,—সে কি হয় শিবু, তোমার জিনিস তোমারই থাকবে, কেউ আপত্তি করবে না। তবে কি জান, দাসীর দায়ীত্ব এখন অনেক। নিজে লেখাপড়া শিখছে, মেয়েটাকে বড় করে তুলছে, ভদ্র জীবনের মধ্যে আসতে চাইছে—

শিবু বলল, বাবু, এসব ভাল নয়। মেয়েমানুষ একবার যদি বিগড়ে যায়, সব ছারখার! ওর মাথা খাবেন না, বাবু।

গণপতি আবার হেসে উঠলেন। বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি এখানে থাক দিনকতক, তাহলে আগা-গোড়া সব বুঝবে। যাও ওপরে গিয়ে বসে ঠাণ্ডা হও। দাসী যা বলে মন দিয়ে শোন—

বাড়িতে মক্কেলদের ভিড় কমে যাবার একটি সমাজ-নৈতিক কারণ ছিল। আলীপুর বার লাইব্রেরীতে গণপতিবাবুকে নিয়ে কিছুকাল থেকে চাপা হাসি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং কানাঘুষো চলেছে। কেউ কেউ সোৎসাহে আরো নাকি কোন কোন জজের প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে ছ'মাসাসিও করছেন শোনা যায়।

গণপতির ষাট বছর প্রায় বয়স হয়েছিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট হবার কথা। কিন্তু তিনি বিশেষ ক্লান্ত বোধ করছেন বলেই এবার অবসর গ্রহণ করতে চাইলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী গত পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল ধরে তাঁকে অকৃপণ ভাবে অনুগ্রহ করে আসছেন। সন্তানাদি থাকলে তিন পুরুষ অতি সচ্ছল অবস্থায় কাটাতে পারত। গণপতি তাঁর কর্মজীবন শেষ করে দিলেন।

বার-লাইব্রেরীর ঈর্ষাপরায়ণ সমকালীন ব্যক্তিরা তাঁর অবসর গ্রহণের সংবাদ শুনে বিশেষ আনন্দের সঙ্গে একটি মস্ত বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। তাঁরা গণপতিকে অভিনন্দন জানাবেন।

সেটি শনিবার সন্ধ্যা। গণপতির পরিচিত, স্বজন, বন্ধু ও আত্মীয়মহলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দু'একজন অবশ্য বাদ পড়েছিল,—গণপতি সেদিকে দৃষ্টি

রেখেছিলেন। তিনি যখন সভায় এসে উপস্থিত হন তখন দেখা গেল তাঁর সঙ্গে রয়েছে সেই আগেকার ক্ষুধাজর্জর কাজলিনী মেয়েটা—যার নাম দাসী, এবং সেই নেড়িকুকুরের মতো আবর্জনা-খোঁকা বাচ্চা মেয়েটা, এবং ওদের পিছনে পিছনে সেই তিন বছরের জেলখাটা খুনে মামলার আসামী শ্রীমান্ শিবচরণ। অতঃপর বার লাইব্রেরীর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে গণপতির সঙ্গে দাসী ও শিবুকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আলীপুরের প্রধান হাকিম আজকের সভায় সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন।

দেবদাসীর হাতে এসে পৌঁছল মস্ত এক ফুলের তোড়া। পরণে ছিল তার দামী জরিপাড় শ্রেষ্ঠ জর্জেটের শাড়ি, কানে হীরের দুল, গলায় আসল মুক্তোর মালা, দুই হাতে অড়োয়ার গহনা,—স্বর্গীত ব্রোকেডের ব্লাউজ তার গায়ে। ঐশ্বর্য্য ও লাবণ্যে সে ঝলমল করছিল। বলা বাহুল্য, মধুর প্রসন্ন হাস্য তার ব্যক্তিত্বকে সযত্নে ভরিয়ে তুলল। তার পাশে পাশে কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি এবং গরদের পাঞ্জাবী পরে মিষ্টি হাসে শিবু তার পাশে এসে বসল। বাঁ হাতের 'রোলেক্স' হাত ঘড়িতে সে দেখল, সাড়ে ছয়টা। —আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলুম হে। —দেবরায় হাসিমুখে বলল।

হাজরা মশাই আর থাকতে পারলেন না। বললেন, এটা যেন তোমার কল্পনার দিক থেকে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ভাই!

দেবরায়ের আবিল চক্ষু মাঝে মাঝে ঢুলছিল। এবার সে একটু সজাগ হয়ে বলল, সত্য ঘটনা কল্পনাটাকে যদি ছাড়িয়ে যায়, আমি কি করব বলুন?

অনিল বলল, এটা ত এক প্রকার প্রেমের গল্প, মিষ্টার রায়।

দেবরায় জবাব দিল, আমি জানিনে।

মিঃ ভার্গব প্রশ্ন করলেন, শিবু তা হলে ঠিক কোন্ জায়গাটা দখল করে রইল বলুন ত?

দেবরায় বলল, এর বেশি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মিঃ হাজরা এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তুললেন,—শেষ পর্যন্ত তা হলে দেবদাসীর সঙ্গে গণপতিবাবুর সম্পর্কটা ঠিক কি রকম দাঁড়াল?

ছোটবেলায় কবিতা লিখত দেবরায়। সেই সূত্র ধরেই সে রাজরোষার ছিন্নমস্তার মন্দিরের উপর দিয়ে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সুদূরপ্রসারিত শূন্যলোকের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে একবার তাকাল। পরে বলল, সম্পর্ক? নয় মাতা, নয় কন্যা, নয় বধূ সুন্দরী স্বরূপী—।

মাস ছয়েক পরে হঠাৎ একদিন রাত্রে উষার প্রাক্কালে বিছানা ছেড়ে উঠে দেবদাসী গণপতির শয়ন কক্ষে এসে দাঁড়াল। শিবু এল তার পিছনে পিছনে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেবদাসী সহসা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে। গণপতি ঘরে নেই।

কীটবাস, চশমা, গায়ের জামা, জুতো, চাবির গোছা—সব পড়ে রয়েছে। শুধু পুরনো চটি জোড়াটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

কাঙ্গাল মেয়েটা তার জীবনে কেঁদেছে অনেক। অন্নবস্ত্রের অভাবে কেঁদে কেঁদে পথে পথে ঘুরেছে, আজ আর আশ্রয়ের অভাবে অনেক কাল ধরে চোখের জল ফেলেছে, আজ সব অশ্রুর বন্যা এক মোহনায় এসে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। আজ আর বাঁধ মানল না।

গণপতি কোথাও নেই। কেউ বলে তিনি মধ্যপ্রদেশের ডাকাতদলের হাতে প্রাণ দিয়েছেন, কেউ বলে তিনি আত্মসম্মান রক্ষার দায়ে গঙ্গাগর্ভে চলে গেছেন, কেউ বলে ব্রহ্মপুত্রের কোনও এক সন্ন্যাস আশ্রমে তিনি বাকি জীবন অতিবাহিত করেছেন, কেউ বা বলে দাক্ষিণাত্যের এক অজানা ছোট্ট ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে তাঁর মৃত দেহ নাকি পাওয়া গিয়েছিল।—

গল্পটা শেষ হয়ে এসেছিল। রুটি ও মাংস পরিবেষণ করা হচ্ছে। মদের পাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে দেবরায় বলল, ছুঁদে উকীল আদল কাজে কিন্তু ভুল করে যায়নি। সম্পত্তির দুভাগ দিয়ে গেছে ওই অনাদৃত কচি মেয়েটার নামে, একভাগ দেবদাসীকে। দুজন ট্রাষ্টির নাম, দেবদাসী আর শিবচরণ। দুজনেরই কিন্তু হাত বাঁধা। শুধু মোটা মাসোহারা পাবে দুজনে। বাচ্চাটার জন্য নিযুক্ত থাকবে এক দাসী। বারলাইব্রেরীর সভাপতির পরিচালনায় সম্পত্তি ও নগদ টাকার সকল ব্যবস্থা হবে। নতুন গাড়িখানা গণপতি দান করে গেছেন দেবদাসীকে—কারণ মেয়েটা পথে পথে ঘুরেছে অনেক কাল—।

আসামে

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক কালে আসামে বাঙ্গালীর উপর যে ব্যাপক নির্যাতন ও অত্যাচার ঘটিয়া গেল, স্বাধীন ভারতবর্ষে তার কোন তুলনা নাই। এই অত্যাচারের মাত্রা ১৯৪৬-৪৭ সালের হিন্দু-মুস্লিম দাঙ্গা কিম্বা ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুর উপর ব্যাপক নির্যাতনের সঙ্গেই তুলনীয়। সেই সমস্ত দাঙ্গার ফলে বাঙ্গালী হিন্দুর যে সর্বনাশ ঘটিয়াছে, আজও আমরা তার ক্ষয় ও ক্ষতি সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যক পরিবারই পুনর্বাসনের সন্তোষকর কোন আশ্বাস পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গে আজ বেকারের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। যদিও আমি সরকারের একজন কঠোর সমালোচক, তবু আমি স্বীকার করিব যে, ক্রমাগত একটির পর একটি করিয়া সমস্যার যে ঢেউ আমাদের ও রাষ্ট্রের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে খুব অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সৎ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও এত বড় দুর্যোগ ও এত বড় বিপদে তাল সামলানো সহজ ছিল না। ইংরাজ শাসনের পর আমাদের দেশে যাঁরা গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্ব লইয়াছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল জেলখানার মধ্যে এবং কারামুক্তির পর আবার নতুন করিয়া আন্দোলন করার মধ্যে। কিন্তু দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, দাঙ্গায়, উদ্বাস্তু আগমনে, বেকার সমস্যার ব্যাপকতায় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের দিনে কি ভাবে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হয়, কিরূপ সততা ও দক্ষতার দ্বারা এই সমস্ত জটিল ও গভীর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়, সেই ট্রেনিং, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার পরবর্তী স্বদেশী শাসকদের ছিল না। সুতরাং পুরানো আমলাতন্ত্রের সঙ্গে নতুন স্বদেশীতন্ত্রের শাসকদিগকে গোঁজামিল দিয়া চলিতে হইতেছে। ফলে, যে কোন সমস্যায় আমাদের সরকারী কর্তৃপক্ষ হাবুডুবু খাইতেছেন। অর্থাৎ কোন সমস্যারই মীমাংসা হইতেছে না।

এই অবস্থার মধ্যে আসামে বাঙ্গালীর বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, যে সম্পর্কে পূর্বাহ্নে পশ্চিমবঙ্গের কোন ধারণা ছিল না। যদিও আমরা জানিতাম যে, আসামে, বিহারে, উড়িষ্যা এবং অন্যত্র বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিরোধিতা আছে। তথাপি উহা এমন নির্লজ্জ ও বীভৎস মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে, এ কথা কল্পনা করা কঠিন ছিল। কারণ ভারতবর্ষের বাইরেও নানা কারণে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশে, মালয়ে, সিংহলে এবং দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় যথেষ্ট বিরূপতা আছে, কিন্তু সেখানেও "বিদেশী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে" এমন সাংঘাতিক ও ব্যাপক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং অত্যন্ত লজ্জা, ঘৃণা ও কলঙ্কের কথা যে, স্বাধীন ভারতের স্বদেশী সরকারের সামনে এই দেশের মানুষই এই দেশবাসীর হাতে প্রচণ্ড মার খাইল এবং স্বদেশের অভ্যন্তরেই নতুন করিয়া উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর সৃষ্টি হইল। আসামের আচরণ ১৯৫০ সালের পাকিস্থানী আচরণের মত—সেই দলবদ্ধ আক্রমণ, লুঠতরাজ, হত্যা, গৃহদাহ, খুন জখম এবং নারীর উপর বলাৎকার—এমন কি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই। আসামের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানী মুসলমানদের যে মনস্তাত্ত্বিক যোগ রহিয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দু নিপীড়নের দ্বারা তাহা আর এক বার হাতে কলমে প্রমাণিত হইল এবং শুনা যাইতেছে যে, আসামের অন্তর্তঃ কয়েকটি স্থানে মুসলমানেরা এই সমস্ত অত্যাচারে যোগ দিয়াছে, সহায়তা করিয়াছে কিম্বা অগ্রণী হইয়াছে। কিন্তু আসামের যে সমস্ত দুর্বুদ্ধিপরায়ণ লোক এ ভাবে পাকিস্থানী মুস্লিমদিগকে উস্কানি ও প্রশ্রয় দিতেছে, তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই খাল কাটিয়া কুমীর আনিতেছে। কারণ আসামের প্রতি পাকিস্থানের লুব্ধ দৃষ্টি রহিয়াছে এবং মনে রাখা দরকার যে, সমগ্র আসাম (শ্রীহট্ট জেলাসহ) প্রদেশই মুস্লিম লীগের দাবীর অন্তর্গত ছিল। অতএব সেই দিক হইতে আসামের কোন দিন বিপদ ঘটিবে না, এই ভরসা যেন অসীমীয়াদের না থাকে।

আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ ও 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন

হইতে আসাম হইতে অনেক দিন ধরিয়া প্রচার করা হইয়াছে যে, বাঙালীরা অসমীয়া ভাষার বিরোধিতা করিতেছে বলিয়াই হাঙ্গামা বাধিয়াছে এবং ফলতঃ বাঙালীরা আসামে 'লুটিয়াপুটিয়া' খাইতেছে। ইদানীং এই দুইটি প্রচারকার্যের ভিত্তিই অন্ততঃ ব্যক্তিদের কাছে নস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। কারণ, এ উপত্যকার যে পাঁচটি জেলা লইয়া "খাঁটি অসমীয়া (অর্থাৎ কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা বাদে) সকার বাঙালীদের অধিকাংশেই অসমীয়া ভাষাকে ভাষা হিসাবে সমর্থন জানাইয়াছে। অথচ এই দীদের উপরেই কিন্তু আসামে গুণ্ডামী ও অত্যাচার হ আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে ারার প্রশ্ন একটা ছুতা মাত্র। আসলে জাতি-

সমাজতন্ত্রের বনেদীকরণ ঘটাইতেছে, তাহা বড় এবং সন্দেহজনক ও চক্রান্তমূলক সম্পর্ক ঘটিয়াছে। অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি, এমন কি পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন ও আসামের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও উপদ্রুত অঞ্চল পরিভ্রমণের পর অন্ততঃ পরোক্ষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, উত্তর আসামে আক্রমণের পদ্ধতি ও গুণ্ডামীর চেহারা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার পিছনে পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান ও নক্সা ছিল এবং সেই নক্সার পিছনে শিক্ষিত ব্যক্তিদের 'মস্তিষ্ক' সক্রিয় ছিল। অন্যথা এত দ্রুত এমন ব্যাপক গুণ্ডামী ঘটিতে পারে না—ট্রাক, মোটর বাস, পেট্রোল, বন্দুক ইত্যাদি কি ভাবে সংগৃহীত হইল এবং পুলিশ এই সমস্ত ট্রাক ও মোটরযানের গতিরোধ করিল না কেন? অতএব কেবল পূর্ব পরিকল্পনাই নয়, প্রশাসনিক স্তরে, রাজনৈতিক মহলে

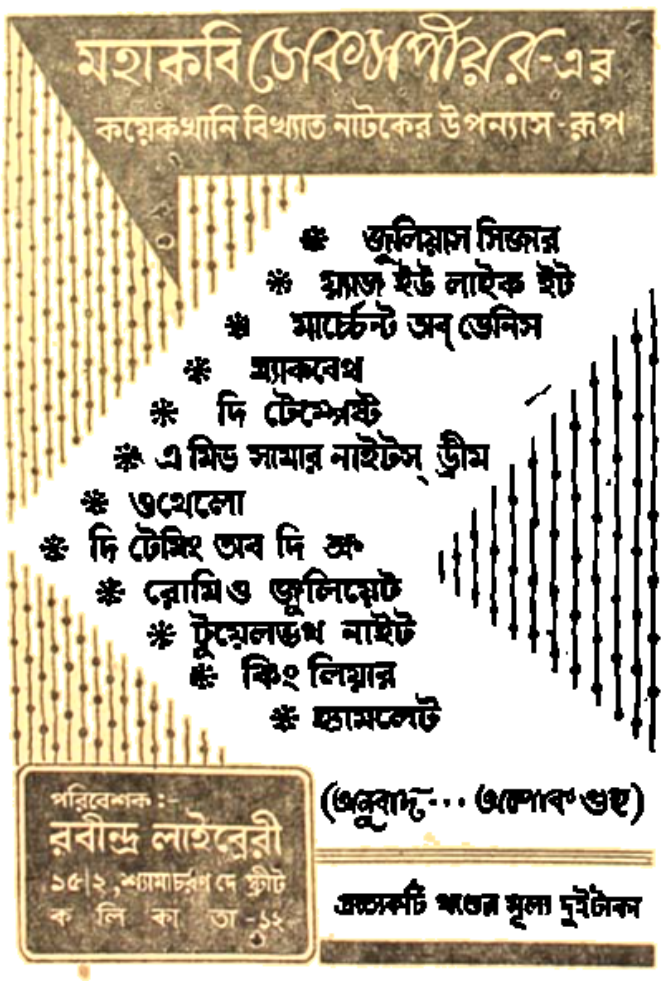

এবং সামাজিক মনস্তত্ত্বে এই আক্রমণ ও গুণ্ডামীর প্রশ্রয় ও সমর্থন ছিল। সুতরাং এই ব্যাধি গভীর এবং মারাত্মক।

কিন্তু প্রাচীন হিন্দু নীতিবাক্যে বলে যে, দুষ্ট লোকে অসৎ কার্য করে, কিন্তু তার ফল ভোগ করে নিরপরাধ। অর্থাৎ আসামের গুণ্ডামীর জন্য বাঙালীর জীবনে নূতন সঙ্কট আসিয়াছে। কারণ, এই অত্যাচারের ফলে আসামের প্রায় ১ লক্ষ বাঙালী দুর্বিপাকগ্রস্ত। ৫০ হাজার নর-নারী আসাম ত্যাগ করিয়াছে এবং আরোও ৫০ হাজার সেখানে বিপর্যস্ত জীবনের সম্মুখীন। আসামে বাঙালীর ভবিষ্যৎ কি?—এই প্রশ্ন যেমন কঠিন, তেমনি পশ্চিম বাঙ্গলাতেই বাঙালীর ভবিষ্যৎ কি, এই প্রশ্ন তেমনি কঠিন। এ কথা পরিষ্কার যে, অসমীয়ারা বাঙালীকে জাতি হিসাবেই অবাঞ্ছিত মনে করে, এমন কি উহাদের মধ্যে একাংশ বাঙালীদের ঘৃণা করে। এবং আসামের রাজনৈতিক নেতারা মনে করেন যে, আসাম একমাত্র অসমীয়াদের জন্য। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে পরলোকগত গোপীনাথ বরদলুইয়ের মত নেতা পর্যন্ত বলিয়াছেন :—

'The newly accepted policy of his government was that Assam was for the Assamese' আসামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীরূপে বরদলুই বলিলেন যে, তাঁর গবর্ণমেণ্টের নীতি হইতেছে এই যে, আসাম একমাত্র অসমীয়াদের জন্য। আসামের গবর্ণর স্যার আকবর হায়দারিও অনুরূপ সুরে এসেম্বলীর উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা দেন এবং তার আগে জুলাই মাসে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ বি, কে, বড়ুয়া আসামের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আসামের সভ্যতা মঙ্গোলীয়, আসাম কোন দিনই ভারতের অংশ ছিল না এবং আসামে আগত প্রত্যেকটি অনসমীয়াই foreigner বা বিদেশী! অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আসামের রাষ্ট্রনেতা ও বুদ্ধিজীবী নেতারা এমন সুরে বক্তৃতা দিতে থাকেন যে, আসাম যেন ভারতবর্ষের বাইরে একটি পৃথক স্বাধীন রাজ্য এবং সেই রাজ্য একমাত্র অসমীয়াদের জন্য। এই ধরণের নিকৃষ্ট ও অতি সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি দেখিয়া স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, অসমীয়াদের বৃহত্তম অংশ এখনও সেকালের tribal বা গোষ্ঠীগত মনোভাবের উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ আসামের ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থাই এজন্য দায়ী। কিম্বা দায়ী তাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁরা আসামের অজ্ঞ, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে ও জাতি-বিদ্বেষের পথে পরিচালনা করিতেছেন। এই জাতি-বিদ্বেষের ফলেই আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে প্লাবিত করিয়াছে এবং অসহায় বাঙালীদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, আসামীদের একটি বৃহৎ অংশ বাঙালী বরদাস্ত করিতে রাজী নহে। ১৯৬০ সালের এই ব্যাপক ও ভয়াবহ দাঙ্গার আগেও ১৯৪৮ সালে গৌহাটিতে এবং ১৯৫৪ সালে ধুবড়ি গোয়ালপাড়ায় দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গৌহাটির দাঙ্গার গুণ্ডামিতে একজন ছুরিকাঘাতে নিহত হয়, ৪০ জন লাঠির ঘায়ে ও বন্দুকের গুলীতে আহত হয় এবং ঘরবাড়ী ও দোকান লুণ্ঠিত হয়। ক্ষতির পরিমাণ সরকারী মতে ৮২ হাজার টাকা। আর ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়া দাঙ্গার জন্য কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীমাধবন নায়ার যে তদন্ত করিয়াছিলেন, তাঁর রিপোর্টটি চাপিয়া দেওয়া হয় এবং গুণ্ডা ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় না। অর্থাৎ আসামে গভর্ণমেণ্ট বা সর্বভারতীয় কর্তৃপক্ষ কেহই এই প্রকার অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য অগ্রসর হইলেন না বরং ইতিমধ্যে আসামের রাজনৈতিক নেতারা এবং কোন কোন তথাকথিত সাহিত্যিক নানা প্রকার পুস্তকে, উপন্যাসে ('মাটি কার', 'আশীর্বাদ', 'বৃষ্টিপাত') ইত্যাদি ও বক্তৃতায় বাঙালী উৎসাদনের জন্য উত্তেজনা ও বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। ফলে, গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা একেবারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে, অসমীয়া ছাত্রদের বৃহত্তম অংশ এই গুণ্ডামীতে অগ্রবর্তী ভূমিকা লইয়াছিল। ফ্যাসিস্ট-সুলভ মনোবৃত্তির দ্বারা এই সমস্ত ছাত্র জাতিবিদ্বেষের পাগলামিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সর্বপ্রকার প্রগতি-মূলক চিন্তা ও গণতান্ত্রিক আদর্শকে পদদলিত করে।

আসামের ছাত্র ও যুবসমাজের এই অধঃপতন ভাবী-কালের আসামকে যে গভীর বিপাকের মধ্যে লইয়া যাইতেছে, এই বোধ পর্যন্ত তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আসামের এই বিপদ্ধ সম্পর্কে অনেকদিন পর্যন্ত সর্বভারতে কোন চেতনা ছিল না। এমন কী বাঙালীদের বিরুদ্ধেই বেশী প্রচারকার্য হইয়াছিল। কিন্তু পর পর কয়েকজন বিশিষ্ট নরনারীর আসাম পরিদর্শন এবং পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন কর্তৃক ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণের পর এক্ষণে আসাম সমস্যার গুরুত্ব অনেকে উপলব্ধি করিয়াছেন। পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক দলগুলিও গোড়ার দিকে ঔদাসীন্য দেখাইতেছিলেন, কিন্তু কলিকাতার জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে জনমত প্রবলভাবে জাগ্রত হওয়ায় এবং রাজনৈতিক দল-বহির্ভূত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহু সভা-সমিতির দ্বারা আসাম সমস্যার গুরুত্ব তুলিয়া ধরায় শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসী-অ-কংগ্রেসী সকলে একজোট হইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার জরুরী অধিবেশন মারফৎ একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা একটি নূতন অধ্যায় এবং এই অধ্যায় রচনার জন্য বিরোধী দলগুলি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রভূত আলোড়নের পর কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ও কেন্দ্রীয় সংসদ জনমতের চাপে পড়িয়া যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন, উহাকে মোটামুটি মন্দের ভালো বলা যাইতে পারে। আইন ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক সংস্কার, বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, আন্তরিকতার সহিত সেগুলি অনুসৃত হইলে কিছু কাজ নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু আমাদের সন্দেহ এই যে কাগজে কলমে ভালো ভালো প্রস্তাব পাশ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলি সততার সংগে পালিত হয় না। বিশেষভাবে শরণার্থীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিতাড়িত বাঙালীদের পুনরায় আসামে গমন ও আশ্রয়লাভ কতখানি সম্ভব হইবে, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সংশয় আছে। কারণ, আসামে আসল ব্যাধি রহিয়াছে উহার সমাজ-মনে, সমাজের বৃহত্তম স্তরে বাঙালীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রহিয়াছে। অসমীয়া সকলকেই ইহারা বহিরাগত ও বিদেশী বলিয়া মনে করেন। সর্বভারতীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনা ইহাদের সামান্যই আছে। একদা মুসলিম লীগের শিক্ষিত শ্রেণী যেমন হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আসামের সংকীর্ণচিত্ততা ও বাঙালী বিদ্বেষও অনেকটা সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং আসাম একমাত্র অসমীয়াদের জন্য এই মারাত্মক মনোভাব আসামের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও দৃষ্টিহীন করিয়া তুলিয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সংখ্যালঘু বাঙালীদের ভবিষ্যৎ আদৌ উজ্জ্বল নহে। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে কিনা, এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। সম্পূর্ণরূপে 'অসমীয়া' না হইলে 'আসাম' রাজ্যে বাঙালীর পক্ষে সসম্মানে টিকিয়া থাকা কঠিন হইতে পারে। কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের যেমন আন্তর্জাতিক সর্ব ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী আছে, আসামের কোন শহরেরই সেই উদারতা ও সর্বজনীন মানবতা-বোধ আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য সৎ লোক উদার লোক এবং বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসমীয়াদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকে আছেন। কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁরা স্বীয় সমাজেই সংখ্যালঘু মাত্র। অন্যথা এতবড় জাতি-বিদ্বেষের ঘটনা কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অত্যন্ত কঠিন। ওখানে বেকার সমস্যা ভয়াবহ। যদি আসামে বাঙালীরা টিকিতে না পারে, তবে তাহারা কোথায় যাইবে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা গভীর উদ্বেগের এবং চিন্তার বিষয়।

ধা রা বা হি ক

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সে আজ অনেক দিনের কথা। বাসিনীর এখনও সে কথা মনে আছে।

মনে আছে তার বিয়ে হয়েছিল। গ্রামেরই একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে যখন হয়, বয়স তখন তার নয় কি দশ। সে নিজেও তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। বিয়ের মর্ম কিছু বুঝতো না।

যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে কিন্তু দেখতে ছিল ভারি সুন্দর। এত সুন্দর যে, তাদের গ্রামে একবার একটা যাত্রার দল এসেছিল, সেই দলের অধিকারী তাকে দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে, তক্ষুনি বলে বসল, চল তুমি আমাদের সঙ্গে।

লোভ সে সামলাতে পারলে না চলেও গেল।

কিন্তু যাত্রার দলের কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে কেন? পারলে না। ছ' মাস পরে ফিরে এলো।

ফিরে এসে বললে সে নাকি সাবিত্রী সাজতো।

এই নিয়ে হাসাহাসি করতো সবাই। মেয়ে সাজতো বলে রাগাতো তাকে।

এ-হেন সাবিত্রী সাজা বরকেও বাসিনীর নাকি পছন্দ হয়নি।

অন্ততঃ বাসিনী সেই কথা বলে বেড়ায়।

বলে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

বলে, 'পছন্দই যদি হবে, আজ তার এমন দুর্গতি হবে কেন?'

আসলে কিন্তু কথাটা মিথ্যা।

বাসিনী ছিল কালো, কদাকার, কুৎসিত। বরেরই তাকে পছন্দ হতো না। এক-একদিন তাকে এমন মার মারতো যে মার খেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে আসতো বাপের বাড়ীতে।

শেষে বাসিনী আর কিছুতেই যেতে চাইলে না বরের কাছে।

বাসিনীর মা অনেক করে বুঝিয়ে বলেছিল। বলেছিল, এর জন্যে তোকে একদিন কাঁদতে হবে দেখিস্।

কিন্তু তখন কি ছাই বুঝেছিল সে-কথা?

মা শেষে নাচার হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'থাক্ তবে তোর বরে কাজ নেই, তুই বাড়ীতেই থাক্।'

বরও তখন প্রতিজ্ঞা করে বললো—পেত্নীটা এ-এসে হাতে পায়ে ধরলেও তাকে সে নেবে না।

সুতরাং পেত্নী তার বাপের বাড়ীতেই রয়ে গেল।

মা বললে, কী আর করবি বাছা, বাড়ীতে বে ধর্ম কর্ম কর্। ঠাকুর-দেবতা খুশী হলে চাই-কি ওই আবার তোর কাছে ফিরেও আসতে পারে।

কিন্তু ধর্ম-কর্ম করবার মেয়ে বাসিনী নয়।

আর কাজ হলো স্বামীকে গাঁজা
পাড়ার পাড়ার ঘুরে বেড়ানো।
যৌবনে পথের থেকে কু ক'রে
হয়, বাসিনী তো মানুষ।
ফেরে একদিন
কাঠে যেন ঘুণ ধরে

একে তার স্বাস্থ্য ছিল ভাল, তার ওপর যৌবনের জৌলুষ। দিকে যারা ফিরেও তাকাতো না, তারাও আজকাল কেমন যেন আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

পাড়ার কয়েকটি দুষ্টু ছেলে একদিন তাকে গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে দেবার নাম করে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর ফিরে যখন এলো, মা দেখলে, ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে নতুন শাড়ীটা বাসিনী ফালি ফালি করে ছিঁড়ে এনেছে।

মা বললে, না মা আর আমি তোকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে যেতে দেবো না।

এই বলে যুবতী মেয়েকে সে তার চোখে চোখে রাখতে লাগলো।

বাসিনী হলো বন্দিনী।

গঙ্গার তীরে বিরাট একটা মেলা বসে। কত দেশ-বিদেশের লোক এসে গঙ্গায় স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় ক'রে যায়। বাসিনীদের গ্রাম থেকে মেলাটা মাত্র আট ক্রোশের পথ।

বাসিনী তার মাকে ধরে বসলো—'চল মা, আমরাও আজ গঙ্গায় স্নান ক'রে আসি'।

মেয়ের হয়তো ধর্মে মন বসেছে ভেবে মা অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলো। বললে,—'চল'।

এবং তারপর দিন-গ্রাম থেকে আরও কয়েকজন সঙ্গী জুটিয়ে গরুর গাড়ীতে চ'ড়ে তাঁরা গঙ্গায় স্নান করতে গেল।

গঙ্গায় স্নান ক'রে, মেলা দেখে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে অবার তারা সন্ধ্যেবেলায় গাড়ী ছেড়ে দিয়ে রাত্রের প্রথম প্রহরেই গ্রামে এসে পৌঁছবে—এই ছিল কথা। গঙ্গায় স্নান করে তারা সবাই মিলে মেলার ভেতর দোকান-পাট দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ এক সময় বাসিনীর মায়ের চমক হলো—পেছন ফিরে তাকিয়ে ডাকলে, 'বাসিনী!

যারা সঙ্গে ছিল সকলেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। কিন্তু কোথায় বাসিনী?

স্নান ক'রে এক পিঠ চুল এলিয়ে দিয়ে চওড়া লাল পাড় কাপড় পরে মেলায় ঢুকবার সময় বাসিনীকে তারা তাদের সংগেই দেখেছে, তারপর সে আসছে কি না—সেদিকে ততটা আর কেউ লক্ষ্য করেনি। চারিদিকে লোকজনের ঠেলাঠেলির মধ্যে নিজেকে নিয়েই সকলে ব্যস্ত, পেছনে কেউ পড়ে রইলো কিনা ফিরে দেখবার অবসরই-বা কোথায়!

বাসিনীর মা বললে,—'না মা, বরাবর সে আমাদের সংগেই ছিল। সোমত্ত মেয়ে, একদণ্ড আমি তারে চোখের আড়াল করি না।'—বলে সে খোঁজা-খুঁজি আরম্ভ করলে।

সংগে পুরুষ মানুষ যে দু'জন ছিল তারাও খুঁজতে লাগলো।

কিন্তু বহু সহস্র লোকের এই হট্টগোলের মাঝখানে স্বেচ্ছায় যে মেয়ে হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বের করা বড় শক্ত।

সন্ধানের বাকী কিছু রইলো না। এদিকে রাত হয়ে গেল। সমস্ত দিন মা খেয়ে গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাসিনীর মা অনেকক্ষণ থেকেই কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। বললে,—'তোমরা যাও মা, আমি আর একলা কোন্ মুখে বাড়ী ফিরে যাব? আমি যাব না।'

কিন্তু গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা তাকে ছাড়লে না, অনেক ক'রে সান্ত্বনা দিয়ে, পোড়ারমুখী বাসিনীর মুখে আগুনের ব্যবস্থা ক'রে, মাকে তার এক রকম জোর ক'রেই গ্রামে ফিরিয়ে আনলে।

পুলিসের লোক বলেছিল,—'মেয়েটির সন্ধান পেলে দু' এক দিনের মধ্যেই তারা সংবাদ পৌঁছে দেবে।'

কিন্তু দু'দিনের জায়গায় সপ্তাহ পার হয়ে গেল, সংবাদ যখন পৌঁছুল না, তখন সকলে মিলে এই কথাই বলাবলি করতে লাগল যে, বাসিনী নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ

হয়েছে। কথাটার মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু নেই, তবু বাসিনীর মা বললে,—'কখ্খনো না। মেয়ে আমার সে রকম মেয়ে নয়।'

তা সে যেরকমই হোক,—মেয়ে আর ফিরলো না।

তারপর জীবনে তার সে এক নূতন অধ্যায়। কোথায় গিয়ে কেমন ক'রে দিন কেটেছে, একটি একটি ক'রে সে সব কথা বলতে গেলে সে এক বিরাট ব্যাপার হয়ে পড়বে, সুতরাং সে চেষ্টা আমরা করব না। আর সে-সব তেমন ভাল কথাও নয়।

তবে একটা কথা যে তার এই নূতন জীবনে এসে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে সে একা। এত বড় এই পৃথিবীতে তার আপনার জন বলতে তার আর কেউ কোথাও নেই। ভবিষ্যতে তার এই দেহের যৌবন ফুরিয়ে গেলে যখন সে দেউলে হয়ে পড়বে কে যে তাকে দেখবে—কে জানে। ভুলেও কেউ হয় তো একবার তার মুখে এক ফোঁটা জল দিতেও আসবে না।

তাই সে ভগবানের কাছে বারে বারে ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছে,—'হে ঠাকুর! পেটে যেন তার একটি মেয়ে হয়!'

প্রার্থনা ভগবান তার পূর্ণও করেছেন। তার একটি মেয়ে হয়েছে।

আমরা আবার যখন তাকে পনেরো-কুড়ি বছর বাদে দেখলাম, মেয়ে তার বড় হয়েছে। এবং যে-সে মেয়ে নয়, সুন্দরী মেয়ে। এমন মায়ের যে এমন মেয়ে হতে পারে ছায়াকে না দেখলে তা বুঝবার জো নাই।

বাসিনী তাকে শিক্ষিতা করে তুলতে চায়। বেশ্যার মেয়ে ইস্কুলে ভর্তি করবে না, তাই সে বাড়ীতে মাষ্টার রেখে ছায়াকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, গান শেখাচ্ছে।

বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বলে, 'তোর আর ভাবনা কি বাসিনী, তোর অমন সুন্দরী মেয়ে, তুই ত এবারে পায়ে পা দিয়ে বসে বসে খাবি ভাই।'

বাসিনী বলে,—'না ভাই, ওকে আমি আর এ পথে পা বাড়াতে দিচ্ছিনি, ওর বিয়ে দেব।'

মেয়েরা এই নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে থাকে। বলে, 'শামুলে—খান্! অমন সবাই বলে। দাঁড়া আর একটু বড় হোক্!'

বাসিনী সে সব কথায় কান দেয় না। মেয়েকে কাছে ডেকে আদর ক'রে তাকে বুকিয়ে বলে, কষ্ট করে তোকে মানুষ করলাম মা, এ পাপের পথে তুই যেন আর নামিস্ নি।'

ছায়া ঘাড় নেড়ে বলে,—'না মা, তুমি দেখে নিও।'

বাসিনী বলে, নিজের সুখের জন্যে তোকে আমি—

এই পর্যন্ত বলে বাসিনী থেমে যায়। কথাটা ক'য় শেষ করতে না পেরে বলে, 'থাক্। তোকে আমি ভাল ক'রেই রাখবো মা,—তাতে আমার যত কষ্টই হয় হোক্।'

মেয়ের জন্য কষ্ট তাকে সত্যিই করতে হয়। রোজগারের দিন তার গত হয়েছে। এখন ভাঙনের দশা। একে তো চেহারা তার কোন দিনই ভাল ছিল না, তার উপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এখন আর তার কিছুই নেই। পোড়া কাঠের মত দেহখানা তার রোগে রোগে জরাজীর্ণ হয়ে অদ্ভুত রকম লম্বা হয়ে পড়েছে, চোখ দুটো কোটরে বসেছে এবং বিগত দিনে যে কুঞ্চকুঞ্চিত আজানুলম্বিত অলক দাম তার একমাত্র গৌরবের বস্তু ছিল, আজ আবার তাও নেই।

সুন্দরী না হোক্, কুড়ি বাইশ বছর বয়সে তার স্বাস্থ্য ছিল অটুট। সেই সময় কোথাকার হিন্দুস্থানী কয়লার ব্যবসাদার তাকে পশ্চিমের শহরে নিয়ে গিয়ে প্রায় বছর-চারেক ধরে স্ত্রী-পুত্রের মত বাস করে এবং সেই ব্যবসাদার ভদ্রলোক মোটা-রকমের কিছু টাকা রেখে তারই কাছে যায়। বাসিনী যদি ওই টাকাগুলো না পেতো তাহলে আজ হয়তো তাকে ওই মেয়ে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হতো। যক্ষের ধনের মত টাকাগুলো বাসিনী তার দুর্দিনের জন্য প্রাণপণে আগলে রেখেছে। ছায়াকেও সেকথা সে জানতে দেয়নি।

দোতলার যেসব মেয়ে বাস করে তারা জানে বাসিনী গরীব। তার আবার রূপ নাই, কাজেই তার দিন চলা ভার।

সকলেই তাকে তাই কৃপার চোখে দেখে। কেউ বা কোনদিন তাকে খাওয়ায়, কেউ বা একটোঙা খাবার তার হাতে দিয়ে বলে, মেয়েকে খাওগে যাও।'

আবার কখনও বা তাকে ডাকাতেও হয় না। কারও ঘরে হয়তো গান-বাজনার মজলিস বসেছে, বাবু হয়তো গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাচ্ছেন, ঘন-ঘন পান আসছে, সিগারেট আসছে, খাবার আসছে, হাসি ও কথার হর্রা ছুটছে, আনন্দেরও অন্ত নাই, স্ফূর্তিরও অন্তন নাই,—এমন সময় দরজা ঠেলে বাসিনী হয়তো ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অপরিচিত বাবু হয়তো এই কুৎসিত মেয়েটাকে এমন অনাহূতভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে রেগে উঠলেন। গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নেশার ঝোঁকে টেনে বলতে লাগলেন, 'কে এই পি, ই, টি, এন, আই, বাবা? এখানে এই অসময়ে কি হেতু আগমন হলো শুনি? নেশাটি চটিয়ে দেবার জন্যে?'

সেদিন ঠিক এমনি একটা ঘটনা বিন্দির বাড়ীতে ঘটেছিল। বিন্দি তার বাবুর কানে কানে বললে—'চুপ করো। ওকে আমিই ডেকেছি। বেচারা ভারি গরীব। রোজগার-টোজগার বুঝতেই তো পারছো।'

বাবুটি হেসে একবার চোখ তুলে বাসিনীর দিকে তাকাল। বললে, 'হুঁ—তা ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

কথাটা যে তারই উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে বাসিনী তা বুঝতে পারলে। আজকাল ওগুলো তার গা-সওয়া হয়ে গেছে! প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কতলোকে যে তার চেহারা নিয়ে বিদ্রূপ করছে তার আর অন্ত নেই।

বাসিনী বললে, 'তোমার একটা পান আমি খাবো বিন্দাবনী?'

বিন্দি বললে, 'দাঁড়া ভাই, পান একটু পরে খাবি। এই বলে গেলাসে এক গেলাস মদ ঢেলে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে খাবারের প্লেটগুলো সে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—'খা। আগে খেয়ে নে ভাই এইটে—তারপর পান খাবি।'

ছাড়া বড় হবার পর থেকে বাসিনী আর ওগুলো পেলেও বড় একটা খেতে চায় না। কিন্তু সেদিন তার কি যে হলো, বহুদিন পরে প্রাণপণে খুব খানিকটা মদ গিলে তাদের সংগে নিজেও সে মাতাল হয়ে পড়লো।

মাতাল হয়ে বাসিনী কাঁদতে আরম্ভ করলে।

একবার বিন্দির বাবুর পায়ে ধরে, একবার বিন্দির পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগলো—'ব্যবস্থা একটা তোমরা আমার করে যাও ভাই, নইলে আমি ঝাঁপ দিয়ে মরব।'

বাবুটি জিজ্ঞেস করলেন,—'কি ব্যবস্থা করতে হবে?'

বাসিনী বললে, 'আমার মেয়ের ব্যবস্থা বাবু, আমি আর ওকে এপথে আসতে দেবো না।'

বিন্দি বললে, 'সেকি লা! তুই খাবি কি? তোকে দেখবে কে? অমন তুই করিসনি বাসিনী, কষ্টে পড়বি।'

বাসিনী বললে, 'তা হোক কষ্ট ভাই আমি ভিক্ষে করে খাব।'

বাবুটি শুনেছিলেন বাসিনীর মেয়ে খুব সুন্দরী, চমৎকার গান গায়, লেখাপড়াও একটুখানি জানে। বললেন, 'মেয়েকে একবার এখানে নিয়েই এসো না বাপু, দেখাই যাক্—কিরকম মেয়ে।'

বাসিনী বললে—'না দাদাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে আমি এখানে কিছুতেই আনবো না।'

বিন্দি হেসে উঠলো। বললে, 'মেয়েকে ও তালাচাবি বন্ধ করে রাখে, তা জানো।

এই নিয়ে তাদের হাসাহাসি চলতে লাগল।

বাসিনী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আসি ভাই—তোরা বোস্।'

বিন্দির হাসি তখনো থামেনি। বাবু তার গলায় কাপড় জড়িয়ে নেশার ঝোঁকে বাসিনীর উদ্দেশ্যে সেখানেই একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, 'আসুন।'

বাসিনী টলতে টলতে সিঁড়ি ধরে নীচে নামলো। ভাবলে, এমন মত্ত অবস্থায় মেয়ের কাছে যাওয়া তার উচিত হবে না। তাই সে আবার সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। দেখলে, দোতলার প্রত্যেকটি ঘরের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শীতের রাত, বাইরেও কাটানো চলে না। ঘরে তাকে যেতেই হবে। ভাবলে ছাড়া এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। সেও চুপ করে একপাশে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু তার দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই বাসিনী দেখলে কে যেন একটা লোক এতক্ষণ তারই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সংগে কথা বলছিল। তাকে দেখতে পেয়েই অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লো লোকটা।

আঁচলের খুট থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বাসিনী দেখলে, মেয়ে তার লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আলোটা যেমন জ্বলছিল, তেমনিই জ্বলছে। বাসিনী ডাকলে, 'ছায়া'—

ছায়ার কোন সাড়া পেলে না, আবার ডাকলে।

ছায়া তবুও নিরুত্তর।

তারপর আবার একবার ডাকতেই ছায়া বললে, 'কি?' ঘুমন্তের কণ্ঠস্বর বলে মনে হলো না কিন্তু।

বাসিনী জিজ্ঞেস করলে, 'জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কে কথা বলছিল রে?'

ছায়া যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে, 'কোথায়? কোন্ জানলায়? তা আমি কেমন করে জানবো?'

বাসিনী বললে, 'আমি দেখলাম যে!'

ছায়া বললে,—'দেখলে তো আর জিজ্ঞেস করছ কেন মা?'

বলে সে লেপটি ভাল করে তার গায়ের ওপর টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

ছায়াকে ধাইয়ে বাসিনী উপরে গিয়েছিল, কাজেই তার কথাটাকে না বাড়িয়ে সেও শুয়ে পড়ল।

ছায়া রীতিমত বড় হয়ে উঠেছে। বিয়ে যদি তার দিতেই হয় তো এই সময় দেওয়া উচিত। বাসিনী পাত্রের সন্ধান করতে লাগল।

কিন্তু পাত্র পাওয়া বড় শক্ত। মেয়ে তার যতই সুন্দরী হোক্, কোন ভদ্র-ঘরের ছেলে তাকে বিয়ে করবে না। তাদের সহধর্মী কোনও মেয়ের যদি একটি ভাল ছেলে থাকে ত তারই সংগে ছায়ার বিয়ে দিতে হবে।

দু-একটি ছেলের সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু কাকেও বাসিনীর পছন্দ হলো না।

না হবারই কথা। ছেলেগুলো দেখতে যেমন, তাদের স্বভাব চরিত্রও তেমনি। লেখাপড়াও কেউ শেখেনি, রোজগারও কেউ করে না।

তবু সে সন্ধান করতে থাকে। গঙ্গার ঘাটে মেয়েকে নিয়ে বাসিনী স্নান করতে যায়। যার সংগে আলাপ পরিচয় হয়, তাকেই তার মেয়ের বিয়ের কথা বলে। বলে—'যদি ভাই ভাল একটি ছেলে থাকে তোমাদের সন্ধানে ত আমায় জানিয়ো।'

কেউ বা জানায়। কেউ বা জানায় না। কিন্তু সবই সমান।

বিন্দি বলে.—'ওসব মতলব তুমি ছাড়ো বাসিনী। মেয়ের বিয়ে যদি দাও ত তোমার দুর্গতির কিছু বাকী থাকবে না।

বাসিনী বলে—'তা ভাই আমার দুর্গতি হয় হোক। সে বরং ঢের ভালো, তবু মেয়ের দুর্গতি আমি সইতে পারবো না।'

বিন্দি হাসে। বলে, 'এপথে এসে তোমার কষ্ট হয়েছে বলেই যে তোমার মেয়েরও কষ্ট হবে তা তুমি ভেবোনা বাসিনী। তোমার রূপ বলতে কিছুই ছিল না,—আর তোমার মেয়ের রূপ আছে।'

কিন্তু বাসিনী সেকথা কিছুতেই বুঝতে চায় না। বলে,—'না ভাই, রূপ থাক্ আর নাই থাক্,—আমাদের সাতপুরুষে চোদ্দপুরুষে এসব কিছু ছিল না, এসব আমাদের সইবে কেন ভাই? আমি হতভাগী ভুল করে এসেছিলাম, সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

যাই হোক্, শেষে বিন্দিই একটি ছেলের সন্ধান করে দিলে। ছেলেটি ভাল। দেখতেও সুন্দর, সামান্য কিছু লেখা পড়াও জানে। ছেলের মা ও দিদি নাকি অনেক পয়সা রেখে গেছে। কলকাতা শহরে দুখানা বড় বড় বাড়ির মালিক। ছায়াকে তার সংগে মানাবেও চমৎকার।

বাসিনী এতদিন পরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। সেই মাসেই ভাল একটি দিন দেখে তার সংগে মেয়ের বিয়ে দিলে।

স্বামীর ঘর করতে যাবার সময় ছায়া খানিকটা কাঁদল। জামাই বললে, 'আপনার মেয়েকে কিন্তু আমি আর এখানে পাঠাবো না মা, আপনি বরং নিজে আমার বাড়ী গিয়ে মাঝে মাঝে দেখে আসবেন।'

বাসিনী সত্যিই সুখী হয়েছে। এমন বাড়ীতে যে সে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে সে তা ভাবেনি। ছায়ার যেমন স্বামী—তার তেমনি বাড়ী। বাসিনী নিজে একদিন গিয়ে দেখে এলো।

ছায়ার [illegible] থেকে প্রত্যহই
তাঁর ভাল খাবার তৈরী করে ছায়া
পাঠিয়ে দেয়।

সেসব খাবার অবশ্য বাসিনী নিজে খায় না। বাড়ীতে যতগুলো মেয়ে আছে, সবাইকে দেয় আর বলে,—'মেয়েকে তোমরা ভাই অনেক খাইয়েছ। আজ তোমাদের আশীর্বাদে মেয়ে আমার সুখে আছে।'

বিন্দি তো সে কি বলে ধন্যবাদ দেবে খুঁজে পায়না। যখনই তার সঙ্গে দেখা হয় তখনই তার মেয়ের কথা পেড়ে বসে। বলে,—'ভাগ্যিস ভাই ছেলেটির খবর তুই দিয়েছিলি! কিন্তু আখ্ তোরা আমায় কত বারণ করেছিলি ভাই, কারও বারণ আমি শুনিনি। আমি জানি যে, ওসব আমাদের সয় না।'

এই বলে খুব খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বলে, 'এবার আমার মরণ হলেই বাঁচি, আর আমার মরতে কোন দুঃখ নেই ভাই।'

বিন্দি বলে, দাঁড়া-না-লো দাঁড়া, এখনই মরবি কি! ছায়ার ঘর সংসার হো!

বাসিনী হেসে বলে, সাধ তো হয়, কিন্তু ততদিন কি আর বাঁচবো ভাই!'

কিন্তু ছায়ার ঘর সংসার ছেলেপুলে হবার আগেই বিধাতা বাদ সাধলেন।

তখন বর্ষাকাল। বাইরে ঝমঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের ভেতর একা বসে বসে বাসিনী তার মেয়ের কথাই ভাবছিল, এমন সময় পায়ের শব্দে মুখ তুলতেই দেখলে, তারই মেয়ে-জামাই ঘরে ঢুকছে। মেয়েকে তার এখানে আনবার কথা নয়, তবে সে আজ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এল কেন জানবার জন্যে কি যেন সে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, জামাই বললে, 'এই নিন্, আপনার মেয়ে।'

এই বলে সে ছায়াকে তার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিলে। বাসিনী দেখলে, ছায়া কাঁদছে।

বাসিনী বললে, 'কেন বাবা? কি হলো বাবা?'

জামাই বেগেই ছিল, তেমনি কঠোর কণ্ঠেই জবাব দিলে, 'কি বলো ওকেই জিগ্যেস্ করবেন। ছি-ছি-ছি-ছি, ওর স্বভাব-চরিত্তির এত খারাপ জানলে বিয়ে কি আমি করতাম কখনো? এত ভালবাসলাম এত সুখে রাখলাম, কিন্তু ছিঃ, ছাতার যে কু—'

কথাটা সে আর শেষ করলে না, কারণ ঘেন্নাটা তাহলে নিজের গায়েও লাগে। জামাই আর অপেক্ষা করলেনা। যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল।

বাসিনী ছুটে তার পেছনে গিয়ে জামাইয়ের হাতখানা চেপে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু জামাই তখন রাগে থর্থর্ করে কাঁপছে। হাতখানা তার সরিয়ে দিয়ে বললে, 'না, আর কোন কথা নয়, কোন সম্পর্ক ওর সঙ্গে আর রাখতে চাইনা। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।'

দরজায় মোটর দাঁড়িয়েছিল, জামাই গিয়ে তাতে চড়ে বসলো। গাড়ী ছেড়ে দিলে। তবুও সে তার শাশুড়ীর দিকে ফিরে চাইলে না।

বাইরে তখনো অঝোরধারে বর্ষণের বিরাম নেই রাস্তার ধারে একটা গ্যাসের আলোর কাঁচের গা বেয়ে বৃষ্টি ধারা দর্দর্ করে ঠিক অশ্রুর মতই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। দরজার পাশে বসে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবতে ভাবতে বাসিনী তাই দেখতে লাগলো।

ভাগ্যিস্ বৃষ্টি পড়ছিল তাই রক্ষা। দরজায় সে সময় কোন মেয়েও দাঁড়িয়েছিল না। তা নইলে তার এই এত আদরের কন্যার এতবড় একটা কলঙ্কের কাহিনী কারো কাছে, কোন রকমেই সে চেপে রাখতে পারতো না, যে মেয়েকে নিয়ে এই কাল পর্যন্ত বাসিনী এত অহঙ্কার করেছে আজ সে একটা দুরপনেয় কলঙ্কের কালি মুখে মেখে স্বামীর ঘর থেকে চিরদিনের জন্যে বিতাড়িত হয়ে আবার তারই কাছে ফিরে এসেছে, সেকথা যেমন করেই হোক্ চেপে তাকে রাখতেই হবে।

বাসিনী বললে, 'জামাই কোথায় যেন যাবে ভাই কিছুদিনের জন্যে, একা বাড়ীতে মেয়েটা আর কার কাছেই বা থাকবে, তাই ওকে আমার কাছেই দিয়ে গেল।'

মিথ্যে এই গল্পটা বানিয়ে বলতে গিয়ে বাসিনীর গলার আওয়াজটা ধরে এলো। মনে হতে লাগল—ধরণী দ্বিধা হও! এই মুহূর্তে তার যদি মৃত্যু হয় তো সেও বরং ভালো!

বাসিনীর লজ্জার আর অবধি রইলো না। ছায়াকে

তিরস্কার করতে গিয়ে নিজেই সে ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললে।

বাসিনী ঠিক করলে এবাড়ীতে সে আ কবে না। এপাড়া থেকে বহুদূরে কোথাও একখানি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে ছায়াকে নিয়ে সেখানেই গিয়ে বাস করবে।

বাড়ীর সন্ধান সে করতে লাগল।

রবিবার দিন মায়ে-ঝিয়ে গঙ্গাস্নান করতে চারিদিকে অসংখ্য লোকজনের জনতা। গঙ্গার ঘাটে যাবার রাস্তাটার দু'পাশে মেলা বসেছে। পথ চলতে চলতে ছায়াকে তিরস্কার করছিল বাসিনী; 'ছি, ছি, এত করে তোকে লেখাপড়া শেখালাম, এত সাবধান ক'রে রেখে ভাল দেখে বিয়ে দিলাম, শেষে কিনা যা ভয় করলাম তাই হলো? তোকে আর কি বলবো মা,—আমার অদৃষ্ট, তোর কোনও দোষ নেই।'

ছায়া আজকাল কথা একরকম বলেনা বললেই হয়। গম্ভীর ভাবে চুপ করে থাকে। কিছুই যেন সে জানেনা, —এই রকম ভাব।

সেদিনও তেমনি সে চুপ করেই সব শুনলো।

গঙ্গার ঘাটেও অসংখ্য মেয়ের ভিড়। শুকনো কাপড় আগলে রাখা দরকার। কে আগে স্নান করবে ভেবে বাসিনী ইতঃস্তত করছিল। ছায়া বললে, 'তুমি যাও, আগে ডুবটা দিয়ে এসো।'—তাই হলো। কাপড় আগলে ছায়া দাঁড়িয়ে রইলো। আর বাসিনী গেল স্নান করতে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! বাসিনী স্নান করে এসে দেখে, ছায়া নেই। দু'জনেরই দু'খানা শাড়ী সেখানে নামানো রয়েছে মাত্র।

মাথাটা ঘুরে গেল বাসিনীর। তবে কি সে পালালো নাকি? ডাকলে,—'ছায়া! ছায়া!'

ভিড়ের মধ্যে শুকনো কাপড় হাতে নিয়ে ভিজে কাপড়েই বাসিনী খানিকটা ছুটোছুটি করলে, ছায়াকে কোথাও খুঁজে পেলে না।

ঠিক এমনি আর একটি দিনের কথা বাসিনীর মনে পড়লো। বহুদিন আগে গঙ্গার ঘাটে সেদিনও এমনি মেলা বসেছিল। মকর সংক্রান্তির মেলা। আজও তার সম্মুখে সেই গঙ্গা। গঙ্গার তীরে তেমনি জনারণ্য। তেমনি

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

বিভূতিভূষণ

পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতির যথার্থ মূল্যায়নের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক ও প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ এম. এ., পি. আর. এস., বিভূতিভূষণ সম্পর্কে সেই আলোচনারই অবতারণা করেছেন এই বই-এ। বিভূতি-ভূষণের জীবন দর্শন ও সাহিত্যের ক্রম বিবর্তনের ধারা ও বিশ্লেষণ লেখকের বিরল লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। দাম: পাঁচ টাকা

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

নজরুলের কবিসত্তা নীহারিকাপুঞ্জ বিশেষ। কিন্তু নজরুল তো শুধু কবিই নন, শুধু রাজনীতিক নন, একটি আশ্চর্য মানুষও। সে মানুষটি কেমন, তাঁর জীবনটাই বা কেমন, যা থেকে একাধারে কাব্যের এই নক্ষত্র বেগ আর ললিত রাগিনী সম্ভব? পাঠকের এ অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক। নজরুলের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সহজ সরল ভাষায়, নজরুলের জীবনের অনেক অজানা তথ্যের উপর আলোকপাত করেছেন। নজরুলের একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ ছবি এ গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। দাম: চার টাকা

বিমলচন্দ্র ঘোষের

রক্তগোলাপ

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কবির আধুনিকতম কবিতাবলীর রুচিরম্য সংকলন গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট এ্যান্টিক কাগজে ছাপা ও চার রঙা প্রচ্ছদ।

দাম: আড়াই টাকা।

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী: ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন: ৫৫-৪৪২৫

সে নিজে পালিয়েছিল—আজ

সেইদিন থেকে বাসিনীর পেটে খাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই। পথে-বিপথে দিনরাত শুধু সে পাগলের মত ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়ায়।—কোথায় ছায়া? কোথায় তার সেই কলঙ্কিনী মেয়ে? ফিরে আয় মা,—ফিরে আয়! তিরস্কার তোকে আমি আর করবনা মা, তুই শুধু ফিরে আয়!

বিন্দি সেদিন জিগ্যেস করলে, 'ছায়া আবার কবে শ্বশুরবাড়ী গেল বাসিনী?'

বাসিনী বললে,—'হ্যাঁ, গেছে।' বলে পাগলের মত জলভরা চোখে সে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তারপর একদিন এক গভীর রাত্রে সঞ্চিত টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে বাসিনী সে বাড়ী ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াল, কোথায় গেল—কেউ কিছুই জানলে না।

সুদীর্ঘ তিনটি মাস যেখানে সেখানে কাটিয়ে একদিন সন্ধ্যে বেলায় দক্ষিণ কলকাতার এমনি একটি বারাঙ্গনা-পল্লীর পথে পথে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কন্যার অনুসন্ধান তখনও তার শেষ হয়নি। সহসা একটা মস্ত বড় বাড়ীর সুমুখে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দোতলার একটা ঘরে কে যেন গান গাইছে। গান এমন অনেকেই গায়, কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে কেমন যেন সন্দেহ হতেই বাসিনী বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লো। সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি ওপরে উঠে গিয়ে যে ঘরে গান হচ্ছিল তারই একটা জানালার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। জানালায় রঙিন একটা পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে সহসা কিছুই দেখবার উপায় নেই। হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে পর্দাটা একটু ফাঁক করতেই তার সেই সন্ধানরত উদ্‌গ্রীব, দুটো ব্যাকুল চোখের সামনে যে দৃশ্য ফুটে উঠলো তা যে সে কোনদিন নিজের চোখে দেখবে তার কল্পনাও করতে পারেনি। দেখলে, যার জন্যে এতদিন পথে পথে ঘুরে মরেছে সে, বহু মূল্য বসনে ভূষণে সুসজ্জিতা তারই সেই পরমাসুন্দরী কন্যা ছায়া—দেবী প্রতিমার মত বসে বসে গান গাইছে আর তার রূপমুগ্ধ ভক্তের দল কেউবা তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে, আর কেউ-বা একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। ছায়া তার রক্তের ঋণ পরিশোধ করছে কিনা তাই-বা কে জানে!

প্রহসন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বড়গোছের একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লেখবার উদ্যোগ করছিল সুকুমার। দাঁতে কলম কামড়ে ধরে বার্টরান্ডের একটা টক্কিকে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে —এই সময় দরজায় কড়া নড়ল।

—আঃ, জ্বালাতন।

দরজা খুলতেই দুজন ভদ্রলোকের আবির্ভাব হল। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের ভেতরে বয়েস। ভাদ্রের গুমোট গরমে ঘামে নেয়ে উঠেছেন দুজনেই, মনে হল অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছেন ওঁরা।

—আপনিই সুকুমারবাবু? অধ্যাপক সুকুমার গুপ্ত?

—আজ্ঞে হাঁ।

—নমস্কার। একটু বিশেষ দরকারে আপনার কাছে আসতে হল।

—নমস্কার। বসুন।

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে পাখার রেগুলেটারটা শেষ পর্যন্ত ঠেলে দিলে সুকুমার। দার্শনিক প্রবন্ধটাকে আপাতত নির্বাসন দিতে হল ড্রয়ারের মধ্যে। খানিকটা ভদ্রতার হাসিও ফোটাতে হল ঠোঁটে।

ভদ্রলোকদুজন ততক্ষণে আসন নিয়েছেন। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে সুকুমার বললে, বলুন, কী করতে পারি আপনাদের জন্যে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে একজন বললেন, আপনাকে আমাদের একটা মিটিঙে যেতে হবে ডক্টর গুপ্ত।

—মিটিং?

—আজ্ঞে। একটা সাহিত্যসভা।

—সাহিত্যসভা? —সুকুমার হাসল: সাহিত্যসভায় আমায় কেন? আমি তো সাহিত্যিক নই।

—কে বলে সাহিত্যিক নন? প্রায়ই তো প্রবন্ধ লেখেন নানা কাগজে। এই তো সেদিনই দেখলাম বৌদ্ধ অস্তিবাদের ওপর—

সুকুমার হাসল: সর্বাস্তিবাদ।

—ওই হল।—ভদ্রলোক একটু লজ্জা পেলেন: মানে আমি আবার সাহেব ঘেঁষে—কী বলে আপনাদের ওসব ফিলসফি-টিলসফি আবার তেমন আসে না। কিন্তু যাই বলুন, নামডাক আপনার খুব।

—তাই নাকি?—মুখের ওপর মৃদু হাসির রেখাটা টেনে রেখেই সুকুমার বললে, কিন্তু আমার প্রবন্ধ বোধ হয় কেউ পড়ে না। পাতা উল্টে চলে যায়।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বোধ হয় খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েই উঠেছেন এতক্ষণে। এবার তিনিই গলা বাড়িয়ে দিলেন।

—এ আপনি রাগের কথা বলছেন স্যার। আমরাই না হয় আপনার লেখা বুঝতে পারি না—কিন্তু আমাদের ক্লাসে অনেক সীরিয়াস আর পড়ুয়া ছেলে আছে। আপনার লেখার খুব তারিফ করে তারা। তাদের তাড়াতেই আমরা আপনার কাছে এসেছি।

মনে মনে একটু প্রসন্ন হল সুকুমার। এই মুহূর্তে সে ভুলে যেতে পারল, তার প্রবন্ধের বইখানা গত দু-বছরে একশো তেইশ কপি মাত্র বিক্রি হয়েছে এবং প্রকাশকের মুখের চেহারা দেখে অনুমান করা শক্ত নয় যে ষাবচন্দ্র দিবাকরৌ। তিনি সুকুমারের দ্বিতীয় বই ছাপতে রাজী হবেন না।

৬

যতদূর মনে পড়ছে বছর

—আমাদের ক্লাবের বয়েস আর পঁচিশ বছর। —প্রথম ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন : রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন থেকে শুরু করে বাসন্তী-পঞ্চমী পর্যন্ত আট দশটা ফাংশন বছরে লেগেই আছে। কোনো সাহিত্যিকই আর বাকী নেই, কারে কারো দু-তিনবার পর্যন্ত হয়ে গেছে। তাই—

—তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই ধরছেন? সভাপতিদের লিস্ট ফুরিয়ে গেছে বলে?

—ছি—ছি—কী যে বলেন!—দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রায় আধ হাত জিভ কাটলেন : না, না, তা নয়। এবার একটু সীরিয়স আলোচনা শুনতে চায় লোকে। সেই জন্যেই আপনাকে নিয়ে যাওয়ার স্পেশাল রিকোয়েস্ট এসেছে।

—কিন্তু আমি তো দর্শন ছাড়া কিছুই জানি না।

—বেশ তো, তাই-ই বলবেন।

সুকুমার গম্ভীর হল।

—একটা জিনিস আগে আমার জানা দরকার।

বিনীত বৈতকণ্ঠ শোনা গেল : বলুন—বলুন—

—কাছাকাছি ইটের পাঁজা নেই তো? আর ডিমের আড়ত?

—তার মানে?—অকৃত্রিম বিস্ময় দেখা দিল ভদ্রলোকদের মুখে।

—মানে, বক্তৃতা শুনতে শুনতে শেষে পচা ডিম আর খান ইট যদি শ্রোতারা আমায় উপহার দিতে থাকেন—

রসিকতাটা বুঝতে পেরে ভদ্রলোকেরা অট্টহাস্য করলেন। বললেন, না স্যার, অমন চোয়াড় বেদরিক শ্রোতা আমাদের ওখানে কেউ নেই। তাছাড়া আপনি যেরকম রস দিয়ে কথা বলতে পারেন, তাতে দর্শনের বক্তৃতাও শ্রেফ জমে যাবে। আপনাকে যেতেই হবে এবারে—নইলে কিছুতেই ছাড়ব না।

ছাড়লেনও না। শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে তবে বিদায় নিলেন দুজনে।

নির্দিষ্ট দিনে গাড়ী এসে হাজির হল। নিয়ে এলেন সেই দুজন—একজন তপন ঘোষ, আর একজন অধীর মুখুজ্জে।

—একটু দেরীই হয়ে গেল স্যার। যে গাড়ীটা গোড়াতে ঠিক করেছিলুম সেটা গেল বিগড়ে। তারপর নানা হাঙ্গামা করে এইটে জোগাড় করতে হল। চলুন এবার—আপনার জন্যেই সবাই বসে আছে।

সুকুমারকে দেখতে হল।

বিকেলের ম্লান আলোয় গাড়ী বালী ব্রিজ পার হচ্ছিল। জোয়ারের গঙ্গার লালচে ঘন জলের দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মন একটা জটিল চিন্তার মধ্যে পাক খাচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে—তারপর জগদীশ গুপ্ত, মাণিক বাঁড়ুজ্জে—

অধীর মুখুজ্জে ধ্যান ভাঙিয়ে দিলেন।

—স্যার, আসাম সম্বন্ধে কিছু বলবেন তো?

সুকুমার চমকে উঠল : আসাম? আসাম কেন? সাহিত্যসভা বলছিলেন না?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, সংস্কৃতি সম্মেলন। তবে কিনা ওটাই হল এখনকার দিনের টপিক—লোকে চায়—

সুকুমার বললে, সে-কথা আগে বললেই হত। গাড়ী থামান, আমি নেবে যাব।

ত্রস্ত হয়ে তপন ঘোষ বললে, রাগ করবেন না স্যার, ও-কথা ছেড়ে দিন। আপনার যা খুসি তাই বলবেন। সত্যিই তো; আমরা তো আপনাকে আর পলিটিকাল মিটিঙে নিয়ে যাচ্ছি না। ওটা কথার কথা, কিছু মনে করবেন না আপনি।

সুকুমার চুপ করে বসে রইল, কিন্তু মনের ভোর থেকে তার নামল না। গাড়ী বালী পার হয়ে, উত্তরপাড়া ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল, বিকেলের শেষ রংটা হপ্ করে নিবে গেল সন্ধ্যার ছায়ার ভেতরে, ডান ধারে গঙ্গার ওপারে কারখানার চোঙাগুলো ভুতুড়ে হয়ে এল। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলল সুকুমার, আর ভেবে চলল : এসব সভা-সমিতিতে যাওয়ার কোন অর্থ নেই, কিছুক্ষণ নিছক ক্লাউনের ভূমিকায় অভিনয় করা মাত্র। এবং নিজেকে যাই ভাবুক সুকুমার, বিদুষকের পর্যায়ে নামতে রাজী নয়। আজ যা হওয়ার হয়েই গেছে, ভবিষ্যতে এমন ভুল সে কখনো করবে না।

কিন্তু অধিকাংশ কিছু বাকী ছিল তখনও।

সাড়ে পাঁচটায় মিটিঙের সময়, পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাড়ে

৬'টা বেজে গেল। ছোট শহরের ছোট টাউন হলটি লোকে কানায় কানায় ভর্তি—অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেছে।

হলের মধ্যে ঢুকেই সুকুমার থমকে গেল। চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হল তার। হলের মেটি একধারে স্টেজ এবং বক্তৃতামঞ্চ—তার ওপর আটটি পেশল দেহ বিচিত্রবর্ণ জাজিম পরা মল্লবীর। তৈলাক্ত মসৃণ শরীর—নানা ভঙ্গিতে তারা পেশী নৃত্য দেখাচ্ছেন।

—একি!

অধীর মুখুজ্জে বললেন, দেহশ্রী প্রতিযোগিতা স্যার। আশে আশের সব জায়গা থেকে এসেছেন এঁরা।

—এখানে আমাকে কেন?—গলার নিচে বোমা ফাটলেও মুখ দিয়ে একটা ক্ষীণ আর্তনাদের মতো বেরুল সুকুমারের।

—আপনি ভাববেন না মশাই—পাশ থেকে উৎসাহ দিলে তপন ঘোষ: এঁদের জন্যে আয়রণ ম্যান লালমণি দাশ আছেন। আপনি এসেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলতে—তাই বলবেন!

—কিন্তু—

প্রতিবাদের আর সময় পেলো না সুকুমার। তার আগেই 'মাইকে' বজ্রনাদে ঘোষিত হল: হ্যালো ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর-টেস্টিং—হ্যালো! এইমাত্র আমাদের সংস্কৃতি সভার সভাপতি—রামকুমারবাবু, সরি, সুকুমারবাবু এসে গেছেন। তিনি এবার তাঁর ভাষণ দেবেন। আমাদের দেহশ্রী প্রতিযোগিতা সাময়িক ভাবে স্থগিত করা হল, সভাপতির ভাষণের পর আবার তা আরম্ভ হবে।

পালাবার উপায় থাকলে সুকুমার ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে যেত, কিন্তু দরজার দিকে এক ইঞ্চিও সে এগোতে পারল না। তিন দিক থেকে সস্নেহ চাপে অনিবার্য ভাবে সে ডায়াসের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হল, তার পর এক সময় আবিষ্কার করল একটা মাইক্রোফোনের সামনে হাজার দেড়েক লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশুদ্ধ নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে আছে!

কিন্তু সামনের কৌতূহলী জনতার নয়—দৃষ্টি বার আসছিল উইংসের দুপাশ থেকে। সেই বারোটি বলিষ্ঠ দেহীর রক্ত-চোখ নির্বাক সমস্বরে যেন সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করছিল: কখন থামবে? যদি বেশি বকবক করো, তা হলে—

তা হলে কী হতে পারে সেটা অনুমান না করাই ভালো। সুকুমারের মত ক্ষীণপ্রাণ অধ্যাপকের পক্ষে ওঁদের যে-কোন এক জনের একটি মুষ্টাঘাতই যথেষ্ট।

এর মধ্যে কখন গলায় এক ছড়া গাঁদা ফুলের মালা এসে পড়েছে। নার্ভাস ভাবে সেটাকে খুলতে গিয়ে তার সুতো চশমার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। একটা সকৌতুক হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল শ্রোতাদের মধ্যে।

এবার গলা খাঁকারি দিয়ে সুকুমার আরম্ভ করলে, বন্ধুগণ, শাস্ত্রে বলেছে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—অর্থাৎ শক্তি হীনের: আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান কিছুই লাভ করতে পারে না। অতএব শক্তি চর্চাই হল জাতির আত্মিক ও মানসিক উন্নতির একমাত্র পথ। আপনারা দলে দলে বলবান হয়ে উঠুন, ভারত মাতার মুখোজ্জ্বল করুন, সমস্বরে বলুন, আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ! আর আমার কিছু বক্তব্য নেই। জয় হিন্দ!

কলেজ জীবন শেষ করবার পর এমন ভাবে ইয়ার্কী সুকুমার কখনো দেয়নি। কিন্তু হাততালি পড়ল হল ফাটিয়ে, সব চাইতে বেশি করে হাত তালি দিলে পেশীশ্রেষ্ঠরা।

একটা আগুন সাপা হাউইয়ের মত এইবার হলের বাইরে ছিটকে এল সুকুমার। আর পেছনে পেছনে মৃত্যুর মতো দুর্বার ভাবে দেখা দিলে দুই মূর্তি: সেই তপন ঘোষ আর অধীর মুখুজ্জে।

দু চোখে বিষ ঝরিয়ে সুকুমার বললে, বক্তৃতা হল আপনাদের?

ভদ্রলোকদের গণ্ডারের চামড়া—বিঁধল না। অধীর মুখুজ্জে হেঁ হেঁ করে বললেন, তা মন্দ হয়নি, বেশ সময়োপযোগী বক্তৃতাই দিয়েছেন। একটু শর্ট হল —এই যা।

এদের বাঙ্গ করাও বিড়ম্বনা।

—তা হলে এবার গাড়ীর আমি ফিরব।

—ফিরবেনই তো।—তপন চা খেয়েই ফিরলেন।

—আমার চা-ও খেতে হবে এর পর ?

—বাঃ, খাবেন বৈকি ! এত কষ্ট করে এলেন।

প্রহসন যখন শুরু হয়েই গেছে তখন শেষ পর্যন্ত দেখা দরকার। সুকুমার দাঁত কিড়মিড় করল একবার। তারপর বললে, তা হলে খাওয়ান।

দু পা এগিয়ে চলুন। ওই যে হলুদে রঙের একতলা বাড়ীটা—ওখানে। আসুন—

—ও কার বাড়ী ?

—আমাদের হেডমিস্ট্রেসের কোয়ার্টার। মিটিঙে আসতে পারেন নি—আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। আসুন—

হেডমিসট্রেস ? একবার ভ্রূকুটি করল সুকুমার। কিন্তু নিজেকে আজ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, প্রহসনের যবনিকা না পড়া পর্যন্ত তাকে অভিনয় করতে হবে। বিস্বাদ হাসি হেসে বললে, চলুন—

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কালো ছিপছিপে চেহারার মেয়ে। চশমার লেন্স্ অতসী কাচের মতো পুরু। এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল।

সুকুমার চমকে পেছনে সরে গেল : থাক—থাক।

মেয়েটি মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হেসে বললে, আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার ? কলেজে আপনার ছাত্রী ছিলাম—আমি মঞ্জুশ্রী।

মঞ্জুশ্রী—মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ! চিনেছে বইকি সুকুমার। সেই ভীরু শান্ত মেয়েটি। প্রায়ই খাতা নিয়ে দেখাতে আসত। একটা ছাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিল অনার্সে। সেই মেয়েটি হেডমিসট্রেস্ ! ভাবতেও আশ্চর্য লাগল।

সুকুমার বলল : চিনেছি বইকি। অনেকদিন পরে দেখা হল। ভালো আছো তো ?

—আছি স্যার একরকম। আসুন ভেতরে—

মঞ্জুশ্রী টেবিল সাজিয়েই রেখেছিল। বললে, বসুন স্যার—একটু চা খান। আমি সারাদিন ধরে আপনার জন্যে খাবার করেছি। ভালো করে খেতে হবে কিন্তু —নইলে ভারী দুঃখ পাব। তপনবাবু, অধীরবাবু আপনারাও বসে পড়ুন।

বেশী আমন্ত্রণের দরকার ছিল না—দুজনে আগেই বসে পড়েছেন। অধীর বুখুজ্জে আর থাকতে পারলেন না। গদগদ গলায় বললে, আপনার ছাত্রীটি আপনাকে খাওয়াবে, আমরাও ভাগ পাবো—সেই জন্যেই তো এত আগ্রহ করে আপনাকে নিয়ে এলুম ডক্টর গুপ্ত। কেরানীগিরি করি—ভালো করে পেটই চলে না, এসব খাবার কোত্থেকে জুটবে বলুন ! বসুন স্যার—বসে যান—

সুকুমার তাকিয়ে দেখেন। ডিমে গরম লুচি, মাংস, কাটলেট, চপ, পুডিং।

মঞ্জুশ্রী বললে, আমার নিজের তৈরী। সব আপনাকে খেতে হবে স্যার।

একটুকরো বিমর্ষ হাসি ফুটল সুকুমারের মুখে।

—কিন্তু আমি তো মাছ, মাংস, ডিম খাইনা মঞ্জুশ্রী। তার ওপর রবিবারে একবেলা খাই, রাত্রে খাই এক পেয়ালা দুধ। তোমার এসব খাবার তো আমার চলবে না !

মুহূর্তে মঞ্জুশ্রীর মুখ অন্ধকারে ডুবে গেল। উছলে এল চোখে।

—স্যার, কিছুই খাবেন না ?

—কেন খাব না ? চা আনো এক পেয়ালা।

দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল মঞ্জুশ্রী। হয়তো চোখের জল চাপবার জন্যেই।

লুচি ভাঙতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল তপন ঘোষের হাত। চাপের একটা টুকরো মুখে দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন অধীর মুখুজ্জে। ওঁদের দিকে তাকিয়ে কোমল হাসি হাসল সুকুমার।

—তার জন্যে কী হয়েছে ! আপনারা খান। আমি আপনাদের সঙ্গ দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থেকে দুজনে খেতে আরম্ভ করলেন। পাশের ঘর থেকে স্টোভের আওয়াজ—মঞ্জুশ্রী চা তৈরি করছে।

আর ওঁদের সেই খাওয়া দেখে একটা স্নিগ্ধ মমতায় সুকুমারের সমস্ত মনটা ভরে গেল। আজকের সভার সমস্তটাই হয়তো প্রহসন, তার জন্যে মঞ্জুশ্রীর এত খাবার তৈরী করা—তাও মিথ্যে ; কিন্তু এই দুটি মানুষের ক্ষুধা তো মিথ্যে নয়। এই খাবারগুলির আশায় দুপুর রোদে সুকুমারের বাড়ীতে এঁদের ছুটে যেতে হয়েছে, মিটিঙের দিন গিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে, হয়তো তার মতো অহেতুক সভাপতিকে নির্বাচন করে আনার জন্যে ক্লাবের মেম্বারদের কাছে অনেক কটু-কাটব্যও শুনতে হয়েছে। কিন্তু দুটি ক্ষুধার্ত মানুষের এই যে পরম তৃপ্তিতে খাওয়া—বহুকালের বঞ্চিত রসনায় কিছু সুখাদ্যের স্বাদ—এর চাইতে বড়ো সার্থকতা আজকের সভায় আর কী হতে পারে ?

সুকুমারের চোখে জল আসতে চাইল।

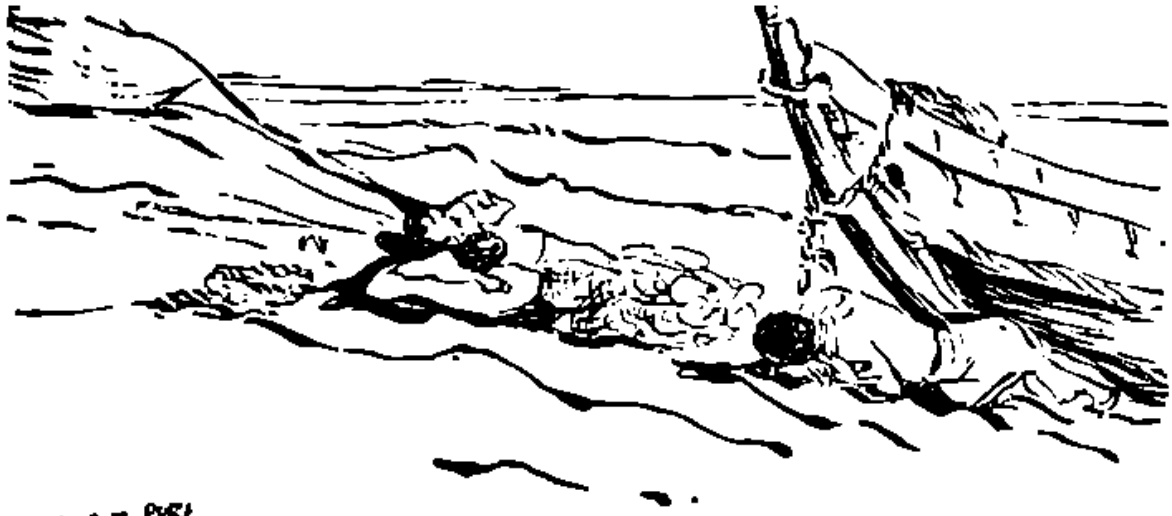

সমুদ্র সৈকতে

দুলিয়া পাড়া

শিল্পী : চিত্ত সরকার

...জাচক্রের ... হাস্য ... কালের ... না হলেও ... বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ... শে ব্যঙ্গচিত্রের প্রচলন ... হয়। ব্যঙ্গচিত্রের স্থায়ী ... ম লাভ করার মূলে ... া বি ক ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর ... ত চেষ্টা বর্তমান। একমাত্র শিল্পীরাই নয়, ...লীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কর্ণধারদের পৃষ্ঠ-কতা কার্টুনের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। ...যুগে ব্যঙ্গচিত্র বলতে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ...কে বলা হতো। একালের মত সে যুগের ...পত্রে কার্টুনের প্রচলন ছিল না বটে কিন্তু সাময়িক ...ত্রিকায় কার্টুন প্রকাশিত হতো। সেকালে ছুটি ... রাজনৈতিক কার্টুন প্রকাশিত হলেও তার মান ...স্তরের ছিল না। এ ছাড়া রাজনৈতিক কার্টুন ...র পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ...কায় সে যুগে শিল্পীরা ...ণের ত সামাজিক ...কে বেছে নিয়েছিলেন ...ত্রের প্রধান সাবজেক্ট ...বে। তৎকালীন রাজ-...ক কার্টুনের অন্যতম ... ছিল আইনগত ...বা।

...উনবিংশ শতাব্দীতে ...নের প্রচলন শুরু হলেও ...যুগে কার্টুন পরিপূর্ণ ...লাভে সমর্থ হয় নি। ...মের সাফল্য বিংশ-...ীর দ্বিতীয় দশক থেকে এবং এই কার্টুনগুলি ...িংশ সামাজিক কার্টুন। ...শতাব্দীর প্রথম এবং ...র পূর্বার্ধ পর্যন্ত রাজ-

গগনেন্দ্রনাথের কার্টুন "জাতাঘর"

...মৌলিক কার্টুন আনার ...বিস্তারে সক্ষম হয়নি এ ...এবংকমাত্র এই কারণে সামাজিক বিষয়-বস্তুর মধ্যে তৎকালীন শিল্পীদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়।

এ শতাব্দীর প্রথমভাগে সামাজিক বিষয়-বস্তুকে উপজীব্য করে ব্যঙ্গচিত্র আঁকার জন্য যাঁরা খ্যাতির চরমশীর্ষে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এছাড়া চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্রকুমার সেন (নারদ), বিনয় বসু, সুকুমার রায়, সতীশ সিংহ, জ্যোতির সিংহ এবং ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সামাজিক বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে যে অনন্য সাধারণ ব্যঙ্গচিত্র সৃষ্টি করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের কার্টুন প্রধানত সামাজিক প্রহসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং যেখানে স মা জে র ত্রুটি বিচ্যুতি সেইখানের এঁদের দৃষ্টিপাত ঘটেছে; উগ্রসাহেবী-আনা, বিজাতীয় ভাবধারার অন্ধ অনুসরণ, জাতিবৈষম্য এবং ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি জাতীয় অসঙ্গতিকে এঁরা কটাক্ষ করেছেন বিভিন্ন কার্টুনে। ক্ষেত্র-বিশেষে অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও কার্টুন করেছেন। এছাড়া কেউ কেউ নক্সা, ছাদির গল্প, ছড়া প্র ভৃ তি র ব্যঙ্গচিত্রায়নও করেছেন হাস্যরস সৃষ্টির "অধিকন্তু" উদ্দেশ্যে। রাজ-নীতিকে সকলেই এড়িয়ে চলেছেন। অবশ্য দুএকজন বিক্ষিপ্ত ভাবে রাজনৈতিক

অথবা জনপ্রিয়তার অভাবে পরিপূর্ণ সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নি।

এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কার্টুন প্রকাশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যে সাময়িক পত্রিকাগুলি এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে মানসী ও মর্মবাণী মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, বাসন্তী এবং সচিত্র শিশির পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গগনেন্দ্রনাথ ছাড়া উল্লিখিত শিল্পীদের কার্টুন এই এই সাময়িকগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথের কার্টুন দুটি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় তা স্বল্প। তাঁর অধিকাংশ কার্টুন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

॥ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

ব্যঙ্গচিত্রের আলোচনায় গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ এবং সমকালীন বাংলা ব্যঙ্গচিত্রের তিনিই প্রথম পুরুষ এমনকি নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। যদিও গগনেন্দ্রনাথ মর্ডান আর্টসের দক্ষশিল্পী হিসেবে সুপরিচিত তথাপি ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর যে পরিচয় তা কোন অংশেই কম নয়। চারুকলা এবং ব্যঙ্গচিত্র উভয়েই তিনি সমপরিমান পারদর্শীতা লাভ করেছিলেন অসাধারণ শিল্প প্রতিভার অধিকারী বলেই।

গগনেন্দ্রনাথের কার্টুনে হাতে-খড়ি নিজের কাছেই। এ বিষয়ে তাঁর কোন গুরু নেই। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় হাফটোনের তীক্ষ্ণ অস্ত্রটিকে তিনি করায়ত্ত করেছিলেন। সে যুগে প্রবাসী, মর্ডান রিভিয়ু এবং মাসিক বসুমতীতে গগনেন্দ্রনাথের ভিন্ন কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। কার্টুনের সাহায্যে সামাজিক ক্ষতস্থানগুলিকে তিনি নিরাময়ের চেষ্টা করেছিলেন অপরিমিত ব্যঙ্গবোধ নিয়ে। তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বিশেষ্য রবীন্দ্রনাথ এবং বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র অন্যতম।

গগনেন্দ্রনাথের বিচিত্র কার্টুন সঙ্কলন অদ্ভুতলোক, বিদ্রূপবল্লী এবং নবহুল্লোড় সে যুগে প্রগতিশীল সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। একাধিক রঙে লিথোপদ্ধতিতে ছাপান এই সঙ্কলন তিনটী প্রকাশের

চকল বন্দোপাধ্যায় এর কার্টুন "কেতাক-কীট"

সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অদ্ভুতলোকের ভূমিকা লিখে দেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। তৎকালীন দৈনিক সংবাদ পত্র হিন্দু-পেট্রিয়ট এবং ইংলিশম্যান গগনেন্দ্রনাথের এই সঙ্কলন তিনটির ভূয়সী প্রশংসা করে।

গগনেন্দ্রনাথের কটাক্ষ সমাজের সকলকেই বিদ্ধ করেছে। —এ থেকে তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ শিল্পপতি রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জিও রেহাই পাননি তাঁর উগ্র-দাহের আনার জন্য। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শিক্ষাব্রতী দেবপ্রসাদ মৈত্র এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন বিভিন্ন কার্টুনে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কেও গগনেন্দ্রনাথের সমালোচনা নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথের স্বল্পসংখ্যক কার্টুনের মধ্যে অদ্ভুতলোকের কার্টুন "বিদ্যার কারখানা" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত মানুষ তৈরীর ভূমিকার পরিবর্তে যন্ত্র তৈরীর ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এছাড়া "দেশীলোকের বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ" কার্টুনে

ন্দ্রনাথকে এবং "জাতাস্তর" কার্টুনে বন হিন্দু
াদকে গগনেন্দ্রনাথ প্রবল আঘাত করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে
ন্দ্রনাথের জন্ম। গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের খুল্লতাত
গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ
প্রখ্যাত মহিলা শিল্পী সুনয়নী দেবী গগনেন্দ্রনাথের
ভ্রাতা এবং ভগিনী। কার্টুন এবং জিউবইজম
বিষয়েই তিনি সাফল্যলাভ করেন কিন্তু দুরারোগ্য
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কর্মশক্তিহীন গগনেন্দ্রনাথের
শেষ জীবনে শিল্পচর্চা সম্ভব হয় নি। ১৯৩৮
খৃ বাংলা তথা ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্রের পথ-প্রদর্শক
ন্দ্রনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

॥ চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ন্দ্র নাথের পরে উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী হিসাবে
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। চঞ্চল বন্দ্যো-
র গগনোত্তর যুগের শিল্পী হলেও গগনেন্দ্রনাথের
থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবধারায়
ল কার্টুন এঁকে চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় অতি অল্প

সময়ে বাংলা তথা ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। যে যুগের রীতি হিসাবে
তিনিও সামাজিক বিষয় বস্তুকে উপলক্ষ্য করে কার্টুন
এঁকেছেন। তবে গগনেন্দ্রনাথের সমকালীন শিল্পী হওয়া
সত্ত্বেও গগনেন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্রভাবে হাস্যরসকে উপজীব্য
করে তিনি খ্যাত। গগনেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ব্যঙ্গচিত্র
মারফৎ তিনি লক্ষ্যকে কটাক্ষ এবং বিদ্রূপ করেছেন কিন্তু
চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্যকে কটাক্ষ এবং বিদ্রূপের
পরিবর্তে ব্যঙ্গ করেছেন বিকৃতির সাহায্যে, যার ফলে
তাঁর ব্যঙ্গচিত্র প্রকৃতই হাস্যরসের উপাদানে পরিণত হয়।
ব্যঙ্গচিত্রে গগনেন্দ্রনাথ গম্ভীর, চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় চটুল।

অঙ্কন ক্ষমতার জন্য চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত।
তাঁর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতীতে কিঞ্চিৎ বিদেশী প্রভাব
থাকলেও কোন সময়েই তাঁর কার্টুনকে বিজাতীয় বলে
মনে হয় না।

চন্দন নগরের নিকটবর্তী তেলেনীপাড়ার বিখ্যাত
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।
ছবি আঁকার ঝোঁক তাঁর ছেলেবেলা থেকে। পরিণত
বয়সে ছবি আঁকার অপরাধে তিনি পরিবারের সকলের
বিরক্তির কারণ হন এবং গৃহত্যাগ করেন। শিল্পচর্চার
উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি প্যারীতে গিয়েছিলেন
জিওলজিক্যাল সার্ভের অনৈক উচ্চপদস্থ ফরাসীর কর্ম-
চারীর সাহায্যে। এছাড়া গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্র-
নাথের কাছে ছবি শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায়ই যাতায়াত
করতেন। এবিষয়ে গগনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি
প্রভূত সাহায্য এবং উপদেশ পেয়েছেন।

সেকালে মাসিক বসুমতীতে চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কার্টুন অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল। মাসিক বসুমতী
ছাড়া তৎকালীন অন্যান্য দুটি একটি মাসিকে তাঁর কার্টুন
প্রকাশিত হলেও বসুমতীতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কার্টুনগুলি
প্রকাশিত হয় এবং বসুমতীকে কেন্দ্র করেই তাঁর খ্যাতি।
বসুমতীর কর্ণধার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চঞ্চল বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। কিন্তু
দুঃখের বিষয় চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা কার্টুন আঁকা
দীর্ঘকাল সম্ভব হয় নি। কার্টুন এবং পৃথিবী তিনি প্রায়
একই সঙ্গে হাতের যন্ত্রণায় আক্রান্ত হন।

গগনেন্দ্রনাথ এবং চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে ব্যঙ্গ-চিত্রের অন্যতম সার্থক শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ওরফে নারদ। যতীন্দ্রকুমারের পরিচয় ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী হিসাবে খ্যাত হলেও শিল্পক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ বিজ্ঞাপন শিল্পী হিসেবে। বিজ্ঞাপন এবং ব্যঙ্গ উভয়কে কেন্দ্র করে যতীন্দ্রকুমারের খ্যাতি। বিজ্ঞাপন এবং ব্যঙ্গ ছাড়াও হাসির গল্প চিত্রায়নের জন্য যতীন্দ্রকুমার বিশেষ পরিচিত। রসস্রষ্টা পরশুরামের বিভিন্ন গল্পের রূপদানে যতীন্দ্রকুমারের অন্যতম কীর্তি। পরশুরাম বিরচিত কজ্জলী, গড্ডলিকা এবং হনুমানের স্বপ্নের সমস্ত গল্পগুলি যতীন্দ্রকুমার বিচিত্রিত। পরশুরামের টাইপ চরিত্র গণেরীরাম থেকে বিরিঞ্চি-বাবা ভূষণ্ডীর মাঠের ভূতেরা, মহর্ষি জাবালি, পেলব রায় এবং লালিমা পাল (পুং)প্রভৃতির অসরূপ রূপায়ণ যতীন্দ্রকুমারের তুলিতেই সম্ভব হয়েছে।

যতীন্দ্রকুমারের অধিকাংশ ব্যঙ্গচিত্র তৎকালীন মাসিক মানসী ও মর্মবাণী, ভারতবর্ষ এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে মানসী ও মর্মবাণীর সম্পাদক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধরসেনের অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ তাঁর শিল্পপ্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। মূলতঃ সামাজিক কার্টুন অঙ্কনের জন্য যতীন্দ্রকুমার খ্যাত হলেও তিনি কিছু রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রও করেছেন। তবে সংখ্যায় তা অল্প।

পেশায় ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী হলেও তৎকালীন সাহিত্যিক সমাজ যতীন্দ্রকুমারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৪নং পাশীবাগানের (গিরীন্দ্রশেখর বসুর বাড়ী) আড্ডায় তিনি অন্যতম প্রবীণ সভ্য। এই আড্ডায় রাজশেখর, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে তিনিও নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে রাজশেখর এবং যতীন্দ্রকুমার একআত্মা। সাহিত্য ক্ষেত্রে রাজশেখরের প্রবেশ যতীন্দ্রকুমারের হাত ধরাধরি করে এবং যতীন্দ্রকুমারের শিল্প জগতে প্রবেশের মূলে অগ্রজ প্রতিম রাজশেখর। বিজ্ঞাপন শিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচয়ের মূলে সবটুকু কৃতিত্বই রাজশেখরের। বেঙ্গল ক্যামিক্যালের সেকালের প্রায় সব বিজ্ঞাপনই যতীন্দ্রকুমারের বিচিত্রিত।

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্টুন "সোনার কী সেলাম"

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে যতীন্দ্রকুমারের জন্ম। পিতা পূর্ণচন্দ্র সেন দ্বারভাঙ্গা রাজ এষ্টেটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যতীন্দ্রকুমারের বাল্যকাল দ্বারভাঙ্গায় অতিবাহিত হয়। কিছুকাল পরে কোলকাতায় সরকারী আর্ট স্কুলে শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভর্তি হন কিন্তু দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি অর্থাভাবে। শিক্ষা সমাপ্ত না হলেও তিনি শিল্পচর্চা পরিত্যাগ করেন নি বরং নিজের চেষ্টায় এ বিষয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। পরে পরশুরামের সাহায্যে বিজ্ঞাপন শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর রাজশেখরের উৎসাহে যতীন্দ্রকুমার ব্যঙ্গচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। যতীন্দ্রকুমার সেকালে নারদ নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন এবং নারদ নামটী রাজশেখরের দেওয়া। রাজশেখরের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' লেখাটির সময়ে রাজশেখর যতীন্দ্রকুমারকে এই নামটি ব্যবহার করতে বলেন এবং সেই থেকে তিনি নারদ নামে পরিচিত।

যতীন্দ্রকুমার সেনের কার্টুন
কবি—কবিতাগুলি কেমন লাগল ?
ব্যাখ্যাকার—ওগুলি বুঝতে পারিনি কিন্তু বানাবার যে আনন্দ সেটুকু পেয়েছি।

বাংলাভাষার প্রসারের অন্যতম সফল প্রচেষ্টা লাইনো টাইপের প্রবর্তনের মূলে যতীন্দ্রকুমারের অবদান স্মরণীয়। বাংলা লাইনো টাইপকে প্রচলিত করেন আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং বাংলা যুক্তাক্ষরের জট ছাড়িয়েছিলেন রাজশেখর। জট ছাড়ানোর পরে রাজশেখরের অনুমোদিত অক্ষর অঙ্কনের কার্য সমাধা করেন যতীন্দ্রকুমার।

ব্যক্তিগত জীবনে যতীন্দ্রকুমার অবিবাহিত। পরশুরামের অভিন্নহৃদয় সোদরপ্রতিম যতীন্দ্রকুমারের তুলি আজ তোলা। বার্দ্ধক্যের জরা এবং দৃষ্টিশক্তির অপরিজ্ঞতা উভয়ই আজ তাঁকে কর্মশক্তিহীন করেছে। সম্প্রতি রাজশেখরের মৃত্যু তাঁর কাছে শোকাবহ ঘটনা। প্রিয়জন বিচ্ছেদের বেদনায় যতীন্দ্রকুমার শোকাভিভূত।

* *

গগনেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রকুমারের সঙ্গে এবং পরে আরও কয়েকজন শিল্পী ব্যঙ্গচিত্রকে উপজীব্য করে খ্যাত হয়েছিলেন একথা আগেই বলেছি। কিন্তু কিন্তু সবদিক থেকে এঁদের তিনজনের সমপরিমান যোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা একমাত্র বিনয় বসু ছাড়া আর কেউ পান নি। আশ্চর্যের কথা একাগ্রভাবে ব্যঙ্গ চিত্র বিনয় বসুরও করা হয় নি। জীবিকার জন্য ব্যঙ্গচিত্র ছেড়ে তিনিও বিজ্ঞাপন করে ছিলেন। অন্যতম বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী জ্যোতিষ সিংহও বিজ্ঞাপনের জীবিকাশ্রয়ী ছিলেন। সেকালে ব্যঙ্গচিত্রকে অবলম্বন করে বিশেষ একশ্রেণীর শিল্পীর সৃষ্টি হলেও তাঁরা চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করতে পারেন নি পৃষ্ঠপোষকতা এবং সুযোগের অভাবে জ্যোতিষ সিংহের অগ্রজ সতীশ সিংহ ফাইন আর্টসের শিল্পী হয়েও ব্যঙ্গচিত্রে প্রভূত সাফল্যলাভ করেছিলেন কিন্তু তিনিও কেবলমাত্র ব্যঙ্গচিত্রকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেন নি। বাঙালী ব্যঙ্গচিত্র শিল্পীদের হাস্যরসিকের ভূমিকায় অবতরণের করুণতম ট্রাজেডি হচ্ছে এই।

তাদের মর্য্যাদা দিও

অদ্ভুত চট্টোপাধ্যায়

যে-হাত কোপায় মাটি, ইট গড়ে,
সুরকিও ভাঙে,
তাদের মর্যাদা দিও।
হাল ধরে, দাঁড় বায়,
যে-হাত সমুদ্রে, ভরা গাঙে,
তাদের সাহায্য নিও
জীবনের সমুদ্র লঙ্ঘনে।
যে-হাত কলম পেষে,
পেশী তা'র অনেক বন্ধনে
বাঁধা আছে অনেকের কাছে,
বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ করে তা'রা ভয়ে,
কষ্ট হয় মহাজন পাছে।
যে-হাত হাতুড়ি দয়ে
লোহা পিটে কাস্তে বানায়,
সেই অস্ত্রে সেই হাত ধান কাটে,
আনে সুখ গোলাভরা, কানায় কানায়
ভাদ্রের নদীর মত!
তাদের মর্যাদা দিও,
যে-হাত খোঁজে না গদি,
যদিও নির্মাণ করে দম্ভের আসন।
তাদের মর্যাদা দিও,
যে-হাত পরের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য আপন
ভুলে গিয়ে রাত্রিদিন করে পরিশ্রম
সমুদ্রে, প্রান্তরে কিম্বা অরণ্যে দুর্গম॥

সুস্থ থাকে মন

বিষ্ণু দে

বনে বনে সুস্থ থাকে মন।
বটে, অশোকে, পিপুলে, শালে, পলাশে
ঋতুতে ঋতুতে পায় বিভিন্ন যৌবন
স্মৃতির গহন বনে বিভিন্ন হাওয়ায় দুলে দুলে।

এবারে সময় হল শরীর ও মনে উভয়ত
কপোত কপোতীসম উচ্চচূড়ে নিরালম্ব নীড় বাঁধবার,
স্মৃতির বিশুদ্ধ শুভ্র ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মীকে সাধবার
ইন্দ্রিয়ের মুক্তধ্যানে বিভূতি সতত।

অথচ বরাতে নেই, পরশুরামেরা দুই হাতে
গৃহস্থের আমজাম শেষ ক'রে আজ মারে বন,
নব্যকালে দেখি তারা, আমাদেরও ইন্দ্রধনু মন
কেটে কেটে ভূমিসাৎ করে যায় লোভের করাতে॥

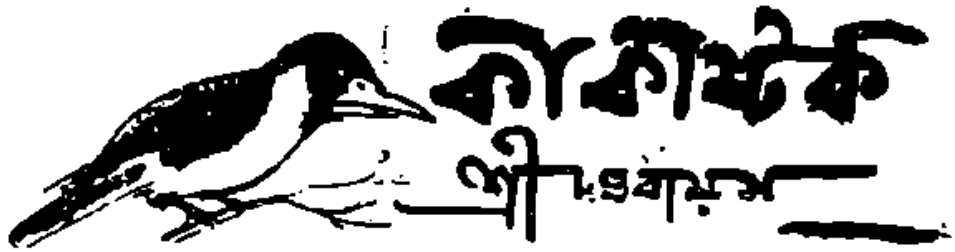

চাচার উপদেশ

চটে বললেন চাচা ঃ
"বাঙালির গলা কেবল চেঁচায়
ঠিক যেন হাঁড়ি চাচা।
নয় পেয়েছিস দু-ঘা-ই ডাণ্ডা
ঘর বাড়ী পুড়ে হয়েছে ঠাণ্ডা
তাই দিবি মোর কাঁচা ঘুম ভেঙে ?
এ তোদের কোন ধাঁচা ?
বাপুজীর মতো কপ্‌নি পরিয়া
ভিক্ষের ঝুলি কাঁধেতে ধরিয়া
স্বাধীন ভারতে সাধক বাঙালি
পুচ্ছ তুলিয়া নাচা।"

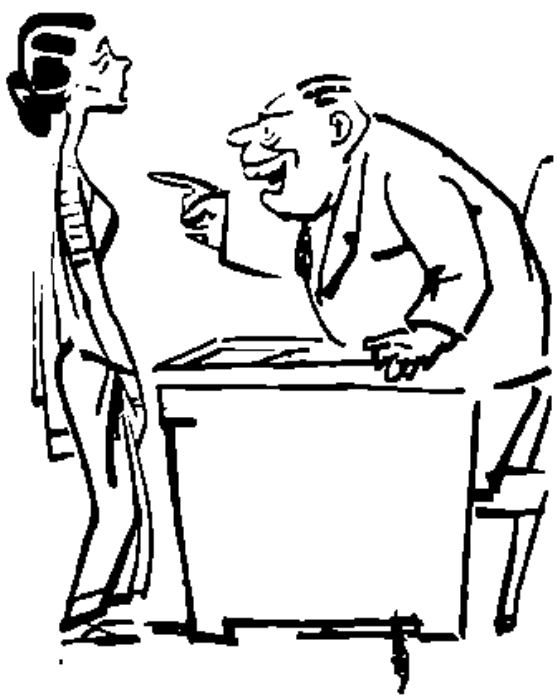

Vendetta

একটুখানি প্রেম চেয়েছি—
অম্‌নি তখন ফোঁস্ ?
বুড়ো এবং ডুঁড়ো বলেই
হলো দেবীর রোষ ?
আমারো দিন আসতে পারে—
খেয়াল ছিল নাকো ?
ধর্মঘটের দাদারা কই ?
এবার তাদের ডাকো !
সোঁদর বনে হরিণ হায়
বাঘের পিছু লাগো ?
যাও শ্রীমতী—চাকরি খতম্—
এবার সোজা ভাগো।

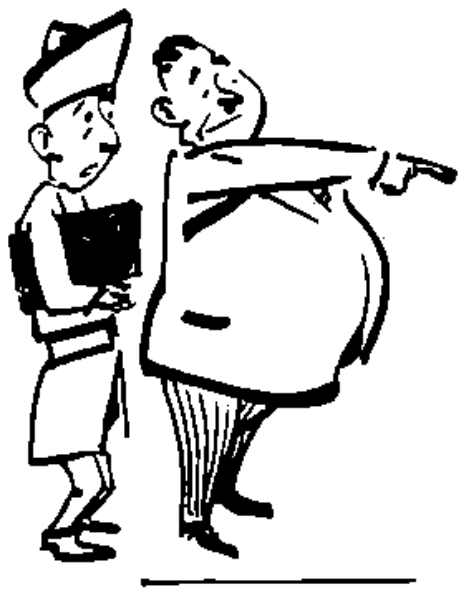

অকৃতজ্ঞ

মাইনে মাত্র হাজার আড়াই
টি-এ হল্‌টেজ আরো কিছু পাই
লাঞ্চে ডিনারে ককটেলে গিয়ে
ভারতের সেবা করছি—
ওরা খাটে মোটে দশটা পাঁচটা
তোমরাই বলো ঃ কী করে কাজটা ?
দেড়শো-দুইশো মাইনে পেয়েও
বলে, অনাহারে মরছি।"

দুশ্চিন্তা

'আরাম হারাম হ্যায়'
রোজ বলি বুঝিয়ে
'জাগো-ব্যাগো- কাজে লাগো'—
কানে দই খুঁচিয়ে।
তবু দেয় কাজে ফাঁকি
কী যে হলো দেশটায়—
তবু স্যাখো তোলে হাই।
হাল ছেড়ে শেষটায়
ঢুকে যাই শীতাতপ
নিয়মিত কক্ষে
শুয়ে পড়ি গদীটায়
নিমীলিত চক্ষে।

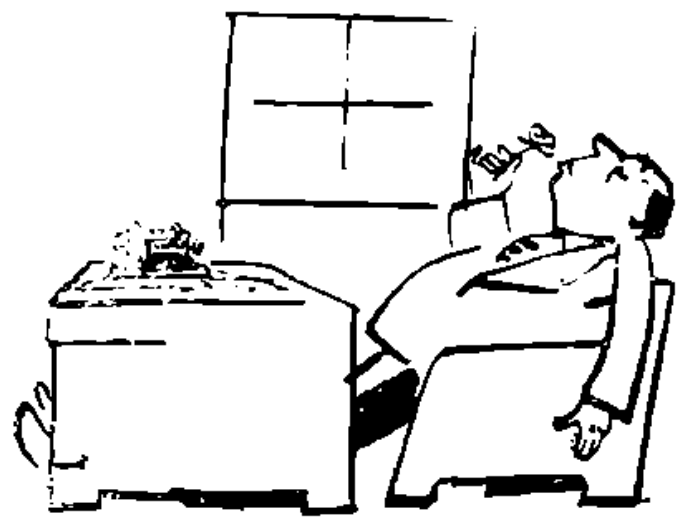

দেশদ্রোহীর দল

তিনটে বছর রয়েছো বেকার ?
সকলের দায় তোমার একার ?
পায় নাকো খেতে বাপ মা ও ভাই।
বোনের যক্ষা ? চাকরিটা চাই ?
বড় দুর্দিন ? বেজায় কষ্ট ?
হুঁ-হুঁ-হু —এবার বুঝেছি পষ্ট।
যে-ভাবে শোনালে দুখের লিস্টি
নির্ঘাত তুমি কমিউনিস্ট-ই।
দেশের শত্রু। যাও, সরে পড়ো,
দল বেঁধে গিয়ে ভাগাড়েতে মরো।

ভেতো বাঙালির প্রতি

মাছ ভাত খেয়ে ভীতু হয়ে গেলি
ভেতো বাঙালির দল—
মাছ ভাত তাই নিতে হলো কেড়ে
বাড়াতে জাতির বল।
শুয়োরের মতো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
বুনো কচু তুলে খাবি পেট পুরে,
কাঁচা বা পুড়িয়ে যে ভাবেই খাস্
তক্ষুনি পাবি ফল—
শুয়োরের গোঁয়ে করে দে বাঙালি
দুনিয়াটা টল্‌মল্।

গুরুবাক্য

ভো-ভো-ভো ছাত্রগণ
কেন এ আন্দোলন ?
রাজনীতি—রাজনীতি !
খেলা পড়া হলো ইতি !
কলেজে পাওনি সীট ?
পথে পেতে বোসো ইঁট।
বই নেই একখানি ?
আমারা দিচ্ছি বাণী
তা'ইতে দু'কান ভরো,
কষে জ্ঞান লাভ করো—
(ওঠো শিশু, মুখ ধোও, পর নিজবেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ ।)

অবশেষে

হালো সে অতি প্রফুল্ল
সংসারে সুখ অতুল্য
বিধান মানিয়া ভেবেছিল মনে
এবারে কপাল খুলল
(শেষে) কালীপদে মাথা মুড়িয়ে
অকালে পটল তুলল।

সমরেশ বসু

প্রেম

জীবনটা যে জুয়া, এমন কথা ভাবতে পারি নে। সে সাহসও নেই। কিন্তু আমার এই তেইশ বছরে এটুকু জানলাম, জীবনটাকে অঙ্কের মত মাপজোক ক'রে, কাটাকুটি করে, একটি অব্যর্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। জানি তেইশ বছর বয়সটা কোনো বয়স নয়। জীবন নিয়ে কথা বলার বয়স নয় এটা। তবে, সবাই বলে, আমরা কুড়িতে বুড়ি। সেটা কি শুধু দেহে? সে বুড়ি হওয়া কি মনের বার্দ্ধক্য? সে বার্দ্ধক্যের কি আর কোনো সাংসারিক মূল্য নেই?

না যদি হবে, তবে চৌদ্দ বছর বয়সে কেমন ক'রে প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে, নিজেকে আমার গোপন করার দরকার আছে। এ দেশে, এ সমাজে দেহের শুচিতা রক্ষা করা যেটাকে বোঝায়, সেটা যেদিন থেকে বুঝতে গিয়েছিলাম, সেইদিন থেকেই বড় হ'য়ে গেছি। আমি যে মেয়ে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার দেহে মনে নিয়ে বুঝতে হয়েছিল। যেদিন থেকে বুঝেছিলাম, সেইদিন থেকে সংসারে কত দায় বেড়েছিল। প্রথম দায়, আমার মধ্যে যে মেয়েটি আছে, তাকে রক্ষা করা। সে রক্ষা করাটা, অনেকটা যেন দ্বীপের মত। চারদিকে আমার জল থাকবে। কিন্তু আমি ভাসব। জেগে থাকব। আমি ডুবব না! বরং আমার ভিতরের তাগিদে, গাছে ফুলে শস্যে বর্ণবাহারে সাজব। শোভনা হব। তবু আমার চারপাশের জলে আমি সিক্ত হব না।

অনেকটা সেই বাউলের তত্ত্বগানের মত। ত্রিবেনী সংগমের গভীর জলে ডুব দিয়ে মীন ধ'রে আনতে হবে। কিন্তু গায়ে এক ফোঁটা জল লাগবে না। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের মন যতই সঙ্কীর্ণ হোক্, জীবনটা তো এমনিই। 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাবো না।' পুরুষের সমাজে বাস করব, কিন্তু যত কলঙ্কই হোক, পুরুষ নিয়ে কলঙ্ক যেন না হয়। ওটাই সবচেয়ে বেশী ধিক্কৃত করে আমাদের। তাই সাবধান! প্রতি পদে পদে ট্রাফিক পুলিসের মত হাত উঠে আছে সর্বত্র। ওদিকে নয়, এদিকে। এখানে নয়, ওখানে। কতখানি মানা হল কি না মানা হল, সে তো মেয়েটির ব্যক্তি জীবনের গোপন বিষয়। কিন্তু এটাই সমাজ। আর এটাকে মেয়েরা এড়িয়ে চলতে পারে না।

চৌদ্দ বছর থেকে যাদের প্রতি পদে পদে সাবধান হতে হয়, স্বাভাবিক ভাবেই তারা একটু কোন্‌ঠাসা হয়। সঙ্কীর্ণ মন যদি হয়ে থাকে, দোষ দেওয়া যাবে কি? আর এই কোন্‌ঠাসা হ'য়ে থাকাটা দশজনকে দেখিয়ে বেড়াবার জিনিষ নয়! ওটাকে প্রায় প্রত্যহের জীবনে আমাদের লালন করতে হয়। করানো হয়। এক দেহ দেহ ক'রেই, সংসারে কত জানতে হয়। কত চোখের কত চাউনিকে, কত হাতের কত কাঁপুনিকে, কত হাসির ধার, স্থূলতাকে প্রতি পলে পলে চিনতে হয়।

ছেলেদের সঙ্গে পা মিলিয়ে বাইরে যেতে চেয়েছি। সেটা তো সমাজের সঙ্গে, একটা বোঝাপড়ার জন্যে। কিন্তু আমি যে মেয়ে, সে কথাটিতো একেবারে ভুলতে পারি নি। মেয়ে ব'লেই আমার দুর্ভাগ্য, আমি বিশ্বাস করিনে। সৌভাগ্য মনে করলেই কি নিজের দেহ মনের কথা ভোলা যায়। তাই, বাইরে যারা গেছে, তাদের জগৎ বড়। আমরা অমন ক'রে বাইরে যেতে পারলাম কোথায়? তা' বলে ভিতরে থাকার দায়গুলি কি কম?

কত ধানে কত চাল, সেকথা কি জানে শুধু সে, যে মাঠে লাঙ্গল দিয়েছিল ? ধান যে সিদ্ধ করেছে, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটেছে, কুলোয় ক'রে ঝেড়েছে, সে কি কিছুই জানে না ?

এক তো নিজের দেহ মনের দায়, তা' ছাড়া আছে ঘরের দায়। ঘরের দায়টা তো ছোটখাটো কিছু নয়। সব যেখানে প্রতিফলিত হল, সে তো ঘর। বাইরের আয়নাটাই ঘর। কারণ নদীর জলের ধাক্কা তো পারেই লাগে। বাইরের সব ছায়া তো শেষ পর্যন্ত ঘরেই।

আয়নাটা কি সত্যি কুড়িতে বুড়ি হয় ? আমি বলি না। বলতে লজ্জা করি নে, পুরুষদের সবটাই বহিপ্রকাশ। আমাদের সবটাই অন্তপ্রকাশ। কিন্তু যে-কারণে মেয়েদের কুড়িতে বুড়ি বলা হয়েছে, ঠিক সেই কারণেই পুরুষ কি একবারো ভেবে দেখেছে, একটি কুড়ি বছরের মেয়ের কাছে তার সত্যি অহঙ্কারের কিছু নেই। একজনের বাইরে, আর একজনের ভিতরে, এ দুইয়ে মিলে আসলে তারা সমানভাবেই অসহায়। পরস্পরের কাছে সহায় খোঁজার নিয়ত সংগ্রামটা একটি সুষ্ঠু শিল্প। কথাগুলি আমার ধার করা হচ্ছে কি না জানি নে। মনে মনে সত্যি ব'লে ভাবছি।

তবে মন গুণে ধন। এহ বাহ্য। মনের কথায় যাই কেন ? সেখানে কুড়ি-বুড়ি তো জলের লিখন। সেখানে কুড়ি ব'লে কিছু নেই। বুড়ি আর ছুকরি ব'লেও কিছু নেই। না কাটে বয়স দাগ। না কাটে রূপ।

তেইশ বছরে জীবন নিয়ে কথা বলা যায় কি না, সেই কথা ভাবছিলাম। জীবনের নানান অর্থের কথা শুনেছি। সে সব বাদ দিয়ে, সংসারের সাধারণ নিয়মে যে-জীবনের কথা প্রতি নিয়ত বলা হচ্ছে, তার কথাই ধরি। ধরতে গিয়ে মনে হল, কুড়িতে মেয়েরা বুড়ি হয় না। অনেক বেশী জানার ভারটা মেয়েদের ওপরে সহজে দাগ ফেলে। ছেলেরা শুনলে নিশ্চয় অহঙ্কার মনে করবে। কিন্তু বুড়িতে বার্দ্ধক্যটা আমাদের দেহে নয়। মনেও নয়। আমাদের অভিজ্ঞতায়।

সে অভিজ্ঞতার গণ্ডীটা সঙ্কীর্ণ। হোক না। আমাদের সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, প্রত্যহের সংসার যে-ভাবে ধরা পড়ছে, আর কোথায় তা পড়ে ? আয়নার ছায়াগুলি সরে যায়, মুছে যায়, তাই। কিন্তু এটুকু কেউ বুঝবে না, সে-আয়নার একটি অদৃশ্য জগৎ আছে, যেখানে আছে সব ছায়ারাই। যদি তা' খুলে দেখানো যেত, তা হলে বোঝা যেত, ওই সঙ্কীর্ণ জায়গাটি কী বিচিত্র। কী ভয়ংকর, কী সুন্দর, কত জটিল। আর কত কান্না, কত ক্লেদ, কত রাগ, কত অপমান, তবু কত পবিত্রতা, কত স্নেহ সোহাগ আনন্দ।

কিন্তু আমি এমন কিছু একটা জীবন নিয়ে ভাবতে বসিনি যে, সাত কাহন করে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, জীবনের কথা বলার অধিকার আমার আছে কি না। কুড়ি বুড়ির কথাটা মনে পড়ল। তাই যেন প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে অমানিতা রইলাম। কারণ কথাটি মানতে পারি নে কোনোকালে।

আমার তেইশ বছরের জীবনটা কতখানি বিস্তৃত, কতটুকু তার গভীরতা, সেকথা আজ আমি নিজে ভাবব না। পরের ভাবনায় দেখতে চাই। তাই ভাবছিলাম জীবনটা কি জুয়া ? পরের চোখে দেখে আমার নিজের জীবনের লটারি করতে হবে ? তাও আবার ছেলেদের চোখে।

কি করব ? আমার তেমন কোনো গুমোর নেই যে বলি, ছেলেদের দেখা না দেখায় আমার কী যায় আসে ? আমার যায় আসে ! আমাকে না দেখলে আমার দুঃখ হয়। দেখলে খুশি হই। সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেদের আমি আমার জীবনের বড় রকমের ধ্যান জ্ঞান মনে করি। ওদের বাদ দিলে আমি কিছু ভাবতে পারি নে। কথাটা বেহায়ার মত

শোনাল। চেয়ে চেয়ে মেয়ে সমাজের মুখ পোড়ালাম কি না কে জানে। কিন্তু কাউকে ডেকে তো বলতে যাইনি। এ আমার নিজের কাছে নিজের কথা। হ্যাঁ, একটু পুরুষ ঘেঁষা বলে বোধ হয় ধিক্কার দিতে চাইবে আমাকে। মেয়ে হ'য়ে মেয়ে ঘেঁষা হবার মধ্যেই বা গৌরব কী আছে, তা বুঝিনে। একটি রূপবতী গুণবতী মেয়ের সঙ্গে বসে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে। তার চেয়ে একটুও কম ভাল লাগে না একটি রূপবান গুণবান ছেলের সঙ্গে বসে কথা বলতে। বরং ক্ষেত্র-বিশেষে অনেক, অনেক বেশী ভাল লাগে।

কিন্তু লটারির কথাটা বুঝি একটু ভুল ভেবেছি। ছেলেদের চোখে নিজেকে যাচিয়ে নিতে চাই আমি। কারণ, আমিও যাচিয়ে নেব। নিজের রূপ শুধু যাচিয়ে নেব, তা নয়। নিজের সব। তাই আমাকে একটু যাচিয়ে দেখবার জন্য বসতে হবে। যদিও মনের মধ্যে, খুব গভীরে, এক বিন্দু নিস্তরঙ্গ জলে যেন একটি ছায়া আমি প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে জল নিস্তরঙ্গ। ছায়াটি ছায়াই। সেই ছায়া দেখাটা যাচাই নয়। আমি নিশ্চিৎ হ'তে চাই। তাতে নিজের কাছে অন্তত এটুকু সততা থাকবে, আমার সুখ অথবা দুঃখের দায় কারুর নয়। সবটাই আমি নিজে বেছে নিয়েছি।

এই যাচিয়ে নেওয়াটাকে আমি বোধহয় জুয়া বলেছি। কেন না, কেবলি ভয় হচ্ছে, নিজেকে কি অস্বীকার করতে পারব? নিজেকে, মানে নিজের মনকে। একে কি চোখ ঠারা যাবে? পরে হয় তো সব ব্যাপারটাই ঢঙ বলে মনে হবে। মনে হবে, নিয়তি চুল ধরে মাথা ঘুরিয়ে বলবে, সেই তো ঘুরিয়ে নাক দেখাতে হ'ল।

তবু আজ আমাকে দেখতে হবে। কারণ বাড়ি থেকে নোটিশ দিয়েছে। যা হোক কিছু কর। আর ধেই ধেই করে বেড়ালে চলবে না। সে বয়স নেই। সংসারের সে অবস্থাও নয়।

আজ সকালেই মা প্রায় ফাইনাল নোটিশ দিয়েছে। আর সেটা প্রায় ঢোল শহরতের মত, সারা বাড়ি জানিয়ে। কারণটা আর কিছু নয়। দাদার বিয়ে। অর্থাৎ আমার কোনো গতি না হলে দাদা বিয়ে করতে পারছে না! দাদার আবার ওই ধরণের নানান রকম মতিগতি আছে কি না। আজকালকার আধুনিক সহৃদয় দাদাদের মতই। ছোট বোনের বিয়ে না দিয়ে, নিজে কেমন করে বিয়ে করবে? কে যে এটা কবে আবিষ্কার করল বাংলা দেশের দাদাদের মধ্যে, তা জানি নে। আমরা বোনেরাও করুণ মুখ করে ভাবলাম, ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটি দৃঢ় চারিত্রিক বিষয় আছে। ক্ষেত্র বিশেষে নিশ্চয় এটা ভাই-বোনের ভালবাসায় জড়িত। কিন্তু সামাজিক সত্য হিসেবে, কোথাও কি এর তিক্ততা নেই।

আমার চিন্তা ভাবনা হয় তো একটু খারাপ। তাই ভাবতে বাঁধে না, গলায় কাঁটা ঝুলিয়ে রেখে দাদাদের বিয়ে ক'রে সুখ নেই। বাস্তব একটু রূঢ় লাগে শুনতে। কিন্তু আমি তো কাউকে বলতে যাচ্ছি নে। এ শুধু আমার নিজের সঙ্গে নিজের কথা। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, সত্য অনেক সময় ঘুরিয়ে বলার দরকার হয়। অবিশ্যি যদি বলতেই হয়। সবচেয়ে ভাল, সত্য সোজাসুজি অথবা ঘুরিয়ে বলার চেয়ে, নিঃশব্দে আপন বিশ্বাসের সত্যকে কাজে পরিণত করা। তা না পারা গেলে, ঘুরিয়ে ব'লে 'সত্য'টাকে জানান দেওয়াই ভাল। যারা বলে, 'সত্যি বলব, তার আবার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কী আছে?' আমি তাদের দলে নই। কারণ দশ জনের সঙ্গে যখন মানিয়ে চলতেই হয়, উপায় কী? যদি দারোগা হতাম, যদি মফস্বলের ডাকঘরের কাউণ্টারের কেরানী হতাম, হতাম যদি রেসন শপের কেরাণী কিংবা যদি রেলের কোনো কর্তা হতাম, মন্ত্রী দপ্তরের কর্তা হতাম, তবে না হয়, সোজা কথা সোজা

করেই বলতাম। অবিশ্যি যতক্ষণ কাছে থ'কতাম। বাইরের লোককেই এভাবে বলা যায়। ঘরে বাইরে, আপন পরিচিত বন্ধু বান্ধবকে, সব সময় ভাল লাগা—না লাগার কথা কি বলা যায়?

অথচ, লোকের বিশ্বাস অন্যরকম। নিজেদের লোককেই সোজা কথাটা সোজাসুজি বলতে পারব না কেন? বলা নিশ্চয়ই যাবে। বলার মত ক'রে বলাই ভাল। ব'লে যদি ফল না হয়, বিবাদ বাধে, কী লাভ বলে? মাঝখান থেকে অশান্তির চোটে সত্য বহু দূর।

আমি বলতে পারি মাকে, মা দাদার বিয়ের আগে আমাকে বিদায় ক'রো না, তোমার পায়ে পড়ি। দাদার হয় তো মনটা খারাপ হবে। সত্যি বলছি মা, দাদা বিয়ে করলে আমার খুব আনন্দ হবে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য ঘুরিয়ে এভাবে সত্য বললেও, তার ফল উল্টো হবে। কারণ মা ভাববে, আমি বোধহয় তাদের মান ইজ্জৎ মনের আরো কোনো গভীর সর্বনাশের গর্ত কাটছি। কারণ, এখন বাড়িতে সে রকমই একটা বিশ্বাস। সকলের কাছে, আমার চলা-ফেরা একটু বুঝি রহস্যময়ই হ'য়ে উঠেছে। আপত্তিকর তো বটেই।

প্রথম কারণ, বাড়ি থেকে যতগুলি বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হয়েছে, আমি প্রায় সবগুলিই নাকচ করেছি। এবং বাড়ির দিক থেকে দেখতে গেলে, সেগুলি আমার দিক থেকে প্রায় অকারণেই। কারণ, সম্বন্ধগুলি কোনোটাই খারাপ নয়।

কিন্তু আমার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। সেকথা মুখ ফুটে বলার সাহস আমার নেই। না, সাহসের কথাটা ভুল। ইচ্ছে করলে সাহস যে সঞ্চয় করতে পারিনে তা নয়। তবে, কারণটা সকলের কাছে এত দুর্বোধ ঠেকবে যে, তাদের সন্দিগ্ধ ভ্রূকুটির সামনে আমার দাঁড়িয়ে থাকাই দায় হবে!

বাড়িতে বাবা-ই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। আমি তাঁকেও বলতে পারি নে। বলতে পারি নি, বাবা আমি বড় সংশয়ে ভুগছি। আমি কিছু ঠিক করতে পারছি নে। তোমরা আমাকে তাড়া দিও না।

মুশকিল হল এই, স্নেহের সুযোগ নিয়েও, এসব কথা বলার বেওয়াজ আমাদের বাড়িতে নেই।

দ্বিতীয় কারণ, চাকরি করতে চাওয়া। লেখাপড়া আমি সামান্য যা করেছি, তাতে একটি চাকরি পাওয়া হয় তো খুব কঠিন নয়। এখানে অবশ্য বলে রাখা ভাল, ভাল সম্মানজনক চাকরি সংগ্রহ করে দিতে পারেন, এমন লোকের সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। কিন্তু সে-চাকরি নেওয়াতে তো আমার নিজেরই আপত্তি আছে। চাকরি নেওয়াটাই আমাদের বাড়িতে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। অর্থের অভাবটা তেমন প্রবল নয়। সংসারটা যে মোটেই আমাদের বড় নয়। সুতরাং আমাদের এই পুরনো পৈতৃক বাড়িতে, বাবার পেনসন্, দাদার উপার্জনে চলে যায়। অর্থাভাব হলেও আমাকে চাকরি করতে দেওয়া হত কি না সন্দেহ। কারণ, মা যেটা মুখ ফুটে বলতে পারে, বাবা দাদা পারে না, সেটা হল, 'চাকরি পেলেই তো তুমি জেদ্ করে বলবে, "বিয়ে করব না।"'

অনার্স নিয়ে পাশ করলেই যে চাকরি করতে হবে, এমন কী কথা? ওটা তো আসলে, একটি নিটোল ভাল বিয়েরই সার্টিফিকেট। কন্যার পিতৃ-পুরুষের মর্যাদা। ওটা বাড়ির সকলে সম্মান।

বাবার একটি কথা এই প্রসঙ্গে না মনে পড়া-ই উচিত। কারণ, হয় তো কোনো মিল নেই। ওঁর মনে কোথাও কোনো ক্ষত আছে কি না, কিছুই জানি নে। মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে বসে বড় দুঃখীর মত বাবাকে ব'সে থাকতে দেখেছি। মনে হয়, আমার ছোট বোনের জন্যেই। আমার ছোট বোন আমার চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোট ছিল। কিন্তু মাত্র চোদ্দ

বছর বয়সে, খুব খারাপ ব্যাধিতে ভুগে মারা গেছে। সেটা আমাদের সংসারে দীর্ঘদিন যন্ত্রণা এবং অনশনের কারণ ছিল। আর যাই হোক, আমাদের রক্ত দূষিত ছিল না। আমাদের বংশ স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের গর্ব বরাবরই করতে পারত। ডাক্তারের বক্তব্য শুনে, সবাই দুঃখে লজ্জায় মরমে মরে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু কে আমার ছোট বোন লিপিকাকে ওই ব্যাধি ওই বয়সে গোপনে দান করেছিল, আমরা কোনোদিন তা জানতে পারিনি। রোগ ধরা যখন পড়েছিল, তখন ওর মস্তিষ্কে গিয়ে সেই ব্যাধি ঢুকেছিল। কেউ ওর কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করতে পারে নি। ও প্রায় পাগলের মত হ'য়ে গেছল। বীভৎস জন্তুর মত যেমন দেখতে হয়েছিল, তেমনি চীৎকার করত। মাত্র ক্লাস টেনে পড়তে পড়তে মারা গিয়েছিল।

ডাক্তার বলেছিলেন, নিশ্চয় আপনাদের পরিচিত-দের মধ্যে কেউ এ রোগ দান করেছে। ঘরে হোক কিংবা পাড়ায় হোক। কারণ, অনেকের মনে এ জাতীয় বিশ্বাস আছে যে, এসব রোগগ্রস্ত লোক যদি কোনো আনটাচ্‌ড হেলদি অল্প বয়সের মেয়েকে ভোগ করতে পারে, তা' হলে সে ভাল হ'য়ে যাবে। তাদের কাছে এ মেয়েই এক হিসেবে আদর্শ। তা' ছাড়া, লিপিকা তো দেখতেও সুন্দরী। রূপটাও ওর কাল করেছিল বোধহয়।

কিন্তু আজ আমি এসব ভাবতে চাই নে। লিপিকাকে ফিরে পাব না। আর লিপির সেই ভীষণ মৃত্যু দেখে, পুরুষদের প্রতি আমি চিরকাল ধরে কোনো ঘৃণাও পোষণ করিনি। কারণ একজন রোগগ্রস্থ পশুকে দিয়ে, পুরুষদের বিচার করা যায় না। মেয়েদেরই কি যায়।

ভাবছিলাম বাবার একটি কথা। বাবা প্রায়ই মাথায় হাত রেখে বলেন, ছাখ্‌ তুলি, (তুলিকা) সংসারে মানুষের নানান সার্থকতা আছে। সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করতে পারার সার্থকতায় যে আনন্দ আছে, এমনটি বোধহয় কিছুতেই নেই।

আমি বুঝতে পারি না, বাবা কী বলতে চান। আমাকে নিয়ে কি বাবার মনে কোনো সংশয় আছে? ভয় আছে? লিপির কথা ভেবে কি বাবা, এত বড় তুলিকে নিয়েও কাঁটা হ'য়ে আছেন?

মা তো আছেই জানি। দাদাটা সাতে-পাঁচে বিশেষ থাকে না। ও দ্রুম দাম্‌ ক'রে এক দমে এম এস সি পাশ করেছে। কোনো এক পেপার মিলে ভাল চাকরি পেয়েছে কেমিস্ট হিসেবে। এবং আরো অনেক উন্নতি হবে। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সাদাসিধে ও আমার চেয়ে প্রায় সাত বছরের বড়। দাদা এখন চায় একটি বিয়ে করতে। 'প্রেম'কে ও বলে, 'প্রেম ট্রেম'। অর্থাৎ ও প্রেম ট্রেম বোঝে না। মাঝে মাঝে ওর রক্তের কেন্দ্রে একটা নাড়া লাগে, তাই বোধ হয় অস্থির হয়ে ওঠে। সেটা মা বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে, মায়ের ছেলেটা বড় হয়েছে। ওকে এবার একটা বিয়ে দিতে হবে।

দাদার এই সাদাসিধে সারল্য আমার ভালই লাগে। অথচ আমি নিজে তেমন সাদাসিধে সরল হ'তে পারলাম না। আমিও এক দমেই পাশ ক'রে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু ছাত্রী-জীবনে দাদার মত নির্বিরোধী থাকতে পারিনি। আমার মত সেও কো-এডুকেশন কলেজেই পড়েছে। কিন্তু কোনোদিন ওকে দেখিনি, পকেট হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পাওয়া দুটি পয়সার বাদাম কিনে, খেতে খেতে হাসতে হাসতে একটি মেয়ের সঙ্গে বক্‌বক্‌ ক'রে চলেছে। শুনিনি যে, ও কলেজের কোনো সভায় যোগ দিয়েছিল। ইউনিয়নে তর্কাতর্কি করেছিল। উত্তেজিত হয়েছিল কোনোরকম মতবিরোধ নিয়ে। দেখিনি যে, দাদা ছাত্র মিছিলে চলেছে, কিংবা দশজনের সঙ্গে হৈহুল্লোড় করেছে। নিজের দুটি ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে একটু বয়সোচিত

পাকামি পাগলামি তত্ত্ব-আলোচনা করতেও দেখিনি। ওর কোনো বন্ধুই ছিল না, নেইও।

অথচ ওর রোমান্টিক চেহারা নিয়ে মেয়েদের মাথা ব্যথা ছিল। জানতাম, অনেক ভাল ভাল মেয়ের মাথা ব্যথা ছিল। কিন্তু ওর মোটা লেন্সের চশমা থেকে, বেশ ভাবময় বড় বড় চোখ দুটি ওসব কোনোদিন দেখতে পায় নি। চেহারা চলাবলা, মানুষকে যে কী রকম ফাঁকি দিতে পারে, দাদা হচ্ছে তার একটা বড় প্রমাণ।

আর আমরা কী না করেছি। কলেজ জীবনে দাদা যা যা করেনি, সেগুলি সবই করেছি। তার বেশী করেছি। নিজের অপার কৌতূহল রোধ করতে পারি নি। কলেজের নানান অনুষ্ঠানের দায়ে, নানান লোকের কাছে গেছি। কত জনের সঙ্গে কত রকমের আলাপ হয়েছে, কখনো ভয় পেয়েছি, কখন আনন্দ হয়েছে। জীবনে অপমানিতাও হয়েছি এই কৌতূহলের জন্য।

তা ছাড়া লিপির যে-দুভাগা ওকে অকালেই শেষ করেছিল, সে-দুর্ভাগ্য আমারও আছে। রূপ আমারও—

ভাবব না। আজ আমার সবকিছুই পরের চোখে দেখার দিন। তবে, রূপকে আমি দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করি নে। ওটা ভুল। রূপ দিয়ে কাউকে ভুলিয়ে রাখতে চাইনে, সেটা ঠিক। কিন্তু যাকে আমি নিঃশেষে দেব, তার গণ্ডুষে গণ্ডুষে পান করা তৃষ্ণায় কাছে আমার রূপ কি একটুও মহত্বও পাবে না? গান দিয়ে দ্বার কি শুধু কু-রূপারা-ই খুলবে? না কি, আসলে রূপ যার আছে, তারই সাজে সেই প্রতিজ্ঞা, 'রূপে তোমায় ভোলাব না।'

ও কথা থাক্। ভাবছি, আমার ভাণ্ডার আছে ভরে। আমি গেছি যাদের কাছে, যারা এসেছে আমার কাছে,কিংবা যাঁরা এসেছেন আমার কাছে, সব মিলিয়ে আমার সুখ দুঃখ, আঘাত অপমান ঘেঁটে ঘেঁটে দেখব আজ।

কিন্তু যে-কথা ভাবছিলাম। দু'দাকে নিয়ে বাবা মার কোনো সংসার নেই। সে কতখানি আদর্শ ছেলে বাবার কাছে, জানি নে। আমি যে আদর্শ নই, সেটা বুঝি। তবে একেবারে যে পতিত হয়েছি, তাও নয়। কিন্তু আমাকে নিয়ে সংশয় আছে। থাকবেই। আমার নিজের যে অনেক সংশয়। দাদার মত, আমি যে কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে, মায়ের কাছে বসে আনমনা অবস্থায় দমকা নিশ্বাস ফেলিনি। তা হ'লে মা বুঝতে পারত, মেয়েটি বড় হয়েছে। পাঠ সাঙ্গ ক'রে ফিরে মেয়েটি বাড়ির পিঞ্জরের মধ্যেই, রান্নাঘর থেকে ছাদে চলে ফিরে বেরাচ্ছে। আর দেরী নয়, এবার ওকে বাবা মায়ের লোহার পিঞ্জর থেকে একটি সোনার পিঞ্জরে পাঠিয়ে দাও।

আমার বেলায় এটা সাব্যস্ত করতে পারলে, সন্তান ভালভাবে মানুষ করার গর্ব্ব বাবার হ'ত কি না জানি নে। অনেক স্বস্তি পেতেন। কিন্তু তা হয়নি, হল না, হবেও না। শুধু আমার দেহ দেখেই বাড়ির মানুষদের স্থির করতে হল, মেয়ের সম্বন্ধ দেখা প্রয়োজন।

দেখলেই হ'ল বুঝি? আর কিশোরী বয়স থেকে এ পর্যন্ত আমার জগতটাকে নিয়ে আমি কী করব? তাকে তো মাদুলি করে গলায় ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

তাই আজ আমি সকাল বেলায় বসেছি আমার তেইশ বছরের হৃদয় মনের ঠিকুজি কোষ্টি কুল পঞ্জিকা নিয়ে।

বাবা রে বাবা। এই বুঝি মেয়ে হওয়ার ঝকমারি। একটি সামান্য কথাকে কত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে না জানি আমরা ভাবতে পারি।

কেবলি পরের কথা দিয়ে নিজের কাজের যুক্তি খুঁজে বার করা।

মা বুঝি আজ সকালেই আমাকে প্রথম ফাইনাল নোটীস দিল? এরকম ফাইনাল নোটিশ মা আমাকে কতবার দিয়েছে গত দু বছরের মধ্যে। অথচ আজকের ব্যাপারটাকে এমন ভাবি বাড়িয়ে দেখছি যে, একটু বাড়াবাড়ি করলেই মনে হবে, আমি যেন রাগ করেছি। কিন্তু মায়ের ওপর তো সত্যি আমার রাগ হয়নি।

মায়ের ওপর, কিংবা সংসারের ওপর রাগ করে কি সত্যি যাচাই করা এবং করানো যায়? না, এত ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে তার জন্যে বলা যায়? আমার নিজের ভিতরে, কোথাও কি কোনো জোয়ার আসে নি? আমি কি কোথাও কোনো ডাক শুনতে পাই নি?

সারা জীবন ধরে সংশয় নিয়ে যাচাই করায় আমার বিশ্বাস নেই। সংশয় জীবন নয়। আসলে আজ এই সকালে আমি সংশয় ত্যাগেরই সাহস নিয়ে বসেছি।

এই সকালে, যখন কংক্রীটের কলকাতাকেও দক্ষিণের বাতাস নাড়া দিয়েছে। যখন বাতাস এসেছে তার পুরোনো পাখার শুকনো পাতা ফেলে। ঠোঁটে ক'রে নিয়ে এসেছে চিকন রুচি পাতা আর কুসুমকলি। যখন, কলকাতায় আমাদের দক্ষিণের এই নিটুট্ মধ্যবিত্ত অঞ্চলেও পাখীরা ডাকছে।

আজ আমি সব সংশয় ত্যাগ করব। তারপরে আজ আমি আমার বাসি বিনুণীর বাঁধন খুলে যাব চান করতে। মা ভাববে, আমি রাগ করে, ঠাট করে বসে আছি ওপরের ঘরে। তাই কথাটিও বলতে আসবে না।

বাবা বলবেন মাকে ডেকে, কেন অমন করে তুমি বলতে যাও। ওরা সব আজকাল বড় হয়েছে। বলার ভঙ্গিটঙ্গিগুলো একটু বদলাতে পার না?

মা আরও রাগ করবে। যে-ওজর তর্ক চালিয়ে যাবে বাবার সঙ্গে। তারপরে এক সময়ে হার মেনে যাবেন বাবা। কিন্তু আমার কার্যোদ্ধার হবে।

যদিও মার কথায় রাগের ইন্ধন অনেক ছিল। ন্যাকামো সংসারের অকল্যান 'ছল চাতুরি ঠাট' অনেক কথা বলেছে মা। কিন্তু মা'কে তো আমিও একটু চিনি। মেয়েটাকে নিয়ে সব সময় অশান্তির জ্বালাটা চেপে রাখা-ই বা যায় কেমন করে? এক তো মেয়ে নিয়ে একটা ক্ষত ছিলই এ পরিবারে।

কিন্তু আমার রাগ করার অবসর কোথায়? যদিও বা স্বার্থপরতা, সত্যি মার কথা ভাবছি বা কতটুকু? আমি যে কান পেতে আছি আমার রক্তে। আমার রক্তে যার কঠিন পায়ের চাপ আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে চাইছে, কাঁপাচ্ছে, আমি তার কাছে নিঃশেষে দেবার নাম দেব ভালবাসা। আর সেই ভালবাসার নাম দেব সাহস।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, ঠোঁট টিপে হেসে অহঙ্কার করার কিছু নেই। আর আর মেয়েদের কাছে যেমন কোনো কোনো ছেলেরা ওদের নিজেদের সঁপতে চেয়েছে, আমাকেও তেমনি কেউ কেউ দিতে চেয়েছে বা চেয়েছেন। আজ আমি তাদের জড়ো করে নিয়ে বসব আমার চারপাশে। সেই বিস্তি খেলার মত দেখব, ফেরাই-এর তাশ সত্যি কার হাতে আছে।

আমার কোনো বান্ধবীকে এমন করে বললে বলত, ন্যাকামি! যেন জানিস নে, ফেরাইএর তাশ কার হাতে আছে।

হয় তো ন্যাকামি। রংএর তাশ ছাড়াও যে শুধু মাত্র কয়েকটি তুচ্ছ তাশ দিয়ে সব পিটগুলি নেবে, ফেরাই তারই। হয় তো আমি তুচ্ছ তাশের হাতে বিকোবে নিজেকে। বাকী তিনজনের কিছুই যাবে আসবে না আমার মনের এই হারজিতের খেলায়। তবু জীবনে সেই তিনজন কম নয় বলে, আমি তাদের সকলের

সঙ্গে বসব। কারণ তাদের ছেড়ে যেতে আমার এক জায়গায় কষ্ট হবেই। আর নিজের কি একটু পরীক্ষাও হবে না? তাদের প্রতি যদি আমার একটুও টান না থাকত, তবে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কেমন ক'রে। কেমন ক'রে পেয়েছিলাম তাদের বন্ধুত্ব।

আমি অসাধারণ মেয়ে নই। তাদের ছেড়ে আসার সাহস আমার আছে কি না, আমাকে শেষবারের জন্য দেখতে হবে। তাদের ছেড়ে আসবার জন্যে দায় আমার। তাদের কিছুই নয়। তাদের কোনো দোষ নেই। তারা ভিন্ন, স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ তারা, তাদের নিজেদের কাজে পেশায় দোষেগুণে মিশিয়ে। আমার নিজের মতই। নিজেকে দিয়ে এ ভাবনাগুলি আমি ভেবেছি।

আমার নিজের একটা মন আছে। মেয়ে হিসেবে আমার অনেক দোষ আছে, ত্রুটি আছে। আমি এক রকমভাবে জীবনকে চিন্তা করেছি। আজ আমার এই খেলার কথা একজন ছাড়া, বাকীরা কেউ জানবে না। সেই একজন হলেন তিনি, যাঁর কাছে যাবার জন্য আমি আমার সব সংশয় নিরসনের জন্য বসেছি। বাকীরা যখন সংবাদ পাবে, তখন তাদের কাছে আমার মূল্য যাবে ফুরিয়ে।

এ মূল্য ফুরিয়ে যাবার কিন্তু একটা কষ্ট আছে। সংসারটা এমনি। তার রীতি-নীতিটা এই রকমই। আপাত দৃষ্টিতে একে নিষ্ঠুরতা বলে মনে হয়। হবেই। কি ছেলে, কি মেয়ে, সকলেরই বুকে বাজে, যখন মনে হয়, তার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হ'তে চলেছে। একটা জগৎ থেকে সে চিরদিনের জন্য মুছে যাবে। লুপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু সেটা স্বার্থপরতা নয়। আমি ভাবি, ওটা মনের ধর্ম। মূল্য কি সকলের আমার কাছেই থাকবে? আমার কাছেও কি তাদের মূল্য ফুরিয়ে যাবে না? হয় তো, তাদের যেমন করে যাবে, আমার তেমন ক'রে যাবে না। কারণ, আমি মেয়ে।

সহস্রের সঙ্গে চলেও একটা কথা ঠিকই থাকবে। যা বুকে থাকবে। মুখ ফুটে তা সব সময় বলতে পারব না। তাতে যদি সেই সেকেলে নায়িকাদের দলে পড়তে হয় আমাকে, ক্ষতি নেই। কারণ নিজে অন্তত জানি, আমরা সকলেই নায়িকা, এবং সকলেই সেকেলে। আমরা যদি মুখ ফুটে সব কথা বলতে পারতাম, কিংবা বলতাম, তা হলে পুরুষের শাসন আমাদের গোটা মেয়ে সম্প্রদায়টাকে বে-আইনি করে দিত। অন্যথায় মেয়ে শাসনের প্রবর্তন হত।

যাক সে কথা। ভাবি শুধু এইটুকু, এমন কপাল যেন আমার হয় যে, যাদের আমি আমার ছোট সাধারণ হৃদয় মনের 'নিঃশেষ অধিকার' দিতে পারব না, তাদের যেন বন্ধু হিসেবে পাই। তারা যেন আমারই সামাজিক সীমার মধ্যে থেকে, অহরহ আমার নিজের পরীক্ষা নিজেকে নিতে দেয়।

তবু যে বিস্তি খেলার নাম করে আজ জীবনটাকে জুয়ার মত দেখছি, তার কারণ আর কিছু নয়। আমার হৃদয় মন রক্তের নিয়তি যেন সত্যি বিস্তি খেলারই ফেরাই-এর প্রতীক হ'য়ে উঠেছে। রং না থাকা সত্ত্বেও যদি সত্যি আমার ভাগ্য কোনো তুচ্ছ কিন্তু একক তাসের হাতেই থেকে থাকে, বুক ফেটে গেলেও একবার তবু চ্যালেঞ্জ করে দেখি।

যদি আশ্রমের মেয়ে হতাম, অরণ্যের ঋষি কন্যা, তবে নিঃসংশয়ে যেতাম আমার সহচরের কাছে। আমাকে বলা হ'ত, 'যাও মা। সাহস ক'রে জীবনের পথে যাও।' বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ বয়স্ক মনীষি হ'লে বলতেন, 'অমন করে কিন্তু খেলার তাসের কথা আপন জীবনের ভবিষ্যৎ গণনায় এনো না। শঙ্খ যদি না-ই বাজে, না যদি থাকে উলুধ্বনি, যা শ্রেয় মনে করেছ যাকে মনে মনে গ্রহণ করেছ, সব তুচ্ছ ক'রে চলে যাও তার কাছে।'

কিন্তু আমি তা পারি নে। তাই নিশ্চয় যাব,

কিন্তু নিঃসংশয় হবার জন্য আমাকে আজ বসতে হবে।

বাবাকে নিজের হাতে চা দিয়ে আসাটা আমার প্রত্যহের কাজ। মায়ের বকুনি খেয়ে আগেই বাবাকে চা দিয়ে এলাম। মা এখনো ব'লে চলেছে। বাবা আমার দিকে একবার করুণ চোখে তাকালেন। শুধু যে মায়ের দিক থেকেই বাবা অসহায়, তা নয়। আমার দিক থেকেও। কারণ আমাকেও তো বাবা সবটুকু জানেন না। আমার মনের গতিবিধিও ধরতে পারেন না। তাই মায়ের কথা বলায় তাঁর সাহস হয় না। পরে শুধু ওইটুকুই বলতে পারবেন মা'কে, 'একটু ভাল ভাবে কথা বলতে পার না?...

কিন্তু মুখ ধুয়ে, যার কাছে আমি খুব মুখ গম্ভীর করে বসে চা' খেলাম। মা বললেন, কি হল? চান না করে চা খাচ্ছিস যে আজ?

বললাম, এখন চান করব না।

আমি কোনো কথা না বলে ওপরে চলে গেলাম। গিয়ে বেশ শব্দ করে দরজা বন্ধ করলাম, মা যত কথাই বলুক, তার প্রাণেও তো একটু ভয় আছে আমাকে নিয়ে। কেন তা জানি নে। কিন্তু আমাকে একটু ভয় পায়। শব্দ করে দরজা বন্ধ করায় আর যাই হোক মা আমাকে সহসা ডাকবে না। বকবকানিও থামবে। কেবল বাবার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হবে। তারপরে, মা তার আসল জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলবে। সে আসল জায়গাটি হচ্ছে দাদা। মায়ের সব কথার নীরব শ্রোতা।

দরজা বন্ধ করে আমি আমার বইয়ের আলমারীটা খুললাম চাবি দিয়ে। ওটা আমাকে চাবি বন্ধ করেই রাখতে হয়। কারণ, ওর মধ্যেই আমার সব। আমার বিস্তি রং ফেরাই, যা-ই বলি, যা-ই ভাবি, সব এইখানে।

কাশ্মীরি ওয়ালনাটের বাক্সোটা তুলে নিয়ে বসলাম মেঝেয়। তার মধ্যে ছোট ছোট থাকে থাকে আমি সাজিয়ে রেখেছি পত্রগুচ্ছ। এ পত্রগুচ্ছ বাংলা দেশের কোনো মনীষীর নয় যে ছাপানো যাবে। এই সব পত্রে কোনো মহত্ব নেই। বড় বড় কথা, বাণী, উপদেশ, কিছুই নেই। নিতান্তই নিজের কথা। একটি মেয়ের কাছে তাদের প্রেমের কথা। তাদের বাসনা কামনা, ব্যথা আনন্দ, ন্যায় অন্যায় সব আছে এই সব পত্রে। কোথাও যদি আবার বাণী কিংবা উপদেশ বলে মনে হয়ে থাকে তবে সে আমারই ভুল, কারণ তারা তাদের নিজেদের কথা নিজেদের মত করে লিখেছে। নিজেদের বিশ্বাসের কথা, জীবন সমাজ সংসার সম্পর্কে তাদের ধ্যান ধারনার কথা অকপটে লিখেছে।

আমার চোখে জল আসছে। কারণ আমার বড় সৌভাগ্য। কারণ, এই চিঠিগুলি আমার। আমি সেই মুখপুড়ি মেয়ে, যাকে তারা এ চিঠিগুলি লিখেছে। এ সম্পদ সংসারে সকলের থাকে না। এ আমার সম্পদ। এর কোনোটাই আমার অশ্রদ্ধার অবহেলার জিনিস নয়। শুধু যে সম্পদে আমার কোনো অধিকার থাকবে না, সেই সম্পদকে অকুণ্ঠে নিজে ফিরিয়ে দিয়ে আসা আমার কাজ।

আমার এই কাশ্মীরি ওয়ালনাটের চার থাক, থাকে চারটি গুচ্ছের পত্রগুলি, শুধু পত্র নয়। যেন চারটি জীবন। চারটি হাত আমাকে ঘিরে ধরে আছে।

আবার সেই বিস্তির কথাতেই আসি। আজ যেন এ চারিটি হাত আমাকে ঘিরে ধরে বসেছে তাদের শেষ খেলায়। আমি বিকোতে বসেছি নিজেকে। মনের এ কথাটা শুনলে মা বাবাদের অসম্মানকর মনে হবে। কিন্তু ভাবতে বেশ রোমান্টিক লাগে। তবে সে সাহস আমাদের সত্যি নেই। আমরা কোনোদিন আর বীর্যশুল্কা হতে পারব না। আমরা একটি বিশেষ পার্সোন্যালিটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হবার চেষ্টা করতে পারি মাত্র।

তবু আমার সেই সাহস হোক। আমার চার হাত নিয়ে বসি। একে একে দেখি এক এক হাত। তারপর যাব ফেরাই-এ। যেখানে নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে, নিঃশেষে সঁপে দেব নিজেকে। দেব তেমন করে, যেমন করে চিরদিন আমার দেশের মেয়েরা দিয়ে এসেছে। তার মধ্যে আমি কোথাও বিদেশ থেকে আমদানি করা স্বাতন্ত্র্যের জটিলতা আনব না। ফিউডাল? না। বরং গণতন্ত্রের বাণী বলা সেই চুক্তিবদ্ধ শয্যাসঙ্গিনীদের দলে আমি যাব না।

ক্লীবের বাসর আমার নয়। সমাজের দুর্ভাগ্য আইন তাকে চালায়। আমার ইচ্ছা-ই হোক আইন! আমার ইচ্ছারই থাকুক সেই সবলতা, যে ভাঙ্গবে, তবু মচকাবে না। সহনশীলতা তারই থাকুক সবচেয়ে বেশী। নিষ্ঠুর পীড়ন সইবার অহঙ্কার, কঠিন প্রতিজ্ঞায় জয় লাভের অধিকার থাক আমারই।

যুবতী স্ত্রীর স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় বলে যায়, 'তোমার জীবন থাক চিরকাল কুসুমিত বর্ণবাহার বাগান। আমার মৃত্যুতে যেন বাগান ধ্বংস না হয়। খুঁজে নিও মনের মত সঙ্গী।' স্ত্রী যদি মেনে নিতে পারে, ফুল যদি পারে ফোটাতে তবে তাই হোক তার আইন।

আমি যদি যেতে চাই সতীদাহের সহমরণে, তবে সেই যেন হয় আমার আইন। শত শত বৎসরের দুর্গন্ধময় মহাফেজখানায় পোকায় কাটা অথর্বের গড়া আইন আমার জীবনে দিগনির্ণয় যেন না করে।

আমি তাই একে একে হাত দেখি। ফেরাই-এর হাতে যাব বলে। আমার বাসর হোক প্রকৃতির আহ্বানের মত। কুসুমিত অরণ্যের বাতাসে ভেসে আসা সিংহের আহ্বান শুনে আমি যেতে চাই। লোকে জানলে বলবে, এ্যানিমেলিটি।

সংসারে দেখলাম অনেক র‍্যাশনাল বীং। মানুষের চামড়া ঢাকা সেই সব জীবেরা আজ সরে যাক আমার ভাবনা থেকে।

আমার ভিতরে থাক সেই আরণ্যক বাসনা ও আত্মদানের আদিমতা। আমি তার নাম দেব ভালবাসা। আমি সেখান থেকে আসব এই ডেমোক্রাটিকদের প্রত্যাহের এরেনায়, এই সুসভ্য সমাজে। এখান থেকে সেখানে যাওয়াটা শোনাবে প্রগতিহীনতার মত।

আমি বাক্সোটি খুললাম। তুলে নিলাম প্রথম হাতের পত্রগুচ্ছ। পাখীটা ডাকতে লাগল। পাতা ঝরতে লাগল, বাতাস এসে ধাক্কা দিতে লাগল আমার দরজায়।

। প্রথম হাত ।

তুলিকা,

এ চিঠি তোমাকে দিতুম না। যদি ভেবে থাক, পরশুদিনের ব্যবহারের কোনো ন্যায়সঙ্গত কৈফিয়ৎ দিচ্ছি, তা হলে আরো ভুল করবে।

চিঠি একটা প্রমাণ স্বরূপ কাজ করে। তা করুক আমি ভয় পাইনে। নিজের বিতৃষ্ণা জানাবার জন্যে যদি তুমি কাউকে আমার এ চিঠি দেখাতে চাও, আমাকে হেয় করতে চাও, করো। আপত্তি করব না। করব না এ জন্যে, আমার কাজের দায় আমার-ই। অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। অন্যায় যদি হয়ে থাকে তার জন্য শাস্তি যদি আসে, আসুক। সেটাই স্বাভাবিক। শাস্তি মেনে নিতে না পারলে আমি লড়ব। লড়তে গিয়ে হারলে আমি কাউকে দোষ দেব না।

কিন্তু তার আগে একটি সত্য কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, সেটাও প্রায় মাস ছয়েক আগে, 'কটি মেয়েকে আপনি এক সঙ্গে ভালবাসেন?'

যে কোনো ছেলে শুনলেই ব্যাপারটাকে খুব

রোমান্টিক ভাববে। অনেক মেয়ের সঙ্গে থাকতে পারা, ঘুরতে পারা, অনেক বাঁদরের কাছে মুক্তোর মালা গলায় দিয়ে বেড়াবার মত, নিজেকে দর্শনীয় করবার মত আনন্দদায়ক হতে পারে।

কিন্তু যে হেতু তোমাদের ওই ভালোবাসা কথাটার মানে আমি সত্যি জানি নে, সেই হেতু, মুক্তো গলায় দিয়ে বেড়াবার বাসনা আমার জাগে নি কখনো। আমি যেগুলি কুড়িয়ে পেয়েছি, সেগুলি মুক্তো কি না জানি নে। তবে তাদের আমি নেড়ে চেড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে পরখ করে দেখতে চেয়েছি? কিন্তু অনেক করেও ওই ভালোবাসা কথাটার মানে উদ্ধার করতে পারিনি।

সেই মুক্তো আমি গোপন করেই রাখতে চেয়েছি। তাকে গলায় লটকে বেড়াইনি। তুমি যে জানতে পেরেছ, তার কারণ আর কিছু নয়, ঘনিষ্ঠতা। প্রায় বছর খানেক তোমার সঙ্গে আলাপ। এবং আলাপের শুরু থেকেই লক্ষ্য করেছ, সৌভাগ্য হোক দুর্ভাগ্য হোক, মেয়েরা আমার আশে-পাশে থেকেছে। আর সকলের মত তোমার মনেও নানান প্রশ্ন জেগেছে। তারপর সরাসরি প্রশ্নই করেছিলে, 'কটি মেয়েকে আপনি এক সঙ্গে ভালোবাসেন।'

সেই সত্যি কথাটি বলবার জন্যেই এ চিঠি। সেই সত্যি কথা, ভালোবাসা'র মানে যে জানল না, তার কাছে ওটা অবান্তর। এক বা একাধিককে ভালবাসা যায় কি না, সে কথা তো আরো বহু দূরে।

এখন আমার মনে হয়, এ সংসারের সবটাই তৈরী করা কতগুলি বিশ্বাস। শোনা মাত্র সবাই আমাকে সিনিক বলবে। বলুক। কারণ আমি সিনিক নই। তুমি একদিন বলেছিলে, 'সিনিসিজম্ খারাপ নয়।'

—কেন?

—নানান প্রশ্ন গেঁথে গেঁথে। সন্দেহ করে করেই জিজ্ঞাসার মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায়। সেই জন্যেই বলব, সিনিসিজম খারাপ নয়।

আমার ওরকম ভঙ্গির কথাই ভাল লাগে না। তুমি যে রকম বুদ্ধি খাটিয়ে সিনিসিজমের ব্যাখ্যা করেছিলে, সেটা বোধহয় একমাত্র উপন্যাসের নায়িকার মুখেই মানায়। তাও সেই সব উপন্যাসের নায়িকা, যারা বাংলা দেশের ইংরেজী কাগজে সংবাদ-দাতার চাকরি করে বিদেশী বই পড়ে, পরের জীবন-বোধের ভাবের ঘরে চুরি করে, উপন্যাস লিখে প্রফেট হতে চায়, যারা মনে করে তাদের নিজেদের মাতৃভূমিকে জানার মধ্যে কোনো গৌরব নেই, সেই তাদের উপ-ন্যাসের নায়িকার মুখে মানায়।

শুধু মানায় বলেছি, তুমি তাই কি না, আমি বলি নে। কারণ, আমি জানি নে। আর তুমি যদি তাই হও, তাতেই বা আমার কি যাবে আসবে? তোমার বিশ্বাস আমি কেড়ে নিতে চাইলেই কি পারব। বিশ্বাস কি কেড়ে নেওয়া যায়?

চিঠিটা বড় হচ্ছে। লিখে ফেলা নিয়ে কথা। পাঠাব কি না, সেটা লেখার পরে ভেবে দেখা যাবে।

তবু আমি কেন বলি তৈরী করা বিশ্বাসের কথা? ভীরুর কাছে সেটাই বাঁচার একমাত্র হাতি-য়ার। তোমার রাগ হচ্ছে তো আমার এসব কথা পড়ে? হলেও, অন্তত আমার নিজের কথা বলার অসঙ্কোচ অধিকার থাক।

বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের কথাই ধর। এটা কি একটা তৈরী করা বিশ্বাস মাত্র নয়? এমন কত বিশ্বাসের উত্থান-পতন হয়েছে। কত গেছে, এসেছে কত।

সুখ তো ভীরুদের জন্যই। জরা ও মৃত্যুর ভয় যাকে দার্শনিক করেছে। আমরা ভাবি, মানব জাতির উদ্ধারের জন্য ভদ্রলোকটির আবির্ভাব হয়েছিল। মিথ্যে। ঘোর মিথ্যে। নিজের জরা ও মৃত্যুর আতঙ্ক তাকে অস্থির করেছিল। তার চেয়ে তো আমার 'সম্মুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।'

অনেক ভাল লাগে। তার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই।

জন্মগ্রহণ মাত্র দেহের ও মনের যে অনুভূতি সারাটি জীবন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, তার লয়, তার ক্ষয় তো সবচেয়ে বড় শান্তি। মেলাই পুঁথি পাঁজী লিখে সে কথা প্রমাণ করতে হয় নি। যদিও সেটাও একটা তৈরী করা বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে। তবু অনেক বেশী সমর্থন করা যায়। কারণ তিনি তো বলেন নি, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হবে, মহানির্বানের কথা তিনি বলেন নি।

তিনি লয়কে ক্ষয়কে শান্তি বলেছেন। জীবনে যাঁর সুখের তীব্রতা বেশী, দুঃখের পাথার যাঁকে চিরকাল আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছে, লয় ক্ষয় তাঁর কাছেই মহাশান্তির প্রতীক।

বুদ্ধদেব যখন মহানির্বাণের কথা বলছিলেন, সেই সময়েই আরো দু' এক জনের কথা ভেবে দেখ। আমার মনে পড়ছে না, তোমার কোন্ বিষয়ে অনার্স। ফিলজফিতে থাকলেও, লোকায়তিক জড়বাদীদের বিষয় তোমাদের নিশ্চয় তেমন করে পড়ায় না। শত হলেও হিন্দুর ঘরের ভদ্রলোকদের মেয়েরাই তো কলেজে পড়ে, তাদের কখনো অমন কু-দর্শনের শিক্ষা দিয়ে মাথা খাওয়া চলে? তুলি! রাগ করো না যেন। আমি দেখতে পাচ্ছি পরশু দিনের তোমার সেই আয়ত চোখের আহত ক্ষুব্ধ দৃষ্টি। তুমি হাত দিয়ে তোমার দুই গাল চেপে ধরে আছ উত্তেজনায়। তখনো তোমার রক্তাভ সিক্ত ঠোঁট দুটির কপাট যেন নিষ্ঠুর বাতাসের ঝাপটায় অসংবদ্ধ, আগলহীন, খোলা এবং কাঁপা কাঁপা। চোখে বুঝি তোমার ঘৃণা ছিল। জল আসছিল। ঘৃণাতেই তুমি তা রোধ করছিলে। দারুন উত্তেজনায় তোমার বুক ওঠা-নামা করছিল। তোমার আঁচল গেছে খসে। তুমি বিস্রস্ত হয়ে পড়েছ।

(কিন্তু আমি পাথরের মত বসেছিলাম না। আমি তোমার ঘৃণা প্রজ্বলিত চোখে, তোমার আন্দোলিত তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ করা দেখছিলাম। তুমি আমার চোখ থেকে চোখ নামাও নি। কি ভাবছিলে? শিবেন রায়ের চওড়া গালে খুব জোরে একটা চড় মারবে কি না? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি। আমি কিন্তু সে সব ভাবছিলাম না। মৃত্যুর মত, একেবারে লয় এবং ক্ষয়ের মত একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অসহ্য ব্যাথায় আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। তোমাকে টেনে নিতে ইচ্ছে করছিল বুকের মধ্যে। নির্দয়ে এবং বর্বরের মত লুট করতে চাইছিলাম।

(তুমি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছলে। যেন বিষাক্ত কোনো পতঙ্গের লালা লেগেছে তোমার ঠোঁটে, এমনি একটা বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে, বিকৃত মুখে সজোরে ঠোঁটে আঁচল ঘসে তুমি চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বললে, 'এ কি করলেন? কেন করলেন? কী বিশ্রী! আপনার মুখে মদের গন্ধ। আপনি মদ খান? আপনি একটা মাতাল, অথচ এ এক বছরের মধ্যে আমি কোনোদিন জানতে পারি নি? কিন্তু কেন এমন কাজ করলেন?

(শেষের ও-কথাটা কি মিথ্যে বল নি তুলি? তুমি কি সত্যি জানতে না, আমি মদ খাই? এক বছরের মধ্যে কখনো কি গন্ধ পাওনি? এ কথা আমি মানতে পারব না। তুমি শুধু আমাকে দেখছিলে। হয় তো আমাকে পরীক্ষা করছিলে। কোনোদিন মাতাল হতে দেখ নি। কিন্তু পরশুদিন তুমি আমাকে অপমান করার আর ভাষা খুঁজে পেলে না।

(আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করি নি। কারণ, ইচ্ছে করছিল না। আমাকে মাতাল বলে যদি তোমার শোধ নেওয়া হয়, হোক। কিন্তু কেন অমন কাজ করলাম, সেকথা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার ভাষাও আমার ছিল না। যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, কাব্যের ভাষায়

তাকে বোধহয় বলা যায়, ভালবাসার উক্তি। কিন্তু ওসব কথা বলার প্যান্‌প্যানানি আমি কপচাতে পারি নে। যদিও শুনেছি, মেয়েরা নাকি ওসব শুনতে ভালোইবাসে। তার চেয়ে অনেক কথা জমে জমে যদি সব কথা একটা হীন তীব্র কান্নায় রূপান্তরিত হয়। লজ্জা রেখে আমি সেই কান্না কাঁদতে পারি।

(তাই তোমার প্রশ্নের সামনে, আমি আরো গাঢ় গম্ভীর স্বরে তোমাকে ডাকলাম, 'তুলি!'

(তোমার ওই প্রশ্নের পরে, আমার মুখে তোমার নাম শুনে, তুমি বোধহয় ক্রুদ্ধ বিস্ময়েই ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালে। দেখলাম, তোমার নাসারন্ধ্র ফুলছে। সে কি তোমার অপমান আর ঘৃণা? ভয় পাচ্ছিলে মাতালটার জন্যে? কিন্তু তুমি জান, আমি সত্যি মাতাল নই। আকণ্ঠ পান করলেও কারুর সম্মানের হানি আমি কখনো করিনি। ভেবে দেখ না কেন সেই গুড ফ্রাই-ডে'র দিন। তুমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলে, আমি অত্যাধিক মদ খেয়েছি। মুখে না বললেও তুমি ভয় পেয়েছিলে, আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারব কি না। বলেছিলে, 'আপনার কি শরীরটা ভাল নেই আজ? চলুন তা হলে আপনাকে বাড়ি রেখে আসি?

(মনে মনে আমার ভীষণ হাসি পেয়েছিল। তবু বলতে পারনি, 'শিবেনবাবু, অতিরিক্ত মদ খেয়েছেন আপনি। আপনার যদি কষ্ট হয়, তবে চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।' কিন্তু তা তো তুমি বলতে পার না। বললেই যে প্রমাণ হ'য়ে যায়, তুমি একটা মদ্যপের সঙ্গে আলাপ রাখ।

কিন্তু তোমার মনে আছে তুলি গুডফ্রাইডে'র দিন তোমার সঙ্গে আমি একটা বেশী কথাও বলতে পারি নি। সেদিন আমি সকাল থেকে প্রতিযোগিতা করে মদ খেয়েছিলাম। কথা ছিল, সব চেয়ে বেশী পরিমাণ মদ খেয়ে যে ভালভাবে কথা বলতে পারবে, শক্ত হয়ে চলতে পারবে, সে হবে বীর শ্রেষ্ঠ! ব্যাপারটা বন্ধু-বান্ধবদের ঠাট্টার বিষয়। বুঝতেই পারছ। আর এসব বিষয় তো কোনো অহঙ্কারের নয়। শুধু, আমাদের ছয় বন্ধুদের মধ্যে, আমার অবস্থাটা দেখবার জন্যও সেদিন কেউ সুস্থ ছিল না। সবাই মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছিল। তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। দশটায় আমরা বসেছিলাম। ঘড়ি দেখে আমি উঠে পড়েছিলাম। কারণ, আমার বোম্বের শিল্পী বন্ধু দুর্গা দাসের ছবির একজিবিশনে তোমার আসার কথা ছিল। আমারও যাবার কথা ছিল। কথা ছিল, তোমার সঙ্গে আমি দুর্গাদাসের আলাপ করিয়ে দেব।

(তুলি, বয়স তোমার বেশী নয়। সেই অনুপাতে তোমার সাহসটা বেশী ছিল। কিন্তু বয়সের চেয়ে তোমার জানার বায়না বেশী। ওসবে আমার তেমন বিশ্বাস নেই, তবু কথা যখন দিয়েছিলাম, যাওয়াই সাব্যস্ত করেছিলাম। অন্তত আমাদের প্রতিযোগিতার প্রমাণটা হবে। তোমার সঙ্গে কি সেদিন কোনো দুর্ব্যবহার করেছিলাম?

(করি নি। কিন্তু চোখ টকটকে লাল ছিল। দুর্গাদাসের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দিয়ে, ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্কতা আসছিল। যদিও তোমার উপস্থিতি একেবারেই ভুলি নি। এমন কি, লক্ষ্য করেছিলাম, তুমি গোপনে আমাকে দেখছ। দুর্গাদাসের কাছে নিজেকে তোমার হীন মনে হচ্ছিল, আমার সঙ্গে একজিবিসনে গিয়েছ ব'লে। নিতান্ত ভদ্রতায় বেঁধেছিল, তাই ছবি দেখা শেষ ক'রে তুমি আমাকে ডেকে বলেছিলে, 'চলুন, দেখা হয়ে গেছে।'

(দুর্গাদাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে, আমি শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ছবি কেমন লাগল?'

(তুমি আমার কথা শুনে স্বস্তি পেয়ে, খুব বক্‌বক্ করতে লাগলে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল,

বাংলা দেশের সেই সব আর্টক্রিটিকদের বাঁধা বুলিগুলি তুমি বলেছিলে। আর আমি ভাবছিলাম, এই এক ফোঁটা মেয়েটার সঙ্গে আমি কেন, কোথায় হেঁটে হেঁটে চলেছি। আমি কোনো কথাই বলি নি। এসপ্লানেডের কাছে এসে বলেছিলাম, 'আমি একটু কফি খেতে যাব।'

(তখন তুমি বলেছিলে, 'আপনার শরীরটা কি ভাল নেই আজ ? চলুন তাহলে আপনাকে বাড়ি রেখে আসি।' আমি কী জবাব দিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে ? আমি বলেছিলাম, 'শরীর ভালই। মনটা খারাপ আছে। বাড়ি পৌঁছে দেবার মত অসুস্থ আমি নই।'

(তুমি কি ভেবেছিলে, কে জানে ? কিন্তু মনটা আমার সত্যি খারাপ ছিল। ভাবছিলাম, আমি আমার হৈ-হুল্লোড়ের সমাজটা ছেড়ে, তোমার সঙ্গে ওরকম উত্তেজনাহীন শান্ত অবস্থায় কেন ঘুরে মরছি ? না কি আমার উত্তেজনা কিছু ছিল ? অশান্ত ছিলাম অন্তরে অন্তরে ?

(তার পরিচয় আমি দিয়েছি পরশুদিন। তুলি, তোমার পরশুর মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। আমার মনে পড়ছে—। কিন্তু ওসব ভাবলে, যা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, তা আর বলা হবে না। এবার ব্রাকেট পূর্ণ করি।)

তাই ভাবি, বুদ্ধদেব যখন একটা বিশ্বাস তৈরী করেছে, তখন অজিত কেশকম্বলী কিংবা মংখলী গোসালেরা ওরকম কোনো বিশ্বাস তৈরী করতে পারছিল না। অথচ ওরা সকলেই সমসাময়িক। বুদ্ধদেব বললে, মহানির্বাণ।

এরা বললে, তা' হ'লে পূর্ণজন্মের কথাটা মেনে নিতে হয় ? অন্যথায় মহানির্বাণের প্রশ্ন আসে কেন ?

তাই এরাই সাহস দেখিয়ে বললে, কিন্তু ওসবই মিথ্যে। ইহকাল নেই, পরকাল নেই। চারিভূত বিশিষ্ট এই শরীর। যা থেকে জন্মে, তাইতেই মিলায়। ঈশ্বর বলে কিছু নেই, সুতরাং মহানির্বাণ দেবার কর্তাও কেউ নেই। তুমি জন্মেছ, এটাই সত্য। যেমন গাছ জন্মায়। তুমি মরবে। সেটাই শেষ। যেমন গাছ মরে। এই প্রকৃতির নিরন্তর পরিবর্তনের তুমি একটি মুহূর্তের ফল। কালের অন্ধকারে মুহূর্তেই মিলিয়ে যাবে। আত্মা বলে কিছু নেই, মৃত্যুর পরেও যে বিরাজ করে। মানুষ প্রকৃতিরই ক্রীড়নক। সে তৈরী বিশ্বাস দিয়ে রাজা হয় প্রজা পালন করে। মনে করে, এ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে। তারা ভুল করে। কারণ, এমনি তৈরী বিশ্বাসের পাশাপাশি, আর একটি তৈরী বিশ্বাস উপস্থিত হলেই, সংঘর্ষ অনিবার্য। তখন রাজা রাজ্য কিছুই থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি নিরন্তর এবং তারই ক্রীড়নক হিসাবে মানুষের লীলা। কারণ এই চারি ভূত বিশিষ্ট জগৎ আমাকে যা দেয়, আবার তা ইচ্ছানুযায়ী ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর, আমার দেহের জল এই জগতের জলেই মেশে। দেহস্থিত বায়ু এ জগতের বায়ুতেই মেশে।

অতএব সাহস যদি থাকে তবে বাস কর এ পৃথিবীতে। এ কথায় কোন ফাঁক নেই, এটা বিজ্ঞান। তৈরী করা নয় সত্য বিশ্বাস নিয়ে বাঁচা।

জানি নে, এ সাহস কার আছে। ভাব, আমার মহানির্বাণের কিছু নেই। আমার ব্রহ্ম নেই। এমনকি আমার পরমপুরুষও নেই। তবে কী নিয়ে বাঁচি ?

যেমন ধর, মর্গান বলছে, যে কারণে প্রিমিটিভ কমিউনিজমএর সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তার উলটো কারণে মডার্ন কমিউনিজমের সৃষ্টি হতেই হবে। একটা ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের উৎপাদনের হাতিয়ারের অভাবে। আর একটা হবে আধুনিক মানুষের উৎপাদনের হাতিয়ারের প্রাচুর্য অথচ দারিদ্র্য।

কথাটা কোনো তৈরী বিশ্বাস নয়। যোগ বিয়োগের

মত সত্য। সে হিসেবে তুমি আমাকে মর্গানিস্ট বলতে পার।

কিন্তু ভালোবাসা কাকে বলে তুলি?

সংসারটা কত বিপরীত বিড়ম্বনায় ভরা। আমি ছিলাম ফাইন আর্টসের ছাত্র। পাশ করে বেরিয়ে প্রথমে আমাকে যেতে হয়েছিল একটা হ্যারিকেন কোম্পানীর কারখানায় জীবিকার জন্যে। টিনের হ্যারিকেন আঁকাটাই ছিল কাজ। অবশ্য মাপজোক ক'রে। হ্যারিকেন, নানান ধরনের। দেয়ালবাতির এমন কি লণ্ঠনও ছিল তার সঙ্গে। না করে কী উপায় ছিল? আমাদের গরীব পরিবার। শুধু গরীবই বা বলি কেন। দারিদ্রের সঙ্গে সব রকম গোঁড়ামি ছিল। আর্ট স্কুলে পড়াটা কেউ কোনদিন সুনজরে দেখেনি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোটা কে কবে আর ভাল চোখে দেখেছে। তবু একটা পাগলাটে ঝোঁক ছাড়তে পারিনি কিছুতেই। ভাগ্যিস্, আমাদের নিম্ন-বিত্ত পরিবারে একটা গোঁড়ামি ছিল, ছেলেকে বসিয়ে রাখতে নেই। যাহোক কিছু করা দরকার। তাই মাট্রিক পাশ করার পর যখন বেয়াদপ পনিটার মত ঘাড় বাঁকিয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছিলাম, কলেজে যাব না, আর্ট স্কুলে যাব, তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কিন্তু পাশ ক'রে বেরুবার পর যখন হ্যারিকেনের কারখানায় যেতে হয়েছিল, তখন আর মাথা তুলতে পারিনি। বাবা মুখের ওপরেই টিট্‌কারি দিয়ে বলতেন 'হ্যারিকেন কারখানার নক্‌সা বাবুর খবর কী? হুরী পরীদের ছবি আঁকা আজকাল কেমন চলছে।'

অর্থাৎ ফাইন আর্টস মানেই, আমার বাবার মতে হুরী পরীদের ছবি আঁকা। শুধু রং আর রং। সত্যি, রং যে কী ভালোবেসেছিলাম ছেলেবেলায়। কী আমার সাহস। আমি মনে করতাম, রং দিয়ে আমি আর একটা পৃথিবী সৃষ্টি করব। গাছ পাখি আকাশ, এদের সব ভঙ্গি আমার সব সময় পছন্দ হ'ত না। ভাবতাম, আমি একটা নতুন আকাশ সৃষ্টি করব! নতুন গাছ, নতুন পাখি।

আমার কথা কেউ বিশ্বাস করত না। ছেলেবেলায় গোধূলির আকাশে আমি কতদিন দেখেছি, একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে। আমার দিদিকে সে কথা বলেছিলাম ব'লে, ও সারাটা বাড়ি রটিয়ে বেড়িয়েছিল। কী ভীষণ হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল সারা বাড়িময়। মনে আছে বাবা বলে-ছিলেন, 'এই ছেলেটি হবে পাকা রকবাজ। এখন থেকেই নানান গালগপ্পো ছাড়তে আরম্ভ করেছে। ওকে জিজ্ঞেস কর তো, ছেলেমেয়েগুলি দেখতে কেমন-?'

বাবার কথার মধ্যে একটি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। সেকথা আমি এখন বুঝতে পারি। তিনি যদি শুনতেন, ছেলেটির পীতবসন গায়ে, মাথায় ময়ূরপাখা, হাতে মোহন বাঁশী আর মেয়েটি নীলবসনা কাঞ্চনবরণী, তা হলে উনি চিন্তিত হয়ে উঠতেন। হয় তো আমাকে নিয়ে যেতেন তার গুরুদেবের বাড়ি। এবং সেটা খুব গৌরব করেই।

কিন্তু আমি যাদের দেখেছিলাম, তাদের গায়ের রং ছিল লাল মাটির মত। দেহে তাদের কোনো জামা কাপড়ই ছিল না। উভয়েই নগ্ন। এক মাথা কালো চুল। ভুবন আলো করা তাদের রূপ।

আমার মায়ের বুঝি তখনো একটু স্নেহ অবশিষ্ট ছিল আমার জন্যে। শুনে বলেছিল, আকাশের ওই মেয়েটির মত একটি টুকটুকে মেয়েকে তোর বউ করে এনে দেব শিবু। (আবার তোমার মুখখানি মনে পড়ছে তুলিকা!) মার কথা শুনে আমার লজ্জা হয়েছিল। আনন্দও হয়েছিল। যদিও তখন প্রেম করার বয়স আমার বহু দূর। প্রেম! (হাসব না, কিন্তু জিজ্ঞেস করব, ভালোবাসা কাকে বলে তুলি!)

কিন্তু কেন এসব কথা বলছি তোমাকে। আমি আমার অতীতকে সহজে স্মরণ করতে চাইনে। পরশুর ব্যাপারটার পরে দেখছি, অতীতকে রোমন্থন করতে হল আমার। আর সেটাও তোমার কাছে। জীবনের ট্যাজেডিগুলি বোধহয় এই রকমই। তোমার কাছেই রোমন্থন করতে হ'চ্ছে, যে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। অবশ্যই সেটা মধ্য কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতার দূরত্ব নয়। তার চেয়ে অনেক অনেক দূরে। চিন্তায় বিশ্বাসে ধ্যান ধারণায়, পরস্পরের সঙ্গে আমাদের কোনো মিল নেই। কোনোদিন মিল হবে না জেনেও লিখতে হচ্ছে। কি বিশ্রী, বিরক্তিকর। সেই প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নকের মত। নিয়তি যেন ঘাড় ধরে লিখিয়ে নিচ্ছে।

ঠিক আমার জীবনটার মত। আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়ে হ্যারিকেনের কারখানায় যাবার মত। কিন্তু তা-ই বা কতদিন। সেখান থেকে যেতে হল কর্পোরেশনের এক ওভারসিয়ারের কাজ নকল করার জন্যে। সেটা কোনো কারখানার চাকরি নয়। বাড়ি ঘরের যে-সব নক্সা ভদ্রলোক তৈরী করতেন, আমাকে তার নকল তুলতে হত। নক্সার মাপ অনুযায়ী আমি আমার কমিশন পেতাম।

প্রায় স্বাধীন ব্যবসা বলা যায়। এবং আমাদের বাড়িতে স্বপ্ন দেখা হত, কালে একদিন আমিও ওভারসিয়ার হয়ে যাব। ওভারসিয়ারি পাশ করা? কী দরকার।

আমি নক্সা তৈরী করব, নাম দেব আর এক জনের। একবার নাম করতে পারলেই হল। কত বিকোবে বিকোক।

সেই বোধহয় আমার প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল। পোর্ট্রেট-এর। আমার কর্তা ওভারসিয়ারের একটি পোর্ট্রেট আঁকতে হয়েছিল আমাকে। সেটা হুকুমেই যদিও, তবু আনন্দ পেয়েছিলাম। সারা জীবনের তিক্ততার মধ্যে, এমনি মাঝে মাঝে কিছু বাঁচার অর্থ থাকে বলেই মানুষ বোধহয় প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে টিঁকে থাকবার।

কিন্তু পোর্ট্রেটটি ভদ্রলোকের পছন্দ হয় নি। আমি নাকি তার গাল দুটি অনেক বেশী ফোলা ফোলা ক'রে ফেলেছিলাম। যেন কিছু খাচ্ছেন মুখে পুরে। চোখ দুটি বোকা এবং লোভী নাকি দেখাচ্ছিল। অথচ ভদ্রলোকের ধারণা, তাঁর চোখ স্বাভাবিক, চাউনি শান্ত এবং ভদ্র! মুখে নাকি ওঁর মোটেই দাড়ি গোঁফ ছিল না। কেবল বজ্জাতি করবার জন্যেই নাকি আমি ওর পোর্ট্রেট-এর মুখটা কামিয়ে দিই নি!

মনে আছে ভদ্রলোক বলেছিলেন, ফাজলামি পেয়েছ। এন্‌তার রং খরচা করে শেষে আমার একখানি কার্টুন এঁকে দিয়েছ?

আমি বলেছিলাম, কার্টুন তো আমি আঁকতে জানি নে।

—নিশ্চয়ই জান। তা' নইলে এসব কী? এটা কার ছবি মনে ক'রে এঁকেছ?

—কারুর মনে ক'রে নয়। আপনাকে দেখে।

—চোপরাও।

ভদ্রলোকের হাতে চিস্কোয়ারটি প্রায় উদ্যত লাঙলের মত হ'য়ে উঠেছিল।—আমাকে পাগল পেয়েছ তুমি? তোমার মত আর্ট স্কুল থেকে পাশ করা গণ্ডা গণ্ডা ছেলেকে আমি পুষতে পারি, আর তুমি আমাকে চালাকি দেখাতে এসেছ? আমার ছেলে মেয়ে, আমার পরিবার, সবাই দেখে বলেছে ওটা আমার পোর্ট্রেট নয়। আঁকতে জান না, তাই বল। হয় তোমাকে তাই স্বীকার করতে হবে, নইলে নতুন ক'রে আর একটা এঁকে দিতে হবে।

বলেছিলাম, কিন্তু ওর চেয়ে ভাল তো আমি আঁকতে পারব না।

—তবে বেরিয়ে যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও। তোমাকে আমি আর কোনো কাজ দেব না।

অগত্যা তাই আসতে হয়েছিল। কিন্তু আমি ঠিকই এঁকেছিলাম। আমি যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি এঁকেছিলাম। বিদেশের কোনো আর্ট-কর্মের কথা তোমার মনে পড়ছে না তুলি? পড়ছে নিশ্চয়ই। তা' পড়ুক, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এ ভ্রাতৃবোধ শিল্পীদের থাকা-ই স্বাভাবিক। (তুলি, তারপরে অনেক পোট্রেট এঁকেছি, একটা পোট্রেট আঁকা হয় নি। সকাল বেলার রোদ খানিকটা তুলে, একটি মুখের ছাঁদ। কালো দুটি চোখের মণি, চঞ্চল। আর দুটি ঠোঁট। পেশল শক্ত নিষ্ঠুর কোনো জোয়ান পুরুষকে খুন করে তার তাজা রক্ত দিয়ে সেই ঠোঁট রাঙানো। সেই পোট্রেট আমার আঁকা হয় নি।

(তুলি, পরশুর কথা আবার মনে পড়ছে। আমার মুখে কোনো কথা ছিল না। কেন না কথায় আমার বিশ্বাস নেই। তার চেয়ে একটা দুর্বোধ্য স্বরের কান্না অনেক পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, অ-জটিল সরল। যার অনেক অর্থ নেই। একটি পশুর অসহায় আর্তনাদের মত।

(কিংবা গর্জন। সেটাও পশুর মতই, অনেক সাবলীল, দৃঢ়, ছলনাহীন, চাতুর্যহীন। আমি জানি তোমার খুব খারাপ লাগছে তুলি এসব কথা। জানি, তুমি আমার কথার একটি-ই মানে ধরবে। এবং আমার কথারই খেই ধরে, আমাকে কল্পনা করবে পরশুর সন্ধ্যায়। তোমার ঘৃণা, তীব্র ঘৃণা জ্যৈষ্ঠের খর রোদের মত দপ্‌দপিয়ে উঠবে তোমার মুখের শানে।

(কিন্তু আমি কী করব? আমার বিশ্বাস। মিথ্যে কথা আমি কেমন করে বলব? কারুর মুখ চেয়েই মিথ্যে কথা আমি বলি নে। আমার বিশ্বাস নেই কথা বলাতে। তাই তোমার ক্রুদ্ধ বিস্মিত মুখের ওপর, আমার বুকের ভিতর থেকে একটি ডাক-ই উঠে এসেছিল, 'তুলি'।

(কী জানি, তুমি কি ভয় পেয়েছিলে তখন আমার সেই ডাক শুনে? তুমি কি খুব অসহায় বোধ করেছিলে? আমি হাত বাড়িয়ে তোমার হাত ধরেছিলাম। তখন তোমার হাত আর গালে ছিল না। যেন আত্মরক্ষার্থেই দু'হাত জড়ো করেছিলে বুকের ওপর। এক হাতে ছোট একটি ঘড়ি, আর এক হাতে রাশি খানেক নীল কাঁচের চুড়ি। চুড়ি পরা হাতখানিই আমি ধরেছিলাম।

(কিন্তু তোমার হাত শক্ত হয়ে উঠেছিল। মট্, মট্, ক'রে টুকরো টুকরো হ'য়ে ফোঁটা ফোঁটা নীল-কান্ত মণির মত তোমার কয়েকটি চুড়ি ভেঙে গিয়েছিল। উঃ কী জ্বলন্ত ঘৃণা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তোমার চোখে। তুমি আমারই বর্ণিত সেই পশুটিকে দেখছিলে, না? আমার চোখের গভীরে তোমার চোখের তীর আমূল হেনে দেখছিলে। কী দেখেছিলে তুলি? সে কথা কিন্তু তুমি আমাকে সঠিক বলতে পার নি।

(তুমি অস্থির হয়ে ওঠো নি। আরো যেন শান্ত হ'য়ে গিয়েছিলে। জিজ্ঞেস করেছিলে, কী চান আপনি?

(আমি তোমার আর একটি হাত ধরেছিলাম। তুমি বলেছিলে, আপনার আর দশজন বান্ধবীদের সঙ্গে যা ক'রে বেড়ান, তাই চান? তাই ভেবেছেন?

(তখন তোমার গালে ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু মারতে পারি নি। শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলাম, না।

(তুমি বলেছিলে, তবে?

(আমি তোমার ঠোঁটের ওপর আবার লুটিয়ে পড়েছিলাম। ইস্! আমি জানি, আমার চেয়ে তোমার শরীরে বল কম। বয়সও অনেক কম। আর

তুমি ভাবছিলে নিশ্চয়, আমি তোমার ওপর জোর খাটাচ্ছি। আমার দেহের জোর।

(কোনো কৈফিয়ৎ নেই তুলি। তবু দেহের জোর-ই কি সব? মৃত্যু-ইচ্ছার মত একটা প্রবল যন্ত্রণার অসহায়তা কি কিছুই নয়?

(তুমি কাঁদবে না চিৎকার করবে, ভেবে পাচ্ছিলে না বোধহয়। কেবল উঠে দাঁড়িয়েছিলে। কী করব? আমি যে কথা ব'লে তোমাকে বোঝাতে পারছিলাম না। আমি যা করছিলাম, তা' কি কথা দিয়ে বোঝানো যায়?

(তুমি কি কাঁপছিলে? আমি জানি নে। খালি দেখছিলাম, তোমার ঠোঁটের দরজা নিপাট কঠিন! চোয়ালের হাড় দুটি অস্ফুট হ'লেও ফুটে ফুটে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত পিষছিলে তুমি? আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমার কাঁধে। ডেকেছিলাম, তুলি!

(না, বারে বারে খালি পরশুর কথাতেই চলে আসছি। থাক্। শেষের দিনটা তো ভয়ংকর হবারই কথা। না কি, সমুখে শান্তি পারাবার। ঠিক এই মুহূর্তে সবটা বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু লয়ের দিন ক্ষয়ের দিন, মৃত্যুর দিন। থাক ও কথা। ফিরে যাই আগের কথায়।)

ওভারসিয়ারের সাকরেদি গিয়েছিল। একটু বড় হ'য়ে গিয়েছিলাম। নইলে বাবা গায়েই হাত তুলতেন। —ভদ্রলোকের ছেলে যখন তুলি রং ধরেছে, আমি তখনই বুঝতে পেরেছি, এটি হবে নষ্টের শিরোমণি।

মা বলেছিল, ম্যাট্রিকটা তো পাশ করেছিস। রেলের নয় তো সওদাগরি আপিসে একটা দরখাস্ত করতে পারিস না? বাপ দাদাদের ভাত আর কতদিন গিলবি বসে বসে।

তারপরে গিয়েছিলাম এক সাইনবোর্ড লেখার দোকানে। সেখানেও আমি আসলে অমনোনীত। লেটারিংএর ওপরে রং বুলানো ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনো অধিকার ছিল না।

ওখান থেকে আমার চাকরিটা গিয়েছিল, ব্যক্তি হিসেবেই আমাকে ওদের পছন্দ হয়নি।

এখন আমি ফার্ণাণ্ডেজ এর চীফ্ আর্টিস্ট। কিন্তু কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। আমি জানি নে, ফাইন আর্টসের বোধ যাদের নেই, তারা কেমন করে ভাল কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হবে। সকল ক্ষেত্রেই সৃষ্টিমূলক হতে হবে ঠিক।

কিন্তু কেমন করে ফার্ণাণ্ডেজ-এ পৌঁছেছিলাম সেটা তোমাকে বলি। না কোনো আদি-ভৌতিক গল্প নয়। আর্ট স্কুলেরই এক প্রাক্তন বন্ধু ওখানে কাজ করত। সেও ফাইন আর্টসের ছাত্র ছিল। সে বলেছিল, ফার্ণাণ্ডেজ-এ লোক নেবে। একটা দরখাস্ত যেন করে দিই।

ওকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম ফার্ণাণ্ডেজ-এ বন্ধুটি কেরানীর চাকরি করত। মাঝে মাঝে আর্টিস্টদের সাহায্যে করাটাও অবশ্য কাজ ছিল। সেই একই ব্যাপার, অনুকরণ করা রং বোলানো। এবং বলেছিল, কর্তারা ওকে নাকি জানিয়ে দিয়েছে, ওর দ্বারা কোনোদিন আর্টিস্টের কাজ হবে না।

সেটা সব মিথ্যে নয়। কারণ বন্ধুটি আঁকতেই শিখেছিল। কিছু সৃষ্টি করতে শেখে নি। আমি দরখাস্ত করেছিলাম, ইণ্টারভিউ এসেছিল। কম করে আমার দশজন প্রাক্তন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেও একটা ফাইন আর্টের মিছিল। চাকরির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলাম আমরা। পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল, স্ত্রী-ব্যাধি থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের ওষুধের একটি বিজ্ঞাপন। দুটি ফিগার আঁকা চলতে পারে। লেটারিংটা চিত্তাকর্ষক হওয়া প্রয়োজন।

কে কী এঁকেছিল, আমি জানি নে। আমি

কিন্তু একটি ফিগারই এঁকেছিলাম। সে ছবি তোমরা কাগজের বিজ্ঞাপনে অনেক দেখেছ। আমার মাথায় ছিল সুস্থ, আরোগ্য হওয়া। যাকে বলে একটি সম্পূর্ণ সুস্থতা?

আমি একটি সুস্থ সবল মেয়ের সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্তি এঁকেছিলাম। পাষাণে এলিয়ে যে বসেছিল।

চাকরিটা আমি পেয়েছিলাম। আর ট্রায়ালের কাজটাই আমার কোম্পানী ব্যবহার করেছিল। উন্নতি করেছিলাম তাড়াতাড়ি। সোপানটা প্রথম পেয়েছিলাম ফার্নাণ্ডেজ-এর মাদ্রাজ অফিসে গিয়ে। এখন আমি কলকাতার চীফ আর্টিস্ট। তুলি, তাই তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছিলে।

কিন্তু সেই কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। এটাই জীবনের বিড়ম্বনা। বিশ্বাস তৈরী করে লাভ কি?

আমি যদি একটা বিশ্বাস তৈর করে নিতে পারতাম জীবনটা আকণ্ঠ ভোগের জন্য, তা' হলে একটি মস্ত বড় পরিবারের দায়িত্ব আমি নিতাম না। কিন্তু তৈরী বিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। ওটা পালানো। ভেগে পড়া। আমার আয়ের একটা মোটা অংশ দিয়ে, আমার মা বাবা ভাই বোনদের রক্ষা করতেই হয়। কারণ, দেওয়া নেওয়াতেই আমার বিশ্বাস। ওটা তৈরী বিশ্বাস নয়। প্রকৃতির উপস্থিতিটাকে মেনে নেওয়া বিশ্বাসের মত।

পরশু দিন, কিংবা তারো আগে, তোমার সঙ্গে গত এক বছরের মেশামিশির মধ্যে, আমার এ পরিচয়টা তুমি হয়ত জানতে না। ভাবতে, একটা বোহেমিয়ান আমি, (যেটা তোমরা ভাবতে পার) থাকি মধ্য কলকাতার প্রায় একটা বিদেশী পাড়ায়। মাস গেলে পাই কিছু মোটা টাকা। তাতে পানীয় আহারটা জোটে ভাল-ই। মাঝে মাঝে ঘরে বসে ফাইন আর্টের চর্চা। মনের মত মেয়েদের ডেকে ডেকে তাদের পোর্ট্রেট আঁকি, কিংবা আরো কিছু। (ভাবতে না?) এবার ফিরে আসি আবার পরশুদিনের কথায়। আচ্ছা, না হয় যাই আরো এক বছর আগে এক ঘোর দুপুরে ফার্নাণ্ডেজ-এর চীফ আর্টিস্টের কামরায়।

জীবনের বিড়ম্বনাটা তোমাকে ব্যক্ত করেছি আগেই। বিড়ম্বনার রূপটা সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠেছে এখন-ই, যখন তোমাকে লিখতে হচ্ছে এ পত্র। পত্র? পত্র আর রইল কোথায়? সেটা আরো লজ্জার কথা, একটা বাজে লোকের প্রায় জীবন-কাহিনী।

এবং কাকে লেখা হচ্ছে? যে আমাকেই এখন সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করছে। যে আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। যার সঙ্গে আমার কোথাও মিল নেই, তাকে লিখতে হচ্ছে। আর তাই আমার নিজেরো রাগ হয়। প্রকৃতিকে আমারও ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে। করে কিন্তু আমি জানি, অদৃশ্যে সুতো ধরে, কেমন নিখুঁত সুন্দর আঙুল দিয়ে টানছে প্রকৃতি।

তুলি! পরশুদিন সন্ধ্যায় আমার মৃত্যু-ইচ্ছা জেগেছিল। সেইদিন প্রথম নয়। তার এক বছর আগে, মৃত্যু-ইচ্ছার ভূমিকা হিসেবে প্রশ্ন জেগেছিল, ভালোবাসা কাকে বলে?

গীতবিতানের 'পূজা' খুলে দেখেছিলাম, ভদ্রলোক ভগবানের সঙ্গেও প্রেম করতে পারেন। 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে, কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।' আঃ, কী পরম বিশ্বাস। কী সুগভীর শান্তি! কত আনন্দদায়ক আশ্বাস। কিন্তু আমার কিসে বিশ্বাস!

ফার্নাণ্ডেজ-এর চীফ আর্টিস্টের ঘরে ভিজিটিং কার্ডটা এসে পৌঁছেছিল।—'শ্রী (মতী ছিল না) তুলিকা চাট্টোপাধ্যায়।' একটি প্রশ্ন নিয়ে তুমি ঢুকেছিলে। না, তোমার কাজের বিষয় নয়। প্রশ্নটা

আমার মনের। তোমার সঙ্গে ছিল একটি ছেলে। বুঝেছিলাম কলেজের বন্ধু।

তারপর তোমার আসন গ্রহণ ও বক্তৃতা। একটা পত্রিকার কভার এঁকে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাকে মনে পড়ল কেন?

কথাটা গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম। রূঢ় মনে হয়েছিল তোমাদের। পরে তুমি তাই বলেছিলে। তুমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলে, প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়ল।'—'কলেজের ম্যাগাজিনে দেখলাম, আপনি একটি গিরিপথের ছবি দিয়েছেন! তাই ভাবলাম—

থেমে গিয়েছিলে। আমি আর একটু যাচিয়ে নিতে চাইছিলাম। বলেছিলাম। কিন্তু আমার ছবি কি আপনাদের ভাল লাগবে?

বিস্ময়ে ও লজ্জায় তুমি প্রায় নুয়ে পড়েছিলে। —কী যে বলেন। আমাদের সৌভাগ্য—

কিন্তু ততক্ষণে আমার ভিতরের দুর্ভাগ্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আমার চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলে তুমি।

আমি রাজী হয়েছিলাম। একটা তারিখ দিয়ে বিদায় দিয়েছিলাম তোমাদের। তারপর সেই তারিখে তুমি যখন এসেছিলে, তুমি একলা এসেছিলে। (কেন?) অবাক হয়েছিলাম। মুখে প্রকাশ করি নি। অবাক হয়েছিলাম কেন জান? তুমি বলে! তোমার কি একটু ভয় করেনি? কী বলে তুমি একলা এসেছিলে আমার কাছে?

পরে বুঝেছি, কোনো টানে নয়। নির্বোধ, তাই এসেছিলে। এবং এক বছর ধরে নির্বোধের মতই তুমি এসেছ, যোগাযোগ করেছ। তোমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। ওটা তোমার শিল্পীর সান্নিধ্যে আসার নির্বোধ অভ্যাস মাত্র। যেমন দুর্গাদাসের একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলে। ও বোম্বতে না থাকলে, ওর সঙ্গে আমার মত-ই তোমার আলাপ হত। এবং এই নির্বুদ্ধিতাই এক বছর ধরে চালিয়ে এসেছে। পরশু তার শেষ হয়েছে, ভালই হয়েছে। আমার নয়। তোমার। কারণ, সেই অনুভূতিটা আমার বাড়ছিল।

সেই অনুভূতি, যে-অনুভূতিটা আমার প্রশ্নের মধ্য দিয়ে জেগেছিল। প্রশ্ন, ভালোবাসা কাকে বলে? প্রশ্নটা নিয়ে তো অনেক জায়গায় মাথা কুটে মরেছি। অনেক জায়গায়। যে-জায়গাগুলিকেই তুমি আমাকে ঘিরে রাখা অবস্থায় দেখেছ। সেই মুক্তোর মালা। যা গলায় দিয়ে আমি বেড়াই না, কিন্তু মন দিয়ে অনুসন্ধান করেছি।

একি, লোকটা কাকে ভালোবাসা বলে জানে না? কী মূঢ়। সংসারে এত লক্ষ কোটি মানুষের ভুলনায়, এক হয় আমি অসাধারণত্ব দাবী করেছি। অন্যথায় বোকা-ই বলেছি এই প্রশ্নটা করে।

তারপরে আবিষ্কার করেছি। কিন্তু যখন আবিষ্কার করেছি, তখন ব্যাধের তীর আমার পাঁজরায়। তুলি, এই আমার শেষ কথা। এই কথার জন্যই এত আনমন অঙ্গন ঘোরা। আনমন নয়, আসলে আহত অবস্থায় হেঁচড়ে হেঁচড়ে এই শেষ কথায় আসা।

এই কথায় আসা যে, ভালোবাসার কোনো ছবি নেই, সাহিত্য নেই, কবিতা নেই। সবগুলিই তৈরী, বানানো, ব্যক্তি স্বার্থের ব্যাখ্যা। সমাজে সংসারে সর্বত্র এই। ভালোবাসা একটা অনুভূতি। মৃত্যুতে উত্তীর্ণ হবার মত একটা তীব্র আনন্দদায়ক আর সাহসিক অনুভূতি। আমি সেইখানে পৌঁছেছিলাম, সেই অনুভূতিতে। তোমাকে কেন্দ্র করে। বিশ্বাস কর, সেটা আমার খুব আপত্তিকর। শুধু তুমি ব'লে নয়, যে কোনো মেয়েই হত, আমার আপত্তিকর-ই মনে হত। প্রকৃতির ক্রীড়নকের মত ভালোবাসার প্রায় সর্বগ্রাসী অনুভূতিটা মেয়েদের কেন্দ্র করেই হয়।

এ সত্যটা বড় দুঃখদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক।

এই অনুভূতিটার সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের, পরস্পরের মতভেদে কিছু যায় আসে না। চিন্তা, জীবনধারণের ভিন্নতা, এমন কি এক সঙ্গে বাস না করাতেও কিছুই যায় আসে না। কারণ এটা একটা অনুভব। লয়ের, ক্ষয়ের আবার জন্ম এবং গঠনেরও। মৃত্যু আর একটা নতুন জন্মের মত। শান্তি, ব্যথা, আনন্দ।

কথা? তা সম্ভব নয়। এ বিস্ময়কর, মূঢ়, পৃথিবীর যে কোন লীলার মতই। তুমি ভেবেছিলে পরশুদিন তোমাকে আমি আরো ভয়ংকর কিছু করব? করতাম হয় তো। কিন্তু তার আগেই, কান্নার মত আর্তনাদটা আমার বুকে উঠে আসছিল। তোমাকে পাব না আমি জানলাম, তোমার মুখ দেখে।

কিন্তু অনুভূতিটা আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

তুমি কাঁধ থেকে আমার হাত সরিয়ে ফেলে দিয়েছিলে। বলেছিলে, যেতে দিন।

আমি তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মনে পড়ছিল তোমার অন্যান্য বন্ধুদের কথা। সেই শক্তিশালী যুবক রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক মিহিররঞ্জন সেন, যার চিঠি একটি ভাবের বশে আমাকে দেখিয়ে ফেলেছিলেন। আর সৌম্যেন মুখার্জি, তোমার সেই লক্ষপতি বন্ধু। না, আদি-ভৌতিক কোনো অনুভূতি নয়, আমার অনুভূতির যন্ত্রণার মধ্যে। ঈর্ষার দহনেই সরে দাঁড়িয়েছিলাম।

কথা শুনতে চেয়েছিলে তুলি? কিন্তু তোমার ভাল লাগত না আমার কথা! পরশু হয় তো বলতে পারতাম না। এখন জলে বলতে পারি এবং সেটা তৈরী করা বিশ্বাস নয়। এ পৃথিবীকে যা দেখছি, তাই আমার কথা।

আমার কথা, এ পৃথিবী আমাকে কোনো গ্যারান্টি দেয় নি যে, ঝড় হবে না, ভূমিকম্প হবে না। মহা-মারী দুর্ভিক্ষ প্লাবন হবে না। হে আমার অতিথি শিবেন রায়, এস, নির্বিরোধে বাস কর এ পৃথিবীতে। এ কথা আমাকে কেউ দেয়নি।

তুলিকা চট্টোপাধ্যায়কেও আমি এ কথাই বলতাম। আমি এ সমাজের বীর চরিত্রবান কাউন প্রেমিক ভদ্রলোকদের মত বলতে পারতাম না, আজ থেকে তুমি আর আমি। আমি নিঃশঙ্ক, তুমি নিঃশঙ্ক, এস দুজনে যাত্রা করি।

না। আমি কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না। কোনো গ্যারান্টি চাইওনা। না পেলে কষ্ট? কষ্ট হবে, কাঁদব আমার একলা ঘরে বসে। পৃথিবী কি বসে থাকবে?

এসব কথা শুনতে কি তোমার ভাল লাগত তুলি? তোমার শিক্ষা সংস্কৃতি, সমাজ কৃষ্টি সংস্কার, সব এক সঙ্গে ঘৃণা হয়ে নিশ্চয় জ্বলে উঠছে চোখে, ভ্রুতে, ঠোঁটে। তাই না?

মনে হচ্ছে নিশ্চয়, একটা নৈরাজ্যবাদী যেন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করল এতক্ষণ। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী আমি নই। যাযাবর মনোবৃত্তিও নেই।

যাক এত কথা। শেষ আহ্বান জানিয়ে রাখার বাতুলতা আর করব না। কিন্তু তোমাকে এ সংসার যেদিন আশ্বাস দিয়ে আহ্বান করবে, তাদের প্রচলিত বিশ্বাস দিয়ে, সেই দিনটিতে থাক আমার অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা।

পরশুর জন্যে কিন্তু আমি কোনো ক্ষমা চাইতে পারলাম না। বরং সেইজন্যেই ক্ষমা করো। ইতি—

শিবেন।

॥ দ্বিতীয় হাত ॥

তুলিকা দেবী :

পত্রটি লিখতে গিয়ে অনেক সঙ্কোচ কাটাতে হয়েছে। অন্য কোনো কারণে নয়। এত অল্প পরিচয়ের মধ্যে হঠাৎ পত্র লেখার একটা উচিত অনুচিতের কথা আসা স্বাভাবিক। মাত্র দু'দিন তো আপনাকে দেখেছি এবং কথা বলেছি। কিন্তু

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের উনিশ বিশ হয়, আশা করি আপনি বিশ্বাস করেন। যদি মন থেকে সবটুকু সত্যের নির্যাস বলতে হয়, তাহলে এ কথাই বলব, আপনার বন্ধু-স্থানীয় হবার আবেদন পত্র হিসেবেই আমার এ পত্রটিকে গ্রহণ করবেন।

ব্যাপারটা আপনার কাছে খুব আকস্মিক মনে হচ্ছে নিশ্চই। আমার ভাষার দৈন্যও হয় তো পীড়া দিচ্ছে আপনাকে, কিংবা হাসাচ্ছে। সেও ভাল যদি আপনি না রাগেন। বলা বাহুল্য, আপনাকে কোনো রকম অপদস্থ করার জন্যে এ চিঠি দিচ্ছি না। বরং নিজেকেই কী রকম খাটো খাটো লাগচে। তাই, আমার প্রথম আবেদনের পরেই, নিবেদন এই যে, যদি আপনার আপত্তিকর মনে হয়, আপনি তখুনি জানাবেন। আমি ক্ষমা চেয়ে আমার পত্র ফিরিয়ে নেব।

কী আশ্চর্য পাগলামি। এ বৎসরের বন্যা ও বর্ষাটা দেখছি আমার ওপরে অনেকখানি ক্রিয়া করল। কথাটির মানে হয় তো আপনি বুঝতে পারছেন। গত মাসের বন্যায় রিলিফের জন্যেই প্রথম আপনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। সেই প্রথম দেখা।

দ্বিতীয় বারের দেখা বিশ দিন পরেই। ঘোর বর্ষায়, গাছ তলায়। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছুটা দূর। অথচ ফুটপাতের ওপর, দোকান-পাটের সামনে পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারেন নি। বিরল পাতা গাছটা আপনাকে রক্ষা করতে পারছিল না। আমি জানি না, আপনার কোনো নির্দয় বন্ধু সেই মাত্র আপনাকে ওখানে ও-অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিলেন কি না। কারণ আপনাকে যেন কেমন একটু আর্ত, বাধাকাতর মনে হয়েছিল। মুষলধার বৃষ্টির মধ্যেও আপনি একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে, দূরের পথে তাকিয়েছিলেন। কিছু মনে করবেন না যেন নির্দয় বন্ধুর কথা লিখলাম বলে। ঠিক সেই সময়েই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হল।

আমার মনে হল আমি সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান আমি প্রথম দিনটিতেই, যেদিন আপনি বান্ধবী পরিবৃতা হয়ে প্রথম এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। আমার বোন শোভনা যে আপনার সহপাঠিনী, সেটাও আমার কাছে আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছিল। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, আপনারা বাইরের ঘরে এসে বসলেন। অনেকগুলি পায়ের শব্দ। এবং মহিলাদের স্লীপার অথবা জুতোর শব্দ শুনলেই বোধহয় চেনা যায়। আপনাদের সমবেত কথাবর্তায় প্রথম ভেবেছিলাম, শোভনার বন্ধুরা হয় তো এমনি আড্ডা দিতে এসেছে।

আমাদের বাইরের ঘরে সব সময়ের জন্য যে বেয়ারাটা থাকে, তার গলা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, কাকে চান আপনারা।

—শোভনাকে। শোভনাকে একটু ডেকে দাও তো তাড়াতাড়ি।

বেয়ারাটার নাম রেখেছি দুর্মুখ। বাড়ি ওর হাওড়ায়। অনেকদিন থেকে আছে আমাদের বাড়িতে। আগে ও ভিতর বাড়িতেই কাজ করত। সম্প্রতি কী খেয়াল হয়েছে, কয়েক মাস ধরে বাইরের ঘরের কাজে এসেছে। দুর্মুখ নাম দেওয়া শুনেই বুঝতে পারছেন, শ্রীমানের মুখনিসৃত বাণী কেমন হওয়া উচিৎ। অসম্ভব রূঢ়ভাষী। যাকে যা নয়, তাই বলে। এমন লোককে বাইরের ঘরে অতিথি অভ্যর্থনার জন্য রাখা কী রকম বিপজ্জনক আন্দাজ করতে পারেন।

আমি যে পাশের ঘরে আছি, আপনারা জানতেন না। শুনতে পাচ্ছিলাম, দুর্মুখ বলছে, আঃ, আপনারা জুতোগুলোন বাইরে রেখে আসবেন তো। দেখছেন বিষ্টি বাদলা হচ্ছে, আপনাদের পায়ে এত

জল কাদা। দেখুন তো কার্পেটটা কী হল।

আপনারা সকলেই চুপচাপ, বুঝলাম খুব অস্বস্তি বোধ করছেন আপনারা। আমারও খারাপ লাগছিল। রাস্কেলটা কি কারুর সঙ্গে একটু ভাল করে কথা বলতে পারে না? মহিলাদের সঙ্গেও না।

তারপরে বোধ হয় আপনার গলার স্বরই আমি শুনতে পেলাম। আপনি বললেন, হয়েছে হয়েছে, তুমি যাও দেখি, আগে শোভনাকে ডেকে নিয়ে এস। বৃষ্টিবাদলে ঘরের জিনিস ওরকম নষ্ট হয়েই থাকে।

দুর্মুখ আবার শক্তের ভক্ত। আসলে মানুষটা ও ভাল। রসজ্ঞানও আছে। আমি শুনতে পেলাম, যাবার সময় ও গজগজ করতে করতে যাচ্ছে,ও কার্পেট তো পোস্কার করতে হবে আমাকেই। সেই জন্যেই বলা।

আপনার বান্ধবীদের মধ্যেই কে যেন বলে উঠলেন' এই জন্যে কোনো বড়লোকের বাড়ি আমার আসতে ইচ্ছে করে না।

আর একজন বললেন, বর্ষা-বাদলায় তা হলে কার্পেট তুলে রাখলেই হয়। অত ঠাট করে পেতে রাখার কী দরকার বাবা? বড়লোকের চাকর হলেই কি ওরকম করে বলবে?

আগের মহিলাটি বললেন, আমি শোভনাকে বলব।

আপনি বললেন, তোদেরও দেখছি মাথা খারাপ হল। এসব গায়ে মাখছিস কেন? এসেছি চাঁদা আদায় করতে। আদায় করে চলে যাব। এদের কার্পেট ভিজুক পচুক, আড়ালে যত খুশি গালাগাল দিক, বয়ে গেল আমাদের।

আপনারই বোধহয় উপযুক্ত কথা। আমার বোন এসে পড়ল। দু'বার কথার পরেই আপনারা আসল কথা ব্যক্ত করলেন।

শোভনা বলল, বাবা তো এখন এখানে নেই। দাদাই ওঁর স্থলাভিষিক্ত।

আপনি বললেন, বাবা বল দাদা বল, কোন আপত্তি নেই। মোটা টাকা আদায় করে দিতে হবে।

শোভনা বললে, আমি কেন দেব। তোরা নিজেরাই আদায় করে নিবি। যতটা পারিস! কিন্তু ওপরে চল, একটু চা খেয়ে যা তোরা।

আপনি বললেন, কোনো উপায় নেই। কালকের মধ্যে টাকাটা পাঠাতে হবে। তোমার আর কি, দুলালীর মত ঘরে বসে আছ, খেটে মরছি আমরা।

তারপরেই শোভনা আপনাদের চমকে দিয়ে ডেকে উঠল, দাদা আছ নাকি পাশের ঘরে।

আমি বললাম, আছি।

সেই মুহূর্তেই প্রায় একটি আর্তনাদই শুনতে পেলাম, ও মা! কোথায় রে তোর দাদা?

বলাবাহুল্য সে আপনার গলা নয়। অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিলাম। তবে, আপনিও যে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন, সেটা আমি অনুমান করতে পারছিলাম।

শোভনা আবার বললে, দাদা তুমি একটু বাইরে আসবে? এঁরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আমি বেরিয়ে এলাম। এবং সকলের মধ্যে আপনাকে প্রথম চোখে পড়ল। দয়া করে কোনো খারাপ অর্থে নেবেন না। পারিবারিক মর্যাদা এবং নিজের আত্মসম্মান জ্ঞান, কোনোটাই জলাঞ্জলি দিই নি আমি। দিতে পারিও নে। এবং আমাদের এ পরিবার থেকে কোনো মেয়ের অপমান হবে, এটাও ভাবা যায় না। এক যদি, আপনি নিজে শেষ পর্যন্ত আমার এ দীর্ঘ পত্রটিকে কোনো অসম্মানজনক চোখে না দেখেন। সেকথা আপনাকে পত্রের শুরুতেই জানিয়েছি।

যদি আপনার একটা বর্ণনা আমি দিই, তা হলে আপনি রাগ করবেন না। সেই কালকুটে বর্ষার দিনটায় আপনার সবুজ পাড় দেওয়া অত্যধিক শাদা শাড়িটা অদ্ভুত রিফ্লেক্ট করছিল। যদি আরো অনুমতি

দেন, তা হলে বলি, আপনার দেহের বর্ণই বোধহয় বিস্ফুরিত হচ্ছিল ঘরের মধ্যে। রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়া যদি অন্যায় না হয়, তা হলে ন্যায়তই আমার তা হয়েছিল। এবং যে-কথাটা আপনাকে বোধহয় জন্মের কাল থেকেই শুনতে হচ্ছে, তারই পুনরাবৃত্তি আমি করি, আপনি রূপসী।

আপনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বয়সের চেয়ে সাবলীল মনে হল আপনার কথা। নমস্কার করে বললেন, আমরা শোভনার সহপাঠিনী। আপনার এসেছি চাঁদা চাইতে। এ বছর যে বন্যা হয়ে গেল, তার সাহায্যের জন্য।

ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। আমাদের বাড়িতে ইতিপূর্বেও অনেকে এসে চাঁদা নিয়ে গেছেন। আমার পক্ষে অবশ্য নতুন। কারণ সত্যি তখন আমি বাবারই স্থলাভিষিক্ত। বাবাকে অনুকরণ করে, আমি আপনাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বন্যা এবং তার কারণ নির্ণয়ের বিষয় আলোচনা করতে পারতাম। কিন্তু আমার লজ্জা করল। হয় তো লজ্জা করার কিছুই ছিল না। আলোচনা করলে আপনারাও কিছু মনে করতেন না। আমার চিন্তা দেখে, খুশিই হতেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন, ওসব চিন্তা আমার আসে না। যে-চিন্তা সারা জীবনে কখনো করিনি, সেদিন এক মুহূর্তে হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠব, এ কি করে সম্ভব। এর জন্যে নিজেকে কিংবা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে পারি। কিন্তু লাভ কি? তার চেয়ে চিন্তা করতে শিখতে পারা অনেক ভাল অনেক বয়স পর্যন্ত বন্যা কাকে বলে, তাই জানতাম না। হয় তো যে-সময়টায় বাংলা দেশে বন্যা হচ্ছে, সেই সময়টাতেই আমরা বিদেশ ভ্রমণ করে কাটাচ্ছি। নদী চোখে দেখেছি। তার জল আমরা স্পর্শ করতে পেরেছি। তার বেশি নয়। এমন কি, কলকাতার লোকে গঙ্গার বান দেখতে যায়। আমাদের কখনো তা দেখা হয়নি। কোনোদিন বায়নাও করি নি তার জন্যে। কারণ, প্রয়োজন কি? তার চেয়ে টেনিস ক্রীকেট খেলা নিয়ে আমরা বেশী চিন্তিত ছিলাম। বিদেশ থেকে খেলোয়াড়রা এলে, দেখতে যেতাম। তাতে আমাদের বাড়িতে কোনো আপত্তি ছিল না। পয়সা আমরা হাতে নিয়ে দেখিনি। জীবনে যে পয়সার প্রয়োজন আছে, এটা অনেক পরে অনুভব করেছি বটে। কিন্তু অনুভবের আগেই যেখানে বস্তু মেলে, সেখানে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে কে?

আপনি যদি আমাকে বলেন, বড়লোকের অকর্মণ্য ছেলে, কষ্ট হলেও আমার আপত্তি করার কিছু নেই। অনেক বিষয়েই নিশ্চয় অকর্মণ্য। সেটা বাইরে বেরুলে, দশজনের মাঝখানে মাঝে মাঝে অনুভব করি। কিন্তু তার জন্যেও নিজেকে দোষ দিই না। কারণ যে-সব বিষয়ে অকর্মণ্য জ্ঞান করে লোকে, তাকে আমরা অকর্মণ্যতা বলতে শিখি নি। ওটাকে আমাদের চারিত্রিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য জেনে এসেছি। সে রকমই জানানো হয়েছে আমাদের।

আমি বুঝতে পারছি, আপনাকে এত কথা লেখার কোনো দরকারই নেই। আমাদের পরিবার সম্পর্কে আপনার না-জানার কিছু নেই। আমাদের পরিবার বলতে, আমাদের পারিবারিক বিষয় কিছু বলছি না। কলকাতার লোকে যা জানে, আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন। সেটা এক কথায়, আমরা কলকাতার নাম করা বড়লোক।

কী রকম যেন সঙ্কোচ হয় কথাটি বলতে। কারণ ভয় হয়, হয় তো একমাত্র এই অপরাধেই আপনার কাছে আমার আবেদন নাকচ হয়ে যাবে। কী করব। প্রাচুর্যের মধ্যেই আমি-লালিত পালিত। ভবিষ্যতে আমার পাওনাও প্রচুর। তার জন্যে একটা নিরাপত্তা আমার আছেই।

আছে বলে যেমন আমার কোনো দর্প নেই, তেমনি কোনো হীনতা বোধও নেই। বাবার জ্যেষ্ঠ

ছেলে হিসেবে, আমি যে তাঁর বিশাল কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করব ভবিষ্যতে এবং ইতিমধ্যেই করতে আরম্ভ করেছি, সেটা আমার ভালই লাগে।

এসব কথাই কিন্তু কৈফিয়ৎ হিসেবে নেবেন। কারণ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমার সহজ দৌড়ের মধ্যেই টের পেয়েছি, আমাকে বন্ধুরা বিশেষ কেউ আমল দিতে চায় নি। আমিও চাইনি।

যাক্ এসব কথা। প্রথম সেদিন, আপনার দিকে ভাল করে তাকাতে পারলাম না বলেই, আরো বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলাম। বললাম, ও! তা আমি কী করতে পারি, বলুন।

আপনি বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। বিরক্ত হলেন কি না জানি না। আপনার বান্ধবীরাও চোখ চাওয়া-চায়ি করলেন। অল্পেতেই যেন হতাশ হয়ে গেলেন সব। অথচ, আসলে আমার প্রগলভ হতেই ইচ্ছে করছিল। এবং মানুষ হিসেবে আমি মোটেই মুখচোরা নই। আমি জানি, আমার সহোদরা শোভনা পর্যন্ত ভাবছিল, আমি বুঝি একটা বিশেষ পোঁজ নিয়ে কথাটা বলছি।

আপনি বললেন, আপনি আর কী করতে পারেন। একমাত্র আর্থিক সাহায্যই করতে পারেন।

আমি একটু হেসে বলতে পারতাম, কেন আর কোনো সাহায্যই কি আমার দ্বারা সম্ভব নয়? সেটা অবশ্য হাসির কথাই হত। সত্যি, তা ছাড়া আমি কী করতে পারি। আপনার বলার মধ্যেও যথেষ্ট সাবলীল পরিচ্ছন্নতা এবং ডিগ্‌নিটি ছিল।

আমি বললাম, তা ঠিক কত সাহায্য করতে হবে বলুন।

এবার বোধহয় আপনি একটু অবাক হলেন। বললেন, আপনার যা সামর্থ।

আমি বললাম আমার সামর্থ আমি নিজেও ঠিক জানিনা, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

শুধু আমার বোন শোভনা নয়, আপনার বান্ধবীরাও অবাক হলেন। আপনি শুধু অবাক নন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, একটু বুঝি লজ্জাই পেলেন। কারণ আমি বোধহয় 'আপনি' শব্দের উপর একটু বেশি জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি সহসা কিছু বলতে পারলেন না। অথচ ভাবুন, এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কে দিতে পারে। তবু আমি দেখলাম, কিছু মনে করবেন না যেন, আমি দেখলাম, আপনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

আপনি বললেন, বাঃ! আপনার সামর্থ আমি কি করে জানব বলুন। আপনি যত বেশি দেবেন, আমরা ততই ক্রেডিট পাব। আমি বললেই তো আর আপনি পাঁচশো টাকা দিয়ে দেবেন না।

আমি হেসে বললাম, কেন দেব না। আপনি যদি বলেন, তাই দেব।

আপনি আমার চোখের দিকে তাকালেন। হেসে ফেললেন। বললেন, আপনার যা ম্যাকসিমাম্ ক্ষমতা তাই দিন।

আমি বললাম, টাকাটা আমি আপনাকে বেয়ারার চেকে দেব। আপনি আজকেই ভাঙিয়ে নিতে পারবেন। কেন না, এখনো সময় আছে।

—আচ্ছা।

—কার নামে দেব চেকটা?

—আমাদের কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী—কা নাম?

—তুলিকা চট্টোপাধ্যায়।

তখন কিন্তু জানতাম না ওটি আপনারই নাম। আমি পাশের ঘর থেকে চেক লিখে এনে আপনাকে দিলাম। আপনি থমকে গেলেন। একবার তাকালেন আমার দিকে। তারপরে চেকটি বাড়িয়ে দিলেন বান্ধবীদের দিকে। যদিও বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আপনি বিল লিখতে লাগলেন, কিন্তু বিস্ময়ের রক্তাভাটা আপনার মুখ থেকে যায় নি। কারণ, সত্যি পাঁচশো টাকা আমি দেব, এটা আপনারা কেউ ভাবেন নি।

আমার এ চিঠি পেয়ে আশা করি, প্রথম দিনের বিস্ময় থেকে আপনি অনেকখানি মুক্ত হবেন। যদিও আমার একটা সন্দেহ এখনো আছে যে, আপনাকে হয় তো সৌমোন মুখার্জির পাঁচশো টাকার বদান্যতার জন্য, বান্ধবীদের অনেকের কাছে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে।

আমাকে বিলটা দিয়ে আপনি বললেন, আপনাকে কী আর বলব। অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি বললাম, ধন্যবাদের কী আছে, আমার ইচ্ছে করল, তাই।

আপনারা চলে গেলেন। বৃষ্টিটা তখন ধরেছে।

শোভনা অবাক হয়ে বলল, বলা ভালো তা বলে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলে দাদা ?

—হাঁ।

আমাদের দুর্মুখ বলে উঠল, এমনি কি আর দিয়েছে। প্রাণ মানল না তাই দিয়েছে।

আমি কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠলাম, বললাম, ছাখ কেশব (ওর আসল নাম) সব সময় বাজে বাজে কথা বকিস না তো।

তবু আমি ওদের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারি নি। শোভনা ঠোঁট টিপে হেসে, শব্দ করে নিশ্বাস ফেলল। জানি না সে আপনাকে কলেজে কিছু বলেছে কিনা !

তখন আমি জানতাম, আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তবু আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, পত্রে কেন এসব পুনরাবৃত্তি করছি। এসব নিজেকেই প্রকাশ করার জন্যে।

তারপরে বর্ষায়, সেই গাছতলার আশ্রয়। জানি না কেন আপনাকে অমন ব্যথিত ব্যাকুল মনে হচ্ছিল। দল বেঁধে বৃষ্টিতে ভিজে, অনেক ছাত্রীর জটলাও ছিল না। আপনি একেবারে একলা ছিলেন। বৃষ্টি এত বেশী যে, দু'একজন ছুটন্ত পথযাত্রী এবং গাড়ি ছাড়া রাস্তায় কিছু ছিল না। আমাকে বৃষ্টি মাথায় করেই বেরুতে হয়েছিল। গাড়ির কাঁচের ভিতর থেকে আপনাকে আমি দেখতে পেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা দাঁড় করালাম আপনার পাশে।

আপনি অবাক হয়ে তাকালেন। ভয় পেলেন কি না, জানি না। দেখলেন, গাড়ির দরজা খুলে আপনাকে আমি ডাকছি, তুলিকা দেবী, গাড়িতে উঠে আসুন।

আমাকে চিনতে বুঝি আপনার এক মুহূর্ত লাগল তার পরের মুহূর্ত আপনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করলেন। আমি আবার বললাম, দয়া করে তাড়াতাড়ি উঠে আসুন। এইভাবে বৃষ্টিতে ভিজবেন না।

গাড়ির সামনের দরজাটাই আমাকে খুলতে হয়েছিল। কারণ, আমি ড্রাইভ করছিলাম। আপনি উঠে এসেই আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন গাড়িটা ভিজে যেতে দেখে। আমি বললাম, ও কিছু নয়। আপনি বসুন। বলুন, কোথায় যাবেন।

আপনি বললেন, না না, আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না। আমাকে সেই বাড়ি যেতে হবে। আমি বললাম, আমার কোনো অসুবিধে নেই। ঠিকানাটা বলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছাড়া উচিত। নইলে অসুখে ভুগবেন।

আপনি হয় তো ভাবলেন, উপকার করার ভূত চেপেছে লোকটার ঘাড়ে। উপায়ান্তর নেই। তা' হয় তো মিথ্যে নয় মিথ্যে হলে, আজ আপনাকে এ ভাবে চিঠি লিখতে পারতাম না। লিখতে লিখতেও এমন একটা কণ্টকিত অবস্থা, আমার এই সাতাশ বছরের সব সম্মান প্রায় হাতের খোলা পাতায় কাচের গুলির মত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি যেন আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আপনি ঠিকানা বললেন। কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। আমিও ঠিক বলবার কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যদি রাগ না করেন, লিফ্‌ট দেবার আনন্দটা নীরবে উপভোগ করছিলাম। তারপরে এক সময়ে আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, আপনি কি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ওখানে ?

আপনি বললেন, না।

আপনি যে কী ভাবছিলেন, তা আপনিই জানেন। আপনাকে খুবই অন্যমনস্ক লাগছিল। কিছু মনে করবেন না, কবি হলে, আপনার ওই বৃষ্টি ভেজা একলা মূর্তির আমি একটা সুন্দর বর্ণনা দিতে পারতাম।

আপনাদের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে, আপনি আমাকে ছাড়লেন না। বললেন, একটু চা খেয়ে যান। নইলে শোভনাটা শুনলে আমাকে অকৃতজ্ঞ বলবে।

হয় তো আপনি শোভনার কাছে কৃতজ্ঞ হতে চাইছিলেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনি আমাকে ডেকেছিলেন। এবং মৃদু আপত্তি করেও আমি আপনাদের বাড়ি ঢুকলাম। আপনার বাবার সঙ্গে পরিচয় হল বাইরের ঘরে। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে বোধহয় কোনো বিষয়-বস্তুই খুঁজে পেলেন না আলাপ করবার। আপনাদের বাড়ির রেডিওতে তখন, আশ্চর্য রেডিওর ব্যাপার, ওই বর্ষাতে শুনলাম গান বাজছে, জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।

চা খেতে খেতে আপনি বললেন, বন্যা তহবিলের চাঁদা আদায়ে আমি প্রায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছি। আমাদের গ্রুপটা প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা তুলেছে। তার মধ্যে আপনিই সবচেয়ে বড় কনট্রিবিউটর।

আমার কিছু বলার ছিল না। ঘোর বর্ষায় আপনার বাসন্তী রং শাড়িটা তখন যেন রোদ ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘরে।

আপনার বাবা এক সময়ে বললেন, এ দেশটাকে এখন মজানদীর দেশ নাম দিলেই ভাল হয়। নদীগুলো মজে যাচ্ছে। যেখান দিয়ে খুশি যেতে পারলে তবু একরকম বাঁচা যেত। কিন্তু মানুষ বাসস্থান গড়ে ফেলেছে। যেখান দিয়ে খুশি যেতে দেবে কেন? এ ভাবেই তো আমরা প্রাকৃতিক ধ্বংসকে ডেকে নিয়ে আসি। হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলে কি বছর বছর তোরা লোকগুলোকে বাঁচাতে পারবি।

আপনি বললেন, এত সহজে কি ধ্বংস হবে? মানুষের কিছু করণীয় তো আছে।

—আছে। সেটা সভ্য সৎ বলিষ্ঠ মানুষদের দেশে কিছু করণীয় আছে। কারণ তারা দেশ রক্ষার্থেই, বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে। এখানে তা কি করে সম্ভব? বাঁধ? শোননি বাঁধ যারা তৈরী করতে গেছে, সেই সব বড় মানুষদের কাণ্ড কারখানা? মাইথন থেকে গাড়ী নিয়ে ওরা আসানসোলে যায় কাঁচকলা কিনতে।

আপনি হেসে ফেললেন। আপনার বাবার তিক্ততা আমি টের পেলাম। তিনি বললেন, সত্যি রে। বাঁধ মানেই আর এক জগত বন্ধনহীন।

আমি চা খেয়ে উঠলাম। বললাম, চলি।

আপনার বাবা বললেন আসুন বাবা।

কথাটা কেমন যেন খট্ করে কানে বাজল। আসুন বাবা, আর কখনো শুনিনি। আমার ইচ্ছে করল আমি বলি, আপনি আমাকে তুমি বলুন। কিন্তু লজ্জা করল।

আপনি বললেন আমাকে, আপনাকে আর কেমন করে বলি আমাদের বাড়িতে আবার আসতে। আপনি তো ভীষণ ব্যস্ত মানুষ।

খুব একটা শুয়ে বসে কাটে না বটে। তবে এমন ব্যস্ত নই যে, আপনি আমন্ত্রণ করলে আমি যেতাম না। অবশ্য তা ছাড়া আপনার বলারই বা কী ছিল। আমিও যে বলব, 'না, ব্যস্ত নই, আপনি বললেই আমি আসতে পারি!' তাও বলা যায় না।

বৃষ্টি তখন একটু কম। আপনি নিজেই একটি ছাতা ধরে, বাড়ির কম্পাউণ্ডটা পার করে দিলেন আমাকে। আমি কেমন যেন অস্থিরতা, না অস্থিরতা নয়, অস্বস্তিবোধ করছিলাম। কী যে বলব, ঠিক ভেবে পাচ্ছিলাম না। অথচ অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। অন্তত, এই কথাটা, 'আমাদের বাড়িতে একদিন আসুন না।'

পারলাম না বলতে। তারই ফল বুঝি এই সুদীর্ঘ পত্র। তুলিকা দেবী, যদি অন্যায় মনে হয়। আবার ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমার সঙ্গে বন্ধুর পরিচয় রক্ষা করা কি আপনার পক্ষে খুব অসম্ভব? আমার দাবী খুব বেশী নয়। একটু পরিচয় রাখা, অসুবিধে না হলে, একটু দেখা সাক্ষাৎ করা। আমি জানি, এ দাবীও আমাদের দেশে একটি মেয়ের কাছে করা খুব মুশকিল। তবু সেই মুশকিলের আবেদনটাই রাখলাম।

ইতি
প্রীতিভাজন
সৌমেন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী তুলিকা চট্টোপাধ্যায়

প্রীতিনিলয়াসু :

প্রায় বিস্ময়ে হয়ে গেল। সত্যি আপনি প্রীতি-নিলয়া, ব্যাপারটাকে আপনি 'তুচ্ছ' বলেছেন। সেটা আপনার উদারতা। লিখেছেন 'এত সাত কাণ্ড রামায়ণ কেন লিখেছেন। এর মধ্যে হাতী ঘোড়া কী আছে। একজন সৎ ব্যক্তির সঙ্গে কেন আলাপ রাখব না আমি? আমিও তো সামাজিক জীব, দশ জনের সঙ্গে চলতেই আমি অভ্যস্ত। অসম্মানের প্রশ্নই বা আসে কেন? আপনার আলাপের ইচ্ছেটা খোলাখুলি লিখেছেন বলে? কেন লিখবেন না? অত কথা আপনি না লিখলেও আমার কোনো অসুবিধে হত না। আত্মসম্মান তো পরস্পরের রক্ষার জিনিষ। তার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আমার নেই। আপনি যেদিন ইচ্ছে হয় আসবেন আমাদের বাড়িতে। আমিও যেতে পারি আপনাদের বাড়িতে। তবু একটা

কথা জিজ্ঞেস করব,
জগতে বন্ধু হিসাবে
আসব ?'

এই শেষের কথাটায় প্রায় ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। হাসতে হাসতে ধমকে ওঠার মতো। কিন্তু ফাঁক আপনিই রেখে দিয়েছেন, 'উপকার'-এর কথাটি বলে। 'আপনার জগত' বলতে বোধ হয় আপনি আমার কাজের জগতের কথা বলেছেন। সেখানে সত্যি আপনি কোনো উপকারে আসবেন না কাজটাকে আমরা জীবন থেকে একেবারেই আলাদা করে ফেলেছি। ও জগতের কোনো কথাও আপনার কাজে আসবে না। কিন্তু উপকার কি সত্যি হবে না। আর যদি বলেন কেন বন্ধুত্ব, তার কি সত্যি কোনো জবাব আছে ? সব মিলিয়ে ওঠা একটা ইচ্ছা, একটা আকাঙ্ক্ষা।

হয় তো যে কারণে আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় আমার ডান্স-ডিনারে যেতে ইচ্ছে করে না, সেই কারণেই হয় তো খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গলাভের ইচ্ছে হয়। আগামী রবিবার দিন আমাদের বাড়িতে আসুন না। বিকালবেলার দিকে। ওই দিনে আমাদের বাড়িতে বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত শানাই বাদক ও গায়ক আসবেন। বলা বাহুল্য, গাইতে বাজাতেই আসবেন। আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব কয়েকজনকে সেদিন নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আপনি এলে আমার দিক থেকে আয়োজন পূর্ণ হয়। আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাই। দয়া ক'রে রক্ষা করবেন।

ইতি

প্রীতিধন্য

সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়।

প্রীতিভাজনীয়াসু

গত রবিবার দিন আপনার খারাপ লাগে নি আশা করি। আমার বাবাকে কি আপনার খুব খারাপ লেগেছে। উনি কিন্তু ওইরকম করেই কথাবার্তা বলেন। আমাকে আমার বন্ধুরা ফাদারিস্ট ব'লে ঠাট্টা করে। করলেও কোনো উপায় নেই। কারণ ওই বিপত্নীক ভদ্রলোকটিকে একমাত্র আমিই খানিকটা চিনি। আমার ছোট ভাইবোন দুটির, বাবার সঙ্গে প্রায় কোনো আলাপই নেই। বাবা ওদের কাছে প্রায় বিদেশী মানুষ।

বাবা আপনার দিকে তাকিয়ে যে-ভাবে আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, আমিই লক্ষ্য পাচ্ছিলাম। কিন্তু ওটা ওঁর অভদ্রতা কিংবা আন্তরিকতার অভাব ব'লে নয়। উনি ওভাবেই কথাবার্তা বলেন। বাবা বললেন, এ মেয়েটি কে ? একে তো কখনো এ বাড়িতে দেখিনি।

আপনি যেন কেমন জড়োসড়ো হয়ে পড়লেন। শোভনার বন্ধু বললে আপনি খুশি হতেন কি না জানি না। আমি কিন্তু আমার দাবীটাই প্রকাশ করেছি। আমি বললাম, ইনি আমার বন্ধু, তুলিকা চট্টোপাধ্যায়।

বাবা বললেন, ও! বেশ, আমি ভাবলুম বুঝি শুভির বন্ধু।

আমি বললাম, শুভিরও বন্ধু উনি। সহপাঠিনী।

বাবা বললেন, বটে ? বেশ। ওই তোমার বড় মাসীমা আসছেন, কণিকাকে আলাপ করিয়ে দাও।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, কণিকা নয় বাবা, তুলিকা।

—ও হো, আমি দুঃখিত মা, কিছু মনে করো না। তুলিকা, তুলিকা, নতুন শুনছি, কিন্তু বেশ সুন্দর। আমাদের মেয়েটার নামটা ভাল নয়। এই যে আসুন বড়দি, কেমন আছেন ?

বাবা বড় মাসীমাকে ডাকলেন। আর আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছিলেন, বড় মাসীমা বাবার কথার জবাব দিতে দিতেই, আপনার দিকে তাকিয়ে দেখে-ছিলেন। তাঁর সব বিষয়েই কৌতূহল বেশী। পরিচয়টা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর কিছু হজম হচ্ছিল না। ওইজন্যেই বাবা তাড়াতাড়ি বলছিলেন, তোমার বড় মাসীমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।

আমি দিলামও তাই। এবং এবারে শোভনার বন্ধু বলেই পরিচয় দিতে হ'ল আপনার। কারণ তা নইলে বড় মাসীমাকে যে কত রকমের কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত, তার ঠিক নেই। কোথায় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল, কেন আলাপ হ'ল, আপনি কী করেন, কেমন পরিবারের মেয়ে, সে একেবারে সাত সতেরো কথা। বুঝতেই পারছেন, সংসারে সবকিছুই ওঁরা নিজেদের মত ক'রে দেখেন।

তবে মানতে হবে, বড় মাসীমা খুশিই হয়েছেন আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে। শোভনা এসে পড়ায় আপনি একটু এদিক থেকে স্বস্তি পেয়েছিলেন। আবার অস্বস্তিও হয়েছিল নিশ্চয়। কারণ শোভনা বড় মাসীমার চেয়ে খুব বেশী এদিক-ওদিক ভাবতে পারে না। ও নিশ্চয় আপনাকে দু'একটা বে-কায়দার প্রশ্ন ক'রে ফেলেছে আমার সম্পর্কে? আপনি যেন তাতে রাগ করবেন না।

আমাদের বাড়ির অতিথিদের ভিড়ে আপনার হয় তো ভাল লাগছিল না। মহিলাদের আসরে আপনার দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল, বুঝতে পারছি। তাঁদের রংচংও আপনাকে বিলক্ষণ বিরক্ত করছিল। কথা বলার ধরণ-ধারণ আরো খারাপ লাগছিল নিশ্চয়। এবং আপনি নিজেকে একাকী বোধ করছিলেন। কারণ, শোভনাও ওই দলেই ভিড়ে পড়েছিল। আসলে ও ওই দলেরই মেয়ে।

শানাইয়ে যখন ভৈরবী বেজে উঠল, দেখলাম, সকলের অলক্ষে আপনি দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। ওদিক দিয়ে অবশ্য, নীচে যাওয়া যায় না। তবু ভাবলাম আপনি হয় তো বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়ে গেলেন। তাই আমাকেও বেরুতে হল। কিন্তু এসে আপনাকে দেখতে পেলাম না। বারান্দাটা ঘুরে, পশ্চিম দিকে চলে গেছে। তবে, ওদিকটা নির্জন বাগান। আপনি ওদিকে যাবেন কেন? ভেবে, ফিরতে গিয়েও মনে হ'ল, তবু একবার দেখে আসি। তা ছাড়া আপনি কোন্‌দিকেই বা যেতে পারেন। বারান্দা-সংলগ্ন ঘরগুলির দরজা তো সবই বন্ধ। নিশ্চয় কোনো ঘরেও ঢোকেন নি।

পশ্চিমদিকের বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, আপনি রেলিংএ ভর দিয়ে, গালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। বেলা তখন গেছে। আমাদের বাগানের পাখীরা প্রায় স্তব্ধ। অন্ধকার আধো-আধো। আমার যেন মনে হচ্ছিল, শানাইয়ে সেই গানটা বাজছিল।

কতই পেলি ভালোবাসা
তবু না তোর মেটে আশা ..

কিছু মনে করবেন না। সমগ্র জীবনের ওটি একটি মুহূর্ত বলে আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আপনার কথা ভেবে। কেন আপনি ওখানে গিয়ে, ওভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বোধহয় খুব অস্বস্তি লাগছে আমাদের বাড়িতে?

আপনি বললেন, একটুও না।

—ওই পরিবেশে—

—আমি বেমানান।

আপনি বললেন। বললেন, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি তো জানি।

শানাইয়ের সুরটা যেন তখন সপ্তমে। আর ওই লাইন দুটিই বাজছিল যেন বারে বারে। আপনি অন্যমনস্ক, তন্ময় হয়ে গেলেন।

তবু আমি না জিজ্ঞেস ক'রে পারলাম না, তবে? উঠে এলেন যে?

আপনি বললেন খুব আস্তে, আস্তে ওই সুরে ওই বাজনাটা শুনলে আমার কান্না পায়।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কান্না যেন আমারও বুকে এসে থমকে রইল। কেবলি মনে হল, আপনার একটি অত্যন্ত গোপন, নিতান্ত একলা থাকার একটি মুহূর্তে মূর্তিমান বিঘ্নের মত এসে উপস্থিত হয়েছি। যদিও আপনার অকপট ভাবে ওই কথাটি বলতে পারাতেও বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি খুব। অপরে হ'লে মনের ওই অনুভূতির কথা ওভাবে বলতে পারত না। ভাবলাম, শানাইয়ে বাজানো ভৈরবী সুরের সঙ্গে, আপনার এই বিশ বছর বয়সের কোনো গূঢ় গাঢ় বেদনাদায়ক ইনভলভেশন র'য়ে গেছে। আমি দু' এক মুহূর্ত কথা বলতে পারলাম না। তারপরে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে ক্ষমা চাইলাম—ও, আমি নিতান্তই অন্য কথা ভেবে আপনাকে দেখতে চলে এসেছি। কিছু মনে করবেন না, আমি যাচ্ছি। আলোটা জ্বেলে দেব কি?

আপনি তাড়াতাড়ি বললেন, না না সৌমোনবাবু, আপনি যাবেন না। আপনার যাবার মত কথা আমি কিছু বলি নি। বিশেষ যন্ত্রের স্বরে, বিশেষ সুরের উপরে এক একজনের কেমন এক একটা মন জড়ানো থাকে না? আমার সেই রকমই। কেমন যেন করে আমার মনের মধ্যে আমি বোঝাতে পারব না। ওখানে তো ওঁদের মাঝে ভাল ক'রে শোনা যাবে না। আর শুনলেও, হঠাৎ যদি আমার কোনো ভাবান্তর হয়, সেই ভয়েই চলে এলাম।

আমি কথঞ্চিৎ শান্ত হলাম আপনার কথা শুনে।

তবু আমার চলে যাওয়া উচিৎ কি না তাই ভাবছি। আপনি বললেন, আপনিও এখানে দাঁড়িয়েই শুনুন না। এ জিনিস ওখানে বসে শোনবার নয়।

মুখ ফুটে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লজ্জা করল। সন্ধ্যার সেই মুহূর্তগুলিকে আমি যেন স্বপ্নের মত দেখতে লাগলাম। আপনি তন্ময় হ'য়ে সানাই শুনতে লাগলেন। সত্যি বলা যদি দোষ না হয়, তবে বলি, আমি যেন বাজনাটা আপনার মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে শুনতে লাগলাম। সানাই শুনতে আমি ভালবাসি। কিন্তু আপনার মত অমন তীব্র অনুভূতি আমার নেই।

বাতি জ্বালানোর কথা আমিও ভুলে গেলাম। অন্ধকার নামতে লাগল। পাখীরা তখন একেবারে নিশ্চুপ। শরতকালীন আবছাওয়ায় আমাদের বাগানটা যতটা খুঁপসি না দেখাবার কথা, তার চেয়ে বেশী দেখাচ্ছিল। কারণ, গাছে গাছে পাতাগুলি বড় হয়েছে আরো। রং গাঢ় হয়েছে অনেক বেশী। আর আপনাকে আমার বয়েসের চেয়ে অনেক বেশী বড় মনে হল। বড় নয়, ভারী এবং গভীর।

এক সময়ে ভৈরবী থামল। আপনি নীরব। আমাকে হয় তো কেউ খুঁজছে। এরকম আমার মনে হল। কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করল না। আমি প্রায় লোভীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু মনে করবেন না যেন। লোভ অন্য কোন কারণে নয়। যদি আপনি কিছু বলেন। আমাকে নয়। আপনার নিজের কথা। কিন্তু আপনি কিছুই বললেন না।

তখন বেহাগ শুরু হয়েছে সানাইয়ে। আসরে বাজাতে গেলে, রাগ-রাগিনীর সময় রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে সত্যি বাজাতে পারে, সে তার সুরেই সময় বদলে দিতে পারে। বেহাগ ঠিক তেমনি বেজে উঠল।

এবার আমার আগে আপনার সংবিত ফিরল। আপনি বললেন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক। আমি বললাম, চলুন।

আপনি না গিয়ে বললেন, দেখলেন, আমার এ পাগলামির জন্য যেন কিছু মনে করবেন না।

পাগলামি আমরা কম-বেশী সবাই করে থাকি। আপনাকে প্রথম চিঠি যেটা দিয়েছিলাম, তাকে পাগলামি ছা আর কী বলা যায়। তাতে একটা জিনিষই প্রমান হয়। এ পাগলামিগুলো না থাকলে জীবনটা বোধহয় দুর্বিসহ হ'য়ে উঠত।

আমি বললাম, আপনার পাগলামির জন্যেই বরং আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আপনার বোধহয় চোখ ভেজা ছিল, বুঝতে পারিনি। কিন্তু আপনি হাসলেন আমার কথা শুনে। বললেন, সত্যি খুব ভাল লাগছে আজ। আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করাটা বৃথা হয় নি।

শুনে আমি কিছু বলতে পারলাম না। আপনি আমার নীরবতায় কী ভাবলেন, কে জানে। এত বেশী আনন্দ হল আপনার কথা শুনে, তাকে প্রকাশ করতে ভয় হল।

তারপরে আপনি চলে গেলেন হল-ঘরে। আমি ওখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই একলা মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, পৃথিবীতে এমন জিনিষ অনেক আছে যা একার। একা ছাড়া অনুভব করা যায় না। একলা না হলে, বুকের ভিতরের সেই ঘুমন্ত-মন জাগে না। দশ জনের মাঝে সে নানান ভাবে, নানান রূপে আবৃত থাকে।

এই সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে আমাদের বাড়িতে নানান রকম গানের আসর বসেছে। আপনার মত এমন করে তাকে ভোগ করবার শিক্ষাটা আমাকে কেউ দেয় নি এর আগে। যদিও আমি আমার বাবাকে দেখেছি, দশজনের মধ্যেও একেবারে ভিন্ন মানুষ হ'য়ে যেতে। কোনো গান অথবা বাজনা, ভাল লাগলে, তিনি হারিয়ে যান একেবারে। অতিথিদের কথা তাঁর একটুও মনে থাকে না। বরং সে সময়ে আতিথেয়তা করতে হলেই দেখেছি তিনি বিরক্ত হন।

আপনি চলে গেলেন। আমি বেহাগ শুনতে লাগলাম। ক্ষমা করবেন, একটু কাব্য না ক'রে পারছি না। শরতকালের কালো আকাশটায় তারা-গুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল বোধ হল। আমি দেখলাম সব তারাগুলি কাঁপছে দুলছে ঘুরছে। আমার বুকের মধ্যে যেন একটা পাগলা ঝড় উঠল। অথচ আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম। আমার মনে হ'ল, সেই ঝড়ে অনেক শুকনো পাতা উড়ল। গাছে গাছে মাতামাতি হতে লাগল। কোথায় যেন দরজা খুলে

গেল শব্দ ক'রে এবং সে দরজা কেবলি বাতাসের ঝাপটায় ঠাস্, ঠাস্, ক'রে ঘা খেতে লাগল।

আমি থাকতে পারলাম না। কেন না, আমি আমার, বুকের ভিতরের কিংবা মনের এ চেহারাটা আর কোনোদিন দেখি নি। আমি পালিয়ে গেলাম হল-ঘরের মধ্যে।

সেখানে আমাদের অতিথিরা বেশ হেসে কথা বলে সানাইয়ের তারিফ করছেন। আমি ভাবলাম, যাক সেই জগতটাই তা' হ'লে আছে পৃথিবীতে। মাঝখান থেকে কী একটি অস্পষ্ট অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলাম আমি। দেখলাম বাবা গালে হাত দিয়ে, চোখ বুজে শোফায় ডুবে আছেন। আর আপনার সঙ্গে এক মহিলা কী সব কথা বলছেন। আপনি ভদ্রতা রক্ষা ক'রে, তার কথার জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক।

সানাইয়ের পরে জলযোগ পর্ব। তখন দেখলাম শোভনা অনেকের সঙ্গে আপনাকে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। এমন কি আমার যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের সঙ্গেও শোভনাই আলাপ করিয়ে দিল। সকলেই আপনার সঙ্গে আলাপে উন্মুখ দেখলাম। আর এটা তো মানতেই হবে, সবচেয়ে সাদাসিধে বেশে, এবং ওইটিই আপনার স্বাভাবিক বেশ আমি দেখছি, আপনার সাদাসিধে বেশবাস, সেই সঙ্গে, আমার মার্জনা প্রার্থনান্তে, আপনার রূপ এবং ব্যবহার, প্রায় একটা স্পর্দ্ধাই প্রকাশ করছিল।

আমার বোন তার বন্ধুর জন্য গর্ব-বোধ করছিল কি না আমি জানি না। আমি কিন্তু করছিলাম। আমি জানি না, এ বয়সেই আপনার এমন ডিগনিটি ও পার্সোনালিটির দায় কার। অথচ বেমানান হচ্ছিল না একটুও। উচ্ছলতা কম ছিল না, যেন ধ'রে রাখতে হচ্ছিল।

এক সময়ে আপনি বললেন, চলি।

ঠিক বাবা সে সময়ে সেখানে। তিনি বলে উঠলেন, কোথায় যেতে হবে তোমাকে?

আপনি গন্তব্য বললেন। বাবা বললেন আমাকে, তোমার বড় মাসীমার গাড়িতে ওকে পাঠিয়ে দাও। ওঁরা তো ওদিকেই যাবেন।

আপনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, না না, আমি একলা যাব।

বাবা বললেন, বেশ তাই যাও। কিন্তু আবার এস একদিন তাড়াতাড়ি। তোমার নামটা কিন্তু আমি বার বার ভুলে যাচ্ছি।

—তুলিকা—

—তুলিকা। তুলিকা। বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীঅনাদিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

—আচ্ছা। তিনি কী করেন?

—তিনি এখন রিটায়ার করেছেন। কিছু করেন না।

—ক' ভাই-বোন তোমরা?

—এক ভাই এক বোন এখন।

—তুমি ছোট?

—হ্যাঁ!

—বেশ। তোমার বাবাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এস বেড়াতে।

আপনি অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে! বাবা ওই রকমই। আমি বুঝলাম, আপনি জবাব দেবার জন্যেই জবাব দিলেন, আচ্ছা।

বাবা সরে গেলেন। কিন্তু আপনার বাবা এলে, আমার বাবা খুশিই হবেন। এটা আপনাকে আমি বলে রাখতে পারি।

সেকথা না বলে আমি আপনাকে বললাম, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আপনাকে আমি রেখে আসি বাড়িতে।

আপনি বললেন, কোনো দরকার নেই। আমি সচ্ছন্দে যেতে পারব।

তা' জানি, আপনি যেতে পারবেন। আমি আসলে আমার ইচ্ছেটাই প্রকাশ করলাম। তাই আমি আবার না ব'লে পারলাম না, যদি অসাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন, তা' হলে আমিই যাই না কেন?

আপনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে কী ভাবলেন, কে জানে। তারপরে বললেন, চলুন।

কিন্তু সারা পথ, গাড়িতে আপনি একটি কথাও বললেন না। আমি মুষড়ে পড়তে লাগলাম। ভাবলাম হয় তো আপনি একলা একলা যেতে চেয়েছিলেন, তাতে বাধা পেয়ে আপনি বিমর্ষ হয়ে উঠেছেন। আপনি একটি কথাও বললেন না। শুধু নামবার সময়, নমস্কার করে বললেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

আমার নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হল। প্রতি নমস্কার ক'রে আমি বললাম, ধন্যবাদের কী আছে।

আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। আজকের এ চিঠিটার মূল প্রশ্ন কিন্তু এখানেই। কেন আপনি চুপ ক'রে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, সেকথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনার নীরবতা দেখে সেকথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

একটু দয়া ক'রে জানাবেন। খুব ব্যগ্র হ'য়ে থাকব।—

সৌমোন।

সহৃদয়াসু,
তুলিকা,

এবারে চিঠি লিখছি অনেকদিন বাদে। আমাদের বাড়িতে সেই গানের মজলিসের পর, ছ'মাস কাটল প্রায়। কাল হোটেলে যাবার প্ল্যানটা বাতিল ক'রে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। শুধু বাঁচাওনি। জীবনের একটা মস্ত বড় লাভ আমার ঘটে গেল। কাল তুমি আমাকে প্রথম অনুমতি দিলে, 'তুমি' ব'লে ডাকবার জন্য।

আমি অবশ্য প্রথমেই ভেবেছিলাম, ওই ধরণের একটা হোটেলে গিয়ে খেতে তোমার মোটেই ভাল লাগবে কি না। শুধু তা' নয়। গিয়ে হয়তো দেখব সেখানে বন্ধু-বান্ধবের ভিড়। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে, আমি প্রায় হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। হয় আমাদের বাড়ি, না হয় তোমাদের বাড়ি। কিংবা কলকাতার কোনো মিডিওকার রেঁস্তোরায়। লোকে শুনলে ভাববে, তোমাকে নিয়ে বুঝি আমি কোনো গুপ্ত জায়গায় যেতে চাইছি। অথচ তা' তো মোটেই নয়।

কাল তোমার পোশাক দেখেই বুঝলাম, হোটেলে যাবার জন্য তুমি প্রস্তুত হ'য়ে আসো নি। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পরীক্ষা শেষের এবং ফলের প্রতীক্ষাকালে মানুষকে বোধহয় এরকমই দেখায়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বি এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি হেলায় পাশ করবে।

তুমি ওভাবে এলে, এদিকে আমি একেবারে সান্ধ্যকালীন পোশাকে: তুমি বললে, হোটেলে যেতে ইচ্ছে করছে না একদম।

আমি বললাম, থাক্ তবে।

তুমি বললে, এক কাজ করবেন? চলুন, বাইরে চলে যাই। কলকাতার বাইরে, কোনো গ্রামের দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।

আমি বিস্মিত আনন্দে ঝলকে উঠলাম। অন্তত, এই আশ্বাস পেলাম, আমার সঙ্গে কলকাতার বাইরে বেড়াতে যেতে তোমার আপত্তি নেই। তোমাকে তুলে নিয়ে আমি গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম সোজা দক্ষিণে।

তারপর ভর সন্ধ্যায় সেই মাঠটার ধারে তুমি বসলে। আমাকে তোমার পাশটা দেখিয়ে বললে, বসুন।

আমি বসে, তোমার এই প্রস্তাবের প্রশংসা ক'রে বললাম, ভাগ্যি আপনি বলেছিলেন নইলে এতক্ষণ আমরা সেই হোটেলটার ঝকঝকে ঘরে বসে খেতাম, কথা বলতাম, পরের খাওয়া দেখতাম। হয়তো একটু নাচ-গান, যা আপনার একদম ভাল লাগত না তুলিকা দেবী।

তুমি বলে উঠলে, দেবী শুনতে আমার একদম ভাল লাগে না। তার চেয়ে আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকুন।

তুমি কত সহজ। কত অনায়াসে নিজের কথা বল। বরাবরই তা' শুনে আসছি। কিন্তু কাল ওই মুহূর্তটিতে তোমার সহজ উক্তি আমাকে নাড়িয়ে দিলে। মনে মনে যে সম্বোধনটা প্রায় প্রতিনিয়তই করেছি। সেই সম্বোধনের আহ্বান এল তোমার দিক থেকে। জানি না, তুমি লক্ষ্য করলে কি না, আমার অবস্থা প্রায় বাতাস লাগা বেতস লতার মত! কেন, এ প্রশ্ন যেন ক'রে বস না। কী ভাবে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, ভেবে পেলাম না।

তুলিকা, রাগ ক'রো না। একটা কথা বলি? কাল সেই মুহূর্তে, আতিশয্যবশত যদি তোমার হাতখানি ধরতাম, তুমি কি রাগ করতে?

আমি জানি, মাত্র একটি অর্থেই লোকে হাত ধরার কথা বলে। সেই অর্থ বাদ দিয়েও তো, নতুন হৃদ্যতার একটি অতি তুচ্ছ কিন্তু অনুভূতিশীল অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। কিন্তু আমি পারলাম না। সেটা তোমার ব্যক্তিত্বেরই গৌরব। এমন কি, সহসা কিছু

বলতেও পারলাম না।

তুমিই আবার বললে, কী হ'ল, চুপ করে রইলেন যে ?

আমিই নিজেকে তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিলাম। ওখানে, তোমার কাছে ব'সে মনের কথা বলার চেয়ে, অধিক রাত্রে আমার এ নির্জন ঘরে, পত্রের নিঃশব্দ কথায় নিজেকে আমি আরো ভাল ক'রে প্রকাশ করতে পারি। বললাম, বেঁচে গেলাম।

—কেন ?

—নইলে কোনদিন নিজেকে বেতে বলতে হ'ত।

—তাতেও ক্ষতি ছিল না! বন্ধুর সে অধিকার থাকা উচিত।

কাল তোমার আশ্চর্য মুড ছিল বলতে হবে। আট দশ মাসের পরিচয়ের মধ্যে, কালকের মত কথা তুমি আর কখনো বল নি।

আমি বললাম, নিজের থেকে দাবী করার চেয়ে কেউ বেচে দিলে, আরো অনেক ভাল লাগে।

তখন একটু অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ফাগুনের বাতাস বেশ উদ্দাম। আমি তোমার মুখের সব ভাবান্তরগুলি খুব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু মনে হল, ঠোঁটের কোণে একটি শুষ্ক হাসি ফুটে আছে তোমার। তুমি মন্তব্য করলে না আমার কথার। বরং আমাকেই এক বিচিত্র সুরে জিজ্ঞেস করলে, সে-কথা কি ঠিক সৌমোনবাবু ?

সৌমোনবাবু! তুমি এমনভাবে বল, যেন তুমি কত বড়। ওটাও তোমার ব্যক্তিত্ব। তোমার সাহসকে মানতেই হয়। আমাকে বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করতে হ'ল, তোমার কি মনে হয় ?

তুমি বললে, আমি বুঝতে পারি না।

জানি না, তুমি এড়িয়ে গেলে কি না।

তবু বলব, তুলিকা, কাল আমি প্রথম অনুভব করলাম, তোমাকে আমার অনেক কথা বলতে হবে। অনেক কথা জমে আছে, যা তোমাকে না জানালে চলবে না। যদিও আজকের চিঠি সে জন্যে নয়। বরং আমার এই ভেবে ভয় লাগছে, এ চিঠি হয় তো তোমার কাছে আমার জমা কথার পূর্বাভাস মনে হবে। এবং এ পূর্বাভাস দেখেই তুমি কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলবে। তা' যেন ক'র না। এমন কি বন্ধু বিচ্ছেদও যদি কখনো করতে চাও, তাও সহসা ক'র না। কারণ, আমি কখনো তোমার মতের বিরুদ্ধে যাব না। আমার দিক থেকে, সবটাই তোমার নিজের হাতে।

কারণ, তোমার জগতের কিছুটা অংশ আমি দেখেছি। তাতে বোঝা যায়, তোমারই বয়সী শোভনাদের সঙ্গে তোমার তুলনা চলে না। সেই জগতে মিহিররঞ্জন সেনগুপ্তের মত মার্জিত রুচি অধ্যাপক আছেন। যদিও ওঁকে আমরা অধ্যাপকের চেয়েও বেশী জানি কবি এবং বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত বলে। উনি আমাদের চেয়ে বয়সে বছর তিন চারেকের বড়। কিন্তু আমি ওঁর কাছে পড়েছি। ওঁর কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রায় আমার সবই পড়া আছে। নতুন যখনি যা বেরোয়, তাও পড়ি। তুমিও পড়, সেটা বোঝা যায় তোমার কথায় এবং ওঁর সঙ্গে তোমার আলাপ দেখে। শুধু আলাপই বোধহয় সেটাকে বলা যাবে না! আমার মনে হয়েছিল, ওঁর সঙ্গে তোমার হৃদ্যতাও আছে।

সেই যেদিন তোমাতে আমাতে চৌরঙ্গী দিয়ে যাবার কালে ওঁর সঙ্গে দেখা হল, তুমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে ওঁর সামনে। তুমি ওঁর কলেজের ছাত্রী নও, কিন্তু আলাপ ছিল। উনি দেখলাম, খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কিন্তু আমাকে দেখে একটু অবাক হলেন। তুমি আলাপ করিয়ে দিতে গেলে। তার আগেই বললাম, আমি চিনি ওঁকে। উনি আমাদের প্রফেসর ছিলেন।

মিহিরবাবু বললেন, মুখটি আমার চেনা চেনা লাগছে। আশ্চর্য মিহিরবাবুর চেহারা। অমন টক-টকে ফর্সা রং আমি কম দেখেছি। কিন্তু চেহারায় যুবক হ'লেও, শান্ত অথচ জোর দিয়ে দিয়ে, টেনে টেনে কথা বলার মধ্যে কেমন একটি ভার আছে। যেন কতই বয়স হয়ে গেছে। আসলে সেটা ওঁর পাণ্ডিত্যেরই ভার, আমি বুঝতে পারি। চোখ দু'টি ওঁর বড় নয়, কিন্তু স্বপ্নালু চাউনি। যদিও ভ্রূর কোণে নাকের ও ঠোঁটের পাশে কয়েকটি রেখা একটি আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা দিয়েছে। সেগুলি দেখে লোকে ওঁকে উন্নাসিক ভাবলেও ভাবতে পারে।

মিহিরবাবু তোমাকে বললেন, কোথায় যাচ্ছ ?

—এমনি একটু বেড়াতে।

তোমার মধ্যে কি আমি একটু বিষণ্ণতা ও

অস্বস্তির ভাব দেখেছিলাম? মনে পড়ছে না। তুমি অনায়াসে ওঁকে বললে, ব্যস্ত আছেন নাকি?

মিহিরবাবু টেনে টেনে বললেন, না, ঠিক ব্যস্ত নই।

উনি চকিতে একবার আমার দিকে তাকালেন। তুমি বললে প্রায় মাথা নীচু করে, চিঠিটা আমি পেয়েছি।

মিহিরবাবু সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, গত রবিবার দিন আমি সারা দিনই বাড়ি ছিলাম! ভাবছিলাম, তুমি অন্তত একটা ফোন করবে।

দেখলাম, তোমার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল। মিহিরবাবুই আবার বললেন, সিম্ফনিগুলো আমি এনে রেখেছি। সোনাটা তোমার কেমন লাগলো।

—বোধহয় তত ভাল বুঝতে পারি নি।

—সিম্ফনি বোধ হয় ভাল লাগবে। আচ্ছা, তোমরা যাও। আমি একটা গাড়ি ধরি।

আমার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলেন। তারপরে চলে গেলেন। কিন্তু তুমি যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলে তারপর। আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার কি হল?

বললেন, কিছু না।

তবু কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, যদিও মনে হয়েছিল! তুমি মিহিরবাবুকে বলেছিলে, 'চিঠিটা আমি পেয়েছি।' কার চিঠি, কী ব্যাপার এবং মিহিরবাবু সেকথাটা কেন একেবারে এড়িয়ে গেলেন, বুঝতে পারলাম না। আজও জিজ্ঞেস করে তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাইনে। সেদিন যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মিহিরবাবুর সঙ্গে আপনার কেমন আলাপ।

তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিলে, বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু বলতে পারেন।

খুব অবাক হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়। তোমাদের দুজনে কথাবার্তাও যেন কেমন দুর্বোধ্য ঠেকছিল। তোমার চিঠি পাবার জবাবে মিহিরবাবু বলেছিলেন, উনি সারাদিনই বাড়ি ছিলেন।

যাই হোক মিহিরবাবু ছাড়াও সবচেয়ে চমকে উঠেছিলাম সারদা বসুর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ আলাপ দেখে। কলকাতার অত বড় একটা পলেটিকাল ফিগারের সঙ্গে কী করে তোমার এতখানি ভাব হল, আজও আমার বিস্ময়। উনি রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বললেন। আমার প্রায় ভোজবাজী মনে হচ্ছিল।

অবশ্য শুনেছি, তুমি ছাত্র-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কর, রাজনৈতিক প্রবন্ধাদিও নাকি লিখেছ। আমি কখনো পড়িনি। শোভনার মুখে শুনেছি, 'তুলিকা আগুনের মত বক্তৃতা দিতে পারে।' যদিও, এতদিনের আলাপে, তোমার সঙ্গে আমার কখনো রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি।

উঃ, প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে, এই সারদা বাবু একবার আমাদের কী বিপদে ফেলেছিলেন। তুমি জান বোধহয়, কোলিয়ারি অঞ্চলে ভদ্রলোকের দারুণ আধিপত্য। সেটা শুধু নেতা হিসেবে নয়। খনির এবং খনির মালিকদের এমন সব দুর্বলতার সংবাদ ভদ্রলোক রাখেন যে, আমাদের ইষ্টনাম জপ করিয়ে ছাড়েন। আমাদেরও কোল মাইন আছে বলেই আরো ভাল ভাবে জানি। সারদা বাবু ঠিক ইউনিয়ন করেন না। এক সময়ে করেছেন। শুনেছি। সতের বছর বয়স থেকে ভদ্রলোক কোলিয়ারি এলাকায় রাজনীতি করে আসছেন। এখন তো পশ্চিম বঙ্গে নামকরা পলেটিশিয়ান। কর্তাদের দলের মধ্যে থাকলেও শুনেছি, মতভেদ প্রচণ্ড। সারদা বাবুকে একবার বুঝি একেবারে মাথায় তুলে রাখবার কথা হয়েছিল। অর্থাৎ গদী, রাজী হননি শুনেছি। আরো শুনেছি, একমাত্র এ্যান্টি দিল্লী লোক। তবে, বাংলা দেশের কর্তাদের তোয়াজ করতে দেখেছি বটে। পারলে সারদা বাবুর পায়ের ওই মোটা সোলের স্যাণ্ডেলও বোধহয় পরিষ্কার করে দেন। অথচ ভদ্রলোককে কখনো খুব ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর উগ্র বলে মনে হয়নি। ওঁকে অনেকে 'ট্রাই কালার রেড' বলে। কথাটার আপাত কোনো অর্থই যদিও হয় না। তুমি নিশ্চই বুঝতে পারছ। প্রায় বাঘের ঘরে যোগের বাসা। আমরা তো খুব ভয় পাই। বিশেষ করে মাইনাসরা। অথচ ভদ্রলোকের বয়স মোটেই বেশি নয়। বছর ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। তুমি তা জান নিশ্চই। পলেটিশিয়ান হিসেবে শুনেছি, ওটা বয়সই নয়। আমার বাবা বলেন, 'সারদা হল' বাংলার নেপোলিয়ন। ওর মত লোক আর দু'চারটে থাকলে এ যুগটাকে বদলে দিতে পারত। শত্রু হলেও ওর স্পিরিটটাকে মানতেই হবে।'

অথচ, আমার বাবাকেই দেখেছি এই সারদা-বোসের পায়ে প্রায় মাথা কুটতে। এটা ঠিকই, খনির মালিকদের ট্যাকটিক্স্ এ্যাণ্ড পলিসি বলে একটা কথা আছে। ব্যবসা চালাতে গেলে সেই সব নীতি এবং কৌশল বাতিরেকে চলা অসম্ভব। সে সব নীতি ও কৌশল সম্পর্কে তোমাকে কিছু লিখতে আমার দ্বিধা হয়। সে সব কথা জানলে তোমার মনে হবে খনি মালিকেরা নিষ্ঠুর। কয়লা যারা কাটে, জীবন তাদের কাছে দয়ালু হতে পারে কেমন করে জানি না। অন্তত, আমাদের দেশে বর্তমানে যে সিস্টেম চালু আছে, তাদের মধ্যে খনির শ্রমিক মালিকদের সম্পর্ক ভাল হবার কোনো আশা নেই। খনি শ্রমিককে সামগ্রিক ভাবে একটি মানুষ ভাবতে গেলে, মালিকের পক্ষে খনি ছেড়ে চলে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঠিক যে-ভাবে মাটির তলায় লোহার ছাতিয়ার এবং বারুদ দিয়ে সমস্ত বাধা অপসারিত করে, কয়লা তুলে আনা হয়। শ্রমিকরা সেই মাটির তলার মতই মালিকদের কাছে। এর চেয়ে ভাল করে আর বলা যায় না বোধহয়। আর ব্যাবসাটা কী রকম? যেন একটা রাক্ষসকে প্রতি মুহূর্তে খাওয়ানো হচ্ছে। এভাবে আমি বলতে পারি, আমার বাবা জানলে আর রক্ষা ছিল না। বোধহয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতেন আমার ওপর। কিন্তু আমি জানি, বিশ্বাস হারাবার কোনো কারণ নেই। নেই এ জন্যে যে, বর্তমান ব্যবস্থায়, খনি চালাবার চলতি নীতি ও কৌশলগুলিকে আমি মেনে নিয়েছি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা আমরা শুনতে পাই। এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের খনি শ্রমিকদের অবস্থাও পত্র-পত্রিকায় পড়ে দেখেছি। এবং আমার ইচ্ছে আছে, সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকদের অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখে আসব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ যখন নেই এখানে তখন তার কথা থাক। একজন শ্রমিক যখন তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শ্রমিক সমাজের কোনো উন্নতি করতে পারে না, মালিকদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ইচ্ছে করলেই একজন নতুন কোনো ব্যবস্থার পত্তন করতে পারে না। তাদেরও ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ চালাতে হয়।

যাক্‌গে যা বলছিলাম। ব্যবসাটা যেন একটা রাক্ষস। তার প্রতি দিনের বরাদ্দ অনুযায়ী, তাকে কীড্ করে যেতেই হবে। কখনো থামা চলবে না। যারা কয়লা তোলে আর যারা ওই রাক্ষসটাকে কীড্ করে, এদের পরস্পরের সঙ্গে কখনো মিলন সম্ভব নয়। এরা পরস্পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

সারদাবাবুর একটি ডাকে সমস্ত খনি অঞ্চলে শুধু ধর্মঘট নয়, পশ্চিম বঙ্গের সরকারকেও বিচলিত হয়ে উঠতে হল। আর মালিকদের স্বার্থটা তো কেবল মালিকেই নয়। সরকারের এবং সরকারের ভিতরের অনেক ব্যক্তিগত স্বার্থেরও হানি। আর আমাদের দুটি খানিকে কেন্দ্র করেই সেবার সারদা বোস ক্ষেপে গেলেন বোঝা গেল, বাকী সবাই রেহাই পেলেও, আমরা রেহাই পাব না।

বাবা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে দিল্লী, প্রায় পাগলের মত ছুটোছুটি আরম্ভ করলেন। অবাক কাণ্ড যে আমাদের খনি এবং তার নথিপত্র সম্পর্কে যে সব সংবাদ আমরাও সব সময় রাখতে পারি নে, সারদা বোসের তা নখদর্পণে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রেহাই পাওয়া গেল। আমি জানি নে, সরষের মধ্যে কোথায় ভূত আছে। সারদা বোস চুপ হয়ে গেলেন। আমি জানি, ভদ্রলোককে কেউ কেউ নীচ ভেবেছে। বিদ্রূপ করেছে। কারণ তাদের ধারণা সারদাবাবু আমার বাবার কাছ থেকে ঘুস খেয়েছেন! এবং সেই ঘুসের পরিমাণ যে এক লক্ষ টাকা, সে হিসেবটাও অনেকে দিয়েছে।

তারপর আমি জানি, সারদা বোসের যে কোনো প্রয়োজনে আমার বাবা যদি গাড়িও পাঠিয়ে দেন, সেটিও প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। এবং মুখের ওপরেই সারদা বোস বলে দেন, লোকটা কোন লজ্জায় গাড়ি পাঠায়, ভেবে পাই না আশ্চর্য ছ্যাঁচড়া তো। বাবাকে বলতে শুনি, কী করব! সিদ্ধিদাতাকে সবাই তুষ্ট করতে চায়।

সেই সারদা বোসকে দেখলাম, রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছেন। তুমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে রাস্তার ওপরেই। সারদাবাবু তোমার হাত ধরে, কাছে টেনে নিলেন। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। আলোর কাছে, তীক্ষ্ণ তির্যক দৃষ্টি একটি কঠোর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি দেখলাম স্নেহমমতা। তারও উর্দ্ধে কিছু। একটা ঘনীভূত আবেগ, যা প্রায় সারদাবাবুর মত লোককে বুঝি

প্রায় অসহায় করেই ফেলে। আমি কিন্তু তখন তোমার জন্যে গৌরব বোধ করছিলাম তুলিকা। তোমার সে ভাগ্যের জন্য একটু হিংসেও হয়েছিল। যদিও সারদাবাবুর স্নেহ পাবার কোনো উপায় আমার নেই। এবং তার তৃষ্ণাও কিছু নেই। শুধু তোমার ভাগ্য দেখে এটা মনে হয়েছিল।

তোমার চোখে মুখেও একটি দীপ্ত হাসি দেখলাম। যদিও তা লজ্জারুণ। সে তোমার এক বিচিত্র রূপ। আমি নয়, সেদিন অনেক রাস্তার লোকেও তোমাকে দেখল। সারদা বোস এবং তুলিকা চট্টোপাধ্যায় কে তারা চেনে না হয় তো। কিন্তু সে একটি অপূর্ব দৃশ্য। শ্রদ্ধা এবং স্নেহের। প্রীতি ও ভক্তির।

তুমি বললে, কোথায় যাচ্ছেন?

সারদাবাবু বললেন, উনি যেমন একটু তাড়াতাড়ি কথা বলেন, সেই ভাবেই বললেন, যাব একটু ডালহৌসি।

তুমি বললে, আপনি তো কাল আসবেন কলকাতায়, তাই জানিয়েছিলেন।

উনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আজই আসতে হয়েছে আমাকে। কালকেই একটু দিল্লী চলে যেতে হবে। পরশু দিনই আবার ফিরব। পরশুর পরদিন, সকাল বেলায় এই ঘর বেলা আটটায় তুমি এস। ও, না থাক্, তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। সামনে তো পরীক্ষা।

সারদাবাবু হাসলেন। ঝকঝকে দাঁতে, ভদ্রলোকের হাসিটি যে অমন স্নিগ্ধ হতে পারে, আমারই ধারনাই ছিল না। বললেন, খুব কনফিডেন্ট দেখছি, অ্যাঁ? বেশ, এস তা' হলে'। আর কী যেন বলব ভাবছিলাম। এখন ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা, পরে বলব। উনি বোধহয় তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন?

হঠাৎ আমাকে দেখিয়ে বললেন।

তুমি বললে, হ্যাঁ।

—আচ্ছা, চলি।

তোমার হাতটা উনি ছাড়লেন। যেন অনিচ্ছায় ছাড়লেন। চলে গেলেন। সে গাড়িটায় গেলেন, সে গাড়িটাকেও আমি চিনি। ওঁর এক বন্ধু আছেন কলকাতায়। সে ভদ্রলোক একটি প্রেসের ম্যানেজার। সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সারদাবাবু কলকাতায় এলে, বন্ধুর গাড়িতেই কাজ করে বেড়ান। যদিও ওঁকে গাড়ি দেবার জন্যে অনেকেই মুখিয়ে থাকে। সরকারি কর্তারা তো বটেই।

অথচ, মিহির রঞ্জন সেনগুপ্ত কিংবা সারদাবাবুর মত লোকের সঙ্গে যার অন্তরঙ্গতা, তাকে যখন দেখি শিবেন রায়ের মত লোকের সঙ্গে মিশতে, তখন কেমন যেন খটকা লাগে। ও-লোকটিকে আমি চিনি। কিছু মনে করো না তুলিকা, তোমার বন্ধুর সমালোচনা করছি বলে। সমালোচনা ঠিক নয়, যা সত্যি, তাই।

তুমি ভাব তো, এই দিন পনর কুড়ি আগে লোকটার সঙ্গে যখন দেখা হল, কী বিশ্রী! যেমন একটি খোঁচা পাথরের মত চেহারা, তেমনি অবিন্যস্ত মাথার চুল। একটা প্যান্ট পরা ছিল, সেটি যেন ঢাউস্। হাতার বোতামগুলো লাগাতে লোকটার কী ক্ষতি হয়েছিল। বুকটা কি রাস্তার লোককে খুলে দেখিয়ে বেড়াবার জিনিষ যে সেখানেও সব বোতাম কটি সে লাগাতে পারে নি? অথচ লোকটা কত বড় একটা পোস্ট হোল্ড করে। যার হওয়া উচিৎ ছিল কুলি, সে হয়েছে আর্টিষ্ট। অত বড় চোখ মানুষের হয় না। তার ওপরে আবার লাল। আমি নিশ্বাসেই গন্ধ পাচ্ছিলাম, লোকটা ড্রিঙ্ক করে এসেছে।

ওকে দেখে যখন তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে, ভেবেছিলাম তোমাকে ডেকে নিই। কিন্তু বাধল। অন্য কোনো কারণে না। তোমার কথা ভেবেই। ভাবলাম তোমার নাকে কি গন্ধ যাচ্ছে না? কিংবা জেনে শুনেই তুমি হয় তো লোকটার সঙ্গে আলাপ রাখ। যেন রাগ কর না। আমার ব্যক্তিগত রুচির এই সামান্য কথাটুকু তোমাকে লিখতে আমার দ্বিধা করা উচিত নয়।

তখন আর একটি মজার নাটক ঘটছিল, তুমি লক্ষ্য করনি। তুমি যে সময়ে শিবেন রায়ের সামনে দাঁড়ালে, ঠিক তখনি উল্টো দিকের ফুটপাত থেকে আর একটি মেয়ে হাত তুলে শিবেন রায়কে ডাকতে যাচ্ছিল। তোমাকে দেখে মেয়েটি আর তাকে ডাকল না। তোমাকে সেদিন সে কথা বলিনি। তুমি হয়তো আমার রুচিকে খারাপ ভাবতে। কিংবা অন্য কিছু মনে ক'রে বসতে। তা ছাড়া, শিবেন রায়ের সঙ্গে যখন তোমার আলাপ আছে, তার

সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে কিছু কম জানবে, তাই বা কেমন ক'রে হয়! তার সম্পর্কে কম জানা মানে, লোকে তার সম্পর্কে যা জানে। সেই জানার কথাই বলছি। মেয়েদের জগতেই বোধহয় তার সবচেয়ে বেশী দুর্নাম। অথচ মেয়েদের ওর কাছে যেতে দেখা গেছে বারবার। রমনীর মন তো সহস্র বর্ষের সাধনার জিনিষ নয়। আসলে 'দেবা ন জানন্তি' ঠিক।

যে মেয়েটি তখন উল্টো ফুটে দাঁড়িয়েছিল, সে একটি বিখ্যাত বাড়ির মেয়ে। তুমি জান, নাম তার অমলা ঘোষাল। এবার তার বাবার নামটাও তোমার মনে পড়ছে আশা করি। হেস না যেন, এক সময়ে আমার বাবার ধারণা ছিল, অমলা ঘোষালের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। আমাদের চেয়ে বছর তিনেকের জুনিয়র অমলা। কী দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিল ইংরেজীতে। বাংলা দেশের ছেলেদের মাথা হেঁট করে দিয়েছিল।

সেই মেয়েকে যখন দেখি, শিবেনের জন্য এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন মনে হয়, ঈশ্বর মানুষের বিবেকের মধ্যে বহু সহস্র অভিশাপের ছিদ্র রেখে দিয়েছে। সেই ছিদ্র বন্ধ করে চলা কঠিন।

শিবেন রায় আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। না, আমাকে তার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। হয় তো সে আমাকে চেনেই না। আমাদের এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরির জন্য একবার কার্নাণ্ডেজের কাছে বিজ্ঞাপনের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। আমি জানি না, পূর্বে নাকি একবার শিবেন রায়েরই করা লে আউট নিয়ে বাবার সঙ্গে কি সব কথা কাটাকাটি হয়েছিল। দ্বিতীয় বারেও শিবেন রায় তাই ফিরিয়ে দেয়। লোকটা কার্নাণ্ডেজের যেন প্রায় সর্বেসর্বা। হোক, কিন্তু অহঙ্কারের তো একটা সীমা থাকা দরকার।

কিন্তু থাক, তোমাকে কেন এসব কথা লিখছি। যে জন্যে শিবেনের কথা লিখছিলাম। লোকটা আমার দিকে তাকিয়েও দেখলে না। তোমাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

তুমি বললে, বিশেষ কোথাও নয়।

শিবেন বলল, অবিশেষ জায়গাটা কোথায়?

লোকটার চাউনিটা কী খারাপ। ও তোমার দিকে ভাল করে না তাকিয়ে, কথা বলছিল। তাকিয়েছিল সামনে। তোমার মাথার ওপর দিয়ে। যেন অন্য কারুর দিকে তাকিয়ে, একটা অন্যমনস্ক, অপমর্ন হাসি ঠোঁটে নিয়ে কথা বলছে। ও আবার কি রকম ভঙ্গি।

তুমি বললে, জায়গাটা জানলেও আপনার ভাল লাগবে না। ধরুন কোনো কাফে রেঁস্তোরায়, কিংবা আমার কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

শিবেন বলল, না, মনের মত নয় ঠিকই। আমার মনের মত জায়গা না হলে, যেতে ইচ্ছে করে না কোথাও।

তুমি বললে, তা যেতে পারব না এখন।

জবাবটা খুবই ভাল দিয়েছিলে। আর আমার মুখে এসে গিয়েছিল, আপনার মনের মত জায়গা কোথায়? কোনো পাবলিক বার?

তারপরেই শিবেন রায় চলে গেল! যাবার সময় শুধু বলল, তা হলে যাওয়া যাক। অবশ্য পথের এ দেখাটা আকস্মিক। যখন ইচ্ছে হবে, দেখা করো।

আমি তোমার কাছে গেলাম। তুমি তখন ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছ। কী তুমি ভাবছিলে, কে জানে। তোমার গাম্ভীর্যের জন্যেই আমি আর শিবেনের বিষয় তোমাকে বলতে পারিনি। তোমার গাম্ভীর্য যখন টুটল তখন আমি লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছি।

আজ এ সব কথা লিখলাম। লিখতাম না। আমি তোমার সাহচর্যের মূল্যের কথা বলতে গিয়েই এদের কথা লিখলাম। তুলিকা, তোমার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে আমার অনেকখানি শ্রদ্ধা। আমি জানি, তোমার বন্ধুত্ব পাওয়াও দুষ্প্রাপ্য। কী একটা ঝোঁকের মাথায় তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা ক'রে একদিন একটা চিঠি দিয়ে ফেলেছিলাম। তার পরিণতি স্বরূপ, গতকাল যেন আমি একটা শীর্ষে এসে পৌঁছেছি।

তুমি নিজে একদিন বলেছিলে, তোমার বন্ধু-বান্ধবীরাই তোমাকে পুরুষঘেঁষা মেয়ে বলে। ও কথাটার মানে আমি তেমন জানি না। পুরুষ ঘেঁষা মানে কী? পুরুষদের সঙ্গে মিশতে বেশী অভ্যস্ত? না কি পুরুষের সংস্পর্শে থেকে, নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার ক'রে চলা? কোন্‌টা।

থাক্‌-সে সব কথা। তুমি কী, তা আমার নিজেকে দিয়েই তো আমি সবচেয়ে ভাল বিচার করতে পারি। পুরুষদের সঙ্গে মেশার অধিকার যদি কারুর থাকে, সে তো তোমারই আছে। শোভনাদের নেই।

তোমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে, তিনজনকেই আমার

সবচেয়ে বেশী বিশিষ্ট মনে হয়েছে। মিহিরবাবু, সারদাবাবু, শিবেন। পরে শিবেন সম্পর্কে আমার মনের কথা তোমাকে লিখেছি, তবু এটা তো স্বীকার্য যে শিবেনকে সবাই জিনায়স বলে। আমার মতে যে পারভারটেড জিনায়স।

আমি জানি না, বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে কি না। কিন্তু তোমার মধ্যে একজন মমতাময়ীকেও আমি দেখেছি। রাজনীতির সঙ্গে হয় তো তোমার কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু ভিক্ষে চেয়ে জীবনরক্ষা, তোমার মত অতটা কাউকে দেখিনি। কারণ, সময়ে সময়ে ও ধরণের ব্যাপারকে যেন তুমি তোমার ব্যক্তিগত কর্তব্য হিসেবেই গ্রহণ কর। তখন অবাক লাগে আমার।

এসব কিন্তু কোনটাই এ্যাপীজমেণ্ট নয়। গত কালের পর, আজকে এত কথা শুধু, একটি কথা বলার জন্যে। এবং সেকথা বলার আগে, তোমার জগৎ সম্পর্কে আমি যেটুকু ওয়াকিবহাল, সেটুকু জানিয়ে দেওয়া।

আজকে আমার শেষ কথা হল, তোমার ব্যক্তিত্বকে যদি কখনো কোনো কারণে, অনিচ্ছায় আহত ক'রে বসি, তবে আমাকে ক্ষমা ক'র। একেবারে ত্যাগ ক'র না।

ইতি—

সৌম্যেন।

প্রীতিময়ী

তুলিকা,

একটা কথা দিয়ে সব প্রমাণ হয় না। তুমি খালি উদাসীনের মত বললে, 'হাত ধরেছেন, তার জন্যে রাগ করব কেন?' আমি জানি, পরশুদিন তোমার কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে একদম ছিল না। আমি যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। সেই গ্রামের সেই মাঠের ধারে গিয়েই বসলাম। তোমার হাত টেনে নিলাম। তার আগে তবু যা হোক কথাবার্তা বলছিলে। হাত ধরা মাত্র তুমি কেমন যেন উদাস হয়ে গেলে। তেমন ক'রে যদি গম্ভীর হ'য়ে উঠতে, তা' হলেও তার একটা মানে বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি দেখলাম, তোমার দুই চোখ সুদূরে। একবার ফিরে তাকালে না অবাক হ'য়ে। হাসলে না, রাগ করলে না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, না কি আমার নিজেরই মনে আসছে সেই কথাটি। 'একটি মৌন স্তব্ধ উদাস বাথিত রাত্রি।' তুমি যেন তখন তেমনি একটি রাত।

তুমি কপালে পরশু একটি টিপ দিয়েছিলে। সন্ধ্যা গেছে, কিন্তু তোমার মুখের বর্ণে যেন তখনো দ্বিপ্রহর। কপালে লাল টিপ্‌টি জ্বলছিল।

তোমার স্তব্ধ উদাসীনতায়, আমি যেন কেমন বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম। তবু হাত ছাড়তে পারলাম না তোমার। বরং তোমার চিবুকে হাত দিয়ে আমি ডাকলাম। জানি না, কেন আমার পরশু এত সাহস হয়েছিল সহসা।

তুমি ফিরলে। হাসলে আমার দিকে তাকিয়ে। ও কী হাসি তুলিকা? তোমার কানে কি তখন শানাইয়ের সেই ভৈরবী বাজছিল! তার চেয়ে তুমি কাঁদলে না কেন? কেন কেঁদে, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, আমাকে কিছু বললে না? কিংবা তোমার চোখে কেন আগুন জ্বলে উঠল না? দগ্ধ হ'য়ে ফিরে আসতাম আমি।

তুমি তাকালে, কিন্তু কিছু বললে না। শুধু একটু হাসি। ও হাসি কখন আসে মানুষের, আমি জানি না।

আমি বললাম, রাগ করলে?

তুমি বললে, কেন?

—হাত ধরেছি ব'লে?

—হাত ধরেছেন, তার জন্য রাগ করব কেন?

তোমার কথার সুর শুনে, আমার হাত খুলে গেল তোমার হাত থেকে। হাত নেমে এল তোমার চিবুক থেকে।

তারপর আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। গরুর গাড়ি চলে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। কৃষাণ গাড়োয়ানটা অবাক হ'ল, তারপরে বিদ্রূপ ক'রে গালাগালি দিল বলদ দুটোকে।

তুমি হঠাৎ বলে উঠলে, আশ্চর্য!

আমি বললাম, কী?

—মানুষের মন।

স্বভাবতই আমার মুখে এল, আমার কথা বলছ তুলি?

তুমি বললে, না, নিজের কথা। আমার নিজের মন।

তারপরে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে।

অনেকক্ষণ কাঁদার পর হাসলে যেরকম দেখায়, ঠিক সেই রকম মনে হল। হাতটা বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। বললে, টেনে তুলুন, শক্তি নেই একদম গা'য়ে।

বুঝলাম না তুলিকা। লোকে এগুলোকেই হয়তো রহস্যময় মনে করে। আমি তোমার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কিছু টের পেলাম না। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। তুমি ধ'রে উঠলে। গাড়িতে উঠে বললে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার।

আমি বললাম, ঘুমোও।

তুমি পিছনের সীটে গিয়ে সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে। কলকাতায় ঢুকে তোমাকে আমি ডাকলাম। তুমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলে। চোখ কচলে বললে, কোথায়? ও! আমাকে একেবারে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসুন।

তাই দিলাম। তখন রাত্রি ন'টাও বাজেনি। তুমি সামনের সীটের ওপর মাথা রেখে আবার তন্দ্রালু হ'য়ে উঠেছিলে। গাড়ি থামার ঝাঁকুনিতে, ভাল হ'য়ে বসলে। তোমাদের দরজায় আমার গাড়ির শব্দ হ'লেই পাশের বাড়ির মেয়েরা যেমন উঁকি ঝুঁকি মেরে থাকে, সেই ভাবেই উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

তুমি আশ্চর্য মিষ্টি গলায় বললে, যাই?

কোনোদিন তো আমার অনুমতি নিয়ে নাম না। সে পাত্রীও তুমি নও। আমি বললাম, আচ্ছা।

তুমি নেমে গেলে।

তুলিকা, পরশু তুমি রাগ নি, আনন্দিতও হও নি। ও কেমন হাসি তুলিকা? সংশয়ে ভয়ে আমি প্রায় কাঁটা হয়ে আছি। মনে করেছিলাম, ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু আর তোমার কাছে কোনদিন বুঝি মুখ দেখাতে পারব না।

ইতি

সৌম্যেন।

তুলি,

কী বলব তোমাকে? মুক্তিদাত্রী? মুক্তি, মুক্তি, বড় মুক্তি বোধ করছি। আর তোমার পত্রখানি বারে, বারে পড়ছি। তুমি না ডাকলে আর আমি তোমার কাছে যেতে পারতাম না। তুমি যে লিখেছ, 'রাগ করিনি। আনন্দ করতে চেয়েছি মনে প্রাণে। কিন্তু কী এক অব্যাখ্যাত বা'র আমার মন ভার হয়ে উঠছিল। আমি কিছু অন্যায় মনে করিনি। সংসারে বন্ধুর হাত কি কখনো কলুষিত হতে পারে? না, তাকে কখনো তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি? বরং নিজেরই খারাপ লাগছিল, আপনার মনটা ভার করে দিয়ে। কিন্তু কী করব, আমার ভিতরের অসামঞ্জস্য বুঝি প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু ওভাবে আপনার কাঁটা হয়ে থাকা চলবে না। এ অভাগীর কপালে যেন বন্ধু বিচ্ছেদের কালিমা না লাগে। আমার দোষে যদি আপনার গ্লানি উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে ক্ষমা চাই। আগামী শনিবার আমি আর আপনি, ম্যান্‌হ্যাটান্ স্যুপার-ম্যান ছবি দেখতে যাব। বেলা পাঁচটায় অপেক্ষা করব গোলপার্কের কাছে।'

তোমার চিঠি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। আসব, আসব, নিশ্চয় আসব। অন্তরের সব কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিই তোমাকে।

ইতি—

বন্ধু-গর্বিত

সৌম্যেন।

তুলি।

বিদেশ যাত্রার আর দেরী নেই। আগামী মাসেই যেতে হবে। বেশী দিন নয়, দেড় বছরের জন্য। প্রধানত, দুই পৃথিবী পরিক্রমার ব্যাপার। আমেরিকা ও সমাজ-তান্ত্রিক দেশ। উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। বাইরের পৃথিবীতে কোনো কোনো বিষয়ে তো আমাদের অনেক কথা না শিখে উপায় নেই।

তুলিকা, কলমের যদি গলার স্বর থাকত, তা হ'লে এবার আমার কথা রুদ্ধশ্বাস, চাপা চাপা শুনতে পেতে তুমি। তুলিকা, তোমাকে আহ্বান করি। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে? ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রথাটুকু সেরে নিয়ে! তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আমার বাবার দিক থেকে কোনো আপত্তি হবে না। তোমার বাবা মায়ের আপত্তি নাও হ'তে পারে। তোমার মালিক যে, তার কাছেই আমার প্রার্থনা। তুলি, যদি বল তুমি বন্ধু, তবে বলি, আগামী দেড় বছর বন্ধুকে ছেড়ে থাকাও আমার দায়।

আমার হাত কাঁপছে। পত্রের বাচনিক নিশ্চয় তোমার কাছে খুবই পরিষ্কার। শুধু একটি জবাবের প্রতীক্ষা।—

সৌম্যেন।

প্রীতিনিলয়াসু,

তোমার পত্র পেলাম। এই যদি তোমার শেষ চিঠি হয়, এবারই তুমি আমাকে, 'তুমি' করে লিখলে। তোমার

পত্রের উদ্ধৃতি একটু তোমাকে দিই। কারণ, আজ আর আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। তুমি লিখেছ, 'প্রিয় সৌমোন, তোমার মধুর ব্যবহারের তুলনা নেই। তোমার বন্ধুত্ব কখনো হারাতে চাইনে। আজ তোমায় একটি সত্যি কথা বলব। আমি একটি সংশয়ে ভুগছি অনেকদিন ধরে। সেই গানটার মতোই বলতে ইচ্ছা করে 'এ নিরন্তর সংশয়ে হায় পারিনে যুঝিতে।'... কিন্তু আশ্চর্য! সে সংশয়টাই আমার ব্যথা হয়ে উঠেছে। কারণ, এ সংশয়টাকেই আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, একে নিয়েই আমি এখন হাসি কাঁদি, কল্পনা করি। আমার একুশ বছরের জীবনে, এ ব্যাপারটা এত নিষ্ঠুর। মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। সৌমোন, এ সংশয় আমি পার হ'তে চাই। উত্তীর্ণ হতে চাই। এর বেশী আর কিছু লিখতে পারছি না। তুমি ঘুরে এস, এ মুখপুড়িকে ক্ষমা করো।... তুমি কখন কোন্ সময়ে দমদম এয়ারপোর্টে যাচ্ছ, জানাওনি। কালকেই জানিও। আমি দেখা করতে যাব।'

না, তুলিকা, তুমি দমদম এয়ারপোর্টে এস না। সেটা বড় নির্মম হবে। আমি রাগ করি নি। চাইতেও পারি নি। বোধহয় সেই সানাইয়ের ভৈরবী আজ আমারও কানে বাজছে। তুলিকা, সংসারের সবটাই অঙ্ক নয়। তোমাকে দোষ দেব কেমন করে? আমি জানি, জীবনটা তোমার কাছে সবচেয়ে সহজে পাওয়া, এক কিস্তিতেই মাৎ করে ফেলার মত নয়। তা যদি হত, তা হলে সৌমোন মুখার্জিকে তুমি হেলাফেলা করতে না। সেইজন্য তোমার সাহসের কাছে আমি চিরঋণী। ফিরে এসে যদি দেখতে চাই, দেখা দিও। আমি জানি, তোমার বন্ধুত্ব আমি হারাই নি। হারাব না।

আজ আমার এইখানেই ইতি।— সৌমোন।

প্রীতিভাজনীয়াসু,

দেড় বছর পরে ফিরে এসেছি আজ সাতদিন শোভনার মুখে শুনলাম, তুমি কলকাতাতেই আছ। জানি না, সে-সংশয়টা উত্তীর্ণ হতে পেরেছ কি না। অন্তত, সামাজিক ভাবে যে পারনি, সেটা তো সবাই জানে। একদিন এস। ইতি—

সৌমোন।

তুলি,

সেদিন তোমাকে দেখে অবাক হলাম। চেহারার তেমন বাড়নি। কিন্তু কোথায় যেন ভিতরে ভিতরে আরো অনেক বড় হয়ে গেছ। তবে, স্বাস্থ্যটা একটু খারাপ দেখলাম। হাসিটাও যেন কেমন। কেন? দু' একদিনের মধ্যেই বোম্বাই যাব একটু। ফিরে আসার পর দেখা হবে। প্রায় মাসখানেক।

আচ্ছা, তোমার বন্ধুদের খবরে এত নীরব হলে কেন? ভয়ে আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেই পারি না।—

— সৌমোন।

তুলিকা।

গত তিনমাস তোমার দেখা নেই। কারণ জানবার জন্য ব্যগ্র। বড় ব্যস্ত। তার মধ্যেও তোমার কথা মনে পড়েই।—সৌমোন।

॥ তৃতীয় হাত ॥

কল্যাণীয়াসু,

সেদিন তোমার বক্তৃতা শুনে বিস্মিত হয়েছি। প্রথমটা ভেবেছিলাম, তুমি লেখা কাগজ দেখে তোমার বক্তৃতা পড়ছ। কিন্তু তা নয়। অভূতপূর্ব। আশ্চর্য! ছাত্রদের রাজনীতিতে প্রায় বিশ্বাস হারাতেই বসেছিলাম গত কয়েক বছর ধরে। ছাত্রদের অমন চিন্তাশীল ওজস্বিনী ভাষায় কথা বলতে শুনিনি দীর্ঘকাল। যদিও ভারতবর্ষের ওই সব চটপটি বক্তাদের কথায় আমার একদম বিশ্বাস নেই। ওরা যে বলে, 'ছাত্ররা রাজনীতি থেকে দূরে থাকুক' সেটা একটা চালাকি। ছাত্রদের ধরে যারা নিজেরাই রাজনীতিতে নামাচ্ছে তাদের নিজেদের কৌশলে ও নীতিতে, তাদের ওসব ধাপ্পাবাজীতে আমি ভুলি না। ছোটদের কথা নিশ্চয়ই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু যুবক-যুবতী ছাত্র ছাত্রীদের কেমন করে রাজনীতিতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া যায়; আমার বুদ্ধির অগম্য। এ কথাগুলি যারা বলে, তারা নিজেদের কী ভাবে, জানি না। তবে, এরা রাজনীতিজ্ঞ বলতে বোধহয় বোঝাতে চায়, উইনষ্টন্ চার্চিল, চেম্বারলেন কিংবা এই জাতীয় ব্যক্তিদের।

দেশপ্রেমটা এদের কাছে কিছু নয়। কেবিনেট-রাজনীতি করে এরা রাতারাতি ভোল বদলাল। বিলাত ফেরৎ না হলে আর এরা কাউকে রাজনীতিক বলবে না।

সে সব কথা বলব না। তোমার বক্তৃতা সেদিন অপূর্ব হয়েছে। ভেবেছিলাম, শুধু এ্যাজিটেশন হবে। তা নয়, অনেক যুক্তি তর্ক দেখিয়েছ তুমি। বেশ! খুব ভাল।

শুধু তাই কেন? আমার রাজনৈতিক জীবন যদিও খুব অল্পদিনের, মাত্র উনিশ বছরের, তবু তোমার দৃপ্তময়ী মূর্তি।' তীক্ষ্ণ শ্লেষ, তীব্র আক্রমণ এবং অকাট্য যুক্তি, সব মিলিয়ে তোমার মধ্যে যেন একটি নতুন দিগন্ত দেখতে

(৩৮৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হৃষীকেশ ট্যাকসিতে উঠে বসল ঠেস দিয়ে। ভালো করে চেপে বসতেই কি যেন খোঁচা মারল তার পিঠে।

পিঠ ঘিরিয়ে দেখল এক ভ্যানিটি ব্যাগ।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে পরখ করলো সে সাগ্রহে। সাদা আইভরির ব্যাগ—বেশী দামী বলেই বোধ হয়।

ড্রাইভারের মাথার দিকে তাকালো একবার। না, না, এধারে তার দৃষ্টি নেই। আস্তে আস্তে খুলল সে ব্যাগের মুখ। যা আশা করেছিল তাই। মেয়েদের টুকিটাকি জিনিস—সেই সঙ্গে খাটো রেশমী রুমাল একখানা। আর রুমালের গায়ে আশ্চর্য খোসবাই।

দামী এসেন্স যে সে বিষয়ে ভুল নেই। আর রুমালের অধিকারিণী যে বেশ খোসমেজাজী তাও বেশ বোঝা যায়।

রুমালের কোণে ফুল তোলা একটি অক্ষর 'র'। অক্ষরটি তার মনে আঁচড় কাটল। এই রঙীন বর্ণটির যেন অবর্ণনীয় ইসারা। রহস্যের আঁচ লেগে যেন সে। রোমাঞ্চের ছোঁয়াচ। এই একাক্ষর থেকেই হৃষীকেশ বুঝে নিলো মেয়েটি রূপসী। তার চোখ কালো আর আয়ত। চুল কালো ও বটেই, আয়ত হয়তো কিন্তু আয়তনে পিঠ কি কোমর অব্দি তা ধরা কঠিন আগুলফ চুম্বিত চুলের দিন তো নেই আর। চিবুক দেখা যায় না। আর গায়ের রং? টকটকে। মুখ হাসি হাসি। ঠোঁট টুকটুকে—চাউনি—ভারী মিঠে।

প্রহ্লাদ যেমন 'ক' থেকেই কৃষ্ণকে টের পেয়েছিল তেমনি শুধু এই র—মেটেরিয়াল থেকেই হৃষীকেশ ধরতে পারলো, মালিক খালি রমনীই নয়, রমনীয়ও।

আরো ছিল সেই ব্যাগে একটা পাঁচ টাকার নোট গোটাকয়েক সিকি, দুয়ানি, খুচরো পয়সা কিছু আর এক লেটার প্যাড—ছোট কিন্তু চমৎকার।

আর প্যাডের ভেতরে একটি পাতায় এই কা কথা আঁচড়ানো।

ভক্তিংকে কোন্
অমিতাকেও
পয়লার দোকান
মার্কেটিং।
সন্ধ্যের সিনেমা—কার সঙ্গে?

এই কটি কথা—জিজ্ঞাসার চিহ্ন সমাপ্ত। কিন্তু এ দিয়ে প্রশ্ন হলেও এই প্রশ্নের কি শেষ আছে! হৃষীকে

জিজ্ঞেস করল আপনাকে। এইখানেই কি থাকেন ?

জিজ্ঞাসাবাদে জবাব পেলো, না হে, মানে এই ব্যাগ তাকে এটা ফিরিয়ে দিতে হবে। ব্যাগের মালিকের কাছে স্বয়ং গিয়ে এবং এক্ষুনি সটান ড্রাইভারকে সে চৌরঙ্গী টেরেসের দিকে হাঁকাতে বলল :

বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাঁক পাড়তেই কি এল বেরিয়ে ছিমছাম, ফিটফাট, ছুটছুটে।

হৃষীকেশ তাকে উদ্দেশ্য জানালো আগমনের।

কি গিন্নীকে খবর দিয়ে ফিরে এসে ভেতরে নিয়ে গেল তাকে। হৃষীকেশ ড্রয়িংরুমে গিয়ে দাঁড়াতেই বেরিয়ে এলেন রেবা মিত্তির।

হ্যাঁ, রূপসীই বটে রেবা। বয়সও বেশী নয়। কিন্তু ও কি ? সিঁথের সিঁদুর যে ?

'আপনিই হৃষীকেশবাবু ?' শুধালো রেবা : "বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন ?" বসলো ওরা দুজনেই।

'আমি—আমি চললাম ' আগমনের কারণ কিভাবে সুষ্ঠু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ভাবে সে, আগাতে বাধা পায়। কয়েকক্ষণের মধ্যেটা টাকসিতে বসে এতক্ষণ মামুলীর মতো মুখস্থ করলেও, মহলে এসে পৌঁছুবার পর সম্মুখে আসে না। আমতা আমতা আমতা করতে হয়—"আমি—মানে, রেবা দেবী, আপনার এই ব্যাগটা আমি টা ক্সিতে পেয়েছি, এবং···এই ব্যাগটা·· মানে···"

"মানে বুঝেছি। এই ব্যাগটা পেয়ে আপনি বেশ একটু বিচলিত হয়েছিলেন ?" হাসতে হাসতে বললো রেবা : 'তাই না ? এমন একটি ব্যাগ যার সে না জানি দেখতে কেমন! তাঁকে না দেখে আপনি থাকতে পারলেন না ? এই তো ?"

"তা—তা যে একবারেই নয় তা বলিনে।" হৃষীকেশও হাসলো—"তাছাড়া ব্যাগ হারিয়ে আপনি হয়তো একটু অসুবিধায় পড়েছেন এ ভেবেও···"

"আপনার ব্যগ্রতার জন্য ধন্যবাদ! সত্যিই ব্যাগটা খোয়া গিয়ে একটু যে ভাবিত হইনি তা নয়।" সায় দিলো রেবা।

'আমারো ভাবনা হয়েছিল। তাবলাম যে ভাগ্যক্রমে' আবার সে মুস্কিলে পড়ে, ভাষার অভাবে···(কিম্বা ভাবের অভাবও হতে পারে) তালগোল পাকিয়ে ভাবতে থাকে—"ভাবলাম যে·· কিন্তু কি যে সে ভাবছিল কোনো ভাবেই বলতে পারে না। তাপ্রক্রমে পাওয়া ব্যাগটাকে বগলে করে ব্যগ্রতার ধারা সৌভাগ্য ক্রমটা কতদূর অব্দি গড়ানো যায়—সেই কথাই কি ?"

রেবার মুখ সত্যিই হাসি হাসি, তার গোড়াকার আন্দাজে ভুল নেই এতটুকুও। তবে তার চাউনিতে মধু যেমন হলও কি তেমনি—যেমন বাঁধে তেমনি বুঝি বেঁধেও ?

"ভাববেন—তার আশ্চর্য কী ? মেয়েদের কিছু হাতে পেলেই ছেলেরা ভাবে। এটা ছেলেদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক।" রেবা বলে আর হাসে।

"কেন বলুন তো ?" অবাক হয়ে যায় হৃষীকেশ। সেও হাসে—বোকার মতন হাসি।

"ওটা স্বভাব। মেয়েরা যেমন আড়ি পাতে, পাততে ভালবাসে, ছেলেরা তেমনি ভাবে পাতাতে চায়।"

"তাই হবে হয়তো।" হৃষীকেশ ঘাড় নাড়ে।—হলে আমি এখন—"

"না। বসুন" হৃষীকেশের উঠি উঠি চেষ্টার মূলেই রেবা তাকে বসিয়ে দেয়। চৈতন্যলাভ করে অড় ভাবটা সে কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মূলোৎপাটন করে রেবা তাকে চেয়ারের সংগে জড়িয়ে রাখে। আরো সে জড়ীভূত হয়ে পড়ে।

"আলাপ ভালো করে না জমতেই পালাবেন, সে কী ! আপনি নিশ্চয় এইটুকুর জন্যেই এতদূর কষ্ট করে আসেন নি ?" রেবার চাউনিতে বেশ উসকানি : "জানেন নিশ্চয় যে আপনাকে চা না খাইয়ে আমি ছাড়বো না ?"

"চা ? না, চা থাক—ধন্য নিতে হয় হৃষীকেশকে। কৌতুকের সংগে মিশ খেয়ে রেবার মিষ্টতা যেন উথলে উঠেছে আরো।"

"না, এবার আমি উঠি। আমার কাজ চুকে গেছে। আর এখানে বসে থাকা হয়ত আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা—"

"আপনি তাহলে কোনো পুরস্কার না নিয়েই চলে যাবেন ?" হৃষীকেশকে রেবা একটু ধম দেয়। নতুন উদ্যম দিতে চায়।

হৃষীকেশের কী যেন হয় : তবে হৃদয়স্থিত 'ঘয়া

হৃষীকেশই' চাগাড় দিয়ে উঠে কিনা কে জানে কী বলে, কী করে কিছুই তার দিকে থাকে না। সবই যেন তার গুলিয়ে যায় কেমন। 'পুরস্কার?'

পুরস্কারের কথা বলছেন?

"হ্যাঁ কি চান বলুন।"

রেবার হাসির মাদকতা যেন ওকে মাতাল করে। আকাশ-পাতাল কিছুই তার ঠিক থাকে না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলে—

"এখন সবে চারটে। যদি পুরস্কারের কথাই তুললেন; তাহলে দয়া করে আজ ছটার সোয়ে আপনার সঙ্গদানে করুন—সেই হবে আমার পুরস্কার।"

কথাটা বুঝি ভালো বলে হৃষীকেশ। নিজের কানেই টের পায়। বেশ গুছিয়েই বলতে পেরেছে সে। ঈষৎ হাসির সংগে মিলিয়েই। "আপনার সংগে সিনেমা দেখতে আমার বাধা নেই—" কিন্তু তার আগে যে আমার···গয়নার দোকানে একটু কাজ ছিলো····· মার্কেটিংটা না হয় বাদই দিলুম, কিন্তু জুয়েলার্স—সেখানে না গেলে·····" আপন মনেই আওড়ায় রেবা।

"তা গয়নার দোকানে কি আমি যেতে পারিনে আপনার সংগে? ওখানের কাজ সেরেই না হয় আমরা·····?

"হ্যাঁ তাহলে হয় বটে। তবে চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক এখুনিই।"

রেবা সজ্জিতই ছিলো, বাইরে যাবার জন্যে তৈরীই ছিলো যেন, শুধু জুতো জোড়াটা বদলে নিলেই হয়। ঘরোয়া স্যাণ্ডেল পালটে নিয়ে SHOE সজ্জিতা হয়েই সে বেরিয়ে পড়লো হৃষীকেশের সাথে।

গয়নার দোকানে একজোড়া দুল কিনলো রেবা—দেড়শো টাকা দামের। দাম দিতে গিয়ে ব্যাগ খুলতেই দেখতে পেলো যে, তাতে আছে খালি একটা পাঁচ টাকার নোট, খুচরো কিছু পয়সা, আর কয়েকটা সিকি দুয়ানি।

"ওমা! এতে যে কিছু নেই। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে টাকা নিতে ভুলে গেছি ব্যাগে।"

"তাতে কি হয়েছে? আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি না হয়," হৃষীকেশ বলে: "আমার কাছে তো আছে"।

তখনি সে টাকা দিয়ে বেরিয়ে ছিলো। হৃষীকেশ নিজের Ca-c আকর্ষণ করে হৃষিতচিত্তেই। নোট কখানা সংগে নেয়েছিল বলে নিজেকে সে ধন্যবাদ জানায়।

দুল কেনা হলে রেবা বলে—"তাহলে চলুন, বাড়ী যাওয়া যাক এখন। আপনাকে আগে টাকাটা দিয়ে তারপর···

"তারপর কী আর সময় থাকবে? ছটা বেজে যাবে যে? টাকা না হয় পরে দেবেন আর কদিন নেবে না হয়। তার কী হয়েছে"?

তা কি হয়? না, চলুন। সন্ধ্যের খাওয়াটা আমাদের ওখানে সেরে তারপর রাত নটা শোয়েই দেখা যাবে সিনেমা।'

"নটার শোয়ে"? হৃষীকেশের মাথা ঘুরতে থাকে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? সেই কাঁদি, মেঘ না চাইতেই জলের মতন, মাথায় পড়লে যা হয় মানুষের! অকারণ পুলকে কাঁদিয়ে দেয়।

ধাক্কাটা সামলে সে বলে—"রাত নটার শোয়ে; কিন্তু···কিন্তু···কিন্তু কিন্তু করেই মনের ভাবটা সে ব্যক্ত করতে যায়। রেবা মিত্রকে নিয়ে না হয় নটাতেই! সে চিত্রগৃহে গেল, কিন্তু তার নিজ গৃহে (তার নিজের নয়, রেবার) আরো ত মিত্রপক্ষ রয়েছে, তারা··?"

.....“কিন্তু মিষ্টার মিত্র”? শব্দগুলোর কথাটা সে না ভুলে পারে না।

“ও আমার স্বামী? তাঁর পাইলটের কাজ। তিনি ডিউটিতে গেছেন আজকে, ফিরতে সেই পরশু। তার নেই আপনার কোনো।” ভরসা দেয় রেবা।

তবে আর রেবা নদীর বুকে ঝাঁপ দেবার বাধাও কি? কে-বা না দেয়। এই অকূলে ডুবতে গিয়ে দেড়শো টাকাও জলে যদি যায়, তাতেই বা কী যায় আসে? এখেন জলাঞ্জলিতে কোনো আলা নেই হৃষীকেশের।

“যথা হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।” গীতার ভাবে গদগদ হৃষীকেশ ফিরে এলো কুরুক্ষেত্রে। চৌরঙ্গী টেরেসেই যায়।

কুরুক্ষেত্রেই বটে। আদতেই সেই ঝিটি এগিয়ে এসে জানালে—“গিন্নীমা! কর্তা কোন করছিলেন একটু আগে। আজকের ডিউটি তাঁর বাতিল হয়ে গেছে। তিনি বাড়ী আসছেন এক্ষুনি।”

“অ্যাঁ!” আৎকে উঠল রেবা—“কী সর্বনাশ তাহলে কী হবে?”

সর্বনাশ বলতে! পাশ দিয়ে যে গাড়ী যায় তার আওয়াজই যেন হৃষীকেশের বুকে বাজ হানে। মটরের হর্ণ যেন তাকেই এসে গুঁতিয়ে দেয়। চোখে কানে ভোঁ ভোঁ লাগে।

“তাহলে—তাহলে আমি এখন”—সে বলতে যায়।

“হাঁ এখুনি। উনি যা যমদোজাী, আপনাকে এখানে দেখলে আর রক্ষে থাকবে না।”

“আমি—আমি তাহলে আসি।” হৃষীকেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

রেবা বলে: কাল যদি ওঁর ডিউটি পড়ে তাহলে আপনি অবশ্য আসবেন। সেই দিনই আমাদের সিনেমা-টিনেমা আপনার টাকাটাও সেইদিনই···কেমন···?”

টাকার জন্য হৃষীকেশ দাঁড়ায় না মোটেই। ফাঁকায় এসে হাঁপ ছাড়ে।

ধাক্কা সামলাতেই তার দিন করেক যায়। তারপর একদিন বিকেলে আবার সে ট্যাকসিতে চাপে। কুরুক্ষেত্রের ফাঁড়া কি কাটেনি এত দিনেও? যদি কেটে গিয়ে থাকে, তাহলে আর সেখানে যাবার বাধা কী? কুরুক্ষেত্রের পরেই না বৈবতক? সেদিনের মত এলম্যানেড থেকেই সে ট্যাকসি ধরে—বোধে ক্রাউনের লাঞ্চ সেরেই। রেবার ফ্লেস পেতে চৌরঙ্গী টেরেসের দিকে ধাওয়া করে। কিন্তু ভালো করে ঠেসান্ দিতেই তার পিঠে যেন খোঁচ লাগে কিসের। ফিরে তাকাতেই কুশনের কোণে একটা ভ্যানিটি ব্যাগের মুখ উঁকি মারে। ব্যাগটি হাতে পেয়ে সে বিচলিত হল কিনা বলা কঠিন। সাদা আইভরি ব্যাগ—বেশ দামী। যন্ত্রচালিতের মতই সে মুখ খোলে ব্যাগের। খুলতেই একটি রেশমি রুমাল বেরয়, ছোট্ট, পরিষ্কার। আর তার এক কোণায় লেখা একমাত্র অক্ষর—র। আর সেই র-এর অনুসরে ক্রমে ক্রমে দেখা দেয়, একটা পাঁচ টাকার নোট, গোটাকতক পয়সা, কিছু রেজকি। ক্রমে পরম্পরা উন্মুক্ত হতে থাকে; কিন্তু তার বিস্ময় জাগে না একটুও। এর সমস্তটাই যেন সম্ভাবিত প্রত্যাশিত। এমনটাই যেন হবে। কিছুই যেন এর অভাবিত নয়।

ব্যাগের থেকে আশ্চর্য সুরভি এসে তার নাকে লাগে। কিন্তু তার ব্যগ্রতা জাগায় না একটুও। আদৌ সে ব্যস্ত হয় না; আস্তে আস্তে সেই প্যাডটিকেই সে বার করে। মেয়েলি ছাঁদের সেই লেখাগুলিও দেখা দেয় একে একে—

তড়িৎকে ফোন
অমিতাকেও
গয়নার দোকান
মার্কেটিং
সন্ধ্যায় সিনেমা—কার সাথে?

সেই তড়িৎকে ফোন···! সে চোখ বুলিয়ে যায় আরেকবার। দেখতে দেখতে ঝাপসা দৃষ্টি খুলে যায় যেন হৃষীকেশের। এমন তড়িৎ গতিতে ছোটার কি কোনো মানে হয় আর? প্রয়োজন কি আছে? এখনো? ভাবে সে। ভালো করে ভাবে। তার পরে আর ভাবে না। ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে যায়। চৌরঙ্গী টেরেসের মোড়েই।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সে হাঁফ ছাড়ে। এলগিন রোডের মোড়ে এসে যেন নতুন করে সে বেঁচে ওঠে।

চৌরঙ্গী টেরেসের টের থেকে একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। কোথায় বন্যার্তদের জন্যে চাঁদা আদায় করতে বেরিয়েছিল যুবকেরা। বেকার যুবকের দল। দেখলে মনে হয় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত। বন্যাদায়ের ছুতো করে এই যে পয়সা আদায়, এ যদি বন্যায় না গিয়ে অন্য দায়ে হয়, এই ক্ষুধার্তদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি তা অন্যায় বলতে পারে?

এমনি শোভাযাত্রা করেই বুঝি তার মনে সাড়া বেঁধে দেখা দিতে থাকে—ভ্যানিটি ব্যাগ, রুমাল, অগুরু সুরভি, পাঁচ টাকার নোট, রাইটিং প্যাড, তড়িৎকে ফোন··· একই পথ ধরে চলেছে দুদল শোভাযাত্রী। কী দাম দিয়ে যে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় এই পৃথিবীতে।

ব্যাগটিকে সে তেমনি করেই রেখে দিয়েছে যথাস্থানে, কুশনের সেই পীঠস্থানেই, যেমনটি ছিলো।

[১]

মেঘদূতের সমস্যা

ডাঃ সুকুমার সেন

কালিদাসের মেঘদূত সংস্কৃত সাহিত্যে সব চেয়ে অভিনব কাব্য, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছাড়া। আধুনিক কালে যাঁরা মেঘদূত নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তাঁদের কাছে কয়েকটি সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। তারই দুই একটি এখানে আলোচনা করছি।

প্রথম সমস্যা মেঘদূতের আকর বা আদর্শ নিয়ে।

অনেকে মনে করেন মেঘদূতের বিষয় কালিদাস রামায়ণ থেকে পেয়েছেন। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ঋতুতে মাল্যবান পর্বতের শিখরে প্রস্রবণ গিরিগুহায় বিরহী রামের বর্ষাযাপনের বর্ণনা আছে। সুন্দর কাণ্ডে রামের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় নিয়ে লঙ্কায় হনুমানের সীতা-সন্দর্শন কাহিনী আছে।

লঙ্কায় পৌঁছে খোঁজ করে সীতার দর্শন পেয়ে হনুমান সীতাকে অভিজ্ঞান আংটি দেখিয়ে এই কথা বলেছিল, "দেবী আমি রামের দূত, তিনি কুশলে আছেন··· আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন"। কালিদাস মেঘদূতে এ কাহিনীর স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। যক্ষ মেঘকে বলছে, তুমি নিজের পরিচয় দিলেই বিরহিনী

> এই পর্যন্ত অভিহিত হলে মৈথিলী যেমন পবনতনয়কে দেখে হয়েছিলেন তেমনি সেও উচ্ছ্বসিত হৃদয় হয়ে (তোমাকে) অভ্যর্থনা জানিয়ে তারপর অত্যন্ত অবহিত হয়ে শুনবে।···

কালিদাসের কাব্যে রামায়ণ কাহিনীর প্রতিচ্ছায়া অত্যন্ত ব্যাপ্ত। রামের দূত চারদিকে খুঁজে বেড়িয়ে তবে ঠিকানা পেয়েছে, যক্ষের সুহৃৎ ভাগ্যক্রমে ম্যাপ জোড়াতেই পেয়েছিল তাই ঠিকানায় পৌঁছতে তার দেরী হয় নি। হনুমান দূত, তাকে শত্রুপুরীতে মিত্রের খোঁজ নিয়ে তৎক্ষণে ফিরে আসতে হবে। আর মেঘ? সে উধাও পথিক, এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে চলেছে। তাকে দেখে যক্ষের খেয়াল হয়েছিল যে সে যখন তার বাড়ির দিকেই—উত্তর মুখে—চলেছে তখন তাকে দিয়ে একটু খবর পাঠিয়ে দিই। সেকালের পথিককে ডাকের বেয়ার কাজ করতেই হত।

সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার দে সম্পাদিত মেঘদূতের সাধারণ ভূমিকার এক পাদটীকায় শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যা লিখেছেন বাংলায় অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়,

> মেঘকে বার্তাবহ কল্পনা চীনদেশের একটি প্রাচীন খ্রীষ্টপূর্ব কবিকল্পনা। চীনা কবি ক্ষু য়ুয়ান (বা চিউ য়ুয়ান), যাঁর মৃত্যু ২৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, তাঁর রচনায় এ কল্পনা পাই। হুতকান্ কাব্যে মেঘদূতের এই প্রতিধ্বনি তুলনীয়ঃ
>
> ওগো উপর আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘ, তোমার পাখায় করে নিয়ে পৌঁছে দাও এই কথাগুলি তাঁর কাছে যাকে আমি ভালবাসি।
>
> —এইচ. এ. জাইলসের চীনীয় সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ১১৯।

চীনা কবিতায় বার্তাবহ মেঘের এই উল্লেখ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে অনেককাল আগেই শুনেছিলুম।

কালিদাসের চীনা সাহিত্য পড়া ছিল এ কল্পনা উদ্ভট। তবে কোন চীনা পর্যটকের কাছে তিনি চীনা কবিতার স্বাদ পেয়ে থাকবেন, এ কল্পনা আর যাই হোক উদ্ভট নয়। কিন্তু চীনা কবিতার কল্পনাটুকুর সঙ্গে কালিদাসের কল্পনার মিল লেনদেনের কারবার নয়, আকস্মিক সংঘটনও নয়। এ কল্পনা মানব সাধারণের ভাবনা যা চীনা কবিতায় আর কালিদাসের কাব্যে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে গৃহীত হয়েছে। কালিদাস যদি কোথাও থেকে কল্পনার ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন তবে তা তাঁর সময়ের লোকগীতি।

ঋগ্বেদের কবিতায় যাকে পর্জন্যের দূত বলা হয়েছে

আসন্ন বর্ষার সেই মেঘখণ্ডকে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে যাবার পথে কাছের পর্বতমালাতে সংশ্লিষ্ট দেখে বিরহী যক্ষ তার প্রিয়াকে আশ্বাসবার্তা পাঠাবার ভরসা পেয়েছিল। বাংলা ছেলে ভুলোনো ছড়াতে যেমন পাই,

"আম কাঁঠালের বাগান-দিলুম
ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম
পথে জল খেতে।"

মেঘদূতেও তেমনি যক্ষ মেঘকে পথে বিরামের ও আরামের জন্য ভালো ভালো স্থানের ও আশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছে। যেমন,

উত্তরদিকের যাত্রী তোমার পক্ষে যদিও একটু ঘুর পথ হবে, তবুও তুমি যেন উজ্জয়িনীর সৌধমালার আলিঙ্গন লাভে বিমুখ হয়ো না। (তোমার) বিদ্যুল্লিচ্ছটায় মণ্ডিত বিলোলনেত্রের কটাক্ষের রস যদি না পাও তবে তুমি ঠকবে॥

জানালা দিয়ে বার হওয়া চুল শুখাবার ধূপের ধোঁয়ায় তোমার দেহে পুষ্ট হবে। বাড়ির পোষা ময়ূররা বন্ধুপ্রীতি-ভরে তোমাকে নৃত্য-উপহার দেবে। সেখানকার কুসুম সুরভিত এবং সুন্দরী মেয়েদের আলতার ছাপ লাগা প্রাসাদে প্রাসাদে রাত্রি যাপন করে তুমি পথক্লান্তি দূর করো।

॥ ২ ॥

কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত—কালিদাসের এই তিনটি কাব্যের দেশ যথাক্রমে দেবভূমি (হিমালয়), মানবভূমি (ভারতবর্ষ), এবং দেবভূমি ও মানবভূমি। কুমারসম্ভবে সবই দেবভূমিকা, সুতরাং সেখানে কালিদাস দেশবর্ণনা বা স্থানবর্ণনার কোন অবকাশ পান নি। রঘুবংশে সবই মানবভূমিকা, এবং সে ভূমিকার একজন দিগ্‌বিজয় করেছিল। সেই উপলক্ষ্যে কালিদাস ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলের এবং ভারত সীমান্তের বাইরের কোন কোন স্থানের চুম্বিত-লোভনীয় বর্ণনা দিয়েছেন। মেঘদূতের নায়ক-নায়িকা "যক্ষ"-জাতীয় হলেও কালিদাস তাদের মানবের মত করেই এঁকেছেন। এর তৃতীয় ভূমিকা মেঘ আকাশের দেব হলেও সে সাধারণ পথ-মানবের মতই দুঃখসুখভোগী—পথশ্রমে ক্লান্তি আসে, বিশ্রাম নিতে হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাতে হয়, নারীসংগ মন্দ লাগে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকখানি মানবভূমি অতিক্রম করে তবে পথিক মেঘ দেবভূমির গন্তব্য ঠিকানায় পৌঁছেছিল। মেঘ-পথিকের অতিক্রান্ত মানবভূমির বর্ণনাই মেঘদূতের বৃহত্তর খণ্ড। রঘুবংশে এ ভূখণ্ডের শুধু আউটলাইন ডিওগ্রাফিটুকু আছে।

নায়ক যক্ষ একাকী রয়েছে রামগিরির উপরে এক আশ্রমখণ্ডে। যক্ষের বাসস্থান গুহা হতে পারে কুটীর হতে পারে। রামগিরি বিন্ধ্যপর্বতমালার দক্ষিণে কোন স্থানে, তবে বেশী দূরে নয়। যক্ষরাজ ধনপতির (অর্থাৎ কুবেরের) অনুচর—কর্মচারী ছিল সে। কর্তব্য কর্মে গাফিলতির জন্যে প্রভু তাকে এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিল। মেয়াদের আটমাস কেটে গিয়ে সেদিন আষাঢ় পড়ল সেদিন আকাশে জলভরা মেঘ একখণ্ড দেখা দিলে। সেই মেঘখণ্ডকে উদ্দেশ করে যক্ষ যা বলেছিল তার বেশী মেঘদূত কাব্যে বড় কিছু নেই।

এখন যাকে গীতিকবিতা বলা হয় ঠিক সে বস্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। তবে মেঘদূত আধুনিক গীতিকাব্যের কাছাকাছি পৌঁছয়। গীতিকাব্যের মুখ্য উপাদান কবির অনুভব। সেভাবে দেখলে মেঘদূতের যক্ষ কালিদাস নিজেই। মেঘদূত কালিদাসের অনুভবের সূক্ষ্মতা ও বিশালতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে যক্ষ শুধু কালিদাসের নয় নিখিল মানব চিত্তের নিগূঢ় বিরহ-বেদনার মূর্তি। সেকালের কোন কোন বিদগ্ধ লেখক সত্যসত্যই যক্ষকে কালিদাসের বেনামদার ভেবেছিলেন। প্রায় আটশ বছর আগে দক্ষিণ ভারতের এক কবি কাককে দূত করে এক কাব্য লিখেছিলেন। তাতে এক শ্লোকে ইংগিত করেছেন যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ভগিনীর প্রেমে পড়েছিলেন। ব্যাপার জানতে পেরে রাজা কালিদাসকে রামগিরিতে নির্বাসন দেন। সেখানে থেকে কালিদাস রাজভগিনীকে চিন্তা করেই মেঘদূত রচনা করেছিল। বলাবাহুল্য এ নিছক গল্প।

মেঘদূত নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই মেঘের যাত্রাপথের আলোচনা করেছেন এবং আধুনিক কালের নাম দিয়ে যথাসম্ভব চিহ্নিত করেছেন।

আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে কোন কোন শ্লোকে আমার নিজস্ব অভিমত আছে বলে খুব সংক্ষেপে কিছু বলছি।

যক্ষ মেঘকে অনুনয় ক'রে বলছে, আমার বার্তাটি প্রিয়ার কাছে পৌঁছে দিতে যেতে হবে তোমাকে ধনী যক্ষদের ("যক্ষেশ্বরাণাং") বসতি অলকায়। সে অলকা "যাহোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা"। দীর্ঘ সমাস পদটির অনুবাদ সহজ,—বাহির-উদ্যানে স্থিত হরশিরের জ্যোৎস্নায় যার (=যে বসতির) প্রাসাদগুলি স্নাত। কিন্তু মানে হয় কী? অলকা-নগরী-সীমান্তের বাগানে কি শিব সর্বদা খাড়া হয়ে পাহারা দিতেন? না কৈলাস ছিল অলকা-নগরোপকণ্ঠস্থিত ক্রীড়াশৈলের মত? না এখানে উদ্যান শব্দের নিরুক্তি ধরে মানে করতে হবে "উদ্যান" অর্থাৎ প্রতীপ বা উচ্চতর ভূমি? অলকা যে কৈলাসের নীচে তা পরে উল্লিখিত হয়েছে ("তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব")।

যক্ষ বলেছে, অলকায় পৌঁছে তোমার ভ্রাতৃজায়া, আমার পত্নী—যে ছাড়া আমার আর সহচরী নেই—তার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে। সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে তবে আমার আশায় দিন গুনছে। মেয়েদের মন যেন ফুল, প্রায়ই দেখা যায় যে বোঁটার মত "সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি"। সব টীকার আর সকল অনুবাদকারী এখানে "সদ্যঃপাতি" "প্রণয়ি" পদ দুটিকে হৃদয়ের বিশেষণ ধরেছেন। তা হলে "সদ্যঃপাতি প্রণয়শীল হৃদয়কে বিরহকালে আটকে রাখে,"—এর অর্থ কী? বিরহ ঘটলেই কি প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হবে? না বিরহিণী সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করবে? কালিদাস কেন, কোন ভালো কবিই এ কথা বলতে পারেন না। আসলে এখানে শুদ্ধপাঠ হচ্ছে "সদ্যঃপাতপ্রণয়ি"—একটি সমাসবদ্ধ শব্দ, হৃদয়ের বিশেষণ। মানে—"অবিলম্বে মরণকামী হৃদয়কে"। এই খাঁটি পাঠ মেঘদূতের প্রাচীনতম টীকাকার বল্লভদেব ধরেছেন।

ব্রহ্মাবর্তের উপর দিয়ে ছায়া ফেলে যাবার সময়, যক্ষ বলেছে, সরস্বতীর বারি সংস্পর্শে মেঘের বর্ণ মলিন হয়ে গেলেও সে অন্তরে শুদ্ধি লাভ করবে। তার পরেই কনখলের উল্লেখ, যেখানে জাহ্নবী হিমালয় থেকে অবতরণ করে সগর তনয়দের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। এখন কথা হচ্ছে মাঝখানে যমুনা গেল কোথায়। কালিদাসের অনেককাল আগেই ব্রহ্মাবর্তে সরস্বতী বিনষ্ট। আর কালিদাসের কালে এখানকার মতই যমুনার প্রাধান্য ছিল। পরের শ্লোকেই যমুনার উল্লেখ আছে উৎপ্রেক্ষায়, অথচ যমুনাপারের কথা নাই। যমুনা না পেরিয়ে মেঘের পক্ষে কনখল যাওয়া অসম্ভব। এই সমস্যার দিকে কোন টীকাকারের ও ব্যাখ্যাতার দৃষ্টি কেন পড়েনি জানি না। কিন্তু সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। "আপাং··· সারস্বতীনাম্"—এই বহুবচনের মধ্যে কালিদাস যমুনাকেও ধরে নিয়ে থাকবেন।

॥ ৩ ॥

মেঘদূত কাব্যের একটা বড় সমস্যা মূল কাব্যের আকার। অর্থাৎ কালিদাস কতগুলি শ্লোকে মেঘদূত লিখেছিলেন? পুথিতে শ্লোকসংখ্যার সমতা নেই। কোন পুথিতে ১১৫, কোথাও ১১৪, কোথাও ১১৬ বা ১১৭, কোথাও ১২১, কোথাও ১২৪, কোথাও ১২৭। প্রাচীনতম টীকাকার কাশ্মীরী পণ্ডিত বল্লভদেব যে মূল পেয়েছিলেন তাতে শ্লোকসংখ্যা মেঘদূতের বিখ্যাততম টীকাকার মল্লিনাথ ১২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা করলেও ছয়টিকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে নির্দেশ করেছেন। বাঙালী টীকাকারেরা শ্লোকসংখ্যায় একমত নন, তবে তাঁরা কেউই একশ চোদ্দর কম অথবা একশ আঠারোর বেশি শ্লোকসংখ্যা ধরেননি। মেঘদূতের প্রথম আধুনিক বিদগ্ধ সমালোচক ও সম্পাদক বিদ্যাসাগর মহাশয় মল্লিনাথের টীকা সমেত একশ পনেরো শ্লোক গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর টিপ্পনীতে ("পাঠাদিবিবেক:") তিনি এর মধ্যে পাঁচটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে নির্দেশ করেছেন, আর ভূমিকায় ("বিজ্ঞাপন")এ লিখেছেন, "মেঘদূত পাঠ করিয়া আমার যেরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তদনুসারে ১১০টি শ্লোক কালিদাস প্রণীত, অবশিষ্ট ১৭টি অন্যের লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে।"

মেঘদূতের ভূমিকায় ও টিপ্পনীতে বিদ্যাসাগর অনেক মূল্যবান্ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রক্ষিপ্তবর্গের মধ্যে দুই তিনটি শ্লোক রচনা বা তার-সঙ্কলন বিষয়ে নিতান্ত নিন্দনীয় নয়।" এমন একটি বিখ্যাত শ্লোক বিচার করে তিনিই প্রথম প্রক্ষিপ্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন,

সেইজন্য বল্লভদেবের টীকার সম্পাদক হলুটস্ বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। শ্লোকটির অনুবাদ এই,

মন্দাকিনীর জলের ধারে, ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে খেতে, তটস্থিত শ্রেণীবদ্ধ মান্দারের ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে, দেবতাদেরও আকাঙ্ক্ষিত মেয়েরা সেখানে সোনার বালুকার মুঠো দিয়ে তরু লুকোনো-খোঁজা খেলা খেলে॥

আর একটি ভালো প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অনুবাদ দিচ্ছি। শ্লোকটি কোন টীকাকার স্বীকার করেন নি। বিদ্যাসাগর টিপ্পনীতে উদ্ধৃত করে বলেছেন প্রক্ষিপ্ত। তবে মেঘদূতে গৃহীত হয়েছে (১১২) এবং শ্লোকটির কিছু পাঠান্তরও আছে। সুতরাং অর্বাচীন সংযোজন নয়।

নবধারাপাতে স্নিগ্ধা মাটির মত সুগন্ধ তোমার মুখের বহু দূরে পড়ে আমি ক্ষীণ, তবুও পঞ্চবাণ পীড়িত করছে। এই যে বাদল দিন এল, ভেবে দেখ কী ক'রে কাটে দিনগুলি, যখন আদিগন্ত বিস্তৃত মেঘের আস্বাদনে দিনের আলো হারিয়ে যায়॥

মেঘদূতের শ্লোকগুলির পাঠান্তর এক সমস্যা। পাঠান্তরের উদ্ভব হয় নানা ভাবে। প্রথমত পাঠকের অথবা লেখকদের অজ্ঞতা। যে শব্দের বা পদের মানে লাগানো যাচ্ছে না ছন্দ বজায় রেখে তাকে বদলালে এইমত ঘটে থাকে। যেমন "কেতকাধান" হয়েছে "কৌতুকাধান" (৪), "যাচ্ঞা মোঘা" হয়েছে "যাচ্ঞা বন্ধ্যা" (৬), "চণ্ডীশ্বরস্য" হয়েছে "চণ্ডীশ্বরস্য" (৩৩), "নক্তং" হয়েছে "রাত্রৌ" (৩৭), "পুলিনজঘনাং" হয়েছে "বিপুল-জঘনাং" অথবা "বিস্তৃতজঘনাং" (৪১), "পাবকেক্ষুং" হয়েছে "পাবকেক্ষুঃ (৫৪), "প্রতিদিশম্" হয়েছে "প্রতিনিশম্" অথবা "প্রতিদিনম্" (৫৮), "শনকৈঃ" হয়েছে "মধুরং" (৮৩), ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, খোদার উপর খোদ্‌কারি-প্রবৃত্তি। কালিদাসের ব্যাকরণ ও শব্দপ্রয়োগ শোধরাবার কিংবা তাঁর অপরাধ প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যেও কিছু কিছু পাঠপরিবর্তন হয়েছে। যেমন "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ" হয়েছে "স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ" (১), "ভবতা" হয়েছে "ভবতো" (১২), "ভর্তুরণ্যে" হয়েছে "অস্ত্রারণ্যে" (২১), "চলোর্মিঃ" হয়েছে "চলোর্ম্যাঃ" (২৪), "শীতো বায়ুঃ" হয়েছে "শীতো বাতঃ" (৪২), ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, এমন কতকগুলি দীর্ঘতর পাঠান্তর আছে যেগুলির উপযোগিতা সমান বলেই মনে হয়, অন্তত পক্ষে উনিশ বিশ। যেমন ৩২ শ্লোকের শেষার্ধ, ৪৪ শ্লোকের প্রথমার্ধ, ৬০ শ্লোকের শেষ চরণ, ৬৭ শ্লোকের শেষার্ধ, ইত্যাদি। ৩২ শ্লোকের শেষার্ধের প্রধান পাঠান্তর এই দুটি।

"হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু॥"
"হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বিন্নস্তরাত্মা
নীত্বা রাত্রিং ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু॥"

প্রথম পাঠ মল্লিনাথ গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয় পাঠ বল্লভদেব।

চতুর্থ চরণেও প্রথম দুটি পদের চারটি পাঠভেদ মিলছে, "পশ্যন্ লক্ষ্মীম্", "রাত্রিং নীত্বা", "মুক্তা খেদং", "নীত্বা খেদং"।

প্রধান পাঠভেদ দুটি উৎকর্ষবিচারে প্রায় তুল্যমূল্য।

এই রকম তুল্যমূল্য পাঠান্তর এবং উপরে উদ্ধৃত শ্লোক দুটির মত রচনা কালিদাসের মত কবির বলেই মনে হয়। আরো মনে হয় যে কালিদাস তাঁর এই কাব্যটিকে একাধিকবার পরিমার্জিত করেছিলেন এবং তাইতেই ভালো পাঠান্তরের ও ভালো প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির উৎপত্তি। পাঠান্তরের ও প্রক্ষেপের প্রাচীনত্বও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়॥

সে আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। তার নিশ্বাস আমার কানে লাগছে। আমার হাতের আঙুলগুলো কেমন অসাড় হয়ে গেল। তাকে বলতে শুনলুম, মিছিমিছি পুরনো কাগজ ঘাঁটছ, খুদো ওড়াচ্ছ। দরদিঅ, সেই গল্পটা তুমি কিছুতেই খুঁজে পাবে না।

তার মুখ আমার কানে। অস্বাভাবিক গলা, ঠ্যাস ঠ্যাসে, ঝুরঝুরে। নালীতে ছেঁদা থাকলে এ-রকম স্বর বেরোয়।

বললুম, তা হোক লেখাটা আমার চাই।

—চাই-ই? সে যেন ঠাট্টা করে উঠল।—চাই কেন?

—মিলিয়ে দেখতুম। খাঁটি সেইটে, না বিজুরানীর যে গল্প তোমাকে বললুম, সেইটে।

—সে-গল্পে কী আছে?

—সব মনে নেই। ঝড়জলে রাত, শোঁ শোঁ হাওয়া, আমাদের বাড়ির বকে বসে ভিখিরি মেয়েটা উপুড় হয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে দিল। বাচ্চাটা তবু কাঁদছিল, নীল হয়ে যাচ্ছিল। শেষে এদিক ওদিক চেয়ে মেয়েটা তার পরনের কাপড় খুলে তিন চার ভাঁজ করে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে নিল। এই ছবিটা শুধু মনে আছে।

শুনে সে জোরে জোরে হাসছিল। কালো আলখাল্লাটা ভাঁজে ভাঁজে ফুলে উঠে-উঠে ঢেউ হয়ে হাসির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

তার চোখে-চোখে তাকানোর সাহস নেই, ক্ষুণ্ণ গলায় বললুম, এ-গল্প কি হাসির?

সে বলল, হাস্যকর। তা তুমিও জান। কত দিন আগে লেখা বল ত?

—বছর গুনে বলতে পারব না। তখন এক পয়সার চিনেবাদাম নিয়ে এক ঘণ্টা কাটানো যেত। চায়ের দোকানে দু'পয়সার পেয়ালা নিয়ে দু-ঘণ্টা। দু-আনায় দুপুর বেলা শ্যামলা থেকে আলিপুর ঘুরে বালিগঞ্জ অব্দি যাওয়া যেত। তখন—

হাত তুলে সে বললে, থা আর দরকার সরসিজ ওই গল্পটাও তুমি আর খুঁজে না

—পাব না কেন ?

—নেই বলে।

সে একটু কাশল, সেই অতিপ্রাকৃত চড়ুয়ে। মুখকে হাসল।—গল্পটা আসলে আমার কাছে আছে। এই দেখ।

বলে সে তার কালো ঝোলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল—ভাঁজের পর ভাঁজ, ঢেউ উঠল, রাত্রির শরীরে মিলিয়ে গেল। কী একটা জিনিস বের করে সে আমার চোখের সামনে নাড়াতে থাকল। মিটমিটে আলোয় ধরতে পারছিলুম না। মনে হল, একটা বেরালছানা, শুকনো, চিমসে, চোখ দুটো ঠিকরে বাইরে এসেছে, মণি দুটো মরা মরা।

হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়েও আমি হাত টেনে নিলুম। সে হাসছিল।—দেখলে ত, তুমিও আর ওকে চাও না। যাকে ছুঁতে ভয়, তাকে বাঁচাবে কী করে ?

সে আবার কিম্ভূত জীবটাকে ঢুকিয়ে দিল তার আঙরাখার তলায়।—ও আমার কাছেই থাকুক।

পিট পিট করে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললুম, তুমি কে ?

জবাব না দিয়ে একটু একটু করে পিছিয়ে গেল। ওর আলখাল্লাটা কাঁপল। কাঁপতে কাঁপতে ফেঁপে উঠতে উঠতে রাত্রির মধ্যে মিলে গিয়ে স্থির হল। চেয়ে দেখি সে-ও নেই। তখন তাকে চিনলুম। ও সময়। সে-ই সময় যখন—

এক পয়সার চিনেবাদামে, ইত্যাদি। যখন গ্যাসের খুঁটির বিজ্ঞাপনে ঘর খালি থেকে চাকরি খালি, পাত্র পাত্রী থেকে ছাত্র ছাত্রীর হদিশ পাওয়া যেত। যখন মমতাময়ী মা সেই ভিখারিনী মেয়ে—

সময় আমাকে এখনকার আলোয় দেখাল বলেই ঘটনাকে মরা, রোঁয়া-ওঠা বেরাল ছানার মত ঠেকল। আমাকে ও ওর আঙরাখার মধ্যে উঁকি দিতে যদি দিত, যদি তখনকার চোখ আর বয়স ফিরিয়ে দিত, আর মন আর আলো, আর তখনকার গন্ধ, মোহ, সব কিছু, তবে এই সুন্দর নির্লজ্জ ভিখিরি মেয়েটাকে আবার জীবন্ত দেখতে পেতুম। ওই আলখাল্লার ভিতরে সব জ্যান্ত, বাইরে টেনে আনলেই মড়া।

॥ ২ ॥

[—তারপর কী হল, সরসিজ ?]

—তারপর বিজুমামী খুব ঠাণ্ডা গলায় আমাকে বললেন, এস। ট্যাক্সির মিটার মিটিয়ে আমি নেমে এলুম। কাঁচা মর্দানা, মানানসই মাপের একটা লাফ দিতে হল। শার্কস্কিনে তবু একটু কাদা ছিটে লেগেছিল।

এ-গলি যেন ট্যাক্সিটার মাপে-মাপে তৈরী। দেশলাইয়ের খোল আর বাক্সের মত মাপাই। ঢুকেই মনে হয়েছিল আমি চিনি। অন্তত এই গন্ধটা। আগে অনেকদিন খেকেছি। হঠাৎ পুরনো প্রবাসিনীর ঘরে ঢুকলে যেমন লাগে। বাসো বাসো ঠেকে, আড়ষ্ট, আবার যেন চেনা-চেনা। শরীরের ভাঁজ, হাই তোলা, চুলের গন্ধ। ঠিক আগে যে-ব্যবহার করেছি এখন তা করতে পারব না, অস্বস্তি হবে, মুখোমুখি হব তবু মুখের কাছে মুখ নেব না, একটু আড়াল থেকেই যাবে।

বাধা কোন্‌টা—আমার বয়স ? হাওয়াই শার্টের পকেটে কড়কড়ে যে নোটগুলো উঁচু হয়ে আছে সেগুলো ? জুতো জোড়া আর একটু কম মশমশ করলেও পারত।

বিজুমামী একটা লণ্ঠন নিয়ে এলেন। বললুম, দরকার ছিল না। আমি ঠিক যেতে পারব।—পরিমল কেমন আছে মামীমা ?

বলতে বলতে যে-ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম, গায়ে জ্বর থাকলে কুলকুল করে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যেত। দরজা একটা নিশ্চয়ই ছিল নইলে ঢুকলুম কী করে ; জানালা বলা চলে এমন কিছু চোখে পড়ল না। —পরিমল কেমন আছে ?

বিজুমামীর পমথমে মুখ দেখেই বোঝা উচিত ছিল প্রশ্নটা নিরর্থক।

মামী আঙুল দিয়ে ভিতরের ঘর দেখিয়ে দিলেন। একটা টুল ছিল, বসলুম, যদিও আমার পেটের চর্বিতে চাপ পড়ছিল, বুকের বোতামগুলো আলগা করে দেব কিনা ভাবছিলুম, এবং জুতোপায়ে ঢোকা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা স্থির করবার জন্যে ঘরের মধ্যে অন্য কারুর জুতো তা সে ছেঁড়া পুরনো যেমনই হোক, খুঁজছিলুম।

—চা আনি ?

সম্বিৎ ফিরল। দেখি বিজুমামী জিজ্ঞাসা করছেন।

বললুম, আসুন। ঘরের কোণে একটা কাপের গা পিঁপড়ে চাটছিল। গোটা দুই আরশোলা ভিতর থেকে শুঁড় তুলে উঁকি দিচ্ছিল। কাপটা কুড়িয়ে নিয়ে বিজুমামীকে বেরিয়ে যেতে দেখলুম।

[সরসিজ, তারপর? কিছু লুকিও না।]

—না, লুকোব না। দেখ, তুমি কে জানি না। হয়ত আমার আত্মা, হয়ত বিবেক, কিংবা কারার কনফেসর। সব বলব বলেই ত তোমাকে ডেকেছি। তোমার কাছে কবুল করছি, চা আমি পেতে পারিনি। কী হয়েছিল জান? কাপটা হাত বাড়িয়ে নিতে যাব, হঠাৎ কসকে সবটুকু পড়ে গেল মেঝেয়। আমার খরখরে শার্কস্কিনে আরোও কয়েকটা ছিটে লাগল। লজ্জিত বিজুমামী বললেন, আহা! তাড়াতাড়ি ন্যাতা আনতে ছুটলেন। আমি বললুম, ইস্!

হাসছ? তুমি কী বলবে জানি। ইচ্ছে করে কাপটা ফেলে দিয়েছি। কিংবা আমার প্রবৃত্তি দিয়েছে। একটু আগে ওই পেয়ালাটায় আরশোলা দেখেছিলাম। তা-ছাড়া ধিকধিকে মেঝে, চোঁয়া পঙ্ক, এই ঘর—ওখানে বসে আমার গলা দিয়ে কিছু গলত না।

এ নিয়ে পরে আমার মনে অনুতাপ ছিল না এমন নয়। কাজটা রুচিকর হয় নি। বিশ্রী—ছোটলোকের মত হয়েছিল। বিজুমামীর চোখে ধরা পড়েছিল কিনা জানি না। কী করব, আমরা সবাই ত প্রবৃত্তির দাস। যদি গা-বমি ভাব এসে থাকে, সে কি আমার দোষ? আমরা কি ঢেকুর ওঠা ঠেকাতে পারি, কিংবা হাঁচি থামাতে?

[তোমার মনে পড়ল না যে বেশি নয়, মাত্র দশ-বারো বছর আগে তুমি নিজে এর চেয়ে নীচের ধাপে ছিলে? এ-রকম গলি, এই ঘর, তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সহজ ছিল।]

—ছিল, এখন নেই। দেখ আমরা এক অভ্যাস থেকে অন্য অভ্যাসে উত্তীর্ণ হই। জন্মান্তরণের মত। এক দিন ওই অন্ধকূপের সঙ্গে এক হয়ে মিশে ছিলুম, এ-ও যেমন ঠিক, তার থেকে বেরিয়ে এসেছি এ-ও ঠিক তেমনই। বাস্তব অবস্থা অকপটে স্বীকার করা চলে। দশ বছরের কামিজ বিশ বছর বয়সে যদি গায়ে না ঢোকে সে-দোষ কার? যার শরীর তার নিশ্চয়ই নয়—সময়ের।

পাশের ঘর থেকে ঘর্ঘর শব্দ আসছিল। সেদিকে কান রেখে বিজুমামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তুললুম।

—পরিমল। বুকে কফ জমেছে, শ্বাসকষ্ট—তাই সব সময় ওই রকম শব্দ হয়। এখন ত ঘুমোচ্ছে, তবুও।

ধিকধিকে মেঝে, মনে হয় না জানি কতকালের অন্ধকারে তৈরী, ঘরের লেভেল রাস্তার চেয়ে বিঘত কয়েক নীচু যেন একটা শুকনো চোবাচ্চা—

[সরসিজ, আর বোলো না। এরপর কী কী বলবে জানি। কড়িকাঠে উই, ছেঁড়া তোষক, দরজার কোণে ঝুল—এইসব ত? না, ভুল হবে না, কিন্তু বর্ণনা প্রাণও পাবে না। যে জীবনের তুমি এখন আর কেউ নও, তার ছবি আঁকতে যেও না।]

নিবুনিবু লণ্ঠনটা ঠকঠক করছিল। সেদিকে চোখ রেখে বললাম, পরিমলের অসুখ কত দিন থেকে মামীমা?

—আজ বাইশ দিন।

—ডাক্তার কী বলছে?

—ঠিকমত ডাক্তার দেখাতে পারছি কোথায় যে বলবে? হতভাগীর হাতে যে কিছু নেই। গলা খালি হাত খালি—ওর দিকে তাকানো যায় না সরসিজ। বিয়ের যা দু চার ভরি সোনা দিয়েছিলুম, এই কদিনে সব ভেঙেছে।

—আপনি কবে এলেন মামীমা।

—বুধ-বুধে আজ আট দিন। পেটের মেয়ে ত—খবর পেয়ে আর থাকতে পারলুম না। সরসিজ, তুমি ত জান, খুকু আমার কতখানি।

—মামীমা, জানি।

—হাতে যা ছিল, তাই কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে এলাম। ওখানকার হালও ত তুমি জান! টুকু এবার পরীক্ষা দেবে—ফী জমা দেওয়া হয়নি।

—বুঝেছি মামীমা।

চোখে আঁচল চেপে বিজুমামী আমাকে আঁচলের ছেঁড়া দিকটা দেখালেন।

—সরসিজ, মেয়েদের গ্রুক সব ছিঁড়ে এসেছে। দুমাসের ঘরভাড়া বাকী—ছাব্বিশ দুগুনে বাহান্ন টাকা। এবেলা ভাত ওবেলা রুটি, তাও মাসের সব রেশন

ভুলতে পারি না। তবু, বিভূষামী বললেন, তবু খবর পেয়ে যা ছিল সব নিয়ে আসতেই হল। পরিমলের প্রাণ ত আগে। পরে আর সব কিছু।

আঁচলের খুট খুলে বিভূষামী একটা নোট বের করছিলেন—হেমেড়ানো পুরনো। একপা একপা করে বিভূষামী এগিয়ে এসেছিলেন। স্থির দৃষ্টি, আমি পিছিয়ে যাচ্ছিলুম। টের পেয়েছিলুম কেন। বিভূষামী টাকাটা আমার হাতে গুঁজে দেবেন। দিলেনও। ওঁর হাত কাঁপছিল। ওঁর গলাও।

—আমার হাতে আর কিছু নেই সরসিজ! দেখ যদি, পরিমলের ইন্সেকশনটা এই দিয়ে এনে দিতে পার। ফিরে যাবার গাড়িভাড়া বাবদ এই টাকাটাই অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

টাকাটা আমি নিইনি, নিতে পারিনি, চলে এসেছিলাম। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। আমার সেই গল্পটার কথা মনে পড়ল। 'ক্রোড়পত্র'।—ভিখিরী মেয়েটি কাপড় খুলে কোলের বাচ্চাটাকে জড়িয়ে দিয়েছিল।

[খুকু, মানে উষার সঙ্গে তোমার সেদিন দেখা হয়নি সরসিজ ?]

—হয়েছিল লণ্ঠন ধরিয়ে উষাই পিছে পিছে এসেছিল। গলির মুখ পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছে আমি ফিরে দাঁড়ালুম। লণ্ঠনের আলো আর কালি ওর শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নিয়েছিল।—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার উষা? উষা হাসল। মুখ ফিরিয়ে নিল। —অসুখে ভুগে উঠলাম যে। তাছাড়া ওর এই অসুখ! রোজই এক রকম রাত জাগতে হয়।

মাথায় ঘোমটা ছিল না, উষার চুল উড়ছিল। লণ্ঠনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওর শরীরে, মুখে, কাঁধে গালে, চোখে আলোছায়া আঁকছিল। আবার হাসল উষা।—কী দেখছ, পেত্নীকে? এই ক'বছরে আমি একেবারে পেত্নী হয়ে গিয়েছি না?

বলা উচিত ছিল, না তুমি তেমনি আছ, কিন্তু আমি চুপ করে রইলুম।

উষা হঠাৎ একবার মুখ টিপে হাসল।—তোমার কিন্তু চেহারা ফিরেছে।

'তুমি আরও মোটা হয়েছ' উষা এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলল কিনা সেটা সাব্যস্ত করে না পেরে আমি রুমালে মুখ মুছলাম। ঘামের শার্টস্কিন, আমার হাওয়াই শার্ট আমার গায়ে সুটছিল।

উষাকেই বলতে শুনলুম, আমাদের এই গলিতে কিন্তু ট্যাক্সি মেলে না বুঝেছ! সারারাত দাঁড়িয়ে থাকলেও লাভ নেই।

অপ্রতিভ আমি ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়লুম। আবার আসব কি কাল আসব অথবা ওই রকমই একটা কিছু অস্পষ্ট গলায় বলে থাকব।

সে বলল, খাবার ঢাকা পড়ে রইল সরসিজ, কিছু একবার ছুঁলেও না?

বললুম, না। এই বারান্দায় বসে আমাকে এই সিগারেটটা শেষ করতে দাও।

সে হাসল। খুব বিশ্রী ভঙ্গিতে আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। অন্ধকার রঙের হাত আমার গলায়। —টিপে ধরবে নাকি!

তাকে, যার মুখ আমি তখন দেখছি না, কিন্তু সে আছে, আমাকে জড়িয়ে আছে, বলতে শোনা গেল, কী হবে শেষ করে। খানিকটা ছাই হয়ে থাকবে, খানিক ধোঁয়া হয়ে উড়বে। তাছাড়া এই দু-ঘণ্টায় সিগারেট কটা শেষ করলে বল দেবি? তার চেয়ে খাবারের ঢাকনা খোল, পেটে কিছু দাও।

—বলেছি ত, আমার খিদে নেই।

—নেই কেন?

—কেন, তা তুমি জান। আমার মন খারাপ। উষাকে আজ যে দেখে এলাম। সে ঘরে ঢুকলে হাল দেখে তুমি কেঁদে ফেলতে। জান, উষার স্বামী পরিমলের খুব অসুখ—বাঁচবার আশা নেই? উষার হাতে টাকা নেই। হাতে একগাছা চুলিও নেই।

সে বলল, জানলুম। সরসিজ, তাই তোমার মন খারাপ?

তার বলার চঙ কেমন বাঁকা বাঁকা।

বললুম,—বলতে আমার কষ্ট হচ্ছিল—উষা আমার কে তুমি জান না তাই এভাবে কথা বলছ। কী হতে পারত। একটা ভুলের কত বড় দাম তাকে আজ দিতে হচ্ছে।

হো-হো করে সে হেসে উঠল। সেই হাসি ভাঙা কাঁসের অজস্র কাচের কুচির মত আমাকে বিঁধল। হাসি থামিয়ে বলল সে—বুকে হাত দিয়ে বলত সরসিজ, সত্যিই তোমার মন খারাপ কিনা! তোমাকে ঠেলে পরিমলকে যে-উষা বিয়ে করেছিল, সে যে সুখী হয়নি, আজ অন্ধকার ঘরে ধুঁকছে এতে তুমি কি একটু খুশিও হওনি?

কোন উত্তর দিলুম না। দিয়ে লাভ লাভ নেই। ও ইতর। ও অবিশ্বাসী। উষাকে ও বোঝেনি। বিজুমামীর কথা যদি ওকে বলি তাহলেই কি বুঝবে?

নেয়ের উপরে বিজুমামীর টান, শেষ দশ টাকার নোটটাও আঁচলের খুট খুলে দেওয়া—একথা শুনেও হয়ত ও হো-হো করে হেসে উঠত।

॥ ৩ ॥

[—সরসিজ, পরদিন সকালেই তো তুমি আবার ওখানে গিয়েছিলে?]

—গিয়েছিলুম। ট্যাক্সিটা সেদিন আর গলির ভিতরে নিলুম না। হাতে ওষুধ, পকেটে ফল, ধুতির কোঁচা সব সামলে উষাদের ঘরের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। চার ঘরের বাড়িগুলো তখন কাঁচা কয়লার আগুন দিয়েছে।

দরজা খুলে আজও দাঁড়ালেন বিজুমামী।

—পরিমল কেমন আছে মামীমা?

—একই রকম। এস।

দিনের যতটুকু আলো ভিতরে ঢোকার পারমিট পেয়েছিল তাতেই ঘরের দরিদ্র চেহারা অত্যন্ত প্রকট; বর্ণনা দিতে চাইনে। পুরনো সামছা, ছেঁড়া জুজি, দেয়ালের দাগ নোংরা তোষক, মাছি, এসব ত ছিলই, থাকবেই। আগের দিনের মোড়াটাকে খুঁজে পেয়েছিলুম। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, তাই আজ বসতে অসুবিধে হয় নি!

ওষুধটা বিজুমামীর হাতে তুলে দিলুম। ফলের ঠোঙাটাও। বিজুমামীর মুখ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সেটা তিনি লুকোতেও চেষ্টা করলেন না।

পাশের ঘর থেকে ঘর্ঘর শব্দ উঠছিল। আমার কান কোন দিকে আন্দাজে সেটা ধরে নিয়ে বিজুমামী বললেন—কাল সারারাত ওই রকম কেটেছে। মা-মেয়েতে মিলে পালা করে রাত জেগেছি। মেয়েটাকে সরিয়ে একবার আমি বসেছি আর ভগবানকে ডেকেছি—এই রাতটুকু কোন রকমে পার করে দাও। এ-ঘরে মেয়েটা তখন মাথা ঠুকে ঠুকে কপালের রক্ত বের করছে ও ঘরে রুগীর গোঙানি,—সে যে কি বিভীষিকা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না বাবা।

বিজুমামী একবার থামলেন।

—মাঝে মাঝে খুকু ছুটে এ-ঘরে আসছিল। ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ দুটো যেন জ্বলে, কাল ত বেরোয়নি। কপাল রক্তে মাখামাখি করে ফেলেছে। আমি বুকে হাত বুলিয়ে দিয়েছি পরিমলের, বেডপ্যান দিয়েছি, বিছানার চাদর বদলে দিয়েছি, তবু খুকুকে রুগীর পাশে বেশি যেতে থাকতে দিইনি। দেখেছ ত ওর শরীরের হাল—খান কয়েক হাড় ছাড়া কিছু নেই। কপালে যা আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না—তবু চোখের সামনে যতক্ষণ আছি, আগলে রাখি। সরসিজ, হাজার হলেও আমি ত মা!

আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। মামীরও চোখের কোলে কালি। চুলগুলো খড়িগোলা জলে ধোওয়া। বলে উঠলুম আপনারও ত শরীর ভাল নয় মামীমা! এভাবে রাত জাগলে যে আপনিও পড়বেন।

বিজুমামী হাসলেন। হাসিকান্না মেশানো একটা অদ্ভুত ছবির ছাপ ছড়িয়ে গেল ওঁর মুখে। —আমাকে বাদ দাও। আমি ত হিসেবের বাইরে গেছি। ডাক আজও আসতে পারে, কালও পারে। না হয় আগেই এল। তবু ত জেনে যাব, আর ভয় নেই, হতভাগীকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

[সরসিজ, ওই একটা কথায় নতুন আলোয় দেখতে পেলে?]

—পেলাম। সেই মুহূর্তে বিজুমামীকে আর গরিব মনে হয়নি। ভাগ্যের ফেরে, অভাবের টানাপোড়েনে সব খুইয়েছেন বিজুমামীরা—তবু বাঁচিয়ে যেটুকু রাখতে পেরেছেন তার দামও কম নয়। এই আর একটা জীবন—এখানে এক জন আর একজনের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়াতে পারে, দুটি হালকা তাস যেমন পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে খাড়া থাকে। রোগীর জন্যে ভাড়াকরা নার্স রাখার উপায় এদের

নেই বটে, কিন্তু থাকলেও বোধহয়
একদিন আমি চিনতাম। আবার চিনলাম।

চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মামী উষা এখন কোথায় ?

বিজুমামী বললেন, ঘুমুচ্ছে। সারারাত এ ঘর ও ঘর ছটফট করার পর, এই খানিক আগে চোখের দুপাতা এক করতে পেরেছে। ওকে আর তুলে দিই নি। ঘুমোক। সব ঘুমই ত জন্মের মত ঘুচতে বসেছে ?

বাইরে, বোধহয় গলির মুখে একটা কুকুর অনেকক্ষণ ধরে সুর করে কাঁদছিল। আঙুল দিয়ে সেদিকে ইসারা করে বিজুমামী ফিসফিস করে বললেন, ওই শোন। রোজ ডাকে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, মাঝরাত্তিরেও। তখন একবারে দরজার বাইরে উঠে আসে। এ-ডাক ভারি অলক্ষুণে। পরিমল বোধহয় আর বাঁচবে না বাবা !

কী হল, ওই একটা কথা আমাকে নিজের কাছে খুব অপদার্থ, অসহায় করে দিল। কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে গলায় সব জোর ঢেলে দিয়ে বললুম—বাঁচবে মামীমা। আমরা বাঁচাব।

কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে বিজুমামী আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। বললাম,—বাঁচাব মামীমা। আমাদের যতটুকু সাধ্য ততটুকু করব। মামামী—একবার কেশে গলা থেকে সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বললাম,—মামীমা, কিছু মনে করবেন না। হাতে আমারও বিশেষ কিছু নেই, জানেনই ত আজকাল সখনই থাকি, এ'কদিনে হোটেলে অনেক খরচ হয়ে গেছে। তবু সামান্য কিছু ওর ওষুধ, ফল চিকিৎসা বাবদ দিয়ে যেতে চাই।

পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলুম। বিজুমামী হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করলেন। স্পষ্টতই উনি অভিভূত, ওঁর চোখ ছলছল করছিল। হাত তুলে বললেন,—বাবা দাঁড়াও। না-না আমাকে নয়। খুকুকে ডেকে আনি। যা দেবার তুমি নিজের হাতে ওকেই দাও। তবু খুকু জানবে ও একবারে একা নয়, ওর পাশে দাঁড়াবার বন্ধু আছে।

বিজুমামী এক রকম ছুটে ভিতরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। মুখে কয়েকটি রেখা ফুটল। একবার ফিরে আমার চোখের দিকে চাইলেন—সেই চাহিটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কী যেন বলবেন মামীমা, কী একটা কথা যেন ঠোঁটের কোণে এসে শুকিয়ে যাচ্ছে।

বিজুমামী ফিরে আমার কাছে এসেছেন, হেঁটো আসা যায়। —সরসিজ (মামীমাকে খুব নীচু গলায় বলতে শুনলাম), সরসিজ, কত ?

প্রথমে মানে বুঝিনি, পরে আরও একবার বিজুমামী যখন আবার একই গলায় বললেন, কত ? —তখন সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হল। সেই কুকুরটা তখনও ডাকছিল। ফিনফিনে পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে একটা নোট বের করলাম। একশো টাকা। বলতে গেলাম, মামীমা আপাতত—

কথাটা শেষ করা হল না।

—এ-ক-শো ! পলকে বিজুমামীকে বদলে যেতে দেখলাম, গলার স্বরও তাঁর বলে চেনা কঠিন।

—এ-ক-শো টা-কা। বিজুমামী ফেঁসে যাওয়া গলায় বলছিলেন, সবটাই ওকে দেবে বাবা ! তার চেয়ে ভাড়িয়ে এনে দাও—আমি—আমি—আমাকেও কিছু দেবে না ?

আগুনের মুখে ধরা কাগজের মত বিজুমামী একটু একটু করে লোভে ক্ষোভে কুঁকড়ে যেতে থাকলেন। একশো টাকা—এই একটা শব্দ যেন স্টিমারের মত নদীর বুক চিরে সিঁথি তৈরি করে দিয়ে চলে গেল। একদিকে উষা, তার অপরিচ্ছন্ন ছোট ঘর মরণাপন্ন স্বামী, অভাব, আসন্ন বৈধব্য ; অন্য দিকে বিজুমামীর নিজের সংসার—বাকী বাড়িভাড়া, মেয়েদের ফ্রকের কাপড়, রেশন—যে সংসারকে বিজুমামী স্নেহে অন্ধ হয়ে ভুলে ছিলেন। দু'টো স্পষ্ট দু'ভাগ হয়ে গেল।

["—ক্রোড়পত্র" গল্পটা, সেই ভিখারিণী মেয়ের কাহিনীটা খুঁজে পেলে তুমি কী করতে ?]

—ছিঁড়ে ফেলতাম।

সে বলল, হুঁ। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ওর মুখের রহস্যময় হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছিল। শেষে আস্তে আস্তে বলল, সরসিজ, তুমি শুধু বিজুমামীকেই দেখলে, ঘরটার দিকে তাকালে না ? আসল চাবিকাঠি তো ওই ঘরেই। একটা খাটিয়া ফেললে যে ঘর জুড়ে যায়, সেই ঘরে কত বড় মাপের মন ধরে ?—এ-হিসাব তোমার জানা যদি না থাকে সরসিজ, তবে এ-গল্প তুমি লিখতে যেও না।

শিল্পী : বাবিকাধনঞ্জয় রায় চৌধুরী

শিল্পী : সুধীরমাধব

কলোনীর বাজার

আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ

• কপিল ভট্টাচার্য্য •

এ কথা বোধ হয় শক্ত নয় যে, জলপথেই মানুষ প্রথম যানবাহন ব্যবহার করতে শিখেছে। অসভ্যতার প্রাচীনতম দিনগুলিতে যখন মানুষ হাতী-ঘোড়ায় চাপতে শিখেনি, অথবা উট, মহিষ, বলদ, খচ্চর, ছাগল কিংবা কুকুর টানা গাড়ীতে তার পণ্য-সামগ্রী বাহনের ব্যবস্থা করতে জানতো না, কিন্তু জলপথের ব্যবহার তার বহু পূর্বেই আয়ত্বে এসেছিল। যতদিন পর্যন্ত "চাকা"র আবিষ্কার হয়নি, ততদিন স্থলপথের সুষ্ঠু ব্যবহার মানুষের কাছে সহজ ছিল না; কিন্তু আদিম মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই জলে সাঁতার দিতে অথবা ভাসমান গাছের গুঁড়িতে চেপে জলপথে যাতায়াত করতে শিখেছে। ভেলা তৈরীর বিদ্যা শিখতে মানুষের যে বিশেষ দেরী হয়নি, সে কথা সহজেই বোঝা যায়, যখন দেখি আজও আমাদের "অসভ্য" ভ্রাতৃবৃন্দ দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ভেলা অথবা বৃহৎকাণ্ড খোদাই করে ডোঙ্গার মহাসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে আর বহু-সামগ্রী বহন করে নিয়ে আসছে। বাস্তবিক নাব্যপথই মানুষের প্রাচীনতম চলাচলের পথ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গেই পরে পরে স্থলপথ, রেলপথ, বায়ুপথ আর আজ রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য পথ মানুষ ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু নাব্যপথের স্থান আজও মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রধানতম ভূমিকাই গ্রহণ করে রয়েছে।

সমুদ্র-পথের সমস্যাগুলি অবশ্য দেশের আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ, এবং সুদূর বিস্তৃতির জন্যে যে শ্রেণীর জলযান আর কম্পাস প্রভৃতি বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ নাব্যপথের জলযানের সে-সব সমস্যা নেই। তারা মোটামুটি স্বল্পতর গভীর জলে যাতায়াত করবার উপযোগী করে তৈরী হয়। তাদের দৈর্ঘ্য, প্রসার এবং উচ্চতা ও জলপ্রণালীর প্রসার ও গভীরতার দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট করা হয়। আভ্যন্তরীণ জলযানের মোটামুটি ৬ থেকে ১২ গভীর নদী ও খাল ব্যবহার করে থাকে। শুধু ইয়াং সো কি য়ে ও যে আভ্যন্তরীণ জলপথেই ব্যতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে দেখাদেখি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাদের সুপিরিয়র, মিচি প্রভৃতি হ্রদ সংযোগ করে, সেন্ট লরেন্স নদের জল কানাডার অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার সম্প্রতি যে ব্যবস্থা করেছে সেখানেও গভীরতর জলপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যখনই আমরা রেলপথের কথা তখন আমাদের মনের চোখের সামনে এক ধরণের ছবি ভেসে ওঠে। আমরা দেখি, স্লীপার, মিটার অথবা ব্রড গেজ লৌহবর্ত্ম, ছোট বড় রেল ইয়ার্ড, লেভেল ক্রসিং, ওভার ব্রিজ অথবা আণ্ডার ব্রিজ। বাষ্প, ডিজেলতেল অথবা ইলেকট্রিকের লোকোমোটিভ ইঞ্জিন, আবার ২০।২২ টনের মালবাহী ওয়াগন গার্ড, যাত্রীবাহী কামরা প্রভৃতি। তাছাড়া, রেলপথ সমতলভূমি অতিক্রম করে যেতে পারে, বাঁধের উপর নির্মিত হতে পারে কিংবা পার্বত্য অঞ্চলে মাটি-পাথর কাটা ভূখণ্ড অতিক্রম করে যেতে পারে, সুড়ঙ্গ-পথেও যেতে পারে। ছোট বড় নানা প্রকার সাঁকো ও সেতু দিয়ে জলপ্রণালী ও নদ-নদী অতিক্রম করে রেলপথ। জনকোলাহল মুখরিত ছোট বড় নানা প্রকার রেলষ্টেশনগুলি রেলপথের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আভ্যন্তরীণ জলপথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকাংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ডক, বাঁধ প্রভৃতির ঐ বিজ্ঞান-সম্মত গৌত্তিক কাজ জলপথের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তাছাড়া লক-স্লুইস গেট (lock & sluice gate) সম্মিলিত বেগুলেটর তো আছে ঢেউ, ঘাটে বাঁধা ভাসমান পন্টুন (pontoon), ক্যাপস্টান্ প্রভৃতি জলপথের বন্দরের অবিচ্ছেদ্য অং ষ্টীমার, লঞ্চ, বার্জ, বোট প্রভৃতি জলযানের কথাও ভেসে আসবে। কোথাও কোথাও জলপথ অতি

লিকাতার নির্মিত ইস্পাত "জলপরি" আরেকটি ইস্পাত টানছে।

স্থলপথের সেতু নির্মিত হয়, কোথাও বা জলপথের
দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ তৈরী হয়েছে। আভ্যন্তরীণ
জলপথের কথা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এই সব
বিষয়ের তথ্য না জেনে উপায় নেই।

দেশের আভ্যন্তরীণ বড় বড় হ্রদেও জলপথের ব্যবহার
ছে, কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচনা
নদ-নদী ও খালগুলিকে নিয়ে।

স্বভাবতঃই নদ-নদীই প্রথম আলোচ্য। অনেক
দী আদিযুগ থেকেই তাদের মোহনার অংশে এবং
লগ্নিত নিম্নাংশে স্বাভাবিক ভাবেই নাব্য। পার্বত্য
শে নদীতে জলের স্রোতের টান অত্যধিক, কাজেই
। যতদিন না বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে লক্-রেগুলেটর
াতে দিয়েছে, ও নানারূপ নদী-শাসন পদ্ধতি প্রয়োগ
ছে, ততদিন এ অংশে নৌব্যবহার হয়নি।

সমুদ্র-সঙ্গমের মোহনার স্থান থেকে বহু দূর অবধি
নদ-নদী কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় সহজ-নাব্য নয়।
ণ আমেরিকার আমাজান প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি নদী
াতে স্বাভাবিক অবস্থাতেই সুদূর অবধি সহজনাব্য
ও সৌভাগ্যের রাখে।

নাব্যতাবর্ধনের ব্যবস্থা করে, তাদের আবহাওয়ার
নানারূপ নদী শাসন (River training works) প্রক্রিয়ায়
কার্যোপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয়
ভারতবর্ষে অবস্থাটা একেবারে বিপরীত। এখানে যে
গঙ্গা নদী এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কানপুর অবধি
ীমার যাতায়াতের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল, আজ আর
তা নেই, বিহারের পাটনা অবধি -আজ গঙ্গা অতি কষ্টে
নাব্য। কলিকাতার পার্শ্বে প্রবাহিত গঙ্গার শাখা
ভাগীরথী হুগলী নদী মুতী থেকে সাগর দ্বীপ পর্যন্ত ৩০০
মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে আজ সাগর থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত ১২০
মাইল কোনক্রমে নাব্য রয়েছে। এ অংশেরও নাব্যতা
দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, গর্ভে পলি পতনের ফলে। আজও
বিজ্ঞান-সম্মত নদী শাসন প্রক্রিয়ায় ভাগীরথী হুগলীর
নাব্যতা রক্ষার কোন প্রয়াস করা হচ্ছে না, গঙ্গার
নাব্যতাও ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে চলেছে

সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নানা
পণ্য-সম্ভার নিয়ে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করে। উপযুক্ত
ক্ষেত্রে নদ-নদীর মোহনার কাছে আভ্যন্তরীণ জলপথের
নিম্নাংশে পোতাশ্রয় (Harbour) থাকলে এই সব
সমুদ্রগামী জাহাজের মালের আদান-প্রদান করা যায়
আভ্যন্তরীণ জলযানের সঙ্গে। কাজেই নদীর মোহনায়
এমনি পোতাশ্রয়ের কাছে বড় বড় বন্দর গড়ে ওঠে।
আমাদের কলিকাতা ছিল পৃথিবীর মধ্যে এমনই এক
গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয় বন্দর। কিন্তু আজ সে অবস্থা ধ্বংস
হতে চলেছে।

কোন নদীর মোহনার কাছে নিম্নাংশের নাব্যতা
সেখানে পোতাশ্রয়ের উপযোগিতা নির্ভর করে নদীর
মধ্যে উচ্চ উপত্যকার জল-সরবরাহের উপর আর
জোয়ার-ভাঁটার বৈশিষ্ট্যের উপর। যদি জোয়ার-ভাঁটার
জলের উচ্চ-নীচ সীমানা পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় (যেমন
কলিকাতায় হুগলি নদীতে গড়ে প্রায় ১৭ ফুট) তা হলে
জোয়ার ও ভাঁটার সময়ে দুই বিপরীত দিকেই নদীর
স্রোতের জোরালো
নদীর এই নিম্নাংশে যাতে পলি জমে চর
তার নাব্য-প্রণালী ক্ষয় করতে পারে

যুগে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার পানা যেমন একদিকে জোরালো স্রোতের টান সৃষ্টি করে অপর দিকে তেমনি ওই নদীগুলিতে উচ্চ উপত্যকা থেকে প্রচুর বন্যার জল নামে। তাই ওই সব নদীর মোহনায় বড় বড় পোতাশ্রয় ও বন্দর স্থাপনা সম্ভব হয়েছে। এই রকম নদীর খাতে অথবা তার দুই তীরে খাল কেটে বৃহৎ জলযান সকল সময়ে ভাসিয়ে রাখা যায়। হুগলী নদীর ক্ষেত্রে যতদিন দামোদর উপত্যকার বন্যাগুলি নিরুদ্ধ হয়নি, আর সে বন্যার জল রূপনারায়ণের খাত দিয়ে নামতো, ততদিন সাগর দ্বীপ থেকে কলিকাতা পর্যন্ত হুগলির নাব্যপথ অনেকটা অব্যাহত ছিল। কিন্তু উচ্চ উপত্যকায় বন্যার জল নিরুদ্ধ করার ফলে গত ৩।৪ বছর ধরে হুগলির নিম্নাংশে ভাঁটার টানে বহু পরিমাণে মন্দা পড়েছে। কাজেই জোয়ারের টানে বঙ্গোপসাগরের পলিমঞ্চ থেকে যে মণ্ডপলি এসে হুগলি গর্ভে পতিত হচ্ছে, তা আজ আর ভাঁটার কেটে নিয়ে যাচ্ছে না। কাজেই এই নদীর নাব্যতা ও জলনিকাশ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে।

১৯৫৯ এর অক্টোবরের প্লাবনের সময়ে দেখা গেল বিগত ৫ বছরে হুগলি নদীর সর্বোচ্চ জল-নিকাশ ক্ষমতা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কমে গিয়েছে। নাব্যতা এমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে আজ সমুদ্রগামী জাহাজগুলি (তাও ছোট সাইজের) আধা বোঝাই হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে—কলিকাতা থেকে দক্ষিণে ৫০ মাইল দূরে হলদিয়ায় একটি জাহাজ খালাস করার ঘাঁটি নির্মাণ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের চোখের সামনে কলিকাতার পোতাশ্রয় ও বন্দর ধ্বংস ও পরিত্যক্ত হতে চলেছে। দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে যে কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হয়ে যাবে আর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ভূভাগ প্রায় প্রতি বছরই সর্বনাশা প্লাবনের কবলে পড়বে, ১২ বছর আগেই সে কথা পুনঃপুনঃ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে এসেছি। তথাপি আজও কোন সুষ্ঠু বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হল না, হুগলি নদীকে বাঁচানোর জন্যে। সম্প্রতি শুনছি, জাতিসংঘের দুইজন বিশেষজ্ঞ এসেছেন, হলদিয়ার ঘাট সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্যে। এঁদের একজন নদীগর্ভের মাটিকাটার যন্ত্র ড্রেজার সম্বন্ধে

র্থাৎ তার খাল মারফৎ সেচ ব্যবস্থা বাতিল
ের আড়ালে সঞ্চিত জল রূপনারায়ণের খাত
চালনা করে রূপনারায়ণের ও হুগলির খাতের
ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ততদিন জাতিসংঘের কোন
রই ক্ষমতা নেই কলিকাতা এবং হলদিয়ার
আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার।

াগরে জোয়ার ভাঁটার পাল্লা নেই অথবা খুবই
সাগরে যে নদী এসে পড়ে, সে নদীর মোহনায়
বালি জমে খুব গভীর করে দেয়। আর সাগর
ওয়া জাহাজ সে নদীতে আদপেই প্রবেশ করতে
।

। ভারতের গোদাবরী ও কৃষ্ণা এবং উড়িষ্যার
মোহনায় জোয়ার-ভাঁটার পাল্লা খুবই কম।
ামে কোন পোতাশ্রয় গড়ে উঠতে পারে না।
রোন্ নদী ভূমধ্য সাগরে পড়েছে, রোনের
১০ কিলোমিটার প্রায় পাঁচ ছয় মাইল পর্যন্ত
করতে পারে না।

ণ্ডের টেমস্ নদী অল্পদীর্ঘ কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার
বেশী। দুই ধারে খাল কেটে ডক (Dock)
া হয়েছে। জোয়ারের জল ঢুকিয়ে, ভাঁটার
গেটের কপাট বন্ধ রাখলে জল বিনির্গমন বন্ধ
তখন টেমসের খাতে জাহাজ বসে পড়ে বটে,

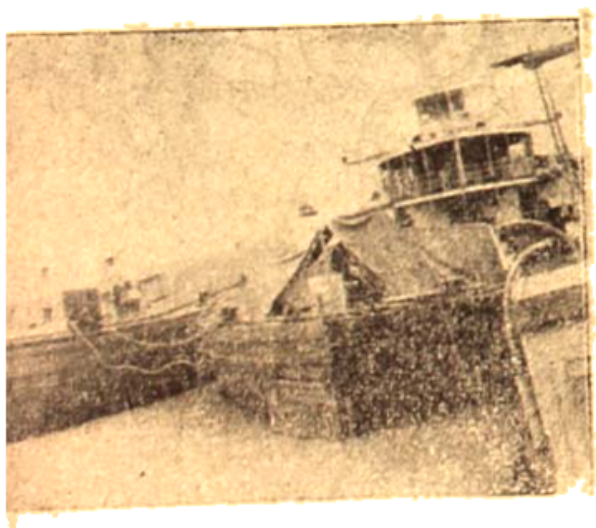

কলিকাতায় নির্মিত Cargo Lighters (মালবোট)

মাইল পর্যন্ত ড্রেজার চালিয়ে মাটি কেটে টেমসের খাত
নাব্য রাখা হয়। অবশ্য টেমস্ খুবই স্বল্প পরিসর নদী
আর লণ্ডন বন্দর পৃথিবীর মধ্যে এক মহাসম্পদশালী
বন্দর, এভাবে ড্রেজারে মাটি কাটার খরচ পোষায়।
কলিকাতা বন্দরের কাছে হুগলি নদী প্রায় ২০০০ ফুট
প্রশস্ত, আর সাগরদ্বীপের কাছে প্রায় ১৩ মাইল।
লণ্ডন বন্দরের ড্রেজার চালানোর পদ্ধতি দ্বারা কলিকাতা
বন্দর রক্ষা করবার পরিকল্পনা কেবলমাত্র বাতুলেই করতে
পারে। সর্বাগ্রে রূপনারায়ণ ও হুগলিকে নদীশাসন
প্রক্রিয়ায় স্বল্প প্রসার ও গভীর করে নিয়ে, তার পরে
ড্রেজার চালাতে হবে এখানে। নতুবা ড্রেজারের পিছনে
ব্যয় শুধুমাত্র অপব্যয়ে পর্যবসিত হবে।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানীতে নাব্য
জলপথের অনেক উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। নদনদী-
গুলির খাত উন্নয়ন ও নতুন নতুন নাব্য খাল কেটে
এই দেশগুলিতে সর্বত্র মাল যাতায়াতের সুলভ পদ্ধতি
অবলম্বিত হয়েছে।

হল্যাণ্ডে সমুদ্রোপকূলে ডাইক বাঁধ বেঁধে সোনাজল
প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে, আর মাস ও রাইন নদীর
উন্নয়ন ও খালের সাহায্যে প্রায় ২০০০ টনের জলযান
দেশাভ্যন্তরে যাতায়াত করতে পারে।

ফ্রান্সে প্রায় চল্লিশ হাজার মাইল জলপথ। ফ্রান্সের
প্রধান নদী সেইন, লোআর, রোন্ আর
গারনের নাব্যতা রক্ষা ও উন্নয়নের কাজে ফরাসীরা
পৌত্তিক কাজে শ্রেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেছে।
পারী শহর থেকে সেইন নদীর খাল মারফৎ
বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স জলপথে
সংযুক্ত রাইন নদী বেয়ে আল্‌স্ পর্বতমালায়
নাব্যতা কন্‌স্টান্স্ হ্রদ পর্যন্ত জলযান যাবে।
রোন নদী বেয়ে ফ্রান্সেই অভ্যন্তর নদীর লিয়ঁ
থেকে সুইজারল্যাণ্ডের আল্‌সে জেনেভা পর্যন্ত
জলযান যাবার পরিকল্পনা হয়েছে। সেইন্ নদী
থেকে ছয়ে পর্যন্ত একমাত্র মাঁ কাঙাখালেই গত
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বছরে প্রায় ৮০ লক্ষ টন

ের মোট পণ্যের পরিমাণই মাত্র ৮৫ লক্ষ টন।)

এই সী কাঁড়াখানে সে সময়ে বছরে ৩০,০০০ রিশ বাজার) জলযান অর্থাৎ দৈনিক ৮০টি জলযান াতায়াত করেছে। কোন কোন দিন দৈনিক ১৫০টি যানও যাতায়াত করেছে। ইলেকট্রিক শক্তি বা ডিজেল ইঞ্জিনের ডগটানা পদ্ধতির দ্বারাই কম শ্রম্ভ জলযান যাতায়াত সম্ভব করা হয়েছিল। ছাড়া ডবল-লক পদ্ধতি অর্থাৎ বিপরীত দিকের ট পৃথক লকগেটের ব্যবস্থা থাকায়, আর সেইগুলি ং চালিত হওয়ায়, কখনও কোন জলযানকে প্রতীক্ষা াঁড়িয়ে থাকতে হয়নি।

জার্মানীতে জলপথের দৈর্ঘ পাঁচ হাজার মাইলেরও ।। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে নাব্য জলপথের উন্নয়ন কল্পনায় জার্মানীতে এক নতুন যুগ দেখা দেয়।

সমস্তই রিমের পর্যন্ত ওয়েজার নদীর নাব্যতা ন করা হয়; ডানিয়ুব অঞ্চলের সঙ্গে রাইন নদী নাব্য পথে যুক্ত করা হয়; এল্‌ব-ওয়েজারএমুর খাল খনন হয়। মিত্তের ডিনোতে বিরাট জাহাজ উত্তোলন যন্ত্র ন করা হয়।

যদ্যা ইউরোপের মানুষ নদ কৃষ্ণ সাগরের যোগাযো ক ২৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুনাব্য করা হয়েছে। াংশে জলপ্রপাতগুলিকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে নাব্য করে া হয়েছে।, "লৌহ কপাট"—অংশে ডানুয়বের তের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১৬ । ১৭০০ অশ্বশক্তির ইঞ্জিনের সাহায্যে লম্বা তারের দিয়ে জলযান স্রোতের বিরুদ্ধে টানা হয়।

পূর্বেই বলেছি, জলপথের ইতিকথায় সোভিয়েত সকলকেই হার মানিয়েছে। অবশ্য, জলপথের র্ঘ সাধনের প্রয়াস রুশ দেশে অতি প্রাচীনকাল কই আরম্ভ হয়। তাই ১৯১৭ বিপ্লবের পূর্বেই নে ঔদক-বিজ্ঞান ও দক্ষ কারিগরের অভাব ছিল । ১৯১৩ খৃষ্টাব্দেই ভল্‌গা ও তার খালগুলির পথের দৈর্ঘ কিলোমিটারের বেশি ছিল । প্রকাশ: প্রায় ১০,০০০ জলযান ও ৭,৫০০ পাল ট ছিল।

ভারতীয় নৌবহর হয় হতে কলিকাতায় নির্মীয়মান এমুনিশন বার্জ
Ammunition barges)

উন্নয়নের পরে ভল্‌গায় আজ ১৮,০০০ টনের জাহাজ জলনীলাক্রমে যাতায়াত করে।

সাইবেরিয়ার অব এবং ইনিসাই নদীগুলিকেও নাকি সম্প্রতি সুনাব্য করে তোলা হচ্ছে। বাস্তবিক সুপরিকল্পিত বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সোভিয়েত দেশে যে যে আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের অবিশ্বাস্য উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে, একথা শত্রুরাও অস্বীকার কোরতে পারে না।

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় সেণ্ট লরেন্স নদ থেকে, সুপীরিয়র, মিশিগান প্রভৃতি হ্রদের ভিতর দিয়ে কানাডার অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ মাইল নাব্য জলপথ সম্প্রতি খনন করা হয়েছে। ১০।১২ হাজার টনের জাহাজ এই জলপথে যাতায়াত করতে পারে। তা'ছাড়া, নিউইয়র্ক থেকে সুদূর দক্ষিণে মিসিসিপির মোহানার নিউঅর্লিয়ান্স পর্যন্ত খালপথ

তো উৎকৃষ্ট করার কাজ চলেছে আজও।

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন এক প্রায়
ন হাজার, কিন্তু তার মধ্যে মোহানা থেকে ২৬০০
ন পর্যন্ত আমাজন স্বাভাবিক ভাবেই নাব্য।
১০০০ মাইল পর্যন্ত ৬৮১০ টনের জাহাজ যেতে
। পূর্ব নদী ও তার উপনদীগুলি সুদীর্ঘ পথে নাব্য।
আফ্রিকার কঙ্গোনদ স্বাভাবিক ভাবে অংশতঃ
নাব্য। এদেশে নদী শাসনের কোনও পৌত্তিক
আজও হয়নি। অবশ্য, অদূরে ভবিষ্যতে সদ্য-স্বাধীন
ঢ়কার রাষ্ট্রগুলি নিশ্চয়ই এদিকে মন দেবে।
মহাচীনের ইয়াংসি প্রভৃতি নদী স্বাভাবিক ভাবেই
াংশে নাব্য ছিল, সম্প্রতি মহাচীনের গণতান্ত্রিক
ার নদী উপত্যকা পরিকল্পার মাধ্যমে ওদেশের
নদীর প্রভূত উন্নয়ন-কাজ সমাধান করছেন।

হাতপূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি, আমাদের দেশের
জলপথের অবস্থা ইদানীং শোচনীয় হয়ে পড়েছে।
একমাত্র ব্রহ্মপুত্র নদ ব্যতিক্রম ভাবে উপরন্তু অবাধ
যেমন নাব্য ছিল, আজও তেমনই আছে। কারণ
আসামে অথবা উত্তর-বঙ্গে আজও নদী ব্যাপক
কোনও সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

গঙ্গানদী যদিও ব্রহ্মপুত্রের মতই হিমালয়ের গলিত
তুষার ও বৃষ্টির জলে পুষ্ট, কিন্তু তার নাব্যতা ও
জলবিকাশ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। তার
কারণ উত্তর ভারতে গঙ্গা-উপত্যকার সেচ পরিকল্পনা
গঙ্গার খাতের প্রবাহ হরণ করে নিয়েছে। তাতে
ক্ষতি হত না, যদি সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তিক কার্যে গঙ্গার
প্রসারতা কমিয়ে তার গভীরতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হত।
যে-পরিমাণ জল, সেচ-কার্যের পরেও গঙ্গার খাতে
প্রবাহিত হচ্ছে, তাকে স্বল্পতর প্রসারে প্রণালীর মধ্যে
রাখতে পারলেই, নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পায়, তার
নাব্যতার উন্নতি হয় এবং বর্ষাকালে যখন সহসা
অধিক বৃষ্টিপাতে জলের ঢল নামে, তখনও গঙ্গা উদ্বৃত্ত
খাতে সে জল নিকাশ করতে পারে। সে রকম ব্যবস্থা

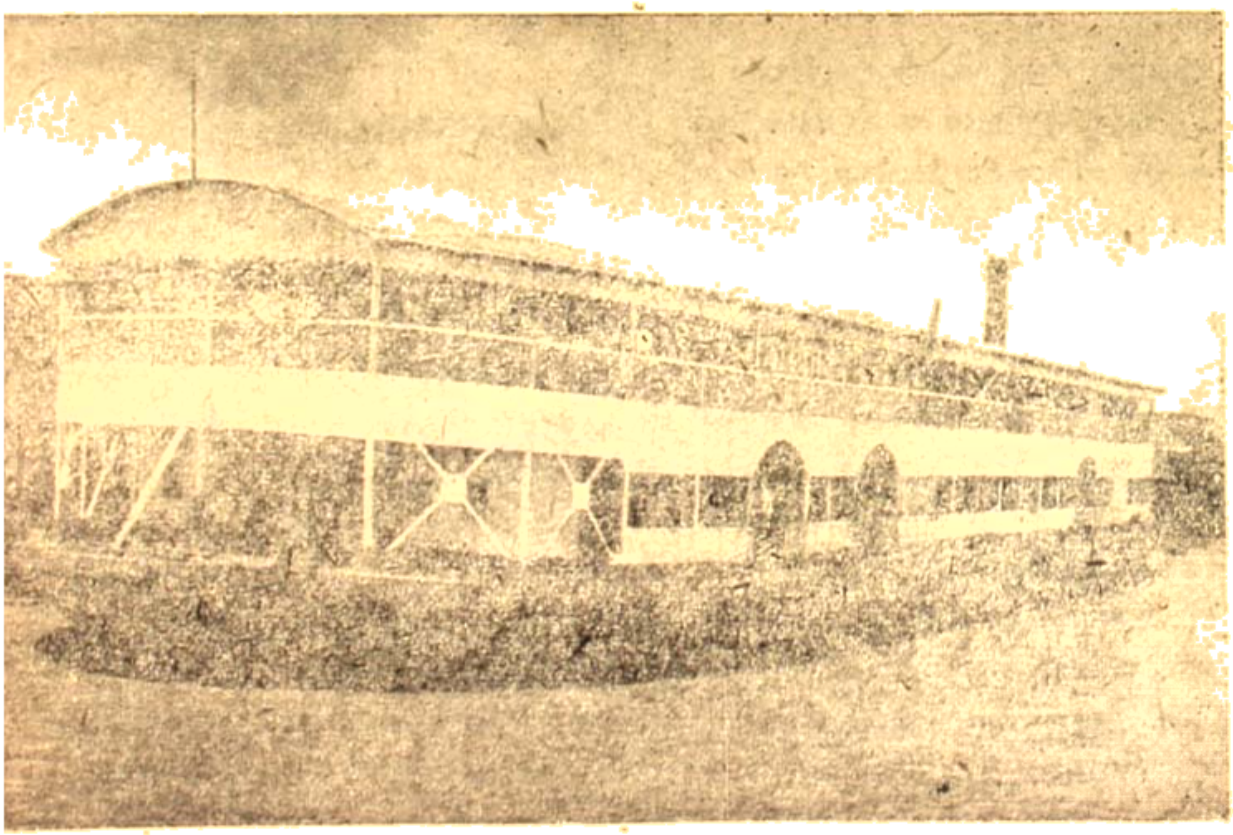

বর্ষায় প্লাবনের আশঙ্কা এত প্রবল। কুশী, শোন, গণ্ডক প্রভৃতি পরিকল্পনার পরেও এ আশঙ্কার কোনও লাঘব হবে না। বরং প্লাবনের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ, এখনও যে জল প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার খাতের পলির চর কেটে নিয়ে গর্ভের উন্নয়ন করে, সে-জল থেকে বঞ্চিত হয়ে গঙ্গা আরও মজে যাবে, সামান্য আকস্মিক অতিবৃষ্টির জলও সুষ্ঠু ভাবে দ্রুত নিকাশ করতে পারবে না। এই "দ্রুত নিকাশেই" প্লাবন প্রতিহত করা যায়।

সরকারের তরফ থেকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বোর্ড গঠিত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের কর্মতৎপরতার পরিচয় দেশের মানুষ এখনও পায়নি।

গত পাঁচ বছরেই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী হুগলী নদী দ্রুত মজে যাচ্ছে। ১৯৫৯-এর প্লাবনে দেখা গেল, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর প্রবাহ বিপরীতগামী হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ভাগীরথীর গর্ভ মূল গঙ্গা-পদ্মার গর্ভ থেকে অনেক উঁচু হয়ে গিয়েছে।

কাজের জন্যে জল ধরে রাখার ফলেই ফরাক্কা বাঁধ ও নিম্নগঙ্গার আজ এই দুরবস্থা। এর প্রতিকার করতে হলে প্রথমেই বাঁধেদের পরিকল্পনায় দেড়শ খালগুলি অবিলম্বে ড্রেজ করে দেওয়া দরকার। এই খালগুলি (যার দুর্গাপুরে তথাকথিত নাব্যখাল) অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূমিতে খনন করা হয়েছে। তাদের দু'পাশে আবার মাটির বাঁধ। ওই অঞ্চলের স্বাভাবিক জল নিকাশের বিরাট প্রতিবন্ধক। সেইজন্যে আজ বর্ধমান হুগলি হাওড়া জেলার বিস্তৃত অংশ সহজেই প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে প্রতি বর্ষাকালে।

কথা উঠতে পারে, আজকের দিনে রেলপথ, রাজপথ ও আকাশে যখন যাত্রী ও মাল তাড়াতাড়ি বহন করে নেওয়া যায়, তখন পশ্চিমবঙ্গে নাব্য জলপথের সুপ্রাচীন পন্থা ধ্বংস হয়ে গেলে ক্ষতিই বা কি? কিন্তু নাব্য জলপথে অধিক পরিমাণ মাল যেরকম অতি সুলভে সুদূরে চালান দেওয়া যায়, এমন আর কোন পথেই আজও সম্ভব হয়নি। দেশের শিল্পের উন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

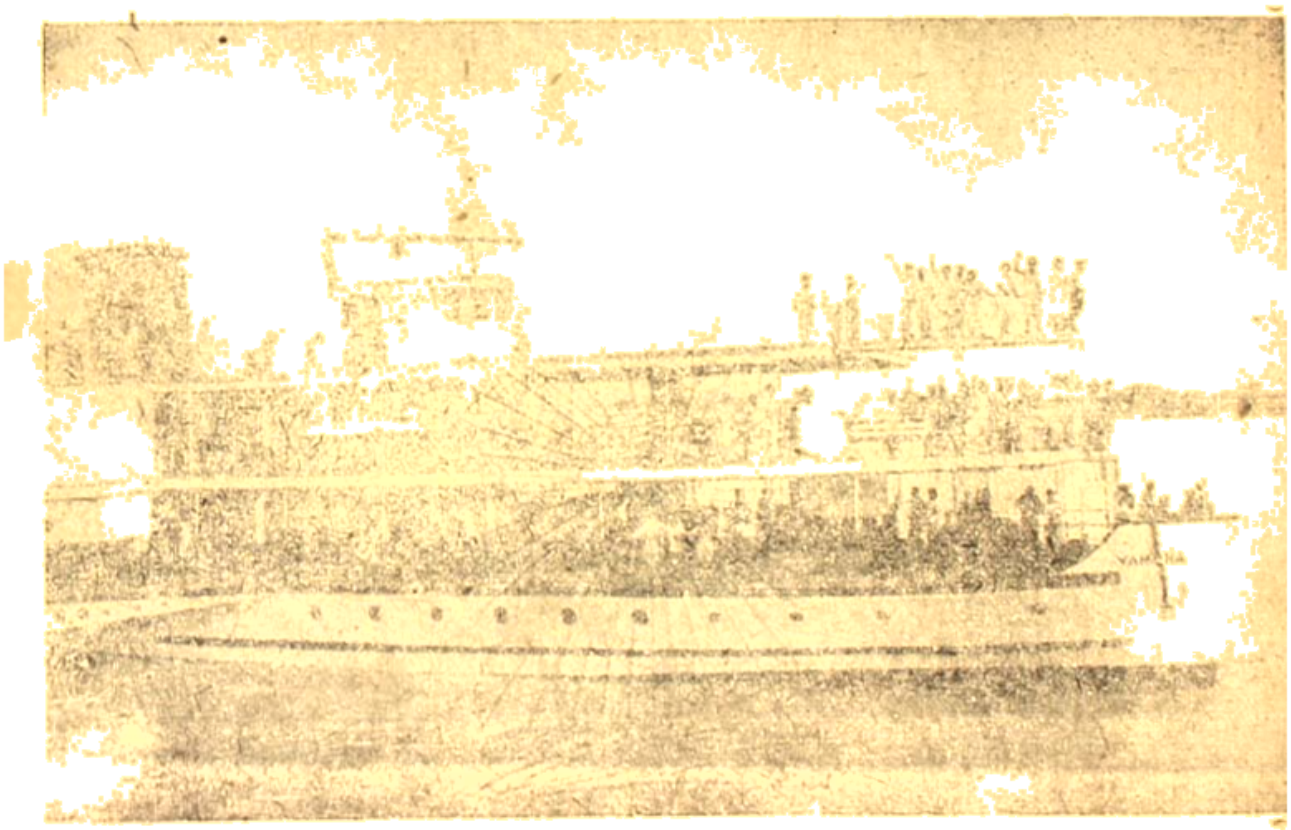

হলে ঘণ্টায় পনের দেশান্তরে চলাচল করে কোনদেশের রেলপথ ও রাজপথ তা পরিবহন করে উঠতে পারি না। একমাত্র ফ্রান্সের কথা মনে রাখলেই একথাটা বোঝা যায়। এই প্রবন্ধে ফ্রান্সের জলপথের কথার বর্ণনা করেছি, কিন্তু সেদেশে রেলপথ ও রাজপথও সারা দেশটাকে জালের মত ছেয়ে রয়েছে—তবু সেখানে নাব্য-জলপথের এতো প্রয়োজন। পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর দেশগুলিই নাব্য-জলপথের প্রসারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছেন, সংক্ষেপে হলেও সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিজলের অঙ্গে জলাভূমির সৃষ্টির হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে, অথবা ভরাবহ প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে, হুগলী নদীর জলনিকাশ ক্ষমতার উন্নয়ন সাধন অপরিহার্য। কারণ হুগলী নদীই প্রধান জলনিকাশী পথ পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা পদ্মার শিখাংশের। এই জলনিকাশী উন্নয়ন কাজের সুষ্ঠু-বিজ্ঞান সম্মত পন্থাই হুগলী নদীর নাব্যতারও উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

আজ কলকাতা বন্দরের আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের জাহাজ-নির্মাণ ও মেরামত শিল্পও ধ্বংস হতে বসেছে। তাদের সঙ্গে জড়িত বহু অঙ্গ শিল্পও ধ্বংস হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে এক নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কলিকাতা বন্দর এবং শিল্পাঞ্চল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বনিয়াদ ও কাঠামো। এই বন্দর, এই শিল্পাঞ্চল যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সে পশ্চিমবঙ্গেরই সর্বনাশ একথা বাঙালীর কখনও ভোলা উচিত নয়।

দুঃখের বিষয়, বাঙালী আজও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ নয়, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা বন্দরকে যে রক্ষা করবার কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করছেন না, শুধু তাই নয়। বরং নিম্নহুগলীর নাব্যতা যাতে আরও সত্বর ধ্বংস হয়ে যায়, তারই বন্দোবস্ত করতে উদ্যত। রূপনারায়ণ নদে কোলাঘাটের কাছে জাতীয় সড়কের উপর যে কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন সেই সেতু নদীগর্ভে অনেকগুলি পোস্তা গেঁথে নির্মিত হবে। তার ফলে রূপনারায়ণ, হুগলি আরও দ্রুততর গতিতে বুজে যাবে। জোয়ার ভাঁটা খেলা রূপনারায়ণে যদি নতুন সেতু নির্মাণ করতেই হয়, তবে তা নির্মিত হওয়া উচিত নদীগর্ভে একটিও পোস্তা না গেঁথে। তবেই রূপনারায়ণ হুগলীর নাব্যতা ও জলনিকাশ ক্ষমতা অব্যাহত রাখা যাবে।

মুখাবরণ

• আশা দেবী •

একটা কাঁকড়া খোকাকে আজ কিনে দিতেই হবে—ইন্দ্রাণী ভাবছিল। আজ কদিন ধরে ছেলেটা সব সময়েই বলে কাঁকড়া খাবার কথা। মাত্র একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পায় ইন্দ্রাণীর স্বামী অনুকূল। খোকা শিশু হলেও বোঝে একশো টাকা মাইনে পাওয়া বাবা বাজারও বারনা ধরলে তাকে পাহাড় ইলিশ এনে দেবে না। সুতরাং তার বায়না শুধু ছ'আনার কাঁকড়ার জন্যে। তা-ও ইন্দ্রাণী জোগাতে পারেনি—। কত চেষ্টা করেছে কিন্তু ছ'আনা বাড়তি পয়সা তার কিছুতেই জুটে আসেনি। রোজই রাতে শুয়ে যখন ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—; জুরাদিনের কড় কচে বালির আস্তরণ গুলো ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলতে থাকে—খোকা ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে

: আনবো—আনবো। এবার মাইনে পেয়ে আগে কাঁকড়া কিনবো, পরে অন্যকথা।

: আচ্ছা— খোকা রোজকার মতই কি যে বোঝে, ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে—আর কথা না বলে।

ইন্দ্রাণী জানে হরিণঘাটার দুধের চাকরীর জন্যে ছ'আনার কাঁকড়া কেনা কারুর আটকায় না

তবু সংসারের নানা টুকিটাকি খরচের মধ্যে পা খোকার ছোট্ট আবদারটা যেন খুনির মধ্যে প কুটোর মত কোথায় হারিয়ে যায়। অনুকূলের অ যেন একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে মাথা শুদ্ধ কিনে নিয়েছে। যেতে হয় ন'টায়, ফেরে প্রায় সাতটা— মধ্যে যেন ওকে একেবারে খাতায় লিখে ফেলে ওর যখন ফেরে তখন মনে হয় ওর মুখখানা কাগজে

মত সাদা হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে স্বামীর কাছে কোন আব্দার নিয়ে যাওয়ার মত নিষ্ঠুরতা ইন্দ্রাণী করতে পারে না। যেন ভাঙাটে ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া—মেজাজের কোন দিশে পাওয়া ভার। ঘর-কন্নার কোন কথা বলতে গেলেও খ্যাচ-ম্যাচ করে ওঠে। ইন্দ্রাণী কোন কথা প্রায়ই বলে না। আর বলবেই বা কাকে? অনুকূল এসেই যে ভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ে তা দেখে ভারি মায়া হয় ইন্দ্রাণীর। দুধ-বিক্রির কাজটা সে নিত না—কিন্তু যদি সংসারের একটুও সাহায্য করা যায় এই কথা ভেবেই সে কাজটা নিয়েছে। মাঝে মাঝে যখন বিরক্ত হয়ে যায়—মাত্র কুড়ি টাকার জন্যে হাজার লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যখন মুখ দিয়ে কেনা উঠতে চায় ইন্দ্রাণীর তখনও হাসতে হবে, কালো মুখে কথা বলবার উপায় নেই—। সাধারণের সেবক তারা, সদা হাস্য মুখে থাকারই রীতি তাদের; ঘিটঘিটে বদমেজাজী হলেই চাকুরী যাবে।

একদিন বলেই ফেললো অনুকূলকে: মাত্র কুড়ি টাকার জন্যে সকালের তিন-চার ঘণ্টা কেটে যায়। ওটা আমি ছেড়ে দেব।

অনুকূল খেতে বসেছিল। একটা শুকনো বিদম খেলো—তারপরে বললে: মাসে কুড়িটা টাকা কি সস্তা? আজকালকার দিনে লোকে একটা পয়সা সাহায্য করে না আর তুমি চাকরীটা ছেড়ে দেবে?

: ছাড়বো না। এমনিই বললাম। —ইন্দ্রাণী জানে এর বেশী কথা বললে অনুকূল খাওয়া ছেড়ে উঠে যাবে। কিন্তু মুখের ডগায় এসেছিল: তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখছ না? কি চেহারা হয়েছে আমার। ওই কটি টাকার জন্যে কি মরতে বলো আমাকে? নফর তো চাকরকেও এর চাইতে বেশী মাইনে দেয়। কিন্তু বলে নি কিছুই, বলতে মুখ বেধে গেছে। আহা—খেতে বসেছে—মাসে কুড়িটা টাকার লোকসানের কথায় ওর গলা দিয়ে অন্ন রুচবে না অথচ বাইরে কাজ করে এসে সংসারের কাজ করতে ইন্দ্রাণীর যে কী কষ্ট হয় তা আর সে কাকে বোঝাবে।

না:—আজ খোকার জন্যে কাঁকড়া সে কিনবেই কিনবে। বাচ্চা ছেলেটাকে শুধু মিথ্যে আর প্রবঞ্চনায় কত দিন এমনি করে ভুলিয়ে রাখা যাবে? কে হয়তো অনুকূলকে দিয়েছে: ভুলে গেছি বাবা। ঠিক আনবো।

: রোজ রোজ তুমি কেন ভুলে যাও বলতো? —খোকার কান্না পায়।

: তোর কাঁকড়ার ওপর এত ঝোঁক কেন? বলতে গিয়েও মুখে আটকে যায়। মাত্র দু-আনার বিনিময়ে আর ওকে কি-ই বা খাওয়ানো যাবে, ডিম? ও খেতে চায় না। আজ ও আর কোন কথাই শুনবে না। কাঁকড়া ওকে এনে দিতেই হবে, যতটা না খাবার ইচ্ছে তার চাইতে বেশী সখ ওটার ওপর খোকার। না—সখটা খুব মারাত্মক নয়। এটা তার পূরণ করাই উচিত।

পূরণ তো অনেক কিছুই করা উচিত। সব উচিতই কী জীবনে সম্ভব। নিজের সেলাই করা সাড়ী-খানার দিকে তাকিয়ে তার একটা বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। গরীবের মেয়ে বটে, কিন্তু ছেঁড়া কাপড় সে কখনও পরেনি।

কলেজে পড়বার সময় নন্দিতা তাকে ঠাট্টা করে বলতো: বাব্বা ইন্দ্রাণীকে দেখে মনে হয় যেন বিয়ের কনে-টি।

: কেন হিংসে হয় বুঝি?

: হয় বৈকি! সব সময় এমন টিপ্‌টপ্—মনে হয়—

: কি মনে হয়? ইন্দ্রাণী বেঁকে দাঁড়ায়।

জানে সে এরা কি বলবে ওকে। ওর দারিদ্র সত্ত্বেও কেন ও এত পরিচ্ছন্ন। কেন ও সর্বদা অমন সেজে গুজে থাকে। অথচ ইন্দ্রাণী জানে নিজে হাতে কাপড় কেচে—ও কিভাবে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। নন্দিতা হয় তো কিছু বলে না কিন্তু ও জানে সে মনে মনে ওকে হিংসে করে। ধনীর দুলালী নন্দিতা। কেন যে ওকে অমন হিংসে করে, তার সঙ্গত কারণ কিছু খুঁজে পায় না ইন্দ্রাণী।

ভিসিটার্স রুমটা বারোয়ারী। এক একটা টেবিল ঘিরে ঘিরে চারটি করে চেয়ার। রবিবারে সবারই ভিজিটার প্রায় আসে। নন্দিতা বলেছিল আমার সঙ্গে

[illegible] সঙ্গে দেখা করতে আসবে। বিরাট বড়লোক, নিজে আই.সি-এস। খুব সংক্ষেপে ইন্দ্রাণী বলেছিল : বেশ, দেখাস্।

কিন্তু দেখাতে হয়নি ইন্দ্রাণীকে। দারোয়ান যখন স্লেট নিয়ে নন্দিতার ঘরে এলো তখন ইন্দ্রাণী ঘরেই বসে। বললে এই এসেছে—দেখবি?—মুখখানা নন্দিতার আনন্দে ঝলমল করছে।

: দেখবো আর কি?—ইন্দ্রাণী খুব শান্ত ভাবে বলে। কিন্তু নন্দিতা ভীষণ চটে যায়। বলে : তাই ছোট মন তোর, কারুর ভালো দেখতে পারিস না। গরীব হলে কি মনও ছোট হতে হবে?

: তোমারটা তো তাই যাই পরি না—। গরীব আছি আমি-ই আছি তুই আমাকে তো আর অর্থ সাহায্য কর না। এত কথা শোনাবার কি আছে।—বলেই অভিমানী ইন্দ্রাণীর চোখে জল টলটল করে উঠলো।

কেঁদেই সে ফেলতো কিন্তু দারোয়ান এসে খবর দিলো তারও ভিজিটার এসেছে।

[illegible] আধময়লা ধুতির সঙ্গে পেট আঁটা হাত ছোট কোট সব মিলিয়ে যেন একটা দারিদ্রের প্রতিমূর্তি। ও সামনেই বসে নন্দিতা ফিটফাট সুদর্শন ছেলেটি সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল, আর ইন্দ্রাণীর দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছিল।

: মেয়েটি আমার সঙ্গে পড়ে—ভাবী স্বামীর স ইন্দ্রাণীর পরিচয় দিয়েছিল নন্দিতা।

: ভারি সুন্দর দেখতে তো। খুব বড়লোকে মেয়ে বুঝি?

: ও অমনিই সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে যাকে দেখছো না ওর মামাকে—একেবারে ছেলে চাষা—

: মেয়েটি কিন্তু বেশ—

: পছন্দ হয় বুঝি? নন্দিতা যেন জ্বলে গেল।

: না—না! ভালোকে ভালো বললেও দোষ—?

নন্দিতা উঠে গিয়েছিল। তারপর সারাদিন ইন্দ্রা সঙ্গে কথা বলেনি। ভাববাচ্যে কেবল শুনিয়েছে কত গরীব আর নন্দিতাদের কটা মোটর আছে।

কেমন করে কেটে গেল কলেজের সেই দিনগুলো আজ ইন্দ্রাণীর তাই মনে পড়ে। বাবা অনেক চেষ্টা করে একটা বিয়ে অবশ্য দিয়েছেন। অনুকূল একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পায়। এই বাজারে একশো পঁচিশ টাকায় কী হয়? কলেজে পড়বার সময় ইন্দ্রাণী নিজের হাতে কাপড় কেচে পরিপাটি করে চুল বেঁধে চলে বজায় রেখেছে কিন্তু এখন যেন আর কিছুতেই ওসব সম্ভব হচ্ছে না।

তবু খোকার ছোট্ট একটা শখ—একটা আব্দার এ তো আর অবহেলা করা চলে না সংসারের ভালোমন্দ ও তো এত বোঝে না। রোজই অপেক্ষা করে থাকে আজ বুঝি ওর কাঁকড়া আসবে। ইন্দ্রাণীরও কষ্ট লাগে। ছোট্ট জিনিস তবু তাই নিয়ে ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলছে। এ বড় বেশী মিথ্যুরতা হয়ে যাচ্ছে যেন—ওর ওপর। না—এ চলবে না আর।

খোলা খোলা আকাশটার দিকে একবার তাকিয়ে ইন্দ্রাণী বাজারের দিকে পা বাড়ালো। আজ নেবেই। বাড়ী ফিরে সে খোকাকে ঠকাবার জন্যে বলবে: বলতো তোমার জন্যে কী এনেছি?

: কাঁকড়া—! বহু প্রত্যাশিত বস্তু।

: হ্যাঁ—ইন্দ্রাণী ওর মুখের কাছে ওটাকে ছেড়ে দিলেই খোকা হাততালি দিয়ে লাফাবে।

ইন্দ্রাণীর সেই কল্পনাটুকু যেন ভারি মধুর লাগছে।

: জোড়াটা কত? ইন্দ্রাণী এক কাঁকড়া ওয়ালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

হাতের সাঁড়াশি নামিয়ে রেখে বললে: আট আনা জোড়া।

: কম হবে না? ইন্দ্রাণী দর করবার চেষ্টা করলো, কাঁকড়াওয়ালা কথার জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসলো।

কিন্তু জোড়াটা কেনবার পয়সা তার সঙ্গে নেই। কাজেই একটাই কিনতে হলো।

ভাল করে রুমালে বেঁধে নিয়ে ইন্দ্রাণী বাড়ীর দিকে পা চালালো। খানিকটা দূরে গিয়ে যেন মনে হলো রুমালটা খালি। ছেঁড়া রুমালের ফাঁক কাঁকড়াটা পড়ে গেছে কখন, ইন্দ্রাণী জানতেও পারেনি।

আকাশ যেন ভেঙে ইন্দ্রাণীর মাথায় পড়লো। আঁতি-পাতি করে সে খুঁজতে লাগলো পথে। কাঠি দিয়ে দিয়ে নর্দমার মুখগুলো খুঁজতে লাগলো পাগলের মত। কি বলবে সে খোকাকে—সেই ছোট্ট মুখখানা যেন বার বার তার কানের কাছে মুখ রেখে বলতে লাগলো মামণি এনেছ? না—না। সে হতে পারে না। খুঁজে সে বের করবেই। পথের পাশে পড়ে থাকা ডাবের খোলা থেকে আরম্ভ করে কলাওয়ালার বুড়ি পর্যন্ত কিছুই বাদ দিলো না। কি জানি হয় ওটা হেঁটে গিয়ে ওই কলাওয়ালার বুড়ি বা ডাবের তলায় লাকিয়ে আছে।

না—পাবে না সে। চোখে জল আসতে চাইছে।

সামনে ঝকঝকে তকতকে একটা মটর থামলো—আর তার থেকে একটি সুদর্শন ভদ্রলোক নামলো। সর্বাঙ্গে গয়না আর সাড়ী ঝিলিক দিয়ে নামলো নন্দিতা।

ওর মলিন আটপৌরে সাড়ী আর রুক্ষ চেহারার দিকে তাকিয়ে বললে, ইন্দ্রাণী না? তখন থেকে দেখছি কে যেন পথের কাদায় কি যেন খুঁজছে। তোর একি চেহারা। দেখে তো চেনাই যায় না। কি খুঁজছিস অমন করে পাগলের মত?

: একটা একশো টাকার নোট! উনি আমার জন্মদিনে দিয়েছিলেন। হারিয়ে গেছে—মনে হচ্ছে পথেই পড়েছে যাকগে—ওর জন্যে মাইণ্ড করি না। চাইলেই এখুনি আর একটা পাব। চাইবো—?

—খ্যাঁ?—তা চাইবে বইকি।

: —কেমন হকচকিয়ে জবাব দিল নন্দিতা, তারপর নন্দিতা বললে: তাহলে ভালই আছিস দেখছি।

: হ্যাঁ—তাই, তা মন্দ নয়। পাম এভিনিউতে উনি বাড়ী করেছেন, বাস একদিন—। যাবি কিন্তু—

: কত নম্বর—? নোটবুক বের করলো নন্দিতা। কিন্তু কোন উত্তর দেবার আগেই দু-নম্বর বাসটায় উঠে পড়েছে ইন্দ্রাণী—। নম্বর বলবার জন্যে সে আর অপেক্ষা করতে পারেনি।

বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসংগীত
প্রাচীন যুগ - চীন ও দূরপ্রাচ্য

অজয় সিংহরায়

'সঙ' রাজত্বকালের পরবর্তী যুগের 'চৌ' রাজত্বকালের সমসাময়িক সাহিত্য শিলালিপি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত বাদ্যযন্ত্র সমূহের তালিকা ও বাদনশৈলী বিষয়ক বর্ণনা অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত মালমশলাদি অপেক্ষা অনেক নির্ভরযোগ্য। সেই যুগে চৈনিক যন্ত্রসংগীত যে প্রধানতঃ মন্দিরধর্মী ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ 'চৌ' যুগের মালমশলা থেকে পাওয়া যায়। ঐ যুগে বেশীরভাগ বাদ্যযন্ত্রেই মন্ত্রাদি খোদাই করে লেখা থাকতো। 'চৌ' যুগে এই ধরণের বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে 'চুঙ-তু' নামক তালযন্ত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বারোটি বাঁশের চটীকে চামড়ার দড়ি দিয়ে চাষির খোকার মত করে গেঁথে নিয়ে ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে তাল ঠোকা হতো। তাতে তাল দেয়া ও ঘুমবুমি শব্দ একসংগে মিলে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব সৃষ্টি করতো। মন্দিরের গাইয়েরা সাধারণতঃ এ যন্ত্র ব্যবহার করতেন। বাঁশে চটিগুলোতে মন্ত্রাদি লেখা থাকতো। সে অর্থে ঐ যন্ত্রটিকে পুস্তক হিসেবেও ধরা হতো। সমসাময়িক সাহিত্যে যন্ত্রটিকে পুস্তকরূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামের পূর্বে অন্য আরেকটি বংশ নির্মিত বাদ্যযন্ত্র ছিল। কোরিয়াতে সেটী এখনও 'তক' নামে প্রচলিত।

'চু' নামক যন্ত্রটির অস্তিত্ব খৃঃ পূর্ব আনুমানিক প্রায় ১১০০ সাল থেকে লক্ষ্য করা যায়। দুফুট দীর্ঘ ও প্রস্থ পাটাতন ও চারদিকটা কাত করা অবস্থায় থাকতো। একদিকে একটি গর্ত করে তার মধ্যে একটি কীলক প্রবেশ করিয়ে পাটাতনের সংগে যোগ করে দেওয়া হতো। কনফুসীয় মন্দিরে পূজোর সময় প্রত্যেকটি মন্ত্রোচ্চারণের সংগে চারবার করে কীলকটিকে ঘা দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ধান মাড়ার যাঁতার সংগে এ যন্ত্রের কোন না কোন যোগাযোগ ছিল। কৃষিপ্রধান চৈনিক সভ্যতাতে এর একটা বিশেষ স্থান থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এও বোঝা যায় যে এ বাদ্যযন্ত্রটী কৃষিসংক্রান্ত কোন পূজো-পার্বনের সংগে জড়িত ছিল। মালয়'এ এখনও কুকুরা যাঁতা দিয়ে ধান মাড়াইকরার রেওয়াজ আছে।

মু-ইয়ু:—'তাঙ' ও বৌদ্ধ ধর্মাচরণের প্রভাবে চাক জাতীয় এই বাদ্যযন্ত্রটীর সৃষ্টি। চৈনিক মু-ইয়ু কথাটির অর্থ কাষ্ঠ মৎস্য। একখণ্ড কর্পূর কাঠকে মৎস্যাকৃতি করে নিয়ে তাকে কোনক্রমে ফাঁপা করে নেওয়া হতো। যন্ত্রটির প্রস্তুতকারক একটি কাষ্ঠ গোলক যন্ত্রটীর ভেতর এভাবে ঢুকিয়ে দিতেন যে গোলকটি ভেতরে ঘুরে বেড়াতে পারে অথচ বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা তার থাকে না। ঝুলিয়ে নিয়ে কিংবা কোনকিছুর ওপর রেখে একটা ভারী দণ্ড দিয়ে আঘাত করে এ যন্ত্রটি বাজানো হতো। যন্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পী ইচ্ছে করেই মাছটির চোখের পাতা খোদাই করতেন না। কারণ একে তাঁরা অনন্তকাল ধরে বিনিদ্র দৃষ্টিতে থেকে মনুষ্য সমাজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকার প্রতীক বলে মনে করতেন। বাদ্যযন্ত্রটির অবয়ব মৎস্যরূপী জলচর প্রাণী হওয়াতে মনে হয় যে বরুণ দেবতার অজেয় এ যন্ত্রটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলো। তাছাড়া চৈনিক কিম্বদন্তীতে পুনর্জন্ম ও মৃত্যুর সংগে মৎস্যের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মনে হয় বাইবেলে বর্ণিত তিনি যাদুর পেটে 'জোনা'র অবস্থানের মত এই কাষ্ঠনির্মিত মৎস্যের পেটের মধ্যে অবস্থিত গোলকটির কোন বিশেষ ধরণের অর্থ ছিল।

ইয়ু—তাল জাতীয় এই বাদ্যযন্ত্রটিরও কনফুসীয় ধর্মাচারের সংগে যোগাযোগ ছিল। এর অবয়ব ছিল শিকারের দিকে অগ্রসরমান একটি বাঘের মত। চৈনিক সভ্যতাতে বাঘকে পশ্চিমদিকের এবং ফসল তোলার প্রতীক আবার সূর্যাস্তের ও মৃত্যুর প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়ে থাকে।

খৃঃ পূর্ব সালে চৈনিক সংহিতোর সর্বপ্রথম 'সুষির' যন্ত্রের উল্লেখ করা যায় 'কুয়ান' নামে একটি যন্ত্র ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল। সঠিকভাবে যন্ত্রটির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত হলেও একথা বলা যায় যে তাতে তিন চারটির বেশী সুর ব্যবহার করা যেতো না।

এ প্রসংগে চৈনিক সভ্যতার অপর একটি দিক আলোচনা করা প্রয়োজন। এতে বোঝা যায় যে সেই প্রাচীন যুগেই চৈনিক সম্রাটরা জীবনের সর্বক্ষেত্রের বিবিধ চর্চা যেন নির্ভুলভাবে অগ্রসর হয় সেদিকে কেমন সচেতন দৃষ্টি রেখেছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী-দপ্তরের মধ্যে একটি বিশেষ মন্ত্রীদপ্তর খোলা হয়েছিলো, যার কাজ ছিল বিভিন্ন বিষয়ের মান নির্ধারণ। শিক্ষা ব্যবস্থা, বাণিজ্য, বিনিময়, ভৌল ব্যবস্থা, ক্রীড়া ইত্যাদির নিয়মকানুন, পরিচালনা ব্যবস্থা ইত্যাদির মান সবই এ দপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। এ দপ্তরের একটি বিশেষ বিভাগ সংগীত সংক্রান্ত সর্বব্যাপার পরিচালনা করতেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁরা সংগীতচর্চাকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন। সুর বিভাগ, তাল বিভাগ, ও স্বরলিপি সংক্রান্ত বিভিন্ন মান এঁরা নির্ধারণ করে দিতেন যাতে এসব সর্বজনগ্রাহ্য ও মান্য হয় এবং নিয়ম প্রণালী সর্বত্র এক হয়। এই দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত বারোটি সুরকে ভিত্তি করেই চৈনিক সংগীত গড়ে উঠেছিলো। বিশ্বচরাচরকে পুরুষ ও প্রকৃতির রূপ হিসেবে চৈনিকরা 'ইয়াং' এবং 'ইন' বলে সাংগীতিক দিক দিয়েও উপলব্ধি করতে চাইতেন। সংগীতকে তাই বিশ্ব প্রকৃতির প্রতীক বলে বারোটি সুরের ছয়টিকে পুরুষ ও ছয়টিকে স্ত্রী বলে ধরতেন। 'সংখ্যা'ও স্ত্রী, পুরুষ হিসেবে ধরা হতো। তদনুসারে ১ম, ৩য় ও ৫ম 'লু' অর্থাৎ সুরের মান পুরুষ এবং ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ 'লু'কে স্ত্রী হিসেবে ধরা হতো। এই বারোটি 'লু' বা সুরের মানকে বর্তমানকালের ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত সুরের সমগোত্রীয় ভাবলে ভুল করা হবে। বাঁশী দিয়ে 'লু' গুলি নির্ধারিত করা হয়েছিলো বলে মনে হয় না যে সেগুলি নির্ভুল ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত চৈনিকেরা ১৪টী 'লু'র মান প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'লু'র মান-সম্বলিত বাঁশের বাঁশি একত্র করে চৈনিক 'প্যান পাইপ' বা গ্রীক ধরণের রাখালিয়া বাঁশী 'পআই সিয়াও' সৃষ্টি হয়। এ যন্ত্রটিকে কতগুলি বাঁশির সমষ্টি বলা যেতে পারে। দৈর্ঘানুসারে গোল কিম্বা পাশাপাশি করে বেঁধে যন্ত্রটি তৈরী করা হতো। প্রথম যুগে ১২টি 'লু' বা সুরের বাঁশী একত্র করে এ যন্ত্রটি তৈরী করা হলেও শেষ পর্যন্ত চৈনিক 'পাআই-সিয়াও' ১৬টি সুরের বাঁশী দিয়ে তৈরী করা হতো। এরই মধ্যে আবার পুরুষ ও নারীর প্রতীক সুরগুলোকে আলাদা করে সাজানো হতো। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের সুরের মিলনে নতুন এই বাদ্যযন্ত্রটি সৃষ্টি হলো। এ ধরণের যৌন ব্যাখ্যা প্রাচীন জগতের অনেক দেশের অনেক বাদ্যযন্ত্রের সম্বন্ধেই পাওয়া যায়—বিশেষ করে সুদূরপ্রাচ্যের দেশ সমূহে।

চৈনিক সভ্যতার ৩০০০ হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র কয়েকটি সুষির যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে খৃঃ পূর্ব অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে 'চি' ও 'ইউয়ে' ও একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 'কুয়ান' ও সিয়াও' এবং পরবর্তী কালে 'ইউ' ও 'তি' নামের কয়েকটি বাঁশির সন্ধান পাওয়া যায়। এত দীর্ঘকালের মধ্যে বহু প্রকার পরিবর্তন স্বাভাবিক। সুতরাং এসব যন্ত্রের নামগত অর্থের ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক হবে না। 'চি' নামক বাঁশের বাঁশির মহত্ত্ব সম্পর্কে তৎকালীন সাহিত্যে অনেক উল্লেখ রয়েছে। সহজেই অনুমান করা যায় যে যন্ত্রটি খুব জনপ্রিয় ছিল। 'কুয়ান' ও 'তি' নামক বাঁশি প্রায় একই যন্ত্র ছিল। 'তি' তে তিনটি ছিদ্র আর 'কুয়ান' এ কোন ছিদ্রই থাকতো না। 'সিয়াও' যন্ত্রটি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। অনেকে একে প্যান পাইপ বলে ধরেছেন। 'পআই সিয়াও' যন্ত্রটি বারো কিম্বা চৌদ্দটি 'কুয়ান' এর একত্র সমাবেশে প্রস্তুত সুতরাং এই নামের অন্য 'প্যান পাইপ' ধরণের বাদ্য থাকবে এ কষ্ট কল্পনা বলে মনে হয়।

'ইও' নামক বাঁশিতে বর্তমানে ৬টি ছিদ্র। কিন্তু প্রথমযুগে এতে তিনটি ছিদ্র ছিল। এ ধরণের অনেক

পরিবর্তন ও পরিবর্ধন চৈনিক বাঁশি যন্ত্রাদিতে লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে বাঁশির ব্যাপারে। এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। ছিদ্র করবার বর্তমান যে পদ্ধতি অর্থাৎ বাঁশির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সুরের ও পরিমাপের যে সম্পর্ক সে বিষয় প্রাচীনযুগের চৈনিক বংশীবাদকরা নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন না। কেন না এই তত্ত্ব ও জ্ঞান বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা মানুষের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং মনে হয় বংশীবাদকরা স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী ছিদ্রগুলি করে নিতেন কিম্বা কোন বিশেষ বর্ণাচারের সঙ্গে ছিদ্র পদ্ধতির যোগাযোগ ছিল এবং ছিদ্রগুলোর কোন একটি বর্ণীর ব্যাখ্যা করা হতো।

'সেঙ বা চৈনিক মাউথ অর্গানের শব্দাধার প্রথমে শুকনো লাউ এর খোল দিয়ে প্রস্তুত করা হতো। পরবর্তী কালে লাউ এর পরিবর্তে কাঠের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ওপরের দিকে ফুঁ দেবার স্থান ও শব্দধারটি বায়ুরক্ষণী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বায়ুরক্ষণীর মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও বিভিন্ন সুরের সরু বেতের বাঁশি বসিয়ে সম্পূর্ণ যন্ত্রটি তৈরী করা হতো। প্রত্যেক বাঁশিতেই ওপরের দিকে এক ধারে একটি ছোকো ছিদ্রতে একটি ধাতুনির্মিত জিব (বর্তমান ক্ল্যারিওনেটের মত) বসানো থাকতো। এর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে ছিদ্র ও 'জিব'এর সংস্পর্শে এর স্বর সকার হতো না বরং বায়ুর আঘাতে জিবটি দুদিকে নড়তে থাকতো। সুতরাং যন্ত্রীকে ফুটোতে অঙ্গুলী সংস্থাপন দ্বারা স্বর নিয়ন্ত্রন করতে হতো। তার জন্য ফুঁ দিয়ে পূর্বেই প্রয়োজনীয় বায়ু বায়ুরক্ষণীর ভিতর জমিয়ে নেওয়া হতো। এ যন্ত্রটির 'জাপান' দেশীয় সংস্করণের নাম 'সো'। যন্ত্রটির স্বর মৃদু অথচ অত্যন্ত মধুর।

জাপানের রাজদরবারে এ যন্ত্রটির খুবই কদর ছিল। এ যন্ত্রটির প্রস্তুত প্রণালী ও বাদন পদ্ধতি ইত্যাদি সবই যে মহাচীন থেকে জাপানে এসেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বহুদেশে এ যন্ত্রটি এদেশ থেকে গিয়েছিলো। অবশ্য পরবর্তীকালে কিম্বা ঐ সময়ই 'স্থানীয় পরিবর্তন' কিছু কিছু হয়েছে।

খৃঃ পূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট 'হু কাওয়া' এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন বলে কথিত আছে। চৈনিক কিম্বদন্তীতে এ যন্ত্রটির পুনর্জন্ম ও দুষ্ট প্রেতাত্মা দূরকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বাজানো হলেও চৈনিক শবযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো এই যন্ত্রটি বহন করে নিয়ে যাওয়া। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এ দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক বিদ্যমান।

পরবর্তী যুগে অন্যান্য দেশেও এ যন্ত্র লক্ষ্য করা গিয়েছে। পারসিকরা একে "মুশতাক চিনি" বলে উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক জর্মন সংগীতজ্ঞ একে "দাই সিয়েংলিসে চাইনিজার ওরগেন" অর্থাৎ চীন দেশের সেই চমৎকার অর্গান বলে অভিহিত করেছেন। এ যন্ত্রেরই খুব স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পরবর্তীকালে অতি মধুর-স্বর সঙ্কলিত কয়েকটি সুন্দর বাদ্যযন্ত্র জন্মলাভ করেছে। এর মধ্যে 'মাউথ হারমোনিকা" এবং ভিয়েন ও হারমোনিয়াম উল্লেখযোগ্য।

চৈনিক আঘাতি তারযন্ত্রের (Plucked) মধ্যে 'চিনি' ও 'সে'র কথা বহু প্রাচীনকাল থেকে চৈনিক সাহিত্যে উল্লেখ রয়েছে। সেই প্রাচীনযুগে জনৈক কবি এ যন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন চৈনিক সাহিত্যে তার উল্লেখ রয়েছে। তিনি লিখেছেন যে এরাকে স্বর্গে পরিণত করতে পারে শুধু মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলি; যেমন স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র প্রেম, অপত্য স্নেহ, দয়া, ক্ষমা, সংযম ও তিতিক্ষা। এর সঙ্গে শুধু 'চিন' ও 'সে'র মধুর সংগীতেরই তুলনা করা যেতে পারে। এই বাদ্যযন্ত্র দুটী প্রায় একই প্রকারের। জিথার বা ভারতবর্ষীয় বেবনতলের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য ছিল। তাছাড়া যন্ত্রের আকৃতি ও বাদন পদ্ধতিও প্রায় একই প্রকারের ছিল। এ যন্ত্র ছিল পর্দাবিহীন (Fretless)। একটী চ্যাপ্টা কাষ্ঠখণ্ডের ওপর যেমন কিম্বা তাঁতের তার আড়াআড়ি ভাবে টানা থাকতো। তারপর দৈর্ঘ্য ও স্থূলতার উপর উদারা, মুদারা ও তারাগ্রামের স্বরগুলি নির্ভর করতো। কনফুসিয়াসের আমলের সাহিত্যেও এর উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী কালে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যন্ত্রগুলি নিকটবর্তী বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রায় একই ধরণের যন্ত্র বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে অদ্যাপিও

প্রচলিত আছে। এ ধরনেরই চৈনিক যন্ত্র 'চেঙ' এর জাপানী সংস্করণের নাম সো কোটো। চৈনিক কিম্বদন্তী অনুসারে এ যন্ত্র প্রথমে বাঁশ-নির্মিত ছিল এবং 'সে' নামক যন্ত্রটীই প্রাচীনতম এবং সেনাপতি 'মঙ তিয়েন' যিনি হুনদের পরাজিত করে ইতিহাস-বিখ্যাত চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেন বলে কথিত আছে তিনিই এ বাদ্যযন্ত্রটীর আবিষ্কর্তা।

এই একই যন্ত্র সামান্য একটু পরিবর্তিত অবস্থায় কোরিয়া ও জাপানে প্রচলিত আছে। জাপানে 'ইচি জেন কিন্' অর্থাৎ একতার বিশিষ্ট, 'নি জেন কিন্' অর্থাৎ দুইতার বিশিষ্ট, 'সান জেন কিন্' অর্থাৎ তিন তার বিশিষ্ট এবং 'সাগে মাগে কোটো' অর্থাৎ নয় তার বিশিষ্ট 'চেঙ' প্রচলিত আছে। অনেক জাপানী সংগীত তাত্ত্বিক দাবী করেন যে 'ইয়া মাতে কোটো' অর্থাৎ ছয়তার বিশিষ্ট 'চেঙ' সম্পূর্ণ ভাবে চৈনিক প্রভাব মুক্ত বরং চৈনিক 'চেঙ' এর চেয়েও প্রাচীনতর।

একই গোষ্ঠীভুক্ত অন্য একটি বাদ্যযন্ত্রকে চীনে 'চিন্', জাপানে 'কিন' বা 'কোটো' এবং কোরিয়াতে 'কুম' বা 'কোমুনকো' বলা হয়। পূর্বোল্লিখিত বাদ্য-যন্ত্র অপেক্ষা আয়তনিক ও বাদনশৈলীগত একমাত্র ব্যতিক্রম হল এই যে এতে পর্দা (Frets) ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য দণ্ডির চেহারা খানিকটা বদলাতে হয়েছে। শব্দধারকের নিচের দিকে পংক্তি এবং ওপরের দিকে আড়া বা স্বরবতী বসিয়ে মাথার দিকটা একটু হেলানো অবস্থায় রাখা হয়েছে। হেলান দিকে লাগানো কানের সঙ্গে শব্দধারকের এবং স্বরবতীর ওপর দিয়ে পাঁচটী কিম্বা সাতটী তার টানানো হতো। সাধারণতঃ এতে রেশমের তারই ব্যবহৃত হতো।

হান্ রাজত্বের সময়ে মহাচীন-সাম্রাজ্য বিস্তার করে শক্তির শিখরে পৌঁছেছিলো। পশ্চিমদিকে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সীমা কাস্পিয়ান সাগরের তীর অবধি পৌঁছেছিলো। পাশ্চাত্য দেশীয় তার-যন্ত্র এ সময় আমদানী হবারই কথা। তাছাড়া চীনারা বিশেষ ভাবে তার-যন্ত্র প্রিয় ছিলেন। কোন স্থান থেকে কোন বাদ্যযন্ত্রটী এসময় চীনে এসেছে কিম্বা পরিবর্তিত অথবা পরিবর্ধিত হয়ে সে যন্ত্র কি অবস্থায় পৌঁছেছিলো তা আজ বলা শক্ত হলেও এ যুগের পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাদ্যযন্ত্র আজও চীনে লক্ষ্য করা যায়। এই সব যন্ত্রের মধ্যে 'পি-পা' যন্ত্রটী জাপানে যাকে 'বিওয়া' বলা হয়—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রের মাথার দিকটা সরু ও ক্রমশঃ নিচের দিকে শব্দধারকের দিকটা মোটা। শব্দধারক ও দণ্ডির ওপরে আলাদা বাধের তবলি বা ঢাকনা। বাঁকা দিক থেকে শব্দধারকের ওপর দিয়ে চারটী তার ব্যবহার করা হয়েছে। তার সাধারণতঃ রেশমেই হতো। বাদন শৈলীর দিক থেকে খুব একটা সম্ভবনা এ যন্ত্রটীর ছিল না। সম্ভবতঃ তাই এ যন্ত্রটী গানের সঙ্গে বাজানো হতো। পরবর্তী কালে নৃত্য ও সমবেত যন্ত্র সংগীতেও এ যন্ত্রটী ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান কালের ব্যবহারের সঙ্গে এ যন্ত্রটীর সাদৃশ্য হয়েছে। 'পি-পা' বা 'বিওয়া'রও অনেক সংস্করণ প্রচলিত হয়েছিলো।

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বলে অনুমিত চৈনিক ভাস্কর্যে পি-পা'র অনেক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এর ঠিক পরবর্তী যুগের জাপানী ভাস্কর্যেও এর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের অন্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে জাপানী 'সাতসুমা বিওয়া' নামক বাদ্যযন্ত্রটী কিউসু দ্বীপে উৎপত্তি বলে, সে যন্ত্রটীর নামের সঙ্গে উল্লিখিত স্থানের যোগাযোগ রয়েছে। এই যন্ত্রটিকে এক ধরণের 'লিউট' বলা চলে। কোলের ওপর রেখে গান গাইতে গাইতে কিম্বা প্রাচীন কাব্য গাঁথা ইত্যাদির সঙ্গে এ যন্ত্রটী বাজানো হতো। 'চিকুজেন বিওয়া', 'নিজেন বিওয়া' ইত্যাদি কতগুলি প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র এরই নিকট সংস্করণ। এ ধরণের বাদ্যযন্ত্রের একটী মূল্যবান সংগ্রহ পিকিং ও টোকিও মিউজিয়ামে রয়েছে।

অন্ধকারের ডায়েরী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

স্বপ্ন অনেক দেখেছি, হয়তো এখনো দেখি, আমি না এরও পরে স্বপ্ন দেখার দায় মিটবে কি না। তবে এখন বুঝি যে প্রথম বসন্তের যে রং ছিল স্বপ্নে আজ আর সে রঙ নেই। কোথায় গেল? সব রং-চুট হয়ে গেছে। বসন্তবাহারী সেই সব মুঠো মুঠো রংবার স্বপ্নগুলো তখন আমার চোখে সত্যের প্রত্যয়ে বাস্তবের—বিশ্বাস—বিকল্প ছিল—তা ছিল সত্যের চেয়ে শক্ত, তাই সংশয়কে আমল দিই নি। যারা আমার কল্যাণ চাইত, যারা আমাকে সার্থক দেখতে চাইত (তাদের সেই সার্থকতার মধ্যে নিছক দামুলিআনা রং-এর পাড়া মাড়াত না তাই) তাদের আমল দিতাম না। কেন না, আমি সে অসাধারণ এই বিশ্বাসটাকে কেমন করে যেন সবাই মিলে আমার মগজে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে।

অহমিকার একটা নেশা আছে। নেশাটায় অনেকগুলি গুণও আছে। আমার স্বপ্নপ্রবণ মনে এই অহমিকার নেশাও এসে বাসা বেঁধে ছিল। ছিল বলছি, কেন আমার ধারণা অহমিকার নেশা আমার ছুটে না, এমনি সে নেশা কাটে না আমার চেয়েও বৃহত্তর অহমিকাওলা চরিত্রের চাপে পড়ে আমি বেচারী টের পেলাম, সেই লোকটি ঐন্দ্রজালিক। সেই লোকটির হস্তের মন্ত্রীরগুলো আমার নিজের কাছে এমন ভাবে হাতে-নাতে ধরা পড়ি দিল যে তাতে আত্মপরিচয় পেয়ে গেলাম। আমার অহঙ্কার আকারে তার চেয়ে হয়তো খাটো—তবু বোধ হয় তার সঙ্গে আমার এইটুকুমাত্র.....

প্রফেসর স্বপ্নসুধা মিত্র ডায়েরী রাখেন, নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে—ডায়েরী 'রাখেন' না বলে, 'লেখেন' বলাই ভালো। কেন ডায়েরীর যে ধরা-বাঁধা নিয়ম সেটা স্বপ্নসুধা মানতে নারাজ। সত্যের ছবহু অনুলিপি ধরে রাখার চেষ্টাকে ফোটোগ্রাফার কিম্বা রিপোর্টারের চাকরীর নকল করা—এই তাঁর ধারণা। তাই তাঁর ডায়েরীতে সত্যের প্রতিফলিত আলো-পাওয়া ভাবনারাই মাত্র ঠাঁই পায়। এটা স্বপ্নসুধার বৈশিষ্ট্য-সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। যেমন তাঁর পৈতৃক নাম 'স্বপ্না'র বদলে একটু পাল্টে নিয়ে 'সুধা'র যুক্ত করেছেন তেমনি।

স্বপ্নসুধা ডায়েরীতে যতটুকু লিখেছেন ততটা আর একবার পড়ে দেখে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। নিজের ওপর একটু বুঝি অপ্রসন্নও হলেন, বললেন—অহমিকার গুণ আছে, কিন্তু কি কি গুণ সেকথাটা বেমালুম এড়িয়ে গেল কেমন করে?

...অনেকগুলি গুণ অহমিকার: যেমন স্বভাব ভীরু মানুষকে আস্বাভাবিক দুঃসাহসী করে তোলে। না, ভীরুতা বলতে সবাই যা বোঝে তা আমি বুঝিনে। অতো কথার দরকার কী! সে যার সামনে পরীক্ষার খাঁড়া উঁচু থাকার সময় যে—আমি পুলিসের লাঠি-চার্জ আর তাদের রুক্ষিনের মতো কালো রং-এর ঢাকা গাড়ির চোখ রাঙানীকে অবহেলা করে মেয়েদের মিছিলে পতাকা ধরে সামনে এগিয়ে ছিলাম সেই-আমিটা অহঙ্কারী ছিল বই কি! কেন না, আরো ও কতো মেয়েই মিছিলে ছিল, কই কেউ সাহসী হয় নি 'লীড' নিতে। ওদের মধ্যে এমনও অনেক ছিল যে পারলে মিছিল এড়িয়ে পালাতো, কিন্তু পারে নি—অহমিকার নেশা ওদের ছিল না, ওরা ভীরু, তাই নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার ধমকে এসে জুটেছিল মিছিলে। আমাকে যারা শিখিয়েছিল: এই হ'ল কর্তব্য, আদর্শের পথে চলতে গেলে এসব করতে হয়; তাদের শেখানোর চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে আদর্শবাদের ঝাণ্ডার তলায় সামিল করেছিলাম ভীরু 'ক্যাডার'দের। মিছিল এগোচ্ছে, লাঠি চার্জ হচ্ছে, টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়ল। কান্না, অন্ধকার, অন্ধকারের ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছি। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে বারবার ওঠানামা করেছে একটা অসহ যন্ত্রণা, যেন আমাকে আরো আরো অতলে টেনে নিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। উঃ···কে আমার হাত ধরে টানছে। পুলিশ! বিড়-বিড় ক'রে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছি। চোখ খুলিনি। যন্ত্রণা? হ্যাঁ? তা-ছাড়া পুলিসের ওই জঘন্য মুখ আমি দেখতে চাইনে।

কানের কাছে কেবল—একটু চেষ্টা করো উঠতে পারবে!

—এ্যাঁ!

চোখ খুললাম। চেনা-চেনা মুখ।

সে বলল—তাড়াতাড়ি, এই এ পাশের গলিতে ঢুকে পড়ি এস! এস, এস!

ভ্রূ আমার বিরক্ত—না পালাবো না।

হাসল সে—বোকা মেয়ে। এ্যারেষ্ট করলে কি কোনো সুবিধে হবে? এরপরও আন্দোলন চালাতে হবে। তোমাকে জেলে পুরলে পরে, সব মাটি, ওঠো ওঠো—

অহমিকা সাড়া দিল, ঠিক, তোমার মতো লীডার···। যদি অহমিকা না থাকতো তাহলে আমার পালানোটাকে অতিসাধারণ ভীরু মেয়ের মতো নিছক পলায়নই মনে করতাম। আর তাহলে তারপর আদর্শবাদের ধ্বজা নিয়ে সগৌরবে নিতান্ত সাধারণ সব মেয়েদের নেত্রী হয়ে ঘুরে বেড়াবার মতো মনের জোরই পেতাম না (যদিও ওই সব ভীরু মেয়েদের অনেকেই জেল-খানায়, হাজতে আমার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট ভোগ করেছে, তবু ওদের সেই 'ক্যালিবার' কোথায়।)

অহমিকার গুণ একটা নয়, এতো গুণ যে তা দিয়ে মামাবলী তৈরী করলেও ফুরোবে না···।

লেখা থামিয়ে স্বপ্নসুধা হাসলেন, তাঁর হাসি পেল একটা দিনের একটি ঘটনার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠাতে। ছবিটা এমন কিছু নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র, (ওদের সঙ্গেই পড়ত) প্রতিনিধি নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের মুখপাত্র হিসেবে 'লন'-এ দাঁড়িয়ে স্বপ্নসুধাদের পার্টির নিন্দে করছিল (এবং স্বপ্নসুধার

ধারণা সে সবই মিথ্যে কেলেঙ্কারী, একবারে এ্যান্টি-প্রোপাগাণ্ডা) স্বপ্নসুধা তেড়ে গিয়ে 'শালা' বলে তার প্যান্টের আঁচল (!) ধরে চেয়ার থেকে নামিয়ে এনে রাগে ফুঁসছিল। সেখানে ছিল ত অনেকে: অনেকে ছেলে অনেক মেয়ে, কিন্তু কে এগোবে স্বপ্নসুধার সামনে। একা ঘরে নিজের হাসিটুকু নিজেই উপভোগ করেন তিনি। না, এসব কথা ডায়েরীতে লেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এখানে আদর্শবাদের সঙ্গে অহমিকা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল, তাই অতগুলি যুবক-যুবতী তেজস্বিনী স্বপ্নসুধার সামনে তিষ্ঠতে ভরসা পায় নি। সত্যিই সেদিনের সেই স্বপ্নসুধা 'শালা' বলেছিল কিনা সেটা স্মরণে আসে না। একথা ও শুনেছে অন্যের মুখে, এবং মাস-কয়েক ব্যবধানে।

নাঃ, এসব লেখার কোনো মানে হয় না। ডায়েরী রচনায় চেয়ে ঢের কাজের কাজ হাতে জমে রয়েছে। পরীক্ষার খাতাগুলো দেখা হচ্ছে না। খাতা নিয়ে বসলেই হীরু পালোয়ান যদি জেগে থাকে (এবং মা বাড়িতে থাকলে সে প্রকৃতির নিয়মকে কলা দেখিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। ঘুম ওর ভয়ে পাড়া ছেড়ে পালায়। মাঝে মাঝে হীরু লাঠি হাতে করে ঘুমকে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়। এটা ও শিখিছে বাপের কাছে) খাতা দেখলে লাঠি ফেলে লাল-নীল পেন্সিলটা নিয়ে গম্ভীর ভাবে নম্বর বসাতে আসে। ফলে তাকে সামলাতে গিয়ে খাতা-দেখা আর হয় না।

রাত এখন সাড়ে এগারোটা। খান আষ্টেক খাতা আজ রাতে কাবার করা যাবে।

বসলেন স্বপ্নসুধা। মেয়েগুলো কিছু লেখা পড়া শেখে না। একটা প্রশ্নের জবাব যদি গুছিয়ে সাজিয়ে লিখতে পারে। অথচ সাজ-গোজের বহর দেখলে সেটা আদৌ মালুম হয় না।

নিজের কথা মনে পড়ল। আজ যেন বড্ড বেশি মনে পড়ছে!···আরে এরা লেখা পড়া শিখবার সময় পাবে কি করে? না সময় যে খুব বেশি লাগে তা নয়—সেটা দরকার সেটা মন।

দেবেন বাবু গল্প করে গেলেন—কাল তখন রাত প্রায় আটটা, দেখি কি আপনার কন্যা কেয়ার ওদিক থেকে টেরিটোরিয়াল প্যাভিলিয়নের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা এসে চৌরঙ্গীতে পড়েছে, সেই রাস্তায় আসছেন। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, দাঁড়ালাম দুটো কুশল কথা কইব! কিন্তু তারপর আর পালাতে পথ পাই নে। সঙ্গে এক বিদেশিনী। মেয়েটির বয়সে কতই বা হবে! খুব জোর সতের-আঠারো আমি তখন ভাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে—

দেবেন বাবুর কথায় স্বপ্নসুধা কোনোরকম উচ্চবাচ্য করেন নি। ছোট্ট একটি প্রশ্ন করেছিলেন—তা আপনিই বা ও সময়ে ওখানে কি জন্যে গিয়েছিলেন?

জবাবটা এড়িয়ে দেবেনবাবু কলেজের কর্তৃপক্ষের অবিচার সম্পর্কে ঘোরালো আলোচনা শুরু করেন—ওসব থাক। পুষ্পবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের লড়তে হবে, সেজন্য একটা স্কীম করা দরকার। আপনার কাছে সে জন্যই আসা—!

দেবেনবাবু একটা টাইপ! কন্যা স্ত্রী হাসপাতালে মরো মরো, সেই সময়ে কিনা ছাত্রীর কাছে প্রণয় নিবেদন করলেন। অবিশ্যি স্ত্রী মরেছে, ছাত্রীও তাঁকে বিয়ে করেছে। এখনও, তারপরও—

স্বপ্নসুধার নাকের দুপাশ ঘৃণায় কুঁচকে গেল। দেবেনবাবুর সঙ্গে মৃগাঙ্ককে এক নরকে স্বপ্নসুধা ফেলতে নারাজ।

মৃগাঙ্ক স্বপ্নসুধারই মতো স্বপ্ন দেখে থাকে। দুই স্বপ্নদর্শীর হঠাৎ খুব মিল হয়েছিল।

ছাত্রীদের ভাগ্যকে আপাততঃ তুলে রেখে স্বপ্নসুধা হীরুর পাশে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আলোটা জ্বলছে জ্বলুক—এখনি নিভোবার তাড়া নেই।

চোখ বুজতেই প্রথমে মনে পড়ল: দেবেনবাবু! মৃগাঙ্ক! আঠারো উনিশের একটি মেয়ে।

থামল স্বপ্নসুধা। দেবেনবাবুর কাছে জেনে নিতে ভুলে গেছে, মেয়েটি দেখতে কেমন? কে?

দেখতে নিশ্চয়ই খারাপ নয়। মৃগাঙ্কর চোখ আছে। অন্তরীর চোখ। নইলে স্বপ্নসুধাকে আবিষ্কার করতে পারতো না সে। ঘন মাথার চুলগুলো ঢেউয়ের অভাবে, শনীর রেখার মতো এলোমেলো ওড়ে, পরণের পোশাক-

আশাক বংশবৈশিষ্ট্য রেখাগুলো, যা দিয়ে গড়ি ওঠে স্বপ্নসুধার সেই সময়ের একদিন সেই ডেনা-ডেনা মুখটির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দেখা করবার আগেই মৃণাল পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। স্বপ্নসুধা গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে হন্‌হন্ করে পথ হাঁটছিল, কাঁধে ওর একটা ঝোলানো ব্যাগ।

পিছন থেকে মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে কে যেন বলল—ডান দিকে যেয়ো না, ও গলিতে সিরিসিটির ভাই আছে।

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে মৃণালকে দেখেছিল, বিড়ি-টানা একটা লোক মিটমিট করে হাসছে। হাসি দেখে মনে পড়ে যায় লাটিচার্জের পিটুনী খাওয়া হুপুরের কথা। এ সেই লোক। চোখের ইশারায় বাঁ দিকের যে পথটা থানার সামনে দিয়ে গেছে সেটাই বলল স্বপ্নসুধা। ওর নামে ওয়ারেন্ট আছে। পুলিশ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে—থানার সামনে দিয়ে কি যাওয়া ঠিক হবে? কিন্তু তখন আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না।

ডেনা-ডেনা মুখটি একেবারে পাশাপাশি চলতে শুরু করেছে, বলল—মাথার ঘোমটা দিয়ে নে! থানাটা পেরুতে হবে।

লোকটা একে বিড়ি টানছে তারওপর 'তুই-তোকারি' করে কথা বলছে। আবার ঘোমটা দিতে বলে, আচ্ছা, স্পর্ধা। বিপদে পড়লেও মনে মনে রাগও কম হচ্ছে না। এর চেয়ে ডানদিকের পথে চলে পুলিশের হাতে ধরা পড়াও ভালো ছিল। দেয় নি, প্রথমে কিছুতেই ঘোমটা দেয় নি স্বপ্নসুধা। লোকটা ধমকে উঠেছিল, চাপাগলায়। ধমকে ধমকাতে জেনে সে নয়, গম্ভীর ভাবে বলেছিল—বিড়ি খাচ্ছিস, তোর কথায় ঘোমটা দিতে আমার বয়ে গেছে।

—ভালো হবে না বলছি। বিড়ি ফুলে কথা বলো না। এইটুকু পুঁচকে মেয়েকে আপনি আজ্ঞে করতে হবে নাকি!

সেদিনের সেই ঝগড়াটার কথা পরে অনেকবার ভেবেছে স্বপ্নসুধা। অসংখ্য কর্মী, বিভিন্ন তাদের কর্মক্ষেত্র—তবু মাঝে মাঝে এই লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, এই ঘটনার পর থেকে।

একদিন সে বলল—আচ্ছা তোর নামের ও খুব বাহার। তা তুই নিজেকে এমন চিত্রাঙ্গদা সাজিয়ে রেখে দিস কেন বলতো।

হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল স্বপ্নসুধা—তা নইলে মেয়ে হয়ে কি রাত দুটোর সময় পাড়ির ভিড়িয়ে পালাবো কি করে!

—সেটা তো দরকারের সময় ছাড়া অন্যসময়ে দরকার হয় না! তখন তো একটু নরম-সরম হতে পারো।

—মুখে বিড়ি দেখলে আপনার সঙ্গে কথাই বলতে ইচ্ছে হয় না।

—সিগারেটের পয়সা নেই। তাছাড়া আমাদের ত কুলি-মিস্তিরি নিয়ে কাটাতে হয়, ওতে বিড়িই মানায়।

—এখনও কি কুলিমজুরের সঙ্গে চলেছেন?

প্যান্ট হলো। মৃণালের মুখে সিগারেট দেখে সবাই যেমন অবাক হয়েছিল, স্বপ্নসুধার হাতে চুড়ি, কানে দুল দেখেও তেমনি সবাই খুশি হয়ে বলেছিল—তোমার চেহারা ফিরে গেছে।

সেই মৃণাল, সেই স্বপ্নসুধা আজো আছে।

কিন্তু কি যেন নেই।

কিছুই নেই।

আবার কখনো মনে হয়, কিছুই হারায় নি, সবই ঠিক আছে। সবই ঠিকই রয়েছে। মাঝখানের কয়েকটা বছরকে অপারেশন করে বাদ দেবার মতো মনের জোর যখন রয়েছে স্বপ্নসুধার তখন আর এই ধরণের মেয়েলি প্যান-প্যানানি কি জন্যে!

যুক্তক মৃণাল ঘাটেঘাটে যাকে খুশি তাকে নিয়ে। মৃণাল একটা অভিশপ্ত গ্রহের মতো, ইহুদীর মতো চলেছে, চলেছে, চলেছে। তার নেশা, তার খপ্পর, তার মত কিছুতেই তাকে ভিড়তে দেবে না। যুক্তক।

আত্মপ্রসাদের হাসির স্বাদ অনুভব করেন অধ্যাপিকা স্বপ্নসুধা মিত্র। অহমিকায় মৃণালকে বড় মনে হয়েছিল। সেটাও মস্ত ভুল। আসলে স্বপ্নসুধা নিজেকে এখন ওই লোকটার চেয়ে অনেক, অনেক বড় ভাবতে পারে।

অথচ বিয়ের পর।

বিয়েটাও স্বপ্নসুধা জোর করেই করেছিল। ওর বাড়ির সবাই আপত্তি করেছিলেন, বাধাও কম দেননি। কথা অবাধ দিয়েছিল স্বপ্নসুধা—তোমরা সবাইও এর-এ

দিতে যারণ করেছিলে, পাটির কাজে সময় নষ্ট করেছি বলে। তোমাদের ধারণা ছিল ফেল করব। কিন্তু ফার্স্টক্লাস ত আমিই পেয়েছি! তেমনি ফুলাক্ষর চিঠি না থাকা মানে তার যোগ্যতার অভাব নয়, একথা বোঝার মতো বুদ্ধি বয়েস সব আমার আছে।

এরপর আর কথা বলা চলে না।

বিয়ে হল। নিজেদের বাড়িতেই। যেমন দিদির বিয়ে হয়েছে তেমনি ভাবেই, কোন অনুষ্ঠান বাকে না বাদ পড়ে সেদিকে ওর খর নজর ছিল।

বিয়ের পর ফুলাক্ষ বলল—তুমি আমার বৌ। এ বাড়ির লক্ষ্মী। আর বাইরের টানে ছেলে বেড়ালে চলবে না। বাস ঘরো।

হাল বেশ শক্ত করেই ধরে ছিল ফুলমুখী।

কিন্তু ওর মনে যাকলা যেমনটি হওয়ার সাধ ফুলাক্ষর আগে তা কোনোদিনই পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

—আমি একটা চাকরী নিই।

সে কথার জবাব এল অন্তভাবে। ফুলাক্ষ ঘটীর আরাধনায় একটি প্রকট হয়ে উঠল যে, অতি আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা পর্যন্ত ফুলমুখী স্বীকৃত অস্ত্রকে রুখতে পারল না। ফুলাক্ষ মৃদু হেসে বলল—চাকরী খুঁজছিলে এই ত পেয়ে গেলে, ঘরের বাইরে যাবারও আর দরকার হবে না।

স্টাডিসার্কল, সিম্পোসিয়াম সব ঘুচল। ছেলের সেবায় ঘরা আর ঘরে বসে বসে বই পড়া অথবা লেখা—এর বাইরে অন্যকিছু করবার অবসর যদি বা ছেলে উপায় নাকি।

কিন্তু চারদিকে দেবার অঙ্ক বাড়তে বাড়তে এমন দশায় দাঁড়াল যে একদিন ছেলেকে ঠাঁয়ে করে ফুলমুখী বাপের বাড়ি চলে এল এবং মায়ের কাছে ঝীকৃতে রেখে পুরনো আস্তানাগুলোয় টহল দিতে শুরু করল।

ওর মত মেয়ের আবার চাকরীর ভাবনা! সেই যে ছেলেটির প্যান্ট ঘরে মত থেকে নামিয়ে এনেছিল তার সঙ্গে পথে দেখা হতে ফুলমুখী লজ্জা পেয়ে বলল—কেমন আছো?

—আরে আপনি! তারপর কি খবর? বিয়ে করলেন শেষ কাকি দিয়ে! কি করছেন এখন?

—চাকরী খুঁজছি। তুমি কি করছ?

—আমি! সেটা তিনেক কলেজে পার্টটাইম চাকরী করছি। তা আপনার মতো মেয়ের আবার কাজের ভাবনা? মুখে মেরে।

চারদিকে নতুন নতুন কলেজ হচ্ছে। কিন্তু কোথায় গিয়ে তার কাছে ধর্না দিতে হবে ফুলমুখীর জানা নেই। এতো আর পলিটিক্স নয় যে ঘাতা ধরে গলাবাজী করতে পারলেই তাত্ত্বিক আর ঠ্যাঙানী দুইই অবধারিত। কাজে বিপক্ষদলের লোকের কাছেই প্রথম শুরু করল ফুলমুখী। ছেলেটি বলল—সোজা আঙুলে ঘেঁত ওঠে কি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে দেখা করে বলে দাখুন। পেয়ে যাবেন। আর একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ফরমের চিঠি ছাড়ুন। তাছাড়া আমিও দেখছি। মোট কথা ছোকরাকে আজ ভালোই লাগল।

পথে দেখার এখানেই শেষ নয়। মৃদুল, ফুলমুখী কফি হাউসে আড্ডা জমিয়েছে। ওরা রিসার্চ করছে। ফুলমুখীকে সবাই ঘিরে বসল, অজস্র প্রশ্ন। তারপর জোর করে ধরে নিয়ে গেল—কেলেন অর ট্রয় দেখতে।

সিনেমা দেখে সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ির গলিতে পা দিয়ে ফুলমুখীর এতক্ষণের হাজারো খুশিগুলো খানখান হয়ে চুরমার! ফুলাক্ষ মুখে ঘন্টা রাজ্যের বিরক্তি আর তিক্ততা মেখে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

ফুলমুখী পথেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। ফুলাক্ষ চোখের ইশারায় বাড়ির দরজা দেখিয়ে বলল—চলো।

—বিড়ি?

—খুশি।

চৌকাঠের ভেতর দিকে একটা পা দিয়েছে ফুলমুখী এমন সময় ফুলাক্ষ বলল—দাঁড়াও, আমি ভেতরে যাবো না। আমার কথাটা যদি শোনা প্রয়োজন মনে করো ত শোনো।

—ভেতরে এসো!

—না।

—এসোই না—

—যাবো না। তুমি যে এভাবে না বলে-কয়ে চলে এলে এতে আমার সম্মান বাড়ল?

—লোকে যে তিন বেলা তাগাদা করে টাকা না পেয়ে দশ কথা শুনিয়ে যায় তাতে কি আমার মর্যাদা বাড়ে? তুমি ত লীডার। নাকেমুখে গুঁজেই আবার সাত সকালে নেতৃত্বের কাজে বেরিয়ে যাও, ফেরো একবারে দুপুরে, বেপাত্তা। পাওনাদারেরা তোমার পেয়ারের লোক তারা ত তোমাকে না পেয়ে আমাকেই শোনাচ্ছে। তাই ঠিক করেছি, আগে যাতে দেনা শোধ হয় তারপর অন্য কথা।

—ও তাহলে সব ঠিক করে ফেলেছ?

—বাধ্য হয়ে। এর মধ্যে রাগারাগি করার কিছু নেই। এস, বোসো, মাথা ঠাণ্ডা করে সব শোনো। একটু বিবেচনা করলে দেখবে যে আমি যা করেছি এটাই শোভন পন্থা।

—বটে! এখন থেকে তোমার কাছে শোভনতা শালীনতার পাঠ নিতে হবে! বলি দেনাটা আমি করেছি, দায়িত্ব আমার।

—তোমার মতো দেবত্ব আমার নেই। কথা হজম করে পার্থিক চালে আমি চলতে পারব না।

—বেশ, তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে না!

—বা রে, আমি কি তাই বলেছি। শুধু শুধু মাথা গরম কর না। চা-টা খাও দেখি এস।

হাত ধরে টেনে এনেছিল, মৃগাঙ্কও এসেছিল।...

ঘুমের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে মাকে আঁকড়ে ধরে—ছোট্ট দুখানি নরম মুঠোয় স্বপ্নসুধার একটি নিটোল স্তন ধরতে পেরেই সে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ এই আবোধ স্পর্শে প্রথমে চমকে উঠে স্বপ্নসুধার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। আচমকা ছেলের হাত সরিয়ে দিয়ে, আবার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল স্বপ্নসুধা।

আলোটা শুধু শুধু জ্বলছে কেন?

উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল স্বপ্নসুধা।

অন্ধকার। একঘর অন্ধকার। অন্ধকারের স্বাদটা যেন বেশ ভেতো। এমনিতে ভেতো খেতে খারাপ লাগে না, কিন্তু তেতো-মোচার মতো অখাদ্য লাগছে আজকের এই অন্ধকার। কেন? এই আঁধারে দেবেনবাবুর কথা-গুলো স্বপ্নসুধার পিছু পিছু এসে জুটেছে।

ওই প্যাভিলিয়নের পাশের পথটা স্বপ্নসুধার কুমারী জীবনে প্রথম বসন্ত-বাহারের ছোঁয়া লাগিয়েছিল। একদা মনুমেন্টের তলায় মিটিং থেকে ছিটকে ঘুরতে ঘুরতে ওরা দুজনে বসেছিল গাছতলার নুপসিতে।

এখনো মৃগাঙ্ক সেইখানে ঘুরপাক খাচ্ছে! যতদিন বাঁচবে লোকটা বোধহয় ঘুরপাক খেয়েই কাটাবে। তার জীবনে স্বপ্নের পরিধি খুব ছোটো। নইলে বড় করে, নিটোল একটা ছন্দ রচনার কথা কল্পনা কেন করতে পারে না মৃগাঙ্ক?

সেই যে টানাটানি শুরু হল সেটা দিনেরাতে পলে পলে বেড়েই চলল। বালিশে মাথা রেখে স্বপ্নসুধা আবার আলোতে হারিয়ে যাওয়া চিন্তার জালকে অন্ধকারে খুঁজতে লাগল। আবছা হাতছানি দিয়ে তারা সরে সরে পালাচ্ছে। - না, পালায় নি, স্বপ্নের সংগে মিশে গিয়ে তামাশা করছে। খেলছে ভাবনারা। কতো সাধ ছিল স্বপ্নগুলোকে কল্পনালোক থেকে বাস্তবালোকে নিয়ে আসবার। যখন ছিল না, যখন স্বপ্নের জন্ম হয় নি তখন স্বপ্নসুধা বেশ ছিল। কিন্তু ওকে স্বপ্ন দেখাতে শেখাল যে মানুষটা সে ত কোনো মূল্যই দেয় না! সব কিছুরই একটা সাধনা আছে এই কঠিন সত্যকে সে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চায়। দেনার দায়কেও তাই, আবার সংসারের দায়কেও তার চেয়ে বেশি আমল দিতে তার আপত্তি। আপত্তিটা দোচ্চার নয়, ঔদাসীন্যের বর্মে সেটা অলংকৃত। এতেও স্বপ্নসুধা ভেতো কিছু মনে করে নি। কিন্তু এক-একদিন সে হঠাৎ স্বামীত্ব তথা প্রভুত্বের দাপট ফলাতে শুরু করে। কলেজের মেয়েরা অভিনয় করবে, স্বপ্নসুধা তাদের গান শেখায়—যেদিন তার 'অফ-ডে' সেদিন মেয়েদের বাড়িতেই ডেকেছে। ওরা রিহার্সালে বসেছে, একখানি ঘর। সেদিন মৃগাঙ্ক ঘর থেকে কিছুতেই নড়বে না। তা নয় রইলই, হীরু হয়তো মায়ের ঘাড়ে পিঠে চড়ছে, হামলা করছে বিচিত্র শিশুসুলভ পদ্ধতিতে। কাজের সময় এসব সয় না। স্বপ্নসুধা স্বামীকে অনুরোধ করেছিল—'ওগো ওকে একটু সামলাও না! দেখছ, কিরকম সুর ভণ্ডুল করে দিচ্ছে!' খাচ্ছিল মৃগাঙ্ক সিগারেট। সেটা ফেলে বিড়ি ধরিয়ে বলল—'আগে ওকে ঘুম পাড়াও,

তারপর তোমাদের নাচ-গান-চলা করো। আমাকে তুমি হুকুম করো!' আর যেটুকু বাকী ছিল সেটা বাংলা ভাষায় উচ্চারিত না হলেও মৃগাঙ্কর চোখে-মুখে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়েছিল 'তোমার এতবড় স্পর্ধা!'

মেয়েরা কি মনে করেছিল তা বুঝতে বাকী ছিল না স্বপ্নসুধার। জাতে ও নিজেও ত মেয়ে।

মৃগাঙ্ক নিজের চোখে মরবে!

কিন্তু স্বপ্নসুধার সাধ্য কি তাকে বাঁচায়! চেষ্টা ত কম করে নি। জোড়াতালি দিয়ে আর কতোদিন চলে? মাঝে মাঝে ছেলেকে নিয়ে চলে এসেও দেখেছে, মৃগাঙ্ক নির্বিকার না, একেবারে নির্বিকার নয়—লোকের কাছে স্বপ্নসুধার নামে মিথ্যে করার ব্রতে একাগ্র উদ্যোগী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে মৃগাঙ্ক। এর-ওর সঙ্গে স্বপ্নসুধার নাম জড়িয়ে দিয়েছে—চরিত্রে কালি ঢেলেছে মনের সাধে। স্বপ্নসুধা গ্রাহ্যও করে নি। মাঝে-সাঝে মৃগাঙ্কর রটনায় ইন্ধন জোগাবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছে। বিলুদার সঙ্গে এখানে-ওখানে একটু ঘুরলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। ঘুরতে সেইসব জায়গায় যেখানে মৃগাঙ্ক ওকে নিয়ে একদা বেড়িয়েছে এবং যেখানে-যেখানে মৃগাঙ্কর চেনা-জানা লোক দু-একজন চলাফেরা করে। বিলুদা আমীরী মেজাজের মানুষ—চরিত্র তাঁর গঙ্গাজলে ধোয়া। কখনো তাতে কলঙ্ক পড়বার আশঙ্কা নেই, কেন না তাঁর অজস্র অর্থাগম হয়ে থাকে এবং তিনি সেই অনায়াসলব্ধ বিত্তের বেশিরভাগই সাধারণজনের জন্য ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। তা বহু তিনি খান, তাঁর সঙ্গে অনেক সুন্দরী মেয়ের অন্তরঙ্গতা। বিলুদার অভাব নেই, মানসিক ঔদার্যের বেলাতেও তিনি কুণ্ঠিত নন্। বিলুদাকে স্বপ্নসুধা আজ নতুন দেখছে না, তাঁর খ্যাতির 'সু' 'কু' সবই সবাই জানে! স্বপ্নসুধাও!—বিলুদা হচ্ছেন সেই জাতের মানুষ যারা কখনো কলঙ্কের আওতায় পড়ে না, পক্ষান্তরে, যে সব মেয়েকে তাঁদের সঙ্গে দেখা যায় তারা কলঙ্কিনী বলে বিখ্যাত হয়ে পড়ে।

একদিন সুযোগটা হাতছাড়া করতে পারল না স্বপ্নসুধা। সেদিনটা কলেজে কামাই করেছিল। সকাল থেকে মনটা ওর ভার ভার।...

আচ্ছা দুষ্টু ছেলে, দিয়েছে দাঁত বসিয়ে, উঃ! দাঁত ত ওই কখানা কিন্তু কী ধার হয়েছে! রেগে গিয়ে ছেলেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। করে, কোনকালে বুকের উৎসধারা শুকিয়ে গেছে—এখন এই উৎসধার শুধু শোভার লোভাধার। কিন্তু ছেলেটা তা বোঝে কই! সে ঘুমের ঘোরে প্রায়ই চোষে মায়ের বুক। বোকা!

কিন্তু আজ কি ঘুম হবে না? গেল কোথায় ঘুম।

চোখ জ্বালা জ্বালা করছে।

করুক। কাল অনেক বেলা অবধি ঘুমোবে স্বপ্নসুধা। আজ ওর জাগর যাপন।

হ্যাঁ বিলুদা কি সাংঘাতিক মানুষ।

মুখের ওপরই বললেন—গাড়ি চড়বে, রেস্তোরাঁতে খাওয়া হল। এরপর কি আরো কিছু চাই!

চেয়েছিল স্বপ্নসুধা। চাইই ত। আরো ঘুরতে চায় ও। একটু কোথাও গিয়ে জায়গা দেখতে চায়। তবে সেই সঙ্গে বলে দিল—আমি কিন্তু একজন অধ্যাপিকা, আমার মূলধনের দিকে নজর রেখেন না দাদা।

—ও তুমি পারেয়া ওড়াতে চাও! তা মন্দ নয়।

সেই অস্থির দিন সেদিন অধ্যাপিকা কলেজে যায়নি, গিয়েছিল গঙ্গার তীরে। কেন? তার আগের দিনটা আশায় আশায় কেটেছিল, চয়তো মৃগাঙ্ক একবার আসবে। বিয়ের স্মৃতিচিহ্ন-মাখা তারিখটাকে অন্তত মর্যাদা দেবে। দেয়নি মৃগাঙ্ক। তাই বেশ ওকে অস্থির করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল। বিলুদার গাড়ি নিয়ে ও নিজের স্বামীর বাসাবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তালা দেওয়া নেই, দেখে আশ্বস্ত হয়ে ঢুকল। মৃগাঙ্ক ছিল না ঘরে, বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের একটি লোক ওকে দেখে প্রশ্ন করল—'কি চাই?' 'কিছু না।' 'তাহলে?' সে প্রশ্নের জবাব দিল না, দেখল ঘরখানার দুর্দশা। ময়লা, যেদিকে চাওয়া যায় সেখানে নোংরা আগোছালো। লোকটি বলল—আপনার অভিপ্রায়?' চটল মনে মনে স্বপ্নসুধা, মুখে বলল—'আপনি তাকে বলে দেবেন, এ ঘরের গিন্নী তার ছেলেকে নিয়ে কাল এখানে আসবে, সেই মতো ব্যবস্থা যেন করে রাখে।' লোকটি আরও চড়া গলায় কড়া জবাব দিল—'গিন্নীকে বলে দেবেন মৃগাঙ্ক বাবুর কোনো ঘর নেই, অতএব ছেলে-বৌ এখানে থাকার কথাই ওঠে না। ঘরের ভাড়া আমি দিই।'

'তাহলে মুখার্জি ?' 'এখানেই থাকে বিবেচনার ব্যাপার।'

স্বপ্নসুধা একেবারে অথৈ জলে পড়ে গেল। ওর ভাবগতিক দেখে বিলুদা বললেন—এবার কি হুকুম হবে ?

—তা এক কাজ করো। আমি ট্যাক্সির ভাড়া দিচ্ছি, ট্যাক্সিও ডেকে তোমায় তুলে দিচ্ছি। মিছেমিছি যে কাজটা ড্রাইভারকে দিয়ে হয় তার জন্যে আমাকে কেন ডোগাও তাই।

—বিলুদা আপনিও ?

—আমি ! আমি মানে ? শুনেছি তুমি আজকাল বেশ দিলখোলা হয়ে প্রসাদ বিলোচ্ছো। আমারও তো চোখ, মন, দেহ আছে—

—কে বলেছে আমি জানি।

এতই যদি যে আমার কথা—

—আঃ, তুমি বড় বোকা মেয়ে। আমাকে কি জন্যে অতো খোলাও করে নেমন্তন্ন করলে তাই বলো ত ; সে কি এইভাবে—

—হ্যাঁ ! যদি বলি সে আপনাকে আমার দরকার ছিল।

—কই সেটা টের পাওয়াও !

—জানেন বিলুদা আমি সাধারণ মেয়ে নই।

—সেই জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করেছি, নইলে—

অগত্যা সব কথা খুলেই বলেছিল স্বপ্নসুধা।

সব শুনে তিনি ক্ষণা চেয়ে বললেন—সত্যি ! আর তোমাকে নিয়ে তামাশা করব না। তবে একটা কথা জেনে রাখো, তোমার যেদিন যখন দরকার পড়বে ভেকো, কোন সঙ্কোচ কর না। যে কোনো কাজ আমাকে করতে বলবে আমি রাজী আছি, থাকবও।

—সব কাজ ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ সব ! আমি যে ফেলেছি—

—ফেলেছেন ?

—হ্যাঁ !

—কি ফেলেছেন ?

—নেহাৎই শুনবে ! শুনে ত আবার ক্ষেপে যাবে—! ওটা ঠিক তোমার বর্তমান মানসিক অবস্থায় শোনানো মানানসই হবে না।

—তবু যা ঘটিয়ে ফেলেছেন সেটা রটিয়ে ফেলতে বাধা কি।

—ধ্যাৎ ! সামান্য কথা দিয়ে বললে ফরেট দেওয়া হয় না। না বলে বোঝানোর মধুর আলাদা। এই যেমন তুমি কোন্ হতভাগাকে ভালোবাসলে, বিয়ে করলে, ঘর বাঁধতে চেষ্টা করলে, এখন সে ঘর ছাড়া। তবু তুমি তাকে ভালোবাসো এটা না বললেও বুঝতে আমার মতো হৃদয়হীনেরও হৃদয় কোমল হয়ে আসে। আর এ রোগটা এমন ছোঁয়াচে ! আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, সত্যি !

সত্যতা প্রমাণের জন্য বিলুদা ওর হাত চেপে ধরেছিলেন ভেজা হাতখানা ঘামের ঠাণ্ডা ছাপিয়েও উত্তপ্ত !

হাত সরিয়ে নিয়ে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে স্বপ্নসুধা বলেছিল—যেখানে সেখানে এভাবে ভালোবাসা ফেলে নষ্ট করবেন না।

—না, না, নষ্ট কোনদিনই হয় না, এ বাড়ে। আমি ফেলে রেখে দিলাম। তোমার যখন ইচ্ছে হবে কুড়িয়ে নিয়ো।.....

বিলুদার গলার স্বরটা এই অন্ধকারে কেঁপে উঠল—ঘরের বাতাসে বিলুদার ভালবাসা যেন প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে স্বপ্নসুধা নিজেকে শুনিয়ে বলছে—ঘুরুক মুসাফির। আমি আর ঘুরব না। শেষে দরকার হয় বিলুদার ভালোবাসা কুড়িয়ে নেবো। কিন্তু স্বপ্ন ত রঙীন হবে না। না-ই হল ঘর বাঁধার সাধ ত মিটবে। তাতে রঙ না থাক রসের প্রাচুর্য থাকলেই চলবে। স্বপ্নের সাধ থাক স্বপ্নেই।

কিন্তু তবুও বুক নিংড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ওর সমগ্র সত্তাকে নাড়া দিয়ে যেন নিঃস্ব করে দিয়ে বলল—তোমার স্বপ্ন। এও সার্থক হবে না।

তবু, তবু স্বপ্নসুধা অন্ধকারের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে নিজেকে শুনিয়ে বলে—তা বলে নিজেকে শুকিয়ে মারব ? কেন ! সে ত কই ঘরখানা ছেড়ে দেবার আগে একবার আমাকে জানাল না। সে ত আবার পথে পথে ঘোরার সঙ্গিনী জুটিয়ে নিয়েছে ! বিলুদাকে কি কৈফিয়ৎ দেবো ? নিজের বলতেই বা আমার কি রইল !

হঠাৎ আবার মাকে আঁকড়ে ধরল। এবার আর বাধা দিল না। ছেলেকে কোলে জড়িয়ে বলল মনে মনে—বিলুদা, সব জানে, সব বোঝে। বিলুদা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

একটি আধুনিক উপন্যাস

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের 'ঝরঝরের কাল' উপন্যাসটি পাঠকের মনে স্থায়ী রেখা এঁকে যাওয়ার মত বই। একজন তরুণ লেখকের রচনায় এরূপ অনন্যতার স্বাক্ষর খুব বিরল। বাংলা সাহিত্যের পরিধি যে ক্রমশঃ বাড়ছে এই বইখানি তার নিদর্শন। যন্ত্র ও কল-কারখানার জীবনযাত্রা যে অর্থনৈতিক স্তরে অতিক্রম করে আমাদের মনন ও আবেগের ছন্দ নিরূপণ করছে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন এতে বিদ্যমান। এক হিসাবে বিরাট কারখানার অসংখ্য জন সমাবেশ ও বিচিত্র কর্মধারা আমাদের মনকে প্রবল ভাবে আলোড়ন ক'রে কৌতূহলোদ্দীপক বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্য কোনও শান্ততর ও স্বাভাবিকতর জীবনচর্যা ঠিক এইরূপ বাঁধন-ছেঁড়া, উদগ্র রুচি—খেয়ালের পূরণে সহায়তা করতে পারত না। সমুদ্র মন্থনে যে বিষ ও অমৃত উঠেছিল শান্ত তড়াগের নিতান্ত কল্পনে সেরূপ চরম পরিণতি প্রত্যাশা করা যায় না।

লেখকের ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে এই সদা-চঞ্চল, উন্মত্ত ছন্দে উৎক্ষিপ্ত জীবন-ধারার সবটুকু গতিবেগ, বিচিত্র রংএর খেলা ও প্রাণের লীলারহস্য আশ্চর্য সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। বাহির অন্তরের মধ্যে এক অদ্ভুত ছন্দঃসাম্য উপন্যাসটির অন্তঃসঙ্গতি রচনা করেছে। বাহিরের কাজের যেমন, তেমনি মানস ক্রিয়ারও একই দুর্বার গতিবেগ, দ্রুত সঞ্চারী চকলতা। লেখক আশ্চর্য বেগবান ভাষার তীক্ষ্ণাগ্রে এই উভয়কেই গেঁথে তুলেছেন, পাতার পর পাতায় মুঠো মুঠো রং ছড়িয়েছেন। ঘূর্ণায়মান কর্মচক্রে মানব সত্তার যে অখণ্ড স্বতঃস্ফূর্ত নেমিদীমায় ভেঙে উঠেছে, সেগুলি প্রাণরসোদ্বেল সঙ্কেতময় ভাষার রূপণে তাদের সম্পূর্ণ বর্ণোজ্জ্বল জীবন দ্যোতনা নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কলের চাকা ও মানুষের মনের চাকা একই ছন্দে ও তালে ঘুরছে, এবং এই দ্রুত-আবর্তিত, বিকেন্দ্রিক শক্তিচক্র থেকে কর্মোদ্যম ও প্রাণবহ্নির দীপ্ত স্ফুলিঙ্গগুলি এক সঙ্গে দূরোৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া গতির সঙ্গে তাল রেখে লেখকের ভাষাও যেন হাউইএর মানস উত্তেজনার পাখায় ভর করে, রংএর মশলা ঘুরাতে ঘুরাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। এই ভাষার কোথাও মন্থরতা নাই, কোথাও গতানুগতিক পদ্ধতির অনুসরণ নাই নেহবহুলতার প্রাণে-ঘাতে-ভরা স্পর্শমাত্র নাই, এ চলেছে অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে, টাঁকশালে নূতন তৈয়ারি করা মুদ্রার উজ্জ্বলতায়, বিদ্যুতের প্রতিটি প্রজাপতি-উল্লাসের সরহ অনুভূতি সঞ্চারে। এ ভাষা সোজাসুজি বর্ণনা বা বিবৃতি করে না; ক্রীড়াচকল মৃগশিশুর ন্যায় দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ থামে, বঙ্কিম কটাক্ষে অনেক অব্যক্তের ইঙ্গিত দেয়, আশে পাশে চকিত দৃষ্টিক্ষেপে অতীত ও ভবিষ্যতের ছবিকে, আখ্যান বস্তুর সঙ্গে গ্রথিত করে, বিশিষ্ট নেপথ্যের তাতে ঘটনার সূত্রকে বয়ন করে একে এক সূক্ষ্ম শিল্পসুন্দর রূপ দেয়। লেখক তরু-অরুণের বাহিরের প্রতিবেশ ও কর্মধারা থেকে অনেক নূতন উপমা-উল্লেখ সংগ্রহ করে নিজ রচনা রীতিকে এক আস্বাদ-সঙ্গতি দিয়েছেন।

কাহিনীর ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে জীবনের অনেক কৌতূহলকর ও করুণ অভিজ্ঞতা ঠিকরে পড়েছে, কতকগুলি নূতন ধরণের মানবিক চরিত্র ও কুম্ভকার চক্র বিবৃত্তিত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় বিশিষ্ট আকার ও রূপ নিয়েছে। লিউইস ও তার পরের দ্রব্যের উপর অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দাম্পত্য ছুয়াচুরি, রামচাঁদ ও বনলতার দাম্পত্য জীবনে রুচিবৈষম্যের শোচনীয় পরিণতির, স্বপ্না ও সুপ্রভা ভাদুড়ীর করুণ ও মোহ স্বপ্নময় বর্ণবিলাস, জোসেফের নোংরামির পাঁকে আত্মবিসর্জনের পঙ্কজ-মাধুরী, ধনুর মুখের হাসি চাপা ক্ষুধার জ্বালা, ম্যাকিন্টশ-গৃহিণীর নির্লজ্জ যৌবন আমন্ত্রণ, বিদায় মুহূর্তের স্মৃতি দুর্ভর বেদনা—সবই যেন এক একখানি বর্ণাঢ্য চিত্রের মত স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মনে হয় যেন তরুর বিশৃঙ্খল জনতা, শ্বাসরোধী বস্তু সম্ভার, বিরাট অভিকায় যন্ত্রসমষ্টির সমাবেশ, এর হাঁক-ডাক কোলাহল, মাপা-জোপা, ঘড়ির কাঁটা

ধরে নিখুঁত ভাবে নিহিত, বিপুল কর্মকীর্তি—এই সকলের পিছনে একটা অপরূপ মায়াদেহকে আমরা প্রবেশ করেছি। আর সকলের উপরে আছে একটা ক্রুর, নৃশংস কর্মতা মত্ততা, বড় কর্তাদের রক্ষিত ও খামখেয়ালী প্রভুত্ব জাহির, মানবাত্মার অবমাননা, নানা কিস্তির-কর্তা, আশ্রিতদের নিষ্ফল খোসামুদি ও করুণ অসহায়তা। এই সমস্ত মিলে মানবজীবনের এক বিচিত্র বিকাশ এই বইটির শুদ্ধসংখ্যক পাতায় উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এই বইটির উপন্যাসধর্মের মধ্যে কিছুটা অপরিপক্কতা বা অপূর্ণতা আছে—এটা না বললে এর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে না। এটি একটি এককেন্দ্রিক উপন্যাস নয়—কতকগুলি খণ্ড-চিত্রের সমষ্টি। এই খণ্ড-চিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে তরুণ লেখকের সংবেদনশীল মন, তাঁর জীবন রস আস্বাদনের উগ্র আগ্রহ আর একটি গৌণ যোগসূত্র হচ্ছে তাঁদের সামগ্রিক পরিবেশ। লেখকের জীবন-সমালোচনা ছাড়া ছাড়া টুকরো টুকরো অনুভূতির কোথাও করুণ, কোথাও বা কৌতুকময় আবিষ্কার, যন্ত্রদৈত্যের ভ্রূকুটিতলে মানব মনের ভিরুক, একপেশে রূপায়ন। এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড উপাদান কোন সামগ্রিক তাৎপর্যে গ্রথিত হয়নি।

অতি আধুনিক দুর্বোধ্য জটিলতাময়, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের নিকট ব্যক্তিসত্তার অর্ধ-বিমূঢ়, অর্ধ-অসহায় আত্মসমর্পণই জীবনের প্রধান লক্ষণ। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতার সংস্কৃতির বিবর্তন পরিণতি সত্ত্বেও যেন আমাদের মধ্যে প্রতিবেশ-অভিভূত আদিম মানুষের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি যেন জড় বস্তুর বিপুল চাপে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়েছে। প্রতিবেশ আমাদের যতটুকু জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে তারই মধ্যে আমাদের সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ। এক অনিশ্চয়তার ভয়াবহ, ব্যাপ্তি ও বিস্তারে আমাদের বোধশক্তির বিপর্যয়কারী পুরাতন নীতিবাদ ও অন্যান্য প্রত্যয়ের সীমালঙ্ঘী। জড়শক্তি ও মানব বুদ্ধিহীনতার লীলাক্ষেত্র একটা বিশাল বস্তু-ও-ভাব আবেষ্টন আমাদের নিজের প্রতি আস্থাহীন করেছে—এই জগতে ভয়ে ভয়ে, দিকভোড়া অন্ধকারে ম্লান দীপ জ্বেলে পদক্ষেপ করছি। আমাদের শক্তিও আমাদের অসহায় ভাবকে আরও ঘনীভূত করছে—আমাদের নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের ধ্বংসের নূতন মারণাস্ত্র রচনা করছে। এই সনাতন মানব প্রকৃতিই নূতন প্রকৃতির তাড়নায়, প্রতিবেশ-নির্মমতার অনিবার্য প্রতিফলনে এক বিস্ময়াবহ, অচেনারূপে আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। ক্ষুদ্রতম অণুর মধ্যে বিশ্বধ্বংসী শক্তির ন্যায় চিরকণার মধ্যেও এক অনুরূপ প্রলয়ঙ্কর ইচ্ছা ও প্রেরণার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করছি। মনে হয় এতদিন মানুষকে যা চিনেছি, যা জেনেছি তা' ঠিক নয়, নূতন করে আবার তার যথার্থ পরিচয় খুঁজতে হবে। বন্দরে ঢোকা জাহাজ যেমন আগে-পিছনের লক্ষের সতর্ক খবরদারিতে, সন্ধানী-আলোর চকিত ইঙ্গিতে পথ খুঁজে নেয়, মানব প্রকৃতির রহস্যময় অতলান্তিকতাও তেমনি নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও তার থেকে বিচ্ছুরিত ছোট আলোক রেখার সঙ্কেতে আমাদের বোধগম্যতার সঙ্কীর্ণ বন্দরে এসে প্রবেশ করে।

তাই আজ উপন্যাস-লেখার রীতিই বদলে গেছে। স্থির প্রজ্ঞা ও রহস্য ভেদকারী সর্বজ্ঞতার দুঃসাহস ঔপন্যাসিকের আর নাই। বাইরের চিত্রিত নানারঙা আবরণ ভেদ করে, হঠাৎ-জ্বলে ওঠা একটা অন্ধকার কোণ অতিক্রম করে জীবনের গভীরতায় নামতে ঔপন্যাসিক আর সাহস পান না, উপরিভাগের বৈচিত্র্য, আচার ব্যবহারের বৈষম্য, প্রকৃতির ক্ষণিক বিস্ফোরণ, মনের অন্ধগলির খুঁটি-নাটি বিবৃতি বিশ্লেষণ, একটু চোখের নেশা বুকের কাঁপন পরিণতিহীন, পাকে পাকে ঘেরা সুদীর্ঘ আত্মগত চিন্তা ও ভাবরোমন্থন এই হল উপন্যাসের মানব চরিত্রায়ণের প্রয়াস। জীবনের অখণ্ড তাৎপর্যবোধ ও জীবনের গভীরতা এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট, যে একটি না থাকলে অপরটিকেও দেখা যায়না, সময় সময় জীবনে গভীরতা আছে কিনা সেই সম্বন্ধেই সংশয় জাগে—ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাসাদে স্ফটিক সরোবরে নামতে গিয়ে দুর্যোধন যেমন বৃথা বস্ত্র সংবরণ প্রয়াসে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন ঔপন্যাসিকও অনেকটা নিজেকে এইরূপ বিড়ম্বিত হবার আশঙ্কায় বিব্রত থাকেন। জীবন মহাসমুদ্রে বিভিন্ন স্থানে গভীরতা পরিমাপক যন্ত্র ফেলে ফেলে, নানা ঝড়-ঝাপটার দোলা খেয়ে, নানা মন্থশৈলে তলা ঠেকিয়ে, জোয়ার ভাটার বহু বিপরীত মুখী আবেগের তরঙ্গোদ্বেলিঘাত অনুভব করে জীবনের নূতন মানচিত্র ও আবহ বিবরণী সংকলন করতে হবে। 'বন্দরের কাল' সেই নবপরিচয় সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়, একটি নূতন দিকের দিশারী।

শ্বশুরবাড়ির দেশে

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

হাটের মাঝে যদি অনেকজনে জিজ্ঞাসা করেন—কোথা থেকে আপনার আসা হচ্ছে? এর এক উত্তর পাবেন না। যত লোক তত মত।

কেউ বলবেন: আমার নিবাস এপার বাংলাই পাকিস্তান।

কাছের মুখ দিয়ে বার হবে শুনবেন: আমার বাড়ী বর্ধমানে অম্বুবের কোলে। কলকাতায় বাসা নিয়ে থাকি।

আবার কেউ বলবেন: আমাদের বাড়ী মুড়োগাছা।

আর যদি কেউ বলেন তাঁর বাড়ী এই খোদ কলকাতায়।

তবু তাঁর কথায় বিশ্বাস করবেন না। কানাকানি করুন। তখন শুনতে পাবেন: প্রায় একশো বছর যদিও এই কলকাতায় সত্যি, কিন্তু তার আগে ছিল গঙ্গাধারের হুগলীজেলার এক গণ্ডগ্রামে—যেখানে থেকে ঠাকুরদাদার বাবা কলকাতায় চলে এসেছিলেন। ছাড়বেন না, আরও টিপে ধরুন। দেখবেন তখন আরও মুড়ো আস্তে আস্তে খুলছে। উনি বলছেন: শুনেছি আমাদের আদি পুরুষ এসেছিলেন কনৌজের কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে বহু বছর আগে। যদি আরও ঠেকে বসেন, দেখবেন এমনি করে পিছুতে পিছুতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত-মহাসাগরের জলে গিয়ে পড়বেন।

দুরদৃষ্টির দুর্বিনে ঘটি-বাঙাল, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান মা কি পী-রাশিয়ান এসব কোন প্রভেদই সত্যিকার প্রভেদ সৃষ্টি করে না। কারণ সাদা-কালো, উচ্চ-নীচ, সব বাবাজীর আগমন ওই একই আঁতুড়ঘর থেকে। অর্থাৎ এক কথায় সবশর্মার মামার বাড়ী একই জায়গা। আমাদের পূর্বপুরুষ তার

এখন যে যাই হইনা কেন, আসলে আমরা সবাই সূর্যবংশীয়। পৃথিবী আমাদের মা। পঞ্চভূত আমাদের পিতা। এক বিস্তৃত সময়ের কোন মহাশূন্যের আঁতুড়ঘরে আমাদের মা-পৃথিবীর জন্ম হয়।

এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে পাই তা সূর্যের অনুপম দান। তার পয়লা নম্বর সাক্ষী ওই কারবন ওই কয়লার মধ্যে হীরার মধ্যেই পাই। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বস্তুসম্ভার মাঝে সংহতির ইঙ্গিত আসে। সূর্যের অনিবার্য ইচ্ছায় ঘটে চলেছে কারবন চক্রের অভিযান। নিজেদের দেহের মধ্যে নিয়ে উপস্থিত। নিজেদের জিনিসে কারবনের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে মাংসে কারবন। পরিমাণের আনাকোনাতে মাংস-সবজির টেবিল তোলপাড়ে। মরবার পর পুড়ে ছাই হলে তেও কারবনের আর এক দল পাবে। সবকিছু দিয়ে শুধু কারবনের কথা বলছি এই জন্যে যে পৃথিবী থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে বিবর্তনের এই ১৫ পর্যায়ে এর ভূমিকা অনন্য। কারবন এক পরিবর্তনের সাক্ষী বিশেষ।

আদিম পৃথিবীর অবস্থা আজকের মত ছিল আবার তারও আগে আমাদের এই পৃথিবী বলতেও কিছুই ছিলনা। আদিম সূর্যের প্রজ্বলিত হাইড্রোজেন থেকে বস্তুকণার উৎপত্তি হলে নানা গ্রহের সৃষ্টি আবার কেউ বলেন প্রথমে এই ব্রহ্মাণ্ডের

গ্রহউপগ্রহের বস্তু সামগ্রী ছত্রছাড়া হয়ে মহাশূন্যে বিচরণকারী ছিল। মধ্যাকর্ষণের চৌম্বকী বিকর্ষণের ফলে আদিম অসভ্য গ্যাসের ঘূর্ণমান পিণ্ড দুটো সারিতে বিভক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে বস্তুকণিকা ঘনীভূত অবস্থা পায় ও নানা গ্রহ উপগ্রহের আকার ধারণ করে। আকর্ষণ শক্তির টানে ভিতরে সূর্য সৃষ্টি হয়। সূর্যের ভিতরের সারিতে অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত ক্ষুদ্রাকার গ্রহ যেমন বুধ, শুক্র, চন্দ্র পৃথিবীর উদ্ভব হয়। বাইরের সারিতে অপেক্ষাকৃত কম ঘনীভূত গ্রহরা যেমন বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। সবচেয়ে দূরে রইল প্লেটো যা আকারেও ছোট ও তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও অতি সংক্ষিপ্ত। ক্রমে সূর্য স্থিতিশীল হয়। অন্যান্য গ্রহে ৯৮% গতিবেগ দেখা যায় সেখানে সূর্যের নিজের গতিবেগ সে তুলনায় সামান্য মাত্র ২% মত। ভিতরের গ্রহ অর্থাৎ বুধ, শুক্র, চন্দ্র পৃথিবী ৩৫ থেকে ১৪৫ মিলিয়ান মাইল দূরত্বের পরিধিতে বিস্তৃত। বাইরের সারির গ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন ৪৮০ থেকে ২,৪০০ মিলিয়ান মাইল দূরত্বের পরিধি নিয়ে আছে।

গ্যাস ও বস্তুকণার মধ্যে চুম্বক শক্তির কার্যকারিতাই এই মহাজাগতিক বিস্ময় সৃষ্টির কারণ বলে ধরা যায়। এই সব ঘটনা যেমন ঘটেছে তখন যে কোথায়? শুধু প্রাণের একখানি আসন পাতা হবে বলে তার সম্ভাবনার সূত্রপাত

হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর সৃষ্টি হবার পর তার প্রজ্বলিত অবস্থা ক্রমে প্রশমিত হতে থাকে, তাপ হ্রাস পায়। পৃথিবী তার যাবতীয় জিনিস সোনাদানা ইত্যাদি সবকিছুর মূল রূপ নিয়ে এসেছে তৈরী হবার সময় আকাশ থেকে। তারপর নানাভাবে নানাচালে পৃথিবীর আদিম বস্তুকণা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণের নানা চিত্রলেখা দেখা দিয়েছে।

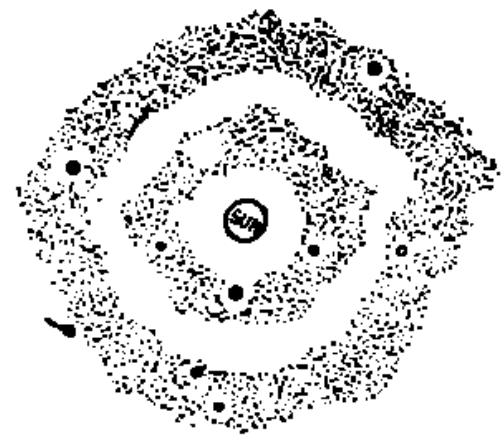

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯, ৩০, ০০,০০০ মাইল। সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লাগে মাত্র ৮ মিনিট। পৃথিবীর নিজের পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল এবং তার ওজন ৬৬ র পর কুড়িটা শূন্য রাখলে যত ওজন তত টন। পৃথিবীতে স্থলের পরিমান ৫, ৭৫, ১০,০০০ বর্গমাইল ও জলের ১৩, ৯৪, ৪০, ০০০ বর্গমাইল। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এভারেষ্ট শৃঙ্গ; উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। প্রশান্ত মহাসাগরের এক জায়গায় সাগর জলের গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট। সবচেয়ে নীচু আর সবচেয়ে উঁচু জায়গার দূরত্বের ব্যবধান ১২ মাইল। পৃথিবীর কেন্দ্রে সম্ভবতঃ লৌহ ও নিকেল জাতীয় জিনিস তরল অবস্থায় রয়েছে। তার বাইরে লোহা ও শিলাযুক্ত নমনীয় ও নিরেট স্তরের প্রলেপ। সবচেয়ে উপরে কঠিন পাথরের আচ্ছাদন। ভূমনীর ওজন পরীক্ষা করলে অক্সিজেন (৪৭ ভাগ), সিলিকন (২৮ ভাগ), এলুমিনিয়াম (৮ ভাগ), লোহা (৫ ভাগ), ক্যালসিয়াম (৩.৫ ভাগ) সোডিয়াম (২.৫ ভাগ), পোটেসিয়াম (২.৫ ভাগ), ম্যাগনেসিয়াম (২ ভাগ) ও অঙ্গার, ক্লোরিন ইত্যাদি (১.৫ ভাগ) পাওয়া যায়। পৃথিবীর আবরণে যে বায়ুস্তর রয়েছে তা ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত—তারপর মহাশূন্য। বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন (শতকরা ২১ ভাগ), নাইট্রোজেন

(৭৮ ভাগ), আরগন, কারবন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি (১ ভাগ আছে। আকাশের মাঠে পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে ২৩ ঘণ্টা, ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড একদিনে ঘুরে আসে। আর ৩৬৫ দিনে, ৫ ঘণ্টা ৪৮ সেকেণ্ড একবছরে প্রদক্ষিণ করে। এত বিরাট হিসাব দিলেও বোঝান সম্ভব নয় যে মহাশূন্য কত বিরাটকত মহান। সেখানে এই পৃথিবীর মত কত অগুণতি গ্রহ লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধানে থাকতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির সর্বত্র একটা গঠনের মৌলিক সংহতি দেখতে পাওয়া যায়।

আজকের পৃথিবীতে জৈব পদার্থে যা অণুপরমাণু পাওয়া যায় প্রাণহীন পদার্থেও তাই। অণুপরমাণুর গঠনের চাতুর্যে একদিকে প্রাণ অন্যদিকে নিষ্প্রাণের কাঠামো গড়ে উঠে। অণুর সমাহারের বৈশিষ্ট্যই সবচেয়ে মূল্যবান প্রভেদ। জীবনের সারে রয়েছে জল, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও নিউক্লেইক অ্যাসিড—সেলের ভিতর তৈরী হয়েছে এক সনাতন রসায়ন। সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার থেকে সবচেয়ে বৃহদাকার জীবের মধ্যে প্রধানতঃ এই নিউক্লিয়ো প্রোটিনই জীবনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। প্রোটিন জীবনের সার। নানান প্রোটিন দিয়ে জীবনের নানান আলেখ্য রচনা হয়েছে। প্রোটিনের গঠনের জটিলতা অশেষ। প্রোটিন গঠন যত সূক্ষ্ম তত নিগূঢ়। কারবণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য পরমাণু দিয়ে প্রোটিন তৈরী হয়। কারবন অন্য পরমাণুদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রাখে। হাইড্রোজেনের পরমাণু সবচেয়ে হাল্কা। প্রোটিন হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে তিন মিলিয়ান গুণ ভারি ও পরিধিতে প্রায় শতগুণ বড়।

প্রোটিনের মর্মমূলে যা রসালে দেখা যাবে প্রোটিন তৈরী হয়েছে আবার অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম প্রোটিন অণুতে প্রায় তিনশো অ্যামিনো অ্যাসিড জড়ান। আর বড় প্রোটিনের তিরিশহাজার অ্যামিনো অ্যাসিড থাকতে পারে। প্রোটিনের লঘু অবস্থা হিসাবে বলা যেতে পারে অ্যালবুমিনস কোন পদার্থের কথা। ধারণা করা হয় পৃথিবীর উৎপত্তির পর কোন সৌর-বিকরণের ফলে এক অসাধারণ রাসায়ণিক পদার্থের সৃষ্টি হয় মেটাস্ট্যাটিক কমনাউণ্ড। ধারণা তখন বাতাসে খুব অক্সিজেন সম্ভবত ছিল না। হাওয়ায় হাইড্রোজেন, অ্যামেনিয়া ও মিথেন (যেমন আজও এই রকম আবহাওয়া কোন কোন গ্রহে বর্তমান) জাতীয় পদার্থ ছিল। এই রকম রাসায়নিক আনুকূল্যে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উদ্ভব হয়—প্রাকৃতিক কোন ঘটনাচক্রে।

এই পৃথিবীতে প্রায় পাঁচশো মিলিয়ান বছর ধরে জীবিত প্রোটিন কাজ করে চলেছে। কখনও বসে নেই। প্রাণপদার্থ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রোটপদার্থের নিজের সহজাত ক্ষমতা চল তা প্রয়োজনে বিবর্তিত হতে পারে। তাই নিজের আত্মপ্রকাশের মধ্যে তার প্রাণময়তার দিবা পরিচয় পাওয়া যায়। কোটি কোটি বছর ধরে নানাঙ্গ প্রাণকণা অসামান্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। পশুত্বের স্তর পেরিয়ে মনুষ্যত্বের উপলব্ধিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে। কাফের মানুষ, রুষের মানুষ, কলকাতার মানুষ, ঢাকা বিক্রমপুরের মানুষ, বর্ধমানের মানুষ, মুড়োপাহাড়ের মানুষ সবাই এসেছে এক উৎসমুখ থেকে। সবার মধ্যে একই রকম অণুপরমাণুর রহস্যময় ব্যঞ্জনা। সবাই এক একজন রাসায়নিক কারখানা। অতীতকে বর্তমানে নিয়ে আসার জীবন্ত সেতু।

আপাতবৈষম্যের কথায় ভুলে যখন ইউ. এস্. ও তে ঝালমুড়ি চলে তখন দেখলে নিরাশ হতে হয়। কোথায় এক মহাজাতি একতা! কিন্তু যখন মানুষের ঊর্ধলোক যাবার প্রস্তুতি দেখা যায় তখন মনে আশা হয়। এবার ভাগনেরা তাহলে মামাবাড়ী যুথো হচ্ছে। মেষমূলুকের মামাবাড়ীতে কিলচড় নেই শুধুই আছে অ্যাটমে অ্যাটমে চকমকি। রাশিয়ানরা কি মামার প্রিয়পাত্র? ইতিমধ্যে গ্রহান্তরে যাওয়ার অনেকখানি পথ তাদের জানা হয়ে গেছে। কোথাও যাবার আগে প্রথমে চাঁদের মাসীর কাছে গিয়ে যেতে হবে। সকালে যেখানে তেলেবেগুনে জ্বলছে, রাত্রে সব শীতে ঠকঠক ঠাণ্ডা। মামাবাড়ী যাওয়া সার্থক হলে আমি ভাবছি অন্যগ্রহে আর কোন রকম না-দেখা মাসতুতো ভাইবোনের সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা।

রসায়ণশাস্ত্র ও প্রাচীন ভারত

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এ্যালকেমি থেকে কেমিস্ট্রির উৎপত্তি ঘটেছিল ইউরোপে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ইউরোপে রসায়নবিদ্যা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক রূপ নিতে পারেনি। ইউরোপের ইতিহাসকে প্রত্যেক দেশে চাপিয়ে দেবার প্রবণতা ইউরোপীয়দের মধ্যে তো বটেই, এদেশীয় কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যেও প্রকটভাবে বিদ্যমান। তারা মানতেই চাননা যে ভারতীয় রসায়নবিদ্যা অত্যন্ত পুরনো এবং তা বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও ভারতীয় রসায়নবিদ্যার উদ্ভব দশম দশকের আগে নয় বলে মনে করতেন। তাঁর মতে চরক শুশ্রুত প্রভৃতি [illegible] যুগের লোক হলেও তাঁরা মোটামুটি উদ্ভিজ [illegible] নিয়েই গবেষণা করেছেন, রাসায়নিক গবেষণা করেননি।

উদ্ভিজ্জ গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল পঞ্চম থেকে দশক শতাব্দীর মধ্যে। ভারতীয় ধাতব-রসায়ন বিদ্যার চর্চা শুরু হয় আরো পরে। পারস্যের বিখ্যাত রাসায়নিক আর রাজীর নিকট ভারতীয়রা এই বিদ্যার জন্য ঋণী। রাজী অবশ্য চরক এবং শুশ্রুতের বইগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আলবেরুণীও সে কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, ধাতব রসায়নের প্রবক্তা ভারতীয়রা নয়, আর রাজী—এই হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তব্য।

এ ইতিহাস বিকৃত ইতিহাস এবং একমাত্র আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষেই তা গ্রহণ করা সম্ভব। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অনেকগুলি দেশেই এর অনেক আগেই রসায়ন বিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল। মিশরের কথাই ধরা যাক, শব-সংরক্ষণে (মমী) তারা উন্নত ধরনের রাসায়নিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল। এবং ভারতবর্ষেও রসায়ন বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে দশম শতকে নয় খ্রীষ্টজন্মাবার অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে।

মহাভারতের যুদ্ধের কাল নির্ণয় এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় আজ থেকে তিন হাজার সাতশ ছিয়াত্তর বছর আগে (মোটামুটি ভাবে সর্বজন স্বীকৃত মত) অর্থাৎ ১৮৩৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। তাহলে স্বীকার করতেই হবে সুশ্রুতের আবির্ভাব ঘটেছিল এর অনেক আগে। মহাভারত সুশ্রুতের সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে সুশ্রুতের যে উল্লেখ আছে তাতে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন বিশ্বামিত্রের পুত্র, কাশীরাজ দিবোদাসের কাছে তাঁর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা। যারা মনে করেন ধাতব বিষয় নিয়ে গবেষণা সুশ্রুত করেননি, তারা ভ্রান্ত। সুশ্রুতে পারদ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। চরক অবশ্য সুশ্রুত অপেক্ষাও প্রাচীন। চরকের ভাষা রামায়ণ মহাভারতের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীন, অনেকটা বেদের ভাষার অনুরূপ।

মোটামুটিভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সে যুগের চিকিৎসাবিদ্যা প্রধানত চারটি ধারায় প্রবাহিত ছিল (১) পারদ ও ধাতুবিদ্যা, (২) উদ্ভিদ ঔষধপত্র (৩) ঝাঁড়-ফুঁক, ভূতপ্রেত এবং (৪) শল্য বিদ্যা। এর মধ্যে ধাতব বিদ্যা কম প্রাচীন নয়। 'রসরত্ন সমুচ্চয়' প্রণেতা ভাগবত সাতাশ জন রাসায়নিক বা রসসিদ্ধের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া সতেরো জন সংগ্রহ-কর্তার উল্লেখও তাঁর গ্রন্থে আছে। 'রসরত্নসমুচ্চয়' উল্লিখিত প্রথম রাসায়নিক আদিন সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু না জানতে পারলেও দ্বিতীয় রাসায়নিক অর্থাৎ চন্দ্রসেন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য ধাতব-বিদ্যা বিশারদ। দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে যে মরচে-বিহীন লৌহস্তম্ভটি আজও রক্ষিত ও অম্লান রয়েছে, এর নির্মাতা ছিলেন রাজা চন্দ্রসেন। ঐ লৌহ-স্তম্ভের গায়ে তা আজো খোদিত হয়ে রয়েছে, তাতে লেখা বিষ্ণুপদ পর্বতে এই স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করলেন রাজা চন্দ্রসেন। ইংরেজী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন চন্দ্র বংশজাত রাজা বলে। এ মত সঠিক নয়। নির্মাণ-কর্তাই ছিলেন রাসায়নিক রাজা চন্দ্রসেন। সাধারণ লোকের মধ্যে ধারণা রয়েছে ঐ স্তম্ভটি বোধহয় পৃথ্বীরাজের সমকালীন। রাজা অনঙ্গচন্দ্র

কর্তৃক ওটি প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণা যথার্থ নয়। দিল্লীতে যেখানে স্তম্ভটি বর্তমানে স্থাপিত রয়েছে তার কাছাকাছি কোথাও বিষ্ণুপদপর্বত বা অন্য কোন পর্বত নেই। বিষ্ণুপদপর্বত রয়েছে গয়ায় এবং সেখানেই এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্তম্ভ-গাত্রে তার প্রমাণ আজো উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। নিজবাহুবলে নিজ কীর্তির জয়ঘোষণা করবার জন্য এই আশ্চর্য স্তম্ভটি দিল্লীতে এনে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন এইমাত্র।

লঙ্কাধীপতি রাবণ ছিলেন আর একজন আশ্চর্য রাসায়নিক। তাঁর আবিষ্কৃত যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আয়ুর্বেদে আছে তাতে পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রভৃতি ধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, রামচন্দ্র মুখাসক কতখানি ছিলেন জানিনা কিন্তু তাঁর রসায়ন চর্চার ইতিহাস 'রামরাজ্য' বইটিতে পাওয়া যায়। নির্বাসিত অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে এ বিদ্যায় তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন সিদ্ধ কণানাথ এবং সিদ্ধ লক্ষ্মীশ্বরের কাছে। 'সিদ্ধ' কথাটির অর্থ এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার। সিদ্ধ অর্থে শুধুমাত্র মুক্তপুরুষ যোগী বা ভবিষ্যৎবক্তা বোঝাতো না। কেমিষ্ট বা রাসায়নিক কথাটির প্রতিশব্দ ছিল 'সিদ্ধ' কথাটি। দণ্ডকারণ্যে অবস্থান কালে রামচন্দ্র খ্যাত হয়েছিলেন দণ্ডকনাথ বলে। দণ্ডকনাথ যে একজন বিখ্যাত রাসায়নিক ছিলেন, একথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও স্বীকার করেছেন। তবে তিনি অনুমান করেছেন ঐ নামটি সম্ভবত দুন্দুকনাথ হবে। লিপিপ্রমাদ বশতঃ দণ্ডকনাথ বলে প্রচলিত হয়েছে। তিনি অনুমান করেছেন দুন্দুকনাথ সম্ভবত কোন বৌদ্ধ রাসায়নিক ছিলেন। ঐ রাসায়নিকের নাম দণ্ডকনাথই হোক আর দুন্দুকনাথই হোক তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন না একথা নিশ্চিত। তিনি যদি বৌদ্ধ হতেন, তাহলে তাঁর রাসায়নিক আলোচনার মধ্যে হিন্দু দেব দেবী সম্পর্কে এত প্রশস্তি কখনই করতেন না দণ্ডকনাথ এবং অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র একই ব্যক্তি ছিলেন এ অনুমানের আরো কারণ রয়েছে। 'রামরাজ্য' বইয়ে রামচন্দ্রকে দণ্ডনাথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসিত করার পরে স্বর্ণসীতা নির্মান করেছিলেন এরূপ প্রবাদ এদেশে আজো বিদ্যমান। 'রামরাজ্য' বই-য়ে বলা হয়েছে 'নিজ কৃত সুবর্ণ রচিত পত্নী বিগ্রহ'। অর্থাৎ রামচন্দ্র নিজেই পত্নীর সুবর্ণ মূর্তি নির্মান করেছিলেন। ঐ বই-য়ে আরো বলা হয়েছে—এটি তিনি করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জানতেন কেমন সোনা তৈরী করতে হয় এবং সেই সোনা থেকে কেমন করে মূর্তি নির্মান করা যায়। 'রামরাজ্য' বইখানি অতি প্রাচীন। শম্ভুর 'রসার্ণব' এবং নাগার্জুনের 'রসরত্নাকরে'র চেয়ে অনেক প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐ দুটি বইয়েই 'রামরাজ্য' থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি রয়েছে। 'ভাবপ্রকাশে' রামচন্দ্রের স্বর্ণ প্রস্তুত সম্পর্কে 'রামরাজ্য' থেকে থেকে যে উদ্ধৃতি রয়েছে সেটি এইরূপ :

'সভাইহুদুতোযোগীন্দ্রৈঃ ক্রমোহয়ং লৌহমারণে।
কথাতে রামরাজেন কৌতুহল বিদ্যাইদুনা।' অর্থাৎ
'ধাতু প্রস্তুতের পদ্ধতি যাহা যোগীদের জ্ঞাত ছিল, এক্ষণে, তাহা রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক বর্ণিত হইতেছে, তিনি যোগীদের নিকট হইতে কৌতুহলবশতঃ ইহা শিক্ষা করিয়াছেন।'

প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের রাসায়নিকদের সম্পর্কে আলোচনার ছেদ এখানেই টানছি যদিও, তাঁদের এবং তাঁদের আশ্চর্য গবেষণা সম্পর্কে বলার কথা অনেক বাকী রইল। বরাহমিহির অন্তত ঐতিহাসিক চরিত্র এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে সবশেষ হলেও ৫৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। বরাহমিহির রাসায়নিক নিত্যানন্দের কথা উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি নিত্যানন্দের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। এ থেকে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় নিত্যানন্দ যদি বরাহমিহিরের পূর্ববর্তী নাও হন তবে অন্ততঃ তিনি বরাহমিহিরের সমসাময়িক। নিত্যানন্দ লিখছেন 'শম্ভু সে সকল কথা 'রসার্ণবে' বলেছেন, যে সব কথা বলেগেছেন নাগার্জুন, আমি সে সবের চর্চাতেই ব্যাপৃত আছি।' এ থেকে শম্ভু বা নাগার্জুনের যুগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারনা পাওয়া যেতে পারে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নাগার্জুন, শম্ভু এবং নিত্যানন্দকে মহৎ রসায়নবিদ বলে স্বীকার করলেও তাঁদের একজনকেও দশম শতকের পূর্ববর্তী বলে মানতে রাজী হননি। আমরা তাঁর সংগে একমত হতে পারিনা এবং একমত না হওয়া কর্তব্য বলে মনে করি। আত্মবিস্মৃত ভারত-বাসীর আত্মসচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। মহত্তর ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্যই মহৎ অতীত-ঐতিহ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য।

অবাক অবধূত

ত্রিবেদী মশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান জানতে যেত লোকে। ভাদ্র মাসে গরু বিয়োলে কি হয়? দাঁত সুদ্ধ ছেলে জন্মালে তার ফল কি? ঘরের চালে শকুন পড়লে ঘরখানা জ্বালিয়ে দিতে হয় না শুধু ভেঙে ফেললেই চলে? শাস্ত্র কি বলে তাই জানতে যেত সকলে। ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হোলে ঠিকুজি মেলাতে যেত, বাপ মা মলে শ্রাদ্ধের কর্দ করাতে যেত, রোগ হোলে শালগ্রামের মাথায় তুলসী চড়াতে যেত। আপদে পড়লে যেত, আনন্দে মাতলে যেত, ত্রিবেদী-বাড়ীতে যেতই সকলে। ত্রিবেদী মশায় শাস্ত্রসাগরে ডুব দিয়ে মণিরত্ন উদ্ধার করেছেন। কেন যাবে না লোকে তাঁর কাছে!

সেই ত্রিবেদী বাড়ী এখনও আছে, লোকে আর এখন সেখানে যায় না। যায় না কারণ ত্রিবেদী-বাড়ীতে ত্রিবেদী মশায় নেই এখন, তিনি সপরিবারে সাত পুরুষের বাস্তু ত্যাগ করে প্রস্থান করেছেন। এবং আর কখনও আসল ত্রিবেদী বাড়ীতে আসল ত্রিবেদীরা ফিরবেন না।

বর্তমান ত্রিবেদী বাড়ী গঙ্গার পশ্চিম কূলে। গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। ত্রিবেদীরা এখন বারাণসী বাসের ফলভোগ করছেন। মস্ত বড় অট্টালিকা গঙ্গা গর্ভ থেকে সোজা উঠে গেছে, মস্ত মস্ত থামের ওপর অট্টালিকার ছাত, ছাতখানা অনেকটা এগিয়ে এসে ঝুলে আছে গঙ্গার ওপর। সেই নবাবী আমলের তৈরী অট্টালিকা। ত্রিবেদীরা এখন এই নবাবী অট্টালিকায় বাস করেন। ত্রিবেদীরা বাস করেন বটে, লোকে কিন্তু এ বাড়ীকে ত্রিবেদী বাড়ী বলে না। বাড়ীর নাম হীরামন্ হাবেলী। কে এক বেগম সাহেবা ছিলেন নবাবী আমলে, তাঁর নাম নাকি ছিল হীরামন্। তাঁর জন্যে বাড়ীখানি বানানো হোয়েছিল। বেগম সাহেবা কোন কালে চলে গেছেন দুনিয়া থেকে, তাঁর নামটা বেঁচে আছে। লোকে এখনও ঐ বাড়ীখানিকে হীরামন্ বিবির বাড়ী বলে কিংবা শুধু বিবি-বাড়ীই বলে। বিবি বাড়ীতে বাস করেন এখন ত্রিবেদীরা, চতুর্ভুজ ত্রিবেদী মশায় স্বয়ং বেঁচে রয়েছেন. প্রতি দিন তাঁদের কুলদেবতা অনন্তদেবের মাথায় তুলসী চড়ছে. এখন গঙ্গাজলে চন্দন বাটা হয় অনন্তদেবের জন্যে গঙ্গাজলে ভোগ রান্না হয়। সকাল সন্ধ্যা বিবি বাড়ীতে কাঁসর ঘণ্টা বাজে, তবু লোকে ও বাড়ীকে ত্রিবেদী বাড়ী বলে না। এবং কেউ কোনও বিধান নিতে যায় না।

বিধানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে লোকের, এ কথা বললে অন্যায় বলা হবে। কিংবা ভাদ্র মাসে এখন গরু বিয়োয় না বা দাঁত নিয়ে ছেলে জন্মায় না, তাও নয়। সবই হয়, আগেকার ত্রিবেদীবাড়ীর আশেপাশে যা যা হোত, এখনকার ত্রিবেদী বাড়ীর তিন দিকেও তাই হয়। বিধান নিতে ছোটে লোকে গঙ্গার পুব কূলের টোলে, ত্রিবেদী বাড়ীর দরজা মাড়ায় না। ভয় পায়, ভয়ানক ভয় পায় সকলে চতুর্ভুজ ত্রিবেদী মশায়ের সামনে দাঁড়াতে। সবাই জেনে ফেলেছে, ত্রিবেদী মশাই কোনও বিধানের ধার ধারেন না। চাক্ষুষ প্রমাণ—ত্রিবেদী বাড়ীর ছাতে এক পাল শকুন সদা সর্বক্ষণ বসে আছে। জ্যান্ত শকুন সবকটি; একেবারে জলজ্যান্ত শকুন সব। ছেলে বুড়ো আতা বাচ্চা আস্ত একটা শকুন সংসার বাস করছে বর্তমান ত্রিবেদী বাড়ীর ছাতে। ছাতের ওপর শকুনের সংসার, ছাতের তলায় ত্রিবেদীদের সংসার। কে যাবে এখন ত্রিবেদীদের কাছে বিধান নিতে! ঘরের চালে শকুন পড়লে কি করতে হবে, তা জানবার জন্যে এমন লোকের কাছে কে যাবে যাঁর ঘরের চালে এক পাল শকুন পরম শান্তিতে ঘর গৃহস্থালি করছে!

বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাস করছেন এখন ত্রিবেদীরা শকুনদের আশ্রয়ে। বাড়ীখানি শকুনগুলো সমেতই নিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। নিয়েছিলেন মানে দাঁও মত পেয়ে গিয়েছিলেন। ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে এই বাড়ীখানি পাবার, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার উপযুক্ত হেতু আছে। সে সব হোল সেই সাবেক কালের কথা। তখন ইংরেজরা ছিল এই দেশে, তারা আবার তাদের জাতি-গুষ্টির সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছিল তখন।

লড়াইটা চলছিল দুনিয়ার অন্য প্রান্তে, তার ছোঁয়াচ এসে পৌঁছে গেল বাঙলার পুব দিকটায়। ওলটপালট হোতে গেল অনেক রকম, জাগ্রত দেব-দেবীর মন্দিরের দরজায় রাতের অন্ধকারে শিঙ্ যুক্ত গরুর মাথা আবির্ভূত হোতে লাগল। মাথাগুলোই এল শুধু ধড়গুলোর পাত্তা নেই। ধড়ের খোলসটা হয়ত দেখা গেল খাবার জলের পুকুরে ভাসছে। আরও নানা জাতের বিদকুটে বিপত্তি ঘটতে শুরু করল একে একে। মাতৃশ্রাদ্ধে ঘটা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছিলেন চাটুয্যেরা, অনাহূত এক দল অতিথি এসে রৈ রৈ করে বসে পড়ল পঙক্তিতে। কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছেন প্রসন্ন বিশ্বাস, গ্রামেরই চেনাজানা ছেলেরা উপস্থিত হোল রণসজ্জায় সজ্জিত হোয়ে। কন্যাটিকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল সকলের নাকের ডগা থেকে। আরও কত কি! ত্রিবেদী মশাই শাস্ত্র ঘেঁটে দেখলেন, দুর্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। এবং শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি—এ কথাও শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। অতঃপর তিনি আর অপেক্ষা করা সমীচীন জ্ঞান করলেন না তলে তলে ব্যবস্থা করে সম্পত্তি হস্তান্তর করে ফেললেন। অনেক দূরে গঙ্গার পশ্চিম কূলের এক শিষ্যকে স্মরণ করলেন। শিষ্যটি দুঁদে জাতের উকিল। তাঁর এক মক্কেল কোন এক নামজাদা নবাবের বংশধর সেই সময় কৌত হোয়ে পড়লেন মামলা মকদ্দমার পাঁচে পড়ে। উকিল বাবুর পরামর্শে তিনি চলে গেলেন বাঙলার পুবে ত্রিবেদীদের বাস্তু ভিটায়। তাঁর বাড়ীখানি নিলেন ত্রিবেদীরা। সমৃদ্ধলে সব কাজ সমাপ্ত হোয়ে গেল। উকিল বাবু তাঁর মক্কেলের মঙ্গল করলেন এবং গুরু বংশকে গঙ্গাতীরে স্থাপন করলেন। এক ঢিলে দুই পাখী বধ হোল।

তবে এক পাল পাখী বেঁচে রইল বাড়ীর ছাতে, এটা উপসর্গ বটে। রইল থাকুক, খেতে পরতে দিতে হবে না যখন, তখন থাকলে ক্ষতি কি! বাড়ীর চালে হঠাৎ একটা বা কয়েকটা শকুন বসলে কি ফল হয়, তাই লেখা আছে শাস্ত্রে। কিন্তু সশকুন বাড়ী ক্রয় করে বসবাস করতে থাকলে কিছু হয় কি না, তা কোনও শাস্ত্রের কোনও শ্লোকে লেখা নেই। সাত পুরুষের ইষ্টদেবতা অনন্ত দেবটিকে গলায় বেঁধে নিরম্বু উপবাস করে সঙ্গে এনেছেন ত্রিবেদী মশাই, নিত্য সেই অনন্তদেবের ওপর তুলসী পড়ছে। যে গৃহে প্রত্যহ শালগ্রামের শিরে তুলসী চড়ে, সে গৃহের শিরে বজ্রাঘাত হোলেই বা কি হবে! শকুন ত' অতি তুচ্ছ ব্যাপার! স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—এই মহা-বাক্যটিও শাস্ত্রে রয়েছে। সুতরাং চিন্তা কি!

চিন্তার কোনও কারণ সত্যিই ছিল না। শাস্ত্র-সম্মত-শকুন গুলোও নিশ্চিন্ত হোয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি করছিল। কলুষ নাশিনী জননী জাহ্নবী স্বয়ং ওদের সহায়, ওদের অভাব কি!

হীরামন্ হাবেলীর ছাত বুক সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে ছ'হাত অন্তর একটি থাম, থামের মাথায় নিরেট গম্বুজ। প্রতিটি গম্বুজের মাঝখান থেকে এক হাত উঁচু লোহার শিক একটি খাড়া হোয়ে রয়েছে। নবাবী আমলে শিকগুলোর সঙ্গে বোধ হয় নিশান বাঁধা হোত। হাল আমলে এক একটি শকুন বসে থাকে প্রত্যেকটি শিক ঘেঁষে। বসে থাকে এমন ভাবে যেন ওরাও চুন বালির তৈরী, এতটুকু নড়ন চড়ন নাস্তি। নজর কিন্তু ঠিক আছে, গঙ্গার এধারে ওধারে যতদূর দৃষ্টি পৌঁছয় ততদূর পাহারা দিচ্ছে। খাবার মত কিছু ভেসে যেতে দেখলেই একজন উড়ল। আকাশে একটা চক্কর দিয়ে পৌঁছে গেল ঠিক জায়গায়, ঝপ করে নেমে পড়ল খাবারের ওপর। তারপর টাল সামলে ঠিকঠাক হোয়ে বসে মন দিলে খাওয়ায়, খেতে খেতে মহা আরামে ভেসে চলল। আরামটুকু দশ হাতও এগোতে পেল না, একজনকে উড়তে দেখেই বাকী সবাই গলা উঁচিয়ে দেখে নিলে ব্যাপারটা। তারপর দল বেঁধে ঝাঁপ দিলে গঙ্গায়। গঙ্গার জলে কিন্তু পড়ল না, করেক হাত ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল। ধরে ফেললে ঠিক তাকে, যে মহা আরামে ভেলায় চেপে খেতে খেতে চলেছে। তখন আরম্ভ হোল ছোঁ মারা, ছোঁ। নেয়ে এক খাবলা ঠোঁটে নিয়ে আকাশে ওঠে। সেটুকু শেষ হোলে আবার ঝাঁপ দেয়। তখন আর কারও পক্ষেই আহার্যের ওপর চড়ে বসে শান্তিতে খাওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবে ছোঁ দিতে দিতে খাদ্যের সঙ্গে উধাও হোয়ে গেল সবাই, আকাশে জলে কোথাও এক প্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ঘণ্টাখানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এসে বসল ত্রিবেদীর ছাতে। উদর পূর্ণ হোয়ে গেছে।

সুতরাং শকুনদের জন্যে ত্রিবেদীদের কানাকড়ি খরচা নেই। তবে ছাত বোঝাই শকুনের জন্যেই বোধ হয় ঐ বাড়ীতে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর কাছে বিধান নেবার জন্যে কেউ না কেউ। শকুনরা ত্রিবেদীদের পসার জমতে দিলে না।

কত কাণ্ডই না ঘটল তারপর। সে বছর পূজার আগে মস্ত বড় ঝড় বৃষ্টি হোল। গঙ্গার জল বেড়ে ত্রিবেদী বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢুকে পড়ল। হাজার হাজার মরা ভেসে চলেছে গঙ্গা দিয়ে, তাদের মধ্যে জনাকয়েক এসে তাঁদের উঠোনে আঙ্গিনায় আশ্রয় নিলে। দুর্গন্ধে প্রাণ যাবার উপক্রম হোয়ে উঠল। ছাত থেকে উঠোনে নামল শকুনরা, দু' দিনের ভেতর উঠোন পরিষ্কার করে দিলে। ওধারে চাল উঠল টাকায় এক সের। মন মন কাঁসা পেতলের বাসন নৌকা বোঝাই করে নিয়ে এসেছিলেন ত্রিবেদীরা দেশ থেকে, সেগুলো একে একে কমতে লাগল। বিস্তর মানুষ দিবা রাত্র অষ্ট প্রহর দরজায় দরজায় চেঁচাতে লাগল—একটু ফেন দাও গো মা। হাহাকারের জ্বালায় ইংরেজরা আর এ দেশে তিষ্ঠুতে পারল না। বাঙলার পুব দিকটাকে মক্কা মদিনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তল্পি গোটালে। ফলে শান্ত যেমন চলবার আশায় রাশী রাশী গৃহস্থ পুব দিক ছেড়ে পশ্চিমে চলে এসে পথের ওপর আশ্রয় নিলে। শাস্ত্র যা করতে পারলে না, পথ তাই করলে। পথ তাদের বেমালুম গ্রাস করে ফেলে ধর্ম নষ্টের দায় থেকে বাঁচালে। ত্রিবেদীদের মত সময় বুঝে গুছিয়ে চলে আসতে পারলে টিকে যেত হয়ত অনেকে। কিন্তু সময়ের সংকেত ধরতে পারে ক'জনে! সব মানুষই ত' আর চতুর্ভুজ ত্রিবেদী মহাশয়ের মত শাস্ত্র-সমুদ্রের ডাঁটো ডুবুরী নন।

টিকে রইলেন চতুর্ভুজ ত্রিবেদী মশায়, সময়ের জন্যে প্রস্তুত হোয়ে রইলেন সব সময়। ঐ প্রস্তুত হোয়ে থাকাটা হঠাৎ শুরু হোয়ে গেল একদিন। সেই পূজার সময়ের বন্যাতেই প্রকাণ্ড এক বেলগাছ গঙ্গা দিয়ে এসে আটকে গেল ত্রিবেদী বাড়ীর ঘাটে। ঘাট সরাতে হোলে গাছ সরাতে হয়। বন্যা কমতে লোক জন ডেকে গাছটাকে টুকরো করাতে হোল। এক-মিলওয়ালা এসে কয়েক নৌকো কাঠ নিয়ে গেল। বেল কাঠ জ্বালিয়ে তারা মিল চালাবে। কয়েকটা মসৃণ সরল টুকরো রেখে দিলেন ত্রিবেদী মশাই, প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই হাত লম্বা বেড়ও হাত বেড়েকের মত হবে। বললেন—জ্যান্ত বেল গাছের গায়ে কোপ দিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠে যজ্ঞ করলে মহাপাতক হয়। শিষ্য যজমানদের জন্যে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করার দরকার হোলে শাস্ত্র-সম্মত কাঠ সংগ্রহ করার জন্যে আর ছুটে বেড়াতে হবে না। কাঠের দুর্ভাবনা ঘুচল।

দুর্ভাবনা কিন্তু ঘুচল না বরং ঘোরতর রকম বৃদ্ধি পেল বলা চলে। ত্রিবেদী মশায়ের নয়, বাড়ীর অন্য সব প্রাণীর। ত্রিবেদী মশায়ের কাণ্ডকারখানা দেখেই বেড়ে গেল সকলের দুর্ভাবনাটা। তিনি কাঠ কখানিকে তুলিয়ে আনালেন দোতলায়, আনিয়ে তাঁর শোবার ঘরের এক কোনে পরিপাটী করে সাজিয়ে রাখলেন। সব শুদ্ধ এক কুড়ি, বেল কাঠের ওজন কম নয়। অন্ততঃ চার পাঁচ মণ ত' বটেই। সেই রাশীকৃত কাঠকে শোবার ঘরে স্থান দেওয়াতে বহু লোকের আপত্তি উঠল। ত্রিবেদী মশায়ের ভায়েরা যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হোলেন। কারও আপত্তিতে কান দিলেন না ত্রিবেদী মশাই, সময় বুঝে সামলে চলাটা তাঁর ধাতস্থ। পাঁচ মণ কাঠ শোবার ঘরে সাজিয়ে রেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হোয়ে গঙ্গাতীরে বাস করতে লাগলেন তিনি, এক পাল শকুনও তাঁর শিরের ওপর নির্বিঘ্নে বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল।

বেল কাঠের পরে এল চন্দন কাঠ। আড়াই হাত লম্বা দেড় হাত বেড়ের চন্দন কাঠ একখানিও মিলল না। দু'সের আড়াই সের ওজনের টুকরো পঁচিশটা সংগ্রহ করা গেল। বিনা পয়সাতেই জুটে গেল কাটগুলো। বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র দেবার সময় প্রত্যেকটি শিষ্যকে জানিয়ে দিলেন ত্রিবেদী মশাই, অনন্তদেবের জন্যে উৎকৃষ্ট চন্দন কাঠ একখানি পাঠাতে হবে। শিষ্যরা গুরুদেবের এই সামান্য আদেশ সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করলেন। বাজার ঢুঁড়ে আসল মৈসুরী চন্দন কিনে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

চন্দন কাঠগুলিও বেলকাঠের পাশে শোবার ঘরে স্থান পেল।

তখন পর্যন্ত কেউ ধরতেই পারল না ত্রিবেদী মশায়ের মতলবটুকু। তারপর অবশ্য কিছুই আর বুঝতে বাকী রইল না। ষোড়শোপচার সংগ্রহ হোতে লাগল এবে

একে। এল একখানি নেয়ারের খাট,সেখানি পাতা হো না, টাঙানো রইল দেওয়ালের গায়ে। বিশুদ্ধ ঘিয়ে ঘৃত এল এক টিন, টিনের মুখ এমন ভাবে বন্ধ করা যাতে হাওয়া না ঢোকে ভেতরে। টিনটি আশ্রয় পেলে দেওয়াল আলমারির নিচের থাকে। সেই আলমারির অন্য থাক-গুলো বোঝাই হোতে লাগল ছোট বড় বয়েম দিয়ে। কোনটায় সের দুই ধুনো, কোনটায় আধ সের শুগগুল, কোনটায় ঝাড়া বাছা আতপ চাল একসের, তারপর কর্পূর, আতর, তিল, কয়েক খণ্ড সুবর্ণ, কুশ এক গোছা সমস্ত থরে থরে সাজানো হোল কাঁচের বয়েমে। এল পাঁচটা মাটির কলসী, এক গোছা পাট কাঠি দু' খানা মালসা, নতুন গামছা, নূতন খান ধুতি কয়েক জোড়া। সমস্ত জিনিষ, মিলিয়ে গুছিয়ে রাখলেন মনের মত করে ত্রিবেদী মশাই কোনও খানে এতটুকু ত্রুটি রাখলেন না। দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেল সবাই—হাঁ সাধক মানুষ বটে। সাধক না হোলে নিজের মরণের জন্যে এ ভাবে কেউ প্রস্তুত হোয়ে থাকতে পারে!

ত্রিবেদী মশায়ের ভায়েরা কিন্তু সাবাস দিতে পারল না, তারা স্তম্ভিত হোয়ে রইল। বড় ভাইকে তারা বড় ভায়ের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিল। উঁচুতে স্থান দিয়েছিল বললে ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যাবে না, বলা যায় বড় ভাইকে তারা প্রায় মায়ের মত দেখত। মায়ের-স্থানটিই দখল করেছিলেন ত্রিবেদী মশায়, ভায়েদের বুঝতে দেননি মায়ের অভাব। নিজে হাতে স্নান করিয়ে দিয়েছেন, জামা কাপড় পরিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছেন, পাশে নিয়ে শুয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন ভায়েদের। লেখা পড়া শিখিয়ে চাকরি-বাকরি করে দিয়ে বিয়ে থা দিয়েছেন। ভায়েরা দাদা ছাড়া আর কিছুই জানত না। দাদার কাছে তাদের লুকবার ছিল না কিছু। দু' ভাই বিদেশে চাকরি করত। ছুটি নিয়ে ছুটে আসত তারা দাদার কাছে, এসে দাদার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে যেত কয়েক দিন। সেই দাদা যখন মরবার জন্যে তৈরী হোয়ে বসলেন হঠাৎ, তখন তারা বোবা বনে গেল। বলবার কি আছে! বললেই বা শুনছে কে! জীবনে বিয়ে করলেন না, সংসারী হোলেন না যিনি ভায়েদের মানুষ করবার জন্যে, তাঁর কাছ ভায়েদের সব মান অভিমান রাগ দুঃখ অরণ্যে রোদন হোয়ে দাঁড়াল। চতুর্ভুজ ত্রিবেদী নিঃশব্দে হেসে ভায়েদের অভয় দিলেন—না রে পাগলেরা, মরছি না আমি এখনই। কিন্তু তৈরী হোয়ে থাকতে আপত্তি কোথায়?

বাস্তবিকই কারও জানার উপায় নেই, মরণ কবে আসবে কি ভাবে আসবে। মরণের কথা থাক, এই যে চোখের দৃষ্টিটুকু, যার সাহায্যে দুনিয়ার বুকে দুনিয়াখানাকে চিনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই দেখে চেনবার শক্তিটুকুও যে কবে কোন মুহূর্তে হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে, তা কে বলতে পারে। বেঁচে আছি, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছি যা কিছু পড়ছে চোখের আওতায়, দেখে বিবেচনা করে পা ফেলছি। হঠাৎ এক দিন তাকানো ফুরিয়ে গেল, দেখা ফুরিয়ে গেল, সম্বন্ধ ঘুচে গেল দুনিয়ার সঙ্গে। চোখের কাজ আর করছে না তখন চোখ দু'টো, বেমালুম অন্ধকার। আলো নিভে গেছে দুনিয়ার বুক থেকে, দুনিয়াখানা চোখের সামনে থেকে উঠে গেছে। এরই নাম কি মরণ নয়! এই জ্ঞাতের মরণে মরে তারপরও যদি শ্বাস প্রশ্বাস বজায় থাকে, তখন কেমন হয়! বেল কাঠ চন্দন কাঠ গাওয়া ঘি কাজে লাগে না বটে, কিন্তু কাঠগুলো বিনা আগুনে গুমিয়ে গুমিয়ে জলতে থাকে। আর সেই বিনা আগুনের জলন্ত চিতার ওপর বসে তখন দিন গুণতে হয়। ধোঁয়া থাকলেই আগুন আছে, এটা সত্যি কথা নয়, তা হলে আরও বড় সত্যি কথা হচ্ছে, কাঠেও আগুন আছে। বিশ্বাস না হয়, কাঠে কাঠে ঘষে দেখ।

শুকনো কাঠ রাশীকৃত জুটিয়ে নিয়ে বসে থাকাটা সত্যিই খুব নিরাপদ নয়।

ত্রিবেদী মশায়ের পক্ষেও নয়। কাঠ জলতে কতক্ষণ?

যাক—যা বলছিলাম। ত্রিবেদী মশায়ের নামটা এবার ক্রমে ক্রমে ছড়াতে লাগল। সংসারের মধ্যে সার যে কিছুই নেই এটুকু চতুর্ভুজ ত্রিবেদী মশায়ের মত কে বুঝেছে! সাক্ষাৎ শিব চতুর্ভুজ ত্রিবেদী। শাস্ত্রজ্ঞান অনেকেরই আছে, কিন্তু কই! আর একটি লোককে দেখাও, যিনি ওঁর মত মরণকে সাদর অভ্যর্থনা করার জন্যে সেজে বসে আছেন। মানে—শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে কিছুই হয় না, সাধনা চাই, সত্যোপলব্ধি চাই। আজন্ম বিয়ে করলেন না, শাস্ত্র-সাগরে ডুবে রইলেন, সিদ্ধিলাভ করলেন সাধনায়। তাই আনন্দে ডুবে আছেন, চিরস্থায়ী আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন। মৃত্যু ওঁর করবে কি!

বাড়তে লাগল ভক্ত সংখ্যা। হীরামন্ হাসলী বা বিবি বাড়ী বলতে বাধল মুখে সকলের বর্তমান ত্রিবেদী বাড়ীকে। ত্রিবেদী মশায় যেখানে থাকেন সেটা ত্রিবেদী বাড়ী। অল্পদিনের মধ্যে ত্রিবেদী বাড়ীর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করার বাসনা নিয়ে অনেক দূর থেকে অনেক মানুষ চতুর্ভুজ মশায়কে দর্শন করতে এল। এসে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শাস্ত্রসার শ্রবণ করে কৃতার্থ হোয়ে ফিরে গিয়ে এমন সব কথা বলতে লাগল যার ফলে আরও মানুষ ছুটে আসতে বাধ্য হোল ত্রিবেদী বাড়ীর দরজায়। একেবারে জমজমাট কাণ্ড, গঙ্গার পুব পাড়ের টোল কানা হোয়ে গেল।

কানা হোয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাইও। এক দিন গঙ্গায় ডুব দিয়ে বুক জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের পানে তাকিয়ে এক আঁজলা জল নিয়ে অর্ঘ দিচ্ছেন তিনি, হঠাৎ সূর্যটা থর থর কাঁপতে লাগল। বনবন করে পাক খেতে লাগল। লাল নীল সবুজ বেগুনী নানা জাতের রং ছিটকে পড়তে লাগল সূর্যের গা থেকে। তাজ্জব বনে গিয়ে তাকিয়ে রইলেন হাঁ করে সূর্য্যের পানে ত্রিবেদী মশায়। অসাড়ে অশ্রু গড়াতে লাগল তাঁর দুই চোখ দিয়ে। অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে অনাস্বাদিত আনন্দে জ্ঞান হারা হোয়ে পড়লেন তিনি। ক্রমে ক্রমে বেগুনী রঙটা কালোয় পরিণত হোলো তারপরে নিভে গেল সূর্যটা, লুপ্ত হোয়ে গেল বিশ্ব চরাচর। ত্রিবেদী মশায় জল থেকে উঠে এলেন। চোখ দিয়ে জল গড়াতেই লাগল কিন্তু, অকোরে গড়িয়ে গড়িয়ে চোখ দুটিকে একদম ভাসিয়ে দিলে। ত্রিবেদী হাতড়ে হাতড়ে দু'হাত বাড়িয়ে চলা ফেরা করতে লাগলেন। বিত্তর বড় বড় ডাক্তার ধরে নিয়ে এল তাঁর ভায়েরা, একদম একটুও ফল পাওয়া গেল না। স্বেচ্ছায় সূর্যের পানে তাকিয়ে সূর্যদেবকে অর্ঘ দিয়ে এসেছেন যিনি চক্ষু দুটীকে, তাঁর অন্তরের দৃষ্টি তখন স্বচ্ছ হোয়ে উঠেছে। বাইরের দৃষ্টি নিয়ে তখন তিনি কি করবেন?

যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকুও হোল। চতুর্ভুজ ত্রিবেদী সংসার মুক্ত পুরুষ হোয়ে বেঁচে রইলেন। ঘি আর কাঠ মুক্ত পুরুষের ঘরে জেগে রইল। কাঠে আগুন আছে, এবং আগুনের কাছে ঘি রাখতে নেই, এই সহজ সত্যি কথাটা কিন্তু তাঁর খেয়ালে এল না এলেই বা তখন করেন কি তিনি! নজর ত' আর রাখতে পারেন না চতুর্দিকে। নজর রয়েছে নিজের বুকের মধ্যে। সেখানে যা দেখতে পাচ্ছেন তাতেই তিনি আনন্দে ডুবে রইলেন।

বাইরে আগুন জ্বলল।

আগুনটা হোল মুক্তার আগুন, যে আগুনে মুক্তা ভস্ম হয় সেই আগুন জ্বলে উঠল হঠাৎ। ত্রিবেদী মশায় মুক্তা ভস্ম করলেন। অথবা একথাও বলা যায়, মুক্তা ভস্ম সেবন করে ত্রিবেদী মশাই জরা জয় করে ফেললেন।

ব্যাপারটা ঘটল অকস্মাৎ।

মুক্তা এল ছোট ভায়ের শ্বশুর বাড়ী থেকে। সে হোল ত্রিবেদী মশায়ের ছোট ভায়ের বউয়ের কি রকম এক সম্পর্কের দিদি। বয়েস, তা' ত্রিশের কাছাকাছি হবেই। বড়ই মর্মস্পর্শী ইতিহাস তার। বিয়ে হোয়েছিল, স্বামী রেলে চাকরী করত। চাঁদপুর থেকে যে লাইনটা চলে গেছে আখাউড়ার দিকে,—সেই লাইনের কোনও ষ্টেশনে টয়ে টক্কার কল ঠুকত। কোয়ার্টার পেলে বউ নিয়ে যাবে, এই আশায় ছিল। হঠাৎ এক দিন বিশুর লোক না টাডি নিয়ে ঢুকে পড়ল ষ্টেশনে। মাষ্টার বাবু, টয়েটক্কা বাবু, টিকিট বাবু মায় যে লোকটা ঘণ্টা বাজাত গাড়ী ছাড়বার সময়, সকলকে ফুপিয়ে কেটে রেখে চলে গেল তারা। যাবার সময় মাষ্টার বাবু আর টিকিট বাবুর কোয়ার্টার থেকে তাঁদের বউ ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গেল। টয়েটক্কা বাবুর নতুন বিয়ে করা পরিবার বাপের বাড়ী ছিল, তাই রক্ষা পেলে। রক্ষা পেয়ে বাপ ভায়ের সঙ্গে একদা পুব দিক ছেড়ে পশ্চিমে চলে এল। বাপ ভাই তখন নিজেদেরই সামলাতে পারে না। অগত্যা তাকে নিজের ভার নিজে নেবার জন্যে তৈরী হোতে হোল।

তৈরী হোয়েই ছিল সব কিছু তার জন্যে। দূর সম্পর্কের বোনের ভাসুর অন্ধ। মস্ত বড় পণ্ডিত, আজন্ম ব্রহ্মচারী দেবতুল্য ব্যক্তি। তাঁর সেবায় নিযুক্ত হোল মুক্তা। ত্রিবেদী মশাইকে হাতে ধরে এ ঘর থেকে ও ঘরে নিয়ে বেড়াতে লাগল। পূজার যোগাড় করে দেওয়া, জলের গেলাসটা হাতে তুলে দেওয়া, কাপড় গামছা গুছিয়ে দেওয়া, হাত ধরে পাতের সামনে আসনে বসানো, তারপর খাওয়া হোলে হাতে জল ঢেলে পা ধুইয়ে দিয়ে খাটের ওপর তুলে দেওয়া, এ সমস্ত সে করে। ছোট ভায়ের

বউটি শুধু আছে সংসারে, সে ও আর ভাসুর ঠাকুরকে ছুঁতে পারে না। ভাই উনি অত চাকরি করে, বাড়ীতে থাকে কতক্ষণ। কে হবে অন্ধের যষ্টি, মুক্তাকে এনে সংসারে আশ্রয় দিতে হোল।

ত্রিবেদী মশাই আবার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। মুক্তার চক্ষু দুটির সাহায্যে তিনি সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তুললেন। মুক্তা তাকে দুনিয়াখানা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখতে লাগল।

ভারী মজা কিন্তু এতে, ত্রিবেদী মশাই ভারী মজা পেতে লাগলেন। মুক্তা যা দেখে, যেমন ভাবে দেখে, দেখে যা বোঝে, যেমন করে বোঝে, তাই শোনায় ত্রিবেদী মশাইকে। শোনাবার মত কথাও শোনায়, না শোনাবার মত ব্যাপারও শোনায়। ক্রমে ক্রমে সাহস বাড়তে লাগল মুক্তার, বাড়াই স্বাভাবিক। তার ওপর একান্ত নির্ভর অন্ধ মানুষটিকে সে ওঠাবার দরকার হোলে ওঠায়, বসবার দরকার হোলে বসায়। তা' ছাড়া আরও একটি গুণ আছে মুক্তার, বাঙলা সে খুব সুন্দর করে পড়তে পারে। সংবাদ পত্র পড়ে শোনায়, মাঝে মাঝে বইটইও। শাস্ত্র পড়তে পারে না, শাস্ত্র ছাড়া পড়বার বস্তুর অভাব নেই দুনিয়ায়। এতকাল অবশ্য ত্রিবেদী মশাই শুধু শাস্ত্রই পড়েছেন, এবার অনেক কিছু পড়তে লাগলেন মুক্তার চোখ দিয়ে। মুক্তার গলায় সদাপর্বদা একটা হাসির আমেজ, একটা হালকা গোছের সুর, একটা বেপরোয়া ভাব। মুক্তা পড়ে, ত্রিবেদী মশাই শোনেন। এত রকমের এত বিষয় যে লেখা হোয়েছে, এবং তা' যে পড়া যায়, পড়লে শুনতে ভাল লাগে, এ যে বড় আশ্চর্য কাণ্ড! দৃষ্টি হারিয়ে দৃষ্টি খুলে যেতে লাগল ত্রিবেদী মশায়ের, তিনি একটু অন্য রকম ভাবে বেঁচে থাকার স্বাদটা পেতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরের কাজ সমাপ্ত করে ওপরে উঠে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। নিজে নিজেই উঠে গেলেন, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করবার সময়ে আর হাত ধরতে হয় না তাঁর, তবে পিছনে থাকতে হয়। মুক্তা ওর পিছনে আছেই। ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন আসনে, আসন-খানি পাতা ছিল মেঝেয়। সন্ধ্যার আগেই পেতে রেখেছিল মুক্তা, ত্রিবেদী মশাই জলযোগ করবেন। রাত্রে তিনি একটু দুধ আর সামান্য মিষ্টি খান, সন্ধ্যায় পরেই খান। তারপর ঐ আসনে বসেই গল্প শোনেন মুক্তার মুখ থেকে। আগে শুয়ে পড়তেন এখন আর শোন না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন আর গল্প শোনেন।

খাওয়া শেষ হোতে হাতে জল দিয়ে ঘর করে হাত পা মুছিয়ে দিলে মুক্তা। এলাচ লবঙ্গ হাতে দিলে। তারপর একটা নতুন জাতের প্রস্তাব উত্থাপন করে বসলো।

"নিন, এবার বিছানায় গিয়ে উঠুন আজ। মশারিটা ফেলে দিয়ে আমি যাব।"

চমকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই, বেশ একটু থতমত খেয়ে গেলেন যেন। বললেন—"যাবে! মানে—এখনই চলে যাবে!" মুক্তা বললে—"আর বলেন কেন ঝঞ্ঝাটের কথা। টিকিট পর্যন্ত কিনে এনেছে একেবারে। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে টিকিট এনে ফেললে। এখন যদি না যাই, তাহলে কি ভাববে।"

ত্রিবেদী মশাই ভয়ানক আশ্চর্য হোয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"টিকিট! কিসের টিকিট? কে কিনে এনেছে?" মুক্তার গলায় কপট ক্রোধ ঝলমলিয়ে উঠল—"কে আবার অমন কর্ম করবে, টিকিট এনেছেন ঐ বিপুল বাবু, যাঁকে আপনি ব্রহ্মচারী বলে ডাকেন। ব্রহ্মচারী হোলে হবে কি, সিনেমা দেখার সখ ষোলো। একটি সিনেমা বাদ পড়েনা। এমন নেশা যে নিজের পয়সা খরচা করে অপরকেও দেখানো চাই। হঠাৎ এসে বললেন, আমাদেরও টিকিট নিয়ে এসেছেন। ভয়ানক ভাল ছবি এসেছে নাকি। এমন ছবি যে না দেখলে জন্মটাই বৃথা। ছোট বাবু ছোট বউ আর আমি, আমাদেরও যেতে হবে। কি জ্বালা দেখুন—"

বলতে বলতে থালা গেলাস তুলে নিয়ে চলে গেল মুক্তা। ত্রিবেদী মশাই চুপ করে বসে রইলেন। বসে থাকাটাও খুব বেশীক্ষণ সম্ভব হোল না। মনে পড়ে গেল, মুক্তা ফিরে আসবে এখনই, এসে তাঁর মশারি ফেলে দিয়ে বিছানার তলায় গুঁজে দেবে। থালা গেলাস রেখে ফিরে এসে যদি দেখে, তখনও তিনি বসে আছেন, তা'হলে ভাববে কি! উঠে পড়লেন ত্রিবেদী মশাই, খাটের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একটু। কি বিপদ দেখ—সন্ধ্যা বেলাতেই মশারির ভেতর ঢুকতে হবে। কেন তিনি কি নিজেই মশারিটা ফেলে নিতে পারবেন না!

মশারিটা এখন না ফেললেই বা ক্ষতি কি।

মশারির ভেতর শুয়ে এই সন্ধ্যা থেকে ঘুমবেন নাকি তিনি। ঘুমতে পারবেন?

বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে বসলেন ত্রিবেদী মশাই। আসুক মুক্তা, বলে দেবেন তাকে, মশারি ফেলবার দরকার নেই। নিজেই তিনি মশারি ফেলে নিতে পারবেন। কিংবা সিনেমা দেখে ফিরে এসে সেই না হয় ফেলে দেবে। দরজা ত খোলাই থাকে, বৃষ্টি যাওয়ার পর থেকে দরজা বন্ধ করেন না তিনি। তাতে অন্য সকলের তাঁর ওপর দৃষ্টি রাখার সুবিধা। রাত্রে যদি কারও দরকার হয় তাঁর কাছে আসবার, মানে-তাঁর যদি কিছু দরকার পড়ে, তা'হলে ডাক দিলেই কেউ না কেউ আসবে। মুক্তাই আসে, মুক্তা তাঁর পাশের ঘরে শোয়। যদি তাঁর ডাকবার দরকার পড়ে রাত্রে তাই মুক্তার স্থান হোয়েছে পাশের ঘরে। কিন্তু কোনও দিনই সে দরকার পড়ে না ত্রিবেদী মশায়ের, কাজেই ডাকেনও না।

রাত্রে দরকার না পড়লেও এই সময়টা, সন্ধ্যার পরে এই সময়টুকু কাটাবার জন্যে দরকার পড়ে মুক্তাকে। সন্ধ্যারতি শেষ করে এসে জলযোগ সমাপ্ত করে যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়েন ত্রিবেদী মশাই, ততক্ষণ দূরে বসে গল্প করে মুক্তা। বইটইও পড়ে শোনায়। তা' চলল সিনেমা দেখতে। আসুক দেখে, ত্রিবেদী মশাই কাল গল্প শুনবেন। কি নিয়ে সিনেমা হয়, তাই না হয় শোনা যাবে। সিনেমা ব্যাপারটা কেমন, তা' কখনও দেখা হয়নি তাঁর, আর হবেও না ইহ জীবনে। মুক্তার মুখে শুনে যতটুকু জ্ঞান হয় সিনেমা সম্বন্ধে, ততটুকুই বা মন্দ কি! আর কেউ ত' তাঁর সামনে বসে সিনেমার গল্প করবে না।

মুক্তা ফিরে এল। ঘরে পা দিয়েই বলল—"কি বসে আছেন যে! শুয়ে পড়ুন, আমি মশারি ফেলে দি।"

ত্রিবেদী মশাই বললেন—"থাক না এখন। ফিরে এসেই ফেলে দিও। এখনই কি মানুষ ঘুমতে পারে!"

"বাঃ, তা' বলে একলাটি এই ভাবে বসে থাকবেন!" মুক্তার গলায় একটু যেন বিষাদের সুর ফুটে উঠল।

ত্রিবেদী মশাই টের পেলেন সেটুকু, কিন্তু ধরা দিলেন না। খুবই দরাজ গলায় বললেন—"থাকি না একটু বসে। বসে বসে তোমার কথা মানে তোমার সিনেমা দেখার কথা ভাবব। ফিরে এসে শোনাবে, কি দেখে এলে। যাও, তোমার জন্যে চমত ওদের বেশী ছোরে যাবে।"

মুক্তা বলল—"আমার কিন্তু একটুও ইচ্ছে করছে না যেতে। কি মুশকিলেই যে পড়েছি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে সেই এগারটা। আচ্ছা এসেই না হয় ফেলে দোব।"

দরজা ভেজাবার শব্দ শুনতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই, তাঁর মুখে তখন কেকাশে এক ফালি হাসি ফুটে উঠেছে।

খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, তাঁর রক্তবর্ণ শুষ্ক আঁখি-গহ্বর দু'টিতে বিচিত্র ধরণের শুষ্ক দৃষ্টি ফুটে উঠল। সে দৃষ্টিতে বাইরের কিছুই ধরা পড়ল না, অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছল সেই দৃষ্টি, নিজের ভেতরটা তিনি ভয়ানক স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন, আর একজন চতুর্ভুজ ত্রিবেদী কখন কোন ফাঁকে তাঁর বুকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে লোকটার মুখখানায় হাসি নেই, চাপা অভিমানে সেই মুখখানা থমথম করছে। ত্রিবেদী মশাই কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হোয়ে পড়লেন। ঠিক খুঁজে পেলেন না, সেই আর একজন চতুর্ভুজের অভিমানের কারণটা। কার ওপর অভিমান তাও ঠিক ধরতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, বিষম রকম ঠকে গেছেন তিনি, নিজের কাছে নিজে হোয়েছেন পিটুনি খেয়েছেন। খেয়ে মুখ আর তুলতে পাচ্ছেন না।

কেন তিনি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর মুক্তাকে সামনে বসিয়ে রাখেন? কেন এ কথা সে কথা আলাপ করেন মুক্তার সঙ্গে? কেন তাকে একটা আশকারা দিয়েছেন তিনি? কই—কেউ ত' কখনও তাঁর সামনে বসে বসে অত বকবক করার সাহস পায় না। আর হাসি—আওয়াজ করে হাসেই বা কে তাঁর সামনে?

তিনি নিজেই বা কার সামনে কবে আওয়াজ করে হেসেছেন?

চতুর্ভুজ ত্রিবেদী কবে কার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করেছেন? কে কবে তাঁর কাছে বাজে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে? দীর্ঘ একটা বছর হোতে চলল, মুক্তা এসেছে। মুক্তার আসবার পরে সবাই যেন নিশ্চিন্ত হোয়েছে। মুক্তার হাতে তাঁর ভার সঁপে দিয়ে ভায়েরা যেন বর্তে গেছে।

আগে ছোট ভাইটা আফিস থেকে ফিরে তাঁর কাছে এসে বসত। এখন বসে না। সিনেমার পর দিন আসেই না তাঁর কাছে, আসলেও তিনি টের পান না। মুক্তা আছে, মুক্তা সব সময়টুকু দখল করে আছে। এসেই বা করবে কি ভাইটি? কথা বলবার ত' সুযোগ পায় না।

এবং তিনিও ভুলে থাকেন, মজে থাকেন মুক্তার সঙ্গে গল্প করায়। একটু খেয়ালও করেন না, অপরে কি ভাবলে। কে কি ভাবছে!

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হোয়ে বসে আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই—কে কি ভাবছে!

আন্দাজ করতে গিয়ে আর একটু কাসাদে পড়ে গেলেন। আর একটি পারালো জিজ্ঞাসা উঁকি হোল তাঁর মনে—মুক্তাই বা কি ভাবছে!

তারপর এই সর্বশেষ শানিত প্রশ্নটাই চিরে চিরে কাটতে লাগল তাঁর মনখানাকে, এবং তারপর তিনি কখন যে মুক্তার চিন্তাতেই আচ্ছন্ন হোয়ে পড়লেন তা' নিজেই টের পেলেন না।

মনে মনে মুক্তার একটা আবছায়া গোছের মূর্তি ঠিক করে নিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। একটি বেঁটে খাটো মানুষ, একটু মাজা মাজা রঙ। আর গড়নটুকুও নেহাৎ হাড়গোড় বার করা নয়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মুক্তার চুল কি রকম, তা' তিনি একদম আন্দাজই করে নেলে-ছিলেন। অপর্যাপ্ত চুল ফেঁপে ফুলে মেঘের মত ঢেউ তুলেছে, চুলের ঢল নেমেছে পিঠে। পিঠ ছাপিয়ে কোমর ছড়িয়ে পৌঁছেছে চুলের রাশী পায়ের গোছ পর্যন্ত। পথ হারিয়ে ফেলতেন ত্রিবেদী মশাই সেই চুলের অরণ্যে, ভয়া-নক হাঁপিয়ে পড়তেন চুলের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে। তখন স্পষ্ট দেখতে পেতেন তাঁর মনগড়া মুক্তার মনোমদী আঁখি দুটিকে। যে কথা তলিয়ে আছে সেই আঁখি দু'টির অতল গহ্বরে, তা' যেন তিনি স্পষ্ট ধরতে পারতেন। বুকের ভেতরটা তাঁর মুচড়ে উঠত। আহা বেচারী, কি নিরুপায়! তাঁর মতই একান্ত নিরুপায়। তাঁর গেছে দেখবার শক্তি, তাই জগৎটা তাঁর নিবিড় আঁধারে ভরে গেছে। মুক্তার দেখবার শক্তি কিন্তু যায় নি, তবু আবছা কোনও দিকে কোথাও এতটুকু আলোর ছিটে দেখবার অধিকার নেই ওর। ওর জীবনেও সব সাধ আহ্লাদ ফুরিয়ে গেছে। হায় হতভাগী—

হায় হতভাগী! পেয়ে বসেছিল ত্রিবেদী মশাইকে খুবই করুণ রসের অনাত্মিক সহমর্মতায়। মুক্তার বুকের মধ্যে কি জাতের বোবা বেদনা কাঁদে, তা' এক মাত্র তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে! আশ্রয়টুকু যখন পেয়েছে বরাত জোরে, তখন একটু সদয় ব্যবহার পেতেই বা বাধা কি! হতভাগীর সঙ্গে পাষাণের মত ব্যবহার করে লাভই বা হবে কতটুকু। তা' ছাড়া কুটুনের মেয়ে স্বজাতি স্বঘর, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কখনও! সব চেয়ে বড় কথা, মুক্তার মত একজনের হাতে নিজের ভারটা তুলে দিতে পেরেছেন, এটা তাঁর একান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। অষ্টপ্রহর যার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে নিচু দরের ব্যবহার করবেন, এতটা ছোট নিশ্চয়ই চতুর্ভুজ ত্রিবেদী নন।

কৃপা অনুকম্পা দিয়ে তৈরী মস্ত একটা কানুশ উড়ছিল ত্রিবেদী মশায়ের মন আকাশে। কানুশের তলায় ভারী মিষ্টি চোপ ছড়ানো একটু আলো জলছিল। হঠাৎ উলটো টানের হাওয়া লেগে কানুশটা একধারে একটু হেলে পড়ল, আগুন লেগে গেল কৃপা-আবরণে ত্রিবেদী মশাই মনে মনে একটি আছাড় খেলেন। বসে বসে ভাবতে লাগলেন, কৃপাটুকু আসল না মেকী। কৃপা বা অনুকম্পা কে পাচ্ছে আর কে দিচ্ছে, একটা সমস্যা বটে!

কোনও সমস্যাই সময়ের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে পারে না। সমস্যা দাঁড়িয়ে থাকে, সময় এগিয়ে যায়। ত্রিবেদী মশায়ের সময়ও এগিয়ে চলল। সিনেমা থেকে সে রাত্রে কখন ফিরে এল মুক্তা, তা তিনি টেরও পেলেন না। ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন বুঝতে পারলেন মশারির মধ্যেই শুয়ে আছেন। মশারিটা যে নিজে ফেলেননি, এটাও খুব ভাল করে খেয়াল হোল তাঁর। তাই ঘুম ভাঙবার সাথে সাথে মনটা খুবই হালকা বোধ হল। বিশেষ করে বেশ একটা মিষ্টি জাতের তৃপ্তি চাখতে লাগলেন। সিনেমা দেখে ফিরেই মুক্তা এসেছিল তাঁর ঘরে, এসে মশারি ফেলে চারিদিক গুঁজে দিয়ে গেছে। হয়ত তখন সোজা ভাবে শরিয়ে নড়িয়ে দিতেও হোয়েছে তাঁর দেহটা। আর সেই সময় ওর সেই মেঘের মত চুলের রাশী ঝাঁপিয়ে পড়েছে ত্রিবেদী মশায়ের মুখের ওপর। তখন হয়ত ঘুমের ঘোরে

সেই চুল দু'হাতে ধরে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। মানে চুলগুলো ছুঁতে পেরেছেন।

দম প্রায় বন্ধ হোয়ে এল ত্রিবেদী মশায়ের, কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন আড়ষ্ট হোয়ে রইলেন। তারপর সজোরে মাথা নাড়িয়ে মনে মনে বললেন – বেশ হোয়েছে, সিনেমা দেখতে ছুটেছিল যেমন, তেমনি কষ্ট পেয়েছে। এই বৃহৎ লাশটাকে টেনে টুনে ঠিক করে শোয়াতে হোয়েছে।

হঠাৎ পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সুড়-সুড় করে উঠল তাঁর, কাতুকুতু লাগলে যেমন হয়। একটা অদ্ভুত রকমের অনুভূতিতে বড়ই কাবু হোয়ে পড়লেন তিনি, যেন খুবই লজ্জা করতে লাগল। তারপরই মনে হোল, ভাগ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নয়ত কি কেলেঙ্কারিটাই না হোত। কি জানি কি ভেবে বসত মুক্তা! হয়ত মনে করত, ওর জন্যেই তিনি জেগে বসে আছেন! হয়ত মনে করত আরও অনেক কিছু। যা খুশী একটা ভেবে বসলেই ত' হোল, ভাবতে ত' আর পয়সা খরচ হয় না।

ভোরের কাজ অনেক, খুব বেশী সময় অপরের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় তখন। বহুকাল ধরে যা করে আসছেন তিনি, তাই শুরু করলেন। চাপা গলায় আওড়াতে লাগলেন—স্বরংস্নাত্র ততঃ শান্তঃ কৃশো ধমনি-সন্ততঃ। রাজস্নান-সহস্রেন সহস্রাংশু দিবাকরম্। এই সময়ে সকলেই ঘুমিয়ে থাকে। একটু পরে উঠবে মুক্তা, উঠে মুখ হাত ধুয়ে তাঁর কাছে আসবে। তারপর দেবে তাঁর তেলের বাটি, দাঁতের মাজন, ঘটি গামছা। ওপর থেকে নিচে নামবেন ত্রিবেদী মশাই, মুক্তা থাকবে তাঁর পিছনটিতে, ঘাটের দরজা খুলে দেবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবেন জলের ধারে ত্রিবেদী মশাই, শেষ ধাপটায় বসবেন জলে পা ডুবিয়ে। ঘটি দিয়ে জল তুলে মাথায় ঢালবেন। চোখ যাওয়ার পর থেকে আর জলে নামেন না, জল তুলে মাথায় ঢেলে গঙ্গাস্নান সমাপন করেন।

গা মুছতে মুছতে শুরু করবেন তখন তিনি—সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ বিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতি। গঙ্গা-স্তব পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়াবেন, গা মোছাও শেষ হবে তখন। গামছা শুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে ধরলেই নিঃশব্দে গামছাখানা চলে যাবে হাতের ওপর থেকে, মটকা কাপড়খানা সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হবে। ভিজে কাপড় ছেড়ে মটকা কাপড় পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকবেন তখন, পরম নিশ্চিন্তে উঠে আসবেন। ছাড়া কাপড়খানা তুলে নিয়ে নির্ঘাৎ একজন আসছে পিছনে পিছনে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

ঠিক ছায়ার মত। যখন যেখানে আছেন ত্রিবেদী মশাই ঠিক তাঁর পিছনটিতে আছে। ত্রিবেদী মশাই গন্ধ পান, চোখের কাজ বন্ধ হবার পর থেকে নাক কানের শক্তি বেড়ে গেছে তাঁর। সাড়া শব্দ বড় একটা করে না মুক্তা, কিন্তু জিজ্ঞাসা না করলে মুখ খোলে না ত্রিবেদী মশায়ের পূজা অর্চনার সময়। কিন্তু গন্ধটা বুঝবে কি করে! কোন জিনিষের গন্ধ, তা' অবশ্য বুঝতে পারেন না ত্রিবেদী মশাই। মাথায় যে তেল মাখে মুক্তা, সেই তেলের গন্ধই পান তিনি বোধ হয়। কিন্তু তেল মুক্তা মাখে না, ত্রিবেদী মশাই কল্পনাই করতে পারেন না যে মুক্তা তেল মাখে। রুক্ষ চুল, রুক্ষ চোখ মুখ, খাঁটি যোগিনীর বেশ। বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা এক ছড়া গলায় ঝোলালে আরও ভাল মানায়। যোগিনীর গন্ধই পান তিনি নাকে। ত্যাগ বৈরাগ্য তিতিক্ষা আছা কটা মানুষ বোঝে এই সমস্ত পবিত্র জিনিষের মূল্য। কটা মানুষ জানে যে ওই সব স্বর্গীয় গুণগুলোর আলাদা একটা গন্ধই আছে। চোখে দেখা যায় কি ত্যাগ বৈরাগ্য তিতিক্ষা ধরা পড়ে। ও সব বস্তু মনে প্রাণে অনুভব করতে হয়।

মনে প্রাণে অনুভব করবার তৃপ্তিটুকুতে তলিয়ে গিয়ে সূর্যস্তব শেষ করে ফেললেন ত্রিবেদী মশাই। কবচটাও শেষ হোয়ে গেল। তারপর নবগ্রহস্তোত্রম শুরু হোল, শেষও হোল। তখনও পরিচিত সাড়াশব্দ একটুও পেলেন না। চুপ করে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন কান পেতে। না, কেউ ওঠেনি এখনও। নিঝুম হোয়ে রয়েছে সারা বাড়ীটা, শুধু কতকগুলো চড়ুই কিচির মিচির করছে চড়ুইগুলো যখন জেগেছে, তখন নিশ্চয়ই ঠিক সময় উঠেছেন তিনি। কিন্তু হোল কি! অনেক রাত্রিতে ফিরেছে হয়ত মুক্তা, তাই উঠতে দেরি হচ্ছে। উঠুক যখন ওঠে, এক আধ দিন একটু দেরি হোলেই বা ক্ষতি কি। ইতিমধ্যে তিনি হাত মুখ ধুয়ে নিতে পারেন। কলঘরে যাওয়া আসা করতে কারও সাহায্য লাগে না। সবই এক রকম মুখস্থ হোয়ে গেছে। গুণে গুণে পা ফেললেই হোল।

তাঁর ঘরের দরজা থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে আঠার পা ফেলতে হবে, তারপর ডান দিকে ঘুরে চল্লিশ পা ফেললেই পুব দিকের বারান্দার শেষ সীমানায় পৌঁছন যাবে। তখন বাঁ দিকে কলঘরের দরজা। কোনও মুস্কিল নেই, দিনে রাত্রে অনেক বার নিজেই যাওয়া আসা করেন ত্রিবেদী মশাই, সব সময় কেউ পিছনে যায় না।

চললেন কল ঘরের দিকে, অনেক গুলো বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে এগিয়ে চললেন। সর্বপ্রথম দরজাটা মুক্তার ঘরের দরজা, হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখলেন, বন্ধই আছে তখনও। তারপরের দরজাগুলো বন্ধ থাকেই, কেউ থাকে না সেই ঘরগুলোতে। পশ্চিম দিকের দু'খানা ঘরে ছোট ভাই থাকে। সে বারন্দায় যেতে হোলে ত্রিবেদী মশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে প্রথমে আঠার পা হাঁটতে হবে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরলেই পশ্চিমের বারন্দায় পা পড়বে। বড় একটা যান না সে দিকে ত্রিবেদী মশাই, যাবার দরকারও পড়ে না।

কলঘর থেকে ফিরে এলেন যখন, তখনও নিঃশব্দ চারিদিক। ব্যাপার কি! হোল কি সকলের! আজ একেবারে সেই দুপুরের আগে কেউ উঠবেই না নাকি!

ওধারে সত্যিই দেরি হোয়ে যাচ্ছে। স্নান করতে হবে, তারপর গিয়ে অনন্তদেবের ঘুম ভাঙাতে হবে। অপরাধ ঘটে, যে সময়ের যে কাজ সেটুকু সে সময় না করলে নিত্য-সেবায় ত্রুটি হয়।

ত্রুটি কে কতক্ষণ সহ্য করতে পারে। ঠাকুরই হোক বা মানুষই হোক, অবহেলা বরদাস্ত করার শক্তি কারও নেই। ত্রিবেদী মশায়েরও সহ্যের সীমানা পার হোল। ঠিক করলেন, একলাই যাবেন তিনি গঙ্গায়, ঠিক যেতে পারবেন। স্নান করে ভিজে কাপড়েই যাবেন ঠাকুর ঘরে, ঠাকুর ঘরের চাবি তাঁর কোমরেই থাকে, সুতরাং ঘুম ভাঙানো ত' হোক ঠাকুরের। তারপরও যদি কেউ না ওঠে, তখন ভিজে কাপড়েই পূজায় বসবেন। গঙ্গাজল দিয়েই পূজা করবেন। অন্ততঃ আহ্নিকটা সারতে পারবেন ঠিক সময়। রোজই তাই হয়, তিনি আহ্নিকে বসেন, ওধারে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে মুক্তা ফুল তুলে দেয়, চন্দন ঘষে দেয় নৈবিদ্যের যোগাড় করে। দেখা যাক, ঠাকুরের ইচ্ছা কি আজ। অনর্থক এ ভাবে পন্ডুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। সত্যিই ত' আর পঙ্গু হয় নি, শুধু চোখ দুটিই খোয়া গেছে। যাক্ গে, চোখ না থাকলেও কিছু আটকাবে না।

কলঘরের পাশে সিঁড়ি, সুতরাং আবার গুণেগুণে আঠার পা এগিয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই, তারপর ডান দিকে ঘুরে চল্লিশ পা ফেললেন। বাঁ হাত বাড়িয়ে কলঘরের দরজাটা ছুঁয়ে আর দু'পা মাত্র এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরলেন। সামনেই সিঁড়ির দরজা, রাত্রে ভেতর দিক থেকে শিকল লাগানো থাকে। হাত তুলে দরজার মাথায় শিকলটা ধরতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে নিতে হোল। একি! শিকলটা খোলা অবস্থায় কপাটের গায়ে ঝুলছে কেন!

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল। ব্যাপারটা কি! শিকলটা তুলে দেবার কথা কারও খেয়ালে আসে নি নাকি! কি সাংঘাতিক কাণ্ড দেখ! চোর ডোর যদি উঠে আসত ওপরে! নিচে ত' কেউ থাকে না।

নামতে লাগলেন সাবধান হোয়ে। উঁচু উঁচু সিঁড়ি, ডান দিকের দেওয়ালে হাত রেখে সিঁড়ি গুণে গুণে নামতে লাগলেন। সিঁড়িও গোনা আছে তাঁর। বার ধাপ নেমে ডান দিকে ঘুরতে হবে। তারপর আবার দশ ধাপ নামতে হবে। তখন পা পড়বে নিচের দালানে। মস্ত চওড়া দালান, রঙ-বেরঙের ভাঙা কাঁচ বসানো মেঝের। ভাঙা কাঁচ দিয়ে নানারকম চিত্র বিচিত্র সৃষ্টি হোয়েছে। সেই আগের কালের শৌখিনতা। বিশ্রী রকম নোংরা জমে কাঁচের ফাঁকে ফাঁকে। এটুকু জ্ঞানও বোধ হয় ছিল না তখন কারও যে হাজার ধোয়া মোছা করলেও সেই নোংরা মেঝে সাফ হয় না। সাফ না হোলেও ক্ষতি নেই, নিচে কেউই থাকে না। সব কটা ঘর বন্ধ। ঘরগুলো ঠিক ঘরের মত নয়, প্রত্যেকখানি এক একটা গড়ের মাঠ। মানে—উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম চার দিকে চারটি মাত্র ঘর। আর সেই চারখানি ঘরের সামনে দিয়ে বিরাট চওড়া বারান্দা ঘুরে গেছে। বারন্দার সামনে মোটা মোটা থাম। থামের আপাদ মস্তক সেই রঙ্ বেরঙের ভাঙা কাঁচ দিয়ে দিয়ে মোড়া। যাকে বলে খানদানী কাণ্ডকারখানা, খাঁটী নবাবী নটঘটি।

বহুবার পড়া পুঁথির মত সবই মুখস্থ হোয়ে আছে। থাকবে না কেন, দৃষ্টিশক্তি বজায় ছিল যখন, তখন কত

শত বার ঘুরে বেড়িয়েছেন বাড়ীটার, তার কি কোনও হিসেব আছে। নিচের ঘর চারখানির নামও ভারি মজার। দক্ষিণ দিকের ঘরখানির নাম মুসায়েরা মজলিস, ওখানি নাকি ব্যবহার করা হোত কবি সম্মেলনের জন্যে। সে ঘরের দেওয়ালগুলোয় এস্তার আরবী ফারসী কবিতা খোদাই করা হোয়েছে। দেওয়ালের রঙ্ নিসমিসে কালো, তার ওপর সাদা রঙের বাঁকাচোরা রেখাগুলোকে দেখে মনে হয়, বহু রকমের জীব জন্তুর হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়েছে যেন। পুবের ঘরখানির নাম মাশুক মজলিশ। গঙ্গার ধারের ঘর, সে ঘরের জাঁকজমক সব চেয়ে বেশী। সামনের পেছনের সবকটা জানালা দরজার নানা রকম নকশা তোলা বহু মূল্যবান সবুজ কাঁচ লাগানো। ভেতরের দেওয়ালে দেওয়ালে নদী পাহাড় বন উপবন আঁকা হোয়েছে। দলে দলে ময়ূর পেখম তুলে নাচছে গাছের ডালে, তলায় বন-হরিণীরা মুখ উঁচু করে ময়ূরের নাচ দেখছে। যেখানে সেখানে ওড়না ঘাঘরা কাঁচুলি পরা নর্তকীরা দু'পায়ে নূপুর বেঁধে অদ্ভুত কায়দায় বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরিণীরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তাকাচ্ছে না, কারণ তাকাবার সাহস হয় না নর্তকীদের দিকে। তাদের শরীরের গড়ন বড়ই বিপদ জনক। কোমর এমন সরু আর কোমরের ওপরের অংশটা এত ভারি যে ভয় হয়, এই বুঝি ওপরের ভারে মটাং করে মড়কে পড়ে কোমরের কাছটা। নর্তকীদের আশে পাশে পালিচা বিছিয়ে বসে গেছে বাজিয়ের দল। তাদের দাড়ি গোঁফ পাটা পাগড়ির বাহারে ময়ূরের পেখমও মাড়মেড়ে বলে মনে হচ্ছে। সব সুদ্ধ মিলিয়ে ইলাহী কাণ্ড যাকে বলে। সত্যিকারের ইলাহী কাণ্ডকারখানাই ঘটত নাকি তখনকার দিনে মাশুক মজলিশে। ত্রিবেদী মশায়ের কপালের তলার রক্তবর্ণ গর্ত দুটোতে বড় বড় দুটো চক্ষু যখন বর্তমান ছিল, তখন তিনি আশা মিটিয়ে দেওয়ালের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। দেখতে দেখতে বিলকুল ছবির হুবহু নকল ফুটে উঠেছে তাঁর মনের পর্দায়। তাই এখন আর দেওয়াল না দেখলেও চলে, মনের ভেতরেই সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পান। মাশুক কথাটির অর্থও তিনি জেনে নিয়েছিলেন এক মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে। মাশুক মানে যে প্রেমে পড়েছে, সোজা কথায় প্রেমপাগলার নাম মাশুক। অর্থাৎ কি না মাশুক মজলিশ হচ্ছে প্রেম-পাগলাদের পাগলা গারদ।

সেই পাগলাগারদের সামনের দালানটা আগাগোড়া পার হোলে পুব উত্তর কোণের দরজায় পৌছন যাবে, সেই দরজা দিয়ে বেরলেই দোতলা সমান উঁচু পাঁচিল ঘেরা মস্ত বড় আঙিনা। আঙিনার উত্তর দিকে অনন্ত দেবের জন্যে মন্দির বানিয়ে দিয়েছেন ত্রিবেদী মশায়ের শিষ্যরা। পুব দিকের দেওয়ালে এক রাঙ্কুসে ফটক। ফটকের কপাট জোড়া বানাতে আস্ত একটা জঙ্গলই বোধ হয় সাফ হোয়েছিল। জনা দশেক জোয়ান লাগালে হয়ত একটা কপাট ঠেলে নাড়ানো সম্ভব। কাজেই কোনও কালে যে কপাট খোলা হোয়েছে কি না সন্দেহ। ঘাটে যাবার জন্যে একখানা কপাটের পায়ের কাছে এক কালি দরজা কাটা হোয়েছে। মাথা নুইয়ে একটা মানুষ অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারে সেই ফাঁক দিয়ে। তারপর চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে গঙ্গা গর্ভে নেমে গেলেই হোল। কোনও ভয় নেই, গলা সমান জলে গেলেও সিঁড়ি ফুরবে না।

সবই যেন খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই, দেখতে দেখতে ভারি আশ্চর্য হোয়ে গেলেন তিনি। কই—চোখ না থাকার দরুণ কিছু মাত্র ত' অসুবিধা হচ্ছে না! থামকা তবে কেন সব সময় একজন তাঁর পিছু পিছু হাঁটবে! এখন থেকে তিনি একলাই চলে ফিরে বেড়াবেন, স্নান করতে আসবার সময় কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না। তিনি কি পশু না অথর্ব যে তাঁকে আগলে নিয়ে বেড়াবে।

সিঁড়িগুলো শেষ করে নিচের তলায় পৌছলেন ত্রিবেদী মশাই। এইবার তাঁকে মাশুক মজলিশের সামনে দিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ পা চলতে হবে।

চললেন।

কয়েকবার পা ফেলবার পরেই চরণ দু'খানিকে কামড়ে ধরল নবাবী নকশা কাটা মেঝে। একটি আঙুল তোলবার মত শক্তিও রইল না তাঁর শরীরে, অথর্ব পশু মন যেটুকু একটু আগে যে উত্তাপটুকু উপভোগ করেছিলেন, সে উত্তাপ একবারে জমে বরফ হোয়ে গেল। শোনবার যন্ত্রই শুধু বেঁচে রইল, বেঁচেই রইল না শুধু, ভয়ানক রকম জীবন্ত হোয়ে উঠল। সেই যন্ত্রের মুখে মনটাকে চেপে ধরে তিনি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটা সংকেত, সামান্য একটু রহস্যময় ফিসফিসানি হঠাৎ ধরা পড়েছে তাঁর শোনার ধরণে। কোনও সন্দেহ নেই যে আশেপাশে জীবন্ত জীব রয়েছে। নিশ্চয়ই রয়েছে, কিছুতেই তাঁর অতি সতর্ক চৈতন্য ধোঁকায় পড়তে পারে না। সুতরাং আর একটি বার শোনা চাই সেই সংকেত। তা' হলেই সংকেতের প্রাণ পাখীটিকে সংশয়াতীত ভাবে তিনি শিকার করতে পারবেন।

একটা একটা করে দম আটকানো মুহূর্তগুলো পাশ কাটিয়ে পালাতে লাগল. কোথাও একটু স্পন্দন মাত্র নেই। একটা নীল শির খাড়া হোয়ে উঠল ত্রিবেদী মশায়ের কপালের মাঝখানে, ডান পা খানা জোর করে ছাড়িয়ে নিলেন মেঝের গ্রাস থেকে। চরণখানি আর সামনে বাড়াতে হোল না, মাস্তুক মজলিশ আবার ফিসফিসি উঠল।

"আঃ ছাড় না দেরি হোয়ে যাবে যে—"

ভয়ানক চাপা গলার স্বরটা কেমন যেন এলিয়ে পড়ল। ছাড়া পাবার আশায় যে বাক্যকটি ব্যবহার করা হোল, তার অর্থটা যেন উলটে গেল সুরের জন্যে। ফলে বেশ কয়েকটি মুহূর্ত জুড়ে রহস্যময় ধস্তাধস্তির আওয়াজ ধরা পড়ল ত্রিবেদী মশায়ের শ্রবণ যন্ত্রে। শেষে আর একবার খুবই নিবিড় চাপা স্বরের ছোট্ট দুটি বাক্য জন্মলাভ করল—"ছিঃ কি দুষ্টু।" আবার প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা নয় অতিবিষাক্ত ছুঁচ বিঁধবার জ্বালা। কপাল মুখ কান সমস্ত ভেতে আগুন হোয়ে উঠল। অতি অল্পক্ষণই সইতে হোল সেই জ্বালাটুকু ত্রিবেদী মশাইকে। হঠাৎ একটা ঝটকানি দেওয়ার মত কিছু টের পেলেন যেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র একটু সুরের ঝংকার বেজে উঠল তাঁর মাথার মধ্যে। সামান্য একটি কথাও আটকে গেল মগজের জালতিতে "যাঃ-ও"। ঝংকারটা মিলিয়ে যাবার আগেই অতি দ্রুত হালকা পায়ের শব্দ উঠল। মাস্তুক মজলিসের গর্ভ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে এল যেন কে। পরমুহূর্তেই একটা ধাক্কা খেলেন বুকের ওপর ত্রিবেদী মশাই, সঙ্গে সঙ্গে একটা আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ হোল—"ইঃ-"। এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল ত্রিবেদী মশায়ের পাশ দিয়ে, ছাতের বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ বুঝি উড়ে গেল সাঁ করে। ব্যাস তারপর সব নিঃশেষে শেষ হোয়ে গেল, মাস্তুক মজলিশের প্রাণ পাখীটাই যেন উধাও হোয়ে গেল আকাশে। হঠাৎ একেবারে মড়ার মত শীতল হোয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। সত্যিই তিনি বেশ কাঁপতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, তিনিও একদম মরেই গেছেন।

কখন যে শ্বাস প্রশ্বাস চালু হোল, কখন যে পা ঘষে ঘষে এগতে লাগলেন আবার তা' মোটে টেরই পেলেন না। কেমন করে নামলেন গিয়ে গঙ্গায়, তা' একমাত্র তাঁর অনন্ত দেবই জানেন। কয়েকটা ডুব দেবার পরে একটু একটু করে সম্বিৎ ফিরে এল। বুঝতে পারলেন যে বুক জলে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেক দিন পরে ডুব দিতে পেরে অনাবিল তৃপ্তিতে মনটা জুড়িয়ে গেল। বুক ভরে হাওয়া নিয়ে দু হাতে দু'কাণ চেপে ধরে আবার দিতে লাগলেন ডুব। দম ছাড়বার জন্যে থামেন কয়েক মুহূর্ত তারপর আবার ডুব দিতে শুরু করেন হাওয়া টেনে নিয়ে। এই ভাবে চলতেই লাগল ডুব দেওয়া, চলতেই লাগল সমান তালে। ডুবতে ডুবতে ষোল আনা হুঁশ ফিরে এল। বুঝতে পারলেন, হঠাৎ তাঁর চৈতন্যের ভাঁড়ার ঘরে বিষম রকম ওলটপালট ঘটে গিয়েছিল। আগের চিন্তাটার সঙ্গে পরের চিন্তার সঙ্গতি ছিল না। তাল কেটে গিয়েছিল যেন জীবন সঙ্গীতের। বদ্ধ কালাও হোয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়। স্থাবর জঙ্গম সব কিছুর সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন হোয়ে গিয়েছিল।

কি ভয়ানক অবস্থা! বারবার শিউরে উঠল সারা শরীরটা, মুখ নুয়ে পড়ল, থুতনি ঠেকে গেল বুকের সঙ্গে। গুড়গুড় করে কাঁপুনি উঠে গেল বুকের মধ্যে, অবরুদ্ধ একটা উচ্ছ্বাস ঠেলে বেরবার চেষ্টা করতে লাগল ভেতর থেকে। বিষম রকম চাপ পড়ল গলায়। বুঝতেও পারলেন না ত্রিবেদী মশাই যে তিনি কাঁদছেন। বুঝতে পারলেই বা কি হোত। কেন কাঁদছেন, কাহার কারণটা কি, এই সব প্রশ্নের সদুত্তর কিছুতেই নিজেকে দিতে পারতেন না।

হীরামন্ হাবেলীর আঙিনায় অনন্ত দেবের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। হোয়ে গেল অনন্ত দেবের সকালের পালা শেষ। একটু দেরি হোল, বড়ই মন্থর গতিতে মন্ত্রগুলি পাঠ করলেন সেদিন ত্রিবেদী মশাই। অনেক-বার অনেক জায়গায় আটকে গেল মন্ত্র আওড়ানো, একই মন্ত্র দু'তিন বার করে বললেন। আরও নানা রকমের

গোলমাল ঘটল। অনন্ত দেবকে স্নান করিয়ে দোনার পৈতে পরাবার সময় পৈতেটা কিছুতে খুঁজে পেলেন না, ফুলের থালার ওপর পঞ্চপ্রদীপ নামিয়ে রাখলেন, নৈবেদ্য নিবেদন করার সময় জলের ছিটা নৈবিদ্যের থালায় না দিয়ে উলটো দিকে ফেললেন। করলেন সবকিছুই, কিন্তু সবই কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে করে গেলেন। অবশেষে পূজা সমাপ্ত করে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন হাঁটু দুটো মুচড়ে রইল। শরীরের ভার বইবার সামর্থ নেই পা দু'খানার, মাথাটা সোজা ভাবে খাড়া রাখবার শক্তি হারিয়েছে ঘাড়টা। যে শরীরের কোথাও এতটুকু টোল খায় নি, সেই শরীরটা হঠাৎ দুমড়ে কুঁচকে ছোট হোয়ে গেছে। অদৃশ্য একটা বোঝা ঘাড়ে করে বেরলেন তিনি ঠাকুর ঘর থেকে, বোঝাটার ভারে সামনে ঝুঁয়ে পড়ে এগিয়ে চললেন। উঠান পার হোলেন, মাশুক মজলিশের সামনের দালান পার হোলেন, সিঁড়িগুলো শেষ করলেন। অবশেষে ওপরের দালানে পৌছে দম নেবার জন্যে দাঁড়ালেন। বোঝার ভারে তখনও ঝুঁয়ে আছেন সামনে, কিছুতে আর মাথাটা সোজা রাখতে পারছেন না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর দেহে। ভোর বেলা যে কচ্ছ দীর্ঘ দেহখানি নিঃশব্দে নেমে গিয়েছিল নিচে, সে দেহখানিকে জরা স্পর্শ করতে পারেনি। বিশুদ্ধ মাখন জাল দিলে টলটলে গরম ঘিয়ের যেমন বর্ণ হয়, তেমনি বর্ণের অতি মসৃণ পাতলা চামড়ায় টান টান করে ঢাকা ছিল যে দেহখানি, সেখানি আর ফিরে এল না। কপালে মুখে বুকে সর্বশরীরে অনেকগুলো খাঁজ পড়ে গেছে, তার ওপর পাতলা করে নীল গুলে ঢেলে দেওয়া হোয়েছে। খাটো করে কাটা চুলগুলোর রঙ কোকিলের মত চকচকে কালো ছিল, সে রঙও কেমন যেন ফেকাশে হোয়ে পড়েছে। যেন গোটা দশেক বছর পার করে দিয়ে উঠে এলেন ওপরে ত্রিবেদী মশাই, যখন নেমেছিলেন তখন তাঁর বয়েস পাঁচের কোঠায় পা দেয়নি। উঠে এলেন ছয়ের কোঠায় পৌছে। এসে ষাট বছরের বুড়োর মত সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

ছোট ভাই চতুরানন ত্রিবেদী প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়লেন সিঁড়ির মুখে, আফিসে বেরচ্ছেন তিনি। দাদাকে ও ভাবে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর বেগে গমনটা হঠাৎ একেবারে প্রাণ হারিয়ে ফেললে। খানিক আগেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত দাদার দিকে তাকিয়ে থাকবার পরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—"কি হোল দাদা! হোল কি? পড়ে গিয়েছিলে নাকি কোথাও! না হোঁচট খেলে কিছুর সঙ্গে?" বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত দাদা মাথা খাড়া করতে পারলেন না। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় সোজা করে বললেন—"না, কই—কিছুই হয় নি ত'।" কথাকটি খুবই ক্ষীণ স্বরে বার হোল। তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে অনেকটা সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেরি হোয়ে গেল না ত রে? ঠিক সময় পৌছতে পারবি ত' আফিসে?" চতুরানন জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন দাদাকে। দেখতে দেখতে তাঁর মুখও শুকিয়ে গেল। একি হোল! হঠাৎ দাদা বুড়ো হোয়ে গেল যে!

দাদা এবার দস্তুরমত সামলে উঠেছেন। সত্যিকারের চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর স্নিগ্ধ শান্ত নিরুদ্বেগ সুর সজাগ হোয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠে। বললেন—"এস, এস এবার ভাই। দুর্গা দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি।"

চতুরানন চলে গেলেন। সিঁড়িতে পা দেবার আগে একবার পিছন ফিরে তাকালেন, দাদা এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের ঘরের দিকে। না, তেমন কিছুই হয় নি। সবে মাত্র পূজা সেরে উঠলেন কি না, তাই একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দেখাবেই, অতক্ষণ এক আসনে সোজা হোয়ে বসে স্নান প্রাণায়াম করা সোজা নাকি! কিন্তু কি করেই বা দাদাকে অনন্তদেবের-সেবা থেকে রেহাই দেওয়া যায়! পুজারী একজন রাখলেই চলে, কিন্তু কার সাহস সে প্রস্তাব দাদার সামনে উত্থাপন করবে! বৃষ্টি যখন গেল, তখন একবার কথাটা উঠেছিল। ফল—দাদা অন্নজল স্পর্শ করা ছেড়ে দিলেন। কি যে করা যায়। ভাবতে ভাবতে ছোট ভাই আফিসে চলে গেল।

বড় ভাইও ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে এসে পৌছেছেন। ভাবতে তাঁকে হবেই এবার, ভাবনা চিন্তা করে উপায় একটা খুঁজে বার করতেই হবে। বিশ্বাস নেই, মোটে বিশ্বাস করা চলে না নিজেকে, ঠাকুরোচ্ছোর নিতান্ত নির্লজ্জ বেহদ্দ ছাংলা একজন বসে আছে তাঁর

বুকের ভেতরে, তাকে তিনি আজ চিনে ফেলেছেন। চতুর্ভুজ ত্রিবেদীকে সে নাজেহাল করে ছেড়েছে। অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান রক্ষা করতে পারেনি চতুর্ভুজ ত্রিবেদীকে। সর্বনাশা একটা চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। একটু একটু করে পা দুখানা তলাচ্ছে। এখনও সময় আছে, আছে, আর নয়। তিল মাত্র বিশ্বাস রাখা চলে না চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রজ্ঞান সাধন ভজনের ওপর, চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে কোনও কিছুতেই তার আস্থা রাখা অন্যায়। কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার উপায় একটা বার করতে হবেই। চোরাবালি থেকে পালাতেই হবে।

ঘরে ঢুকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন, কাঠগুলোর কাছে। চুপচাপ শুয়ে আছে কাঠগুলো, নিচে পাঁচ মণ বেল তার ওপর মণ দেড়েক চন্দন। শুখিয়ে টনটন করছে সব, ছিটে ফোঁটা রস নেই ওদের দেহে। শুখবে না! এত দিনেও শুখবে না! এমন চনৎকার শুখিয়েছে যে একটি দেশলাই কাঠির ওয়াস্তা, একটি কাঠি খরচা করলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। জ্বলবার জন্যে তৈরী হোয়ে প্রতীক্ষা করছে ওরা, অধীর আগ্রহে তাকিয়ে দেখছে তাঁকে। ভাবছে, কত দেরি আর! আর কতদিন মুখের গ্রাস মুখের সামনে রেখে অপেক্ষা করতে হবে!

একখানি হাত বাড়িয়ে আলতো ভাবে স্পর্শ করলেন কাঠের পাঁজাটা, তারপর সন্তর্পণে তুলে নিলেন একখানি চন্দন। ওজনটা আন্দাজ করলেন। বাঃ. কি সুন্দর হালকা। শুখিয়ে শুখিয়ে অর্ধেক ওজনে দাঁড়িয়েছে। সুবাস কিন্তু একটুও কমে নি, বরং বেশ বেড়েছে বলা চলে। নাকের কাছে না তুললেও বাসটুকু পাওয়া যায়। আঃ. গন্ধটুকু কেমন শীতল। শরীর মন জুড়িয়ে যায়।

জুড়িয়ে দেবার শক্তি আছে আবার জুড়িয়ে দেবার আগুনও রয়েছে। এক সঙ্গে দু' জাতের দু'টো শক্তি লুকিয়ে রয়েছে কাঠের অন্তরে। কি আশ্চর্য কাণ্ড।

একদম নতুন আশ্চর্য একটা সত্য উপলব্ধি করে দাঁড়িয়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, কাঠখানা হাতেই রয়ে গেল। হাতখানি রইল বুকের সামনে উঁচু হোয়ে, গন্ধটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকতে লাগল। তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। একে একে আস্তে আস্তে অনেক রকমের গন্ধ উদয় হোতে লাগল. তাঁর শরীরের মধ্যে লুকনো গন্ধ পরবার ঘরটায়। গন্ধগুলো যেন একটা একটা ছবি, ছবিগুলো একে একে ফুটে উঠতে লাগল তাঁর মনের পর্দায়। এর যেঁা রায় যে গন্ধ লুকিয়ে থাকে, নতুন সুগন্ধি আতপ চাল আর নানা রকমের কাটা ফল দিয়ে নৈবেদ্য সাজালে পূজার ঘরে যে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, ফুলের গন্ধ. বেলপাতার গন্ধ, তুলসী পাতার গন্ধ, গাওয়া ঘি আহুতি দিলে যে গন্ধ ওঠে, সব একে একে এসে তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। কতরকমের গন্ধই যে এল, বহুকাল আগে বহুদূরে একটিবার মাত্র যে গন্ধ পেয়েছিলেন উনি, সে গন্ধটিও এসে উপস্থিত। কি কাণ্ড দেখ! আচ্ছা, এই গন্ধটা কবে কোথায় পেয়েছিলেন তিনি! আচ্ছা, আচ্ছা, মনে পড়েছে। সেই সেবার-খুলনা থেকে গহনার চেপে গিয়েছিলেন সাতক্ষীরা মহকুমায়—একেবারে ভোরের দিকে। সারা রাত এই গন্ধটা ভয়ানক বিরক্ত করেছিল। সকালে বুঝতে পেরেছিলেন গন্ধটা উঠছে কি থেকে। বড় বড় গাছ জঙ্গল থেকে কেটে এক সঙ্গে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হোয়েছে। নদীই গাছগুলো বয়ে নিয়ে চলেছে। পচছে জলের ভেতর গাছের ছাল, তারই গন্ধে সারা রাত প্রাণ ওষ্ঠাগত হোয়েছিল। সেই গন্ধটা এত কাল পরে আবার পেলেন, স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, গন্ধটা তাঁর ভেতরেই লুকিয়ে ছিল। অর্থাৎ জীবন ভোর যখন যে গন্ধটা শুঁকতে হোয়েছে সবই জমে আছে তাঁর দেহে। কিছুই হারায় নি, খোয়া যায়নি একটিও গন্ধ ভাল মন্দ সব রকমের গন্ধ বজায় আছে শরীরের ভেতরে। গন্ধের একটা ভাঁড়ার, বা একথাও বলা চলে শরীরটাই গন্ধ দিয়ে গড়া। সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ, সবরকমের সব জাতের গন্ধ রয়েছে শরীরে। এত বড় একটা গন্ধের ভাঁড়ার বয়ে বেড়াচ্ছি. কিন্তু মোটেই টের পাচ্ছি না! কেন।

জবাবটা খুঁজতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই মনের মধ্যে, খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ পেয়ে গেলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের একটা গন্ধ। গন্ধটা ভাল কি মন্দ. বুঝতেই পারলেন না। গন্ধটা কিসের, কবে কোথায় শুঁকেছিলেন গন্ধটা, খেয়ালে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করতে হোল, অন্য গন্ধগুলোর বেলায়—যেমন চট করে তার ইতিহাসটাও স্মরণ হোয়েছিল, এবার সে রকম হোল না।

তারপর অবশ্য হোল স্মরণ এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এক রকম বেহুঁশ হোয়ে পড়লেন। গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতে চক্ষু-বিহীন চোখের গর্ত দুটো মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন একটা দৃশ্য। বহুকাল আগে—হ্যাঁ—অনেক—অনেক—অনেক গুলো দিন পার হোয়ে গেছে মাঝখানে—এই গন্ধটা শুঁকে ছিলেন তিনি আর চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন একটা জলন্ত আগুনের পানে। ছুটে বেড়াচ্ছিল আগুনটা ঘরের মধ্যে। ছোট একখানা ঘর, চতুর্দিকে টিনের বেড়া ওপরে টিনের চাল। ঘরে আসবাবপত্র বলতে যা কিছু ছিল, তাতে আগুন ধরে গেলেও খুব বেশী ক্ষতি হোত তা কারও। খানকয়েক খুব বিশ্রী জাতের কাপড় জামা, এক গাদা ছেঁড়া লেপ তোশক বালিশ আর অতি পুরনো গোটা কতক থালা বাসন। পুড়ত যদি সব, তাহলে আপদ যেত। জঞ্জাল কিছু কমত পৃথিবী থেকে। কিন্তু পুরতে পেল না, কয়েকটা লোক ঢুকে পড়ল ঘরে। লেপ তোশক তুলে নিয়ে ছুঁড়ে চাপা দিলে সেই ছুটন্ত অগ্নি শিখাটাকে; আগুন নিভে গেল, ছোট যন্ত্র হোল, ঘরখানা আর ঘরের জঞ্জালগুলো রক্ষা পেল। কিন্তু সেই বিশ্রী গন্ধটা চাপা পড়ল না তা মিলিয়ে গেল না। সেটা ঠিক বেঁচে রইল, ঘর থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে। সমস্ত গ্রামখানা সেই গন্ধে ডুবে রইল অনেকক্ষণ। আশপাশের অনেকগুলো গ্রামেও পৌঁছে গেল সেই গন্ধ, জানতে বাকী রইল না কারও কোথায় কি হোয়েছে! বিশেষ কিছু হয়নি, গায়ে কেরোসিন তেল এক বোতল ঢেলে রসরাজ ভরদ্বাজের বউটা পুড়ে মরেছে। মাংস পোড়া গন্ধ, কাঁচা অর্দ্ধ মাংস পুড়ছিল। তাই অমন বিকট গন্ধ ছড়িয়েছে।

অনে সবাই নিশ্চিন্ত হোল। যাক্, তাহলে বিশেষ কিছুই নয়। রসরাজের বউটা তাহলে নিষ্কৃতি পেল বেঁচে থাকার হাত থেকে। যাক্—বাঁচল হতভাগী—

এ গ্রাম ও গ্রাম দশখানা গ্রামের নারী-পুরুষ এক সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রসরাজের বউটার মাংস পোড়া গন্ধ শুঁকে। ত্রিবেদী মশাই শুধু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ভয়ানক রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ইস্—এত দুর্গন্ধ লুকিয়ে ছিল ছোট্ট একটুখানি শরীরের মধ্যে। কই—না পোড়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যায় নি ত!

ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই, তখন ঘাবড়ার মত বয়েস ছিল। ঠোঁটের ওপর নরম পাতলা চুল সবে মাত্র দেখা দিয়েছে সে সময়, আকাশের রঙ কতবার কিভাবে পালটায় তার হিসেব না রাখলে খুব বড় লোকসান হোয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে, নদীতে যখন তুফান ওঠে তখন তুফানের মাঝে ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রাণের মধ্যে আঁকু পাঁকু করে, এই রকমের বয়সে যখন পৌঁছয় মানুষে, তখন সেটা ঘাবড়াবারই বয়েস। রোগা ছিপ-ছিপে পলি মাটি রঙের একটুখানি শরীর, সরু সুতো খুব টানা টানা দুটি চক্ষু, আর খুব সাদা ছোট ছোট দাঁত কয়েকটা, যে দাঁত গুলো প্রায় সর্বক্ষণই দেখা যেত, কারণ অদ্ভুত জাতের একটু নিঃশব্দ হাসি লেগেই থাকত সেই মুখে, সেই মুখ চোখ দাঁত শুদ্ধ ছোট্ট দেহটা পুড়লে অমন বিদঘুটে গন্ধ বার হয়, তা' তখন জানা ছিলনা যে! কাজেই সেই বয়েসের চতুর্ভুজ ত্রিবেদী বিশেষ রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ঘাবড়ে গিয়ে নিজের শরীরটা সম্বন্ধেও খুব বেশী সচেতন হোয়ে উঠেছিলেন। কে বলতে পারে, কি জাতের গন্ধ বার হবে তাঁর নিজের শরীর যখন পুড়বে! তখন থেকেই চন্দন কাঠ ঘি ধুনো আতরের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন। পুড়তে ত' একদিন হবেই।

হাঁ—পুড়তে হবেই একদিন—পোড়ার জন্যে প্রস্তুতও হোয়ে আছেন। পুড়বেন যখন তখন যাতে রসরাজ ভরদ্বাজের বউ-পোড়ার গন্ধ না বার হয়, সে জন্যে চন্দনও পুড়বে তাঁর সঙ্গে। বেল কাঠ আর ঘি এক সঙ্গে পুড়ে হোমের গন্ধ বার হবে, সেই সঙ্গে ধুনো গুগ্‌গুল কর্পূর ত' রইলই। আর কি চাই! এত উপচার সহ পুড়লেও কি দুর্গন্ধ বার হোতে পারে! অসম্ভব।

রসরাজ ভরদ্বাজের বউটার সম্বল ছিল মাত্র এক বোতল কেরোসিন, তাঁর রয়েছে এক টিন বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত। আকাশ-পাতাল তফাত। তা' ছাড়া সে পুড়েছিল-অ্যাক্ত অবশ্যই. তিনি পুড়বেন মরে। হুঁ: কিসে আর কিসে! দূর, দূর, বিশ্রী গন্ধ অমনি বেরলেই হোল কি না। খানকা যত বাজে চিন্তা মগজে উদয় হোচ্ছে। অনন্তদেব, অনন্তদেব, শ্রীমধুসূদন—

ইষ্টদেবতা অনন্তদেবকে স্মরণ করে বাজে চিন্তাগুলোকে বর্জন করবার চেষ্টা করলেন ত্রিবেদী মশাই। চিন্তাটা

গেল কিন্তু গন্ধটা গেল না। রসরাজ ভরদ্বাজের সেই এক রত্তি বউটার শরীরে সত্যিই কি অত দুর্গন্ধ লুকিয়ে ছিল। কোথায় ছিল লুকিয়ে! মানুষটাই ছিল রাশীকৃত চুলের মধ্যে তলিয়ে, চুলের দরুণ মানুষটাকেই ভাল করে দেখা যেত না। কোনও দিন এক ফোঁটা তেল ছুঁতো না। কেউ কখনও হাত দিয়ে ছুঁতও না, ঝুলে কেঁপে যা দুর্গার বাহনের কেশরের মত হোয়ে ফাঁপিয়ে পড়ত সেই চুলের বন্যা চারিদিকে। ব্যাস—একেবারে লুকিয়ে পড়ত সেই ছোট্ট দেহখানি চুলের আড়ালে। চেন তখন কি করে চিনবে!

সত্যিই প্রথম দিন একেবারে চিনতে পারেন নি ত্রিবেদী মশাই, মানুষ বলেই ধারণা করতে পারেন নি। কি করে পারবেন! সন্ধ্যা প্রায় হোয়ে এসেছে তখন শ্রাবণী পূর্ণিমার আকাশ এত কাছে নেমে এসেছে যে ইচ্ছে করলে সুপুরি গাছের মাথায় উঠে ছুঁয়ে ফেলা যায়। সেই আকাশের গায়ে রয়েছে কয়েকটা ফুটো; তার ভেতর দিয়ে নজর চালালে দূরে বহুদূরে দেখতে পাওয়া যায়, নীলে সোনায় মেশানো আকাশ গঙ্গার জল। আকাশ গঙ্গায় তখনও দিনের আলো ঝলমল করছে। ত্রিবেদী মশাই, সেই তখনকার দিনের ত্রিবেদী মশাই, সদ্য যিনি কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে গাঁয়ে ফিরেছিলেন, তাঁর হঠাৎ খেয়াল চেপেছিল কেয়া ফুল সংগ্রহ করবার। তাই ছুটেছিলেন খালের পাড়ে। কেয়া বনে সাপ থাকে, তবু সন্ধ্যা কালে কেয়া বনে যাবার সাহস আছে কার! কাব্যের পরীক্ষা দেওয়া তখনকার সেই চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর ছিল, শ্রাবণী আকাশের অন্তরালে নীলে সোনায় মেশানো আকাশ গঙ্গার ছোঁয়া পায় যার মন তার কি কোনও হুঁশ জ্ঞান থাকে।

মানুষের মাথার ওপরে উঠে গেছে পাট গাছ, পাট গাছের সমুদ্র গাঁয়ের চারিদিকে। পাট ক্ষেতের আল নজরে পড়ে না। যে পারে সে কিন্তু সোজা ছুটতে পারে সেই অদৃশ্য আলের ওপর দিয়ে। আলের মাথা আধ হাত চওড়া দুপাশে হাঁটু সমান জল, পা ফসকালেই রূপাৎ। কিন্তু ফসকাবে কেন? কাব্য পরীক্ষার আগে ঐ আলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়েছিলেন চতুর্ভুজ ত্রিবেদী। সেই উদম খাকার বয়েস থেকে আলে আলেই ছুটে বেড়িয়েছেন। পা ফসকাল না, কিছুই হোল না, সোজা খাল পাড়ে গিয়ে উঠলেন। উঠে কয়েক হাত এগিয়ে গিয়ে উলটো দিকে সাবধানে নামতে লাগলেন। সাবধান হোতেই হবে সেখানে, ভয়ানক পিছল। খালের জল নেমে যাওয়ার দরুণ আধ হাত পলি পড়েছে। পা পিছলালে একবারে কেয়া ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পড়তে হবে। তার মানে—তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

কোথাও কিছু নেই, প্রকাণ্ড একটা বস্তু যদি আছড়ে পড়ে ঘাড়ে, তা'হলে কে না চমকে ওঠে, কে না সেটাকে ঠেলে ঠেলে ফেলতে চায়। সাপেদের ত আর হাত নেই, তাদের আছে মুখ। চমকে উঠেই ব্যবহার করে ফেলবে তারা মুখ। অর্থাৎ সবাই মিলে চুম্বন দান করবে। কেয়ার গন্ধে ডুবে থাক চিরকাল, কোনও আপত্তি নেই।

কেয়া ফুলের গন্ধে ডুবে যেতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই, মানুষ পোড়ার গন্ধটা চাপা পড়ল। হীরামন হাবেলীর দোতলার তাঁর শোবার ঘরের কোণে পড়ে রইল ডাঁই প্রমাণ বেল কাঠ, তার ওপর চুপ করে বসে রইল পঁচিশ খণ্ড আসল মৈসুরী চন্দন, ত্রিবেদী মশাই উধাও হোয়ে গেলেন। ভুলেই গেলেন বোধহয় হতভাগা কাঠগুলোকে, হাতে যেখানা ধরা ছিল, সেখানাকে অন্যমনস্ক ভাবে নামিয়ে রাখলেন যথাস্থানে। তারপর তিনি পিছিয়ে যেতে লাগলেন। পিছতে পিছতে পৌঁছে গেলেন সেই ভয়ানক পিছল ভয়ানক গড়ানে খালের কিনারায়। নামতে লাগলেন পলির মধ্যে পায়ের আঙুল বসিয়ে বসিয়ে। নামতে নামতে হঠাৎ একেবারে আড়ষ্ট হোয়ে গেলেন। আঙুলের কল্যাণে আটকে রইল শরীরটা, আর তাকিয়ে রইলেন! তাকিয়ে যা দেখতে লাগলেন, তা দেখার কল্পনা কখনও কোনও মানুষ করতে পারে না।

দেখতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই, একটা অদ্ভুত-দর্শন প্রাণী খুব আস্তে আস্তে জলের কিনারায় হাঁটছে।

কি ওটা।

কি সেটা বুঝতে পারার আগেই হঠাৎ সেই প্রাণীটা ছিটকে উঠল। জলের ভেতর থেকে খেলে বোধ হয় কারও ছোবল। ছিটকে উঠেই হেলে পড়ল পিছন দিকে। তখন দেখতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই, দেখতে পেলেন তার হাত দু'খানা। দু'হাত দিয়ে সরু লাঠির মত একটা কিছু ধরে

আছে। সেই লাঠির মাথায় বাঁধা সুতো ডুবে আছে জলের মধ্যে, সম্ভবতঃ জড়িয়ে আছে কোনও কিছুতে। তাই পেছন দিকে হেলে পড়ে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করছে সুতোটা। টানছে, প্রাণপণে টানছে, ধনুকের মত বেঁকে পড়েছে লম্বা লাঠির মাথাটা। ভাঙল বুঝি মটাং করে।

ভাঙল না কিন্তু, ক্রমেই নুয়ে পড়তে লাগল। ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগল সুতোটা জলের ভেতর। হঠাৎ আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ত্রিবেদী মশাই, আটকেছে—। নিশ্চয়ই বেশ বড় একটা শোল টোল কিছু গিঁথেছে। চলতে লাগল টানাটানি। জলের ভেতর যে আছে তাকে দেখা গেল না। ডাঙার জীবটিকে কিন্তু অনেকটা স্পষ্ট ভাবে দেখা গেল। অস্বাভাবিক এক বোঝা চুলে ঢাকা একটি মানুষী মূর্তি। মাথায় চুলে যে কারও লজ্জা নিবারণ হোতে পারে, তা' জানা ছিল না সেই সদ্য কাবা পরীক্ষা দেওয়া নবীন পণ্ডিতটির। প্রায় ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থাটা তাঁর তখন, সেই অবস্থায় তিনি দেখতে লাগলেন, অনেক নিচে যা ঘটেছে। টানাটানি চলতেই লাগল জলে ডাঙায়। বহুবার চুলের বোঝার ফাঁকে ফাঁকে ডাঙার জীবটির অনেকখানি অংশ ধরা দিলে নজরে। তারপর জলের জীবটির দর্শনও পাওয়া গেল। বেশ কিছুক্ষণ টানাটানি করে ডাঙার জীবটি একটি নোক্ষম ঝন্দি আঁটলে। ছিপের গোড়াটাকে গেড়ে দিলে ডাঙায়। দু'হাতে ধরে কয়েকবার দমক দিতেই অনেকটা মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। তখন সে ছুটে নেমে পড়ল জলে, প্রায় বুক সমান জলে গিয়ে দিলে ডুব। দম আটকে তাকিয়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, কয়েকটা মুহূর্ত থাকতে হোল দম বন্ধ করে। তারপর জলের ওপর ভেসে উঠল এক রাশ চুল, তারপর দেখা গেল, দু'হাতে একটা কাছিমকে ধরে ডাঙার জীবটি ডাঙায় উঠে আসছে।

"আসুন বড়দা, বসে পড়ুন। বড্ড দেরী হয়ে গেল আজকে—"

ভয়ানক রকম চমকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। জলজ্যান্ত একটি কূর্ম অবতারকে চিত অবস্থায় নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে এক জলদেবী জলের ভেতর থেকে উঠে আসছে তখন। হঠাৎ ত্রিবেদী মশায়ের পা পিছলে গেল যেন, মুহূর্ত মধ্যে তিনি পড়লেন গিয়ে খালের জলে। অবোধ্য একটা শব্দ বার হোল তাঁর গলা থেকে। তারপর তিনি সামলে নিলেন ধাক্কাটা। টেনে টেনে বললেন—"এনেছ বেশ—বেশ। কই—দেরি আর এমন কি হয়েছে।"

মুক্তা বললে—"না, দেরি আবার হয়নি। ঘুম ভাঙতেই বেলা হোল কত আজ। কালঘুমে পেয়েছিল আমায়। সিনেমা দেখা না ছাই দেখা। নিছেমিছি আজ সব গোলমাল হোয়ে গেল।"

ত্রিবেদী মশাই আর কথা বাড়ালেন না, বেশ ব্যস্ত ভাবেই এগিয়ে এসে বসে পড়লেন আসনে। সাদা পাথরের থালা নামিয়ে দিল সামনে মুক্তা। একটু আগে একবার এসেছিল সে, এসে থালা রাখবার স্থানটুকুতে জল ছিটিয়ে মুছে দিয়ে গেছে। ত্রিবেদী মশাই টের পাননি। পাবেন কি করে, তখন যে তিনি খালের পাড়ে আটকে ছিলেন। কেয়ার গন্ধে তখন তিনি ভরপুর। কেয়ার গন্ধ কি সহজ গন্ধ নাকি!

কেয়ার গন্ধটা এবার চাপা পড়ল। সুগন্ধি আতপের গরম ভাত, তার ওপর মাখন জ্বালানো ঘি ছড়ানো হোয়েছে। আলু কাঁচাকলা কাঁচা পেঁপে ঘুমড়ো দিয়ে হোয়েছে ভাতের সঙ্গে। বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন, অনন্ত দেবকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করেন ত্রিবেদী মশাই। যখন চোখ ছিল, তখন স্বহস্তে নানা রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে অনন্ত দেবের সামনে রেখে ভোগ দিতেন, চোখ যাওয়ার পরে ব্যবস্থা হোয়েছে শুধু হবিষ্যান্ন। মুক্তা চড়িয়ে দেয়, নামিয়ে নেয়। পাঁচ রকম করতে গেলে কতটা পবিত্রতা বজায় রাখতে পারবে, তার ঠিক নেই। তার চেয়ে শুধু হবিষ্যান্নই ভাল। ঠাকুর ঘরেও নিয়ে যেতে দেন না সে ভোগ ত্রিবেদী মশাই। কাঁচা নৈবেদ্য নিবেদন করে নিত্য সেবা সমাধা করেন। তারপর নিজের ঘরে বসে হবিষ্যান্ন নিবেদন করেন। খেতে ত' হবেই নিজেকে, খেতে যখন হবে তখন যা পাবেন তাই নিবেদন করবেন ইষ্ট দেবতাকে। ইষ্ট দেবতা যখন চোখের দৃষ্টি নিয়েছেন, তখন আর তাঁর অপরাধ কোথায়!

হবিষ্যান্নের গন্ধ অন্য সব গন্ধকে চাপা দিল।

"হাতে জল নিন বড়দা।"—মুক্তা একখানি ছোট গামলা ডান পাশে বাড়িয়ে ধরল। ত্রিবেদী মশাই গেলাস কাত করে অল্প একটু জল নিলেন ডান হাতে, হাতখানা গামলার

ওপর ধরে আঙুল কটি ডিঙিয়ে নিলেন। থালাটা সরিয়ে মুক্তা বলল—"নিন, এবার নিবেদন করুন। আমি ততক্ষণ ফলের থালাটা নিয়ে আসি।" বলতে বলতে মুক্তা উঠে গেল। এবার ভোগ নিবেদন করতে হবে।

অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর ফাঁকে পৈতে নিয়ে আবার সেই রকম গেলাস কাত করে এক গণ্ডুষ জল নিলেন ত্রিবেদী মশাই। বিষ্ণু স্মরণ করলেন, একবার গায়ত্রী পাঠ করলেন, শুরু করলেন নিবেদন করার মন্ত্র। এতৎ সম্ভোপকরণং নৈবেদ্যং—

হঠাৎ তাঁর জিভটা স্থির হোয়ে গেল, নিবেদন মন্ত্রের শেষটুকু আটকে রইল জিভে, হাতের জলটুকু যথাস্থানে পড়ল না। প্রায় মিনিট খানেক সেই অবস্থায় স্থির হোয়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, শেষে খুব লম্বা নিশ্বাস একটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না, অন্ধ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক—বেগে গিয়ে বিছানায় উঠে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন একেবারে শুয়ে তবে নিশ্চিন্ত হোলেন।

ফলের থালা নিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই মুক্তা আঁতকে উঠল—"একি! উঠে গেলেন যে!"

শান্ত স্বাভাবিক গলায় ত্রিবেদী মশাই বললেন—"আজ যে গুরুদেবের তিরোধান তিথি। ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ একটু আগে মনে পড়ে গেল।"

স্তব্ধ হোয়ে তাকিয়ে রইল মুক্তা ভোগের থালাটার ওপর; মুখ দিয়ে আর রা ফুটল না।

হীরামন্ হাবেলীর দোতালার ঘরখানা বোবা হোয়ে রইল। শুকনো কাঠগুলোর পেটে জলন্ত ক্ষুধা, ওদের আর সবুর সয় না। ছাতের ওপর শকুনগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। জননী জাহ্নবী কয়েক দিন ওদের কৃপা করেন নি। সাদা পাথরের থালাখানা তুলে নিয়ে গেছে মুক্তা, গুরুদেবের তিরোধান তিথিটিকে মর্যদা দেবে না, এ হেন সাহস কার আছে। গুরুদেবের তিরোধান তিথিতে ত্রিবেদী মশায়ের ঘুমও তিরোধান করেছে। জেগে আছেন তিনি। ইষ্ট-দেবতা অভুক্ত থেকে গেলেন। ক্ষুধায় কষ্ট পাবেন অনন্ত দেব। উপায় কি। নিবেদনের মন্ত্র কিছুতে বেরল না তাঁর মুখ থেকে। হীরামন্ হাবেলীর নিচের তলার ফিস-ফিসানী তাঁর জিভ টেনে ধরলে। খবরদার, কোন হাতের রান্না ভোগ তুমি নিবেদন করছ!

ক্ষুধার কিন্তু জাত নেই। ক্ষুধা কি বস্তু, তা ত্রিবেদী মশাই জানেন। ক্ষুধার উলঙ্গ রূপ তিনি দেখেছেন। জ্যান্ত কাছিমটাকে চিত করে ফেলে লম্বা ছোরা দিয়ে চাকা চাকা মাংস তুলে নিচ্ছে তার দেহ থেকে, আর তৎক্ষণাৎ আগুনে ঝলসে নিয়ে মুখে পুরছে, এই জাতের ক্ষুধার—কি জাত, তা কি বলতে কেউ পারে। টিনের বেড়ার গায়ে মুখ বুক পেট লেপটে দাঁড়িয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই, শ্রাবণ রাতের আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে তখন, ছড়ছড় করে জল পড়ছে তাঁর পিঠে। পড়ুক, বৃষ্টিতে কেউ মরে না, ক্ষুধার জ্বালায় মরে। ইস্—কি ক্ষুধা! কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা! কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ছোরা দিয়ে কাটছে, আগুনে সেঁকছে, মুখে পুরছে, আস্তে আস্তে চিবচ্ছে, গিলে ফেলছে। একমনে করে যাচ্ছে নিজের কাজ, কোনও দিকে নজর দেবার ফুরসত নেই। মাত্র তিন হাত সামনে টিনের বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিবেদী মশাই, ছোট্ট একটা ফুটোয় একটা চোখ লাগিয়ে দেখছেন। তখন তাঁর চোখ ছিল, তখন তাঁকে মনের চোখ দিয়ে দেখতে হোত না।

ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখবার আশায়, সেই সর্বনাশী ক্ষুধার সাকার রূপের চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়ার জন্যে অলক্ষিতে তার পিছু পিছু গিয়েছিলেন কি তিনি খালের পাড় থেকে! কেন গিয়েছিলেন।

কেন যে গিয়েছিলেন, তা' তিনি আজও নিজেকে নিজে বোঝাতে পারেন নি। কেন যে আড়িপেতে-আগ্যগোড়া সবটুকু দেখেছিলেন তার জবাব কে দেবে।

ক্ষুধা-ক্ষুধা ঐ দেখাটাও এক জাতের ক্ষুধা। দেখার ক্ষুধায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে। দেখতে দেখতে নাড়ীভুঁড়ীতে মোচড় দিয়ে উঠেছিল, গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল বমি, তবু তিনি সরতে পারেন নি, ফুটোটা ছেড়ে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারেন নি। তাঁকে এক অন্য জাতের ক্ষুধায় গ্রাস করেছিল। কোনও জাতের ক্ষুধার হাত থেকে কোনও মতেই রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। সব ক্ষুধাই সমান, চোখের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা-, ক্ষুধা মাত্রেরই জাত নেই। ক্ষুধা কোনও বাছ বিচার মানে না। সত্যিকারের ক্ষুধা

নির্বিচারে সমস্তই গিলে ফেলতে পারে।

অভুক্ত রইলেন ইষ্ট দেবতা, ক্ষুধা নিয়ে বসে রইলেন। ক্ষুধার জ্বালায় ইষ্টটুকুই হয়ত—গ্রাস করবেন।

তাই ত' হোল। শেষ পর্যন্ত নিজের গায়ে এক বোতল কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুনে ঝলসে ক্ষুধার মুখে তুলে দিলে নিজেকে হতভাগী। লোকে বললে—যাক্, বাঁচল রসরাজ ভরদ্বাজের বউটা, বেঁচে থাকার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেল। লোকে কি জানে! কতটুকু জানে! রাতের পর রাত সেই টিনের ফুটোয় চোখ নিয়ে যা দেখেছেন ত্রিবেদী মশাই, তার শত ভাগের এক ভাগ জানলেও অমন কথা বলত না। কার কতটুকু সংবাদ রাখে লোকে। ভাগ্যে রাখে না! কার কি সতিকারের পরিচয়, সেটুকু নজরে পড়লে নজর গলে জল হোয়ে যেত, যেমন চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর হোয়েছে।

হাঁ—তাই হোয়েছিল। অন্ধ হোয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই অনেক দিন আগে, টিনের বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে রাতের পর রাত জেগে থাকার ফলে অন্ধ হোয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর কিছুই দেখেন নি। মানে কপালের ওপর চোখ দুটো থাকলেও দেখবার শক্তিটা ছিল না। চোখ থাকলেই কি দেখা যায়! চোখ থাকলে যা দেখা যায়, তা দেখে শুধু ঠকতে হয়। চোখ হোল ঠকাবার যন্ত্র, চোখের মত নিমকহারাম ঠগ জোচ্চোর আর কে আছে! চোখের মাথা খেলে আর ঠকবার ভয় থাকে না। সাদাকে কালো, কালোকে সাদা দেখবার জন্যে চোখ দু'টোই দায়ী। চোখের মত শত্রু আর কে আছে!

চোখের পাল্লায় পড়ে ত্রিবেদী মশাইও মরিয়া হোয়ে উঠেছিলেন। আস্ত কাছিমের মাংস কেটে সেদ্ধবার ক্ষুধাটায় আহুতি দিতে শুরু করেছিলেন। ভরদ্বাজের বউকে আর কাছিম ধরবার জন্যে নামতে হয়নি খালে। ভেজবার ভয়ে একমাত্র সম্বল পরনের ছেঁড়া কাপড় খানাকে কূলে রেখে শুধু চুলের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে জলে নামতে হয়নি। ভাত কাপড় আর সেই চুলের বোঝার জন্যে তেল পৌঁছে দিতে শুরু করেছিলেন ত্রিবেদী মশাই। দিয়েই সুখ, খেওয়ার বদলে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা তাঁর ছিল না।

সত্যিই কি ছিল না!

তা'হলে রোজ রাতে চোরের মত লুকিয়ে কেন বেরিয়ে যেতেন বাড়ী থেকে! কেন অর্ধেকটা রাত জেগে বসে থাকতেন একটা ফুটোয় চোখ রেখে! বেত কাঁটার শরীরের চামড়া কালাকালা হোয়ে ছিঁড়ে যেত, মশার কামড়ে হাত পা মুখ ফুলে উঠত, দুর্গন্ধে দম আটকে আসত। তবু নড়তেন না। কেরসিনের টেমির ধোঁয়ায় বোঝাই ঘর খানার ভেতর আলোর বালাই থাকতই না বলা চলে। স্পষ্ট ভাবে কিছুই দেখা যেত না শুধু আন্দাজ করা যেত। কালি বর্ণ দুটো শরীর নড়ছে চড়ছে। কখনও এক হোয়ে মিশে যাচ্ছে, কখনও আলাদা হচ্ছে। হয়ত হোয়ে ওঠা দুটো হিংস্র প্রাণী নিঃশব্দে নড়ছে যেন, একে অপরকে না খেয়ে কিছুতে ছাড়বে না।

ক্ষুধা-আর এক জাতের খুনজোনী ক্ষুধা—ত্রিবেদী মশাই নিজের শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু একটি মাত্র চক্ষে জমা করে সেই ক্ষুধার পানে তাকিয়ে থাকতেন। মশার কামড়ে করবে কি তাঁর তখন, কেউটে সাপের ছোবলেও বোধ হয় কিছু করতে পারত না।

তারপর একটা মূর্তি ঘর ছেড়ে চলে যেত। আগুনটা একটু ফাঁক করে চোরের মত চুপি চুপি পালাত। ঘর থেকে দশ পা ফেললেই পাট খেত। পাট খেত ছুঁতে পারলে আর পায় কে! স্বয়ং যমও খুঁজে পাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে টেমিটা নিভে যেত, চোখ বুজে ফেলত যেন ঘরখানা। তখন ত্রিবেদী মশাইও পাট খেতে নামতেন, বুক ভরে নিঃশ্বাস টানতেন, অতটা সময় দম আটকে থাকবার ফলেও বুকখানা কাটেনি দেখে আশ্চর্য হোয়ে যেতেন। তারপর বাড়ী ফিরে নিজের ঘরে শুয়ে আবার মনের চোখটাকে চেপে ধরতেন একটা ফুটোয়, মনের চোখ দুটোর হাত থেকে সহজে নিস্তার পেতেন না।

নিস্তার নেই। অভুক্ত অনন্তদেব—তাকিয়ে রয়েছেন। আগুন জলে উঠেছে তাঁর দৃষ্টিতে। না-কিছুতেই নিস্তার নেই।

নিস্তার কি সহজে মেলে!

ক্যাঁ—কোঁ—অল্প একটু আওয়াজ হোল, কপাট ঠেলে ঢুকল বুঝি কেউ ঘরে। আলাদে দেখছি, শান্তিতে শুয়ে থাকতেও দেবে না নাকি।

সাড়া দিলেন ত্রিবেদী মশাই—"কে? কে এলে ঘরে?"

"আমি—আমি বিপুল।" বিপুল বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলে।

"বিপুল! বাঃ—" বিপুল বিস্ময়ে ত্রিবেদী মশায়ের স্বর আটকে গেল।

বিপুল বললে—"আজ্ঞে হাঁ, আপনার কাছে এলাম। এ সময় কেউ থাকে না আপনার কাছে, তাই এলাম। খুবই মুশকিলে পড়ে গেছি, একটা পরামর্শ মানে আপনার উপদেশ না পেলে-মানে—"

ত্রিবেদী মশাই বিপুল আগ্রহে উঠে বসলেন। বললেন—"বলনা, বল বল। মুশকিলে পড়েছ, সে ও খুবই ভাল কথা। মুশকিলে না পড়লে এ সময় আসবে কেন? আফিস কামাই করেছ—পরামর্শ নেবার জন্যে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর। বল—শুনি তোমার সঙ্কটটা। দেখা যাক—যদি পরামর্শ দেওয়া যায়।"

কেশে গলা পরিষ্কার করে বিপুল বললে—"আজ্ঞে ভারী একটা হাঙ্গামা বেধেছে। আমায় এবার বিয়ে করতে হবে দেখছি।"

"বিয়ে করতে হবে।" বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে আর একবার উচ্চারণ করলেন ত্রিবেদী মশাই—"বিয়ে করতে হবে!"

বিপুল বেচারা বড়ই বিব্রত হোয়ে পড়ল। গলাটা বেশ খাটো করে বলল—"আজ্ঞে, তাই ত' দেখছি। বিয়ে না করে আর উপায় নেই। ভারী একটা ইয়েতে পড়ে গেছি। মানে—বিধবা কি না, সবাই বাধা দিচ্ছে। এধারে আবার খুবই পেড়াপীড়ি লাগিয়েছে, কিছুতেই—"

ত্রিবেদী মশাই বাকীটুকু বলে ফেললেন—"ঠেকানো যাচ্ছে না। উত্তম, অতি উত্তম কথা হে বিপুল। আমি বলছি, এ বিয়ে হবে। আমি নিজে চেষ্টা করব। বিয়ে করবে, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কথাটা আগেই আমায় জানানো উচিত ছিল। না না, আগেই বা জানাবে কেমন করে, কথা পেলে তবে ত' জানাবে। বিয়েতে দু' পক্ষেরই সম্মতি চাই। যাকে বিয়ে করবে, তার মতামতটাই আসল ব্যাপার। সেটুকু যখন পেয়েছ—"

তাড়াতাড়ি বিপুল বলে উঠল—"আজ্ঞে হাঁ, পাত্রীর পেড়াপীড়িতেই—"

ত্রিবেদী মশাই খুবই উৎসাহিত হোয়ে উঠলেন—"অতি সৎ মেয়ে। অন্য কেউ হোলে শুধু ফুর্তি করেই সন্তুষ্ট থাকত। দেখছ ত আজকাল, চারিদিকে কি ঘটছে। কুমারী সধবা বিধবা সকলেই মজা লুটতে চায়। বিয়ের কথা তুলতে গেলেই বেঁকে বসবে। কেন যাবে একটা পুরুষের কাছে বন্দিনী হোতে। ব্যভিচার ব্যাপারটাকে ব্যভিচার বলেই মনে করে না কেউ। আর এ মেয়ে বিয়ে করার জন্যে পেড়াপীড়ি লাগিয়েছে। অতি সাধু সঙ্কল্প, আমি নিজে চেষ্টা করব যাতে এ বিয়ে হয়। কে বলেছে হবে না? কার কতখানি শাস্ত্রজ্ঞান আছে? যেখানে দু'টি হৃদয়ের মিলন হোয়েছে, সেখানে কোনও বাধা থাকতে পারে না। যাও—তুমি, ব্যবস্থা করগে বিয়ের। শাস্ত্রসম্মত ভাবে আমি নিজে বসে বিয়ে দোব। দেখি, কে কি করতে পারে।"

বিপুল বোধ হয় একটা আশা করে আসেনি। পরম কৃতার্থ হোয়ে পড়ল একেবারে, বলে গেল—"আজ্ঞে, এবার আমার বুকে বল এল। আমি—আমি এখন, কাল আবার আসব এই সময়। এইবার সমস্ত ব্যবস্থা করি গিয়ে। আপনার মতটা পেয়ে গেলাম, আর আমার ভয় কি?"

ত্রিবেদী মশাই আর কিছু বললেন না, বলবার আর আছেই বা কি? বেশী বলা মোটেই বলার মত বলা নয়। একেবারে মুখ টিপে থেকেও অনেক কিছু বলা যায়। মৌন হোয়ে থাকা—অনেক ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়ার লক্ষণ। আবার অনেক ক্ষেত্রে মৌন হোয়ে থাকাটা খুবই ভয়ঙ্কর।

অভুক্ত অনন্তদেব মৌন হোয়ে আছেন। ক্ষুধায় অস্থির হোয়ে উঠলেও মৌন হোয়েই থাকবেন। থাকতেই হবে যে, কে রাঁধবে ওঁর ভোগ। অশুচি অবস্থায় ভোগ রাঁধলে সে ভোগ কি করে নিবেদন করা যায়! নিবেদন করলেও কি উনি গ্রহণ করবেন!

হঠাৎ ভয়ানক রকম শিউরে উঠলেন ত্রিবেদী। ইস্! করেছেন কি তিনি! দিনের পর দিন নিশ্চিন্ত হোয়ে ভোগ নিবেদন করেছেন ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদেবতা গ্রহণ করেন নি। অভুক্ত ইষ্টদেবতা মৌন হোয়ে আছেন।

ক্ষুধা, নিদারুণ ক্ষুধা, দেবতার ক্ষুধা বড় ভয়ানক। দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি সহজে হয় না।

মানুষেরও না।

ঠিক ভাবে, শাস্ত্রসম্মত শুচিতা রক্ষা করে শাস্ত্রসম্মত খাদ্য দ্রব্য নিবেদন করলে দেবতার তুষ্টিবৃদ্ধি হয় কি না কে জানে, মানুষের বেলা কিন্তু একেবারে উলটো ফল ফলে। যত খায়, ততই ক্ষুধা বাড়ে মানুষের। বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মানুষটাকেই গ্রাস করে। রসরাজ ভরদ্বাজের তাই হোল। তার ক্ষুধা তাকে খেয়ে তবে শান্তি পেলে।

ক্রমেই ভরদ্বাজের সাহস গেল বেড়ে, সন্ধ্যার পরেই সেঁদোতে লাগল ঘরে। ত্রিবেদী মশাই ত আর সন্ধ্যার পরেই রওয়ানা দিতে পারতেন না, নিজের দিকটাও রক্ষা করা চাই। বাড়ী নিঝুম হোলে তবে তিনি চুপি চুপি পালাতেন। পৌঁছতেন যখন যথাস্থানে, তখন ফুটোর চোখ দিয়ে নিরাশ হোতেন শুধু। ঝড় ঝঞ্ঝা তুফানের চিহ্ন মাত্র নেই ঘরে, দুটি প্রাণী পাশাপাশি শান্তিতে শুয়ে আছে। কিংবা হয়ত দেখলেন, ভরদ্বাজ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে আর বউটা তার গা ঘেসে বসে টেমির শিস্‌টার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। রেগে উঠতেন ত্রিবেদী মশাই। কি আপদ দেখ! শুয়ে ঘুমবার অন্তে আসে নাকি লোকটা! ভারী মজা পেয়ে গেছে ত! আসছে খাচ্ছে ঘুমচ্ছে। এক ঘুম দিয়ে উঠে ধীরে সুস্থে প্রস্থান করছে, কোনও চিন্তা নেই। খাবার রসদ কোথা থেকে জুটছে, তা নিয়ে মোটে মাথা ঘামায় না। অপদার্থ আর কাকে বলে।

শুধু শুধু মশার কামড় খাওয়া আর দাঁড়িয়ে থাকা কতক্ষণ ধৈর্য থাকে মানুষের। ত্রিবেদী মশাই হাত গুটোলেন। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হোলেন শুধু হাতে। রসরাজের বউ এসে কিছুই পেল না। ত্রিবেদী মশাই একান্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, বাড়ীতে খুবই গোলমাল হচ্ছে। চাল ডাল নুন মশলা কেন ফুরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি, তা নিয়ে কথাবার্তা উঠেছে। কি করবেন তিনি, তাঁর দ্বারা বোধ হয় আর কোনও উপকারই হবে না।

শুনে রসরাজের বউ মাথা নুইয়ে কি যেন একটু ভেবে নিলে। মুখ তুলে তাকাল যখন আবার ত্রিবেদী মশায়ের চোখের দিকে, তখন তিনি বেশ আশ্চর্য হোয়ে গেলেন। আশা করেছিলেন, চোখ দু'টিতে দুর্ভাবনার ছাপ পড়বে। আবার উপোস করতে হবে, এ সংবাদটা শুভ সংবাদ নয়। কিন্তু না, রসরাজ ভরদ্বাজের বউ মোটেই ঘাবড়াল না। বরং মনে হোল, চোখ দুটো তার বেশী রকম চকচক করছে। বললে—তাই ত ঠাকুর, ঘরে যে কিছুই নেই। আজ থেকে আবার সে অনেকটা রাত করে আসবে বলে গেল। নিশুতি না হোলে নাকি বিপদ ঘটতে পারে। আমিও তাই বললাম, যাই হোক তবু একবার এক মুঠো খেতে ত পাচ্ছে, তা খানিক রাত হোলেই বা দোষ কি। বেশী রাতে খেলে দিনের বেলায় খিদে পাবে না। জেগে বসে থাকতে হবে আমাকে একলা, থাকব। উপোস করে থাকতে হবে না, কাঁচা মাছ আস্ত কাছিম খেয়ে বাঁচতে হবে না। হোক না রাত, বিপদ না ঘটলেই হোল।

তৎক্ষণাৎ ত্রিবেদী মশাই ঠিক করে ফেললেন, বিপদ ঘটতে দেবেন না। বসে থাকতে বললেন ভরদ্বাজের বউকে সেখানেই। যাবেন আর আসবেন, কোনও চিন্তা নেই। বিপদ তিনি কিছুতে ঘটতে দেবেন না। রাত করে এসে কিছুই খেতে পাবে না ভরদ্বাজ, এটা একটা কাজের কথা নাকি! রসদ তিনি জোটাবেন, ঠিক জুটিয়ে যাবেন রসদ। সন্ধ্যার পরেই ঘরে ঢুকে ভরদ্বাজ যদি বিপদ না ঘটায়, তা হোলেই হোল।

সে দিন রাত্রে নিজের বাড়ী নিশুতি হোলে যথাস্থানে পৌঁছে ত্রিবেদী মশাই খুশী হোলেন। ভরদ্বাজ তখনও আসেনি। একটু পরে সে এল। আসবার সঙ্গে সঙ্গে বউটা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। দম আটকে বেড়ার ফুটোর চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিবেদী মশাই। কি কাণ্ড দেখ! পাগল হোল নাকি ওরা! খাওয়া দাওয়া করবে না!

তারপর আর কোনও দিন মনেই হয়নি ত্রিবেদী মশায়ের যে রসদ যোগান অনর্থক হচ্ছে।

কিন্তু বিপদটা ঘটে গেল রসদের জন্যেই। ক্রমেই মানুষের ভুরু কোঁচকাতে লাগল। কই, রসরাজ ভরদ্বাজের বউটা ছেঁড়া কানি পরে খাল বিলের ধারে ঘুরে বেড়ায় না ত আর! বনে জঙ্গলে সেঁদিয়ে মাটি খুঁড়ে কচু ঘেঁচু খোঁজে না। তা'হলে।

তারপর আরও একটু নজর ফেলতেই বুঝতে পারল

সবাই, ভরদ্বাজের বউ মাথায় তেল দিচ্ছে। ভরদ্বাজের বউ কানি পরে রুক্ষ চুলের আঁড়ালে মেঘটা ঢেকে বেড়াচ্ছে না। চুলগুলোকে ঝিড়ে পাকিয়ে মাথার পেছনে আটকেছে। মোটেই বেআবরু হয়নি তাতে, কারণ পরনের কাপড়খানায় গিট পড়েনি। নজর রাখতে রাখতে শেষ পর্যন্ত জেনে ফেলল সবাই, ভরদ্বাজের বউ বসন্ত সাধুর দোকান থেকে পান কেনে দোক্তা পাতা কেনে। মানুষের নজর আরও তীব্র হোল।

সর্বনেশে রাতটা সমুপস্থিত হোল শেষে। পৌষ মাস কুয়াসায় ঢেকে গেছে গ্রামখানি। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে উপস্থিত হোলেন ত্রিবেদী মশাই যথাসময়ে, যথাস্থানে চোখ দিয়ে দাঁড়ালেন। ওরা তখন খাচ্ছে। হঠাৎ যেন মনে হোল ত্রিবেদী মশায়ের, কারা এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে। আর একটু হোলেই তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন। সে সুযোগ আর পেলেন না। এক সঙ্গে পাঁচ ছ'টা মানুষ চেপে ধরল ওদের পেছন থেকে। টুঁ শব্দটি হোল না, চক্ষের নিমিষে কাজ সুসম্পন্ন হোল। একটা মাল তুলে নিয়ে চলে গেল তারা, আর একটা পড়ে রইল। বেড়ার গা থেকে সরে গিয়ে বেতের ঝোপে গুড়ি মেরে ঢুকলেন ত্রিবেদী মশাই। কে জানে, বেটারা যদি ঘরের পেছনে এসে পড়ে !

বেটারা তা যায়নি। তারা তাদের রাস্তায় চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে ত্রিবেদী মশাইও নিজের পথ ধরেছিলেন। তখন তাঁর বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। রসরাজ ভরদ্বাজের ঘরখানার দিকে ফিরেও তাকান নি। সোজা বাড়ী ফিরে কাঁথার তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরোপকার করার সখ তখন তাঁর রক্তের ভেতর থেকে নিঃশেষে নিঃসৃত হোয়ে গেছে। পরোপকার করতে গিয়ে খুনখারাপির ভেতর জড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল। খুবই বেঁচে গিয়েছিলেন সেবার। ভূতের বেগার খেটে মরছিলেন। ভূতটা তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গেল।

স্বপ্নটা কিন্তু মিটল না। ঠিক বেঁচে আছে। ফুটোর চোখ দেবার প্রবৃত্তিটা ঠিক বেঁচে আছে। চোখ দুটো গলে জল হোয়ে গেছে, তবু রেহাই নেই। তবু এখনও ফুটো দেখলেই ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে পড়েন। কপালের চোখ দুটো গেছে, কিন্তু মনের চোখ দুটো আছে। মনের গায়ে যে ফুটো আছে, তাতে উঁকি দেয়। সমস্ত মনটার গায়েই ফুটো, কুৎসিত রকমের ফুটো হোয়ে গেছে তাঁর সারা মনখানায়। ছেঁড়া কাপড়, ভরদ্বাজের বউ যে রকম কাপড় পরত, সেই রকম দশা হোয়েছে তাঁর মন-কাপড়খানার। ইস্—ঐ মন দিয়ে কি আর লজ্জা নিবারণ হয় !

আর একবার তাঁর মন তাঁকে বেইজ্জত করল।

ঘর থেকে বেরিয়েই ধাক্কা খেল মুক্তা তাঁর বুকের সঙ্গে। কি ভাবল সে ! বুড়ো ভামটা আড়ি পেতে আছে, বুড়োটার হুঁশ জ্ঞান নেই, ঘরেতে এক গাদা কাঠ রেখেছে পুড়বে বলে তবু এখনও হ্যালোপনা ঘুচল না, এই সমস্ত ভেবে খুব খানিক হেসে নিল নিশ্চয়ই। বিপুল এসেছে, বিপুলের সঙ্গেও নিশ্চয়ই হাসাহাসি করবে বুড়োটার হ্যালোপনা নিয়ে। বেইজ্জতির একশেষ একেবারে—ছিঃ—

বেইজ্জত কিছু কম হননি ভরদ্বাজদের কাছেও। কি ভাবে তাঁর ইজ্জতটুকু নিঙড়ে নিঙড়ে ওরা ওদের বাঁচবার রসদ জোটাচ্ছিল, সেটা যেদিন টের পেলেন তিনি, সেদিন গলা পর্যন্ত গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে ছিলেন না, তাই গঙ্গায় তলিয়ে যাবার কথাটা মনে হয়নি। কিন্তু আর একটা কথা মনে মনে তিনি জননী ধরিত্রীকে জানিয়েছিলেন, হাঁ করে তাঁকে গ্রাস করবার জন্যে। ভরদ্বাজের বউটার দুটো জলন্ত চক্ষুর আঁচ থেকে বাঁচবার জন্যে ধরিত্রীর কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন মনে মনে। ধরিত্রী দ্বিধা করেনি, পায়ের তলার মাটি পায়ের তলায় পড়ে নিঃশব্দে হাসছিল তাঁর দশা দেখে। দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে ভরদ্বাজের বউ হিসহিস করে বলছিল—"খুব সাবধান ঠাকুর, বোলনা, কিছুতেই যেন কারও কাছে বলে ফেলনা কোন কথা। সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল ঘরের ভেতর, কেউ যেন না জানতে পারে। জানাজানি হোলে আমাকেও তারা মেরে ফেলবে।"

ত্রিবেদী মশাই পাশ কাটিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিলেন। আকাশ থেকে পড়া সুর ফুটিয়ে তুলেছিলেন গলায়—"কবে। কোন ঘরের ভেতর কি ঘটেছিল !"

ভরদ্বাজের বউ যেন শুনতেই পায়নি তাঁর কথা। আপন মনেই বলে যেতে লাগল—"খুব ভাল কাজ করেছিলে চুপচাপ পালিয়ে এসে। যখন জ্ঞান হোল আমার, তখন

বড় ভয় হোল। হয়ত তুমি গ্রামের লোককে সব বলে দেবে। তারপর হিসেব করে বুঝে দেখলাম, তা তুমি পারবেই না কখনও। রোজ রাতে বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে থাক তুমি ফুটোর চোখ দিয়ে, এ কথাটা লোককে জানাতে পারবে না কিছুতেই। কাজেই তোমায় মুখ বুজে থাকতে হবে। তবু তোমায় সাবধান করা দরকার, তাই আজ এলাম এখানে। নয়ত আসতাম না। আর ত আমার চাল ডালের দরকার নেই। যার জন্যে নিতাম তোমার চাল ডাল, সে গেছে। পুলিশে ধরতে পারলে মেরে ফেলত না, জেল হোত। এরা একেবারে নিকেশ করে ফেলবে। সেই রাত্রেই নিকেশ করেছে নিশ্চয়ই। এদের বড় ভয়, পুলিশের হাতে পড়লে পাছে কোনও কথা ফাঁস করে ফেলে, এই ভয়ে এরা কিছুতেই তাকে বাঁচতে দেয়নি। চিরকালের মত তার মুখ বন্ধ করেছে। তুমিও মুখ বন্ধ করে থাক ঠাকুর, আমিও মুখ টিপে থাকি। নয়ত আমাদেরও তারা শেষ করবে।"

ধরিত্রী যখন কিছুতেই হাঁ করল না, তখন ত্রিবেদী মশাই আবার হাঁ করলেন। বললেন—"নাও, আজকের মত অন্ততঃ নিয়ে যাও এগুলো। এনেছি, ফিরিয়ে নিয়ে যাব কেমন করে!"

অদ্ভুত জাতের একটু হাসি ফুটে উঠেছিল ভরদ্বাজের বউটার চোখে। বলেছিল—"কেন দেবে? দাম দোব কেমন করে আমি? এখন বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে কি দেখবে তুমি রোজ রাতে? আর ত সে ফিরবে না।"

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ান নি সেখানে ত্রিবেদী মশাই, তৎক্ষণাৎ লাগিয়েছিলেন দৌড়। একটা জান্ত কালকেউটে যেন ছোবল দিয়েছিল তাঁর মুখের ওপর। মুখের জ্বালায় পাগল হোয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন।

সেই ছোবল আবার তাঁকে খেতে হোল এতদিন পরে। বুক সমান জলে দাঁড়িয়ে ডুব দিচ্ছিলেন, সেইখানে গিয়ে কালকেউটেটা তাঁর ঘাড়ে ছোবল দিল। হঠাৎ কানে গেল —"উঠুন, উঠে আসুন বড় দা। করছেন কি! একশটা ডুব দেওয়া হোল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেল আমার—। শেষ পর্যন্ত নামতেই হোল জলে। স্নান পর্যন্ত হোয়ে গেল আমার, এখনও আপনার ডুব দেওয়া শেষ হোল না। কি পাগলামিতে পেয়েছে আপনাকে। জ্বর না এনে ছাড়বেন না বুঝি!"

সোজা ধমকানি, সহজ পন্থায় জোরজবরদস্তি করা, দুষ্ট ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জল থেকে তুলে আনে যেমন ভাবে, তেমনি ভাবে তাঁকে জল থেকে উঠিয়ে এনেছিল মুক্তা। তিনি শুধু আড়ষ্ট হোয়েছিলেন। ভরদ্বাজের বউ তাঁকে ঠিক এই ভাবেই দেখত। ঠিক মুক্তার মত চমৎকার সহজ সরল ব্যবহার করত। ভরদ্বাজ উপোস করে থাকবে যদি সে একটা ছাংলা লোকের ছাংলাপনা বরদাস্ত করতে না পারে। খুবই নিরীহ জাতের ছাংলাপনা, এমন সাহস নেই সে গায়ে হাত দেবে। শুধু আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখের ক্ষুধা মেটাবে। মেটাক, ঐটুকুতে সন্তুষ্ট হোলে রসদ ও জোটাচ্ছে। আহা বেচারা, কি কষ্টই না পায় রোজ রাতে বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অত কষ্ট করে যদি একটু শান্তি পায় ত' পাক, কি এমন ক্ষতি হবে তাতে! রসদ যোগানো বন্ধ করলে কিন্তু ক্ষতির অবধি থাকবে না।

ওরা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করে কৃপা করত। কৃপারই মত অনেকটা, কিংবা একথাও বলা চলে আবদার সহ্য করত। আবদেরে আদুরে খোকার বায়না—ঐ বায়নাটুকু সইতে পারলে যখন উপোস করার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। তখন সহ্য না করে উপায় কি!

মুক্তা আর বিপুলও মনে করবে, আদুরে খোকার বায়না। খোকার খোকামনা মনে করে গায়ে মাখবে না। কি লাভ গায়ে মেখে, তার চেয়ে ছাংলা খোকাটিকে হাত করে বিয়েটা যদি হোয়ে যায় নির্বিঘ্নে, তা'হলে একটা কাজ হয়। সেই চেষ্টাই করতে এসেছিল বিপুল, ঠিক বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। যে মানুষ আড়ি পেতে আরাম পায়, সে কি কখনও কোনও অন্যায়কে বাধা দিতে পারে! যে মানুষের মনের জিভ লকলকে করছে এক হাত, সে কি করে অপরের লকলকে জিভ টেনে ধরবে! বরং সাহায্য করবে। ভয় আছে যে, ভয়ে মুখ বুজে থাকবে, ছাংলাপনার কথাটা যদি প্রকাশ হোয়ে যায়।

কিছুই হয়নি যেন, এইটুকু দেখাতে পারলেই হোল। মুক্তাও তাই করলে। গঙ্গা থেকে তুলে এনে পূজার বসালে, পূজার যোগাড় করে দিলে, ভোগ রাঁধলে, ভোগের থালা সামনে ধরে দিলে। নিখুঁত ভাবে করে গেল সমস্ত, যেন

কিছুই হয়নি, কিছুই সে জানে না। ত্রিবেদী, মশাইও প্রাণপণে 'কিছুই হয়নি' ভাবটা বজায় রাখলেন। কিন্তু ভোগ নিবেদন করার সময় মনটা আটকে গেল। মাতৃক মজলিশের রহস্যময় ফিসফিসানি ফিসফিস করে বলতে লাগল তাঁর কানে—"করছিস কি! কি করছিস? কি নিবেদন করছিস ইষ্টদেবতাকে!"

সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই অনেক কিছু। টিনের বেড়ার ফুটোয় চোখ দিয়ে রাতের পর রাত যা দেখতেন, সব দেখতে পেলেন। ঘিনঘিন করে উঠল গা, বমি উঠে আসার উপক্রম একেবারে। ভরদাজের বউটা স্নান করে এসে ভোগ রেঁধে দিলে সে ভোগ কি তিনি দেবতাকে নিবেদন করতে পারতেন!

অসম্ভব!

দেবতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সামনে ভোগের থালা সাজানো রয়েছে, তবু তাঁর স্ফূর্তিবৃত্তি হোল না। ঘৃণার পরশে পবিত্র করে দেবতাকে ভোগ নিবেদন করা যায় না। ঘৃণা বাসা বেঁধেছে বুকের মধ্যে, অন্তর্যামী অনন্তদেব সেইখানেই বাস করেন। কি করে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যাবে।

বুকের মধ্যে ক্ষুধার অধীর হোয়ে উঠেছেন অন্তর্যামী অনন্তদেব।

কি দিয়ে তাঁর স্ফূর্তিবৃত্তি হবে?

"বড়দা"—

খুব চাপা একটু শব্দ যেন কানে গেল। ছিঁচকাঁদুনে দেবতার কান্নাটা শুরু হোল বুকের মধ্যে। সতর্ক হোলেন ত্রিবেদী মশাই, এবার যেন শব্দটা না ফসকে যায়।

"বড়দা"—

আবার সেই কুণ্ঠিত কণ্ঠের ডাক। সত্যিকারের ডাক, মনের কারসাজি নয়। একটুও না চমকে, গলায় এতটুকু চাঞ্চল্য ফুটতে না দিয়ে সাড়া দিলেন ত্রিবেদী মশাই—"বল"

"সন্ধ্যা হোয়ে এল, উঠুন এবার—"

ত্রিবেদী মশাই একটু কেঁপে উঠলেন। সাদাসিধে সাধারণ কয়েকটি কথা—সন্ধ্যা হোয়ে এল, উঠুন এবার—কথাকটির মধ্যে কোনও রহস্য নেই। কিন্তু—

ত্রিবেদী মশায়ের মনে হোল, কথাকটির মধ্যে অনেক কথাই যেন লুকিয়ে আছে। যেটুকু বলা হোল, তার চেয়ে অনেক বেশী না বলা রয়ে গেল যেন। কি সেটুকু!

"উঠুন বড়দা। একটি বার আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কোনও দিন আর দেরি হবে না উঠতে, কোনও দিন আর—" চাপা কোঁপানিতে বাকীটুকু ফুটতেই পারল না।

অস্থির হোয়ে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই, উঠে বসলেন ধড়মড়িয়ে। ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলেন—"দেখ, কি পাগল দেখ! কিসের দেরি! দেরি আবার হোল কোথায়। আচ্ছা মুশকিল ত!"

একটুখানি সময় লাগল কোঁপানিটা সামলাতে, গলার কিন্তু কান্নাটা আটকে রইল। সেই কান্নার ভেতর দিয়ে ছেঁকে বেরতে লাগল—"কিরতে রাত বারটা বেজে গেল। রগ দুটো তখন ছিঁড়ে পড়ছে। সিনেমা না ছাই, ওই ছাই পাশ দেখতে গেলেই আমার মাথা ধরে। শেষ রাত পর্যন্ত ছটফট করে মলুম। কাল ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি রোদ উঠে গেল। ছুটে বেরলাম ঘর থেকে, ঘর বারন্দা কলঘর সব খোঁজা শেষ হোল। ছুটলাম নিচে, নিচেও দেখতে গেলাম না। বাইরের উঠোন, ঠাকুর ঘর, না কোথাও নেই। তখন দম আটকে এসেছে, কি সর্বনাশ হোয়েছে কে জানে? পা আর ওঠে না, চোখে অন্ধকার দেখছি—কোনও রকমে ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। এক গলা দাঁড়িয়ে তার ওপর তার ওপর ডুব দেওয়া হচ্ছে তখন। দেখে ধরে প্রাণ এল। তখনই বুঝেছিলাম, শাস্তি আমায় পেতেই হবে।"

"শাস্তি!" আঁতকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই।

"হাঁ, শাস্তি নয়ত কি? বাড়া ভাত ফেলে রেখে শুয়ে পড়লেন, সারাটা দিন জল স্পর্শ করলেন না, আর কি শাস্তি দেবেন আমায় দিন। সব সহ্য করব মুখ বুঁজে, সব"—সুস্পষ্ট কান্নায় গলা ভেঙে পড়ল।

বোবা হোয়ে বসে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, এক চুল নড়তে পর্যন্ত পারলেন না।

গেল, ধুয়ে মুছে সাফ হোয়ে গেল সব জঞ্জাল। ঝলমল করে উঠল অন্তরটা স্পষ্ট দেখা গেল সেখানে অনন্ত দেবের হাসি। ক্ষুধায় ক্ষুব্ধ নন, তৃপ্তিতে প্রসন্ন। প্রসন্ন দেবতা মুখ টিপে হাসছেন।

তা'হলে!

খুবই ভাবা-চাকা খেয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। বার বার নিজেকে শুধাতে লাগলেন—"তা'হলে! তা'হলে?"

আর একবার কান্নায় ভেঙ্গে গলাটা কেঁপে উঠল—"এখনও কি সাজা দেওয়া শেষ হোল না আমার? বলুন, কি করলে আপনার রাগ পড়বে। বলুন, এখুনই তাই করব। বলুন"—

ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন যেন ত্রিবেদী মশাই। বললেন—"আঃ কি পাগলামি করছ। চল, চল, আরতি করে এসে জল-টল খাব। আচ্ছা খেপীর পাল্লায় পড়া গেল দেখছি!"

বলতে বলতে নেমে দাঁড়ালেন মেঝেয়। দিন রাতের সন্ধিক্ষণ দক্ষির সন্ধান দিলে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন ইষ্টদেবতাকে, অনন্তদেব,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, কিছুই লুকনো নেই তোমার কাছে। অন্তর্যামী, আলো দেখাও। আর যে পারি না অন্ধকারে হাঁতড়ে মরতে। সন্ধ্যা দীপটি যেন নিভে না যায়।

জ্বলতে লাগল সন্ধ্যা দীপ। স্নিগ্ধ আভায় জুড়িয়ে গেল দিনের জ্বালা। দুঃস্বপ্ন, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছেন সারাদিন ত্রিবেদী মশাই। দুঃস্বপ্নে গোবিন্দকে স্মরণ করতে হয়। গোবিন্দ স্মরণ করে তিনি খেতে বসলেন। রাত্রে দুধ আর মিষ্টি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়, সেদিন ভোগ হোল লুচি কপির ডালনা ক্ষীর দিয়ে। সারাদিন মুখে জল দেয় নি মুক্তা,—বিকেলে গঙ্গায় স্নান করে এসে ভোগ তৈরী করছে। পরম পরিতুষ্ট হোলেন ত্রিবেদী মশাই, মন্দিরে ভোগ নিয়ে যাবার আদেশ করলেন। যখন স্বহস্তে ভোগ রাঁধতেন, তখন মন্দিরে ভোগ দেওয়া হোত। স্বহস্তে ভোগ রান্না বন্ধ হোল চোখ নষ্ট হবার দরুণ, মন্দিরে রান্নাভোগ নেওয়াও বন্ধ হোল। বললেন—"একই কথা। অনেক সব নাম করা মন্দিরে রান্না ভোগ নেওয়া হয় না। রান্না ঘরের লাগাও ভোগ মন্দিরে ভোগ নিবেদন করা হয়। তাতে ভোগের পবিত্রতা বজায় থাকে। দেবতা তুষ্ট হোয়ে গ্রহণ করেন।"

সেই থেকে রান্না-ভোগ ত্রিবেদী মশাইয়ের নিজের ঘরেই বেড়ে দেওয়া হয়। জানে কিন্তু সকলেই তাঁর মনের কথা। অপরের রান্না ভোগ একান্ত বাধ্য হোয়েই নিবেদন করেন তিনি, ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করে প্রসাদ পান। কিন্তু সাক্ষাৎ অনন্ত দেবের সামনে অপরের রান্না ভোগ সাজিয়ে নিবেদন করা—না, অতটা বাড়াবাড়ি ত্রিবেদী মহাশয়ের মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

সেদিন সন্ধ্যার পরে তাও সম্ভব হোল। সন্ধ্যা দীপ জ্বলছে তখন তাঁর অন্তরে, অন্ধকার ঘুচে গেছে। অন্তরের আলোয় সবাই আলোময় দেখছেন তখন তিনি। সব শুচি সব পবিত্র সবই আনন্দের উৎস বলে মনে হচ্ছে। অতএব আজ ভোগ মন্দিরেই, তোমার হাতের রান্না ভোগ অসঙ্কোচে নিবেদন করব দেবতার দৃষ্টির সামনে স্থাপন করে। নিজের তৈরী বিচারের বেড়া নিজেই ভেঙে ফেলব। শুচি-অশুচি বিচার করার স্পর্দ্ধা ঘুচে যাক,—ঘৃণা লজ্জা ভয় দূর হোক অন্তর থেকে। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা।

মিথ্যাকে মন থেকে বিদেয় দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন ত্রিবেদী মশাই, তারপর প্রসাদ গ্রহণ করলে মুক্তা! সারাটা দিন উপোস করে আছে বেচারী,—খামকা কষ্ট পেলে। ত্রিবেদী মহাশয়ের পেড়াপীড়িতে তাঁর ঘরে বসেই তাকে খেতে হোল। খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে ঘর পরিষ্কার করে বসল সে ত্রিবেদী মহাশয়ের সামনে। ত্রিবেদী মশাই আসনেই বসে আছেন। ঘুম না পেলে উঠবেন না। গল্প হবে, এসময়টা গল্প করার সময়! এই সময়টুকু নষ্ট না হোলেই হোল। আগের সন্ধ্যাটা নষ্ট হোয়েছে সিনেমার দৌরাত্ম্যে। সে লোকসানটাও পুষিয়ে নেওয়া চাই।

শুরু করে দিলেন ত্রিবেদী মশাই—"তারপর? বল এখন শুনি, কি দেখে এলে কালকে!"

"কি আবার দেখব, দেখবার শোনবার কি উপায় ছিল নাকি কিছু। বক বক বক বক—কানের কাছে বক বক করলে কি সিনেমা দেখা হয়! সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন নাকি বিপুল বাবু, ওঁর বক বকানি শোনাবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার কাছেও আসবেন শুনবেন তখন আপনিও। সে সব কথা ওঁর মুখ থেকে শোনা ভাল। আমার মুখে সেসব কথা আসবেই না, ও বলব কেমন করে।"

বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ল একেবারে মুক্তা। হাসির ঝাপটায় সন্ধ্যা দীপের শিখাটা কাঁপতে লাগল।

প্রমাদ গণলেন ত্রিবেদী মশাই, তাঁর বড় সাধের দীপটি বুঝি নিভে যায়!

তাড়াতাড়ি আড়াল দিয়ে বাঁচাতে গেলেন। বেশ একটু কাঁকালো স্বরে বললেন—"পাগল, ওটা একটা আস্ত পাগল। আশকারা দিতে নেই অমন লোককে। যত সব বাজে মতলব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আমার কাছে এসেছিল সে, কিছু বলিনি। আগে শুনেনি সব ব্যাপারটা তোমার কাছে। কতদূর এগিয়েছে জেনে নি আগে। তারপর দেখাচ্ছি মজাটা। ইতরামি করার জায়গা পেয়েছে নাকি এটা! আকাশের চাঁদ পাবার আবদার করা বার করে দিচ্ছি। আর একবার এলে হয়!"

হাসিটা থেমে গেল মুক্তার, ভয় পাওয়া স্বরে বলে উঠল—"না না, আপনি অমত করবেন না। অনেকদূর এগিয়েছে বেচারা, এখন যদি বিয়েটা না হয়, খুব খারাপ হবে।"

"খারাপ হবে!" রুখে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই—"খারাপ কি হবে শুনি? খারাপের মধ্যে এইটুকুই হবে যে একটা ভদ্রঘরের বিধবার সর্বনাশটা হবে না। মনে করেছ বুঝি, বিয়ে হোলেই ওর স্বভাব বদলাবে? ঐ জাতের চরিত্র কখনও বদলায়? যে একটা বিধবাকে ফুসলতে পারে, সে আরও পাঁচটাকেও পারবে। বিশ্বাস করতে আছে ও রকম জীবকে! সারাটা জীবন জলে পুড়ে মরতে হবে—এই আমি তোমায় বলে রাখলাম।"

অনেকটা সময় চুপ করে রইল মুক্তা, ত্রিবেদী মশাই ভাবলেন ওষুধ ধরেছে। ভয় আর সন্দেহ, এই দুটিই এক মাত্র ওষুধ। খুবই বিষাক্ত ওষুধ, কোনও রকমে ওষুধটা গেলাতে পারলেই হোল। ওষুধের ক্রিয়া শুরু হোলেই মনটা অসাড় হোয়ে পড়বে। দেখা যাবে তখন, বিপুল বাবাজী কত বড় ঘড়েল।

গলা খাটো করে খুবই অন্তরঙ্গ ভাবে আবার শুরু করে দিলেন তিনি—"জানলে মুক্তা, ঐ বিপুলের মত ছোঁড়া আমি অনেক দেখেছি। বিয়ে করে না, ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকে। সুযোগ পেলেই আর কথা নেই। সধবা বিধবা কুমারী একটা কিছু পেলেই হোল, অমনি তার মাথাটি চর্বণ করে বসেছে। আর হতভাগী মেয়েগুলোও তেমনি হাঁদা, ঠিক ওদে পড়বে। ব্যাস—তারপর একেবারে সুকতলার মত মনে করবে। যা খুশী করবে তার নাকের ডগায়। বিয়ে করেছি যখন তখন মুখ বুজে থাকতে বাধ্য। না থাকতে পার দূর হও, সর্বনাশ ত' তোমার করেই ছেড়েছি, এবার গোল্লায় যাও। বল তখন সে হতভাগীর উপায় কি? হয় মুখ বুজে সারাটা জীবন জলে মরতে হবে, নয়ত গলায় দড়ি দিতে হবে। যখনই কেউ কানের ভেতর মধু ঢালতে আসে, তখনই লাথি মারতে হয় মুখে। তখনই বোঝা উচিত, লোকটার স্বভাব কেমন। একজনকে যখন ফুসলাচ্ছে, তখন আর একজনকে আবার ফুসলাবে না, তার ঠিক কি। ওই রকম লোকের ছায়া মাড়াতে আছে!"

মিনমিনে গলায় মুক্তা বলল—"সকলেই কি এক রকম হয়! বিপুলবাবুকে ত' আপনি ভাল করে চেনেন। তার মত মানুষ—"

"ঘুঘু—একটি আসল ঘুঘু, ত্রিবেদী মশাই আরও গলা খাটো করলেন। খুবই একটি গোপনীয় কথা বলছেন যেন, ভেতরের কথাটা ফাঁস করতে যেন তাঁর বিবেকে বাঁধছে। কিন্তু না বলেও যে উপায় নেই, তাই বললেন—"সব সংবাদ ত' আর সবাই জানতে পারে না। কিন্তু আমি ত' জানি। আগের বার ঠিক এই ভাবে কেঁদে পড়ল এসে আমার কাছে। সেবার সর্বনাশটা অনেক দূর গড়িয়েছিল চেপে ধরলাম আমি, কর বিয়ে, নয়ত কিছুতেই ছাড়ব না। করলে কি জান, এমন এক চাল চাললে যে মেয়েটাও ঠকল, আমিও ঠকলাম। খদ্দের জুটিয়ে ফেললে। পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা তখন মেয়েটা, সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে গেল পঞ্জাবে। সেখানে আর্য সমাজী মতে বিয়ে করবে বলে নিয়ে গেল। ফিরে এল কিছু টাকা নিয়ে। কর তখন কি করবে।"

এই একান্ত অবিশ্বাস্য গল্পটা শুনে মুক্তা জিজ্ঞাসা করলে, —"এখানে কেউ গোলমাল করলে না? কোথায় গেল মেয়েটা জানতে চাইলে না ওঁর কাছে?"

ত্রিবেদী মশাই বললেন—"খেপেছ! কার দায় পড়েছে তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার। যাদের ঘাড়ে চেপে বসে ছিল সে, তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।"

মুক্তা চুপ, ত্রিবেদী মশাই কান পেতে রইলেন। মনে মনে সাবাস দিলেন নিজেকে, মোক্ষম দাওয়াই, দাওয়াটা ঠিক ধরেছে। ভাবুক, ভাবতে থাকুক, ভেবে দেখুক, এখন কি করবে।

অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রা ভাঙা স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে মুক্তা—"ঘুম পাচ্ছে বড়! মাথার যন্ত্রণায় সারাটা রাত ছটফট করে মরেছি —"

ত্রিবেদী মশাই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—"ঠিকই ত'। একে ঘুমতে পারনি রাত্রে, তারপর সারাদিন উপোস গেল। যাও, শুয়ে পড় গে। ঘুমোলে মাথা ঠাণ্ডা হবে। তখন বুঝতে পারবে, ও রকম মানুষকে বিশ্বাস করা কত বড় বিপদের কাজ। ওই সব ঘুঘুদের কি বিশ্বাস করতে আছে।"

বিছানায় উঠে পড়লেন তিনি, মশারি ফেলে দিয়ে চলে গেল মুক্তা।

সন্ধ্যাদীপটি কি নিভে গেল!

ত্রিবেদী মশাই ভয়ে ভয়ে তাকালেন তাঁর মনের ফুটোয় চোখ দিয়ে, দেখে আশ্বস্ত হোলেন। না, নেভেনি, জ্বলছে ঠিক জ্বলছে। খুব মিষ্টি একটু আলো ছড়াচ্ছে তাঁর বুকের মধ্যে, তাতে সেখানকার নিবিড় আঁধারটা বেশ ফিকে হোয়ে উঠেছে।

মিষ্টি আলোটুকুর পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁরও তন্দ্রা এসে গেল। অদ্ভুত একটা অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলেন। খুব নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যেন কে, একেবারে মিশে গেছে তাঁর শরীরের সঙ্গে। ক্রমেই অবশ হোয়ে পড়ছে তাঁর শরীরটা, আবেশে এলিয়ে পড়ছে। নেশার মত, ঠিক নেশার মত। এই রকম নেশায় আচ্ছন্ন হোয়ে পড়ে মানুষে কেয়া ঝাড়ের-কাছে পৌছলে! শ্রাবণ মাসে আকাশ যখন নেমে আসে মাটির মুখে চুমু দিতে, কেয়ারা তখন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে মাথা দোলায়। দেহটা লুকলে হবে কি, গন্ধটা যে লুকতে পারে না। গন্ধটা যে পালাবে কোথাও সে উপায়ও নেই। আকাশে মাটিতে ছোঁয়াছুঁয়ি হোয়ে গেছে তখন, ফাঁক কোথায়। এমনি সময় যদি কেউ পৌছতে পারে কেয়া ঝাড়ের কাছে, তা'হলে তার নেশা লাগবেই। কেয়ার গন্ধ মিশে যাবে শরীরের রক্তের সঙ্গে, নেশায় আচ্ছন্ন হোয়ে পড়বে।

নেশায় আচ্ছন্ন হোয়ে পড়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, নেশার ঘোরে মনটা তাঁর কেয়া ঝাড়ের ধারে ঘুরঘুর করতে লাগল।

দেবতা জেগে রইলেন এধারে, দেবতার চোখে তন্দ্রা নামে না। তন্দ্রাহীন নেত্রে তাকিয়ে রইলেন ভোগের দিকে। ক্ষুধা তাঁর মিটল না। বলি চাই, আরও বলি চাই। বিচার বলি দিয়ে সেই রক্ত ছিটিয়ে ভোগ শোধন করে মন্দিরের মধ্যে নিবেদন করে এলেন ত্রিবেদী মশাই, দেবতা শুধু তাকিয়ে রইলেন। মনঃপুত হোল না তাঁর। বলি চাই, আরও বলি চাই।

সন্ধ্যাদীপটি জ্বলছে কি এখনও! ঐ যাঃ—কখন নিভে গেছে।

এখন কি হবে!

অন্ধকার, উঃ কি অন্ধকার!

ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন ত্রিবেদী মশাই, আকাশ দেখতে পেলেন না। অতবড় আকাশখানা অতগুলো নক্ষত্র শুদ্ধ বেমালুম উধাও হোয়ে গেছে। ফলে আকাশের পেছনে লুকনো অন্ধকারের সমুদ্রটা ভেসে পড়ছে ধরিত্রীর বুকে। অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে সাঁতরাতে লাগলেন তিনি। ওপরে অন্ধকার নিচে অন্ধকার, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু অন্ধকার। আলকাতরার মত কালো, আলকাতরার মত চটচটে অন্ধকার। কার সাধ্য, সেই গাঢ় চটচটে গলানো আলকাতরায় তলিয়ে সাঁতরে এগোবে!

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে সময় ত্রিবেদী মশায়ের বুকে চুল গজায় নি, ঠোঁটের ওপর সবেমাত্র কালো রেখার ছোঁয়াচে লেগেছে। সে সময়ের বুক কাঁপবার বুক নয়। তবু কেঁপে উঠল। উঠলেও তিনি ফিরলেন না, ফেরবার বয়েস নয় সেটা কাজেই এগিয়ে চললেন।

এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের শক্তিতে না তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! থেমে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা করলেন। উপায় নেই, আলকাতরার সমুদ্রে স্রোতের টান ঠেলে উজানে উঠে আসা—পিশাচের পক্ষেও সম্ভব নয়, তা মানুষে পারবে। পিশাচ নামতেও সাহস করবে না

আলকাতরা-সমুদ্রে, ত্রিবেদী মশাই করেছিলেন। করেছিলেন, কারণ তিনি পিশাচ নন। পিশাচের পৈশাচিক পিপাসা মানুষের পিপাসার কাছে অতি তুচ্ছ। পিপাসা নিবৃত্তি না হোলে পিশাচ মরে না, মানুষ মরে। হাঁ, পিপাসায় বুকখানা শুকিয়ে কাঠ হোয়ে গিয়েছিল বলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই সেই আলকাতরা-সমুদ্রে। তারপর স্রোতের টানে পৌঁছেওছিলেন ঠিক জায়গায়। কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হয় নি।

জল নেই, জলের বদলে চাপ চাপ থকথকে রক্ত। বিষাক্ত রক্ত, শমন সদৃশ বিষাক্ত বীজ সেই রক্তের মধ্যে কিলবিল করছে।

ভরদ্বাজের বউই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

ঠিক জায়গায় পৌঁছে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হোল, আগে সেই ফুটোটার চোখ দিয়ে দেখে নিলে হয়। মাঝখানে অনেকগুলো দিন চলে গেছে, কে জানে কি খেয়ে কাটিয়েছে। নিশ্চয়ই কাছিম ধরেছে। প্রথম দিন সেই ফুটোর চোখ দিয়ে যে দৃশ্য দেখেছিলেন তিনি, সেইটে ফুটে উঠল চোখের সামনে। মোচড় দিয়ে উঠল বুকখানার মধ্যে। হয়ত আজও তাই করছে, একলা এই ঘরখানার মধ্যে বসে চিবচ্ছে কাছিমের মাংস, আর তাকিয়ে আছে আগুনটার পানে। কেউ নেই, কেউ নেই ওর। উঃ, কি ভয়ানক একলা! ঐটুকু প্রাণটা একলা বেঁচে আছে ওর ক্ষুধা নিয়ে, এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাতে একলা ঐ ঘরে বসে কাঁচা কাছিম খুবলে খাচ্ছে। আর সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আর স্থির থাকতে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই। আগে সেই ফুটো দিয়ে দেখে নিতে হবে, কি করছে। তারপর ডাকতে হবে। ডেকে বুঝিয়ে বলতে হবে যা বলতে এসেছেন। সোজা কথায় বলবেন, হয় তুমি পালিয়ে চল আমার সঙ্গে, নয়ত আমি মরব। যে ভাবে হোক শেষ করে দোব নিজেকে, কারণ জীবন নিয়ে অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছি। তুমি এই ভাবে একলা এখানে পড়ে শুকিয়ে মরছ, এটা আমার পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। তুমি মানা করেছিলে, এতদিন আসিনি। কিন্তু আর পারলাম না। বুঝে দেখ, কি ভাবে কেটেছে আমার দিন রাত-গুলো, কি জ্বালায় জ্বলছি আমি। কি করে বাঁচব এ ভাবে? হয় তুমি রাজী হও, নয়ত আমি মরি। মরে তোমার হাত থেকে রেহাই পাই।

কথাগুলো আর একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিয়ে ফুটোর কাছে পৌঁছলেন। তারপর চোখও দিয়েছিলেন ফুটোতে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাতা জ্বলন্ত অঙ্গার যেন পড়ল এসে তাঁর চোখে। ছিটকে পড়লেন পেছনের বেত ঝোপে। চোখের জ্বালায় তখন প্রাণ যায়।

আর একবারও সেই ফুটোয় চোখ দেন নি।

চোখের আগুন তখন মনের গায়ে লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে বারুদ. বারুদগুলো আবার দরদে ভেজানো। দরদে ভেজানো মনের প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ। আগুনের ছোঁয়া পেলে আর রক্ষে নেই, সব উড়িয়ে দেয়। দয়া মায়া মমতা প্রেম, এই সমস্ত মিষ্টি মিষ্টি নামের লেবেল আঁটা যে সমস্ত মহামূল্য মদের বোতল জমা থাকে হৃদয়ের ভাণ্ডারে, নিমেষের মধ্যে সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়। বোতলগুলোর মধ্যে আসল পদার্থ যেটা থাকে, সেটায় তখন আগুন লাগে। অতি তীব্র সুরাসার, কামনার বিষ ঢোলাই হোয়ে সেই সুরাসারের উৎপত্তি। মিষ্টি মিষ্টি নামের লেবেল আঁটা বোতলে পুরে হৃদয়ের ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখা হয় সে জিনিষ। তাতে আগুন লাগলে আর রক্ষে নেই। হৃদয়খানাকেই ছাই করে ফেলে তবে ছাড়ে।

সব পুড়ে গেল, ত্রিবেদী মশায়ের মনের ভাণ্ডারে জমা করা যা কিছু সম্পদ সব ছাই হোয়ে গেল। কেন তিনি এলেন! এতগুলো দিন রাত তুষানলে দগ্ধ হোয়েছেন কার জন্যে! একটা নরকের কীটের জন্যে তিনি মুখে অন্ন তুলতে পারেন নি, শুয়ে চোখ বুজতে পারেন নি। ইস্-কি অধঃপতন! ত্রিবেদী বাড়ীর ছেলে, গ্রাম শুদ্ধ মানুষ যার পায়ের ধুলো নেয়, সে কোথায় নেমে দাঁড়িয়েছে!

দাঁড়িয়েছে যখন নেমে, তখন একটা এসপার ওসপার না করে আর উঠছে না। নরকের কীটটাকে অন্ততঃ একবার জিজ্ঞাসা করে যেতে হবে, কেন সে এ কাজ করছে।

পোড়া পেট কি তার ভরত না? পোড়া পেটের জন্যে ত্রিবেদী বাড়ীর ছেলেই ত' সব ছোটাতে চেয়েছিল। তবে?

জবাবটা কি দেয়, না শুনে কিছুতেই ফেরা হবে না। নরকের কীট কি জবাব দেয় শোনা চাই।

অবাব শুনেই ফিরেছিলেন ত্রিবেদী মশাই। জিজ্ঞাসা করতে হয়নি, নরকের কীট সেধে সব বলেছিল।

"ওঠ গো ঠাকুর, ঘরে চল। এই বেতের ঝোপে বসে সাপের বিষে মরবে নাকি?"

নিদারুণ ধমকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। মুখ তুলে দেখলেন, অন্ধকারের মধ্যে দুটো চোখ জ্বলছে। কতক্ষণ যে বেহুঁস হোয়ে বসেছিলেন, খেয়াল করতে পারলেন না চেষ্টা করে খাড়া করলেন শরীরটাকে, তারপর তার পিছু পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন! সেই ঘর, যার প্রত্যেকটি জিনিষ তাঁর মুখস্থ, অথচ কখনও পা দেননি যে ঘরে, সেই ঘরে সশরীরে আবির্ভূত হোলেন।

ভরদ্বাজের বউ বলল "কোথায় বসাই। এক কাজ কর, ঐ মাচাটার ওপর একখানা পিঁড়ি আছে, নামিয়ে নিয়ে বোস। পিঁড়িখানা নষ্ট হয় নি, আমি ছুঁলেই নষ্ট হবে। নাও, পেড়ে নাও।"

ত্রিবেদী মশাই একটুও নড়লেন না। জিজ্ঞাসা করলেন —"তুমি ছুঁলে পিঁড়িখানাও নষ্ট হবে! কাঠের পিঁড়ি নষ্ট হবে মানে?"

ভরদ্বাজের বউ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে কখনও দেখেন নি তাকে ত্রিবেদী মশাই, অমন চমৎকার হাসি হাসতে পারে জানতেন না। খুবই চমৎকৃত হোলেন। চমৎকৃত হোলেন আরও ওর সাজ পোষাক দেখে। কি আশ্চর্য্য মানিয়েছে! কচি কলা পাতা রঙের কাপড়, কলাপাতা রঙের কাঁচের চুড়ি, টেমির আলোয় ভাল করে বোঝা গেল না আরও কি কি আছে। যেটুকু বোঝা গেল, তাই যথেষ্ট। আশ্চর্য্য ত'। দু'খানা লাল পেড়ে শাড়ী, যজমান বাড়ী থেকে পাওয়া, যেমন মোটা তেমনি খাটো, বাড়ী থেকে চুরি করে এনে দিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। জানতেন কি তখন কচি কলাপাতার রঙটা এমন চমৎকার মানায় ওকে। জানলে নিশ্চয়ই কিনে এনে দিতেন শহরে গিয়ে। সেই চক্ষুশূল গুণচট পরে থাকতে হোত না। বললে ত' জানবেন। একটিবার মুখ ফুটে বললেই পারত। তা বলবে কেন, এখন বলবার লোককে বললে। উঃ—কি নেমকহারাম!

ভরদ্বাজের বউ বলল—"মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে কি অত ভাবছ ঠাকুর? থাক, তুমি এলে আমি খুশি পেলাম। জানতাম, একদিন একবার তুমি আসবেই। তাই রোজ রাতে ঐ জায়গাটা দু'তিন বার ঘুরে আসি। আজ তোমায় কুড়িয়ে পেলাম, মা মনসা মুখ তুলে চাইলেন।"

ত্রিবেদী মশাই জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না—"কেন? কি দরকার আমার সঙ্গে?"

"ঐ শোন কথা।" ভরদ্বাজের বউ গালে হাত দিলে। বিচিত্র ভঙ্গিমা করে বিচিত্র সুরে বলে উঠল—"যাবার সময় একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব না, একি একটা কথা হোল।"

"যাচ্ছ!" ঢোঁক গেলবার চেষ্টা করে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই, আর কিছু বলতেও পারলেন না—। গলা জিভ মুখের ভেতরটা শুখিয়ে খটখটে হোয়ে গেছে।

ভরদ্বাজের বউ খুবই আমোদ পেল যেন। বিশ্রী রকম সুর করে বলে উঠল—"ও মা! যাব না ত কি চিরকাল পচে মরব নাকি এখানে! ছিরি দেখ কথার!" ঢংটা বরদাস্ত করতে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই, মুখ ঘুরিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে। হাতে পেয়ে ছাড়বে কেন ভরদ্বাজের বউ। নামতে নামতে কোন রসাতলে তলিয়ে গেছে সে, সে পরিচয় ষোল আনা না দিয়ে কেন ছাড়বে! অপূর্ব ছিরি-সম্পন্ন করে তুলল সে মুখ চোখের ভাবটা, দুর্গন্ধ গাঁজলা খানিকটা গড়িয়ে পড়ল যেন রসের হাঁড়ি উপচে। হাত দু'খানি ত্রিবেদী মশায়ের মুখের কাছে তুলে নাড়তে নাড়তে বললে—"হ্যাঁ গো ঠাকুর, ভারী মন খারাপ হোয়ে গেল—না—? হবেই ত', তখন আর দুটোর চোখ দিয়ে দেখবে কি। ও। চল না, চল আমার সঙ্গে। ঘরের ভেতরেই এমন ভাবে লুকিয়ে রাখব তোমায় যে কেউ টের পাবে না। তোমারও খুব আরাম হবে। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আর পা ব্যথা হবে না। কেমন—?"

আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তখন ত্রিবেদী মশাই গলায় স্বর ফোটাবার জন্যে। স্বর ফুটবে কি, গলায় তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসছে। তেতো, উৎকট তেতো রক্ত গলা ছাড়িয়ে মুখের মধ্যেও এসে গেছে, ওগরাতে পারলে রক্ষা পান।

সে উপায় নেই। ভরদ্বাজের বউ তার সবটুকু বিষ

উগরে উজাড় করে না দিয়ে কিছুতে রেহাই দেবে না। লম্বা একটা শ্বাস ফেলে সে বলতে লাগল—"কি করব বল। এখানে সব তোমার মত সাধু পুরুষরা বাস করেন। আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে পারলেই খিদে মিটে যায়। তা' আমারও ত' সাধ আহ্লাদ আছে। আমি ত' আর কারও শোবার ঘরে উঁকি দিতে পারি না। তাই যাচ্ছি। না গিয়ে উপায় কি বল। এখানকার সাধু পুরুষদের চোখের খিদে মেটাতে গেলেও যে একটা পুরুষ মানুষ দরকার। তা' পুরুষ মানুষ পাই কোথায় এখানে। বাইরে থেকে পুরুষ আমদানি করে তোমাদের সন্তুষ্ট করা কি সহজ কথা। তাই ত' বলছি, চল না আমার সঙ্গে। চল, তোমায় আমি ঘরেই লুকিয়ে রাখব কোনও কষ্ট হবে না। তোমায় আমি—"

হুঁশ হারিয়ে ফেললেন ত্রিবেদী মশাই, কি করছেন টের পাবার আগেই একখানা হাত তাঁর ছিটকে উঠল ওপর দিকে। চটাং করে—একটা আওয়াজ হোল। নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল কাণ্ডটা, হতভম্ব হোয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভরদ্বাজের বউ, বাঁ হাতখানা বাঁ গালের ওপর চেপে ধরে—মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। স্তব্ধ যেমে গেছে, ঘর এমন নিস্তব্ধ যে ছুঁচ পড়লেও টের পাওয়া যায়।

"ছুঁয়ে ফেললে!" ফিসফিস করে কে যে উচ্চারণ করলে কথাটা, ঠিক ধরতে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই। নিদারুণ আতঙ্কে—ফিসফিসানিটুকু থরথর করে কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবেদী মশায়ের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভয়ানক রকম শিউরে উঠল। আর একবার সেই অতি মারাত্মক কথাটা ঢুকল তাঁর কানে "ছুঁয়ে ফেললে!" সামনে তখনও ঠিক সেই ভাবে মুখ ঘুরিয়ে বাঁ হাতখানা বাঁ গালের ওপর চেপে দাঁড়িয়ে আছে ভরদ্বাজের বউ, জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে না। ত্রিবেদী মশাইও কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দম আটকাবার উপক্রম হোয়েছে তাঁর, ঘরের বাতাস যেন আগুন হোয়ে উঠেছে। পুড়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা, ভেতরে ছাতিটা ফেটে চৌচির হোয়ে যায় বুঝি!

হঠাৎ এক ঝটকায় মুখ তুলল ভরদ্বাজের বউ, চোখ দুটিতে সে কি বীভৎস চাউনি! রাগ নয় দুঃখ নয়, শুধু ভয়। চরম সর্বনাশ হাঁ করে গিলতে এলে ঐ জাতের আতঙ্ক বোধ হয় ক্ষমা হয় চাউনিতে। সেই চাউনিটা তখন ফিসফিসিয়ে উঠল। ত্রিবেদী মশাই সেই চাউনির দিকে তাকিয়ে রইলেন আর শুনতে লাগলেন—"কি সর্বনাশ করলে! কেন ছুঁলে আমায়! কেন ছুঁলে! তোমার কিছু হয় যদি! যদি তোমাকেও ধরে ফেলে!"

আর পারলেন না ত্রিবেদী মশাই, দু হাত তুলে টপ করে চেপে ধরলেন মুখখানি। দু'পাশের দুই কান দুই গাল তাঁর হাতের মধ্যে এসে গেল। চোখ দু'টির সেই ভয়াল চাহনি তখনও স্থির চেয়ে আছে তাঁর মুখের ওপর। ওপর দিকে তোলা মুখখানির খুব কাছাকাছি নামিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের মুখ। সেই ভয়ঙ্কর চাউনির তলায় সেই অন্ধকারের মধ্যে কি যে খুঁজতে লাগলেন; তিনি জানেন। সামান্য দুটি কথা তাঁর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল—"ভয় নেই, ভয় নেই।" স্থির হোয়ে রইল দুটি প্রাণী সেই ভাবে। দু'জনে দু'জনের চোখের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল। আলকাতরার মত কালো অন্ধকারে তলিয়ে রইল সেই ছোট টিনের ঘরখানি। বাকী দুনিয়াটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—অনেক দূর থেকে ভেসে এল ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, ক্রোশের পর ক্রোশ তলিয়ে যাচ্ছে বিষখালি নদীর গর্ভে। পাড় ভাঙছে, নদী এগিয়ে আসছে, ভয়ঙ্করী বিষখালীর জোয়ার ভাঁটার টানে এ কূল ও কূল ধ্বংস হোয়ে গেল। বিষখালীর গ্রাস থেকে কিছুই বাঁচবে না।

আচমকা একটা ধাক্কা লাগল ত্রিবেদী মশায়ের বুকে শত দুয়েক পেছনে ছিটকে পড়লেন তিনি। ধাক্কা সামলে দেখলেন, ভরদ্বাজের বউ ঘরের কোণে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে, ঝুঁকে পড়েছে উনুনের ওপর। মুহূর্ত-মধ্যে সে ঘুরে দাঁড়াল একখানা জলন্ত চেলা হাতে নিয়ে। সনসনে আগুনটা সামনে বাড়িয়ে ধরে চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল "সাবধান।"

ত্রিবেদী মশাই এক চুল নড়লেন না, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—"মারবে? মার—। তবু তোমায় ছেড়ে যাব না। কিছুতেই তোমায় ফেলে যাব না।"

অনেকটা সময় স্থির হোয়ে রইল ভরদ্বাজের বউ। তারপর অতি ভয়ঙ্কর সুরে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললে—"কেন? কেন? কি করবে আমায় নিয়ে গিয়ে?"

এইবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। বললেন—"জানি না। কিছুই করব না, এক সঙ্গে মরব।"

ভরদ্বাজের বউ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ত্রিবেদী মশায়ের পানে। তারপর হাতের আগুনটার দিকে তাকিয়ে খুব—চুপি চুপি নিজেকেই যেন বলতে লাগল—"আর হয় না, আর সময় নেই। বড্ড দেরি হোয়ে গেল। এতদিন পরে—সময় হোল তোমার? কাঁচা কাছিম খেতে দেখেছিলে যেদিন, সেদিন শুধু চাল ডালের কথা মনে হোয়েছিল। তারপর সেই চাল ডালের বদলে যা পেয়ে সন্তুষ্ট হোলে, তা' মনে হোলেও গা ঘিনঘিন করে। আজ নিতে এসেছ। কি নেবে? জান কি করেছি? গঞ্জের ঘাটে বেদেদের নৌকো লেগে আছে, জান ত'। সেই নৌকের একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ওষুধ নিয়েছি। সে ওষুধ মিশে গেছে রক্তের সঙ্গে, ফল ফলতে শুরু করেছে। তারপর কি করেছি শুনবে? কে আমার ঘরে ছিল জান? কার মাথাটা চিবুলাম শুনবে। রাখেশ চাটুয্যের একমাত্র বংশধর নীলমনিকে চেন ত'। সেই নীলমনি ছিল ঘরে, শেষ করে দিয়েছি। নীলমনি নীল হোয়ে যাবে, রাখেশ চাটুয্যের চোখও নীল হোয়ে যাবে। ভরদ্বাজকে খেয়েছে রাখেশ চাটুয্যে,—আমি তার এক মাত্র ছেলের মাথাটা চিবিয়ে খেলাম। আজ—এত দিনে আমার খাওয়া শেষ হোল।"

মন্ত্রমুগ্ধ হোয়ে শুনছিলেন ত্রিবেদী মশাই, ভরদ্বাজের বউ থামতেই বলে উঠলেন—"কেন? কি করেছিল তোমার রাখেশ? অতটুকু ছেলে নীলমনি, কি করলে তার? কি ভাবে তাকে হাতে পেলে?"

"কি করেছে রাখেশ চাটুয্যে আমার?" ভরদ্বাজের বউ খুবই শান্ত ভাবে বলতে লাগল—"আমার কি করবে সে? দেশের লোক জানে, রাখেশ চাটুয্যে বড় লোক। দান ধ্যান করে, বড় দয়ার শরীর রাখেশ চাটুয্যের। দান করার টাকা কোথা থেকে আসে, সে খবর কেউ রাখে না। দান করতে গেলে টাকা চাই, টাকা জোটাতে গেলে দল বানাতে হয়, দল রাখতে গেলে নিয়ম বেঁধে দিতে হয়। ভারী চমৎকার নিয়ম রাখেশ চাটুয্যে বানিয়েছে। দলের লোক যদি ধরা পড়ে বা দলের কারও নামে যদি হুলিয়া বেরোয়, তবে তাকে শেষ করে দাও। ধরা পড়বার পরে মুখ না খুলতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। আমি আরও ভাল ব্যবস্থা করলাম। আগুন জেলে দিলাম রাখেশ চাটুয্যের বুকে। ঐ ছেলে ওর নয়নের নীলমনি, নীলমনি এই বয়সেই তৈরী হোয়ে গিয়েছিল। কিশোরী দুর্গীর ঘরে বসে তামাক টানত, আর ওর মেয়েটার দিকে কালকাল করে তাকাত। দু' দিন যাওয়া আসা করলাম সেখানে, তিন দিনের দিন ঠিক আসছে পিছু পিছু। সোজা পথ ছেড়ে দক্ষিণের খাল পার হোয়ে হোগলা বনের ভেতর ঢুকে লুকিয়ে পড়লাম; ঠিক পৌঁছল সেখানে, পৌঁছে কাউকে না দেখতে পেয়ে চকা এঁড়ের মত চারিদিকে তাকাতে লাগল। তখন হাত ধরা আর নিয়ে আসা। রাক্ষস বাপের রাক্ষুসে ছেলে। রোজ আসছে, একটি দিন কামাই নেই। আসছে আর বিষ নিয়ে যাচ্ছে আমার শরীর থেকে। ফল ফলছে, আজ এসে দেখলে মুখের ওপর চাকা চাকা দাগ, ফুলেও উঠেছে। আর ভাবনা নেই, আর আসতে পারবে না। কালই সর্বাঙ্গে ফুটে বেরবে। নীল হোয়ে যাবে নীলমনি, রাখেশ চাটুয্যে দেখবে আর তার বুকখানা শীতল হবে।"

ত্রিবেদী মশাই অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠলেন—"মিথ্যে কথা। একদম বিশ্বাস করি না। মিছিমিছি আমায় ভয় দেখাচ্ছ।"

ভরদ্বাজের বউ বললে—"মিথ্যে কথা! দেখবে তা' হলে? দেখতে চাও? বেদেদের ওষুধ মিথ্যে কি সত্যি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ওষুধটা শরীরের রক্তে মিশলে কি না, তা জানবার উপায় আছে। এই ওষুধের গুণ এমন যে আগুন খাওয়া যায়। আগুন খেলেও কিচ্ছু হয় না। আচ্ছা-তোমায় না হয় দেখিয়ে দিচ্ছি—"

বলতে বলতে হাঁ করলে ভরদ্বাজের বউ, জলন্ত কাঠখানা দিলে পুরে মুখে। আঙারটা কামড়ে ভেঙে নিয়ে-কড়মড় করে চিবোতে লাগল।

আঁ—আঁ—আঁ—

ঘুমের ঘোরে বিকট রকম চেঁচিয়ে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। শ্বাস ফেলবার চেষ্টা করলেন, মশারির মধ্যে হাওয়া নেই। আর থাকতে পারলেননা, বিছানা থেকে নেমে বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে। দালানে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বুঝতে পারলেন, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, হাঁ করে ঠাণ্ডা হাওয়া গিলতে লাগলেন। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে, ঘরের ভেতর খাটের পাশে জলের ঘটি—আছে, কিন্তু কে যায় ঘরের ভেতর আর! উঃ—

তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ত্রিবেদী মশাই, প্রত্যক্ষ দেখছেন—তাঁর ঐ ঘরের ঠিক তাঁর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভরদ্বাজের বউ। ডান হাতে রয়েছে একখানা চেলা কাঠ, কাঠের মাথায় জলন্ত আঙারটা নেই। চোখ বুজে কড়মড় করে চিবুচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন তার শেষের কথাগুলো-"আজ থাকী-আমি-জন্মেই মা খেয়েছি বাপ খেয়েছি। যারা বাঁচালে, ঘরে বছরের করে তুললে তাদের পেলাম। তারপর গেলাম যার কাছে, সে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলে। স্বামীর বাড়ী এসে দেখলাম, খাবার কিছু নেই। স্বামী নিজে খাই খাই করে ঘুরে বেড়ায়। তারপর স্বামীর মাথাও খাওয়া হলো। শেষ খাওয়া রাখেশ চাটুয্যের মাথাটা, সে আশাও মিটেছে। পালাও, পালাও বলছি শীগ্‌গীর, পালাও সামনে থেকে। নয়ত তোমায় খাব। দেখবে? মজা দেখবে?"

দরকার নেই আর মজা দেখে, যথেষ্ট হোয়েছে। দরজার সামনে থেকে খানিকটা সরে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। ঘরের ভেতর থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। কার সাধ্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে!

বেরুবেই।

রাশীকৃত কাঠ, শুকনো—ঝনঝনে শুকনো বেল আর চন্দন, তারপর ঐ ঘি ধুনো গুগ্‌গুল কর্পূর—সাঘাতিক রকমের দাহ পদার্থ সবগুলো। জ্বলবেই—সময় পেলে ঠিকই জ্বলে উঠবে।

কিন্তু যে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়। আগুন খেলে কি তেষ্টা মেটে! জল কোথায়!

আরও কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই, তখন তাঁর খেয়াল হোল। পাশেই মুক্তার ঘরের দরজা, পাশের ঘরেই শোয় মুক্তা। কখনও যদি তাঁর কিছু দরকার পড়ে রাত্রে, ডাকতে পারবেন। এতদিন একবারও দরকার পড়েনি, ডাকেন নি কখনও। আজ ডাকা উচিত। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু ডাকবেন না। কেন ডাকবেন না! সময় মত ডাক দিতে কেন পারবেন না তিনি! ডাকবার সময়টা পার হোয়ে গেলে ডেকে কি হবে।

"আর হয় না—আর সময় নেই—এতদিন পরে সময় হোল তোমার?"

আগুনখাকী আগুন খাবার আগে ডুকরে উঠেছিল। সময় পার করে দিয়ে পৌঁছেছিলেন তিনি তার সামনে। সময়ের সংকেত ধরতে পারেন নি।

কিন্তু এবার সময়টাকে পালাতে দেবেন না। বিপুল কাল আসবে। বিপুল একটা নচ্ছার ছাংলা মিটমিটে শয়তান, সিনেমা দেখবার নাম করে নিয়ে গিয়ে কানের কাছে বক বক করে মাথা ধরিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। উঃ—কত বড় সাহস! চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর বাড়ীতে, চতুর্ভুজ ত্রিবেদী বেঁচে রয়েছেন সশরীরে, চতুর্ভুজ ত্রিবেদী থাকেন ওপর তলায় আর নিচের তলায় চলে নচ্ছারপনা। চোখ গেছে যে চতুর্ভুজ ত্রিবেদী, কাজেই নিশ্চিন্ত হোয়েছে। নিশ্চিন্ত হোয়ে কেড়ে নিচ্ছে অন্ধের একমাত্র সম্বল। অন্ধকে ফাঁকি দেওয়া, অন্ধকে কানা করে দেওয়া মোটেই শক্ত কাজ নয়। অন্ধের কি কানাকড়ির মূল্য আছে।

আছে কি নেই, দেখাচ্ছি। ভয় আর সন্দেহ, দুটো বিষ ঢেলে দিয়েছি কানে। ঐ বিষের ক্রীয়া থাকতে থাকতেই ডাক দেওয়া চাই। নয়ত শুনতে হবে—"আর হয় না—আর সময় নেই—এতদিন পরে সময় হোল তোমার?"

সময় হয়ত পার হোয়েই গেছে। শেষবার টিনের ফুটোর চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে সময়টাকে পালাতে দিয়েছিলেন, এবার দিলেন গল্প শুনে। বিপুল ওত্ পেতেছিল। ওধারে তিনি পরম নিশ্চিন্তে গল্প শুনছেন, এধারে বিপুল সময়ের সদ্ব্যবহার করেছে। হাঁ—অন্ধ। সত্যিই তিনি অন্ধ। চোখ থাকতে অন্ধ, চোখ খুইয়েও অন্ধ। জীবন ভোর-অন্ধ থেকে গেলেন আর ঠকলেন। কিন্তু আর নয়। আর কোনও মতেই ঠকলে চলবে না। বাঁচতে হবে ত', বেঁচে যে থাকতেই হবে। এবারও যদি সময়টা ফসকে যায়; তা'হলে বাঁচবেন

কেমন করে! অন্ধ তিনি, চোখের গর্তে কিছু নেই। কার আর চোখ দিয়ে দেখবেন! কার মন দিয়ে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন!

এখনও হয়ত সময় আছে, সময়টাকে কিছুতেই পালিয়ে যেতে দেবেন না। কিছুতেই না।

মুক্তার কপাটের ওপর হাত রাখলেন ত্রিবেদী মশাই, ঠিক জায়গায় ঠিক সময় পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত। যাক্—আবার দম নিতে হচ্ছে। শুকিয়ে কাঠ হোয়ে গেছে কি না গলা বুক সব। জল চাই, তেষ্টার জল। নিজের ঘরে জল নেই, আছে আগুন। রাশীকৃত শুকনো কাঠের গর্ভে লুকিয়ে রয়েছে দাবাগ্নি। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আগুনখাকী। পাশের ঘরেই জল। দরজায় ঘা দিলেই হয়।

মুহূর্ত-কয়েক দাঁড়ালেন ত্রিবেদী মশাই দরজার গায়ে আলতো ভাবে হাত রেখে। হঠাৎ একবার নজর পড়ল নিজের বুকের ভেতর। ক্ষুধার্ত দেবতা ক্রুদ্ধ নেত্রে তাকিয়ে আছেন। ক্ষুধা তাঁর মেটেনি।

আকুল আবেদন জানালেন—"নাও, আরও বলি নাও। বিচার বলি দিয়েছি এবার বিকার বলি দোব। অন্তর্যামী, তুষ্ট আমি করবই তোমাকে। কিছুতেই আর ঠকাবো না।"

"মুক্তা—মুক্তা"

কপাটের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে চাপা গলায় ডাক দিলেন। বুক কাটা তেষ্টার ডাক, স্পষ্ট ভাবে ফুটল না। তখন দুম দুম করে আঘাত করলেন দরজায় দু'বার। আবার ডাক দিলেন—"মুক্তা মুক্তা।" কপাটের গায়ে চেপে ধরেছেন নিজেকে, আরও নিবিড় ভাবে ডাক দিতে হবে। ডাকের মত ডাক দেওয়া চাই। ওধারে ঘরে রয়েছে ছোট ভাই ছোট ভায়ের স্ত্রী, তারা না আবার জেগে ওঠে। কেউ জেগে থাকলে চলবে না, চরাচর বিশ্ব ঘুমিয়ে থাকবে। সেই হোল মহেন্দ্রক্ষণ, মহেন্দ্রক্ষণটিতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছেন। এখন শুধু ডাক দিয়ে জাগিয়ে তোলা আর বলার মত করে বলা-"ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। আমি আছি। সময় পার হোতে দিই নি আমি। আগুন খেয়ো না।"

শুধু নির্ভর করে দেওয়া। কারও কাছে যেতে হবে না, কারও কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে না, কোনও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকবে না, ভবিষ্যতের ভিত্তি পাষাণ দিয়ে গড়া রইল। দেখছ বুকের ছাতিখানা, চোখ গেছে—চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর, তা কি হোয়েছে। হাত দু'খানার এখনও যে শক্তি আছে, তা দিয়ে দশটা বিপুলকে পিশে গুঁড়ো করে দিতে পারি। তোমার চোখ দুটি দিয়ে দেখব, তুমিই আমার দৃষ্টিশক্তি। এই দৃষ্টিশক্তি কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে দেব না আমি। কিছুতেই কেউ আর একবার আমাকে অন্ধ করতে পারবে না।

"মুক্তা—মুক্তা।"

আরও দুটি ডাক দিলেন, আরও চাপ পড়ল কপাটের গায়ে, চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর সমস্ত ভারটা পড়ল। নিজের ভার নিজে বইতে পারছেন না বলেই ত' তিনি এসেছেন। নিজের ভার অকপটে সঁপে দিতে এসেছেন মুক্তার হাতে। মুক্তার ঘরের কপাট সে ভার সইতে পারবে কেন। হঠাৎ কপাট দু'খানা খুলে গেল, চৌকাট ডিঙিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ত্রিবেদী মশাই। ঢুকে পড়লেন মুক্তার ঘরে। ঘরে ঢোকা মাত্রই শরীরে ভার পায়ের ওপর রইল না ভারশূন্য হোয়ে নিশ্চিন্ত হোলেন।

কিন্তু—কিন্তু—ঘুম ত' ভাঙল না!

এখন ঘুম ভাঙতে হবে। ওধারে লগ্ন বয়ে যায়।

"মুক্তা-মুক্তা"

উঠে বসে দুবার ডাক দিলেন আবার, তারপর উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। আবার নিজের পায়ের ওপর নিজের ভারটা রাখতে হোল। পা দুখানা তাঁকে বয়ে নিয়ে চলল মুক্তার বিছানাটার কাছে, বিছানাটা ঠিক কোনখাতে আছে তাও তিনি জানেন না। পা দু'খানার ওপর নিজের ভার রেখে দু'হাত সামনে মেলে সারা ঘরখানায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পা দু'খানা তাঁকে মুক্তার চৌকির পাশে পৌঁছে দিল, চৌকির গায়ে গিয়ে ঠেকল পা দু'খানা। আবার দুবার ডাক দিলেন ত্রিবেদী মশাই—"মুক্তা—মুক্তা"। ডাক দিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শেষে হুয়ে পড়লেন চৌকির ওপর। হাত দুখানায় মশারি ঠেকল না। ভয়ানক চমকে উঠলেন। মশারি নেই কেন? মশারি ফেলেনি কেন?

আরও বাড়িয়ে দিলেন দুখানা হাত, সারা চৌকির ওপর হাতড়াতে লাগলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন

চৌকির ধারে, দুখানা এক করে এ হাতের আঙুল ও হাতের আঙুলের ফাঁকে গলিয়ে মোড় দিতে লাগলেন। মট মট করে শব্দ হোল। হাত দুখানায় এসে গেল শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু। ক্ষুধার্ত হাত দুখানা সম্পূর্ণ সজাগ হোয়ে উঠেছে! হাতের আওতায় একবার তাকে পেলে হয়, ঘাড় জন্তে বঞ্চিত হোল হাতের ক্ষুধা,—তাকে একবার হাতের আওতায় পাওয়া চাই। মট মট করে তার শরীরের সব কখানি হাড়-গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছাড়বে।

হীরামন্ হাবেলীর সিঁড়িগুলোর ধাপ খুবই উঁচু উঁচু। তরতর করে নেমে আসবার সিঁড়ি নয় সেগুলো। ঘাসের নামা ওঠার জন্তে ঐ সিঁড়ি তৈরী হোয়েছিল, তাদের চলনই ছিল আলাদা। ওঠবার সময় উঠত ধীরে ধীরে, নামবার সময় নামত তালে তালে। ওঠা নামা আর নামা ওঠা, কোনওটাতেই তাদের তেমন তাড়া ছিল না নিশ্চয়ই। তাড়া খেয়ে বেড়াবার মানুষ ছিল না তারা, কে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। চোখ থাকলে গাঢ় অন্ধকারে অমন ভাবে নামতে পারতেন না। চোখ না থাকার ঐটুকুই সুবিধে। চোখ-ওয়ালাদের পক্ষে অন্ধকারে চলা অসম্ভব। চোখ দুটো ঘুচলে অন্ধকারও ঘুচল। নির্ঝঞ্ঝাটে ছুটে চল যেখানে খুশী—কিবা আলো কিবা অন্ধকার—সবই সমান।

সিঁড়ির শেষ নামারও শেষ। নামলেই মাশুক মজলিশ, প্রেম পাগলাদের পাগলাগারদ। হীরামন্ হাবেলীর অন্দরের সিঁড়ি ঐ পাগলা গারদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। তারপরে আর নামাতে পারে না। কাজেই তখন থামতে হয়।

থামলেন ত্রিবেদী মশাই। পাগলা গারদের সামনে এসে পেতে থাকতে হবে। যাবে কোথায়। এবার কোথায় যাবে! দুখানা হাত খাইখাই করছে ক্ষুধার জ্বালায়। খাবেই, একটিবার আওতার মধ্যে পেলে হয়। মড়মড় করে আগুন চিবিয়ে খেয়েছিল আগুন-খাকী। ঠিক সেই রকম ভাবে মড়মড় করে হাড় গুঁড়িয়ে খাবে। যাকেই পাক গ্রাসের মধ্যে, কোনও বিচার নেই। চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর দুখানা হাতে চারখানা হাতের শক্তি, চারখানা হাত হা হা করছে। দেখা যাক, কি করে পরিত্রাণ পায়!

পাগলা গারদ মাশুক মজলিশ মুখর হোয়ে উঠল।

চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর চারখানা হাতের সবটুকু শক্তি জেগে উঠল নিমেষের মধ্যে। এতটুকু শব্দ একটু আওয়াজ পর্যন্ত যেন না ফস্‌কায়। ধরা পড়া চাই, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ। কিছুতেই পরিত্রাণ নেই।

ধরা পড়ল।

"দেখ, রোজ রোজ এই ঘরে আসা, কি যে পাগলামিতে পেয়েছে তোমাকে। সব দরজা খোলা রইল, দিদি পর্যন্ত নেই। মাথা ধরেছে বলে ছাতে গিয়ে শুয়েছে। যদি কিছু হয়—"

"কি হবে? কিছু হবে না। জান, এই ঘরখানায় কেন আসি? তোমাকে নিয়ে এ ঘরে আসলে আমার কি মনে হয় জান? মনে হয় আমি একজন সেই তখনকার দিনের নবাবজাদা, আর তুমি হোলে খুব নামকরা এক বাইজী। তুমি নাচছ, আমি সেই তখনকার দিনের অদ্ভুত দর্শন একটি পাত্র সামনে নিয়ে বসে আছি। তাতে রয়েছে টকটকে লাল—"

"আঃ, থাম। সকালে হোলেই নবাবজাদাকে কলম পিষতে ছুটতে হবে, বাইজী যদি তাড়াতাড়ি ভাত না চাপায় ত উপোস করেই দৌড়—"

"সব মাটি করে দিলে। নাঃ, কেন যে মরতে কুমারী বিয়ে করতে গিয়েছিলুম। তার চেয়ে যদি ঐ বিপুলের মত বিধবা একটিকে নিয়ে আসতাম—"

"ঐ রকম মোটা আর ঐ রকম কালো একটি মেয়ে দারোগা জুটত। বয়ে যেত তার তোমার সঙ্গে সারারাত জেগে থাকতে। নাক ডাকিয়ে ঘুমত পড়ে পড়ে। আবার নামটাই কি সাংঘাতিক—সাজ্ঞা সংবিদা দেবী। কি কি দেখে যে ওকে পছন্দ করলেন বিপুল বাবু—। নামটা উচ্চারণ করতেই দাঁত ভাঙবে।"

"তা ভাঙুক। কিন্তু তোমার দিদিটি কতদূর কি কি করলেন? বড়দার মত করাতে পারলেন? বিপুল বেচারা অত করে ধরল তোমার দিদিকে।"

"বয়ে গেছে দিদির। দিদি ও সব ছুচকে দেখতে পারে না। ঐ পাত্রী দেখাবার জন্তে সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছেন বিপুল বাবু। এ কথা জানলে দিদি মোটে যেতই না।"

"তবেই সেরেছে দেখছি। বিপুল বেচারা ওদা করে বসে আছে।"

"থাকুক, তুমি এখন চল। আজ ভোরে যে কাণ্ড ঘটেছে। ছুটে বেরিয়ে বড় ঠাকুরকে ছুঁয়ে ফেললাম একেবারে। ভাগ্যে তোর বেলা কথা বলেন না যদি সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করতেন—কে গেল? যদি গোলমাল বাধাতেন?"

পাগলা গারদের ফিসফিসানি চলতেই লাগল।

ত্রিবেদী মশাই কিছু হেঁটে সিঁড়ির নিচের ধাপে পা দিলেন। পাগল হন নি ত' তিনি যে পাগলা গারদের গায়ে কান পেতে পাগলা পাগলীর পাগলামি শুনবেন।

কিন্তু সিঁড়িগুলোর ধাপ বড্ড উঁচু উঁচু। ভারী কষ্ট হয় ওঠবার সময়। কি দরকার অত কষ্ট করে।

যাচ্ছেনই বা কোথায়! সেই ঘরে!

কাঠগুলো যে সাজানো রয়েছে!

দুর্গন্ধ, ভয়ানক দুর্গন্ধ, হাড় মাংস পোড়া গন্ধ কি বিশ্রী! ও গন্ধ কিছুতেই ঢাকা পড়বে না। হোলই বা মৈসুরী চন্দন আর বেল কাঠ। কোনও বাধা নেই ওদের মানুষ পোড়া গন্ধ লুকিয়ে ফেলবে।

দূর দূর থানকা আবার কষ্ট করে ওপরে ওঠা।

যতটুকু উঠেছিলেন, নেমে এলেন। থাকুক কাঠ ঘি ধুনো গুগ্‌গুল। ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করা আর পোষাবে না।

ভেষ্টা কিন্তু খুবই পেয়েছে।

হনহন করে হাঁটতে লাগলেন মাশুক মজলিসের সামনে দিয়ে। মাশুক মজলিসের ফিসফিসানি কি আর কানে যায় তখন। ভেষ্টা পেয়েছে কিনা ভয়ানক। জল না খেয়ে যে আর চলছে না।

পৌঁছলেন বাইরের উঠোনে, অনন্তদেবের মন্দির উঠোনের উত্তর সীমায়। মন্দিরটায় কখা মনেই এল না। ভেষ্টা পেয়েছে কিনা ভয়ানক। প্রকাণ্ড কটকের পাশের কাছে কাটা দরজাটা খুলে নিচু হোয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

তারপর সিঁড়ি। আর সিঁড়ির শেষে জল, না গঙ্গা কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

হীরামন হাবেলীর ঘাটের সিঁড়িগুলো খুবই চমৎকার কোনও ভয় নেই, সোজা নেমে যাও যতদূর খুশি, সিঁড়ি ফুরবে না।

হীরামন হাবেলীর ছাতে আজ একটা শকুন সংসার। ওরা গঙ্গা পাহারা দিচ্ছে। কোথাও যদি কিছু ভেসে ওঠে, অমনি সবাই উড়ে যাবে। তারপর আকাশ থেকে ঝপাঝপ পড়বে গঙ্গায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার উড়বে আকাশে। জননী জাহ্নবী ওদের আহার সেখানে কিনা, তাই ওদের কোনও ভাবনা নেই।

কিন্তু পাঁচ মন বেল কাঠ, সোয়া মন মৈসুরী চন্দন, একটিন ঘি ধুনো গুগ্‌গুল কর্পূর সাজানো আছে হীরামন্ হাবেলীর দোতলার ঘরে। অনন্ত কাল সবুর করে থাকুক ওরা তাতে কার কি গেল এল।

কাঠ কিন্তু বড় ভয়ানক জিনিষ। শুকিয়ে খটখট করছে, একটু রসকষ নেই কিন্তু আগুন লুকানো আছে ঠিক। কাঠে কাঠে ঘষা লাগলে কি সর্বনাশই না হয়। পুড়ে ছারখার হয় বন, আহা, কত পশু পাখী জীবজন্তু যে ধ্বংশ হয়।

সাক্ষাৎ বৈশ্বানর হোল কাঠ। ও জিনিষকে কখনও বিশ্বাস করতে আছে! কাঠের সঙ্গে এক ঘরে বাস—সর্বনাশ! ওর অন্তরে যে আগুন লুকিয়ে থাকে তার নামই হোল দাবানল। দাবানল হোল অন্তরের আগুন, অন্তরে লুকিয়ে থাকে। বাইরে থেকে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না। দাবানলকে সাবধান।

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী

শিল্পী : কেসরকার

তৃষ্ণার শেষ নেই

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শেষ করে মেনকা মজুমদার বাড়ী ফিরলেন। ড্রয়িং-রুমে ঢুকে ভ্যানিটি ব্যাগটা সোফার উপর ছুঁড়ে ফেলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাঁক দিলেন, বলভদ্র।

ব্যস্তচকিতভঙ্গীতে পরদা ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি ভৃত্য বলভদ্র নয়, গৃহস্বামী রাজশেখর মজুমদার।

তাঁর পানে চেয়ে মেনকা দেবী বলে উঠলেন, জল। ত্বরিতপদে রাজশেখর ভিতরে চলে গেলেন। তারপর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই এক গ্লাস জল নিয়ে এলেন।

তুমি আনতে গেলে কেন? আমি কাঁচের গেলাস ছাড়া জল খাই? বলভদ্র কোথায়?

টিপাইএর উপর গ্লাসটি নামিয়ে রেখে রাজশেখর স্ত্রীর ক্লান্ত আরক্ত মুখের পানে বারেক তাকালেন, তারপর বিব্রতভাবে বললেন, বলভদ্র নেই।

নেই! কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠল, গেল কোথায় হতভাগা?

চলে গেছে।

চলে গেছে? কাজ ছেড়ে? মাইনে চুকিয়ে?

ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে রাজশেখর জানালেন, হ্যাঁ, তাই। বললে···

থাক। ইডিয়ট কোথাকার।

রাজশেখর মাথা চুলকাতে লাগলেন, নিজেকেই অপরাধী মেনে নিলেন বোধ হয়। স্ত্রীর মেজাজের দরুণ এ বাড়ীতে যে চাকর টেঁকে না সে দোষ তো রাজশেখরেরই।

ওবেলা রান্নাবান্নার কি হবে? খিঁচিয়ে উঠলেন মেনকা মজুমদার, আমি কিন্তু জানি না তা বলে দিচ্ছি।

না, না, তোমায় জানতে হবে কেন! সে আমি ম্যানেজ করে নেব। দু'হাত কচলে আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হলেন রাজশেখর।

যা হয় করগে। বিকাশবাবু ফোন করেছিলেন?

কৈ না তো।

মেনকা দেবী, ইডিয়ট। আচ্ছা যাও এখন। আমি বিশ্রাম করব।

রাজশেখর তাড়াতাড়ি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড্ড ক্লান্ত হয়ে এসেছো। বিশ্রাম কর। আমি বরং ততক্ষণ ওবেলার ব্যবস্থা দেখি গে।

রাজশেখর ভিতরে চলে গেলেন। মেনকা দেবী সোফায় বসে জলের গ্লাসটা তুলে নিলেন, সব জলটুকু খেয়ে ফেললেন এক চুমুকে। আঃ। কী তেষ্টাই না পেয়েছিল কিন্তু এতটুকু জলে কি পিপাসা মিটল? মনে হল তাঁর এ তৃষ্ণার বুঝি শেষ নেই।

সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজলেন মেনকা, স্বনামধন্য লেখিকা মেনকা মজুমদার, সমাজে সংস্কৃতিসম্পন্না বিদুষীরূপে পরিচিতা মেনকা দেবী।

তাঁর মাথার মধ্যে আজ যেন আগুন লেগেছে হতাশার সঙ্গে হিংসার বিষ মিলে স্নায়ুতন্ত্রীগুলো যেন সাপের মত কুণ্ডলী পাকাচ্ছেন পায়ের তলা থেকে ক্রমাগত যেন মাটি সরে যাচ্ছে কিছুদিন ধরে! সারা বাংলা সাহিত্য মেলার কমিটিতে তাঁর স্থান নেই। আজ সকালে যে প্রাথমিক সম্মেলনে গিয়েছিলেন, কিন্তু বহু তদ্বির করে কার্যকরী পরিষদে ঢুকতে পারলেন না।

সরকারী উৎসব-পরিষদও তাঁকে সভ্যরূপে নিলে না! ও বিরুদ্ধে এ কী অঘন্য চক্রান্ত চতুর্দিকে! এমন কি, শঙ্করাচার্যের অত বড় যে সর্বভারতীয় আশ্রম, গুরুর কৃপ যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগ বহু দিনের, সেখানেও আ তাঁর কোন স্থান নেই, খাতির নেই। গুরুদেবের দেহবসা পর তাঁর কাশীর আশ্রমে তিনি মাসে মাসে যান বং কিন্তু সেখানে তাঁর জন্যে কী শীতল অভ্যর্থনা। তাঁকে দে যেন সবাই হাসি চাপে, আড়ালে বুঝি বিদ্রূপও কর ঈর্ষা। তাঁকে সবাই ঈর্ষা করে, গুরুদেব তাঁকে

অপরিমেয় ভালবাসা দিয়েছিলেন তা তারা বরদাস্ত করতে পারে না. তাই তাঁর পরে তাদের এত বিষ।

এর প্রতিকার করতে হবে, চুটিয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু এই কাজে যাকে সবচেয়ে প্রয়োজন সেই বিকাশ চাটুয্যে যেন কিছুদিন থেকে সরে সরে থাকছেন, পিছলে যাচ্ছেন, কিছুতেই তাঁকে ধরতে পারছেন না মেনকা দেবী।

বহুদিনের অভিজ্ঞ প্রবীণ প্রকাশক বিকাশ চাটুয্যে। মেনকা দেবীর একখানা বই কিছুদিন আগে ছেপে বার করেছেন (শুধু প্রকাশ করাই নয়, প্রচুর পাবলিসিটি দিয়ে তাঁকে সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলা চলে।

আরও এক প্রকাশক তাঁর আগে মেনকা দেবীর একখানা বই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই সেই প্রকাশকের সঙ্গে লেখিকার ঝগড়া লাগল। একদিন প্রকাশকের দোকানে চাহির হয়ে মেনকা দেবী তাঁকে শুনিয়ে দিলেন কড়া কড়া কথা, বললেন, আপনি মহা জোচ্চর!

প্রকাশকও রুখে উঠলেন, বললেন দয়া করে রাস্তায় নেমে যান। এখানে অনেক ভদ্রলোক বই কিনতে এসেছেন।

আজো সে কথা ভুলতে পারেনি মেনকা মজুমদার। নিজের ডান হাতখানা চোখের সামনে তুলে ধরলেন। এই হাতে প্রকাশককেও চড় মারতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি, এবং বাধা হয়েই হাতখানা ধরে ফেলেছিল প্রকাশক।

মনে হলে আজো লজ্জায় অপমানে অস্থির বোধ করেন লেখিকা মেনকা মজুমদার।

তারপর একদিন হঠাৎ এই বিকাশের সঙ্গে পরিচয়। আশ্চর্য ঘটনাচক্র। ভাবতে লাগলেন তিনি। এই বিকাশই যে রাতুলের বন্ধু ছিল তা কে জানতো তখন। প্রথম পরিচয়ের পর বিকাশ তাঁকে একদিন সে গল্প শুনিয়ে গেছেন। তিরিশ বছর আগেকার কথা। কলেজের সাহিত্যসভায় মেনকার প্রথম যোগদান। আঃ কী দিনই গেছে! ছেচল্লিশ বছরের মেনকা ফিরে গেলেন ষোল বছরে। কটাক্ষে বিদ্যুত। সারা অঙ্গে প্রস্ফুটিত লাবণ্যের হিল্লোল। মুগ্ধ হয়েছিল ছাত্রের দল। তাদের মধ্যে ছিল রাতুল। সুন্দরকান্তি সদ্য এম এ পাশ বাইশ বছরের যুবা। আর শুধু কি সুন্দর? কী নম্র কী পেলব। কিন্তু কী অসম্ভব লাজুক। মুখ তুলে কোনদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে না। তাঁর মনের কথা সে কি বুঝতে পারেনি? নিশ্চয় পেরেছিল। কিন্তু, ভীরু, সাহস পেল না। পালিয়ে গেল বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে। তার বিলাতে যাত্রার কথা শুনে পাগলের মত অষ্টাদশী মেনকা তাকে পরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাগাল পান নি। কী দুঃসহ বেদনা, আর পরাজয়ের সে কী গভীর গ্লানি সেদিন তিনি অনুভব করেছিলেন, আজো তা তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে।

ভাবতে ভাবতে অস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে এলো তাঁর কণ্ঠ থেকে। উঠে বসলেন। চোখের সামনে যেন ভেসে চলেছে বায়োস্কোপের ছবি। বাপের আদেশে বিয়ে স্থির হয়ে গেল। পাত্র এই রাজশেখর মজুমদার। একান্ত অপরিচিত ও অবাঞ্ছিত। সেদিন কেন মৃত্যু হয় নি তাঁর?

মনে পড়েছে সেই উদ্বাস্তুবিভীষিকার কয়েকদিন আগেকার একটি স্মৃতি। কাশী থেকে গুরুদেব কলকাতায় এসেছেন। প্রণাম করে এসেছেন মেনকা। কিন্তু সবাই তার সামনে মনের দুঃখ জানাতে পারেন নি। কিন্তু জানাতেই হবে। উজাড় করে দিতে হবে নিজেকে।

গ্রামের এক আত্মীয়ের ছেলে তাঁদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করত। সমবয়সী এবং বলাবাহুল্য আলোর পাশে পোকার মতোই তাঁর অনুগামী। শেষ রাত্রে তার ঘরে ঢুকে মেনকা তাকে ঘুম থেকে টেনে তুললেন। বললেন, চল আমার সঙ্গে, বেরুতে হবে।

ছেলেটি অবাক, সে কি, অন্ধকারে!

হ্যাঁ, অন্ধকারেই তো অভিসার। প্রেমিকের হাত ধরে লুকিয়ে বাড়ি থেকে পালাবার এই তো উপযুক্ত সময়। ওঠো। ভয় নেই, ফিরে আসবো। একজন সঙ্গী চাই। একা বেরুতে ভয় করছে।

রাস্তায় বেরুলেন দু'জনে। থমথম করছে চারিদিক। আকাশে সবে লালরং ধরেছে। রাস্তার আলো তখনো নেভে নি। দ্রুতপদে চললেন। গুরুদেবের কলকাতার বাসা মিনিট পনেরোর পথ। এতক্ষণে তাঁর জপ আহ্নিক সারা হয়েছে নিশ্চয়। বাড়ীর সামনে বাগানের গেট। মালীকে দেখা গেল। গেট খুলে দিলে। সঙ্গীকে মেনকা বললেন—তুমি এখানে এই বেঞ্চিতে বসে থাক। আমি

ওপরে যাচ্ছি। শিগগিরই আসবো।

নিস্তব্ধ আশ্রম। পাশের ছোট কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মেনকা দোতালায় উঠলেন। একটা গুরুদেবের নিজস্ব এলাকা। ঘরের সংলগ্ন পূর্বদিকের ছাদে বসেছিলেন তিনি। লঘু পদশব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—একি! তুমি এত ভোরে কোথা থেকে?

প্রণাম করে পায়ের কাছে বসলেন মেনকা। বললেন বাড়ী থেকে চলে এলাম।

বেশ করেছ। কারণটা ব্যক্ত কর।

বাড়ীতে থাকতে পারছি না। সইতে পারছি না। পারবো না। শিষ্যার মনের খবর গুরুদেবের অজানা ছিল না। স্মিতমুখে বললেন, কিন্তু এই পারাটাই যে সংসারে বড় কথা, বড় পরীক্ষা। কোনকিছুই পারবো না বলা চলে না। পারতেই হয়।

জীবন নিষ্ফল হয়ে গেলেও পারতে হবে?

নিষ্ফল হবে কেন? মরুভূমির মাঝখানেও গাছ জন্মায় ফুল ফোটে। নৈষ্ফল্য মানুষের সৃষ্টি। তোমাকে তার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

পারবো না। চাই না ঊর্ধ্বে উঠতে।

কী করতে চাও?

আপনার পায়ের কাছে থাকতে চাই। বাড়ী ফিরবো না আর।

আমার কাছে থাকবে?

হ্যাঁ, আপনার আশ্রয়ে। আপনার রক্ষিতা হয়ে থাকবো। তাতেও আমার গৌরব, চরম স্বার্থকতা।

তোমার স্থান আমার মনে। উতলা হয়ো না। শোন। বুঝিয়ে বললেন তিনি। মাথায় হাত রেখে উপদেশ দিলেন। আদর করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ী ফিরলেন মেনকা।

বিয়ে হয়ে গেল। দারুণ হতাশায় প্রথমটা ভেঙে পড়েছিলেন। মনে পড়ছে সে সব। হিষ্টিরিয়ায় ভুগলেন বেশ কিছুদিন। শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে চলে যেতে হল দূর দেশে। বদলির চাকরি রাজশেখরের। নানাস্থানে ঘুরে অনেক ঘাটের জল খেয়ে বেড়ালেন অনেকদিন। অশেষ রূপবতী আর গুণশালিনি স্ত্রীর কাছে বেচারা রাজশেখর সারা জীবনটাই অপরাধীর মত কাটালেন। প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে বাস করতে গিয়ায় কণ্টকিত হতেন মেনকা মজুমদার। ক্রমে সয়ে গেল। মায়া জাগল। কী নিরীহ আর অনুগত স্বামী। দাসানুদাস। বেচারা।

বিশ বছর পরে আবার দেশে ফিরছেন তাঁরা। রাজশেখর শারীরিক অপটুতার জন্য কয়েক বছর আগেই রিটায়ার করেছেন। মেনকা মেতেছেন সাহিত্যের আসরে আর সমাজে প্রতিষ্ঠা-অর্জনের প্রতিযোগিতায়। ছেলে-পুলে হয় নি, তাই সংসারের কোন বাঁধন নেই।

কিন্তু পারছেন না। বারবার পরাজয় ঘটছে। এমন সময় এসেছেন এই বিকাশ চাটুয্যে। তাঁকে পুরনো দিনের কথা শুনিয়েছেন। আশা দিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন।

একখানা নতুন বই লিখেছেন মেনকা মজুমদার। বিষ্ফোরণ বই। গুরুদেবের আশ্রমের যে কর্তারা তাঁকে আমল দেয় নি, যে সব প্রকাশক তাঁর বই ছাপেনি, যে সরকারি মাতব্বররা তাঁকে সম্মানিত করেনি তাদের সবাইকে তিনি তাঁর নতুন প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে তীক্ষ্ণ তীব্র বিষাক্ত ভাষায় আক্রমণ করেছেন, মনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন।

এই বই বেরুলে সাহিত্যের হাটে সোরগোল পড়ে যাবে। কিন্তু এ বই ছাপবে কে? বিকাশ। কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, এখন যেন পিছিয়ে যাচ্ছেন। নিষ্ফলতার আতঙ্কে বিহ্বল হয়েছেন মেনকা মজুমদার। প্রত্যহ বিকাশের কাছে লোক পাঠাচ্ছেন। ফোন করছেন। কিন্তু তাঁর দেখা নেই।

পাশের ঘরে ফোন বাজল। আলুথালু বেশে ছুটে গেলেন মেনকা। কে? ও, বিকাশবাবু! বাঃ, বেশ লোক তো আপনি।

না, না, তিক্ততা প্রকাশ করা চলবে না, হৃদিও মনে মনে জ্বলছেন মেনকা। কণ্ঠস্বরে মধু ঢেলে দিলেন, রোজ রোজ, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। এত অবহেলা কেন? অবহেলা নয়, কাজের চাপ? কিন্তু আমি কি এতই তুচ্ছ? হ্যাঁ, না, না, আজ আসতেই হবে। হ্যাঁ, এখুনি। না দেরী সইবে না। কখন? চারটের মধ্যে আচ্ছা, তার এক মিনিট দেরী না হয়। আচ্ছা, তাহলে কথা থাকল, চারটে। আচ্ছা।

ফোন রাখলেন। দু'চোখ জ্বলছে। আজ বিকাশকে বেঁধে ফেলতেই হবে। যেমন করে হোক।

রাজশেখর অদূরে দাঁড়িয়েছেন। স্ত্রী ঘুরে দাঁড়াতেই হাসিমুখে বললেন—বিকাশবাবু তো! কখন আসবেন?

চারটের মধ্যে। যা যা আনতে বলেছিলাম এনে রেখেছো?

নিশ্চয়! এক ডজন চিকেন রোল, এক ডজন পেস্ট্রী আটটা রাজ ভোগ আর আটটা ক্ষীরকদম। উনি তো একলা খাবেন, তাই ভাবছিলাম, এতগুলো করে আনতে বললে কেন?

তুমি গিলবে বলে! শোন, আমরা লাইব্রেরী ঘরে বসব। তুমি যেন কথার মাঝখানে গিয়ে হাজির হয়ো না।

না, না। আমি যাবো কেন? আমি তো যাই না।

আচ্ছা এখন যাও। লাইব্রেরী ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখ তো।

এখনি যাচ্ছি। বলে রাজশেখর অদৃশ্য হলেন।

চঞ্চল হলেন মেনকা মজুমদার। বেশ পাল্টাতে হবে। আজ কিন্তু প্রসাধন করবেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। শরীরের তটে সে স্রোত নেই বটে, কিন্তু সব দীপ্তি কি নিভে গেছে? সব আবেদন কি নিঃশেষে শেষ হয়েছে? আজ সেই পরীক্ষাই হবে।

আসবে না মানে। আসতেই হবে বিকাশকে। না এলে রক্ষা ছিল তাঁর। প্রতিহিংসার হলাহল তাঁর মাথায় ঢেলে দিতেন না তাহলে? অপবাদ রটিয়ে এমন কি শুশ্রূষা লেলিয়ে বিকাশকে নাস্তানাবুদ করবার ক্ষমতা নেই তাঁর? আপন মনেই আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন মেনকা মজুমদার।

আসুন না! আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবেন। না, না, আজ আর কড়া কথা নয়। মাধুর্য দিয়েই আজ আলাপ চলবে। গলে গিয়ে গলিয়ে দিতে হবে।

সারা শরীরে অসহ্য উন্মাদনা। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে যেন। পুরনো অসুখটা আবার দেখা দিতে চাইছে নাকি? মাথাটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। না, তাহলে তো চলবে না। আজ তাকে শান্ত থাকতে হবে। ললিত শোভন লীলায় আজ নিজেকে মেলে ধরতে হবে। যে শিকারের যে আয়োজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপড়-চোপড় বদলে তিনি তৈরী হয়ে নিলেন। কিন্তু এ কী। ইতিমধ্যে যে চারটে বেজে গেছে! এলো না তো এখনো। কান পাতলেন। সিঁড়ির নীচে কলিং বেল-এর শব্দ হচ্ছে কি? কৈ না। অস্থির হলেন। মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল এতক্ষণ। আবার গরম হয়ে উঠল। না না, আসবে নিশ্চয়। বোধ হয় কোন বিশেষ কাজে আটক পড়েছে।

অস্থিরপায়ে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজশেখর আগেই বুদ্ধি করে ধূপ জ্বেলে দিয়ে গেছেন। কস্তুরী-ধূপের উগ্র গন্ধে ঘরের বাতাস যেন মাতালের মত টলছে। টলছেন মেনকা মজুমদারও। সাড়ে চারটে··· পাঁচটা···

ওঘরে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। টলতে টলতে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ফোন ধরলেন, হ্যালো, কী ব্যাপার, এত দেরী হচ্ছে কেন? কী বলছেন, কাজ, তাই আসতে পারবেন না? ও। কি বলছেন? ক্ষমা চাইছেন? ও। হ্যাঁ, কি কথা বলুন। চেক? চেক কিসের? ও। আমার প্রথম বইখানার পুরনো হিসেব বাকি সব টাকাটাই একসঙ্গে চুকিয়ে দিচ্ছেন, তারই চেক তৈরী করে রেখেছেন? লোক পাঠিয়ে চেক আনিয়ে নেব? আচ্ছা, ধন্যবাদ। না, না, তাতো বটেই। আচ্ছা. নমস্কার!

ঝনাৎ করে ফোন রেখে দিলেন মেনকা মজুমদার।

অদূরে রাজশেখর এসে দাঁড়িয়েছেন। মেনকা দেবী মুখ তুললেন। ব্যর্থতার আঘাতে হিংস্র আর বীভৎস সেই মুখের পানে চেয়ে রাজশেখর ভয় পেলেন। বললেন, আসতে পারবেন না বুঝি?

ঘাড় নাড়লেন। দেখতে দেখতে সেই ক্রুদ্ধ বিকৃত মুখের উপর বেদনার করুণ আর্তি ফুটে উঠল। পরক্ষণেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন খ্যাতনামা লেখিকা বিদুষী মহিলা মেনকা মজুমদার।

পরমায়ু

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কিন্তু লক্ষ্যভেদ হল না। হবার কথাও নয়। শরীর এখনও বেশ দুর্বল। একটু উত্তেজনা হলেই থর থর করে কাঁপে।

টেবিলে লেগে ক্রাচটা সশব্দে মেঝের ওপর পড়ল।

শান্তা হাত ঘড়িটা খুলে টেবিলের ওপর রাখছিল। এমন আচমকা আক্রমণে একটু বিব্রত হল না। সরেও গেল না। হাত ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে নীচু হয়ে ক্রাচটা কুড়িয়ে নিল মেঝে থেকে তারপর অমিয়র কাছে এসে বিছানার ওপর ক্রাচটা হেলান দিয়ে রাখল।

কি হল কি? শান্তা নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল।

কি হল কি? অমিয় খিঁচিয়ে উঠল, পাঁচটায় ছুটি, ছটার মধ্যে বাড়ী আসা উচিত। এখন ক'টা বাজে খেয়াল আছে?

খুব নিরুত্তেজ, নিস্পৃহ গলায় শান্তা উত্তর দিল, সাতটা কুড়ি।

এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলে? কোন্ যমের বাড়ী?

বালাই ষাট। ওসব জায়গায় যেতে যাব কেন। ময়দানে বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম।

রাগে বাকরোধ হয়ে গেল অমিয়র। কি একটা বলবার চেষ্টা করেই থেমে গেল।

শান্তা আলমারির পাল্লা খুলল। গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে মালিশের শিশিটা পাড়ল তারপর ফিরে এল বিছানায়।

দাও পা-টা ছড়িয়ে দাও। পদসেবা করি। শান্তা বিছানার ওপর উঠে বসল। অমিয়র পায়ের দিকে।

তুলে নিয়ে শান্তা সন্তর্পণে মালিশ করতে লাগল।

একটু পরে বলল, তুমি একটুতেই অমন চেঁচামেচি কর কেন বল তো? কি মেজাজ হয়েছে তোমার?

অমিয় কোন উত্তর দিল না। শুধু বোজা চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল।

আবার শান্তা বলল, অফিসের পরে কি বেলা করতে গিয়েছিলাম। প্রথমে ডাক্তার সেনের ওখানে গেলাম। তোমার পায়ের অবস্থার কথা বললাম। উনি প্রেসক্রপশনটা বদলে দিলেন। সেটা নিয়ে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে ঘোরাঘুরি করে ওষুধ জোগাড় করলাম। একবার মাঝপথে নামলে বাসে-ট্রামে ওঠা কি কষ্টের জান তো? দেরী হবে না আসতে?

চোখ দুটো বোজা অবস্থাতেই অমিয় বলল, সে কথাটা বললেই হত। ওসব আবোল-তাবোল কথা বলা কেন?

শান্তা খিলখিল করে হেসে উঠল, বারে, তুমি আমার সাতপাকের স্বামী, তোমার সংগেও একটু রসিকতা করতে পারব না? তা বলে ওই চ্যালা কাঠের বাড়ি তুমি মারবে আমায়?

চ্যালাকাঠ? অমিয় এবার, এতক্ষণ পরে চোখ খুলল।

তাছাড়া আবার কি? ওগুলোকে আমার গুণী মনে হয়।

কিন্তু ওগুলোই তো আমার চিরজীবনের সংগী।

মাথা খারাপ তোমার। ডাক্তার সেন বলেছেন আর বড় জোর মাস দুয়েক। পা তো তোমার অনেক সেরে এসেছে।

কোলের ওপর রাখা পা-টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরখ করল। যেন নতুন গহনা দেখছে।

কিন্তু পায়ে তো একেবারেই জোর পাচ্ছি না। খুব ক্লান্ত গলায় অমিয় বলল।

পাবে, পাবে। অত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট। এর মধ্যে কখনও ঠিক হতে পারে।

সত্যিই বেশ বড় অ্যাকসিডেন্ট। শুয়ে শুয়ে অমিয় ভাবতে চেষ্টা করল। সেদিনের সমস্ত ঘটনাটা।

শনিবার। ভাল খেলা ছিল মাঠে। অমিয় ঠিক করেছিল বাড়ীতে এসে একটু জিরিয়ে, জলটল খেয়ে তবে যাবে। টিকেট যখন হাতের মুঠোয়, তখন ভয় কিসের!

চলতি একটা বাসের হ্যাণ্ডেল ধরেছিল কিন্তু রাখতে পারে নি। আর একজনের ধাক্কায় হাতটা ফসকে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জনতার মিলিত একটা চীৎকার। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার। তমিস্রা।

আর কিছু মনে নেই।

কড়া ওষুধের গন্ধে চোখ খুলেছিল অনেক পরে। সারি সারি বেড। সাদা এ্যাপ্রন পরা ডাক্তার, এধারে ওধারে নার্সের দল আর ঠিক মাথার কাছে শান্তা। দুটো চোখ জবাফুলের মতন লাল। অবিন্যস্ত কেশপাশ।

অমিয়র ভয় হয়েছিল পা-টা বুঝি হাসপাতালেই রেখে আসতে হবে, কিন্তু অবস্থা অত মারাত্মক হয় নি। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাড়া পা জোড়া লাগবে। আবার বিপদ হবে অমিয়র। ক্রাচের সাহচর্য সাময়িক।

অমিয় আশা করেছিল মাসখানেকের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়াতে পারবে। সহজ মানুষ। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সব ঠিক হয় নি। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। দুগল ক্রাচ বগলে প্রায়ে স্থায়ী আসন লাভ করল।

অফিসে ছুটি পাওনা ছিল। সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হল না। ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও ভয়ের কিছু ছিল না। বিনা মাইনের ছুটি চলবে। ভরসা শান্তা। শান্তার রোজগার।

অমিয়র খুব ইচ্ছা ছিল না, শান্তাই জোর করেছে।

অমিয়কে বলেছে, সারাদিন বাড়ীতে বসে কি করবে? একটা ছেলেও দিতে পারলে না, যে তাকে নিয়ে সময় কাটাই। তার চেয়ে বরং বাবু চাকরিবাকরির চেষ্টা দেখি।

প্রথম প্রথম অমিয় ঘোরতর আপত্তি করেছে, তারপর ঠাট্টার সুরে বলেছে, তোমার কি ধারণা চৌরঙ্গীতে গেলেই চাকরি পাওয়া যায়? বলে কত এম. এ., বি. এ বাষবধোয়াল ঘই পাচ্ছে না, আর তুমি ইন্টারমিডিয়েট পুঁটি। তাও একবার মুখ থুবড়ে পড়ে।

তাই নাকি? কোমরে আঁচল জড়িয়ে শান্তা দাঁড়িয়ে উঠেছে। খোঁচা খাওয়া কেউটের মতন। চাকরি যোগাড় করাটা যেন মল্লযুদ্ধের সামিল, আট-সাঁট করে শাড়ী বেঁধে এমন ভাব দেখিয়েছে।

অমিয় কিছু বলে নি। ইজিচেয়ারে বসে পা দোলাতে-দোলাতে ঠোঁট মচ্‌কে হেসেছে। হাসি তো নয়, যেন লঙ্কার গুঁড়ো, তাও কাটা ঘায়ের ওপর।

শান্তা কথা রেখেছে। মাসখানেকের চেষ্টায় চাকরি একটা যোগাড় করেছে। মার্চেন্ট অফিসে। তা হোক, মাসের শেষে মাইনেটাই আসল। সরকারী আর সওদাগরী অফিসে এ ব্যাপারে কোন তফাৎ নেই। টাকার দাম দু জায়গাতেই এক।

মেসোমশায়ের বন্ধু। গ্রামসুবাদে কীণ সম্পর্কের একটা সুতো ছিল। সমস্ত অফিস চুঁড়ে শান্তা ঠিক তাকে বের করেছিল। পুরোন কথার জের টেনে সেই সুতোকে শান্তা দড়ির রূপ দিয়েছিল। তারপর সেই দড়ি ধরে চাকরির চত্বরে নামা খুব কঠিন হয় নি।

এ নিয়েও অমিয় রাগারাগি কম করে নি। সকালে কোন অসুবিধা হয় নি। অমিয়র অফিস সাড়ে নটায়, শান্তার সাড়ে দশ। হাজিরার কড়াকড়ি ছিল না। পৌনে এগারোটার আগে পৌঁছলেই যথেষ্ট।

অমিয়কে খাইয়ে-দাইয়ে, টিফিনের কৌটো হাতে গুঁজে, সদর দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে তবে শান্তা স্নানের ঘরে যেত।

মুস্কিল হত বিকেলে। খেলার মরশুমে অবশ্য মাঠ ছিল, কিন্তু অন্যসময়ে অমিয় সোজা বাড়ীতে আসত। তার আর কোন নেশা ছিল না। বাড়ী খালি। শান্তার আসতে প্রায় সাড়ে ছটা। একদিন, দুদিন নয়, রোজ।

বিরক্ত অমিয় কতদিন বলেছে, অফিসে কি কর এতক্ষণ?

বড় সাহেবের সংগে গল্প করি। শান্তা অম্লানবদনে উত্তর দিয়েছে।

গল্প কর? কি গল্প?

এ-ই সংসারের কথা। তোমার পাগলামীর কথা। ছেলেপুলে হল না, সেই দুঃখের কাহিনী।

শান্তার মুখচোখের ভংগী দেখে পরিহাসটা অমিয় বুঝতে পেরেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, চাকরি-বাকরি না করে স্টেজে কিংবা স্ক্রীনে চেষ্টা করলে পারতে। অভিনয়টা খুব ভালই শিখেছ।

ও জিনিসটা আমাদের শিখতে হয় না। কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতন সহজাত শক্তিটা নিয়েই আমরা জন্মাই। রাগে অমিয় মুখটা ঘুরিয়ে বসেছে।

তখন শান্তা পায়ে পায়ে অমিয়র খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তার মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছে, কি গো তুমি? বড় সাহেবের সঙ্গে ওসব কথা কখনও বলা যায়? বড় সায়েব বসে থাকে, কাজেই আমাকেও বসে থাকতে হয়। কখন কি ফাইলের দরকার হয়, ঠিক আছে।

এখন অমিয় ভাবে শান্তার চাকরিটা না থাকলে কি অবস্থা হত? অর্ধেক মাইনেতে ওষুধপত্র, পথ্য সোজা কথা!

মালিশ শেষ করে অতি সন্তর্পণে পাটা নামিয়ে রাখল। বিছানা থেকে নেমে অমিয়র দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, কি গো ঘুমালে নাকি? অনুমতি দাও, এবার গা ধুয়ে আসি।

অমিয় শান্তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অল্প চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

আর কিছু নয়। শান্তার ওপর অমিয়র আর কোন অভিযোগ নেই। প্রাণ দিয়ে অমিয়র সেবা করে। পান থেকে চুণটি খসতে দেয় না। ডানা দিয়ে যেন আগলে আগলে রাখে। বিশেষ করে দুর্ঘটনার পর তো কথাই নেই।

কিন্তু এক দোষ। অফিস থেকে কিছুতেই সময়ে ফেরে না। রোজ যে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় এমন নয়। ওষুধও রোজ কিনতে হয় না, তবু শান্তার দেরী হয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ট্রামের কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছিল কিংবা পথের মাঝখানে খুব পুরোন এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছাড়ল না কিছুতেই। মেয়েদের গল্প একবার জমলে কি হয় জানো তো।

অমিয় অনুযোগ করেছে, কিন্তু তুমি তো জানো, আমি একলা শুয়ে পড়ে থাকি। কথা বলবার একটা লোক নেই। তবু এত দেরী কর কেন?

তুমি এমন বলছ যেন আমি হাত কাটিয়ে ফিরছি। মোটে তো পৌনে আট। কি তোমায় চা করে দিয়েছে, ঠিক আটটায় খাবার পাবে। মালিশ আমি এখনই করে দিচ্ছি।

কি করে শান্তাকে বোঝাবে অমিয় যে শুধু মালিশে আর সময়মত খাবার যোগালেই একটা পুরুষের মন ভরে না। দেহ ছাপিয়ে আরও যে কিছু চায়। বুভুক্ষু হৃদয় অক্টোপাশের মতন একাধিক হাত মেলে আরও কিছু খোঁজে।

একরাতে জানালার দিকে চেয়ে চেয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে অমিয় বিছানায় ঢলে পড়েছে, তখন দরজায় আওয়াজ হল। দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল সাড়ে সাতটা। আজ শান্তা বলে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে।

চাদরটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে অমিয় শুয়ে পড়ল। আজ কথা বলবে না শান্তার সঙ্গে। তার সেবা নেবে না। মালিশ ওষুধ কিছু নয়।

শান্তা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। একটানে চাদরটা অমিয়র মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আজ ভারি মজা হয়েছে, জানো?

অমিয় নির্বিকার। এ সব বাজে কথায় শান্তা আজ তাকে ভোলাতে পারবে না।

প্রিয়দার সঙ্গে দেখা হল।

ঔদাসীন্যের মুখোশ খুলতেই হল অমিয়কে। ভ্রূ কুঁচকে বলল, তিনি আবার কেউ তোমার প্রাক-বিবাহিত জীবনের লীলা-সহচরদের একজন?

হ্যাঁ, তাও বলতে পার। প্রিয়দা আর আমরা পাশাপাশি ছিলাম যখন বড়াল লেনে। প্রায় দশ বছরের ওপর।

দশ বছরের ওপর? তাও প্রিয়দা প্রিয়ই রয়ে গেলেন?

প্রিয়তর, প্রিয়তম হতে পারেননি।

ফাজলামি রাখ, শান্তা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, কত বড় লোক প্রিয়দা আজকাল জান। আমাকে চিনতে পেরেছে এই আমার কত ভাগ্য। মোটর থামিয়ে তুলে নিল।

এত পরে? অমিয় নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন করল।

এত পরে মানে?

মানে, আর বছর পাঁচেক আগে তুললেই ভাল করতেন। এখন আবার ডাইভোর্সের একটা আগাছা রয়েছে। সেটা সরাতে না পারলে তোমাদের প্রেমের চারার অকাল মৃত্যু হবে যে।

এবার শান্তা রীতিমত রেগে উঠল। গম্ভীর গলায় বলল, কথাটা আমায় বলতে দেবে, নাকি?

অমিয় আর বাধা দিল না।

প্রিয়দা এখন মস্ত বড় ডাক্তার। ভিয়েনা ফেরৎ। তাকে তোমার কথা বললাম। ঠিকানাও দিয়েছি। কাল সন্ধ্যার দিকে তোমায় দেখতে আসবে।

এইবার অমিয় পাশ ফিরল। বলল, ভিয়েনা ফেরৎ স্পেশালিষ্ট। দক্ষিণা তো চৌষট্টির কম হবে না। আজ মাসের বাইশে। এসব আসবে কোথা থেকে?

শান্তা মুচকে হাসল, বললাম না তোমার প্রিয়দার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আলাপ। একটি পয়সা দিতে হবে না। সে কথা প্রিয়দাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি। বলেছে ডাক্তার সেনের প্রেসক্রপশনগুলো ঠিক করে রাখতে।

পরের দিন শান্তা একটু তাড়াতাড়ি ফিরল। অমিয়র কাছে গিয়ে বলল, কি গো আজ খুশী তো?

খুশী হতাম, যদি আমার জন্য তাড়াতাড়ি আসতে।

তোমার জন্য আসিনি তো কার জন্য এসেছি?

তোমার প্রিয়দার জন্য।

নেমকহারাম কোথাকার। যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। প্রিয়দা তো তোমাকে দেখতেই আসছে।

উঁহু, অমিয় ঘাড় নাড়ল, আসছেন শুধু আমার পা দেখতে আর তোমার সর্বদেহ।

ছোটলোক কোথাকার। শান্তা সশব্দে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওরই মধ্যে শান্তা ঘরের অবস্থাটা ফিরিয়ে এনেছে। সুটকেশ থেকে হালকা সবুজ পর্দা বের করে জানালায় দরজায় টাঙিয়েছে। গোল টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানী থেকে কাগজের ফুলগুলো ফেলে দিয়ে রজনীগন্ধার স্তবক রেখেছে। সেলফের ওপর বইগুলো সাজিয়েছে সযত্নে।

সংসার শুধু রোগীর ঘরের নয়, রোগীরও হয়েছে।

আধময়লা গেঞ্জী জামা ছাড়িয়ে অমিয়কে ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরিয়েছে। নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। বালিশের ওপর একটা ফুলতোলা ঢাকা, পায়ের কাছে বাসন্তী রংয়ের চাদর।

নিজেও শান্তা সেজেছে। মানানসই শাড়ী ব্লাউজে। গালের লালচে রংটা অকৃত্রিম নয়। গোটা চারেক রজনীগন্ধা খোঁপায় গুঁজেছে।

চেয়ে চেয়ে অমিয় সব দেখল। সব শেষ হতে বলল, এ বাড়ীতে ডাক্তার আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

মুখের ওপর আলগাভাবে পাউডারের তুলিটা বোলাতে বোলাতে শান্তা বলল, তবে কি মনে হচ্ছে?

এ যেন তোমার কিংবা আমার পাকা দেখা।

পাকা দেখা তোমারই হোক। আমার আর পাকা দেখার শখ নেই।

অমিয় লাগসই একটা কথা বলতে গিয়েই থেমে গেল। দরজায় মোটরের হর্ন।

অমিয় বিছানার ওপর উঠে বসল। শান্তা ছুটে গেল বাইরে।

দীর্ঘকায় সুদর্শন চেহারা। পরণে দামী সুট। অমিয়র মনে হল বয়সে তার চেয়ে কিছু ছোটও হতে পারে।

ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে অমিয়র দিকে দুটো হাতজোড় করল।

নমস্কার।

অমিয় নমস্কার ফেরত দিল। শান্তাকে বলল, চেয়ারটা এগিয়ে দাও ওঁকে বসতে।

হাত নেড়ে প্রিয় বারণ করল, ব্যস্ত হবেন না। আগে সেরে নিই।

প্রিয় খাটের একটা কোণে বসল। অনেকক্ষণ ধরে টিপে টিপে পাটা দেখল। ছোট একটা লাঠি বের করে হাঁটুর ওপর ঠক ঠক করে ঠুকতে লাগল।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াতে অমিয় জিজ্ঞাসা করল, কি দেখলেন ?

প্রিয় হাসল। বলল, পাকা হাড়, তা না হলে আর শান্তার মতন মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে পারেন এতদিন।

শান্তা পাশেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, কেন, শান্তা খারাপ মেয়ে কেন শুনি।

খারাপ তো বলিনি। বলেছি পাকা হাড় না হলে সামলানো যায় না।

পকেট থেকে সোনালী সিগারেট কেস বের করে প্রিয় একটা ধরাল, আর একটা এগিয়ে দিল অমিয়র দিকে।

সিগারেটটায় বার কয়েক টান দিয়ে প্রিয় বলল, নার্ভাস হবেন না। সে রকম কিছু হয়নি। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। টিস্যুগুলো যখন ঠিক আছে তখন ভয়ের কিছু নেই।

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, এই ভাবে শান্তার দিকে ফিরে বলল, কই দেখি আগের প্রেসক্রপশনগুলো।

টেবিলের ওপর থেকে প্রেসক্রপশনগুলো নিয়ে শান্তা প্রিয়র হাতে দিল। সেগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রিয় বলল, আমার চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু একটু ভিন্ন। হয়তো আপনার কাছে একটু aggressive বলে মনে হবে। মালিশ বন্ধ। আমি একদিন অন্তর একটা করে ইনজেকশন দেব। শেষকালে ইলেকট্রিক মাসাজ।

অমিয় কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল।

সমর্থনের আশায় শান্তার দিকে চোখ ফিরিয়েই প্রিয় দেখল শান্তা নেই। ভেতরে চলে গেছে।

তারপর সাধারণ কথাবার্তা হল। রাজনৈতিক অবস্থা থেকে অর্থনৈতিক সমস্যা। যেমন দুজন পুরুষ মানুষে হয়ে থাকে।

প্রিয় উঠবার মুখেই বাধা পেল।

পর্দা সরিয়ে শান্তা ঘরে ঢুকছে। হাতে ট্রের ওপর ঘুমায়িত চায়ের পেয়ালা, প্লেটে খাবার।

কি সর্বনাশ, এসব কার জন্য ? প্রিয়র গলায় কৃত্রিম ভয়ের ছোঁয়াচ।

ভিজিট দেওয়ার দাবী নেই, তা'বলে ভদ্রলোক এলে একটু চাও দিতে পারব না এমন মনে করছ কেন।

আমি কিছুই মনে করছি না। এক কাপ চা বরং আমি খেতে পারি কিন্তু অত মিষ্টি আমার চলবে না।

সে কি, আগে মিষ্টি তো তুমি খুব ভালবাসতে ?

আগের ভালবাসার পাত্রপাত্রীর রূপান্তর ঘটেছে।

কি ভেবে প্রিয় কথাটা বলেছিল, সেই জানে। কিন্তু শান্তার দুটো গাল আরক্ত হয়ে উঠল। দু চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কোচের ছায়া।

প্রিয় আবার বলল, আজকাল ভালবাসি শুধু রোগীকে। কথাটা বলেই প্রিয় খুব জোরে হেসে উঠল। এতটা হাসির প্রয়োজন ছিল না। কিংবা হয়তো ছিল, আগের কথাগুলো লঘু করার জন্য।

শান্তা ছাড়ল না, মিষ্টিমুখ প্রিয়কে করতেই হল।

প্রিয় বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তা। গাড়ীতে ওঠার আগে অনেকক্ষণ কথা হল। সম্ভবতঃ রোগীর অসুস্থতার পরিমাপ নিল ডাক্তার। কিংবা হয়তো ইনজেকশনের নামগুলো বলে গেল শান্তাকে। অফিস ফেরৎ যাতে এনে রাখতে পারে।

প্রিয়র গাড়ী গলি পার হয়ে যাবার অনেক পরে শান্তা ঘরে ফিরে এল।

কি বললেন ডাক্তার ? অমিয় উঠে বসার চেষ্টা করল।

ওই ইনজেকশন কটা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। পায়ে জোর পাবে।

পায়ে হয়তো জোর পাব কিন্তু বুকে তো জোর পাচ্ছি না।

কেন, বুকে আবার কি হল ? বুকের ব্যথার কথা তো একদিনও বলনি ?

এতদিন হয়নি, বলব কি। আজ থেকেই টের পাচ্ছি।

বুঝেও শান্তা না বোঝার ভান করল।

কি জানি বাপু, তোমার হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারি না।

এখন আমার কিছুই ভাল লাগবে না। অমিয় কৃত্রিম নিশ্বাস ফেলল, কিছুই বুঝতে পারবে না। মক্ষ থেকে আমার প্রস্থানের সময় এসেছে। সংবেগে প্রস্থান।

অবশ্য অমিয়র কথার ধরণই এই। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি মন কষাকষির কোন মানে হয় না।

তাই শান্তা বলল, আজ তো আর মালিশ করবে না, প্রিয়দা বারণ করে গেলেন ?

মালিশ তো উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য তোমার স্পর্শ। একটু পায়ে হাত বুলিয়েই যাও। পা'টা ভারী না হলে তোমায় ছুঁতে ইচ্ছে করবে না।

কথা না বাড়িয়ে শান্তা স্বামীর পদসেবা

প্রিয় ঠিক ঠিক দিনে আসতে লাগল। ইনজেকশন শান্তাকে আনতে হয়নি। প্রিয়ই সংগে এনেছে।

অমিয় হাসের কথা বলাতে হেসে বলেছে, আপনি সেরে উঠুন। এক সংগে বিল দেব।

সত্যি সত্যিই উপকার পেয়েছে অমিয়। গোটা ছয়েক ইনজেকশনের পর পায়ের দুর্বলতা অনেকটা কমেছে। ক্রাচ ছাড়া চলতে পারে না বটে, কিন্তু আগে পায়ের পাতা সম্পূর্ণভাবে পাততে পারত না, এখন পারে। আশা হচ্ছে অমিয়র, এভাবে চিকিৎসা চললে সে সেরে উঠবে। ক্রাচ-নির্ভর জীবন যাপন করতে হবে না।

একদিন ইনজেকশন দেবার পরই প্রিয় বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি শান্তা। একটা টনিকের ব্যবস্থা করতে চাই। আজ থেকে খেলেই ভাল হয়।

আজ থেকে? শান্তা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলেছে।

হ্যাঁ। এই ইনজেকশনের পর টনিকটা পড়লে খুব কাজ দেবে। তুমি এক কাজ কর, চল আমার সংগে। আমার ডিসপেনসারি থেকে টনিকটা নিয়ে আসতে পারবে।

একটু দাঁড়াও প্রিয়দা, শাড়ীটা তাহলে বদলে আসি।

চুপ করে অমিয় কথাগুলো শুনল। টনিক খাওয়ার পর অমিয়র শরীরের কি উপকার হবে সে জানে না, কিন্তু টনিক আনবার নামেই শান্তার চেহারায় ঔজ্জ্বল্য এল। মুখে রক্তাভা।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই অমিয় শুনল। প্রিয়-ডাক্তারের গাড়ী স্টার্ট নিল। ষ্টীয়ারিংএ প্রিয়র পাশে শান্তা। গাড়ী চলার সংগে সংগে অমিয় যন্ত্রণায় চোখ বুজল।

আর একবার তেমনই নির্মমভাবে যেন তার পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ীর চাকাটা ঘুরে গেল। দুটো মানুষের পুরো ওজন শুদ্ধ।

আশ্চর্য লাগল অমিয়র। এত বড় প্রিয় ডাক্তার, গলার বিলিতী ভিজিট মালা, অথচ ঠিক দিনে আসতে লাগল। যেদিন ইঞ্জেকশন দেবার কথা নয়, সেদিন এল খবর নিতে। অর্থ ফেলে নিরর্থক এই মূল্যহীন রোগীর পিছনে এতটা সময় ব্যয় করা একটু অস্বাভাবিক। অতীতে শান্তার সংগে আলাপের গভীরতা কতখানি ছিল সেটাই বিবেচ্য। দুজনের বাড়ীদুটোই কি কেবল পাশাপাশি, মানুষ দুজন কখনও পাশে আসেনি। অল্পক্ষণের জন্যও!

আগে কি হয়েছিল জানবার উপায় নেই অমিয়র, তবে এখন ছল-ছুতোয় অনবরত দুজনে পাশাপাশি আসছে। অমিয়র ঘর থেকে সরে গিয়ে পাশের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে ফিসফাস করে। সবটুকুই কি রোগীর সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়? ওষুধ, পথ্য আর সেবার কথা। কিংবা দুজনেই বুঝি পুরোন দিনের খুঁট তুলে নিয়ে আগের দিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করে।

একদিন বলেও ফেলেছে অমিয়, এতক্ষণ ধরে কি এত কথা বল দুজনে? ফিসফিস করে?

শান্তা আমল দেয়নি। চিরাচরিত রসিকতার সুরে বলেছে, বুঝতেই তো পার কি এত কথা বলি? এতদিন পরে দুজনে দুজনের দেখা পেয়েছি, কত বছরের কথা আমাদের জমা আছে। একযুগেও শেষ হবার নয়।

তারপরই কিন্তু শান্তা চোখে ঘৃণার আগুন জ্বেলেছে।

ছি, ছি, কি ইতর মন তোমার। এসব কথা ভাবতেও লজ্জা হল না?

যাই বলুক শান্তা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার যতই চেষ্টা করুক, কথার দু একটা টুকরো, হাসির দু একটা ঝলক যা কানে এসেছে, মনকে পোড়াবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আজকাল বদলে গেছে শান্তা। আটপৌরে শাড়ী আর পরেই না। সবসময়েই বেশবাসে একটা চটক থাকে। ভাবটা যেন প্রিয় ডাক্তার সব সময়ে রয়েছে ওর কাছে কাছে। তার স্বপ্ন রয়েছে ওকে ঘিরে।

অকারণে গানের সুর। সংসারের কাজ করতে করতে অমিয়র সেবা করতে করতে হালকা গানের কলি।

কি বড় ফুর্তি দে? শান্তার মুখের দিকে চেয়ে অমিয় জিজ্ঞাসা করছে।

হবে না, তুমি সেরে উঠছ।

উত্তর দিয়েছে।

কিন্তু খুশী হয়নি অমিয়। হতে পারেনি। এ আনন্দ বলয় ওকে ঘিরে, এ উচ্ছ্বাসের উৎস অমিয়, এটা ভাবতে পারলে খুশীই হত, কিন্তু তা যে নয় সেটা অমিয়র চেয়ে ভাল করে বুঝি আর কেউ জানে না।

প্রিয় ডাক্তার ঘরে ঢুকলেই আবেগে কলকল করে ওঠে শান্তা। সারা দেহে মনে ভোরাই আসে।

সেদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল।

প্রিয় অল্পক্ষণ অমিয়র কাছে কাটিয়েই পাশের ঘরে ঢুকল, শান্তাকে নিয়ে।

বিকেল থেকেই শান্তার সাজপোশাকের ঘটাটা অমিয়র ভাল লাগেনি। ভাল শাড়ী পরেছে, খোঁপায় বেলফুঁড়ির মালা, মুখে রঙের প্রলেপ বেশ গাঢ়।

পাশের ঘর থেকে খিলখিলিয়ে হাসির শব্দ কানে যেতেই, বালিশে ভর দিয়ে অমিয় উঠে বসল।

পর্দা ফেলা। তার ফাঁকে চোখ রেখে সবকিছুই দেখা যাবে। নিজের চোখে একবার দেখতে চায় অমিয়। নিঃসন্দেহ হতে চায়। শান্তার ছলনার অভিনয়ের শেষদৃশ্য।

ক্রাচে হাত দিয়েই অমিয় সেটুকু সরিয়ে রাখল। আওয়াজ হবে। এ আওয়াজটুকুর ওপর ভরসা করেই ওরা হয়তো আলাপ করতে সাহসী হয়েছে। কাছাকাছি আসতে।

খুব সাবধানে খাটটা আঁকড়ে ধরে অনেক কসরত করে অমিয় মেঝের বসে পড়ল। দুহাতে ভর দিয়ে বসে বসে চলতে শুরু করল। না, বেশী শব্দ হচ্ছে না। অন্তত ওদের সচকিত হবার মতন নয়।

চৌকাটের কাছে গিয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে কিছুক্ষণ জিরোল। তারপর চোখ রাখল পর্দার ফাঁকে।

বেশীক্ষণ চোখ রাখার দরকার হল না। সারা দেহের রক্ত অমিয়র মুখে এসে জমা হল। হৃদস্পন্দন দ্রুততর। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে।

চৌকাটের কাছের চেয়ারে শান্তা। পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়। তার একটা হাত শান্তার পিঠের ওপর। শান্তার খোঁপার বেলফুঁড়ির মালা প্রিয়র অন্য হাতে।

এ ছবির একটা মানেই হয়।

আবার সাবধানে মেঝে ঘসে ঘসে অমিয় বিছানার কাছে ফিরে এল। হাত বাড়িয়ে একটা ক্রাচ টেনে নিল। দুহাতে ক্রাচটা জড়িয়ে কি ভাবল, তারপর চৌকাটের কাছে এসে বসল। হাঁপাতে, হাঁপাতে।

এখান থেকে ক্রাচটা ছুঁড়বে। পর্দা সরিয়ে। শান্তাকে লক্ষ্য করে। এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

ক্রাচটা ঠিক করে হাতে নিয়ে অমিয় পর্দায় চোখ রাখল।

এবার ছবি বদলেছে। দুজনেই দাঁড়িয়ে। শান্তা আর প্রিয়। ভালই হয়েছে। শান্তা চৌকাটের আরও কাছে।

ক্রাচের লক্ষ্যের পরিধির মধ্যে।

ছুঁড়তে গিয়ে অমিয় থেমে গেল।

প্রিয় ডাক্তার বলছে, কাল আর্গাসে পড়ছিলাম। একটা ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। এ ধরণের পক্ষাঘাতে নাকি অব্যর্থ। বহু দুর্ঘটনার রোগী সেরে গেছে। তিনটে ইনজেকশান। ওষুধটার জন্য কালই আমি কেবল্ করে দিয়েছি। শীঘ্র এসে পৌঁছবে।

হাতের উদ্যত ক্রাচটা অমিয় আস্তে আস্তে নামিয়ে আনল। চোখ গিয়ে পড়ল নিজের অপরিস্ফুট ডান পায়ের ওপর। সেরে উঠবে পা। আয়ুধ হিসেবে আর ক্রাচের দরকার হবে না।

মাত্র তিনটে ইনজেকশন। সুস্থ হয়ে বাঁচার সেই স্বর্ণসম্ভাবনাকে এই মুহূর্তে নষ্ট করার কোন মানে হয় না। কে কাকে স্পর্শ করল, ঘনিষ্ঠ হল, এই সামান্য উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে।

ক্রাচটা একহাতে তুলে আবার বসে বসে অমিয় খাটের কাছে ফিরে এল। অনেক কসরত করে উঠল বিছানার ওপর। বালিশের ওপর পাটা রেখে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল।

যাবার আগে প্রিয় ডাক্তার এঘরে এসে দাঁড়াবে। নতুন ওষুধের আশার বাণী শোনাতে পূর্ণতার আশ্বাস নিয়ে।

কংগ্রেস আন্দোলনে নরম ও গরম দল

মুজফ্ফর আহমদ

পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা কংগ্রেসের ভিতরে নরম ও গরম দলের কথা শুনেছি। আজ যে কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা এসেছে, আজও শুনেছি ওই রকমই দুটি দল নাকি কংগ্রেসের ভিতরে আছে। রাজনীতিতে শ্রেণীস্বার্থে বিবর্জিত কোন দলের কথা কল্পনাও করা যায় না। রাজনীতির মানেই হচ্ছে শ্রেণী-স্বার্থের সমর্থন ও তার জন্যে লড়াই। এই বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন, অনেক কিছু প্রলেপও দেন, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে শ্রেণীস্বার্থহীন কোনও রাজনীতি নেই। তবু কেন একই রাজনৈতিক পার্টির ভিতরে গরম দল ও নরম দল থাকার কথা ওঠে তারই বিচার আমাদের করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে কাহিনী ব্যাপারটি কি?

আজ কংগ্রেস যেমন সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগেকার কংগ্রেস এত সুশৃঙ্খল সংগঠন ছিল না। তবুও তা সংগঠন ছিল আজকার মতো ওপরের শ্রেণীরই। আমরা সকলে জানি ১৮৮৫ সালে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের প্রেরণায় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল এবং ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই তা জন্ম নিয়েছিল। কংগ্রেসের এই চেহারার পরিবর্তন কখনও ঘটেনি। ব্রিটিশের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক বারে বারে অবনতি ঘটেছে সত্য, কিন্তু একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ কখনও হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ হতে উচ্ছেদ করার জন্যে কংগ্রেসকে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করার চেষ্টাও অতীতে হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব বরাবর ধনিক জমীদারের হাতেই থেকেছে। এ সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভিতরে নরম দল ও গরম দলের কথা বলা হতো এবং আজও বলা হয়।

অতীতে গরম দলের নেতা হিসাবে লাল-বাল-পালের নাম উল্লিখিত হতো। লাল হচ্ছেন লালা লাজপৎ রায়, বাল মানে বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাল মানে বিপিনচন্দ্র পাল। নরম দলের প্রতিনিধি হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির নাম শোনা যেতো। শ্রেণী-চেতনার দিক হতে তাঁদের ভিতরে কোনও পার্থক্য ছিল না। ধনিক-জমিদারের স্বার্থ তাঁদের স্বার্থ ছিল। তাঁদের কেউই ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করতেন না। ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় তাঁরা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতে চাইতেন।

আমার মনে হয় কংগ্রেস নেতাদের বক্তৃতার ভাষাই তাঁদের নরম ও গরম দলে বিভক্ত করেছিল। গরম দলের নেতারা খুব গরম ভাষায় যে বক্তৃতা দিতেন এটা সত্য কথা। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা শুনলে যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। নরম দলের নেতাদের বক্তৃতা শুনে তাঁদের সে অবস্থা হতোনা। গরম বক্তৃতা বা লেখার অপরাধে গরম দলের নেতাদের কারাবরণ করতে হতো, কিন্তু নরম দলের নেতাদের জেলে যেতে হতো না।

বাল গঙ্গাধর তিলকের লেখা ও ছাপানো বক্তৃতা পড়ে কোথাও দেখা যায় না যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছেন। বরঞ্চ আমরা দেখেছি যে তিনি পারস্পরিক সহযোগের (responsive Co-operation-এর) প্রস্তাব পেশ করেছেন। এই প্রস্তাবও তিনি পেশ করেছেন অদ্ভুত সময়ে ও বিস্ময়কর অবস্থায়! ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ান-ওয়ালা বাগে ইংরেজদের দ্বারা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। তারপরে পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে সামরিক আইনের যে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তা কখনও ভুলতে পারা যায় না। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পাঞ্জাবের যে কোনও স্থানে নয়,—জালিয়ানওয়ালা-বাগের অমৃতসরেই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হতে যাচ্ছিল। পাঞ্জাবের নির্যাতন ও মন্টেগু-চেমসফোর্ড ভারত সংস্কার আইন এই বিশেষ আলোচনার বিষয়

ছিল। তিলক সদলবলে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকটে কংগ্রেস অধিবেশনের আলোচনায় তেমন কোনো মূল্য ছিল না। অমৃতসর যাওয়ার পথে তিনি গঙ্গাপুর নামক একটি রেলওয়ে ষ্টেশন হতে ব্রিটেনের রাজা বা মন্ত্রিসভার নামে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। তাতে তিনি বললেন যে ভারতের জনসাধারণের তরফ হতে ভারত সংস্কার আইন পাস করার জন্যে তিনি ব্রিটিশ রাজা বা মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর এই টেলিগ্রামেই তিনি তাঁর বিখ্যাত পারস্পরিক সহযোগের (responsive Co-operation-এর) প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। বাপ্টিস্টো ও কেলকার ট্রেনে তিলকের সহযাত্রী ছিলেন। শোনা যায় পারস্পরিক সহযোগের কথা বাপ্টিস্টোর মাথা হতেই এসেছিল। আর টেলিগ্রামটির মুসাবিদা করেছিলেন কেলকার। (ডাক্তার পি. পট্টভি সীতারামাইয়া রচিত "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)।

তিলক কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগেভাগেই লণ্ডনে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছিলেন। তিনি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন ব্যবস্থা কাজে প্রয়োগ করার জন্যে একান্ত উন্মুখ ছিলেন। আশ্চর্য এই যে দেশের জনসাধারণের মত না নিয়েই তিনি তাঁদের তরফ হতেই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন। সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে দেশময় বিক্ষোভ যে ফেটে পড়তে যাচ্ছে সেদিকে কোনও নজর না দিয়ে তিনি অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বামপন্থী নেতা হিসাবে বিপিনচন্দ্র পালের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। কী যে তাঁর বামপন্থা ছিল তা জানিনে, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তিনিও চাইতেন না। ১৯১৭ সালে তাঁর যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তার কয়েকটি মোদ্দা কথা এখনও আমার মনে আছে। কলকাতার মুন্সী সদরুদ্দীন লেনে বস্তী ও বাড়ী-ঘর ভেঙে দেওয়ার ফলে একটা বেশ ময়দান মতো জায়গা সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত এই জায়গাতেই এখন মহাজাতি সদনের বাড়ী উঠেছে। এই খোলা জায়গায় বন্দী-মুক্তি উপলক্ষে একটি বড় সভা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল তাতে বাংলায় বক্তৃতা দেন আর চিত্তরঞ্জন দাশ বক্তৃতা দেন ইংরেজিতে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন আমাদের নৌবহর নেই, বাণিজ্য বহর নেই, এই নেই, সেই নেই,—কাজেই আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করতে পারিনে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অনেকগুলি দেশতো ডোমিনিয়ন স্টেটাস পেয়েছে। তার কোনো কোনো দেশ হতে আমরা অনেক বেশী সভ্য। তা সত্ত্বেও ডোমিনিয়ন স্টেটাস আমরা কেন পাব না?

এর কয়েক বছর আগে বিপিনচন্দ্র পাল দীর্ঘদিন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি দেশে ফেরার সময় হয়েছে বুঝে প্রত্যাগমনের জাহাজী টিকিট খরিদ করলেন। বিদায়-কালীন বক্তৃতায় বললেন, 'ভগবান যদি আমায় এক দিকে একান্তে স্বাধীন-ভারত দিতে চান, এবং অন্যদিকে বৃটিশ জাতিসমূহের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনশীল ভারত দেন—আমি নিঃসন্দেহে পরের প্রস্তাবটি গ্রহণ করব।'

"কাগজ পড়ে তাঁর স্তাবক ও শুভানুধ্যায়ীরা বজ্রাহত হলেন। সুরেন্দ্রনাথ সংবাদ পেয়ে বললেন, বিপিন বলে কি হে? আমি "নির্জলা স্বাধীনতা" বলিনা। জানি যে বিনা রক্তপাতে সে হবার নয়। ভগবান যদি দেন, তবে তো রক্তপাতের বালাই থাকে না। সে অবস্থায় আমি ইংরেজ সম্পর্ক-যুক্ত স্বাধীনতা চাইব'।" (ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি", পৃষ্ঠা ৩৪৫ ৪৬)।

মুন্সী সদরুদ্দীন লেনের ওই সভায় চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতাও আমি শুনেছিলাম। তাঁর হাতে অধ্যাপক এন, মোর লিখিত "ভারতে ইংল্যাণ্ডের কাজ"(England's Works in India) নামক বই একখানা ছিল। ১৮৫৭ সালে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার পরাজয়ের পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত হতে ভারতবর্ষের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। সেই সময়ে প্রকাশিত তাঁর ঘোষণাটি এই পুস্তকের শেষের দিকে ছাপা হয়েছিল। বক্তৃতায় দাশ সাহেব এই ঘোষণাটিই বিশেষভাবে ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বিপিনচন্দ্র পালের মতো ডোমিনিয়ন স্টেটাসও চাননি। তবুও তাঁর বক্তৃতাটি প্রশংসিত

হয়েছিল। অনেকে বললেন, এরপরে কার ক
পুরি রাজনীতিতে নামবেন।

আবার আমি অমৃতসর কংগ্রেসের কথা বলব। আগেই বলেছি ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তিলক তো আগেই তাঁর টেলিগ্রাম ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভারত সংস্কার আইনকে কাজে লাগাবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। এই আইনকে কাজে প্রয়োগ করার জন্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং গান্ধীজীরও আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে সহযোগিতা পেলে তাঁরাও সহযোগ করবেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে মত জাহির করলেন। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে নিম্নলিখিত মর্মে প্রস্তাব তুললেন :—

(১) ভারতবর্ষ পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট পেতে চায়;

(২) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এই কংগ্রেসও মানছে, অর্থাৎ ঘোষণা করছে যে সংস্কার আইন অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক;

(৩) পার্লামেণ্টকে (ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে) বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে যে অবিলম্বে আত্মকর্তৃত্বের ভিত্তিতে ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা হোক।

দাশ সাহেবের এমন একটি নিরীহ প্রস্তাবও গান্ধীজীর বরদাশ্‌ত হলো না। 'নৈরাশ্যব্যঞ্জক' কথাটিতে তিনি ঘোর আপত্তি করলেন। তাঁর কথা হলো পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র পেতে হবে, তবে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড ভারত সংস্কার আইনকেও যথাসম্ভব কার্যে প্রয়োগ করতে হবে। এ বিষয়ে এটাই তাঁর শেষ কথা ছিলনা। তিনি বললেন, মণ্টেগু সাহেব যে ভারত সংস্কার আইন পাস করিয়েছেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদও জানাতে হবে। বলাবাহুল্য দাশ সাহেবের প্রস্তাবের সঙ্গে গান্ধীজীর মতটুকু যোগ হয়েই তা কংগ্রেসে পাস হয়েছিল। এই ভাষায় অমৃতসর কংগ্রেসে যখন এই প্রস্তাব পাস হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন জালিয়ান-ওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেনি, পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হয়নি এবং পাঞ্জাববাসীরা নির্যাতিত-অপমানিত কোনও দিন হয়নি। কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের দৃষ্টি দেশের মানুষের প্রতি ছিল না, দেশবাসীরা কি ভাবছেন তা জানার আগ্রহও তাঁদের মনে উদয় হয়নি, শুধু মন্ত্রীর গদিতে বসার জন্যে তাঁদের মন আঁকুপাকু করছিল।

অমৃতসর কংগ্রেসে ঘটিত আর একটি ব্যাপারের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। তার শঙ্করণনায়ার বড় লাটের এক্‌জেকিউটিব কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। বছরে চৌষটি হাজার টাকা বেতনের চাকরি। পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যাচারসমূহের প্রতিবাদে তিনি তাঁর এই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, অবশ্য খেতাব ছাড়েন নি। এই চাকরি ছাড়ার জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব পাশ হলো। কিন্তু পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, অত্যাচারের ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তাঁর নাইটের খেতাব বর্জন করেছিলেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করে কোনও প্রস্তাব কংগ্রেস হতে পাশ হলো না! অথচ, এই খেতাব বর্জন নিয়ে দেশ-বিদেশে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে-পত্র লিখেছিলেন তার কোনও তুলনা হয় না। তাঁকে অভিনন্দিত করে কংগ্রেস হতে একটি প্রস্তাব পাস করানোর চেষ্টা কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি করেছিলেন, কিন্তু সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই রকম কোনো প্রস্তাব তুলতেই দিলেন না। এই থেকে কংগ্রেস নেতাদের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করলে তাঁর তেজোপূর্ণ পত্রের ভাষাও অভিনন্দিত হতো। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই পত্রের ভাষা কখনও পছন্দ করেনি। কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে চটাতে চাননি। তাছাড়া তখনও কংগ্রেসের মধ্যে প্রচুর খেতাবধারী লোক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালে তাঁরা অসুবিধায় পড়ে যেতেন। তবে শঙ্করণনায়ার চাকরি ছেড়েছিলেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ রাজার দেওয়া খেতাব তিনি ছাড়তে পারেননি।

কংগ্রেসের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত হলেন না বটে, কিন্তু ইংরেজেরা তাঁকে নিয়ে মুশকিলে পড়ে গেলেন। তিনি তো শুধু বাঙালী বা ভারতের কবি ছিলেন

না, তাঁর ছিল বিশ্বকবির মর্যাদা। তাঁর খেতাব বর্জনে সারা বিশ্বে খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এই ব্যাপারটা ইংরেজদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। তাঁদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সাপের ছুঁচো গেলার মতো। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশ নাইটরূপে গণ্য করতেই থাকেন। ইংরেজরা ও এদেশের ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রাপণণে স্যার রবীন্দ্রনাথ লিখেই চললেন। কবি কিন্তু তাঁর বর্জিত খেতাব আর কোনও দিন ব্যবহার করেননি। দেশের লোকও তাঁকে ব্রিটিশ রাজের খেতাব-শূন্য কবি হিসাবেই গ্রহণ করে নিলেন।

গান্ধীজী খেতাবে জিদ ধরেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই যে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তাব পরিবর্তিত হয়েছিল সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু তাঁর জিদের শেষ তখনও হয়নি। তিনি বললেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা দেশবাসী হত, নির্যাতিত ও অপমানিত হয়েছেন বটে, কিন্তু পাঞ্জাবে ও গুজরাটে দেশবাসীর পক্ষ হতেও তো আক্রমণ হয়েছে। তার নিন্দাসূচক প্রস্তাব কংগ্রেসকে পাস করতে হবে। গান্ধীজীর এই প্রস্তাব সবজেক্ট কমিটি নাকচ করে দিল। সত্যই অমৃতসরে বসে সবজেক্ট কমিটির পক্ষে এই রকম একটি প্রস্তাব পাস করা দুরূহ কাজ ছিল। গান্ধীজী বেঁকে বসলেন, বললেন তাঁর এই প্রস্তাব পাস না হলে তিনি কংগ্রেসের সভা ছেড়ে চলে যাবেন। অগত্যা কংগ্রেসে এই প্রস্তাবও পাস হয়ে গেলো। (ডাক্তার পট্টভি সীতারামাইয়া লিখিত 'কংগ্রেসের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ব্যাপারটি এই ইতিহাসে স্থান পায়নি। এই সত্য ঘটনাটি কেন কংগ্রেসের ইতিহাস হতে বাদ পড়ল, কে জানে?

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আহমদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। মাওলানা হসরৎ মোহানী এই অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছিলেন। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতায় এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। কোনও বামপন্থী কংগ্রেস নেতাকে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করতে কিংবা ভোট দিতে দেখা যায়নি। কমিউনিস্টরা অবশ্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে এই কংগ্রেসে ইশ্‌তেহার ছড়িয়ে ছিলেন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেও কমিউনিস্টদের উত্থাপিত পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কোনও বামপন্থী কংগ্রেস নেতা কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'স্বরাজ'-এর আবার কোনও সংজ্ঞা দেওয়া যায় নাকি? স্বরাজ অন্তরে অনুভব করতে হবে।

১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে স্বয়ং গান্ধীজী সভাপতি ছিলেন। এই বছরের ২১শে জানুয়ারী তারিখে বিশ্বের মহান্ বিপ্লবী নেতা লেনিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। ব্রিটেনের সহিত সোভিয়েৎ দেশের কূটনীতিক সম্পর্কও এই বছরে স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তবুও লেনিনের মৃত্যুতে একটি শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করার চেষ্টা করা হলো তখন গান্ধীজী তা তুলতেই দিলেন না। তিনি বললেন, লেনিন উপদ্রবে (Violence-এ) বিশ্বাস করতেন। গান্ধীজীর এই অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে বামপন্থী কংগ্রেস নেতারা প্রতিবাদ করেননি।

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতি ছিলেন। আগেকার মতো এবারেও কমিউনিস্টদের দ্বারা উত্থাপিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পরাজিত হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা এই প্রস্তাবের পক্ষে লড়েছিলেন এমন কথা ভাবার কোনও কারণ নেই। গান্ধীজী বলেছিলেন, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বড় দুর্বল সভাপতি। বললেন, তিনি নিজে সভাপতি হলে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতেই দিতেন না। বাঙলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত খুব আশ্চর্য হয়ে যান যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবক জমীদারী প্রথা উচ্ছেদ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, জমীদাররা কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্য করেন, আর উচ্ছেদ হবে তাঁদেরই? এর ভিতর দিয়েই কংগ্রেস নেতাদের শ্রেণী-সচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার

মুখ্যতার আহ্‌মদ আনসারী। প্রতিবারের মতো এবারেও কমিউনিস্টরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের নোটিস দিয়েছিলেন। একটি কর্মপদ্ধতিযুক্ত ইশ্‌তেহারও ওয়ার্কস্ এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বিতরণ করেছিল। বলা বাহুল্য, ওয়ার্কস্ এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির নেতৃত্বেও কমিউনিস্টরাই ছিলেন আর, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় ইশ্‌তেহার বিতরণের কাজ কমিউনিস্টরা ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশন হতেই করে আসছিলেন।

মাদ্রাজ অধিবেশনের পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্ত্রীর অসুখের জন্যে দীর্ঘকাল ইউরোপে ছিলেন। ইউরোপে থাকার সময়ে নানান লোকের ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। নবেম্বর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উৎসবের সময়ে অল্প ক'দিনের জন্যে তিনি মস্কোও গিয়েছিলেন। ব্রুসেল্‌স্-এ অনুষ্ঠিত "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগে"র (পুরো নাম ছিল League Against Imperialism and For National Independence) আনুষ্ঠানিক বিশ্বসম্মেলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এই লীগের কার্য-নির্বাহক কমিটির সভ্যও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সব কিছুর রং গায়ে মেখে কলম্বোর পথে ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করেই তিনি সর্ব প্রথমে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর আত্ম-চরিতে লিখেছেন:—

"মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়াই আমি এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাবসহ এক গোছা প্রস্তাব আমি ওয়ার্কিং কমিটির দরবারে পেশ করিলাম। যুদ্ধের আশঙ্কা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের সহিত যোগ স্থাপন প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কার্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাবরূপে গৃহীত হইল। আমাকেই ঐগুলি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল। ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। এমন কি, মিসেস আনি বেসান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। চারিদিক হইতে এত সমর্থন পাওয়া আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকে বুঝিতে কেহ চেষ্টা করিলেন না, না হয় ভুল বুঝিলেন। কংগ্রেসের পরে যখন স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখনই ইহা বুঝিলাম।" (তৃতীয় বাঙলা সংস্করণ, ১৮১ পৃষ্ঠা)।

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে তখনকার দিনে (সম্ভবত এখনও) অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতো। তাতে কোনও প্রস্তাব পাস হয়ে যাওয়ার মানেই ছিল তা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেও পাস হয়ে গেলো। কারণ প্রকাশ্য অধিবেশনটি ছিল একটা হট্টগোলের ব্যাপার। সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা হতো ঠিকই, কিন্তু সে বক্তৃতার সবজেক্ট কমিটির কোনও প্রস্তাবে কিছুমাত্র পরিবর্তন হতো না। মাদ্রাজ অধিবেশনের সময়ে লেখক অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি খুব নিকট হতে নেতাদের দেখেছেন এবং তাঁদের বক্তৃতা শুনেছেন। এটা মোটেই ঠিক কথা নয় যে বিনা প্রতিবাদে ওই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। মিসেস্ আনি বেসান্ত ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মাওলানা শওকৎ আলী এবং আরও অনেকে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অবশ্য, একথা সত্য যে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যাবে ভেবে অনেকে বিরুদ্ধে ভোট দেননি। সেদিন সবজেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবটি পাস হয়ে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণের জন্যে সভা বন্ধ থাকে। তখন এক জায়গায় নলিনীরঞ্জন সরকার ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দাঁড়িয়েছিলেন। লেখক তাঁদের নিকটে গিয়ে দাঁড়াতেই সত্যেনবাবু কিঞ্চিৎ হেসে দিয়েই বললেন, "আপনাদেরই তো জয় হলো।" সত্যেনবাবুর সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কাজেই, পণ্ডিত জহরলাল ব্যাপারটিকে যতটা লঘু করতে চেয়েছেন ততটা লঘু তা ছিল না। তিনিও কি লঘুচিত্ততার বশে প্রস্তাবটি পাস করেছিলেন? ব্যাপারটির গুরুত্ব এই ভাবে বুঝতে হবে যে মাদ্রাজে উপস্থিত থেকেও গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগ দেননি। শোনা গিয়েছিল তাঁর রক্তের চাপ বেড়েছে। কিন্তু তিনি চুপ করে থাকেননি কিছুতেই। পরে প্রস্তাবের তীব্র

ছিলেন এবং সমস্ত বছর ধরে শক্তি সংহত করে পরের বছরে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রস্তাবটি ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়ে যায় তা কোনও কংগ্রেস নেতাই চান নি। তাঁরা প্রস্তাব ভোটে হারাবার শক্তি সঞ্চয় করে মাদ্রাজে আসতে পারেন নি। এই কারণে প্রস্তাবটি পাস হয়ে যাবে জেনেই তাঁরা তার তেমন বিরোধিতা করেন নি। প্রস্তাব পাস হওয়ার পরক্ষণে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলে উঠলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হলো বটে, কিন্তু কংগ্রেসের মত (Creed) বদলালো না। এই অধিবেশনই সর্বদল সম্মিলনীর প্রস্তাব পাস করিয়ে নেওয়া হতে বোঝা গিয়েছিল যে নেতাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্ত শাসনের একটি খসড়া সংবিধান রচনা করা। আশ্চর্য যে এর পরেও জওহরলাল কংগ্রেসের জেনেরেল সেক্রেটারি হয়েছিলেন! তিনি জানতেন জেনেরেল সেক্রেটারি হলে তাঁর হাত দিয়ে সর্বদল সম্মেলনের খসড়া সংবিধানও যায় হবে।

যে অধিবেশন হয়েছিল তার সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তিনি শর্ত করে ছিলেন, তাঁর নামীয় কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করতে কংগ্রেস রাজি হলেই তিনি সভাপতিত্ব করবেন, নতুবা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বাঙালী কংগ্রেসওয়ালারাও তাঁকে অমত করেন নি। আসলে মাদ্রাজের পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রস্তাব পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এক রকম বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর, সমস্ত সংবিধান রচনা করার জন্যে সর্বদল সম্মিলনীর তরফ হতে একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। এ সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। এ কমিটি যে খসড়া সংবিধান রচনা করেছিল তা "মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্ট" নামে খ্যাত হয়েছিল কলকাতা কংগ্রেসে এই রিপোর্ট গ্রহণ করানোই ছিল বড় নেতাদের মুখ্য কাজ। কারণ, এটা গৃহীত হলে মাদ্রাজে গৃহীত পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

আপনার পছন্দমত সেরা কালি

রেনবো
ইঙ্ক

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
২/২ এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, • কলিকাতা-১

গান্ধীজী শক্তি সঞ্চয় করে কলকাতায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও নেহরু রিপোর্ট পাস করাতে তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। যে-দিন রাত্রে সবজেক্ট কমিটিতে ভোট হলো সে দিন দেখা গেলো পণ্ডিত জওহরলাল সভায় উপস্থিত নেই। তাঁর অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ গান্ধীজী দিলেন। তিনি জানালেন, "জওহরলাল বড় মনোবেদনা পেয়েছেন এবং সারাদিন কেঁদেছেন"। (স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত। লেখক এবারেও অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন)। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল হতে চলেছে বলেই তিনি নাকি কেঁদেছিলেন। কংগ্রেসের জেনেরেল সেক্রেটারি হিসাবে তিনি ভালভাবেই জানতেন কংগ্রেসে কলকাতা অধিবেশনে কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু মাদ্রাজের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবক কলকাতায় কেন সেই প্রস্তাবেরই পক্ষে একটি ভোট দিলেন না? এই প্রশ্নের জওয়াব তাঁর আত্ম-চরিতে নেই।

সুভাষচন্দ্র বসু মতিলাল নেহরু কমিটির এক জন সভ্য ছিলেন। "তিনিও রিপোর্টে নাম সই করেন"। জেনে-শুনেই তিনি মতিলাল কমিটির সভ্য হয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে এ-রিপোর্টের সমর্থন করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবুও তিনি গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধে সবজেক্ট কমিটির সভায় "সুভাষ বাবু গান্ধীজীর দিকে ভোট দেন"। (উদ্ধৃতি দুটি ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" হতে নেওয়া হয়েছে)। এর পরে বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের চাপে পড়ে প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি উল্টো সুর গেয়েছিলেন, অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, কংগ্রেসের সবজেক্ট কমিটির অধিবেশনে যা পাস হয়ে যায় প্রকাশ্য অধিবেশনেও তাই ঠিক থাকে। পণ্ডিত জওহরলালও প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলেন। "আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলাম; আমার প্রতিবাদ অবশ্য ধিক্কার-সঙ্কুচিত হইয়াছিল"। (আত্ম-চরিত, তৃতীয় বাঙলা সংস্করণ, ২০১ পৃষ্ঠা)।

এই লেখায় আমি অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। ইচ্ছা করলে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি এ কথা বুঝাতে চেয়েছি যে রাজনৈতিক পার্টি সব সময়ে শ্রেণীভিত্তিক হয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ধনিক-জমীদার শ্রেণীর পার্টি। এই পার্টির মঞ্চকে আমরা কমিউনিস্টরাও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা অতীতে করেছি। আমাদের উপস্থিতিতে কংগ্রেসের শ্রেণীগত চেহারার কখনও পরিবর্তন ঘটেনি। কংগ্রেসের শ্রেণীস্বার্থে যাঁরা আস্থা হারিয়েছেন তাঁদের অনেকে আমাদের দিকে চলে এসেছেন মাত্র। কংগ্রেসের ভিতরকার নরম দল ও গরম দলের কথা যতই বলা হোক না কেন, তার কোনও দলই কংগ্রেসের শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে নয়। আমি একজন পথের ভিখারী হতে পারি, কিন্তু যে-শ্রেণীর পার্টিতে আমি আছি সে-শ্রেণীর স্বার্থ আমারও স্বার্থ। আমি যদি শুধু বুর্জোয়া পার্টির সভ্য হই তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ আমারও স্বার্থ হবে।

জওহরলাল তাঁর আত্ম-চরিতে লিখেছেন :—

"আমার রাজনীতি, আমার শ্রেণীর অর্থাৎ বুর্জোয়া-রাজনীতি। অবশ্য তখন (এখনও বহুল পরিমাণে) রাজনৈতিক আন্দোলন মধ্য শ্রেণীর আন্দোলন। কি মডারেট, কি চরমপন্থী—একই শ্রেণীভুক্ত এবং স্বীয় শ্রেণীগত উন্নতিতে আগ্রহান্বিত; কেবল পথ বিভিন্ন।" (তৃতীয় বাঙলা সংস্করণ, ৫২ পৃষ্ঠা)।

খবরটা প্রথম কী করে ছড়াল তা কেউ জানে না। সন্তোষের চায়ের দোকানে অথবা লাইব্রেরীতে—কিংবা সোমেদের রকে যে আড্ডা বসে সেখানে—ঠিক কে কাকে খবরটা দিল তা কেউ মনে করে রাখে নি। কিন্তু—যাকে বলে বিদ্যুৎ-বেগে ছড়িয়ে পড়া—ঠিক সেই ভাবেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল—পাড়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। অবিনাশ বাবু মারা গেছেন। গতকাল রাত্রে যেমন খাওয়া দাওয়া করে শুতে যান তেমনিই গিন্নি ছিলেন—অন্যদিন চাকর ওঠবার অনেক আগেই উঠে পড়েন, ঠিক চারটেয় নাকি ওঠা অভ্যাস, আজ চাকর উঠে দেখেছে তখনও তিনি ঘুমোচ্ছেন। শরীরটা হয়ত খারাপ হয়েছে মনে করে সে ডাকে নি। কিন্তু আরও আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পরও সাড়া-শব্দ না পেয়ে সে একটা উদ্বেগ বোধ করেছে, কারণ অবিনাশ বাবুর পক্ষে এ অনিয়ম একেবারেই অঘটন। চাকর নবগোপালের স্মরণকালের মধ্যে এমন ঘটে নি। তা ছাড়া প্রত্যহ উঠে প্রাত্যহিক কাজ সেরে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় একবার চা খাওয়া অভ্যাস অবিনাশ বাবুর—চায়ের জলও প্রস্তুত হয়ে গেছে—সুতরাং অনেক ইতস্তত করে সে বাবুকে ডাকাই স্থির করেছিল। কখন কী দরকার হয় মনে করে ইদানীং ভেতরের দিকের একটা ঘরেই নবগোপালের শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন অবিনাশবাবু. মধ্যে দরজাটা ভেজানো থাকত শুধু—ডাকবার কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ডাকতে গিয়েই নবগোপাল আবিষ্কার করেছে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে তাঁর দেহ। পায়ে হাত দিয়ে দেখেছে বরফের মত ঠাণ্ডা।

তারপর?

তারপর এই খবর দেখতে দেখতে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়বে এইটেই তো স্বাভাবিক।

অবিনাশ বাবু এ পাড়ার—পাড়ার কেন এই গোবিন্দপুর গ্রামেরই অনেকখানি। আজ হয় ওটা কলকাতার অন্তর্ভুক্ত, পৌঁছে অফিস বলতে কলকাতা শহরটার পাশে একটা অঙ্ক দিয়ে আজকাল এরা গর্ব করে—কর্পোরেশনও এসে গেছে এ পর্যন্ত, তবুও এটা এককালে গ্রামই ছিল। আর সেই সময় থেকেই অবিনাশবাবু এখানকার অনেকখানি স্থান জুড়ে আছেন। অবিনাশবাবু চব্বিশবছর বয়সে বিবাহ করে ছাব্বিশবছর বয়সে বিপত্নীক হয়েছিলেন, তারপর আর বিবাহ করেন নি। বলতেন যে, 'অদৃষ্টে যদি ওটা থাকত তাহলে ঐ প্রথমটাই টিকে থাকত—তা যখন থাকে নি তখন অদৃষ্টে নেই বুঝতে হবে। বার বার পরীক্ষা করে দেখার আর শখ নেই আমার।' সুতরাং যা কিছু উদ্যম কর্মশক্তি এবং অর্থ সবই তিনি ব্যয় করেছেন এই পল্লীর উন্নতির জন্য। বিশেষ কেউ ছিলও না অবিনাশবাবুর। এক দিদি, তাঁর বিবাহ হয়েছিল সুদূর জয়পুরে। খুব কম হ'লেও পাঁচ ছ বছরের ব্যবধানে দেখা হ'ত। ভগিপতি জয়পুর-মহারাজের সরকারে খুব বড় চাকরি করতেন, অবস্থা ভাল, সময় কম। সুতরাং যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল না। ভাগ্নেরাও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে জীবনে—তাদের কারুরই অবিনাশবাবুর সামান্য বিষে

লোভ ছিল না। বরং তাঁরা বহুবার বলেছেন ওঁকে তাঁদের কাছে গিয়ে থাকতে, উনিই এই পল্লীর মায়া কাটিয়ে যেতে রাজী হন নি। মা যতদিন ছিলেন ততদিন সংসার দেখার অসুবিধা ছিল না। মাও মারা গেছেন দীর্ঘকাল—তারপর থেকেই ভৃত্য-রাজক তন্ত্র। সেদিক দিয়ে অবিনাশবাবু খুব ভাগ্যবান। কেউ কেউ যে মধ্যে মধ্যে জ্বালায় নি তা নয়—হাকও খুব ভাল চাকর ছিল, কিন্তু একবার ক্ষেপে গেলেই তার ছ মাস দেড় হ'ত সেই সময়টা দুর্দশার শেষ থাকত না—কিন্তু জীবনের এই শেষ কটা বছর নবগোপালকে পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। এরও নাকি তিন কুলে কেউ নেই, তাই ছেড়ে যাবার জ্বালাই ছিল না। ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা মধ্যে মধ্যে আসত, দু-একদিন কাটিয়ে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে চলে যেত, নবগোপাল কখনও দেয় না। আর ওর অসুখ-বিসুখও হত কম। অবিনাশ বাবু রসিকতা ক'রে বলতেন—'নব আমার আইডিয়াল গৃহিণী। স্ত্রীর যে অসুবিধা, ঝামেলা এবং জ্বালা আছে তা ওর নেই, অথচ সাভিস—আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কোন সুগৃহিনীও এত দিতে পারবে না।'

সুতরাং অবিনাশবাবু নিশ্চিন্ত হয়েই জনসেবা বা এই পল্লীসেবা করতে পেরেছিলেন।

ভাল সরকারী চাকরী ছিল। পেনসন পেয়েছেন ভাল। সে টাকার সবটাই তিনি এই গ্রাম বা (এখন) পাড়ার জন্য খরচ করেছেন বলতে গেলে। নিজের ব্যয় ছিল সামান্য। আলার বরাবরই পরিমিত, বিলাসব্যসন বলতে গেলে শুধু বই পড়া—তাও কিনতেন খুব কম, দুটো তিনটে লাইব্রেরীতেই কাজ চলত। পান-সিগারেটও খেতেন না। বাড়ির লোক বলতে ঐ চাকর। কারুর জন্য রেখে যাওয়ার কথাও ভাবতে হয় নি। নবগোপালের জন্য একটি ওল্ড এজ-পেনসন কিনিয়ে রেখেছেন এক বীমা কোম্পানীতে, আর তাঁর সংক্ষিপ্ত উইলে নির্দেশ আছে যে যতকাল সে বাঁচবে—ইচ্ছা করলে এই বাড়ির যে কোন একটা ঘর নিয়ে থাকতে পারবে। বাড়িটা স্থানীয় মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারবে—ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারও থাকবে তাদের। কাশীতে ওঁদের একটি পৈতৃক বাড়ি ছিল, শুধু সেইটে দিয়ে গেছেন তাঁর বিধবা ভাগ্নীকে। অবশ্য সেটা উইল করবারও আগে—সে বিধবা হয়ে এসে কাশীতেই বসবাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র তা দানপত্র ক'রে দিয়ে দিয়েছিলেন তাকে।

কাজেই টাকা তিনি অনেকখানিই এখানকার কাজে ব্যয় করতে পেরেছেন। ইস্কুলের বাড়িতে ঝোঁক দিয়েছিলেন দশ হাজার টাকা, তাছাড়াও মাসে মাসে দুশো টাকা করে দিয়ে গেছেন, যতদিন না যুদ্ধের বাজারে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইস্কুল স্বাবলম্বী হয়েছে—ততদিন। মেয়ে ইস্কুল যখন আলাদা করার দরকার হ'ল তখন তারও জমিটা কিনে দিয়েছেন অবিনাশ বাবু। লাইব্রেরীর বাড়ি করার সময়ও এক হাজার টাকা দিয়েছেন, আর বই এবং আলমারি যে কত দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ওঁর সর্ব শেষ কীর্তি হচ্ছে—মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান। এতেই তাঁর সামান্য যা কিছু সঞ্চয় অবশিষ্ট ছিল সব চলে গেছে—তাছাড়া মাসে মাসে পেনসনের টাকা থেকে সামান্য কিছু নিজেদের জন্য রেখে সবটাই দান করে গেছেন—গত মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে দুটি মাত্র শর্ত তিনি করে-ছিলেন—মেয়ে ইস্কুলের সঙ্গে তাঁর মার নাম, আর মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর নাম যুক্ত থাকবে। এতখানি দানের এইটুকু প্রতিদান দিতে কেউই দ্বিধা করে নি—তা বলা বাহুল্য। তাঁর বালিকা বধূ প্রথম প্রসব হতে গিয়েই মারা গিয়েছিল—এ রকম ক্ষেত্রে প্রসূতিকে বাঁচাবার চেষ্টাটা সেদিন এখানে ছিল হাস্যকর রকমেরই স্বল্প—সেটা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি।

সুতরাং এ-হেন অবিনাশবাবুর মৃত্যু সংবাদ সারা পল্লীতে একটা গভীর রকমের আলোড়ন আনবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। লাইব্রেরী সবে খোলা হয়েছিল—সংবাদটা সেখানে পৌঁছবামাত্র বন্ধ করে দেওয়া হল—একটা কাগজে চওড়া কালো বর্ডার দেওয়া মৃত্যু সংবাদটা সিদে বাইরের বড় দরজাটায় লাগিয়ে দেবার পর। ইস্কুলও প্রায় খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করতে হল—কিন্তু ছেলে-মেয়েদের অপেক্ষা করতে বললেন প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা। স্কুল কিনতে

লোক ছুটল সর্বত্র—লেক মার্কেট, সাউদার্ন মার্কেট, গড়িয়াহাট মার্কেট। লাইব্রেরীর তরফ থেকে, দুই ইস্কুলের তরফ থেকে, মাতৃমঙ্গলের তরফ থেকে তো বটেই—এ ছাড়া পাড়ার অগণিত ক্লাব আছে—ব্যক্তিগত তরফ থেকেও দেবেন।

মোটামুটি যাঁরা সব ব্যাপারেই মাথা গলান—তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন। স্থির হ'ল এখানকার প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবগুলো অন্তত একসঙ্গে একটা মিছিল ক'রে গিয়ে ফুল দেবেন শবে। যতটা পারা গেল খবরটাও ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। যারা সকালেই অফিস যান তাঁরা যাওয়া স্থগিত রাখলেন—বেলায় যাঁরা যান তাঁদের তো কথাই ওঠে না। বিরাট একটা শবযাত্রা বার করা দরকার। ফোটো গ্রাফারদের খবর দেওয়া হ'ল। একটা মুভি-ক্যামেরার কথাও বললেন কেউ কেউ। এ পাড়ার লোক অকৃতজ্ঞ এমন কথা না কেউ বলতে পারে—সে সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। শুধু বাকী রইল বোধাই খাটটা, সেটা কেনবার টাকাটা কে দেবে কেউই মুখ ফুটে কাউকে প্রশ্ন করতে না পারায় স্থির হ'ল, যে ব্রত ওঁর বাড়িরই কোন খাটে সে কাজ সারা যেতে পারে। যাই হোক, আগে ওঁর বাড়িতে গিয়ে যা হয় ঠিক করা যাবে।

প্রথমে যে দল ফুল মালা ও রীল্ হাতে ওঁর বাড়িতে পৌঁছলেন তাঁরা প্রথম ধাক্কা খেলেন বাইরে থেকে নবগোপালকে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বাগানের একটা রজনীগন্ধা গাছের গোড়া নিড়োতে দেখে। এ আবার কি? কান্নাকাটি নেই—তা না-ই রইল, কোন নিকট আত্মীয়ই যেখানে কাছাকাছি থাকে না সেখানে কে-ই বা কান্নাকাটি করবে কিন্তু তা বলে নবগোপাল—সে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানে কাজ করবে—এটা কী রকম কথা!

সকলের আগে যিনি কণ্ঠস্বর খুঁজে পেলেন সেই ললিত রায় মশাই প্রশ্নটা করলেন, 'নবু, তোমার—তোমার বাবু?'

'বাবু?' খুরপিটা হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে উঠে কোমরটা সোজা করবার চেষ্টা করতে করতে জবাব দিলে নবগো 'বাবু তো ঐ দোপা বাইরের ঘরে।'

তারপর নিজেই ডাক দিলে, 'বাবু—এনারা সব কে কে এয়েছেন দেখুনসে বেরিয়ে।'

এবং তার কথা শেষ হবার একটু আগেই বরং—স্বয়ং অবিনাশবাবুই বেরিয়ে এলেন।

'কে যে নবু—? আরে এ কী ব্যাপার! ললিত যে—? ওকি, এ যে বিরাট দল! এত ফুল—বলি ব্যাপার কি?'

তারপর একটু এগিয়ে এসে, বোধকরি ওদের মুখের চেহারা দেখেই, একটা কুটিল সন্দেহ দেখা দিল তাঁর মনে।

'ললিত, এ—এ, কী ব্যাপারটা বল দিকি? তোমাদের মুখ-চোখই বা এমন থমথম করছে কেন, এত সব ফুল—কেউ, কেউ মারা গেছেন নাকি পাড়ায়? এসব কী কাণ্ড আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কেউই কোন জবাব দিতে পারে না। জবাব দেবার মত অবস্থা নেই কারুর। 'সামনে ভূত দেখা' কথাটা নেহাৎই শোনা ছিল সকলের এতকাল—আজ সেটার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হল! সকলেরই জিভ্ গেছে শুকিয়ে, মুখে কথা যোগাচ্ছে না।

অবিনাশবাবুই এগিয়ে আসেন আর খানিকটা।

'এই যে অজয় রয়েছ দেখছি। বলি, তোমাদের কি হল বল তো? কে মারা গেছেন? আমাদের প্রবীরদা নয়? কিম্বা সত্যদা?...আমাকে খবর দাও নি কেন? এ যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

যতীশ্বর ছেলেমানুষ, সে তত মনস্তত্ত্বের ধার ধারে না। সে ঘুম ক'রে বলে বসল, 'আজ্ঞে আপনি ভাল আছেন তো জ্যাঠামশাই? আমরা যে আপনার জন্যেই বরং—মানে আপনার সম্বন্ধেই একটু অন্যরকম খবর পেয়েছিলুম যে—'

অবিনাশবাবুর মুখখানা এইবার বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁরও যেন কথা বলার শক্তি যায় হারিয়ে। তিনি নিঃশব্দে বিমূঢ়ের মত বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু সে নিমেষমাত্র।

তারপরই প্রবল তৃপ্তিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর।

'ওহো, তোমরা ভেবেছিলে আমিই মারা গেছি?

তাই এমন মুখ করে ফুল নিয়ে এসেছিলে? কে এমন তামাসা করলে? আজ তো কই পয়লা এপ্রিলও নয়!'

এদের সকলকারই মুখের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। যতি কথাটা বললেও, বিস্ময় লজ্জা ও অপ্রতিভতার আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারে নি সে-ও। ততক্ষণে পর পর আরও বহু লোক এসে জমে গেছে। ফুলও বোধহয় কলকাতার এই ঘঞ্জির উপকণ্ঠে আর কোথাও নেই। ইডেন থেকে নিউ মার্কেটে লোক পাঠানো হয়েছিল ট্যাক্সী করে—সেও এসে পৌঁছেছে।

এদের সে লজ্জা ঢেকে নিলেন অবিনাশবাবুই। তিনিই এগিয়ে এসে প্রত্যেকের হাত থেকে একরকম জোর করে মালা তোড়া ও পুষ্পচক্রগুলো নিয়ে নিয়ে নবগোপালের হাতে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'আরে, তাতে কি হয়েছে। এত এত লজ্জার কথাই বা কি আছে? এ তো বরং ভালই হ'ল—মড়ার ওপর দিতিস তোরা আমি টেরও পেতুম না। এ আমি চোখে দেখে গেলাম তোরা, কত ভালবাসিস, কত পরচ করেছিস—কলকাতা শহর উজাড় ক'রে ফুল এনেছিস—এ ভাল হ'ল না? এ তামাসা যে-ই করে থাকুক সে আমার উপকারই করেছে। আমাকে একটি দুর্লভ সৌভাগ্য উপলব্ধি করতে সুযোগ দিয়েছে। শুধু এই বাচ্চাছেলে মেয়েগুলোর জন্যেই দুঃখ হচ্ছে—আহা বাছারে! এই রোদ্দুরে—ঘাম দিকি, গলদে গেছে সব!...ওরে অ নবগোপাল একটা কাজ কর না বাবা—যা যা দৌড়ে যা, হরিহরের দোকানে যা মিষ্টি পাবি সব নিয়ে আয়, এদের একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিই—দৌড়ো দৌড়ো—ফুলগুলো ধরে যাবে—বাকী আমি নিচ্ছি ওদের হাত থেকে!'

স্বভাবতই এরা আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। চারদিক থেকে ক্ষীণ ও প্রবল রকম প্রতিবাদই উঠতে লাগল। কিন্তু কোন কথাই শুনলেন না অবিনাশবাবু, বারবার হাতজোড় করতে লাগলেন সকলের কাছে, 'না ভাই, না বাবারা, এ আমার বড় আনন্দের দিন, বড় সৌভাগ্যের দিন। এদিনে মিষ্টিমুখ না করলে কবে করবে? আরে এ যে কত ভাল হ'ল তা তোমাদের বোঝাতে পারব না। এমন ভাগ্যি কটা লোকের হয়? তোমরা শ্রদ্ধা জানালে সেটাও যেমন আমি জেনে গেলাম—তেমনি প্রাণের মিষ্টিটাও আমার হাত থেকেই খেয়ে যাও। আর একটা অনুরোধ, এর পর যেদিন সত্যিই মরব—সেদিন আর কেউ পয়চ করে ফুল এনো না। সেটা তো এই ঘরে গেল!'

তিনি কিছুতেই কাউকে ছাড়লেন না। নিজে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে, ছেলেদের মধ্যে থেকে দুচারজনকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে টেনে নিয়ে সকলকেই প্রায় জলযোগ করিয়ে দিলেন। বলাবাহুল্য, শুধু হরিহরের দোকানে কুলোল না। হরিহরের দোকান, মাইতির দোকান, অন্নপূর্ণার দোকান—যেখানে যত মিষ্টি ছিল সব উজাড় ক'রে আনা হ'ল। সকলের সব রকম সমান মিলল না—কিন্তু সে তো আর সম্ভবও নয়। সেই কথাই সবিনয়ে সবাইকে বলে ক্ষমা চেয়ে চেয়ে নিতে লাগলেন অবিনাশবাবু, এমন কি ছোটদের কাছেও।

সত্যিই তাঁর বড় আনন্দ হয়েছিল। আনন্দেই চোখে জল এসে পড়ছিল বারবার—আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায়। হাসিমুখে ছলোছলো চোখে অবিনাশবাবু যেন দশবারো বছরের ছেলের মত ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

বিকেলের দিকে পাড়ায় রীতিমত 'ইনকোয়ারি কমিশন' বসল। মাতব্বররা সবাই এসে জড়ো হলেন ললিত রায় মহাশয়ের বিরাট বৈঠকখানায়। এমন অভূতপূর্ব ঘটনা কখনও ঘটে নি, কারুর স্মরণকালের মধ্যেই না। এরকম অপ্রস্তুতও কেউ হয়নি কখনও। ছি ছি! কী লজ্জা, তাঁরা একটা জীবিত লোকের জন্য ফুল মালা কিনে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন—একটু খবরও না নিয়ে। ভাগ্যিস বোম্বাই ঘাটখানাও নিয়ে যান নি।...এখন যেন নিজেদের বড় বেশী নির্বোধ বোধ হচ্ছে কিন্তু তখন তো কোনপ্রকার সন্দেহ করার কথাও মনে পড়ে নি কারুর।

আর সত্যিই—ব্যাপারটা তো অপ্রত্যাশিতও নয়। সাতাত্তর আটাত্তর বছর বয়স হয়েছে অবিনাশবাবুর, কিম্বা হয়ত আরও দু-এক বছর বেশী। হয়ত পুরো আশিই হবে। সুতরাং তিনি মারা যাবেন এটা এমন কিছু অভাবনীয়ও নয়, বিস্ময়করও নয়। আর পরিণত

বয়সে এই রকম মৃত্যুই তো স্বাভাবিক। এইতো সেদিন পাড়ার কিরণ ঘোষ, কলকাতার রাজশেখরবাবু—এই একই রকম ভাবে ঘুমের মধ্যে হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন। অবিনাশবাবুর মত পরোপকারী নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় লোকের এইরকম মৃত্যুই তো কাম্য, ঈপ্সিত। সুতরাং কেন সন্দেহ হবে। আর ওঁর মত মানুষের মৃত্যু নিয়ে তামাশা করবে এমন পাষণ্ডই বা কে আছে।

তবু কেউ যে করেছে—এটা তো নিশ্চিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে করল এ কাজ।

কে শুনল প্রথম, কার কাছ থেকে?

এই প্রশ্নই সকলে করতে লাগলেন সকলকে।

পাড়ার রামেশ্বরবাবু বড় উকীল, সামান্য একটু তদ্বির করলেই জজ হ'তে পারতেন এমনি একটা গুজব চলছে বহুকাল থেকে। তিনিই আজকের এ অনুসন্ধান সমিতির স্বয়ংবৃত 'চেয়ারম্যান' হলেন। অর্থাৎ জেরা করার বেশীর ভাগ দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করলেন।

এমন জিনিস কিছুতেই চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এর একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজন। সবচেয়ে খুস দুটোর অবস্থা চিন্তা ক'রেই আরও সকলে বিচলিত বোধ করছেন। এক গাদা টাকা খরচ ক'রে বসে আছে তারা—এ খরচের হিসাব দেখাবে কী করে? যে মানুষ মরে নি তাকে অন্তিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে এই খরচ হয়েছে—এ যে কোন অডিটারই মানতে চাইবেন না!

সুতরাং সকলেই বিষম ব্যস্ত, বিষম উদ্বিগ্ন—ক্ষুব্ধও। সকলেই জানতে চান যে এমন কাণ্ড কে করলে?...

জেরার পর জেরা ক'রে যান রামেশ্বরবাবু, খুস প্রশ্নের কোন জবাব মেলে না। সত্য থাকে রহস্যাবৃত।

অনেকেই মনে করতে পারছেন না ঠিক কার কাছ থেকে প্রথম শুনেছেন কথাটা।

যাঁদের মনে পড়ছেও, তাঁরা যাঁর কাছ থেকে শুনেছেন তাঁদের নাম মনে করতে পারছেন না হয়ত।

একজন আর একজনের কাছ থেকে শুনেছে, সে অপর একজনের কাছ থেকে—এমনি অনন্ত-বিস্তার এই সংবাদ-সরবরাহপথের।

কিন্তু রামেশ্বরবাবুরও এমনি খ্যাতি হয় নি।

তিনি ধৈর্যসহকারে একজনের পর একজনকে ডাকতে লাগলেন ও জেরা করতে লাগলেন। বহুলোক এসেছিল, আরও বহুলোক এল। যারা আসেনি তাদের ডেকে পাঠানো হল। যাদের আসা সম্ভব নয়—তাদের কাছে লোক পাঠানো হল। অবশেষে আরেকক্ষণ পরে—সন্ধ্যা ছটা থেকে শুরু হয়েছিল তদন্ত—রাত সাড়ে নটারও পরে এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে, পাড়ার সরকারী ইঞ্জিনিয়ার সন্তোষবাবু প্রথম এই খবরটি পান টেলিফোনে, তিনি ডেকে বলেন অবিনাশ বাবুকে, তিনি অন্তত জনদশেককে বলেন—এইভাবেই খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। সন্তোষবাবু নিজেও আর কয়েকজনকে বলেছেন। সংবাদপত্রেও খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন নি, একটা জরুরী ইন্‌স্‌-পেকশানে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল বলেই এতক্ষণ এই সূত্রটা ধরতে পারা যায় নি।

না—টেলিফোন যে করেছে তা তিনি জানেন না। জিজ্ঞাসা করবার কথা মনেও হয় নি তাঁর। সংবাদটা এতই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত যে কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন—এরকম প্রশ্নের কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে নিয়েছেন যে হয় ডাক্তার নয় পাশের বাড়ির কেউ কিম্বা কোন বন্ধু বা আত্মীয় টেলিফোন করছেন। নিশ্চয় যাদের যাদের ফোন আছে তাদেরই জানানো হচ্ছে, খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে দেবার জন্যে। সেই ভেবেই তিনি যতদূর সাধ্য সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে এই প্রচণ্ড দুঃখের সংবাদের সামনে দাঁড়িয়ে সংবাদদাতার পরিচয় নেবেন—এতটা হৃদয়হীন তিনি নিশ্চয়ই নন।

অতএব—এই নিরুত্তর যক্ষদেবতার সামনে এসে সকল প্রশ্ন, সকল অনুসন্ধানকে থামতে হ'ল। এ রহস্যের কোন কিনারাই হ'ল না। সে ফোন কোথা থেকে কার বাড়ি থেকে এসেছিল সেটা এমন কি টেলিফোন অফিসেও তো জানা সম্ভব নয়!

সকলেই বিমূঢ়ের মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাত দশটা বেজে গেছে। আর কোনমতেই দেরি করা সম্ভব নয়। ললিত রায় মশাই-এর বাড়িতে আত্মপীড়া ঘটানো হচ্ছে এমনিতেই—ওঁরা সবাল করে শুয়ে পড়েন। হেডমাষ্টার মশাই (এবং মেয়ে ইস্কুলের

সেক্রেটারী) চন্দরবাবুর দুশ্চিন্তাই সব চেয়ে বেশী। তিনি গম্ভীর ও ভ্রূকুটি-কুটিল মুখেই আস্তে আস্তে নমস্কার ক'রে বিদায় নিলেন। খরচটা অডিটারকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে তবে পাকাপাকি লিখতে হবে—অর্থাৎ কোন্ খাতে লিখলে তিনি আপত্তি করবেন না।

অনেকেই এবার অনেককে সন্দেহ করতে লাগল। সকলেই যেন সকলের মুখের দিকে বারবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কিন্তু কেউই মুখ ফুটে বলতে পারল না কিছু। নিরুচ্চারিত রইল সকলের কণ্ঠের-কাছে-ঠেলে ওঠা অজস্র জিজ্ঞাসা।

একসময় জমায়েত ভাঙতেই হ'ল।

শুধু যতীশ্বরটাই দুম করে প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আচ্ছা, অবিনাশবাবুর বাড়ি ফোন আছে না?'

'হ্যাঁ—তা তো আছে। তাতে কি?' অসহিষ্ণুভাবেই কে যেন জবাব দিল।

'বুড়োই করেনি তো ফোন—মজা দেখবার জন্যে, মানে আমরা কে কি করি, ওর জন্যে সত্যিকারের শোক প্রকাশ করি কিনা দেখবার জন্যে?'

চারিদিক থেকে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল সবাই। যতীশ্বরটা যেমন চ্যাংড়া—তেমনি চ্যাংড়ার মতই কথা বলেছে। সেই লোক কিনা অবিনাশবাবু! এতকাল দেখে যতি কি তাঁকে এইরকমই চিনেছে?

সমবেত জনতার প্রতিবাদের সামনে চুপ ক'রে যায় যতীশ্বর। হয়ত একটু লজ্জিতও বোধ করে নিজেকে।

সেদিন দুপুরে আর অবিনাশবাবুদের রান্না-খাওয়া হ'ল না। ভাত চাপিয়ে বাগানে কাজ করছিল নবগোপাল—সে ভাত পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে—এসব ঝঞ্ঝাটে কারুর মনেও পড়ে নি সে কথা। তারপর তো ঐ রাজ্যের হৈ-হৈ। খাবারই যেখানে এল দুশ একান্ন টাকা চার আনার—নিজে হাতে বিকেল বেলা সকলের টাকা মিটিয়ে এল নবু—সেখানে পাতা চুপড়ি কী পরিমাণ পড়বে তা অনুমেয়। সেই এঁটো পাতা, রস, মাটির হাঁড়ি, গেলাস ভাঁড় ইত্যাদি ফেলে, বাড়িটা ধুয়ে-মুছে চলনসই ক'রে, স্নান ক'রে আসতেই নবুর বেলা দুটো আড়াইটে বেজে গেল। রান্নাটা করে কে? সেকথা আর উত্থাপনও করলেন না অবিনাশবাবু। নিজেই বাজারে গিয়ে চিঁড়ে-দই কিনে আনলেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে দিলেন—দুজনে বেলা তিনটের সময় সেই চিঁড়ে-দই খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। ওরই মধ্যে থেকে গোটা তিনেক রসগোল্লা ও খান-দুই জিলাপী বেঁচেছিল, সেগুলো সবই অবিনাশবাবু জোর ক'রে নবগোপালের পাতে ঠেলে দিলেন। বললেন, 'ভাল ক'রে খা। আমার সত্যিই আজ বড় আনন্দের দিন। বড় খুশী হয়েছি আমি আজ। ছাখ, বেইমানীর যুগ চলছে এটা, এই যুগেও যে এতখানি কৃতজ্ঞতা আছে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। অবশ্য এটা আমি যে প্রত্যাশা করে কিছু করেছিলুম তা নয়—তবু আনন্দ হয় বৈকি। বরং বেশীই হয়—প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী পেয়ে।'

তারপর উঠে আঁচাতে আঁচাতে বললেন, 'ওবেলা আর ভাত ক'রে দরকার নেই। সেদিন ছোলার ডাল করতে চাইছিলি, লুচি আর ছোলার ডাল—আজই করিস রাত্রে। আর একটু রাবড়িও আনিস। ভাল ক'রে সেলিব্রেট করতে হবে অকেশনটা!'

'সেটা আবার কি?' শেষের ইংরেজী কথাগুলো বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে নবগোপাল।

'এই একটা কিছু করা আর কি। আমোদ। আমোদ বুঝিস না?...আবার আজ একাদশীও তো পড়ে গেছে দেখলুম কিনা—যখন ভগবান ভাতটা এবেলা খেতে দিলেন না—তখন আর আজ না-ই খেলুম!'

হাসি হাসি মুখে অবিনাশবাবু নিজের ঘরে চলে যান।

নবগোপাল তাঁর মুখের ওপর কিছু বলে না—আড়ালে গজ গজ করতে থাকে। এইসব অলুক্ষণে অমুদুলে ভারতছাড়া কাণ্ড তার একটুও ভাল লাগে নি। কী যে বাবু এই নিয়ে সকাল থেকে আদিখ্যেতা করছেন তাও সে বুঝতে পারছে না। আর লোকগুলোও হয়েছে সব তেমনি। কাকে কান নিয়ে গেল শুনলে তো তার পিছনে পিছনে ছোঁড়ল—কানে হাত দিয়ে ছাখ আগে কান আছে কি নেই, তা নয়!

তাছাড়া তার খাটুনীটাই কী বড় যে-সে হল! বাবুর আর কি—হৈ হৈ ক'রে নেচেকুঁদেই খালাস।

কিন্তু তার এ গজগজানি অবিনাশবাবুর কানে গেল

না। গত কয়েক বছরে দুপুরে একটু ঘুমোনো অভ্যাস হয়ে গেছে, তাও ঘুমোলেন না। বরং বহুকাল পরে জায়ে-ভাদ্রীদের চিঠি লিখতে বসলেন তিনি। এমন কাণ্ডটা সবাইকে বলতে না পারলে যেন তাঁর শান্তি হচ্ছিল না।

বিকেলবেলা ঘর ঝাঁট দিতে এসে নবগোপাল প্রশ্ন করল, 'তাহলে ফুলগুলো এবার ফেলে দিই বাবু, কী বলো?'

'বলিস কি?' যেন ঝাঁৎকে ওঠেন অবিনাশবাবু, 'ফেলে দিবি কিরে?'

'তা শুকনো ফুলগুলোও কি তাংড়ে রেখে দিতে হবে? ঘরে আপনি শোবে কোথায়? সবতো ভরে গেছে। যেগুলো শুকিয়ে গেছে—'

'না না। এখনও কিছু শুকোয় নি। ও থাক।... আজকেও রাত্তিরে দেখবি কেমন খোসবো ছাড়বে। অত দামী ফুল একদিনে শুকোয় বুঝি?'

নবগোপাল উত্তর দেবে কি, তৎক্ষণে বাবুর কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। যত ফুলের তোড়া, রজনীগন্ধার গোছা এসেছে—সবগুলোকেই বাবু সারা দুপুর ধরে জলে বসিয়েছেন। পেতলের কলসী, হরেক রকমের ফুলদানী সব তো টেনে বার করেছেনই, এর মধ্যেই বাজার থেকে কখন গিয়ে রাজ্যের মাটির কলসী কিনে এনে তাতেও জলভরে ভরে ফুল রেখেছেন।

সে হাত ও কাঁধের একটা বিচিত্র হতাশ ভঙ্গী ক'রে বেরিয়ে গেল। এ ঘর ঝাঁট দেবার কোন মানেই হয় না।

সে রাত্রে একটু সকাল ক'রেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন অবিনাশবাবু। নবগোপালকে বললেন, 'তুইও খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি। সেই দুপুর রাত পর্যন্ত খুটখাট করিস—ঘুম ভেঙে ভেঙে যায়। আজ শরীরটা বড্ডই খারাপ বোধ হচ্ছে—এখনই শুয়ে পড়ব। সদর দরজায়, গেটে সব তালা দিয়েছিস!'

সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নবগোপাল বললে, 'শরীরের আর অপরাধ কি বল, সারাদিনটা যা নাচানাচি ক'রে বেড়ালে আপনি! তা শোও শোও, শুয়ে পড়—আমারও এসব গোছানো রইল, যা করব কাল সকালে তখন আমিও এই বাতি নিবোলুম ব'লে!'

তার কী মনে পড়ে যাওয়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা ফুলগুলো কি এই এতের বেলায়ও ঘরে থাকবে—দ্যাও বাবু!'

'ওমা, রাত্তির বেলায়ই তো বেশী খোসবো রে। আর দিকি ঘর মৌ মৌ করছে একেবারে। এখনই তো ওর দাম।'

'কে জানে বাবু, বলে এতের বেলা বিছানায় কা ফুল থাকলে তানের ভয় হয়!'

'দ্যা, তোর মাথা হয়। এই বুড়ো বয়সে আমার ওপর ডাইনীর ভর হচ্ছে! যা যা—বাসন-কোসন ঘরে তুলে শুয়ে পড়গে যা।'

তিনি আর কথাটা বাড়ালেন না। বাড়তে দিলেনও না। আঁচিয়ে এসে মাঝের ঘরের—অর্থাৎ যে ঘরে নবগোপাল শোয় আজকাল—সেই ঘরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তখনই আলো নিভিয়ে দিলেন।

শোওয়ারই ভূমিকা এটা। কিন্তু তখনই শুতে গেলেন না। জানলার ধারের ইজিচেয়ারটায় বসলেন। চাঁদনী রাত—বাইরে তাঁর জমি সামান্যই, তাকে বাগান বলা বিড়ম্বনা, তবু সেদিকে চেয়েই বড় ভাল লাগল তাঁর। পাতাবাহারের গাছে, পুষ্পিত কামিনী গাছটার ওপর চাঁদের আলো পড়ে কী সুন্দরই দেখাচ্ছে।

বাইরের দিকেও তাকালেন একবার। একতলা বাড়ি, শহরতলীর সংকীর্ণ রাস্তার ওপর—সুতরাং বেশী দূর দেখা সম্ভব নয়। তবু যেটুকু দেখা গেল ভাল লাগল তাঁর। এই গ্রাম এই পল্লী বড় প্রিয় তাঁর—চিরকাল এদের ভালবেসে এসেছেন। এই গ্রাম আর এই গ্রামের লোকদের। সে ভালবাসার প্রতিদানও দিয়েছে তারা —তারা যে অকৃতজ্ঞ নয়, তারা যে তাঁর সারা-জীবনব্যাপী সেবা ভোলে নি—সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন। মন ভরে গেছে তাঁর। তিনি তৃপ্ত হয়েছেন।

এইবার যদি মরে যেতে পারতেন—সত্যি সত্যিই মরতে পারতেন তো ভাল হ'ত। আর কিছু চান না তিনি, আর কিছু পৃথিবীর কাছে পাওনা আছে ব'লেও মনে করেন না। তাঁরও কিছু করবার নেই, দেবার নেই

ক'টকে কিছু। তবে আর কেন? এসেছেনও তো বহুকাল। ওঃ, সে যে কতকাল তা যেন আজ আর ভাল ক'রে মনেও পড়ে না। একা এই দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবন বহন করা, এ যে কী গুরুভার—তা তিনিই জানেন। আর পারেন না—ক্লান্তি এসেছে। জন্মে যাদের দেখেছেন তাদের আর কাউকেই তো মনে নেই ভাল ক'রে বাবা, মা, দিদি, জামাইবাবু—সে সব যেন কোন অতীত জন্মের লোক! আর ছবি—তাঁর স্ত্রী, সে তো শুধু আজ তাঁর মনে একটা জনশ্রুতিমাত্র। কেউই নেই, কত কাল আগে চলে গেছে সবাই—শুধু তিনিই বা এতকাল বাঁচতে গেলেন কেন? বিধাতার এ কি রসিকতা তাঁকে নিয়ে!

অথবা তাঁকে দিয়ে, তাঁর ঘাড় ধরে এইসব কাজ করিয়ে নেবেন ব'লেই এমন ভাবে তাঁকে বিক্ত বঞ্চিত করেছেন—কে জানে! কিন্তু তাই যদি উদ্দেশ্য হয়—সেও তো সফল হয়েছে। আর কেন? এবার ছুটি দিন বিধাতা!...

ওধারের ঘরটা বন্ধ চাবি দেওয়ার শব্দ অনেকক্ষণ থেমে গেছে—পাশের ঘরেও শব্দ বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টায় ক্ষুদ্র অতি মৃদু খুট-খাট আওয়াজ—নবগোপালের মশারী টাঙাবার প্রয়াস—তাও বন্ধ হয়ে গেছে। নবগোপাল শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

অবিনাশবাবু মাঝের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

নাঃ, আর কোন সাড়া নেই, সানাচ্ছ নাক ডাকার একঘেয়ে একটা শব্দ ছাড়া। নবু ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই একটা ওর মহৎ গুণ—এখনও এই বয়সেও শুলেই ঘুমিয়ে পড়ে—অবিনাশবাবুর মত বিছানায় শুয়ে আধঘণ্টা ধরে সাধা-সাধনা করতে হয় না।...

অবিনাশবাবু আবার আলো জ্বাললেন। না—বড় আলোটা নয়, ছোট কম-শক্তির নীল আলোটা। এটা রাত্রে জেলে রাখারই কথা—কিন্তু তিনি খুব কমই জ্বালেন। যেদিন সন্ধ্যায় শুধু ইজিচেয়ারটায় চুপ ক'রে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে—সেইদিনই এটা জ্বলে।

তবু এতে আবছা আবছা দেখা যায় বেশ।

তিনি এবার বিছানার নীচে থেকে চাবি বার ক'রে সেখাটীটা খুললেন। থরে থরে কাপড় জামা সাজানো আছে। আজকাল আর প্রয়োজনই হয় না এসবের। একটা খদ্দরের ধুতি নেহাৎ ই, এই হ'লেই দিন কেটে যায়। যখন ঘোরাঘুরি করতে হত তখনকার দিনের জামা এসব, অফিসের সময়কার কোটগুলো পর্যন্ত এখনও আছে।

কিন্তু তারও নীচে থেকে অনেক ঘেঁটে তিনি বার করলেন একটা গরদের পাঞ্জাবী, শেষ বেবার দিদি তাঁর জীবদ্দশায় কলকাতায় থাকেন, সেই সময় ভাই-ফোঁটা করেছিলেন এই দিয়ে। সাদা দুধে-গরদের পাঞ্জাবী আর কালোপাড় ফেঁপে ধুতি। সেই দুটোই খুঁজে বার করলেন তিনি—তারপর আবার আলমারী বন্ধ ক'রে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দিলেন।...

ধুতি পাঞ্জাবী পরে আটপৌরে খদ্দরের গাটো ধুতিটা বিছানার পাশের চেয়ারে সযত্নে পাট ক'রে রেখে দিলেন। ভোরবেলা নবু দেখবার আগেই এসব বেমানান ছেড়ে ফেলতে হবে। এ ছেলেমানুষী না প্রকাশ পেয়ে যায় ওর সামনে। গল্প করবে না ওকে কাছে এটা ঠিক—তবু মনে মনে নিজেও তো হাসবে। সে বড় লজ্জা।

দেশী ধুতি গরদের পাঞ্জাবী পরে আয়নার সামনে এসে আন্দাজে আন্দাজে চুলটাও আঁচড়ে নিলেন—অল্পই চুল আছে আর—তবু তাই বা অবিন্যস্ত থাকবে কেন?

এইবার পড়লেন ফুলগুলো নিয়ে। মালাগুলো গলায় পরলেন—যে কটা পর্যন্ত পরা যায়। তার পরে রীদ্‌গুলো ও ফুলের তোড়া, রজনীগন্ধার গোছা,—সাবধানে ও নিঃশব্দে জল থেকে তুলে বয়ে বয়ে এনে—বিছানার পাশে হাতের কাছে স্তূপাকার ক'রে রাখলেন সব।

সময় কম যায় না এতে। কাল সকালে আবার তাঁকেই এসব যথাস্থানে সরিয়ে রাখতে হবে, নবগোপালের ঘুম ভাঙবার আগেই। তা হোক্—তাঁর অত ঘুমের দরকার নেই। খানিকটা পরেই আবার তিনি—যাকে বলে 'পুনর্বাসনে'র কাজ শুরু—ক'রে দেবেন, ভোরের আগেই এই উৎসবের সব চিহ্ন মুছে ফেলবেন নিঃশেষে।

শখ। হ্যাঁ, শখই তাঁকে পেয়ে বসেছে। যাকে বলে নেশার মত পেয়ে বসা। সকাল থেকে একটু একটু ক'রে

চিন্তাটা মাথায় এসেছে তাঁর। মৃত্যুর পর কে তাঁকে কী ভাবে সম্মান দেবে, কে কতটা শোক করবে—তা তো দেখেই নিলেন। আচ্ছা এই পুষ্পস্তূপে সাজিয়ে যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে, যেমন ভাবে নেওয়া হ'ত আজ তিনি সত্যি-সত্যি মারা গেলে—সেটা একবার তেমনি সাজিয়ে দেখে নিলে কী হয়?

প্রথম প্রথম চিন্তা বা কল্পনাটা যখন অস্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে রূপ নিতে শুরু করে—তখন তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সে কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। মনে মনেই পিছন ফিরতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেই অদ্ভুত, অকারণ, অর্থহীন ইচ্ছার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। এই প্রথম দেখলেন তিনি তাঁর বার্ধক্যের পরিণাম। নিজের ইচ্ছার কাছে তিনি কত অসহায়, কত দুর্বল, কত উপায়হীন। যেন কোন কিছুই আর তাঁর নিজের বুদ্ধিমত করবার উপায় নেই—কে যেন ঘাড়ে চেপে ঘাড় ধরে করিয়ে নিচ্ছে!

অবিনাশবাবু এবার সন্তর্পণে বিছানায় এসে বসলেন। দেওয়ালের বড় আয়নাখানা এমন ভাবেই একটু উঁচু করে রেখে এসেছেন যে বিছানায় শুয়ে তাঁর ছায়াটা পরিপূর্ণ ভাবে দেখা যায়।...তবুও এখন একবার সেদিকে তাকিয়ে নিঃসংশয় হয়ে নিলেন সেটা, তারপর পা দুটো তুলে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমালা-গুলি সযত্নে নিজেরই পায়ের ওপর সাজাতে লাগলেন। মালা সব গলায় পরা সম্ভব নয়—এত মালা এসেছে—সুতরাং সেগুলি লম্বা-লম্বি ক'রে দেহের ওপর থেকে খাটের তলা পর্যন্ত ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দিতে লাগলেন। রীদগুলি খাটের চারিদিকে, খাটের গায়েই ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সাজিয়ে দিলেন। দু'তিনটে বাস্কেট ছিল—সেগুলো আগেই খাটের তিন দিকে একটু দূরে দূরে রেখেছিলেন।

এদিকের ব্যবস্থা যখন হয়ে গেল তখন তিনি আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন।

বড় ক্লান্তি লাগছে এবার।

কী যেন এক সুগভীর শ্রান্তিতে হাত-পা ভেঙে আসছে।

বুকের মধ্যেটাও কেমন ধড়ফড় করছে যেন—

তা হোক। এদিকেই বা কতটুকু বাকী আছে! হয়ে এল প্রায়। আরও দ্রুত হাত চালান। সব ফুলই প্রায় গুছিয়ে এনেছেন। মালাগুলো বুকের ওপর দিয়ে অমনি লম্বা লম্বা ক'রে ঝুলিয়ে দিলেন, রজনীগন্ধার শীষগুলো তার ওপর চাপিয়ে দিলেন, ফুলগুলো বুকের দিকে আর ডাঁটাগুলো মেঝের দিকে ক'রে। বাকী রইল শুধু এক গাছি মালা—এটি শেষ মুহূর্তে দুহাতে জড়িয়ে হাত দুটি জোড় ক'রে বুকের ওপর রাখবেন।

সেটাও শেষ ক'রে আয়নার দিকে তাকাবার কথা কিন্তু তার আগেই অদম্য কৌতূহলে একবার চেয়ে দেখলেন সেদিকে। কিন্তু এ কী—কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না যেন? সব যেন অস্পষ্ট, কাপ্‌সা কাপ্‌সা ঠেকছে। যেন মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে একরাশ কুয়াশা ঢুকে গেছে! এ আবার কী হ'ল? আলো কম? কিন্তু এ আলোতে তো চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এতক্ষণে। একটু আগেও তো এই আলোতেই দেখেছেন। তবে—?

আসলে তাঁর ঘুমই পেয়েছে বড্ড।—ঘুমেতেই তো দেখতে পাচ্ছেন না।

শেষ মালাটার দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু সেটুকুও আর যেন শক্তিতে কুলোল না। ঘুমে অবশ হয়ে আসছে হাত-পা।

আচ্ছা—একটু ঘুমিয়েই নেওয়া যা

এখনও তো ঢের সময় আছে।

পরিপূর্ণ আরামে ও শান্তিতে চোখ বুজে অবিনাশবাবু।

• • • •

নবগোপালের সেদিন উঠতে একটু বেলাই হয়ে গিয়েছিল। বেশ ফরসা হয়ে গেছে চারদিক। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি বাবুর ঘরের দিকে তাকাল—বাক্ বাঁচোয়া। বাবুও আজ এখনো ওঠেন নি।

সে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানা তুলে দোর-কপাট খুলে, সদরে জল দিয়ে ছড়া-ঝাঁট দেবে বলে আর একবার উঁকি মারলে—তখনও বাবুর ঘরের দরজা বন্ধ, কোন সাড়া শব্দ নেই।

বড্ডই বেলা হয়ে গেছে কাল। বয়স তো হয়েছে—এ বয়সে কি আর অত দৌড়ঝাঁপ পোষায়। আসলে খুবই

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ক'লে। তাই এত বেলা।

সে মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিলে। খুটখাট আরও কিছু কাজ সারল। তবু বাবু উঠলেন না।

ব্যাপার কী? নবগোপাল একবার ভ্রূ কুঁচকে বিমূঢ় হয়ে তাকাল দরজাটার দিকে। এমন তো সে এ দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও দেখে নি। এ তো সাধারণ অনিয়ম নয়—রীতিমত অঘটন।

নাঃ—একবার দেখা দরকার। অসুখ-বিসুখ করল না তো? অং-আড়ি কিছু?—তাই হয় তো উঠতে পাচ্ছেন না।

ঘোর একটু ফাঁক করতেই নীল আলোটা চোখে পড়ল।

আলো জ্বলছে এত বেলা অবধি! কী কাণ্ড!

তারপর চোখ পড়ল খাটের দিকে।

কিন্তু চোখের দেখাটা মাথায় যেতে অনেকসময় দেরি লাগে একটু।

নবুরও খানিকটা সময় লাগল কী দেখেছে বুঝতে।

কয়েক মুহূর্ত।

তারপরই চিৎকার ক'রে উঠল সে। বুক-ফাটা সন্তস্ত আর্তনাদ একটা।

সে চিৎকারেও কিন্তু অবিনাশবাবুর ঘুম ভাঙল না।

কোন দিনই ভাঙবে না আর।

• •

আবারও এ সংবাদ প্রচারিত হ'ল। আবার লোক এল ছুটে—হয়ত কিছু বিলম্ব হল খবরটা বিশ্বাস করতে, —তবু শেষ পর্যন্ত এল সকলেই। টাটকা ফুলও কিছু কিছু এসে পৌঁছল, কিন্তু অবিনাশবাবুর এই মৃত্যু-রহস্যটা কিছুতেই পরিষ্কার হল না। এমন ভাবে মরাটা কিছু আশ্চর্য নয়, কালকের ঐ ঘটনায় মানসিক উত্তেজনার ফলে এই বয়সে হার্টফেল করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে মৃত্যু-রুদ্ধদ্বারের মধ্য দিয়ে কে কী ভাবে দেখল এবং কেমন ক'রেই বা ভেতরে ঢুকে মহাযাত্রার উপযুক্ত সাজে অমন নিখুঁৎ ক'রে সাজিয়ে দিয়ে গেল—সেইটেই জানা গেল না।

আর সেইটেই এখন প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল।

কেউ বললে—ওঁর স্ত্রী। কেউ বললে—ওঁর মা। কেউ নেই দেখে বিদেহী কোন আত্মাই এসে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন।

কেউ বললে স্বপ্নের ঘোরে নবগোপালই এসে উনি মারা গেছেন দেখে সাজিয়েছে অমনি ক'রে, তারপর আর মনে নেই। ওকেই নাকি বলে সোমনাবুলিজম্ —স্বপ্নসঞ্চরণ।

সে কথাও ঠিক সকলে বিশ্বাস করতে পারল না। অথচ সত্যটাও জানা গেল না কিছুতেই।

কিছুতেই সে রহস্য অনাবরিত হল না। পাকা উকীল রামেশ্বরবাবুর সবত্নে জেরার উত্তরেও না।

উপন্যাসের কর্মকাণ্ড

ই·এম·ফস্টার

(একটি কাল্পনিক কথোপকথন)

শিশির চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিনে E. M. Forster-এর জন্ম। তিনি লেখাপড়া করেছিলেন টনব্রিজে এবং কেমব্রিজের কিংস্ কলেজে। কেমব্রিজেই তিনি পরবর্তী কালের ব্লুমস্‌বেরি গ্রুপ নামে প্রখ্যাত মণ্ডলীর প্রাথমিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। ১৯০৩ সালের মধ্যেই তিনি নবগঠিত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিভিয়ুর সহায়ক লেখক হিসাবে পরিচিত হন। ১৯১০ সালে তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন ব্যাপকভাবে। এই ভ্রমণ রূপায়িত হয়েছে তাঁর অন্যতম প্রধান উপন্যাস A Passage to India গ্রন্থে।

১৯০৫ সালে Forster-এর প্রথম উপন্যাস Where Angels Fear to Tread প্রকাশিত হয়। তারই পরে ক্রমশ প্রকাশিত হলো The Longest Journey (১৯০৭), A Room with a View (১৯০৮) এবং Howard End (১৯১০)। এরপরেই তাঁর প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলি কেটেছিল।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস A Passage to India রচনা শেষ করেন। এইটিই তাঁর পঞ্চম এবং শেষ উপন্যাস।

Forster সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে যে অল্পলিখিত গ্রন্থই তাঁর খ্যাতির কারণ। Forster অনুপন্যাস সাহিত্যেই অধিকতর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ ধারায় তাঁর A binger Harvest (১৯২৬) Aspects of the Novel (১৯২৭), Two Cheers for Democracy (১৯৫১) এবং The Hill of Devi (১৯৫৩) প্রধান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার আগুনে তাঁর এবিদারের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর থেকে তিনি কেমব্রিজে বসবাস করেন এবং কিংস্ কলেজের অবৈতনিক সহযোগী হিসাবে কাজ করেন।]

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে। এও ঠিক তেমনি সাহিত্যলোকে উপন্যাস তৈরীর কারখানায় একজন সুদক্ষ শিল্পী ই, এম, ফস্টার আমার অবাধ-বিচরণ-প্রয়াসে মন সে বিরাট সৌধের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল সেই প্রশস্ত ঘরের মধ্যে। বিরাট উঁচু তার ছাদ। সাজে-সজ্জায় এডওয়ার্ডীয় রুচির চিহ্ন। দেয়ালে গিল্টির ফ্রেমে বাঁধানো ছবির সারি। ইংরাজী আর ফরাসী তাষার অনেক অনেক বই সাজানো আছে আলমারিতে। তারই পাশে একটি পিয়ানো। একটি সোফায় বসে আছেন ফস্টার। সামনে টেবিলের উপর কাগজ ও কতকগুলো খোলা চিঠি। সামনে হাজির হতেই তিনি মৃদু স্বরে বলতে বললেন। অভিবাদন জানালাম। কথায় কথায় উপন্যাসের কর্মকাণ্ডের কথা এসে পড়ল। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলাম একে একে। ফস্টার তাঁর স্বাভাবিক সুন্দর ভঙ্গিতে সে প্রশ্নগুলোর জবাব দিলেন।

জিজ্ঞাসা। আচ্ছা, মি, ফস্টার., বলুন তো কেন আপনি Arctic Summer শেষ করলেন না?

জবাব। আমি তাঁর মুখবন্ধেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। ঔপন্যাসিক একটা বিষয়কে বেছে নিয়ে এবং তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্থির করে নিয়ে লিখতে সুরু করেন। আমার মনে হয় সব উপন্যাসিক সম্পর্কেই এটা সত্যি। তিনি তাঁর ঘটনাস্রোতকে পরিবর্তিত করতে পারেন লিখতে লিখতে এগিয়ে যেতে যেতে; করেনও। তা না হলে উপন্যাস কেমন অস্বাভাবিক আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত তাঁকে হতে হবে এবং হওয়াটা একান্ত প্রয়োজনীয়। বস্তু পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজন নয়, অপরিহার্য।

জিজ্ঞাসা। আপনি কি বলতে চাইছেন যে বৃত্তের প্রতি পদক্ষেপ বস্তুর প্রাথমিক ধারণার পরিবেশনা।

জবাব। নিশ্চই সব পদক্ষেপ নয়। কিন্তু তার মধ্যে

কিছু থাকবে, কিছু প্রধান বিষয় থাকবে যা লক্ষ্যভেদ। যখন আমি A passage to India লিখতে শুরু করি তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মালাবারের গুহায় এমন কোন বিশেষ ঘটনার অস্তিত্ব আছে—অবশ্য তা যে কি হবে তা ঠিক আমি জানতাম না।

জিজ্ঞাসা। আচ্ছা বেশ। যদি তাই হয়, যদি তা কি হবে আপনি জানতেন না তাহলে A Passage to India আর Arctic Summer-এর মধ্যে এই পার্থক্য কেন? দুটো উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তো বিষয় আপনার হাতে ছিল।

জবাব। A Passage to India-র পরিবেশ যত গভীর ভাবে আমার কাছে আবেদন করেছিল Arctic Summer-র পরিবেশ তত গভীরভাবে আবেদন করেনি। কথাটি আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। মালাবারের পরিবেশ অভিনিবেশ আকর্ষণ করে সহজেই। সেখানে এমন কিছু ছিল যার উপর আলোকসম্পাত করা যায়, যার সবকিছুকে তুলে ধরা যায়। আর Arctic Summer-এ আমি যা করেছি তা আরও সূক্ষ্ম একটি পটভূমি আর কিছু নয় শুধু।

জিজ্ঞাসা। আচ্ছা বলুন তো, উপন্যাস রচনার আগে তো একটি কাঠামো মোটামুটি স্থির করা হয়। লিখতে লিখতে কি উপন্যাস সে কাঠামোর বেড়া ডিঙিয়ে ভিন্নপথে অগ্রসর হয়?

জবাব। নিশ্চয়ই হামেশাই তা হয়ে থাকে। আর তাই হচ্ছে আশ্চর্য। চরিত্র আপন প্রবণতায় পরিণতি পানে ছুটে চলে। আমার তো মনে হয় শুধু আমার বেলায় নয়, সব ঔপন্যাসিকের বেলাতেই এটা সত্যি।

জিজ্ঞাসা। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষদ বর্ণনা সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রশ্ন আছে? আপনার A Passage to India-তে হিন্দু উৎসবের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তার উপযোগিতা কি?

জবাব। গঠনের দিক থেকে তার প্রয়োজন ছিল। একটি হিন্দু মন্দিরের অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল আমার ঐ উপন্যাসের জন্য। উন্নতশীর্ষ পর্বত আর হিন্দু মন্দিরের পরিবেশের সূত্র ঘটনাকে সন্নিবদ্ধ করার প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারে না। আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হিন্দু উৎসবের সুদীর্ঘ বর্ণনা আমাকে করতে হয়েছে উপন্যাসের প্রয়োজনে।

জিজ্ঞাসা। আচ্ছা, যে ঘটনা সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই সেরকম ঘটনা কি আপনি কখনও বর্ণনা করেছেন?

জবাব। হ্যাঁ করেছি। লিওনার্ড ও জ্যাকির পারিবারিক জীবনের যে বর্ণনা আছে Howards End-এ তাই এর একটি নিদর্শন। তাদের পারিবারিক জীবনের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। আমার কল্পনাজাত বিশ্বাসের বলেই তা বর্ণনা করেছি।

জিজ্ঞাসা। কতখানি সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও আপনি এ ধরণের বর্ণনা করতে পারেন?

জবাব। এই ব্যাপারে সময়ের চেয়েও স্থানের মূল্য বেশী। আমার A passage to India রচনায় আমাকে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছে। শুরু করার পর কতবার মনে হয়েছে শেষ করা বুঝি আর আমার সাধ্যে কুলোবে না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি এ উপন্যাস রচনা শুরু করি। তারপর এল যুদ্ধ। আমি বইটাকে সংগে নিয়ে গেলাম। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে এলাম ভারতবর্ষে। দেখলাম আমি যা এঁকেছি তা ভারতবর্ষ নয়। অংকনের উপর আলোকচিত্র এঁটে দেওয়ার মত ব্যাপার হয়েছে অনেকটা। তা যা হোক, ভারতবর্ষে থেকে বোধ হয় আমি এ বই লিখতে পারিতাম না। ভারতবর্ষ থেকে দূরে এসেই তাকে আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

জিজ্ঞাসা। আচ্ছা, মি. ফষ্টার., আপনি আপনার চরিত্রগুলোর নামকরণ করেন কি করে?

জবাব। সাধারণত আমি আমার উপন্যাসের চরিত্রগুলির নাম লেখা শুরু করার আগেই ভেবে রাখি। অবশ্য সবক্ষেত্রে নয়। লিখতে লিখতে তাদের নাম পাল্টানোর তাগিদ অনুভব করেছি কতবার। কতবার কতনাম পাল্টেছিও।

জিজ্ঞাসা। আপনার চরিত্রগুলোকে সত্যিকার কোন বাস্তব মানুষের আদলে গড়ে তোলার ব্যাপারটা আপনি কতটা স্বীকার করেন।

জবাব। বাস্তব কোন মা'র আদলে উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে গড়ে তোলা হয় না—এ ধরণের একটা ভাণ আমরা প্রায় সবাই করে থাকি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা সবাই তা করি। আমি আমার পরিবারের কতজনকে ব্যবহার করেছি। যেমন ধরুন, Miss Bartlett হলো আমার আন্টি Emily। আঙ্কল্ Willie-ই তো Mrs. Falling-এ পরিবর্তিত হয়েছেন। তেমনি Miss Lanish Miss Spender নামে এক ভদ্রমহিলারই আদলে গঠিত। Mrs Honey Church চরিত্রটি আমার গ্র্যাণ্ডমাদারকে সামনে রেখে আঁকা। এমনি প্রায় সবাই।

জিজ্ঞাসা। আপনার সব চরিত্রই কি এমনি জীবন্ত বাস্তব আদর্শকে সামনে রেখে আঁকা?

জবাব। আমার কোন বইতেই আমি এমন কোন চরিত্র সৃষ্টি করিনি, যারা আমার অচেনা, যারা আমাকে কোন প্রেরণাই দেয় না।

জিজ্ঞাসা। আচ্ছা, নিজেকে আপনি কোন চরিত্রের মাধ্যমে হাজির করেছেন কি?

জবাব। হ্যাঁ, Rickie-ই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। Philip-ও। Cecil-এর মধ্যেও অনেকটা।

জিজ্ঞাসা। আপনি একজায়গায় বলছেন যে Jane Austen ও Proust-এর কাছ থেকে আপনি অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেছেন। আচ্ছা Jane Austen-এর কাছ থেকে শিল্পকৌশলগত কি শিক্ষা আপনি পেয়েছেন?

জবাব। পারিবারিক জীবনের কৌতুক-সরসতার প্রতি দৃষ্টিপাত তাঁরই প্রভাবের ফল। অবশ্য তাঁর তুলনায় আমার মনোদৃষ্টি আরও সুদূরপ্রসারী। আমি সে কৌতুককে জীবনের অন্তস্তর ঘটনাতে আরোপ করার চেষ্টা করেছি।

জিজ্ঞাসা। Proust-এর কাছ থেকে কি শিখেছেন।

জবাব। চরিত্রকে দেখার কৌশল তাঁর কাছে শিখেছি। আধুনিক অবচেতন পদ্ধতি। আধুনিকতার যাকিছু আমি গ্রহণ করতে পেরেছি তিনি তাতটা আমায় দিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা। আপনার লেখা সম্পর্কে আপনার কি মত? আপনি কি আপনার রচনা সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ করেন।

জবাব। আমি এ ব্যাপারে অন্যান্যদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। অন্যান্যরা তাঁদের লেখা সম্পর্কে একটা ভাবনা, একটা অতিব্যস্ততা প্রকাশ করেন। আমি কিন্তু সব সময় লেখা সম্পর্কে একটা শান্ত আনন্দ অনুভব করি। আমি লিখে আনন্দ পাই, আমার মনে হয় এটা বরং ভাল। এতে নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছে। জানিনা আমার লেখা কতদিন বেঁচে থাকবে, তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।

হঠাৎ দেয়ালের বড়ো ঘড়িটা ঢং ঢং করে আমাদের কথার ছেদ টানলো।

---

* বিদেশী থেকে।

বিশ্বাস করুন। আমরা মেষ অথবা Mass; কিন্তু আমরা যা বলে নিজেদের পরিচয় দিই,—আমরা সেই 'মানুষ' নই। আজ বলে নয়; আমরা কোনও এককালে হয়তো বনমানুষও ছিলাম; কিন্তু কোনকালে মানুষ ছিলাম কিনা এ বিষয়ে যতই দিন যাচ্ছে এবং দুর্দিন আসছে ততই আমার সন্দেহ বাড়ছে। আমরা মানুষ হলে আমাদেরই নির্মূল করবার জন্যে আমাদের অর্থে-সামর্থ্যে, পরিশ্রম ও প্রতিভার বিনিময়ে ফাঁসুড় কাটাতে চাইতাম? আমরা মেষ অথবা Mass বলেই কখনও ধর্মের নামে কখনও ধর্মঘটের বেনামে আমাদের বলি দেবার জন্যে কেউ আমাদের দিয়েই বানাতে সাহস করত না কি? ধর্মের নামে এককালে নরবলি হয়েছে; ধর্মঘটের নামে আজ 'বা'-নরবলি চলছে। একদিন ছিলো ভক্তিবাদ, গুরুবাদ; তার বদলে আছে সমাজবাদ; সাম্যবাদ। দুই বিবাদের মধ্যে উলুখড়ের মতো বরবাদ হয়েছে যে সে মেষ অথবা Mass হতে পারে; মান এবং ডাঁশ বাদ দিয়েই চলতে চেয়েছে সে চিরকাল। অলখিত বলে মানুষ পরিগণিত হবে কিসের ভাবীতে? একদিন রাজা, রাজপুরোহিত পাণ্ডার পায়ে আমাদের প্রণাম এবং তার বদলে আজ কখনও প্রেসিডেন্ট, কখনও প্রধানমন্ত্রী, কখনও ডিক্টেটারের হাতে প্রণামী গুঁজে দেবার এই হাস্যকর অবিমৃষ্যকারিতায় আমার অনিবার্যভাবে, সেই সওদাগরী বড় সাহেবের কথা কেন জানি না, মনে পড়েই।

মস্তবড় সওদাগরী অফিস; তার একনম্বর সাহেব। যেমন গোঁসা, তেমনই মেজাজ। অত্যন্ত সন্তর্পণে কথা বলতে হয়। তার লেডি টাইপিস্ট দুর্গা নাম জপতে জপতে দুরুদুরু বক্ষে তার কাছে এসে বুহু হেসে দাঁড়ায়; তারপর বলে: অনেক পুরানো চিঠিপত্তর, বহু-বছরের বাজে অদরকারী মিটির জঞ্জালকে সে কেটিয়ে বিদায় করতে পারে কিনা? সাহেব কি ভাবে, তারপর অনুমতি দেয়। পিতৃ-পুরুষকে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে নিষ্ক্রান্ত হবার চেষ্টায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছয় মিস টাইপিস্ট, দরজা পর্যন্তই পৌঁছতে পারে। এমন সময় ব্যাঘ্রহুঙ্কারে হাতের কাগজ-পেন্সিল প্রায় পড়ে যায় আর কি। সাহেব ডাক ছাড়েন: লুক হিয়ার, মিস হোয়াটনট, যেসব চিঠিপত্তর ফেলে দেবে তার প্রত্যেকটার একটা ট্রু কপি কিন্তু ফেলবার আগে রেখে দিয়ে তবে ফেলবে সব; তার আগে নয়।

রাজা, রাজপুরোহিত, পাণ্ডা, তন্ত্রমন্ত্র মারণ উচাটন চার্চ, গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, বিদায় দেবার আগেই তার ট্রু কপি, প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী, ডিক্টেটর, সাম্যবাদ সমাজবাদ, বৈপ্লবিক সাম্যবাদ, সিনেট, পার্লামেন্ট, প্রিসিডিয়াম সযত্নে রক্ষা করতে সারা দেশে দেশে বাধা হচ্ছে তারা কি মানুষ? আপনিই বলুন। আপনি, আমি, এরা, ওরা, তারা কেউ মানুষ নয়; হয় মেষ, নয় Mass।

বেশিদূর যাবার প্রয়োজন নেই; হাতের কাছেই এর মজির আছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নাকি সমাজবাদের দিকে এক মস্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। হতেও পারে। কিন্তু জমি কিনে রেখেছে যারা লর্ড ক্লাইভের আমলে সতের টাকায় বিঘের দরে এখন সেখানে এক বিঘৎ জমির দর সতেরশো টাকা, তারা কিন্তু জমিদার নয়। যেহেতু তারা জমির ওপর বাড়ি তুলেছে, নিজের জন্যে, ভাড়ার জন্যে অথবা বায়স্কোপ দেখাবার জন্যে

সেহেতু তারা উচ্ছেদের অযোগ্য। কোন অবধারীত এককালে কেউ হেষ্টিংসের, কেউ ড্যালহৌসীর মুৎসুদ্দি ছিলো অতএব এই জমি এবং বাড়ি তাদের খোপার্জিত। আজকেও যারা প্রাইভেট বাসের মালিক তারা কেউ জমিদার নয়; তারা ব্যবসাদার। ছবি দেখাবার জন্যে একবার একখানা বাড়ী করতে পেরেছে যে সে একখানা বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকেনি আর; বাড়ির পর বাড়ি তুলছে ঐ এক,—ছবির জন্যে ভাড়া বাটানোর উদ্দেশ্যে। কারুর কাছেই এটা বাড়াবাড়ি মনে হয়নি; যদিও ছবিখানা তুলেছে ছবি না চললে তাদের কেউ রাস্তায়, কেউ পাওনাদারের তাগাদায় রাস্তায় হন্তে কুকুরের অধম হয়ে ঘুরে একদিন আলুর সিজনে তুলেছে পটল; অর্থাৎ অকালে মারা গেছে প্রযোজক হিসেবে। কিন্তু ছবি না চললেও যাদের চলা অসুবিধে হয়নি এক মুহূর্তের জন্যেও তারা ছবির মালিক নয় কোনওদিন; তারা চিরকাল ছবিঘরের মালিক। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ অথবা শূন্য প্রেক্ষাগৃহ তাদের পক্ষে অহেতু কিবা রাত কিবা দিন নয়; নয় তার কারণ ছবির বিক্রি যখন সপ্তাহে চোদ্দ হাজার তখন তাদের ভাগে সাত হাজার; প্রযোজকের দুর্ভাগ্যে মিডলম্যানস কমিশন দিয়ে কিন্তু সাতহাজারের অনেক কম। কিন্তু মজা এই, মজানোও এইখানেই যে ছবির বিক্রি যখন পাচ হাজারের পর্যায় অথবা একটু তলায় তখন ছবি দেখাবার বাড়ি যার সবটাই তার, কারণ তার সংগে ছবিওলার ছবি দেখাবার প্রধান সর্তই সে আগে আদায় করেছে এই বলে যে ছবি দেখাবার জন্যে বাড়িওলার ভাড়া ওই পাচহাজার অথবা তার একটু কম। হারলেও যার জিত; লোকসান হলেও যার লাভ তাকে ব্যবসা বলে না; তাকে বলে জমিদারী। অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টিতে যে জমিদার মাফ করতে চায়নি খাজনা।

জমিদাররা তবুও অনেক খারাপের সংগে কখনও কখনও ভালোও করেছে একআধটুক। গান নাচ বাজনা ব্যায়াম থেকে সুরু করে জলের কল, খেলার মাঠ, স্বাধীনতা আন্দোলনেও তারা তাদের কিছু রক্ত দিয়েছে কিন্তু স্বাধীন ভারতে যারা আবাসের অথবা বাসের মালিক তারা? জানতে ইচ্ছে করে, খৃষ্ট জন্মাবার উনিশশো বাট বছর আগে আর খৃষ্ট মারা যাবার উনিশশো বাট বছর পরে, পার্থক্য কি ঘটেছে, তারা ওপরতলার যারা তারা আরও ওপরতলায় উঠছে; নীচুতলার যারা তারা তলিয়ে গেছে আরও নীচে; এছাড়া আর পার্থক্য কি লক্ষ্য হয়েছে যদি বুঝিয়ে বলেন তো বাধিত হই। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। রাজনীতি, অর্থনীতি দুর্নীতি; সুখ থেকে অসুখ; ধর্ম থেকে অধর্ম,—জীবনের সব কুরুক্ষেত্রেই অক্ষৌহিনীরা মারা গেছে, মারা যাচ্ছে এবং মারা যাবে; ইতিহাসে থাকবে কর্ণার্জুনের নাম।

বড়লোককে গালপাড়া বই অথবা ছবি যেমন বড় লোকেরা সবচেয়ে আনন্দের সংগে গ্রহণ করে; কখনও কখনও আরেক গাল বাড়িয়ে দেয় চড় খাবার জন্যে তার কারণ বুঝি। গালাগালিতে তাদের আপত্তি নেই; গলাগলিতেই তাদের যা কিছু আতঙ্ক। নীচের তলার লোকের সংগে তাদের তলার কাউকে গলাগলি করতে দেখলে তবেই উত্তেজিত হয় তাদের গাল দিলে তারা গাল বাড়িয়ে দিতে পারে যে তার কারণ তাদের গণ্ডের চর্ম এবং গণ্ডারচর্মে তফাৎ অল্পই অথবা একেবারেই নেই। কিন্তু যারা চিরকাল মেষের অধম, যারা কেবল Mass-এর অন্তর্ভুক্ত, তারা মাসের পর মাস কোন উৎসাহে ফুটবল খেলা দেখতে ভীড় করে, রোদ জল ঝড়, পুলিশের গুঁতো, ঘোড়ার চাট উপেক্ষা করে ভেবে পাইনে! ওই যে চামড়ার বল নিয়ে একবার এদল লাথিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদলের গোলের দিকে; আরেকবার ওদল মারতে মারতে নিয়ে আসছে এদিকের গোলপোষ্ট বরাবর—সেই বল কাদের চামড়ায় তৈরী?—রাজায় রাজায়, পার্টিতে-পার্টিতে, ইজমে-ইজমে সুদূর অতীত থেকে বহুদূর আগামী কাল পর্যন্ত যে খেলার শেষ নেই সে খেলার বল কি নয় তাঁরা যারা কোনদিন মানুষ নয়; যারা চিরকাল Mass?

আপনি যদি নিজেকে কেবল মানুষ বলেন তাহলে এই এ্যাটমের যুগে যখন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই',—তাহলেই আপনি মানুষ রইলেন না আর। মানুষ বললে হবে না; বলতে হবে আপনি কোন্ 'IST'? আপনি সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট, রেভলুশনারি কম্যুনিস্ট, র‍্যাডিকালিস্ট, রাইটিস্ট না লেফটিস্ট?

এককালে প্রত্যেক মানুষের ইষ্টধর্ম ছিলো, এখন তার ধর্মই 'IST' হওয়া। East-এও তাই; ওয়েস্টেও তাই। কবি বলেছিলেন ইষ্ট এবং ওয়েস্ট টেনেন ফ্লাস নেভার মিট। ঠিক বলেননি। এই IST-এর বন্ধনে দুয়ের মিলন ঘটতে চলেছে আজ, শুভবিবাহের চারহাত এক করার মিল নয়, হাতকড়ার মাধ্যমে এক করার গোজামিল। বহু ইংরেজী কথারই যথার্থ বাঙলা করা আজও সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইজমের বাঙলা যে 'বাদ' করা হয়েছে এমন যথার্থ খাঁটি ভাষান্তর আর হয় না। 'বাদ' অর্থাৎ গান্ধীবাদ মানে গান্ধী যার থেকে গান্ধী প্রথম; মার্কসবাদ মানে মার্কস যার থেকে সর্বপ্রথম; হিউম্যানিজম মানে মানবতাবাদ অর্থাৎ যার থেকে মানবতা বরবাদ হয়েছে সম্পূর্ণ। একদিন ধ্যানী জ্ঞানীরা বলেছিলেন যোগ কর, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ। আমরা হেসে, নাকসিঁটকে বলতে সুরু করলাম প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা মধ্যযুগীয় ধাপ্পা হচ্ছে এই যোগ.—রাজা এবং রাজপাণ্ডাদের যোগাযোগে ম্যানুফ্যাকচার্ড। তার বদলে আজ বলছি: বাদ দাও। সমাজ বাদ দাও সমাজবাদ করো, সাম্য বরবাদ করে করো সাম্যবাদ। রামপ্রসাদের কালে শুনেছি: আবাদ করলে ফলত সোনা; রাজেন্দ্রপ্রসাদের হুজুগে শুনছি: বিবাদ করলে ফলবে জহর।

রাজাদের কালে রাজপুরোহিতদের জন্ম-জন্মান্তর ব্যাখ্যায় মজেছি আমরা যারা মেষ অথবা Mass। গতজন্মে যে ছিলো প্রজা সৎকর্মের ফলে এজন্মে সেই হয়েছে রাজা; অতএব এজন্মে তুমি যদি সৎকাজ করো তাহলে তুমিও আসছে জন্মে রাজা হয়ে সতেক অসৎকর্ম করবার পাবে ঈশ্বরপ্রেরিত অধিকার। সৎকর্ম কি? না, দেবদ্বিজে ভক্তি। অর্থাৎ রাজাকে খাজনা দাও, পুরো আহত করবার ক্ষমতা আছে যার সন্তুষ্ট করতে না পারলে সেই পুরোহিতকে দাও প্রণামী। রাজাদের বদলে আজ রাজনৈতিক নেতারা বলছে: আমাদের পার্টিকে চাঁদা দাও, তাদের প্রতিনিধিরা চেঁচাচ্ছে: ভোট দাও আমাদের। আগামী নির্বাচনের পর ইহলোকেই স্বর্গসুখ সুনিশ্চিত। রাজাদের যুগে পরলোকের ভরসায় থাকতাম; এখন থাকি পরের নির্বাচনের ভরসায়। রাজা বলত দাও; রাজনৈতিক নেতারা বলে: ভোট দাও। পরের জন্ম বলে আশ্বাস দেবার একটা মস্ত সহায় ছিলো এই যে পরজন্মে আগের জন্মের কিছুই মনে থাকার কথা নয়। এযুগের রাজনৈতিক নেতাদেরই বা ভয় কোথায়—নির্বাচনের পর স্বর্গসুখের ছবি আঁকতে? নির্বাচনের আগের প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনের পরেও মনে থাকলে এ তথ্য অসম্ভব হতো যে পাবলিক মেমোরি ইজ সর্ট।

শুধু তন্ত্র বললেই আজ জাত গেল; কিন্তু প্রজাতন্ত্র বললেই সাতখুন মাফ। কিন্তু তফাৎ কোথায় মহাশয়? তন্ত্র সেদিনও একাধিক; আজও প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্র, তন্ত্রের শেষ নেই। সেদিনও মন্ত্রের শেষ ছিলো না; আজও মন্ত্রীরা অশেষ। সেদিন বলত ধর্ম করো, যজ্ঞ করো, ফল পাবে হাতে হাতে। না পেলেও সান্ত্বনা তৈরী ছিলো এভারেডি ব্যাটারির মতই কাজ করে যাও, ফলের দিকে তাকিও না। আজ বলছে: ধর্মঘট করো, দক্ষযজ্ঞ বাধাও। Fall হবে সংগে সংগেই। সরকারের ডাউনফল না হয়ে ধর্মঘট পণ্ড হলে বলছে, তদন্তেই বলছে, সবুরে মেওয়া ফলে। সবুরে মেওয়া নয়, স্বাধীন ভারতে সবুরে গোয়া ফলে; গোয়ার জন্যে ত্রিদিব চৌধুরীর মার খাওয়া বিফলে যায়, গোয়া থাকে পর্তুগীজের কাছে বাঁধা ভারত স্বাধীন হবার একযুগ পরেও। ধর্মের যুগে যজ্ঞের দিনে বলব ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও। ধর্মঘটের হুজুগে, দক্ষযজ্ঞের দুর্দিনে বলছে পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দাও। সেদিন রাজা দিগ্বিজয়ে বেরুলে বলতো: চলো, নতুন রাজ্য জয় মানে, আরও আরাম, আরও সুখ, আরও স্বাচ্ছন্দ্য। রাজ্য আক্রান্ত হলে বলত বাঁচাও। দেশ গেল, ধর্ম গেল, আজ রাজনৈতিক নেতারা অন্য রাজ্যের মাথায় বোমা ফেলবার সময় বলে, নতুন base পাওয়া মানে, নতুন বেশ, নতুন আবেশ, নতুন পরিবেশ। অন্য দেশ রকেট পাঠালে বলে রুখে দাঁড়াও। ইজম ইন ডেঞ্জার। যারা চিরকাল মারা যায় তারা রাজারাজা কেউ নয়; তারা হয় মেষ, নয় Mass!

ফুলকে গাছ থেকে উপড়ে নিয়ে ঠাকুরের পায়ে অথবা ফিঁয়াসীর খোঁপায় দিলে পুণ্য অথবা প্রেম অর্জন

সম্ভব। কিন্তু ফুলের তাতে না পুণ্য, না প্রণয়—কোনটাই হবার নয়। Fool-এর বেলাতেও তাই, ফুলের বেলায় যা। নেপোলিঁও কেন মস্ত বীর—একথা আমরা এখনও জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না। ঘোড়ার পিঠে চার ঘণ্টা ঘুমোতেন, বীরত্বের এত বড় নমুনার পর কে সে প্রশ্ন করবে? কিন্তু বলতে ভরসা হয় না তাই; নাহলে বলতাম যে নেপোলিয়ঁা যদি আর কয়ণ্টা ঘোড়ার পিঠে না ঘুমিয়ে বউয়ের পিঠোপিঠি নিদ্রা দেতেন তবে রাশিয়ার দুর্দান্ত শীতে অসংখ্য ফরাসী নরে ভূত হবার অদ্ভুত খেলার হাত থেকে পেতে পারত আরও কয়েক বছরের নিষ্কৃতি।

একজন সাধারণ ম্যাক্সিকানের সংগে একজন সাধারণ র‍্যাশানের বিবাদটা কোথায়? বিবাদ নেই বলেই আবির্ভাব হয় 'বাদে'র। গণবাদের সংগে সাম্যবাদের লড়াই, আইসেনহাওয়ারের সংগে ক্রুশ্চেভের বাকাযুদ্ধ, অসংখ্য ম্যাক্সিকান এবং অগণিত রাশিয়ান উলুখড় কেন তার জন্যে মারণাস্ত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও, তৃতীয় মহাযুদ্ধের সংগে সংগে সমগ্র মানবজাতির বিলুপ্তি আসন্ন সভ্যতার সাগ্রহে কেন আবার আগুণ নিয়ে খেলার দায়ে মজবে, একথা জিজ্ঞেস করলেই আপনি প্রতিক্রিয়াশীল, আপনি হয় ম্যাক্সিকার টাকা মারছেন আর নয় লালের দালাল।

ওয়াজেদ-আলি বড় খাঁটি কথা বলেছিলেন; সেই এক ট্র্যাডিশন আজও চলছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বসুন্ধরা জুড়ে। রাজা মরলে রাজনৈতিক নেতা আসে; ধর্ম যায়, আসে ধর্মঘট; ভেটের পরিবর্তে চায় ভোট। মেষের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের আখ্যা হয় Mass।

আসলে রাজা মারা যায় না কোনওদিন। তাইতো রাজা মরলেই সংগে সংগে বলতে হয় King is dead; Long live king! কিং নয়। কিং মারা গিয়ে অথবা যেতে গিয়ে যাদের উদয় হচ্ছে তারা কিং-এর চেয়ে একটু বেশীই কিং কং।

কেবল রাজা অথবা রাজনৈতিক শক্তিরাই চুপারে আমাদের নিয়ে খেলছে যে এমন নয়। মেষের ক্ষেত্রে Mass-এর বেলায় নেতায় আর অভিনেতায় অভিন্নহৃদয়। ওরা যুগে যুগে দেশে দেশে একজাত; একই রকম বজ্জাত। আগে ছিলো বায়োস্কোপ। এখন শুধু কোপ। সেখানেও ইজম গিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে; নিওরিয়ালিজমের এই নতুন প্রকোপে কচুকাটা হচ্ছি সেই আমরা যারা মানুষ নই; মেষ অথবা Mass। আমরা কিছুতেই সাহস করে বলতে পারছি না যে আড়াই ঘণ্টা ধরে মাঠ, আকাশ, টেলিলাইন এবং গঙ্গাফড়িং দেখবার জন্যে আমরা ছবিঘরে যাই না। ছবি দেখি আমরা আনন্দের জন্যে; যে আনন্দ লিখিত গল্পে পেয়েছি তারই অতিরিক্ত কিছু পেতে চাই চলচ্চিত্রায়ণে; সে গল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত আছে, জীবনের সেই চিরন্তন গল্প যা পড়ে আমরা হেসেছি কেঁদেছি ভালোবেসেছি। সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে প্রয়োজন হয় না ব্যাখ্যাতার; গল্পে, অভিনয়ে উপন্যাপনার কৃতিত্বে কখনও বসে আছি, কখনও অশ্রুতিবাষ্পে মজেছি। কিন্তু পুরা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে সহৃদয় হলেই চলে গেছে; এখন বুঝতে গিয়ে বোঝা হয়ে চাপছে।

আগেকার ছবিতে কারুর মৃত্যু দৃশ্যে কান্না থেকে শুরু করে শ্মশানের ধোঁয়া এবং জীবন অনিত্য-বিষয়ক গান না গাওয়া পর্যন্ত দর্শকের বাঁচার উপায় ছিলো কই? এখন সে জায়গায় বোঝাই শক্ত কেউ বলে না দেওয়া-তক যে একজন মারা গেল এই মাত্তর। ধরুন, হারাধনের দশটি ছেলেকে একটিকে খতম করতে বসে ছবিতে। আরম্ভেই হারাধনের মুখস্তুতি করে দশটি আঁচিল বসিয়ে, মুখখানাকে পর্দাভর্তি করে (ক্লোজআপ) দর্শকের চোখে সেঁধে যাও, তারপর একটি আঁচিলকে খসিয়ে দাও মুখ থেকে। শুধু আঁচিলটিকে গড়িয়ে দাও এমনভাবে যাতে গড়াতে গড়াতে পুকুর-ঘাটের ধাপের পর ধাপে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের সহযোগিতায় জলে না পড়ে যতক্ষণ না নিওরিয়ালিষ্টিক ছবির নিউরটিক সমালোচক চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার সুযোগ পায় যে হারাধনের একটি পুত্রকে সে হারালো। আগেকার ছবি এবং এখনকার ছবির মধ্যে তফাৎ কেবল ওই পুকুরের ধাপ, ওইখান থেকেই ধারার শুরু শেষ কোথায় বলা শক্ত [শেষ নাহি যে! শেষ কথা কে বলবে।]।

আগেকার ছবিতে একজন অন্ধ এলেই বোঝাতে সেই ব্যক্তি কারুর ঘাড়ে হাত দিয়ে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে এলেই চলত; বড় জোর তার সঙ্গে গান জুড়ে দেওয়া হত ফাউ হিসেবে: আমার বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা! আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতাম অন্ধগায়ক বলতে চাইছে যে তার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ভাগ্য, কিন্তু ভগবান তার পরিবর্তে দিয়েছে অন্তর্দৃষ্টি। আর এখন? অন্ধের ভূমিকায় যে অবতীর্ণ তার চোখ খোলা থাকায় বোঝাই শক্ত যে তার চোখ আছে কিন্তু চোখের দৃষ্টি নেই; যুক্তি হচ্ছে এই যে, সব অন্ধেরই কিছু চোখ বন্ধ হয় না। Correct! চোখ-খোলা অন্ধেই তো এদেশ ছেয়ে গেল; নিওরিয়ালিষ্টিক ছবির দর্শক মানেই তো চোখ-খোলা থাকা সত্ত্বেও যে অন্ধ; বিদেশের হাততালি-মোহান্ধ। যাক, এখনকার ছবিতে চোখ-খোলা একটি লোক এসে দাঁড়ালো পর্দায়। বোঝাতে হবে সে অন্ধ! কি করে একই সঙ্গে বোঝান এবং বোঝা চাপানো সম্ভব দর্শকের ক্ষেত্রে? না,—পর্দা জুড়ে প্রথমে একটি ছাতা দেখাও—তারপর ছাতা সরিয়ে আনো জুতো। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে নিওরটিক না কি নিওরিয়ালিষ্টিক ক্রিটিক বেড়ি বোঝাবার জন্যে অন্ধের কাছে যেমন কিবা দিন কিবা রাত; তেমনই অন্ধের কাছে জুতো আর ছাতার নো ডিফারেন্স! তার মতো নিওরিয়ালিষ্টিক অন্ধ আর কে?

আগেকার পরিচালকরা গরু মেরে জুতো দিতো; এখন জুতো মেরে যারা ছত্রদান করছে তারাই একচ্ছত্র চলচ্চিত্র সম্রাট এযুগে।

চলচ্চিত্রের কথা ছেড়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর আসুন। রঙ্গমঞ্চের বদলে এসেছে নঞ্চরঙ্গ—তার নাম নবনাট্য আন্দোলন। মঞ্চের ওপর রঙ্গ জমত বলে একটা স্টেজের নাম হয়েছিল রঙ্গমঞ্চ; এখন মঞ্চ জায়গা নিয়েছে রঙ্গর তাই এখন যা চলছে তা মঞ্চরঙ্গ। ছবিতে আজ গল্প বাদে আর সব আছে। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ঘর দেখানো, ট্রেন না দেখিয়ে ট্রেনলাইন দেখিয়েই ট্রেন আসছে-যাচ্ছে বোঝান; মৃতশয্যায় শায়িত এক ব্যক্তি মারা গেল বোঝাবার জন্যে তাকে না মেরে একজন বাগানে গাছ থেকে পটল তুলছে দেখিয়েই তাকে মরানো ইত্যাদি যে লেটেস্ট কায়দা দেখা যাচ্ছে তার নাম নাকি ফিল্ম ল্যাংগুয়েজ। ঠিক। কে না জানে ল্যাং দেবার জন্যে ল্যাংগুয়েজই এখন স্বাধীন ভারতে সব চেয়ে বড় অস্ত্র লিডারদের হাতে।

রঙ্গমঞ্চেও এখন মঞ্চের রঙ্গ জোর জমেছে। এখানেও এখন দৃশ্যসজ্জা এবং আলোকসম্পাতের খেলাই অভিনয় এবং নাটক লেখার চেয়েও বেশি চলেছে। নাটক ইমপোটেন্ট; এয়াই ইমপর্টান্ট এখন। আলোকসম্পাত নয়, আলোক-অভিসম্পাত। নাটক দেখে এসে কেউ বলে না নাটক কেমন হয়েছে, নাটক সম্বন্ধে No talk! অভিনয়ও কিছু নয়। নাটক দেখে এসে বলে কিরকম দেখে এসেছে স্টেজের ওপর হেলিকপটার নামবার দৃশ্য! গাড়িসুদ্ধ মানুষের অদৃশ্য হবার পি, সি, সরকার ম্যাজিকের সঙ্গে এই হেলিকপটার-অবতরণ দৃশ্যের পার্থক্য কোথায় জিজ্ঞেস করলে না দর্শক, না নাটকের উপস্থাপয়িতারা বলে একটি কথাও। আলোই যেন নাটকের সব। ঠিকই বলে! নাটকের সব তো বটেই!

আত্মার জন্যেই অঙ্গ, নাটকের জন্যে আঙ্গিক। আমরা একদিন শীতের রাতে গুহার মধ্যে আগুন জেলে গল্প শুনতে চেয়েছি। আরেকদিন কাগজে ছাপা গল্প চেয়েছি পড়তে। চলচ্চিত্রে অথবা রঙ্গমঞ্চে সেই গল্পেরই চরিত্রদের চেয়েছি দেখতে শুনতে। কখনও রূপকথায় মজেছি, কখনও হয়তো জীবনের অপরূপকথায়। কিন্তু কখনই কথাকে ছাড়িয়ে হাত-পা নাড়াকে উঠতে দিতে চাইনি; বক্তব্যকে অতিক্রম করে বক্তাকে দিইনি বাসবৎ লিখে। জীবন্ত মানুষকে দেখতে চেয়েছি মঞ্চের ওপর জীবনরঙ্গে। সেই রঙ্গের জন্যেই যে মঞ্চ চিরকাল তাই জেনেছি; আজ জানছি,—না। মঞ্চের জন্যেই রঙ্গ। জীবনের বিচিত্র বক্তব্যের জন্যেই এরকম জিনিষে প্রয়োজন চিত্রভাষার। এখন জানছি,—না। সাধারণ মানুষকে কতরকমে ল্যাং দেওয়া যায় তারই জন্যে নাকি এই ফিল্ম ল্যাংগুয়েজ।

ভুল বললাম। মানুষ নয়, মেষ। না। মেষও নয়। মেষের চেয়েও যে আমরা অধম; আমরা Mass—সে Mass-এর ছাড়মাস খেয়ে এ্যামাস করে নেওয়ার অর্থ

এবং সামর্থ্য। নেতা নয়; নেতা মানেই আসলে দারুণ পাকা অভিনেতা।

এই বাহ্য। সবচেয়ে বেশি যেখানে আমরা মেষে পরিণত অথবা অপরিণত Mass এ সেই পবিত্র ভূমির নাম আবহমান কাল ধরে এক: সাহিত্য জগৎ। এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অতিক্রম করেও এই সাহিত্য জগৎও এখন এই একই সুর বাজাচ্ছে। এখানেও পাঠককে ঠকানোই, কখনও মলাটের চাকচিক্যে, কখনও বিজ্ঞাপনের জয় ঢাকে, যাদের কাজ তারাই প্রকাশক; তারাই লেখক। এবং আমরা যারা বই পড়তাম এক কালে সেই আমরা এখন শুধু নাম পড়ি। কি লেখা সে সম্পর্কে আমাদের এতটুকু জানবার অথবা জানাবার আগ্রহ নেই; কার লেখা এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রশ্ন অথবা বক্তব্য। তাই দেখবেন বিংশ শতাব্দীতে কাগজের বিজ্ঞাপনে সব চেয়ে বড় করে কারা কারা লিখছেন। প্রকাশকও এবার্তা জানে; লেখকও। যারা এককালে না খেয়ে লিখে নাম করেছিল, তারা আজ লিখে কেবল খেতে চাইছে অনবরত খেতে চাওয়ার ফলেই অনবরত লিখতে হচ্ছে। তা হোক; তাতে ভয় পায় যে সে বাঙালী লেখক নয়। সে জেনে নিয়েছে এদেশে যখন একবার নাম করো, তারপর তার সুনাম অথবা বদনাম যাই করো, তাকেই লেখার বাজার আছে কেবল; এ দেশের লেখক মাত্রই আজকে যেমন বাজারে-লেখক, তেমনই এদেশে প্রত্যেক দিন যা বাড়ছে এবং যার ফলেই বাজলা বইয়ের বিক্রি বাড়ছে তার নাম পাঠাগার নয়; পাঁঠাগার। পাঠাগার হলে বই পড়ে কিনতো; পাঁঠাগার বলে কিনে পড়ে। তাও ভুল বললাম। নামকরা লেখকের বদনাম করার মতো বই হলেও পড়ে, কিন্তু দৈবাৎ যদি নাম না করা কারুর নাম করার মতো বই বেরোয় তারা কেনে কিন্তু পড়ে না কখনই। পাঠাগার না পাঁঠাগার? আপনিই বলুন।

আমাদের দেশেই বা কেবল বলব কেন? কোন দেশে নয়। ফরাসী দেশে ফলি-বার্জার বলে উলঙ্গ নৃত্যের একটি আয়োজন আছে যেটির কৃপায় জগতের সমস্ত দেশের বস্তাপচা-পর্নোগ্রাফিকে ফোঁকা বানিয়ে পকেট কাটার এবং সেই একই সঙ্গে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সব চেয়ে বড়ো হাতিয়ার হয়ে গেছে এখনও ফরাসীদের হাতে। এখন কিন্তু এর চেয়েও বড়ো ফলি-বার্জার হল অধুনাকালের ফরাসী সাহিত্য। ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ নামে অষ্টাদশী এক তরুণী জীবনের এমন নগ্ন চিত্র এঁকেছে যার তুলনা নেই জগতের কোন ফলি-বার্জারেই। —এই বিজ্ঞাপনেই আমরা মাৎ হলাম। এবং পড়বার আগেই মুখ দিয়ে লাল পড়বার এমন বৃত্ত ভারতবর্ষের পাঠকদের মধ্যেও দেখা গেল যে বেস্ট সেলার হতে অনুদিত হতে এবং একমাত্র সাহিত্য হতে ছাড়া আর কিছু হতেই বাকী থাকলো না এই আঠারো বসন্তের উত্তেজক অভিজ্ঞতা।

যত দোষ সবই কি নন্দ ঘোষ না কেবল আধুনিকতম ফরাসী বইকে দায়ী করে লাভ কি? লেটেস্ট অশ্লীলতার স্টক দিয়ে পাঁচ টাকার মাল পঁচিশ টাকায় লাইসেন্সধারকে কলা দেখিয়ে কালোবাজারে গরম ঘুষনির চেয়েও দ্রুত কেটে গেল সেই 'লজিক' কি? এদেশে পৌঁছবার আগেই, এমন বিকৃত হবার ব্যাপার আগেই ঘটানো হলো, যে সর্বাধিক বিক্রীত হবার ডোটিনুড অপমান, বই বিক্রী আরম্ভ হবার আগেই, সবাগ্রে যে প্রচ্ছদে ধারণ করবার সুযোগ পেল সেই 'লাস্টটা' পুরো পড়বার ধৈর্য কিন্তু একজনের যদি বা হলো, বাকী ন'জনের হলোই না; তারা কেবল কোন জায়গাটায় সেই মারাত্মক (!) কথাগুলো আছে, খুঁজে বেড়াতে লাগলো তাই; দ্রুত হাতে পাতা ওলট-পালট করতে করতে। যা সাহিত্য হয়নি তা অশ্লীল হতে পারে; কিন্তু যা-ই অশ্লীল তাই সাহিত্য হবে কেন? —এ প্রশ্ন আমরা করতে সাহস করলাম না যে তার কারণই এই শিরোনামায় জলজল করছে: মানুষ নহি তো; আমরা মেষ। আমরা মেষও নই যে; আমরা যে তার চেয়েও অধম। আমরা যে Mass!

এ পর্যন্ত ও না হয় হজম করা গেছিলো; ম্যালেরিয়া হলে কুইনিন সেবনে অথবা 'অণ্ডি'—

নোবেলের কৃপায় ধন্যই সার্থ হলে,
ধন্যটা-পাঁচটার ঘড়ে গিয়ে আমার
কিন্তু ডক্টর জিভাগোর ক্ষেত্রে একবার

দুবা (মে)-বেলভেডায় যেতে বাধ্য হলো, তার বেলায়? এক শিবির থেকে বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন, টমাস মানের পরে এত বড়, এত মহৎ, এত দীর্ঘ বই যে আবার লেখা হবে, হতে পারে বিংশ শতাব্দীতে আরেকবার,—কবি পাস্তারনাকের এই গদ্য কবিতার আগে তা অকল্পের ছিলো, আরেক ক্যাম্পের বিশেষজ্ঞরা প্রায় একই স্বরে একই সুরে অসুরের সঙ্গে একাসনে বসালেন পাস্তার নাককে। পাস্তার নাকের নাক কেটে নিজেদের যাত্রা,—বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বদেশের জয়-যাত্রাও ভঙ্গ করতে পেছপাও হলেন কই? কই কেবল আমরা যারা বিশেষজ্ঞকে মাঝে মাঝে বিশেষ অঙ্কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি তারা একবার রামের ডান হাতে, আরেক বার সুগ্রীবের বাঁ হাতে মার খেয়ে মরবার জন্যে একোর্ট ওকোর্ট করে বেড়াচ্ছি এখন?

ডক্টর জিভাগো পড়ে আমরা একজনও এই সাদা সহজ কথাটা নোবেল প্রাইজ দেনেওয়ালাদের বলতে পারলাম না, যে, জিভাগো উপন্যাস নয়। না হবার কারণে পাস্তারনাক ঔপন্যাসিক নন। এবইতে সাম্যবাদী দোভিয়েতের শত্রুর চিত্র থাকতে পারে; ভালো কবিতা কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছে যারা এমন কয়েকটি উপন্যাস এবং পায়নি যারা এমন কয়েকটির সঙ্গেও বটে ডক্টর জিভাগোর তুলনা দুজন দ্বিপদের সঙ্গে একজন চতুষ্পদের তুলনা করার মতোই গণিত-সঙ্গত, কিন্তু জীবনের অসঙ্গ অবিমৃষ্য-কারিতা মাত্র। এ যেমন বলতে পারলাম না, তেমনই পারলাম না বলতে তাদেরও কিছু যারা নোবেল প্রাইজ পাবার কারণেই ডক্টর জিভাগো সাহিত্যের ছাড়পত্রও পাবার উপযুক্ত নয় বলতে উন্মুক্ত-কচ্ছ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য আরও একটা কথা ভারতীয় সাম্যবাদীদের বলতে পারছি না; স্বদেশের যে ক্ষতিই করুক ডক্টর জিভাগো ভারতীয় সাম্যবাদীদের মহা উপকার করেছে সে, তাতে সন্দেহ কি? পাস্তারনাকের এই নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বইয়ের নাম ধার করে উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান ডাক্তারকে কি খুব ক্ষেপে খুবই সংক্ষেপে তারা বলতে পারেন না,—ডক্টরজি ভাগো। পারেন কিনা? আপনারাই বলুন? আপনারই বা বলেন কি প্রকারে? আপনারাও যে আমাদেরই মতো এই রচনার শিরোনামা; আপনারাও সে মানুষ নন; মেষ। মেষের চেয়েও অধম। Mas।

মেরুর রহস্য সন্ধানে

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মেরু ও মরু! আদিগন্ত তুষারক্ষেত্র ও দিগন্তপ্রসারী বালুকা-ভূমি! উষর, জলহীন মরুবক্ষে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সমাজের সেবা করতে বাধ্য করার পথে সোভিয়েতের মানুষ অগ্রসর হয়েছে অনেকখানি। মেরু-বিজয়ের সাধও তার বহুযুগের। সে সাধ শুধু কৌতূহলের জন্যে নয়। তার পিছনে রয়েছে যুগ-যুগের সেইসব জাতীয় জীবনের সমস্যা—যেগুলি মানব-সভ্যতার আদিম প্রভাত যুগ থেকে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে আসছে বিশ্বপ্রকৃতিকে চেনবার ও আয়ত্ত করার নেশায়। সেই অনুপ্রেরণাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রাণবস্তু। দেশে দেশে বহু প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ ও নারী প্রকৃতির রহস্য-সন্ধানে আত্মোৎসর্গ করেছেন উদাসীন শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়েও। প্রাক্‌বিপ্লব রুশিয়াতেও সেইরকম মহাজ্ঞানীর অভাব ছিল না। স্বদেশের সমৃদ্ধির জন্য তাঁরা বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে অসাধারণ নিষ্ঠা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই মধ্যে অনেকে রুশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে প্রথমে উত্তরমেরু বিজয়ে প্রয়াসী হন নবম ও দশম শতকে।

এই বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন যে অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের পথ তাঁদের সামনে খোলা কিন্তু চিরতুষারাবৃত উত্তর মহাসাগরের বুকে জাহাজ চলবার কোন জলপথ নেই। রুশ ভূ-ভাগের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মেরু-মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত অথচ পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর থেকে পূবে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার কোন জলপথ নেই। এটা ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্য-পরিবহণের পক্ষে এক প্রচণ্ড অন্তরায়। মেরু মহাসাগরবক্ষে জলপথ সৃষ্টি করার চেষ্টায় রুশরা নবম শতকে শ্বেতসাগরের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। তার কিছুকাল পরে রুশ জেলেরা নোভায়া জেম্‌ল্যা ও স্পিটজ্‌বার্গেন দ্বীপ দুটি আবিষ্কার করে এবং আন্দাজ নিয়ে তারা নিয়মিত সেই তুষারবদ্ধ এলাকায়, সীল, মাছ ও অন্যান্য জানোয়ার শিকার করত।

তারপর ১৬১৭ সালে এক রুশ অভিযাত্রীদল এশিয়ার উত্তরতম ভূ-বিন্দু চেলুস্কিন অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে উত্তর মহাসাগরের পশ্চিমাংশ ঘুরে আসেন।

১৬৪৮ সালে জলপথে উত্তর মহাসাগর থেকে মহাসাগরে গিয়ে পড়ে কাস্টেন যে, রুশিয়া কোন ভূখণ্ডের দ্বারা যুক্ত নয়। মানচিত্রে দেখতে পাবেন এশিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে যে অন্তরীপটি রয়েছে তার নাম চেল্যুস্কিন অন্তরীপ।

আমেরিকা ও রুশিয়ার মাঝখানে যে প্রণালীটির নাম বেরিং সেটিরও নামকরণ হয়েছিল রুশ-নৌ-পরিব্রাজক বেরিং-এর নামে যিনি ১৭২৮ সালে প্রথম সেই প্রণালী পার হন। এশিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দ্বীপ, আলাস্কা এবং উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম কিছু কিছু অংশের আবিষ্কর্তা তিনিই।

এই সমস্ত অভিযানের ফলাফল পরীক্ষা করে রুশিয়ার মহাবিজ্ঞানী লোমনোসভ মেরুসাগরের এক মানচিত্র রচনা করেন।

১৮শ শতকে রুশ অভিযাত্রীরা মেরুসাগরের উপকূল-ভাগ থেকে আরো উত্তর দিকে যাবার চেষ্টা করেন এবং ঐ সময়ে নোভোসীবিস্কিয়ে দ্বীপপুঞ্জটি আবিষ্কৃত হয়।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রুশ-আমেরিকান নাকারুক নিজে মাথা খাটিয়ে একটি তুষারভেদী অর্ণবপোত নির্মাণ করেন। 'ইয়েনার্কী'-নামে সেই জাহাজটি আজও অক্ষত অবস্থায় উত্তর মহাসাগর বক্ষে পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। 'ইয়েনার্কী' হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম পরমাণুশক্তিচালিত তুষারভেদী সমুদ্রপোত লেনিনের অগ্রদূত।

উত্তর মেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে বিমানের ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৯১৪ সালে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে রুশ অভিযাত্রীরা পুরেক-

জয়ের কাহিনীতে এক বিরাট সাফল্য-বিশেষ। সে ছে মেরুমণ্ডলের এক বিশালসংকুল ও সুবিস্তীর্ণ দ্বীপ-লের আধিকার। সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম "সোভেৎস্কায়া ম্যুল্যা"। এই ষোল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গেকার যুগের সুমেরু অভিযানের ইতিহাসের শেষতম রণযোগ্য ঘটনা।

অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী সোভিয়েত আমলে মেরু-জয়ের অভিযান এক সরকারী দায়িত্ব হয়ে ওঠে। ানিন নিজে সুমেরু মহাসাগরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা রিচালনার বন্দোবস্ত রেন ১৯১৮ সালে একটি ক্তি ঘোষণা করে। মলে আশ্চর্য লাগবে , ১৯২০ সালে যে মেরু গবেষণা ভবনের তিষ্ঠা হয় তার পরিষদ-র মধ্যে একজন ছিলেন াম্রিন গর্কী।

দক্ষিণ মেরুতে গবেষণা চলছে

এরপর অ্যাডমিরাল শাকফ, ক্যাপ্টেন ত্যারোনিন, অটো শ্মিড াযুধ নাবিক ও বৈজ্ঞা-নিকদের চেষ্টায় উত্তর-মাসাগরীয় জলপথের যে উন্নতি হয়েছে।

১৯৩৪ সালে চেলুস্কিন নামে একটি সোভিয়েত াহাজ মুর্মান্স্ক বন্দর থেকে ভ্লাদিভস্তক বন্দরে যাবার গে ভূষারস্তূপে অবরুদ্ধ হয়ে বসে হয়ে যায়। জাহাজের াবিকদের বিমানের সাহায্যে উদ্ধার পাবার আগে যেন কিছুদিন ভাসমান ভূষারক্ষেত্রে আড্ডা গেড়ে থাকতে য়েছিল। তাদের এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক শ্মিড সুমেরুমণ্ডলের মধ্যভাগে প্রবমান ভূষারক্ষেত্রের উপর একটি বিজ্ঞান গবেষণা শিবির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রেন। ১৯৩৭ সালে সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত ও জয়লাভ করে পৃথিবীর প্রথম সুমেরুমণ্ডলীয় গবেষণা একদল সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ৯ মাস সেই প্রবমান ভূষারক্ষেত্রে থেকে গবেষণা চালিয়ে যাবার পর দেখেন তাঁদের শিবির সমেত ভূষার ক্ষেত্রটি ভাসতে ভাসতে গ্রীনল্যাণ্ড-সাগরে এসে পৌঁছেছে।

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে চার ইঞ্জিন-যুক্ত একটি বিমান কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে মেরু-মণ্ডলের আরো অনেক দূর ও দুর্গম এলাকায় (যেখানে জাহাজ যেতে পারে না) তাঁদের নামিয়ে দেয় বিভিন্ন জায়গায়। তাঁরা সেইসব জায়গায় কয়েকদিন ধরে থেকে সমুদ্রের গভীরতা, জলপ্রবাহের গতি ও প্রকৃতি, সৌর তেজস্ক্রিয়া, চৌম্বক-কার্য-কলাপ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসেন। "উড়ন্ত গবেষণা পদ্ধতির" এই হোল গোড়াপত্তন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সনে কোতক নামে এক রুশ বৈমানিক মেরুমণ্ডলের সুদূর উত্তর-ভাগে র‍্যাঙ্গেল দ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে ৫০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এক পার্বত্য প্রকৃতির ভূষারাবৃত "দ্বীপ" দেখতে পান। পরের বছর আর একজন বৈজ্ঞানিক সেই দ্বীপটিকে দেখতে পান আরো ২০০ মাইল পশ্চিমে। তার মানে সেটি একটি ভাসমান ভূষার-দ্বীপ; পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, দ্বীপটি একসময়ে মূল-ভূখণ্ডের অংশ ছিল।

এর পর সুমেরুমণ্ডলে আরো ৭টি প্রবমান গবেষণা শিবিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেইসব শিবিরের গবেষণা থেকে সুমেরু সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সাগরগর্ভে পর্বতমালা

সোভিয়েত মেরু-অভিযাত্রী বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পেরেছেন যে, সুমেরুমণ্ডলের মহাভাগে মহাসাগরের তল-

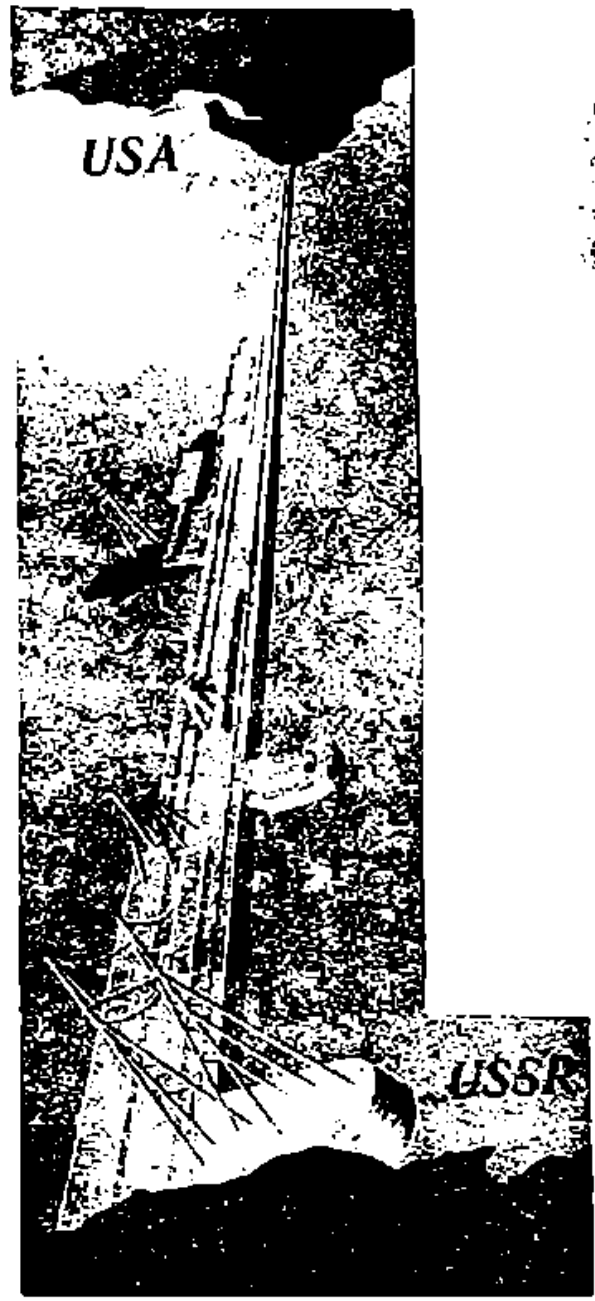

কল্পিত মেরিং যোজক। এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশকে এই যুগপথে যুক্ত করবে।

দেশ সব জায়গায় সমতল বা সমান গভীর নয়। তার কোথাও বা অবনমন, কোথাও বা উচ্চতা। সেখানে সমুদ্রের তলায় সমতলক্ষেত্রের মাঝে মাঝে পর্বতমালা আছে। ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত অভিযাত্রীরা লোমনোসভ-বিজ্ঞানীর দ্বীপপুঞ্জ থেকে গ্রীনল্যাণ্ড ও ওয়েলসমিথার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ নিমজ্জিত এক পর্বতমালা আবিষ্কার করে তাঁর নাম রাখেন লোমনোসভ পর্বতমালা। এই পর্বতমালা উত্তর মহাসাগরকে জলের তলায় দ্বিখণ্ডিত করে প্রশান্ত মহাসাগরের জলকে উত্তর মহাসাগরের পূর্বভাগে বন্দী করে রাখে এবং অতলান্তিক মহাসাগরের জলকে উত্তর মহাসাগরের পূর্বে যেতে দেয় না। মহাবৈজ্ঞানিক লোমনোসভ আধুনিক বিজ্ঞানের সাজসরঞ্জাম না পেয়েও এই ধারণা করেছিলেন যে উত্তর মেরুর কাছাকাছি কোথাও একটি বিশাল দ্বীপ আছে। সাগর তলে এই পর্বতমালার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় আমরা বলতে পারি যে লোমনোসভের ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও আসল ব্যাপারের অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছিল। লোমনোসভ পর্বতমালার দৈর্ঘ্য ১৮০০ কিলোমিটার অর্থাৎ উরাল পর্বতমালার দৈর্ঘ্যের সমান। সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা ৩৩ কিলোমিটার। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন ভূপৃষ্ঠ গঠনের সর্বশেষ যুগ (যে যুগে মানুষের উৎপত্তি হয়) বা তৃতীয়ক যুগে ভূত্বকের ভাঙনের সময় এই পর্বতমালার অভ্যুদয় হয়।

সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে যে অতলান্তিক মহাসাগরের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলধারা উত্তর মহাসাগরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বয়ে যায় উপরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলের অনেক নিচের স্তরে। তারপর উত্তর মহাসাগরের বিচরণশীল আণুবীক্ষণিক প্রাণীগুলি পরীক্ষা করে বলা যায় যে সেগুলি এসেছে অতলান্তিক মহাসাগর থেকে অর্থাৎ উত্তর মহাসাগরের জলে পুষ্ট। ঐসব আণুবীক্ষণিক জীব লোমনোসভ পর্বতমালার ওপারে উত্তর মহাসাগরের পূর্বখণ্ডে নেই বলেই চলে। ঐ দিকে আছে এমন এক অন্য জাতীয় জীব যার কথা আমরা জানতাম না। উত্তর মহাসাগরের পূর্বখণ্ডে মেরিং প্রণালী মারফত প্রশান্ত মহাসাগরের জল যে প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হয় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

এতদিন মানুষের ধারণা ছিল যে উত্তর মেরু অঞ্চলে কোন জীবজন্তু নেই সে ধারণাও সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা সুমেরুর কেন্দ্রভাগে প্লবমান তুষার ক্ষেত্রে শাদা ভালুক, মেরুমণ্ডলীয় খেঁকশিয়াল, সীল, সিন্ধুশশক, হাঁস এবং গাঙচিল জাতীয় জীব দেখতে পেয়েছেন।

এতকাল বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে সুমেরু কেন্দ্রে সূর্য থেকে যতটা তাপ এসে পড়ে তার চেয়ে বেশি তাপ সেখানে থেকে আবহমণ্ডলে বিকীর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ সেখানে বাৎসরিক বিকিরণের ফলাফল নেতিবাচক। কিন্তু সুমেরুর দুই নম্বর গবেষণা শিবির থেকে আজ প্রমাণিত হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে আবহমণ্ডল বিকীর্ণ হবার পরও প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ২·৭ ক্যালরি তাপ বজায় থাকে অর্থাৎ ফলাফলটা নেতিবাচক নয় ঐতিবাচক।

সোভিয়েত অভিযাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সুমেরুর চৌম্বক কেন্দ্র লোমনোসফ পর্বতমালার উপর নির্ভরশীল। ঐ পর্বতমালার গর্ভে যে সব চৌম্বক-ধর্ম সম্পন্ন খনিজ পদার্থ আছে সেইগুলির আকর্ষণ চলে কতকগুলি সরল রেখার পথে যেগুলির নাম সুমেরুর চৌম্বক মধ্যরেখা। মেরু-মণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির প্রবাহ এই প্রাকৃতিক চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে নানা রকমের তড়িৎ প্রবাহ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সেইসব গণ্ডগোল বেতার-প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে।

উত্তর মেরুর চেয়েও দক্ষিণ মেরু মানুষের কাছে অনেক বেশি রহস্য সমাচ্ছন্ন। তার দুর্গমতার জন্য তাকে লোকে বলে থাকে কুমেরু। উত্তর মেরুকেন্দ্রে আমরা কোন জমি পাইনি, পেয়েছি ভূষারের প্রবমান দ্বীপ। উত্তর মেরুতেও সৌররশ্মি বিকীর্ণ হয় কিন্তু পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে পরিমাণ সৌর বিকিরণ আসে তার শতকরা ৯৬ ভাগ এসে পড়ে দক্ষিণমেরু বা আন্টার্টিকায়। কোটি কোটি বছরের পুরানো ভূষারের চাদর বিছানো আন্টার্টিকা ভূমণ্ডলের রবিক-রোজ্জ্বল অঞ্চলগুলির অন্যতম। শীতের সময় সেখানে এত ঠাণ্ডা যে তাপমানযন্ত্রের পারা পর্যন্ত জমাট বেঁধে যায় (শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ৮৮ ডিগ্রী নিচে । কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা চড়ে যায় ৩০।৩৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে অর্থাৎ ৯০ থেকে ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে।

দক্ষিণ মেরু অভিযানের ইতিহাসেও রুশ বৈজ্ঞানিকদের নাম ও কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে।

সেকালে লোকের ধারণা ছিল যে দক্ষিণ মেরুতে স্থল না থাকলে ভূমণ্ডলের ভারসাম্য থাকতে পারে না। কোন কোন সওদাগর দক্ষিণ মেরু বিজয় করে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কথাও যে কল্পনা না করতেন এমন নয়। আর বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করতেন সেই সুদূর অজ্ঞাত দেশের প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটনের কথা। বৈজ্ঞানিকের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার ব্যাপারে যাঁরা প্রথম অগ্রণী হন তাঁরা দুজন রুশ নাবিক।—বেলিংহাউসেন ও লাজারেফ। ১৮১৯ সালে "ভস্তক"—(প্রাচ্য) ও "মির্নি" (শান্তিপ্রিয়) নামে দুখানি পাল-তোলা জাহাজ নিয়ে তাঁরা দক্ষিণ মহাসাগরের দিকে যাত্রা করেন। প্রকৃতই পৃথিবীতে কোন ষষ্ঠ মহাদেশ আছে কিনা সেটা জানাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য, কারণ ক্যাপ্টেন কুক আন্টার্টিক মহাদেশ বলে কোন কিছু দেখতে পাননি, সুদূর দক্ষিণে কোন জায়গায় স্থলের সন্ধান পাননি। বেলিং হাউসেনের নেতৃত্বে রুশ অভিযাত্রীরা ব্রিটিশ সন্ধানী ক্যাপ্টেন কুকের ধারণা ভেঙে দিয়ে ১৮২০ সালের জানুয়ারী মাসে আন্টার্টিকার এক কোণে গিয়ে লঙ্গর ফেলেন। সেই জায়গার নাম দেওয়া হয় "ক্রাউন প্রিন্সেস মার্থা ল্যাণ্ড"। পিটার দি গ্রেট দ্বীপ ও বেলিংহাউসেন সাগর সেই অভিযাত্রীদেরই আবিষ্কার। এই রুশ নাবিকরাই প্রথম প্রমাণ করলেন যে ভূমণ্ডলের সুদূর দক্ষিণে চিরতুষার মেখলার ওপারে ভূভাগের অস্তিত্ব আছে।

এর পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কমপক্ষে ১৯-টি অভিযাত্রী দল ষষ্ঠ মহাদেশ নিয়ে গবেষণা করতে যান কিন্তু কেউই পিটার দি গ্রেট দ্বীপ বা বেলিংহাউসেন সাগর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি।

তারপর ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত রুশিয়াই বেলিংহাউসেন ঐতিহ্যের উত্তর-সাধক হবার জন্যে এগিয়ে আসে। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে একদল সোভিয়েত অভিযাত্রী হ্যাজেলটন দ্বীপে আন্টার্টিকার প্রথম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন যার নামকরণ হয় "মির্নি"।

গত ৪ বছরে সোভিয়েত অভিযাত্রীরা ষষ্ঠ মহাদেশ সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য-সম্পদ আহরণ করেছেন।

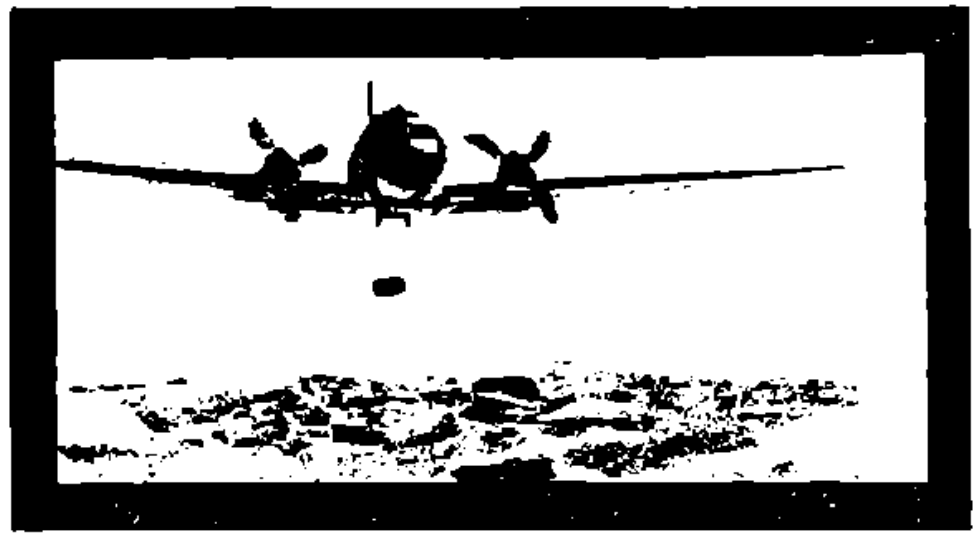

পৃথিবীর ষষ্ঠ-মহাদেশে বিমান অবতরণের দৃশ্য।

আণ্টার্টিক'র সূর্যালোকের ও সৌর-তাপের প্রাচুর্যের কথা আগেই বলেছি। এত তাপ আছে অথচ ৪০০০ মিটার পুরু বরফ একটুও গলে না। কেন? সুমেরু বৃত্তে ইগার্কা নামে যে অঞ্চল আছে সেটির অবস্থান আণ্টার্টিকার অনুরূপ। ইগার্কায় বন জঙ্গল আছে, ফলমূল শাকসব্জি হয় অথচ আণ্টার্টিকা চিরতুষারের শুভ্র ধ্যানমগ্নতা। তবে আণ্টার্টিকা কি আজ মৃত?

এত উত্তাপ পেয়েও আণ্টার্টিকা তার সবটুকুই খুইয়ে বসে। আমরা ভূগোল পড়েছিলাম যে ভূমণ্ডলের সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা হচ্ছে ভের্খোইয়ান্স্ক্। সোভিয়েত অভিযাত্রীরা আণ্টার্টিকা'র এক গবেষণা কেন্দ্র 'ভস্তক' এর কাছে একটি জায়গা আবিষ্কার করেছেন যেটি ভের্খোইয়ান্সকের চেয়েও ঠাণ্ডা (শূন্য ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেডের ৮৭ ডিগ্রী নিচে)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কুমেরুবৃত্তে আরো কয়েকটি গবেষণা-শিবির স্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণা-কেন্দ্রের কাজ-কর্ম ও পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বলা যায় যে আণ্টার্টিকা শুধু যে দক্ষিণ গোলার্দ্ধের জলবায়ুর রাজাধর তাই নয় আংশিক ভাবে উত্তর গোলার্দ্ধেরও বটে। আণ্টার্টিকা, মহাদেশ সীমাহীন চিরতুষারের রাজত্ব। সেই তুষারের স্পর্শে যে প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহ জন্মলাভ করে তার বরফের নিঃশ্বাস ভূমণ্ডলের বিষুবরেখা অতিক্রম করে উত্তরে গিয়ে হানা দেয়। এইভাবে ষষ্ঠ মহাদেশ সারা দুনিয়ার জলবায়ুর গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

আণ্টার্টিকা কি মহাদ্বীপ নাকি দ্বীপপুঞ্জ? সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের মতে আণ্টার্টিকা হচ্ছে এক শিলা ও পর্বতসংকুল ভূখণ্ড যা সবসময়ে বরফের মুকুট পরে আছে। সেই মুকুট ৪০০০ মিটার (১ মিটার = একের দশ গজ) থেকে মিটার পর্যন্ত পুরু। সেই তুষাররাশির প্রচণ্ড চাপে আণ্টার্টিকা ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কিন্তু মহাকালের অগ্র-গতির সঙ্গে কোন এক যুগে সেই তুষার হয়ত গলে যাবে এবং উত্তর গোলার্দ্ধের স্কান্ডিনেভিয়া, স্পিট্‌স্-বার্গেন বা ফ্রান্জ জোসেফ ল্যাণ্ডের মতই সে সাগর স্নান করে সূর্য প্রণাম করবে।

ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে আণ্টার্টিকার পাহাড় ও পাথরের উৎপত্তি ও গড়ন অন্য রকমের। ভূপৃষ্ঠ গঠনের প্রথম যুগেই সেইসব পাহাড়ের উদ্ভব। আণ্টার্টিকার পূর্বাঞ্চলের গড়ন সিঁড়ি-দেওয়া চাতালের মত। পশ্চিমাঞ্চলের পর্বতমালাকে বৈজ্ঞানিকরা দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিস্ পর্বমালার পরিবর্ধন বলে মনে করেন।

আণ্টার্টিক মহাসাগরের তলায় পরীক্ষা করে সোভি-য়েত বৈজ্ঞানিকরা আণ্টার্টিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের মাঝামাঝি বহু উদীয়মান আগ্নেয়গিরির সন্ধান পেয়েছেন এবং প্রমাণ পেয়েছেন যে সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মহা-সাগর গর্ভে নতুন পাহাড়-পর্বত মাথা তুলে

হয়ত কয়েক হাজার বছর পরে এইসব পাহাড় চুরিল

দ্বীপের পরম।

ভৌগলিক, চৌম্বক, ভূচৌম্বক, শৈত্য ও অনধিগম্য এই পাঁচটি মেরুবিন্দুর শেষ, আর্কটিকে, যেখানে ঠাণ্ডায় সালফিউরিক এ্যাসিড পর্যন্ত জমাট বেঁধে যায়, পেট্রলে যেখানে আগুন জ্বালানো যায় না বরং যে কাঁচের মত ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং বাতাসের বেগ যেখানে সেকেণ্ডে মিটার (অর্থাৎ ঘণ্টায় ১২০ মাইলেও বেশি) সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি ? আছে।

আর্কটিকার অন্তঃসলিলা তুষার ক্ষেত্রে বিচরণ করে অতিকায় সীল ও পেঙ্গুইন, অনেক নিচে জলে সাঁতার কাটে নানা রকমের মাছ। সামান্য কিছু উত্তরে তিমিও আছে। দিগন্ত-প্রসারী তুষার মেরুর বুকে কোথাও কোথাও ছোট ছোট মরুস্থান আছে যেখানে পাথরের বুকে নিবিড় হয়ে আছে শৈবালের গালিচা। সেই গালিচায় কোথাও উদ্ভিদগুলি কয়েক সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা নয়। জলের মধ্যে কয়েক রকমের অদ্ভুত মাছ পাওয়া গিয়েছে যাদের রক্তে লাল কণিকা নেই।

এই রকম ২টি মরুস্থানের মাঝখানে বৈজ্ঞানিকরা আর্কটিক অঞ্চলীয় জীবজন্তুর এক সমাধি ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন যেখানে এক বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে সীল, গারডিন, সাগর-হস্তী ও পেঙ্গুইনের মমীভূত দেহাবশেষ পড়ে আছে। এত উঁচুতে এই সব জীব এল কোথা থেকে ? বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে তুষার-যুগের অব্যবহিত পরে আর্কটিক অঞ্চলের আবহাওয়া অনেক বেশি গরম ছিল এবং সেখানকার সাগরপৃষ্ঠ অনেক উঁচু ছিল। সেই সময় ঐ সব জীব এই তুষার-ভূমিতে এসে পড়ে।

সাম্প্রতিক কালে পরমাণু শক্তিচালিত তুষার ভেদী-জাহাজ 'লেনিন' এবং আর্কটিক অভিযাত্রী ডিজেল-বৈদ্যুতিক জাহাজ 'ওব্' সুমেরু ও কুমেরুর রহস্য উদ্ঘাটনের শান্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অভিযানের দুটি মূল্যবান সহায়। মেরুমণ্ডলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অগুরু উত্তাপ ও আবহাওয়ার চাপ এবং অত্যধিক উচ্চতায় মানুষকে কি ভাবে চলতে হবে সে সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়ে মেরু বিজয়ের অভিযানকে মহাকাশ বিজয়ের অভিযানের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে এবং বেরিং প্রণালীর জলকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে 'গালফ্ ষ্ট্রিম'র উষ্ণ জলধারাকে সুমেরু মহাসাগর সৈকতে প্রবাহিত করে সেখানকার চিরতুষার-বলয়িত এলাকাকে নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত করা ও উপকূলবর্তী তুষার ক্ষেত্রকে চাষবাসের উপযোগী করার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য চাই যুদ্ধের চিরনির্বাসন ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা।

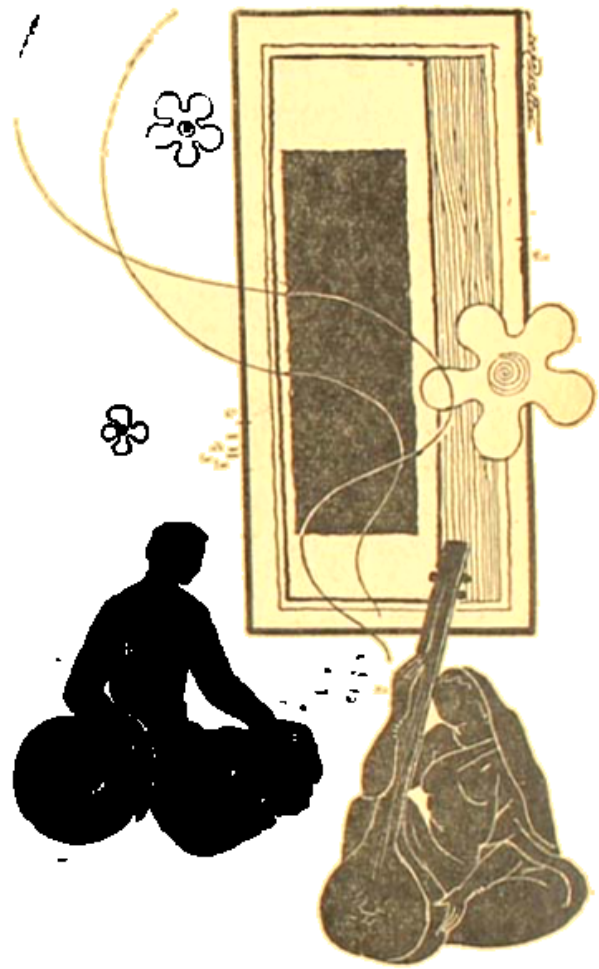

নায়ক নায়িকা

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রামদাস বাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পলিত কেশ মাথাটা নেড়ে চেয়ে রইলেন। ছেলেটি বললো—আপনি যে আছেন তাইত কেউ জানে না। এখন আবার নতুন করে এইসব জিনিসকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। নতুন দৃষ্টিভংগীতে মূল্যায়ন হচ্ছে বললেন না।

মূল্যায়ন কথাটার মানে বুঝলেন

বললেন—তা আমাকে কি করতে হবে?

—আপনাকে আমরা নিয়ে যাব। বুঝতে পারলেন না? এবার কনফারেন্সটা যে পিয়ারা খাঁর নামে। তাঁর সময়কার তবলচি আপনি। আপনি বেঁচে আছেন! আপনাকে দিয়ে যদি উদ্বোধন করাতে পারি!

—পিয়ারা খাঁর নামে বাবুরা কনফারেন্স করছেন? বাবুরা বলে কথা কওয়াতে যে অশালীনতা ছিল, ছেলেটি সহাস্যে সেটা ক্ষমা করলো। কেননা আর যাই হোক, পঞ্চাশ বছরের পুরনো দিনের এক অবলচি বয়স যাঁর নব্বই-এর ওপর—তাঁর ভাষা এই রকমই হবে। এই ধরে নেওয়াই ভালো। সে বললো—ও নিশ্চয়। শুধু তাই নয়—হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। নিউএম্পায়ার দিচ্ছি আমরা।

—সেখানে কি হবে?

—আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানাব। আপনি বলবেন তাঁর সম্পর্কে দুইচার কথা। সত্যি বলতে কি, পিয়ারা খাঁ এযুগে একটা বিস্ময় ত! হাসছেন কেন?

রামদাসবাবু বললেন—হাসি পেল। ঐ যে বারান্দাটা দেখছেন, পিয়ারা খাঁ ঐখানে পড়ে মরেছিল। গোরা-কাফনের টাকা তুলতে আমার জান বেরিয়ে গিয়েছিল। সেইসব কথা মনে পড়ে যৈ কি!

—কি আশ্চর্য। সেই জন্যেই ত আজকে তাঁকে নতুন করে স্মরণ করছি আমরা। তাঁর সমসাময়িক যুগ তাঁকে সমাদর করতে পারেনি। আজকে এই দিনে আমাদের নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার যুগে—আমরা তাঁকে নতুন করে দেখব চিনব!

বড় বড় কথার ধাক্কায়ও রামদাসবাবু আবার বিভ্রান্ত হলেন। তারপর বললেন—বড় পান্নাকে নে যাব ত?

—বড় পান্না?

রামদাসবাবু অনুকম্পার হাসি হাসলেন। বললেন বাবুরা পিয়ারা খাঁকে নিয়ে মাতামাতি করছেন, রাজ হাজার টাকা লুটিয়ে দিচ্ছেন, আর বড় পান্নার খ রাখেন না?

—না। কে বলুন ত?

ছেলেটির মনে হলো সে খুব ভিতে গিয়েছে নোটবইটা বের করলো। কলমখুলে সাগ্রহে তাকি রইল। এই নোংরা বুড়োটার কাছ থেকে সে নতুন নং গল্পের মালমশলা পাবে বলে মনে হচ্ছে।

রামদাসবাবু বললেন—জানেন যে পিয়ারা খাঁর মনের মানুষ ছিল বড় পান্না? তার গানকে ও কারুর কাছে থাকতে ঐ বড়পান্নার কাছে আছে। পিয়ারা নিজে সরগম্ করতো না। শেষে ডুনিবাবু যখন তাকে ব্যবস্থা করে দিলেন—তখন ঐ বড়পান্নার বাপ পিয়ারাকে নে গেল। পান্না কোনদিনও সরগম্ করেনি। সোজা গান তুলত।

—পিয়ারা খাঁ সংগীত গায়ক ছিলেন, তাই ত বোঝা যায়।

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। আমাদের সময় এত কথার কায়দা ছিল না। পিয়ারা পূর্বজন্মে যা শিখেছিল তাই তার মনে ছিল। গান সে শুনতো আর পাখির মতো তুলতো। শেষকালে তাকে বাঁচালে ঐ বড় পান্না। বড়পান্না তাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, রোগে চিকিচ্ছে করেছে। নিজের গয়না বেচে মদ খাইয়েছে। পিয়ারার যত গান সব ঐ বড়পান্নার কাছে পাবেন।

—তিনি বেঁচে আছেন?

—নিশ্চয়। এই চারবছর আগেও দেখা করে এসেছি আমি।

—তা দেখুন—ওঁর কথা ত কেউ বলেন নি। আপনি ওঁর সংগে একটু যোগাযোগ করুন না!

—রামদাসবাবু হঠাৎ ছেলেটির হাত চেপে ধরলেন। বললেন—দেখুন বড়পান্নার এখনো তেমন বয়স হয়নি। দিব্যি গাইতে পারে। আজকাল ও আপনাদের কত রকমই হয়েছে শুনতে পাই। ওকে কয়টা টাকা পাইয়ে দিতে পারেন? আমি বরং ওকে বলব যখন—ও পিয়ারার গান দুটো একটা শুনিয়ে দেবে?

—দেখব।

ছেলেটি বিব্রত বোধ করল। তারপর বললো—দেখুন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে আপনি ওঁর সংগে যোগাযোগ করুন।

ছেলেটি চলে গেলে পরে রামদাসবাবু উঠলেন। পুরনো আলপাকার কোটটা টেনে পরলেন। আধময়লা উড়ুনীটা পাকিয়ে কাঁধে ফেললেন। তারপর ঘর থেকে বেরুলেন। তাঁর পাশের ঘরে যে জুজাওয়ালা থাকে তার ছেলেটা বললো—বুড়োবাবু কোথায় চললেন?

—একটা রিক্সা ডেকে দে ত বাবা।

বিস্ময় চড়ে বসলেন রামবাবু। রিকশার তালে তালে তাঁর মাথাটাও দুলতে লাগল। মাথাটা আজকাল এমনিই মাঝে মাঝে নড়ে। চলতে চলতে মনে হলো আজকাল কত রকম-ই না হয়েছে। তাঁদের সময়ে কি ভাবতে পারতো রাজারাজড়া ছাড়া হাজার হাজার টাকা খরচ করে কনফারেন্স ডেকে গানবাজনা হবে? পিয়ারার কথা মনে হলো। মুখে বসন্তের দাগ, কর্সা রঙ, চোখ দুটো লালচে। তিরিশবছর না হতে মরে গেল। বেঁচে থাকলে কি রকম নাম করতে পারতো। নাম অবশ্য হয়েছিল। টাকা হয়েছিল কি? পিয়ারা সাহেবের সংগে সংগে আরো অনেকগুলো মুখ আরো অনেকগুলো নাম মনে আসে। কোথায় গেল সেসব মানুষ! আজকাল সব রেডিওতে পনেরো মিনিটে গান শেষ করে। পিয়ারার গলায় 'ফুল বা বিনত ডার ডার' মনে হলো। আগ্রাওয়ালী আর বুলবুলির সংগে টেক্কা দিয়ে শহরের বাড়াতে—। রামদাসবাবু হঠাৎ বিড়বিড় করে বললেন—ঝাঁটা মার আজকালকার মুখে। এ কথাটা তিনি প্রায়ই বলে থাকতেন। আর মনে বেশ হলে আরো অনেক কথা বলেন···

পান্নার বাড়ী পৌঁছে গেল।

নীচ তলাটায় চীনে মিস্তিরী কাজ করছে। এই এক মানুষ পান্না। একেবারে পায়রার খুপরি করে নিচটা ভাড়া দিয়েছে। এক জীবনে পান্না আট ঘোড়ার ফিটন হাঁকাল। কলকাতায় বাড়ী কিনল তিনটে। আর আজকে তার অবস্থা এই। রামদাসবাবু আবর্জনার ওপর থুতু ফেলতে ফেলতে উঠলেন। একদিন এই ধরণা দিয়ে এই সিঁড়ি মাড়িয়ে পান্নার দোতলায় উঠে আসেন নি এমন কলাবন্ত মানুষ কেউ ছিলেন না। সকলকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষটা ফতুর হয়ে গেল এরজন্যেই। রামদাসবাবু আজকাল এসব কথা ভাবেন না। তবে মাঝে মাঝে খেদ আসে বইকি!

পান্নার ঘরটা তেমনিই আছে। দেয়ালে একটি ছবি নেই। কড়িকাঠ ভেঙে ঝুলছে। চারবছর আগে যা দেখেছিলেন রামদাসবাবু সব তেমনই। মেঝে জোড়া ময়লা কার্পেট। এবার শুধু রূপোর আলবোলাটা দেখলেন না রামদাসবাবু। পিয়ারার সখের জিনিষটা অনেক

অভাবের ঝড়ঝাপটার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছিল পান্না। কারুকে হাত দিতে দেয়নি। ভাইয়ের পড়াশুনোর পেট ভরাতেই তার সর্বস্ব গিয়েছে, ওটাও বোধহয় সেই পথেই গিয়েছে দোকানে। আলবোলার নলটা এখনো মরা একটা সাপের মতো পড়ে রয়েছে এককোণায়।

পান্না ময়লা একটা মসলন্দের চাদরে গা ঢেকে পড়ে-ছিল। রামদাসবাবুকে দেখে ক্ষীণ হাসলো। বললো—বসুন দাসবাবু। আমি রোজা রয়েছি। তাই শুয়ে আছি।

রামদাসবাবু বসলেন। বললেন—ভাল আছ পান্না?

—আমি আপনি কি ভাল থাকব দাসবাবু! দিন শুনছি।

—সে কি পান্না? তোমার এখনো পঁয়ষট্টি বছর হলো না!

…দুঃখীমানুষের আর বয়স! তারপর খবর বলুন!

—খবর আছে পান্না। খুব ভারী খবর।

উনিশশো বিশ সালে একদিন এই দাসবাবুই এসে পান্নাকে বলেছিলেন—খুব ভারী খবর পান্না। পিয়ারা সাহেবকে এনেছি।

পান্নার সেইকথা মনে হলো। সে বললো

—এখনো কী ভারী খবর আছে দাসবাবু? আর কার জন্যে?

রামদাসবাবু ফোকলা মুখে হাসলেন। বললেন—তোমাকে গান গাইতে হবে পান্না। পিয়ারা সাহেবের নামে মস্ত জলসা। যাকে বলে কনফারেন্স।

রামদাসবাবুর কাছে সব শুনে পান্না বললো—দাসবাবু আপনি ত সব জানেন! আমাদের সময় ত মাইকের রেয়াজ ছিল না। আর আমাদের কেউ টাইম বেঁধে দিত না। এখন গান গাইব বলছেন—আমার সারেঙ্গী তবলচির পয়সা কোথায়? কোথায় রেওয়াজ করব? আর আজকালকার রেওয়াজ আপনি জানেন। বাইরের দেখনাই এখন খুব কদর পায়। আমার গান কি ওঁদের ভাল লাগবে?

—কিন্তু পান্না, পিয়ারা সাহেবের গায়কী ত কারু কাছে নেই। তুমি চলে যাবে, আর তোমার সংগে সংগে যে সব চলে যাবে।

—তাও যদি কারুর দুঃখ থাকত দাসবাবু, তাহলে আমি আপনি আজ এমন করে বেঁচে থাকি?

—হুঁ, পান্না!

রামদাসবাবুর দিকে চেয়ে পান্নার চোখ জলে ভরে এল। একসময় পান্নার চোখ বড় সুন্দর ছিল। উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া পিয়ারাকে যে পান্না শেষ কয়টা বছর বেঁধে রেখেছিল, সে ঐ চোখের মায়ায়। পান্নার সমস্ত মন ঐ চোখে কথা কইত। পিয়ারার বড় সাধ ছিল মরবার সময়ে ঐ ঈষৎ নীল বড়বড় চোখের দিকে চেয়ে সে মরে।

তা হয়নি। তখন পান্না কাছে ছিল না।

আজ পান্না টলটলে চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর বললো—পিয়ারাসাহেবের সে বাজুবন্দ বা হয়সে অবধবন এখন আর পারব না। তবু গাইব। আপনি যখন বলছেন!

রামদাসবাবু বললেন—হ্যাঁ। আর বাবুটি বেশ ভাল। জানলে পান্না? আমি বলেছি তোমাকে ওঁরা টাকা দেবেন। এখন গভর্নমেণ্ট কতরকমে টাকা দিচ্ছে! বল?

পান্না আর রামদাসবাবু দুজনেরই অনেক কথা মনে হলো। অনেককথা বলতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু তারা মনের কথা সাজিয়ে সাজিয়ে বলতে শেখেনি। তবে দুজনে দুজনের প্রতি একটা নিবিড় মমতা একটা মিতালী অনুভব করলেন। যৌবনে পান্না বা রামদাসবাবুর কোন দিনও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। এখন তাঁরা দুজনেই একই যুগের একই জীবনের মানুষ, এবং আজকের দিনে দুজনেই তাঁরা বিশ্রান্ত বোধ করেন না। এই মুহূর্তে এত নৈকট্য এবং পরস্পরের কাছে পরস্পরকে এত প্রয়োজনীয় বোধ হলো যা কোনো যৌবন বা প্রেমের দিনে সম্ভব হতো না। দুজনের দুজনাকে বড় আপনার বলে বোধ হলো।

রামদাসবাবু উঠে পড়লেন।

পান্না ভাইয়ের নাতিকে ডাকলো। বললো—আর এই কবচটা নিয়ে যা! কম করে চল্লিশটা টাকা তোকে দেবে শওকৎসাহেব। নিয়ে আয়।

কবচটা একদিন সে পরতো তার সুখসমৃদ্ধিতে যেন কারু নজর না লাগে, সেইজন্যে। তার প্রেমাস্পদকে অন্যকেউ যেন ছিনিয়ে না নেয় সেইজন্যে।

সুখসমৃদ্ধি এখন স্বপ্নকথা, আর প্রেমাস্পদ কবে চলে

গিয়েছে গোরের তলায়। তার হাড়গুখানাও বুঝি মাটি হয়ে গেল। জায়গাটুকু কিনেই রেখেছিল পান্না। মনের মতো করে বাঁধিয়ে দিতে পারেনি।

আজ তাই কবরটার দরকার নেই। পান্নার মনে হলো ঐ টাকায় সে নিশ্চয় তবলচি আর সারেঙ্গীয়া পাবে।

রামদাসবাবুর কাছে আবার এল ছেলেটি। বললো—ওঁকে আমরা গাওয়াব। ওঁকে দিয়েই ওপন্ করাব কনফারেন্স। চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছিলেন আপনি। দারুণ পাবলিসিটি হয়েছে। এখনও আমাদের স্যুভেনিরটা হয়নি। এবারে ওঁর আর আপনার ছবিটা তুলে নিয়ে জীবনীটা দেব।

রামদাসবাবু ছেলেটির হাত চেপে ধরে বললেন—আপনি বড় ভালমানুষ মশাই। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

পান্না একদিন কি ধরের গাইয়ে ছিল জানেনই ত! ওর যদি একটু উপকার করতে পারেন জানাবেন, পিয়ারা সাহেবের নামে জলসা করা সার্থক হবে আপনাদের।

ছেলেটি বললো—এখন হলো পাবলিসিটির যুগ। পাবলিসিটি ছাড়া ওঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়া মুস্কিল। আমাদের দিক থেকে যা করা সম্ভব সবকিছু করব। তারপর ওঁর ওপর নির্ভর করছে।

—আর একটা কথা।

—কি বলুন?

—দেখুন স্যার—

রামদাসবাবু এখন তাকে 'সার' বলছেন শুনে হাসি পেল ছেলেটির। রামদাসবাবু বললেন।

—দেখুন, আমাদের সার আর কিছু নেই, থাকে না। ঐ অভিমানটুকুই সম্বল। দেখবেন অনেকদিন বাদে জলসায় বেরুচ্ছে বড়পান্না। কোনমতে যেন ব্যবহারে··· যানে চটবেন না আপনি—সেবার ত জলসা থেকে উঠে এসেছিল কিনা!

ছেলেটি আবার ভরসা দিল। বললো—না না—আমরা কি তা জানি না? ব্যবহারে কোন ত্রুটি পাবেন না আপনি।

তারপর ছেলেটি আরো দুদিন এল। ফটোগ্রাফার ছবি তুলল বড়পান্নার রামদাসবাবুর। গ্রামোফোন কোম্পানীর পুরনো ক্যাটালগ ঘেঁটে পিয়ারসাহেবের ছবি বেরুল একখানা। বড়পান্নাকে বিশেষ পাবলিসিটি দেওয়া হচ্ছে। টায়রা জ্যাকেট ও চেনঘড়ি সহিত বড় পান্নার যৌবনের একখানা ছবিও পাওয়া গেল। পিয়ার সাহেব এবং বড়পান্নার সংগীত সূত্রে যে সখ্য হয়েছিল, তার মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখেছিলেন এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক।

কনফারেন্সের দিন এসে পড়লো।

পাড়ার লণ্ড্রী থেকে জামাকাপড় কাচিয়ে এনেছেন রামদাসবাবু। ছেলেটি গাড়ী করে তাঁকে নিয়েই বড় পান্নাকে তুলতে এল।

বড়পান্নাকে দেখে কিন্তু উদ্বিগ্ন হলেন রামদাসবাবু।

তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। অনেকদিন বাদে পুরনো জ্যাকেট পরেছে বড়পান্না। জামাটা চলচল করছে। কাপড়খানা কর্সা। আঁচলটা মাথা দিয়ে ঘুরিয়ে নিল বড়পান্না। পান মুখে দিল দুটো।

নিউএম্পায়ার হলে এই বোধ হয় প্রথম ঢুকল বড় পান্না। স্টেজে ঢুকে রামদাসবাবুরই কি রকম লাগছিল। তাঁকে হাত ধরে মাইকের সামনে বসিয়ে দিল ছেলেটি। তারপর মাইক ধরে ঘোষণা করলো। বললো,—আপনি কিছু বলুন।

রামদাসবাবু কতবার মনে মনে ঠিক করেছেন কি বলবেন না বলবেন। কিন্তু সব কথা তাঁর গোলমাল হয়ে গেল।

এত মানুষ, এমন সব দামী দামী লোক, এমন সাজানো স্টেজ, সব দেখে তাঁর মনে হলো তিনি আর একটা কথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি বলেন—আপনারা আমাকে ডেকেছেন, দুটো কথা কইতে বলেছেন, আমি বড় লজ্জায় পড়েছি আজ। পিয়ারা সাহেবের গান সম্বন্ধে দুটো কথা কইব। তার সঙ্গে দশটা বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি। তার সম্পর্কে দুটো কথা বলি। পিয়ারা ছিল আমার বহুদিনের দোস্ত। তার গানের কথা, তার ক্ষমতার কথা আপনারা সবাই জানেন। আমার কিন্তু আজকে তার সে সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

আগে দিলুন তার তবলচি। সে যদি পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা পেত ত আমাকে পনেরো বিশ দিয়ে দিত। আপনপর জ্ঞান ছিল না। এই যে সেতারী আলি বসে আছেন, এঁর বাপকে পিয়ারে সাহেব না বাঁচালে সে মরে যেত।

বলতে বলতে রামবাবু আবেগে কিরকম হয়ে গেলেন। বিড়ি শেষ করে কোঁচায় খুটে চোখ মুছে বললেন—সেই পিয়ারা সহর ভর্তি এত মানুষ থাকতে বিনে চিকিচ্ছের কেমন করে মরলো আমি ভুলতে পারি না। তখনকার সময়ে হাসপাতালে যেবার রেওয়াজ ছিল না। আমাদের ছিল না টাকা পয়সা। বড় কষ্ট পেয়ে মরেছিল মানুষটা। মশায়রা, আপনারা আজ তার নামে কত কি করেছেন দেখে আমার চোখে জল আসছে। কত কি আজ বাজে কথা বলুন, ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন। এখন দিনকাল কত ভাল হয়েছে সে কথাও মনে হচ্ছে বৈকি! আমরাই এক হতভাগা। এখন কি আর দশ দশটা টাকার জন্যে ঐ ধরের মানুষ পরের বাড়ীর রোয়াকে শুয়ে মরে?

খুব বিব্রত এবং অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেটি দাঁড়াচ্ছিল। রামদাসবাবু শেষ করতে না করতে সে মাইকটা ছিনিয়ে নিল। রামদাসবাবু যা বললেন সেটা ইংরেজী হিন্দীতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বলে গেল আবার। রামদাসবাবু ইংরেজীটা বুঝলেন না। তবে হিন্দীতে যা বলে গেল ছেলেটি, শুনে আশ্চর্য হলেন। তিনি এই সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

পিয়ারে সাহেবের স্মৃতি আজ ধন্য হলো? হবেও বা। শহরের মানুষ যে কি রকম সাজিয়ে বানিয়ে কথা বলে, তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর বুকের ভেতরটা হাতুড়ি পিটছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পান্নার দিকে চেয়ে তবু হাসলেন রামদাসবাবু। পান্না নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। মুখে পাউডার ফুটে উঠেছে। হাতটা মুঠো করে বসে আছে।

এবার পান্নার গান।

মাইকের সামনে বসে পা

না। মুখ নীচু করে বসলো।

—আমি পিয়ারে সাহেবের কণ্ঠ ধন্য পরজ ফুলবা বিনত ডার ডার গাইছি। ত্রুটি যা হয় সবই আমার, আর এই ভরসায় গাইছি কি পিয়ারে সাহেবের নিজের কাছে বসে গানটি শিখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

পান্নার হাতটা গলার কাছে কি যেন খুঁজল। সেই কবচটা কোথায়? সেই কবচটার আশ্বাস তার বড় প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

তারপর সে গান সুরু করলো।

পিয়ারে সাহেবের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা মনে করে নিয়ে চোখ বুঁজে সে গান ধরলো। ইষৎ ভাঙা গলা। এখনো গলায় মিষ্টতা আছে এবং খাদে গলা ভালই খেলে।

কিন্তু এপাশ ওপাশ থেকে কথা শোনা যাচ্ছিল। ছেলেটির দিকে একবার চোখ পড়লো পান্নার। এমন মুখ করে সে তাকিয়েছিল, যে পান্না যদি ভাল করে না গায়, যারা এত টাকা খরচ করে এসেছে তাদের যদি সন্তুষ্ট না করতে পারে, তাহলে যেন তার আর মুখ থাকবে না।

পান্নার মনে হল সে গানের চরণ ত্যাগ করে স্বরবিস্তারে চলে এসেছে, তবু যেন দর্শকদের মনে একটুকু ছোঁয়া লাগেনি। তাঁদের ভেতর থেকে ত কই কোন তারিফ, বা সমঝদারীর ছোট ছোট বোল-ও শোনা যাচ্ছে না।

পান্না হতাশ বোধ করলো।

এবার সে স্বরবিস্তার সুরু করলো। যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন, এই আলাপেই ছিল মৃত ওস্তাদের চরম কৃতিত্ব। সেখানেই পিয়ারে অনন্য। সমকালীন অন্যান্য গুণীজ্ঞানীর চেয়ে সে শুধু প্রতিভার-ই গুণে শ্রেষ্ঠ।

পান্নার কণ্ঠে এবার একটা দীনতা, একটা আকুতি ফুটে উঠল। এইবার শ্রোতারা খুসী হোক। তারা বলুক যে পান্না আজও বড় পান্না। বলুক, যাঁর নামে যাঁর স্মৃতিতে এই অনুষ্ঠান, তাঁর-ই গান শুনে তারা খুসী হয়েছে। তাঁর গানের অবমাননা করেনি বড় পান্না।

কিন্তু পেছন থেকে চাপা গুঞ্জন উঠল। দুই চারজন সমঝদার শ্রোতা পেছন ফিরে তাকালেন।

পান্নার কণ্ঠ তখন প্রথম কথায় ফিরে ফিরে আসছে—

ফুলবা বিনত ডার ডার

ফুলবা বিনত ডার ডার···

আর চোখ শুধু আকুল হয়ে খুঁজছে

শ্রোতার চোখ থেকে তার গুণের স্বীকৃতি। সহসা তার-ই পাশ থেকে কে যেন নারীকণ্ঠে বললো,—মিছিমিছি সময় নষ্ট!

পুরুষ কণ্ঠে চাপা হাসি শোনা গেল। অসহায় বোধ

করলো পান্না। শেষে তিনবার 'ফুলবা বিনত ডার ডার' বলবার মধ্যে গলাটির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য এবং পিয়ারের খামখেয়ালী প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় এবং অনুকরণীয় স্বাক্ষর রয়ে গিয়েছে।

পান্নার সে কথা মনে পড়লো। সে মনে করলো, এইবার নিশ্চয় সকলে বুঝবে তারা আজ অনন্য কিছু শুনছে। তার মনে হলো, এখন গলার ওপর আশ্চর্য সংযম রাখা দরকার, নইলে একই শ্রেণীর তিনটি সুরকে তিনটি ঠাটে সে গাইবে কেমন করে?

ওস্তাদের নাম স্মরণ করে সে প্রথমবার পরজে গাইল—ফুলবা বিনত ডার ডার!

দ্বিতীয়বার পঞ্চমে সে গাইল—ফুলবা বিনত ডার ডার।

ডালে ডালে ফুল, সে তো ফুটেছে। সেই কুসুমের স্তবকে তিনটি সুরে তিন ঠাটে সাজিয়ে শ্রোতাদের শ্রবণে এবং বিস্মৃত অতিথির চরণে নিবেদন করবার যে আকুতি, তা পান্নার মর্ম মথিত করে উঠে এল।

কণ্ঠ ভেঙে এল, চোখ ভরে এল জলে। তবু পান্না গাইল বসন্ত রাগে—ফুলবা বিনত ডার ডার।

দুই মদন এবং দৈবত যার ওপর নির্ভর করে বসন্তের স্বরবিস্তার, সেইখানে এসে পান্নার কণ্ঠ ডালে ডালে শেষ ফুল ফুটিয়ে দিল। যারা বুঝল, তারা দেখল, পিয়ারের সে প্রিয় গানে আজ পরজ-পঞ্চম-বসন্ত তিনটি স্তবকে ফুল ফুটে উঠেছে। সে ফুলের সৌরভ বুঝি তাদেও মুগ্ধ করলো।

চুপ করলো পান্না।

তানপুরা থামিয়ে রাখল, উঠে দাঁড়াল। শ্রোতারা এবার দর্শক। তাদের মনে হলো পান্নার মধ্যে এমন কোন গৌরব, এমন কোন ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, যা প্রতিভার স্পর্শে ধন্য, এবং যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না।

এই হীন প্রৌঢ়া বাইজীকে খুব বিশিষ্ট মনে হয়। তারা অনিচ্ছুক করতালিতে ফেটে পড়ল।

নমস্কার করে পান্না বেরিয়ে এল।

গাড়ীর কাছে এসে ছেলেটি একশো টাকার একখানা নোট পান্নার হাতে তুলে দিয়ে বললো—আপনি আমার মুখ রেখেছেন। এবার অভিমান দিয়ে আপনাকে রেডিওতে ঠিক চান্স করে দেওয়া যাবে দেখবেন। আমি আবার যাব।

বড় পান্না নোটখানা ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে বললো—আপনি আর আসবেন না বাবুজী। আমি গাইতে পারব না। গান ফুরিয়ে গিয়েছে।

—সে কি। এ ত আপনার···

বড় পান্না ঈষৎ হাসল। বলল—সব জিনিসের দাম হয় না বাবুজী। ফুটো কাঁচের দামে হীরে বিকিয়ে যায়, হীরের দামে কাঁচ পরে মানুষ খুশী হয়। এ আপনাদেরই থাক।

আজকে পান্না রামদাসবাবুকে না নিয়ে এল। বসাল করাসে।

বাইরে লালবাজার ট্রামের গোলমাল। ট্রামের শব্দ। পান্না বললো,—রামদাসবাবু গান গাইবার জন্যে আজ বড় পান্নার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। পিয়ারা আজ আমার কাছে এসেছিল, আমার মাথায় হাত রেখেছিল।

—জানি পান্না।

—তবে আপনি শুনুন। ওখানে গান আমার শেষ হয়নি। শেষ কলি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।

রামদাসবাবু পলিত কেশ মাথা নীচু করে রইলেন। রাস্তার বাতি এসে পড়েছে তাঁর সাদা চুলে। পান্নার কাঁচাপাকা চুলে সে আলো রূপো ছড়াচ্ছে। বড় পান্না এবার ধরল পরজের ঠাটে—ফুলবা বিনত ডার ডার!

আর গায়িকা এবং শ্রোতা দুজনেই অনুভব করলেন, এই অন্ধকার ঘরে পিয়ারে সাহেবের প্রতিভার স্পর্শে পান্নার কণ্ঠে যে ফুল ফুটে উঠেছে তার তুলনা নাই, তার তুলনা নাই।

আসাম

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আসামে প্রায় দুইমাস ব্যাপী বর্বরতার তাণ্ডব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন আসাম হইতে অসমীয়াদিগের বাঙালী বিতাড়ন অনুষ্ঠান ("বঙাল খেদা") আসামের সুনামে (?) কলঙ্ককালিমা-প্রলেপ করিয়াছে; কেহ বলিয়াছেন, আসামের এই ব্যাপার সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সভ্য সমাজে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে; কেহ বলিয়াছেন, আসামের ব্যাপারে অনেকে মনে করেন, ভারত এখনও স্বায়ত্ত-শাসন লাভের উপযুক্ত নহে—স্বাধীন হওয়া পরের কথা; কেহ বলিয়াছেন, আসামের একটি সম্প্রদায়ের অন্য একটি সম্প্রদায় সম্বন্ধে বর্বর ব্যবহারে ভারতরাষ্ট্রের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে—রাষ্ট্র তাহার সিবিল শক্তি লইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে।

আসামে কি ঘটিয়াছে? হইয়াছে—

(১) বাঙালীদিগের উপর দারুণ অত্যাচার—গৃহদাহ, সম্পত্তি নাশ, বসতি লুণ্ঠন, প্রহার, হত্যা এবং নারীধর্ষণ। আসাম শিলং হইতে ৪ শত ২৬ জন বাঙালী মহিলা ভারতরাষ্ট্রের বাক্‌বিভূতিসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে লিখিয়াছেন—

ভাষা-আন্দোলনের নামে আসামে বাঙালী নারীজাতির সতীত্ব লইয়া দুর্বৃত্তদল যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা নারীজীবনের চরম অপমান। অথচ আজ পর্যন্ত আসাম সরকার এক জন দুর্বৃত্তকেও গ্রেপ্তার বা দণ্ডিত করেন নাই!

... যে দেশে নারীর সতীত্বের কোন মূল্য বা মর্যাদা নাই সে দেশে প্রধানমন্ত্রীর স্বীয় পদত্যাগে অসম্মত হইয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার সার্থকতা কি? (তথাকথিত) স্বাধীনতা লাভের দ্বাদশ বৎসর পরে যদি এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে, তবে ভারতরাষ্ট্রে—বিশেষ আসামে—নারীরা কিরূপে আপনাদিগের সম্মান লইয়া জীবনযাপন করিতে পারেন? ভস্মীভূতগৃহ পুনর্নির্মিত হইতে পারে ভগ্নগৃহ সংস্কার হইতে পারে কিন্তু যে নারীর সতীত্ব গিয়াছে তাহার সেই সতীত্ব —দুর্বৃত্তদিগের দ্বারা নিহত হতভাগাদিগের প্রাণের সবই পুনরুদ্ধার করা যায়

আসামের ঘটনার গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টায় নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারই বলিয়াছেন—সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে অতিরঞ্জন আছে; আর গত ২০শে আগষ্ট তারিখেও—সেই সুরে সুর মিলাইতে না পারিলেও—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব, শান্তি সংস্থাপনের অজুহাতে সংবাদপত্রকে সংযত হইবার জন্য উপদেশ দিয়া যে দৈন্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট প্রকাশ আছে।

আসামে যাহা হইয়াছে, তাহার তুলনায় তুচ্ছ একটি ঘটনা উপলক্ষে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ষ্টেড লিখিয়াছিলেন—

"Who is there who witnessed the culminating orgy...without feeling that the progress which humanity has made form the days when dragons wallowed in their primal slime,

but a narrow span capable of being overleaped in an hour, when... a people yet drunk with blood to vomit crime..... The brute talent is every human breast asserted himself with the supreme disregard of all the conventions with which centuries of civilisation have draped his nether limbs... The scenes that were witnessed, the sounds that were heard in the long hours... have been hinted at by my scandalised beholders, but no publication would reproduce, whether with the aid of photograph

or photograph reigned supreme."

সত্যই ইহার তুলনায় তুচ্ছ কারণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইত।

আলোচ্য পত্রের শেষাংশে মহিলারা বলিয়াছেন—

"Merely condemning the goonda leaders, even in the strongest language will not help in restoring confidence and security in the minds of the minorities and Bengali women in particular."

(২) ভারতীয় সংবিধান আসামে পদদলিত হইয়াছে এবং সেজন্য আসাম সরকার কেবল দায়ী নহে, দায়ত সাহায্যকারী। ভারতীয় সংবিধানের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিক নাগরিকের অধিকার সম্ভোগ করিতে পারিবেন এবং ধনপ্রাণসম্মানের নিরাপত্তা সে সকল অধিকারের সর্বপ্রধান। যদি এই মিথ্যাও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় যে, আসাম সরকার এই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় অতর্কিত ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন, তবে বলিতে হয়, তাহা যে কোন সরকারের পক্ষে অযোগ্যতার চরম নিদর্শন। এবং অযোগ্য সরকার কখন সরকারের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

আসামে যাহা হইয়াছে, তাহার তুলনায় পাঞ্জাবের ওডয়ারী শাসনে—সামরিক ব্যবস্থাও ম্লান মনে হয়। কিন্তু তবুও ইংরেজ ভারতসচিব সে সব ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন—সেসব অন্যায় এবং সে সব বর্বর—"To flout the standards of propriety and humanity which the inhabitants not only of India in particular, but of the civilised world in general have a rihgt to demand of those set in authority over them."

কেন্দ্রীয় সরকার এই সরকারের পতনও ঘটান নাই। কাজেই লোক মনে করিতেছে—ও মনে করিতে পারে যে, এই অত্যাচারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না থাকিলেও কেন্দ্রীয় সরকার, আসাম সরকার ও সরকারের বেসামরিক কংগ্রেস ইহার সমর্থন—প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষভাবে—করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে প্রায় ৩০ হাজার বাঙালী নিজ রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে—এখনও এই সকল উদ্বাস্তুর আসা বন্ধ হয় নাই। তাহা বন্ধ করিবার জন্য আসাম সরকারের রেলস্টেশনে টিকেট বিক্রয় বন্ধ করার চেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রযুক্ত আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক কুমার সেনের আহ্বান এবং প্রধানমন্ত্রীর কন্যার নেতৃত্বে কার্যরত শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর আহ্বান ব্যর্থ হইয়াছে এবং ব্যর্থ হওয়াই সঙ্গত।

কারণ—সরকার পদচ্যুত হয় নাই, একজন দুষ্কৃতিকারীকেও দণ্ডিত করা হয় নাই।

(৪) কত বাঙালী আহত ও কতজন নিহত হইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই; আসাম সরকার তাহা জানিবার চেষ্টাও করেন নাই—করিবেন বলিয়াও মনে হয় না। কতটাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। ক্ষতিপূরণের কথা বলা হইতেছে বটে, কিন্তু কাজে কিছুই হইতেছে না।

(৫) প্রধানমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের অস্থায়ী প্রধান সচিব পর্যন্ত এবং আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমতী কৃপালনী পর্যন্ত অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসত্যের দ্বারা সত্য বিকৃত করিবার চেষ্টাই করিতেছেন—কংগ্রেসের কর্তাদিগের ত কথাই নাই। আমরা যে বলিতেছি, ইঁহারা অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রমাণ করিব বলিব, বলিয়াছি ও বলিতেছি। ইহাতে অতিরঞ্জন নাই; পরন্তু অতিসংযমের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

(৬) বলা হইতেছে ভাষার জন্যই এই আন্দোলন। এই কথা যে নির্জলা মিথ্যা তাহা জানিয়াও এই কথা বলিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার হীন চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা আরম্ভ করিয়াছেন—ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। আর সকলে তাঁহার সুরে গান ধরিয়াছেন—তাহাতে মৌলিকতা নাই, আছে অসত্যানুরাগ ও প্রধানমন্ত্রীকে তোষামোদ।

আসামে সংখ্যালঘিষ্ঠ অসমীয়া সম্প্রদায় আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা চেষ্টায়—জাতীয়তার আদর্শ কর্মনাশার জলে বিসর্জন দিয়া প্রাদেশিকতার অন্ধকার অবলম্বন করেন।

সেই কাজের আরম্ভ দেশবিভাগের সময় বাঙালী-বহুল শ্রীহট্ট পাকিস্তানকে প্রদান। যে নিয়মানুসারে দেশ বিভাগ করা ইংরেজের সহিত স্থির হইয়াছিল, সে নিয়ম রক্ষা না করিয়া শ্রীহট্টে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গত দাবী ত্যাগ করা হয়। কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া কংগ্রেস সরকার লোকগণনার মিথ্যাকে আশ্রয় করেন—মিথ্যার ভিত্তিতে প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায় আসামে অধিবাসীদিগের সংখ্যা এইরূপ ছিল—

বাঙালী—৩,৯৬০,৭১২
অসামী—১,৯৯২,৮৪৬
পাহাড়ী—২,৪২০,৯৫৬

ইহার পরবর্তী লোক গণনায় (১৯৪১ খৃষ্টাব্দে) দেখা যায়—

বাঙালী—৪,৫২৬,৫২৮
অসামী—২,৬৯২,৯০০
পাহাড়ী—২,৪২০,৯৬৬

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট পাকিস্তানভুক্ত হয়। তখন শ্রীহট্টের লোকসংখ্যা—২,৪০০,০০০। ফলে আসামে বাঙালীর সংখ্যা হ্রাস হয়।

কিন্তু আসাম সরকারের স্বীকৃতি অনুসারে ৬ লক্ষ বাঙালী অন্যস্থান হইতে আসিয়া আসামে বাস করিতে থাকেন।

যদি এই কথাই ধরা যায়, তবে—ঐ ৬ লক্ষ বাঙালীর আসলে—লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সাধারণ নিয়মানুসারে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আসামে বাঙালীর সংখ্যা ২,৮০,০০০ হইবার কথা। কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সরকারী হিসাব এইরূপ হয়—

বাঙালী—১,৭১৯,১৫৫
অসামী—৪,৯৭২,৪৯৩
পাহাড়ী—১,২৩৮,১৪৯

অর্থাৎ লোকসংখ্যা ব্যবস্থার ঐন্দ্রজালিক হস্তের স্পর্শে ১,১০০০০০ বাঙালী ও ১,২০০০০০ পাহাড়ী শূন্যে মিলাইয়া যায়।

এই হিসাবে নির্ভর করিলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়।

আসামীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি—

১৯০১—১৯১১ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরে শতকরা ১৪·৬, ১৯১১—১৯২১ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরে শতকরা ১২·৭। কিন্তু তারপরে ১৯৩১—১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৮৫ জন।

কোন দেশে—কোনখানে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এইরূপ হয় নাই—তাহা অসম্ভব।

এইভাবে আসামে বাঙালীদিগের সংখ্যা হ্রাস শতকরা ৫০ দেখা যায়।

যে হিসাব নির্ভরযোগ্য তাহাতে হইবার কথা—১৯৪১ খৃষ্টাব্দে—

বাঙালী—২,৮৫০০০০
আসামী—২,৬০,০০০০
পাহাড়ী—১,৯৩,০০০০

ইহা ব্যতীত নেপালী—১,১৯,০০০০ ও হিন্দুস্থানী—৭৬০০০০। এইরূপে মোট—৯,০৩,০০০০। একজন লিখিয়াছেন—"To alter this hard reality planned killing seem to have been decided upon by some."

আসামে লোকগণনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাখলএয়ালা মন্তব্য করেন—

"The figures do not fail to reflect the aggressive linguistic nationalism now prevailing in Assam....."

আসামে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষাভাষী ছিল—শতকরা ২৬ জন—আর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হয়—শতকরা ১৬ জন। আর অসমীয়া ভাষাভাষীদিগের সংখ্যা শতকরা ৩১ জনের স্থানে শতকরা ৫৬ জন হয়।

সম্প্রতি ভারত সরকারের অন্যতম সহকারী মন্ত্রী—পুরুষানুক্রমে আসামবাসী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ উহার ভাগিনেয় বিশেষক আত্মীয় বসু কর্তৃক সযত্নে সঙ্কলিত যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে দেখা যায় এখনও যদি আসাম প্রদেশে বাঙালীরা সংখ্যা-পরিষ্ঠ না হয় তবে—আসামের জনসংখ্যা—

শতকরা ৩০ হইতে ৩৫ জন অসমীয়া ভিন্নভাষী।

শতকরা প্রায় ৩০ জন দ্বিভাষাভাষী।

আসাম সরকারের অসমীয়া ভাষাভাষীরা যে মিথ্যা অঙ্কের প্রচার করিয়া তাহারই ভিত্তিতে তথায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়া সরকার অধিকার করিয়াছেন, তাহা সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অজানা নাই। তাঁহার পিতা পণ্ডিত মোতিলাল সম্বন্ধে শুনা যায়—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁহার সম্বন্ধে নিয়মের ব্যতিক্রম সমর্থন করিয়াছিলেন।—মোতিলালের মদ্যপান তাঁহাকে দলে গ্রহণে আপত্তির কারণ করেন নাই। পুত্র জওহরলাল কি তেমনই আসামীদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"আমার সত্য-মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও?" যে আসামীরা এই মিথ্যার উপর নির্ভর করিয়াছে তাহারা কংগ্রেসদলীয় এবং জওহরলালের প্রধান মন্ত্রীত্ব সমর্থক বলিয়াই কি এই অবস্থা ঘটিয়াছে?

আসামে বাঙ্গালীরা এখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে বর্ত্তমানে আসাম প্রদেশের কয়েকটি জিলায়—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লছীমপুর, শিবসাগর, দারাং, নওগাঁ ও কামরূপ এই কয়টি জিলায় তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই কয়টি জিলাই সমগ্র আসাম প্রদেশ নহে।

ভাষা যে বিরোধের প্রকৃত কারণ নহে, তাহা দিবালোকের মত প্রকাশ। কারণ—রাজনীতিক দুরাশা অর্থাৎ একটি সংখ্যায় সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করাইয়া—রাজনীতিক ক্ষমতা আত্মসাৎ করিবার উদগ্র কামনাই এ দুরাশা।

কেহ কেহ মনে করেন, যখন ইংরেজের ষড়যন্ত্রে ও জওহরলাল প্রমুখ রাজনীতি-ব্যবসায়ীদিগের সমর্থনে দেশ বিভক্ত হয়—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভক্ত-ভক্তারা, তাঁহাদের মতে পদলেহন করিয়া পদলাভ করেন, তখন তাঁহাদিগের আদামী বন্ধুরা—প্রদেশের নাম যখন আসাম তখন তথায় আসামীদিগের প্রাধান্য হইবে এই রব তুলিয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করেন।

তাঁহারা আপনাদিগের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাঙ্গালী-প্রধান শ্রীহট্টের পাকিস্তান ভুক্তিতে আপত্তি করেন নাই। অবশ্য জওহরলাল প্রমুখ যে সকল লোক দেশের বিভাগে—ভারতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতা স্বীকারে সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আসামীদিগের এই কার্যে আপত্তি করিলেন না। আর যে সকল কংগ্রেস—আসাম কংগ্রেসের নামে সরকারের বেনামদার হইয়া উঠিল সেই কংগ্রেসও আসামীদিগের এই কাজের সমর্থনই করিল। কারণ, কেন্দ্রে সকল প্রদেশের সমর্থন প্রয়োজন।

শ্রীহট্ট ছাড়িয়া দিলেও আসাম প্রদেশে আসামীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার কারণ—দেশ বিভাগের পরে বহু বাঙালী শ্রীহট্ট ও পাকিস্তানের অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়া আসামে বাস করিতে লাগিলেন।

কাজেই ক্ষমতা লাভ করিয়াই আসামী প্রধান আসাম সরকার লোকগণনায় মিথ্যা অঙ্ক দেখাইয়া আপনাদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী করিলেন। আসামে আসামীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি যেরূপ দেখান হইল, তাহা যে মানুষে সম্ভব নহে, তাহাও বিবেচনা করা হইল না। ক্ষমতা চাই—সে জন্য উপায় কি হইবে, তাহা দেখিবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হইল না। বিশেষ কেন্দ্রে যে সরকার গঠিত হইল, সে সরকার ও তাহার তাঁবেদার কংগ্রেস মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

দেশ বিভক্ত হইল। আসামে কংগ্রেসী সরকারের নেতা হইয়া গোপীনাথ বড়দলই প্রদেশে সরকারের নীতি ঘোষণা করিলেন—আসাম আসামীদিগের জন্য।

এই "আসামী" কাহারা?—যাহারা অসমীয়া ভাষা মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার করে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, ক্ষমতালাভ করিয়াই যখন গোপীনাথ এই কথা বলেন, তখন তাহা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেও বিচলিত করিয়াছিল। তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় বলেন—যদি এই প্রাদেশিকতা প্রসারিত হয়, তবে ভারতের (অর্থাৎ খণ্ডিত ভারতবর্ষে ভারতরাষ্ট্রের) অবস্থা কি হইবে?—

"I have noticed the view expressed that Assam belongs exclusively to the Assamese-

In India if that spirit were to enter in every province to whom then would India belong? People of all provinces belong to India and India belongs to all."

কিন্তু গোপীনাথ তখন বাজী মাৎ করিয়াছেন। আসামী ছাত্রদিগকে "হাত করিয়া" ক্ষমতা দৃঢ় করিবার জন্য তিনি পর বৎসর ছাত্র সম্মেলনে আবার বলেন—আসামে আসামীদিগের এবং অসমীয়া যাহাদিগের মাতৃভাষা তাহারাই আসামী—অর্থাৎ আসাম কেবল তাহাদিগের।

এক সময়ে পূর্ববঙ্গে সার র‍্যামফাইল্ড ফুলার মুসলমান-দিগকে "ওয়োবিবি" বলিয়া আকৃষ্ট করিয়াছিলেন—এখানে গোপীনাথ তেমনই আসামে আসামীরাই সর্বেসর্বা বলিয়া আসামী তরুণদিগকে আকৃষ্ট করিলেন।

গোপীনাথ বলিলেন—আসাম বলিতে সমগ্র প্রদেশ বুঝিতে হইবে। আর তাঁহার প্ররোচনায় আসামের তৎকালীন গভর্নর সার আকবর হাইদারী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ই নভেম্বর ঘোষণা করিলেন—"The Bengalees have no longer the power, even if they had the will, to impose anything on the peoples of the hills and villages which constitute Assam."

বাঙালীরা যে কখন এরূপ কাজ করিয়াছিলেন—এমন নহে। তবুও বাঙালীদিগের সম্বন্ধেই ঐরূপ উক্তি করা হইল।

ইহার উদ্দেশ্য—আসাম হইতে অন-আসামীদিগকে—বিশেষ বাঙালীদিগকে—বিতাড়িত করা।

এই কাজের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। ১৯৩৮ সালে গৌহাটিতে হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে দেখা দিল। তাহাই প্রথম "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলন। কিন্তু ইহাতে ভাষার কথা ছিল। ভাষা অপেক্ষাও অর্থ অধিক লোককে আকৃষ্ট করে। এই হাঙ্গামা সম্বন্ধে আসাম সরকারের বিবরণ—

"The genesis of the trouble in the Assamese feeling that they should get their due show in the Railway employment."

অর্থাৎ রেলের চাকরীতে আসামী তাহাদিগের সংখ্যানুপাতে চাকরী পাইবে না—তাহারা এই আশঙ্কাই করিয়াছিল। অল্পদিন পূর্বে বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম রেলের প্রধান কেন্দ্র পাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করা হয়। বলা হয়—রটনা করা হয়, বাঙালীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে এবং বাঙালীরা আসামে অসমীয়াভিরিক্ত অধিবাসীদিগকে "হাত করিয়া লইতেছে।"

এই উদ্দেশ্যমূলক রটনা যত ভিত্তিহীনই কেন হউক না—আসাম সরকার ইহাই হাঙ্গামার কারণ বলিয়াছেলেন, তখন ভাষার কথা ছিল না। ছিল—চাকরীর কথা।

ভাষার কথা পরবর্তী হাঙ্গামার সময় প্রথম করিত করা হয়।

যাঁহারা গৌহাটির ঘটনার অব্যবহিত পরেও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনার পূর্বে আসামে গিয়াছেন ও অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন—সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য আসামীরা চেষ্টা করিতে-ছিল। অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন আসাম সরকার, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস ও একদল আসামী।

সেকথা আমরা পরে বলিব। এইস্থানে কেবল বলা প্রয়োজন, সংখ্যালঘুদের জন্য আসামের মন্ত্রিসভায় বাঙালী মন্ত্রিবের নিয়োগ হয় নাই।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ভাষার কথা ছলমাত্র। ভারত সরকার ভাষাভিত্তির রাজ্য গঠনের প্রস্তাব সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আসামীরা চাহিতে-ছিলেন—অসমীয়া ভাষা আসামে রাষ্ট্রভাষা হইবে। কিন্তু বাঙালীরা (আসামে সংখ্যালঘিষ্ঠ কিনা সন্দেহ) আসামকে বহু ভাষাভাষী রাজ্যে দেখিতে চাহিতেছিলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামার পূর্ববর্তী অর্থাৎ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনায় সরকারী হিসাবে—

নিহত—১ জন (ছুরিকাঘাতে)
আহত—৪০ জন (প্রহারে ও গুলীতে)
গৃহদাহ—৩টি
গৃহভঙ্গ—১১টি

বলাবাহুল্য, আসাম-বিবাদে ঘটনার যথাযথ হিসাব দেওয়া হয় নাই। যদিও ঘটনাগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হয়, তথাপি পুলিশ মাত্র ২টি মামলা

উপস্থাপিত করিয়াছিল এবং
ত্যক্ত হয়।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনার সময় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অত্যাচারের কথা বলা হইলে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী অস্পষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন, সেকথা আমরা আজও ভুলি নাই—তাহা আমাদিগের কাছে সংগৃহীত আছে। এই মহেন্দ্র আজ আসামে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস (পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সম্বন্ধে কটূক্তির পরে) সাধারণ সম্পাদক শ্রীযাদবন নায়ারকে তদন্তের জন্যে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন। তিনি গোপন না করিয়া যে বিবরণ পেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস আসামী নেতৃবৃন্দের কুকার্য গোপন করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দুইটি বিবৃতি হইতে এই উপলব্ধি করিতে পারি।

(১) ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল এর্ণাকুলমে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সমিতি (কংগ্রেসের নির্দেশ পদদলিত করিয়া) বাঙালীদিগের বিরুদ্ধে সভানুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করিলেও কতকগুলি কংগ্রেসী সে সকলে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন—প্রদেশ কংগ্রেস তাঁহাদিগকে সেই অপরাধের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন

"Those Congress men who had gone against the decision of the Congress would be suitably dealt with by the Assam Provincial Congress Commitee."

(২) বহরমপুরে ১৯শে মে (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ) তারিখে কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি শ্রীদেবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বলেন—

"The most objectionable feature of this (Goalpara) incident is that some of the Congressmen in that district associated themselves with what is nothing short of an anti-national movement."

অবশ্য অপরাধীদিগকে কোনরূপে দণ্ডিত করা হয় নাই। আসাম সরকার যখন এই সকল কংগ্রেসীকে (প্রমাণ পাইয়াও) মামলাসোপর্দ করেন নাই; কংগ্রেসও তখনই তাঁহাদিগকে পদোন্নতিতে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

এইদলের দুইজনের বিষয় উল্লেখ করিতেছি—

(১) আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি—মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

(২) ধুবড়ী জিলাকংগ্রেস সমিতির সভাপতি—শরৎচন্দ্র সিংহ।

উভয়েই বাঙালীদিগের বিশেষ শ্রীরমনীকান্ত বসুর উপর সব দোষ ন্যস্ত করিয়া অব্যাহতিলাভের যে হীন চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সভ্য সমাজে তাঁহারা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু যখন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেস সমিতির অধিবেশনে তাঁহারা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইলেন—তখন তাঁহারা নির্লজ্জভাবে ত্রুটি স্বীকার করিয়া সব শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

২৪শে জুলাই তারিখের সভায় মহেন্দ্রমোহন—ঐ ঘটনার জন্য "Expressed his profound regret." আর শরৎচন্দ্র সিংহ বলেন—

"Although it was farthest from our mind to create my ill-will against the Bengalee community or to encourage any violence, yet I connot but accept the moral responsibility for what has happened. It was indeed wrong on my part to agree to organise any meetings or processions in violation of the directives of the Working Committee not to do so, for which I express my profound regret."

তিনি যে সভা ও শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন—তাহা বারবার বলিবার পরেও আসাম সরকার তাঁহাকে মামলা সোপার্দ করেন নাই এবং কংগ্রেসও তাঁহাকে বহিষ্কৃত করেন নাই। তিনি আজ পণ্ডিত জওহরলালের সহকর্মী—অথচ উহাকে নৈতিক হিসাবে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বিবেচনা করাই সভ্য সরকারের উচিত।

স্থানাভাবে আমরা আরও বহু ঘটনার বিবরণ প্রদানে বিরত হইলাম। কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে যদি

বাঙ্গালীরা মনে ভাবেন—"বাঙ্গাল খেদা" ব্যাপারে যে, ব্যাপক ষড়যন্ত্র দেখা যায়—তাহাতে কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষ প্রমুখ কেন্দ্রী সরকারের সদস্যগণ, আসাম সরকার, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস, নিখিল ভারত কংগ্রেসও একদল আসামী —তবে তাহা কি অন্ত, অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

যাহারা এইরূপ কাজ করে তাহারা রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি?

এই দলের সমর্থক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কি দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হইতে পারেন না?

তারপর আমরা ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইব—জওহরলাল, কংগ্রেস সভাপতি, আইন মন্ত্রী কাহাকেও অত্যাচারের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায় না।

আসাম সরকার ও সেই সরকারের সমর্থকগণ বলিয়াছেন, হাঙ্গামা তখন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হইয়া এত দ্রুত সম্প্রসারিত হইয়াছিল যে, আসাম সরকার তাহাতে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন, তখন অগ্নি চারিদিক লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়াছে। এই কৈফিয়ৎ afterthought প্রথমে ইহাপ্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু ইহা মিথ্যা। কারণ, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামার পরে আসামে এইরূপ হাঙ্গামা অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হইতে পারে না। বিশেষ যে ভাবে প্রদেশের নানা স্থানে একইরূপে অত্যাচার হয়, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবও ইহা সুপরিকল্পিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেভাবে আয়োজন হইয়াছিল, যেভাবে অত্যাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রধানমন্ত্রীও বলিয়াছেন—সরকারের দোষ ছিল, ৫টি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা কর্তব্যপালন করেন নাই। কংগ্রেসীরা দেখা দেন নাই। তদ্ভিন্ন অভিযোগ—আগামী পুলিস অত্যাচার দেখিয়া আনন্দানুভব করিয়াছে অত্যাচারে বাধা দেয়া ত পরের কথা।

যদি এই মিথ্যা কৈফিয়ৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়—আর যদি বলিতে পারা না যায়, আসাম সরকার ও আসাম প্রদেশ কংগ্রেস এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন:—তবে আসাম সরকারকে যে অযোগ্যতার অপরাধে অপরাধী বলিতে হয়—তাহার জন্য সে সরকারকে কি পদাঘাতে দূর করিতে বিলম্ব করা সমর্থিত হইতে পারে?

লক্ষ্য করিতে হইবে, কেন্দ্রীসরকারও সেই অযোগ্য সরকারের পরিবর্তন না করায় অপরাধী—"অসৎসঙ্গে পাকিতে হইলে অধর্মের ফল ফলে।"

যদি এইরূপ সরকারকে পদচ্যুত করিয়া রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত করিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য না হয়, তবে কোন্ ক্ষেত্রে সে কর্তব্য প্রয়োগ করা সঙ্গত?

হাঙ্গামা প্রবল হইবার পূর্বে রেলপাড়ী প্রভৃতিতে যে সব বিচ্ছিন্ন অত্যাচার চলিতেছিল, সেসবও কি সরকারকে সতর্ক করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলনা? না—সরকার লক্ষ্য করিতেছিলেন, দুষ্কৃতকারীরা প্রস্তুত হইয়াছে কিনা?

কেন্দ্রীয় সরকার কেবলই বলিয়াছেন—আসামের অবস্থা এমন নহে যে, রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত করা যায়। অবশ্য কেরলে যে অবস্থায় তাহা করা হইয়াছিল, তাহার তুলনায় আসামের অবস্থা ভয়াবহ। কিন্তু কেরলে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না—কাজেই সে প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি "সাপ মরে অথচ লাঠি যে কৌশলে।" সেজন্য মসলেম লীগের সাহায্য লইয়া জাতিনাশও করা যায়। কাজেই আসামে বাঙালীদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য পরে যেই যেমন মসলেম লীগের ভণ্ডদিগকে সাদরে ঘরে আনিয়া ছিলেন, কেন্দ্রী সরকার তেমনই কেরলে মসলেম লীগকে মিত্র বলিয়াছেন। আর সেই কেন্দ্রী সরকারই আসামের সরকারের সমর্থক। "With all thy faults I love thee still" আর বাঙ্গালী নির্যাতন, তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ নাই। কারণ, বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর স্বদেশ প্রেম। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব—রামমোহনের, বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের, অরবিন্দের সুভাষচন্দ্রের বাঙ্গালার লোকের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত হইবার যোগ্যতা আদর্শ ধরা জওহরলাল প্রভৃতির পক্ষে অসম্ভব!

আসাম সরকার ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন না ইহা মনে করা যায় না। আর যখন হাঙ্গামা প্রবল

তখনও যে ঐ সরকার—প্রধান সচিব ও রাজ্যপাল ঘটনার গুরুত্ব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ—পশ্চিম বঙ্গের প্রধান-সচিবের অনুপস্থিতিতে খাদ্য-সচিব যখনই টেলিফোনে অবস্থা জানিতে চাহিয়াছেন, তখনই তাহাকে প্রধান-সচিব ও রাজ্যপাল বলিয়াছেন, অবস্থা সন্তোষজনক—আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আসাম সরকার পূর্ব হইতেই প্রকৃত সংবাদ প্রচারের পথ বন্ধের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে পাঞ্জাবে ওডায়ারের সরকারের যে ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ "নিষেধ নিষ্কৃত" বলিয়াছিলেন তাহাই। সরকার কলিকাতার সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদিগকে সংবাদ সংগ্রহের সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, আর আসামীরা তাহাদিগকে ঘরের বাহির হইলে বিপদ ঘটিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল।

উপরন্তু বাঙ্গালীদিগকেই দায়ী করিবার চেষ্টা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী আসামে গমন করিবার পূর্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি নাবালকও নহেন অবলা নারীও নহেন। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি মন্ত্রীর বেত্রী তাঁহার সংগী হইয়া আসামে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীর আসাম যাত্রার পূর্বেই ফিরিয়া তাঁহাকে বক্তব্য বলিয়াছিলেন। তিনি যে আসাম সরকারের সব কথা গোপন করিবার চেষ্টায় গিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এতদিনে সমস্ত বিষয় বুঝিয়া প্রত্যাবৃত হইয়া বলেন—হাঙ্গামার জন্য দায়ী—

(১) বাঙ্গালীর অংহিকা—Superiority complex

(২) বাঙ্গালীর অদমনীয়া ভাষার প্রতি ঘৃণা।

(৩) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালীর সংবাদ-পত্র সমূহের উত্তেজনা।

তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া ঐ কথা প্রকাশ করিলে যখন তাহা বিচারসহ নহে প্রতিপন্ন হয়, তখন তিনি স্বীকার করেন—তাঁহাকে ভুল বুঝান হইয়াছিল। অবশ্য কে তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়া ছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু তিনি যে একদিনে সবজান্তা হইয়াছিলেন, সেই এক দিন তিনি সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন—আসাম সরকারের লোকের সঙ্গে আর, কংগ্রেস সভাপতির ব্যবস্থায়, আসাম প্রদেশে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে। কাজেই অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে আসাম সরকার ও আসামে কংগ্রেস নেতারা এক যোগে তাঁহাকে "বোকা বুঝাইবার" অপচেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই চেষ্টার ফলে যে কংগ্রেসী পার্লামেন্টারী দলেও কাঁপাইয়াছে তাহার প্রমাণ—অজিতপ্রসাদ জৈন সেই দলের নেতা হিসাবে বলিয়াছেন—(ডেহরাদুন—১৭ই আগষ্ট) কতকগুলি বাঙ্গালীদের দোষ তাঁহারা নির্দেশের জন্য সর্বদাই পশ্চিমবঙ্গ ও ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন।

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীও কতকটা সেইরূপ মত প্রকাশ করিতেও লজ্জানুভব করেন নাই।

অজিতপ্রসাদ এ বিষয়ে তাঁহার পূর্বগামী ভারত সরকারের আইন মন্ত্রীর মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন হইলেও উভয়ে প্রভেদ এই যে আইন মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার বলা—এরূপ বলিবার সাহস তাঁহার ছিল। পক্ষান্তরে বাবু অজিত প্রসাদের সে সাহসও নাই। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের দোষ তাঁহারা আসামে থাকিলেও নির্দেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ও বিধানবাবুর মুখাপেক্ষী—তাহার প্রমাণ কি জিজ্ঞাসায় অজিতপ্রসাদ জৈন কাপুরুষের মত বলিয়াছেন—মওগাঁর একজন উকীল আমাকে এই কথা বলিয়াছেন! যে উকীলের কথা তাঁহার কাছে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তার কথার মত নির্ভরযোগ্য তিনি কি আসামী?

বাঙ্গালীরা যদি—তিনি যে স্থানেই কেন থাকুন না—বাঙ্গালীর সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন, তবে কি তাহা নিন্দনীয়? লর্ড ডাফরিন একবার বলিয়াছিলেন—

"To our fond imagination, in whatever distant land we may be serving, amid all our troubles and anxieties England arises from our view as she did to the men of Crecy-like a living prince."

ইহা দোষ নহে—গুণ। আর বাঙ্গালার গোমুখীমুখ হইতেই জাতীয়তার প্রস্রবণীধারা নির্গত হইয়া—বাঙ্গালীর চেষ্টায় খণ্ডিত ভারতে মহাভারত সৃষ্টির আয়োজন

করিয়াছিল। সে আয়োজন যে দেশ বিভাগে পর্ব হইয়াছে—তাহার জন্য কাহারা দায়ী? "না হইবে মাতঃ বোধন তোমার, কাহারা ভাঙ্গিল মঙ্গল-ঘট?" জওহরলাল এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি?

আসামীরা যখন বলে—আসাম আসামীদিগের জন্য তখন তাহা দোষের হয় না; আর বাঙ্গালী যদি আসামে থাকিয়াও বাঙ্গলার শ্রেয়ঃ লাভের চেষ্টা করে, তবে তাহা দোষের হয়!

পদের আশা ও চাকরীর মোহ কি মানুষকে এমনই অমানুষ করিয়া থাকে? আজ আমরা ভারতে এ কি লক্ষ্য করিতেছি?

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে নিপুণ অভিনেতা তাহা আমরা জানি। তিনি একদিন ইংরেজকে তুষ্ট করিবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে আপনার তাবেদার বলিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়াছিলেন আর তাহার পরে সুভাষচন্দ্রের মূর্ত্তিতে মাল্যদানকালে, অশ্রুপাতের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যখন 'আসামে অসমীয়ারা "বঙ্গাল খেদা" Repeat performance আরম্ভ করে, তখন তিনি কাশ্মীরে। ভারতীয় সেনাগণ যখন কাশ্মীর হইতে অনধিকার প্রবেশকারীদিগকে বিতাড়িত করিতেছিল তখন যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিয়া তিনি যে কাশ্মীরে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন সেই কাশ্মীর হইতে তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া স্থির করেন, বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে অগৌণ অত্যাচার প্রয়োজন হইলে আসাম যাইবেন, বাঙ্গালীদের মনোবল রক্ষায়।

আসামে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। অভিনেতা জওহরলাল ১৭ই-জুলাই তথায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কন্যা ইন্দিরা। দুইজন দুইরূপ ধরিলেন। কন্যা বলিলেন, তিনি দোষ কাহার তাহা বিচার করিতে গমন করেন নাই; গিয়াছেন—অশান্ত আসামে শান্তি স্থাপন করিতে—ভগবানকে বলিতে—"ধরিব ধরামাঝে শান্তির বারি।"

কিন্তু দুই-নৌকায় পা রাখিবার মত চতুরতায় কিছু গরম বুলী বক্তৃতা দিলেন। অবশ্য তাহা ব্যবস্থামত—By arrangement। তিনি যে পরে আসাম সরকার ও আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নৌকায় আসিবেন, ইহা বোধ হয়, স্থির করাই ছিল।

১৭ই জুলাই গৌহাটিতে অবতরণ করিয়াই জহরলাল বক্তৃতার তুবড়ী বাজী ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে করেন, তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি স্থিরীকৃত মিথ্যার আশ্রয় প্রথম হইতে গ্রহণ করিয়া সেখানে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিলেন—আসামে হাঙ্গামা যে তাহার দাবীর জন্য নহে তাহা সত্য হইলেও তিনি প্রথম হইতেই তাহা তাহার জন্য বলিয়া—আসামীদিগের অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলেন।

আর অসামীদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি অধিক ভাবে ঘোষণা করিলেন—অসমীয়া ভাষা যে আসামে রাষ্ট্রের ভাষা হইবে, সে বিষয়ে তিনি আসামীদিগের সহিত একমত। "I am in full agreement with you that Assamese should be the State language" তবে ভাষাকে সাষ্টির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি কাব্যের রাজ্য হইতে উপমা সংগ্রহ করিলেন—ভাষা তবে কৃষ্ণ নহে করিতে পারে [illegible] যত্নে বর্দ্ধিত করিতে হয়, তবে যথাকালে পূর্ণ বিকাশ পায়। ইহার পরে—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে—জহরলাল তাঁহার উক্তি অস্বীকার করিয়াছিলেন—তিনি নাকি ওরূপ বলেন নাই। তবে কি সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ ভুল? জওহরলাল যখন বিভিন্ন বক্তৃতে আক্রমণ করিয়া তথা হইতে লাভের উপায় পান নাই; তখন যে বলিয়াছিলেন, তিনি অন্যমনস্ক থাকায় ঐরূপ অসঙ্গত উক্তি করিয়াছিলেন—তিনি সেজন্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই জওহরলালের উক্তি ও অস্বীকার কোনটি যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে ও থাকিবে। তিনি যে ঐ উক্তির দ্বারা আসামীদিগকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই!

কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন—অসমীয়া কেন আসাম রাজ্যে ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইবে? আসামীরা আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জওহরলাল যে আসাম সরকারের লোক

গণনায় নিবারণ আশ্রয় গ্রহণ করেন
করিলে তাহাকে বলিতে
আসামীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করা কেবল ইহাদের তাহা
কতকগুলি পক্ষান্তরে সম্ভব—মাত্রুষে নহে।

তাহার পরে—

(১) জওহরলাল কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেসকর্মীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—তিন সপ্তাহ পূর্বে হাঙ্গামা আরম্ভ হয় আর কংগ্রেসপন্থীরা তাঁহাদিগের কর্তব্য পালন বিরত। কংগ্রেসপন্থীরা কি ভীতিবিহ্বল হইয়া লুকাইয়া ছিলেন?

এই উক্তির প্রতিবাদে একজন বলিতে চাহিলে জওহরলাল (কৃত্রিম?) ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলেন—তিনি ঐ সকল বিষয়ে কাহারও সহিত তর্ক করিতে চাহেন না; তিনি প্রদেশের অবস্থা সম্যক অবগত আছেন অর্থাৎ উক্তিই প্রামাণ্য। সভা এক ঘণ্টা চলিবার কথা ছিল—ঠিক এক ঘণ্টায় তিনি সভা শেষ করিয়া স্থান ত্যাগ করেন। ইহা যে অভিনয় তাহার প্রমাণ—কংগ্রেসের গঠনে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

দিল্লীতে ফিরিয়া ২৮শে জুলাই জওহরলাল নির্মল চন্দ্রকে যে পত্র লিখেন, তাহা লিখিত—সুতরাং, তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাতেও তিনি লিখেন—

"I have little doubt that many Congressmen either participated or merely looked on. Unfortunately the one man who could have held the situation, that is Chief Minister Chaliha, has been lying very ill."

প্রধান সচিব চালিহার অসুস্থতা—রাজনীতিক কিনা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা জানি, তিনি হাঙ্গামার সময় পশ্চিমবঙ্গের সচিবের অনুসন্ধানে টেলিফোনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অসত্য।

(২) জওহরলাল পুলিশের ও সরকারের একমাত্র নিন্দা করেন—তাঁহারা হাঙ্গামার উদ্ভব নিবারণ করিতে পারেন নাই।

জওহর বলিয়াছিলেন, তিনি আসামের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তবে তিনি কেন বলেন নাই—পুলিশ হাঙ্গামার উদ্ভব নিবারণ করা ও পরে তাহা—হাঙ্গামা উপভোগ করিয়াছিল?

(৩) জওহরলাল বলেন, হাঙ্গামা নিবারণ ব্যাপারে একটি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা কর্তব্য পালন করেন নাই। তিনি (জওহরলাল) যদি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন, তবে একমাস পূর্বেই ইহার ব্যবস্থা করিতেন।

কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অপরাধের অভিযোগ আর কিছু হইতে পারে কি? জওহরলালের উক্তিতে বুঝা যায়, এই হাঙ্গামা যে ঘটিবে, একমাস পূর্বেই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারও আসাম সরকারকে স্পর্শ করেন নাই আর ঐ অক্ষম ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকজনকেও বিতাড়িত করা হয় নাই। তাঁহাদিগের পদোন্নতি হয় নাই ত?

গৌহাটীতে অবতরণ করিয়াই জওহরলাল তাঁহার গমন কথা শেষ করিলেন। তাহার পরেই বেলুন হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যাইলে তাহার যে অবস্থা হয় তাঁহার সেই অবস্থা দেখা গেল। তখনও বাঙালীর গৃহে অগ্নিযোগ হইতেছে, বাঙালীকে হত্যা করা হইতেছে বাঙালী-নারীর মর্যাদা হানি করা হইতেছে—তথায় (১৭ই জুলাই তারিখেই) তিনি বলিলেন—

"বটিও আসামে আর অশান্তি নাই (The air is now free from disturbances) বহু লোক এখনও আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিতেছে।"

অর্থাৎ লোকেরই ভুল! ১৭ই জুলাই তারিখেও হাঙ্গামা ছিলই—১৭ই আগষ্ট তাহা শেষ হয় নাই। অথচ ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—আসামে আর অশান্তি নাই!

ওই উক্তি যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সুর পরিবর্তন হইল; পিতা কন্যারই মত বলিতে লাগিলেন—এখন প্রয়োজন পুনর্বাসনের আর লোকের মনে আস্থা প্রতিষ্ঠার!

গৌহাটীতে পুলিসের গুলিতে একটি আসামী ছাত্রের মৃত্যু হয়। জওহরলাল সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু যেসকল বাঙালী পিশাচ আসামীদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের জন্য এতটুকু দুঃখপ্রকাশ করা হইল না। প্রধানমন্ত্রীর নানা বক্তৃতায়—বাঙালী হত্যার,

বাঙালীকে আঘাতের ও বাঙালী নারীলাঞ্ছনার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। যেন তিনি সত্য গোপন করিলেই সত্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে না।

পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ, আস্থা প্রতিষ্ঠা—এই সকল কথার ধুয়াটিকায় জওহরলাল প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। আর আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে যাহা প্রয়োজন তাহার উল্লেখও করিলেন না—দুষ্কৃতকারীদিগের দণ্ডবিধান।

তাঁহার বক্তৃতা—only sound and fury—আর কিছুই নয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সব আনিতে একদিনের অধিক প্রয়োজন হয় নাই—প্রধান মন্ত্রী তিন দিনে সব বুঝিয়া দিল্লীতে ফিরিলেন। কন্যাকে আসামে রাখিয়া যাইতে সাহস হইল না। দিল্লীতে আবার অসত্যের স্রোত বহিল। ২০শে জুলাই তিনি বলিলেন। —"আসামের অবস্থা চমৎকার। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হইলেও সর্বতোভাবে নিরাপদ। ভবিষ্যতে হাঙ্গামার কোন কথাই উঠে না। নিরিখতার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি আছে।"

এই প্রতিশ্রুতি কে দিল এবং ইহার মূল্য কি? নরপশুরা তখনও নিরাপদে কাজ করিতেছে। উদ্বাস্তুদিগকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলা হইল—অথচ গৃহ ভস্মীভূত। সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল:—

(১) হাঙ্গামা অত্যন্ত সহসা আরম্ভ হইয়াছিল।

(২) অনেক পরে ঘটনার প্রচারিত বিবরণ অত্যন্ত অতিরঞ্জিত—উত্তেজিত উদ্বাস্তুরা অতিরঞ্জিত বিবরণই প্রদান করে।

(৩) আসাম সরকার সরাইয়া আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কারণ নাই।

প্রথম কথা—আসাম সরকারের অমার্জনীয় অপরাধের সমর্থন জন্য সৃষ্ট—অসত্য। তাহার স্রষ্টা—কংগ্রেসের সভাপতি রেড্ডী। তিনিই প্রথম ঐ কথা বলেন—তাহার পরে জওহরলাল।

আসাম সরকার পরিবর্তিত করা হইবে না—অথচ সেই সরকারের শাসনে আসামে ভারতীয় সংবিধানের মূল নীতি তত্ত্বাবধেয় করা হইয়াছে। বাঙালীরা অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন- সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহারা নারীর সতীত্বের মর্যাদা বুঝে না—এমন কথা তাহাদিগের মুখেই শোভা পায়।

হতাহতের সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই, হয়ত হইবে না। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাইবে না। দুষ্কৃতকারীরা অবশ্যই দণ্ডিত হইবে না।

বিধানের বন্যায় সত্য ভাসাইয়া বিপন্ন বেষ্টন হইয়াছে—হইতেছে এবং হইবে।

সত্যই জওহরলাল (গঠন তন্ত্র নিরাপদ করিতে আসামে গমন না করিলেও) তথায় গুণ্ডামীতন্ত্র দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

প্রথম হইতে যতদূর বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ অতিরঞ্জিত আমরা অবশ্য শ্রীজহরলালের মত লোকের নিকট অতি উচ্চাঙ্গের মত আশা করি না। কিন্তু তবুও মনে পড়ে যখন সুইটজারলণ্ডের সরকার রুশোর পুস্তক প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া তাহা পুড়াইয়া ফেলিতে আদেশ দেন, তখন ভলটেয়ার তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"I do not agree with a
but I will defend to death
say it."

মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই মনোভাব জহরলালের অনধিগম্য হইলেও তিনি কি জেফারসনের উক্তি পাঠ করেন নাই—

"Our liberty depends on the freedom of Press, and that cannot be limited without being lost?"

যাহারা সত্যকে ভয় করে, তাহারাই সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার বিরোধী। আসামে—

(১) আসামীরা কলিকাতা হইতে তখন উপনীত সংবাদপত্রের কতকগুলি কপি লইয়া দগ্ধ করিয়াছিল—পুলিস তাহাতে বাধা দেয় নাই।

(২) ছয় জন ম্যাজিষ্ট্রেট (নিশ্চয়ই সরকারের নির্দেশ বা অনুমোদনে) কলিকাতার সংবাদ পত্রের প্রবেশ ও প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

জওহরলাল এই দুষ্কার্য্যের নিন্দা করিয়া একটি কথাও বলেন নাই। বরঞ্চ তিনি সেটাই সমর্থনই করেন। সকলেই জানেন পাঞ্জাবে হাঙ্গামার সময় ওডায়ারের সরকার সংবাদ প্রকাশের পথ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাই সর্ব্বত্র অত্যাচারের সমর্থক সরকারের কাজ।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী আসামীদিগের ও আসাম সরকারের কলিকাতায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে আচরণের নিন্দা করেন নাই। অথচ আসামে যেমন ভারতীয় সংবিধানের মর্য্যাদা তেমনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মর্য্যাদা নষ্ট করা হইয়াছে।

যে স্থানে সরকার ও দুষ্কৃতকারীরা সংবাদ সংগ্রহের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টায় রত সে স্থানে সংবাদ সংগ্রহ করা যে কত কষ্টকর ও বিপজ্জনক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

তথাপি কলিকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। অন্ততঃ দুই ব্যক্তি—এই আসামীর সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ হেতু নিহত হইয়াছেন—সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি প্রভৃতির পক্ষে দিনের পর দিন বিপদ বরণ করিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। সে জন্য গণতন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার সমর্থনে তাহাদিগকে ধন্যবাদার্হ মনে করা উচিত। কলিকাতার সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত না হইলে অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারিত, তাহা বিবেচনা করাও জওহরলাল প্রয়োজন মনে করেন নাই। মক্ষিকা যেমন ব্রণই সন্ধান করে তিনি তেমনিই প্রকাশিত সংবাদে অতিরঞ্জন সন্ধান করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্র অতিরঞ্জন ঘটিতে পারে—কিন্তু কোন প্রকাশিত সংবাদ ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ইহা আসাম সরকার প্রমাণ করিতে পারে নাই।

যে সময় হাঙ্গামা চলিতেছিল (আজও অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই) তখন কি আসাম সরকার নিয়মিত ভাবে তাহাদিগের বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন?

আসামে বাঙ্গালীরাই নিগৃহীত এবং প্রায় ৪ হাজার বাঙ্গালী আসাম হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন। কাজেই—সমগ্র রাষ্ট্রে আসামী সরকারের প্রতিক্রিয়া হইলেও পশ্চিমবঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া সর্ব্বাধিক হওয়াই স্বাভাবিক পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারের বিক্ষুব্ধ বিহারী হিন্দুরা যখন প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করেন, তখন জওহরলাল লোক সভায় তাহার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন—তাহা আশ্চর্য্য তিনি ভুলিয়া যান নাই। তিনি ভুলিলেও সভার কার্য্য বিবরণে রহিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস ও সরকার শান্তিরক্ষার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেও বেদনার অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। তাহারা দলীয় মর্য্যাদা তুচ্ছ মনে করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। আসামের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব হরতাল হইয়াছে—প্রধান সচিব তাহা "শোক দিবস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পালিকা সচিবগণের পরামর্শে—"স্বাধীনতা দিবসের" অনুষ্ঠানে সমর্দ্ধনা সম্মেলন বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইহার জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জওহরলালের অপ্রীতি-ভাজন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার মতানুবর্ত্তী হয় নাই। প্রধান সচিব বলিয়াছিলেন—আসামের ব্যবহারের বেদনা এত অধিক যে তাহা লইয়া উৎসবে যোগদান করা অসম্ভব—

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

জওহরলাল প্রকাশ করুন আর নাই করুন, আসামে বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। তাহার পরেও যে মনে করিতে পারে বাঙ্গালীরা উৎসবে মাতিবে। তাহাকে কি মানুষ বলিয়া বিবেচনা করা যায়?

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আসামে বাঙ্গালীদিগের লাঞ্ছনার কিছু কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস সে জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আসামে বাঙ্গালীরা আসামের বঙ্গভাষাভাষী অংশ স্বতন্ত্র করিয়া "পূর্ব্বাঞ্চল প্রদেশ" গঠনের ইচ্ছা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ—

"A Government against which a claim of liberty is tantamount to high treason, is a Government to which submission is equivalent to slavery."

"স্বাধীনতা দিবসে" উৎসব বর্জনের প্রতিবাদ করিয়া জওহরলাল বলিয়াছেন, স্বাধীনতা সমগ্র রাষ্ট্রের—পশ্চিমবঙ্গ বা আসাম অপেক্ষা ভারত রাষ্ট্র বড়। একথা কি বাঙালী জওহরলালের মুখে শুনিবে? যে জওহরলাল সমগ্র ভারতবর্ষে গৃহীত আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া—অখণ্ড ভারত খণ্ডিত করিয়া, জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতা বরণ করিয়া—(অতুল কালাম আজাদের উক্তিতে) লেডী মাউন্টব্যাটেনের প্রভাবে দেশ বিভক্ত করিয়াছেন এবং পরিচালনের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি কি বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেকানন্দের সঙ্গীগণকে দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিবেন তাহাও সহ্য করিতে হইবে, অদৃষ্টের কি পরিহাস!

যে আসামে "বাঙাল খেদা" আন্দোলন—১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ও ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে পর পর তিনবার ববরতার পরিচয় দিয়াছে—সেই আসাম কি রাষ্ট্রকে প্রদেশ অপেক্ষা বড় মনে করিয়াছে?

অথবা তথায় যে সরকার সংবিধান পদদলিত করা নিবারণ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই সেই সরকার অপরিবর্তিত।

কংগ্রেস সভাপতি ধেবর আসামে প্রদেশ কংগ্রেসের ও সরকারের "সাফাই" চাহিয়াছেন—প্রধান মন্ত্রী—নিজে বাঙালীদিগের জন্য শোক প্রকাশ করেন নাই—এমন কি দুষ্কৃতকারীদিগের ওপর বিধানের প্রয়োজনও হয়তঃ অনুভব করেন নাই।

সাহস পাইয়া প্রধান সচিব বলিয়াছেন।

Have some confidence Government. It was never a disturbance.

একথার একমাত্র উত্তর—আসাম সরকার যে করিয়াছেন তাহাতে আর আস্থা রাখা করিতে পারেন না। আর সেই সরকার যে চাঙ্গামায় যোগ দেন নাই, তাহা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না।

দেয়াল, চাকনি, ঈশ্বর

স্বরপ্রসাদ মিত্র

কালো দেয়ালের পরে শাদা, লাল, ধূসর দেয়ালে
যতোই বেধেছে দৃষ্টি
তাতো চোখ দূরে যেতে চায়,—
অর্থাৎ আকাশ খোঁজে
কিংবা গাছ, কিংবা নীল জল—
জুড়োবার ছায়া কিংবা জিরুবার শূন্যই শুধুই !

সে শূন্য কোথাও নেই।
নেই সেই ছায়ার বীথিকা।
জগৎ চলন্ত যন্ত্র,
নিরন্তর গতি ও গর্জন—
তারই মধ্যে থাক্ থাক্ সামান্যেরও
অক্লান্তকর্মিতা।
যে শুধু দাঁড়ায় একলা, সেও সত্যি ঈশ্বরসেবক !

সকালে বিষ্টির জল, মেঘঢাকা আলো,—
অটুট প্রত্যয়বলে তাতে সূর্য দেখতে এগিয়ে
দেখলুম উদ্যমে ক্রমে নিরুপায়, দেউলে লোকটি
না পেয়ে রোদের আলো
বলছে সে : 'এ শুধু ঢাকনি'।

ভাঙা ছাতা, ম্লান মুখ, হাতে ত্রস্ত বাজারের থলি—
সম্প্রতি বেড়েছে যেথা আসামের বঙ্গালখেদাতে।
অটুট প্রত্যয় দিয়ে মেঘকে যে করে মেঘদূত
তেমন যক্ষ তো নয়।
বলছে সে : 'এ শুধু ঢাকনি'।

'নিজেকে ঢেকোনা তুমি ওগো সূর্য আকাশবিস্তারে !'
'যক্ষের বিরহ দীর্ঘ শোনো শোনো ওগো মেঘদূত।'
—এই দুটি স্বগতোক্তি জেগেছিল মনের খাদেতে
এবং উড়েছে মন সাহিত্যের কদমে কেয়াতে।
আচম্বিতে ভেঙে গেছে মুহূর্তে সে অন্তর্মুখিতা—
পৃথিবীর নিরন্তর শাদা, লাল, ধূসর দেয়ালে।

আগস্ট, ১৯৬০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চোখ মেললেই এবার যেন দেখতে পারি তোকে,
সন্ধ্যাবেলার নদী।
মানুষ আমি অনেক দেখলাম,
অনেক রকম মানুষ !
ঘরের মানুষ, পরের মানুষ,
হরেক রকম মানুষ !
আর না, মানুষ আর না !
চোখ মেললেই এবার যেন দেখতে পারি তোকে,
সন্ধ্যাবেলার নদী।

হে ঊর্ধ্বাকাশ, জেনে রাখো, তোমায় বলছি আমি,
সারাটা দিন মানুষ দেখে, মানুষ দেখে দেখে,
এখন শুধুই অসম্মানের জ্বালায় জ্বলছি আমি।

চোখ মেললেই এবার যেন দেখতে পারি তোকে,
সকাল বেলার টগর।
মানুষ আমি অনেক দেখলাম,
অনেক রকম মানুষ।
হাটের মানুষ, মাঠের মানুষ,
হরেক রকম মানুষ !
আর না, মানুষ আর না !
চোখ মেললেই এবার যেন দেখতে পারি তোকে,
সকাল বেলার টগর।

ঋষিকেশের সমাধি

সুকুমার সেনগুপ্ত

বেঁটে খাট আর মোটা লোকটা বছর পঞ্চাশের ওপর চলে গিয়েছিলেন। বড় বড় চুল আর লম্বা দাড়ি ; গেরুয়া রঙের একটা লুঙ্গি আর সাদা কতুয়া। এটাই সব সময়ের পোশাক। লাগপাঙ্গ নিয়েই এসেছিলেন এক রবিবারের দুপুর বেলায়। মন্দির করবেন এখানে আর সেই মন্দির করতে যারা সাহায্য করবেন তাদের অনেকেই ছিলেন তার সঙ্গে। তারপর বেশ কয়েকটা দিন, জায়গা কিনে ছোট দু'খানা ঘর আর আর রান্নাঘর করে নিয়ে সামনে ছোট একটা বোর্ড লাগিয়েছিলেন "স্বামী অদ্ভুতানন্দ" তারপর স্ত্রী আর বুড়ো চাকরটাকে সঙ্গে করে উঠে এসেছিলেন এখানে।

অথচ উনি কালীর সাধক। আলাপে মিষ্টভাষী আর···হ্যাঁ প্রথম দর্শনেই মানুষকে আপন করে নেওয়ার সকল গুণই আছে লোকটার। হাতের রেখা বিচার করেন না, কপালের রেখা। কপালের রেখা কথাটা অবিশ্যি হলেও কিন্তু করার কিছু নেই, মোটা পুরু কাঁচের মধ্যে বেশ ফুটে ওঠে কুঞ্চিত করা কপালের রেখা।

ঋষিকেশ বাবুর এ জাতীয় স্বামিজী জীবন মাত্র কুড়িটা বছর। এর আগের জীবন অর্থাৎ ঋষিকেশ নামের জীবন একটা আলাদা। একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন ঋষিকেশ বাবু। রেশমের জীবনের যে অঙ্কুর নিজের হাতে বপন করেছিলেন, একটা মহীরুহেই পরিণত হতে চলেছিল, জেল খেটেছেন কয় বছর অবশ্য গল্পচ্ছলে বলেছিলেন আমাদের কাছে যে জেলখাটা তার হাতে নৈতিক ব্যাপার। পরে ত্রিগুবাবুর কাছে জেনেছিলুম যে জেল খাটাটা নৈতিক ব্যাপারেই হয়েছিল, এবং নৈতিকটা অন্য ধরনেরই ছিল। পরের স্ত্রী নিয়ে বেলেল্লাপি করাটাই নাকি ব্যাপার।

ত্রিগুবাবুই বলেছিলেন, ত্রিগুবাবুই ত দিয়েছেন। স্বামিজীর জায়গাটা কেনার খোঁজাটা পেয়েছিলেন এখানে আসতেনই না।

ইছামতীর পাড়ে অমন ছাড়া গ্রামটা আজও আধো কলকাতা শহরের ছেলে, বাপ মায়ের সংসার ছেড়ে কাছে ঘরে চাকরীটা জোগাড় করে গ্রামটায় এসে মন বসে ছিলেন। বেশ ছিলেন, আর বেশ লেগেছিলও গ্রামের চক্কোত্তির অবনী দাস সেদিন তাকে তার বাড়ীতে সহসা নিয়ে গিয়েছিল, এখনও নিশ্চয়ই স্বামিজীর সে সব দিনের কথা মনে আছে। মাত্র দশটাকায় অবনী দাসের বাড়ীতে খাওয়া-থাকা, অবনী দাসের সংসারে ভীড় তারও

কোন প্রশ্ন ছিলনা, অবনী আর অবনীর বৌ
ঋষিকেশ, প্রথম যেদিন অবনী ঋষিকেশকে নিয়ে
তাদের বাড়ীতে, অবনীর এসে একহাত
দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেখানে মাত্র দু'টা মাস। মায়ার দরদভায় অবনী কেন সন্দেহ প্রকাশ না করলেও একটা অজ্ঞাত সুযোগ নেওয়ার প্রচেষ্টা ঋষিকেশ খুঁজছিলেন। একদিন রাত্রে পেয়েও গেছলেন। অবনীর ঘর ভাঙতে এতটুকুও দ্বিধা করলেন না ঋষিকেশ।

"হ্যাঁ মনীষাবাবু, মায়া সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করল। আর অবনী পাগোল হয়ে গেল, ইছামতীর পাড়েই মায়াকে দাহ করা হয়েছিল, আজও বোশেখ অবনী এক গাল দাড়ি নিয়ে ঐখানটায় বসে থাকে।"

ভিক্ষুবাবুর বক্তব্য সেদিন যে দীর্ঘশ্বাসে বেরিয়েছিল, কেন জানিনা সে দীর্ঘশ্বাস আমার অন্তরও ছুঁয়ে গিয়েছিল. ঋষিকেশ বাবু ফেরার পরেও নিস্তার পাননি, মায়া একটা চিঠি লিখে গিয়েছিল আর তারই জেরে পুরো একটি বছর। তাও বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হয়েছিল ঋষিকেশবাবুকে।

আমাদের রাম ধোপার বৌ লক্ষ্মী লোক চেনে। আর শুধু চেনা নয়, দরকার হলে সে কথা প্রকাশ করতেও ভয় পায়না, এখানকার আদি বাসিন্দা, কথায় কথায় তাই বলে "বয়সটা আমার ত্রিশে ছাইরে গেল এই মাটিতে, আমায় লোক চেনাতে হবেনি," রামের সঙ্গেও তাই মাঝেমাঝে বেজে। যার রামের মতে স্বামিজী বেশ লোক, "আহাঃ হাঃ এমন ধার্মিক লোক কি সুন্দর সব কথা বলেন

"প্রেম করেছ কোন দিন, প্রেম means love হ্যাঁ ভালবাসা, কোন দিন কোন ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছিস ?"

সেদিন সামনে জ্ঞান হাসের কলেজে পড়া মেয়ে আরতি তার কপাল দেখাচ্ছিল, পরপর দু'টো বছর সে উত্তরোতে পারছে না, তাই তার বাবার নির্দেশেই স্বামিজীকে দেখাতে এসেছিল।

আরতি তারপর আর স্বামিজীর কাছে যায়নি, এখানে একটা একটা দিন করে পঁচিশ বছর কাটালেন, জীবন বৈচিত্র্যের একটা পরিবর্তনের পূর্ণচ্ছেদ বোধ হয় এখানেই

শুরু আর শেষও হয়ত হবে এখানেই এক একটা ইঁটের গাঁথুনী করে হাজার হাজার ইটের ব্যাপার, শিষ্যদের দয়া, সরকারের প্রচেষ্টা, দু'খানা ঘর বাদ দিয়েও মন্দিরের ভিত করেছেন, গাঁথুনিও তুলেছেন, এখানে যা ছিলনা, যা কেউ কোন দিন আশাও করেনি স্বামিজীর দয়ায় এসব হচ্ছে।

ভূতে পেয়েছিল রামদাসীকে নিতাই কুমোরের বৌ রামদাসী, গল্প নয় সত্যিই, আমার চোখে দেখেছি তাকে উলঙ্গ হয়ে ছুটতে, নিজের কানে শুনেছি আবোল তাবোল বকতে। ভোর সন্ধ্যে বেলায় চুল খুলে আসছিল একটা কেরোসিনের ডিবি জ্বালিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে। তাদের গরুটা হারিয়ে গেছল, তাকে খুঁজতে বেড়িয়েছিল : নিতাই কুমোর এসে কেঁদে পড়েছিল স্বামিজীর পায়ের ওপর। উন্মুক্ত একটা স্থলকে ঘিরে ছেলে তার মধ্যে রামদাসীকে নিয়ে তিনদিন আর তিনরাত্রি... একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তারপর চিৎকার করে করে মন্ত্রপাঠ। হ্যাঁ রামদাসী ভাল হয়ে গেছল ; কিন্তু নিতাই কুমোরকে হারাতে হয়েছিল দু'খানা জমি। আর নাম খুলেছিল স্বামিজীর, একটু মৃদু হেসেই স্বামিজী বলছিলেন...

"হ্যাঁ... বেশ জালিয়েছে আমাকে এই ভূতটা, আর এই ভূতটা আমাদের হিন্দুর আত্মা নয়, মুসলমানের, একি সহজে যেতে চায়রে বাবা, এযে চালাকি ভূত"।

রাম ধোবির বৌ লক্ষ্মী কিন্তু এ কৃতিত্বে বাহবা দিতে পারে না, সে বলে "ভূত তাড়াতে অনেক ওঝাই পারে, কেঁটিয়ে আমিই তাড়াতে পারি...।" রাম শুনতে শুনতে কানে আঙুল দিতে চায়, বলে কি লক্ষ্মী ! কিন্তু মিথ্যে প্রলোভনে পড়বার লোকও নয় লক্ষ্মী, সাদামন সাদা কথা, কথায় কোন রঙ চড়াতে চায় না।

স্বামিজীর তাতে যায়-আসে না কিছু। প্রতি অমাবস্যায় খিচুড়ি ভোগ, আর বেজাতের ত বালাই নেই। এ শতাব্দীর স্বামিজী, কথায় কথায় গীতা আওড়ান নয় অর্থ করে বুঝিয়ে দেন। অমাবস্যার রাত্রিতে উচ্চারিত হয় সেই মন্ত্র...

"করাল বদনং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্
কালিকাং দক্ষিনাং দিব্যা, মুক্তামালা বিভূষিতাম্

ভোরে সূর্য ওঠার আগে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন

স্বামিজী। বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করেন ডাকতে ডাকতে "মা···মা···মা···" তিনবার। তারপর বসে পড়েন চেয়ারে, প্রসাদ বিতরণ করেন নিজের হাতেই।

রামদাসী সলজ্জ চোখ দুটো বন্ধ করেই হা করে, মাথাটা টেনে নেন স্বামিজী। "আর একটু·····" তারপর কমণ্ডলুর থেকে কয়েক ফোটা জল মুখের ভেতর দিয়ে দেন।

অনেকের চোখে এ দৃশ্যটা বেশ খারাপ লাগে; কিছু বলতে পারে না। পাপী মন তাদের।

"প্রত্যেক দিনই রাত্রে প্রসাদ নিয়ে যাবি·····"

মন্দির প্রতিষ্ঠাও ঠিক নয়, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

স্বামিজীর আমাদের ওপর আস্থা না থাকলেও আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন, বাইরের থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে উঠে এলুম, স্বামিজী ধ্যানস্থ ছিলেন! পাশে সুন্দরী একটা বৌ পাখা দিয়ে স্বামিজীকে বাতাস করছিল। আর দশজনের মত কতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে ছিলুম মেয়াল নেই। আকস্মিক ভাবে একটা মটরের শব্দে ঘুরে তাকালুম। সেই গাড়ীটা এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল।

আমরাও হকচকিয়ে গেলুম···। পুলিশ অফিসার উঠে এলেন মন্দিরের ওপর, "নিত্যানন্দ ফকির এখানে আছে না?"

পুলিশ অফিসারের প্রশ্নে আমরা যেন একটু বোকা বনে গেলুম। "নিত্যানন্দ ফকির মানে?"

"হ্যাঁ, ব্যাটাকে অনেকদিন ধরেই
এখানে নাকি সে বেশ জমিয়ে বসেছে?"

পালটা অপমান সূচক কথায় আমার বিশ্রী লাগল। আমিও বিরক্তভাবেই উত্তর দিলুম।

"এটা হচ্ছে অদ্ভুতানন্দের আশ্রম··"

অফিসার চলে যাবার আর একটু চড়িয়ে দিয়ে বললেন···

"হুঁ··· হ্যাঁ ও একবার হয় ঋষিকেশ, একবার নিত্যানন্দ ফকির, আবার স্বামী অদ্ভুতানন্দ···

শেষ পরিণতি আমরা দেখিনি, দেখতে পারিনি, ধীরে ধীরে নেমে এসেছিলুম।

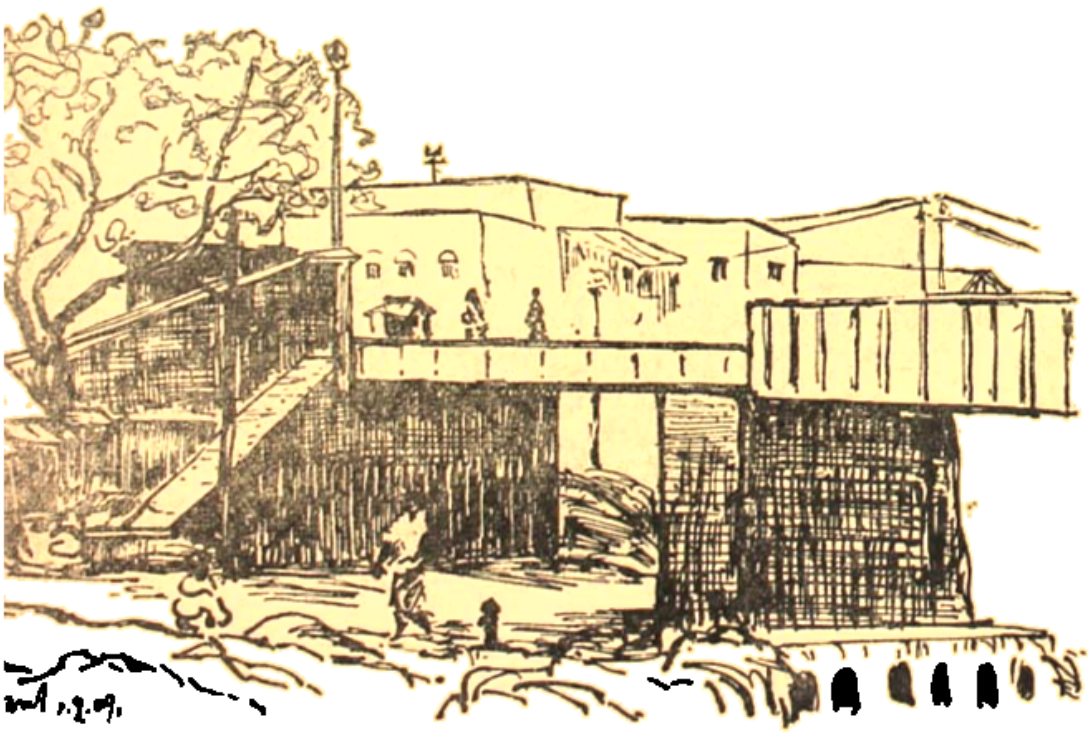

শিল্পী : অবনী ঘোষ

অনেক দূর থেকে ভেসে আসে শব্দটা। রাত বলেই শোনা-যায়। দিনের কোলাহলে মাঝেপথে ঝরে যেত!

'বল হরি, হরি বোল।' এবার আরো কাছে।

'আ মর' অস্ফুট উচ্চারণ করে নয়নতারা। সে তার মেটে ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ থেকে। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে রাগ চড়ছিল তার। আর যারা দরজায় দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে সেই সন্ধ্যেয়, তারা ঘরে ঢুকে গেছে। একা ঢোকেনি। নয়নতারার বয়স বেড়েছে। কঠিন সত্য।

হরিধ্বনি এবার আরো কাছে এগিয়ে আসে। নয়নতারার দরজার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নয়নতারার সহকর্মিনীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাদের সঙ্গীদের জোরে আঁকড়ে ধরেছে! কেউ ভয়ে কেউ ভয়ের ভানে।

নয়নতারা বিরক্তির মধ্যেও দু'হাত কপালে তোলে। ছোটবেলা থেকেই তুলছে। মানুষ মরলে দেবতা বা অপদেবতা হয়ে যায়। তাই ওই যুক্তকর—ভয়ে বা ভক্তিতে। এখন অবশ্য তার ভয় বা ভক্তি কিছুই হয় না। তবু হাতটা ওঠে। অভ্যেস।

শব-সহ দলটা এগিয়ে গেছে শ্মশানের দিকে। হরির নামে দিয়েছে আর একটা হাঁক। মৃতের কানে পুণ্য নাম প্রবেশ করানোর অবিরাম ব্যর্থ চেষ্টা। মৃতের কানে না ঢুকলেও নেকড়ের কানে ঢোকে!

নেকড়ে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। অর্থাৎ রাত্রে আবার জ্বালা। অবশ্য তাতে নেকড়ের কি অসুবিধে তা বোঝা মুস্কিল। কারণ সে দু' একবার চীৎকার করে অর্ধবৃত্তাকার ল্যাজের কাছে মুখ এনে শুয়েই থাকে। অবশ্য তাতে মনিব-সঙ্গ থেকে একটু বঞ্চিত থাকতে হয়। হয়তো সেই বিরহই তার চীৎকারের কারণ। শ্মশানে ঢোকবার মুখেই ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে তার প্রিয় জায়গাটি থেকে না নড়েই চীৎকার চালায় নেকড়ে।

শ্মশানের একেবারে সামনে এসে গেছে দলটা। একপাশে একটা ভাঙা গোছের শিব মন্দির, অন্যপাশে একটা বট গাছ। মধ্যেখানের রুক্ষ পথটা থেকেই শ্মশান-সীমানা সুরু। ধুলোমাখা পথটাও শ্মশান-সম্পত্তি।

এখানেও একটা হাঁক দিল দলটা: 'বল হরি হরি বোল।'

শিবমন্দিরের রক আর বটমূলের বাঁধানো চাতালটায় মোটাকতক বাউণ্ডুলে আর সন্ন্যাসী থাকে। দু' চারজন এসে বারে পাকা বাসিন্দা। কয়েকজন মাঝে মাঝে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যারা ঘুমিয়ে ছিল হাঁক শুনে তারা একটু নড়া-চড়া করে আবার অনড় হয়ে গেল। কিন্তু জন দুয়েক ছাই-মাখা লেংটি-পরা জটাধারী সামনে একটা ত্রিশূল পুঁতে চোখ বুঁজে পদ্মাসনে টান হয়ে বসেছিল, তারা নির্বিকারভাবেই বসে রইল। নয়নতারাদের পাড়ার দু'চারটে কৌতূহলী ছেলে অনেক দিন ওদের গায়ের ওপরে ডেঁয়ো পিপড়ে ছেড়ে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছে। তাতে কোন কোন সন্ন্যাসী অধ্যাত্ম-অস্ত্র ত্রিশূলটা নিয়ে প্রলয়-নৃত্যের ছোটখাট একটা মহড়া দিয়েছে আর মুখ দিয়ে মন্ত্রাত্মক এমন সব শব্দ উচ্চারণ করেছে যা সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীরাই মাত্র পারে। দু'একজন অবশ্য ডেঁয়োতে নড়ে নি। হরিধ্বনি [illegible]

দলটা সরু ধুলো-মাখা রাস্তাটায় ঢুকে গেল। রাস্তাটা একটু গিয়ে ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে একেবারে গঙ্গার মধ্যে। নিচের দিকটা ধুলো নয়, কাদা। নিচের দিকের খানিকটা অংশ বাঁধানোও। কিন্তু কালের প্রকোপে ভাঙা।

রাস্তাটার বাঁ দিক খাড়াই বাঁধানো। আর তার পরে গঙ্গার পলি-শয্যা। ঐ দিকেই খানিকটা দূরে পলিশয্যা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দুটো জড়াজড়ি করা অশ্বত্থ গাছের আশ্রয়ে বোসেদের ঘাট—পুরানো, ভাঙা-ভাঙা স্যাঁতলা ধরা, শ্রীহীন। নয়নতারাদের পাড়ার লোকেরা এই ঘাটেই স্নান করে।

রাস্তাটার ডান দিকে নিচু একটা পাঁচিল বরাবর গঙ্গা অবধি প্রায় এগিয়ে গেছে। পাঁচিলটার নানা জায়গায় ইঁট খসে, ফলে অনেক ফোকর। সেই ফোকর দিয়ে বাইরে থেকেই ভেতরকার চিতা নজরে পড়ে। পাঁচিলের মাথা কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। নোনা-ধরা দেহ থেকে সব সময়ই ইঁট-গুঁড়ো ঝরে। এই দেওয়ালেরই একটা যায়গা হঠাৎ ডুঁকি-ওটাই শ্মশানের প্রবেশ-পথ।

এই দেওয়াল ঘেঁসেই নেকড়ের শোবার যায়গা, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় সে আরো কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

করালী ডোম একটা চিতার কাজ সদ্য সেরে ছোট কলকের নেশায় টান দিচ্ছিল। এত রাতে আবার হাঙ্গামা জুটল বলেই সে ক্ষুব্ধ ছিল, তার ওপর ব্যাটাদের হরিধ্বনিটা এত উচ্চ ও উৎকট যে তার নেশাটা বার বার বড় চোট খাচ্ছিল। সুতরাং সে নেকড়েকে উদ্দেশ করে বলল, 'হেই শালা চুপ যা।'

প্রভুভক্ত নেকড়ে উচ্চকণ্ঠ নামিয়ে গলার মধ্যে চাপা ক্ষোভের ঘড়-ঘড় শব্দ করে। তারপর সেটাও থামিয়ে শুয়ে পড়ে।

মড়া নামালো দলটা। একটা বুড়ী—ঠিক কালেই মরেছে বলে কান্নাকাটি কম। তবু নিয়ম-রক্ষা হিসেবে দু'একজন স্ত্রীলোক সুরে শীর্ণ কান্না কাঁদছে। দম ফুরিয়ে এসেছে—প্রায় থামি-থামি করছে।

করালী জিজ্ঞেস করল, 'কোতায় তে' বাবু?'

'নাটাগড়।'

ওপাশের কোণের দিকে অন্ধকার একটা অতি ক্ষুদে ঘর। একটা দরজা, একটা জানালা, ফলে ভেতরটা অসহ্য গরম। তাই ঘাটবাবু বসেন ঘরের সামনের ছোট ঢাকা বারান্দাটায়। চিতার চুল্লী থেকে একটু দূরে বলে আগুনের হলকা লাগে না বিশেষ, কিন্তু গঙ্গার ধারের হাওয়াটা মেলে।

সেই বারান্দাটার একটা কোণ বরাবর এসে দাঁড়াল করালী। বলল, 'নাটাগড়ে খুব লোক মরচে।'

ঘাটবাবু করালীর দিকে তাকাল না। দূরে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে যেমন বিড়ি ফুঁকছিল, তেমনি ফুঁকতে লাগল। ধোঁয়াটা ছাড়তে ছাড়তে নির্বিকারভাবে বলল, 'নাটাগড়ে ওলাউঠা হয়েচে।'

থলথলে চেহারা ঘাটবাবুর। মিশ্‌কালো গায়ের রং। সব ব্যাপারেই এক ধরণের নিরাসক্তি লোকটার। একমাত্র আসক্তি বিড়িতে। বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি খায় লোকটা।

রুটিন-বাঁধা কাজ একে একে হয়ে চলল। আগে ঘাট-বাবুর কাজ, পরে করালীর।

কাজ শেষ হতে রাত অনেক হোলো। ঐ রাতেই গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে নিল করালী। এটা ঠিক ওর সংস্কার নয়, চিতার আগুনের গরমটা কাটাবার চেষ্টা। এই সময়টায় নেকড়েও জেগে ওঠে। স্নানের সময় জলের কাছ বরাবর একটা পৈঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, প্রভুর স্নান মন দিয়ে দেখে।

নেকড়ের পিঠে গোটা দুই বড় গোছের থাবড়া মেরে আদরও করে করালী। নেকড়েও দেহটা সংকুচিত করে কুঁ-কুঁ শব্দ মারফৎ আদরটাকে সানন্দে গ্রহণ করে।

তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করল করালী। নেকড়ে হেঁটে ঐ লম্বা পা-র সঙ্গে তাল রাখতে পারে না, তাই প্রায় ছোটে।

রাতের চলমান করালীকে দেখলে আচমকা একটু ভয়ই লাগতে পারে। করাল-দর্শন সে বটেই। ছ'ফুটের ওপর লম্বা। মাথার চুলগুলো তেলহীন, রুক্ষ, ছাই আর ধুলো মাখা; কাঁপা-কোলা এক ঝুড়ি চুল যেন তার মাথায় বসানো। তাতে তার দৈর্ঘ্য আরো কয়েক ইঞ্চি বেড়ে যায়, আর মুণ্ডুটার পরিধিও দেখায় প্রকাণ্ড। চোখদুটো লাল আর ছোট, বড় মাথায় বসানো বলে, বোধহয় আরো বেশী ছোট দেখায়। চোখের ভুরুর চুলগুলো আগুনের তাতে ঝরে যাওয়া গোছের। এটা শুধু চোখের চুলে নয়, হাত পা ও বুকের লোমের বেশীর ভাগেরই ডগা পুড়ে খোঁচা-খোঁচা খড়খড়ে হয়ে গেছে। ঐ কদম উদ্ধত লোমগুলো

তীরের মত বিঁধে থাকে খুব কালো রঙের দেহটার ওপর। এক তাল জমাট অন্ধকারের মত চেহারাটার যায়গায় যায়গায় পেশল স্ফীতি শক্তিমান কাঠিন্যে চাপ বেঁধে আছে। পেশী-গুলো এমন তীক্ষ্ণভাবে সংহত ও আকৃতি সম্পন্ন যে মনে হয় না ওগুলো দেহের অঙ্গাঙ্গী অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়, কতগুলো আলাদা মাংসপিণ্ডকে কালো চামড়ার মধ্যে কে যেন বেঁধে দিয়েছে। দেহের সঙ্গে মিশে নেই, যেন ঠেলে উঠে আলাদা হয়ে গেছে, চামড়ার ঢাকাটা খুলে গেলেই বেরিয়ে দেহ ছেড়ে গড়িয়ে যাবে।

তার হাতে থাকে নিজের চাইতেও লম্বা একটা লাঠি। শক্ত বাঁশের। এটা তার নিত্য সঙ্গী। আর নিত্য সঙ্গী ঐ নেকড়ে। সে পায়ে পায়ে আছেই। এই দুই সঙ্গী নিয়ে যখন করালী রাস্তার পথে চলে তখন নয়নতারাদের পাড়ার ছেলেরা বেশ ভয়ই পায়, দূরে দূরে থাকে। সেই অতি-দুর্ধর্ষ ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে নেকড়েকে ইঁট ছোঁড়ে অথবা শুধু দু'একবার চিৎকার করে, 'যমরাজ-হেই যমরাজ, যমরাজ যাচ্ছে।'

যমরাজ নামটা করালীকে কে দিয়েছে, ঐ ক্ষুদে সেনা-বাহিনী না তাদের মায়েরা তা কেউ জানে না।

যে রাস্তা দিয়ে খানিক আগে শবযাত্রীর দল শ্মশানে এসেছিল, সেই রাস্তাটা ধরেই হাঁটছিল করালী। বেশী হাঁটল না। নয়নতারার ঘরের সামনে এল সে। নয়ন-তারা দরজার ঠেস দিয়ে বসে ছিল, বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল অথবা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়েই বসে পড়েছে।

'আকুনও ডেঁইড়ো রইচিস্।'

ধড়মড় করে উঠল নয়নতারা। বলল: 'ডেঁইড়ো আর আচি কই গো। ক্যামন দিব্যি বসে বসে ঘুমুচ্ছিলুম।'

'গে, আর বসে বসে কিমোতে হবে না। চল্ ভেতরে।'

নয়নতারা সশব্দে একটি মস্ত বড় হাই তুলল: 'নাও চল।'

যা এক ঘাটের মড়া রেতের বেলা এসে জুটল, আসতেই পারি না।' বলল করালী।

'হ্যাঁ, শুনিচি। এই এখেন দিয়েই তো গেল। তাও তাড়াতাড়ি এয়েচ।'

'হ্যাঁ। হাত-পাগুলো ভেঙে ছোট করে দিলুম।'

'বড়ার লোকেরা কিছু বললে না?'

'বলবে কি! ওরাই তো চাইছেল টপটপ মেরে ফেলতে। বুড়ীর সাত কুলে কেউ নেই। পাড়ার লোক পোড়াতে নিয়ে এয়েছিল।'

'লোকগুলো কি বললে?'

'বললে—হ্যাঁ হে বাপু ভেঙে-টেঙে তাড়াতাড়ি শেষ করে দাও। আমি বলি—আমারও ভালই হোল।'

'আপনা লোক থাকলে কত্তে দিত না, না?'

'তাই কখনও দেয়!'

নয়নতারা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারও সাত কুলে কেউ নেই। একটা মাসী বেড়াল ছাড়া। আর জুটেছে শেষ বেলায় এই মানুষটা করালী। তার মৃত্যুর পর তার কপালে কি আছে কে জানে! করালী না দেখলে হয়তো টেনে কেউ ডাগাড়ে ফেলে দেবে।

নয়ন জিজ্ঞেস করল, 'মুখে আগুন দিলে কে?

'কে এক বোনপো না ভাইপো। লে, চল ভেতরে।'

'চলব তো। কিন্তু ঐ যে তোমার হিস্যেটি পুষ্যিপুত্তুর—ও কি ছাড়বে তোমায়?'

ঐ বিশেষণটা নেকড়ের। নেকড়ে এতক্ষণ ওদের দিকে ঘাড় তুলে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ল্যাজ ও মুখ নাড়ছিল। ওরা দুজনেই ওর দিকে তাকাতে ও যেন বুঝল যে প্রসঙ্গটা ওকে নিয়েই। একটু ঘেউ ঘেউ করল নয়নতারার দিকে তাকিয়ে। নয়নকে ও দেখতে পারে না।

নয়নতারা বলে, 'নাও, ঐ সুরু হোলো থাম্ মুখপোড়া।'

করালীকে ঘরে ঢুকিয়ে নয়ন দিলে দরজা বন্ধ করে। নেকড়ে দু' একবার ঘড়-ঘড় করে ফিরে গেল তার শ্মশান-শয্যায়।

ঘরের ভেতরে অন্ধকার। ছোট মাটির ঘর। এমনি ঘর এখানে অনেকগুলো। এই ঘরগুলোকে নিয়েই পাড়াটা।

করালীর প্রকাণ্ড বুকটায় হাত বোলাতে তীক্ষ্ণ একটা সুখ পায় নয়নতারা। বিশাল পেশল ব্যাপ্তি, কঠিন ভিজের প্রসারিত আধার। সারা বুকটায় লোমগুলো পুড়ে

খাটো ; সেই কাঁটার মতমতে শব্দের হাত গলে নয়ন, গাল ঘসে। আর মৃদু ধরণের খোঁচায় খোঁচায় তার আদুরে একটা ধারালো শিহরণ বাজে।

নয়ন ডাকে, 'যমরাজ।'

'উঁ।'

'চিতের আগুনে তোমার বুকটা পুড়ে গেচে।'

'বুকটা।'

'হ্যাঁ, বুকের বাইরেটা। এই লোমগুলো।'

হঠাৎ প্রশ্ন করল নয়নতারা, 'আচ্ছা, মড়ায় তোমার ভয় করে না ?'

হাসল করালী।

'ভয় কিসের ? মড়া তো।'

'মড়া বলেই তো ভয় নেই। জ্যান্ত হলে একটা কত্তা ছেল।'

'আমার বাপু মড়ায় কেমন ভয় করে।'

'তা করলেই বা। তোকে তো আর মড়া পোড়াতে হবে না।'

একটু বাদে আবার নয়ন বলে, এই বুড়ীর মাথার খুলিটা পিটো পিটো ভাঙলে তুমি ?'

'হুঁ। ভাঙতেই তো হয়।'

'মায়া হয় না ?'

হাসল করালী : 'মায়া ! কেন।'

'আমার তো ভাবলেই গা কেমন করো ওঠে।'

'ও তো মড়া। জ্যান্ত হলেও তা কত্তা ছেল।'

'হুঁ জ্যান্ত হলেই কত। কুকুরগুলোর মাথায় লাঠি মেরো যখন ঘিলু চল্‌কে যাও'—

'সে তো কুকুর।'

'তোমার কাছে মানুষ কুকুর সব সমান। ঐ যে কুকুরটা —তোমার পেয়ারের পুষ্যিপুত্তুর—ওকে তুমি আমার চে' বেশি ভাল বাসো না ?'

'যাচ্ছলে', হাসল করালী। 'হেই নয়ান, তুই না বেকড়েকে বলিস হিংসুটি।'

'বলি, বলি, হাজারবার বলব।' ছোট খুকীর মত করে বলল নয়ন।

সত্যি করালীর সান্নিধ্যে নয়ন তার পুরোনো বয়সটাকে যেন এক এক সময় ফিরে পায়। করালীর বয়স কত তা ওর চেহারা দেখে ধারণা করা যায় না। কিন্তু প্রবল শক্তি যেন দানা বেঁধে আছে ওর পেশীগুলোতে। আদিম ও দুর্ধর্ষ দেখায় ওকে। নয়নতারার বয়স সাঁইত্রিশ। খুব বেশী নয়। কিন্তু কৈশোর থেকে সে যে পেশার অধীন, তার খেসারৎ গুণছে এখন রোগজীর্ণতায়। তার পসারও গিয়েছে মজে। অনশন অর্ধাশন ছায়া ফেলেছে। বয়সের কালে করালীকে সে কোন দিন ঘরে ঢুকতে দেয় নি। মড়া পোড়ানো ডোম, তার অত ভয়ংকর, আপত্তি ছিল স্বাভাবিক। সে-দিন চলে গেছে। এখন ঐ একটিই মাত্র লোক বলতে গেলে নয়নতারার। এখনও এক আধ দিন হঠাৎ নয়নতারার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে করালী দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়, এবং সরবে বা নীরবে কোন রকমে অভিযোগ করে না। আগেও এ রকম ঘটেছে, তাতে অভিযোগ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এখন তা নয়, এখন চাকা ঘুরে গেছে, তাও সে কিছু বলে না। কিছু মনে করে কিনা তাও ভাল করে বোঝে না নয়নতারা।

আসলে সে লোকটাকেই ভাল করে বোঝে না। কি যে চায় লোকটা আজকের তার কাছে। যেদিন দেবার ছিল সেদিন বিরূপতা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু দেয় নি। আজ দেবার নেই কিছু। তবু টাকা যখন নিজে এবং ঐ যখন একমাত্র খদ্দের-লক্ষ্মী সেই জন্যে নয়নতারা আগে আগে তার জীর্ণ দেহটার শুষ্ক খাতেই আবেদনের বান ডাকাবার চেষ্টা করত—মর্মান্তিক প্রচেষ্টায় করুণভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করত খুশী করতে। ঐ আদিম প্রবল লোকটা দেহটাকে পান করত ঠিকই—সাগ্রহেই করত। কিন্তু কতটা তৃপ্তি পেত তা বোঝা দুষ্কর। দুষ্কর বলেই নয়নতারার ভয় যেত না। তাই তার রোগ-যন্ত্রণা-কাতর বিগত-যৌবন দেহটাকে যথাসাধ্য নিংড়ে এই তুকার্ত মানুষটার মুখের সামনে মেলে ধরত। লোকটার তৃষ্ণা যে প্রচণ্ড এটা বুঝত নয়নতারা। তার দেহ অগ্নি-সান্নিধ্যে যেমন শুষ্ক ও তৃষার্ত-জিহ্ব, সারাটা ব্যক্তিত্বও তাই। লোকটাকে আজও নয়নতারা একটু একটু ভয় করে। যে লোকটা নিত্য মড়া পোড়ায়, আর মিউনিসিপালিটির আহ্বানে পাগলা কুকুরের মাথটা ঐ লম্বা লাঠির এক ঘায়ে অবলীলাক্রমে দু'ফালি করে দেয়, তাকে একটু ভয় না করে উপায় নেই। এই এখন তারা দুজন যখন এক ঘরে শুয়ে

আছে ওখন ভয় কম করে, কিন্তু বাইরে দেখলে তো কেমন অচেনাই মনে হয়।

আর মরণদশা পোড়ারমুখী নয়নতারার। এই বুড়ো বয়সে তার আবার ঐ লোকটারই ওপর আজকাল বেশ একটু টান হয়েছে। অন্নের একমাত্র দাতা বলে নয়, তার বাইরেই এ টানটুকু। তাছাড়া নয়নতারার এখন আবার মরণভয় ধরেছে, সেই আসন্ন-মৃত্যুর ছায়ার টানটা একটা বেদনা জাগিয়ে তোলে। নয়নতারা আজকাল একা-একা প্রায়ই কাঁদে। কৈশোরে কেঁদেছে—কারণে, অকারণে। তারপর কান্নাটা জীবনে প্রায় ছিলই না। আবার নতুন কান্না এসেছে এখন তার চোখে।

সে জানে, তার মরণে কারো কিছু এসে যাবে না। মাসী হয়তো ভাগাড়ে ফেলে দেবে। কাঁদবে না কেউ। ঐ মাসী বেড়ালটা দু'দিন হয়তো মেও-মেও করবে, তারপরে ভুলে যাবে।

হঠাৎ নয়নতারা জিজ্ঞেস করল, 'যমরাজ, মড়া দেখলে তোমার কষ্ট হয় না?'

'দূর!

'কেউ মরলে তোমার কান্না পায় না?'

'যে মরল সে মরল, আমি খামোকা কাঁদতে যাব কেন মাইরি!'

নয়নতারা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'চিতের আগুনে তোমার চোখের সব জল শুকো নিয়েচে।'

'হবে।'

'যমরাজ, আমি মরলে তুমি কাঁদবে?

হঠাৎ দরজার বাইরে নেকড়ে এসেছে বোঝা গেল তার মুখের কুঁই-কুঁই শব্দে। আর দরজাটাকে সামনের পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

ঘরের ভেতরে মুহূর্তের জন্যে দুজনেই একটু থমকে রইল।

তারপর করালী বলল, 'উঠি, নেকড়ে এয়েচে।'

কিন্তু নয়নতারা ওকে ছাড়ল না।

'হোলো কি?' বলল করালী।

কি হোলো, কি হয়, কি করে বোঝাবে নয়নতারা। করালী উঠে চলে গেলেই জগতে যে সে কত একা তা যেন হঠাৎ প্রকট হয়ে ওঠে তার কাছে। সেই শূন্যতাকে ভয় করে নয়তারা।

'কাঁদচিস?' জিজ্ঞেস করল করালী।

জবাব দিল না নয়নতারা। 'হ্যাঁরে নয়ান, কাঁদচিস কেন?'

নয়নতারা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এমনি।'

'চিতের আগুন আমার চোকের জল সব শুকো নিয়েচে, আর না গঙ্গা তোর চোক দুটোকে সব সময়ই ভিজো রেকেচে।'

কথাটা বোধ হয় শুনতেই পেল না নয়নতারা। হঠাৎ বলল, 'আমি মরে যাব, যমরাজ,—খুব শীগগিরই।'

'সে কি?'

'আমার যে মরণ ব্যামোয় ধরেচে।'

'ব্যামো তো চিকিচ্ছে করলেই যায়।'

'এ যাবার নয়। এ আমাকে সেই তবে যাবে।'

'চিকিচ্ছে—'

'এ সব খারাপ ব্যামো—চিকিচ্ছে নেই এর। থাকলেও হোতো না আমার—খরচের ব্যাপার—'

নেকড়ে দরজাটা আঁচড়েই চলেছে বাইরে থেকে।

'কোলকাতায় নেই এর চিকিচ্ছে?'

'তা থাকতে পারে, শোনায় শহর তো। একবার গিইচি কালীঘাটে—মার মন্দিরে। সে অনেক দিন হোলো—মাসীর সঙ্গে গিয়েলুম। আকুন কে নিয়ে যাবে এই ঘাটের মড়াকে!'

'কেন! আমি।'

'সত্যি তুমি সেই যাবে।'

করালী হেসে বললে, 'ঘাটের মড়া আর আমি ছাড়া কে নেবে?'

একটু চুপ করে রইল নয়নতারা—যেন কথাটাকে নিজের অনেক ভেতরে নিয়ে নিতে লাগল। তারপর বলল, 'তুমি বলেচ এই আমার অনেক ভাগ্যি যমরাজ। আমার যাওয়া হবে নি গো।'

'কেন রে নয়ান?'

'সে হবে নি। অত খরচা—'

'কোলকাতায় শুনিচি মিনি পয়সায় চিকিচ্ছে হয়। সব বড় বড় হাসপাতাল আছে।'

'হ্যাঁ, শুনিচি।'

কোলকাতারই আট-দশ মাইলের মধ্যে বাস করে এরা

কিন্তু মনের দিক থেকে কোলকাতা এদের কাছে অনেক দূর।

নেকড়ে কেঁউ-কেঁউ করছিল বাইরে।

বেরোল করালী। বলল, 'কিরে চেল্লাচ্ছিস কেন? চ।'

নেকড়ে চলল শ্মশানের দিকে। করালীর অগ্রদূত হয়ে।

শ্মশানে একটি শবযাত্রীর দল এসেছে একটি শিশু নিয়ে। শিশুশবযাত্রায় এ অঞ্চলে হরিধ্বনি দেওয়ার বিশেষ রেওয়াজ নেই। নইলে নয়নতারার ঘর থেকেই করালী এদের আগমন সংবাদ পেত।

মৃত শিশুটির মা কাঁদছে। রোগজীর্ণ শীর্ণ চেহারা মা-র—অনেকটা নয়নতারার মত।

করালী বলল, 'এত একেবারে বাচ্ছা। একে পুড়ো কি হবে, ঘাটবাবু! পুঁতে দিন।'

ঘাটবাবু গঙ্গার ওপারে তাকিয়ে আস্তে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল।

এ অঞ্চলে শিশুর দেহ দাহ করে না বড় একটা। রেওয়াজ নেই। গঙ্গার ধারে পুঁতে দেয়।

এ ক্ষেত্রেও তাই হোলো। করালীর ছুটিও হোলো তাড়াতাড়ি। লম্বা লাঠিটা হাতে বড় বড় পা ফেলে এল চায়ের দোকানে। সঙ্গে নেকড়ে আছে। দোকানের ভেতরে ঢোকে না করালী। হাতে থাকে একটা টিনের মগ। সেইটেতে চা ঢেলে দেয় দোকানী। বাইরে রাস্তার ওপর বসে খায় করালী। নেকড়েও তার ভাগ পায়—চা-র সঙ্গে লেড়ো বিস্কুটটার।

করালী বেরিয়ে পড়ল। চলে গেল কোলকাতায়। ঘটনাটা আশ্চর্যের, সে এ অঞ্চল ছেড়ে বাইরে যায় নি কোন দিন। যুদ্ধের সময় তার সহকর্মী হারু ডোম যখন যুদ্ধে গেল, তখন করালীরও একবার যাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি যায় নি সে। লোকে বলে 'নেকড়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে যায় নি।' কারণ যাই হোক, ঘটনাটা সত্যি।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে বছর খানেক। হারু ডোম এখন বড় চাকরী করে। সায়েব সেজে দু'একবার গাঁয়ে পদধূলি দিয়ে গেছে, এক এককালীন-বন্ধু করালীর শ্মশানে পড়ে থাকার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে। হারু ডোমের সাহেব-সুবার মত পোষাক দেখে করালীও এক আধ সময় ভেবেছে, গেলেই হোত। আর তখন তো নয়নতারার দরজা তার মুখের ওপর বন্ধই ছিল। কিন্তু মড়া পুড়িয়ে আর কুকুর মেরে সে ওখানেই দিন কাটাতে লাগল—নড়া-চড়া করতে পারল না।

সেই লোকটা হঠাৎ নড়ল। আর নড়বি তো নড়, একেবারে কোলকাতা।

নয়নতারার জন্ম বয়সে কর্ম—একবার কালীঘাট-দর্শন। তারও ভয় করছিল। কেঁদে বলেছিল, 'মাসী, আমি আর বোধহয় ফিরবনি গো।'

'সে কি কতা!'

'হ্যাঁ, আমার পরানটা যে কেমন কচ্ছে!'

'কিছু না, ব্যামো হয় না কার। সেরে যাবে।'

'আর সারতে চাই না গো মাসী।'

সত্যি নয়নতারা মরতে চাইছিল। বয়সে বুড়ী হলেও ইদানীং তার মধ্যে একটা ছেলেমানুষীর ছোঁয়াচ লেগেছে। তার মনে হচ্ছিল, এই তার চরম সুখের সময় যাচ্ছে। আর সব মেয়েই চরম সুখের সময়ে মরতে চায়। নয়নতারা চাইছিল আরো বেশী করে, কারণ তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অন্ধকার।

মাসী বেড়ালটাকে যাওয়ার সময় অনেকক্ষণ ধরে আদর করল। কিন্তু ওকে নিয়ে যাওয়া চলে না। নেকড়ে শুধু ওদের সঙ্গে ষ্টেশন অবধি গিয়েছিল। এর আগে নেকড়ে কোন-দিন এত দূর আসে নি। যাত্রাগাটাও কোনদিন দেখে নি। মস্ত বড় একটা বক—প্রকাণ্ড বড়, নেকড়ে তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দেখতেই পায় না। সেখানে কত লোকজন, হৈ-হট্টগোল। লোকরা সবাই অপরিচিত আর অজানা লোক হলেই নেকড়ে তাদের একটু সন্দেহ ও ভয়ের চোখে দেখে। সুতরাং এখানে তার বেশ অস্বস্তিই লাগ-ছিল।তাছাড়া এখানকার শব্দগুলোও অজানা। অতি উচ্চ এবং উৎকট। শুনলেই আঁতকে উঠতে হয়। এমন বিটকেল যায়গায় মানুষের মত উদ্ভট প্রাণীরাই থাকতে পারে। একটা মস্ত বড় জন্তু—কত বড় তা নেকড়ে ভাল করে বুঝতেই পারল না—প্রকাণ্ড মুখ, কালো রং, তার ডাক শুনলে মৃত্যুভয় জাগে, আর কি জোর ছোটে, সেই জন্তুটা এসে দাঁড়াল মস্ত বড় বকটা ঘেঁসে। জন্তুটার পেটের মধ্যে

ছোট ছোট গর্ত, তারই একটা গর্ত দিয়ে জন্তুটার পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেল করালী আর নয়নতারা। নেকড়ে জন্তুটা থেকে খানিকটা দূরে ভীত ও বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জন্তুটা ওদের নিয়ে বিপুল চীৎকার করে ছুটে চলে গেল। নেকড়ে ভয় পাচ্ছিল, এবং ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিল না। ওর চোখের সামনেই যখন জন্তুটা ওদের নিয়ে চলতে সুরু করল ক্রমে দূরে তার লাজটাও মিলিয়ে গেল, তখন ভয়টা আরো বাড়ল। তখনও আশা ছিল যে ওরা ফিরবে, অনেকক্ষণ সে ঐ বাঁধানো রকটায় এধার ওধার করে বেড়ালো, কিন্তু ওরা আর ফিরল না তখন সে ভাবল যে অন্যপথে হয়তো ওরা শ্মশানে পৌঁছে গেছে। ফিরে এল সে-ও। কিন্তু শ্মশান অঞ্চলের কোথাও ওরা নেই। ফেরে নি ওরা।

অনেকদিন হয়ে গেল ফিরল না ওরা। নেকড়ে একেবারে অনাথ হয়ে গেল! খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আগে করালীর সঙ্গে ঘুরলেই খাবার জুটে যেত। অবশ্য তা সত্ত্বেও সে রুচিকর আহার্যের সন্ধানে আস্তাকুঁড়ে যেত। কিন্তু সেটা নেহাৎই সৌখীন কারণে। প্রয়োজন মিটিয়ে দিত করালীই। প্রভুর ঘন্টাতিনেক রাস্তার কুকুরদের সমাজে তার একটা আভিজাত্য ছিল। সে ওদের সঙ্গে বড় একটা মিশতেই চাইত না। যখন মিশতও, উঁচুদরের প্রাণী সে একথাটা ভুলত না। এখন ঐ রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় খাদ্যের সন্ধানে।

বোসপাড়ার সেই কুৎসিত-দর্শন ঘেয়ো কালো কান-কোলা কুকুরটার রাগ তার ওপর বহুদিনের। আর সাহসও খুব ছোটলোকটার। করালীর সঙ্গে নেকড়ের চলবার সময়ও গলার মধ্যে ক্রোধাত্মক ঘড়-ঘড় শব্দ করত। অতএব এখন তো সামনে পেলেই আক্রমণ করে। অভদ্রের মত ব্যবহার, ছোটলোকের মত গায়ের জোর। তবু ভাগ্যিস নেকড়ে একটু ভদ্রলোকের মত দৌড়তে পারে। নইলে এতদিন ওর হাত থেকে নিস্তার ছিল না।

বোসপাড়ার শুধু ঐ ঘেয়ো কুকুরটাই শুধু নয়, দুনিয়ার যেখানে যত শত্রু তিমিত হয়েছিল করালীর উপস্থিতিতে, তারা সবাই যেন ফণা ধরে উঠল। নয়নতারাদের পাড়ার এক ঝাঁক কুঁচো কুঁচো ছেলে আছে। তারা দুর্ধর্ষ। আশ-পাশের লোক তাদের ভয় করে সন্ত্রস্ত থাকে। হাতে কোন কাজ না থাকলে এই দলটাই শ্মশানের সন্ন্যাসীর গায় পিঁপড়ে ছেড়ে সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করে। অথবা গঙ্গার পলি-ঢালা তীর ধরে এলোমেলো ছোটাছুটি করে, অনেক সময় ঐ পলি ছেঁচে ডাহুঁড়িও করে, নয়তো নেমে জলের ধারে তেচোকো মাছ ধরবার দুঃসাধ্য সাধনায় ব্যর্থ হয়ে মুখ খারাপ করে গাল পাড়ে। এই দলটার কী এক অপ্রয়োজনের আনন্দ আছে, এরা রাস্তায় কুকুর দেখলেই ইঁট মারে অথচ নেকড়ে হলক করে বলতে পারে কুকুররা কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে একবার ঘেউ-ও করে নি। এতদিন করালীর সান্নিধ্য-হেতু নেকড়ে এদের হাত প্রায়ই এড়িয়ে গেছে। এখন যেন ওর সেই পাওনা সুদে-আসলে উসুল করতে সুরু করল। আর দৌড়েও পার পাবার উপায় নেই, কারণ ওদের ইঁট দ্রুততর।

যে দোকানে করালী চা খেত সেই দোকানের একটা ছোকরারাও একটি অকারণের আনন্দ আছে, নেকড়েকে কাছাকাছি পেলেই তার গায়ে কিঞ্চিৎ গরম জল ঢেলে দেবে। রুটি ইত্যাদির এক-আধটা টুকরোর সন্ধানে নেকড়েকে যেতেই হয়, আর চা-ওয়ালার দোকানে গরম জল সবসময়ই মজুত থাকে।

এসব দুঃখ-ধান্দা তো আছেই। তার ওপর ইদানীং আবার করালীর জায়গায় একটা নতুন লোক শ্মশানে কাজ করছে। এ ব্যাপারটা দেখতেই নেকড়ের খারাপ লাগে। তাছাড়া লোকটা নেকড়ের ওপর বিশেষ প্রসন্ন নয়, তার শোবার জায়গাটাতেও নিরাপত্তার অভাব ঘটেছে।

কুঁচো ছেলেগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে নেকড়ে অনেকবার গিয়েছে নয়নতারাদের ঘেঁষ-ঘেঁষ-চালাঘরের ওপাটে। বিপদের ঝুঁকি নিয়েই গিয়েছে। আশা, যদি দুয়ের কারুরও হদিশ মেলে।

বোসদের অতি-বৃদ্ধ ঘাটের রানায় অশ্বত্থের ছায়ায় শুয়ে সে অনেকগুলো প্রহর কাটায়। এই ঘাটে নয়নতারা স্নান করতে আসত।

শ্মশানের আশপাশ বাজার, চালপট্টি, গ্রামের রাস্তা এসব জায়গায় সে প্রতিনিয়ত প্রত্যাশা করেছে যে হঠাৎ আচমকা করালীকে দেখে সে চমকে উঠবে, আর সঙ্গে

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে তার কোলের মধ্যে ঢুকে পরিচিত প্রিয় দেহ-গন্ধের ঘ্রাণ নেবে।

আর মাঝে-মাঝে যখেষ্ট ভয়ে ভয়ে গিয়েছে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূরের বিদঘুটে যায়গাটায়, যেখানে প্রকাণ্ড একটা রুক্ষ শক্ত একখানা গঙ্গার মত পড়ে আছে; যার পাশ দিয়ে বীভৎস জন্তুরা উৎকট ডাক ছেড়ে ছোটাছুটি করে, এইখান থেকেই করালী উদাও হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কোথাও দেখা মেলে না করালীর। বা নয়ন-তারার। কি যে হোলো লোক দুটোর! মরে গেল নাকি! কিন্তু মরলেও তো আসত এই শ্মশানে।

কতদিন যে হয়ে গেল! হিসেব নেই নেকড়ের।

তারপর একদিন সত্যি করালী ফিরল। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে করালীর! নেকড়ের চোখই তাকে প্রথমটা চিনতে পারে নি। করালীকে দেখতে হয়েছে একটা পাগলের মত। প্রথমেই নজরে পড়ে তার এক মুখ দাড়ি। চুলের প্রাচুর্য তার ছিলই। এখন মুণ্ডুটার ওপর-নিচে চুলের ঝাড়—তেল-জল-হীন ময়লায় আটালো মুখের রেখায় রেখায় ময়লার শিরা-উপশিরা। চোখের চাউনি শূন্য, বিভ্রান্ত। নেকড়ে ছুটে গেলেও সে চাউনিতে চেনা-র সুর বাজল না। রূঢ়ভাবে নেকড়েকে সরিয়ে দিয়ে করালী চলে গেল। বিমূঢ় ভাবটা কাটলে নেকড়ের চোখে জল এল। আর মনে হোলো, করালীর গায়ের গন্ধটাও পালটে গেছে। নিষ্ফল ক্রোধে আর ব্যর্থ প্রতিবাদে সে একবার চীৎকার করল—ঘেউ। শব্দটা ভাঙা-ভাঙা গলায় ককিয়ে উঠল। আধখানা বেরোল গলা দিয়ে আধখানা স্বর ভেঙে বসে গেল। করালী কিন্তু থামল না। লম্বা লাঠি আর লম্বা দুটো পায়ে ভিন পেয়ে হিংস্র একটা জন্তুর মত পথটা পেরিয়ে গেল। আর নেকড়ের মনে হোলো তার বাঁ পায়ে বোস পাড়ার ঘেরো কানঝোলা কুকুরটা একদিন অতর্কিতে কামড়ে যে ঘা-টা করে দিয়েছিল সেই ঘা-টায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। করালী যাবার পর এটুলী পোকা ধরেছিল কানে, মাথায়, লোমের গোড়ায়, তাদের রক্তচোষা টান যেন হঠাৎ জোরালো লাগল।

নেকড়ে কাৎরে ডাকল, 'কেঁউ-উ-উ।'

করালী শুনতে পেল না।

তবু ভাল, করালী ফিরেছে তো। মেজাজ আজ খারাপ আছে, কাল ঠিক হয়ে যাবে। ভাবল নেকড়ে। এসেছে করালী এই তো সান্ত্বনা আরও একটা ভাল ব্যাপার—সঙ্গে ফেরেনি সেই মেয়ে-লোকটা—নয়নতারা।

করালীর একটা পেশা ছিল কুকুর মারা। মূল পেশা নয়, উপপেশা। ডোমের উপরি চাকরি। মুনিসিপালে এলাকার মধ্যে কোন কুকুর পাগল হলে করালীর ডাক পড়ত। পাগলা কুকুরটাকে মারলে পেত চার আনা পয়সা। অনেক সময় করালী রাস্তার ভাল কুকুরও মেরে ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে চেয়ারম্যানের অফিসে দেখাতে। পয়সা নিয়ে আবার সেটা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছে।

কুকুর মারাতে সে সিদ্ধহস্ত। ঝোপের আড়ালে লাঠি নিয়ে বসে থাকে। চোখ দুটো হয় হিংস্র, প্রখর। অনেক সময় নেকড়েও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে · সে পাগলা কুকুরের সঙ্গে খেলে তাকে নিয়ে আসতে পারত করালীর লাঠির সীমানায়। আর তখন লাঠিটা ঐ চোখের মত হিংস্র হয়ে আছড়ে পড়ত কুকুরটার মাথায়। এক বাড়িতেই রাস্তার ধিসু-মাখামাখি হয়ে যেত। একটা আর্তনাদ করতে পারত বড় জোর। তারপর থেঁতলানো মাথাটা নিয়ে কয়েকবার ছটফট করে কেঁপে কেঁপে নিথর হয়ে যেত।

এই সময়টা করালীর চোখ দুটো হয়ে যেত অদ্ভুত রকমের। তীব্র এক হিংস্রতা গণগণ করত তপ্ত-লাল কয়লার মত—সে-চোখের একটা আঁচ ছিল। তাছাড়া ঐ চোখ যেন আর কিছু দেখতে পেত না। আলাদা এক জগতের আলাদা এক মানুষ যেন সে তখন। নয়নতারা কোন দিন দেখে নি সে চোখ, নেকড়ে দেখেছে। কিন্তু এই হিংস্র চোখের স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ ছিল না। কাজ শেষ হলে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে যেত।

কিন্তু এখন তা নয়। এখন সেই চাউনি যেন সারাক্ষণই করালীর চোখে লেপটে আছে। নেকড়ে ভয়ে ভয়ে আরও দু' একবার করালীর কাছ ঘেঁসে এসেছে, করালী পাত্তা দেয় নি। ভয় করেছে নেকড়ের ঐ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে। তার বোবা ধরণের মনের অন্ধকারেও সংস্কার যেন তাকে সাবধান করেছে। মনে হয়েছে, এখুনি এ চোখের হিংস্রতা আর নির্দিষ্টতা উদ্ভত একটা নয়ন

লাঠির আকারে তার কপালের ওপর লেগে ঘিলু আর রক্ত দিয়ে রাস্তার ধুলো ভিজিয়ে দিতে পারে।

সুতরাং নেকড়ের ঘা বেড়েই চলল, এঁটুলী—বংশ বৃদ্ধি হয়ে চলল তার রক্তের মূল্যে, নয়নতারাদের পাড়ার ক্ষুদে শয়তানেরা ইট মারা বন্ধ করল না, ডোমপাড়ার কালো কুকুরটা সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে চলল, খাদ্য হল অনিশ্চিত। সারা গায়ে ঘা আর এঁটুলি নিয়ে মার খেয়ে চিৎকার করে বিরক্ত হয়ে রোগে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে রইল নেকড়ে।

বেঁচে রইল করালীও। আসার পর কিছুদিন যেন তার একটা ঘোরে কেটে গেল। গঙ্গার ধারে শূন্যদৃষ্টিতে বসে কাটাতে লাগল। যখন সে গিয়েছিল কোলকাতায়, তখন সদ্য গরম পড়েছে। বট-অশ্বত্থ গাছে কিছুদিন হোলো কচিপাতা এসেছে, আর গঙ্গা একটু ক্ষীণ। আর এখন পাতাগুলোর কচি লাবণ্য কমে পরিণত পাকা রং ধরেছে। গঙ্গার এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত। বর্ষা নেমেছে। গঙ্গার জল লালচে হয়েছে।

তারপর বর্ষার প্রকোপ কমল। করালীর একদিন যেন হঠাৎ একটু টনক নড়ল। সে এল শ্মশানে—চাকরী করতে, দেখল, একটা বেঁটে-খাটো যণ্ডা গোছের লোক তার যায়গায় একটা চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কীরকম একটা রাগ হোলো লোকটার ওপর। ইচ্ছা হোলো, লাঠিটা দিয়ে ওর মাথায় এক ঘা কুকুর-মারা বাড়ি মারে।

ঘাটবাবুকে বলল, 'এসব কি?'

ঘাটবাবু ওর দিকে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে নিজে একটা ধরাল। বলল, 'তুই চলে যাবার পর এই লোকটাকে রাখা হয়েছে।'

'শালার মাথাটা একদিন অন্ধকারে দো-চালা করে দোব।'

ঘাটবাবু অবিচলিতভাবে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'তুই একবার বরং চেয়ারম্যান বাবুর কাছে যা—গিয়ে বল।'

করালী বেরোচ্ছিল। ঘাটবাবু ডাকল, 'শোন্।'

'আঁ?' থামল করালী।

'শ্মশানের কি হয়েছে ব্যা?'

করালী সামনের জ্বলন্ত চিতার ওপর দিয়ে গঙ্গার ওপারে তাকাল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হচ্ছে ওপারের গাছগুলোর মাথায় মাথায়। ওপারে জ্বলে উঠেছে দুটো-একটা আলো। চিতার আগুনের হলকা লাগছে। কত দিন সে চিতার পাশে দাঁড়ায় না! নয়নতারার চিতার পাশে দাঁড়িয়েছিল, তারপর আর নয়। একটা আশ্চর্য ইচ্ছা হয়েছিল করালীর নয়নের চিতার পাশে দাঁড়িয়ে। আগুনের আবরণের মধ্যে দিয়ে সে তাকিয়েছিল নয়নতারার মুখটা দেখবার জন্য। তার মুখ আগেই কাঠে প্রায় চাপা ছিল, তারপর আগুন জ্বলল, ও তাকিয়েই রইল, যদি হেসে ওঠে মুখটা।

'হ্যাঁরে, শ্মশান ফিরল না কেন?'

করালী বেরিয়ে পড়ল!

চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে বিশেষ কিছু সুবিধে হোলো না। চেয়ারম্যান বললেন, 'তুই হুট করে চলে গেলি। এখানের কাজ চলে কি করে।'

'কাজে পড়ে গিসলুম, বাবু।'

'তা কি হবে। ও লোকটা এতদিন কাজ করছে।'

'দুজন করেই তো আগে থাকত। শিবে মরো গেল থেকে আমি একা।'

'ওসব এখুন হবে-টবে না। যা। আমার কাজ আছে।'

করালী মরিয়া হয়ে বলল, 'আমি তাহলে খাব কি!'

চেয়ারম্যান ততক্ষণ ঘরে ঢুকে গেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে করালীর সেই তপ্ত-অঙ্গার-চোখ ধপধপ করে উঠল। লম্বা লাঠিটা একটা কারো মাথা না ভাঙলে শান্তি পাচ্ছে না।

বেরিয়ে ঠিক করতে পারে না করালী কোথায় যাবে, কি করবে।

নয়নতারাদের পাড়ার আশপাশ দিয়ে ঘোরে সে অনেক সময়। কিংবা বোসেদের ভাঙা ঘাটে বসে থাকে। নয়নতারাদের পাড়ার মেয়েরা বা মাগী অনেক দূর থেকে দেখে—কাছে আসতে ভয় পায়—বলে 'লোকটা বেশ ছেল। কিন্তু—

'ছেল' কথাটায় কি রকম খটকা লাগে করালীর। ছিল, আজ তাহলে সে নেই। চিতাটায় উঠতে বাকি! আর ওরা অত দূরে দূরে থাকে কেন! কি রকম যেন ভয় পায় ওরা। তাকে দেখলে ওদের চোখে মুখে ভয়ের

একটা ছাপ পড়ে। পাগলা কুকুর দেখলে মানুষের যেমন হয়। মাসিকে সে একদিন বলতেও শুনেছে, 'আহা, নয়ানের ধমরাজটা কেমন পাগল-পাগল হয়ে গেল গা।'

ওরা ভয় পায়। দূরে থাকে। যেন সে কামড়ে দিতে পারে। তা কথাটা সত্যিও। কামড়ানোর ইচ্ছা তার না অবশ্য। কিন্তু লাঠিটা রক্ত-স্বাদ চায়। আর ওরাও হয়ত করালীকে পাগলা কুকুরের মত পিটিয়ে মেরে ফেলতে চায়। এক ধরণের পেটানো কিন্তু সুরু হয়ে গেছে। কেউ তাকে কাজ দিতে চায় না—বোধ হয় পাগল ভেবেই। এই পেটানোতেই মরবে সে। সেই সব কুকুরের কথা তার মনে হোলো, যারা ভাল পাগল নয়, তবু সে যাদের মেরেছিল। তাদের আর্তনাদের টুকরো টুকরো অংশ তার মনের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে বেড়াতে লাগল। কাটা মাথার ঘিলু আর রক্তের ভিজে ছোঁয়া মনকে বিষণ্ণ উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত করল।

নয়নতারা থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারত। 'আমার পাগল-পাগল লাগছে? ভয় পাচ্ছে তোর?'

সত্যি পাগল করে দিচ্ছে করালীকে নয়নতারাদের পাড়ার পিতৃপরিচয়হীন ছেলেগুলো। ইট মেরে মেরে নেকড়ের তো প্রাণ প্রায় বার বার করে দিয়েছে, এখন করালীকেও রেহাই দেয় না তারা! নেকড়েকে মেরে যখন করালীর কাছ থেকে কোন সাড়া পায় নি, তখনই ধরে নিয়েছে করালীর অথর্বতা। তাই ইটের টুকরো পড়তে লাগল করালীর গায়ে। ইঁটের সুবিধে আছে অনেক দূর থেকে আক্রমণ চালানো যায়। ইঁটের সঙ্গে চীৎকার ছুঁড়ে দেয় দল বেঁধে: 'হেই পাগলা ধমরাজ।'

একদিন করালী লাঠিটা উঁচিয়ে ছুটে গিয়েছিল। একটাকে আজ সাবড়ে দেবে। ছুটতে কষ্ট হয় তার আজকাল। তবু রাগের মাথায় বেশ ছুটল। ছেলেগুলো মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু একটা কুদে হাড় জিরেজিরে ছেলে ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল! একেবারে করালীর উঁচানো লাঠির তলায়। মুহূর্তে লাঠিটা তীব্র গতিতে নেমে রক্তের স্বাদ নিয়ে নিত, কিন্তু কি হোলো লাঠিটার, সেটা আস্তে নেমে এল। লাঠির মালিকের গলা শোনা গেল, 'শালা বেজন্মার বাচ্চা।'

মৃত্যুর আতঙ্ক ছেলেটার সারা মুখে লেপটে রয়েছে। এতক্ষণ কাঁদতে পর্যন্ত পারে নি, এইবার আর্ত কান্নার শব্দ শোনা গেল। ভয়ে জোরে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। চেপে চেপে কাঁদছে—যেন কেউ তার গলা টিপে ধরেছে।

করালী বলল, 'ভাগ শালা। ফের যদি ইঁট ছুঁড়বি তো মেরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দোব।'

করালীর মনে পড়ে গিয়েছিল—এই ছেলেটাকে নয়ন তারা খুব ভালবাসত। ওপাড়ার লোকেরা বলে ছেলেটা নাকি নয়নতারার কোন ভূতপূর্ব প্রেমিকের দান—নয়ন তারারই কোন প্রতিবেশিনীকে।

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল। ছেলেটার নাম গোবরা— সেটাও মনে পড়ল করালীর।

একদিন ঘাটবাবুকে বলল, 'ঐ শালাকে একদিন অন্ধকারে লাঠি হাঁকড়ে দি—'

ঐ শালা অর্থে নতুন ডোম।

ঘাটবাবু তার স্বাভাবিক ঔদাসিন্যে বলল, 'হাজতে যেতে চাস তো দে—'

'আমি তাহলে করব কি?' ঝাঁঝিয়ে উঠল করালী।

বিড়িতে লম্বা টান মারতে মারতে কী যেন ভাবল ঘাটবাবু। বলল, 'রং কলে লোক নিচ্ছে শুনছিলুম, গাপ দিনি একবার গিয়ে!'

'রং কল! সে আবার কোতা।'

'বড় রাস্তার ওধারে নতুন যে কলটা হয়েচে।'

'হুই সেই চোঙা ভুলেছে যত্ত?'

'হ্যাঁ, আর রাস্তা-ঘাটে কুকুরও তো আচে।'

কুকুরই মারতে হবে—চার আনা পয়সা ছাড়াও একটা নৃশংস কিছু করার ইচ্ছে তার। না খেতে পেয়ে কুকুর-মারা বিদ্যার শক্তি ও নৈপুণ্য কমে যাচ্ছে। তবু ভেতরে ভেতরে যে রাগটা জমছে অনেকদিন ধরে তার একটা মুক্তিপথ চাই। বেরুচ্ছিল সে।

ঘাটবাবু ডাকল: 'হারা, নয়ানের কি হোলো?

বোসপাড়ার ভাঙা ঘাটের দিকে তাকিয়ে করালী চুপ করে রইল।

'ওখানেই কোন বাবু টাবু পেয়ে গেলো নাকি?'

'ও মরণ-বাবুকে পেয়েচে।'

ঘাটবাবু যেন বিশ্বাস করতে পারতে পারলনা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মরে গেল!' তারপর করালীর

দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বোসপাড়ার ঘাটের দিকে চাইল : 'মাগীটা ছেল ভাল। ঘাটে চান করবার সময় দেকিচি তো।'

ঘাটবাবু অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে বিড়িতে একটা টান দিতে লাগল। করালী বেরিয়ে এল।

সেই দিনই করালী একটা রাস্তার কুকুরকে মেরে চার আনা পয়সা রোজগার করল। দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। এক ঘায়ে কুকুরটা মরে নি, কয়েক ঘা লেগেছে। তবু নৃশংস রক্তাক্ত কাজটা করতে তার ভাল লেগেছিল। কুকুরটা মৃত্যুকালীন চীৎকারও তার খারাপ লাগে নি। বরং প্রাণীটার কষ্টে তার এক ধরণের আনন্দ হচ্ছিল—যেন কারুর ওপর একটা প্রতিশোধ নেওয়া গেল। শুধু একেবারে শেষ সময়টায় যখন কুকুরটা ক্ষীণ কণ্ঠে কেঁদে মৃত্যুর একেবারে কাছে এসে পড়েছে, তখন তার সেই গলা-চাপা একঘেয়ে কান্না শুনে মনে পড়েছিল গোবরার কথা। গোবরা—নয়নতারার এক প্রেমিকের সন্তান।

পর দিন গেল রংকলে। ঘাটবাবু ঠিক খবরই দিয়েছিল। লোক নেবে। অনেক লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে গেটে! সবাই তাদের সবাইকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। কয়েকজন রয়েছে ওখানকারই আগেকার মজুর—দিন-মজুরীতে কিছুদিন কাজ করেছিল। তারা উচ্চকণ্ঠেই শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—এ চাকরী তাদের।

কার্যতও হোলো তাই। ওদেরই কয়েকজনকে নেওয়া হোলো। করালী বোসপাড়ার ভাঙ্গা ঘাটে ফিরে এল।

বর্ষা শেষ হোলো। গঙ্গার জল টান ধরেছে—যৌবনের উত্তেলতা কমছে। ঘাটের যে ভগ্নাংশগুলো জলে ডুবে থাকত প্রায়ই, তাদের কাদা-মাখা মুখটা আবার দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট ছোট কাঁকড়া দেখা দিয়েছে জলে। নয়নতারাদের পাড়ার কুঁচো ছেলের দল গামছা নিয়ে নেমে পড়েছে তাই ধরতে। গঙ্গার অসমতল বুকের ওপর থেকে কালো মেঘের ঘন ছায়াভার সরে গেছে। এখনও হালকা ছায়ারা আসে, হয়তো বুকের একাংশ আলতো ভাবে ঢাকে, আদুল যায়গা থাকে অনেকটা, সেখানে রোদ্দুর হাসে, সেই হাসির দিকে ছায়াটা ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

বাজারে হোটেলের পাশের আস্তাকুঁড় থেকে খাবার খুঁটে খায় করালী। ভিখিরির মত দেখতে, পাগলের মত হাবভাব। আশপাশে খাবার খোঁটে গোটাকত কুকুর। তাদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে করালী। ওরা ঘেউ ঘেউ করে, করালী চীৎকার করতে পারে না, ওদের ধমকাতেও পারে না।

ঘাটবাবু একদিন বলল, 'বোসপাড়ার একটা ছেলেকে কুত্তায় কামড়েচে। তোর সেই কুত্তাটা—ওটা খেপে গেচে।'

করালী বলল, 'মেরে দোব।' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ঘাটবাবু, মরার পর মানুষের কী হয়?'

'শ্মশানের লোকের ও কতা শুদোতে নেই।'

'আমি তো আর আসুন শ্মশানের লোক নই, ঘাটবাবু।'

'কে বললে তুই শ্মশানের লোক! শ্মশানে একবার ঢুকলে সে চেরটা কাল শ্মশানেরই থাকে রে, বুঝলি। একবার এক বুড়ীকে মড়া ভেবে শ্মশানে নে' এয়েছেল, মনে আচে?'

'হ্যাঁ, মড়াটা বেঁচে উঠল।'

'হ্যাঁ। তাকে আর ঘরে নেয়লো?'

'না। এই ঘাটের ধারে একটুকখানি চালা করে রেখে দিয়ল।'

'তালে? শ্মশানে ঢুকলে আর কেউ ফেরে না। ঐ বুড়ী তো শুধু ঘাটটা একবার ছুঁয়ে ছেল রে, আর আমরা—?'

হঠাৎ করালী প্রশ্ন করল, 'ঘাটবাবু, তোমার মাগ্‌ছেলে নেই?'

ঘাটবাবুর মুখের নির্বিকার ভাবটা হঠাৎ একটা হাসির ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে গেল। থামে না ভূমিকম্পটা। থলথলে দেহটা আন্দোলিত হয়ে হয়ে হাঁপিয়ে গেল। এত হাসল ঘাটবাবু যে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'আমাদের মেয়ে দেবে কে রে?'

'কেন?'

'আমরা যে ডম্বর লোক—ইদিকে কাজ করি ঘাটে। হেসে-ক্লান্ত ঘাটবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'শ্মশানের ঘরে নতুন মেয়েমানুষ এয়েচে, দেকিচিস?'

'না।' অনেক দিন যায় নি করালী ও দিকে।

'একবার দেকে আসিস। বেশ দেকতে মেয়েটা।'

করালী গেল। দেখল। ঘরটা। মেয়েটা। অল্প-বয়সী—বছর সতেরো আঠারো হবে। বয়সের তুলনায়

ডাগর-ডোগর দেখতে। শ্যামলা রঙে একটা ছায়া-ছায়া ভাব আছে। পানের রসে লাল ঠোঁট। সে করালীকে দেখে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, 'ও মাসী, একটা পাগলা, ওরে বাবারে।'

মাসী এসে চিনলো। খুব ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাবা যমরাজ। আর এখেনে কেন? নয়ান তো নেই।'

করালী চলে গেল। থাকতে আসে নি সে। মাসীর অত ভয় পাবার দরকার ছিল না।

ঘাটবাবুকে বলল, 'দেখলুম। বেশ ডাগরটি আছে। একটা কতা বলি ঘাটবাবু।'

'বল।'

'তুমি ওর কাছে যাও না কেন?'

'ভাবি যাব, পারি না।'

'কেন?'

'আমি যে ভদ্দর লোক। ভাবি আল্যাষা হবে, পাপ হবে। আর রোগ ভোগ যদি হয়—নয়ানের যেমন ছেল—'

'হ্যাঁ নয়ান বড় কষ্ট পেয়েছেল। মরার আগে যন্ত্রনায় ছটফট করত, আমায় বলত—তোমার কুকুর মারা লাঠিটা দিয়ে এক ঘা মেরে দাও গো আমায়, এ আমি আর সইতে পাচ্ছি না। সে যন্ত্রনা চোখে দেখা যায়, না, ঘাটবাবু। কিন্তু আমি মারতে পারিনি। অনেক সয়ে শেষটা ওর পরাণ বেরোল। মরার পরে কী হয়। হয়তো পরাণটা ওর এখানেই ঘুরে বেড়ায়। ওর ঘরে, এখেনে, বোসেদের ঘাটে। আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। ও হয়তো এখেনেই রয়েছে, শুনছে আমাদের কতা, হাসছে-কাঁদছে নিজের মনে। ঘাটবাবু আমিও বোধহয় শীগগিরই মরে যাব।'

'কেন রে?'

'আমরা তো ভদ্দর লোক নই। নেকাপড়া শিকি নি।'

'তাতে কী হোলো। নেকাপড়াতে কি সুখ হয় মানুষের?'

'তবু তুমি ভাল আছো ঘাটবাবু। নেকাপড়া দিয়ে ছুটি ভাত তো হয়।'

'পাগলা কুত্তাটাকে মার।'

সেই দিন সন্ধ্যেবেলায় বাজারের হোটেলের পাশের আস্তাকুঁড়ে গেল করালী। ভাত খুঁটে খায়। গোটাকত কুকুরও এসে জুটেছে। ঘাটবাবুর কথাটা তার মনে ছিল। কিন্তু কোথায় সে পাগলা কুকুর খুঁজতে যাবে। এখানে-কারই একটাকে বরং—

ভাবা মাত্র সামনের একটা কুকুরের মাথায় মারল লাঠি দিয়ে এক ঘা। সে-জোর করালীর হাতে এখন নেই। কুকুরটা এক ঘায়ে মরে নি। যত জোরে লাঠিটা পড়েছিল, তত জোরে তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে উঠল। সেই শব্দটা আশ্চর্য। যেন অনেক দূরের অতীতকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে ডাকল, নেকড়ে সম্পর্কিত বোধটা করালীর মনে ইদানীং চাপা পড়ে ছিল; পূর্বের কোমলতার ওপর একটা, আবরণ পড়ছিল। হঠাৎ ঐ চীৎকার আবরণটাকে বিদীর্ণ করে ভেতরে ঢুকে গেল।

নেকড়ে তখন যন্ত্রনায় ছটফট করছে। কাৎরাচ্ছে আর কাঁদছে। একটা গোঙানি যেন সারা দেহে দৃশ্যমান। রক্তে ভিজে গেছে কান, মাথা, রাস্তা। মাথাটা রাস্তায় গুঁজে যাচ্ছে যেন, আর সেই আহত অবশ মাথাটাকে তোলবার চেষ্টায় ঘুরপাক খাচ্ছে নেকড়ে।

করালীর হঠাৎ মনে পড়ল নয়নতারার মৃত্যু পূর্ব যন্ত্রণার কথা। সেও এই রকম করে চীৎকার আর ছটফট করত, বলত—মেরে ফেল, সইতে পাচ্ছি নে। নেকড়েও হয়তো তাই বলছে এখন। নয়ন বাঁচে নি। নেকড়েও বাঁচবে না, কিন্তু আর এক ঘা মারা কঠিন এখন। কিন্তু নেকড়ে কাৎরে কাৎরে নয়নতারার মত বলেই চলেছে। না, এ মারার দরকার নেই, নয়নতারাকে সে মারতে পারে নি। নেকড়েকে সে মারবে, মেরে এ বাঁচা থেকে রেহাই দেবে, আর এক ঘা লাঠি। গলাটা মিইয়ে গেল নেকড়ের। গোঙানিটা মৃদু হোলো, আতংকে কাঁপতে লাগল। গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ এমন চাপা গোঙানি—ঠিক সেই গোবরার ভয়ার্ত কান্নার মত, নয়নতারার প্রেমিক-পুত্র গোবরা। এমন বেশীক্ষণ চলল না, গোঙানিটা ক্ষীণ হয়ে হয়ে মিলিয়ে গেল। দেহের কাঁপুনিটা আর কিছুক্ষণ রইল। তারপর সব চুপ চাপ।

রক্তাক্ত মৃত নেকড়ের পাশে করালী বসে রইল ঝিম ধরে। বাকী কুকুরগুলো পালিয়েছে। আস্তাকুঁড়টা নিস্তব্ধ।

পরদিন সকলে হোটেলের মালিক বলল, 'হেই ওটা

নিয়ে বসে আছিস কেন। পচবে, গন্ধ হবে।'

এই কথা কটাতেই করালী যেন বুঝল যে, প্রচণ্ড খিদে তার।

করালীর ঝাঁকড়া চুলের অতিশয় মুণ্ডটা উঠল। নেকড়ের পায়ে দড়ি বাঁধা হোলো। তারপর সেই অসাড় মৃত দেহটা রাস্তার ধুলোর ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে চলল—তার সামনে অসাড় জীবন্ত একটা লম্বা দেহ, সেই দেহের ডগায় ঝাঁকড়া-চুল-দাড়ি মুণ্ডটা বিদ্ধ।

চার আনা পয়সা রোজগার করে তাই দিয়ে ভাত-ডাল কিনে ফিরল করালী বোসেদের ঘাটে। একহাতে খাবার। আর এক হাতে নেকড়ের পায়ে বাঁধা দড়ি। সেই দু' হাত যে দেহাগ্রে যুক্ত, তার ওপর বসানো সেই ভয়াবহ রক্তচক্ষু মাথাটা।

বোসেদের ঘাটে বসল। পাশে নেকড়ে। প্রচণ্ড জৈবিক তাড়নায় যখন একটা হাত খাদ্যটা তুলে দিল ঐ মুণ্ডুর একটি গহ্বরে, তখন ঐ মুণ্ডুরই আর দুটো ছোট সেকরে ঝাপসা একটু জল ভেসে উঠল।

করালীর মনে পড়ল নয়নতারার কথা, নয়ন নেকড়েকে বলত, করালীর পুষ্যিপুত্তুর, নয়ন বলেছিল, 'চিতের আগুনে তোমার চোকের জল সব শুকো গেচে।' এখন নয়ন থাকলে করালীর চোখে ঝাপসা আবরণটা দেখতে পেত।

খাওয়ার পর কী ঘুম যে পেল! একপাশে মাথা-ভাঙা মৃত নেকড়ে, অন্য পাশে এঁটো শালপাতা, তার মধ্যে সে গড়িয়ে পড়ল। ঘুম, ঘুম, ঘুম। বর্ষার যেমন বৃষ্টি নামে গঙ্গার ওপর তেমনি।

প্রথমে ধীরে নামে—টুপ, টুপ, টুপ। প্রতিটি বিন্দুকে আলাদা করে দেখা যায়। তারপর ঝপ ঝপ করে গঙ্গার বুকে লক্ষ বিন্দুর এককালীন বর্ষণ। গঙ্গা ভিজে নেয়ে যায়, আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অপেক্ষা করে চার ধার। ভাল চোখ চলে না তার মধ্যে দিয়ে। ঘুমের বৃষ্টি নামল। ঝম্ ঝম্ ঝম্। একেবারে নিবিড় অন্ধকার নয় ঘুমটা। ঝাপসা। একটু একটু যেন চোখ চলে। কত কী যে দেখল। নেকড়ের মাথায় বাড়ি মারছে করালী। যন্ত্রণাকাতর চীৎকারটা বেরোল নয়নতারার কণ্ঠে। ছটফট করছে নেকড়ে। নয়নের মত। চাপা গোঙানি—গোবরার মত। তারপর শব্দ নেই। কোন আর্তনাদ নেই। নেকড়ের মুণ্ডটা পালটে যাচ্ছে—একটা মেয়ের মুখ হয়ে গেল। মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছে করালী। কিন্তু কোথায় —বুঝতে পারছে না। ও! মনে পড়েছে! নয়নতারার ঘরে যে নতুন মেয়েটি এসেছে। করালীকে দেখে ভয় পেয়ে কিশোরী মুখটা বিকৃত হয়ে গেল—যন্ত্রণায় নয়নের যেমন হোতো। ক্রমে মুখটাই পালটে নয়নের হয়ে গেল। তরুণী নয়নতারা—প্রথম যৌবনের দর্পিতা। যাকে করালী দেখেছে দূর থেকে। ঘাটবাবুর কতগুলো এলোমেলো কথা কানে আসছে। কিন্তু কি বলছে কোথা থেকে বলছে বোঝা দায়। করালী চাইছে ঘাটবাবু এখন চলে যাক। নয়নতারা এসেছে, এইখানেই আছে। তার কাছে। ঘাটবাবুর জন্যে সে যেন একটু আড়াল হয়ে গেল, তাকে ভাল করে পাচ্ছে না সে।

ঘুম ভাঙল। ঘাটবাবু সামনে দাঁড়িয়ে। বলল, 'আ সকালে রবার কলে লোক নেবে।' একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল।

বিড়িটা খেতে খেতে করালী কাল রাতের কথা ভাবল। আশ্চর্য, নয়ন যেন এসেছিল।

'তাড়াতাড়ি কর।' বলল ঘাটবাবু।

'যাই তো, হয় তো না।'

'আজ হতে পারে। বেশী লোক নেবে।'

'কোতা? রবার কলে?'

'হ্যাঁ।'

করালী নেকড়েকে দু'হাতে তুলে নিয়ে গঙ্গার হাঁটুজল পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর আস্তে ভাসিয়ে দিল। তীরের কোলের দিকে স্রোত কম। নেকড়ে ভেসে চলল মন্থরভাবে—যেন যেতে চাইছে না করালী, শ্মশান, নয়ন-তারাদের পাড়া, বোসেদের ভাঙা ঘাট ছেড়ে। জলে দাঁড়িয়ে রইল করালী।

ঘাটবাবু ডাকল, 'আয়।'

উঠে এল করালী। বলল, 'ঘাটবাবু নয়ানের যৈবনের চেহারাটা মনে পড়ে!'

'পড়ে। এখন তাড়াতাড়ি যা।'

'তুমিও চল না ঘাটবাবু। তুমিও ওখেনে একটা চাকরি করবে। পয়সা বেশী পাবে?'

'না।'

'কেন?'

'আমি যে ভদ্দর নোক। তোদের সঙ্গে গায়ে খেটে খেতে পারি?'

বিমল কর

একদা বসন্তে

শিমুল গাছের মাথায় বসে কোকিলটা আরও পরে ডাকতে শুরু করবে। এখনও আকাশে কয়েকটি তারা আছে, অনুজ্জ্বল ম্লান তারা। দেখতে দেখতে দেখতে মুছে যাবে। নদীর মাঝ-মধ্যে যেমন চর পড়ে, আকাশের তলায় তেমনি চর পড়ে আছে অন্ধকারের, এখনও। চৈত্রের প্রত্যূষটি নষ্ট হলে ওই চর ভোরের নির্মল আলোয় ডুবে যাবে। এখন এই শেষ যামের কয়েক দণ্ড এই রকম—ম্লান অন্ধকারে পূর্ণ, সুপ্ত শান্ত নিস্তব্ধ। যেন নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে দক্ষিণের বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। শীতল স্নিগ্ধ বাতাস। কেরানীপাড়ার সদর ডিঙেয়ে অন্দরে সে বাতাস অবশ্য অবাধ অনায়াস নয়। তবু থেকে থেকে, ঢেউ ভেঙে পড়ার মতন, বাতাসের ঢেউ ভেঙে পড়ে কেরানীপাড়ার অলি গলি ইতি উতি ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আর এই বাতাসের বেপরোয়া ভাবটা অনুভব করছিল কেরানী-পাড়ার শ্রান্ত বাসিন্দারা। চাঁদমারি আর সাহেবদের কারখানাকে ঘাঁটি করে ফাঁকা মাঠ ডিঙিয়ে বাতাসের সেই বাঁধন-হারা দমকগুলো যেন ছুটে ছুটে আসছিল এপাশে, নব বিধুমুখী, কার্তিক হরিধনদের বাড়ির দিকে আসছিল আর কড়া নেড়ে যেন পালিয়ে যাচ্ছিল, আবার আসছিল!

চাঁপার ঘুম প্রথম রাতের দিকে বেশ গভীর, মাঝরাত থেকে খুব পলকা হয়ে যায়। ভোর রাতের পরে আরও পলকা। তখন আর ঠিক ঘুমোয় না, ধরণীর গায়ে গা ঘেঁষে আরও নিবিড় হয়ে থাকে। সারাটা রাত গরমে কাটে। ছোট খুপরির মতন ঘরে একটু বাতাস নেই। দেড় হাতের তক্তপোষটা ভেঙে গেছে কবে, মাটিতে বিছানা; ওপরের জানালাটা থাকা না থাকা সমান; গরমে হাঁস ফাঁস করতে হয়। তখন আর গায়ে গা সয় না, সইলেও অল্পক্ষণের পর যেন হাঁপ ধরে। এই ভোর রাতের দিকটাই সুন্দর। হুড়মুড় করে যে বাতাস আসছে তা নয়, দরজাটা খুলে দিলে হয়ত তাও আসতে পারে, তবু দরজা না খুলেও এই সকালের দিকটা সুখ পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা ভাবটা আছে, নেই নেই করেও দুএক ঝলক বাতাস আছে। সময়টা বরং আরও অসাড়ে ঘুমোবার, কিন্তু চাঁপা পারে না, ওই অভ্যাস।

ধরণীর খালি গা বুকে নিজের খোলা মেলা গা ঘন করে, স্বামীর পায়ে পা দিয়ে—ধরণীকে যেন সর্বাঙ্গে আশ্রয় করে চাঁপা পরম পরিতৃপ্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এ-কথা চাঁপা বিয়ের পর ধরণীকে পাশে পেয়ে বুঝতে পেরেছে, ঠিক এই সুখ এই মনপ্রাণ ভরা তৃপ্তি সে আগে আর কখনও অনুভব করে নি। কখনও না। একটা মানুষে কত সুখ হয়, কত আনন্দ হয়—বিয়ে না হলে মেয়েরা জানতে পারে না। কিছুতেই পারবে না।

অবশ্য, চাঁপা জানে, স্বামী যদি তার স্বামীর মতন হয়। এমন স্বামী পাওয়া কপাল, পুণ্যির জোর। শিব পূজো ত কত মেয়ে করে, কিন্তু এমন বরাত কার হয়।

চাঁপা জানালার ফোকর দিয়ে ভোরের রাতের ফরসা ফরসা ভাবটা দেখতে পেল। একটু চলচলে বাতাসও যেন দরজার ফাঁক ফুটো দিয়ে আসছিল। একবার ভাবল, দরজাটা খুলে দেয়। বাতাস আসবে, ভোর আসবে, আর স্বামীর সঙ্গে বিছানায় সে রোদ না উঠা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। পরে আর সে ইচ্ছে হল না। দরজা খুলে দিলে ভোরটা যেন ফুটফুটে করে উঠবে, আর উদোম ঘরে

যাই বল—স্বামীর পাশে এভাবে এই এত, আলগা টালগা হয়ে শুয়ে থাকা যায় না। লজ্জা করে। যেন ঘরটাই চোখ হয়ে সব দেখে। স—ব।

ঘুমন্ত স্বামীর গলার পাশ দিয়ে চাঁপার হাতটা স্বামীর পিঠে চলে গেল। আরও যেন বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল ধরণীকে। তা, চাঁপা হঠাৎ তন্ময় ভাবল, এই বুকে সে স্বামীকে সত্যিই জড়িয়ে নিতে পারে। আমার গা গতরে বাপু একটু বেশী মাংসটাংস আছে, একেবারে কঞ্চি কাঠি নই. তোমায় আমি বুকে আগলে নিয়ে শুতে পারি। ধরণী একটু রোগা রোগা, লম্বা মুখ, বেশ ছিপছিপে, মাথায় প্রায় চাঁপার সমান সমান। দেখলে মশাইকে ছেলে মানুষই মনে হয়, আর চাঁপার গোল গোল ফুলো ফুলো শরীরের জন্য একটু বেশী বয়সেরই লাগে দেখতে। তা বলে সেই যে, ঘা নিয়ে ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অত হাসিঠাট্টা সেই কার্তিকের মা—কুচুটে বদমাস বুড়িটা যা বলেছিল চাঁপাকে প্রথম দেখে তা নয়, চাঁপা মোটেই মা মাসির বয়সী নয় আর স্বামীটি তার মোটেই ছেলেমানুষ নয়।

পাঁচ বছরেরও বেশী· প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ছোট চাঁপা বয়সে ধরণীর চেয়ে। কিন্তু উনি রোগা রোগা পুরুষ বলে বয়সটা দেখায় না, চাঁপা মোটাসোটা মেয়ে বলে—বউ বলে চোখে অমনটা দেখায় হয়ত। কিন্তু, এত সত্যি, এই দশ এগারো মাস, বউ হয়ে থাকতে থাকতে এখন যেন চাঁপারই মনে হয়, সে ধরণীর চেয়ে সত্যিই বড়। বড় মানে কি বয়সে. মর্যাদায়, বুদ্ধিতে বড়? তা কি হয় কখনও? না—না, চাঁপা মনে মনে জিভ কাটল, ওসবে সে বড় না, ছোট; ধরণীর পায়ের তলার বসবার যোগ্য। কিন্তু যেমন নাকি—নাকি—, আ, কি বলবে তাকে চাঁপা? চোখ খুলে, ঘুমের জড়িমার মধ্যেই, স্বামীর মুখ একবার দেখল। বিঘত খানেকও দূর বলে মুখটা দেখাই গেল না। খালি গাল আর চোখ চোখে পড়ল। জানলার দিকেই তাকাল একটু চাঁপা, ধরণীর পিঠে রাখা হাতটা আরও যেন আঁকড়ে নিল। তারপর মনে হল চাঁপার, ধরণী তার এত বশ বাধ্য অনুগত যে চাঁপার সিংহাসনটা উঁচু হয়ে গেছে, ধরণীরটা নীচুতে। সংসারে যা করবে চাঁপা, যা করছে চাঁপা, ধরণীর সব বুদ্ধি চাঁপা দিচ্ছে, চাঁপাকে বাদ দিলে ধরণী একেবারে ফাঁকা। কাজেই যেমন বয়সে বড় হয়েও উপযুক্ত ছেলের কাছে মা ছোট হয়ে যায়—নির্ভর আশ্রিত হয়ে যায় তেমনি ধরণী বড় হয়েও স্বামী হয়েও চাঁপার কাছে ছোট হয়ে গেছে।

কচি ছেলে নাকি—? ধ্যুত্···ছি ছি···। চাঁপা নিজের কাছে যেন লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল। কি যে মাথা মুণ্ড ভাবনা! চাঁপা স্বামীর গালে আলগা করে একবার চুমু খেল। খেয়ে সুখ হল না। মন ভরল না। মাথাটা ধরণীর গলার কাছে আস্তে করে ঘষল। এই আদরটুকু সেরে চাঁপা উঠবে। আঙুলের ডগা আলতো করে স্বামীর বুকে ঘষল চাঁপা, অন্যমনস্ক ভাবে, যেন ধরণীর বুকের হাড় স্পষ্ট কি অস্পষ্ট দেখছে। তারপর আস্তে আস্তে এক সময় আঙুলের ডগা দিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করল, ধরণীর বুকের উপর। আবেশ ভরে বার কয়েক লিখল—আর তার পর হেসে ফেলল। আ ছাই, বরই ত; তার আবার অত লেখার কি আছে!

চাঁপা মাথা সরিয়ে স্বামীর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল তাঁর সিঁথির সিঁদুর ধরণীর চিবুকে নাকে লেগে গেছে। অমন করে গালে নাকে মাথা ঘষলে আর সিঁদুর লাগবে না! কিন্তু এই সিঁদুরের ছোপ চাঁপাকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করছিল। বরাবরই করে।

ধরণীকে নিবিড় করে চুমু খেতে গিয়ে চাঁপা এবার এত অস্থির আকুল হল যে ধরণীর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পর ধরণী অল্পক্ষণ আর স্ত্রীকে এই ঘনতা থেকে সরতে দিল না।

'ছাড়, উঠি'—চাঁপা শেষে বলল, বালিশ থেকে মাথা তোলার ভঙ্গি করল।

'শোও—শোও—শুয়ে থাক।' ধরণীর গলায় আবেশ।

গায়ের কাপড়টা একটু গুছিয়ে নিল চাঁপা শুয়ে শুয়েই। 'আর শুয়ে থাকলে চলবে না। ভোর হয়ে গেছে।'

'এর মধ্যে'—

'ওমা, তা হবে না। তোমার জন্যে কি বেলা দশটায় ভোর হবে!'

'হলে কিন্তু বেশ হত।'

'খু-ব নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে'—চাঁপা এবার স্বামীর পাশ থেকে সত্যিই উঠবার চেষ্টা করল।

'অমন ধড়ফড় করছ কেন গো, 'শোও না আর-একটু' ধরণী বউয়ের বাসি খোঁপার গন্ধ পাচ্ছিল, বউয়ের শাড়ির

এবং শরীরের স্পর্শ অনুভব করছিল তখনও।

'না গো অনেক কাজ—'

'আমি করে দেব।'

'থাক্। ওই ঘর-দালান ঝাঁট দেওয়া, কয়লা ভাঙা উনুন ধরানো—এ-সব তোমায় না করলেও চলবে।'

'করে দিই নি একদিনও?'

'কে না করছে, তবে আমি কখনও করতে বলি না, নিজেই জোর করে কর। আমার আবার এ-সব দেখলে গা জ্বালা করে।' চাঁপা জোর করেই উঠে পড়ল। শুয়ে থাকলে বেলা হয়ে যাবে; আর শেষ পর্যন্ত ধরণী সংসারের এই সব মেয়েলী কাজে হাত লাগাবে। চাঁপার কথা শুনবে না, নিষেধ মানবে না। মানুষটা একেবারে বউয়ের আঁচল ধরা হয়ে গেছে। সর্বক্ষণ বাড়িতে, চাকরির সময়টুকু যা বাইরে। যদি পারত, বোধ হয় সে সময়টুকুও বাড়িতে বসে থাকত।

'আমায় তবে মিছিমিছি জাগিয়ে দিলে কেন? বেশ ঘুমোচ্ছিলাম।' ধরণী বলল।

'আমি জাগিয়ে দিয়েছি—?' শাড়ির আঁচলটা আদুল গায়ে টেনে নিয়েছে ততক্ষণে চাঁপা। ঘরের দরজা খুলে দিল। ভোরের ফরসা এল প্রথমে, তারপর বাতাস।

'জাগালে না তুমি!'

'মোটেই না। ঠিক সময়টিতে মশাইকে আর জাগাতে হয় না—তখন তিনি জেগেই থাকেন।' চাঁপা অর্থসূচক হাসিতে চাঁপার গাল ঠোঁট চোখ ভরে উঠল।

ধরণী কাত হয়ে দরজার দিকে চেয়ে ছিল—ভোরের ফরসার দিকে। চাঁপার হাসিটা বুঝল, অনুভব করল—কিন্তু ভাল করে দেখতে পেল না। চাঁপা ততক্ষণে বাইরে চলে গেছে।

বিছানাটা বড় নয়। এক মানুষের বিছানায় ওরা দুজন মানুষ শোয়। তলায় মাদুর, তারপর একটা তোষক, চাদরটা ছিঁড়ে গেছে, বালিশে ওয়াড় নেই। এই বিছানাও এখন ফুলের বিছানা। ধরণী উপুড় হয়ে সাঁতার কাটার মতন একটা হাতে বিছানা হাতড়াতে লাগল, যেন চাঁপার শোয়ার জায়গাটিতে কিছু আছে এখনও, ধরণী সেটা অনুভব করছে।

বালিশে চাঁপার ঘন এক মাথা চুলের গন্ধ কিন্তু বেশ রয়েছে। এক শিশি ভাল গন্ধ তেল চাঁপাকে এনে দিলে কেমন হয়? খুব খুশী হবে চাঁপা। কিন্তু তেলের শিশিটা নেবে না, বলবে ফেরত দিয়ে দাও। গন্ধ তেল মাখার মাথার অবস্থা আমাদের নয়। কত দায়-অদায় না আছে ঘাড়ের ওপর। দেশে বুড়ো বাপকে মাসে মাসে পনেরোটি টাকা পাঠাতে হয়। অফিসে ধার করেছিল ধরণী, সে বাবদ পাঁচ টাকা করে কাটা যায়, এখনও মাস-কতক যাবে। তাহলে বাকি থাকে আর বাহাত্তরটি টাকা। এই সম্বল। বাড়ি ভাড়া দশ যায় দিলে—বিয়াল্লিশ টাকায় দুটি মানুষের খাওয়া পরা। কী ভীষণ গুছিয়ে-গাছিয়ে যে চলে চাঁপা; এক পলা তেল, একটি কানতু কয়লাও তার অযথা খরচ নেই। এক পাই পয়সা কর্জ পাবে না। যেটুকু মুঠোয় পায়—তাই দিয়ে স্বামীকে সুখে রেখেছে। বলে না কোনদিন, ওগো আর একটি টাকা আন, নয়ত আর পারছি না...চাঁপা, কোনদিন মুখ ফুটে এ-কথা বলতে পারবে না, কোনদিন নয়।

ধরণী বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকল। শুয়ে শুয়ে প্রায় বেহুশে স্ত্রীর গুণ বিচার করল। তারপর মনে মনে ভাবল, এই রকমের বউ টউকেই আসলে লক্ষ্মী বলে।

ধরণীর মাথায় হঠাৎ—একেবারে আচমকা একটা খেয়াল এসে ভর করল। চাঁপাকে 'লক্ষ্মী বউ' বলে ডাকলে কেমন হয়? বেশ চমৎকার শোনাবে।

বিছানা থেকে উঠে পড়ল ধরণী। অন্যদিন ঘুম থেকে উঠে আগে বিছানা তুলে, গুছিয়ে রাখে—তারপর বাইরে এসে দাঁড়ায়। আজ বিছানা না গুছিয়েই একেবারে বাইরে।

বাইরে একেবারে সদ্য সদ্য ভোর। বাতাস ঠাণ্ডা, কুর কুর করে বইছে। চাঁপা রান্নাঘর থেকে উনুনের ছাই এঁটো-কাঁটা বাসন পত্র বের করে উঠোনের একপাশে জড় করে রেখেছে। রান্নাঘর ধুয়ে মুছে এসে এবার বাসন মাজতে বসবে। তারপর উঠোন ঘর দোর ঝাঁট দেবে। উনুনে আগুন দিয়ে কাপড় কাচতে যাবে। এত কাজ সারতে সূর্য উঠে যাবে আকাশে, উঠোনে একটু রোদও এসে পড়বে। চাঁপা যখন ধোওয়া মোছা হয়ে হেঁসেলে এসে বসবে—তখন এই বাড়ি একেবারে পরিচ্ছন্ন পবিত্র যেন।

ধরণী উঠোনে পা দিয়ে চাঁপাকে দেখল ক'পলক।

দেড় হাতের রান্নাঘর ধুয়ে মুছে সবে উঠেছে চাঁপা।

'লক্ষ্মী বউ—' ধরণী দু পা এগিয়ে এসে ডাকল।

রান্নাঘর থেকে উঠোনে নেমেছে সবে ছায়া। হাতে তখনও জলের ঘটি। মাথার ঘোমটা নেই, আঁচলটা কোমরে পাক দেওয়া। খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়েছে! অবাক চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকল চাঁপা।

ধরণী বেশ হাসি খুশি। বউয়ের ছেঁড়া শাড়িটা সে সুদ্ধি করে পরে—শত সেলাইয়ের পরও যে পায়ের দিকটা ছেঁড়া সেদিকে লক্ষ্য নেই তার। চাঁপার দিকে আরও একটু এগিয়ে আসবার সময় বেকায়দায় ছেঁড়াটা আরও ফেঁসে গেল। চাঁপা তাকাল।

'লক্ষ্মী বউ কথাটা কেমন গো?' ধরণী চাঁপার একেবারে গায়ে গায়ে এসে দাঁড়াল।

চাঁপা ততক্ষণে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এমন ভাব করে বলল, 'আমি মোটেই আঙুল দিয়ে তোমার পায়ের কাছটা ছিঁড়ি নি।'

ধরণী পায়ের দিকটা দেখল। গ্রাহ্য করল না। হেসে ফেলল। 'তোমায় আমি লক্ষ্মী বউ বলে ডাকব এবার থেকে

চাঁপা দু'পলক স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকল আসল কথাটা বোঝাবার জন্যে। তারপর মোটা ঠোঁটে হাসির টোল ফেলে বলল, 'ইস্, কী আমার লোহাসের ডাক রে—'

'খারাপ?'

'কি বা আমার মধুভরা—' চাঁপা যেন কতই ভাজিলা করছে এমন ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে নিতে গেল, পারল না। হেসে ফেলল। দুহাত তুলিয়ে ঘটিটা ধরেছে ততক্ষণে। হেসে দাঁড়াল সামান্য। স্বামীর দিকে হাসি হাসি চোখে চেয়ে বলল, 'লক্ষ্মী বউয়ের ভেতরে এখন যে কী হচ্ছে'—মুখে ঈষৎ কৃত্রিম বেদনার ভাব আনতে চাইল চাঁপা, 'পেটের মধ্যে যেন দাপাচ্ছে…'

'কে?'

'কে আবার, অলক্ষীটা।' চাঁপা স্বামীর মুখে তার সমস্ত আনন্দের ঝাপটা যেন ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

ধরণী হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল চাঁপাকে; চাঁপার হাতের ঘটিটা ঠক্ করে পড়ল মাটিতে, পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকটা চলে গেল। না ধরণী না চাঁপা ঘটির কথা ভাবল।

চাঁপা স্বামীর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে শুধু বলল, 'বাসি মুখে অত খেতে নেই।'

ধরণী হো হো করে হেসে উঠল। তাকাল এ-পাশ ও-পাশে। ভোর এখন ধবধব করছে। আকাশটা যেন বকের ডানার মতন সাদা। ফুর ফুর করে বাতাস এসেছে উঠোনটুকুতে। খোলা-খাপরার চাল ডিঙিয়ে নিমগাছটা দেখা যাচ্ছে। কচি ডালগুলো দুলছে। কত পাতা হয়ে গেছে গুচ্ছে গাছটায়; নতুন পাতা। বসন্ত ত! ধরণী বিমোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকল।

শিমুলগাছের মাথায় বসে কোকিলটা ডাকছে। ভোরের কোকিল। ডাকটা আরও নরম পরিষ্কার টানাটানা।

সুন্দরব্রত ছাদে আলশের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়েছিল শিমুলের ডালে আর একটিও ফুল নেই। ফল ফেটে আঁশ উড়ছে। তলায় গিয়ে দাঁড়ালে বাতাসে আঁশ উড়ে উড়ে গায়ে মুখে লাগবে।

সুন্দরব্রতর কোনো দিকে মন ছিল না। এই শুভ্র নির্মল সকাল, কোকিলের ডাক, শিমুলের আঁশ ওড়া—কোনো কিছুই লক্ষ্য করছিল না। অন্যমনস্ক উদাস ভাবে দাঁড়িয়েছিল। উস্কোখুস্কো চুল, রাত জাগা চোখ, চোখে ঈষৎ কালিমা। ক্লান্ত শুকনো ম্লান দেখাচ্ছিল ওকে।

খোলা ছাদে পায়ের হালকা শব্দে সুন্দরব্রত মুখ ফেরাল। বড় বউদি।

'তোমায় ডাকছেন।' লতিকা কাছে এসে বলল। লতিকাকেও ক্লান্ত শুকনো দেখাচ্ছিল, কপালের চুলগুলি গালে মুখে এসে পড়ছে।

'উঠেছেন?'

'হ্যাঁ—' লতিকা ঘাড় নোয়াল। ওর হাই উঠছিল; চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে।

'তুমি নিচে যাচ্ছ?' সুন্দরব্রত শুধোল।

নিচেই যাচ্ছে লতিকা। ঘরে গিয়ে এখন আর গা এলিয়ে বিছানায় পড়ে থাকার সময় নেই। সকাল হয়ে গেছে। কলঘরে ঢুকবে, এই বাসি শাড়ি জামা ছাড়বে, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে বসতে হবে। সকালের চা জল-খাবার, বাচ্চাদের দুধ গরম—ঠাকুর চাকরদের ভাঁড়ার বুঝিয়ে দেওয়া, বাজারে পাঠানো। অনেক কাজ। লতিকা

বলল, 'ফুরসত করে ওপরেআসতে আমার দেরী হবে, তুমি ওঁর মুখটুখ ধুয়েই দিও—আমি জলটল পাঠিয়ে দেব।'

সুন্দরব্রত কিছু বলল না। ছাদ পেরিয়ে টালির ঘরটার দিকে চলে গেল।

লতিকা অল্প একটু দাঁড়িয়ে থাকল। ঘুমে সারা শরীর অবশ হয়ে রয়েছে। একটু গা গড়িয়ে নিতে পারলে বাঁচত। উপায় নেই; চৈত্রের সকাল যেন সাঁতার কেটে আসছে। দেখতে দেখতে কত ফরসা হয়ে গেল। কেরানী-পাড়ার সদর রাস্তা ধরে গোয়ালারা আসতে শুরু করেছে, গোরু বাছুর দুধের বালতি···। ঝি চাকরদের মুখও দেখা যাচ্ছে।

না, এখন আর শোবার উপায় নেই। সোজা কলঘরেই চান যেতে হবে। চালাক সুনন্দা। সে তার ঘরে সারাটা রাত দিব্যি পড়ে পড়ে ঘুমলো, এখনও ঘুমোবে। ভোরের ঘুমের আমেজটি তিনি ছাড়তে রাজী নন।

বিরক্ত হল লতিকা। ছোট জায়ের এই বড়লোকি চলে তার অসহ্য। রোদ না-ওঠা পর্যন্ত তিনি বিছানা ছেড়ে উঠবেন না। ঘুম ভাঙলেও দরজা খুলে বাইরে আসবেন না। স্বামীর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে গল্প করবেন। তারপর ঠিক চায়ের সময় বুঝে বাইরে আসবেন। টুথব্রাশ আর তোয়ালে হাতে। কলঘরে থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন একটু; 'ঠাকুর, আমাদের ঘরে চায়ের জল পাঠিয়ে দাও।' অর্থাৎ চায়ের গরম জলটুকু শুধু দোতালায় ওঁর ঘরে যাবে, আলাদা পাত্রে আলাদা ভাবে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর চা তৈরী হবে ঘরে, কত আহার-বাহার সেই চায়ের; বিস্কুট কেক মুরগির ডিম দিয়ে চা খাওয়া হবে··· এত নবাবী ভাল লাগে না লতিকার। কি তুমি রাজ-রাজেন্দ্রাণী? সংসারের কুটোটি পর্যন্ত কাটতে পার না, কাট না?

দেখা যাবে। লতিকা ছাদ থেকে অলস পায়ে চলে যেতে যেতে আকাশকে সাক্ষী রেখে যেন মনে মনে বলল, এই নবাবী কতদিন চলে। এখন না হয় পেটে আসে নি, আসবে ত বাচ্চা-কাচ্চা, তখন দেখব কত গড়িয়ে বসে কাটে।

সিঁড়ির কাছে এসে লতিকা ভাবল, দোতলায় নেমে সরাসরি সুনন্দার ঘরে গিয়ে ডেকে দেবে কি না। শ্বশুর ত একলা তার নয়, সুনন্দারও। আমি একা কেন রাত জাগব, সেবা করব; তুমিও করো। এ তোমারও কর্তব্য। আজ দশ পনের দিনের মধ্যে একদিনও তুমি বুড়ো শ্বশুরের কাছে এসে দশ মিনিট বসতে পারলে না। ষোল আনা ফাঁকিয়ে আছে, 'ওসব আমি দেখতে পারি না; ভয় করে আমার।' ভয় করে! কচি খুকি!

সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় নামতেই চোখে পড়ল শোবার ঘরের দরজাটা পুরোপুরি খোলা। লতিকা দোতালার রেলিং ধরে নিচে তাকাল, স্বামীকে দেখতে পেল না। এত ভোরে উঠে কোথায় গেল মানুষটা?

শোবার ঘরে এসে চৌকাটে পা দিতেই চোখ পড়ল, বিছানায় প্রিয়ব্রত বসে। সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

লতিকার পায়ের শব্দ পেয়ে প্রিয়ব্রত মুখ ফেরাল।

'উঠে বসে আছ যে!' লতিকা শুধলো।

'ভোরের দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল।' প্রিয়ব্রত বলল। সিগারেটটা ধরাল এবার।

'রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি!'

'না।' প্রিয়ব্রত আস্তে আস্তে মাথা নাড়াল। 'ক' দিনই ঠিক মতন হচ্ছে না। কাল বড় ডিস্টার্বড্ হয়েছি।'

'ছেলেরা জেগেছিল?'

'উঁহু!·····' প্রিয়ব্রত অন্যমনস্ক, চিন্তিত। 'সুন্দর তোমায় ডেকে নিয়ে গেল তখন ক'টা হবে আন্দাজ?'

'প্রায় দুটো।'

'তারপর থেকে আর ঘুম এল না ভাল মতন।'

সামান্য চুপ চাপ। ওদিককার বিছানায় ছেলে দুটো গলা জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে।

'বাবা রাত্রে একটু ঘুমোতে পেরেছিলেন?' প্রিয়ব্রত শুধলো।

'কোথায় আর! শেষ রাতটায় সামান্য···'

'খুব ছটফট করেছেন?'

'তা করেছেন। ওঁর সহ্যশক্তি ত ভীষণ, সহজে কিছু বোঝা যায় না—বুঝতে দেন না। কাল আর চাপতে পারছিলেন না।'

'কিছু বলছিলেন?'

'না। মাঝে একবার বললেন, "বড় বউমা, কাল

একবার মনে করে তোমার শাশুড়ির ছবিটা পরিষ্কার করো।' লতিকার গলায় স্বর নিষ্ক শোনাল।

প্রিয়ব্রত গলা ভর্তি ধোঁয়া টেনে নিল। ছেলেদের দিকে তাকাল একবার দেওয়ালের দিকে—লতিকা এবং তার একত্র ছবিটির দিকে, বিয়ের পর তোলানো ছবি—অনেক দিন হল।

'জ্বরটা সারা রাত ওপরেই ছিল?' প্রিয়ব্রত শুধালো।

'হ্যাঁ—' মাথা নাড়লে লতিকা।

'ওকে জোর করে একটু ঘুমোতে পাঠালে পারতে।'

'বলেছিলাম ত। যাবে না। বাবার খাটের পাশে মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে শুয়ে থাকল।'

প্রিয়ব্রত আর কোনো কথা বলল না। লতিকা অল্প অপেক্ষা করে শোবার ঘরের গা-লাগানো ছোট্ট ঘরে গিয়ে ঢুকল। শাড়ি জামা নিল আলনা থেকে ব্রাশ পেস্ট নিল। এ-ঘরে এল আবার।

'তুমি আমায় তাড়াতাড়ি একটু চা খাইয়ে দিতে পার!' লতিকা তাকাল। স্বামীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিল না।

'চা খেয়ে আমি একবার অমিয়র কাছে যাব।'

'অমিয় মল্লিক?'

'হ্যাঁ।'

'অমিয় ত নিজেই আসবে।'

'অপিসে বেলা হবে তার। আমিই যাব। আমার মনে হয়, অমিয় তার নিজের মতন করে ট্রিটমেন্ট করলেই ভাল হত, অথবা দেবুর শ্বশুরের অ্যাডভাইস নিয়ে এ-একটা চিকিৎসা শুরু হচ্ছে।'

লতিকা স্বামীর দিকে ঈষৎ রাগের চোখে তাকাল। তার চোখ কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে যেন বলছিল, তাই নাকি!

'কথাটা আর পাঁচ জনের সামনে যেন বলো না—' লতিকা ঠোঁটের সোড়া কুঁচকে বলল, 'কানে গেলে ওঁরা দুজনে এখুনি হয়ত বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।'

'যাবে যাক. আমি কেয়ার করি না। আমার বাবা, তাঁর সম্পর্কে কথা বলার অধিকার আমার আছে।' প্রিয়ব্রত কঠিন গলায় বলল।

'একা তোমার নয় তোমার মেজ ভাইয়ের ও বাবা—' লতিকা মনে করিয়ে দিল।

'বাবা···' প্রিয়ব্রত বিরক্ত বীতস্পৃহ উত্তেজিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'ও একটা রাস্কেল। বিশ্ব সংসারে বউ ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

লতিকা আর কোন কথা বলল না। স্বামীর উদ্বেগ আশঙ্কার সময় কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিজের মনের বিভ্রান্ততার সঙ্গে স্বামীরও মনের- বিভ্রান্ততা যেন সমর্থন হিসেবে তাকে একটু খুশি করল। ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বলল—'তোমার চা আমি আগে করে এনে দিচ্ছি।'

প্রিয়ব্রত সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। বাবার অসুখ এবং গত দশ পনেরোদিন ধরে এক নাগাড়ে এই টানা-পোড়েন তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এই অসুখ ঠিক যে কী ধরা যাচ্ছে না। বুড়ো বয়সের রোগ এই রকমই হয়, তার এক নয় একাধিক লক্ষণ। তা বলে আদপেই রোগ ধরা যাবে না, চিকিৎসা হবে না, প্রিয়ব্রত তা মেনে নিতে রাজী নয়। দেবুর শ্বশুর ক্যাপ্টেন হালদার যা যা বলেন অমিয় সেকথা বলে না। প্রিয়ব্রতর প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিল চিকিৎসাটা পুরোপুরি অমিয়র হাতে তুলে দেয়। বাবারও অমিয়র ওপর আস্থা বেশী। ঠিক যাকে পেশাদার ডাক্তার বলে অমিয়ও ত তা নয়। এ বাড়ির সঙ্গে তেমন না হলেও সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা অনেকটা আত্মীয়ের মতন। ওর মার সঙ্গে প্রিয়ব্রতদের মার খুব ভাব ভালবাসা ছিল। বাবারও বন্ধু-পুত্র অমিয়। এক সময় এ পাড়ায় ছেলে ছিল, এখনও তাদের বাড়ি আছে গুলিক-টায়, নেহাত দায়ে বাজারের কাছে যে ডিস্পেন্সারী করেছে তারই লাগোয়া বাড়িতে থাকে। সত্যব্রতর চিকিৎসার ভার অমিয় পুরোপুরি নিতে চেয়েছিল। কিন্তু দেবু রাজী হলো না। তার শ্বশুরকে টেনে না আনলে দেবুর মান সম্ভ্রম যেন থাকছিল না। বলতে কি এক ঢিলে দুই পাখী মারার মতন দেবু যেন বাবার প্রতি তার দায়িত্বের পরিচয় এবং শ্বশুরের গৌরব ঘোষণা করে নিল। দেবুর বৌ বলেছিল 'বাবা থাকতে এসব ছেলে-ছোকরা ডাক্তারের কি দরকার।' দেবু বৌয়ের কথার প্রতিধ্বনি তুলেছিল, 'আরে অমিয় তো সেদিন পাস করল; ওই সামান্য সর্দিটর্দি পেটের অসুখ হলে ওকে দিয়ে চলে, কোন সিরিয়াস কম্প্লিকেটেড কেসের ও কি বুঝবে।' প্রিয়ব্রত তখন দোটানায় পড়েছিল। যে অধিকারে সে অমিয় ওপর নির্ভর করতে চায় ঠিক সেই

অধিকারে দেবুও তার শ্বশুরকে ডাকতে চায়। জো করে একা কিছু করার মতন সাহস প্রিয়ব্রতর হয়নি। আর বাবার সৌজন্য বোধও অদ্ভুত। অমিয়র ওপর তাঁর বিশ্বাস-আস্থা থাকা সত্ত্বেও দেবুর শ্বশুর যখন দেখতে এলেন বাবা কোন রকম বাধা দিলেন না। অমি মনে মনে আহত হয়েছিল তা সত্ত্বেও নিজের গরজে সে দুটি বেলা এসে বাবাকে দেখে যায় তার মনোমত চিকিৎসা করে না, দেবুর শ্বশুর ঠিক যেমনটি যা বলেছেন সেইভাবে চিকিৎসা করে যাচ্ছে। সুন্দর বলছিল, বাবা নাকি অমিয়কে বলেছেন: সব রোগ সারার নয়। অনেক বয়স হল, এবার আমায় শান্তিতে যেতে দাও বাবা। আমি তো যাবই, কেন মিছিমিছি এ বুড়োর জন্য তুমি দায়ী হও।

প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। অমিয়কে বাবা যাই বলে থাকুক তা নেহাতই মন জোগান কথা, প্রিয়ব্রত এসব গ্রাহ্য করবে না।

লতিকা চা নিয়ে এল। এখনও বাসি কাপড়-চোপড় ছাড়েনি। কোন রকমে স্বামীর জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরী করে এনেছে। প্রিয়ব্রত চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘর ছাড়ছিল, লতিকা শুধলো, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ওপরে।'

'কাল—' লতিকা কথা সুরু করে স্বামীর দিকে চেয়ে একটু কি ভাবল, তারপর বলল, 'বাবা আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন নতুন বাড়ির কাজে কবে তোমরা হাত দেবে।' আমি বললাম, 'আমি ঠিক জানি না।'

প্রিয়ব্রত ঘার ফিরিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে অপলকে একটু চেয়ে থাকল। স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে কী যেন দেখছিল, ভাবছিল। প্রায় অসতোক্তির মত বলল, 'ও বাড়ি দেবুই তার খুশীমত করুক, আমি আলাদা জমি কিনে বাড়ি করব। যার সঙ্গে বনিবনা হবে না তার সঙ্গে একবাড়িতে বাস করা যায় না।'

'কি বলছ তুমি'—লতিকা সবিস্ময়ে বলল, 'জমি তো তোমার ভাই একলা কেনেনি তুমিও টাকা দিয়েছ সেই টাকার কি হবে?' 'ফেরত নেব।' প্রিয়ব্রত দৃঢ়কণ্ঠে বলল তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

স্বামীর কথায় লতিকা পরিতৃপ্ত হল। আজ এতদিন পরে কী করে যেন কথাটা স্বামীর মগজে ঢুকেছে। অথচ যখন থেকেই জমি কেনার কথা হচ্ছে লতিকা আপাত্তি বাধা দিয়েছে। কত বলেছে বুঝিয়েছে, জমি বাড়ি যদি করতেই হয় তুমি আলাদা করেই কর। সংসারে একজন রানী সেজে খাটে শুয়ে থাকবে অন্যজন দাসী হয়ে খাটবে তা হয় না। তোমার ভাইয়ের বৌয়ের এই ঔদ্ধত্য অহঙ্কার আমি সহ্য করতে পারি না। তা ছাড়া উঠতে বসতে ঝিয়ের অত সাহেবীখানা কিসের—সতীই তো দুই আর সাহেব নয়।...লতিকার এসব কথা প্রিয়ব্রত তখন গ্রাহ্য করেনি। কেরানীপাড়া ছেড়ে যাবার জন্যে পা তুলে রয়েছে। যেন এই নোংরা পাড়া ছেড়ে গেলেই সর্বশান্তি। আসলে একথা বোঝেনি পাড়া শুধু নয় এই একত্র সংসারও ছাড়তে হবে নয়ত শান্তি নেই।

লতিকা চুপা এগিয়ে ছেলেদের বিছানার কাছে এসে ডাকছিল: এই সুদীর ওঠ, উঠে পড় অধীর। দুই ছেলেই ঘুমের ঘোরে আরও বেশী করে বিছানা আঁকড়ে নিচ্ছিল।

পুবের আকাশ কখন যে হালকা নীলে ভরে গেছে, সূর্য উঠে এসেছে রোদের স্রোত কেরানী পাড়ার আলোকিত করে গেছে ধরা গেল না। চৈত্রের বাতাসে ঈষৎ উষ্ণতার আভাস। ঠিক বেলা কটা বোঝার কোন উপায় নেই। বারোয়ারী কলতলায় স্নানে জল পড়ে চলেছে কলতলার কাছে তিন বালতী ভরা নানান কলতলার পাশে, মাটিতে এখনও অল্প ঘষেই এঁটো কাঁটা বাসনপত্র ঝি-চাকরের দল একহাতে বাসন অন্যহাতে জলের বালতী সামলাচ্ছে। মাঝে মাঝেই বাড়ির বৌ ঝিদের মুখ দেখা যায় সদরে, ঝি চাকরদের তাগাদা দিচ্ছে—কারও বা কড়াইটা আগে দরকার কারও বা ভাতের হাঁড়ি। বাসন মাজা ছোবড়া শালপাতা ইঁটের টুকরো রাজ্যের ছাই ভস্মাল আর যত রাজ্যের উচ্ছিষ্টের ওপর কাক চড়ুইয়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু'একটি বাড়ির রান্নাঘরের ফুটোফাটা দোকর দিয়ে তখনও অল্পবিস্তর ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। এরি মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির ময়লাটানা মোষের গাড়িটা কেরানী-পাড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। খাটা পায়খানা পরিষ্কারের গন্ধে সমস্ত জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর। ওরি মধ্যে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রামবাবু বিড়ি টানছিলেন এবং বাজারবাবু অথবা বাজার ফিরতিদের কাছ থেকে সেদিনের বাজার

দরটি জেনে নিচ্ছিলেন। এ অঞ্চলের দুটো খেঁকী কুকুর অন্য এলাকার আর একটা কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে চিৎকার করছিল। হরিপদ আর মৃণাল নুড়ির ওপর মরলা সার্ট ঝুলিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বেকার বকাটে দুই বন্ধু আজ যেন সামান্য উদ্‌ভ্রান্ত। কাল রাতে বিধুর গায়ে বসন্ত দেখা দিয়েছে। হরিপদ কিংবা মৃণাল কেউই ঠিক করতে পারছিল না এর পর কি কর্তব্য। হরিপদর ইচ্ছে বিধুর মামাতো ভাইকে একটা খবর দিয়ে আসে পুরনো ষ্টেশনপাড়ায় গিয়ে। মৃণালের খুব একটা সায় ছিল না। বিধুর সঙ্গে তার মামাতো ভাইয়ের সম্পর্ক যে খুব মধুর নয় একথা ওদের জানা আছে। আজ বিপদের দিনে সেই ভাইকে ডাকতে গিয়ে গালমন্দ খাবার সম্ভাবনাই ষোল আনা। লোকটা খোলাখুলি বলতেই পারে ফুর্তির সময় তোমরা তার ইয়ার দোস্ত আর এখন বিপদের সময়ে এসেছ আমার কাছে।...কথাটা মৃণাল অস্বীকার করতে পারে না মনে মনে। দুহাতে বিধুর পয়সা তারা লোটেনি ঠিকই তবু ধর্মও অস্বীকার করা যায় না প্রায় প্রত্যহ সকালে ত্রিদিব রেষ্টুরেন্ট চায়ের পয়সা বিধুই জুগিয়েছে, ফুটবলের মরশুমে এসপ্লিবিসন ম্যাচ দেখা তাও বিধুর পয়সায়, আর থেকে থেকে ইনষ্টিটিউটের সিনেমায় যে বাইস্কোপ দেখা তাও বিধুর দয়ায়। আরও আছে; দরকারে একটা কাচা ধুতি কি সার্ট তাও বিধু দিয়েছে তার বাক্স থেকে বের করে। এহেন বন্ধুকে ঠিক আজ এ বিপদের দিনে অন্যের ঘাড়ে তুলে দিয়ে সরে পড়া ভাল দেখায় না।

'কইরে, প্রবে'ধটা ত এখনও এল না তুই একবার এগিয়ে দেখ', হরিপদ অধৈর্য গলায় বলল।

'কি হবে দেখে—' মৃণাল অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিল, 'আসার সময় ডেকে ত এসেছি। শালা লাটের মতন পড়ে পড়ে বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমায়—'

'বেটা জেগে ছিল ত ঠিক', হরিপদ সুধলো।

'জেগে ছিল মানে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল, বললাম সব, বলল আসছি আর তারপর দেখাই নেই।' মৃণালকে অত্যন্ত বিরক্ত মনে হচ্ছিল।

'তাহলে কি ওর জন্যে ওয়েট্ করব না?' হরিপদ বলল।

'আমরা এগোই ও যখন আসার আসবে।' মৃণাল পা বাড়াল।

'তোর কাছে কিছু আছে ত?' হরিপদ লোভীর মতন বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে সুধলো!

'না।' নির্বিকার চিত্তে মাথা নাড়ল মৃণাল।

'না! তবে—' হরিপদ দাঁড়িয়ে পড়ে।

'চলত চা খেতে খেতে প্রবোধটা এসে যাবে যদি না আসে দামটা ধারে রেখে দেব।'

'ত্রিদিব রেষ্টুরেন্টে ধার—! তুই কি পোষ্টাপিসে পাস বই খুলেছিস?'

'না।' মৃণাল কেমন যেন দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল 'একটা চাকরি ত পেয়েছি। আজ দুপুর থেকেই জয়েন করব।'

'চাকরি।' হরিপদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ ছ-মাসের চাকরি তিরিশ টাকা মাইনে পাঁচ টাকা সাইকেল অ্যালাউয়েন্স।' মৃণাল বন্ধুর দিকে চেয়ে চেয়ে একটু হাসল। 'মিউনিসিপালিটির টিকাদার। রোজ সকালে চার ঘণ্টা, বিকালে তিন ঘণ্টা বসন্তর টিকে দিয়ে বেড়াতে হবে, জব্বর চাকরি।'

হরিপদ প্রথমে লোভীর মত মৃণালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বলল, 'টিকাদার।'

মৃণাল সে কথার কোন জবাব দিল না। কেরাণী পাড়ার পাথুরে রাস্তাটা দিয়ে বাজারের দিকে হাঁটতে লাগল। হরিপদ পিছু পিছু চলল।

কেরাণীপাড়ার মাথার ওপর চৈত্রের সকালটি এখন ওছিয়ে বসেছে। সূর্য উজ্জ্বল, রোদ গাঢ় পরিষ্কার আকাশ নীলের মত জাজিমখানার ওপর কিছু সাদা হাল্কা মেঘ, কোথাও বা নদীর রেখার মত একটি কাল রেখা ছড়িয়ে গেছে। শেষ বসন্তের এই রোদে চিলের দল খুশে সাঁতার কেটে উড়ছিল। দক্ষিণের বাতাসটি মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে কেরাণীপাড়ার রাস্তা কলতলা ঘরের সদরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। এ বাতাসে সতর্ক চঞ্চল হবার মতন বোধ হয় কেউ ছিল না কেরাণীপাড়ায়।

কালী দত্তদের বাড়িতে এইমাত্র সকালে বাজার এল। বাজারের থলেটা রান্নাঘরের কাছে উঠনে নামিয়ে দিয়ে

কালী দত্ত কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, অন্নপূর্ণার গলার তোড়ে কথাটা আর বলা হল না। কালী দত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে একবার রান্নাঘর তারপর ঘরের দিকে চেয়ে নিলেন। রান্নাঘরে পিঁড়ির ওপর অন্নপূর্ণা, শ্যামলী ঘরের মধ্যে। কালী দত্ত স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছিলেন, মেয়েকে দেখতে পাচ্ছিলেন না; কিন্তু অনুভব করতে পাচ্ছিলেন শ্যামলী ঘরের কোণে কোথাও মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু অনুচ্চস্বরেই বললেন, 'কি, হল কি?'

'হওয়াতে তোমরা বাপে মেয়ে মিলে কি আর বাকি রেখেছ!' অন্নপূর্ণা উনুনের তলা খুঁচিয়ে লোহার শিকটাকে ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিল। মনে হচ্ছিল অন্নপূর্ণা আজ ভীষণ চটেছে। তার দুর্বল ছোটখাট পলকা শরীরটা রাগে কাঁপছিল। কালী দত্ত স্ত্রীর এই রাগের চেহারাকে ভীষণ ভয় পায়। মানুষটা গায়ে মাথায় ছোট দুর্বল হলে কি হবে দাপটে যেন কালী দত্তকে ছোট ছেলের মতন শাসিয়ে রেখেছে।

'অযথা সকালে অশান্তি করছ কেন, কি হয়েছে?' কালী দত্ত যথাসম্ভব ধীর বিনীত গলায় বললেন। অন্নপূর্ণার ছোট হাড়হাড় কালো মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসবারও চেষ্টা করলেন।

অন্নপূর্ণা কিছুই গ্রাহ্য করল না, উনুনের ওপর এক-রাশ করলা ফেলে দিল, জলের ঘটিটা গড়িয়ে দিল নর্দমার দিকে। 'সংসারে যত অশান্তি আমি-ই করি!' অন্নপূর্ণা স্বামীর দিকে তাকাল, 'তুমি আর তোমার মেয়ে যত শান্তির জল ছিটিয়ে বেড়াচ্ছ।'

কালী দত্ত স্বভাব মত দেশলাইয়ের কাঠি বের করে কান চুলকোতে শুরু করেছেন। মোটা কালো বৃহৎ শরীরটা তাঁর কান চুলকোবার সময় কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে আসে। প্রায় তিনি চোখ বোজেন, এবং চোখ খুললে দেখা যায় দুটি বড় বড় চোখে জলের পাতলা পর্দা নেমেছে। কালী দত্তর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল স্ত্রীর সঙ্গে মোটেই তিনি আর যুদ্ধে নামতে রাজী নন। তবে আসেই তিনি নির্বিধায় পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন।

অন্নপূর্ণা পিঁড়ি ছেড়ে সশব্দে উঠল। উনুনে কাঁচা করলার ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছিল। অন্নপূর্ণা বাইরে এল, কালী দত্ত একটু সরে উঠোন ছেড়ে বারান্দার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

'সব সংসারে যখন হাঁড়ি চেঁচেলের পাট চুকেছে আমার সংসারে তখন বাজারটি এল।' অন্নপূর্ণা গজরাতে গজরাতে বাজারের থলেটি টেনে কলতলার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

'এখনও আটটা—'কালী দত্ত নিজের দোষ কাটাবার জন্যে মৃদু কণ্ঠে বললেন।

'আবার কাল সূর্য উঠলে আটটা বাজবে—'অন্নপূর্ণা সব্জির ঝুড়ি নিতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসছিল। 'ঘুম থেকে উঠতেই কলের জল চলে যায়, তারপর গড়িমসি করতে করতে চা-টি খেয়ে বিড়িটি ফুঁকে বাজার যাওয়া রাস্তার যত রাজ্যের গল্প গুজব--আমার সংসারে বেলা বারটা না বাজলে হাঁড়ি চড়তে আর দোষ কোথায়।' অন্নপূর্ণা রান্নাঘর থেকে তরকারীর ঝুড়ি আঁশ বটি নিয়ে আবার কলতলার কাছে গিয়ে বসল।

কালী দত্ত বুঝতে পারছিলেন আজ অদৃষ্ট বড় মন্দ। এই যে সকাল থেকে অশান্তি শুরু হল সারাটা দিন রাত পর্যন্ত এখন থেমে থেমে চলবে। অন্যদিন বাজার এলে বাছাবাছি ধোয়া কোটা সবই শ্যামলী করে, আজ শ্যামলীকে এই যে রাগ করে কাজ থেকে সরিয়ে রাখল অন্নপূর্ণা তার পরিণাম আরও দুঃসহ হবে। স্ত্রীর রাগের মাত্রা একটু কমাবার চেষ্টায় কালী দত্ত মেয়েকে ডাকলেন, 'শ্যামলী।'

ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিয়ে শ্যামলী এল না। একটু পরে উঠোনে এসে দাঁড়াল। কালী দত্ত মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন এই মাত্র চোখের জল মুছে দুটি চোখ যত না শুকনো তার চেয়ে বেশী লাল করে এসেছে। মুখে কিছু বললেন না কালী দত্ত ইসারায় অন্নপূর্ণাকে দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তুই যা মা, আর কেন মিছে ঝামেলা বাড়াস।

অন্নপূর্ণা ততক্ষণে আনাজ-পত্র ছড়িয়ে বাছাবাছি করতে শুরু করেছে। দুটো আলু প্রায় পলকে দরজার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অন্নপূর্ণা বলল, 'ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে বাজার কর নাকি যত রাজ্যের দাগধরা পচা কিনে নিয়ে এসেছ।' অন্নপূর্ণার এই রাগ মেজাজ এখন ক্রমশই উনুনের আঁচের মত চড়তে থাকবে।

কালী দত্ত বেশ উদার শান্ত গলায় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে

বললেন, 'তুমি ওঠ, হাত ধোও। শ্যামলী যা করার করছে।'

সহজে ওঠার পাত্র অন্নপূর্ণা নয়। স্বামীর কথায় কিছু মাত্র কর্ণপাত করেছে বলে মনে হল না। মাছের টুকরো আলাদা করে একপাশে ঠেলে দিয়ে অন্নপূর্ণা বলল, 'সংসারে কে কত করে আমার দেখা আছে। একজনও খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি আর বছরে বাড়ছি; অসুখ সারা দিনের মধ্যে একটু এটা একটু ওটা নাড়লাম বিছানা দুটো পরিষ্কার করলাম আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কাটালাম।'

কালী দত্ত বুঝতে পারছিলেন যতক্ষণ না এই বাড়তি কাজ থেকে অন্নপূর্ণাকে মুক্তি দেওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ আর না তাঁর না শ্যামলীর কপালে সুখ আছে। মেয়েকে আড় চোখে আর একবার ইসারা করলেন কালীদত্ত।

শ্যামলী গুটিগুটি পায়ে মার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক কি ভাবে মাকে উঠিয়ে নিজে বসবে বুঝতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত বসে পড়ল শ্যামলী, মুখ নিচু, অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তুমি ওঠ।'

অন্নপূর্ণা জেদ ধরে তবু একটু এটা সেটা নাড়তে লাগল। স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝাঁঝাল গলায় বলল 'তোমার না কচি নিম পাতা কিংবা উচ্ছে-টুচ্ছে আনতে বলে দিয়েছি। এখন এই বসন্তকালে তেঁতোটি না খেয়ে একটা অসুখবিসুখ বাধাতে কতক্ষণ!'

'কাল যে গুচ্ছের নিমপাতা আনলাম—'কালী দত্ত বললেন। 'হ্যাঁ, আস্ত একটা গাছ এনেছিলে—' অন্নপূর্ণা নিজেকে ঠোক্কর দিয়ে বলল।

কালী দত্ত হেসে ফেললেন। শ্যামলীও মার কথায় ঠোঁট চেপে না হেসে পারল না। নীচু মুখে বসেছিল বলে তার হাসিটা দেখা গেল না।

অন্নপূর্ণা স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'খুব রঙ্গ করে বাপে মেয়েতে মিলে ত হাসছে।' অন্নপূর্ণা আড়চোখে কোন ফাঁকে যে দেখে নিয়েছে কে জানে। 'পাড়ায় কি রকম হাম বসন্ত-টসন্ত হচ্ছে তার ত আর খোঁজ রাখ না।' কথাটা শেষ করে অন্নপূর্ণা চকিতে আরও একবার মেয়ের দিকে চেয়ে নিল।

শ্যামলী ততক্ষণে আনাজপাতি গুছিয়ে নিয়েছে। একবার উঠল, একবালতি জল নিল চৌবাচ্চা থেকে, আলুটা বেগুনটা ধুতে সুরু করল। অন্নপূর্ণা হাত ধুয়ে উঠে পড়ল।

কালী দত্ত পকেট থেকে একটা কাঁচি সিগারেট বের করে নিশ্চিন্তে এইবার ধরিয়ে নিলেন।

অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের চৌকাট থেকে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিল উনুনে আঁচ উঠেছে কিনা। এখনও ভাল করে আঁচ ওঠেনি। অন্নপূর্ণা উঠোন পেরিয়ে ঘরে যেতে যেতে স্বামীকে ইশারায় ডাক দিয়ে গেল।

অন্নপূর্ণার ঘরটি এতক্ষণে ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে শ্যামলী। বিছানাটি ভাল করে পাতা, দেওয়ালের পেরেকে মশারির খুঁটে-বাঁধা দড়িগুলো ঝুলছে না, জানলাটা খোলা। কালী দত্ত ঘরে আসতেই অন্নপূর্ণা বলল, 'তোমার মেয়েকে আজকাল রোগে ধরেছে।'

কালী দত্ত কথাটা বিন্দুমাত্র বুঝতে না পেরে স্বভাবসিদ্ধ নির্বিকার চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

অন্নপূর্ণা বিছানায় বসল। স্বামীর অনাগ্রহ তাকে বিরক্ত করছিল। অধৈর্যের গলায় বলল, 'খাচ্ছ-দাচ্ছ আর আপিস করছ, সংসারের কোন ব্যাপারে তোমার হুঁশ নেই। এমন মানুষকে নিয়ে আমার সংসার!'

কালী দত্ত মনে মনে বুঝতে পারছিলেন সারা সকাল ধরে যে ভূমিকাটি চলেছে এবারে তার রহস্যটি জানা যাবে। ঈষৎ আগ্রহ দেখিয়ে শুধোলেন, 'কি অসুখ হয়েছে শ্যামলীর?'

অন্নপূর্ণা এলো শাড়ির আঁচলটা বিছানায় মেলে দিয়ে তার ছোট ছোট দুটি চোখ স্বামীর চোখে রেখে বলল, 'তোমার মেয়ে সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে উনুনে আগুন দিয়ে এসে আবার বিছানায় পড়ে ঘুমোয়।'

কালী দত্ত নিজে ঘুমকাতুরে লোক, কোন মানুষ ভোর ছটায় উঠে সংসারের কাজ সারতে সারতে হঠাৎ যদি একটু গা এলিয়ে কোনদিন বিছানায় অল্পের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে তাতে কী যে ক্ষতি হয় তিনি বুঝতে পারছিলেন না। একে কি অসুখ বলে। সরল সাদা-মাটা গলায় তিনি বললেন, 'আজকাল ওরকম একটু আলসামি আলসামি ভাব থাকে। বসন্তকাল ত—!'

'থাকে—' অন্নপূর্ণা সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

কালী দত্ত তাঁর বক্তব্য বিশদ করার জন্যে বললেন, 'কী রকম গরম পড়ছে দেখছ না, রাতে ভাল ঘুমোন যায় না, এখানকার ক্লাইমেটটাই খারাপ, আলসেমি লাগে।'

অন্নপূর্ণা স্বামীর এই দ্বিতীয় বাসরের বিবরণ পুরোপুরি না শুনেই সমস্ত মুখে-চোখে অবহেলার ভাব ফোটাল। বলল, 'রাখ। মেয়ের গরমে ঘুম হয় না—অথচ বাপ ও বেশি বিছানায় পড়লেই কুম্ভকর্ণ।...' অন্নপূর্ণা মাত্র দুটি কথায় স্বামীর সমস্ত বিজ্ঞতা ধূলিসাৎ করে দিল। তারপর বলল, 'তোমার মেয়ের মনে এখন পোকা ঢুকেছে।' অন্নপূর্ণা থামল, স্বামীকেই যেন কথাটার অর্থ ধরতে সময় দিল একটু পরে বলল, 'উনি এখন রাত জেগে প্রণয়ের কথা ভাবছেন।' অন্নপূর্ণার রোগা শীর্ণ মুখে একটু বা ব্যঙ্গের ছায়া।

কালী দত্ত কথাটা বাস্তবিকই ধরতে পারেননি প্রথমে, সবটাই কেমন হেঁয়ালি এবং ধোঁয়াটে মনে হচ্ছিল। স্ত্রীর দিকে অল্পক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকলেন। শেষে কোন রকমে গলা দিয়ে যেন জড়ান একটি স্বর ছুটলো, 'প্রণয়—'

অন্নপূর্ণা স্বামীর বিমূঢ়তা এবং নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। 'আহা—যেন আকাশ থেকে পড়লে, প্রণয় আর বোঝনা। এ তোমার-আমার যুগ কিনা, আজকাল আইবুড়ো ছেলেমেয়ে ঘরে বসিয়ে রাখলে এমিটি হয়। এ পাড়ার ত দেখছি শুনছি সব—ঘরে ঘরে।

কালী দত্ত স্ত্রীর মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। যেন নির্বাক বিহ্বল হয়ে বসে থাকাই তাঁর একমাত্র কাজ।

'আমি কদিন ধরেই সন্দেহ করছিলাম—' অন্নপূর্ণা বলল 'আজ সকালে তোমার মেয়েকে দেখেই বুঝতে পারলাম। বলে কি, সুবোধদাকে আজ দেখতে যাব। হারামজাদীর কথা শোন। সুবোধ তোর কে হয়! খোঁজখবর নেবার হয় আমরা নোব, আমি নোব, সে আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। সম্পর্ক কুটুম্বিতে যা তা আমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক রে হারামজাদী!'

কালী দত্ত স্তম্ভিতের মতন বসে থাকলেন।

সমস্ত দোষটাই অন্নপূর্ণার। নিজের বাপের বাড়ির দেশের লোক বলে ছোকরাটাকে অন্নপূর্ণা এ বাড়ীতে বড্ড বেশি আসা-যাওয়া করতে দিয়েছে। যদি এই আসা যাওয়ার ফলে এরকম কিছু একটা ঘটেই থাকে তবে তার জন্যে অন্নপূর্ণাই দায়ী। মেয়ের দোষ তেমন একটা ভীষণ হয়ে কালী দত্তর চোখে পড়ছিল না। এই শান্ত সরল কোমল ধীর স্থির মেয়েটির অপরাধ তিনি উপস্থিত তেমন বড় করে দেখেছিলেন না। গায়ের রঙ কালো বলে, একটু মোটাসোটা বলে মেয়ের জন্যে কালী দত্ত পাত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চেষ্টাও না করেছেন এমন নয়। মেয়ের বয়স আঠার পেরিয়ে গেল। আর কতদিন ঘরে বসে বসে সে বেচারী ঘরে বাইরে তার গায়ের রঙের খোঁটা খাবে।

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল কালী দত্তর, চোখ মুখের ভাবটা থমথমে হয়ে এল। বললেন, 'খাল কেটে কুমির ত তুমিই এনেছ!'

'কি—' অন্নপূর্ণা মুহূর্তে যেন ছিলেকাটা ধনুকের মত ছিটকে উঠল, 'আমি খাল কেটে কুমির এনেছি না তোমায় পার করে দেবার জন্যে নৌকো এনেছি কদিন পরেই তা দেখতে পাবে। মেয়েটা ত ঘরে বসে বসে বুড়ি হয়ে যাচ্ছিল, তোমার ত মুরোদ হল না একটা পাত্র জুটিয়ে আনতে। শেষকালে মেয়ের চুল উঠে গেলে দাঁত পড়ে গেলে কি বিয়ে দিতে।'

কালী দত্ত নীরব। রামবাবুর মুখটি তাঁর চোখে ভাসছিল। চৌতুলতলায় খালি গায়ে পৈতেটাকে পেটের ওপর ঝুলিয়ে সেই কদাকার মানুষটা না জানি এবার কালী দত্তর মেয়েকে নিয়ে কী মুখরোচক আলোচনার আসর বসিয়েছে। কালী দত্তর অসাক্ষাতে পাড়ার আর পাঁচ জনের কাছে রাম কী যে বলে কালী দত্তর সংসার নিয়ে কে জানে? তাঁর মনে পড়ল শৈলেনের বোন রাধারাণীকে নিয়ে রাম দিনের পর দিন যত কেচ্ছা কুৎসা রটিয়েছিল এমন কি রাধারাণীর বিয়ে দিনটিতেও কালী দত্তকে যেসব কথা বলেছিল তেমনি ইতর কথা হয়ত এবার রাম অন্য কাউকে বলছে, বলবে শ্যামলীকে জড়িয়ে। কালী দত্তর মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। স্ত্রীর দিকে কঠিন চোখে চেয়ে কালী দত্ত বললেন, 'যা করবার সবই ত তুমিই করেছ। পাড়ার লোকের কাছে আমার মাথা যদি হেঁট হয় তবে তোমার সেই পেয়ারের ছোঁড়াটার মাথাও আমি আর আস্ত রাখব না।' কালী দত্তর গলা ক্রোধে দুঃখে ধরে এসেছিল।

চৈত্রের বেলা দেখতে দেখতে বেড়ে গেল। এঁজমালি কলেরজল কখন বন্ধ হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও কলের চারপাশে বেড় দিয়ে বাঁধান সিমেন্টের বেদীর ওপর ধোয়া বাসনপত্র ছড়াছড়ি পড়েছিল। কলতলার বাইরে মাটিতে কোনও কোনও বাড়ির একটা পোড়া হাঁড়ি কিংবা ঘাসের আড়ালে হাতা খুন্তিও দেখা যাচ্ছিল। কি চাকরের দল অনেকেই চলে গেছে, দু'একজন তখনও টুকটাক কাজ সারছে। আকাশের রোদ এখন উজ্জ্বল এবং তপ্ত। রোদের রঙ দেখে মনে হচ্ছিল খানিক পরে সমস্ত আকাশ জুড়ে চৈত্রের যে আগুন জ্বলে উঠবে এখন যেন তার প্রথম আঁচটা কেরানী-পাড়ার গায়ে লেগেছে। আকাশে আঁচের রঙ ধরে গেছে। দু'এক খণ্ড হালকা নীল মেঘ এক প্রান্তে পড়ে আছে। এখন যে বেলা দশটা বেজে গেছে তার লক্ষণ এ পাড়ায় স্পষ্ট। পাড়াটা অনেকটা শান্ত। অপিসের বাবুর দল ছাতা মাথায় পান চিবোতে চিবোতে বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে অপিসে চলে গেছে; কেউ কেউ তখনও যাচ্ছিল। স্কুলের ছেলে-মেয়েগুলোকে সদরের বাইরে মাঠে রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল। বইপত্র বগলে দল বেঁধে তারা স্কুলে যাচ্ছে। মেয়ে স্কুলের

ঝি-টাকেও ঠিক এই সময় দেখা যায়, বাড়ি বাড়ি ঢুঁ দিয়ে পড়ুয়া মেয়েদের ছুটিয়ে বিরাট একটা দল নিয়ে সে কেরানী পাড়া ছাড়বে।

এইমাত্র কেরানীপাড়ার বুড়ো পিয়নটা মঙ্গল হালদারের বাড়িতে এসে কড়া নাড়ল। মঙ্গল বারান্দায় বসে বসে তার জামাকোনটা আগাগোড়া খুলে সারতে বসেছে, তার হাত ভর্তি গ্রিজ, দুহাতেই যত রাজ্যের ময়লা। ছোট বড় যন্ত্রপাতি নিয়ে সে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।

মঙ্গল বলল, 'দেখ ত।'

শোভা সবে মাত্র রান্নার পাট চুকিয়ে বাইরে এসেছে। স্নানে যাবার আগে চুলের জট ছাড়িয়ে তেল মাখছিল মাথায়। স্বামীর কথায় শোভা উঠল। এক মুহূর্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে চিঠি নিতে চলে গেল।

শোভাকে আর দরজা খুলতে হল না, কপাটের ফাঁক দিয়েই চিঠি গলিয়ে ফেলে দিয়েছে বুড়ো পিয়ন। শোভা পিঠ দুইয়ে খামটা তুলে নিল। খামের ওপর ঠিকানাটা এত স্পষ্ট যে শোভা খামটা খুলতে না খুলতেই যেন সবটুকু পড়ে নিতে পারল। দু মুহূর্ত নিশ্চলকে দাঁড়িয়ে থাকল, ওর মুখ পাণ্ডু হয়ে এসেছিল। চিঠি হাতে শোভা একটিবার বন্ধ দরজার দিকে তাকাল, তার বুকের স্পন্দন দ্রুত।

শোভা চিঠি হাতে আস্তে আস্তে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

'কার চিঠি?' মঙ্গল বারান্দা থেকে শুধালো।

'দাদার।' শোভা স্বামীর দিকে তাকাল না। বারান্দা দিয়ে ঘরে চলে যাচ্ছিল।

'তোমার বড়দার?' মঙ্গল ছেঁড়া কালি-ঝুলি মাখা নেকড়ার হাতের গ্রিজ মুছে নিচ্ছিল। 'কি লিখেছে?'

শোভা ততক্ষণে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েছে। বলল, 'দেখিনি এখনও।' স্বামীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না শোভা, সোজা ঘরে ঢুকে গেল।

ঘরে জানালার কাছে এসে প্রথমটা জানালার দিকেই মুখ করে দাঁড়াল তারপর দরজার দিকে একপলক চেয়ে নিল। খামের মুখ আস্তে করে ছিঁড়ল। এ চিঠি তার পক্ষে বেশিক্ষণ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত না। চিঠিটা সবে মাত্র বের করেছে বারান্দায় মঙ্গলের গলা শোনা গেল। 'আমার দেশলাইটা দাও।'

শোভা চমকে উঠল। দরজার দিকে ভীত চোখে তাকিয়ে তার মনে হল মঙ্গল যে কোন মুহূর্তে ঘরে এসে পড়তে পারে। যদি এসে পড়ে; যদি চিঠির দিকে হাত বাড়ায়, বলে, দাও দেখি কি লিখেছে তাহলে শোভা কি এই চিঠি কিছুতেই স্বামীর দিকে বাড়িয়ে পারবে? না—কিছুতেই না। অথচ একদিন বেপরোয়া হয়ে এই রকম কোন চিঠি যদি সে স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিতে পারত ভাল হত। শোভা কিছুতেই তা পারে না। কিসের এক কৌতূহল এবং অস্বাভাবিক মমতা তাকে দিনের পর দিন এই অদ্ভুত আকর্ষণের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কে জানে এর পরিণাম কি হবে। একদিন মঙ্গলের হাতে এই রকম কোন চিঠি ধরা পড়বে। সেদিন চিঠি পড়ে হয়ত মঙ্গল তার শক্ত কঠিন হাতের দশটা আঙুল দিয়ে শোভার গলা টিপে ধরবে। শোভার পক্ষে দেবার মত কোন কৈফিয়ত তখনও থাকবে না যেমন আজও নেই। একথা মঙ্গল বিশ্বাস করবে না যে, মঙ্গলের সেই থাইসিস হওয়া বন্ধু অচিন্তার সঙ্গে সত্যিই কোন সম্পর্ক শোভার নেই; কোন দিন ছিল না। তা সত্ত্বেও এই চিঠি, এই এক তরফা কান্না, মিনতি, পাগলামির খোলামেলা বিবরণ কেন যে শোভার কাছে ঘৃণ্য ত্যাজ্য নয় তার জবাব নেই। শোভা বাস্তবিকই বলতে পারবে না: বিশ্বাস করো এমন চিঠি আমি চাইনি আমি তাকে লিখতে বলিনি, আমিও লিখিনি।

চিঠিটা শোভা বিছানার গদির তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। টেবিলের ওপর দেশলাইটা পড়ে ছিল। হয়ত মঙ্গলই কখন এনেছিল হাতে করে, ফেলে গেছে। শোভা দেশলাই নিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'পড়লে?' মঙ্গল মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

শোভা অন্যমনস্ক ছিল, স্বামীর প্রশ্নটা প্রথমেই যেন বুঝতেই পারেনি, পরে বলল। দেশলাইটা মঙ্গলের হাতেবু দিয়ে বলল, 'পড়েছি।'

'কি লিখেছে?'

'দাদার অসুখ।'

রামবাবু নিত্যকার মতন তেঁতুলতলায় বসেছিলেন। তাঁর আড্ডা আজ তেমন জমে নি। বেশ বেলা হয়েছে। কি কথায় যেন নাড়ুর মার কথা মনে পড়ল।

মানুষটার আবার সকালের দিকে শরীর খারাপ হতে শুরু করেছে, ঘুম থেকে উঠতে চায় না, মুখ ধুয়ে চা টুকু পেটে পড়তে না পড়তে হড়হড়িয়ে বমি শুরু করে। এতদিন শুধু বমিটা এত জোর দেয়নি। আজ নাড়ুর মার কাহিল অবস্থা। বিছানায় সকাল থেকেই লটকে আছে, বছর দেড়েকের কোলের ছেলেটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে, কাঁদছে। সংসারের সব কিছু আজ মেয়েদের হাতে। সরমা সকাল থেকেই রান্নাঘরে শান্তি দিদিকে জোগান দিচ্ছে কখনও, কখনও বা সংসারের আর পাঁচটা খুঁটিনাটি কাজ সারছে। আজ রামবাবু সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আলস্য কাটাতে কাটাতে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে বড় মেয়ে এবং বউ-এর কথা শুনেছেন। নাড়ুর মা তখন সবে মাত্র একপাদা বমি করে টলতে টলতে ঘরের চৌকাঠে এসে বসে পড়েছিল, সরমা বোধ হয় মাকে হাত ধরে নিয়ে আসছিল কলতলা থেকে। মা এবং মেয়ের মধ্যে তখন অস্পষ্ট সংক্ষিপ্ত বা একটি দুটি কথা হচ্ছিল তা থেকে রামবাবু বুঝতে পারলেন সরমা মার অসুখের কারণ কি সহজেই ধরতে পেরেছে। শুয়ে শুয়ে

রামবাবুর তখন কেমন একটা রাগ এবং ঘেন্না হয়েছিল বউয়ের ওপর। মনে হচ্ছিল, এই মেয়েমানুষটা একেবারে বর্ষার মাটি, যা পাচ্ছে তাতেই আগাছা গজিয়ে চলেছে।

মনোহরদা উঠে যাচ্ছিলেন, তিনকড়িও উঠি উঠি করছিল, রামবাবু বললেন, 'আরে বস আর একটু। দাও একটা বিড়ি দাও।' রামবাবু তিনকড়ির দিকে হাত বাড়ালেন।

মনোহরদার আর তেমন আগ্রহ ছিল না বসার। অপিসের তাড়া তাঁর ইদানীং নেই। রিটায়ারমেন্টের আগে পাওনা ছুটি ভোগ করছেন। তিনকড়িরও তেমন কোন তাড়া ছিল না। হস্তাভোর রেল ইয়ার্ডে রাতে চাকরি করে এখন ডবল্ রেস্টে আছে। বাড়িতে বউ ছেলে নেই, বাপের বাড়িতে বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে, মনে হয় না আর ফিরবে। অন্তত চৈত্র মাসে যে বউ আর ফিরছে না এ ত জানা কথা। তিনকড়ির ঘর এখন তাই কাঁকা আকর্ষণ-হীন। অবশ্য স্ত্রীবিহীন জীবনটাও তিনকড়ির মন্দ লাগছে না। আরও একটু বেলায় বাড়ি ফিরে স্নান করবে, চন্দ্রদের মেসে দুমুঠো খাবে, তারপর ঘুম। বিকেল গড়িয়ে গেলে তিনকড়ি উঠবে, তাসের আড্ডায় গিয়ে বসবে এবং অনেক-রাতে বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে আবার ঘুম। বউ না থাকায় ইদানীং তিনকড়ির বাড়িতেও একটা তাসের আড্ডা বসে। যদি কেশব চাটুজ্যে আড্ডায় আসে তাহলে বলা যায় না তাসের পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে একটু মালটালও খাওয়া যায়, বড়িতে বসে, হাঙ্গামা না পুইয়ে।

মনোহরদা কয়েক পা এগিয়ে যেতে রামবাবু তিন-কড়িকে বললেন, 'মনোহরদা রিটায়ারমেন্টে কত পাচ্ছে হে তিনকড়ি?'

তিনকড়িকে অবশ্যই এ প্রশ্ন শুধনো। তিনকড়ির পক্ষে কোনমতেই কথাটা জানা সম্ভব নয়। তবু রামবাবু মনোহরদার অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চোখ রেখে চোখের পাতা স্থির রেখে শুধলেন, তারপর চুপ করে থাকলেন, যেন তিনকড়িকে সঠিক একটা হিসেব করার সময় দিচ্ছেন।

তিনকড়ি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল না। বলল, 'তা হরেদরে মোটাই হবে।'

'মোটা—!' রামবাবু তিনকড়ির দিকে বিরক্তির চোখে তাকালেন. 'মোটা-টা হচ্ছে কি করে?'

'হবে না—' তিনকড়ি ঈষৎ বিব্রান্ত হয়ে বলল, 'মনো-হরদার চাকরি ত অনেককালের. প্রভিডেন্টের সঙ্গে গ্র্যাচুইটি আছে—'

'তোমাদের সব সময় হাতী আর হাতীর লেজই চোখে পড়ে—' রামবাবু বিদ্রূপ এবং ভর্ৎসনার স্বরে তিনকড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন.' ইঁদুর আর ইঁদুরের লেজটা চোখেই পড়ে না। মনোহরদার তিরিশ বছর আগের মাইনে ছিল বাইশ টাকা, এইটি কাইন্ড-এ রিটায়ার করল—। কত আর লাখ দুলাখ জমতে পারে হে?'

তিনকড়ির এসব গুপ্ত তথ্য জানা ছিল না। রামবাবুর বিদ্রূপ-ঈর্ষা-বিরক্তি মাখান মুখের দিকে চেয়ে তিনকড়ি বোবা হয়ে বসে থাকল।

অল্প নীরব থেকে রামবাবু বিড়ির টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'সব মিলিয়ে মেরেকেটে চার পাঁচ হাজার হতে পারে। মনোহরদা বলে আট ন হাজার—' রামবাবু কথাটা শেষ করে সারা মুখে এমন একটা হাসি হাসি ভঙ্গি করলেন যাতে মনে হচ্ছিল তিনি বলছেন. এসব চালিয়াতি আমার কাছে কেন। তোমাদের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা।

তিনকড়ি কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল; তার মাইনে এখন সত্তরের কোঠা ধরেছে. কে জানে রামবাবুর কথার মধ্যে লুকানো আরও কোনও খোঁচা ছিল কিনা। তিনকড়ি বিব্রত হয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করল, বলল, 'মনোহরদার রেসপন্সিবিলিটি কিছু নেই। ছেলেটা শুনেছি ভালই চাকরি বাকরি করে। চার পাঁচ হাজার ঘরে পাক বুড়ো-বুড়ির চলে যাবে। বেশি বাড়িঘর ত আছেই।'

রামবাবু পেটের ওপর থেকে পৈতেটা টেনে বুকের কাছে নিলেন, চোখে পড়ল রাস্তার রাস্তা দিয়ে বটগাছের তলা পেরিয়ে একটি বউ আসছে সঙ্গে বাচ্চা নতন কে একটা ছেলে। মুহূর্তক সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রামবাবু বউটিকে চিনতে পারলেন। সিংহীর বউ। বাচ্চাটা পাশের বাড়ির পরেশের ছেলে। রামবাবুর চোখের পাতা আর পড়ছিল না। তিনকড়ি পাশে বসে আছে কথাটা রামবাবু যে ভোলেন নি এমন করে বললেন, বাঁকড়ো ঘেনার লোকদের সবকটার বেশ বাড়ি জমি জমা থাকে। তবু তারা চাকরি করতে পথে বেরোয় কেন বলতে পার হে! আমাদের মনোহরদার বাড়ি আছে, বাড়ির মাথায় চাল নেই ' রামবাবু অবজ্ঞা এবং উপেক্ষাভরে ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলেন। 'সিংহীর বউটা হাসপাতালে গিয়েছিল নাকি?'

তিনকড়ি সিংহীর বউয়ের দিকে চেয়ে থাকল। ততক্ষণে সিংহীর বউ অনেকটা কাছে চলে এসেছে। পরণের ডুরে শাড়ি গায়ের জামা এমন কি হাতের চুড়িগুলোও দেখা যাচ্ছিল। রামবাবুদের তেঁতুলতলায় বসে থাকতে দেখে মাথার এলোমেলো ঘোমটাটা একটু ঠিক করে নিল সিংহীর বউ। ওর ডান হাতে ওষুধের শিশি। তিনকড়ি বলল, 'সিংহী ট্রান্সফার পেয়েছে।'

'কোথায়?' রামবাবু শুধলেন।

'অপিডি'। তিনকড়ি বলল।

সিংহীর বউ তেঁতুলতলার কাছে এসে পড়েছে। রামবাবু কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলেন না। অনেক-খানি পথ হেঁটে আসতে আসতে সিংহীর বউয়ের ঈষৎ লম্বা

আবরণে মুখটিতে ঘাম জমে উঠেছে। কপালের গোড়ায় এলোমেলো কয়েকটি চুল, ডান গালে কান ঘেঁষে মটর দানার মত কালো আঁচিলটা রামবাবুর চোখে পড়ছিল। সিংহীর বউ রামবাবুর দিকে এক পলক তাকিয়ে পাশের বাচ্চাটির হাত ধরে হনহন করে চলে যাচ্ছিল। রামবাবু সিংহীর বউয়ের পায়ের চটি দেখছিলেন, শাড়ি দেখছিলেন, হাঁটার তালে তালে বউটির শরীরে যেখানে যেটুকু ছন্দ ফুটছিল রামবাবু কেমন একটা ক্ষুধার্ত লোভীর চোখে সবই লক্ষ্য করছিলেন। এমন মজবুত কাঠামো, আঁটো-সাঁটো অঙ্গ বউটার যে রামবাবুর ইন্দ্রিয়গুলো চড়া রোদে যেন জ্বালা করতে থাকে।

সিংহীর বউ রামবাবুদের কয়েক হাত তফাতে রেখে চলে গেল। যাবার সময় তার ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাথা মুখ নীচু করে কোনও ভীতিকর বস্তু এড়িয়ে সে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

রামবাবু বিরক্ত হলেন। তেঁতুলতলার ছায়ায় বসে প্রায় প্রত্যহ সকালে তিনি এক আধবার সিংহীর বউকে দেখেন। বাড়ির সদরে কিংবা দু'পা এগিয়ে কলতলার কাছে দাঁড়িয়ে কি চাকরদের হাত থেকে থালাটা বাসনটা নিয়ে যাচ্ছে—এ প্রায় প্রত্যহের ঘটনা। কে জানে কেন সিংহীর বউ যখনই কাজে কর্মে বাড়ির সদরে কি সদরের বাইরে এসে দাঁড়ায় দুপলক এদিক পানে চেয়ে—তেঁতুল গাছের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবে। রামবাবু এই তাকানোটুকু খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। সিংহী জমিদি চলে গেলে তার বউটাকে আর দেখা যাবে না ভেবে রামবাবু হঠাৎ ভীষণ বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন।

'সিংহীর বউ হাসপাতালে কি করতে গিয়েছিল হে।' রামবাবু বিরক্ত গলায় শুধলেন।

তিনকড়ির হাসি পাচ্ছিল। নিজের বউ হলে সে হাসপাতালে যাবার কারণটা বলতে পারত। পরের বউ কেন হাসপাতালে যায় বলা মুশকিল। তিনকড়ি পরিহাসের গলায় বলল, 'বাতের মালিশ আনতে।'

তিনকড়ির পরিহাস রামবাবুর অবোধ্য থাকল না। মুহূর্তে তিনি চটে গেলেন। তিনকড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'বাতের মালিশ তুমি আবার চিনিও না তিনকড়ি। আমি বাতও দেখেছি বাধকও দেখেছি।' সিংহীর বউ বাধকের রুগী।

তিনকড়ি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল। রামবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন সিংহীর বউ তাদের সদরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেখতে দেখতে রোদ আরও প্রখর হল। বেলা গড়িয়ে দুপুরে গিয়ে ঠেকল। সূর্য কেরাণীপাড়ার মাথার আকাশের মাঝখানে, খাঁ খাঁ রোদে সব যেন জ্বলে যাচ্ছিল। বাতাস শুকনো। এখন কেরাণীপাড়া প্রায় নিস্তব্ধ, বাবুরা অফিসে, ছেলেমেয়েগুলো স্কুলে, বেকারের দল ঘুমোচ্ছে। দুপুরটা গাঢ় নিঝুম হয়ে এসেছে। এই দুপুরে একটা কোকিল একটানা ডেকে যাচ্ছিল। হয়ত সকালের সেই কোকিলটা শিমুল গাছের ডাল ছেড়ে তেঁতুল অথবা রাস্তার পাশের কোনো দেবদারু গাছের ঘন ছায়ায় এসে বসেছে।

রেণুবালার চোখে তন্দ্রা, কেরা পাশে শুয়ে। বিছানাটা গরম লাগে বড় এই দুপুরে, তাছাড়া এই ঘরে রেণুবালাদের পালঙ্কের ওপর বিছানাটা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাহারী সুখনি পেতে তকতকে করে সাজিয়ে রাখা যে, রেণুবালার ইচ্ছে হয় না সন্ধ্যের আগে স্বামী ফিরে আসার আগে, বিছানায় কোথাও একটু ভাঁজ পড়ুক। রেণুবালার এক স্বভাবে দাঁড়িয়েছে, বরাবরই এমনি। স্বামীর বিশ্রামের জন্য যা সাজানো গোছানো সেখানে অন্যকে ভাগ দিতে ভাল লাগে না। পাশের ঘরে কেরা আর দুই ছেলের বিছানা। সে বিছানাটার যা হাল করে ছেলেগুলো। রেণুবালার হাজার নিষেধও তারা কানে নেয় না। নেবে না।

মাটিতে বৃন্দাবনী সতরঞ্চি পেতে বালিশের ওপর তোয়ালে পেতে রেণুবালা শুয়ে। তন্দ্রা আসছে। ঘর প্রায় অন্ধকার। জানলা বন্ধ। দোরের একটি পাট সামান্য খোলা, তাতে যেটুকু আলো আসছে—সেই আলোয় কেরা মায়ের পাশে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে।

হাসির কী এমন ছিল বইয়ে কে জানে, কেরা প্রথমে একটু চাপা খুক খুক করে হাসল, পরে থেমে আবার, শেষে জোর হেসে ফেলল।

'আ—রেণুবালার তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল। বালিশের ওপর দিয়ে এলানো চুলের গোছা মেঝের লুটোচ্ছিল। পা টান করে মেলা। নড়ল চড়ল রেণুবালা, চোখের পাতা খুলল, হাত দিয়ে চুলের গোছাটা আরও ছড়িয়ে দিল। হাঁটু মুড়ল, পাখার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, 'কি ফল ফল করে হাসছিস?

কেরার হাসি যেন আরও বেড়ে গেল। দমকে দমকে হাসতে লাগল। হাসি জিনিসটা এমনিই, একা যেন বেশিক্ষণ হাসা যায় না, শ্রোতা পেলে জোয়ারের মত উথলে ওঠে।

রেণুবালা বুঝি ঈষৎ বিরক্ত, তোর জ্বালায় দুপুরে দু দণ্ড শান্তিতে চোখের পাতা এক করা যায় না। খুস্‌খাস্ উস্‌খুস্ বই পড়া। কাল থেকে তুই আমার পাশে শুবি না।

কেরা ততক্ষণে হাসির দাপটে পেটে রাখা নিয়ে উঠে পড়েছে। কোমর দুইয়ে ঘম নিচ্ছে, বাথা সামলাচ্ছে। কোমরের বাঁধনটাও বুঝি একটু ঢিলে করল।

রেণুবালা পাখা তুলে মেয়েকে শাসাল। আর যদি হাসবি তুই—

কেরা আঁচলে চোখ মুখ মুছল। হাসতে হাসতে জল

এসে গিয়েছিল চোখে। বার কয় পুরো বুক নিশ্বাস নিল। বলল, এই যারা বই লেখে তারা এমন এমন সব মজার কথা লেখে না—'

রেণুবালা কোনো জবাব দিল না। তবে মনে হল, লেখকরা কি মজার কথা লেখে তা জানবার একটু আগ্রহ অনুভব করছে। মেয়ের গা থেকে পাখা সরিয়ে চোখের পাতা খুলে রাখল রেণুবালা।

কেয়া বালিশের পাশ থেকে বইটা কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'এক বুড়ি তার বুড়ো বরকে হামানদিস্তেতে করে পান ছেঁচে খাওয়াত। একদিন বুড়ি বুড়োর ওপর খুব চটে আছে। বুড়ো যেই না পান চেয়েছে বুড়ি ছেলের বউকে দেখিয়ে দিয়েছে। ছেলের বউ পান ছেঁচে শ্বশুরকে দিল। সেই পান খেয়ে শ্বশুরের গলায় সুপুরি লাগল, জিব পুড়ল, মাড়িতে সুচি ফুটল। বুড়ো বলছে, এ ওই বুড়ির কীর্তি। তাকে জব্দ করার ফন্দি। আর বুড়ি বলছে, বুড়োর কিছু হয় নি বুড়িকে জব্দ করার চেষ্টা।' কেয়া একটানা গল্পটা বলে আবার হাসতে লাগল. 'ইস্···কী কাণ্ড। অতই যদি তবে ঝগড়া করিস কেন!'

রেণুবালা অবাক। এতে হাসির কি আছে? কেয়ার ওপর এবং গল্পের সেই ছেলের বউয়ের ওপর বিরক্ত হয়ে রেণুবালা বলল, আজকালকার মেয়েগুলো শুধু সাজন গোজন জানে, পান ছেঁচবে কি করে? এ ওই বউটারই দোষ।' রেণুবালা নড়ে চড়ে দু মুহূর্ত বাতাস খেয়ে পাশ ফিরল।

কেয়া বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে মার পিঠের দিকে তাকাল। দেখলে কাণ্ড, মা একেবারে জজ ব্যারিস্টারের মতন এক কথায় রায় দিয়ে দিব্যি চোখ বুজল।··· আবার হাসি পাচ্ছিল কেয়ার। হয়ত হেসে ফেলত। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় হাসতে পারল না। একটুক্ষণ হাঁ করে ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। তাই উ, ঠিক, মা ঠিক কথাই বলেছে। একদিন বাবার ওপর মা রাগ করছিল। বাবার মতন মানুষের ওপর রাগ—তাও আবার মার মতন মানুষ। বাবা কি রাগের দিকে চেয়ে আছে, না ভাবছে কিছু। অফিস থেকে ফিরে খালি বগড়ই করছে। বরাবর বাবার খাবার চা সব মা দেয়, কেয়াকে দিতে দেয় না। সে দিন কেয়াকে বলল, তোর বাবার চা করে দিগে যা।··· কেয়া কত এটি সেটি করে করে চা করল, বাবাকে দিল। বাবা দু চুমুক চা খেয়েই হঠাৎ পেয়ালা হাতে একেবারে বাইরে উঠোনে। আরে রাম রাম—এ কি চা নাকি—নুন, চায়ে নুন, পড়ে গেছে—ছি ছি···ইস জিব গলা গেল আমার।' কেয়া অবাক। নুন কি, সে ত চিনির আর থেকে চিনি দিয়েছে চায়ে। মা বেরিয়ে এল। বাবা বললে, 'রাগের একটা লিমিট আছে, তা বলে চায়ে নুন দেবে গো! কেয়া একেবারে হতভম্ব। যত না না করতে চায়, মা তত জোরে মাথা নাড়ে; এ তোর কীর্তি। কী আমার কাজের মেয়ে হয়েছিস! লোকের বাড়ি গেলে আমার চেয়ে পুরুষকে নরকে রেখে পিষবে।' মা বিশ্বাসই করল না, কেয়া নুন দেয় নি ভুল করে। সেই চায়ের কাপ বাবা সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়েছিল দোপাটি গাছের মাটিতে। নয়ত কেয়া বাবাকে দেখত। মা নিজের হাতে চা করল বাবার। নিজেই নিয়ে গেল আবার।··· কেয়ার জীবন দুঃখ হয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল। দুঃখটা অবশ্য রাত্রে আর থাকে নি। একসময় ফাঁকা পেয়ে বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তোর মাকে একটু ঠাণ্ডা করে দিবাম, খুকি। ঘা চটে ছিল, কাল দেখছিল তোর মার মাথার চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে।···নে নে দুটো টাকা রাখ; সেই যে কী গানের বইটা বলছিলি—আনিয়ে নিস।···কেয়া বাবার কাণ্ড দেখে হেসে আর বাঁচে না।

বই সরিয়ে রাখল কেয়া, মেঝের ওপর রেখে দিল। বিন্দুমাত্র আকর্ষণ যেন আর নেই। চুপ করে চোখ খুলে ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। দরজার এক পাট আর একটু খুলে রাখার জন্যে ঘরের মধ্যে কেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ছাদটা যেন আড়ালে নিয়ে ঝুলছে। কেয়া তাকিয়ে থাকল, চোখের পাতা আর একটু ছোট করল তারপর ভাবল, যদি ওর মার মতনই স্বামী জোটে।

মায়ের সংসারের মতন একটি ছোট সংসারের বউ কল্পনা করে নিজেকে বসিয়ে দিল কেয়া। কিন্তু সেই সংসারের ছবিটা কিছুতেই এ-বাড়ির ছায়া পেরোতে পারল না। না পারুক, কি এল গেল! হ্যাঁ, কেয়া মার মতনই বউ, আর তার বর একেবারে বাবার মতন—ওই রকম সাদা মোটা সরল হাসি খুশি আর রঙ্গ ভরা। সারাক্ষণ হেসেই আছে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সর্বক্ষণ খুনসুটি করছে। কে বলবে—বাবা! তা হোক, তা হোগগে। সংসারে এমন মানুষ কটা পাওয়া যায়। মার মতন সুখী কে! কেউ না। এ পাড়ায় কেয়া আর একটিও বউ দেখে নি মার মতন সুখী। এত শান্তি কারও মনে নেই, মুখে নেই? মা যেন সেই···

কি সেই!—কি? কেয়া কিছুতেই মনে করতে পারল না, মার সুখ-শান্তিকে কি দিয়ে তুলনা করে স্পষ্ট করা যায়। চোখের পাতা বুজে কেয়া ভাবল একটু, ভাবল। না, মনে করতে পারল না। মনে করতে না পেরে চোখের পাতা খুলল, মার দিকে পাতা ফিরাল, ফিরে মার চুলের গোড়ায় খুব আস্তে আলতো করে আঙুল ছোঁয়াল, সুখ পেল না। মার গায়ে হাত দিল। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। কেয়া মার গায়ের চুলের শাড়ির গন্ধ পাচ্ছিল। হ্যাঁ, সুন্দর গন্ধ। মানুষের গায়ে এমন গন্ধ থাকে! হ্যাঁ, থাকে,—যদি সে আমার মায়ের মতন হয়। কেয়া

[১২০ পৃষ্ঠায় দেখুন]

(৬৮৪ পৃষ্ঠার পর)

পেলাম ওইদিন তোমাদের সভায়।' সভাপতি হয়ে আমার গৌরব বোধ হচ্ছিল। আমরা বলে এসেছি, মেয়েরা চিরদিন আমাদের পথ চুনিয়ে নিয়ে গেছে। কিরিয়ে আনার মত মেয়েও যে আছে, তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে, সেকথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল।

এমন যে কয়েকজনকে আমার জীবনে দেখি নি, তা' নয়। কিন্তু উত্তীর্ণের সংখ্যা এত কম যে সহসা শুনে মনে হয়, বাকি জীবনের কলুষে অনেকেই, শেষ পর্যন্ত, অনেক ঠেকতে ঠেকতে, কোনো একটা মন্থন সুন্দর ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে। অনেকে তাও পেরেছে কি না, জানি না। হয় তো আজও পথেই ঠেকে আছে। এক সব দোষ তাদের নয়। দায় পুরুষদের অনেক। কিন্তু পরের দোষ দেখিয়ে, আপন স্খালন সম্ভব নয়।

আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু আমরা সবাই জানি, আমাদের কোনো জ্বালাই জুড়োয় নি। সেই জ্বালারই অগ্নিশিখা, সেদিন আমি প্রায় একটি বাঙালী কিশোরীর ললাটে দেখলাম। দেখলাম তার চোখে, স্বতোৎসারিত কথায়।

সেই সঙ্গে, একটি অনুরোধ তোমাকে করি। হয় তো অল্প বয়স থেকে রাজনীতি ক'রে উইদাউট ইনটেলেকট মাষ্টারদের মত উপদেশ দেবার বাতিক হয়ে গেছে। কিংবা আমার বয়স দেখে তোমার নিজেরই অবাক লাগবে উপদেশ শুনতে। যদিও বয়সটা সত্যি আমার কম নয়। বলছি, লেখাপড়াটা যেন কোনো কারনেই মাটি ক'র না।

আমার আন্তরিক স্নেহ নিও। শুভেচ্ছাসহ, সারদা বসু স্নেহভাজনীয়াসু ;

খুব অবাক হ'য়ে গেলাম সেদিনের মিটিং-এর পরে তোমার দেখা পেয়ে। বুঝতেই পারি নি প্রথমে, কে এমন করে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ে। পায়ে হাত দেওয়াটা এবং নেওয়াটা, দুটোই আমি প্রায় কৈশোরেই বর্জন করেছি। সেদিন কিন্তু থমকে গেলাম মুখ ফুটে বলতে পারলাম না কিছু। কারণ, তোমাকে দেখেই আমার ভীষণ আনন্দ হ'ল। সেটাও ঠিক নয়। শুধু তোমাকে দেখেই কেন ? যে-প্রণাম দেওয়া নেওয়াকে এতদিন ধরে অগ্রাহ্য করে এসেছি।' সেদিন মনে হল, এর মধ্যেও কিছু আছে। কী, তা ব্যক্ত করতে পারব না। কিন্তু, প্রায় আবিষ্কারের মত মনে হল আমার।

তা' ছাড়া, সেদিন সেই মুহূর্তে আমার বেশী একটু ইমোশন ছিল। আমি সেদিন পুরোপুরি ইমোশানাল বক্তৃতাই দিয়েছি। তুমি তার পরিণতি কিছুটা নিশ্চয় অনুভব করতে পার। সকলের এাপ্রিসিয়েশন, মুগ্ধতা, সব মিলিয়ে নিজের মধ্যেও একটি অদ্ভুত কলরোল সৃষ্টি হয়। একটি আশ্চর্য উন্মাদনা। মুগ্ধতা, বিশ্বাস এবং উৎসাহের সৃষ্টি হয়। যারা স্বীকার করে না, তারা সব। আমি এখনো সে-দলে ভিড়তে পারিনি।

ইমোশনের পিছনে নিশ্চয়ই অনেক মর্মান্তিক কারণ ছিল। আমি বিক্ষুব্ধ ছিলাম। হয়তো অনেক কথা আমার না বলাই উচিত ছিল। বর্তমানে, আমাদের দলের যেসব ব্যক্তি এবং বন্ধুরা কর্তা হয়েছেন, তারা অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমার সেদিনের বক্তৃতা শুনে। তোমাকে এসব কথা লেখা হয় তো আমার উচিৎ হচ্ছে না। কিন্তু তোমাকে আমার বিশ্বাস হয়। তোমাকে অনুরোধ নিশ্চয় করতে পারি, তুমি আমার পত্রগুলি কাউকে দেখিও না। অন্য কোনো কারনেই নয়। আমাদের ব্যক্তিগত পত্রাদি একটু সাবধানে রাখা-ই উচিত। চোখে পড়লে, কার কখন কী কাজে লেগে যাবে, বলা যায় না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সংবাদপত্রে দেখলে হয় তো, তোমার ব্যক্তিগত পত্র ছাপা হ'য়ে বেরিয়েছে! সে হিসেবে রাজনীতি যত ভাল, তত মন্দ। রাজনীতির একটা নোংরা দিকও আছে। সব নীতিরই বোধহয় আছে। তবে রাজনীতি একবার নোংরা হ'লে, তাকে শুদ্ধ করা বড় কঠিন। ক্ষতিকারক অনেক বেশী। কারণ তার বিস্তারিত হবার পরিসর অনেকখানি।

সেদিনের বক্তৃতার পরদিনই আমার ডাক পড়েছিল কর্তাদের কাছে! হয় তো এমন দিন থাকবে না। আমাকে দলের বাইরে সরিয়ে দেওয়া হবে। এখনো কর্তারা আমাকে খোসামোদ করেন। প্রধান কর্তাকেই বলতে হয়, 'আপনি কলকাতায় থাকেন না। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি করে যান, আমাদের সামলানো দায় হ'য়ে যায়। আপনি কি সবদিক রক্ষা করতে পারেন সত্যি সত্যি ?

থাক এসব ভিতরের কৌশলের কথা। তুমি দেখা করার মুহূর্তটিতে এত বেশী ইমোশনড ছিলাম। আমি সব ভুলে গেলাম। সেই মুহূর্তটিতে, একটি সত্যের মত তোমাকে মনে হল। সেই ছাত্র সভার বক্তৃতামঞ্চের দীপ্ত চক্ষু অগ্নিশিখাকে আমি দেখলাম প্রায় ঝরা ফুলের মত। আমি কবিতাই ক'রে ফেলছি। হেস না যেন। এটাও আমার কাছে আজ আবিষ্কারের মত লাগছে।

তুলিকা, তোমাকে একটা কথা বলি। আমাকে কেউ কেউ ভয় করে। ঘৃণাও করে অনেকে। ভক্তিও নিশ্চয় করে কেউ কেউ। তাই এ পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধু নেই। যাকে, না মেপে, অপ্রয়োজনে কোনো কথা বলতে পারি। মাপামাপির বাইরে এবং অপ্রয়োজনেও এত কথা এত সময় মনে আসে যে, সেগুলি প্রায় রুদ্ধ হয়েই থাকে। তাই তোমাকেই বলি, তুমি অন্তত আমাকে খুব একটা কেউকেটা ভেব না।

তোমার চোখে অবশ্য আমি ভক্তির অর্ঘ্যটা দেখেছি।

সেটাও না হয় রইল। কিন্তু সাধারণ চোখেও একটু দেখ। যদি তোমার দাদা-ই হতাম। সেইরকম। তোমার আধুনিক মন আবার এসব নিয়ে কী ভাববে, কে জানে?

তোমার প্রবন্ধটি পড়বার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রইলাম। আমার কলকাতার ঠিকানাও দিলাম। কলকাতায় এসে যখন থাকব, তখন তুমি এলে খুশি হব। আমার বন্ধুপত্নীটি অবশ্য ভীষণ কড়া। প্রায় কাউকেই প্রবেশ করতে দেন না, আমি থাকাকালীন। তোমার অবাধ অধিকার। স্নেহ নিও।

সারদা বসু

স্নেহের তুলিকা,

বরাকরে বসে তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি। কাজ প্রায় আকণ্ঠ। তার ওপরে আসন্ন এক গোলমালের আশঙ্কা করছি যে কোনো মুহূর্তেই এ অঞ্চলে ধর্মঘট শুরু হয়ে যেতে পারে। আমি দেখতে পাচ্ছি এবং বিশ্বাসও করি, মালিকদের পক্ষ থেকেই সব সময় প্রোভোক করা হয়। এ-কথায় আমার দলের লোকেরা কখনো খুশি হয় না। কারণ, মালিকের সঙ্গেই তাদের আসল বন্ধুত্ব।

সব মিলিয়ে নানান দুশ্চিন্তার মধ্যেও তোমার পত্রটি একটি প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাসির মত এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার এত প্রশংসা করেছ কেন? এত বড় করেছ কেন? এর জন্যে তো অনেক লোক আছে। দু'রকমই লোক আছে। কেউ বড় করে। কেউ ছোট করে।

প্রবন্ধের কাটিং পাঠিয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ। তোমার প্রবন্ধ পড়ে প্রায় হতবাক হয়েছি। তোমার সেই বক্তৃতারত মূর্তিটি আমার মনে পড়ছিল। তার চেয়েও বেশী গম্ভীর মনে হচ্ছিল তোমাকে, প্রবন্ধ পড়তে পড়তে। ছাত্রজীবনের এত খুটনাটি বিষয় ও সমস্যা জানবার সময় পেলে কখন? নিশ্চয় তোমার নিজের জীবনের সমস্যা দিয়েই অনেকখানি বুঝেছ। তবু ছাত্রছাত্রী তো অনেক আছে। সবাই কি সমস্যা বোঝে, না তা ব্যক্ত করতে পারে? তোমাকে যদি না চিনতাম, তা' হ'লে বিশ্বাস করতে পারতাম না, এই জটিল গম্ভীর প্রবন্ধ তোমার বয়সের একটি মেয়ে লিখেছে।

এই যুগটার কথা বলতে গিয়ে, আমরা সব সময় বলি, ডিটোরিয়েট করেছে। বলি, তার কারণ সব সময়, পথে ঘাটে সিনেমা থিয়েটারে, ঘরে ঘরে, সর্বত্র যে-ছবি আমরা দেখতে পাই, তাতে ও-কথাটাই প্রথম মনে আসে। আজ যদি দলের অনেকের মত শাসকের ভকমা এঁটে এ্যাসেম্বলী কিংবা পার্লামেণ্টে গিয়ে বসতাম, আরো বেশী বলতাম। সমালোচনা করতাম যুগটার।

আজ পতিতের সংখ্যা যেমন অনেক বেশী, উত্থানও কম নেই। তোমাদের দেখে সেটা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, বুড়োদের মত গালে হাত দিয়ে বসে ভাববার কিছু নেই। তোমরা কত ম্যাচিওর। অল্প বয়সেই তোমাদের কত বেশী জানতে হচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে, কত জটিল কুটিল পথে তোমাদের যাত্রা, সেটা এই ভারতের অভিভাবকেরা দেখতে পান না।

তুমি স্কুল-কলেজের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে, লাইন কেটে, দাগ দিয়ে একটা খুব রুক্ষ জটিল চমক দেখাবার চেষ্টা কর নি। সহজভাবেই লিখেছ। কিন্তু ভাবনাগুলি ভাবা কত অসহজ। আমি জানি, অভিভাবকদের অনেকেই এত কথা চিন্তা করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা কর্তা, সেই সব মাথা মোটার দল বোধহয় কোনোদিন তোমার প্রবন্ধ ঘেঁটেও দেখবে না; দেখলে তাঁদের একটি চৈতন্য হত যে, শিক্ষাটাকে কোন্ পর্যায়ে এনে ফেলেছে তারা। পরীক্ষার হলটাকে যারা 'মধ্যরাত্রের শুঁড়িখানা' বলে সমালোচনা করেন, তাঁরা জানেন না, ওই শুঁড়িখানার সৃষ্টিকর্তা তাঁরা-ই।

পরিচ্ছন্ন সাবলীল তোমার বক্তব্য। ছদ্ম নামে লিখে ভালই করেছ। নইলে সত্যি তোমাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত।

তোমার প্রবন্ধ আর তোমার পত্র, দুটিতে কত তফাৎ। দুই তুলিকাকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে।

তোমাদের পরিবারের কথা লিখেছ; 'অন্তরে অন্তরে গোঁড়া, বাইরে উদার।' এ বিষয়ে সহসা আমি কিছু বলতে পারব না। গোঁড়ামি কাকে বলে? সম্মানের প্রতি স্নেহবশত সাবধানতাকে যেন গোঁড়ামি মনে ক'র না। কোথাও একটা বাঁধন থাকা ভাল। দেখ তুলিকা, রাজনীতি করতে করতে, একেবারে বন্ধনহীনা মেয়েও আমি দেখেছি। আমার প্রথম চিঠিতে রাজনীতির আসরের মেয়েদের কথা তোমাকে বলেছি। রাজনীতি করবে বলেই যেন তারা সব বাঁধন ফেলে এসেছে। সেটা যে কী মারাত্মক, কী ভয়ংকর! মেয়েরা সিনেমা থিয়েটারে যোগদান করলে, আমরা বেশ প্রাণ খুলেই ব'লে থাকি, মেয়েটির ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হ'য়ে গেল। কিন্তু আজন্ম পারিবারিক বাঁধন থেকে মুক্তির নাম ক'রে, প্রবৃত্তি ও বাসনার লাগাম ধরে, অনেক মেয়েকে ছুটতে দেখেছি রাজনীতির আসরে। মুক্ত অবাধ অথচ অসম্মানজনক নয়। এমন কাঁকির আসর আর কোথায় পাওয়া যাবে! হয় তো তাদের মধ্যেও কেউ কেউ একটী সৎ বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি নিয়েই এসেছিল। তারপরে আর রুদ্ধ বাসনা দমিয়ে রাখতে পারে নি। সব চেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে, এই লাগাম ছাড়া বাসনা চরিতার্থকেও তারা রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতার অঙ্গ হিসেবে নিয়েছে। নিজের আত্মতৃপ্তির নাম দিয়েছে তারা, জীবনকে উৎসর্গ করা।

তারপরে এক সময়ে তাদের ফুর্তি ফিরেছে। তখন চারদিক অন্ধকার। কেঁদে কূল পায় না। তাদের আশ্রয় গেছে, সম্মান গেছে, সমাজকে দাদারকে শুধু অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই তাদের জীবনে।

কিন্তু, তোমাকে এত কথা লেখার দরকার নেই আমি জানি। আর এ ভুলও নিশ্চয় করবে না যে, আমি তোমাকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে বলছি। বরং আমার সমর্থনই রয়েছে পুরোপুরি। সেকথাও তোমাকে আগে জানিয়েছি। আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতাটা ব্যক্ত করলাম।

না হয় বাবা মা একটু গোঁড়াই হলেন। কাজে যাতে তাঁরা কোনো বাধার সৃষ্টি না করেন, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব তো তোমারই। তুমি যে এতখানি এসেছ, বাইরে বেরুতে পেরেছ, এতে কি তাঁদের কোনো অবদান নেই? নিশ্চয়ই আছে। তাদের ভয়টাকে কাটানো দরকার। তোমার কাজ, তোমার মুভমেন্টস্, আপনি আপনি তাঁদের সে ভয় কাটিয়ে দেবে।

বাঁধন একটু থাক। ওটা স্নেহ। ওটা ভালোবাসা। ওটা সন্দেহ আর অবিশ্বাস ভেবে যেন তাঁদের সহসা আঘাত ক'রে ব'স না। আর যদি সন্দেহ আর অবিশ্বাসও হয়, বাইরের যে কোনো অপমানের চেয়ে, ঘরের সন্দেহ অবিশ্বাস নিরসনের চেষ্টা অনেক ভাল।

দেখ, কেমন মাস্টারমশাইদের মত অভ্যাসটা তৈরী করেছি। কেবলি উপদেশ আর উপদেশ। পড়াশোনা কেমন চলছে?

তোমাকে একটি মজার কথা লিখি। তুমি কলকাতায় আমার বন্ধুর বাড়িতে গেছ। তোমাকে বলেছি নিশ্চয়, আমার বন্ধু জগদীশের একটি প্রেস আছে। ও আমার সমবয়সী। রাজনীতি ত্যাগ করে বিয়ে টিয়ে করেও বেশ সংসারী সেজে বসেছে। ভালই করেছে। মানুষ তার নিজেকে চিনে যদি সংসারে চলতে পারে, তার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই। ওর স্ত্রী সতীর সঙ্গে ও তোমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। বড় ভাল মেয়ে। রাজনীতির বা বোঝে না! কিন্তু এমন একটি খাঁটি মন আছে যে, আমার ধারনা যে-কোনো মহৎ পণ্ডিত ব্যক্তিও ওর সান্নিধ্যে সুখী হবে। কলকাতায় গেলে আমি ইচ্ছে করেই ওদের বাড়িতে থাকি। যদিও কলকাতায় বাসস্থানের সত্যি আমার কোনো অভাব নেই। বরং এত আছে যে আমার লজ্জা করে, ঘৃণাও হয়। আমার মত তুচ্ছ ব্যক্তিকে রাজা করে রাখবার আয়োজন দেখলেই, আমি সন্দেহ করব, এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ আমি তো জানি, কলকাতায় আসার সংবাদ পেলে যারা আমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেয়, রাজকীয় ব্যবস্থা করে থাকবার, একবার তাদের হাতায় ঢুকলে, আমাকেও একজন পশ্চিম বঙ্গের অধিপতি সেজে বসতে হবে। পরের হাতের খেলার পুতুল হতে হবে।

তা ছাড়া নিজের ঘর নেই বলে কি আমার একটু ঘরের তৃষ্ণা থাকতে নেই? তাই কলকাতায় যাবার আগেই আমি জগদীশকে সংবাদ দিয়ে রাখি। জগদীশ নিজে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকে। কোনো কোনো সময় সতীকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। কলকাতাতেই আসলে আমার একটি ঘর আছে। যেখানে সারদা বসুকে কেউ রাজনৈতিক নেতা বলে মানে না। দাড়ি কামাবার জন্যেও ধমক খেতে হয়। কষ্ট হলেও, পাতে কিছু ফেলে রেখে উঠে যাবার উপায় থাকে না।

না:, ধান ভানতে শিবের গীত এসে ফেললাম। ওদের কথা বলতে গেলে কম বলে শেষ করতে পারি না। যে-জন্যে ওদের কথা এল। সতী একটা চিঠি লিখেছে, তাতে তোমার উল্লেখ করেছে। "দাদা, জানেন তো, মেয়ে হয়ে কোনো মেয়ের রূপেগুণে মুগ্ধ হওয়া বড় কঠিন কাজ। কিন্তু আপনার নতুন শিষ্যা তুলিকা সত্যি আমার হৃদয়-হরণ করেছে। কী নিরহঙ্কার, অথচ কেমন গুণী মেয়ে। কী সুন্দর রুটি বেলতে পারে। হাতের লেখা কী সুন্দর। তবে, তুলিকা ওর চুলগুলির বড় অযত্ন করে। আপনি না থাকতে একদিন আমার কাছে এসেছিল। আমি জোর করে ধরে, চুল বেঁধে খোঁপা করে দিয়েছিলাম। কী মস্ত খোঁপা হয়েছিল! আর তুলিকা তো হেসেই বাঁচে না। কিন্তু আমি চোখ দিয়ে একেবারে জল বার করে দিয়েছিলাম। এমন চিরুণী চালিয়েছি, আর এমন করে বেঁধেছিলাম, শ্রীমতী টের পেয়েছিল সেদিন কার হাতে পড়েছে। আমাকে বললে, 'বউদি মারা গেলুম।' আমি বললাম, মর। কিন্তু চুল তোমাকে বাঁধতে হবে রোজ। সবাই যা সাধনা করে পায় না, তা আপনি আপনি পেয়েছ বলে বুঝি তার দাম নেই। তারপরে তুলিকা আরো বললে. 'বউদি, খোঁপা নিয়ে আমি রাস্তায় বেরুব কেমন করে? আমার ভীষণ লজ্জা করবে।' আমি খুব বকেছি। দেখুন দাদা, আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু আমি তো লেখাপড়া শিখিনি। আমাকে দিয়ে আপনার যে সাধ মেটেনি. সেটা আপনি তুলিকাকে দিয়ে কিন্তু মেটাবেন।"

এই হল সতী। কী রকম কমপ্লিমেন্ট তোমাকে দিয়েছে একবার ভাব। আর ও জানেনা, তোমাকে দিয়ে আমার নিজের সাধ মেটাবার কিছু নেই। তুমি তোমার নিজের দ্বারেই এ দেশের সাধ মেটাবে।

এখানকার গোলমাল আপাতত থামাতে পারলে, শীঘ্রই কলকাতা যাব। তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। যখন ইচ্ছে চিঠিপত্র দিও। আমার বেশ ভাল লাগে। ইতি—

সারদাবসু।

(১০২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঝিলিমিলি

মৈত্রালী রায়চৌধুরী

আজ অকপটে সব কথা তোমাকে বলি। এই দেড় বছর ধরে, না, বোধ হয় দেড় বছর নয়, বছর পনেরই হবে, যে যন্ত্রণা তুমি ভোগ করেছ, আমি জানি। আমি প্রতি দিন প্রতি নিয়ত পলকে পলকে তোমার মুখে যে আলো ছায়ার খেলা দেখেছি, আমি জানি সে আলো কিসের, সে ছায়া কেন তোমারই অজান্তে তোমার মুখকে কালো করেছে।

সুরমা, এ সংসার বড় বিচিত্র। আর মানুষ, মানুষের মন গহন অরণ্য। মনের সে গহনে কি আছে কেউ জানে না। মুহূর্তে সেখানে কত জন্ম কত মৃত্যুর সূচনা কেউ তার খবর রাখে না। ধীরে ধীরে তারা তাদের খেলা খেলে। তারপর একদিন পরিবর্তনের সেই মহীরুহকে দেখে ভয়ানক ভাবে চমকে ওঠা ছাড়া আর কিছুই তার করবার থাকে না। সুরমা সব মানুষের মনেই বুঝি এই রহস্য, তাই সংসার এত বিচিত্র। অথবা মানুষের মন বুঝি যাদুকরের সেই ঝাঁপি, খুলতে বড় সাধ কিন্তু বড় ভয়—কি জানি কি বেরিয়ে পড়বে। তাই বুঝি এ ঝাঁপি পুরোপুরি কোনদিনই খোলা যায় না।

আজ থেকে পুরো দুটো বছর আমি তোমায় আর চোখে দেখতে পাবোনা। কালকেও আমার প্রবাস যাত্রার শুভেচ্ছা সভায় তুমি ছিলে আমার পাশে। তোমারই আলোয় আমি উদ্ভাসিত উজ্জ্বল ছিলাম, কালকেও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তোমারই মুখাপেক্ষী ছিলাম কিন্তু আজ থেকে অন্তত আগামী দুটো বছর আমি আমাতেই সম্পূর্ণ থাকবো। আমার এই প্রবাস যাত্রার পেছনে আর কোন কারণ নেই, শুধু এইটুকু। এ কথা আর কেউ না জানুক তুমি অন্তত জেনে রাখো। যে সন্দেহ অনেকের মনেই আনাগোনা করছে, আর কেউ না জানুক তুমি অন্তত জানো সেটা শুধু সংশয় নয়, তা যথার্থ। লীলাকে আমি আমার সংগে নিয়েই যাচ্ছি। এ কথা চাপা থাকবে না আমি জানি। কয়েকদিন পরেই আমার নামে ছি ছি কার পড়ে যাবে। আফিসে সহকর্মীরা মুখ টিপে হাসবে, আত্মীয়রা অনেকেই নিঃসংশয় হওয়ার জন্য তোমার সাথে দেখা করবে, প্রশ্ন করবে, কথাচ্ছলে সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু, তুমি আমায় ভুল বুঝো না সুরমা। তুমিও যদি ভুল বোঝ তবেই তা হবে আমার অনন্ত দুঃখের কারণ। তুমি অন্তত বুঝে নিও এ ছাড়া আর অন্য কিছু আমি পারলাম না। এই দেড় বছর ধরে আমি নিজের মনের সংগে লড়াই করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি, তবু এরই জন্য নিয়ত নিজেকে প্রস্তুত করেছি, তাই আর কিছু আমি পারলাম না। আমার কৃতকর্মের সব দায়, সব ভার আমি তোমার জন্যই রেখে গেলাম জানি। কৈফিয়ৎ দিতে

দিতে এই দুবছর, বোধহয় তার পরেও সমস্ত জীবনটাই
স্থ হয়ে উঠবে। আমি কি

আমার কথা আমার থেকে আর ভাল কে জানে! আ রি মতো মানে, মানে, প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল এক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, তার মেয়ে সন্তানের জননী, ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ... পরিণামী, যে তোমার মতো অনন্তা স্ত্রীর স্বামী, তার পক্ষে সমস্ত হিসেব নিকেশ পেছনে ফেলে অল্প বয়সী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ দিনের জন্য প্রবাসে পাড়ি জমানোর অর্থ কি, তাও বুঝতে পারবো না, এতটা বিভ্রান্ত আমি এখনও হইনি। তবু তা' আমি তা না করে পারলাম না, শুধু সে জন্যই তুমি বুঝে নিও এ না করে আমার আর কোন উপায় ছিল না সুরমা। আমি জানি এরপর তুমি মনে মনে অভিযোগ করবে তোমায় বলে এলে কি হত? বলে এলেও যে অন্য কিছু হত না, তুমি আমার সিদ্ধান্তে কোন বাধাতে সৃষ্টি করতে না তাও আমি জানি তবু তোমায় আমি বলে আসিনি। বলতে পারিনি। কেন পারিনি, সে কথাই তোমায় বলব বলে আজ বসেছি।

দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তোমার সংগে আমার যৌথ
সেদিনের কথা মনে করে দেখো সুরমা।

য়, মেধায়, রূপে তুমি ছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ। আর আমি সামান্য কেরানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, রূপে সাধারণ, গুণে অনুজ্জ্বল, গৃহশিক্ষকতা করে যাকে পড়া চালানো এবং সংসারে সাহায্য দুই-ই করতে হয়। তোমার অনুজ্জ্বল আলোয় আমার চোখ ধেঁধে গিয়েছিল, কিন্তু তুমি আমাকেই বেছে নিলে?

সেদিন এ দুর্লভ সৌভাগ্যে অধীর হয়েছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু পরে অনেক দিন অনেকবার ভেবেছি কেন এটা ঘটল। প্রথমে সংশয় হয়েছিল স্বাচ্ছন্দে অবসর তোমার এ একটা খেয়াল মাত্র। কিন্তু অল্প পরেই সে ভুল ভেঙেছিল। আমার জন্য তোমায় ছাড়তে হলো সব কিছু, তোমার লেখাপড়া, তোমার দীর্ঘদিনের জীবন-যাত্রার ধরণ, সর্বোপরি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ধনী পিতার ঘৃণাকে সম্বল করে তুমি আমার ঘরে এলে। আমার মা প্রথমটা খুশী হয়েছিলেন আমার কৃতিত্বে। তাঁর আশা ছিল, বিলম্বে হলেও তার ছেলে ধনী শ্বশুরের প্রসন্নতা না হোক প্রসাদ কিছু পাবে। সে আশা যেদিন ভাঙলো, যে দিন মা বুঝতে পারলো তোমার বাবা অকুণ্ঠ ঘৃণাই একমাত্র কন্যাপণ দিয়েছেন, সেদিন মা চরম বিরক্ত হয়ে উঠল তোমার ওপর। মা তোমাকে অনুযোগ করলো, সংসারের ভার বাড়াবার অপরাধে, তার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার অজুহাতে দায়ে। তবু তুমি মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে দাওনি। অবিচ্ছিন্ন সুখের আধার হয়েই রইলে আমার কাছে। তখন বুঝেছিলাম, এ খেয়াল নয়, জেনেছিলাম এ তোমার ভালবাসা।

তারপর, তার পরের ইতিহাস তো' তুমি জান। সে দীর্ঘ ক্লান্তিকর ইতিহাসের সব ঘটনাই তোমার গোচরে, শুধু গোচরে নয় বলতে গেলে তোমারই অভিপ্রায়ে, প্রায় তোমারই নির্দেশে তার সব কিছু ঘটেছে। তুমি বলেছিলে আমাকে বড় হতে হবে। ছোট সার্থকতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমার চলবে না। তুমি বলতে ক্ষমতা, অর্থ এগুলো হেলার জিনিস নয়, এসব মানুষকে ভাস্বর করে। তুমি বলতে নির্ধনের ধনবান হওয়া, অক্ষমের ক্ষমতাবান হওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এ আশীর্বাদ আমাকে অর্জন করতে হবে। আমি বলে-ছিলাম তুমি যা চাও তাই করবো। তুমি বলতে, আমার কথা নয় এ তোমরাই চাওয়া হোক।

সে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজো আমার আশ্চর্য লাগে। তুমি কি ভাববে জানি না কিন্তু আজ আমি সত্যি স্বীকার করছি, তোমার সেই দুর্বার কামনা তখন আমার ভাল লাগেনি। মনে হয়েছিল এ তোমার কি সর্বনাশা ক্ষুধা। মনে হয়েছিল, এ তোমার প্রচণ্ড অহমিকা অসম্ভবকে সম্ভব করবার। আর আমার নিজেকে মনে হয়েছিল আমি তোমার কাছে তোমার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার পাত্র মাত্র।

কিন্তু, তুমি তো শুধু তোমার বাসনা জানিয়েই ক্ষান্ত হওনি। তুমি সব সময় থেকেছ আমার পাশে। নিজের অকৃতকার্যতায় আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি, অসাফল্যে অশান্ত হয়েছি, মনে মনে অভিযোগ জানিয়েছি তোমার বিরুদ্ধে। তুমি ধৈর্য হারাওনি। হাসিমুখে এগিয়ে এসেছ, পথ দেখিয়েছ, আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছ।

তুমিই যেন এক এক করে আমার সাফল্য কৃতিত্বকে

জয় করে নিয়ে এসে আমায় সাজিয়ে দিয়েছ। অথচ আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতাম নিজের জন্য তোমার চাওয়া নেই।

আমার স্ত্রী হয়ে, আমার সন্তানের জননী হয়েই তুমি তৃপ্ত। তোমার প্রথম উদারতা আমাকে শুধুই অবাক করতো।

পরে বুঝেছিলাম, এ তোমার উদারতা নয়, এ তোমার মহিমা।

সুরমা আমি প্রথমে তোমাতে মুগ্ধ, পরে ভালবেসেছিলাম।

এবার লীলার কথা বলি। লীলার কথা না বললে সবটাই যে বাকী থেকে যাবে, তোমার কথা বলাও নিরর্থক হয়ে যাবে।

লীলা আমার অফিসের অনেক টাইপিষ্টদের ভেতর একজন, একথা তুমি জান। লীলা দেখতে সুন্দরী নয়, সাধারণ। শিক্ষায় আবার আরো সাধারণ। সে কারণেই আর সকলের মতো তুমিও হয়তো আমার রুচিতে বিস্মিত হয়েছ। অন্যান্যরা যখন ভীষণভাবে কথা ভেবেছে তুমি হয়ত ভেবেছে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। তোমার তুলনায় লীলাকে অতি তুচ্ছ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু সবাই একটা কথা ভুলে গেছে, আর কোন কিছু না থাকলেও লীলার হাতে এমন একটি সম্বল আছে, যা তুমি বহুদিন আগেই হারিয়েছে, সে সম্বল হচ্ছে, আর কিছু নয়, অল্প বয়সের যাদু। আমি যখন প্রথম দেখেছি, লীলা তখন অষ্টাদশী।

সেদিন কয়েকটা জরুরী কাজে প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত অফিসে থাকতে হয়েছিল। তখন সবাই চলে গেছে। শুধু অফিসের বড় সাহেব আমিই ছুটি পাইনি। ভেতরে ভেতরে মনটা অশান্ত হয়ে উঠেছে। জানি বাড়ীতে পেয়ালা সাজিয়ে তুমি বসে আছ, আমি ফিরলেই চালবে। সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যেবেলা আমি না ফিরলে কোনদিনই তুমি চা খাওনা। তোমার এই সামান্য স্বভাবটুকু আমার যে কি ভালই লাগত। এই কথা ভেবেই আমি ব্যস্ত হচ্ছিলাম। আর একটা চিঠি শেষ করে উঠবো। টাইপিষ্টকে ডেকে পাঠিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। সারাদিনই বৃষ্টি পড়ছিল, তখন একেবারে ঝরঝর ধারায় নেমেছে। ডালহাউসী স্কোয়ারের বড় বড় গাছগুলি কি অশান্ত খেলায় মাতামাতি করছে বৃষ্টির ধারার সঙ্গে। চারিদিক নির্জন, শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ট্রাম বাসের অস্পষ্ট শব্দ আর সব কিছু নীরব হয়ে গেছে বৃষ্টির সেই প্রমত্ত রাগিনীর সঙ্গে। প্রকৃতি বুঝি তার আয়োজন রেখেছিল সম্পূর্ণ করে।

লীলা আমার ঘরে ঢুকল।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই প্রায়-কিশোরী মেয়েটির আগমনে; শুধু জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি?' ও কোন মতে শুধু বলল—'আমি লীলা মিত্র। টাইপিষ্ট। এই কয়েকদিন হল চাকরিতে ঢুকেছি। ওকে দেখেই বুঝতে পারলাম বড় সাহেবের আহ্বানে ও ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল, অস্থিরতা চাপবার জন্য একবার করে হাতটা মুঠো করছে আর খুলছে। আমার কেমন যেন মায়া হল। ওকে অনেকটা অভয় দেবার জন্যই যেন উৎসাহ দেখিয়ে বললাম "ও, তাই বলুন, আপনিই আমাদের নতুন টাইপিষ্ট। বসুন, বসুন, সামনের চেয়ারটা টেনিয়ে নিলাম। আপনি এসেন যে। আর কেউ নেই অফিসে?'

'না, আর সবাই চলে গেছে। একা আমিই আছি।' এবার অনেকটা সহজ হতে পেরেছে ও। আমার সামনে ও বসে পড়ল, বুঝলাম নতুন আর অল্প বয়স বলেই ওকে ফাইল দিয়ে সবাই চলে গেছে। আমি ভাল করে তাকালাম ওর দিকে। সামনের বারান্দাটা দিয়ে আসবার সময় বৃষ্টির ছাট লেগেছে ওর চোখে মুখে। কালো চুলের

ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোং
১৫৪, রাধাবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১ • ফোন: ২২-৪৩৩৬

ওপর আলো পড়ে অভ্রের সূচির মতো ঝক ঝক করছে বৃষ্টির জল। বললাম, 'বসুন, আগে চা খাই, তারপর কাজ। আপনি চা খাবেন ত?' ও সম্মতি জানাল। বেয়ারাকে ডেকে দু কাপ চায়ের কথা বলে দিলাম।

ও আমার সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল। আমি কাজ করতে লাগলাম। কাজ যে আমার অনেক ছিল তা নয়। তবু সামান্য একটা টাইপিষ্টকে বসিয়ে রেখে বড় সাহেবকে কাজ করতে হয়—সব অফিসের এটাই রীতি।

চা খেতে খেতে ওকে ভাল করে দেখলাম। সাধারণ চেহারা তবু ওর চোখের ভাকানোতে, ঠোঁটের পাশের কুঞ্চনে কি যেন একটা কেবলি ফুল ছাপিয়ে উঠতে চাইছে। পরে বুঝেছিলাম ফুল ছাপানো ভাবটি আর কিছু নয়, সে ওর সর্বগ্রাসী যৌবন। সুরমা, আজ আমি স্বীকার করছি—বহু বছর পরে আবার আমি একটি মেয়ের মুখের দিকে বারবার তাকালাম, তবু তাকে দেখবার সাধ যেন মিটল না।

প্রথম দিনটার এত দীর্ঘ বিবরণ কেন দিলাম, তুমি ভাববে, তার কি প্রয়োজন। তবু মনে হল বলা দরকার। না হলে, তুমি আমার এই অবস্থার কথা, সবাই যাকে বলবে অধঃপতন, তা কেন ঘটল তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

জীবনে এমন এক একটি মুহূর্ত আসে। হঠাৎ যা আমাদের সব কিছু ওলট পালট করে দেয়। একে কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। একেই বোধ হয় বলা উচিত লগ্ন। এ কেন ঘটে, কি ভাবেই বা ঘটে। একমাত্র বিধাতার কারসাজি ছাড়া আর কি সম্ভব বল। সেদিন সে মুহূর্তে আমার জীবনে বোধ হয় এমনি এক সময় উপস্থিত হয়েছিল। সুরমা, আমি সে লগন বয়ে যেতে দেইনি। সেদিন যদি অমন করে প্রকৃতি তার আয়োজন সম্পূর্ণ না করত, অমন করে বৃষ্টি না নামত, অমন করে নির্জনতা তার আসর সাজিয়ে না রাখত, বৃষ্টির জল যদি অমন করে লীলার মুখে কেশে জলের প্রসাধন এঁকে না দিত, অথবা এরএকটিও যদি বাদ পড়ত, তবে হয়ত যেমন ছিল তেমন-ই দিন চলত। আর সকলের মতো আমারও জীবন শুধু ভালে লয়েই কেটে যেত। কিন্তু তা হয়নি, সেই দারুণ সুখের আর ভাবনার মুহূর্তটি এল আমার জীবনে। দীর্ঘ জীবনের সব আয়োজন, সব প্রস্তুতি বানচাল করে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর এই দেড় বছরের ইতিহাস যেমন ঘটবার তাই হল। আমি কাজের ছলে লীলাকে বারবার ডেকেছি, কাছে বসিয়ে রেখেছি, আলাপ করেছি, ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হয়েছি।

তুমি শুনলে কি বলবে জানিনা। তবু বলছি, এর প্রতিটি কাজই আমি সচেতনভাবেই করেছি। এর ফল কি হবে আমি জানতাম, আমি তো অবোধ ছিলাম না। তবু একটা জিনিষ আমি বুঝেছিলাম—এ না করে আমি পারছি না, আমার আর কোন উপায় নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই অফিসের কেরানি মহলে গুঞ্জন উঠল। যেতে আসতে কিছু মন্তব্য লীলাকে শুনতে হলো। আমরা অফিসে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলাম। তারপর সে এক আশ্চর্য অধ্যায়। যে কেউ শুনলে হাসবে। কৌতুকে বিদ্রূপে চোখে ঝিলিক দেখা দেবে।

সমস্যা হল কোথায় ওকে পাব? কলকাতা সহরে এ ধরণের সাময়িক আশ্রয়ের অভাব নেই জানি। কিন্তু আমার মন তা চায়নি। এই ধরণের আশ্রয় গ্রহণের ভেতর কেমন যেন একটা অশালীন গন্ধ আছে। তাই অফিসের কাজ সারা হতে হতেই ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে গাড়ী নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তাম। রাস্তায়

প্রসিদ্ধ ভারতীয় মিষ্টান্ন দ্রব্যের
অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান

★

খগেন ঘোষ

২০৮, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬।
ফোন : ৩৩-৩২৪৫

কোথাও লীলাকে ভুলে নিতাম। সহর ছাড়িয়ে অনেকদূর বেড়িয়ে আসতাম। তাতেও মন অতৃপ্ত হতে সুরু করল। চলন্ত গাড়ীর আশ্রয় নিরাপদ হলেও নিবিড় হওয়ার অন্তরায়। বাধ্য হয়েই কলকাতার নানা হোটেল-গুলোতে সাময়িক আশ্রয় নেবার ব্যবস্থাই করতে হল। তাতে পদে পদে আশঙ্কা। আমার মতো একজন কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ-শীর্ষের পক্ষে এ কত দুরূহ তুমি জান। আমার দুরন্ত বাসনা সব ভয় আশঙ্কাকে জয় করেছে।

হোটেলের নিভৃত আরামে আমরা দেহে মনে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছি। আমার এ বয়স অপেক্ষার অবসর রাখেনি। প্রতিদিন ওকে কাছে পেয়েছি, তৃপ্ত হয়েছি আর আরো আকাঙ্ক্ষার দুর্বার দাহ বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। অপেক্ষা করেছি পরের দিনটির জন্য। সময় ভুলেছি, কাজে অবহেলা এসেছে। সহকর্মীদের বন্ধুদের ইঙ্গিতকে বিদ্রূপকে অগ্রাহ্য করেছি। তোমার, সন্তানদের চোখের বিরাট জিজ্ঞাসার সামনে মাথা নত করে পালিয়ে বেড়িয়েছি। তবু পারিনি, লীলাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি।

লীলার সংগে অন্তরংগতার প্রতিটি মুহূর্তে নীরবে নিঃশব্দে যযাতির মতো বিধাতার কাছে যৌবন প্রার্থনা করেছি আর প্রার্থনা করেছি ও সব ভুলে সমস্ত মন নিয়ে ওর সকল প্রয়োজন সব নির্ভরতা আমাতেই স্থাপনা করুক।

সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান! আমার সংগে অন্তরংগতায় লীলাও আনন্দিত, বিমোহিত। প্রতিদিন ওর চোখের আলো যখন আমায় বরণ করে, আমার অভিজ্ঞ পরিণত মন বুঝেছে তাতে কোন ফাঁকি থাকে না। এর পরেও আমি লীলাকে ছাড়ি কেমন করে বল? জানিনা এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হয়েছে, তবু তা ঘটেছে এটাই বড় সত্য। তাই আজ আমার প্রশ্ন যৌবন তাহলে কি? দেহের পটুত্বই যদি যৌবন হয়, তবে সত্তর বছর বয়সে যে বৃদ্ধ সন্তানের জনক হয়। সেও তো যুবক। যৌবন যদি শুধু মনের সম্পদ হয় তবে অমন লালসাও তো যৌবন। আজ আমার কি মনে হয় জান, যৌবন কখনো দেহের, কখনো মনের, কখনো উভয়ের। ভালবাসা যে শক্তিটাই যৌবন। লীলাই আমাকে এ উপলব্ধি দিতে পেরেছে। এই একটি কারণেও ও আমার কাছে আকর্ষণীয়া।

দিন দিন পাকে পাকে জড়িয়েছি। জটিলতা বেড়েছে আকাঙ্ক্ষাও বেড়েছে। ও আমার ভেতর খুঁজে পেয়েছে মহিমায়, উদারতায়, ক্ষমতায় এক আশ্চর্য মানুষকে। আর ওর মাঝে আমি প্রত্যক্ষ করেছি আমার ব্যক্তিত্বকে, আমার পরিপূর্ণ মুক্তিকে। তাই আমার বড় সাধ আরামে বিলাসে নিবিড়তার প্রাচুর্যে ওকে আমি আমাতেই একান্ত নির্ভর করে রাখি। এখানে আমার প্রতিষ্ঠা, আমার মর্যাদা, আমার সংসার, আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে দুস্তর বাধা সে তুমিও জান। এ জন্যই আমার প্রবাস যাত্রা।

আমি জানি, আমি সারা জীবন ওকে বেঁধে রাখতে পারবো না। ওরও সমস্ত জীবনটা আমাকে নিয়ে চলবে না। তবে সময় অনেক সমস্যারই সমাধান করে। আর দুটো বছর দিন গণনায় নেহাৎ কম নয়। তাই কালের হাতেই আমার এ সমস্যা সমাধানের ভার দিলাম।

সবশেষে আরো কিছু কথা না বললে সব বলাটাই বৃথা হবে। সে তোমার কথা। আমার মনের কত ভাঙাগড়া অনুভব করলাম, কত অস্থিরতায় চঞ্চল হলাম। কিন্তু এক জায়গায় আমি অচঞ্চল অসংশয় ছিলাম—আমি তোমাকেই ভালবাসি। গানের মাঝে যেমন কত সুর বিস্তার, চরণে চরণে বিচরণ, তবু প্রথম চরণেই শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হয়। তেমনি সব কিছুর ভেতরেও একটা অনুভব আমার অম্লান—তোমার কাছেই ফিরে আসবো, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

কিন্তু, মানুষ শুধু আশ্রয় পেতেই চায় না, দিতেও চায়। অনন্তকে শুধু প্রত্যক্ষ করতেই চায় না। নিজের মহিমার স্বীকৃতিও দেখতে চায়।

আনন্দ উৎসবে নৃত্য গীত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শুধু বাঙালাদেশে বা ভারতে কেন, সমগ্র বিশ্বে সকল রকম উৎসবে ও আনন্দানুষ্ঠানে নৃত্যগীতের ছিল আয়োজন এবং এখনো আছে তার ধারা অব্যাহত। বাঙলায় কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, বাঙালার প্রতিটি গানে ও নৃত্যের কল্পনাতেও তেমনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী জড়িত আছেই। তেমনি আবার প্রতিটি উৎসবে ও মঙ্গলানুষ্ঠানেও আছে নৃত্য-গীতের আয়োজন। ভারতবাসী নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানকে করেছে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও ছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, ক্ষণিকের জন্যও করেনি বিচ্ছিন্ন। বাঙালী জীবন ও ভারতবর্ষীয় জীবনের সঙ্গে নৃত্য ও গীতের এই যে নিবিড় ও মধুর সম্পর্কের আছে স্পর্শ, এর নিদর্শন শুধু আজকের নয়। সুদূর অতীতেও ছিল এর ধারা অব্যাহত।

বৈদিক যুগে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার সকলের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হোত স্তোত্র ও স্তবের আকারে গান, নৃত্যেরও থাকতো তাতে যোগ, শিঞ্জোরাদি বীণাবাদনের সঙ্গে পুরনারীরা করতো ছন্দায়িত নৃত্য। বিশেষকরে সূর্য ও অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে আহুত হত হবি, পুরোভাগ সোমরস এবং আহুতির সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র নৃত্যের হত অনুষ্ঠান; সারাটি দিন এভাবেই হত উদ্‌যাপিত; উৎসব-প্রাঙ্গণ থাকত মুখরিত নৃত্য ও গীতের ঝঙ্কারে।

ক্রমে ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যের যুগে সূর্য ও অগ্নি দেবতা ছাড়াও অঙ্গিরা ও সূত্রাত্মা হতেন পূজিত। পূজা পেতেন ক্রমে অচিস্বতী হবিস্বতী, মহাস্বতী প্রভৃতি দেবতারা এবং নৃত্য-গীত ছিল তাদের পূজার প্রধান উপকরণ। দর্শ ও পৌর্ণমাসী যজ্ঞে বৃহস্পতি দেবতার হত আবাহন, সোমপাত্রের সঙ্গে সঙ্গে উপহার দেওয়া হত তাঁকে নৃত্য ও গীতের ছন্দায়িত রূপ। বিষ্ণু, পাঞ্চজন্য ও অন্যান্য বৈদিক দেবতাদেরও হত অর্চনা। তাঁদের উদ্দেশ্যেও হত নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান।

বৌদ্ধযুগেও ছিল বিচিত্র রকমের উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠান। চীনা পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াং (৬৪২ খ্রীঃ) ছিলেন অনেকগুলি অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী। হর্ষবর্ধনের সময়ে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হত, সম্রাট স্বয়ং পরিদর্শন করতেন আয়োজন। ঠিক আজ কালকার মতোই বিস্তৃত রাজপথে টানা হত শ্রীবৃদ্ধের রথ, ত্রিরত্নের থাকত সমাবেশ। রথের সম্মুখে হত নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান, দেবদাসীরা করত নৃত্য ও শত সহস্র নগরবাসীর কোলাহলে উৎসব-প্রাঙ্গণ হোত মুখরিত।

সেন ও পাল রাজত্বের আমলেও বাঙালায় ছিল কত শত উৎসবের আড়ম্বর। রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন যেমন ন্যায়বান এবং শিল্প-সংস্কৃতির পরম-অনুরাগী, নৃত্য-গীতেরও তেমনি পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজ সভায় অবারিত দ্বার ছিল কবি সাহিত্য-সেবীদেরই মতো গীত ও নৃত্য-শিল্পীদের। হলায়ুধ মিশ্রের দেবস্তুতোদয়ায় বর্ণনা করা হয়েছে কবীন্দ্র জয়দেব ও পদ্মাবতীর সঙ্গীত-মনীষার কথা। রাজনটী বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলার মতোই অসংখ্য ছিল দেবদাসী রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায়, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানেই থাকতো তারা নিয়োজিত। উৎসব-অনুষ্ঠানের হত আয়োজন। শিব ও কার্তিকের মন্দিরেও দেবদাসীরা করতো নৃত্য-গীত। আনন্দোৎসব-গুলিতে অবাধ মেলামেশার ছিল সুযোগ ও সুবিধা, মিলন-পরিবেশের মধ্যে হত সকলের ভাব-বিনিময়।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের আগে দশম-একাদশ শতকে বাঙলার চর্যা ও বজ্রগীতির ছিল অনুশীলন। অপর দেশে আবার বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী, শিতলা ষষ্ঠি প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীদেরও ছিল পূজার প্রচলন। ব্রতকথার মতো মুখে মুখে হোত তাদের মহিমা-কীর্তন। মনসামঙ্গলের গান, মাণিকচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি নাম গীতিকাগুলিও ছড়ার আকারে হত

গীত, পল্লীপথ, নদী, প্রান্তর ও অনাকীর্ণ নগর গীতির প্রবাহে হত আন্দোলিত, নৃত্যেরও ছিল সহযোগে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন বাঙ্গালার বৌদ্ধ গানগুলিই পরবর্তীকালের মহাজন-পদাবলী ও মুসলমানি মারফতী গানের নাকি প্রোটোটাইপ বা পূর্বরূপ। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর অভিজাত পরিপুষ্টি লাভ করেছিল আরো কতকগুলি ওদানীন্তনকালে প্রচলিত বাঙ্গালার গীতিধারার সাহচর্যে। বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, উমাপতি ও আরো কত শত বৈষ্ণব পদকর্তারা করেছিলেন পদাবলীর রূপ সমুন্নত। চণ্ডীদাস ছিলেন প্রেমের পূজারী, সমাজের বাঁধনকসন ছিল তাঁর কাছে তুচ্ছ, ধনী-নির্ধন—অভিজাত-সাধারণ সকলের কাছেই ছিল তাঁর গান আদরণীয়।

মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুর ছিলেন পঞ্চোপসাক ও তৈ ব্রাহ্মণ, অভিজাত ছিল তাঁর রুচি, কিন্তু বাঙ্গালার নাড়ীর সঙ্গে ছিল তাঁর গানের তখনো পল্লীর প্রতিটি চণ্ডীমণ্ডপে মঙ্গল কাব্যের গান, কবিকঙ্কণ, রামায়ণ গান, পাঁচালী, কালীকীর্তনের মত অনুষ্ঠান। মৃদঙ্গ, করতাল ও তারযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্যের মত আয়োজন। নৃত্যগীতের যুগলরূপ রস-মন্দাকিনী সৃষ্টি করে পল্লীপ্রাণকে করতো আনন্দোচ্ছল। বাঙ্গালার গম্ভীরা, গাজন, বিচিত্র পূজাপার্বণ প্রভৃতিতে নৃত্য-গীতের থাকত সমারোহ। গান-রচয়িতাদেরও ছিল না অভাব। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার The Folk-Element in Hindu Culture বইয়ে তাই স্বীকারও করেছেন এই বলে: "Many Ramprasads and many Chandidasas have thus owed their origin to the Gambhira." গম্ভীরা গান ও নৃত্যকে উপলক্ষ্য করে বাঙ্গালার পল্লীতে হয়েছে শত শত কবির অভ্যুদয়, শিল্প-সৌন্দর্যেরও হয়েছে বিচিত্র বিকাশ।

শূন্যপুরাণে নৃত্য-গীতের কথা রামাই পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠ ভাবে। ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশেই ধর্মমঙ্গলের গান হয়েছিল রচিত। বাঙ্গালার পতিত ও অবহেলিত জাতির জন্য ছিল সে গান প্রথমে নির্বাচিত। পরে অভিজাত সমাজেও ধর্মপূজার হল প্রবর্তন। সর্ব-সাধারণেই নৃত্য-গীতের মাধ্যমে শিল্পকলায় ছিল পূজারী। ঘনরাম ও মাণিক গাঙ্গুলি ঐ দুজনের ধর্মমঙ্গলেই নৃত্য-গীত পেয়েছিল প্রচুর সমাদর। কবিকঙ্কণ ও মাণিকদত্ত মঙ্গলচণ্ডী গানে খোল, করতাল ও তানপুরায় দিয়েছেন অধিকার। মনসার আসনে বিষহরির পূজায়ও ছিল নৃত্য-গীতের প্রচলন। বটগ্রামবাসী একজন বিপ্রদাস রচনা করেন পদ্মার গীতিমালা। 'ভয়বিভূতি' ও 'জগজ্জীবন' গ্রন্থে চাঁদ সওদাগর ও বেহুলার কাহিনী হয়েছে রচিত। শিল্প-পরিণয়কে কেন্দ্র করে নিরক্ষর ও সরল বিশ্বাসী সমাজে সারাদিন হত নৃত্য-গীতের আয়োজন। কুমারী মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠান, পৌষ-দুর্গোৎসব, বসন্তোৎসব, চৈত্র-সংক্রান্তি এই কত কিছু উৎসবের আড়ম্বর বাংলার পল্লীজীবনকে করতো সরল ও রসায়িত।

বিজয়াদশমীর কোলাকুলি ও আনন্দোৎসবের নিদর্শনও আধুনিক নয়, সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে এর ধারা সমাজের অঙ্গ হিসাবে। বৈদিক যুগে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা মিলিত হতেন যজ্ঞোৎসব মণ্ডপে, প্রীতিভাবের সম্প্রসারণ ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। রামায়ণে রাম ও রাবণের অথবা রাম ও বালিরাজার যুদ্ধোদ্যতকালে মিলন মৈত্রীর ভাবই প্রকাশ করে। মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানাতেন নগরবাসীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময়ের জন্য। একেই বলা হোত সৌভরাত্রমিলন। সে মিলনোৎসবে নৃত্য-গীতের থাকত সমাবেশ। হরিবংশে দ্বারকার উৎসব-সমারোহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সংহিতাগুলিতে শিব-পরিণয়কে কেন্দ্র করে অভিনয়ের মত অনুষ্ঠান ও সে অনুষ্ঠানে যোগদানের সকলেরই ছিল অধিকার। জৈন সাহিত্যেও এ ধরণের উৎসবের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ উৎসবগুলিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রথারা হতেন সমবেত, সম্রাট অশোক স্বয়ং সে উৎসবে করতেন অংশগ্রহণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ই ফা-হিয়েন আসেন ভারত-পর্যটনে। পাটলিপুত্রনগরে শৈব, শক্ত, বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী শ্রমণ ও তীর্থঙ্করা হতেন মিলিত এবং ফা-হিয়েন এসবের করেছেন বর্ণনা। রাজা হর্ষবর্ধনের সময় ইউয়ান্ চোয়াংও বর্ণনা করেছেন প্রয়াগ উৎসবের কাহিনী। পাল রাজাদের সময় ষোল শত সন্ন্যাসী রামাই পণ্ডিতের করেছিল অনুসরণ এবং নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বিচিত্র উৎসবে হত তাদের মিলন ও সৌহার্দ্যের বিনিময়। বাঙালার রাখীবন্ধনের স্মৃতি বাঙালী সমাজের চিরস্মরণীয় স্মৃতি।

সুতরাং শারদীয়াপূজায় বিজয়ার মিলনোৎসব মৈত্রী-বন্ধনেরই নিদর্শন। এ অনুষ্ঠানও শুধু বাঙালারই নয় কিংবা ভারতেরই নয়, বিশ্বের সর্বত্রই সকল দেশে ও সকল জাতির ভিতর বিচিত্র আকারে এর আছে প্রচলন। সকল অনুষ্ঠানেই নৃত্যগীতের আছে অনুশীলন। কিন্তু আজ সেই আনন্দোৎসবের কথা ভুলতে বসেছে সমগ্র ভারতবাসী এবং ভুলতে বসেছে তার নৃত্য ও গীতির কথা! অর্থকৃচ্ছতা ও অসচ্ছলতার বিষবাষ্পে ভারতের সমাজবন্ধন আজ ছিন্নভিন্ন শিথিল। নাই প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনন্দের কল্লোল, নাই পল্লীবাসী ও নগরবাসীর গৃহে উৎসবের আয়োজন। নাই পাঁচালী, রামায়ণগান চণ্ডীর গান, যাত্রা, কথকতা, তর্জা, কবিগান প্রভৃতির সমারোহ। বাঙলার ঘরে ঘরে বর্ষীয়সী রমণীরা একদিন প্রদীপের আলোকে পাঠ করে শোনাতেন সুরে ও ছন্দে রামায়ণ ও মহাভারত, আনন্দোজ্জ্বল হত প্রতিটি গৃহ। কিন্তু সে সকল অনুষ্ঠানও হয়েছে আজ বন্ধ। আশ্বিনের কোলে দশভুজার আবাহন এখনো আছে অব্যাহত, মঙ্গলঘট এখনো হয় পূজার মণ্ডপে স্থাপিত, ঢাকেরা বাদ্য এখনো পূজার অনুষ্ঠানে থামে নি, কিন্তু কোথায় গেল সেই স্বতঃউৎসারিত অন্তরের আনন্দ-প্রবাহ। যন্ত্রযুগের মানুষ আমরা এখন অতীতের সকল কিছুকেই করে নিয়েছি সহজ ও সরল, অথচ জীবনের কোন জটিলতার এতটুকুও হয়নি তাতে লাঘব। ভারাক্রান্ত এই জীবনকে আনন্দোজ্জ্বল করুক আবার আনন্দময়ী তাঁর অমোঘ আশীর্বাদ সকলকে বিতরণ করে!

টেলিফোন

অরুণ চক্রবর্তী

[স্থান—চিত্রতারকা চকলকুমারের আবাস। কাল—সন্ধ্যা। বাইরে তুমুল ঝড় বৃষ্টি। বজ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে।]

ললিতা। কদম, রেডিওটার "এরিয়ালটা খুলে দেত। যে সাংঘাতিক বাজ পড়ছে, ভালভগুলো এখুনি খারাপ হয়ে যাবে।

কদম। দিচ্ছি দিদিমনি।

[টেলিফোন বাজছে]

ললিতা। [রিসিভার তুলে নিয়ে] হালো কে কথা বলছেন? ওঃ তুমি—কি ব্যাপার! ষ্টুডিও থেকে কথা বলছ? রাত্তির আটটা বাজে, এখনও ষ্টুডিওতে আছ! আসতে দেরী হবে? কেন, কি ব্যাপার! কি বলছ, হয়ত সারারাত কাজ হবে? না না ভাবব কেন? আচ্ছা রাখছি কেমন? (মৃদু হাসি) কি বলছ, না না, ধ্যাঃ গত সব বাজে কথা। শেষ হলেই কিন্তু চলে এসো। (হাসি) আচ্ছা রাখছি···

ললিতা। [টেলিফোন রেখে] কদম।

কদম। আমায় ডাকছ দিদিমণি!

ললিতা। হ্যাঁ, দাদাবাবুর ফিরতে বোধহয় রাত্তির হবে। অত রাত্তিরে এসে যেতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেই রকম ব্যবস্থা কর বুঝলে!

কদম। আচ্ছা দিদিমণি।

[কলিং বেল বেজে উঠল]

ললিতা। দেখত কলিং বেল বাজছে। ডাকছে। এত জল-ঝড়ে আবার কে এল!

[কদম দরজা খুলে দিতেই এক ভদ্রলোক ভিতরে চলে এলেন। তিনি ফরসা ডাঙার ধুতি আর সিল্কের করা পাঞ্জাবী পরে আছেন পায়ে চামড়ার চটি। কিন্তু ভদ্রলোক জলে একেবারে ভিজে গেছেন। জামা-কাপড় দিয়ে জল ঝরছে। চোখের চশমা খুলে তিনি রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছে নিয়ে চশমা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন।]

কদম। আপনি কাকে চান?

ভদ্রলোক। (চশমা পরে) চকলকুমার বাড়ী আছে?

কদম। না, তিনি এখনও ফেরেন নি।

ভদ্রলোক। বড় মুস্কিল হল তো! বাড়ীতে আর কে আছেন?

কদম। বৌদি আছেন।

ভদ্রলোক। আর কেউ নেই?

কদম। না।

ভদ্রলোক। তাইতো কি করা যায়! আচ্ছা তুমি তাঁকেই একটু খবর দাও। বল, স্বপন চৌধুরী ডাকছেন আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি বৌদিকে খবর দিয়ে আসি।

[টেলিফোন বাজছে। ললিতাদেবী এসে ধরলেন—

ললিতা। হালো! কে কথা বলছেন? ও, মোহন ষ্টুডিও থেকে কথা বলছেন। কি বললেন—চঞ্চলকুমারকে খবর দিতে হবে! তিনি ওখানে নেই? অ্যাঁ, কখন—পাঁচটার সময় স্যুটিং শেষ হতেই বেরিয়ে গেছেন! কি বলছেন?—ও: ষ্টুডিওর গাড়ীতে চলে গেছেন? আচ্ছা, গাড়ীতে কি আর কেউ ছিলেন? অ্যাঁ, ও: স্বাগতা দেবীর সংগে বেরিয়েছেন! আচ্ছা। (ললিতাদেবীর মুখে ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে) আচ্ছা! আচ্ছা! কি বলছেন···কাল কখন। সকাল নটায় স্যুটিং হবে। আচ্ছা, আমি ওকে বলে দেব। হ্যাঁ, আমি কথা বলছি আচ্ছা, নমস্কার।

[ললিতাদেবী টেলিফোন রেখে দিলেন। ইতিমধ্যে কদম এসে দাঁড়িয়েছে]

ললিতা। কি রে কদম?

কদম। একজন ভদ্দরলোক···নাম বললেন, স্বপন চৌধুরী। তোমার সংগে দেখা করতে চাইছেন।

ললিতা। আমার সংগে দেখা করতে চাইছেন! কি ব্যাপার বলত কদম! (নিজের মনে) আমি কারুর সংগে দেখা করি এটাত উনি তেমন·· (প্রকাশ্যে) তুই একবার জিজ্ঞেস করে আয় কি দরকার। (একটু ভেবে) না না, তুই ভদ্রলোককে ডেকে আন।

কদম। (বাইরে থেকে একটু জোরে) বাবু, আপনি এদিকে আসুন। বৌদি আপনাকে ডাকছেন।

স্বপন। (ভিতরে এসে) নমস্কার।

ললিতা। নমস্কার।

স্বপন। মাপ করবেন। আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না। আমি চঞ্চলের কাছেই এসেছিলাম। কিন্তু···

ললিতা। আপনার কাপড়-জামা যে একেবারেই ভিজে গেছে।

স্বপন। হ্যাঁ, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি এসে কাপড়-জামা সব একেবারে ভিজিয়ে দিল। কোথাও দাঁড়াবার মত একটা জায়গা পেলাম না। একটা ট্যাক্সির জন্য কাছাকাছি একটা গাছের তলায় প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির বেগ ক্রমাগতই বাড়তে দেখে শেষে আপনার বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। চঞ্চল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি জানি, কেউ তার বাড়ীতে আসে এটা সে পছন্দ করে না। তাই প্রথমটা এখানে আসতে চাইনি। কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে···

ললিতা। আপনি ব্যস্ত হবেন না স্বপনবাবু, আমি আপনাকে চিনি।

স্বপন। (অবাক হয়ে) কি করে চিনলেন? চঞ্চল ত কোনদিন আপনার সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় নি।

ললিতা। ওকথা থাক। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনাকে আপনার বন্ধুর একজোড়া জামা কাপড় এনে দিচ্ছি। আপনি ওগুলো ছেড়ে ফেলুন। কদম, দাদাবাবুর একটা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবী এনে বাথরুমে রেখে দে'ত।

স্বপন। সত্যি, জামা-কাপড়গুলো একেবারে ভিজে গেছে কিন্তু চঞ্চল বাড়ি নেই। আপনাকে বিব্রত করতে বড় কুণ্ঠা বোধ করছি।

ললিতা। আপনার বন্ধু হয়ত বাড়ী নেই; কিন্তু তাঁর স্ত্রী ত আছেন। এ অবস্থায় আপনাকে বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দিয়েছি শুনলে উনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন না।

কদম। দিদিমনি, জামা-কাপড় রেখে এসেছি।

ললিতা। কদম ওঁকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে। আপনি ভিজে জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে আসুন। আমি ততক্ষণ আপনার জন্য এক কাপ গরম কফি নিয়ে আসি।

* * *

ললিতা। ওকি স্বপনবাবু কফি খাচ্ছেন না! ওটা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। দাঁড়ান, আমি না হয় আর এক কাপ তৈরী করে নিয়ে আসি।

স্বপন। (ব্যস্তভাবে) না না, ওটা ঠিকই আছে। আপনি মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছেন। আপনি বসুন ত ললিতাদেবী।

ললিতা। আপনি আমার নাম জানেন?

স্বপন। হ্যাঁ চঞ্চলের কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু আপনার নামের সংগে চেহারাটির এত মিল দেখে

মুগ্ধ হয়ে গেছি। সত্যি ললিতাদেবী, চঞ্চল সত্যই ভাগ্যবান।

ললিতা। একথা বলছেন কেন ?

স্বপন। আপনার বসবার ঘরটিই আমি দেখছি। কত সুন্দর করে আপনি সাজিয়েছেন। এ সাজ সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়েছে যে উপকরণে, সে উপকরণ হচ্ছে -- স্বয়ং ললিতাদেবী।

ললিতা। আপনি সাহিত্যিক মানুষ। সব কিছু একটু বেশি করে দেখা, আর একটু বাড়িয়ে-শুছিয়ে বলা আপনাদের স্বভাব। তাই আপনি এমন করে বলছেন।

স্বপন। ও কথা থাক ললিতাদেবী। যা কিছু সুন্দর তাকে দেখার মত করে দেখতে হয়, দেখে মুগ্ধ হয়ে, অভিভূত হয়ে মনে মনে উপভোগ করতে হয়। কথা কইতে গেলেই অর্থের সীমায় আবদ্ধ ভাষার দুর্বলতা ভাবকে ঠিক প্রকাশ করতে পারে না। তাই মিথ্যে আপনাকে লজ্জা দিয়ে নিজে লজ্জা পেতে চাই না।

ললিতা। আপনার কথাগুলি ভারী সুন্দর স্বপনবাবু। ঠিক মনে হয়, যেন নাটকের পাত্র-পাত্রী কথা কইছে।

স্বপন। ওদের মুখে ভাষা দেওয়াই যে আমার কাজ ললিতাদেবী। কিন্তু রাত্তির হয়ে যাচ্ছে, অথচ বৃষ্টি থামবার ত কোন লক্ষণ দেখছি না।

ললিতা। থামা দূরে থাক, বেড়েই যাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখুন না, রাস্তা জলে ডুবে গেছে। জল-ফুটপাথ ছাড়িয়ে আমাদের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বপন। সত্যি বড় মুস্কিলে পড়া গেল। চঞ্চল থাকলে বড় ভাল হত। অভিসির খাতিরে আপনি উঠতে পারছেন না। আমি নিজেকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়লাম দেখছি।

[বজ্রাঘাতের শব্দ শোনা গেল]

ললিতা। উঃ মাগো কি ভীষণ শব্দ! এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না স্বপনবাবু। আমার কেমন ভয় করে।

স্বপন। চঞ্চল যে কেন এত দেরী করছে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা। স্যুটিং ত পাঁচটায় শেষ হবার কথা তারপর, যতদূর জানি, আজ আর তার হাতে কোন কাজ নেই।

ললিতা। আপনি যেমন আটকে গেছেন, হয়ত তিনিও তেমনি কোথাও আটকে আছেন। কিন্তু আপনিও এত "কিন্তু" করছেন কেন স্বপনবাবু।

স্বপন। না-না, "কিন্তু" কিসের !

ললিতা। আপনাকে পেয়ে, সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব খুশী হয়েছি। যে বৃষ্টি সুরু হয়েছে, বাইরে বেরুবার কোনো উপায় নেই। মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাকবার চেয়ে আপনার সঙ্গে গল্প করবার সুযোগ পেয়ে আমার বড় ভাল লাগছে। আপনার "সতী বারাঙ্গনা" বইটি আমার খুব ভাল লেগেছে।

স্বপন। ধন্যবাদ ললিতা দেবী। আরও অনেকের মুখে এ কথা শুনেছি। তবু আপনার প্রশংসা পেয়ে বড় খুশী হলাম।

ললিতা। কিন্তু সত্যি কথা বলুন ত স্বপনবাবু। সুমিতার মত মেয়ে বাস্তব জগতে কি পাওয়া যায়।

স্বপন। পাওয়া যায় কিনা এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে ললিতা দেবী ; কিন্তু আমি পেয়েছি। ওই কাহিনী আমার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। সুমিতা আ কল্পনার ছবি নয়, ওকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। ললিতা দেবী, ওকে আমার নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছি। তাই বলছিলাম ওটা আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ কাহিনীর নাট্যরূপ।

ললিতা। যদি কিছু মনে না করেন স্বপনবাবু, আজ রাত্রের খাওয়াটা এখানেই সেরে নিন।

স্বপন। না না ললিতা দেবী, মিথ্যে আপনাকে কষ্ট দেওয়া। কি দরকার ওসব হাঙ্গামার ! একটু পরে বৃষ্টিটা থামলেই আমি চলে যাব।

ললিতা। বৃষ্টি সহজে থামবে, মনে হচ্ছে না স্বপনবাবু। তাছাড়া রাস্তায় যে পরিমান জল দাঁড়িয়েছে, বৃষ্টি থামলেও ওজল সরতে আরও কয়েক ঘণ্টা লাগবে।

কদম। (ভিতরে এসে) দিদিমণি !

ললিতা। কি রে কদম, আমায় কিছু বলবি ?

কদম। বৃষ্টি এখন থামবে না, মনে হচ্ছে। এবার আমায় ছুটি দাও দিদিমনি, আমি বাড়ী যাব।

ললিতা। সে কি কদম, এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি যাবে কেমন করে ?

কদম। কি করব দিদিমনি। তুমি ত জান, সোয়ামী আমার বাতে পঙ্গু তার ওপর অন্ধ। পেটের দায়ে আমি কাজ করতে বেরুই। দশ বছরের মেয়েটাকে ভরদায় তাকে রেখে আসি। যে জল হচ্ছে, আমাদের বস্তিটা বোধহয় এতক্ষণ ভেসে গেছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না দিদিমনি।

ললিতা। কিন্তু তুমি যাবে কেমন করে কদম? জল যে কোমর অবধি উঠছে।

কদম। দরকার হয় সাঁতরে যাব দিদিমনি। যেতে যখন হবেই, তখন ভেবে কি করব!

ললিতা। তা'হলে চল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

স্বপন। সে কি, আপনি যাবেন কেন—ললিতা দেবী চাকর-বাকর···

ললিতা। সে ছঃখের কথা আর বলবেন না স্বপনবাবু। একটা চাকর, একটা দরোয়ান। চাকরটা ছুটি নিয়ে বিয়ে করবার জন্য দেশে গেছে। যে লোকটাকে বদলী দিয়ে ছিল দু'একদিন পরেই সে পালিয়েছে। কাল রাত্তির থেকে দারোয়ান জ্বরে পড়েছিল। আজ দুপুর বেলা উনি বেরিয়ে যাবার পর ওর কোন এক আত্মীয়ের বাসায় চলে গেছে। ড্রাইভার ত ওর সংগেই ঘুরছে। এখন ঐ ষ্টিকে ঝি কদমই আমার শেষ সম্বল। চল কদম দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। আপনি একটু বসুন স্বপনবাবু। আমি এখুনি আসছি।

[ওরা বেরিয়ে গেল। স্বপন টেবিল থেকে একটা মাসিক পত্রিকা তুলে নিল। একটু পরে সে যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছে। পত্রিকাখানি তার হাতেই রয়ে গেছে, সেদিকে কোন খেয়াল নেই।]

ললিতা। [ভিতরে এস] স্বপনবাবু!

স্বপন। [চমকে গিয়ে] অ্যাঁ আমায় কিছু বলছেন?

ললিতা। একেবারে তন্ময় হয়ে কি ভাবছিলেন স্বপনবাবু? কোনো গল্পের প্লট নাকি!

স্বপন। হ্যাঁ···না···না, মানে ভাবছি, রাত ন'টা হ'ল। বাড়ীতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আপনি নিশ্চয়ই খুব বিব্রত বোধ করেছেন। চকল যদি···

ললিতা। আপনি যদি না আসতেন আমি সত্যি বিপদে পড়তাম। একা একা আমি কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকতে পারতাম না।

স্বপন। কিন্তু চকল যদি···

ললিতা। উনি খুব সম্ভব আজ বাড়ী ফিরবেন না।

স্বপন। কেন, সেকি তেমন কিছু বলে গেছে?

ললিতা। না না তা নয়। তবে যে জল-ঝড়···

স্বপন। কিন্তু বাড়ীতে আপনি একা আছেন!

ললিতা। আপনি বারে বারে আমার অস্বস্তির কথা বলছেন। এইবার আমার মনে হচ্ছে অস্বস্তিটা বোধ হয় আপনার।

স্বপন। না, না, আমার অস্বস্তির কোন কারণ নেই ললিতা দেবী। আমি চকলের বন্ধু, কিন্তু আপনি আমার সংগে যে সহজ অথচ সুন্দর ব্যবহার করেছেন, আমার আড়ষ্টতা কেটে গেছে। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন—আপনি আমাকে ভাল করে চেনেন না। তাই হয়ত আপনার···

ললিতা। অস্বস্তি নিশ্চয়ই হোত স্বপনবাবু, যদি আপনার "সতী বারাঙ্গনা" ছবিখানি না দেখতাম। সত্যি আজকালকার লেখকদের লেখায় এমন নোংরামি থাকে, যা আমি সহ্য করতে পারি না। ওরা যদি ঢাকা ঢাকা কথায় ঢাকামি করত বা সহজ সতেজ ভাবে-ভাষায় মানবতার পরিচয় দিত, ভালই লাগত। কিন্তু নোংরামি নিয়ে এমন সতেজ ভাবে ন্যাকামি করে বাহাদুরি দেখাতে চায়, এটাই কেমন অসহ্য হয়ে ওঠে। আপনার লেখায় আমি একটা বলিষ্ঠ প্রাণের পরিচয় পেয়েছি। বর্তমান যুগধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের মানব-মহিমা আপনি বড় সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। বোধ হয় সেই জন্যই বাড়ীতে এখন তৃতীয় প্রাণী না থাকলেও, অস্বস্তি বোধ করবার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

স্বপন। কিন্তু ললিতা দেবী, আমরা যে সামাজিক জীব, সে কথা ভুললে চলবে না। মানুষের মনে উদারতা আছে একথা যেমন সত্য, তেমনি নীচতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রবণতাও এগুলিকেও অস্বীকার করতে পারি না। চকল যদি এসে আমাদের এই অবস্থায় দেখে, সে কি ভাববে বলুন ত।

ললিতা। ভাববার মত অবস্থা যদি না থাকে, তা'হলে নিশ্চয়ই কিছু ভাববে না। তাঁরই বিপন্ন বন্ধুকে এই দুর্যোগের রাত্রে আশ্রয় দিয়েছি—এতে অন্যায় কোথায়? আপনার চলে যাবার জন্য এই ব্যস্ততাতেই বোধ হয় আমি বেশী খুসী হয়েছি স্বপন বাবু। আজকের যুগের মানুষের ব্যালেন্সি দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। আমি রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না স্বপন বাবু। আপনার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, আপনিই "সতী বারাঙ্গনার" উপযুক্ত কাহিনীকার। বিশ্বাস করুন, আমার এতটুকু অস্বস্তি হচ্ছে না, বরং আজকের এই বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় আমার নির্জন ঘরে আপনার মত অতিথি পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছি।

স্বপন। নির্জনে কথা বলার একটা বিপদ আছে ললিতা দেবী। প্রকাশ্যে যে সব কথা বলা যায় না, মনের সেই গোপন কথা নির্জনে, বিশেষতঃ নির্জন রাত্রে অনায়াসে বলা যায়। রাত্রি পরিব্যাপ্তমান জগৎকে তার অন্ধকারের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে। কিন্তু তার নিজস্ব একটা আলো আছে। সেই আলোর প্রভাবে দেখার অতীত, রহস্যের অন্ধকারে-ঘেরা মানুষের মন একেবারে নিরাবরণ হয়ে যায়। আপনি আমাকে যতখানি বিশ্বাস করছেন, আমি হয়ত ততখানি বিশ্বাসের পাত্র নই। তাছাড়া আমি সাহিত্যিক হলেও আমিও ত মানুষ।

ললিতা। একটু আগে আপনি যে কথাটা বলছিলেন একটু ঘুরিয়েই আমি আবার তারই পুনরাবৃত্তি করছি। মানুষের মধ্যে শয়তান আছে, এও যেমন সত্যি, দেবতা আছে—এও ততখানি সত্যি।

স্বপন। আপনি নিশ্চয়ই কবিতা লেখেন ললিতাদেবী। চক্ষল সত্যই ভাগ্যবান।

ললিতা। রাত হয়ে গেল। আপনি একটু বসুন স্বপন বাবু। আমাদের খাবারটা নিয়ে আসি। বাড়ীতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। তাই আপনাকে বসিয়ে রেখে আমায় বারে বারে উঠে যেতে হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না; আমি যাব আর আসব।

স্বপন। না না আমি কিছু মনে করবনা ললিতাদেবী। আপনি স্বচ্ছন্দে গিয়ে আপনার কাজ সেরে আসুন। আমি ততক্ষণ বসে বসে আপনার কথা চিন্তা করি।

[ললিতা দ্রুত ছন্দে চলে গেল। স্বপন বসে বসে কি যেন একটা ভাবছে। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে একবার চাইল। তারপর টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। রিসিভার তুলে নিয়ে স্বপন প্রার্থিত ব্যক্তির সংগে কথা সুরু করল।]

স্বপন। হ্যালো! কে—স্বাগতা? হ্যাঁ আমি স্বপন কথা বলছি। কি করছ? কি বললে? বসে বসে আমাকে ধ্যান করছ? তুমি ধ্যান-নেত্রে আমার কোনরূপ দেখছ, জানিনা; কিন্তু আমি এখন কোথায় জান! তোমাদের স্যুটিং শেষ হবার একটু আগে আমার পাবলিসারের ফোন পেয়ে এখানে এসেছি। আমি নাকি অত্যন্ত অলস, আমি নিজের ভাল বুঝি না—এই রকম নানা-মতের অভিযোগ করে তিনি আমায় প্রুফ দেখতে বসিয়েছেন। হঠাৎ ভীষণ বৃষ্টি এল। পথ-ঘাট জলে ডুবে গেছে। আজকে রাতে উনি আমায় আটকে দিয়েছেন। সারা রাত বসে বসে উপন্যাসের বাকীটুকু শেষ করে দিতে হবে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন, পুজোর সময় আমার "সতী বারাঙ্গনা" কোলকাতার বাজারে আলোড়ন তুলবে কি বলছ ···না না, লক্ষ্মীটি রাগ করোনা। আজকের রাতটা তুমি আমায় মাপ করো। কি বলছ বিরহ-বেদনা! সে কি শুধু তোমারি! (স্বপন হেসে উঠল) হ্যাঁ, কাজ করছি আর নতুন একটা গল্পের প্লট ভাবছি। গল্পের নাম হবে রক্ত কুড়িয়ে পেলাম। কেমন নাম! কি বলছ, আর আমায় ডিস্টার্ব করবে না? সারারাত প্রেমে বসে কাজ করতে হবে। নাহয় তার মধ্যে একটুখানি ছুটি নিলাম। ওই যে উনি এসে গেছেন। [স্বপন লক্ষ্য করে নি, ইতিমধ্যে ললিতা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে রাত্রি ভোজনের আয়োজন। স্বপন বলেই চলেছে] উনি তাড়া দিচ্ছেন, এবার রাখি কেমন? ছ গ্যালি প্রুফ সামনে পড়ে আছে। এবার কাজে বসি। কিছু মনে করো না স্বাগতা শুভরাত্রি।

[স্বপন টেলিফোন রেখে নিজের চেয়ারের দিকে

স্বপন।

দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

ললিতা। স্বপন বাবু, মাপ করবেন—স্বাগতা কে ?

স্বপন। ছবি-চিত্রাভিনেত্রী স্বাগতা দেবী। আপনাকে মিথ্যে বলতে পারবনা ললিতা দেবী। উনিই আমার "সতী বারাঙ্গনা"র প্রেরণা দাত্রী।

ললিতা। আপনি মিথ্যা কথা বলেন স্বপন বাবু—তাও "সতী বারাঙ্গনা"র প্রেরণা যে দেয়, তার সংগে।

[ললিতাকে দেখেই স্বপন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণ সোজা একটু একটু করে ঘোরে সে আবার গভীর স্বরে কথা বলল]

স্বপন। বই আমার শেষ হয়েছে ললিতাদেবী। কিন্তু স্বাগতাকে দেখা আমার আজও শেষ হয়নি। সুখের মধ্যে দুঃখের মধ্যে, সত্যের মধ্যে, মিথ্যার মধ্যে ওকে নতুন নতুন করে আমি দেখতে চাই। তাই কারণে অকারণে আমাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।

ললিতা। কিন্তু···

স্বপন। ললিতা দেবী, আপনার অনুরোধ আমি অমান্য করতে পারব না। আপনার মধ্যে যে মহিমময়ী নারীকে আমি দেখতে পেয়েছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু ললিতা দেবী তার আগে আমায় একটা কথা দিন।

ললিতা। অবাক হয়ে। কি কথা !

স্বপন। খাবার পরেই আমায় বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। রাত্রে আপনার সংগে আমি আর কথা কইতে পারবে না।

আমার মাথায় নোতুন একটা গল্পের প্লট এসেছে "বন্ধু চুরি হয়ে গেলাম"। ওটা আমায় বড় ভাবাচ্ছে। তাছাড়া আপনাকে ত আগেই বলেছি, নির্জন রাত্রের একটা নেশা আছে। ও সময় কথা কইলে মনের সব গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আপনি আমার বন্ধুর স্ত্রী। তাঁর অজান্তে আপনার মনের গোপন কথা আমি যদি জেনে ফেলি, আমার লজ্জার সীমা থাকবেনা আপনাকেও হয়ত এর জন্য পরে অনুশোচনা করতে হবে।

ললিতা। আপনার এ কথা আমি স্বীকার করলাম না স্বপনবাবু। আমি একজন সাধারণ মেয়ে। আমার মনের গোপন সুখ-দুঃখ যখন আপনার মত বাস্তববাদী সাহিত্যিকের মনের মাধুরী মিশে সাহিত্যে অসাধারণ হয়ে উঠবে, সে আনন্দ আমি কল্পনা করতে পারিনা। স্বাগতা দেবীর সৌভাগ্যে আমি ঈর্ষা করিনা। কিন্তু নিজের জীবনেও সৌভাগ্যকে বরণ করে নিয়ে বড় তৃপ্তি পাব। কিন্তু আর কথা নয় স্বপনবাবু, আপনার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

স্বপন। একটা প্রশ্ন করব ললিতা দেবী,—আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন ?

ললিতা। ওটা একটা সায়েন্স। বিশ্বাস করব না কেন ?

স্বপন। কয়েক বছর আগে হরিদ্বার গিয়েছিলাম। সেখানে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসীর সংগে পরিচয় হয়েছিল। নিরাবরণ দেহে যে এতখানি সৌন্দর্য থাকতে পারে তা আমার কল্পনার মধ্যেও ছিলনা। তিনি ছিলেন হস্ত-রেখাবিদ। আমি তখন অবধূতে। তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে প্রায় দুবছর তাঁর সংগে হিমালয়ের কন্দরে

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
মজার্ণ ডেকরেটরস
৬৫ এ, জন্ম সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন-৫৫-২৫৪৯

কথাবে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার আগের দেখে তিনি ক্রমে ক্রমে এ বিদ্যাটি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

ললিতা। (ছেলেমানুষী সুরে) আপনি হাত দেখতে পারেন? কি মজা! আমার হাতটা একটু দেখুন না স্বপন বাবু!

স্বপন। কেউ হাত-দেখার অনুরোধ করলে, সে অনুরোধ আমার রাখতেই হবে—এ আমার গুরুর আদেশ। কিন্তু একটা কথা বলব ললিতা দেবী, ভগবান যখন ভবিষ্যৎটা অন্ধকারে রেখেছেন তখন সেটা নাই বা জানলেন।

ললিতা। সাহিত্য করে করে আপনার সব কথাতেই "সাহিত্য" করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এত করে খোসামোদ করছি, একটু দেখুন না বাবা! [ললিতা তার হাতখানি স্বপনের দিকে এগিয়ে দিল।

স্বপন। (ওর হাতখানি ধরে) আপনার হাতখানি আপনার মনের মতই সুন্দর। কিন্তু ললিতা দেবী, বন্ধুর অসাক্ষাতে বন্ধু পত্নীর পাণিগ্রহণ করেছি এ অন্যায়।

ললিতা। এবারে কিন্তু আপনি একেবারে সাধারণ মানুষ হয়ে যাচ্ছেন স্বপন বাবু।

স্বপন। (গম্ভীরে) আমায় অসাধারণ না ভেবে সাধারণ একটি রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ বলে ভাবুন না ললিতা দেবী। তাতে আপনিও স্বাভাবিক হতে পারবেন, আর আমিও লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে পারব।

ললিতা। আপনি বড় বাজে কথা বলেন স্বপনবাবু। কথা রেখে হাতটা দেখুন ত! এদিকে আপনার খাবার কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

স্বপন। এ এমন এক বিদ্যা, যাতে মানুষ নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। (হাত দেখছে) আপনার হাতখানি সত্যই অসাধারণ। দেখুন ললিতা দেবী—

ললিতা। বলুন!

[টেলিফোন বেজে উঠল]

ললিতা। আঃ! এখন আবার কে টেলিফোন করে…। সারাদিন কেবল টেলিফোন আর টেলিফোন। বিখ্যাত লোকের স্ত্রী হওয়া এক ঝকমারি ব্যাপার! (ফোন ধরে) হালো! কে কথা বলছেন!… ও তুমি—কি ব্যাপার। রাত্রে ফিরতে পারবে না সারারাত ছুটি হবে তুমি কি মোবাইল ট্রাঙ্ক থেকে কথা বলছ! কি বলছ, সারারাত ছুটি হবে! তাই নাকি হ্যাঁ…হ্যাঁ…আচ্ছা। হ্যাঁ, এদিকে তোমার বন্ধু স্বপন চৌধুরী এসেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ কি করে যাবেন? চারিদিক জলে ডুবে গেছে। হ্যাঁ তাই ওকে আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছি। আঁ…ছি ছি… কি যাতা বলছ! এখুনি আসবে? বেশত এস না; তিনজনে গল্প করা যাবে। কি বলছ…দেখ, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে…হ্যাঁ হ্যাঁ… ওকে বসিয়ে রাখছি…না না কিন্তু তোমার ছুটি?…ওঃ তাই নাকি আচ্ছা! আচ্ছা! রাখি তাহলে কেমন! (টেলিফোন রেখে দিলো)

ললিতা। স্বপনবাবু এইবার আপনার অসুবিধার কারণ দূর হল। আপনার বন্ধু এখুনি এসে পড়বেন। নিন, এবার আমার হাতটা দেখুন!

স্বপন। মাপ করবেন ললিতা দেবী। আজ আর আপনার হাত দেখতে পারব না। সাধনার জিনিষ আমার গুরুর নিষেধ—হাত দেখতে দেখতে যদি বাধা পড়ে সেদিন আর হাত দেখতে নেই।

ললিতা। তবে আর কি হবে! আপনি একটু বসুন স্বপনবাবু। আপনার খাবারটা আবার গরম করে নিয়ে আসি। (যাইতে উদ্যত)

স্বপন। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে) ওই যাঃ! হা

ললিতা। কি হল স্বপন বাবু?

স্বপন। বিশেষ একটা জরুরী কাজ ছিল। আজ ন'টার সময় এক জায়গায় যেতেই হবে। আপনার সংগে কথা কইতে কইতে একেবারে ভুলে গেছি। কিছু মনে করবেন না ললিতা দেবী। আর একদিন এসে পেটপুরে খেয়ে যাব আর সংগে সংগে আপনার ভাগ্যটাও বলে দিয়ে যাব।

ললিতা। কিন্তু আপনার বন্ধু যে আসছেন। এই ঝড়ের মধ্যে শুধু আপনার জন্যই তিনি ছুটে আসছেন।

স্বপন। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন ও যেন কিছু মনে না করে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আর একদিন আমি নিশ্চয়ই আসব। বড় জরুরী কাজ! ছি ছি, একেবারে ভুলে বসে আছি। আজ চলি। আচ্ছা, নমস্কার!

ললিতা। নমস্কার। [উচ্চহাস্য]

চঞ্চল। [ভিতরে এসে] হাসছ কেন লতা! সে শয়তানটা কোথায়?

ললিতা। ছিছি! শয়তান বলছ কেন? বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যপরিবেশে কাউকে শয়তান বলতে নেই। তিনি পরের অধরে ফেলে রাখা সিন্দুক থেকে একটি রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন ভেবে সযত্নে তাকে আয়ত্ত করবার ব্যবস্থা করছিলেন। রত্নটির মনেও যে একটু অবৈধ আনন্দের ভাব দেখা না দিয়েছিল তা নয়। মালিক নিজের রত্ন ফেলে অন্য রত্নের সন্ধানে ঘুরছিলেন।

ইতিমধ্যে এই ভয়াবহ সংবাদ পেয়ে অধিকার হারাবার ভয়ে ছুটে আসতেই রত্ন-সন্ধানী পালিয়ে গেছেন।

চঞ্চল। তোমার কথার অর্থ কি ললিতা! কি বলতে চাও তুমি!

ললিতা। যা বলতে চাই সেটা বুঝতে পারনি, এত বোকা তুমি নও। কিন্তু আমার যদি কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়, হয় মিথ্যা কথা বলতে হবে, নইলে মনস্তত্ত্বের এক জটিল কথা বলতে হবে, যা তোমার শোনবার ধৈর্য থাকবে আমার বলারও উৎসাহ থাকবে না।

চঞ্চল। (ক্রুদ্ধস্বরে) ললিতা!

ললিতা। অমন করে চোখ রাঙিও না। বর্তমান সভ্যযুগে ওটা আউট-অফ-এটিকেট। রাত অনেক হয়েছে। আমি জানি, স্বাগতা দেবীর বাড়ী থেকে তুমি খেয়ে এসেছ। মিথ্যে কথা না বাড়িয়ে···

[টেলিফোন বেজে উঠল। চঞ্চল ধরতে যাচ্ছে]

ললিতা। (চঞ্চলকে বাধা দিয়ে) দাঁড়াও, আমি ধরছি। তোমার বন্ধু সাহিত্যিক স্বপন চৌধুরী নিশ্চয়ই। (টেলিফোনে) হ্যালো! কে?...ওঃ স্বপনবাবু। হ্যাঁ, আমি ললিতা কথা বলছি। কি ব্যাপার! হ্যাঁ··· না-না। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলেছি। কি বলছেন-ওকে ডেকে দেব? কিছু মনে করবেন না স্বপনবাবু, উনি এইমাত্র শুতে গেছেন। আচ্ছা···হ্যাঁ...হ্যাঁ... আচ্ছা...নিশ্চয়ই। ওঃ তাই নাকি! আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার! [টেলিফোন রেখে দিল]

চঞ্চল। কি বলছিল হতভাগা?

ললিতা। রাত গভীর। বাইরের সমাজের সংগে কোন যোগাযোগ নেই, তাই বলছি—এ অবস্থায় যা বলা উচিত, তাই বলছিলেন···মানে, বানিয়ে বানিয়ে কতগুলো মিথ্যে কথা বলছিলেন আর কি! রাত অনেক হয়েছে। আর দেরী করোনা। যাও শুতে যাও।

কোনও জিনিস ভালোভাবে বুঝতে হলে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে দেখতে হয়। বেটি গ্রহীব্য, তার সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। কথাটা খুব সহজ এবং পুরানো লাগতে পারে। কিন্তু কার্যে পরিণত করা অত অনায়াস নয়। কৌতূহল খানিকটা স্বাভাবিক, বাকিটা উদ্দীপিত শিক্ষিত। রুচিও তেমনই, কিছুটা সহজাত আর অধিকাংশ অর্জিত।

এই কলকাতা শহরে এবং তার আশেপাশে কত দেখবার জিনিসই তো আছে। আমরা যে দেখে বেড়াই না তা নয়। কিন্তু যেভাবে দেখি, তাতে অনেক সময়ই ভাসা-ভাসা দেখা হয়, ভিতরে প্রবেশ করা হয় না। মিউজিয়মে যাই, অর্ধেক জিনিস না দেখে ফিরে আসি কারণ বোঝবার আগ্রহ নেই। মন্দির মসজিদ গির্জা দেখছি দুবেলা। কিন্তু তাদের ইতিহাস, তাদের গঠন ও সৌন্দর্য ভালো করে জানতে চাইনা, নজরও করি না। কলকাতা শহর দিন দিন রূপ বদলাচ্ছে, বাড়ীঘর রাস্তা ভেঙেচুরে একেবারে অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। তবু ওরই মধ্যে এখনও কিছু পুরানো জিনিস রয়ে গেছে, যা শাবল হেলি হাতুড়ির ঘায়ে ধূলিসাৎ হয়নি। ট্রামে যেতে যেতে ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের বালিঘসানো ইট বার করা গির্জেটা দেখি। শূন্য পরিত্যক্ত উপাসনা ঘরটি আর কতদিন টিঁকে থাকবে এ অবস্থায়, মনে মনে ভাবি। খুব বেশী পুরানো নয়, অথচ এই অবস্থা। দুঃখ হয়।

এই থেকেই পুরানো কলকাতার কথা মনে আসছে। বাসটিড, রেকিন্‌ডেন-এর বই, কিংবা অন্য কোম্পানির গোড়ার দিনের কথা, পুরানো কলকাতা গেজেট প্রভৃতি যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কাছে অবশ্য এসব নতুন কথা নয়। হরিহর শেঠ মহাশয়ের বই-এর পর আরো কিছু কিছু বাংলা বই বেরিয়েছে পুরানো কলকাতার বাড়ী ঘর রাস্তার ইতিহাস ও পরিচিতি দিয়ে। তবু কলকাতার মধ্যে এবং আশেপাশে বৃহত্তর কলকাতায় এমন কয়েকটি পুরানো গির্জা আছে, যাদের ইতিহাস জানবার মতো। যে বণিক সম্প্রদায় য়ুরোপ থেকে এদেশে এল বাণিজ্য করতে, তাদের উত্থান-পতনের সঙ্গে কয়েকটি গির্জা বিশেষভাবে জড়িত। এবং সেসব গির্জার কয়েকটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের স্মারক ও পুরাতন স্মৃতি বহন করে। কাজেই প্রথম বিদেশীদের বসতি, জীবনযাত্রা এবং উপাসনার চিহ্ন হিসেবে এদের নিজস্ব আকর্ষণ তো আছেই ইতিহাসের ছাত্রের কাছে। জন-সাধারণের কাছেও শহরের বনেদী বাসিন্দা আর সুপরিচিত দৃশ্য হিসেবেও এরা একেবারে মূল্যহীন নয়।

কলকাতায় যে সব গির্জা আছে, তাদের চেয়ে ভাগীরথীর তীরে যেসব উপনগরী, সেখানকার গির্জাগুলি আরো পুরানো। কারণ কলকাতার চেয়ে উত্তর দিকে নদীর ধারে প্রায় তিরিশ মাইল ব্যাপী যে অঞ্চল তার ইতিহাস আরো প্রাচীন। য়ুরোপীয় বণিকদের প্রথম পদার্পণ ও কুঠি স্থাপন হয় হুগলী এলাকায়। সেখানে পোর্তুগীজ ওলন্দাজ ইংরেজ ফরাসী অনেক বিদেশী ব্যবসায়ী এসে জমায়েত হয়। তারপর ভাগ্য-পরীক্ষায় ইংরেজরাই জয়ী হল। অন্যান্য বণিক-সম্প্রদায় নানা কারণে, স্বদেশের এবং এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানিই বাণিজ্য বজায় রাখতে হুগলী থেকে সরে এসে কলকাতায় কায়েমী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। অতএব যখন যেখানে বিদেশী বণিকরা কুঠি নির্মাণ করে বসবাস করেছে, তখন সেখানে একটি করে ভজনালয় তৈরী হয়েছে। তাই স্থানীয় গীর্জাগুলি গত তিন চারশো বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাঙলায় বিদেশীদের উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী হয়ে।

পোর্তুগীজরাই প্রথম এল বাংলাদেশে। কাজেই ব্যাণ্ডেলে পোর্তুগীজদের গির্জাটি হল প্রাচীনতম খ্রীষ্টান ভজনালয়। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৩২ সালে মুঘল সৈন্য যখন হুগলী আক্রমণ করে, তখন এই গির্জাটি ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় পরিণত হয়। পরে দুজন ব্যাণ্ডেল গির্জার সংস্কার সাধন করে তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ছোট বয়সে ১৯১৫ সালের গ্রীষ্মাবকাশে

এই গির্জাটি প্রথম দেখি। গির্জার প্রাঙ্গণে ইংরেজীতে একটি প্রকাণ্ড মান্দ্রাজ, সংলগ্ন বাগানের ছায়াশীতল স্নিগ্ধতা, ভজনালয়ের ভিতরে নীরব পরিচ্ছন্নতা, প্রাচীরে অঙ্কিত কয়েকটি সুন্দর ফ্রেস্কো—সমগ্র সৌধটি তার সৌন্দর্য-পরিবেশ নিয়ে বালক-মনকে মুগ্ধ করেছিল। তখন তার ঐতিহ্যের মর্ম বোঝার বয়স ছিল না। কিন্তু ভিতরকার সেই গম্ভীর থমথমে ভাবটি এমন এক শান্ত বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, যা আজও মুছে যায় নি।

কিংবদন্তী আছে যে একবার মাতা মেরীর পবিত্র মূর্তি গির্জা থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু কি এক অলৌকিক উপায়ে সে মূর্তিটি ফিরে পাওয়া গেলে ছাতুজ তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন সমুচিত সমারোহের সঙ্গে। ঠিক ঐ উৎসবের দিনে কয়েকজন পোর্তুগীজ নাবিক হুগলীর বন্দরে এসে পৌঁছয়। পথে ঝড়-বাদলে তাদের জাহাজ বিধ্বস্তপ্রায়, প্রাণ যেতে বসেছিল। তারপর দৈবানুগ্রহে সমুদ্র শান্ত মূর্তি ধারণ করে এবং নাবিকরাও কোন মতে বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়। ক্লান্ত নাবিকদল সেদিনকার অনুষ্ঠানে ভক্তিভরে যোগদান করে এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাদের জাহাজের মাস্তুলটি ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে। সেই থেকে ব্যাণ্ডেল গির্জার প্রাঙ্গণে মাস্তুলটি বিরাজ করছে। তারপর বহু কাল কলস্রোতে ভাগীরথী দিয়ে নেমেছে। পোর্তুগীজ মুঘল কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হুগলী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, ইংরেজ কোম্পানীর ক্রমাগ্রসর শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে সাতগাঁ হুগলী অঞ্চল থেকে কবে অপসারিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাণ্ডেল চার্চটি আজও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কাছে পরম পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। জেসুইট যাজকরা 'রিট্রীট'-এর সময় এখানে এসে ধর্মচিন্তায় অবকাশ যাপন করেন।

তখনকার দিনে ব্যাণ্ডেল হুগলী চুঁচুড়ার সীমানা তেমন নির্দিষ্ট ছিল না। পোর্তুগীজ ইংরেজ ও ওলান্দাজদের কুঠিগুলো নিজেদের এলাকায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত, এই পর্যন্ত। চুঁচুড়াতেও এই রকম একটি পুরানো গির্জা আছে। অবশ্য ব্যাণ্ডেল চার্চের পাশে অর্বাচীন। ১৬৯৫সালে এই আর্মেনিয়ন গির্জার প্রতিষ্ঠা। উৎসর্গ করা হয়েছিল যীশুখৃষ্টের দীক্ষাগুরু সেণ্ট জন দ্য ব্যাপটিসের নামে।

এরই কিছু দক্ষিণে আন্দাজ মাইল দুয়েক ব্যবধানে করাসী চন্দননগর। চন্দননগরে নদীর ধারে একটি পুরানো কনভেণ্ট আছে। তারই সংলগ্ন যে গির্জা, সেটি কিন্তু ফরাসীদের তৈরী নয়। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালিয়ন মিশনরীরা এর প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দননগর হাতবদল হয়েছে। কিন্তু ঐ মঠ আর গির্জা অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও বিরাজ করছে।

এর পর শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুরের একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে। বাংলাদেশে দিনেমারদের প্রথম উপনিবেশ তো বটেই, উপরন্তু, ইংরেজ কোম্পানির কাছে তার হস্তান্তরে এবং উইলিয়ম কেরী ও মিশনারীদের কর্মকেন্দ্র আর বাংলা মুদ্রণের আদিভূমি হিসেবেও শ্রীরামপুরের খ্যাতি কম নয়। এখনকার ভজনালয়টিও বেশ প্রাচীন। আঠারো শতকের শেষ দিকে এই সেণ্টওলাফের গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সঠিক তারিখ জানা নেই, তবে স্থাপত্যরীতি থেকে উপাসনা-গৃহটির বয়স নির্ণয় করা কঠিন নয়। কলকাতার উপকণ্ঠে যে সব গির্জার কথা বলা হল, সেগুলি খাস কলকাতার অনেক গির্জার চেয়ে আরও প্রাচীন। কারণ, কলকাতা ঐ সব উপনগরীর চেয়ে পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং বিদেশী বণিকরা হুগলী নদী ধরে যতটা অগ্রসর হয়েছিল, সেই সব জায়গায় নদীর তীরে একটি করে কুঠি-বাড়ী এবং উপাসনার জন্য গির্জা তৈরি করার দরকার হয়েছিল।

জব চার্নক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে যে কলকাতায় পত্তন করলেন, তা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। মুঘল সরকারের সঙ্গে শুল্ক-নীতি নিয়ে বিসংবাদ, মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ, হোলঘাটের যুদ্ধ—এ সব তো ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে কলকাতার প্রোটেস্টাণ্ট গির্জাগুলি বেশ কিছুকাল পরে, অর্থাৎ আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রারম্ভে, প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শহর কলকাতার খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তারের আগে, অর্থাৎ প্রথম পঞ্চাশ ষাট বছর, ইংরেজ কুঠিয়ালরা কোথায় সমবেত হতেন এবং কোন্ উপাসন-গৃহে মিলিত হতেন, তারও একটা হদিস পাওয়া যায়।

ইংরেজদের বসতি সে সময়ে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বা লালদীঘিকে কেন্দ্র করে অবস্থিত ছিল। এখানে

তাদের প্রথম ভজনালয় ছিল সেন্ট অ্যানের গির্জা, পুরানো কেল্লার প্রধান প্রবেশপথের ঠিক সামনেই। চল্লিশ বছরের ওপর এই গির্জাটি ব্যবহৃত হয়। তারপর ১৭৪৬ সালে নবাবী সৈন্যরা যখন কলকাতা আক্রমণ করে, তখন এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইংরেজরা যখন পলাশী যুদ্ধ-জয়ের পর কলকাতায় আবার ফিরে এল, তখন শহরের পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রোটেস্ট্যান্টদের কোনও উপাসনা-গৃহ ছিল না, সেন্ট অ্যানের গির্জা তো ইতিমধ্যে নষ্ট হয়েই গেছে। অবশ্য পোর্তুগীজদের পুরানো গির্জা ছিল মুন্সিহাটায়। এখনও সেটি বর্তমান, এবং বয়সে প্রাচীনতম। কিন্তু ওটি রোমান ক্যাথলিক। তবুও গত্যন্তর না দেখে, চুঁচুড়ার প্রেসিডেন্সি চ্যাপলেন বা ধর্মযাজক ঐ মুন্সিহাটার পুরানো রোমান গির্জাতেই ইংরেজ বাসিন্দাদের জন্য উপাসনা পরিচালনা করতে লাগলেন।

পরিস্থিতিটা খুবই হাস্যকর ঠেকে আজকের দিনে। আঠারো শতকের খৃষ্টানদের দুই প্রধান সম্প্রদায়, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যে মতান্তর ও বৈরি-ভাব ছিল, তাতে পরস্পর মুখ দেখাদেখি ছিল না বললেই হয়। ধর্মজীবনে তখনও পরধর্মসহিষ্ণুতার যথেষ্ট অভাব ছিল। ইংলণ্ডে ক্যাথলিকদের প্রতি সরকারী মনোভাব এবং সিংহাসনে কায়েমী প্রোটেস্ট্যান্ট উত্তরাধিকারের কথাও সুবিদিত। এর পর পোর্তুগীজরা একে বিদেশী, তায় ক্যাথলিক, তার ওপর ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, শত্রু স্থানীয়। এ অবস্থায় নবাবী সৈন্য-কর্তৃক বিতাড়িত আবার পলাশীর পর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা মুন্সিহাটার অপবিত্র ক্যাথলিক গির্জাকেই নিজেদের উপাসনা-গৃহে রূপান্তরিত করে নিলেন! অদ্ভুতও হল, পোর্তুগীজদের সঙ্গে শত্রু পক্ষ মুসলমান সরকার এবং ফরাসীদের যোগসাজস আছে। অতএব গির্জাটিকে দখল করে সেইখানেই বিশুদ্ধ প্রোটেস্ট্যান্ট মতে ইংরেজদের উপাসনা-অনুষ্ঠান চলতে লাগল। ভর্তন নদীর জলে তো দুই সম্প্রদায়েরই সমান ভাগ ও আস্থা। বোধ হয়, হাতের কাছে গঙ্গাজল দিয়েই অশুদ্ধ ক্যাথলিক গির্জাকে যথারীতি শোধন করে নেওয়া হয়! পরে অবশ্য, পোর্তুগীজ গির্জাটির দখল ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে কলকাতার প্রাচীনতম প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা হচ্ছে ওল্ড চার্চ বা ওল্ড মিশন চার্চ। এখানকার মিশন রো রাস্তাটি ঐ পুরাতন গির্জারই নামানুসারে চিহ্নিত। মিশন চার্চের ইতিহাস দেশে প্রাচীন, পুরোপুরি এক শো' নব্বুই বছরের ইতিহাস। সৌভাগ্যক্রমে, এই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সেখানকার পুরানো রেকর্ড থেকে পাওয়া যায়। এই গির্জা-প্রতিষ্ঠার পিছনে যে অক্লান্ত কর্মীর নিষ্ঠা-পরিচয় আছে, তাঁর নাম কীর্যাণ্ডার। বাংলায় খৃষ্টান মিশনরীদের মধ্যে তিনি অগ্রণী। সুইডেন দেশের বিদেশী মানুষ, কিন্তু ভারতের দিকে আকৃষ্ট হলেন খৃষ্ট ধর্মপ্রচার সমিতির কুড্যালোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে। তারপর নাগাপট্টম প্রদেশে মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক হিসেবে তিনি এদেশে এলেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে। রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই তাঁকে নাগাপট্টম ছাড়তে হয়। ১৭৫৮ সালে ৩১শে মে তারিখে কাউন্ট লালীর নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যরা এসে যখন কুড্যালোর দখল করে, তখন কীর্যাণ্ডার বাংলা দেশে চলে আসেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৭৫৮ সালে যখন তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন, তখন ক্লাইভ এবং বেঙ্গল বোর্ডের সদস্যরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। শহরে তখন একটিও প্রোটেস্ট্যান্ট মিশন বা গির্জা নেই। কাজেই কোম্পানির কর্মচারীদের আগ্রহ সহজেই অনুমান করা যায়। কীর্যাণ্ডার সত্যিই কর্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। উপাসনা-ক্রিয়ায় পাদরিদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করা এবং ভাষণ দেওয়া ছাড়া, তাঁর আর একটি মহৎ কাজ হল—মুন্সিহাটা অঞ্চলে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়-স্থাপন। কলকাতায় দেশীয় ছেলেদের জন্য প্রথম য়ুরোপীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব তাঁরই। তারপর ইংরেজদের একটি নিজস্ব ভজনালয় স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি নানা ভাবে সচেষ্ট হন। অবশেষে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বেথ্ টেফিলা' অর্থাৎ উপাসনা-গৃহ নামে যে গির্জার ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন, সেইটিই পরে মিশন চার্চ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থায়ী প্রোটেস্ট্যান্ট ভজনালয়টির নির্মাণ কার্য ১৭৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ণ হয়। মোট খরচ পড়েছিল আটষট্টি হাজার টাকা।

আর সেই টাকা তোলা, বাড়ী তৈরী করানো এবং আনুষঙ্গিক নানা কাজে তিনি পরিশ্রমের কার্পণ্য করেননি। ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে এই চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অবসর নেবার সময়, বোর্ড অব্ ট্রেড-এর সেক্রেটারি চার্লস গ্র্যান্টকে এই গির্জার স্বত্ব ও দায়িত্ব বিক্রয় করেন। ১৭৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁরই হাতে-গড়া মিশন চার্চের সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

কীর্ণাণ্ডারের জীবন কথা কিছু দীর্ঘ হল, কিন্তু তা প্রাসঙ্গিক। এবার 'ওল্ড চার্চ' সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলি। এই ওলড মিশন চার্চ-এর চেহারা মোটামুটি একই রকম বজায় আছে, যদিও কিছু কিছু অংশ ভেঙে বদল করা এবং নতুন করে গড়ার দরকার হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পরে। এর পুরানো নথিপত্রে একাধিক সংগঠক ও প্রচারকর্মীর নাম পাওয়া যায়, যেমন ব্রাউন, টমাসেন, কৃষি ও ডিলট্রি। কৃষি সাহেবের নাম থেকে করিস চার্চ লেনের নামোৎপত্তি। আর আচ্ছীবন ডিলট্রি তো স্বনামধন্য পাদ্রি। এঁরই হাতে ঐ ওল্ড চার্চেই মহাকবি মধুসূদনের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা এবং মাইকেল নাম গ্রহণ,—১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

যে বছর চার্লস গ্র্যান্ট কার্ণাণ্ডারের কাছ থেকে মিশন চার্চ কিনে নেন, সেই বছরই সেন্ট জনস চার্চের উদ্বোধন হয়। পুরানো কলকাতার এই আর এক সাক্ষী এখনও জীবিত। আগেকার কলকাতার বেতার কেন্দ্র অফিসের ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এর অবস্থান। এর পশ্চিমে চার্চ লেন এবং প্রাঙ্গণের এক কোণে জব চার্নকের সমাধি আজও রয়েছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ওই এপ্রিল ওয়ারেন হেস্টিংস এর ভিত্তি স্থাপনা করেন বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে। প্রথম দিনই চাঁদা ওঠে পঁয়ত্রিশ হাজার ন'শো পঞ্চাশ টাকা। এই জায়গাটি আগে ছিল কবর-স্থান,—১৭৮৭ সালে যা পার্ক স্ট্রীটে সরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে গির্জার পূর্ব দিকে যে সোনা ঘাসগা, তাকে এক কালে বারুদ সোলার ইয়ার্ড বলা হত। ওটি পরে মহারাজা নবকৃষ্ণের সম্পত্তি হয় এবং গির্জা তৈরির সময়ে জায়গাটি আবার সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয়। দেশী লোকেরা একে 'পাথুরিয়া গির্জা' বলত, কারণ গৌড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে চুণার পাথর আনিয়ে কাজে লাগানো হয়েছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন, সেন্ট জনের নামে উৎসর্গীকৃত এই গির্জার উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হল। সাহেবেরা অবশ্য বহু দিন ধরে একে 'নিউ চার্চ' বলতেন, কারণ অদূরে লাল দীঘির পূব দিকে মিশন চার্চ হল 'ওলড চার্চ'। ১৮১৪ সাল পর্যন্ত এটি প্রেসিডেন্সি চার্চ ছিল। কলকাতা যখন বিশপের এলাকায় পরিণত হয়, তখন 'সেন্ট জন কেথিড্রাল' বলে অভিহিত হল।

খাস কলকাতায় সবচেয়ে পুরানো গির্জা কিন্তু ওল্ড চার্চ, নিউ চার্চও নয়। শহরের প্রাচীনতম খৃষ্টান ভজনালয় বলতে গেলে ঐ আর্মানি গির্জা, যার সম্বন্ধে বাল্য-স্মৃতি কবি খোলেনদি, সহজ পাঠে ধরে রেখেছেন। ১৭০৭ সালে কলকাতা-বাসী আর্মেনিয়ন বণিক সম্প্রদায় একটি কাঠের উপাসনা ঘর তৈরি করেন নিজেদের কবর-খানার জমিতে। নাম দিয়েছিলেন সেন্ট জন্দ চার্চ। কিন্তু চুঁচুড়ার ১৬৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আর্মানি গির্জারও নাম ছিল ঐ একই। তাই পার্থক্য রাখার জন্যে কলকাতার গির্জাটির নাম বদলে রাখা হল 'হোলি চার্চ অব ক্রাজারেথ', সংক্ষেপে ক্রাজারেথ চার্চ। এবং সেই সময়ে, ১৭২৪ সালে, কাঠের বাড়ীটি ভেঙে নতুন ইমারত তোলা হয়। স্থপতি ছিলেন ইরাণের এক আর্মেনিয়ন শিল্পী—লেভন গেবণ্ড। কলকাতার আর্মানি খৃষ্টানরা একটি ছোট সম্প্রদায়। কাজেই এ গির্জা তাদের কাছে খুব সমাদরের বস্তু। একাধারে ভজনালয় এবং সামাজিক জীবনের মিলন কেন্দ্র। পুরো আড়াইশো বছর হয়ে গেল দীর্ঘ দিনের ইতিহাস বহন করে আজও গির্জাটি দাঁড়িয়ে আছে মোটামুটি একই চেহারা নিয়ে। আর্মেনিয়ন স্ট্রীটে জায়গাটি অবশ্য প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন নয়। কিন্তু এক কালে ঐ খানেই ছিল আর্মানিদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মস্থল। কাজেই তাদের উপাসনা গৃহটি স্বক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর্মানি সম্প্রদায়ে ধনী ব্যক্তির অভাব ছিল না কখনোই। তাই চার্চের রেকর্ড থেকে জানা যায়—আগা নজর, শাজারমালিয়ন, থ্যাডিউস, আপকার প্রভৃতি ধনশীল ও স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা গোড়া থেকেই নানা ভাবে আনুকূল্য দেখিয়েছেন।

১৮২০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে যেসব গির্জা তৈরি হয়েছে, তারা অপেক্ষাকৃত নবীন, যেমন—লোয়ার সার্কুলার রোডে সেন্ট জেমস (১৮২০), আমহার্স্ট স্ট্রীটে করিস চার্চ, (লংসাহেবের গির্জা বলে পরিচিত, এটাই সি. এম. এস. চ্যাপেল, বর্তমানে টিনটি চার্চ—১৮২৬), ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে সেন্ট টমাসের গির্জা (১৮৩১), ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ে ক্যাথলিক গির্জা (১৮৩২), কেল্লার মধ্যে সেন্ট পিটার্স (১৮৩৫), হেদুয়ার পশ্চিমে বেন্টারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো'র স্মৃতি-জড়িত ক্রাইস্ট চার্চ (১৮৩৯) এবং কলকাতার সেরা এবং সব চেয়ে উঁচু ও বড় কেথিড্রাল, সেন্ট পলস্ (১৮৩৯)। এদেরও এক একটি ইতিহাস আছে, পুরানো চার্চ-রেজিস্টার থেকে সে সব কথা জানা যায়। কিন্তু ব্যাণ্ডেল চুঁচুড়ার গির্জার পরেই কলকাতার ঐ চারটি গির্জা হল প্রাচীনতম। বয়ঃক্রম-অনুসারে আর্মানি গির্জা, পর্তুগীজ চার্চ, ওলড মিশন চার্চ এবং সেন্ট জনস বা নিউ চার্চ। এদের আভিজাত্য স্বতন্ত্র। পুরানো কলকাতার এই স্মৃতি-চিহ্নগুলো নতুন সড়ক আর রাইটার্সের দৌলতে আজো লুপ্ত হয়নি।

নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু

উৎপল দত্ত

নাট্য-আন্দোলন চলতে কি বেঝায় সে নিয়ে যাঁরা কৃত্রিম অজ্ঞতার ভাণ করে বৈদগ্ধ্য প্রচার করেন তাঁদের সংগে তর্ক করে লাভ নেই। মোটামুটি সকলেই আজ বুঝে নিয়েছেন কোন নাটক, কোন সম্প্রদায় নাট্য-আন্দোলনে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত—আর কোন থিয়েটারগুলি নিছক অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে নাটক করেন—আর কোন দলগুলি বছরে একদিন আমোদ-আহ্লাদের জন্যে নিছক নাটক করেন।

আজ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো ঐ নাট্য-আন্দোলনে আর বিষয়বস্তুতে।

বর্তমানে অধিকাংশ দলের পুরোহিতরা নাটকের অভাবের দোহাই পাড়েন; সেই জন্যেই নাকি যন্ত্র পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। বাংলায় নাটক নেই কি? পুরোনো নাটক—প্রায় বিস্মৃত, অজ্ঞাত, ঔদাসিন্যে ক্লিষ্ট—রচ রয়েছে এটা সকলেই জানেন। এবং তার মধ্যে অনেকগুলিই নূতন আলোয় পুনরভিনীত হওয়ার যোগ্য এও পরোক্ষে অনেকেই স্বীকার করেন। তবু সেগুলির অভিনয় হয় না। এলিয়ট সেক্সপীয়রের সমসাময়িকদের প্রায় সেক্সপীয়রের পর্যায়ে তুলে ছেড়েছেন। অথচ এখানে কাগজে হঠাৎ একদিন দীনবন্ধু মিত্রকে নাট্যরসজ্ঞ আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, ছাপা অক্ষরে এক "কবি" মাইকেলকে অকবি সংজ্ঞা দিয়ে আমাদেরকে কুসংস্কার-মুক্ত করার চেষ্টা করেন। এ ধরণের নির্বিচারের সর্দারিতে ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মূল্যায়ন হয় না গালাগালি হয়।

একটা অভিযোগের ভদ্রতো কিছুটা ভিত্তি আছে—ভাল সমসাময়িক নাটক বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। এর জন্যেই বা দোষ দেওয়া হবে কাকে? নাট্যসংস্থাগুলি যা দেওয়া হচ্ছে তার এমন দুর্দশা কেন?

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সব নাটকই জীবনের প্রতিফলন করার চেষ্টা করে আমাদের অনুকরণ করছে ঐ যে ভেডিভ ছিল ফোটো তুলতে শুরু করলেন ১৮৭ নাগাদ—সেইজন্যে দায়ী করলেন আমাদেরকেও পৃথিবী জুড়ে প্রায় একশ' বৎসর ধরে চলল ফোটোগ্রাফি দৌরাত্ম—উপন্যাসে, কাব্যে, ছবিতে, থিয়েটারে

তবে অন্যেরা কাটিয়ে উঠলেন এক সময়ে; থিয়েটার এখনো কাটেনি। কাটাতে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়ে অনেকে—গর্ডন ক্রেগ ছেড়ে দিলেন, মায়াকোভস্কি মরেই গেলেন, টলের করলেন আত্মহত্যা, ভাখতাঙ্গভ অকাল মৃত্যু বরণ করে মুক্তি পেলেন। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরুলেন ব্যতিক্রমমাত্র। সব দেশের শ্রেষ্ঠ ফোটো-বাদীদের বিপ্লবীরা পরিত্যক্ত গুদাম ঘর ভাড়া নিয়ে টিম টিম করছেন

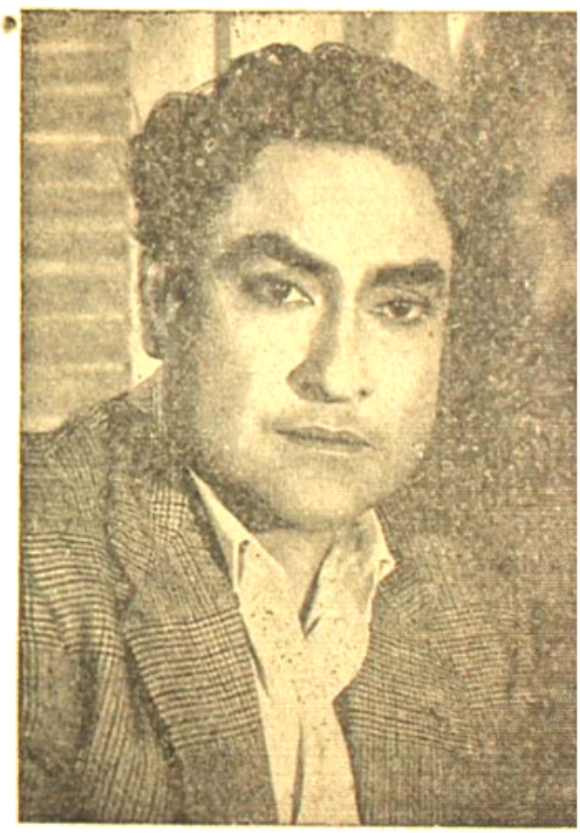

'হাসপাতাল' চিত্রে অশোককুমার

াংলার নাট্যকারদেরও ঐ রোগে পেয়েছে।
। ঘাটো হয়ে গেছে, নিজের ক্লান্ত হয়ে গেছে।
জিনিসটাকে পরিপক্ক করা হয়েছে কিছু ঠাণ্ডা-গরম
। মারপ্যাঁচে। নাটকে এসেছে মধ্যবিত্ত ভাব।
টে বাপ, অন্ধ্য কন্যা, হিটলার্স্ত্রা ভাই, বেকার
র অন্তর্দ্বন্দ্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে নাটক। অন্যধার
ই যুবক, অধর্মবাদী রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে ঐ
ক্ত পারিবারিক কলহই পাঁচমিশেলি করে যাই
গরম বক্তৃতা দিয়ে আসর গরম করা হচ্ছে।
ামরা এ কথা কখনো বলছি না যে অত্যন্ত
ণ জীবনের সাধারণ কথাবার্তা থেকে মহৎ নাটক
তে পারে না। আমরা বলছি—এই সব নয়।
জীবনের চেহারা ধারার একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উপায়
আমরা বলছি—জীবনকে অনুকরণ করতে গেলে
বনসদৃশ সংলাপ বসিয়ে যেতে হয়, আর তাহলে
র চিন্তার যে বিশাল জগৎটা, সেটা থেকে যায়
বলার সত্যটা ধরা পড়ে, না-বলার বৃহত্তর
। থাকে অপ্রকাশিত।
ার মানুষ যা করে যা বলে, তার চেয়ে ভাবে
বেশি। একটি যুবক বার বার আঘাত পেয়ে

'সাথীহারা' চিত্রে উত্তমকুমার

আত্মহত্যা করল। সত্যিকারের জীবনে সে কি করে? পায়চারি করে, রাত্রে ঘুমোয় না, প্রিয়জনের সংগে কথা বলে না—বড়জোর চুলগুলি অবিন্যস্ত হয়, চোখে নামে এক উন্মাদ স্বপ্ন। তারপর একদিন এক টুকরো কাগজে লিখে যায়—আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। লোকে এসে দেখে চোখ বিস্ফারিত করে সে উদ্বন্ধনে শেষ মূক প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এটুকু তার বাঙ্ময়লাপ—এটুকু তুলে ধরলে নাটক হয়তো হতে পারে।

'হাসপাতাল' চিত্রে সুচিত্রা সেন

কিন্তু এর পেছনে যে চিন্তার জাল বুনে গেছে সে—মানবসত্তার ইতিহাস আউড়ে গেছে তা কি বৃহত্তর সত্য নয়? তা কি নাটকের উপজীব্য হবে না? এই অন্তরকে ধ্বনিত করলেই শোনা যায় "To be or not to be"-র মতন মৃত্যু বিন্যাসের অথবা "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" ধরণের এক দীর্ঘশ্বাস।

'গঙ্গা' চিত্রে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

মানুষের সুপ্ত কবিত্ব, অব্যক্ত প্রতিবাদ, নিভৃত কামনারাশি—সবই নাটকে স্থান পাওয়া উচিত। তাহলে অবশ্যই নাটককে আর ফোটোগ্রাফ করে রাখা চলেনা; অবশ্যই চরিত্রগুলিকে চেনাজানা সাধারণ মানুষ করে রাখা চলে না; নাই বা রাখা গেল। ফোটোগ্রাফ না হয়ে সে হয়তো যামিনী রায়ের ছবি হয়ে উঠবে।

উজিয়ে দেয়া যাক বং, চড়িয়ে দেয়া যাক সুর; ঘটুক ঘটনার পর ঘটনা—জীবনের যতটুকু ঘটে তার চেয়ে ঢের বেশি ট্র্যাজেডি পরপর এসে দলিত মথিত করে দিক যোগেশের সাজানো বাগানকে। ভাইল-খাঁটা মিহি কেরানীর ক্ষুদ্র জীবনকে বিশাল কুরুক্ষেত্রের রূপ দেয়া যাক। টাইপরাইটারে খট খট করতে করতে একদিন সিংহনাদ করে উঠুক নগ্না অর্জুন।

কিন্তু তার ধারে কাছেও যাচ্ছে না আজকের নাটক। এমন একাগ্রচিত্তে চলেছে ফোটোগ্রাফির সাধনা যে কখন একটু বাস্তবতার ভাব কেটে যায় সেই আশঙ্কায় কুঁজো বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন

করছেন মানুষকে; কিকে যেমে থাকো কিকে করছেন বং, ঘটনা হীন বর্ণহীন গাঢ় হীন করে তুলছেন থিয়েটারকে, ঠিক জীবনে যেমনটি ঘটে।

অতি পুরো কথা, ইচ্ছাকৃত ঝাঁকানো-চোরানো সব আধুনিক শিল্পের মূল কথা। যার না আনিনাকো ম্যাটিসের প্রাচীন তার পদাঘাত যেমন প্রেমে মিত্রা হাজার বছর ধরে পথ হাঁটে জীবনের বনলতার মুখে শ্রাবস্তী কারুকার্য দেখতে। এলিয়ে দেখেন কাঁপা মানুষ; মাথায় ঠাসা খড়। র‍্যাঁবো দিব্যচক্ষে দেখতে পান খুনেদের ঘুম আসছে—

"O! tous les vices, colire, luxure
Magnifique, la luxure
Surtout mensonge et paresse."

গানের আসল শক্তিটা কোথায়? মালকোষে সা পা মা ধা নি সা বার বার আওড়ালেই কি মালকোষ না মধ্যমে বার বার পাড়ালেই মালকোষ? স্বরগুলি নি

'ভাইনা' চিত্রে গীতা

ষ্টি হবে—তবেই না ঘনকোশ!
কাশে বাস্তবতা কতটুকু?
শুনলে হাসি পায় না?
রে বৃষ্টির শুদ্ধ নকল করা হয়
বড় ওস্তাদ গাইলে বৃষ্টি বন্ধ
শোনা যায় বটে—তবে
ড়াও আরো অনেক কিছুই
যায়, অন্তরে অনেক কথাই
ধ্বনিত হয়ে ওঠে। বসন্ত রাগে
াস্তকালীন প্রাকৃতিক বর্ণনার
দও আটকে রাখা যায়?
ক্ষেত্রে হোলিখেলার ধারা-
ই কি তাহারের বৈশিষ্ট্য।

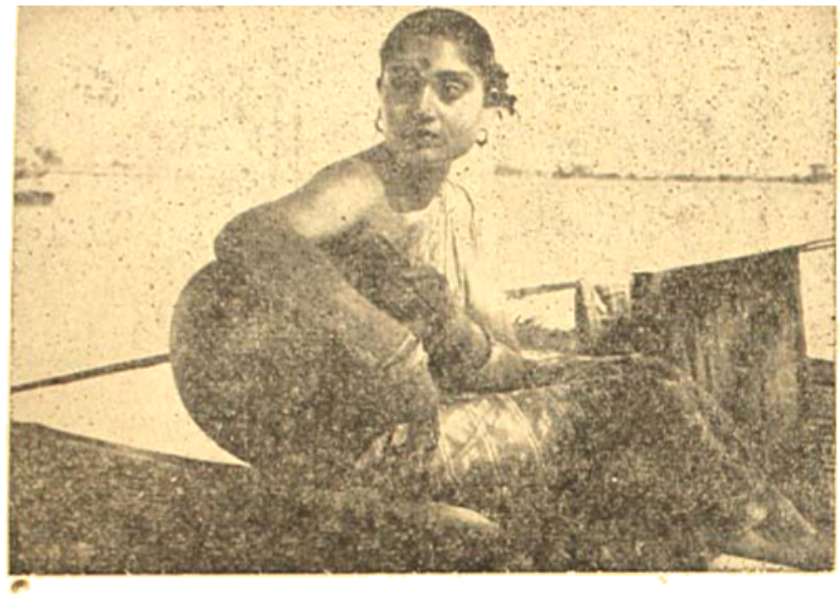

গঙ্গা' চিত্রে রুমা দেবী

ই চেষ্টা হয়েছে সঙ্গীতকেও একটা বাস্তবতার
: কেওয়ার ততই সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, মেলে ধরেছে ডানা,
ধিচঙ্গীর মতন কল্পনার অন্তরীক্ষে উধাও হয়েছে।

কত রাগরূপ দিয়ে গেছেন কবিরা; সঙ্গীত কিন্তু বাঁধা পড়ল না। টমাস মুরের মিস্ট্রেল-এর মতন সঙ্গীত চির-স্বাধীন।

'মরুতৃষা' চিত্রে সাবিত্রী চ্যাটার্জী

পশ্চিমে সঙ্গীতের উপর আরো বেশি অবরদস্তি হয়েছে। অবজেক্টিভ্ মিউজিক; ভিভিড্ মিউজিক --প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করে এক শ্রেণীর সঙ্গীত সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে যার যোগ থাকবে প্রত্যক্ষ। ব্যর্থ হয়েছে চেষ্টা। চাই কোত্স্কির "১৮১২" ওভার্চার-এ মুহূর্তের জন্য শোনা গেছে ঝুরাবঝড়ের হাহাকার, পরমুহূর্তে হারিয়ে গেছে, জেগে উঠেছে আবেগের ঝড়। বেঠোফেন ষষ্ঠ সিম্ফনিতে শুনিয়েছেন ঝড়ের গর্জন; পরের অংশেই এসেছে শেপার্ডস্ হিম—কোন এক অনির্বচনীয় আনন্দে হেসে উঠেছে সুরকার।

চিত্রকলার কথা নাই বা বললাম। চিত্রকলায় ফোটোগ্রাফির হাঁড়ি তো বহুদিন ফেটেছে। উপরন্তু থুলেস-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন চিত্রকররা বিকৃত করে যা আঁকছেন তা আসলে বিকৃত নয়, চোখ নাকি সত্যি তাই দেখে। তাকে যাঁরা ফোটো-গ্রাফের মতন নিখুঁৎ করে তোলেন তাঁরা সত্যের অপলাপ করেন।

চলচ্চিত্রে আইজেনষ্টাইন বাস্তবোত্তর যে স্তরে

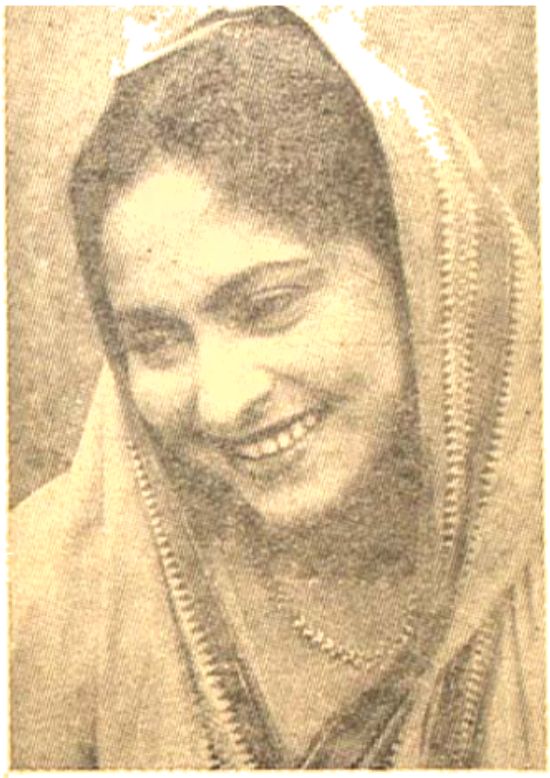

'মায়ামৃগ' চিত্রে সন্ধ্যারাণী

নিয়ে পৌঁছেছেন তাকে কি আর্ট বলে মানা হবে না? ইব্সান যে টেরিব্‌ল্-এর রহস্যময় ছায়া নিয়ে আধা-জৈবিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তাও সত্য—বাহ্যিক সত্য না হলেও আন্তরিক সত্য।

অপেরার কাহিনী এত ঘটনাসঙ্কুল কেন হয়? কেন রিগোলেত্তোকে উত্যক্ত ক'রে যাবে দুর্দৈব? কেন নিজের কন্যাকে প্রমাদবশে দিয়ে আসে সে রাজার অন্তঃপুরিনী হতে? কেন তেমনি নিজের প্রমাদবশে নিজের কন্যার বুকে ক'রে ছুরিকাঘাত? কেন কন্যার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দুজনের দীর্ঘ দ্বৈত কণ্ঠসঙ্গীত? স্পারাফুচিলে চরিত্রটাই বা কেন এত ভীষণ? ঘটনার সম্ভাব্যতার বিচারে "রিগোলেত্তো" অবাস্তব, মিথ্যা। জীবনসত্যের বিচারে "রিগোলেত্তো" অমর সৃষ্টি।

শেক্‌স্‌পীয়ার কেন করেন এত ঘটনা সংস্থাপন? তলোয়ার-খেলা, খুন, শবের ছড়াছড়ি। তাই বলে কি অবাস্তব?

রবীন্দ্রনাথ কেন কাব্যের রং-এ চিত্রিত করেন রক্তকরবীকে? রক্তকরবী আধুনিক সমাজের মূল জিজ্ঞাসায় পৌঁছে গেছে। বর্তমান জীবনের ভিত্তিতে ধরে পড়া দিচ্ছেন বিশ্বকবি। অথচ সেখানেই বর্তমান জীবনের সঙ্গে চেহারার মিল খুঁজতে গেছি সেখানেই দেখেছি রক্তকরবী বর্তমানকে ছাড়িয়ে উচ্চতর এক কাব্যলোকে উঠে গেছে। সে বর্তমানের হয়ে সর্বকালের। সবই বলা হচ্ছে, তাদেরও আরো কি বলা হচ্ছে। এমন কি যেখানে চরিত্রের নাম নেই সবং সমাজের এক অতি-পরিচিত শ্রেণীর নামে ভূষি হয়েছে চরিত্র—যেমন অধ্যাপক—সেখানেও অধ্যাপক সুলভ কথাবার্তা শুনতে পাবো না। কোনো কোনো অতি-রাবীন্দ্রিক আছেন যাঁরা এটুকু শুনেই ক্ষেপে গি হ্যামলেট পর্যন্ত টান মারেন রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করবে দোহাই অপনাদের, রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার প্রয়োজ নেই—শেষটুকু শুনুন। বক্তব্য হচ্ছে—অধ্যাপক বলতে যে চশমা-আঁটা তাত্ত্বিকের চেহারা মানসপটে উদি হয় সে অধ্যাপক রক্তকরবীতে নেই। বাস্তব অধ্যাপকে বাস্তব লেকচারকে কাব্যগুণে মণ্ডিত করে বিশ্বক ইচ্ছে করেই বাস্তবতার তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করছেন- পরিবর্তে দিয়েছেন তাকে বাস্তবোত্তর কল্পলোকে চেহারা। বাস্তব পরিবার করে রবীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পীয়ারে মতনই সত্যে গিয়ে উপনীত হয়েছেন।

বাংলার বর্তমান নাট্যকাররা এই সত্যের দি যেতে পারছেন না, তারা বাস্তবেই আবদ্ধ। বাস্তবে সো যা বলে যা করে তার ক্ষীণ অনুকরণেই তারা শৃংখলাবদ্ধ

মানুষ সম্ভাবনার সমষ্টি। গোটা মানুষটাকে কর হবে। তার বহিঃপ্রকাশ গল্প—নাটকের ঐটুকু সম্বল থাকা চলবে না।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও ছবির সম্ভাবনা

॥ কৌশিক ॥

কাহিনী চলচ্চিত্রের প্রাণ। সার্থক ছবি সৃষ্টির পিছনে তাই কাহিনীর বড় প্রয়োজন। অন্ততঃ 'পথের পাঁচালী'র পর এ কথা আর যুক্তির অপেক্ষা রাখেনা। মহৎ-সাহিত্য, মহৎ উপন্যাসকে ছবির প্রয়োজনে সার্থকভাবে ব্যবহার করা চলে বিদেশে এবং স্বদেশে তো বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলা ছবির জগতে সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবের পর বিশেষতঃ তরুণ পরিচালকেরা ছবির আর্ট ফর্মকে যথাযোগ্য বিন্যাসের চেষ্টা করছেন। তাই তপন সিংহ, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, হারাধন চট্টোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ সেনমজুমদার প্রভৃতিরা বাংলা ছবিতে এক নূতন দিগ্‌নির্দেশনার সূচনা করেছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসগুলি বিভিন্ন বৈচিত্র নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেগুলির ছবির সম্ভাবনাও প্রচুর। উদাহরণ হিসাবে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্তর্ঘনা'র কথা বলা যেতে পারে। 'অন্তর্ঘনা' বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের রূপক নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বাস্তব অনিন্দ্যের চৈতন্য ঘিরে এ উপন্যাস যার সুরু হয়েছে এইভাবে।

সারারাত ঘুমুতে পারেনি অনিন্দ্য। প্রথমটা বিছানায় ছটফট করতে লাগলো। তারপর ঘামতে সুরু করলো। বিছানা বালিশ ঘামে সপ্‌সপ্‌ করে উঠলো। ঘরে গুমোটে ভাবটা যেন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। একটুও হাওয়া নেই। এতোটুকুটুকু জানলা। তাও আবার ছুটোর বেশি নয়। যতোবার তার চোখের পাতা বুজে আসে ঠিক ততোবারই সে দেখলো তাদের সেই ছোট ঘরটার দেওয়ালে মেঝেতে আর তার বিছানা-বালিসে কারা সেই খবরে কাগজ লেপে দিয়ে গেছে। খবরে কাগজের গায় চাইনিজ ইংকে ঘন করে লেখা—অন্ন বস্ত্র খাদ্যের সংকট।

সবিতা বসু

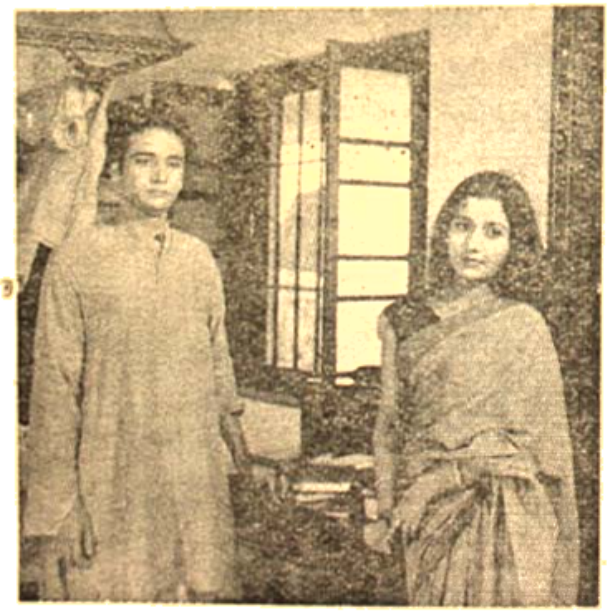

'শিলালিপি' চিত্রে অজিত ও রঞ্জনা

বিরাট জনসভা! আপনারা দলে দলে যোগদান করুন। রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলো সে। ঘরটার যতোটুকু যায়গায় সামান্য একটু ফাঁক পর্যন্ত নেই। আজ সকলেই তো সে রাস্তায় দেখেছিলো—কারা যে দেয়ালে দেয়ালে আর ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে এঁটে দিয়ে গেছে ওই সব লেখা কাগজগুলো। যোতো ওই পাশটায় জানালার ধারেই শুয়েছিল। যায় ছোড়দিতো ওই কোণটায়। কাউকে সে দেখতে াচ্ছেনা। খালি ঘরের সবটুকু জুড়ে ওই কাগজগুলো।

সে আবার স্পষ্ট পড়লো—আপনারা দলে দলে যোগদান করুন। ঘন কালো কালির লেখা। অনিন্দ্য যাবার পাশ ফিরলো। না! ঘুম তার চোখে নামবেন। াজ আর কিছুতেই। থেকা থেকে কি যিগড়ে গছে। কিন্তু এমন হলো কেন?

'অন্তর্যামী'র বেদনা ছবির ভাষার স্বপক্ষে। উপন্যাস হিসাবে যেমন এর আবেদন ছবি হলেও তো বাড়বে ই কমবে না।

নমিতা সিনহা

এ প্রসঙ্গে আশীষ বর্ধনের 'রাজেশ্বরীর' কথা বলা যেতে পারে। অভিজাত পরিবারের অন্তরঙ্গচিত্র 'রাজেশ্বরীতে মেলে। আশীষ বর্ধন রাজেশ্বরীতে নায়ক সুমনের চোখ দিয়ে যে পরিবারের পরিচয় করিয়েছেন ছবি হিসাবে তার আছে প্রচুর সম্ভাবনা।

বিমল করের 'কাহুসের আহু' ও 'দেওয়াল' উপন্যাস দুটি স্বভাবতঃই আলোচনায় এসে পড়ে। কাহুসের আহু দুপর্বে ভাগ করা। প্রথম পর্ব তিতু—দ্বিতীয় তীর্থপতি। তিতু এবং তীর্থপতির জগতের তফাৎ ও দ্বন্দ্ব ছবির পথে নূতন Experiment। 'দেওয়াল' বর্তমান মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচালী। তিনখণ্ডে সমাপ্ত এ উপন্যাসের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই দুটি খণ্ডের মধ্যেও ছবির সম্ভাবনা আছে, নূতন Experiment-এর সুযোগ আছে।

মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত' জ্যোতিরীন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মৌসুমী' প্রভৃতির কথাও প্রসঙ্গে বলা যায়।

কাহিনী যখন চলচ্চিত্রের প্রাণ, বহু উপন্যাস থেকে তখন চলচ্চিত্রের কাহিনী কেন গ্রহণ করা হবে না?

● রমেশচন্দ্র সেনের

কাজল ৬·০০

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ২·৫০

● সুশীলকুমার ঘোষের

গ্রহসারথি ৬·০০

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

আকাশ নন্দিনী ৩·৫০

রাত্রির বয়স ৩·৫০

গ্র্যাণ্ড হোটেল ৬·০০

(কিঙ্কি বাউমের গ্র্যাণ্ড হোটেলের অনুবাদ)

● সজনীকান্ত দাসের

রবীন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সাহিত্য ৬·০০

● শিবনারায়ণ রায়ের

নায়কের মৃত্যু ৪·৫০

● শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

৬·০০

● রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাগার প্রচার ২·০০

● ডক্টর নারায়ণী বসুর

Political Philosophy After Hegel and Marx. 5·00

—প্রকাশের অপেক্ষায়—

● গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

মিলনান্ত

● ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের

তারাশঙ্কর

● গৌরীকিশোর ঘোষের (কবিতা)

জলবত্তরলম্

● বোম্মানা বিশ্বনাথমের

দুধের স্বাদ

শতাব্দী গ্রন্থ ভবন ঃ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭।

ফোন : ৩৪-৪৯২১

মহামল্ল মহান গোলাম

অজয় বসু

তাঁকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে তাঁর কথা শোনার সুযোগ আমার ঘটেছে। স্মৃতি নয়, শ্রুতিই আমার মূলধন।

অতোবড় পালোয়ানের যে অমন শান্ত-শ্রী হতে পারে চোখে দেখেও সেকথা বিশ্বাস করতে চায়নি অনেকে। ছেহারাটি সুপুরুষটির মাথায় বেনারসী পাগড়ী ঘোরপুরী চংয়ে বাঁধা। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে ফিনফিনে মলমল। তারই ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল দুর্লভ স্বাস্থ্য। চলনে সংযত, বলনে মিতবাক্ ও মার্জিত। আদির কুরার এতোটুকু চেষ্টা নেই তাঁর আচরণে, লক্ষ্য যেন কেবলই নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার। একেবারে রবাহুতের মতোই তিনি সেদিন এসে পড়েছিলেন কেতু গুহের আখড়ায়।

১৯০০ সালের কথা। কলকাতায় তখন বাবু কালচারের স্রোত। বাবুরা বিলাস সায়রে গা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছেন সত্যি কিন্তু তাঁদেরি কেউ কেউ আবার ভোগ্য পণ্যকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় দেহ-তরণীকে মজবুত রাখতে চাইছেন আখড়ার মাটি মেখে। অভিজাত বিত্তবান অনেক বাবুরই গৃহপ্রাঙ্গণে তাই সেদিনে ছিল বীর হনুমানের সাড়ম্বর প্রতিষ্ঠা। গুহরাই তার বড় দৃষ্টান্ত! অমৃত গুহ প্রমুখ, কেতু গুহও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণকারী।

উত্তর কলকাতায় আজ যেখানে দর্শনা প্রেক্ষাগৃহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেইখানেই ছিল কেতু গুহের কুস্তির আখড়া। সেই আখড়াতেই একদিন মহাবলীর পদার্পণ ঘটেছিল। আর সেই আখড়ার মাটিতেই তিনি একদিন জোর অর্থে অনুশীলন পদ্ধতি প্রদর্শনে সম্মত হয়েছিলেন গৃহস্বামীর অনুরোধে। প্রতিযোগিতা নয়, দিল্ কুস্তি ও শুধুমাত্র রেওয়াজের রীতি প্রদর্শন। তবু সেই প্রদর্শনীকে ঘিরেই সেদিন সারা কলকাতায় একটা সাড়া জেগে উঠেছিল। দিনক্ষণ জেনে নিয়ে ক্রীড়ানুরাগীরা প্রহর গুণছিলেন। শহরে গণ্যমান্য, সমাজের মাথারা গুহদের আমন্ত্রণ পেয়ে পুনরুদ্ধার রক্ষার তোড়জোড় সুরু করে দেন। কিন্তু ঢাকের কথা, অনুরাগী বা নিমন্ত্রিত কারুর আশাই শেষপর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। অনুষ্ঠানের দুদিন আগে দুরারোগ্য ওলাউঠো সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তটিকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কলকাতার মাটিতে মহাবলী তাঁর স্বকীয় ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি, বিফল দিয়ে গিয়েছেন তাঁর নশ্বর দেহটিকে উপহার। পাহাড় প্রমাণ আক্ষেপের মাঝে সান্ত্বনা এইটুকুই যে মহানগরীর বুকে অন্তত রয়েছে মহাবলীর শেষ স্মৃতিটুকু। মাণিকতলার কবর

মহামল্ল গোলাম

গ্রে গোলাম

পল পণ্ডের অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো তাঁর ঘুমন্ত
ই স্মৃতি-সৌধমূলে ভিড় করে মল্ল ক্রীড়ানুরাগীরা
দের মনের আবেগ উজাড় করে দিয়ে আসেন।
মে মহাবলী ছিলেন মল্লভূমির নায়ক, ব্যক্তি-
তিনি শ্রদ্ধেয় সর্বজনের। দক্ষতার প্রকাশে;
ভতায়, আচরণের শালীনতায় তিনি মহান।
ানে তাই তিনি পূজ্যপাদ পীর; ওস্তাদেরও ওস্তাদ
কমাত্র 'পালোয়ানজী'!

এই পালোয়ানজী? নাম গোলাম।
ার সমাধি লিপি অনুসারে "আলি বক্স
নর পুত্র 'রুস্তম-ই-হিন্দ' গোলাম"—
ফুরিম দিনপঞ্জী অনুযায়ী ১০-৫-১৯১৯,
ক্যালেণ্ডার মতে ১৯০০ সাল।
তাঁর গোলাম। কিন্তু এ তো শুধু নাম নয়।
রের অন্যটি ভারতীয় মল্লক্রীড়ার স্বর্ণ যুগের
র এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। যে ইতিহাসে
গোরব বিশ্ববিজয়ী। যে ইতিহাসে ভারত পৃথিবীর অনন্য। সেই ইতিহাস আজ বিস্মৃত প্রায়। ভারতের চিন্তায় ও কাজে সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণে নিষ্ঠা নেই সত্যি। কিন্তু সেই অধ্যায় স্মরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই কালে। কারণ প্রচার প্রভাবিত এই কালেই ভারত বাসীর সুনাম, ভারত ভূমির মর্যাদা যাচাইয়ের মাপকাঠি হয়ে ভারতীয় ক্রীড়াযোদ্ধাদের আন্তর্জাতিক সফলতার নজীর।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় নামমাত্র যে কজন ভারতীয় সাফল্য লাভ করেছেন গোলাম পালোয়ান শুধু তাঁদেরি অন্যতম নন। সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর আগে আর কোনো ভারতীয় ক্রীড়াবিদ বিদেশ পরিক্রমায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। ভারতের অধিতীয় পালোয়ান গোলামকে ১৯০০ সালে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্র প্যারিসে নিয়ে যান স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। পণ্ডিতজীর দলে ছিলেন আরও অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় যথা, সংবেদশিল্পী মুকুন্দ খাঁ ও করমতুল্লা খাঁ, ধ্রুপদীয়া মুবক আলি, মহবীর কাল্লু, রহমানি, বল্লু, গোলাম উদ্দিন, খলিফা বগলা প্রমুখেরা। পণ্ডিতজীর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মল্লক্রীড়ার নিরিখে ভারতীয় কুস্তির জাত যাচাই করে নেওয়া। তাই প্যারিসে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্কের বাজীর কথা ঘোষণা করে তিনি বিদেশের মল্লবীরদের গোলামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানান। ১৯০০ সালের ২৯শে জুলাই প্যারিসের বিখ্যাত দৈনিক পত্র সমূহে এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের বিবরণ ছাপা হয়েছিল।

ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ
প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম-বি।
৪৫নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

ভারতের চ্যাম্পিয়নের খেতাবে আবদ্ধ থাকতে পারেনি ছিল বিদেশী মল্লদের শুধুমাত্র ভূবনের কোর দেরেলির ছাড়া। কোর-দেরেলি ছিলেন তখনকার বিশ্বশ্রেষ্ঠ মল্ল। হেক্সলের জলে শীতস্নান পেয়ে তিনি স্বীকৃত হয়েছিলেন বিশ্ব বিজয়ী রূপে। প্যারিসে এই বিশ্ব-বিজয়ীর সঙ্গে মৈত্রেয় সময়ে তীব্র প্রতিযোগিতার পর গোলাম জয়লাভ করেন। দুই মল্ল প্রায় পৌনে তিনঘণ্টা সমানে সমানে লড়েন। 'দোবিপট' প্যাচে কোর দেরেলিকে বার কয়েক ভূতলশায়ী করলেও গোলাম তাঁকে পুরোপুরি চিত করতে পারেননি। পোঙনে তিনঘণ্টা পর বিচায়করা স্থির করেন যে অতিরিক্ত আরও পনেরো মিনিটের মল্লযুদ্ধের যে প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তিনিই সাব্যস্ত হবেন বিজয়ী বলে। এবার গোলাম খুব তাড়াতাড়িই কোর দেরেলিকে মাটিতে নামিয়ে এনে জয়মাল্য অর্জন করে নেন।

প্যারিসে আয়োজিত গোলাম বনাম তুর্কী কোর দেরেলির মল্লযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক মতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই দেরেলি বিজয়ী গোলামকে আন্তর্জাতিক মহল সরাসরি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরূপে অভিহিত না করতে চাইলেও বেসরকারী ভাবে তাঁকে সে মর্যাদা দিতে কারুরই আপত্তি ছিল না। কোর দেরেলির পর বিদেশের আর কোনো মল্ল গোলামের সামনে দাঁড়াতে সাহস পান নি। বিদেশের পত্র পুস্তিকায় 'শ্রেষ্ঠ গোলাম' নামে অভিনন্দিত হয়ে গোলাম ফিরে আসেন স্বদেশে। তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই কলকাতায় তিনি দেহরক্ষা করেন।

মহান গোলাম ছিলেন অমৃতসরের অধিবাসী

শরীরচর্চায় রত

এক খানদানি পালোয়ান বংশোদ্ভূত। গোলামের জ্ঞ আলিয়াও (পুরানাম আলি বক্স) ছিলেন ভারত গোলাম নিজেও ভাই এবং বিশ্ব বন্দিত। তাঁর সহো দের মধ্যে কাদুও হয়েছিলেন গুরুজবক্স পালোয়ান রহমানি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্ল। রহমানির ছামিদা এবং কাদুর তনয় ছোট গামার প্রসিদ্ধি এক সর্বজন বিদিত।

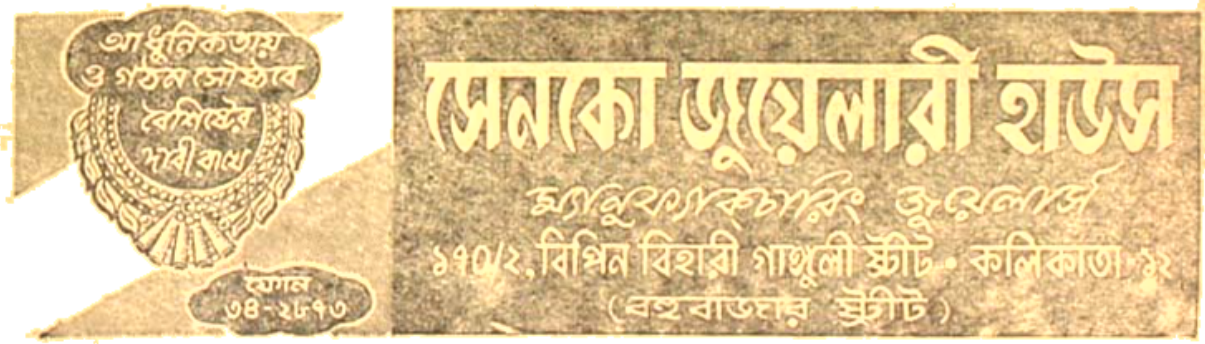

তীয় মল্ল মহলে পরম বাঞ্ছিত। 'গুরুজ' অর্থে গদা—
। হনুমানের হাতের কম্পিত গদার অনুকরণে সোনা
ঢে গড়া এই গুরুজ রাধা হোতো সেকালের বড় বড়
দ্ধের আসরে। যে মল্লবীর অর্জন করতেন এই
জ তিনিই পেতেন শ্রেষ্ঠের সম্মান। গোলামের
মলে ভারতবর্ষে গুরুজ নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল
মাত্র কিঙ্কর সিংয়ের সঙ্গে কারণ কিঙ্কর ছাড়া
লামের সমান জোরের আর কোনো পালোয়ান
তীয় কুস্তির স্বর্ণযুগের ভারতবর্ষে ছিলেন না।

কিঙ্করও ছিলেন পাঞ্জাবী পালোয়ান, তবে হিন্দু।
সল নাম হারিয়ে ফেলে তার উপাখ্যানের কাহিনী
েই তিনি পরিচিত আছেন কিঙ্কর নামে। কবে
কি গুরু বুটা পালোয়ানের আদেশে পথের বাধা একটি
সড় কিঙ্কর গাছ একটানে তিনি উপড়ে ফেলেছিলেন।
র সেই থেকেই তাঁর নাম হলো কিঙ্করজিৎ। গাছটি
তাবড় ছিল জানি না তবে দেহের বর্ণনার মধ্যেই
ঙ্কর সিংয়ের অপরিমিত শক্তির ইঙ্গিত মেলে। আকৃতির
ক থেকে কিঙ্কর সিং ছিলেন অতুলনীয়। মাথায় সাড়ে
ফুটের ওপর; দেহের ওজন প্রায় চারমণ। তার শুধু
ড়ি, মর্জা এবং সুগঠিত মাংসপেশীর, শরীরে মেদের
নো বাহুল্যই ছিলনা। মিশকালো রং যেন সেরা
তির হাতে গড়া এক বষ্টিপাথরের মূর্তি। লোকে
তো কিঙ্কর সিং মানুষ নয়, দৈত্য।

শ্রেফ গায়ের জোরে দৈত্যকায় কিঙ্করের সঙ্গে
লামের পেরে ওঠার কথা নয়। কিন্তু মল্লক্রীড়া শুধু
বলের সঙ্গে কৌশলে সমন্বয় ঘটাতে পারেন যিনি সেই
বলীই মল্লবীর! গোলাম ছিলেন এমনি এক মল্লবীর
বীরোত্তম! 'কুস্তম-ই হিন্দ' বা ভারত শ্রেষ্ঠের মর্যাদা
অক্ষুন্ন রাখতে গোলাম পালোয়ানকে কমপক্ষে চারবার
কিঙ্কর সিংয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল।

জম্মুতে অনুষ্ঠিত মল্লযুদ্ধে গোলাম কিঙ্করকে হারান
পৌনে তিন ঘণ্টায়। দুজনের দ্বিতীয় সাক্ষাতকার ঘটে
লাহোরে। এবার কিঙ্কর প্রতিশোধ নিতে পারতেন
কিন্তু সাময়িক স্নায়বিক দৌবল্যে তিনি সে সুযোগ হারিয়ে
ফেলেন। লাহোরের লড়াইয়ের সুরুতে কিঙ্কর সিং 'পালো-
য়ানী হাত' মারতেই গোলাম কতকটা আহতের মতো
মাটীতে পড়ে যান। তখনকার দিনে হার তো দূরের কথা
গোলামের পতনের দৃশ্যও ছিল অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য।
তাই তাঁকে পড়ে যেতে দেখে দর্শকের মতো স্বয়ং কিঙ্কর
সিংও যেন কিছুক্ষণের জন্যে হকচকিয়ে যান। এই ফাঁকে
গোলামের হুঁশ ফিরে আসায় তিনি আবার উঠে দাঁড়াতে
কি জানি কি ভেবে কিঙ্কর আর লড়তে রাজী হন না।
বিচারক অগত্যা গোলামকেই বিজয়ী সাব্যস্ত করে দেন।
কিন্তু গোলাম ছিলেন সত্যিকারের খেলোয়াড়ী বীর মনো-
ভাব সম্পন্ন, প্রতিদ্বন্দ্বীকে না হারিয়ে তিনি গুরুজ নিতেও
অস্বীকৃত হন। তাঁদের তৃতীয় কুস্তিও হয় লাহোরে।
দু ঘণ্টা সমান সমান থাকার পর সে লড়াইটি অমীমাংসিত
থেকে গিয়েছিল। পরের বার অর্থাৎ চতুর্থ সাক্ষাতকার
কালে ইন্দোরে মাত্র মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে
'থোবিপট'এ চিত করে গোলাম পালোয়ান কিঙ্কর-
গোলামের দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফয়সালা করে
দেন। এরপর ভারতীয় মল্লদের মধ্যে
একমাত্র 'পূরব কা কিঙ্কর সিং' ছাপরার
জমিদার সুচ্চিৎ সিংই একদিন গোলামের
সঙ্গে লড়েছিলেন কিন্তু মিনিট খানেকের
মধ্যেই আসমান দেখে ফেলায় সেই দণ্ডলেই
সুচ্চিৎ সিং গোলাম পালোয়ানের শিষ্যত্ব
গ্রহণ করেন।

মারা যাবার বছর সাত আট আগে
গোলাম পালোয়ান আর একবার কলকাতায়

এসেছিলেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সঙ্গে। কুচবিহারাধিপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে সেবার কলকাতায় মস্ত এক দঙ্গল বা পেশাদারী কুস্তির আসর বসেছিল। যে আসরে গোলাম লড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কেউ এগিয়ে আসেননি। যদিও সে দঙ্গলে উপস্থিত ছিলেন কমপক্ষে দুশো মল্লবীর।

গোলাম পালোয়ানের প্রাথমিক কুস্তি শিক্ষা হয় জনক আলিয়ার কাছে, পরে মাতুল মাড়োয়ারের বিখ্যাত মল্ল সলোমন পালোয়ানের গুরুদিরিতে। পালোয়ান হিসেবে গোলাম ছিলেন যোধপুর পতির আশ্রিত। গোলাম নিজেও অনেক ভারত বিখ্যাত মল্লকে হাতে গড়ে তৈরী করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সহোদর কালু ও বহমানি ছাড়া চুন্নি, ঠাকুর সিং, শোভা সিং শিয়ালকোটের করিম বকস, রহিম গুরদাওয়ালা প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলিয়া ঘরাণার রহিম গুজরাঁওয়ালাই কালু পালোয়ানের পর ভারত শ্রেষ্ঠের সম্মান পেয়েছিলেন এবং প্রধান রহিম গুজরাঁওয়ালাকে এলাহাবাদের দঙ্গলে হারিয়ে তদানীন্তন উঠতি জোয়ান বড় গামা পালোয়ান 'গুরুজ' ও 'রুস্তমই-হিন্দ'এর মর্যাদা অর্জন করে নেন।

কুস্তি ছাড়া সঙ্গীতেও গোলামের অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে এস্রাজ বাজাতেন। আর অনুরাগ ছিল সাধু ফকীর-সঙ্গ করা। সাধু ফকীরের কাছ থেকে পাওয়া দৈবওষুধ দীন দুঃখীদের বিলিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর নিত্যকার সাধ্যকর্ম। গোলাম পালোয়ানের অন্তহীন জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁর সাবজমীন মেলামেশা এবং চারিত্রিক শুদ্ধতা। ধনী নির্ধন হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায় ও শ্রেণী নির্বিশেষে তিনি ছিলেন প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। গৃহী হয়েও যেন একান্ত নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত। সেকালের এক প্রখ্যাতা বাইজী তাঁর রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য ও মধুকণ্ঠের প্রলোভন সামনে রেখে বৃথাই ছায়ার মতো অনুসরণ করেছিলেন তাঁর। বাইজিটির ঐশ্বর্য্য ও কণ্ঠ কাহিনী তাঁর নামের মতোই সকলেরই জানা। কিন্তু রুচিত প্রশ্ন ভেবে সে নামের আজকে আর উল্লেখ রাখলাম না।

গোলাম পালোয়ানের দেহের গড়ন সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল দেখা দিতে পারে জেনেই সে সম্পর্কে একটি প্রমাণ্য তথ্য উপস্থাপন করেছিলাম। এই তথ্য বিদেশের বিখ্যাত পত্রিকা "ক্রিমিনিক্যাল কালচার" তার অধ্যাপক ডেসবোরোটের 'কিংস অব রেসলিং' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যটি নিম্নরূপ :—

গোলাম পালোয়ানের দৈর্ঘ্য ১.৭০ মিটার, ওজন ১৩০ কিলোগ্রাম, ছাতি ১.৪৫ মিটার (তদানীন্তন রেকর্ড), বাইসেপ ৫০ সেন্টিমিটার, ফোরআর্ম ৩৫ সেন্টিমিটার ঘাড় ৩২ সেন্টিমিটারে (তদানীন্তন রেকর্ড) জঙ্ঘা ৪০ সেন্টিমিটার (তদানীন্তন রেকর্ড) তার পায়ের গুলী ৪৬ সেন্টিমিটার।

(৩৮৭ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থার ব্যবস্থা স্পষ্টই চারজনের।

চতুর্থ জনটি ও হতে পারে [illegible] পায়নি কিছুতেই। বাইরের অতিথি অভ্যাগত যে কখনো সখনো ভোমভুড়ির দেওয়ান কুঠিতে তখনকার দিনেও আসত না এমন নয়। কিন্তু সেরকম কেউ এসে থাকলে আগেই ও দেখা যেত।

সব রহস্যের মীমাংসা যখন হয়েছে বিস্ময়ে তখন অবনী নির্বাক।

শশধর হাসিমুখে কি পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ভালো করে কানেও যায় নি।

সেই অবগুণ্ঠনবতী মেয়েটি তারই কিনে দেওয়া শাড়িটি পরে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে তার দুর্বোধ্য সেই কৌতুক কিন্তু আজ যেন ভ্রূকুটির সঙ্গে মেশানো।

চতুর্থ আসন কিন্তু খালিই থেকেছে। মেয়েটি সেখানে যায়নি। খাবার পরিবেশন করেছে মাত্র।

শশধরই আজ যেন অন্য মানুষ। সে ভাবলেশহীন গাম্ভীর্য আর নেই। কি যেন একটা উত্তেজনা তার চোখে মুখে জ্বলছে!

দু-একটা বৈদেশের কথা ছাড়া যার মুখে বিশেষ কিছু শোনা যায় না সে আজ একাই আসর জমিয়ে রেখেছে। আর কারও মুখে যে একটি কথাও নেই তা যেন সে লক্ষ্যই করেনি।

কি! তোমার পোষা মুরগির চেয়ে বনের হরিণ ভালো কি না!

অবনীর উত্তর দেবার দরকার হয়নি। শশধর অন্য কথায় চলে গেছে।

বন্দুকে মারা নয়, ফাঁদে ধরা হরিণ। ইচ্ছে করলে পুষতেও পারতাম।

একেবারে আচমকা সে প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে বলেছে, —মঙ্গলাকে শাড়ীটায় চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু!

অবনীর সঙ্কুচিত বিহ্বল নীরবতার নিজের মত মানে করে নিয়ে বলেছে,—মঙ্গলা নামটা দেওয়ান কুঠির বৌরাণীকে ঠিক মানায় না, না? একটা নাম দিতে পারো নতুন?

নাম দিলি কি ঝুটা সাচ্চা হয়ে যায়!

অবনী বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এ সেই বনের মেয়েটির গলা।

মঙ্গলা ঠিক যেন ফণা তোলা নাগিনীর মত পরিবেশন সেরে চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়েছে তখন। তার মুখে এখন কোন ভাবান্তর বুঝি নেই শুধু কণ্ঠের স্বরে যেন গলানো আগুন।

অবনী অপ্রস্তুত বিমূঢ়, ভরত শঙ্কিত, শশধর পর্যন্ত যেন চমকে গিয়ে নির্বাক।

কয়েকটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর মুহূর্ত।

কি করবে কি বলবে এবার মঙ্গলা?

কিন্তু কিছুই আর না বলে মঙ্গলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই সঙ্গে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠেছে শশধর।

সে হাসি যত ক্রত্রিমই শোনাক, অবনী যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। নিশ্চিন্ত হয়েছে শশধরের পরের কথাতেও।

একটু মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছি! শশধরের গলায় অকপট অনুতাপের সুর—শাড়িটা আমায় লুকিয়ে কিনেছে বলে একটু খোঁচাতে চেয়েছিলাম। হপ করে অতটা জ্বলে উঠবে ভাবিনি।

শশধর শাড়ি কেনার ইতিহাসটা হয়ত জানে কিন্তু তার কথার ধরণে মনে হয়েছে মনে তার কোন সন্দিগ্ধতার জ্বালা আর নেই।

ভুলটা বুঝেছে পরে।

শশধর সেদিন রাত্রে ফিরতে দেয়নি। রেখে দিয়েছিল।

সকালে কিন্তু শশধর বা কারুর সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিল বনের ভেতর দিয়ে।

মঙ্গলার সত্যিকার পরিচয় পাবার পর আর তার সঙ্গে দেখা হওয়াটা চায়নি।

শশধরের খেয়ালের কথা ত বলা যায় না। সকালে উঠে আবার মঙ্গলাকে হয়ত ধরে আনতে পারে কালকের ভুল সংশোধন করতে।

সেটুকু জটীলতাতেও অবনী নিজেকে জড়াতে নারাজ।

কেন নারাজ সারারাত্রি প্রায় বিনিদ্র হয়েই কাটিয়ে সে বুঝেছে।

দেওয়ান কুঠিতে মঙ্গলার সঙ্গে অমন অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের প্রথম বিস্ময় কাটাবার পর নিজের মনকে কিছুটা শান্তভাবে বিচার করবার সময় সে পেয়েছে। সে বিচারে যা জেনেছে তাতে মঙ্গলাকে স্মৃতি থেকেও বাদ দিতে পারলে সে যেন খুশি হত।

মঙ্গলা সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলেই তার মেটেনি। তার চালচলন চরিত্র দেওয়ান কুঠিতে শশধরের সঙ্গে তার সম্বন্ধের রহস্য অনেক কিছু জানবার জন্যেই তার মন ব্যাকুল। কিন্তু এ ব্যাকুলতাকে সে জোর করে মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে।

মঙ্গলা তার প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে জীবনের একটা পাতা থেকে মুছে যাক। আর তার কোন সংশ্রব সে চায় না।

সেই শিরিষ গাছটার পাতাগুলোয় মর্মরে তার এই সঙ্কল্পের প্রতি বিদ্রূপের হাসি বুঝি সেদিন মেশানো ছিল।

তারই তলায় মঙ্গলা দাঁড়িয়ে আছে। ওই অত ভোরেও অবনীর আগে কখন সে সেখানে এসেছে কে জানে?

এ যেন আর এক মঙ্গলা।

সকালের প্রথম কুয়াশা জড়ানো বনস্থলীর স্নিগ্ধ করুণ রহস্য।

যত কঠিন সত্যই তুক প্রচণ্ড বৃষ্টি তা ভাঙার বেগ।

সেই বেগই অবনী অনুভব করেছে হৃদয়ের মধ্যে। সমস্ত বাধা বন্ধন বিচার ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার বেগ।

মনে হয়েছে সমস্ত অন্তরের বাসনা তার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে যেন ওই দেহলতাকে নিঃশেষে করতে চায়।

নিজেকে সংবরণ করেছে তবুও।

উপেক্ষা করে চলে যেতে পারেনি কিন্তু কাছে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব অপ্রসন্ন স্বরে বলেছে,—তোমার লজ্জা নেই জানি মঙ্গলা কিন্তু ভয়ও কি নেই! কোন সাহসে তুমি আজ এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ আমার অপেক্ষায়?

মঙ্গলা মুখে উত্তর দেয়নি কিন্তু মনে হয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে সব কিছু বলা হয়ে গেছে।

সে ভাষা অগ্রাহ্য করে অবনী কঠিন স্বরে বলেছে,—কি তুমি করছ তা জানো? আমায় নিয়ে এ সর্বনাশা খেলা তোমার কেন?

এবার মঙ্গলা করুণভাবে একটু হেসেছে। সে হাসিতে বেদনার সঙ্গে বিস্ময় বুঝি মেশানো।

অবনীর গলার স্বরে ভর্ৎসনার চেয়ে বাঞ্ছিত অনুযোগই ফুটে উঠেছে এবার,—তুমি কে জানবার পর আর তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা হওয়া উচিত? তুমি জানো শশধর আমার বন্ধু।

এতক্ষণে মঙ্গলার মুখের কথা শোনা গেছে।

তোমার বন্ধু, কিন্তু আমার কে বটে?

চমকে দেওয়া কথা কিন্তু গলার স্বরে কোন উত্তাপই যেন নেই।

অবনী অবাক হয়ে বলেছে,—শশধর তোমার কেন সে তোমার স্বামী নয়?

মঙ্গলা হেসেছে;—ছিনাই আনি ধরি বাধিলে স্বামী হয়! একটা মন্তরও পড়বার লাগে না।

এবার অবনী সত্যিই ধৈর্য হারিয়েছে। রুক্ষ স্বরে বলেছে,—এসব কথা আমায় শোনাবার কোনো দরকার নেই। মন্তর পড়া হোক না হোক তুমি শশধরেরই স্ত্রী। তোমায় ঘরে বেঁধেও সে রাখেনি তাহলে এমন করে খুশিমত ঘুরে বেড়াতে পারতে না!

এই শেষ ভর্ৎসনার পর আর সেখানে দাঁড়াবার দরকার ছিলনা। কিন্তু অবনী তবু দাঁড়িয়ে থেকেছে কেন? মঙ্গলার কাছে প্রতিবাদ শোনবার আশায়? নিজের যুক্তিই নিজের কাছে অসহ্য বলে?

মঙ্গলা প্রতিবাদ করেনি।

শুধু এক পা হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে নীরবে অবনীর বুকের মধ্যে অশ্রু সজল মুখ লুকিয়েছে।

যুক্তি তর্ক বিচার সংস্কার বিবেক সব নির্মূল হয়ে গেছে তারপর কোন দুরন্ত বন্যায়।

সেই শিরিষ গাছের তলায় বসেই মঙ্গলার সমস্ত ইতিহাস শুনেছিল। লোধা নয় ভীমের বেডের কাছে আর এক আরণ্য উপজাতির মেয়ে। সাহেব কোম্পানীর প্রভাবের দিনে তাদের গ্রামে এক মিশনারী সম্প্রদায় কিছুদিন আস্তানা পেতেছিল। মঙ্গলা তাদের কাছে সেখানে কিছুদিন পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। মিশনারী সম্প্রদায়ের ঘাঁটি সেখানে থাকলে হয়ত একদিন তাদের ধর্মেই দীক্ষা নিত। কিন্তু সাহেব কোম্পানীর দুর্যোগ শুরু হতে মিশনারীরাও সেখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ও জঙ্গল তখন নিরাপদ জায়গা আর নয়।

সামান্য একটু শিক্ষা দীক্ষার পালিশ নিয়ে মঙ্গলা আবার আরণ্য জীবনেই মিশে গেছল।

শিকার করতে গিয়ে শশধর তাদের জংলা বস্তির কাছে তাঁবু ফেলেছিল একবার। মঙ্গলাকেও দেখেছিল।

নিজে সে ধরে বেঁধে আনে নি। মঙ্গলাদের সর্দারই একদিন মঙ্গলাকে নিয়ে এসে দেওয়ান কুঠিতে রেখে গিয়েছিল।

দেওয়ান কুঠিতে কত যুগ ধরে অমন কত মেয়ে এসেছে গেছে।

শশধর বাইরের জগৎ দেখে এসেছে বলে সব কিছুতে দেওয়ান কুঠির ব্যতিক্রম হয় নি।

মঙ্গলার কদিন দেওয়ান কুঠিতে থেকেই সেখানকার পাট চুকে যাওয়ার কথা।

কিন্তু মঙ্গলার বেলা ধারা বদলে গেছে।

চলে যেতে হয় নি। শশধরই যেতে দেয়নি।

মঙ্গলা ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারত না কি! তাদের জংলা সমাজেও কলঙ্ক আছে, গ্লানি আছে, কিন্তু তার জন্যে কোন মেয়ের জীবন বরবাদ হয়ে যায় না।

মঙ্গলা চলে যায় নি তবু। সে কি জংলী জীবনের তুলনায় দেওয়ান কুঠির আরামে ঐশ্বর্যের লোভে?

বলত তাই। হয়ত যায়নি বুকের মধ্যে পুষে রাখা অন্য একটা আক্রোশে শশধরের নিজস্ব রক্তের অনুরাগ সোহাগও যা মুছে দিতে পারেনি।

অবনীর প্রতি দুর্বোধ দুর্বার এই আকর্ষণে আক্রোশেরই কিছুটা পরিতৃপ্তি হয়ত আছে।

মঙ্গলার এ কাহিনী না শুনলেও অবশ্য কিছু ক্ষতি ছিল না।

সত্য হোক মিথ্যা হোক এ কাহিনীর মধ্যে নিজের দুর্বলতার সমর্থন অবনী খোঁজে নি।

ভেসে যাওয়াকে ভেসে যাওয়া বলেই মেনে নিয়েছে। এবং তার জন্যে তৈরীও হয়েছে অন্ততঃ মনে মনে। মঙ্গলার সঙ্গে তার জীবনের শেষ দেখা যে হয়ে গেছে তা কি করে জানবে!

এ কথা কাউকে বলবার নয়। কিন্তু একটিমাত্র মানুষের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে পারেনি নিজেকে।

স্পষ্ট করে কিছু না বলতেই ভাণ্ডারী যেন বুঝেছিল।

সেদিন দুপুরে তাকে খুঁজেই পেয়েছিল অবনী।

মন কথা বলতে চায়নি, চাইলেও পারত না বলতে। হঠাৎ এক সময়ে বলেছিল,—এখান থেকে চলে যাবো ভাবছি ভাণ্ডারী দা।

ভাণ্ডারী খানিকক্ষণ তার দিকে নীরবে তাকিয়েছিল। তারপর হেসে উঠেছিল,—তাই যা না কেনো! যা পাতালটো দেখি আর একবার! তুকে মিছাই আমি ভয় দেখাইছি। ইখানে তোকে খুঁজতে হবেক নাই।

ধোঁয়াটে এলোমেলো কথা কিন্তু খুব অস্পষ্ট আর লাগেনি অবনীর।

ভাণ্ডারীই আবার একসময়ে বলেছে,—আর তুর ভাবনাটো কি! বান ডাকিয়ে জলে পুকুর ভরি গেলে তার খাজনা লাগে না।

সেদিন ওই পর্যন্ত

রাত্রে হয়ত ভাণ্ডারীকে আর কিছু বলতে পারতে।

কিন্তু সেই রাত্রেই শশধর এসেছিল বন্দুক নিয়ে অবনীকে দেওয়ান কুঠিতে মঙ্গলার পাহারায় থাকবার জন্যে অনুরোধ করতে।

অবনী শেষ পর্যন্ত সে রাত্রে দেওয়ান কুঠিতে অবশ্য যায় নি।

তারপর কদিন শশধরকে এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু তার দরকার যে ছিল না জেনেছে কদিন বাদে। শশধরকে সেই রাত্রের পর কিছুদিন ডোমজুড়ির কোথাও নাকি দেখা যায় নি।

শশধর দেওয়ান কুঠি বা ডোমজুড়িতে নেই জানবার পর বিস্মিত প্রশ্ন জেগেছে মনে,—শশধর গেল কোথায়?

শুধু শশধর নয়, মঙ্গলাই বা হল কি?

শিরিষ গাছটার তলাতেই পরের দিন ভোরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এসেছে হতাশ ভাবে।

দেওয়ান কুঠিতে খোঁজ নিতে অবশ্য যাবে না, শশধরকে ত এড়িয়ে চলতেই চায়। মঙ্গলার খবর তাহলে পাবে কি করে?

কয়েকটা দিন নিদারুণ উদ্বেগে আশঙ্কায় কেটেছে।

ভাণ্ডারীর কুঞ্জেও এ কয়দিন যায়নি ইচ্ছে করেই। শশধর যদি তার আস্তানায় দেখা করতে আসে আসুক। ভাণ্ডারীর সামনে তার সংগে দেখা হওয়াটা চায় না।

ভাণ্ডারী সেদিন হঠাৎ এসেছে তার আস্তানায় দুটো সাজানো টাট্টু সংগে করে নিয়ে।

লুকাই লুকাই আছিস কেনে? আজ চারদিন দেখা করিস নাই। চ তুকে খেসারৎ দিতে হবেক!

কি খেসারৎ?—অবনী তোর কি চেষ্টা করেছে!

মুখ বুজি থাকি আমার সাথে। যিখানে লই যাই কথাটি বলবি না।

হঠাৎ আশার আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠেছিল। ভাণ্ডারী কি মঙ্গলার খবর জানে! দারুণ কিছু দুঃসংবাদ দেবার জন্যেই কি তাকে এইভাবে নিয়ে যেতে চাওয়া।

টাট্টু দুটোর সাজ-সরঞ্জাম দেখে অন্ততঃ ভীমের বেড় পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা বলে মনে হয়নি।

অবনী বিনা প্রতিবাদে ঘোড়ায় উঠেছিল।

ভাণ্ডারী সাহেবের সংগেও সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আলাপ হয়ে গেল।

বলতে গেলে ছোকরাই বলা উচিত। কিন্তু রাসভারী চেহারায় একটা স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে।

আলাপ হল ব্যানার্জিবাবুর দোকানেই।

জীপ থামিয়ে ভাণ্ডারী সাহেব নিজেই নেমে এসেছেন পাইপের তামাকের খোঁজ করতে।

ব্যানার্জি কৃতার্থ।

একটু অনুগ্রহ করে ভেতরে এসে বসুন স্যার। আমি চোর থেকে এখনি আনিয়ে দিচ্ছি। আপনি কলকাতা থেকে যে ব্র্যাণ্ড আনান তা আর কোথায় পাবো। তবে এটাও ভালো।

ভাণ্ডারী সাহেব হেসে বলেছেন—তামি সস্তা ব্র্যাণ্ডই খাই মশাই। আপনি রাখেন কি না জানতাম না বলে কলকাতা থেকে আনাতাম। আছুন দেখি কি আপনার ব্র্যাণ্ড! দা কাটা না হলেই হয়।

ভাণ্ডারী সাহেব ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসেছেন।

না দা কাটা কি বলছেন স্যার। বাজে জিনিস আমি রাখি না। ব্যানার্জি ব্যস্ত হয়ে সহকারীকে স্টোরে পাঠিয়েছে। তারপর অবনীকে পরিচয়ও করে দিয়েছে। তার দোকানে আর কেউ সেদিন নেই।

ইনিই ভাণ্ডারী সাহেব, আর ইনি রাজীব মল্লিক—এখানে নতুন এসেছেন। এইখানেই থেকে যাবার ইচ্ছে।

রাজীব মল্লিক!—ভাণ্ডারী সাহেব প্রথম পরিচয়ের পর নমস্কার জানিয়ে—নামটা নিজের মনে কিন্তু সবারেই উচ্চারণ করেছেন কি যেন মনে করবার চেষ্টায়।

তারপর হেসে বলেছেন,—হ্যাঁ মনে পড়েছে। রাজীব মল্লিক নাম সই করা চিঠিটা আজই সকালে কাছারীতে দেখলাম যে! সিসল ডাঙাটা কিনে সেখানে একটা অবলাশ্রম করবার জন্যে স্টেটের হাতে হাজার ত্রিশ টাকা দিতে চান। সে কি আপনি;

অবনী অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলেছে—সেইরকম একটা ইচ্ছা ছিল।

ব্যানার্জির চোখ অনেক আগেই কপালে উঠেছে।

বলেন কি মশাই! ত্রিশ হাজার দাতব্য! আপনার পেটে পেটে এত! দেখে ত চেনা যায় না!

দেখে কি জানুকেই চেনা যায়।

ভাণ্ডারী সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পাইপের তামাক এসে গেছে। যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে ধীরে চুস্কিয়ে চলে যাবার আগে তিনি বলেছেন—আপনার প্রস্তাবটা আমরা ভেবে দেখছি। নমস্কার!

ভাণ্ডারী সাহেব চলে যাবার পরও ব্যানার্জির বিস্মিত মন্তব্য থামে নি।

তা আর কি জায়গা খুঁজে পেলেন না মশাই—দানের টাকা ছড়াবার! ওই সিসল ভাণ্ডা! আপনি নতুন লোক কে কি বুঝিয়েছে কে জানে! আরে ওটা যে পোড়ো ভুতুড়ে জায়গা! এখানকার মানুষ ওর ত্রিসীমানায় যায় না।

মিছক ছায় অন্যায় নিখাদ সত্য-মিথ্যা শুধু বুঝি মানুষের কল্পনায়।

নইলে সব কিছুই শাদা থেকে কালো নানান রঙে মেশানো! মানুষের মনও তাই।

এ কথাটা সেই দিনই উপলব্ধি করেছিল সবচেয়ে তীব্রভাবে তার জগৎ বিদীর্ণ করা সেই ঘটনার বিদ্যুৎ দীপ্তিতে।

চাক্রিগাঙ পর্যন্ত হেতে শশধরের সমস্ত কথা কান দিয়ে যেন শোনে নি, শুনেছে আরো গভীর কোন চেতনা দিয়ে।

তখনই তার মন বুঝি সত্য মিথ্যা বিচারের সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে।

শশধরও সত্য, সত্য মঙ্গলাও। সত্য তার নিজের অনির্বাণ কামনা।

শুধু মেলানো যায় না এই তিনজনের সত্যকে। মেলাতে গেলেই বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরণ যে প্রত্যক্ষই দেখেছে বলা যায়।

সমস্ত অরণ্যভূমি কাঁপানো সেই শব্দ। পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি যেন আর্তনাদ!

টাটুর সরঞ্জাম দেখে অনুমান করতে না পারলেও ভীমের বেড়াই ভাণ্ডারীর লক্ষ্য বুঝতে পেরেছিল পরে।

পাহাড়ের সারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

বন এখানে অনেক ফাঁকা হয়ে এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারও এসেছে ঘনিয়ে।

সেই আবছা অন্ধকারেও সামনের সওয়ারকে চিনতে ভুল হয়নি।

শশধর বন্দুক ধরে ঘোড়ার ওপর বসে আছে তাদের দিকে মুখ করে।

কিছুক্ষণ পাথর খোদাই মূর্তির মত তিনজনেই স্থির নিস্তব্ধ। তারপর শশধর আর একটু এগিয়ে এসেছিল ঘোড়াটা চালিয়ে।

বলেছিল—চারদিন তোমাদের অপেক্ষাতেই এখানে ঘোরাফেরা করছি। জানতাম তোমরা এই দিকেই আসবে। এখন চলো—তুমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে চলো।

কুথা লই যাবো। মঙ্গলার কাছে? ভাণ্ডারীর জ্বালাধরানো বিদ্রূপের স্বর—মঙ্গলাকে আমি লুকাই রাখছি নাকি!

হ্যাঁ, তোমরাই রেখেছ!—গর্জন করে উঠেছিল শশধর,—সেই রাত্রে সে তোমার কুল্লেই অবনীকে খুঁজতে গেছল আমি জানি।

জানো? তাহলে ত আরো অনেক কিছু জানা উচিত! কেন সে চলি আসছিল তাও জানো! অবনীর সাথে তার দেখা হয় নাই তাও!

জানি! জানি! এখন কো
মিছে কথা বাড়িও না!

বেশ বাড়াবো নাই।—ভাণ্ডারীর স্বর এবার অনুদ্ধত গম্ভীর,—শুনো তবে দেওয়ান হাকুর! ই তোমার গোহালের গাই না যে পলাই আসিছে আর আমি ধরি রাখছি বলি তুমি হামলা লাগাবেক। মঙ্গলা তুমার বিয়ে করা ইস্তিরিও না। সে নিজের খুশিতে চলি আসছে আর আমি নিজের খুশিতে তাকে জাগো দিছি। তার তালাস তুমাকে দিব নাই।

তাহলে এই বন থেকে আর ফিরে নাই যেলে!—শশধরের গলায় যেন ইস্পাতের কাঠিন্য।

সে বন্দুকটা ভাণ্ডারীর দিকে তুলেছে।

অবনীর সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু ভাণ্ডারী তার বিরাট দেহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শশধরের দিকে ঘোড়া থেকে।

সেই মুহূর্তেই সেই অরণ্য কাঁপানো শব্দ যার প্রতিধ্বনি আজও তার মন থেকে মেলায়নি।

শেষ পর্যন্ত রঘুই তার বাক্য পূরণ করবে ভাবতেও পারেনি।

জিরাখালার দিকে অনেক দূর গিয়ে সেদিন ফিরবার উপক্রম করছে। পথে রঘুর সঙ্গে দেখা।

সাইকেল রিকশ থামিয়ে এক গাল হেসে বলেছিল,—হাটি কুথা যাবেন সাধু বাবা। জিরাখালা বহুৎ দূর বটে।

না জিয়াখালা যা
চেষ্টা করছিল একটু।

তবে চলেন না ঠাকুর বাবার ঠাঁই। এই ত মাতঙ্গী নদীর ঘাটে।

অবনীকে উৎসাহিত করবার জন্যে রঘু আরো ওকালতি করছিল,—হুঁ ভাণ্ডারী সাহেব ওঁর ঠাঁই কি হপ্তা আসে আপনি সাধু মানুষ তেনাও সাধু। আপনে যাবেন নাই ত যাবে কে।

নেহাৎ রঘুকে খুশি করবার জন্যেই তার ঝিকশায় উঠেছিল।

মাতঙ্গী নদীর ঘাটে ঠাকুর বাবার ঠাঁই বাইরে থেকে দেখে। শ্রদ্ধা ভক্তি কিছু আসেনি।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাধারণ চেহারার একটি বারান্দা ঘেরা বাংলো ধরণের ঘর। চার পাশে বেড়া দেওয়া অনেকখানি জায়গা আছে বটে কিন্তু সেখানে একটা বড় মহুয়া গাছ ছাড়া বলবার মতো আর কোনো বাহার নেই।

শ্রদ্ধা ভক্তি না হলেও একটু চমক লেগেছিল বুঝি প্রথম গেট দিয়ে ঢুকতে। গেটের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই পড়ে আছে মনে হয়।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় সেটা পাথরের চাঁই মাত্র নয়, তার মধ্যে মোটা হাতের একটা মূর্তি খোদাই-এর চেষ্টা যেন ছিল।

কিন্তু সেই অপটু খোদাই-এর দরুণ নয় পাথরের চাঁইটা অবনীকে চমকে দেবার অন্য কারণে।

এই পাথরের চাঁই তার চেনা। এখনো তার স্মৃতিটা মন থেকে মুছে যায়নি।

হ্যাঁ, এ পাথরের চাঁই তখনকার দেয়ান কুঠিতেই সে কোথায় দেখেছে। সেখানেও এমনি গেটে ঢোকবার মুখেই বোধ হয়।

অবনীকে দাঁড়াতে দেখে রঘু ভরসা দিয়ে গেটের বাইরে থেকে বলেছিল,—যান চলি যান। ঠাকুর বাবার কাছে কারুর মানা নাই।

অবনী নির্ভাবনাতেই ভেতরে চলে গিয়েছিল এবং দেখাও পেয়েছিল ঠাকুর বাবার পেছনের বারান্দায়।

দুজনের কারুকেই চিনতে খুব দেরী হয়নি। তারা পরস্পরের অন্তরের চেহারা জানে বলেই বোধ হয়, যে চেহারার ওপর কালের চিহ্ন পড়ে না।

বিস্ময় কেউ প্রকাশ করেনি। উচ্ছ্বাসও নয়।

শশধর চৌকিটা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলেছিল,—তোমাকে তাহলে ফিরতে হল!

হ্যাঁ, হল। কিন্তু সত্যি ফিরেছি কিনা সন্দেহ হয়।

শশধর তাকে সামনের আর একটি চৌকিতে বসতে বলেছিল,—সত্যি করে কোথাও কেরা আর যায় না!

দুজনেই অনেকক্ষণ তারপর নীরব।

দুজনের মনেই কি এক স্মৃতির ধারা তখন বইছে!

অরণ্যের বিশাল কোন গাছের মতই ভাণ্ডারী তখন মাটির ওপর আছড়ে পড়েছে। এতটুকু স্পন্দনও যেন আর টের পাওয়া যায় নি।

শশধরকে প্রথমটা তাই নিতান্ত বিমূঢ় মনে হয়েছিল। ঘোড়া থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বুঝি নেমে পড়েছে।

পরের মুহূর্তে অবনীর সাড় ফিরে এসেছিল সমস্ত শরীরে আর সেই সঙ্গে উন্মাদ একটা প্রতিহিংসা।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে সে চীৎকার করে ছুটে গিয়েছিল শশধরের দিকে কোনো কিছু না ভেবে।

শশধর তার দিকে বন্দুকটা তুলেছিল কিন্তু অবনী তা গ্রাহ্যই করেনি।

কি হয়েছে তারপর?

এখনো যেন অবিশ্বাস্য একটা স্বপ্ন।

শশধরের কাছে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ বন্দুকটা সে ছুঁড়ে দিয়েছিল অবনীর দিকে নিজে থেকে।

চীৎকার করে বলেছিল—মারো, মারো তুমি। আমায় মারো।

নাটক বটে। কিন্তু জীবন কখনো কখনো সমস্ত কাল্পনিক নাটককে ম্লান করে দেয়।

অবনী বন্দুকটা লুফে নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ছোড়বার চেষ্টাও করেনি। প্রতিহিংসার বিদ্যুৎ দাহটা এক মুহূর্তে তাকেই যেন ভস্ম করে মিলিয়ে গেছে।

ভাণ্ডারীদার কিছু করবার আর নেই তখন।

সেই বিরাট নিস্পন্দ দেহটার দিকে চেয়ে অবনী সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিল এ হত্যা করেছে সে নিজে। অবনীর হাত দিয়ে বন্দুকের গুলিটা ছুটেছে মাত্র কিন্তু সব কিছুর মূল সে ছাড়া আর কেউ নয়।

ভাণ্ডারীর মৃত্যুর সমস্ত দায়িত্ব না নিলে তার প্রায়শ্চিত্ত নেই।

সেই কথাই বুঝিয়েছিল শশধরকে হাজিগঞ্জের পথে যেতে যেতে। সমস্ত অপরাধ নিজের ওপর নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে সে শশধরকে মুক্ত করে যাবে। শশধর যেন মঙ্গলাকে আবার ফিরিয়ে আনে।

শশধরের কথা কেউ কল্পনাও করবে না। ভাণ্ডারীর সঙ্গে তাকেই বনের পথে আসতে সবাই দেখেছে। সবাই জানুক সেই ভাণ্ডারীকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

শশধরকে বোঝানো সহজ হয়নি। শশধর নিজে অনুতপ্ত কিন্তু তার আত্মাভিমান ত মরেনি। জীবনে কোথাও যে মাথা নোয়ায় নি সে হাত পেতে নিরাপদ হবার এই যুক্তিভিক্ষা নেবে অবনীর কাছে!

অবনী শেষ যুক্তি দিয়েছিল—এই ডোমজুড়ির ভবিষ্যতের জন্যে শশধরের নিরাপদ হওয়া দরকার।

ডোমডুঙির অনেক স্বপ্ন শশধর দেখেছে। অবনী নির্দ্বেষ হলেও সে স্বপ্ন ব্যর্থ হবে না।

শশধরকে বুঝিয়েছিল এসব, আর তার কথা শুনেছিল। অন্য এক অচেনা শশধর বুকের গহন গোপন অতলতা যে অবনীর কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্যে ব্যাকুল।

অবনী যেন তখন জীবনের স্রোতের বাইরে চলে গেছে। নির্লিপ্ত বিদেহী এক সত্তা।

মঙ্গলার কথা শুনেছিল এবার শুনেছে শশধরের কথা।

কিছুই বলেনি কারো সমর্থনে। হৃদয়ের প্রশ্নের মীমাংসা নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শশধরই প্রথম কথা বলেছিল।—ফিরে এসেছ বলে খুশিই হয়েছি, কিন্তু মিছেই তোমাকে যেতে দিয়েছিলাম অবনী। কোন দরকার ছিল না।

বুঝতে পারলাম না।—অবনী সত্যিই বিস্মিত।

শশধর বুঝিয়ে দিয়েছিল। যা বুঝিয়েছিল তা অবনীর কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য।

ভাণ্ডারীদার মৃত্যু নিয়ে কোন গোলযোগই বাকি হয়নি। ভাণ্ডারীরা মারা গেছল কিনা সে বিষয়েও শশধর নিঃসংশয় নয়। নিজের মনের গ্লানিতেই পরের দিন আবার শশধর সেখানে গেছল। ভাণ্ডারীদার দেহ সেখানে নেই। কোন বন্য শ্বাপদ যে টেনে নিয়ে গেছে তারও কোন চিহ্ন মেলে নি। ভাণ্ডারীরা হয়ত সত্যিই মারা যায় নি, আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল মাত্র। তারা সেই উত্তেজনার মুহূর্তে বুঝতে পারে নি। কিন্তু আহত হয়ে বেঁচে থাকলেও ভাণ্ডারী আর ফেরে নি। আর কোনদিন তার সন্ধানও পায় নি কেউ।

শশধরের কাছে আরো অনেক কথা শুনতে চেয়েছে অবনী। কিন্তু শশধরের তেমন কোন উৎসাহ দেখা যায় নি।

হেসে বলেছিল একবার,—শুকিয়ে যাওয়া ঘা কেন খুঁচিয়ে তোলা। সাধ করে যন্ত্রণা ডাকাই শুধু।

কিন্তু আমি যে সেই যন্ত্রণার মধ্যেই বেঁচে আছি শশধর। আমার কাছে এই বর্তমানই ছায়া। তুমি অতীতকে ছাড়িয়ে এসেছ আর আমি তার মধ্যেই ডুবে আছি।

সেদিন না হোক শশধরের কাছে আরো কিছু তারপর অবনী অবশ্য শুনেছে। শুনেছে অনেক দিন ধরে। সন্ধ্যাটা এখন প্রায় দেখানেই কাটে।

শুনেছে মঙ্গলার কয়েকদিন বাদে অবনীর খোঁজেই ফিরে আসার কথা। শশধরের কাছে সব কিছু শুনে আবার চলে যাওয়ার কথা।

শশধর বাধা দেয়নি তাকে। কোথায় সে গেছে তাও জানে না। জানে না আজও বেঁচে আছে কিনা।

শশধর ডোমডুঙির স্বপ্ন ভুলে যায় নি। কিন্তু নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিয়েছে ধীরে ধীরে।

দেওয়ান কুঠি বলতে এখন ভাণ্ডারী সাহেব।

হ্যাঁ, ভাণ্ডারী সাহেব সেই ভাণ্ডারীদেরই ছেলে। এক-মাত্র ছেলে। শশধর দেওয়ান কুঠির সমস্ত অধিকার কিছুদিন বাদেই ট্রাষ্ট করে দান করেছিল, ভাণ্ডারীরা ও তার অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারীরা তার প্রধান পরিচালক হবে এই সর্তে।

দেওয়ান কুঠি একদিন তারই নির্দেশে নতুন চেহারা নিয়েছিল।

তারপর এখন ভাণ্ডারী সাহেবই অবশ্য সব কিছু করে, কিন্তু ঠাকুরবাবার অনুমতি ও নিয়ে যায়।

অর্থহীন অনুমতি। অনেক কিছুই অর্থহীন হয়ে গেছে শশধরের কাছে। সেই সব আবর্তকেলির দিন যেন আজ কার গল্প।

ঠাকুর বাবা নাম কে করে দিয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু সেই নামটার আড়ালেই সে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে দিয়েছে। ডোমডুঙির যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তা হয়ত সফল হয় নি। কিন্তু তাতেও তার ক্ষোভ নেই। কোন স্বপ্নই সফল হয় না সে মেনে নিয়েছে।

অবনী হাসপাতালের হোস্টেলে আর বেশী দিন থাকবে না। শশধর তাকে তার আশ্রয়েই থাকতে বলেছে।

সেখানে যাবার আগে অবনী একবার জীবনের বেড় হয়ত যাবে, ভাণ্ডারীদার সে গোপন গুহাবাস খুঁজে পায় কি না দেখতে।

হয়ত ভাণ্ডারীদার সেই পাতালেই তাঁর অস্থি তারই আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে।

তারপর একজন স্মৃতি আর একজন বিস্মৃতি নিয়ে দুই অতীত পাশাপাশি শেষ বিলুপ্তির জন্যে প্রতীক্ষা করবে।

— স মা প্ত —

জলের রেখা

শ্যামসুন্দর দে

রাতের শিউলিগুলো ঝরে গেল
ভোরের বাতাস এসে আরো কিছুক্ষণ উড়বে
ঝরে পড়া ফুল আর পাতা
বিদায়ের সৌরভটুকু থাকবে
শিশিরের গন্ধ নিয়ে রাতের ফুল
দুপুরে রোদের চিতা, শুধুই পুড়বে।
কতটুকু সময়ের সীমানা
ম্লান গন্ধটুকু ভরে থাকবে
তারপরে ভুলে যাবে দিনের রোদ
ভোরের বাতাস জুড়ে একটি কান্না।

কথাগুলো শেষ হল, আবার কথার ফুল
ভোরের বাতাস স্পর্শে ঝরে যায়
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে,
রাতের শিশির ঝরে
কান্না। নক্ষত্রের জল পড়ে
রোদের প্রাঙ্গণ জুড়ে
ফোঁটা ফোঁটা দাগ—চিহ্ন
কতটুকু অবশেষ, কতটুকু বাকি
ছোট ছোট ঢেউগুলো মিশে গেল
প্রবল তরঙ্গ জুড়ে
একাকার জলরাশি।
রোদের তাপ কি মুছে নেবে
জলের আঁচড়ে লেখা নাম।

শেষ ছবি

রাম বসু

দিগন্ত নির্মোহ স্বচ্ছ, তৃষ্ণা আছে, নেই মরীচিকা
বুকের প্রান্তরে মৃত নদী তটে রিক্ততা পলাশ
যা আমার ন্যায্য প্রাপ্য। হে বিষাদ দগ্ধ কনিনীকা
নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে ছুঁড়ে দাও শেষ সর্বনাশ।

বিচূর্ণ শৃঙ্খলা, আমি চিত্রপটে সম্পর্ক বিহীন
নখে দেহ তুলে কাল দীর্ঘপায়ে গেলে নিরুদ্দেশে
আমার জন্মের স্মৃতি, তিক্তফল, করে প্রদক্ষিণ
তোমরা ভাসিয়ে দিয়ো আলোড়িত আঁধার প্রদেশে।

সেতু হতে গিয়ে শব্দ কতবার ভেঙেছে নিজেকে
হৃত কিছু থেকে গেছে কিছু লুপ্ত কিছু বা অলক্ত
নিষ্ঠার বিনীত কণ্ঠ সমুদ্রের পীতাভ চিৎকারে
ছিন্ন হলে, পরাস্ত মহিমা মুখ জেলে আপনারে
শিখা হয় একবার। তারপর নিশ্চিত নিস্তব্ধ
কালো দৃশ্যপটে থাকে নম্র স্থির রক্তরেখা এঁকে।

(৬২৮ পৃষ্ঠার পর)

কল্যাণীয়াসু,

তোমার এবারকার প্রশ্নটা বড় কঠিন। বলেছিলাম চিঠি লিখে জবাব দেব। তবু হরপ্রসন্নর বাড়িতে সেদিন তোমাকে কাছে টেনে, অনেকক্ষণ ধরে তোমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, তুমি অবাক হ'চ্ছিলে। ভাবছিলে, আমি তোমাকে কোন রকম সন্দেহ করছি কি না। আমার সম্পর্কে তুমি সংবাদ সংগ্রহে রত কি না!

কিন্তু আমি ওসব মোটেই ভাবছিলাম না। তোমার কথাটা শুনে থমকে গিয়েছিলাম। আমার একটি অত্যন্ত দুর্বল স্থানে, খুব স্বাভাবিক এবং সহজ ভাবে এসে তোমার হাতে পড়েছে। জানি, ওটা তোমার সঞ্চয় করা সাহস নয়। তোমার সহজ মনের উক্তি। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে সেটাই বুঝেছিলাম।

তুমি বলেছিলে আমাকে, 'আপনার নিজের দলের সঙ্গে আপনার কোথাও মিল খুঁজে পাই না। অথচ আপনি দলত্যাগ করেন না। নিজের দলের লোকেরাই আপনাকে ভয় পায়। এড়িয়ে চলতে চায়। আপনি তো সবই বোঝেন। তবে কেন আছেন?'

দেখ তুলিকা, অন্য কেউ আমাকে এই প্রশ্ন করলে, আমি তাকে কোন জবাবই দিতাম না। হয় তো, হয় তো কেন, আমি খুব গোঁয়ারের মত হয় তো রেগেই উঠতাম। কিন্তু তোমাকে আমি জবাব দেব। যে কথা আমি জগদীশ আর সতীকে বলতে পারি, তোমাকেও সেকথা বলতে পারি।

এক কথায়, এর জবাব হল পাপ। পাপের জন্য। রাজনীতির মধ্যে যে কী ঘোর পাপ আছে, তুমি এখনো সবটা টের পাওনি। কারণ তুমি রাজনীতির মধ্যে এখনো সে ভাবে প্রবেশ করনি। জানি না, তুমি কোথেকে শুনেছ যে আমাকে অনেকে 'ট্রাইকলার রেড' বলে। কিন্তু জেন সেটা বাইরের লোকেরা বলে না। আমার দলের লোকেরাই আমার এই বিচিত্র রংটা খুঁজে বার করেছে। যেদিন তারা সুযোগ পাবে, আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দেবে।

পাপ কেন বললাম? পাপটা আর কিছুই নয়। আমার নিজের দুর্বলতা। আমি জানি, তোমাদের মনের মত দলে আজ যদি আমি যোগদান করি, তা'হলে তোমরা খুশি হও। তোমাদের মনের মত দল বলতে আমি সরকার বিরোধী দলের কথা বলছি। আমার দলের সেটাই ইচ্ছা। তারা মনে প্রাণে চায়, আমি ভিন্ন দলে চলে যাই। তা' হলে তারা খোলাখুলি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে। আর নতুন কোন প্রতিষ্ঠিত দলে গেলেও আমার সম্মান বাড়বে না। আজ আমি যেখানে আছি সেখানে আছি, যেতে হবে।

আর দল বড় বিচিত্র জিনিস। তার নামের ডক্কা থাকতেই হবে। এবং তাই বলি, তাই করি, আমিও একজন চক্রের ভেতরের লোক। এর বাইরে আসা আজ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমাকে উড়ো চিঠি মারবে। এটা ঠিক, তোমরা যতটা শুনতে পাও, আমার ক্ষমতা ঠিক ততখানি নয়। আমি মিনিস্ট্রি গড়তে পারি কিংবা ভাঙতে পারি, এ সব সত্যি নয়। যদিও শাসকচক্রের ভিতরে আমাকে প্রবেশ করতে হয়েছে। এবং কোনো অদৃশ্য স্বার্থের বশে সই ক'রে আমি ঢুকিনি। কিংবা গদী আঁকড়ে বসিনি। কারণ গদী নিয়ে বসার আমার সখ নেই। শাসক চক্রের ভিতরে আমার হাত থাকলেও, আমি বাইরের লোক। এবং শক্তিটাও বাইরে, আমার বিশাল কর্মক্ষেত্র জুড়ে। এই শক্তিটাকেই আমার দলের লোকেরা ভয় পায়।

দলের লোক হয়েও এ কথা বলতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই, এদের শাসন কখন টিকতে পারে না। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা বার বার বলি। তার কারণ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দিল্লী সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। বিশ্বাস-ঘাতকদের বহু পুরনো সবচেয়ে এবং শক্ত ঘাঁটি ওখানেই ছিল। আজও আছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ সেই দিল্লীর হাতে ক্রীড়নক। আমার ক্ষোভ এবং দুঃখ সেখানেই, শাসকদের সব ক'টিই প্রায় মেকী দেশপ্রেমিক। এদের অবস্থা সেই, অবদমিত বাসনা নিয়ে, রাজনীতি করতে আসা মেয়েদের মত। এদের রুদ্ধ বাসনা আজ গলিত ময়লার মত উছলে পড়ছে। লোভ নির্লজ্জ হ'য়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মত আমিও বিশ্বাস করি, আমাদের পাওয়ানা আমরা পাইনি। এবং এই ক্ষোভ নিয়ে আমাকে দলের ভিতরেই চীৎকার ক'রে মরতে হবে। দলত্যাগী হ'য়ে তা একেবারেই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন করতে পার, ভাল হবে কি কিছু?

না হ'তে পারে। তবু এইসব হিংস্রদের সামনে আমি মূর্তিমান আতংকের মত চলে ফিরে বেড়াব। তাতে অন্তত শত দিকে মেলে দেওয়া যাবার, একটিকেও আমি থেংলে দিতে পারব। একমাত্র সেইটাই সান্ত্বনা।

তুলিকা, সর্বের মধ্যে ভূত থাকে ভাই, শুনেছ তো আমার জীবনেও সেটাই ট্র্যাজেডি। তবু আমি আমার মানুষদের, আমার বন্ধুদের ত্যাগ করব না। রাজনীতি আমি করব, কিন্তু তার উদ্দেশ্য কখনো ক্ষমতা দখল নয়। যতক্ষণ পারব, ততক্ষণ ন্যায়ের পক্ষে আমি থাকব। কিন্তু আমি জানি, আমার মাথার ওপরেও অদৃশ্য

রক্তের রঙ্গ আছে। আমার দলের হাতে যে-রক্ত লেগেছে, তা' আমার হাতও অস্বীকার করতে পারবে না। যে-পাপ আমার দলের হাতকে কলুষিত করেছে, সে কলুষ থেকে আমার হাতও মুক্ত নয়। এরই নাম দল। সেই দলের সঙ্গেই আমার প্রতিনিয়ত লড়াই। দলের ও চক্রের প্রতি আমি বিশ্বস্ত, এ ধারণা আছে বলেই সেই এখন অদৃশ্য কৃপাণ আমার ঘাড় ছুঁয়ে আছে, কিন্তু আঘাত করতে পারছে না।

তুমি কি আমার সব কথা বুঝলে? তোমার কাছে বড় অসহায়ের মত সব কথা লিখলাম। কিন্তু আমার তাতে কোনো আফশোস্ নেই। এমন করে বোধহয় কোনদিন জগদীশ সতীকেও বলতে পারিনি। যা ইচ্ছা তা ভাববার অধিকার তোমার। তবু, আমার এ অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে এস না যে, আমি তোমাকে রাজনীতি করতে বারণ করছি। যদি রাজনীতি নাও কর, তবু তোমার মধ্যে আমি যাকে দেখতে পেয়েছি, সে বীর্যবতী বিদ্রোহিণী। রাজনীতির সংগে সে না যেতে পারে তার বুকের আগুন কখনো অন্যায়কে মার্জনা করবে না। তাই, তোমাকেই জানাতে পারি মনের সব কথা। ভবিষ্যতে ইচ্ছা রইল, তোমাকে আরো অনেক কথা বলার। যা আরো জটিল-কুটিল নিষ্ঠুর এবং শয়তানিতে ভরা। আইন-আদালতের প্রত্যহের দুটি চারিটি খুন জখম, রাজনীতির ভয়ংকরতার কাছে কিছুই নয়। আবার রাজনীতির শুভদৃষ্টি-ই মানুষকে সৎ সত্যবাদী সহজ ও মহৎ করতে পারে। সমগ্র দেশব্যাপী নতুন রক্তের জোয়ার আনতে পারে।

আমাকে যেতে হবে ধর্মদাসপুর কোলিয়ারিতে। সেখানে একটি শ্রমিক খুন হয়েছে। আজ এ পর্যন্তই।

জান তুলিকা, ব্যাপারটা কেমন আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে। কারণ, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। প্রীতি ও স্নেহ নিও।—দারুণ বন্ধু।
কল্যাণীয়া তুলিকা,

এ তোমার কি পাগলাটে খেয়াল চাপল? আমার জীবনের ছেলেবেলা থেকে তুমি কেন জানতে চেয়েছ? আমার ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত, কোথাও একটু রসকষ নেই। কেন জানতে চেয়েছ, বল তো। বড়দিনের দিন তোমাকে আদর ক'রে অনেক কথা বলছিলাম বলে? বোধহয় আমার যে কথাটি তোমাকে আমার ছেলেবেলাটা জানবার জন্যে খুঁচিয়েছে, সে কথা হল, আমার এখন নতুন ক'রে ছেলেমানুষ হ'তে ইচ্ছে করে। বড় বড় কথা নয়, রাজনীতির জটিলতা নয়, ছেলেমানুষ হ'য়ে সকলের স্নেহ ভালবাসা কুড়িয়ে ফিরতে ইচ্ছে করে।'

তাই না তুলিকা? তবে তোমার দাদ আমি অপূর্ণ রাখবনা। কারণ, তোমাকে আমার সব কথাই বলতে চাই।

আমি বীরভূমের ছেলে, সেটা জান। বাবা ভেবেছিলেন আমি মাইনিং এঞ্জিনীয়ারিং পড়ব। কেন, তা জান ব'লে বাবাকে জিজ্ঞেস করবার আগেই, বাবা মারা যান। বাবা মারা যান তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে। আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না। যে-ধর্মদাসপুরের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে জানিয়েছি, সেখানে আমার মামার বাড়ি। মা তাঁর পূর্ণ বয়সে, একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হন। যদিও বা খুঁদকুড়ো খেয়ে কোনোরকমে পৈতৃক ভিটায় বাস করা যেত তার উপায় ছিল না। কারণ জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশীরা, রাত্রে আমাদের দরজা ধাক্কা দিত। মা রাত্রি জেগে থাকতেন। কাঁটা হ'য়ে থাকতেন সারা রাত। তখন আমার বছর পাঁচ ছয় বয়স। আমার ইচ্ছে করত, দরজা খুলে বাইরে যাই। লোকটাকে মার দিয়ে আসি।

কিন্তু মা আমাকে বুকে জড়িয়ে রাখতেন। বলতেন, ভগবান তোকে বড় করুক বাবা সাক্ষ। তা' হলে'ই আমার সব দুঃখ ঘুচবে।'

কিন্তু আমি সেসব কথা বুঝতাম না। ওই বয়সেই আমার এই জ্ঞানটুকু হয়েছিল, কোনো চোর ডাকাত আমাদের দরজা ধাক্কাচ্ছে। তাই মা ভয়ে কাঠ হ'য়ে বসে আছে। আমি মায়ের কোলের পাশ থেকেই চীৎকার ক'রে বলতাম, 'এই শালা চোর, বঁটিটে দিয়ে তুর গলাটা কেটে ফেলব কিন্তুক।'

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত, কেউ রক্ষা করতে আসে না। মানুষ যে কী অসহায় এই সমাজে। মা বলি ওই কথা বলতেন; তোকে ক্যানে ভগবান রাতারাতি বড় ক'রে দেয় না? সে কথাটা তু ভগবানকে জিগেস্ করিস।'

অনেক জিজ্ঞেস ক'রেও জবাব পাইনি। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হ'তে লাগল। মা আমাকে নিয়ে চলে গেলেন ধর্মদাসপুরে। গাঁয়ের পরে মাঠ। মাঠের ওপারে কোলিয়ারি। পড়াশোনা চলতে লাগল। মামারা খেতে দিত, পুষত। কিন্তু অসম্মানটা টের পেতাম। মা'কে দেখতাম লুকিয়ে কাঁদতে। কেন, হে ভগবান, সংসারে মানুষের এত বিভিন্নতা কেন? এত দুঃখ কেন আমার মায়ের? দেখতে এমন সুন্দর, ব্যবহার, কাজ এত সুন্দর তবু কেন এত কষ্ট? কেন আমার বাবা-ই মরে, হে ভগবান!

তুলিকা ভাই, আমার ইমোশন ক্ষমা ক'র। মায়ের কথা মনে হলে এই বয়সেও একবার ছেলেমানুষ হ'য়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কী অধিকার বল দেখি। আমি আই এস. সি. পাশ করব। মাইনিং এঞ্জিনীয়ারিং পড়ব। কিন্তু ম্যাট্রিকের ফলাফল বেরুবার আগেই, মা মারা গেলেন। ওখানে মা আমাকে বড় ছোট ছেলে ভাবতেন। মরবার আগে বলে গেলেন, বাবা সাক্ষ, মামাদের কথা শুনিস কিন্তু।

মামারা অবশ্য পড়ালেন না। আদানসোলে গিয়ে

থাকতে হ'ত তা চলে'। টাকা কোথায়? তাই মামা তার কোলিয়ারির আপিসে নিয়ে গেলেন, কাজ করবেন বলে। কোলিয়ারির জীবনটা প্রত্যহই দেখতাম। পীড়নটাও জানতাম। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, অবিচারের শেষ নাই। জন্ম থেকে প্রায় অবিচার দেখে দেখে, কোথায় মেনে নিতে পারা উচিৎ ছিল। মনে করা উচিৎ ছিল, সংসার এমনি। কিন্তু প্রতিবাদ না করে পারিনি। ধর্মদাসপুর কোলিয়ারির জীবনে সেই প্রথম সার্থক ধর্মঘট।

বেশী বলে লাভ নেই। সেখান থেকে আজ এখানে এসেছি। থামবার অবকাশ পাইনি। ধর্মদাসপুরে মাঝে মাঝে যাই। মাস পনেক আগে একটা খুন হয়েছিল। সেকথাও তোমাকে লিখেছি।

গত সপ্তাহেই আবার গিয়েছিলাম। গ্রামের শেষে, নদীর বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে সেদিন কোলিয়ারির চিমনীর দিকে তাকিয়েছিলাম। শুনতে পাই, ধর্মদাসপুরের খনিতে কয়লা নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। শীতের দুপুরে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে, সেই কথাটিই আমার মনে পড়ল। আর মনে হল, ধর্মদাসপুরের খনি যেন আমার জীবনের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে নিঃশেষ হল। আর কি! চল্লিশ ধরতে চলেছি। বয়সগুলিতো সব কয়লার মতই দেশের চুল্লিতে তুলে দিয়েছি।

হায়! তবু রক্ত কোথায় রইল জানিনা। তার আলোর রং এখনো আমার চোখে ছটা লাগায়। তুলিকা আজ এখানেই শেষ।—সারদা বসু।

তুলিকা,

'আপনার চিঠি পড়ে কেঁদে বাঁচিনে কেন লিখেছ? তোমার কাঁদাবার জন্ম কিন্তু লিখিনি। ও প্রসঙ্গ থাক্। আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়ছি। যে-কথাটা এর আগে কলকাতায় তুমি মুখ ফুটে বলতে পারনি, আমারো লজ্জা করেছে, সেই সতীর প্রসঙ্গটা আমি না লিখে পারছি না। আগের চিঠিতেই হয়তো লিখতাম। কিন্তু নিজের কথা বলতে গিয়ে আর ও বিষয় ভুলতে পারিনি।

এবারে সতীর ব্যবহার আমাকেও একটু অবাক করেছে। ও যে ওর অমন বড় বড় হাতের অক্ষরে লিখেছিল আমাকে, তুলিকা আমার হৃদয় হরণ করেছে—সেকথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলল কেমন ক'রে? শেষের দিন যে সতী তোমার সঙ্গে একবারেই কথা বলেনি, পরে আমি সেটা টের পেয়েছি। কারণ, ও আমার সঙ্গেও কথা বলছিলনা। কেবলি মুখ লুকিয়ে ঘুরছিল। যা কিছু চাইছিলাম, চাকর দিয়ে পাঠাচ্ছিল। এমনতো এত বছরের মধ্যে কখনো দেখিনি। জগদীশও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর তুমি চলে গেলে বেলা চারটে নাগাদ। আমার যে মিটিংএ যাবার কথা ছিল, হঠাৎ সেখান থেকে ফোনে খবর এল যে, সেখানে মারামারি হয়েছে, সুতরাং মিটিং প্রসপণ্ড করা হয়েছে। সে সবই তুমি জান, তুমি ফোনে খবর নিয়েছিলে। জগদীশও বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। আমি একলাই বসেছিলাম। হঠাৎ মনে হল, সতীকে একবার ডাকি। কী হয়েছে ওর, জানা দরকার। কেন আমার সামনে আসছে না। আমি তো কখনো ওকে জানতঃ কোনো কারণে আঘাত করিনি।

ভাবছিলাম, ঠিক সে সময়েই দেখলাম, দরজা ধরে এসে দাঁড়াল সতী। মাথা নীচু করে ছিল সে। দেখে কেমন যেন করুণ মনে হল। ভাবলাম এতাহলে জগদীশেরই কীর্তি। শ্রীমান বোধহয় কোনো কারণে মেয়েটাকে দুঃখ দিয়েছে। আমার কাছে ভান করে গেল এই বলে, 'সতীর আবার কী হল কে জানে। কারুর সঙ্গে কথা বলছে না।'

অথচ সতী আনন্দময়ী মেয়ে। ওকে আমি কখনো দুঃখের বড় একটা করতে দেখিনি। যদি বা কোনো কারণে মন খারাপ হল, ও সেগুলি তাড়াতাড়ি বলে ফেলে নিজেকে পরিষ্কার করে নেয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে সতী?

দেখলাম, ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। ও কাঁদছে দরজায় মুখ চেপে। তাড়াতাড়ি ওর কাছে গেলাম। ওর হাত ধরে বললাম, কী হয়েছে সতী, কাঁদছ কেন?

ও আমার পায়ের ওপর ভেঙে পড়ল। মুখ চেপে ধরল আমার পায়ে। আমি এক মুহূর্ত শক্ত হয়ে রইলাম। তারপরেই ওর মাথায় হাত দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম আবার, কী হয়েছে সতী?

সতী বলল, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমি তুলিকাকে হিংসে করেছি। আমি পাপ করেছি।

হাত তুলে নিলাম সতীর মাথা থেকে। স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কেন জানি না, মুখে যাই বলি, এমনি একটি সন্দেহ সারাদিনই আমার মনের মধ্যে খচখচ করছে। তোমাকেও দেখেছি, তুমি হাসছ কিন্তু কেমন যেন মন মরা ভাব। বার কয়েকই ভিতরে গেলে। প্রত্যেক-বারেই ফিরে ফিরে এসে নিঃশব্দে। অথচ অন্যান্যদিন তোমার এবং সতীর কত কথা ও হাসি ভেসে আসে ভিতর থেকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন হিংসে করেছ সতী?

সতী বলল, সেকথা বলতে পারব না আপনাকে, আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু সে বড় ভাল মেয়ে, তার কোথাও কোনো দোষ নেই। কেন আমি তাকে হিংসে করতে গেলুম। হে ভগবান, কেন কেন?

কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সে আমাকে চাপা দিচ্ছে না। ইতিমধ্যেই তার কয়েকবার চাপা দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন তা বলল না।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরী হয়নি। এটা ঠিক একটি মেয়ের পরিবেশ, একটি মেয়ের কৃপা নিয়েই বারে বারে জগদীশের ওখানে গিয়েছি। কিন্তু সতী কবে থেকে নিজের এমন সর্বনাশ করে বসে আছে, টের পাইনি। ও মেয়ে তো। হয়তো আত্মহত্যা প্রকাশ করত না। কিন্তু তোমাকে দেখার পর থেকে ওর বাঁধ ভেঙেছে। নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারল না।

এখন মনে হচ্ছে, পত্রে যে সে তোমার কথা লিখেছিল তার কারণ আর কিছুই নয়। সে প্রথম থেকেই নিজেকে সন্দেহ করছিল। আর সেই সন্দেহটার সংগে লড়তে গিয়ে বারে বারে তোমার প্রশংসা করছিল।

তারপরেই সতী বলল, আপনি তুলিকাকে আজই ডেকে আনুন। আমি প্রায়শ্চিত্ত করি। আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইব।

তাই আমি তোমাকে পরদিন সকালবেলা ডেকে এনেছিলাম। তুমি আর সতী অন্তরালে কী কথা বলেছ, আমি জানি না। তবে তুমি যে কেঁদেছ, সেটাও টের পেয়েছি তোমার চোখ দেখে। কিন্তু আমাকে তুমি কিছুই বললে না। আমিও কিছুই বলতে পারলাম না। সতী দেখলাম তারপরেই অনেকখানি হাল্কা, অনেকখানি সহজ।

এইখানে তোমাদের জয় তুলিকা। তোমাদের নিজেদের মধ্যে একবার মিটমাট হয়ে গেলে, তোমাদের হাসি আর নষ্ট হয় না। আর এইখানেই বোধহয় পুরুষদের জ্বালা। কে জানে! আমি এসব ব্যাপারে প্রায় আমার ব্যাপারী জাহাজের খবরে নাক গলাচ্ছি।

তবু একটি কথা, নিজের কাছেই প্রায় নিজে কৈফিয়ৎ তলব করেছি। এ ঘটনাটি ঘটা সত্ত্বেও তুমি যে আমার ছেলেবেলার কথা জানতে চেয়েছিলে, আমি তোমাকে সেটা জানাতে উন্মুখ হয়ে ছিলাম। অথচ সতীর ব্যাপারটা তার চেয়ে জরুরী ছিল বলে এখন মনে হচ্ছে।

সতী তারপরে আমার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এতদিনে চেপে রাখা ঘটনাটা আর চাপা থাকছিল না। আজ আমি ভাবছি, সর্বনাশ হতে কি আমারো বাকী আছে? কিন্তু কেন? জীবনের এই মুহূর্তে, সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে আমার শিয়রে?

আজ আর লিখতে পারছি না। তোমার শারীরিক ও মানসিক কুশল দিও।—

সারদা বসু।

তুলিকা,

তোমার চিঠি আজই পেলাম। আজই জবাব দিতে বসেছি। তুমি লিখেছ, 'সতী বউদিকে আমি নির্ভয় করেছি। তার ভুল ভেঙে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।' এ যে আমার অসুখই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে তুলিকা।

আজ তুমি ভুলে যাও আমি সেই সারদাবাবু, নামে ডাকে যার রাজনীতির গগন কাঁপে। মনে কর, আমি আমার গাঁয়ের সেই ছেলে বড় হয়েছি। আমার নাম সারু। জিজ্ঞেস করি, সতীর ভুল ভাঙালে, সতীকে নির্ভয় করলে। সেই সঙ্গে কি আমার ভুলও ভাঙাতে চাইলে? আমাকে ভয় দিলে?

ভয় পেলাম তুলিকা। বাইরে আমি কঠিন কঠোর। বাইরে আমার অনেক প্রতাপ। সেই আমি, একটি অতি সাধারণ মানুষের মত, সাধারণ বোধহয় সবচেয়ে অসাধারণ পিপাসিত মন নিয়ে, একটি অত্যন্ত প্রত্যহের ছোট ঘরে ফিরতে চাই। সেই ছোট ঘরে আমি বাইরের সবকিছু রেখে ফিরব। সেই ছোট ঘরের আশ্রয়কে আমি আমার হাতের শক্তি দিয়ে নিরাপদ রাখব, নিশ্চিন্ত করব।

সেই ছোট ঘরে কি তোমার নিজেকে ভুলোতে পারবে?—সারদা।

কল্যাণীয়াসু,

জীবনে ভয় একবারই পেলাম। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, তুমি এমন ক'রে আমাকে নির্ভয় করলে। বরং তুমি অমন পরিষ্কার ক'রে না লিখলে, আমি আর সঙ্কোচে লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে পারতাম না। তুমি লিখেছ 'আপনি যে—ছোট ঘরটিতে আমাকে আহ্বান করেছেন, সেখানে আমার মত অনেক তুলিকা নিজেকে ভুলোতে পারবে, ধন্য হবে, গৌরব করে বাঁচবে।' কিন্তু সেই ছোট ঘরটিতে যাবার সাহস তো চাই। আমার পায়ে পায়ে সংশয় বলতে পারেন, এক অদৃশ্য শিকল যেন জড়ানো আমার পায়ে। আমি নিজেও তাকে বোধহয় চিনিনে। এই শিকলে শক্ত ক'রে হেঁচড়ে হেঁচড়ে কেমন ক'রে যাব আমি? আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু আমাকে ত্যাগ করবেন না। শ্রদ্ধার ওপরেও জীবনে কিছু থাকে, আমার সেই ঘনিষ্টতা নিয়ে আপনার কাছে বারে বারে যেতে চাই।'

তুলিকা, দরজা চিরদিন ধরে খোলা পড়ে থাকবে। তুমি তোমার ইচ্ছে মত যেয়ো এস। তোমার এই শেষ কথাটি রক্ষা করলেই সুখী হব। এ বিষয়ের কথা এখানেই শেষ।

আগামী রবিবার দিন কলকাতায় যাব। জগদীশের ওখানে সন্ধ্যাবেলা এস। স্নেহ নিও।—সারদা বসু।

॥ চতুর্থ হাত ॥

সুচরিতাসু,

আপনার পত্রটি পেলাম। পেয়ে সুখী হলাম। এই

অন্তে নয় যে, নতুন আমার কবিতার বইটি পড়ে, প্রায় সব কটি কবিতাই আপনার ভালো লেগেছে। অবিশ্যি কবি-কুলের এটা হয়তো সহজাত যে প্রশংসা পেলেই তাঁরা খুশি। অনন্তরার দাবী আমার নেই। শুধু সেবে পাইনে, যা আমার নিতান্ত আপন কথা, তা ছাপতে দিতে যাই কেন। কারুর, আমার, একান্ত আমার, কথা পরের ভালো নাও লাগতে পারে। তাই সাধারণের সামনে যখনি প্রকাশ করতে গিয়েছি, তখনি বোঝা গিয়েছে, কবিতা লিখেই শুধু ক্ষান্ত থাকা যায় না। অপরকে শোনানো চাই। অতএব অনন্তরার দাবী এ দরবারে টেকে না। তবু নিজে বিশ্বাস করি, ইহকাল ধরে শুধু একটি কবিতাই লিখতে চেষ্টা করব। চেষ্টা করেও চলেছি। শত ঘাবে, শত আঘাতে, তবু সেই কবিতাটি বোধহয় কোনোদিন হয়ে দেবে না। এই অতৃপ্তিটা এত বেশী বিঁধিয়ে টাটিয়ে রাখে সব সময় যে, প্রশংসাটা ভোগ করে উঠতে পারিনে।

আপনার পত্রটি পড়ে আমার ভাল লাগল। দু'একটি লাইন পড়ে। আপনি লিখেছেন, 'একটি আশ্চর্য তন্ময়তা প্রতিটি কবিতায়। শুধু চারদিকের ঘাসগুলি বেশ নিটোল নিটুট মসৃণ নয়। কাটা কাটা, খোঁচা খোঁচা। যেন সে'জা ঘাস কেটে, ওপরে একটি ছুরি দিয়ে ঘাসগুলি কেটে কেটে কণ্টকিত করা। কেন? একে তো শৈলী বলে মনে হল না। সিনিসিজমের বাঁকা ছুরি দিয়ে খোঁচানো। ভুল হলে ক্ষমা করবেন।'

আপনার কি ধারণা, সিনিসিজম্ সম্পর্কে? অবিশ্বাসী? বার্থতার জ্বালা? ওসব বুঝিনে। সন্দেহ করি। তাই প্রশ্ন করি। মানতে পারিনে, তাই বাতিল করি। অবিশ্বাস? থাকতেই পারে। এবং থাকলে অনুসন্ধান করব। তবে, আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছি। আর সেই বিশ্বাসের কথাটা বড় বিস্তৃত। ওটা থাক।

কখন বাড়ি থাকি জিজ্ঞেস করেছেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায়। দুপুরবেলাটা জীবিকার জন্য কলেজে যেতে হয়। আর আপনার বাড়ির ঠিকানা তো দেখছি আমার বাড়ির কাছেই। আসবেন, আলাপ করা যাবে। নমস্কারান্তে—মিহিরেরঞ্জন সেনগুপ্ত।

অবিশ্বাসীষু,

পায়ের তলায় আমার রক্ত লেগেছিল। আমি কাঁটার ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছি দীর্ঘদিন। সেই রক্ত ভরা পায়ের দাগ লুকিয়ে ফিরছি অনেককাল। চোখে পড়েনি কারুর, সেই আমার আত্মার সন্ধান। কারণ কমলের পাপড়ির আলোকচ্ছটায় সেই রক্ত দূর হবে, আশা ছিল তাই। এবং সেটা নির্জনে, গহনে, নিঃসঙ্গে।

প্রায় সেই রকম এক আলোকচ্ছটা, কেতকীকেশে যাবার পথে, যে-আলো দেখেছিল সেই লোকটি। যে-আলো তার বিরুদ্ধের করা কাঁটায় ফুটেছিল। তার চোখে, মুখে তার সর্বাঙ্গে ছড়ে। সেইরকম সুন্দর, পবিত্র, স্নিগ্ধ হরণ আলোচ্ছটা। চিত্ত ক্ষুব্ধিত, তিক্ত সন্দেহবাদী মন যেখানে হেসেছে, কেঁদেছে।

আপনি তো সেই ভাবেই এলেন।

আপনি সেইভাবেই এলেন। ভাগ্যি, আমাদের বাইরের ঘরটা পশ্চিম মুখো। বেলা শেষে সেই দরজা, প্রায় আমারই বয়সী, এতদিন বোধহয় আপনারই প্রবেশের প্রতীক্ষায় ছিল। দেখলাম, সূর্যের রক্তাভা আপনার কেশে। পিছনে পিছলে পড়ছে প্রতি মুহূর্তে। আপনার মুখ দেখবার আগে, আপনার চোখ দেখলাম। পরনে শাড়িতে আপনি প্রায় নিঃশেষেই কুটলেন। আর আমারই নির্জনে গহনে। পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশের জড়তা আপনার সর্বাঙ্গে।

কিন্তু, কী আশ্চর্য! আপনি তো জীবন ছেলেমানুষ। পত্র পড়ে একদম বুঝতে পারিনি। কথা বলে আরো সংশয়ে পড়েছি।

তার আগে, প্রায় প্রাচীন কবির মত, প্রথম দর্শনের যে-বর্ণনা দিলাম, তা আপনাকে বিরক্ত করল কিনা জানাবেন। অকপট হয়েছি, অপরাধ সেইটিই। যেমন কবিতার কাছে হই।—ইতি মিহিরেরঞ্জন সেনগুপ্ত।

শ্রীমতী তুলিকা,

আমার পত্র আমার বিচিত্র লেগেছে, কিন্তু বিরক্ত হননি। ভাল লেগেছে, আর অর্থ খুঁজতে গিয়ে বিস্ময় লজ্জা ও আনন্দ অনুভব করেছেন। সেই আমারও বিস্ময়, আনন্দ এবং এখন তো একটু একটু লজ্জাই করছে। কবে আসবেন?—মিহিরেরঞ্জন সেনগুপ্ত।

তুলিকা,

এই এক বছরের মধ্যে তোমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করিনি। দ্বিধা কোনো সময়েই করিনি, যখন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

আমার আরো কথা আছে। তুলিকা, বলতে লজ্জা করিনে, আমি লুকিয়ে কাঁদি। কাঁদি, তার কারণ বোধহয় আমি অসহায় বলে। আমার অসহ্য ক্ষোভ, আমি শোধ নিতে পারিনে বলে কাঁদি। এ দেশ আমাকে হতাশ করেছে, বিরক্ত করেছে, প্রায় ব্যর্থ করেছে সবদিক দিয়ে। এদেশ আমার নয়। অথচ এদেশেই আমি জন্মেছি। অন্য কোথাও আমি স্বীকৃত নই। এই আমার ক্ষোভ।

নিবিচার অনধিকার চর্চা এদেশে, আমারই প্রত্যেক ভাইয়ের। এ ভাইদের আমি ঘৃণা করি। আমি ভ্রাতৃদ্রোহী। এ দেশে কোথাও আমার নিজের ঘর নেই।

আমার দেহের জন্য আকস্মিক। আর আমার এ দেহের অস্তিত্ব আমাকে জোর করে স্বীকার করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে কুৎসিত হাসি এই, যার ঔরসজাত এই দেহ, সে-ই নাকি আমার পিতা। কিন্তু এ দেহটাকেই

তো আমি ভুলে থাকতে চেয়েছি। সে ছিলেবে কোন ঈশ্বর প্রেরিত ম্যাজিস্ট্রেট মনীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ছেলে আমি নই। আমি কতগুলি চিন্তার ফল। কতগুলি মনের। যাদের মত-কে আমি বিশ্বাস করছি। তারা হয়তো কেউ লীন কিংবা রাইন নদীর ধারের বাসিন্দা। কিন্তু চিন্তার ঔপনিবেশিক এই বিচিত্র বিদেহীকে কেউ স্বীকার করছে না।

তাই হাতে কলম নিয়ে রুদ্ধ হ'য়ে উঠি। আমি প্রতিবাদ করতে চাই। কিন্তু সবত্র আমি অস্বীকৃত। তাই আমি সোজা ঠোঁটে কোনদিন হাসতে পারলাম না। বিদ্রূপ করে ঘরে এসে আমাকে কাঁদতে হল।

সেদিন প্রায়ান্ধকার ঘরে আমি কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই বেলা যাচ্ছিল। আমার ঘর থেকে আমি সেই আলো দেখলাম। আর আমার কান্না যেতে লাগল। কারণ মৃত্যুর মাত্র একটাই অর্থ। এই মৃত দেশেও। কবিতা লিখেও মৃত্যুর সেই ঘৃণ্য কর্মটাকে বন্ধ করতে পারব না। তবে? তবে আমার লেখার সেই একমাত্র কবিতার অর্থ কী? কবে সেখা হবে? শুধুমাত্র অভ্যাসের বশে লিখে লিখে, নানান রংএ রংএ আমি তাকে বিদ্রূপ করব?

তুমি এলে। কাঁদতে দেখে তাড়াতাড়ি আমার গায়ের ওপর এসে পড়লে।—কী হয়েছে মিহিরদা?

আমি বললাম, জানিনে তুলি।

কী বুঝলে তুমি জানিনে। আমার চোখ মুছিয়ে দিলে। আমি তোমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরলাম। তুমি মাথা নামিয়ে নিলে। আমি তোমার মুখ তুলে ধরলাম। তুমি হাসলে! সন্ধ্যাবেলার কমল বোধ হয় অমনি ক'রেই হাসে। আমার চেয়েও কম বিষণ্ণ দেখাল না তোমাকে।

তুমি প্রায় চুপি চুপি বললে, বসুন।

তারপরে কথা আমাদের অল্পই হল। তুমি বললে, চলুন বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।

কিন্তু তুলিকা, এ ক্ষোভের মধ্যে, অসহায়তার মধ্যেও, আমার এই পরাভূত অস্তিত্বটাকে নিয়ে বাঁচতে চাই। পার না বাঁচাতে? নিয়ে যেতে পার না সেই আলোকচ্ছটায়? ইতি—

মিহিররঞ্জন।

॥ সেরাই ॥
[আমার কথা]

চিঠি পড়া আমার শেষ হ'ল। তবু যেন শেষের রেশ টা এগিয়ে এল না। চার হাতের এলোমেলো তালের মধ্যে যেন আমি হারিয়ে গেলাম। উঠতে পারলাম না।

সেই পাখীটা ডেকে মরছে এখনো। পাড়াটা যেন নিঝুম হ'য়ে গেছে। দরজায় বুঝি বাতাসেরই ধাক্কা। কিন্তু মায়ের ডাক শুনতে পেলাম, তুলি, ও তুলি।

মায়ের গলার স্বরটা কেমন যেন মোটা শোনাল। দরজা খুললাম। দেখলাম, মা'র চোখ ফোলা, ভেজা ভেজা। কেঁদেছে।

—মা কেঁদেছ কেন?

—মেয়ে হয়ে তুই আমাকে কাঁদাচ্ছিস।

—কেন মা?

—তুই আমার একমাত্র মেয়ে। বললে তুই রাগ করিস। তোকে এমনি দেখলে আমার কষ্ট হয় না? বলতেও তো পারিস, কাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। শুধু টো টো করে ঘুরে বেড়াস?

মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মার চোখে জল দেখে, কথা শুনে আমারও যেন কান্না পেতে লাগল। চুপি চুপি গলায় বললাম, মা এবার যাহোক একটা কিছু হবে।

ঘরের মধ্যে ছড়ানো চিঠিগুলির দিকে মা তাকাল। আমার লজ্জা করতে লাগল। তাড়াতাড়ি বললাম, কটা বেজেছে মা?

—আড়াইটে।

—অ্যাঁ? সে কি! তুমি খেয়েছ?

—তুই রইলি রাগ করে বসে, আমি খাব?

তাড়াতাড়ি চান করে নিলাম। খেলাম মার সংগে। খেয়ে উঠে, চিঠিগুলি গুছিয়ে রেখে মাকে বললাম, মা একটা পান খেবে?

মা হা করে তাকিয়ে রইল একটু। কারণ, আমি পান কখনো খাই না। মা বললে, পান খাবি?

—হ্যাঁ।

—কী হয়েছে তোর আজকে?

—কী জানি। একটা পান খেতে ইচ্ছে করছে।

বাবা শুনতে পেয়ে বললেন, তুলির আজ ঠোঁট রাঙাবার সাধ হয়েছে বুঝি? মায়ের সংগে নেশা করে মায়ের মন রাখা হচ্ছে?

মা আর আমি দুজনে হাসলাম। মা নিজের হাতে পান সেজে দিতে দিতে বাবাকে বলল, তোমার মেয়ের যেন আজ কী হয়েছে।

বাবা বললেন, কী হয়েছে রে তুলি?

আমি বললাম, কিছু নয় বাবা।

বাবা আরো কৌতূহল দেখালে, আমি ভীষণ লজ্জায় পড়ে যেতাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আমি লালপাড় ধেওয়া শাদা শাড়ি পরলাম। বাসন্তী রংএর জামাটি পরলাম। পয়সার ব্যাগটা নিয়ে বেরুবার সময় মাকে বললাম, আমি একটু ঘুরে আসছি।

হাতদুটো একেবারে খালি করেছিস। ঘুসটাও তো ভাল করে ঘুস নি।

আমি বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম, এখান থেকে আসছি ঘুরে এখুনি।

কে জানে, কোথায় শঙ্খ বাজল। আজ আবার কোনো সাজ নেই। চুলে চিরুনীটি পর্যন্ত দিলাম না। আজ আমার সব সংশয় শেষ। আজ আমার কেরাইয়ের হাতে যাবার সাহসের দিন। আজ উৎসব। এখন আমার বুকের গভীরে, সেই বিন্দুর ছায়া পূর্ণ পরিস্ফুট।

রোওলার ওপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দা। বারান্দার সামনেই ঘর। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু আলো নেই। ঘরের দরজাটাও খোলা। সেখানে মানুষ আছে বলে মনে হল না। ঘরটা আমার অচেনা নয়। ভিতরে গেলাম। যাবার মুখেই, একজন ডেকে বলল, কে?

সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলল। দেখলাম চাকর। আসলে লোকটা সোয়ানীজ, বাংলা বলতে শিখেছে। আমাকে চেনে। দেখেই এক গাল হাসি। বলল, ও আপনি?

আমি বললাম, লোক কোথায়?

চাকরটি বলল, ছাদে। আপনি বসুন, ডেকে নিয়ে আসছি।

বলেই ছুটতে যাচ্ছিল। আমি ডাকলাম। বললাম, ছাদে কেন?

—ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—থাক্ তাহলে ডেক না। যখন হয় আসবেন। আমি একটু বসি।

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপরে আবার হাসল। বলল, একটু চা খাবেন।

—না, থাক। তুমি বরং বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দাও।

বোধহয় অনিচ্ছাতেই ওকে নেভাতে হল। আজ আমি আমার কেরাই-এর হাতটিকে সহসা দেখব। বিস্মিত চমকিত অবস্থায় দেখব।

বুকের মধ্যে বড় কাঁপছে আমার। আমি সংশয় পার হয়ে এসেছি। কিন্তু যার কাছে এসেছি, তার হাতেই আমার ঠাঁই আছে তো? সেখানে কোন বিড়ম্বনা, আমার সব সাহসের মুখের উপর কোনো নিষ্ঠুর বিদ্রূপ অপেক্ষা করে নেই তো?

জানি না, কত রাত হল। ঘরের দরজায় একটা ছায়া দেখা গেল।

—কী।

—কি লাগে।

—কী।

তারপরেই আলো জ্বলল। ছায়াটা কায়া হল। ঘরে ঢুকে বাঁ দিকে যেতে গিয়ে, থমকে দাঁড়াল।—তুমি!

'হ্যাঁ' বলব, এমন ক্ষমতা নেই। বাইরে মেঘে ঘরে বুক শুকিয়ে কাঠ। ঠিক এসেছি তো! ঠিক কপালে প্রত্যাখ্যান নেই তো? যদি থাকে, তবে?

কায়াটা যেন শান্ত হয়ে এল হঠাৎ। দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল, কখন এলে?

কোনরকমে প্রথম গলার স্বর বার করলাম, অনেকক্ষণ।

—খবর দাওনি কেন?

—বেড়াচ্ছিলেন ছাদে।

শিবেন তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সারা ঘরময় রং তুলি ইজেল, খাট চেয়ার, কাগজপত্র ছড়ানো।

আমিও শিবেনের চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

শিবেন বলল, কোনো পত্রিকার কভার আঁকতে হবে নাকি?

শিবেনের কালো ভ্রূ, বড় দুটো চোখ আর তীক্ষ্ণ রেখা ঠোঁট, সব যেন এক সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠল একবার। আমার হাসিটা ঠোঁটে থাকতে চাইছে না তবু জোর করে ধরে রেখেছি।

আমি বললাম, না। একটা পোর্ট্রেট।

কার?

কার? কার? বলব? এই যে আমার শেষ কথা তারপর?

বললাম, সকালবেলা ব্রোচ তুলে নিয়ে একটি মুখ—

শিবেন দেয়াল থেকে সরে দাঁড়াল। আমি বললাম কাঁপা বুক দিয়ে ঠোঁট—

শিবেন ডাকল, তুলি!

ও আমি চিনি। আমার চিরকালের ডাক। আমি কেঁদে ওঠবার আগেই, আমার জীবনের সেই প্রথম ঠোঁটের স্পর্শ, একটি বিন্দু দিয়ে আমি রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে, নিশ্বাস নিয়ে, অসহ্য কান্নাটা শিবেনের বুকে পড়ে কাঁদলাম।

শিবেন আবার ডাকল, তুলি!

—বল।

শিবেন তৃষিত হেসে চিবুকটা তুলে ধরল। তৃষ্ণাটা ও আমাকেও দিল।

তারপরে শিবেন জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কেমন করে হল তুলি?

বললাম, সে ব্যাখ্যা তুমিও জানো। আমি কি জানি কেন?

শিবেন বলল, কিন্তু অন্য কেন গুলোর জবাব আছে নিশ্চয়?

—যেমন?

—মিস্টিরিয়াস, সাইকো বোস, সৌমেন?

—এরও কোন জবাব সঠিক নেই। এ বোধহয় তোমার সেই অনুভব। তবু বলি। প্রথম কারণ, আমি খুব সাধারণ, এটা মানো তো?

—যদি মানি?

—তা হলেই সব জবাবের শেষ হয়। এঁরা কেউ সাধারণ নন। সকলেই অনেক অনেক বড়। সৌমেন অর্থে প্রতিপত্তিতে। আমি ওর ও জীবনটায় কখনো ঢুকি মনেতে পারব না। সাইকোর ছোট ঘর, ওও নিশ্চিন্ত থাক, সেখানে আমার প্রায় কিছুই করবার নেই। একটি বাক্তিত্বের ছায়ায় অন্ধকারে থাকো। আর মিস্টিরিয়াস, আমি এত বেশী দেশীয় মেয়ে, ওঁর-ই পরে আমাকে নিয়ে কষ্ট হত।

—আর শিবেন?

—সবচেয়ে বড় সাহসের ডাক দিয়েছে।

—যথা।

—এ পৃথিবীতে কোন গ্যারান্টি নেই।

—তুলি!

—হ্যাঁ, তোমার মধ্যে ঝড় আছে। ভূমিকম্প আছে। মারী মহামারী আছে।

বান-বন্যা আছে। তবুও তোমার কাছেই এসেছি। তোমার মধ্যে প্রতিনিয়ত বাঁচবার সংগ্রাম আমার জীবন। ত্যাগ বল, গ্রহণ বল, আমি কোন চুক্তি সই করে আসেনা।

—তুলি! তুলি!

কী পাগল শিবেনটা। ও আমার পায়ে মাথা রাখছে।

বললাম, ওঠো সন্ধ্যে হয়ে গেছে কখন, মুখে গন্ধ পাচ্ছিনে কেন?

পুরুষটার চোখে দেখলাম জয়ের হাসি। বলল, সমস্ত অনুভূতিটার কাছে ওটা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে তুলি।

— ম সা প্ত —

কয়েকটি নতুন "সোভিয়েত দেশ" পুস্তিকা

১। কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনার পূর্ণতর সদ্ব্যবহার
(এন. এস. খ্রুশ্চফের রিপোর্ট)

২। সোভিয়েত কলকারখানায় কর্ম-ব্যবস্থা (প্রশ্নোত্তর)

৩। শিশুদের লালন পালন (চিকিৎসকের পরামর্শ)

৪। আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ—নিরস্ত্রীকরণ—এন. এস. খ্রুশ্চফ

৫। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি
—এন. এস. খ্রুশ্চফ

সোভিয়েত অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা

:: অর্ডার দিবার ঠিকানা ::

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১/১, উড ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬।

পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম আসে, তখন হইতেই সে তাহার চারিপার্শ্বের দৃশ্যাবলী অঙ্কন করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাষ্ঠফলকের উপর মানুষ কর্তৃক খোদিত ছবি ও লেখার বহু নমুনা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রস্তরযুগে এই অসংস্কৃত সহজাত শিল্পটি সুস্পষ্ট এবং বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠে, যাহা হইতে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, মানুষ খোদাই শিল্পকার্যে সেই সময়েই কতকটা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

সেই যুগে মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা তাহা বুঝা যায় না, এবং আজ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক যুগে মুদ্রণ শিল্প যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছে তেমনি ইহা তীব্র প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হইয়াছে: এখন কাজ কেবল সুন্দর ও পরিপাটী হইলে চলিবে না, অধিকন্তু কাজ যথা সম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করাও চাই।

০ নিখুঁত মুদ্রণ

০ সুন্দর ডিজাইন

০ সত্বর সরবরাহ

লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ
প্রিণ্টার্স ও কার্ড-বোর্ড বক্স মেকার্স

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ফোন ৫৫-৪৪২৫ ও ৫৫-১৮৬১

পা রাখার জায়গা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীটা যেন রাস্তার খেঁকীকুকুরের মত
পেঁকার জ্বালায়
নিজের ল্যাজ কামড়ে ধ'রে
কেবলি পাক খাচ্ছে ;
আর
একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা প'ড়ো বাড়িতে
তার বিকট আর্তনাদই হল
জীবন

এই রকমের একটা শক্ত খোলসে ঢাকা
তরল বিষয়ের ওপর
মনকে তা দিতে বসিয়ে
একজন
একটা চাবির গোছা
দুহাতে ঢালা-উপুড় করতে করতে হেঁটে
রাস্তা পার হচ্ছিল

হঠাৎ ব্যাচ্ ক'রে শব্দ।
আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ফুটপাথে ওঠা।

কী কারণে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে,
কেনই বা গলা শুকিয়ে কাঠ,
এ সব তলিয়ে ভাল ক'রে বুঝে নেবার জন্যে
রেলিঙে ঠেস্ দিয়ে একটু দাঁড়াতে হল।
এক কথায়,
বাতাসের মত ভুরু উঁচিয়ে
চোখ গুগ্‌লি ক'রে তাকানো চারটে চাকা
আর একটু হলেই
তাকে একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে
ফেলছিল !

হোকরার আক্কেল দেখে এক বুড়ো
ছানি-কাটা চোখের চশমাটা তার মুখের গোড়ায়
দূরবীনের মত ক'রে ধ'রে,
ডান হাতের লাঠিটা, মাটি ছেড়ে ঈষৎ তুলে,
মুখ বুঁজে নাকের ফুটো বড় ফুটো দিয়ে
আর হাতের লাঠিটা দিয়ে খুব জোরে
হুঁ : আর ঠকাস্
এই দুটো শব্দ বার ক'রে
যেদিক দিয়ে উজিয়ে এসেছিল সেই দিকেই ফের
চলে গেল।

বিরক্ত হয়ে চাবির গোছাটা পকেটে রাখতে গিয়ে
নজরের পড়ল
গোটা রাস্তা তার দিকে ফিরে
তাকে আঙুল দিয়ে সনাক্ত করছে।
নিজেকে একটু একা পাবার জন্যে
তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে সে গা ঢাকা দিল।

একটু হেঁটে যাবার পর একটা চায়ের দোকান।
গরম কাপের ছ্যাঁকায়
মনটা ঠাণ্ডা হল।
সামনের ফুটপাথে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে
উবু হয়ে ব'সে লোহার কড়াইয়ের একটা উনুন
হাওয়ার মুখে খই ফুটিয়ে
কাঠ কয়লার আগুনে ভুট্টাগুলোকে পোড়াচ্ছে।
মাটিতে চাপ-চাপ রক্তের মত ফুল ;
ভুট্টার রং মানুষের গায়ের মত।
খালি কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে
লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ল।

তিন নয়া পয়সার মিটে পানে
মুখটা মিষ্টি ক'রে
মোড়ের ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে
হাওয়ায় বুক ভ'রে নিশ্বাস নিল।

তারপর লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে পা ধরে
যাওয়ায়
যেখানে এসে সে দাঁড়াল, সেখানে সামনেই একটা
শো-কেস্।
ভেতরে খুব বাহারে সব জিনিষ,
আহহা, রেফ্রিজারেটার! বেশ রেডিওটা! ওহো,
তাহলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস এখন বেশ
সস্তায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে!
একটা ভাল শাড়ি আর মেয়ের একটা লাল ফ্রক
কেনা দরকার অনেক দিন থেকে বলছিল বটে।
ঘড়ি [illegible]
সবুর ক[illegible], আরেকটু সস্তা হোক।
আচ্ছা, একটা ইলেকট্রিক ক্ষুরের দাম কত?
এহে, দাম লেখা কাগজটা পেছন ফিরে রয়েছে।

তারপর সে গালে হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল
এখুনি কামাবার দরকার আছে কিনা।
কাঁচের গায়ে ছায়া পড়েছে,
আরও একটু কাছে স'রে গেল।
জামা নয়, শাড়ি নয়, রেডিও নয়, ঘড়ি নয়—
কী আশ্চর্য!
কাঁচের গায়ে অবিকল সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে
তার সামনে আস্ত একটা মানুষ
বুক টান ক'রে দাঁড়িয়ে।

দেখে সে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল
পৃথিবীর
জীবনের
সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দেবার মত ক্ষমতা রাখে
যে দুটো হাত—
কী আশ্চর্য, সে হাত দুটো
সমস্তক্ষণ তো তার পাশাপাশিই ছিল!

তারপরই একটা ভর্তি বাসের হাতল ধরে
ছুটতে ছুটতে
সেই লোকটির মালকোঁচা-মারা আস্তিন-গোটানো
বাজখাঁই গলা শোনা গেল

হাতটা সরিয়ে নিন না, মশাই!
ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া করে
স্যার, একটু পা রাখার জায়গা॥

(৬৮৫পৃষ্ঠার পর)

নিকেতনে বলে কথাটা। বলে চোখ বুজল যেন মার সুখ-শান্তির গন্ধ সে নিজের মধ্যে নিতে নিচ্ছে। মার গালের ডৌল, মারই মতন গলার স্বর পেয়ে যে পেয়ে থাকে, তবে ভগবান কেন তাকে মার এই সুখ-শান্তির গন্ধ দেবে না!

এই সব ভাবতে কি কেউ বোকার মত কাঁদে! ছি ছি। কিন্তু কেয়া কেঁদে ফেলেছিল। ছোট কাকার বাড়িতে দেখা কাকাবাবুকে কেয়া ভাবছিল, আর বলছিল মনে মনে—তুমি আমার বাবার মতন যদি না হও, তবে আমার গায়ে মার মতন গন্ধ থাকবে না। আমিমরে যাব।

এ-সব কথা দুপুরেও বুঝি ভাল করে ভাবা যায় না। কাকাবাবুর কথাও বেশীক্ষণ ভাবল না কেয়া। মনে হল, সে বাবা এবং মার অজান্তে এ-কথা ভাবতে পারে না। ভাবা উচিত হবে না।

চোখ মুছে কেয়া শুয়ে থাকল। দুপুরটা যে বেশ ঘনিয়ে এসেছে ঘরে অন্ধকার থেকে কেয়া বুঝতে পারল। আর সেই কোকিলটা ডাকছে। বড় সুন্দর ডাকে। মা কি একটা গান গায় কোকিলের চমৎকার গান—'কেন ডাকে কোয়েলা বারে বারে,—হা মোর কান্ত কোথা তুমি হায়।'...এই গান মার সেই একটু ভাঙা ভাঙা বাঁশির মত গলায় কী সুন্দর শুনতে লাগে! না বলে, আমরা কি তোদের মতন গলা দেখে গান গাই, আমাদের যাদু প্রাণে যা আসে তাই গলায় আসে।

প্রাণে যা আসে তেমন গান কই কেয়া ত গাইতে পারে না!...পারবে, একদিন পারবে। মার মতন হও, তখন। এখন তুমি গলায় ও-সুর পাবে না।

মার গা জড়িয়ে কেয়া চোখ বুজে বুজেই অনুভব করল তার ঘুম আসছে। দুপুরের এই ঘুম তার ভাল লাগে না। কিন্তু কি করবে আর এখন! ভাই দুটো স্কুলে, বাবা অফিসে, মা ঘুমিয়ে, কেয়ার বই পড়তেও ইচ্ছে কচ্ছে না,—না ঘুমিয়ে কেয়া এখন কি করবে?...

কেয়া ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘর রোদ একটু চাপা পড়ল। কেরানীপাড়ার মাথার ওপর এক খণ্ড মেঘ এসেছে। দুপুরে এমন কত মেঘ আসে যায়। এই কটকটে রোদ ঢাকা পড়ল, আবার কয়েক পলকের মধ্যে আগুন করতে লাগল। একটু বোধ হয় হাওয়াও দিয়েছিল।

সরমা ঘুমোয় নি; চুপ করে শুয়েছিল। ও ঘরে মা বোধ হয় সারাটা সকাল বমি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তি মার ঘরে। বাবা বাড়ি নেই; কি একটা কাজে অফিসে গেছে—বিকেলের আগেই ফিরবে। রাতে ডিউটিতে যাবে।

সরমা ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে ছিল মেঝেতে। উত্তুরে হাওয়ার দিকে জানলাটা ভেজিয়ে রেখেছিল। সাইকেলের ঘণ্টির শব্দের জন্যে অপেক্ষা করছিল, যেন সময় গুনছিল অধীর হয়ে।

সরমার একবার মনে হল সাইকেলটা আসছে। কান পেতে থাকল। না এল না।

মেঝের ওপর লুটিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে উঠে বসল সরমা। ক'টা বেজেছে এখন? দুটো বেজে গেছে? এই সময়েই তার আসার কথা।

যদি না আসে? সরমার হঠাৎ ভয় হল, যদি না আসে কিরণ? কথাটা ভাবতেই একটা আতঙ্ক যেন বুকের তলায় কেমন সব কিছু অসাড় করে দিল। যদি না আসে—!

নিজের ভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সরমার মনে হল, হয়ত শেষ পর্যন্ত কিরণও আসবে না। আসার কথা দিয়ে —আসছি আসব করে আর একটা মানুষও ত কটা বছর কাটিয়ে দিল। এসেছে? না আসে নি।

ও আর আসবে না; কোনোদিনই নয়। পাঁচ বছরের ওপর যে লোক আসে না; শুধু ন মাসে ছ মাসে একটা করে পোস্টকার্ড লিখে শ্বশুরকে জানায়—'এইবার শীঘ্রই আমি যাইব'—সে লোক আসে না। তার আসার গরজ নেই, ইচ্ছেও নেই। গত ছ' মাসের মধ্যে আর একখানাও চিঠি লেখে নি। বাবা কেবল দিনের পর দিন বছরের পর বছর সব জেনে শুনেও মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে, এবার জামাই আসবে, এইবার আসছে বলে লিখেছে।

আর এসে লাভ নেই, কাজও নেই। তের বছর বয়স থেকে আজ আঠারো পেরিয়ে গেল সরমা। এই পাঁচ বছর সেই পলাতক স্বামীর আসার পথ চেয়ে চেয়ে কাটিয়েছে সরমা। বিশ্বাস করছে তার স্বামী আসবে, এই বিচ্ছিরী সংসার থেকে তাকে নিয়ে যাবে, বাবার গালাগাল মার অত্যাচার থেকে তার বউকে বাঁচাবে! এই বিশ্বাসে কতদিন নিজেকে সামলে রেখেছে সরমা। কত সয়েছে! কত সয়েছে! কিন্তু সে মানুষ কি এল? না, এল না।

আজ সরমা মোটেই তার আসার পথ চেয়ে নেই। সরমা আর কারও মুখের দিকে তাকিয়ে নেই। বাবা, মা-বোন, ভাই—কারও কথা সে ভাবছে না। শুধু কিরণের কথা ভাবছে। কিরণ যদি আসে সরমা বেঁচে যাবে!

কিরণ আসবে। আজ বছর খানেক ধরে যে লোক এত লুকিয়ে চুরিয়ে কষ্ট করে পলকের জন্যে এসেছে সাইকেলে চেপে, টুকরো টুকরো চিঠি দিয়ে গেছে, যে লোক বলেছে—'আমি তোমায় নিয়ে যাব, সরমা; আমি তোমায় এই বাড়ির বাইরে নিয়ে যাব—সে নিশ্চয় আসবে।

সরমাকে এ-বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে বলেই না কিরণ

অভ্যস্ত করেছে। এখানের ইনস্টিটিউটের সিনেমার মেশিন চালাতে চালাতে সে ঘুরে কোথাও চাকরির খোঁজ করেছে, সরমাকে সব কথা লিখে জানিয়েছে, লোকের চোখে পড়ার ভয় তুচ্ছ করে এত দিন ধরে নিত্য লুকিয়ে এসে চিঠি দিয়ে গেছে, একটি দুটি পলক দেখে গেছে সরমাকে। এত করেছে শুধু সরমার জন্যে। কিরণ চাকরিও পেয়েছে। আজ তার সরমাকে নিয়ে রাত্রে পালিয়ে যাবার কথা। শুধু কখন কি ভাবে সরমা যাবে—কিরণ তার ব্যবস্থা করে দুপুরে একটা চিঠি দিয়ে যাবে।

সাইকেলের ঘন্টি বাজছে না বলে সরমা একটু আগে যতখানি ভয় পাচ্ছিল উদ্বেগ অনুভব করছিল—অতটা আর করল না। কিরণকে সে বিশ্বাস করল।

উঠল সরমা। জানলা একটু ফাঁক করল। তেঁতুলতলার ছায়া এখন ওঁড়ির কাছ থেকে সরে অন্যদিকে হেলতে সুরু করেছে। কাক ডাকছিল কোথায়। পাড়াটা নিঝুম। অনেকটা দূরে বুঝি বাসন-ওলাটা এসেছে। বাসন বাজিয়ে পাড়াটাকে সে তার আগমন জানিয়ে দেয়। দূর থেকে সেই অদ্ভুত ধাতব শব্দটা ভেসে আসছিল।

জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সরমার কান্না পেল। কাল সে থাকবে না জানে এ-পাড়ার লোকে জেনে যাবে রামবাবুর মেয়ে সরমা পালিয়েছে। লোকে বলবে কানাকানি করবে, বিয়ে করা মেয়েটা পালাল!

বলবে। সবাই বলবে। সবাই তার ভাগ্যের কথা না জানে এমন নয়। এ-পাড়ার সবাই জানে—তের বছর বয়সে সরমার বিয়ে হয়েছিল, উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার স্বামী ওর কাছে আসে নি। একবার একটি দিনের জন্যেও নয়। ওরা অনেকে আবার সন্দেহও করে, সরমার বিয়েটা রামবাবুর একটা চাল কি না। হয়ত লোকটা বিয়েই দেয় নি। পাছে কেউ কিছু বলে তাই মেয়ের কপালে সিঁদুর দিয়ে রেখে দিয়েছে। রামবাবুর অসাধ্য কাজ নেই।

না, সরমা মনে মনে মাথা নাড়ল, বাবা যত খারাপই হোক, এই বিয়ে দেবার ব্যাপারটা নিয়ে জোচ্চুরি করে নি। সরমার বিয়ে হয়েছিল। ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মতন সরমার আজও মনে আছে, একদিন সে লাল একখানা কাপড় পরে—আর গয়না পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল। একটা ছেলেকেও তার মনে পড়ে। তার মুখ সরমার মনে নেই, শুধু মনে আছে—কালো গায়ের রঙ, রোগা রোগা হাত একটা ছেলে বিয়ের সময় তার সামনে বসেছিল।

সাইকেলের ঘন্টি শুনতে পেয়ে চমকে উঠল সরমা। বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল থর থর করে, পা কাঁপছিল, হঠাৎ যেন জ্বর এসে গেল সরমার।

সাইকেলটা রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তেঁতুলতলা দিয়ে সোঁ করে নেমে সরমার জানলার কাছে চলে এল। নালার ওপাশে সাইকেলটা ফেলে রেখে কিরণ যেন লাফ দিয়ে জানলার কাছে চলে এল। পকেট থেকে এক টুকরো চিঠি বের করে সরমার হাতে গুঁজে দিয়ে কিস কিস গলায় বলল, 'চিঠিতে লেখা আছে সব। আজ রাত্তিরে। কিছু সঙ্গে নিও না।'

কিরণ এক মুহূর্তও দেরী করল না। চলে গেল। সরমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মুঠোর মধ্যে চিঠিটা জলন্ত করলার মতন জ্বলছিল।

কতক্ষণ অসাড় অপলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সরমা কে জানে। যেন জ্বরের প্রবল ঘোর আস্তে আস্তে কেটে গেল। সরমার বুকের মধ্যে বাথা ভার হয়ে রয়েছে। চিঠিটা মুঠো থেকে বের করল। খুলল। পড়ল সরমা: রাত দশটার পর শিমুলতলার কাছে এস। আমি থাকব। মাপার ঘোমটা দিয়ে আসবে। কিছু সঙ্গে নিয়ো না।

চিঠিটা একবার দুবার তিনবার—বার বার পড়ল সরমা। পড়তে পড়তে আবার তার জ্বর হল। চোখ জ্বালা করতে লাগল, সমস্ত গা গরম হয়ে উঠল, বুক কাঁপতে লাগল। আর সেই ঘোরের মধ্যে সরমা একবার শুধু তার ভুলে যাওয়া ঠিক স্বামী এবং নিষ্ঠুর হৃদয়হীন এ বাকে মনে করতে পেরে যেন বলল: আমি যাব। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। তোমরা আমার ওপর কতটুকু ন্যায় করেছ!

আঃ, সরমা এখন এ-সময় কাঁদছে! ছি—! চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে ছাওয়াচ উড়িয়ে দিল ও। দুপুরটাকে যেন মাঠে খাটে খেয়ে যাওয়া রেলগাড়ি বলে মনে হচ্ছিল সরমার।

রায় গিন্নীর বাড়িতে আজ আর তাসের আসর বসে নি। এই গরমে কেউ আর আসতে চায় না। সবাই বাড়িতে পা এলিয়ে দিয়ে একটু ঘুমোয়।

দত্ত গিন্নী হাস কাঁদি করতে করতে এসেছিল তবু। পান জরদা চালাচ্ছিল, আর রায়গিন্নীর সঙ্গে অনেক রকম গল্প চালাচ্ছিল দত্ত গিন্নী।

'আজ তোর ননদ আসার কথা ছিল নারে সুখদা।' রায় গিন্নী বুক থেকে সবটা কাপড় নামিয়ে আই চাই করতে লাগল। হাতে জরদা নিল খানিক; মুখে ফেলল।

'আসে নি, দত্ত গিন্নী বলল।

'এলে একবার নিয়ে আসিস—'

'আমি বারণ করে পাঠিয়েছি আসতে।' দত্ত গিন্নী পা ছড়িয়ে বসল। বলল, 'এই চোত মাসের আর ক'টা দিন আছে। আসবে—আবার যাবে। 'অত হুড়াহুড়ির দরকার কি! আমরা ত আর পালিয়ে যাচ্ছি না। পরে এলেই হবে।'

'তোর আবার বেশি বেশি ' রায় গিন্নী বলল, 'আসা যাওয়া বলতে ত সাত আট মাইল। এ মানুষ এ-বেলা ও-বেলা যাওয়া আসা করে আমার ননদের আসা ত তোমার ননদের মতন আসা নয়— এ একেবারে মা দুর্গার আসা, পাঁচ সাতটা দিন থাকবে। আর সেই হারামজাদা-গুলোর কত তোষামুদ, মামি দুধ খাও, মামি রসগোল্লা খাব, লুচি খাব। মাসি যদি ধমকালো, মামার কোঁচা ধরে ঝুলে পড়ল।' রায় গিন্নী বিরক্তির সঙ্গে বলছিল। বিরক্তির ভাবটা দত্ত গিন্নীর মুখে চোখে ফুটে উঠলে একেবারে মেছুনী মেছুনী দেখায়। রায় গিন্নী অন্তত তাই বলে। 'আমার বাড়িতে এসে একটু আবদার করবে না, তুই বলিস কি রে সুধদা।'

'কোঁটা মার অমন আদরে।' দত্তগিন্নী মুখ বিকৃত করল। 'মামার যদি উলবেড়েতে জমিদারী থাকত, বুঝতাম।'

'তোর ননদকে কিন্তু আমার বেশ লাগে রে—' রায়গিন্নী পানের পিচ গালের পাশে নিয়ে এল, তারপর গিলে ফেলল।

'তা লাগবে না। ও এলে তোমার যত বাতের মাদুলি ধাচাধাচড়ার গল্প ।'

রায়গিন্নী মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। দত্তগিন্নী একটা পান নিল বাটা থেকে।

'সুশীলের বউ কাল অবলার বাড়ি গিয়ে প্রভার কাছে খুব কাঁদাকাটি করেছে, তা শুনেছ!' দত্তগিন্নী বলল।

দত্ত গিন্নী আশা করেছিল রায় গিন্নী গোল বেঁটে পাশ বালিশের মতন না গড়িয়ে এবার উঠে বসবে। আশ্চর্য, রায় গিন্নী উঠল না। শুয়ে শুয়েই বলল, 'শুনেছি।··· সুশীলটা থিয়েটারে মেয়ের পার্ট করে করে একেবারে মাগী হয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছ।' দত্ত গিন্নী সায় দিয়ে মাথা নড়ল।

'বেঠিক কথা আমি কবে বলেছি, বল—' রায় গিন্নী বলল, 'আমি তোদের বলেছিলুম না—ও তোমরা সুশীল ছোঁড়াটাকে হতই কচি কচি বল, ভাল বল—তত নয়। ও হচ্ছে মিচকে বদমাস। ঘরে বিধবা ছুঁড়ি পুষে রাখলে অমনি হয়। বলে ঘি আর আগুন, কত মুনিঋষিই তল পেল না—ত আমাদের সুশীল।'

দত্ত গিন্নীর মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, এতক্ষণে তার মেজাজ বেশ গরগরে হয়ে উঠেছে। রায় গিন্নীর পাশে আরও একটু সরে এল দত্ত গিন্নী। বলল, 'এ-পাড়ায় এই কেলেঙ্কারী মাসের পর মাস চলল, সবাই দেখল, কেউ কিছু বলল না।'

'কে বলতে যাবে মা, কার ঘাড়ে পড়েছে!' রায় গিন্নী হাতে চুড়ি থেকে সেফটিপিন খুলে দাঁত খোঁচাতে লাগল। 'ওই যে দুটো মর্দা আছে—অবলা আর নন্দকিশোর—ওই মন্দো দুটো সুশীলের ইয়ার বন্ধু যে। একবার রামবাবু কি বলেছিল, দুটোয় মিলে রামবাবুকে এমন ধোলাই করেছিল যে বলার নয়।'

'সুশীলের বউটা কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ।' দত্ত গিন্নী বলল। 'রত্না—। ওমা ছেলেমানুষ হবে না। আমি মেয়েটাকে স্কাউটে দেখেছি ও-পাড়ায় থাকতে।'

সেই মেয়ের কি হাল হলো,' দত্ত গিন্নী সখেদে, বলল 'বেচারীর একমাস হল বিয়ে হয়েছে, এখন থেকেই মাথা খুঁড়ছে।'

'ওর বাপ যেমন। তখন একবার এসে জিজ্ঞেস করল না, কি করি, বউদি। আগে,—ও পাড়ায় থাকতে কত আসা যাওয়া ছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

'অবলারাই, ত যত নষ্টের গোড়া। ওরাই রত্নার বাপকে ভজং ভাজং দিয়েছে।' দত্ত গিন্নী বলল।

'দিক না, তা বলে তুই বাপ হয়ে মেয়েকে একটা নষ্ট চরিত্রের হাতে দিবি!' রায় গিন্নী যেন ধমকে উঠল দত্ত গিন্নীকেই।—রত্নার বাবা থাকলে যা বলত, যেমন করে বলত—ঠিক তেমন করে দত্ত গিন্নীকে বলল রায় গিন্নী, 'আমাদের হিঁদু ঘরের বিয়ে ত আর ঠাকুর বিসর্জন নয়, যেখানে খুশী জল পেলাম ত ফেলে দিলাম, না দেখলাম ডোবা না এঁদো পুকুর না বা খাল বিল।··· তোর যদি এতই ছেলের গরজ—মেয়ে গলায় পাথরের মতন ঝুলছে—তবে আমাদের কাছে এসে বলতেও ত পারতিস।'

দত্ত গিন্নী সায় দেবার মতন করে মাথা নাড়ল। যেন বোঝাতে চাইল, ঠিক, রত্নার বাবার তোমাদের কাছে আসা উচিত ছিল।

খানিকটা চুপচাপ কাটল। রায় গিন্নী পাখার হাওয়া খেল একটু। তারপর বলল, 'আমি যদি পারতুম—ওই, টাটকা চলিশ মাছের মতন মাগীটাকে কেটে টুকরো করতাম।'

'গৌরীকে ?'—

'নয়ত আবার কাকে।···হারামজাদী অমন মাটির মানুষ স্বামীটাকে খেল। স্বামী খেয়ে স্বামীর বন্ধুটার মাথা খেল, তার পয়সায় পেটে বাঁচল, গায়ে কাপড় ঢাকতে পারল। অথচ কী মানুষ—কত বড় নেমকহারাম, যার দয়ায় বাঁচল—আজ তাকেই শেষ করছে। ছি ছি একেই লোকে মেয়েমানুষ বলে।' রায় গিন্নী ঘেন্নায় বিতৃষ্ণায় রাগে মুখখানা কুঁচকে কুৎসিত করে তুলল।

দত্ত গিন্নী একটু অপেক্ষা করল। রায় গিন্নী যদি আরও কিছু বলে সেই প্রত্যাশায় রায় গিন্নী কিছুই বলছে না দেখে দত্ত গিন্নী বলল, 'অবলার, বউয়ের কাছে গিয়ে রত্না যা বলেছে—তা তাহলে সত্যি?'

'বলেছে ত অনেক, কোনটার কথা জিজ্ঞেস করছিস তুই?'

'গৌরী নাকি রাত্তিরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মরতে—সুশীল ধরে এনেছে?'

'মরতে যাচ্ছিল না আর কাউকে মজাতে যাচ্ছিল, তাই দেখ—'রায় গিন্নী ওপরের ঠোঁটে ঘৃণার রেখা কোটাল।

'সুশীল ধরে না আনলে ও মরত শুনলাম। কি করে মরত, আমি ভেবেই পাচ্ছি না। রেল লাইনে কাটা পড়ত, রাণী বাঁধে ঝাঁপ দিত, না কি বিষ খেত?' দত্ত গিন্নী সমস্যার কূল পাচ্ছিল না।

'সুখদা, তোর পঞ্চাশেও আক্কেল হল না—রায় গিন্নী বলল। 'ও মরতে যাবে কোন দুঃখে। কথায় বলে, যার কেউ তার খামার, সুশীলের টাকা পয়সা সংসারে মাগী একা পাটরাণীর মতন কর্তামি করছিল, এখন কে প্রাণে সয়ে অন্যকে কর্তামি করতে দেয়। রাগারাগি তো ওইখানে।' রায় গিন্নী সহজ করে জলের মতন সব বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'মরতে হলে ঘরে কেরসিন তেল নেই দেশলাই জোটে নি না কি গলায় দড়ি দেবার জন্যে একটা স্থান পায় নি বেন্তাটা।'

'বেন্তা.....' দত্তগিন্নী বোধ হয় ঠিক এই শব্দটা আশা করে নি বলেই সবিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

'বেন্তা নয় ত কি। কোন হিন্দু বিধবা কে দেখেছিস ফুল তোলা সাদা পরে, মিহি কাপড় পরে চুল বেঁধে থিয়েটার করে।'

'থিয়েটার ও করে কোথায়—সে ত সুশীল করে।'

'তুই বাপু আমার কাছে ও-বাড়ির গল্প করিস নে, সুখদা। সুশীলকে মেয়ের পার্ট শেখাত কে বাড়িতে বসে—? ওই ছুঁড়ি, ওই ছুঁড়ি শেখাত।

দত্তগিন্নী আর কথা বলতে পারল না। এই ত কদিন আগে শীতের শেষে, ইনস্টিটিউটে 'কৃষ্ণাজের উইল' থিয়েটার করল বকুরা। সুশীল রোহিনীর পার্ট করেছিল। এত সুন্দর, এত ভাল করেছিল যে তিনটে মেডেল পেয়েছে। চলনে বলনে রোহিনী যেন রোহিনী—সুশীল নয়। তবে কি তবে কি এই গৌরীই সুশীলকে শিখিয়ে দিয়েছিল। হতে পারে নয়ত অমন কি পারে সুশীল? সে কি মেয়ে? গৌরীর কাছে জিনিষটা ডাল ভাত ছিল।

দত্ত গিন্নী যেন চোখ বুজে সেই রোহিনীকে এখনও দেখতে পাচ্ছে এমন ভাব করে বলল, 'তা সত্যি।'

চৈত্রের দুপুর এখন জ্বর-ছাড়া রুগীর মতন চোখ খুলছিল। সেই তাপ নেই। সেই জ্বালা নেই। এখন যেন অবসাদ জড়িয়ে আছে। আকাশে সূর্য ছাট পরে যাওয়ার মতন নিস্তেজ হয়ে আছে, রোদের রঙে আঁচের দপ দপে ভাবটা নেই, ঘরা কাঁসার রঙ ধরেছে। আকাশে এক জোড়া সাদা মেঘ এসে জুটেছে, তার পাশে নীল একটা মেঘের লম্বা চর। হাওয়া দিচ্ছিল ফুর ফুর করে।

পারিজাতের বউ ছবি বলবে না বলবে না করেও পারছিল না। এই মাত্র আরও একবার গিয়েছিল। ফিরে এসে ভাল করে কাপড়টা পর্যন্ত গায়ে দিতে পারে নি। কোনো রকমে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে উঠোন ডিঙিয়ে ঘরে এল। পা কাঁপছে থর থর করে। পেটের কোন তলায় মুচড়ে করে একটা ব্যথা কেউ ধরেছে, আবার মুচড়ে আলগা করে ছেড়ে দিচ্ছে। শরীরটা কেমন করছিল ছবির। সব যেন তালগোল পাকিয়ে মাথাটা ঝাঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

ঘরে এসে কাপড়টাও পরতে পারল না ছবি। হঠাৎ কেঁদে উঠল।

মালা বসে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। মুখ তুলে তাকাল। তাকিয়ে অবাক হল, বউদি ঠোঁট কামড়ে যন্ত্রণা পাওয়ার মতন মুখচোখ করে কাঁদছে।

'কি হল?' মালা কাঁথা কোল থেকে নামিয়ে রেখে শুধলো।

'ব্যথা করছে।' ছবি বলল কাতর মুখভঙ্গি করে।

'পেটে?' মালা চমকে উঠেছিল।

ছবি মাথা নেড়ে হাঁ বলল।

কাঁথা কোল থেকে নামিয়ে মালা উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তে তার সমস্ত শরীরে যেন কেমন একটা ঝিম ঝিমে ভাব ছড়িয়ে গেল। গলা শুকিয়ে গেছে। বুক ধক ধক করছিল। হাতে পায়ে সাড়া পাচ্ছিল না মালা।

'শোও, শোও—শুয়ে পড়।' মালা তাড়াতাড়ি পাতা মাদুরের ওপর একটা বালিশ এনে ফেলে দিল। 'শোও, শুয়ে পড়। .....ব্যাথাটা, কোথায়? কই দেখি—দেখাও।'

ছবি শুয়ে পড়ল। মালা বউদির মাথায় বালিশটা ঠিক করে দিয়ে পেটের কাছে কাপড়টা সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল। ছবি বাধা দিল। মালা একটানে বউদির হাত ঠেলে দিয়ে কাপড় একটু আলগা করে হাত দিল পেটে। 'কোথায় ব্যাথা?'

ছবি বলতে পারছে না কোথায়। বাঁয়ে উঠছে কন কন করে নেমে আসছে, কখনও আবার বাঁয়ে উঠে সারা পেটে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আসছে—চলে যাচ্ছে—আবার আসছে।

'বউদি—' মালা অকূলে পড়ে দিশেহারার মতন ডাকল, 'বউদি—'

'উঁ—'

'ব্যথাই উঠেছে, না—?'

ছবি চুপ। সে কি বলবে? সে কি জানে? মালার ওপর এখন, এই মুহূর্তে, রাগ হচ্ছিল ছবির। এতদিন প্রতিটি মাস তুমি শাশুড়ির মতন—সব জানতার খবরদারি করে এসেছ। আর এখন, এই সময় তুমি জানতে চাইছ এটা আসল জিনিসের ব্যথা কি না।

বউদির কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মালা আরও দিশে-হারা বোধ করল। ভয়ে তার হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

মা, মা কালী, মা। মনে মনে মালা বার কয়েক মা কালীর নাম করে একটু সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল। বলল, 'তুমি ব্যথা দেখে বুঝতে পারছ না?'

'না।' দমবন্ধ করে যেন ব্যথা কমাতে চাইছিল ছবি।

'না কি! তোমার তুমি বুঝতে পারছ না।' মালা ভয়ে চিন্তায় বউদির উপর বিরক্ত হল।

'না, না—' ছবি বালিশের ওপর মাথা রগড়ে রগড়ে বলল।

একটু চুপ করে থেকে মালা আবার শুধলো, 'তবু কি মনে হয় তোমার?'

ছবি ব্যথার কাঁদল না নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করে কাঁদল, বোঝা গেল না। কিন্তু কান্নাটা যে ছেলেমানুষের মতন সরব হয়ে উঠল।

মালা কি করবে বুঝতে পারছিল না। দাদা অফিসে বিমলনাইয়ের বাড়ি অন্তত আধ মাইল। এখনও দুপুর কাটেনি। আশে পাশে কার কাছে যাবে মালা একটু ভাবল। পর পর চার পাঁচটা নাম তার মনে পড়ল। অন্নদা পিসির কাছে যাবে? না কি পাশের বাড়ির মণি বউদির কাছে। দাদাকে খবর দেবে কি করে? এখন পাড়ায় কে আছে? একটা বাচ্চাও নেই। অহিদার বাড়ি যাবে একবার? অহিদাকে কি পাওয়া যাবে।

'বউদি—,ও বউদি!'

'উঁ—'

'আমি বরং ছোটঠাকুমাকে একবার ডেকে নিয়ে আসি।'

ছবি মালার হাত চেপে ধরল। এ-সময় তাকে একা ফেলে যাবে ভেবে ছবির ব্যথা এবং কান্না দুইই যেন এক সঙ্গে দেখা দিল।

মালা হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না। তার নিজেরই কান্না পাচ্ছিল। হে মা কালী, তুমি বিপদ কাটাও। তোমার পায়ে পড়ি, একটা কিছু করো।

'তুমি একটু শুয়ে থাকো, আমি এক দৌড়ে ছোট-ঠাকুমাকে ডেকে আনি।'

'না।'

'না কি, এসব কি ঘরে সঙ্গে রাখার জিনিস। একটু সাহস করে থাক, আমি যাব আর আসব।...আচ্ছা মণি বউদিকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।' মালা হাত ছাড়িয়ে নিল।

'আমাকে একটু জল দাও।' ছবি জল চাইল।

মালা জল এনে দিল। ছবি উঠে বসে জল খেল। মালা বউদিকে দেখছিল। বউদির প্রত্যেকটি ভঙ্গি সে দেখছিল।

'এখন ব্যথাটা একটু কম, না—?'

'একটু।' ছবি মাথা দিয়ে মাথা নাড়ল।

'তবে চুপ করে শুয়ে থাক একটু।—ভয় কি, মা কালীর নাম কর—আমি ছোট ঠাকুমাকে ডেকে আনি।' বউদির মাথায় হাত দিল মালা। চুলে একটা ঝিট দিয়ে শুইয়ে দিল।

'ঠাকুরঝি—' ছবি মৃদু নিস্তেজ গলায় ডাকল।

'বল।'

'আমি যদি আর—'ছবি কথাটা শেষ করতে পারল না।

'চুপ—' মালা বউদির মুখে হাত চাপা দিল। এবং সেই মুহূর্তে তার বুকে গলায় কী যে অসহ্য বেদনার পাক জড়াতে লাগল। নাক ফুলে উঠল, কান্না যেন চোখ মুখে থর থর করে কাঁপছিল। কড়ানো বিকৃত গলায় মালা বলল, 'ছি—বউদি—ও-সব অলুক্ষণে কথা বল না। ভগবানকে ডাকো।—আমাদের আর কেউ নেই, তোমার ছেলে আমাদের বংশ রাখবে।' মালা কেঁদে ফেলল। কান্নাটা যেন তার সমস্ত শরীর থেকে মুচড়ে মুচড়ে উঠে এল।

ছবি এমন করে কাঁদতে দেখে নি কোনোদিন মালাকে। সারা মুখে যার বসন্তের কুচ্ছিত দাগ, যার ডান চোখ বসন্তে কানা হয়ে গেছে, যার শ্যামল সুগঠন মুখটিকে ভগবান বিনা অপরাধে কেড়ে নিয়েছেন—সেই মুখ এমন করে ভগবানকে ডাকতে পারে—এমন করে কাঁদতে পারে এ যেন ছবির জানা ছিল না।

ছবি তার সমস্ত যন্ত্রণা এখন অল্পক্ষণের জন্যে ভুলে গেল। মালার দিকে চেয়ে তার চোখের পাতা ঝাপসা হয়ে এল। অস্পষ্ট ভাবে বলল, 'আমি শুয়ে আছি, তুমি যাও। তোমার দাদাকে একটা খবর দেবার ব্যবস্থা কর।'

মালা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ছুটল।

দুপুর পড়ল। বিকেলটা যেন দুপুরের (কিংবা সারাদিনের) ছড়ানো শাড়ির আঁচল। যদি শাড়ি সব পরাই হল, তবে আঁচল আর কতটুকু ঝোলে। সেও যেন চৈত্রের দিনের গায়ে একপাশে একটু বাহারী হয়ে ঝুলছে। দেখো, ওই যে—কেরানীপাড়ার বিকেল। সেই নিত্যকার মতন কলে জল পড়ছে, চাকর বাকর ঝি দাসী ব্যস্ত-ত্রস্ত। ছেলেগুলো স্কুল থেকে ফিরে মাঠে ময়দানে বেরিয়ে পড়ছে, চেঁচাচ্ছে ছুটছে, ঢিল ছুঁড়ছে। ঘুগনিওলাগুলো ঠিক এ-সময় ঘোরা-ফেরা করছে। বড়দের কে একজন তাড়া লাগিয়েছে ঘুগনিওলাটাকে, এখন এই বসন্তের সময় ঘুগনি বেচতে এসেছে—যা বেটা, ভাগ। স্কুলের মেয়েগুলো কলের কাছে এসে সাবান দিয়ে মুখ ধুচ্ছে। ওরই মধ্যে মা মাসি দিদিরা কখন মেয়েগুলোর চুল বেঁধে দিয়েছে। দেখতে দেখতে চৈত্রের মরা বিকেলকে আরও, ম্লান করে দিল ধোঁয়ার রাশ, ঘরে ঘরে বিকালের উনুন ধরে গেল। জল বলছে পালাই। তেঁতুল গাছের ডাল বাতাসে এবার নড়ল। বাবুরা ফিরছে অফিস থেকে। কে যেন—কোন রসিক গৃহিনী তার স্বামীকে বলেছিল: বাবা তোমরা যখন সব

কেরোমনে হয় কেউ তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে।—স্বামী জবাবে হেসে বলেছিল, মাঠ থেকে যেমন গোরু ফেরে, না—? গৃহিনী জিব কেটেছিল।

তবু এই বিকেল এল, আর এসে বসতে বসতে উঠল, এটি কলরবে আশা যাওয়ার দোঁয়ার কাল্লা অন্ধকারের জড়াতে জড়াতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। তারপর অন্ধকার আসে। সন্ধ্যের অন্ধকার, কি যে কালির মতন। কলের জল বন্ধ হয়ে যায় কখন, ছেলেগুলো খেলা ছেড়ে ফিরে আসে, আকাশ সাঁতরে পাখীর দল গাছে ফেরে, আর বাবুরা সারাদিনের পর এখন একটু সাথে নামেন হাওয়া খেতে। কারণ চৈত্রের হাওয়া এবার ফিরতে সুরু করেছে।

আজ হাওয়াটা এত স্বচ্ছন্দ মুক্ত হয়ে দেখা দেবে এ ভাবা যায় নি। সারাটা দিন কোথায় ছিল এই হাওয়া? ছিল। ওই চাঁদমারির আড়ালে কিংবা রাণী বাঁধের পাশে কোথাও দুপুরের ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। এতক্ষণে এল।

আকাশে তারা ফুটছে। বসন্তের হাওয়া বইছে তেঁতুলগাছে মাথায় বসে কোকিলটা শেষবার ডেকে ডেকে কোথায় পালিয়ে গেল।

'কে রে?'

'কই—?' মায়া দরজা থেকে সরে এল।

'কথা বলছিলি কার সঙ্গে?'

'বহুরূপী।'

'ওমা, আমার চোখে যেন ধন্দা ধন্দা লাগল—' পিসি বলল। 'কি সেজে বেরিয়েছে রে?

'পুরুষ সেজে।' মায়া চোঁক গিলল।

'পুরুষ সেজে আবার কি—, পুরুষই ত লোকটা।' পিসি ভাইঝির দিকে তাকাল। উঠোনে বাতি নেই বলে অন্ধকারে মুখ দেখতে পেল না মায়া। 'কি সেজে বেরিয়েছে? গয়লা, ধোপা—?'

'না—' মায়া মাথা নাড়ল। আজ ও মাষ্টার সেজে বেরিয়েছে।'

'মাষ্টার—!' পিসির তেমন মনঃপুত হল না। বলল' ও-সব মাষ্টার কাষ্টার সাজা আবার সাজা না, কি!···একদিন ওকে রামচন্দ্র কিংবা অর্জুন সাজতে বলিস।' পিসি রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে যেতে বলল। 'আমাদের মামার বাড়িতে একটা বহুরূপী কত কি সাজত। আজও চোখে লেগে আছে। একবার হরগৌরী সেজেছিল। এমন চমৎকার?'

মায়া হাঁফ ছাড়ল। বাবা, আর একটু হলেই হয়েছিল। ধরা পড়ে যেত। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল মায়ার। পিসি রান্নাঘরের দিকে যেতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মায়া। এবং হাসল একটু। পাঁচিলের গায়ে পেঁপে গাছটার দিকে তাকাল। বহুরূপী মশাই গাছের ওপারে রয়েছে।

ভাগ্যিস চট করে মাষ্টার কথাটা মুখে এসেছিল, নয়ত কি যে হত! সিল্কি ধুতি জামা পরা মানুষটাকে আর কি বলা যায়? বলতে পার যে, পিসি ও পাশের বাড়ির কলাবৌ দা। তবে? মায়া মনে মনে হাসল। কথাটা কিন্তু খুব একটা মিথ্যেও নয়। কলাবৌদা মাষ্টার। হাই-স্কুলের মাষ্টার। একেবারে ছোকরা। নতুন এসেছে।

মায়া উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল একটু। একপাশে আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে জলের কলসি রয়েছে। জল গড়িয়ে খেল। একটু আগের ভয়টা—যেটুকু বা ছিল—জলের সঙ্গে যেন গলা দিয়ে নেমে গেল।

মায়া আবার একবার পেঁপে গাছটার দিকে তাকাল। দু মাস আগেও ওর পেঁপে গাছের আড়াল থেকে যখন তখন মায়া একা উঠোনে থাকলেই টুপ করে একটি চিঠি পড়ত। তাতে পেন্সিলে লেখা: তোমার নাম মায়া। কিন্তু একটুও মায়া দয়া নেই তোমার। তুমি নিষ্ঠুর তুমি।

এই সব লিখত সেই বকাটে বরেণ ছোঁড়াটা। একদিন বাবাকে ঠিক বলে দিত মায়া। বলতে অবশ্য হল না। তার আগেই রেবার সঙ্গে ছোঁড়ার হয়ে গেল।

রেবাকে মনে পড়ল মায়ার। কী বিচ্ছিরী স্বভাব ছিল মেয়েটার। মায়াকে নিয়ে কেমন সব অসভ্যতা করত। তারপর ওই নিয়ে ঝগড়া হল, নুপ দেখাদেখি বন্ধ হল। উনি বলতেন, বড় গলায় বলতেন, আমি বিয়ে করব না—পুরুষ মানুষ ছোব না, আইবুড়ো থাকব, চাকরি করব, না জানি লেখা পড়া, সেলাই ত জানি, স্কুলে সেলাই দিদি হব।··· বেশ ত, একদার সেই বন্ধুকে মায়া এখন টিটকিরি দিয়ে বলল, বেশ ত সেলাই দিদি হলি না কেন? কেন বকাটে ছোঁড়াকে বিয়ে করে বাজারের দিকে গিয়ে রয়েছিস? তোর বর তো সিনেমার ওখানে টিকিট বেচার চাকরি নিয়েছে!

রেবাকে দু কথা শুনিয়ে মন একটু শান্ত হয়েছে, আচমকা মনে হয় রেবা কি তাকে জব্দ করার জন্য বরেণকে বিয়ে করল! না কি রেবা ভেবেছিল—মায়ার কাছ থেকে সে বরেণকে কেড়ে নিচ্ছে। হয়ত রেবা সেই রকম কিছু ভেবেছিল। মায়াকে দেখান—দেখ, তোর জিনিষ নিয়ে নিলাম।

আমার জিনিস। মায়া ঠোঁট উল্টে বক্রের ভঙ্গি করল। বয়ে গেছে আমার অমন লক্কড় লক্কড় জিনিস নিতে। আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে। অন্ন নেব, যখন কপালে আসবে নেব, কিন্তু সভ্য ভব্য মানুষকেই নেব।

বসন্তের হাওয়া যেন মায়ার গায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল। পেঁপে গাছের মাথাটা দুলল। আকাশের চেহারা করুণ লাগছিল। ভাইটা ঘরে পড়তে বসেছে। পিসি বুঝি রান্নাঘরে বাবার জন্যে দুধটুকু জাল দিচ্ছে। আজ বাবা

আসবে। টি টি সির চাকরিটা বড্ড ভোগায় বাবাকে। কাল সকালে গেছে—এখনও ফেরে নি। তবে আজ ফিরবে। হয়ত এতক্ষণে পাড়ায় ঢুকে পড়েছে বাবা।

মায়ার মন বেশ হালকা লাগছিল।

এক খণ্ড হালকা ভাসন্ত মেঘ রেলগাড়ির মতন আকাশের মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। আর মেঘটা যেন যাবার পথে কেরানীপাড়ার মাথার ওপর একপাশে চাঁদটাকে নামিয়ে দিল। চাঁদ উঠল। আধখানা চাঁদ, আকাশ আলো আলো হল, কেরানীপাড়ার মাথায় দিহি জ্যোৎস্না এসে পড়ল। দক্ষিণের বাতাস বুঝি এই আলো দেখে আরও খুশী হয়ে বইতে লাগল।

'ছোট বউ—' শৈল বউকে ডাকল।

কমলা রান্নাঘরে কি একটা কাজ করছিল। স্বামীর ডাক শুনতে পেল, সাড়া দিল না। রান্নাঘরের মুখোমুখি শাশুড়ি আর দেওরের ঘরে তখনও শৈলর মা কাঁদছিল। দেওর পবিত্র বাড়ি নেই; বেরিয়ে গেছে। ননদ রাধারাণী মায়ের কাছে বসে বসে কাঁদছে।

শৈল আবার ডাকল, 'ছোট বউ—'

কমলা বাটি ঝিনুক খুঁজে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শৈল বিছানায় শুয়ে আছে। ক'দিন আগে তার পা ভেঙেছে। আজ ন'বছর মালগাড়ির গার্ডের চাকরি করছে শৈল—চলন্ত ট্রেনে কত ওঠা নামা করেছে—কিন্তু সেদিন গোমো স্টেশনে ড্রাইভারকে গ্রীণ ফ্ল্যাগ দেখিয়ে—গাড়ি ছেড়ে গেলে—নিজের ব্রেক ভ্যানে উঠতে গিয়ে কি করে যে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল শৈল বুঝতে পারল না। কেমন করে পা পিছলে গেল। শৈল প্লাটফর্মে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর একটু হলেই পা দুটো চলে যেত, হয়ত জীবনটাও।

কমলা ঘরে এসে ঘুমন্ত ছেলেটাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে দুধ খাওয়াতে বসল।

'ওরা কি ঠিক করল?' শৈল জানতে চাইল।

'জানি না।' কমলা দুধের বাটিতে ঝিনুক ডুবিয়ে গরম দুধ ঠাণ্ডা করতে করতে বলল।

'জানো না কেন—' শৈল চটে উঠল, 'তুমি কি এ-বাড়িতে থাক না?'

কমলা কোনো জবাব দিল না। এক ঝিনুক দুধ ছেলের মুখে ঢেলে দিল। দুধের মধ্যে ঝিনুক ধরা আঙুলটা ডুবোতে গিয়ে কমলা মনে মনে এই দুধের জলের অংশটুকু হিসেব করে নিল। সোয়ালা কতটা জল দেয়—কমলা জানে না। মাসের টাকা যত বাকি জমে যায় সরলার দুধে তত জল বাড়ে। আর কমলা যত দুধ কমায় সংসারে তত ছেলের দুধে তাকে জল দিতে হয়। তবু, আজ স্বামী তাকে শুধোচ্ছে, তুমি এ-বাড়িতে থাক না?

শৈল পাশ বালিশের ওপর ভর দিয়ে হাত ঠেলে একটু উঠল, স্ত্রীর মুখ দেখার চেষ্টা করল।

কমলা নীরবে ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। 'ও-সব বোবা সাজা তোমার চলবে না।' শৈল বলল।

'বোবা কানা কালা—সব সাজতে পারলেই বাঁচতাম।' কমলা বলল।

শৈল একটুক্ষণ বোধ হয় বউয়ের ক্ষোভ ও রাগের পরিমাণটা বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'আমি তোমায় যা বলেছিলাম, ওদের বলেছ?

কমলা চুপ। হাঁ না কিছু বলল না। ছেলেটাকে দুধ খাওয়াতে লাগল, লণ্ঠনের আলোয় কমলার টকটকে ফরসা মুখ, গোলগাল সুন্দর আদলটি দেখা যাচ্ছিল না। শৈল তবু কয়েক পলক সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বউয়ের কাঠিন্য বোঝার চেষ্টা করল।

'তুমি যদি না পার বলতে—ডাকো ওদের—আমি বলব।' শৈল বলল।

'তুমি ডাকো।' কমলা বলল।

শৈল ভীষণ ভাবে চটে উঠল। বউয়ের এই নীরবতা, অসীম সহ্যশক্তি, মরার মতন মুখবুজে থাকা তার সহ্য হচ্ছিল না। কত সহ্য হয় মানুষের। কতকাল সহ্য হয়!

ভাঙা পা নিয়ে শৈল হাতড়ে হাতড়ে উঠতে লাগল। কমলার চোখ পড়ল স্বামী সমস্ত বিছানা বালিশ ঠেলে ঠুলে লণ্ড ভণ্ড করে রগড়ে হাতড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। তার কোনো সহায় নেই। সে উঠতে পারছে না।

কমলা তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে উঠিয়ে নিয়ে বিছানার কাছে চলে এল।

'আমি আজ হারামজাদীকে তাড়াব···জুতো মেরে তাড়াব।' শৈল হাতে ভর দিয়ে পাশ বালিশ ঠেলে অনেকটা উঠে পড়েছে।

কমলা বিছানার পায়ের দিকে ছেলেটাকে শুইয়ে দিল ধপ্ করে। স্বামীকে ধরল জড়িয়ে। 'কী পাগলামি করছ, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!'

'ছাড়ো—ছেড়ে দাও আমাকে—' শৈল বউকে ধাক্কা মেরে সরাবার চেষ্টা করল, গায়ে যেটুকু জোর অবশিষ্ট আছে তাই দিয়ে যেন শেষ যুদ্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

কমলা জাপটে ধরেছে স্বামীকে। স্বামীর হাতের ধাক্কায় তার বুকের এক পাশে ভীষণ লেগেছে, হাতের শাঁখাটাও বুঝি ভেঙে গেল। 'কি করছ, এই রাতে চেঁচামেচি করে তুমি আরও কেলেঙ্কারী বাড়াবে!'

'বাড়াব। আমার বাড়িতে আমি চেঁচাব, কোন শালার কি বলার আছে—' শৈল এবার সোজাসুজি বউকে এক ধাক্কা মারল প্রাণপণে। কমলা পিছিয়ে এল।

বিছানার ওপর শরীরটাকে রগড়ে দিয়ে নামতে নামতে শৈল গলা কাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আমার এ-বাড়িতে আমি তোকে ঢুকতে দেব না। তুই যা—এখুনি যা—এ-বাড়ি থেকে যা। জুতো মেরে বের করে দেব। হারামজাদী কুলটা মেয়েছেলে কোথাকার।'

শৈলর চিৎকারে ও-ঘর থেকে রাধারাণী এবং রাধারাণীর মা ছুটে এল না। শৈল একপাশে ভর দিয়ে খাট ধরে দাঁড়াল। টলছিল শৈল, হাঁপাচ্ছিল থর থর করে;· কমলা এসে স্বামীকে ধরল। 'তুমি কি করছ! পড়ে যাবে। লাগবে যে, তুমি বসো· '

'আমি বসবো না। আমায় তুমি ও-ঘরে নিয়ে চল··· আমি ওকে তাড়িয়ে তবে বসব। শৈল বউয়ের কাঁধ জাপটে ধরল, যেন সমস্ত পৃথিবীতে এই একটি মাত্র সহায় সম্বল তার আছে।'

'কমলা স্বামীকে বসাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, তুমি বসো. একটু শান্ত হও। তোমার পায়ে পড়ি গো, অমন মাথা খারাপ করো না।'

শৈল বসবে না। শৈল ছেলেমানুষের মতন কাঁদছিল। শৈল বউকে জড়িয়ে ধরে যেন টলে টলে যাচ্ছিল। 'বসো ; পায়ে আবার লেগে যাবে—, তুমি বসো—' কমলা স্বামীকে বসাবার চেষ্টা করল।

'লাগুক। আর কত লাগবে, ছোট বউ!···' শৈল কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো মোটা গলায় বলছিল, 'বারো বছর এই সংসার টানছি। বড়টাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওরা মেরেছে। ওরা তোমার হাঁড়ির হাল করে ছাড়ল। সোনা দানা বেচে সমস্ত সংসার পেট ভরাল। বোনটা পোয়াতি হয়ে বিয়ে করল। আর আমি কত দেখব।' শৈল বিছানায় বসে পড়ল, হাঁপাচ্ছিল, কপাল চাপড়াচ্ছিল, 'সমস্ত পাড়ায় আমার মুখ দেখাবার যো নেই।···আমি বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, ব্যাস ফুরিয়ে গেছে। ওকে আর এ-বাড়িতে পা দিতে দেব না।'

পাশের ঘরে বসে রাধারাণী এবং রাধারাণীর মা সব শুনছিল। রাধারাণী আজ বড় বিপদে পড়ে ভাইয়ের বাড়ি এসেছে। তার বর আজ পাঁচদিন ধরে উধাও। কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানে রাধারাণীকে পথে বসিয়ে পালিয়ে গেছে কি না।

কমলা স্বামীকে কোনো রকমে বিছানায় শুইয়ে দিল। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল 'তুমি অমন করে কেঁদো না গো, আমার কেমন যেন করে।···আর ত ক'টা দিন, তারপর আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

শৈল ভাবছিল তার ট্রান্সফারটা কেন আজ এই মাত্র হল না। এ-বাড়ি এই সংসার তার আর সহ্য হচ্ছে না। মা, ভাই, বোন—কারুর দিকে আর তাকাবে না শৈল। বারো বছর এদের দিকে তাকিয়েছে—, অথচ এরা তাকে কি দিল? কিছু না। এরা শুধু অভাব অনটন নীচতা দিল, দিল কলংক আর লজ্জা। এরা শত্রু। শৈলর সারা জীবনের শত্রু।

কমলা স্বামীর চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল।

ঘড়ির কাঁটা যেন সময়ের টিকিট বেচছে। এই আটটা, একটু পরেই সাড়ে আট, তারপর নয়। সাড়ে নয়। কেরাণীপাড়া ক্রমশই শান্ত হয়ে আসছে। ছেলেগুলো বুঝি রাতের খাওয়া খেয়ে শুয়ে পড়েছে; অনেকগুলো লণ্ঠন নিভে গেল। জ্যোৎস্না আরও ফুটল। হাওয়া আরও টলমলে হল। একটু ফুলের গন্ধ এল—না কি জ্যোৎস্না আর বাতাস দেখেই ফুলের গন্ধটা মনে পড়ল। একটা পাগল কদর্য ভাবে ডাকল বার-কয় কেরাণীপাড়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তাদের দান চালতে চালতে প্রকাশবাবু বললেন, 'তারক ওই দেখ বসন্তের কোকিল ডাকছে।' তারকবাবু হাসলেন।

তার বাড়িতে গ্রামোফোন বাজছে: চৈতি রাতের উদাস হাওয়ায়···। কাজল গান শুনতে শুনতে স্বামীর জন্যে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। কে জানে আজ তার এই অপেক্ষা কেন। বছরের মধ্যে তিরিশ দিন লোকটা নেশা করে মাতলামো করে। কাজল অপেক্ষা করা ভুলে গেছে। তবু আজ অপেক্ষা করছিল।

দশটা বুঝি। দূরে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসের কাছে থানার ঘড়ি বাজল। কেরাণীপাড়া আরও শান্ত, নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। তেঁতুলতলার ঝুপসি ছায়ায় বসে একটা ভিখিরী বমি করছে। দুটো কুকুর পরস্পরকে শুঁকতে শুঁকতে নালা পেরিয়ে চলে গেল।

সরমা তৈরী। শান্তিটা ঘুমোলেই সে বাইরে বেরুবে। মা-র জন্যে দুফোঁটা চোখের জল কেবল এই মাত্র। আবার মার কোলে যেটা আসবে সেটা যেন সরমার মতন না হয়। শান্তির একটা ভাল বর যেন জোটে ভগবান। সরমা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আজ যদি অন্ধকার থাকত। মাথায় ঘোমটা দিয়ে নিল সরমা। খুব বড় করে ঘোমটা দিল। কিরণ এতক্ষণে শিমুল তলায় এসে দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যব্রতের ঘরের মধ্যে সুন্দরব্রত পাথরের মতন দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয়ব্রত দরজার কাছে ঢুকছে, আবার বাইরে ছাদে চলে যাচ্ছে। নীতিকা শ্বশুরের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা দুটি পায়ে হাত বোলাচ্ছে। আজও সত্যব্রতর ঘরে সেই চীনে টেবললাম্প জ্বলছে. টেবিলটা তেমনি গুছোনো দেরাজদানের ওপর কলমটি পড়ে আছে। অল্প কটি বই সাজানো।

অমির শেষবারের মতন একটা ইনজেকশন দিল। রাণীদি মাথার কাছে বসে। ষাট বছর বয়স পেরিয়ে গেছে রাণীদির, আজ পঁয়ষট্টি; নেড়া মাথা, গৌর রঙ,

। সত্যব্রতর কপালটা একটু মুছে দিলেন।

সত্যব্রতর স্ত্রী নলিনীর ছবিটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ব্রতকে বিকেলে দেখানো হয়েছিল। সেই ছবি এখনও পাশে ঘরে রাখা আছে। নলিনীর হাতে কার্পেটের । সুতো দিয়ে লেখা সেই কাজটা সত্যব্রতর পায়ের ছ রাখা আছে। "প্রভু, এই নিঃসঙ্গ সংসারে—তোমার আমার কামনা। তুমি আমায় সঙ্গ দাও, সান্ত্বনা দাও।'

বাইরে ছাদে মিত্তির মশাই, নন্দী, অবলা, নন্দ—আরও কজন দাঁড়িয়ে আছে। সবাই চুপ। সবাই আজকের । জোৎস্নার তলায় কেরাণীপাড়ার এক সুন্দরতম ঘের স্মৃতি লেহন করছে।

প্রিয়ব্রত ছাদের আলসের দিকে এগিয়ে গেল একবার র হঠাৎ ফিরল। সত্যব্রতর ঘরের দিকে চলে গেল। ন্তু ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে।

ঘরে এই মাত্র অমিয় সত্যব্রতর হাতটা আস্তে করে রে রাখল। এত আস্তে যে মনে হল, অমিয় একটি ছেলের অলস ঘুমন্ত হাত ঠিক করে রেখে দিল।

তাকিয়ে থাকল অমিয়, চৌকসকোণ সরিয়ে নিল—

—পায়ের কাছে গেল, তারপর তার নাড়ি দেখা হাতের ত সত্যব্রত দুটি পায়ের পাতা ছুঁয়ে থাকল, গভীর পে হাত উঠিয়ে নিজের নত মস্তক কপালে ঠেকাল। মিয় কিছু বলল না। তার ঠোঁট কাঁপছিল, গলা উঠেছিল, চোখ ঝাপসা।

ানীদি প্রথমেই বুঝলেন। হঠাৎ তিনি হাত বাড়িয়ে পন্নাজল চাইতে গিয়েছিলেন, চাইলেন না। সত্যব্রত । নলিনী মরার আগে কোন সংস্কারে একটু গঙ্গা খেতে চেয়েছিল রানীদি জানেন। সত্যব্রতও চান রানীদি—নিজের ডান হাত সত্যব্রতর কপালে আস্তে আস্তে বললেন "দাদা, নলিনীর কাছে

সতিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শ্বশুরের পায়ের তলায় মাথা দিয়ে পড়ল। সুন্দরব্রত বাবার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল। প্রিয়ব্রত দরজার কাছ থেকে বিহ্বলার কাছে ছুটে এল, বিহ্বল হয়ে বলল—'চলে গেলেন; এঁা, চলে গেলেন! অমিয়—বাবা চলে গেলেন?'

অমিয় বাইরে চলে গেল।

বাইরের ছাতের সব ক'জন অমিয়কে দেখে এক সঙ্গে নির্বাক প্রশ্নটা চোখে তুলে যেন শুধাল, 'উনি চলে গেলেন?'

দেবব্রত আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঘরে রানীদি শেষবারের মতন নিজের কাপড়ের আঁচলে শুভ্র পবিত্র সুন্দর এই মানুষটির মুখ বুলিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বাইরে মিত্তির মশাই অবলাকে বললেন—'অবলা, তুমি পাড়ায় একটু খবর দাও।'

পারিজাতের বউ ছবির এই মাত্র ছেলে হল। কচি গলার নতুন কান্না শুনল কেরাণী পাড়ার বাতাস।

সরমা শিমুলতলা দিয়ে হন হন করে চলে যাচ্ছে। পাশে কিরণ।

কেরাণী পাড়ার গায়ে চন্দ্রালোক, সর্বাঙ্গে চৈত্রে বাতাস। কেরাণী পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ, অগাধ। মাঝে মাঝে চৌকিদারের হাঁক ভেসে আসছে। তেঁতুল গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে রাধারাণী। পাশে তার মা। তারা চলে যাচ্ছে। খড়ম পায়ে সেন মশাইয়ের সেই সন্ন্যাসী ভাই গান গাইতে গাইতে আসছে: 'রাতের ঘরে চুরি করে মন বলে তুই পেলি না কি—'

স্তব্ধতা ও স্থিতিতে কেরাণী পাড়া আচ্ছন্ন হল। এই বিচিত্র একটি ভূখণ্ডকে আকাশ থেকে দেখছিল চাঁদ। আজ যা দেখেছে, কাল আবার কি তাকে এই সব দেখতে হবে।

হয়ত কেরাণীপাড়ার বসন্ত চলে গেলে এমনি করেই আর এক গ্রীষ্ম আসবে, আর এক বর্ষা; শীত এবং বসন্ত। যুগো তুলসীর গন্ধ দিচ্ছিল বাতাসে।

সমাপ্ত

VERSI

কার্তিক
১৮৮২
পঞ্চম বর্ষ
৫ম সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

জাতিসঙ্ঘ ও তার ভবিষ্যৎ

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পনের বছরের মধ্যে লীগ অব নেশনস-এর কর্ম শক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ঠিক পনের বছর। জাতিসঙ্ঘও কি লীগ অব নেশনস-এর পথাঙ্ক অনুসরণ করতে চলেছে? — এই প্রশ্নই বর্তমান পৃথিবীকে আলোড়িত করছে সব চেয়ে বেশী।

নানা কারণে জাতিসঙ্ঘের বর্তমান অধিবেশন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মে মাসে পারিসে ইউরোপ বিভক্ত হয়ে যাবার পর আকস্মিক ডামোক্লিসিকিতা ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্র সঙ্ঘের বর্তমান অধিবেশনে তিনিই সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র-প্রধানদেরও কর্তব্য হল নিজ নিজ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করা। এর পরেই তিনি সেজো বওনা দিলেন জাতিসঙ্ঘের পথে। নিকিতা ক্রুশ্চেভের উপস্থিতিকে অবহেলা করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। এক এক করে অনেক রাষ্ট্র প্রধানকেই ওখানে সমবেত হতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, ম্যাকমিলান, নেহরু, নকুমা, টিটো, নাসের সোয়েকার্ণ, কাস্ত্রো পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনেতাই জাতিসংঘের এই পঞ্চদশ অধিবেশনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

নানা কারণে এই অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ। এ অধিবেশনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। কঙ্গোকে ভারতবর্ষের মতই বিভক্ত করার যে চক্রান্ত চলছে জাতিসঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী হ্যামারশীল্ডের নেতৃত্বে, তা উল্লেখ করে ক্রুশ্চেভ জেনারেল সেক্রেটারীর অপসারণ তথা জেনারেল সেক্রেটারীর পদের বিলোপ দাবী করেছেন। ক্রুশ্চেভ দেখিয়েছেন নিছক ভোটের জোরে কেমন করে জাতিসঙ্ঘকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। নিছক কয়েকটি রাষ্ট্রের ভোট নয় পঞ্চ প্রধানের পারস্পরিক সম্প্রীতিই জাতিসঙ্ঘের কর্ম-পরিচালনার মূলনীতির ভিত্তি হওয়া উচিত। আর পঞ্চ-প্রধানই বা কেন ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়ারাষ্ট্রগুলি প্রধান রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হবে না কেন? ব্রিটেন যদি প্রধান রাষ্ট্রগুলির অন্যতম হতে পারে ভারত নয় কেন? তার চেয়ে বড় কথা চীনের মত রাষ্ট্র বাদ পড়ল কেন?

পনের বছর আগে যাই অবস্থা থাকুক না কেন, বর্তমানে বিশ্বে তিন ধরনের শক্তি গোষ্ঠী আছে। একদিকে রয়েছে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-গোষ্ঠী, অন্য দিকে পশ্চিমী রাষ্ট্র-গোষ্ঠী আর রয়েছে মিশর, ভারত, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়ার মত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গোষ্ঠী। জাতিসঙ্ঘের নেতৃত্বে তাদের প্রতিফলন দেখা যাবে না কেন! কেন তিন পক্ষের তিন জনকে নিয়ে গঠিত সম্পাদক-মণ্ডলী কর্ম পরিচালনা করবে না?

বিশ্ব-শান্তি ও ঔপনিবেশিক জাতির মুক্তি দাবী করে ক্রুশ্চেভ যে বক্তৃতা ঐ অধিবেশনে দিয়েছেন, ইতিহাসে তা এক নূতন অধ্যায় যোজনা করল। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান জাতির নেতা দুর্বল দেশের দিকে সাম্রাজ্য-বিস্তারের বাধা বিস্তার না করে প্রতিটি জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন জানালেন বিশ্ব নাট্য মঞ্চ থেকে—এ ঘটনা অভিনব। পত্র-পত্রিকায় নিকিতা ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার সারমর্মটুকু মাত্র বেরিয়েছে। বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশটির সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করবার লোভে সংবরণ করা দুঃসাধ্য। এই কারণে আমরা ঐ বক্তৃতার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি তুলে দিলাম।

কুরুক্ষেত্রের আহ্বান

রাষ্ট্রসংঘ সংগঠন পরিষদের এই অধিবেশনে প্রায় ১০০টি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন এবং শীঘ্রই রাষ্ট্রসংঘের নূতন সভ্য-রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরাও যোগদান করবেন। "আমরা এই ঘটনাকে অভিনন্দন জানাই যে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রেরই এই রাষ্ট্রসংঘে প্রতিনিধি থাকা বাঞ্ছনীয়।

"আমাদের এই যুগ মানব সমাজের অস্তিত্বের বিভিন্ন রূপের দ্রুত রূপান্তরের যুগ, প্রকৃতির শক্তির উপর মানুষের অভূতপূর্ব প্রভুত্বের যুগ, অধিকতর প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার অশ্রুতপূর্ব উত্তরণের যুগ। কিন্তু এখনও আমরা অতীতের শতাব্দীগুলিতে প্রত্যাবর্তনের দৃষ্টান্ত—এমন কি বর্বরতার স্তরে প্রত্যাবর্তনের বিড়ম্বনাও দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির মূল কথা হল দুটি প্রবণতা বা ধারার সংঘাত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি পন্থার সংগ্রাম।

একটি পন্থা: অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতার অবসান, আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ এবং সমাজ-জীবন থেকে মহাযুদ্ধের অভিশাপ দূরীকরণের পন্থা। দ্বিতীয় পন্থা: ঠাণ্ডা যুদ্ধ বজায় রাখার পন্থা, মারণাস্ত্র মজুত করার পন্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তি ধ্বংস করার বিপজ্জনক পন্থা।

এক সময়ে শান্তি ও নিরাপত্তার আদর্শ জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পনের বছর পরেও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস পায়নি।

যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অপর জাতির সার্বভৌম অধিকার লংঘনের চেষ্টা চলছে, ঐ অপচেষ্টার অবসান ঘটাতে হবে।

এক বৎসর আগে, সাধারণ পরিষদের পূর্ববর্তী অধিবেশনে, মানব জাতির সামনে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার উন্নতি ঘটার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। দুনিয়ার সব দেশের মানুষের মনে তখন প্রচণ্ড আশার ভাব জাগ্রত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সর্বতোভাবে চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক উত্তেজনার দাবা লাভবান হয় সেই প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলি তাদের পূর্ব মনোভাবেই অটুট আছে।"

কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদল বিলুপ্ত করলে, তবেই শান্তি নিরাপদ করা যায়। সোভিয়েত সরকার কখনও নিরস্ত্রীকরণ বাদ দিয়ে অস্ত্রসংক্রান্ত উপর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন অসাধারণ দাবি উপস্থিত করছে না। জাতিসংঘের সনদে বলপ্রয়োগ, দস্যুবৃত্তি, আক্রমণ নিষিদ্ধ আছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবল সেগুলি পালন করে চলতে বলছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সরকারের তীব্র সমালোচক, এ কথা ঠিক। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, প্ররোচকদের দেখেও না দেখলে, তাহার প্রতি উদারতা দেখালে শেষপর্যন্ত যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করা হয়।

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশে দেশে মার্কিন যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি হল বিপজ্জনক ব্যাধির মত। যেসব দেশে ঐসকল ঘাঁটি আছে, তাদের স্বাভাবিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঐসকল দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথেও ওগুলি বাধা স্বরূপ।

জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতলান্তিক সামরিক জোটকে কেন্দ্র করে সমবেত শক্তিগুলির হিংস্রতা ব্যক্ত হচ্ছে। সমস্ত রকমের স্বাধীনতা আন্দোলন ধ্বংস কামনা করবার "মিশন" নিয়েছে এই অতলান্তিক সামরিক জোট। দৃষ্টান্ত হিসাবে কিউবার কথা উল্লেখ করা চলে, স্বাধীনতাপ্রিয় সাহসী কিউবার জনগণ স্বাধীন জীবনযাপন করতে চান, এটাই তো তাঁদের একমাত্র "অপরাধ"। বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে কিউবাকে রক্ষা করা জাতিসংঘের কর্তব্য। তা যদি না হয়, যদি সেখানে "নূতন গুয়াতেমালা" ঘটতে দেওয়া হয় তবে এমনসব ঘটনাও ঘটবে যার পরিণতি আজ সকলেরই কল্পনাতীত। কঙ্গোর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংকট সকলকে ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকটের দিনগুলিই স্মরণ করিয়ে দেয়, এবার আফ্রিকার একটি দেশ বিনা কারণেই আক্রমণের

দেশকার হল। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি পদদলিত করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হল, যা শান্তির অন্তরায় এবং যে-বিপদ এক আফ্রিকার নয়। কঙ্গোর বিরুদ্ধে এই চক্রান্তের আসল কারণ হল এই যে, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের মসলা ইউরেনিয়ম, কোবল্ট ও টাইটানিয়ম এবং সস্তা লোকবলের উৎসটি হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে একচেটিয়া কারবারিরা মহা উদ্বিগ্ন। এই চক্রান্তের জাল বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ থেকে অতলান্তিক জোটের অন্যান্য প্রধান শক্তির রাজধানীগুলিতে সম্প্রসারিত হয়েছে।

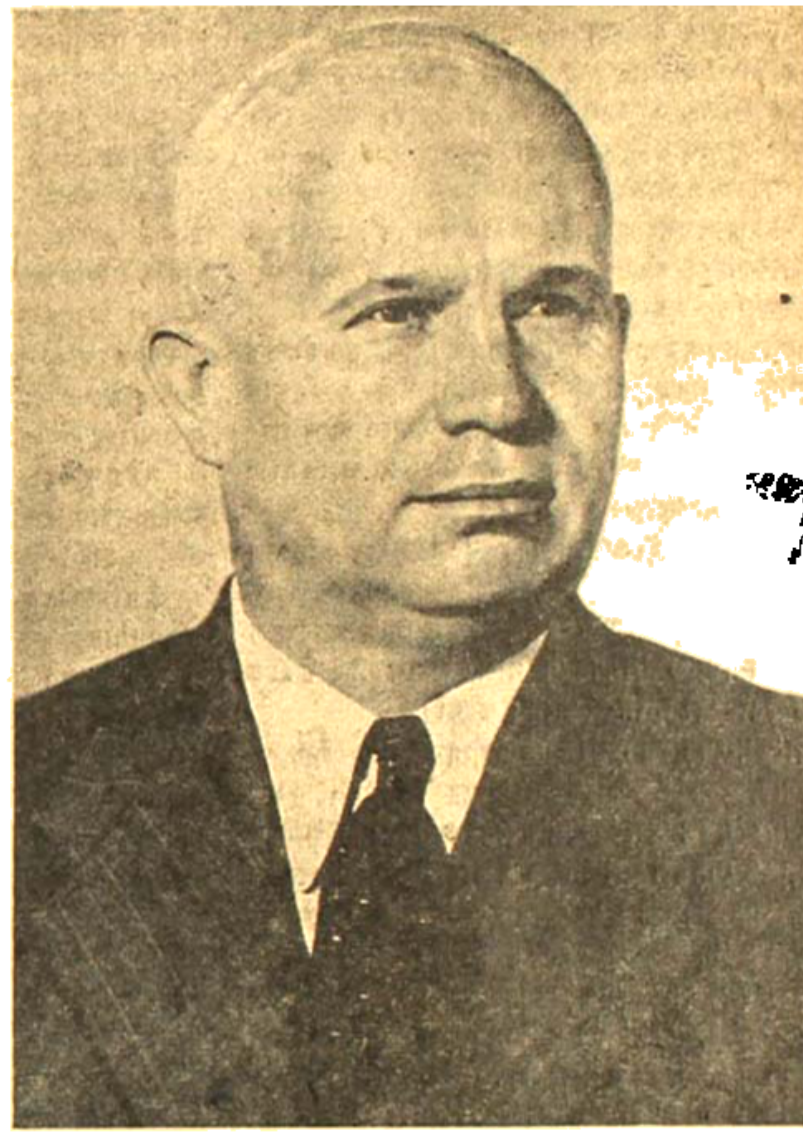

নিকিতা ক্রুশ্চেভ

কঙ্গোর আইনসম্মত সরকার-টিকে উচ্ছেদ করে অন্যায়ের সরকার স্থাপনের জন্য উপনিবেশিকবাদীদের অপচেষ্টা কলঙ্কজনক। দুর্ভাগ্যের কথা, কঙ্গোর এই অবস্থা কাজে লাগান হয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ সম্পাদক হ্যামারশল্ডকে দিয়ে।

ঔপনিবেশিক দেশে দেশে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সোভিয়েত সরকার আগেও স্বাগত জানিয়েছেন, এখনও জানায়, এবং এই ন্যায় সংগ্রামে নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তা দেবার জন্য সোভিয়েত সরকার যথাসাধ্য করবেন।

কঙ্গোর আইনসম্মত ভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট যাতে কাজ করতে পারে, কঙ্গোলী জনগণের আত্মাভিজন যেখানকার আইনসম্মত সুষ্ঠু সরকারের কাজের উপযোগী অবস্থা যাতে সৃষ্টি হয়, তার উপযোগী আইন-শৃংখলা স্থাপনের জন্য জাতিসংঘকে তৎপর হতে হবে।

সোভিয়েত সরকার মনে করেন যে, কঙ্গোর মাটি থেকে কেবল আফ্রিকীয় দেশগুলির ফৌজই থাকে, এবং সুষ্ঠুভাবে দ্বারা পরিচালিত আইনসম্মত সরকারের সম্মতি অনুসারে ও কেবল ঐ সরকারের নির্দেশ অনুসারেই যাতে ঐ ফৌজ ব্যবহৃত হয়, সেই মর্মে জাতিসংঘে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া দরকার। কঙ্গো-প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, এমন যে কোন কাজ থেকে সমস্ত রাষ্ট্রকে বিরত থাকতে হবে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, জাতিসংঘে চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব নেই, এই অবস্থা শান্তির ক্ষেত্রে ভয়ানক এবং জাতিসংঘের অবমাননাকর। চীন

জনগণের প্রজাতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন কোন পশ্চিমী দেশের ও সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-মহলগুলির পছন্দসই নয়, একথা ঠিকই। কিন্তু এই একমাত্র কারণে চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের আইনসঙ্গত অধিকার পুনঃস্থাপনে যে বাধা দেওয়া, তার অর্থ হল বাস্তবতার প্রতি উপেক্ষা, আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমন না চাওয়া এবং যুক্তিসঙ্গত রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা অনুসারে বিশ্ব-শান্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে বাধা দেওয়া।

মঙ্গোলিয়া জনগণের প্রজাতন্ত্র যাতে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে অংশ গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য এই দেশটিকেও জাতিসংঘে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন।

মানবজাতির ইতিহাসে এক নূতন পর্যায় এসেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশে দেশে জনগণ ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার সঙ্গে একযোগে সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্যনির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করায় এই নূতন অধ্যায়ের সূচনা।

জাতিসংঘে নূতন নূতন রাষ্ট্রের আগমন যাতে সীমাবদ্ধ করা যায়, সেজন্য অনেকে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বহুসংখ্যক নূতন রাষ্ট্রের আগমনে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই খুশি। যেসকল জাতি জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবার যেকোন চেষ্টার আমরা বরাবর বিরোধিতা করেছি এবং এখনও বিরোধিতা করব।

সকলেরই বোঝা উচিত যে, যুক্তির অস্ত্র দেশে দেশে জনগণের সংগ্রাম রোধ করতে পারে, এমন কেউ নেই, এমন কিছু নেই, কেননা, এটা একটা মহান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং ধারা। এই ঘটনা অপ্রতিরোধ্য।

এই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিনাশ অবধারিত; এর চূড়ান্ত পতন এখন শুধু কিছু সময়ের ব্যাপার। প্রশ্নটা এখন কার্যত এই যে, ঔপনিবেশিক রাজের কবর দেবার ব্যাপারটা শান্তিতে হবে, না, তার বিপরীত পদ্ধতিতে হবে।

সোভিয়েত সরকার মনে করেন যে, যেকোন রূপের যেকোন প্রকারের ঔপনিবেশিক শাসন পুরাপুরি ও চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত করে এই কলঙ্ক, এই বর্বরতা, এই পাশবতার অবসান ঘটাবার প্রশ্নটি উত্থাপন করবার সময় উপস্থিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত খসড়া ঘোষণা পত্র উপস্থিত করতে চাই:

(১) সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশ, অর্ধ-শাসনাধীন এলাকা ও অন্যান্য অধীনস্থ এলাকাকে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি দিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের জনগণের স্বাধীনভাবে ব্যক্ত ইচ্ছা ও কামনা অনুসারে নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে। এই সকল দেশ ও এলাকার জনগণ যাতে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে এবং নিজেরাই নিজেদের জাতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার রূপ নির্ধারণ করতে পারে, সেজন্য সমস্ত রূপের ও সমস্ত রকমের ঔপনিবেশিক-রাজ ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে হবে।

(২) পরদেশে অধিগত এলাকা রূপে কিংবা লীজ-নেওয়া এলাকাগুলিতে ঔপনিবেশিকতার সমস্ত ঘাঁটি নির্মূল করতে হবে।

(৩) সমস্ত দেশের সরকার যেন জাতিসংঘের সনদে-বর্ণিত ব্যবস্থাগুলির প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত ও অবিচল থেকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের যেকোন অভিব্যক্তি হতে বিরত থাকেন।

সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাজ বিলুপ্ত হলে প্রাচ্যের দেশগুলির, এবং পশ্চিমের শিল্প-অগ্রসর দেশগুলিরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

ঔপনিবেশিক রাজত্বের প্রবক্তারা স্বদেশের অধিবাসীদের এই বলে ভয় দেখান যে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা হলে শিল্পোন্নত দেশগুলির জীবন-যাত্রার মান হঠাৎ নেমে যাবে।

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি যদি যুক্তিবুদ্ধির নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে পরানত রাখার সেই পুরাতন নীতিই অনুসরণ করে চলেন, তা হলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উচ্ছেদকামী জাতিগুলি ঔপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জাতিগুলিকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। স্বাধীনতা লাভের ঐ ন্যায়সঙ্গত ও পবিত্র সংগ্রামে নৈতিক, সমর্থন ও সর্বপ্রকার বৈষয়িক সহায়তা দেওয়া হবে।

সোভিয়েত দেশ সমস্ত বাহিনীগুলি রাখতে বাধ্য এই কারণে যে সামূহিক ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের সোভিয়েত প্রস্তাব এখনো গৃহীত হয় নি।

সাধারণ পরিষদে সামূহিক ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরে যদিও এক বৎসর পার হয়ে গেছে, তবু ইতিমধ্যে এই বিষয়ে এক চুল উন্নতি দেখা যায় না। ঘটনাবলী এই সাক্ষ্যই দেয় যে, নিরস্ত্রীকরণের আলোচনার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নাটোর অন্তর্ভুক্ত তারই কতিপয় দোসর রাষ্ট্র। দশ-জাতি নিরস্ত্রীকরণ কমিটির আলোচনা-বৈঠকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি সামূহিক ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটা খসড়া চুক্তি রচনার কাজে হাত দিতে বরাবর অসম্মত হয়ে এসেছে। তারা যে সব প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছে তাতে নিরস্ত্রীকরণের নামগন্ধও নেই, আছে কেবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা, অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণ ব্যতিরেকেই নিয়ন্ত্রণ।

"নিরস্ত্রীকরণ বাদ দিয়ে নিরস্ত্রণে আমরা কখনোই রাজি হব না। কারণ এ প্রস্তাবে রাজি হলে আক্রমণকারীকেই উস্কানি দেওয়া হবে। আমরা চাই স্থায়ী শান্তি। এই স্থায়ী শান্তি গড়া আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে অস্ত্রশস্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীগুলির উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমেই শুধু সম্ভব।"

আরও কতিপয় দেশের গভর্নমেণ্টের ন্যায় সোভিয়েত গভর্নমেণ্টকেও দল-জাতি কমিটি হতে সরে আসতে হয়েছে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি তাদের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতাকে আড়াল করার এক সরল হিসাবে ঐ দল-জাতি কমিটিকে ব্যবহার করছে। বিশ্বশান্তির স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী উদ্দেশ্যে নিরস্ত্রীকরণের ন্যায় এক মহৎ আদর্শের এরূপ অপব্যবহারের প্রচেষ্টাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

এই কারণেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটিকে রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত করেছে। রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ সভ্য-রাষ্ট্রেরই অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় কোনো স্বার্থ নেই। তারা এই প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্যই আগ্রহশীল।

সোভিয়েত সরকার দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণ ও পরীক্ষা বন্ধ করা সত্ত্বেও ঐ সকল অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করবার ব্যবস্থা সংবলিত এবং ঐ সকল অস্ত্রের যাবতীয় মজুদ বিনষ্ট করবার ব্যবস্থা সংবলিত যে-আমূল সমাধান, নিরস্ত্রীকরণের সেই সমাধানই মানবজাতিকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ থেকে রেহাই দিতে পারে।

নিরস্ত্রীকরণ যাতে বাস্তব ঘটনা হয়ে ওঠে—যাতে অবসরের মৈকল্পের ঘরে পাঠাবার কাজ আরম্ভ করা যায়, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ও ঐ সকল অস্ত্র বহনের উপযোগী উপকরণগুলিসমেত অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট করবার কাজ যাতে আরম্ভ করা যায়, তার চেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন ও জরুরী কোন কাজ জাতিসংঘের থাকতে পারে না।

হালে কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপক ধ্বংসের যে সকল অসাধারণ উপকরণ নির্মিত হয়েছে, সেগুলিই নূতন যুদ্ধে প্রযুক্ত হবে; সেই যুদ্ধের সর্বনাশ রোধ করবার জন্য মানবজাতির যে—সর্বজনীন কামনা, তা পূর্ণ করা জাতি সংঘের কর্তব্য।

কোরিয়ার প্রশ্নটিকে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগে সমাধান করবার কথা কেবল উন্মাদেরাই ভাবতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরীয় কনফেডারেশন স্থাপন করবার জন্য কোরিয়া জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সরকার যে-প্রস্তাব করেছেন, তা গ্রহণ করলে রাষ্ট্র দুইটির শান্তিপূর্ণ ঐক্য স্থাপনের শুভারম্ভ হতে পারে।

কিন্তু এ সব সমস্যা সমাধানে সব চেয়ে মুস্কিল হল, জাতিসংঘের কার্যনির্বাহক সংস্থা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রায়ই নির্দিষ্ট একটি ভোটের মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয় এবং বিশেষভাবে সাধারণ সম্পাদকের কার্যকলাপ এক বিশেষ শক্তি ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পশ্চিমী শক্তিগুলির সামরিক জোটগুলির অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমী দেশগুলি সবসময়ই এই পদটিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেন—এটা নিয়মে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের পক্ষে উপযুক্ত লোককেই তাঁরা সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য মনোনীত করেন। ফলে, জাতিসংঘের বহু দৈনন্দিন কাজে সম্পাদকমণ্ডলী (সেক্রেটারিয়েট) একপেশেভাবেই কাজ করে।

সমগ্র জাতিসংঘের, এবং সংগঠনটির কার্যনির্বাহক সংস্থাটিরও আরও ভাল কাজের অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সময় হয়েছে, এই বৃঢ় সিদ্ধান্তেই সোভিয়েত সরকার পৌঁছেছেন। প্রশ্নটা হল সাধারণ সম্পাদক ও তাঁর দপ্তরের প্রশ্ন।

এখন সাধারণ সম্পাদক একাই জাতিসংঘের দপ্তর পরিচালনা করেন এবং নিরাপত্তা পরিষদের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে ব্যাখ্যা করেন ও কাজে পরিণত করেন তিনি একাই। ঐ সাধারণ সম্পাদক পদটি বিলুপ্ত করার সময় হয়েছে। যে ব্যবস্থায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনগুলি ও নিরাপত্তা পরিষদের কাজগুলির অন্তবর্তীকালে জাতি-সংঘের সমস্ত কাজকর্ম নির্দেশ করেন জাতিসংঘের সাধারণ সম্পাদক, সেই ব্যবস্থা বদল করাই প্রয়োজন।

ক্রুশ্চেভ বলেন, যে সেক্রেটারি জেনারেল এখন সাধারণ পরিষদের ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করেন ও তদনুযায়ী কাজ করেন, তাঁর পদের উচ্ছেদ হওয়া উচিত; তার পরিবর্তে রাষ্ট্রসংঘের একটি সম্মিলিত কার্যনির্বাহক সংস্থা গঠিত হওয়া দরকার—নির্দিষ্ট রাষ্ট্রযুগের তিন জন প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে।

এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের কার্যনির্বাহক সংস্থার কাজ যাতে এই সব রাষ্ট্রযুগের মধ্যে একটি যুগের স্বার্থের পরিপন্থী না হতে পারে, সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে।

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কেন্দ্রের জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন যেখানে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বহুমুখ কার্যকলাপ আরও ভালভাবে চলতে পারে। "সুইজারল্যাণ্ড অথবা অস্ট্রিয়ায় এই স্থান নির্বাচিত হতে পারে।"

"আজই ঔপনিবেশিক দাসত্বের উচ্ছেদের জন্য এবং আজই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী সমাধানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সব কিছু করতে প্রস্তুত।

"আর বিলম্ব নয়, আর দ্বিধা নয়। অনেক দেরী হবার আগে রাষ্ট্রসংঘকে এখন জনগণের ইচ্ছা পূর্ণ করার ভার নিতে হবে।

বিশ্বসাহিত্য

অনরে ভ্যমিয়ে

নবরূপ আচার্য

O

সামান্য আয় থেকে
ী ভাড়া দিতে
র না। বাড়ী-
ার লাগালি চলছে
রত। উচ্ছে
। বাং। ঠিক এই
র চিঠি পেলেন—
র বন্ধু, অ্যাডাম
কাছে ভ্যালমঁ-এ
একটা বাড়ী
ছি। কিন্তু ভেবে
না এটা নিয়ে কি করি। হঠাৎ মাথায় এল এটা
কে দিয়ে দিই। তাই সবচেয়ে ভাল বিবেচনা
ন এবং দলিলপত্র তোমার নামে লিখে দিয়েছি।
সলে তোমার জন্যে আমি এটা কিনিনি। করেছি
তামার বাড়ীওয়ালাকে বিরক্ত করবার জন্যে।"
মোটই 'কোরোট'।

র্বীয়ান শিল্পী 'পাপা'
ট-এর চিঠি পেয়ে ভ্যমিয়ে
গেলেন ভ্যালমঁ-এর
। ৬৩ বছর বয়সে মাথার
একটি আশ্রয় জুটল।
জীবনের আর সাতটি
এখানে কাটিয়ে চরম
া আর দীনহীন অবস্থা
ধ্যে সম্বল করে ১৮৭৯-এ
। মারা গেলেন।
ভদেহের সৎকারের জন্যে
কপর্দকও নেই। কোরোট,
ামী প্রমুখ সহযাত্রী বন্ধুরা
ই গেছেন। জীবিত যাঁরা
শেষকৃত্যে উপস্থিত
কেউ। ফ্রান্সের সরকার
ব্যয়ে এই মহান

অনরে ভ্যমিয়ে

শিল্পীকে নিতান্ত হীন-
হীনের মত করে দেবার
জন্যে বাজেটি মুদ্রা ছুঁড়ে
দিল। মানভাজন ব্যক্তি
নিঃসম্বল অবস্থায় মারা
গেলে তাঁর প্রতি সম্মান
দেখাবার জন্যে যে সামান্য
অর্থের বরাদ্দ ছিল
ভ্যালমঁ-এ মেয়র
অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে
তা মঞ্জুর করতে অস্বীকার
করলেন। কারণ, ভ্যমিয়ে জেলখেটে—'লা ক্যারিকেচার' পত্রিকায় রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র আঁকার জন্যে ছ'মাস জেল হয়েছিল তাঁর। তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে তিনি ব্যবহার করেছেন লোক ক্ষ্যাপানোর কাজে এবং রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি সরকার-বিরোধী দলে। কিছু কিছু তল্পীবাহক সংবাদপত্র মেয়রকে খুব বাহবা দিয়ে সরকারের সমালোচনা করল বাজেটি ফুঁ দান করার জন্যে।

এ হচ্ছে ১৮৭৯ সালের ঘটনা। আর আজকে, বিংশ শতকের মধ্যপাদে পপুলার স্মল এনসাইক্লোপিডিয়া লিখছে : ভ্যমিয়ে (অনরে), ফরাসী ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। জন্মমার্সাই-এ (১৮-৮-১৮৭৯)। তিনি জুলাই মনার্কিকে আক্রমণ করেছিলেন। এই হচ্ছে একদল প্রতিভাবান শিল্পীর—বালজাক যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, রক্তে আছে মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিভা—পরিচিতি! কায়েমী স্বার্থের আনুগত্য, 'রসবেত্তা' শিল্প-

স্পৃহা, শিল্পীর স্বাধীন চেতনার প্রতি অনুদারতা এবং অমর্যাদা কতদূর যেতে পারে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন অনরে দুমিয়ে।

অথচ দুমিয়ে যে শুধু খবরের কাগজের ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়েই ছিলেন না তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁর মৃত্যুর পর। দুমিয়ে মারা গেছেন—এ খবর ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিস থেকে শিল্পের 'সমঝদার', কড়ে দালালেরা এসে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করল শিল্পীর অ্যাপার্টমেন্ট-এর জরাজীর্ণ গৃহে। যেখানে যত ছবি পাওয়া গেল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, লুটপাট করে সমঝদারের দল বাড়ী ফিরল। দুমিয়ের দারিদ্র্যে-পীড়িতা বিধবা স্ত্রী হতবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন শুধু—একটি কানাকড়িও কেউ ছোঁয়ালনা তাঁকে। সারাজীবনের শ্রমে এগুলি এঁকেছিলেন দুমিয়ে—প্রাণাচ্ছাদনের সামান্য আয়ও হয়নি এর থেকে। তারপর কয়েক বছর যেতে না যেতে সেইসব ছবি একটার পর একটা চিত্র-ব্যবসায়ীদের গহ্বর থেকে বাজারে বেরোল। চড়া দামে বিক্রী হল প্রত্যেকটি ছবি।

শিল্পের প্রেরণাটা দুমিয়ে খানিকটা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। তাঁর বাবার ছিল কবি হবার বাসনা। কিন্তু কাব্যচর্চা করে যখন অন্ন জোটাতে পারেননা তখন সপরিবারে মার্সাই থেকে এসে প্যারিসের এক বস্তিতে বাসা বাঁধলেন। আশা এখানে তাঁর কবি প্রতিভা স্ফূর্তি পাবে। কিন্তু দীর্ঘদিনের সাধ্য-সাধনায় কিছু জুটলনা। অগত্যা ভদ্রলোক ঠেকে শিখলেন। তাই বালক দুমিয়ে যখন চিত্রশিল্পী হবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন তখন বাবার দিক থেকে নিরুৎসাহই পেলেন। নাদিঁয়ে দুমিয়ে বললেন—শিল্পীর জীবন বাস্তবের সঙ্গে মেলেনা। কিন্তু দুমিয়ে দমলেননা। আর্ট স্কুলে গেলেন পড়তে। কিন্তু তখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জীবিকার সংস্থান করা। এক লিথোগ্রাফার বন্ধুর পরামর্শে তাঁর কাছ থেকে লিথোগ্রাফী শিখলেন। লিথোগ্রাফী থেকে কিছু কিছু আয়ও হতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যে বড় রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র বেরোল তাঁর হাত দিয়ে। প্রগতিবাদী সাপ্তাহিক পত্র 'লা ক্যারিকেচার' তখন ফ্রান্সের রাজতন্ত্রবিরোধীদের অন্যতম

মুখপত্র। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে পত্রিকাটি রাজতন্ত্রে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করছে। 'লা ক্যারিকেচার'-এর সম্পাদক দুমিয়ের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর পত্রিকায় নিয়োগ করলেন ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হিসেবে।

১৮৩৪-এ ফরাসী সরকার নির্দেশ দিলেন সংবাদপত্রে সমালোচনা চলবেনা। 'লা ক্যারিকেচার'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। দুমিয়ে চলে এলেন দৈনিক ব্যঙ্গ-পত্রিকা 'লা চারিভারি'তে এবং দীর্ঘ তের বছর ধরে এখানে তাঁর অজস্র গ্রাফিক চিত্র প্রকাশিত হল। ফরাসীদেশের উপর দিয়ে এ সময় রাষ্ট্রীয় তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে একটার পর একটা। ১৮৩০-এর জুলাইতে হল দশম চার্লস এর বিরুদ্ধে প্যারিস-অভ্যুত্থান, ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবে দ্বিতীয় রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হল, ১৮৫১-এর ডিসেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানে দ্বিতীয় রিপাবলিকের অবসান ঘটল এবং তারও তিরিশ বছর বাদে হল প্যারিস কম্যুনের সূচনা। এই প্রচণ্ড রাষ্ট্র-আলোড়নের মধ্যে দুমিয়ে একবারের জন্যেও মানসিক ভারসাম্য হারাননি—স্বাধীনতা এবং রিপাবলিকের প্রতি তাঁর তীব্র ভালোবাসা বারবার উৎসারিত হয়েছে তাঁর শিল্পের ভেতর দিয়ে। রোবস্

ার-এর একটা কথা তিনি প্রায়ই বলতেন—পুণ্যকর্ম একটাই—বিপাবলিককে ভালোবাসা। রাজাকে ে দেখালেন 'গারগাণ্টুয়া'—বুভুক্ষু মানুষের শ্রম নিংড়ে সোনা বার করে নিয়ে তাকে পরিপাক করে র মহামান্য পাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করছেন। এই দ্রোহীতার পুরস্কার পেলেন ছ'মাস জেল।

শিল্পকলার 'তত্ত্ব' নিয়ে অবশ্য দুমিয়ে খুব বেশি মাথা ামাননি। তিনি সৃষ্টি করে গেছেন প্রাণের উল্লাসনায়। নিক শিল্পের মূল ধারার সঙ্গে তাঁর সংযোগটা খুব ক্ষ নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে তিনি রেনেসাঁস ন্দোলনেরই সৃষ্টি। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, আঙ্গিকে, ব্যঙ্গাসে দুমিয়ে তাঁর সমসাময়িক কালের চেয়ে ক অগ্রসর।

দুর্বোধ শিল্পরীতিই যদি 'আধুনিকতা'র প্রধান লক্ষণ তাহলে অবশ্য দুমিয়ে 'আধুনিক' নন। কিন্তু তিনি রেছেন যে বিষয়বস্তুকে অর্থবহ হৃদয়সংবেদ্য করে তুলতে কলাকৈবল্যবাদেই শিল্পের আধুনিকতার পরমাগতি নয়—যথার্থ শিল্পসৃষ্টিও হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। তাঁর ছবিতে কিনা এসেছে? বিত্তহীন, বিত্তবান, চোর, ভিক্ষুক, বারবনিতা, দুর্নীতিপরায়ণ আইনজীবী, চিকিৎসক, বণিক তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, মৃতনিপ্পু সরকার—এক কথায়, দেশের সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে তিনি এঁকেছেন। এঁকেছেন দুর্গতের প্রতি অপরিসীম সংবেদনায়, অন্যায়ের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ এবং ঘৃণার মধ্য দিয়ে। ১৮৩০-এ বাহান্ন বছর বয়সে 'লা চারিভারি' থেকে বিতাড়িত হয়ে সমস্ত পত্র-পত্রিকার দরজায় ঘুরলেন সামান্য রোজগারের জন্যে। সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিংবা যে কোন ধরণের তাঁরা চান তাই তিনি আঁকতে প্রস্তুত। সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হলেন—তিনি নাকি 'সেকেলে' হয়ে গেছেন। প্রচুর ছবি আঁকেন কিন্তু বিক্রী হয়না। দিনযাপনের এই গ্লানির জন্যে মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন—'সংসারের এই জোয়ালটা যদি আমাকে বইতে না হোত।'

১৮৬৩-তে 'লা চারিভারি' আবার ডেকে আনল তাঁকে। প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন দুমিয়ে। তবু বৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই কাজ করলেন। বারো বছর ধরে অসংখ্য ছবি আঁকলেন। ক্ষীণদৃষ্টিতে রাত্রিবেলা আঁকতে পারেননা—আসন্ধ্যা-সকাল তুলি চালিয়ে যান ইজেলের ওপর। ৭১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী চিত্রশিল্পের একটি যুগের অবসান সূচিত হল। সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যভিচার এবং অবিচারের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিদ্রূপকে শিল্পের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন দুমিয়ে—প্রমাণ করেছেন যে তিনি শুধু রাজনৈতিক রেখাঙ্কনের চিত্রকরই নন, তাও শিল্পী তিনি। যমনীতে তাঁর সত্যিই 'মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিভা'।

চৌদ্দ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মনটা এমনিতেই মোটেই ভাল ছিল না। তাতে আবার বিকেলের আকাশ যদি মেঘের ছোঁয়া পায় অমনি সন্ধ্যের বিষণ্ণতা তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে এনে একজোটে আঁধার নামায়। না, এগুলো মন খারাপের হেতু নয়। আসলে ওই শ্রীহর্ষকে বিদায় দিয়ে ওপর ওপর নিজের কাছে নিজে জিতে যাবার ফাঁকা ক্ষণজীবী খুশিটা ফুরিয়ে গেল যে মুহূর্তে অমনি আকাশের মেঘলা ভাব দেখে শ্রাবণীর বুকের ভেতরে গুমোট জমল। টের পেতে ইচ্ছে না থাকলেও ঠিকই টের পেল যে শ্রীহর্ষ চলে না গেলে, কিংবা দুজনে গড়ের মাঠে গেলে এই মেঘলা বিকেলখানাই অকারণে (!) খুশি বিলোতে পারত। আদর্শবাদী হওয়ার শতেক ঝামেলা। আপন মনেই ভাবতে ভাবতে চলছিল শ্রাবণী। অত্যেস মাফিক গলির বাঁক থেকে চোখ তুলে লক্ষ্য করল—মা ছাদে পায়চারী করছেন কিনা। করছেন। এত দূর থেকেও মায়ের চোখে চোখ পড়ল, হাসল শ্রাবণী। মা কি হাসলেন? এখান থেকে মুখখানা দেখা গেলেও হাসিটুকু নজরে পড়বার কথা নয়, তবু শ্রাবণীর মনে হল হাসছেন মা। বাকি পথটুকু মনের সঙ্গে তর্কেই পেরিয়ে গেল—আদর্শবাদী হওয়ার চেয়ে অদৃষ্টবাদী হওয়াই যেন লোভনীয়। অদৃষ্টের ওপর ঢালাও ফরমাস দিয়ে ইচ্ছে মতো চলাফেরা করা কতো আরামের—! এই যেমন অনীতা, লেখাপড়ার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই অথচ ও ছাত্রী। বিজয়দার সঙ্গে যত্রতত্র যখন তখন দিব্যি ঢেউও গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে অনীতা। এক এক সময় অনীতার নিশ্চিন্ততা দেখে হিংসা হয় বই কি। হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঠল—আচ্ছা, বিজয়দাও কি অদৃষ্টবাদী? এতো দেশ ঘুরে কতো দেখেশুনে, লেখাপড়া করে বিজয়দা এই বয়সে পৌঁছেছেন। বিজয়দা অদৃষ্টবাদী, এ যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু—কিন্তু, অনীতার মত মেয়েকে বরদাস্ত করেছেন তো। তাই কি বরদাস্ত করেন অনী তাকে? একেবারে তালে না বাগলে এভাবে সঙ্গ দেওয়া কি সম্ভব! বিশেষ যে মানুষের ডেনোজানার পরিধিটা ছোট নয় সে কেন এইভাবে নিজেকে গণ্ডীতে গুটিয়ে রাখতে যাবে!

চৌকাঠে পা দিয়েই শ্রাবণীর বুকের ভেতরটায় ধক্ ধক্ তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। যদি এর মধ্যে বিজয়দা এসে থাকেন, যদি কালকের সেই রেস্তোরাঁর গল্প করে থাকেন তাহলে মায়ের কাছে আজ একহাত কথা শুনতে হবে। এক হাত নয়, হাতায় হাতায় দিনরাতের অভিধান জর্জর হয়ে উঠবে। রেস্তোরাঁয় খাওয়াটা বড় কথা নয় সে খবরটা গোপন করাই হ'লো অপরাধ। এই সূত্র ধরে পরের মেয়ের দায়িত্ব নেওয়া যে কী ঝক্‌মারী সে কথা উঠবে। এবং বিদুষী করে তোলার জন্যে যে শয়ে টাকা জলে ফেলার চেয়ে চট্‌পট্ এ মেয়েকে পার করে দেওয়া যে কতো ভালো সে সিদ্ধান্ত এসে পড়বে। তখন মাকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, বন্ধুনী স্তরেই ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হয়েছিল এবং শ্রাবণী মোটেই বিয়ের জন্য ব্যস্ত নয়। নিজেকে একটু তাচ্ছিল্যে কানমলা দিল শ্রাবণী, 'এই যদি আদর্শবাদ হয়, তাহলে সুবিধাবাদ কাকে বলবে তুমি!' সেই মুহূর্তটিতে একটা

নিশ্বাসে ওর ভেতরে আর একটি সত্তা যেন বলল—'শ্রীহর্ষ তুমি এসো না। না, না, তুমি আমাকে বাঁধবার চেষ্টা করো না। তুমিত আমার বন্ধু, তবে কেন এইভাবে আমাকে খর্ব, ক্ষুণ্ণ হতে দেবে! জানো, মন বড় টনকো'।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই মা বললেন—আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরলি? বোনুর ওখানে গিয়েছিলি ত? কেমন আছে?

জবাব দেবার আগেই আড়চোখে মালিনীর মেজাজটা আন্দাজ করে নিল শ্রাবণী। তাহলে বিজয়রা আসেন নি। এইসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক ভাবে ও বলল—কে জানে, হয়তো ভালই আছে।

দায়সারা গোছের জবাবের পিছনে সুপ্ত একটা কারণও রয়েছে, মালিনীর কাছে প্রকাশ করতে চায় না যে বোনের জন্য ওর কোনো দুর্ভাবনা সত্যিই আছে! কিন্তু মালিনীকে শ্রাবণীর এখনো চিনতে বাকি আছে। ওর ওই দায়সারা গোছের জবাবই তাঁকে সন্দিগ্ধ করে তুলল যেন। কিম্বা তা নাও হতে পারে, হয়তো বনানীকে তিনি ভালোইবাসেন তাই বললেন—'হয়তো ভালই রয়েছে? তার মানে তুই যাসনি ওকে দেখতে! নিজের মায়ের পেটের বোন, তাকেও যে মানুষ ভালো না বাসে তার মতো পাষাণী দুনিয়ায় দুটো আছে! আমি কোথায় ভাবছি যে, খুকী হয়তো আজ বোনুকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ঢুকবে! আমার পোড়া অদৃষ্ট, বলে কি না কে জানে! বলি তুই কি ভেবেছিস বলতো, ওইটুকু মেয়েটা বিদেশ বিভূঁয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। তা তোকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে, যার মা-বাবা এইভাবে সন্তানকে ফেলে রাখতে পারে—।

অনুপস্থিত সেই বাপ-মায়ের উদ্দেশ্যে শুরু হয়ে গেল চরম ফতোয়া—যাদের অনেক সন্তান থাকে তারাই এই ভাবে অবজ্ঞেলা করতে পারে। আরে বাবা, যদি মানুষ করতে না পারো তবে এদের সংসারে আনাই বা কেন। কলকাতায় একটা বাসা করে বছর কয়েক থেকে ছেলে-মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিলেই পারিস। থাক সে, থাক বার বার বিচার তার-তার কাছে। এখন দয়া করে আমার সঙ্গে একটু চলো সেই মেয়েটাকে আজই আমি এখানে নিয়ে আসবো—তারপর যা হয় হবে। তুমি যদি ভেবে থাকো যে দুনিয়াতে তুমিই আমার অঙ্কের নড়ি তাহলে খুব ভুল করেছ। আমার কাছে তুমিও যা বোনুও তা, সেও কালিদা নয়।

শ্রাবণী নিজের কানকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা কি সত্যিই মালিনীর মনের কথা? না কি মুখসাপটে বললেন শুধু শ্রাবণীকে আঘাত দেবার জন্যে। যদি তাই হয় তবু শ্রাবণীর দুঃখ নেই। এই বাসাবাড়ীর একঘেয়ে কটি মুখ দেখার দিনগুলো পাল্টে গিয়ে একটা নতুন স্বাদ পাওয়ার সুযোগ ত জুটবে! কতো দিন, কতো কাল এই কটি মুখের সঙ্গে মুখোমুখী বাঁচতে হয়েছে। এমনই একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে যেন, সারাটা জীবন এইভাবেই পুইয়ে দিতে হবে। তাই বুঝি শ্রীহর্ষর সঙ্গে এত প্রিয়। হয়তো সেইজন্যেই বিয়ের কল্পনাটা খারাপ লাগে না। হয়তো সেই কারণেই শ্রাবণীর মনটা বুড়িয়ে যেতে বসেছে।

দিদিমাকে চুপি চুপি খবরটা দিয়ে এল শ্রাবণী এক ফাঁকে।

মালিনী ওকে চলে আসতে দেখে বললেন—দাঁড়াও যাচ্ছ কোথায়! তোমার গুণপনার কথা দিদিভাইকে শুনিয়ে যাও। আদরে-আদরে তাঁর নাতনী কেমন ধরাকে সরা সমঝাচ্ছে সেটা ওঁরও জানা দরকার। ছি-ছি খুকী, লেখাপড়া শিখে তুই দিন দিন মায়া-মমতা সব খোয়াতে বসেছিস, এ ত ভালো কথা নয়।

চুপ করে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শ্রাবণী। কি জবাব দেবে? যদি বলে যে মায়ামমতা যথেষ্টই রয়েছে, তাহলে হয়তো অন্য ব্যাখ্যা শুরু হয়ে যাবে। তার চেয়ে মৌন থাকাই ভালো।

মৌন একটি নিথর মূর্তি যেন শ্রাবণী। মনে মনে মহাসুখরতার উপচে উঠেছে আবেগ। আশাতীতভাবে ভাগ্যের মোড় ফিরবে বোধহয়। বোধহয় এর পর শুরু হয়ে যাবে মিলনের যুগ। নটবর নগরের কুটুম্বিতার সেতু দিয়ে শ্রাবণীর ভাইবোন মা-বাপ সবাই কাছে চলে আসবেন। এত সুখ, এত অজস্র সৌভাগ্য! কল্পনায় শ্রাবণীর গায়ে কাঁটা দিল—শিহরণে ওর অপরিণত যৌবন-সত্তেজ রোমরাজি শিরশিরিয়ে শুড় শুড়িয়ে দিয়ে গেল,

হয়তো এখনি, আর একটু হলেই শ্রাবণী হেসে ফেলছিল। ভাগ্যে হেসে ফেলে নি, তাই রক্ষে। তাহলেই হয়েছিল সর্বনাশ। মালিনী অবধারিত ভাবে ধরে নিতেন মেয়ে তাঁকে ঠাট্টা করছে।···ওদিকে তখন শ্রাবণীর এই স্বভাব নির্মমতার হেতু নিয়ে রীতিমত গবেষণায় মালিনী আর তাঁর মা মগ্ন। শ্রাবণী সবই শুনছে। মালিনী বলছেন—এ তো আমি তখনই জানি মা! যে মেয়ে অসময়ে অষ্টম ভূমিষ্ঠ হল না, সে ত মাটির ছোঁয়া পেল না জন্মলগ্নে। আর যে মানুষ প্রাতুড়ের মাটিতে না জন্মে পালকীতেই হয়ে গেল তার শরীরে মায়ামমতা থাকার কথা নয়—বিধাতাই যাকে বঞ্চিত করল তাকে তুমি বলে-কয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে আর কতোখানিই বা শোধরাতে পার।··· দিদিমা সান্ত্বনার সুরে বললেন—মিথ্যে দুঃখ করে কি হবে মা! মানুষের যদি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ষোল আনাই গুণ থাকতো তাহলে মানুষ দেবতা হয়ে যেত। ওর মাথার ওপরে কতো ভারি ভারি বই পড়ার দুর্ভাবনা সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন মা! মায়ামমতা তোমারও যেমন ওরও তেমন, কিছু কম নেই। যাও এখন ঘরে-গিয়ে গিয়ে রুগী মেয়েটাকে ঘরে এনে তোলো। সুতারাতাড়ি ঠাকুরের দয়ায় সেরে উঠুক।

মালিনী আজকাল মোটে পথ চলতে পারে না। তাছাড়া কলকাতা শহরের ট্রাম-বাস, মোটরের হরদম হামলা দেখে যেন আরো বেশি ঘাবড়ে যান। একখানা রিকশা নিল শ্রাবণী। তাতে মালিনীর আপত্তি ছিল, উনি বললেন—একেবারে ট্যাক্সি নিলেই পারতিস, সেই গাড়িখানাতেই বোম্বুকে নিয়ে ফেরা যেত।

শ্রাবণী বলল—হস্টেল থেকে আমাদের কাছে ছাড়বে কি না তার ঠিক নেই, খামোখা কতকগুলো খরচার কি দরকার। যদি ও আসে ত ট্যাক্সির ওখানে অভাব হবে না মা।

—ছাড়বে না মানে? আমাদের মেয়ে আমরা আনবো তাতে কার কি—

—না, তা নয়, হস্টেলের আবার নিয়মকানুন আছে ত।

এরপর মালিনী আর একটিও বাক্য উচ্চারণ করেন নি। এমন কি হোস্টেলে পৌঁছেও না, বাড়ি ফেরার পথেও নয়।

কথা বলার পর ত তিনি নিজে হলেই বন্ধ করেছেন কয়েক বছর আগে।

ভিজিটারদের ঘরে ঢুকে শ্রাবণী প্রথমে আয়াকে ডাকল। স্লিপে নাম লিখে পাঠাবার সময়ও সন্দেহ করেনি যে ওপাশের চেয়ারে যে ভদ্রলোক বসে রয়েছেন তিনি মহিমারঞ্জন চৌধুরী ছাড়া অন্য কেউ নন।

আয়াকে স্লিপখানা দেবার সময় জিজ্ঞেস করল—বনানী কেমন আছে জানো?

—ভালো আছে। জ্বর ছেড়েছে তবে আর তিনটি মেয়ের জ্বর হয়েছে। এই মেয়েগুলো এমন কাঁদুনে আয়াদী কেন যে আসে! অবিশ্যি বস্তিদিদিদের সেসব ঝামেলা নাই—কেবল দ্যা ভোরে জোরে গান গায়। জ্বর বাড়লেই ওর গানের জোর চড়ে যায়।

স্লিপখানা হাতে নিয়ে আয়া দিব্যি গল্প করছিল। ওর নড়বার নাম নেই, দেখে শ্রাবণী তাগাদা দিল, বলল—তুমি যাও, মেট্রনকে খবরটা দাও, বলো তার মাসিমা এসেছেন!

আয়া হেসে চোখ ঘুরিয়ে বলল—আমার ত যাবার দরকার নেই। বস্তি দিদির বাবা এয়েছেন ওই, লাফাতে লাফাতে ওই এল বলে

বাবা! চমকে উঠল শ্রাবণী। নিজের অজ্ঞাতেই আয়ার মজরের নাগাল ধরে তাকাল শ্রাবণী। বোধকরি কয়েক মুহূর্তকাল ধরে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল ও। মহিমারঞ্জনের যে উগ্রচণ্ড আকারটা ওর মনে ছাপা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ভাসে এই গম্ভীর বাসভারিচেহারার প্রৌঢ় ব্যক্তিটির সঙ্গে তার আদৌ মিল নেই। তবু ইনিই তিনি। শ্রাবণীর বাবা। কোন্ অদৃশ্য বিধাতার সাঁড়াশি হাত ওর ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে মহিমারঞ্জনের পায়ের ওপর মাথাটা নুইয়ে দিল। উদ্যত মহিমারঞ্জন তাড়াতাড়ি 'আহা হা, করো কি, করো কি মা! থাক থাক। ভগবান তোমার চিরসুখী করুন। ব'লে শ্রাবণীর হাত ধরে তুললেন।

এ কান্নার কোন অর্থ হয় না। কেন না মহিমারঞ্জনকে দেখবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ শ্রাবণীর কখনও ছিল না, বরং তাঁর কথা মনে হলেই আতঙ্কে শিটিয়ে উঠেছে বিশেষ ক'রে বোম্বু আর শিবুকে দেখার খুব বেশি ইচ্ছে থাকলেও

কখনই আসে শ্রাবণী, পাছে মহিমারঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তবু এই অপ্রত্যাশিত, অনভিপ্রেত ঘটনায় শ্রাবণী যে একটুও খুশি হয়নি তা নয়। হ্যাঁ ভালো লাগছে। খুব? হ্যাঁ, তা লাগছে বই কি। কি যেন একটা তৃপ্তি যার কোনো রূপ নেই, শুধু বেগ আছে—যে বেগ কেবল কাঁদায়, সেই তৃপ্তিতে শ্রাবণী অভিভূত। এতই অভিভূত যে মালিনীর প্রতিক্রিয়াটুকু পর্যন্ত অনুমান করার শক্তি শ্রাবণী হারিয়ে ফেলেছিল। সচেতন বাস্তবে ফিরে আসামাত্র, এক ঝলক ছেলেমানুষী হাসি দিয়ে কান্না ঢেকে শ্রাবণী জিজ্ঞাসা করল—আপনি ভালো আছেন? মাসিমা কেমন আছেন!

কথাটা উচ্চারণের মুহূর্তে নিজের মস্ত বড় একটা বিচ্যুতি টের পেল শ্রাবণী। ওপাশে মালিনী মুখ বুজে বসে আছেন—মহিমারঞ্জনকে প্রণাম করার পর তাঁকেও প্রণাম করা উচিত ছিল।

কিন্তু মহিমারঞ্জন অবশ্য ত্রুটী নিলেন না। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে শুরু করেছেন কথা বলা—হ্যাঁ আমার এ শরীরে শাপমন্যি স্পর্শ করে না মা। তবে ইয়ে, তোমার গর্ভধারিণী খুবই কাহিল। মানে ত যাই-যাই অবস্থা হয়েছিল। টাল্‌টা একটু সামলেছে, তাই এখানে এনেছি, হাসপাতালে চিকিৎসে করাচ্ছি। এই আজই সকালেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। অবিশ্যি নরেন ডাক্তার আমাদের ধন্বন্তরি, তার হাতেও রাখা চলতো, তবে নরেন নিজেই বলল—একবার ভালো করে এগ্‌জামিন করিয়ে নিন্ চৌধুরী মশাই।

—কি অসুখ?

—ওসব তুমি ছেলেমানুষ বুঝবেনা মা! তারপর, তুমি ত দেখছি বেশ বড় হয়েছ। ব'লে মহিমারঞ্জন শ্রাবণীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বললেন—তোমাকে একা কোথাও দেখলে চিনতেই পারতাম না। যাক্, এখনো বিয়ে হয়নি দেখ্‌ছি, কি করছো?

—এম-এ পড়ছি।

—ও তা বেশ, ভালো। আজকাল যে যুগ এলো, তাতে লেখাপড়াটাও দরকার বটেই। এই ভাখো না, আগে আমাদের ঘরে তাতের ভাবনা ছিল না। এখন হা-ঘরে গর্মেণ্ট ত জমিদারী উচ্ছেদ করল। অথচ আজ পর্যন্ত, স্বাধীন হয়ে অব্দি একটা ভালো কাজ করতে দেখলাম না। যতোসব চুলে-বাদ্দী প্রজা তারা এখন আমার সামনে মাথায় মাথা দিয়ে গট্ গট্ ক'রে চলে যায়। যাকগে, ওরা কলি—এসবই ত চার-পো কলির লক্ষণ। নইলে মেয়েদের পর্যন্ত ঘরের বার ক'রে ছাড়ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সবই কলি প্রকট হওয়ার লক্ষণ—যাক গে, তোমাকে এসব বলছি কেন, না তুমি লেখাপড়া শিখছো মা, তুমি হয়তো মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে মানবে। বলো তো মা ধর্ম কোথায়! যেখানে ছোটর কাছে বড়র মান থাকে না, ধর্ম আছে? তবে তার মধ্যেও কথা আছে, এই যে তুমি হঠাৎ প্রণাম করলে—এটা দেখতেও কতো ভালো লাগে! আহা সুখী হও মা, মানুষের মনে দুঃখ না দিয়ে সুখ ভোগ করো। আত্ম-সুখের জন্য অন্যের ব্যথায় কারণ হওয়াতে সুখও নেই, শান্তিও নেই, বুঝলে মা। এই যে কথাগুলো আমি বলছি এগুলো কিনতে হয়েছে—ধন্বন্তর মতো একটা জীবনের পরমায়ু খরচা ক'রে তবে পেয়েছি। যাকগে, আবার যদি ভগবান দয়া করেন তবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি যে তোমার বোনকে দেখতে এসেছ এটা খুবই সুখের কথা। তাই বলছি আপন কখনো পর হয় না, আর, পরও আপন হয় না। যাকগে, এই যে বোমু এসে পড়েছে।

বলে তিনি বনানীর দিকে তাকালেন—হ্যাঁরে তোর নাকি অসুখ করেছিল।

—হ্যাঁ বাবা, সে ত সেরেও গ্যা দিদি তুমি, ও মা মাসিমা তুমিও এসে পড়েছ। কী মজা! কিন্তু—

ব'লে বনানী জিভ কেটে ঠোঁট কামড়ালো। ওর সরল মুখে গভীর সমস্যার ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে ফুটলো।

শ্রাবণী সেই অবসরে মালিনীর সামনে এসে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। মুখ তুলে দেখল মালিনীর কপালের পাশের শিরগুলো শুভ্র ত্বকের পর্দা চাপিয়ে ফুলে উঠেছে, সবুজ রঙের আভাটুকু এই আলোতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শ্রাবণী সোজা হয়ে দাঁড়াবামাত্র মালিনীও চলে আসবার জন্য পা বাড়ালেন।

হঠাৎ এইভাবে বিদায় নেয়াটা কল্পনাই করে নি শ্রাবণী। তবু বুঝল যে এখানে আর এক দণ্ডও থাকা সমীচীন নয়। তাই একটু দৃষ্টিভাব বোনের দিকে তাকিয়ে ও বলল—

তুই ত ভালোই আছিস। আজ আমরা চলি।

মহিমারঞ্জন বললেন—তোমার গর্ভধারিণী হাসপাতালে

ওঁর কথা শেষ হবার আগেই শ্রাবণী কথা টেনে নিয়ে বলল—ও, হ্যাঁ, ওঁর বেড নম্বর, ওয়ার্ড এগুলো একটু বলুন না, যাবো। জিগ্যেস করব-করব ভেবেও ভুলে গিয়েছিলাম।

মহিমারঞ্জন এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে বললেন—কেবিনেই আছেন, সুবিধামতো একদিন যেয়ো।

—আচ্ছা।

মালিনী একেবারে পথের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শ্রাবণী আসতেই বললেন কেলেঙ্কারী যেটুকু বাকী ছিল তাও পুরো হয়ে গেল। এখন নটেবালির জমিদার মশাই রটিয়ে বেড়াবেন যে, একটি মেয়েকে ত পর করেছেই মালিনী মজুমদার এখন আর একটির দিকেও হাত বাড়াচ্ছে। তোর জন্যে আমার আর কতো খোয়ার হবে বলতে পারিস খুকী!

অপ্রতিভ, ক্ষুণ্ণ শ্রাবণী জবাব দিল, জবাব নয়, প্রশ্ন—বা রে আমি কি করেছি! তুমিই ত জোর করে এলে—

—আমার বয়েই গিয়েছে। কোথাকার কে পরশু পর, তার জন্যে আমি মাথা কেন ঘামাতে গেলাম! তুইই ত কাল দেখতে এসেছিলি। আর, মুখ দেখে মনের কথাই যদি টের না পেলাম ত মিথ্যেই তোকে মানুষ করেছি। আচ্ছা, তুই বুকে হাত দিয়ে বল, কাল বোম্বকে বাড়ি নিয়ে যেতে তোর ইচ্ছে হয়েছিল কি না? আর সেইজন্যে আজ রাগ ক'রে ওকে দেখতেও এলি না—এসব কি আমি বুঝি না? তুই কি ভাবিস, আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি!

এ সময় প্রতিবাদ করা মানে সেধে বিপদ ডেকে আনা। তাই শ্রাবণী মুখ খুলল না। মালিনী বকতে বকতে হাঁটছিলেন—উল্টো পথে। তারও প্রতিবাদ করতে ভরসা হচ্ছিল না প্রথম। কিন্তু একটু এগিয়ে শ্রাবণী বুঝল যে এর পর ভুলটা শোধরাতে গেলে আর এক দফা ধমক খেতে হবে। এমন কি মালিনী হয়তো বলে বসবেন যে, ওঁকে ভোগাবার অভিসন্ধিতেই এ কাজ করেছে শ্রাবণী। তাই ও বলল—আমরা বরং একটু দাঁড়াই এখানে, রিকশা পেলে ডাকবো।

দাঁড়ানো অথবা চলা দুইই মালিনীর কাছে এখন সমান। তিনি অন্য রাস্তায় বিচরণ করছেন। থেমে গিয়ে বললেন—বয়েস ত কম হয়নি, কিন্তু মানুষটা এক কোটাও পাল্টায়নি, ঠিক আগের মতোই একগুঁয়ে রয়ে গেল। অন্য কেউ হ'লে হয়তো এই বিপদের সময় আপন মনে করে বলতো, তোমরা একটু দাঁড়াও, তোমার বড় বোন হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। আরে বাবা তাও বলতে হ'ত না, যদি মুখ ফুটে বলতেন, 'কি মালিনী কেমন আছো?' সেটাই ত যথেষ্ট হ'তো। যার যার বিবেচনা তার তার নিজের কাছে। আরে বাপু, আমার মায়ের পেটের বোন—। বলিহারি মানুষ, নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্যে ও সব করতে পারে। ওকে আর আমি চিনিনে? যদি ছোটদি মারাও যায় তবু একটা খবর দেবে না। এই যে এত বড় অসুখটা হয়েছে, আজ এখানে হোঁচট খেয়ে দেখা না হ'লে আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম না।

রিকশায় বসেও মহিমারঞ্জনের গুণ ব্যাখ্যান চলল—বেশ, আমরা না হয় পর হয়ে গেছি, কিন্তু মা! মা কি দোষ করলেন? বুড়ো বয়সে মেয়ের যদি ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে বেঁচে থেকেও তিনি চোখের দেখাটা দেখতে পাবেন না! জমিদার! জমিদার হ'লে বুঝি বিবেচনা-বুদ্ধি বেবাক বিকিয়ে দিতে হয়—তাও যদি লাটের দরজা থেকে দশ বার পড়ি কি মরি ক'রে বাঁচাতে না হ'ত! সে সময় ত এই গরীব মজুমদারদের কাছেই হাত পাততে হয়েছিল। আর আজ সে জমিদারী ত ঘুচেছে, তবু বিষ নেই কুলোপানা চক্করখানি ফলাও রাখতে লজ্জা হয় না। আশ্চর্য।

আশ্চর্য হবার এর মধ্যে কিছু খুঁজে পেল না শ্রাবণী, কেন না মহিমারঞ্জনের ওরফে আগ্রহের বিশেষ অভাব নেই ব'লেই ওর মনে হয়েছে। এমন কি মালিনী যদি কথা বলতেন তাহলেই মহিমারঞ্জন বাধার প্রাচীরটা ভেঙেচুরে দিতে প্রস্তুত ছিলেন এটাই যেন প্রতীত হয়েছে। অন্ততঃ মেয়ের সঙ্গে তিনি খুবই শোভন এবং সংযত আচরণই করেছেন। 'বাবা' ব'লে ডাকতেও ইচ্ছে হয়েছিল শ্রাবণীর হয়তো মালিনীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার

যাতিরে পিতার পক্ষ থেকে সংযম পালিত হয়েছে তারই প্রভাবে শ্রাবণী ও নিজের উদ্বেলিত দুঃখাবেগ সামলে রাখতে সমর্থ হয়েছে। মোট কথা মালিনীরই ব্যবহারটা সমর্থনযোগ্য না হওয়াতে শ্রাবণী একটু বিস্ময় বোধ করেছে।

বাড়িতে পা দিয়েই মালিনী তাঁর মায়ের কাছে জামাইএর অদ্ভুত আচরণের বিশদ বিবরণ দিলেন। দিদিমা মুখ বুজে সব শুনে শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্ন করলেন—তা, দেখাই যখন হ'ল, কানেও যখন শুনলি তখন মায়ের মায়া খেয়ে এই বুড়ি মায়ের জন্যে হাসপাতালের ঠিকেদারিটা নিয়ে নিতে পারতিস! সবই আমার কপাল। কতো পাপে যে আর জন্মে করেছি—নইলে ভগবান আমার ললাটে এত খোয়ার কেন হবে! কতো লোক ত মহানন্দায় জলে হাত ডুবোয়—আমারই বেলায় শুধু চোখের জল ছাড়া আর কিছু মাপালে না ঠাকুর।

দিদিমা পা ছড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না যে কতক্ষণ চলত তার ঠিক কি। মাঝখান থেকে শ্রাবণী গিয়ে তাঁর কোলের ওপর বসে পড়ে বলল—তুমি কিছু ভেবো না দিদিভাই, আমি নিয়ে যাব তোমাকে।

—তুই, তুই কি করে নিয়ে যাবি?

—যাবো, তার আগে কথা দাও অমন করে কাঁদবে না।

মালিনী প্লেট দুটো হাতে এ ঘরে ঢুকে বললেন—রাজকন্যের খাবার সময় হয়েছে, চলো এখন খেয়ে নিয়ে উদ্ধার করবে চলো।

মাতৃনির কাছে আশ্বাস পেলেও মেয়ের অনুমতি ছাড়া কিছু করা চলবে না, দিদিমা তা জানেন ব'লেই প্রশ্ন করলেন—এই লীলাবতী বলছিল জানিস বৌমা, পাগল মেয়ে আর কাকে বলেছে—

—কি বলছিল তোমার লীলাবতী?

বলছিল হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি। তা তুই কি বলিস।

—পারে, যাবে। এর মধ্যে আমার আবার বলাবলির কি আছে। ওর মা, তোমার মেয়ে, তোমাদের আপনার-জন, তাকে দেখতে যাবে। বেশ ত। আমি কে?

—অই শোনো! আমি কি তাই বলেছি নাকি, গেলে কি তোকে বাদ দিয়ে যাবো আমি।

—মরে গেলেও আমি সেখানে যাবো না মা। না, সে আদেশ তুমি দিয়ো না আমাকে। তোমার জামাই আজ একটা কচি মেয়ের সামনে যে অপমানটা করেছে আমাকে, তার পর—। তবে হ্যাঁ, ছোটদির অসুখ, মায়ের প্রাণ, তোমার মেয়েকে তুমি দেখতে যাবে বৈ কি—তাতে আমি বাধা দেবো কি জন্যে। আর খুকীকেও নিয়ে যাবে, চোখের দেখাটা দিয়ে আসুক—কর্তব্য যা তা করতে হবে বৈ কি। আমারই কি—

কথাটা পুরো শেষ করতে পারলেন না মালিনী, তাঁর দু-চোখ বেয়ে অশ্রু নামল বন্যার বেগে। কোনো শব্দ হচ্ছে না, শুধু ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কাঁপছে। এ কান্নায় অভিমান নেই, অভিযোগ নেই, হয়তো নিঃসঙ্গ, অসহায়, নিষ্ঠুরতার বরফ-জমাট বেদনা দীর্ঘকাল পরে তরল হয়ে গলে গলে নামল। যেমন আপনি সেই ধারা নেমেছিল তেমনি আপন নিয়মে হয়তো এক সময় ঝরে ঝরে নিঃশেষ হয়ে থেমে যেত। কিন্তু তার আগেই, সিঁড়িতে ভারি গলায় হাঁক শোনা গেল—মাসিমা! ও মাসিমা!

সকলেই চমকে উঠল। শ্রাবণীই প্রথম সাড়া দিল—আসুন, আসুন বিজুদা।

মালিনীর অনাবৃত মনের আয়না মুখখানি মুহূর্তে সংসারী দায়িত্বের পোশাকী চেহারায় ফিরে এল। তিনি আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে সাড়া দিলেন—বসো বাবা। আমি এই গেলাম ব'লে।

এ বাড়ীর ভারি থমথমে গুমোট বাঁধা অবস্থাটা বিজয়ব্রতের উচ্চকণ্ঠের আলাপে নিমেষকালের মধ্যে বদলে গেল। শীতের পর হঠাৎ যেন বসন্ত বাতাসের আমেজ এনেছেন বিজয়ব্রত। কিন্তু এই বিজয়ব্রতের আজ সকালের বিজয়ব্রতের কোনই মিল নেই। সারাটা দিন তাঁর কেটেছে প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যেন। এলোমেলো ভাবে অস্থির তাড়নায় এখান-ওখানে ঘুরে ঘুরে যেন নিজের কাছ থেকে তিনি নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। নিজের মুখোমুখি হওয়ার, নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতো মুখ তাঁর নেই। অথচ এই মুহূর্তে তাঁকে দেখে কেউ কি সেটা টের পাচ্ছে!

বিজয়ব্রতের সকাল আজ হাজির হয়েছিল জেলখানার পরোয়ানা নিয়ে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অনীতা ঘরে ঢুকল বিজয়ব্রত তা টের পেয়েই বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন। অন্য দিন এই সময়টা জেগেই প্রতীক্ষা করেন বিজয়, অনীতা তাঁর ঘন ঘন কোঁকড়া চুলের বিলি কেটে দিয়ে মৃদু সুরে গায় 'তোমারি সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে সুর আমার রমনীয়'। কিন্তু আজ আর সে সুরের স্বাদ গ্রহণে আনন্দ নেই অসংখ্য শঙ্কার কাঁটা যেন তাতে শিজ্‌-শিজ্‌ করছে। গম্ভীর ভাবে হাত বাড়িয়ে তিনি পাত্রটি নিলেন। তারপর খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

চায়ের পালাটা নীরবে চুকল। অনীতা নতমুখে চলে গেলে পরে ডায়েরীর পাতায় কলম ছুঁইয়ে বিজয়ব্রত থমকে থেমে গেলেন। না, আজ আর ডায়েরীতে কিছু লিখবেন না। অথচ এই ক'দিনে যেসব কাণ্ড হয়ে গেল সেগুলো তাঁর মনে চিরদিনের জন্য লেখা হয়ে থাকবে। মোছবার কোনো উপায় নেই। বিরাট সমস্যা জটিল। জটিলতার গ্রন্থিতে গোটা অস্তিত্বই সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন। অবশ্য সাদাভাবে দেখতে গেলে একটা জীবনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সেই একটা জীবন যদি আরো অনেকগুলি জীবনকে বিক্ষুব্ধ ক'রে, তাহলে ? অথচ অনীতা বলেছে, "আমি সব জানি। সবদিক ভালো ক'রে ভেবে দেখেছি। কিন্তু আমার সামনে এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই বিজু দা। এ আর ভালো লাগে না। তুমি আমাকে বিয়ে করো। করো, করো, করো।" কান্না, কান্না, কান্না। বিজয়ব্রতর বুকে মুখ গুঁজে মুঁপিয়ে মুঁপিয়ে কেঁদেছে অনীতা। সিনেমার অন্ধকার হলখানা যেন ওর সেই কান্নার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। বিজয়ব্রতর চোখের সামনের মানুষে যোভারীর সমস্যা-তাড়িত জীবন যেন অনীতার কান্নার কাছে তুলোর মতো লঘু। অনীতার নিটোল কোমল স্তনের অবস্থান বিজয়ব্রতের কব্জিকে অসাড় করে দিয়েছে। সেই কব্জি শুধু এইটুকু খবর পৌঁছে দিচ্ছে তাঁর মগজে, এই যে নরম দুটি কামনার কেন্দ্র ওর গভীরে প্রচণ্ড অস্থিরতা বহমান। অনীতা অনেক কেঁদে—কান্নার মধ্য দিয়ে উদ্দাম যৌবনকে ক্লান্তির তীরে ভিড়িয়ে যখন মুখ তুলল তখনও বিজয়ব্রতের মুখে কোনো কথা ফুটল না। একটা বিষণ্ণ হেসনা রুক্ষির আকারে হাজির হ'ল, অনীতা ফিসফিসিয়ে বলল—তোমার পক্ষে সেটা অসম্ভব জানি। জানি, বৌদির কথা ভাবছ তুমি। তোমার ছেলেমেয়ের কথা ভাবছো জানি। তাদের কাছে জবাবদিহীর কথা আমারই কি মনে হয়নি ? তা হয়েছে ব'লেই এতদিন ঠোঁট কামড়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছিলাম বিজুদা। কিন্তু আমি সব মেনে নিতে রাজী আছি যদি তুমি রাজী থাকো। আর কিছুই ভাবতে পারিনে। আমার কথা আমি-ছাড়া আর কেউ ভাবে না—একমাত্র তুমি আমাকে বোঝো, জানো, হয়ত তুমি আমাকে ভাবো। তুমি—' ...এতক্ষণে বিজয়ব্রত মুখ খুললেন, কথা যেন অনভ্যস্ত অক্ষর পরিচয়, বললেন—'আমি ! আমার জন্যে ভাবিনে। কিন্তু তুমি ! তোমার কি হবে। যা আশা করছ তা তো পাবে না অনু। শান্তি পাবে না। এখন এই যে আকুলি-বিকুলি, এই যে একজনকে কাছে পাওয়ার দারুণ ইচ্ছে যেন তাকে পেলেই সব সিদ্ধি মিলবে মনে হচ্ছে, আসলে তাকে পেলেও পুরোটা পাবে না, সেখানে তারও আর পাকিস্তানের মতো প্রতিটি মুহূর্তে নানা ছোট-বড় স্বার্থ, দ্বেষ, সমস্যা নিয়ে নিত্য বিতণ্ডা লেগেই থাকবে। আর আর কি জানো ? তোমার তখন এই মনে হবে যে, বিজুদা ভয়ানক ঘরোয়া লোক, তোমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে মাথাটি খেয়ে তোমার জীবনটাই ছারখার ক'রে দিল। সত্যি অনু আমি এমন লোভনীয় কিছু নই—তা ছাড়া বিক্রী হয়ে যাওয়া মানুষটাকে আবার বেচবার কোনো অধিকার কি আমার আছে ? তুমি বলো !'

অনীতা হঠাৎ যেন পাগলের মতো ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠল—'স্বার্থপর ! লোভী, জানোয়ার তুমি। যদি আমাকে স্বীকার করে নেবার সাহসই নেই তবে কেন তুমি এমন ক'রে কাছে টানলে। কেন, কেন, কেন ? কেন তুমি ভালোবাসলে, কেন নিলে আমার ভালোবাসা।

কোনো জবাব দিতে পারেন নি বিজয়ব্রত। ওর ওই অনন্ত দুটি চোখের দিকে বিহ্বল স্থির দৃষ্টি রেখে শুধু প্রশ্ন করেছেন—'তুমি কি বিশ্বাস করো, আমি তোমায় ভালোবাসি।

—নিশ্চয় করি। কিন্তু তুমি আমার সব জেনেও কেউ

নও এটা যখন ভাবি তখন মনে হয় সব মিথ্যে। সত্যি বিজুরা সেই ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি, যখন তোমরা ছিলে একতলার ভাড়াটে, তখন থেকেই তোমাকে ভালোবেসে এসেছি—টের পাইনি। টের যখন পেলাম তখনো ভরসা ছিল তোমার ওপর, এখনো ভাবতে পারি নে তুমি ছাড়া আর কেউ আমার ভরসার পাত্র হতে পারে। আর কাউকেই ত মনপ্রাণ দিয়ে মেনে নিতে পারব না। তুমি যখন এখানে থাকো না তখন নিজেকে দিয়ে অনেক ট্রায়াল দিইয়েছি কিন্তু সে যেন হয় না।

হঠাৎ সিনেমা হলের আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠে ওদের দুজনকে বাস্তবের মুখোমুখি করে দাঁড়িয়ে দিয়ে ছিল। তারপর ফিরতি পথে অনীতা বিজয়ব্রতের গম্ভীর দার্শনিকতার মতো নিজের নীরবতাকে ভাঙবার জন্যে নিজে থেকেই অনেক কথা বলে গেল—বিয়েটা যে কী অসম্ভব ব্যাপার তা আমি খুব বুঝি। তবে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় যখন পাগল হই তখন ভাবি হোক গে, যা হয় হবে বিয়েটা করে থাক—কিন্তু সব মাটি করে দিয়েছে নিয়তি, আগে থেকে অন্যের হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে আবার ভাবি, ওদেশে ত আবহাওয়া এমন হয়, বছরে-বছরে মেয়েরা স্বামী পাল্টায়, কই তাতে ত তাদের কোনো অসুবিধে হয় না—দিব্যি হেসেখেলে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। ওদেশের বা যাবার কি দরকার, আমাদের দ্রৌপদী একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা স্বামী নিয়ে ঘর করেছে। আমাদের মিনতিদি কি বলে জানো, যখন যার সঙ্গে সম্পর্ক তখন তার সঙ্গে সিনসিয়ারলি সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার—তার মধ্যে যেন ফাঁকি বা চালাকি না-থাকে। ধরো যদি আমার কোনো দিন বিয়ে হয় তাহলে আমি তখন থেকে পিওরলি তাকেই নিয়েই থাকবো। অবিশ্যি সেটাই হওয়া উচিত। কিন্তু জানো বিজুরা আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি নে, হয়তো, হয়তোই বা বলছি কেন—এখনো তোমাকে ছাড়তে পারব না। এই যেমন তুমি, তুমি ত বৌদিকেও ভালোবাসো, কিন্তু সেইসঙ্গে আমাকে কাছে পেলে—

আরো কতো কথাই অনীতা বলেছে। সে সব কথা ডায়েরীতে লেখা চলে না, কিন্তু মনের লেখা কে মুছবে। আর সেটা মোছা যাচ্ছে না বলেই বিজয়ব্রত নিজের কাছ থেকে, অনীতার আওতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সারাদিন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সঙ্কল্প করলেন। সকালেই অনীতার মাকে বলে দিলেন—'কাকীমা; আজ আর ফিরবো না এ বেলা। জরুরী কাজ আছে।' কাকীমা হাসলেন 'আমাকে অত বকাবকি করবে বাবা! খাওয়াদাওয়া করে বেরোও।' গম্ভীর বিজয়ব্রত সংক্ষেপে বললেন—'অত্যন্ত জরুরী জন্য আমার কোম্পানীর কর্তারাও ছেড়ে দেবে না আমাকে। সময় মোটে নেই কাকীমা।'

একটা কাজ বাড়ি থেকে বেরিয়েই প্রথমেই শ্রাবণীর কথা মনে পড়েছে। আর এই মনে-পড়ার জন্যই বিজয়ব্রত নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছেন। মনের ভেতরটা যখন নিজেকে সন্দেহ করতে শুরু করে তখন সব ব্যাপারেই কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অনীতার সমস্যাটাকে পাশ কাটাবার মতলবে যে-মানুষটা পথে বেরিয়ে পড়েছে সে কিনা আবার নতুন একটা সমস্যা সৃষ্টির সন্ধানে তৎপর হবে! না, বিজয়ব্রত কিছুতেই এই অঘটনের সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেবেন না। অতএব শ্রাবণীকে দেওয়া কথাটা অগ্রাহ্য করেই 'দৈনিক নয়া-দুনিয়া' পত্রিকার অফিসে হাজির হলেন।

এবং সারাদিন ঘুরে ঘুরে যখন শ্রান্ত হয়ে তাঁর কলকাতার আস্তানা অর্থাৎ অনীতাদের বাড়ি ফিরে যাবার চিন্তা মনে এল তখন ভাবলেন, ওদের বিয়ের কথাবার্তা যখন খানিকটা এগিয়েছে তখন সেটা যাতে চুকে যায় তার জন্য চেষ্টা করা তাঁর কর্তব্য। তাছাড়া কথা দিয়ে না-যাওয়াও ত এক ধরণের দুর্বলতা। আর যা-ই হোক বিজয়ব্রত নিজেকে অতখানি অপদার্থ প্রতিপন্ন দেখতে রাজী নন। তাই তিনি অসময় হলেও এই রাতেই এ বাড়িতে এসে জমিয়ে বসলেন। ভেতরের অস্থিরতাকে চাপা দেবার জন্যে একটু বেশি রকম হাসি আর গল্পের অবতারণা করলেন।

[ক্রমশ

শতবর্ষ পরে

"ছুঁচবেশী"

কমিটি ও ছাগল

ওঁরা যে কমিটিতে আছেন তা ওঁরা নিজেরাই ভুলে গেছেন। স্বাভাবিক কথা। বাংলাদেশের কোন কমিটিই ওঁদের বাদ দিয়ে হয় না, হতে পারে না। এত ভাল কাজের লোক আর কোথায় পাওয়া যাবে! অন্তত বাংলাদেশে যাবে না। তাই তাঁরা কাঁঠালীকলার মত সর্বঘটে আছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম, ধর্মঘট। কমিটি নামক ঘটনে তাঁরা থাকবেনই। কমিটি আছে, অথচ তাঁরা নেই, এ হতেই পারে না। তাঁদের বাদ দিয়ে কমিটি নেই। তাঁরা কমিটির প্রাণ।

এঁদের হাত থেকে দোষ রবি ঠাকুরেরও রেহাই নেই। রবি ঠাকুরকে ছেড়ে কথা কইবার লোক এঁরা নন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথকেও এঁদের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। যদি তিনি একটু পাবলিসিটি চান, তবে এদের দরজায় দাঁড়ানো ছাড়া ভদ্রলোকের অন্য কোন উপায় নেই। এ যুগের লোক কে আর পাবলিসিটি না চায়। আর রবি ঠাকুর তাঁর আজানুলম্বিত দাড়ি সত্ত্বেও এ যুগেরই লোক। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, ততদিন নিজের পাবলিসিটি তিনি নিজেই করতেন; প্রতি মাসে নিজের সম্পর্কে লিখতেন বিভিন্ন পত্রে। এরই জোরে তিনি জগৎ-জোড়া নাম কিনেছিলেন। ভদ্রলোকের গুণ ছিল—পাবলিসিটিটা ভাল বুঝতেন, গুণ না থাকলে উন্নতি হয়! কিন্তু এ হেন পাবলিসিটি ধুরন্ধরকে এঁদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এঁরা রবি ঠাকুরের চেয়েও বড়। এঁদের মুষ্টিভিক্ষার ওপর রবি ঠাকুরকে নির্ভর করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বেঁচে থাকতে হলে তাঁর নামাঙ্কিত একটি রাস্তা কলিকাতা মহানগরীতে তাঁর চাই, অথবা ভাল যায়গায় একটি মর্মরমূর্তি চাই; অথবা তাঁর নামে একটা থিয়েটার বা হল বা মিউজিয়াম বা লাইব্রেরী যাই তিনি চান না কেন, এঁদের দয়া ছাড়া রবি ঠাকুরের গত্যন্তর নেই।

রবীন্দ্রনাথ এত মূর্খ এবং এত অদূরদর্শী ছিলেন, যে কর্পোরেশনে বা মন্ত্রীমহলে একটা দল রেখে যেতে পারেননি। নইলে দেখুন, গান্ধীজী মরতে ফুরসুৎ পান না—প্রায় তার আগেই গান্ধীঘাট হয়, হ্যারিসন রোড পরিবর্তন করেন। কত অখ্যাত বা কুখ্যাত লোকের মর্মরমূর্তি কোলকাতায় আছে, গলি-ঘুঁজির নাম তো বাদই দিচ্ছি। কিন্তু রবিবাবুর মৃত্যু হয়েছে তা প্রায় এক কুড়ি বছর ধরে চলল, ভদ্রলোক এ যাবৎ কিছু সুবিধে করতে পেরেছেন কি? পারেন নি। এই শতবার্ষিকী তাঁর লাস্ট চান্স্। এই সুযোগে যদি তিনি কিছু আদায় করতে পারেন, তবে ভাল, নইলে ব্যবচ্ছেদকারীর বিসার্চের উপজীব্য ছাড়া তিনি আর কিছু হতে পারবেন না। তাই রবিবাবু এঁদের দ্বারে উমেদার।

কিন্তু এঁদের সময় কোথায়। কমিটির একটাও মিটিংও হয়নি। এঁরা কমিটি-বাজ লোক। এঁদের কমিটি কি একটা। তাছাড়া এঁরা আরো কত কি—তার ঠিক নেই। টাকা থেকে আত্ম-টাক সবই বাজাতে হয় এঁদের।

বরং সেদিক থেকে অনেক নিঃস্বার্থ কমিটির অন্যতম মহিলা-সদস্য লেডী আইভি চাকলাদার। প্রকাণ্ড বড় লোকের বৌ। এটাই প্রধান যোগ্যতা। তাঁর পেট, বুক, হাত ও পিঠের দিকে তাকালে বোঝাই যায় না যে তাঁর স্বামী তিনটা কাপড়-কলের মালিক—এত ভারমুক্ত তিনি। শুধু তাই নয়, বৈদেশিক মুক্তা নিয়মুখের উদ্দেশ্যে নিজের ঠোঁটে-গালে রং-কল বসিয়েছেন। ইংরেজী কেতাদুরস্ত মানুষ বলে বাংলা ভাঙা-ভাঙা বলেন, ক্লাস ওয়ানের ছেলের মত কুঁতে কুঁতে বাংলা পড়েন, আর লিখতে গেলে বানান—অবশ্য তাঁকে বাংলা বিশেষ লিখতে হয় না। এ হেন অসুবিধের মধ্যে মানুষ হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পড়েছেন, মুখস্ত রেখেছেন তার কয়েকটি পংক্তি (বক্তৃতায় প্রয়োগ করার জন্য) রবীন্দ্র-ভক্তিতেও কম নয় কারো থেকে। রবি ঠাকুরের ভাগ্যি বলতে হবে। এমন ভক্ত পেলে যে কেউ বর্তে

দেওয়া। রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর।

সেই আইডির কিন্তু সবার বড় কন্ট। তাঁকে সংস্কৃতির ঝালে-ঝোলে-অম্বলে থাকতে হয়। তাঁকে ছাড়া বাংলা দেশের সংস্কৃতির চাকা অচল।

কমিটির আর একজন সদস্য শিউতগৎ। ইনি খুব বড় ব্যবসায়ী। ইনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন, ছবি দেখেছেন, ব্যস আর কিছু নয়। কিন্তু একে ধনী, তায় দুরন্ত গোছের লোক। অর্থাৎ তিনি নিজে কিছু টাকা দেবেন, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ধরপাকড় করে কিছু আদায় করে দিতে পারবেন। অতএব মূল্যবান ব্যক্তি।

আছেন শংকরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি দুটো কাগজের মালিক। সেই বাবদে সম্পাদক। সুতরাং পাকে-প্রচারে তিনি অদ্ভুত।

এছাড়া আছেন মন্ত্রী। সারাজীবন 'রাজনীতি' করেছেন। অর্থাৎ দলের মধ্যে 'পলিটিক্স' করেছেন। নানা প্যাঁচ তিনি বোঝেন ভাল। তাই তিনি প্যাঁচ-প্রকারে এসেছেন।

নারী গৃহের শোভা। কমিটিরও। নারী ছাড়া কমিটি মানায় না। আইডি অবশ্য একা একশো। তবু সুন্দরী নারীও কয়েকজন রয়েছে। ওঁদের কৃতিত্ব ঐটুকুই ওঁদের সৌন্দর্য। কেউ শিশুপাঠ্য পত্রিকায় একটি-দুটি কবিতা লিখেছেন, কেউ সমাজকর্মী, কেউ কোন বড় লোকের স্ত্রী, কেউ নিছক সুন্দরী।

আর কিছু আছেন আমলা। খুবই পদস্থ। এঁদের একজনের নাম হোমরা আর একজনের নাম চোমরা। এঁরা গোঁফ চুমরে মাঝে মাঝে বলেন, 'এটার তো প্রভিসন নেই, ওটার বাজেট নেই।'

আর আছেন এক মুঠো সাহিত্যিক শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ। এঁরা এলেবেলে। আছেন; আসেন, বসেন, কাশেন, হাসেন, শোনেন, মাথা নাড়েন, বলার চেষ্টা এক-আধ সময় করেন, বলতে পাবেন। ওঁদের গলার জোর কম।

বহুদিন এ কমিটির মিটিং ডাকার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেটা সফল হয়নি। এতগুলো ব্যস্ত লোককে জড় করা কি চাট্টিখানি কথা।

সেই অসাধ্য আজ সাধিত হয়েছে। আলোচনা আরম্ভ হোলো। তার ধারণাটা এই রকম :

আইডি। (দেহ বেঁকিয়ে সুর নেড়ে)। উঃ আজ বড় গরম পড়েছে।

সকলে (সমস্বরে)। সত্যি।

মন্ত্রী। আমি জানতুম আপনার কষ্ট হবে। আপনার ডেলিকেট কনষ্টিট্যুশনের কথা তো জানি। তাই আজ কোল্ড ড্রিংকসের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

আইডি। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজ মিটিংটা কিসের। (সব মিটিংয়েই এঁদের মুখ দেখেন, অতএব গুলিয়ে ফেলেছেন।) শাড়ী প্রদর্শনীর, না রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনের ঠিক মনে করতে পারছি না।

শিউতগৎ। আপনার চিঠিটি মেলেনি। পত্তার কিন্তু গোলমাল রয়েছে।

শংকর। আমার দুখানা কাগজেই তো নোটিশ ছিল।

হোমরা। কাজ আরম্ভ করা যাক। রবীন্দ্র—

আইডি। মাই গুডনেস্, মনে পড়েছে। অত্যন্ত দুঃখিত।

একজন সুন্দরী (আইডির প্রাধান্যে ক্ষুব্ধ)। আলোচনা আরম্ভ হোক।

একজন সাহিত্যিক। আলোচনাটা কোথা থেকে আরম্ভ হবে?

শিউতগৎ। এটা আবার একটা কী কোথা? এর আগের দিন আমরা যেখানে ছেড়েছিলুম, ওহি থেকে সে সুরু হোবে।

আইডি। আগের দিন কি আলোচনা হয়েছিল আমার মনে নেই।

একজন সুন্দরী। আপনি তো সব মিটিংএ অ্যাটেণ্ড করেন না।

মন্ত্রী। আমারও মনে নেই। এত কাজের চাপে—

শংকর। আগে যদি বলতেন আর তারিখটা দিয়ে দিতেন, তাহলে আমার কাগজে যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তার কপি আনতুম।

একজন সঙ্গীতজ্ঞ। মিঃ হোমরার কাছে কোন 'মিনিট' নেই?

হোমরা। না, মনে করতে পারছি না।

শংকর। আপনার কাইলটা দেখুন না।

হোমরা ও চোমরা উভয়ে কাইল হাঁটকে কিছু সাদা

কাগজ বার করলেন। বললেন, 'কোন আলোচনা হয়নি এর আগে।'

আইডি। তাই বলুন। আলোচনা হবে আর আমার মনে থাকবে না, তাই কখনও হয়।

শংকর। ঠিক তাই, আমার কাগজে রিপোর্ট বেরোলে আমি সেটা প্রায় মুখস্ত বলে যেতে পারতুম।

মন্ত্রী। তাই বলি, কাজের চাপ যতই থাক, এটা কখনো ভুলতে পারি! রবীন্দ্রনাথ বলে ব্যাপার।

চোমরা। তাহলে আলোচনা শুরু হোক।

হোমরা। হ্যাঁ, গোড়া থেকে।

সাহিত্যিক। অগত্যা।

সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু বছরের অনেক কটা মাস যে চলে গেল।

মন্ত্রী। সাইলেন্স্ প্লীজ্। সবাই কথা বলবেন না। ওতে গোলমাল হয়।

শিউডগৎ। আমার প্রস্তাব—রবীন্দ্রনাথের লিখে একটা, কিছু কাম বহৎ জরুরী।

মহিলাদের কল-কাকলি। করা দরকার, করা দরকার। একটা কিছু, কিছু-মিছু। করা চাই, করা চাই।

সঙ্গীতজ্ঞ। বাইরের লোকে আমাদের ছিঁড়ে খেলে।

চোমরা। অত্যন্ত অরাজনৈতিক ব্যবহার।

শংকর। সারা দেশটাই। দেখেননি আমাদের কাগজের আজকের খবর?

মহিলারা। কি খবর? খবর কী? ভাল খবর? ভাল?

হোমরা। আমাদের সর্বপ্রথম একটা প্রোগ্রাম দরকার।

সাহিত্যিক। এবং সেটা ঘোষণা করা দরকার জন-সাধারণের কাছে।

শংকর। সেটা আমি করে দিতে পারব।

মন্ত্রী। হ্যাঁ, প্রোগ্রামটা ঘোষিত হলে লোকজন তাদের চেয়ারটা একটু কমাবে।

চোমরা। তে বাহলে একটা প্রোগ্রাম করা যাক।

হোমরা। বাজেটের মধ্যে করতে হবে।

মহিলারা। বেশ বড় করে করতে হবে, বড় করে। [illegible] ভাল ভাল সব। গান, নাচ।

[illegible] প্রোগ্রাম।

[illegible] দিতে পারি,

কিন্তু কাগজ? মেরামতীর ব্যাপারে ঘা কড়াকড়ি।

মন্ত্রী। আমি তো কোটা বার করে দিয়েছি।

শিউডগৎ। আমি আনিয়েও দিয়েছি

সাহিত্যিক। দুঃখিত।

সঙ্গীতজ্ঞ। কাগজ আনুন। বড় কাগজ চাই।

মহিলারা। বড় কাগজ, হ্যাঁ বড়। চাই, চাই খু-উ-ব বড়।

শিউডগৎ। বড়ই আছে। লিখিয়ে।

একটা রীল সামনে আনা হোলো। কাগজের রীল। মস্ত বড় কার্টিনের মত—এক মানুষ উঁচু। কাগজ জড়ানো।

মন্ত্রী। সাত মাইল লম্বা হবে কাগজটা খুললে।

সাহিত্যিক। বেশ লম্বা প্রোগ্রাম হবে।

মন্ত্রী। হ্যাঁ, সাত মাইল লম্বা।

মহিলারা। লিখুন, লিখুন। লিখে ফেলুন লম্বা—আঃ, সুন্দর। কী সুন্দর।

হোমরা লিখতে লাগলেন। সবাই বলতে লাগলেন, যার যা ইচ্ছে। নানা কিছু। বলা আর লেখা। লেখা, লেখা, লেখা।

কাগজের কার্টিন খুলতে লাগল। খুলতেই লাগল। আর তার লিখিত প্রান্তটা বাড়তে লাগল। বেড়ে চলতে চলতে ঘর ছাড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। লেখা চলছেই। কাগজ ঘর ছাড়িয়ে বাইরে যাচ্ছেই। কতক্ষণ ধরে লেখা চলল তার ঠিক নেই।

মন্ত্রী। এবার আমি উঠব।

শিউডগৎ। আভি থামলে হোয় না?

সাহিত্যিক। এক মাইল প্রোগ্রাম হয়েছে।

মহিলারা। মাত্র এক মাইল। মাত্র। এ মা! ছিঃ! এতে কি হবে। মা গো! আরো চাই, চাইই।

অতএব আরো খানিক চলল। হঠাৎ দরজার বাইরে শোনা গেল একটা আওয়াজ। কুচমুচ, কুচমুচ।

সবাই কান খাড়া করল। হোমরা কলম থামাল। না, কোন শব্দ নেই।

হোমরা আবার কলম চালাল। বস খস, খস বস।

আবার বাইরে শোনা গেল। কুচমুচ, কুচমুচ।

থমথম

আবার বাহিরে কুচমুচ কুচমুচ।

থমথম থমথম।

এবার কিন্তু আর কুচমুচ থামল না। কুচমুচ, কুচমুচ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কুচমুচ এগোচ্ছে।

সবাই এ ওর চোখের দিকে তাকাল। তারপর দরজার দিকে চোখ ফেরাল। সুদীর্ঘ কাপড়ের মত কাগজটা দরজার বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, একটু কাঁপছে

তারপর দেখা গেল দুটো শিং—দুটো মাথল যেন। তারপর কালো নাক। মুখ খুব্রি নয়। দাড়ি—খুব্রি। দাঁতের পাটি নড়ছে—অতি কর্মশীল।

মহিলারা কল-কল কণ্ঠে বলল, 'ছাগল। ওমা, কি হবে? ছাগল। যদি গুঁতোয়?'

মন্ত্রী। লালবাজার।

শিউডগং। মাথার জিরো।

ছাগল পরিতৃপ্তির স্বরে বলল, 'ন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ন্‌'।

হোমরা। এক মাইল খেয়ে ফেলেছে।

চোমরা। ছ'শ মণ দেড় গজ রয়েছে। এতে কি দেশবাসী সন্তুষ্ট হবে? ওদের যা খাই খাই স্বভাব।

মন্ত্রী। তবে না। যে দেশে এক মাইল না চলে ছাগলের খাই মেটে না, সে দেশে মানুষ যে কি চাইবে বোঝাই দায়।

হোমরা। এখন কি করা দরকার?

চোমরা। কাবাব দেখ।

হোমরা। অসম্ভব। ছাত ভেঙে একশা।

চোমরা। তবে এই দেড় গজই খেয়ে যাও।

মহিলারা। অসভ্য।

অসভ্য দেড় গজই খেয়ে ওঁরা চলে গেলেন তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছাগলের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

সোল অব লিলিথ

মেরী করেলী

অনুবাদক—হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এলরামির কথা শোনবার পর, কিরাজ হাতের ওপর গাল রেখে, বহুক্ষণ অবধি নানা কথা ভাবতে লাগল। মনের মধ্যে যেন তার একটা লজ্জার ভাবও জেগে উঠছিল। তাদের গোপন পরীক্ষার ব্যাপারে মাথা গলানর জন্যে, মনে মনে সে সত্যি লজ্জা বোধ করতে লাগল। কিন্তু, সেই সঙ্গে সে এ কথাও ভুলতে পারছিল না, সে ইচ্ছে করেই, এলরামি এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ তার কাছ থেকে গোপন রেখে ছিল।···এই বিরূপ মনোভাবটাই তাকে, এলরামির কাছে, নিজের অপরাধ স্বীকার করতে দিচ্ছিল না। তা ছাড়া, লিলিথের সুন্দর মুখের একটা অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, তার মধ্যে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছিল।···সে সৌন্দর্য—সে দেবী প্রতিমা, আর কোন দিন কি সে দেখবার সুযোগ পাবে?···না, হয়ত পাবে না।

তখনই কিন্তু তার মনে হল, আরোবা যদি তার সহায় থাকে, তবে আবার···বার বার, সে প্রাণভরে লিলিথের অপূর্ব সুন্দর মুখ খানি দেখতে পাবে···মখমলের মত কোমল হাত খানিতে হাত দিতে পারবে!···হাঁ, আরোবা তাকে নিশ্চয় সাহায্য করবে!

সে যখন নিজের মনে এই সব কথা ভাবছিল, ততক্ষণে যে এলরামি উঠে গিয়ে তার বড় চেয়ারটায় বসেছিল; তা সে লক্ষ্যই করেনি মোটে। এলরামি নিজের চেয়ারে বসে, কিরাজ যে হাতে লেখা পুঁথি খানির অতি কষ্টে কতকটা পাঠোদ্ধার করেছিল, সেইটাই সে পাতার পর পাতা অবলীলা ক্রমে দ্রুত পড়ে যাচ্ছিল। কাজেই সারা ঘরটা তখন নিস্তব্ধ।

কতক্ষণ পরে কিরাজ আড়ামোড়া খেয়ে আলস্য ভাঙলে,—কেমন যেন তার ঘুম পাচ্ছিল, চেষ্টা করে সে ভাবটাকে দূর করলে কিরাজ। মনে হতে লাগল, বোধ হয় তার ভাগ্যের ইচ্ছা-শক্তিই এমন অসময়ে তাকে তন্দ্রাতুর করছে। কথাটা মনে হতেই সে তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। আর তার এই সশব্দে উঠে পড়ার শব্দে, এলরামি পুঁথি থেকে মুখ তুলে, সহাস্যে কিরাজের দিকে চেয়ে জিগেস করলে,—"এখন—সব কথা শোনার পরও কি, তুমি আমায় দুষ্ট-বুদ্ধি বলে মনে কর কিরাজ?···বা সত্যি সত্যি তোমার মনে হচ্ছে, স্পষ্ট করে সেই কথা আমায় বল।···তাতে তোমার ভয় করবার কিছু নেই।"

ঈষৎ ইতস্ততঃ করে, কিরাজ বললে,—"কি যে মনে করা উচিৎ, আর কি না, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তবে, একথা আমায় স্বীকার করতেই হবে, যে তোমার সাধনা অতি অদ্ভুত!···আর আমার মনে হয় তা উগ্র—ভয়ঙ্করও!···"

"জীবন উগ্র, মরণ উগ্র, প্রেম উগ্র, আর ভগবানও উগ্র—ভয়ঙ্কর! এই এতগুলো ভয়ঙ্করকে বুকে ধরেই প্রকৃতির বুক দুরু দুরু করছে। জ্ঞানের বিভীষিকা, অজ্ঞানের বিভীষিকা···বিভীষিকা নেই কোথায় বলতে পার?"—বলতে বলতে তার চোখ দুটো যেন প্রচণ্ড দীপ্তিতে ধপ্ ধপ্ ক'রে উঠলো।

"অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন?—আমার কাছে এসো না। কোমরে ত' তোমার যাদুর দলের ছোরা ঝুলছে,—তবু তোমার এত প্রাণের ভয়?···অবোধ বালক! আমার কাছ থেকে, তোমার ভয়ের কি আছে?···আমি তোমায় কথা দিয়েছি, আগে সাবধান করে না দিয়ে, আমি আমার ইচ্ছা-শক্তি তোমার ওপর প্রয়োগ করব না।···কাছে এসো।"

স্খলিত পদে, কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই, কিরাজ এলরামির কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। এলরামি চেয়ে চেয়ে, তার রকম সকম দেখছিল। সে কাছে এলে, এলরামি মিশরীয় ভাষায় লেখা পুঁথিখানা দেখিয়ে তাকে জিগেস করলে,—"পুঁথিখানা, তুলে, কাল যারার

টেবিলের ওপর ফেলে দেছলুম। এসে দেখলুম তুমি পুঁথিখানা পড়ছ, বা পড়বার চেষ্টা করছ, তাই নয় কি ?"

"হ্যাঁ তা করেছি।"

"আচ্ছা, এটা পড়ে কিছু বুঝতে পেরেছ কি ?"—বলে ফিরাজের মুখের দিকে চাইল এলরামি।

"হ্যাঁ, বুঝেছি,—চালাকী, আর চাতুরী দিয়ে, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি কেমন ক'রে বিভ্রান্ত ক'রে দেয়। তোমার মতন চতুর চুম্বক-শক্তির অধীশ্বর, মানুষকে কত সহজে, কাল্পনিক দৃশ্য, কাল্পনিক শব্দ,—যার কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই,—তাদিয়ে বোকা বানিয়ে বাঁদর নাচাতে পারে।"

এলরামি শান্ত স্বরে বললে—"ঠিক, কিন্তু তা ছাড়া আর কি বুঝেছ ?"

রাগতঃ স্বরে ফিরাজ বললে,—"আর কিছু বুঝি নি।"

সহানুভূতিভরা স্বরে এলরামি বললে,—"কি দুর্ভাগ্য তোমার! কি ক'রে অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করে, তাই শুধু জানলে, কিন্তু নিজে একবার তা করবার চেষ্টা করেও দেখলে না ?···থাক এখন শেষ বারের মতন তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি, যে—আজ থেকে আমার সাধনা, আমার পরীক্ষার বিষয়ে কোন প্রশ্ন, কোন ইঙ্গিত করবে না তুমি, লিলিথের নাম কোন দিন মুখে উচ্চারণও করবে না, তার দেহ যে ঘরে রাখা আছে, তার ধারে-কাছেও যাবে না,—কখনও ভবিষ্যতে, সে ঘরের চৌকাঠ মাড়াবে না,—এই আমার আদেশ মনে রেখো।"

কথা শুনে, রাগে ফিরাজের স্বাভাবিক অবস্থার অতি-শান্ত চোখদুটোও জ্বলে উঠল যেন! বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সরোষে বলে উঠল,—"তোমার আদেশ ?···আমার আদেশ দেবার তোমার অধিকারটা কি শুনি ?···আর, আদেশ না মানলেই বা তুমি আমার করবে কি ?"

এক হাতে পুঁথি খানা নিয়ে, এলরামি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফিরাজের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বললে,—"আদেশ তুমি অমান্য ক'রবে না। তোমার 'না' উত্তর আমি মেনে নেবো না—জোর করেই আমি তোমার সম্মতি আদায় করব। শুধু তাই নয়,—ভগবানের পবিত্র নাম নিয়ে, তোমায় শপথ করতে হবে, যে কোন দিন, তুমি আমায়, বা দুনিয়ার কোন লোকের কাছে, আমার জীবনের সেরা পরীক্ষা সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কোন কথা বলবে না,—শপথ করতে হবে, যে, লিলিথের নাম পর্যন্ত কোনদিন মুখে উচ্চারণ করবে না।···"

এলরামির কথায় বাধা দিয়ে ফিরাজ বলে উঠল,—"জেনে রাখো, এ শপথ আমি ক'রব না। লিলিথের মিষ্টি নামটি আমার প্রাণে আনন্দ জাগায়,—তবে কেন সে নাম আমি মুখে উচ্চারণ ক'রব না ?···তার নাম দিয়ে, কেন আমি গান বাঁধব না ?···কেন তার জন্যে, ভগবানের কাছে আমি করুণা ভিক্ষা করব না ?—প্রার্থনা জানাব না ?···কেন ?···কেন ?···কেন ?"

ফিরাজের কথা শুনতে শুনতে এলরামির চোখের দৃষ্টি ভয়াল হ'য়ে উঠলো, ভ্রূদুটো কুঁচকে গেল, ঠোঁটে ভীষণ দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠল।

"তোমার 'কেন'র জবাবের উত্তর আছে, তার মধ্যে কেবল একটাই তোমায় বলছি—কারণ লিলিথের দেহ, লিলিথের আত্মা, আমার নিজস্ব সম্পত্তি, তোমার তাতে কোন হিস্সেই নেই। তোমার বাঁধা গানের, তার কোন দরকারই নেই,—না তোমার তার জন্যে প্রার্থনার। মূর্খ, শক্তি থাকে ত' আমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিহত কর এবার,—তোমায় জানিয়েই আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করছি,—ভুলে যাও লিলিথের নাম!—শপথ কর আমার আদেশ মত!"

ফিরাজের মনে হল, শেষের কথাগুলো বলতে বলতে, এলরামির দেহটি, আড়ে বহরে বেড়ে, যেন এক বিরাট আকার ধারণ করলে তার অগ্নিবর্ষী চোখ দুটোর দিকে, মুহূর্ত মাত্র চেয়ে ফিরাজ হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। বেশ বুঝতে পারলে সে, এ দুর্বার শক্তির কাছে, সে প্রবল স্রোতের মুখে কুটোর মত, নিতান্ত অসহায়। যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে, প্রতি মুহূর্তে তার সব শক্তি, সব সাহস, ক্ষীণ থেকেও ক্ষীণ হয়ে কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে! এ শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা, অসম্ভব, বাতুলতা মাত্র!

এলরামি গর্জে উঠলো আবার,—"শপথ কর, এখনও শপথ কর, ভগবানের নামে।···এই ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ কর, আমার জীবনের রহস্য, চিরদিন গোপন রাখবে,···বলতে

বলতে, নিজের গলায় ঝোলান, একটি ছোট রূপোর ক্রুশ. সে ফিরাজের দিকে এগিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা-ভরে হাঁটু গেড়ে বসে, ফিরাজ ক্রুশটি, দুহাতে ধরে, ভক্তিভরে চুম্বন করে বললে,—"আমি শপথ করলুম।"

বলতে বলতে চোখ দুটো তার পরাজয়ের অশ্রুতে ছলছল্ ক'রে উঠলো। মৃদু কম্পিত স্বরে সে বললে,—"তা বলে, লিলিথের নামটা আমায় ভুলতে বোল না।"

সে অনুনয় গ্রাহ্য না ক'রে আগের মত রূঢ়স্বরে এলরামি বললে, "ভগবানের নামে শপথ করছ?"

"হ্যাঁ, ভগবানের নামে শপথ করছি।"

"যিশুর মৃত্যুর নামে শপথ করছ?"

একথা শুনে, থর থর ক'রে ফিরাজের সারা দেহ কাঁপতে লাগল, কারণ ফিরাজ আর এলরামি যে ধর্ম মেনে চলত, তাতে এ শপথ সবচেয়ে বড়,—দুর্লঙ্ঘ্য!

"যিশুর মৃত্যুর নামে শপথ করছি।"

"বেশ। ওঠ এবার।"—বলে ক্রুশটি ফেরৎ নিয়ে এলরামি সেটি আবার নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখলে, আগে যেমন ছিল। তার পর কতকটা স্বাভাবিক স্বরে ফিরাজকে বললে,—"মনে রেখো, এরকম শপথ, স্বর্গের খাতায় লেখা থাকে···আর, এ রকম শপথ ভাঙলে স্বয়ং ভগবান তাকে অভিশাপ দেন।···কিন্তু ভয় নেই তোমার। আমি জানি, এ শপথ কোনদিন ভাঙবে না তুমি। আর আমার ইচ্ছেঅনুসারে লিলিথের নামও তোমার মনে থাকবে না।"

উঠে, ফিরাজ নিশ্চল, নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল মনে হ'ল কোন কিছু যেন সে বলতে চাইছে, কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন কথাই বেরুল না। বুঝতে পারছিল, মনে মনে তার খুব রাগ হচ্ছে, কারণ, এই মাত্র সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অতি নির্বোধের মতই, এক দুশ্ছেদ্য শপথ করছে; কাজেই নিজের ওপর তার রাগ করবার কারণ সত্যি সত্যিই ঘটেছে। কিন্তু রাগটা যে ঠিক কার ওপর তা সে সহসা বুঝে উঠতে পারছিল না। এটাকি সত্যিই নিজের ওপর?—না, এলরামি,—যে তার বড় ভাই, তার চির-শুভানুধ্যায়ী, তার প্রতিপালকের ওপর? কথাটা মনে হতেই লজ্জা, আর অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল, আর আগেকার মত এলরামির প্রতি স্নেহ ও সমীহে তার প্রাণ যেন উথলে উঠল।

দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে, এলরামি কাছে এগিয়ে যেতে যেতে কাতর কণ্ঠে বললে—"ক্ষমা কর এলরামি,—দাদা আমার, আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি। সে কথা বুঝে, মন আমার দুঃখে ভরে উঠেছে। তুমি যেমন বলবে, তেমনি করেই এ অপরাধের আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু দাদা, দোহাই তোমার, আমার লিলিথের নামটা ভুলতে বল না'—তা আমি পারব না।...নামটা, মানে আমার গানের মতন শুনতে করে—মাঝে-মিশলে, মনে মনে এ নাম নিলে, তোমার কি-ই বা ক্ষতি?—আর সব বিষয়ে, আমি যেমন শপথ করেছি, তেমনই করব।···আর যা ক'রে ফেলেছি, তার জন্যে আবার আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি।"

সাগ্রহে ফিরাজের দুটি হাত নিজের হাতে ধরে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে এলরামি বললে—"বার বার ক'রে আর তোমার ক্ষমা চাইতে হবে না ভাই। তুমি প্রথমবার চাইতেই, আমি সর্বান্তকরণে তোমায় ক্ষমা করেছি, জেনো। —বয়েস তোমার অল্প,—তার ওপর যৌবনকাল, চিরদিনই যৌবন চঞ্চল, আর ক্ষণস্থায়ী। কাজেই যৌবনের অপরাধ, অল্পেই ভুলে যাওয়া উচিৎ।···তা ছাড়া, তুমি যতটা মনে কর সত্যিই ততটা ক্ষুব্ধ আমি নই ফিরাজ!"

অল্পক্ষণ নীরব থেকে, এলরামি আবার বললে,—"তোমার কবিত্বভরা স্বপ্ন, তোমার সুখে মশগুল ক'রে রাখুক। এ পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট, যেন কোনদিন তোমার মনকে ছুঁতে না পারে এই আমার কামনা।··· তোমার নিজের যদি তাতে অমত না থাকে, তবে এখনও আমি সেই ভাবেই তোমার নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করে যাব। আর তা যদি তুমি না চাও?.. বেশ ত', তাহলে অতঃপর আমরা অনায়াসেই যে যার খুসীমত পথ বেছে নিতে পারি। আমার পথে আমি, আর তোমার নিজের মতে—নিজের পথে তুমি, দিন কাটাতে পার। কে বলতে পারে, তাতে হয়ত ভবিষ্যতে তুমি এর চেয়েও বেশী খুসী হতে পারবে..."

ফিরাজের দুচোখ উপছে জল ঝরে পড়ল। মুখ তুলে

করুণ স্বরে সে বললে,—তোমার কাছ থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে না!

"না, না, আমি তাড়াতে চাই না। বলছুম, যদি তোমার সেই রকম ইচ্ছেই হয়, তবে তুমি অনায়াসে এখান থেকে চলে যেতে পারো।"

"না, কোন দিনও না,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি জীবনের শেষদিন অবধি এমনি ক'রে তোমার আশ্রয়ে, —তোমার আড়ালে, থেকেই দিন কাটিয়ে দেব।"

কৌতূকদৃষ্টিতে ফিরাজের দিকে চেয়ে এলরামি বললে "শেষদিন? ...কিসের শেষ ফিরাজ?"

"আঃ, এটাও বুঝলে না? আমি বলেছি জীবনের শেষদিন—তার মানে মরণের দিন অবধি।...তাহলে জন্ম যার আছে, অর্থাৎ আরম্ভ যার আছে, শেষ অর্থাৎ মৃত্যুও তার নিশ্চয়ই আছে। নয় কি?"

"বড় গোলমেলে প্রশ্ন ফিরাজ! আমার মনে হয়—জীবনের কোনদিন আরম্ভ হ'য়েছিল কি?...আর তার শেষ কোথাও আছে কি?"

"তোমার সব ভাবনাই এইরকম গোলমেলে...তার কারণ তুমি বড় বেশী করে ভাব। তোমার প্রশ্ন অনেক সময়েই আমি যেন বুঝেই উঠতে পারিনা।...আমার বড় ক্লান্তি-বোধ হচ্ছে। তোমার আর কোন কাজ এখন করতে হবে কি?—দরকার এখন যদি আর না থাকে, আমার, তবে ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে আসি। আর ভেবে দেখতে চাই, একা বসে, জীবনটা আমার কি?—আর কিভাবেই বা সেটা চালান উচিৎ।"

"ভাববার কথা বটে!" —বলে এলরামি ফিরাজের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, তাতে একটা মৃদু ঝাঁকানী দিলে। এবার ফিরাজ নিজের ঘরে যাবার জন্যে দুপা এগিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে বিস্ময়ভরা চোখে চাইতে চাইতে বললে,—"একি? হঠাৎ ঘরটা টাটকা গোলাপের মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল যে!...আর, ঐ শোন—শোন, কি সুন্দর মিষ্টি গলার, নতুন রকমের সুরের, প্রাণ-মাতান-তান উঠল দিকে দিকে।"

তখনও ফিরাজের হাতখানা এলরামির হাতেই ধরা ছিল। এইবার এলরামি সে হাতটা ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরাজের মত হতে লাগল যেন সেই অপূর্ব-সুন্দর গানের রেশ, দূর থেকে দূরে সরে যেতে যেতে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে! কথাটা ভেবে দেখতেই ফিরাজ বুঝতে পারল সব।

হেসে, এলরামির দিকে চেয়ে সে বললে— "বুঝেছি— এ তোমার যাদু-বিদ্যা এলরামি। গান যে আমি শুনছি, তা তোমার অজানা নয়। তুমিই এ কল্পনার-গান, আমায় শুনিয়েছ,—কিন্তু কি অপূর্ব! কি স্বর্গীয় সুরের ঝঙ্কার। ...চমৎকার,—অতি সুন্দর। ...সত্যি এলরামি তোমার এ অপূর্বশক্তি, তোমার নিশ্বেরের মর্যাদাক্ষ করে নি কেন? ...যাই, আমি এখন। ...বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে আমার। ...কিছু কাজ পড়লে ডেকো।"

"না, এখন আর তোমার দরকার নেই।"

দোর খুলে ফিরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরাজ চলে গেলে, এলরামি নিজের চেয়ারে বসে পুঁথি নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগল।

মনে তখন তার ভাবনা হচ্ছিল,—"একি অস্থিরতার আজ আমার মন ভরে উঠেছে? ...এর কারণ আমি নিজেই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না যে! অদৃষ্ট কি আমার ওপর বিরূপ হচ্ছে? ...সত্যিই কি আমি সাধারণ স্তরের মানুষের চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নই? ...তা না হলে, আজ আমি এত রিপু-পরবশ কেন হয়ে উঠছি? ...লিলিথ আর একজনের প্রাণের আকুতি,—প্রেম-ভরা ডাক শুনে হেসেছে! —এই ত' ঘটনা? ..তার জন্যে আমার মন আজ এত চঞ্চল কেন হচ্ছে?"... [ক্রমশঃ

যুদ্ধ না শান্তি

শৈলপতি মুখোপাধ্যায়

★

সম্প্রতি আর একটি বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্যতা, শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কমিউনিস্ট জগতে আলোচনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া সাংবাদিকরা মহা উৎসাহে হরেক রকম টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য মারফৎ সমস্ত আলোচনাটাকে এমন ঘোলাটে করে তুলেছেন, যে এর মধ্যে কতটাই বা মার্কসবাদীদের আসল বক্তব্য, কতটাই বা সাংবাদিকদের নিজস্ব মস্তিষ্ক-প্রসূত, বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং আসল ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে লেনিনের মত ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধ অনিবার্য, কারণ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির মধ্যেই যুদ্ধের বীজ রয়ে গেছে। তাঁর মতে "এক দেশে সমাজতন্ত্র জয়ী হলেই এক আঘাতে সাধারণভাবে সমস্ত যুদ্ধ নিঃশেষ হয়ে যায় না। এবং "যখন আমরা শুধু একটি মাত্র দেশে নয় কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে বুর্জোয়াদের উৎখাত করেছি, চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত করছি এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছি, কেবল মাত্র তখনই যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে পড়বে"। (স্তি পেচোরকিন, ইন্টার ন্যাশনাল এ্যাফেয়ারস, সংখ্যা ৯এ উদ্ধৃত) যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে এ যাবৎকাল মার্কসবাদীরা এই সিদ্ধান্তই আঁকড়ে ছিলেন। ১৯৫২ সালেও স্তালিন সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী রচনায় লিখেছিলেন "বলা হয়ে থাকে যে যেহেতু শান্তি রক্ষার এবং আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য শক্তিশালী গণশক্তি আজ এগিয়ে এসেছে—সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্য ভাবে যুদ্ধের জন্ম দেবে, লেনিনের এই তত্ত্বকে অচল বলে গণ্য করতে হবে। এটা কিন্তু সত্য নয়"। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ এই প্রশ্নে নতুন বক্তব্য উপস্থিত করলেন। "যুদ্ধ ভাগ্যের লিখনের মত অবশ্যম্ভাবী নয়" (war is not fatalistically inevitable) তাঁর মতে লেনিনের বক্তব্য ছিল সেই যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাই বিশ্ব জুড়ে ছিল এবং যুদ্ধ-বিরোধী শক্তিগুলি ছিল দুর্বল। এখন বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা একটি বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে এবং যুদ্ধ বিরোধী শক্তিগুলিও আগের চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী। "যুদ্ধ একটা অর্থনৈতিক ঘটনা (economic phenomenon) নয়। যুদ্ধ হবে কি হবে না, তা অনেকখানি নির্ভর করে শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর, জনসাধারণের সংকল্প, সতর্কতা ও সংগঠন কতখানি তার ওপর। উপরন্তু, কোন কোন অবস্থায় প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির সংগ্রাম চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকা নিতে পারে" (বিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট পৃঃ ৪৩) শান্তির স্বপক্ষে ক্রুশ্চেভ নিম্নলিখিত শক্তিগুলিকে দেখান :— (১) বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার নৈতিক বল এবং বাস্তব শক্তি উভয়ই আছে। (২) একদল শান্তিকামী রাষ্ট্র যাদের লোক সংখ্যা বিরাট। এর মধ্যে প্রাক্তন উপনিবেশগুলি পড়ছে। (৩) পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক-আন্দোলন; (৪) শান্তি আন্দোলন। অবশ্য যেহেতু পুঁজিবাদ থাকছে সেজন্য যুদ্ধের অর্থনৈতিক ভিত্তিও থেকে যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ লাগানোর চেষ্টাও করবে, সেইজন্য দেশে দেশে জনসাধারণকেও সতর্ক থাকতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে; শান্তির জন্য অবিরাম লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

১৯৫৭ সালে মস্কোয় শাসক পার্টির ঘোষণায় এবং শান্তি ম্যানিফেস্টোয় এই মতই সমর্থিত হয়। ১৯৫৯-এ রুশ পার্টির একবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ এই বক্তব্যকে আরো জোরের সঙ্গে উপস্থিত করেন: "সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপ ও এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নতুন কি উপাদান দেখা দেবে? আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে যুদ্ধকে নিঃশেষ করে দেবার সত্যিকারের সম্ভাবনা দেখা দেবে।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পৃথিবীর প্রধান শিল্পোন্নত দেশ হবে; চীন গণরাষ্ট্র শিল্পে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবির পৃথিবীর মোট শিল্পোৎপাদনের অর্ধেকের বেশী উৎপাদন করবে তখন বিশ্বপরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হবে। সমাজতন্ত্রের সাফল্য সারা দুনিয়ার শান্তির শক্তিগুলিকে আরো শক্তিশালী করবে। ঔপনিবেশিকতার যোয়াল-মুক্ত আরো নতুন নতুন দেশ শান্তির শক্তির পক্ষে যোগদান করবে। যুদ্ধ যে আর হতে দেওয়া চলে না, লোকের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও যুদ্ধ লাগানো যে বৃথা তা বুঝতে পারবে। "এই ভাবে, সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী জয়ের আগেই, পৃথিবীর একাংশে পুঁজিবাদ থাকতেই, মানব সমাজ থেকে বিশ্বযুদ্ধকে নির্বাসিত করার প্রকৃত সম্ভাবনা রূপ নেবে"। —(একবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট পৃঃ ৬৫) সন্দেহ নেই লেনিনের বক্তব্যকে এখানে ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য পুঁজিবাদ থাকছে বলে যুদ্ধের একটি সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এ রকম পাগলামি করলে পুঁজিবাদ নিজেই তার মরণ ডেকে আনবে। রুমানিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে বুখারেস্টে ক্রুশ্চেভ তাঁর মতের পুনরুক্তি করেছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশের পার্টিগুলির বুখারেস্ট কমিউনিকে (ঐ সভায় পুঁজিবাদী দেশের আরো আটত্রিশটি পার্টির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল) ১৯৫৭-র মস্কো ঘোষণাই আবার সমর্থিত হয়।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বগত পত্রিকা হংকিতে (লাল ঝাণ্ডা) প্রকাশিত লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক—প্রবন্ধে যুদ্ধ, শান্তি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও অন্যান্য প্রশ্নে যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদীদের সমালোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে দেখান হয়েছে—লেনিন প্রদর্শিত সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বদলায়নি, সাম্রাজ্যবাদ আগেকার মতই ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল ও রণলিপ্সু আছে। "তাহা হইলে কি সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাক্রমের সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির পরাক্রমের দরুণ এবং শান্তির শক্তিগুলির পরাক্রমের দরুণ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া লেনিনের ঐ কথাগুলি বাতিল হইয়া গিয়াছে? না কি, যদিও সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি বদলায় নাই, তবু উহা আর হিংসার শরণ লইবে না? এই সকল ধ্যান-ধারণা কি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিলে?" —(লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক পৃঃ ২৩) অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি বদলায়নি। "ইহা ঠিকই যে আক্রমণাত্মক মনোভাব হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি"—(অটো কুসিনন, লেনিন দিবসের রিপোর্ট)। "যখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যুদ্ধ বন্ধ করার সম্ভাবনার কথা বলে, দুটি বিরুদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলে, তারা মোটেই ধরে নেয় না যে সাম্রাজ্যবাদ আর আক্রমণমুখী নেই, কিন্তু প্রধমতঃ এবং প্রধানতঃ এই কারণে যে আমাদের যুগে শান্তির শক্তিগুলি পুঁজিবাদী দেশগুলির ওপর শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাপিয়ে দিতে পারে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, জাপান এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সত্ত্বেও তারা এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারে"—(ডায়লেকটিস অব আওয়ার টাইমস্, নিউ এজ সেপ্টেম্বর পৃঃ ১৪)। নিউ টাইমসে (সংখ্যা ৩০) অবজার্ভার লিখেছেন—নতুন অবস্থা বিচার করে বিংশ কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আমাদের যুগে যুদ্ধ আর অনিবার্য নয়, কেন? পুঁজিবাদের পরিবর্তন হয়েছে বলে? সাম্রাজ্যবাদ তার স্বভাব বদলে ফেলেছে বলে? না, সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি একই রকম আছে কিন্তু তার ক্রিয়াক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছে"।

"সাম্রাজ্যবাদী যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যুদ্ধের প্রত্যেকটিই যে অন্য উপায়ে রাজনীতিরই অনুবৃত্তি মাত্র"। লেনিনের এই উক্তি উল্লেখ করে হংকির প্রবন্ধে যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদীদের আক্রমণ করে বলা হয়েছে, "যুদ্ধের অন্তর্নিহিত শ্রেণী-চরিত্রকে অস্বীকার করিয়া তাহারা এইভাবে ন্যায়যুদ্ধ ও অন্যায়যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটিকে মুছিয়া দেয়।" (পৃঃ ২৯) বিশ্ব ট্রেড-ইউনিয়ন ফেডারেশনের একাদশ জেনারেল কাউন্সিলের অধিবেশনে নিখিল চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে সহসভাপতি লিউ চ্যাং সেং এক বক্তৃতা দেন। "যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা কি মনোভাব অবলম্বন করব সে সম্বন্ধে লিউ চ্যাং সেং বলেন যে, তার আগে আমাদের সর্বপ্রথম যুদ্ধের চরিত্র সম্পর্কে একটা

পার্থক্য টানতে হবে।.....আমরা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত বৈপ্লবিক যুদ্ধের সপক্ষে দাঁড়াব এবং অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করব"।

"ঔপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দমনমূলক যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক জনগণের জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধ, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনগণের বিরুদ্ধে শোষক-শ্রেণীর দমনমূলক যুদ্ধ এবং জনগণের বৈপ্লবিক যুদ্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে—এই ধরণের যুদ্ধ ইতিহাসে চিরদিন বিদ্যমান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে এ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক জগতে কোনদিন এ যুদ্ধ থামেনি। ইন্দোচীনে, আলজিরিয়ার, সুয়েজ সম্পর্কিত এবং কিউবার যুদ্ধসমূহ এই ধরনের যুদ্ধ। ভবিষ্যতে যতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন বিভিন্ন চরিত্রের এই ধরনের যুদ্ধ অনিবার্য। উপরোল্লিখিত চরিত্রের যুদ্ধগুলি এড়ানো সম্ভব এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল এবং তথ্যবিরোধী"। (পিকিং বক্তৃতাবলী পৃঃ ১৮)। এই প্রশ্নে বুলগেরিয়ার পার্টি নেতা টোডর জিভকভ লিখেছেন,—"সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তির দৌলতে, পূর্বতন উপনিবেশগুলি যুদ্ধ ছাড়া, কম যন্ত্রণাদায়ক পথে স্বাধীনতা অর্জন করার অবস্থায় এসেছে। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে ন্যায়সঙ্গত মুক্তিযুদ্ধ অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে ন্যায্য এবং অন্যায্য যুদ্ধ সম্পর্কে লেনিনবাদী ধারণা এখনও বলবৎ আছে। মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে কমিউনিস্টরা তাকে স্বাগত জানায় এবং মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জনতাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত।" (শান্তি আজকের মূল সমস্যা, ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ, আগস্ট, ১৯৬০)।

"লিউ চ্যাং শেং বলে চলেন যে, যুদ্ধ এড়ানো যাবে কিনা এই প্রশ্ন প্রধানত বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো যাবে কিনা এই ব্যাপার নিয়ে"। এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক। বিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট থেকে শুরু করে বুখারেস্ট ঘোষণা পর্যন্ত প্রতিটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দলিলে সাধারণভাবে বিশ্বযুদ্ধ (world war) বন্ধ করার সম্ভাবনা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। আলজিয়ার্স এর মত জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ বা লাওসের মত স্থানীয় যুদ্ধ এই বিশেষ আলোচনার বহির্ভূত। সাধারণভাবে 'বিশ্বযুদ্ধ' বলতে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে আক্রমণ করে নতুন বিশ্বযুদ্ধ, না একটা থেকে আর একটায় গড়িয়ে জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ ঠিক কি বোঝাচ্ছে এ প্রশ্নও উঠতে পারে। ক্রুশ্চেভের একবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট (পৃঃ ৬৫) পড়লে মনে হয় ক্রুশ্চেভ সমস্ত রকমের বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করার কথাই আলোচনা করছেন। বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে লিউ চ্যাং সেং বলেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও শান্তির শক্তিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে যুদ্ধ বন্ধ করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ থাকছে, যুদ্ধের মূল কারণ থেকে যাচ্ছে, নতুন যুদ্ধ শুরু হওয়ার বিপদ থাকছে। বাদশ পার্টির ঘোষণা থেকে শান্তির শক্তিগুলির ঐক্য যে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে তার উদ্ধৃতি দিয়ে হংকি লিখছেন "এইসকল পরাক্রমশালী শক্তি যতক্ষণ ক্রমাগত বিকশিত হইতে থাকিবে, ততক্ষণ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পরিস্থিতি বজায় রাখা সম্ভব"...কিন্তু এইরূপ পরিস্থিতিতেও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যতকাল বজায় থাকে ততকাল হিংসার তীব্রতম রূপ, অর্থাৎ যুদ্ধ পৃথিবীতে কোনক্রমেই শেষ হয় না। বুখারেস্টে রুমানিয়ান পার্টি কংগ্রেসে চেং চেন বাদশ পার্টির মস্কো ঘোষণা সমর্থন করে বলেছেন শান্তির বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে যতকাল একতা থাকবে ততকালই যুদ্ধ নিবারণ এবং শান্তি নিরাপদ করার সম্ভাবনা রয়েছে। "বিভিন্ন দেশের জনগণের শক্তি ও সংগ্রামই হল যুদ্ধ প্রতিহত করার এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার নিয়ন্তা বস্তু" (পেং চেন)। লু চাওলি লেনিন জন্মবার্ষিক উপলক্ষে হংকিতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, শান্তির শক্তিগুলি ক্ষমতাশালী হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়েছে, কিন্তু, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে কিছুতেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধ করবে না বা আধুনিক যুদ্ধের মূল কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে" (পিকিং রিভিউ সংখ্যা ১৫)। উপরের বক্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে শান্তির সম্ভাবনা অস্বীকার করা হচ্ছে না, শান্তির স্বপক্ষে শক্তিবৃদ্ধির হিসাব করা হচ্ছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার জনগণের

উপরই থাকছে। শান্তিরক্ষা করার সম্ভাবনার সংগে সংগে সমান জোরে যুদ্ধের বিপদের কথাও উল্লেখ করা হচ্ছে কিন্তু বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধ করার উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার আশা সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না। বুখারেস্ট-ঘোষণার পর রেনমিন রিবাওর সম্পাদকীয়তে যুদ্ধ বন্ধ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে ১৯৫২র মস্কো ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হচ্ছে, "জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ হল বিপ্লবী জনগণ। দেখা যাক, কে সংগ্রামের ফলাফল রচনা করে—বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ যে বিপ্লবী জনগণ তারা? না, শতকরা ১০ ভাগেরও কম বিভিন্ন দেশের যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াপন্থী, তারা? দেখা যায়, আজকের দিনে বিশ্বের নিয়ন্তা কে?" এখানেও যুদ্ধ ও শান্তির কোন তরফে রায় না দেবার ঝোঁক স্পষ্ট। কে অস্বীকার করতে পারে শেষ বিচারে জনগণই ইতিহাসের ভাগ্যনিয়ন্তা? কিন্তু একথা লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে নতুন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে যুদ্ধ আর অনিবার্য নয় এই ঘোষণা অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে। বরং লিউ চ্যাং শেং সাবধান করে দিচ্ছেন, "আমরা যদি কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধ শুরু করা বন্ধ করার সম্ভাবনার কথা বলি, অথচ সাম্রাজ্যবাদের নতুন বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার বিপদের কথা না বলি এবং যুদ্ধের বিপদযুক্ত সামরিক প্ররোচনার সম্পর্কে সতর্ক না থাকি তবে আমরা কেবল নিজেদের ও জনগণকেই পঙ্গু করব।" পক্ষান্তরে 'চায়নেকাটিকস অফ আওয়ার টাইম' রচনায় পাচ্ছি, "বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি না দিয়ে একজন দ্বন্দ্ববাদী নিজেকে, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না; শান্তি সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা এবং সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না।.....রুশ পার্টির বিংশ ও একবিংশ কংগ্রেস, ভারত পার্টির ঘোষণা শান্তি ম্যানিফেস্টোর সিদ্ধান্তগুলির বিরাট তাৎপর্য এইখানে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বন্ধ করার একটা বাস্তব সম্ভাবনা আছে দেখিয়ে দিয়ে জনসাধারণের সামনে শান্তির একটা নতুন, স্পষ্ট, উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষ্য উপস্থিত করেছে। (নিউ এজ সংখ্যা ৯) স্বভাবতই আপনা হতে এই শান্তি আসবে না, জনসাধারণের সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঠিক নীতি একে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দরকার। লিউ চ্যাং শেং বলছেন, "এ রকম বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বকালেই চিরতরে যুদ্ধের বিপদ নির্মূল হতে পারে। সমস্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই ধরণের মোহ ছড়ানোর ফল খুব মারাত্মক হবে এবং আমরা এখনই এই রকম অবস্থা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি।" কিন্তু নিউ এজে প্রকাশিত রচনায় দেখছি।

"সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধ অনিবার্য এই পুরাতন তত্ত্বের উপর যান্ত্রিকভাবে নির্ভর করে বর্তমানে শান্তির জন্য সকল লড়াই চালানো অসম্ভব।" বুলগেরিয়ার পার্টি নেতা টোডর জিভকভ লিখছেন যুদ্ধকে যে নিবারিত এবং চিরকালের মত পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করা যায় এই স্লোগানের প্রচণ্ড জনাবেদন করার ক্ষমতা রয়েছে। এই স্লোগান যুদ্ধ-বিপদের বিরুদ্ধে জনতাকে সংগ্রামে উদ্দীপিত করে, তাদেরকে এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করে যে এই সংগ্রাম বৃথা নয়, এবং মানবজাতির বহু পুরাতন স্বপ্ন চির-শান্তিকে বাস্তবে পরিণত করা যায়। অপর পক্ষে আমাদের যুগে যুদ্ধ অনিবার্য বলার অর্থ হচ্ছে মানুষকে নিশ্চেষ্টভাবে পরমাণু যুদ্ধের বিভীষিকার জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় ফেলে রাখা, শান্তির জন্য তাদের সংগ্রামী ইচ্ছাকে পঙ্গু করে দেওয়া, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেওয়া। এই রকম মনোভাব শান্তির আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যায় না।" (ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ আগষ্ট ১৯৬০)। কি লিউ চ্যাং শেং, কি হংকির দুটি প্রবন্ধ, কি বুখারেস্ট ঘোষণার ওপর রেনমিন রিবাওর সম্পাদকীয় প্রত্যেকেই লেনিনের মত উপস্থিত করে বারংবার বলেছেন সাম্রাজ্যবাদ বজায় থাকাকালীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে যুদ্ধ একেবারে বন্ধ হওয়া অসম্ভব। "যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা পৃথিবী জুড়ে বিজয়ী হবে, কেবল তখনই যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী সম্ভব, অস্ত্রহীন পৃথিবী সম্ভব। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বকালে এই রকম ধারণা করা যায় না।" (লিউ চ্যাং শেং) "যখন, সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা

পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত হবে এবং শ্রেণীও বিলুপ্ত হবে একমাত্র তখনই সত্যকার চিরস্থায়ী বিশ্বশান্তি বিরাজ করতে পারে।" (রেনসিন রিভিউ)। স্তালিনও বলেছিলেন, "যুদ্ধের অনিবার্যতাকে নিষেধ করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ প্রয়োজন" (সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী পৃঃ ২৮)। এখানে বৃথায়েস্টে জুলিওর বক্তৃতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শান্তির শক্তিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধির বিবরণ দিয়ে জুলিও বলেছেন, "এ সব ছাড়াও কমরেডগণ বহু দশক আগে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভলাদিমির ইলিচ লেনিন কি বলেছিলেন বর্তমানে সেই কথা যান্ত্রিকভাবে পুনরাবৃত্তি করলে চলবে না—সারা দুনিয়ার সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনিবার্য বলে উক্তি করলে চলবে না। আমরা এখন এমন একটা অধ্যায়ে বাস করছি যখন সমাজতন্ত্রের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সমাজতন্ত্রের শিবির ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। যখন মেহনতী জনগণ আরও অধিকতর সংখ্যায় এসে সমবেত হচ্ছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে। ইতিহাস হয়ত এমন যুগের মুখ দেখবে যখন পুঁজিবাদ টিঁকে আছে মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক রাষ্ট্রেই। সেই স্বল্পসংখ্যক রাষ্ট্র তখন গায়ের একটা জামার বোতামগুলির মত। তবে? সেইরূপ পরিস্থিতিতেও কি আমরা ভাদিমির লেনিন তাঁর যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল উক্তি করেছিলেন যে গ্রন্থে, সেই গ্রন্থের পাতা উল্টে যেতে যেতে বলতে থাকব যেহেতু পুঁজিবাদী দেশগুলির অস্তিত্ব আছে সেই হেতু যুদ্ধ অনিবার্য।" এই বক্তব্য ব্যাখ্যা করে কি পেচোরকিন লিখেছেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিকাশের প্রথম স্তর ও সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী পূর্ণ বিজয় এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোন স্তরে যুদ্ধকে মানব সমাজ থেকে নির্বাসিত করার সম্ভাবনার কোন বিশদ আলোচনা লেনিন করে যান নি। লেনিনের জীবদ্দশায় করা সম্ভবও ছিল না। মাত্র একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক অবস্থার প্রভাব সাম্রাজ্যবাদের এমন কি দু-একটা নিয়মের ক্রিয়াকেও নিবৃত্ত করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্ষমতাশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুত্থানে মানব সমাজের বিকাশে গুণগতভাবে নতুন স্তরের উদ্ভব হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুগের যুদ্ধের নিয়মের কার্যপরিধি সঙ্কুচিত হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এটা সত্য লেনিন আবিষ্কৃত সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম এখনও চালু আছে, সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলি আরো তীব্র হয়েছে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার খুব উচু মাত্রায় অর্থনৈতিক বিকাশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা এবং ফলে সামরিক শক্তিতে সোভিয়েতের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্য, পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক আন্দোলন এবং জগৎজোড়া শান্তি আন্দোলন অবস্থাকে পাল্টে দিয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় কিঞ্চিৎ গৌণ হলেও উল্লেখ করা ভাল। শান্তির স্বপক্ষে উপাদান হিসাবে অটো-কুসিনিন বলছেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিগুলির ভারসাম্যের পরিবর্তন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধমান পরাক্রম এবং আর একটি যুদ্ধের স্পষ্ট প্রতীয়মান সর্বনাশা ফলাফল—এই সবের ফলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শাসক মহলে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। বুলমন্তিক শান্তি-বিরোধীদের পাশেই দেখা যাইতেছে ধীর বুদ্ধি রাজনীতিক-দের যাঁহারা বোঝেন যে গণহত্যার মাধ্যমে লইয়া যুদ্ধ করা বাতুলতা হইবে।

"সামরিক যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির বাস্তব পরিস্থিতি হইতেছে এইরূপ: যুদ্ধের জন্য যে নূতন অস্ত্র তৈয়ারী হইতেছে, তাহা শান্তির পক্ষেই প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিতেছে। মার্কসবাদীদের নিকট ইহা কোনও রহস্য নহে। মার্কসবাদের চিরায়ত সাহিত্যে একথা কখনও অস্বীকার করা হয় নাই যে নূতন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র শুধুমাত্র যে সমরকৌশলের মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারে তাহা নহে, নীতির উপরও তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে এ-সম্পর্কে এঙ্গেলস এ্যান্টিড্যুহ্রিঙ এ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করা যায়। নদেজ্দা ক্রুপস্কায়া বলেন যে, "লেনিন পূর্বেই একথা বুঝিয়াছিলেন যে এমন এক সময় আসিবে যখন যুদ্ধ এমন বিধ্বংসী হইয়া উঠিবে যে যুদ্ধ লাগাই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অবজার্ভারও বলছেন পুঁজিবাদী জগতের শাসক শ্রেণীর মধ্য একটি বিভেদের প্রক্রিয়া চলছে, কেননা এমন কি বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে কাহাকে দেখা যাচ্ছে যাঁরা বোঝেন আর একটি যুদ্ধের ফলে তাঁদের

সর্বনাশ হবে। তাঁদের ধনসম্পত্তি এবং বিশ্বের সুবিধাগুলি নষ্ট হবে, জাতিক অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেতে পারে। সুতরাং এই সব শ্রেণীর মুখপাত্রদের সমস্ত শান্তির অনুকূল বক্তব্যকেই মিথ্যে গলাবাজি বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিৎ নয়। হংকির একটি প্রবন্ধে (পিকিং রিভিউ ১৫) যদিও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তত্ত্বতত্ত্ব বিশ্লেষণ আছে এবং লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও প্রযোগবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে কিন্তু কুসিনিন উল্লিখিত দুটি প্রসঙ্গই অনুপস্থিত।

ভারত পার্টির ঘোষণা যেটা বর্তমানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সনদ হিসাবে পৃথিবীর সব পার্টি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে সেই দলিলে যুদ্ধ বন্ধ করার সম্ভাবনা এবং যুদ্ধ হওয়ার বিপদাশঙ্কা উভয়েরই উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হতে পারে কোন একটির উপর জোর দেওয়া বা emphasis নিয়েই যত সমস্যা। যুদ্ধ ও শান্তির সাধারণভাবে কোন দিকে পাল্লা ভারী তার চুলচেরা বিতর্কই বড় কথা নয়। শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে যুগোস্লাভ নেতা কার্ডেলীর বক্তব্য—"যদি নিরপেক্ষ ভাবে দেখি, তাহলে যুদ্ধ একেবারে চরম ভাবে বা ভাগ্য-লিপির মত অনিবার্য কখনোই নয়। এ চিরকালই শক্তি সাম্যের ওপর নির্ভর করেছে"—মার্কসবাদ লেনিনবাদ বিরোধী দেখিয়ে আর্নুঘানিয়ান ও কোরিস্তনভ বলছেন, "কার্ডেলী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতার সিদ্ধান্ত টানছেন শক্তির পারস্পর্যের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু কোন্ শক্তি পারস্পর্য এবং কোন্ যুগ নিয়ে প্রশ্ন সেটা সাবধানে চাপা দিচ্ছেন। যে যুগে পৃথিবী দুটি সমাজ ব্যবস্থায় ভাগ হয়ে গেছে, মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সেই যুগের শক্তি পারস্পর্য সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।" মনে রাখা দরকার যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের আলোচনা হচ্ছে একটি 'পিরিয়ড' নিয়ে। ঐতিহাসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে। কনস্টান্টিনভ ও সমুদ্নিয়ান বলেছেন সেই প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা যে শুধু আগামীকাল বা পরশুর কথাই ভাবে না কিন্তু এখন থেকে সাত বছর দশ বছর পরের ঘটনাবলীর আভাস দিতে পারে, অগ্রগতির মূল ঝোঁকটি ধরতে পারে, কোন শক্তি উঠছে এবং কোন শক্তি ক্ষয় পাচ্ছে লক্ষ্য করতে পারে এবং কিসের ওপরই বা জগতের ভাগ্য নির্ভর করছে বুঝতে পারে। মনে হয় ক্রুশ্চেভের বিশ্ব ঘটনাবলী বিশ্লেষণের প্রথম এবং প্রধান ধাপ হচ্ছে বিশে কংগ্রেসের প্রস্তাবের ঐতিহাসিক ঘোষণা "একটি মাত্র দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্রের একটি বিশ্বব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াই আমাদের যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।" হংকির প্রবন্ধের বিশ্লেষণের প্রারম্ভিক এবং মৌলিক ধাপ হচ্ছে বর্তমান যুগ সম্বন্ধে লেনিনের সুপরিচিত মত "আমাদের যুগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, সর্বহারা বিপ্লবের ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ।" লেনিনের এই বিশ্লেষণ অচল হয়ে গেছে এমন কথা কেউ বলেননি, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে এও সত্য কিন্তু বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক বিকাশের নির্ধারক বস্তু খুঁজতে গিয়ে হংকি যুগ বিচারের লেনিনের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন। "কোন নির্দিষ্ট যুগে (epoch) কোন ঐতিহাসিক গতি (movement) কত তাড়াতাড়ি বা কিরকম সহজ ভাবে বিকাশ লাভ করবে আমরা জানতে পারি না। কিন্তু আমরা জানতে পারি, জানিও যে কোন শ্রেণী একটা বা আর একটা নির্দিষ্ট যুগে কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে এর প্রধান বিষয়বস্তুকে, বিকাশের প্রধান অভিমুখকে, সংশ্লিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণ করছে।" হংকি লেনিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বর্তমান যুগে এই শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী এবং সর্বহারা বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপনেই মানব জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বুলগেরিয়ার পার্টি-নেতার মতে বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের যুগকে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ বলা একপেশে ও গোঁড়ামিদুষ্ট হবে, নতুন শক্তিসাম্যেরও হিসাব নেওয়া হবে না। লেনিনের ঐ একই বক্তব্য সমর্থন করে তিনি বলছেন "এই সংজ্ঞার মূল্যায়নের সময় পরিবর্তনগুলিকে অগ্রাহ্য করা, কোন সামাজিক শক্তি এখন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থলে আছে তাকে না দেখা ভুল হবে। এই ঘটনাগুলির কেন্দ্রে অবস্থান করছে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র সমবায় এবং শেষ বিচারে এটাই

বিশ্ব রাজনীতির ওপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছে।" মাও-সে-তুং বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে ত্রিবিধ দ্বন্দ্ব—সাম্রাজ্যবাদ বনাম উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ, সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজি বনাম জনসাধারণ, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বনাম সমাজবাদী রাষ্ট্র—যে আজও বজায় আছে এবং তীব্র হয়েছে এবং আধুনিক যুদ্ধের মূল কারণ হিসেবে কাজ করছে দেখিয়েছেন। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বর্তমান আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণের সঙ্গে স্তালিনের সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ঐ বিষয়ে আলোচনার খুবই সাদৃশ্য আছে। (লিফিং রিভিউ, ১৭)। কিন্তু আজকে ইতিহাসের গতি কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে না। আমাদের যুগে দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতার গতি ও ফলাফলের দ্বারাই বিশ্বের বিকাশ লাভ নির্ধারিত হচ্ছে—এই হচ্ছে ব্রাশ পার্টির ঘোষণা" (নিউ টাইমস্ ৩২)। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শুধু বিরোধগুলিকেই দেখতে শেখায় না, উপরন্তু প্রধান বিরোধগুলিকে পৃথক করতে শেখায়। আজকের আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দ্বন্দ্বই যে এই জাতীয় চূড়ান্ত বিরোধ, এটা আর বেশী জোর দিয়ে বলার দরকার করে না। বিশ্ব দ্বন্দ্বগুলির জটিল মাকড়সা-জালের মধ্যে এইটিই হচ্ছে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব; এইটিই আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র গতিপথকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করছে এবং অন্য জিনিস ছাড়াও পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে, পুঁজিবাদকেই দুর্বল করে দিচ্ছে।"—কনস্টান্টিনভ এবং সমদ্‌স্কিয়ান এই লেখকদ্বয় এবং পেচোরকিন লেনিনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যে অন্ততঃ কয়েকটি অগ্রসর দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপন, "সমগ্র বিশ্ব রাজনীতির ওপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম।" পেচোরকিন 'অগ্রসর' কথাটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এ জেনে বলছেন যদিও এখন এমন কয়েকটি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলি পুঁজিবাদের আমলে অগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ছিল না। কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে সামনে এগিয়ে চলছে। আগের লেখক দুজন কিন্তিৎ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলছেন যাঁরা লেনিনের

কয়েকটি নতুন "সোভিয়েত দেশ" পুস্তিকা

১। কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনার পূর্ণতর সদ্ব্যবহার
(এন. এস. খ্রুশ্চফের রিপোর্ট)

২। সোভিয়েত কলকারখানায় কর্ম-ব্যবস্থা (প্রশ্নোত্তর)

৩। শিশুদের লালন পালন (চিকিৎসকের পরামর্শ)

৪। আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ—নিরস্ত্রীকরণ—এন. এস. খ্রুশ্চফ

৫। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি
—এন. এস. খ্রুশ্চফ

সোভিয়েত অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা

:: অর্ডার দিবার ঠিকানা ::

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১/১, উউ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬।

লেখা থেকে উদ্ধৃতি ভালবাসেন তাঁরা এই উদ্ধৃতিটি তোলেন না কেন? বুখারেস্টে ক্রুশ্চেভ স্পষ্টই বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের মত অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং এই মত এখনো আমাদের মতবাদ ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধ্রুবতারার মত কাজ করছে। কিন্তু এই কথা তুললে চলবে না যে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছিল বেশ কয়েক দশক আগে। তখনও পৃথিবীর কাছে এমন অনেক বিষয় ছিল অপরিজ্ঞাত যেগুলি এখন ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পক্ষে, সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পক্ষে নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

যুদ্ধের অনিবার্যতার প্রশ্নের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নটি গুলিয়ে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্যমূলক মেঁাক পুঁজিবাদী প্রচারের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম থেকেই, যখন বিশ্ব-যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠে নি, তখন থেকেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ মার্কস্‌বাদীরা প্রচার করছেন। এই আদর্শকে সফল করার জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে সঠিক পররাষ্ট্র নীতির প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধতা নেই। "সাম্রাজ্যবাদ ও তার আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এটা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের স্বার্থে যখনই সম্ভব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা এবং সাক্ষাৎকারের আদান প্রদান চালাবে……চীনের সরকার কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনসাধারণ, কমরেড ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকারের প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রাষ্ট্রপ্রধানদের শৃঙ্গসম্মেলন আহ্বান, সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, পরমাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি শান্তি প্রস্তাব সক্রিয় ভাবে সমর্থন করেন" (লু চিং ইর বক্তৃতা)। "ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা-সম্পন্ন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য নমনীয়তা, ধৈর্য, কিছুটা বোঝাপড়া মনোভাব এবং আপোস রফার প্রয়োজন। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই ও জনগণের মৌলিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে চীনের জনগণ আপোস মীমাংসা করতে কখনোও অস্বীকার করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না"—(পিপলস ডেলীর সম্পাদকীয় পিকিং রিভিউ ১১)। চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত চুক্তিই তার জলন্ত প্রমাণ। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল নীতি লেনিন থেকে শুরু করে স্তালিন, ক্রুশ্চেভ, মাও সকলেরই নীতি কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই একটি মূল নীতি। অবশ্য শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অর্থ যে আদর্শগত সংগ্রামের বিরতি নয় এ কথা ক্রুশ্চেভ বিংশ-কংগ্রেসেই বলেছেন। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সময়ে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার দ্বারাই সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। যুদ্ধ বন্ধ করার অর্থ যে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামে বিরতি নয় এও সর্বজনী সম্মত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিপ্লব রপ্তানী করে না কিন্তু কোন দেশের ধনিকশ্রেণীকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টিও দেয় না। রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে আমেরিকা ভ্রমণের সময় নিউইয়র্কে ক্রুশ্চেভ বলেন "আপনারা কি চাহেন আমেরিকার জনগণ চিরকাল পুঁজিবাদী সমাজেই বাস করুক এই প্রতিশ্রুতিই কি আপনারা আমাকে দিতে বলেন?" ('দি কমিউনিস্ট' পত্রিকার প্রবন্ধে উদ্ধৃত)। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান স্থায়ী হবে, না দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে দুই শিবিরের যে রকম শান্তিপূর্ণ অবস্থান সেই ধরনেই চলতে থাকবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও কুড়ি বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী ঘেরাও সত্ত্বেও সফল ভাবেই এগিয়ে চলছিল। কিন্তু তখন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের যুগের অন্তর্নিহিত নিয়ম—যুদ্ধ ও শান্তির অধ্যায়ের পালাক্রমে পরিবর্তন বলবৎ ছিল। কেবলমাত্র এখনই এমন একটা অবস্থা এসেছে যে এই পালাবদল আর অনিবার্য নয়" (ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ, আগষ্ট) অথচ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি বিশেষ সমস্যার আলোচনাকে বিকৃত করে প্রচার চলেছে যে চীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে না, পঞ্চশীলে বিশ্বাস করে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনা বিভ্রান্তি বাড়ায় বই কমায় না।*

* 'যুদ্ধ না শান্তি' বিষয়ে আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। —সম্পাদক

দুই দিকে উঁচু পাহাড়ী গেরুয়া মাটি—ঠাই ঠাই মাথা তুলে আছে কালো পাথরের স্তূপ—মাটিতে যেন অলস মধ্যাহ্নে গা গড়ান দিচ্ছে মেষপাল। উঁচু পাহাড়ী মাটির বুক চিরে চলেছে ধামোদহ। বালির স্তূপ আর ঝাঁকে ঝাঁকে বয়ে চলেছে জলধারা।

ওর দুইদিকের দুই রূপ।

একদিকে শুরে শুরে উঠে গেছে মাটি—শাল পলাশ মহুয়ার বন, মাথা তুলেছে চলমা—বিহারীনাথ প্যাকেত পাহাড়। শীতের শেষে ওর আকাশ লাল হয়ে ওঠে পলাশের রং, চলচে পাতার বুকে আগুন জ্বালা লাল গণগণে রং; মুক্তির আভাস আনা বাতাস।

এপারে উঁচু টিলার উপর কাঁটাতারের বেড়া দেরা লেবার ক্যাম্প। তারপরই এদিক ওদিক মাথা তুলে আছে কলিয়ারীর হেড গিয়ার—কোথাও।

রোপওয়েতে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে বালিবোঝাই টবগুলো, চিমনীর ধোঁয়া আর ধোঁয়ার এর আকাশ-বাতাস কালো—ধুলোভর্তি। এপারের জীবনে বন্দী মানুষ—ওপারের ভুংরি আর পাহাড় থেকে চেয়ে থাকে মুক্ত কোন সাওতাল ভুঁইহার মাহাতো চাষী; লাঙল বন্ধ করে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকে চিনকুঠী মুলুকের দিকে।

এপারে লেবার ক্যাম্প থেকে চেয়ে থাকে মানকু মাহাতো—ওদিকের বনে লেগেছে পলাশের রং; হু হু ঘূর্ণিওঠা বাতাস নদীর জল পার হয়ে এগিয়ে আসে এই দিকে ওই দূর জগতের খবর নিয়ে।

—এ্যাই? হিয়া ক্যা করতা?

ক্যাম্পের বাইরে সন্ধ্যার পর ডিউটি সেরে এসে থাকবার হুকুম নেই। ক্যাম্পে কম্যাণ্ডাণ্ট এর কড়া আইন।

মানকু উঠে এল ভিতরে।

আটকুট উঁচু কাঁটা তারের বেষ্টনী তার জীবনে একটা কঠিন বাধার সৃষ্টি করেছে। প্রথম যেদিন তারদেশের লেবার-বোর্ডে নাম লেখায় সেদিন ভাবেনি এইখানে তাকে আসতে হবে। ছোট বসতি—তার চেয়ে ছোট খুপড়িখানা দু খানি কালি বজরার কেত মহাজনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই অন্যকোন পথ না দেখে লেবার বোর্ডের লাইনে দাঁড়াল।

—ক্যা নাম?

—মানকু মাহাতো। রহিয়া বসতি—

মুন্সীবাবু লালকালি দিয়ে নাম লিখে নেয়, পাশাপাশি আরও অনেকের। বয়স্ক হয়ে গেল একখানা করে খাকি প্যান্ট-সার্ট, কেডস জুতো আর একটা কালো খসখসে কম্বল।

পরদিন সকালের ট্রেনেই তারা রওনা হবে।

এইখানে প্রথম দেখে কম্যাণ্ডার প্রীতম সিংকে। পাতলা সিটকে চেহারা, সুঁচলো গোঁফ জোড়া—খাড়া নাকের দুই পাশে দুটো কোটর থেকে বিড়ালের চোখের মত নীল আভা জলে দুই চোখে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে চলেছে সবাইকে—বাজারে কসাই যেমন পাঁঠা খাসি কিনতে গিয়ে কোনটার কলজে—কারোও দাঁতনার ওজন কুৎ করে দেখে—এও যেন তেমনি দেখা।

—ঠিক সে খাড়া রও এই উরক কা বাচ্ছে।

বেহাতী চাষী মজুর এরা, না খেতে পেয়ে খণের জ্বালায় পেট পিঠ এক হয়ে গেছে। তাদের মেরুদণ্ড আগেই ভেঙে দিয়েছে মহাজন, আর জমিদার, না হয় অসুখের তাড়না।

তবু থমকে গেছে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

ঠিকে চুক্তি এক বছরের কঠিন চুক্তির কাজ।

মাসে নগদ দশটাকা হাতে খরচে পাবে—আর খেতে পাবে ক্যাম্পে। এগারো মাস একটানা কাজ করতে হবে কলিয়ারীতে—তবে এক বৎসর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। মাস-মাইনে পাওয়া-হাতখরচ দশটাকা বাদ দিয়ে কলিয়ারী অপিস থেকে লেবার বোর্ডে জমা হবে, এগারো মাস কাজ শেষ হলে ফিরে এসে তবে মিলবে সেই বকেয়া টাকা, অবশ্য তার থেকে মুন্সীবাবু, অন্যান্য-বাবুদের নজরানা দিতে হবে। না হলে পরের সাল আর নাম লেখা হবে না খাতায়। বেকার থাকতে হবে। এগারো মাস কাজ শেষ করার দুদিন আগেও যদি কেউ ক্যাম্প ছেড়ে পালায়-একপয়সাও আর পাবে না সে। বিলকুল টাকা তার গায়ের হয়ে যাবে লেবার অপিসেই। টাকার হকদার সে নয়।

মানকু চুপ করে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। এত জায়গা তবুও লেবার ক্যাম্পে সেই সামান্য একটুকু ঠাঁই এ; কয়েকখানা পাঁচেইঞ্চি ইটের উপর টিনের চাল, ওপাশে জায়গা সঙ্কুলান না হবার দরুণ কয়েকটা তাঁবুও পড়েছে।

রান্নাঘর থেকে হাতা খুন্তির শব্দ আসে—প্রকাণ্ড একটা কড়াই এ চেপেছে লোপ্‌সী; চাল ডাল তাতেই ফেলে দিয়েছে কয়েকটা কুমড়ো খেতো করে—কিছু ঝিঙে, ডাঁটা আরও পাঁচমিশেলী আনাজ পত্র, নুন আর নামমাত্র তেল দিয়ে তাই ঘাঁটছে লোক দুজন।

পথে মিটি মিটি জ্বলছে দু-একটা আলো, গেটে চারি পাশের সেন্ট্রি পোষ্টে জ্বলছে ঝকঝকে সার্চ লাইট; যেন বন্দীপুরী। পালাবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে ওরা।

দূরে চারিদিকে জ্বলছে নীল মার্কারী ল্যাম্পের অসংখ্য আলো, দামোদরের জলে ঝিকিমিকি তোলে—টিলার আড়ালে আকাশকোল রক্ত লাল হয়ে উঠেছে বার্ণপুর ফ্যাক্টরীর ব্লাষ্টফার্নেসের আগুনে।

চারিদিকে এর কর্মব্যস্ততা—এরই মাঝে মানকু কোথায় হারিয়ে যায় প্রথমে কয়েকমাস আগে। মুক্ত আকাশ আর হু হু বাতাসের মধ্যে বাস করেছে, হঠাৎ সেদিন প্রথম খাদে নামল সে দিনের কথা আজও ভুলতে পারে না।

অন্ধকার জমাট ঘন বন্ধকরা ঠাণ্ড বুনোই অন্ধকারে তার নিঃশ্বাস আটকে আসে। সবেগে ডুলিটা সেই পাতাল রাজ্যে নেমে চলেছে তাদের নিয়ে।

কে যেন ককিয়ে কেঁদে ওঠে কাহা মাতা হায়?

—জাহান্নামমে।

—ইয়ে নোকরী

ছোড় দে।

এমন চাকরী করতে তারা আসবে না।

ঝড়ের বেগে প্রচণ্ড শব্দে নেমে চলেছে ডুলিটা শাফ্টের মধ্যে দিয়ে; হুহু বাতাস ঝড় তোলে। ঝর ঝরিয়ে ডুলির মাথায় পড়ে জল; ভূগর্ভস্থ কোন জলস্তর থেকে জল ঝরছে অবিশ্রান্ত ধারায়। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠছে—এমনি একটা আলোড়ন সারা দেহে।

মানকু মাহাতো হাঁপিয়ে উঠেছে, ডুলি থেকে নেমে চলেছে তারা কলিয়ারীর অতলে হাঁটা পথ দিয়ে, চালু ক্রমনিম্ন পথটা মাথার উপর টিপ টিপ জল ঝরছে। কানে আসে, দূরে বয়ে চলছে জলস্রোত নয়ন ছুসী বয়ে। অতল অন্ধকারে ওদের মতই ক্ষীণ কয়েকটি কেপলার বাতির আলো কোথায় কোন অসীমে হারিয়ে গেছে।

—হঁস···স্ স্ স্।

থমকে দাঁড়াল ওরা, অন্ধকারে কোথায় যেন হাজারো বিষধর সাপ নিষ্ঠুর হিংসায় গর্জন করছে।

—গ্যাস! কোই ডরকা নেহি হায়। চলো।

প্রীতম সিংহ বলে ওঠে। বুড়ি আর গাঁইতি নিয়ে চলেছে তারা।

···কখন বলেছিল জানেনা। বাতাস এখানে নেই, গলগলিয়ে ঘামছে সারা গা;

—লাগাও গাঁইতি। ডসিয়ার। ধিনকি মৎ উঠানা।

শক্ত কয়লার গায়ে একটু জোরে গাঁইতি লেগে যেন কণিকামাত্র ঝিনকিনা ওঠে, গ্যাসভর্তি কলিয়ারী, এক মিনিটেই বিপর্যয় ঘটে যাবে। ওরা জানেনা।

হুড়মুড় করে খানিকটা কয়লার চাল গ্যালারীর মাথা থেকে ধসে পড়ছে। গুরু গুরু গর্জন।

—ভাগো ভাগো হিয়াসে।

কোনদিকে কি হয়ে যায় বুঝতে পারেনা। পাতাল-

পুরীর দৈত্য যেন ক্ষেপে উঠেছে মত্ত আক্রোশে, দুহাতে সামনে যা পাচ্ছে তাই ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিতে চায়। কয়লার গুঁড়োয় নাক বন্ধ হয়ে আসে, চারদিকে নামে অতল অন্ধকার।

…সরিয়ে দেয় ওদিকে। সেদিন আর সেখানে সিলার কাটিং হলনা; কি যেন দারুন একটা গণ্ডগোল ঘটেছে, মানকু আর সবাই বুকভাঙা পাতালপুরীর চড়াই ঠেলে ডুলি বেয়ে উপরে উঠে যেন হাপ ছেড়ে বাঁচে। আলো বাতাস ওপারে নদীর ধারে ধানখেতে হলুদের আভা।

বের হয়ে আসছে, বাধা দেয় কয়েকজন খাকি পোষাক পরা গার্ড।—খাড়া রহো। লাইনসে যানে'হোগা।

একপা এদিকে ওদিকে যাবার হুকুম নেই। লেবার বোর্ডে কাজে ঢোকবার সময় এসব তাদের বলা হয়নি। এগুলো অলিখিত হুকুম আর কি?

হঠাৎ আবিষ্কার করে ব্যাপারটা। মানকুর ঘরেরই একজন লেবার পাটোয়ারী, পাশের ঘরের দুজন বাচ্চা সিং আর ভিখনরাম চারজনকে পাওয়া যায়না।

—কাঁহা গিয়া উলোক? নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে। তাদের সঙ্গে খাদে নেমেছে। কিন্তু!…উঠতে দেখেনি কেউ তাদের। চকিতের মধ্যে মানকুর মনে পড়ে কয়লার জমাট ধুলোয় সেই গুরুগুরু গর্জনের মধ্যে কাদের একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। তবে কি?

প্রীতম সিং এগিয়ে আসে। গম্ভীর গলায় হুকুম দেয় মার্চ, এক দো, এক দো।

মানকু বলে ওঠে—সরকার, তিন আদমী পাটোয়ারী ভিখন আউর—

তার কথাটা শেষ হয়না; সাঁই করে ওর মুখের উপর এসে পড়েছে প্রীতম সিংএর চামড়া বাঁধানো বেটনটা।

—চুপ রহো উল্লুক পাঁড়ে।

চমকে ওঠে মানকু, কথা বলতেও মানা, এখানে কথা বলবার স্বাধীনতাটুকুও নেই।

ক্রমশঃ অনেকেই বুঝেছে। কোম্পানীর মাইনে করা লেবার আছে অনেক, তাদের আলাদা ধাওড়া। স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে তারা; কাজ করতে নেমেও তারা প্রতিবাদ করে ধর্মঘট করে।

লেবার ক্যাম্পের লোকদের নামানো হয় সবচেয়ে কঠিন বিপদজনক কাজে। প্রথমদিনই খানিকটা অনুমান করেছিল। তারপরেও দেখেছে।

প্রতিবাদ করার অপরাধে বুধন রামকে সেদিন প্রীতম সিং খাদের নীচেই মেরেছিল জানোয়ারের মত। শক্ত পাথরের উপর লাথি দিয়ে ছিটকে ফেলে বুট সমেত লাথি চালিয়েছিল ওর মুখে, গায়ে। হাতের ছিটকে পড়া গাঁইতিখানা তুলে নিয়ে তবু একবার রুখে দাঁড়ায়নি।

মানকু রাগে গরগর করে দেখেছে মাত্র। বুধন তবুও উঠে প্রীতম সিংএর পা ধরে ক্ষমা চেয়েছে বেকুফির জন্য। নাহলে?

—বড় কড়াইএ ফুটছে লাপসি। রাত্রের ওই খাদ্য। শালপাতায় খানিকটা করে ঢেলে দেয়। সারাদিন মাটির নীচে গলদঘর্ম হয়ে খেটে পরমতৃপ্তি ভরে ওই খেতে বসে তারা।

—জী সরকার?

মানকু ভর যোয়ান; মকাইএর দানা আর চানা খুটে বেঁধে নিয়ে যায়। মাসিক দশটাকা বরাদ্দ তাই থেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে। কিন্তু তাইবা কতক্ষন।

রসুইকরকে দিন দুআনা করে দিয়ে কয়েকদানা বেশী লাপ্‌সি পাবার ব্যবস্থা করেছে।

…হঠাৎ বাইরের বারান্দার খুটিতে বাঁধা বুধনরাম, সকালের সেই প্রহারের চিহ্ন ওর সর্বাঙ্গে। মাছি বসছে ছেঁচা ঘাগুলোতে।

—এ বুধন?

বুধন চোখ মেলে রইল। রসুইকর আগে জমাদার এসে বুধনের সামনে দাঁড়ায়।

—আজ, কাল দোরোজ খানা বন্ধ!

…প্রতিবাদ করবার ভাষাটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

মাথা নীচু করে খাদে যায়, মৃত্যুপুরীর প্রহরা এড়িয়ে সেদিনের মত বেঁচে উঠে আসে তো আবার এদের জিম্মায় বন্দী হয়ে এসে ক্যাম্পে ঢোকে। সপ্তাহে একটা দিন বের হতে পায় তাও এই এলাকার বাইরে যাবার কানুন নেই।

…কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালেই কাটলো শীতে রুক্ষ দিনগুলো, ওপারের ধান খেতের গায়ে সিড়ি সিড়ি উঠে গেছে শাল মহুয়া পলাশের বন। শালবনের বুকে এ

কচিপাতার সমারোহ, মহুয়া পত্রহীন ডালে গোপমেলে চাইল হলদে ফুলের দল, বাতাসে তারই মদির সৌরভ, পলাশের বনে বনে রং-এর তুফান এল।

শীতের শেষে বসন্ত এসেছে।

তামাটে মাটির বুক থেকে দগ্ধ ধরিত্রীর জ্বালা উঠছে।

একটু মুক্তির স্বাদ পেয়েছে মানকু। কঠিন উষর মৃত্তিকার বুক চিরে ওই দামোদরের কালো জলধারার শান্তিময় প্রবাহের মতই সেই অনুভূতিটুকু ওর দেহ-মনে একটা চাঞ্চল্য আনে—শান্তির স্পর্শ আনে মনের গভীরে।

…সারাদিনের কাজের পর কয়লার ধুলোয় কালো হয়ে আসে তারা, চোখের পাতায় লালচে একটা পৈশাচিক আভা, ঠোঁট দুটো পুরো লাল হয়ে থাকে।

দলের পিছনে পিছনে আসছে—হঠাৎ হাসির শব্দে মুখ ফিরিয়ে চাইল একজন। হাসছে একটি মেয়ে—কয়লা কুড়োচ্ছিল ঝুড়িতে। নিটোল পুরুষ্ট গড়ন, সারা দেহে নিবিড় পূর্ণতা।

—বাঃ বেশ মানাইছে যে? একেবারে আবলুস কাঠ খুদে তৈরী যে হে? নামটো কি?

—মানকু! মানকু মাহাতো।

মেয়েটি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ওদের সঙ্গে। হঠাৎ প্রীতম সিং গর্জে ওঠে এ্যাই?

মেয়েটি হাসিতে ফেটে পড়ে—সেলাম সাব। তা যাত্রার দলের সংগলোন নিয়ে যেছো কেনে? একপালা গেয়ে যাও।

—ক্যা? প্রীতম সিং ঠিক ওর কথাটা বুঝতে পারে না। তবে যেন কি দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। মেয়েটি হাসছে।

—খেয়েই ফেলাব নাকি গো?

হা হা করে হাসছে প্রীতম সিং ওর ডাগর দুচোখে কপট ভয়ের চিহ্ন দেখে, নিটোল পুরুষ্ট দেহে যেন বর্ষার শ্যাম-সজীবতা।

প্রীতম সিং হঠাৎ আবিষ্কার করে কুতের মত চেহারার ওই লেবারের দল তার দিকে চেয়ে দেখছে। ওকে হাসতে বড় একটা কেউ দেখেনি। ওরাও অবাক হয়ে গেছে।

প্রায়ই দেখে তাকে মানকু যেতে-আসতে। বাভিল কয়লার স্তূপের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে গান গায়ে সুর করে। মানকুর মনে ঝড় ওঠে। মুনিয়া গান গাইছে।

—ভাদু আমার পরম সোহাগিনী গো,
মনের মানুষ এলো নি রে
ও ভাদু ধনের

প্রীতম সিং পকেট থেকে সিগারেট বের করে এগিয়ে দেয়—নে?

—যাত্রার দলের রাজা যে গো, আচ্ছা রাজা বটে।

মানকু মুনিয়ার দিকে চেয়ে থাকে। লাস্যময়ী মুনিয়া হঠাৎ যেন কেমন বৈকালের রোদে ম্লান হয়ে আসে, কয়লার কালো জমাট ধোঁয়ায় আকাশের কোল ছেয়ে গেছে।

মুনিয়া হাসছে প্রীতম সিংও।

ক্যাম্পের টিলার নীচেই দামোদর। তরতরে জলধারা বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে নদীর বুকে পাম্প বসিয়ে জলের বেগে বালি তোলা হচ্ছে, কনভেয়ার বেল্টে সেই বালি উপরের দিকে রোপওয়ে ষ্টেশনে যাচ্ছে সেখান থেকে শূন্যপথে দূরের কলিয়ারীতে।

ক্যাম্পে জলের ব্যবস্থা তেমন নেই! প্রীতম সিং কয়েকজনকে মাত্র নদীর ঘাটে যাবার অনুমতি দিয়েছে। সারাদিনের ধুলো কয়লার কণ জলে রগড়ে তুলে ভদ্রস্থ হবার চেষ্টা করছে মানকু।

—কয়লা ধুলে কি ময়লা যায় গো, যায় না?

কার হাসির শব্দে মানকু চাইল। ওদিকে জলের বুকে কয়েকটা পাথর মাথা জাগিয়ে আছে। তিরতিরে জলে উজান বয়ে যায় দু-একটা মাছের ঝাঁক। তাদের ধরবার চেষ্টা করছে কারা জাল দিয়ে—না হয় কাপড়ের ছাকনি দিয়ে।

মুনিয়াও রয়েছে ওদের দলে। জলে কাপড়-চোপড় ভিজে গায়ে বসে গেছে। জলে ভেজা একটা লাস্য শ্রী ওর সারা মনে।

মুনিয়া তাকে দেখে হাসছে। বলিষ্ঠ নিভাজ দেহ, ওদের মত এখনও কুঁকড়ে যায়নি লেবার ক্যাম্পে কয়েক বছর যাতায়াত করে। এখনও বনের শালগাছের মত সবুজ সলজ্জ একটি মধুভাব তার দেহমনে!

হঠাৎ মুনিয়া হাসি থামিয়ে বলে ওঠে—পালাও মোড়ল আসছে।

যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ; গলা ডুবিয়ে আবার একটু এগিয়ে গিয়ে মেছেলদের ভিড়ে মিশে যায়।

জুতোর শব্দ শুনে পিছন ফিরে চাইল মানকু।

—ক্যা, হিয়াই রহেগা?

প্রীতম সিংএর নজর চারদিকে। ওরা নদীতে স্নান করতে আসে সেখানেও পাহারা। সুঁচ গলবার কোন পথ নেই।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে ওপারের বনভূমিতে। এদিকে জ্বলে ওঠে বাবুপাড়ায়—সাহেব বাংলোয় রকমারি রং-বেরংএর আলো। বাতাসে ভেসে আসে ভারি গলায় আলসেশিয়ান কুকুরের ডাক।

বাসায় ফেরা পাখির ডাক ছাপিয়ে ওঠে ওই হিংস্র গর্জনধ্বনি। ওরা উঠে এল স্নান সেরে।

কেমন যেন অসহ্য হয়ে উঠছে এই বন্দী-জীবন। সকালে কলাই সেদ্ধ আর এক মগ করে চা নামক জলীয় পদার্থের বরাদ্দ, তাতে কোন স্বাদ গন্ধ নেই একটা বিশ্রী বিস্বাদ বস্তু। কলাইগুলো নিয়ে যায় বাদের নীচে, ওই চিবিয়েই কাটাতে হবে সেই বৈকাল পর্যন্ত। এক ছটাক লাপসি কখন হজম হয়ে যায়।

সেদিন কলিয়ারীর নীচে নেমে দেখে কোম্পানীর লেবাররা উঠে আসছে, অনেকেই উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে—গ্যাসে ভরপুর হয়ে রয়েছে, কাজে যাবো নাই।

পিটহেডে জমছে ওদের জটলা। প্রীতম সিং-এর নেতৃত্বে এরাও গিয়ে জুটেছে। রেজিং কমে যাচ্ছে গ্যাসের দরুণ। ম্যানেজার ছোট সাহেবও ভাবনায় পড়েছে। রেজিং যোনাশ বন্ধ। কাজ চালু রাখতেই হবে। কোম্পানীর লেবাররা খাদে নামতে রাজী নয়। হাজার দুয়েক ফিট অতলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তারা যেতে রাজী নয়।

ম্যানেজার সাহেব এমনি সময়ে কাদের দিয়ে কাজ চালু রাখা যেতে পারে জানে। প্রীতম সিংকে ঘুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফাস কথাবার্তা হয়ে যায়। এগিয়ে দেয় কেস খুলে দামী টার্কিস সিগারেট। সাবধানে ধাঁড়ির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সিংজী সিগারেট টানতে টানতে এসে তার দলবলকে হুকুম দেয়। —নামো? এতনা ডর কাহে?

লেবার ক্যাম্পের বাসিন্দারা কি যেন অজানা আতঙ্কের সন্ধান পেয়েছে আকাশে বাতাসে, ওই পলাতক মাল-কাটাদের মুখে চোখে, ওদের কণ্ঠের দৃঢ়তায়। প্রথম দিনই দেখেছে কেমন গোপনে এখানে আসে মৃত্যু ওই পাতালপুরীর অন্ধকার অতলে।

মানকুর মনে আসে প্রীতমের উপর বিজাতীয় ঘৃণা; নির্লজ্জ নিষ্ঠুর লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। বুকে যেন আগুন জ্বলে ওঠে ওর প্রতিবাদের আগুন।

—চলো? ক্যা দেখতা হ্যায়?

—নেহি জায়গা। মানকু এগিয়ে আসে।

সমবেত লেবাররা যেন প্রতিধ্বনি তোলে ওর কথার —নেহি জায়েগা।

প্রীতম সিং থমকে দাঁড়ায়। তারদিকে চেয়ে আছে ম্যানেজার—ছোট সাহেব অনেকেই। প্রীতম সিংএর রক্ত মাথায় চলকে ওঠে, মানকুর গালে সশব্দে একটা ঘুসিই মেরে বসে পর পর কয়েকটা।

মানকু এমনি অতর্কিত আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না। ছিটকে পড়ে শক্ত পাথরের উপর; ওর পড়ে যাওয়া দেহটার উপরই বসাতে থাকে চড় লাথি, লাথির পর লাথি বুট সমেত। কেউ এগিয়ে এসে দাঁড়াল না বাধা দিতে। প্রীতম সিং যেন ক্লান্ত হয়ে থামল।

লিফট অপারেটারও অবাক হয়ে গেছে। আবার চলতে থাকে লিফট, ওরা নামছে অতলে।

মানকুর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে জামা-কাপড়, কপালের কাটা বাটায় কয়লার ধুলো লেগে থকথক করছে। —ইস্‌কো ক্যাম্পনে লে যাও। পিছু দেখেঙ্গা।

প্রীতম সিং ওকে পাহারাওয়ালার জিম্মায় ক্যাম্পে পাঠিয়ে লোক নামাতে থাকে লিফটে। ম্যানেজার সাহেবের অলিখিত সই আছে মাথা পিছু এক টাকা বকশিস পাবে ক্যাম্প কম্যাণ্ডার প্রীতম সিং।

...হঠাৎ মুনিয়া চমকে ওঠে মানকুকে দেখে।

—ওমা! ই কি হয়েছে গো? ঝেড়েসের কাণ্ড বুঝি না?

কাছে এগিয়ে আসে মুনিয়া। দু চোখে ওর নিবিড়

ব্যথা। মানকু কথা বলে না। ওকে বাঁধা দেয় গার্ড—মৎ আও ইধার!

মুনিয়া চেঁচিয়ে ওঠে—বাঁদরের চেয়ে কি বড়! তোর বাপ ওই সেন্ট্রেল বলতে পারে ই কথা? মৎ আও?

লোকটাকে এমনি করে মারলি মানকুরে তোরা? মানকু কথা বলে না, ওর চোখে দয়াটুকু যেন অসহ্য হয়ে ওঠে। চলে গেল ক্যাম্পের দিকে।

ওদের গাঁও বসতির ধারের জঙ্গলে সেবার একটা চিতাবাঘ দেখেছিল—একটা বয়েল মেরে বসেছিল তার পাশে বসেটা; প্রীতম সিংকে দেখে তেমনিই মনে হয়—সেই চিতাবাঘের মত জ্বলছিল তার দুটো চোখ, তেমনি নিষ্ঠুর গর্জনের একটা শব্দ উঠছিল গলা থেকে।

বুধনের মত তাকে না খেতে দিয়ে আটকে রাখবে লোহরখানার বাইরের খুঁটির সঙ্গে; খিদেতে পেট জ্বলে যাবে—আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে ওদের খাওয়া; না হয় আবার বেটন দিয়ে পিটিয়ে সর্বাঙ্গ ছিঁচে ফেলবে। অসহ্য সেই যন্ত্রণা।

এরই মধ্যে সারা গা ব্যথা করছে—ক্যাম্পে এসে নিজের খাটিয়ায় পড়ে প্রীতম সিংএর প্রতীক্ষা করছে।

ক্যাম্প ফাঁকা:—দু একজন গার্ড ছাড়া বিশেষ কেউ নেই ওরা ফিরবে রাত্রি দশটার পর; আবছা অন্ধকার নামছে আকাশ বাতাসে। ইলশেগুড়ি বৃষ্টি। ঝিনঝিন্ স্বরে বাতাসে উড়ে উড়ে ঝরছে। এখান থেকে আজমগড় কতদূর? কতনদী পার হয়ে পাহাড়ের বুক চিরে এসেছে লাইনটা; মুক্তির স্বাদ—এখান থেকে পালাবে?

…চোখের সামনে ভেসে ওঠে কতদিন আগেকার ঘটনা। দুপুরের সময় জি. টি. রোডের ধার থেকে তাদেরই ক্যাম্পের পলাতক একজনকে ধরে আনে পুলিশ। তারপর তাকে ধোলাই দিতে থাকে প্রীতম সিং, নিষ্ঠুর সেই শাস্তি।

লোকটা আর্তনাদ করে—মর যায়ে গা হুজুর। আর বাপ্—গোড় পাকড়ে সহকার।

তবুও রেহাই নেই। প্রীতম সিং কম্যাণ্ডার তার গর্দানও নিয়ে নিতে পারে। বলবার কিছুই নেই। কালো কম্বলটায় জমেছে এই কয়দিনের ধুলো ময়লা—বিটকেল গন্ধ ছাড়ছে ভালুকের গায়ের মত। তাই জড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে আলোর নিশানা! কতদূর পর্বত থেকে ভেসে আসে বৃষ্টিভেজা রাত্রে কুটি ফুলের গন্ধমাতা বাতাস—কার বাঁশীর সুর।

…হঠাৎ কাকে দেখে চমকে ওঠে, মুনিয়া!

মুনিয়ার দুচোখে খারাপ হাসির আভা নেই, একটা নিবিড় সমবেদনায় থমথমে সেই মুখ। মেয়ের অসাধ্য কাজ নেই। এখানে এলো কি করে?

—ক্যাম্পমে কেইসে আয়ি?

মানকুর কথার জবাব না দিয়ে এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলে ভাগ্ যায়েগা?

পালাবে! মুক্তির আহ্বান। ওর শিরায় শিরায় বয় চঞ্চল রক্তস্রোত। বহুদিনের বুভুক্ষা জেগে ওঠে। মুনিয়া এগিয়ে আসে। দুচোখে ওর কি এক নিবিড় সঙ্গ ছায়া।

…পথ। মুনিয়াই বাতলে দেয় দামোদরের দিকে বেড়ার বালাই বিশেষ নেই। আলোও নেই ওদিকে। পাহাড়ী পথ, পাথরে পাথরে বৃষ্টির জল পড়ে শেওলা গজিয়েছে, পিছল পাথর নীচে বর্ষার খরস্রোতা নদীর জল ঘূর্ণিপাক খেয়ে চলেছে। পা পিছলে পড়তেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবু! এদিকে অনাহার, নিষ্ঠুর অত্যাচার আর খাদের নীচে অতল অন্ধকারে গ্যাসগুস্তি মাইনে প্রাণ হাতে করে যাওয়া, অন্যদিকে মুক্তির আহ্বান—মুনিয়ার দুচোখের নেশা।

…এই পথই বেছে নিয়েছে সে। মুনিয়া ওদিকে গার্ডের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে; ওদের হাসির শব্দ কানে আসে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পাথরের পর পথর টপকে অন্ধকারে চলেছে মানকু। হাসির শব্দ আর শোনা যায় না—কানে আসে বর্ষার মেতে ওঠা দামোদরের ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনি। হাতপা ঘামছে। চোখের সামনে জেগে ওঠে মুনিয়ার হাসিভরা মুখখানা, যৌবনবতী মুনিয়া; আসবে সে—তার জন্য অপেক্ষা করবে তিন নম্বর গেটের বাইরে মালগাড়ীর ষ্টেশনের কাছে ছায়া অন্ধকার ঘেরা অশথগাছের নীচে।

…আবার বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ছেয়ে। আলো-গুলো ম্লান হয়ে যায় বাতাসে কাঁপছে গাছ-গাছালি। শেডের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে মানকু। মুনিয়া আসবে,

পালাবে দুজনে যে দিকে পারে। পালাবার পথও ঠিক করে রেখেছে।

ইঞ্জিনটা বৃষ্টির মধ্যেই এদিক ওদিক থেকে কয়লা বোঝাই গাড়ী টেনে এনে জুড়ছে। বৃষ্টি নামা বাতাসে ওর বাঁশীর তীক্ষ্ণ শব্দটা কেঁপে ওঠে।

…সময় নেই। ধরা পড়লে প্রীতম সিং সেবই করে দেবে তাকে। কম্বল-জড়ানো দেহখানা পড়ে থাকবে খাদের অতল অন্ধকারে—নয় ত দামোদরের খরস্রোতে ভেসে যাবে।

সামনে বাঁচবার পথ; কি ভেবে লাফ দিয়ে মাল গাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল। কয়লা বোঝাই গাড়ী, ওরই মধ্যে কালো কম্বল জড়িয়ে রং এ রং মিলিয়ে একোণে পড়ে রইল। বৃষ্টি নেমেছে বাইরে-ছাদের উপর পট পট শব্দ ওঠে। বেশ গরম একটা পরিবেশ। মালগাড়ীটা চলছে। চলছে তাকে নিয়েই কোনদিকে কে জানে।

…হঠাৎ কোথায় যেন, হাজার বাজ পড়ল একসঙ্গে। কেঁপে উঠেছে মালগাড়ীটা পর্যন্ত, প্রচণ্ড কাঁপুনিতে গড়িয়ে পড়ে কয়লার স্তূপ। বাইরে দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বৃষ্টি ভরা আকাশে লাল হয়ে উঠেছে—ওরই মাঝে উঠেছে লকলকে শিখা। কাদের হাজারো কণ্ঠের আর্তনাদ জেগে। বাতাস কাঁপিয়ে উঠছে সাইরেনের বিকট শব্দ।

চিনভোড় কলিয়ারীতে আগুন ধরে গেছে।

উঠে বসেছে মানকু; ট্রেনটা বেগে ছুটে চলেছে, যেন ওই ধ্বংসপুরী থেকে প্রাণ ভরে পালাচ্ছে সে মানকুর মত।

…তাদের ক্যাম্পের সবাই আছে আজ রাত পালিয়ে। সেইই যেতে চায়নি! তাই…সারা গায়ে অসহ্য ব্যাথা। মাথার ঘা দিয়ে আবার বোধ হয় রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

তবু একটা আনন্দময় অনুভূতি; দুনিয়ার চোখে সেই কামনার আমন্ত্রণ, কি এক দুর্বার নেশাই তাকে বাঁচবার সাহস এনে দিয়েছে, জাগিয়েছিল প্রতিবাদ করার ক্ষমতা। হাসির আভায় দেখেছিল নোতুন প্রাণের মধেত। তরা দামোদরের মত যৌবনবতী দুনিয়া।

…কিন্তু দুনিয়া শেষ পর্যন্ত আসেনি। ওরা ধরা দেয় না। দূর থেকে পথের সন্ধান দিয়েই পথের শেষে আবার সরে যায়। মানকু সেই আলোতেই পথ পেয়েছে।

…দূরে মিলিয়ে যায় কান্না, মাটি কাঁপানো বিস্ফোরণের শব্দ, আগুনের লকলকে শিখা, রাত্রির আকাশে বৃষ্টি ধোয়া গিয়ে চাঁদ উঠেছে। নির্জন হলুদ ডাঙা দূরে পাহাড়ের ইসারা। শুরু প্রান্তরের মাঝে ট্রেনখানা হাঁড়িয়ে যেন দম নিচ্ছে।

এ কোন এক নোতুন দেশ। ঘুম চেয়ে থাকে মানকু মাহাতো।

এ দেশ আমার . . . .

★

নবজাগরণের পথে কৃষ্ণ মহাদেশ

বাসব সরকার

●

বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পৃথিবীর ইতিহাসের বিস্ময়কর ক—আফ্রিকা। আফ্রিকা শুধু ভৌগলিক সীমানায় ত একটা মহাদেশ নয়—'আফ্রিকা' মানে চার'শ ধরও বেশী নিপীড়িত মানুষের নীরব প্রতিবাদের া. তার চেতনার ভিত্তি, তার জীবনের বনিয়াদ। সঞ্চিত অবজ্ঞা, ঘৃণা, অত্যাচার ও অনাচারে রিত মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রথম ভার স্বপ্ন, আজ আফ্রিকার মানুষের জীবনে য়ে বড়ো প্রেরণা, শক্তির উৎস। যে দুর্জয় প্রতিরোধ- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তিল তিল করে গড়ে ছে। তার সম্যক ধারণা আজও পৃথিবীর মানুষের । শুধু এই চিন্তা আজ তাদের কাছে স্পষ্ট যে ালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারায় ও সভ্যতার অভিপ্রেত বিকাশ বিস্তারে টা বিরাট পরিবর্তনের যুগের মুখোমুখি পৃথিবী আজ । দাঁড়িয়েছে, যেখানে হয়তো শেষবারের মতো গত-কালের মানুষের জীবনধারা নির্ণীত হয়ে । ইউরোপ আমেরিকার শ্বেত জাতিদের দেশে সরব আশংকা প্রকাশ পায়। এশিয়া গেছে ম দুনিয়ার প্রভাব থেকে সরে, আফ্রিকা আজো আছে। একটা বিরাট ভৌগলিক আয়তন রাজনৈতিক শূন্যতার আবর্তে পড়ে পথ খুঁজছে, যেখানে হয়তো শুরু হবে শেষ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম। আফ্রিকার বর্তমান গুরুত্বের মাপকাঠি এখানেই।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সভ্যতার ইতিহাসে আফ্রিকা একটা বিস্ময়। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারের অভাবিত বৈচিত্র্যের মতো, সভ্যতার নাম না জানা রূপের, রেখার অনেক তথ্যই আফ্রিকার অভ্যন্তরে চোখের আড়াল হয়ে রয়েছে। আফ্রিকা বিচিত্র মানুষের গবেষণাগার। একেবারে আদিম জীবনের বিচিত্র আচার আচরণের গোষ্ঠী জীবন থেকে, বিংশ শতকের মার্জিত, সুসভ্য জীবন-যাত্রা পর্যন্ত, সব স্তরের মানুষের দেখা মেলে আফ্রিকায়। পাশাপাশি সভ্যতার প্রাথমিক স্তর আর আপত —শেষ, এবং এই দুয়ের মাঝামাঝি আরো অসংখ্য ধারার একত্র সমাবেশ বোধ হয় একমাত্র আফ্রিকাতেই সম্ভব। আফ্রিকার রহস্যের সূত্রপাত এইটানেই।

॥ দুই ॥

তমসাচ্ছন্ন মহাদেশের অন্ধকার আমাদের অজ্ঞতা-প্রসূত। আফ্রিকার কালো মানুষদের কথা জানার

কিছু নেই, শোনার কিছু নেই, এই প্রচার স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল। পশ্চিমী সভ্যতার চোখ দিয়ে যখন পৃথিবীর মানুষের গোগ্রাতার সভ্যতার বিচার করা হয়, তখন শুধু ইউরো-আমেরিকার বর্ণ-শ্বেত মানুষ ছাড়া আর কারো সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। সেই কারণেই এশিয়ার ইতিহাসে জাপ্পো-ডা-গামা পর্বে চীনকে আফিম খেতে হয়েছে, ভারতকে হীনবীর্যতার অপবাদ মাথায় নিয়ে তার সাত লক্ষ গ্রামের ভাঙা ঘরের বেড়ার আড়ালে সরে যেতে হয়েছে। অথচ দু হাজার বছর আগে রোমান সিনেটে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক প্লিনী ঘোষণা করেছেন: "Always something new out of Africa." আফ্রিকা সব সময়ই নতুন কিছু শোনাবে। মধ্য-যুগের আফ্রিকার কথায় পণ্ডিত ফ্রোবেনিয়াস (Frobenius Civilisation Africaine) গিনি উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের যে বিবরণ দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সেকালের গিনি উপকূলে আফ্রিকার একটি রাজ্যে যে প্রাচুর্য ও জীবন ধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা সমকালের ইউরোপকেও অনেকাংশে লজ্জা দিতে পারে। তিনি বলেছেন যা তিনি দেখেছেন! ...Street well cared for. bordered for several leagues by two rows of trees... maenificent fields...a country inhabited by men clad in briliant costumes. the stuff of which they had woven themselves...a swarming crowd dressed in silk and velvet, great states well ordered. powrful soveirieans, rich industries—civilized to the marrow of their bones." (উদ্ধৃতি "Africa, Africa" : Derek Kartun.)

খ্রীষ্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ঘানা সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিস্তার, কেন্দ্রিয় শাসন ব্যবস্থা, সুগঠিত সেনাবাহিনী ও শিল্পকলার প্রসার, সেকালের সমস্ত পর্যটকদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। 'মালি' ও 'সোনঘাই' রাজ্যের সুবর্ণ যুগ এই সব শতাব্দীরই ইতিহাস। লিও আফ্রিকানস ১৫১৩ সালে মধ্যপশ্চিম আফ্রিকার সমৃদ্ধশালী পনেরটি নিগ্রো রাজ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যারা আফ্রিকার দীর্ঘকাল শাসন করেছে। আর পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়ার সভ্যতার ঐতিহ্য, পণ্ডিতরা বলেন প্রাচীন মিশরের সমবয়সী। অথচ মধ্যযুগের সুসভ্য আফ্রিকার মানুষরাই নৌবলে বলীয়ান ইউরোপের বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে পড়ে কয়েক শতাব্দী পরেই চিত্রিত হয়েছে, ইউরোপ ও নতুন মহাদেশের হাটে বাজারে অসভ্য, বর্বর মানুষ বলে পণ্যের সামিল হয়ে। সে কাহিনী মানুষ জাতির কলঙ্ক—দাস ব্যবসা।

॥ তিন ॥

দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসা আফ্রিকার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ইউরোপের চোখে আফ্রিকা দীর্ঘদিন ছিল একটা কালো মানুষের উৎস। যাদের বাঁচা-মরার একটাই তাৎপর্য, সেটা হলো ইউরোপের লাভের খড়ি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা। আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের প্রথম পরিচয়ের শুরু দাস ব্যবসায়ে। সেখানে ইউরোপ বিক্রেতা, আফ্রিকা বিক্রয়োপযোগী কাঁচামাল। আর লাভের মাত্রা এতে এতো বেশি যে কাঁচা মালের ঝড়তি-পড়তি, ক্ষয় ক্ষতি, মরণ নিপীড়িনের বাধা অতিক্রম করেও তা ইউরোপের ঘরে পৌঁছেছে। দাস-ব্যবসার আনুষ্ঠানিক শুরু ১৫৬২ সালে এবং আনুষ্ঠানিক শেষ ১৮০০ সালের কিছু পরে। সুদীর্ঘ আড়াই শো বছরের ব্যবসার ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম হয়নি। সম্ভবতঃ ১৪৪২ সালে পর্তুগালের নাবিক হেনরী দি নেভিগেটের, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে প্রথমে দশ জন কালো মানুষকে ধরে আনেন ইউরোপের বাজারে। মানুষের বাজারে, ক্রেতা মানুষের কাছে, পণ্য-মানুষের চাহিদা হেনরীর লোভে ইন্ধন যোগাল। তারপর আরো কতো হেনরীর সঙ্গে পর্তুগাল সরকার এগিয়ে এলো এই বাণিজ্যের পৃষ্ঠ-পোষকতায়। গড়ে উঠল পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপকূলে বিক্ষিপ্ত কিন্তু একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পর্তুগীজ উপনিবেশ। রোমের পোপের করুণার রাজ্যে এতটুকু চিড় খেল না। পাদ্রীরা জাহাজ ঘাটায় এসে দাঁড়ালেন শিকল পরা সারি বাঁধা প্রতীক্ষমান জীবন্ত মানুষ-পণ্যের পাশে ব্যাপ্টাইজ করার জন্য—মৃত্যুর পর যেন পরম কারুনিক ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন। আর ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা

করার মতো বিনিময় পাওয়া গেল মাথা পিছু ৩০ থেকে মুদ্রা দক্ষিণা বাবদ। অবশ্য বিনিময়ের জন্যে তাঁদের কোন স্বতন্ত্র দাবী ছিল না।

ইউরোপের দেশে দেশে পর্তুগালের লাভের ব্যবসায় খবর ছড়াতে দেরী হয়নি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো পশ্চিম ইউরোপের সব রাজা ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন এবং এশিয়ার আরব ব্যবসায়ীরা। ব্রিটেনের তরফ থেকে প্রথম শুরু করলেন স্যার জন হকিন্স, ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে তৃতীয়বার সমুদ্র অভিযানের সময়। ইংল্যাণ্ডে সেটা রানী এলিজাবেথের আমল—ইতিহাসের সুবর্ণ-যুগ। হকিন্স এইবারের অভিযানে ধরে নিয়ে গেলেন ৩০০ নিগ্রো নরনারী। তাদের বিক্রয় করা হলো পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের হাটে বাজারে নীলামে ডেকে। মাথা পিছু দর উঠেছিল ২৫ পাউণ্ড। ব্রিষ্টল, লণ্ডন, লিভারপুলের সম্ভ্রান্ত বণিক পরিবারের আনুকূল্যে ১৬৮০ থেকে ১৭৮৬ সালের মধ্যে ব্রিটেন বিক্রয় করলে প্রায় ২০ লক্ষ কালো মানুষ, বছরে গড়ে ১৫০০০ হিসেবে। ১৭৯১ সালের এক বিবরণীতে পাওয়া যায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ব্রিটেন প্রতিষ্ঠা করেছিল ৪৩টি "কারখানা"—Slaving station, অবাধ্য কালো মানুষগুলোকে "নীজন্" করার জন্যে। আর কারবারের ফলাও অবস্থায় ব্রিটেনের জাহাজ কাজ করছিল ১৯২ খানা। তাই ১৭৭৫ সালে ব্রিটেনের উপনিবেশ সচিব লর্ড ডার্ট মাউথকে বলতে শোনা যায়: We can not allow the colonies check or to discourage in any degree a traffic so beneficial to the nation" কিন্তু কাঁচা পয়সা উপার্জনের মাধ্যম এই পণ্য-মানুষের সাগর যাত্রায় সামান্যতম সুবিধা দিতেও দাস ব্যবসায়ীরা ছিল একেবারে নারাজ। জাহাজের ডেকে হেড ফুট চওড়া বেড়া দেওয়া পথ করা হতো। তার মাঝে দাঁড় করান হতো হতভাগা কালো মানুষদের সার বেঁধে ঠাসাঠাসি করে। যেখানে সবাই না ঘুরলে কেউ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না, পাশ ফিরতে পারবে না। ঝড়ো বিক্ষুব্ধ অতলান্তিকের উপর খোলা আকাশের নীচে, হাজার হাজার মানুষের যাত্রা শুরু হতো অচেনা পরিবেশের উদ্দেশ্যে। যে হতভাগ্যের প্রাণ সেই বন্ধন দশায় শেষ হতো সে পেত মুক্তি, কিন্তু যারা তখনও বেঁচে অপর তীরের বাজারে পৌঁছত তাদের জন্যে অপেক্ষা করতো আরো নিগ্রহ। কিন্তু প্রতিটি সমুদ্র যাত্রায় জাহাজের অবস্থা দাঁড়াত এমনই যে বন্দরে লোক মিলত না জাহাজ পরিষ্কার করার জন্যে। এবং সাধারণ যে ব্যবস্থা ছিল এই সময় তা হলো প্রতিটি দাসবাহী-জাহাজ উদ্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছবার পর সেটা পুড়িয়ে ফেলা, সাফ করার অসুবিধা এড়ানোর জন্যে। সুতরাং বোঝা যায় যে জাহাজ পোড়ানোর লোকসান দাস ব্যবসায়ের লাভের কড়িকে গ্রাস করতে পারেনি কিন্তু দাস ব্যবসায়ীর লোভের আগুনে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল-বর্তী অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছে। উইলিয়ম উড্‌ওয়ার্ড তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেছেন "It was sorrowfully recognised that the degradation of the Negro peoples of the nearer African interior was the direct result of Europern slave dealing."

॥ চার ॥

মানবজাতির কলঙ্ক দাস-ব্যবসায়ের রেশ উনবিংশ শতাব্দীতেও রীতিমতো বজায় ছিল। এই লোভের আগুনে আফ্রিকা পুড়েছে কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। ডঃ আলবার্ট সুইট্‌জার ১৯১৩ সালেও ফরাসী নিরক্ষীয় আফ্রিকার দাস ব্যবসায় বিলীয়মান রেশ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী ইউরোপের অর্থগৃধ্নুতার সামনে নতুন পথের ইংগিত দিল। পশ্চিম ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারা, শিল্প-বিপ্লবের ফল-স্বরূপ মার্কেন্টাইলইজমের অবসানে ঘটিয়ে পুঁজিবাদী অর্থ-নৈতিক বিকাশের সূচনা গণতান্ত্রিক ও উদার-নৈতিক মতাদর্শের প্রতিক্রিয়ায় জনমতের সমর্থনে এবং আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই নতুন পৃথিবীর দাস-ব্যবসা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের প্রসার, এই সবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল স্বরূপ দাস ব্যবসার ব্যাপক প্রচলন ক্রমশঃ কমে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আফ্রিকা সম্পর্কে ইউরোপের চেতনা উপকূল রেখা ও অভ্যন্তরে অল্পদূরে সীমাবদ্ধ "It was a coast, not a continent" ফরাসী ইংরাজ অভিযাত্রীদল তখন সবেমাত্র অজ্ঞাত আফ্রিকার অভ্যন্তরে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে। পশ্চিম ইউরোপের

দেশে দেশে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আফ্রিকা-আবিষ্কার দ্রুততর হতে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের এই বিস্তার ও শোষণ-পর্বের প্রস্তুতিতে যারা সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার, মূল্যবোধের পরিচয় নিতান্ত মৌখিক। শ্রেষ্ঠ জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী, খ্রীষ্টভক্ত শ্বেত মানুষের আফ্রিকায় এই অনুপ্রবেশ ইউরোপীয় সভ্যতার চিন্তাধারার কোন বৈশিষ্ট্যকেই এ মহাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে দেয়নি। তখন উপনিবেশ গড়ে উঠতো ভাগ্যান্বেষীর সাহসিকতায় আর স্বদেশ-বিতাড়িত, ঘৃণ্য লোকের রুটী রুজির তাগিদে। ১৮৩৭ সালে স্যার কর্নওয়াল লুইস এই সব উপনিবেশ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে বলছেন "The scum of England is poured into the colonies, brilless barristers, broken down merchants, ruined debanchers, the offal of every calling and profession are crammed into colonial places." স্বভাবতই এদের কাছ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর আফ্রিকা যা পেয়েছে তা হলো বর্ণবৈষম্য নির্যাতন, লুণ্ঠন আর হত্যালীলা, পরাধীনতা আর নির্বিচার শোষণ।

আফ্রিকার একটি প্রবাদ আছে। শান্ত, নিরীহ কালো মানুষের জীবনের প্রতিটি রক্ত-বিন্দুর মূল্যে সেটা লেখা। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের আফ্রিকা আবিষ্কারের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিণতি তার মধ্যে প্রকট। কালো মানুষেরা বলে "when the white man came, he had the Bible and we had the land; now we have the Bible and he has the land." বিদেশী বণিক ও পাদ্রীদের যৌথ চেষ্টায় উপকূলবর্তী আফ্রিকায় যে উপনিবেশের গোড়াপত্তন হয় ধীরে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ব্রিটেনের সরকারী নথি-পত্রে এই পরিবর্তনের যুগের চেহারা স্পষ্ট। ১৮৮২ সালে আফ্রিকার উপনিবেশগুলি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে আনা হয়। কিন্তু উপনিবেশ বজায় রাখার জন্যে যেহেতু যুদ্ধের প্রয়োজন হয়—উপনিবেশের নিজস্ব প্রসারের তাগিদে, কিম্বা ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে, তাই ১৮৮১ সালে উপনিবেশ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হল যুদ্ধ ও উপনিবেশ দপ্তরের হাতে।

ইউরোপের তরফ থেকে আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের যুগ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে তীব্র ভাবে শুরু হয়। এটাকে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের যুগ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সঠিক সময়ের নিরিখে তা হলো ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাহীন এই বিরাট মহাদেশ মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধ ও কূট কৌশলের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল। মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বিসমার্কের কূট-কৌশলে যে পরিমানে সাময়িক স্থিতিলাভ করছিল, এই অসাধারণ রাজনীতিবিদের প্রচেষ্টাতেই তার স্বার্থগত প্রসারের ক্ষেত্র খুঁজে নিল আফ্রিকায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাই দেখা যায় বিরাট আফ্রিকা মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের সাতটী প্রধান শক্তির সাম্রাজ্যে নিজের অস্তিত্ব হারিয়েছে। তারা হলো ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, ইটালী, বেলজিয়াম ও জার্মানী।

সাম্রাজ্যবাদের এই বিস্তার কিন্তু নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে ঘটেনি। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইউরোপের অধিকার গড়ে উঠেছে, সামরিক শক্তির জোরে আর স্থানীয় প্রতিরোধের অভাবে যথেচ্ছভাবে। সুতরাং পরস্পরের অধিকৃত এলাকায় কারা পাকল, কারা গেল এটা কোন হিসেবে ধরা হয়নি। যথেচ্ছ সীমানা নির্দেশিত হয়েছে যা আফ্রিকার প্রাকৃতিক বিভাগ বা অধিবাসীদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। বর্তমান আফ্রিকার সব স্বাধীনতা প্রাপ্ত নানা দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তার বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে পরস্পরবিরোধী আনুগত্য ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার মাধ্যমে। একটি উদাহরণই বোধহয় এই কথার তাৎপর্য স্পষ্ট করে তুলবে। পশ্চিম উপকূলের ১০ লক্ষ ইউই জাতিদের প্রথমে ভাগ করা হয় ব্রিটিশ গোল্ড কোষ্ট ও জার্মান টোগোল্যাণ্ডের মধ্যে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর তাদের পুনর্বণ্টন করা হল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে। স্মরণীয় যে এই বিভাগ ও পুনর্বিভাগ কোন সময়েই ইউই জন সাধারণের স্বাচ্ছন্দ চিন্তায় করা হয়নি। দেখা হয়েছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ রেখে জার্মান

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

কন্যকা

ভারত সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে পুরস্কৃত নাটক। একেবারে নতুন ধরণের হাস্যরসাত্মক তিনটি একাঙ্কের সংকলন। পাতায় পাতায় রেখাচিত্রের ছবি।

দাম : আড়াই টাকা

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

বিভূতিভূষণ

পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতির যথার্থ মূল্যায়নের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক ও প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ এম. এ., পি. আর. এস., বিভূতিভূষণ সম্পর্কে সেই আলোচনারই অবতারণা করেছেন এই বই-য়ে। বিভূতি-ভূষণের জীবন দর্শন ও সাহিত্যের ক্রম বিবর্তনের ধারা ও বিশ্লেষণ লেখকের বিদগ্ধ লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। দাম : পাঁচ টাকা

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

নজরুলের কবিসত্তা নীহারিকাপুঞ্জ বিশেষ। কিন্তু নজরুল তো শুধু কবিই নন, শুধু রাজনীতিক নন, একটি আশ্চর্য মানুষও। সে মানুষটি কেমন, তাঁর জীবনটাই বা কেমন, যা থেকে একাধারে কাব্যের এই নক্ষত্র বেগ আর ললিত রাগিনী সম্ভব? পাঠকের এ অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক। নজরুলের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সহজ সরল ভাষায়, নজরুলের জীবনের অনেক অজানা তথ্যের উপর আলোকপাত করেছেন। নজরুলের একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ ছবি এ গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। দাম : চার টাকা

বিমলচন্দ্র ঘোষের

রক্তগোলাপ

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কবির আধুনিকতম কবিতাবলীর রুচিরম্য সংকলন গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট এ্যান্টিক কাগজে ছাপা ও চার রঙা প্রচ্ছদ।

দাম : আড়াই টাকা

রাষ্ট্রশক্তিকে দুর্বল করা যাবে কিনা? অর্থাৎ ইউরোপের রাজনীতির ধারা খেলার নিরাপরাধ ইউট জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ে ছল চালাচালি করা। এই ঘটনা সেকালের আফ্রিকা ভাগ বাটোয়ারা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমেরিকান পর্যটক জন গান্থার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "আফ্রিকাকে একটা তরমুজের মতো, সবাই যথারীতি ভাগ করে নিয়েছে।"

॥ পাঁচ ॥

আফ্রিকার উন্নত ও অনুন্নত সমাজ-জীবনে যখন বিংশ শতাব্দীর শুরু হলো অগীম বিপদের নিয়ে তখন ইউরোপের এইসব রাষ্ট্রগুলির মুনাফার পাহাড় গড়ে উঠছে। জন গান্থার বলেছেন: "আফ্রিকার দারিদ্র পাশ্চাত্যের সমস্ত কল্পনাকে পরাস্ত করতে পারে। চাক্ষুষ না দেখলে তাকে বিশ্বাস করাই কঠিন।" উদ্ভবগত বৈশিষ্ট্য অনুসারী আফ্রিকায় প্রধানতঃ তিন শাখার লোক বাস করে, যথা হোমাইট, নিগ্রো ও বান্টু। 'বান্টু' শাখা 'বান্টু' ভাষী শ্রেণীর সাধারণ নাম। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরেক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। তাদের বলা হয় বুশম্যান: উত্তরে প্রায় শ্বেত হেমাইট শাখা, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় নিগ্রোশাখার বাস ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা বান্টু শাখার বাসভূমি। এই বান্টু আফ্রিকার অধিবাসীদের সম্পর্কে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রার মানের তুলনা-মূলক আলোচনায় বলা হয়েছে যে, এদের জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে নীচু। এখানকার মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের পরিমান ১ থেকে ৩ পাউণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আফ্রিকাকে নিঃস্ব করে ইউরোপের সম্পদ বৃদ্ধির সঠিক খবর দেওয়া সম্ভব নয়। তার খনিজ, বনজ, কৃষিজ-সম্পদ যার দীর্ঘকাল কোন সার্থক ব্যবহার হয়নি, ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ সস্তা মজুর লাগিয়ে সেটা প্রাণপনে শোষণ করে নিয়েছে। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে এই শোষণ-পর্ব সম্পর্কে একটু ধারণা মাত্র হবে। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই ২৬ বছরে শুধু নাইজেরিয়ার টিনের খনি থেকে ইউনাইটেড আফ্রিকান কোম্পানী (সম্পূর্ণ ব্রিটিশ মূলধন ও মালিকানায় পরিচালিত) নীট মুনাফা লাভ করেছে ৩ কোটি ৭০

লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সালে সমগ্র ব্রিটিশ আফ্রিকার ইংল্যাণ্ডের কাছে পাওনা ষ্টার্লিং ব্যালান্সের পরিমাণ ছিল ৬৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৯৫২ সালে তার পরিমাণ দাঁড়াল ১২২২ মিলিয়ন পাউণ্ড। তিন বছর সময়ের মধ্যে এই বিস্ময়কর বৃদ্ধি কি এটাই সপ্রমাণ করে না যে এই সময়ের মধ্যে আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে ব্রিটেন যে পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করেছে, তার পরিবর্তে কত সামান্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করেছে সেখানকার মানুষের জীবনধারণের চাহিদা মেটাতে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসের পর জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শোষণ-নীতির কোন সীমা ছিল না। আবার এই লুটের ব্যবসা শুধু ব্রিটেন করেনি, করেছে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ।

এই আলাদীনের ঐশ্বর্যে যখন ইউরোপের অর্থনীতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পথে, তখন আফ্রিকা প্রতিদানে পেয়েছে লাঞ্ছনা আর নির্যাতন। আফ্রিকার আফ্রিকাবাসীর এই দুর্দশা সমস্ত সভ্য মানুষের কাছে অন্ততঃ একথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন ছাড়া এই অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। গান্ধার বলেছেন, আফ্রিকার ঘুম ভাঙার পিছনে যদি কোন কিছুর সবচেয়ে বড়ো অবদান থাকে সেটা হলো ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবাধ শোষণ ও দমন নীতি।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেহারা আজ মধ্য বিংশ শতাব্দীতে কিভাবে গড়ে উঠত বলা যায় না, যদি না নির্যাতন, নিপীড়ন আফ্রিকার কালো মানুষদের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, গণতন্ত্রের স্বপ্নকে সজীব করে না তুলত। কিন্তু যদি তার অর্থ এই হয় যে, পশ্চিমী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও সেই সংগে আফ্রিকার মনে নবতর সভ্যতার আলো পাওয়ার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে, তাহলে আফ্রিকাবাসী একই জবাব দেবে যে, যে সভ্যতা বর্ণবৈষম্যের পাকা গাঁথুনীতে মানুষের সমাজকে ভাগ করে ভোগ করতে চায় তাদের আর যাতে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে থাক, সভ্যতার প্রকৃত মূল্যবোধ তাদের জন্মায় নি। কারণ তরুণ আফ্রিকার রাজনীতি-চিন্তার প্রধান দুটি ভিত্তি আছে। প্রথম, পাশ্চাত্য সভ্যতার ধর্মের শিখণ্ডী খাড়া করে অবাধ ঔপনিবেশিক শোষণ-নীতির বিরোধিতা এবং দ্বিতীয়ত এই অনিবার্য ফল স্বরূপ বর্ণবৈষম্যের প্রতি সমস্ত আফ্রিকার মানুষের অপরিসীম ঘৃণা। ইউরোপ ধারি করে কালো আফ্রিকায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো প্রথমে সেখান থেকেই আসে। স্বাধীনতার চিন্তা ইউরোপের মানসপুত্র। কিন্তু এশিয়া আফ্রিকার কোটি কোটি সাধারণ মানুষ জানে সেই স্বাধীনতার অধিকার ইউরোপ বিশ্বাস করে একমাত্র তারই আছে। কারণ ইউরোপের দারুণ দুর্দিনে যখন এশিয়া আফ্রিকার সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত ২য় মহাযুদ্ধে জয়ের সম্ভবনা অনিশ্চিত বলে বিবেচিত, তখনও পশ্চিম ইউরোপের কোন রাষ্ট্রই সেই সাহায্যের পরিবর্তে উপনিবেশের মানুষদের রাজনৈতিক অধিকার দানের কোন কার্যকরী প্রস্তাব করেনি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের বহু প্রশংসিত আটলান্টিক চার্টার স্পষ্টতই এশিয়া আফ্রিকার প্রযোজ্য নয়, একথা প্রকাশ্যেই বলা হয়েছে। ইউরোপের এই মনোভাব তার স্বার্থের সংগে সংগতিপূর্ণ এবং ১৯৬০ সালেও তার শেষ হয়নি। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট মানসিকতা আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছে একথা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

॥ ছয় ॥

কিন্তু তরুণ আফ্রিকার এই তীব্র স্বাধীনতা স্পৃহার উৎস কি? আজকের আফ্রিকা আজই স্বাধীনতা চায় এই মুহূর্তে। রাজনীতির মারপ্যাঁচের কূট-কৌশল ধৈর্য ধরে লক্ষ করার মতো বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা তার নেই। যে অবস্থাকে বলা যেতে পারে অতীতের দুঃস্বপ্ন থেকে একেবারে বর্তমানের অত্যুজ্জ্বল আধুনিকতার মধ্যে নবজাগরণ। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকমিলন তাঁর এই বছরের গোড়ায় আফ্রিকা সফরের সময় যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছিলেন যে এই অধৈর্যের কারণ হলো সমগ্র আফ্রিকার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আজ একটি পরিবর্তনের হাওয়া—a wind of change.

ঔপনিবেশিক শাসনের অবাধ শোষণ-ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্যে যে সামান্যতম শিক্ষার সুযোগ দিতে তারা বাধ্য হয়েছিল, তারই প্রত্যক্ষ ফল এনেছে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন। আফ্রিকার খনিজ সম্পদকে আহরণ করতে

গেলে শুধু নিরক্ষর কালো মানুষদের সস্তা মজুরি দিলেই চলবে না, তাদের অন্ততঃ কিছু পরিমাণে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে প্রয়োজন শিক্ষার সুযোগ প্রবর্তনের। যেমন ভারতে একদা কোম্পানী রাজ কেরানীবাবুর প্রয়োজনে চালু করেছিল ইংরেজী শিক্ষা। এই শিক্ষা আফ্রিকার কালো মানুষকে ইউরোপের সমকক্ষ করতে চায়নি, চেয়েছে একদল কারিগর তৈয়ারী করতে।

কিন্তু যে মানুষ কারিগরি বিদ্যা আয়ত্বের জন্যে বই পড়ে টেক্‌নিক্ শিখতে পারে, সে খবরের কাগজও পড়তে পারে। যারা খবরের কাগজ পড়তে পারে তারা অন্ততঃ বাইবেল পড়ে এটুকু শিখতে পারে যে সমস্ত মানুষই এক, সমান, বর্ণের পার্থক্য একজনকে শাসক অন্যকে শাসিত বলে ভাগ করে না। আর যে বাইবেল পড়তে পারে সে হয়তো সুযোগ পেলে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোও পড়তে পারে।

আর কারিগরি বিদ্যা আয়ত্বের পর যারা কলে-কারখানায় কাজের আবেদন করতে পারে, তারা হয়তো পরস্পরের মধ্যে নিজেদের সুখ দুঃখের কথাও আলোচনা করতে পারে। আর সমব্যথীদের সাহচর্য কামনায় তারা হয়তো গড়তে পারে কোন সংঘ, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন কিম্বা কোন রাজনৈতিক দল। তরুণ আফ্রিকার রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে এই ভাবেই। এই রাজনৈতিক চেতনার প্রসার দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তী ও যুদ্ধোত্তর কালে ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছে একথা ভেবে যে ৪০ লক্ষ ইউরোপীয় কিছুতেই শুধু গায়ের জোরে প্রায় ২০ কোটি মানুষকে পদানত রাখতে পারে না। আফ্রিকার অধৈর্যের আরেকটি কারণ এই চিন্তা।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের তীব্রতম যুগ। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা যখন একদিকে প্রাণপণে সচেষ্ট স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিতে, যার জন্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করা হয়নি, তখন অন্যদিকে দেখা গেল আফ্রিকার অনমনীয় প্রতিরোধ, যার কাছে কোন বাধা আর বাধা নয়। জঘন্যতম দমননীতিও সেদিন এই যৌবনের জলতরঙ্গকে রোধ করতে পারেনি। তাই আজ মানুষের মুক্তি-আন্দোলনে কেনিয়া, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া কংগো অবিস্মরণীয় নাম।

১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ ঘানার মুক্তি দিবস। সমগ্র আফ্রিকায় এই দিনটির তাৎপর্য অসীম। কালো মানুষদের জাতীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন এই দিন প্রথম বাস্তবে রূপায়িত হয়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে মুক্তি-আন্দোলনের দুর্নিবার গতিবেগ সমগ্র আফ্রিকায় প্রবল আলোড়ন তুলেছে। ১৯৬০ কে তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বলা হয় "আফ্রিকা বৎসর"। প্রায় ষোলটি দেশ শুধু এই বছরেই পরাধীনতার নাগপাশ কাটিয়ে স্বাধীনতার সূর্যোদয় দেখেছে।

কিন্তু আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষের জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা শুধু রাজনীতিগত নয়। ঔপনিবেশিক শোষণে জীর্ণ দেহ আফ্রিকার স্বাধীনতার সার্থক রূপ দেখা দেবে সেদিন যখন সমগ্র আফ্রিকার কালো মানুষের জীবনে আসবে এক নিশ্চিন্ত প্রশান্তি, সুগভীর ঐক্যবোধ, সার্থক শিক্ষা, শোষণ-মুক্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতি আর এদের সবার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে এক নতুন সভ্যতার সুদৃঢ় বনিয়াদ।

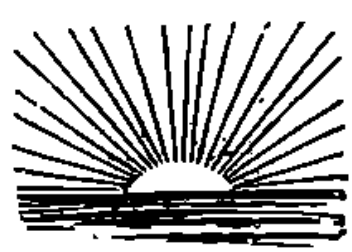

একটি স্বপ্নের ডোর

শঙ্করকৃষ্ণ রায়

ষ্টেশন থেকে এক ক্রোশ পথ।

জ্যৈষ্ঠের শুষ্ক ধূলি উড়িয়ে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীটা কনকডাঙার ভরদ্বাজ পাড়ার পথে পড়ল।

সদানন্দ ঠাকুর বুড়ো শিবতলার পূজো সেরে ফিরছেন, হেঁকে শুধালেন, গাড়ী কাদের বাড়ী যাবে রে আবিদালি।

আবিদালির কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। সপাং করে চাবুকগাছি ঘোড়ার পিঠে নেমে এলো। কোচবক্স থেকে মাথা ও হাত নেড়ে যে ইঙ্গিত জানালে তার অর্থ হতে পারে, সে জানে না কিংবা বহুদূরে।

ভিতরের মানুষটির চেহারা ততক্ষণে চোখে পড়েছে। গম্ভীর ভারিক্কী একখানা মুখ। পোশাক থেকে চুল ছাটার সবকে অভিজাত্য। পুনঃ প্রশ্ন করতে সদানন্দ কুণ্ঠিত হলেন। গাড়ীটা তাকে পার হয়ে গেল।

দুটি কৌতূহলী চোখের একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন প্রতিম ব্যানার্জী। গ্রামের লোক। বয়স প্রায় বছর ষাট। তার প্রায় সমবয়সী। কিন্তু কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

কৌতূহল দমন করেন না। হেঁকে শুধান, "ঐ লোকটির নাম কি হে গাড়োয়ান?"

"কোন লোকটা হুজুর?" প্রতি প্রশ্ন আসে কোচবক্স থেকে।

"ঐ যে, তোমাকে জিজ্ঞেস করলে।"

"লোক কোথায় বাবু। এতো আমাদের ঠাকুর মশায়।"

"নামটা কি বলতে পার না!" বিরক্তি ফুটে উঠে প্রতিম ব্যানার্জীর।

"সদানন্দ ঠাকুর—চাটুর্যে। ভরদ্বাজ পাড়ার দক্ষিণ আড়ে বাড়ী।"

"সদানন্দ!" যেন আৎকে উঠেন প্রতিম ব্যানার্জী। ইস্কুলে তার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো সদানন্দ। তার ছেলেবেলাকার মুখখানা স্মরণ করতে পারেন না। তার বুড়ো বয়সের মুখখানার মধ্যে বালোর সেই সাথীর খোঁজও পান না। গাড়ীর দুয়ারে কত কৌতূহলী চোখ তার প্রতি নিবদ্ধ হচ্ছে। সবাই অপরিচিত। সবাই পর। দীর্ঘ ত্রিশ বছরে এ গ্রামের স্মৃতি থেকে তিনি মুছে গেছেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ভরদ্বাজ পাড়া পিছনে ফেলে গোরু ঘুরে গাড়ীটা বাড়ুয্যে পাড়ায় প্রবেশ করে। অন্যমনস্ক ছিলেন প্রতিম ব্যানার্জী। হঠাৎ হেঁকে উঠেন,—"এই যে, এই বাড়ী। থামাও—থামাও—"

গাড়ীটা থেমে এসে থামে। গাড়োয়ান উপর থেকে বলে, "তাই বলুন হুজুর—কাঞ্চন ঠাকুরদের বাড়ী। বললে কি আমি চিনতে পারতুম না। এ গ্রামে কাকে না চিনি বলুন।"

নীচে নেমে আসে গাড়োয়ান।

কিন্তু আরেকটা আঘাতে মুষড়ে পড়েন প্রতিম ব্যানার্জী। এ গ্রামে কাঞ্চনমালা এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে নেই শুধু তিনি।

গাড়ীর দোর খুলে দেয় গাড়োয়ান। বলে—"বড় ভাল মানুষটা ছিলেন না ঠাকরুণ। গরীবের জন্য খুব করতেন।"

জবাব দেবার মত মন ছিল না প্রতীম ব্যানার্জীর।

সে দমবও দেন না সরকার মশাই। ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পার হয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে ছুটে আসেন। কি করবেন যেন দিশা পান না। চেঁচিয়ে হাকেন, "ওরে পাঁচু, ও নীলকণ্ঠ।"

পাঁচু ও নীলকণ্ঠ ততক্ষণ গাড়ীর পিছনে লাগিয়েছে।

"খবর দিয়েও ছাব্বিশ তারিখে
ভাবলাম মানুষের আর অসুখের
পয়লা বাদ দিয়ে সেই পরশু কি তরশু—"

জবাব দেন না প্রতিম ব্যানার্জী। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সেই পুরাতন বাড়ী সিমেন্ট, বালি বংএর নূতন আভরণ পড়েছে, কিন্তু সেই পরিবেশ নেই। কোথায় যেন বেসুরা। —এক সামঞ্জস্যবিহীন সুর।

কারো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভিতরে চলে আসেন।

কিন্তু ঘরে কাঞ্চনমালা।

জীবিতা নয়। ফ্রেমে আঁটা কাঞ্চনমালা।

প্রতিম ব্যানার্জী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। একখানি সলজ্জিত মুখ। দুচোখে যৌবনভরা প্রশ্ন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কাঞ্চনমালাকে এভাবে জেনেছেন— স্বার্থে, প্রলোভনে, অহংকারে এক সংকীর্ণমনা নারী, এই মুখে তার কোন প্রতিচ্ছায়া নেই।

অন্তরে অনুতপ্ত হন প্রতিম ব্যানার্জী। তার প্রচণ্ড অপরাধ ক্ষমা করে দাসী বাঁদীর মত তার কাছে থাকবার অধিকার চেয়েছিল কাঞ্চনমালা। কিংবা বৎসরে অন্তত দিন কয়েকের জন্য স্বগৃহে থাকবার অনুরোধ। কিন্তু সুনীতা অনুমোদন করেনি।

সুনীতার যে মুখখানা স্মৃতিতে ভেসে উঠে তাতে যৌবন নেই। মুখের রেখাগুলো সুখ। চোখের দৃষ্টিতে নিরুপায় উপেক্ষা।

সুনীতাকে আজ তিনি ঘৃণা করেন। একদিন যে স্বপ্নের মধ্যে তাকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, ত্রিশ বছর বাদে নিয়ত অনুভব করছেন তার মধ্যে মস্তবড় ফাঁক ছিল সা তিনি ধরতে পারেন নি। জীবনে কি পেয়েছেন এবং কি পাননি, তার আগাগোড়া হিসাবে গোলমাল হয়ে গেছে।

তার প্রথম প্রেমের নৈবেদ্য কাঞ্চনমালাকেই অর্পণ করেছিলেন। বিয়ের প্রথম দুটি বছর হামেশা কলেজ পালিয়ে বাড়ী চলে আসতেন। কাঞ্চনমালার পিতার অর্থানুকূল্যে পৈতৃক বিষয় ঋণের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তিনি তখনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছেন, কোনদিন এই সমস্ত অস্বীকার করেন নি। কিন্তু পিতৃ-ঐশ্বর্যের অহংকারে বাবধান নিজেই সৃষ্টি করেছিল কাঞ্চনমালা। কৃতজ্ঞতার মূল্যে প্রেম বিক্রয় করতে তার মন সায় দেয় নি। বিবাহের দুরূহ মন্ত্রকেও প্রেমের সার্থক বন্ধন বলে স্বীকার করতে পারেন নি। অনুতপ্ত করতেন তার অন্তর উপবাসী।

সেই উপবাসী মনকে আকর্ষণ করেছিল সুনীতা। স্নিগ্ধ হাসি। দুচোখে মাধুর্যের ঔজ্জ্বল্য। শিক্ষিত মন সুরুচির পাটে বাঁধা। কারো মতের অপেক্ষা না করে প্রবাসে বিয়ে করেছিলেন সুনীতাকে।

সেই অপরাধ মা ক্ষমা করেন নি। আমৃত্যু তার মুখ দর্শন করেন নি। দেনার দায় থেকে সম্পত্তি রক্ষা করেছিলো কাঞ্চন মাসীর বাবা। বেনামী করা হয়েছিল মায়ের নামে। মৃত্যুর সময় সমস্ত বিষয় কাঞ্চনমালাকেই লিখে দিয়ে গেলেন মা। এর মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা সে বিচার করবার অবকাশ হয়েনি প্রতিম ব্যানার্জীর। শুধু অনুমান করে ছিলেন তাকে নতি স্বীকার করাবার এ শুধু কাঞ্চনমালার চক্রান্ত।

সমস্ত দিন প্রতিম ব্যানার্জী ঘরের মধ্যে কাটান। অন্যমনস্ক মন শৈশব ও কৈশরের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকে। অস্বস্তি বোধ করেন। এখনকার পরিবেশের সঙ্গে যেন তিনি বেমানান। বাইরে যে খাতা লিখছে, ভিতরে যে ঠাকুরটা তার পরিচর্যায় নিযুক্ত, সে দু'চার জন লোক বাইরের দালান থেকে তার খোঁজ নিয়ে চলে গেছে কারো সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র নেই।

সন্ধ্যার আকাশে হাল্কা মেঘ। আবছা আলোয় প্রতিম ব্যানার্জী একেলা পথে বেরোন। মাঠের মাঝখান দিয়ে দু'ধারের পথ নির্জন। ছোট অশথ গাছটা কত বড় হয়েছে। হঠাৎ চিনতে পারেন নি। ঐ তো ডানদিকে বাউড়ী পাড়া। বাঁ দিকে খালের নীচে কৈলাস নন্দীর গোলা। ঐ তো ছিদাম চাটুর্যের আম বাগান। সবাই যেন তার অন্তরের কোমল স্থানে মৃদু হাত বুলায়। ব্যথা অনুভব ভাল লাগে।

রাত্রে সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে আসে। দেহমনে অবসন্নতা ব্যাপ্ত। তবু ঘুম আসে না। ঘরের স্তিমিত আলো কাঞ্চনমালার ফটোতে পড়েছে। মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায়। মনে হয় তার নিস্তব্ধ ব্যক্তিত্ব সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে আছে। তার হাতে আলমারির মাথায় পরানো সিঁদুরের টিপ, কাপড় পরানো লক্ষ্মীর পট, ফ্রেমে বাঁধানো সুতোর তোলা নমুনা।

হঠাৎ একটা ভাবনা প্রতিম ব্যানার্জীর মনে খেলে যায়। কাঞ্চনমালা কি এ বাড়ীর মায়া কাটিয়ে যেতে পেরেছে? নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা মরে, সংসারের বন্ধন থেকে তারা নাকি মুক্তি পায় না। ছোটবেলা থেকে এই কথা শুনেছেন। বিশ্বাস করেন নি। আজও বিশ্বাস হয় না। তবু ভয় পান। হাত বাড়িয়ে আলোটা উস্কে দেন।

স্বল্প আলোকে ছায়ার রেখাগুলো মুছে যায়। কেউ কোথাও নেই। অস্বাভাবিক চিন্তার জন্য নিজেরই হাসি পায়।

আলোটা হাত বাড়িয়ে নিবিয়ে দিলেন। জানালার খড়খড়িতে হাওয়ার শব্দে চমকে উঠেন। পরক্ষণেই কারণ বুঝতে পারেন। এবার হাসেন না। মনের অস্থিরতায় অস্বস্তি বোধ করেন। নিজের মনকেই যেন বলেন, গত বছর আগে যে মরে গেছে, ফটো ছাড়া তার কোন অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু ফটোর মানুষটাই অন্তরের একান্ত সান্নিধ্যে পৌঁছায়। খাটের আলিসায় মাথাটা এলিয়ে দিয়ে স্মৃতির অন্ধকার অলি-গলিতে কাঞ্চনমালাকে খুঁজে বেড়ান। বত্রিশ বছর অতিক্রম করে ফুলশয্যার রাতটিতে পৌঁছান। এই খাট, রাশি রাশি ফুল। ফুলসাজে সজ্জিতা কাঞ্চন-মালা। কি অপূর্ব দেখিয়েছিল তাকে সে দিন। মনে হয়েছিল এক প্রাণময়ী দেবী-মূর্তি।

তন্দ্রাচ্ছন্ন দুচোখ জুড়ে আসে। স্বপ্ন দেখেন। রাশি রাশি ফুল। খাটের কানাতে দুলছে ফুলের মালা। মিষ্টি গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস। কাঞ্চন-মালা কাছে এসে বসেছে।

তন্দ্রা ভেঙে যায়। কেউ কোথাও নেই।

কিন্তু সুগন্ধ যেন তখনও লেগে আছে। নির্মেঘ আকাশে কৃষ্ণা-পঞ্চমীর চাঁদ। কখন জেগে উঠেছে জানতে পারেন নি। বিছনের বাগান জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। জ্যোৎস্নায়, ফুলের গন্ধ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার খেলা অভূতপূর্ব। তারা যেন এল নূতন জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে ডাকে।

দোর খুলে বাইরে আসেন। ভুলে যান তিনি পলিত-কেশ রিটায়ার্ড-ইঞ্জিনিয়ার প্রতিম ব্যানার্জী। সেখানে, ঘোড় দৌড়ে সর্বস্ব খুইয়ে উপার্জী পুত্রের অপমান, স্ত্রীর গঞ্জনায় জর্জরিত হয়ে গৃহে ফিরে এসেছেন। এই সুন্দর রাত্রি যেন অপার করুণায় তাঁকে এক নূতন আনন্দের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি এক নূতন মানুষ।

অন্তরের গভীরে এক অভূতপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে পড়েন। কত অনুভূতির আনাগোনা। অতীত বর্তমান মুছে যায়। যেন তিনি যৌবনে ফিরে এসেছেন।

এক জীর্ণ আকৃতি যেন সমস্ত সত্তায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

মনে হয় রাত্রির স্নিগ্ধ পরিবেশ যেন সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। ভাসা ভাসা আসছে অপরিচয়ের গুঞ্জন। ঐ নিস্তব্ধতার অন্তরেও এক প্রচণ্ড চাঞ্চল্য। কি যেন লুকিয়ে আছে। কে যেন ধরা দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ব্যাকুল মর্মপীড়ায় কে যেন চুপি সাড়ে ডাকছে।

বয়সের জড়তা ভুলে যান। দৃঢ় পদবিক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে যান। কিন্তু কে সে? ঝিরি ঝিরি পাতার শব্দে সে কি তার সঙ্গে খেলা করছে। ভ্রান্ত হয়ে সে কি তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছে। দু'হাত বাড়িয়ে অসীম শূন্যতাকে বাহুতে বেষ্টন করতে যান। মাটীর উপর ছায়া নেচে উঠে। কিন্তু কোথায়? এদিকে, না, ওদিকে। পাগলের মত ছুটাছুটি করেন প্রতিম ব্যানার্জী।...একি, পৃথিবী যেন বদলে যাচ্ছে। এত রূপ পৃথিবীর এত ফুল। গাছের পাতায় পাতায় হাসি। এ কোন সঙ্গীত। আগে কখনও তো শোনেন নি। বাইরের নিস্তব্ধতাকে ব্যাহত না করে অন্তরে প্রবেশ করছে। দেহাতীত স্পর্শ। এত আনন্দ...রোমাঞ্চ...তৃপ্তি। কিন্তু কারা খেলা করছে গাছের পাতায় পাতায়। ডাকছে, হাসছে...চুপিসারে গান গাইছে...।

প্রতিম ব্যানার্জীর মনে হয় তিনি ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই তো সিঁড়ি। পুকুরে অসংখ্য পদ্ম। কিন্তু এদেরও কি প্রাণ আছে। ঘাড় তুলিয়ে ফিসফাস কথা কইছে কি এরা। না আর কেউ। কার যেন মুখ। এই...এই...ওই...ওই। এখানে ওখানে সর্বত্র। অস্পষ্ট, তবু অনন্তকালের আত্মীয় এই মুখ। সমস্ত জীবন এই মুখ যেন তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। তার সমস্ত সত্তায় যেন এর অস্তিত্ব।

"এই ফুলগুলোর সঙ্গে আমিও কথা কইব।" "আমি তোমার কাছে আসব।" চেঁচিয়ে উঠেন প্রতিম ব্যানার্জী। জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

* * *

সকালবেলা লোকের ভীড় জমে।

সিঁড়ির নীচে দেহটা পড়ে আছে। ক্ষতাক্ত নিঃসাড়।

সদানন্দ ঠাকুর এসেছেন। আপশোষ করে বলেন, "আহা-হা। কালচুপুর বেলা আবিদালির গাড়ী চেপে আমার গা ঘেঁষে যে এল। জানতে পারলে শেষবারের মত দু'টো কথা বলে নিতাম।"

ডাক্তার লাশ পরীক্ষা করছিলেন। বলেন, "রাত দু'টো তিনটায় হার্টফেল করেছেন। সম্মুখ দিয়ে পড়েছেন। মনে হয় কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করলেন সদানন্দ ঠাকুর।

নারীর রূপ ঃ ত্রিভুজ বিরোধ

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

ঘটনাটা এমন কিছু নয় মনে রাখবার মতো।

অমিট্টের দিকে তাকিয়ে তার বান্ধবী বলেছিল, অমিট্ট তুমি যা বলছো সেটা এত বেশী সত্য যে না বললেও চলতো। এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল, এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনদিন ঘটবে না।

এটাও তেমনি। পরিচিত পৃথিবীর বুক থেকে সত্যি সত্যিই তো কতো অসংখ্য ঘটনা ঘটে চিরকালের মতো হারিয়ে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা কী? না, দেখলাম একটি মেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। প্রায় অর্ধনগ্ন। একটি লোক মাটিতে পড়ে। আর একটি লোক সমানে তাকে যথেচ্ছভাবে মেরে চলেছে। সুদৃশ্য নয় বলাই বাহুল্য। ছোটোখাটো একটা জনতা দৃশ্যটি উপভোগ করছে। জানা গেল, লোক দুটি নাকি স্ত্রীলোকটির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। এই ত্রিভুজ বিরোধ-এর মীমাংসার জন্যেই এই যুদ্ধের অবতারণা। সেই চিরকালের Survival of the fittest

ঘটনাটি সামান্য হোক, প্রশ্নটি কিন্তু নয়।

আসলে নরনারীর এই বিরোধ চিরন্তন। ত্রিভুজ-বিরোধ উপন্যাসের একটি বিশেষ উপজীব্য। অন্ততো য়ুরোপীয় উপন্যাসে এর প্রমাণ মিলবে ভুরিভুরি। এই বিরোধ উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ সূত্রে দাঁড়িয়ে গেছে। বেশীভাগ কেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরিণতি হয় মানসিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি নায়ক দেখা দেয় সমাজের প্রশস্ত রাজপথ ধরে, কখনো মনের বন্ধুর গলি-পথে। যখন মুখোমুখি হয় তারা—মাঝে থাকে সেই চিরন্তনী নারী, আর থাকে একটি প্রশ্ন ঃ তুমি কার? নারী উত্তর দেয় না। উত্তর মেলে রক্তের লাল অক্ষরে। নারী তাই 'মধ্যবর্তিনী'।

এই ত্রিভুজ বিরোধ চলে আসছে চিরকাল। রাজা মহারাজা থেকে গোলাম-নফর পর্যন্ত—আকবর বাদশা থেকে হরিপদ কেরানী—বলা উচিত, সর্বস্তরে সর্বদেশে সর্বকালে। আর নারী শুধু মধ্যবর্তিনীই নয়, অঘটন-ঘটন পটিয়সীও বটে। এবং সেইটেই তার সত্যিকারের পরিচয়।

আমাদের শাস্ত্রে আদি পিতার উল্লেখ থাকলেও আদি মাতার নেই সম্ভবতো। খ্রীষ্ট-শাস্ত্রে তা আছে। আদি মাতা শ্রীমতী ইভের উদকানিতেই আদি পিতা শ্রীযুক্ত আদম বেচারী নিষিদ্ধ ফল খেয়ে সেই যে নিয়ম ভঙ্গ করলে—তারপর থেকেই মানুষের একটা-না-একটা বগড়া বেধেই আছে। সেদিন মানে ছিল শয়তান। সে কি ইভকে ভালোবেসে 'ইলোপ' করতে চেয়েছিল? কে জানে!

আমাদের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের যতোকিছু গোলমাল ঐ নারীকে নিয়ে। তাঁরা স্বনামধন্যা সীতা ও দ্রৌপদী। বেচারী রাবণকে দোষ দিয়ে লাভ কী? সন্ন্যাসী-বেশ ছিল তার বাইরে। ভিতরে তখন তার দশ দুগুনে-কুড়িটা দর্শনেন্দ্রিয় সীতার রূপ যে গোগ্রাসে গেলেনি, এমন প্রসঙ্গ মহামুনির লেখনী কলংকিত না করলেও আমাদের মনকে তা স্পর্শ করে। সেখানে দুটি পুরুষের মাঝে একটি নারী। তবে রাবণ সত্যিই কাপুরুষ। 'যুদ্ধং দেহি' বলে রামের সামনে দাঁড়ানো উচিত ছিল। মাইকেল মধুসূদনের সব কথা মানতে রাজী, কিন্তু রাবণ যে কাপুরুষ ছিল, একথা স্বীকার করতেই হবে। আর শূর্পনখা? উনি না থাকলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের চোখে ঘুম নামতো পঞ্চবটী বনেই। হায় নারী! Frailty, thy name is woman!

দ্রুপদনন্দিনীর প্রসঙ্গেও একটি কথা কবিবর সযত্নে বা অযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। হায় হতভাগ্য দুর্যোধন! ভদ্রলোক যে পঞ্চপাণ্ডবের ঐ রত্নটির প্রতি আসক্ত ছিলেন না, এমন কথা কে জোর করে বলতে পারে। তবে হ্যাঁ, দুর্যোধন খাঁটি ভদ্রলোক ছিলেন নিঃসন্দেহে। একটি নারীকে পাঁচ পাঁচজন পুরুষ ভোগ করছে। ছি, ছি। এ যে বর্বরতা! এ যে প্রাগৈতিহাসিক মাতৃতান্ত্রিকতা! আর যাইহোক্, দেহটাকে না হয় দেওয়া গেল। কিন্তু

মন ? সেখানে বোধহয় অর্জুনেরই monopoly ! অতএব অতএব—। না, দুর্যোধন চতুরশিরোমনিও বটে। নিজে না করে ঠেকিয়ে দিয়েছে দুঃশাসনকে। মাঝখান মিছি-মিছি দোষ চিয়েছেন সুনন্দা ব্যানার্জীকে ; পুরুষ নিয়ে পুতুল খেলাতে দেখা যাচ্ছে দ্রৌপদীও কম অভিজ্ঞতা দিলেন না !

বস্তুতঃ ইতিহাসের পাতা উলটে গেলেই দেখবো অসংখ্য যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ অঘটন-ঘটন পটিয়সী নারী। হেলেন আর ক্লিওপেট্রার কথা জানে না, এবং জেনে ঐ সত্য স্বীকার করে না, এমন মানুষ বিরল। একদিকে প্যারিস আর ডিউক, মাঝে হেলেন : একদিকে এ্যান্টনি আর সীজার মাঝে ক্লিওপেট্রা। সেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকেই তো নারী পুরুষকে টেনে এনেছে মৃত্যুপুরীতে। একটি নারীকে কেন্দ্র করে কখনো মন, কখনো রাজনৈতিক আবহাওয়া হয়ে উঠেছে ঘোলাটে। কোনো Destiny নয়, নারীই তার উদ্‌গাতা। মানসিকতার দিক থেকে লেডী ম্যাকবেথের সংগে ডেস-ডিমোনার পার্থক্য থাকলেও আসল কথা, নাটক দুটির পরিণতির জন্যে তারাই দায়ী। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। ডেস্‌ডিমোনার সতীত্ব কি ওথেলোকে বাঁচাতে পেরেছে ? A Mid Summer Night's Dream-এ সেক্সপীয়র সব চেয়ে ভালো করে এই বিরোধের বা দ্বন্দ্বের ছবিটি এঁকেছেন। এখানে বিরোধ আবর্তিত হয়েছে অবশ্য চাক্রিক গতিতে। এবং শেষ-পর্যন্ত দেখা গেল, আসলে সবই মায়া অর্থাৎ Cupid is a Knavish lad।

য়ুরোপের ইতিহাসে জোয়ান-অফ-আর্কের শোচনীয় পরিণতির পিছনে তার সততা কতটা দায়ী জানি না, তবে তার ষোড়শী জীবনের স্পর্শ কামনা করে ব্যর্থ হয়ে তাকে আগুনে ফেলেছিল পুরুষের বহ্নি, এমন কথা কল্পনা করা যেতে পারে। সম্ভবত, এই একটি ঐতি-হাসিক ঘটনা, যেখানে নারীকে মূল্য দিতে হয়েছে।

আমাদের পুরাণের অসংখ্য ঘটনা থেকেও ঐ সত্য প্রমাণিত হবে। বেচারা শুম্ভ-উপশুম্ভ। ইন্দ্র অথবা ব্রহ্মের মতো রাজনীতিক আর কে আছে ! তাঁরাও ত্রিভুজ-বিরোধের কথা জানতেন দেখা যাচ্ছে। আর তাই পেয়েছি তিলোত্তমাকে। অন্যান্য অপরাধের কথা ছেড়েই দিলাম।

এছাড়া নারীর আরো এক অন্যরূপ আছে—সেখানে প্রতি-নায়ক নেই। পুরুষ সেখানে পঞ্চশরবিদ্ধ নারীর হাতে পুতুল। আমার তো মনে হয়, মদনের কল্পনা রূপক, আসলে মদনের পঞ্চশর হচ্ছে নারীরই হৃদয়ের অদৃশ্য অস্ত্র। পুরুষ তাতে আহত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে। কালিদাসের কাব্যে একাধিকবার এই প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। বেচারী দুষ্মন্ত আর যক্ষ। দুষ্মন্তকে একবাক্যে সকলেই দোষ দিয়েছেন। এমনকি স্বয়ং কালিদাস হংসপদিকার গানের মধ্যে দিয়ে তার ক্লীব-চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নারীর রূপবহ্নিতে পুড়ে মরেনি, এমন হতভাগা পুরুষ কে আছে ! তবে শ্যামা রূপে যে ভোলেনা সে তো পুরুষই নয়। আর যাইহোক, দুষ্মন্ত খাঁটি পুরুষ যে ছিলেন, সে কথা তো ঠিক ! শ্রীরাধাকে ভালবাসতে গিয়ে কৃষ্ণ যে দোসরং দিয়েছে, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা আছে কি ! হলেই বা রাধা 'মাউলানী' তাতে কী এসে যায়। মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে নারীর জন্যে পুরুষ শাস্তি ভোগ করেছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। বেচারী কালকেতুর যতো ঝঞ্ঝাট, সেতো ফুল্লরার জন্যেই ! বিদ্যার জন্যে সুন্দর যে কেরামতি দেখিয়েছে সুরঙ্গ গহ্বরের অভিসার জমিয়ে, পদ্মলা নম্বরের রোমান্টিক নায়ক রোমিও তার ধারে-কাছেও ঘেঁসতে পারেনি পাটিল টপকে।

সুরসিক পাঠক এই বলে এইসব দৃষ্টান্তকে উৎখাত করতে পারেন যে, ওগুলো তো কল্পনা। ওতে আমাদের জীবনের কথা নেই। বেশ, তাই নাহয় হোল। উপন্যাসের দিকে তাকানো যাক্। য়ুরোপীয় উপন্যাসের কথা তুলে লাভ নেই, কেননা, বলেছি, সেখানে ত্রিভুজ বিরোধ তো একটি সাধারণ সূত্র। আমাদের বাঙলা উপন্যাসের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি যুদ্ধের মূলে, পারিবারিক বা মানসিক বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে নারী। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুরু ক'রে সাম্প্রতিককালের মনো-বিকলনী উপন্যাসেও তার পরিচয় মিলবে। তবে হ্যাঁ, শরৎচন্দ্রেরই এবিষয়ে জিৎ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই বিরোধ যে সর্বত্রই ঘনীভূত রূপ লাভ করেছে, একথা দাবী করছি না। মনে হয়, এই বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন থেকেও তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন এই দিকটা। ওসমান ও জগৎসিংহের মাঝে পড়ে

আবেগের যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব থাকা উচিত ছিল তা নেই। এই বিরোধ তেমনই দিকে হয়ে গিয়েছে কল্যাণীর ক্ষেত্রে। একদিকে মহেন্দ্র অন্যদিকে স্বামানন্দ আর তার দুর্বার কামনা। নারী নাকি উগ্রতাকে, বন্যতাকে ভালোবাসে। একথা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। দেখা যাচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আমল দেননি বিশেষ। বৈবাহিনীর ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা। তবে সে দ্বন্দ্ব পুরুষের নয়, নারীর। লবঙ্গলতার ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রনাথ এই বিরোধকে চমৎকার রূপ দিয়েছেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। মাঝে বিমলা, একদিকে নিখিলেশ, অন্যদিকে সন্দীপ। 'চার অধ্যায়'-এ এলাকে কেন্দ্র ক'রে অন্য ও অন্যান্যদের মধ্যে বিরোধের যে সম্ভাবনা ছিল, তা পূর্ণতা পায়নি। যদিও 'চতুরঙ্গে' তার সার্থকতা দেখা যায়। এদিক থেকে শরৎচন্দ্র সত্যিই সার্থক। অন্তত, গৃহদাহের দিকে তাকিয়ে একথা বলা চলে। তিনি এখানে য়ুরোপীয় ঔপন্যাসিকের সহোদর ভ্রাতা। অচলাকে ঘিরে মহিম আর সুরেশের যে আবর্তন তা সত্যিই রসঘন। 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ী, 'শেষপ্রশ্নে' কমল এবং 'শেষের পরিচয়ে' নতুন-মা একই আলোকে সমীক্ষ্যা!

প্রসঙ্গটি উত্তর-শরৎচন্দ্র উপন্যাসের প্রাঙ্গণে টেনে আনা যায়। কিন্তু তা বাহুল্য। একটি নারীকে কেন্দ্র করে বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে এমন প্রসঙ্গ যে কোনো ঔপন্যাসিকেরই প্রিয়। ঠাকুরঝি, মীরা, কুসুম এরা একই আবর্তে আবর্তিতা। কলেবর দীর্ঘতর করে লাভ নেই। বরং মনোবিকলিনী প্রবণতা আজ যখন ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তখন ঐ দ্বন্দ্বকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত শুধু প্রম-জগৎ থেকেই নয়, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সমুদ্র-মন্থন করেও এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

কী জানি কেন, বোধহয় এইটেই স্বাভাবিক, পুরুষ চিরদিনই নারীর কাছে আত্মসমর্পন করতে চেয়েছে। শুধু আত্মসমর্পন নয়, তার জন্যে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। সে নরকে পচে মরুক ক্ষতি নেই, কিন্তু নারীর কোমল অঙ্গে যেন কাঁটাটি না বেঁধে। নারী-পুরুষের রক্তের পার্থক্য আছে কিনা, একথা শরীরতত্ত্ববিদরাই জানেন কিন্তু লেখকদের হাতে পার্থক্য ঘটে যায়। যেখানে শ্বেত সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুরুষের রক্তে বরফের শুভ্রতায় শিমুলের ছোঁয়াচ লাগে, সেখানে লেখকের লেখনী দেবতাত্মা নাগাধিরাজের মতোই মৌন—অথচ যেখানে নারীর এনামেল করা মুখের ওপর দু'ফোঁটা মাত্র চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, সেখানে রবি ঠাকুরেরও হাত কাঁপে। শরৎ চাটুজ্যের রমণীমোহন হিসেবে বেশ নাম ছিল শোনা যায়। এবং তিনি নারী মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে যে জলের অভাবের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, তার উত্তরে বলা যেতে পারতো—চাটুজ্যে মশাই আপনার কথা ও যুক্তি-গুলি অতীব সত্য, কিন্তু এজন্যে পুরুষকেই কেবলমাত্র দোষ দিয়ে লাভ কী? মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ছবি যদি সত্য বলে স্বীকার করি এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের লেখা থেকে এর বিপরীত দৃষ্টান্ত তুলে ধরি, তাহলে আপনি কী বলবেন। শরৎচন্দ্র নারীর দুর্দশার অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সারা পৃথিবীর সমাজ-জীবন থেকে কিন্তু পুরুষ—হতভাগ্য চারুদত্ত আধারকাররা কি এমনিই হতভাগ্য যে সমস্ত ত্যাগ অস্বীকৃত হবার পরও তাদেরকে এই বিরাট কলংকের বোঝা বহন করতে হবে? পুরুষকে কল-কারখানায় খাটতে হবে, খেত-খামারে যেতে হবে। নারী থাকবে অন্তঃপুরে। কেন! না, নারীকে যে তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বলব সেই যন্ত্রণা কী? না, এখন নয়।

আসলে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে নারীর রূপ বা মূল্য কী? জন্মের জন্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত সাহচর্য দরকার। ব্রহ্ম আপন তৃপ্তির জন্যে নারীকে জন্ম দিলেন। দিলেন তো—তারপর? তাকে দেওয়া হল সংসারের দায়িত্ব। প্রজা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্যা। নারীকে হতে হল পত্নী ও জায়া। রবীন্দ্রনাথের কথায় প্রিয়া ও জননী। প্রিয়ারূপে সে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। কিন্তু জননীরূপে! তাকে পুরুষের দাবী মেটাতে হল। সংসারের সব কাজেই তার দরকার। কিন্তু চলবার বেলায় তাকে হতে হয়েছে বলুর বলদ। অন্ততো বাইবেল বা কোরাণে এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। নীট্‌সে তো বলেইছেন, The Woman and the dog the more whipped, the

এ বলেছেন Woman is natures contravention for perpetuating its purpose অবশ্য এরই পাশাপাশি বলা হয়েছে, women and music are two things which touch Infinity শোপেনহাওয়ার শঙ্করাচার্যের উক্তি আর নাইবা স্মরণ করলাম।

হায় হতভাগিনী নারী!

একথা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা চলে, ঐ সমস্ত শাস্ত্র পুরুষের রচনা। Religion তো পুরুষের তৈরী। পুরুষ পুরোহিত রূপে চরিতার্থ করেছে কামনা, অথচ নারীকে হতে হয়েছে দেবদাসী—চিরকালের মতো সমাজ পরিত্যক্তা। তান্ত্রিকধর্মে সঙ্গিনীরূপে তার স্থান, কিন্তু সেখানে সে পঞ্চ-ম-কারের অন্যতম ম-কার। সাধনার সে সঙ্গিনী, কিন্তু, ফলে তার অংশ নেই। মদ, মোদ, মাৎসর্যের পাশেই নারীর স্থান। অর্থাৎ, নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রী। পুরুষের demand-দপ্তরে নারীর Supply-র বেশ দাম আছে। নারীও নির্বোধ নয়। এই পরম সত্যটি তাদের নখদর্পণে। তাই তাকে মুদ্রণ, সেখানে দেহকে সাজাতে চাইই। কেননা, মেনকা-রম্ভা-উর্বশীরাও জানে যৌবনের শেষ আছে, ফুলও ঝরে যায়, আরো জানে—তাদের প্রয়োজন আছে বিশ্বামিত্র পুরুষদের কাছে তার হতভাগিনী গঙ্গা, তোমাকেও তাই বুঝি নারীর দেহ নিয়ে শান্তনুর কাছে যেতে হয়েছে।

টাকা হাত-বদল হবেই। নারীও কি তাই? তার ওপর একাধিকের দৃষ্টি। তাই শেষ পর্যন্ত নারীকে Selection করতে হয়। তখনই সৃষ্টির দ্বন্দ্ব—দ্বিত্বের বিরোধ। আর এই তত্ত্বেই কি Frailty thy name is Woman!

তবু সংশয় জাগে: মৈত্রেয়ী বলেছিল, যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদাও তো বলেছে, ঘৃণা করে দূরে ঠেলে রাখবে, সেও নই, শ্রদ্ধা করে পূজো করবে—তাও নয়; তবে? শুধে দুধে যদি হাত মোর স্থান, সেই মোর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। একথা কি সত্যি? আর এই তত্ত্বেই কি

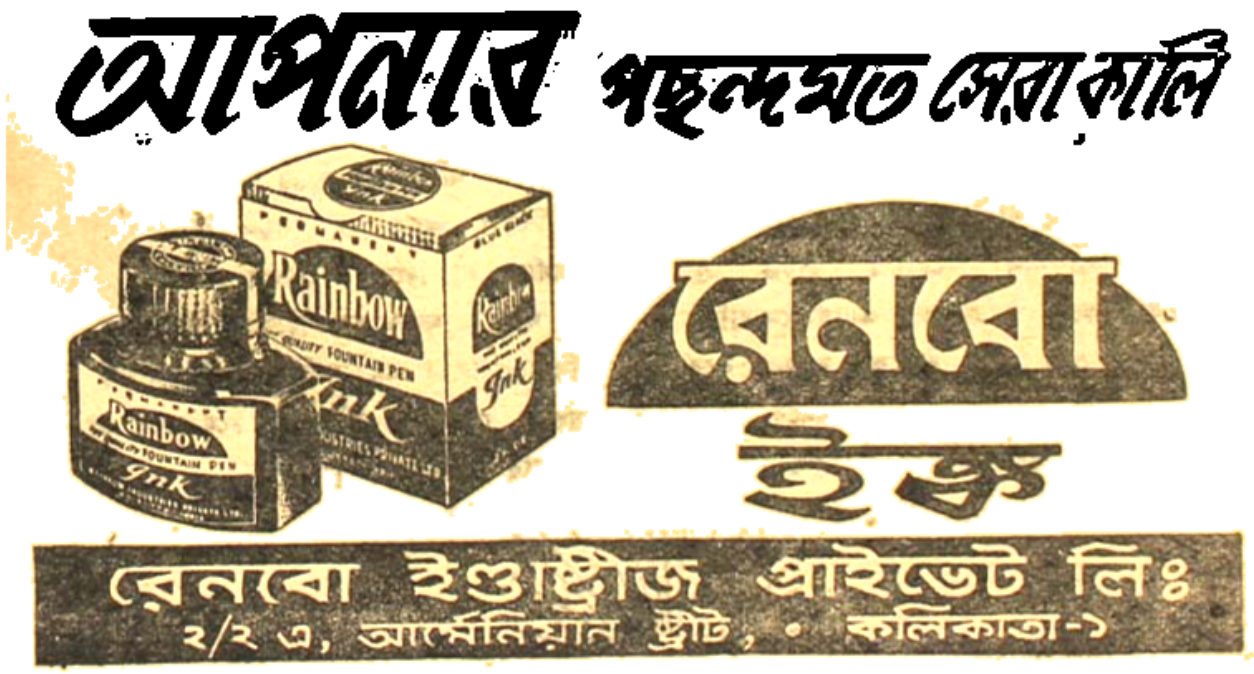

Woman and Music are two touch eternity. অমৃত ? কিসের ?

কিন্তু ব্রেড্‌ সাহেব যে বলেন—

ও প্রসঙ্গ থাক্‌। আসল কথা হচ্ছে, নারীর রূপ হচ্ছে অচলা বা লাবণ্য। ভারতীয় শাস্ত্র নর-নারীর দুটি প্রতীক চরিত্র রচনা করেছে—শিব ও পার্বতী।

একজন উদাসীন, তাই ভোলানাথ। সংসারের চক্রাবর্তে কতো পাড় ভেঙে পড়ে। কতো চর সৃষ্টি হয়। তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। কোনো কিছুই বাঁধতে পারে না তাকে। আর নারী ? সে হচ্ছে ত্রিশঙ্কা—। সংসারে নারীই একমাত্র বাস্তববাদী। লাবণ্য জানে অমিতকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায়, বাঁধা চলে না ঘর, সেখানে দরকার শোভনলালকে। সেও ভালোবাসে। তবে তাতে রঙিন মনের ওদের বৈষম্যটা মেলা নেই।

অতীতকে তুচ্ছ করতে হয়। ভবিষ্যৎকে করতে হয় আগ্রাহ্য—

"ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে
প্রসবের ভয়, তবু পতিসঙ্গ করে।"

'We look before and after'-একথা পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। নারীর পক্ষে নয়। বর্তমানেই তার কাছে একান্ত। নারীর জীবনের ঘড়িতে কাঁটাগুলো বারোটার ঘরে থেমে পিছু হাঁটতে সুরু করে না, তার উল্লম্ফন সংখ্যাতীতের দিকে।

ঠিক সেই কারণেই নারীকে মধ্যবর্তিনী হতে হয়। অনেক সময় লোকসান দিয়েও। একটি মধু-মক্ষিকাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় অসংখ্য মৌমাছির মধুচক্র। নারী শ্রদ্ধা করে বীর্যকে, কামনা করে ঐশ্বর্যকে। শকুন্তলা ভালোবাসে তপোবনকে, তবু নিজেকে সমর্পন করে দুষ্মন্তের কাছে। কিন্তু পুরুষের রক্তে আছে পলাশের আগ্নেয়গিরির জলন্ত লাভা। তাই সে যা চায়, জোর করে চীৎকার করে জানাতে চায়। তখনই সুরু হয় বিরোধ। অসংযমটা পুরুষের, নারীর নয়। তাই ত্রিকূল বিরোধে পুরুষকেই মূল্য দিতে হয়। নারী দেখে যায়। বলে না কিছু। প্রতিবাদ করবার থাকলেও করতে পারে না। মেরা ওয়ালেস্কার। শেষ পর্যন্ত বোনাপার্টের করতলগত হবেই। তাতেই নারীর তৃপ্তি।

অর্থাৎ নারীর জীবনে সত্যের স্থান নেই। তাকে কৃত্রিমতার মধ্যেই বাঁচতে হয়। তার বুক ফাটে, মুখ ফাটে না। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের পৃষ্ঠাতেই কাল্পনিক সিনেটর মঞ্চে বক্তৃতা জমাতে পারে। সেখানে পায়ের নীচে মাটি আর তিন হাত দূরে ঘরের দরজা, সেখানে নারীকে সমস্ত যন্ত্রণা, বেদনাকে অবগুণ্ঠনের আড়ালে লুকিয়ে রাখতেই হয়। নারী-বিদ্রোহ নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব নিদ্রাকর্ষক গল্প ফাঁদতে থাকুন, তাতে নারীরক্তের সংস্কারে কোনো তরঙ্গ উঠবে না। নারী সত্যকে দেখে ভয় পায়। সত্যকে সে স্বীকার করে না।

নারীকে তাই ভালোবাসা যায়, অথবা ঘৃণা করা যায়। শ্রদ্ধা করা চলে না। লুলু, ক্যাথি, লেডী চ্যাটারলি, অচলা, অভয়া, কিরণময়ী, বিনোদিনীদের এই সত্যিকারের রূপ।

কিন্তু, তবু কেন ভালোবাসে পুরুষ ? 'ভালোবাসা' ! —সেটা কী ? অমিত এর উত্তর দিয়েছে,—"যে পক্ষের দখলে শিকল আছে, সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার, সে বাঁধে আফিম খাইয়ে অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওলা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটা আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানি তার যোগান দেয়।"

ছায়া নেই তার | উৎপলকুমার গুপ্ত

আমার জীবনে দেখাল যে এনে
সূর্যের নীচে মায়াবী জগত
নদী জল নাচে, ছায়া ঝিকমিক
আরো সব কত শব্দ জলদ।

আরো কত ছবি এল আর গেল
মনে নেই আজ মনে নেই সব;
শীত এসে গেল বরষা বাইরে
দরজায় পড়ে শরতের শব।

আনাচে-কানাচে কেঁদে ফেরে তাই
ঝরা বাসনার রঙীন ফুল;
স্বগত ইচ্ছা বুঝেও বোঝে না
হিসেবে কোথায় হয়েছে ভুল!

তাই চাঁদ এলে আকাশের গায়
ডুবে যাওয়া তারা জাগে হঠাৎ:—
ঝড় নেমে আসে, ঝড় ভেঙে আসে
ঝড়ে ভেঙে যায় বন্ধ কপাট।

আমার জীবনে দেখাল যে এনে
সূর্যের নীচে মায়াবী জগৎ;
ছায়া নেই তার, ছায়া নেই আজ
থেমে গেছে সব শব্দ জলদ।

সে ঃ আমি | শান্তশীল দাস

সে আসে যখন কাছে সব কথা ভুল হয়ে যায়;
অনেক কথায়-ঘেরা এ পৃথিবী নীরব নিথর:
মুখোমুখি বসে বসে দুজনেই দেখি দুজনায়;
সে-দেখা ফুরায় নাকো, কেটে যায় কত না প্রহর।

সে-চেনা কত না চেনা, অচেনা তবুও বড় লাগে:
সেই চোখ, সেই মুখ; চিবুকের পাশে সেই তিল;
সব আছে একই মতো, তবু মনে কী বিস্ময় জাগে:
এ রূপের সাথে কত সেদিনের রূপের অমিল।

কোথায় রয়েছে যেন; ঠিক ধরা যায় নাকো, তাই
চেয়ে চেয়ে অপলক; চেনা অচেনার মাঝখানে
কালের পাঁচিলখানা। আমরা রয়েছি তবু নাই
মুখোমুখি দুজনায়। সময় এত কি কিছু মানে?
সে এগিয়ে চলে ঠিক। সে ওঠে। তাকিয়ে শুধু দেখি:
এক পা এক পা করে চলে যায়। সে তো নেই, একি।

স্বপ্নদেখা সেই লোক | করুণাময় বসু

আমাদের কিছু নেই, চিরকাল স্বপ্ন দেখে যাই,
উজ্জ্বল রৌদ্রের স্বপ্ন: সমুদ্রের রঙীন ঝিনুক,
(ঘুমোয় মুক্তোর মন): ময়ূরকণ্ঠী রঙের দিন
হাতছানি দিয়ে যায়, তারপর তিক্ত ব্যঙ্গ হাসি।

আশ্চর্য জীবন-শিল্প বুনে যাই আত্মযন্ত্রণার
মর্মান্তিক প্রেরণায়, বঞ্চনার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে
উজ্জ্বল শিল্পের মূর্তি নানা রঙে তীব্র অনুরাগে
গড়ে তুলি দিন রাত্রে, তার গায় অশ্রুর আস্বাদ।

পৃথিবী সুন্দর হয় আমাদের রক্তঝরা হাতে,
ঐশ্বর্যের আস্ফালনে দুঃখ আরো তীব্র মনে হয়:
তবু তবু স্বপ্ন দেখি মুক্তোঝরা শিশির-সকাল,
ব্যঙ্গভরা শূন্যতার মাঠে চরা সোনার হরিণ।

তবু ভাবি প্রাণপণে একদিন রাত্রি হবে ভোর,
দুঃস্বপ্নের রাত্রিশেষে ফুলফোটা বসন্তের দিন:
মৌমাছির গুন গুন, সমুদ্র সৈকতে দোল লাগা
বিকেলের চঞ্চল হৃদয় আনন্দ উত্তাপ ভরা।

প্রতিদিন দেখে যাই রামধনু রঙ আঁকা দিন
উজ্জ্বল মুক্তোর মতো, ঐশ্বর্যের আশ্চর্য উচ্ছ্বাস
মদের ফেনার মতো স্পর্ধাভরে বাড়ায় দুহাত:
হঠাৎ পিছনে বাজে ক্রুদ্ধকণ্ঠ মোটরের হর্ণ।

আমি ছুটবো | শ্যামলী কুমার

আমি আজ শেকল দিয়ে বাঁধা
একটি দাঁড়ের ময়না।
এ শেকল ছিঁড়ে ফেলার দিন
যখন আমার আসবে
আমার ছুটো ডানা মেলে
আকাশের গভীর নীলে
আমি শুধুই উড়বো।

জীবনের জটিল যন্ত্রণা
কর্তব্য, নীতিবোধ, তীক্ষ্ণফলা
শুধুই রক্ত ঝরে, রক্ত
মনের জানলা থেকে আকাশের রঙ মুছে নিল।
আমি সেদিন ছুটবো
উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়া,
আমি সেদিন খুঁজবো
সমুদ্রের গভীর অতল।

আজ শুধু ঢুপায়ে শিকলের যন্ত্রণা।

হয়তো সবাই ভোলে | মধুষ দাশগুপ্ত

যেমন সহজে ভোলে সূর্য-আলো শিশিরের প্রীতি
যেমন সহজে মোছে হাঁসেরা জলের কথাকলি
তেমনি সহজে তুমি ভুলে যাবে? মুছে ফেলবে কি
টিয়ারঙ ঘাসে ঘাসে আঁকা হোল যতটুকু স্মৃতি?

এই যে কুসুম বৃষ্টি ঝিরিঝিরি প্রশান্ত বিকেলে
হয়তো সবাই ভোলে এবং তা খুব স্বাভাবিক
তবুও হৃদয় বলে তুমি যেন কিছু ভুলবে না
অন্ধকারে সব দেখবে জোনাকির দীপালোক জ্বেলে।

অসম্ভব আজীবন পুরাতন দিনগুলি নিয়ে
নাড়াচাড়া করে যাওয়া। সুনিশ্চিত ক্লান্ত হতে হয়।
কতক্ষণ ভালো লাগে একমুঠো স্মৃতির সোনাকে—
যেহেতু নূতন ডালে অন্যসুরে পাখি কথা কয়।

হয়তো সবাই ভোলে এবং তা খুব স্বাভাবিক
তবুও হৃদয় বলে তুমি কিছু ভুলবে না ঠিক।

সুপ্তিভঙ্গ | মানিক মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

দিগন্তে শুনি আর্তির শত
রাত্রির উপকূলে
সমুদ্র ঢেউ ঘন উত্তাল
বিস্ময়াহত;
দুরন্ত মন তপ্ত ডানায়
থেকে থেকে দেয়
উদ্দাম নাড়া, গতির কেন্দ্র
তন্দ্রাব্যাহত!

দু'চোখে রূপের
দুহাতে জয়ের
অমোঘ তৃষ্ণা তাই;
মউসুমীদের
ঝড়ের দোলায়
মুক্ত চেতনা তীক্ষ্ণ!
কালের মাদলে জয়রোল ওঠে
পড়ে থাকে বাঁধা বিন্ন॥

একটি বিপ্লবের জন্ম

আনন্দ দে

★

In my thirty years on the New York Times I have never seen a big story so misunderstood, so badly handled, and so misinterpreted as the Cuban Revolution. —H. Matthews.

১৯৪৫ সালের জুন মাস। মাত্র ১৯ বছর বয়েসে আরও অনেক যুবকের সংগে একটি যুবক হাভানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ডিগ্রী পেলেন। Colegio Belen Year Book সেই যুবকের কথা উল্লেখ করে লিখলেন:

His record was one of excellence. he was a true athlete. always defending with bravery and pride the flag of the school. He has known how to win the admiration and the affection of all...and we do not doubt that he will fill with brilliant pages the book of his life. He has good timber and the actor in him will not be lacking.

বর্ষপঞ্জীর শেষ কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে ডাঃ ফিডেল কাস্ত্রো রুজের জীবনে এবং যে মঞ্চের নট তিনি সেই কিউবার ইতিহাসেও তাঁর জীবননাট্য অবিস্মরণীয়।

মঞ্চটার কথা আগে বলি।

২৮শে অক্টোবর, রবিবার, ১৪৯২ সাল। কলম্বাস নামলেন কিউবায়—আমেরিকার সন্নিকটে অতলান্তিকের বুকের ওপর পড়ে আছে শিরশিটির মতো যে দ্বীপ। নেমে বললেন, 'মানুষের চোখে বোধ হয় এতো সুন্দর দেশ পড়েনি।' কিউবা সুন্দর, কিউবা উর্বর, সম্পদশালী, কিউবা বিপ্লবের দেশ। নিউইয়র্কে যতো লোক বাস করে অতো লোকও নেই এই দ্বীপদেশে। পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে কিউবার লোকে ধনী। অথচ কিউবার প্রতি চার জনে একজন বেকার। উচ্চ শিক্ষার সেই সুযোগ। আর উৎপন্ন দ্রব্য তিনি আর চুরুটের জন্য মুখ চেয়ে থাকতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। এই দ্বীপদেশ ছিল স্পেনের, আর মজুর ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। গত শতকের গোড়ায় দশ কোটি টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপ, স্পেন দেয়নি; তখন যুক্তরাষ্ট্র মনে করতো একদিন জুড়ে যাবে দ্বীপটা তারই সংগে, সুতরাং তাড়াহুড়োর কারণ নেই; তাছাড়া, স্পেনের অন্যান্য লাতিন আমেরিকান্ উপনিবেশগুলোর মতো যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তবে ইংলণ্ড ছোবল মেরে নিয়ে নেবে ঐ শিরশিটিটাকে; অতএব, স্পেনেরই থাক্। কিন্তু কিউবার লোকেরা মনে করলো, ওটা স্পেনের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নয়, ইংলণ্ডের তো হবে না কোনকালে, ওটা তাদেরই।

লোকগুলো পাগলামি সুরু করলো—বিদ্রোহ করলো ১৮৬৮ সালে। এতো খেপে গেলো যে, স্পেনকে আশি হাজার স্পেনীয় সৈন্য বিদ্রোহ থামাতে বলি দিতে হলো। বিদ্রোহ দমন করতে দশ বছর লেগেছিল। বিদ্রোহের আগুন নিভলো বটে, কিন্তু ধূম উদ্গীরণ বন্ধ হয়নি।

১৮৯৮ সালে এই কিউবাকে নিয়েই স্পেন-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের পূর্বাভাস। কিউবা তখন লড়াই করে চলেছে। শেষে ১৮৯৯ সালে স্পেন কিউবাকে স্বাধীনতা দিল। কিন্তু অত্যন্ত চতুরতার সংগে আমেরিকা কিউবার সার্বভৌমত্ব নষ্ট করলো। দলিল—প্লাট সংশোধনী। তারপর থেকেই চললো লড়াই, ঘরে বাইরে; ঘরে, কিউবার নপুংসক প্রেসিডেন্টের সংগে, অত্যাচারী সেনাপতির সংগে, আর বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারীর বিরুদ্ধে। শেষে রুজভেল্ট কিউবার সার্বভৌমত্ব মানলেন—কিন্তু The long arm of United States power was never absent from Cuba. and the results were always the same—good for North American capitalists. bad for the Cuban people (পল সুইজি ও লিও হুবারম্যানের লেখা থেকে)।

হাঙ্গামা শুরু হবে, সৈন্যবাহিনী আক্রান্ত হবে, সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি। কিন্তু অনেক দুর্বিপাক পেরিয়ে যে দিন এক অধ্যাত অঞ্চলে কিউবার নামলেন সে দিন ওরা ডিসেম্বর, ওদিকে তখন হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে দু'চার জায়গায়, খবর পেলেন আতাঙ্কের বেতারে। সে বেতার এমনি যে খবর পাওয়া যায়, দেওয়া যায় না। নামলেন এক ইক্ষুক্ষেতে; সঙ্গে সঙ্গে আগুনে বোমা পড়তে লাগলো মাথার ওপর; সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলেন—বোমা পড়া বন্ধ হলে দেখা গেল সবশুদ্ধ আছেন ১২ জন, তাও ডাঃ গুয়েভারা নিজেই বুলেটবিদ্ধ। কাস্ত্রো সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন—"বাতিস্তার দিন শেষ।" সকলে ভাবলো কাস্ত্রোর মাথা খারাপ হয়েছে, কারণ, এদিকে বারো জন আর ওদিক বাতিস্তার ত্রিশ হাজার সুগঠিত সৈন্য, বোমা-বারুদ-বিমান। আর আমেরিকার অঢেল ডলার। কিন্তু কাস্ত্রোর কথাই ঠিক—১লা জানুয়ারী ১৯৫৯ সালে বাতিস্তার দিন শেষ হলো।

বারোজন ত' বারোজন মাত্র নয়। গ্রামে-সহরে-জনপদে এই বারোজন বহুগুণিত হয়েছেন ত্যাগে, বিপ্লবের আদর্শে। কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, বার-লাইব্রেরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁরা জানেন কাস্ত্রোকে, শুনেছেন তাঁর বক্তৃতা "মানুষ তো মানুষকে অনুসরণ করে না, করে তার ভাবধারা।" কেউ দিলো টাকা, কেউ বাতিস্তার বন্দুক ছিনিয়ে এনে দিলো, আর কেউ দিলো নিজেকে। হাজারে হাজারে বহুবারের প্রত্যাবর্তিত কৃষক এলেন। সৈন্য বাহিনী গোপনে তৈরি হতে লাগলো। হাভানার বিখ্যাত ডাক্তার জুলিয়ো পেজ্ চিকিৎসা কেন্দ্র খুললেন, ডাঃ গুয়েভারা কৃষকদের মধ্যে ইস্কুল বসালেন। দুষ্টমতি বাতিস্তাও সাহায্য করলেন, তবে সে অন্তভাবে—অত্যাচারের লৌহরথ চালিয়ে দিয়ে। লোকে উপায় খুঁজতে লাগলো। ১৯৫৭ সালেও বাতিস্তা-বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থ হলো। কাস্ত্রোর বেআইনী সৈন্যবাহিনীর অনেকে ধরা পড়লেন, নিহত হলেন। বাতিস্তার সৈন্য বাহিনীতেও বিদ্রোহ দেখা দিল, নৌবাহিনীর বিদ্রোহও ব্যর্থ হলো। একটি ছাত্র বাতিস্তাকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। এই রকম যখন চলছে তখন Radio Rebelde বিপ্লবীদের বেতারে কাস্ত্রোর আহ্বান জনসাধারণ শুনতে লাগলো। ১৯৫৮-র মার্চ মাসে ইস্তাহার জারী হলো—১লা এপ্রিল থেকে খাজনা বন্ধ করো, ধর্মঘট করো, এই থেকে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করো। বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়লেন কাস্ত্রোর সাথীরা, সৈন্যবাহিনী ভাগ করে নিয়ে। বাতিস্তার সৈন্যবাহিনীতে ভাঙ্গন ধরলো, যারা রইল অনুগত হয়ে তারা অসামর্থ জানালো বাতিস্তাকে। এদিকে এতো দিন কিউবার রাজনৈতিক দল-উপদলগুলিকে একত্র করা যায়নি, হঠাৎ তাদের মতিগতি ফিরলো—২৩শে জুলাই তাদের সম্মিলিত সম্মতি পাওয়া গেল, কেবল কম্যুনিষ্ট পার্টি বাইরে রইল। জুলাই মাসের পর থেকে কম্যুনিষ্ট পার্টি আন্দোলনকে সাহায্য করতে থাকে। ২৩শে আগষ্ট কাস্ত্রো রেডিওতে বললেন : Victories in war depend to a minimum on weapons and to a maximum on morale.

কিউবার বিভিন্ন সহর তখন বিপ্লবীদের হাতে যেতে শুরু করেছে। ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯। বাতিস্তা পদত্যাগ করে পালিয়েছে বিমানে করে—সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ বিচারপতিকে প্রেসিডেন্ট করে গেছে। কাস্ত্রো যুদ্ধ না থামিয়ে বাতিস্তার লোকজনদের কাছ থেকে সর্তহীন আত্মসমর্পন দাবি করলেন। ২রা জানুয়ারীর আগেই বিপ্লবী পতাকা উড়লো চারদিকে। ওদিকে ২রা তারিখে নিউইয়র্কের কাগজে কাগজে বড় বড় হেডিং—বাতিস্তা জিতিতেছে, কাস্ত্রো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, বাতিস্তা যুদ্ধ জয় করিয়াছেন।

এই ভাবে একটি বিপ্লবের জন্ম : What is going on in Cuba to day is no mere palace revolution at the top. In which one oligarchy has ousted another. This is a social revolution. (ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান্)।

...রকটি পরিচ্ছিন্ন আঁচড়।
...টি চিঠি। নেহাৎই ভাল
...হয়, গোবেচারা চিঠি।
...মেয়ে অথবা সং সাজার
...ও নেই। রেগে টং
...র মেজাজ দেখাবার লোভ
...ই। কথাগুলো ফুলের
...ন সাজানো নয়। কোন
...ই গন্ধ চিঠিটার গা বেয়ে
...ঠ আসছে না।

নেহাৎই সাধারণ, নিতান্ত
...ল, নিপট ভালোমানুষ
...ঠি। অথচ এর মধ্যেই
...মিতার জন্যে একটা ভেজা
...সাহের গন্ধ ছিলো। চিঠিটা
...র হাত থেকে পেয়ে ও কয়েক মিনিট অবাক হয়ে গেল।
...রপর, হ্যাঁ, ঠিক তারপরই সে কেঁপে আকুল হল।
...খের জলে বুক ভেসে গেল। চোখের বড়ো বড়ো
...তাগুলো ভারী হয়ে উঠলো। চিঠিটা কে লিখেছে?
...খকের কোন নাম নেই। কিন্তু তবু বোঝা যায়।
...তে পেরেছে সুমিতা। ঠোঁটটা কামড়ালো।

অক্ষরগুলো পর্যন্ত চেনা চেনা লাগছে। 'ক'টা এক
...াঁচ দিয়ে বেবাক ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে মজি মতো।
...' টাকে জুড়ি গাড়ি চাপিয়ে মোটা করে দেওয়া হয়েছে।
...' এর কোমড় জড়িয়ে ধরে নষ্টামি দেখানো হয়েছে।

এর পরও চিনতে কিছু বাকি আছে সুমিতার?
...ন্তু কেন এই চিঠি? তার কাছেই বা কেন? কি
...কার ছিলো এইসব ছাই-পাঁশ দিয়ে কাগজটা ভরাট
...রার? চিঠিটার ভাষা আপত্তিকর নয় মোটেই।
...ং বেশ ভদ্র, বেশ ভালোই। কিন্তু ভালো কথাগুলো
...কেই বিশেষ করে জানানোর কি মানে হয়?

চিঠিটা খারাপ কিছু নয় অথচ যা গম্ভীর।

চিঠিটা মন্দ নয়—বাবার মুখ ঘনঘনে।

...চিঠি তাকে লেখে কি চিঠি পেয়ে মনে আলোড়ন ... করে গেছেন ... এই—ই মায়ের স্বভাব।

...সেই ছোট ছোট
...বোনেরা পর্যন্ত মুখে একরাশ
...বিদ্যা মেখে গুপুর্দু।
...আর অপমানে, লজ্জায়,
...ঘেন্নায় আকণ্ঠ ডুবে
...সুমিতা। নেহাৎই সরল—
...কিন্তু চিঠি দেবার কি প্রয়োজন ছিলো? কি দরকার
...ছিলো অপমান করার?

সুমিতা কেঁদে ফেলে। এই প্রথম তার এই ধরণের অভিজ্ঞতা। কেউ একজন তাকে চিঠি দিয়েছে। এতদিনে যে কি তা এর আগে জানা ছিলো জানবার কথাও নয়। বয়েস তার বেশী নয় খুব। এই প্রথম এই প্রথম একজন কেউ তাকে একখানা চিঠি দিয়েছে।

কিন্তু তার ভালো লাগলো না। যেন একটা মূর্তিমান মনোযের পাপকে সে দেখতে পাচ্ছে। সুন্দর একটা নোংরা লোভ তাকে যেন ডাকছে। অপরূপ মন্দ একটা ইঙ্গিত তাকে হাত ধরে টেনে আনতে চায়।

সমস্ত কাণ্ডটা সুমিতার পড়ে রইলো। বাড়ির অবস্থা তার ভালো নয় বাবা কাজ করেন ওপারের ছুটমিলে বাইশ ধরে। তাতে কিছুই হয় না। আবার ও মধ্যেই বাবার নেশা ভাং করা চাই-ই। বাবা গন্তা হয়েছেন বটে তবে নেশাখোর মানুষ। কয়েক ছিলি টেনে কিংবা কয়েক ঢোঁক গিলে এই দশটাই টু গেলেন বলে। কিন্তু ভুলবেন না শুধু একজন।

লোকে বলে সুমিতা সুন্দরী। কিন্তু মায়ের এ বয়সেও যা চুল, যা গায়ের রং—সুমিতা তাঁর চে সিকি বয়েসের ছোট হয়েও তা পায়নি। সেই অপরূ সুন্দরী মা তার মনে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন মা তো তাকে ধমকান নি, চোখ রাঙাননি। শুধু চু

এমন কতোদিন গেছে, যারা কোথায় না কোথায় সামান্য টাকাও ফোন ঢংগে ছুড়িয়ে দিয়ে পকেট গড়েরমাঠ করে নেশায় টং হয়ে 'রে রে' করতে করতে বাড়ি ঢুকেছেন, মা সোরগোল করেন নি, প্রতিবাদ করেন নি। শুধু নীরবে, চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন।

পাশের বাড়ির, ছেলেমেয়েরা পুজোর আনন্দে মাতিয়ে রেখেছে নতুন জামা পরে। তাঁর ছেলেমেয়েদের নতুন জামা নেই। পুরোনো কাপড়জামা কাচতে কাচতে মা সাবানগোলা জলের সংগে আরো কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল—চোখের জল মিশিয়েছেন। কোনদিন কোন কথা বলেন নি।

এসবও কিছু নয়।

এই যে আজ—সুমিতা ম্যাট্রিক পাশ করে টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়েছে—মা না থাকলে এসব হত?

সংসারের অভাব কম নয়। পোষ্য অনেক। বাবা টাকার ভরে না। নানা ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে টাকা জোগাড় করে দিয়েছেন। সেলাই কোঁড়টা জানেন ভালোই। বাড়ি বাড়ি অর্ডার নিয়ে, সেমিজ, ব্লাউজ, সার্ট, প্যান্ট তৈরী করেন কখনো। এই সেদিনো বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি-কলাই ভেজে দিয়ে আসতেন। একসময় বোঁদাও তৈরী করেছেন রাশি রাশি।

কোনদিন কোন শব্দ, আওয়াজ বের হয়নি মুখ থেকে। শুধু ঐ অপরূপ মুখশ্রীতে গাম্ভীর্যের ছায়া নেবেছে ঘন হয়ে। চোখের নিচে লেগেছে কয়েক পোঁচ কালি। ভুরু দুটো কেন্নাইএর মত কুঁচকে গেছে থেকে থেকে।

• সেই মা আজ কি ভাবলেন তার সম্বন্ধে?

ছিঃ। সমস্ত মনটা সুমিতার অশুচি লাগলো। আর সংগে সংগে মনে পড়লো চিঠিটা।

একটা সাধারণ চিঠি। সহজ সরল ভাষায় লেখা। কিন্তু এর কি দরকার ছিলো? কি দরকার ছিলো তাকেই দেবার? এতে পত্র-লেখকের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো? চিঠিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। আবার ইচ্ছে করছে ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে। চিঠিটাকে চুমু খেতে সাধ যাচ্ছে, আবার আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে ওর গায়ে। চিঠিটার কথাগুলোর আড়ালে যে আছে তাকে দেখবার প্রচণ্ড বাসনা হচ্ছে, আবার এও মনে হচ্ছে এ জীবনে ও মুখ যেন দেখতে না হয়।

তাই-ই হওয়া উচিত। সুমিতা হয় তো এ জীবনে সুব্রতের মুখ দেখতই না। বিশেষ করে এমন অপমান করার পর। কিন্তু চিঠিটা সত্যি তাকে লিখতে গেল কেন সুব্রত এটা জানবার তার ইচ্ছে হল। জানতে তার সাধ গেল এ ধরনের অপমান করবার তার কি দরকার ছিলো। অধিকারই বা কে দিল?

সে সকাল আটটায় টাইপ স্কুলে যেতো। সব কাজ ফেলে সুব্রত তখন বেরুতো সাইকেলে। বিশেষ কোন কথা বলতো না। বললেও বড় জোর বলতো, কি, কোথায় যাচ্ছো? কিন্তু আটটার সময় সুমিতা বার হলেই সুব্রতের বার হওয়া চাই।

সুমিতা বন্ধুদের সংগে সিনেমা দেখতে গেলে সুব্রতেরও সিনেমা হাউসে যাওয়া চাই-ই। বিশেষ কোন কথা হোত না। কথা বললেও বড় জোর সুব্রত বলল, কি, কেমন দেখলে? ব্যস। এই পর্যন্ত। কিন্তু যাওয়াটা তার চাই-ই।

বিকেলের দিকে ভাড়াটে বাড়ির ছাদে উঠে দাঁড়াতে যখন ভালো লাগতো সুমিতার তখন সে দেখতো সুব্রত ঠিক তার সামনের বাড়ির মাঠে কার সংগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এর কিন্তু ব্যতিক্রম হোত না।

কথা হোত না। কথা বললেও বড় জোর সুব্রত বলতো, কি, ছাদে, আর সমস্ত কথার—'কি, কোথায় যাচ্ছ,' কিংবা 'কি, সিনেমা কেমন দেখলে' অথবা 'কি, ছাদে?' —এসবের জবাব সুমিতা টেনে টেনে কোন দিনই বড়ো করেনি। যেটুকু জবাব না দিলে খারাপ দেখায় সেটুকুই দিয়েছে।

সুব্রত নিজে নিজে ঘেঁসে ঘেঁসে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, পাশে সে বসতে বলেনি কিন্তু চলে যেতেও বলেনি। কেন বলবে? সুমিতা সুব্রতকে তো অন্যত্র ভাবেনি।

তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি সুব্রতকে ঠিক মন্দ বলে মনে করাই যায় না। সাধারণ, খুবই আট-পৌরে চেহারার একটা এলোমেলো বেমানান চুল-অলা শুকনো মুখ, ভোঁতা চোখ, না লম্বা-না বেঁটে ধার না

খাপছা আর রুগ একটা লোক। লোকটা এমনিতে কিছুই নয়। কিন্তু কথা বলার একটা বিশিষ্ট ভংগি আছে। গায়ে, শরীরে না রং থাক, কথায় আছে। আর গলার স্বরটি মিষ্টি। মেজাজ বড়ো ঠাণ্ডা। বড়ো ধীর। সরল সহজ মানুষ। চুঁচুড়ার কোন গানের দোকানের সেলস্‌ম্যান। কীর্তির মধ্যে এইটুকু। চিঠি দেবার মত দুঃসাহস যে তার হতে পারে সুমিতা এটা ভাবতেই পারতো না যদি না চিঠির কথাগুলো চেনা চেনা না লাগতো, হাতের অক্ষরগুলো অতো পরিচিত না লাগতো।

কি আশ্চর্য! সুব্রতের ওপর আর কিন্তু রাগ হচ্ছে না। একটু আগেও ছিলো। সুব্রতের কথা ভাবতে গিয়েই ওর ওপর রাগ পড়ে গেছে।

তার কারণ বোধ হয় সুব্রত যে এই ধরণের একটা চিঠি লিখতে পারে এটা যারা সুব্রতকে চেনে তারা সহজে বিশ্বাস করতে পারবেনা। যে ভালো করে চোখ তুলে চাইতেই পারে না, কথা বলতে গেলে ঘামে, তার মতো একটা নার্ভাস লোক এই রকম একটা চিঠি লিখতেই পারেনা।

অথচ চিঠির কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। ওর সংগে সময় সময় যেন কোন ব্যাপার নিয়ে সামান্য সামান্য কথা হয়েছিলো। এই চিঠিতে সেই সামান্য জিনিসগুলিকে অসামান্য কায়দায় এক জায়গাতেই জড়ো করা হয়েছে। এমনকি হাতের লেখা পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে। সুমিতা সুব্রতের হাতের লেখা চেনে। সে দিকে ঢাকে যাবার উপায় নেই।

এটাই খালি মনে হচ্ছে সুমিতার সুব্রত কেন এরকম চিঠি লিখলো?

আর লিখলই যদি তবে চিঠিতে একটু রং ঢাললোনা কেন; রংটা হোক না মিথ্যে। চিঠিটার গা থেকে একটু গন্ধ উঠে এলোনা কেন? হোক না গন্ধটা ছলনার। কালি দিয়েই বা লিখলো কেন? একটু হৃদয় দিয়ে লিখলেই তো পারতো। হোক না হৃদয়টা ফাঁকির, বঞ্চনার।

সকালবেলা সুমিতা সুব্রতের ঘরে দোতলা থেকে নেমে এলো। সুব্রতের মা ঠাকুর পুজোয় বসেছেন। বাবা গেছেন বাজারে। সুব্রতের বোনের সংগেই সুমিতার আলাপ। সেই সূত্রেই এ বাড়িতে তার অবাধ গতিবিধি। সুব্রতের বোনও এ সময় ঘরে নেই। ছাতেলায় গেছে। সবাই বাইরে। সুব্রত শুধু ঘরে। এসবই সুমিতা জানে। তাই সে চিঠিটা হাতে নিয়ে নীচে নেমে এলো সুব্রতের কাছে।

বল্লে—এসবের কি মানে হয়?

সুব্রত এ সময় সুমিতাকে এখানে দেখবে আশাই করেনি বিশেষ করে ঘরে যখন কেউ নেই। তাছাড়া এমন করে সুমিতা কখনো কথা বলেনা। আগে সুব্রত কিছু বলে। তবে সুমিতা জবাব দেয়। তাকে কথা বলাও বলা চলেনা।

সুব্রত অবাক হয়ে সুমিতার দিকে তাকালো। তারপর কি ভেবে হাত থেকে চিঠিটা নিলো। পড়তে লাগলো সুব্রত। বারকতক পড়লো। পড়ে মাথা মুণ্ড বুঝতে পারলেনা।

বল্ল—এ চিঠি আমার কাছে এনেছো কেন? দেখছি এটা তোমাকেই দেওয়া হয়েছে?

সুমিতা রেগে টং হয়ে বল্ল—চমৎকার অভিনয় করতে শিখেছেন। কবে থেকে এটা শিখলেন?

সুব্রত সত্যিই বিস্মিত হয়ে গেছে। ও বল্ল—কি বলছো সুমিতা? আমি তো তোমার কথা বুঝতেই পারছিনা।

সুমিতা ঠোঁটটা কামড়ে বল্ল—বোঝা-বুঝির দরকার নেই। এ চিঠি আপনি লেখেন নি—সত্যি করে বলুন।

সুব্রত বল্ল—না। আমি এসব লিখতেই যাবোনা কেন?

সুব্রতর মুখের দিকে সুমিতা তাকালো। গলার স্বর ঢাকলেও, চোখ দুটো মানুষ ঢাকতে পারে না। ওখানে ছায়া পড়বেই। কিন্তু চোখদুটো সুব্রতের আশ্চর্য রকম স্থির। বড়ো যেন অবাক চোখদুটো।

তাহলে?

সুব্রত ফের বল্ল—চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তা কি আমি মুখে বলতে পারতাম না? বিশেষ কোন মন্দ কথা তো আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দেখতে পাচ্ছি না।

ঠিক! একথা তো সুমিতা ভেবে দেখেনি। কিন্তু চিঠির কথাগুলো মিলে যাচ্ছে যে! সেগুলো?

সুমিতা বল্ল—কিন্তু ওসব যা লেখা হয়েছে এ অন্য লোক জানলো কি করে?

সুব্রত এবার একটু হাসলো। ঠিক তাকে হাসি বলা

চলে না। যেন মনের সে গোপন অভিপ্রায়কে একটু মুচকি হাসির কৌতুক দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হল।

সুব্রত ঐরকম একটু করে হেসে বলল—এইবার আমি বুঝতে পেরেছি। কাজটা সত্যি কাঁচা হয়ে গেছে। সত্যি আমার উচিত হয়নি। আমি আমার বন্ধুর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সুমিতা বুঝতে না পেরে বলল—বন্ধুর হয়ে ক্ষমা চাইছেন কেন?

সুব্রত লজ্জিত হয়ে বলল—ওটা আমারই বোকামি। আমার বন্ধু তোমাকে চেনে। আমরা এক বাড়িতে থাকি। তাতেই সে নানারকম আষাঢ়ে গল্প তৈরী করে নেয়। আমাকে সে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতো। আমি তখন অতো বুঝিনি। সরল মনে সবই বলতাম। সেই সম্ভবত এই চিঠি লিখেছে।

—কিন্তু হাতের লেখাটা?

—ওটা আমার নয়। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নকল করে অনেকেই হাত পাকায়। মিল থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

সুমিতা এইবার হাসলো। মনের গুমোট কেটে গেছে খানিকটা। শুধু এখনো রয়েছে একটু আলাদারা অস্বস্তি।

সুমিতা নিরীহ, সরল, নিতান্ত গো-বেচারা মানুষটির দিকে তার শান্ত গভীর চোখ দুটো তুলে কেমন একটু ব্যাথার সুরে বলল—বন্ধুটিকে কেন আপনি সব বলতে গেলেন?

চকিতে সুব্রত একবার তাকালো সুমিতার দিকে।

একটু হেসে ও বলল—বেশ একটু অপরাধ, করে ফেলেছে তারই এটা যেন কৈফিয়ৎ, ও বলল—কি জানি তখন মাথায় কি ভূত চেপেছিলো সুমিতা।

সুমিতা একটু তরল হেসে বলল—কিন্তু কেন ভূত চাপে?

বড়ো ধীর স্থির সুব্রত যখন অল্প একটু হেসে লজ্জায় যেমে মাথা নীচু করে মুখটা লুকোতে চায় তখন ও যেন আরো কিছু চায়। কথা বলতে গিয়ে সুব্রতের যখন গলা কাঁপে তখন ঐ কাঁপা গলায় একটা অন্ত রঙের সুরও কাঁপতে থাকে ঝির ঝির করে।

সুব্রত যখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তখন শুধু কথা বললেই যেন তার আশ মেটে না ঐরকম মিষ্টি মিষ্টি কোন কিছু যেন তার পাবার ইচ্ছে হয়।

এসবই সুমিতা জানে। আর জানে বলেই তো সুব্রতের ঐ ভালোমানুষ কৈফিয়ৎ সে সহজে হজম করতে পারলো না। কয়েকদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে মা অন্য একটি বিপদে জড়িয়ে গেছেন। ছোট মামা মারা গেছে। মা হাত পা ছড়িয়ে, চীৎকার করে, পাড়ায় সোরগোল তুলে কাঁদতে বসেননি। মুখের গাম্ভীর্য আরো বেশী করে বেড়েছে। কপালে আরো কয়েকটি কুঞ্চন দেখা দিয়েছে। আরো ঘন করে পড়েছে দুচোখের নিচে কালির পলি।

ইতিমধ্যেই নতুন বিপদ এসে পুরোনো বিপদকে বলেছে 'যাও'. সুমিতার কাছেও। কিন্তু অস্বস্তিটা থেকে গেছে। বুকটাও তাই কেমন ভার ভার। অন্য ধরনের বেদনায় টনটন করছে।

কৈফিয়ৎটা দিয়েই সুব্রত বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে। ও অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? যদি সবটাই বন্ধুর কীর্তি হয়, তাহলে ওরকম চোরের মতন স্বভাব কেন সুব্রতের? যে যেমন ছিলো তেমনিই থাক না।

টাইপ স্কুলে যাবার পথেই সুব্রতের সংগে সুমিতার দেখা হল। সুব্রত যাচ্ছিলো সাইকেলে। সুমিতা ডেকে সাইকেল থামালো।

সুব্রত দাঁড়ালো। সুমিতা বলল—চিঠিটা আপনি লিখেছিলেন—না? বলতে বলতে সুমিতা মধুর হাসলো।

অতো সুন্দর হাসির দিকে অতো বেশীক্ষণ তাকানো যায় না। সুব্রত লজ্জায় জড়িয়ে গিয়ে দই-কাদা গলায় বলল—আমার সেই বন্ধুটির কথা তো তোমায় সেদিন বললাম।

—আপনার সেই বুদ্ধিমান বন্ধুটি কোথায় থাকেন? আমাদের বাড়িতেই? সুমিতা আবার ওমন মধুর হেসে তাকালো যে সেদিকে বেশীক্ষণ চোখ রাখা যায় না।

সুব্রত অস্বস্তিতে আটকে গিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে বলল—চুঁচুড়ায়।

সুমিতা চোখদুটো কুঁচকে দুষ্টুমি করে বলল—তা অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? চুঁচড়োয় যাচ্ছেন বুঝি?

সুব্রত তাড়াতাড়ি বলল—না, না। ইয়ে, আমি আসছি এক্ষুনি।

'এক্ষুনি আসছি' বলে সেই যে সুব্রত গেল তারপর অনেকদিন আর দেখা নেই। কি একটা বই হচ্ছে সিনেমায়। বই দেখতে যাবার জন্যে বাসে উঠেছে সুমিতা। বাসে উঠে দেখে ভালোমানুষ সুব্রত এককোণে বসে তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

জায়গা ছিলো। সুমিতা পাশে গিয়েই বসলো। একথা সে কথার পর যেকথা সুমিতা এতদিনেও ভুলতে পারেনি সেই কথাটা সুমিতা দুষ্টুমি করে কের বলল।

চোখদুটো কুঁচকে, ভুরু দুটো আকাশে তুলে সুমিতা বলল—আচ্ছা, বাসটা চুঁচড়োর যাচ্ছে তো?

সুব্রত হেসে বলল—তাতে আর সন্দেহ কি।

সুমিতা ঐ একই ভঙ্গীতে বলল—আপনার সেই বুদ্ধিমান বন্ধুটিতো ওখানেই থাকেন না? চলুন না তার সংগে একবার দেখা করে আসি।

সুব্রত পড়ে গেল ফাঁপরে। সেই বন্ধুটিকে এখন সে কোথায় পায়? তার নানা কাজ। নানা কলি-কিকিরে সে থাকে। হয়তো পাওয়া যাবে তার বাড়ি গেলে কিন্তু সেখানে সুমিতাকে নিয়ে যাবে কেমন করে? সুমিতা যা রেগে আছে যদি বেফাঁস কিছু বলে? কাজটা অবশ্য অত্যন্ত অন্যায় করেছে বন্ধুটি তবু—

সুব্রত চিন্তিত হয়ে বললে—সে এখন চুঁচড়োয় নেই। কোথায় যেন গেছে। বাস এসে গেছে স্টপেজে। সকলে নামলে সুমিতা মধুর হেসে তার সুন্দর চোখ দুটো তুলে সুব্রতকে বলল—যদি বলি আপনার বুদ্ধিমান বন্ধুটি কোথাও যাওনি। যদি বলি সে আছে কাছেই আছেন।

সুব্রত পালটে গেছে আজকাল। কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপে না। চোখের দিকে স্থির হয়ে তাকাতে পারে। চলনে-বলনে একটু স্মার্ট হয়েছে। গানের দোকানের সেলসম্যান অথচ একটা গোটা গান সে জানতো না এতোদিন। হঠাৎ রোখের মাথায় একটা গোটা গান সবটাই ভৈরী করে ছেঁড়ে গলায় বিচিত্র স্বর করে সুমিতাকে একা পেয়ে প্রায় জোর করে শুনিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুমিতাও ছাড়েনি।

সুমিতা বলে—ঐ একখানা গান শুনিয়ে আপনি পার পাবেন না। আরো খানকতক শোনান। দেখি আপনার গলার জোর বেশী না আমার ধৈর্য বেশী।

কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা। জানে তো মাত্র ঐ একখানাই সুব্রত। বাকী গানগুলোর কোনটার মুখের দিকটা, কোনটার সিকি অংশ, কোনটার মাঝখানের একটুখানি। হার স্বীকার না করে সুব্রত বলে—তোমার যখন এতোই গান শোনার ইচ্ছে একদিন এলেই তো পারো আমার দোকানে।

দোকানেই একদিন গেল সুমিতা।

বেশ খাতির করে বসালো সুব্রত। চা খাওয়ালো। চপ খাওয়ালো, গান শোনালো। কয়েকজন বন্ধুর সংগে আলাপ করিয়ে দিলো। তারপর আর এক সেলসম্যানের জিম্মায় দোকানটা রেখে রাস্তায় নেবে পড়লো সুব্রত।

সুমিতা এটা সেটা জিজ্ঞেস করলো। কয়েকটা দোকানে ঢুকলো, বার হল। খিল খিল করে হাসলো। একটা পান খেলো। খাওয়ালো আর একটা সুব্রতকে। সুব্রত এছাড়াও আর একটা সিগারেট খেলো। খাওয়াতে চাইলো সিগারেট। সুমিতা থামিয়ে দিলো।

সুমিতা বলল—সবইত হল। চুঁচড়োয় আসা হল। আপনার দোকানে বসা হল। পান খাওয়া হল। সিগারেট পর্যন্ত খাতির করে খাওয়াতে চাইলেন। আপনার কয়েকজন বন্ধুর সংগে আলাপ করিয়েও দিলেন। কিন্তু একটা জিনিস বাদ পড়ে গেল।

চিন্তিত মুখে সুব্রত বলল—কি বলতো, কি বাদ পড়লো?

সুব্রতের কথা শুনে কৌতুক যেন ঝলকে উঠলো সুমিতার চোখে। তাতে এসে মিশলো অনুরাগের গাঢ় রং। আশ্চর্য অর্থময়, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সুমিতার অপরূপ চোখ দুটো। নিয়নের আলোর ছটায় তাকে যেন মনে হচ্ছে সে যেন কোন মায়াবিনী। বিদেশিনী কেউ পথ ভুলে এখানে এসে যেন আটকে পড়তে ইচ্ছে করে।

সুব্রত সেই দিকে চেয়ে অস্থির হয়ে উঠলো, বলল—কি, কি বাদ পড়লো?

কৌতুক আবার ঝলকে উঠলো সুমিতার চোখে।

সুমিতা আবার বলল—সবই হল। একজনের সংগে শুধু কথা হল না। বাকী রইলো শুধু একজন।

—কে, কার কথা বলছো ?

—আপনি যেন কিছু বুঝতে পারছেন না ? আপনার সেই বুদ্ধিমান বন্ধুটির কথা বলছি।

'বুদ্ধিমান বন্ধুটি'কে নিয়ে সুব্রত মহা ফাঁপরে পড়েছে। না বলেও উপায় ছিলোনা তার কথা। কেননা চিঠিটা তো সেই লিখেছিলো। বলেও খারাপ লাগছে। লাগবারই কথা। তার আর সুমিতার অন্তরংগ কথার মাঝখানে ঠিক এসে যায় 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি'। অদ্ভুত তার ভংগি। সে আসবেই। সে পাবেই সুমিতাকে। সুমিতার হৃদয়কে। তার জন্যে তাকে কোন মূল্য দিতে হবেনা। সাধনা করতে হবেনা। পরিশ্রম তার জন্যে নয়। তার সম্বন্ধে সুন্দর কুৎসিতের কথা ওঠেই না। আদিতে সে আসেনা। সে আসে অন্তে। তাকে নিয়েই উপসংহার। সমস্ত আলোচনা, সমস্ত কথকতার শেষে তাকে যেন আসতেই হবে। প্রচুর আনন্দ আর সম্ভোগের হরির লুটে সে এসে তার পাওনা-গণ্ডা ঠিক বুঝে নেবেই। প্রচণ্ড তার খিদে। অতি তীব্র তার পিপাসা। সুতরাং সুব্রতের দিক দিয়ে কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। প্রচুর আনন্দের মাঝখানেও যেন অসীম বিচ্ছেদ থেকে যায়।

'বুদ্ধিমান বন্ধুটি'কে তাই সুব্রত হিংসে করে।

অথচ কোন উপায় নেই। চিঠিটাই একমাত্র সে লিখেছিলো। তাও তারই কথা। সুব্রতর কথা। নিজের কথা সে লেখেনি। আর তার কোন অপরাধ নয়। তাকে যদি কেউ ভাবে তাতে সে আর কি করতে পারে ? সেইজন্যে দেখা হলেও কোন কথা বলতে পারেনা সুব্রত। বললে খারাপ শোনাবে। হয়তো 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি' হো হো করে হেসে উঠবে। হয়তো বিশ্বাসই করবে না। হয়তো পাগল ভাববে। আর আশ্চর্য মেয়ে সুমিতা। 'পুরাতন বন্ধুটি'কে নব আলোচনায় আনবার তার দুর্লভ প্রতিভা। তার কথা বলতে গেলেই সুমিতার চোখে কৌতুক ঝলকে ওঠে। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আর হিংসেয় ঈর্ষায় জ্বলে জ্বলে ওঠে সুব্রত।

এর বেশী আর সে কি করতে পারেই বা ?

একটা মতলব খেলে গেল সুব্রতের মাথায়। সুব্রত ঠিক করলো এইবার দেখা হলে সেই আগে যে কোন অছিলায় 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি'র কথা তুলবে। বলবে, এতোদিন পর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় ধর্না দিয়ে ভাগ্যের শিকেটা খুলেছে 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি'র। দুর্গাপুরে প্ল্যান্টিংএর কাজে অপারেটর দরকার। ও পেয়ে গেছে চাকরীটা। মাস ছয়েক ট্রেনিং পিরিয়ডে থাকতে হবে। তবে মাইনে পাবে পুরো। সহজে চুঁচড়োয় আর আসতে পারবেনা। এমন চমৎকার একজন বন্ধুর অনেকদিন আর দেখা পাবেনা বলে সুব্রতের খুব খারাপ লাগছে।

মনে মনে বানিয়ে বেশ ভালিম দিয়ে রাখলো। সুতরাং একদিন নিরিবিলি পেয়ে সুমিতার সামনে সুন্দর অভিনয় করে গেল সুব্রত।

সুব্রত বলল—তোমার বন্ধুটি' তো এইবার চলল।

সুমিতার চোখে কৌতুক ঝলকে উঠলো।

ও বলল—কোথায় ?

সুব্রত মিটমিট করে হেসে বলল—দুর্গাপুর। এখন আর আসবেনা। এতক্ষণ কৌতুকের সাজ পড়েছিলো সুমিতা। হঠাৎ সাজটা খসে পড়লো। বেদনায় বোধ হয় বুকটা টনটন করে উঠলো সুমিতার।

চোখ দুটো ছাপিয়ে গেল জলে। অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো। একবার মনে হল বাজে কথা। মিথ্যে দিয়ে সাজানো। কিন্তু আবার মনে হল হতে পারে। সবই হতে পারে। 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি' চলে যেতে পারে।

সুমিতা বেদনার সংগে বলল—কেন, কি এমন দরকার ?

সুব্রত সব কথাই বলল তেমনি অভিনয় করে।

সুমিতা আর কিছু বললনা। চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্যে নয়। কোথা থেকে যেন কি একটা বার করলো। তারপর সেটা খুঁজে দিলো সুব্রতের হাতে।

আস্তে আস্তে ধরা গলায় বলল—যেখানেই যাক সে যাই করুক শুধু যেন এটা মনে রাখে। এই চিঠিটা। আর কিছু চাইনা। আর কিছুই না।

সুব্রত বিব্রত ভাবে চিঠিটা সামনে মেলে ধরলো। বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। জায়গায় জায়গায় ঘষলুদের

ছোপ লেগেছে। ছেঁড়া একটু একটু। একটু চাপ দিলেই ভাঙা লুচির মত গুড়ো হয়ে যাবে। অক্ষরগুলো উঠে গেছে একরকম। ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের মত হতভাগা চেহারা তাদের। ছন্নছাড়া অবস্থা। সুব্রত চিঠি থেকে মুখ তুলে অবনতমুখী মেয়েটির দিকে তাকালো। সুমিতা কাঁদছে।

সুব্রত কি আর করবে। সে প্রথম দিন যেমন অস্বীকার করেছিলো আজও তেমনি অস্বীকার করলো।

সে বলল চিঠিটা আমার নয়। এ চিঠি নিয়ে কি করবো?

আবার সেই মিথ্যে কথা! আবার বানিয়ে বলা?

সুমিতা গভীর চোখে তাকালো সুব্রতের দিকে। তার চোখ দুটো এখন ছলছল করছিলো। তবুও কৌতুক ঝলকে উঠলো। অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠলো দুটি চোখের তারা।

সুমিতা বলল—আর চালাকি করতে হবেনা। এ চিঠি তুমিই লিখেছিলে। একবার সুব্রতের মনে হল ঠিকই তো। চিঠিটা তাকে নিয়েই। যেই লিখুক, অক্ষরগুলো যেই আঁকুক—সে তো নিজের কথা লেখেনি, নিজের ছবি আঁকেনি। আসলে চিঠিটার সবটা জুড়ে সেই আছে—বিচিত্র, মনোহর, প্রেমিক মানুষটি। একবার, কেবলমাত্র একবার তার মনে হল।

কিন্তু না। সে তার 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি'কে দেখতে পাচ্ছে। সে চতুর হাসি হাসছে। হাসছে মূর্তিমান শয়তানের মত। ধারালো দাঁতগুলি তার দেখা যাচ্ছে। সে ছুরির ফলার মত চোখ জোড়া নিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। না, অস্বীকার করা যাবেনা। যতো সামান্যই হোক, সেই সামান্য জায়গাটির অধিকার সে ছাড়বেনা। সুব্রতের কথা সে লিখেছে ঠিকই। তার কথা লেখেনি। কিন্তু অক্ষরগুলো সেই তো সাজিয়েছে। কলম তো সেই ধরেছে।

সুতরাং যতো কমই হোক, সে থেকে যাবেই। তাকে বাদ দেওয়া যাবেনা। এই মুহূর্তে সুব্রতের বড়ো অসহ্য, বড়ো খারাপ লাগলো। ঐটুকু, ঐ সামান্য অংশটুকু, ঐ ইঞ্চিখানেক জায়গা জুড়েই বা সে থাকবে কেন?

একবারও যদি মিথ্যে করে বলা যেতো, বলা সহজ হত, চিঠিটা আমারই লেখা, সবটা আমার, গোটা চিঠিটার সব অক্ষরগুলি আমিই, আমারই রচনা সবটাই তাহলে—

কিন্তু না। 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি' নিয়তির মতো কুটিল হাসি হাসছে। হিংস্র দাঁতগুলি তার ঝক্ ঝক্ করছে। ছুরির ফলার মত চোখজোড়া তার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে। চিবুকটা তার দৃঢ়, কঠিন। ঠোঁট দুটো চাপা। আর সে শয়তানের হাসি হাসছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুব্রত বিষাদময় গলায় বলল—চিঠিটা সত্যিই আমি লিখিনি। কিন্তু আমার কথাই ওতে লেখা আছে।

বিশ্বাস ছিলো। বড়ো দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো সুমিতার। চিঠিটা সুব্রতেরই রচনা। 'বুদ্ধিমান বন্ধুটি'র কথা যতোই বলুক আসলে ওটা একটা আড়াল। ঐ আড়ালের আঁচলে মুখ ঢাকতে চেয়েছিলো সুব্রত। বরাবর সুমিতা এটাই জানতো। বরাবরই তার বিশ্বাস ছিলো চিঠিটার কথা যাই বলুক না কেন সুব্রত, আসলে এটা তারই লেখা।

কিন্তু একি হল! সব যে ভেঙে গেল হড়মুড় করে! দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো সুমিতা।

ব্যস্ত হয়ে সুব্রত বলল—কি হল? সামান্য একটা চিঠি, তা নিয়ে—ধীরে ধীরে মাথা তুলল সুমিতা। চোখের জল মুছে ফেলল আঁচল দিয়ে। তারপর পরিষ্কার চোখে আস্তে আস্তে বলল তুমি সামান্য হতে পারো। চিঠিটা সামান্য নয়।

চীনের গণ-কমিউন ও মার্ক্সবাদ

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

★

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে চীনের গণকমিউনগুলির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে বলা হয়:—

"পূর্ব এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ দিগন্তে ১৯৫৮ সালে এই যে নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠনের আবির্ভাব হোল তা প্রভাতী সূর্যের মতই অভিনব।"

এই ঘোষণার কয়েক মাস যেতে না যেতেই ৭ লক্ষ ৪০ হাজার কৃষি-উৎপাদক-সমবায় এক জোট হয়ে ২৬ হাজার কমিউন গড়ে তোলে। তারপর আজ পর্যন্ত ১২ কোটি কৃষক পরিবার অর্থাৎ চীনের শতকরা ৯৯টি চাষী পরিবার কমিউনে যোগ দিয়েছে। কমিউন আন্দোলন আজ সেখানে দেশব্যাপী। সুতরাং চীনে কমিউনের আবির্ভাবকে যাঁরা আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে বর্ণনা করেন তাঁদের বক্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন।

চীনের ভিতরে ও বাইরে অনেককে বলতে শোনা যায় যে কমিউন প্রতিষ্ঠা করা আজকের চীনের সময়োপযোগী নয় অর্থাৎ তাঁরা কমিউন প্রতিষ্ঠার নীতিকে অতি-বামপন্থী নীতি বলতে চান। তাঁরা যুক্তি দেন যে, যে চেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়নে 'ব্যর্থ হয়েছিল' এবং সোভিয়েতের মত অগ্রগামী সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে যা আজও করা সম্ভব হয়নি মুখের দুধ শুকোতে না শুকোতেই চীনের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেই কাজ করতে যাওয়াটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ও শিশু-সুলভ বিশৃঙ্খলার লক্ষণ ছাড়া আর কি! এই ধরনের মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের মোদ্দা কথাটা এই যে কমিউন সাম্যবাদী সমাজের তথা সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের জিনিস, প্রথম পর্যায়ের নয়।

কোনো দেশে কোন একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সময়োপযোগী কিনা সেটা বিচার করার মানদণ্ড হচ্ছে সেই সময়ে সেই দেশের বস্তুনিষ্ঠ অর্থনৈতিক অবস্থা। এই দিক থেকে চীনে কমিউন প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বিচার করে দেখতে হবে।

চীন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিপ্লব ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড উভয় ক্ষেত্রেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বব্যাপী সাধারণ সত্যের সঙ্গে চীনের বাস্তব ও বিশিষ্ট দেশজ অবস্থার সমন্বয় সাধন করা, এই হচ্ছে শুধু চীনের কেন, যে কোন দেশে মার্কসবাদী বিপ্লবী পার্টির প্রধানতম কর্তব্য।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রে তার সেই কর্তব্য কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছে। কিন্তু দেশ গঠনের ক্ষেত্রেও কি সে কথা প্রযোজ্য?

সমাজতন্ত্র নির্মাণের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে বেগ। প্রথম ৫-সালা বন্দোবস্তের সময় চীন দেশ গঠনের ক্ষেত্রে বেগের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছে কোন পুঁজিবাদী দেশে তার তুলনা মিলবেনা। ১৯৫৫ সালে উৎপাদনের উপায় করণের মালিকানার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে সেই সময় মাও সে-তুং অদূর ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র নির্মানের বেগ আরও বাড়াবার বস্তুনিষ্ঠ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ৮ম জাতীয় কংগ্রেসে মাও সে-তুং-এর সেই পরামর্শের ভিত্তিতে যখন পার্টির নতুন কর্মপন্থা রচিত হয় তখনও সেই দক্ষিণ-পন্থী সুবিধাবাদীরা ও গোঁড়া মার্কসবাদীরা বেগবৃদ্ধির স্লোগানকে অতি-বাড়াবাড়ি, পাকামি, পাগলামি ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন যাঁরা আজ কমিউন সম্পর্কেও সেই সব বুলি আওড়াচ্ছেন। কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কষ্টিপাথরেই একমাত্র সত্যের ও তত্ত্বের যাচাই সম্ভব। দ্বিতীয় ৫-সালা বন্দোবস্তের সময় চীনের ৬০ কোটি লোক পার্টির নতুন কর্মপন্থাকে অদম্য উৎসাহ নিয়ে যখন বাস্তবে রূপায়িত করে চলেছে তখনও এইসব উন্নাসিকদের চিৎকার বন্ধ হয়নি। ১ম বন্দোবস্তের সময় শিল্প কৃষির মিলিত বাৎসরিক উন্নতির হার ছিল শতকরা ১০ ভাগ, (শিল্পের ক্ষেত্রে শতকরা ১৮ এবং

কৃষির ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ ভাগ)। ১৯৫৮ সালে ৫-সালা বন্দোবস্তের সময় সেই উন্নতির হার দাঁড়ায় শিল্পের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৬ ভাগ এবং কৃষির ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ। ১ম বন্দোবস্তের সময় শিল্পের উন্নতির চার কৃষির উন্নতির হারের চার গুণ বেশি হয় কিন্তু ২য় বন্দোবস্তের সময় কৃষিক্ষেত্রে অসাধারণ দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিল্পের উন্নতির হার কৃষির উন্নতির ২·৬ গুণে দাঁড়ায়— অর্থাৎ কৃষির মন্থর গতি কাটিয়ে ওঠার ফলে শিল্প ও কৃষির অগ্রগতিবেগের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা সঙ্কুচিত হয়ে যায় অনেকখানি। এইভাবে চীনের অর্থনীতি ১৯৫৮ সালে এক বিরাট পদক্ষেপ করে অথচ সেই পদক্ষেপ অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে কোন ধাপছাড়া অবস্থার সৃষ্টি করেনি। চীনের অর্থনীতির মধ্যে প্রতিফলিত হোল অভূতপূর্ব পরিকল্পিত সুসামঞ্জস্য। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ক্ষিপ্র অগ্রগতি এবং সামঞ্জস্য এই দুটি বিরোধী ব্যাপারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোল একতা। দ্রুততা ও সুসঙ্গতি, এই দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার একে অপরকে প্রণোদনা জোগান দিতে লাগল। ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে এইখানে সমাজতন্ত্রের এক মস্ত বড় তফাৎ। পুঁজির রাজত্বে অগ্রগতির মধ্যে সমানুপাত বজায় রাখতে হলে বেগের দ্রুততা সম্ভব হয় না, আবার দ্রুত এগোতে গেলে সামঞ্জস্য রাখা যায় না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির সময় সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের বিরোধ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। সে বিরোধের বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে হলে মনে রাখতে হবে যে অসামঞ্জস্য জিনিসটা অনাপেক্ষিক কিন্তু সামঞ্জস্য জিনিসটা আপেক্ষিক। এ ক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অনাপেক্ষিক অসামঞ্জস্যের বস্তুনিষ্ঠ নিয়মাবলী আয়ত্ত করে সেগুলির সাহায্যে আপেক্ষিক সামঞ্জস্য বিধান করা। স্ববিরোধী ব্যাপারগুলির মীমাংসা সম্পর্কে মাও সে-তুং যে মৌল রচনা লিখেছেন তাতে তিনি এক জায়গায় বলেছেন :—

"সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে একটা সঙ্গতি আনবার জন্য প্রতিবছর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করা হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা। সামঞ্জস্য বলতে আমরা বুঝি

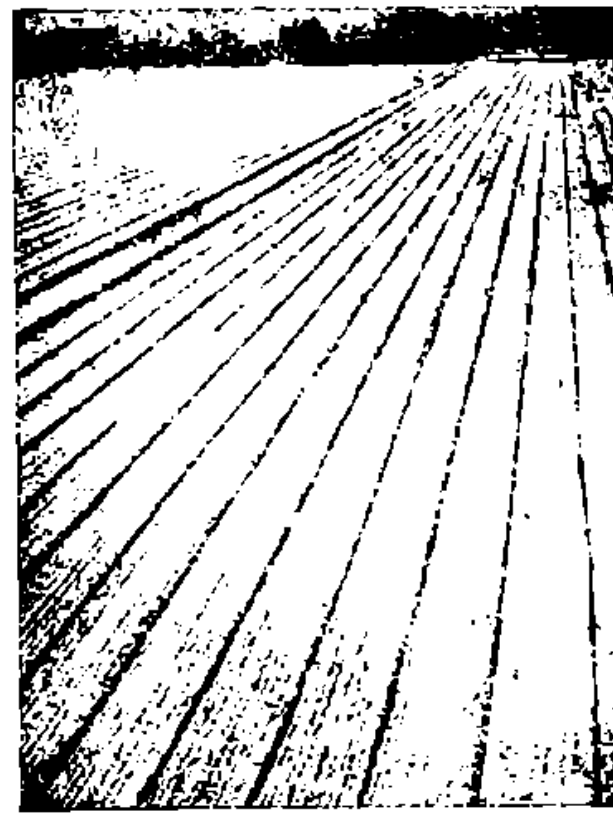

ক্ষেতের ধারে ধারে ফলের গাছ। এতে ফলের উৎপাদন বাড়ে।

পরস্পর বিরোধী ব্যাপারগুলির মধ্যে একটা সাময়িক ও আপেক্ষিক একতা প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রতিটি বছরের শেষে সেই পরস্পর-বিরোধী ব্যাপারগুলির সংঘাতের ফলে সঙ্গতি আবার অসঙ্গতির কাছে আত্মসমর্পণ করে ঐক্য হয়ে দাঁড়ায় অনৈক্য। তখন আসছে বছরের জন্য আবার নতুন করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করতে হয়। আসলে প্রতি মাসেই প্রতিষ্ঠিত একতা কিছু কিছু করে নষ্ট হতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব অবস্থার সংগে আমাদের বন্দোবস্ত খাপ না খেলে স্ববিরোধের উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে আমরা বলি আমরা ভুল করেছি। স্ববিরোধের আবির্ভাব এবং সঙ্গতির ভাঙন এক নিত্যনৈমিত্তিক সত্য। এই হচ্ছে অগ্রগতির দ্বন্দ্বমূলক নিয়ম।"

এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ নির্মাণ এবং ভোগ্য-বস্তু উৎপাদনের উপায় উপকরণের মধ্যে যে আনুপাতিক সম্পর্ক সেটাই জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিভৌম

আনুপাতিক সম্পর্কে। সেই সম্পর্কের বাস্তব অভিব্যক্তি হচ্ছে ভারিশিল্প, হালকাশিল্প ও কৃষির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক। চীনে ভারি শিল্প প্রসারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু কৃষির উন্নতি যদি সেই সংগে না হয় অর্থাৎ কৃষির ওপর পা না রেখে ভারিশিল্প যদি এগিয়ে চলতে যায় তাহলে ভারি শিল্পতে উৎপন্ন জিনিসের বাজার সম্প্রসারিত হবেনা, শিল্পের কাঁচামালের অভাব হবে, রাষ্ট্রের সঞ্চয় বাড়বেনা, কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পের জন্য বেশি লোকবল পাওয়া যাবে না। সেই সংগে হালকা শিল্পও খুঁড়িয়ে চলবে। কিন্তু কৃষি ও লঘু শিল্প যত দ্রুত পদে এগিয়ে চলবে ভারি শিল্প তত বেশি বাজার ও অর্থ পাবে যা তাকে আরো জোরে এগিয়ে চলতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয় ৫-সালা বন্দোবস্তের সময় জাতীয় অর্থনীতি অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি চিহ্নিত করার ফলে চীনের বস্তুনিষ্ঠ অবস্থার মধ্যে পরস্পর বিরোধী উপকরণগুলির মধ্যে আগেকার সংগতি ও ঐক্য যে অসংগতি ও অনৈক্য রূপান্তরিত হয় তার মীমাংসা করার উদ্দেশ্যেই কমিউনের প্রতিষ্ঠা। তাই চীনের কোটি কোটি মানুষ বলে :—"কমিউনিজম আমাদের ভূস্বর্গ আর গণ-কমিউন হচ্ছে সেই ভূস্বর্গে পৌঁছবার সেতু।"

আগেই বলা হয়েছে যে সমাজবাদী সমাজের ভিত্তিভৌম পরস্পর বিরোধিতা নিহিত রয়েছে উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তির সম্পর্কের মধ্যে, অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি ও তার উপর খাড়া করা কাঠামোর সম্পর্কের মধ্যে। সমবায় কৃষি চীনে ব্যষ্টিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমষ্টি ভিত্তিক তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরস্পর বিরোধিতার বা অসংগতির সমাধান করে। কিন্তু তারপর দেখা দিল এক নতুন অসংগতি। কৃষি সমবায়-গুলি আয়তনে অত্যন্ত ছোট এবং তাদের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে উৎপাদিকা শক্তির বিপুল অগ্রগতির সংগে তাল রেখে চলা তাদের সম্ভব হোল না।

নয়া চীনের অভ্যুদয়ের পর ভূমিসংস্কার কৃষি ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের মূলোচ্ছেদ করে উৎপাদিকা শক্তির যুগযুগের বাঁধন খুলে দেয়। সেই হোল প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুরু হয় কৃষি সমবায় বা যৌথ কৃষি আন্দোলন যা চীনের কৃষিকে সামন্ততন্ত্রের পরবর্তী পুঁজিবাদী পর্যায় থেকে সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত করে। প্রথম পর্যায়ের ভূমি সংস্কার আন্দোলন (কৃষাণকে জমির মালিক করা) হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কথা। দ্বিতীয় পর্যায়ের যৌথ কৃষি আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপকরণ। এই দুটি স্বতন্ত্র আন্দোলন চীনে এবং রুশিয়ায় একই বৃহত্তর বৈপ্লবিক আন্দোলনের দুটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। একটি রূপান্তরিত হয়েছে আর একটিতে এবং দুটি এগিয়ে চলেছে যুগপৎ। দুয়ের মধ্যে কোন চীনা প্রাচীর নেই। মাও সে-তুং বলেছেন :—

"কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সম্পন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনে মোটামুটিভাবে একটিই আন্দোলন যা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এই দুটি বিপ্লবকে একসংগে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দুটি বিপ্লবের পার্থক্য কোথায় এবং তাদের যোগসূত্রই বা কোথায় সেটা যদি আমরা ধরতে ও বুঝতে পারি তবেই চীনের বিপ্লবে আমরা নির্ভুল নেতৃত্ব দিতে পারব।"

চীনে (কৃশিয়ার মেন্‌শেভিকদের মত) দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা চীন বিপ্লবের গণতান্ত্রিক উপবিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক উপবিপ্লবের মধ্যে এক চীনা প্রাচীর কল্পনা করেছে। তারা কোন যোগসূত্র খুঁজে পায়নি সে দুটির মধ্যে। তাই গণতান্ত্রিক পর্যায় যে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারে তা তারা কল্পনা করতে পারে নি। তেমনি কৃশিয়ার ট্রটস্কি-পন্থীদের মত চীনের অতিবামপন্থীরা এই চীন বিপ্লবের এই দুটি পর্যায়ের পার্থক্য দেখতে না পেয়ে গণতান্ত্রিক পর্যায়ে গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত করার আওয়াজ তুলেছিল অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পর্যায়ের ঘাড়ে জোর করে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। মাও সে-তুং এই দুটি ধারার বিরোধিতা করে পার্টিকে যে পথ দেখান তা হচ্ছে দুই-পর্যায়িক বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ যে পথে চলতে হলে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের স্বতন্ত্র কর্তব্যগুলি গুলিয়ে ফেলা চলবেনা এবং নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে এমন ভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে যাতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের

...তান্ত্রিক পর্যায় সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে রূপান্তরিত ...য়েছে। ঠিক সেই ভাবেই আজ বলা যায় সাম্যবাদ ...লনের বিপ্লবের দুটি পর্যায় অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ও ...ম্যবাদী পর্যায়ের পার্থক্য ও যোগসূত্র উপলব্ধি করে ...তের সাম্যবাদী বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ...র্তব্য ও সাম্যবাদী কর্তব্যগুলির মধ্যে এমন ভাবে ...ধান করতে হবে যাতে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের পূর্ণ ...কাশ রূপান্তরিত হবে সাম্যবাদে। গণকমিউন ...ছে সেই সমন্বয়সাধনের পথে এক নতুন অধ্যায়।

১৯৫৮ সালে কৃষির অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে ...নের গ্রামবাসী জনতা গ্রামাঞ্চলে কারখানা শিল্প গড়ে ...লবার জন্য উদ্যোগী হয় যেমন চাষবাসের যন্ত্রপাতির ...রখানা, রাসায়নিক সারের কারখানা, জলসেচের ...কল্পা নির্মাণের কারখানা ইত্যাদি। জায়গায় জায়গায় ...খচাষীরা একজোট হয়ে তাদের এলাকার উন্নতি ...ার জন্য পরিকল্পনা রচনা করতে আরম্ভ করে। ...া বুঝিয়ে দিল যে এতদিনকার সমবায় কৃষির ...াবদ্ধ কর্মক্ষেত্র ডিঙিয়ে তারা এমনভাবে জীবনকে ...শিল্প ও কৃষি এক নতুন স্তরে উন্নীত করতে পারে।

জমি চাষীর হাতে তুলে দেবার পর প্রথমে ব্যষ্টি-ভিত্তিক অর্থনীতির বুনিয়াদের ওপর চাষীদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা করবার জন্য কতকগুলি দল গঠন তোলা হয়। সেই হোল সমাজতান্ত্রিক কৃষির প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। তারপরের স্তরে যৌথ পরিচালনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয় সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে যে যত জমি দিয়েছে সেই অনুপাতে তার অংশীদারি। সেটা হোল চীনের প্রাথমিক স্তরের যৌথখামার। তৃতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত হোল সোভিয়েতের মত পুরোদস্তুর যৌথখামার অর্থাৎ অগ্রগামী কৃষি সমবায়। প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে। ১৯৫৭ সালে পারস্পরিক সহায়তার আমলে কৃষির উৎপাদন বাড়ে শতকরা ৬৬ ভাগ। ১৯৫৬ সালে প্রাথমিক সমবায় কৃষির কল্যাণে কৃষির উৎপাদন ১৯৫৪ সালের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বেড়ে গেল। ১৯৫৮ সালে যৌথখামার প্রতিষ্ঠার সুফলের পরিচয় মিলল। ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে কৃষির উৎপাদন বাড়ল শতকরা ৭৬ ভাগ।

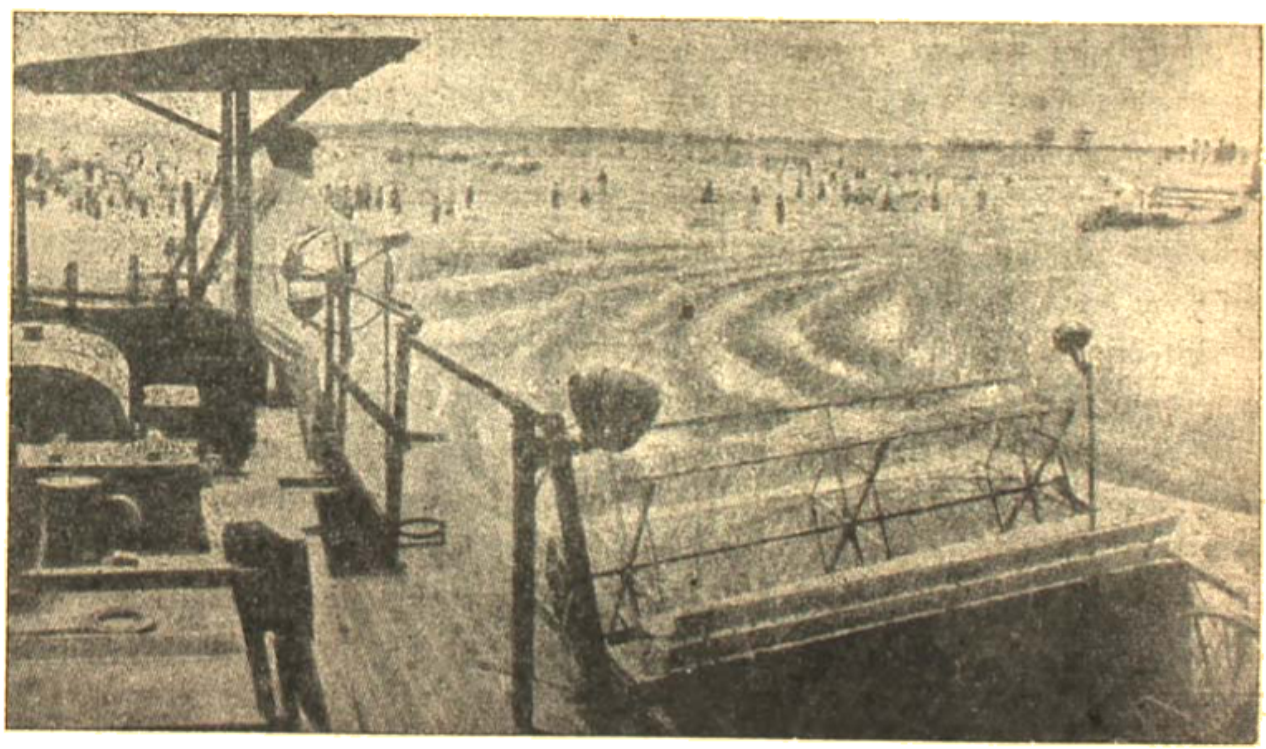

কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে যৌথখামারগুলি নিত্য-নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। লোকবলের অভাব ছোল। আরো নানারকম স্থানীয়-শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে কাজের বেগ বজায় রাখা যায় না। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি চাই, অসাভাবের সময়ের জন্য জল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা চাই, আবাদের সম্প্রসারণ চাই, বছরে একাধিকবার ফসল বোনা ও কাটার জন্যে অনেক বেশি লোকের দরকার, বিজ্ঞান-সম্মত কৌশলে জমি বাছাই করা চাই, যন্ত্রপাতি চালাবার জন্য তালিম পাওয়া লোক চাই, চাষীরা যাতে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস না করে একসঙ্গে বসতি করে থাকতে পারে তার জন্য ঘরবাড়ী পত্তন নির্মাণ করা চাই। এইসব চরেক রকমের পাঁচমিশেলী প্রশ্নের মীমাংসা করার ক্ষমতা যৌথখামারের নেই। যৌথখামারের এক্তিয়ার তো শুধু চাষের জমির মধ্যে। চীন ছিল এক অত্যন্ত দরিদ্র কৃষি প্রধান দেশ। যৌথখামার প্রতিষ্ঠার পরও চাষীদের বৎসরের আয়ের শতকরা ৬০।৭০ ভাগ খাদ্যের পিছনেই খরচ হয়ে যেত। শতকরা ৩০টি চাষী-ঘরের ভাঁড়ারে প্রতি বছরই ঘাটতি পড়ত। সরকারী সাহায্য ও ঋণ দিয়ে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সচরের রাষ্ট্রিয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে অর্থনীতির অন্য সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করে গ্রামের এতরকম নতুন সমস্যার যথাসময়ে সন্তোষজনক মীমাংসা করা কঠিন হবে এতো জানা কথাই। এক কথায় বলা যায় উৎপাদিকা সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির আগেকার সঙ্গতি অসঙ্গতি হয়ে দাঁড়াল, বৈপরীত্য দেখা দিল পত্তনী উৎপাদিকা সংস্থা ও পত্তনী রাষ্ট্র-ক্ষমতা সংস্থার মধ্যে, বৈপরীত্য দেখা দিল কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে।

সেই অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যের সম্মুখীন হয়ে চীনের মানুষ কমিউনের জন্মের আগেই বিভিন্ন জায়গায় নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কতকগুলি বৃহত্তর সমবায় গড়ে তোলে এবং সেগুলির সাংগঠনিক ও পরিচালক-নিয়মগুলির কিছু কিছু সংস্কার করে ফেলে এমন কি কিছু কিছু কৃষি সহায়ক কলকারখানা পর্যন্ত খাড়া করতে আরম্ভ করে, ভোজনালয়, শিশুপালনাগার, পশুপালন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নির্মাণ করে। ব্যাপক জনসাধারণের সেই মতিগতি লক্ষ্য করে মাও-সে-তুং-এর নায়কত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সেই মতিগতিকে বাস্তব রূপ দেন কমিউনের মধ্যে। এইভাবে চীনের পার্টি আর একবার প্রমাণ দেয় যে চীনের পার্টি জনগণকে যেমন শিক্ষা দেয় তেমনি জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যা হচ্ছে গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মূল কথা। এই ব্যাপার থেকেও প্রমাণ হয় যে জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা।

চীনের গণকমিউন জিনিসটা কী, এবার সেটা আলোচনা করা যেতে পারে। গণকমিউন হচ্ছে বর্তমান চীনের পত্তনী সমাজতান্ত্রিক সংগঠন—যার মধ্যে মিলিত হয়েছে কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে কমিউন আজকের চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ক্ষমতার পত্তনী সংস্থাও বটে। কমিউনের লক্ষ্য হচ্ছে দেশে দুই রকমের রূপান্তর সাধন করা :— গ্রামাঞ্চলে যৌথ মালিকানাকে জাতীয় মালিকানায় রূপান্তরিত করা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত করা। তার মানে এই নয় যে অদূর ভবিষ্যতে চীনে এই দুটি রূপান্তরণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। চীনে কমিউন-আন্দোলন এখনো শৈশব পার হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই লোকবল এবং বহুবল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সাংগঠনিক উন্নতি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার কলকারখানা, সর্বসাধারণের ভোজনালয়, শিশু-লালনাগার, বৃদ্ধাশ্রম ইত্যাদি। ভোজনালয়ের আবির্ভাবে চাষী পরিবারগুলির মেয়েরা রান্নাঘর ছেড়ে সামাজিক কাজে নেমে আসতে পারছে। তারপর বণ্টনের প্রশ্ন ধরুন। কৃষি উৎপাদনের অসাধারণ উন্নতির দরুণ ১৯৫৭ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল সাড়ে আঠার কোটি টন, ১৯৫৯ সালে হবে সাড়ে পঁইত্রিশ কোটি টন। কমিউনে পারিশ্রমিক দেবার এক নতুন নিয়ম চালু হয়ে যার মূল কথা হচ্ছে নগদ টাকার সঙ্গে বিনামূল্যে কিছু পণ্য বিশেষত খাদ্য বণ্টন করা। একে আপনি সমবায় ব্যবস্থা ও সমাজবীমার যোগাযোগ বলতে পারেন। এই দুটি চালু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কমিউনের মাধ্যমে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। এর ফলে বছরের শেষের দিকে চাষীর ভাঁড়ারে ঘাটতির আশংকা আর রইলো না। সুতরাং তাদের কাজের উৎসাহ বেড়ে গেল বহুগুণ।

...খরা বন্যা ঝড়ঝঞ্ঝার দুর্যোগ সম্ভাবনা তার বেশি, বন্যা, খাতার ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও তার বেশি। সেচ্যুয়ান প্রদেশে বন্যা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৯ সালে কমিউনগুলি আবাদী জমি সম্প্রসারণ করে এবং দুবার ফসল বোনে। ফলে চাষীদের খাদ্যের অভাব হয়নি।

দেশে বিদেশে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা বলল যে বিনামূল্যে খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা 'কাজের অনুপাতে দেবার' সমাজতান্ত্রিক নিয়ম লঙ্ঘন করার সামিল। কিন্তু চীনা পার্টির মতে কাজের অনুপাতে মজুরি দেবার সমাজতান্ত্রিক নিয়মের সংগে সংগে অবস্থা উপযোগী ও প্রয়োজন অনুসারে দেবার নিয়মের বীজ বুনলে মানুষকে পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে দেশ ও দশের জন্য স্বার্থত্যাগে কাজ করার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে কমিউন যৌথ অর্থনীতির মধ্যে দুটো জাতীয় অর্থনীতির উপাদান মিশিয়ে দিয়েছে। কমিউনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার পত্তনী সংস্থা। কৃষি ব্যাংক, পণ্যভাণ্ডার এবং অন্যান্য শিল্প ও সমাজ প্রতিষ্ঠান কমিউনের নেতৃত্বের আওতায় আনা হয়েছে। এক এক জেলায় জেলায় যখন কমিউনগুলি একসংগে মিলে বৃহত্তর সংযুক্ত কমিউন গড়ে তুলবে তখন কমিউনের অর্থনীতির মধ্যে জাতীয় রূপ আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। উৎপাদন বেড়ে চলবে আরো দ্রুতগতিতে। গ্রামাঞ্চলের ছোটবড় ৮০টি কলকারখানা আজ কমিউনের অধীনে।

কমিউন কৃষি ও শিল্পের পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব নেওয়ায় সহর ও গ্রামের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকের যে ব্যবধান আজে আস্তে কমে যাবে। উৎপাদন যত বাড়বে বিনামূল্যে অন্ন ও পণ্য বিতরণের মাত্রাও বাড়বে সেই অনুপাতে, যার ফলে গ্রাম্য অর্থনীতির মধ্যে সাম্যবাদী উপাদানের প্রাধান্য হতে থাকবে। চীনের নেতারা আশা করেন আগামী ৫।৬ বছরের মধ্যে দেশের অধিকাংশ জায়গায় গণ-কমিউনগুলি যৌথ মালিকানার জায়গায় সর্বজাতির মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

কমিউন প্রতিষ্ঠার মাত্র ১ বছরের মধ্যে (১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) কমিউন পরিচালিত মাধ্যমিক কৃষিবিদ্যালয় ও সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ হাজার, সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংখ্যা হয় ১০ লক্ষের উপর। এছাড়া ২ লক্ষ হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ৩৯ লক্ষ সর্বসাধারণের ভোজনালয় ৩৭ লক্ষ নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন এবং ৮৮ হাজার বৃদ্ধ আশ্রম নির্মাণ করা হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সাফল্যের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নেই। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে নেতৃত্ব ও গণ-আন্দোলনের অভিন্নতা, কেন্দ্রীয়তা ও গণতান্ত্রিকতার অভিন্নতা, সহরে শাসনকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ও গ্রামাঞ্চলে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতার অভিনেতা, জাতীয় স্বার্থ ও স্থানীয় স্বার্থের অভিন্নতা, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কমিউনের স্বার্থের অভিন্নতা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও শ্রমিকের স্বার্থের অভিন্নতা, কমিউনের স্বার্থ ও কমিউন সদস্যের স্বার্থের অভিন্নতা। এখানে গণতন্ত্রের পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে কেন্দ্রীয়তা এবং কেন্দ্রীয়তার বুনিয়াদ হচ্ছে গণতন্ত্র।

কৃষকদের সাহায্য করছেন শ্রমিকরা। এঁরা কাপড় তৈরি করছেন।

কমিউনের কল্যাণে আজ চীনের গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে কারখানা-শিল্প আজ ২ কোটি শ্রমিকের একচেটে বিষয় নয়। কোটি কোটি চাষী আজ শ্রমশিল্পমুখী হয়ে উঠেছে যার পরিণাম হবে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যেকার ব্যবধান দূর হয়ে যাওয়া যার মানে সহর ও গ্রামের বৈপরীত্য কমে আসা।

গ্রামের জনসাধারণের বুদ্ধিবিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থাও

কমিউনের দায়িত্ব। কমিউনের উৎপাদিকা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের পাশে পাশে মিলিশিয়া সংগঠন খাড়া করা হয়েছে। এসব মিলিশিয়া বাহিনীর নায়কেরা কমিউনের অধ্যক্ষ বা নেতা হতে পারবেন না কিন্তু কমিউনের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন কমিউনের নেতৃত্বাধীনে। মিলিশিয়াদের যে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে তা উৎপন্ন হবে স্থানীয় অস্ত্রের কারখানায়। চাষীরা উৎপাদন কার্যের পর অবসর সময়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করবে যাতে সাম্রাজ্যবাদের যে কোন আক্রমণাত্মক চক্রান্ত তারা বিফল করে দিতে পারে।

এক বছরের মধ্যে একটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে চীনে গণ-কমিউন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পার্টি নেতার জনসাধারণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপারও নয়। ১৯৫২ সালে নয়াচীন যখন সামন্ততন্ত্রের সমস্ত উত্তরাধিকার উৎখাত করে, সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও কুটীর শিল্পের জগাখিচুড়ি অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদের ওপর খাড়া করতে নামে তখন চলেছে কোরিয়ার যুদ্ধ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে চীনের জনগণ দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্তব্য পালন করতে চলে। তখন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা আওয়াজ তুলেছিল যে সেই বিপদের সময় বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সে কথায় কান দিয়ে সেদিনকার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্জন করেনি। কৃষিক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়েও সেই দক্ষিণপন্থীরা যুক্তি দিয়েছিল যে কারখানা-শিল্পের মান যেখানে এত নীচু সেখানে কৃষির যন্ত্রীকরণ হতে পারে না এবং যন্ত্রীকরণ না হলে সমবায়ীকরণ হতে পারে না। চীনের পার্টি বিনা যন্ত্রীকরণে সমবায় কৃষিকে সাফল্যমণ্ডিত করে এইসব সমস্যা পণ্ডিতদের বক্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন করে। তার পরেই আর এক তত্ত্ব শোনা গেল যে সমবায় প্রতিষ্ঠার পথে তাড়াতাড়ি এগোতে গেলে ফসল উৎপাদন কমে যাবে। কিন্তু দেখা গেল সহসম্পদের এত অভাব থাকা সত্ত্বেও চীনে সমবায় কৃষি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আর একদল ভয় দেখাল যে অত তাড়াতাড়ি সমবায় ব্যবস্থা 'চালাতে' গেলে শুধু সঙ্গতিপন্ন চাষী কেন, মধ্যশ্রেণীর চাষীরাও বিক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যদ্বাণীও ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যশ্রেণীর চাষীদের কাছ থেকে নেওয়া চাষবাসের হাতিয়ার ও গরু ঘোড়া ইত্যাদির জন্য তাদের ধাপে ধাপে ক্ষতিপূরণ দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সমর্থন লাভ করে।

এই সমস্ত লোকেরাই 'কমিউন' প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এই বলে যে সাম্যবাদী সমাজ না হলে মার্কসবাদ কমিউন প্রতিষ্ঠা করতে বলে না। এঁরা সেই দলের লোক যাঁরা চীনের পার্টিকে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গোঁড়ামীর দোষ দিচ্ছেন কিন্তু চীনের স্বরাষ্ট্রনীতিকে অতি-বামপন্থী বলে 'কমিউন' শব্দটি নিয়ে নিজেদের গোঁড়ামীর পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁরা মার্কসবাদ লেনিনবাদকে চীনের ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনুসারে প্রয়োগ করতে নারাজ।

চীনের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে প্রধান অন্তর্বিরোধ হচ্ছে কৃষি ও শিল্পের মানের মধ্যে যার সমাধান না হলে অর্থনৈতিক প্রগতি সুনিশ্চিত হবে না। কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতি সাধন করা, এই হচ্ছে কমিউনের মৌল উদ্দেশ্য এবং তার জন্য এমন কার্যক্রম রচনা করতে হবে যা চীনের বস্তুনিষ্ঠ অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা না করতে পারলে নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সুতরাং কৃষির জন্য বহুকৌশল, বিজ্ঞান, যন্ত্রশক্তির ও বিজলীর ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিল্প প্রসার করে যেতে হবে। কৃষির এই উন্নতির মূলভিত্তি অনাবাদী অহল্যা ভূমিতে আবাদ করা নয়, বর্তমান আবাদী জমিতে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে ফসলের পরিমাণ বাড়ানো অর্থাৎ ভূমির উর্বরা শক্তি বাড়ানো। তার মানে মানুষ ও জানোয়ারে টানা লাঙ্গলের বদলে যন্ত্রপাতি যন্ত্রবল ও বিজলী ব্যবহার, হাতে তৈরি সারের বদলে রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং বছরে একই জমিতে একাধিক বার ফসল ফলানো। এইভাবে ক্রমশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমিয়ে এনে সেই বাড়তি লোকবল শিল্প প্রসারে লাগানো যাবে অথচ ফসল উৎপাদনও বেড়ে চলবে, কৃষক রূপান্তরিত হবে শ্রমিকে। কমিউন ব্যবস্থার ভিত্তিতে এইভাবে অবস্থা পরিপক্ব হলে কৃষিক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক যৌথ মালিকানা প্রথমে সমাজতান্ত্রিক জাতীয় মালিকানায় রূপান্তরিত হবে যার পরবর্তী ধাপ হবে সাম্যবাদী রূপান্তর।

তখন চীনের গ্রামাঞ্চল সারা দেশকে অফুরন্ত খাদ্য ও কাঁচা-মাল জোগানোর সংগে সংগে কোটি কোটি শ্রমিক জোগান দেবে। এত বড় শ্রমবল জোগাবার শক্তি অন্য কোন দেশের নেই। চীনের ৬৩ কোটি লোকের ৫২ কোটি চাষী। সেখানে কৃষির যান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের কর্তব্যকে যদি সহরে ভারী শিল্প প্রসারের মুখ চেয়ে থাকতে হয় এবং শিল্প যদি কৃষিকে পাঁকের মধ্যে ফেলে রেখে হুহু করে এগিয়ে যায় তাহলে দেশের ৫২ কোটি লোক নিজেদের সংসার-যাত্রার উন্নতির জন্য কত যুগ বসে থাকবে? তাতে কি শ্রমিক-কৃষক মিত্রতা ক্ষুণ্ন হবে না?

চীনের এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক সমস্যাকে চীন বিপ্লবের কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করে। তাই গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের যুগে কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলের গভীরে চলে যায় এবং সেখানে ২২ বছর ধরে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালায় এবং সেই সংগ্রামের মধ্যে চীনের সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের দ্বারা যুগনিপীড়িত চীনা চাষীদের জমিদার উৎখাত, কৃষি সংস্কার ও বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন করতে শেখায়। সেই সংগে ইয়েনানের বিপ্লবকেন্দ্র চাষীদের অর্থনীতি পরিচালনা করতে, কলকারখানা তৈরি করতে সাহায্য করে। এইভাবে চিয়াংকাইশেকের উৎখাতের আগেই মহাচীনের বিভিন্ন চাষীরা বিপ্লবের বুনিয়াদ পাকা করে সবদিক দিয়ে বৈপ্লবিক সর্বহারাশ্রেণীর সামিল হয়ে ওঠে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনা অনেকখানি এগিয়ে যায় যা বিপ্লবোত্তর কালে কৃষিসমবায় প্রতিষ্ঠার কাজ অনেক সহজ করে দেয়। চিয়াংকাইশেকের পরাজয়ের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য কৃষি-সংস্কার ও সমবায় প্রতিষ্ঠার জমি তৈরি ছিল। রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের আগে ও পরে এই ধরনের সব ব্যাপার ঘটেনি। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামে গিয়ে ২২ বছর ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়নি। কারণ সেখানকার বস্তুনিষ্ঠ অবস্থা ছিল অন্য রকম। রুশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল নগরাঞ্চল। তাই বিপ্লবের সাফল্যের পর রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে কৃষক সমাজকে সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে ১০।১২ বছর লেগেছিল। রুশ চাষীদের সাংস্কৃতিক মান ও রাজনৈতিক চেতনা তখন সমবায় আন্দোলনের উপযুক্ত ছিলনা বলেই ১৯২৩ সালের জানুয়ারীতে লেনিন সমবায় সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লেখেন :—

"আমি বলতে চাই যে এবার শিক্ষাধানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। সমস্ত চাষীকে সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হলে চাষীদের সাংস্কৃতিক মান এমন হওয়া দরকার যা পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়।"

কিন্তু চীনের ২২ বছরের বৈপ্লবিক যুদ্ধযুদ্ধের মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব আগেই হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় কথা পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে রুশিয়ায়। সেই বৈপ্লবিক রাষ্ট্র ছিল পৃথিবীতে একা এবং শত্রু পরিবেষ্টিত। ঘরের শত্রুরাও দলে কম ভারি ছিলনা। চীনে বিপ্লব যখন জয়যুক্ত হোল তখন নয়া গণতান্ত্রিক চীন-রাষ্ট্র সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিখেছে এবং নিজে সেই জ্ঞান কাজে লাগাতে শিখেছে। শুধু তাই নয়, নয়াচীন জন্মের পর নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের মত শত্রু পরিবেষ্টিত ছিলনা, বন্ধুহীনও ছিলনা। তার সোভিয়েত রাষ্ট্র-সংলগ্ন পশ্চাদ্ভাগ (rear) ছিল নিরাপদ এবং শিল্পোন্নত সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল তার অর্থনৈতিক প্রগতির সহায়। তারপর ক্রমে ক্রমে পূর্ব ইউরোপের নতুন নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকেও সে বন্ধুরূপে লাভ করল এবং সেই রাষ্ট্রগুলিতে যে নয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হোল তার মূলতত্ত্বের জন্মদাতা হচ্ছেন মাও সে-তুং। মাও সে-তুং-এর সেই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সবচেয়ে বড় অবদান। এই সব দিক থেকে নবজাত সোভিয়েতের তুলনায় চীনের গোড়ার দিকের রাস্তা অনেকটা সহজ হয়েছিল বলে চীনের জাতীয় অগ্রগতির ইতিহাসে কিছু কিছু নতুন জিনিস ও সোভিয়েতের চেয়ে অধিকতর বেগে অগ্রগতির দৃষ্টান্ত দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সব নতুন অভিব্যক্তি যে কৃষির ক্ষেত্রেই প্রধানত দেখা দেবে সেটাও স্বাভাবিক কারণ চীনের পক্ষে কৃষক সমস্যা হচ্ছে মর্মস্থানীয় সমস্যা। সেই জন্যই চীনের কমিউনগুলি প্রধানত কৃষকদের সংস্থা এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। সহরে কমিউন গড়বার চেষ্টা

চয়নি কারণ সহরের বস্তুনিষ্ঠ অবস্থা অনেক জটিল। এইসব সত্ত্বেও যাঁরা অভিযোগ করেন যে চীন তার বিপ্লবের শুরু রুশিয়ার অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করে বাড়াবাড়ি করছে তাঁরা হচ্ছেন সেই দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের চেলা যাদের সম্পর্কে লেনিন ১৯২৩ সালে লিখেছিলেন :—

"এদের মধ্যে যারা সেরা তারাও জার্মান দৃষ্টান্ত থেকে এতটুকু এদিক ওদিক গেলেই আপত্তির পরিখা দিয়ে নিজেদের ঘিরে রাখে। এদের গোলামের মত নকল করার স্বভাবটাই আমার বেশি করে চোখে পড়ছে।"

ইতিহাসে প্রত্যেকটি বিপ্লব যে একই ছক বাঁধা রাস্তায় চলেনা এইকথা মনে করিয়ে দিয়ে লেনিন সুখানভের মত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকপন্থী সুবিধাবাদীকে জানিয়ে দেন

"প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপ্লব যেবেছিল তার মধ্যে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য না প্রকাশ পেয়েই পারেনা। কিন্তু তবু আমাদের সংস্কারপন্থীরা মনে করলেন যে স্বাভাবিক বুর্জোয়া বিপ্লবই হচ্ছে শেষ সীমা।...

"বিশ্ব ইতিহাসের ক্রমবিকাশ মোটামুটিভাবে সাধারণ নিয়ম অনুসারে চলে বলেই সেই ক্রমবিকাশের কোনো কোনো পর্যায়ে তার অভিব্যক্তি বা পর্যায়-পরম্পরার মধ্যে কিছু কিছু বিশিষ্টতা দেখা দিতে পারে। একদিকে সভ্য দেশগুলি এবং অন্য দিকে যুদ্ধের দরুণ সেই সভ্যতার কক্ষপথের মধ্যে প্রথম এসে পড়া দেশগুলি অর্থাৎ প্রাচ্যের অ-ইউরোপীয় দেশগুলির মাঝখানে থাকার ফলে রুশিয়ার বিপ্লবের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য বিপ্লবের তুলনায় কিছু কিছু নতুনত্ব উদ্ঘাটিত না হয়েই পারে না। বিশিষ্ট পরিস্থিতির দরুণ আমরা কৃষক সংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যুক্ত করতে পেরেছি যে সম্ভাবনার কথা স্বয়ং মার্কসের মত মার্কসবাদী বলে গিয়েছেন (যে কৃষক সংগ্রামের কথা লেনিন বলছেন তা হচ্ছে অন্তত জার্মান বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগ্রাম। লেনিনের বক্তব্য রুশিয়ার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এক সূত্রে গেঁথে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং এটাই রুশ বিপ্লবের এক নতুন দিক যার তুলনা তার আগে কোন দেশের বিপ্লবের মধ্যে পাওয়া যাবেনা —লেখক)।

চীনের বিপ্লবও মোটামুটিভাবে সমাজতান্ত্রিক রাস্তার নিয়মাবলী মেনে এগিয়ে চলতে চলতে নিজস্ব অনন্যতার পরিচয় দিচ্ছে। সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিতও লেনিনের লেখার মধ্যে পাওয়া যাবে —

"আমাদের এইসব পণ্ডিতদের একথা বুঝবার ক্ষমতা নেই যে এর পরে অনেক বেশি জনসংখ্যা-বিশিষ্ট প্রাচ্যের দেশগুলিতে যে সব বিপ্লব ঘটবে সেগুলির মধ্যে আরো অনেক বড় রকমের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করবে। যারা একথা বোঝেনা তাদের মূর্খ ছাড়া আর কিছু বলা যায়না।" (ভি আই লেনিন, "আমাদের বিপ্লব" ১৭ই জানুয়ারী ১৯২৩)।

৬০ কোটি লোকের দেশ মহাচীনে আজ লেনিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে গণ-কমিউনের মধ্যে এমন এক সময়ে যখন পূবের হাওয়া প্রাধান্য লাভ করেছে পশ্চিমের হাওয়ার ওপর। গৃহযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদীক্ষা এবং ১৯৫৮ সালের দেশব্যাপী রাজনৈতিক শিক্ষা ও শুদ্ধি-অভিযানের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চীনের কোটি কোটি চাষী মাও সে-তুং-এর পথে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের সমাজতান্ত্রিক কৃষির জমিতে কমিউনের মাধ্যমে আগামী যুগের সাম্যবাদী সমাজের বীজ বুনে চলেছে।

তুমি | সিদ্ধেশ্বর সেন

অন্ত্যরমে মিল হবে ব'লে
পৃথিবীর দুস্তর গতির মধ্যে তুমি
ভালোবাসার বিশাল আবেগ
অনন্ত প্রদেশ গ্রাস করে চলেছে
এক এক প্রদেশ সেই সমুখ রাজধানী,
প্রাকারের সাদৃশ্য,
বিলীন
আগমন-নির্গমনের দ্বারগুলি তবুও খোলা
আমি যে সব অলিন্দ, স্তম্ভ, সোপানশীর্ষের
ধারে ধারে
যে সব পাথরের মিহিঝালরের কাজের
অদ্ভুত আড়ালে
নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছিলাম, কেননা
আমার কোনও সংকেত নেই
আমি ভালোবাসতে চেয়েছি
জাফরির আলোয়
আর, নিচু কথাকে গমগম করে ছড়িয়ে দিতে
এমন স্থাপত্য আমি গড়ে নিতে চেয়েছি
স্মৃতির খোঁড়লে
দীর্ঘশ্বাসও যেখানে প্রবল হ'য়ে বাজবে
অথচ দীর্ঘনিশ্বাস নেই, কেননা শিল্প
নিজেই তা বলয়িত করেছে
কোনও হ্রস্বআশ্বাস নেই
কেবল উত্থানপতনের শব্দ রয়েছে
আর, আবর্তনের
নিজস্ব রীতির নৈঃশব্দ্য
যে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, তুমি
বদলে যাও
নিজেরই অজান্তে
তোমার দিকে ফিরে তাকালে তখন, বুঝি
তোমার নিজের দিকে ফিরে তাকাবার সময়—নেই
তাহলে, আশ্চর্য হয়ে যেতে ॥

সে পাখি ক্ষমা করেনি | গোপালচন্দ্র ঘোষ

সারারাত্রি ধরে পাখিটা
বিচিত্র ডাক ডেকেছে—
কখনো কাতর কখনো শঙ্কিত কখনো উদা
জগৎসংসারের কর্মসূচীর উপর
বিরাগের অন্ত নেই তার,
আর সে তা প্রকাশ করতে চেয়েছে
ধ্যানে-বসা স্মিত মুহূর্তগুলোর মৌন সভায়।

তখন হাওয়ার বড় বড় ঢেউ
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছিল মশারীর গায়ে,
আচ্ছন্ন মনকে করেছিল সমুদ্রশায়ী
ছোট পালের জাহাজ
মানুষের জগৎ থেকে পালিয়ে
অনেক-স্বপ্নের-বুদ্বুদে-গড়া সবুজ জ্যোৎস্নার দ্বীপে
নোঙর ফেলবে সে কখনো।

অথচ সেই সমুদ্র বারবার পাথর হয়ে
কঠিন স্পর্শ দিয়েছে শরীরকে,
ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি লেগেছে চেতনায়,—
যখন স্বচ্ছ তন্দ্রার মধ্যে পাখিটার তীক্ষ্ণ স্বর
নালিশ ছুঁড়ে দিয়েছে
অসম্বৃত চিত্তের পলকা আশ্রয়ভূমিতে!

রাত্রির প্রহর
কেবলই সঁপে দিয়েছে যন্ত্রণাজর্জর পৃথিবীকে
পাখিটার করুণায়।
আর সে পাখি ক্ষমা করেনি। সব নির্জীব মানুষের
বিক্ষুব্ধ স্নায়ুপিণ্ডের নেতালো স্পন্দন
তার অবিরাম আওয়াজ ধ্বনিত করেছে
রুক্ষ শাসনের বিভীষিকা ছড়িয়ে।

আর্থিক প্রসঙ্গ

মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা ও তার প্রতিকার

মন্ত্রমুখর

★

বিজয়ার পর সাক্ষাতে প্রীতি-সম্ভাষণ করার রীতি আছে। পাঠক-পাঠিকাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু আমার-আপনার শত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও বাজার দর একটুও নামছে না এটা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। পুজো গেল বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব এমন কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াও। কিন্তু কোন্ উৎসবটায় আপনি প্রাণ খুলে যোগ দিতে পেরেছেন? অর্থনৈতিক সমস্যা সমস্ত আনন্দের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। আর সমস্যাটির বাস্তব ও ভয়াবহ রূপ হল দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি। অথচ আপনি ভাবছেন যে নেতারা চুপ করে আছেন? মোটেই নয়। এই তো সেদিন প্রধান মন্ত্রী তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে দ্রব্য মূল্যকে ঠেকিয়ে রাখাটা আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। অর্থমন্ত্রীও আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে যে তাঁরা নাকি খুব চেষ্টা করছেন যাতে তৃতীয় প্ল্যানের মধ্যে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি রোধ করা যায়। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে, ন্যাশন্যাল ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিলে এবং কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী মহলে সর্বত্রই নাকি একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপরও কি ভাবনার কিছু রইলো আপনার?

প্রথম পরিকল্পনা ছুটোয় অনিবার্য ফল যা হাতেহাতে পেয়েছি আমরা তা হল এই মূল্যবৃদ্ধি—তাও আবার যথেচ্ছ হারে। এটা লক্ষণীয় যে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে যেরকম চাবদিক দিয়ে আটঘাট বেঁধে নেবেছেন—তার এক ভগ্নাংশ শক্তিও এদিকে নিয়োজিত হয়নি। বিদেশী মুদ্রা বাঁচাতে গিয়ে সরকার বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি বন্ধ কিংবা কম করেছেন। দেশে অনেক দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে বাইরে বেচবার ব্যবস্থা করেছেন, স্বর্ণরৌপ্য ও বিদেশী মুদ্রার অবাধ চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। অথচ এখনো নাকি কোনও কোনও মূল্যবান সৌখীন দ্রব্য আমদানি করা হচ্ছে। সে অন্য প্রসঙ্গ।

এবার দেখা যাক, ভারতের অভ্যন্তরীণ মূল্যমান কতটা বেড়েছে এবং সেটা কী হারে। মূল্যবৃদ্ধিটা বিশেষভাবে অনুভূত হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে। ১৯৫২-৫৩কে ১০০ ধরলে মূল্যমান ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯৯ বলে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬-৫৭তে ওটা দাঁড়ায় ১০৫, ১৯৫৭ ৫৮তে ১০৬, ১৯৫৮-এ ১০৮ এবং এবছরের গোড়ার দিকে ১১৪। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে ১৯৫৬ থেকেই দাম ঊর্ধ্বমুখী। তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের দরটাই চড়েছে সবচেয়ে বেশি শতকরা ১০ ভাগ। কাঁচামালের ক্ষেত্রে বাড়টা কিছু কম ৭%

মূল্যবৃদ্ধির এই চাপে স্বল্প-আয় বিশিষ্ট এবং চাকরিজীবী সম্প্রদায়ের নাভিশ্বাস উঠছে। এটা তত্ত্বের কথা নয় প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু এই রকম অবস্থার হেতু কী? সেই সব কথাই একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই ধরুন, যুদ্ধের সময়কালীন এবং তৎপরবর্তী কালের মুদ্রাস্ফীতির কথা। আর প্রধান হল বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজে প্রচুর অর্থব্যয়। ফলে বাজারে সহসা এসে পড়েছে প্রচুর টাকা অথচ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা সে তুলনায় খুব সামান্যই বেড়েছে। অনিবার্য ফল যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম হয়েছে আগুন। উন্নয়ন-মূলক ব্যয়ের ফললাভ হাতে হাতে বলে এর ভয়াবহতা এত তীব্র হত না। কিন্তু সে তো হবার নয়।

প্রথম দুটো পরিকল্পনার যদি এই অভিজ্ঞতা হয় তবে খুব সঙ্গত কারণেই আমরা ভয় পেতে পারি তৃতীয় পরিকল্পনার কথা শুনে। বিশেষ করে, তার বরাদ্দ ব্যয় যখন ১০,২০০ কোটি টাকার মতো। নেতারা তো বাঁধা বুলি আওড়ান—ভবিষ্যতের জন্যে কষ্ট করতে হবে, এই মূল্যবৃদ্ধিজনিত কষ্ট সাময়িক ইত্যাদি। কিন্তু যদি জনসাধারণ দেখতে পেতো যে নেতারা এবং বড়লোকেরা তাদের মতই ত্যাগ স্বীকার করবেন কিংবা "ভবিষ্যতের জন্যে" আনুপাতিক হারে বেশি কষ্ট করছেন তাহলে

তাঁদের সেই আবেদনের একটা মানে থাকত। অথচ দেশের বিরাটতম একটা অংশকে অসন্তুষ্ট রেখে যে কোনও জাতীয় পরিকল্পনাই যে সার্থক রূপ নিতে পারে না—কর্তাদের মাথায় এ কথাটা ঢোকানো যাচ্ছে না। অনেক দেশেই সরকারের লক্ষ্য থাকে যেন অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম মোটামুটি একটা স্তরে বাঁধা থাকে।

আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হচ্ছে এদেশে উচ্চতম ক্ষমতা-সম্পন্ন আর্থিকসংস্থা। অথচ তাদের অসহায়তা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেন দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করবার কোনো দায়িত্বই তাদের নেই—থাকলেও তারা অক্ষম। ভারতীয় অর্থনীতির ওপর তাদের ১৯৪৮-৪৯ এর রিপোর্টটা দেখলেই তা বোঝা যায়। তাতে বলা হয়েছে যে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য (মুখ্যতঃ ধান ও গম) প্রচুর পরিমাণে গোলাজাত করা হয়েছিল এবং সে কাজে ব্যাঙ্কের কোনো সহায়তাই নাকি লাগে নি। অর্থাৎ চাষীদের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তারাও শস্য ধরে রেখেছিল। আড়তদারের কথা তো আলাদা। তারা ও কাজে ভালোই আছে। মুখ্যতঃ ধান চালের বাজারের সঙ্গেই চলতি বাজারের দর বাঁধা। অথচ এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে ধান-চালের দর যথেষ্ট কমে যাওয়া সত্ত্বেও বাজারের অন্যান্য দ্রব্যের দাম কমছে না—এমনকি কাঁচা মালেরও। যাই হোক, বস্ত্র এবং অন্যান্য ভোগ্য-দ্রব্যের দর ধান-চাল-গমের দরের সঙ্গে বাঁধা একথাটা অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু অসাধু আড়তদার ও কাটকারাজদের হাতে পড়ে তারাও বিপরীত ফল প্রদর্শন করতে পারে তাতেও ভুল নেই। অন্ততঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে তাদের এ ব্যাপারে করবার কিছু নেই এটা জেনে দুঃখ হয় বৈকি।

তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফেও অসুবিধে আছে। আমাদের দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমিতেই তার বিচার করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোবিধ অস্ত্র আছে অর্থনৈতিক সাম্য রক্ষার জন্যে। কিন্তু ভারতের মতো স্থানে যেখানে সুসংগঠিত "টাকার বাজার" নেই, সেখানে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতটা কার্যকরী হতে পারে?

একটা বিরাট অংশই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ত্তাধীন নয়, একথাটা মনে রাখতে হবে। তাছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি সেই সমস্ত চাকর-কুমীরদের কথা যাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ইন্ধন যোগাতে আপনি-আমি তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি। মুনাফাশিকারী, কাটকাবাজ টাকা-কাঁকীবাজ, আড়তদার ও কালোবাজারী এরা সেই সব শক্ত ঘাদের সঙ্গে মোকবিলা করার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেই। জাতীয় আয়ের বেশ বড় একটা অংশও এদের পেটে যায়।

আমাদের এই দুর্দশার আর একটা কারণ হল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যকে অবহেলা করে তার বহির্বাণিজ্যিক মূল্যকে স্থিতিশীল রাখার প্রয়াস। অন্যান্য দেশে কিন্তু এমনটা হয় না। ইংরাজ আমলে সে আচরণের হেতু ছিল—কিন্তু স্বাধীন ভারতেও একই নীতি অনুসৃত হতে দেখলে অবাক হতে হয়। তখন আমাদের বাণিজ্যের বেশির ভাগ ছিল ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে—তাই বৈদেশিক মূল্যমান সেদেশের মূল্যমানের সঙ্গে স্থিতিশীল রাখার যুক্তি ছিল। আর এখন কতো ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

মূল্যবৃদ্ধির পরিণাম কী, তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। কাঁচামালের দাম বাড়লে, তৈরী করা মালের দাম বাড়বেই। সেটা বাড়লেই তার চাহিদা যাবে কমে আর চাহিদা কমে গেলেই উৎপাদনের প্রয়োজন হবে কম। ফলে মন্দা আসবে—আসবে ছাঁটাই ও অন্যান্য অশান্তি। আর দরের হ্রাস-বৃদ্ধির সুযোগ নেবে কাটকা-বাজরা। আবার বিদেশী রপ্তানী করার ব্যাপারেও অসুবিধে ঘটাতে পারে মূল্যবৃদ্ধি—ফলে টাকার বৈদেশিক মূল্যমানও চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে।

যাই হোক, টাকার মূল্য কমে যাওয়া এবং দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া যখন একই কথা তখন একথা স্বীকার করতেই হয় যে কিছু কিছু ওঠানামা হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেটা ঠেকানো সম্ভব নয়—বরং বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক অবস্থায় সেটা অনিবার্য। কিন্তু যদি সেই মূল্যবৃদ্ধির আকার এত বড় হয় যে উন্নতি, প্রগতির যা কিছু অবদান সবই তার গর্ভে চলে যায়—তাহলে সেটাকে রোধ করতে হবেই। বর্তমানে দেশ সেই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে বলে মনে করা যায়।

কারো কারো মতে সমবায় প্রথা অধিক পরিমাণে চালু করে দালালদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত। কারো মতে আবার সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা হওয়ার দরকার, মানে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বণ্টন চাই। কারো কারো মতে আবার সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও লালফিতার বন্ধনই যত গণ্ডগোল। ওগুলো দূর হোক—সব ঠিক হো যায়গা। তবে একটা উপায়—আমরা সেটাকে সমর্থন করি প্রায় সবাই, সেটা হল চাকরদের শায়েস্তা কর—উল্লেখযোগ্য শাস্তি অন্তত একটাকে দিলেই কাজ হবে।

সরকারী প্রচেষ্টায় দাম যদি কমানো সম্ভব হয় তাহলে দেখতে হবে সেটা খুব কমে না যায়। তাতে উৎপাদকের উৎসাহ যাবে কমে। সেটা অন্য এক দিকে ভীষণ ক্ষতিকর। এমনকি সেই কারণেই দাম আবার চড়বে। সুতরাং একথা পরিষ্কার হল যে একটা উপযুক্ত স্তরে দাম বাঁধতে হবে। তাছাড়াও আরো করণীয় আছে। জাতীয় আয়ের যথাসম্ভব সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চেষ্টা করবে ব্যাঙ্ক মারফৎ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে। সরকারী পুলিশ চেষ্টা করবে চোরাকারবারী ও কটকাবাজদের ধরতে। অবশ্য সে সম্পর্কে বিচার ও শাস্তিদানের উপযুক্ত আইন চাই।

মোটকথা জনসাধারণ, সরকারী কর্মচারী, আইন সভা ও পার্লামেন্টের সদস্য, ব্যবসায়ী সমাজ সবারই ঐকান্তিক চেষ্টা চাই এ ব্যাপারে। তা না হলে এই বিরাট সমস্যাকে বাগ মানাবার সাধ্যও নেই সরকারের। এবং তার মানে হল তৃতীয় প্লানের অপমৃত্যু কিংবা তৃতীয় প্লানের শেষে আমাদের স্বর্গারোহণে।

সংগীত

রবীন্দ্র সংগীতের রহস্যলোকে

(রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক গান

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

○

একথা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় যে প্রথম কাব্যসৃষ্টি হয়েছিল বাল্মীকির কণ্ঠে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিয়োগজনিত ব্যথার উপলব্ধিতে, তাহলে কবিতাকে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ বলেই স্বীকার করতে হবে। তবে সেই অনুভূতি নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তার সঙ্গে বিশ্বের ভাবগত যোগ। তা নইলে ছেলের জন্য মায়ের কান্না, কিম্বা রোগের যন্ত্রণায় রোগীর আর্ত চীৎকার-জনিত বিলাপ মাত্রকেই সাহিত্যের সামগ্রী বলতে হয়। কিন্তু এই বিলাপ যদি একটি মায়ের বা একটি রোগীর অনুভূতির প্রকাশ না হয়ে বিশ্বজননী বা তাবৎ জাগতিক রোগীর অনুভূতির সঙ্গে মিলে যেতে পারে তবে তা সাহিত্যের উপলব্ধির সত্য হতে পারে। ক্রৌঞ্চবিরহ বাল্মীকির মনে বিরহের অনুভূতি জাগিয়ে একাত্ম হল বলেই কাব্যসৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠল। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সেই সাহিত্য বাস্তবকেও অস্বীকার করে না, কল্পনাকেও অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয় না। বাস্তবকে ভিত্তি করে কল্পনার রং চড়ায়, আবার কল্পনাকে অবলম্বন করে বাস্তবের রাস্তায় পা বাড়ায়। এই কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জগৎ অবশ্যই আছে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে কখনো বা প্রকাশ্যে।

কবিতার ক্ষেত্রে কবির অনুভূতির জগতেও এই ব্যক্তি-মানসের প্রকাশ। বিশেষ করে গীতিকবিতার বেলায়। কারণ বস্তুনিষ্ঠ কবিতার মধ্যে বাস্তবের যে-সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠতে পারে, বস্তুনিরপেক্ষ কবিতায় তা হয় না। অন্তরের আভাসে বিশ্ব প্রতিফলিত হয়। গীতিকাব্য তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েও বিশ্বরসে অভিসিক্ত। গীতি-কবিতা কবির নিজের মনের প্রতিধ্বনি। কিন্তু সেই মন বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত। বাস্তব থেকে দূরে গিয়ে উপলব্ধির এক অন্য জগতে যেন আনাগোনা করি তা ব। সেখানে রস আছে নৈর্ব্যক্তিক পুরুষের মতো অনুভূতির আকাশে, আর তার চারদিকে ঠিকরে পড়ছে মনন-শীলতার জ্যোতি। ক্লাসিকের বা সনাতন ধারার গণ্ডী থেকে একদিন বেরিয়ে এল রোমান্টিক ধারা, মিশে গেল বাস্তবে আর কল্পনায়। কবির ব্যক্তিত্ব চড়িয়ে পড়ল বিশ্বের ব্যক্তিসত্তায় তারপরে আরো দূরে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন সব কবি সেখানে রহস্যের আনাগোনা। কবিতা হল মিষ্টিক

রোমান্টিক কবিমানস কি ভাবে পরিণামে গিয়ে মিষ্টিক হয়ে যেতে পারে সে কথা ভেবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই পরিণতি স্বতঃসিদ্ধ না হলেও স্বাভাবিক। রোমান্টিক কবি নিজের পরিচিত জগৎ নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে স্বরচিত আরেক পূর্ণতর জগতের কল্পনায় তৃপ্তি পান। তাঁর রচিত জগৎ তাঁর কাছে সত্য হয়ে দেখা দেয়, এবং সেই আলোয় পরিচিত জগৎকে তিনি পরিপূর্ণতর দেখেন বা দেখতে চান। তখন সব কিছুই তাঁর কাছে এক নূতন অর্থ নিয়ে দেখা দেয়। অথচ তবু তাঁর অন্তরের আকুতির শেষ হয় না, চরম তৃপ্তি আসে না। কিসের যেন একটা অভাব-বোধ তাঁকে অস্থির করে রাখে। তার ফলে তিনি জানা থেকে অজানায়, সীমা থেকে অসীমের দিকে চলতে থাকেন। নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে ও অসামান্যের আভাস পেয়ে রোমান্টিক কবি সেই নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সব কিছু দেখেন। দৃশ্যমান জগৎ ও বাস্তব জীবনের উপরে কল্পনার রং চড়িয়ে মনোমত একটি রূপ খাড়া করে রোমান্টিক কবি সেই রসে মগ্ন থাকেন। অথচ এই মনোনীতাকে কখনো পুরোপুরি করে পান না। তাই তাঁর কাব্যে অতি প্রাকৃত আশা, অভিনব কল্পনা, হতাশা

ও বিষাদের সুর থাকে। তবু সেই রূপ-রসের অভিব্যক্তি আমাদের ভাল লাগে, কারণ অপূর্ণতার ব্যথা এবং পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলেরই মনে বিদ্যমান। সেইজন্যই রিয়েলিজম বা বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিসিজম বা রূপকল্পতার একটা আপাত বিরোধ থেকে যায়। বাস্তবের জগতে কল্পনার জগতে মেশামেশি হয়ে যেতে চায়,—অথচ এক হয়ে যায় না। বাস্তবকে কল্পনার জগতের দিকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, আবার কল্পলোক এসে বাস্তবে রূপ পেতে চায়। 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, গন্ধ সে চায় ধূপেরে রহিতে জুড়ে।'

রোমান্টিক কবি যখন মিষ্টিক দৃষ্টি লাভ করেন তখন বস্তুগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে আর দ্বন্দ্ব থাকে না। তখন রূপলোকের মধ্যে অরূপের উপলব্ধি হয়, সীমার মধ্যে দেখা মেলে অসীমের। আবার অরূপ বা অসীমকে রূপায়িত বা সীমিত করে দেখাও সম্ভব হয়। তখন নিজের বুদ্ধি, অনুভূতি, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, সব এক প্রশান্তিতে ঘিরে আসে। শুধুমাত্র হৃদয়ের আলোতে সব কিছু দীপ্তি পায়। মিষ্টিক কবির মধ্যে রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ি থাকে না, বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরাল দৃষ্টি-বোধও থাকে না। কেন না বাস্তবকে এক নূতন রহস্যের আলোয় মরমীয়া রসের ধারায় উপলব্ধি করে নিয়ে তাকে কবি গ্রহণ করেন। কোন প্রকার মোহ সেখানে বাধার সৃষ্টি করে না। একমাত্র প্রেমের আধারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ একসঙ্গে ধরা দেয়। এই মিষ্টিকতা বা রহস্যময়তা আলোচনা দিয়ে বোঝবার জিনিস নয়। যুক্তি বা তত্ত্ব দিয়ে বোঝবার চেষ্টা দার্শনিক, আবেগের নেশায় বিভোর হয়ে অজানাকে অনুভব করা রোমান্টিক, হৃদয় দিয়ে জানা অজানার একাত্মতার উপলব্ধি মিষ্টিক। তাই মিষ্টিক ধারাকে বৈষ্ণব বা ঐশী ভাব বলা হয়েছে। মরমীয়া-সাধকদের সাধনা-ধারা প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক। কিন্তু মিষ্টিকতা মাত্রেই আধ্যাত্মিকতা নয়। বৈষ্ণব কাব্যের যে রোমান্টিক প্রেম কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতার বা ভগবৎ উপলব্ধিতে মিষ্টিক হয়ে উঠেছে তারও মূলে যেমন রয়েছে মানবীয় ধারা, তেমনি রয়েছে অজানা রোমান্টিক কবির কাব্যেও। অর্থাৎ নিছক যে রূপের পূজা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব প্রেম, তাতে কবির মন তৃপ্ত হয় না। তৃপ্তির সিঁড়ি বেয়ে লৌকিক প্রেম ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের অনুভূতিতে উঠে গেলে অলৌকিক অতীন্দ্রিয় রসে লীন হয়ে যায়। সেই হৃদয়োৎসারিত বন্ধনমুক্ত প্রেম ভগবৎ প্রেমের সামিল। তাই মিষ্টিক কবি ঐশী ভাবাপন্ন। কিন্তু বাস্তব থেকে বিযুক্ত নন। হৃদয়ের সহজ প্রকাশের ভাষাকে সহজ ভাবে যদি দেখি তাহলে মিষ্টিক কবিতা বা গান অন্য স্তরের মনে হলেও অন্য জগতের মনে হবে না। অনেক সময়ে দেখা যায় বাউল, সুফীসাধক প্রভৃতির গান প্রতীকী বা রূপক-ধর্মী কথায় ভরা। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেও এ জাতীয় কথার ব্যবহার দেখা যায়। কাব্যমাত্রই একটা রূপক অর্থ প্রকাশ করে, বা, বলা যেতে পারে বাক্যের অতীত কিছু অর্থ প্রকাশ করে, সামান্য দিয়ে বিশেষকে অথবা বিশেষ দিয়ে নির্বিশেষকে প্রকাশ করে। তার সুর আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু মানবীয় আবেদনও তার মধ্যে জড়ানো।

রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতার মরমীয়া সুর ঐশ্বরিক না হয়ে বেশি মাত্রায় মানবিক। তিনি এই পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে মানুষকে বেশি ভালবেসেছেন। তাই তিনি মানুষের মধ্যে ভগবানের লীলা অনুভব করেছেন, মানুষের প্রেমের জন্য ভগবানের প্রেমাভিসার দেখেছেন। পরম লীলাময়ের জন্য মানুষের আকুলতার মধ্য দিয়েই ভগবানেরও একই আকুলতার উপলব্ধি তাঁর হয়েছে। নিজের মধ্যে যে আরেক মানুষ, তাকে জীবাত্মা, জীবন-দেবতা, যাই বলি না কেন, সে অন্তরতমের জন্য বা পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল। কোন কোন সাধক অন্তরস্থ এই 'আমি'কে নারীরূপেও কল্পনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বলছেন, 'এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন ওগো কৌতুকময়ী,'

'আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে,
কোন বিরহিনী নারী।
আপন করিতে চাহিনু তাহারে
কিছুতেই নাহি পারি।'

এই আকুলতা রোমান্টিক হয়েও মিষ্টিক। সে জানে না যাকে চায় কী তার রূপ। শুধু বলে; 'অজানারে কবে আপন করিব'; বলে, 'আমি যে তোমারে খুঁজি।'

আবার এই রোমান্টিক চঞ্চলতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি হয়,

'স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে।'

এই যে 'স্বর্ণকমল', এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অবশ্যই করা যায়। কিন্তু একে যদি আমরা কবির মিস্টিক অনুভূতি বলি, তবে আর আলোচনার কিছু থাকে না, এক অখণ্ড উপলব্ধিতে মন ভরে ওঠে, চারপাশের অস্থিরতা পার হয়ে মন শান্তিরসে ভরে যায়। অর্থাৎ মিস্টিক কবিতার সাংকেতিক অর্থবিচার ছাড়াও এর মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক অর্থ, তার রসেও মন অনায়াসেই সাড়া দেয়। সাধারণ থেকে অসাধারণে, আবার গূঢ়তম থেকে সহজতায় এর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা।

'জীবনস্মৃতি'তে দেখি আঠারো উনিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র অনুভূতির কথা। 'সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।'

এর পরেই তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা লেখেন। এই অনুভূতি পুরোপুরি রোমান্টিক। আনন্দে বিষাদে স্বচ্ছন্দে চঞ্চলতায় হৃদয় আন্দোলিত। এই অনুভূতিতেই বলেন,—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।'

তারপরেই বলেন তাঁর আরেক অনুভূতির কথা; 'এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, সেইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।'

রোমান্টিক মিস্টিক এই দৃষ্টিই একটি কবিতা পেয়েছিল এই ভাবে :—

'শান্ত মৌন নগরীর সুপ্ত সূর্য শিরে
হেরিনু জ্বলিছে তারা নিস্তব্ধ তিমিরে।
ভূত ভাবীর বর্তমান একটি পলকে
মিলিল বিষাদ স্নিগ্ধ আনন্দ পুলকে
আমার অন্তর ভরে; অনির্বচনীয়
সে-মুহূর্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অশ্রুগত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌন বুক
আমার হৃদয়পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কী অমলে উচ্ছলিল।.....

এই থেকেই একটা অখণ্ড দৃষ্টি লাভ করলেন তিনি। 'যে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য তাহাই আনন্দ।' এই উপলব্ধির সূত্রেই তিনি আরো বলেন, 'এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা, যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ...তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। সমস্ত বিশ্বের আনন্দ-রূপকে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম,...। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময়ের যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।'

মিস্টিক অনুভূতি তীব্র প্রশান্তিতে মন ভরে দেয়,

এক অখণ্ড আনন্দ লোকে নিয়ে যায় মনকে। তাই কথার বাহুল্য থাকে না, বাগর্থের বাড়াবাড়িও থাকে না। উপলব্ধির ভাষায় কারিগরি নেই, আছে আত্মনিবেদনের শুদ্ধ সুর। কবিতার চেয়ে গানেই তাই তার প্রকাশ সহজ, সুন্দর। সংগীতকে শুধু সুরের খেলা না বলে ভাবের লীলা বলতে পারি। এবং যে হেতু মিস্টিক রস ভাবনির্ভর, হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ, সে হেতু গানই তার উপযুক্ত ভঙ্গি। কবিতার মধ্যে কথার চাতুরী বা অর্থমাধুরী থাকবেই, কিন্তু গানে শুধু অনুভূতির ছোঁয়া, উপলব্ধির প্রশান্তি।

'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক মন প্রকৃতি, মানব, ভগবান, সব কিছুর মধ্যেই এক সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের চেতনা, আমাদের আত্মা যখন সমস্ত প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তা দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা নয়। ...একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব একসঙ্গে মিলে যেতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিন্তুতেই তারা মিলতে চায়না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়।'

এই প্রেমদৃষ্টি দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করা রস রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় সুরে পূর্ণ হয়ে আছে। প্রকৃতিকে তিনি ঋতুর পর্যায়ে পর্যায়ে পূর্ণরূপে দেখেছেন। তার একদিকে প্রকৃতির বস্তুসত্তা অন্যদিকে ভাবসত্তা। বস্তুকে বাদ দিয়ে ভাব নয়। রোমান্টিক রস যদি বা বস্তুর অতীত কল্পনায় বিচরণ করতে পারে, কিন্তু মিস্টিক রস তাকে অস্বীকার করতে পারে না কিছুতে। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়াতীত রূপোপলব্ধি মিলেমিশে থাকে মিস্টিক গানে।

'অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

...পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

নানারূপে প্রকৃতিকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। গানে গানে কখনো তার উজ্জ্বল উজ্জ্বল রূপ প্রকাশ করেছেন, কখনো প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সহজ সংযোগের কথা বলেছেন, কখনো বা কল্পনা করেছেন বস্তুর মধ্যে অখণ্ড এক রূপমূর্তি। আর এমনি করেই সুরের পথ ধরে তিনি মিস্টিক হয়ে গিয়েছেন

'শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নিরব সমে সুপন সম কে এলে।
পরাণ-পরে তুলিলে কর নীরব তব কমল-করে
মালতী-মালা রহিল গলে, গন্ধ তারি রহিল জলে।
প্রভাত হলে পাখির গানে ঘুমের ঘোর যখন টুটে
তখন তুমি কোথায় যাও সে কথা কিছু নাহি যে বলে।
সে-পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানস লোকে গানের দেশে
চিরদিনের বিরহিনীর কুঞ্জবনে।'

গানে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গির দুরকম প্রকাশ। কখনো তার যাত্রা জানা থেকে অজানায়, সীমা থেকে অসীমের দিকে, আবার কখনো বা অসীম থেকে সীমার দিকে, অজানা থেকে জানার ভার নেওয়াতে

'যে-আমি ঐ ভেসে চলে কালের ঢেউয়ে আকাশ তলে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে
ধূলার সাথে, জলের সাথে, ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চলছে ওযে ধেয়ে॥
ওযে সদাই বাইরে আছে দুঃখে সুখে নিত্য নাচে
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে।
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।
যে-আমি যায় কেঁদে হেসে তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠিতেছি গান গেয়ে।
ওযে সচল ছবির মতো আমি নীরব কবির মতো
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে॥
এই যে আমি ওর আমি নই, আপন মাঝে আপনি যে রই
বাইরে ভেসে মরণধারা বেয়ে
মুক্তি আমি, তৃপ্তি আমি, শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি।
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে॥

সমস্তীয় রসের সাধক তিনি সৃষ্টির মধ্যে এবং বিশ্বজগতে ভগবানের চিরন্তন লীলা উপলব্ধি করেন।

কিন্তু সেই লীলারসের সাধনায় মরমীয়া সাধক আত্মমুক্তির এক স্বকীয় আধ্যাত্মিক মার্গ অবলম্বন করেন। তাই সহজিয়া রসের পথিক বাউল সাধক, সকলের মধ্যে এমন সব তত্ত্বকথার ব্যবহার দেখা যায় রূপক যার অবলম্বন। 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়' বললে তাঁরা দেহের মধ্যে আত্মার অবস্থান বুঝবেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'কূল হারা কোন হ্রদের সরোবরে, বুল হারা বুল ভাসে জলের পরে' শুনলেও একেবারে চর্যা গানের তাত্ত্বিক রসের আভাষ জাগে মনে। তবু মরমীয়া সাধকদের থেকে রবীন্দ্রনাথের মরমীয়া তত্ত্বের রূপ আলাদা। আধ্যাত্মিকতা এর ভিত্তি নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয়না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসারতা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনি আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেইরকম করে যখন পাই তখন আর বুঝতে বাকি থাকেনা যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।' পদ্মানদীর উপরে নৌকোয় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের একদিন উপলব্ধি হয়েছিল, 'দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জল-ভারনত মেঘ, নীচে ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে, তাদের মধ্য দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূর। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকাল-ব্যাপী সর্বানুভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা।...এতকাল নিজের জীবনে সুখ দুঃখের যেসব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টরূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।'

এই অনুভূতিই মিস্টিক অনুভূতি। আধ্যাত্মমার্গের পথিকদের মতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর মিস্টিক অনুভূতিকে শুধু তত্ত্বরসের বা ধর্মবোধের সামগ্রী করে রাখেন নি। এক আনন্দলোকে বসে তিনি তার সমগ্র রস আস্বাদন করেছেন, এবং তাঁর কাব্য ও সংগীতামোদীকেও সেই আনন্দলোকে নিয়ে গিয়েছেন। পরিপূর্ণ প্রেমের উপলব্ধি ভগবৎ উপলব্ধির সামিল। সেই প্রেম পৃথিবীর হয়েও সার্বিক কামনা-বাসনা বর্জিত। অপরদিকে, ভগবানের কাছে আত্ম-নিবেদনের জন্য মানুষের অনন্তকাল ধরে চলেছে, আর ভগবানও মানুষকে ভালবেসে ধরা দিতে আসছেন। অসীমের উদ্দেশে অনন্তযাত্রার মধ্যে রোমান্টিক ভঙ্গি আছে। কিন্তু অসীমের শান্ত অনুভূতি আপনাতে আপনি পূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিমন যেমন বলেন,

'লক্ষিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নবনব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ ধরলম।'

'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়।'

'এই যে তুমি' এই কথাটি বলব আমি যেন
কত দিকেই চোখ ফেরালেম কত পথেই চলে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
'আছে আছে'র স্রোত বহে যায়
'কই তুমি কই' এই কাঁদনের
নয়ন জলে গলে।'

তেমনি আবার দৃষ্টিভঙ্গি পালটিয়ে তিনি বলেন,

'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।'

'মোরে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব।'

'মোর মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।'

'তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
মোর নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগেযুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।'

পথ সেই একটাই। কখনো 'আমি' সেখান থেকে ছুটে চলি 'তুমির' দিকে, কখনো 'তুমি' এসে তুলে নাও 'আমি'কে। এই 'আমি' সীমা, আমি জানা, আমি অস্তি, আর 'তুমি' অসীম, তুমি অজানা তুমি অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক গানে সত্তার এমনই অখণ্ড রূপ। 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে।' জীবন ও মৃত্যুর রূপকেও এমনই সহজ মরমী দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি দেখেছেন। মৃত্যুর মধ্যে লীন হয়ে জীবন আবার নূতন হয়ে দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ অন্তভাবে দেখতে গেলে মৃত্যু বলে শেষতম কোনো ছেদ নেই। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি চাই, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

মিস্টিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানবকে এক অখণ্ড সত্তার মধ্যে দেখেছেন। তাই 'মানবের মাঝে' তিনি 'বরদার রূপ' দেখেন, নিজের মধ্যে লীলাময়ের মধুর প্রকাশ অনুভব করেন। গানের মধ্য দিয়ে বলেন সেই উপলব্ধির কথা,

'আকাশ ছুড়ে আজ লেগেছে তোমার আমার মেলা,
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে তোমার আমার খেলা।'

'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হল, ধন্য হল মানব জীবন।'

রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক মন মানুষকে কেন্দ্র করে মানুষেরই মধ্যে লীলাময়ের লীলা অনুভব করে আনন্দে বিভোর। এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময় উপলব্ধি—তা সে ভগবানেরই হোক বা চির নূতন চির আনন্দময় পরম শক্তিমান কোনো সত্তারই হোক—সেই নেশাতেই তিনি শিশুর মতো বিভোর। ভগবানকে মানুষরূপে কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে লীলা খেলা নয়, মানুষের মধ্যেও তত্ত্বরসের ইঙ্গিত দিয়ে বন্ধনমুক্তির সাধনা নয়, এ হল সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে লীলাময়ের রসবৈচিত্র্যের আস্বাদনের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, 'আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।'

'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি।
আপন-মনে আমারি পটে আঁক মানস ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী ধেয় মোরে কেমনে কব,
আপন-মনে মেল স্বপন আপনি রচ রবি।'

নিজের মধ্যে লীলাময়ের অসীম রহস্য-ভরা প্রকাশের এমনই নিবিড় আনন্দ।

'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
তারে যৌবন মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রস ধারায় কতই হল মগ্ন,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তার অকারণের হর্ষ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।'

রবীন্দ্রসংগীতের পর্যবিভাগে তাঁর মিস্টিক গানকেও নানা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রকৃতির রূপ নিয়ে মণ্ডল থাকে এবং সেই প্রাকৃতিক বিকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ সত্তার আবির্ভাব তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের বহু গানের মূল রস। 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি, কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী,' 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে, সেই আগুনের কালো রূপ যে আমার চোখের পরে নাচে;' 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে নিশার মতো নীরব ওহে, সবার দীঠি এড়ায়ে এলে;' 'আমার নয়ন ভুলানো এলে, আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে;' 'শরত-আলোর কমল বনে বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে

মনে ;' 'এত দিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে ;' 'কার যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায় ;' 'সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া ;' ইত্যাদি, ইত্যাদি। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে প্রকৃতি যেন ঋতুতে ঋতুতে নূতন বেশে নূতন রূপে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দোলা দিচ্ছে হৃদয়ে হৃদয়ে। প্রকৃতির সেই সর্বব্যাপী আনন্দ রূপ সারা বিশ্বে আনন্দ তরঙ্গ তুলেছে। মিলনে বিরহে সে পূর্ণ লীলাময়।

আবার কখনো তাঁর গানে মানুষের মধ্যে চিরলীলা-ময়ের লীলার প্রকাশ মাধুরী : যেমন, 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও' ; 'কত অজানারে জানাইলে তুমি··· ;' 'সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে ;' 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ;' 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে ;' ইত্যাদি। এইসব গান কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেও কবির 'আমি' বিশ্বের সব 'আমি'র প্রতীক। তাই তাঁর এই আনন্দময় উপলব্ধি সর্বজনীন রূপে ওঠে। গানের মধ্যে কথা আর সুরের ছোঁয়ায় বিশেষ করে তা হয়, কেননা সব বক্তব্যের সারটুকু নিয়েই গান, সরটুকু নিয়েই সুর। তাই তাঁর নিজের কথা নিজের গান হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের গান, বিশ্বজগতের সুর। নিজের দেবতাই মানবদেবতা। জীবন-দেবতাই বিশ্বদেব। নিজের প্রেমের অনুভূতি সকল মানুষের প্রেমানুভূতি হয়ে ওঠে যখন বলেন,

'ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।'

'আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে—
যত তোমায় ডাকি আমার আপন হৃদয় জাগে।'

মিস্টিক দৃষ্টিতে খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের উপলব্ধি যেমন হয় তেমনি অখণ্ডকেও খণ্ড খণ্ড অথচ পূর্ণ করে দেখা সম্ভব হয় ?

'তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমার চিরনূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চির সুমধুর।
মোর গানে নেই দীনতার লেশ,
যত নেবে তুমি না পাবে শেষ—
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে।'

অখণ্ড দৃষ্টিতে শেষ বলে কিছু আর থাকল না। থাকে আরম্ভ আর সমাপ্তি দুইই এক ধারাবাহিকতার মধ্যে বিধৃত।

'শেষের মধ্যে অশেষ আছে এই কথাটি মনে
আজকে আমার গানের শেষে জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।'

মিস্টিক গানের সব কথা সব ভাবনা সব সুর অন্তরের একেবারে অন্তঃস্থল থেকে তাঁকেই ঘিরে বেজে ওঠে যিনি অন্তর বাহির জুড়ে চিরব্যাপ্ত, চিরজাগ্রত। হৃদয়ের ভাব এসে ভাষা আর সুরের সব দ্বন্দ্ব সব স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক গানের সুর নিয়ে আলাদা করে কিছু বলবার নেই। রবীন্দ্রসংগীতের ভাবটুকু সমগ্র ভাবে প্রকাশ করে যে সুরমাধুর্য তা মিস্টিক গানের ও শেষ কথা। গানের সুর সেই ভাবের সুরটুকুই প্রকাশ করে সার্থক। তারপরে থাকে শুধু ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যময় পাওয়ার উপলব্ধি।—

'আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় তাদের সকল সীমারই পারে।'

ভিন্নপথে কেদারবদরী

গণেশ লালওয়ানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উঠলাম সেই সকালেই। ত্রিরাত্রি ত থাকব না এখানে। কালই আবার চলে যাব। তাই আশে পাশে যা দেখবার আছে সে সব দেখে রাখি।

ছটার সময়েই বেরুলাম। তারপর মন্দিরের পাশ দিয়ে ঘুরে কুণ্ড ঘুরে যাই ভৃগুতুঙ্গ ভৈরবের। কেদার ক্ষেত্রের পূব দিকের পাহাড়ে এই ভৃগুতুঙ্গ ভৈরবের মন্দির মাইল দুই পথ। কিন্তু গিয়ে দেখি মন্দির আর কি, খোলা আকাশের নীচে বসানো রয়েছে এক ভৈরবের মূর্ত্তি। আকাশই তাঁর চন্দ্রাতপ। চন্দ্রসূর্য তাঁর দীপক। আর পাহাড়ের গায়ে যে ফুল ফোটে তাতেই তাঁর অর্চনা হয়। পাশেই আবার জলের ঝরণা। জলকণা ভেসে আসে হয়ত বাতাসে। তাইতেই তাঁর স্নান।

এখানে এসে দাঁড়ালে সমস্ত কেদার ক্ষেত্রকে দেখা যায় এক ঝলকে। পাহাড় আর বরফের রাজ্যে এই একটু সমতল ভূমি। মন্দির, দোকানপাট, যাত্রী আবাস সব মিলিয়ে ছোটখাট জনবসতি। ঠিক সামনেই দুগ্ধ-গঙ্গা। দুধের মতোই তার জল। মন্দিরের পেছনের পটভূমিও আবার ফুটে ওঠে চোখের সামনে

রেতস কুণ্ড ঘুরে ঘরে ফিরি। পাথরের মন্দির। ভেতরে কুণ্ড। জলের ওপর কেমন যেন বুদ্বুদ ভাসে। কথা বললে কি শব্দ হলে আরো বেশী।

ঘরে এসে কাপড়চোপড় নিয়ে যাই মন্দাকিনী ও দুগ্ধগঙ্গার সংগমে।

কিন্তু দুগ্ধগঙ্গা সেই জল দুধেরই মতোই ঠাণ্ডা। তাছাড়া দুর্বার তার প্রবাহ। জলে নামি সাধ্য কি? তাই তীরে বসে জল নিয়ে গায়ে মাথায় দেই। সমস্ত শরীর কেমন যেন ঝিম হয়ে যায়। শুধু তাই নয় গায়ে জ্বালা ধরে। অসহ্য জ্বালা। মনে হয় কে যেন মরিচ বাঁটা লেপে দিলে সর্বাঙ্গে।

আঙুলের রক্ত বোধ হয় জমাট বেঁধেছে, হাত হয়েছে অবশ। কাপড় আর নিঙড়োতে পারিনে। শেষে পায়ে চেপে কোনোমতে নিঙড়োই।

মন্দাকিনী যেতে ফিরে এসে মন্দিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হই। পান্ডালালও আসেন আবার ঠিক সময়ে। তারপর পান্ডালালের সাথে সাথে খালি পায়ে মন্দিরে যাই।

কেদারনাথের উচ্চতা ১১৭৫০ ফিট। মন্দীশ্বরকে পাশে রেখে সেই মন্দিরের প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ডান দিকে গণপতির মূর্তি। গণপতির পূজা করে তবে ভেতরে প্রবেশ।

প্রথমেই নাটমন্দির। থেকে থেকে পাথরের থাম। মন্দিরের গায়ে পাথরের বৃত্তি। পান্ডালাল বলেন, ওসব পরে দেখবেন—পঞ্চ পান্ডব আর দ্রৌপদী।

নাট মন্দিরের পর গর্ভ মন্দির। ছোট্ট চৌকো পরিসর নীচু মেঝে শ্বেত পাথরের। ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলি। কত কালের পাপর—পান্ডার জলে ধীরে কালিতে পেছল হয়ে আছে। মেঝের মাঝখানে কেদারনাথের স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ। ত্রিকোণ পর্বতাকৃতি। মানুষের হাতের খোদাই নয়, স্বাভাবিক। ভিতরের কুলুঙ্গীতে প্রদীপ জ্বলছে। ওই বোধহয় অখণ্ড জ্যোতি, যার আলো কোনোদিন নেবেনা। তারি আলোয় চিকচিক করছে দেয়ালের গা, জলে ভেজা মেঝে, ধীরে মাথা কেদারনাথ।

যী কেন মাথায় এখানে কেদারনাথকে তারি গল্প বলছিলেন কাল পান্ডালাল। যুদ্ধে গুরু হত্যা ও ব্রহ্ম হত্যা করে পাণ্ডবেরা পাপে মসীবর্ণ। শিবপূজো করে পাপক্ষালন করবেন। তাই গেলেন কাশী বিশ্বেশ্বর। কুচুটে স্বভাব আবার নারদের। তিনি সাবধান করে দিলেন শিবকে পাণ্ডবেরা আসছেন তাঁর মাথায় পাপ ক্ষালনের জন্য। শিব তাই শুনে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন উত্তর কাশী। পাণ্ডবেরা কাশীতে শিবকে না পেয়ে তাঁর পেছন পেছন এলেন উত্তর কাশী। শিব

ন। পাণ্ডবেরাও তাই পেছনে পেছনে এলেন আবার কোনী। শিব তখন পালিয়ে এলেন এখানে। কিন্তু ান থেকে আর কোথায় পালাবেন। সামনে পথ ।। শিব তখন পাণ্ডবদের এখানে আসতে দেখে র পশুর রূপ ধারণ করলেন। পাণ্ডবেরা এখানে স শিবকে আর দেখতে পান না। কিন্তু এখানে ত যাবেন তিনি আর কোথায়, কোন পথ দিয়ে? ণ্ডবেরা তাই শিবের চালাকি বুঝতে পারলেন। ম তখন দুইপা ফাঁক করে দাঁড়ান এখানে। বলেন র আর ভাইদের—তোমরা বনের পশু তাড়িয়ে নো। যারা পশু তারা পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, ত আর পায়ের তলা দিয়ে যেতে পারবেন না। তখন র দেখব। হলও ঠিক তাই। শিবকে ইতস্ততঃ করতে খে ভীম দুম করে গদা বসিয়ে দিলেন শিবের কোমরে। ই থেকে শিব কোমর ভেঙে পড়ে আছেন এখানে।

শুনে হাসি আর কি। শিবের পুজো করতে এসে বের কোমর ভাঙা। তবে ভীমত? পান্নালাল বলেন, ণ্ডবেরা তখন মন মন খী এনে শিবের কোমর তলে। ই থেকে যারাই এখানে আসে সবাই খী তলে শিবের মরে। কোমরে মানে কি এই পাথরের এক পিঠে।

পান্নালাল পুজো করিয়ে বলেন, খী দিয়ে বেশ করে ল ঘিন শিবের কোমর। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরুন

্যাতির্লিঙ্গকে

মানুষ অনেক ভাগ্যের ফলেই নাকি আসতে পারে ানে। কিন্তু শিবকে এমন করে নিজের বুকের মধ্যে ড়িয়ে ধরা এ আর কোথাও দেখিনি। শাস্ত্র বলে, াদিদেব মহাদেবের কেদারনাথে নিত্য সান্নিধ্য। সেই মার হৃদয়ের দেবতাকে পরম আরাধ্যকে এমন করে ক পাওয়া এ আর কোথায় সম্ভব! এখন বুঝতে পারি ানে এসে মানুষ কেন এমন বিহ্বল হয়, এমন নিজেকে রিয়ে ফেলে।

পার্বতীর পুজো সেরে আসি নাটমন্দিরে। তারপর টমন্দির ঘুরে পাশের দরজা দিয়ে বাইরে আসি। র পুজো নন্দীশ্বরের। বাকী যাটুকু তারই কপালে

মন্দির প্রদক্ষিণ করে যাই শঙ্করাচার্যের সমাধি দেখতে। শঙ্করাচার্যের নাম শোনেননি এমন ভারতবাসী বোধ হয় কমই আছেন। তিনি এই কেদার ক্ষেত্রেই নাকি দেহরক্ষা করেন। পাথরের একটুখানি চাতর। ওইটাই তাঁর সমাধি।

মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করি সেই সমাধিতে।

পান্নালাল বলেন, এখানে এক মন্দাকিনী নয়, পাঁচ পাঁচটী নদী। অন্যখানে দুটো নদীর প্রয়াগ কিন্তু কেদারক্ষেত্রে পাঁচটীর। দুগ্ধগঙ্গা, মন্দাকিনী, মহোদধি, সরস্বতী ও স্বর্গারোহণীর। হাত ঘুরিয়ে চিনিয়ে দেন সব ক'টি।

দুগ্ধগঙ্গার দুধের মতো রঙ। মন্দাকিনীর একটু ছাইমাখা। যেন শিবের জটা ঘুরেই নামছেন তিনি। মহোদধি ধূম্রবর্ণা, স্বর্গারোহণী পদ্মিল আর সরস্বতী নীলাভ। দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। কেমন করে হয় এই রঙ?

পান্নালাল বলেন মন্দাকিনীর উৎপত্তি স্থান আরো দু'মাইল ওপরে। চোরাবারি তাল—সেখান থেকে

আসছেন তিনি। চোরাবারি নামে বরফের সমুদ্র। ওখানে বরফ প্রতিনিয়ত নীচে গড়িয়ে পড়ছে।

বাসুকি তালের কথা শুনে এসেছিলাম, তাই বাসুকি তালের কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাসুকি তাল শুনি দুর্গম্ভার ওপরে। তিন চার মাইল বিস্তৃত পাথরে বাঁধানো এক সরোবর। অবশ্য ভেঙেচুরে গেছে এখন। সাপের মতো তরঙ্গ ওঠে সেখানে। ওই নাগ লোক। বাসুকি নাগকে নাকি দেখা যায় কখনো কখনো।

সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পান্নালাল বলেন কেন যাবেন ওখানে? কি বা আছে? তাছাড়া ওখানে যাবার সময় নয় এটা। বরফ এখন গলা। সেও এক কোমরের কম নয়।

বাসুকিতাল যাবার সময় যেমন ভাদ্র আশ্বিন তেমনি আবার ব্রহ্মকমলের। তাই ব্রহ্মকমলও দেখা হয় না। পান্নালালের মুখেই শুনি—বরফের পাহাড়ে মাইল জোড়া ফুলের বন। 'কড়া বাস'। নাকে কাপড় দিয়ে ফুল তুলতে যায়। সেও আবার পারে না সকলে। গন্ধে মানুষ মূর্চ্ছা যায়।

পান্নালাল হাত তুলে দেখান স্বর্গারোহণী। ওই পথ দিয়ে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করেছিলেন। আর এই যে পাহাড়টা অনেকটা হাতীর মতো—ওটা ছিল পাণ্ডবদের হাতী। সেই হতে ও প্রস্তরীভূত হয়ে আছে।

পাণ্ডবদের হাতীর প্রস্তরীভূত হবার কারণ বুঝি, কিন্তু রাবণের? বদরীকাশ্রমের পথে দেখি রাবণ পাহাড়। তিনি কেন প্রস্তরীভূত হলেন? তা নয়। দশটি শৃঙ্গ ওই পাহাড়ের। তাই ওই নাম।

লোকের মুখে শোনা কথাই। বলে বদরীকাশ্রমে যাবার পথ ছিল কেদার মন্দিরের পেছন দিয়েই। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ। আগের দিনে যখন একই পূজারী পূজো করতেন দুই মন্দিরে তখন ওই পথেই যাতায়াত করতেন। এখন সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

ভূমিরপাতে না প্রাকৃতিক পরিবর্তনে—কে জানে? কিন্তু পান্নালাল যখন মন্দিরের পেছনের এলোমেলো ফাঁকর পাথর ছড়ান পাহাড় দেখিয়ে বলেন, আলামুখী তখন মনে হয় ওকি আগ্নেয়গিরি? আজ সকালে ওদিক হতেই যেন একটা আওয়াজ শুনেছিলাম ভোর ভোর অনেকটা বন্দুক ফাটার মতো।

পান্নালাল বলেন, শব্দ হয় বটে মাঝে মাঝে।

পান্নালালের সঙ্গে ফিরে চলেছি আবার মন্দিরের দিকে। পান্নালাল যেদিকে দেখিয়ে বলেন, ওদিকে হংসকুণ্ড, রেতস কুণ্ড।

বলি, সে হয়ে এসেছি। কিন্তু হংস কুণ্ড অত নোংরা দেখলাম কেন?

ওখানে যে সবাই অস্থি বিসর্জন দেয়। এতে নাকি মৃতের আত্মার কল্যাণ হয়। ওর কাছে যে নদী দেখেছেন সেইটি সরস্বতী।

কেদার মন্দিরের পাণ্ডো ফলাহারী বাবার আশ্রম। খানিকক্ষণ ওঁর ওখানে বসি। তারপর ওখান হতে উঠে ধরে যাই। উদক কুণ্ড পড়ে পথে। উদক কুণ্ডের জলে আচমন করি।

যাবার সময় সুফল দিতে এলেন পান্নালাল। সুফল নিয়ে কেদারনাথকে মনে মনে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ি আমরা।

সবাই চলেছে দেখছি পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে, আনন্দ নিয়ে—কেদারনাথ দর্শন হল বলে। কিন্তু আমার মনে কেন জানি না আনন্দ নেই। আমি যে ফিরে যাচ্ছি তাই নিরানন্দ।

একবার ত ইচ্ছে হয়েছিল, ছুটে ওপরে চলে যাই। যেখানে হতে এসেছি সেইখানে। ওই যে পান্নালাল বললেন, মন্দাকিনী ও স্বর্গারোহণী যেখানে মিলিত হয়েছে তার ওপারে মাইল দুই হেঁটে গিয়ে ওপারে নামলে পাওয়া যাবে অর্দ্ধচন্দ্রশিলা। ওই শিলাতেই পাণ্ডবেরা শেষ উপবেশন করেছিলেন। তারপর তাঁরা অনন্ত তুষার রাজ্যের মধ্যে হারিয়ে যান। তবে কেন ফিরছি আমি! আমি কেন না ওই পথ ধরে চলে যাই নিত্য অমৃতলোকে!

কিন্তু যাওয়া হয় না। তবু সেই বেদনা নিয়েই নামছি আমি। নদী যেমন নামে পাহাড়ের গা দিয়ে অনেকটা সেই রকম। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে যাই রামবাড়ায়। বেলা তখন একটা। তিনটের গৌরী কুণ্ড।

মন্দাকিনীর পুল পেরোলে।

তারপর সন্ধ্যার মুখে মুখে রামপুরে গিয়ে থামি।

যারা কদ্রপ্রয়াগ হতে আসে তারা গুপ্তকাশী হয়েই কেদারনাথ। তাই তারা ফিরতি পথে গুপ্তকাশী য় যায় না। নালা হয়ে চলে যায় উখীমঠ। কিন্তু ময়া ওদিক হতে আসিনি তাই এসটুকুনি ঘুরেই আর কি!

পরদিন সকালে মাইল দুই পথ হেঁটে আসি কাটা তে। পথে রডোডেনড্রন গাছ দেখলাম কিন্তু ফুল র করে গেছে। আর তালিম ও নেবু গাছ। আর টা নূতন গাছ দেখলাম, চিনিনি।

কাটা হতে মৈখণ্ডা দুমাইল। মৈখণ্ডার আর এক নাম বুলা চটি। বোধহয় মহিষমর্দিনীর মন্দিরের ছ যে বিরাট দোলনা রয়েছে তারই জন্য।

পূজারী এসে মন্দির খুলে বিগ্রহ দেখালেন। বললেন, খানেই দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।

পাহাড়ের মাথায় মৈখণ্ডা তাই চারিদিকে দেখা যায়। চও অনেক দূর অবধি।

পূজারী বলেন এখানের দোলনায় দুলতে হয়। ার অসুর বধ করে আহ্লাদ হল। তখন তিনি এই দনায় দুলে ছিলেন।

মৈখণ্ডা ছাড়িয়ে মাইলখানেক আসতে না আসতেই সি নারায়ণ কোটি। নারায়ণ কোটিরই আর এক ম ভেত্তা। প্রাচীন মন্দির রয়েছে এখানে আর জলের ।।

এই ভেত্তার পরপরই আবার মাত্তা। এখানেও প্রাচীন মন্দির। এক আধখানা নয় অনেকগুলি। ঙোর ভাটের যে ছবি দেখেছি অনেকটা তারি মতো। নি জীর্ণ দশায়। ফুল জল হয়ত দেয় পূজারী কিন্তু যে এগুলো ভেঙে পড়বে—কে জানে? বোধহয় ইই এদের খবর নেয় না, যা দেখে না।

রোদ উঠেছে খাঁ খাঁ। গুপ্তকাশী এখনো মাইল ।। তাড়াতাড়ি হেঁটে চলি। কপাল হতে ঘাম

ত্রিযুগীনারায়ণ

আবার দাঁড়াই। নালার আগে কালীমঠের পথ দেখলাম। দু'তিন জন ওদিকে নেমে গেলেন।

ইচ্ছে হল একবার ওদিকে নেমে যেতে। সরস্বতী নদীর তীরে ওই কালীমঠ। আড়াই মাইল পথ। পীঠ স্থান। বিল্বপত্তী—কালিদাস ওইখানেই তপস্যা করে বর লাভ করেছিলেন নীলসরস্বতীর।

কিন্তু নামা হল না। কপ্‌পুরকেত বলা নেই। এ গুপ্তকাশীর পথ নয়, ভিন্ন পথ।

বারোটার কাছাকাছি এলাম আমরা নালা হয়ে গুপ্তকাশীতে। গুপ্তকাশী বেশ সহরই! শিব এখানে উত্তরকাশী হতে পালিয়ে এসে গুপ্ত হয়ে ছিলেন। তাই গুপ্তকাশী। গুপ্তদান দিতে হয় গুপ্তকাশীতে—বলছিলেন পান্নালাল।

এখানে সব পাকা ঘরবাড়ী। অনেক আশ্রমও দেখছি আবার সাধু সন্ন্যাসীদের। চটিগুলোও আবার তিনতলা চারতলা। তিনতলার ঘরেই উঠেছি আমরা। সেখানে আর কেউ নেই। তিন দিকে বারান্দা। বাইরের দৃশ্য তাই এখান থেকে বেশ দেখা যায়।

পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনা-সামনি দেখছি উখীমঠ। এপার ওপার উখীমঠ ও গুপ্তকাশী, অবশ্য দুই পাহাড়ের মাথায়। মাঝে মন্দাকিনী। উড়ে গেলে

জলের কল মন্দিরের সামনেই। কিন্তু কলে কেন স্নান করব কুণ্ড যখন রয়েছে বাঁধানো কুণ্ড। সেই কুণ্ডে দুটি জলের ধারা পড়ছে—একটা গোমুখ দিয়ে অন্যটা হস্তীমুখ দিয়ে। শুনি একটায় গঙ্গার জল অন্যটায় যমুনার। কে জানে? কিন্তু জলের স্বাদ দেখি আলাদা।

স্নান করে মন্দিরে যাই। শিবের অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি আছে আর কাশী বিশ্বনাথের লিঙ্গ মূর্তি। নন্দী ও পার্বতীর মূর্তিও আছে' একপাশে পঞ্চ পাণ্ডবের।

বেলা তিনটের সময় আবার গুপ্তকাশী হতে বেরিয়ে পড়ি। তবে ফিরে মালা পর্যন্ত আর আসি না। শুনি সামনে দিয়েই একটা পাকদণ্ডী পথ নেমে গেছে ঊখীমঠের আগে যে মন্দাকিনীর পুল সেই পুল পর্যন্ত। তখন সে পাকদণ্ডী পথ ধরেই নেমে যাই।

কিন্তু এই পাকদণ্ডী পথে না এলেই বোধ হয় ভালো ছিল। কারণ, একে পথ নেই। তারপর নামছি ও নামছিই। নামতে নামতে কতদূর যে নেমে গেলাম কে জানে। গুপ্তকাশী হতে ঊখীমঠ তিন মাইল। তা তিন মাইলের ওপর ত বোধ হয় নামাই হল আমাদের। কিন্তু যখন এ পথে এসেই পড়েছি তখন আর ফিরে যাব কি করে!

শেষ পর্যন্ত এলাম আমরা মন্দাকিনীর তীরে যেখানে উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠ।

এখানেই মন্দাকিনীকে ত্যাগ করব আমরা। এরপর চমোলীতে গিয়ে সঙ্গ ধরব আবার অলকনন্দার।

গুপ্তকাশী হতে মন্দাকিনী পর্যন্ত যেমন সমস্তটাই উৎরাই, এখান হতে ঊখীমঠ তেমনি সম্পূর্ণটাই চড়াই। ঊখীমঠের চড়াইয়ের কথা জানা ছিল। বুক বুক চড়াই, তাই সেই চড়াই ভেঙে যখন ওপরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

ঊখীমঠে ঢুকবার মুখে দেখছি দীর্ঘ দীর্ঘ আউরের সার। পেছনে গুপ্তকাশীর সহর ও কোঠাবাড়ী। দূরে বহুদূরে বিস্তৃত পর্বত শ্রেণী। সূর্যাস্তের শেষ রঙ ধূসর হয়ে আসছে পাহাড়ের মাথায় মাথায়।

ঊখীমঠ ঊষা মঠের অপভ্রংশ। কিন্তু আসলে এই ঊখীমঠের পুরনো নাম হল শোণিতপুর। শোণিতপুর একসময় বাণ রাজার রাজধানী ছিল। এই বাণ রাজার মেয়ে ঊষা স্বপ্নে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত হন। ঊষার প্রিয়সখীরা ঊষার 'মনের' কথা উপলব্ধি করে অনিরুদ্ধকে এখানে আনয়ন করেন ও ঊষাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। বোধ হয় সেই ঊষার নামেই এখন এখানের নাম হয়েছে ঊষা বা ঊখীমঠ।

মন্দিরে ঢুকবার মুখের দরজার ডানদিকের একটা ছোট ঘরে উঠলাম আমরা। তারপর হাত মুখ ধুয়েই গেলাম মন্দিরে। দরজার পাশে বসে তূর্যবাদক বারবার তূর্যনিনাদ করল।

বৃহৎ মন্দির ঊখীমঠের। মন্দিরকে ঘিরে খাপরা খাপরা দোতলা ঘর। ওরই একদিকে রাওল সাহেবের বাড়ী। বাড়ীর সংলগ্নই কেদারনাথের গদি। মন্দির হতে কেদারনাথের গদিতে যাই।

সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ। দেয়ালে দুদিকে বড় বড় দর্পণ। সামনের একদিকে সোনা রূপার কাজ করা ঝলমলে সিংহাসন। পূজারী বলেন ওটাই কেদারনাথের গদি। শীতকালে যখন কেদারনাথে তুষারপাত হয়ে পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন তাঁর চলমূর্তি আসে এইখানে। এইখানে তাঁর পূজো হয়।

সিংহাসনের পাশেই দেখছি রূপোর থালার মাথা কেদারনাথের মুখারবিন্দ। পাঁচ কেদারের পাঁচ প্রতিকৃতি।

পূজারী দেখিয়ে দেখিয়ে বলেন কোনটা কে? —কেদারেশ্বর, তুঙ্গেশ্বর, মধ্যমহেশ্বর, রুদ্রেশ্বর আর রুদ্রেশ্বর! বলেন, এখানে যেমন পাঁচ প্রয়াগ, পাঁচ বদরী, তেমনি পাঁচ কেদার। কিন্তু পাঁচ কেদারে ত যেতে পারে না সকলে। এক কেদারেশ্বরেই যায় সবাই। আর যায় তুঙ্গেশ্বর কেউ কেউ। কিন্তু অন্য তিনটিতে কেউই যায় না। পথ ভালো নয়—বিকট। তাই ঊখীমঠে এলে পঞ্চ কেদারেরই দর্শন হয়। দর্শন করো।

দর্শন করি। দেবি গদির পাশেই রাওল সাহেবের আসন। আগের দিনে রাওল সাহেবের অনেক প্রতাপ ছিল। এখন অবশ্য ততটা আর নেই। শুনি যিনি কেদারেশ্বরের রাওল তিনি এখন এখানেই আছেন। রাত্রে দেখা হতে পারে।

যতক্ষণ আরতির দেরী, ততক্ষণ ঊষা অনিরুদ্ধের

মন্দির দেখি। মন্দিরেরি লাগোয়া। সেখানে আবার পঞ্চ-পাণ্ডবের মূর্তি আর মান্ধাতার। শুনি মান্ধাতা নাকি এখানে ঘোর তপস্যা করেছিলেন।

আরতি যখন হয়েছে আধাআধি, তখন এলেন রাওল সাহেব। আগে আগে এল আগুন দোটা নিয়ে তাঁর পাইক। দেখলাম তাঁর মাথায় জটার মতো চুল কুণ্ডলী করা। বেশ পরিপাটী, চকচক করছে। বোধ হয় সদ্য স্নান করে এলেন।

আরতি শেষ হবার আগেই তিনি কিন্তু চলে গেলেন। কিন্তু আরতি শেষ হতে তাঁর পাইক এলো আমাদের ডাকতে। বোধ হয় পূজারী তাঁকে আমাদের কথা বলে থাকবেন।

কেদারনাথের গদি যে ঘরে সে ঘরে, তিনি বসেছিলেন চাঁদোয়া তলায়। গিয়ে প্রণাম করে তাঁর সামনে বসলাম।

জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে এসেছি, কি করি। তারপর কথা প্রসঙ্গে এখানকার কথা বলেন। বলেন, মহিষরূপী ভগবান শঙ্করের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হল পঞ্চকেদারের উদ্ভব। কেদারনাথে পীঠ, মধ্যমহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গেশ্বরে বাহু, রুদ্রেশ্বরে মুখ ও কল্পেশ্বরে জটা। এ ছাড়া তাঁর যে মাথা সেটি প্রতিষ্ঠিত হল নেপালের পশুপতিনাথে। বলেন এ সমস্তই শিবের ক্ষেত্র। পোপেশ্বর পেরিয়ে গেলে, গিয়ে পড়বে তোমরা নারায়ণ ক্ষেত্রে।

তারপর যখন ঘরে ফিরি তখন কোথাও এতটুকু আলো নেই। সমস্ত নিস্তব্ধ। সব নির্জন।

কলতলায় মুখ ধুয়ে চা খেয়ে উখীমঠ হতে বেরিয়ে পড়ি সকালেই।

সাড়ে তিন মাইল পথ হেঁটে আসি গণেশ চটি। তারপর গোয়ালিয়াড় গড় হয়ে জঙ্গল ও দেড়া চটি পেরিয়ে যখন পোখিবাসায় এলাম তখন বেলা দশটা। গোয়ালিয়াড় গড় হতেই প্রায় চড়াই। পৌনে দুমাইল মতো একটানা চড়াই। পথের দুধারে কাঁকড়া লতা ও ঝোঁপ।

পাশেই জলের ঝরনা দেখে চটির প্রথম দোকানটিতেই উঠেছি।

জঙ্গল থেকেই পথ বনময় ছিল। পোখিবাসায় ত বেশ জঙ্গল। দোকানের যে দিকটা খোলা সে দিকে দেখছি কাঠ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। দেখে বুঝতে পারি রাত্রে এখানে ভালুকের আনা গোনা আছে।

দুপুরে রোদ উঠল কড়া। দোকানী রোদে তামাক পাতা মেলে দিল শুকোবার জন্যে। এখানে নাকি প্রচুর তামাক হয়।

কিন্তু বেলা তিনটের কাছাকাছি সেই রোদ গেল মিলিয়ে। মেঘ জমতে সুরু করল চারদিক থেকে। কিন্তু বৃষ্টি যে অত তাড়াতাড়ি নামবে তা ভাবিনি। তাই সঙ্গে ছাতা কি বর্ষাতি রাখিনি। কিন্তু বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে খানিকটা ওপরে উঠতে না উঠতেই এল প্রবল বেগে বৃষ্টি। বন বলে কোনো পাথরের খাঁচের আশ্রয়ও নেই।

গুরু গুরু করে মেঘ ডাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়। এক পাহাড় হতে আর এক পাহাড়ে। তারপর অন্য আর একটায়।

প্রথমটায় সামনের দিকে ছুটে ছিলাম। কিন্তু চড়াই পথে কত আর ছুটব। পাতার ফাঁক দিয়ে জল পড়ে তাই বাঁচোয়া। শেষে দাঁড়াতেই হল এক গাছের তলায়। দাঁড়ানো ঠিক নয় থাপটি মেরে বসা এক রাশ শুকনো পাতার ওপর। জলের ছাঁট অনেক কম লাগছে এখানে। পাতা চুইয়ে গায়ে যা জল পড়ছে তাই।

বৃষ্টি তখনো থামেনি। কিন্তু বৃষ্টির বেগটা একটু কমতেই আবার হাঁটতে আরম্ভ করি।

মাইল খানেক পথ হেঁটে তবে এলাম দোগলবীঠায়। জোনলবীঠায় ও থামি না। আরো মাইল খানেক পথ হেঁটে আসি বেনিয়াকুণ্ড। শুনতেই মাইল খানেক কিন্তু সমস্তই পথটাই চড়াই আর পিছল। বেনিয়াকুণ্ডে যখন এলাম তখন মনে হল একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় যেন উঠে এলাম।

আমাদের কপাল গুণেই বোধ হয় বৃষ্টি বন্ধ ছিল। কারণ বেনিয়াকুণ্ডের ধর্মশালায় উঠবার পরপরই যেন আবার মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল পথে যদি তেমন বৃষ্টি হত ত গাছের পাতাও বোধ হয় আর বাঁচাতে পারতো না, আর না পারতাম তখন আমরা সন্ধ্যার অন্ধকারে

এতে কি পিছুতে।
থাকত না।

লোক কম বলেই একটা ঘরই পেয়ে গেলাম ধর্ম শালার দোতলায়, আর পড়ি ওরই ওপর কম্বল পেতে। তারপর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। হাড় কাঁপানো শীতের জন্যে দরজা খুলি তার সাধ্য কি? মনে মনে ভাবি, কাল সকালেও যদি এমনি থাকে তবে আর বেরুতে হবে না।

রাত্রে একবার নীচে এসেছিলাম। বাতাসে বৃষ্টিতে সে কি দাপাদাপি। শীতও তীব্র। ঘনান্ধকার! মনে হল একটা প্রলয়ের তাণ্ডব চলেছে।

সে প্রলয় রাত্রে কখন যে থামল জানি না। কিন্তু যখন ভোর হলে উঠে বাইরে এলাম তখন দেখি আকাশে আর মেঘ নেই। গাছগুলোও কেমন শান্ত। স্নিগ্ধ ধোয়া আকাশে ভোরের আলো ফুটেছে। সেই আলো ভারী নির্মল, ভারী লোভনীয়।

বেনিয়াকুণ্ড হতে চোপতা একমাইল। যাঁরা তুঙ্গনাথ যান না, তাঁরা এখান হতেই চলে যান চুলকনা। কিন্তু এখন সে ধরণের যাত্রী এদিকে আসবে কেন? তারা ওখুকাশী হয়েই ত চলে যাবে রুদ্র প্রয়াগ। সেখান হতে কেদারিকাশ্রমের বাকী পথটুকু আসবে তারা বাসে করে। তাই এক কুলীরা ছাড়া সবাই চলেছে তুঙ্গনাথের দিকে। তুঙ্গনাথ চোপতা হতে তিন মাইল যার সবটাই চড়াই। আমরা চোপতা দিয়ে গেলেও নামব সেই চুলকনায়।

তুঙ্গনাথের চড়াইর কথা আগেও শুনেছি—আবার কাল থেকেও শুনছি কিন্তু উঠতে গিয়ে দেখি তেমন কিছু ভয়াবহ নয়। চড়াই চড়াই।

তুঙ্গনাথের তিন মাইল চড়াই-ই বা আবার কোথায়? কারণ শেষের একমাইল ত দেখছি প্রায় সমতল অনেকটা কেদারনাথের মতো। তবে একটানা পথ। আকাশের পটভূমিকায় নীচে থেকে আমাদের দেখলে নিশ্চয়ই মনে হত যেন আমরা মহাপ্রস্থান করে চলেছি।

দূরে দেখা যাচ্ছে তুঙ্গনাথের দিকে নত হয়ে আসা আকাশগঙ্গার চূড়োটি। সেই আকাশগঙ্গার জলই এসেছে এখানে যে জলের কুণ্ড রয়েছে সেই কুণ্ডে। জল বরফের মতো ঠাণ্ডা। সেই কুণ্ডের জলে স্নান করে তবে যেতে হয় মন্দিরে।

কুণ্ডের জলেই স্নান করি। তারপর যাই মন্দিরে। মন্দির আরো একটু উঁচুতে। তাই আরো খানিকটা চড়াই ভেঙে ওপরে উঠি।

চোপতার পর ছুটো বাঁক উঠে আসতে না আসতেই দেখেছিলাম তুষারশৃঙ্গ। কিন্তু এখন যেমন চারদিকে দেখছি তার সীমা সংখ্যা নেই। এর পূব দিকে নন্দাদেবী, পঞ্চচুলী ও ত্রিশূলাচল, উত্তরে গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী; কেদার, বদরী ও রুদ্রনাথ। দক্ষিণে পৌড়ী, চন্দ্রবদনী। হিমালয়ের এমন অপরূপ শোভা অন্যস্থান হতে খুব কমই চোখে পড়ে।

অল্পক্ষণের জন্যই সে দৃশ্য দেখলুম আমরা। দেখলুম আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ ছড়িয়ে গেল—দিগ্ দিগন্তরা মেঘ। যেন মেঘের অথৈ সমুদ্র।

পূজো তখন শেষ হয়েছে। তাই দোকান হতে পুরী কিনে খেয়ে নেমে পড়ি। যত তাড়াতাড়ি পারি নেমে যেতে হবে। বৃষ্টির ত ঠিক নেই। নামলেই হল। পিছল ঢালুপথে বৃষ্টি মাথায় করে নামা সত্যি কষ্টকর।

আমরা নামবার জন্য উঠতে না উঠতেই নীচে হতে উঠে এল এক নীল কুয়াসা। সেই কুয়াসা আমাদের পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত রঙ গেল মুছে। নীচে থেকে সেই অবসরে কেউ যদি আমাদের দেখত তবে দেখত যে আমরা মেঘের মধ্যে দিয়েই হেঁটে চলেছিলাম। সত্যিই তখন আমরা ছিলাম মেঘলোকে।

ছুটতে ছুটতে তাই নেমে যাচ্ছি। নামতে নামতেই দাঁড়িয়ে নীচের দিকে একটু চেয়ে দেখে নিচ্ছি। ওপরে মেঘ থাকলেও নীচে ফুটফুটে রোদ উঠেছে। বনের সবুজের গায়ে কিকে ফুল ফুটে আছে। কী ফুল কে জানে। কিন্তু কোমল রঙ। ভারী ভালো লাগছে নয়নমন লোভা শ্যাম-শস্য ধরণীকে। [ক্রমশঃ

নতুন বই

১৮৫৭ ও বাংলাদেশ—লেখক—সুকুমার মিত্র। প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ; দাম—দু টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

'আমরা মনে করি, সমসাময়িক লোকে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ঘটনাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, ইতিহাস তার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে তা দেখবে।'

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, দি হিন্দু পাট্রিয়ট ৬, ৪, ১৮৫৮

১৮৫৭ ভারতের ইতিহাসে লাল কালিতে লেখা, স্বতঃসিদ্ধ। সিপাহী-বিদ্রোহ বা সেপাই মিউটিনীকে নিছক সিপাহীদলের একটা সামরিক বার্থ সামরিক অভ্যুত্থান বলে ইংরেজ আমাদের শিখিয়েছিল। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুযোগ এলো তখন আমরা আর ইংরেজের শেখানো বিদ্যের সন্তুষ্ট না থেকে বরং নিজেরাই উদ্যোগ নিলাম অতীত অনুসন্ধানের। এতোদিন যা ছিল সিপাহীদের কাণ্ডকারখানা বলে বিদিত, একটা বিদ্রোহ-বিদ্রোহ খেলা বলে, তা নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো। '১৮৫৭'র আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

কিন্তু আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। ১৮৫৭-র ঘটনাকে সিপাহীদের অসন্তোষের পরিণাম বলে শিশুমনে প্রবেশ করানোর বৃটিশ চেষ্টা হলেও এবং তেমনতর ধারণা বড়দের মহলে থাকলেও ১৯০৯ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কিত যে বই বোম্বের তার নাম ছিল, "দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব্ ইন্ডিপেনডেন্স ১৮৫৭"। সাভারকরের বক্তব্যে বিনয় সরকারের সমর্থন ছিল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও মোটামুটি একমত। এখন তো অধিকাংশই। কিন্তু যখন ভারতে এই অভ্যুত্থান ঘটছিল তখনই লণ্ডন থেকে আমেরিকার নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে কার্ল মার্কস যে প্রবন্ধগুলি লিখছিলেন লণ্ডন টাইমসের ডেসপ্যাচ পড়ে পড়ে, তাতে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাকে লক্ষ্য করে দেখেন নি, তিনি সমগ্র ঘটনাকে 'ভারতের বিদ্রোহ' বলে বর্ণনা করেছেন (from first to a national revolt, a revolution (the Indian people against British rule) কিন্তু ডঃ রমেশ মজুমদার তা মনে করেন না, তাঁর বইয়ের নামেই প্রকাশ—দি সেপাই মিউটিনি এণ্ড দি রিভোল্ট অব্ এইটিন ফিফটি সেভেন। কোন কোন স্থানে এই বিদ্রোহ সর্বাত্মক বিপ্লবের রূপ নিলেও সর্বত্র তাকে একটা অভ্যুত্থান বলা চলে না (পৃঃ ২২১) বলে তিনি মনে করেছেন। ডঃ সুরেন সেন লিখিত ও ভারত সরকার প্রকাশিত '১৮৫৭' দুর্দিক রক্ষার চেষ্টার নিদর্শন, গ্রন্থের কাব্যিক নামের ভিতর দিয়েও তা স্বচ্ছ। এই বিদ্রোহ-টাকে যদি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে স্বীকার না করা হয় তাহলে বাংলা দেশ বা তদানীন্তন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা জনসাধারণের সেই অভ্যুত্থানে দায়িত্ব ও কর্তব্য কতোটুকু ছিল বা থাকতে পারে, কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে কি হয়নি, তার আলোচনা সম্পূর্ণাংগ হতে পারে না। যদি সেই ব্যাপারে তাঁরা মনস্থির দিয়ে না থাকে, কেন দেয়নি, পর পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র-চরিত্র কী ছিল, সেইসবের আলোচনা আসবে পরে।

১৮৫৭র অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে আরও পাঁচটা দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো। কিন্তু যদি আমাদের মন আগে থেকে রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা কিংবা কিউবা বা অপর কোন কোন দেশের সার্থক বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় অভিসিঞ্চিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের যথোচিত বিচারে আমরা অসমর্থ হবো। ১৮৫৭র ভারতবর্ষ আর ১৯৫৭র ভারতবর্ষ এক নয়; তবু প্রবন্ধে উপ-শিরোনাম হিসাবে উদ্ধৃত বিখ্যাত হরিশ মুখুজ্জের কথায় জানতে পারি তাঁরা কেউ কেউ বাংলা দেশে সিপাহী বিদ্রোহকে নিছক

এ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান বলে ভাবেন কি না সন্দেহ, এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব সামন্ততন্ত্রের পরিপোষকদের ছিল, কিংবা, মার্কস-এর ভাষায়, a motley crew of mutineering soldiers who have murdered their own officers, torn asunder the ties of discipline, and not succeeded in discovering a man upon whom to bestow the supreme command, are certainly the body least likely to organise a serious and protracted resistance (বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন ভবন, মস্কো) কিন্তু একথাও তো সত্য, হিন্দুরা যে বিদ্রোহ শুরু করেছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল তা শেষ হলো দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান সুলতানকে স্থাপনায়। তাছাড়া, অভ্যুত্থানের আয়তন যে দুদেও এতো ব্যাপক হয় যে ব্রিটিশপুরুষরা সৈন্য চলাচলের ও রসদ সরবরাহের জন্য অসীম অসুবিধায় পড়ে; মার্কস কৃষক শ্রেণীর সার্বিক বিরোধিতা এর কারণ বলে মনে করেন। আসলে ১৮৫৭র অভ্যুত্থান কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং the consummation of a political and social development which had been in process for a century (ডঃ এস্, বি, চৌধুরী —সিভিল ডিস্টার্বেন্সেস ডিউরিং দি ব্রিটিশ রুল ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২১১); মার্কসও দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় জনসাধারণ সামাজিক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও, এক জাতীয়তায় আবদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও, ব্যাপকভাবে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ উভয়ত এই বিদ্রোহে মদৎ দিয়েছেন। তাই অভ্যুত্থানের সামরিক চরিত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষক-সমাজের অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে এই অভ্যুত্থান অতোদিন স্থায়ী ও অতো ব্যাপক হতো না। এই 'বিদ্রোহে'র ফলে ব্রিটিশ শক্তি এমন ঘা খেয়েছিল যে কয়েক দশকের জন্য আফগানিস্তান, পারস্য ও এশিয়ার অন্যত্র তার লোলুপ থাবা বাড়াতে পারেনি।

মনে রাখতে হবে, লর্ড ক্যানিংয়ের শাসন আমল ১৮৫৬-৫৮; এবং 'বিদ্রোহ' ১৮৫৭-৫৮য়।

এই জাতীয় অভ্যুত্থানে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নীরব নিষ্ক্রিয়তা অনেককে ব্যথিত করেছে। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীসুকুমার মিত্র অনেক তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন, কিন্তু তিনি বলেছেন ভূমিকায়, "বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী মহাবিদ্রোহে সক্রিয় সমর্থন জানাতে পারেনি।" তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ ও একদিকে দিকনির্দেশকারী পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমিত্রের গ্রন্থে কোন গাণিতিক তত্ত্বের উপস্থাপনায় শেষ হয়নি। একথা ঊহ্য, বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই অভ্যুত্থানে সহযোগিতা করেনি, আনুকূল্য করেনি, বিরোধিতা করেছে। সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের সাহিত্যে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে যেসব উল্লেখ আছে তা বহু আয়াসে তিনি উদ্ধার করেও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসেন নি। অথচ যে হরিশ মুখুজ্জের মন্তব্য তিনি উদ্ধার করেছেন (যা এ প্রবন্ধের উপ-শীর্ষনাম) সেই হরিশ মুখুজ্জে তাঁর 'হিন্দুপ্যাট্রিয়ট' পত্রে দিনের পর দিন সরকারকে বিদ্রোহাত্মিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে নিবৃত্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন, কারণ, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সংযোগ যদি নাও থেকে থাকে বিদ্রোহে, বাংলা দেশের কৃষক সমাজ ও সাধারণ মানুষের ওপর সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের ক্রোধ জাগ্রত হয়েছিল বিদ্রোহে সমর্থন জানানোর জন্যে। তখনকার ইংরেজি কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখা যাবে বাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষের তরঙ্গ ইংরেজ-মহলে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বেসরকারী ইংরেজরা এবং লণ্ডনের তদানীন্তন কর্তারা কতোখানি ক্ষেপে গিয়েছিল তা বোঝা যাবে—তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে ফরমান জারী করেছিল ভারত সরকারের কাছে তার মধ্যে।—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলার ইতিহাসে' উল্লিখিত হয়েছে—"মহম্মদের ও বিষ্ণুর লোক-দিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা যেমন পশু আমরা তাহাদিগকে পশুর ন্যায় বধ করিব।"..."ভারত-বর্ষীয়রা যতগুলি ইউরোপীয় মারিয়াছে সেই ইউরোপীয় দিগের মাথায় এবং গাত্রে যতগুলি লোম আছে ততগুলিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে হইবে।" কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ক্যানিং মাথা গরম করেন নি। সেইজন্যই ক্রুদ্ধ ইংরেজরা তাঁকে Clemency Canning বলেছে। একথা সত্য যে অনেক বুদ্ধিজীবী অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে অভ্যুত্থানকে সাধারণ ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; যদি অভ্যুত্থান সফল হতো তাহলে হয়ত-বা এই মনোভাব নাও দেখা দিত, কারণ, দেখা যাচ্ছে, ইংরেজরা অতিরিক্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বাঙালীদের ওপর একহাত নেওয়ার

চেষ্টা করছিল। শুধু তাই নয়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, অভ্যুত্থানের কয়েক বছর পরে, সিবিল সার্ভিসে বা উচ্চপদে বাঙালী নিয়োগের বিরোধিতা করা হয়। সেই সময়ে ইংরেজরা ও তাদের মুখপত্রসমূহ এতোদূর বিদ্বেষ ছড়াতে আরম্ভ করে যে, ক্যানিং বাধ্য হয়ে এক বছরের জন্য মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। এতে অবশ্য একটিলে দুই পাখি মারা পড়ে। শ্রীমিত্র উল্লেখ করেছেন, কিশোরীচাঁদ মিত্রের The Mutiny, the Government and the people—By a Hindoo নামে গ্রন্থকে ক্যানিং প্রশংসা করলেও কিশোরীচাঁদ কর্মচ্যুত হন। কিশোরী-চাঁদকে সমর্থন করেন মধুসূদন ও হরিশ মুখুজ্জে। দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের ধারে কাছেই ছিলেন; সুতরাং যখন তিনি বর্ণনা করেন (১৮৬১) লঙ্কার অবস্থা—

নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;—

তখন সমসাময়িক বাংলা তথা ভারতের কথাই তাঁর মনে ছিল বলে অনুমান করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন—যে হরিশ মুখুজ্জে নীলবিদ্রোহের (১৮৬০) বেলায় অতো দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন তিনি, সিপাহী বিদ্রোহের বেলায় তাঁর লেখনী সংযত করলেন কেন? কিংবা কেন বাঙালী-বুদ্ধিজীবী এই অভ্যুত্থানকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেনি? কেন সমসাময়িক বা তৎপরবর্তী সাহিত্যে তার রূপ ফুটে ওঠেনি? শ্রীমিত্র এই সব প্রশ্নের উত্তরে যদি সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন তাহলে তাঁর গ্রন্থ একাধারে তথ্য ও তত্ত্বের আকর হয়ে উঠতো। সেইখানেই তিনি মার্কস্‌বাদী চিন্তার সার্থক শাণিত প্রয়োগের নিদর্শন রাখতে পারতেন। এটা নিছক কাণ্ডজ্ঞানের কথা যে, সদ্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ও তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজের দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করছিল; তারা সহজে ইংরেজের বিরাগভাজন হতে চাইবে কেন। আজও তো আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি পদ ও অর্থের জন্য বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর পরিপোষণা করে থাকেন। তবু তো কিছু লোক তখন কলম ধরেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে রজনীকান্ত গুপ্ত অবধি যতগুলো বই লেখা হয়েছে, জিজ্ঞেস করি ৪২'র আন্দোলন নিয়ে কি বাংলাদেশে অতো বই লেখা হয়েছে আজ পর্যন্ত। ১৮৬২ সালেও শিক্ষিত বাঙালীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে হুতোম-প্যাঁচার-নক্সা'র লেখকের দুঃসাহসের অভাব হয়নি। ঐ অভ্যুত্থানে সাহায্যে করা উচিত ছিল বলেই হুতোম বিদ্রূপ করতে পেরেছেন। কিন্তু তখন বাঙালী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে—ঐ সময়ে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে; ১৮৬৩ সালে ষোলজন ভারতীয়ের মধ্যে একা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিবিল সার্বিসের পরীক্ষায় পাশ করলেন।

তাছাড়া, যে কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল, ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের আগে থেকেই বাঙালাদেশের নিজস্ব সমস্যা ছিল—একদিকে সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলন, অন্যদিকে নীলচাষীদের সমস্যার তীব্রতা। এবং সেই সময়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ নিয়ম-তান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। লক্ষ্য করা দরকার, গত শতকের প্রথম থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের নেতৃত্বে এতো সমিতি-সংগঠন স্থাপিত হতে থাকে যে তার তুলনা সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সমাজ-ইতিহাসে মেলে না। ১৮৪৩ এ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়; ১৮৫১তে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানিন্তন ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য এদের জন্ম। এখানে আরও উল্লেখ্য, এই নিয়মতান্ত্রিক ঝোঁক ছাড়াও, নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ব্যাপারে বাঙালাদেশের ইংরেজ শাসন-কর্তাদের কেউ কেউ বাংলার জনসাধারণের পক্ষে কিছু কিছু কথা বলেছেন, কিছু কিছু কাজ করেছেন। বাকল্যাণ্ড সাহেবের বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফ্‌ট্যাণ্ট গভর্নরস্‌-এর সাক্ষ্য ছাড়াও আমরা জানি, অভ্যুত্থান-পরবর্তী দু'একবৎসরের মধ্যে নীলকর সাহেবদের চাপে গভর্নর স্যার পিটার গ্রাণ্ট (যাঁকে নীলকররা "হাই প্রিষ্ট অব্ দি সিবিল জগন্নাথ বলে বর্ণনা করেছে), সেক্রেটারী সিটন-কার, এ্যাশলি ইডেন প্রমুখরা ব্যক্তিরা নাজেহাল হয়েছিলেন, দু'একজনকে পদত্যাগও করতে হয়। এমতাবস্থায় শিক্ষিত বাঙালীর যে 'সদাশয়' ইংরেজদের প্রতি, বিশেষত ভারত সরকার তিরস্কৃত বাঙলা সরকারের প্রতি একটা নমনীয় মনোভাব থাকবে তা সহজেই বর্তব্য।

এমন কি নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশক লং সাহেবকে নাকি সিটন-কার সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য এ মোহ বেশি দিন থাকেনি। তাছাড়া, বাঙালীর সমর্থনের অভাবের আরও একটা কারণ থাকতে পারে, অভ্যুত্থানের উদ্যোক্তারা ফরাসী-বিপ্লবের যে আতিশয্য ঘটেছিল তারাই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কোলরিজ যদি ফিরে যেতে পারেন তবে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দোষ দেওয়া যায় না। এ-ও হতে পারে অভ্যুত্থানে শক্তি যোগানোর সম্ভাব্য প্রবেশ পথ হয়ত তারা পায়নি সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য। অবশ্য মার্কস্ সিপাহীদের পক্ষে এই নৃশংসতার অভিযোগের যোগ্য উত্তর দিয়েছেন (দ্রঃ ৪.৯.১৮৫৭ তারিখে লিখিত পত্র মার্কস-এঙ্গেলস লিখিত দি ফার্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স ১৮৫৭-১৮৫৯, মস্কো থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সংস্করণ)।

পরিশেষে বক্তব্য, শ্রীমিত্রের পুস্তকখানি আয়াসসাধ্য অধ্যবসায়ের ফল সন্দেহ নাই, তার বহুল প্রচারও কাম্য একান্তই, কিন্তু সমস্ত তথ্য থেকে আরও বিশ্লেষণজাত সিদ্ধান্তে তথা তত্ত্বে পৌঁছিলে অধিক উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হতো। একটা কথা—অন্যান্য যে সমস্ত স্থানে 'বিদ্রোহ' বেশ প্রকট রূপ নিয়েছিল সে সব স্থানের তাৎকালিক বুদ্ধিজীবী মহলে এবং 'বিদ্রোহ'-পরবর্তী সাহিত্যে কি ছাপ পড়েছিল সে তথ্য অনুসরণ করলে এবং তখন তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজের বিচ্যুতি সহজে ধরা পড়বে কিন্তু তা কি একক প্রচেষ্টায় সম্ভব?

—কমলাপতি দে

দণ্ডকারণ্য : লেখক—রবীন মুখোপাধ্যায়; প্রকাশক—অমিত কুমার বসু, বসু প্রকাশনী, ১১৯ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। দাম চার টাকা॥

বাঙলা উপন্যাস বর্তমানে বিষয়ের নূতনত্বে বিচিত্র, এবং অন্তপক্ষে, অভিজ্ঞতার অভাব মনোবিকারের বর্ণনায় বিবর্ণ। আলোচ্য উপন্যাস বিষয়বৈচিত্র্যে বাংলাসাহিত্যে নবতর সংযোজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন রাজধানীসহ যেসব নতুন রাজ্য চিহ্নিত সেগুলো সব একাধিক মূল রাজ্য বা দেশ ভেঙেই গঠিত। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী থেকে এর শুরু। তারপর দুই কোরিয়া দুই ভিয়েৎনাম, এমনকি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ফরমোসা এখনও জাতিসংঘে আসীন মূল চীনের বদলে। সামান্য স্বতন্ত্র হলেও এই একই চক্রান্তে এবং নেতৃত্বের দুর্বলতায় (বিশ্বাসঘাতকতায়?) ভারতবর্ষ দেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত—ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান। ফলে এধারের মানুষ ওধারে গেছে, ওধারের তারা এধারে। পাঞ্জাব দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ায় পশ্চিম থেকে যারা পূর্বে এসেছে তাদের পুনর্বাসন যতো তাড়াতাড়ি হয়েছে, ততো তাড়াতাড়ি পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূলদের ক্ষেত্রে নয়; সেই কারণে কিনা জানিনে, পঃ পাঞ্জাবের ঐ পুনঃস্থাপিত মানুষগুলোর কথা উর্দু কিংবা বৃহত্তর পাঞ্জাবের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে বলে শুনিনি। কিন্তু বাঙলাদেশের সাহিত্যে ছিন্নমূলরা এক করুণ অথচ বিরাট সাহিত্যিক প্রেরণা জুগিয়েছে। পূর্ব বঙ্গের সেই মানুষগুলো যারা রাতারাতি বিধ্বস্ত হলো, যারা ভিটে-মাটি ছাড়া হলো, যাদের মেরুদণ্ড নুয়ে গেল অনিয়মিত সরকারী ডোল-এর দাক্ষিণ্যে ছিটেফোঁটা প্রাপ্তির লজ্জাকর প্রয়াসে, সেই মানুষগুলো বাঙলার সাহিত্যিক মানসে ঘা দিয়ে বেঁচেছে। নেতৃত্বের হাতে দাবাবড়ের মতো এই মানুষগুলো এক অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে কেমন করে বেঁচে আছে তা দরদী মানুষের মনে বিস্ময় প্রশ্ন, কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব অনস্বীকার্য।

দণ্ডকারণ্যে সেই পুনর্বাসন চলছে। ছন্নছাড়া মানুষের পুনর্বিন্যাস রামায়ণের কাল থেকে বিহিত যে দণ্ডকারণ্য, সেখানে। কিন্তু যে মানবিকতাবোধ, আন্তরিকতা থাকা উচিত ছিল ঐ ব্যাপারে, যাদের পরোক্ষধানে এই স্বাধীনতা, তাদের আপন ভাগ্য প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস তাগিদ কিন্তু দুর্লভ হলো। ফলে দণ্ডকারণ্য, আমাদের লেখক ঠিক বলেছেন, হলো 'যন্ত্রণার অরণ্য' (পৃঃ ৯৪); "যে পরিকল্পনার মাধ্যমে মনের মিল হওয়াতে ব্যর্থ হচ্ছে, পরা বুদ্ধির অভিমানে একক শক্তির পরিচয় দিতে পরিকল্পনার গতি স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য" (পৃঃ ১২৫), কিন্তু তারফলে পুনর্বাসন প্রার্থীদের জীবন

দুর্বিসহ, এবং সেজন্য যদি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষিতীশ-গিন্নী বলে ওঠেন—"বেড়াল ছানার মত এধার-ওধার নাড়ানাড়ি না করে দিকনা একেবারে গঙ্গায় চুবিয়ে" (পৃঃ ১৪)—তখন খুব অস্বাভাবিক লাগেনা। যখন সতীশ চেঁচিয়ে ওঠে, "এসব চালবাজি, পলিটিক্সের পাকা খেলা। নরকে এনে কেলে তামাসা করা হচ্ছে।" তখন অস্বাভাবিক লাগে না, কিংবা যখন দেখি, আশ্চর্য মানুষ ক্ষিতীশ স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে চাকরী ছেড়ে দেয়, যখন দেখি মিস্রজী কুমারস্বামী অবাঙালী ঠিকেদার হওয়া সত্ত্বেও উৎপাটিত মানুষগুলোর জন্যে স্বার্থত্যাগে উন্মুখ তখনও নয়। যে মানুষগুলো একদিকে অপরিচিত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করছে, অন্যদিকে লাল-কিেতমির বিরুদ্ধে, তাদের নিজেদের মধ্যেও ছোট-ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুখ-দুঃখ, দ্বেষ-দাক্ষিণ্য আবর্তিত। লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে তা বর্ণনা করেছেন আর পশ্চাতে রেখেছেন মহাকাব্যায়ত দণ্ডকারণ্যকে, আর আদিবাসীদের। আদিবাসী মোনি প্যাটেল, সুখদেব আর শম্পা, উপন্যাসের নায়িকা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখক সুনিপুনভাবে আদিবাসী সমাজজীবন তুলে ধরতে পেরেছেন। মুখ্যচরিত্র কুমারেশ শিক্ষিত ট্রাক ড্রাইভার—তার সৎপ্রাণ, রোমান্টিক ভাবাবেগে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারেনি বটে, কিন্তু বুদ্ধাবিধবা যোগমনি এবং সেই সঙ্গে শম্পা বাঙলা সাহিত্যে নতুন একথা বলতে দ্বিধা নেই।

লেখকের পরিমিতি জ্ঞান খুশী করে। সাবলীল ভাষার সূক্ষ্ম কারুকাযের চেয়ে মোটা তুলিকায় বড় বড় রঙের চরিত্রাঙ্কণ ও আবহ-রূপায়ণ সুখপাঠ্য করে তুলেছে "দণ্ডকারণ্য"কে ; মনোবিকলনের নামে মনস্তত্ত্বের কেতাব করে তোলেনি উপন্যাসকে। পাঠক সাধারণ সেই কারণে তৃপ্তি পাবেন।

কিন্তু, প্রশ্ন—চরিত্রগুলো যখন পূর্ববঙ্গের তখন সংলাপগুলি—অন্তত জনমজুর চাষা চরিত্রগুলোর—পূর্ব-বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় হলে স্বাভাবিক হতো না? দ্বিতীয়ত, ত্রিভুজ প্রেমে এখনও কি ঘন্টা ভবিতব্য-নির্ধারিক ?

কিছু-কিছু মুদ্রণ প্রমাদ বাদ্দেও প্রতি পরিচ্ছেদশীর্ষে অমিত চৌধুরীর আঁকা চিত্রগুলি ও প্রচ্ছদপট নয়নাভিরাম একথা উল্লেখ করা দরকার।

: ভ্রম সংশোধন :

'স্লেভারী ইন ইণ্ডিয়া' বইখানির নাম মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ ভাদ্র সংখ্যায় 'স্লোভেরী ইন ইণ্ডিয়া' হইয়া গিয়াছিল। বইখানি ভারতবর্ষের দাসপ্রথার উপর রচিত এবং বইটির নাম স্লেভারী ইন ইণ্ডিয়া।

—সাত—

চা এর গোড়ার কথা

বীরেশ্বর বসু

জমি চা চাষের উপযোগী কিনা এ-বিষয় জানবার জন্য জমির মাটি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ জন্য অনেক পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে। এই পরীক্ষা শুধু যে নতুন চাষের জমির জন্য প্রয়োজন তা নয়। মাঝে মধ্যে পুরনো চাষের মাটিও পরীক্ষা করবার দরকার হয়ে ওঠে। পুরনো চাষের যে সমস্ত সেক্সনের গাছ দুর্বল, বাড়ছে না অথবা উপযুক্ত পরিমাণ পাতি আসছে তখন সেই সকল সেক্সনের মাটি পরীক্ষা করা উচিত। কারণ এই মাটি পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় গাছ কেন বাড়ছে না। এবং তৎক্ষণাৎ তার উপযুক্ত চিকিৎসা করলে জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে, ফলে গাছগুলো সবল হয়। এই মাটি পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত পদার্থগুলির কার কত ভাগ বা পারসেন্ট আছে জানতে পারা যায়। পদার্থগুলি এই :—Course Sand, Fine Sand, Silt, Fine Silt, Clay, Loss on ignition, organic matter, nitrogen, Total Phosphoric Acid, Potash, Lime, Acidity. এই পরীক্ষার জন্য মাটি পাঠাতে হলে কতকগুলি বিষয় বিশেষ ভাবে জানা থাকা প্রয়োজন। এক জায়গা থেকে খানিকটা মাটি পাঠালে তাতে সম্পূর্ণ বাগান বা সেক্সনের মাটির পদার্থগুলি ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে না। কারণ আমরা নির্ধারিত একটা জায়গার মাটি পাঠালে তাতে হয়ত গরু মেষ চরার ফলে অথবা কোন উঁচু জায়গা থেকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে আসা অনেক রকম ধাতব বা ক্ষার জাতীয় জিনিষ এসে সেখানকার জমিটা সারালো করতে পারে অথবা হয়ত ঐ জমির অনেক পদার্থই ধুয়ে অন্য জমিতে গিয়ে জমা হতে পারে ফলে ঐ জমিতে ঐ সমস্ত পদার্থগুলির অভাব দৃষ্ট হয়। তাই পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য মাটি সংগ্রহ করতে হলে বাগানে বা সেক্সনের একটা জায়গার মাটি না নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে অনেকেই নিম্নলিখিত পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন :—

(ক) যে সেক্সনের মাটি পরীক্ষা করাতে হবে সেই সেক্সনের সমস্ত জমিটা বেশ করে পরীক্ষা করে একশো বা সোয়াশো ফুট কোয়ার জমি ঠিক করে নিতে হয়।

(খ) এই জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে দাগ থেকে বিশটি নমুনা নেওয়া উচিত।

(গ) জমির সমস্ত পদার্থগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে কম পক্ষে চার পাঁচ পাউণ্ড মাটির দরকার তবে যদি শুধু মাটির অম্ল ভাগ, চুনকার ভাগ এবং প্রজ্বলনের অভাবের ভাগ জানবার প্রয়োজন হয় তা হলে এক দেড় পাউণ্ড মাটি পাঠালেই যথেষ্ট।

(ঘ) এই নমুনা সংগ্রহ করতে সূত্রধরের ভুরপুন ব্যবহার করাই উচিত।

(ঙ) আর এই নমুনা না দিতে হলে দু'রকমের নমুনা নেওয়া ঠিক। প্রথমটা নয় দশ ইঞ্চি পরিমাণ গভীরের আর দ্বিতীয়টি এক ফুট থেকে দু'ফুট গভীরের। এবং দু'টি নমুনাকেই পৃথক পৃথক ভাবে পাঠান উচিত। এই নমুনা পাঠানোর সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুস্পষ্ট ভাষায় পরীক্ষাগারে জানাতে হয়।

(১) যে মাটি পাঠানো হচ্ছে তা অনাবাদি; জঙ্গল, পুরনো চা নার্সারী অথবা চা বাগানের মধ্যকার চা গাছের ভেতরকার মাটি কি না?

(২) অনাবাদি বা জঙ্গলের জমির মাটি হলে শুধু অনাবাদি বা জঙ্গলের মাটি এ-কথাই উল্লেখ করতে হবে তবে মাটি যদি চা চাষের ভেতরকার মাটি হয় তা হলে

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঠিক ঠিক ভাবে জানাতে হয়।

(১) ঐ মাটিতে যে চায়ের আবাদ আছে সেখানকার চা গাছগুলির বয়স কত অর্থাৎ কত বছর আগের রোপাই?

(২) চা গাছগুলি কোন জাতের?

(৩) কতটা ব্যবধান বা গ্যাপ দিয়ে রোপাই।

(৪) কিভাবে কোন বছর কি প্রকার কলম করা হয়েছে তার পাঁচ ছয় বছরের মোটামুটি একটা হিসাব।

(৫) ঐ পাঁচ ছয় বছরে গাছে কি রকম কলন হয়েছে।

(৬) উক্ত সময়ে কোন বছর কোন কোন সার দেওয়া হয়েছে এবং এই সারের পরিমাণ কত।

(৭) ড্রেনের অবস্থা কি? কতটা চওড়া ও গভীর।

(৮) চা গাছগুলির মধ্যে অন্য কি গাছ আছে। যে গাছ আছে তার নাম এবং ঐ গাছগুলির কতটা ব্যবধান।

(৯) গাছে আগে কোন পোকামাকড় লেগেছিল কিনা? এবং বর্তমানের অবস্থাই বা কি? যদি পোকা মাকড়ের আক্রমণ হয়ে থাকে তা হলে তা কোন জাতীয় পোকামাকড়, কি পরিমাণ আক্রমণ এবং এর জন্য প্রতিষেধকই বা কি এবং কত পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে।

(১০) গাছের গোড়াগুলির অবস্থা কি।

নার্সারী সম্বন্ধে আরো একটু বলবার আছে। গাছ রোপাই দুই রকম হতে পারে। ট্রাঙগুলার ও স্কোয়ার এবং গাছ রোপাইয়ের ব্যবধান নানাপ্রকার হতে পারে। সাড়ে তিন ফুট X সাড়ে তিন ফুট থেকে শুরু করে ছয় ফুট X ছয় ফুট। ছয় X ছয় ট্রাঙগুলার রোপাইএ সাধারণত প্রতি একর জমিতে ১৪০০ গাছ এবং স্কোয়ার রোপাইএ ১২০০ গাছ রোপাই করা যেতে পারে। ঐরূপে সাড়ে পাঁচ X সাড়ে পাঁচ ফুটে ১৬৭০ এবং ১৪৪০ গাছ, পাঁচ X পাঁচ ফুটে ২০২৫ ও ১৭৪০, সাড়ে চার X সাড়ে চার ফুটে ২৪০০ ও ২১৪০, চার ফুট X চার ফুটে ৩১৪০ ও ২৭২৫ এবং সাড়ে তিন ফুট X সাড়ে তিন ফুটে ৪১২৫ ও ৩৫৭৫ গাছ। তবে বেশির ভাগ রোপাই হয় সাড়ে চার X সাড়ে চার থেকে যা গাছের মধ্যে ছায়ার জন্য যে শিরীষ গাছের রোপাই করা হয় তারও একটা নিয়ম আছে। এই রোপাইও চল্লিশ X চল্লিশ থেকে শুরু করে ষাট X ষাট ফুট অন্তর করা যেতে পারে এতে প্রতি একরে ট্রাঙগুলার রোপাইএ গড় পড়তা ২৫ থেকে চল্লিশ গাছ এবং স্কোয়ার রোপাইএ ১৫ থেকে ২৫ গাছ।

এখানে বলে রাখা ভাল যে আসাম ও বাঙলার জমির মাপ ভিন্ন প্রকার এবং ভাষাগত পার্থক্যও আছে। আসামের মাপ ১৪৪ স্কোয়ার ফুটে এক লোছা। বিশ লোছাতে এক কোথা পাঁচ কোথাতে এক হালিসা বা বিঘা চার বিঘায় এক পুরা। এক্ষেত্রে বাংলা দেশের মাপ ১৬ ছটাকে এক কাঠা বিশ কাঠায় এক বিঘা। তবে উভয়ের ক্ষেত্রেই ১৬০০ স্কোয়ার গজে এক বিঘা অর্থাৎ এক একরের এক তৃতীয়াংশ।

চা-বীজ সম্বন্ধেও আরো একটু বলবার রয়ে গেছে। আসাম ও মণিপুর বীজে সাধারণত ১৪০০০ থেকে ১৫০০০ এবং ব.র্মা ও চীনা জাত বীজ প্রতি মণে ১৮০০০ থেকে ২২০০০ পর্যন্ত গাচ হয়ে থাকে। এক মণ বীজে সাধারণত ৭৫০০ থেকে এগার বার হাজার ভাল গাছ হয়। তার মানে এক মণ বীজ দিয়ে প্রায় তিন থেকে পাঁচ একর জমি রোপাই করা চলতে পারে। তবে নার্সারীতে বীজ রোপাই কিন্তু প্রতি একরে সাড়ে তিন বা চার মণ বীজ রোপাই করা যেতে পারে।

আমার বিশ্বাস চা লাগান সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানতে হলে বাগানে ব্যবহৃত কতকগুলি অতি সাধারণ অথচ বুঝতে দুরূহ ভাষা বা কথা জানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত কথাগুলি জানা না থাকলে সব জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থেকে যাবে। তাই এখানে সেই সমস্ত কথাগুলি যতটা সম্ভব অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

(১) বাগান কামান বা বাগিচার অর্থ একটা সম্পূর্ণ টি ষ্টেট অথবা চা বাগান।

(২) বাড়ি অর্থে বুঝতে হবে টুকরো আবাদী জমি যেমন পালং বাড়ি (নার্সারী) ঝাঁশ বাড়ি, খড় বাড়ি, শাল বাড়ি ইত্যাদি।

(৩) টিলা অর্থ ছোট নিচু উপত্যকা।

(৪) জাত অর্থ কোন জাতের কোথাকার চা বীজ।

যেমন আসাম জাত, বর্মা জাত, চীনা জাত ইত্যাদি।

(৫) বেলা অর্থ একটা দিনের টুকরো। সকাল ছ'টা থেকে বেলা বারোটা একটা বেলা একটা থেকে পাঁচ পর্যন্ত আর একটা বেলা।

পাই কথাটা আসামে ব্যবহার হয়। এর অর্থ লাইন বা চা গাছের সারি। বাংলাতে একে 'ড' বলা হয়।

(৭) মালা অর্থ ট্রেন।

(৮) মাল অর্থে বুঝতে হবে একমাল অর্থাৎ ১৪৪ পোঁটার ঝুড়ি। উত্তর বাংলায় একে বলে "লগি"।

(৯) কামজারি কথাটা আসামে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ দিন-শ্রমিকের কাজ।

(১০) মাল অর্থে বুঝায় মলাই বা রং করা পাতি অর্থাৎ রোলড্ অথবা ফারমেন্টেড্ চা পাতি। এই মালের মধ্যে আবার দু'রকম আছে। যেমন গুরি বা গুলি মাল আর পোটা বা মোটা মাল। গুরি বা গুলি মাল অর্থে বুঝতে হবে মলাই বা রোলড্ করা সরু মাল আর পোটা বা মোটা মাল অর্থে মলাই বা রোলড্ করা মোটা মাল।

(১১) গুলি অর্থ একটা চারা গাছ।

(১২) রোগামুলা অর্থ এক প্রকার মিজলটো পরগাছা জাতীয় গাছ যা সাধারণত বীজ বাগানে গাছে দেখা যায়।

(১৩) হুড় অর্থাৎ মালাই বা ফারমেন্টেড্ পাতি।

(১৪) গ্যাপ কথাটা আসামে প্রচলিত। এর অর্থ চা প্যাক করার আগে যে শুকনাই করা হয়। অন্য কথায় একে 'পাকা ভাটি' বলে।

(১৫) ঝোলগুরি অর্থ সরু (ফাইন) চা যা ড্রায়ারের চালনির ছিদ্র দিয়ে পড়ে। ঝোল অর্থে পড়া।

(১৬) জনম মানে নতুন জন্ম। যখন পাতাটা ডগার সঙ্গে কোঁকড়ে থাকে। আসামে অনেক জায়গায় একে 'গোলপাত' বলে থাকে।

(১৭) ভেটি, ভিন্‌দি বা চেলা অর্থে বুঝতে একটা নাটির ধলা। চেলা এবং ভিন্‌দি কথাটা অবশ্য বাংলার উত্তর অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় তবে 'ভেটি' কথাটা আসামে ব্যবহার হয়।

(১৮) বানজি অর্থে বুঝায় কুড়ি।

(১৯) কুন্‌চি কথা সাধারণত সুরমা ভ্যালির বাগান গুলিতে প্রকাশিত। এর অর্থ ছোট নীচু উপত্যকার সরু এক টুকরো জমি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে চা-গাছে ছায়ার জন্য কয়েক প্রকার গাছ রোপন করা হয়। এর মধ্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গাছগুলিই চায়ের উপযোগী ছায়াগাছ বলে রোপন করা হয়ে থাকে।

(১) Albizzia Stipulata অর্থাৎ কালো শিরীষ।

(২) Albezzia Procera অর্থাৎ কড়ই বা সাদা শিরীষ।

(৩) Albezzia Odoratissuna অর্থাৎ খাকড়।

(৪) Albezzia Mobuccana অর্থাৎ সিংহল দেশে এক প্রকার ছাউ গাছ।

(৫) Albezzia lebbek—এটিও কড়ই জাতীয় গাছ।

(৬) Dalbergia Assamica অর্থাৎ মেন্ডেলোয়া।

এই সমস্ত গাছগুলিই লেগেডম্ অর্থাৎ শিম্বিকোষ জাতীয় গাছ। এই সমস্ত গাছগুলিই আগে শুধু চা গাছকে ছায়া দেওয়ার জন্যই রোপাই করা হতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় যে এই গাছগুলি শুধুমাত্র ছায়া দান করে না। এ থেকে আরো অনেক কিছু পাওয়া যায় যা চা চাষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। ছায়া ছাড়া এ থেকে পাওয়া যায়। (১) সবুজ সার (২) অংশি ছোট ছোট লতা গুল্ম প্রভৃতিকে দমন রাখে। (৩) জমি ধ্বংসে বা বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়া রোধ করে। (৪) বাতাসের প্রবল আক্রমণের হাত থেকে চা গাছকে রক্ষা করে। (৫) শিলের প্রচণ্ড আঘাতের গতিবেগ কমিয়ে দেয়।

এই সমস্ত গাছগুলির মধ্যে Albizzia Stipulate বা কালো শিরীষ এই গাছটিই বেশি রোপাই করতে দেখা যায়। এবং প্রথমে এই গাছ উত্তর-পূর্ব ভারতের বাগানগুলিতে রোপন করা হয়। প্রায় সত্তর আশি বছর আগে ডিব্রুগড়ের কর্নেল হানুলে এই কালো শিরীষ গাছকে চা-উৎপাদনে শক্তিবর্ধক গাছ বলে ঘোষণা করেন। মিঃ জে, বাকিংহাম ১৮৮৪ সালে ২৩শে অক্টোবর এই গাছ এবং এর উপকারিতা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন অনেক পরীক্ষান্তে তিনি জানতে

পারের যে এতে এমন একটি জিনিষ আছে যা জমির ক্ষতিত পদার্থগুলির পরিপূরক এবং চা গাছগুলিকে সবল ও সুস্থ করে। এই সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু মত প্রকাশ করেছেন এবং এই বিষয়ে "The Past and Blights of the Tea Plant" by George Watt Calcutta, 1898. বইটিতে জানতে পারা যায়।

এই গাছের বাকল ধূসরবর্ণ। কাঠ বেশি শক্ত নয়। কাঠ কাটলে দেখতে পাওয়া যায় প্রথম স্তরটা সাদাটে কিন্তু ভিতরের অংশটি বাদামি। এর ফুল হলদে। ফলের লেচি ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা এবং প্রায় ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া। এর ফুল হয়ত মে থেকে জুনের মধ্যে। ফল বা বীজ সংগ্রহ করা হয় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারীর মধ্যে। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এর কোন পাতা থাকে না শুধু শুটিগুলো ঝুলতে থাকে। এই গাছের আয়ু সাধারণত পঁচিশ ত্রিশ বছর।

Albizzia Procera অর্থাৎ কড়ই বা সাদা শিরীষ গাছ কালো শিরীষের চেয়ে অনেক বেশি সোজা এবং আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। এর বাকল অনেকটা সাদা। কাঠও সাদাটে ধাধামি রঙের। এরও কালো শিরীষের মত লেচি হয়। লেচিগুলো সাধারণত পাঁচ থেকে আট ইঞ্চি লম্বা এবং প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া। ফল থাকে দশ বারোটা। এরও ফুলও হলদে। ফুল মে থেকে আগষ্টের মধ্যে হয় এবং ফল সংগ্রহ করা হয় জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে। বর্ষাকাল ছাড়া এরও পাতা থাকে না, শুধু শুটিগুলোই ঝুলতে থাকে গাছে।

Albizzia Odoratissima অর্থাৎ বাকড এই গাছটিও কড়ই জাতীয় গাছ। তবে এই গাছ কড়ই গাছ থেকে আকৃতিতে কিছুটা ছোট। এরও ঐ রকম ফুল, লেচি ও ফল হয়।

Albizzia holuccana বা সিংহল জাতীয় আউ। এই গাছগুলি খুব বড় হয় এর বাকল ধূসর এবং কাঠ খুব নরম। এরও ফুল ফল ও লাচি হয়। এর লাচি সাধারণত চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ইঞ্চি অথবা তার চেয়ে একটু বেশি চওড়া হয়। তবে এতে বীজ বেশি থাকে। এই গাছটি মালয় দেশের। কিন্তু সিংহলে একে সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সিংহলে এই গাছগুলির ডালপালা ছাঁটাই করা হয় এবং ঐগুলিকে সার করা হয়। ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের বাগানে এই পদ্ধতিতে কাজ করে দেখা গেছে যে এতে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বাড়ে।

Albizzia lebbek—এই গাছটিও কড়ই জাতীয় এবং এর বাকল ঈষৎ ধূসর। এর ফুল হয় এপ্রিল, মে মাসে এবং ফল পাওয়া যায় সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের মধ্যে। এই গাছটির বড় একটা রোপাই করা হয় না কারণ এর তেমন বৃদ্ধি নেই।

Dalbergia Assamica অর্থাৎ মেচেলোরা এই গাছের বাকলও ঈষৎ ধূসর রঙের। এর লেচি হয় এবং লাচিগুলি প্রায় তিন চার ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি মত চওড়া হয়। ফল খুব কম। দুইটি অথবা তিনটি মাত্র। তবে এই গাছগুলি বড় একটা রোগাক্রান্ত হয় না তাই ছায়া গাছ হিসাবে বাগিচার পক্ষে ভাল।

এ ছাড়া এই জাতীয় আরো কতকগুলি গাছ আছে যাদের বোটানিক্যাল নাম Albizzia Amara, A. Mollis, A. Stipulata এই গাছগুলি সাধারণত জাভা এবং সুমাত্রাতেই রোপাই করা হয়। আরো অনেক প্রকার গাছ আছে। এর মধ্যে Erythrina Indica, E Lithosperma, Glyricidia maculata, leucaena Glauca, Acacia, Specia and Grevillea robusta বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গাছগুলি বড় একটা ভারতে রোপাই করা হয় না। এবং ব্যবহারও সিংহল এবং জাভাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

বিশেষ করে আপার আসামেই প্লান্টারদের মধ্যে এই ছায়া-গাছ সম্পর্কে অনেক আলাপ-আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে আসামের বিশনাথ জেলায় একটা চা ব্লকে এই গাছ রোপাই করে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনকে জানান হয় এবং ১৯০৯ সালে মিঃ এইচ, আর, কুপার "The Nitrogen Surply to Tea" নাম দিয়ে এসোসিয়েসনের মাধ্যমে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাতে এই পরীক্ষা ও ফলাফল সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারা যায়। পাডেই বাগানের ম্যানেজার মিঃ বুকার, তাঁর বাগানের পাঁচ-একর জমিতে Albizzia

Sissoo অর্থাৎ কালো শিরীষ রোপাই করেন তিন ফুট অন্তর। ১৯২২ সালে প্লট নং এক যথাপূর্ব রেখে দেওয়া হয়। দুই নম্বর প্লটে গাছগুলি কেটে ৩০ × ৩০ ফুটের জায়গায় ৩০ × ৬০ ফুট করা হয়। তার মানে অর্ধেক গাছ কেটে ফেলা হয়। এবং তিন নম্বর প্লটটির সমস্ত গাছগুলির ডালপালা ছেঁটে দেওয়া হয়। এরপর দেখা যায় এক নম্বর প্লটে অর্থাৎ ৩০ × ৩০ ফুট রোপাই-এ পাঁচ একর জমিতে ১৯২৩ সালে ২২৪ মণ, ১৯২৪ এ ২৩১ এবং ১৯২৫ এ ২০৯ মণ পাতি পাওয়া যায়। অথচ দুই নম্বর প্লটে অর্থাৎ ৩০ × ৬০ ফুট রোপাই-এ ১৯২৩ সালে ২৪৪, ১৯২৪-এ ২৩৩ এবং ১৯২৫ সালে ২১৭। আর তিন নম্বর প্লটে অর্থাৎ যেখানে ছায়া নেই ১৯২ -এ ২৩৩ ১৯২৪-এ, ১৯৪, এবং ১৯২৫-এ ১৪৮ মণ পাতি পাওয়া যায়।

এই ক্রপ চাটি পরীক্ষা করলে দেখতে পাই যে দুই নম্বর প্লটে অর্থাৎ ৩০ × ৬০ ফুট রোপাই এ ভাল ফল পাওয়া গেছে অথচ যেখানে ছায়া নেই অর্থাৎ তিন নম্বর প্লটের ক্রম অবগতি দেখতে পাই। এতে প্রমাণিত হয় ছায়া গাছের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এবং এই প্রয়োজন শুধু ছায়া পান করার জন্য নয় সবুজ সারই জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং গাছ থেকে পাতিও পাওয়া যায় যথেষ্ট।

এছাড়া আরো কতকগুলি ছোট গাছ আছে যাদের থেকে জমি এবং চা গাছ কম উপকৃত নয়। এগুলির মধ্যে যোগা মেডেলোয়া অর্থাৎ Tephrosia Candida, অরহর অর্থাৎ Cajanus Indicus এবং Indigofera dosua বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই যোগা মেডেলোয়া ও অরহর মার্চ বা এপ্রিল মাসে চা গাছের সারির মধ্যে ছিটিয়ে দিতে হয়। এই গাছের ডালপালা ছাটাই করতে হয় আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। এই দুই জাতীয় গাছের মধ্যে যোগা মেডেলোয়ার আয়ু তিন বছর কিন্তু অরহরের আয়ু মাত্র এক বছর। এই দুই প্রকার গাছই সাধারণত ডুয়ার্স, আসাম প্রভৃতি বাগানে ব্যবহার করা হয় কিন্তু Indigofera dosua শুধু মাত্র দার্জিলিং জেলার বাগানেই হয়। এছাড়া যোগা মেডেলোয়া ও অরহরও দার্জিলিং এর কোন কোন বাগানে রোপাই করা হয়। তবে দার্জিলিং এর উঁচু উপত্যকার বাগানগুলিতে বড় একটা ছায়া-গাছের প্রয়োজন হয় না।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান বিচিত্রা

সংকলন

○

জ্যোতির্বিদগণ এই প্রথম শনিগ্রহ ও নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আগত বেতার তরঙ্গ ধরিতে পারিয়াছেন।

হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নীহারিকা পুঞ্জের একটি মুমূর্ষু নক্ষত্র হইতে এই তরঙ্গ ভাসিয়া আসিয়াছে, তবে বাষ্প-আবৃত ছিল বলিয়া ইহা দূরবীক্ষণে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল সাইেন্টিফিক রেডিও ইউনিয়নের ত্রয়োদশ অধিবেশনে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফ্রেডারিক হাডকের বিবরণী হইতে ইহা জানা গিয়াছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ ফুট ব্যাসের একটি নূতন ধরনের রেডিও টেলিস্কোপে ইহা ধরা পড়িয়াছে। এই দূরবীক্ষণে অতি সূক্ষ্ম একটি পরিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে বেতার তরঙ্গকে হাজারগুণ বড় করার ব্যবস্থা আছে।

শনিগ্রহ পৃথিবী হইতে ৭৫ কোটি মাইল এবং ঐ নীহারিকা ৩০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। এক আলোকবর্ষ ৫৮৮০ ০০০ ০০১, ০০০ মাইলের সমান।

নক্ষত্রের পরমায়ু সম্পর্কে এই তথ্য নূতন আলোকপাত করিবে এবং ইতিপূর্বে শনিগ্রহ সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও বর্তমান গবেষণা-দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

নক্ষত্রের গ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান :

ওয়াশিংটন-জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার জনৈক বিজ্ঞানী জানাইতেছেন যে, কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চন্দ্রে কোন আবহাওয়া-মণ্ডল না থাকায় চন্দ্র হইতে বৃহদাকার দূরবীক্ষণের সাহায্যে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। পৃথিবীতে দূরবীক্ষণ ও মহাশূন্যের তারকার মধ্যে আবহাওয়াই সবচেয়ে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও জানাইয়াছেন যে, সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র হইল 'আলফা সেনটরী' (Alpha Centauri) পৃথিবী হইতে ইহা ২৫ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ব্যতীত সিরিয়াস (Sirius) প্রোসিয়ন (Procyon) এলটায়ার (Altair) এবং আর্কটুরাস (Arcteurus) এই কয়টির গ্রহ আছে বলিয়া জ্যোতির্বিদেরা অনুমান করিতেছেন। প্রত্যেকটি নক্ষত্রই উজ্জ্বল ও ইহাদের খালি চোখে দেখা যায়।

শ্রম শিল্পের ক্ষেত্রে বিটা রশ্মির প্রয়োগ :

কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সম্মেলনে মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ আর এইচ মুলার তেজস্ক্রিয় বিটা রশ্মিকে শ্রম শিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্লেষক হিসাবে ব্যবহারের একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। বর্তমানে এক্সরেকে যে ভাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে সেইভাবে ইহাকেও ব্যবহার করা যাইবে। ইহার সাহায্যে ফিল্ম প্রভৃতির রাসায়নিক সংগঠন জানা যাইবে।

বিগ্রাটকায় বেতার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা :

এখান হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী আরেসিবোতে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ১৮ একর জমির উপর ৫৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি বেতার নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী বৎসরের শরৎকালে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবে। পিরীচাকৃতি ইহার অ্যানটানার ব্যাস হইবে ১০০০ ফুট। মহাশূন্য সম্পর্কে যে সকল তথ্য এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই সেই সকল ইহার সাহায্যে সংগৃহীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধির উপায় :

বিমানবিজ্ঞানীরা বাতাসকে জেট বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়ক রূপে ব্যবহার করার একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়া অনুসারে বিমানের ডানায় ছোট ছোট ছিদ্র করা হইবে এবং এই সকল ছিদ্রের সাহায্যে বাতাসকে ইঞ্জিনে লইয়া যাওয়া হইবে। ইহাতে বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে, এজন্য অতিরিক্ত ইন্ধনও খরচ হইবে না। সাধারণতঃ যে পরিমাণ ইন্ধনে জেট-বিমান সমূহ না থামিয়া ৪০০০ মাইলেরও বেশী যায়, এই প্রক্রিয়ায় তাহা ৭০০০ মাইল পর্যন্ত যাইবে। বর্তমানে নর্থ্রপ কর্পোরেশন পরীক্ষামূলকভাবে এই ধরনের দুইটি জেটবিমান নির্মাণ করিতেছেন। এই নূতন প্রক্রিয়া সকল রকম বৃহৎ বিমানেই যাহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তজ্জন্য এই পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঘণ্টায় ৪০০০ মাইল গতি সম্পন্ন বিমান :

মার্কিন বিমান বাহিনীর বৈমানিক মেজর রবার্ট এম হোয়াইট রকেট চালিত এক্স-১৫ বিমানে পৃথিবী হইতে ১০৬২০০ ফুট উর্ধ্বে উঠিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার বৈমানিক জোসেফ এ ওয়াকারও ঐ বিমানেই ঘণ্টায় ২১৯৬ মাইল পথ পাড়ি দিয়া রেকর্ড করেন। তাঁহাদের বিমান ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস বিমান ঘাঁটি হইতে ছাড়া হয়। প্রথমতঃ এক্স-১৫ বিমান খানিকে এ বি-৫২ নামে একটি বিমান পৃথিবী হইতে ৪৫০০০ ফুট উর্ধ্বে লইয়া যায় ও সেখানে এক্স-১৫ কে ছাড়িয়া দেয়। পৃথিবী হইতে ১৫০ মাইল এবং তাহারও অধিক উর্ধ্বে থাকিয়া ইহা যাহাতে ঘণ্টায় ৪০০০ মাইলের বেশী গতিতে চালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরমাণু শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ :

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ পর্যটক ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেলানও তিন বছরে জাহাজে করিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সেই পথেই পরমাণু শক্তি চালিত মার্কিন সাবমেরিন ট্রিটন ৬১ দিনে সমুদ্রের নীচে দিয়া ৩১০০০ মাইল পাড়ি দেয়। ট্রিটন ইহার পরেও ১০৭২ মাইল অতিক্রম করিয়া ৮৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করে।

গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীব :

টোমেটি এবং এপসিলন এরিডানি এই দুইটি নক্ষত্র পৃথিবীর মতই বলিয়া বিজ্ঞানীদের ধারণা। ঐ সকল নক্ষত্রের বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব রহিয়াছে কিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিতভাবে তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা হইতেছে। ইউ এস ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশান বিশেষ ধরনের রেডিও মহাপাতির সাহায্যে এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে।

বিদ্যুতের রং :

সাধারণতঃ আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন তাহার রং আমাদের নিকট সাদা বলিয়া প্রতিভাত হয়। অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের জন্যই ইহা সাদা দেখায়। জলীয়বাষ্প এবং হাইড্রোজেন থাকিলে ইহাকে ইষৎ লাল ধূসিলমাকীর্ণ আবহমণ্ডলে হলুদ এবং গাঢ় লাল রং এর দেখায়। বেগুনী এবং সবুজ রং এর বিদ্যুতও দেখা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কড্ মাছের গুড়া :

স্নেহবর্জিত প্রোটিন যুক্ত কড মাছের গুড়া পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্র সমূহে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পৃথিবীর বহু সমুদ্রেই কড মাছ পাওয়া যায়। কানাডার দুইজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ইহা জানাইয়াছেন।

বিশ্বের প্রথম অটোমোবিল নির্মাণের পরিকল্পনা :

ইতালীর বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ ভিঞ্চি ১৪৮০ খৃঃ প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে প্রথম অটোমোবিল নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। স্প্রিং এর সাহায্যেই তাহাতে গতিবেগ সঞ্চারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ১৪৫২ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি কেবল তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রতিভাবান ভাস্কর স্থপতি এবং ইঞ্জিনীয়ার।

ঘুমের প্রয়োজন :

বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষ শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ঘুমায় না। তাহারা বলেন, মস্তিষ্কের যে অংশের জন্য মানুষ কথা বলিতে পারে, স্মরণ করিতে পারে, যুক্তি বিচার করিতে পারে এবং কল্পনা করিতে পারে

প্রধানতঃ মগজের সেই অংশকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যই ঘুমের প্রয়োজন।

সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন পেশী :

বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের পেশীর শক্তির তুলনায় ফড়িংএর পায়ের পেশীর শক্তি ১০ গুণ বেশী। কীটপতঙ্গ ও পশুজগতে একমাত্র শামুক ও ঝিনুকের পেশীর শক্তিই ফড়িং এর তুলনায় অধিক।

ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে আগুনে-পোড়া রোগীর চিকিৎসা :

আমেরিকার মেডিকেল এসোসিয়েশনের পত্রিকার চলতি সংখ্যায় ডাঃ অ্যালেক্স জি গুলম্যান লিখেছেন, আগুনে-পোড়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসায় বরফের মত ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করে তিনি বিশেষ ফল পেয়েছেন—এতে জ্বালারও খুবই উপশম হয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে দেড়শ রোগীর ক্ষেত্রে তিনি এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটি রোগী এতে আরাম পেয়েছে—দগ্ধ স্থানে কোন ফোস্কাও পড়েনি। ক্ষতস্থান খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়েও গেছে। শরীরের শতকরা বিশভাগ পর্যন্ত দগ্ধ হলে এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা চলতে পারে।

টাইপ রাইটার মেশিনের প্ল্যাসটিক ফিতা :

আমেরিকার ইণ্টারন্যাশনাল বিজিনেস মেশিনস নামে একটি প্রতিষ্ঠান টাইপরাইটারের এক প্রকার নূতন ধরনের ফিতে তৈরী করেছেন। কাপড়ের ফিতের মত এই ফিতে মেশিনে আটকে ধরে না এবং ছাপা খুব পরিষ্কার ও ঝরঝরে হয়ে থাকে। কাপড়ের ফিতে ব্যবহারে নানারকম অসুবিধা আছে। প্লাষ্টিক ফিতে ব্যবহারে এসব অসুবিধা অনেকটা দূর হবে এবং নূতন ধরনের অক্ষর ব্যবহারও সম্ভব হবে। এই ফিতেটি বেশ শক্ত এবং সঙ্কোচন ও প্রসারশীল বলেই মেশিনে আটকে ধরে না।

অতিদ্রুত গণনা করার অভিনব যন্ত্র :

আমেরিকার ওয়েষ্টিং হাউস কর্পোরেশন অতি দ্রুত গণনা করার একটি অভিনব যন্ত্র তৈরী করেছেন। এই কম্পিউটারের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,৬০০০ অঙ্ক কষা বা হিসেব করা যাবে। বিমান চলাচল ব্যবস্থা, বিমানে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগবে।

রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করার অভিনব ভেষজ :

কোন কোন ব্যক্তির দেহ থেকে সামান্য আঘাতেই প্রচুর রক্তপাত হয়ে থাকে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করাও কঠিন হয়। ওয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন চিকিৎসক এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণা করে সম্প্রতি গবাদি পশুর রক্ত থেকে রক্ত জমাট করার একটি ভেষজ আবিষ্কার করেছেন। মাত্র একই ধরনের রক্ত-ক্ষরণ বা হিমোফেলিয়ার ব্যাপারেই এই জিনিসটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে গবাদি পশুর রক্ত থেকে এই জিনিসটি তৈরী করা হয়েছে বলে মানুষের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা চলবে না। তাঁরা বলেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে এই জিনিসটি প্রয়োগ করা না গেলেও, কি প্রকার ভেষজ যে মানুষের বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, এই আবিষ্কারের ফলে তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

কলেরা রোগে ভেদবমির কারণ :

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেরালডিন ফুকস্যান ও ফ্রেডরিক ফুকস্যান নামে চিকিৎসক দম্পতি জানিয়েছেন, কলেরা বীজাণুর জন্য রোগীর দেহে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার ফলে রোগীর অন্ত্রসমূহ লবণ গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য রোগী যে জল পান করে তা পেটে জমা হয় এবং ভেদ-বমি দেখা দেয়।

সস্তায় সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করার প্রক্রিয়া :

বর্তমানে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করার জন্য প্রতি হাজার গ্যালনে এক ডলার খরচ পড়ে। সরকারী প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ডাকোটা, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো এবং ফ্রিপোর্টে আরও সস্তায় সমুদ্রের লোনা জলকে পানীয় জলে পরিণত করার কারখানা নির্মিত হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী সমুদ্রের জলকে সস্তায় পানীয় জলে পরিণত করার একটি অভিনব প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছেন।

শল্য চিকিৎসায় অস্ত্রের বদলে আলোর ছুরি ঃ

এমন দিন আসছে যখন মস্তিষ্কের অপারেশনে বা ক্যানসার ক্ষতের অপসারণে আর চিকিৎসকের ছুরির প্রয়োজন হবে না—এসব কাজ হবে চিকিৎসকের অতিতীক্ষ্ণ অস্ত্রের চাইতেও ধারালো তীব্র রশ্মিচ্ছটার সাহায্যে। হিউজেস এয়ারক্রাফট কোম্পানীর গবেষণা বিভাগের ডাঃ থিয়োডোর এইচ মেইম্যান এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন যে : এ পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের রুবি ক্রস্ট্যালের সাহায্যে সমান্তরালভাবে যে সকল রশ্মি মহাশূন্য থেকে ভেসে আসছে তাদের কেন্দ্রীভূত করা হয়। ঐ মিলিত রশ্মির আলোকচ্ছটার উজ্জ্বলতা সূর্যের কেন্দ্রস্থ আলোকের উজ্জ্বলতাকেও হার মানায়। আর এর তীব্রতা ও সূক্ষ্মতা সূক্ষ্মতম ছুরিকেও ছাড়িয়ে যায়। তাই এর সাহায্যে মানবদেহের টিসু বা কলাতে নিখুঁত-ভাবে অস্ত্রোপচার চলে। তবে ক্যানসার রোগ চিকিৎসা ও ক্ষত অপসারণ ব্যতীত অস্ত্রোপচারের মস্তিষ্কাতি বীজাণুমুক্ত করার ব্যাপারেও এই রশ্মিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ক্যানসাররোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই রশ্মি ব্যবহৃত হতে পারে। পদার্থের গঠন-প্রণালীর বিশ্লেষণে এই রশ্মি বিশেষভাবে সাহায্য করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

৫০ হাজার ডিগ্রী তাপ উৎপাদনকারী টর্চ ঃ

এখানে প্লাজমা টর্চ নামে এক ধরনের নূতন টর্চ আবিষ্কৃত হয়েছে। রক্তে যে জলীয় অংশে লাল কণিকা সমূহ ভাসমান থাকে, তাকে বলা হয় প্লাজমা। এই টর্চের বিচ্ছুরিত আলোকের তাপমাত্রা ৫০০০ ডিগ্রী ফার্নহাইট পর্যন্ত উঠে এবং এর তাপ শক্তি অক্সিএসিটেলিন টর্চের তুলনায় ছ গুণ বেশী। ইট পর্যন্ত এর তাপে মাখনের মত গলে যায়। ধাতু ও ধাতব দ্রব্যাদি গলানো, জোড়া লাগানো এবং কাটা প্রভৃতিতে এই টর্চ খুবই কাজে লাগবে।

মহাজাগতিক রশ্মির আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা ঃ

এক প্রকার অভিনব ক্যামেরার সাহায্যে আলোর পরেই সর্বাধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মিরও আলোকচিত্র গ্রহণের উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। অ্যাস্ট্রোকন্ নামে এক প্রকার ইলেকট্রনিক টিউবই এই ক্যামেরার মূল উপাদান। সাধারণ ক্যামেরার আলোকের সংস্পর্শে ফটোগ্রাফিক প্লেট পরিবর্তিত করা যায়। অনেকে বলেন, তারকারাজিতে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে থেকেই মহাজাগতিক রশ্মি সৃষ্ট হয়েছে। এই রশ্মি সেকেণ্ডে ১৮৫০০০ মাইল গতিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এ পদ্ধতিতে এই রশ্মিকে একটি ঘন কাচের মধ্য দিয়ে (ক্রস্ট্যাল) প্রবেশ করানো হয় এবং এক সেকেণ্ডের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে এই রশ্মির আলোক চিত্র গ্রহণ করা হয়। সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে এ সম্ভব নয়। অ্যাস্ট্রোকন্ টিউবই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। লম্বায় এটি ছয় ইঞ্চি এবং এর ব্যাস চার ইঞ্চি।

পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ফটোগ্রাফির ব্যাপারে এই টিউব বৃহত্তর সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এসেছে। যৌগিক পদার্থের উৎস নিরূপণে এই টিউব অনেকখানি আলোকপাত করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

তেজস্ক্রিয় শক্তির প্রতিরোধক সোলার সেল ঃ

আমেরিকায় সম্প্রতি তেজস্ক্রিয় শক্তির প্রতিরোধক এক প্রকার সোলার সেল বা সৌরচুল্লী আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সেল সূর্যরশ্মিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। বর্তমানে যে সকল সেল চালু আছে তাদের তুলনায় এ সকল সেল দশগুণ বেশী তেজস্ক্রিয় শক্তির প্রতিরোধক। মহাশূন্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এ সকল সেল খুবই কাজে লাগবে।

অভিনব প্রলেপ ঃ

আমেরিকার টেনেসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ বা কলেজ অব্ ফার্মেসী এক প্রকার অভিনব প্রলেপ আবিষ্কার করেছেন। শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে এই প্রলেপ প্রয়োগ করতে হয়। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে প্লাস্টিক নির্মিত বন্ধনী বা বেণ্ডেজের স্থান এই প্রলেপই গ্রহণ করবে বলে চিকিৎসকদের ধারণা। কয়েক প্রয়োগ করার পর এর এক অংশ ম্যাসটিকে পরিণত হয়। আর এর যে অংশটিতে ওষুধ থাকে তা ধোওয়া যায়, তারপর এ জিনিষটি তৈলাক্ত নয়।

পতঙ্গপাল ধ্বংস করার অভিনব পন্থা :

পতঙ্গপাল শস্যের বিস্তর ক্ষতি করে বলে নানা দেশেই এই মারাত্মক কীট নির্মূল করার চেষ্টা হচ্ছে। আমেরিকার কৃষি-দপ্তর এ জন্য এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করেছেন। পুরুষ পতঙ্গকুলকে এই কৃত্রিম বস্তুটি আকৃষ্ট করে থাকে। স্ত্রীজাতীয় পতঙ্গের যে সকল গুণের জন্য পুং জাতীয় পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে থাকে তারই কিছুটা ঐ কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থে রয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের আলোক প্রতিফলন থেকে অস্তিত্ব নির্ধারণ :

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বার্তা প্রেরণ ঠিক কখন যে বন্ধ হয়ে গেল তার সুনির্দিষ্ট সময় জানবার উপায় ছিল না। আমেরিকার রেথিয়ন কোম্পানী এ জন্য একটি অভিনব-যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এর সাহায্যে ডিগবাজী খেয়ে খেয়ে পড়তে পড়তে কখন যে উপগ্রহটির বার্তা প্রেরণ একদম বন্ধ হয়ে গেছে তা জানা যায়। এই উপগ্রহের আলোক প্রতিফলনের মাত্রা নিয়ে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যন্ত্রটি সহজে বহনযোগ্য। পৃথিবী থেকে এর গতিবিধি লক্ষ্য করার ব্যাপারে মেঘলোক বাধা হতে পারে বলে যন্ত্রটিকে বিমানযোগে মেঘের উপরে নিয়ে গেলে তথ্য সংগ্রহে সুবিধা হয়।

অভিনব ইলেকট্রনিক টিউব :

জেনারেল ইলেকট্রিক রিসার্চ লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা এক অভিনব ইলেকট্রনিক টিউব আবিষ্কার করেছেন। এতে অতিশয় শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের সাহায্যে সঙ্কেত প্রেরণের ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচীত হচ্ছে। অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের বেতার সঙ্কেতের পরিবর্ধন ও সঙ্কেত প্রেরণের ব্যাপারে এই দুটি নূতন ইলেকট্রনিক টিউব বিশেষভাবে সাহায্য করবে। ও রেডিও আসট্রোনোমি সম্পর্কে, মহাশূন্যে যোগাযোগ স্থাপনে এবং শক্তি সম্ভবপরে এমনকি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনেও হয়তো এই টিউব বিশেষ কাজে লাগবে।

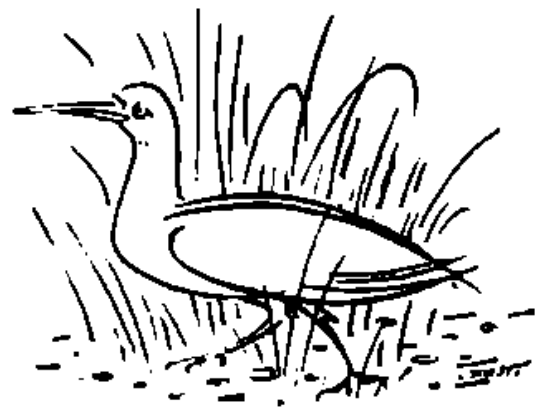

খেলাধূলা

তুরীয়ান—তুঙ্গীয়ান—বলীয়ান

অজয় বসু

রোম অলিম্পিক কাহিনী হয়তো আমাদের মনে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি জাগাতে পারে কিন্তু ক্রীড়াবিদ তথা সমগ্র মানবের অগ্রগতির ইতিহাসে এই আখ্যানের ভূমিকা মহান এবং আশা-ব্যঞ্জক। সত্যি বটে এই আসরে ভারত তার বত্রিশ বছরের হকি সাম্রাজ্য হারিয়েছে, কোন ভারতীয় প্রতিযোগি সেখানে পদক অর্জন করতে পারেননি এবং একা মিলখা সিং বাদে অন্য কোনো ভারতীয়ের ভাগ্যে জোটেনি বিশেষজ্ঞদের সপ্রশংস স্বীকৃতিও। তবুও বলিতে আমাদের আত্মকেন্দ্রিক আবেগের উত্তাপটুকু এড়িয়ে যদি একবার সপ্তদশ অলিম্পিক বিবরণের পাতায় স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টি মেলা যায় তাহলে আশ্বস্ত ও আনন্দ বোধ করার হাজারো উপকরণ নিশ্চই খুঁজে পাওয়া যাবে।

'সাইটিয়াস—আল্টিয়াস—ফরটিয়াস' বা 'তুরীয়ান—তুঙ্গীয়ান—বলীয়ান'—এই তিনটি শব্দের অর্থেই অলিম্পিকের মহান আদর্শ প্রতিফলিত। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ দুনিয়ার লক্ষ্য আরও জোরে ছোটা, আরও ঊর্ধ্বে উঠা এবং আরও বলে বলীয়ান হওয়া। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ প্রশস্ত করার সংকেতেই আয়োজিত হয় অলিম্পিক ক্রীড়ার চতুর্বার্ষিকী অনুষ্ঠান। এক কথায় মানুষের এগিয়ে চলার সাধনার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে রাখতেই বিছানো হয় বিশ্বক্রীড়ার আসর। মহান পরিকল্পনা সন্দেহ নেই। এবং সে পরিকল্পনাও যে সফল, সার্থক হতে চলেছে, সপ্তদশ অলিম্পিক কাহিনীই তার উজ্জ্বল নজীর।

সেই নজীরে প্রকাশ যে রোমে লক্ষ্যবিদ্ধ ও ভারোত্তোলনে পুরানো প্রায় সমস্ত কীর্তিই ম্লান হয়ে গিয়েছে, সাঁতারের সমস্ত রেকর্ডই গিয়েছে গুঁড়িয়ে এবং অ্যাথলেটিক মহিলারা প্রতি ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেছেন নতুন রেকর্ড ও পুরুষেরা মোট চব্বিশটির মধ্যে কুড়িটি বিভাগে। তাছাড়া সাঁতারে ভেঙেছে ছটি অনুমোদিত বিশ্ব রেকর্ড এবং অ্যাথলেটিকে চারটি। কীর্তি-কুতিত্বের পুরানো স্বাক্ষরগুলিকে মুছে দিয়ে নতুন করে যে ইতিহাস রচিত হলো তা স্মরণীয়, সমৃদ্ধ ও রীতিমতো আশাসজনক এবং বহু প্রচারিত আদর্শ তুরীয়ান তুঙ্গীয়ান বলীয়ান এর সুসমঞ্জস।

সান্ত্বনার কথা এইটুকু যে নতুন যুগকে স্বাগত জানাতে আমাদের ভারতেরও ভূমিকা ছিল। যদিও সে ভূমিকা সংক্ষিপ্ত ও একান্তভাবেই বিক্ষিপ্ত। এই বিক্ষিপ্ত নিদর্শন 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিং। মিলখা সিং চারশো মিটার দৌড়ে কোনো পদক পান নি সত্যি, কিন্তু পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড অতিক্রম করে তিনি এসিয়েছিলেন অনেকদূর। পদক অর্জনে বিফল মিলখা সিং ভারতের গর্বের ও গৌরবের পরিচয়, ইতিহাস স্বীকৃত ও অভিনন্দিত চরিত্র তিনি। তিনি ব্যতিক্রম-বিশেষ সন্দেহ নেই, তবু তিনি অনুন্নত ভারতের আকাশ জোড়া অন্ধকারের ফাঁকে একটুকরো বিজলীর ঝলক। তবে মিলখা সিং আপাতত থাক, ভারতকে ছেড়ে এবার বৃহত্তর পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি ফেলা যাক্।

অলিম্পিকের বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চের নায়কের আসনে এবারও প্রতিষ্ঠিত ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। যেমন ছিল চার বছর আগে মেলবোর্ণে এবং আট বছর পূর্বে হেলসিঙ্কিতে। বিশ্বক্রীড়ায় সোভিয়েত ক্রীড়াবিদদের এই যুগব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ—সে দেশের খেলাধূলার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। পুরোভাগ থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে দিতে কোনো পক্ষেরই চেষ্টার কসুর নেই। কিন্তু অন্যের কথা ঘুরে যাক্, স্বয়ং আমেরিকাও আজ রাশিয়ার নাগাল ধরতে পারছে না। দিন যতো এগোচ্ছে দু'পক্ষের ব্যবধান যেন ততোই বাড়ছে। হেলসিঙ্কি ও মেলবোর্ণের অনুপাতে তাই রোমের ব্যবধান কিছুটা বেশি। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে এই ব্যবধানের স্বরূপ আরও ভাল করে উপলব্ধি করা যেতে পারে। কারণ সে হিসাবে জানা গিয়েছে যে রোম অলিম্পিকে আমেরিকা পেয়েছে মোট

য়ে নিয়েছে ১০৩টি পদক (৪৩+২৯+৩১)।

রোমে ক্রম ক্রীড়া-বিদ্বদের সংশয়াতীত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল
ছাগীয় অনুষ্ঠানে জিমনাষ্টিকে, মহিলাদের অ্যাথলেটিকে
গ্রীকো-রোমান কুস্তিতে। ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে রুশবাসীরা
ধারণের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেননি যেমন পারেননি
র্কিন তরুণেরা অ্যাথলেটিকে—যদিও পুরুষদের অ্যাথলে-
ক মোটামুটিভাবে মার্কিন দলই ছিল প্রতিযোগী হিসেবে
শ্রেষ্ঠ। তবে পুরুষদের অ্যাথলেটিকে পূর্বগৌরব ধারাতে
ধ্য হলেও সাঁতারে এবং ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে আমেরিকা
ন নাম ফিরে পেয়েছে। প্রাক্ অলিম্পিক কালে
ধারণ ক্রীড়ানুরাগী তথা বিশেষজ্ঞ মহলে এই ধারণাই
মূল ছিল যে মেলবোর্ণের মতো রোমেও বুঝি অষ্ট্রেলীয়
তারুরা একচেটিয়া প্রাধান্য লাভে সমর্থ হবেন। কিন্তু
ত্তবে তা ঘটেনি। বাস্তবে অষ্ট্রেলিয়াকে সরিয়ে দিয়ে
আমেরিকা দখল করে নিয়েছে সাঁতারে শীর্ষস্থান।
র ফলে একা মার্কিন দলের সংগ্রহশালায় জমা পড়েছে
বারোটি স্বর্ণপদক সমেত মোট একুশটি পদক আর
ষ্ট্রেলিয়ার ভাগে সবসমেত তেরোটি।

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের বিচারে যে ক্রীড়াবিদকে
সংক্ষোচে সপ্তদশ অলিম্পিকের প্রথম পুরুষ হিসেবে
ভিনন্দিত করা যায় তিনিও সোভিয়েত প্রতিনিধি।
ম তাঁর বরিস সাকলিন। সাকলিন জিমনাষ্টিকে চারটি
ি, দুটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে মেডেল
গ্রহে ব্যক্তিগত সাফল্যের যে নজীর রেখেছেন, আধুনিক
লিম্পিকের দীর্ঘ চৌষট্টি বছরের ইতিহাসে তার তুলনা
লা ভার। তবু সাকলিনের এমন সাফল্য সত্ত্বেও
শ্বদের জিমনাষ্টিকে রাশিয়া দলগত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান
য়নি। আধুনিক যুগের প্রতিযোগিতার তীব্রতার উজ্জ্বল
র্শন রাখতেই যেন এশিয়ার সুযোগ্য প্রতিনিধি
াপানকে সে সম্মান ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

বরিস সাকলিন রুশের নায়ক। আর নায়িকা
লন মার্কিন মুল্লুকের উইলমা রুডলফ্। উইলমা যেন
ুদশ অলিম্পিকের বিস্ময়! ক্লার্ক সভিলের বিংশতী বর্ষীয়া
ইলমা এক গরিব নিগ্রো পরিবারের উনিশটি সন্তান-
ন্তির মধ্যে অন্যতমা ছাত্রী। শিশুপক্ষাঘাতে বিকল ছিলেন

এখেন্স থেকে রোমে অলিম্পিক মশাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

বাল্যে, দৌড়ানো দূরে থাক ভাল করে হাঁটতে পর্যন্ত
পারতেন না। সঠিক পদবিক্ষেপের জন্যে তাঁকে সে সময়
বিশেষ ধরনের জুতা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হত।
সাতবছর পর্যন্ত উইলমাকে এইভাবে অশক্ত শরীরটাকে
টেনে বেড়াতে হয়েছে। তারপর কি করে যেন সব ওলট
পালট হয়ে গেল! উইলমা দৌড়তে শিখলেন, ট্র্যাক
ছুঁয়ে যেন উড়ে যেতে লাগলেন, দেখতে দেখতে তামাম
দুনিয়া রইলো তাঁর পেছনে পড়ে।

রোমে এসে উইলমা রুডলফ্, বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করে
শত মিটার দৌড় দিয়েছেন, দু'শ মিটারে স্বর্ণপদক
পেয়েছেন নতুন রেকর্ড করে ও বেসরকারী ভাবে বিশ্ব
রেকর্ড ভেঙে দিয়ে আর বিশে রেলে শীর্ষস্থান পেতে
আমেরিকাকে সাহায্য করেছেন তিনিই সবচেয়ে বেশি।
তিনি ছাড়া আর কোনো অ্যাথলিট, কি পুরুষ কি
মহিলা, কেউই রোমে তিন তিনটি স্বর্ণপদক পাননি।
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে তেমন-তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার
'চ্যালেঞ্জ' এসে পড়লে উইলমা আরও জোরে দৌড়তে
পারতেন এবং তাঁর রেকর্ডে সে দিন মহিলাদের প্রতিযো

বিশ্ব ক্রীড়া অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদকটি পাকিস্তান লাভ করেছে। মধ্যস্থলে তাদের দলের অধিনায়ক হামিদ।

পর্কে মানুষের সব ধারনাই বদলে যাবে। তবী, ক্ষী উইলমার বাইবের কাঠামো আদর্শ অ্যাথলিট-ত, সপ্রতিভ মধুর স্বভাব। গায়ের রং কালো তাঁর, ত্ত তপগত উৎকর্ষে তিনি কালো-ধলা সকল পক্ষেরই ন্ন। ইতালীয় সংবাদিক ও লেখকদের লেখনীমুখে লেমাই ছিল অলিম্পিক-কালে সর্বাধিক প্রচারিত নাম। ায় ও ভালবাসায় তাঁরা তাঁকে সমবেত কণ্ঠে ডেকেছেন ক মুক্তা' বলে?

রোম অলিম্পিকের অ্যাথলেটিকে আমেরিকার সুনাম ঃ রাখায় উইলমার অভ-ডাই-বোমেদের ভূমিকা ছিল াতীতি বড়। অনেক বড় বর্ণ-বিদ্বেষীদের আভ্যা-ধানের চেয়ে। রিলেরেসে শীর্ষ স্থানাধিকারী মার্কিন টলা-দলের চার চারজনই ছিলেন উইলমার মতো ত কৃষ্ণবর্ণ এবং সবাই উইলমার নিজের ক্লাবেরই তিনিধি। নিগ্রো তরুণ রাফের জনসন ডেকাথলনে,

প্রথম দুজন রাফ্ক বোইন ও বোরাবসন দুজনেই অতিক্রম করে গিয়েছেন আর এক অবিস্মরণীয় নিগ্রো অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্সের প্রায় পঁচিশ বছরের পুরানো অলিম্পিক রেকর্ড।

কিন্তু এঁদের চেয়ে বর্ণ-বিদ্বেষীদের আরও বড় চক্ষুশূল হয়েছিলেন আফ্রিকার অখ্যাত তরুণ আবেবে বিকিলা। আবশ্যক আথলিটিক্সের ক্রীড়া-শিক্ষা অথবা সুমিয়ন্ত্রিত ক্রীড়া পরিকল্পনার আশীর্বাদ না পেয়েও আবেবে বিকিলা রোমে দীর্ঘ ম্যারাথন দৌড় (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ পথ) জিতে অ্যাথলেটিকে আফ্রিকার ভবিষ্যত সম্ভাবনায় প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। এবং ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ১৬.২ সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট পথ ছুটে তিনি বিশ্ববিশ্রুত এথিল অ্যাটোপেকের পুরানো রেকর্ডটিকেও গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।

রাশিয়া ও আমেরিকা ছাড়া রোম অলিম্পিকে আর যারা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাদের মধ্যে ইতালী, জার্মানী ও তুরস্কের নাম স্মরণীয়। মল্লক্রীড়ায় তুরস্কের নাম আছে চিরদিন। সে নাম অক্ষুণ্ণ থেকেছে তুর্কী মল্লদের সাতটি স্বর্ণপদক সংগ্রহে। রোমে ইতালীয় সাইক্লিস্টদের ছিল একচেটিয়া প্রাধান্য, একা সান্তে গিয়ারডনি জয় করেছেন দুটি বিভাগ। তাছাড়া ইতালীয় ছাত্র লিভিও বেরুতি বিশ্ব রেকর্ড (২০.৫ সেকেণ্ড) স্পর্শ করে দু'শ' মিটারে দৌড়ে আমেরিকার বত্রিশ বছরের একনায়কত্বে কাটল ধরিয়ে দিয়েছেন।

জার্মান তরুণী সন্তরণী ইনগ্রিড ক্রেমারও পেয়েছেন দুটি স্বর্ণপদক। ডাইভিং প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগীয় ফাইনাল জয় করে। ক্রেমারের সাফল্য কিছুটা অপ্রত্যাশিত কিন্তু প্রত্যাশিত ছিল জার্মান তরুণ আমিন হারির বিশ্ব বিজয় অভিযান। কারণ রোমে আবির্ভূত হবার আগেই হারি দশ সেকেণ্ডে শত মিটার দৌড়ে অ্যাথলেটিক দুনিয়ায় চাঞ্চল্যের খোরাক জুগিয়েছিলেন। সেই চাঞ্চল্যের মর্যাদা যথাযথ রেখে আমিন হারি রোমে শত মিটারে দৌড়ে জয়লাভ করেছেন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। তাঁর সাফল্যে স্বল্প-পাল্লার দৌড়ে আমেরিকার কয়েক-যুগ ব্যাপী প্রাধান্য নষ্ট হয়েছে। আরল্যাণ্ডের এক খনিশ্রমিকের তনয় আমিন হারির বয়স মাত্র

...রে।

...লিম্পিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আসরে শ্রেষ্ঠের ...তিদ্বিক্ত হওয়া বড় কথা। দক্ষতা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও অনেকের ভাগ্যে শ্রেষ্ঠের সম্মান জোটে না। ...ক প্রমাণ জন টমাস। উনিশ বছরের এই নিগ্রো ...টির হাইজাম্পে বিশ্ব রেকর্ড আছে সাত ফুট পৌনে ...ইঞ্চি এবং সাত ফুট দু'বা আড়াই ইঞ্চি ঊর্ধ্বে তিনি ...ার উঠেছেন। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে ...লরই ধারণা ছিল যে হাইজাম্পের স্বর্ণপদকটি জন ...সের 'পকেটেই' রয়ে গিয়েছে। আসলে প্রতি-...গিতার ক্ষেত্রে জন টমাস সোজা সাত ফুটের ওপরে ...ত পারলেন না। ফলে রাশিয়ার সাতলাকাজে ...মেলের কাছে টমাসকে হার স্বীকার করতে হল। ...যজনের বিচারে হাইজাম্পে টমাসের শীর্ষস্থান না ...ার দুটোস্টিই রোম অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ...চয়ে অপ্রত্যাশিত নজীর। যাকে বলে 'নেভার ...সেট'। এছাড়া 'মাইনর আপসেট' বলতে বোঝায় ...পাল্লার দৌড়ে রে নটনের, ও হ্যামার নিক্ষেপে ...বোর্ণের চ্যাম্পিয়ান ও বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী হল ...মাণী; বর্শা নিক্ষেপে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী এ ...নুয়েলো ও বিলঅ্যালের এবং স্বল্প পাল্লার দৌড়ে ...বোর্ণের চ্যাম্পিয়ন কুমারী বোট কাথবার্ট ও সাঁতারে ...রী ইল্‌সা কনরডিসের পরাজয়।

পুরানো চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে হার্ডলার গ্রেন ডেভিস ...ী কলহোন এবং সাঁতারু মারে রোজ ও ডন্‌ফ্রেজার ...া বোধ হয় আর কেউই রোমে তাঁদের অপরাজিত ...খ্যা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। তাও আবার রোজ ও ...ফ্রেজারকে বিভাগ বিশেষে পরাজয় মানতে হয়েছে। ...র যেসব নতুন প্রতিভার আবির্ভাবে পুরানো নজীরগুলি ...ন হয়ে গিয়েছে তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ...ষ্ট্রেলিয়ার হার্ব ইলিয়ট ও রুমানিয়ার ইওলান্ডা ...লাস।

দুজনকেই অনভোচে 'সুপার অ্যাথলিট'এর পর্যায়ে ...লা করে। ইওলান্ডা বালাস হলেন একমাত্র সেই

শট পাট নিক্ষেপে রুশ মহিলা এগাথাসেট তামার মেডেল।

মহিলা যিনি হাইজাম্পে ছ ফুটের বাধা ডিঙোতে পেরেছেন। রোমে এসে স্বচ্ছন্দ আয়াসে পৌনে সাত ফুট ওপরে উঠে তিনি আবার নিজের বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। হার্ব ইলিয়টের মাইল দৌড়ে বিশ্বের রেকর্ড আছে এবং চার মিনিটের কমে বারবার এক মাইল দৌড়াবার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন একমাত্র তিনিই। রোমে এসে তাঁর নিজের অর্জিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে নিজের হাতে তাঁকে ভাঙতে হয়েছে ১৫০০ মিটার দৌড়ে তাঁর নিজের সৃষ্টি বিশ্বের রেকর্ড।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে রোমে ১৫০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতাটিই ঘটেছিল সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠান কম পক্ষে ছ জন প্রতিযোগী সেদিন পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ডকে পেছনে ফেলে চলেছিলেন। তবুও বাকি পাঁচজন শেষ পর্বে হার্ব ইলিয়টের নাগাল ছুঁয়ে

এবারের অলিম্পিকের বিশেষ বিশেষ
ত্বের নি। ইলিয়ট ি কেন
ার পাঁচজনের ভাড়ে,

পেছন ফিরে তাকালেন না। পা দুটোর শিরে একেবারে চরমসীমার ওপারে দিয়ে। এই অনায়াস সাফল্যের দৃষ্টান্তে এক মহান আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ প্রতিষ্ঠা প্রতিভাত হয়েছে মহত্তর পথেই।

মানুষের মহান প্রকাশের ক্ষেত্রকে অনুকূল করে রাখার জন্যেই অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। রোমের আয়োজন সে সত্যের বাস্তব রূপায়নে সর্বশ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ ঘটিয়েছে। মত ও পথের ব্যবধান ভুলে অন্যূন পঁচাশীটি দেশের তরুণ-তরুণীরা মিলেছেন সর্বজনীন ক্রীড়াভূমিতে। আশার কথা, আদর্শের মূল্যমান এখনও নেমে যায়নি মানুষের দৃষ্টিতে। মানুষ তাই মানুষ হওয়ার সাধনা করছে অলিম্পিকের আদর্শের সূত্রটিকে হাতে নিয়ে। বিশ্বাস হয়, সে সাধনা জয়যুক্ত হবেই কারণ অলিম্পিক-আন্দোলনের প্রসারিত কল্যাণ-স্পর্শ দেশ দিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বের অজ প্রত্যন্তে।

আজব দুনিয়া

শ্রীজ্ঞানপাপী

কিউবার রাজধানী হাভানা হইতে যত যত আমিষাছে তাহারা একের পর এক মার্কিন প্রতিষ্ঠান-গুলি জাতীয়করণ করিতেছেন।

বহু বৎসর বিজয়ী হইয়া অলিম্পিকে পরাজিত হইয়াছে।

টাকা উদ্ধার করিতে গিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন আরো ১৭,০০০ টাকা গচ্চা দিয়াছে।

ছেলের চেয়ে ঘুড়ী বড়।

O

সিনেট হল চূর্ণ করিবার পর নির্মল সিদ্ধান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গিয়াছেন।

এবারে বোধ হয় লালাকেল্লার পালা!

O

ডাক্তার সুবোধ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হইয়াছেন।

অপারেশনে সফল হইলেও রোগী বাঁচিবে কি?

O

জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—২৬ ধো সংখ্যাধিক্যের জন্যই সমস্ত হইয়া যাইবে।

O

ও অপসারিত হইয়াছেন—সংবাদ।

ব-হ-টা-র!

মহাত্ম-সংকট

সংবাদ সম্পূর্ণ তিরোহিত।

● রামেশচন্দ্র সেনের

কাজল ৬·০০

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ২·৫০

● সুশীলকুমার ঘোষের

গ্রহসারথি ৬·০০

● গৌরশঙ্কর ভট্টাচার্যের

আকাশ নন্দিনী ৩·৫০

রাত্রির বয়স ৩·৫০

গ্র্যাণ্ড হোটেল ৬·০০

(ফিঞ্চি ব'উমের গ্র্যাণ্ড হোটেলের অনুবাদ)

● সজনীকান্ত দাসের

রবীন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সাহিত্য ৬·০০

● শিবনারায়ণ রায়ের

নায়কের মৃত্যু ৪·৫০

● শ্যামলকুমার চাট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ৬·০০

● রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাগার প্রচার ২·০০

● ডক্টর নারায়ণী বসুর

Political Philosophy After Hegel and Marx. 5·00

—প্রকাশের অপেক্ষায়—

● গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

মিলনান্ত

● ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের

তারাশঙ্কর

● গৌরকিশোর ঘোষের (রূপদর্শী)

জলবত্তরলম্

● বোম্বানা বিশ্বনাথমের

দুধের স্বাদ

শতাব্দী গ্রন্থ ভবন ঃ ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭।

ফোন : ৩৪-৪৯২১

রঙ্গ জগৎ

কুমারগুপ্ত

অঙ্গারের দ্বি-শত রজনী

ভাল নাটক, ভাল সাহিত্য, ভাল শিল্প যে জনপ্রিয়ও হতে পারে একথা মানতে চান না অনেকে। ভাল এবং জনপ্রিয় কথা দুটি যেন বিপরীতধর্মী। জনপ্রিয় জিনিষ ভাল হতে পারে না আর যা কিছু ভাল তাকে জনপ্রিয় হবার আশা বিসর্জন দিতে হবে—আমাদের দেশের একদল উদ্ভাসিক এই রকম একটা বক্তব্য উপস্থিত করে থাকেন।

এদের সঙ্গে তর্ক করা চলতে পারে। কিন্তু তর্ক করবার প্রয়োজন কি যখন প্রমাণ কাছেই রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা 'অঙ্গারের' কথা বলছি। আমরা দাবী করছি 'অঙ্গার'কে একটি উৎকৃষ্ট নাটক বলে, আর সেই উৎকৃষ্ট নাটকটি জনপ্রিয়ও বটে। 'অঙ্গার' দুশো রজনী পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পার হয়ে গেল এমন একটি হলে যেখানে কিছুদিন আগেও মানুষ যেত না। ভাল জিনিষ জনপ্রিয় হতে পারে এবং জনপ্রিয়তা মানে লঘু কিছু নয় 'অঙ্গার' তার একটি সার্থক প্রমাণ।

"অঙ্গার' সেই সঙ্গে লিটল থিয়েটার ও উৎপল দত্তকে আমরা অভিনন্দিত করছি। বাংলা নাটক যখন মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না—এরা পথ দেখালেন। শুধু আঙ্গিক নয়, প্রাণবান বিষয়বস্তু চাই তারই বলিষ্ঠ ঘোষণা 'অঙ্গার'। বাংলা দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক ও কৃষক হলেও শ্রমিক-কৃষক জীবনের উল্লেখযোগ্য ছাপ বাংলা সাহিত্যে পড়েনি—শ্রমিক-জীবন তারও মধ্যে গৌণ স্থান পেয়েছে। বাংলা নাটক সম্পর্কে এ কথা আরো সত্যি। 'অঙ্গার' তার ব্যতিক্রম।

বিভ্রান্ত 'বহুরূপী'র মত শুধু আঙ্গিকের যাদু দেখানো বা শুধু শক্তিমান এক বা একাধিক নটের সাহায্যে কেল্লা ফতে করার চেষ্টা নয়, 'টীম ওয়ার্ক' নাটককে কতখানি সাহায্য করতে পারে 'অঙ্গার' তারও প্রমাণ।

লিটল থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। 'শ্যামলী' 'উল্কা' 'এক মুঠো আকাশ' 'এক পেয়ালা কফি' বা 'তাজ বাংলো'র মত নাটক যখন মঞ্চ জাঁকিয়ে বসে আছে, তারই পাশাপাশি এ রকম একটা নাটক সাফল্যলাভ করতে পারে এ যেন ভাবাই যায় না। ভাল জিনিষ পেলে বাংলাদেশের জনসাধারণ তা গ্রহণ করতে রাজী আছেন, এটা তার প্রমাণ।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ ও উৎপল দত্ত যে ধারার প্রবর্তন করলেন তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে চলুন—এই আমাদের কামনা আর সেই সঙ্গে কামনা করি 'অঙ্গার' অভিনয় আরো কয়েক শত রজনী পেরিয়ে যাক।

•

গত ১৩ই অক্টোবর গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নাটক হিসাবে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' নাটকটি নবকল্লোল-এর প্রযোজনায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে গেল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক ও 'উদ্ধারণপুরের ঘাটে'র লেখক স্বয়ং অবধূত এই নাটকে সাঁই-বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রেক্ষাগৃহে সেদিন তিল-ধারণের স্থান ছিল না।

'উদ্ধারণপুরের ঘাটে'র কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়া ও মাত্র তিন সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে অভিনয়-যোগ্য করে তোলা সহজ কাজ নয়। সে কাজটি যদিও সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু অভিনয়াংশে খুবই দুর্বল মনে হল। অভিনয়ের পূর্বে যথাযথ রিহার্সালের ব্যবস্থা হয়েছে বলেও মনে হল না। কিন্তু সাঁই-বাবার ভূমিকায় অবধূত একটা প্রমাণ করলেন—বাংলাদেশ যেমন আকস্মিক ভাবে সাহিত্যিক অবধূতকে পেয়েছে তেমনি আকস্মিক ভাবে এক নট অবধূতেরও আবির্ভাব হতে পারে।

টুকরো খবর—

বোম্বাই এর এক সংবাদে প্রকাশ যে সত্যেন বসু পরিচালনায় বসু চিত্র মন্দিরের "দার্জ্জ্রেও" ছবির কাজ সমাপ্তপ্রায়। হেমন্তকুমারের সঙ্গীত-সমৃদ্ধ চিত্রটির প্রধ

নকায় নামছেন জনপ্রিয় অভিনেতা কিশোরকুমার ও
াহিয়া রহমান।

•

তারাশঙ্করের আবেগময় কাহিনী ...''র চিত্ররূপ
সম্প্রতি অগ্রগামী পরিচালিত এই কাহিনীর
ান চরিত্রে রূপদানে করছেন উত্তমকুমার। নায়িকা
হবেন সে কথা এখনও পরিষ্কার ভাবে জানা
নি। চিত্রনাট্য লিখছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক
রেশ বসু

সাংবাদিক সন্তোষ ঘোষের লেখা বাঙালী পাঠকের
ছ অপরিচিত নয়। সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সৌমিত্র
াধ্যায় "স্বয়ম্বরা"র অভিনয় করবেন বলে চুক্তি বদ্ধ
ছেন। অসিত সেনের পরিচালনায় এই রোমান্টিক
নীটির চিত্ররূপ দর্শনের জন্য দর্শক মাত্রই অত্যন্ত
হের সঙ্গে অপেক্ষা করবে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই
র সঙ্গীত পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে।

•

চিত্রজগতে সত্যিকার হাসির ছবির চাহিদা এখনও
আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। শৈল প্রোডাক-
র প্রথম প্রয়াস "মানসী" এ ক্ষেত্রে আর একটি
প। লেখক স্বয়ং কুমারসরকার ছবিটি পরিচালনা
ন। তরুণ, অরুণ, তুলসী, নৃপতি, ও গীতাদে
মেডিয়ানরা বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন। সুর-
জনা করছেন মচিকেতা ঘোষ।

•

লাপ বিহীন কাহিনী সবাক চলচ্চিত্র যুগের এক
র্ব বিস্ময়। তরু মুখার্জীর "ইংগিত" সাম্প্রতিক
মূক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিস্ময় সৃষ্টি করবে বলে
। অনেক চেনা-মুখ এই মূক অভিনয়ে
বে।

• •

ত বৎসর অন্তর্ধা সাংস্কৃতিকদল ভারতে আসে
। এই আসা-যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন
মানুষের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করা। এই
নিয়েই দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কমলা-
হচ্ছেন।

—ডি রূপ এর পরিচালনায় "মায়া" চিত্রে, দক্ষিণ
আমেরিকার নৃত্যশিল্পী মারিয়ার অংশ গ্রহণ ঐ ছবির
আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে। ভারতীয় চিত্রে এই বিদেশিনীর
আগমন কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ আনবে।

পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার চরম ফল ভারত-
বিভাগ। হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের ভালবাসাকে কেন্দ্র
করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে আর একটি ছবি রচিত
হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীভি কেড়
পালাসপাগরের উপস্থিতিতে কমল আমরোহি বিরচিত
"শরর ধোসেন" এর স্যুটিং এর কাজ শুরু হয়। ছবিটি
প্রযোজনা করেছেন শ্রীমধুসূদন।

•

আসামের সাম্প্রতিক ভাষা-আন্দোলনের ফলে যারা
গৃহহারা হয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য রাণীগঞ্জে সম্প্রতি
এক নাটক ও জলসার ব্যবস্থা করা হয়। বহু অভিনীত
"দেবলাদেবী" অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।
কলকাতার কিছু পেশাদার অভিনেতাও অনুষ্ঠানে অংশ
গ্রহণ করেন। হীরালাল সা'র অভিনয় একবাক্যে
রাণীগঞ্জবাসী সবার প্রশংসা অর্জন করে। কিছু সরকারী
উচ্চপদস্থ কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে
গৃহীত সমস্ত অর্থ কলিকাতায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
নিকট প্রেরিত হয়।

• •

দীঘার সমুদ্র সৈকত এখন কেবলমাত্র বেড়ানোর জন্য
নয়, সিনেমার স্যুটিং এর এক অত্যন্ত উপযুক্ত ক্ষেত্র
বলে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমানে "ঢেউয়ের পর ঢেউ"
এর কাজ চলেছে দীঘার উত্তাল সমুদ্র সৈকতে। ভূপেন্দ্র
সান্যাল ও স্মৃতিশ গুহঠাকুরতা ছবিটি যুগ্মভাবে পরিচালনা
করছেন।

অসহায় ছিন্নমূল অগণ্য উদ্বাস্তু নগরের এক প্রান্ত হতে
আর এক প্রান্তে চলেছে—তাদের নীরব কথা তাদেরই এক

সত্যজিতের গানে প্রকাশ পাচ্ছে—এমনই এক পটভূমিকায় চন্দ্রাবাদের প্রসঙ্গে সংগৃহীত "অমর বহে-ই লেগায়ে" এর শেষ দৃশ্যটি গৃহীত হয়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীপ্রভু।

•

দিল্লীর নিউজপেপার মহলে খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের তরফ থেকে পশ্চিম জার্মানীতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবিশঙ্করের "ডাকঘর" নাটকটি এ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

প্রবাদ সাহিত্যিক সমরেশ বসুর সাহিত্য-সাফল্য চিত্র নির্মাতাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন মহল থেকে সমরেশ বসুর যে সব কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া নিয়ে জোর আলাপ আলোচনা চলেছে তার মধ্যে 'নেই তাই' 'বাঘিনী' 'ছেঁড়া তমসুক' 'এক এক ছায়া' অন্যতম।

• •

অভিনেত্রী জীন সেবার্গকে বহু বছর হলিউডে অভিনয় করে তিনি আমেরিকান দর্শকদের মনের পড়েছিলেন কিছুদিন আগে। সম্প্রতি ফরাসী চিত্রজগৎ মহল নূতন করে আবিষ্কার করেছেন সেবার্গকে। তাই বর্তমানে বিভিন্ন ফরাসী চিত্রে অভিনেত্রী হিসাবে যে সুডৌল একটি মূল শোভা পাচ্ছে সে মূলটি জীন সেবার্গের।

• •

পৃথিবীর চলচ্চিত্রে সম্প্রতি যে ছবিখানি বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে তার নাম 'আই এ্যাম এট দি স্টারস্।' চার্লস [illegible] যৌথ প্রযোজিত [illegible] পরিচালিত চিত্রটিতে একটি অনন্য [illegible] গড়ে তুলেছেন কার্ট জার্গনস্

• •

ভিয়েনার বিখ্যাত কার্টুনশিল্পী এরিখ [illegible] আধুনিক কালে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের শিরোনামগুলি এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়। পৃথিবীর চিত্রতারকেরা এ গ্রন্থখানিতে নতুন এক অভিনয় দান করেছেন।

•

আধুনিক বিশ্বরাজনীতিতে যাঁরা আগ্রহশীল নিশ্চয় তাঁদের চোখে পড়েছে 'আফ্রিকা' সাম্প্রতিককালে এ রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে আফ্রিকার অভ্যন্তর এখনো অগম্য, এ দিবাদীপের সন্ধানে কেন্দ্র প্রত্যক্ষ হাতে নেওয়ার [illegible] সাংবাদিক টমাস স্টার্লিং তাঁর আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে ছড়িয়েছেন 'স্ট্যানলীস্ ওয়ে' গ্রন্থটিতে আফ্রিকা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য এমন একখানি গ্রন্থ রসিক-পাঠক মাত্রই আদৃত হবে।

রূপকথায় সে এক রাক্ষসের গল্প আছে যার মৃত্যু হয়েছিল রাজপুত্রের তরবারির আঘাতে। সাম্প্রতিক রঙ্গ চিত্র "দি সোর্ড অ্যাণ্ড দি ড্রাগন" এমনি একটি কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই চিত্রটি বর্তমানে প্রদর্শিত হচ্ছে। ভারতবর্ষেও এর জনপ্রিয়তা। চিত্রটির উৎকর্ষতারই পরিচায়ক।

প্রস্তরযুগে এই অসংস্কৃত সহজাত শিল্পটি সুস্পষ্ট এবং বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠে, যাহা হইতে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, মানুষ সোপাই-শিল্পকার্যে সেই সময়েই কতকটা বাহ্যিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

সেই যুগে মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সম্বন্ধে কিছু লিপিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা তাহা বুঝা যায় না, এবং আজ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক মুদ্রণ-শিল্প যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছে তেমনি ইহা তীব্র প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হইয়াছে। এখন কাজ কেবল সুন্দর ও পরিপাটী হইলে চলিবে অধিকন্তু কাজ যথা সম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করাও চাই

● নিখুঁত মুদ্রণ

● সুন্দর ডিজাইন

● সত্বর সরবরাহ

লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ

প্রিন্টার্স ও কার্ড-বোর্ড বক্স মেকার্স

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ :: ফোন ৫৫-৪৪২৫

অগ্রহায়ণ
১৮৮২
পঞ্চম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

বিংশ শতাব্দী

বাঙালীর ইংরেজি কাব্য-চর্চার প্রেরণা প্রসংগে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি ইংরেজি থেকে অনূদিত; ইংরেজি ভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধটি দি বেংগলী বুক অব্ ইংলিশ ভার্স নামক পুস্তকের ভূমিকা; উক্ত পুস্তকখানির সংকলয়িতা বিওডোর ওয়ক্লাস ডুন; গত শতকের বাঙালী কবিদের ইংরেজিভাষায় লিখিত কিছু কবিতার এই সংকলন ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়; যখন এই সংকলন প্রকাশিত হয় তখনও রবীন্দ্রনাথ স্যর পেতার ত্যাগ করেননি—তাই প্রচ্ছদপটে তাঁর নামের আগে পেতার জুড়ে দেওয়া আছে। আরও বৈশিষ্ট্য হলো, যদিও তার আগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে এবং সেই সূত্রে ইংরেজ পাঠক-সমাজে সুপরিচিত হয়েছেন তথাপি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও সংকলনে স্থান পায়নি—কারণ সংকলক গ্রন্থখানিকে memorial of Bengali achievement in the language of the British Empire বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সংকলয়িতা বোধের স্যর জগদীশ বসুকে উদ্দেশ করে লেখা একটি বাঙলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নামে। এই সংকলনে আছেন কালীপ্রসাদ ঘোষ, রাজনারায়ণ দত্ত, মধুসূদন দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, নবকৃষ্ণ ঘোষ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, তরু দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, রবি দত্ত, প্রফুল্লরঞ্জন সেন, সরোজিনী নাইডু, মনমোহন ঘোষ। এই প্রসংগে আরও উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণকুমারী লহিড়ী দত্ত ১৯০২ সালে লিখিত ইণ্ডিয়ান্ পোয়েটার্স অব্ ইংলিশ ভার্স নামক প্রবন্ধ পুস্তকের অতি ক্ষুদ্র একটি ভূমিকাও রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন—সেই পুস্তকে ডুন সম্পাদিত পুস্তকের বর্তমান অনূদিত ভূমিকা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়েছিল। তারপরে এই প্রবন্ধটির কথা আর কোথাও উল্লিখিত হয়নি—বাংলা ভাষার আর কোথাও কখনও অনূদিত হয়েছে বলে জানিনা—সম্ভবত এ-ই-ই প্রথম বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন আনন্দ দে। —সম্পাদক]

পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে বাঙলাদেশ নাড়া দিয়েছিল। সব চেয়ে আগের সেই আত্মধারণক্ষম সাক্ষী হিসাব এই সংকলনের তাই সুবিপুল মূল্য। অতি সহজেই জোরের সংগে বলতে পারি প্রাচ্যে সেই হলো একমাত্র দেশ যে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে য়ুরোপের বাণী তার কাছে পৌঁছিয়ে তাকে যে চকিত করেছে তার প্রথম শিহরণের স্পষ্ট চিহ্ন সে রেখে গিয়েছে। বিজাতীয় ভাষার বিপজ্জনক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক অভিযানের মূল্যবিচার নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো নেই। কিন্তু উল্লেখ্য ঘটনা হলো, য়ুরোপ আমাদের কাছে যে প্রভূত বীর্য ও ঐশ্বর্য তুলে ধরেছে তার দৃষ্টে যখন প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ মোহিত, তখন বাঙলা দেশ পশ্চিম দিগন্ত থেকে আসা নূতন ভাবের শক্তিতে নাড়া খেয়েছিল। আমাদের ছাত্রদের ওপর তার প্রথম ফল, যা কিছু গোঁড়া সংস্কার তার পরে মারমুখী বিরোধিতার মত্ততায় পেয়ে বসলো, তা গুণাগুণ সে-সবের যাই থাক্। যুগ যুগ ধরে যে নিপীড়ন চলেছে তার বিরুদ্ধে এ হলো জীবনের এক আকস্মিক আত্মসচেতনতা। বাঙলাদেশকে জাগিয়ে দিল এই যে আঘাত, এ আঘাত এসেছে মূলত সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। এবং আপনাকে প্রকাশ করার জন্যে তার শক্তির বড় একটা অংশ সাহিত্যের সেই পথই গ্রহণ করলো।

য়ুরোপের সংগে মনের প্রথম যোগাযোগের দিনে বাঙলাদেশে ভাবের যে ভিয়ান্ হয়েছিল তার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নিদর্শন হলো ভারতের প্রতি রামমোহন রায়ের জীবনের বাণী। সে জীবন ঈশ্বরের সর্বতঃপ্রসারিত একত্বের অধ্যাত্মভাবে কেন্দ্রীভূত উপনিষদগুলিতেও তা ব্যাখ্যাত এবং সে জীবন নৈতিক-ক্রিয়াকাণ্ড থেকে

রাজনৈতিক কার্যকর্ম পর্যন্ত মানুষের সকল রকমের কর্মকলাপের পরিধিতে প্রসারিত। এ ছিল জাগরণের আহ্বান, পুরোপুরি জীবনের আহ্বান, আন্দোলনের প্রতি অন্ধপ্রীতির থেকে নয়। এই জীবন চালিত হত ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রজ্ঞার মর্ম থেকে আসা এক অন্তরের নির্দেশে।

যদিও ওপরের উদাহরণ আমাদের জীবনের সারবত্ত অংশের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পৃক্ত নয়, তবুও আমি এইটে দেখানোর জন্যে উল্লেখ করেছি যে, ভাবাদর্শের প্রতি স্পর্শকাতরতার ভেতর দিয়েই বাংলাদেশ য়ুরোপের সংগে তার প্রথম সংযোগে বিপুল ভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। আর তার পর থেকে সে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথে সেই একই অন্তর্দৃষ্টির গঠন করে চলেছে। যুগ যাদের আছে, গঠনমূলক কাজে যাদের প্রীতি, তারা তাদের সৃষ্টি-কর্মকে যথার্থ রূপে এবং সুসমঞ্জসভাবে ঐক্যতার ভেতর দিয়ে দেখতে পারে। কিন্তু তাদের কাজ জীবনের গভীরে, মাটি ও বীজেও সে মৌলিক পরিবর্তন আনে সে। এবং সে তার নিজস্ব সময়ে অন্তর থেকে ঠেলে বেরোয় সজীব সুচলশীল রূপের মধ্যে। তার গোড়ার দিককার সৃষ্টি মনে হবে বিদেশের কাছে, অন্তরোধের বিকাশে। পছন্দ-অপছন্দের অবিরাম দোদুল্যমানতায় নিয়োজিত হয়ে হয় বিনষ্ট। এবং সেই জন্যে লঘুচিত্ততা ও অতিরিক্তিতার অভিযোগও তার পরে আসতে পারে। কিন্তু জীবনের প্রতি পদক্ষেপের দিক আছে, অনিশ্চয়তা ও পরস্পর বিরোধিতায় পূর্ণ থাকার দিক হয়েছে। চাঞ্চল্যের যে চিহ্ন বাংলা দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, তার বৃদ্ধির মীমাংসায় অতি স্পষ্ট বা তার সত্তার কেন্দ্রে যে সৃষ্টিধর্মীতারের কাজ চলছে তা প্রমাণ করে। বিশ্বাস করি, প্রাচ্যের সকল দেশের থেকে বাংলাদেশই যে জীবনের আদর্শ খোঁজার কাজে ব্যগ্রতার সংগে নিযুক্ত ছিল একথা বলে আমি কেবলমাত্র আমার দেশ-প্রেমের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করছিনে। আধুনিক কালে বাংলাদেশ যে সব বড় বড় ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে তাঁরা তাঁদের জীবনেই জীবনের গূঢ় সমস্যার কোন কোন আদর্শ সমাধান আমাদের দিয়ে গেছেন। বেশ জানি মানব জাতির প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি অকিঞ্চিৎকর; তাল করেই জানি বাঁচতে যদি হয়—তবে আরও অনেক বেশি জরুরী প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। আর সেই জরুরী প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আমরা যে সক্রিয়ভাবেই গুরুত্ব দিতে সুরু করেছি তারও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই সংগে স্বীকার করতে হবে, ক্ষতি আমাদের যাই হোক, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে যে উপকরণগুলির প্রয়োজন সেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার চেয়ে আমরা সেই সব ভার নিয়ে বেশি মেতেছি যা আমাদের কল্পনা-শক্তিকে প্রদীপ্ত করে আত্মার মধ্যে দোলা লাগিয়েছে। এই ঘটনা ঠেলে দিয়েছে বাংলাদেশকে নূতনে পুরাতনে এক জোয়ারের সংঘাতের দিকে, ঠেলে দিয়েছে জীবন সম্পর্কে তার সতত পরিবর্তনশীল মনোভঙ্গির দিকে। এবং পৃথিবীতে সুচিরকালের জন্যে পর সত্য আসন জয় করতে যে ভাবার্থক কোন একটা কিছুর প্রয়োজন তার সন্ধানে হাতড়িয়ে বেড়ানোর অস্থিরতার দিকে।

আমাদের বর্তমান রেনেসাঁর যুগ তার যাত্রা শুরু করেছিল বিদেশী ও বহিরঙ্গ বিষয়ের পরে অত্যধিক আস্থা রেখে। শেষে বুঝেছিল জীবন হচ্ছে নিয়ত আত্মবিকাশের একটা প্রক্রিয়ামাত্র যার প্রেরণা আসে আপন সত্তারই কেন্দ্র থেকে। বাংলাদেশে আমরা এই বিকাশের সকল বিভিন্ন স্তরেরই সাক্ষাৎ পাই। এবং তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের চেয়ে এখানেই দেখি পশ্চিমের অনুকরণের প্রীতির ঝোঁক অনেক দূর পর্যন্ত গেছে চটক ও অসামঞ্জস্য নিয়েও স্ফীত গর্বে। পক্ষান্তরে, এই বাংলাদেশে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে যে সত্যানুসন্ধানে তাঁরই জন্যে সাম্প্রতিক সকল আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। যে পশ্চিম প্রথমে আমাদের টেনে নিয়েছিল নিজের দিকে সেই-ই জোরের সংগে ছুঁড়ে দিয়েছে পরে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রগাঢ় সচেতনতার পরে। প্রেরণায় যে প্রাণবায়ু এসেছিল পশ্চিম থেকে সেই প্রাণবায়ু মৃত অভ্যাসের স্তূপরূপে গতানুগতিক আদর্শের কাঠিন্যের তলায় যে অমর অগ্নি-কণা আবৃত ছিল তা প্রজ্বলিত করেছে অগ্নিশিখায়। আমাদের সাহিত্য যে ধারা নিয়েছে তাতেই একথা প্রমাণ হয়, আগেকার বিদেশী অথা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক পথ খুঁজে পেয়েছে। বাঙালীর লেখা ইংরাজি কবিতার বর্তমান সংকলনও তাই প্রমাণ করে। এর প্রথমাংশের রচনাগুলো একান্তই অনুকরণাত্মক। এবং শেষ অংশের রচনাগুলো আপন দীপ্তিতে ভাস্বর যেন অমরতার দাবি নিয়ে মহাকালের বিচারের চ্যালেঞ্জ করছে। আমি বিশ্বাস করি, এই গ্রন্থ পাঠের সময়ে বিদেশী পাঠক এই নিয়ে চিন্তা করার অনেক কিছু পাবেন যে পশ্চিমের আহ্বানে বাংলাদেশ সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যে সাড়া দিয়েছিল তা আধুনিক প্রাচ্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এর একটা ভবিষ্যৎ আছে, কারণ এ দেশ যে জীবন চঞ্চল। এখানে রয়েছে সেই আশা যে একদিন দুঃসাহী পশ্চিমের সংগে অমর শান্তির প্রাচ্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে এ হয়ে উঠবে একটা মহৎ মাধ্যম।

তলস্তয় ঃ জীবন ও সাহিত্য

পরিতোষ মুখোপাধ্যায়

★

এক স্বল্পপরিচিত রেল-ষ্টেশনের কক্ষে উপস্থিত হলেন একবৃদ্ধ—শুভ্রশুশ্রু-মণ্ডিত ঋষিতুল্যচেহারার মানুষ। দিনটি ১৯১০ সালের ২০ শে নভেম্বর। ষ্টেশন-মাষ্টার অনেক খাতির করে আনলেন নিজের ঘরে—কৃতার্থ হলেন সেই ছোট ষ্টেশনের ততোধিক ছোট ষ্টেশনমাষ্টার। গরীব চাষীর ঘরের ছেলে, কোনরকমে হতে পেরেছেন ষ্টেশনের কর্তা—কিন্তু তাই বলে এ-ঋষিকে ভোলেন কেমন করে। কপনও কি আর এমন সৌভাগ্য হবে। এ-ঋষি শান্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন ঘর ছেড়ে—অনেক বিনয় করে জানতে পারলেন একথা ষ্টেশন মাষ্টার। কিন্তু ঠাণ্ডায় শীতে আর এগুতে পারেন নি—ভ্রমণের আশা ত্যাগ করে এখানেই তাই নেমে পড়তে হয়েছে। ষ্টেশনমাষ্টারের হৃদয় আনন্দে আথাল-পাথাল—কিন্তু হঠাৎ বিষাদ হলো তাঁরই ঘরে আর তাইই চোখের সামনে হঠাৎ সেই ঋষি দেহরক্ষা করলেন—সেই দিনই! হাহাকার করে উঠলেন ষ্টেশন-মাষ্টার আর আশপাশের যত চাষীমজুর মানুষ ছিলেন সবলে—ঋষি তলস্তয়ের মৃত্যুতে। তারপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলো তলস্তয়ের নিজের বাড়ীতে কিন্তু সমাধিস্থ করার জন্য গীর্জা থেকে কোন পাদরী এলেন না—এলো হাজারে হাজারে চাষী মজুর। পাদ্রী এলো না—কারণ, বর্জন করেছে তাঁকে রাশিয়ার ধর্ম-নেতারা। কারণ, তাঁর জীবন নাকি নাস্তিকের জীবন; তাঁর লেখা নাকি নাস্তিকের পরিপোষ্টা। তাই ১৯০১ সালেই ধর্মচ্যুত বলে ঘোষণা করেছে তাঁকে—অথচ নিরীশ্বরবাদী গোর্কীকে একদিন কথায় কথায় শুধোলেন তলস্তয়—"তুমি ভগবান মানোনা বলছো, সেটা ঠিক কথা নয়; তুমি কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরবিশ্বাসী। ঈশ্বর না মেনে তোমার উপায় নেই! বুঝতে পারবে তুমি শীগগিরই। তুমি মানোনা কারণ, তুমি একগুঁয়ে আর খাপ্পা তুমি দুনিয়া সম্বন্ধে। তুমি যেমনটি চাও, জেনো তেমনটি কখনও হয় না দুনিয়াটা। লজ্জার বশে ভগবান অনেকেই মানেন'—তরুণ বয়স্করা মানেনা প্রায়ই সেই কারণে।... জানো, বিশ্বাস করতে গেলে বুকে বল চাই, চাই বেপরোয়া ভাব। মনে মনে বলো—'বিশ্বাস করি' দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে, তোমার কাছে জগৎ ধরা দেবে।" গোর্কিও শেষপর্যন্ত নিজে নিরীশ্বর চেতনার বিমূর্তবিগ্রহ হয়েও বলেছেন, মানুষটা দেবতাই বটেন—তবে আর সব দেবতার থেকে যোলআনা চতুর হবেন হয়ত তাই। কিন্তু পাথর দেখলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী তলস্তয় শালগ্রামশীলা বলে তাকে মনে করতেন না—মনে করতেন না শিবমন্দির ভাঙাঘর দেখলেই। বলতেন,—দেখো, যাদের প্রচুর আছে তাদের সংখ্যা কম, আর তাদের আছে বলেই ভগবানকে [redacted], যাদের কিছুই নেই, সংখ্যায় যারা বেশী, তারাও মানেন ভগবানকে কিছুই তাদের নেই বলে!

তলস্তয়ের মত লোক কোটিকে গোটিক মেলে। তাঁর মূল্য যথাযথ নিরূপণ করতে গিয়ে [redacted] সমালোচক মোটেই অত্যুক্তি করেননি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, Leo Tolstoy or his life not born every day not even every age. ভক্তের শ্রদ্ধা-নিবেদন নয় এ উক্তি, সমালোচকের বিচার; সেদিন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 'অমৃতপ্রাণ' বিশেষণ দিয়ে। জীবনের প্রতি যে সুবিপুল মমিতাবোধ থাকলে অমৃত-প্রাণ বিশেষণে বিশেষিত হওয়া যায়, তলস্তয়ের তা ছিল। সেদিকে লক্ষ্য করেই গোর্কি বলেছেন—He so much of the fire of life in him that he seems of sweat sparks, like a red-hot iron.

টুলা শহরের কাছে ১৮২৮ সালের ২৮শে আগষ্ট তলস্তয়ের জন্ম হয়। অত্যন্ত অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন কাউণ্ট, আর মা রাজকুমারী। নাড়ীর যোগ তাঁর রাজসভা আর রাজরক্তের সংগে। তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধ ও শান্তি (ওয়ার এণ্ড পীস্) নামক

উপন্যাসে রস্টভের ও মারিয়া বোল্‌কোন্‌স্কি চরিত্র তাঁর বাবা ও মায়েরই চরিত্র। খুব ছোটতে মাকে হারান তলস্তয়; তার ভাই আর এক বোন তাই মানুষ হন পিসিমার কাছে। এই পিসিমার প্রভাব জীবনে শেষদিন পর্যন্ত অনপনেয় ছিল। পিসিমা ছিলেন ধর্মভীরু রমণী—তাই, ছোটবেলা থেকে তলস্তয় মানুষ হন এক ধর্মীয় পরিবেশে—এবং ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য নিজের জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত খুঁটিয়ে তুলেছেন। অথচ ধর্মীয় নেতারা তাঁকেই নাস্তিক অপবাদে ভূষিত করেছে।

তলস্তয় কাজান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। উদ্দেশ্য ছিল কূটনীতিক হবেন; তাই আইনও পড়েছিলেন—আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও; কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ঠিক করলেন তাঁর জমিদারীর কৃষক সমাজের সংগে মিশবেন। একথা তাঁর জীবনের একেবারি পর্যায়ের [illegible] করেও বলা যায় যে, এই কৃষক সমাজের কাছে তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মের জন্য কৃতজ্ঞ। যাই তিনি লিখতেন তা প্রকাশের আগে এই সমস্ত কৃষকদের নিজের ঘরে ডেকে এনে শোনাতেন তাঁর লেখা—তাদের বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করে তবেই তিনি তাঁর লেখা হাজির করতেন সাধারণ পাঠকের দরবারে।

তলস্তয় কিছুদিন কসাকবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। সেই সময়েই তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার উন্মোচন। ১৮৫২ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস চাইল্ডহুড্ প্রকাশিত হয়। সেই অর্থে একে আত্মজীবনী বলা যায় যে অর্থে ডেভিড কপারফিল্ড ডিকেন্সের আত্মজীবনী। এর পরে বেরোয় দি কসাক্স্ আর দি ইনভেডর্স্। খুব বড় কিছু সৃষ্টি এ দু'খানা নয়। তবু, এখানে তলস্তয়ের রোমান্টিক কবি-মানসের কিঞ্চিৎ পরিচয় মেলে। অনেকটা টিভেনসনের লেখার ভংগী আমরা এ দু'খানিতে পাই। বন আর পর্বতের গন্ধ, শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাতের অরুণিমা দু'খানি উপন্যাসের পাতায় পাতায় রয়ে গেছে। এক মুক্তপ্রাণ মনের স্বচ্ছন্দের অভিসিঞ্চন। জীবনের বহু বিচিত্র রঙ্গ-পথে তাঁর গতায়াত, বহু রকমের চরিত্রের স্বাদে তাঁর আগ্রহ প্রথম এ দু'খানি লেখায় ধরা দিয়েছে। আরণ্য-জীবনের প্রতি আসংগ-লিপ্সু তাঁকে পরবর্তীকালে সহর-সভ্যতার প্রতি যে বিমুখ করেছিল তার অপরিণত ঢেহারা এই লেখা-গুলোয় স্পষ্ট চিহ্নিত। (বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে তলস্তয়ের একচতুর্থাংশও ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি তাঁর অরণ্য কথায়।)

'টেলস্ ফ্রম সেবাস্তোপোল' প্রকাশের কাল ১৮৫৪। এরই প্রকাশের সংগে-সংগে সারের নজর পড়লো বইখানায়। খ্যাতির অনেকগুলো সোপান পেরিয়ে গেলেন তলস্তয়। মানুষের বীর্য আর মানুষের ভাগ্যের ট্রাজেডি দু'টোই তিনি সমানভাবে দেখালেন এখানে। নৈরাশ্য নয়, —নৈরাজ্যও নয়—দেশপ্রেমের অলভ্য আদর্শের জন্য জয়পরাজয়ের দোদুলদোলায় মানুষের অব্যবস্থিত তার সার্থক রূপায়ন করলেন তিনি।

এরপরে তলস্তয় ইউরোপ-ভ্রমণে পাড়ি জমালেন—জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে বেড়ালেন—দেশ-দেখা, মানুষ-দেখা, সমাজ-দেখা চোখ পেলেন তলস্তয়। এদিকে ১৮৬১ সালে রাশিয়ার দাস (serf) রা তখন মুক্ত হয়েছে। খুশ হলেন তলস্তয় নিজের জমিদারীতে সেই সব দাসদের জন্য। তাদের জন্য গল্প বানাতেন—মজাদার গল্পে তাদের মন্‌গুলি রাখতেন। জমি নিয়ে জমিদার ও কৃষকের সংঘর্ষ মেটাতেন। তাতে চটে যেতেন সকলে। নীল-রক্ত যাঁদের শিরায় শিরায়, বিরক্ত হতেন তাঁরা, বিরূপ হতেন শেষে। কিন্তু তলস্তয় খুঁজে ফিরতেন দেবতা সেই সব মানুষের মধ্যে, কৃষিজীবী শ্রমজীবীদের মধ্যে। কেউ ফিরে না তাকালেও ক্ষুব্ধ হতেন না তিনি। চাষীর কোন দুঃখই ছিল না তাঁর জমিদারীতে—ছিল না অসন্তোষের কোনও কারণ। সুখেই ছিলেন তলস্তয় স্ত্রী-পুত্র পরিবার আর অনুগত কৃষকদের নিয়ে।

১৮৬৪-৬৯ আর ১৯৭৩-৭৬ এর মধ্যে প্রকাশিত হলো তাঁর অতিবিখ্যাত দু'খানা উপন্যাস—ওয়ার এণ্ড পীস্, আর এ্যানা কারেনীনা। উপন্যাস বললে বই দু'খানার মূল্যমর্যাদা দেওয়া হয় না—উপন্যাস নয়, সত্যে মহাকাব্য। মহাকাব্যের সেই অটল গাম্ভীর্য, সেই উদাত্ততা, সেই সমুন্নতি অন্তমনস্ক পাঠককেও সচকিত

করে তোলো। যুদ্ধের সময়ে, এই সেদিনও ওয়ার এণ্ড পীস্ সকলের কাছে Writers Bible বলে মনে হয়েছিল। তার ওপর আরও অনেক বই লিখেছেন তলস্তয়, কিন্তু এ দু'খানি বই তাঁকে যে সম্মানের শিরোপা দিয়েছে অন্য কোন লেখকের ভাগ্যে তা ঘটেনি। এমন কি তাঁর অন্য বইগুলোর কথা লোকে ভুলে গেলেও এ দুখানি বইকে ভুলতে পারবে না লোকে। এ্যানা কারেনীনা সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একটি মেয়ে চলন্ত ট্রেনের তলায় মাথা দেয়—এই বাস্তব ঘটনা তলস্তয়কে এ্যানা কারেনীনা লিখবার প্রেরণা দিয়েছিল। বাইবেলের বিখ্যাত লাইন—'Vengeance is mine, I will repay' হলো গ্রন্থের মন্ত্র। মানুষ মানুষের বিচারের কে; মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈশ্বর একটা বড় ভূমিকা—শ্রেষ্ঠ ভূমিকা,—একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দুঃখের বিষয় তলস্তয়ের সমালোচকরা এই কথাটি কেউ-ই বোঝেননি। ডষ্টয়ভস্কি কেবল এ্যানাকারেনীনার বিচারে লেখকের এই মন্ত্রের কথা স্মরণ রেখেছিলেন। দি কসাকই হোক আর ওয়ার এণ্ড পীসই হোক তলস্তয় খুঁজেছেন জীবনের মানে। এ্যানা কারেনীনায় তলস্তয়ের কুশলতা শিল্প-কর্মে, সমাজ চেতনায় এবং তাঁর আবেদন নিখিল মানব মনের দরবারে; আর ওয়ার এণ্ড পীসের পরিধি স্মরণ করার না হোমারকে, জাতীয়তার সীমানা পেরোয় না, ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাইরে স্থান করে নিতে পারে না। তৎসত্ত্বেও বিপক্ষ-সমালোচকের ভাষায় বলতে পারি—"The enormous scope of the book, the power of its psychology the vast number of characters crowding its pages, its tremendous vitality—all won for Tolstoy a recognition deservedly world-wide. After reading it we feel as if we have beheld with our own eyes a terrific and soul stirring crisis in the history of great nation, and one of the epoch-making events of the world."

উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে যতজন দিকপাল আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্যদের বেশীরভাগই জন্মেছেন রাশিয়ায়: গোগল, ডষ্টয়ভস্কি, তুর্গেনিভ, তলস্তয়। তলস্তয়ের মাথা অন্যান্যদের ছাড়িয়ে উঠেছে খ্যাতিতেই শুধু নয়,—শিল্পকর্মের বিরাটত্বে, বিপুলত্বে, বহুবিচিত্রতায়। ডষ্টয়ভস্কির চাতুর্য তাঁর না থাকতে পারে, হুগোর নাটকীয়তার অভাব তাঁর থাকতে পারে, কিন্তু যাকে বলে সেক্সপীরীয়ান স্ট্রেংথ, যাকে বলে মিলটনিক ম্যাস্‌কিউলিনিটি তা তাঁর পুরোমাত্রায় ছিল। জীবনের যে অপচয়, নিষ্পিষ্টনিষ্পেষিত মানুষের যে অবক্ষয় তিনি অবলোকন করেছিলেন আর কারো চোখে তা তেমন করে পড়েনি। তাই না যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন নাটকে, তলস্তয় সেই সমসিদ্ধান্তে এসেছিলেন উপন্যাসে—What is wrong with the poor is poverty. এই 'পুয়োর' নিম্নবিত্ত শুদ্ধচিত্তদের জন্য তিনি লিখতেন। গোর্কিকে এক সময়ে জিগ্যেস করেছিলেন: "তুমি লেখ কেন?" গোর্কির জবাবে খুশী না হয়ে বলেছিলেন: "তোমরা সব জিনিষ—সব কালো, সব কটল তোমাদের নিজেদের বড় দিয়ে ভরাট করো। ...দেখ, সব যাবে, সত্য থাকবে। ...তোমাদের ভাষা জলজলে, চাতুর্যময়, তাতে কিছু হবে না। আরও সহজ করে লিখবে, জীবন সহজ করে লোকে কথা বলে, হয়ত প্রথম প্রথম এরকম পেরেড়ে মনে হবে, কিন্তু তারাও নিজেদের উন্নত করেই নেয়। চতুর লেখার কোন দাম নেই।" গোর্কিকে আরও বলেছিলেন—"তুমি বড় বেশী লেখকের দৃষ্টিভংগি থেকে কথা বলো, তোমার নায়করা আসল মানুষ নয়, সকলেই প্রায় এক রকম। তুমি বোঝনা মেয়েদের বোঝোনা—তোমার নারী চরিত্র [illegible]—প্রত্যেকটিই। কেউ তাদের মনে রাখতে পারে না।" গোর্কির সব চরিত্র সম্বন্ধে একথা হয়ত সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়—তবু মুখের ওপর ঋষিশিল্পী যে কথা বলেছিলেন গোর্কি তা অবলীলায় দূরে সরিয়ে রাখেননি—নিজেই লিখে গেছেন।

তলস্তয়ের প্রভাব আজ প্রচণ্ড। চারিদিকে অবক্ষয় দেখেছেন তিনি, অথচ নিতল নৈরাশ্যে মগ্ন হননি। খ্রীষ্টধর্মকে অস্বীকার ঘোষণা করলেও তিনি পিছু হটেননি। নীটশে খ্রীষ্টধর্মকে slave morality বলেছেন কিন্তু তলস্তয় তা বলেননি; তিনি বলেছেন মন্দিরে বা ঐতিহ্যে ধর্ম নেই—ধর্ম অন্তরে। বাইবেল তাঁর সংগে সংগে থাকতো—গান্ধীর হাতে যেমন গীতা। তলস্তয়ের শান্তি ও অহিংসা, আত্মশক্তির উদ্বোধন ও পরমত সহিষ্ণুতা গান্ধীজীর জীবনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। তলস্তয় সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। আবার ব্যক্তিকেও তিনি ছোট করে দেখেননি। আর বিশ্বাস করতেন ইবসেনের মতো—নিজে ঠিক থাকো, তখন যদি ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলবে। একথা বলে তাই প্রবন্ধের শেষ রেখা টানতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন সমাজ-চেতনায় বিপ্লব এনেছিলেন, তলস্তয়ও তেমনি। লেনিন তাই তলস্তয়কে "বিপ্লবী" বলে আখ্যাত করেছেন। এই বিড়ম্বন মহৎ ব্যক্তির প্রতি আর এক মহৎ ব্যক্তির।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসংগে টলস্টয়

আলেকজান্দার শিফমান্

★

১৮৭৩ সাল। টলস্টয়ের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় উল্লেখযোগ্য বৎসর। ঐ সময় তিনি প্রথম লিটারেরি আমল অবলম্বন করে একখানি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস "আনা কারেনিনা"র রূপরেখা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন। আবার ঐ বছরেই টলস্টয়ের নোটবুকে হঠাৎ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে লেখা ছয়-সাতখানি বইএর তালিকা দেখা যায়। অদূর ভবিষ্যতেই বইগুলি পড়ে ফেলবেন বলে তালিকাভুক্ত করেছিলেন।

১৮৭৩ সালে মানব-সমাজের আত্মিক সম্পদের নতুন করে মূল্যায়ন করতে গিয়ে টলস্টয় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলী গভীরভাবে অনুশীলন করেন। সেই সঙ্গে কনফিউসিয়াস ও লাওৎসির বাণী, বৌদ্ধ সাহিত্য ও শঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্যও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, শুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ এবং মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বহু কাল টলস্টয়ের চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে।

টলস্টয়ের রচনাবলীতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৭৯ সালে। তাঁর আত্মজীবনমূলক গ্রন্থ "মাই কনফেশন"—এ তিনি বুদ্ধের জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি লেখেন: "শাক্য সিংহ জীবনের অর্থ খুঁজতে থাকেন। ঐ যুবক রাজকুমার মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে উদ্‌ঘাটিত করলেন করুণার বাণী, অহিংসার মন্ত্র।" টলস্টয়ের তৎকালীন চিন্তাধারার উপর বৌদ্ধ ধ্যান-ধারণার প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই। টলস্টয়ের মতে, মানুষ নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করতে পারে না। তার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা চাই, তার জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও ব্রত থাকা চাই। মানব জাতির সেবা ও মানব সমাজের অন্তিম কল্যাণ সাধনের মধ্যেই টলস্টয় তাঁর জীবনের ব্রত খুঁজে পেলেন।

প্রাচ্যের চিন্তানায়কদের সম্পর্কে কুশভা যায় মহত্তরবোধ্য পুস্তক প্রণয়নের অভিপ্রায় নিয়ে টলস্টয় বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন। এই প্রবন্ধে শাক্যমুনির জীবন-কাহিনীর এক কাব্যময় বর্ণনা ছাড়াও আছে ভারতের ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন। এই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে টলস্টয়ের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

টলস্টয় লিখেছেন, "রাশিয়ার মধ্যভাগ থেকে শীত কালের উদীয়মান সূর্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে তুমি একে একে সারাতোভ, উরালস্ক, কিরঘিজিয়ার স্তেপভূমি, তাশকন্দ ও বোখারা পার হয়ে গিয়ে পৌঁছবে তুষারমৌলি পর্বতমালার রাজ্যে। পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী ডিঙিয়ে গেলেই তোমার সামনে ভারত-ভূমি। ভারতবর্ষের আয়তন রাশিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু রাশিয়ার তিন গুণ লোকের আহার্য উৎপন্ন হয় ভারতের উর্বর শস্যক্ষেত্র থেকে। ভারতের জনসংখ্যা ২৪ কোটি। ভারতবাসীরা এখন ব্রিটিশ শাসনের অধীন। দেড় শ বছর আগে ইংরেজরা ভারতবর্ষ গ্রাস করে। তার আগে ভারতবাসীরা ছিল স্বাধীন। তাদের শাসক ছিলেন তাদের নিজেদেরই রাজা-মহারাজা।"

এমনি সহজ সাবলীল ভাষায় টলস্টয় প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্র নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁর মতে ভারতীয় সংস্কৃতির অক্ষয় কীর্তি বেদ-উপনিষদে বিধৃত হয়ে আছে সুউচ্চ নৈতিক বিধিবিধান। টলস্টয়ের বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই সব নৈতিক অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। যুগযুগান্তের ব্যবধানে, বহু শতাব্দী পরে, বেদের এই সব মহতী শিক্ষা স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ

ক্তিমানের স্বার্থ-সাধনের কাজে প্রযুক্ত হয়। এই ভাবে প্রাচীন ভারতের সুউচ্চ নৈতিক মানের অবনতি ঘটে।

টলষ্টয়ের বুদ্ধ-চরিত্রচিত্রণে রহস্যময়তা বা অতীন্দ্রিয়-বাদের নামগন্ধ নেই। বুদ্ধদেব মাটির মানুষ, তাঁর জীবনের পরিবেশ ও কার্যকলাপ এই মাটির পৃথিবীরই। টলষ্টয় ভারতের জীবন্ত জনসাধারণের মধ্যেই বুদ্ধকে স্থাপন করেছেন। বুদ্ধ মানুষ, কোনো অলৌকিক শক্তি বা ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী নন। টলষ্টয়ের বুদ্ধ-সম্বন্ধের প্রচলিত অন্ধাচার-অবিচার নিয়ে মাথা ঘামান, এই সব পাপের উচ্ছেদ করতে চান।

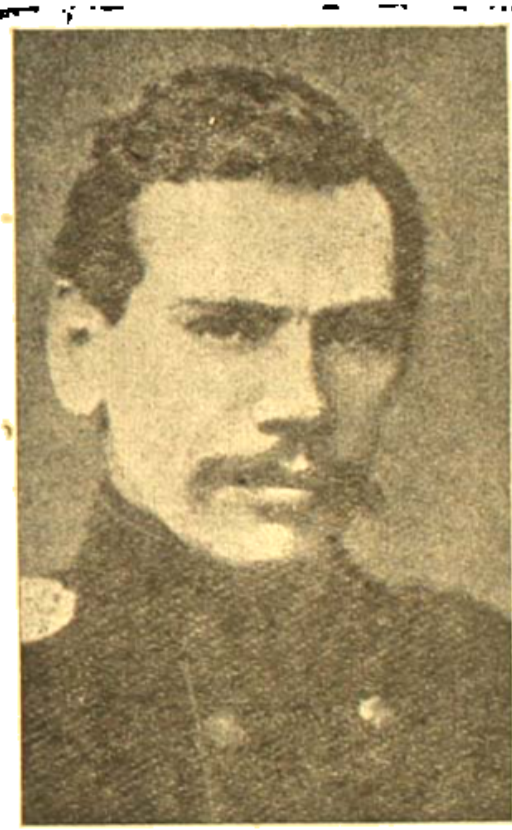

যৌবনে টলষ্টয়

পরবর্তী কালে টলষ্টয় বুদ্ধ সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি "হীথ্স্ ম্যাগাজিন অব্ নলেজ" নামক সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৯১০ সালে, তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন আগে, টলষ্টয় "সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন ও শিক্ষা" নামক গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ লিখে দেন। এই ভাবে বৌদ্ধ মতবাদ এবং তার সামাজিক ও নৈতিক দিক টলষ্টয়-লেখকের রচনাবলীতে একটা বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।

ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে টলষ্টয় প্রাচীন কালে শঙ্করাচার্য এবং আধুনিক কালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার গভীর অনুশীলন করেন।

টলষ্টয় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন শঙ্করের নৈতিক মতবাদের দিকে। ১৮৯৭ সালে একখানি ফরাসী সাময়িক পত্রিকায় সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধ পড়ে টলষ্টয় তাঁর বন্ধু জি. মাক্সিমফ্-কে লিখে জানান যে, শঙ্করাচার্যের [illegible] পড়লাম "প্রবলেম্স্ অব্ সাইকোলজি" পত্রিকায় চমৎকার লেখা। বড় বড় চিন্তানায়কদের সকলেরই ভাবনার একটা মিল দেখা যায়। পরে ১৯০৯ সালে কাগজ থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক রামদেব-সম্পাদিত "দি বেদিক্ ম্যাগাজিন" পত্রিকায় "প্লেটো অ্যাণ্ড শঙ্করাচারিয়া" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়ে আর একবার তাঁর রোজনামচায় লিখে রাখেন: শঙ্করের নীতিকথা আর বিশ্ব মানবের কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর নিজের ধ্যানধারণার মধ্যে বহু বিষয়ে মিল রয়েছে।

আধুনিক কালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারাও তিনি বিশদ পর্যালোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। এ কথা জেনে টলষ্টয়ের বন্ধু ভালো লেগেছিল যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরিবারের ঘরে এবং তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] জনগণেরই একজন জনগণেরই মুখপাত্র হিসেবে তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই দিকটা টলষ্টয়কে মুগ্ধ করে।

টলষ্টয়ের বিবেকানন্দ-অনুশীলন শুরু হয় ১৮৯৬ সালে। ঐ সময় তাঁর রোজনামচায় একস্থানে তিনি মন্তব্য লেখেন: ভারতীয় প্রজ্ঞার একখানি চমৎকার বই তিনি পড়েছেন। এই বইখানি হচ্ছে ১৮৯৭-১৮৯৮ সালের শীত কালে নিউ ইয়র্ক-এ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা।

ভারতবাসীর অধ্যবসায় ও শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে [illegible]

মহৎ ব্রত সম্পর্কে তাঁর সুন্দর উক্তির মধ্যে টলস্টয় প্রাচীন ভারতের মনীষীদের, বিশেষ করে বেদের, বহুতর জ্ঞান-ধারণারই প্রতিফলন দেখতে পান। এই সব চিন্তাধারার সঙ্গে টলস্টয় নিজেরও চিন্তাভাবনার যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করেন।

বিবেকানন্দের যে দ্বিতীয় বইখানি টলস্টয় পড়েন তার নাম "স্পীচেস্ অ্যাণ্ড আর্টিকল্স্" (ইংরেজি ভাষায়)। ১৯০৭ সালে এই সংকলন গ্রন্থখানি টলস্টয়কে পাঠান তাঁর বন্ধু আই. নাকিভিন। টলস্টয় প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে লিখে জানালেন: "এই ধরনের বই পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গ্রন্থ মানুষের মনের দিগন্ত আরও প্রসারিত ও অবারিত করে দেয়।"

১৯০৮ সালে আই. নাকিভিন "হরেসেস্ অব্ দি পিপল্স্" নামে একখানি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি প্রবন্ধ: "ফিয়ার অব্ দি পিপল্স" ও "গড্ অ্যাণ্ড ম্যান"। শেষোক্ত প্রবন্ধটি টলস্টয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে। বন্ধু নাকিভিনকে এক চিঠিতে তিনি লিখে জানান: এই লেখাটা অদ্ভুত, অপূর্ব!"

এই ভারতীয় দার্শনিকের ব্যক্তিত্বের প্রতি টলস্টয় গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইউরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকলাপের সংবাদ তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন।

১৯০৯ সালের মার্চ মাসে জনগণের পড়ার জন্য নতুন বই-এর এক তালিকা তৈরি করতে গিয়ে টলস্টয় "পোস্রেদ্নিক্" সংস্করণের ঐ পত্রিকল্পনায় "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তি" নামক বইখানি অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবিদ্ এর্ন অইন্‌গর্ন্‌কে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান। "বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আমরা তাঁর রচনাবলীর একখানা সংকলন-গ্রন্থ বার করার আয়োজন করছি।"

এইভাবে টলস্টয় ভারতের প্রাচীন ও নবীন চিন্তানায়কদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন। রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে লিও টলস্টয়ের মতো আর কোনো ব্যক্তি এতখানি করেন নি। "ভারতের দর্শনশাস্ত্র, মহাকাব্য ও লোককাহিনীর প্রতি অপরিসীম আগ্রহ, রাশিয়ায় ভারতীয় দর্শনকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক চিরকালের অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

কেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে
-যেন বিজয়ব্রত এর আগে
ই মেয়েকে কখনো
খেননি। অত্যন্ত অপরিচিত
ানো এক বুদ্ধিমতী বয়স্কা
ছিলা—যার অন্তরে সম-
বনার আশ্রয় আছে, যে
য়ে কেবলই মেয়ে নয়।
নের আলো আর বিজলী
তির আলো—এ দুই-এর
কাৎ মানুষকে যে এমন
ল্টে দেয় সে খবর বিজয়ব্রত
ই প্রথম পেলেন। তাঁর
ই মন্থরদৃষ্টিকে হঠাৎ একটা
লজ্জার ধাক্কায় শ্রাবণী
ছুঁড়ে দিল—অতো অন্যমনস্ক
য়ে কি ভাবছেন বিজুদা?

বদলে গেল। সব তলিয়ে গেল। নেহাতই আলোর
ায়া। এ নিশ্চয় তাঁরই মনের প্রতিফলন। একনিশ্বাস
াগে যে শ্রাবণীকে দেখছিলেন বিজয়ব্রত সে মেয়ে এই
াবোদ্ভিন্নযৌবনা নয়,—সে মেয়ে আদৌ বাস্তবে নেই।
নছক এক কল্পনা, তাঁর চোখকে প্রভাবিত ক'রে, স্বল্প
ালোর সুযোগ নিয়ে, মিথ্যে-ভাবালেন আর একবার
বিজয়ব্রত সাইকা কিংবা কন্ট্যাক্স ক্যামেরার লেন্স যেন
ঠার ঘুরি। হ্যাঁ, এটাই ঠিক। এই ত অনীতার সখী।

হাসি দিয়ে মনের ভাবটা ঢাকলেন বিজয়ব্রত—না,
কিছু তো ভাবি নি। সারাদিন খুব ঘোরাঘুরি হয়েছে।
াড়ি। পথ চলতি মোষের গাড়ি দেখেচ কখনো?

—অনেক-অনেক। হরদম দেখি। প্রায় রোজই—

—ব্যাস! বোঝার ভারে, জোঁয়াল যখন চেপে
ষকে কাবু করার দশায় নিয়ে যায় তখন প্রথম চোটে
সেই চাপটা সামলাতে মোষ বেশ কসরৎ করে। আস্তে
আস্তে ওজনটা তার ঘাড়ে সয়ে যায়। তখন সে নিশ্চিন্ত

বিভ্রান্ত, বিস্রস্ত মুখে শ্রাবণী বলে—এসব কথা যেন আপনার মুখে মানায় না বিজুদা।

আরও হাল্কা হবার প্রয়াসে বিজয়ব্রত হো-হো শব্দ করলেন। নিজের কানেই তাঁর বেমক্কা শোনালো হাসিটা। এ কী! এইটুকু মেয়ের সামনে শেষে ধরা পড়ে যাবেন নাকি বিজয়ব্রত! হাসির প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর না দিয়ে কথার জাল ফেললেন—হ্যাঁ যা বলছিলাম ভাবনার কথা বলছিলে না সেই মোষটার চোখের দিকে তাকালে তাকে দার্শনিক ছাড়া আর কিছু মনে আসে না জানো! আমি কতোবার লক্ষ্য করেছি। সুযোগ পেলে মোষের দিকে তাকাই, ইচ্ছে, আমার ধারণাটা পাল্টে যাক—কিন্তু একবারও দার্শনিক কিংবা চিন্তামগ্ন ছাড়া অন্য কি ভাবতে পারিনি। তা আমি আজ বিস্তর ঘুরেছি, হয়তে সেই জন্যে ক্লান্ত, তাই আমার দিকে তাকিয়ে তোম সন্দেহ হয়েছে বুঝি বা গভীর কোনো সমস্যায় ডু পেছি। আসলে তুমি নিজেই কোনো গভীর চিন্তায় ম ছিলে তাই—!

খিল-খিল হাসির দোলায় শ্রাবণীর চোখ মুখ বুক চে লাগা নৌকোর মত দুলে দুলে উঠল বিজয়ব্রতর সামনে ও হাসতে হাসতেই বলল—বাব্বাঃ, আপনার কথ বাঁধুনী বটে! প্রথমে কিরকম ঘাবড়ে দিয়েছিলেন।

—ঘাবড়ে! কেন?

—মনে হয়েছিল আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যে দেখা হলেই দুঃখের পসরা মেলে বসে তেম মামুলি কিছু বলবেন।

—তা আমি বুঝি তোমাদের মতো মানুষ নই?

—মানুষ ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনাকে যদি সাধারণ মানুষ ব'লে স্বীকার করতে হয় তবে আমাদের দেশ সম্পর্কে নিজের একটা কল্পনা খাড়া করতে হবে। তা ছাড়া এই আপনারা, মানে সাংবাদিকরা আলাদা জাতের মানুষ। কত বড় বড় ব্যাপার নিয়ে আপনাদের কারবার—সেখানে—

—আপো শান্তু! এখানে আমার সম্বর্ধনার সভা ডাকা হয়েছে বলে জানা ছিল না।

মালিনী ঘরে ঢুকলেন। খুব সম্ভব শ্রাবণীর কথাগুলো তাঁর কানে গিয়েছিল, তিনি বিজয়ের কথার প্রতিবাদে বললেন—না বিজু, এ ব্যাপারে আমি আমার মেয়ের পক্ষে ভোট দেবো। সাংবাদিকদের দায়িত্বই বলো, ব্যক্তিত্বই বলো, অনেক বড়। এককালে আমরা ত দেখেছি, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বড় বড় নেতারা খবরের কাগজ বার করেছেন, তাতে লিখেছেন—আর জেল খেটেছেন। তোমার দেশবন্ধু, সেনগুপ্ত, সুভাষ বাবু সবাই ত খবরের কাগজের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা স্বার্থকে ত্যাগ ক'রে পরার্থকে বেছে নিয়েছিলেন। এই যে তুমি ঘর সংসার ছেড়ে ভবঘুরের মতো আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে মরছো, তেমন স্বার্থবুদ্ধি থাকলে কি পারতে? বৌ ছেলেমেয়ের মুখ ক'দিনই বা দেখতে পাও। জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম সংসার করার যে সুখ তার মুখ কতটুকু দেখতে পাও বলো! সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোমাদের তুলনা চলে না, যাই বলো।

বিজয়ব্রত ঘাড় বেঁকিয়ে শুনছিলেন মালিনীর কথা। মালিনীর বলবার ভঙ্গীতে কিছুটা শ্রদ্ধাও প্রকাশ পাচ্ছিল। শুনতে ভালো লাগার মতো কথা। কিন্তু বিজয়ব্রত নিজের উপর কাল রাত থেকে রীতিমত অপ্রসন্ন, তাই মাথা নেড়ে বললেন—না মাসিমা, আপনাদের ওটা একেবারে সেকেলে ধারণা। আমরা এই এ-কালের জার্নালিস্টরা না খাটুকা না ঘুরুকা! আমরা চাকরী বাঁচাবার জন্যে, বজায় রাখবার জন্যেই ঘুরি। আরো যে কারণে ঘুরি সেটা শুনলে আমাদের অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই মনে করবেন না আপনি। এই যে এখানে এসেছি এর জন্যে ফার্স্ট ক্লাসের গাড়ি ভাড়া পাবো, বড়ো হোটেলে থাকার মতো ভাতা পাবো—বুঝলেন। অথচ আমরা হয়তো সেকেণ্ড কিম্বা থার্ড ক্লাসে আসা যাওয়া করব, সস্তার হোটেলে থাকব। কিন্তু কোম্পানীর কাছে বিল করবার সময়—

মালিনী কতকটা তর্কের খাতিরেই বললেন—সংসারে চলতে গেলে এটুকু সবাই করে। যদি কেউ নিজে কষ্ট করে দুপয়সা সাশ্রয় করে তবে সেটা তার প্রতিদান ধরা যায়। আসলে সে যদি ফার্স্ট'ক্লাসে ভাবে থাকত তাহলে ত—পুরো টাকাটাই লাগত!

—আমারও বক্তব্য তাই মাসিমা। সেকালের জার্নালিস্টরা খবরের কাগজকে আর নিজেকে আলাদা ক'রে ভাবতেন না। তাঁরা একটা বিরাট দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবার ব্রত নিয়ে চলতেন। তাঁরাই বা বলছি কেন, আমাদের জীবনের গোড়ার দিকে, যখন কলেজে পড়তে পড়তে জার্নালিজম করতে এসেছি তখনকার সঙ্গে আজকের দিনের পত্তরের কাগজ বা এই আজকের আমি কোনো দিক দিয়েই মেলে না। তখন মনে পড়ে, 'বন্দেমাতরম' কাগজে চাকরী করি, মাইনে প্রথমে পনেরো, বেড়ে বেড়েও কুড়ি টাকার চৌকাঠ পেরুল না। তা পনেরো টাকা একসঙ্গে চোখে দেখিনি,—এক, দুই, বড় জোর পাঁচ টাকা ক'রে নিতে হত। তাও কি সব মাসে পুরো মাইনে পেতাম। আবার রবিবারে-রবিবারে এডিটরের বাড়িতে নেমন্তন্ন হ'তো—নেমন্তন্ন মানেই মাইনে ক'মে যাওয়া। তখন কিন্তু মনেই হ'ত না যে আমাকে কেউ ঠকাচ্ছে, মালিকের অবিচার-অত্যাচার এসব কথা কেউই ভাবতে পারতাম না আমরা। আর মালিকেরও এমন কিছু সুখের জীবন ছিল না। আমরা ছিলাম যৌথ-পরিবারের এক-এক শরীক। মাঝে মাঝেই পুলিশের হুমকী, থানাতল্লাসী, জামানত-জব্দ, অর্ডনান্সের অজুহাতে জেলে টেনে নিয়ে যাওয়া এসব ছিল ডালভাত। তখন খবরের কাগজের সঙ্গে থাকার গৌরবই ছিল মস্ত বড় মোহ। অবিশ্যি এই মোহের সুযোগ যে কেউ কেউ নেয়নি, অথবা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই-এর বদলে ইংরেজের

সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়ে দেশের লোককে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করেনি এমন কথা বলিনে। একবার ত এই অপরাধে অমৃতবাজার পত্রিকাকে বর্জন করা হল। কলেজের ছেলেরা পর্যন্ত সে সময়ে রুখে প্রতিবাদ করেছিল। তখনকার মানুষের ধারণাই ছিল, খবরের কাগজের পবিত্র কর্তব্য ইংরেজদের খুঁত-চুকগুলো দেশের লোকের সামনে তুলে ধরা। অন্যায়কে অন্যায় বলবার দায়িত্ব ছিল খবরের কাগজের। কিন্তু এখন—। এখন দেশের হাওয়া বদলেছে। এখনকার এই সব খবরের কাগজের সঙ্গে পাটকল কিম্বা লোহার কারখানার বিশেষ কোনো তফাৎ নেই মালিমা। আমরা জানি আমরা চাকরী করছি। কোম্পানী জানে যে তাকে কাগজের চাহিদা বাড়াতে হবে, বিজ্ঞাপন-দাতাদের খুশী রাখতে হবে। আসলে খবরের কাগজ এখন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছাড়া বড় বেশি কিছু নয়। থাক গে, এখন এক গ্লাস জল দাও শাহু—একসঙ্গে অনেকখানি বক্তৃতা দেওয়া হয়ে গেছে।

মালিনী অবাক হয়ে বিজয়ব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাকিয়েই রইলেন তিনি। শ্রাবণী উঠে জল আনতে চলে গেল।

বিজয়ব্রতর কণ্ঠ নিশ্চুপ হলেও মনটা কিন্তু থামেনি। ভাবছিলেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে। যেন মনকে বলছেন, আত্মপ্রসাদের এতটুকু অধিকার তোমার নেই। যেন নিজেকে চাবুক মারবার জন্যই এত কথা এক নিশ্বাসে বলে গেছেন তিনি। তাঁর চোখের সামনে নিরুপমা থেকে শুরু করে অনেকগুলি মেয়ের মুখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই নিরুপমা যাকে একদিন বিজয়ব্রত ভালোবেসেছিলেন, যাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন একদা অনেক রকম ভাবে দেখতে ভালোবাসতেন। তারপর—তারও পরে, পরে, কতোই ত ঘটনা এগিয়ে গিয়েছে—বিজয়ব্রতকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, চলে এসেছে, কোথাও দাঁড়াতে দেয়নি—কে? কে দাঁড়াতে দেয়নি বিজয়ব্রতকে? আর কেউ নয়, অন্য কিছু নয়, বিজয়ব্রত নিজেই নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছেন। খবরের কাগজের ছাপা সংবাদের মতো নিজের জীবনের সব কিছুকেই দূর থেকে দেখে চোখ বুলিয়ে পাতা উল্টে গেছেন। কিন্তু—না, যেখানেই 'কিন্তু' তাঁকে আক্রমণ করবার সুযোগ পেয়েছে সেখান থেকেই বিজয়ব্রত ভীরু বিপ্লবীর মতো চোরা পথ দিয়ে পিছলে পালিয়ে গেছেন। নিজেকে চেনেন। তাই যখন মালিনী 'তোমার সংসার—সুখের মুখ, বৌ-ছেলে-মেয়ের-মুখ' না দেখতে পাওয়াকে বঞ্চিত থাকা, ত্যাগ স্বীকার করা বলেছেন তখনই বিজয়ের মনটা লুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সেই মনটা যেন বলতে চেয়েছিল, এই অভাবটাই তাঁকে অনীতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে—স্বাভাবিক বলে পাছে সে নিজের পক্ষকে সমর্থন করে বসে, সেই আশঙ্কায় তিনি কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন। হ্যাঁ, মানুষ অন্যায় করতে পারে, তা বলে কৃত-অন্যায়কে সমর্থনের মতো নীচতা যেন তাকে স্পর্শ না করে। ---ভাবছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে।

শ্রাবণীর ডাকে চমকে উঠে তিনি দেখলেন, একটা প্লেটে দুটো সন্দেশ আর ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল। হেসে সে দিক থেকে শ্রাবণীর মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন—লৌকিকতা! তা দাও—

—তা কেন, শুধু জল কি দিতে আছে! তোমার মুখখানা কেমন শুকনো দেখাচ্ছে বাবা। খুব ধিধে পেয়েছে নিশ্চয়। একটু বসো গরম-গরম দু'খানা লুচি ভেজে দিই, খেয়ে তবে উঠতে পাবে বলে মালিনী নড়ে-চড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হেসে বিজয়ব্রত টিপ্পনী কাটলেন -তা ষষ্ঠীর বিধের হিসেবেও সেটা মন্দ হবে না।

শ্রাবণী ঠোঁট কামড়ে বলল—আপনি অতো বাঁকা ভাবে দেখছেন কেন! মা এমনিতেই কাউকে খাওয়াতে ভালোবাসেন। দেখছেন ত আমাকে, দিন দিন খেয়ে খেয়ে কেমন গরুর মতো মোটাচ্ছি!

—ষাট-বালাই, বিস্যুদ্বারের বারবেলায় আর খুঁড়তে হবে না। ওই আজকালকার ডামাডোলে ফুঁয়ে উড়ে যাওয়ার মতো চেহারার ক্যাশান্ দেখলে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। আমরা বাপু সেকেলে মানুষ, একটু গায়ে-গতরে হাড়েমাসে জড়ানো শ্রীই আমাদের ভালো। তা বলে পানীর মনদের মতো চাকাও ভালো বলছি নে।

শ্রাবণী অস্বস্তি বোধ করে, এখনি বুঝি সেই বিয়ের

সম্বন্ধ নিয়ে কথা উঠে পড়বে। তাহলেও কেমন বিশ্রী লাগে—তারা ওকে দেখতে এসেছিল! ইস্, কি একটা অদ্ভুত নিয়ম—যেন বাজারের পাঁচ-দোকান ঘুরে-ঘুরে পছন্দ করে শাড়ী কেনার মতো মেয়ে দেখে ছেলের সম্বন্ধ করা! আজ এই যে বিজয়দা এসেছেন, ইনিও সেই বিয়ের সম্বন্ধ নিয়েই এসেছেন। কিন্তু বিজয়দার কথাবার্তায় সে ধরনের বিষয়কেন্দ্রিক আভাসটুকুও নেই। যেন এ বাড়িতে উনি বেড়াতেই এসেছেন। তা ছাড়া, এক্ষেত্রে পছন্দের সুযোগটা শ্রাবণীকেই পরোক্ষভাবে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তবেশ বাবু ঠিক এই মুহূর্তে কালিম্পং-এর বাংলোতে কি করছেন? হয়তো কোনো বই পড়ছেন। আচ্ছা বেচারী বড়ো একা। কেমন ছেলেমানুষের মতো অসহায়, আবার ছেলেমানুষের মতো কোন-কোন ব্যাপারে অবুঝ, এক-রোখা! কিন্তু লোকটার জ্ঞানের পরিধি যে সামান্য বা সাধারণ নয় তা ওই অল্প ক'ঘণ্টার মধ্যেই বেশ টের পেয়েছে শ্রাবণী।

মনের একটা অংশ যখন এইসব নিয়ে ব্যস্ত, তখন—ঠিক সেই কটি মুহূর্তে শ্রাবণীর চোখের সামনে মা দাঁড়িয়ে হাই-হাই করছেন আর বিজয়ব্রত একটার পর একটা কথার বাধায় তাঁকে আটকে রাখছে। শ্রাবণীর কানেও যাচ্ছে কথাগুলো, আর তারই ওপর এসে দাঁড়াচ্ছে কালিম্পং-এর কটি ঘণ্টার টুকরো-টুকরো ছবি। বিজয় বললেন—তবেশ ও আর বসে থাকতে রাজী নয় মাসিমা। দিল্লীতে আমার টেবিলটা তার চিঠিতে চিঠিতে বোঝাই হয়ে উঠেছে।

—তা আমাদেরও ত দিয়ে দিতে পারলেই এখন হয় বাবা। কিন্তু এতদিন ধরে মেয়েটা ঘাটছে, শেষে বিয়ের আগে পরীক্ষাটা দেওয়া বন্ধ করা উচিত হবে কি!

—আমিও সেই কথাই লিখেছি। কিন্তু ওটা ও আজ পাগল, সে সব যুক্তির ধারকাছেই ঘেঁষছে না।

—আমরাও যে একেবারে তা টের পাচ্ছিনে তা নয়। নিরুপমা চিঠি লিখেছে—অবিশ্যি আমাকে না, খুকীকে চিঠি লিখেছে যে, তোমার বিদুষীর ওপর ভরসা করে বসে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হবে না। আগে বাবা, এর মধ্যে নাকি তবেশ দু'তিন বার শিলিগুড়ি এসেছিল, নিরুপমাও ধরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়েছে যে, বিয়েটা সে তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে স্থির করেছে। নিরুর চিঠিতে এমন আভাসও আছে যে আমরা যদি দেরী করি তাহলে—! থাক ও সব পরে হবে, তোমার খুব খিদে পেয়েছে। বরং খেতে-খেতে শুনো।

মালিনী চলে যেতে বিজয়ব্রত শ্রাবণীকে বললেন—হ্যাঁ, নিরু কি লিখেছে? কই তুমি ত বলোনি নিরুর চিঠির কথা!

—নিরুদি খুব ওকালতী করছেন তবেশবাবুর পক্ষ নিয়ে। তা করুন, কিন্তু অযথা আপনাকে আসামী খাড়া করার কি কারণ আছে বলুন তো! আপনি নাকি কোনো বিষয়েই শেষ পর্যন্ত ইন্টারেস্ট নেন্ না, চোখের আড়ালই নাকি আপনার মনের আড়াল! এসব কেন লিখতে গেল নিরুদি! আমার একটুও ভালোলাগে না। সেইজন্যেই বলিনি চিঠির কথা।

বিজয়ব্রত সায় দিলেন ঘাড় নুঁকিয়ে—তা নিরু কিছু মিথ্যে লেখেনি। মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও সব সময় কাজের মধ্যে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, এও তো হতে পারে। তবে লোকের মনের খবর নিয়ে ত পৃথিবী চলে না। কাজ দিয়েই মানুষের প্রকৃতির পরিচয় ধরে।

শ্রাবণী হেসে ফেলল—কিন্তু সে ত গেল প্রকৃতির পরিচয়, পুরুষের পরিচয় কিসে মেলে বিজুদা?

চমকে উঠলেন বিজয়ব্রত। তাঁকে যেন হঠাৎ কোল-পাঁজা ক'রে কেউ মাটি থেকে একেবারে মহাশূন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু শ্রাবণীর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন যে, নেহাতই কথার পিঠে বলার লোভেই শ্রাবণী এ উক্তি করেছে। কেননা পরক্ষণে ও বলল—আজ সারাদিন আপনারা কোথায় কোথায় ঘুরলেন?

—আমরা নয়, আমি। সে ত আগেই বলেছি।

—না সেজন্যে জিগ্যেস করিনি। অনীতাকে আজও ক্লাসে দেখিনি তাই ভাবলাম, বেশ মজা ক'রে ঘুরছে আপনার সঙ্গে।

গম্ভীর ভাবে বিজয়ব্রত বললেন—যদি কিছু না মনে করো তাহলে একটা কথা বলি শান্তু।

—কি আবার মনে করব? বলুন না আপনার

কথা এক থেকে একশো হলেও ক্ষতি নেই। সেগুলো ও আমার স্টক হয়ে থাকবে।

যদি আমার ধারণা ভুলও হয় তাতে ক্ষতি নেই। ফিল্ করে দিয়ো ম্যাটারটা।

ভ্রূ-কুঁচকে শ্রাবণী বিজয়ব্রতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—ম্যাটার ও তুমি কখন বদলাতে পারে বিজুদা! একেবারে লুপ্ত করা যায় না—

—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি। আমাদের খবরের কাগজে ছাপার জন্য কম্পোজ-করা সংবাদকে ম্যাটার বলে। যদি কোনো ম্যাটার দু-তিন দিনের মধ্যে ছাপা না হয় তবে তা আবার ডিকম্পোজ্ ক'রে ফেলা হয়, তাকে ফিল্' করা বলে, বুঝেছ! নাঃ, তুমি বড় বকাও—! কোথায় একটা সিরিয়াস টপিক্ নিয়ে কথা বলব, তা না, দিলে মেজাজটা এলোমেলো ক'রে।

—মাপ চাইছি বিজুদা! এবার বলুন।

—কথাটা মাসিমা আসার আগেই বলে ফেলা দরকার, বুঝলে?

—কেন?

—আবার! মাসিমার সামনে কি একথা বলতে পারব যে, শান্তু তুমি যদি কোন ছেলের প্রেমে পড়ে থাকো এবং যদি তোমার মনে হয়, সে ছেলে তোমাকে ভালোবাসে, তাহলে মা বা আর সকলের মন-রাখার জন্যে অন্য কাউকে বিয়ে করবে কি না সেটা চিন্তা করে দেখো।

—আচ্ছা বিজুদা হঠাৎ একথা কেন বললেন? অনীতা বুঝি আপনাকে কিছু বলেছে?

—তাদের অতের বলা কথায় আমি ষোল-আনা নির্ভর করি না। আমাদের নিয়মই হ'ল, কোনো সংবাদের গুজব যদি কানে আসে তাহলে ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে যাচিয়ে নেওয়া। অনীতা হয়তো কিছু বলেছে, কিন্তু আমি তোমার কাছে শুনতে পেলে খুশি হবো।

—বেশ, তার আগে বলুন আপনি, অনীতার কাছে কি শুনেছেন।

শ্রাবণীর চোখ দুটো একবার বিজয়ব্রতর মুখের ওপর ঘোরাফেরা করল। সরাসরি যাতে চোখে না পড়ে যায় সেইভাবে সাবধানে বিজয়ব্রতর দৃষ্টি এড়িয়ে প্রথমে মাথার চুল, তারপর কান দুটো আর কপাল পর্যন্ত এসে বই ক'রে একেবারে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শ্রাবণী ওর সঙ্কোচের ঘোরটুকু কাটাতে চায়।

বিজয়ব্রতর কথাগুলো ওর কড়িকাঠ ছোঁয়া চোখ-দুটো নামিয়ে আনতে বাধ্য করে। তিনি বেশ কৌতুকময় সুরে বললেন—ও, তুমি বুঝি আমার আমার বহরটা দেখে নিয়ে সেই হিসেবে মুখ খুলবে? আমি কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কথাগুলো বলিনি শান্তু। যা তোমার ইচ্ছে না থাকলে, জোর করে নিছক মেয়েলি কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যেও প্রসঙ্গটা পাড়িনি।

এবার শ্রাবণী সত্যিই লজ্জা পেল। আঙুলে শাড়ীর আঁচলটা পাকাতে পাকাতে মুখ নীচু ক'রে বলল—না, না, আমি সব বলব বিজুদা। কিন্তু এখুনি এখানে বসে ত বলা চলে না।

—বেশ ত, তোমার যদি মনে হয় এ ব্যাপারে কথা হওয়া দরকার, তাহলে বরং বলো আমাকে, আমি কফিহাউস কিম্বা অন্য কোথাও দেখা করব। তারপর না হয়, আমি মাসিমার সঙ্গে আলোচনা করব।

—না, না, যাকে আপনার কিছু বলে কাজ নেই। তেমন বুঝলে আমিই বলতে পারব। যদি কাল ইউনিভার্সিটির সামনে তিনটের সময় আসেন তাহলে গোলদীঘিতে বসে কথা কইব। বেশি ঘুরে যাওয়া সুবিধে হবে না, কাল আবার হাসপাতালে যেতে হবে মাকে দেখতে।

শেষের কথাটা যেন নিজেকেই শোনালো শ্রাবণী এমন মৃদু স্বরে বলল। কিন্তু দরদখানি এতই নিখাদ ছিল যে, বিজয়ব্রতর কান পর্যন্ত কথাগুলো পৌঁছলো। তিনি প্রশ্ন করলেন—মা, মানে?

—না, না, মাসিমা! আমার মাসিমা হাসপাতালে খুব অসুস্থ। কলকাতার হাসপাতালে কখনো যাইনি বিজুদা। কেমন ভয় ভয় করছে—সবে খুঁজে পেতে বার করতে করতে না ভিজিটিং আওয়ার পেরিয়ে যায়।

—তা কেন যাবে! ওয়ার্ড, বেড নম্বর জানা থাকলে ওটা খুবই সহজ কা

—না, আমরা যখন ছোটোবেলায় ছিলাম তখন আমাদে

মিহিলাল বাবাকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে খবর পেয়ে ও গেল দেখতে—কিন্তু প্রথম দিনে ওর ভয় ভয় ভাবে হাসপাতালে ঘুরে ঘুঁজে পেল না, জানেন। তারপর ফিরে এসে কি আছাই হাসল। অবিশ্যি ও ওয়ার্ড বা নম্বর জানতো না। ওর ধারণা হল, বাবা মরে গেছেন। পরদিন ওর কাকার সঙ্গে আবার দেখা করে তবে—।

হো-হো করে হেসে উঠল প্রাবণী—একবারে ছেলে মানুষের মতো।

পরমুহূর্তে ও বলল—অনীতা মেয়েটা এমনিতে ভালো, বুঝলেন বিজুদা! কিন্তু পড়ার ব্যাপারে সিরিয়াস বলে ও মনে হয় না।

—চুঁ! আমি জানি। ওকে কিছুতেই সিরিয়াস করা যাচ্ছে না এ দিকে। ওর জন্যে একটা ছেলে দেখো না।

—হাঃ, বেশ বলেছেন! দুনিয়ার সব মেয়ের বিয়ে হবার পাত্তর আপনার মুঠোর মধ্যে, আর আপনি নিজের বোনের জন্যে সুযোগটুকুতে কাত্তিকের মতো মুখ করে বসলেন।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ, বেশ বলেছ।

প্রাবণীর চোখের সামনে বিজয়ব্রতর চল্লিশ-ছোঁয়া মনটা হঠাৎ যেন বাইশ-তেইশে নেমে এল। হয়তো নিজের বোন' কথাটার প্রতিক্রিয়া লাঘবতার জন্যে একটা হাতড়ে দেশলাই আর সিগারেট বার করে নিলেন। পর পর গোটা তিন-চার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে সময়ের কটি মুহূর্ত ঘরে পড়ল, শীতের হাওয়া যেমন গাছ থেকে ঝরের পাতা ঝাটিতে পড়তে যে সময়টুকু লাগে সেই সময়ের মধ্যে কালকের সারাটা দিন আর আজকের তাহিবের প্রতিমুহূর্তের বয়সের ওপর দিয়ে বিজয়ব্রতর মনটা পরিক্রমা সেরে এল। আলো। অন্ধকার। বিজ্ঞাপনের ছবি। আলো। অন্ধকার। অনীতার হাত। পর্দায় মাথায় ব্যোতারীর সংঘাতময় জীবন। চাপা গলায়, আমায় বিয়ে করো, করো! ফুঁপিয়ে ফুলে-ফুলে কান্নার ঢেউ তুলে (কখনো বা সিউরে) ওঠা উষ্ণ স্পর্শ যুবতী দেহের সমর্পিত অসহায় আকুতি। অস্থির অনিদ্র রাত্রি। শুধু। হ্যাঁ, সবটুকুই ঘরে ঘুমের ঘোর।

কে যেন আপত্তি করল ঘরের কাগজের আপিসে। আশ্চর্যরকমের বিরক্তি আর ঘৃণায় চুপচুপে গলায় —শালা ছোটলোক, ইতর কোথাকার! আরো কিছুক্ষণ কাল ছিল লাইটডিউটি, হঠাৎ হাত একটায় শালারা ফোন্ করল, চলে আসুন এরোড্রামে। কি ব্যাপার? না, কিছুক্ষণের মধ্যে একটা প্লেন ক্র্যাশ করবে! কেন? প্লেনটা ল্যাণ্ড করতে পারছে না, চাকা খুলছে না ব'লে। আটকে বসে আছে। প্লেনটা এখন এরোড্রামের চার-পাশে চক্কর মারছে। তার তেলও বেশী নেই। চাকা যদি না খোলে তাহলে ক্র্যাশ করতেই হবে। সেলাম, কন্ট্রোল থেকে বরদম খবর নিচ্ছি আর চা-খাচ্ছি আমি আর ফটোগ্রাফার। একখানা ছবি যা হবে! ইশ্-শ! আর কোন কাগজের লোকে খবর পায়নি। শুনলি আমরা দু'জন আছি। হ্যাঁ মশাই, চাকা খুলছে? না। তেলের অবস্থা কি? আছে, এখনো।...পাঁচ-দশ-বিশ-ত্রিশ ক'রে ষাড়া একঘণ্টা পঁচিশ মিনিট ধরে আমরা একেবারে দমবন্ধ অবস্থায়—! তেল কমে এসেছে। এই বুঝি পড়ল প্লেনটা! ঠিক সাতাশী মিনিটের মাথায় শালা ল্যাণ্ড করল। কি? না, চাকা খুলে গেছে। ফুস্-স্! বেকার বরবাদ।...আশ্চর্য, বিজয়ব্রতর খুব অবাক লেগেছিল কথাটা শুনে, একটা এরোপ্লেন দুর্ঘটনা ঘটার হাত থেকে বেঁচে গেল, কতগুলো মানুষ বাঁচল মৃত্যুর হাত থেকে। অথচ এরজন্যে রিপোর্টারের আপশোসের অন্ত নেই। এই কাহিনীতে নিজেদের মনের বিচিত্র অবস্থার দিকটা দেখতে পেয়েই বিজয়ব্রত নয়া দুনিয়ার আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ে পথে পথে চক্কর দিয়ে ঘুরেছেন। অনীতার চোখ দুটো যেন তবু তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি। নিজের বোন? হুঁঃ। যে মেয়ে তাঁর অস্তিত্বকে বন্দী করার জন্যে দুনিয়ার জাল পেতে রেখে দিয়েছে সে বোন! হাসি পেলেও সব সময়ে হাসা চলে না, তাছাড়া সব হাসির কারণও এক জাতের নয়—জুল ভার্নটাই এক ধরণের। বিজয়ব্রতর এখন যে কারণে হাসি উপছে উঠবার উপক্রম হয়েছে সেটার কারণ সম্পূর্ণ করুণ—না, পুরোটা করুণ নয়, করুণে করুণায় বিচিত্র! যেন না যে মুহূর্তে অনীতার ঘাড়ে অপরাধের বোঝা

চাপাতে চাচ্ছেন সেই মুহূর্তে নিজের এই দারিদ্র অপদার্থতার চারুপটা ধরে ফেলেছেন তিনি। নিজেকে নিয়ে এই লুকোচুরিখেলা অভ্যেসবশতই খেলেছেন বিজয়ব্রত।

সিগারেটের ধোঁয়াতে ধরতো সবটুকু মনোভাব চাপা পড়েনি, নইলে শ্রাবণী কেন বলবে—আপনাকে আজ অন্যরকম লাগছে বিদুদা। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেন এই ঘর থেকে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছেন। কি হয়েছে বলুন তো?

—এঁ্যা! ও কিছু না। আসলে কিছুই হয়নি। মানে, কতকগুলো ব্যাপার আছে, যা ঘটলে ভালো হত অথচ আলো টেনে পারল না—বুঝলে! আবার এমন কিছু কিছু ঘটে গেল, যেগুলো না ঘটলেও ক্ষতি হত না।

তা ও ঘটেই, আমরা যা চাই তার কতটুকুই বা পাই!

স্নেহের হাসি হেসে বিজয়ব্রত বললেন—তা কেন বলছ! আমরা যতোটা চাই তার চেয়ে অনেক বেশিও ত পেয়ে থাকি। আসলে চাওয়ার বা পাওয়ার তাত্ত্বিক ওজনের হাঁড়িপাল্লাটা আমাদের হাতে নেই—সেখানেই যতো গোলমাল।

শ্রাবণীর ভ্রূযুগলে টানের টঙার পড়েছে। বিজয়ব্রতর কথার গভীর অর্থটা ধরবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে ও বলল—ঠিক বুঝলাম না বিদুদা! হাঁড়িপাল্লা কি অনুভূতির ওজন সম্ভব?

—তা বটে! অনুভূতির হাঁড়িপাল্লাটা বাইরে থেকে দেখা যায় না, প্রতিক্রিয়া থেকে ধরতে হয়। সেটা অন্যের চোখে ধরা পড়ে না চট করে—অনেক সময় নিজেও ধরতে পারা যায় না।

—আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। অন্যের চোখ যদি তেমন তীক্ষ্ণ হয় তবে নিজেকে ধরতে না পারলেও সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি মানুষটার কাছে ধরা পড়ে যেতে হয়। মায়ের কাছে থেকে থেকে এটুকু বুঝেছি যে আমার মনের অনেক ভাব আমার আগে উনিই ধরতে পারেন। তার ফলে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, হাঁড়িপাল্লার চেয়েও সূক্ষ্ম, কোনো নিরবয়ব যন্ত্র আছে পৃথিবীর অলক্ষ্যে থেকে কাজ করে চলেছে।

শ্রাবণীর কথা শেষ হবার আগেই বিজয়ব্রত ঘুরে ঘুরে ঘরখানার আসবাবপত্র দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওর কথা থামার পরও তিনি কোনো জবাব দিলেন না।

শ্রাবণীর কাছে তাঁর এই নীরবতা অস্বস্তিকর মনে হল। ও বলল—হয়তো আমার অনুভবশক্তি কিছু ভোঁতা, নইলে আমার আগে অন্য আরাকে বুঝে বলতে পারবে কেন?

—কিন্তু তোমাকে দেখে ত তা মনে হচ্ছে না। তবে এ হতে পারে যে, তোমার মেজাজ যাঁর জানা, তাঁর দ্বারা তুমি খুব বেশি প্রভাবান্বিত সেইজন্যেই হয়তো উনি তোমাকে দেখেন এত চট করে। আচ্ছা শ্রাবণী, আমার এতক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল না, যাতে আটটার একবার বাড়ি ফেরবার যাওয়া জরুরী দরকার। আমি চলি—

—দাঁড়ান প্লিজ, মায়ের হয়তো হয়ে গেছে—

—না, আর এক মিনিটও নষ্ট করা চলে না। আমি যাচ্ছি। মালিনীকে বলে দিও, কাল-পরশু এসে দেখে যাবো।

—যা কিছু দুঃখ পাবেন, বিদুদা।

—তার চেয়ে আমার লোকসান আরো বেশি। তবু উপায় নেই—

শ্রাবণীর মুখখানা ভয়ে-ভাবনায় শুকিয়ে একরত্তি হয়ে গেছে। বিজয়ব্রত চলে গেলে যা অনর্থ বাধবে তার জের ওকেই সামলাতে হবে। যা কিছুতেই বুঝবেন না যে, কাজের তাগিদেই বিজয়ব্রত চলে গেছেন, সম্পূর্ণ দোষটা শ্রাবণীর ঘাড়ে এসে পড়বে। ব্যস্তভাবে ও বলল—আপনি আর মিনিট বসুন, মাকে ডাকছি—ওকে বলে তবে যাবেন।

বিজয়ব্রত কিছু বলবার আগেই শ্রাবণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং এটা বুঝতে বিজয়ব্রতর একটুও দেরি হল না যে, মালিনীর হাত থেকে না-খেয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। অথচ এখানে আর এক সেকেণ্ডও তাঁর থাকতে ভরসা হচ্ছে না।

অতএব বিজয়ব্রত প্রায় নিঃশব্দেই শ্রাবণীদের দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে, ক্ষিপ্রগতিতে গলিপথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ে পিছন ফিরে দেখলেন তাঁকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা।

সোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর একটা লোক তখনো বসে আছে ফুলের পসরা নিয়ে। পসরা বলতে ফুল হবে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা আর কিছু মৌসুমীফুল তার সম্বল। বিজয়ব্রতকে দেখে সে কতকটা মরীয়া হয়েই ডাকল—বাবু ফুল নেবেন? সস্তায় দেবো।

কোনো কিছুই না ভেবে বিজয়ব্রত বললেন—কতো?

তাঁর মুখ দিয়ে যেন অন্য কেউ কথাগুলো উচ্চারণ করিয়ে নিল। তাঁর মনের মধ্যে তখনো চিন্তার টানা-হেঁড়া বুনুনী চলেছে। এইভাবে পালিয়ে এলাম কেন? শ্রাবণীর মা, বা, ওই শ্রাবণী মেয়েটি ত কোনো অবিচার বা কিছুমাত্র দুর্ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে। খামোখা একটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে চলে আসার জন্যে ওরা সবাই দুঃখ পাবে, ওদের কাছে আমি লক্ষ্যনীয় ব্যক্তি হয়ে থাকব। অবশ্য এর কোনো প্রয়োজনই ত ছিল না। স্বাভাবিক ভাবে সৌজন্য সেরে বিদায় নিলেও এরকম ঝামেলা বইতে হত না।

ফুলওয়ালা বলল—আপনার যা ইচ্ছে তাই দিন।

ফুলের ঠাণ্ডা স্পর্শে বিজয়ব্রত প্রথমে চমকে উঠলেন, বিরক্তিভরে বললেন—কি? কি ব্যাপার বলো তো!

হেসে জবাব দিল—স্যার, ফুল!

—হ্যাঁ তাই কি?

—স্যার আপনি নেবেন বললেন যে—!

—আমি ফুল নিয়ে কি করব?

এমন বিজ্ঞভাবে উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল ফুলওয়ালা যার অর্থ খুব স্পষ্ট। এই হাসির ধরণ দেখে বিজয়ব্রতর আড়ষ্ট মনটাও কেমন ঢিলে হয়ে গেল, তিনিও হেসে ফেললেন। বললেন—দাম বলো।

—এক টাকা।

—মনসেন্স।

লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে হয়তো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বিজয়ব্রত একটা নোট বার করে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। লোকটি টাকা নিয়ে রজনীগন্ধার গোছাটা দিতেই বিজয়ব্রত হনহন করে এগিয়ে গেলেন। লোকটা যে সেলাম করল, সে যে "থ্যাঙ্ক উ" বলবার সময় সত্যিই কৃতজ্ঞ ভাবেই বলল—তা তিনি পিছন ফিরে দেখলেনও না।

খানিকটা এগিয়ে রেলিং-এর এপারে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন বিজয়ব্রত। রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছেন তিনি। এগুলো নিয়ে এখন কোথায় যাওয়া যায়? যদি অনীতাদের বাড়ীর সেই নির্দিষ্ট ঘরে এই ফুলগুলি স্থান পায় তাহলে আবার সেইসব অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিজয়ব্রত নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন,—(অবশ্য আজ থেকে আর তিনি অবচেতনতায় বিশ্বাসী নন। তাঁর ধারণা, মানুষ নিজেকে ঠকাবার জন্যেই অনেক সময় মনের সবটুকু দেখে না, পাছে বিবেকের কাছ কৈফিয়ৎ দিতে হয়।) সেই দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দিয়ে নিজের বা পরের বিড়ম্বনা বাড়াবেন না। ইচ্ছে করছে ফুলওয়ালার কাছে ফিরে গিয়ে এগুলো দিয়ে বলেন,—'রাখো ভাই। এগুলো আবার অন্য কাউকে বেচে দিয়ো। টাকা ফেরৎ চাই না। হয়তো আমার চেয়ে বেশি দরকার আছে এমন কোনো লোক এই কবরখানায় গভীর রাতে হাজির হবে।' কিন্তু পাছে লোকটা তাঁকে পাগল মনে করে—। তার চেয়ে রেলিং-এর ওপারে ওই শাদা-শাদা পাথরের ছোট ছোট ছাদের নীচে যারা আরামে মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে তাদের বিলাসের উপকরণ হিসেবে এগুলো উপহার পাঠিয়ে দিলে ত হয়। তাই হোক। দিলেন বিজয়ব্রত।

কোনো শব্দ হল না। কেউ সাড়া দিল না, ফুলগুলো পেয়ে। আশ্চর্য এক আন্তরিক বিনিময়ের মাধ্যমে বিজয়ব্রত যেন টের পেলেন—ওদের প্রাপ্য ছিল এগুলো। কেন না বিজয়ব্রতর যে জৈব ক্ষুধা এতদিন ধরে এই, মননশীল ব্যক্তিটিকে গ্রাস করে বসেছিল সেই ক্ষুধাকে তিনি কবরখানাতে পাঠালেন, জোর করে ধরে-বেঁধে পাথরচাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচতে চান তাই তাঁর সত্তার একটা বিরাট অংশ ও রেলিং-এর ওপারের অশরীরীদের শরীক—এখন ওই ফুলগুলো ওখানকার বাসিন্দে হোক্!

আঃ, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মানুষটা বাঁচল। এখন আর কোন ভাবনার লিছুটান নেই। সহজ। একেবারে স্বাভাবিক, সাধারণ বিজয়ব্রত হিসেবে স্বচ্ছন্দে চলা

যাবে। ক্ষিদে পেয়েছে। শ্রাবণীদের বাড়ীতে ফিরে গেলে কেমন হয়? সাবার ও তৈরী সেখানে। কিন্তু ওরা কি মনে করবে? যে বাঁড়িপাল্লার হাত থেকে ছিটুকে পালিয়ে এসেছেন বিজয়ব্রত সেখানে আবার পরীক্ষা দিতে যাওয়া? না, হোটেলে খাওয়া? না কি অনীতার মায়ের রাঁধা আহার্যের ওপর সুবিচার করা?—যখন, যে কোনও একটা বেছে নেওয়ার প্রশ্ন উঠল তখন ও নিয়ে মিথ্যে ভাবা, এমনিই চলা যাক। বালীগঞ্জগামী একখানা ট্রামেই বিজয়ব্রত পথ নির্ধারণ করে নিল। এই ঘরখানাকেই তিনি কলকাতায় নিজের ঘর বলে ভেবে এসেছেন। সোজা তিনি নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন। মাঝে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছাড়া পাশের ঘরে তখন রেডিওতে একটা নাটক হচ্ছিল, তাই তার উপস্থিতি আর কেউ টের পায় নি। কিন্তু ঘরের আলো জ্বালাতেই বিজয়ব্রত দেখলেন, অনীতা তাঁর বিছানা জুড়ে ছড়িয়ে শুয়ে। নিজের সারাদিনের সংকল্পকে ডিঙিয়ে বিজয়ব্রতর অবাধ্য দুটো চোখ ওই দিকেই কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল।

বাইরের পোশাক পাল্টে তিনি একটু জোরে জিজ্ঞাসা করলেন—অনু! অনু! তুমি এখানে ঘুমুচ্ছো?

সাড়া এল—না, তুমি এসেছ জানি। তাকাচ্ছি না, এমনি।

—মাথা ধরেছে?

—না। তাকিয়ে যদি দেখি যে আমার ভয়ে তুমি পালিয়ে গেছ—তাই চোখ বুজে রয়েছি।

—আচ্ছা, এখন দয়া করে চোখ বুঁজে একবার রান্নাঘরে যাবার রাস্তা দাও। বড্ড—

কথাটা শেষ করতে ফুরসৎ দিল না অনীতা, হাওয়ার মতোই নিমেষে বেরিয়ে গেল। চলে যাবার সময় শুধু বলল—ইস্! আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল।

একা ঘরে বিজয়ব্রতর মনে পড়ল, কাল তিনটের সময় শ্রাবণীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কথা দিয়ে এসেছেন তিনি। না, কথাটা কতকটা গায়ে পড়েই বলেছেন। কি দরকার ছিল? যে নিজের সমস্যায় বোঝা দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে তার আবার পরের ভাবনায় মাথা গলানোর কি অর্থ! রেডিওর ভল্যুমটা হঠাৎ জোর করে দিল কে!

অনীতার ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন! অনীতা মেয়েটি বড় অসহায়, বড় নরম ওর মনটা। অথচ ওকে আজ সারাদিন ধরে বিজয়ব্রত কি সাংঘাতিক ভাবে এঁকেছেন নিজের কাছে। লুব্ধ দৃষ্টিতে তাঁকা বিছানাটার দিকে তাকিয়ে বিজয়ব্রতর লোভ হল,—পিঠটা একটু ফেলে নিলে হয়! খাবার জন্যে অনীতা ডাকলেই ওঠা যাবে।

বিছানায় পড়েই মিনিট দুয়ের মধ্যে বিজয়ব্রতর নাক ডাকতে লাগল।

[ক্রমশঃ

ওল্ড বেইলী কোর্ট

শুকঘুরে

সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্ট ওল্ড বেইলীর ইতিহাস প্রায় একটি সুদীর্ঘ রক্ত-ভেজা কাহিনী। বহু জীবনের অশান্ত কামনার, বাসনার ঘাম মেশানো নৈর্ব্যক্তিক আইনের ব্যাখ্যা চলেছে এখানে যুগের পর যুগ। তাতে কতো জীবন ভেঙেছে, কতো ভাঙা জীবন জোড়া লেগেছে, সে হিসেবে কোর্ট-রেজিষ্টারের পাতা কলঙ্কিত। কিন্তু এই ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের উপর অবিচল গাম্ভীর্য নিয়ে চিরকাল দাঁড়িয়ে থেকেছে ওল্ড বেইলী। তার কারুকাজহীন বাড়ীটার ইট পাথরের মতোই পুরানো ঐতিহ্যবান। কিন্তু একটানা কাহিনীর এই ঘাত্রিক প্রকৃতিতে বোধহয় এইবার চিড় খেল। ২০শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ওল্ড বেইলীর বিচার-শালার ইটপাথরগুলোও বোধহয় তাই চমকে উঠেছিল।

অক্টোবর মাসের লণ্ডন। মেঘে ঢাকা আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর হিমেল হাওয়ার পরশ। ওল্ড বেইলী বিচারশালায় এক তীব্র কামনাদগ্ধ অভিজাত নারীর বিচার শুরু হলো। বিচারশালার ভিতরে আর বাইরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। ভিতরে যারা তারা বিচার-কক্ষের মধ্যে আসন সংগ্রহে ব্যস্ত। আর বাইরে যারা তারা কেবল কোর্টের প্রাঙ্গনে একটু প্রবেশাধিকার চায়। কিন্তু ক'জনকে সুযোগ দেওয়া যাবে? বিচার-কক্ষের দর্শকের মোট আসন সংখ্যা ১১৫টা। তার মধ্যে পঁচিশটা নিয়েছে খবরের কাগজ। সারা পৃথিবীর সাংবাদিক জড়ো হয়েছে আজ ওল্ড বেইলীতে। তাই প্রেসের আসন নিয়ে লটারীতে ঠিক হয়েছে, কারা দেখবে অভূতপূর্ব বিচার আর কারা হবে ইতিহাসের এই বিস্ময়কর কাহিনীর পরোক্ষ দর্শক আর শুধুমাত্র শ্রোতা। কিন্তু ২০শে অক্টোবর যারা বিচারকক্ষে প্রবেশাধিকার পেল কিম্বা পেলনা, সেই সব সাংবাদিকদের লেখনী একথা অনাগত কালের সমস্ত কৌতূহলী মানুষ আর আইনজীবীদের বলে যাবে যে ২০শে অক্টোবর ১৯৬০ সালের আগে এই ধরনের ক্লাসিক হয়নি।

ইংল্যাণ্ডের সমাজ-জীবনেও এই বিচার এনেছে প্রচণ্ড আলোড়ন। যুগ-ধর্মের প্রবক্তা যাঁরা তাঁদের সমস্ত একাগ্রতা নিবদ্ধ হয়েছে এই বিচারটিকে কেন্দ্র করে। জীবন বড়ো কঠোর, বড়ো নির্মম বাস্তবতা সেখানে। তার দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকলেই তাকে অস্বীকার করা চলবেনা। সনাতনী-মনের সব শাসন যখন অমোঘ সামাজিক নিয়মে, যান্ত্রিকতার চাপে বিনষ্ট তখন তার খোলসটিকে আঁকড়ে থেকে প্রাণপণ চীৎকারে একমাত্র সত্য বলে দাবী করলেও সমকালের জীবনে তার স্বীকৃতি মিলবে না। এই অভিজাত নারীর বিচার সেই সংকটকে প্রকট ভাবে তুলে ধরেছে অনুধাবনের জন্যে।

কিন্তু কি তার অপরাধ? সমাজের নৈতিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষার ভার যাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার কপাটের যারা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের ধারনা এই নারী ব্যভিচারিনী। সে তার অভিজাত স্বামীর আভিজাত্য ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে স্বামীর প্রেম কিপার মেজর নামে এক সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যাভিচার করে। সুতরাং মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিচারে যদি মাননীয় আদালত অভিযোগ সমর্থন করেন যদি এই হীন চরিত্রের নারীর বলুষতা প্রমাণিত হয় তাহলে একে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে। কি ভয়াবহ পরিণাম, সারা সভ্য জগত আতঙ্কে শিউরে উঠেছে সেকথা চিন্তা করে। ১৯৬০ সালের ইউরোপেও এটা সম্ভব? কিন্তু আইন বড়ো নির্মম, দয়ামায়া, হৃদয়াবেগ আইনের গ্রানাইট মনে এতটুকু আঁচড়ে কাটতে পারেনা। মানুষের স্বাভাবিক মন প্রশ্ন তোলে কিন্তু এতো বড়ো দণ্ড যার মাথার উপর ঝুলছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব কে নিয়েছে? সেকি প্রত্যক্ষদর্শী? কবেকার এ ঘটনা? কিন্তু এসব প্রশ্নেরই সহজ জবাব হাতে নিয়েই বিচার শুরু হয়েছে। দায়িত্ব নিয়েছেন লিংকনইনশাধারের এক ধনি-

শ্রমিকের ছেলে ডেভিড হার্বার্ট রিচার্ডসন লরেন্স, সংক্ষেপে ডি. এইচ. লরেন্স। তিনি শুধু লেখেননি, এই কাহিনী লিপিবদ্ধও করেছেন। সেই লিপিবদ্ধ কাহিনীর নাম "লেডি চ্যাটার্লীস লাভার"। ঘটনার প্রকাশকাল ১৯২৮।

ওল্ড বেইলীর কাঠগড়ায় আজ দাঁড়িয়েছে লেডি কনি চ্যাটার্লী। কিন্তু অভিযোগকারী তার স্বামী স্যার ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লী নয়। অভিযোগ করেছে স্বয়ং শাসন-কর্তৃপক্ষ। এই মহিলাকে ইংল্যাণ্ডের সভ্য, শিক্ষিত সমাজে কলে-কারখানার সাধারণ মানুষদের কাছে, অফিসে ফ্যাক্টরীতে কর্মরতা মেয়েদের আসরে ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে অবাধে ছেড়ে রাখা যায় কিনা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ চাই আদালতের। ৩২ বছর আগে লেডি চ্যাটার্লী বিতাড়িত হয়েছিল। আজ এক দুঃসাহসীর সাহায্য নিয়ে আবার সে ফিরে আসতে চায়। অতএব এই কাহিনীর সূত্রপাত।

বিচারটি অনেকের ধারণা যতোটা না কনি চ্যাটার্লীর অপরাধের, তার চেয়েও ঢের বেশি লরেন্সের দুঃসাহসের কেন তিনি এই ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে, ইংল্যাণ্ডের পাঠকের সামনে এক বিকৃত রুচির অসুস্থ মানসিকতার দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। আর এই অপরাধ-প্রবণতার আওতায় কেনই বা এসে পড়ল পেঙ্গুইন প্রকাশক স্যার অ্যালান লেন?

ডি. এইচ. লরেন্সের "লেডি চ্যাটার্লীস্ লাভার" একটি অবিস্মরণীয় উপন্যাস। লরেন্স এটা রচনার পর এখানে প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর নায়িকার প্রথম আবির্ভাব ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে। মাত্র এক হাজার খানা বই প্রথমে ছাপা হয়, আর বিলি করা হয় শুধু গ্রাহকদের কাছে প্রতি কপি দুই গিনি দামে। লরেন্সের নিজের দেশে এর প্রকাশ, বিক্রয় বন্ধ ছিল। কারণ এমন অনেক নিষিদ্ধ প্রসঙ্গের অচ্ছ বর্ণন লরেন্স দিয়েছেন যা পাঠক-সমাজের মনকে বিভ্রান্ত করবে। পরে অবশ্য লরেন্সের বইয়ের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাঁর নিজের দেশেই। সম্প্রতি বিখ্যাত প্রকাশক-মণ্ডলী পেঙ্গুইন আড়াই লক্ষ সস্তা দামের লরেন্সের অমার্জিত সংস্করণ ছাপার দুঃসাহস করে এই ঐতিহাসিক বিচারপর্বের সূচনা করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য হলো ১৯৫৯ সালের অবশীন পাবলিকেশন্স্ এ্যাক্টের আওতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, আইনের একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে অন্ততঃ এইটুকু চিন্তার মুক্তির পথ প্রশস্ত করা যে সমাজের ভালোমন্দ, লাভ-ক্ষতির বিচার শুধু মাত্র আইনের চার দেওয়ালের মধ্যে সব সময়ে ছাঁচে ফেলে করা যায় না। ওল্ড বেইলী আদালতে বিচারপতি মিঃ বারনের কক্ষে এই স্মরণীয় বিচার শুরু হলো। সরকারী পক্ষের সওয়াল আরম্ভ করেন মিঃ মারডিন গ্রিফিথ্ জোন্স। বিচারপতি মিঃ বারনি একজন ছোটখাটো চেহারা বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গুরুনো গলায় মৃদু স্বরে কথা বলায় অভ্যস্ত। লাল রঙের পোশাকে তাঁকে দেখতে লাগে অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক জাপানী অভিজাতের মতো। তিনি রক্ষণশীল দলের লোক। সুতরাং কনি চ্যাটার্লীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বিগলিত হবার মনের অবস্থা তাঁর নয়। বাদী পক্ষের মিঃ গ্রিফিথ জোন্স সম্পর্কেও একই কথা। তাঁর একটু চাপা ধরনের যা কেবল ব্যঙ্গোক্তিতে উঁচু পর্দায় ওঠে, যার প্রতিটি কথার মধ্যে ঘরে পড়ে সনাতন নিয়ম-কানুনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। অশ্লীল বিষয়ের মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁর বহুদিনের। তীব্র উত্তেজনায় তাঁর বক্তব্যকে এমন জোরের সঙ্গেই তিনি উপস্থিত করলেন যাতে মনে হলো লরেন্সের নায়িকা মুক্তি পেলে, ইংল্যাণ্ডে সমস্ত গণিকালয়ের স্থায়ী বাসিন্দারা পথে পথে আনন্দোৎসব করবে। ইটন, কেম্ব্রিজের এই প্রাক্তন ছাত্রের মতামত যে সমগ্রভাবে রক্ষণশীল সমাজের সে কথা অনস্বীকার্য।

পেঙ্গুইনের পক্ষ সমর্থন করলেন মিঃ জিরাল্ড গার্ডিনার। তাঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা যায় যে সমস্ত দুর্বলতা যখন মানুষের শক্তিকে ছেড়ে বসে নিয়ে আসে, তিনি তার মাঝেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন অবিচল দৃঢ়তায়। শান্ত-সাত্ত্বীকের এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব। মিঃ গার্ডিনারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ও দক্ষতার সাহায্য না পেলে "পেঙ্গুইনের" ইতিহাস অকালে শেষ হয়ে যেত। জুরীদের মতামত প্রকাশের আগের

কয়েক ঘণ্টায় যাদের তাকে দেখার সুযোগ হয়েছে, তারা সকলে স্বীকার করবে যে ওল্ড বেইলীর আদালত-প্রাঙ্গনে এক প্রতিজ্ঞারূঢ়, আহত সিংহকে তারা চাক্ষুষ দেখেছে, অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে।

কিন্তু মিঃ বারার্নের বিচার-কক্ষের ঘুন্তে কোন হতাশার ঠাঁই ছিল না। দর্শকদের অধিকাংশই এই কয়দিনে বুঝতে পেরেছিল বিচারের ফল পেন্থুইন-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যাবে না। ইংল্যাণ্ডের আইনে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যায় জুরীর সাহায্য নেওয়া হয়। লেডি চ্যাটার্লীর বিচারে তাই বসেছিলেন বারো জন জুরী—নয় জন পুরুষ আর তিন জন মহিলা। মিঃ বারার্ন বিচারের প্রথমেই জুরীদের বলে দিলেন, লরেন্সের এই উপন্যাসের আদ্যোপান্ত তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে যেন তবে মতামত দেন। অশ্লীলতার অভিযোগ সমগ্র উপন্যাসের বিরুদ্ধেই আনতে হবে। কোন বিশেষ ঘটনা, বা কথা বা পূর্বপর সম্পর্কহীন কোন অনুচ্ছেদ দেখিয়ে মতামত দেওয়া যাবে না এটা অশ্লীল কি নয়। জুরীদের মতামতের ভিত্তিতেই বিচারপতি তাঁর মতামত দেবেন।

সঙ্গতভাবেই সমস্ত আদালত তথা দেশের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন এই জুরীবৃন্দ। তাঁদের প্রতিটি কার্যকলাপের উপরই ছিল দর্শকদের সজাগ প্রহরা। কোন কথা শুনে কার মনে কি প্রতিক্রিয়া হলো, দর্শকেরা তা অনুমান করতে সচেষ্ট। কারো মুখের একটু হাসি, কিম্বা ভ্রূকুটী, ক্ষণিক অমনোযোগ কি একটু একাগ্রতা, লরেন্সের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামতের পাল্লা কতোটা ভারী করলো সে গবেষণার অন্ত ছিল না। ঐ যে রোগা মধ্যবয়সী লোকটি যে জুরীদের নির্দিষ্ট আসনের একেবারে দক্ষিণ দিকে বসেছে। তাকে বয়সের তুলনায় বোধহয় একটু বৃদ্ধ মনে হয়। কারণ কি এর, ওর মন কি খুব অনুভূতিপ্রবণ? কিম্বা ওই যে মহিলাটি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কাগজে খস্ খস্ করে কি লিখে নিল, ওই বা কি ভাবছে? আচ্ছা সত্যি লেখার মতো কোন কথা এখনই কেউ বলে গেল নাকি? না আদলে এটা ওর ঘামেয়োদ? কে জানে? কিন্তু ওর মুখের এই চকিত হাসির রেখা, এর কি কোন তাৎপর্য নেই? কিম্বা ওই যে সামনের দিকে যে মহিলাটি বসে আছে, গম্ভীর, একমনে সব কথা শুনছে। কিন্তু প্রায় কিছুই লিখছে না? ও বোধহয় কোন স্কুল মিস্ট্রেস? গাম্ভীর্য ওর হয়তো তাই এতো স্বাভাবিক? লরেন্সের নায়িকার কোন ভাগ্য নির্ণয় এরা করবে, সমস্ত লণ্ডনে তাই নিয়ে আর আলোচনার অন্ত ছিল না। ডেলীমিরর থেকে শুরু করে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান, ডেলী এক্সপ্রেস থেকে ইভনিং নিউজ তাদের পাঠকদের বিশেষ সংখ্যা মারফৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জানিয়েছে, একেবারে প্রায় সেই মুহূর্ত পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ।

কিন্তু বিচার যখন শুরু হলো তখন মনে হয়ে যে বিচারপতি মিঃ বরার্ন ও বাদীপক্ষের মিঃ গ্রিফিথ জোন্স ভাবছিলেন তাদের বহু-চেনা, বহু-জানা স্বদেশকে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। এ কোন ইংল্যাণ্ড! যেখানে অধ্যাপক, সমালোচক সম্পাদক, কবি ও সাহিত্যিকেরা এসে বক্তৃতা করছেন সাহিত্য কি নন্দনতত্ত্ব কাকে বলে, আর তাদের সামগ্রিক বিচারে কখন তথাকথিত অশ্লীলতাও তার স্বকীয়তার গণ্ডী কাটিয়ে মানবিক মূল্যবোধের সুস্থ এবং সুষ্ঠু প্রকাশ হয়ে ওঠে। সাক্ষ্য দান করতে আসলেন ওয়াল্টার অ্যালেন এবং রেমণ্ড উইলিয়ামস্ তাঁদের অপূর্ব বাগ্মীতা নিয়ে, হিটকেন সোটার যিনি সহজেই উপস্থিত করলেন তাঁর লরেন্স সম্পর্কে অসাধারণ বিশ্লেষণ, কবি সেসিল ডে লুইস যাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মন মানুষ লুইসের মতোই সদাজাগ্রত এবং উলউলচের বিশপ আর অ্যালইয়েন ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। ওল্ড বেইলী সেদিন বোধহয় সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল উইউইয়েচ বিশপ এবং প্রধান শিক্ষক নীতিবাদী মিঃ হগার্টকে দেখে। যদি এরপর মিঃ বারার্ন এবং মিঃ জোন্স মনে করে থাকেন সমস্ত ইংরেজ সমাজের ভবিষ্যৎ এবার গভীর অন্ধকারে ঢেকে যাবে, তার অপমৃত্যু ঘটবে, তবুও তাঁদের রক্ষণশীল মনের কথা ভেবে, খুব দোষ দেওয়া যায় না। এর আগে কোনদিনই ওল্ড বেইলীর বিচারের ইতিহাসে এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের আমল দেওয়া হয়নি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন আরেকবার এই শতাব্দীর মধ্যেই সাহিত্যে শ্লীল ও

অশ্লীলের প্রশ্ন উঠেছিল, তখন ওল্ড বেইলী প্রায় ৪০ জন বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকদের মতামত শুনতে অস্বীকার করেছিল। ঘটনা ঘটেছিল মিঃ র‍্যাডক্লিফ হলের "দি ওয়েল অব্ লোনলিনেস্" বইখানা নিয়ে। ওল্ড বেইলী জানে তাকে জীবনে কোন আইনগত সমস্যায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য দরকার হলে তারা হবে হয় চিকিৎসাবিদ কিম্বা অপরাধবিজ্ঞানী কিম্বা বড়জোর কোন মনস্তাত্ত্বিক। কিন্তু আজকের ঘটনা ইতিহাস সৃষ্টি করল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী-পুরুষ কমি চ্যাটার্লীর মামলার প্রকাশ্যে অকুণ্ঠ আলোচনা করেছে স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনের প্রস্তুতি, মাধ্যম আর ফলাফল নিয়ে। অথচ বিশেষজ্ঞরাই কি সব একমত? কেউ যদি লরেন্সকে বলে থাকেন পিউরিটান, গোঁড়াপ্রকৃতির বলে, পরক্ষণেই অন্য একজন বলে ওঠেন না লরেন্স ছিলেন খাঁটি ক্যাথলিক। হয়তো তৃতীয় ব্যক্তি এগিয়ে আসেন চূড়ান্ত মতামত দিতে যে লরেন্স পিউরিটান বা ক্যাথলিক কোনটাই নয়, তিনি একজন বিশুদ্ধ প্রোটেস্টান্ট, ধর্মে, আচারে আচরণে।

স্বভাবতই মিঃ বারার্ন বিচারপতি হিসেবে জুরীদের চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বল্লেন যে বিশেষজ্ঞদের মতামতের যে মূল্যই থাক, বিচার নির্ভর করে তাঁদের মতামতের উপর। তাঁরা যেন নিছক সাহিত্যের অতীন্দ্রিয় মার্গে হারিয়ে না যান, যেন মনে রাখেন ইংল্যাণ্ডের সেই সমাজের কথা, সেই সব মেয়েদের কথা যেখানে কিশোর কিশোরী টিকিনের পয়সা জমিয়ে কিনবে এই বই, সেখানে অফিসে কাজের অবসরে তরুণী মেয়েরা পড়বে এবং আলোচনা করবে এর কথা।

জুরীদের প্রথমতঃ বিচার করতে হবে যে এই বই সমগ্রভাবে মানুষের মনকে নিম্নগামী করে কিনা, কলুষিত করে কিনা (tended to deprove and corrupt)? যদি এই বিচারে সাব্যস্ত হয় যে এই বোধে এটা দোষী, তাহলে তারপর তাঁরা বিচার করবেন যে এই জাতীয় গ্লানিময় কলঙ্কের কাহিনী জনসমক্ষে রাখা সামাজিক স্বার্থের অনুকূল কিনা (the interest of public good)? মিঃ বারার্নের মতে obscene Publications Act এর মূল বক্তব্য প্রধানতঃ এই কথাগুলির উপর নির্ভর করে যে,—for the public good, জনসাধারণের কল্যাণ এতে ব্যাহত হবে কিনা? মিঃ বারার্ন বারবার নানাভাবে এই চারটি কথা আবৃত্তি করতে থাকেন, যেন জুরীদের মনের উপর এর ছাপ প্রকট ভাবে পড়ে যায়। কারণ আলোচ্য লেডি চ্যাটার্লি এমন একজন মহিলা যার জীবনে পরপুরুষ সংসর্গ বিবাহের পূর্বে ঘটেছে এবং পরেও স্বামীগৃহে ঘটেছে। তরুণ মনের উপর এই সব ঘটনার যথাযথ হবহু বর্ণনার ফল অনিবার্য ভাবেই মারাত্মক। বাদী পক্ষ ও মিঃ বারার্নের সমস্ত যুক্তিই দাঁড়িয়েছিল এই চিন্তার উপর।

বিবাদীপক্ষের বক্তব্য আগাগোড়াই সমস্ত আলোচনার মূল সূত্র কি হওয়া উচিত তাতে জোর দিয়েছে। নরনারীর জীবনে যা অনিবার্য স্বাভাবিক সম্পর্ক যদি তাকে আচার-আচরণে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কের কোন বিশেষ অবস্থার চিত্রণও স্বাভাবিক বলে মানা উচিত (If the act of sex is not bad or shameful, why then would be the description of it?)। মিঃ জিরাও স্যাডিবাবের মূল বক্তব্য কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। তিনি বাদীপক্ষের সমস্ত বক্তব্যের চুলচেরা আলোচনা করে জুরীদের উদ্দেশে সমগ্র আদালতকে প্রশ্ন করলেন ব্রিটেন কি নিজেকে সভ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। আমেরিকার ফেডারেল কোর্ট এবং জাপানের সুপ্রীম কোর্ট অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করেছে লরেন্সের "লেডী চ্যাটার্লিস্ লাভার" এযুগের যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে পিষ্ট মানুষের সহজাত-প্রবণতার একটা বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। তিনি বলেন ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন যখন সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের মূলে আঘাত করে তাকে পরিবর্তন করতে চায়, যখন চারিদিকে বৃদ্ধির জয় সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়, তখন মানুষের প্রবৃত্তি যে পথ নিতে পারে, লরেন্সের নায়িকা তাই নিয়েছে। তার মধ্যে আমাদের জীবনের নরনারীর সম্পর্কের একটা সার্বজনীন সত্যকে তার ব্যবহারিক ভাষাতেই প্রকাশ যদি করা হয়ে থাকে, তাতে যেমন সমস্ত কাহিনী কলুষিত হয় না, তেমনি সেটাই একমাত্র উদ্দিষ্ট হয়ে ওঠে না।

অতএব জুরীদের বিচার এই যে এই উপন্যাসের লক্ষ্য কি, অশ্লীলতার জয়ধ্বনি করা, না তথাকথিত অশ্লীলতাকে সাধারণ প্রকাশ-মাধ্যমে এনেও মহত্তর মহত্তর কোন সত্যের দিকে নির্দেশ করা। কারণ লরেন্সের বর্ণনা এবং বাচনভঙ্গি পাঠককে সৌন্দর্য-বোধের সেই নিবাক বিস্ময়ের গভীরে নিয়ে যায়। যেখানে সহজ কামনা স্তিমিত, নিষ্প্রাণ (a high breathlessness about beauty that cancels lust.)

এই ঐতিহাসিক বিচারের পরিণতি কোন দিকে, তার ইঙ্গিত বোধহয় সেই দিন পাওয়া গিয়েছিল, যখন মিঃ জিরাল্ড গার্ডিনার, প্রধান শিক্ষক মিঃ রিচার্ড হগার্টের জেরা করছিলেন। মিঃ হগার্টের পক্ষপাতহীন ব্যক্তিত্ব, র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী ও বিদ্যাবত্তা সুবিদিত। তিনি যখন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে লরেন্স নর-নারীর আদিম সম্পর্ককে কথার আড়ম্বরে, ভাবের মাধ্যমে আড়াল করে রাখেননি। তার স্বাভাবিক প্রকৃতি ও সর্বজনবোধ্য নামে ও সংজ্ঞায় ব্যবহার করেছেন, সেটা সপ্রমাণ করে তাঁর মন পক্ষপাত শূন্য ছিল। মিঃ গার্ডিনার তখন প্রশ্ন করেন : যদি লরেন্স এই আদিম ক্রিয়ার বহু পরিচিত নামের মাত্র আদ্যাক্ষর ব্যবহার করতেন, তাতে কি আপনি মনে করেন এর অর্থের কোন তারতম্য হতো ?

মিঃ হগার্ট : তাহলে এর মোরো ইঙ্গিতটাই আরো প্রকট হয়ে উঠত। (It gains a dirty suggestiveness) এটা বিচারের তৃতীয় দিনের ঘটনা। এবং এই দিনই বাদী পক্ষের প্রশ্নের জবাবে মিঃ হগার্ট সুস্পষ্ট ভাষে ঘোষণা করেন যে তাঁর মতে লরেন্স ছিলেন virtuous if not puritanical—নীতিবান কিন্তু গোঁড়া নয়, বিশ্ব সংসারের সব কাজ ও অকাজের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করেননি। কিন্তু তবুও অগণিত নরনারীর মনের সন্দেহ যায়নি যে জুরীদের উপর মিঃ বার্নার্ড ও মিঃ জোন্সের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কি হতে পারে। অবশেষে রায় ঘোষণার দিন এসে গেল। ধমথমে লণ্ডনের আবহাওয়া। পেঙ্গুইন কোম্পানীকে হয়তো চিরতরে বিনাশ করে দেবে। আড়াই লক্ষ "লেডি চ্যাটার্লীস লাভারের" আজ হবে বহুৎসব। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে যা তুলনাবিহীন। ২রা নভেম্বর ১৯৬০ ওল্ড বেইলী কোর্টে বিচারপতি মিঃ বার্নার্ড ঘোষণা করলেন জুরীদের বিচারে একমত হয়ে ডি. এইচ লরেন্স অভিযোগ-মুক্ত।

শেষ ছবি

লিওনিদ্ রাদিস্চেভ্

★

সেদিনটা ছিল প্রথম বসন্তের এক উজ্জ্বল সোনালী দিন। সারা মস্কো শহরটা যেন আলোর ঝরনায় সবে স্নান করে ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠেছে। মস্কো শহরের কোন এক অঞ্চলে সেদিন সকালে একটা লোক পথ চলছে। তার মনে সোনালী সকালের ঢেউ খুশির তুফান তুলেছে। রাস্তায় একটা ভাঙা মতো জায়গায় খানিকটা জল-কাদা জমে আছে। জমে থাকা জলটা কেমন নেল নীলচে দেখাচ্ছে। লোকটা এক লাফে সেই জায়গাটুকু পার হয়ে শিস্ দিতে দিতে চলতে লাগল।

"সত্যি সূর্য কি আশ্চর্য জিনিস," সে ভাবছে, এই বিরাট আলোর ঝরনা, অথচ তার জন্যে এক পয়সাও কোন খরচ নেই। নেই কোন ক্ল্যাসসাইটের দুর্ভাবনা···

লোকটা মনে মনে শপথ করে বলে "না, আর না, আজ থেকে সূর্যের আলো ছাড়া আর কোন কৃত্রিম আলোর সাহায্য নেব না।"

প্রথম বসন্তের সেই উজ্জ্বল সোনালী সকাল এই পথ-চলা লোকটার মনে একটাই চিন্তার রেখা জাগিয়ে রাখলে। সেটা তার পেশাগত সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। রাস্তার আর দশজন লোকের মতো সে সাধারণ নয়। তাদের থেকে একটু স্বতন্ত্র। সে একজন ফটোগ্রাফার। কাগজগুলো তার ছবি ছেপে তলায় লিখে দেয় "আমাদের প্রেস ফটোগ্রাফার"।

একালের প্রেস ফটোগ্রাফাররা তাকে দেখে নিশ্চয়ই কৌতুক বোধ করবে। এদের চট্‌পটে চেহারা, হাল্কা ধরনের সাজ সরঞ্জাম সুন্দর চামড়ার ব্যাগ কাঁধ থেকে ঝোলানো। এর সঙ্গে আমাদের সেই ফটোগ্রাফারের উল্টট ধরনের বাক্সের মতো ক্যামেরা বয়ে নিয়ে যাওয়া চেহারার কতো তফাৎ।

কিন্তু তাতে কি যায় আসে। আমাদের ফটোগ্রাফার একালের আধুনিক ছবি তোলার সরঞ্জামের সঙ্গে তার সেকেলে ধরণের বাক্সের মতো ক্যামেরা বদল করতে মোটেই রাজী নয়। ক্যামেরা তার স্মৃতি আর গর্ব বিজড়িত, সন্তানের মতো। সোভিয়েত দেশের অনেক কিছু "প্রথমের" চিহ্ন বুকে তুলে রাখার ইতিহাস তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দুয়েকটা নাম বলবো. যেমন সোভিয়েতে প্রথম মে দিবস, ছুটির দিনে স্বেচ্ছামূলক কাজ শুরুর প্রথম দিন (সুবোৎনিক), মেহনতী মানুষের প্রথম ছুটির দিন কাটাবার জন্যে "হোমের শুরু" এই রকম আরো কত কি।

সেইদিন সকালে তার কাগজের তরফ থেকেই সে যাচ্ছিল এই রকমই এক নোন "প্রথমের" স্মৃতি বহন করতে। পার্টির কর্মীদের একটি সমাবেশ হচ্ছে সার্ভলোভস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে কর্মীরা সব ছড়িয়ে পড়বে দূর দূর গ্রামে কাজের জন্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ঘরের বাতাস সে দেখল বড়া তামাকের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে। জানলার শার্সীর জমাট বাঁধা বরফ গলে গেছে। আর হল ঘরটায় আলোর বান ডেকেছে। এক পাশে মঞ্চের উপর একটা টেবিল লাল পতাকায় ঢাকা: আর তার পিছনে দেওয়ালে প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের একটি মানচিত্র। তার উপর জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট রঙীন পতাকা আটকানো।

ফটোগ্রাফার একবার চার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর জানলার উঁচু জায়গায় উঠে পড়ল। ক্লিক, তার ক্যামেরায় একটা শব্দ। মঞ্চের একেবারে সামনের সারির একটা ছবি "রিপোর্টের শ্রোতৃমণ্ডলী"। তারপর ক্যামেরাটা উঁচু করে ধরে আবার একটা ক্লিক্ "কর্মী সমাবেশের সাধারণ দৃশ্য।"

সে খুব ব্যস্তভাবে কাজ করতে শুরু করে দিল, হয়তো বা একটু সোরগোলও হয়ে থাকবে যা সাধারণত আমাদের ফটোগ্রাফাররা করেনা। কিন্তু তারুণ্যের চাঞ্চল্য তার দেহে মনে, তাকে তো থামানো যায় না। তার বয়স তখন তো কুড়ি বছরও হয়নি! আরো দু তিনটে ছবি নেওয়া হয়ে গেছে। সে তখন চারদিকে দেখে

ভাবছে একটা সুবিধাজনক জায়গার কথা, যেখান থেকে মঞ্চের উপরকার একটা ভালো ছবি নেওয়া যায়। ওই যে লোকটি রিপোর্ট পেশ করছে কর্মী সমাবেশে। হাতে একটা লাঠি, সেটা দিয়ে নানা জায়গার নির্দেশ করছে, তার একটা ছবি দরকার। হঠাৎ যেন একেবারে সামনের সারি থেকে একটি মৃদু করতালির শব্দ শোনা গেল। কিন্তু একি দেখতে না দেখতে সারা হলটা উল্লাসে ভেঙে পড়ল, ব্যাপার কি ?

আমাদের ফটোগ্রাফার চোখ মিটমিট করে চারদিকে চেয়ে ব্যাপারটা অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল। সারা-মুখে চোখে তার বিস্ময়ের ছাপ। কি এমন ঘটল এই মুহূর্তে, যা তার চোখে পড়েনি। হলের সমস্ত লোক উল্লাসে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ভারী ক্যামেরা আর তেপায়া স্ট্যাণ্ড নিয়ে সে ভালো করে কিছু দেখার চেষ্টাও করতে পারছে না। তবু গলা উঁচু করে আড়চোখে ভর দিয়ে সে দেখার চেষ্টা করল কোন রকমে তার মোটঘাটের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে। কিন্তু না, এতে হবে না। একহাতে ক্যামেরা আর স্ট্যাণ্ড ধরে, অন্যহাতে প্রাণপণে ভিড় ঠেলে সে এগোতে লাগল সামনের দিকে…

একজন খর্বাকৃতি লোক, চওড়া কাঁধ খয়েরি রঙের জ্যাকেট গায়ে, ঠিক তার পাশ দিয়েই দ্রুত পায়ে চলে গেলেন : একটু পরেই সে দেখতে পেল লোকটি মঞ্চের উপর সভাপতি-মণ্ডলীর মধ্যে গিয়ে বসে পড়লেন। তার বুকে তখন সাগরের অশান্ত ঢেউয়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। বিস্ময়গ্রস্ত লোকের মতো হাতের মুঠোয় ধরা ক্যামেরার স্ট্যাণ্ডটা সে প্রাণপণে গায়ের জোরে চেপে ধরেছে উত্তেজনায়, আনন্দে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছু মুখ বন্ধ করে রাখতে পারলো না। প্রায় চিৎকার করে উঠলো অধীর আনন্দে "লেনিন"।

মাত্র দশ ফুট দূরে মঞ্চের উপর লেনিন বসে আছেন। তাঁর ঈগল চক্ষু আরো ছোট হয়ে গেছে। লেনিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই হলের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখছেন, আর মাঝে মাঝে উঁচু কপালে হাত বুলাচ্ছেন।

"কি কপাল !" ফটোগ্রাফার অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগল, "ইনিই লেনিন…ভ্লাদিমির ইলিচ্…কি সুযোগ…আল্লো…কি অভাবনীয় ছবি !"

কিন্তু সুযোগ ছিল সত্যিই খুব কম, আর সুযোগ ব্যবহার করার সুবিধা আরো কম। লেনিন ছবি তোলা একেবারে বরদাস্ত করতেন না। খুবই কম সময় তিনি রাজী হয়েছেন ছবি তুলতে। সেই রাজী করানোই ছিল প্রায় দুঃসাধ্য একটা ব্যাপার। তাই আশাভঙ্গ হয়েছে বহু লোকেরই প্রতিবার।

এই তো মাত্র গত বছরের কথা। ঠিক প্রায় এই রকম সময়। মে দিবস, ক্রেমলিনে তখন প্রথম ছুটির দিনে স্বেচ্ছামূলক কাজ সবে চালু হবে। মাত্র সেদিনের ঘটনা, আমাদের ফটোগ্রাফারের সব জানা আছে। লেনিন তাঁর ছবি তোলার চেষ্টায় বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন "আমি এখানে কাজ করতে এসেছি, ফটো তোলাতে আসিনি !"

সেদিন তাই অনেক কৌশল করতে হয়েছিল। লেনিনের কর্মীরা একটানা কাজের পর যখন সবে একটু বিরতি দিয়েছেন, তখন লেনিনের অজ্ঞাতেই ফটো তোলা হয়। আর তাইতো সমস্ত পৃথিবী পেয়েছে, ক্রেমলিনে কর্মরত লেনিনের প্রথম ছবি…

ফটোগ্রাফারের চিন্তায় একটানা স্রোতে বাধা পড়ল হঠাৎ। সভাপতির ঘোষণা শোনা গেল ! "এইবার বলবেন কমরেড লেনিন।"

এক ঘণ্টা পরে লেনিন সভাকক্ষের বাইরে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে সভাপতি ও অন্যান্য প্রেসিডিয়ামের সদস্যরা। তাঁরা তখনও আলোচনায় মগ্ন। লেনিন মাথায় টুপি দিয়ে তাঁর কাগজ পত্রের ব্যাগটা হাতে নিলেন। আকস্মিকভাবে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোকের উপর তাঁর চোখ পড়ল। লোকটা বিব্রতভাবে চেষ্টা করল তার কাছেই রাখা বড়ো কালো বাক্স আর তেপায়া স্ট্যাণ্ডটা লেনিনের চোখের আড়াল করতে। লেনিনের চোখ কুঁচকে গেল, তিনি একবার বাক্সের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু অভ্যাসিত ভাবে আমাদের ফটোগ্রাফার ধরা ভারী গলায় কিছু বলবার চেষ্টা করল।

"কমরেড লেনিন !" সে চিৎকার করে ওঠে, "আমি

আমার জন্যে আপনার ছবি নিতে আসিনি। সমস্ত দেশ আপনার ছবি নিতে চায়…"

"হুঁ…তাই নাকি!" লেনিন ব্যঙ্গের সুরে বলে ওঠেন।

কিন্তু আমাদের ফটোগ্রাফার হঠাৎ যেন একদল বন্ধুকে আবিষ্কার করল। লেনিনকে চারিদিকে যারা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারাও সমস্বরে বলে ওঠে যে তারাও কমরেড লেনিনকে সঙ্গে নিয়ে ফটো তুলতে চায়। লেনিন যেন তাদের এই অনুরোধ রক্ষা করেন।

"বেশ, যদি সবার সঙ্গে হয়, তাহলে না হয়…" লেনিন তাঁর কথা অর্ধসমাপ্ত রাখেন।

আমাদের ফটোগ্রাফার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ সরঞ্জাম ঠিক করতে তার স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি সময় লাগে। আর কাজের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধস্ফুট ভাবে ক্রমাগত বলতে থাকে "এক সেকেণ্ড…আরেকটুক্ষণ… আরেকটুখানি…এই হয়ে গেছে…"

কিন্তু একটা গ্রুপফটো তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সকলকে ছবির মধ্যে আনতে গেলে খুব ভালো করে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে সবাই লেনিনের কাছে, পাশে দাঁড়াবার জন্যে ব্যস্ত। তাই একটা তাড়াহুড়োর ভাব। কিন্তু লেনিন খুব ধীর ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন ছবি তোলা শেষ হবার জন্যে।

অবশেষে প্রাথমিক দাঁড় করানোর কাজ শেষ হলো। এবার ছবি তোলার পালা। কালো মোটা একটা কাপড়ের টুকরোর আড়ালে মাথা ঢেকে লোকটি ক্যামেরার লেন্স ঠিক করতে লাগল। কাজের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের কথার বিরাম নেই। "আরেক সেকেণ্ড", সে বিড়বিড় করে বললে, "এইবার প্লেটটা বসিয়ে নিয়েই……এক সেকেণ্ডের মধ্যে আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি।" ক্যামেরার সামনে সবাই গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল লেনিনের চোখেই একটু প্রসন্ন কৌতুকের দৃষ্টি চিক্ চিক্ করছে।

কিন্তু ব্যাপার কি? সবার চোখ পড়ল ফটোগ্রাফারের উপর। কি যেন গণ্ডগোল হয়েছে বলে মনে হয় লোকটার। সে মাথার কালো ঢাকনি টেনে খুলে ফেলে দিয়েছে।…কয়েকটা টিনের বাক্স মেঝের উপর ফেলে দিয়ে, লোকটা দুই হাত দিয়ে নিজের মাথাটা চেপে ধরল। লেনিন তখনই তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "কি অসুবিধা হচ্ছে কমরেড? আপনি অসুস্থ বোধ করছেন নাকি।"

"আমার সব কটা প্লেটই ফুরিয়ে গেছে!"

"বেশ ব্যাপার তো, কমরেড।" সভাপতি মন্তব্য করে ওঠেন।

"এতো খবরের কাগজের সনাতন কথার মতো।"

"একটা লজ্জাকর ভুল ছাপার পরে যেমন সম্পাদকরা মন্তব্য করেন যে এই ভুলের জন্যে সম্পাদকরা দায়ী নন। …যাক্, আর আমাদের ভ্লাদিমির ইলিচ্‌কে দেরি করিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।"

লেনিন, এতক্ষণ একদৃষ্টে ফটোগ্রাফারের দিকে চেয়েছিলেন, যেন কিছুই হয়নি। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। তারপর কোটের ভিতর পকেট থেকে ঘড়ি টেনে বার করে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"নোতুন একটা প্লেট বসাতে, কতক্ষণ সময় লাগবে?"

"আমি?" ফটোগ্রাফার বিমূঢ় ভাবে বলে উঠল, "প্রায়… দশ…মিনিট…"

তার মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে।

লেনিন ধীর শান্ত কণ্ঠে বল্লেন "ঠিক আ মরা আরো দশ মিনিট কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি।"

লোকটা মুহূর্তের মধ্যে কতকগুলো প্লেট রাখার খালি খাপ আর একটা প্লেটের বাক্স নিয়ে ছুটে চলে গেল। মাথার উপরে তখন প্রথম বসন্তের উজ্জ্বল রোদে চারদিক ঝক্‌ঝক্ করছে। কিন্তু এই আলো, এতো আলো তার দরকার নেই। সূর্যের অসীম আলো তার কাছে মনে হলো একটা মর্মান্তিক উদারতা! আজ সকালের শপথ সে ভুলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কারণ তার তখন দরকার শুধু একটা অন্ধকার ঘরের।*

* অনুবাদক—বাসব সরকার

যুগান্তকারী লেখা ও লেখক

বসুবন্ধু

If Darwin had never written a word on evolution, he would still have been among the world's great biologists—J. B. S. Haldane

—Darwin

ইতিহাসে দেখা যায় কখনও কোন কোন সাল একাধিক কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই রকম একটা সাল হলো ১৮০৯। এই সালে চার্লস ডারউইন্ জন্মগ্রহণ করেছেন। আর জন্মগ্রহণ করেছেন আব্রাহাম লিঙ্কন্, জন্মগ্রহণ করেছেন আরো অনেকে—গ্ল্যাডস্টোন্, টেনিসন্, এডগার অ্যালান পো', অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স্, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং। আর গত শতকে যে কজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন পৃথিবীর চিন্তাজগতে এমন এক বিপুল আলোড়ন এনেছেন যে মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেছে চিরকালের মত। সেই তিনজন হলেন কার্ল মার্কস্, নিউটন ও আইনস্টাইন। অন্যদের কথা থাক ডারউইন্ সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক।

ডারউইন্—যাঁকে জীববিজ্ঞানে নিউটন বলে বর্ণনা করার রেওয়াজ আছে—শৈশবে অতি সাধারণ ছাত্র ছিলেন। একদিন ডাঃ রবার্ট ডারউইন্ তাঁর ছেলেকে ডেকে ধমকে দিলেন—"তুমি কি কেবল কুকুর নিয়ে শিকার করা নিয়ে মেতে থাকবে? লেখাপড়া না করে তোমার মুখ পোড়াবে আর বংশের মুখে কালি দেবে?"

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ডারউইন্ ভাবলেন, গ্রীক ল্যাটিন শেখাটায় কোন অর্থ নেই; ডাক্তারী বিদ্যেটাও কোন কাজের কিছু নয় আর পাদ্রী হওয়াটা ত' জীবন বরবাদ করে দেওয়ার সামিল। সুতরাং বিত্ত পরিবারের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ তাকে মনে করাটা তাঁর পিতার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

এই করে কাটলো জীবনের প্রথম বাইশটা বছর। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর খুব খাতির হয়ে গিয়েছিল তখনকার দিনের দু'জন বিশিষ্ট লোকের সংগে—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আর কিছু দিতে পারুক আর না-ই পারুক পরিচয়ের সেতু বেঁধে দিয়েছিল তাঁর উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপক হেন্‌স্লো আর ভূতত্ত্বের অধ্যাপক সেজউইক্-এর সংগে। এঁদের সংগে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতেন তিনি—পাহাড়ে, জংগলে, নুড়ি কুড়িয়ে, মাটির ঢেলা ছাতড়িয়ে আর নানা গাছ-গাছড়ার সন্ধান নিয়ে।

এমনি সময়ে বাইশ বছর বয়েসে চার্লস উঠে পড়লেন এক জাহাজে, যে জাহাজ পাঁচ বছর ধরে দক্ষিণ গোলার্ধ পরিক্রমায় রত ছিল। জাহাজে তাঁর চাকরী হলো প্রাণিতত্ত্ববিদ্ হিসাবে। এই জাহাজেই তিনি আপন ভবিষ্যত ভেবে নিলেন—পরে লিখেছিলেন, "ঐ ভ্রমণ যাত্রা আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

বই-ত' শুধু ছাপার হরফের সমষ্টি নয়, বই হলো হাতিয়ার: মানবজাতির ইতিহাসে বই প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে—হয়ত কখনও মঙ্গলের দিশারী হয়েছে, কখনও বা সন্দেহ দিকে ঠেলে দিয়েছে মানুষকে, জাতিকে, দেশকে। বই-কেতাবকে ভয় করেনি এমন স্বৈরাচারী দুঃশাসন খুব কমই আছে ইতিহাসে। বই পোড়ানোর উদাহরণ তাই ইতিহাসে বিরল নয়, এই সেদিনও আইজেন হাওয়ারকে বই-পোড়ানো বন্ধ রাখার আবেদন করতে হয়েছিল চক্ষু লজ্জার খাতিরে। বার বার বই যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় কিন্তু সকলের জানা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিদ্যার বিভিন্ন ছাত্রদের হয়ত জানা আছে। এখানে সকলের জানার জন্যে বিভিন্ন বইয়ের ভূমিকার আলোচনা করা হবে।

মিকায় বলা চলে, অভিনয় করে যেতে হয়েছে—আর তাতেই ভবিষ্যত-জীবনের দিক্‌নির্দেশ ঘটেছে। আহাজ যখানে নোঙর করেছে সেখানেই চার্লসের সন্ধানী াখ খুঁজে বেড়িয়েছে নানা গাছপাছড়ার, পোকামাকড় ীটপতঙ্গ, তা সেগুলো জীবন্ত হোক আর না-ই াক, মাটির ওপরের হোক আর মাটির নিচের তথা ধুত্রেরই হোক। সংগ্রহ দেখতে দেখতে একটা গ্রহশালায় পরিণত হলো। অষ্ট্রেলিয়া থেকে ার্জেন্টিনাপর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির বিচরণ ক্ষেত্র ছিল : ক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগের ভূতন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল, চিলির ভূমি, ব্রাজিলের অরণ্য অঞ্চল, পক্তর নিশ্চিহ্ন মানবজাতি, প্যাটা-গানিয়ার আদিম মানুষ—সকল বিষয়ে তাঁর আশ্চর্য আগ্রহ এবং সে াব সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সংগ্রহের াগ্রহ উদ্দীপনা বিস্ময়ের খোরাক জোগায়। এই আগ্রহ তাঁর জীবনের শষ দিন (১৮৮২) পর্যন্ত ছিল—৭২ ছর বয়েসে তাঁর শেষ যে বইখানা বেরোয় তার জন্যে তিনি অন্তত বিয়াল্লিশ বছর সাধনা করেছেন।

ডারউইন

যাই হোক—পাঁচ বছর পৃথিবী পরিক্রমার পর ১৮৩৭ সালে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন, তারপর থেকে কখনও ইংলণ্ডের বাইরে যান্‌নি—যাওয়ার জন্যেই। ফিরে এসে ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা লিখে ফেলতে সুরু করলেন। ১৮৪৪ সালে বেশ খানিকটা লেখা হলে বন্ধুদের দেখালেন, অনুরোধ করলেন, যদি মরে যাই এটাকে ছেপে বের করো। তারপর আরও চোদ্দটা বছর কাটলো—১৮৫৮ সালে বিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস্ ডারউইনের কাছে তাঁর নিজের লেখা জীববিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কিছু কাগজ পত্র পাঠিয়ে দিলেন—ডারউইন্ সেগুলো ছেপে বের করার জন্যে সচেষ্ট হলেন, আর নিজের লেখা যাতে না প্রকাশিত হয় বল্‌লেন, আর কিছু না হোক, দেশের সর্বনাশ হবে তোমার বই যদি না ছাপো। তারপরে একটা রফা হলো—যে সভায় ওয়ালেসের লেখা পাঠ করা হবে সেখানে ডারউইনের লেখার কিছু অংশও শ্রোতাদের জানবার সুযোগ দেওয়া হবে। ওয়ালেস্ লোক ভালো ছিলেন, ডারউইন্ ত' বটেই। অপ্রকাশিত বইয়ের লেখক হয়েও বিজ্ঞানী সমাজে একজন বিজ্ঞানী বলে ডারউইন্ স্বীকৃতি পেলেন। বই খানার নাম On the Origin of species by means of natural selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for life —সংক্ষেপে 'অরিজিন্ অব্ স্পেসিস্' ডারউইন যখন প্রথম খসড়া করেছিলেন তখন ১৮৪২ সালে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ ; দু'বছর পরে বেড়ে হলো দু'শ ত্রিশ। এই বই লিখতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ বাইশ বছর যে পরিমাণ পড়াশুনা করেছেন বিভি বিজ্ঞানবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে তাতে আমরা ত' বিস্মিত হই, তিনি নিজেও নিজের অধ্যবসায়ে বিস্মি হয়েছিলেন। একথা তিনি বলেছিলেন —যে-পরিমাণ কাগজ পত্রপত্রিকা ব কেতাব আমি পড়েছি তাতে আমি আমার অধ্যবসায় দেখে হতভম্ব হই ("When I see the list of books of a kind which I read and abstracted, includir whole series of journals and transactions, I am surprised at my industry.")।

১৮৫৯ সালের শেষ দিকে বইখানা বেরোয় লণ্ডনে-প্রথম দিনেই বারো শ' কপি বিক্রি হয়ে যায়—তারপ ডারউইনের জীবিতকালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজ কপি বিক্রি হয়।

বই ত' বেরুলো, কিন্তু মুস্কিল করার লোকের অভ হয় না—তাছাড়া ডারউইন যে কথা বল্‌লেন তা যে

যুগযুগ লালিত বিশ্বাসকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে, পাদ্রীদের তাতে মাতার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং কাগজে কাগজে—কোয়ার্টারলি-রিভ্যু, স্পেকটেটর, এ্যাথেনিয়ম—কুৎসার বান ছুটিয়ে দিল। কেম্ব্রিজের লাইব্রেরীতে ডারউইনের বই ঢুকতে পেলো না—এমন কি তাঁর শিক্ষক সেজ্‌উইক লিখলেন ডারউইনকে—তোমার বই পড়ে হাসতে হাসতে পেটে ভীষণ খিল ধরেছে।

১৮৬০ সালে অক্সফোর্ডে এক সভার আয়োজন হলো—ডারউইনের বন্ধু, সহকর্মী বিজ্ঞানীরা উপস্থিত হলেন—চার্লস্ লায়েল, টমাস্ হাকস্‌লে, জোসেফ হুকার, এ্যাসা গ্রে। এঁদের মধ্যে হাক্সলে হলেন ডারউইনের 'এজেন্ট জেনারেল' (ঐ নামে তাঁকে ডারউইন্ সম্বোধন করতেন)' হাক্সলে নিজেকে 'ডারউইনের বুলডগ্' বলতেন। সভার বিতর্কবিষয় ডারউইনের গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বক্তৃতা করতে উঠলেন প্রথমে অক্সফোর্ডের বিশপ্ উইল্‌বারফোর্স। হাক্সলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—অধ্যাপক হাক্সলেকে জিগ্যেস করি—তাঁর পিতামহ না মাতামহের তরফ থেকে বানর বংশ নেমে এসেছে? হাক্সলে সংগে সংগে তাঁর পাশের বন্ধুকে বললেন: The lord hath delivered him into my hands (ঈশ্বর ওঁকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন)। তারপর হাক্সলে দীর্ঘ বক্তৃতায় তার যে জবাব দিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বললেন, কারো পিতামহ যদি বানর হয়ে থাকেনও তাহলে তার আজকে লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। হাক্সলের বংশধর—পৌত্র বিখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিয়ান্ হাক্সলে এই সেদিনও ডারউইনের হয়ে আসরে নেমেছিলেন—তিনিও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু কী আছে ডারউইনের বইয়ে—অরিজিন অব স্পেসিস্-এ, যেজন্য বিরুদ্ধে গেল তখনকার দিনের খবরের কাগজগুলো, বিরুদ্ধে গেল পাদ্রী-পুরোহিতরা, বন্ধুরা হলো শত্রু? এ বইয়ের দোষ হলো মার্কস্‌পন্থীরা এই বইয়ের প্রশংসা করে। মার্কস্-এর বন্ধু-সহকর্মী এঙ্গেলস্ ডারউইনের বইকে যুগান্তকারী বলে অভিনন্দিত করেছেন। ডারউইন্ আসল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর চোখ দিয়েছেন আমাদের।

ডারউইনের মূল বক্তব্যগুলি তাঁর বইয়ের প্রথম চারটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। তারপরের অধ্যায়গুলিতে ভূতত্ত্ব গাছ-গাছড়া ও পশুপক্ষীর ভৌগোলিক বণ্টন—তাদের শ্রেণীভেদ, তাদের জন্ম প্রকৃতি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। আর সবশেষের অধ্যায়ে সমগ্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূলসূত্রগুলিকে একত্রীকরণ করা হয়েছে। ডারউইন বললেন, যেখানে জীবন সেখানেই পরিবর্তন; আর প্রাণী জগতে দুটো প্রাণী কখনই এক রকমের নয়; কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী ঈশ্বরের খেয়ালমত পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়নি, বিয়োরী অব্ স্পেশাল ক্রিয়েসন্ বা বিশিষ্ট সৃষ্টি মতবাদ বাজেকথা মাত্র। মানুষ যুগ যুগ ধরে ক্রমবিকাশের বিবর্তনের যে ক্রিয়া চলছে তার ভেতর দিয়ে এসে আজকের মানুষ হয়েছে। আজ আমরা যে ধরনের সব প্রাণী দেখি, তারা সবাই আজকের অবস্থায় হাজার হাজার বছর আগে ছিল না; অন্য ধরনের প্রাণী ছিল, কেউ কেউ হয়ত ছিল-ই-না। প্রত্যেক প্রাণীরই ইতিহাস রয়েছে—সেইতিহাসের গোড়াকার অধ্যায় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হলেও বলা চলে জীব-জগতে অবিরাম পরিবর্তনের লীলা চলছে—ফলে প্রাণীর চেহারা-চরিত্র বদলে যাচ্ছে—সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে, জটিল থেকে জটিলতর, উন্নত থেকে উন্নততর। কিন্তু এই যে পরিবর্তন চলছে সে পরিবর্তনকে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। ডারউইন স্পষ্ট করেই বলেছেন: "পরিবর্তনের একমাত্র সম্ভাব্য কারণহিসাবে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বারবার জলবায়ু, খাদ্য প্রভৃতি বহিরঙ্গ শর্তের উল্লেখ করে থাকেন। সামান্যপরেই আমরা দেখতে পাবো ঐ কথা সংকীর্ণ অর্থে সত্য হতে পারে। কিন্তু, উদাহরণত ধরা যাক্ কাঠঠোকরার গড়ন—তার পা, লেজ, তার ঠোঁট, জিভ এগুলির সাহায্যে কী বিস্ময়কর ভাবে গাছের ছাল থেকে পোকামাকড় ধরা তার পক্ষে সম্ভব।—এবং এ সমস্তই কেবলমাত্র বহিরঙ্গ অবস্থারফল বলাও অসম্ভব।" (অরিজিন অব্ স্পেসিস্-এর ভূমিকা)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্পেসিস্ বা প্রজাতির উৎস ধরে টান দিলেন ডারউইন—প্রশ্ন করলেন, কেমন করে জন্মালো প্রজাতিগুলি? এই প্রশ্ন বাইবেলের সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে ধারণাকে একবারেই উল্টে দেয়, তাতেই খেপে গেল ধর্মবীররা, আর তারা যারা মৃত-অভ্যাসের কারাগারে আবদ্ধ। বাইবেলে সৃষ্টির উপাখ্যান হলো এই রকম—প্রথম দিনে ঈশ্বর আলোর সৃষ্টি করলেন; পরের দিনে পৃথিবী সমুদ্র-আকাশ; তারপরে ঘাস-লতাগুল্ম-বৃক্ষ; চতুর্থ দিনে চন্দ্র-সূর্য; পঞ্চম দিনে পাখী ও জলজ প্রাণী; ষষ্ঠ দিনে সরীসৃপ ও অন্যান্য জীবজন্তু আর শেষ দিনে মানুষ। ডারউইনের বক্তব্য এই ধারণার বিরোধী। দ্বিতীয় বক্তব্য ডারউইনের হলো, বংশগতিকে অনেকাংশে বদল করা সম্ভব; কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মানুষের জন্মগত নয়—পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষ কিছু কিছু গুণ আহরণ করে এবং এই নতুন গুণ বংশগত সূত্রে পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়; এই বংশ-পরম্পরাগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংগ্রহ করার ব্যাপারে মানুষের শক্তি কী অসামান্য! এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্যে ডারউইন ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চালালেন গৃহপালিত পশু ও চাষের ফসল নিয়ে। মানুষের সংসর্গে থাকার ফলে কেমন করে আদিম গুণ বর্জন করে ক্রমাগত নতুন গুণ অর্জন করছে এই সব পশুপক্ষী ও ফসলজাতীয় উদ্ভিদগুলি। অসংখ্য তথ্য ঘেঁটে এ তত্ত্বে তিনি উপস্থিত হলেন। ডারউইনের পুত্র একটা গল্প বলেছিলেন: চড়ুই পাখীদের পর্যবেক্ষণের জন্যে তিনি মাঠের মাঝখানে এমন ধৈর্য ও স্থৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে পাখীগুলো নাকি নতুন গাছ ভেবে তাঁর গায়ে-মাথায় এসে বসতো। ডারউইন নিজেও বলেছেন: I think that I am suprior to the common run of men in noticing thirgs which ea-ily escape attention. and in observing carefully" (সাধারণের মানুষের চেয়ে আমি অনেক বড় অন্তত এই ব্যাপারে যে, যে-সব জিনিস সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, আমি সে সব তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করি)। এখানে উল্লেখযোগ্য, বংশগত সম্বন্ধে তাঁর মতামত যেমন চূড়ান্ত ছিল না, তেমনি

সমরেশ বসুর উপন্যাস

রাণীর বাজার

রাণীর বাজারের নাম নেই ইতিহাসে বা ভৌগলিক বিবরণে। তবু কালের রাসায়নের বাঁশীতে সে নাম বাজে আর বাজে। কোন একটি পুরুষ বা নারীকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী গড়ে ওঠেনি। একটি জনপদ, একটি আধাগ্রাম আধাসহর এ কাহিনীর নায়ক। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমরেশ বসু আর নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। রাণীর বাজার তাঁর অনবদ্য উপন্যাস। বিচিত্র অভিজ্ঞতার আশ্চর্য অভিব্যক্তি হিসাবে 'রাণীর বাজার' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উৎকৃষ্ট আর্টিক ডিমাই কাগজে ছাপা। পূর্ণেন্দু পত্রীর সুন্দর প্রচ্ছদ।

দাম: তিন টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

চোরাবালি

ভাগ্য দেবতা এক হাতে কেড়ে নিয়ে আবার ভরে দিয়েছিল তার দুহাত। যে মেয়ে অদৃষ্টের চক্রে একদিন মাদাজ ক্রিনিকের জীবনে নেমে এসেছিল অদৃষ্টের আবর্তনে সেই আবার স্বামী সংসার সব ফিরে পেল। কিন্তু অতীত তার পিছু ছাড়ল না। যা ছিল গোপন তা আবার ব্যক্ত হলো। হৃদয়হীন সমাজ, বিভ্রান্ত স্বামী আর সাজানো সংসারের সামনে দাঁড়িয়ে চিরদিন তাকে বলে যেতে হলো—"বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, আমায় বিশ্বাস করো।" তবু প্রশ্ন থেকে যায় নিষ্ঠুর সমাজ আজ তাকে কোন স্থান দেবে? দরদী লেখক এই উপন্যাসে সে প্রশ্নরই উত্তর দিয়েছেন। দাম: দুই টাকা

শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী

মহামরণ

স্ত্রী নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তান কামনা করেন। স্বামীর একান্ত কামনা স্ত্রীর জীবন। কার দাবি বড়? 'মহামরণ' এনেছে মহাজীবনের ইঙ্গিত।

দাম: আড়াই টাকা

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী: ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন: ৫৫-৩৪২৫

পরবর্তীকালে তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

ডারউইন কিন্তু এই বিবর্তনবাদের জন্মদান করেননি—তাঁর আগে আরও কেউ কেউ এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করেছেন—কিন্তু যেহেতু তাঁদের উক্তি তথ্যের যুক্তিতে বলশালী ছিল না তাই তাঁরা সহজে ইতিহাসের গর্ভে মিলিয়ে গেছেন। যে বছর ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ ১৮০৯ সালেই লেমার্কের প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বই বেরোয়। বিস্তৃত আলোচনায় জানা যায় লেমার্কের কাছে তাঁর ঋণ কতোখানি, কিংবা তাঁর পিতামহ ইরেস্‌মাস্‌ ডারউইনের কাছে। এমন কি ডারউইনের বিবর্তনবাদের সঙ্গে আর যে একটা বড় অংশ রয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল্‌ সিলেকসন্‌ তত্ত্ব, তার জন্যে তিনি ম্যালথাসের বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত। বিবর্তনবাদের প্রয়োগ ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক নির্বাচন-তত্ত্ব খুবই প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি মনে করেছেন যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার প্রকৃতি দিয়েছে; অর্থাৎ এক প্রজাতির মধ্যে নিরত মারামারি কাটাকাটির ফলে দুর্বল অংশগুলি হেরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আর সবলগুলি বেঁচে রইল। এ হলো বাঁচার জন্যে যুদ্ধ বা আপনি বাঁচলে বাপের নাম নানক প্রবাদকে একটু বড় করে ভাবা। পৃথিবীতে মানুষ বেশি, অথচ খাদ্যসম্ভার যথোপযুক্ত নয়। অতএব সংগ্রামে যুঝিয়ের প্রাণীই বাঁচবে, বাঁচার অধিকারী তারা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভেতর দিয়ে নতুন প্রজাতির জন্ম। এইখানেই ডারউইনের দুর্বলতা। ম্যালথাস তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃষ্টির সমগ্রতার ফলে যে বিপ্লব ঘটেছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে মত পোষণের দিকে যেতে পারতেন তা ভিন্নরূপ ধারণ করলো। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করলেন।

তৎসত্ত্বেও তাঁর এই তত্ত্ব উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র সৃষ্টিকে একসঙ্গে দেখার, খণ্ড-খণ্ড করে না-দেখার, চোখ পেলাম আমরা, বুঝতে পারলাম জড়ের ওপর জীবনের প্রভাব, জীবনের চলার পথে জড়ের প্রভাব—প্রজাতির ওপর প্রজাতির প্রভাব, পরস্পর সাপেক্ষতা (ইন্‌টারডিপেণ্ডেন্স) এবং আজ ডারউইনের মতবাদকে মেনে নিলেই জীববিজ্ঞানীকে হতে হবে বস্তুতন্ত্রবাদী পাঠ নিতে হবে মিচুরিন-লাইসেঙ্কোর উদ্ভাবনা থেকে। সে আর এক পর্ব জীব-বিজ্ঞানে।

ডারউইন আরও অনেক বিষয়ে গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষণ করেছিলেন—আরও অনেক বই লিখেছিলেন—ফুল সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও তার ফলে তাঁর যে ব্যাপক গবেষণা তা বিস্মিত করে। অন্যান্য বইগুলির কথা উল্লেখ করা যাক (ক) অন্‌ দি ভেরিয়াস্‌ কণ্ট্রাইভ্যান্সেস্‌ বাই ইনটার অকিডস্‌ আর্‌ কারটিলাইজড বাই ইন্‌সেক্টস্‌; (খ) দি মুভমেণ্টস্‌ অ্যাণ্ড হ্যাবিট্‌স্‌ অব ক্লাইম্বিং প্ল্যাণ্টস্‌, (গ) দি ভেরিয়েসন্‌ অব্‌ এ্যানিম্যালিস্‌ অ্যাণ্ড প্লাণ্টস্‌ আণ্ডার ডমিস্টিকেসন্‌; (ঘ) দি ডিসেণ্ট অব্‌ ম্যান অ্যাণ্ড সিলেক্সন ইন্‌ রিলেসন্‌ টু সেক্স, আসলে এই শেষ বইখানায় তিনি বিবর্তনবাদকে অনেক তথ্যসহ প্রতিষ্ঠিত করেন আর ঐ অরিজিন্‌ অব্‌ স্পেসিস্‌-এ মানুষের তথা জীবজগতের জন্মের কথা বলেন। ডারউইন্‌ কোথাও সমাজের বিবর্তনের কথা বলেননি। কিন্তু সে কাজ আজকের বিজ্ঞানীদের, অপরের পক্ষে তিনি কাজ সহজ করে দিয়েগেছেন। কিছু কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে; বংশের মুখে কালি দিয়েছেন কি না জানিনে তবে ধর্মীয় পাণ্ডাদের মুখে তিনি চুন-কালি দিয়ে সর্বহারাদের কল্যাণ করে গেছেন। বিজ্ঞানী হাল্‌ডেনের বক্তব্য তুলে দিয়ে শেষ করি—He has had a very unsetting effect on thought, and made it much harder to take a great many current ideas for granted, or to believe a number of doctrines which were thought to be essential to religion.

দক্ষিণীদের রাজধানী বিজয়

অমিয়া সেন

পশ্চিম পাকিস্থানের শরণার্থীরা বাস্তহারা হয়ে বিস্তৃত হ'লো সারা ভারতে। পূর্ব-পাকিস্থানের কাঙাল-জনেরা বিস্তৃত হতে গিয়ে বিপর্যস্ত হ'লো চতুর্দিক দিয়ে। ওরা রাজধানীতে এসে সবল হাতে লুঠ করলো রাজমুগ্রহের ভাণ্ডার। এরা ভিক্ষের দাবী করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে গড়াগড়ি গেলো রাস্তার ধুলোয়। ওরা রাজপুতানার মরুভূমিতে গিয়ে বালির বুকে প্রাণের ফসল ফোটালো, এরা যেখানেই গেল, মাটি পাথর হয়ে জমাট বাঁধল। প্রাণের ফসল ফললো না কোথ'ও। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গর্বিত স্বাধীন ভারত সরকারের সম্মুখে এই দু'দলই যেন উদ্ধত চ্যালেঞ্জ। পশ্চিম পাকিস্থানের দাবলা আর পূর্ব-পাকিস্থানীদের অসাফল্য—দুই-ই দিনের পর দিন উত্তপ্ত করে তুলছে এয়ার কণ্ডিশন্ড পার্লামেণ্ট ভবনের আবহাওয়া। ভারত সরকারের এ প্রশ্নের সিক্রেট ব্যাপার নয়। দেশ-বিদেশের সবাই জানে। কিন্তু রাজধানীর গ্রীনরুমে এই বারো বছর ধরে গড়ে উঠেছে যে একটি দার্শনিক নাট্যচক্র সে খবর জানে না কেউ।

শরণার্থী-সমস্যা ভারতের স্বাধীনতার অবদান, সুতরাং আধুনিক। কিন্তু পূর্ব, পশ্চিম-উত্তর—ভারতবর্ষের এই তিনদিক ঘিরে চিরদিন উদ্দাম প্রাণের উল্লাস কলরব। সংগ্রামে মুখর, পরাজয়ে ক্লিষ্ট, জয়গর্বে উজ্জ্বল। সাফল্যে অসাফল্যে, ঈর্ষায়, প্রেমে, পতনে উত্থানে,—ভারতবর্ষের অখণ্ড আত্মা নিরবধিকাল ধরে এই ত্রিভুজের মধ্যে এক অপরূপ ঐকতানে স্পন্দিত।

কিন্তু এই ঐকতানের সভায় দক্ষিণ কই!

দক্ষিণ শুধু দূর নয়, সুদূর—স্বতন্ত্র।

উত্তরের রঘুকুল-নায়ক দক্ষিণে গিয়ে সেতুবন্ধন করেছিলেন। প্রেমের ধারায় একাকার করতে চেয়েছিলেন উত্তর-দক্ষিণ। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। আদি বাস্তিকী এমন্ত রেগে গিয়ে ওদের প্রাজ্ঞতা-বিজ্ঞতাকে যতই অস্বীকার করুন না কেন, রাজনীতির তুরুপ-খেলায় ওরা বাজী মেরে নিল চিরকাল।

এই বিচিত্র ভারতবর্ষের অংশ হয়েও ওরা চিরকাল ঘরে মুক্ত সবরকম হাওয়া থেকে। না রাম, না কৃষ্ণ, না বুদ্ধ—অবতারের উপদ্রব ওদের পোষাতে হয়নি। মুসলমান আক্রমণ ও ওদের প্রায় ছুঁতেই পারলো না,

অথবা ওরাই সর্বপ্রথমে রক্ষা করল নিজেদের স্বাতন্ত্র্য শুচিতাকে।

সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষ যখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, ইচ্ছা'দ বা অনিচ্ছায়, রাগে বা অনুরাগে বহিরাগত বিদেশীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবধারা আত্মসাৎ করে বিজয়ী ও বিজেতার মধ্যে এক অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র নির্মান করছিল, দক্ষিণ তার সকল দুয়ার রুদ্ধ করে বিরত ছিল সেই সূত্রমালায় নিজের নামটি যুক্ত করতে।

কিন্তু বুদ্ধিমান দক্ষিণ তার বিচক্ষণতার চরম উৎকর্ষতা দেখাল শ্বেত-বণিকদের বেলায়। পুরানো যুগের সংরক্ষণ প্রবৃত্তিকে জীর্ণ কন্থার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উদার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো সাগরপারের নয়া আমদানীকে। তার সর্বপ্রকার রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারকে সে গুটিয়ে নিয়ে এলো গৃহগণ্ডীর গোপন অভ্যন্তরে, কিন্তু বাহির অঙ্গনের আগল ভেঙ্গে পরম ঔদার্যে আমন্ত্রণ জানালো বিজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে।

দূরাগত আনবিক যুগকে সে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল তৃতীয় নেত্র দিয়ে, তাই ভবিষ্যৎ স্বর্ণ-যুগের সবটুকু সুযোগ-সুবিধা ও ঐশ্বর্য করায়ত্ত করবার জন্য সে সর্বপ্রথমে আত্মসাৎ করলো শ্বেত-বণিকদের ভাষা, সাহিত্য, তৎপরতা ও পোশাক পরিচ্ছদ।

১৯৪৭ থেকে শুরু হল ওদের সেই স্বর্ণ যুগ।

ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর প্রত্যন্তের অধিবাসীদের জন্য এ যুগ গোনামাথা না-ও হতে পারে, কিন্তু দক্ষিনীদের

বেলায় ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে এলো অপার সম্ভাবনা।

মনে করুন শতাব্দীব্যাপী বিদেশীদের বিরুদ্ধে ভারতের একটানা সংগ্রাম আন্দোলন সংঘর্ষ ও অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ এবং সেই সঙ্গে মেপে দেখুন এতে দক্ষিণীদের অবদান।

সহিংস বিপ্লব—যার জন্য ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে প্রাণ দিল কত ক্ষুদিরাম, কত ভগৎ সিং, বিয়াল্লিশের সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা.—ভারতবর্ষের যৌবন শক্তি যাতে জ্বলে উঠে ছিল দাবানলের মত, পিছন ফিরে সেই আগুনের আলোয় একবার তাকিয়ে দেখুন দক্ষিণের দিকে।

ঝড় উঠেছে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে,—কিন্তু দক্ষিণে যেতে যেতে সেই ঝড়ো হাওয়া হারিয়ে ফেলেছে তার গতির প্রচণ্ডতা।

অহিংস আন্দোলনের পূজারী লালা লাজপৎ রায় ছিলেন লাহোরের রাজপথে, বাংলার একদিক জনপ্রিয় নেতা আবুল্লীন হলেন ইংরেজের কারাবাসের ফলে। (দুষ্ট লোকেরা বলে মৃত পরজন,) এমন ঘটনা দক্ষিণী নায়কদের বেলায় ঘটেছিল কি?

অবশ্য ফসল যখন ফললো, সুদূর, স্বতন্ত্র হয়েও দক্ষিণ পেল তার যথোচিত ভাগ।

আজ রাজধানীর রাজনীতির কর্মচক্রের ওরাই পরিষ্কার পরিচালক। সংগ্রাম-ক্লান্ত, লাঞ্ছনা-ক্ষুব্ধ তামাম ভারত আজ দক্ষিণ-চক্রের কৃপাপ্রার্থী।

বিভক্ত পাঞ্জাবের ছিন্নমূল অধিবাসীরা রাজধানীর ওপর চড়াও হ'য়ে যতখানি সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিল, তার সবটাই প্রায় গায়ের জোরে। কিন্তু দক্ষিণ বিভক্ত না হলেও এখানে এসে সে যতখানি অধিকার করল, তার মধ্যে গায়ের জোর নেই। এর সবটাই কূটনীতিক তৎপরতা। এরা অধ্যবসায়ী নিঃসন্দেহ। কিন্তু এরা যে এতখানি কর্ম-কুশল, বুদ্ধিমান ও ভারত-প্রেমিক এ তথ্য এই সেদিন—দেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্তও কি কেউ জানত?

একে একে দুই—দুই-দুইয়ে চার—কুরুক্ষেত্র কর্মবীরদের সংখ্যা কখন যে শূন্যে পূরে হাজারকে ছাড়িয়ে লক্ষ পূরো করবার লক্ষ্যে ছুটলো, রাজধানীর আর্য বংশ-ধরেরা তা টেরই পেলো না। মোহ যখন টুটলো, তখন হাতের তাস খসে পড়েছে। আর কোন উপায় নেই। উপায় যে অদূর ভবিষ্যতে কিছু হবে, এমত সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত।

আমি এক অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ-ব্যক্তি। বিশাল ভারতের বিশালতম মানচিত্রের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। কুয়োর ব্যাং,—মাত্র বাংলা দেশটাকেই যা অল্পবিস্তর জানি।

রাজধানীর ভদ্রভাইদের দেখে, তাদের অভূতপূর্ব কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়ে স্বভাবতঃই মনে হচ্ছে আপন জাতভাইদের কথা।

শুনেছি, পরাধীন যুগে নাকি বাঙালীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে প্রেরণা নিত সারা ভারত। এখন মনে হচ্ছে কথাটা ষোল আনা সত্য নয়। যাঁরা ঐ প্রকার বলতেন, তাঁরা, মনে হয়, ফাঁপা বেলুনকে আরো ফোলাবার জন্যই এরূপ স্তুতিবাক্য ব্যবহার করতেন।

এখন চাক্ষুষ দেখছি, বাঙালী মস্তিষ্ক আর যাকেই প্রভাবিত করে থাকুক না কেন, দক্ষিণ চিরদিন তার প্রভাব-মুক্তই ছিল। শুধু বাঙালীর কেন, জাতির জনকের প্রভাবও দক্ষিণের উপর কতখানি ছিল, তাতেও আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

স্বদেশী যুগে বাঙালী যখন জীর্ণ কন্থার মত ইংরেজী স্কুল কলেজ, সরকারী চাকরী ইত্যাদি অবহেলে পরিত্যাগ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ কবরস্থ করছিল, দক্ষিণীরা সেই স্বর্ণ-সুযোগে ভাবী স্বাধীন ভারতের শাসন যন্ত্রের হাল ধরবার জন্য আরো বেশী করে রপ্ত করছিল বিলিতী বিজাতীয় শিক্ষা। তাই ইংরেজ শাসন সূর্য পাটে বসতে না বসতেই দেখা গেল, পরাধীন যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রধান আন্দোলনকারী হয়েও সারা ভারতে তথা কেন্দ্রীয় শাসন যন্ত্রে বুদ্ধিজীবী বাঙালীর যে পাকা পোক্ত স্থান ছিল, সেই সুউচ্চ সম্মানের স্থান থেকে অকস্মাৎ তার বিলুপ্তি ঘটেছে এবং আর্য, মুসলমান বা ইংরেজ—কোন আমলেই যাদের শিক্ষাবুদ্ধি, যোগ্যতা বা দেশপ্রেমের বিশেষ কোন পরিচয় আমরা পাই নি, সেই কৃষ্ণকায়রা এসে দাঁড়িয়েছে বাঙালীর মাথায় পা দিয়ে।

স্বদেশী যুগে বাঙালী যখন স্বরাজ স্থাপনার জন্য

অহিংস সহিংস উভয় পদ্ধতিতে প্রবল আন্দোলন করেছে, দক্ষিণীরা তখন নিজেদের দাবি অবারিত করে দিয়েছে বিদেশী ধর্ম ও শিক্ষার জন্য।

উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখুন। স্বাধীন ভারতে যখন অহিন্দীভাষী প্রদেশগুলি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটু একটু করে ফিরিয়ে আনছে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য, দক্ষিণ তখনও তার উত্তর পুরুষদের শিক্ষার ভার রেখে দিয়েছে মিশনারীদের হাতে। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য একটুও কমায়নি সে

এর ফল সুদূর প্রসারী। আগামী সিকি শতাব্দীর মাথায় যখন তামাম ভারত রাষ্ট্রভাষার তালিম নিয়ে 'হায়, হায়—' করে চোস্ত হিন্দীর প্রতিযোগিতায় নামবে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং কর্মকাণ্ডের চাবিকাঠিতে তখন সম্ভবতঃ দক্ষিণীদেরই থাকবে একচেটিয়া অধিকার।

অনেকে হয় ত ভাবছেন, কেন্দ্রের রামরাজত্বের ভাটা তা হলে ত দক্ষিণীদের হাত থেকে খসে পড়ল বলে। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

ধীমান দক্ষিণীরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ নয়। সমস্ত ভারত জানে দক্ষিণ হিন্দীর ঘোর বিরোধী। এই বিরোধের আন্দোলনে ভাগ নেবার জন্য কিছুদিন পূর্বে সে উদার আহ্বান জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। আন্দোলনে অরুচি আছে বাঙালীর, এমন কথা তার পরম শত্রুও বলতে পারে না। তেমন মহেন্দ্রক্ষণ এলে অগৌণে সে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিন্দী-বিরোধী অভিযান সুরু করবে, যেমন জাতির পিতার পাল্লায় পড়ে স্বদেশী যুগে করেছিল ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে। কিন্তু সে বোধ হয় স্বপ্নেও জানতে পারবে না যে এটা শুধু ভবিষ্যতে তাকে কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করবার জন্য দক্ষিণের একটা চাল মাত্র।

হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে করে দক্ষিণ শুধু প্রস্তুতির সময় বাড়িয়ে দিচ্ছে মাত্র। ভারতের হিন্দী-অহিন্দী—সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দীকে মাধ্যমিক গুরুত্ব দিয়েছে দক্ষিণ। প্রবল প্রস্তুতি চলেছে ভাবী নাগরিকদের রাষ্ট্রভাষায় পরিপক্ক করে তুলবার জন্য। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি,—সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায়ও সেখানে হিন্দী বাধ্যতামূলক। সমস্ত পেপারে কার্স্ট ডিভিসনের নম্বর পেয়েও হিন্দীতে ফেল করলে কম্পার্টমেণ্টালের ব্যবস্থা নেই।

আর একটি, ১৯৫০এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাশ হয়েছে তারও অনেক পরে। ১৯৫৩তেই দেখা গেল, গভর্নমেণ্টসার্ভেণ্টদের জন্য রাজধানীতে যে অবৈতনিক হিন্দি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে, তাতে শিক্ষার্থীরা দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দি গ্রামার পড়ছেন।

তৎপরতা এবং কর্মকুশলতার এর চেয়ে বড়ো প্রমান আর কি হতে পারে।

হিন্দী ভাষাভাষী উত্তরীরা আশা করে আছেন, ইংরেজী ভাষা একবার উঠে গেলেই হয়। সমস্ত কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলিতে ফুল মার্কস নিয়ে কাইবেকগুলি তারাই দখল করবেন। কিন্তু দক্ষিণীরা সে গুড়ে নতুন হিন্দী সাম্রাজ্যের ইতিহাস তৈরি করেছেন, সে খবর নিশ্চয় করে বলতে পারি, তাঁরা জানেন না।

স্বাধীন ভারতে আজ বাঙালী নতুন এক দুর্নাম অর্জন করেছে সে নাকি উগ্র প্রাদেশিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন। কিন্তু এই ভারতে চরম প্রদেশ প্রীতি যদি কারুর থাকে তবে তা আছে শুধু দক্ষিণীদের। আজ কতকাল ধরে দিল্লী ভারতের রাজধানী। দক্ষিণীদের হোটেল রেস্তোরাঁর অভাব নেই, এখানে চাকরী-সূত্রেও বহুজন বহুকাল কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু দিল্লীতে বাড়ীওয়ালা দক্ষিণী নেই একজনও। বহু প্রদেশের বহুলোক এখানে ঘরবাড়ী বানিয়ে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন মাত্র ওরা নয়। ওরা এখানে আসে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াতে। যতবড় চাকুরেই হোক না আর যতকালই এখানে থাকতে হোক না, ওরা অধিকাংশেই থাকে অতিথির মত। ফার্নিচার কিনে ঘরবাড়ী সাজায় না, দিল্লীর শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবেও বিশেষ কোন মূল্যবান জিনিস পয়সা খরচ করে সংগ্রহ করেনা, অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া বাহুল্য একটুকরো সুতোও প্রায় ওরা কেনে না। স্বাধীনতার পরে এখানে ওদের সমাজ বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর হয়েছে। কিন্তু তা বলে শিক্ষিতজনেরা কখনো এখানে বসে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বা বিবেচনাদি

অনুষ্ঠান করে না। ওদের স্ত্রী কন্যাদের কাপড় জামা যাযবরা আসে স্বদেশ থেকে বা স্বদেশী কেই ওয়ালার থেকে। গয়না গড়ানো হয় দক্ষিণী স্যাকরা দিয়ে বা কোন ভেকেশন উপলক্ষে দেশে গিয়ে। ওদের খোপার ফুল জোগায় কৃষ্ণকায় ফুলওয়ালা। সাউথ ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোন ব্যাঙ্কে ওদের একাউণ্ট নেই।

দক্ষিণী হোটেল, কফিহাউসগুলিতেও এই একই নিয়ম। চাকর বাকর রাধুনী, কর্মচারী সব সাউথ ইণ্ডিয়ান। লোকের অভাব হলে ওরা বরং দেশ থেকে লোক আনিয়ে নেবে, কিন্তু অ-দক্ষিণী কাউকে সে জায়গায় বসাবে না।

বাড়ী বা হোটেলের কোন চাকরেরও যদি অন্য কোথাও কোন ভালো কাজের চান্স আসে, মালিক স্বয়ং তার জন্য আপ্রাণ তদ্বির করবে যাতে কাজটি তার দেশের লোক পায়।

দিল্লী বাঙালীদের পুরানো প্রবাস গৃহ। তবু বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য একটা শিক্ষায়তন স্থাপন করতে তাদের যে পরিমাণ বাধা বিঘ্ন এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তার কিছুমাত্র ভোগ না করেই এই ক'বছরে সাউথ ইণ্ডিয়ার ছেলেমেয়েদের জন্য একাধিক স্কুল এখানে গড়ে উঠেছে।

এরা কথা বলে কম, কাজ করে বেশী, কর্মক্ষেত্রে সেন্টিমেন্টের ধার-ধারে না। এক কথায় আপাদ-মস্তক প্রাক্টিক্যাল।

এদের কিন্তু কেউ প্রাদেশিক বলে না।

দক্ষিণ খুব সমৃদ্ধশালী অঞ্চল নয়। দারিদ্র্য এবং অন্নাভাব নীচুতলার লোকেদের নিত্য সঙ্গী। তবু এরা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আশ্চর্য প্রাণশক্তি নিয়ে এবং আন্দোলন না করেই।

এই প্রাণশক্তির অপূর্ব প্রবাহ যদি দেখতে চান, রাজধানীতে আসুন।

বারো বছর আগে যখন এখানে এলাম, তখন টিকা বি চাকরের কাজগুলি ছিল পাঞ্জাবী ও ঝাঁসীওয়ালা বা ওয়ালীদের একচেটিয়া। আজ তারা নিশ্চিহ্ন হবার মুখে।

দলে দলে দক্ষিণী দরিদ্র-নারায়ণেরা এসে রাজধানী ছেয়ে ফেলেছে। প্রথম যখন এরা এলো, হিন্দীর 'হ্যা'ও এরা তখন বলতে পারে না। এদের কথা ও তৎসহ উত্তর, পশ্চিম পূর্ব অঞ্চলের লোকেদের কাছে ঘোরতর দুর্বোধ্য। কথা বোঝে না বলে এদের ধরন-ধারণ, স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও লোকে ছিল সন্দিগ্ধ। তবু এরা কাজ পেলো। নিয়েনডারথেল মানবদের মত ইসারা ইঙ্গিত আর হাত পা নেড়ে ভাব বোঝবার চেষ্টা,—এই সম্বল করেই এগুতে লাগল আস্তে আস্তে। হিন্দী বলতে শিখল অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। অবশেষে এদের প্রবল উদ্যম, ইচ্ছাশক্তি এবং প্রাণ প্রাচুর্যের কাছে পর দেশের সমস্ত বাধা ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেল স্রোতের মুখে তৃণের মত। একদল সেটল হতেই তাদের আমন্ত্রণে দেশ থেকে রওনা হয়ে এলো আর একদল। তারপর দলের পর দল। নতুন একদল যখন দেশ থেকে আসে, তখন যে পর্যন্ত তারা কাজ না পায়, পুরানো দলের সবাই ভাগাভাগি করে তাদের খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করে, নিজেদের থেকে এক ঘর দু'ঘর ওদের ছেড়ে দেয়। এমনি করে করে এরা রাজধানীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। আজ এরা শুধু পরিচিত নয়, পপুলারও। এদের আগে যে সব পাঞ্জাবী বি এবং ঝাঁসীর স্ত্রী-পুরুষ টিকে বি-চাকরের কাজ করত; তাদের কাজে কোন রেগুলারিটী ছিল না, ছুটী অছুটীর কোন সময় অসময় ছিল না। অর্থাৎ বাড়ীর গিন্নীদের তারা জ্বালিয়ে খেয়েছে।

এরা এসে নিজেরাই কতগুলি নতুন নিয়ম প্রচলন করেছে। টাকা নেবে ওদের থেকে কম, (এটা প্রথম অবস্থার কথা, বর্তমানে এরা রেট বাড়িয়ে নিয়েছে।) কাজ করবে রেগুলার, মাসে একদিন ছুটী, অনিচ্ছা সত্ত্বে বা দৈব দুর্বিপাকে যদি বেশী ছুটী নিতে হয়, মাইনে থেকে পয়সা কাটা যাবে। কাজ পরিষ্কার না হলে বরখাস্ত।

সবচেয়ে বড়ো কথা, এদের মাইণ্ডি পার্সেণ্ট লোকই সৎ এবং বিশ্বস্ত আর এটাই এদের পপুলারিটির অন্যতম মুখ্য কারণ। কোথায় দূর দক্ষিণ আর কোথায় দিল্লী!

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, শূণ্য পকেট এই নিয়ে এরা

সেই সুদূর দেশ থেকে কখনো ট্রেনে বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে, কখনো ধরা পড়লে নেমে পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে এখানে। ভাগ্যের মুখ ঘরে তার গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে সমৃদ্ধি আর স্বচ্ছলতার দিকে। এরা এখানে এসে শুধু দু'বেলা পেট ভরে খেয়ে বাঁচছে না, সঞ্চয়ও করছে দু'হাতে। বৌদের গায়ে রূপো নয়, সোনা-দানা উঠছে। পুরুষেরা এই কাজ করতে করতেই দু'পয়সা জমিয়ে নিয়ে অনেকে ছোটখাটো দোকান বা ব্যবসা খুলে বসেছে। কিন্তু চাকুরীজীবী ভদ্রলোক দক্ষিণীদের মত এরাও—'খায় দায় পাখিটি বসের দিকে আঁখিটি।' দিল্লীর মাটি থেকে পয়সা কুড়োচ্ছে, ঢালছে গিয়ে সেই দক্ষিণে।

শতকরা নব্বুইজন বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে দৌড় দেয় দেশে জমি জমা কিনতে বা ঘর বাড়ি বানাতে। সঞ্চয়কর্মে এরা পটুও খুব। টাকা কি করে জমাতে হয় আমার মনে হয় সারা ভারত এদের কা সম্বন্ধে তালিম নিতে পারে।

এই নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত দক্ষিণীরা শুধু নিজেদের হাত পা আর প্রচেষ্টার জোরে এখানে এসে যা করেছে, রেকর্ড করে রাখার মত।

দেশ থেকে স্বশ্রেণীর শিক্ষক আনিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য এরা স্কুল পত্তন করেছে। টাকা জমা রাখবার জন্য হিসাব নিকাশ জানা লোক এসেছে এদের আন রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে। ছুতোর ডাক্তার, স্যাকরা, পুরোহিত—সব কিছু নিয়ে এরা এখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলেছে।

নিজেদের মধ্যে গোলমাল নেই ঝগড়া কাউকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই, এদের জন্য মুহূর্তে জান কবুল করতে উঠে দাঁড়াবে সবাই। ভারতবাসীদের মধ্যে থেকেও সৎ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলছে এদের গভর্ণমেন্ট।

কয়েকটি নতুন "সোভিয়েত দেশ" পুস্তিকা

কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনার পূর্ণতর সদ্ব্যবহার

(এন. এস. খ্রুশ্চফের রিপোর্ট)

২। **সোভিয়েত কলকারখানায় কর্ম-ব্যবস্থা** (প্রশ্নোত্তর)

৩। **শিশুদের লালন পালন** (চিকিৎসকের পরামর্শ)

৪। **আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ—নিরস্ত্রীকরণ**—এন. এস. খ্রুশ্চফ

৫। **আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি**

—এন. এস. খ্রুশ্চফ

সোভিয়েত অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা

:: অর্ডার দিবার ঠিকানা ::

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১/১, উড স্ট্রীট,

কলিকাতা-১৬।

বলতে যতটা সহজ, এদের এই টিঁকে থাকার প্রচেষ্টাটা কিন্তু তত সহজ নয়। নাতিশীতোষ্ণ দেশের লোক এরা। এখানে এসে মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রচণ্ড গরম আর দুরন্ত শীতের। এদের কাদামাটি আর লতা পাতা দিয়ে গড়া কুটীরগুলি ভেঙে প্রায়ই পুলিশ এদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্থান হতে স্থানান্তরে। তবু এরা অনড়। তবু এরা কাজ কামাই করে না। রাত জেগে স্ত্রীপুরুষে মিলে নতুন কোন জলাভূমি বা পতিত প্রান্তরে (রাজধানীর আশে পাশে যার অভাব নেই)। মধ্যে রাতারাতি খাড়া করে তোলে নতুন ঝোপড়ী।

লেটের বান্ধায় এরা যখন দিল্লীতে এসেছিল, এদের পিছনে তখন না ছিল কোন রাজনৈতিক দল, না ছিল ভারত সরকারের কোন নৈতিক দায়িত্ব এদের প্রতি। কিন্তু আজ আর এরা অসহায় নয়। কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রে শক্তিশালী দক্ষিণী চক্রের দৃষ্টি পড়েছে এদের দিকে।

কয়েক মাস আগে পার্লামেন্টে উদ্বাস্তু সমস্যা আলোচনার সময় তাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, রাজধানীতে অগণত দক্ষিণী উদ্বাস্তু (?) দের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ভারত সরকার।

সেদিন এ নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য হয়নি। তবে মনে হয় এ প্রশ্ন চাপা পড়তে দেবেন না স্বদেশপ্রেমিক দক্ষিণীরা রাজধানীর জীবন-যাত্রায় এই ভাগ্যান্বেষী দক্ষিণী ভৃত্য-শ্রেণীর অপরিহার্যতাও হয় ত অদূর ভবিষ্যতে একদিন আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়ে যাবে।

দক্ষিণের প্রতি কেন্দ্রের দাক্ষিণ্য অরুপণ। দক্ষিণও তার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে চোখ বুঁজে। তবু কেউ বলবেনা ওরা প্রাদেশিক।

গত বিজ্ঞান কনফারেন্সে দরকার হয়েছিল কয়েক শো স্টেনোগ্রাফার। অস্থায়ী কাজ ঝাঁকে ঝাঁকে স্টেনো-গ্রাফার চলে এলো দক্ষিণ থেকে। এলো বললে ভুল হবে, ওদের আনানো হলো টেলিগ্রাফ করে। দৈনিক পঞ্চাশ টাকা মাইনের তিন মাস বিজ্ঞান কনফারেন্সে কাজ করে পকেট বোঝাই করে আবার ফিরে গেল তারা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে। রাজধানীর অ-দক্ষিণী স্টেনো-গ্রাফাররা এ প্রয়োজনের আভাসমাত্র জানতে পেলো না।

যে স্বদেশ প্রেমিক দক্ষিণীর দাক্ষিণ্যে এটি সম্ভব হলো তিনি কখনো এজন্য কারুর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে না বা পার্লামেন্টে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতেও তাঁকে হবে না।

তীরে পৌঁছবার জন্য বাঙালী কেবল হাপাহাপি করে জলই ঘোলা করছে, এরা সেই সুযোগে পাকা ডুবুরীর মত ডুবেডুবে তুলে নিচ্ছে শুক্তির গর্ভ থেকে রাশি রাশি মুক্তা।

সেখানে প্রাদেশিক স্বার্থের কোন প্রশ্ন নেই। (যেমন স্বস্তি পরিষদে।) সেখানে এঁরা উত্তম ভারত প্রেমিক। কিন্তু ভারতে এরা নির্ভেজাল স্ব-প্রদেশ প্রেমিক। সে প্রদেশপ্রেম এমনই উগ্র যে তার কাছে প্রতিরক্ষা বিভাগের কঠোর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতাও তুচ্ছ হয়ে যায়।

ভারতের নানান সমস্যা-সঙ্কুল উদ্বেল-সঙ্কটবারিধিতে এঁরা যেন অ-সিক্তসঙ্গ হংসযূথ।

তবু এদের উপর রাগ করতে পারিনে, বিদ্বেষ আসে না। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি এদের গভীর স্বজাতি প্রেম, কর্মতৎপরতা এবং অনুকরণীয় সঙ্ঘবদ্ধতা যা দিয়ে এরা জয় করেছে ইংরেজোত্তর দিল্লী।

হায়, আমরা যদি এমনি হতে পারতাম!

—আট—

চা এর গোড়ার কথা

বীরেশ্বর বসু

এবারে চা বাগানের পক্ষে উপযোগী সারের কথা আলোচনা করবো। বাগানের সমস্ত শ্রমিক, কামদারি চাপরাশি সর্দার সকলেই সারকে "দল" বলে। সত্তর পঁচাত্তর বছর আগে এই সমস্ত সার বড় একটা ব্যবহার হতো না। সারের উপকারিতা অনুভব করা হয় সাধারণত চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে এবং সেই সময় হতে চায়ের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। সার চা গাছের যে একটা জীবন-রসায়ন এ-কথা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে না। যার ব্যবহার করাতেও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ জমি অথবা চা গাছের অবস্থা বিবেচনা করে যার নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচন ঠিক মত না হলে অথবা শ্রম ও অর্থ নষ্ট হবে। আজকাল প্রায় সমস্ত চা বাগানেই প্রতি বছরে সার ব্যবহারের একটা হিসাব রাখে। এ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনের বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তবে এরমধ্যে মিঃ এইচ, আর কুপারের "The Mitrogen Supply to Tea. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তিকাতে কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কোন সার ব্যবহার করা উচিত যে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে এবং প্রমাণ দিয়ে লেখা আছে।

এই সমস্ত সার ব্যবহারের প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য জমির ক্ষয়িত পদার্থগুলিকে সজীব করা। জমির পদার্থ-গুলি ঠিক থাকলেই গাছের জোর থাকবে এবং পাতিও বেশি পাওয়া যাবে। অনেক প্রকার সার আছে। পূর্বে সার বলতে বুঝাত গোবর ও খৈল। কিন্তু অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর দেখা গেল যে একটা চা গাছকে সবল ও সুস্থ রাখতে হলে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ Mitrogen, Potash, Phosphoric Acid ও Lime থাকা দরকার। গোবর বা খৈল জমিকে এই সমস্ত পদার্থই দান করে সত্য কিন্তু এর কাজ বড় বিলম্বিত। আর এই গোবর বা খৈল যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করাও সম্ভবপর নয়। আজকাল প্রায় সমস্ত বাগানেই আর এক জাতীয় সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই সারও গোবর ও খৈলের মত উপকারী। এর নাম Humus Compost। এই Humus Copost তিন প্রকারের। (ক) Indor Compost (খ) Adco Compost (গ) Dacca Compost.

Indor Compost বা ইন্দোরের ছোটে ব্যবহার হয়, দেখা গেছে এইটি আমাদের ইণ্ডিয়ার পক্ষেও উপযোগী। এই Compost তৈরি করতে গাছের পাতাপুতি, আবর্জনা ছাই প্রভৃতি গোবর ও গরুর প্রস্রাব ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে কোন একটা গর্তের মধ্যে জমা করে রাখতে হয়। সেখানে এই মিশ্রণটা পচতে থাকে এবং মাঝে মাঝে এই মিশ্রণটাকে উলটপালট দিতে হয়।

Adco Compost এবং Dacca Compost তৈরির বিধিনিয়ম ও প্রায় অনুরূপ।

সবুজ সারের কথা আগেই বলেছি এই সবুজ সারও Compost জাতীয় সার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই Compost তৈরি করতে আজকাল অনেক 'Giuant Ageratum'ও ব্যবহার করে থাকেন।

এই সমস্তপ্রকার সারেরই কাজ শুরু হয় দেরিতে তাই আজকাল দ্রুত সুফল পাওয়ার জন্য সমস্ত বাগানেই 'Artificial manure' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একে অনেকে 'Chermical manure' ও বলে থাকে। এই Artificial অথবা Chemical manure পশুপক্ষীর হাড় দিয়ে তৈরি হয়।

অনেক প্রকার গাছের মাটিতে পরিমাণ Lime বা চুনের অংশ প্রয়োজন চা গাছের পক্ষে কিন্তু তা নয়।

চাগাছের পক্ষে জমিতে acid বা অম্লভাগ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য Lime বা চুণ সাধারণত চায়ের জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যে চা-চাষের জমিতে যে পরিমাণ অম্লভাগ থাকা প্রয়োজন তা স্বভাবতই প্রায় সমস্ত জমিতে থাকে। তবে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ খুব উঁচু জমিতে চুণের ভাগ বেশি থাকে এবং এই জন্য সেই সমস্ত জমিতে অম্লভাগ অনেক কম। এই অম্লের ভাগ কম থাকলে চা গাছ বাড়তে পারে না। আর চুণ যে অম্লের অম্লত্ব নষ্ট করে এ-কথা সকলেই জানেন। কারণ চুণ আর অম্ল বিরোধী পদার্থ।

কোন কোন জমিতে কি কারণে অম্লের ভাগ কমে যায় নিম্নে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি :

(১) একেবারে আনকোরা নতুন জমি অর্থাৎ নদীর চরে অথবা ঐরকম আর কোন জমিতে। কারণ এই সমস্ত চর বা জমি আর একটা জমির উপরের-ধৌত মাটি বা বালি। এতে অম্ল ভাগ নেই বললেই চলে।

(২) বনে ঘুরে আনা মাটি যে জমিতে জমা হয় সেখানেও অম্লের ভাগ কম।

(৩) যে সমস্ত জমিতে পর পর অনেক বছর ধরে কাঠ বা খড় জ্বালানো হয়েছে সেই সমস্ত জমিতেও অম্লের ভাগ কম। কারণ কাঠ বা খড় ইত্যাদি পুড়ে ছাই বা ক্ষার হয়। এই ছাই বা ক্ষার অর্থই চুণ। আগেই বলেছি যেখানে চুণের ভাগ বেশি হয় সেখানে অম্লের ভাগ কমে যাবে।

(৪) যে জমিতে কিছুকাল পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণে চুণ বা চুণঘটিত কোন পদার্থ দেওয়া হয়েছে।

(৫) যথেষ্ট পরিমাণ গোবর সার দিলে—

যে সমস্ত জমিতে অম্লের ভাগ কম থাকার দরুণ চা গাছ ভুগছে এক্ষেত্রে সেই সব জমিতে Sulpher বা গন্ধক দিলে তার অম্লভাগ বাড়ে। এছাড়া Sulphure of Ammonia দিলেও অনুরূপ সুফল পাওয়া যায়।

চায়ে চাগাছের পক্ষে 'Potash and Phosphoric Acid manumers খুব ভাল। কারণ 'Potash' গাছকে বাড়বার শক্তিদান করে আর 'Phosphates' লাল মুতো পোকা ইত্যাদির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

সমস্তরকম সারই সাধারণত ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে দিতে হয়। কারণ এই সময়ে দিলে 'সেকেণ্ড ফ্লাশ' আসে যে মাসের শেষে অথবা জুনের প্রথমে।

চায়ে গাছে সার প্রয়োগ করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে গাছের মূল শিকড়ের গোড়ে সার দেওয়া না হয়। প্রথম বৎসরে গাছের চারপাশে আঠারো ইঞ্চি পরিমাণ জমিতে পাঁচ ছয় ইঞ্চি মাটির নিচে সার দেওয়া উচিত। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে সার দেওয়ার জমির পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া ভাল।

সবুজ সারের মত 'Artificial manure' কোদালী মেরে জমির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে দেখতে হবে জমিটা যাতে শিশির ভেজার মত ভিজে ভিজে থাকে। কারণ মাটি শিশির ভেজা ভিজে ভিজে থাকলে সমস্ত সারটাই গলে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং বাতাসে উড়ে অন্য যাওয়ার আর ভয় থাকে না। তবে গোবর oilcake বা খৈল অথবা Animal meds কোদালী মেরে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া উচিত কারণ এই সমস্ত সার মাটির ওপর পড়ে থাকলে এর থেকে ammonia from করে এবং অনেক পদার্থের অংশেই বায়ুর সঙ্গে মিশে হাওয়া হয়ে যেতে পারে আর বেশি পরিমাণ বৃষ্টি হলে হয়ত তা ধুয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে।

অনেকের হয়ত ধারণা আছে যে সার দিলে ভাল সুগন্ধযুক্ত চা পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ এই সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনের বৈজ্ঞানিকগণ, চা কোম্পানীর পক্ষ থেকে বাগানের অনেক মালিক এবং সিংহলের Tea Research Institute থেকে বহু গবেষণা করা হয়েছে। এদের সকলের রিপোর্টে জানা যায় যে সার দিলেই গাছে ভাল চা পাওয়া যায় না এবং জমিতে সার না দিলেই ভাল চা পাওয়া যায়। তবে সার দিলে বেশি পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আবার সার না দিয়েও উপায় নেই। গাছ রোগা ক্ষীণজীবী ও স্বাস্থ্যহীন হবে।

সার সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা একান্ত সংক্ষিপ্ত। কারণ ও সম্বন্ধে পুরোপুরি সব লিখতে হলে ছোট খাটো একটা বই হয়।

চা বাগানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কতকগুলি

জিনিষ আছে যা ছাড়া বাগান চালানো অসম্ভব। এর মধ্যে কাঠ খুঁটি, খড় বাঁশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জন্য চা চাষের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত জিনিসের চাষ করাও উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে নির্ভর করে জমির প্রাচুর্যের ওপর। অনেক বাগানে চা চাষের পর অতিরিক্ত জমি না থাকায় এই সমস্ত জিনিসের চাষ-আবাদ সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এ ক্ষেত্রে এদের এই সব জিনিস অন্যত্র থেকে বেশি দামে কিনে আনতে হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে দরকার মত জিনিস পাওয়া যায় না।

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে প্রায় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সমস্ত মাল বাগান থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তবু প্রত্যেক বাগানের কর্তব্য (অবশ্য যদি অতিরিক্ত জমি থাকে) যতটা সম্ভব এ-সব জিনিসের চাষ করা। এতে খরচ অনেক কম হয়। আর এ-ছাড়া অনেক সময়ে যখন বাগানে সমস্ত শ্রমিকের কাজ দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন তাদের এই সমস্ত কাজ দেওয়া যেতে পারে। কারণ আজকাল দিন দিন প্রতি বাগানে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমার বিশ্বাস খড় ও বাঁশের চাষ করতে খুব বেশি জমির প্রয়োজন হয় না। তাই প্রতি বাগানেই দুটো জিনিসের চাষ থাকা দরকার। তবে কাঠের কথা আলাদা। কারণ কাঠের চাষ করতে হলে অনেক জমির আবশ্যক। খড় বাঁশের চেয়ে কাঠের প্রয়োজনও অনেক বেশি।

এখন কাঠ, খড়, বাঁশ চা বাগানে কোন কোন কাজে লাগে এবং এদের চাষ-আবাদের সম্বন্ধে কিছু বলছি।

কাঠ শুধু যে কেবল মাত্র ঘরবাড়ি তৈরি করতেই লাগে তা নয়। চা বাগানে রবেলাবে আগুন দিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঠের দরকার। আজকাল অবশ্য কয়লা ও তেল ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু আগের দিনে কয়লা বা তেল বড় দুষ্প্রাপ্য ছিল তা ছাড়া যানবাহনের অভাবে কয়লা বা তেল আনা সম্ভব হত না। তখনকার দিনে প্রতি মণ চা তৈরি করতে আট নয় মণ কাঠের দরকার হতো। অবশ্য শক্ত কাঠ হলে ছয় মণ কাঠে এক মণ চা তৈরি করা যায়। আর ঘর বাড়ি তৈরি করতেও কাঠের প্রচলনই বেশি ছিল কারণ ঐ সময়ে ইঁট বা কংক্রিটের কাজ বড় একটা হতো না। এ ছাড়া সাহেব, বাবু ও শ্রমিকদের রান্নাবান্নার জন্যও জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন।

খড়ও বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস। শ্রমিকদের ঘর বাড়ি নার্সারী প্রভৃতি অনেক কাজেই প্রচুর পরিমাণে খড়ের দরকার। খড় সংগ্রহে জমি না হলেও চলে তবে তাতে ভাল ফসল আশা করা যায় জমি যদি ভাল হয় তা হলে অনেক কাল ধরে ভাল ফসল পাওয়া যায়। খড় বাড়ি প্রতি বছর খড় কেটে নেওয়ার পরে বেশ করে পরিষ্কার করে দিতে হয়। এবং সমস্ত বাড়িটা জাগিয়া দিলে আরো ভাল হয়। খড় কাটা শুরু হয় সাধারণত নভেম্বর মাস থেকে তখন খড়গুলি পাকে। খড় না পাকলে অল্প বৃষ্টি পেলেই তা পচে যায় খড় কেটে কয়েক দিন জমিতে ফেলে উচিত। এতে রোদ পেয়ে খড়গুলি শুকোয়। বেশি শুকোবার পর খড় অনেক দিন ধরে গাদি মারা থাকলেও নষ্ট হয় না কিন্তু কাঁচা খড় গাদি মেরে রাখলেই একটু বৃষ্টিতে পচে যাবে। আর বৃষ্টি না হলেও গাদির ভেতরে গাঁজিয়ে ওঠে। খড় ভাল ভাবে শুকোবার পরে বাণ্ডিল বাঁধতে হয়।

এরপর বাঁশ। বাঁশ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস। অবশ্য কাঠ, খড়, বাঁশ এর কোনটাই কম দরকারী নয়। এবং কোনটার গুরুত্ব বেশি বা কম এর হিসাব করা বড় শক্ত। বাঁশ শুধু যে ঘরবাড়ি তৈরি করতে লাগে তা নয়। বাড়ির বেড়া, নার্সারী এবং সেতু তৈরি করতেও বাঁশের প্রয়োজন। অনেক প্রকারের বাঁশ আছে। তবে এর মধ্যে যে সমস্ত বাঁশ চা বাগানে সাধারণত পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা হয় নিম্নে তার একটা হিসাব দিচ্ছি। আবার একই জাতের বাঁশ অথচ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত। যেমন (১) Bambusa balcooa—এটি বোটানিক্যাল নাম। এই জাতের বাঁশই সাধারণত ভারতে বেশি পাওয়া যায় এবং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বাঁশ প্রায়ই ষাট পয়ষট্টি ফুট লম্বা হয়। মোটা হয় পাঁচ ছয় ইঞ্চি। এর গিঁটগুলি খুব ঘন ঘন। গিঁটগুলি ঘন ঘন থাকায় বাঁশগুলি খুব শক্ত হয় এবং এই কারণেই বড়ের খুঁটি, সেতু ও গরু ভরসার গাড়িতে ব্যবহৃত হয়। এই বাঁশকে বাংলা দেশের লোকে ভালকু বাঁশ বলে। ডুয়ার্স অঞ্চলে এর নাম

বোরো বাঁশ আর আসামে একে বলে তোলোকো বাঁশ।

(২) Melocanna Bambusoides—বাংলা দেশের এর নাম মুলি বাঁশ আর আসাম অঞ্চলে একে বলে তরাই। এই বাঁশ সাধারণত পঞ্চাশ ষাট ফুট লম্বা হয়। গোড়া আড়াই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি মোটা। এর গিঁট খুব কম। প্রায় দেড় থেকে আঠারো উনিশ ইঞ্চি ব্যবধান। এই বাঁশগুলি দেয়াল ও ছাতের পক্ষে ভাল।

(৩) Bambusa Tulda—বাঁশকে বাংলা দেশে জোয়া বাঁশ বলা হয়। ডুয়ার্স অঞ্চলে বলে মাকলা বাঁশ। আসামে জাও এবং মুর্মা ভ্যালিতে মিরতেত্রগা বলে। এই বাঁশ বেড়া বা দেয়ালের পক্ষে ভাল। লম্বা হয় বিশ ফুট থেকে প্রায় সত্তর ফুট পর্যন্ত। মোটা দুই তিন অথবা ক্ষেত্রে বিশেষে চার ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে এর গিঁটগুলিও বেশ দূর দূরে।

(৪) Dendro calamus Hamiltonii:—আসামে ও বাংলা দেশের এই জাতের বাঁশের নাম কাকা। দেরাদুনে 'ছাইয়ে' বলে। এই বাঁশ ও প্রায় সত্তর ফুট লম্বা আর মোটা হয় প্রায় চার থেকে ছয় ইঞ্চি। এই জাতীয় বাঁশ আসাম, ডুয়ার্স, তরাই ও দার্জিলিং অঞ্চলে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৫) Dendro calamus Giganteus—এই জাতের বাঁশই বোধহয় সব চেয়ে বড় অর্থাৎ লম্বা ও মোটা হয়। একে আসামে 'ওরবা' এবং বার্মা ও নাগা পাহাড়ে 'ওয়াবো' বলে। বাংলা দেশে এর বড় একটা চলন ছিল না তবে আজকাল ডুয়ার্স অঞ্চলে অনেকে এর চাষ করেছে। মনে হয় একেই ডুয়ার্স অঞ্চলের লোকে বোম বাঁশ বলে থাকে। এই বাঁশ প্রায় এক শো ফুট পর্যন্ত লম্বা আর দশ এগারো ইঞ্চি মোটা হয়ে থাকে।

(৬) আসামে আর এক জাতীয় বাঁশ দেখা যায় যার বোটানিক্যাল নাম D. Mannii. আসামে ডাক নাম ভেডি বাঁশ। এ দিয়ে লাঠি, ছাতার বাঁট ইত্যাদি তৈরি হয়।

এ ছাড়া আরো অনেক প্রকার বাঁশ আছে। তাদের বিষয় এখানে উল্লেখ করা বোধহয় উচিত হবে না কারণ পূর্ববর্ণিত বাঁশ ছাড়া আর অন্য কোন বাঁশ চা বাগানে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না।

এখানে আর দু'একটা কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশের সাধারণ এবং চাষীদের বিশ্বাস যে বাঁশের চাষ করতে হলে গোড়ার শিকড়ে জড়ি থেকে যে গো ওঠে সেটাকেই কড়িমেত কেটে এনে লাগিয়ে দিতে হয়। বাঁশের যে বীজ আছে তা অনেকেরই জানা নেই। বাঁশের বীজ খুব ছোট পোস্ত দানার মত। বড় রকমের চাষ করতে হলে এই বীজ রোপণ করাই ভাল। সাধারণত পনর দিন থেকে এক মাসের মধ্যে অঙ্কুর হয়। বীজ রোপাই চৌদ্দ পনর ইঞ্চি অন্তর করা উচিত। এরপর দেড় দুই বছর বাদে ঐ বাঁশের চারা অন্তত বিশ বাইশ ফুট অন্তর রোপণ করতে হয়।

চা গাছের মত পোকা-মাকড়ে বাঁশের বড় একটা ক্ষতি করতে পারে না। তবে এরও শত্রু আছে। এই শত্রু ইঁদুর। এরা গাছের গোড়া কুরে কুরে খায়। এর আরো শত্রু আছে তবে তা আমাদের পূর্ব পশ্চিম বাংলা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এই শত্রু জঙ্গলময় পার্বত্য উত্তর অঞ্চলগুলিতেই দেখা যায়। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে এই সমস্ত জঙ্গল সমকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলেই চায়ের চাষ। সুতরাং চা বাগানের কাজের জন্য বাঁশ রোপাই করতে হলে সেখানেই করতে হবে। এই দেশের আর আর শত্রু হচ্ছে কোন কোন বন্য পশু-পক্ষী। এর মধ্যে হাতী ও হরিণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়।

আর একটা কথা বলেই বাঁশের প্রসঙ্গ শেষ করছি। আমার ধারণা অনেকেই হয়ত জানেন না যে বাঁশের বীজ একটা পুষ্টিকর খাদ্য। বিশেষ ভাবে খোঁজ নিয়ে দেখলে জানা যায় যে দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক দরিদ্র পরিবারের লোকেই এই বীজ খেয়ে জীবনধারণ করেছে। কারণ এই বীজের মধ্যে জলীয় ভাগ আছে ১৩.৫০, খাদ্যসার পদার্থ ১০.৮০, শ্বেতসার ৭০.৬০ তৈল ভাগ ০.৬০, ছিবড়া ২.১০ এবং ক্ষারের ভাগ ১.৪০। এতে প্রমাণিত হয় যে জীবন ধারণের মত উপাদান এর মধ্যে আছে।

এ ছাড়া বাঁশের উপকারিতা আরোও অসংখ্য আছে তবে সে সমস্ত বিষয়ের এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

—এই সন্তু
ান ছড়িয়ে ছিটিয়ে
যেছিস যে?
সন্তু নিরুত্তর।
ানতে দুটি ভাত
ধ পুরেই বেরিয়ে
বে বলে ঠিক
রে ছিল। শনি-
রের স্কুল।
ড়টায় ছুটি। তবু ছুটি হলেই খিদে পেয়ে যায় সন্তুর।
জ ভেবেছিল ভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়বে। মা, বড়দি
য়ে থাকবেন, এই সুযোগে অনেকক্ষণ থাকা যাবে।

কিন্তু ভাত খাওয়া শেষ না হতেই বড়দি এলেন
ঘরে। এতক্ষণের স্তব্ধ মুহূর্তে চুপসে গেল। বড়দির
খা শুনে উঠবে কি উঠবে না করছে এমন সময় মা
কলেন ঘরে।

—ও মা! ওই তোর খাওয়ার ছিরি। দাঁড়া দেখাচ্ছি,
াজ তোকে কে বেড়াতে যেতে দেয়। খা—খা,
গুলো সব—

সন্তুর খেতে ইচ্ছে করছিল না। সারা শরীরে এক উন্মাদনা।
ানমতে খেয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যেতে পারলেই আঃ—

ময়ূর দুটো নিশ্চয়ই খাঁচার মধ্যে বসে রোদ পোয়াচ্ছে।
কটা অন্তটার সংগে খেলছে, নাচছে, হাঁটছে—যেতে
াতে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল সন্তু। কাল মা
র পয়সা দিয়েছিলেন। তার থেকে দু পয়সা বাঁচিয়ে
ভজে ছোলা কিনেছে। কিনে দুভাগে ভাগ করে
খেছে। একভাগ দেবে গিনিপিগদের, আর একভাগ
ময়ূর-ময়ূরীকে।

—ওঠ। মুখ ধুয়ে এখন পড়তে বসো।

সন্তুর এবার কান্না পেল। বড়দি মা-র কেবল পড়া-
ড়া। অথচ পড়তে এতটুকু ভালো লাগে না। রাতদিন
ড়লে,—দাদা কি আরামে আছেন। কেউ পড়তেও
লে না। যখন খুশী বেরিয়ে পড়ছেন, খেলছেন। দাদার
ত হতে পারলে—

সন্তু এলো পড়ার টেবিলে। ছোড়দি মেঝেয় বসে পুল-ওভার বুনছে। সন্তু চেয়ারে বসে আড়-চোখে তাকাল। ছোড়দি আপন মনে বুনে চলেছে। খুব ভালো লাগে ছোড়দিকে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। বাড়ির কাজ করে—সবকাজ। কিন্তু কখনো রাগ করে না, বড়দির মতো ওমন চিৎকার করেও কথা বলে না।

বই খুলল। সামনে যে পাতা বের হলো, তাতেই মন দিতে চাইল। চেঁচিয়ে পড়বে। তাহলে ছোড়দি রাগ করবে কিন্তু চেঁচিয়ে না পড়লে বড়দি তাড়া দেবেন—পড়ছিস না কেন, পড়ছিস না কেন। চেঁচিয়ে পড়লে ছোড়দি রাগ করবে, ব্যাস তাহলেই—

বুদ্ধিটা মাথায় আসতে চেঁচাতে থাকল,—একটি ধ্বনি বা কয়েকটি ধ্বনির সমষ্টি যদি কোন দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া—

—এতো চেঁচিয়ে পড়ছিস কেন?

শুনতে পেল না এমনভাবে পড়তে থাকল,—তবে তাদেরকে শব্দ বলে। যেমন, প্রদীপ—

—সন্তু!

পড়া থামল।

—কি?

—অতো জোরে পড়তে হবে না, মনে মনে পড়ো।

ঠিক যেমনটি ভেবেছিল, তেমন হয়েছে দেখে খুশী হলো মনে মনে। বই খোলাই থাকল। মন চলে গেল পার্কে। ময়ূর দুটো নিশ্চয়ই খেলছে, গিনিপিগগুলো পাহাড়ের গুহায় ঢুকছে—আবার বেরুচ্ছে। কফি পাখি খেয়ে ফেলেছে হয়ত। কাল বাড়িতে কফি এলে অনেক পাতা রেখে দিতে হবে।

চোখের সামনে ভাসতে থাকল গিনিপিগ, পাখি আর ময়ূর-ময়ূরী। অসীম নিয়ে গিয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে

বোজই গলিতে, না হয় বড়জোর নরেন সেন স্কোয়ারে খেলতে যায়। বেশীদূরে যেতে মানা। আর এখনকার ছেলেরাও বেশীদূর যেতে চায় না। স্কুল থেকে এসে গলিতে, না হয় পার্কে ফুটবল, ক্রিকেট, গুলি খেলে। সেদিন স্কুল ছুটির পর—

সন্তু মনে করতে চাইল। কিছুতেই যেতে চাইছিল কেমন ভয় ভয়।

অসীম বলল, তোকে এমন জিনিস দেখাবো, দেখবি মজা।

চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল। প্রথমে বিশ্বাস হতে চায়নি। কিন্তু পার্কে গিনিপিগ আর ময়ূরের খাঁচা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। ব্যস, সেদিন থেকে খেলাধূলা সব চুলোয় গেল। স্কুল ফেরৎ বাড়ি হয়ে আসা চাই পার্কে।

জানালা দিয়ে তাকাল একবার। দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে। রোদের তেজ কমে আসছে। সন্তুর মন ভারি হয়ে উঠল। মা, বড়দির পর একটা অভিমান জমে উঠতে থাকল। পল্টু, মঙ্গলদের বাড়ির লোকেরা কত ভালো, ওরা যে-কোন সময় বেরিয়ে পড়ে, কেউ কিছু বলে না। শুধু আমাদের বাড়ির—

একটা চিন্তাও সম্পূর্ণ হতে চায় না এখন। রাগের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। তাকাল ছোড়দির দিকে। ছোড়দি কি যেন লিখছে। সন্তু জানে, এ সময় ছোড়দি আরও ভালো হয়ে ওঠে।

—ছোড়দি।

ছোড়দি লেখায় তন্ময়। উত্তর দিল না।

কাছে সরে এলো, ছোড়দি।

—উঁ। লিখতে লিখতে জবাব দিল ছোড়দি।

—তুই ময়ূর দেখেছিস?

ছোড়দি লিখতেই থাকল।

সন্তু বিরক্ত বোধ করল, ছোড়দিটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে!

—ছোড়দি, আবার ডাকল সন্তু।

তাড়াতাড়ি কাগজ কলম ঠিক করে নিল, কি!

—তুই ময়ূর দেখেছিস।

—ছোড়দি হাসল। এ হাসি ভালো লাগে সন্তুর! ছোড়দি জোরে হাসে না, হাসলে সারা মুখ জল জল করে।

—হ্যাঁ।

—ময়ূরের নাচ দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—দেখেছিস! বিশ্বাস করতে পারল না সন্তু। এ প্রশ্ন বহুদিন করেছে। ছোড়দি যতই বলুক না কেন সে দেখেছে তবু বিশ্বাস করতে পারে না সন্তু।

অসীম বলেছে, জঙ্গলে থাকলে ময়ূরের নাচ দেখতে পেতিস। মেঘ দেখলে ময়ূর যা নাচে—

—তুই জঙ্গলে ছিলিস!

—না।

—তবে—

—ঠাকুর্দা জঙ্গলে ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য বাঘ ভাল্লুক, জন্তু-জানোয়ার তাড়ো পাখির সম্বন্ধে—

অসীম অনেক অনেক কথা বলতো। সন্তুর মনে একটা ছবি গেঁথে গিয়েছিল আর সেই বইটার গল্পের কথা মনে পড়তো—পশুরা বসেছে সভাতে, সিংহ হয়েছেন সভাপতি, এক একজন পশু বলে—

অসীমের কাছে এত কথা শুনেছে বলে ছোড়দির কথা বিশ্বাস করতে পারে না সন্তু। ছোড়দি বললেই বলে,—তুমি জঙ্গলে গেছো নাকি।

ছোড়দি হেসে ওঠে,—জঙ্গলে না গেলে বুঝি দেখা যায় না।

সন্তু মিইয়ে পড়ে। ছোড়দির হাসি তখন ভালো লাগে না। তবু একমাত্র ছোড়দিকেই এসব কথা জিজ্ঞেস করতে পারে। ভরসা পায়। মা, বড়দি যা! একটু জিজ্ঞেস করলেই চটে যান, না হয় দাদা এলে বলে দেন। ভাগ্যিস দাদা রাত করে বাড়ি ফেরেন নইলে—

ছোড়দির দিকে দৃষ্টি ফেরাল সন্তু। ছোড়দি যা লিখছিল, তাই পড়ছে এখন।

—তুই গিনিপিগ দেখেছিস—

—উঁ, পড়তে পড়তে জবাব দিল ছোড়দি।

—আচ্ছা বলতো, গিনিপিগ দেখতে কেমন।

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, বড়দি এসে চিৎকার ছাড়ে দিলেন,—এই তোর পড়া হচ্ছে।

সন্তু এতটুকু হয়ে গেল। কোনমতে ঢোক গিলে বলল, —জিজ্ঞেস করো ছোড়দিকে আমি এতক্ষণ—

—বিনু, পড়ছিস সন্তু ?

ছোড়দি মাথা নাড়ল।

—আরও পড়ো। আজ সব পড়া—

—কাল রবিবার, আজ—

—কাল রবিবার তো কি। আসুন দাদা, আজকে তোমার—

অগত্যা পড়তে বসতে হলো সন্তুকে। সন্তুর কান্না পেতে লাগল। তবু কান্নাকে চাপতে হলো। জোরে জোরে পড়তে থাকল, প্রদীপ, শঙ্খ, তালা চাবি প্রভৃতি—পড়া থামিয়ে ডাকল, ছোড়দি।

—পড়ে নাও কিছুক্ষণ, তা না হলে বড়দি এসে আবার—

সন্তুর চোখ জলে ভরে উঠল। আজ কি কুক্ষণে তাড়াহুড়ো করে খেতে গিয়েছিল। বড়দি-টা এমন! মা ও বড়দির সঙ্গে থেকে থেকে—মা-র প্রতি ভীষণ অভিমান হলো। বাড়িতে যেন—ঠিক আছে, আমি একদিন রাঙাদার মত পালিয়ে যাবো, তখন দেখবো তোমাদের কি অবস্থা হয়। তখন কাঁদতে কাঁদতে—পড়ায় মন দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই মন বসছে না। বই তুলে নিল হাতে, ছোড়দি, মনে মনে পড়ব ?

—পড়ো, ছোড়দি হাসল।

ছোড়দির হাসিতে বুঝতে পারল, ছোড়দি তার মতলব বুঝতে পেরেছে। মনে মনে খুশী হলো। সরে এলো জানলার ধারে। বই সামনে কিন্তু নজর চলে গেল রাস্তায়। নবীন সেনের সরু গলি বেয়ে কলেজ-রো। কলেজ-রো পেরিয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট-এ, তারপর আমহার্স্ট স্ট্রীট—চার মাথা পেরিয়ে পার্ক—ছেলেমেয়েরা খেলছে ফুটবল, ক্রিকেট। স্লিপ খাচ্ছে, দোলনায় ঝুলছে। সন্তু এ-সব দেখবে না। সোজা চলে আসবে—দৃষ্টি ঊর্ধ্বে পাঠাল। আকাশ দেখতে চায়। আকাশে যদি মেঘ থাকে, ওঃ—

ঘাড় ব্যথা করতে থাকল। অথচ এখান থেকে মেঘ তো কোন ছার, আকাশ দেখতে পেল না। ঘুরু হলো। এ-সময় যদি অসীমটা একবার আসে—। কি করে যাই ? বড়দি ছুটি দেবেন না। ভাবতেই হু-হু করতে থাকল বুকটা।

আচমকা পেন্টের পকেটে হাত গেল। খচ্ খচ্ করে উঠল কি যেন। ভিজে ছোলার দুটো প্যাকেট ঠিক করে রেখেছে। আচ্ছা, মদনা, পল্টু, বিশে, বুলবুল এরা দেখেনি সিমিলিপাল, ময়ূর ? ওরা যা-তা বলে ক্ষেপায়। কি সব আজে বাজে কথা—মেনীমুখো, ময়ূর-পুচ্ছী, খরগোস-বাচ্চা। রাগে সারা শরীর জ্বলে ওঠে।

মা, দিদি থেকে অভিমানটা ধীরে ধীরে চড়াতে শুরু করল। আর অসীমটাই বা কি ? ও-ই দেখিয়েছিল অথচ এখন নেমেই মা ওর সঙ্গে। পল্টু, মদনা, বিশেদের সঙ্গে এক হয়ে ওই সব আজে-বাজে কথা বলে।

সন্তুর চোখ জলে টস্ টস্ করতে থাকল। যদি বড় হতাম, তাহলে আমিও, জল গড়িয়ে পড়ল সন্তুর। বড়দা, দিদি, মা, এরা সবাই এমন করে আমায়—

—কি রে সন্তু, কাঁদছিস কেন ?

—কই, কই, বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দৌড়ে এসে ছোড়দির কাপড়ে মুখ লুকোলো।

—কাঁদতে নেই, ছি—ছোড়দি মাথায় হাত বুলোতে থাকল। কান্না এবার দমকে দমকে বেরিয়ে পড়তে চায়।

—আচ্ছা চ। মা-র কাছে ছুটি পাইয়ে দিচ্ছি।

ছোড়দিকে এজন্যে এতো ভালো লাগে। ছোড়দি কতো ভালো, অথচ বড়দি কেবল খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে। মা আগে করতেন না। আজকাল বড়দির মত রাগ করেন ছোড়দির ওপর। ছোড়দি বাড়ির সব কাজ করে, তবু মা-র এতটুকু দয়া হয় না।

—আয়, আর কাঁদে না।

সন্তুর লজ্জা করতে লাগল। কথা খুঁজে পেল না। কাপড়ের মধ্যে থেকে মুখ তুলতে চাইল। একটা লজ্জা, মুখ তুলতে পারল না। ছি-ছি, কেঁদে ফেললাম। ছোড়দির সঙ্গে এলো পাশের ঘরে। ছোড়দি ঢুকে পড়ল। সন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। বুক ঢিপ ঢিপ্ করছে। বড়দি কি আছেন ? উঁকি মেরে দেখল। না। বড়দি তবে কোথায় ? ওখান থেকেই ভাবতে চেষ্টা করল—বড়দি কোথায় কোথায় থাকতে পারেন। কান খাড়া করল। জানে, বড়দি যেখানেই থাকুক না, একটা কিছু শব্দ হবেই হবে। কোন শব্দ পেল না। হাল্কা হলো শরীর। তৎক্ষণে ছোড়দি-মা-র কথা কানে এলো।

—সন্তুকে ছুটি দেবে ?

—পড়েছিল ? মায়ের কণ্ঠ।

কান খাড়া করল সন্তু। ছোড়দি নিশ্চয়ই বলবে, সন্তু অনেকক্ষণ পড়েছে, তবু বুক টিপ টিপ করে, যদি মা—

—সন্তু, মা ডাকলেন।

সন্তু ঘরে ঢুকল।

—পড়া করেছো ?

সন্তু মাথা নাড়ল সম্মতির।

—আচ্ছা, যাও।

সন্তু বেরিয়ে পড়ছিল, মা ডাকলেন, বেশী দূরে যেও না—কোনমতে সম্মতি জানিয়ে বেরুতে পারলে বাঁচে। চৌকাঠে পা দিয়েছে এমন সময় বড়দির গলা, এখুনি বেরুচ্ছিস। কে ছুটি দিলো তোকে ?

এতটুকু হয়ে গেল সন্তু। মনে মনে ভগবানকে দোষ দিতে লাগল। এত করে মা রাজী হলেন আর—

ঢোক গিলে বলল,—মা।

—মা তুমি কেন—ছোড়দিকে দেখে থেমে গেলেন বড়দি। ও, তুই। তোর জন্যে ছেলেটা গোল্লায় যাবে। নিজে বাড়ির মুখ পুড়িয়েছিস, এবার—

—অ্যাঃ সতী—মার গলায় চাপা ভর্ৎসনা।

ছোড়দি ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সন্তু অবাক হয়ে যায়। ছোড়দিকে বড়দি অমন কথা প্রায়ই বলেন। সন্তু বুঝতে পারে না। ছোড়দি বাড়ির কলঙ্ক, মুখ পুড়িয়েছে ? কেন ? ছোড়দি এমন ভালো আর—কিছুতেই বুঝতে পারে না সন্তু। মা ও এসময় কেমন হয়ে যান। আর ছোড়দিও বদলে যায়। আগে কি হাসিখুশী ছিল। হঠাৎ অসুখ হলো। ডাক্তার আসত। বাড়ির সবাই কেমন গম্ভীর। ফিস ফিস করে কি বলতো সকলে। বড়রা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। ছোড়দিকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করত, কিন্তু মা, বড়দি তখন ধমক লাগিয়ে দিলেন একদিন যে ও-মুখো হবার জো রইল না।

ছোড়দি পালিয়ে গেল। বড়দিটা যে কি...কিন্তু তখনি...ছুটি...ভাবতেই ধড়-ফড় করে উঠল বুক। সব ছেলেরা ছুটি পায় কেবল আমার বেলায়—সমস্ত বাড়ির পর বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। আজ ঠিক বাড়ি থেকে পালাব, রাঙাদা যেমন পালিয়ে গিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল, মেজদির চিঠি না পেলে যেমন মা কাঁদেন, তেমনি তেমনি···এ বাড়িতে থাকবই না। এরা কেউ ভালোবাসে না। আমাকে, ছোড়দিকে···

—তুই যা সন্তু, মা নিজে থেকে বললেন।

অপ্রত্যাশিত ছুটি পেয়ে সন্তু-র বিরক্তি উপে গেল। বড়দির দিকে না তাকিয়ে মারল ছুট।

—শোন্ শোন্—

মা ডাকলেন। সন্তু শুনতে পেল। আবার যদি যেতে না দেন, তাই শুনতে পায় নি এমন ভাবেই ছুটতে থাকল।

রাস্তায় নেমে দেখল বিশু আর পুলক ক্রিকেট খেলছে। ওদের উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল দু-চার পা।

—সন্তে, এই সন্তে, বিশুর গলা।

ফিরে দাঁড়াল সন্তু।

—খেলবি ?

—না। আমি এখন—

—খেলবি না ? এখন—

—না—। সন্তু কথা না বাড়িয়ে পা বাড়াল।

—মেনীমুখো, আঁচল ধোঁয়া। খেপাতে লাগল বিশু আর পুলক।

ঘুরে দাঁড়াবে ভাবল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেল। ওরা যদি পিছনে লাগে তবে যাওয়াই হবে না পার্কে। দাঁড়াল না, পা চালাল।

নবীন সেন পেরিয়ে কলেজ রো।

এখন যেন বল পাচ্ছে। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। তাড়াতাড়ি প্যান্টের পকেটে হাত চালাল। দেখল, প্যাকেট দুটো ঠিক আছে কিনা ! গিনিপিগগুলো নিশ্চয়ই এখন গুহার মধ্যে ঢুকছে। কি মজা ! সবগুলো একসঙ্গে ঢোকে না। আর পাখিগুলো। ও-গুলোর নাম অসীম বলতে পারেনি। কে যেন বলেছিল। সন্তু মনে করতে পারে না। পাখিগুলো বোধহয় ঝাঁকায়, না বোধহয় গিনিপিগের পিঠের উপর, আজ যা মজা হবে। হাত-তালি দিয়ে উঠবে যেন। আর ময়ূর-ময়ূরী। অনেক বড়। নানা রঙের একটি স্রোত।

গোলমাল শুনে থামল। আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের মাথায়। আর একটু গেলেই—এবার যেন দৌড়তে শুরু করল।

করল। দুপুর গড়িয়ে গেছে, বিকেলের সবে শুরু। লোকজন তেমন নেই। হ্যারিসন রোডে এসে থামতে হলো। দুটো বাস যাবে, আর একটা ট্রাম। তারপর ও-পাশে যেতে পারবে।

কাপড়ের দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট বেয়েই রোজ পার্কে ঢোকে। প্রথমে দেখে গিনিপিগদের খাঁচা, তারপর ময়ূর-ময়ূরী।

সমস্ত শরীর উছলে উছলে উঠল। কি কষ্টই না ভুগতে হয়েছে। রোজ এমনি করতে হয়। স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি, বাড়িতে মা, বড়দির মন জিজ্ঞলে তবে বেরুতে পায়! সামনের গলিতে খেলার অনুমতি পেয়েছে, বেশিদূর যেতে মানা। তবে ওইটুকু অনুমতি পেয়েই এতদূর চলে আসে। বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়ে যায়, আর সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরলে—

পার্কের গেট দিয়ে ঢুকল। কোনাকুনি ডানদিক ঘেঁষে চলে এলো সন্তু। ওদিকে ছেলেরা স্লিপ খাচ্ছে, দৌড়ুচ্ছে। এদিকে কেউ দোলনায় দুলছে, কোন ভদ্রলোক বসে আছেন বেঞ্চিতে। সন্তু এসব কিছুই লক্ষ করল না। পকেটে হাত দিয়ে একটা প্যাকেট বার করল।

সারা মুখ হাসিতে সমুজ্জ্বল। এখন খাঁচার সামনে, খুলে ফেলল প্যাকেট,—চু, চু, শব্দ করল মুখে। পাশে একজন ভদ্রলোক আছেন, খেয়াল করল না। দুটো গিনিপিগ খাঁচার ধারে এগিয়ে এলো। সন্তুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। প্যাকেট থেকে ছোলার দানা বের করে ছড়িয়ে দিতে থাকল খাঁচার মধ্যে। গিনিপিগ দুটো টুক টুক করে খেতে লাগল। ওমা! একটা পাখিও ঠুকরে খেতে শুরু করেছে। আনন্দের উত্তেজনায় ছোলার দানাগুলো প্যাকেট থেকে তাড়াতাড়ি তুলতে থাকল, দিতে থাকল ওদের সামনে।

গিনিপিগ দুটো খেতে খেতে থেমে গেল। চুপ করে চোখ মেলে চাইল।

—কি, আরও খাবে?

গিনিপিগ দুটো বোধহয় শুনল না। টুক করে চলে গেল পাহাড়ের দিকে। ক্ষুণ্ণ হলো সন্তু। আর একটা গিনিপিগ এগিয়ে এলো। কিন্তু ছোলায় মুখ স্পর্শ করল না। চুপ মেরে দাঁড়াল।

—তুমিও খাবে না?

দু-একটা পাখি এসে ছোলার দানা মুখে তুলল। সন্তুর মুখে হাসি। পাখিদের সম্বোধন করে বলল, তোমরাই খাও, ওদের,—বলে একটা রোষদৃষ্টি হানল গিনিপিগদের দিকে। আবার বলতে যাবে, তার আগে একটা হাসি শুনে লজ্জা পেল।

—কি খোকা, তুমি এদের—

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই সন্তু পালিয়ে এলো। ছি-ছি! আমি খোকা? তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো ময়ূরের খাঁচার দিকে। এখানে আসার আগে ছোট্ট বাঁধানো পুকুরের সামনে দাঁড়ায় ও। একটু দাঁড়িয়ে তারপর আসে। কিন্তু আজ সটান চলে এলো খাঁচার সামনে।

খাঁচার মধ্যে একটা ডাল। সেই ডালের নানা শাখা-প্রশাখা। সেই ডালের' পর, কখনও বা খাঁচার মধ্যে ময়ূর-ময়ূরী দাঁড়ায়, চলে ফিরে বেড়ায়। ময়ূর-ময়ূরী দেখতেই ভালো লাগে সন্তুর। লম্বা পা বাড়িয়ে যখন হাঁটে, তখন কি মজাই না লাগে। একদিন আকাশে মেঘ থাকলে দেখতে হবে ময়ূররা নাচে কি না?

খাঁচার সামনে দাঁড়াল। সন্তু ময়ূর-ময়ূরী চেনে না। অসীম বলেছিল, ওইটা ময়ূরী?

—কোনটা?

—দেখবি যার গা থেকে পালক ঝরে গেছে—

—সত্যি?

—তবে? আমি কি জানি না—

সন্তু ওকেই ময়ূরী বলে জানে, ভালোটাকে জানে ময়ূর বলে। দাঁড়াতে দেখল, ময়ূরটা ডালের উপর চুপ করে বসে আছে। চোখ বোজা। কি যেন ভাবছে। আর ময়ূরীটা? দেখতে চেষ্টা করল। কোথায় ময়ূরী? চারিদিকে দৃষ্টি পাঠাল। চারপাশে ঘুরে এলো একবার। না, কোথাও ময়ূরীকে দেখতে পেলো না! তবে কি উড়ে গেছে? ভালোকরে দেখল জাল-টা। কোন জায়গা ছেঁড়া নেই। তবে? তবে কি করে পালাল? তবে কি কেউ নিয়ে গেছে?

খাঁচার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে প্যাকেট-টা তুলে নিল হাতে। বের করল ছোলার দানা, আয়-আয়।

ময়ূর-কে ডাকল। ছড়াতে থাকল ছোলার দানা। অদ্ভুত। ময়ূর একবারও চোখ খুলল না যেমন চোখ বুঁজে চুপটি মেরে বসেছিল, তেমনি বসে রইল।

মোলায়েম সুরে ডাকল, এসো, এসো! ময়ূর তবু নিশ্চুপ।

বিরক্ত বোধ করল। আচ্ছা তো, কি হলো আজ? ভীষণ রাগ হলো। অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকল। আবার ডাকল, এসো, এসো।

—ও আজ আসবে না।

পাশে দু'টি ছেলে। সন্তু তাকাল সেদিকে।

—আমরা কত ডাকলাম, এলো না। তাই তো—

—কেন?

—কেন আবার, দেখছ না একটা মরে গেছে।

—মরে গেছে! ধক্ করে উঠল সন্তুর বুক। ছেলে দুটো কি বলল, শুনতে পেল না সন্তু। "মরে গেছে!" কথাটা ওর বুকে অসংখ্য ঢেউ তুলতে থাকল। বুক-টা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠল। কোথা থেকে একটা চাপ এসে ডুবিয়ে দিতে থাকল। কি করবে ভেবে পেল না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেমন ভয় করতে লাগল। ময়ূরী মারা গেছে! চিন্তা শেষ করতে পারল না, চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল মস্ত মস্ত ঢেউয়ের··· কালো কালো···গমগুজ···মস্ত কড়াই···টগবগ করে ফুটছে তেল···

চোখ বুজল সন্তু, অন্ধকার। ভীষণ কালো। চোখ খুলতে ভরসা পাচ্ছে না। ময়ূরীটা যদি ভূত হয়ে··· সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। ছুটে পালাতে চাইল, কিন্তু সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সন্তু। নিশ্চল, নিথর। শুধু চোখ খুলল জোরে করে। সামনে তাকাতে চেষ্টা করল···একজন লোক মরুর। ময়ূর ঠিক তেমনি ভাবে বসে আছে। সমস্ত খাঁচাটা ফাঁকা। ফাঁকা একদম কিছু নেই···আবার একটা বেদনা মোচড় দিয়ে উঠতে থাকল। ময়ূরী মারা গেছে···ময়ূর কাঁদছে। ময়ূরের চোখের কোণ চিক্ চিক্ করছে। সন্তুরও কান্না পেতে লাগল।

—তুমি কেঁদো না, তুমি, বলতে বলতে সন্তু নিজেই কেঁদে ফেলল। আমি তোমাকে, কান্নার আবেগে কথা আটকে যাচ্ছে। ময়ূরের ছেলে মেয়েরা নিশ্চয়ই কাঁদছে ···ওরা আজ···

আকাশ কালো হয়ে আসছে, ভারি ছায়া পার্কে। সন্তু খাঁচাকে উঠল। একটা ভয়, শিহরণ, অনুভূতি পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। সন্তু কিছু ভাবতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। ময়ূর। খাঁচা। লোকগুলি।

ময়ূরী। কালো। যম।

সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ময়ূরী ডাকছে— সমস্ত খাঁচা ফাঁকা। ময়ূর বসে বসে কাঁদছে। সন্তু ডুবে যেতে থাকল···সামনে আশে পাশে সব কালো হয়ে উঠলো—

ছেলেরা খেলছে···একটা বল···দুটো বুড়ো···একটা লোক···সন্তুর চোখ ঘুরতে থাকল। কিন্তু সে-চোখে দৃষ্টি নেই। মন যেন কোথায় উধাও। বুকের ভেতরটা গুর গুর করছে।

আর একবার তাকাল খাঁচার দিকে। ময়ূর-টা তেমনি বসে আছে। চুপ, চোখ বোজা। সন্তুর মন ভারে ভারে ছিঁড়ে পড়তে চায়। ময়ূরের দিকে তাকাতে একটা ভয়···ফাঁকা, কেমন একটা···

অলক্ষ্যে এগিয়ে এলো দু-এক পা। বাড়ি যাবে? ভাবতে থমকে দাঁড়াল না, না, না। আজ বাড়ি যাবো না। আমি···কেউ ভালো না, কেউ ভালো···অভিমানের স্রোত। সন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলবে এবার। ছেলেরা হৈ-হৈ করছে, ওদিকে বুড়োরা বসে আছে, এদিক ···সন্তুর কানে কিছুই যাচ্ছে না। অচেতনে হাত মুঠো করল। ছোলার প্যাকেট। ছোলাগুলো···?

ওখান থেকেই একবার খাঁচার দিকে তাকাল। ময়ূর তেমনি বসে আছে। চুপ, চোখ বোজা। ফেলে দেবো? নাকি গিনিপিগদের···কথাটা ভাবতেই আবার অভিমান হলো। গিনিপিগগুলো আজ ছোলা খায় নি। অভিমানের পর অভিমান জমতে থাকল।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো সন্তু! মির্জাপুর ষ্ট্রীট। বা দিকে ঘুরতেই থেমে গেল। না, বাড়ি যাবো না। আজ পালাব, রাজারাণ মত···কেউ ভালো না··· আবার কান্নাকে দমন করল।

ডান দিকে হাঁটতে সুরু করল সারি সারি দোকান। সন্তু এগিয়ে আসতে থাকল হ্যারিসন রোড বেয়ে

শেয়ালদা'র দিকে। বাতি জ্বলতে সুরু হয়েছে। নানা রঙের আলো। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। কিছুদূর এগিয়ে এসে থামল। ভীড়, খুব বেশী নয়। বাইরে থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কি যেন বলছে একটা লোক। দু-একজনকে ঠেলে চলে এলো সামনে। একজন বাঁশি বাজাচ্ছে। সামনে অনেকগুলো পুতুল। তারা নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। আর একটা লোক একটু দূরে বসে কি যেন বলছে।

সন্তু পুতুলগুলো দেখতে থাকল। কানে আসছে বাঁশীর সুর। পুতুলগুলো নড়ছে, হাঁটছে, বেড়াচ্ছে।

সন্তু অবাক হয়ে দেখতে থাকল। পুতুল কেমন বেড়াচ্ছে। লোকটি বলছে, সন্তু এবার কান দিল।

এই ছেলেটা বড়ো ভালো। বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলো। বেড়িয়ে এবার বাড়ি ফিরলো।

ওমা! তাই তো, লোকটির কথামত বাঁশীর সুরে সুরে পুতুলগুলো তেমন তেমন করছে। সন্তু অবাক।

—মা-র কাছে চলে এলো, লোকটি গাইছে, মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। দিদি তাহার গান গাইলো...

সন্তুর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। ঠিকতো··· ছোড়দিও এমন গান করে।

আর, কি সুন্দর! পুতুলগুলোর মুখ নাড়ছে।

বাঁশি বাজছে, লোকটি গাইছে—

দেখুন দেখুন এদের সংসার শোক দুঃখ নেইকো আর। এইবার এক মজা দেখুন—

সন্তু দেখতে পেল দুটো পুতুল মারামারি করছে।

—চালাও জোর, চালাও—অনেকের গলার স্বরে সন্তু কণ্ঠ মেলাতে থাকল।

—ছোট ভাইটো হেরে যাবে তার বললো, লোকটি বলছে।

সন্তু ছোট ভাইয়ের পক্ষে, চালাও.. চালাও

একি! ছোট ভাইটা জিতে গেল। আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল সন্তু। আবার খেলা সুরু হলো। ছোট ভাই বড় ভাই হাত ধরা-ধরি করে যাচ্ছে, এমন সময় একটা গুণ্ডা—

সন্তু কল্পনা পেয়ে পড়বে যেন। ভীড় বাড়ছে। আরও আরও লোক জড়ো হচ্ছে। সন্তু চারদিকে তাকাল। লোকে লোকারণ্য।

বাঁশি বাজছে, লোকটি গেয়েই চলেছে।

সন্তু ভুলে যেতে থাকল। ওর মনে প্রাণে আনন্দের বন্যা। হাততালির পর হাততালি পড়তে থাকল। সন্তু হাততালি দিয়ে উঠল। মধুর দুঃখ, নিজের দুঃখ কোথায় তলিয়ে গেল। ওর চারিদিকে শুধু সুর আর গান, আনন্দ আর সমারোহ।

লোকটি গাইছে বাঁশির সুরে সুরে। সন্তুর মন উধাও হলো। সন্তু দেখতে পেল, ছোড়দি, মা, বাবাকে। বাড়ি ফিরে এসেছে—সারা বাড়ি হৈ-চৈ, রৈ-রৈ। সন্তু গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে আর নেচে নেচে উঠছে।

হাততালির পর হাততালি পড়তে থাকল।

সন্তু হাততালি দিতে থাকল। ওর চারিদিকে শুধু সুর আর গান, আনন্দ আর সমারোহ। সুখ আর আনন্দ, গান আর সুর।

যে যাবে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

আমার চারপাশে সারাক্ষণ
ছলছল ক'রে এক অন্ধকার।
তাকে আমি সরে যেতে বলেছি
অন্য হাওয়ার দিকে,
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি
দেখবো না।

বুঝতে পারিনি সে আমায়
কখন তুলিয়েছে হাজার কথার কোলে,
কথায় কথায় ঘুম পাড়িয়েছে।

শুধু ছলছল শব্দের দোলায় দোলায়
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন
স্বপ্ন দেখলুম
সে ডাকছে দূরের দিন থেকে
এসো এসো,
তার হাতে একটা গনগনে আগুনের
কী ভীষণ লাল মশাল।

আমার রক্তের মধ্যে চলকে উঠলো
একটা বিশাল ফুল,
সমস্তটা অন্ধকার জুড়ে
ফুলে ফুলে ছয়লাপ হয়ে গেল
ভালোবাসার মতন।
আকাশ কাটার আওয়াজে
একরাশ পয়মন্ত রোদ্দুর
ফসল পাকার মতো বর্ণবান

বলে উঠেছে, যাই যাই।

তুমিও নিবিড়…

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

নদীতে এখন জল নেই
বালিতে ঢেউয়ের শুধু দাগ—
তুমি এক ভূখণ্ড ভূভাগ
অবিচল কঠিন নির্বাক…

মাঝখানে অনেক সময়
বল্মীকের মন করে জয়,
বালিয়াড়ি তোমার চৌদিকে
রহস্যের লিপি গেছে লিখে

নদী আজ গভীর বাউল,
তুমি যদি হও সেই ভুল—
ছায়ায় ঢাকে না তুমি কী যে,
কালকে ঢাকতে বলা মিছে…

নদী হবে মাঠ, জনপদ,
তোমার বুকের মাঝে দেখো
খুলে যাবে স্মৃতিভরা পথ
তুমিও নিবিড় হয়ে থেকো॥

সহঅবস্থানের নীতি

(আলোচনা)

শৈলপতি মুখোপাধ্যায়

★

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, "প্রতিটি পুরাতন সমাজগর্ভে যখন নতুন সমাজব্যবস্থা আবির্ভূত হয় তখন বলই ধাত্রীর কাজ করে" (কার্ল মার্কস)। বলপ্রয়োগের দরকার এই জন্যই যে ক্ষয়িষ্ণু শাসক শ্রেণী কখনই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে না, বিনা সংগ্রামে আপনা হতেই অপসারিত হয় না। প্যারী-কমিউনের পর মার্কস-এঙ্গেলস আরো বললেন যে সর্বহারাদের শুধু বুর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রকে দখল করলেই চলবে না, তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে। হংকির প্রবন্ধ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এইটি হচ্ছে প্যারী কমিউনের প্রধান শিক্ষা। পার্লামেন্ট সম্বন্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ধারণা ছিল ওটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই একটি অলঙ্কার, নির্বাচনী যন্ত্রে কমিউনিস্টরা কখনোই নামবে না, এমন নয় কিন্তু পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব সমাধান হবে এমন কথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কখনোই বিশ্বাস করতেন না। এ কথা ঠিক যে মার্কস্ এবং লেনিন দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখলের কথা বলেছিলেন। হংকির প্রবন্ধে বলা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে লেনিনের কথায় "বিপ্লবের ইতিহাসে অসাধারণ দুর্লভ সুযোগ" মাত্র এবং সাধারণ নিয়ম নয়। অবশ্য এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মার্কস বা লেনিন এবং তাঁদের মত অনুসরণকারী সকলেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব হলে অশান্তি সৃষ্টি করতে চান না, শুধু রক্তের জন্যই রক্তর নীতিতে বিশ্বাস করেন না। আরো একটি জিনিস প্রমাণিত হয় যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলেই বিপ্লবীদের জাতিচ্যুতির আশঙ্কা নেই।

বিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন, "সর্বহারা ও সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণের এক ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলনপুষ্ট পার্লামেন্টারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা, বেশ কিছু পুঁজিতন্ত্রী ও পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।" অবশ্য যে সব দেশে এখনও পুঁজিবাদ বেশ শক্তিশালী এবং বিরাট সামরিক ও পুলিশ বাহিনী রেখেছে সেখানে এখনও তীব্র বিপ্লবী সংঘর্ষ মারফৎ সমাজ-বিপ্লব হবে। ক্রুশ্চেভ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলছেন যে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ যে ঠিক একই ভাবে ঘটবে লেনিন কখনও এমন কথা বলেননি, বরং উল্টোই বলেছেন। সবাইকেই রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই— প্রমাণ ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি (বিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট পৃঃ ৪৯)। 'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক' প্রবন্ধে লেনিনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, "ইতিহাসে একটিও মহান বিপ্লব গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে সাধিত হয় নাই; গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কখনও সম্ভব, এমন কথা কোন চিন্তাশীল মার্কসবাদী বিশ্বাস করিবেন না"। অক্টোবর বিপ্লবে অবশ্য পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের উপায় ছিল না। কিন্তু তারপর ঐতিহাসিক পরিস্থিতির এমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে যে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবা দরকার। সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলির ক্ষমতা অসাধারণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুঁজিবাদ অনেক দুর্বল হয়ে গেছে এবং সমাজতন্ত্রের আকর্ষণী শক্তিতে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীরা একজোট হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে একটা সুযোগ এসেছে যখন জনসাধারণের বিপ্লব সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিজেদের নেতৃত্বে জড়ো করে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাজিত করে পার্লামেন্টেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা যায় এবং পার্লামেন্টকে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের একটা যন্ত্র থেকে জনসাধারণের ইচ্ছার সত্যিকারে যন্ত্রে রূপান্তরিত করা

যায়। এই রকম অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্রের হাতিয়ার হতে পারে। সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর রূপ যাই হোক না কেন, "এর চূড়ান্ত এবং অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী পরিচালিত সর্বহারার নেতৃত্ব।" এ ছাড়া সমাজতন্ত্র আসতেই পারে না। এটা খুব জোর দিয়ে বলা দরকার সমাজতন্ত্রের জয়লাভের অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সোভিয়েত ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের ফলেই।

লেনিনবাদ শীর্ষক এই প্রবন্ধে মার্কসবাদী চিরায়ত সাহিত্য থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হচ্ছে, "পার্লামেন্টারী সংগ্রামে আমাদের অংশ গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন মোহ আমাদের থাকিবে না। কেন? কেন না, বুর্জোয়াদের সমরবাদী-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র যতক্ষণ অক্ষত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেও, কিংবা পার্লামেন্টে বৃহত্তম পার্টি হইলেও পার্লামেন্ট বুর্জোয়া একনায়কত্বের অসহায় ছাড়া অন্য কিছু নহে। অধিকন্তু এইরূপ রাষ্ট্রযন্ত্র যতক্ষণ অক্ষত থাকে বুর্জোয়ারা তাহাদের নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন হইলে যে কোন সময় পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিতে, কিংবা পার্লামেন্টে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বৃহত্তম হইলেও উহাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্টিতে পরিণত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন কৌশল ব্যবহার করিতে কিংবা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি নির্বাচনে আগের চেয়ে বেশি ভোট পাইলেও ঐ পার্টির আসনসংখ্যা হ্রাস করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কাজেই পার্লামেন্টে ভোটের ফলে শান্ত বুর্জোয়া একনায়কত্বে পরিবর্তন ঘটিবে এমন কথা কল্পনা করা শক্ত, এবং পার্লামেন্টে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইয়াছে বলিয়াই সর্বহারারা শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য পার্লামেন্টে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে এমন কথা কল্পনা করাও ঠিক তেমনি শক্ত। বহুপূর্বেই অনেকগুলি পুঁজিতন্ত্রী দেশের অভিজ্ঞতায় ইহা সম্পূর্ণতঃ প্রমাণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন এশিয় ও ইউরোপীয় দেশের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার নূতন প্রমাণ মিলিয়াছে। লেনিন বলিয়াছেন: 'জনসংখ্যার অধিকাংশকে যতক্ষণ না নিজেদের পক্ষে পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বহারাশ্রেণী জয়যুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের সময়ে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট সংগ্রহের মধ্যে এই কথাটিকে সীমাবদ্ধ বা শর্তবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা হইবে অতি বড় মূঢ়তা কিংবা শ্রমিকদের সঙ্গে নিছক প্রতারণা। "এটি হচ্ছে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের 'ক্লাসিকাল এ্যাপ্রোচ', ক্রুশ্চেভ বর্ণিত 'নিউ এ্যাপ্রোচ' এই প্রবন্ধে কোথাও নেই। শান্তিপূর্ণ কথাটি ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে "কোন কোন দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনাকে সমর্থন করার অর্থ বুর্জোয়ারা যে স্বেচ্ছায় কখনও ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না এই মার্কসবাদী তত্ত্বকে বাতিল করে দেওয়া নয়। এটা যুক্তিসঙ্গত যে কোন একটা দেশে বুর্জোয়ারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দমন করবার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছে এই জন্য নয় যে সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে, মানবিক সহানুভূতি জেগেছে কিন্তু পৃথক পৃথক পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র শক্তিরা বহু গুণ বেশী শক্তি জড়ো করেছে বলে। সুতরাং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত থাকছে —পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক সক্রিয় ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম, একচেটিয়া পুঁজি দ্বারা নিপীড়িত সমাজের সমস্ত অংশগুলির জমায়েত, বিরোধী শ্রেণীগুলির সুবিধাবাদী আপোস রক্ষার চেষ্টার দৃঢ় ভাবে মুখোস উদ্‌ঘাটন।" (নিউ এজ, আগষ্ট ১৯৬০) বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপন মার্কসবাদীরা আদৌ ছেড়ে দেয় নি। সংশোধনবাদীদের পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ ভাবে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে ক্রুশ্চেভের 'নিউ এ্যাপ্রোচের' কোন সম্পর্ক নেই। শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই যে এখন একেবারে সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে বা কেবল মাত্র ভোট কুড়িয়ে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সমাজতন্ত্র আনয়ন সম্ভব, এমন কথা বিশ্ব-কংগ্রেসের প্রস্তাবে বা কোন বক্তৃতায় নেই। এ কথা ঠিক পার্টী কমিউনের চিরন্তন অবিনাশী শিক্ষা-রাষ্ট্র যন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া সম্বন্ধে ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার বিপক্ষ

কোন আলোচনা নেই। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র—সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ, অটুট থাকবে অথচ সমাজতন্ত্র এসে যাবে ক্রুশ্চেভের বক্তব্যের এমন অর্থ করা যায় না। এক ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলনের চেউয়ে ঠেলে শ্রমিকশ্রেণী পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে পার্লামেন্টকে প্রকৃত গণতন্ত্রের অঙ্গে পরিণত করার অর্থই হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র তখন অকেজো, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, তার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে গেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা অটুট থাকলে পার্লামেন্ট কখনোই জনগণের ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র হতে পারে না। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে যে ভেঙে দেওয়া হবে এ কথা ক্রুশ্চেভের বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত আছে। নচেৎ ক্রুশ্চেভ-আরোপিত সর্তগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে সোবোলেভের উক্তি উল্লেখ করা ভাল "শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতা বজায় রাখতে এবং উচ্ছিন্ন শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ দমন করার জন্য পুরাতন জনবিরোধী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে নতুন জনপ্রিয় রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করতেই হবে। এটি করতেও ভিন্ন ভিন্ন উপায় গৃহীত হয়েছে এবং হবে। কোন কোন দেশে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে অক্টোবর বিপ্লব এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী কালে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে দ্রুততার সঙ্গে এবং চূড়ান্তভাবে, চুরমার করে দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশে যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়াতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে একসঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়নি কিন্তু ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ কাঠামো বদলে ফেলে ধ্বংস করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতা-দখলের লড়াইয়ের সময় সর্বহারা পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা বা আর একটা যোগসূত্রকে সাময়িক ভাবে ব্যবহার করেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার আরো একটি উপায় হচ্ছে পুরানো রাষ্ট্র শাসন কাঠামোর রূপ বজায় রেখে, তাকে নতুন বিপ্লবী উপাদানে পূরণ করা। মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান স্তরে জনতার স্বার্থে পার্লামেন্টকে ব্যবহার করা যে খুবই অনুমোদনযোগ্য, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" (পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কয়েকটি রূপ। পৃঃ ১৭) অবশ্য সোবোলেভের বক্তব্যই শেষ কথা নয় কারণ পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত ফৌজের উপস্থিতি জনতাকে যেমন উদ্দীপিত করেছিল প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেও তেমনি অসহায় অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। তাই জোর শান্তিপূর্ণ বলার অর্থ যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা নয় এটা খুবই স্পষ্ট। এ কাজ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হতে পারে পার্লামেন্টে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার দরুণ নয় কিন্তু পার্লামেন্টের বাইরে বিরাট বিপ্লবী আন্দোলন থাকার দরুণ এবং দেশের জনসংখ্যার প্রায় সবাই একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার দরুন। কথা উঠতে পারে এতটা অনুকূল পরিস্থিতির কথা ভাবাটা কি কল্পনাবিলাস নয়, এর বাস্তব সম্ভাবনা আছে কি? নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দুটি উপাদানের কথা বিশ কংগ্রেসের প্রস্তাবে উল্লিখিত হয়েছে—একটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিপুল শক্তি-বৃদ্ধি, আর একটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আকর্ষণী-শক্তি। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টি প্রথমটির ওপর নির্ভরশীল যদিও দ্বিতীয়টিরও বিপুল জনসংখ্যাকে জয়ান্বিত করার স্বাধীন ক্ষমতা রয়েছে। ক্রুশ্চেভ বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবই বিপ্লবের পক্ষে এই বিশেষ অনুকূল সম্ভাবনার কারণ। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের মতই এখানেও আমরা সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে আসছি—একটি মাত্র দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্রের একটি বিশ্ব-ব্যবস্থায় পরিণত হওয়াই আমাদের যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "অবশ্য, প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের বিকাশ, সেই দেশের আভ্যন্তরীণ নিয়ম, দ্বন্দ্ব এবং এদেরই ওপর ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের যে সংগ্রাম গড়ে ওঠে, সেইগুলির দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কিন্তু বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থার অস্তিত্ব অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী করবে" (কনস্টাটিনভ এবং ও সমূহ বিনয়ন)। আবার, "এই মৌলিক বিষয়টি যা পৃথিবীর সমস্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ওপর নিজের ছাপ ফেলছে, তাকে চিন্তা না করে আজকের দিনে, রাজনীতি, অর্থনীতি, মতাদর্শ, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রূপের প্রশ্ন বিবেচনা করা অসম্ভব।" (ঐ) বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্বন্ধে মোহ-বিস্তার না করেও ঐ লেখকরাই বলছেন "যারা বেশ কিছু পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা বাতিল করে দিচ্ছেন, তাঁরা পৃথিবীতে যে সমস্ত পরিবর্তন হয়েছে সেগুলিকে হিসেবের মধ্যে নিচ্ছেন না। কিন্তু কমিউনিস্ট ও শ্রমিক-পার্টিকে ভুল পথে চালিত করা, তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, পার্লামেন্টে দ্রুত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার সংগ্রাম থেকে বিরত করার বিপদ তাঁরা বহন করছেন। তাঁরা এই পার্টিগুলিকে কেবল গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার পথেই টেনে নামাতে পারেন।" (ঐ) এই প্রশ্নের সঙ্গে শান্তি আন্দোলনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে হংবি লিখছেন "শান্তির জন্য সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম দুইটি দুই বিভিন্ন প্রকারের সংগ্রাম। এই দুই প্রকারের সংগ্রামের মধ্যে উপযুক্ত পার্থক্য না টানা ভুল। শান্তি আন্দোলনে যাহারা অংশ গ্রহণ করে, তাহাদের সামাজিক গঠন স্বভাবতই অধিকতর জটিল; বুর্জোয়া শান্তিবাদীরাও উহার মধ্যে থাকে। বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার কাজে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতায়, সহ-অবস্থানের হিসাবে এবং পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরোধিতা করিবার কাজে আমরা কমিউনিস্টরা থাকি একেবারে সম্মুখে। এই আন্দোলনে আমরা বহু জটিল সামাজিক গ্রুপের সহিত একত্রে কাজ করিব এবং শান্তি অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি করিব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নীতিগুলিকে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং আমাদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত মান ছোট করিয়া শান্তির সংগ্রামে বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের পর্যায়ে নিজেদের নামাইয়া আনা চলিবে না। নৈত্রী গঠন ও সমালোচনার প্রশ্ন ওঠে এইখানেই।" (লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক পৃঃ ৪০)। খুবই খাঁটি কথা, শান্তির জন্য সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্য টানা দরকার। স্তালিনের বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য—"আজকের দিনের শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য হল শান্তিরক্ষা এবং আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করার সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। সুতরাং পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়—শান্তিরক্ষা করার গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ। এই দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার আন্দোলনের সঙ্গে আজকের দিনের শান্তি আন্দোলনের তফাৎ আছে; কারণ প্রথমোক্ত আন্দোলন আরো এগিয়ে গিয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল। এটা সম্ভব যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা সমাবেশের ফলে শান্তির জন্য সংগ্রাম হয়ত এখানে ওখানে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই-এ পরিণত হবে। কিন্তু তখন আর সেটা আজকের দিনের শান্তি আন্দোলন থাকবে না; সেটা পরিণত হবে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার আন্দোলনে" (সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজ-তন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী পৃঃ ২৮)। কিন্তু ঝিওকফ বলছেন "শান্তির জন্য সংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের জন্য লড়াই-এর ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আজকের দিনের যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।" (ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ আগষ্ট ১৯৬০)। তিনি দেখিয়েছেন ঠাণ্ডা-যুদ্ধের ফলে আক্রমণমুখী একচেটিয়া পুঁজি শক্তিশালী হয়, শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিভক্ত করা যায়। প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হয়। অপরপক্ষে ঠাণ্ডা-যুদ্ধের কিঞ্চিৎ হ্রাসও শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমজীবীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করে। প্রমাণ উত্তেজনা হ্রাসের ও পঞ্চম দশকের মধ্যভাগে ম্যাকার্থিবাদের পরাজয় এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধে সামান্যমাত্র কমতি দেখলেই পশ্চিম জার্মাণ সরকারের অস্বস্তি। জনসাধারণের মনে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসের সময়ের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিনীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সোভিয়েতের শান্তি অভিযানের আর একটি ফল হচ্ছে শান্তির আদর্শের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ও তাদের মতাদর্শ; মার্কসবাদ লেনিনবাদ ক্রমশই বেশী বেশী করে যুক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন পার্টির দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য সকলেই দেখতে পাচ্ছে। মানব প্রগতির জন্য আজ শান্তি যে কোনো কিছুর চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় এটা বোঝার ফলে কমিউনিস্টরা, যারা তাদের রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত লক্ষ্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি যুক্ত করেছে তাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার দূর হচ্ছে। মার্কসবাদ লেনিনবাদের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজতন্ত্রের মর্যাদা বাড়ছে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি শক্তিশালী হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম বৃদ্ধির এটি

একটি মূল্যবান কারণ। কারুর কারুর ধারণা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম ব্যাহত হয়। শ্রমিকশ্রেণী আদর্শগতভাবে নিরস্ত্র হয়ে পড়ে, বুর্জোয়া-শ্রেণী শক্তিশালী হয়। সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের বর্তমান স্তরের বিশেষ লক্ষণগুলি ধরতে ভুল করার ফলেই এরকম ধারণা হয়। পুঁজি দ্রুত কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির দ্রুত বিকাশলাভের ফলে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির স্বার্থ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার স্বার্থের তীব্র বিরোধী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতাই জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপের জনক আবার এরাই শান্তির প্রধান শত্রু, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রচণ্ডতম বাধা। ফলে শান্তি আন্দোলন অবশ্যম্ভাবীরূপে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। শ্রমজীবী জনগণের গণ-তান্ত্রিক অধিকারের সাধারণ ফল লড়াইএর কাছাকাছি চলে আসে। গণতন্ত্রের আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের সহস্র যোগসূত্র রয়েছে। সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক সংস্কার একচেটিয়া পুঁজির প্রতাপ খর্ব করে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের পথই প্রশস্ত করে। কোটি কোটি মানুষের দাবী শান্তির ধ্বনি এখন শ্রমিকশ্রেণীকে তার চারপাশে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশকে জড় করতে পারে, তার মধ্যে অনেকে আছে যারা একচেটিয়া পুঁজির বিরোধিতা করতে রাজী যদিও এখনও সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী নয়। "এইভাবে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক শ্রেণী-মৈত্রী স্থাপন করতে পারে, অধিকাংশ লোককে নিজের দিকে টেনে নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এর ফলে অনেক পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।" "সুতরাং শান্তির সংগ্রাম এবং আমাদের সময়ের বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একটাকে আর একটার বিরুদ্ধে খাড়া করার অর্থ হচ্ছে আসলে শ্রমিক শ্রেণীর মূল লক্ষ্য সাধনে গণতান্ত্রিক বাহিনীর স্বাধীন তাৎপর্যকেই নাকচ করে দেওয়া। এইভাবে একটাকে আর একটার বিরুদ্ধে খাড়া করালে সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক আসে, শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের আদর্শেরই ক্ষতি হয়।" ইউরোপের সতেরটি পুঁজিবাদী দেশের প্রস্তাবে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাতেও শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের মূল ধারাগুলির অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই তুলে ধরা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য সংগ্রাম জাতীয় মুক্তির লড়াইকেও শক্তিশালী করে। সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক বলপ্রয়োগের কার্যক্রমকে বানচাল করে দেয় এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রম-বর্ধমান শক্তির জন্য ঔপনিবেশিক দেশগুলিও কম রক্তপাত-জনক পথে, যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীনতা লাভ করার অবস্থায় আসতে পারে। মোটামুটি এই হচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ করা ও শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে টোডর জিভকভের বিশ্লেষণ।

একটি কথা নিশ্চয়ই মনে রাখা দরকার। ক্রুশ্চেভ রিপোর্ট কি স্বাদেশ পার্টির ঘোষণা, কি বুখারেস্ট কমিউনিক কি কোন কমিউনিস্ট নেতার রচনা কোথাও শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো সম্বন্ধে এ্যাবসলুট গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি বা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ আর হবেইনা বলা হয়নি। স্বাদেশ পার্টির ঘোষণায় খুব স্পষ্ট করেই শান্তিপূর্ণ এবং অশান্তিপূর্ণ উভয় পন্থার জন্যই প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

উপনিবেশ বিশেষতঃ প্রাক্তন উপনিবেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মনোভাব সম্পর্কেও নানা কথা উঠেছে।

পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নীতি কি এবং এই দেশের বুর্জোয়া নেতাদের সম্বন্ধেই বা তাদের ধারণা কি? "পূর্বতন উপনিবেশগুলি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মূল নীতি হচ্ছে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। অনগ্রসর দেশগুলিকে ঔপনিবেশিকতার অবশিষ্ট চিহ্নগুলি মুছে ফেলতে ও তাদের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করাই হচ্ছে এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।" (জিভকভ) "এই দেশগুলিকে সাহায্য করার সময় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এই কথাই বিশ্বাস করে যে এই সব দেশে ক্ষমতাসীন সমস্ত জাতীয় বুর্জোয়াই প্রতিক্রিয়াশীল নয়। অনেক ক্ষেত্রে এখনও তারা সমগ্র দেশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ শান্তি এলাকার অংশ এই তরুণ স্বাধীন

রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য করছে।" (ঐ) তবে একথা ভাবলে ভুল হবে বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কোন আদর্শগত বিরোধ নেই বা তারা সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নেই একমত। নতুন স্বাধীন দেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ঐ দেশেরই শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের যে বিরোধ আছে সে বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবির অচেতন নয়। ১৯৫৮র জুলাইতে ইরাকে বিপ্লবের পর কর্নেল নাসের যখন ইরাককে গ্রাস করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন তখন ক্রুশ্চেভ সোজাসুজিই তাঁর বিরোধিতা করলেন। নাসেরের কমিউনিস্ট বিরোধিতার আসল কারণটি দেখিয়ে দিয়ে ক্রুশ্চেভ একবিংশ কংগ্রেসে বললেন, "ঔপনিবেশিকতার উচ্ছেদের পর গোটা জাতির কর্তব্য-গুলির বেশীরভাগ সীমান্তের পর, জনসাধারণ অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান খোঁজে। কৃষি ও কৃষকের সমস্যা এবং পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের সংগ্রাম এ ব্যাপারে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে এসব সামাজিক প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে যে নিজের নিজের রাষ্ট্রের ভাবী বিকাশলাভের প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি করে।...সামাজিক বিকাশের বাস্তব নিয়ম আছে। ঐগুলির দ্বারা বোঝা যায় জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের উচ্ছেদের পর শ্রমিকরা কাজের সময় কমাতে ও বেশী মজুরী চায়, কৃষকরা জমি ও তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে চায়, শ্রমিক কৃষক উভয়েই রাজনৈতিক অধিকার চায়। অন্য-দিকে পুঁজিপতিরা চায় আরো লাভ, জমিদাররা জমির দখল বজায় রাখতে চায় প্রগতিশীলেরা তাদের দেশের সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি চায়। তারা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে আরো শক্তিশালী করতে চায়। আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানীতে এই সমস্ত প্রগতির বিরুদ্ধতা করে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঘোড়াল ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে এমন সব দেশগুলিতে এই যে ধারাগুলি বিকাশলাভ করছে এটা কোন পার্টির ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়। এদের জন্ম হচ্ছে, কারণ পৃথক পৃথক স্বার্থ সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। আমরা কমিউনিস্টরা, সমস্ত প্রগতিশীলরা স্বভাবতঃই যারা সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রাম করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমরা অস্বীকার করিনা যে আদর্শের ক্ষেত্রে সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের কিছু নেতার সঙ্গে আমাদের মতবৈধতা আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে ঔপনিবেশিকতা-মুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মজবুত করার বিষয়ে এবং যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের সঙ্গে মেলে। আদর্শগত বৈষম্য আমাদের দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামের পক্ষে বাধাস্বরূপ হওয়া উচিৎ নয়।" জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা ও দুমুখো নীতির বিরুদ্ধে লেনিন যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন ক্রুশ্চেভের বক্তব্য তারই বাস্তব প্রয়োগ। "যদি উৎপীড়িত জাতির বুর্জোয়ারা উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আমরা সব সময়ে সর্বক্ষেত্রে অন্য যে কারুর চাইতে দৃঢ়ভাবে তাদের পক্ষে আছি, কেননা আমরাই হচ্ছি অত্যাচারের সব চাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবিচল শত্রু। কিন্তু যদি উৎপীড়িত দেশের জাতীয় বুর্জোয়া নিজের বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ জারি করে আমরা তাদের বিপক্ষে" (লেনিনের উক্তিঃ জি. জিনোভিয়েভ কর্তৃক উদ্ধৃত। ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯)। ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ পরিচালিত জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রে রুশ মার্কসবাদী লেভিনসন প্রাচ্যের বুর্জোয়া শাসকদের দুটি স্পষ্ট পরস্পর-বিরোধী ধারা দেখিয়েছেন একটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে শান্তির স্বপক্ষে, সমাজতন্ত্রের শিবিরের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পক্ষে সারা দেশের জনতা এর পেছনে আছে। দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কারের পথ রুদ্ধ করা, সাম্রাজ্যবাদ ও ফিউডাল জমিদারদের সঙ্গে আপোস করা এমন কি কোথাও কোথাও খোলাখুলি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পিপলস ডেলীর সম্পাদকমণ্ডলী লিখছেন "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

ঔপনিবেশিক শাসন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক অবস্থাবলীর সে তার জাতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে তার গভীর দ্বন্দ্ব রয়েছে। এইটি হচ্ছে ছবির এক দিক। আর এক দিক হচ্ছে ভারতের বৃহৎ ধনিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বহুরকম যোগাযোগ বজায় রেখেছে এবং কিছু পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজির ওপর নির্ভরশীল। উপরন্তু বৃহৎ ধনিক-শ্রেণীর তার শ্রেণীচরিত্রের দরুণই কিছুটা বহির্মুখী সম্প্রসারণের তাগিদ আছে। সেইজন্যই এই শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেও জাতিসংঘ বা অন্যভাবে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ করার নীতির প্রতি বরং কমবেশী প্রতিফলিত করে। "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার মোটামুটি জনগণের ইচ্ছাই প্রতিফলিত করছেন এবং যুদ্ধ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে শান্তি রক্ষার সংগ্রামে। চীন, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার বৈদেশিক নীতি অনুসরণে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধজোটে ঢুকতে অস্বীকার করায় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণবশতঃ ভারতের বৃহৎ ধনিকশ্রেণী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছে এবং সেগুলি বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। অবশ্যই ভারতের "জনসাধারণ ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই দ্বৈত চরিত্রের জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী নয়" (তিব্বতের বিপ্লব ও নেহরুর দর্শন)। স্পষ্টতঃই উপনিবেশ-গুলির বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবী চরিত্র সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। প্রাক্তন উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশ কত-খানি আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের ওপর কতখানিই বা দুই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর নির্ভর করবে তাই আলোচনা চলতে পারে কিন্তু বর্তমান স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে উপনিবেশের মার্কসবাদীদের কর্তব্য সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট বক্তব্যই আছে। মি, সেভিনস বলছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কাজ বাকী আছে, তাদের সংস্কার সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কাজও বাকী আছে। "প্রশ্ন ওঠে, প্রাচ্যের স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বর্তমান শাসনের

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

কন্যকা

ভারত সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দুর্গা উৎসবে পুরস্কৃত নাটক। একেবারে নতুন ধরণের চারমুখর তিনটি একাঙ্কের সংকলন। পাতায় পাতায় রেখাচিত্রণের ছবি।

দাম : আড়াই টাকা

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

বিভূতিভূষণ

পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতির যথার্থ মূল্যায়নের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক ও প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ এম, এ, পি, আর, এস, বিভূতিভূষণ সম্পর্কে যেই আলোচনাটি অবতারণা করেছেন এইটিতে বিভূতি-ভূষণের জীবন দর্শন ও সাহিত্যের ক্রম বিবর্তনের ধারা ও বিশ্লেষণ সেগুলো বিশদ ভাষণীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। দাম : পাঁচ টাকা

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

নজরুলের কবিসত্তা নীহারিকাপুঞ্জবিশেষ। কিন্তু নজরুল তো শুধু কবিই নন, শুধু রাজনৈতিক নন, একটি আস্ত মানুষও। সে মানুষটি কেমন, তাঁর জীবনটাই বা কেমন, যা থেকে একাধারে তাঁদের এই নক্ষত্র বেগ আর চলিত রাগিণী সম্ভব? পাঠকের এ অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক। নজরুলের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সহজ সরল ভাষায়, নজরুলের জীবনের অনেক অজানা তথ্যের উপর আলোকপাত করেছেন। নজরুলের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ ছবি এ গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। দাম : চার টাকা

বিমলচন্দ্র ঘোষের

রক্তগোলাপ

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কবির আধুনিকতম কবিতাবলীর রুচিরম্য সংকলন গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট আর্টিস্টিক কাগজে ছাপা ও চার রঙা প্রচ্ছদ।

দাম : আড়াই টাকা

কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ কতদূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে? অন্য কথায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সামন্ততন্ত্র-বিরোধী পথে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী কতদূর পর্যন্ত এগুবে? তারা যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে ততদূর কি এগিয়েছে? দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও, প্রাচ্য দেশের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী স্পষ্টতাই সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধিতা করবে, স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সংগ্রাম করবে, যেহেতু এর অর্থ হচ্ছে নিজেদের শ্রেণী আধিপত্য বজায় রাখার সংগ্রাম, মুনাফার জন্য সংগ্রাম। খুবই সম্ভাবনা আছে যে তারা এই পথে কিছুটা সফলতা অর্জন করবে, যেহেতু, অসম বিকাশের নিয়ম, তারা পুঁজিবাদের ভিত্তিতে, নিতান্ত সংকীর্ণ মাপে হলেও, অর্থনৈতিক উন্নতি করতে সক্ষম। যা হোক, আমরা এ সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারি না যে দেশের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও ফিউডাল জমিদারদের সঙ্গে আপোস করার ঝোঁক ক্রমেই বেশী বেশী করে দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত প্রথার অত্যাচারের সমস্ত অবশেষ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসর্ত মুক্তি পাবার জন্য এবং রাজনৈতিক-ক্ষেত্রের পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের জন্য জনসাধারণের চেষ্টার সঙ্গে এই ঝোঁকের বিরোধিতা উপস্থিত হচ্ছে। এবং শ্রমিক শ্রেণীই এই বিপ্লবী ধারার সব চাইতে সক্রিয় বাহক শক্তি। প্রাচ্যের স্বাধীন বুর্জোয়া দেশগুলির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব, শ্রমিক-শ্রেণীর, কৃষক সম্প্রদায় ও জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য-বদ্ধ ফ্রন্টের স্লোগান কার্যতালিকা থেকে মুছে দেয় না।" (জি. লেভিনসন)। একজন ব্রিটিশ মার্কসবাদীও বলছেন, "এর অর্থ হচ্ছে, প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বের সংগ্রামের মত, এই স্তরেও প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতির মধ্যে। শ্রমিক ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যকার অপ্রধান দ্বন্দ্বের, এই দুই শ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন চালু রেখে সেই কাঠামোর মধ্যেই মীমাংসা করতে হবে এবং যখন সাম্রাজ্যবাদ ও দালালরা একদিকে "বাম-পন্থী" সংকীর্ণতাবাদী উপকরণ ও স্লোগান ব্যবহার করে, অন্যদিকে 'কমিউনিস্ট বিপদের' ঢাক বাজিয়ে শ্রমিক ও জাতীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে পার্থক্য আরো বাড়িয়ে মৈত্রীকে ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করবে (ফোআট আক্টার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স? মার্কসিস্ম্ টু ডে, জুলাই, ১৯৪৯)। বিশ্বের মার্কসবাদী মহলের ঐকমত্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে লিমিং এ বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের এক্তাদশ অধিবেশনে 'উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' সম্বন্ধে প্রস্তাবে। তাই কাউন্সিল সমস্ত শ্রমিকদের কাছে সুপারিশ করছে যে, তারা প্রত্যেকেই অবশ্যই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবে এবং সমস্ত উপনিবেশবাদ-বিরোধী শক্তি-সমূহে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক-শ্রেণীর মৈত্রীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গঠনে ও তার সংহতি সাধনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে।" বর্ণ, ধর্ম, রাজনীতিক বিশ্বাস-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিকদের জড় করে গণতান্ত্রিক ও শ্রেণীভিত্তিক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা, বুর্জোয়াদের ট্রেড-ইউনিয়ন গুলিকে ধ্বংস করা বা হাত করার চক্রান্ত ব্যর্থ করা, সাধারণ কর্মী ও নেতাদের মধ্যে বাবসায় ঘুচিয়ে সব-ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সৃষ্টি করা ইত্যাদি উল্লেখ করার পর আরো কর্তব্য হিসাবে বলা হচ্ছে, "শ্রমিক শ্রেণীর মৌল স্বার্থ ক্ষণেকের জন্যও লঘু ভাবে না দেখে, অথচ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কের ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্রকে উর্ধ্বে তুলে ধরা।— জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কালে ও স্বাধীনতা উত্তরকালের জন্য যুক্ত কার্যক্রমের একটি সম্পূর্ণ কর্মসূচী রচনা করা, ঔপনিবেশিকদের সম্পূর্ণ উৎখাত এবং স্বাধীন স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার জন্য আর্থিক বিন্যাস সমন্বিত একটি সুবিবেচিত পরিকল্পনা রচনা করা" (লিমিং অধিবেশনের বক্তৃতা ও প্রস্তাবাবলী পৃঃ ৩৭)। এর ওপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধে নতুন তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থিত করার আদৌ কোন চেষ্টা করা হয় নি। বুর্জোয়া সংবাদ পত্র জগতের রকমারী গবেষণার ঠেলায় যে আলোচনা অনর্থক দুর্বোধ্য, বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে, তাকে যতটা সম্ভব স্পষ্ট করার জন্য মার্কসবাদীদেরই বিভিন্ন মন্তব্য একত্র জড়ো করা হয়েছে মাত্র।

—তারপর

াসা করি

রণকে।

—তা র প র

কি? আম-

উপর দাঁড়িয়ে

লাকছিলাম।

ক সেকেণ্ডের

ব্যাপার!

াতলা থেকে

তে পড়তে

ণ লাগে?

বশীজন কি?

ক রে হ লো!

তুই এখন—তার

পা স নে? স ব

খু লে ব লি।

ব্যা পা র টা

বেবীকে নিয়ে।

—বে বী?

আরো অবাক

হই আমি, তুই

বিয়ে ক র লি

কবে? আর—

বা ধা দে য়

নিবারণ: উঁহু

উঠতে নেয় অনেক সময়, প্রথমে ভেবেছিলাম একটা একটা করে সিঁড়ি গুনে গুনে উঠি।

তো শেষবার! এরপর তো আর উঠবনা। কি হলো তখন লিফটে চড়লাম। লিফটম্যান টের সুইচ্ চালিয়ে দিল। ইণ্ডিকেটার লাইট গুলো টার পর একটা জ্বলে উঠলো—কেমন অদ্ভুত ছিল তখন। একতলা, দু'তলা, তিনতলা—ত আস্তে লিফট উঠতে শুরু করে। আট তলা ছুয়ে গিয়েই লিফট বিকল হয়ে পড়লো। একেবারে ন্ধ অবস্থা। সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড! অনেক ধস্তির' পর যখন বারোতলায় পৌঁছালাম মেজাজ ড়ে গেছে তখন। ভাবলাম আজকে যখন বাসা ন থাকুক না কাজটা। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার া এলো জীবনটাকে যখন বাহুল্য মনে হচ্ছে তখন । কি চব্বিশ ঘণ্টার মায়া বাড়িয়ে। অনেক পৌঁজা-র পর একটা জানলা পেলাম যাতে লোহার রেলিঙ নৌ-শেষ হয়নি। সরকার আজ কাল সব লাতেই রেলিঙ ফিট করে রেখেছে। কাউকে মরতে না,—হ্যাঁ ওপাশ থেকেই ছিলাম লাফ? নিবারণ ারেটে একটা জোর টান দেয়।

—কিন্তু, অবাক হয়ে বলি, এটা কি যা' ভাবছিল তা' নয়, বেবী রায়। ওই-ই আমাকে ডোবালো।

কোঁস করে নিবারণ চাতুর্যানেক লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে—বেবীকে দেখেছিস?

মাথা নাড়ি—না, কিন্তু ব্যাপার কি আসলে? কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না?

—তা'হলে শোন। নিবারণ আরেকটা সিগারেট ধরায়: বি, এ, পাশ করার পর কি করবো ভাবতে ভাবতে জার্নালিজম ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। চাকরী-বাকরীর চেষ্টাও করলাম। কিন্তু মাথা নেই—ব্যাকিং নেই। কপাল এমন যে হাঙ্ক-ব্যাক পর্যন্ত জোটাতে পারলাম না। অগত্যা লোকে যাতে বেকার না বলে ওই পথ বরণ করলাম। বাড়ীতে কি বলবে বল। দিন কালের অবস্থা জানে। সে জন্য কেউ কিছু বলে নি। সকালে সন্ধ্যায় দুটো টিউশনি আর ক্লাস করেই সময় কেটে যেত। ওই জার্নালিজম ক্লাসেই বেবী রায়ের সঙ্গে আলাপ। সুন্দরী, চটপটে, সপ্রতিভ। তুই তো জানিস মেয়ে দেখলেই আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি। তাই প্রথম প্রথম খুব গম্ভীর হয়ে থাকতাম। নিজের দুর্বলতাকে জানতে দেবো কেন?

কিন্তু বেবী রায়ই আমাকে আক্রমণ করলো প্রথম:

—নমস্কার। আপনিই তো নিবারণ বাবু?

—পালটা প্রশ্ন করলাম—কি করে বুঝলেন?

—এটা জানা এমন শক্ত কি?

জবাব দেয় বেবী রায়।

যাক সে সব কথা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আপনার ত এই প্রবন্ধটা খুব ভালো লেগেছে আমার। বলে বেবী রায় আমার সদ্য প্রকাশিত সংবাদ পত্রের ক্রমবিকাশ প্রবন্ধটা খুলে বার করে বলে খুব চমৎকার হয়েছে।

লজ্জিত হয়ে পড়লাম: না, এ' আর এমন কি।

ওই তো আপনাদের দোষ। নিজেদের কথা বলতে চান না। কিলিক মেরে বেবী রায় আবার হেসে ওঠে।

—চলুন না কোথায়ও বসে গল্প করা যাক।

—বেশ চলুন, কখন কোথায় যাবেন, না কফি হাউসে। জিজ্ঞাসা করি।

—না বড় ভীড় ওদিকটায়। তার চেয়ে—একটু ভাবিত হয় বেবী রায়, তার চেয়ে চলুন আউটরাম ঘাটে। আপত্তি আছে?

—না: আপত্তি কি? চলুন।

পড়ন্ত বিকেল। পাশে বেবী রায়। সামনে গঙ্গা তখন কি ভাবছিলাম কি জানি। কি কথা হলো তাও' সব মনে নেই। অনেক কথার ফুলঝুরি জালিয়ে যখন ক্ষান্ত হলাম বেলা রাত্রি নেমে গেছে তখন।

—চলুন যাওয়া যাক্। উঠে পড়ি।

—চলুন। বেশ লাগলো আজকের বিকালটা, সত্যি খুব আনন্দ পেলাম।

হ্যাঁ ভালো কথা আপনাকে কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একদিন যেতে হবে।

[illegible] ট্যাক্সি করে বেবী রায় চলে যায়।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম—এটা কি হলো? এমনি করেই কি জীবনে ইয়ে আসে, মানে একে কি—কোথায় একটা টিকটিকি ডেকে ওঠলো টিক্ টিক্ টিক্।

হবে হয়তো তাই, তারপর থেকেই দিনগুলো যেন কেমন হয়ে গেল। কাজ করতে গেলে সব ভুল হয়ে যায়। সব সময় দুটো চোখ আর মিষ্টি হাসির কথা মনে পড়ে। অথচ বলতে গেলে রোজই তো দেখা হচ্ছে কিন্তু মনে হয় কতদিন দেখছি না। সপ্তাহে দু'তিন দিন তো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লেগেই ছিল। সিনেমা-রেষ্টুরেন্ট-এর পেছনে কত পয়সা বেরিয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করতে আরম্ভ করলাম। শোধ করবো কি করে একবারো ভাবিনি। ভাবলাম যা' হবার হবে।

ও জন্মদিনে নিমন্ত্রণ জানালো। বলল—না এলে ভীষণ রাগ করবো! আসবে কিন্তু!

বুঝতে পারছিস মনের অবস্থা? এ সময় না গিয়ে পারি? কিন্তু জন্মদিন, খালি হাতে যাওয়া যায় না। কি করা যায়! একটা বই হাতে নিয়ে গেলে ভাজকর মনে হবে! শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বেশ মোটা টাকা ধার করলাম। বাড়ীতে জানলাম না। একটা সোনার হার কিনলাম।

ওদের বাড়ীতে এই প্রথম গেলাম। ছবির মত। বাংলো প্যাটার্নের, অনেক সম্ভ্রান্ত অতিথি উপস্থিত। আমি যেতেই—উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানালো বেবী রায়। ওর মা বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর গান বাজনা আবৃত্তি—কি ভাবে যে সন্ধ্যাটা বেরিয়ে গেল তা' আমার পক্ষে গুছিয়ে বলা সম্ভব হবে না, তবে ওদের অনুরোধে আমাকে খান চারেক রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে হলো। শেষ হলে প্রচুর প্রশংসা পেলাম আর পেলাম বেবীর বাজস-চোখের মিষ্টি মাধুরী। শেষ হয়ে গেল অনুষ্ঠান। হারের বাক্সটা ওর হাতে তুলে দিলাম। সুন্দর হাসি হেসে ধমক দিল আমায়—এসব পাগলামি তোমাকে কে করতে বলেছে? কি যে পয়সা নষ্ট করো!

—আমি হাসলাম শুধু বললাম—চলি। শনিবার বিকালে আউটরাম।

—সূর্য নেমে আসছে! গঙ্গার বুকে অজস্র সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন।

—অশান্ত হাওয়ায় বেবীর চুল আমার মুখে এসে পড়ছে। দূরে একটা ষ্টীমার বাঁশী বাজাল। বেবীর

হাতটা আমার হাতে তুলে নিলাম। বেবী এক দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রয়েছে। মুখে চোখে রৌদ্রের লাবণ্য ছড়িয়ে।

—বেবী! আস্তে আস্তে ডাক দিলাম।

—উঁ! মৃদু জবাব।

—শুনছো?

—শুনছি!

—কি?

—যা বলছো!

—বেবী আমি তোমাকে—

—জানি!

—জানো? তবে কিছু বলছো না কেন?

—ভরসা পাচ্ছি না। আচ্ছা এ'সব যদি মিথ্যা হয়, যদি সব নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে যায় তখন কি হবে?

—তোমার জন্য সব আঘাত সইতে রাজী আছি, বেবী। শুধু তুমি বলো—

—আজ নয় নিবারণ। সময় হলে সবই বলব। আজকের দিন আমার তোমার মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাই না?

—নিশ্চই! উত্তর দিলাম।

অনেক কথা, অনেক গুঞ্জন। রাত্রি নেমে এলো। বেবী আরো মাধুরীময় হয়ে ওঠেছে। ওকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

—শোন, কয়েক দিন ক্লাসে যেতে পারবো না। কিছু ভেব না যেন আবার।

—মৃদু হাসি। বেবী আস্তে আস্তে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে।

—বেবী অনুপস্থিত। সারাটা দিন মনে হয় যেন নাহারা। বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা ইয়ারকী মারতে শুরু করে। তিন চার দিন চলে গেল। বেবী এলোনা একদিন ক্লাস থেকে ফিরে দেখি আমার নামে চিঠি এসেছে। বেবী লিখেছে। কি ব্যাপার? আস্তে আস্তে খাম খানা খুললাম।

প্রিয় নিব,

তুমি যখন এ চিঠি পাবে আমরা তখন অনেক দূরে—হাজারীবাগে। কলকাতায় আর ফেরা হবে না। যে কথা এতদিন বলি বলি করেও বলতে পারিনি সেটাই আজ বলতে চাই। তোমার সব কথাই বুঝেছি। কি বলতে চাও তাও জানি কিন্তু আমি নিরুপায়। জানি আঘাত পাবে তবুও এখনই সব খুলে বলা উচিৎ। আমি বাগদত্তা। সুতরাং যে স্বপ্নের দোর মনে পড়েছো তা' এই মুহূর্তেই ধূলিসাৎ [redacted] যাকো। এর জন্য আমায় ক্ষমা করো।

ভুলে যেও সব কথা, সব স্মৃতি। ই[redacted]

—অতএব বুঝতেই পারছিস, নি[redacted] আরেকটা সিগারেট ধরায়, আমার কি অবস্থা হ[redacted]—সব আলো নিভে গেলো যেন। কেমন দিশাহার[redacted]ড়লাম। সমস্ত শক্তি যেন নিমেষে নষ্ট হয়ে গেল[redacted] তারপর কটা দিন কি ভাবে কাটলো কি বলবো। খাওয়া দাওয়া প্রায়ই ভুলে গেলাম—চুপচাপ আউটরাম ঘাটে গিয়ে বসে থাকলাম। ক্লাসে কামাই। টিউশনিতেও সেই অবস্থা। কত রাত্রি যে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আর তারপর পাওনাদারদের তাগাদা।

এর পর চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেললাম। দরকার নেই এই গ্লানি নিয়ে বেঁচে থেকে। সুইসাইড! একটা মানুষ মরলে সংসারের খুববেশী কি ক্ষতি হবে? তা' হলে মৃত্যু বলে কিছু থাকতো না। সংসারও টিকে থাকতো না। মরতে হবে যে করেই হোক মরতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? রেল লাইন-স্পিরিট দড়ি-লেক কিম্বা সায়ানাইড। যে কোন একটা নিলেই তো শেষ।

দুরন্ত গতিতে যাওয়া রেলগাড়ীর সামনে ঝাঁপিয়ে ছেবেছি দিই লাফ। কিন্তু ভাবতে ভাবতে দেখি ট্রেন কখন বেরিয়ে গেছে। হলো না, রেল লাইনে হবে না। আর কেমন বিশ্রী যেন ব্যাপারটা। দেহটা [redacted] হয়ে পাকিয়ে থাকবে! ভাবতেই গা শি[redacted]। এর চেয়ে স্পিরিটই ভালো। রাত্রি বে[redacted] স্পিরিটের বোতলটা বার করলাম। ঘরে কেউ নেই! এই তো চমৎকার সময়। গায়ে ঢেলে দিলাম। ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপিয়ে উঠলো। দেশলাই, একটা দেশলাইয়ের কাঠি! তারপরেই বাস কেল্লা ফতে!

কিন্তু একি আমার আগুন ধরছে না কেন? একটা,

টো তিনটা—কত কাজ নষ্ট হয়ে গেল। হঠাৎ ঘরে ছাড়দি ঢুকে পড়ে।

—কি করছিস তুই? জামা কাপড় ভিজে কেন? ারে একি পায়ে গঙ্গা জল ঢেলেছিস কেন? ওমা সব া জল নষ্ট করেছিস! আমি সকালে বোতলটায় া জল ভরে রাখলাম। তোর মাথা খারাপ লো নাকি?

কি লজ্জাকর পরিস্থিতি! কোন রকম পালিয়ে চলার।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাসকে চিনিস তো? এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে নিবারণ বলে, ও ডাক্তার হয়েছে। ওর কাছে লাম। বললাম।

—একটা উপকার করতে হবে মৃগী! কিছুটা ায়ানাইড দরকার!

চমকে ওঠে মৃগাঙ্ক—কি ব্যাপার! সায়ানাইড। ার? কি হলো? আমি এমনি চাইলে দেবে না। ই মিথ্যেই বললাম—আর বলিস না। বাড়ীর কুকুরটা গলা হয়ে গেছে। ওর জ্বালায় আর পারা যায় না। যাদ খাবারের লঙ্গে—ও বুঝেছি। দেখো কিন্তু সাবধানে রাখিস আবার কোন কেলেঙ্কারী করে বসিস না। মৃগাঙ্ক আলমারী খুলে একটা শিশি থেকে খানিকটা পাউডার কাগজে ঢেলে দেয়।

—পুরিয়াটা নিয়ে চলে এলাম। এর পর আমায় পায় কে? এক মুহূর্ত!

আর তার পরেই অন্য জগতে। বেবী রায় দেখুক মানুষের মন নিয়ে খেলা কি মর্মান্তিক।

রাত্রি বেলা খেলাম না। শরীর খারাপ বলে শুয়ে পড়লাম। সবাই ঘুমোচ্ছে তারপর আমিও শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বো। পকেটে একটুকরো কাগজে লেখা। মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। না কাউকে দায়ি করতে চাই না।

—পুরিয়া খুলে মুখে ঢেলে দিলাম। মিষ্টি! সায়ানাইড কি মিষ্টি। না মৃত্যুকে অমৃত বলে মনে হচ্ছে? সব অন্ধকার। জানলা দিয়ে আসা আলো যেন হঠাৎ করে নিভে গেল। অতল শূন্যতা। কোন সুদূর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছি।

আপনার পছন্দমত সেরা কালি

রেনবো
ইঙ্ক

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
২/২ এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, • কলিকাতা-১

—এই দাদা ওঠ! চা' খাবি না? চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি ছোট বোনটা বিছানার পাশে দাড়িয়ে আছে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

এ কি হলো! তবে কি মৃণাল বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সায়ানাইড দেয়নি। উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা খেলাম। ভালো লাগছে না। সমস্ত পৃথিবী যেন আমার বিরুদ্ধে লেগেছে! আমাকে ক্লাউন বানিয়ে মজরা করছে! সবাই সবাই আজ আমার বিপক্ষে।

কলকাতার বাইরে যাচ্ছি বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

শেষ চেষ্টা!—তেরোতলা বাড়ী! ওই তেরোতলা নিশ্চই আমাকে আরো ওপরে নিয়ে যাবে। লোকে দেখুক। খবর কাগজে ছাপাক।

এ খবর নিশ্চই হাজারীবাগে পৌঁছাবে!

—নিবারণ আরেকটা সিগারেট ধরালে।

বারোতলার এক জানলার ওপর উঠে দাঁড়ালাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।—অফিস ছুটি হয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যা। নিচের গাড়ী গুলো খেলনার মত দেখাচ্ছে। দূরে রেড রোডের লাইট পোষ্ট গুলো মোমবাতির সারির মত দেখাচ্ছে।

আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। দিলাম লাফ।

আকাশের সব তারা ঘুরতে ঘুরতে এক বিন্দুতে মিলে গেল। সেই অন্তহীন মহাশূন্যে উদ্দাম গতীতে মিলিয়ে গেলাম।

সিগারেটের ধোঁয়ায় নিবারণ চারদিকে ভরিয়ে ফেলেছে। আমি ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, তবে তবে কি? শরীরটা হঠাৎ শির শির করে উঠলো।

নিবারণ ম্লান হাসলো। বলল—

হলোনা। এবারেও হলোনা। জ্ঞান হয়ে তাকিয়ে দেখি গলির মধ্যে-ষণ্ডের গাদার উপর শুয়ে আছি। চারপাশে ছোট খাটো ভীড়।

সকাল হয়ে গেছে। কে জানতো, যেখান থেকে লাফ দিয়েছি তার নিচেই ষণ্ডের স্তূপ বাঁধছে। ওঠতে গেলামণ পারলাম না বা দিকটা বেশ ব্যথা।—বোধহয় বা' পাশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

—নানান ধরনের প্রশ্ন আসতে লাগলো; কোন-রকমে উত্তর দিলাম।

সবাই ভাবলো ভবঘুরে।

করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

—দুদিন বাদে ছাড়া পেলাম।

বাড়ীতে ফিরে এসে শুনি অনেক পাওনাদার এসে আস্তানা দিয়ে গেছে।

নিবারণ আমার হাত চেপে ধরে; তোর কাছে এসেছি নিরুপায় হয়ে। আমি হাজারীবাগ যাবো। একবার কয়লা করে আসবো বেবী রায়ের সঙ্গে। কিন্তু যাবার মত পয়সা নেই। তাই গোটা পঞ্চাশেক টাকা যদি ধার দিতে পারিস খুব উপকার হয়।

করুণতম দৃষ্টিতে নিবারণ আমার দিকে তাকায়।

সবটা পারিনি। তবুও-যা' দিলাম তাতে নিবারণ প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি!

—তোকে আর কি বলবো। মরতে গেলাম।

নিয়তির কাছে আজ আমি উপহাসের পাত্র।

সান্ত্বনা দিলাম-পুরুষ মানুষ হয়ে এতো ভেঙ্গে পড়ছিস কেন। যখন সুবিধা হয় দিবি। বেবীর সঙ্গে কি কথাবার্তা হয় এসে বলিস।

নিবারণ চলে যায়।

তারপর অনেকদিন প্রায় মাস দু'য়েক নিবারণের সঙ্গে দেখা হয়নি।

সেদিন পুরোনো আড্ডায় গেলাম। অমরেশের সঙ্গে দেখা। বলল;—এই যে অমিয় নিবারণের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না তো! উত্তর দিই।

—কি আশ্চর্য! গত সপ্তাহে আমার কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা ধার নিয়ে বললো এ সপ্তাহে দিয়ে যাবে। কে বেবী রায় ওকে নাকি খুব ঘুরিয়েছে তাই তার সঙ্গে জলপাইগুড়িতে দেখা করে হেস্ত নেস্ত করে আসবে—

—জলপাইগুড়ি! আমি অবাক হলাম।

-হ্যাঁ জলপাইগুড়ি, আমাকে তো তাই বললো। অমরেশ বলে, -আমাকে বললো যে হাজারীবাগে! কোন রকমে আমি বলি,—তোর তোর কাছ থেকেও—

অমরেশের সব কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না।

বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সোল অব লিলিথ

মেরী করেলী

অনুবাদক—হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫ ॥

ফিরাজ চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই নিঃশব্দে দোর ঠেলে জারোবা এসে ঘরে ঢুকলো। তার তখনকার মুখের ভাব দেখে বোঝবার একটুও উপায় ছিল না যে সে এলরামির আদেশ অমান্য করে মোটেই কোনরকম শঙ্কিত বা অনুতপ্ত হয়েছে কিনা!

এলরামি মুখ তুলে তার দিকে চাইতেই সে তার স্বভাবিক কর্কশ স্বরে বলে উঠল,—"সব কথা শুনেছ-ত? এবার আমায় কি বলতে চাও, বল।...শ্লেটে লেখ, কি তোমার হুকুম। তোমার ও চোখ-রাঙানীকে আমি আর ভয় করি না।...জানি, তুমি বলবে,—আমি তোমার সঙ্গে বেইমানী করেছি।—তা করেছি-ই এই ছ' বছর মুখ বুজে, তোমার হুকুম মেনে চলে আজ আর আমি তার অবাধ্য না হয়ে থাকতে পারিনি!..ব্যাস্! আর কি বলতে চাও?"

কথা শুনতে শুনতে রাগে এলরামির চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগলো। শ্লেটখানা তুলে নিয়ে লিখলে,—"আর কিছু নয়, শুধু বলতে চাই বেইমান তুমি! —যে কাজের ভার তোমার ওপর দিয়েছি, আজ দেখতে পাচ্ছি, তুমি তার সম্পূর্ণ অযোগ্য!...আমার পা জড়িয়ে ধরে, একদিন যে শপথ করেছিলে, তা আজ তুমি ভঙ্গ করেছ,—আর তোমার ওপর নির্ভর করা চলে না"—লিখতে লিখতে, গভীর উত্তেজনায় এলরামির হাতখানা থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। রাগে সে তখন এমনি পাগল হয়ে উঠেছিল যে পারলে—যদি সে মনের একাগ্রতা আনতে পারতো, তা হলে, হয়ত, একমুহূর্তে জারোবার কথা কইবার শক্তি চিরদিনের মত রোধ করে দিয়ে, তাকে এই অতি বিরক্তিকর কথাগুলো শোনার হাত থেকে রেহাই পেতে পারত। কিন্তু এই অতি অস্থিরতা, তার রাগের জন্যে, সে তখন কিছুতেই শান্তভাবে মনের মধ্যে একাগ্রতা জাগাতে পারলে না।

এলরামির শ্লেটে লেখার সঙ্গে সঙ্গেই জারোবা তা পড়ে ফেলেছিল। শেষ কথাটা পড়েই সে সগর্বে খাড়া হয়ে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বললে,—"না, আমি বিশ্বাসঘাতিনী-বেইমান নই। —অন্ততঃ তোমার সঙ্গে তা করিনি আমি।...তোমার সঙ্গে বেইমানী করবার আগে আমি আত্মহত্যা করাও ভাল মনে করি। একদিন তুমি আমার মরণের মুখ থেকে বের করে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলে—সে কথা কোনদিনই আমি ভুলতে পারবো না। আর এই অকেজো প্রাণকে রক্ষে করার প্রতিদানে, আমি হাসি মুখে বুকের শেষ রক্তবিন্দু অবধি পাত করব। না—না, জারোবা বেইমান,—মিথ্যাচারিণী নয়,—সে তোমার একান্ত অনুগত।"

হঠাৎ, কথা বলতে বলতে স্বর যতদূর সম্ভব কোমল করে সে আবার বলতে লাগল,—"এলরামি—প্রভু—প্রাচ্যের মধ্যাহ্নানী পুরুষ! আমার সব কথা আগে ভাল করে মন দিয়ে শোন,—আজ আমি যা করেছি, তা শুধু তোমার ভালর জন্যেই জেনো। তোমার সুখ হবে ভেবেই আজ আমি তোমার আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হয়েছি। আমার এই অবাধ্যতার ভেতর দিয়ে, তুমি দেখতে পাবে—কোথায় কি করলে তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেতে পারো। ভগবানের দোহাই, তুমি বিশ্বাস কর, তোমায় সুখী করবার জন্যেই আজ আমি বেইমানী করেছি।...এই তোমায়, আমার প্রাণের কথা প্রকাশ করে বলে দিলুম। —বিশ্বাস কর। অবিশ্বাস করে আমায় ভুল বুঝো না।"

কৌতূহলভরা চোখে এলরামি একবার তার দিকে চাইলে তারপর শ্লেটের লেখা পুঁছে আবার লিখলে,—"এ ভাবে, তোমার বেইমানী করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না।...তোমার ওসব কথার কোন মানেই হয় না। যাক্ ওসব কথা,—বল লিলিথের নতুন খবর কি?"

"নতুন খবর ? নতুন খবর আবার কি থাকবে ? রোজকার মতই সে চোখ তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমচ্ছে.তো-ঘুমচ্ছেই !—তার আবার নতুন খবর কি বলব ? ...আমার কথায় ফিরাজ সে ঘরে গাওয়াতেও তার কোন পরিবর্তনই হয়নি ।...যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে দেখছি—তোমারই !"

রাগে, এলরামি ভুলে গেল যে জারোবা বন্ধকালা ! সে তেড়ে চেয়ার থেকে উঠে কি একটা তাকে বলতে গিয়েই, তার মনে পড়ে গেল, যে জারোবা ছোট-বড় কোন কথাই কানে তোলে না। কথাটা মনে পড়তেই আবার সে নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে ফুলতে চেয়ারে বসে পড়ল।

এলরামির এই নিষ্ফল ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে জারোবার মুখখানা খুশীতে যেন বিজয়োদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বলে উঠল,—"ফিরাজের কথা নিশ্চই শুনেছ তুমি। এইবার আমার কথা,—ঘটনাটার আগাগোড়া শোন এলরামি।...ভগবানকে ধন্যবাদ, যে কানে আমি কোন কথাই শুনতে পাই না। শুনলে,—তোমার অভিশাপ, তোমার বকুনী, আমার কানে ঢুকলে, হয় ত আমি ভয়ে যেতুম ! তোমার ম্যাজিক আমি বুঝি না,—বুঝি আমি মানুষের মনের ম্যাজিক। তার কামনা-বাসনা, যাতে সে দুনিয়া জয় করে ! তোমার ম্যাজিক কেবল স্বপ্ন সৃষ্টি করেই থেমে যায় "

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে জারোবা আবার বলতে লাগলো,—"এলরামি জারাথোস্ প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুমি রাজা,—কিন্তু প্রভু, কোনদিন কি তুমি নিজের মনের কামনা-বাসনার দিকে নজর দিয়ে দেখেছ ভাল করে ?... শক্তি তার কোনদিন পরখ ক'রে দেখেছ কি ? তুমি কি মনে কর, সেগুলোকে তুমি এমন করে গলাটিপে মেরে ফেলতে পেরেছ, যে কোনদিনই আর তারা মাথা তুলতে পারবে না ? সত্যি বটে, সময় সময় তারা, কোন অজানা মনের কোণে মরুর সাপের মতন, কুণ্ডলী পাকিয়ে, চুপ করে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে ..তারপর কোন অসাবধানীর পায়ের খোঁচায়,—ছিটকে পড়া একটা অতর্কিত পাথরের নুড়ির ঘায়ে যখন জেগে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে তখন যে ফণা তুলে তারা মাথা-ঝাড়া দেয়, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?...সে কামড়, একদিন আমার বুকেও পড়েছিল,—কামড়ের বিষে, আমার শরীরের সব রক্ত, বিষিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে বিষের জ্বালা বড় মধুর ! সেই বিষ থেকেই আমি জীবনের সেরাসুখ ভোগ করেছি।...থাক্ আমার কথা। তোমার নিঃসঙ্গ জীবনের কথাই ভাবছি আমি।—শেষজীবনে, কোন সুখের আশা বুকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছ তুমি ?... মরুঝড়ের দিনে, যখন আমি প্রায় মরণের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম—তখন তুমি আমায় তার মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলে। তার জন্যেই শপথ করেছিলুম, চিরদিন তোমার বিশ্বাস বজায় রেখে,তোমার সেবায় জীবন কাটিয়ে দেব। তাই আজ ভগবানের দরবারেই তোমার প্রাণ দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ, তোমার লিলিথের প্রেম তোমায় দেবার ব্যবস্থা করেছি।"

অতি উত্তেজনাভরে, চেয়ার ছেড়ে এলরামি উঠে দাঁড়াল —সমস্ত মুখ খানা তখন তার রক্ত শূন্য হয়ে গেছে, হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে ! রুদ্ধ আক্রোশে সে গর্জে উঠল—"কেন বুড়িকে জন্মের মত বোবা করে দিতে পাচ্ছি না ? ..কেন ? কেন ?...কেন ?"

...কিন্তু তার অতি উত্তেজিত মনের মধ্যে কোন মতেই তার একাগ্র-ইচ্ছা-শক্তি স্ফুরিত হল না। নিরুপায় হয়ে তীব্র দৃষ্টিতে জারোবার দিকে চেয়ে, তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলে।

গর্ব ভরে জারোবা সে ইশারার আদেশ অমান্য করে বললে,—"না—না, আমি থামব না। যা কিছু বলতে চাই আমি তা এখুনি বলব।—তা না হলে জীবনে আর কোন দিন হয়ত তা বলাই হবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলুম।... লিলিথের প্রেম !—একবার কল্পনা কর দিকি,সেই মখমলের মতন নরম হাত দুখানা দিয়ে সে যখন তোমার গলা জড়িয়ে ধরবে,—তার চামেলী ফুলের মত ঠোঁট দুটি, চুমোয় চুমোয় মুখ তোমার ভরিয়ে দেবে,-তার নিষ্পাপ চোখের মধুর দৃষ্টি, তোমার মুখে-চোখে বুলিয়ে দেবে,...এ সবই করবে সে, শুধু একবার যদি তুমি জাগিয়ে তোল তাকে।...শোন এলরামি, আজ ছ বছর ধরে আমি তোমাদের দু'জনকে মন দিয়ে লক্ষ্য করে এসেছি। দেখেছি, ঘুমিয়েই বেচারার রাত-দিন কেটে যাচ্ছে,—কারণ ?—তাইতে তোমার ইচ্ছে। আর সেই ঘুমের মধ্যেই সে কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে উঠেছে।

তুমি,—পাষাণের মতন হৃদয়হীন তুমি, আজ অবধি তাকে বিজ্ঞানের পরীক্ষার-বস্তুই করে রেখেছ! কোন দিন তোমার মনে প্রেমের কথা, বা-তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা, আজ অবধি মাথা তুলেছে বলে দেখিনি। তার অসীম সৌন্দর্য আজ অবধি মনে তোমার এমন কোন রেখা-পাতই করতে পারেনি যাতে করে তার সৌন্দর্য-স্বপ্ন ভেঙে যায়। দেখে দেখে আমি অবাক হয়েছি।...বুদ্ধি হারিয়েছি। দিনের পর দিন, উপায় খুঁজেছি। দিনের পর দিন, পরমেশ্বরের পায়ে আকুতি জানিয়ে, নির্দেশ চেয়েছি। আজ—এত দিন সে আকুতির উত্তর দিয়েছেন ভগবান। এতদিন বুঝেছি কি আমার করতে হবে।"

একবার অতি আনমনার মতন জারোবা আবার বললে—"কিশোরী লিলিথ মরে গেল, তুমি তাকে আবার বাঁচালে। সেই বাঁচা সে এখনও বেঁচে আছে।... তবু কিন্তু তাকে তুমি মরাই বলে থাক। সে এখন, বাড়তে বাড়তে, পূর্ণ যুবতী হয়েছে,—আর তুমি পুরুষ।... এমন করে জীবন্মৃত অবস্থায় আর তাকে ফেলে রাখা তোমার উচিৎ হচ্ছে না;—তাতে, ভগবান স্বয়ং তোমায় অভিশাপ দেবেন, জেনো। সেই অভিশাপের হাত থেকে তোমায় বাঁচাব বলেই আজ আমি তোমায় অবাধ্য হয়েছি। শপথ করেছি, লিলিথ তার জীবনে প্রেমের স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হবে না।...তুমিই হবে তার মনের মানুষ। এই পবিত্র কর্তব্য পালন করতে আমি যে মাতৃলী বাঁধার করেছি, তা তোমার মনের সুপ্ত প্রেমকে নিশ্চয়ই জাগিয়ে তুলবে জেনো।" বলতে বলতে, এলরামির দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বললে—"সে মাতৃলী আর কিছু নয় জান?—সেটা 'প্রেমের ঈর্ষা'।"

বুড়ী জারোবার এই পাগলামীভরা বক্তৃতা শুনে এলরামি ঘৃণাভরা মৃদু হাসি হাসলে একটু।

তার এই হাসি দেখে, জারোবা যেন জ্বলে উঠলো,—"তুমি হাসছ এলরামি?...আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই ঈর্ষার কালসাপ এর মধ্যেই তোমার বুকে ফণা তুলে উঠেছে!...আর, তার কারণ, লিলিথের ওপর আর এক জন পুরুষের নজর পড়েছে। ঐ ত' আমার চাতুরী!... আমিই, কিরাজকে লিলিথের ঘরে এনে ঢুকিয়েছি,... আমিই তাকে ঘুমন্ত যুবতীর খাটের ধারে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছি,...আমার কথাতেই সে ঘুমন্ত লিলিথের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল!...আর... আর যদিও আমি তার একটা কথাও কানে শুনিনি, তবু তার মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝেছি, আমার দোহাগের কথা বলে, সে যুবতীকে জেগে উঠে, চোখ খোলবার জন্যে অনুনয় বিনয় করেছে।...কিন্তু তা করলে কি হবে?—লিলিথের কাছ থেকে কোন সাড়াই সে পায়নি। .....আমি ত' জানি, লিলিথের নিঃশ্বাসটি অবধি তোমার,—তোমারই শুধু! সে তাকে জাগাবে কি করে? আমারই কথা মত, ঘণ্টাখানেক ধরে সে ক্ষুধাতুর পেটুকের মত, শুধু চোখ দিয়েই তার সৌন্দর্য-সুধা পান করেছে তার তরুণ প্রাণের সব আকুতিই সে চোখে ফুটে উঠেছিল, তা আমি এক নজরেই বুঝে নিয়েছি, ভালবাসায় মন তার মশগুল হয়ে গেছল তখন!...হাঁ,-হাঁ। আরও আছে, শোন এলরামি,—কিরাজ যখন লিলিথের হাতটা ধরে তাকে আদর করছিল, তখন লিলিথের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।...তা হলেই বুঝতে পারছ,—কিরাজের ডাকে সে জাগেনি বটে, কিন্তু সে আদর সে স্পষ্ট অনুভব করেছিল—তা না হলে সে হাসবে কেন?...সে স্পর্শ যে তোমার নয়,—তাও নিশ্চয় সে অনুভব করতে পেরেছিল। ...তা হলেই বোঝ, আজ আর, আগেকার মত তোমারই নেই সে ষোল আনা!"—বলতে বলতে গভীর আনন্দ ভরে সে হা হা ক'রে হেসে উঠল।

গভীর বিরক্তি ভরে এলরামি শ্লেট খানা তুলে নিয়ে তাতে লিখলে—"ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অবধি তোমার কথা আমি শুনেছি কিন্তু আর না। এবার তুমি ওপরে গিয়ে নিজের নিত্য-কর্ম করগে।...তোমার এই অবাধ্যতার ফলে, জীবনের উদ্দেশ্য আমার ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারত', কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, কিছুটা ক্ষতি হলেও, ততটা ক্ষতি হয়নি এতে,—তাই, এবারের মত মাপ করলুম তোমায়।...কিন্তু মনে রেখো, ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমার কোন আদেশ অমান্য করলে, সেই দিন-ই, জাহাজের টিকিট কেটে, তোমায় তোমার দেশে পাঠিয়ে দেব। এই আমার শেষ কথা;—শেষবারের মত তোমায় হুঁশিয়ার করা, জেনো।...মনে রেখো, তোমায় তোমার অন্নহীন, আশ্রয়হীন, অবস্থা থেকে, বাঁচবার

অন্তেই, রোগ সারবার পর, এখানে এসে চাকুরী দিয়েছি—অবাধ্য হলে আবার সেই অবস্থাতেই তোমায় ফিরে যেতে হবে।"

লেখাটা পড়া হলে গম্ভীর মুখে জারোবা বললে,—"এলরামি জারানোজ্ জানী, আর আমার মনিব হলেও, যেন ধরা করে জারোবার আজকের সতর্কবাণীটা মনে রাখেন। জারোবাও প্রাচ্যের লোক,—তারও ভুরু-তারু, অনেক কিছু জানা আছে।···সেও মাঝে মাঝে নিয়তির অমোঘ-বাণী শুনতে পায়।···জীবন মরণের মত প্রেমেরও একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে। প্রেমের নিয়ম-কানুন না মানলে এ পৃথিবীর অস্তিত্বই লোপ পাবে। কাজেই, পারেন যদি, তবে এলরামি জগতের নিয়ম-কানুনের বদ-বদল করবার চেষ্টাটাই আগে করুন,—তারপর যেন তিনি প্রেমকে হেলনা করতে যান!"—বলে গম্ভীর ভাবে, এলরামিকে অভিবাদন করে, সে দর্প ভরে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

জারোবা চলে গেলে, এলরামি তারই কথাগুলো ভাবতে লাগল।—ভাবলে সে,—"লিলিথের প্রেম?... বৈজ্ঞানিক শক্তিতে যে মড়াকে জিইয়ে রেখেছি, তার সঙ্গে প্রেম করতে হবে?·· না, না, আমি ত' পাগল হইনি এখনও!···কিন্তু লিলিথের আত্মা?·· আত্মা কি ভালবাসতে জানে?—তা কি করে পারবে?···আত্মা কুটস্থ কাজেই এ সম্ভাবনা আত্মায় থাকতেই পারে না। আত্মা বলতে ত' সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, চৈতন্যময় নির্বিকার সত্তাকেই বোঝায়,—যা জীবনের সব কিছু কর্মের সাক্ষীই শুধু—কিন্তু নিজে সব থেকে সদাই নির্লিপ্ত!···তার মধ্যে প্রেম বা ঘৃণার বিকাশ, কি করে সম্ভব হবে? কিরাজ, লিলিথের মৃতদেহটাকে, প্রেম-দৃষ্টিতে দেখেছে···তাকে ভালবেসেছে!"

॥ ১৬ ॥

একটু নিরালায় থাকবে বলে কিরাজ নিজের ঘরে গিয়েছিল—ইচ্ছে ছিল তার, এলরামির সঙ্গে এতক্ষণ অবধি তার যে সব কথা-বার্তা হল, সেইগুলোই আর একবার মনে মনে আলোচনা করে নিয়ে, তার ন্যায় অন্যায়ের বিচার-বিবেচনা, করে দেখবে। এলরামির মত বিরাট চুম্বকশক্তির সামনে বসে সে তা করতে পারেনি। তাই সে তার কাছ থেকে সরে এসে, নিজের ঘরে বসেছিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! অল্পক্ষণ বসেই কিন্তু চোখ দুটো যেন তার দারুণ ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে আসতে লাগল। আর ঘুমের মধ্যেও যেন কুয়াশার মত কোন কিছু, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে দিলে। বিরক্ত হয়েই সে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। অসময়ে কেন যে তার এ তন্দ্রাঘোর এলো তা সে বুঝে উঠতে পারলে না।

তারপরই ঘুম!—এমনি গাঢ় ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কেমন করে কোথা দিয়ে চলে গেছে, তা সে বুঝতেই পারলে না। ক্রমে যখন সে-ঘুম তার ভাঙলো, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত এসে গেছে!. ধড়্ মড়্ করে সে উঠে বসলো। মনে পড়ল সন্ধ্যার খাবার এখনও সে তৈরী করেনি,—অথচ খাবার সময় পেরিয়ে গেছে আগেই!···ক্ষুধাতুর এলরামি হয় ত' এতক্ষণ তারই আশা-পথ চেয়ে বসে আছে,—আর, এই অসময়ে এমন করে এতক্ষণ অবধি সে ঘুমিয়ে রইল কি বলে?···ছিঃ! ছিঃ! কি অন্যায় তার। আর সবের মত, তার ঘুমের ত' একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিৎ!... না আর দেরী করা নয়।

ত্বরিতে উঠে, কিরাজ চোখ মুছতে মুছতে সোজা গিয়ে এলরামির ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরক্ষণেই কিন্তু অন্য একজনকে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে দোর গোড়াতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এলরামি তখন লর্ড মেলথর্পের সঙ্গে কথা কইছিল। কথার মাঝে, কিরাজ ঘরে ঢুকে পড়তেই লর্ডের তার ওপর চোখ পড়ল। সুন্দর, প্রাচ্য-পোশাক পরা অপরিচিত যুবককে দেখে লর্ড মেলথর্প কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে, বিস্ময়ভরে কিরাজের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর এই হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ যে কিরাজ, তা বুঝতে পেরে এলরামি লর্ড মেলথর্পকে বললে—"ও আমার ভাই, কিরাজ জারানোজ।" তারপর কিরাজের দিকে চেয়ে বললে—"কিরাজ, ইনিই লর্ড মেলথর্প আমায় অনেক দিনই ত' এঁর নাম করতে শুনেছ তুমি?"

পরিচয় করিয়ে দিলে, কিরাজ প্রাচ্য-প্রথায় অতিথিকে অভিবাদন করলে। লর্ড মেলথর্প হাসি মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর আবার চেয়ারে বসে, এলরামিকে বললেন,—"সত্যি এলরামি,

তোমার ভাইকে দেখে, অন্যান্য উপনিবেশের কোন রাজা বা যুবরাজ বলেই [illegible] প্রথমটায়। সন্দেহ হচ্ছিল, তোমার ঘরে বসে, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি না কি আমি?"

লর্ডের কথা শুনে এলরামি নীরবে স্মিতহাস্য হাসল।

লর্ড মেলথর্প আবার বললেন, মঙ্গলবার "সান্ধ্যসম্মিলনে যাবার জন্যে, তোমায় নেমন্তন্ন করেছি,—এখন সেই সঙ্গে তোমার ভাইকেও নেমন্তন্ন করছি।... অতিঅবশ্য সঙ্গে এনো ওকে। ওর সঙ্গে আলাপ করে আমার লেডী বড় আনন্দ পাবেন। ভুলো না যেন, ওকে সঙ্গে আনতে।"

এলরামি একটু ইতস্তঃ করে বললে,—"ফিরাজ এর আগে কোনদিন, বাড়ীর বাইরে কোথাও নেমন্তন্নে যায়নি। কাজেই সামাজিক আদব-কায়দার জ্ঞান, ওর বড় একটা নেই। তবে আপনি যখন এতটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন,—আর নিয়ে যাবার জন্যে জেদ করছেন, তখন অবশ্য..."

বাধা দিয়ে লর্ড মেলথর্প বললেন,—"না না জেদ নয়, এটা শুধু তোমার অনুগ্রহ। তুমি অনুগ্রহ করে, ওকে সঙ্গে এনো, এই-ই শুধু বলছি আমি।"

এলরামি এবার নীরব-ফিরাজের দিকে চেয়ে বললে,—"শুনলে ত' ফিরাজ? সামনের মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়, লর্ড মেলথর্প তাঁর বাড়ীতে এক সামাজিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করছেন। আর সেই সম্মেলনে যাবার জন্যে, তোমায় নেমন্তন্ন করছেন। এখন, এ বিষয়ে তোমার মতামত, লর্ড বাহাদুরকে জানিয়ে দাও।"

ফিরাজ সলজ্জ ভাবে লর্ড-মেলথর্পের দিকে চেয়ে বললে, —"বেশ ত' নেমন্তন্ন করছেন যখন, তখন আমি দাদার সঙ্গে নিশ্চয় যাব।"

ফিরাজের সম্মতি পেয়ে, লর্ড মেলথর্প খুশীমনে এলরামিকে বললেন,—"বেশ, বেশ! তাহলে সেদিন তোমাদের দুজনকেই পাব, কি বল? হ্যাঁ, আর এক কথা। আমার লেডী তোমায় বিশেষ করে অনুরোধ করতে বলছেন যে, সেদিন যেন তুমি প্রাচ্য-পোশাক পরে সম্মেলনে আসো।... তোমার ভাইকেও অবশ্য প্রাচ্য-পোশাকে এনো।"

মৃদু হেসে এলরামি বললে,—"লেডী মেলথর্পের আদেশ আমার মনে থাকবে।"

অতঃপর যথারীতি বিদায়-সম্ভাষণ করে লর্ড মেলথর্প চলে গেলেন। ফিরাজ তাঁকে সদর দোর অবধি পৌঁছে দিয়ে, দোর বন্ধ করে, এলরামির কাছে ফিরে এল।

কৌতূহল ভরে সে এলরামিকে জিগেস করলো— "এখানের এই সামাজিক সম্মিলনটা কি রকম হয়?"

"যাও না কেন? মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে যখন, সে ক্ষেত্রে আজ তা মুখের কথায় বুঝিয়ে লাভ কি? আর তাছাড়া কথায় বলে তোমায় জিনিসটা ঠিক বোঝাতেও পারবে না হয় ত'।"

"কিন্তু, আমায় কেন হঠাৎ নেমন্তন্ন করলেন?"

"তা আমি কেমন করে বলব? কিন্তু, তুমিই বা হঠাৎ যেতে রাজী হলে কেন?"

"তার কারণ, আমি মানুষের জীবন-রীতি দেখতে চাই।—ভালকরে বুঝতে চাই।"

"জীবন-রীতি?... সে আবার কি?... এমনিই ত' তুমি রোজই মানুষ দেখছ, তবে সেখানে আর দেখবার,— বোঝবার কি থাকতে পারে?"

"হ্যাঁ, এমনি স্ত্রী-পুরুষ আমি রোজই দেখছি বটে, কিন্তু কি ভাবে তারা সমাজে থাকে, কি তাদের সেখানের আচার-ব্যবহার, সে সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই জানি না। তুমি ছাড়া, আর কারো সঙ্গে ত' মিশিনি কোন দিন!"

"ভাল। আর আগে থেকেই, আমি তার কতকটা আভাস তোমায় দিয়ে রাখছি। তুমি দেখতে পাবে,— কি করে, একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাবে,—এমন কি তার পাশের লোকের সর্বনাশ করেও নিজেকে তার চেয়ে বড় করে দেখাবে, লোকে অষ্টপ্রহর সেই ভাবনাই ভাবছে। আর সেই চেষ্টাতেই প্রাণপাত করছে। এই হল এখানের মানুষের জীবনের ধারা—এই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মঙ্গলবার সম্মেলনে গেলেই দেখতে পাবে, আমার কথা কত সত্যি! যাকগে যাগ, এখন খাবার আনো ক্ষিদে পেয়ে গেছে!"

লজ্জিত হয়ে ফিরাজ যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা করে, দুই ভাইয়ে এক সঙ্গে খেতে বসলো। ভোজ্য তাদের সাদা-মাটা-অন্ন। কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। উচ্ছিষ্ট সরিয়ে, ফিরাজ টেবিলটা সাফ করে ফেলল।

তারপর সে পিয়ানো বাজাতে উদ্যত হতেই শুনলে, বাইরের দোরের কড়া কেউ ঘনঘন নাড়ছে।

ফিরাজ গিয়ে দোর খুলতেই একজন টেলিগ্রাম-পিওন এলরামির নামের একটি টেলিগ্রাম তার হাতে দিলে। সই করে টেলিগ্রাম নিয়ে পিওনকে বিদায় করার পর বাইরের দোর বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসে সে সেখানি এলরামির হাতে দিলে।

খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রামখানি পড়তে পড়তে এলরামির চোখে-মুখে স্পষ্ট উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটে উঠল। নিজের অজ্ঞাতে সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল,—"কাল রাতে তিনি এখানে আসবেন? আমার এখানে? আমার কাছে কেন? পরম সাধু রাজাধিরাজ তিনি ধর্মজগতের, আমার কাছে তিনি কেন আসছেন?"

ফিরাজ তার এই বিহ্বল ভাব দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলে না। এলরামির এ রকম বিহ্বলতা আগে কোন দিন দেখেছে বলে সে মনে করতেই পারে না। কাজেই সাগ্রহে সে প্রশ্ন করলে,—"কোন দুঃসংবাদ নয় ত' এলরামি? কে আসবেন কাল এখানে?"

ফিরাজের কথায় এলরামির যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। টেলিগ্রামখানি ভাঁজ করে, খামে ভরে, খামটি পকেটে রেখে প্রায় স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিলে,—"না তেমন কিছু নয়। —কোন গোপন কাজের জন্যে কাল রাত্রে এখানে একজন সাধু আসছেন। তাঁর রাতের খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে এই তার করেছেন।"

ধীর, নম্র স্বরে ফিরাজ বললে,—"কেন আমায় মিথ্যে কথা বলে ভোলাতে চাচ্ছ, এলরামি?—এ ত' তোমার রীতি নয়? আমার মনে হয়, সাইপ্রাসের যে ধর্মসংঘের ভ্রাতৃত্ব একদিন তুমি মেনে নিয়েছিলে, পরে কোন কারণে যে ভ্রাতৃত্ব থেকে তারা তোমায় বরখাস্ত করে দিয়েছিল, সেই সংঘের প্রধান মোহান্তই বোধহয় আসছেন এখানে। —তাই তুমি অত বিচলিত হয়ে উঠেছ। কিন্তু এই সরল সত্যি কথাটি, কেন তুমি আমার কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করলে এলরামি? আমি ত কোনদিন তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি? তবে এ কথাটা আমায় জানালে কি ক্ষতি হত?"

ফিরাজের কথা গুলো শুনতে শুনতে এলরামির সা দেহটা যেন শক্ত হয়ে উঠলো। চোখেও তার কেমন একটা ক্রোধের অভিব্যক্তি ফুটল। তবু স্বর সংযত করে সে প্রশ্ন করলে,—"কে বলেছে তোমায় এসব কথা? কার কাছে শুনেছ?"

"নক্তুনিতে থাকার সময় একটা চিঠি আর ক'খানা হাতে লেখা পুঁথি দিয়ে তুমি আমার যখন সাইপ্রাসের সংঘে পাঠিয়েছিলে, আর তোমার আহ্বান না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে আমায় থাকতে বলেছিলে সেই সময় সেই মঠের একজন সাধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে তোমার অনেক সুখ্যাতি করে, শেষে দুঃখ করে বলেছিল যে, অতি সামান্য বিষয় নিয়ে, মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে তোমার মতান্তরের ফলেই নাকি শেষ অবধি মঠাধ্যক্ষ তোমার ভ্রাতৃত্ব থেকে নাম কেটে মঠের জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠান থেকে বার করে দেন। এইটুকু মাত্রই, আমি তার কাছে শুনেছি,—তার বেশী আর কিছু জানি না।"

"তা হলে ত' তুমি প্রায় সবই জান। তাদের সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য দিক থেকে আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করেছি। অবশ্য তাদের পদ্ধতি আমার জানা নেই। যাক্—কাল যিনি আসবেন বলে তার করেছেন, সত্যিই তিনি সেই প্রধান মঠাধ্যক্ষ। তিনি এখানে কেন আসছেন, আমি তা বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা। বোধহয় আমার আহৃত জ্ঞানের তথ্য জানাই তার উদ্দেশ্য। যাই হোক, তিনি না আসা পর্যন্ত আমি সুস্থির হতে পারছি না।"

"কিন্তু, সেখানে থাকতে আমি ত' শুনেছিলুম—প্রধান মঠাধ্যক্ষ স্বয়ং দেবদূতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। কাজেই মনে হয়, জ্ঞানের তাঁর সীমা নেই।"

"কিন্তু আমাদের বাস্তব জগতে সত্যিই দেবদূত বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা, সেইটেই যে ভাববার কথা! ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তা হয়ত তাঁর সত্যিই অসীম। কিন্তু তাছাড়া আর যে সব জ্ঞান তাঁর আছে, তা সবই অনুমান আর অনুভবের ওপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে। আমার ধর্মজ্ঞান বলতে বিশেষ কিছু নেই, তা ছাড়া অনুমান আর অনুভব থেকে কোন জ্ঞানও, আমি মেনে নিতে রাজী নই। আমি চাই প্রমাণ-সাপেক্ষ

জানি।—আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি সাধনা করছি। আমার মনে হয়, জ্ঞানে আমি ভ্রাতৃসঙ্ঘের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়।"

ফিরাজ এবার পিয়ানো খুলে বাজাতে বসল।

এলরামি তার কাছে গিয়ে বললো—"তোমার বাজান শেষ হলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়,—আমার জন্যে রাত জেগে বসে থেকো না যেন। আমি এখন ওপরে যাচ্ছি।"

কথা শেষ করে এলরামি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরাজ পিয়ানোর যেন একটা মিঠে সুরের ঝরণা খুলে দিলে। কিন্তু বেশীক্ষণ বাজালে না, অল্প পরেই বাজনা থামিয়ে দিলে।

হঠাৎ, সে সেই মিষ্টি নামটি স্মরণ করতে গেল—এলরামি যে নামটা তাকে ভুলে যেতে বলেছিল। তার মনে হল—ফুলের নাম—চাঁদের আলো, মিষ্টি সুর,—এসব কি কোনদিন কেউ ভুলে যেতে পারে? তরুণীর নামটি মনে মনে উচ্চারণ করতে গিয়ে, হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল সে। কি যেন সে নামটি? ঐ যা। মনেই পড়ছে না যে? এ কি হল? কি নাম। কি নাম তার যেন? সেই যে পরীর মতন সুন্দরী তরুণীটির? হা ভগবান! সত্যি সত্যিই সে তার নামটা ভুলেই গেছে? ভুলতেই হল তাকে, শেষ অবধি!

ভাবতে ভাবতে মনটা তার খিচ্‌ড়ে গেল। পিয়ানো বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে সে দু হাতে মুখ ঢাকলো। এলরামির দুর্বার শক্তির কথা ভেবে, মনে মনে সে রাগে ফুলতে লাগলো।···এ কি অত্যাচার?···শুধু নামটি মনে রাখবারও অধিকার নেই তার? ভগবান! ভগবান!···

॥ ১১ ॥

লিলিথের ঘরের একটা কোণে, ঘাড় গুঁজে বসে আরোবা একমনে সোনালি জরির সুতো দিয়ে দেশের মত একটা কিছু বুনছিল। অন্য কোন দিকে নজর ছিলনা তখন তার।

সুন্দর কারুকার্যময় মেহগিনীর খাটে, মখমলের বিছানায়, লিলিথের রম্যদেহ শোয়ান ছিল। তার পাশেই একটি উজ্জ্বল বিজলীর আলো—সমস্ত ঘরটাকে প্রচুর আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিল। লিলিথের খাটের পাশেই একটি জানালা। দিনের বেলা সেটা মখমলের পরদায় ঢাকা থাকে, কিন্তু সন্ধের পরই, পরদাটি খুলে দেওয়া হয়। তাতে বন্ধ ঘরের বাতাস নিকেশ হ'য়ে তাজা বাতাস ঢোকে ঘরে।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আকৃষ্ট হ'য়ে একটা বড় প্রজাপতি খোলা জানালার পথে ঘরের মধ্যে ঢুকে, লিলিথের মখমলের তৈরী মাথার বালিসের ওপর বসে মাঝে মাঝে পাখা নাড়তে নাড়তে তার শুঁড় দিয়ে খুঁজে দেখছিল, সেখানে খাবার মত কোন কিছু আছে কিনা।

এই সময় এলরামি এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে, ভেতর থেকে খিল এঁটে দোরটা বন্ধ করে দিল সে। তারপর আগ্রহভরা দৃষ্টিতে লিলিথের খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে সেই ঘুমন্ত মূর্তির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।···হঠাৎ সে অনুভব করলে, তার বুকের স্পন্দন যেন দ্রুত হয়ে উঠেছে!—কিন্তু কি যে এর কারণ, তা সে বুঝতে পারলে না।···তার জীবনে, আজ হঠাৎ এরকম হবার কারণ কি?···আজই প্রথম লিলিথের কাছে এসে, সে এরকম বুকের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলে···

ধীরে ধীরে ঘুমন্ত লিলিথের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে, এলরামি তার একগোছা চুল, অতি সন্তর্পণে, নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে সেগুলো ভালো করে দেখতে লাগল।—আজ যেন তাতে কি একটা নতুন কিছুর সে সন্ধান পেয়েছে! এর আগে, এলরামি কোন দিনও তার চুলের দিকে চেয়ে দেখেনি। এলরামির চুলের গুচ্ছ তুলে নেওয়ায় ভয় পেয়ে প্রজাপতিটা লিলিথের বালিশের ওপর থেকে উড়ে গেল। যেন স্নেহভরেই এলরামি লিলিথের চুলগুলোর হাত বোলাতে বোলাতে দেখতে পেল, উজ্জ্বল আলোয় আকৃষ্ট হ'য়ে প্রজাপতিটা এইবার সেই দিকেই উড়ে যাচ্ছে।

প্রজাপতির সেই উড়ে যাওয়া দেখতে এলরামির মনে হ'তে লাগল— "আলো···আগুন!···আলোর দীপ্তির আকর্ষণে মুগ্ধ হ'য়ে বেচারা আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে!... বেচারা জানেনা, যে ঐ আগুনের স্পর্শ, এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ভস্ম ক'রে ফেলবে,—আর সেই হবে ওর আকাংখার শেষ!···সব উচ্চাশার ইতি!·· এই কি জীবের পরিণাম? তার উচ্চাকাংখার শেষফল?···কে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলরামি লিলিথের দেহের

ওপর আর একটু ঝুঁকে পড়লো, এত কাছে এল দেহটার যে লিলিথের মৃদু উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে তার গালে লাগতে লাগল। আজই প্রথম তার নজর পড়ল, দেহটার সৌন্দর্যের ওপর! গর্বে তার মন ভরে উঠল এই ভেবে, সে এই অসীম সৌন্দর্যেভরা দেহের স্রষ্টা, স্বয়ং সেই!

ইতিমধ্যে, কখন যে জারোবা তার নির্দিষ্ট কোনটি থেকে উঠে, তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে এলরামির এই রূপ-বিহ্বলতা লক্ষ্য করছিল, তা সে মোটেই জানতে পারেনি। তাই, হঠাৎ তার কর্কশ স্বর শুনে সে চমকে উঠল। জারোবা বললে,—"বিজয়ীও একদিন বিজীত হবে এলরামি!...আর, কালও তার শুরু হ'য়েছে!"

এলরামির নির্বিকার মুখখানার দিকে চেয়ে জারোবা বুঝতে পারলে না, এলরামি তার কথা শুনেছে কিনা, বা শুনে থাকলেও তার মানে বুঝতে পেরেছে কিনা। পরক্ষণেই এলরামি আঙুল দেখিয়ে দোর খুলে তাকে বাইরে চলে যেতে নির্দেশ দিলে সংকেতে। জারোবা সে নির্দেশ অমান্য করতে পারলে না। ধীরে ধীরে সে লিলিথের ঘরের বাইরে চলে গেল।

উঠে এলরামি ভেতর থেকে দোরে চাবি বন্ধ করে দিলে তারপর লিলিথের খাটের একপাশে বসে, তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে, আদেশের স্বরে আহ্বান করলে,—"লিলিথ!—লিলিথ!—"

ডেকে সে অপেক্ষা করতে লাগল। অধৈর্যভাবে মনে মনে, এক থেকে একশ অবধি গণনা করে, আবার ডাকল, "লিলিথ।"

এবার লিলিথ পাশ ফিরে তার দিকে ঘুরে শুলো। তারপর মৃদু হেসে কি যেন বললে, এলরামি কিন্তু তার ঠোঁট নড়া ছাড়া আর কিছুই শুনতে বা দেখতে পেলে না।

আবার এলরামি ডাকলে,—"লিলিথ! কোথায় তুমি?"

এবার সুস্পষ্ট স্বরেই উত্তর এলো, "এই ত' তোমার কাছেই রয়েছি আমি! তুমি আমার একটা হাত ধরে রয়েছ!"

উত্তর শুনে এলরামি যেন চমকে উঠল বিস্ময়ে! এর আগে লিলিথ কোন দিন এমন কথা বলেনি। মনে সন্দেহ হওয়ায় সে প্রশ্ন করল—"তা হলে আজ তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ, কি বল?"

"না, না। আমি দেখছি কেবল উজ্জ্বল বাতাস, আর তারই বর্ণবিন্যাস।...এ ছাড়া, আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"তুমি কি একা হয়েছ লিলিথ?"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লিলিথ বললে—"সব সময়েই ত' আমি একা থাকি।"

এবার এলরামি তার স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলে,—"এতদিন কোথায় কোথায় গেলে, আর কি-বা দেখে এলে, বল আমায়।"

অল্পক্ষণ নীরব থেকে লিলিথ বললে,—"তুমি আমায় নরকের সন্ধান করতে বলেছিলে। এই দু'দিন ধরে অনেক খুঁজেও কিন্তু নরকের অস্তিত্ব দেখতে পেলুম না কোথাও।"—বলে একবার হেসে, কি যেন ভেবে নিয়ে, আবার বললে,—"তুমি বলেছিলে, নরক এক অদ্ভুত জায়গা,—যেখানে পাপীদের সাজা দেয়, মর্মপীড়া দেয়। সেটা নাকি অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নৈরাশ্য, আর মারিভয়ের দেশ। কিন্তু দেখলুম, ভগবানের সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তেমন অসম্ভব দেশ কোথাও নেই। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোথাওই এমন দুঃখের দেশ আমার চোখে পড়েনি। সব জায়গাতেই দেখেছি,—আলো, সৌন্দর্য, আর প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা!"

লিলিথের কথা শুনে কতকটা নিরাশ হয়েই এলরামি বললে,—"এ তুমি বলছ কি লিলিথ?...দুঃখ, কষ্ট, সাজা —এসব নেই কোথাও?"

এবার লিলিথ যেন একটা উৎকণ্ঠা-ভরে নড়ে উঠে, নিজের চেষ্টায় বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর আগের মত বন্ধ চোখেই সে স্পষ্ট স্বরে বললে,—"একি বিপদ বলত'?...আমি সত্যি বলে যা জেনেছি,—দেখেছি, তাই ত' তোমায় বলব?...যা মিথ্যে, দেখিনি, তা তোমার কাছে কেমন ক'রে বলব?—শোন, আমি গ্রহের পর গ্রহ ঘুরে দেখে, যা বুঝেছি, তাই আমি তোমায় বলছি। দেখেছি, ভগবানের সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে, মন্দ বলে কোথাও কিছু নেই,—মৃত্যু বলে কোথাও কিছু নেই। এসবের কোন অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে তবে তা আছে তোমাদের এই পৃথিবীর ভেতরেই। মানুষেরই কর্মফল

এসব,—তাদেরই স্বকপোল-কল্পিত জিনিস। ভগবানের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।"

"এ যদি মানুষের কল্পনা, মানুষেরই স্বকপোল-কল্পিত জিনিসই হয়, তবে মানুষ কি?"

"ভগবানের দূত মানুষ। ভগবান মানুষ-সৃষ্টি করে তাকে নিজের খানিক-ইচ্ছায় ভূষিত করেছেন। স্রষ্টার মতন, মানুষও নিজে সৃষ্টি আর ধ্বংস করতে পারে। মানুষের কাজে, ভগবান কোনদিন বাধা দেন না। কাজেই মানুষ নিজের বুদ্ধির দোষে, যদি মন্দ কিছুর সৃষ্টি করে, তবে সেই মানুষের সৃষ্ট মন্দ মানুষ নিজেই যতদিন না ধ্বংস করে, ততদিন সে মন্দ থাকবেই!...আমি যে স্তরে ঘোরবার অধিকার পেয়েছি, সেখানের অধিবাসীরা ভাল ছাড়া অন্য কিছু সৃষ্টি করে না। কাজেই, পাপ, আর কষ্টের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। তুমি বারবার যে নরক, সাজা,—এই সব কথা বল, আমি এর কোন মানেই বুঝে উঠতে পারি না।"

"তার কারণ নিজে তুমি সুখে রয়েছ কিনা! যে নিজে সুখে থাকে, সে অপরের অসুখ,—দুঃখ, এসব দেখতেও পায়না বুঝতেও পারেনা। পৃথিবী থেকে এখন তুমি অনেক ওপরে রয়েছ কাজেই পৃথিবীর স্মৃতিও তোমার মন থেকে মুছে গেছে। তাই এ পৃথিবীতে থাকতে তুমি যে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছ, তার কথাও তোমার মন থেকে মুছে গেছে।...শোন লিলিথ, দেখে শুনে আমি নিজে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় তোমার মঙ্গলময় ভগবান অতি নিষ্ঠুর আর নির্দয়। এ জগতের সব দুঃখ দুর্দশাই তাঁরই সৃষ্ট আর বেচারা মানুষদের হাতে তার প্রতিকারেরও কোন উপায় রাখে নাই..."

এ কথাগুলো শুনতে শুনতে একটা বেদনার ভাব লিলিথের মুখের ওপর ফুটে উঠছিল। এলরামির ভগবানের দোষ-কীর্তন শুনতে শুনতে সে ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো তারপর বিষণ্ণ হাসি হেসে ধীরে ধীরে বলল,—"কত অন্ধ তোমার দৃষ্টি!—ভগবানের দেওয়া এতো আলো, এতো সৌন্দর্য তোমার নজরে পড়ছে না?"

"তাই, আমার জন্যে মনে মনে তুমি করুণা বোধ করছ নয়?"

"হ্যাঁ, তোমার জন্যেও বটেই তার সঙ্গে আমার জন্যেও।"

"কেন?...তোমার জন্যে কেন?"

"কারণ, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না, আর তুমিও আমায় দেখতে পাচ্ছ না। আমি যদি তোমায় দেখতে পেতুম, আর যদি তোমায় আমার প্রকৃত চেহারা দেখাতে পারতুম, তাহলে হয়ত অতি সহজেই তুমি আমার কথা বুঝতে পারতে,—মেনে নিতে যা বলছি, সব!"

"সে কি কথা? আমিত তোমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই আমার চোখের সামনে।—এইত তোমার হাতখানা আমি ধরে বসে রয়েছি।"

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে লিলিথ বললে,—"না না না। ওটাত আমার প্রকৃত হাতই নয়—ওটা আমার হাতের প্রতিবিম্ব মাত্র!"

রোগীর মত এলরামি লিলিথের ঘুমন্ত দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলো—এমন সুন্দর মুখখানি, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি, দুধে-আলতার মতন গায়ের রঙ, আর মখমলের মত সুখ-স্পর্শ লিলিথের এই দেহ—এ যদি তার প্রকৃত দেহের খালি প্রতিবিম্বই হয়, তবে সে আসল দেহ কেমন?—আর কোথায়?

লিলিথ আগেকার কথার জের টেনে আবার বলতে লাগল—"সব প্রতিবিম্ব, সব ছায়ার মতনই, আমার এ ছায়াও মিলিয়ে পঞ্চভূতে মিশে যাবে। তবু কিন্তু প্রকৃত আমি ঠিক থাকবো—তবে হ্যাঁ, হয়ত এখানে নয়, অন্য কোন জায়গায়...কবে আমায় যেতে দেবে গো সেখানে?"

"কোথায় যেতে চাও তুমি লিলিথ!"

এবার লিলিথ সাগ্রহে উত্তর দিলে—"আমার বন্ধুদের কাছে,—প্রায়ই আমি শুনতে পাই গানের মতন সুর করে তারা সব আমায় ডাকছে—'লিলিথ! লিলিথ! চলে এসো!'...কখন দেখি হাত ইসারায় তারা আমায় তাদের কাছে যেতে বলছে। কিন্তু আমি যে যেতে পারি না, তাদের কাছে! একি নিষ্ঠুরতা তোমার বল ত'? আমায় তুমি একটুও ভালো না বেসে জোর করেই এখানে ধরে রেখেছ। তারা আমায় কত ভালবাসে,—তবু তুমি আমায় তাদের কাছে যেতে দিচ্ছ না! আরও কতদিন এমন প্রেমহীন জীবন আমায় কাটাতে হবে বল ত'?"

"প্রাণে তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে? বেশ বেশ ত' শুনি তোমার প্রাণের স্বপ্নের স্বরূপটা কেমন?"

"প্রেম স্বপ্ন নয়,—প্রেম বাস্তব। প্রেমই প্রকৃত জীবন। এই প্রেম পাইনি বলেই, আজও আমি পূর্ণ-জীবন পাইনি। চুপ করে একলা একলা আমি মাঝের একটা স্তরে দিন কাটাচ্ছি।"

"তাতে কি তুমি দুঃখ পাচ্ছ? দুঃখের মাঝে কি দিন কাটছে তোমার?"

"না—দুঃখ বলে এ স্তরে কোন কিছুই নেই। আমার এ নিঃসঙ্গতার ভেতরও প্রায়ই মাঝে মাঝে আলোর ঝলক খেলছে।—করুণাময় ভগবানের সৌন্দর্য-মহিমা, চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে কিনা!"

লিলিথের কথাগুলো শুনে এলরামি ভাবতে লাগল,—"একি বিষম বিড়ম্বনা? আমি যে ওর আনন্দের হদিসই পাচ্ছি না!—আর না পাচ্ছে লিলিথ আমার দুঃখের হদিস! স্বর্গের বাণী বুঝি পৃথিবীর লোকের কাছে এমনি দুর্বোধ্যই হয়?"

কতক্ষণ ভেবে লিলিথকে সে বললে—"আচ্ছা লিলিথ! তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি যেন ভগবানকে দেখেছো,—যেন তাঁকে ভালকরেই চেনেছ, তুমি। কিন্তু আমি···আমি ত' তাঁকে জানি না, তাঁর অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারিনি। সত্যিই যদি তাঁকে তুমি দেখে থাক, তবে বল ত' আমায়, ভাল করে বুঝিয়ে,—কেমন তাঁর চেহারা? দেখতেই বা কেমন তিনি?"

লিলিথ চুপ করে রইল।

"কই?—কোন উত্তর নেই যে!···কি-ইবা উত্তর দেবে বেচারা?···জানি ত', ভগবান বলতে এক বিরাট অন্ধ শক্তিকেই বোঝায়···অহেতুক সৃষ্টি, আর অন্ধ-ধ্বংসই তাঁর স্বরূপ!"

এই সময় লিলিথের সারা দেহটা নড়ে উঠল। হাত-দুটি যুক্ত করে, ওপর দিকে তুলে সে যেন কাকে প্রণাম করে, আবার নামিয়ে নিয়ে বললে,—"গানের সুর-সপ্তক জান, শুনেছও নিশ্চয়?···এইবার তার সঙ্গে আরও ঐরকম সোত্তর লক্ষ সুর যোগ কর,—এই মিলিত মহাসুরের মধুরতম সম, যদি কখনও কল্পনায় আনতে পার তখন বুঝবে, যে শ্রীভগবানের মধুর স্বরের সে-দম কতকটা আঁচ দিচ্ছে মাত্র!···যত রকম উজ্জ্বল, সুন্দর রঙ আছে, তাদের সব গুলোর সুষ্ঠু সমাবেশ করে, এক মহামহিমময়, সুন্দরতম মূর্তি কল্পনা কর, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে দাও, অনন্ত-যৌবনের সৌরভ গরিমা, অনন্ত সততা, অসীম আনন্দ, আর সীমাহীন অনন্ত শক্তি,—তবুও আমরা সেই মন-বাক্যের অগোচর, বিরাট-হিরণ্যগর্ভ, পরমপুরুষের, রূপ, গুণ, আকৃতির অল্প একটুও বর্ণনা করতে পারব না। ···এক কথায় তিনি মন-বাক্যের অগোচর, সৎ-চিৎ-আনন্দময় পরম পুরুষ!···তাঁর চকিৎ দৃষ্টিতে আলোর ঝলক, তাঁর সত্তায় শান্তির প্রবাহ। তিনি শূন্য পথে চলে গেলে জলের ওপর পদ্মের মত, আকাশের পথে নতুন নতুন জগতের সৃষ্টি হয়! তাঁর অনুজ্ঞায়, বায়ুর শূন্য মণ্ডলে নব নব গ্রহ-উপগ্রহ ফুলের মত ফুটে উঠতে থাকে। ···আর কি করে বোঝাব তোমায়?···আহা! কখনও যদি তাঁর সে শূন্য-বিচরণ দেখবার সৌভাগ্য হত তোমার! না—না, আমি বৃথা ত' মোটেই তোমায় বোঝাতে পারলুম না গো মোটেই না।"

লিলিথের কথাগুলো শুনতে শুনতে, এলরামির মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠলো। কতকটা রুক্ষ স্বরেই সে বললে,—"তোমার কাছ থেকে কোন নতুন জ্ঞানই আমি পেলুম না। তুমি যা দেখেছ বলে মনে কর, তাই বরঞ্চ বললে আমায়, কিন্তু সেগুলো যে সত্যি, তার কোন প্রমাণ আনতে পার?"

লিলিথের মুখের আনন্দ-আভা ম্লান হয়ে গেল। ক্লিষ্ট স্বরে সে বললে,—"প্রেম থাকলে, অনুরাগ জন্মালে, তবে মনে বিশ্বাস আসে। যেখানে প্রেম-অনুরাগের অভাব সেখানেই হয় সন্দেহের জন্ম, আর এই সন্দেহ থেকেই হয় পাপের উৎপত্তি। আর যে পাপী, সে কোন দিন ভগবানকে জানতেও পারে না, বুঝতেও চায় না।"

বিরক্তকণ্ঠে এলরামি বললে,—"তোমার কথায় একটুও নতুনত্ব নেই লিলিথ! তোমার মতন প্রায় স্বাধীন আত্মাও যদি এর চেয়ে নতুন কিছুর সন্ধান না আনতে পারে, তা হলে আমার এ সাধনাই বৃথা বুঝতে হবে। তুমি যা বললে, সেগুলো অতি মামুলী কথা। আমাদের মঠের, গির্জার পুরুতরা ত' রোজই ওসব কথা বলে বেড়ান।"

কথা শেষ করে, মাথার দুপাশে রাখা লিলিথের হাত

দুগানির মধ্যে একটিকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে কড় আদেশের স্বরে বললে—"শোন লিলিথ, এসব হেঁয়ালীর কথা ছেড়ে, সাদা কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার মতে 'নরক' বলে কোথাও কিছু নেই। কেমন, এই ত' তোমার মত ?"

স্পষ্ট স্বরে লিলিথ বললে—"না, 'নরক' বলে কিছু নেই।"

"তা হলে বলতে চাও, যে অসৎ লোক, কোন সাজাই পায় না ?"

"সাজা সে পায় ঠিকই, তবে সে সাজার স্রষ্টা সে নিজেই। আর তাতেই তার নাশও হয়।—এই-ই নিয়ম।"

"আর জ্ঞানী গুণীরা ?—তারাও ত' সাজা পায়,—কিন্তু কেন পায় ? জগতে অনেক সময়ই দেখা যায় যে সে সাধু,—গুণবান, সে সারা জীবন সৎকাজ করেও, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে থাকে ?—এরকম কেন হয় ?"

"তা অসম্ভব !—কিছুতেই তা হতে পারে না। তবে প্রাক্তন কর্মফলের ফলই সময় সময় তা হয়ে থাকে,—এর অন্য কোন কারণ নেই।"

"তা ছাড়া আর কিছুতেই হয় না বলছ ?"

"না, আর কিছুতেই হতে পারে না। তা ছাড়া দুঃখ-কষ্ট মনের বিকার। সবাইয়ের কাছে তা সমান হয় না। তুমি যাকে দুঃখ মনে কর, আর একজন তাকে সুখ মনে নাও করতে পারে। অনেক সময় বাইরে থেকে দেখে, লোকে মনে করতে পারে যে সৎ-আত্মা কষ্ট পাচ্ছে, আর অসৎ আত্মা সুখে আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়।"

"আর, তুমি বলছ, ভগবান আছেন।"

"হ্যাঁ, ভগবান আছেন।"

"স্বর্গ বলে কোন কিছু আছে কি ? তুমি দেখেছ ?"

"আছে বই কি, কিন্তু স্বর্গ ত' লক্ষ লক্ষ রয়েছে। কোন স্বর্গের কথা বিশেষ করে তুমি জানতে চাইছ ?"

"যে স্বর্গে ভগবান থাকেন।"

"না, সে স্বর্গ আমি দেখিনি। দূর থেকে সেই জগৎ-কেন্দ্র আমি দেখেছি বটে, কিন্তু তোমার ইচ্ছা-শক্তির বাঁধনে বদ্ধ থাকায়, আমি সেখানে কোন দিন যেতে পারি নি।"

"আচ্ছা—মনে কর, একবার যদি তোমায় আমি ছেড়ে দিই তা হলে আর কি কোন দিন আমার কাছে ফিরে আসবে ?"

"না। সে নিখুঁত দ্যুতি-মণ্ডলে কেউ যদি একবার যেতে পায় সে আর কোনদিন এই অপূর্ণ আলোর দেশে ফিরে আসে না।"

অতঃপর আর কি প্রশ্ন করবে, এলরামি যখন মনে মনে তাই পরিকল্পনা করছিল, সেই সময় হঠাৎ লিলিথের কথা শুনে সে চমকে উঠল। লিলিথ বলছিল, —"আজ কে আমায় সুকোমল মিঠে সুরে নাম ধরে বারবার ডাকছিল,—যেন সে আমায় কত ভালবাসে !—এমনি তার প্রেম-বিহ্বল স্বর। কথা তার আমি শুনেছি, বুঝেছি,—কিন্তু আমি তার কথার উত্তর দিতে পারিনি। তবু এখানের কেউ যে আমায় ভালবাসে, তা জানলে ভালোও, তোমাদের এ পৃথিবী আমার কাছে কতকটা সহনীয় হয় !"

এলরামি মনে মনে প্রমাদ গণলে।—সর্বনাশ ! তা হলে নিদ্রিতা লিলিথের কানেও ফিরাজের আকুতি পৌঁছেছে আর শুধু পৌঁছেই চুকে যায় নি,—তার সে ডাকে, লিলিথের প্রাণে প্রেমের আবেগ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে ? তার পরিব্রাজক সূক্ষ্ম আত্মাতেও তা হলে, প্রেমের ভাব ফোটে ? অগত্যেই ত' ভাবের প্রথম বিকাশ হয় আমি,—আরও জানি, বিজ্ঞান বলেছে, সে বিকাশের হেতু, ভেতর বা বাইরের কোন একটা কিছু। একটা অর্থহীন ভাসা-ভাসা ধারণাও শূন্য থেকে জন্মায় না ! তবে ?…

লিলিথকে এই জীবন্মৃত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে রাখার গোড়ার দিন থেকেই, এলরামি সতর্ক ছিল, যাতে, তার নিজের মনের কোন রকম ভাবনা-চিন্তার ভাবধারা যেন তার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে লিলিথের মগজে প্রতি-ফলিত না হয়।—ফলে এতদিন লিলিথ, ভগবান বা অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহের সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছে, এলরামির নিজের ধারণা, ঠিক তার বিপরীত। এই জন্যেই ভেবে দেখা দরকার এসব ধারণা লিলিথের মনে কি করে আর কোথা থেকে এলো ?

দু'বছর আগে, সিরিয়ার মরুভূমিতে তার যখন স্বাভাবিক মৃত্যু হ'য়ে ছিল, তখন সে সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা কিশোরী

মাত্রই ছিল। তারপর এই ছ'বছর ধরে, সে যে জীবন-যাপন করছে,—তা শুধু বিজ্ঞানের বলেই। এ সময় তার দেহের এই ক্রমবিকাশ, তার বুদ্ধির দীপ্তি কোথা থেকে কেমন ক'রে হ'ল?—এর কোন হেতুই এলরামি খুঁজে পায় না, কিন্তু তবু তার মন-প্রাণ এই অপূর্ব সাফল্যে গর্বোৎফুল্ল না হ'য়ে পারেনি।

এইবার সত্যিকারের সমস্যা দেখা দিয়েছে। লিলিথের প্রাণে প্রেমের আবেগ এসেছে; আর সে প্রেম স্বর্গীয়, ব্যক্তিত্ব-হীন-প্রেমেও নয়। এই প্রেম তার আত্মাকে এক অব্যক্ত আনন্দ দিয়েছে, তার আত্মার-কানে আর একজনের স্বর পৌঁছেছে!—আর শুধু তাই নয়, সে স্বর তার নিঃসঙ্গ জীবনে প্রেমের পিপাসা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে!...এটা অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়। জানোয়ার অবাধ্যতা, আর কিরাজের অপকর্মের বিচার, সে সহানুভূতির সঙ্গেই করতে চেয়েছিল। তবু কিন্তু তার মনের মধ্যে, কেমন একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য যেন তাকে স্থির হতে দিচ্ছিল না। সে ভেবে পেলেনা, লিলিথের শেষের কথাগুলোর কি জবাব দেওয়া উচিৎ।

এলরামি, তাকে আর নতুন কোন প্রশ্ন করলে না। নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখা লিলিথের হাত খানি সে তার মাথার পাশে আগে যেমন রাখা ছিল, ঠিক তেমনি করেই রেখে দিলে।

মনে হ'তে লাগল তার, লিলিথের আত্মা যেন ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। কথাটা ভেবে মন তার যেমন আনন্দ-গর্বে ভরে উঠল, সেই সঙ্গে, পূর্ণ বিকাশের পর, লিলিথের আত্মাকে আর হয়ত' সে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারবে না,—এই সম্ভবনার কথাটাও তার মনে, মাঝে মাঝে জেগে উঠে, একটা হতাশা তার মনের উৎসাহকে মুষড়ে দিচ্ছিল।

"আচ্ছা লিলিথ, এবার তুমি যাও, বিশ্রাম করগে।"

"বিশ্রাম?...কোথায় গিয়ে বিশ্রাম করব?"

"সেখানে তোমার মন চায়?"

"না।...আমার মন যেখানে যেতে চায়, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সেখানে আমি যেতে পারি না।"

কথাটা শুনে, এলরামির মন আবার আনন্দ-গর্বে ভরে উঠল। মুখে প্রশ্ন করলে,—"আমার ইচ্ছে?...তার শক্তি?...তার লোকাতীত ক্ষমতা?..."

"হ্যাগো! তোমার ইচ্ছাশক্তি...আর তার সঙ্গে পরম করুণাময় ভগবানের ইচ্ছা আর কৃপা!..."

বিস্ময়ে চমকে উঠে এলরামি ডাকলে,—"লিলিথ!"

নিদ্রিতা তরুণী নীরব!

অবিশ্বাস ভরে মাথা নেড়ে এলরামি নিজের মনে বলে উঠল,—"ভগবানের ইচ্ছা আর কৃপা?..সে কৃপার বলে ত তুমি আজ ছ'বছর আগেই মরে ভূত হ'য়ে গেছে। আমি আমার বিজ্ঞানের বলে ধরে না রাখলে তো এত দিন ওর এ দেহেরও কোন অস্তিত্ব থাকত না।...তবে ভগবান আবার কি কৃপা করবেন?"

বিজ্ঞান অনেক সময়েই ভগবানের বিরুদ্ধে কাজ করতে চায়, আর সেই জন্যেই অনেক বৈজ্ঞানিক-গবেষণা অসমাপ্তই থেকে যায়। এলরামির আত্মপ্রবিঞ্চনার অভাব ছিল না! সেই জন্যেই সে ভেবে পেলে না, তার বিজ্ঞানের শক্তিতে বাঁচিয়ে রাখা লিলিথের আত্মার ওপর ভগবানের কি অধিকার থাকতে পারে?

[ক্রমশঃ

ব্যথার এপারে | কুশল মিত্র

সবাই হারিয়ে যায়, এ জীবনে আর সব যেমন হারায়
একে একে, অন্ধকারে জানালার আলোগুলি নেভে
প্রতিদিন পৃথিবীর ব্যথার আড়ালে।
যা রয়, সে এক দীর্ঘ দিনের চিতায়
অতীতের জরাজীর্ণ রূপকথা শবরীর স্মৃতির শরীর।

অগ্নি জ্বলে শিয়রের রৌদ্র-জানালায়
আকাশের বাঁধ ভেঙে সজল ছায়ারা
মেঘে মেঘে বেলা ডাকে, সখি!
তোমার ঘাটের কাছে চেনা পথ, চেনা চিহ্ন,
চেয়ে দেখি নেই
আঙিনায় মৃত পায়ে আর কারো ছায়া পড়ে না তো,
স্মৃতির ফ্রেইমে বাঁধা অতিপ্রিয় মুখ
কে যেন দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে চলে গেছে
এ জন্মের মত।

যা থাকে না, তাই নিয়ে ব্যথা, তাই নিয়ে আছি
তাই তো তোমায় নিয়ে চারিদিকে ব্যথার উৎসবে
মাঠে মাঠে রৌদ্র জ্বলে, রক্ত ওঠে কোকিল কণ্ঠের
পলাশ ফোটেনি তবু বসন্তের বনে বনে
অভিসারী ডালে
নির্জন রক্তের স্রোতে ভেসে যায় কান্নার হাঁসেরা।

দূরের সবুজ বন দিগন্তের টিয়া
হঠাৎ মেঘের দিনে পথ হারিয়েছে
খাঁচার দুয়ার খোলা, আমার আকাশ
আমিও হারিয়ে যাবো অন্ধকার ঘাটে
সেই খানে আছে বাঁধা কালো কালো মেঘের গলুই,

ঝিলের গভীরে কাঁপে হিজিবিজি ওপারের ছায়া
আমি সেই ছবি আঁকি মেঘময় এপারের সখিহীন ঘাটে।

দোসর | কৃষ্ণ ধর

পাহাড় সমান কাঁধ তোলা রাত, অন্ধকার
ছোঁয় কি ছোঁয় না, এমনি আলতো পায়ে চলা
তুমি কী ভীষণ সুন্দর ওগো দোসর আমার
কেন এত কালো কাজল মেখেছো চোখে
পথ আগলাবে! কেমনে তাহলে হবো পার
পাহাড় সমান কাঁধ তোলা রাত, অন্ধকার॥

এই ছবিটুকু থাক, ঢাকবেনা ফুলের রং,
যদি মুছে যায়, যাকনা, থাক বরং
কাঁপানো পাতার ধ্বনিটুকু শুধু জীবনভর
তুমি কী ভীষণ চটুল ভাবছি ওগো দোসর।

আমি যাবো না তো, তোমার জন্যে ঘর বাঁধি
(সত্যি কি তাই, সত্যি, সত্যি, সত্যি,)
যেতে যেতে যদি ভুলে যাও, তুমি যেতে যেতে
ফুল কুড়োবেনা, ধুলোয় আঁচল পেতে।
তাহলে কখন ডাকবে আমায় ভুলি যদি
থাকবো একাকী তোমার জন্যে ঘর বাঁধি।

তুমি চলে যেও, যখন তোমার হ'বে মনে
যাবার সময় শুধু একবার ফিরায়ো মুখ
আমি দেখবো এখনও তোমার চোখের কোণে
বাঁকা বিদ্যুতে ঝলকায় কিনা সেই অসুখ।

ভিন্নপথে কেদার বদরী

গণেশ লালওয়ানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রায় দৌড়েই নেমে এলাম সেই দীর্ঘ তিন মাইল উৎরাই। এবং আধঘণ্টার মধ্যেই। কিন্তু ভুলকণায় এসে আমি এমন কি আর ক্লান্ত হয়েছি! চলে যাব সেই একেবারে মণ্ডলচটি।

প্রথমেই একটুখানি চড়াই। কিন্তু আকাশে কেমন সাদা সাদা মেঘ লেগে রয়েছে—তাই দেখতে দেখতে যাচ্ছি। কোনো কষ্ট নেই। মনে হচ্ছে আকাশের নীল আঁচলায় কে যেন জরির কাজ তুলেছে।

এবড়ো খেবড়ো পথ। পথের ওপর ঝুঁকে আছে গাছের ডাল। সেখানে বসে আছে কালো-মুখ এক হনুমান। কিন্তু ও কি সাজ? —সাজ নয়। আমারই ভুল। ঘাড়ে গলায় লম্বা লম্বা লোম। দেখলে মনে হয় যেন কন্ফার্টার জড়িয়েছে।

জঙ্গলচটি হতে উৎরাই। ছোট্ট চটি এই জঙ্গল-চটি। তাছাড়া যাত্রী চলাচলও এ পথে কম।

উৎরাই হলে কি হবে—কি গভীর এই বন। অরণ্য বললে কিছু বলা হয় না, মহারণ্য। ব্রহ্ম বলে, তারই অরণ্য ঠিক এমনি নিবিড়। হবে হয়ত। দেখছি জল গড়িয়ে আসছে চারদিক হতে। ভাওলা মাখা গাছ, ভাওলা মাখা পাথর। স্যাঁৎস্যাঁতে রাস্তা—আঁকা-বাঁকা। পায়ে পায়ে লতা জড়িয়ে যায়, গাছের পাতা মুর মুর করে। অরণ্য যেন কথা কয়, চারিদিক হতে চেপে আসে। মনে মনে ভাবি বাঘ-ভালুক থাকা এখানে কিছুই আশ্চর্য নয়।

পাঞ্জর-বাসা পেরিয়ে এলাম। কিন্তু দেখছি সেই মহারণ্যের যেন শেষ নেই। পত্র-পল্লবের ভেতর দিয়ে কোথা দিয়ে জল গড়িয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছিনা। শুধু দেখছি জল গড়িয়ে আসছে পথের ওপর। শুকনো ডাল পড়ে আছে এখানে ওখানে। ঝুরঝুরি হয়ে পড়েছে লতাপাতা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এ দৃশ্য কখনো ভুলবার নয়।

বেলা দুটোর কাছাকাছি একটা পাহাড়ের নীচ অবধি যেন নেমে এলাম। বাঁ দিকে বেশি খানিকটা ফাঁকা। একটা উটকো পরও দেখা যায়। তবে চটি নয়। মণ্ডলচটি তাই এলাম তিনটের কাছাকাছি একেবারে চলৎশক্তি-হীন হয়ে।

ধর্মশালায় এসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বৃষ্টি নামল। ভাগ্যিস পথে নামে নি। নামলে আজও ভিজতে হত।

মণ্ডলচটির কাছেই বালখিলা পেরিয়ে আজকের আমাদের পথ মনে হচ্ছিল বাঙলা দেশেই এমন সমতল মাটিতে পা ফেলব পেরেছিলাম!

মণ্ডল-চটি ছেড়ে আসবার খানিক পরেই দেখে ছিলাম অমৃতকুণ্ডের পথ। ওই পথ ধরেই নাকি যাওয়া যায় অনুসূয়া অত্রি ও দত্তাত্রেয়। এখান হতে রুদ্রনাথও আবার যাওয়া যায়। তবে গোপেশ্বর হতেও একটা পথ গেছে। পথ কি—নিজেরা হেঁটে তুলে চলে যাও।

পথের দুপাশে দেখছি আজ আমার ক্ষেত। মাঝে মাঝে বাংলো ধরনের ছোট ছোট বাড়ী। ফুল ফুটে রয়েছে কত। সমস্তে লাগানো সব ফুলগাছ। গোলাপ ফুটেছে কি বড় বড়। গাড়োয়ালীদের বাড়ী, ঘর নয় নিশ্চয়ই। সখ করে কেউ তৈরী করেছে

মণ্ডল-চটি হতে গোপেশ্বর সাড়ে পাঁচ মাইল। পথ প্রায় সমতল। গোপেশ্বরের আগে মাইল দেড়েক যা চড়াই। তাই আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাই গোপেশ্বর।

প্রাচীন মন্দির এই গোপেশ্বরের। অন্তত এর জীর্ণদশা দেখে তাই মনে হয়। প্রায় ভেঙে পড়বারই সামিল। মন্দিরের পাশেই এক কোণায় রয়েছে প্রকাণ্ড

এক ত্রিশূল। ত্রিশূলের মাঝখানে কুঠার। ওখানকার পূজারী বলেন, ত্রিশূলটি শিবের এবং কুঠারটি পরশুরামের। ত্রিশূলের গায়ে প্রাচীন অক্ষরে কী সব লেখা। এই লেখার পাঠোদ্ধার হয়েছে। খ্রীষ্ট শতাব্দীর এক নরপতি কোন এক মল্লের বিজয়বার্তা নাকি ওখানে লেখা রয়েছে।

মন্দির হতে ফিরে এসে কুন্তনাথ ও কল্পেশ্বরের গাড়ি দেখতে ওপরে উঠি। কেদারনাথ তুঙ্গনাথ ও মধ্য মহেশ্বর যেমন এক রাওয়লের অধীন, কুন্তনাথ ও কল্পেশ্বর তেমনি অন্য রাওয়লের। উখীমঠে তিনটি কেদারের রাওয়লকে দেখেছি, এখানে দেখি দুটী কেদারের রাওয়লকে। গোপেশ্বরের মন্দিরের মতোই তাঁরো জীর্ণদশা। তাছাড়া কেদারের রাওয়লের যেমন জৌলুস দেখলাম এঁর তার কিছুই নেই। বোধ-হয় আধিক অসচ্ছলতাই তার কারণ।

এক বৈতরণী কুণ্ড আছে এখানে। স্নান করে ফিরছে সবলোক সেখান থেকে। পাহাড়ের গায়ে একটু নীচের দিকে দেখেছিলাম তাকে গোপেশ্বর আসতে আসতে। কিন্তু স্নান করা হয় না। ইচ্ছা আছে চমোলিতে গিয়ে অলকনন্দায় একেবারে ডুব দেব। ঘণ্টা খানেকই ছিলাম আমরা তাই গোপেশ্বরে। তারপর চমোলির পথ ধরি।

বালি পাথরের পাহাড়। সূর্য কিরণে ঝলমল করে। চোখে কেমন ধাঁ ধাঁ লাগে। আশে পাশে বন-গোলাপের জঙ্গল, ডালিম আর আপরোট গাছ। আম গাছও আছে কিছু এখানে। কি দীর্ঘ এই পথ।

চমোলি আর দূরে নেই। বুঝতে পারছি ওপারের পাহাড়ের গায়ের বাসের পাকা সড়ক দেখে। মাঝে অলকনন্দা। জলে স্রোত আছে কিনা আছে বুঝতে পারা যায় না। পাহাড়ের গা নিয়ে নেমে নদীর এপার দিয়ে বাস সড়কের সমতলালে হেঁটে চলি।

নদীর ওপারে চমোলি। পুল পেরিয়ে তাই চমোলিতে এলাম। ব্রহ্ম বলে, কি হবে চমোলিতে থেকে। এসারোটাও বাজেনি। যদি টিকেট পাই তবে চলে যাই পিপলকোটি। তাই ছুটতে ছুটতে যাই বাস স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু বাস তখনি এলেও বাসের টিকেট আর পাই না।

বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই অবশ্য নূতন একটা রেস্ট হাউস হয়েছে তবে সেখানে রান্না করবার ব্যবস্থা নেই। না পাওয়া যায় খাবার কিছু। তাই পিছু হটে ধর্মশালাতেই আবার ফিরে যাই। ওখানে চাল ডালও পাওয়া যাবে, রান্নার জায়গাও। ভীড় অবশ্য খুব ধর্মশালায়। তবে একটা ছোট ঘরই পেলাম। একেবারে অলকনন্দার দিকেই।

মস্ত সহর এই চমোলি। কেদার বদরীর অংশন বলেই হয়ত। তারপর বাসরুট হয়ে পথের দূরত্বও গেছে অনেক কমে। ঋষিকেশ হতে একদিনের পথও নয় যদি গেটের ব্যাপার না থাকত। সত্যি বলতে কি ঋষিকেশের চাইতেও যেন বড় মনে হল এখনকার বাজার। বেলনা হতে আরম্ভ করে ক্যামেরার ফিল্ম পর্যন্ত সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে। সবই অবশ্য বাস-রুটের দৌলতে। সভ্যতা যেন থাবা মেলে এসে গ্রাস করে নিয়েছে চমোলিকে।

বিকেলের গাড়ীর টিকেট পেলাম। তাই চলেছি পিপলকোটি বাসে করেই। অলকনন্দার ধারে ধারে পথ। মাত্র এগারো মাইল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাই এসে গেলাম পিপলকোটি। এদিকের বাস টার্মিনাস। টিনের সেড আর বাস ও ট্রাকে কেমন যেন জট পাকানো। কেন জানি না আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগল না পিপলকোটি।

তবু ভালো যে পিপলকোটিতে থাকছিনে আমরা। আগে শুনেছিলাম বেলাকুচি পর্যন্ত বাস যায়। এখন দেখছি তা নয়। পাহাড়ের ঢাল নেমে পথ ভেঙে গেছে। বাস আর তাই যাচ্ছে না।

খানিকদূর গিয়েই পাই পুরনো দিনের পথ—গরুড়গঙ্গা হয়ে। বাস রুটের পথে বদরিকাশ্রমের দূরত্ব যখন চল্লিশ মাইল তখন গরুড়গঙ্গার পথ মাত্র আটত্রিশ মাইল। তবুও বাসরুটের পথেই যাই আমরা।

পিপলকোটি হতে বেলাকুচি মাত্র ছ'মাইল। তাই বেলাবেলিই পৌঁছে যাই সেখানে। তবে সন্ধ্যারও দেরী নেই। তাই থেকে যাই বেলকুচিতেই। এর আগে গেলে কুমার চটি বা হেলা। কুমার চটি পুরনো

পথের ওপর। সেখানে এই পথ দুটো মিলে গেছে।

কিন্তু বেলাকুচি আসতে আসতে আজ একটা অদ্ভুত রকমের পাহাড় দেখলাম—কিসের পাহাড় জানিনে। হয়ত চুণাপাথরের—পাহাড়ের গা দিয়ে ঘামের মতো কেবলি জল ঝরছে। কোথা হতে এত জল আসছে আর কোথায় যে যাচ্ছে কে জানে। আর পাহাড়ের রঙ এক এক জায়গায় মানুষের নাড়ীভুঁড়ির মতো—নীল, লাল, কপীশ। একখানে একটা গণেশ মূর্তি হয়ে আছে ওই পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক ভাবেই। এমন কি সিঁদুর লেপা পর্যন্ত। সামনে একটা থালা নিয়ে বসে গেলেই হয়।

আজ রাত্রে প্রথম নামকীর্তন শুনলাম। দোকানী হারমোনিয়াম বাজিয়ে নাম কীর্তন করছে ভগবান বদরীনাথের :

শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ।

অলকনন্দার পুল পেরিয়ে চলেছি যোশী মঠের দিকে। বাস রুট বলেই পথ যেখানে বাঁক নিয়ে ওপরে ওঠে সেখানে হাঁটা হয় একটু বেশীই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি—ফার্লঙ দুই এগিয়ে গিয়ে আবার ঠিক সেইখানেই প্রায় ফিরে আসি। অথচ সেখান দিয়ে যদি পাকদণ্ডী ধরে সোজা ওপরে উঠি তবে সে দূরত্ব কিছুই নয়। তাই অনেকখানেই পাকদণ্ডী দিয়ে উঠছি।

এমনি এক পাকদণ্ডী দিয়ে ওপরে উঠছি নেপালী দলের পেছন পেছন। পাশেই দেখি বৃদ্ধ বদরীর মন্দির। পুরোহিত ডেকে ডেকে সারা। কিন্তু কেউ কি তার কথা শোনে! সবাই সোজা পথ বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

জায়গাটির নাম ঘনোটী। পুরনো পথ দিয়ে যারা যেত তাদের এখানে আসতে হলে খানিকটা নেমে আসতে হত। এ পথে ও একেবারে পথের মধ্যেই।

ঝাড়কুলায় এসে প্রথম দেখলাম খোবানির গাছ। পাকাপাকা খোবানি সব থলো থলো গাছে ধরে রয়েছে।

ঝাড়কুলা হতে পুরনো পথ নিয়েছি যোশী মঠের। যোশীমঠ মাত্র আর তিন মাইল।

ঝাড়কুলা হতে সিংধার সামান্যই পথ। এখানে ঘন ঝরণা দেখছি আর খোবানির গাছ—আপেল গাছও দেখলাম আবার। পাশেই মিলিটারী ছাউনি। যোশী মঠ হয়েই যেতে হয় নিতিথাটি। তিব্বতের এই এক সীমানা। বড়াহোতি এই দিকেই, যা নিয়ে ভারত ও চীন গভর্নমেন্টের মধ্যে চলেছে কয়েক বছর হতে মন কষাকষি।

বেলা এগারটার কাছাকাছি এসে পৌঁছই যোশী মঠ। তারপর নৃসিংহ মন্দিরের কাছেই এক চটিতে উঠি। বাজারও সামনেই।

ওবেলা আজ আর এগিয়ে যাবনা, এখানেই থাকব আমরা। দেখতে যাব জ্যোতির্মঠ। এখানে এসে জ্যোতির্মঠ না গেলেই নয়।

স্নান করতে যাই নৃসিংহ মন্দিরের সামনে যে কুণ্ড রয়েছে সেই কুণ্ডে। দুটি জলের ধারা এসে পড়ছে দেখি এখানেও। একটি নভঃগঙ্গার অন্যটি তপ্ত ধারার। দুই ধারায় জলে স্নান করে মন্দিরে যাই।

এখানের শালগ্রাম শিলায় তৈরী নৃসিংহ মূর্তিটি একটু অদ্ভুত ধরণের। নৃসিংহ দেবের একটি হাত এতই পাতলা যে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ঐ হাতখানি খসে যেতে পারে। পূজারীর মুখেই শুনি, যেদিন ঐ হাতখানি খসে যাবে সেদিন বদরিকাশ্রমের পথও বন্ধ হয়ে যাবে। বিষ্ণু প্রয়াগের আগে যে নর নারায়ণ পাহাড় খুব কাছে এসে গেছে তারা এখন এক হয়ে যাবে। তখন বদরিকা যাত্রীদের যেতে হবে ভবিষ্য বদরী।

ভবিষ্য বদরী অবশ্য যাওয়া হয় না। তুমি এখান হতে যে পথ গেছে নিতিথাটি হয়ে কৈলাস মানস, সেই পথে। এখান হতে ছয় মাইল তপোবন। তপোবন হতে তিন মাইল ভবিষ্য বদরী। মন্দিরের পাশেই গাছের নীচে যে শীলা পড়ে রয়েছে ধ্যান-নেত্রে দেখলে সেই শীলায় ভগবানের অর্ধেক আকৃতির দর্শন পাওয়া যায়। যেদিন বদরীকাশ্রমের পথ বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন এই মূর্তিটি পূর্ণাবয়ব লাভ করবে।

কেদারের যেমন ঊখীমঠ। বদরীনাথের তেমনি যোশীমঠ। শীতের ছ' মাস এই মন্দিরেই তাঁর চল মূর্তির পূজো হয়।

খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে যাই আমরা জ্যোতির্মঠে। জ্যোতির্মঠের কথা আর বলতে হবে না। জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠের অন্যতম

আনন্দাশ্রমীদের ত মহাতীর্থ। জ্যোতির্মঠের নামেই এই জায়গাটির নাম। জ্যোতিই লোকের মুখে মুখে হয়েছে যোশী।

সড়ক ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাই জ্যোতির্মঠের দিকে। আপেল আর খোবানির গাছ এখানে কত। নূতন নূতন বাড়ী উঠছে দেখছি আবার চারদিকে।

জ্যোতির্মঠের কাছেই ছোট্ট একটা মন্দির। মন্দিরটি জ্যোতিশ্বর শিবের। স্বয়ম্ভু শিব। মন্দিরটি প্রাচীন। ঠিক তেমনি প্রাচীন মন্দিরের সামনের বিরাট ডুঁত গাছটি। এই গাছের বেরই হবে প্রায় একশো ফুটের ওপর। শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে যে ভাবে জায়গাটিকে সুশীতল করে রেখেছে তাতে তপোবনের আবহাওয়া। এই মন্দিরের ঠিক নীচে ছোট্ট একটি গুহা দেখলাম। এই গুহায় বসে নাকি শঙ্করাচার্য আরাধনা করেছিলেন জ্যোতিশ্বর শিবের।

মন্দির দেখে মঠে যাই। দোতলায় যে ঘরে আচার্যের পাদুকা, সেই ঘরে বসেছিলেন একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী। আমি ভাবলাম বুঝি ইনিই বর্তমান শঙ্করাচার্য। কিন্তু তা নয়। শঙ্করাচার্য আর একজন। তিনি বসেছিলেন অন্য ঘরে বাটিয়ার ওপর। মাথায় চাঁদোয়া। লোকজনের ভীড় দেখলাম সেখানে। কিন্তু এই শঙ্করাচার্যকে এখনো সকলে স্বীকার করে নেননি। এই পদের আর একজন দাবীদার দেখা দিয়েছেন। তিনি মামলা রুজু করেছেন লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টে।

বেশীক্ষণ সেখানে থাকিনি। কারণ মামলা নিয়েই কথা হচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, এলাম এ কোন জ্যোতির্মঠে!

এই শঙ্করাচার্যকে দেখলাম আবার বদরিকাশ্রম হতে ফেরার সময় পথে। দলবল নিয়ে চলেছিলেন তিনি। বোধ হয় বহিকাশ্রমেই। সঙ্গে গেরুয়া হলেও সৌখীন মালপত্র। এঁর ধনু নিয়ে চলেছেন একজন আগে আগে আর একজন টুকিটাকি ভরা প্যান এমেরিকান ব্যাগ নিয়ে পেছন পেছন। দেখলাম লটবহর এঁর কিছু কম নেই। শুনলাম ইনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্স-এর এম্-এ।

পরদিন সকালেই বেরিয়ে গেলাম বিষ্ণু প্রয়াগের দিকে। আমরা গেলাম পাকদণ্ডী পথে—তাই খাড়া উৎরাই। পথ দিয়ে এলে বোধ হয় এতটা খারাপ হত না।

যোশী মঠ হতে বিষ্ণু প্রয়াগ দুই মাইল যেখানে নীচে নেমে এলাম সেখানে বিষ্ণু গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম। জলের তোড় আর গর্জনে সব যেন যায় যায়।

পুল পেরিয়ে ওপরে গেলাম। দেবি মন্দিরের পাশ দিয়ে সঙ্গমে যাবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামি। সিঁড়ির গায়ে রেলিং রয়েছে তার জলে লোহার শিকল। সাহসী যাত্রীরা ওই শেঁকল ধরে জলে নামে। কিন্তু তাও যার তার কাজ নয়, জলের এমনি প্রলয় নৃত্য। আর সমুদ্রের ঢেউ যেন এসে ভেঙে পড়ছে সিঁড়িতে। তাই দূর হতেই সেই জল হাতে করে মাথায় ছোঁয়াই। শুনি এইখানে বসেই নারদ মুনি আরাধনা করেছিলেন ভগবান বিষ্ণুর। আরাধনা করবার মতোই জায়গা বটে। মনটা আপনা হতেই নিঃসীমে হারিয়ে যায়।

বিষ্ণু গঙ্গাকে পেছনে ফেলে, অলকনন্দার দক্ষিণ দিক দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। দুপাশে উঁচু পাহাড়। বেলা হয়েছে তবু তেমন রোদ নেই। শীত জর্জর হাওয়া। পথটাও খুব ভালো নয়। আবহাওয়া কেমন যেন হিমেল।

বলদৌড়া পিছনে ফেলে এলাম। তারপর ঘাটচটি হয়ে আসি গোবিন্দ ঘাটি। দেখি সামনেই গুরুদ্বারা আর তার পাশ দিয়ে ঝোলা পুল। ওই পথই গেছে লোকপাল, নন্দন বন, হেমকুণ্ড হয়ে কাকভুশণ্ডী পর্বত। এই নন্দন বনই Valley of Flowers বলে প্রসিদ্ধ। হেমকুণ্ডে গুরুদ্বারা আছে। নীচে ঘাঁঘরিয়া শিখদের ধর্মস্থান। গুরুগোবিন্দ তাঁর 'বিচিত্র নাটকে' লিখেছেন যে পূর্বজন্মে তিনি এখানে মহাকাল ও কালিকার আরাধনা করেছিলেন। শিখদের কাছে তাই এই স্থানটি খুবই পবিত্র।

গোবিন্দঘাটি হতে পাণ্ডুকেশ্বর এক মাইল, বলদৌড়া হতে ছয়। এখানে যোগবদরীর মন্দির। একে যোগধ্যানীও বলা হয়। শুনি এইখানেই মহারাজ পাণ্ডু তপস্যা করেছিলেন কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে। পাণ্ডবদের

ানি বদরীর মন্দিরের স্থাপনাও
বার করেছিলেন মহারাজ
ণ্ডুই।

কেদারের আগে যেমন এক
াইল খাদির করা পথ—এখানে
মস্ত পথটাই তাই। আর দেখছি
খানে বেশ কিছু লোক-বসতি।
নেক ঘর বাড়ী রয়েছে। এর
মস্তটাই যাত্রীপাল নয়।

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে এক মাইল
ে শেষ ধারা—শেষ নাগের
োক্তানি। মন্দিরও রয়েছে তার।
তন মন্দির। আগের মন্দিরটাকে অলকনন্দা গ্রাস করেছে।
ই মন্দিরের কাছেই দেখলাম আর একটা মন্দির উঠছে।
ওয়ার মহারাজাই ওটা তৈরী করিয়ে দিচ্ছেন। এখানে
। মূর্তিটি স্থাপিত হবে সেই মূর্তিটি বদরিকাশ্রমে
ওয়া গেছে।

এবেলা লামবাগড়ই যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষ
র্যন্ত যাওয়া হল না। হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামায়
ঠতে হল বিনায়ক চটিতেই। যতক্ষণ বৃষ্টির জন্য আটকে
ক্ষণ ততক্ষণ রান্নাবান্না করে খেয়ে নিলাম। তারপর বৃষ্টি
তেই আবার পথে নেমে এলাম। আজই যেতে হবে
রিকাশ্রম

লামবাগড় চটি পার হয়ে এলাম। একে ফুটিয়া
ম বললেই হয় লামবাগড়ের পর পথটা যেন
পরে ওঠে। নদীও অন্তর্ধানে নদীকে দেখেছি
দের মধ্যে প্রবাহিত হতে কিন্তু এখানে তা নয়,
মছে একেবারে পাহাড়ের গা দিয়ে আর গর্জন
রতে করতে

নদীর এই এক রূপ। পথ চলতে চলতে এই রূপ
আগে আর দেখিনি। তাই যেতে যেতে থমকে
ি। জলের সেই অবিশ্রান্ত প্রবাহ—দুর্বার গতি।
ন যেন বিহ্বল করা।

ছায়াচ্ছন্ন পথ। চড়াই আর উৎরাই। আকাশও
খলা। তাই হাঁটবার একটুও কষ্ট নেই।

হনুমান চটিতে হনুমান মূর্তি দর্শন করি
নাকি কিছুকাল এখানে বাস করেছিলেন।

বদরিকাশ্রমের দিকের এই শেষ চটি। তারা বলত
এখানেই থাকতে বলেছিল। বলেছিল কাল সকালে
প্রবেশ করবে দেবনগরী বদরিকাশ্রম। কিন্তু
আমরা থাকি না। বলি সন্ধ্যার ত এখনো অনেক
দেরী। সন্ধ্যারতি আজই না হয় দেখলাম গিয়ে
দেবনগরীতে।

হনুমান চটি থেকে পথ ঘুরে গেল পাহাড়ের এক
বাঁক দিয়ে শুনলাম শেষের পথ বদরিকাশ্রমের পথ বিশেষ
ভালো নয়।

ভালো নয় সে দেখতেই পেলাম একটু পরে। বালুময়
পথ। মাঝে মাঝেই সংকেত বিপদের। যে কোনো
মুহূর্তেই পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে আসতে পারে।

ঘোরদিল পুল পেরিয়ে এলাম। পেরিয়ে এলাম
বড়ংগ। কাকন গঙ্গার পাশ দিয়ে হাঁটছি। ঐ দিকেই
দেখতে পাচ্ছি আবার তুষার ঢাকা পাহাড়। ঐ পাহাড়ের
অপর পারেই কেদারনাথ। কিন্তু খানিকটা গিয়েই
ফিরে দাঁড়াই। সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে চলেছে যেন
একটা তড়িৎ প্রবাহ, আনন্দের শিহরণ। জানিনে কেন?
শুধু দেখলাম একজন সন্ন্যাসীকে বসে রয়েছেন পাহাড়ের
এক খাঁজের মাঝে। চারিদিক গাছপালায় নিবীড়,
আর কিছু না।

তারপর আরো অনেকখানি এগিয়ে গেলাম। শেষ চড়াই উঠে এলাম বোধ হয় বদরিকাশ্রমে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় টেলিগ্রাফের তার দেখছি। পাহাড়ের গায়ে বরফ অলকনন্দা অনেক নীচে নেমে গেছে। গাছপালা আর নেই এখানে। তাই কেমন ছাড়া ছাড়া দেখায় ঘর বাড়িগুলো। মাঝে মাঝে দু'একটি ছোট ছোট কাঁটা গাছ দেখা যায় আর লাল লাল ফুলের ঝাড়। কালো পাহাড়ের গায়ে ভারী সুন্দর দেখায়। আমার পাশ দিয়েই প্রায় চলে গেলেন এক ভৈরবী হাতে ত্রিশূল বিরে পা দুটোয় ঘপ্ ঘপ্ করে একটা শব্দ তুলে।

বদরিকাশ্রম আর দূর দেওদেবদারু পেরিয়ে এসেছি। সামনেই দেখা যাচ্ছে বদরিকাশ্রমের ছোট্ট শহর আর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া।

ঘর বসতী বিশাল সালকী।

বিরাট বসতি এই বদরিকাশ্রমের। এখান হতেই দেখতে পাচ্ছি সব। দেখছি বড় বড় বাড়ী হতে ছোট ছোট কুটীর। দোকান-পাট, পুল আর সড়ক। বাজারের ভেতর দিয়ে পথ, ওরই একপাশে বদরীনাথের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া।

অলকনন্দার পুল পেরিয়ে প্রবেশ করি দেবনগরীতে।

পাণ্ডার আবাসেই উঠি আমরা। তারপর চা ও মিষ্টি খেয়ে মন্দিরে যাই। সন্ধ্যার সময় পূজার বেশে দেখা যাবে ভগবান বদরীনাথকে।

মন্দিরের বাইরের দরজাটি যত বড়, ভেতরের নাট-মন্দির কি গর্ভগৃহ সে তুলনায় অনেক ছোট। অল্প লোক জমলেই ভীড় জমে যায়। পাণ্ডা বীরেন ভট্ট তাই আগে ভাগেই ঢুকিয়ে রাখলেন আমাদের নাট মন্দিরে। বললেন, এক পাও নড়বেন না এখান হতে। তাহলে আরতিই আর দেখতে পাবেন না। যা ভীড় হয় এখানে—

ভীড় বলতে ভীড়! সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ভেতরে আরতি সুরু করেছেন রাওয়ল, আর গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণেরা পথ রেখেছেন আগলে। নাট মন্দির ভরে গেছে—সিঁড়ির মুখে লোক। এমন কি বাইরের দরজা পর্যন্ত। সবাই এসেছে ভগবানের আরতি দেখতে। কেনই বা আসবে না। কিন্তু যারা দরজা আগলে আছে তাদেরি বা দোষ কি? পথ ছেড়ে দেওয়া মানেই যারা আগে এসে নাট মন্দিরে ঢুকে আছে, তাদের পায়ের তলায় পিষে মারা। তাই আরতি আরম্ভ হতেই সুরু হয় ওঁদের ধমক-ধামক। একদিক দিয়ে বের করে দিচ্ছেন যাঁরা গর্ভগৃহে আগে হতে এসে ঢুকে আছেন—অন্যদিক দিয়ে ঢুকাচ্ছেন আবার তাঁদের যারা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকটা কলকাতার বারোয়ারী পূজোর ব্যাপার। ধীর সুস্থে দু'দণ্ড যে ভগবান বদরীনাথকে দেখব কি তাঁর আরতি দেখব তার উপায় নেই।

তবু আমরা তাঁকে অনেকক্ষণ ধরেই দেখেছিলাম। আরতিও। অনেক দেখেছি কিন্তু এমন অপরূপ আর দেখিনি। মূর্তি মানে কি—সে মূর্তি দেখব কাল নির্ণয় সনয়ে। এখন শুধু দেখছি বহুমূল্য বস্ত্রালংকারে ঢাকা একটুখানি কালো পাথর, রত্ন মুকুটের নীচে—তারও আবার যতটুকু দেখা যায়। কিন্তু কি যে ভালো লাগে। মনে হয় যেন দীর্ঘ পথের শান্তি হয়ে গেল এইখানে এসে।

গর্ভগৃহ হতে বাইরে আসি। তারপর চার দিক দেখতে দেখতে এসে দাঁড়াই যেখানে ভগবান বদরীনাথের নিত্য কীর্তন হয়।

বীণ দেখে বসে পড়ি। একজন স্বামীজী কীর্তন গাইলেন। সেই নামকীর্তন যে কীর্তন শুনে এসেছিলাম বেলকুচিতে—

শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ

শুনি, স্বামীজী নিয়মিতভাবে এখানে নাম কীর্তন করেন প্রতিদিন।

বদরীনাথ! বদরীনাথ! কিন্তু কেন ওই নাম? এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম পাণ্ডাকে। শুনে তিনি বলেন, ভগবান নারায়ণ যখন এখানে তপস্যা করেন তখন লক্ষ্মী বদরী বৃক্ষ হয়ে তাঁকে ছায়া দিয়েছিলেন। তাই তিনি বদরীনাথ।

বলি, নারায়ণও আবার তপস্যা করেছিলেন?

হাঁ, পুরাণে ত তাই বলে। সহস্র কবচ দৈত্য যখন শিবের কাছে বর পেল—এক সঙ্গে যাঁর হাজার বছরের

করতে পারবেন তখন নারায়ণের
স্তা করা ছাড়া উপায় কি?
বের ত বর দিয়েই ছুটি।
রপর তার জন্য যত ঝক্তি
হানো সে ত বিষ্ণু বা নারায়ণের।

তারপর একটু থেমে বলেন,
ত বড় জাগ্রত বিগ্রহ এই
রীনারায়ণের! তবে বলি
ন:

এক বৃদ্ধ এসেছেন বদরীনাথ
নে। জরাজীর্ণ দেহ। আসতে
সতে তাই বিলম্ব হয়ে গেছে।

সোপের

বিলম্ব আবার এতখানি যে তিনি যখন এখানে এসে
ছিলেন তখন রাওয়ল মন্দিরের দরজা বন্ধ করেছেন।
ধর সেদিন শীতের ছ'মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
ার তিনিও নীচে নেমে যাবেন।

বৃদ্ধ অনেক কাকুতি মিনতি করেন। বলেন, একবার
ই তিনি মন্দিরের দরজা খুলে দেন। তা নইলে তাঁর
ার দর্শনই হবে না এই জীবনে—কত দিনই বা আর
নি বাঁচবেন। কিন্তু রাওয়ল দরজা খুলতে পারেন না
বার বন্ধ করে। তাই তাঁকে প্রায় ঠেলে দিয়েই
নি নীচে নেমে যান।

কেমন একটা বিভ্রান্তি এসে যায় বৃদ্ধের জীবনে।
দেহে তাঁর দর্শন হল না সে দেহ তিনি আর রাখবেন
বলে নেমে গেলেন অলকনন্দার দিকে। অলকনন্দার
লই দেহ বিসর্জন করবেন। তারপর সেই জলে ঝাঁপ
তে যাবেন অমনি এক ষোড়সোয়ার এসে তাঁর হাত
র নিল। বললে, আপনি কি পাগল হয়েছেন?
বললে মন্দির ছ'মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাল
কালেই আবার খুলবে। আসুন সামনের গুহায় বসে
জকের রাতটা আমরা কাটিয়ে দেই দাবা খেলে।

দাবা খেলেই সেই রাত কাটালেন তাঁরা। তারপর
ার হতেই ষোড়সোয়ার তাঁকে নিয়ে এলো মন্দিরে।
দেখেন, রাওয়ল মন্দিরের দরজা খুলছেন।

তবে, তবে না আপনি বললেন, মন্দির ছ'মাসের জন্য
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কই? আজ সকালেই ত এলেন আবার!
এই যুবকটি নিষেধ না করলে আত্মহত্যা করে কি
মহাপাতকই না করতাম।

হকচকিয়ে ফিরে তাকান রাওয়ল। দেখেন সেই
বৃদ্ধ যাকে তিনি দেখেছিলেন, ছ'মাস আগে যখন মন্দির
বন্ধ করে নীচে নেমে যাচ্ছিলেন। আজ ছমাস পরে
আবার দেখছেন তাঁকে মন্দিরের দরজা খুলতে এসে।

মনের ভেতর তোলপাড় চলেছে তখন রাওয়লেরও।
কোথায় কি ভাবে, কেমন করে কাটালেন এই বৃদ্ধ শীতের
সেই দীর্ঘ ছয়টি মাস! তাই তিনি নীচে নেমে এসে
জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধকে—এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি?
কি করে কাটালেন—আর সে যুবকই বা কোথায়? আমি
ত এসেছি ঠিক সেই ছমাস পরেই মন্দিরের দরজা খুলতে।

না না, মিথ্যে বলবেন না। একটি মাত্র ত রাত
কাটালাম আমরা ঐ গুহায়। এই তো সেই যুবক—
ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

কিন্তু কোথায় সেই যুবক। ধারে কাছে তাঁর কেউই
নেই। বুঝতে তখন তাঁর কিছুই বাকী রইল না—
কে সেই যুবক। তিনি হায় হায় করে ওঠেন। তোমাকে
পেয়েও আবার হারালুম।

বীরেন ভট্ট বলেন, এইত সেদিনের কথা। নারায়ণ
স্বামী ভোগ খাওয়ালেন বদরীনাথকে। থালায় করে
রেখে দিয়ে এলেন খাবার সকলের সামনে। তারপর

দরজা খুলে দেখা গেল ঘিয়েগায় মাখামাখি পাবলে দেওয়া, যেন কেউ তুলে নিয়ে খেয়েছে।

তর্ক বিচার করে এসবের অর্থ পাওয়া যাবে না। আর সব কিছুরি যে অর্থ পেতে হবে তারি বা কি মানে আছে! এমন তো অনেক কিছুই ঘটে যা আমাদের জানাশোনার বাইরে।

মন্দিরের কিছুটা নীচে তপ্ত কুণ্ড। সেই কুণ্ডে নেমে স্নান করে যাত্রিরা। পরদিন সকালে আমরাও স্নান করি সেই কুণ্ডে নেমে। তারপাশে আরো দুটি কুণ্ড ছোট ছোট। সেই কুণ্ড দুটিতেও আবার নামতে হয়। শেষ কুণ্ড নারদ কুণ্ড প্রায় অলকনন্দার কাছাকাছি। নারদ কুণ্ডের জল ঠাণ্ডা। তাই সেই জল শুধু স্পর্শ করতে হয়। তারপর শঙ্করাচার্যের ও আদি কেদারের মন্দির দর্শন করে ওপরে উঠে আসি।

সকাল সকালই এসেছি। তাই এখনো ভীড় জমেনি। বদরীনাথকে এখন স্নান করানো হবে। তাই এখন নির্বাণ মূর্তি। দেখছি, অনেকটা শ্যামী বুদ্ধের মতো।

এই মূর্তি দেখাও এক রহস্যের ব্যাপার। শুনলাম, কেউ কখনো এঁকে এ রকম দেখেন না। কেউ বলেন কালী দেখলাম, কেউ নারায়ণ। কেউ বলেন, অনেকটা আমার মায়ের মতো, কেউ বা গোপীরমণ দেখেন এঁর মধ্যে। বোধ হয় প্রত্যেকেরই এঁর মধ্যে নিজের নিজের ইষ্টদেবতার দর্শন হয়।

এই মূর্তিটির ইতিহাসও আবার বিচিত্র। এই মূর্তিটিকে প্রথম নাকি উদ্ধার করেন দেবতারা নারদকুণ্ড হতে, তারপর স্থাপিত করেন এখানে। তখন নারদ এঁর পূজারী হন। তারপর শঙ্করাচার্য এঁকে উদ্ধার করেন অলকানন্দা হতে। তৃতীয়বার তপ্ত কুণ্ড হতে রামানুজ সম্প্রদায়ের কোনো একজন আচার্য। এ যদি সত্যি হয় তবে বলতেই হয় যে যুগে যুগে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্যে দিয়ে এর যে ইতিহাস সেও কম রহস্যময় নয়।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম, কেন এঁকে আমি দেখলাম বুদ্ধরূপে। তবে কি এটি বুদ্ধ মূর্তি। বৌদ্ধরাই ত প্রথম ধর্ম প্রচারে বেরিয়েছিল ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর দিকে দিকে। আবার এই পথ দিয়েই ত যেতে হয়েছিল তাঁদের তিব্বতে, চীনে। হয় ত তখন এটা বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল। তারপর বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির যুগে কেউ হয়ত ফেলে দিয়েছিলেন মূর্তিটিকে অলকনন্দায় শঙ্করাচার্য সেই মূর্তিটিকেই উদ্ধার করে নারায়ণ মূর্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করেন এখানে। মূর্তিটিকে আরো মহিমা দেবার জন্য দেবতাদের কাহিনীটি হয়ত জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকবে এর সঙ্গে। একথা আরো বেশী এই কারণে মনে হয় যে আমরা যে সব বিষ্ণু বা নারায়ণের মূর্তি দেখে থাকি তার সঙ্গে এর যেমন সাদৃশ্য নেই যেমনটা আছে ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে। তবে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বোধ হয় কেউই বলতে পারবেন না।

বদরীনারায়ণের ঐশ্বর্য অনেক। কাল দেখেছি তার কিছুটা। দামী দামী পাথর বসানো মুকুট, হার, বলয়। মুকুটের মাঝে যে দামী হীরা রয়েছে, তারই দাম শুনি ছাপ্পান্ন লাখ টাকা। নানাখান হতেই ত আসে এঁর উপঢৌকন, ভক্তদের প্রদত্ত।

রাত্রে ভালো দেখিনি কিন্তু এখন দেখছি এখানের চৌকাঠ, কপাট সমস্তই রূপোর পাতে মোড়া। পূজোর থালা, ঘটি, বাটি, চৌকি সব। কেনই বা হবে না। কিন্তু কেদারনাথে যেমন কেদারেশ্বরকে আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি এখানে তার উপায় নেই। বদরীনাথের ঐশ্বর্যই বাধা। রেলিং এর এপার হতেই তাই আমাদের দেখতে হয়। রেলিং এর ওপারে গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণদেরও যাবার উপায় নেই—বদরীনাথ একমাত্র রাওয়লদেরই অধিকারে।

ভোগ দিলাম বদরীনাথের। ভোগ মানে থালায় করে এলাচদানা, মিছরি, ভাঙা ছোলার ডাল, শুকনো নারকেল কুচি যা নিয়ে এসেছিলাম দোকান হতে। সেইগুলো সব ঢেলে দিলেন রাওয়ল মূর্তির সামনে যে থালা রয়েছে সেই থালায়। তারপর সেখান হতে তাই তুলে নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন আবার আমাদের।

এখান হতে যাই ব্রহ্ম কপালীতে। ব্রহ্ম কপালীতে পিণ্ডদান আর তর্পণ পিতৃ পুরুষদের। এখানে পিণ্ডদান তর্পণ করলে আর কোথাও পিণ্ডদান ও তর্পণ করতে হয় না।

পুরাণে বলে কটুভাষী হবার জন্য শিব যখন ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকটি কেটে ফেলেন তখন সেই মুণ্ডটি তাঁর হাতের

ও আর আলগা হয় না। শেষে যখন এখানে এলেন তখন
।। আলগা হয়ে জলে পড়ে যায়। ব্রহ্মকপালী যাত্রীরও
দখতে অনেকটা কপালের মতো। এর নীচে ব্রহ্মকুণ্ড।
ম্মা এখানে তপস্যাও করেছিলেন বহুদিন।

কিন্তু পিণ্ডদান ও তর্পণের যে ব্যবস্থা দেখলাম—সে
।রোয়ারী। মানে একসঙ্গে বিশ বাইশ জনকে বসিয়ে
পিণ্ডদান ও তর্পণ করাচ্ছেন ব্রহ্মাণরা। না করিয়ে উপায়ই
।। কি! এক একজনকে পৃথক ভাবে করাতে হলে দিনে
।তে নিশ্বাস ফেলবারও আর অবসর পাওয়া যাবে না।

ধুনিগঙ্গা ও কেদারগঙ্গার সংগমে এই বদরিকাশ্রম—
কদারনাথে যেমন সামনে আর পথ নেই, এখানে তা নয়।
অলকনন্দার ধারে ধারে পথ গেছে এগিয়ে। দেখি সে
পথ আমাদের হাতছানি দেয়।

এই পথ ধরেই যেতে হয় সৎপথ ও স্বর্গারোহণ।
বাঁ দিক দিয়ে পথ। যাতায়াতে আটদিন। সঙ্গে তাঁবু
নিতে হয় আর খাবার। তারপর অলকনন্দার ডান দিক
দিয়ে বসুধারা হয়ে ফিরে আসতে হয় মানায়। বসুধারা
একটি জলের ঝরণা যার জল ঘাটীতে পড়তে পায় না।
পড়বার আগেই বাতাসে তা উড়িয়ে নেয়।

সৎপথ কি স্বর্গারোহণে যাচ্ছিনে এবার আমরা। কারণ
তারজন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি, তবু পা পা করে মানা
পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। নদী পেরুবার আগেই বাঁ দিকে দেখি
মাতামূর্তি। নরনারায়ণের মা ধর্মপত্নী মূর্তি দেবী।
শুনি মাতা মূর্তির বছরে মাত্র এক দিনই পুজো হয় যেদিন
ভগবান নরনারায়ণ আসেন মাকে দর্শন করতে। ভাদ্রশুক্লা
দ্বাদশীতে সেদিন এখানে মেলা বসে।

মাতামূর্তির মন্দিরটী ছোট আর জনশূন্য। সেই মন্দির
দেখে অলকনন্দার পুল পেরিয়ে যাই মানায়। কাল যে
বরযাত্রীদের পেছন পেছন ওপরে উঠে এসেছিলাম আজ
দেখলাম তাদের ভোজসভা। বড় বড় সামিয়ানা টাঙানো
হয়েছে আর লোক জনের ভীড়। মানা দেখছি এক
বিরাট বসতি।

মানায় এসেছি ব্যাসগুহা দেখতে যে গুহায় ব্যাসদেব
তাঁর অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত লিখেছিলেন।

প্রবেশপথ ছোট হলেও ভেতরে বেশ প্রশস্ত। একজ
সন্ন্যাসীকেও আবার দেখলাম। তাই খানিক ব
তাঁর সঙ্গে আলাপ করি।

কথায় কথায় কথা ওঠে কৈলাস মানসের। যে
সামনে ওই যে পথ দেখছ ওই ত পথ তিব্বতের। এখ
দিয়েও যাওয়া যায় কৈলাস মানস। আমিও গে
কয়েকবার। আসবার সময় যে বাঁধা সড়ক দেখে এল
ওপরে ওইটীই বোধ হয়।

তবে বলেন, সবাই বলে মানস, মানস—কিন্তু মানস ক
ক'জন যায়। সবাই যায় মান সরোবর। মানসে যায় য
যোগী আর দেবতারা। আমিও গেছি ওই মান সরোবর

তাই বটে। মানস ত কোনো জায়গা নয়। সে
নিজের মনে।

এই পাহাড়ের ওপরেই আবার মুচুকুন্দ গুহা। সে
এক গল্প। কাল-যবন শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করলে
শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ না করে পালিয়ে এলেন এই মুচুকুন্দ গুহা
কাল-যবন শ্রীকৃষ্ণের পেছনে পেছনে এসে উপস্থিত হ
এখানে। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে দেখ
পেলেন শায়িত মুচুকুন্দকে। তিনি ভাবলেন ই
শ্রীকৃষ্ণ। তাই পদাঘাতে তাঁকে জাগরিত করলে
মুচকুন্দ জাগরিত হয়ে সেই কাল-যবনের দিকে যি

াদের ঘরে এখানে নিত্য যাচ্ছিলেন। দেবতারা
। দিয়েছিলেন, যে তাঁর খুব তাড়াবে সে তাঁর চোখের
তে ভস্ম হয়ে যাবে।

মুচুকুন্দ গুহা আর যাইনি। ব্যাসগুহা ঘুরেই ফিরছি।
ট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে ঘিরে ধরেছে পাই পয়সার
। একজন বৃদ্ধ পাটিয়ায় বসেছিল। বললে, কালো
ড়া দেখেছ, কালো ঘোড়া?

কোথায় আবার কালো ঘোড়া। শেষে তার নির্দেশ
া ঘাড় উঁচু করে ওপরের দিকে তাকাই। একেবারে
াড়ের মাথার কাছে দেখি কালো পাথরে আঁকা তারো
তেও এক কালো ঘোড়া। মনে মনে ভাবি ওখানে ঐ
ড়া কে কি করে আঁকলে। কারণ পাথরের ঐখানটায়
কে দাঁড়াবার ত কোনো জায়গাই নেই। আর
উঁচু।

কে এঁকেছিল তা বলতে পারবনা। তবে কি করে
ছিল সেকথা বলতে পারি। আমাদের দেশে
মিস্ত্রীরা যে মাচা বাঁধে সে নীচে হতে কিন্তু ওদেশে,
তেও, মাচা বাঁধা হয় ওপর হতে ঝুলিয়ে। যেখানে
াড়ের গা দিয়ে ঘরবাড়ী সেখানে তা না হয়ে উপায়
। ওই ঝুলন্ত মাচায় বসে ওরা ঘরবাড়ী মেরামত
রত করে। এই ছবিটিও আঁকা হয়েছে ওই ভাবেই।

এখানে এসে কষ্ট হয়ে গেল। কষ্ট হওয়াই বটে। কোণারকে যেমন সূর্য রথের গতি চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে আছে।

চমরী গাই-এর কথা এতদিন কেবল শুনেই এসেছিলাম মানায় এসে প্রথম দেখলাম চমরী গাই, বিরাট লোমশ পুচ্ছ তার।

খাওয়া দাওয়া সেরে খানিক বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়ি আবার সেইদিনই। ধীরেন ভট্ট সুফল দিলেন। সুফল না নিলে নাকি যাত্রা পূর্ণ হয়না। বলেন, এইযে চুরাশি লক্ষ পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে এলাম পাহাড় পর্বত না হোক পাথরত নিশ্চয়ই। কিন্তু এসবওকি আবার পাথর। রবিদার মতো বিশ্বাস থাকলে বলতাম শিব। একজন সন্ন্যাসীকেও ত আবার দেখলাম হাঁটছে আর বারবার মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। বোধ হয় সবই শিব, সবই স্বয়ম্ভূ বলে।

আজ সকালেই ধীরেন ভট্ট চিনিয়ে দিচ্ছিলেন কোনটি নর পর্বত কোনটা নারায়ণ পর্বত বাজারের ধারখানে দাঁড়িয়ে। হাঁটতে হাঁটতে সেই সব আবার দেখে নেই। তারপর পুল পেরিয়ে এসে ফিরে চাই দেবনগরীর দিকে। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত এখন যদরিকাশ্রম। অথচ যখন মানা হতে ফিরছিলাম তখন ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছিল। একটুখানি ভিজেই এসেছিলাম।

সূর্যের আলোয় শুভ্রতর দেখায় নীলকণ্ঠকে। সে শুভ্রতা এমন তীব্র যে সে দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকা যায়না।

দ্রুত পায়ে পথ চলি। পেরিয়ে আসি দেবদেবনী। কাকনগঙ্গা রঙ্গংগ ঘোরসীল। তারপর হনুমান চটি পেরিয়ে আসি। পেরিয়ে আসি লামবাগড়।

বিনায়ক চটির কাছাকাছি এসে পড়েছি। হঠাৎ চেয়ে দেখি বরফঢাকা অজ্ঞাত এক পাহাড়ের চূড়োয় শেষ আলোর রঙ লেগেছে। সেই আলো আগুন হয়ে জ্বলছে সেই পাহাড়ের গায়ে।

মুগ্ধের মতো চেয়ে থাকি। চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করেনা।

তাই থামতে হল। তারপর চটির খোলা বারান্দায় শুয়ে পড়ে আঁধারে ঢাকা অধিত্যকার দিকে আঁধার নয়, মনে হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদের আলো সেখানে অপরূপ মায়া ছড়ায়—ভারী অদ্ভুত লাগে মনে হয়েছে স্বপ্নভরা এক রহস্যপুরী। কতক্ষণ চোখের পাতা না জড়িয়ে আসে কতক্ষণ সেই দিকে চেয়ে বসে থাকি।

ভোর হতেই আবার বেরিয়ে পড়ি বিনায়ক চটি হতে। তারপর ভেড়া ছাগলদের দল ঠেলে এগিয়ে আসতে আসতে আলাপ হয় এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে—পথ চলতি আলাপ। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন অনেক যুরলেন এদিকে গিয়ে হেঁটে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে যাচ্ছেন?

কি অভিজ্ঞতা?—শুনে চমকে উঠি। অভিজ্ঞতার কথা ত আসিনি এদিকে। তবু বলি—ভারী ভালো লাগল হিমালয়ের অপূর্ব শোভা আর অপার্থিব সৌন্দর্য।

বলতে বলতেই এগিয়ে যাই। চলে আসি গুপ্তকেশ্বর। তারপর একটুখানি বিশ্রাম নিয়েই আবার বেরিয়ে পড়ি—এবেলা যোশীমঠ আর থাকবনা বলে যেতে

দুর্গম পথের যাত্রী

চাই বেলাকুচি। কিন্তু কিছু প্রহার পেরিয়ে আসতে না আসতেই চড়চড়িয়ে রোদ উঠল তারপর সেই রোদের

পাকদণ্ডী পথে যোশীমঠের চড়াই ভাঙি।

ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর ছবি দেখেছি—আজ দেখি সত্যকার ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীকে। হাতে আর প্রাণ নেই তাই বেদনাও নেই, না হাত উঁচু করে ধরে রাখবার প্রয়াস। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলেই না এসম্ভব হয়েছে—কি কঠিন সেই তিতিক্ষা!

ভাবি, এসবের অর্থ কি? আমি প্রাণের চাইতেও বড় ভাই নয় কি?

ঝাড়কুলা পর্যন্ত এলাম যেমন তেমন। তারপর রোদে আর পথ চলতে পারিনে। শরীর হতে আগুন বেরোয়। তাই একটুখানি ওপরে ওঠে কুমার চটিতেই আশ্রয় নিই। খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে ওবেলাই নাহয় যাওয়া যাবে বেলাকুচি।

খাঁ খাঁ করছিল কুমারচটি। এক আমরা ছাড়া আর কাউকেই দেখলাম না সেখানে। তাই দোকানীরা দুধার হতে তখন ডাকাডাকি করছিল আমাদের। বলে, আমার চটিতে এসো আমার চটিতে এসো। শেষে সামনেই যে চটি পাই তাইতেই ঢুকে পড়ি।

শুয়ে শুয়ে চেয়ে আছি সামনের পাহাড়ের দিকে। মনে হচ্ছিল কেমন যেন হেলান দিয়ে আছে আকাশের গায়ে পাহাড়টা। আর ঐ পাহাড়ের গা দিয়ে আকাশের বুকে ছুটে উঠেছে সাদাসাদা মেঘ। নীচে সবুজের সমারোহ আর রোদের পীত আভা। পরিপূর্ণ একখানা ছবি। দেখতে দেখতে ভাবছিলাম—বাসরুট হয়ে কি ফল হল? তখন সবাই যাবে বদরিকাশ্রম বাসে করে। তখন কে দেখবে এই ছবি—কে শুনবে কানে ঝরণার কল কল নদীর ঝিরঝির। পথ চলতে বনফুলের গন্ধ যে কতবার ভেসে এসেছে বাতাসে—সে কি আর আসবে পেট্রোল গন্ধের উগ্রতায় বাসের ভেতরে। এপথের এত যে মাধুর্য—সেদিন এর কিছুই অবশেষ থাকবেনা।

সেদিন আজ যে চটিতে আমরা শুয়ে আছি—এই চটিও উঠে যাবে এদের কজি মারা যাবে।

আসবার সময় নূতন পথ দিয়ে এসেছিলাম। তাই পুরনো পথ দিয়ে ফিরে চলেছি। গুলাব কোটি পর্যন্ত দেখলাম পথ মোটামুটি ভালো। কিন্তু পাতাল গঙ্গা পেরিয়ে সেই যে উঠতে আরম্ভ করলাম কে জানে কোথায় তার শেষ?

চড়াই মানেই আবার উৎরাই। কিন্তু কষ্টকর এর পরের উৎরাই। ভারী খাড়া। উৎরাই পেরিয়ে আসি টংগণী। টংগণী হতে পুরনো পথ ছেড়ে বেলাকুচিতে নেমে আসি।

যাবার সময় যেখানে উঠেছিলাম এবারো সেখানেই উঠলাম। তবে বাসরুটে নেমে আসা মোটেই সুখকর হয় নি। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে যে ভাবে পড়ি কি মরি করে অলকনন্দা পেরিয়ে এলাম সে অনেক দিন মনে থাকবে।

অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠলাম পরদিন সকালে। তারপর ওই ভাবেই এলাম ছ'মাইল পথ হেঁটে পিপলকোটি। বাস পেলাম ঋষিকেশের নয় শ্রীনগরের। রাত্রে শ্রীনগরেই থাকতে হবে। কাল দুপুরে ঋষিকেশ।

বাস ছুটে চলেছে হু-হু করে। মাথা তুলে কিন্তু আজ আর বসতে পারছিনে। তাই মুখ গুঁজে সামনের সীট ধরে কোনো মতে পড়ে আছি। কে জানে কখন এই কষ্টের শেষ হবে। কখন যে চমোলি পেরিয়ে এলাম, কখন কর্ণ প্রয়াগ। নাম শুনে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে একবার চেয়ে দেখি—ওই পর্যন্তই।

পূজারী ব্রাহ্মণ প্রয়াগের জল নিয়ে আসেন বাসের দরজায়। জল স্পর্শ করা। কিন্তু এই কি জল স্পর্শ করা।

থাক আবারো আসতে হবে। ফিরে যেতে যেতে আসবার কথাটাই ভাবতে ভাবতে চলি।

— স মা প্ত —

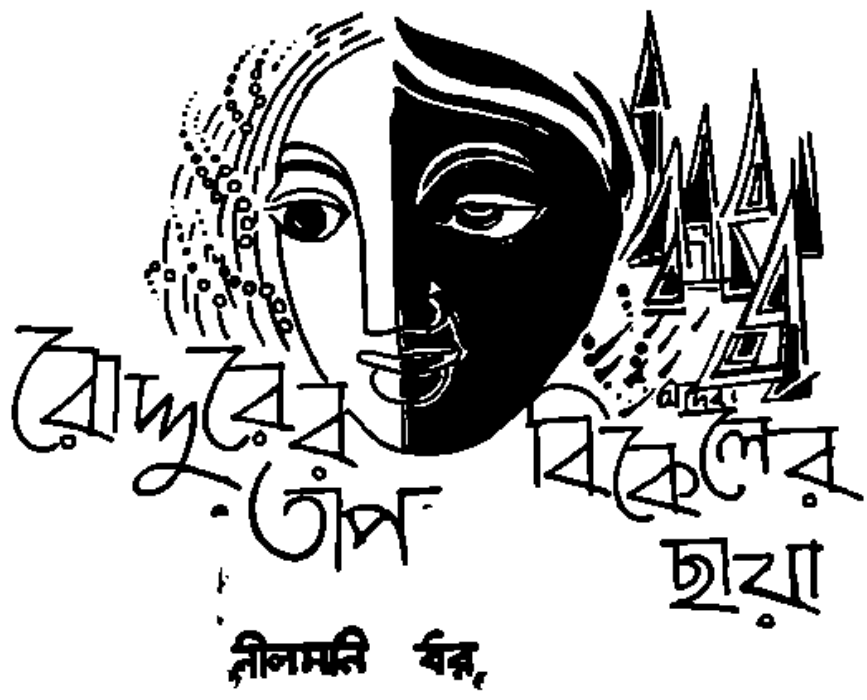

ভাল লাগছে না।
রোদ্দুরের দিকে
কি যে বিশ্রী
ড় ক ল
াগছিল। তার-
ই ওর শরীরে
কটা অসহায়
ব ফুটল।
ছু করার নেই।
কিন্তু এ ভাল
লাগাটা সহ্য
রতে পারছি না।
চি ৎ কা র
রতে ইচ্ছে করল
াহিতের। রোদ্দুরের শিরগুলোর দিকে তাকাল।
াকিয়ে চুপ হয়ে গেল।

ওই শিরগুলো এসে আমাকে বিঁধুক।

মাছিটা উড়ছে। ভন ভন করছে। ওটা উড়তে
ড়তে একটি আমার গায়ের উপর বসবে। বসবে। উড়বে।

আমি একটা মাছি হব। মোহিত বেশ জোরে জোরে
লল। বলেই সাবধান হল। দিদি কি শুনতে পেল!

না, না শুনতে পাবে কি করে। ও তো ঘুমোচ্ছে।

এ ছবিটা কত টাকা নিয়েছিল! দাদা ছবি আঁকে।
াদার চাকরী নেই। একটা একজিবিশন দরকার।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মোহিত। তাকিয়ে
াবল। আমি এই সব ভাবছিলাম। তখন আমার
ারাপ লাগাটা ছিল না। না, না ছিল। সাংঘাতিকই
ছিল। এখনও আছে।

জানালা দিয়ে মোহিত তাকিয়েই রইল। রোদ্দুরের
টকে। রোদ্দুরের শিখে। এই রৌদ্রে, এই গরমে
াস্তায় কেউ নেই। একটা লোকও নেই। আমি
াস্তায় একটা লোক হব। রোদ্দুরের আগুনে পুড়ব।

জামাটা নিল। গায়ে দিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মাহু। মাহুদি। মাহুদি দিদির নকর।

মাহুদি ঘুমোয়নি!

কো থা য়!

মা হু দি আ স্তে
বলল।

মোহিত বলল,
বেরুচ্ছি।

এই রোদ্দুরে!
কেন?

কেন। বিহ্বল
হয়ে মো হি ত
তা কা ল। কি
বলবে ভেবে
পেল না।

কেন? মাহুদি

আবার ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল।

আর মাহুদির সেই গলার স্বরে
চমকে তাকাল। তাকিয়ে ভয় পেল।

মোহিতের পিঠে হাত রাখল মাহুদি

বেরুতে হবে না।

মোহিত চোখ বুজল জোরে নিশ্বাস নিল।

মাহুদি আরও কাছে এগিয়ে এল। কাছ ঘেঁষে
দাঁড়াল। বলল, চল।

মোহিত চোখ খুলে তাকাল। তাকিয়ে না
নাড়ল। বলল, না। বলে ছুটে রাস্তায় নেমে এল।

আমি এখন হাঁটব। খালি হাঁটব। এই রোদ্দুরে
রাস্তায়—এই রোদ্দুরে, রোদ্দুরে মিশে যা রোদ্দুর
হয়ে যাব।

তারপর, তারপর আমার যন্ত্রণাটা আর থাকবে
আমি ভাল লাগা না লাগার ঊর্ধ্বে উঠে যাব।

আমার ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না।

আমি নিজেকে বুঝি না। বুঝতে পারি না।

কেন? ভাল লাগে না কেন? ভাল লাগা কি?

মোড়টার কাছে এসে থামল মোহিত। নির্জন
রাস্তাটা দেখল। লাইটপোস্ট, দোকানের বসবস, গাছে

পাতায় চোখ রাখল। চোখ ঝিরিয়ে নিল। হাঁটতে লাগল।

আমি এই রোদ্দুরে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলব। দু'হাত ছড়িয়ে রোদ্দুরের মিষ্টি মিষ্টি কণাগুলোকে জড়িয়ে ধরল মোহিত। তাদের কণাগুলোকে অদ্ভুত সুখে শরীরে মাখিয়ে নিল। আর ওরা শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল।

রাস্তায় এখন কেউ নেই।

আমার একার।

ওরা বলে, আমার কম বয়েস। আমি বুড়িয়ে গেছি। এ বয়সে ছেলেরা খেপে। হাসে। আমি ভাবি।

কি অত ভাবিস তুই। দিদি বকে।

আমি হাসি। ওরা দেখে না। আমি হাসি, কাঁদি, তারপর এক সময় আবার চুপ হয়ে যাই। রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল মোহিত। আমার কিছু ভাল লাগেনা।

কিন্তু আমি কি করতে পারি।

মোহিত হঠাৎ দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল।

দোকানের লোকটা তাকে দেখছে। কি দেখছে! সে কি অবাক হয়েছে! মোহিত মজা পেল। লোকটা তার কথা ভাবছে।

আমার ভয় করে। ভীষণ ভয় করে। মানুষকে একটা ভয়।

বাসটার পাশ দিয়ে রাস্তা পার হল। বাসের লোকগুলোকে দেখল। এই বাসটা ভয় পেয়েছে। আস্তে আস্তে চলছে। চুপচাপ নিঃশব্দে।

আমার মত। বাসটা আমার মত। ভয় পেয়েছে।

আমার মানুষকে ভয়। কিন্তু বাসটার কাছে?

আরে, আরে! মোহিত অবাক হল। রাস্তায় তো অনেক লোক। কিন্তু বেশীক্ষণ কেউ ওরা রৌদ্রে থাকবে না। কোথাও ঢুকে পড়বে। ভয়ে। শরীরের ভয়ে। শুকোবে। পালাবে। এ রোদ্দুর, এ রাস্তা আমার একার। একার।

বাঁ পাশের দোকানটার দিকে তাকাল মোহিত। ওখানে শান্তিনিকেতনের জিনিস বিক্রয় হয়। আমার কিছু আছে। আমি কিনব।

চায়টে বোতাম ছ' আনা নিল। সুন্দর গন্ধ। আমি গন্ধের জন্যেই এগুলো কিনলুম। নাকের কাছে ধরে রাখব।

দোকানের লোকটা আমাকে দেখে বিরক্ত হয়েছিল। লোকটা ঝিমুচ্ছিল। আমার ভাল লাগছে মজা লাগছে। লোকটা বিরক্ত হয়েছে। ওর আর ঘুম হবে না। আমি খুশী হয়েছি।

নাকের কাছে বোতাম কটাকে চেপে ধরল মোহিত। শ্বাস টানল। গন্ধ নিল। আহঃ। চমৎকার। এই গন্ধ আর মিষ্টি রোদ্দুর। ভাল লাগছে। ওরা মিশে থাক। আহ্! রোদ্দুর। গন্ধ। বোতাম। রোদ্দুর।

হঠাৎ থমকাল মোহিত। লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল। লোকটা ওরকম তাকাচ্ছে কেন!

ঝড়ে অনেকগুলো গাছ পড়ে গেছে। অনেকগুলো এখনও আছে। ওদের নীচে ছায়া। আমি ওখানে যাব না।

এই রাস্তাটা আমার চেনা। একটুদূর এগোলেই একটা চায়ের দোকান। আমি ওখানে চা খাব।

আমি অসুস্থ। এটা কি অসুখ! এই ভাল না লাগা। আমার ভয় লাগে। আমি কি ভাবি! কেন ভাবি!

আমি বাঁচব না। এটা রোগ। ভাল না লাগা। আমি মরব।

চা খাও।

আর কি?

কিছু না।

আমি বাঁচব কেন? মরে গেলেই ত শেষ। সব শেষ। বেঁচে থাকব আর এই যন্ত্রণাটা থাকবে থাকবে। থাকবে। জ্বালাবে। আমি জ্বলব। জ্বলছি।

শোন।

বলুন।

কাটলেট খাও একটা।

কি কাটলেট?

মিট্।

মরে গেলে আমি এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা জানব না। আমি বাঁচব। বেঁচে থাকব। যন্ত্রণার নীল হবো। নীল হয়ে যাবো।

এই শেষ হওয়া—এই যন্ত্রণায় ঝরে যাওয়া আমাকে অতৃপ্তি থেকে বাঁচাবে।

আমি ভাবছি। এই কথাগুলোই ভাবছি। আর ভাবব না। ভাবা উচিৎ নয়। মানুষ সব সময়েই ভাবে। ভাবতেই হয়।

রোদ্দুর, মিষ্টি রোদ্দুর আবার আমাকে পুড়িয়ে দাও। আমি ঠাণ্ডা হয়েছিলাম। বোকা হয়ে গিয়েছিলাম।

হন্ হন্ করে কিছুক্ষণ হাটল। ডাবের খোলা, মোহিত লাইটপোস্ট, সরবতের দোকান পেরিয়ে সেই পার্কটার সামনে দাঁড়াল। যেখানে গাছের পাতায়, ফুলগাছের মাথায় আর মাঠের ঘাসে রোদ ঝিলমিল করছিল। ঝিকমিক। এরা বোকা। এই লোকগুলো। এই ছায়ায়—গাছের ছায়ায় ঘুমোচ্ছে। ঝিমুচ্ছে। আমি এই ঘাসের সঙ্গে—রোদ্দুরের সঙ্গে মিশে যাব।

সেই ঘাসের বিছানায়—আগুনের বিছানায় শুয়ে পড়ল মোহিত।

লোকে যা করে না আমি তা করছি। আমি পাগল।

না, না। আমার ভাল লাগে! আগুনের তাপে আমি পুড়ছি। আমি পুড়ছি। আমার ভাল লাগে। ভাল না লাগাটা ডুবে যায়। আমি তৃপ্ত হই। পরিতৃপ্তিতে মিশে যাই।

শুয়ে থাকল মোহিত। সেই আগুনের উত্তাপে স্নান করতে থাকল।

রোদ্দুর আমার ভাল লাগে। ভালবাসি। মানুষকে ভয় করে।

আমার কিছুই ভাল লাগে না। বাঁচা, খাওয়া। মানুষ।

শুধু রোদ্দুর। রোদ্দুরের তাপ।

কিন্তু এই রোদ্দুরের তাপ কমছে। ছায়া বেড়ে বেড়ে রোদ্দুরকে গ্রাস করবে। আমার ভয় করছে।

মোহিত শুয়ে শুয়ে ফুল, নিম গাছ, লোকগুলোর শুয়ে থাকা দেখল। দেখতে থাকল।

ওই লোকগুলো সুখ বোঝে।

খুশীতে।

আমি সুখ পাই না। সুখে থাকতে পারি না। আমি জ্বলছি। একটা যন্ত্রণায় জ্বলছি।

এই যন্ত্রণাটা আমার শরীর মনের সঙ্গে মিশে গেছে।

রোদ্দুর কমছে। মিইছে। মিইয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রণাটাকে আমার শরীর আর মন থেকে পৃথক করা যায় না।

মানুষি বোকা। মানুষি যেন জ্বলছে। যন্ত্রণায় পুড়ছে।

রোদ্দুর দূরে সরে গেল। বিকেল। বিকেল হয়ে গেল।

আমার ভয় করছে। আমি কি করব। আমি পারছি না। আমার ভাল লাগছে না। রোদ্দুর নেই! ভয় করছে।

মানুষিও জ্বলছে! জ্বলছে।

আমি কি করব। আমিও জ্বলছি। অসুখে জ্বলছি। ভয়ে জ্বলছি।

বিকেল। এখন বিকেল। আমি কি করব।

মানুষি জ্বলে। আমি ভয় পাই; মানুষি তাকায়। আমি ভয় পাই।

আমি বোকা।

আমি রোদ্দুর বুঝি না। ছায়া বুঝি না।

মানুষি জ্বলে! যন্ত্রণায় জ্বলে। কাঁপে! কাঁদে!

রোদ্দুর। না, না। ছায়া। বিকেলের ছায়া।

আমি ভীরু। বোকা। ভয়ু।

মানুষি জ্বলে। আমি জ্বালাই।

আমি বোকা।

মানুষি বিকেলের ছায়া। আমি বুঝি না। বোকা।

ছায়া কাঁপছে। বিকেলের ছায়া।

রোদ্দুরের শেষ তাপটুকুও মিলিয়ে গেল।

এখন এইখানে, এই পার্কে আমি আর বিকেলের ছায়া।

আর কেউ না।

না, না আমি, বিকেলের ছায়া আর মানুষি।

আমি, মানুষি আর বিকেলের ছায়া।

আশ্চর্য, আমার ভাল লাগছে।

শতবর্ষ পরে

"ছদ্মবেশী"

ব্যাসো

এমন সভাপতি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। সচ্চিদানন্দ সামন্তকে দেখে সবাই এই কথাই বলে। যে দল যে কারণেই ডাকুন না কেন, তিনি আসরে প্রস্তুত। তিনি অসুস্থ হলেও কাউকে 'না' বলেন না। একেবারে শয্যাগত না হয়ে পড়লেই তিনি যাবেন। দু' একবার তিনি এ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে করে গিয়ে বক্তৃতা করে এসেছেন। লোকে বলে উনি যখন অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে কৃত্রিম শ্বাস নেবেন তখনও বক্তৃতা করবেন। দুঃখকে তিনি ভয় পান না। পরকে তিনি বিরূপতা দেখান না। দুঃখকে তিনি নিকট করেছেন, পরকে আপন। তিনি ঠিক করেছেন সভাপতি-ব্রতে সারাটা জীবন উৎসর্গ করবেন করছেনও। তিনি শুধুমাত্র সভাপতিত্বই করেন। পড়েন না, লেখেন না, ভাবেন না, শুধু সভাপতিত্ব করেন। এক মহৎ সভাপতির আদর্শে তিনি অনন্যমনা।

প্রায় রোজই তাঁর সভা থাকে। এক আধ দিন ফাঁক পড়লে ভারী ভাবিত হন। সেদিন ঘরে বসে বক্তৃতা অভ্যাস করেন—বক্তৃতার বিষয় নয়, বক্তৃতার গলা, বক্তৃতায় বলা। বক্তৃতার উন্নতিকল্পে চোখ, মুখ, হাত পা হাসি অভ্যেস করেন। নিরলস সাধক সচ্চিদানন্দ সামন্ত।

তবে ইদানীং তাঁর ফাঁক যাচ্ছেনা একদিনও। বরং একদিনে পাঁচটা সাতটা দশটা 'কল' থাকে। ক্লান্ত হন, হাঁপান, আর রবীন্দ্রনাথকে দন্তবাদ দেন। তাঁর কৃপাতেই তো এই সুযোগ। অবশ্য একটা অসুবিধেও আছে। গলায় রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে বসে যাচ্ছেন, যে অন্য বিষয়রা উধাস্ত। এটা ভাল কথা নয়। গলা সব রাগিনীতে সাধা থাকা ভাল। বৈচিত্র্যই জীবনের স্বাদ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেয় হবেন, তখনও তো তাঁকে সভাপতি হতে হবে এবং অন্য সুরে গলা বাজাতে হবে। তখন যদি 'অন্য সুর না বেরোয়?'

যাই হোক, এখন সে দিকে তাঁর বিশেষ তাকাবার সময় নেই। তিনি এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে এক সভাপতি শ্রান্তিহীন।

চলছিল সব ভালই, হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা বিগড়ে গেল। ঠিক এক দিনে নয়, ভেতরে ভেতরে রবীন্দ্রক্রিয়া আগে থেকেই চলছিল, তার ফলটা প্রকট হোলো একদিন। রবীন্দ্ররসে তিনি প্রায় স্যাচুরেটেড্ ছিলেন, সেই দিন পুরো হলেন, এবং—।

সেই দিনটার কথাই বলি।

সকালেই উঠেই সামন্ত মশাই গেলেন বেনেপাড়া সাহিত্য সমিতিতে। সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয়—'রবীন্দ্রসাহিত্যে সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব'।

গিয়েই তিনি শুরু করে দিলেন, 'সীমা আর অসীম। এই নিয়েই রবীন্দ্রনাথ। দুইই আছে। এক ছেড়ে আর নেই। উভয়ে মিলে এক—রবীন্দ্রনাথ। উভয়ে আবার বিবাদও আছে। কখনও এ ওকে ও এ কে সহ্য করতে পারে না। একজন মাথা চাগিয়ে ওঠে। পরে আবার মাথা নামিয়ে নিয়ে মেনে নেয়। এ যেন কিশোর-কিশোরীর প্রেম। সীমা আর অসীম। কিশোরী আর কিশোর। প্রেমিকা আর প্রেমিক। ঝগড়াও আছে, ভালবাসাও আছে।...

এটি শেষ করেই ছুটলেন শাঁখারীটোলায়। সেখানে বক্তব্য: 'রবীন্দ্রকাব্যে মানুষ'।

উনি বললেন, মানুষ। মানুষ আমরা কাকে বলি। দুই হাত, দুই পা আছে এমন এক প্রাণী। সে পায়ে হাটে, হাতে খায়, চড়ও মারে। এই হচ্ছে মানুষ! এই মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে ভর্তি—কিস্‌গিস করছে। মানুষ আর মানুষ হাটা দায়। ঠিক যেন মীর্জাপুর ষ্ট্রীট। ধাক্কা লাগে, পায়ে পা ঘষে যায়, রাগি, গালাগালি খাই, কিন্তু ভালও লাগে, কারণ পাই সেই মানুষকে,

যে-মানুষ সত্যিকারের মানুষ, যার দুই হাত দুই পা···।

'তৃতীয় বক্তৃতা করলেন টাদীগঞ্জ 'আগে চল' সংঘে। বিষয়—রবীন্দ্রনাথের ধর্ম।'

বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। খাঁটি ব্রাহ্ম। তার প্রমাণ তাঁর চোহারাতেই রয়েছে। তাঁর দাড়ি ছিল। এইটাই যথেষ্ট প্রমাণ। যা ধারণ করে রাখে তাই ধর্ম। তিনি দাড়িকে ধারণ করে রেখেছিলেন, দাড়িও তাঁকে ধারণ করে রাখত। অতএব···'

চতুর্থ বক্তৃতা : 'বাউল রবীন্দ্রনাথ'

বললেন, 'বাউল শব্দটা এসেছে বাতুল থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাতুলতার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন দেড়শতী সাহিত্যে—সমগ্র সাহিত্যই তাঁর বাক্যে পরিপূর্ণ। তা ছাড়া চেহারাতেও তিনি বাউল। আলখাল্লার কথাটা স্মরণ করে দেখুন।···'

পঞ্চম বক্তৃতা : 'বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ।'

বললেন, 'বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়লোকে বিশেষ জানে না। আমি গবেষণা করে দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ আসলে বৈজ্ঞানিকই ছিলেন। জগদীশ বসুর সব আবিষ্কারই আসলে রবি ঠাকুরের। বন্ধুকে উনি স্বত্ব দান করেছিলেন।···'

সব শুদ্ধ তিনি বক্তৃতা করলেন পনেরোটা। এক দিনে। সবেরই বিষয়—রবীন্দ্রনাথ। মধ্যে একবার চাটটি খেয়ে নিয়েছিলেন দুপুরে। প্রতিটি স্থানেই রবীন্দ্র-নৃত্য-গীত-নাট্যের ব্যবস্থা ছিল।

রাতে যখন বাড়ী ফিরলেন তখন পুরো রবীন্দ্রস্থ।

বৌ বলল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিল। সারাদিন দেখা নেই। ভেবে ভেবে মরি।'

সচ্চিদানন্দ বললেন, ভাবনা মিছে। দিন আর রাত। দিনে আলো, রাতে অন্ধকার। জীবন আর মৃত্যু। মিলন আর বিচ্ছেদ। কিন্তু যাওয়া তো একেবারে যাওয়া না। এতো ঘুরে ঘুরে আসা। ওদিকের অন্ধকারটা ভাল করে জানি না বলে হঠাৎ দৃষ্টির আগোচর হলে দুঃখ জাগে। কিন্তু আমি তো আছি, তোমার জগতে অথবা অন্য জগতে, মাতার বাম স্তনে অথবা ডান স্তনে।'

'আ মর্। কাকে কি বলচে গা। নেশা ভাঙ করে এয়েচে না কি?'

'তোমরা যা বলো তাই বলো আমার লাগে না মনে।'

বৌ দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'তুমি কী চা

'যাতা চাই তাঁহা ভুল করে চাই।'

'যা-তা বকছ কেন! এলে কোথা থেকে? গিয়লে কোথায়?'

'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে, মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে।'

'তবে সেখানে থাকলেই পারতে। ফিরলে কেন?' চেঁচিয়ে উঠল বৌ।

'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে।'

'মরণ।'

'মোর মরণে তোমার হবে জয়।'

'এমন লোককে ধরে পিঠে কাড়া-নাকাড়া বাজানো উচিৎ।'

'বাজাও আমারে বাজাও। বাজাবে যে সুরে প্রভাত আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও।'

'বেরোও বেরিয়ে যাও।'

'জানি, হল যাবার আয়োজন,—তবু পথিক থাকো কিছুক্ষণ।'

'উঃ, এ তো ভাল জ্বালায় পড়লাম। কবে যে এর হাত থেকে মুক্তি পাব তার ঠিক নেই।'

'মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথা পাবি।'

'খুব তো সারাদিন গলাবাজি করে এসে এখন চং করা হচ্ছে। মুদি পয়লা আর বাড়ীওয়ালা এসেছিল তা জানো?'

'তুমি জানো নাই, তুমি জান নাই, তুমি আন নাই তার মূল্যের পরিমাণ।'

তখন সচ্চিদানন্দকে ধরে-বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হোলো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি বিড়-বিড় বক-বক করতে লাগলেন।

বৌ বলল, 'হ্যাঁ গা কি বলছ।'

'গিন্নী, কোলকাতা-টা কেমন নড়তে নড়তে চলেছে দেখতে পাচ্ছ? বাড়ী-ঘর চলেছে। চলেছে রাস্তাগুলো—অজগর সাপের মত। সাপের পিঠে ট্রাম গাড়ি দুদ্দাড় পড়ছে। ঝাওড়া ব্রিজটা চলছে ছাখো—ঠিক যেন বিছে। মনুমেন্ট-টা যেন হাতির শুঁড়।'

'আঃ ঠিক করে ঘুমোও তো। আমার ছেরা ঘটিয়ে তবে তোমার শান্তি হবে বুঝতে পারছি।'

'শ্রাদ্ধ! শ্রাদ্ধে কিন্তু মোণ্ড-তিন সর্ষে চাই—ঝোলে ঝাটনায়; কালুবাবুকে তাহলে পাটনায় পাঠিয়ে দাও।'

এরপর আর কবিরাজ না ডেকে উপায় নেই।

সচ্চিদানন্দ আপত্তি করে বলেছিলেন, 'কবিরাজে আমার কি দরকার। কবিকুলের রাজা তো সদাই আমার মধ্যে বিরাজ করছে।'

তবু ডাকা হোলো কবিরাজ।

সচ্চিদানন্দ কবিরাজকে দেখে বললেন, 'কে, কবিরাজ-মশাই? রাজার চিঠি কি এসেছে? আমি যে অনেক দিন থেকে বসে আছি তাঁর চিঠি পাব বলে। চলে যাব দূরে—অনেক দূরে। আপনি জানেন—রাজার চিঠি আমার কবে আসবে?'

কবিরাজ গুম হয়ে দাঁড়ালেন।

বৌ জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? খারাপ কিছু?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

'দেখুন রোগীকে।'

'দেখতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।' বললেন কবিরাজ।

'কী রোগ?'

'রবীন্দ্র-রোগ।'

'রোগটা কেমন?'

'ঐ অনেকটা বহুজনের ফল—মানসিক ক্ষেত্রে অবশ্যই। তাছাড়া বায়ুর প্রকোপ। এখন এ কিছুদিন ঘন ঘন উদ্গার ছাড়বেই।'

'এ রোগের প্রকোপ কমবে কবে?'

'এক বছর পর্যন্ত থাকবে। তারপর কমবে।'

'ওষুধ দিন।'

'এর ওষুধ নেই। একবার ধরলে কিছুদিন ভোগাবেই।'

'পড়াশোনা একদম বন্ধ করে দিই? মাথার ব্যামো বলছেন যখন—'

'না। ওটা করুক। ওটায় ক্ষতি নেই। ওর মাথাকে এখন আপনি থামাতে পারবেন না। ওঁর মাথা এখন এত চটে উঠেছে, যে ও একটা কিছু করবেই। বই না পেলে নিজের মনেমনেই নানা কিছু বানাবে। তার থেকে মনের সামনে একটা খাদ্য থাক।

'বেরোনো, বক্তৃতা করা—এসব বন্ধ করবো?'

'না। ছেড়ে দিন। বেয়াড়া গ্যাসটা বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।'

'এরকম রোগ আগে তো শুনিনি।'

'না। এটা ইদানীংকালে খুব হচ্ছে। সারা কোলকাতার এই ব্যামোহ-ভোগা কিছু লোক খুব ছোটাছুটি করছে।'

'তাহলে আছে এমন! যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম।'

'হ্যাঁ, ভয়ের খুব কিছু নেই।'

'মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।'

'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি কিরে। আমার খুবই ইচ্ছে। এলেই কিছু হয়। কিন্তু আজকাল রবীন্দ্র-সভায় প্রায়ই ডাক পড়ে বক্তৃতার জন্য। সময় বড় কম।'

'তাহলেও ওঁরি মধ্যে চেষ্টা করে—'

'হ্যাঁ, চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, সেখানে আসা যায় বৈ কি।'

'হ্যাঁ, আপনার কাজ অনেক। এত বড় পসার, তাছাড়া সমাজসেবা, রাজনীতি—। কি করে যে করেন ভেবে পাই না।'

'আমি কি করি। আমায় করায়।'

'কে?'

'আমার জীবন দেবতা।'

'এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

'ঐ বৌটির কাছে। তেরো নম্বর বাড়ী। তার দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর বয়স না হতে হতে পুরা দু' বছর।'

'অতি বড় কষ্ট।'

'আমি সান্ত্বনা দিয়েছি। বলেছি—কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস, হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।'

'আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলাম।'

'নষ্ট কিছুই হয় না। মাঝে মাঝে ভাবি, কর্মহীন আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন। কিন্তু সত্যি তো হয় না। কারণ, পূর্বের পর-পরম তাদের পরে। যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি যে জানি তাও হয়নি হারা।'

সামন্ত-গৃহিনী টাকা দিল কবিরাজকে।

কবিরাজ বেরোতে বেরোতে বললেন, 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই, যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।'

নতুন বই

সাময়িকী—লেখক : অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ; প্রকাশক : কে'স্ পাবলিশিং কনসার্ন ৬৭ সি, ঈশ্বর রো, কলিকাতা-১৪ ; পৃঃ ১৩১।

কবি-লেখকদের সম্পর্কে গ্রেটোর মনোভাব সকলেই জানে। তাঁর বক্তব্য ইংরেজিতে সংক্ষেপে : We shall be justified in not admitting him into a well-ordered Commonwealth. কিন্তু তাঁর যুক্তি চলেনি—সম্ভবত তাঁর স্বদেশে তাঁর অব্যবহিত পরেও অচল হয়ে গিয়েছিল; আর আজকাল তা রাষ্ট্রশাসনের বনিয়াদ পাকা করতে হলে শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের হাতে রাখা দরকার শাসনকর্তৃদের। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কোন রাজদরবারে কবি-সাহিত্যিকরা বহাল তবিয়তে ছিলেন (বা সময় বিশেষে প্রধান অমাত্যের) গুণকীর্তন করার জন্যে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সংগে সম্পৃক্ত ছিলেন এমন কবিসাহিত্যিক গোটা ভারতবর্ষে খুঁজলে খুবই কম মিলবে। কিন্তু ১৯৪৭ এর আগষ্ট মাসের পর থেকে কেউ কেউ পথ বদলালেন, মত বদলালেন, ছাতা ধরলেন অন্য কারও মাথায়, ফলে রবীন্দ্র-পুরস্কার, রাজ্য সভার আসন, বিধান পরিষদের টিকিট মিলতে লাগলো—সংগে সাংস্কৃতিক মিশনের (এগুলির ঠিক কী কাজ তা যাঁরা যান তাঁরাও খুব যে জানেন তা মনে হয় না) দৌলতে বিদেশ ভ্রমণের যথেষ্ট সুযোগ।

এ ছাড়াও আকাদেমীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাতে আর কিছু না হোক অন্তত অন্যরাজ্য-সমূহের ভাষা-সাহিত্যের সম্পর্কে ও বিগত যুগের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে কিছু জানার মতো করে কেতাব-পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। তাতেও যদি কবি-সাহিত্যিকদের এক করে ফেলা না যায় তাহলে অন্য চেষ্টা দেখা যেতে পারে। তারও অভাব হলোনা—১৯৫৩ সালে সর্বভাষা কবি সম্মেলন হলো দিল্লীতে, সাহিত্য আকাদেমীর উদ্যোগে, [illegible] সালে ৬, ৭-তেও। আমার আকাদেমী-উদ্যোগে সর্বভারতীয় মুশায়েরার অনুষ্ঠান হলো—১৯৫৮-তে ৬। আকাশ বাণী সংগীত সম্মেলনের ভিতর দিয়ে সংগীত-সাংগীতিক জগতেও এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সব অনুষ্ঠানের সবই মন্দ, এমন কথা বিশ্বনিন্দুকই বলতে পারে মাত্র। কিন্তু প্রতিনিধি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের শিল্পকর্মে রাজতন্ত্রের প্রশংসায় যখন বাস্তব-জীবনকে বিস্মৃত হন তখন মনে হয় এই সবের উদ্দেশ্য আর যাই হোক জীবনের স্বার্থে নয়—। না হলে কুমুদরঞ্জন মল্লিক রবীন্দ্র প্রতিভাকে বাঙলা-কাব্যের যে পরিচয় দিয়ে এসেছেন তাতে বাঙলী মাত্রেরই মাথা কাটা যায়—

কামাখ্যা হতে আলামুখী জ্বলে
মার আরতির আলো।

প্রজাতন্ত্রের পার্লিমেন্টারিয়ান আজি প্রতিষ্ঠা হলো। কিংবা নাকি আলোচনায় যখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (নাটক সম্বন্ধে তাঁর বলার এক্তিয়ার কী) বিদ্যাসাগর পাঠ প্রবন্ধে পাঠ করে ছেলে-মানুষী করেন তখন মনে ভাবি সম্মেলন হোক কিন্তু এই ধরনের দুর্বলচিত্ত কর্তাভাজনদের যেন প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া না হয়। এই রকমের রাজারো অভিযোগ উঠতে পারে। তৎসত্ত্বেও এই সব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সর্বভারতীয়তা বৃদ্ধি পেতে পারে—সাহিত্যে ভারততীর্থ হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির প্রতিবেদন (রিপোর্ট) দিয়েছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজের মন্তব্যসহই দিয়েছেন। মন্তব্যগুলি বেমানান হয়নি। লেখক যদি আরও বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠানগুলোর বর্ণনা দিতে পারতেন যেমন পাঞ্জাবী কবি মোহন সিংয়ের একটি কবিতা বাংলা

অর্থসহ দিয়েছেন; তাহলে আমরা পূর্বকালের লেখকে বেশি উপকৃত হতে পারতাম। উড়িষ্যার অন্যতম পট্টনায়ক প্রমুখ আরও দু' একজনের কবিতার সমাদরই দিতে পেরেছেন লেখক। এগুলির পূর্ণতর বর্ণনার ভিতর দিয়ে আমরা আঞ্চলিক সাহিত্যের বর্তমানিক অবস্থা জানতে পারতাম, শুধু তাই নয়, প্রতিনিধিদের প্রতিভা ও মেজাজও উপলব্ধি করতে পারতাম। আরও একটু বক্তব্য, এই সব অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দিয়েছেন সেগুলির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ যথেষ্ট নয়, অনুবাদের সংগে মূল ইংরেজী থাকা উচিত ছিল। ১৯৪৮ সালে নাটক সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তার আরও সুষ্ঠু বর্ণনা থাকলে বইটির মর্যাদা বাড়তো—আগামী দিনের লেখকের গ্রন্থই গণ্য হিসাবে থাকতো। আশা করা যায়, লেখক বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করবেন—এবং পরবর্তী সংস্করণে আমাদের আরো ভালো জিনিস উপহার দেবেন। এই পুস্তকের দুটি দুর্বলতা—পুস্তকের শেষ অংশে তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধর্মী প্রবন্ধ কেন তিনি সংযোজিত করলেন বোঝা গেল না; দ্বিতীয়ত, হুমায়ুন কবীরের ভূমিকা তবু সহনীয়, কিন্তু শ্রীবাসবের কাব্য একেবারে অসহনীয়, ওটা না থাকলেই ভালো হতো। এরকম তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ-পুস্তক উপহার দিয়ে লেখক নিশ্চিতই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

পদক্ষেপ : লেখক, আবদুল আজীজ আল-আমান ; প্রকাশক : এস, মল্লিক, ৩৭-এ, কলেজ রো, কলিকাতা-১২ দাম—সাত টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার বর্তমানে ভরপুর। এক রবীন্দ্রনাথই বিশাল একটা অংশ জুড়ে বসে আছেন। আরও সব মাণিমাণিক্যের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহের জন্য আগে কতিপয় মাত্র অন্বেষী ছিলেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তার গতিপ্রকৃতি জানার প্রয়োজন নানাভাবে ঘটেছে। ফলে সাহিত্যের এই বিভাগে নতুন নতুন রসিক ব্যক্তির আসা-যাওয়া ঘটেছে। শিক্ষিত মন সাহিত্যের রসের সংগে সমালোচনা-সাহিত্যের রসাস্বাদনে উদগ্র হয়ে উঠেছে যতো ততোই নতুন নতুন নাম নিয়ে নতুন নতুন বই বেরুচ্ছে। বর্তমান লেখকও তেমনি একজন নতুন রসবোদ্ধা। 'পদক্ষেপ' বাংলা সাহিত্যের ঠিক ধারাবাহিক ক্রম-অনুযায়ী-বিন্যস্ত ইতিহাস নয়, সমালোচনা গ্রন্থও নয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি বাছাই করা বিষয়ের মোটামুটি পূর্ণাংগ আলোচনা। বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠককেও তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা লেখকের আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকাল থেকে লেখক আলোচনা শুরু করেছেন, এবং ক্রমান্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, চণ্ডীদাস প্রমুখ মহাজন চতুষ্টয়, মঙ্গলকাব্য, মৈমনসিংহগীতিকা, বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি ও কাব্য, চৈতন্য চরিতামৃত, চট্টগ্রাম-রোসাঙ্গের মুসলমান কবি ও কাব্য এবং সবশেষে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত লেখক মোটামুটি সরস, হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন। সরস ও হৃদয়গ্রাহী বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, বিতর্কিত বিষয় ও প্রামাণিক উদ্ধৃতির আড়ম্বরের মধ্যেও সাধারণ পাঠক খুসি হতে পারবেন। আলোচনাগুলিতে লেখকের নিজস্ব চিন্তার ধারাও যেমন আছে তেমনি অপরের চিন্তার সংগে আপন চিন্তার সামঞ্জস্য-করণে পারদর্শিতাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে গুটি কয়েক শব্দ কেবল পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে—'মুসলিম' শব্দটির বদলে 'মুসলমান' কথাটা চালাতে আপত্তি কি ছিল? আর, বেশ কয়েকবার 'প্রতিভা' কথাটার সংগে 'উন্মাদ' কথাটা পাঠকের মনে উদ্বাদনার সৃষ্টি করেছে। বৈষ্ণবসাহিত্য আলোচনার কিছু তত্ত্বাশ্রয়ী শব্দের ব্যবহার বিদগ্ধতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই, তবে বাহুল্য মাত্র। মুদ্রণ-প্রমাদের আধিক্যও লক্ষ্য করা গেল।

ছাত্র-ছাত্রী মহলে পুস্তকখানির সমাদর হবে বলে মনে হয়।

—প, মু.

আন্তন চেখভের গল্প ও ছোট উপন্যাস। প্রকাশক বিদেশী ভাষার সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো পরিবেশক —ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২.৪৪

সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে বিদেশী ভাষার সাহিত্য

প্রকাশালয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি "আন্তন চেখভের গল্প ও ছোট উপন্যাস" এর বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তন চেখভের জন্ম-শতবার্ষিকীবর্ষে এই বই প্রকাশ আমরা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করি, কারণ ইহা দ্বারা সোভিয়েত জনগণের বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাই সূচিত হইতেছে।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের সংখ্যা এখন আর নগণ্য নয়। অন্য ভাষার বিখ্যাত সব লেখকদেরই বহু লেখা আমাদের ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে, স্বল্প খ্যাতিমান কোন কোন লেখকের লেখাও, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বাজারের চাহিদা অনুসারে, আমাদের প্রকাশকদের চলিতে হয়, সাহিত্যরসিক বিদগ্ধজনের প্রয়োজনানুসারে, অথবা বাংলা ভাষার ক্রমবর্ধমান প্রসার ও উৎকর্ষ অনুযায়ী, বই প্রকাশ করা সব সময় সম্ভবপর হয় না। তাই সর্বদেশের ও সর্বকালের ছোট গল্পের মহৎ শিল্পী আন্তন চেখভের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার কোন রচনা বাংলা ভাষায় যে রূপান্তরিত হইল না তাহা আমাদের পক্ষে লজ্জার। মস্কো হইতে প্রকাশিত এই বই আমাদের সেই লজ্জা আরো বাড়াইয়া দিয়াছে।

মস্কো হইতে চেখভের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই সঙ্কলনে, চেখভের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন, ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সহ একটি তথ্যবহুল ভূমিকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের কাছে, চেখভ এখনও বহুল-পরিমাণে পরিচিত নন। যে স্বীকৃতি আমরা রুশ চিরায়ত সাহিত্যিকদের মধ্যে তলস্তয়, ডস্তয়েভস্কী বা গর্কিকে দিয়াছি, চেখভ তাহা পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই বিচারে বর্তমান পুস্তকটি বাংলা পাঠকদের দীর্ঘদিনের এক প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মস্কোর বিদেশী ভাষার সাহিত্য প্রকাশালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই সংকলনটিতে চেখভের অনেকগুলি বিশ্ববিখ্যাত গল্প স্থান পাইয়াছে। তার মধ্যে একটি কেরানীর মৃত্যু, ঝুকুর সঙ্গী মহিলা, নালায় উল্লেখ্য। মস্কো হইতে প্রকাশিত এই বইটিতে প্রচলিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া অনুবাদকের নাম প্রকাশ করা হয় নাই। কারণ-হিসাবে মনে হয় সমগ্র সংকলনটির অনুবাদক একজন নয় একাধিক। এবং বোধহয় এই কারণেই সমস্ত গল্পগুলির অনুবাদ সমমানের হয় নাই। একটি সংকলনে এই ধরনের ত্রুটি একেবারে অস্বাভাবিক না হইলেও পাঠকের রসাস্বাদনের ব্যাঘাত করে। প্রকাশকের এই দিকে নজর রাখাও কর্তব্য। আশা করি ভবিষ্যতে মস্কো বিদেশী সাহিত্য প্রকাশালয় এদিকেও দৃষ্টি রাখিবেন।

আমাদের দেশে প্রচলিত বইয়ের মূল্যহারের তুলনায় আলোচ্য সংকলনটির স্বল্প মূল্য ধার্য করায় প্রকাশককে বাংলা দেশের পাঠকদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাই।

হ্যামেলিনের বাঁশিওলা—বুদ্ধদেব বসু। শ্রীপ্রকাশ ভবন। এ-৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। দাম—দু' টাকা।

আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু এক আশ্চর্য ভূমিকা নিয়ে বর্তমান। ছোটদের জন্য তাঁর রচনা অজস্র নয় তথাপি সেগুলি উল্লেখযোগ্য গৌরব নিয়েই সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের পরবর্তী অনুসারী এই শিল্পী শিশুসাহিত্যে এক আশ্চর্য জগত সৃষ্টি করেছেন।

'একটি আইনঘটিত ব্যাপার' নিয়ে 'পাইড পাইপার' গল্পটি লেখা হয় এবং আজ প্রায় দুশো বছর ধরে পৃথিবী ভরে যে গল্প এতবার লেখা হয়েছে, আঁকা হয়েছে, বলা হয়েছে—এত সব ছেলে-মেয়ের দল মা-বাবা মাসি পিসি ঠানদি ঠাকুমার মুখে শুনেছে যে গল্প, আবার নিজেরা মা বাবা ঠানদি-ঠাকুমা হয়ে নতুন সব নীল চোখের, ব্রাউন চোখের, সোনালী চুলের ছেলে-মেয়েদের কাছে বলেছে, সেই গল্প 'হ্যামেলিনের বাঁশিওলা' বর্তমান সঙ্কলনে সূচীর প্রথমা। অদ্ভুত নমনীয় এর গল্পের চালটুকু। মনে হয় যেন কবিতা

পড়ছি। আর বলার ভঙ্গী অপরূপ, চিত্রল। গল্পের শেষটুকু যেন ভোলা যায় না :

'এরপরে হান্স আর বেশিদিন বেঁচে ছিল না। জীবনে একবার এক ? উত্তেজের আর উচ্চাশার ঢেউ এসেছিল তার—সেটা ম'রে যাবার পর তার বাঁচার ইচ্ছাটাও যেন ম'রে গেল। সেই কাঠের ঝুটুরিতেই চুপচাপ বসে থাকতো সে—আগের চেয়েও চুপচাপ—দূরের দিকে, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। আগে তার যেটুকু-বা চেষ্টা ছিল তাও ফুরিয়ে এল ধীরে ধীরে। কোন দিন খায়, কোন দিন খায় না। দিনের পর দিন পা বাড়ায় না বাইরে। মাঝে—মাঝে বাচ্চারা আসে তার কাছে—তার ঐ একটি গোধূলির মুহূর্ত বাচ্চারা শুধু ভোলেনি, আর-বুড়ো খ্যাপাটে মানুষটাকে একটু ভালোবেসেই ফেলেছিল তারা। হান্স গল্প বলতো ওদের—কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না মৃত্যুর পরে নরকে তাদের কী ভয়ানক শাস্তি হয়। শোনাতো বাইবেলের গল্প, যীশুর কথা—যিনি ব'লে গেছেন যে স্বর্গের দরজা ভিখিরির জন্য খুলে যাবে, উকিলের জন্য কখনো না। পরের বছর শীত পড়ার আগেই সে ম'রে গেলো, তার কফিনের সঙ্গে গির্জের গেল গুটিকয়েক ছোট ছেলেমেয়ে—আর তাদের একজন বড়ো হ'য়ে গল্প বানালো তাকে নিয়ে তার নাম দিলো 'পাইড পাইপার', তারপর কে জানে কত বছর ধ'রে অদল-বদল হ'য়ে এই বাঁশিওলার আশ্চর্য গল্প দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়লো। একটা আইনঘটিত ব্যাপার হ'য়ে উঠলো রূপকথা—এই তো মানুষের চরিত্র। তারা এমনভাবে চলাফেরা করে যেন বিষয় আশয় টাকা-পয়সা কড়াক্রান্তি ছাড়া কিছুই বোঝে না—কিন্তু ভালোবাসার বেলায় ভালোবাসে শুধু অসম্ভবকে।'

পরবর্তী গল্পগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বাবা'। ছোটদের যে কোন গল্প রসোত্তীর্ণ হলে তা যে সার্বজনীন হয়ে দাঁড়ায় এ গল্প তারই সার্থক প্রমাণ। বুলু নামের ছোট্ট একটি মেয়ে বড় হতে লাগলো আর তার দুষ্টুমি, কান্না কিম্বা ভালবাসার রূপ অন্য চেহারা নিয়ে দাঁড়াল। বড় হয়ে বুলু তার ছেলেবেলার সঙ্গে আড়ি দিলো, সে বদলে গেল।

'বই পড়ায় বুলুর মন লাগলো, আর আমার লেখার আর একজন ভক্ত হলো, দুটোই আমার পক্ষে সুখের; কিন্তু আমি যেন সুখী হতে পারলাম না, কেমন একটা ঝাপসা, বুঝতে-না-পারা কষ্ট পেলাম যেন। মনে হ'লো, আমাকে দিয়ে এই পৃথিবীর প্রয়োজন আরো একটু কমলো; বুলু কি ভালো হ'লো? বুলু কি বড়ো হ'লো? আমি কি আর একটু বুড়ো হলাম?

গল্পের পরিণতিতে লেখকের ইঙ্গিতটুকু লক্ষ্যণীয়। বাকী তিনটি গল্প 'আমাদের আশ্চর্য দাদু', 'প্রোফেসর' ও 'দুই বন্ধু'। গল্পগুলি লেখকের আশ্চর্য শিল্পকর্মেরই ফলশ্রুতি।

—শ্যামাপ্রসাদ সরকার

সমস্যা-সঙ্কুল কংগো

বাস্তব সরকার

★

১৯৬০ যেমন আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে অনেকাংশে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখেছে, তেমনই দেখেছে তার সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশের নিদারুণ অন্তর্বিরোধ। স্বাধীন রাষ্ট্র সত্তার প্রবর্তন ও প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসনে শৃঙ্খলিত জীবন, এ দুয়ের পার্থক্য, আফ্রিকার অন্ততঃ কয়েকটী অঞ্চলে বেশি অনুভূত হওয়ার সুযোগ এর আগে আসেনি। আফ্রিকার জাতীয় জীবনে যে সংকটের আশঙ্কা ইতিপূর্বে শুধু সম্ভব বলে মনে হতো, আজ তারই প্রকট রূপ বহু দেশেই হতাশা ও ব্যর্থতার মনোভাব সৃষ্টি করছে। সন্দেহ নেই যে সেখানে আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক দুর্বলতা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থান্বেষী পরস্পর মনোভাব আন্তর্জাতিক রাজনীতির আবর্তের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। সংযুক্ত দেশগুলির এই জাতীয় রাজনৈতিক অস্থায়ীত্ব, সমপ্রভাবে আফ্রিকার দুর্দিনকেই ত্বরান্বিত করছে।

এই সংকটের চরম প্রকাশ কঙ্গো। মাত্র ৩০শে জুন ১৯৬০ কংগোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম দুই সপ্তাহেই, তার আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে এমন পরিবর্তনের সূচনা হয়, যার ফলে স্বাধীন কংগোর অস্তিত্ব আজ শুধু আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলাপ-আলোচনায় সীমাবদ্ধ। কংগোর অভ্যন্তরে ক্ষমতালুব্ধ উপদলীয় চক্রান্ত, সামরিক বাহিনীর শাসন ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র, একের পর এক তার স্বাধীন অস্তিত্বকে সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই, বিপর্যস্ত করেছে। বিশ্বরাজনীতির যে করাল ছায়া পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করতে পারে, কংগোর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রিক চেতনায় তা ঘন অন্ধকার ডেকে এনেছে। এবং ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে বেলজিয়াম হয়েছে তার মুখপাত্র। দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতিতে যে অন্তঃসারশূণ্য রাজনৈতিক শাসনের বনিয়াদ খাড়া করা হয়েছিল, যখন অনিবার্য কারণে তারই হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো, তখন বেলজিয়ামের অসুবিধা হয় নি একে সহজেই পর্যুদস্ত করে ক্ষমতা দখলের নতুন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করায়। জুলাই থেকে নভেম্বর, এই পাঁচ মাসে কংগোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে কথা অভ্রান্ত ভাবেই প্রমাণ করে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে বেলজিয়াম ন্যাটোর (উত্তর অতোলান্তিক চুক্তি সংস্থা) অন্যতম সদস্য এবং এরই সর্বশক্তিমান সদস্য স্বয়ং আমেরিকা। সুতরাং কংগোর রাজনীতিতে আমেরিকার অবদান থাকা তো বিচিত্র নয়ই বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সে প্রসঙ্গ যথা সময়ে বিবেচ্য।

আফ্রিকায় ইউরোপীয় অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত পুরানো হলেও এই মহাদেশে ইউরোপীয় অধিকারের বিস্তার একশ' বছরেরও কম আগে সুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির ইতিহাসে এই কাহিনী চরম কলংকময়। কিন্তু বেলজিয়ামের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজ্য-বিস্তারের টেকনিকে পার্থক্য ছিল সুরু থেকেই। এক হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতে এটা একটা অভাবিত ঘটনা। ১৮৮৪ সালে বার্লিন সম্মেলনের পর বিসমার্কের ইঙ্গিতে নিরপেক্ষ বেলজিয়ামের রাজা ২য় লিওপোল্ড আফ্রিকা অভিযান সুরু করে কংগো দখল করেন। তাঁর অভিযানের প্রেরণা এসেছিল সুপ্রসিদ্ধ পর্যটক হেনরী মর্টন ষ্টান্‌লীর লণ্ডন ডেলী টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত আফ্রিকা-ভ্রমণের বৃত্তান্ত থেকে ১৮৭৬ সালে। লিওপোল্ড ছিলেন জাতিতে জার্মান, বিসমার্কের সঙ্গে উদ্ভবগত সাদৃশ্যে স্বজাতি। তাঁর উচ্চাশার সীমা ছিল না। নিরপেক্ষ বেলজিয়ামের সাদামাটী রাজত্ব দীর্ঘদিন তাঁকে আকৃষ্ট করার কথা নয়। সুতরাং আকর্ষণ এলো দূরদেশ কংগো থেকে—আয়তনে ছোটো বেলজিয়ামের ৭৭ গুণ বড়ো। লিওপোল্ডের রাজশিরে দুটী মুকুট উঠল,

একটা বেলজিয়ামের অন্যটা কংগোর। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল খুবই সৎ। প্রথমতঃ বেলজিয়ামের বৈদেশিক, অর্থনৈতিক জীবনের ব্যাপক উন্নতি করা এবং কংগোর ক্ষেত্রেও তাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা। এবং দ্বিতীয়তঃ আফ্রিকার এই কালো মানুষগুলোকে সুসভ্য করে তোলার পবিত্র দায়িত্ব পালন করা (sacred duty of civiliging the people)। ১৮৮৪ থেকে ১৯০৮ সাল, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে লিওপোল্ডের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের কোন বাধা কেউ দেয়নি। শাসনের প্রথম দশ বছরে রাজা লিওপোল্ড তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কংগোতে লগ্নী করেন ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড। স্বভাবতই এর প্রতিদান তিনি চাইবেন। প্রতিদানে সংগৃহীত হতে থাকলো প্রায় পোল্যাণ্ডের আয়তনের সমান অঞ্চল থেকে বাধ্যতামূলক শ্রমের ভিত্তিতে রবার ও অন্যান্য বনজ সম্পদ। যদি কোন কারণে এই রবার রপ্তানীর কাজে দেরী হতো, তার সহজ ব্যবস্থাও ছিল সেই সব লোকদের হাত, পা, কেটে দেওয়া। এই রক্তের বিনিময়ে সংগৃহীত রবার মধ্য আফ্রিকার "রেড রবার" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আর সভ্যতা-বিস্তারে রাজা লিওপোল্ড যে বিরাট মানবিক মূল্য-বোধের বিকাশ সাধন করেছিলেন তাতে এই সময়ের মধ্যে প্রাণ দিয়েছে ৩ কোটী কংগোবাসী। অবশ্য এর মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার কংগোবাসী গড়ে বছরে চালান গেছে আমেরিকার দেশে দেশে। সেলউইন জেমস্ মন্তব্য করেছেন তাঁর South of the congo পুস্তকে : "There was only one man who could be accused of the outrages which reduced the native population of the Congo from between 20 to 40 million in 1890 to 8·5 million in 1911— Leopold II."

সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারে এই অধিকারের আরেকটী বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হলো কংগো অধিকারে বেলজিয়াম পুঁজিপতিশ্রেণী, সরকার বা রাজনীতির কোন হাত ছিলনা। কংগো কলোনী সম্পূর্ণ লিওপোল্ডের কৃতিত্ব। শ্রীমতী Hannah Arendt মন্তব্য করছেন : "[It is a] story not of the expansion of the Belgian nation or even the Belgian bourgeoisie, but of the expansion of the Belgian king personally, unchecked by any govt. unconnected with any other institution. (Rise of Totalitarianism)

। দুই ।

২য় লিওপোল্ডের মৃত্যুর পর, বেলজিয়ান পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগোর শাসন ভার গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃত শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয় তিনটী সংস্থার উপর। এদেরই নাম সুবিখ্যাত Trinity। এরা হলো যথাক্রমে শাসন কর্তৃপক্ষ, বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ১৯০৮ থেকে ১৯৫৬ সাল, সুদীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে সমগ্র কংগো এদের শাসন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে কোন রাজনৈতিক দল বা পার্লামেন্ট এদের শাসনের কোন আলোচনা করাও দরকার মনে করেনি।

ট্রিনিটির শাসনকালেই সমগ্র সভ্যজগত কংগোকে চিনেছে মডেল কলোনী হিসেবে। রাজনীতির পরিভাষায় যাকে বলা হয়েছে "blue chip colony"। ত্রয়ী শাসনকে বেলজিয়ানরা অভিহিত করেছে কল্যাণকর কর্তৃত্ব বলে (benevolent paternalism)। তার উদ্দেশ্য ও পন্থা দুটীই নাকি নিবদ্ধ ছিল সমগ্র কংগো-বাসীর ঐকান্তিক মংগলের জন্যে। এবং সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে বেলজিয়ান শাসন কায়েম কংগোবাসীদের সেবা করার জন্যে, কারণ তা না হলে বিদেশী শাসনের কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। "we rule in order to serve. this is the sole excuse for conquest. It is also its complete justification."

কংগোর বেলজিয়ামের সরকারী প্রচার কেন্দ্র "Inforcongo"-র মতো, এই মডেল কলোনীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে বেলজিয়াম সরকার কংগোর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় কোন বাধাই মানেননি। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, স্থানে স্থানে খোলা হয়েছে হাসপাতাল আর ক্লিনিক, বিরাট দেশের দূরতম অঞ্চলগুলি পরস্পর

সংযুক্ত হয়েছে সুন্দর রাস্তাঘাটে। সেখানে মৃত্যুর হার গেছে কমে, এবং কাজের পরিমাণ এবং মজুরীও আশাতীতভাবে বেড়ে গেছে। রাজনৈতিক অধিকার যদি কংগোবাসীর নাও থাকে, তাহলে তাতে এমন কোন অসুবিধায় কংগোকে পড়তে হয়নি, যা তার অধিবাসীদের কোন রকম হীনমন্যতায় শিকার করে তোলে। Inforcongo নিজের দাক্ষিণ্য সম্পর্কে এতদূর সুনিশ্চিত ছিল যে তার বিবরণীতে একথা নির্বিচারে বলা হয়েছে যে কংগো বাসীর রাজনৈতিক জীবনের প্রয়োজন নেই। যথা: "It is true that no one votes in the Congo; They work, the Belgiams prefer administration to politics." সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানোতে বেলজিয়াম-সরকার কোনদিনই দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। দিনের পর দিন কংগোবাসী পেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাদের রুটী রুজির ব্যবস্থা করে দেবে না। যেমন: "Economic progress is the watchword which has given the Congo its remarkable development, and brought the natives an economic freedom in the form of bicycles, food medicine and housing which no amount of political liberty could have done" অন্যদিকে বিদেশের সমালোচক মানুষের কাছে বারবার এই সতর্কনীতির প্রচার করা হয়েছে যে বৃটেন, ফ্রান্সের মতো রাজনৈতিক অপরদর্শিতায় বলি বেলজিয়াম কোন দিনই হবে না, কংগোবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে। "The Congo is preoccupied above all with practical ends, and is suspicious of the abstract ideologies which else where in Afria have produced disastrous results."

॥ তিন ॥

জন গান্থারের মতে কংগো একটী বেলজিয়ামের অধীনস্থ কল্যাণব্রতী দেশ, যার শুধু মাত্র রাজনৈতিক অধিকারটাই নেই। বেলজিয়াম সরকার কংগোর সম্ভাব্য রাজনৈতিক চাঞ্চল্যকে অনেক পূর্বেই শক্তিহীন করে দিয়েছেন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে। দ্বিতীয়তঃ বেলজিয়াম সরকার যথাযথ স্পষ্ট ভাবেই অনুমান করেছিলেন যে কংগোর রাজনৈতিক ভবিষ্যত-নির্ণয়ের চাপ ততদিন প্রবলআকার ধারণ করবে না, যতদিন সেখানে বর্ণ-বৈষম্যের বিষ প্রবেশ করতে না পারে। অনেক আফ্রিকাবিশেষজ্ঞের মতে এই মহাদেশে বর্ণ-বৈষম্যের একটী প্রধান কারণ, বর্ণ-শ্বেত মানুষের অর্থনৈতিক কারণে স্থায়ী বসবাস। এবং দ্বিতীয় কারণ স্থায়ী শ্বেত বাসিন্দাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও চূড়ান্তভাবে শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্যে তাকে ব্যবহারের চেষ্টা। বেলজিয়াম সরকার এই দুটী কারণেরই প্রয়োজনমতো প্রতিষেধক নীতি গ্রহণে দ্বিধা করেননি।

প্রথমতঃ স্থায়ী বসবাসের বিরুদ্ধে সরকারী নীতি সুস্পষ্টভাবেই আপাগোড়া কার্যকরী করা হয়েছে। ৫০ হাজার বেলজিয়ান ফ্রাঙ্ক মূল্যের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ছাড়া কোন বেলজিয়ান নাগরিক কংগো ভ্রমণের অধিকার লাভ করতে পারত না। এবং কংগোয় বসবাস ও ব্যবসা প্রবর্তনের আনুমানিক নগদ মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াত প্রায় হাজার পাউন্ডে, যা যে কোন নাগরিকের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। সুতরাং বেলজিয়ান নাগরিকদের কংগো আগমন ঘটেছে চুক্তিবদ্ধ ভাবে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এবং চুক্তির কার্যকাল শেষে তারা স্বদেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কংগোবাসী বেলজিয়ান নাগরিকদের বেলজিয়াম সরকার কেনিয়ার মতো রাজনৈতিক দল গঠনে অথবা রোডেসিয়ার মতো শ্রমিক সংঘ গঠনে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয়নি। ফলতঃ কংগোর শ্বেত বেলজিয়ান নাগরিক ও সাধারণ কংগোবাসী কালো মানুষ সকলেই তারা কংগোর ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সর্বময় কর্তৃত্বের অধীন। শ্বেত বেলজিয়ান নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কংগোর কারো কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ আইনানুমোদিত ছিল না।

অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গ কংগোবাসীদের বিরুদ্ধে বর্ণ বৈষম্যের বাধা সৃষ্টি করা হয়নি এটা যতো সত্য ঠিক ততোটা সত্য যে তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ যে

পরিমাণে দেওয়া হয়েছে, সেই পরিমাণে শ্বেত বেলজিয়ানের সঙ্গে সমান অধিকার কোন দিনই দেওয়া হয়নি। অর্থনৈতিক সুযোগের মাধ্যম কংগোবাসী কালো মানুষদের জন্যে চিরকালই ছিল সেই সমস্ত কাজ যেখানে কারিগরি-দক্ষতা পেশাগত, অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে আয়ত্ব করা সম্ভব। উচ্চতর পদ-লাভের জন্যে দক্ষতা অর্জনের ইচ্ছায় কংগোবাসী কালো মানুষদের বিদেশ যাত্রা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

কারণ ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও মানসিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার পর কংগোবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা অত্যন্ত বেশি। তাদের কাঁচা নরম মনে ইউরোপের চিন্তাধারা অপরিণত রাজনৈতিক তত্ত্বের বিষ এনে দিতে পারে।

সেই একই কারণে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার কংগোতে কোন দিনই বেলজিয়ামের অনুমোদন লাভ করেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে যে সমস্ত সৌভাগ্যবান কংগোবাসী উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। তাদের সংখ্যা এক হাতেই গোণা সম্ভব। মাত্র জুন মাসে যেদিন বেলজিয়ান কর্তৃত্বের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলো। সেদিন সমগ্র কংগোয় গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭ জন, এবং উচ্চতর রাজকর্মে নিযুক্ত কংগোবাসী ছিল মাত্র জন। সমগ্র কংগোয় কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসাবিদের সংখ্যা শূন্য, এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের এমনই বিস্ময়কর প্রসার ঘটেছিল যে মাত্র ২০ জন ডাক্তার (যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন) পেতে গেলে কংগোকে অপেক্ষা করতে হবে আরো পাঁচ বছর। "স্টি নিটি" কিম্বা "ইনকুর কংগো" কোন প্রতিষ্ঠানের সরকারী বিবরণীতে একথা প্রকাশিত হয়নি। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে মধ্য বিংশ শতাব্দীতে এই বিস্ময়কর অজ্ঞতা অনাবিষ্কৃত থাকতো, যদি না স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যে জাতিপুঞ্জের সাহায্যের প্রয়োজন না ঘটত। সুতরাং blue chip colony কংগোর সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি বেলজিয়াম শাসনে সুন্দরভাবে সাধিত হয়েছে সেটা নিঃসন্দেহ।

॥ চার ॥

কিন্তু প্রশ্ন হলো এতো সাবধানতার মধ্যেও রাজনীতির দাবী কিভাবে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল? ইংরেজ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের তথাকথিত উদার-নৈতিক নীতি যে ভাবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, বেলজিয়াম সেই সম্ভাবনা এড়াবার ঐকান্তিক চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিস্ময়কর অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী স্বীকার করে নিল কেন? এটা কি বেলজিয়ামের নীতিগত উদারতা? কংগোর সমাজজীবনের ভিত্তিতে তার জবাব মিলবে। Trinity বা ত্রয়ী শাসনের স্থায়ী শক্তি ছিল শুধু মাত্র বর্ণশ্বেত কংগো প্রবাসী বেলজিয়ানদের সমবায়ে গঠিত এক লক্ষ কোলনের (Colon) মধ্যে। কংগোর শাসন ভার ন্যস্ত ছিল একজন গভর্ণর জেনারেলের হাতে, যিনি একদল পরামর্শদাতার সাহায্যে শাসন পরিচালনা করতেন। আইনের দিক থেকে তিনি বেলজিয়ানরাজ ও বেলজিয়ান পার্লামেন্টের অধীন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বেলজিয়ামের নিজস্ব রাজনীতি যখন কংগো সমস্যার চাপে কোন দিনই আলোড়িত হয়নি, তখন সেকথা এটাই সপ্রমাণ করে যে গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন কার্যতঃ স্বাধীন। ফলত ব্রাসেল্‌সে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত যেমন লিওপোল্ডভিল মানত না, তেমনি লিওপোল্ডভিলের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা না করা নির্ভর করতো কোলনগুলির উপর। সুতরাং শাসন কার্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতা-সম্বলিত কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অবর্তমানে কংগোর আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রাধান্যই ছিল সবচেয়ে বেশি।

১৯৫৮ সালে বেলজিয়াম পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ক্ষমতা দখল করে উদারনৈতিক সমাজ-বাদীরা এবং এই প্রথম বেলজিয়াম গভর্ণমেন্ট ও কংগোর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। সমাজবাদীরা মনে করতেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা চার্চের অধীনে না রেখে সরাসরি শাসন কর্তৃপক্ষের অধীনে আনা প্রয়োজন। রোমান ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষা ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপের কথা ইতিপূর্বে আভাষিত ছিল। আর সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে মিশন স্কুলে শিক্ষিত সামাজ সংখ্যক

কিন্তু প্রভূত প্রতিপত্তিশালী কালো মানুষেরা, যাদের বলা হতো evolues বা আধা বেলজিয়ান খৃষ্টধর্মী কংগোবাসী (অনেকটা আমাদের দেশীয় খৃষ্টানদের মতো)। সাধারণ দক্ষিণ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ আফ্রিকার অনেক উপনিবেশেই মিশন স্কুল সে সময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতীয়তাবোধ উন্মেষের প্রাথমিক কেন্দ্র। সেখানকার কর্তৃপক্ষও অনেক সময় পরোক্ষ আপোষের মনোভাব নিয়ে এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করেছিলেন। কংগো দেশেও কিছু কিছু জেসুইট পাদ্রী এবং উদার ক্যাথলিক শিক্ষকবৃন্দ অনুরূপ পরিবর্তনের স্বপক্ষে আন্দোলন করছিলেন। বেলজিয়ামের নতুন সমাজবাদী সরকারের নীতিও এদের সমর্থন করছিল। কারণ বেলজিয়াম সরকার অনুমান করতে সুরু করেছিলেন যে সমগ্র আফ্রিকায় যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, তার রেশ কংগোকেও স্পর্শ করবে। সুতরাং সংস্কারের মনোভাব যে জাতীয়তাবাদের সম্ভাব্য চাপকে দুর্বল করে রাখবে এ ধারণা তখন করাই স্বাভাবিক। তখন কংগোর বড়ো বড়ো শহরে evolues-দের নেতৃত্বে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে। লিওপোল্ডভিলেতে বর্তমান কংগোর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা প্যাট্রিশলুমুম্বা এবং জোসেফ্ কাসাভুবু তখন সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধীরে সতর্কভাবে রাজনীতির আমদানী সুরু করেছেন।

বেলজিয়ামের পুঁজিপতিশ্রেণীও এই পরিবর্তনের কথা অনুভব করতে সুরু করেছিল। চারিদিকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ারে কংগোর নিশ্চিন্ত অরাজনৈতিক জীবনধারা যে দীর্ঘকাল থাকতে পারে না, এই ধারণা থেকেই তাদের লক্ষ্য হলো নিরাপদ অনুগত নেতৃবৃন্দ সৃষ্টির দিকে। আফ্রিকার সম্পদ আহরণ করতে গেলে যে আফ্রিকার মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন, সেই সহযোগিতা যতোই বেলজিয়ামের উদ্যোগে লাভ করা যায় সে চেষ্টাই হলো তাদের প্রাথমিক কাজ। বিস্তীর্ণ কংগো দেশের প্রভূত খনিজ সম্পদের উৎস হলো কাটাঙ্গা ও কাসাই প্রদেশ। প্রধানতঃ বালুবা ও লুলুয়া উপজাতীয়দের বাসভূমি। পুঁজিপতিদের সমর্থন লাভ করল কাটাঙ্গার বালুবা নেতা মোশে শোম্বে। আর বেলজিয়ামের আনুকূল্যে গড়ে উঠল কাটাঙ্গার পরম বেলজিয়ান ভক্ত কোনাকাট দল (conakat)। এতোলুইদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন যে বর্তমান কংগোর নানা রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন করেছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আধা বেলজিয়ান দেশীয় কংগোলীজ খৃষ্টানদের পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও এদের উপজাতীয় আনুগত্য খুব কম ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত হয়েছিল। এবং সামান্য শিক্ষিত কংগোবাসীদের কাছে উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ঝোঁক এর ফলে আরো বেড়ে যায়। জোসেফ্ কাসাভুবুর নেতৃত্বে গঠিত বাকংগো সাংস্কৃতিক সমিতি· সেটা পরবর্তীকালে আবাকো রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়, তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এবং আছে স্বতন্ত্র বাকংগো রাজ্য গঠন। বাকংগো দলের মধ্যে একটা প্রচলিত কাহিনী আছে। সেটা তাদের নেতা কাসাভুবুর নামের সঙ্গে জড়িত। স্বতন্ত্র রাজ্য-গঠনের শপথ গ্রহণের পর, বাকংগো উপজাতির স্ত্রী পুরুষ, চিতাবাঘের চামড়ার উপর তরবারি হাতে অর্ধ উলঙ্গ নেতা কাসাভুবুর পদচুম্বন করে আনুগত্য প্রদর্শন করছে। সেখানে তিনি কংগো নদীর মোহনায় বাকংগো রাজ্য গঠনের কথা বলছেন যার সঙ্গে যুক্ত হবে বর্তমান ফরাসী কংগো ও পর্তুগীজ অ্যাংগোলার অন্তর্ভুক্ত বাকংগো অঞ্চল।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে কংগোর একমাত্র জাতীয়তা-বাদী নেতা হলেন প্যাট্রিশ লুমুম্বা। ১৯৫৮ সালে তাঁর মুভমেণ্ট ন্যাশনাল কংগোলীজ দল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন কংগোতে একটা এককেন্দ্রিক শক্তিমান জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনের জন্যে। লুমুম্বার সমর্থন কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যদিও উত্তরের স্টানলীন ভিলেতে তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা সর্বাধিক। বিস্তীর্ণ কংগো দেশের সর্বত্রই তাঁর দল রাজনৈতিক কাজ করে যাচ্ছে। এমন কি বেলজিয়ামের পুঁজিপতি-শ্রেণীর প্রত্যক্ষ প্রভাব-পুষ্ট শোম্বের কাটাঙ্গাতেও এক শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁর অনুগামী। লুমুম্বার রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুপ্রেরণা এসেছে ঘানার

বর্তমান প্রেসিডেন্ট কোয়ামে এনক্রুমার মতামত থেকে। যানার মতোই লুমুম্বার ধারণা ছিল যে, স্বাধীন কংগো বেলজিয়ামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে পারবে। তাই তিনি অল্প কিছু কাল আগেই ঘোষণা করেছিলেন: "We are now ready to work with the Power who have been in Africa to create a powerful new bloc"...। একথা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে প্যাট্রিস লুমুম্বা কোনঅর্থেই কম্যুনিস্টপন্থী বা রুশপ্রীতির অনুগামী নন।

। পাঁচ ।

কংগোর রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস অতি অল্পকালের ঘটনা। ১৯৫৯-৫৮ সালেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। নিম্ন কংগো অঞ্চলে আবাকো দলের আন্দোলনের তীব্রতা ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে অপ্রত্যাশিত ভাবে বেড়ে যায়। আবাকো কার্যকরীভাবে বেলজিয়ামের শাসকমণ্ডলীকে আঘাত করে, আদালত প্রতিষ্ঠা ট্যাক্স বন্ধ ও অনুরূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাকংগোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করানো। রাজাহাজামা সমগ্র নিম্ন কংগোয় ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।

ব্রাসেলস কর্তৃপক্ষ দমননীতি গ্রহণ করতে সাহসী না হয়ে ১৯৫৯ এপ্রিল মাসে একটি সর্বদলীয় বেলজিয়াম পার্লামেন্টারী কমিশন প্রেরণ করে। কংগোর ঘুমায়মান রাজনৈতিক সমস্যা পাছে দেশব্যাপী একটা গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, তাই বেলজিয়ামের লক্ষ্য হয়, পূর্বাহ্নেই তার ব্যবস্থা করা। এই কমিশনের রিপোর্ট নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইবারই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় যে, Inforcongoর বুলেটিন কেবল সত্য গোপনই করেছে তা নয়, তার বিশ্লেষণ আলোচনা ও সমাধানের কোন ব্যবস্থাই করেনি। বিচার বিভাগের একটি মারাত্মক অপকীর্তির উদাহরণ দেখিয়ে কমিশন মন্তব্য করেন যেখানে বিদেশী শাসক নিজেই বিচারক ও জুরীর কাজ করে, সেখানে শাসিত মানুষ সামান্যতম সুবিচারের আশাও কখনো করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কংগোর তথাকথিত বর্ণবৈষম্যহীন সমাজে, কোনো কংগোবাসী এবং কংগো-প্রবাসী বেলজিয়ানদের বাসস্থান ক্লাব, রেস্তোরাঁ সমস্তই পৃথক। এমনকি সরকারী সমর্থন-পুষ্ট এভোলুইরাও এই একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। তাদের বেলজিয়ামের শ্বেত মানুষদের সমকক্ষ মনে করার কোন চেষ্টাও কোনদিন করা হয়নি। বরং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের উপজাতীয় আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে বরাবর সচেষ্ট ছিল বর্ণবৈষম্যের আনুষ্ঠানিক সমর্থন না জানিয়ে উপজাতীয় বিরোধের সমর্থন করতে।

কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রাসেলসে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বেলজিয়াম সরকার অর্থ সামর্থ্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছিল এই বৈঠকে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে না পৌঁছবার জন্যে। উপজাতীয় আনুগত্যই ছিল সেখানে প্রধান আশা। কিন্তু অযাচিত ভাবেই এই বৈঠকে অবিলম্বে রাষ্ট্রিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার দাবী করা হয় সমগ্র কংগোবাসীর তরফ থেকে সম্মিলিতভাবে। বেলজিয়ামের সামনে মাত্র দুটি পথ ছিল। হয় সরাসরি এই দাবী অগ্রাহ্য করে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করা কিম্বা এমন ভাবেই স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া যাতে স্বাধীন কংগো বেলজিয়ামের সাহায্য ব্যতিরেকে একদিনও চলতে না পারে। বেলজিয়াম এই শেষোক্ত অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথই বেছে নিয়েছিল। জানুয়ারী থেকে জুন এই পাঁচ ছয় মাসের প্রস্তুতিতে নির্বাচন হলো সমগ্র কংগোয়। নির্বাচন পরিচালনা করেছে বেলজিয়াম। স্থির হয়েছিল এই নির্বাচনের পর নবগঠিত কংগো পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে ৩০শে জুন ১৯৬০।

নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে; এবং বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ শুরু থেকেই সতর্ক ছিল তাদের প্রধান শত্রু ঐক্যকামী প্যাট্রিস লুমুম্বা সম্পর্কে। সুতরাং বিভক্ত দুর্বল কংগো গঠনের উদ্দেশ্যে যতোদূর সম্ভব সমস্ত রকমে উপজাতীয় বিরোধ-বিভেদকে বেলজিয়াম সমর্থন জানিয়েছে আনুষ্ঠানভাবে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল আশাতীতভাবে লুমুম্বার পক্ষে গিয়েছে। ১৩৭টি আসনযুক্ত কংগো পার্লামেন্টে লুমুম্বার মুভমেন্ট ন্যাশনাল কংগোলীজ দখল করে ৩৩টি আসন। Inforcongoর কংগোবাসী কর্তা বলি-

কংগোর সিপলস্ ন্যাশনাল দল পায় ১৯টি, লুমুম্বা সমর্থক কংগোর মার্কসবাদী নেতা (?) অ্যান্টনিন সিজেনগার আফ্রিকান সলিডারিটি দল, যার সংগে তীব্র প্রতিযোগিতা হয় কাসাভুবুর আবাকো দলের, লিওপোল্ডভিলে প্রদেশের ২৪টি আসনের ১৩টি দখল করেন সিজেনগা আর বাকী ১২টি পান কাসাভুবু। শোম্বের কোনাকাট ও অন্যান্য বহু দল উপদলের মধ্যে বাকী আসন সংখ্যা ভাগ হয়ে যায়। সুতরাং নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন প্যাট্রিস লুমুম্বা। কিন্তু বেলজিয়াম গভর্ণর-জেনারেল লুমুম্বার এই রাজনৈতিক মর্যাদাকে অস্বীকার করে প্রথম আহ্বান জানান কাসাভুবুকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে। যে আহ্বান যথাযথভাবে লুমুম্বার কাছে প্রথমে আসা উচিত ছিল। স্বভাবতই বেলজিয়াম সরকারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লুমুম্বা সন্দিহান হয়ে ওঠেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে শোম্বের মন্ত্রিসভায় যোগদান উপলক্ষে। লুমুম্বা যখন মন্ত্রিসভা গঠনের কাজে হাত দিয়েছেন, তখন শোম্বেও তাতে যোগদান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। যদিও নির্বাচনে শোম্বে, লুমুম্বার দল ও নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন, তবুও লুমুম্বার এই সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া জানাতে খুব অনিচ্ছা কোনদিনই ছিল না। শোম্বে প্রথমে স্বীকৃতি জানান, কিন্তু সেটা সর্ত-সাপেক্ষ ছিল। এবং এই সর্তের ব্যাপ্যায় এমনই অসম্ভব দাবী উপস্থিত করেন যা কোনমতেই স্বীকৃত হতে পারে না। সুতরাং প্রাক্-নির্বাচনী পর্বে কোনাকাট দলের সংগে বেলজিয়াম পুঁজিপতি শ্রেণীর যে রাজনৈতিক সম্পর্কের সন্দেহ ছিল, সেটাই এখন শোম্বের অনমনীয় মনোভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে জোসেফ কাসাভুবু নির্বাচনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লুমুম্বা বিরোধী হিসেবে, শোম্বের কোনাকাট দলের সংগে সখ্যতায়। তাই ৩০ জুনের স্বাধীনতা দিবসে যদিও কাসাভুবু সাময়িকভাবে লুমুম্বা বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের আসন গ্রহণে সম্মত হন এবং লুমুম্বা সর্বসম্মতিক্রমে না হলেও পার্লামেন্টের সংযুক্ত দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেন, তবুও সেইদিনই কাটাঙ্গায় শোম্বে এর বিরোধিতা করে নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে বদ্ধপরিকর হন। কংগো স্বাধীন হলো বিচ্ছিন্ন, দুর্বল, পরস্পরবিরোধী রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ার জন্যেই। বেলজিয়ামের দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রধান উদ্দেশ্য প্রায় সাফল্যের কাছাকাছি এসে পড়ে। এই প্রসংগে বিখ্যাত আফ্রিকা-বিশেষজ্ঞ রাসেল ওয়াবেন হো এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "It proves that to give Independance "at once" is a cruel trick for a Europlan country to play on a former source of revenue and not, as might reasonably be thought, an act of great political generosity." স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরের ঘটনা একথার সত্যতা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করেছে।

॥ ছয় ॥

কংগোর রাজনৈতিক দলগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের উপজাতীয় এবং আঞ্চলিক আনুগত্য। সুতরাং ৩০শে জুনের জাতীয় ঐক্যের মহান আদর্শ ছিল একটা অত্যন্ত সাময়িক ঘটনা। লুমুম্বার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের দাবীতে বেলজিয়াম সৈন্য বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, দীর্ঘদিনের বিরোধ, স্বার্থপরতা স্বরূপ ধারণ করে। নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে এ এক চরম দুর্দিন। ক্ষমতাহীন নেতৃবৃন্দ পরস্পরের প্রতি সন্দেহের মনোভাব-সম্পন্ন। সরকার পরিচালনার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ও মানসিক দৃঢ়তার একান্ত অভাব এবং উপযুক্ত অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন শাসক মণ্ডলীর অনুপস্থিতি, নতুন রাষ্ট্রের কার্যকরী ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিল। ফলে চাপা পড়া বিরোধ এবং অসন্তোষ অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। ঐক্যবিহীন, অকর্মণ্য সরকারের চোখের সামনেই। এই অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল কংগোর সৈন্য বাহিনী।

পঁচিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত এই বাহিনী চিরকাল বেলজিয়াম অফিসার ও বিভিন্ন পদস্থ সামরিক কর্মচারীর অধীনে সংগঠিত হয়েছে। বেলজিয়ামের শাসনতান্ত্রিক স্বার্থেই তাদের করা হয়েছিল চূড়ান্তভাবে নির্মম ও বর্বর। অথচ এদের কেউই দীর্ঘদিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব-সম্পন্ন পদলাভ করতে পারেনি। শ্বেত অফিসারদের

বিদ্রোহের পর তাদের সামনে এমন আর কেউ রইল না যার নেতৃত্ব ও মর্যাদা এরা নির্বিচারে মেনে নিতে পারে। অথচ সমস্ত দেশের মধ্যেই তারাই সুগঠিত সংস্থা যাদের ঐক্য বেলজিয়ামের বিদায়ের পরেও অটুট আছে। কংগোর রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এবার প্রবেশ করলো এই সংগঠিত নেতৃত্ব-বিহীন সেনা বাহিনী।

বেলজিয়ামের অধীনতা শেষ হওয়ার পর সমগ্র কংগো দেশে নেমে এলো একটা বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা যেখানে ক্ষমতার ব্যবহার করার শক্তি কারো নেই। সেনাবাহিনী তাই সচেষ্ট হয়েছে এই শূন্যতা পূরণ করার জন্যে। এবং একথা অনস্বীকার্য যে সেনা-বাহিনীর সাহায্য ছাড়া কোন দল বা কোন নেতার পক্ষেই কংগোতে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের ২৪শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে। "No politician or group of politicians can hope to give the Congo a semblence of stability without controlling the army which remains the only real lever of power." সুতরাং কংগোর বর্তমান সামরিক নেতা মবুতুর গুরুত্ব এই প্রসঙ্গে স্বীকার অনুমান করা যায়। স্বাধীনতা দিবসের মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সামরিক বাহিনী বিদ্রোহ করে। শুরুতে ধারণা ছিল প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার সামরিক বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব যথেষ্ট। কিন্তু জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে সেই কর্তৃত্বের বনিয়াদে ফাটল ধরতে শুরু করে এবং শেষ হয় যেদিন কংগোর সামরিক বাহিনীর একাংশ লুমুম্বাকে হত্যা করার জন্যে ধাওয়া করে। সেইদিন জাতিপুঞ্জের সামরিক বাহিনীর প্রচেষ্টাতেই লুমুম্বার প্রাণরক্ষা পায়, আর সেই থেকেই তিনি তাদের প্রহরাধীনে বসবাস শুরু করেছেন। মাত্র সেদিন তিনি গোপন পথে পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

সামরিক বাহিনীর সাহায্যে রাষ্ট্রপতি কাসাভুবুর রাজনৈতিক মর্যাদাও রক্ষিত হয়েছে। যে কারণে কর্ণেল মবুতু ও তাঁর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত কলেজ অব্ কমিশনারস্ বর্তমান কংগোর সুবিধা সুযোগ মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যে কাসাভুবু গোড়ায় সামরিক বাহিনীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি আজ তার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ণীত হচ্ছে সেই সামরিক বাহিনীর সাহায্যে।

জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে আগষ্টের শেষ পর্যন্ত সমগ্র কংগোর বিরাজ করেছে একটা রাজনৈতিক অচলাবস্থা। শক্তিহীন প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা ও নিষ্ক্রিয় কিন্তু সুযোগ সন্ধানী রাষ্ট্রপতি কাসাভুবুর পুরানো বিরোধ দিনের পর দিন বেড়ে গেছে। আর দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা-বিধান ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় সামরিক ভাবে ঠেকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে এ সময়ে প্রায়ই ধরা পড়েছে যে কংগোর কার্যকরী শাসনকর্তা (de facto) লুমুম্বা-কাসাভুবু নয়, জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ডাঃ রাল্‌ফ্ বুকে। ডাঃ রাল্‌ফ্ বুকে আমেরিকার নর্থ ডাকোটার নিগ্রো এবং সে দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের আস্থাভাজন ব্যক্তি। সুতরাং তার উপস্থিতি ও জাতিপুঞ্জের কাজের পরিচালনা সে সময় ব্যাপকভাবে এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে সদ্য স্বাধীন কংগো দেশ আমেরিকার রাজনীতির আওতায় এসে পড়েছে, যাকে স্বীকার করা সম্ভব নয়। সেপ্টেম্বরের শুরুতে ডাঃ বুকের স্থানে আসলেন ভারতের রাজেশ্বর দয়াল, হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে। দয়ালের বিরোধী মনে কংগো পরিস্থিতির সঠিক রূপটি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে, বেলজিয়াম, ফ্রান্সে এবং আমেরিকার কোন কোন মহলে দয়াল-বিরোধী মতামত তীব্রভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। অন্যদিকে কংগোর কেন্দ্রশক্তির এই দুর্বলতার সুযোগে কাটাঙ্গা কাসাই ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল বেলজিয়াম নাগরিক। এবং শুধু আগষ্ট মাসের মধ্যেই ফিরে এলো ২৬ হাজার বেলজিয়াম। কাটাঙ্গার শোম্বে, কাসাই প্রদেশে কালানজী এবং বাকী সমগ্র কংগো দেশে মবুতু ও তার সঙ্গী সাথীদের কাজ কর্মের তীব্রতা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পেল। ঠিক এই সময়ে রাষ্ট্রপতি কাসাভুবু এক রেডিও বক্তৃতায় লুমুম্বাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করে, কংগো পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষে সেনেটের

সভাপতি জোসেফ ইলিওকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব বোঝার আগেই পরপর দুটি রেডিও বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা, কাসাভুবুর এই আচরণ অবৈধ ঘোষণা করে, মৌলিক আইন লঙ্ঘনের অপরাধে কাসাভুবু রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত বলে ঘোষণা করলেন।

কঙ্গোর মৌলিক আইনে (Loi Fundomental) বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতির, কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা মনোনয়ন এবং মনোনীত মন্ত্রিসভা বাতিল করার অধিকার আছে। কাসাভুবুর লুমুম্বাকে বাতিল ঘোষণা করার আইনগত ভিত্তি এইখানে। কিন্তু মৌলিক আইনে একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, রাষ্ট্রপতির কোন আদেশ বা নির্দেশ আইন-সিদ্ধ ও কার্যকরী হতে গেলে, প্রধান মন্ত্রী বা মন্ত্রি সভার কোন সদস্যের স্বাক্ষর যুক্ত হওয়া চাই ("no act of the head of state can have effect unless it is countersigned by a Minister who thus becomes responsible (for that act.") এই হিসেবে, লুমুম্বার মতে কাসাভুবুর আদেশ সংবিধান বিরোধী।

এই দুই নেতার মধ্যে বিরোধ যতো তীব্র আকার ধারণ করেছে, কর্নেল মবুতুর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর দাপট সেই পরিমাণে বেড়ে গেছে। যদিও বিভিন্ন যোগসূত্রের সংবাদে একথা স্পষ্ট যে মবুতু প্রত্যক্ষভাবে বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে, তবুও রাষ্ট্রসংঘ তার প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্পর্কে একমত হতে পারেননি। রাষ্ট্র সংঘের পঞ্চদশ অধিবেশনে এই বিষয়ে মতভেদ সোভিয়েত ও আমেরিকা এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে এতোই তীব্র হয়েছে, যে কঙ্গো সমস্যার সমাধান মনে হয়েছে সুদূর পরাহত। এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজনীতির অনেক অভাবিত ঘটনাই যে কঙ্গোকে নিয়ে ঘটবে তা নিঃসন্দেহ।

॥ সাত ॥

আমেরিকার রাজনীতিতে কঙ্গোর গুরুত্ব প্রধানতঃ ইউরেনিয়ামের জন্যে। এই ধনিজ দ্রব্য আণবিক বোমার প্রধান উপাদান। যতো দিন কঙ্গো সম্পূর্ণ-ভাবে বেলজিয়াম উপনিবেশ ছিল, ততদিন এই সরবরাহ বন্ধ হওয়ার আশংকা ছিল না। কারণ আমেরিকার যুদ্ধ জোট NATO-র সক্রিয় সদস্য বেলজিয়াম। এই মহাযুদ্ধে কঙ্গোর ইউরেনিয়ামই আমেরিকাকে জয়লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধোত্তর কালে এর চাহিদা বেড়েছে আরো বহু গুণ। সেজিয়ার নামক যে বেলজিয়াম নাগরিক এই বহুমূল্যবান পদার্থ সরবরাহ করেছিলেন, তাকে আমেরিকা সরকার মেডেল অব্ মেরিট দিয়ে সম্মানিত করেন। এবং তিনিই বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি যিনি আমেরিকান নাগরিক না হয়েও এই বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন। ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর নিউ ইয়র্ক টাইমসে এক টুকরো সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৭৬ সালে অমেরিকা বেলজিয়ামের কাছ থেকে কিনেছে ৩৬০০ টন ইউরেনিয়ম ৪৩ লক্ষ ৩২ হাজার ডলারের বিনিময়ে।

সুতরাং কঙ্গোয় আমেরিকার নীতি সাধারণ ভাবে এমন এক সরকারকে সমর্থন করা, কিম্বা এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করা, যেখানে আমেরিকার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, লুমুম্বার প্রধান মন্ত্রীত্বের অল্প কালের মধ্যেই আমেরিকার পুঁজিপতিশ্রেণীর একাংশ মিঃ এডগার স্টেট্টওয়াইনিয়াসের নেতৃত্বে বেসরকারী প্রস্তুত পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। যদিও রাজনৈতিক অস্থায়ীত্ব সেই চুক্তিকে কার্যকরী করতে দেয়নি। অতএব সঙ্গতভাবেই বলা যায় কাসাভুবু-মবুতু-শোম্বে চক্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বর্তমানে এবং আগেগোড়া বেলজিয়াম তথা আমেরিকার মৌলিক নীতির অনুগামী ছিল বলেই, লুমুম্বা ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী কঙ্গোবাসীদের স্বপ্ন ধূলাবলুণ্ঠিত হতে বাধ্য হয়েছে। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ রাজেশ্বর দয়ালের সর্বাধুনিক বিবরণী।

রাজেশ্বর দয়ালের প্রায় তিন মাস কার্যকালের মধ্যে দুটী রিপোর্ট রাষ্ট্রসংঘে প্রেরিত হয়েছে। দুটী রিপোর্টের মূল বক্তব্য একই। তার সারমর্ম হলো এই যে, কঙ্গোর স্থায়ী শান্তি ও সংবিধানের মর্যাদা পুনঃ

ইনীর অস্বীকার। দ্বিতীয়তঃ বেলজিয়ামের ামরিক নাগরিকবৃন্দের অপসরণ। তৃতীয়ত কংগোর ীমেন্টের পুনর্বাধিবেশন। স্বরণীয় যে ভারত, া, সিরি, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও সমাজতন্ত্রী দেশ-লির যৌথ দাবী প্রথম থেকেই এই প্রসঙ্গে উঠেছে। লের ২য় রিপোর্ট পেশ করা হয় ৩রা নভেম্বর। দিনই বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্পিয়ের উইগনী ATO-র সদস্যদের কাছে এই মর্মে আবেদন করেন । তারা দলের রিপোর্ট বর্জন করে, বেলজিয়ামের তকে আরো অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। রাষ্ট্রসংঘের ান অধিবেশনে কংগো সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ রছে। কিন্তু কংগোর রাজনৈতিক অস্থায়ীত্বে কোন উনিধি দল সে আসন গ্রহণ করবে তা স্থিরীকৃত হওয়ায় সে আসন শূন্য ছিল। রাষ্ট্রপতি কাসভুবু ভিনি বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিই স্বাধীন কংগোর একমাত্র প্রতিনিধি। এশিয়া-আফ্রিকার ২৪টী রাষ্ট্রের আলোচ্য কমিটিও এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্যে অনুরোধ জানান। দীর্ঘ নেপথ্য আলোচনা ও কূটনৈতিক চাপের ফলে গত ২৩শে নভেম্বর কাসাভুবুর দাবী স্বীকৃত হয়েছে। এবং এরই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিওপোল্ডভিলের রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীভুক্ত ভারতীয় সেনাদলের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী স্বগৃহে আক্রান্ত ও প্রহৃত হয়েছেন।

কংগোর রাজনীতির এই আকস্মিক পরিবর্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি ও প্রকৃতির বিশেষ এক স্তরের প্রতি ইংগিত করে। স্নায়ু যুদ্ধের যে আগুনে ইউরোপ ও এশিয়া জর্জরিত আফ্রিকায় অত্যন্তরেও তার প্রয়োগ সুরু হলো।

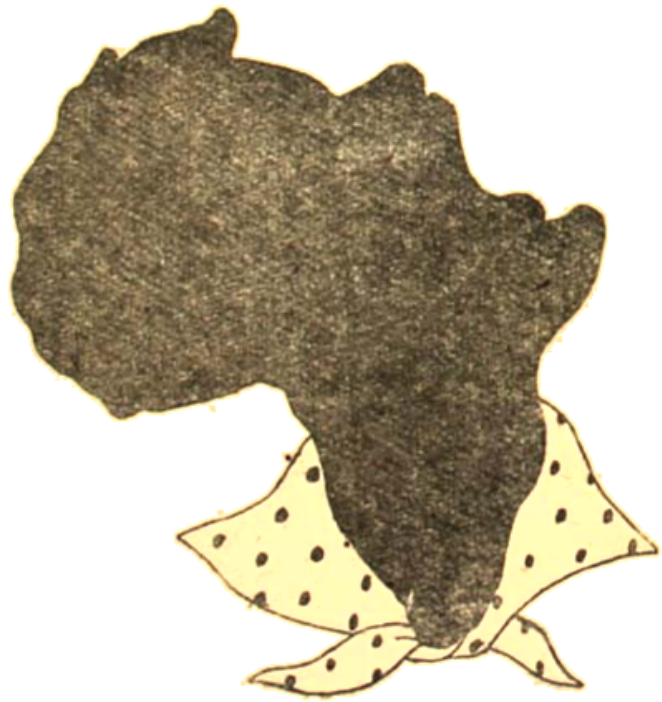

সাঁ জঁ পার্স

বিকাশ সরকার

উপসাগরে একটা ছোট
ন বাস দ্বীপে গত
তাব্দীর শেষ দশকে
ব ছোট ছেলে টি
তলান্তিকের ঢেউয়ের
র্জন ওনত আর
নরক্ষীয় অঞ্চলের
বুজের সমারোহে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঘুরে
ই দ্বীপের লোকেরা আজ নিশ্চয়ই ভুলে গেছে
াপ-দেশের জল হাওয়া আর মানুষগুলো, যাদের জীবনে
াপ রেখেছে নানা জাতির বৈশিষ্ট্য আর নানা ঐতিহ্যের
মিশ্রণ। যেখানে নিগ্রো আর শ্বেত মানুষদের জীবন
নেকখানি মেশামেশি, যেখানে মানুষে আর প্রকৃতিতে
গভীর একটা সম্পর্ক, সেখানকার স্মৃতি কিন্তু সেদিনের
ই ছেলেটীর আজকের মনে এখনও রয়ে গেছে।
লেটী জাতে ফরাসী, ভাষাও তাই। সপ্তাদশ শতাব্দীতে তার
র্বপুরুষ ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি
ঞ্চল ছেড়ে এ খা নে
সা বাঁধে গুয়াদালোপ
পে। তা র প র
াছাকাছি একটা ছোট
প তাদের অধিকারে
াসে যার নাম হলো
লেজে-লে জুগলে।
পুরানো সনাতন-
স্থী ফরাসী পরিবার
া। ছেলেটির বাবার
াক ছিল নৌচালনায়
র অখা রো হ ণে।
বার কাছে থেকে এর
তি আ গ্র হ ও তার
জাত হয়েছে। আর
পে য়েছে শৈশবে
জন বৃদ্ধ বিশপের

রমনীর স্নেহ, যে সাহচা
আর স্নেহ সে দি য়ে
কি শো র ম নে
অনেকখানি জুড়ে ছিল
১৮৯৮ সালের কথা
একটী কিশোর পল্লি
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে
ফরাসী দেশে পৌছল। উদ্দেশ্য এখানে পড়াশুনো করে
ডাক্তার হওয়া। ছেলেটার নাম আলেক্সিস্যাঁ লিজে। কিশোর
আলেক্সি কিন্তু ডাক্তার হতে চায়নি। পালাবার পথ খুঁজে
পররাষ্ট্রে দপ্তরের কর্মপ্রার্থীদের তখন একরকম পরীক্ষার
মাধ্যমে মনোনীত করা হত। আলেক্সি ঠিক করল ডাক্তারি
নয়, এই পরীক্ষা দিতে হবে কারণ পররাষ্ট্র দপ্তরের
অধীনে চাকরীতে অন্তত পৃথিবীর নানা জায়গায় যাওয়ার
সুযোগ আছে, যা সহজে অন্যত্র মিলবে না আর
এর মধ্যে কেটেও গেল বেশ কয়েকটা বছর। ১৯১৪
সাল প্রথম মহাযুদ্ধের
সুরু হলো. আলেক্সি
চাকরী পেলেন ফ্রান্সের
পররাষ্ট্র-দপ্তরে। তার
তিন বছর পরে এলো
প্রথম দূরদেশ যাওয়ার
অভিজ্ঞতা। আলেক্সি
এলেন চীনে। শৈশবের
খেলা আর সা দিনের
হাতছানি মনে আলোড়ন
তুলল। এদিকে চীনের
অন্তর্মুখী জী ব ন ধা রা,
দার্শনিকের চিন্তাভাবনা,
অন্যদিকে অনতিদূরে
প্রশান্ত ম হা সা গ রে র
আহ্বান আ লে ক্সি র
প্রকৃতিমুখী ম ন কে
অভিভূত করে ফেলল।

কিন্তু পেশাদার কূটনীতিবিদ্ আলেক্সি চীনের ভেঙে পড়া মাঞ্চু সাম্রাজ্যের সমস্যা তথা দূরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতার খবর রেখেছিলেন যথাযথ কবি আলেক্সি কিন্তু কূটনীতিবিদ্ আলেক্সির জীবনকে মোটেই বিচ্যুত করেনি। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা একটা অন্যতম কথা। আলেক্সি চীনে ছিলেন ১৯১৬—২১ সাল পর্যন্ত। ১৯২২ সালের ওয়াশিংটনের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন। আলোক্সর ডাক পড়ল সেখানে ফরাসী সরকারের দূর-প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে। এখানেই আলেক্সি পেলেন ফ্রান্সের অভিজ্ঞ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, বিচক্ষণ রাষ্ট্রবিদ ব্রিয়াঁর সাহচর্য। এই দুই অসম বয়সের মানুষের মধ্যে কেমন করে জানি একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। হয়তো বা আলেক্সির বাস্তব সচেতন অথচ স্বপ্নালু মনের ছবি ব্রিয়াঁর ভালো লেগেছিল। ব্রিয়াঁর আনুকূল্যে আলেক্সি পেলেন রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভার ডিরেক্টারের পদ। সে পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। এরই দু-বছর পরে ফরাসী পররাষ্ট্রদপ্তরের সর্বোচ্চ পদ লাভ করলেন আলেক্সি লেজে। সেটা হলো পররাষ্ট্র-দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেলের পদ (১৯৩৩—১৯৪০)। তিরিশের দশকে যখন ইউরোপের রাজনীতি হিটলার-কোজক হয়ে ক্রমাগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনিবার্যতার দিকে এগিয়ে চলছিল, তখন ফরাসী পররাষ্ট্রনীতির কর্ণধার ছিলেন এই শান্ত স্বভাবের আত্মসচেতন কবি মানুষটী। তাঁর নীতির মূল কথাই ছিল হিটলার একনায়কত্বের ঘোরতর বিরোধিতা। কিন্তু মিউনিকের লজ্জাজনক বিপর্যয়ের পর দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ্দের কঠোরতম সমালোচনার প্রায় সবটাই প্রযুক্ত হয়েছিল আলেক্সির বিরুদ্ধে। আলেক্সি লেজের পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্যকালের আলোচনা ও সমালোচনা এ প্রবন্ধের উপজীব্য নয়। কিন্তু একথা প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে এই কবি মানুষটী, রাজনীতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলের জন্যে দায়ী ছিলেন না। তাঁর হিটলার বিদ্বেষের তীব্রতার জন্যেই সবচেয়ে বড়ো মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে, জার্মান আক্রমণে ফ্রান্সের পতনের পর। যে ১৯৪০ সালে আলেক্সি পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী-জেনারেলের পদ থেকে বরখাস্ত হলেন প্রেসিডেন্ট পলে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে। ফ্রান্সের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ্ এবং ফ্রান্সের আটলোরে নীতির মধ্যে আলেক্সির জাতীয়তাবোধের সমর্থন ছিল না। সুতরাং তাঁর পক্ষ অবলম্বনের জন্যে দেখা যায়নি কাউকে বেশী আগ্রহান্বিত। একমাস পরে তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করলেন—তা হয়ে দাঁড়াল চিরকালের মতো। আলেক্সি লেজে এলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে তখন বর্তমান ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য-গলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন ফরাসী সরকার অস্থায়ীভাবে। রাজনীতির চক্রান্ত আর জটিলতা আর তাঁকে টানতে পারল না। আলেক্সি পাড়ি জমালেন আতলান্তিকের অন্য তীরে আমেরিকায়। এদিকে স্বদেশে তখন পেতাঁ গভর্নমেণ্ট তাঁর ফরাসী নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করে পেনসন্ বন্ধ করার আদেশ জারী করেছে। আর নাৎসী সৈন্যরা তাঁর প্যারীর বাসগৃহে চালিয়েছে ব্যাপক খানাতল্লাসী আর ধ্বংসলীলা। এই নাৎসী সৈন্যদের হাতেই নিঃশেষ হয়েছে তাঁর কবিমনের অনেক স্বাক্ষর, যে সব পাণ্ডুলিপির নকল আর কোথাও ছিল না। আমেরিকায় আলেক্সি কেবল আশ্রয় পেলেন না, পেলেন নতুন জীবিকা। কবিবন্ধু আর্চিবল্ড ম্যাকলীনের সহায়তায় চাকরী পেলেন ওয়াশিংটনের কংগ্রেস গ্রন্থাগারের ফরাসী সাহিত্য বিভাগে উপদেষ্টা হিসেবে। ১৯১৪ সালে, দেশ ভ্রমনের সুযোগ-লাভের যে আকাঙ্ক্ষা আলেক্সি লেজেকে পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে পেশাদার কূটনীতিবিদ্ গড়ে তুলেছিল ১৯৪১ সালে সেই কূটনীতিবিদের মৃত্যু হল। নতুন জগতের নতুন পরিবেশে জেগে উঠল তাঁর গোপন মন, কবি সত্তা, যাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে ১৯৬০ সালে নোবেল কমিটি ও রসিক মানুষ।

ফ্রান্সের শিক্ষানবিশীর যুগেই, তরুণ কবি আলেক্সি লেজের প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। তার নাম "ইমাজ আ ক্রশোয়ে"। তারপর ১৯১০ এ "এলোজ্"। কিন্তু এই দুই প্রকাশনাতেই আলেক্সির নিজের আগ্রহের চেয়ে, বন্ধু-বান্ধব রসিকজনের উৎসাহ ছিল বেশী। তদানীন্তন ফরাসী কবি সাহিত্যিকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে এনেছিল কাব্য। এই যোগাযোগের ফলে শুধু ফ্রান্সের সাহিত্য জগতে তাঁর প্রবেশাধিকার ঘটেনি, ঘটেছে ব্যাপক মানসিক যোগাযোগ। যেটাকে নিশ্চয়ই পরবর্তী কবি মানসের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। আলেক্সি লেজের কাব্যাস্বাদ রসিকজনের দ্বিতীয়বার পাওয়ার সুযোগ ঘটল ১৯২২ সালে যখন ক্যালেরী লারবোর আগ্রহে প্রকাশিত হল "পোয়েমে"। এক বছর পর "অগমিতি শুঁ প্রাঁস।" তখন কিন্তু···আলেক্সি লেগে চলে গেছেন কাব্যের জগৎ ছেড়ে রাজনীতির জগতে। তিনি আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করলেন নোতুন নাম সাঁ জঁ প্যার্স। যে নামে আজ তিনি দেশনন্দিত।

১৯২৪ সালেই প্রকাশিত হল সাঁ জঁ প্যার্সের অবিস্মরণীয় কাব্য "অ্যানাবাস"। বিশ্ব-জগতের সামগ্রিক চিন্তার, বিশ্বমানবের অভিযাত্রী মনের একটা ক্রমিক অন্বেষণের ছবি তুলে ধরেছেন অ্যানাবাসের কবি। সেখানে নায়ক কেউ নেই বিশিষ্ট কোন মানুষ। সেখানকার নায়ক নির্বিশেষে—তারা মানুষ, বিজয়ী মানুষ, এই তার একমাত্র পরিচয়। দেশ থেকে মহাদেশে, সমকাল থেকে মহাকালের অভিমুখে তার জয়যাত্রা। দে সময়, মাটী, সংস্কৃতি, সভ্যতার, কোন বিশেষ স্তরে আবদ্ধ নয়। দে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সর্বত্র, সব বৃহত্তর, মহত্তর, নবীনতর চেতনায়। কবি এলিয়টের প্রচেষ্টাই এই মহৎ শিল্প-কর্মকে পরিচিত করিয়ে দেয় ইংরেজী-ভাষী পাঠক সমাজের কাছে। প্যার্সের শব্দ-চয়ন ও শব্দ-কেন্দ্রিক বিনিময় সাংকেতিক বর্ণনার, রস-উপলব্ধি সাধারণ পাঠকের অভিব্যস্ত জীবনে কোন দিনই সম্ভব হবে না। কারণ অ্যানাবাসে বর্ণনা মুখ্য স্থান গ্রহণ করেনি। সভ্যতার মানবিক সত্তা ও মূল্যবোধের ভিত্তিকে প্যার্স নিরবচ্ছিন্ন কথার ঠাসবুননে আবদ্ধ করেননি। চিন্তার, কল্পনার বিস্তারে পাঠকের মানসিক সমৃদ্ধির সুযোগ সম্ভাবনায় আস্থা রেখে, প্যার্স কাব্যে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ক্রমপর্যায়ে উন্নীত হবার প্রকাশ ভঙ্গি বর্জন করেছেন। এই মানবিক জয়যাত্রার সুরু এবং আপাতঃ শেষ গানে। বিজয়ীর আগমন থেকে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার অবসানে আবার সমুদ্র পথে নতুন জীবনের অভিমুখে যাত্রার কাহিনী শেষ। মোট দশ ভাগে বিভক্ত এই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে মানুষের অজেয় সত্তার, বিশ্বময় বিস্তারের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আকুলতাকে সার্থক রূপ দিয়েছেন কবি সাঁ জঁ প্যার্স।

"অ্যানাবাসের" পর সুদীর্ঘ নীরবতা। প্রায় বিশ বছরের ব্যবধান অ্যানাবাসের সঙ্গে "গ্রিলের" (১৯৪২ সাল)। কবি তখন রাজনীতির সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছেন। নির্বাসিত সাঁ জঁ প্যার্সের লেখনী ১৯৪২ সাল থেকে অবিরাম ধারায় এক বিরাট শব্দের বাহিনী প্রেরণ করছে অতলান্তিকের অপর তীর থেকে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে। পরপর সাতখানি কাব্যগ্রন্থ প্যার্স উপহার দিলেন ফরাসী রসিক সমাজকে। ১৯৪৩ এ "পোয়েমে এ্যা লা এত্রেজে" ও "প্লুয়েই", ১৯৪৫ এ "নিয়েজেস", ১৯৪৭ এ "ভঁা", ১৯৪৪ সালে "অ্যানেবর্স" ও সর্বাধুনিক "ক্রনিকরে"।

প্যার্সের কবিতার অনুবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় না হলেও, ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাতেই হয়ে গেছে। প্যার্স কল্পনারাজ্যের অভিযাত্রী, নিপুণ-শব্দের স্থপতি (an adventurer of imagination, an architect of words.)। প্যার্সের রচনা-শৈলীর এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে বর্তমানের ফরাসী কবি-সাহিত্যিকের জগতে বিশিষ্টতা দান করেছে। শব্দ-চয়নের ও সংস্থাপনের যে প্রতীকি বৈশিষ্ট্যে প্যার্সের কাব্য সমৃদ্ধ, তাতে হয়তো মনে হতে পারে যে মহৎ শিল্পের সাধারণ নিয়মে তিনি ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ। ভাষান্তরে শুধু রসাস্বাদে ঘাটতি করে না, কাব্যের অপমৃত্যু ঘটায়। যেমন পুশ্‌কিন ভাষান্তরে তাঁর অনন্যতা হারান। একথা প্রায় সব মহৎ সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু ভাষার বা শব্দের নিগূঢ় অর্থের প্রতি এই দারুণ আসক্তি ও প্রয়োগবাহুল্য থাকা সত্ত্বেও প্যার্সের কাব্য, ভাষান্তরে তার বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। ভাষান্তরিত কাব্যেও একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রতীক-ধর্মী কবি হিসেবে প্যার্স, র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, ভালেরী, মালার্মের সহযাত্রী।

যে বিরাট সৃষ্টির প্রকাশ, সভ্যতার সুরু থেকে বর্তমান

চ, এবং সৃষ্টির রূপ ধারণের যেটা একটা অখণ্ড
ন'রই স্বপ্রকাশ, সেই কসমিক ধ্যান ও অনুভূতি
র্শর সঞ্জাত। "এলোহের" কাল থেকে
মকেই পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী কাব্য চর্চায়
র্শর এই কসমিক চেতনা এতটুকু বদলায়নি।
ালের মানুষের আত্মকেন্দ্রিক সমাজচিন্তায়, খণ্ড
নের যে প্রাধান্য অনুভূত হয়, প্যার্স সেই সমকালের
ও, চিন্তার স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। প্যার্সের সমগ্র কাব্য
ীবন দর্শন এই খণ্ড চেতনার, খণ্ড জীবনের পরিপন্থী।

প্যার্স আমাদের কা'লের লোক হয়েও
রিচিত।

নোবেল কমিটির পুরস্কার যেদিন ফরাসী রেডিওতে
ষিত হয়, সেদিন বুল ক্লাবেই তাঁর অনুরাগী পাঠক
। সৃষ্টিলের। যাঁরা তাঁর মতো চিন্তার স্বাতন্ত্র্য অর্জন
সমর্থ হয়।

প্যার্সের কাব্যে পরিচিত মানুষ প্যার্স অনুপস্থিত। তাঁর ব্যক্তিত্বে এই কাব্যের সন্ধানে অন্বেষণে ছায়াপাত করেনি। কবি হিসেবে যদি প্যার্সকে কোথাও অনুভব করা যায়, তো সে কবির প্রজ্ঞার অস্তিত্ব। বরং যা সেখানে অনুভব করা যায় সেটা কবিকে নয়, কবির রহস্যময়তার আচরণ উন্মোচনের বিপুল জ্ঞানের বিস্তারকে, বিশ্ববৈচিত্র্যের স্বরূপ-প্রকাশে নিপুণ বাক্-শিল্পকে চিত্রকল্পের বিকাশ বিস্তারে বিপুল কল্পনাশক্তি এবং বিশ্বের সমস্ত অনুভূতির মধ্যে এক সুনিপুণ যৌক্তিকতার সন্ধানকে। এই বিরাট চেতনাচিন্তা সাধারণ মনের নয়, তাই সাধারণ মানুষের নয়। সেই কারণেই সাঁ জঁ প্যার্স জননন্দিত কবি কোনদিন হতে পারেননি, হয়তো কোনদিন পারবেনও না।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণময়তায়

অশোক মুখোপাধ্যায়

পাখিকে আমরা মানুষ বলেই গণ্য করিনে। এটা আমাদের স্বভাবের দোষ। প্রাচীনের সন্ধানদানে যারা আগ্রহশীল, তারা এতে ক্ষুণ্ণ বোধ করবেন। কারণ পক্ষিজাতির তুলনায় মনুষ্যজাতি নিতান্তই অর্বাচীন। মা বসুন্ধরার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ওরা প্রাচীনত্বের কোঠায় পৌঁছেছে। মানুষের জন্মের বহু-লক্ষ বছর আগেই ওরা ডানা ভাসিয়েছে আকাশের নীলে।

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উন্মেষ কোথায়? গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল হল পৃথিবী, তারপর সেই শৈশব তরলতা কাটিয়ে সে পা দিল বয়োবৃদ্ধির কাঠিন্যে। কিন্তু তখনও তার দেহে ধপধপ করছে যৌবনের প্রাণময় উষ্ণতা। জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্রের সৃষ্টি হল। কিন্তু স্থলভাগকে শীতল হওয়ার জন্য তখনও বহু বছরের তাপ-বিকীরণের প্রতীক্ষায় থাকতে হল। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয়, প্রাণের উদ্ভবের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন, সমুদ্রই তা প্রথম সাগ্রহে বাড়িয়ে দিল। তার কয়েক বুকের স্নেহচ্ছায়ায় কতগুলো মৌলিক পদার্থের অনুপরমাণুর আকস্মিক রাসায়নিক মিলনের মধ্য দিয়ে ঘটল বিশ্বজগতের সবচাইতে বিস্ময়কর ঘটনা—প্রাণের অভ্র আবির্ভাব। সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াতে লাগল জীবজগতের আদিমতম সংস্করণ—আকারবিহীন জেলির মত নরম থকথকে অনেক রকমের ছড়িয়ে পড়া জিনিস। তার এক একটি কণিকা বিশ্বের প্রথম প্রাণস্পন্দনের গৌরবে মহিমান্বিত—বৈজ্ঞানিক ভাষায় যার নাম প্রোটোপ্লাজম। সেই প্রোটোপ্লাজমের যুগযুগান্তরের ক্রমবিবর্তনের ফল এককোষী প্রাণীর বহুকোষী মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রূপান্তর। এল মাছের যুগ। সমুদ্র ছোটবড় অজস্র মাছে ছেয়ে গেল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রাণের জয়যাত্রা এগিয়ে চলল অব্যাহত গতিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মত প্রাণী, কাঁকড়া, শামুকজাতীয় আগোছা—এরা ছিল সেকালের বাসিন্দা। তখনকার বৃহত্তম জীব ছিল প্রায় আট ফুট লম্বা শামুকবিছা।

ডাঙার প্রথম আগন্তুক সম্ভবতঃ সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর কোন উদ্ভিদ। জল থেকে স্রোতের বেগে এরা তীরভূমিতে আশ্রয় পায়। তারপর ডাঙার জীবের তালিকায় সংযোজিত হল মাকড়সা শ্রেণীর পোকামাকড় এবং ড্রাগন-ফ্লাই নামক পতঙ্গকুল। অবশ্য এদের বিচরণ কেবল ডাঙাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমুদ্রজলেও বিস্তৃত ছিল বিস্তর। কথা, অনেক উদ্ভিদও তখন উভচরবৃত্তি গ্রহণ করেছিল।

পৃথিবীর আয়ুষ্কালের বিভিন্ন অধ্যায়ে অচিন্তনীয় পরিবর্তনের ইতিহাস। ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং আরও কতরকমের ওলট-পালট ঘটেছে তার বুকে সে হিসেব কে রাখে! এমনি একটি বড়রকম পরিবর্তন ঘটেছিল উভচর প্রাণীদের যুগে। অকস্মাৎ পৃথিবীর উত্তাপ বেড়ে গেল। জলাভূমির পরিমাণ হ্রাস পেল। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সংগে সংগে নতুন নতুন উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর আগমন হল, যারা ঐ আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে সক্ষম। এই সময়েই জলের বহু সরীসৃপ ডাঙায় চলে এসেছিল। এসকল সরীসৃপেরা ছিল অতিকায়। এদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলল। উত্তাপবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল বৃষ্টির আধিক্য এবং তারই সংগে তৃণভূমির বিস্তৃতি। অফুরন্ত তৃণভূমি তৃণভোজী প্রাণীর আগমন সুচিত করল। ডাইনসর, ইগুয়ানোডন, ষ্টিগাসেরাস ইত্যাদি বিশালকায় সরীসৃপেরা ছিল সে যুগের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অধিবাসী।

এসকল জীবজন্তু তখনকার তৃণভূমি এবং অরণ্যে আহার অন্বেষণে বিচরণ করত। এদের মধ্যে টেরোডাক্‌টাইল নামে সরীসৃপেরা অরণ্য এবং তৃণাঞ্চলে ছুটোছুটি এবং লাফালাফি করতে করতে একদিন অকস্মাৎ উড়তে শিখল। আবির্ভাব হল পৃথিবীর প্রথম উড়ন্ত প্রাণীর।

সরীসৃপেরাই যে কালক্রমে পাখীর জন্ম দিয়েছে, এটা সন্দেহাতীত সত্যরূপে স্বীকৃত। অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং ক্ষুদ্রকায় সরীসৃপদের শক্তিমান এবং বৃহত্তর জীবদের আক্রমণে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত। তখন তাদের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল। এক : পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, দুই : শীতলতর অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করা—যেখানে শক্তিশালী জন্তুদের উপদ্রব কম। শীতে বেঁচে থাকতে হলে উষ্ণ আবরণ অপরিহার্য। বিবর্তনের ফলে তারা দেহে পালকের আবরণ লাভ করল। এইভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়ে এবং আত্মরক্ষার সংগ্রামে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দুর্বল এবং লাজুকো সরীসৃপেরা জন্ম দিল আকাশচারী পক্ষিজাতির।

ক্রমবিবর্তনের এই পরমাশ্চর্য প্রক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য এবং বুদ্ধির অগম্য বোধ হলেও তার তাৎপর্য একটু চেষ্টা করিলেই অনুধাবন করা যেতে পারে। ডারুইনের পূর্বসূরী ল্যামার্ক একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব সরলীকৃত করে বুঝিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ জিরাফ-এর জন্মের ইতিহাস আলোচনা করা যাক। জিরাফএর পূর্বপুরুষরূপে বহুকাল আগেকার হরিণজাতীয় কোন জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে। বৃষ্টিহীন বা স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চলে তৃণাভাবে তাদের বৃক্ষপত্রের সন্ধান করতে হত। ক্ষুধার তাড়নায় কখনও কখনও উঁচু ডালের নাগাল পাবার জন্য তারা গ্রীবাবিস্তার করত। এতে স্বভাবতই তাদের গলদেশে টান পড়ে এবং তার দৈর্ঘ্যে সামান্য বৃদ্ধি পায়, যদিও তা দুই এক পুরুষ কালের মধ্যে ইঞ্চীগ্রাহ্য ছিল না। কিন্তু এই গ্রীবাবৃদ্ধির প্রবণতা মৃত্যুর সংগে সংগে লয় পেয়ে যায়নি, বংশধরদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত থেকে গেছে। এমনিভাবে প্রায় উপেক্ষনীয় হারে বাড়তে বাড়তে হাজার হাজার পুরুষ অতিক্রান্তির শেষে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান আকৃতিবিশিষ্ট জিরাফ জাতীয়।

যে বিবর্তন সরীসৃপের পাখিতে রূপান্তরের হেতু, তা আজও শেষ হয়ে যায়নি। ওড়ার অভ্যাস বর্জন করার ফলে কোন কোন শ্রেণীর পাখি বর্তমানে পক্ষহীন হতে চলেছে। উড্ডয়নক্ষমতাহীন দক্ষিণ আফ্রিকার উটপাখি, নিউজিল্যাণ্ডের ডোডো পাখি (অধুনালুপ্ত) এবং কুমেরু মহাদেশের পেঙ্গুইন পাখীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

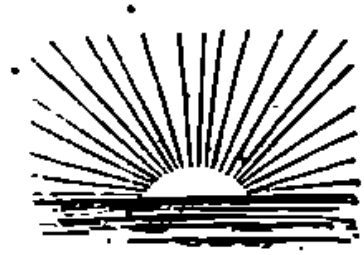

রূপ বর্ণে গন্ধে

প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল

★

আত্মরক্ষার অধিকার

একটু ভালো করে চোখ মেলে তাকালেই বুঝতে পারবেন যে আত্মরক্ষার অধিকার প্রাণী-মাত্রেই আছে। এই আত্মরক্ষার উপায়ও আছে। যেমন ধরুন কেউ যদি আপনাকে আঘাত করতে আসে, তাহলে কি আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবেন? মোটেই না। আপনিও রুখে দুঁদিয়ে দাঁড়িয়ে তার আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। নয় কি? ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত সকলেরই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার নৈতিক সংগ্রাম আছে। এ কথা উদ্ভিদের বেলাতেও খুব সত্য। তারও আত্মরক্ষা করার উপায় আছে। কেন না তারও তো শত্রু বড় কম নয়। আপনার তো হাত আছে, পা আছে, ইচ্ছে করলে আপনি সরে যেতে পারেন কিন্তু অসহায় দুর্বল উদ্ভিদ, সে কোথায় যাবে? তার তো সরবার উপায় নেই। তাই প্রকৃতি নিজের খেয়ালেই তাদের আত্মরক্ষা করবার উপায় করে দিয়েছে।

প্রথমত বেহদি গাছের কথাই ধরা যাক। সেখানে আত্মরক্ষা করার জন্য যে কাঁটাগুলি আমরা দেখতে পাই সেগুলির বৈজ্ঞানিক নাম হলো থর্ন (Thorn)। আসলে এগুলো হল গাছের কাণ্ড। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে ওগুলো এই আকারে রূপান্তরিত হয়। তা ছাড়া কণিমনসা গাছ তো আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। ডান দিকে এর একটা চিত্র দেওয়া গেল। এর চাপটা সবুজ দেহের ওপর চারিদিকে আপনি অনেক কাঁটা দেখতে পাবেন। এই কাঁটাগুলো দিয়েই এ জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। কাঁটা-গুলোর মারমুখী চেহারা দেখেই তারা মানে মানে সরে পড়ে। আসলে এই কাঁটাগুলো কি জানেন? এ গুলোই হলো কণিমনসা গাছের পাতা। শুনে আপনি হয়ত প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তা কি করে সম্ভব? আমি উত্তরে বলব এটা সত্যিই সম্ভব হয়েছে দুটো কারণে। প্রথম কারণ, এটা হলো মরুভূমির গাছ। জীবন-ধারণের জন্য তার সঞ্চিত জলের পরিমাণ অত্যন্ত কম। কাজেই তার পাতা যদি খুব প্রশস্ত হয়, তাহলে এর মধ্য দিয়ে সেই কষ্ট-সঞ্চিত জল সহজেই উবে যাবে। আর পাতাগুলো যদি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়, তা হলে সেই সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। তার ওপর দ্বিতীয় কারণ হলো যে এই ভীষণ-দর্শন কাঁটাগুলো দিয়ে সব রকম জীবজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে। গোলাপ ফুল বা বেতগাছে যে কাঁটাগুলো আমরা দেখতে পাই, এদেরও ওই একই কাজ। ঝেরেণ্ডা গাছে যে ঘন কেশের সমাবেশ দেখতে পাই, তারও পেছনে রয়েছে এই আত্মরক্ষা করবার স্বতস্ফূর্ত প্রয়াস। তা ছাড়া চিতাগাছ দেখেছেন তো? যে

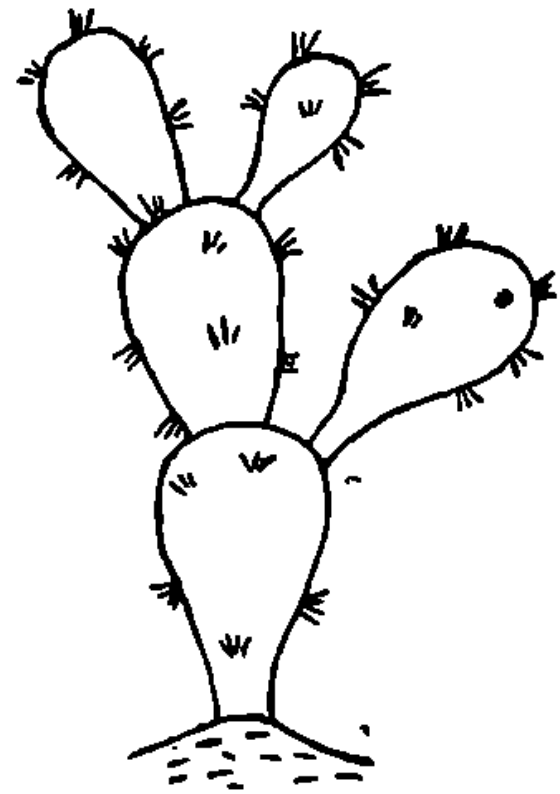

গুলো দিয়ে অনেক সময় বেড়া দেওয়া হয়, বা ছোট ছেলেরা ফুলনের সময় এর দেহ ফুড়ে ফুড়ে জলের ফোয়ারার নল তৈরী করে? লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে এর দেহ দিয়ে এক রকমের লাদা রস বেরোয়। এই রস কোন রকমে একবার ছাগল বাছাজীর দাড়িতে লেগে গেলেই একেবারে কর্পোরেশনের কাউন্সিলারের মত হাঁড়ি মুখ করে তিনি তাড়াতাড়ি গুরুকারণো সরে পড়বেন, আর কখনও এ মুখো হবেন না। আলকুশীর কেশে পড়েছেন কোনদিন? বা বিছুটির কাছে? দয়া করে একদিন পড়ে আমায় জানাবেন, কেমন লাগলো, কেমন? আমি সাগ্রহে আপনার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা শোনবার জন্যে অপেক্ষা কোরবো, অবশ্য গোবর হাতে। এ ছাড়াও এক রকমের গাছ আছে, তার নাম হলো এরাইসিমা (Arisaema)। এ আবার আরও চালাক। এ কি করে জানেন? এর যে স্তম্ভের ওপরে ফুলগুলো জন্মায়, সেই স্তম্ভের পেছনে যে লম্বা পাতাটা গজায়, তার চেহারাটা অবিকল বিষের সাপের ফণার মতন। দূর থেকে ভয় জানোয়ার এটাকে সত্যিই সাপ মনে করে আর এগোতে সাহস পায় না। এ ছাড়াও অনেক গাছ আছে, যারা দেহে অজস্র পিঁপড়েকে বাসা বাঁধতে দেয়। এর ফলে তারা যায় বেঁচে। এতেই তাদের আত্মরক্ষার কাজ খুব ভালো ভাবে সম্পন্ন হয়। তাই দেখুন, প্রকৃতি উদ্ভিদেরও আত্মরক্ষার জন্যে কত ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

—সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতির রঙ্ আর মানুষের খাবার

আমাদের মনের সঙ্গে রঙের একটা সংযোগ রয়েছে। এর কারণ হল বাইরের জগতের বিভিন্ন রঙ। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। চোখ বাইরের আলোর খবর বয়ে এনে মনে রূপ ও রঙের অনুভূতি জাগায়। বাইরের বিচিত্র রঙের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই বিশেষ অর্থ।

জীব-জগতের বিভিন্ন রঙের মধ্যে যে সৌন্দর্য ও উপকারিতার একত্র সমাবেশ দেখা যায় অন্য কোথাও এমনটি দেখা যায় না। প্রকৃতির দুটি প্রধান রঙ হল লাল আর সবুজ। প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, সবুজ ও অন্যান্য কয়েকটি রঞ্জকের সাহায্যে সমগ্র উদ্ভিদ্ জগৎ সৌরশক্তি আহরণ করে এবং এভাবে সৌর শক্তি আহরণের ফলেই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। আবার সুন্দরী তরুণীদের গণ্ডদেশ রক্তিম রাগে রঞ্জিতকারী লাল রঙই জীবজগতে অক্সিজেন বহনের কাজ করে জীবকে বাঁচায়।

জীব জগতে বিভিন্ন রঙ তাদের পুষ্টি সাধন, দৃষ্টি শক্তি, বংশ বৃদ্ধি এমন কি আত্মরক্ষায়ও সাহায্য করে।

পদার্থবিদরা বলেন আলোর মধ্যে সাতটি রঙ রয়েছে, কিন্তু মনোবিদদের মতে আসলে মূল রঙ বা প্রাইমারী কালার হল তিনটি: লাল নীল ও সবুজ। তিনটি এক সঙ্গে মিলিয়ে হয় সাদা আর তিনটির কোনটাই যখন কাজ করে না তখন দেখি কাল। জীব বিজ্ঞানীদের মতে প্রাইমারী কালার হল সবুজ আর লাল। ক্লোরোফিলের সবুজ রঙ দেখতে পাই বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, মস, ফার্ণ, শেওলা, সামুদ্রিক আগাছা প্রভৃতি উদ্ভিদ জগতের প্রায় সর্বত্র।

রক্তের লাল রঙ প্রাণী জগতের প্রাইমারী কালার।

আশ্চর্যের বিষয় রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে ক্লোরোফিলের অনেক রাসায়নিক মিল রয়েছে। কেবল ক্লোরোফিলের ম্যাগনেসিয়ামের স্থানে হিমোগ্লোবিনে রয়েছে লোহা।

উদ্ভিদের সবুজ রঞ্জক ব্যতীত পৃথিবীতে কোন জীবের অস্তিত্ব সম্ভব হত না। জীবরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদজগৎ হতেই খাদ্য সরবরাহ করে। আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের ক্লোরোফিল সূর্যালোক হতে শক্তি সংগ্রহ করে মাটি হতে নেওয়া জল ও বাতাস হতে নেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এভাবে উদ্ভিদ-জগৎ হতেই জীব-জগৎ জীবন-ধারণ উপযোগী শক্তি পেয়ে থাকে।

ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, এরা বিভিন্ন জীব অথবা উদ্ভিদের শরীর হতে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য পেয়ে থাকে। তৃণভোজী প্রাণীরা প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্ভিদ জগৎ হতে খাদ্য আহরণ করে। মাংসাশী প্রাণীরা অন্যান্য মাংসাশী

অথবা তৃণভোজী প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ এরা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ জগতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শেষপর্যন্ত সব প্রাণীরই খাদ্য হল বিভিন্ন উদ্ভিদ। এই পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক প্রাণীর খাদ্য সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ জগৎকে প্রতি বছরে প্রায় ৭০০০০০০০০০০০০০ টন কার্বনডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ৪০০০০০০০০০০০০০ টন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরী করতে হয়।

উদ্ভিদ যে কেবল সমগ্র প্রাণী-জগতের খাদ্য যোগায় নয়, পারমানবিক শক্তিকে কাজে লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভিদ-জগৎ দ্বারা আহৃত সৌর-শক্তি পৃথিবীর জ্বালানী সমস্যাও সম্পূর্ণ মেটাত। উদ্ভিদ-জগৎ দ্বারা বর্তমানে আহৃত সৌরশক্তির খানিকটা ব্যবহার হয় জ্বালানী কাঠরূপে, আর অতীতে আহৃত সৌরশক্তির ব্যবহার হয় কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে।

আলোক-সংশ্লেষরূপ অত্যাশ্চর্য প্রক্রিয়ার সব সন্ধান ক্লোরোফিলেরই প্রাপ্য নয়। 'কেরোটিনয়েড' নামক হলুদে ও কমলা রঞ্জকও ক্লোরোফিলের সঙ্গে থাকে এরাও সৌরশক্তি আহরণে সমর্থ। আবার বেগুনী রঙের এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া অবস্থা বিশেষে আলোক সংশ্লেষণে সমর্থ।

সামুদ্রিক শেওলার মধ্যে 'ফাইকোইরিথ্রিন' নামক এক প্রকার লাল রঞ্জক আছে যা আলোক সংশ্লেষী হিসেবে হরিত ক্লোরোফিলের চেয়েও বেশী কার্যকরী। একথা প্রমাণের উপর অনেক গুরুত্ব নির্ভর করে। কারণ পৃথিবীর মোট আলোক সংশ্লেষের মাত্র এক দশমাংশ স্থলজ উদ্ভিদ দ্বারা সাধিত হয় আর বাকী অংশ হয় সামুদ্রিক নানা জাতের উদ্ভিদ হতে।

কেরটিনয়েড গ্রুপের মধ্যে কেরটিন পাওয়া যায় গাজরে। গাজরের কমলা রঙ, গম, ভুট্টার হলুদে রঙ। ডিমের কুসুমের হলুদে রঙ কেরটিনের জন্য হয়ে থাকে। অবশ্য এই গ্রুপে হলুদে ছাড়া অন্য রঙও দেখা যায়। যেমন টমেটর লাল রঙ, চিংড়ি ও ক্রেমিংসোপাথির পাটল রঙ ইত্যাদি।

কেরটিনয়েডস ও ক্লোরোফিলের মিলনের ফলে ফুল ও পাতায় বিভিন্ন বর্ণ-বিচিত্র দেখা যায়। সৌন্দর্য সৃষ্টি ছাড়া বংশ বিস্তারেও এরা সাহায্য করে।

জীব জগতের দুইটি প্রধান শাখা হল প্রাণী ও উদ্ভিদ। এদের পরস্পর নির্ভরতার আর একটি উদাহরণ পাই কেরটিনের ক্ষেত্রে। গাজর, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে এদের কেরটিন প্রাণী দেহে আংশিক ভাবে ভিটামিন এ-তে পরিবর্তিত হয়। মানব-দেহে ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহের উত্তম পরিপুষ্টির জন্য ভিটামিন এ একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার ভিটামিন এ হতেই শরীরে 'রিসুয়েলপ পারপেল' বা দৃশ্য বেগুনী তৈরী হয়। আমাদের অক্ষিপটস্থিত এই দৃশ্য বেগুনীর উপর আলো পড়েই আমাদের স্নায়ু-তন্ত্রে আলোর সাড়া জাগায়। যদি কেরটিনের পরিমাণ কম হলে শরীরে দৃশ্য বেগুনী তৈরী হতে পারে না, ফলে রাত্রান্ধতা দোষ দেখা দেয়।

এবার প্রাণীদেহের রঙের কথায় আসা যাক। মেরুদণ্ডীপ্রাণী যথা, মাছ, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী ইত্যাদি সকলের রক্তে হিমোগ্লোবিন নামক লাল রঞ্জক আছে। হিমোগ্লোবিন অথবা অন্য কোন অক্সিজেন বহনকারী ছাড়া এ সকল জটিল জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব হত না। রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেনের সরাসরি মিলন ঘটে। এজন্য শিরার রক্ত বেগুনী এবং ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লাল।

অক্টোপাস, শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতির রক্ত নীল, অর্থাৎ এরা অভিজাত শ্রেণী। এদের অক্সিজেন পরিবহনকারী হল 'হিমোসায়েনিন' নামক এক প্রকার নীল রঞ্জক।

আবার এক জাতের সামুদ্রিক কীটের শরীরে ক্লোরোকোরিন নামক এক জাতের রঞ্জক রয়েছে। এই রঞ্জক অল্প মাত্রায় থাকলে রক্তকে দেখায় সবুজ। আর অধিক মাত্রায় থাকলে দেখায় লাল।

অক্সিজেন পরিবহন ছাড়াও বিভিন্ন রঞ্জক প্রাণী-দেহে নানা কাজ করে থাকে। উদ্ভিদ জগতের মূল রঙ সবুজ থাকে চারদিকে ছড়িয়ে, যা সব সময়ই আমাদের চোখে পড়ে। বাইরের সবুজ রঙের সঙ্গে সবুজ প্রকৃতির যোগ আমাদের ভাল লাগে। প্রাণী জগতের মূল রঙ লাল থাকে প্রাণী দেহের অভ্যন্তরে। উদ্ভিদ

জগতের সবুজের মত সব সময়ে যদি আমরা এটা দেখতে পেতাম তাহলে হয়ত পাগল হয়ে যেতাম। লাল রঙ হিংসা, উত্তেজনা, বিপদ ইত্যাদি ভাবদ্যোতক।

প্রাণী দেহের বিভিন্ন রঙ নানা প্রকার রঞ্জকের প্রভাবে হয়ে থাকে, এই সকল রঞ্জক কোন কোন সময় প্রাণীরা নিজেরাই তৈরী করে আবার কোন কোন সময় উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। আবার বাইকলাভঙ্গের প্রাকৃতিক গঠনের উপরও কোন কোন রঙ নির্ভর করে। জন টিণ্ডাল দেখান যে বায়ুমণ্ডলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ হতে সূর্যের আলোর হ্রস্ব তরঙ্গ অধিক সংখ্যায় বিচ্ছুরিত হয় এজন্য আকাশের রঙ নীল। ঠিক একই কারণে কোন রঞ্জক না থাকলেও কোন কোন মানুষের চোখ নীল দেখা যায়।

পাখীর পালকের লাল ও হলুদে রঙ কেরটিনয়েডের জন্য হয়ে থাকে। জলবিন্দুর উপর সূর্যের আলো পড়ে যেমন রামধনুর বর্ণালীর সৃষ্টি করে তেমনি কিছু প্রাণীর শরীরে সূর্যের সাদা আলো পড়ে বর্ণ-বৈচিত্রের সৃষ্টি করে। ময়ূরের পালকের বর্ণ-বৈচিত্র ও প্রজাপতির পাখার বর্ণ-বৈচিত্র্য এর জন্য দায়ী। আলোর আপতন কোণের পরিবর্তনের সঙ্গে আলোর রঙেরও পরিবর্তন হয় ফলে এদের পাখায় বিভিন্ন রঙের খেলা দেখতে পাওয়া যায়।

বেড়ের হলুদে চামড়া, সোল মাছ ও গোসাপের পেটের কমলা রঙ শ্যামন মাছের পাটলে রঙ, কয়েক প্রকার চিংড়ির নীলাভ সবুজ খোলা ইত্যাদি কেরটিনয়েড এর জন্য হয়ে থাকে। চিংড়ির বেলা এই কেরটিনয়েডের সঙ্গে প্রোটিনের রাসায়নিক মিলন ঘটে। চিংড়ি রান্না করলে এজন্য লাল হয়ে যায়। উত্তাপের ফলে প্রোটিন ঘনীভূত হয়ে যায় এবং বাকী যে কেরটিনয়েড থাকে তার রঙ লাল।

চিংড়ি মাছ খাওয়ার জন্য ট্রাউট মাছের চামড়ার লাল দাগ হয়ে থাকে। চিংড়ি মাছ না খাইয়ে দেখা গেছে এদের লাল দাগ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

প্রাণী দেহে তৈরী রঞ্জকের মধ্যে হিমোগ্লোবিন প্রধান। মানুষের হাড়ের মজ্জায় প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০০০ লাল রক্ত কণিকা তৈরী হয়, আবার এরা নিয়ত পৈত্তিক রঞ্জকে পরিণত হয় এবং এভাবে দেহ হতে নিঃসৃত হয়। কোন কোন পাখীর ডিমের রঙ এই পৈত্তিক রঞ্জকের ফলেই হয়ে থাকে—আমরা যে সব পোকা-মাকড় দেখি তাদের অধিকাংশই সবুজ, এই সবুজ ক্লোরোফিল থাকার জন্য নয়। খাদ্যের এক প্রকার কেরটিনয়েডের সঙ্গে এক প্রকার পৈত্তিক রঞ্জকের মিলনেই ওটি হয়ে থাকে।

সাপে মাওয়া, কাকে ইত্যাদির কাল রঙ, সাদা চামড়ার রোদে তামাটে হওয়া ও নিগ্রোদের চামড়ার রঙ ইত্যাদি হয় মেলোনিন নামক এক প্রকার রঞ্জকের জন্য। এই মেলোনিনের জন্যই আবার সিংহের কেশর অথবা মানুষের চুলের সোণালী রঙ হয়ে থাকে।

এ ছাড়া কয়েক প্রকার রাসায়নিকের জন্য প্রাণী-দেহের বিভিন্ন রঙ হয়ে থাকে, 'টেরিনের' জন্য প্রজাপতি ও বেঙের লাল রঙ, 'পরফাইরিনের' জন্য পাখীর পালকের রঙ ও 'একিনো চোখের' জন্য সামুদ্রিক অচিনের লাল রঙ হয়ে থাকে।

রঙের সৌন্দর্যের কথা বাদ দিলেও এদের উপকারিকতাও কম নয়। বিভিন্ন রঙ নানা ভাবে প্রাণীদের উপকারে আসে। কোন কোন রঙ প্রাণীকে সহজে আকর্ষণীয় করে তোলে, আবার কোন রঙ তাকে অস্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। জংলা যোরগ অনেক সময় পাছ পালার সঙ্গে নিজেদের এমন ভাবে মিশিয়ে রাখে যে নড়াচড়া না করলে তাদের অস্তিত্বের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

কোন কোন প্রাণী যেমন মেরুদেশের শুশুক ও শশক, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রঙ পাল্টায়, যাতে সেই ঋতুর প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজে আত্মগোপন করতে পারে।

কেত্রার ডোরাকাটা চামড়া এদের আত্মগোপনে সাহায্য করে। এরা বেশীর ভাগ গোধূলীর সময়ে খাদ্যান্বেষণে বের হয়। গোধূলির স্বল্পালোকে গায়ের ডোরাকাটা দাগ সহজে এদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে।

যদে সাধারণত বেশীর ভাগ আলো উপর হইতে কোন জীব-জন্তুর পিঠ ও বুক একই রঙের হলে উপর

ও আলো পড়লে তাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু ক্র রঙ পিঠ হতে হালকা হলে পরিবেশ হতে ঁ সহজে পৃথক করে নেওয়া যায় এজন্য মেক প্রাণীর বুকের রঙ পিঠের রঙ হতে হালকা। ৷ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে নানা প্রকার পরীস্থপ, ভনপায়ী খী, উভয়চর, পতঙ্গ ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জগতে ফুলে নানা রঙের সমাবেশে পরাগ ষট সাহায্য করে। ফুল চল গাছের বিজ্ঞাপন। ৬ নানা রঙের ফুলের বিজ্ঞাপন দিয়ে মৌমাছি, জাপতি ইত্যাদিকে আকৃষ্ট করে। উদ্দেশ্য পরাগের হায্যে গর্ভাধান।

প্রাণী-জগতেও রঙ যৌন মিলন ও বংশ বৃদ্ধির য়ক। প্রাণী জগতে প্রায়ই দেখা যায় পুরুষ স্ত্রী ত সুন্দর। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের স মা বে শে র ফলেই এই সৌন্দর্য দেখা যায়।

ময়ূরের পাখনা মনুষ্য হতে বর্ণ বৈচিত্র-সমৃদ্ধ। এমন কি পাখনার বেলাতেও আমরা দেখি পুরুষ পাখরা গলা ফুলিয়ে, পুচ্ছ বিস্তার করে নানা রঙের খেলা দেখিয়ে স্ত্রী পাখরার মন মুগ্ধ করে। মোরগের মাথায় যেমন সুন্দর ঝুঁটি দেখা যায় মুরগীর মাথায় তেমনি দেখা যা

না প্রাণীর ডিম, গাছ-পালার পুষ্পরেণু, ফল ইত্যাদির রঙ্গনে ডেরটিনয়েডের ব্যবহার দেখা যায়।

তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃতির এই বর্ণ-বৈচিত্র ছাড়া আমাদের জীবন যে কেবল নিরাপদ হয়ে উঠে তা নয় এ ছাড়া জীবনের অস্তিত্বও সম্ভব হত না

—মল্লিকা কান্ত চক্রবর্তী

সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী সমাবেশে

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"		"কলম্বিয়া"
শচীন দেববর্মন		শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়		লতা মঙ্গেশকর
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়		হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র		গীতা দত্ত
নির্মলেন্দু চৌধুরী	★	মান্না দে
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়		প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
সনৎ সিংহ	★	গায়ত্রী বসু
মান্না দে		শ্রীযুক্তা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপলা সেন		দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
নির্মলা মিশ্র		পান্নালাল ভট্টাচার্য
ইলা বসু		রুমা চট্টোপাধ্যায়
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়		কীর্তন-কলানিধি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

: উত্তর কলিকাতায় বিক্রয় কেন্দ্র :

রেডিও টেক্‌নিক্‌স

৬৪এ, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, কলিকাতা-৫ ফোন : ৫৫-৪০৩১

রঙ্গ জগৎ

পরিচালকের নিষ্ঠার উজ্জ্বলতম নিদর্শন 'গঙ্গা'

বেশ কিছুকাল যাবৎ চলচ্চিত্র জগতে যে তিক্ততিক্ত ভাব দেখা দিয়েছিল, 'গঙ্গা' চিত্রের অসাধারণ সাফল্য শুধু সেই তার কাটিয়ে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে তাই নয়, কি দর্শক কি চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী সকলের মনেই এই বই বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। 'গঙ্গা' চিত্রের সাফল্য নানান দিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্যময়। গত কয়েক বছর বাংলা চলচ্চিত্র-জগতের স্বনামধন্য কয়েকজন পরিচালক এই শিল্পে যে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন এবং সাফল্যের পথ-সন্ধানে নেমে নিজেদের ও দর্শকদের বিভ্রান্ত করেছিলেন ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাংলা-চলচ্চিত্র শিল্পকে যে অনিশ্চয়তার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন 'গঙ্গা' চিত্রের সার্বত্রিক সাফল্য তাঁদের অনেকেরই পথের দিশারী হবে।

গত কয়েক বছরে বাংলায় যে সব বই তোলা হয়েছে তাকে স্পষ্টতই দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে যে বইগুলো পড়ে কয়েকটি সুস্পষ্ট চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সে বইগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই কম বেশী-মাত্রায় বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পরিচালনার উৎকর্ষের নামে অসংখ্য কষ্ট-কল্পিত প্রতীক ব্যবহার, উচ্চ রুচির নিদর্শনের নামে বাংলা দেশের সাধারণ জনরুচির প্রতি উৎকট অবহেলা, এই দুটি বৈশিষ্ট্যই সর্ব প্রথম বলা চলতে পারে। এই বইগুলির কাহিনীঅংশ গৌন ব্যাপার, পরিচালক পরিচালনার কসরৎ দেখাবার জন্য সে কাহিনীর যথেচ্ছ কাট-ছাট এবং বদ-বদল করে থাকেন। পরিচালনার মুন্সিয়ানার নামে শুধু অপূর্ব টেকনিকল কারুকার্যই এ বইগুলির অন্যতম সম্পদ। ফলে, এগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিদেশ থেকে কিছু কিছু সম্মান-সূচক সংগ্রহে সমর্থ হলেও দেশে জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গেছে। যে বিপুল অর্থ ব্যয়ে এ বইগুলি তোলা হয়েছে তার অনুরূপ আর্থিক অসাফল্য দিন দিন আমাদের চলচ্চিত্র-জগতের ব্যবসায়িক ভিত্তিকে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতে ঠেলে নিয়ে গেছে। প্রযোজকদের বিপুল অর্থ ক্ষতি, বাংলা দেশের জনসাধারণের রুচির প্রতি পরিচালকদের বিতৃষ্ণা এবং বিদেশের সম্মান-পদকগুলির দিকে চোখ রেখেই নতুন বই-য়ে হাত দেওয়া—সর্বসাকুল্যে এই বইগুলির লাভ-লোকসানের খতিয়ান শেষ পর্যন্ত এখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বইগুলি দেখলে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এগুলির অন্যতম এবং একমাত্র লক্ষ্য ব্যবসায়িক সাফল্য। তার জন্য এর পরিচালকগণ ধরা-বাঁধা সাফল্যের পথ ছেড়ে এক পাও এদিক ওদিক করতে ইতঃস্তত করেছেন। ধরা বাঁধা সাফল্যের পথ মানে—সর্বপ্রথম বহু বাজে স্বনামধন্য এক বা একাধিক তারকার সমাবেশ (জনপ্রিয় জুটি জোটাতে পারলে তো আর কথাই নেই), চটকদার সংলাপ, নায়ক নায়িকার যুগ্ম প্রদর্শিত একই ভঙ্গি ও ভঙ্গিমা, সাজ পোশাক আর তদনুসারে কাহিনী সৃষ্টি বা কাহিনী নির্বাচন। এ বই-গুলির মধ্যে কোন কোনটির অসাধারণ আর্থিক সাফল্যের মূল বিসাবে বাংলা দেশের জন-রুচিকেই দায়ী করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রকে যে best form of commercial Art বলা হয়, এই দুই শ্রেণীর পরিচালকগণই তার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি বলেই আজকে আমাদের চলচ্চিত্রের এই দুর্দশা। প্রথম শ্রেণীর পরিচালকগণ এর Art form টা নিয়েই মেতে উঠেছেন আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকগণ শুধু Commerce টাই বুঝেছেন—তার ফল যা হতে পারে তাই হয়েছে।

এমন বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে 'গঙ্গা' চিত্রের সাফল্য যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে। এ বইটির সাফল্যের অন্যতম হেতু এর সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিণত পরিচালনা। পরিচালক রাজেন তরফদারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে হয় যে তিনি প্রচলিত দুটি ধারাকেই অস্বীকার করে সম্পূর্ণ এক নতুন ভাবে ভাবিত হয়ে পরিচালনা করে সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি

শ্রীমতী রমা গাঙ্গুলী

সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত করেছেন পরিচালকের পেশাগত অসাধারণ নিষ্ঠাই 'গঙ্গা' বইয়ের সাফল্যের নিশ্চিন্ত নিদর্শন। এতে কোন একদিকে প্রতীকের আশ্রয়ে, বাহ্যিক কূট-কলা কৌশলের মাধ্যমে পরিচালকের অনুচ্ছ ক্ষমতা ও রুচি জাহিরের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার প্রমাণ নেই, তেমনি অপর পক্ষে নাম করা তারকার সমাবেশে বা চটকদার সংলাপ ও সাজ-পোশাকের মাধ্যমে দর্শককে আকৃষ্ট করার সহজ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণের নিদর্শনও নেই। প্রত্যেক নিষ্ঠার সঙ্গে এবং যথাসাধ্য চেষ্টায় যথাযথ ভাবে কাহিনীকে উপস্থিত করবার জন্য পরিচালক 'গঙ্গা' বইতে যে দুঃসাধ্য সাধন করেছেন তার নজীর আর কোন বাংলা বইতে এতাবৎ পাওয়া যায়নি। ষ্টুডিওর মধ্যে সেটের সাহায্যে নয় পরিচালক গঙ্গাবক্ষ বলতে গঙ্গাবক্ষই বুঝেছেন। এবং একটা বেটো দৃশ্য নয় দীর্ঘ সময় ধরে গঙ্গাবক্ষে এই ভাবে ছবি তোলার মধ্যে পরিচালককে কাজ করতে হয়েছে। অথচ এমন পরিচ্ছন্ন রুচির বইটিও সহজেই নিশ্চিন্ত জয় করে আমাদের পূর্বোক্ত দুই দলে পরিচালকেরই সৃষ্টি-ভঙ্গীর আসারত্ব প্রমাণ করেছে।

'গঙ্গা'র অভিনয়ের ক্ষেত্রে একথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে পুরুষ চরিত্রগুলি যেমন প্রায় সবই অভিনীত নারী চরিত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় নায়কের ভূমিকে নিরঞ্জন রায়ের অভিনয়। কি চেহারায়, কি ব্যক্তিত্বে, কি কথাবলার ধরনে নিরঞ্জন তার অংশে 'বিলাসে'র সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। অনুরূপভাবে নাম করতে হয় 'পাঁচু'র চরিত্রে জানেশ বাবুর অভিনয়ের কথা। নায়িকা রমা দেবী চেহারায়-বলনে বলনে সর্বাংশে ব্যর্থ।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে এমন সুপরিচালিত এবং সু-অভিনীত ছবি দেখতে গিয়েও দর্শককে মাঝে মাঝে একঘেয়ে বোধ করতে হয় এবং মিশ্র বইতে রসস্বাদনের চরম বা সুউচ্চ অনুভূতি কোথাও হয় না। তবে এ ত্রুটি ছবির নয় এ ত্রুটি সর্বাংশে কাহিনীর অন্তর্গত সেটাই আমার কথা।

অনেক আশা ও সম্ভাবনার রূপরূপ দেখবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা রাজেন তরফদারের পরবর্তী বইয়ের অপেক্ষায় রইলাম।

সেন

টুকরো খবর :

হলিউড চিত্রজগত সম্পর্কে অনেক মানুষেরই আকর্ষণ আছে। হলিউডের ছবি পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আর সেই সব ছবি থেকে আমেরিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা গড়ে ওঠে। এই ছিল এতকালের ধারণা। গত মাসে কোলারে অনুষ্ঠিত রোটারি ক্লাবের এক সম্বর্ধনা সভায় আমন্ত্রিত U S I S-এর এক পদস্থ কর্মচারী মিঃ থমাস বলেন যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র যেরূপ প্রকৃত ভারতবাসীর জীবন প্রতিফলিত করে না, হলিউডের

'মীরা' চিত্রে জ্ঞানেশ মুখার্জি

...রূপে ও নাটকরূপে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এখন হিন্দীতেও এই ছবি অভিনীত হতে যাচ্ছে। পরিচালক দত্ত শীঘ্রই এই ছবির কাজ বোম্বাইএ আরম্ভ করবেন বলে প্রকাশ।

* * *

কোন অভিনেত্রীর পুরুষ চরিত্রে অভিনয় ভারতীয় চলচ্চিত্রে কেবল নতুনই নয় অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপকও বটে। গীতা প্রোডাকসন্সের "এহি লোক" ছবিতে কোন এক দৃশ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক খ্যাতিমতী অভিনেত্রী শ্রীমতি মধুবালাকে সম্পূর্ণ পুরুষের ভূমিকায় দেখা যাবে। পরিচালকের এ ধরনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সস্তা রুচির চাহিদা মেটাবেনা সত্যিকার কোন সুরুচির পরিচয় দেবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

* * *

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী আসন্নপ্রায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ এ উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার আনন্দ অনুষ্ঠান ও সাহিত্য-বাসরের আয়োজন করছেন। চিত্র-পরিচালকদের মধ্যেও এ ব্যাপারে বেশ একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। সম্প্রতি রাজকুমার-চিত্র সংস্থা কবিগুরুর "দেনা পাওনা" ও 'অপরিচিতা'র চিত্ররূপায়ণ করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এ দুটি ছবির প্রধান স্ত্রী ভূমিকায় অরুন্ধতী রূপ দিচ্ছেন। ছবি দুটি পরিচালনা করছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে শেষ পর্যন্ত "জীবিত ও মৃতের" প্রধান স্ত্রী ভূমিকায় সুমিত্রা দেবী নির্বাচিত হয়েছেন।

* * *

অনেকদিন পর আবার সুচিত্রা-উত্তম এর অভিনয় দেখা যাবে "বিপাশায়"। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছবিটির পরিচালনা করছেন অগ্রদূত। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন গোষ্ঠীপ্রসাদ

...বিশ্বপরিক্রমণ আমেরিকাবাসীর জীবন-যাত্রার প্রকৃত ...তিফলক নয়। তিনি আরও বলেন যে চিত্র প্রদর্শনের ...ময়ে প্রযোজকগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অর্থ-উপার্জনের ...দ্দেশ্যে ... করেন; প্রকৃত শিল্প সৃষ্টি ও সুরুচির পরিচয় ...য়ো খুব অল্প ক্ষেত্রেই দিয়ে থাকেন।

* * *

স্বাধীন জাতির জীবনে শিশু চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে ভারতবর্ষে শিশু চলচ্চিত্রের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি উদয়পুরে রেডার ও তথ্য-দপ্তরের ডঃ কেশকার শিশুচিত্র সংস্থার 'মীরাবাঈ চিত্র'-এর শুভ ...ঘোষন করেন। ঐতিহাসিক রাজপুতানার জীবন-...হিনীকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে এই ছবিতে দেখান হয়েছে। ডঃ কেশকার তাঁর নাগরিকদের জীবন-গঠনে এ ধরনের ...শিশু-চিত্রের বাস্তব রূপায়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

* * *

...বোম্বাই-সংবাদে প্রকাশ যে "বেয়াকুফ" পরিচালক ...হরের আগামী ছবি "রাম, রহিম, রীতা"তে কোন ...ক প্রযোজকের অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। এখন ...খা যায় ভারতের ছবিতে ইংরেজ অভিনেত্রী কতদূর ...কিলাভ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রাম ...হির রীতার কুশ অভিনেতা ও লেখক উভয়ই তিনি।